শরৎ সমগ্র

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অরক্ষণীয়া

অরক্ষণীয়া – ০১

মেজমাসিমা, মা মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন—ধরো।

কে রে, অতুল? আয় বাবা আয়, বলিয়া দুর্গামণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। অতুল প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

নীরোগ হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও। ওরে ও জ্ঞানদা, তোর অতুলদাদা ফিরে এসেছেন যে রে! একখানা আসন পেতে দিয়ে মহাপ্রসাদটা ঘরে তোল মা। কাল রাত্তিরে সাড়ে-নটা দশটার সময় সদররাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনে ভাবলুম, কে এলো! তখন যদি জানতুম, দিদি এলেন—ছুটে গিয়ে পায়ের ধূলো নিতুম। এমন মানুষ কি আর জগতে হয়! তা' দিদি ভাল আছেন বাবা? এখন পুরী থেকে আসা হ'ল বুঝি? কি কচ্ছিস মা—তোর অতুলদা যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মায়ের আহ্বানে একটি বার-তের বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে হাতে একখানি আসন লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল; এবং যতদূর পারা যায়, ঘাড় হেঁট করিয়া দাওয়ার উপর আসনখানি পাতিয়া দিয়া, অতুলের পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিল; কথাও কহিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, মহাপ্রসাদের পাত্রখানি হাত হইতে লইয়া, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, যাবার সময়ে মেয়েটির চোখমুখ দিয়া একটা চাপা হাসি যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

আবার শুধু মেয়েটিই নয়। এদিকেও একটুখানি নজর করিলে চোখে পড়িতে পারিত, এই সুশ্রী ছেলেটিরও মুখের উপরে দীপ্তি খেলিয়া একটা অদৃশ্য তড়িৎপ্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয় গেল।

অতুল আসনে বসিয়া তীর্থ-প্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল। তাহার বাপ একজন সেকেলে সদরআলা ছিলেন। অনেক টাকাকড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি

করিয়া পেনসন লইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন; বছর-চারেক হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বি. এ. একজামিন দিয়া অতুল মাস-দুই পূর্বে মাকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি রামেশ্বর হইয়া, পুরী হইয়া কাল ঘরে ফিরিয়াছে।

গল্প শুনিয়া দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর এমনি মহাপাতকী আমি যে, আর কিছু না হোক, একবার কাশী গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করে আসব, এ-জন্মে সে সাধটাও কখন পুরল না।

অতুল বলিল, কাশীই বল, আর যাই বল মেজমাসিমা, একবার সব ছেড়েছুড়ে জোর ক'রে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর হয় না। আমি অমন জোর ক'রে না নিয়ে গেলে, আমার মায়েরই কি যাওয়া হ'ত?

দুর্গামণি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, জানিস ত বাবা সব। জোর করব কি দিয়ে বল দেখি? তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে, ডাক্তার-বদ্যির ওষুধের খরচ যুগিয়ে কি থাকে বল দেখি? আর এই মেয়েটা দেখতে দেখতে তেরোয় পা দিলে। তোকে সত্যি বলচি, অতুল, ওর পানে চাইলেই যেন আমার বুকের রক্ত হুহু করে শুকিয়ে যায়! উঃ! এতবড় শত্রুকেও পেটে ধরে মাকে লালন-পালন করতে হয়! বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অতুল এতবড় দুশ্চিন্তা ও কাতরোক্তির সম্মুখেও ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল; কহিল, মাসিমার সব বাড়াবাড়ি! আচ্ছা, মেয়ে কি আর কারু হয় না যে, তোমারই শুধু ওই একটা হয়েছে—আর রাজ্যের দুর্ভাবনা একা তোমার?

দুর্গামণি কহিলেন, আমার এটা ঠিক ভাবনা নয়, অতুল, এ আমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা! সমাজ আমি জানি ত! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে;

কিন্তু দেব কি ক'রে? টাকা চাই—কিন্তু পাব কোথায়? এই ভদ্রাসনের একাংশ ছাড়া আপনার বলতে ত আর কিছু নেই বাবা!

আধ-ঘণ্টা পূর্বে এই মেয়েটাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যথা দুর্গামণির মনে আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং টপটপ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বাহিয়া কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আর-জন্মে কত স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম অতুল, যে, এ-জন্মে মেয়ে পেটে ধরেচি।

নাঃ—মেজমাসিমা, আমি উঠলুম, নইলে তুমি থামবে না।

দুর্গামণি আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিলেন, না বাবা, একটু বোস, দু'দণ্ড তোর কাছে কাঁদলেও বুকটা হালকা হয়। তাই বলি, ভগবান! হতভাগীকে আমার কোলেই যদি পাঠালে, রংটা একটু ফরসা করেই পাঠালে না কেন? কালো ব'লে কেউ যে ওকে আশ্রয় দিতেই চায় না! সবাই যে চায় সুন্দরী মেয়ে। ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুল, শীল, স্বভাব, চরিত্র কিছুই যদি দেখবি নে, মেয়ে শুধু কালো বলেই তাকে ঘরে ঠাঁই দিবিনে, তবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ-মাকে দণ্ড দিবি কেন?

অতুল কহিল, কালো মেয়ের কি বিয়ে হচ্ছে না? ভোমরাও কালো, কোকিলও কালো—তাদের কি আদর হয় না? এ-সব ত চিরকালের দৃষ্টান্ত—মেজমাসিমা!

দুর্গামণি কহিলেন, তাই দৃষ্টান্তই শুধু চিরজীবী হয়ে আছে বাবা, আর কিছু নেই। কিন্তু তাতে আর সান্ত্বনা পাইনে, জোরও পাইনে অতুল। গিরীশ ভটচায্যির মেয়ের বিয়ে চোখের উপর দেখে হাত-পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেছে! ঠিক আমাদের মতই—না ছিল তার টাকার বল, না ছিল মেয়ের রূপ—তাই পাত্রের

বয়সও গেল ষাটের কাছাকাছি। তার মায়ের কান্নাটা আমি আজও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি।

অতুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—ষাটের কাছাকাছি? বল কি?

তা হবে বৈ কি বাবা! হরি চক্কোত্তির নাতজামাই হ’ল ওপাড়ার নিতাই চাটুয্যে। তারই একটা আট-দশ বছরের মেয়ে যে! হিসেব করে দেখ দেখি।

খবর শুনিয়া অতুল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুর্গামণি বলিতে লাগিলেন, সে মেয়ে যদি মনের ঘেন্নায় বিষ খায়, কি গলায় দড়ি দেয়, কিংবা কুলে কালি দিয়ে চলে যায়—মা হয়ে তাকে বুকের ভেতর থেকে অভিশাপ দিই কেমন করে, বল দেখি বাবা?

অতুল চুপ করিয়া রহিল। দুর্গামণি হঠাৎ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা অতুল, আজকাল সবাই বলে, তোদের ছেলেদের মধ্যে দয়াধর্ম আছে। দেখিস নে বাবা, তোদের ইস্কুল-কলেজের কোন ছেলে যদি নিতান্ত দয়া করেই মেয়েটাকে তার পায়ে একটুখানি ঠাঁই দেয়। তাহলে তোদের কাছে আমি মরণ পর্যন্ত কেনা হয়ে থাকবো।

অতুল শশব্যস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কেন এত ব্যস্ত হচ্চ মেজমাসিমা? আমি কথা দিচ্চি—

কিন্তু কথাটা সে দিতে পারিল না। সহসা লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্গামণি যদিচ ইহা লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু আর কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত সংশয় করিত, কি এমন কথাটা অতুল ঝোঁকের উপর দিতে গিয়াও এমন করিয়া থামিয়া গেল।

অতুল নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজভাবে কহিল,আচ্ছা, খুব চেষ্টা করব।—কৈ রে জ্ঞানদা, একটা পান-টান দে না—বাড়ি যাই।

দুর্গামণি রাগিয়া চিৎকার করিলেন, তোর অতুলদারে একটা পান দে না গেনি। মুখপোড়া মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ। বলি, এ-সব কথাও কি শেখাতে হবে? মহাপ্রসাদ নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকলি, আর বেরুলি নে। শিগ্‌গির পান নিয়ে আয়।

আচ্ছা, আমি নিজেই গিয়ে পান নিচ্চি—কোন্ ঘরে রে জ্ঞানদা! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া অতুল শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখে পানের সজ্জা লইয়া মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অতুল ঘরে ঢুকিয়াই গম্ভীর হইয়া বলিল, মেজমাসিমা বলচেন, মুখপোড়া গেনির না আছে রূপ, না আছে গুণ। তাকে একটা ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

জ্ঞানদা জবাব দিল না, অবনত মুখে বাটা হইতে গোটা-দুই পান লইয়া হাত উঁচু করিয়া ধরিল।

অতুল পিছনে আসিয়া হাত হইতে পান লইয়া কহিল, কিন্তু পান সাজা ভাল হলে এবার মাপ করা হবে, ষাটকে কমিয়ে না হয় কুড়ি-একুশে দাঁড় করান যাবে।

জ্ঞানদা লজ্জায় মাথাটা ঝুঁকাইয়া প্রায় বাটার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। অতুল গলা খাটো করিয়া বলিল, মাসিমার কাছে আর একটু হলে বলে ফেলেছিলুম আর কি! আচ্ছা, বেলা হ'ল চললুম।

জ্ঞানদা ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সেই যে জড়সড় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

কথা কওয়া হ'ল না? আচ্ছা—বলিয়া অতুল মেয়েটির ভিজা এলো চুলের একগোছা টানিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু আসচে হরি চক্কোত্তির মতন একটা বুড়ো—চললুম, বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু উঠানে পা দিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, মেজমাসিমা, জ্ঞানোর জন্যে বোম্বাই থেকে মা একজোড়া চুড়ি কিনেছিলেন, বাইরে এসে দেখ—

কৈ, দেখি বাবা,—বলিয়া দুর্গামণি পুনরায় রন্ধনশালা হইতে বাহির হইলেন। অতুল পকেট হইতে দু'গাছি চুড়ি বহির করিয়া মেলিয়া ধরিল।

তাহার রং এবং কারুকার্য দেখিয়া দুর্গামণি অত্যন্ত পুলকিত-চিত্তে দাতার ভূয়োঃভূয়োঃ যশোগান করিতে লাগিলেন। চুড়ি দু'গাছি কাঁচের বটে, কিন্তু সেরূপ মূল্যবান বাহারে চুড়ি পাড়াগাঁয়ে কেন, কলিকাতাতেও তখনো আমদানি হয় নাই। বস্তুতঃ তাহার গঠন, চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য দেখিয়া মায়ের নাম করিয়া অতুল নিজের টাকাতেই বোম্বাই হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

মায়ের ডাকাডাকিতে জ্ঞানদা বাহির হইয়া আসিল এবং নিঃশব্দ-নতমুখে স্নেহের এই প্রথম উপহার হাত পাতিয়া গ্রহণ কারিতে গিয়া তাহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপিয়া গেল। তার পরে দাতার পায়ের কাছে নমস্কার করিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। সে একটি কথাও কহে নাই—কিন্তু আজ তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানিলেন। শুধু পিছনে দাঁড়াইয়া এই দুটি মানুষ ক্ষণকালের জন্য সস্নেহ-মুগ্ধ-নেত্রে এই কিশোরীর অনিন্দ্য গঠন ও গতিভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অরক্ষণীয়া – ০২

বড়ভাই গোলোকনাথ মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরি নির্বংশ পিতৃকুলের যৎসামান্য বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া হাতে কিছু নগদ পুঁজি করিয়া, কনিষ্ঠ দেবর অনাথনাথকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহারই বিষের অসহ্য জ্বালায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মেজভাই প্রিয়নাথ গত বৎসর ঠিক এমন দিনে ছোটভাই অনাথের সঙ্গে বিবাদ করিয়া উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া পৃথগন্ন হইয়াছিলেন এবং মাঝখানে একটা কপাট রাখার পর্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, তখন রঙ্গ দেখিয়া বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিতেছিলেন। কারণ, একটা বৎসরও কাটিল না–প্রাচীরের সমস্ত উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিয়া দিয়া, সেদিন প্রিয়নাথ সাতদিনের জ্বরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর আগের দিনটায়–মরণ সম্বন্ধে যখন আর কোথাও কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না, এবং তাই দেখিতে সমস্‌ত গ্রামের লোক পিলপিল করিয়া বাড়ি ঢুকিয়া, ঘরের দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট কলকণ্ঠে হা-হুতাশ করিতেছিল, তখনও প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই। অতুল গ্রামে ছিল না। কলিকাতার মেসে ওই দুঃসংবাদ পাইয়া আজ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া যখন সে রোগীর ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কোথা হইতে জ্ঞানদা পাগলের মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। যাহারা তামাশা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই আর একটা অভাবনীয় ফাউ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু অতুল এত লোকের সমক্ষে দুঃখে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে যখন সে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, তখন জ্ঞানদা জোর করিয়া পায়ের উপর মুখ চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবার মরণকালে তুমি নিজের মুখে তাঁকে একটা সান্ত্বনা দিয়ে যাও– আমার অদৃষ্টে পরে যাই থাক– এ-সময় আমার মতন আমার ভাবনাটাকেও যেন তিনি এইখানেই ফেলে রেখে যেতে পারেন–আর তোমার কাছে আমি কখন কিছু চাইব না।–বলিয়া তেমনি করিয়াই মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্ভাগা পিতা অত্যন্ত অসময়ে অকালে মরিতেছে–আজ আর তাহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না–এত লোকের সম্মুখে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কিছুই ভাবিয়া দেখিল না,—ক্রমাগত একভাবে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু অতুল সংযমী লোক। জ্ঞানদার এই ব্যবহার অন্তরে সে যত ক্লেশই অনুভব করুক, বাহিরে এতগুলি কৌতূহলী চক্ষের উপর কঠিন হইয়া উঠিল।

জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া মৃদু তিরস্কারের স্বরে কহিল, ছি, শান্ত হও, কান্নাকাটি করো না–আমার যা বলবার তা আমি বলব বৈ কি। বলিয়া মুমূর্ষুর শয্যার একাংশে গিয়া উপবেশন করিল। দুর্গামণি স্বামীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন, অতুলের মুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী নীলকণ্ঠ চাটুয্যে দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; অতুলের বিলম্ব দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়নাথের এখানো একটু জ্ঞান আছে বাবা, যা বলবে, এইবেলা বেশ চেঁচিয়ে বল–তা হলেই বুঝতে পারবে। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের এই প্রস্তাব আরও দুই-একজন তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিল।

জনতা দেখিয়া অতুল প্রথমেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার উপর ইহাদের এই নিতান্ত অশোভন কৌতূহলে সে মনে মনে আগুন হইয়া কহিল, আপনারা নিরর্থক ভিড় করে থেকে ত কোন উপকার করতে পারবেন না,—একটুখানি বাহিরে গিয়ে বসলেই আমার যা বলবার বলতে পারি। নীলকণ্ঠ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিরর্থক কি হে? প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশীই এসে থাকে। তুমি

কোন্ সার্থক উপকার করতে বিছানায় গিয়ে বসেচ বাপু? অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি উপকার করি না করি, আপনাদের এমন করে বাতাস আটকে অপকার করতে আমি দেব না। সবাই বাইরে যান।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলকণ্ঠ দু' পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সেদিনকার ছোকরা–তোমার ত বড় আস্পর্ধা দেখি হে! কে একজন তাঁহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, এল.এ.বি.এ. পাশ করেচে কিনা! একটা দশ-বার বছরের ছোঁড়া উঁকি মারিতেছিল। অতুল কাহারও কথার কোন জবাব না দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। সে গিয়া আর একজনের গায়ে পড়িল। যাহার গায়ে পড়িল, সে অস্ফুটস্বরে সদরআলার ব্যাটা প্রভৃতি বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভদ্রলোক অতুলের কথাটা শুনিবার বিশেষ কোন আশা না দেখিয়া, মনে মনে শাসাইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন বাহিরের লোক আর কেহ রহিল না, তখন অতুল মুমূর্ষুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, মেসোমশাই! প্রিয়নাথ রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অতুল পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন কি? প্রিয়নাথ চক্ষু মুদিয়া অস্ফুটে বলিলেন, অতুল।

এখন কেমন আছেন?

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া তেমনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, ভাল না।

অতুলের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল, মেসোমশাই, একটা কথা আপনাকে জানাচ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন–আজ থেকে জ্ঞানদার ভার আমি নিলুম। প্রিয়নাথ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কৈ জ্ঞানদা?

দুর্গামণি স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন, একবার দেখবে জ্ঞানদাকে? প্রিয়নাথ প্রথমটা জবাব দিলেন না–শেষে বলিলেন, না!

দুর্গামণি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অতুল কি বলচে, শুনেচ? সে তোমার জ্ঞানদার ভার নিতে এসেচে। আর তুমি ভেবো না–হতভাগীকে অনেক গালমন্দ করেচ; আজ একবার ডেকে আশীর্বাদ করে যাও।

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুর্গামণি আবার সেই কথা আবৃত্তি করার পর, তাঁহার চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অক্ষম হাতখানি অনেক কষ্টে তুলিয়া, অতুলের কপালে একবার স্পর্শ করাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না বটে, কিন্তু এই আসন্নকালে তাঁহার হৃদয়ের একটা অতি গুরুভার নিঃসংশয়ে তুলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে অনুভব করিয়া অতুল অকস্মাৎ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাক্ষী রহিলেন–শুধু দুর্গামণি আর ভগবান।

পরদিন সায়াহ্নকালে, শতকরা আশীজন ভদ্র-বাঙ্গালী যাহা করে, প্রিয়নাথও তাহাই করিলেন। অর্থাৎ, অফিসের ত্রিশ টাকা চাকরির মায়া কাটাইয়া, ছাব্বিশ বৎসরের বিধবা ও তের বৎসরের অনূঢ়া কন্যার বোঝা তদপেক্ষা কোন এক দুর্ভাগ্য আত্মীয়ের মাথায় তুলিয়া দিয়া, ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ছিয়াশী বৎসরের সমতুল্য একটা জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তুলসীবেদীমূলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।

অরক্ষণীয়া – ০৩

ছোটভাই অনাথনাথকে বাধ্য হইয়া প্রাঙ্গণের প্রাচীরে একটা দ্বার ফুটাইতে হইল। অগ্রজের শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেলে পনর-ষোল দিন পরে একদিন তিনি অফিসে যাইবার মুখে চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, আর না বললে ত নয় বোঠান, বুঝতে ত সবই পার–খেতে তোমাকে একবেলা একমুঠো দিতে আমি কাতর নই–তা দাদা আমার সঙ্গে যতই কেন না কুব্যবহার করে যান। কিন্তু এতবড় মেয়ের বিয়ের ভার ত আমি আর সত্যি সত্যি নিতে পারিনে। শুনতেই আমার দেড়-শ টাকা মাইনে, কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা ত কম নয়? তা ছাড়া আমার নিজের মেয়েটাও বার বছরে পড়ল, দেখতে পাচ্চ ত। তাই, আমি বলি কি, মেয়ে নিয়ে এ সময়ে তোমার একবার হরিপালে যাওয়া উচিত।

দুর্গামণি রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া ছিলেন; সভয়ে সসঙ্কোচে কহিলেন, দাদার অবস্থা তুমি ত জান ঠাকুরপো। কিচ্ছু নেই তাঁর। এতবড় বিপদের কথা শুনে একবার দেখা পর্যন্ত দিতে এলেন না। তা ছাড়া, না নিয়ে গেলেই বা যাই কি করে?

বড়বৌ স্বর্ণমঞ্জরী দেবরের পার্শ্বে প্রাচীরের আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, একটুখানি গলা বাড়াইয়া কহিলেন, দাদার অবস্থা ভাল নয় জানি, কিন্তু তোমার দেওরটিই কোন্ লাটসাহেব মেজবৌ? আর ঐ শুনতেই দেড়-শ! কিন্তু যা করে আমি সংসার চালাই, তা আমি ত জানি! আর তাও বলি–অত বড় ধুম্‌সো মেয়ে তোমার ঘাড়ে--কে তোমাকে যেচে ঠাঁই দিতে যাবে বল দিকি? কিন্তু তা বলে মান-অভিমান করে বসে থাকলে ত চলে না!

দুর্গামণি ধীরে ধীরে বলিলেন, না দিদি, আমার আবার মান-অভিমান কি!

স্বর্ণ দেওরকে বাঁ হাত দিয়া পিছনে ঠেলিয়া, নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, তোমাকে মন্দ কথা ত আমি বলিনি মেজবৌ, যে অমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি বললে? তা, রাগই কর, আর ঝালই কর বাপু--তোমার ঐ ডানাকাটা পরীর বিয়ে দিতে আমরা পারব না| মেয়ে ত ঐ ছোটবৌটাও পেটে ধরেচে। কেউ একবার বাছাদের মুখপানে চেয়ে দেখলে আবার নাকি সে চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে! তা সত্যি কথা বলব মেজবৌ--যেমন তোমার মেয়ের ছিরি, তেমনি গিয়ে হরিপালে পোড়ে-হোড়ে থেকে যা-হোক একটা চাষা-ভূষো ধরে দাও গে--ন্যাটা চুকে যাক। শুনেচি নাকি--সেখানকার লোক সুচ্ছিরি-কুচ্ছিরি দেখে না--মেয়ে হলেই হ' ল।

দুর্গামণি চুপ করিয়া রহিলেন। যে বিষের জ্বালায় একদিন তাঁহারা পৃথক হইয়াছিলেন, সেই বিষদন্ত পুনরায় উদ্যত দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন। স্বর্ণ কহিলেন, যার যেমন! তোমাকে কেউ ত নিন্দে করতে পারবে না। হাঁ, পারে বটে বলতে আমাকে। তিনটে পাশের কম যদি জামাই ঘরে আনি, দেশসুদ্ধ একটা ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বলবে–এটা করলে কি! এতবড় একটা জ্যাঠাই ঘরে থাকতে কিনা দুর্গাপ্রতিমে জলে ভাসিয়ে দিলে! সত্যি কিনা বল ঠাকুরপো? বলিয়া স্বর্ণ অনাথের প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

তা বৈ কি! বলিয়া অনাথ তাহার মহামান্য বড়ভাজের মর্যাদা রাখিয়া অফিসের বেলা হওয়ার অছিলায় প্রস্থান করিল।

স্বর্ণ বলিলেন, তোমার ভাইকে ধরে-করে যা হোক একটা ধরে-পাক্ড়ে দাও গে। তাতে তোমার লজ্জা নেই মেজবৌ, কেউ নিন্দে করতে পারবে না। তিরিশটি টাকা ত সবে মাইনে ছিল, কেই বা তাকে জানত, আর কেই বা চিনত। এঁদের ভাই বলেই যা লোকে জানে। আমি বলি কি--কাল দিনটে ভাল আছে, কালই চলে যাও।

দুর্গামণি মনে মনে একবার অতুলের কথা ভাবিলেন, কিন্তু, ইহার সাক্ষাতে কোন কথা কহিলেন না। কারণ এই বড়জায়ের সম্বন্ধেই অতুলের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। স্বর্ণ অতুলের মায়ের মামাত বোন।

সেদিন কেমন করিয়া জ্ঞানদা অতুলের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদাকাটা করিয়াছিল, মা তাহা দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতবড় বিপদ মাথার উপর লইয়া ইহার বিশেষ কোন অর্থ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখীর ঘরে ত একান্ত-মনে শোক করিবারও অবসর নাই! তাই স্বামীর মৃত্যুর পরের দিন হইতেই এই কথাটা চিন্তা করিতেছিলেন। ঘরে গিয়া দেখিলেন, মেয়ে চুপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, দিদি যা বললেন শুনেচিস ত?

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। তার পরে যে তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

কিন্তু মেয়ে নিজেই তাহার সুবিধা করিয়া দিল। কহিল, কখ্‌খনো ত বাপের বাড়ি যাওনি মা, এ সময় একবার কেন চল না?

মা বলিলেন, মা বেঁচে নেই, দাদা কোনদিন খোঁজ নিলেন না। এতবড় বিপদ শুনেও একটা চিঠি পর্যন্ত লিখলেন না। কেমন করে তাঁদের কাছে সেধে যাই, বল্‌ দেখি মা?

মেয়ে কহিল, দুঃখীর খোঁজ কেউ সেধে কখনো নেয় না মা। তাঁরা নেননি—এঁরাও ত নেন না। এঁরা বরং যেতেই বলচেন। আমাদের মান-অভিমান বাবার সঙ্গেই চলে গেছে, মা। চল, আমরা সেখানে গিয়েই থাকি গে।

মায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেয়ে সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিল, আমি জানি, শুধু আমার জন্যেই তুমি কোথাও যেতে চাও না। নইলে, জ্যাঠাইমার কথা শুনে একটা দিনও তুমি এখানে থাকতে না। আমার জন্যে তোমাকে এতটুকু ভাবতে হবে না মা, চল, দিন-কতকের জন্যে আমরা আর কোথাও যাই। এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে।

মা আর থাকিতে পারিলেন না, মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মেয়ে বাধা দিল না, শান্ত করিবার চেষ্টা করিল না; শুধু নীরবে জননীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দুর্গামণি নিজেই কতকটা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, তোকে সত্যি বলচি জ্ঞানদা, তুই না থাকলে আমি যেখানে দু' চক্ষু যায় সেইদিনই চলে যেতাম যেদিন তিনিও জন্মের মত চলে গেলেন। শুধু তোর জন্যেই পারিনি।

তা আমি জানি মা।

আচ্ছা, একটা কথা আমাকে সত্যি করে বল দেখি, বাছা, সেদিন কেন অতুল ও-কথা বললে? না জ্ঞানদা, অমন করে মুখ ঢেকে থাকিস নে মা, লজ্জা করবার সময় এ নয়। আমি জানি, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয়। তবে, সেই বা কেন তাঁর মরণকালে অমন ভরসা দিলে আর তুই বা কেন তার পায়ে পড়ে অমন করে কাঁদলি?

জ্ঞানদা মায়ের বুকের মধ্য হইতে অস্ফুটে কহিল, সে আমি জানিনে, মা।

দুর্গামণি জোর করিয়া মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমার কখনো কিছু মনে হয়নি বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে ভেবে ভেবে এখন যেন অনেক কথাই বুঝতে পারি। অতুলের মুখের কতদিনের কত ছোটখাট কথাই না আজ আমার মনে হচ্চে। বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ ব্যগ্র হইয়া কন্যার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি বল মা, আমি যা মনে করেচি, তা মিথ্যে নয়! আমি এ ক' দিন শুধু স্বপন দেখিনি?

জ্ঞানদা তেমনি মুখ ঢাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, কি জানি মা, তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া কহিলেন, আমাকে সংশয়ে ফেলে রেখে আর বিঁধিস নে মা, একবার মুখ ফুটে বল্–আমি তোর বাপের জন্যে একটিবার প্রাণ খুলে কাঁদি। আমার এ কান্না আজ তিনি শুনতে পাবেন।

মেয়ে চুপি চুপি কহিল, কাঁদো না মা–আমি ত তোমাকে কাঁদতে বারণ করিনে। বাবাকে জানাতে বলেছিলাম–তিনি নিজেই ত জানিয়েচেন। এখন তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি এবার আর বাধা মানিলেন না। জোর করিয়া মেয়ের আরক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে অজস্র চুম্বন করিয়া, পুনরায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, নীরবে বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিলেন। পরে চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই বটে মা, তাই বটে! অতুল আমার দীর্ঘজীবী হোক–তার ধর্ম তার কাছেই বটে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের কারু একদিনের তরে মনে পড়েনি মা, তুই নিজেই যে তাকে মরা বাঁচিয়েছিলি। সে বছর, লোকে বললে–বেরিবেরি রোগ। তা সে যে রোগই হোক–ফুলে ফেটে, ঘা হয়ে,–আগে তার মা, তার পরে অতুল। অতুলের তো কোন আশাই ছিল না। পচা গন্ধে, ভয়ে, কেউ যখন তাদের ওদিক মাড়াত না, তখন এতটুকু মেয়ে হয়ে তুই যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলি। সে ধর্ম সে কি না রেখে পারে? সাবিত্রীর মত যাকে যমের হাত থেকে তুই ফিরিয়ে এনেছিলি, তাকে কি ভগবান আর কারু হাতে তুলে দিতে পারেন? এ ধর্ম যদি না থাকে, তবে চন্দ্র-সূর্য এখনও উঠচে কেন?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, এখন যেখানে আমাকে বলিস সেইখানেই যাব। কিন্তু তুই ত তার মত না নিয়ে যেতে পারিস নে বাছা। তাই বটে! তাই বটে! তাই বাবা আমার ফিরে এসেই, সকাল হতে না হতে দু' গাছি চুড়ি দেবার ছল করে মাকে আমার দেখতে এসেছিল।

ওগো, আর একটা বছর কেন তুমি বেঁচে থেকে চোখে দেখে গেলে না! বলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া রোধ করিলেন।

বলি মেজবৌ?

দুর্গামণি তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুক হইতে ঠেলিয়া দিয়া, চোখটা মুছিয়া লইয়া সাড়া দিলেন, কেন দিদি?

বড়বৌ একবার ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া কঠিন-স্বরে বলিলেন, তোমাদের না হয় শোকের শরীরে ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; কিন্তু বাড়ির আর সবাই ত উপোস করে থাকতে পারে না। বেরিয়ে একবার বেলার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

দুর্গামণি শশব্যস্তে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলার দিকে চাহিয়া লজ্জিতমুখে মেয়ের নাম করিয়া কি একটুখানি জবাবদিহি করিতেই, স্বর্ণমঞ্জরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, বেশ ত। হেঁসেলটা চুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে কাছে বসিয়ে সারাদিন বোঝাও না– আমি কথাটিও কব না। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েগুলো যে পিত্তি পড়ে মারা যায়। না বাপু, এমনধারা সব অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি সইতে পারব না। বলিয়া নিঃসন্তান বড়বৌ ছোটবধূর সন্তানদের প্রতি মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

অনাথের সংসার পুনরায় প্রবেশ করা অবধি দুর্গাকেই রান্নাঘরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে বড়বৌ এবং ছোটবৌ উভয়েই সমস্তদিনব্যাপী ছুটি পাইয়া, একজন পাড়া বেড়াইয়া এবং খরচপত্র অত্যন্ত বেশী হইতেছে বলিয়া কোন্দল করিয়া, এবং আর একজন ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন।

অনাথ সাড়ে-আটটার ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরে উঠিয়া যথাসময়ে তাঁহার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, এ-বাটীতে একটা নিদারুণ অশান্তির ব্যাপার ছিল। এই লইয়া বড় এবং ছোট জায়ে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি এবং মন-কষাকষি চলিত। এ কয়দিন এই হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক দিনের পর

আবার একটা ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধনের সূচনা হইতেছিল। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ সেই বাঁধনটা আর একবার ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার কারণ এই যে, বেলা সাতটা বাজে, এবং ঝি আসিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত ছোটবধূকে জানাইল যে, কয়লার উনানের আঁচ উঠিয়া গিয়াছে, একটু তৎপর হইয়া রান্না চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ছোটবৌ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, মেজদি কি করচে? বেলা সাতটা বাজে—আজ বুঝি তার সে হুঁশ নেই?

ঝি কহিল, হুঁশ কেন থাকবে না গা? ভোরে উঠে মায়ে-ঝিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা করচে—এই আটটার গাড়িতে হরিপাল না কোথায় যাবে যে!

ছোটবৌর কালকার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রসন্ন না হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, যাবে বললেই যাবে নাকি? বাবুর হুকুম নিয়েচে? দিদিকে জানিয়েচে?

ঝি কহিল, বাবুর কথা জানিনে ছোটবৌমা, কিন্তু বড়মা ত নিজেই তাদের আজ যেতে বলেছিল।

তবে, তাকেই বল গে সাড়ে-আটটার ভাত দিতে—আমি জানিনে, বলিয়া ছোটবৌ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া খানিকটা গুলগুঁড়ানো ঠোঁটের ভেতর পুরিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া খিড়কির দিকে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ঝি বলিল, থাকলে ত বলব! তিনি গেছে গঙ্গাচ্চান করতে—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ছোটবৌকে ফিরিতে হইল, কারণ অফিসের সাহেব তাহার রাগের মর্যাদা বুঝিবে না। হয় যা-হোক দুটা সিদ্ধ করিয়া দিতেই হইবে, না হয় স্বামীকে ঠিক সময়ে অভুক্তই যাইতে হইবে। দুটার একটা অপরিহার্য। ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া দুর্গামণির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, যাবেই ত। কিন্তু এমন খোলোমি করে না গেলেই কি হত না মেজদি?

এই অভাবনীয় আক্রমণে দুর্গামণি অবাক হইয়া গেলেন।

ছোটবৌ কহিল, আমরা কেউ জানিনে, তোমরা সকালেই যাবে। তিনি গেছেন গঙ্গা নাইতে। আমি ত এই উঠচি। টাইমের ভাত কি করে দিই বল দেখি?

প্রাতঃপেন্নাম হই মাসিমারা, বলিয়া অতুল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি হঠাৎ যে অতুল?

অতুল কলিকাতার মেসে থাকে। সেখানে চিঠি পাইয়া ছুটাছুটি করিয়া এইমাত্র আসিয়া জুটিয়াছে–এখনও বাড়ি যায় নাই। কহিল, মেজমাসিমা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর শেষ দেখাটা একবার দেখতে আসব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ডিপো! তা এই আশ্বিনের শুরুতেই এমন সুবুদ্ধিটা তোমাকে কে দিলে বল দেখি, মেজমাসিমা? বাঃ–বাঁধাছাঁদা একেবারে কমপ্লিট যে! বলিয়া সে সহাস্যে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই একপ্রান্ত হইতে একজোড়া জলেভরা আরক্ত চক্ষুর টেলিগ্রাফ পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল।

ছোটবৌ প্রশ্ন করিল, তুমি কি করে খবর পেলে অতুল?

আমি? বাঃ–, বলিয়া অতুল তাহার কৈফিয়ত শেষ করিল।

অকস্মাৎ প্রাঙ্গণের কোন একটা অনির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠস্বর শব্দভেদী বাণের মত আসিয়া প্রত্যেকের কানে বিঁধিল। অর্থাৎ তিনি গঙ্গাস্নানে শান্ত-শুচি হইয়া বাটীতে পা দিয়াই ঝির মুখে কয়লার উনুনের খবর পাইয়াছিলেন। সুতরাং মেজজায়ের সদ্য-বৈধব্যের যথার্থ হেতুটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন–চারপো পূর্ণ না হলে কি ভগবান কারু এমন সর্বনাশ করেন? করেন না। এ তাঁর ধর্মের সংসার–এখানে অধর্ম হবার জো নেই। সোজা চলিয়া আসিয়া ঘরের চৌকাঠের ভিতরে একটা পা দিয়া কহিলেন, মতলবটা ত তোমার এই, মেজবৌ–না খেয়ে উপোস করে ছোটকর্তা অফিসে যাক, সন্ধ্যাবেলা পিত্তি পরে জ্বর হয়ে বাড়ি আসুক। তারপর নিজের যেমন হয়েছে তেমনি সর্বনাশ আরো একজনের হোক।

দুর্গামণি মনে মনে শিহরিয়া কহিলেন, এ কপাল যার পুড়েচে দিদি, সে অতিবড় শত্রুর জন্যেও অমন কামনা করে না। কিন্তু কি করেচি তোমার যে, এত কটু কথা আমাকে উঠতে বসতে শোনাচ্চ?

স্বর্ণ হাত নাড়িয়া মুখ অতি বিকৃত করিয়া কহিলেন, কচি খুকী যে! আমাকে বলতে হবে–কি করেচ? সাড়ে-সাতটা বাজে–টাইমের ভাত রাঁধবে কে?

অতুল এতক্ষণ অবাক হইয়া শুনিতেছিল। তাহার বড়মাসিকে সে ভাল করিয়াই চিনিত; এইজন্য কথাবার্তাও বড় একটা কহিত না। কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই প্রশ্নের জবাব দিয়া বসিল। কহিল সত্যি কথা বললে তুমিই রাগ করবে মাসিমা; কিন্তু কপাল নেহাত না পুড়লে, আর কেউ তোমাদের ভাত খেতে আসে না, সে-কথা তোমরাও জান, পাড়ার আর পাঁচজনেও জানে। কিন্তু আজ যাবার দিনটায় হতভাগিনীদের একটুখানি মাপ করলে তোমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না, মাসিমা।

হঠাৎ অতুলের কথার ঝাঁজে দুই জায়েরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মিনিট-খানেক কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে স্বর্ণ কহিলেন, কোলকাতা থেকে তুই কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসে হাজির হয়েচিস নাকি রে?

ছোটবৌ বলিল, ঝগড়া করতে আসবে কেন দিদি? ওর মেজমাসিকে আমরা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করাচ্চি, ও তাই যে শেষ দেখাটা দেখতে এসেচে।

ও, তাই বটে?

ছোটবৌ কহিল, তাই দিদি, তাই। তাই তখন থেকে ভাবচি, আমরা বাড়ির লোক জানলাম না, তোমার বোনপোটি কলকাতায় বসে জানলে কি করে? তা হলে লোকে যা বলে তা মিথ্যে নয় দেখচি।

স্বর্ণ ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া চেঁচাইয়া বিদ্রূপ করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। বলিতে লাগিলেন, বেশ ত বাছা, এতই যদি দরদ জন্মে থাকে,

তোমার শাশুড়িমাসিকে গঙ্গাযাত্রা করাবে কেন, ঘরেই নিয়ে যাও না। গাঁ-সুদ্ধ লোক বাহবা করবে এখন।

তাঁহার বিষের জ্বালায় অতুলেরও মাথা বেঠিক হইয়া গেল। সেও বলিয়া বসিল, বেশ ত মাসিমা, তোমরা আপনার লোক, কথাটা যদি দু’ দিন আগেই জেনে থাক, ভালই ত। উনি আমার ঘরে গেলে, আমি মাথার করে নিয়ে যেতে রাজি আছি। তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো তাতে বাহবা দেবে, কি ছি ছি করবে, আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অতুল নিজেও যেমনি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গুরুজনেরাও তেমনি অসহ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ যেন অকস্মাৎ কোথা একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ছুটিয়া আসিয়া লজ্জা-শরম আড়াল-আবডাল সমস্তই চক্ষের পলকে ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া মস্ত একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে সবাইকে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল। কাহারও কাছে কাহারও আর গোপন করিবার, রাখিবার-ঢাকিবার জায়গা রহিল না।

অতুল নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। যদু বাগদী গরুর গাড়ি আনিয়া কহিল, মা, সময় হয়েচে, জিনিসপত্তর কি দেবে দাও। এখন থেকে না বেরুলে ইস্টিশনে গাড়ি ধরতে পারা যাবে না। বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া নির্দেশমত সুমুখের টিনের তোরঙ্গের উপর বিছানাটা তুলিয়া নিয়া ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বড়বৌ ছোটবৌ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দুর্গামণি ‘দুর্গা দুর্গা’ বলিয়া ঘরে তালা দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। মেয়েটা মূর্ছিতের মত মায়ের কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

অরক্ষণীয়া – ০৪

এগার বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপসা ধুঁয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানার উপর হুমড়ি খাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়িতে বাপ-মা নাই–বড়ভাই আছেন। শম্ভু চাটুয্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন। অতএব সূর্যাস্তের পরই তিনি প্রস্তুত হইয়া বিছানা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া সুপ্রাচীন বালাপোশে মাথা এবং দুই কান ঢাকিয়া খড়ম পায়ে খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া চিনিতে পারিলেন।

কে, ও দুর্গা এলি নাকি? তা আয় আয়।

দুর্গা কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া দাদার পদমূলে প্রণাম করিলেন।

জ্ঞানদা প্রণাম করিলে, কহিলেন, এটি বুঝি মেয়ে? তা বিয়ে দিলি কোথায়?

দুর্গা কুণ্ঠিত-স্বরে কহিলেন, বিয়ে এখনও দিতে পারিনি দাদা–যেখানে হোক শিগগিরই–

অ্যাঁ–বিয়ে দিসনি? এ যে একটা সোমত্ত মাগী রে দুর্গা? বহুকাল অদর্শনের পর ভগিনীর প্রতি তাঁহার ঈষৎ করুণ কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তেই জমিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল; বলিলেন, তাই ত, এখানকার আবার যে-সব বজ্জাত লোক–তা জানতে পেলে–তা আমি বলি কি, ওকে হেঁসেল-টেসেল ঠাকুরঘরদোরে ঢুকতে দিয়ে কাজ নেই–জানিস ত এদেশের সমাজ! বিশেষ হরিপাল–এমন পাজী জায়গা কি ভূ-ভারতে আছে? তা আয়, বাড়ির ভিতরে আয়। এতবড় মেয়ে–ওর কাকার

কাছে রেখে এলে স্বচ্ছন্দে তুই দু' দিন জুড়িয়ে যেতে পারতিস। এখানে থাকলে ত আর–বুঝলি নে দুর্গা–তা যা, এখন হাত-পা ধু গে–ওগো, কৈ গো,—বলিতে বলিতে শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় খটখট করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গা এবং তাঁহার কন্যা যেমন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া বাড়ি ঢুকিল সে শুধু ভগবানই দেখিলেন।

শম্ভুর এটি দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষের বৌকে দুর্গা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে দেখেন নাই। উপস্থিত ইনি যেমনই কাল, তেমনই রোগা এবং লম্বা। ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়াকাঠের মত। তিনদিনের গোবর উঠানের মাঝখানে জমা করা ছিল, তাহা এইমাত্র নিঃশেষ করিয়া ঘুঁটে দিয়া, হাত-পা ধুইয়া প্রদীপের জো করিতেছিলেন; স্বামীর আহ্বানে সম্মুখে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শম্ভুর জ্বর আসিতেছিল, আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার জন্য স্ত্রীর কাছে সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বৌয়ের নাম ভামিনী। মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। কথাগুলো একটু বাঁকা-বাঁকা। সে হাসিয়া উপরের এবং নীচের সমস্ত মাড়ীটা অনাবৃত করিয়া ননদের হাত ধরিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় লইয়া গিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইলেন। তাঁহার হাসি এবং কথার শ্রী দেখিয়া দুর্গার বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। আসিবার সময় দুর্গা একহাঁড়ি রসগোল্লা আনাইয়াছিলেন, সেটা নামাইতে না নামাইতে এক পাল ছেলে-মেয়ে কোথা হইতে যেন পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিয়া ছেঁকিয়া ধরিল। চেঁচাচেচি ঠ্যালাঠেলি–সে যেন একটা হাট বসিয়া গেল। তাহাদের মা ইহাকে আধখানি, উহাকে সিকিখানি, আর দু' জনকে দু' টুকরা বাঁটিয়া দিয়া হাঁড়িটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া শোবার ঘরের শিকায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। ছেলেগুলো যে যাহা পাইয়াছিল, অমৃতবৎ গিলিয়া ফেলিয়া, হাতের রস চাটিতে চাটিতে প্রস্থান করিল।

দুর্গা এখানকার রীতিনীতি কতক জানিতেন, কারণ তিনি এই গ্রামের মেয়ে। কিন্তু জ্ঞানদা আট-দশ বছরের ছেলেগুলাকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মেয়েগুলারও প্রায় ঐ দশা। ইতরবিশেষ যাহা আছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের নিজেদের গ্রামটাও শহর নয় বটে কিন্তু সেখানে রাস্তাঘাট আছে; এমন আম, কাঁঠাল ও বাঁশঝাড়ে মাথার উপর অন্ধকার করিয়া নাই। এরূপ গোবর ও পাট-পচা গন্ধ চতুর্দিক হইতে আসিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ভারাক্রান্ত, ব্যাকুল করিয়া দেয় না। তখনও অন্ধকার হয় নাই, একটা শৃগাল উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই বড়ছেলেটা তাড়া করিয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকা বিকট শব্দ শুরু করিয়া দিল। দেয়ালের গায়ে একটা শুকনা ডালে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব একপ্রকার বিশ্রী শব্দ শুনিয়া জ্ঞানদা সভয়ে চুপি চুপি কহিল, ও কি ডাকে মা? মামী শুনিতে পাইয়া কহিলেন, ও যে তোক্ষোপ।

জ্ঞানদা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোক্ষোপ কি? তক্ষক সাপ?

মামী বলিলেন, হাঁ মা, তাই। ঐ যে কোন্ রাজাকে কামড়েছিল বলে। — গাছে গাছে একেবারে ভরা!

জবাব শুনিয়া জ্ঞানদা মায়ের মুখের প্রতি একবার চাহিল। ইতিপূর্বে কান্নায় তাহার সমস্ত বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সে জননীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, এখান থেকে চল মা—এখানে আমি একদণ্ডও বাঁচব না।

মামী আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, ভয় কি গো, ওরা যে দেবতা। কখ্খনো কারুর অপকার করে না। আর সাপখোপের কামড়ে কটা লোক মরে বাছা? বরঞ্চ, ভয় যা তা ঐ ম্যালোয়ারীর। একবার ধরলে, আর তাতে বস্তু রেখে ছাড়ে না। এ-বছর দিন-কুড়ি হ' ল তোমার মামাকে ধরেচে—এরই মধ্যে যেন শতজীর্ণ

করে ফেলেচে, আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ-গাঁয়ে তার ঠিক থাকবে না।

জ্ঞানদা মনে মনে অতুলের শেষ কথাগুলো মিলাইয়া লইয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। সে-রাত্রে সে একবারও ঘুমাইতে পারিল না। মায়ের বুকের কাছে মুখ রাখিয়া বারংবার চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া প্রভাত হইল; নূতন স্থানে নূতন আলো চোখে পড়ায় বিন্দুমাত্রও তাহার আনন্দোদয় হইল না–বরঞ্চ সমস্ত আবহাওয়া, আলো, বাতাস যেন কালকের চেয়েও বেশি করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

এতবড় আইবুড়ো মেয়ে দেখিয়া পাড়ার লোক ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাদের বাঙ্গালাদেশে মেয়ের বয়স ঠিক করিয়া বলার রীতি নাই। সবাই জানে, বাপ-মাকে দু-এক বছর হাতে রাখিয়া বলিতে হয়। সুতরাং দুর্গা যখন বলিলেন, তের, তখন সবাই বুঝিল পনর। তা ছাড়া একমাত্র সন্তান বলিয়া, নিজেরা না খাইয়া মেয়েকে খাওয়াইয়াছিলেন, পরাইয়াছিলেন–সেই নিটোল স্বাস্থ্যই এখন আরও কাল হইল–জ্ঞানদার যথার্থ বয়সের বিরুদ্ধে ইহাই বেশি করিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

দুই দিন না যাইতেই শম্ভু কথাপ্রসঙ্গে ভগিনীকে কহিলেন, মেয়েটার জন্য ত পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হয়েছে। একটি ভারী সুপাত্র হাতে আছে, দিবি?

দুর্গা বলিলেন, জামাই আমার স্থির হয়ে আছে–আর কোথাও হতে পারে না। শম্ভু বলিলেন, তা হলে ত কথাই নেই। কিন্তু এমন সুপাত্র বড় ভাগ্যে মেলে, তা বলে দিচ্চি। কুড়ি-পঁচিশ বিঘে ব্রহ্মত্র, পুকুর, বাগান, ধানের গোলা–লেখাপড়াতেও–

দুর্গা কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, না দাদা, আর কোথাও হবার জো নেই–এই বছরটা বাদে সেখানেই আমাকে মেয়ে দিতে হবে।

শম্ভু বলিলেন, কিন্তু, আমার বিবেচনায়—এই সামনের অঘ্রানেই মেয়ে উচ্ছুগ্যু করা কর্তব্য হয়েছে। দুর্গা আর নিরর্থক প্রতিবাদ না করিয়া—কাজ আছে, বলিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, এই সুপাত্রটি শম্ভুরই এ-পক্ষের বড় শ্যালক। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায়, প্রায় ছয় মাস যাবৎ বেকার অবস্থায় আছেন—আর বেশিদিন থাকা কেহই সঙ্গত মনে করে না। বিশেষতঃ ঘরে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা থাকায় একটি ডাগর মেয়ে নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সেইজন্যই বোধ করি, দুর্গার বারংবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও এই সুপাত্রটি একদিন সহসা আবির্ভূত হইয়া সম্মুখেই জ্ঞানদাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বলা বাহুল্য যে, পছন্দ করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। অনতিকাল মধ্যেই ভগিনীর প্রতি শম্ভুনাথের স্নেহের অনুরোধ কঠোর নির্যাতনের আকার ধরিয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, প্রিয়নাথের অবর্তমানে তিনিই এখন ভাগিনেয়ীর যথার্থ অভিভাবক। সুতরাং আবশ্যক হইলে এই সামনের অঘ্রানেই তিনি জোর করিয়া বিবাহ দিবেন।

দাদার সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া মেয়ের পানে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে সমস্ত শুনিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি মা! মুখে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁহার নিজের বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এ-সব দেশে এরূপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া যে একটা সচরাচর ঘটনা, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া মেয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা তাহার কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরে গা ফাটিয়া যাইতেছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন জ্বর হল মা?

কাল রাত্তির থেকে।

আমাকে জানাস নি কেন? আজকাল যে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার সময়। মেয়ে চুপ করিয়া রহিল, জবাব দিল না।

দাদার বৌয়ের সহিত দুর্গা এ পর্যন্ত কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন নাই। শুধু যে তাহার বিকট চেহারা ও ততোধিক বিকট হাসি দেখিলেই তাঁহার গা জ্বলিয়া যাইত তাহা নহে, তাহার অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহে; কিন্তু বৌয়ের কথাবার্তা একটু দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা, তেমনি যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু তাহার একটা গুন দুর্গা টের পাইয়াছিল–সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চাহিত না। তার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিলে, সে কাহাকেও কিছু বলিত না–ছেলে-পিলে ঘর-সংসার লইয়াই থাকিত, পরের কথায় কান দিত না।

প্রথমে আসিয়াই দুর্গা একদিন তাহার রান্নাবান্নার সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল–তুমি দু' দিনের জন্যে এসেচ ঠাকুরঝি, তোমাকে কাজ করতে হবে না। আমি রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর কাউকে দিতে পারব না। সেই অবধি দুর্গা এবিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন!

আজ বেলা দেখিয়া বৌ দোর-গোড়ায় স্বাভাবিক চিৎকারশব্দে প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়া কি হবে না ঠাকুরঝি? হেঁসেল নিয়ে বসে থাকব?

দুর্গা মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেয়েটার ভারী জ্বর হয়েচে বৌ; তোমরা খাও গে, আমরা আজ আর কেউ খাব না। বৌ কহিল, মেয়ের জ্বর, তা তোমার কি হ ' ল গো? জ্বর আবার কার না হয়? নাও, উঠে এসো। দুর্গা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, না বৌ, আমাকে খেতে বল না–মেয়ে ফেলে আমি মুখে ভাত তুলতে পারব না।

তোমাদের সব আদিখ্যেতা, বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, জ্বর হয়েচে কবরেজ ডেকে পাঁচন সিদ্ধ করে দাও। ম্যালোয়ারী

জ্বরে আবার খায় না কে? আমাদের দেশে ওসব উপোস-তিরেসের পাঠ নেই বাপু! বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অপরাহ্নবেলায় সে নিজেই একবাটি পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া কহিল, ওলো ও গেনি, উঠে পাঁচন খা! ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, চল, খাবি আয়।

মামীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। বিনাবাক্যে উঠিয়া খানিকটা তিক্ত পাঁচন গিলিয়া বমি করিয়া ফেলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল। দুর্গা ঘরে ছিল না, বমির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মামী রাগ করিয়া উঠানে গিয়া সমস্ত পাড়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, এ-সব বাবুমেয়ে নিয়ে আমাদের গরীব, দুঃখীর ঘরে আসা কেন বাপু?

সেই হইতেই জ্ঞানদার অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। তাহার ভামিনী-মামী সেই যে প্রথম দিনেই বলিয়াছিল, বাছা! পল্লীগ্রামে সাপের কামড়ে আর ক' টা লোক মরে, মরে যা তা ঐ ম্যালোয়ারীতে। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই। তাহার কথাটার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে বেশি বিলম্ব ঘটিল না, অনতিকালমধ্যেই জ্ঞানদাকে একেবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। সেদিন কার্তিকের সংক্রান্তি; দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, বৌ জ্ঞানদার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। একে ত সংসারের কাজ ছাড়িয়া এইসব বাজে কাজ করিবার তাহার অবসরই নাই, তাহাতে পরের মেয়ের প্রতি এই অযাচিত সেবাটা এমনি একটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিসদৃশ কাণ্ড বলিয়া দুর্গার মনে হইল যে, তিনি দাদার প্রস্তাবিত সেই বিবাহ-ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। ভামিনীর এই যত্নটা যে সেই জন্যই, তাহাতে আর সংশয়মাত্র রহিল না। কারণ, সে যে নিজের দাদার সহিত জ্ঞানদার বিবাহ ঘটাইবার জন্য স্বামীকে নিয়োজিত করিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করিতেছে, প্রথম হইতেই এই কথাটা দুর্গা স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিলেন। বৌ গলাটা আজ একটু খাটো করিয়াই কহিল, তারকেশ্বরে পাশ-করা ডাক্তার

আছে—তোমার দাদাকে আনতে পাঠিয়ে দিয়েচি, ঠাকুরঝি। জ্বর যেন রোজ রোজ বেশিই হচ্চে—এ তো ভালো না। দুর্গা অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না, কারণ এই সুসংবাদ শুনিয়াও তিনি অন্তরের ভিতর হইতে প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

বৌ সংসারের কাজে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা বালিশের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিল, জবাব দিয়েচেন।

কৈ দেখি, দেখি, বলিয়া মা সেখানি যেন কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অসহ্য আগ্রহ দমন করিয়া চিঠিখানা দুই মুঠার মধ্যে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার মনে করিলেন, খুলিয়া পড়ি। আবার ভাবিলেন, না, উচিত নয়। মেয়ে যেন হাতেই দিয়েছে, কিন্তু মা হইয়া তিনি পরিবেন কি করিয়া! মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখেচে অতুল?

জ্ঞানদা ইতিমধ্যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। সংক্ষেপে কহিল, আসা উচিত ছিল না—এই-সব। পত্রের এই দুটি কথা শুনিয়াই মায়ের দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, আসা উচিত ছিল না—এই সব। অতুলের মুখখানি স্মরণ করিয়া, তাহাকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া দুর্গা মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, না জানি, বাছার কতই না অভিমান, কতই না মর্মান্তিক ব্যথা, এই দুটি কথার মধ্যে লুকান আছে। এখানে আসিয়া জ্ঞানদা জ্বরে পড়িয়াছে—তাহাতেই ত বাছা সেদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ইহাদের গঙ্গাযাত্রা দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। সত্যই ত!—আমি নিজে যাই করি এবং যেখানেই যাই, সে আলাদা কথা। কিন্তু মেয়ে লইয়া আমার যে কোনমতেই আসা উচিত ছিল না। যতই কষ্ট হোক, সব সহ্য করিয়াই ত সেখানে আমাদের পড়িয়া থাকা উচিত ছিল। কাগজখানি অপূর্ব মমতার সহিত মুঠার মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কত কথাই আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুশয্যায় অতুলের প্রতিজ্ঞা—সেই চুড়ি দু' গাছি দিবার ছলে মহাপ্রসাদ লইয়া আসা, বিশেষ

করিয়া আসিবার দিনটায় মাসির সহিত তাহার কলহ। এ-কথা তাহার মা শুনিয়াছেন, পাড়ার লোকে শুনিয়াছে–এতদিনে সবাই জানিয়াছে কেন সে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। আনন্দে গর্বে তাঁহার মাতৃবক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন, কালো মেয়ে! আমার কালো মেয়ের গৌরব দেখুক সবাই! ওরে কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো যে! ডাকিলেন–জ্ঞানদা, এখন কেমন আছিস মা?

ভাল আছি মা।

হাঁ রে, আমার কথা অতুল কিছু লিখেচে?

পড়ে দেখ না।

কৌতূহল আর তিনি সামলাইতে পারিলেন না। জানালার কাছে কাগজখানি মেলিয়া ধরিলেন। অতবড় কাগজের মধ্যে মাত্র দুইছত্র লেখা দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে হইল, মেয়ে কি দিতে, হয়ত কি দিয়াছে। পরক্ষণেই 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাইতেই পড়তে দিয়েছে–এ যে আমারই চিঠি। লেখা আছে– "সেই সময়েই বলিয়াছিলাম, ও জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো। জ্ঞানদার জ্বর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম–আশা করি, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।" ইতি–

দুর্গার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে একটু বাধিল, কিন্তু মায়ের প্রাণ–না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিলেন না; কাছে বসিয়া মেয়ের রুক্ষ চুলগুলি আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে আস্তে আস্তে বলিলেন, হাঁ মা, তোমার চিঠিটার মধ্যে বুঝি অতুল রাগ করেচে? জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমার চিঠি আবার কোথায় মা? তোমাকেই তো লিখেছেন। দুর্গা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি দেখতে চাই না, শুনলেই সুখী। রাগ করেচে, সে ত আমি বুঝতেই পারচি–

না মা, আমাকে তিনি আলাদা চিঠিপত্র কিছুই লেখেন নি। যা লিখেছেন, তা ওই। বলিয়া মেয়ে পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

সবে দু' ছত্র? আর কোন কথা নেই? বলিয়া দুর্গা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার যে আঙুলগুলা এতক্ষণ মেয়ের চুলের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র গতিতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেগুলাও যেন হাড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিল; এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আবার দিন কাটিতে লাগিল।

অরক্ষণীয়া – ০৫

প্রথম অগ্রহায়ণের শীতের বাতাস বহিতেছিল। দুর্গার এক ছেলেবেলার সাথী বাপের বাড়ি আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা মেয়েকে একটু ভাল দেখিয়া দুর্গা তাহার সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে ডাক-পিয়নের সাক্ষাৎ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ দাশু, আমার নামের চিঠিপত্র পাচ্ছিনে কেন?

দাশু হাসিয়া কহিল, চিঠি না এলে কি করে পাবে, দিদিঠাকরুন?

দুর্গা সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, আমার কিংবা আমার মেয়ে জ্ঞানদা দেবী–কারু নামেই কি চিঠি আসে না?

দাশু কহিল, এলে ত আমিই দিয়ে যেতাম দিদিঠাকরুন?

দুর্গা বলিলেন, না দাশু তোমার ব্যাগটা একটু ভাল করে দেখো–আসতেও পারে। তিন-তিনখানা চিঠির জবাব দেবে না,—আমার অতুল ত তেমন ছেলে নয়।

দাশু বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিল, না দিদি, নেই–এলেই পাবে। বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দুর্গা বাধা দিয়া বলিলেন, হাঁ দাশু, এমনও ত হতে পারে–তোমার পোস্টাফিসেই পড়ে আছে–পোস্টমাস্টার আমাদের নাম জানে না। হয়ত বা টেবিলের তলায় ঘোঁজে- ঘাঁজে কোথাও পড়ে গেছে, তোমরা কেউ দেখতে পাওনি। আমাকে ত এখানে সবাই জানে, আমি নিজে গিয়ে কি একবার খুঁজতে পারিনে?

ব্যাকুলতা দেখিয়া দাশু সদয়চিত্তে কহিল, কেন পারবে না দিদিঠাকরুন–কিন্তু সে মিছে খোঁজা হবে। আচ্ছা, আমি গিয়ে আজ একবার খুঁজে দেখব। যদি পাই দিয়ে যাবো। বলিয়া সে আর সময় নষ্ট না করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গা ঠাকুর-দেবতার চরণে বিশ্বের ঐশ্বর্য মানত করিতে করিতে চলিলেন—হে মা দুর্গা, হে মা কালী, একখানি চিঠিও যেন খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞানদার এত বড় অসুখ শুনিয়াও সে উত্তর লিখিবে না—এ কি কোনমতেই বিশ্বাস করা যায়! সে নিশ্চয় লিখিয়াছে; কিন্তু কোথাও গোলমাল হইয়া গেছে।

হায় রে মানুষের আশা! শত কোটি সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এ কথাটা একবারও দুর্গার মনে উদয় হইল না যে, ইতিমধ্যে অতুলের মনের গতি বদলাইয়া যাইতেও পারে। একবারও ভাবিলেন না—অতুলের যে কামনা একদিন একান্ত সঙ্গোপনে সম্পূর্ণ আবরণের অন্তরে, শুধু নির্বিবাদেই বাড়িয়া উঠিতে পাইয়াছিল, তাহাকে এমন অসময়ে এতবড় অনাবৃত প্রকাশ্যতার মাঝখানে টানিয়া আনিলে, সে চক্ষের পলকে শুকাইয়া যাইতে পারে! এখন শত বিরুদ্ধ-শক্তি সজাগ হইয়া তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে চাপিয়া মারিতে পারে! মানুষ এমনিই অন্ধ!

দুর্গা একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া মেয়ের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে জ্ঞানদা, দাশু কোন চিঠিপত্র দিয়ে গেছে কি?

মেয়ে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, না মা।

আজ দুই মাস হইতে উপর্যুপরি তিনখানি পত্রের জবাব আসিতেছে না। দুর্গা সংশয়ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, তুই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলি। তোর সাড়া না পেয়ে দাশু হয়ত ফিরে গেছে। আমি বাড়িতে নেই—একদিন একটুখানি কি জেগে থাকতে পারিস নে বাছা? বলিয়া দুর্গা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল। সে ঘুমায় নাই, জাগিয়াছিল বলিয়া তর্ক করিল না। মায়ের কাছে প্রত্যহ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে দিতে সে নিজের লজ্জায় নিজেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল।

দুর্গা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিলেন, কেন দাশু যে আমাকে বললে, সে খুঁজে এনে দিয়ে যাবে? আজ কেমন করিয়া যেন তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, অতুলের চিঠিপত্র আসিয়াছেই।

মেয়ে কথা কহিল না–একটা মলিন কাঁথার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু দুর্গা এইখানেই থামিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোস্টাফিসে পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিলেন, দাশু আসে নাই।

পরের তিন-চারি দিন তিনি পত্রের প্রত্যাশায় অহোরাত্র যেন কণ্টকশয্যায় বসিয়া কাটাইলেন–তথাপি কিছু আসিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া অতুলের জননীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে জানাইলেন, অতুল ভাল আছে এবং কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পূর্ববৎ লেখাপড়া করিতেছে। তাঁহার চিঠির মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের সুরই যেন দুর্গার কানে বাজিল। এমনি করিয়া অঘ্রান গেল, পৌষ গেল, কিন্তু অতুলের চিঠি আসিল না। মাঘের মাঝামাঝি মেয়ে যদিবা একটু সারিয়া উঠিল, মা অসুখে পড়িলেন। এতবড় নিরাশার আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তা ছাড়া, বৌয়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের আর যেন অন্ত ছিল না। তাহার উল্লেখ করিতে হইলেই, ঘৃণাভরে কখনো বা 'পোড়া কাঠ' কখনো বা 'তাড়কা' বলিতেন এবং যত দিন যাইতে লাগিল, ঘৃণা যেন অপরিসীম হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আরও একটা কারণ এই ছিল,—'পোড়া কাঠ' নিজের ধরনে জ্ঞানদাকে তাহার স্বাভাবিক মাধুর্যের জন্যই বোধ করি ভালবাসিয়াছিল, যত্নও করিত। কিন্তু এই যত্নের মধ্যে একটা উৎকট স্বার্থের গন্ধ পাইয়া দুর্গা বিষের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন। বড় দুঃখের দেহ, তাই অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। মাঘের শেষে তিনি শয্যা আশ্রয় করিলেন। মেয়ে কাঁদিয়া বলিল, আর না মা, এইবার বাড়ি চল। যা হবার সেইখানেই হোক।

দুর্গা রাজি হইলেন। তাঁহার সম্মতির এখন আর কোন বিশেষ কোন কারণ ছিল না; শুধু এই 'পোড়া কাঠে' র যত্ন ও আত্মীয়তা হইতে বাহির হইবার জন্যই মন যেন তাঁহার অহরহ পালাই পালাই করিতে লাগিল।

যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া শম্ভু বাঁকিয়া বসিলেন। তখন সকাল সাতটা-আটটা, শম্ভু সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, দুর্গা!

দুর্গা দাওয়ার একপ্রান্তে খুঁটি ঠেস দিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। জ্ঞানদা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। দাদার আহ্বানে দুর্গা সাড়া দিলেন।

শম্ভু কহিলেন, এখন ত তোমার যাওয়া হতে পারে না।

কেন দাদা?

কেন দাদা! আমি কি তোমার জন্যে কথা দিয়ে মিথ্যাবাদী হব নাকি? সে জন্ম আমার নয়। কথাটা না জানিয়াও দুর্গার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের কথা, দাদা?

শম্ভু কহিলেন, গেনির বিয়ের। আর ত আমি রাখতে পারিনে–কাজেই আমাদের নবীনের সঙ্গেই সামনের পাঁচুই ফাগুনে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হ' ল। এদিকে গয়নাগাটিও মন্দ দেবে না বলচে। দেখতে শুনতে সবদিকেই ভাল হবে, দেখলাম কিনা।

খবর শুনিয়া দুর্গার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন, আমাকে না বলে কেন কথা দিলে, দাদা? এ বিয়ে ত আমি প্রাণ থাকতে দিতে পারব না।

শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পারব না বললেই হবে? আমি মামা–আমি যা বলব, তাই হবে। তোর জন্যে কথার নড়চড় করব, তেমন বাপে আমাকে জন্ম দেয়নি–তা জানিস?

এইবার দুর্গা সত্যি সত্যিই কাঁদিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, না দাদা, মেয়ের বিয়ে এখানে আমি মরে গেলেও দেব না–আমার জন্যে তুমি এতটুকু ভেব না দাদা–কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া কথাটা তিনি শেষ করিতেই পারিলেন না ।

শম্ভু এই কান্না দেখিয়া মহাবিরক্ত হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, শুভকর্মে মিছে কাঁদিস নে ভ্যানভ্যান করে। যা হবার নয়, যা পারব না–

রঙ্গস্থলে 'পোড়া কাঠ' দেখা দিলেন। দুই হাত গোবর-মাখা–বোধ করি, তখনো গোয়ালঘরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙ্গা-কাঁসির মত খ্যানখ্যান করিয়া বাজিয়া উঠিলেন– বলি সুপাত্তরটি কে গা ঠাকুর? একবার শুনতে পাইনে?

শম্ভু স্ত্রীর ভাবগতিক দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু মুখের সাহস বজায় রাখিয়া কহিলেন, যেই হোক, তোর তাতে কি?

'পোড়া কাঠ' গোবর-মাখা হাত দু' খানা নাড়া দিয়া অর্ধেক উঠানটা যেন নাচিয়া আসিল। তেমনি সুমধুর-কণ্ঠে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া কহিল, মামা! মামাত্বি ফলাতে এসেছেন! নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেব! তা হলে একশ' টাকা সুদে-আসলে শোধ যায়, না? তাই সে সুপাত্তর? আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি-গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে, মেরে ফেললে কিনা,—তাই অমন সুপাত্তর আর নেই? গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোমার? ধিক! ধিক!

শম্ভু ভগিনী ভাগিনেয়ীর সমক্ষে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পায়ের খড়ম হাতে লইয়া চিৎকার করিলেন, চুপ কর্ বলচি, হারামজাদী!

'পোড়া কাঠ' এইবার ক্ষেপিয়া উঠিল। সে এমনি একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গী করিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে, সে বস্তু চোখে না দেখিলে শুধু লেখা পড়িয়া বোঝা যায় না, কহিল, অ্যাঁ আমাকে হারামজাদী? ফের মুখে আনলে পোড়া কাঠ যদি না মুখে গুঁজে দি ত, পাঁচু ঘোষালের মেয়ে নই আমি। জোর করে বিয়ে দেবে? কেন,

কে তুমি? ও এসেছে মেয়ে নিয়ে দু' দিন জুড়োতে, কেন তুমি ওকে রাতদিন ভয় দেখাবে? আঁশ-বটিটা আমার দেখে রেখো। শালা-ভগ্নীপোতের একসঙ্গে নাক-কান কেটে তবে ছাড়ব। আমার নাম ভামিনী, তা মনে রেখো।

সে মূর্তির সামনে শম্ভু আর কথা কহিলেন না–ঘরে চলিয়া গেলেন।

'পোড়া কাঠ' তখন দুর্গার পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, ও কি সোজা চামার, ঠাকুরঝি! তোমার আসা পর্যন্ত মতলব আঁটচে,—কি করে অমন সোনার প্রতিমা বাঁদরের হাতে দিয়ে ধার শোধ করে জমি খালাস করে নেবে। আবার বলে–মামা আমি!

একটুখানি দম লইয়া কহিতে লাগিল, বললে তুমি মনে কষ্ট করবে, আমি বলতাম না, ঠাকুরঝি। বললাম, মেয়েটা জ্বরে মরে যায়, একটা ভাল ডাক্তার আনো। বললে, অত পয়সা নেই আমার। সম্বলের মধ্যে সম্বল, একগাছি রূপার গোট ছিল আমার, তাই বাঁধা দিয়ে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম–আর ও বলে কিনা যা খুশি করব–আমি মামা! মুখপোড়া। আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি ঠাকুরঝি! আমি আজই বন্দোবস্ত করে দিচ্চি, তুমি বাড়ি গিয়ে মেয়ের বিয়ে দাও গে–দিয়ে যখন খুশি আবার এসো।

দুর্গা খুঁটি ঠেস দিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন–তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া কেবল ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

'পোড়া কাঠ' কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ খাটো করিয়া অদৃশ্য স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, অনাথ বলে ওর ওপর জুলুম করবে কেন, মাথার ওপর ভগবান নেই কি? আমি বলি, যা তোমার আছে, তাই নিয়ে নাড়ো-চাড়ো খাও-দাও। পরের নিয়ে নিজের পেট মোটা করব কি জন্যে? ভগবান কখনো তার ভাল করেন না।

সেই দিনেই দুপুরবেলা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল।

গরুর গাড়িতে উঠিতে গিয়া দুর্গা 'পোড়া কাঠে' র দু' পায়ের উপর মাথা পাতিয়া আজ সত্য সত্যই তাহা অশ্রুজলে ভিজাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, বৌ, বড় ভাজ তুমি, তোমাকে ত আশীর্বাদ করতে পারিনে–কিন্তু ভগবান তোমাকে যেন দেখেন। আমার জন্যে তুমি তোমার গোটছড়াটি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেললে।

'পোড়া কাঠ' আদ্যন্ত মাড়ী বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, ছাই গোটছড়া! এই বল ঠাকুরঝি, হাতে নোয়া নিয়ে স্বামী-পুত্তরের, গো-ব্রাহ্মণের সেবা করে যেন যেতে পারি। নাও, রোগা শরীরে আর দাঁড়িয়ে থেকো না–গাড়িতে উঠে বসো। গেনি, মামা-মামীর ঘরে অনেক কষ্ট পেয়ে গেলি মা; কিন্তু আবার আসিস–ভুলিস নে যেন। বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে জোর করিয়া দুটি টাকা গুঁজিয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুর্গা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, না বুঝে অনেক অপরাধ তোমার চরণে করে গেলাম বৌ, সে-সব আমার মাপ করো।

'পোড়া কাঠ' আজ আর সমস্ত মাড়ী বিকশিত করিয়া হাসিল না, বরং চট করিয়া একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া কহিল, পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হ' ল ঠাকুরঝি। ওলো, ও গেনি, মামা-মামীর ওপর রাগ-টাগ করিস নে যেন। আসচে বছর আম-কাঁঠালের দিনে তোর নেমন্তন্ন রইল–জামাইকে সঙ্গে করে একবার আসিস মা। বলিয়া হাতের পিঠ দিয়া আর দু' ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

অরক্ষণীয়া – ০৬

সংবাদ দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই দুর্গা চিঠি না লিখিয়াই আসিয়াছিলেন। জ্ঞানদার চেহারা দেখিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়াই খুন–ওলো ও গেনি, গালদুটো তোর চড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে কে লো? ও মা, কি ঘেন্না! মাথায় টাক পড়ল কি করে লো? ও ছোটবৌ, শিগগির আয়, শিগগির আয়–আমাদের জ্ঞানদাসুন্দরীকে একবার দেখে যা। গায়ের চামড়াটাও কি তোর মামা-মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েচে নাকি লো? জ্ঞানদা নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটখুড়ী আসিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা হইল।

ছোটবৌ শিহরিয়া উঠিল–ইস, এ কি হয়ে গেছিস মা?

জ্যাঠাইমা নিতান্ত অত্যুক্তি করিলেন না; কহিলেন, বাঁশবনের পেত্নী। অন্ধকারে দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আজ কিন্তু ছোটবৌ তাহাতে যোগ দিল না। সে আর যাই হউক, সন্তানের জননী ত? মেয়েটির এই কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মায়ের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কাছে বসিয়া, তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, একটি একটি করিয়া রোগের কথা শুনিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কেন তবে তখ্খুনি চলে এলিনে মা! আমি ত তোদের আসতে মানা করিনি। মেজদি কোথায়?

মার গাড়িতে জ্বর এসেছিল,—ঘরে শুইয়ে দিয়েছি।

স্বর্ণ কহিলেন, হবে না? আমি হাজার হই বড়জা ত! অত তেজ করে চলে গেলে কি সয়?

ছোটবৌ জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাহার মাকে দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বড়জায়ের এই নিতান্ত গায়ে পড়া কটুকথাগুলো আজ তাহার এতই বিশ্রী লাগিল যে, সে সহিতে পারিল না; কহিল, দিদি, বছর-দুই মধু-সংক্রান্তির ব্রত করো–আর-জন্মে মুখখানা যদি একটু ভাল হয়। স্বর্ণ এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে ক্রোধে বিস্ময়ে হঠাৎ অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তীব্রস্বরে গর্জিয়া উঠিলেন, তবু ভাল লো ছোটবৌ, তবু ভাল। এতকাল পরেও যা হোক মেজজাকে দেখে শোকটা উৎলে উঠেচে। মাইরি, কত ঢঙই তুই জানিস।

ছোটবৌ জবাব দিল না। জ্ঞানদার হাত ধরিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু সে যাওয়া জ্ঞানদার পক্ষে একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠিল। কারণ তাহার ও তাহার মাতার বিরুদ্ধে স্বর্ণমঞ্জরীর এমনই ত বিদ্বেষের অবধি ছিল না; কিন্তু ছোটবৌয়ের ব্যবহারে আজিকার বিদ্বেষ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

হরিপালে থাকিতে দুর্গা জ্বর আসিলে শুইয়া পড়িতেন, ছাড়িলে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেন। সাধ্যে কুলাইলে স্নান-আহ্নিক করিয়া একবেলা একমুঠা ভাতও খাইতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আর একপ্রকার ঘটিল। পাড়ার মেয়েরা অহোরাত্র সহানুভূতি করিয়া দু-পাঁচদিনেই তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া দিল। নীলকণ্ঠ মুখুয্যেমশায়ের পরিবার মেজবৌকে দেখিতে আসিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, এ কি করেচিস মেজবৌ, মেয়ের বিয়ে দিবি কবে? ওর পানে যে আর চাইতে পারা যায় না।

দুর্গা শ্রান্ত চোখ দুটি নিমীলিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি পিসিমা, কবে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

তা ত জানি মা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ত? ভগবান ত আর বর জুটিয়ে এনে দিয়ে যাবেন না!

দুর্গা আর জবাব দিলেন না।

একমিনিট প্রতীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, বলি বাপের বাড়ি গেলি, ভাই কিছু যোগাড় করে দিলে না? দেওর কি বলে?

ভগবান জানেন। বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরেই আদরিণী বেড়াইতে আসিয়া চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়াই উঁকি মারিয়া কহিল, বলি এ-বেলাটায় কেমন আছ মেজবৌ?

জ্ঞানদা শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; কহিল, জ্বর এখনো ছাড়েনি পিসিমা। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন; বলিলেন, ব' সো ঠাকুরঝি।

না বৌ, বেলা গেল, আর বসবো না। তা বলি কি মেজবৌ, যাকে হোক ধরে উচ্ছুগ্যু করে দাও,আর খুঁতখুঁত ক' রো না। বলতে নেই,—তখন তবুও মেয়েটার যা হোক একটু ছিরি ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে একেবারে যেন পোড়া কাঠটি হয়ে গেছে। হ্যাঁ লা গেনি, সুমুখের চুলগুলো বুঝি উঠে গেল?

জ্ঞানদা ঘাড় নাড়িয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। আদরিণী কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিল,—শুনচি নাকি ও-পাড়ার গোপাল ভটচায্যি আবার বিয়ে করবে। একবার অনাথদাকে পাঠিয়ে খবরটা কেন নিলে না মেজবৌ?

আচ্ছা, বলব, বলিয়া দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

এমনি করিয়া কত লোক যে কত হিতোপদেশ দিয়া গেল, তাহার সংখ্যা রহিল না। কিন্তু যাহাদের পথ চাহিয়া দুর্গা অনুক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিলেন, তাহারা দেখা দিল না। না আসিল অতুল, না আসিল তাহার মা।

ছোটবৌয়ের দেহে দয়ামায়া ছিল; কিন্তু সে ভারী অলস, তাহাতে অন্তঃসত্ত্বা। সুতরাং স্বর্ণ জ্ঞানদাকে যখন বলিলেন, বাছা, রোগ বলে ত আর চিরকাল চলে না, তোমার মা যেন ধরলুম পারে না, কিন্তু তুমি বাপু সোমত্ত মেয়ে—সকালে কাকার ভাত দুটি কি আর রেঁধে দিতে পার না? ঘরের ভিতর

হইতে ছোটবৌ কথাটা অন্যায় বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিল। পরের দুঃখে সে ব্যথা অনুভব করিত; কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে পরিশ্রম দিয়া সে দুঃখ দূর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।

জ্ঞানদা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমিই দেব জ্যাঠাইমা।

যদিচ, এখনও প্রতিরাত্রেই তাহার জ্বর হইত, কিন্তু মায়ের যন্ত্রণা বাড়াইবার ভয়ে এ কথা সে প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। ফোঁপরা নির্জীব দেহটাকে সে সকালে বিছানা হইতে যেন টানিয়া তুলিতেই পারিত না; তথাপি একবার ইতস্ততঃ করিল না–একটিবার মুখভার করিল না।

দুঃখী পিতা-মাতার কন্যা হইলেও সে একমাত্র সন্তান; তাঁহাদের বড় আদরে যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই গুরুজনের আজ্ঞা–ন্যায়-অন্যায় যাই হউক–নির্বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে, সেবা করিতে, মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে, সংসারে বোধ করি আর তাহার জুড়ি ছিল না। কিন্তু আজ সে যে কত বড় গুরুভার মাথায় করিয়া লইল, তাহা আর কেহ না বুঝুক, ছোটবৌ বুঝিল। সুতরাং বড়জায়ের এই অত্যন্ত অন্যায় আদেশে তাহার অন্তর জ্বলিতে লাগিল, তথাপি মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হইল না–পাছে, বলিতে গেলেই পালার শর্তমত তাহাকে ভোরে উঠিয়া রাঁধিতে হয়।

পরদিন যথাসময়ে কাকাকে স্নানঘরে যাইতে দেখিয়া, জ্ঞানদা ভাতের থালাটি হাতে করিয়া দিতে যাইতেছিল,—কোথা হইতে জ্যাঠাইমা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন–কোথা যাস লা গেনি?

জ্ঞানদা থতমত খাইয়া বলিল, কাকা স্নান করে এলেন যে!

তাতে তোর কি? বলিয়া জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন–মানা করে দিয়েচি না ভাত বেড়ে নিয়ে যেতে? তোর হাতে পুরুষমানুষ খেতে পারে লা?

দুর্গা সেইমাত্র উঠিয়া ঘরের সুমুখে বসিয়াছিলেন–চেঁচামেচি শুনিয়া সভয়ে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দিদি?

স্বর্ণ কাহারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, সেই নির্বাক নিস্পন্দ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—হাতে করে থালা নিয়ে গেলে কাকা খুশি হয়ে তোমাকে মাথায় করে নিয়ে নাচবে—রাজপুত্তুর এনে বিয়ে দেবে, না? এই বয়সে কি মন যোগাতেই শিখেছিস মাইরি! বলিয়া থালাটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্গা সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন; মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, পোড়ারমুখী, গুরুজনের কথা শুনবি নে যদি, তোর মরণ হয় না কেন!

জ্ঞানদা নীরবে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। একবার বলিল না, এ-বিষয়ে তাহাকে কেহই নিষেধ করিয়া দেয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে সে বোধ করি জানিতই না।

প্রতিবাদ যে করিতে পারিত, সে ছোটবৌ। কিন্তু সে বড়জাকে চিনিত বলিয়া কথা কহিল না। বড়জা যেমন মুখরা, তেমনি আত্মমর্যাদাজ্ঞানশূন্যা। মুখের উপর তাহার সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও লজ্জা পাইবে না; বরঞ্চ অধিকতর নিষ্ঠুর হইয়া যন্ত্রণা দিবে জানিয়াই, ছোটবৌ নীরবে জ্ঞানদার অনুসরণ করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া সস্নেহে সযত্নে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, দিদির কথাটা কেন শুনিস নি মা?

এতক্ষণের এত কঠোর লাঞ্ছনা সে সহিয়াছিল, কিন্তু সেই স্নেহের অনুযোগ সহিতে পারিল না। একটিবার মাত্র চোখ তুলিয়া ছোটখুড়ীর মুখের পানে চাহিয়াই সে তাহার পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়িল—আমাকে কেউ নিষেধ করে দেয়নি খুড়ীমা, বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ছোটখুড়ী কাছে বসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল, কিন্তু কি বলিয়া যে এই মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এমনি করিয়া এই শ্রীহীনা হতভাগ্য অনূঢ়া কন্যার দিন কাটিতে লাগিল। ঘরে-বাইরে আত্মীয়-পর সবাই মিলিয়া অনুক্ষণ কেবল লাঞ্ছনা দিতেই লাগিল, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার কেহ চেষ্টামাত্রও করিল না।

অরক্ষণীয়া – ০৭

আজকাল ধরিয়া না তুলিলে দুর্গা প্রায় উঠিতেই পারিতেন না। মেয়ে ছাড়া তাঁহার কোন উপায়ই ছিল না। তাই সহস্র কর্মের মধ্যেও জ্ঞানদা যখন-তখন ঘরে ঢুকিয়া মায়ের কাছে বসিত। আজিকার সকালেও একটুখানি ফাঁক পাইয়া, কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে মায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সহসা একটা অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতর ধক করিয়া উঠিল।

দোলের দিন। ছুটির বন্ধে অতুল বাড়ি আসিয়াছিল। দুই-তিনজন পাড়ার সঙ্গী লইয়া রঙ মাখিয়া পকেট ভরিয়া আবীর লইয়া সে 'মাসিমা' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বাড়ি ঢুকিল।

দুর্গা তন্দ্রায় জাগরণে সারাদিন একপ্রকার আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিতেন। পাছে কণ্ঠস্বর কানে গেলে মা সজাগ হইয়া উঠেন, এই ভয়ে জ্ঞানদা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে ইনি যে এই লোকটিরই প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা সে জানিত। অথচ, তাঁহার সেই স্বাভাবিক ধৈর্য, গাম্ভীর্য, আত্মসম্মান আর যেন ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনাও কেমন যেন দ্রুত বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার যে জননী কলহের ছায়া দেখিলেও শঙ্কিত হইতেন, তিনি আজকাল ইহাতেও যেন বিমুখ নন–সে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। সুতরাং, উভয়ের দেখা হইলেই একটা অত্যন্ত অশোভন কলহ যে অনিবার্য, এ-কথা তাহার অন্তর্যামী আজ বলিয়া দিলেন। কি করিলে যে এই বিপদ এড়াইতে পারা যায়, ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পা-টিপিয়া উঠিয়া সে কপাট রুদ্ধ করিতেছিল; মা বলিলেন, জ্ঞানদা, ও অতুল কথা কইলে না?

জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি জানি মা তিনি ন' ন বোধ হয়।

হাঁ, সেই বৈ কি! উঠে একবার দেখ দিকি।

তর্ক করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন—তাহা সে জানিত; তাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখা গেল না। শুধু বারান্দার ওধারে অনেকের মধ্যে তাঁহারও কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল। এইটুকু খবর লইয়াই সে ফিরিতে পারিত; কিন্তু অন্তরাল হইতে একবার তাঁহার মুখখানি দেখিয়া লইবার লোভ তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল।

সে নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল, তিনি বড়মাসির পায়ের উপর মুঠা করিয়া আবীর দিয়া হাসিতেছেন। পাড়ার ছেলেরাও দেখাদেখি তাহাই করিতেছে।

ছোটবৌ ছিল না। একটা ব্যথার মত হওয়াতে আজ সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। ফিরিবে ফিরিবে করিয়াও নিজের অজ্ঞাতসারে বোধ করি জ্ঞানদার একটু বিলম্ব ঘটিয়াছিল, অকস্মাৎ বজ্রাহতপ্রায় হইয়া দেখিল, সে যে ভয় করিয়াছিল ঠিক তাই,—মা হেলিয়া-দুলিয়া সেইদিকে চলিয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, যেয়ো না মা, ফেরো।

দুর্গা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কেন?

কেন, জানিনে মা, তুমি ফেরো। তার ত কোন আশাই নেই মা—

আমাকে ছাড়্ হতভাগী—ছেড়ে দে! বলিয়া অমানুষিক বলে দুর্গা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। জ্ঞানদা কলের পুতুলের মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সবাই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল—মেজবৌ।

তাঁহার সেই কঙ্কালসার মুখমণ্ডলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি ছিল। সে দুটা জ্বলন্ত চক্ষুর পানে চাহিয়া অতুল সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

দুর্গা বলিলেন, অতুল, আমরা তোমার কি করেছিলাম যে, এমন করে আমাদের সর্বনাশ করলে?

অতুল জবাব দিবে কি, অপরাধের ভারে ঘাড় তুলিতেই পারিল না।

সেই কাজটা করিলেন স্বর্ণ। হৃদয় বলিয়া তাহার ত কোন বালাই ছিল না; তাই অতি সহজেই মুখ তুলিয়া কহিলেন, কেন, কি সর্বনাশ করেচে শুনি?

দুর্গা বলিলেন, তোমাকে তার কি জবাব দেব, দিদি, যাকে বলচি সেই জানে সে কি করেচে।

স্বর্ণ কহিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে মেজবৌ, কিন্তু, ও কি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লেখাপড়া করে দিয়েছিল যে, এত লোকের মাঝখানে তেড়ে এসেচ? যাও, ঘরে যাও—পাল-পার্বণ আমোদ-আহ্লাদের দিনে আমার বাড়িতে বসে অনাছিষ্টি কাণ্ড ক' রো না।

অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি করতে আসিনি দিদি। বলিয়া অতুলের পানে চাহিয়া বলিলেন, যে করে আমাদের এই একটা বছর কেটেছে অতুল, সে তুমি জান না—কিন্তু ভগবান জানেন। কিন্তু, এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তাঁর মরণকালে আশা দিয়েছিলে? কেন তুমি তখনি জানালে না?

স্বর্ণ রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন, বাছাকে তুমি ভগবান দেখিয়ো না বলচি, মেজবৌ ভাল হবে না। আমারা বেঁচে থাকতে কথা দেবার কর্তা ও নয়।

এত লোকের সমক্ষে অতুল নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছিল; মাসির জোর পাইয়া কহিল, আমি কি নিজে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছিলাম? আমার পা ছাড়ে না—পায়ের উপর পড়ে মাথা খুঁড়তে লাগল—বাবাকে নিজের মুখের কথা দাও| করি কি? অত লোকের সামনে আমি লজ্জায় বাঁচিনে—তাই পা ছাড়াবার জন্যে যদি একটা কৌশল করে থাকি, তাকে কি কথা দেওয়া বলে?

স্বর্ণ খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ওমা কি ঘেন্নার কথা অতুল,—তুই বলিস কি রে? ছুঁড়ি নিজে পায়ে ধরে বলে—আমায় বিয়ে কর? অ্যাঁ?

অতুল কহিল, সত্যি কিনা, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না? মেজমাসিমা নিজেই বলুন না, আমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়তে দেখেছিলেন কিনা। নইলে ঐ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাব? আমার কি মরবার দড়ি-কলসী জোটে না?

অতুলের সঙ্গীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্গা উন্মাদের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন, ওরে নিষ্ঠুর! ওরে কৃতঘ্ন! দড়ি-কলসী আমি কিনে দেব রে, তুই মর গে! তোর মরাই উচিত। যে মেয়েকে তুই এত লোকের সুমুখে এতবড় অপমান করলি, সেই মেয়েই যে তোকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল রে! সব ভুলে গেলি?

চিৎকার শুনিয়া ছোটবৌ ব্যথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, স্বর্ণ লাফাইয়া উঠিয়াছে—তবে লো হতভাগী! বেরো আমার বাড়ি থেকে—বেরো বলচি।

জ্ঞানদা দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে অচেতন পাথর হইয়া গিয়াছিল। লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান, অপমান, ভালমন্দ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল না। এ-সমস্তরই যেন সে একান্ত অতীত হইয়াই নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব মূর্তির প্রতি চাহিয়া ছোটবৌ সভয়ে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিল,—জ্ঞানদা? সে ঘরের ভিতর হইতেই কলহের কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল।

জ্ঞানদা জবাব দিল, কেন খুড়ীমা!

আর কেন দাঁড়িয়ে মা, তোর মাকে ঘরে নিয়া যা।

মা চল, বলিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেল।

স্বর্ণ কহিলেন, দেখলি ছোটবৌ, আস্পর্ধা! একেই বলে, বামন হয়ে চাঁদে হাত।

অতুল হাসিবার মত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কহিল, শুনলেন ছোটমাসিমা কাণ্ডটা? কি ভয়ানক লজ্জা!

স্বর্ণ খনখন করিয়া বলিলেন, একফোঁটা মেয়ে,—এ কি ঘোর কলি! ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া কহিল,—ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি! নইলে আর কোন কাল হলে, মা বসুন্ধরা এতক্ষণ লজ্জায় দু' ফাঁক হয়ে যেতেন অতুল। বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

স্বর্ণ বিদ্রূপের তাৎপর্য না বুঝিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, সেই কথাই ত বলচি ছোটবৌ!

কিন্তু অতুলের মুখ কালো হইয়া উঠিল। ছোটবৌয়ের কথার তাৎপর্য স্বর্ণ না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল। তাই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া যখন সে উঠিয়া গেল, তখন মনে হইল, এই হোলির দিনে কে যেন তাহার জামায় কাপড়ে লাল রঙ এবং মুখে গাঢ় কালি লেপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

আসল কথাটা এতদিন অপ্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু আর রহিল না। পাড়ার হিতাকাঙ্ক্ষিণীদের কথায় অচিরেই দুর্গার কানে গেল যে, এই বাড়িতেই অতুল আবদ্ধ হইয়াছে। অনাথেরই বড়মেয়ে মাধুরীর সঙ্গেই তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ঘটকালি স্বর্ণ করিয়াছেন এবং মেয়ে দেখিয়া অতুলের ভারী পছন্দ হইয়াছে।

অরক্ষণীয়া – ০৮

মাধুরী শিশুকাল হইতেই কলিকাতায় মামার বাড়ি থাকে। মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত শিখিয়াছে। গাহিতে, বাজাইতে, কার্পেট বুনিতেও জানে; আবার শিব গড়িতে, স্তোত্র আওড়াইতেও পারে। দেখিতেও অতিশয় সুশ্রী। এইবার পূজার সময় মাস-দুয়ের জন্য বাটী আসিয়াছিল; সেই সময়েই কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। অতুলের মত দুর্লভ পাত্র চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় নাই, পাত্র আপনিই ধরা দিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ মাঝখানে ছিলেন।

ছোটবৌয়ের ভাইয়েরা অবস্থাপন্ন। মা বাঁচিয়া আছেন, আসন্ন-প্রসবা মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, সঙ্গে মাধুরীও আসিল। মেজজ্যাঠাইকে সে অনেকদিন দেখে নাই, আসিয়াই প্রণাম করিতে আসিল।

দীর্ঘজীবী হও মা! বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া দুর্গা নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। একে সে সুন্দরী, তাহাতে মামী সাজাইয়া-গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। মামী কলিকাতার মেয়ে–কেমন করিয়া সাজাইয়া দিতে হয় জানে। গায়ে গুটি কয়েক বাছা বাছা স্বর্ণালঙ্কার; পরনে কোঁচানো চওড়া লালপেড়ে শাড়ি; পিঠের উপর চুল এলো করা; কপালে টিপ। চাহিয়া চাহিয়া দুর্গার চোখের পাতা আর পড়ে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল–আহা! মেয়ে ত নয়–যেন স্বর্ণ-প্রতিমা! এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পদতলে উপবিষ্টা নিজের ঐ মলিন, শ্রীহীন মেয়েটার পানে চাহিয়া তাঁহার দু’ চক্ষু সহসা যেন জ্বলিয়া গেল;—পাশ ফিরিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, আর আমি মেয়ে পেটে ধরেচি যেন কাল্ প্যাঁচা!

মাধুরী ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাহার রূপ এবং সাজসজ্জার পানে চাহিয়া জ্ঞানদা নিজেই ত হীনতার সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। মাধুরী কহিল, দিদি, চল না, একটু গল্প করি গে।

প্রত্যুত্তর জ্ঞানদা অব্যক্ত স্বরে কি কহিল, বোঝা গেল না। কিন্তু সেই শব্দটা মাত্র শুনিতে পাইয়াই দুর্গা তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও পোড়ামুখ লোকের সামনে আর বার করিস নে গেনি–বসে থাক। জ্ঞানদা নীরবে বসিয়া রহিল।

মাধুরী চলিয়া গেলে, দুর্গা বোধ করি নিতান্তই মনের জ্বালায় বার-দুই আঃ উঃ করিলেন। জ্ঞানদা আস্তে আস্তে কহিল, কপালটা একটু টিপে দেব মা?

না।

ওষুধটা একবার–

ওলো, না, না, না। যা, আমার বিছানা থেকে উঠে যা, হারামজাদী! তোর মুখ দেখলেও আমার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলেপুড়ে যায়। বলিয়া পা দিয়া তিনি মেয়েকে সজোরে ঠেলিয়া দিলেন।

জ্ঞানদা অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু লাথিটা সহ্য করিতে পারিল না। নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দু' চক্ষের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—ভগবান! আমি কার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে সকলেরই চক্ষুশূল। আমার রূপ নাই, বসন-ভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ত্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেহ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে–সেও কি আমার অপরাধ? প্রভু! এতই যদি আমার দোষ, তবে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও–তিনি আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন না|

জ্ঞানদা! বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিলেন। মায়ের ডাকে সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

রোগা শরীর, ভিজে মাটির ওপর কেন মা? বলিয়া দুর্গা উৎকণ্ঠায় নিজেই উঠিয়া বসিলেন।

ওঃ, বকেচি বুঝি মা! বলিয়া চক্ষের পলকে দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আজ সন্ধ্যার পরে হঠাৎ অনাথ দুর্গামণির ঘরে ঢুকিয়া বিমর্ষমুখে কহিল, আজ কেমন আছ মেজবৌঠান? থাক থাক, আর উঠো না। তা–তা ওষুধপত্র কিছুই খেতে চাও না শুনলাম–অমন করলে ত আরাম হতে পারবে না!

কথাটা সত্য। যদিচ ঔষধ যাহা দেওয়া হইতেছিল, তাহা না দিলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সেও তিনি একেবারে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। কণ্ঠস্বর প্রতিদিন গহ্বরে ঢুকিতেছিল–খুব কাছে না আসিলে আজকাল আর শুনিতেই পাওয়া যাইত না। দেবরের আকস্মিক আত্মীয়তায় দুর্গা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তথাপি অব্যক্ত স্বরে প্রত্যুত্তরে যাহা কহিলেন, অনাথ ঘাড়টা কাত করিয়া, বিশেষ চেষ্টা করিয়া শুনিয়া, বলিলেন, সে ত সত্যি কথাই বৌঠান। বিধবা হয়ে আর বেঁচে লাভ কি,—কোন্ হিন্দুসন্তান এ কথার প্রতিবাদ করবে বল? তবে কিনা, আত্মহত্যাটা না করে কোনগতিকে ক ’ টা দিন সংসারে থাকা! তোমার আবার যে-রকম দেহের অবস্থা, তাতে এসব কথা আমার না বলাই উচিত, কিন্তু না বললেও যে নয় কিনা, তাই বলি কি, নিজেও দেখতে পাচ্চ–চেষ্টার আমি ত্রুটি করচি নে; কিন্তু কি হতভাগা মেয়ে–কোনমতেই কি একটা গাঁথচে না। ছ-সাতটা সম্বন্ধ–সব ক ’ টাই ভেঙ্গে গেল–মেয়ে দেখে আর কারুর পছন্দ হ ’ লো না।

দুর্গা কিছুই বলিলেন না। একটুখানি থামিয়া অনাথ পুনরায় কহিতে লাগিল, মেজদা মরে তুমি আবার আমার সংসারে এসেছ কিনা! গোল হচ্ছে ত

তাই নিয়ে। নীলকণ্ঠ মুখুয্যেকে ত চেনই–বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ তালগোল পাকাচ্চে–তোমার ছুতো করে আমাকে কি করে ঠেলবে। আর, তাদের দোষই বা দিই কি করে, নিজেরাও ত মেয়ের বয়সটা দেখতে পাচ্চি! আবার তাও বলি, শহরে বাপু এত নেই–পোড়া পাড়াগাঁয়েই আমাদের যত হাঙ্গামা, যত বিচার। বলিয়া জোর করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দেবর যে কিসের ভূমিকা করিতেছেন, কোন্‌দিকে ইহার গতি–তাহা ধরিতে না পারিয়া দুর্গা তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু শীর্ণ মুখের উপর একটা অনিশ্চিত শঙ্কার ছায়া পড়িল।

একবার কাশিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাথ এইবার আসল কথা প্রকাশ করিল; কহিল, তোমার এ অবস্থায় সত্যিই ত আর কোথাও যাওয়া-আসা চলে না–সে আমি বলিনে; কিন্তু কি জান মেজবৌঠান–নিজের মেয়েটাও ত বিবাহযোগ্য হ' ল,—তাই আমি বলি কি জান,—সব দিক আমার বাঁচিয়ে চলা ত আবশ্যক,—আমি বলি কি–গেনিকে এ সময় আর কোথাও না পাঠালেই নয়। এ বাড়িতে আর ত তাকে রাখা যায় না। বড্ড হৈচৈ হচ্চে।

দুর্গার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ওষ্ঠাধরের মধ্যেই যেন মিলাইয়া গেল,—কোথায় সে যাবে ঠাকুরপো?

অনাথ কহিল, হরিপালেই যাক।

সেখানে কি করে যাবে? গিয়েই বা কি হবে ঠাকুরপো?

অনাথ এবার রুষ্ট হইল; কহিল, এ তোমার অন্যায়, মেজবৌঠান। কেবল নিজেরটি দেখলেই ত চলে না, যার সংসারে আছ–অসময়ে যে তোমাদের ঘাড়ে নিলে–তার ভালমন্দও ত চেয়ে দেখা চাই।

দুর্গা জবাব দিতে পারিলেন না–শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এ নিঃশ্বাসে এইটুকু কাজ হইল যে, অনাথ গলাটা একটু কোমল করিয়া কহিতে লাগিল, এ অবস্থায় তোমার একটু কষ্ট হবে বটে, তা বুঝতে পারচি। কিন্তু উপায়

কি? আর তোমার নিজের দোষও আছে, মেজবৌঠান। তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম–তিনি ত স্পষ্টই লিখছেন–সেখানে বিয়ের সমস্ত যোগাড় হয়েছিল, তুমি শুধু একটা অসম্ভব আশায় ভুলে, রাগারাগি করে মেয়ে নিয়ে চলে এলে। তা না করলে ত আজ স্বচ্ছন্দে–

স্বচ্ছন্দে যে কি হইতে পারিত, সেটা আর অনাথ খুলিয়া বলিল না। কিন্তু দুর্গা বুঝিলেন–হঠাৎ কেন সে আজ জ্ঞানদাকে বিদায় করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিছুমাত্র হাঙ্গামা না পোহাইয়া, একটা পয়সা খরচ না করিয়া এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সন্ধান যখন তাহার মিলিয়াছে, তখন এ লোভ ত্যাগ করিবে–সে লোক অনাথ নয়।

সে চলিয়া গেলে খানিক পরে কাজকর্ম সারিয়া জ্ঞানদা ঘরে ঢুকিয়া, মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। তাঁহার কোটর-প্রবিষ্ট রক্তশূন্য চোখ দুটি আজ ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েকে দেখিবামাত্রই তাঁহার ক্রন্দনের বেগ একবারে সহস্রমুখী হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া মেয়ের বুকে মুখ রাখিয়া মা আজ ছোট্ট মেয়েটির মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণে কান্না যখন থামিল, তখন মেয়ে কহিল, আমাকে কি তুমি চেনো না মা যে, কেউ আমাকে তোমার কাছ-ছাড়া করতে পারে? এ ত কাকার বাড়ি নয় মা, এ আমার বাবার বাড়ি। তিনি খেতে না দেন তখন ত আর লজ্জা থাকবে না–যা করে হোক তখন তোমাকে আমি খাওয়াতে পারব মা। বলিয়া মেয়ে আজ মা হইয়া মাকে মেয়ের মত কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে মা শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু মেয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়াও স্থির করিতে পারিল না, তাহার এই 'যা হোক' টা তখন কি হইবে। সে-দুর্দিনে মায়ের খাওয়া-পরাটা সে কেমন করিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে!

জ্ঞানদাকে বিদায় করার প্রস্তাবটা ছোটবৌ শুনিতে পাইয়া স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া কহিল, তোমার কি ভীমরতি হয়েচে যে, ভাজের পরামর্শে এই অসময়ে

মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে দূর করবার কথা বলে এলে? কসাই,—যাদের জবাই করাই ব্যবসা–তাদেরও তোমাদের চেয়ে দয়ামায়া আছে।

যাই হোক, কাজটা নাকি একেবারেই অসম্ভব, তাই অনাথ চুপ করিয়া গেল; না হইলে এ-সকল ব্যাপারে সে স্ত্রীর বাধ্য, এতবড় দোষারোপ তাহার অতিবড় শত্রুরাও তাহার প্রতি করিতে পারিত না।

কিন্তু দুর্গা হয়ত এই আসন্নকালেও মেয়ে লইয়া আর একবার হরিপাল যাইতে পারিতেন, কিন্তু সেখানে সেই যে পাত্র, যে নিজের পাঁচ-ছয়টি সন্তানের জননীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লাথি মারিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহার কথা মনে হইলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

পরদিন অনাথকে নিজের শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া দুর্গা তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, সম্পর্কে বড় না হলে, আজ তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইতাম ভাই, তোমার যাকে ইচ্ছে হয় একে দাও, কিন্তু মেয়েকে এ সময়ে আমার কাছ-ছাড়া ক' র না। বলিয়া জ্ঞানদার হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহার কাকার হাতের উপর রাখিলেন।

অনাথ হাতটা টানিয়া লইয়া বিরক্ত হইয়া কহিল, পরের দায়ে আমার জাত যায়। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করচি মেজবৌঠান? কিন্তু ঘাটের মড়াও যে এ শকুনিকে বিয়ে করতে চায় না। বলি, তোমার সেই বালাজোড়াটা যে ছিল, কি করলে?

সে ত তোমার দাদার শ্রাদ্ধের সময়েই গেছে ঠাকুরপো।

অনাথ হাতটা উল্টাইয়া কহিল, তা হলে আর আমি কি করব! একটা পয়সাও দেবে না, মেয়েও ছাড়বে না,—তার মানে, আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবোতে চাও আর কি! বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দুর্গা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, অকস্মাৎ মেয়ের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, বসে আছিস! ঘরে সন্ধ্যা দিবিনে?

যে-সমস্ত আলোচনা এইমাত্র হইয়া গেল, তাহারই দহনে বোধ করি জ্ঞানদা একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব দিবার পূর্বেই মা নিরতিশয় কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মরণ আর কি! রাজকন্যার মত আবার অভিমান করে বসে আছেন! হাঁ লা গেনি, এত ধিক্কারেও তোর ত প্রাণ বেরোয় না! যদু ঘোষের এক ছেলে সেদিন তিনদিনের জ্বরে ম' লো—আর এই একটা বছর ধরে তুই নিত্যি জ্বরের সঙ্গে যুঝচিস্, কিন্তু তোকে ত যম নিতে পারলে না! তুই বলে তাই এখনও মুখ দেখাস, আর কোন মেয়ে হলে মনের ঘেন্নায় এতদিন জলে ডুবে মরত। যা যা, সুমুখ থেকে একটু নড়ে যা শুকুনি,—একদণ্ড হাঁফ ফেলে বাঁচি। দিবারাত্রি আমাকে যেন জোঁকের মত কামড়ে পড়ে আছে। বলিয়া একটা ঠেলা দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

বাস্তবিক মায়ের কথাটা সত্য যে, আর কোন মেয়ে হইলে সুদ্ধমাত্র মনের ঘৃণাতেই আত্মহত্যা করিত,—এমন কত মেয়েই ত করিয়াছে,—কিন্তু এই মেয়েটিকে ভগবান যেন কোন নিগূঢ় কারণে মা বসুন্ধরার মতই সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়াছিলেন। সে নীরবে উঠিয়া গিয়া নিয়মিত গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইল। এতবড় নির্দয় লাঞ্ছনাতেও মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল,—না মা, মরিতে আমিও জানি! শুধু তুমি ব্যথা পাইবে বলিয়াই সব সহিয়া বাঁচিয়া আছি।

ঘরে প্রদীপ দিয়া গঙ্গাজল ছড়া দিয়া ধুনা দিয়া সে আর একটি ক্ষুদ্র দীপ হাতে করিয়া তুলসী-বেদীমূলে দিতে গেল। বাঙ্গালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই এই ছোট গাছটিকে দেবতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। এইখানে আসিয়া আজ আর সে কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া আর উঠিতে পারিল না। দুই হাত সুমুখে ছড়াইয়া দিয়া কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল।

ঠাকুর! দয়াময়! এইখানে তুমি আমার বাবাকে লইয়াছ—এইবার আমার মাকে আর আমাকে কোলে লইয়া আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও ঠাকুর! আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।

অরক্ষণীয়া – ০৯

চৈত্রের শেষের কয়টা দিন বলিয়া ছোটবৌয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নাই। মাসটা শেষ হইতেই তাহার ছোটভাই তাহাকে এবং মাধুরীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ ভাল দিন–খাওয়া-দাওয়ার পরেই যাত্রার সময়। অতুল বাড়ি আসিয়াছিল বলিয়া স্বর্ণ তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দুপুরবেলা এই দুটি যুবক আহারে বসিল, স্বর্ণ কাছে আসিয়া বসিলেন। শখ করিয়া তিনি মাধুরীর উপর পরিবেশনের ভার দিয়াছিলেন। সকালবেলা আঁশ-রান্নাটা জ্ঞানদাকে দিয়াই রাঁধাইয়া লওয়া হইত, কিন্তু তাহা গোপনে। বাহিরের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই স্বর্ণ অসঙ্কোচে কহিতেন, মা গো! সে কি কথা! ওকে যে আমরা রান্নাঘরেই ঢুকতে দিইনে; সুতরাং পরিবেশন করা তাহার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নিজের লজ্জাতেই সে কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইত না–যতদূর সাধ্য ঘরের বাহিরের সকলের দৃষ্টি এড়াইয়াই সে চলিত।

অতুলের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইবে। তাই, এই সুন্দরী মেয়েটি সর্বাঙ্গে সাজসজ্জা এবং ব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা জড়াইয়া লইয়া অপটু হস্তে যখন পরিবেশন করিতে গিয়া কেবলি ভুল করিতে লাগিল–এবং জ্যাঠাইমা সস্নেহ-অনুযোগের স্বরে, কখনো বা ‘পোড়ামুখী’ বলিয়া, কখনো বা ‘হতভাগী’ বলিয়া, হাসিয়া তামাশা করিয়া কাজ শিখাইতে লাগিলেন–তখন বিশ্বের পায়ে-ঠেলা আর একটি মেয়ে ইহারই জন্য রন্ধনশালায় নিভৃতে একান্তে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সর্বপ্রকার আহার্য গুছাইয়া দিতে লাগিল।

স্বর্ণ মাধুরীর বিবাহের কথা তুলিতেই সে ছুটিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই ভাই?

কিছু না দিদি; আমি আর পারিনে। বলিয়া হাতের খালি থালাটা দুম করিয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পরক্ষণেই স্বর্ণ চেঁচাইয়া ডাকিলেন, একটু নুন দিয়ে যা দেখি মা। কিন্তু নুন লইবার জন্য মাধুরী ফিরিয়া আসিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, কৈ রে–তোর ছোটমামা যে বসে আছে। তথাপি কেহ ফিরিল না। এবার তিনি রাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—কথা কি কারু কানে যায় না? এরা কি উঠে যাবে নাকি?

তবুও যখন মাধুরী ফিরিয়া আসিল না, তখন জ্ঞানদা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ভাবিল, নুন জিনিসটা ত আর ছোঁয়া যায় না–তাই বোধ করি, এ আদেশটা তাহারই উপরে হইয়াছে।

তখন মলিন শতচ্ছিন্ন পরিধেয়খানিতে সর্বাঙ্গ সতর্কে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া, সে নুন হাতে করিয়া ধীরে ধীরে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলে দুটি তাহাকে দেখিতে পাইল না। জ্যাঠাইমা তাহার আপাদমস্তক বার-দুই নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোমাকে আনতে কে বললে? মাধুরী কৈ?

জ্ঞানদা ঘরের বাহির হইতেই চুপি চুপি বলিল, কি জানি কোথায় গেল।

তাই তুমি এলে? এক কথা তোমাকে কতবার মনে করিয়া দিতে হবে যে, তোমার মুখ দেখলে সাত পুরুষ নরকস্থ হয়? আমার সুমুখে তুমি এস না। ঐ যে অতুল খেতে এসেচে কিনা, তাই তোমার সামনে আসাই চাই? না? নুনের পাত্রটা ঐখানে রেখে দিয়ে যাও।

পাত্রটা রাখিয়া দিয়া জ্ঞানদা চলিয়া গেল। সে শুদ্ধ এইজন্যই যাইতে পারিল যে, মা বসুন্ধরা দ্বিধা হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন না।

স্বর্ণ স্বয়ং উঠিয়া নুন পরিবেশন করিলেন এবং স্বস্থানে বসিয়া অতুলের পানে চাহিয়া কহিলেন, তুই ব্যাটাছেলে, পুরুষমানুষ–তোর আবার লজ্জা কি যে ঘাড় হেঁট করে বসে আছিস! খা।

মাধুরীর মামা প্রশ্ন করিল, ও কে দিদি?

স্বর্ণ একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ও কিছু না–তোমরা খাও|

কিন্তু অতুলের সমস্ত খাবার বিস্বাদ হইয়া গেল। লুচির টুকরা কিছুতেই যেন সে গিলিতে পারিল না। গিলিবে কি করিয়া? আজ সে মাধুরীকে দেখিয়া ভুলিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু জ্ঞানদাকেও ত সে চিনিত। এখনও জ্ঞানদা তাহাকে ভালবাসে কি ঘৃণা করে, যদিচ ঠিক জানিত না, কিন্তু একদিন সে যে তাহাকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত তাহা ত জানে। কিন্তু তেমন দিনেও যে কখনো গায়ে পড়িয়া তাহার সুমুখে আসিবার চেষ্টা করে নাই, আজ সে যে তাহাই করিতে আসিয়াছে–এতবড় নির্লজ্জ অপবাদ সে এত সত্বর বিশ্বাস করিবে কি করিয়া?

অপরাহ্নবেলায় ছোটবৌ মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় মেজজায়ের সহিত দেখা করিয়া গেল না। শুধু একমুহূর্তের জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া জ্ঞানদার হাতে একখানি দশটাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া, অনেকটা যেন চোরের মত পলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া তাহার প্রণামটা পর্যন্ত গ্রহণ করিল না।

বাটীর মধ্যে শুধু এই একটা লোক,—যে এই দুর্ভাগা মেয়েটার ভিতরটা দেখিতে পাইয়াছিল–সেও আজ কি জানি, কতদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেল। থাকিয়াও সে যে বিশেষ কিছু করিয়াছিল তাহা নয়–ব্যথা পাওয়া এবং ব্যথা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া কাজ করা, এক জিনিস নয়–সকলে তাহা পারে না, তবুও ছোটখুড়ীমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিবিড় অন্ধকারে এই মেয়েটার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বৈশাখের মাঝামাঝি একটা দিনে অনাথের অফিস যাইবার সময় বড়বৌ মুখের উপর সংসারের সমস্ত দুশ্চিন্তা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েছে বৌঠান?

স্বর্ণ কহিলেন, তুমি করচ কি ঠাকুরপো; মেজবৌয়ের যে হয়ে এলো!

অনাথ হাতের হুঁকাটা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়া পাংশু-মুখে কহিল, বল কি? কৈ আমি ত কিছু জানিনে!

স্বর্ণ বলিলেন, না না, তা নয়; আজই সে মরচে না; কিন্তু বেশিদিন আর নেই, তা বলে দিচ্চি। বড় জোর দশ-পনর দিন। তার পরে ছ' মাস, একবছর ছুঁড়িটার বিয়ে দেবার জো থাকবে না–কিন্তু আমার মাধুরী-মায়ের বিয়ে আমি এই আষাঢ়ের মধ্যেই দেব–তা কারু কথা শুনব না | এমন খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া দেবার-থোবার কামড় নেই। ছেলে নিজে পছন্দ করেচে,—মা মাগী যে বলবেন–এ নেব, তা নেব, সে না হলে চলবে না–তার জো নেই| এমন সুবিধে কি আমি শেষকালে দেরি করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলব?

অনাথ সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, সে কি হতে পারে! তুমি হলে আমার সংসারের কর্তা-গিন্নী সমস্তই। তোমার মেয়ের বিয়ে বোনপোর সঙ্গে দেবে–যেদিন খুশি দিয়ো, যা ইচ্ছে ক' রো, আমি কখনো ত তাতে না বলব না, বৌঠান।

স্বর্ণ সগর্বে বলিলেন, তা ত বলবে না, জানি। কখনো বলোওনি–আমার সে দেওর তুমি নও। তাতেই ত বলচি, এখন যা বলি কর। আর গড়িমসি ক' রো না, যাকে হোক ধরে-বেঁধে ওকে বিদায় কর। সে না করলে মাধুরীর বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। এমনিই ত পাড়ার ব্যাটা-বেটীরা নানা কথা কইচে, তখন কি আবার একটা গোলমালে পড়ে যাব? মনে বেশ করে বুঝে দেখ, ও তোমারই ঘরের মড়া, ফেলবে ফ্যালো, না হয় পচা গন্ধে মরো।

কথাটা অনাথ ভাবিতে ভাবিতে অফিসে গেল এবং পরদিন হইতেই ঘরের মড়া ফেলিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এমন দুই-চারিজন পাত্র ধরিয়া আনিতে লাগিল, যাহাদের পরিচয় নিজের মুখে দিতে গেলে বোধ করি স্বর্ণমঞ্জরীকেও দু ' বার ঢোক গিলিতে হইত।

সেদিন দুপুরবেলা অনেক দিনের পর স্বর্ণ আসিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকলেন–বলি, আজ কেমন আছ মেজবৌ?

দুর্গা কষ্টে পাশ ফিরিয়া হাতটা একটু উলটাইয়া কহিলেন, আর থাকা-থাকি দিদি! আশীর্বাদ কর, আর যেন বেশী দিন ভুগতে না হয়।

স্বর্ণ সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, না না, ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে বৈ কি।

দুর্গা চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতিবাদ করিলেন না। স্বর্ণ তখন কাজের কথা পাড়িলেন। কহিলেন, তা মেয়ে বড় কিনা, পাত্তরটি নেহাত ছোঁড়া হলেও ত আর মানাবে না মেজবৌ। বাপ-মা নেই, তাই নিজেই ওবেলা মগরা থেকে দেখতে আসবেন, বলে পাঠিয়েচেন–বলা বাহুল্য, বাপ-মা অমর না হইলে আর পাত্রটির ও-বয়সে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা চলে না। স্বর্ণ বলিতে লাগিলেন, এখন মা-কালী করেন, মেয়ে দেখে তার পছন্দ হয়, তবেই ত ছোটঠাকুরপোর ছুটাছুটি হাঁটাহাঁটি সার্থক হয়। তার পর আবার দেনা-পাওনার কথা–তা আমি বলি কি–

কথাটা শেষ না হইতেই দুর্গা আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া ছলছল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ কর দিদি, এই সম্বন্ধটি আর যেন ভেঙ্গে না যায়। আমি যেন দেখে যেতে পারি, বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দিয়া দু’ ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বর্ণ বলিলেন, আশীর্বাদ করচি বৈ কি মেজবৌ, দিনরাত ঠাকুরকে জানাচ্চি,—ঠাকুর, যা হোক মেয়েটার একটা কিনারা করে দাও। তা দেখব বৈ কি মেজবৌ–আমি বলচি, তুমি জামাইয়ের মুখ দেখে তবে–

দুর্গা নীরবে আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন। স্বর্ণ একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কাচ্চাবাচ্চার বাপ–ঐ শুনতে দেড় শ মাইনে–নইলে কিছু নেই, সব জানি ত। নিজের মেয়েটার কি করে যে দু’ হাত এক করবে তাই ভেবে কাঠ হয়ে যাচ্চে। তার ওপর আবার এটি! বুঝতে সবই ত পার মেজবৌ,—তাই ঠাকুরপো বলছিল কি–লজ্জায় নিজে ত তোমাকে বলতে

পারে না–বলছিল যে, তোমার অংশের বাড়িটা বাঁধা না দিলে ত আর খরচপত্রের যোগাড় হয়ে উঠবে না–তোমাকে নিজে কিছুই করতে হবে না, শুধু একটা ঢেরা-সই করে দেওয়া। শুধু হাতে কেউ ত আর ধার দিতে চায় না–পোড়া কলিকাল এমনি যে, তুমি মর আর বাঁচ, কেউ কারুকে বিশ্বাস করবে না–

দুর্গা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি আর ক' দিন দিদি, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করব। শুধু এইটুকু দেখো দিদি, ও আমার না একবারে অকূলে ভেসে যায়।

না না, ভেসে যাবে কেন মেজবৌ? বাপ-খুড়ো, মা-জ্যাঠাই কি ভিন্ন? তা যদি হবে আমরাই বা কেন ওর জন্যে ভেবে ভেবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করব বল? আমার জ্ঞানদাও যা, মাধুরীও সেই পদার্থ। দে না মা জ্ঞানদা, তোর মায়ের চোখ দুটো মুছিয়ে। মাথায় একটু পাখা কর্‌ মা বসে। বলিয়া একাধারে আশা ও ভরসা দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আজ বহুদিনের পর দুর্গার মৃত্যুমলিন মুখের উপর একটা আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল। মেয়ের হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া, নিজে শীর্ণ হাতখানি তাহার মাথায় মুখে বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এইখানে শুয়ে একটু ঘুমো দিকি মা! বলিয়া জোর করিয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, এমন পোড়াকপালীর পেটে তুই জন্মেছিলি মা, যে এই বয়সেই খেটে খেটে, আর ভেবে ভেবে শরীর পাত করলি। যদি জন্মই নিয়েছিলি, ছেলে হয়ে কেন জন্মাস নি মা!

অনেকদিন পর জননীর আদর পাইয়া মেয়ের দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই বোধ করি একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ মায়ের ঠেলা খাইয়া জ্ঞানদা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল।

ও মা, ওঠ ওঠ; বেলা যে আর নেই। আমার টিনের বাক্সটার মধ্যে বোধ করি একটুখানি সাবান আছে–যা দিকি মা, চট করে পুকুর থেকে মুখ হাত পা

ধুয়ে আয়। না বাছা, ঐ তোর বড় দোষ–তুই কথা শুনতে চাসনে। বলচি, যা শিগগির।

মাতার নির্দেশমত জ্ঞানদা টিনের বাক্স খুলিয়া বহুদিন পূর্বের একটুকরা সাবান বাহির করিয়া গামছা লইয়া ম্লানমুখে পুকুরে চলিয়া গেল। মা বলিতে লাগিলেন, বেশ করে একটু রোগড়ে রোগড়ে ধুস মা, তাচ্ছিল্য করিস নে, চট্ করে আসিস মা–বলা যায় না ত, কখন তাঁরা সব এসে পড়বেন।

পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানদা অবাক হইয়া গেল। মরণাপন্ন মা ইতিমধ্যে কখন বিছানা হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া কি জানি তোরঙ্গের কাছে গিয়া, সেটা খুলিয়াছেন এবং নিজের একখানি ছোপান কাপড় এবং জামা বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। মেয়ে আসিতেই বলিলেন, ভুল হয়ে গেল রে, মাথাটা বেঁধে দিলাম না, গা ধুয়ে এলি–তা হোক, ব’ স। চট করে বেঁধে দিই।

মেয়ে কাতর হইয়া বলিল, না মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পারবে না মা, শোও, আমি আপনি বেঁধে নিচ্চি। দোহাই মা তোমার।

মেয়ের কথা শুনিয়া আজ মা একটুখানি হাসিলেন; ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঃ! পারব না! জানিস গেনি, এই মেজবৌয়ের হাতে চুল বাঁধবার জন্যে পাড়ার মেয়ে ঝোঁটিয়ে আসত। আমি পারব না চুল বাঁধতে? নে, আয় দেরি করিস নে। বলিয়া জোর করিয়া কাছে বসাইয়া সযত্নে সস্নেহে স্বহস্তে পরিপাটি করিয়া, বোধ করি এই তাঁহার শেষ সাজ সাজাইয়া দিলেন।

পায়ে আলতা, কপালে খয়েরের টিপ, ঠোঁটে রঙটুকু পর্যন্ত দিতে ভুলিলেন না, মুখখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি চুমা খাইয়া তাঁহার হঠাৎ মনে হইল,—কে বলে, মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়! একটু কালো কিন্তু কার মেয়ের এমন মুখ, এমন চোখ দুটি!

এটা তিনি ধরিতে পারিলেন না যে, কার মেয়ে মাকে এমন ভালবাসে? কার এমন মা-অন্ত প্রাণ? কোন্ মেয়ের হৃদয়ের এতবড় ভক্তি ও ভালবাসার দীপ্তি

এমন করিয়া তাহার সমস্ত কুরূপ আবৃত করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে? এ-সকল তিনি টের পাইলেন না বটে, কিন্তু মেয়ের গায়ে একখানি অলঙ্কারও পরাইতে পারেন নাই বলিয়া ইতিপূর্বে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, কেমন করিয়া কখন যেন তাহা মুছিয়া গেল। গহনার অভাব একটা ভারী অভাব বলিয়া আজ আর তাঁহার চোখে পড়িল না।

তখনও অনেক বেলা ছিল, কিন্তু কোনমতেই আর তিনি শুইতে চাহিলেন না। সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া মেয়েকে সম্মুখে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

গেনিকে দেখিতে আসিবে শুনিয়া পাশের বাড়ির নীলকণ্ঠের পরিবার আসিলেন, তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি আসিলেন। যথাসময়ে মেয়ের ডাক পড়িল, তাঁহারা গিয়া পাশের ঘর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের অত্যন্ত কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে থাকিলে, তাহার মা যেমন করিয়া সময় কাটান, তেমনি করিয়া দুর্গা একাকী তাঁহার মলিন শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন।

পাত্র এবং ঘটকঠাকুর জলযোগাদি সমাধা করিয়া বাহির হইলেন—তিনি টের পাইলেন। তাঁহাদের ঠিকাগাড়ি ছড়ছড় ঘড়ঘড় করিয়া চলিয়া গেল—তাহাও শুনিতে পাইলেন। তার পরে তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি ঘরে ঢুকিয়া একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জানাইলেন, নাঃ—মেয়ে পছন্দ হ' লো না।

দুর্গা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন, একটি প্রশ্নও করিলেন না।

ঠাকুরঝি করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, ঐ হাড়গোড়-বার-করা মেয়ে কি কারো পছন্দ হয়? বলি মেজবৌ, গেনিকে দু' দিন খাওয়াও-মাখাও, একটু তাউত কর। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখচি ত, এই মেয়ে কি এমনই ছিল? জ্বরে জ্বরে বাছার হাড়-পাঁজরা বার করে ফেলেচে—একটা বছর সবুর করে যত্ন-আত্তি করে দেখ দিকি, ঐ মেয়ে আবার কেমন হয়! তখন পড়তে পাবে না।

সে ত ঠিক কথা। কিন্তু কৈ সে সুযোগ? টাকা কৈ? একটা বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাহার অস্থিপঞ্জর ঢাকা দিবার সময় কোথায়? মেয়ে যে পনরোয় পড়িল। পিতৃপুরুষেরা প্রতিদিন যে নরকে গভীরতর কূপে নিমগ্ন হইতেছেন! বড় কুলীনের মেয়ে নয়, তাই গ্রামের লোক 'জাতি মারিব' বলিয়া যে অহর্নিশি চোখ রাঙ্গাইয়া শাসাইতেছে। প্রতীক্ষা করিবার আর তিলার্ধ অবসর নাই, বিদায় কর, বিদায় কর। যেমন করিয়া হোক, যাহার হাতে হোক–কাল তাহার বৈধব্য অনিবার্য জানিয়া হোক, অসহ্য দুঃখ ও চিরদারিদ্র্য চোখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়া হোক, তাহাকে সঁপিয়া দিয়া জাতি-ধর্ম এবং পিতৃপুরুষের পারলৌকিক প্রাণ রক্ষা কর।

তখনো ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয় নাই। সেই অন্ধকারে লুকাইয়া জ্ঞানদা তাহার লাঞ্ছিত সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। দুর্গা মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন। খানিক পরে সে হতভাগ্য কঠিন অপরাধীর মতো নীরবে মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া যখন বসিল, জননী জানিতে পারিয়াও সাড়া দিলেন না। তার পরে তেমনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অভুক্ত পীড়িত কন্যা শ্রান্তির ভারে সেইখানেই ঢলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত অনুভব করিয়াও মায়ের প্রাণে আজ লেশমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না।

অরক্ষণীয়া – ১০

দুর্গার এমন অবস্থা যে, কখন কি ঘটে বলা যায় না। তাহার উপর যখন তিনি পাড়ার সর্বশাস্ত্রদর্শী প্রবীণাদের মুখে শুনিলেন, তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃপুরুষদিগেরই দিন দিন অধোগতি করিতেছে তাহা নহে,—তাহার নিজেরও মরণকালে সে কোন কাজেই আসিবে না—তাহার হাতের জল এবং আগুন উভয়ই অস্পৃশ্য—তখন শাস্ত্র শুনিয়া এই আসন্ন পরলোকযাত্রীর পাংশু মুখ কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া রহিল।

বহুদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত ঘা খাইয়া খাইয়া তাঁহার স্নেহের স্থানটা কি একপ্রকার যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। যে মেয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না, সেই মেয়েকেই দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেছিলেন। আজ এই সংবাদ শোনার পর, তাঁহার পরলোকের কাঁটা এই মেয়েটার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত চিত্ত একেবারে পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেল। মায়া-মমতার আর লেশমাত্র তথায় অবশিষ্ট রহিল না।

অনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, শুনেচি নাকি ও-পাড়ার ঐ যে গোপাল ভটচায্যি, না কে, সে বুঝি আবার বিয়ে করবে। আমার মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না ঠাকুরপো?

অনাথ কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, না না, গোপাল ভটচায্যি আবার বিয়ে করবে কি! কে তোমার সঙ্গে তামাশা করেচে, বৌঠান?

দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে আর তামাশা করবে কে, ঠাকুরপো? তিনি পুরুষমানুষ ব্যাটাছেলে, তাঁদের আবার বয়সের খোঁজ কে করে? না না, ও-বয়সে অনেকে বিয়ে করে ঠাকুরপো! আমি মিনতি করচি, একবার

গিয়ে তাঁর সন্ধান নাও। বেঁচে থেকে ত কিছুই পেলাম না, মরণের পরে একটু আগুনও কি পাব না?

এখন ইহাই হইয়াছে তাঁহার সকল আশঙ্কার বড় আশঙ্কা। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে এই যে, মেয়ে পেটে ধরা, এত দুঃখে লালন-পালন করা, শেষ মুহূর্তে সমস্তই কি একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে? যাহার হাতে আগুন পাইবার জো নাই, সে মেয়ে কেন জন্মিয়াছিল?

উদ্বেগে প্রায় উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, যেখানে হোক, যার হাতে হোক, আমি বেঁচে থাকতে ওকে সঁপে দাও। আমি বলচি, আমার এই শেষ আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে ঠাকুরপো।

ঠাকুরপোর নিজের গরজও এ বিষয়ে কম নয়। সে সেইদিনই গোপাল ভটচায্যির খোঁজ লইতে গেল এবং কথাটা সত্য শুনিয়া খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, শুধু সত্য বলিয়াই নয়—ইহারই মধ্যে খবর পাইয়া চারি-পাঁচজন কন্যাভারগ্রস্ত পিতা আসিয়া তাহাকে সাধাসাধি করিয়া গিয়াছে বলিয়া।

এত কষ্টের বিয়ে, তবুও যে শুনিল গোপালকে কন্যা দান করা হইবে—সে-ই ছি ছি করিল। কিন্তু জননীর তাহাতে মন টলিল না। তিনি যে এখন পরলোকের যাত্রী; সে যাত্রার পাথেয় শাস্ত্র-নির্দেশমত যেমন করিয়া হোক তাঁহার সংগ্রহ হওয়া যে নিতান্তই চাই!

বাঙ্গালীর মেয়ে—কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে শাস্ত্রের যূপকাষ্ঠে কন্যা বলি দিয়া আসিয়াছে, আজ পিছাইয়া দাঁড়াইবে সে কি করিয়া? আবার দুঃখের উপর দুঃখ, সেই গোপাল বলিয়া পাঠাইল, সে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবে। এ পোড়া দেশে তাহারও শখ আছে এবং পাঁচটি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার সুযোগও আছে।

গ্রীষ্মের শুষ্ক তৃণ একটা মেঘের বারিপাতেই যেমন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই একটুকুমাত্র আশার ইঙ্গিতে দুর্গার মরা-আশা চক্ষের পলকে মাথাঝাড়া দিয়া

উঠিল। তিনি অনাথের হাতটা ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, এইটুকু ছোটভাইয়ের কাজ কর ভাই—হতভাগীর হাতের আগুনটুকু যেন শেষ সময়ে পাই। সামনের পাঁচুইটা যেন আর কোনমতেই ফসকে না যায়। তুমি বলে এস ভাই, আজকেই যেন মেয়ে দেখে কথাবার্তা পাকা করে যান।

বিয়ে না হইলে মায়ের শেষ কাজটাও তাহাকে দিয়া করান হইবে না—শাস্ত্রে নিষেধ আছে—এ কথা শুনিয়া জ্ঞানদা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করিল। সেও ত বাঙ্গালীর মেয়ে—তাহারও বুকের মধ্যে অবিশ্রাম যেন চিতার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

অপরাহ্নবেলায় একাকী রান্নাঘরে বসিয়া সে মায়ের জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল,—রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য আর একবার তাহার ডাক পড়িল।

স্বর্ণ নিজে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ওলো গেনি, ওটা নামিয়ে রেখে শিগগির শিগগির আয়, তারা দেখতে এসেচে। শুধু একখানা কাপড় পড়ে আয়, তারা এমনি দেখে যাবে। বলিয়া তিনি তেমনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অনাথ তখনও অফিস হইতে ফিরে নাই, সুতরাং আদর-অভ্যর্থনা করিবার ভার তাঁরই উপরে। দেখিতে আসিয়াছিল পাত্র নিজে এবং তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। ছেলে- ছোকরাদের পছন্দ আছে বলিয়া গোপাল বুদ্ধি করিয়া তাহার এই ভাগিনেয়টিকে সঙ্গে আনিয়াছিল। ইহারই পরামর্শ মত মেয়ে যেমন আছে তেমনি দেখাইবার আদেশ হইয়াছিল,—কারণ সাজাইয়া দেখানোর মধ্যে ফাঁকি চলিতে পারে।

ছেলেটি ছয়টার ট্রেনে কলিকাতায় যাইবে—সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল স্বর্ণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া গলা চাপিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞানদা আর আসে না।

শুদ্ধমাত্র একখানা কাপড় পরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার অনেক বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঝি গিয়া যখন তাহাকে টানিয়া আনিল, তখন তাহার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই জ্যাঠাইমা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, খোল এ-সব, কে বললে তোকে এমন করে সেজেগুজে আসতে? যা শিগগির খুলে আয়–

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, হঠাৎ এই চেঁচামেচি শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন। ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে এমনিই নিয়ে আসুন, আমার আর দেরি করবার জো নেই।

ঝি যখন তাহাকে আনিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইল, তখন কন্যার অপরূপ সাজসজ্জা দেখিয়া ছেলেটি বহু ক্লেশে হাসি দমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাল খবর দেব, বলিয়া মাতুলকে লইয়া প্রস্থান করিল। জলযোগের আয়োজন ছিল, কিন্তু ট্রেন মিস্ করিবার ভয়ে তাহা স্পর্শ করিবারও তাঁহাদের অবকাশ ঘটিল না।

কাল খবর দিবার অর্থ যে কি, তাহা সবাই বুঝিল। জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া, গালি পাড়িয়া, চক্ষের পলকে সমস্ত পাড়াটা মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন। মেজবৌয়ের অবস্থা ভাল নয়, অনর্থ আশঙ্কা করিয়া পাশের বাড়ির দুই-চারিজন ছুটিয়া আসিয়া পড়িল এবং ঠিক সময়েই অকস্মাৎ কোথা হইতে অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও ছটার ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছিল এবং পথের মধ্যে চিৎকার শুনিয়া এই আশঙ্কা করিয়াই বাড়ি ঢুকিয়াছিল।

অতুলকে দেখিতে পাইয়া স্বর্ণের রোষ শতগুণ এবং ক্ষোভ সহস্রগুণ হইয়া উঠিল। শীর্ণ, সঙ্কুচিত, ভয়ে মৃতকল্প, দুর্ভাগা মেয়েটার ঘাড়টা জোর করিয়া অতুলের মুখের উপর তুলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, দ্যাখ অতুল, একবার চেয়ে দ্যাখ! হতভাগী, শতেকখাকী, বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!

বাস্তবিক তাহার মুখের পানে চাহিলে হাসি সামলানো যায় না। তাহার ঠোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ দাড়িতে, অন্ধকার কোণে স্বহস্তে টিপ পরিতে গিয়া

সেটা কপালের মাঝখানে লাগিয়াছে। রুক্ষ চুল বোধ করি তাড়াতাড়ি এক খাবলা তেল দিয়া বাঁধিতে গিয়াছিল, তখনো দুই রগ গড়াইয়া তেল ঝরিতেছে।

দুই-একটা মেয়ে পাশ হইতে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজনের কোলে ছেলে ছিল, সে কহিল, গিনি পিতি থঙ থেজেচে। পিতি, এমনি কোলে জিব বার কলো—বলিয়া সে হাঁ করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল। আর একবার সবাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুখপোড়া ছেলে! বলিয়া তাহার মা-ও হাসিয়া ছেলের গালে একটা ঠোনা মারিলেন।

কিন্তু অতুলের বুকের ভিতরটা কে যেন তপ্ত শেল দিয়া বিঁধিয়া দিল। অনেকদিন হইয়া গেছে, এমন দিবালোকে এত স্পষ্ট করিয়া সে জ্ঞানদার মুখের পানে চাহে নাই। শুধু পরের মুখে শুনিয়াছিল, রোগে বিশ্রী হইয়া গেছে। কিন্তু সে বিশ্রী যে এই বিশ্রী, তাহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। একদিন সাংঘাতিক রোগে নিজে যখন সে মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকে সে ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নয়, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নয়,—অকপটে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়াই ভালবাসিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ যখন চোখে পড়িল, সেই মুখখানার উপরেই যম তাঁহার ডিক্রিজারি করিয়া শেষ নোটিস আঁটিয়া দিয়া গেছেন, তখন মুহূর্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হইল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বর্ণের উচ্চকণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

অ্যাঁ, খানকীর বেহদ্দ করলি লা? একটা ঘাটের মড়া, তার মন ভুলোবার জন্যে এই সঙ সেজে এলি? কিন্তু পারলি ভুলোতে? মুখে লাথি মেরে চলে গেল যে!

কে একজন প্রশ্ন করিল, কে এমন ভূত সাজিয়ে দিলে বড়বৌ? বুড়োর পছন্দ হ' ল না বুঝি?

স্বর্ণ তাহার প্রতি চাহিয়া, তর্জন করিয়া কহিলেন,—নিজে সেজেছেন—আবার কে সাজাবে? মা ত অজ্ঞান-অচৈতন্য। বলে দিলাম, শুধু একখানি কাপড় পরে আয়। তা পছন্দ হ' ল না। ভাবলেন, সেজেগুজে না গেলে যদি বুড়োর মনে না ধরে? আর সাজের মধ্যে ত ঐ ছোপানো কাপড়খানি, আর অতুলের দেওয়া এই দু-গাছি চুড়ি। তা দিনের মধ্যে দশবার খুলে তুলে রাখচে, দশবার হাতে পরচে। কালীমুখীর ও-চুড়ি হাতে দিয়ে বার হতে লজ্জাও করে না? বেরো সুমুখ থেকে—দূর হয়ে যা—

বেহায়া মেয়েটার এই নির্লজ্জ চরিত্রের সবাই সমালোচনা করিয়া, ছি ছি করিয়া চলিয়া গেল; শুধু যাঁহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, সেই অন্তর্যামীর চোখ দিয়া হয়ত বা একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনিই শুধু জানিলেন,—যে মেয়েটা আজন্মকাল লজ্জায় কখনো মুখ তুলিয়া কথা কহিতেই পারিত না, সে কেমন করিয়া, আজ সকল লজ্জায় পদাঘাত করিয়া নিজের ওই স্বাস্থ্য-শ্রীহীন দেহটাকে স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া ঐ অতিবৃদ্ধটার পদেই ঠকাইয়া বিক্রি করিতে গিয়াছিল! কিন্তু বিক্রি হইল না—ফাঁকি ধরা পড়িল। আজ তাই সবাই ছি ছি করিয়া ধিক্কার দিয়া গেল—কেহই ক্ষমা করিল না। কিন্তু অন্তরে বসিয়া যিনি সর্বকালে সর্বলোকের বিচারক, তিনি হয়ত দুর্ভাগা বালিকার এই অপরাধের ভার আপনার শ্রীহস্তেই গ্রহণ করিলেন।

জ্ঞানদা উঠিয়া দাঁড়াইল। কখনো সে পরের সমক্ষে কাঁদে নাই—আজ কিন্তু অতুলের সম্মুখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অথচ, একটা কথারও কৈফিয়ত দিল না, কাহারো পানে চাহিয়া দেখিল না—নীরবে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাইবার আর গাড়ি ছিল না বলিয়া অতুল সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া গেল। পথে সব কথা ছাপাইয়া ছোটমাসির সেই শেষ কথাটাই বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন বাপের বাড়ি যাইবার সময় অতুলকে নিভৃতে

ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, অতুল, হীরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তার মনস্তাপের আর অবধি থাকে না বাবা। সেদিন কথাটা ভাল বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজ তাহার যেন নিঃসংশয়ে মনে হইল, কথাটা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। লজ্জাহীনা বলিয়া যাহাকে আজ সবাই লাঞ্ছনা করিয়া বিদায় দিল, তাহারই লজ্জা-শরমের সীমারেখাটা যে কোন্‌খানে, আজ সে-কথাও তাহার স্মরণ হইল।

তখনো ভোর হয় নাই, অনাথ ডাকিতে আসিলেন,—মেজবৌকে দাহ করিতে হইবে।

চলুন যাই, বলিয়া অতুল বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, দেড় বৎসর পূর্বে তুলসীমূলে পিতার পা-দুটি কোলে করিয়া যেমন বসিয়াছিল, আজও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের পদ-দুটি কোলে লইয়া জ্ঞানদা বসিয়া আছে। শুধু একটিবার ছাড়া জীবনে কেহ কখনো তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই--সেই যখন সে অতুলেরই পায়ের উপর পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়াছিল। সুতরাং, তাহার এই নিবিড় নীরবতায় কেহ কিছুই মনে করিল না। সেদিকে কাহারও দৃষ্টিই ছিল না, সৎকারের উদ্যোগ-আয়োজনেই পাড়ার লোক ব্যস্ত।

যথাসময়ে তাহারা মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। সকলের পিছনে জ্ঞানদাও গেল। দুঃখীর মেয়ে বলিয়া পাড়ার কোন মেয়েই তাহার সঙ্গে গেল না; যাবার কথাও কাহারো মনে হইল না।

বর্ষায় ভরা গঙ্গা শ্মশানের ঠিক নীচে দিয়াই খরবেগে বহিতেছিল। মায়ের শেষ কাজ মেয়ে নীরবে সাঙ্গ করিল। চিতা যখন ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে পুরুষের ভিড় হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া একেবারে জলের ধারে গিয়া বসিল। কেহই নিষেধ করিল না; কারণ, নিষেধ করিবার কিছু ছিল না। বরঞ্চ এই গভীর শোকের দৃশ্যটাকে চোখের আড়াল করিতেই সে যে নামিয়া গেল, তাহা নিশ্চয় অনুভব করিয়া মুহূর্তের সমবেদনায় অনেকেই 'আহা' বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল।

এই চিরদিন শান্ত পরমসহিষ্ণু মেয়েটি উৎকট কিছু যে করিয়া বসিতে পারে, সে ভয় কাহারও ছিল না। অতুলেরও না। তথাপি তাহাকে খরস্রোতের একান্ত সন্নিকটে গিয়া বসিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা কেমন একরকম করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল নিষেধ করে; একবার ভাবিল কাছে গিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু লজ্জায়, কুণ্ঠায় কোনটাই পারিল না।

অগ্ন্যুত্তাপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বাসিয়াছিল, অতুলও গিয়া সেখানে বসিল। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত চিতার পানে চাহিয়া সহসা তাহার মনের মধ্যে সেই চিরদিনের পুরানো প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল–কাল যে ছিল, আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারও ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না; অথচ, এই দেহটাকেই আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল! কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে কি তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

সহসা তাহার নিজেরই বিগত জীবন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বছর-তিনেক পূর্বে সেও ত মরিতে বসিয়াছিল, কিন্তু মরে নাই। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের দৃষ্টি চিতার পিঙ্গল ধূসর ধূমের তরঙ্গিত যবনিকা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মনে পড়িল, সেদিন যে মরিতে দেয় নাই–সে ওই, ওই যে জাহ্নবীর ঘোলা জলে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া মূর্তিমতী শোকের মত বসিয়া আছে,--শুধু রুক্ষ কেশ ও মলিন অঞ্চল যাহার বাতাসে দুলিতেছে!

তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, ছাই রূপ! রূপেরই যদি এত দাম, তবে তিন বৎসর পূর্বে রূপের হাটে সে নিজেই ত দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। সেদিন পরমাত্মীয়েরাও ত ঘৃণায় তাহার পানে চাহিতে পারে নাই!

কেমন করিয়া যে সময় কাটিতেছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। কখন যে চিতা নিভিতেছিল, তাহাও সে দেখে নাই। সর্বক্ষণ তাহার সমস্ত দৃষ্টি শুধু ওই নিশ্চল মূর্তিটার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া ছিল।

অনাথ কহিলেন, আর বসে কেন বাবা? এসো, শেষ কাজটা শেষ করে দিই।

চলুন, বলিয়া অতুল অপরাহ্নবেলায় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখন সূর্য ঢলিয়া পড়িতেছিল। সেই ম্লান আলোকে দীপ্যমান ঘাটের উপরে নিপতিত দু' গাছি ভাঙ্গা চুড়ির উপর দৃষ্টি পড়ায় সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ সেই তাহারই দেওয়া অতি তুচ্ছ মহামূল্য অলঙ্কার।

শত লাঞ্ছনা, সহস্র ধিক্কারেও যে দু' গাছির মায়া জ্ঞানদা কাটাইতে পারে নাই, আজ নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কৈফিয়ত দিয়াছে। অতুল দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেই দু' গাছি সস্নেহে, সযত্নে কুড়াইয়া লইল। অখণ্ড অবস্থায় যাহার কোন মর্যাদাই সে দেয় নাই, আজ তাহা ভগ্ন তুচ্ছ কাঁচখণ্ড হইয়াও তাহার কাছে একেবারে অমূল্য হইয়া উঠিল।

পিছনে পদধ্বনি শুনিয়া জ্ঞানদা মুখ ফিরিয়া চাহিল। সে চাহনি অতুল সহ্য করিতে পারিল না। বোধ করি বা একবার সে যেন তাহার হাত ধরিতেও গেল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—ভুল সকলেরই হয়, জ্ঞানদা, কিন্তু–, বলিয়া সে হাতের মুঠাটা মেলিয়া ধরিতেই সায়াহ্নের আরক্ত আভায় আর একবার সেই কাঁচখণ্ডগুলি ঝকঝক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, আজ যাকে তুমি ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এলে, আমি তাকেই আবার শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কথাটা জ্ঞানদা বুঝিতে পারিল না, তাই সে তাহার নিবিড় শোকাচ্ছন্ন উদাস দৃষ্টি অতুলের মুখের প্রতি তুলিয়া আজ অনেক দিনের পরে আবার কথা কহিল, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

জবাব দিতে গিয়া অতুলের দু' চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল, জ্ঞানো, আজ মেজমাসিমার চিতার আগুনের মধ্যে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি, যা ভাঙ্গবার নয়, তাকে কিছুতেই জোর করে ভাঙ্গা যায় না। জোর করে কাঁচের চুড়িই ভাঙ্গা যায়, কিন্তু, আমাদের সেই দেওয়া-নেওয়াটা আজও তেমনি অটুট হয়ে আছে—তাকে ভেঙ্গে ফেলি, এত জোর তোমার আমার কারও নেই। আমি যা পারিনি, তুমিও তা পারবে না নিশ্চয় জানতে পেরেচি বলেই এই ভাঙ্গা চুড়ি বুকে করে তুলে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। জ্ঞানদা হতচেতনের মত নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতুল অকস্মাৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহার শীর্ণ ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল, কিন্তু জ্ঞানদা তেমনি পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়াই রহিল। অতুল ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমার সমস্ত পাপের গুরুদণ্ড আর যেই দিক জ্ঞানো, তুমি দেবার চেষ্টা ক' রো না। আমি যত অপরাধই করে থাকি না কেন, আমাকে তোমার ফিরে নিতেই হবে। আমাকে ত্যাগ করে শাস্তি দেবে এ সাধ্য তোমার কিছুতেই নেই।

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার ফুটিল না—শুধু দুর্বল শীর্ণ হাতটি অতুলের হাতের মধ্যে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অতুল হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, বাড়ি চল, তাঁরা সবাই এগিয়ে গেছেন।

গৃহদাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ। একসঙ্গে এফ. এ. পাস করার পর সুরেশ গিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুরাতন সিটি কলেজেই টিকিয়া রহিল।

সুরেশ অভিমান-ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, মহিম, আমি বার বার বলছি, বি. এ., এম. এ. পাস করে কোন লাভ হবে না। এখনও সময় আছে, তোমারও মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হওয়া উচিত।

মহিম সহাস্যে কহিল, হওয়া ত উচিত, কিন্তু খরচের কথাটাও ত ভাবা উচিত।

খরচ এমনই কি বেশি যে, তুমি দিতে পার না? তা ছাড়া তোমার স্কলারশিপও আছে।

মহিম হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ অধীর হইয়া কহিল, না না–হাসি নয় মহিম, আর দেরি করলে চলবে না, তোমাকে এরই মধ্যে অ্যাডমিশন নিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি। খরচপত্রের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে।

মহিম কহিল, আচ্ছা।

সুরেশ বলিল, দেখ মহিম, কোন্‌টা যে তোমার সত্যকারের আচ্ছা, আর কোন্‌টা নয়–তা আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। কিন্তু পথের মধ্যে তোমাকে সত্য করিয়ে নিতে পারলুম না, কারণ, আমার কলেজের দেরি হচ্ছে। কিন্তু কাল-পরশুর মধ্যে এর যা-হোক একটা কিনারা না করে আমি ছাড়ব না। কাল সকালে বাসায় থেক, আমি যাব। বলিয়া সুরেশ তাহার কলেজের পথে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দিন-পনের কাটিয়া গিয়াছে। কোথায় বা মহিম, আর কোথায় বা তাহার মেডিক্যাল কলেজে অ্যাডমিশন লওয়া! একদিন রবিবারের দুপুরবেলা সুরেশ বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, সুমুখের একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝের উপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কুশাসন পাতিয়া ছয়-সাতজন আহারে বসিয়াছে। মহিম মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া কহিল, হঠাৎ বাসা বদলাতে হল বলে তোমাকে সংবাদ দিতে পারিনি; সন্ধান করলে কি করে?

সুরেশ তাহার কোন উত্তর না দিয়া থপ্ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়ল এবং একদৃষ্টে ছেলেদের আহার্যের প্রতি চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত মোটা চালের অন্ন; জলের মত কি একটা দাল, শাক, ডাঁটা এবং কচু দিয়া একটা তরকারি এবং তাহারই পাশে দু' টুকরা পোড়া পোড়া কুমড়া ভাজা। দধি নাই, দুগ্ধ নাই, কোনপ্রকার মিষ্ট নাই; একটুকরা মাছ পর্যন্ত কাহারও পাতে পড়িল না।

সকলের সঙ্গে মহিম অম্লান মুখে, নিরতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত এইগুলি ভোজন করিতে লাগিল। কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া সুরেশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে কোনমতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সামান্য কারণেই সুরেশের চোখে জল আসিয়া পড়িত।

আহারান্তে মহিম তাহার ক্ষুদ্র শয্যার উপর আনিয়া বন্ধুকে যখন বসাইল, তখন সুরেশ রুদ্ধস্বরে কহিল, বার বার তোমার অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না মহিম।

মহিম নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে? ্ধুকে যখন বসাইল, তখন সুরেশ রুদ্ধস্বরে কহিল, বার বার তোমার অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না মহিম।

মহিম নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

সুরেশ কহিল, তার মানে–এমন কদর্য বাড়ি যে শহরের মধ্যে থাকতে পারে, এমন ভয়ানক বিশ্রী খাওয়াও যে কোন মানুষ মুখে দিতে পারে, চোখে না দেখলে আমি কোনমতে বিশ্বাস করতে পারতুম না। তা যাই হোক, এ জায়গার তুমি সন্ধান পেলেই বা কিরূপে, আর তোমার সাবেক বাসা–তা সে যত মন্দই হোক, এর সঙ্গে তুলনাই হয় না–তাই বা পরিত্যাগ করলে কেন?

বন্ধু-স্নেহ বন্ধুর বুকে আঘাত করিল। মহিম আর তাহার নির্বিকার গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে পারিল না, আর্দ্রস্বরে কহিল, সুরেশ, তুমি আমার গ্রামের বাড়ি দেখনি; তা হলে বুঝতে, এ বাসায় আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হতে পারে না। আর খাওয়া–আরও পাঁচজন ভদ্রসন্তান যা স্বচ্ছন্দে খেতে পারে, আমি পারব না কেন?

সুরেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, এ কেনর কথা নয়। ভালমন্দ জিনিস সংসারে অবশ্যই আছে। ভাল ভালই লাগে, মন্দ যে মন্দ লাগে, তাতে আর সংশয় নেই। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার এত দুঃখ করবার প্রয়োজন কি হয়েছে?

মহিম চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল–কথা কহিল না।

সুরেশ কহিল, তোমার প্রয়োজন তোমার থাক, আমি জানতে চাই না। কিন্তু আমার প্রয়োজন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। আমি গাড়ি ডেকে তোমার জিনিসপত্র এখনই আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। এখানে তোমাকে ফেলে রেখে যদি যাই, চোখে আমার ঘুম আসবে না, মুখে অন্ন রুচবে না। তোমাদের বাসার চাকরকে ডাক, একটা গাড়ি নিয়ে আসুক। এই বলিয়া সুরেশ মহিমকে টানিয়া তুলিয়া স্বহস্তে তাহার বিছানা গুটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মহিম বাধা দিয়া টানা-হেঁচড়া বাধাইয়া দিল না। কিন্তু শান্ত গম্ভীরস্বরে বলিল, পাগলামি করো না সুরেশ।

সুরেশ চোখ তুলিয়া কহিল, পাগলামি কিসের? তুমি যাবে না?

না।

কেন যাবে না? আমি কি তোমার কেউ নই? আমার বাড়ি যাওয়ায় কি তোমার অপমান হবে?

না।

তবে?

মহিম কহিল, সুরেশ, তুমি আমার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই; সংসারে এমন আর কয়জনের আছে, তাও জানি না। এতকাল পরে এ বস্তু আমি একটুখানি দেহের আরামের জন্য খুইয়ে বসব, আমাকে কি তুমি এত বড়ই নির্বোধ পেয়েছ!

সুরেশ কহিল, বন্ধুত্ব জিনিসটি তোমার ত একার নয় মহিম। আমারও ত তাতে একটা ভাগ আছে। খোয়া যদি যায়, সে ক্ষতি যে কত বড়, সে বোঝবার সাধ্য আমার নেই–আমি কি এতই বোকা? আর এত সতর্ক-সাবধান, এত হিসাবপত্র করে না চললেই এ বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় ত যাক না মহিম! এমনই কি তার মূল্য যে, সেজন্য শরীরের আরামটাকে উপেক্ষা করতে হবে?

মহিম হাসিয়া বলিল, না, এবার হেরেছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে নিশ্চয় জানাচ্ছি সুরেশ। তুমি মনে করেছ– শখ করে দুঃখ সইতে আমি এখানে এসেছি, তা সত্য নয়।

সুরেশ কহিল, বেশ ত, সত্য নাই হল। আমি কারণ জানতেও চাই না– কিন্তু যদি টাকা বাঁচানই তোমার উদ্দেশ্য হয়, আমাদের বাড়িতে এসে থাক না, তাতে ত তোমার উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যাবে না।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, এখন থাক সুরেশ। কষ্ট যদি সত্যই হয়, তোমাকে জানাব।

সুরেশ জানিত, মহিমকে তাহার সঙ্কল্প হইতে টলান অসাধ্য। সে আর জিদ না করিয়া একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু বন্ধুর এই থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থাটা চোখে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল।

সুরেশ ধনীর সন্তান, এবং মহিমকে সে অকপটে ভালবাসিত। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, কোনমতে সে বন্ধুর একটা কাজে লাগে। কিন্তু মহিমকে সে কোনদিন সাহায্য লইতেই স্বীকার করাইতে পারে নাই–আজিও পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বছর-পাঁচেক পরে দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।

তোমার উপর আমার যে কত শ্রদ্ধা ছিল মহিম, তা বলতে পারি না।

বলবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করচি না সুরেশ।

সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না।

না থাকলে তোমাকে দণ্ড দেবো, এমন ভয় ত কখনও দেখাই নি।

তোমাকে কপটতা দোষ দিতে তোমার অতি-বড় শত্রুও কখনও পারত না।

শত্রু পারত না বলে কাজটা যে মিত্রও পারবে না, দর্শন-শাস্ত্রের এমন অনুশাসন ত নেই।

ছি ছি, শেষকালে কিনা একটা ব্রাহ্মমেয়ের কাছে ধরা দিলে? কি আছে ওদের? ঐ শুকনো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ করে করে গায়ে কোথাও একফোঁটা রক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়ছে বলে ভয় হয়–গলার স্বরটা পর্যন্ত এমনি চিঁ চিঁ করে যে শুনলে ঘৃণা হয়।

তা হয় সত্য।

দেখ মহিম, ঠাট্টা কর গে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে, যে ব্রাহ্মমেয়ে কখনো চোখে দেখেনি; মেয়েমানুষ ইংরাজিতে ঠিকানা লিখতে পারে শুনলে যারা আশ্চর্য অবাক হয়ে যায়–তিনি চলে গেলে যারা সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়ায়। বিস্ময়ে অভিভূত করে দাও গে তোমার গ্রামের লোককে, যারা এঁকে দেব-দেবী মনে করে মাথা লুটিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের বাড়ি ত পাড়াগাঁয়ে নয়–আমাদের ত অত সহজে ভুলানো যায় না।

আমি তোমাকে শপথ করে বলচি সুরেশ, তোমাদের শহরের লোককে ভুলোবার আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি তাঁকে আমাদের পাড়াগাঁয়ে নিয়েই রাখব। তাতে ত তোমার আপত্তি নাই?

সুরেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, আপত্তি নেই? শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি আপত্তি আছে। তুমি সমস্ত জগতের বরেণ্য পূজনীয় হিন্দুর সন্তান হয়ে কিনা একটা রমণীর মোহে জাত দেবে? মোহ! একবার তার জুতো-মোজা শৌখিন পোশাক ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রাঙ্গা শাড়িখানি পরিয়ে দেখ দেখি, মোহ কাটে কি না! তখন ঐ নির্জীব কাঠের পুতুলটার রূপ দেখে তোমার ভুল ভাঙ্গে কি না! কি আছে তার? কি পারে সে? বেশ ত, তোমার যদি সেলাই আর পশমের কাজই এত দরকার, কলকাতা শহরে দরজির ত অভাব নেই। একখানা চিঠির ঠিকানা লেখবার জন্য ত তোমাকে ব্রাহ্মমেয়ের দ্বারস্থ হতে হবে না। তোমার অসময়ে সে কি বাটনা বেটে, কুটনো কুটে তোমাকে একমুঠো ভাত রেঁধে দেবে? রোগে তোমার কি সেবা করবে? সে শিক্ষা কি তাদের আছে? ভগবান না করুন, কিন্তু সে দুঃসময়ে সে যদি না তোমাকে ছেড়ে চলে আসে ত আমার সুরেশ নামের বদলে যা ইচ্ছে বলে ডেক, আমি দুঃখ করব না।

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ পুনরায় কহিতে লাগিল, মহিম, তুমি ত জান, আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনো ভুলেও অমঙ্গল কামনা করতে পারিনে। আমি অনেক ব্রাহ্ম মহিলা দেখেছি। দু-একটি ভালও যে দেখিনি, তা নয়; কিন্তু আমাদের হিন্দুঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। তোমার বিবাহেই যদি প্রবৃত্তি হয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আচ্ছা, যা হবার হয়েছে, আর তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই। আমি কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে তোমাকে এমন কন্যা বেছে দেব যে, জীবনে কখনো দুঃখ পেতে হবে না; যদি না পারি, তখন না হয় তোমার যা ইচ্ছা করো–এর শ্রীচরণেই মাথা মুড়িও, আমি বাধা দেব না;

কিন্তু এই একটা মাস তোমাকে ধৈর্য ধরে আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হবে। বল রাখবে?

মহিম পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল—হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না। কিন্তু বন্ধু যে বন্ধুর শুভকামনায় কিরূপ মর্মান্তিক বিচলিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিল।

সুরেশ কহিল, মনে করে দেখ দেখি মহিম, ব্রাহ্ম না হয়েও তুমি যখন প্রথম ব্রাহ্ম-মন্দিরে যাতায়াত শুরু করলে, তখন কি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিনি? তোমার জন্যে এত বড় এই কলকাতা শহরের মধ্যে কি একটাও হিন্দু-মন্দির ছিল না যে, এই কপটতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল? এমনিভাবে একটা-না-একটা বিড়ম্বনার ভেতরে যে অবশেষে জড়িয়ে পড়বে, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম।

মহিম এবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, তা যেন করেছিলে, কিন্তু আমি ত তা করি নাই যে, আমার যাওয়ার মধ্যে কপটতা ছিল। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরেশ, তুমি ত নিজে ভগবান পর্যন্ত মান না, যে হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা মানবে! আমি ব্রাহ্মের মন্দিরেই যাই, আর হিন্দুর মন্দিরেই যাই তাতে তোমার কি আসে যায়?

সুরেশ দৃপ্তস্বরে কহিল, যা নেই, তা আমি মানিনে। ভগবান নেই, ঠাকুর-দেবতা মিছে কথা। কিন্তু যা আছে, তাদের ত অস্বীকার করিনে। সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, মানুষকে পূজা করি। আমি জানি, মানুষের সেবা করাই মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা। যখন হিন্দুর বংশে জন্মেছি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ। আমি প্রাণান্তে তোমাকে ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করে ব্রাহ্মের দল-পুষ্টি করতে দেব না। কেদার মুখুয্যের মেয়েকে বিবাহ করবে বলে কি কথা দিয়েছ?

না, কথা যাকে বলে, তা এখনও দিইনি।

দাওনি ত! বেশ! তবে চুপ করে বসে থাক গে, আমি এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

আমি বিবাহের জন্য পাগল হয়ে উঠেছি তোমায় কে বললে? তুমিও চুপ করে বসে থাক গে, আর কোথাও বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? কি করেছ? এই স্ত্রীলোকটাকে ভালবেসেছ?

আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বল সুরেশ।

সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বয়স কত জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

জানি না।

জান না? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা আরও বেশি–কিছুই জান না?

না।

তোমার চেয়ে ছোট, না বড়–তাও বোধ করি জান না?

না।

যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলেছেন, তখন নিতান্ত কচি হবেন না–অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কি বল?

না। তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার এখন একটু কাজ আছে সুরেশ, একবার বাইরে যেতে চাই।

সুরেশ কহিল, বেশ ত মহিম, আমারও এখন কিছু কাজ নেই,—চল, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।

দুই বন্ধুই পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলার পর সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, তোমাকে আজ যে ইচ্ছে করেই ব্যথা দিলাম, এ কথা বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই?

মহিম কহিল, না।

সুরেশ তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন দিলাম মহিম?

মহিম হাসিল। কহিল, পূর্ব্বেরটা যদি না বুঝালেও বুঝে থাকি, আশা করি, এটাও তোমাকে বুঝাতে হবে না।

তাহার একটা হাত সুরেশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। সুরেশ আর্দ্রচিত্তে তাহাতে ঈষৎ একটু চাপ দিয়া বলিল, না মহিম, তোমাকে বুঝাতে চাই না। সংসারে সবাই ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তবুও আজ আমি তোমার মুখের উপরেই বলচি, তোমাকে আমি যত ভালবেসেছি, তুমি তার অর্দ্ধেকও পারনি। তুমি গ্রাহ্য কর না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু ক্লেশও আমি কোনদিন সইতে পারি না। ছেলেবেলায় এই নিয়ে কত ঝগড়া হয়ে গেছে, একবার মনে করে দেখ। এখন এতকাল পরে যাঁর জন্য আমাকেও পরিত্যাগ করছ মহিম, তাঁকে নিয়েই জীবনে সুখী হবে যদি নিশ্চয় জানতাম, আমার সমস্ত দুঃখ আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম, কখনও একটা কথা কইতাম না।

মহিম কহিল, তাঁকে নিয়ে সুখী না হতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করব কেমন করে জানলে?

তুমি কর বা না কর, আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

কেন? আমি ত তোমার ব্রাহ্মবন্ধু হতেও পারতাম!

না, কোনমতেই না। ব্রাহ্মদের আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না—আমার ব্রাহ্মবন্ধু একটিও নেই।

তাদের দেখতে পার না কেন?

অনেক কারণ আছে। একটা এই যে, যারা আমাদের সমাজকে মন্দ বলে ফেলে গেছে, তাদের ভাল বলে আমি কোনমতেই কাছে টানতে পারি না। তুমি ত জান, আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থাক, আমার তারা শত্রু।

মহিম মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; কহিল, এখন কি করতে বল তুমি?

সুরেশ কহিল, তাই ত এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত বলচি।

আচ্ছা, আরও একবার বল।

এই যুবতীটির মোহ তোমাকে যেমন করে হোক কাটাতে হবে। অন্তত: একটা মাস দেখা করতে পারবে না।

কিন্তু তাতেও যদি না কাটে? যদি মোহের বড় আরও কিছু থাকে?

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, ও-সব আমি বুঝি না মহিম। আমি বুঝি, তোমাকে ভালবাসি; এবং আরও কত বেশি ভালবাসি আমার আপনার সমাজকে। তবে একটিবার ভেবে দেখ, তোমার ছেলেবেলার সেই বসন্তের কথাটা, আর মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকা ডুবে যখন দুজনেই মরতে বসেছিলাম। বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিলাম বলে আমাকে মাপ করো মহিম। আমার আর কিছু বলবার নেই, আমি চললাম। বলিয়া সুরেশ অকস্মাৎ দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটা ছিল তেমনি কোমল, তেমনি স্নেহশীল। পরিচিত—অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় কখনো একটা মশামাছি পর্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মারোয়াড়ীদের দেখাদেখি কতদিন সে পকেট ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া, স্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায় গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার যে মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য কি করিয়া যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। অথচ তাহার গায়ের জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান—এই সব দেখিয়াই সে তাহার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এমনি বাড়িয়া ওঠে যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। মহিম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, এই চারিটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসে এবং স্বগ্রামস্থ একজন মুদীর দোকানে থাকিয়া স্কুলে ভর্তি হয়। এই সময় হইতেই সুরেশ অনেকপ্রকারে বন্ধুকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; কিছুতেই তাহাকে রাজি করাইতে পারে নাই। এইখানে থাকিয়াই মহিম কোনদিন আধপেটা খাইয়া, কোনদিন উপবাস করিয়া এন্ট্রান্স পাস করে। ইহার পরের ঘটনা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে সপ্তাহমধ্যে সুরেশ মহিমের দেখা না পাইয়া, তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কি একটা পর্ব উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বাসায় আসিয়া শুনিল, মহিম সেই যে সকালে বাহির হইয়াছে, এখনো

ফিরে নাই। সে যে পটলডাঙ্গার কেদার মুখুয্যের বাটীতেই ছুটির দিনটা কাটাইতে গিয়াছে সুরেশের তাহাতে সংশয়মাত্র রহিল না।

যে নির্লজ্জ বন্ধু তাহার আশৈশব সখ্যের সমস্ত মর্যাদা সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মোহে বিসর্জন দিয়া সাতটা দিনও ধৈর্য ধরিতে পারিল না—ছুটিয়া গেল, মুহূর্তের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের বহ্নি সুরেশের বুকের মধ্যে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিচার না করিয়াই, গাড়িতে উঠিয়া সোজা পটলডাঙ্গার দিকে হাঁকাইতে কোচম্যানকে হুকুম করিয়া দিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "ওরে বেহায়া! ওরে অকৃতজ্ঞ! তোর যে প্রাণটা আজ এই স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে ধন্য হয়েছিস, সে প্রাণটা তোর থাকত কোথায়? নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দুই-দুইবার কে তোকে ফিরিয়ে দিয়েছে? তার কি এতটুকু সম্মানও রাখতে নাই রে!"

কেদার মুখুয্যের বাড়ির গলিটা সুরেশের জানা ছিল, সামান্য দুই-একটা জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা গাড়ি ঠিক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতরণ করিয়া সুরেশ বেহারাকে প্রশ্ন করিয়া সোজা উপরে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নীচে ঢালা বিছানার উপর একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সুরেশ নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিল—আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমি মহিমের বাল্যবন্ধু।বৃদ্ধ প্রতি-নমস্কার করিয়া চশমাটি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, বসুন।

সুরেশ আসন গ্রহণ কহিল, মহিমের বাসায় এসে শুনলাম, সে এখানেই আছে; তাই মনে করলাম, এই সুযোগে মহাশয়ের সঙ্গেও একবার পরিচিত হয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য—আপনি এসেছেন। কিন্তু মহিমও এদিকে দশ-বারো দিন আসেন নি। আমরা আজ সকালে ভাবছিলুম, কি জানি, তিনি কেমন আছেন।

সুরেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, কিন্তু তার বাসার লোক যে বললে—

বৃদ্ধ কহিলেন, আর কোথাও গেছেন বোধ হয়। যা হোক, ভাল আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলেম।

পথে আসিতে আসিতে সুরেশ যে-সকল উদ্ধত সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাদের ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার শান্তমুখে ধীর-মৃদু কথাগুলি তাহার ভিতরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে শীতল করিয়া দিল। তথাপি সে নিজের কর্তব্যও বিস্মৃত হইল না। সে মনে মনে এই বলিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ইনি যত ভালই হোন, ব্রাহ্ম ত বটে! সুতরাং ইঁহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম। ইঁহারা এমনি করিয়াই নির্বোধ ভুলাইয়া নিজেদের কাজ আদায় করিয়া লন। অতএব এই সমস্ত শিকারী প্রাণীদের সম্মুখে কোনমতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া কাজ ভুলিলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক, ইঁহাদের গ্রাস হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিতে হইবে। সে কাজের কথা পাড়িল; কহিল, মহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই। যদি অনুমতি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথার আলোচনা করি।

বৃদ্ধ একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আপনার নাম আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

সুরেশ কহিল, মহিমের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

বৃদ্ধ কহিলেন, হাঁ, সে একরকম স্থির বৈ কি।

সুরেশ কহিল, কিন্তু মহিম ত আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নয়। তবুও বিবাহ দেবেন?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা সে কথা এখন থাক। কিন্তু তার কিরূপ সঙ্গতি, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করবার যোগ্যতা আছে কি না, পাড়াগাঁয়ে বিরুদ্ধ হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গা মেটেবাড়ির মধ্যে আপনার কন্যা বাস করতে পারবেন কিনা, না পারলে তখন মহিম কি উপায় করবে, এই-সকল চিন্তা করে দেখেছেন কি?

বৃদ্ধ কেদার মুখয্যে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কৈ এ-সকল ব্যাপার ত আমি শুনিনি। মহিম কোন দিন ত এ-সব কথা বলেন নি?

সুরেশ কহিল, কিন্তু আমি এ-সকল চিন্তা করে দেখেছি, মহিমকে বলেছি এবং আজ এই-সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্যেই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনার কন্যার বিষয় আপনি চিন্তা করবেন; কিন্তু আমার পরম বন্ধু যে এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অসহ্য ভারে চিরদিন জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন, সে ত আমি কোনমতেই ঘটতে দিতে পারিনে।

কেদারবাবু পাংশুমুখে কহিলেন, আপনি বলেন কি সুরেশবাবু?

বাবা!—একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

কে, অচলা? এস মা, বস। লজ্জা কি মা; ইনি আমাদের মহিমের পরম বন্ধু।

মেয়েটি একটুখানি অগ্রসর হইয়া হাত তুলিয়া সুরেশকে নমস্কার করিল। সুরেশ দেখিল, মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই অতিশয় সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ-দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির-বুদ্ধির আভা। নমস্কার করিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল। সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, মহিমের ব্যাপারটা শুনেছ মা? আমরা ভেবে মরছিলাম, সে আসে না কেন? ঐ শোন! ইনি পরম বন্ধু বলেই ত কষ্ট করে জানাতে এসেছিলেন, নইলে

কি হত বল ত? কে জানত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী। তার পাড়াগাঁয়ে শুধু একটা মেটে ভাঙ্গা-বাড়ি। তোমাকে খাওয়াবে কি—তার নিজেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান নেই। উঃ—কি ভয়ানক! এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল, অ্যাঁ!

কথা শুনিয়া অচলার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, কিন্তু সুরেশের মুখের উপরেও কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সে নির্বাক কাঠের পুতুলের মত মেয়েটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেশের একবার মনে হইল, তাহার নিষ্ঠুর সত্য অচলার বুকের ভিতর গিয়া যেন গভীর হইয়া বিঁধিল, কিন্তু পিতা সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। বরঞ্চ কন্যাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুরেশবাবু, আপনি যে প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য করতে এসেছেন, এ কথা আমরা কেউ যেন ভ্রমেও না অবিশ্বাস করি। হোক না অপ্রিয়, হোক না কঠোর, কিন্তু তবুও এই যথার্থ ভালবাসা। মা যখন তাঁর পীড়িত শিশুকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে কি তাঁর কঠোর ঠেকে না? কিন্তু তবুও ত সে কাজ তাঁকে করতে হয়! সত্য বলচি সুরেশবাবু! মহিম যে আমাদের প্রতি এত বড় অন্যায় করতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বছর-দুই পূর্বে সমাজে যখন তাঁর কথায় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ডেকে এনে অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সে কি এমনি করেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ—এত বড় প্রবঞ্চনা আমার জীবনে দেখিনি! বলিয়া কেদারবাবু ভিতরের আবেগে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সুরেশ এবং অচলা উভয়েই নীরবে এবং অধোমুখে বসিয়া রহিল। কেদারবাবু হঠাৎ একসময়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা অচলা, এ চলবে না। কোনমতেই না। সুরেশবাবু, আপনি যেমন কর্তব্য সকলের উপরে রেখে বন্ধুর কাজ করতে এসেছেন, আমিও সেই কর্তব্যকেই সুমুখে রেখে পিতার কাজ করব। অচলার সঙ্গে মহিমের সম্বন্ধটা যতদূর অগ্রসর হয়েচে, তাতে যদি বিনা প্রমাণে আমার বাড়ির দরজা তার মুখের উপর বন্ধ করে দিই, ঠিক হবে না। সেইজন্য একটা প্রমাণ চাই। আপনি মনে করবেন না সুরেশবাবু, আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু এটাও আমার কর্তব্য। কি, মা অচলা! একটা প্রমাণ নেওয়া আমাদের উচিত কি না?

উভয়েই তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল, উচিত-অনুচিত কোন মন্তব্যই কেহ প্রকাশ করিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, কিন্তু এ প্রমাণের ভার আপনারই উপর, সুরেশবাবু। মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা, কোন্ গ্রামে যে তার বাড়ি তাই আমরা জানিনে।

বেহারা আসিয়া জানাইল, নীচে বিকাশবাবু অপেক্ষা করিতেছেন।

সংবাদ শুনিয়া কেদারবাবু শুষ্ক হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ ত তাঁর আসবার কথা ছিল না। আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আমাকে মিনিট-পাঁচেক মাপ করতে হবে—লোকটাকে বিদায় করে আসি। যখন এসেছে, তখন দেখা না করে ত নড়বে না। মা অচলা, সুরেশবাবুকে আমাদের পরম বন্ধু বলে মনে করবে। যা তোমার জানবার প্রয়োজন, এঁর কাছে জেনে নাও—আমি এলাম বলে। বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

তখন মুহূর্তকালের জন্য চোখাচোখি করিয়া উভয়েই মাথা হেঁট করিল। সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমরা উভয়ে আশৈশব বন্ধু। কিন্তু তার ব্যবহারে আপনাদের কাছে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।অচলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, তার জন্যে আপনার কোন লজ্জার কারণ নেই।

সুরেশ কহিল, আপনি বলেন কি! তার এই কপট আচরণে, এই পাষণ্ডের মত ব্যাবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই ত আর কে পাবে বলুন দেখি? কিন্তু তখনই ত আমার বোঝা উচিত ছিল যে, সে যখনই আমাকেই আগাগোড়া গোপন করে গেছে, তখন ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছেই।

অচলা কহিল, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের। কিন্তু আপনি এ-সমাজের কোন লোকের কোন সংস্রবে থাকতে চান না বলেই বোধ করি তিনি আমাদের উল্লেখ আপনার কাছে করেন নি।

কথাটা সুরেশের ভাল লাগিল না। অচলা যে তাহারই মুখের উপর মহিমের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এ খবর আপনি মহিমের কাছে শুনেচেন আশা করি।

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তিনিই একদিন বলেছিলেন।

সুরেশ বলিল, আমার দোষের কথা সে বলতে ভোলেনি দেখচি।

অচলা ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ আর দোষের কথা কি? সকল মানুষের প্রবৃত্তি একরকমের নয়। যারা আপনাদের সংস্রব ছেড়ে চলে গেছে, তাদের যদি আপনাদের ভাল না লাগে ত আমি দোষের মনে করতে পারিনে।

এই উত্তরটা যদিচ সুরেশের মনের মত, এবং আর কোথাও শুনিলে হয়ত সে লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু এই সংযতবাদিনী তরুণী ব্রাহ্মমহিলার মুখ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাহার একান্ত বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়া আজ তাহার কিছুমাত্র আনন্দোদয় হইল না। বস্তুতঃ, এই-সব দলাদলির মীমাংসা শুনিতে সে কথাটা বলেও নাই। বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে ইহাও জানিতে চাহিয়াছিল, মহিমের মুখ হইতে তাহার আর কোন সদ্‌গুণের বিবরণ তাঁহার কানে গিয়াছে কিনা অচলা বোধ করি এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অনুমান করিতে পারিল না। তাই প্রশ্নটার সোজা জবাব দিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয় কহিল, আপনাদের প্রতি আমার সামাজিক বিদ্বেষ আছে কি না, সে আলোচনা মহিম করুক; কিন্তু তার ওপর আমার যে লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই, এ কথাটা আপনি আমার মুখ থেকেও অবিশ্বাস করবেন না। তবুও হয়ত আমি তার সাংসারিক প্রসঙ্গ এখানে তুলতে আসতাম না—যদি না সে আমার কাছে সেদিন সত্য কথাটা অস্বীকার করত।

অচলা সুরেশের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অবিচলিত-স্বরে কহিল, কিন্তু তিনি ত কখনই মিথ্যা বলেন না।

এইবার সুরেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মুখ দিয়া যে এমন শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বাহির হইতে পারে, ক্ষণকাল ইহা যেন ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তকালের জন্য। জীবনে সে সংযম শিক্ষা করে নাই, তাই পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চেয়ে তাকে আমি কম জানিনে। এখানে নিজেকে আবদ্ধ করে স্পষ্ট অস্বীকার করাটাকে আমি সত্যবাদিতা বলতে পারিনে।

অচলা তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তিনি ত এখানে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি।

সুরেশ কহিল, আপনার বাবা ত তাই বললেন। তা ছাড়া নিজের হীন অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন করাটাকেও ঠিক সত্যপ্রিয়তা বলা চলে না। স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করবার অক্ষমতা অপরের কাছে না হোক, অতঃপর আপনার কাছেও ত তার অকপটে প্রকাশ করা উচিত ছিল।

অচলা নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আপনি যে এত করে তার দোষ ঢাকচেন, আপনিই বলুন দেখি, সমস্ত কথা পূর্বাহ্নে জানতে পারলে কি তাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে পারতেন?

অচলা তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার কাছে কোনপ্রকার জবাব না পাইয়া সুরেশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, এই কলকাতা শহরে আপনাকে প্রতিপালন করবার তার সাধ্যও নেই, সঙ্কল্পও নেই। তার সেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গ্রামে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হিন্দুসমাজের মধ্যে সে যে আপনাকে একখানা অসচ্ছল ভাঙ্গা মেটে-বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে কথা কি আপনাকে তার বলা কর্তব্য নয়? এত দুঃখ আপনি সহ্য করতে প্রস্তুত কিনা, এও কি জিজ্ঞাসা করা সে আবশ্যক বিবেচনা করে না?

বলিয়া উত্তরের জন্য চোখ তুলিয়া দেখিল, অচলা চিন্তিত, অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। জবাব না পাইলেও সুরেশ বুঝিল, তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। কহিল, দেখুন, আপনার কাছে এখন আমি সত্য কথাই বলব। আজ আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবার সঙ্কল্প করেই শুধু এসেছিলুম—সে বিপদে না পড়ে, এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন দেখছি, তাকে বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে বাঁচানো আমার ঢের বেশি কর্তব্য। কারণ, তার বিপদ ইচ্ছাকৃত, কিন্তু আপনি ঝাঁপ দিচ্চেন অন্ধকারে। এইমাত্র আপনার বাবা যখন আমাকেই প্রমাণ করবার ভার দিলেন, তখন মনে হয়েছিল, বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ভার আমি গ্রহণ করব না; কিন্তু এখন দেখচি, এ কাজ আমাকে করতেই হবে—না করলে অন্যায় হবে।

অচলা কহিল, কিন্তু তিনি শুনলে কি দুঃখিত হবেন না?

সুরেশ কহিল, উপায় নেই। যে লোক পাষণ্ডের মত আপনাকে এত বড় প্রবঞ্চনা করেচে, বন্ধু হলেও তার সুখ-দুঃখ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করিনে। কিন্তু বিপদ হয়েচ এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানিনে। কোন উপায়ে আজ যদি সেইটে মাত্র জানতে পাই, কাল সকালেই নিজে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব এবং সমস্ত প্রমাণ টেনে এনে আপনার বাবার সম্মুখে উপস্থিত করে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

অচলা কহিল, কিন্তু আপনি কেন এত কষ্ট করবেন? বাবাকে বলুন না, তিনি তাঁর বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে সমস্ত সংবাদ জেনে নিন। চব্বিশ পরগনার রাজপুর গ্রাম ত বেশি দূর নয়।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, রাজপুর! তা হলে গ্রামের নামটা যে আপনি জানেন দেখচি! আর কিছু জানেন?

অচলা সহজভাবে কহিল, আপনি যা বললেন, আমিও ঐটুকু জানি। রাজপুরের উত্তরপাড়ায় একখানি মেটে-বাড়ি আছে। ভিতরে গুটি-তিনেক ঘর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ—তাতে গ্রামের পাঠশালা বসে।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের সাংসারিক অবস্থা?

অচলা কহিল, সে বিষয়েও আপনি যা বললেন তাই। সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাতে কোনমতে দুঃখ-কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র।

সুরেশ কহিল, আপনি ত তা হলে সমস্তই জানেন দেখচি।

অচলা কহিল, এইটুকু জানি, কারণ এইটুকুই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আর আপনি ত জানেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

সুরেশ সমস্ত মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিল, যখন সমস্তই জানেন, তখন আপনাদের সতর্ক করতে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা বাহুল্য কাজ হয়েচে। দেখচি, আপনাকে সে ঠকাতে চায়নি।

অচলা কহিল, আমি কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু আপনি ত আমাকে জানাতে আসেন নি; আপনি যাঁকে জানাতে এসেছিলেন, তিনি এখনো জানেন না। তবে যদি বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাবাকে জানাতে পারি।

সুরেশ উদাসকণ্ঠে কহিল, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে গিয়ে মহিমকে সমস্ত কথা জানিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে আমি স্থির হতে পারব।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তার কি কিছু আবশ্যক আছে?

সুরেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, আবশ্যক নেই? না জেনে তার ওপর সে-সকল মিথ্যা দোষারোপ আজ করেচি, সে অপরাধ আমার কত বড়, আপনি কি মনে মনে তা বোঝেন নি? তাকে জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী কিছু বলতেই বাকি রাখিনি—এ-সকল কথা তার কাছে স্বীকার না করে কেমন করে আমি পরিত্রাণ পাব?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বরঞ্চ আমি বলি, এ-সবের কিছুই দরকার নেই সুরেশবাবু! মনে মনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যে চাওয়াই যে সকল সময়ে সবচেয়ে বড় জিনিস এ আমি স্বীকার করিনে। তিনি

শুনতে পেলেই যখন ব্যথা পাবেন, তখন কাজ কি তাঁকে শুনিয়ে? আমি বাবাকেও বরঞ্চ নিষেধ করে দেব, যেন আপনার কথা তাঁকে না বলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা। তার পরে অচলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেচি যে, মহিম কোন কারণেই এতটুকু ব্যথা না পায়, এই আপনার একমাত্র চেষ্টা। বেশ তাই হোক, আমি তাকে কোন কথাই বলব না। আজ তার সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠচে, তাও বলতে চাইনে, কিন্তু আপনাকে একটা কথা না বলে কিছুতেই বিদায় হতে পারচি নে।

অচলা স্নিগ্ধ চক্ষু-দুটি তুলিয়া কহিল, বেশ, বলুন।

সুরেশ কহিল, তার কাছে ক্ষমা চাইতে পেলুম না, কিন্তু আপনার কাছে চাইচি, আমায় মাপ করুন। বলিয়া সে হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিল।

ছি ছি, ও কি করেন! বলিয়া অচলা চক্ষের নিমিষে হাত-দুটি ধরিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, এ কি বিষম অন্যায় বলুন ত! বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরেশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য স্পর্শ, সলজ্জ মুখের অপরূপ রক্তিম দীপ্তি চক্ষের পলকে তাহাকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। সে অচলার অবনত মুখের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, না, আমি কোন অন্যায় করিনি। বরঞ্চ আমার সহস্র-কোটি অন্যায়ের মধ্যে যদি কোন ঠিক কাজ হয়ে থাকে ত সে এই। আপনি ক্ষমা করলেই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যাবে।

অচলা কাতর হইয়া কহিল, আপনি অমন কথা কিছু বলবেন না। যাঁকে দু-দু'বার মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেচেন—

তাও শুনেচেন?

শুনেচি। আপনার মত সুহৃৎ তাঁর আর কে আছে?

না, বোধ হয়, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সুবাদে আমরা দু'জন—

অচলার মুখের উপর আবার একটুখানি রাঙ্গা আভা দেখা দিল। সে কহিল, হাঁ, বন্ধু। আপনি তাঁকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোন কাজই আমি অন্যায় বলে ভাবতে পারিনে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জা আপনি রাখবেন না—ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ করলে আপনার যদি তৃপ্তি হয়, আমি তাও বলতে রাজি ছিলুম, যদি না আমার মুখে বাধত।

আচ্ছা, কাজ নেই। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। মহিমের সঙ্গে হয়ত আবার কোনদিন আসতেও পারি। নমস্কার।

অচলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, নমস্কার। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই যে আসতে হবে, এর ত কোন মানে নেই।

সত্যি বলচেন?

সত্যি বলচি।

আমার পরম সৌভাগ্য। বলিয়া সুরেশ আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ-মন টলিতে লাগিল। আকাশের খর রৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। সে গাড়ি ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল; ইচ্ছা, কলিকাতার জনাকীর্ণ কোলাহলময় রাজপথের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়।

অচলার মুখ, অবয়ব, ভাষা, ব্যবহার—সমস্তই তাহার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়া নিজেকে যেন ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে মুখে সৌন্দর্যের অলৌকিকত্ব ছিল না, কথায়, ব্যবহারে, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির অপরূপত্ব কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই; তথাপি কেমন করিয়া যেন কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহা এতদিন কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই। পথে চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি অনুক্ষণ এই প্রশ্ন করিতে লাগিল—এ বিস্ময় কিসের জন্য? কিসে তাহাকে আজ এতখানি অভিভূত করিয়া দিয়াছে?

এই তরুণীর মধ্যে এমন কোন্ জিনিস আজ সে দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে আপনাকে আপনি লীন মনে করিয়াও তাহার সমস্ত অন্তরটা কি এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে! ঐ মেয়েটির সত্যকার কোন পরিচয় এখনো তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু সে যে বড়, অনেক বড় তাহাকে লাভ করা যে-কোন পুরুষের পক্ষেই যে দুর্ভাগ্য নয়, এ সংশয় একটিবারও তাহার মনে উদয় হয় না কেন? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ এক সময়ে তাহার চিন্তার ধারা ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, এই যে মেয়েটি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বয়সে, হয়ত সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও এই দণ্ড-কয়েকের আলাপেই তাহাকে এমন করিয়া পরাজিত করিয়া ফেলিল, সে শুধু

তাহার অসাধারণ সংযমের বলে। তাই সে এত শান্ত হইয়াও এত দৃঢ়, এত জানিয়াও এমন নির্বাক। মহিমের সম্বন্ধে সে নিজে যখন প্রগল্‌ভের মত অবিশ্রাম বকিয়া গিয়াছে, তখন এই মেয়েটি অধোমুখে শুনিয়াছে, সহিয়াছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হইয়া তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, আপনাকে লঘু করে নাই। সর্বক্ষণই আপনাকে দমন করিয়াছে, গোপন করিয়াছে, অথচ কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। মহিমকে সে যে কতখানি ভালবাসে, তাহা জানিতে দিল না সত্য, কিন্তু তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা যে কিছুতেই তিলার্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে কথা কতই না সহজে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

এ বিদ্যা যে মহিমের কাছেই শেখা এবং ভাল করিয়াই শেখা, এ কথা সে বহুবার আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল; এবং তাহার নিজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই সংযম জিনিসটার একান্ত অভাব ছিল বলিয়া, ইহারই এতখানি প্রাচুর্য আর একজনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ আপনা-আপনিই এই গৌরবময়ীর পদতলে মাথা নত করিয়া ধন্য বোধ করিল।

অনেক রাস্তা গলি ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, সুরেশ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিল, মহিম চোখের উপর হাত চাপা দিয়া একটা কোচের উপর পড়িয়া আছে, উঠিয়া বসিয়া কহিল, এস সুরেশ।

এই যে! বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল।

মহিম কালেভদ্রে আসে। সুতরাং সে আসিলেই সুরেশের অভ্যর্থনা কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। মহিম মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বাসায় ফিরে এসে শুনি, তুমি গিয়েছিলে। তাই মনে করলুম—

দয়া করে একবার দেখা দিয়ে আসি। না হে! কতদিন পরে এলে, মনে করতে পার?

মহিম হাসিয়া কহিল, পারি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি যে। বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গ্যাসের আলোকে সুরেশের মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান এবং কঠিন দেখাইতেছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্নিগ্ধস্বরে পুনরায় কহিল, তোমার রাগ হতে পারে, এ আমি হাজার বার স্বীকার করি সুরেশ। কিন্তু বাস্তবিক সময় পাইনে। আজকাল পড়াশুনার চাপও একটু আছে, তা ছাড়া সকালে-বিকালে গোটা-দুই টিউশনি—

আবার টিউশনি নেওয়া হয়েছে?

মহিম তাহার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে খুঁজেছিলে, বিশেষ কিছু দরকার ছিল কি?

সুরেশ কহিল, হুঁ। তুমি আজ না এলে আমাকে আবার কাল সকালে যেতে হত।

মহিম কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। সুরেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে তাহার পায়ের জুতাজোড়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি এর মধ্যে বোধ করি কেদারবাবুর বাড়িতে আর যাওনি?

মহিম কহিল, না।

কেন যাওনি, আমার জন্যে ত? আচ্ছা, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। তোমার ইচ্ছামত সেখানে যেতে পার।

মহিম হাসিল; যাব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেম বলে ত আমার মনে হয় না!

সুরেশ বলিল, না হয় ভালই, তবুও আমার তরফ থেকে যদি কোন বাধা থাকে ত সে আমি তুলে নিলুম।

এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ, সুরেশ?

তোমার কি মনে হয় মহিম?

চিরকাল যা মনে হয়, তাই।

সুরেশ কহিল, তার মানে আমার খামখেয়াল! এই না? তা বেশ, তোমার যা ইচ্ছে মনে করতে পার, আমার আপত্তি নেই। শুধু যে বাধাটা আমি দিয়েছিলুম, সেইটেই আজ সরিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

খেয়ালের কি কারণ থাকে যে, তুমি জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে বলতে হবে!

মহিম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিন্তু সুরেশ, তোমার খেয়ালের বশেই যে সমস্ত সংসার বাধা পড়বে, আর উঠে যাবে, এ হলে হয়ত ভালই হয়; কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে তা হয় না। তোমার যেখানে বাধা নেই, আমার সেখানে বাধা থাকতে পারে।

তার মানে?

তার মানে, তুমি সেদিন ব্রাহ্মমহিলাদের সম্বন্ধে যত কথা বলেছিলে, আমি তা ভেবে দেখেচি। ভাল কথা, সেদিন বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে আমার জন্য পাত্রী স্থির করে দেবে, তার কি হল?

সুরেশ মুখ তুলিয়া দেখিল, মহিম গাম্ভীর্যের আড়ালে তীব্র পরিহাস করিতেছে। সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, আমি ত ভেবে দেখলুম মহিম, ঘটকালি করা আমার ব্যবসা নয়। তার পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু তামাশা থাক। এতদিন আমার মান রেখেচ বলে তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু আজ যখন আমার হুকুম পেলে, তখন কাল সকালেই একবার সেখানে যাচ্ছ ত?

না, কাল সকালে আমি বাড়ি যাচ্ছি।

কখন ফিরবে?

দশ-পনেরো দিনও হতে পারে, আবার মাস-খানেক দেরি হতেও পারে।

মাস-খানেক! না মহিম, সে হবে না। বলিয়া অকস্মাৎ সুরেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিমের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আর

আমার অপরাধ বাড়িয়ো না মহিম, কাল সকালেই একবার যাও। তিনি হয়ত তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহিমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুরেশের আকস্মিক আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মমহিলা সম্বন্ধে এই সসম্ভ্রম উল্লেখে সে যেন বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে সুরেশ? কেদারবাবুর মেয়ে?

সুরেশ সহসা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, থাকতেও ত পারেন?

মহিম আবার কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে যে ইতিমধ্যে ব্রাহ্মবাড়িতে গিয়া অনাহূত পরিচয় করিয়াও আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার কোনমতেই মনে উদয় হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, না সুরেশ, আমি হার মানছি—তোমার আজকের মেজাজ বাস্তবিক আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মমেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, এ কথা তোমার মুখ থেকে বোঝা আমার দ্বারা অসম্ভব।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে কথা একদিন বুঝিয়ে দেব। তুমি বল, কাল সকালেই একবার দেখা দেবে?

না, কাল অসম্ভব। আমাকে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।

মিনিট-কয়েকের জন্যও কি দেখা দিতে পার না?

না, তাও পারিনে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল দেখি?

সে কথা আর একদিন বলব—আজ নয়। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা বলে আসতে পারি কি?

মহিম অধিকতর আশ্চর্য হইয়া কহিল, পার, কিন্তু তার ত কিছু দরকার নেই।

সুরেশ কহিল, না থাক দরকার—দরকারই সব নয়। আমার পরিচয় দিলে তাঁরা চিনতে পারবেন?

একজন নিশ্চয়ই পারবেন।

সুরেশ বলিল, তা হলেই যথেষ্ট। তোমার বন্ধু বলে চিনবেন ত?

মহিম বলিল, হাঁ।

সুরেশ এইবার একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর চিনবেন—তোমার একজন ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হিন্দুবন্ধু বলে? না?

মহিম বলিল, কিন্তু সেই ত তোমার প্রধান গর্ব সুরেশ!

সুরেশ বলিল, তা বটে। বলিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মহিম, আমি শুতে চললুম। বলিয়া অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরেশ মনে মনে অসংশয়ে অনুভব করিতেছিল যে, কথাটা মহিম যেমন করিয়াই উড়াইয়া দিক, সে তাহারই একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই এতদিন অচলার সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সে যত ভালই বাসুক, এখন পর্যন্ত সে একটা ব্রাহ্মমেয়ের কাছে তাহার শৈশবের বন্ধুকে খাটো করিতে পারে না, এমন কথা কাল শুনিলেও সুরেশের বুকখানা গর্বে দশ হাত ফুলিয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার নির্জন শয্যায় এ চিন্তা তাহাকে লেশমাত্র আনন্দ দিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, একদিন-না-একদিন হাসি-গল্পে উপহাসে-পরিহাসে বিচিত্র হইয়া সমস্ত কথা অচলার কানে উঠিবে। সেদিন সুখের ক্রোড়ে বসিয়া সে তাহার স্বামীর এই অপদার্থ বন্ধুটার নিষ্ফল ঈর্ষার কোন তাৎপর্যই খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ হাসির ছলেও সে স্বল্পভাষিণী কোনদিন কোন প্রশ্নই তাহাকে করিবে না। হয়ত-বা, শুধু মনে মনে একটুখানি হাসিয়া বলিবে, এই লোকটা বন্ধুত্বের অতি-অভিমানে কত পণ্ডশ্রমই না করিয়াছে! ব্যর্থ আক্রোশে কত অন্তর্দাহেই না জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে!

রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না। যতবার ঘুম ভাঙ্গিল, ততবারই এই-সকল তিক্ত চিন্তা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া গেল—পরের জন্য এমন উৎকট মাথাব্যথার রোগ কবে সারিবে সুরেশ?

সকালবেলা উঠিয়া সে দিনের কোন কাজে মন দিতে পারিল না এবং বেলা বাড়িতে না বাড়িতেই গাড়ি করিয়া কেদারবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। বেহারা জানাইল, বাবু আলিপুর আদালতে বাহির হইয়া গিয়াছেন—ফিরিতে তিন-চার ঘণ্টা দেরি হইতেও পারে।

সুরেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দুইজনেই বেরিয়ে গেছেন?

প্রশ্নটা বেহারা বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ত আমি জানিনে বাবু।

সুরেশ মুশকিলে পড়িল। গৃহস্বামীর অবর্তমানে তাঁহার যুবতী কন্যার সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্ন করা ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে শিষ্টতা-বিরুদ্ধ কি না, তাহা স্থির করিতে পারিল না, অথচ এই কন্যাটিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। চিন্তা করিয়া কহিল, তোমার বাবুর ফিরতে এত দেরি নাও হতে পারে ত? আমি এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেই দেখি।

বেহারা সুরেশকে বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইয়া বলিল, দিদিঠাকরুন বাড়ি আছেন, তাঁকে খবর দেব কি? বলিয়া উত্তরের জন্য চাহিয়া রহিল। অচলা এই ভদ্রলোকটির সুমুখে যে বাহির হন তাহা সে কালই দেখিয়াছিল।

সুরেশ অন্তরের আগ্রহাতিশয্য প্রাণপণে নিবারণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কহিল, তাঁকে আবার খবর দেবে? আচ্ছা দাও, ততক্ষণ না হয় তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কই।

বেহারা চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই অচলা পার্শ্বের দরজার পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম যে বাড়ি চলে গেল। এত করে বললুম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে—কিন্তু কোনমতেই কথা শুনলে না, এমন একটা—

অচলার মুখ মুহূর্তের জন্য সাদা হইয়া গেল। কিন্তু নমস্কার করিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, যাওয়া বোধ করি খুব বেশি দরকার, বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

নমস্কার করিতে দেখিয়া সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল; এবং নিজের অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে অচলার শান্ত ধীর কথাগুলি ওজন করিয়া শতগুণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ ও

স্বাভাবিক করিয়া বলিল, দরকার যাই হোক—সে এমন কি ভয়ানক হতে পারে যে, অন্তত: দু' মিনিটের জন্য এসেও একবার আপনাকে সে বলে যেতে পারে না? আর যখন কবে ফিরবে, তার কোন ঠিকানা নেই, আপনিই বলুন, বাড়িতেই বা তার আছে কে—যার অসুখের জন্যে তাকে এভাবে যেতে হয়? আমি ত মরে গেলেও এমন করে চলে যেতে পারতুম না।

অচলার মুখের উপর দিয়া একটা সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি খেলিয়া গেল। কহিল, আপনার এখনও কেউ হয়নি বলেই এ কথা বললেন ; কিন্তু হলে ঠিক ওঁর মতই অবহেলা করে চলে যেতেন—এ আমি নিশ্চয় বলচি।

সুরেশ তাহার বসিবার চৌকির হাতলের উপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, কখ্‌খনো না। আমাকে আপনি চেনেন না, তাই এ কথা বলতে পারলেন; কিন্তু চিনলে পারতেন না।

অচলা কহিল, বেশ ত, এখন থেকে ত চিনতে পারব, আর কেউ হলে জানতেও পারব। কি বলেন?

সুরেশ কহিল, নিশ্চয়। এক শ'বার। তা ছাড়া মহিমের মত আমি বন্ধুর কাছে কোন কথা গোপন করে রাখতেও পারিনে, রাখা ভালও মনে করিনে; বলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি বলচেন, হলে জানতে পারবেন, কিন্তু আমি বলচি যে, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার মত না নিয়ে এ-সব কখনো হবেই না; কারণ আপনাকে মহিমের সঙ্গে পৃথক করে দেখবার সাধ্য আর আমার নেই। আপনারা আমার কাছে আজ অভিন্ন।

অচলা সলজ্জ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে যাচাই করার শুভদিন না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু আপনার বন্ধুকে দোষী করতে পারব না সুরেশবাবু।

সুরেশ সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যাচাই করবার শুভদিন এ জন্মে ঘটবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে যাক। আজ

সকালেই কেন আপনাদের কাছে এসেছি জানেন? কাল রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি—না এলে আজও পারব না তাও জানতুম। আমি অনেক অপরাধ করেছি—তার সমস্ত একটি একটি করে আজ আপনার কাছে স্বীকার করে আমি যাব। আমি তাই এসেছি।

তাহার প্রবল বিরুদ্ধতা অচলার অবিদিত ছিল না। তাই সে শঙ্কিত-মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি মহিম বসে আছে। ভাল কথা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আমি ব্রাহ্মদের দু'চক্ষে—অর্থাৎ কিনা, ব্রাহ্মসমাজটাকে আমি তেমন ভাল মনে করিনে।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমি জানি।

সুরেশ বলিতে লাগিল, জানবেন বৈ কি। কিন্তু এ কথাটাও ভুলবেন না যে, আমি তখন আপনাকে চিনতুম না। তাই মহিমকে অনুরোধ করি, সে যেন অন্তত: একটা মাস এখানে না আসে। কেন জানেন?

অচলা পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তবে বোধ হয়, আপনি ভেবেছিলেন পুরুষমানুষের ভুলতে একটা মাসই যথেষ্ট সময়। তবে বেশি বিলম্ব হওয়া সঙ্গত নয়।

আঘাতটা সুরেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, আমি চিরদিনই নির্বোধ। হয়ত এমনই কিছু একটা মনে করে থাকব। তা ছাড়া আরও একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে আমার ছিল। আমি শপথ করেছিলুম, এই একটা মাসের মধ্যেই আর কোথাও পাত্রী স্থির করে মহিমের বিয়ে দেব। যেমন করেই হোক তাকে আটকাতে হবে। আমার বন্ধু হয়ে সে যে একটা নারীর মোহে নিজেদের সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, এ যেন কিছুতেই না ঘটতে পায়।

অচলা রুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, তার পরে?

তাহার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া সুরেশ একটুখানি হাসিল; কহিল, তার পরে আর ভয় নেই। এ পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি, আজ সেই কথাই আমি স্বীকার

করে যাব। আপনাকে দেখা দেবার জন্যে কাল রাত্রে তাকে অনেক অনুরোধ করেচি। একদিন আমার অনুরোধটা সে রেখেছিল, কিন্তু কালকের অনুরোধটা রাখলে না—আপনাকে দেখা না দিয়েই সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, যাবার কোন কারণ দেখিয়েছিলেন?

সুরেশ কহিল, না। দরকার আছে—এই মাত্র।

অচলা আর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল—দরকার! দরকার! চিরকাল তাঁর মুখে এই কথাই শুনে আসছি—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্বস্ব!

সুরেশ কহিল, একটা চিঠি লিখেও ত সে আপনাকে জানাতে পারত।

অচলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না। চিঠি তিনি লেখেন না।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, কি প্রয়োজন, তাও কখনো বলে না। তার সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর! কখনো কাউকে তার ভাগ দিলে না। এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলেবেলা থেকে আমাকে দিয়ে এসেছে, বোধ করি, তার সীমা নেই। নিষ্ঠুর! দিনের পর দিন নিজে উপোস করে, আমার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা তিক্ত বিষাক্ত করেচে—কিন্তু কখনো কোনদিন আমার মুখ চেয়েও আমার হাত থেকে কিছু নেয়নি। আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন? বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ-দুটো অশ্রুজলে ঝকঝক করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন, আমার বাইরেটা ভারী শক্ত দেখতে, কিন্তু ভিতরটা তেমনি দুর্বল। মহিমের ঠিক তার উলটো—তবু আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।

অচলা নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, সে আমি জানি সুরেশবাবু, এবং আরও জানি যে, সে বন্ধুত্ব আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।

শৈশবের সমস্ত পূর্বস্মৃতি সুরেশের বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যখন জানেনই, তখন এই ভিক্ষা আজ আমাকে দিন যে, অজ্ঞানে যে শত্রুতা আপনাদের করেচি, সে অপরাধ আর যেন আমার বুকে না বেঁধে।

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং এই একান্ত ব্যাকুলতায় অচলার নিজের অন্তরটাও যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়াই দেখিল, তাহার পিতা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কেদারবাবু সুরেশকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে সুরেশবাবু!

সুরেশ দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

কেদারবাবু আসন গ্রহণ না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিমের খবর কি? তাকে ত দেখচি নে!

সুরেশ বলিল, মহিম অত্যন্ত প্রয়োজনে সকালের গাড়িতেই বাড়ি চলে গেল—এই খবর জানাবার জন্যেই আমি এলুম।

কেদারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বাড়ি চলে গেল। বলিয়াই সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, সে বাড়ি যাক, থাক, আমাদের তাতে আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি বাবা সুরেশ যখন সময় পাবে বাড়ির ছেলের মত এখানে এসো, যেয়ো—আমার বড় আনন্দ হবে—কিন্তু তোমার সেই মিথ্যাচারী বন্ধুরত্নটি যেন আর কখন এ বাড়িতে মুখ না দেখায়। দেখা হলে বলে দিও তার আর কোন লজ্জা না থাকে—অন্ততঃ অপমানের ভয়টা যেন থাকে।

সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া কেদারবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, না, না, সুরেশ তোমার লজ্জা বোধ করবার ত এতে কোনই কারণ নেই। বরঞ্চ কর্তব্য করবার গৌরব আছে। তুমি

বুঝতে পারছ না যে, কি বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছ এবং কতদূর পর্যন্ত আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি কাল থেকে এই বড় আশ্চর্য হচ্ছি অচলা, সে লোকটা সুরেশের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কি করে, আর কি করেই বা এতদিন ধরে সেটা বজায় রেখেছিল। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, যে এ পারে, সে যে আমাদের মত দুটি নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে, এ বেশি কথা নয়, মানি, কিন্তু এও বড় অদ্ভুত যে এই লোকটা বাস্তবিক কি, কেমন—এটুকু অনুসন্ধান করার কথাও আমার মত প্রবীণ বয়সের লোকের মনেও একটা দিন ওঠেনি। আশ্চর্য!

সুরেশ কথা কহিল না, কেদারবাবুর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্যন্ত পারিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজের পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে বাবা; একটু বসো, আমি এইগুলো ছেড়ে আসি; বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুরেশ কহিল, আমার বেলা হয়ে গেছে। আজ যাই, আর একদিন আসব, বলিয়া ব্যস্ত হইয়াই উঠিয়া পড়িল এবং কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল এবং পরদিনও ঠিক এই সময়েই তাহার গাড়ির শব্দ আসিয়া থামিল।

কিন্তু ইহার পরদিনও আবার যখন তাহার গাড়ির শব্দ শুনা গেল, তখন বেলা হইয়াছে। পিতাকে স্নানাহারের তাগিদ দিয়া অচলা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আর উঠা হইল না, তিনি সুরেশকে সানন্দে আহ্বান করিয়া লইয়া গল্প শুরু করিয়া দিলেন।

সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়াই দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরে যখন উঠিতে গেল, তখন তাহার শুষ্ক রুক্ষ মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আজ অকস্মাৎ একনিমেষেই কেদারবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এখনো ত তোমার স্নানাহার হয়নি সুরেশবাবু?

সুরেশ সহাস্যে কহিল, আমার আহার একটু বেলাতেই হয়।

কেদারবাবু তাহা কানেই লইলেন না, বলিতে লাগিলেন, এবং একনিমিষেই একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি? না, আর এক মিনিট দেরি নয় সুরেশ! এইখানেই স্নান করে যা পারো খেয়ে নাও। মা অচলা, একটু তাড়া দাও—বেলা বারোটা বেজে গেছে। বেয়ারা,—ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতে করিতে তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

অচলা এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখনও কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। পিতা চলিয়া যাইবার পর আস্তে আস্তে বলিল, আপনি আমাদের এখানে কি কিছু খেতে পারবেন?

সুরেশ মুখ তুলিয়া অচলার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি কি বলেন?

আপনি কখনই ত ব্রাহ্ম-বাড়িতে খান না।

না, খাইনে। কিন্তু আপনি এনে দিলে খাবো। একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় ভাবছেন, আমি তামাশা করছি; কিন্তু তা নয়। আপনি হাতে করে দিলে আমি সত্যি খাবো; বলিয়া চাহিয়া রহিল।

এইবার অচলা একটুখানি মুখ নিচু করিয়া হাসি গোপন করিল; কহিল, যথার্থই আমি ভেবেছিলুম আপনি ঠাট্টা করচেন। কাল পর্যন্তও যাদের বাড়িতে খেতে আপনার ঘৃণার অবধি ছিল না, আজ তাদেরই একজনের ছোঁয়া খেতে কি করে আপনার প্রবৃত্তি হবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছিনে সুরেশবাবু।

সুরেশ ম্লানমুখে ব্যথিতস্বরে কহিল, তবে এতক্ষণ পরে কি এই ভেবে পেলেন যে, আপনার হাতে খেতে আমার ঘৃণা হবে?

অচলা বলিল, কিন্তু এই ভাবনাই ত স্বাভাবিক সুরেশবাবু। আপনার মত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের চিরদিনের বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কার হঠাৎ একদিনে অকারণে ভেসে যাবে, এইটেই কি ভাবতে পারা সহজ?

সুরেশ কহিল, না, সহজ নয়। কিন্তু অকারণে ভেসে যাচ্ছে—তাই বা ভাবচেন কেন? কারণ থাকতেও ত পারে, বলিয়া এমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল যে, জবাব দিতে গিয়া অচলা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কথাটায় সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা সে মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং একপ্রকারের হিংস্র আনন্দও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু সে বেদনা যে অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানাকে একেবারে ছাইয়ের মত শুষ্ক করিয়া দিতে পারে—তা সে ভাবেও নাই, ইচ্ছাও করে নাই। তাই নিজেও ব্যথা পাইয়া কথাটাকে সহজ রহস্যালাপে পরিণত করিতে, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভেবেই দেখুন আপনার মত কঠোরপ্রতিজ্ঞ লোকও—

সুরেশ বলিল হাঁ, ভেসে যায়। তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল; কহিল, আপনি একটা দিনের কথা বলছিলেন—কিন্তু জানেন আপনি, একদিনের ভূমিকম্পে অর্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে? একটা দিন কম সময় নয়। বলিয়া আবার নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা ভীত হইয়া উঠিল। সুরেশের মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক পাণ্ডুরতা—কপালের শির-দুটো রক্তে স্ফীত, চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করিতেছে—যেন কি একটা সে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়!

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত স্নানাহার নাই—গতরাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নীচের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি

না সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—

তাহার উন্মাদ ভঙ্গীতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, বেহারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশের যায় না। সে স্থানকালের অতীত। তুমি ভূমিকম্প দেখেচ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

অচলা ব্যাধভীত হরিণীর মত চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার স্নানের যোগাড়—, বলিয়া পা বাড়াইতে সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করে স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুড় হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিয়া তাহার আর্তকণ্ঠের 'মা গো!' আহ্বান তাহার কম্পিত ওষ্ঠপুট ত্যাগ করিতে না করিতে সুরেশ তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চোখ তুলিয়া মূর্ছিত মায়ামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল এবং সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসা-দগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা স্তব্ধ তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে থাকিয়া সুরেশ আর একবার অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব করে দেখ—কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে! এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট? বলতে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাত, কোন্

ধর্ম, কোন্ মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না।

ছেড়ে দিন—বাবা আসচেন, বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অচলা তাহার চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া শান্ত হইয়া বসিল এবং পরক্ষণেই কেদারবাবু ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, তাইত, একটু দেরি হয়ে গেল—আর এই বেয়ারা ব্যাটা যে থেকে থেকে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই। মা অচলা—ও কি রে, তোর কি কোন অসুখ করেছে? মুখ শুকিয়ে যেন একেবারে—

অচলা কোনমতে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন?

তবু মাথাধরা-টরা? যে গরম পড়েছে, তা—

না, আমি বেশ আছি বাবা, আমার কিছুই হয়নি।

কেদারবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভাল। মুখ দেখে আমার ভয় লেগে গিয়েছিল, তবে, তুমি একটু দেখ দেখি মা, যদি—

অচলা বলিল, বেশ ত বাবা, আমি এক মিনিটে সমস্ত যোগাড় করে দিচ্চি। কিন্তু এইমাত্র আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম সুরেশবাবুকে—আমাদের এখানে নাওয়া-খাওয়া করতে তাঁর ত আপত্তি নেই?

কেদারবাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আপত্তি কেন থাকবে? না না সুরেশ, আমি ত তোমাকে বলেইছি যে, একদিনেই তোমাকে আমি ঘরের ছেলে মনে করেচি। এ বাড়ি তোমার নিজের বাড়ি। মেয়ের দিকে চাহিয়া সগর্বে কহিলেন, আর তাই যদি না হবে অচলা, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান ওঁকে পাঠাবেন কেন? কিন্তু আর দেরি ভাল হবে না বাবা, এসো আমার সঙ্গে—স্নানের ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই গে।

কিন্তু সেই যে সুরেশ, কেদারবাবু প্রবেশ করা পর্যন্ত মাথা হেঁট করিয়াছিল, কিছুতেই আর সে মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিল না।

অচলা বলিল, কাজ কি বাবা পীড়াপীড়ি করে! আমাদের ব্রাহ্ম-বাড়িতে খেতে হয়ত ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।

কেদারবাবু একেবারে মুষড়িয়া গেলেন। সুরেশ বড়লোকের ছেলে—স্বাধীন। ঘরের গাড়ি করিয়া যাতায়াত করে। তাহাকে খাওয়াইয়া মাখাইয়া যেমন করিয়া হোক আত্মীয় করা যে তাঁহার চাই-ই; হঠাৎ তাহার আনত মুখের একাংশে নজর পড়ায় কেদারবাবু বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ! একি হয়েছে সুরেশ? শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে! ওঠো, ওঠো—মাথায় মুখে জল দিতে আর এক মিনিট বিলম্ব করো না। বলিয়া হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর কোনমতেই কেদারবাবু এই রৌদ্রের মধ্যে সুরেশকে ছাড়িয়া দিলেন না। বিশ্রামের নামে সমস্ত দুপুরটা একটা ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে চোখ বুজিয়া কৌচের উপর পড়িয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের বাহিরে মধ্যাহ্ন-সূর্য আকাশে জ্বলিতে লাগিল, ভিতরে আত্মসংযমের আত্মগ্লানি ততোধিক ভীষণ তেজে সুরেশের বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া সমস্ত বেলাটা অন্তরে-বাহিরে পুড়িয়া আধমরা হইয়া যখন সে উঠিয়া বসিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। কেদারবাবু প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকিয়া জোর করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—গরমটা একবার দেখচ সুরেশ! আমার এতটা বয়সে কলকাতায় কস্মিনকালেও এমন দেখিনি। বলি, ঘুমটুম একটু হয়েছিল কি?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, দিনের বেলায় আমি ঘুমোতে পারিনে।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আর পারা উচিতও নয়। ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। তবুও আমি তিন-চারবার উঠে উঠে দেখি, তোমার পাখাওয়ালা টানচে, না ঘুমোচ্ছে। এরা এত বড় শয়তান যে, যে মুহূর্তে তুমি একটু চোখ বুজবে, সেই মুহূর্তেই সেও চোখ বুজবে। যে হোক, একটু সুস্থ হতে পেরেচ ত? আমি নিশ্চয় জানতুম—এ রোদে বাইরে বেরুলে আর তুমি বাঁচতে না।

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু ঘরের অন্যান্য জানালাগুলা একে একে খুলিয়া দিয়া, বসিবার চৌকিখানা কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়িমসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট করে মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল?

প্রশ্নটা সুরেশের পিঠের উপর যেন মর্মান্তিক চাবুকের বাড়ি মারিল। সে এমনি চমকিয়া উঠিল যে, কেদারবাবু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, নিষ্ঠুর কর্তব্য যে কি করে করতে হয়, সে শিক্ষা ত তুমিই আমাকে এতকাল পরে দিলে সুরেশ; এখন তোমার ত পেছুলে চলবে না বাবা।

এ ত ঠিক কথা। সুরেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, কিন্তু আপনার কন্যারও এ সম্বন্ধে মতামত নেওয়া চাই।

কেদারবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, চাই বৈ কি।

তিনি কি স্পষ্ট করে চিঠি লিখে দিতেই বলেন?

কেদারবাবু ইহার সোজা জবাবটা না দিয়া কহিলেন, তা একরকম তাই বৈ কি। এ-সব বিষয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাব করাটা সকলের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু সে ত বড় হয়েছে, রীতিমত শিক্ষাও পেয়েছে; এ-সকল ব্যাপার দিন থাকতে পরিষ্কার করে না নিলে এর পাগলামিটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, এ ত সে বোঝে। তাই ভাবচি, আজ রাত্রেই কাজটা সেরে ফেলব।

সুরেশ ম্লান হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'দিন চিন্তা করাও ত উচিত।

কেদারবাবু বলিলেন, এর ভেতরে চিন্তা করব আর কোন্‌খানে? ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না, সে নিশ্চয়—তখন এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, আমার উল্লেখ করাও কি প্রয়োজন?

কেদারবাবু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো হয়েচি, এইটুকু বিবেচনাও কি আমার নেই মনে কর? তোমার নাম কোনদিনও কেউ তুলবে না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা আরামের নিশ্বাস পড়িল, কিন্তু সে আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই নিশ্বাসটুকু কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশের আরও দু-একটা আচরণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়া মনে

মনে একটা অনুমান খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ফেলিলেন; কহিলেন, মস্ত উপকার আমাদের যেমন তুমি করলে বাবা, কিন্তু এর চেয়েও বড় উপকার তোমার কাছে আমরা দু’জন প্রত্যাশা করচি। আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সে-রকম ব্রাহ্ম নয়। আর আমার মেয়ে ত তার মায়ের মত মনে মনে হিন্দুই রয়ে গেছে। সে আমাদের ব্রাহ্মগিরি-টিরি একেবারেই পছন্দ করে না।

সুরেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার এই নীরব ঔৎসুক্য কেদারবাবু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাই, মেয়েকে আমি কিছুতেই চিরকাল আইবুড়ো রাখতে পারি না। এ বিষয়ে আমি তোমাদের মতই সম্পূর্ণ হিন্দুমতাবলম্বী। একটি সম্বন্ধ যেমন তোমা হতে ভেঙ্গে গেল সুরেশ, তেমনই আর একটি তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে বাবা।

সুরেশ কহিল, যে আজ্ঞে; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

তাহার মুখের ভাব পড়িতে পড়িতে কেদারবাবু সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন, সমাজে এই নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হবে দেখতে পাচ্চি। কিন্তু যত শীঘ্র পারা যায়, অচলার বিয়ে দিয়ে এই-সব আলোচনা থামিয়ে ফেলতে হবে। তবে একটা শক্ত কথা আছে, সুরেশ। বলিয়া একবার দরজার বাহিরে চাহিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিলেন, শক্ত হচ্চে এই যে, পাত্র রূপে-গুণে ভাল হলেই যে হিন্দুসমাজের মত তাকে ধরে এনে বিয়ে দিতে পারব, তা নয়। ও চিরকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, তাতে ওর অমতে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু মত সে কোন মতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দু’জনের মধ্যে এমন একটা কিছু—বুঝলে না সুরেশ?

কথাবার্তার মধ্যেই সুরেশ কতকটা যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রণয়-ইঙ্গিতটা যেন আর একবার নূতন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া দিল। দুপুরবেলায় তাহার নিজের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-নিবেদনের বীভৎস

উৎকট আচরণ স্মরণ হওয়ায় নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা না হইয়া একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল; এবং সকালের যে খবরের কাগজখানা এতক্ষণ পায়ের কাছে মেজেতে পড়িয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের পাতাটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেদারবাবু ইহা দেখিতে পাইলেন, এবং এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং সুযোগ বুঝিয়া একটা বড়রকম চাল চালিয়া দিলেন; কহিলেন, আমি বরাবর এই বড় একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আসচি সুরেশ, যে, কেন জানিনে, একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও একতিল বিশ্বাস হয় না, আর একটা মানুষকে হয়ত দু' ঘণ্টা মাত্র কাছে পেয়েই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্যন্ত সঁপে দিতে পারি। মনে হয়, যেন জন্মজন্মান্তরের আলাপ,—শুধু দু' ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি। কতক্ষণেরই বা পরিচয় বল দেখি?

ঠিক এমনি সময় অচলা ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশ মুহূর্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

বাবা, তুমি এ বেলা চা, না কোকো খাবে?

আমি কোকোই খাব মা।

সুরেশবাবু, আপনি চা খাবেন ত?

সুরেশ কাগজের দিকে চোখ রাখিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, আমাকে চা-ই দেবেন।

আপনার পেয়ালায় চিনি কম দিতে হবে না ত?

না, আর পাঁচজন যেমন খায় আমিও তেমনি খাই।

অচলা চলিয়া গেল। কেদারবাবু তাঁহার ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র যোজনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এই দেখ না সুরেশ, আমার এই মা-টির জন্যেই এই বুড়োবয়সে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েচি, এ কথা তোমার কাছে ত গোপন রাখতে

পারলুম না। নইলে, নিজের দুর্দশা-দুরবস্থার কাহিনী সহজে কি কেউ কখনো অপরের কানে তুলতে পারে! কখনও যা পারিনি, এত বন্ধুবান্ধব থাকতে সে কথা শুধু তোমার কাছেই বলতে কেন সঙ্কোচবোধ হচ্ছে না? এর কি কোন গূঢ় কারণ নেই মনে কর?

সুরেশ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, এ ভগবানের নির্দেশ—সাধ্য কি গোপন করি? আমাকে বলতেই হবে যে! বলিয়া চৌকির হাতলের উপর তিনি একটা চাপড় মারিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই বিস্তৃত ভূমিকা সত্ত্বেও তাঁহার দুর্দশা-দুরবস্থাটা যে মেয়ের জন্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুরেশ আন্দাজ করিতে পারিল না। কেদারবাবু তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার অমন অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা নিছক প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও তিনি অবিচলিত ধৈর্যের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেলেও একমাত্র কন্যার শিক্ষাসম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যয়সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, গুটি-পাঁচছয় ডিক্রীজারির ভয়ে তাঁহার আহার-বিহার বিষময় এবং খুচরা ঋণের তাগাদায় জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। অথচ এই কলিকাতা শহরেই এমন অনেক আছেন যাঁহারা টাকাটা অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারেন।

একটুখানি থামিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে যে জানালুম—একটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচ হল না—একি শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ নয়? বলিয়া পরম ভক্তিভরে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

সুরেশের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না—সে বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না, বরঞ্চ তাহার মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া গেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঋণ কত?

কেদারবাবু বলিলেন, ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাকলে কি এ আবার একটা ঋণ! বড়জোর হাজার তিন-চার। তিনি আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এমনি সময়ে অচলা বেহারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু গরম কোকো এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া, হর্ষসূচক একটা অব্যক্ত নিনাদ করিয়া পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ সুরেশ, আমার ওপর ভগবানের এই একটা আশ্চর্য কৃপা আমি বরাবর দেখে আসচি যে, তিনি কখনো আমাকে অপ্রস্তুত করেন না। মহিমকে কথাটা বলি-বলি করেও যে কেন বলতে পারতুম না—তিনি বরাবর আমার যেন মুখ চেপে ধরতেন—এতদিনে সেটা বোঝা গেল। বলিয়া আর একবার কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহার অসীম দয়ার জন্য নমস্কার করিলেন।

সুরেশ তাহার পেয়ালাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, টাকাটা কবে আপনার প্রয়োজন?

কেদারবাবু মুখ হইতে কোকোর পেয়ালাটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, প্রয়োজন আমার ত নয় সুরেশ, প্রয়োজন তোমাদের। বলিয়া একটুখানি উচ্চ-অঙ্গের হাস্য করিলেন।

হেঁয়ালিটা বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, অচলা জিজ্ঞাসুমুখে পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি একবার কন্যার মুখে, একবার সুরেশের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এর মানে বোঝা ত শক্ত নয়। বাড়িটা আমি ত সঙ্গে নিয়ে যাব না! যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদেরই দু’জনের থাকবে। বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

দু’জনের চোখাচোখি হইল, এবং চক্ষের পলকে উভয়েই আরক্তমুখে মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

পেয়ালা-দুই কোকো নিঃশেষ করিয়া কেদারবাবু একখানা জরুরি চিঠি লেখার কথা স্মরণ হইল। অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ তোমার খাওয়ার ভারী কষ্ট হল সুরেশ, কাল দুপুরবেলা এখানে খাবে, বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিম দিকের দরজা খুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

খোলা দরজা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যের এক ঝলক রাঙ্গা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, অচলা তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—সেও দৃষ্টি অবনত করিল। মিনিট-দুই বড় ঘড়িটার খটখট শব্দ ছাড়া সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরে নীরবতা ভঙ্গ করিল সুরেশ, কহিল, হঠাৎ আচ্ছা একটা কাণ্ড করে বসলুম।

অচলা কথা কহিল না।

সুরেশ পুনরায় কহিল, আপনার নিশ্চয়ই আমাকে একটা রাক্ষস বলে মনে হচ্চে। একলা বসে থাকতে বোধ করি আপনার সাহস হচ্চে না, না? বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। অচলা এখনও মুখ তুলিল না; কিন্তু তুলিলে দেখিতে পাইত, সুরেশের ওই একান্ত চেষ্টার নিষ্ফল হাসিটা শুধু তাহার নিজের মুখখানাকেই বারংবার অপমানিত করিয়া লজ্জায় বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আবার সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং সেই দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটাই শুধু খটখট করিয়া স্তব্ধতার পরিমাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে এই কঠিন নীরবতা যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুরেশ তাহার সমস্ত দেহটাকে ঋজু এবং শক্ত করিয়া কহিল, দেখুন যা হয়ে গেছে, তার পরে আমাদের মধ্যে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। বেলা গেল—আমি এবার যাব। কিন্তু তার আগে গোটা-দুই কথার জবাব শুনে যেতে চাই, দেবেন?

অচলা মুখ তুলিল। তাহার চোখ-দুটি ব্যথায় ভরা। কহিল, বলুন।

সুরেশ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনার বাবার দেনাটা পরিশোধ করে দিতে কাল-পরশু একবার আসব; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাই, আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি আপনি জানেন?

অচলা কহিল, আমাকে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন না।

সুরেশ বলিল, আমাকেও না। তবুও বিশ্বাস, তিনি আমাকেই—কিন্তু আপনি বোধ করি রাজি হবেন না?

অচলা কহিল, না।

কোনদিন না?

অচলা দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, না।

কিন্তু, মহিমের আশা যদি না থাকে?

অচলা অবিচলিত-স্বরে কহিল, সে আশা ত নেই-ই।

সুরেশ প্রশ্ন করিল, বোধ করি, তবুও না?

অচলা মুখ তুলিল না, কিন্তু তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, তবুও না।

সুরেশ কৌচের পিঠে ঢলিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, এ দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁচা গেল। বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু আমি এই একটা মুশকিলের কথা ভাবচি যে, আপনার বাবার দেনাটা তা হলে শোধ হবে কি করে?

অচলা ভয়ে ভয়ে একটুখানি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, আর ত আপনি দিতে পারবেন না?

পারব না? কেন? প্রশ্ন করিয়া সুরেশ তীক্ষ্ণ ব্যগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির সম্মুখে অচলা পুনরায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া সুরেশ হাসিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিতে আনন্দ না থাক, কৃত্রিমতাও ছিল না। কহিল, দেখুন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত আমার কোন আচরণকেই যে ভদ্র বলা যেতে পারে না, সে আমি নিজেও জানি; কিন্তু আমি অত ছোটও নই। আপনার বাবাকে আমি এই টাকাটা ঘুষ দিতে চাইনি, তাঁর বিপদে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। সুতরাং আপনার মতামতের ওপর আমার দেওয়াটা নির্ভর করচে না। নির্ভর করচে তাঁর নেওয়াটা।

এখন কি করে যে তিনি নেবেন, আমি তাই ভাবচি। বরং আসুন, এ সম্বন্ধে আমরা একটা পরামর্শ করি।

অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, বলুন।

সুরেশ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকাকড়ির উপর কোনদিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার-চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাতছাড়া করতে পারি। আর আপনার সুখের জন্য ত আরও ঢের বেশি পারি। তা যাক। এখন কথা এই যে, আপনার বাবার ধারণা, এ টাকাটা শোধ দেবার আর আবশ্যক হবে না, অথচ সে একরকম শোধ দেওয়াই হবে। বুঝলেন না?

অচলা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, হাঁ।

সুরেশ বলিতে লাগিল, কথাটা স্পষ্ট বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। বুঝতে পারচি, টাকাটা তাঁর চাই-ই, অথচ এত টাকা ধার নিয়ে শোধ করবার অবস্থা তাঁর নেই। যদিচ, আমার নিজের তরফ থেকে তার আবশ্যকও কিছুমাত্র নেই—আচ্ছা, এ ত সহজেই হতে পারে। পরশু পর্যন্ত আপনার মনের ভাব তাঁকে না জানালেই ত আর কোন গোল থাকে না। কেমন, পারবেন ত?

অচলা তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, টাকার লোভে আপনি যে মত দিলেন না, এতে আমার ঢের বেশি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বরঞ্চ মত দিলেই হয়ত আমি শেষে ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়াতুম। আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আমি চললুম। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার বলবার আর মুখ নেই—তবু যাবার সময় একটা ভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছি যে, আমার দোষ-অপরাধগুলো মনে করে রাখবেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, নমস্কার। খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে বিদায় হলুম—কিন্তু বাস্তবিক, পিশাচও আমি নই। যাক—বিশ্বাস করবার যখন এতটুকু পথ রাখিনি, তখন বলা

বৃথা। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল, অচলা শুনিতে পাইল; এবং তাহার পরেই নিতান্ত অকারণে তাহার দুই চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কেদারবাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, সুরেশ?

অচলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, এইমাত্র চলে গেলেন।

কেদারবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে কি, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল? কাল এখানে খাবার কথাটা তুমি যাবার সময় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে ত?

অচলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমার মনে ছিল না বাবা।

মনে ছিল না! বেশ! বলিয়া কেদারবাবু নিকটস্থ চৌকিটার উপর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িলেন। মেয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে তাঁহার মনের মধ্যে একবার একটা খটকা বাজিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে মুখের চেহারাটা দেখিতে না পাইয়া সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না। বলিলেন, এ বুড়ো বয়সে যা নিজে না করব, যেদিকে না চাইব, তাতেই একটা-না-একটা গলদ থেকে যাবে—তাই হবে না। যাই বেয়ারাটাকে দিকে এখ্‌খুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিই গে। সুরেশের বাড়ির ঠিকানাটা কি? বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

আমি ত জানিনে বাবা!

তাও জান না! বল কি? বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারের উপর পুনরায় হেলান দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বসিয়া রুক্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, তোমরা নিজের হাত-পা যদি নিজেই কেটে ফেলতে চাও, ত কাটো গে মা, আমার ঠেকাবার দরকার নেই। ভাল, এটা ত একবার ভাবতে হয়, যে এককথায়

এতগুলো টাকা দিতে চায়, সে লোকটা কি দরের? তার বাড়ির ঠিকানাটাও কি জিজ্ঞাসা করে রাখতে নেই? তুমি যত বড় হচ্চ, ততই যেন কি-রকম হয়ে যাচ্ছ অচলা। বলিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ঋণ-জাল-বিজড়িত বিপন্ন পিতা তাঁহার যে-সকল অসত্য ও হীনতার মধ্য দিয়া সম্প্রতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন, সে-সমস্তই অচলা দেখিতে পাইত। এ-সকল তাহার মর্মভেদ করিত, কিন্তু নীরবে সহ্য করিত। এখনও সে কথা কহিয়া তাঁহার অকারণ বিরক্তির প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু সে যেন মনে মনে অতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে, কেদারবাবু ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিয়া প্রীত হইলেন।

বেয়ারা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিতে লাগিলেন, মহিমের সম্বন্ধে কোন খোঁজ কোনদিনই তুমি নিলে না। আচ্ছা, সে না হয় ভালই হয়েচে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু সুরেশের সম্বন্ধে ত এ-সব খাটতে পারে না। দেখলে না—ঈশ্বর স্বয়ং যেন হাত ধরে এঁকে দিয়ে গেলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশবাবুর কাছ থেকে কি তুমি টাকা ধার নেবে বাবা?

কেদারবাবু ভগবদ্ভক্তি হঠাৎ বাধা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হাঁ—না, ঠিক ধার নয়; কি জান মা, সুরেশ নাকি বড় ভাল ছেলে—একালে অমন একটি সৎ ছেলে লক্ষর মধ্যে একটি মেলে। তার মনের ইচ্ছে যে, বাড়িটা ধারের জন্য না নষ্ট হয়। থাকলে তোমাদেরই থাকবে—আমি আর কতদিন—বুঝলে না, মা?

অচলা চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, জান ত, আমি চিরকাল স্পষ্ট কথা ভালবাসি। মুখে এক, ভিতরে আর—আমার দ্বারা হবার নয়। কাজেই খুলে বলে দিলাম যে, এখন সমস্ত জেনেশুনে মহিমের হাতে

মেয়ে দেবার চেয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। সুরেশেরও যখন তাই মত, তখন বলতেই হল যে, তার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা অনেক দূর জানাজানি হয়ে গেছে, তখন সম্বন্ধ ভাঙলেই চলবে না—একটা গড়ে তুলতেও হবে; না হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যাই বল, ছেলে বটে এই সুরেশ! আমি মঙ্গলময়কে তাই বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

পিতার প্রণাম জানানো আর একবার নির্বিঘ্নে সমাধা হইবার পর অচলা ধীরে ধীরে কহিল, এঁর কাছ থেকে এত টাকা না নিলেই কি নয় বাবা?

কেদারবাবু শঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, না নিলেই যে নয় মা!

বেশ! কিন্তু আমরা ত শোধ দিতে পারব না।

শোধ দেবার কথা কি সুরেশ—কথাটা উদ্বিগ্ন-সংশয়ে বৃদ্ধ শেষ করিতেই পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত মুখ সাদা হইয়া গেল। অচলা সে চেহারা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল, তিনি বলছিলেন, পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবেন।

শোধ দেবার কথা—

না, তা তিনি বলেন নি।

লেখাপড়া-টড়া—

না, সে ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর একেবারে নেই।

ঠিক তাই! বলিয়া পরিতৃপ্তির রুদ্ধশ্বাস বৃদ্ধ ফোঁস করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া পা-দুটা সুমুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। আনন্দে এবং আরামে তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন ক্ষণকালের জন্য শিথিল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পা নামাইয়া উদ্দীপ্ত-স্বরে কহিলেন, একবার ভেবে দেখ দিকি মা, কোত্থেকে কি হল! এই সর্বশক্তিমানের হাত কি এতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না? অচলা নীরবে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্চি, এ শুধু তাঁর দয়া। তোমাকে বলব কি মা, এই দুটো বৎসর একটা রাত্রিও আমি ভাল করে ঘুমাতে পারিনি—শুধু তাঁকে ডেকেচি। আর সুরেশকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, সে যেন পূর্বজন্মে আমার সন্তান ছিল।

অচলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা সে জানিত বেশ, কিন্তু তাহা এতটা দূর পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই জানিত না। আজ দুই বৎসরের একাগ্র আরাধনায় তাঁহার দুঃখের সমস্যা যদি বা মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার নিজের সমস্যা একেবারে ভীষণ জটিল হইয়া দেখা দিল। সুরেশের কাছে টাকা লওয়া সম্বন্ধে সে এইমাত্র মনে মনে যে-সকল সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লেশমাত্র বাধা দিবার কথা সে আর মনে করিতে পারিল না। যাই হোক, টাকাটা তাহাদের গ্রহণ করিতেই হইবে।

সান্ধ্য-উপাসনার জন্য কেদারবাবু উঠিয়া গেলেন। অচলা সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য সেখানেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কাহাকে? কে সে? যে মহিম তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে, কে জানে কোন্ কর্তব্যের আকর্ষণে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে, তাহার শান্ত স্থির মুখখানা মনে করিতেই একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে অচলার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোনদিন যে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ, 'যাও' বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ জীবনে, কোন সূত্র, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না। অচলা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, সেই

অভাবনীয় চির-বিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য এক তিল বিচলিত হইবে না, কাহাকেও দোষ দিবে না, হয়ত কারণ পর্যন্তও জানিতে চাহিবে না—নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয়ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু সে ছাড়া আর কাহারো তাহা চোখেও পড়িবে না।

তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তার কানে উঠিবে। সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে হয়ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়াই নিজের কাজে মন দিবে। ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া এই নির্জন ঘরের মধ্যেও তাহার চোখ-মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দিন দশ-বারো কাটিয়া গিয়াছে। কেদারবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, এত স্ফূর্তি বুঝি তাঁহার যুবা বয়সেও ছিল না, আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিবার পথে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সুরেশ, আমি এইটুকু হেঁটে সমাজে যাব বাবা, তোমরা বাড়ি যাও; বলিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

সুরেশ কহিল, তোমার বাবার শরীরটা আজকাল বেশ ভাল বলে মনে হয়।

অচলা সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, হাঁ, সে আপনার দয়ায়।

গাড়ি মোড় ফিরিতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। সুরেশ অচলার ডান-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, তুমি জানো এ কথায় আমি কত ব্যথা পাই! সেই জন্যেই কি তুমি বার বার বল অচলা?

অচলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, এত বড় দয়া পাছে ভুলে যাই বলেই যখন তখন স্মরণ করি। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্য বলিনে।

সুরেশ তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, সেই জন্যই ব্যথা আমার বেশী বাজে।

কেন?

আমি বেশ বুঝতে পারি, শুধু এই দয়াটা স্মরণ করেই তুমি মনের মধ্যে জোর পাও। এ-ছাড়া তোমার আর এতটুকু সম্বল নেই, সত্যি কি না বল দিকি?

যদি না বলি?

ইচ্ছে না হয় বলো না। কিন্তু আমাকে ‘তুমি’ বলতেও কি কোনদিন পারবে না?

অচলার মুখ মলিন হইয়া গেল। আনত-মুখে ধীরে ধীরে বলিল, একদিন বলতেই হবে, সে ত আপনি জানেন।

তাহার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুরেশ নিশ্বাস ফেলিল। কহিল, তাই যদি হয়, দুদিন আগে বলতেই বা দোষ কি?

অচলা জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনিট-খানেক নিঃশব্দে থাকিয়া সুরেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমার মনে হয়, মহিম সমস্তই জানতে পেরেছে।

অচলা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। তাহার একটা হাত এতক্ষণ পর্যন্ত সুরেশের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সেটা টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করে জানলেন?

তাহার ব্যগ্র কণ্ঠ সুরেশের কানে খট্ করিয়া বাজিল। কহিল, নইলে এতদিনে সে আসত। পনর-ষোল দিন কেটে গেল ত!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। আচ্ছা, বাবা কি তাঁকে কোন চিঠিপত্র লিখেছেন, আপনি জানেন?

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, না, জানিনে।

তিনি বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন কি না, জানেন?

না। তাও জানিনে।

অচলা গাড়ির বাহিরে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাহলে খোঁজ নিয়ে একখানা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোনদিন আবার না এসে উপস্থিত হন।

আবার কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ আর একবার তাহার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয়, আমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা পর্যন্ত

করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে, শুধু টাকার জোরেই তোমাকে ছিঁড়ে এনেচি। আমার দোষ।

অচলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, এমন কথা আপনি বলবেন না—আপনার কোন দোষ দিতে পারিনে। একটু থামিয়া বলিল, টাকার জোর সংসারে সর্বত্রই আছে, এ ত জানা কথা; কিন্তু সে জোরে আপনি ত জোর খাটান নি। বাবা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত জেনেশুনে যদি আপনাকে অশ্রদ্ধা করি, ত আমার নরকেও স্থান হবে না।

চিরদিন সামান্য একটু করুণ কথাতেই সুরেশ বিগলিত হইয়া যায়। অচলার এইটুকু প্রিয়বাক্যেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে জল, সে অচলার হাত দুখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতেই মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মনে করো না, এ অপরাধ, এ অন্যায়ের পরিমাণ আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু আমি বড় দুর্বল বড় দুর্বল! এ আঘাত মহিম সইতে পারবে—কিন্তু আমার বুক ফেটে যাবে। বলিয়া একটা কঠিন ধাক্কা যেন সামলাইয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যে আমার নও, আর একজনের, এ কথা আমি ভাবতেই পারিনে। তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত যেন টলতে থাকে।

সেইমাত্র পথের ধারে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। গাড়ি তাহাদের গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপর পড়িয়া তাহার দুই চক্ষের টলটলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল। মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।

সুরেশ অচলার সেই হাতটি নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার অচলা, এর বেশি আর চাইনে। কিন্তু, এটুকু থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

গাড়ি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া উভয়েই একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, সুরেশ, তুমি যে এখানে?

সুরেশের গলা দিয়া প্রথমে কথা ফুটিল না। তার পরে সে একটা ঢোক গিলিয়া পাংশুমুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বাঃ—মহিম যে! আর দেখা নেই। ব্যাপার কি হে? কবে এলে? চল চল, ওপরে চল। বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া হাসির ভঙ্গীতে কহিল, আচ্ছা মজা করলেন কিন্তু আপনার বাবা। তিনি গেলেন সমাজে, আর পৌঁছে দেবার ভার পড়ল এই গরীবের ওপরে। তা একরকম ভালই হয়েচে—নইলে মহিমের সঙ্গে হয়ত দেখাই হত না। বাড়িতে এতদিন ধরে করছিলে কি বল ত শুনি?

মহিম কহিল, কাজ ছিল। বিস্ময়ের প্রভাবে তাহার অচলাকে একটা নমস্কার করিবার কথাও মনে হইল না।

সুরেশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, আচ্ছা লোক যা হোক আমরা ভেবে মরি, একটা চিঠি পর্যন্ত দিতে নেই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওপরে চল। বলিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই উপরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কিন্তু বসিবার ঘরে আসিয়া যখন সকলে উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একেবারে থামিয়া গেল। গ্যাসের তীব্র আলোকে মুখখানা তাহার কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন কেহই কথা কহিল না।

মহিম একবার বন্ধুর প্রতি একবার অচলার প্রতি শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সব ভাল?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না।

মহিম কহিল, আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছি—কিন্তু সুরেশের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হল কি করে?

অচলা মুখ তুলিয়া ঠিক যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ করে দিয়েছেন। তাহার মুখ দেখিয়া মহিমের নিজের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তার পরে?

তার পরে তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, বলিয়া অচলা ত্বরিতপদে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া কহিল, ব্যাপার কি সুরেশ?

সুরেশ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, তোমার মত আমার টাকাটাই প্রাণ নয়। ভদ্রলোক বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে আমি দিই—বাস্, এই পর্যন্ত। তিনি শোধ দিতে না পারেন ত আশা করি, সে দোষ আমার নয়। তবু যদি আমাকেই দোষী মনে কর ত এক শ-বার করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।

বন্ধুর এই অসংলগ্ন কৈফিয়ত এবং তাহা প্রকাশ করিবার অপরূপ ভঙ্গী দেখিয়া মহিম যথার্থই মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, হঠাৎ তোমাকেই বা দোষী ভাবতে যাব কেন, তার কোন তাৎপর্যই ত ভেবে পেলুম না সুরেশ। দয়া করে আর একটু খুলে না বললে বুঝতে পারব না।

সুরেশ তেমনি রুক্ষস্বরে কহিল, খুলে আবার বলব কি। বলবার আছেই বা কি।

মহিম কহিল, তা আছে। আমি সেদিন যখন বাড়ি যাই, তখন এদের তুমি চিনতে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলই বা কি করে, আর একটা ব্রাহ্ম-পরিবারের বিপদে চার হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে, আপাততঃ এইটুকু বুঝিয়ে দিলেই আমি কৃতার্থ হব সুরেশ

সুরেশ বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু আমার গল্প করবার এখন সময় নেই—এখুনি উঠতে হবে। তা ছাড়া, কেদারবাবুকেই জিজ্ঞাসা করো না, তিনি সমস্ত বলবার জন্যেই ত অপেক্ষা করে আছেন।

তাই ভাল, বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, শোনবার ভারী কৌতূহল ছিল, কিন্তু তবু এখন তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকবার সময় নেই। আমি চললুম—

সুরেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

মহিম বাহিরে আসিতে দেখিতে পাইল, সুমুখের রেলিং ধরিয়া, এই দিকে চাহিয়াই অন্ধকারে অচলা দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে কাছে আসিবার বা কথা কহিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না দেখিয়া সে-ও নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরী ঔষধ কিনিতে মহিম কলিকাতায় আসিয়াছিল, সুতরাং রাত্রের গাড়িতেই বাড়ি ফিরিয়া গেল। সুরেশ সন্ধান লইয়া জানিল, মহিম তাহার বাসায় আসে নাই, দিন-চারেক পরে বিকালবেলায় কেদারবাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া এই আলোচনাই বোধ করি চলিতেছিল। কেদারবাবু বায়স্কোপে নূতন মাতিয়াছিলেন; কথা ছিল, চা-খাওয়ার পরেই তাঁহারা আজও বাহির হইয়া পড়িবেন। সুরেশের গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল—এমনি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল এবং সকলের মুখের ভাবেই একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

কেদারবাবু বিরস-মুখে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এস মহিম। সব খবর ভাল?

মহিম নমস্কার করিয়া ভিতরে আসিয়া বসিল। বাড়িতে এতদিন বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শুধু জানাইল যে, বিশেষ কাজ ছিল।

সুরেশ টেবিলের উপর হইতে সেদিনের খবরের কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল এবং অচলা পাশের চৌকি হইতে তাহার সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল। সুতরাং কথাবার্তা একা কেদারবাবু সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময়ে অচলা বাহিরে উঠিয়া গিয়া মিনিট-খানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল এবং ক্ষণেক পরেই মাথার উপরে টানা-পাখাটা নড়িয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস পাইয়া কেদারবাবু খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তবু ভাল। পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হল।

সুরেশ তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মহিমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। কেন অচলা উঠিয়া গিয়াছিল, কেন পাখাওয়ালার অকারণে দয়া প্রকাশ পাইল, সমস্ত ইতিহাসটা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে খেলিয়া গিয়া, যে বাতাসে কেদারবাবু খুশি হইলেন, সেই বাতাসেই তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, পাঁচটা বেজে গেছে—আর দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু।

কেদারবাবু আলাপ বন্ধ করিয়া চায়ের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেই বেয়ারা সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া অচলা পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া সুরেশ ও পিতার সম্মুখে আগাইয়া দিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাবে না মা?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবা, বড় গরম।

হঠাৎ তাঁহার মহিমের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি, মহিমকে দিলে না যে! তুমি কি চা খাবে না মহিম?

সে জবাব দিবার পূর্বেই অচলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এত গরমে তোমার খেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এবেলা ত তোমার চা সহ্য হয় না।

মহিমের বুকের উপর হইতে কে যেন অসহ্য গুরুভার পাষাণের বোঝা মায়ামন্ত্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে কথা কহিতে পারিল না, শুধু অব্যক্ত বিস্ময়ে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অচলা কহিল, একটুখানি সবুর কর, আমি লাইম-জুস দিয়ে শরবত তৈরি করে আনচি। বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বিন্দু তখন তাহার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চা-পান শেষ করিয়া কেদারবাবু তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়া দেখিলেন, অচলা নিজের জায়গায় বসিয়া একমনে সেলাই করিতেছে। ব্যস্ত এবং আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, এখনো বসে কাপড় সেলাই করচ, তৈরি হয়ে নাওনি যে?

অচলা মুখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি যাব না বাবা।

যাবে না! সে কি কথা?

না বাবা, আজ তোমরা যাও—আমার ভাল লাগচে না। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

সুরেশ অভিমান ও গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, চলুন কেদারবাবু, আজ আমরাই যাই। ওঁর হয়ত শরীর ভাল নেই, কাজ কি পীড়াপীড়ি করে?

কেদারবাবু তাহার প্রতি চাহিয়াই তাহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইলেন। মেয়েকে কহিলেন, তোমার কি কোনোরকম অসুখ করেচে?

অচলা কহিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন, আমি ভাল আছি।

সুরেশ মহিমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল না, বলিল, আমরা যাই চলুন কেদারবাবু! ওঁর বাড়িতে কোনোরকম আবশ্যক থাকতে পারে—জোর করে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কেদারবাবু কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িতে তোমার কাজ আছে?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেদারবাবু অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলচি চল। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে!

অচলার হাতের সেলাই স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত-মুখে দুই চক্ষু ডাগর করিয়া প্রথমে সুরেশের, পরে তাহার পিতার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ মুখ কালি করিয়া কহিল, আপনার সব-তাতেই জবরদস্তি। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারিনে—অনুমতি করেন ত যাই।

কেদারবাবু নিজের অভদ্র আচরণে মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলেন—সুরেশের কথায় রাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগটা পড়িল মহিমের উপর। সে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি-উঠি করিতেছিল। কেদারবাবু বলিলেন, তোমার কি কোন আবশ্যক আছে মহিম?

মহিম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না।

কেদারবাবু চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, তা হলে আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—

মহিম কহিল, যে আজ্ঞে, আসব। কিন্তু আসার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

কেদারবাবু সুরেশকে শুনাইয়া কহিলেন, আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি দরকার মনে কর, এসো—দু-একটা বিষয় আলোচনা করা যাবে।

তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নীচে আসিয়া মহিমকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সুরেশ কেদারবাবুকে লইয়া তাহার গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহিম খানিকটা পথ আসিয়াই পিছনে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, কেদারবাবুর বেহারা। সে বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া একটুকরা কাগজ হাতে দিল। তাহাতে পেনসিল দিয়া শুধু লেখা ছিল, অচলা। বেহারা কহিল, একবার ফিরে যেতে বললেন।

ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই বলিল, তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছো কি বলে? বলিয়াই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেলিংটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর নত-মস্তকে ধীরে ধীরে মহিম যখন তাহার বাসার দিকে পথ চলিতেছিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণটা যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল। কি করিয়া সুরেশ এখানে আসিল, কেমন করিয়া এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিল—এই-সব ছোটখাটো ইতিহাস এখনো সে জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা আর তাহার অবিদিত ছিল না। কেদারবাবুকে সে চিনিত। যেখানে টাকার গন্ধ একবার তিনি পাইয়াছেন, সেখান হইতে সহজে কোনমতেই যে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন না, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। সুরেশকেও সে ছেলেবেলা হইতে নানারূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। দৈবাৎ যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য সে কি যে দিতে না পারে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। টাকা ত কিছুই নয়—এ ত চিরদিনই তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। একদিন তাহারই জন্য যে মুঙ্গেরের গঙ্গায় নিজের প্রাণটার দিকেও চাহে নাই, আজ যদি সে আর-একজনের ভালবাসার প্রবলতর মোহে সেই মহিমের প্রতি দৃক্‌পাত না করে ত তাহাকে দোষ দিবে সে কি করিয়া? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করা ব্যতীত কাহারও উপর সে বিশেষ কোন দোষারোপ করিল না। কিন্তু এই যে এতগুলা বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না; তাই তাহার শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আংটিটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না। অথচ, শেষ-নিষ্পত্তি হওয়াও একান্ত

প্রয়োজন। এমন করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া আর একটা মুহূর্তও কাটানো চলে না। যা হবার তা হোক, চরম একটা মীমাংসা করিয়া সে লইবেই। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই আজ সে তাহার দীন-দরিদ্র ছাত্রাবাসে গিয়া রাত্রি আটটার পর হাজির হইল।

পরদিন অপরাহ্নকালে কেদারবাবুর বাটীতে গিয়া খবর পাইল, তাঁহারা এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। তাহার পরদিন গিয়াও দেখা হইল না। বেহারা জানাইল, সকলে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সকলে যে কে তাহা প্রশ্ন না করিয়াও মহিম অনুমান করিতে পারিল। অপমান এবং অভিমান যত বড়ই হোক, উপর্যুপরি দুই দিন ফিরিয়া আসাই তাহার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু হাতের আংটিটা তাহাকে তাহার বাসায় টিকিতে দিল না, পরদিন পুনরায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। আজ শুনিতে পাইল, বাবু বাড়ি আছেন—উপরের ঘরে বসিয়া চা-পান করিতেছেন।

মহিমকে দ্বারের কাছে দেখিয়া কেদারবাবু মুখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে শুধু বলিলেন, এসো মহিম। মহিম হাত তুলিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিল।

দূরে খোলা জানালার ধারে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসিয়া অচলা এবং সুরেশ। অচলার কোলের উপর একটা ভারী ছবির বই। দুজনে মিলিয়া ছবি দেখিতেছিল। সুরেশ পলকের জন্য চোখ তুলিয়াই, পুনরায় ছবি দেখায় মনঃসংযোগ করিল; কিন্তু অচলা চাহিয়াও দেখিল না। তাহার অবনত মুখখানি দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে যেরূপ একান্ত আগ্রহভরে তাহার বইয়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, তাহাতে এমন মনে করা একেবারে অসঙ্গত হইত না, যে পিতার কণ্ঠস্বর, আগন্তুকের পদশব্দ—কিছুই তাহার কানে যায় নাই।

মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

কেদারবাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না—একটু একটু করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। বাটিটা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল এবং আর চুপ করিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সেটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, তা হলে এখন কি করচ? তোমাদের আইনের খবর বার হতে এখনো ত মাস-খানেক দেরি আছে বলে মনে হচ্চে।

মহিম শুধু কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কেদারবাবু বলিলেন, না হয় পাসই হলে—তা পাস তুমি হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস করে হাতে কিছু টাকা না জমিয়ে ত আর কোনদিকে মন দিতে পারবে না। কি বল সুরেশ, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ত শুনতে পাই তেমন ভাল নয়।

সুরেশ কথা কহিল না। মহিম একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, প্র্যাক্‌টিস করলেই যে হাতে টাকা জমবে, তারও ত কোন নিশ্চয়তা নাই।

কেদারবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নেই—ঈশ্বরের হাত, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'পুরুষসিংহ'; তোমাকে সেই পুরুষসিংহ হতে হবে। আর কোনদিকে নজর থাকবে না—শুধু উন্নতি আর উন্নতি। তার পরে সংসারধর্ম কর—যা ইচ্ছা কর, কোন দোষ নেই—তা নইলে যে মহাপাপ! বলিয়া সুরেশের পানে একবার চাহিয়া কহিলেন, কি বল সুরেশ—তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারব না—এমনি করেই ত হিন্দুরা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও যদি সৎদৃষ্টান্ত না দেখাই, তা হলে সভ্যজগতের কোনমতে কারো কাছে মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারব না, ঠিক কি না? কি বল সুরেশ?

সুরেশ পূর্ববৎ মৌন হইয়া রহিল। মহিম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখব। কিন্তু আপনি কি এই আলোচনা করবার জন্যই আমাকে আসতে বলেছিলেন?

কেদারবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, না, শুধু এই নয়, আরও কথা আছে, কিন্তু—, বলিয়া তিনি সোফার দিকে চাহিলেন।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা তা হলে ও-ঘরে গিয়ে একটু বসি, বলিয়া হেঁট হইয়া অচলার ক্রোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল। তাহার এই ইঙ্গিতটুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না। কেদারবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দুজনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে বসো গে মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অচলা মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া শুধু কহিল, আমি থাকি বাবা।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি না হয় যাচ্ছি, বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাবু যে খুশি হইলেন না, তাহা তিনি মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু জিদও করিলেন না। খানিকক্ষণ রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহিম, তুমি মনে করো না, আমি তোমার উপর বিরক্ত; বরঞ্চ তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই আছে। তাই বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্ছি যে, এখন কোনপ্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকর্মণ্য করে তুলো না। নিজের উন্নতি কর, কৃতী হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।

মহিম মুখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল। সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল। তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য; কিন্তু আপনার কন্যারও কি তাই ইচ্ছা?

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, অন্ততঃ এটা ত নিশ্চয় যে, সমস্ত জেনে-শুনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসর্জন দিতে পারব না।

মহিম শান্তস্বরে কহিল, ইংরেজদের একটা প্রথা আছে, এ-রকম অবস্থায় তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আপনার সেই অভিপ্রায়ই কি বুঝব?

কেদারবাবু হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, দেখ মহিম, আমি তোমার কাছে হলফ নেবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। তুমি যে-রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচ, তাতে আর কোন বাপ হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় লোক, কোনরকমের গোলমাল হাঙ্গামা ভালবাসি নে বলেই যতটা সম্ভব মিষ্টি কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। তাতে তুমি অপেক্ষা করে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবেরা কি করে, এত কৈফিয়তে ত আমাদের প্রয়োজন দেখিনে। তা ছাড়া, আমরা ইংরেজ নই, বাঙালী। মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম আসে না, মুখে অন্ন-জল রোচে না, এ-কথা তুমি নিজেই কোন্ না জান?

মহিমের চোখ-মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, আমি কি ব্যবহার করেচি, যার জন্যে অন্যত্র এত বড় কাণ্ড হতে পারত—এ প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাইনে। শুধু আপনার কন্যার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, তাঁরও এই অভিপ্রায় কি না। বলিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, কেমন, এই ত?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না।

একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্প মহিম সবলে নিরোধ করিয়া পুনরায় কহিল, তোমার মনের কথা নিভৃতে জানবার, জিজ্ঞেস করে জানবার অবকাশ আমি পেলুম না—সেজন্যে আমি মাপ চাচ্চি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝোঁকের উপর যে

কাজ করে ফেলেছিলে, তার জন্যেও তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। শুধু একবার বল, সেই আংটিটা ফিরে চাও কি না।

সুরেশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আমাকে মাপ করতে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা করবার জো নেই।

উপস্থিত সকলেই মৌন-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সুরেশ অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত-দুটো বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না—না, এ ভুলের মার্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কিনা সমস্ত ভুলে গিয়ে, এখানে বসে বৃথা সময় নষ্ট করচি!

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ, প্লেগ? যাবে নাকি সেখানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়! অনেক পূর্বেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

কেদারবাবু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কিন্তু প্লেগ যে! তিনি কি তোমার এমন বিশেষ কোন আত্মীয়—

সুরেশ কহিল, আত্মীয়! আত্মীয়ের অনেক বড়, কেদারবাবু! মহিমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রথম কথা কহিল, বলিল, মহিম, আমাদের নিশীথের কাল রাত্রি থেকে প্লেগ হয়েচে, বাঁচে যে এ আশা নেই। আমার তোমাকেও একবার বলে উচিত—যাবে দেখতে?

মহিম নিশীথ লোকটিকে চিনিতে পারিল না। কহিল, কোন্ নিশীথ?

কোন্ নিশীথ! বল কি মহিম! এরই মধ্যে আমাদের নিশীথকে ভুলে গেলে? যার সঙ্গে সমস্ত সেকেন্ড-ইয়ারটা পড়লে, তাকে তার এতবড় বিপদের দিনে আর মনে পড়ছে না? বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া লইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, তা মনে পড়বে না বটে! প্লেগ কিনা!

এই খোঁচাটুকু মহিম নীরবে সহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ভবানীপুর থেকে আসতেন?

সুরেশ ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল, হাঁ, তাই। কিন্তু নিশীথ ত আমাদের দু-চারজন ছিল না মহিম, যে, এতক্ষণ তোমার মনে পড়েনি! বলি যাবে কি?

মহিম চিনিতে পারিয়া কহিল, নিশীথ কোথায় থাকে এখন?

সুরেশ কহিল, আর কোথায়? নিজের বাড়িতে, ভবানীপুরে। এ সময় তাকে একবার দেখা দেওয়া কি কর্তব্য বলে মনে হয় না? আমি ডাক্তার, আমাকে ত যেতেই হবে; আর অত বড় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে না থাক ত তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। কেদারবাবু, আপনাদের কথা বোধ করি শেষ হয়ে গেছে? আশা করি, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও ওকে একবার ছুটি দিতে পারবেন?

এ বিদ্রুপটা যে আবার কাহার উপর হইল, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে একবার মহিমের, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বড়লোক ভাবী জামাতাটির মান-অভিমান যে কিসে এবং কতটুকুতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আজও বৃদ্ধ তাহার কূলকিনারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, মহিমও হতবুদ্ধির মত নীরবে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া হাতের বইখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, তুমি ডাক্তার, তোমার ত যাওয়াই উচিত; কিন্তু ওঁর ওকালতির কেতাবের মধ্যে ত প্লেগের চিকিৎসা লেখা নেই? উনি যাবেন কি জন্যে শুনি?

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাবে সুরেশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, আমি সেখানে ডাক্তারি করতে যাচ্ছিনে, তার ডাক্তারের অভাব নেই। আমি যাচ্ছি বন্ধুর সেবা করতে। বন্ধুত্বটা আমার প্রাণটার চেয়েও বড় বলে মনে করি।

একটা নিষ্ঠুর হাসির আভাস অচলার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল; কহিল, সকলেই যে তোমার মত মহৎ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। অতবড় বন্ধুত্বজ্ঞান যদি ওঁর না থাকে ত আমি লজ্জার মনে করিনে। সে যাই হোক, ও জায়গায় ওঁর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সুরেশের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল।

কেদারবাবু সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিতে লাগিলেন, ও-সব তুই কি বলচিস অচলা? সুরেশের মত—সত্যই ত—নিশীথবাবুর মত—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, নিশীথবাবুকে ত প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তা ছাড়া উনি ডাক্তার—উনি যেতে পারেন। কিন্তু আর-একজনকে বিপদের মধ্যে অনর্থক টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?

আহত হইলে সুরেশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, যা মুখে আসিল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি ভীরু নই—প্রাণের ভয় করিনে। মহিমকে দেখাইয়া বলিল, ঐ নেমকহারামটাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি ওকে মরতে মরতে বাঁচিয়েছিলুম কি না।

অচলা দৃপ্তস্বরে কহিল, নেমকহারাম উনি । তাই বটে! কিন্তু যাকে এক সময়ে বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছে করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?

কেদারবাবু হতবুদ্ধির মত বলিতে লাগিলেন, থাম না অচলা; থাম না সুরেশ। এ-সব কি কাণ্ড বল দেখি!

সুরেশ রক্ত-চক্ষে কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি প্লেগের মধ্যে যেতে পারি—তাতে দোষ নেই! মহিমের প্রাণটাই প্রাণ, আর আমারটা কিছু নয়! দেখলেন ত আপনি!

লজ্জায় ক্ষোভে অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, ওঁর প্রাণ উনি দিতে পারেন, আমি নিষেধ করতে পারিনে; কিন্তু যেখানে বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই। আমি কোনমতেই অমন

জায়গায় ওঁকে যেতে দিতে পারব না। বলিয়া সে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই কেদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় যাস অচলা!

অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বাবা, দিন-রাত্রি এত পীড়ন আর সহ্য করতে পারিনে। যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাকতে স্বীকার করবার আমার একেবারে জো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশ বিঁধছ। বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ কেদারবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বার বার বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষ—কি সব কাণ্ড বল ত!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক গত হইয়াছে। কেদারবাবু রাজি হইয়াছেন—মহিমের সহিত অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। সেদিন যে কাণ্ড করিয়া সুরেশ গিয়াছিল, তাহা সত্যই কেদারবাবুর বুকে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু সেই অপমানের গুরুত্ব ওজন করিয়াই যে তিনি মহিমের প্রতি অবশেষে প্রসন্ন হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা নয়। সুরেশ নিজেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে—এতদিনের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সেই রাত্রেই সে নাকি পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কবে ফিরিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেদিন কান্না চাপিতে অচলা ঘর ছাড়িয়া যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনজনেই মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কথা কহিল প্রথমে সুরেশ নিজে। কেদারবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আপনার কন্যাকে গোটা-কয়েক কথা বলতে চাই।

কেদারবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! তুমি কথা বলবে, তার আবার আপত্তি কি সুরেশ? যত সব ছেলেমানুষের—

তা হলে একবার ডেকে পাঠান—আমার বেশি সময় নেই।

তাহার মুখের ও কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া কেদারবাবু মনে মনে শঙ্কা অনুভব করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া, আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষের কাণ্ড! কিন্তু একটুখানি সামলাতে না দিলে—বুঝলে না সুরেশ, ও-সব প্লেগ-ফ্লেগের জায়গার

নাম করলেই—মেয়েমানুষের মন কিনা! একবার শুনলেই ভয়ে অজ্ঞান—বুঝলে না বাবা—

কোনপ্রকার কৈফিয়তের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুরেশের মনের অবস্থা নয়—সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক কেদারবাবু, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

তা ত বটেই। তা ত বটেই। কে আছিস রে ওখানে? বলিয়া ডাক দিয়া কেদারবাবু মহিমের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিলেন। মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা নমস্কার করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু নিজে গিয়া অচলাকে যখন ডাকিয়া আনিলেন, তখন অপরাহ্ন-সূর্যের রক্তিম-রশ্মি পশ্চিমের জানালা-দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে উদ্ভাসিত এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহের পানে চাহিয়া, পলকের জন্য সুরেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ খেলিয়া গেল, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না। তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে ভাব তাহার চক্ষের নিমেষে নির্বাপিত হইল। কিন্তু, তবুও সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না, নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অচলার মুখের উপর আকাশের আলো পড়ে নাই বটে, কিন্তু সুমুখের দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত আরক্ত আভায় সমস্ত মুখখানা সুরেশের চোখে কঠিন ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির মত বোধ হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি যেন একটা নিবিড় বিতৃষ্ণায় এই নারীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত কোমলতা নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়া মুখের প্রত্যেক রেখাটিকে পর্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তায় একেবারে ধাতুর মত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সহসা কেদারবাবুর প্রবল নিশ্বাসের চোটে সুরেশের চমক ভাঙ্গিতেই সোজা হইয়া বসিল।

কেদারবাবু আর একবার তাঁহার পুরাতন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যত সব পাগলামি কাণ্ড—কাকে যে কি বলি, আমি ভেবে পাইনে—

সুরেশ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া নিরতিশয় গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি যা বলে গেলেন, তাই ঠিক?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

এর আর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

রক্তের উচ্ছ্বাস এক ঝলক আগুনের মত সুরেশের চোখ-মুখ প্রদীপ্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিল, আমার প্রাণটার পর্যন্ত যখন কোন দাম নেই, তখনি আমি জানতুম। তাহার বুকের ভিতরটা তখন পুড়িয়া যাইতেছিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে পড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে?

অসহ্য বিস্ময়ে অচলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

সুরেশ কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, বাপ-মেয়েতে ষড়যন্ত্র করে শিকার ধরার ব্যবসা বিলাতে নতুন নয় শুনতে পাই; কিন্তু এ-ও বলচি আপনাকে, কেদারবাবু, একদিন আপনাদের জেলে যেতে হবে।

কেদারবাবু চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এ-সব তুমি কি বলচ সুরেশ!

সুরেশ অবিচলিত-স্বরে জবাব দিল, চুপ করুন কেদারবাবু; থিয়েটারের অভিনয় অনেকদিন ধরে চলচে। পুরানো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুলব না। টাকা আমার যা গেছে, তা যাক—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না; কিন্তু এই যেন শেষ হয়।

অচলা কাঁদিয়া উঠিল—তুমি কেন এঁর টাকা নিলে বাবা?

কেদারবাবু পাগলের মত একখণ্ড সাদা কাগজের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে হাত বাড়াইয়া, শেষে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ সবেগে টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, আমি এখ্খুনি হ্যান্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

সুরেশ বলিল, থাক—থাক, লেখালিখিতে আর কাজ নেই। আপনি ফিরিয়ে যা দেবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমিও ঐ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করে আপনার সঙ্গে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

জবাব দিবার জন্য কেদারবাবু দুই ঠোঁট ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

সুরেশ অচলার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। তাহার একান্ত পাংশু মুখ ও সজল চক্ষের পানে চাহিয়া তাহার একবিন্দু দয়া হইল না, বরঞ্চ ভিতরের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল, কি তোমার গর্ব করবার আছে অচলা, ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ! তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও করো না।

পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখে ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ব্রাহ্মদের আমি দু' চক্ষে দেখতে পারিনে। যাদের ছায়া মাড়াতেও আমার ঘৃণা বোধ হত, তাদের বাড়িতে ঢোকবামাত্রই যখন আমার আজন্মের সংস্কার—চিরদিনের বিদ্বেষ একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল, তখনি আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—এ যাদুবিদ্যা! আমার যা হয়েছে, তা হোক, কিন্তু যাবার সময় আপনাদের আমি সহস্রকোটি ধন্যবাদ না দিয়ে যেতে পারছি নে। ধন্যবাদ অচলা!

অচলা মুখ না তুলিয়াই অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবা, ওঁকে তুমি চুপ করতে বল। আমরা গাছতলায় থাকি, সে-ও ঢের ভালো, কিন্তু ওঁর যা নিয়েছ, তুমি ফিরিয়ে দাও—

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গাছতলায়? একদিন তাও তোমাদের জুটবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেদিন আমাকে স্মরণ করো, বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, উঃ, কি ভয়ানক লোক! এমন জানলে আমি কি ওকে বাড়ি ঢুকতে দিতুম!

পিতার কথা অচলার কানে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না, উপুড় হইয়া পড়িয়া যেমন করিয়া কাঁদিতেছিল, তেমনি একভাবে পড়িয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল। অদূরে চৌকির উপর বসিয়া কেদারবাবু সমস্ত দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথা উচ্চারণ করিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। বেহারা আসিয়া গ্যাস জ্বালাইবার উপক্রম করিতেই অচলা নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু, মহিম ইহার কিছুই জানিল না। শুধু যেদিন কেদারবাবু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্মতি দিলেন, সেই দিনটায় সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনেকপ্রকারের অনেক কথা, অনেক সংশয় তাহার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু তাহার এই সৌভাগ্যের সুরেশ নিজেই যে মূল কারণ, ইহা তাহার সুদূর কল্পনায়ও উদয় হইল না। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু চিরদিনই সে নিঃশব্দ-প্রকৃতির লোক; আবেগ উচ্ছ্বাস কোনদিন প্রকাশ করিতে পারিত না, পারিলেও হয়ত তাহার মুখে নিতান্তই তাহা একটা অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন আচরণ বলিয়া লোকের চোখে ঠেকিত। বরঞ্চ, আজ সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী কেদারবাবুর সহিত দুই-চারিটা কথাবার্তার পর বাসায় ফিরিয়া গেল, তখন অন্যান্য দিনের মত অচলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একটা ছোট্ট নমস্কার পর্যন্ত করিয়া যাইতে পারিল না। কথাটা কেদারবাবু নিজেই পাড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে শুরু করিয়া সম্মতি দেওয়া—মায় দিন-স্থির পর্যন্ত, একাই সব করিলেন। কিন্তু সমস্তটাই যেন অনন্যোপায় হইয়াই করিলেন; মুখে তাঁহার স্ফূর্তি

বা উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তথাপি দিন কাটিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিন আসিল।

পরশু বিবাহ। কিন্তু মেয়ের বিবাহে তিনি কোনরূপ ধূমধাম হৈচৈ করিবেন না—স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, আগামী শুভকর্মের আয়োজন যতটা নিঃশব্দে হইতে পারে, তাহার ত্রুটি করেন নাই।

আজও বিকাল-বেলা তিনি যথাসময়ে চা খাইতে বসিয়াছিলেন। একটা সেলাই লইয়া অচলা অনতিদূরে কৌচের উপর বসিয়া ছিল। অনেকদিন অনেক দুঃখের মধ্যে দিন-যাপন করিয়া আজ কয়েকদিন হইতে তাহার মনের উপর যে শান্তিটুকু স্থিতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহার পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল। চা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে কেদারবাবু ইহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। কলহ করিয়া সুরেশ চলিয়া যাওয়া পর্যন্ত, এতদিন তিনি মন-মরা ভাবেই দিন-যাপন করিতেছিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, না করিবে—এই এক দুশ্চিন্তা; তা ছাড়া, তাঁহার নিজের কর্তব্যই বা এ সম্বন্ধে কি—হ্যান্ডনোট লিখিয়া দেওয়া বা টাকাটা পরিশোধ করিতে আর কোথাও ঋণের চেষ্টা করা, কিংবা মহিমের উপর দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া—কি যে করা যায়, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূল-কিনারাই দেখিতেছিলেন না। অথচ একটা কিছু করা নিতান্তই আবশ্যক—সুরেশের নিরুদ্দেশ অবস্থার উপর বরাত দিয়া যে চিরদিন চলিবে না, অথবা মেয়ের মত নিজের খেয়ালে মগ্ন হইয়া, চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে না, তাহাও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন। হতাশ প্রেমিক একদিন যে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এবং সেদিন ফিরিয়া আসিয়া কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া মস্ত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিবে এবং যে টাকাটা চেকের দ্বারা তাঁহাকে দিয়াছে—তাহা আর কোন লেখাপড়া না থাকা সত্ত্বেও যে আদালতে উড়াইতে পারা যাইবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া এ বিষয়ে একপ্রকার তিনি নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু, মেয়ের সহিত এ-বিষয়ে

একটা পরামর্শ করিবার পর্যন্ত জো ছিল না। সুরেশের নামোল্লেখ করিতেও তাঁহার ভয় করিত। এখন অচলার ওই শান্ত স্থির মুখচ্ছবির প্রতি চাহিয়া তাঁহার ভারী একটা চিত্তজ্বালার সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটাই তাঁহার সকল দুঃখের মূল। অথচ, কি সুবিধাই না হইয়াছিল, এবং অদূর-ভবিষ্যতে আরও কি হইতে পারিত!

যে নিষ্ঠুর কন্যা বৃদ্ধ পিতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না, সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল, সেই স্বার্থপর সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অভিশাপের মত যখন-তখন প্রায় এই কামনাই করিত—সে যেন ইহার ফলভোগ করে, একদিন যেন তাহাকে কাঁদিয়া বলিতে হয়, "বাবা, তোমার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি আমি পাইতেছি।" পাত্র হিসাবে সুরেশ যে মহিমের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। মনে মনে তাহার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না। এত কাণ্ডের পরেও যদি আজ আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ থাকিত, উপস্থিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ করি লেশমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু কোন উপায় নাই—কোন উপায় নাই! অচলার কাছে তাহার আভাসমাত্র উত্থাপন করাও অসাধ্য।

সেলাই করিতে করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবা, সুরেশবাবুর ব্যাপারটা পড়্‌লে?

অচলার মুখে সুরেশের নাম! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন। নিজের কানকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সকালের খবরের কাগজটা টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল; অচলা সেটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কাগজখানার স্থানে স্থানে তিনি সকালবেলায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অপরের সংবাদ

খুঁটিয়া জানিবার মত আগ্রহাতিশয্য তাঁহার মনের মধ্যে এখন আর ছিল না। কহিলেন, কোন্ সুরেশ?

অচলা সংবাদপত্রের সেই স্থানটা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, বোধ করি, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাদের সুরেশবাবু? কি করেছেন তিনি? কোথায় তিনি?

অচলা উঠিয়া আসিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা পিতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ না বাবা!

কেদারবাবু চশমার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন, চশমাটা হয়ত আমার ঘরেই ফেলে এসেছি। তুমি পড় না মা, ব্যাপারটা কি শুনি?

অচলা পড়িয়া শুনাইল, ফয়জাবাদ শহরের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, সেদিন শহরের দরিদ্র-পল্লীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একে প্লেগ, তাহাতে এই দুর্ঘটনায় দুঃখী লোকের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। কিছুদিন হইতে সুরেশ নামে একটি ভদ্র-যুবক এখানে আসিয়া অর্থ দিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া, নিজের দেহ দিয়া রোগীর সেবা করিতেছিলেন। বিপদের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান, রোগশয্যায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোক একটি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহাকে উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই।

সংবাদদাতা অতঃপর লিখিয়াছেন, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে কি করিয়া এই অসমসাহসী বাঙালী যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া,—ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়া শেষ হইয়া গেল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু এ কি আমাদের সুরেশ বলেই তোমার মনে হয়?

অচলা শান্তভাবে বলিল, হাঁ বাবা, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু আর একবার চমকিয়া উঠিলেন। বোধ করি, নিজের অজ্ঞাতসারেই অচলার মুখ দিয়া এই 'আমাদেরই' কথাটার উপর একবার একটা অতিরিক্ত জোর প্রকাশ পাইয়াছিল। হয়ত সে শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জানাইবার জন্যই, কিন্তু কেদারবাবুর বুকের মধ্যে তাহা আর একবার বাজিয়া উঠিল; এবং মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে তৃণ অবলম্বন করিতে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়, ঠিক তেমনি করিয়া বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের এই একটিমাত্র কথাকেই নিবিড় আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। এই একটি কথাই তাঁহার কানে কানে, চক্ষের নিমিষে কত কি অসম্ভব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ শুনাইয়া গেল, তাহার সীমা রহিল না। তাঁহার মুখখানা আজ এতদিন পরে অকস্মাৎ আশার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না যে—

পিতাকে সহসা থামিতে দেখিয়া অচলা মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি মনে হয় না বাবা?

কেদারবাবু সাবধানে অগ্রসর হইবার জন্য মুখের কথাটা চাপিয়া গিয়া বলিলেন, তোমার কি মনে হয় না যে, সুরেশ যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করে গেল, তার জন্য সে বিশেষ অনুতপ্ত?

অচলা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, আমার তা নিশ্চয় মনে হয় বাবা।

কেদারবাবু প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! এক শ-বার। তা না হলে সে এভাবে পালাত না—কোথাকার একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বাঁচাতে আগুনের মধ্যে ঢুকত না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, সে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হয়েই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়াছিল। সত্য কি না বল দেখি মা!

অচলা পিতার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল, শুনেছি, পরকে বাঁচাতে এইরকম আরও দু-একবার তিনি নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছিলেন।

কথাটা কেদারবাবুর তেমন ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে আলাদা কথা অচলা। কিন্তু এ যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া! এ যে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! দুটোর প্রভেদ দেখতে পাচ্চ না?

অচলা আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু যারা মহৎপ্রাণ, তাঁদের যে-কোন অবস্থাতেই, পরের বিপদে নিজের বিপদ মনে থাকে না—

কেদারবাবু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, ঠিক, ঠিক! তাই ত তোকে বলচি অচলা—সে একটা মহৎপ্রাণ। তার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে! এত লোক ত আছে, কিন্তু কে কারে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল দেখি! সে যাই কেন না করে থাক, বড় দুঃখেই করে ফেলেচে—এ আমি তোমাকে শপথ করে বলতে পারি।

কিন্তু শপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ সত্য অচলা নিজে যত জানিত, তিনি তাহার শতাংশের একাংশও জানিতেন না। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—নিমিষের লজ্জা পাছে তাহার মুখে ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধের সতৃষ্ণ-দৃষ্টির কাছে তাহা ফাঁকি পড়িল না। তিনি পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, মানুষ ত দেবতা নয়—সে যে মানুষ! তার দেহ দোষে-গুণে জড়ানো; কিন্তু তাই বলে ত তার দুর্বল মুহূর্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব বলে ধরে নেওয়া চলে না! বাইরের লোক যে যা ইচ্ছে বলুক অচলা, কিন্তু আমরাও যদি এইটেকেই দোষ বলে বিচার করি, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত থাকে কোন্‌খানে বল দেখি? বড়লোক ত ঢের আছে, কিন্তু এমন করে দিতে জানে কে? কি লিখেচে ওইখানটায় আর-একবার পড় দেখি মা! আগুনের ভেতর থেকে তাকে নিরাপদে বার করে নিয়ে এল! ওঃ কি মহৎপ্রাণ! দেবতা আর বলে কাকে! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

অচলা তেমনি নিরুত্তর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কেদারবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আমাদের একখানা টেলিগ্রাফ করে কি তার খবর নেওয়া উচিত নয়? তার এ বিপদের দিনেও কি আমাদের অভিমান করা সাজে?

এবার অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানিনে বাবা।

কেদারবাবু বলিলেন, ঠিকানা! ফয়জাবাদ শহরে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের সুরেশকে আজ চেনে না? তার ওপর আমার রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিছু মনে নেই। একখানা টেলিগ্রাম লিখে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দাও মা; আমি তার সংবাদ জানবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

এখুনি দিচ্চি বাবা, বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাফের কাগজ আনিতে ঘরের বাহির হইয়া একেবারে সুরেশের সম্মুখেই পড়িয়া গেল।

অন্তরে গভীর দুঃখ বহন করার ক্লান্তি এত শীঘ্র মানুষের মুখকে যে এমন শুষ্ক, এমন শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে, জীবনে আজ অচলা এই প্রথম দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে সে-ই কথা কহিল। বলিল, বাবা বসে আছেন; আসুন, ঘরে আসুন। ফয়জাবাদ থেকে কবে এলেন? ভাল আছেন আপনি?

অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কতখানি স্নেহের বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা সে নিজে টের পাইল না; কিন্তু সুরেশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল; কিন্তু তবুও আজ সে তাহার বিগত দিনের কঠোর শিক্ষাকে নিষ্ফল হইতে দিল না। সেই দুটি আরক্ত পদতলে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাহার অগাধ দুষ্কৃতির সমস্তটুকু নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার দুর্জয় স্পৃহাকে আজ সে প্রাণপণ-বলে নিবারণ করিয়া লইয়া, সসম্ভ্রমে কহিল, আমার ফয়জাবাদে থাকবার কথা আপনি কি করে জানলেন?

অচলা তেমনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, খবরের কাগজে এইমাত্র দেখে বাবা আমাকে টেলিগ্রাফ করতে বলছিলেন। আপনার জন্যে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—আসুন একবার তাঁকে দেখা দেবেন, বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ বলিয়া উঠিল, তিনি হয়ত পারেন, কিন্তু তুমি আমাকে কি করে মাপ করলে অচলা?

অচলার ওষ্ঠাধরে একটুখানি হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, সে প্রয়োজনই আমার হয়নি। আমি একটি দিনের জন্যেও আপনার ওপর রাগ করিনি—আসুন, ঘরে আসুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ যখন জানাইল, সে মহিমের পত্রে বিবাহের সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, তখন কেদারবাবু লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অচলার মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

সুরেশ বলিল, মহিমের বিবাহে আমি না এলেই ত নয়, নইলে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে গেলেই ভাল হত।

কেদারবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসপাতালে কেন সুরেশ, সে-রকম ত কিছু—

সুরেশ বলিল, আজ্ঞে না, সে-রকম কিছু নয়—তবে, দেহটা ভাল ছিল না।

কেদারবাবু সুস্থির হইয়া বলিলেন, ভগবানকে সেজন্য শতকোটি প্রণাম করি। অচলা যখন খবরের কাগজ থেকে তোমার অলৌকিক কাহিনী শোনালে সুরেশ, তোমাকে বলব কি—আনন্দে, গর্বে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে মনে বললুম, ঈশ্বর! আমি ধন্য যে—আমি এমন লোকেরও বন্ধু! বলিয়া দু'হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু, তাও বলি বাবা, নিজের প্রাণ বারংবার এমন বিপদাপন্ন করাই কি উচিত? একটা সামান্য প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এতবড় একটা মহৎ প্রাণই যদি চলে যেত, তাতে কি সংসারের ঢের বেশি ক্ষতি হত না?

ক্ষতি আর কি হত! বলিয়া সুরেশ সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অচলা নির্নিমেষ-চক্ষে এতক্ষণ তাহারই মুখের পানে চাহিয়া ছিল—এখন দৃষ্টি আনত করিল।

কেদারবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, এমন কথা মুখে আনাও উচিত নয়; কারণ আপনার লোকেদের এতে যে কত বড় ব্যথা বুকে বাজে, তার সীমা নেই।

সুরেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনার লোক আমার ত কেউ নেই কেদারবাবু! থাকবার মধ্যে আছেন শুধু পিসিমা,—আমি গেলে সংসারে তাঁরই যা-কিছু কষ্ট হবে।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও তাহার কেহ নাই শুনিয়া কেদারবাবুর শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুধু কি পিসিমাই দুঃখ পাবেন সুরেশ? তা নয় বাবা, এ বুড়োও বড় কম শোক পাবে না। তা সে যাক, অন্ততঃ আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সে ক'টা দিন নিজের শরীরে একটু যত্ন রেখো সুরেশ, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া সুরেশ হঠাৎ হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার একটা প্রার্থনা আছে কেদারবাবু, মহিমের বিয়ে ত আমার ওখান থেকেই হবে, স্থির হয়েছে; কিন্তু সে ত পরশু। কাল রাত্রেও এই অধমের বাড়িতেই একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—নইলে বিশ্বাস হবে না যে, আমি ক্ষমা পেয়েচি। বলুন, এ ভিক্ষে দেবেন? বলিয়া সে অকস্মাৎ নিচু হইয়া কেদারবাবুর পায়ের ধুলো লইতে গেল।

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া বোধ করি বা তাহাকে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে গিয়াছিলেন—অকস্মাৎ তাহার অস্ফুট কাতরোক্তিতে লাফাইয়া উঠিলেন। পিঠের খানিকটা দগ্ধ হওয়ায় ব্যান্ডেজ করা ছিল, একটা শাল গায়ে দিয়া এতক্ষণ সুরেশ ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। না জানিয়া টানাটানি করিতে গিয়া, তিনি ব্যান্ডেজটাই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন অনাবৃত ক্ষতের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া অচলা ব্যান্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্চি। বলিয়া তাহাকে ও-ধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সযত্নে সাবধানে ব্যান্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু তাঁহার চৌকির উপর ধপ্ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন—বহুক্ষণ পর্যন্ত আর তাঁহার কোনরূপ সাড়া-শব্দ রহিল না। কৌচের পিঠের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া অচলা নিঃশব্দে ব্যান্ডেজ বাঁধিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল পরেই মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না; এদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। সে শুধু নিমীলিতচক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া, তাহার অসীম প্রেমাস্পদের কোমল হাত-দু'খানির করুণ স্পর্শ বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অচলা এক সময়ে চুপি চুপি বলিল, আজ আমার কাছে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সুরেশ ধ্যান ভাঙ্গিয়া চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সেও তেমনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কি প্রতিজ্ঞা?

এমন করে নিজের প্রাণ আপনি নষ্ট করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রাণ ত আমি ইচ্ছে করে নষ্ট করতে চাইনে! শুধু পরের বিপদে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—এ যে আমার ছেলেবেলার স্বভাব, অচলা।

অচলা তাহার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, সুরেশ তাহা টের পাইল। বাঁধা শেষ হইয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কাল কিন্তু এ দীনের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—তাহার দু' চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল; কিন্তু কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না।

অচলা অধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সুরেশ কেদারবাবুকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবেন, আমাকে নিরাশ করবেন না যেন। বলিয়া অচলার মুখের পানে চাহিয়া, আর একবার তাহার আবেদন নিঃশব্দে জানাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে সুরেশের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। কেদারবাবু প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কন্যাকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

সুরেশের বাটীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারবাবু অবাক হইয়া গেলেন। সে বড়লোক, ইহা ত জানা কথা, কিন্তু তাহা যে কতখানি—শুধু আন্দাজের দ্বারা নিশ্চয় করা এতদিন কঠিন হইতেছিল; আজ একেবারে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাঁচিলেন।

সুরেশ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিল; হাসিয়া বলিল, মহিমের গোঁ আজও ভাঙতে পারা গেল না কেদারবাবু। কাল দুপুরের আগে এ বাড়িতে ঢুকতে সে কিছুতেই রাজি হলো না।

কেদারবাবু সে কথার কোন জবাবও দিলেন না। তিনজনে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই একজন প্রৌঢ়া রমণী দ্বারের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিজের ঘরের মেজের উপর একখানি কার্পেট বিছান ছিল, তাহারই উপর অচলাকে সযত্নে বসাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আমি সম্পর্কে তোমার শাশুড়ি হই বৌমা। আমি মহিমের পিসি।

অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আপনি এখানে কবে এলেন?

মহিমের যে পিসি ছিলেন, তাহা সে জানিত না। প্রৌঢ়া তাহার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া, হাসিয়া কহিলেন, আমি এইখানেই থাকি মা, আমি সুরেশের পিসি; কিন্তু মহিমও পর নয়, তাই তারও আমি পিসি হই মা।

তাঁহার স্বভাব-কোমল কণ্ঠস্বরে এমনই একটা স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল যে, একমুহূর্তেই অচলার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার মা নাই, সে অভাব এতটুকু পূর্ণ করে, বাড়িতে এমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক কোনদিন নাই। তাহার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এতদিন সে পিতার স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে স্নেহ যে তাহার হৃদয়ের কতখানি খালি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা একমুহূর্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—আজ পরের বাড়ির পরের পিসিমা যখন 'বৌমা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। প্রথমটা যে অভিনব সম্বোধনে একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল; কিন্তু ইহার মাধুর্য, ইহার গৌরব তাহার নারী-হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে বহুক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দু'জনের কথা জমিয়া উঠিল। অচলা লজ্জিতমুখে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা পিসিমা, আমাকে যে আপনি কাছে বসালেন, কৈ ব্রাহ্ম-মেয়ে বলে ত ঘৃণা করলেন না!

পিসিমা তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গুলির প্রান্ত দ্বারা তাহার চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমাকে ঘৃণা করব কেন মা? একটু হাসিয়া কহিলেন, আমরা হিন্দুর মেয়ে বলে কি এমন নির্বোধ, এত হীন বৌমা, যে, শুধু ধর্ম্মমত আলাদা বলে তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সঙ্কোচবোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দুরের কথা মা!

অচলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন পিসিমা, আমি জানতুম না। আমাদের সমাজের বাইরে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গেই কোনদিন আমি মিশতে পাইনি; শুধু শুনেছিলুম যে, তাঁরা আমাদের বড় ঘৃণা করেন; এমন কি, একসঙ্গে বসলে দাঁড়ালেও তাঁদের স্নান করতে হয়।

পিসিমা বলিলেন, সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয়ত তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে, কিন্তু সত্যি বলচি মা, সত্যিকারের ঘৃণা—আমরা কাউকে করিনে। আমাদের দেশের

বাড়িতে আজও আমার বাগদী-জেঠাইমা বেঁচে আছে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বলতে পারিনে।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা তোমাকে—এ কি সুরেশের মুখ থেকে শুনে, না আজ তোমার আমাকে দেখে এ কথা মনে পড়ল?

সুরেশের উল্লেখে অচলা ধীরে ধীরে বলিল, অনেকদিন আগে একবার তিনিও বলেছিলেন বটে।

পিসিমা বলিলেন, ঐ ওর স্বভাব। একটা মনে হলে আর রক্ষে নেই—ও তাই চারিদিকে বলে বেড়াবে। কোনদিন ব্রহ্মদের সঙ্গে না মিশেই ও ভেবে নিলে, তাদের ও ভারী ঘৃণা করে। এই নিয়ে মহিমের সঙ্গে ওর কতদিন ঝগড়া হবার উপক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ত তাকে একরকম মানুষ করেচি, আমি জানি সে কাউকে ঘৃণা করে না—করবার সাধ্যও ওর নেই। এই দেখ না মা, যেদিন থেকে সে তোমাদের দেখলে, সেদিন থেকে—

কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, অচলার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ মাঝখানেই থামিয়া গেলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কতদূর জানিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলেও অচলার সন্দেহ হইল যে, অন্ততঃ কতকটা পিসিমার অবিদিত নাই। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই মৌন হইয়া রহিল; অচলা নিজের জন্য লজ্জাটাকে কোনমতে দমন করিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, পিসিমা, আপনিই কি তবে সুরেশবাবুকে মানুষ করেছিলেন?

পিসিমা আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, হাঁ মা, আমিই তাকে মানুষ করেছি। দু'বছর বয়সে ও মা-বাপ হারিয়েছিল। আজও আমার সে কাজ সারা হয়নি—আজও সে বোঝা মাথা থেকে নামেনি, কারুর দুঃখ-কষ্ট কারুর আপদ-বিপদ ও সহ্য করতে পারে না, প্রাণের আশা-ভরসা ত্যাগ করে তার বিপদের

মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত ভয়ে ভয়ে দিন-রাত থাকি বৌমা, সে তোমাকে আর বলতে পারিনে।

অচলা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ফয়জাবাদের ঘটনাটা শুনেছেন?

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, শুনেছি বৈ কি মা! ভগবানকে তাই সদাই বলি, ঠাকুর, আমি বেঁচে থাকতে যেন আমাকে আর সে দেখা দেখিয়ো না—মাথায় পা দিয়ে একেবারে আমাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ো না। এ আমি কোনমতে সহ্য করতে পারব না। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ধরিয়া গেল। তাঁহার সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত মুখের সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া অচলার নিজের চোখ-দু'টি সজল হইয়া উঠিল; করুণকণ্ঠে কহিল, আপনি নিষেধ করে দেন না কেন পিসিমা?

পিসিমা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! আমার নিষেধে কি হবে মা? যার নিষেধে সত্যি সত্যি কাজ হবে, আমি তাকেই ত আজ কত বছর থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কিন্তু সে ত যে-সে মেয়ের কাজ নয়। ওকে বাঁচাতে পারে, তেমন মেয়ে ভগবান না দিলে আমি কোথায় পাব মা?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মনের মত মেয়ে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না?

পিসিমা কহিলেন, ঐ যে তোমাকে বললুম মা, ভগবান না দিলে কেউ পায় না। যে সুরেশ কখ্‌খনো এ কথায় কান দেয় না, সে নিজে এসে যেদিন বললে, পিসিমা, এইবার তোমার একটি দাসী এনে হাজির করে দেব, সেদিন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা মুখে জানানো যায় না। মনে মনে আশীর্বাদ করে বললুম, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা। সেদিন আমার কবে হবে যে, বৌ-ব্যাটা বরণ করে ঘরে তুলব। কত বললুম, সুরেশ, আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না, হেসে বললে, পিসিমা, আশীর্বাদের দিন একেবারে গিয়ে দিনস্থির করে এসো। তার পর হঠাৎ একদিন শুধু এসে বললে, সুবিধে হল না পিসিমা, আমি রাত্রির গাড়িতে পশ্চিমে চললুম। কত জিজ্ঞাসা

করলুম, কিসের অসুবিধে আমাকে খুলে বল্‌, কিন্তু কোন কথাই বললে না, সেই রাত্রেই চলে গেল। মনে মনে ভাবলুম, শুধু আমার ছেলের ইচ্ছেতেই ত আর হতে পারে না—সে মেয়েরও ত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা থাকা চাই! কি বল মা?

অচলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। এতক্ষণে সে টের পাইল—মেয়েটি যে কে, পিসিমা তাহা জানেন না। তাহার একবার মনে হইল বটে—তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল—কিন্তু পাথরখানা যে সহজে যায় নাই, বুকের অনেকখানি ছিঁড়িয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

আহারের আয়োজন হইলে পিসিমা অচলাকে আলাদা বসাইয়া খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ির প্রত্যেক কক্ষ, প্রতি জিনিসপত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া আনিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা, ভগবানের আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নেই—কিন্তু এ যেন সেই লক্ষ্মীহীন বৈকুণ্ঠ। মাঝে মাঝে চোখে জল রাখতে পারিনে বৌমা।

চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল, বাহিরে কেদারবাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইতেই পিসিমা তাহার একটা হাত ধরিয়া একবার একটু দ্বিধা করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু না মনে কর মা!

অচলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

পিসিমা বলিলেন, সুরেশের কাছে তোমার আর মহিমের সমস্ত কথা আমি শুনতে পেয়েচি মা। তার মুখেই শুনতে পেলুম, সে গরীব বলে নাকি তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্যেই—

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সত্যি পিসিমা।

পিসিমা অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে অচলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ত চাই মা! যাঁকে ভালবেসেচ তাঁর কাছে টাকাকড়ি,

ধনদৌলত কতটুকু? মনে কোন ক্ষোভ রেখো না মা। আমি মহিমকে খুব জানি, সে এমনি ছেলে, যত কেন না দুঃখ তার জন্যে পাও—একদিন ভগবানের আশীর্বাদে সমস্ত সার্থক হবে। তিনি এত বড় ভালবাসার কিছুতেই অমর্যাদা করতে পারবেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি।

অচলা আর একবার হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

তিনি তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আহা, এমনি একটি বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করতে পেতুম!

সুরেশ আসিয়া উভয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল। যাবার সময় লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য তাহার মুখখানা অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে মুখে যে কি ছিল, তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, জুড়ি-গাড়ি দ্রুতপদে পথে আসিয়া পড়িল। রাস্তার জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছে, সেইদিকে চাহিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল, এতক্ষণ সে যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহা সুখের কিংবা দুঃখের তাহা বলা শক্ত। কেদারবাবু এতক্ষণ মৌন হইয়াই ছিলেন—বোধ করি সুরেশের ঐশ্বর্যের চেহারাটা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, বড়লোক বটে!

মেয়ের তরফ হইতে কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। উৎসাহের অভাবে বাকি পথটা তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারে লাগিল এবং সহিস কবাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, সুরেশকে আমরা কেউ চিনতে পারিনি! একটা দেবতা!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আজ অচলার বিবাহ। বিবাহ-সভার পথে পলকের জন্য সুরেশকে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরে সে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, সারা রাত্রির মধ্যে কেদারবাবুর বাটীতে আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

বিবাহ হইয়া গেল। দুই-একটা দিন অচলার মনের মধ্যে বিপ্লব বহিতেছিল। সেই নিমন্ত্রণের রাত্রে সুরেশের পিসিমার কথা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না; আজ তাহার নিবৃত্তি হইল।

মহিমের অটল গাম্ভীর্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য-প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ দেখিয়াই অচলার সমস্ত বক্ষ আনন্দে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে মনে বলিল, প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।

শ্বশুরবাটী যাত্রার দিন কেদারবাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া কহিলেন, মা, আশীর্বাদ করি স্বামীর সঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করে জীবনের পথে, কর্তব্যের পথে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। বলিয়া তেমনি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরে, শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সঙ্কীর্ণ কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পালকি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব-বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত তাহার ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র ইঙ্গিতের মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিতা ছিল, কল্পনার সৌরভ ছিল। পালকি হইতে নামিয়া সে বাড়ির ভিতরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথাও কোন দিক হইতে কবিত্বের এতটুকু তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম সাক্ষাৎ-দৃষ্টিতে যে এমনি নিরানন্দ, নির্জন—মেটেবাড়ির ঘরগুলা যে এরূপ স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার জানালা-দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য গৃহে জীবন-যাপন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামিসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল। বাটীতে শ্বশুর-শাশুড়ি জা-ননদ কেহই ছিল না। দূরসম্পর্কের এক ঠানদিদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বর-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য ও-পাড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের আজন্ম-পরিচিত সাজসজ্জার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া অব্যক্ত-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; অবশেষে বধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। পাড়ার যাহারা বধূ দেখিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারা অচলার বয়স অনুমান করিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি, গা টেপাটেপি করিল এবং প্রত্যাগমনকালে তাহাদের অস্ফুট কলরবের মধ্যে 'বেহ্ম' 'মেলেচ্ছ' প্রভৃতি দুই-একটা মিষ্ট কথা আসিয়াও অচলার কানে পৌঁছিল।

অনতিবিলম্বেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কথাটা সত্য যে, মহিম ম্লেচ্ছ-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। বিবাহের পূর্বেই এইপ্রকার একটা জনশ্রুতির কিছু কিছু আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল; এখন বৌ দেখিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, যাহা রটিয়াছিল, তাহা ষোল-আনাই খাঁটি।

প্রতিবেশিনীরা প্রস্থান করিলে ঠানদিদি আসিয়া কহিলেন, নাতবৌ, আজ তা হলে আসি দিদি। অনেকটা দূর যেতে হবে, আর ঘরে না গেলেও নয় কিনা—

ছোট নাতিটি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি অনুরোধ-উপরোধের অবকাশমাত্র না দিয়াই চলিয়া গেলেন। তিনি যে এতক্ষণ শুধু একটা সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই যাইতে পারেন নাই এবং সেজন্য মনে মনে ছটফট করিতেছিলেন, অচলা তাহা বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ ঠানদিদির অপরাধ ছিল না। ব্যাপারটা যথার্থই এরূপ দাঁড়াইবে তাহা জানিলে হয়ত তিনি এদিক মাড়াইতেন না। কারণ পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া এ-সকল জিনিসকে ভয় করে না, এত বড় বুকের পাটা পল্লী-ইতিহাসে সুদুর্লভ।

ঠানদিদি অন্তর্ধান করিলে, বাড়ির যদু চাকর ও উড়ে বামুন এবং কলিকাতা হইতে সদ্য আগত অচলার বাপের বাড়ির দাসী হরির মা ভিন্ন সমস্ত বিবাহের বাড়িটা শূন্য খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল, পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে শুরু করিল। হরির মা কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এমন বাড়ি ত দেখিনি দিদি, কেউ যে কোথাও নেই—

অচলা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, অন্যমনস্কের মত শুধু কহিল, হুঁ—

হরির মা পুনরপি কহিল, জামাইবাবুকেও ত দেখচি নে, সেই যে একটিবার দেখা দিয়ে কোথায় গেলেন—

অচলা এ কথার জবাবও দিল না।

কিন্তু এই বনজঙ্গলপরিবৃত শূন্যপুরীর মধ্যে হরির মার নিজের চিত্ত যত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠুক, অচলাকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছে, তাহাকে একটুখানি সচেতন করিবার জন্য কহিল, ভয় কি! সত্যই ত আর জলে এসে পড়িনি! জামাইবাবু এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ততক্ষণ এ-সব ছেড়ে ফেল দিদি, আমি তোরঙ্গ খুলে কাপড়-জামা বার করে দি—

এখন থাক হরির মা, বলিয়া অচলা তেমনি অধোমুখে কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। জীবনের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্ধিত-বেগ বারিধারার মধ্যে কখন যে দিনশেষের অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লীগৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কিছুই ঠাহর হইল না। শুধু আনন্দ-লেশহীন আঁধার ঘরের কোণে কোণে আর্দ্র অন্ধকার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। যদু চাকর আসিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিল। হরির মা প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু কোথায় গো?

কি জানি, বলিয়া যদু ফিরিতে উদ্যত হইল। তাহার সংক্ষিপ্ত ও বিশ্রী উত্তরে হরির মা শঙ্কিত হইয়া কহিল, কি জনি কি-রকম? বাইরে তিনি নেই নাকি?

না, বলিয়া যদু প্রস্থান করিল। সে যে আগন্তুকদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহা বেশ বুঝা গেল। হরির মা অত্যন্ত ভীত হইয়া অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, রকম-সকম আমার ত ভাল ঠেকছে না দিদি। দোরে খিল দিয়ে দেব?

অচলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, খিল দিবি কেন?

হরির মা ছেলেবেলায় দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, আর কখনও যায় নাই। পল্লীগ্রামের চোর-ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতি গল্পের স্মৃতি ছাড়া আর সমস্তই তাহার কাছে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। সে বাহিরের অন্ধকারে একটা চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অচলার গা ঘেঁষিয়া চুপি চুপি কহিল, পাড়াগাঁ—বলা যায় না দিদি। বলিতে বলিতেই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময়ে প্রাঙ্গণের মাঝখান হইতে ডাক আসিল, ঠানদি কোথায় গো? বলিতে বলিতেই একটি কুড়ি-একুশ বৎসরের পাতলা ছিপছিপে মেয়ে জলে ভিজিতে ভিজিতে দোরগোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, আগে একটা নমস্কার করে নিই ঠানদি, তার পরে কাপড় ছাড়ব এখন, বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অচলার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং লণ্ঠনটা অচলার মুখের

কাছে তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া চিৎকার করিয়া ডাক দিল, সেজদা, ও সেজদা—

মহিম বাটী পৌঁছিয়াই এই মেয়েটিকে নিজে আনিতে গিয়াছিল। ও-ঘর হইতে সাড়া দিল, কি রে মৃণাল?

এদিকে এসো না, বলচি—

মহিম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, কি রে?

মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে আর একবার ভাল করিয়া অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল, নাঃ—তুমিই জিতেচ সেজদা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।

মহিম বাহির হইতে তাড়া দিয়া কহিল, কিছুতেই আমার কথা শুনবি নে মৃণাল? আবার এই-সব ঠাট্টা? তুই কি আমার কথা শুনবি নে?

বাঃ, ঠাট্টা বৈ কি, অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, ঠানদি, মাইরি বলচি ভাই, তামাশা নয়। আচ্ছা, তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ করেছিলেন কি না!

মহিম কহিল, তবে তুই বকে মর্, আমি বাইরে চললুম।

মৃণাল কহিল, তা যাও না, তোমাকে কি ধরে রেখেচি? অচলার চিবুকটা একবার পরম স্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই ঠানদি, হিংসে হয় নাকি? এ সংসারে আমারই ত গিন্নী হবার কথা! কিন্তু আমার মা পোড়ারমুখী কি যে মন্তর সেজদার কানে ঢুকিয়ে দিলে—আমি সেজদার দু' চক্ষের বিষ হয়ে গেলুম। নইলে—ওরে যদু, ঘোষালমশাই গেলেন কোথায়?

যদু কহিল, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছেন।

অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে? মৃণালের হাসিমুখ একমুহূর্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, যদু যা বাবা, আলো নিয়ে একবার পুকুরে। বুড়োমানুষ, এখুনি কোথায় অন্ধকারে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙবে।

পরক্ষণেই অচলার মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, কি কপাল করেছিলুম ভাই ঠানদি, কোথাকার এক বাহাত্তুরে বুড়ো ধরে আমাকে দিলে—তার সেবা করতে করতে আর তাকে সামলাতে সামলাতেই প্রাণটা গেল। আচ্ছা ভাই, আগে ও-ঘর থেকে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি, তার পরে কথা হবে। কিন্তু সতীন বলে রাগ করতে পাবে না, তা বলে দিচ্চি—আর বল ত, না হয়, আমার বুড়োটাকেও তোমায় ভাগ দেব। বলিয়া হাসির ছটায় সমস্ত ঘরটা যেন আলো করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

এই শ্রেণীর ঠাট্টা-তামাশার সহিত অচলার কোনদিন পরিচয় ঘটে নাই। সমস্ত পরিহাসই তাহার কাছে এমনি কুরুচিপূর্ণ ও বিশ্রী ঠেকিতেছিল যে, লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা যে কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারিত না। সুতরাং সমস্ত রসিকতাই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার আগমনে তাহার নির্বাসনের অর্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল; এবং এ কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—সমস্ত জানিবার জন্য অচলা উৎসুক হইয়া উঠিল!

হরির মা কহিল, এ মেয়েটি কে দিদি? খুব আমুদে মানুষ।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, হাঁ।

ভিজে কাপড় ছাড়িয়া মৃণাল এ-ঘরে আসিয়া কহিল, কেবল ঠাট্টা-তামাশা করেই গেলুম ঠানদি, আমার আসল পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয়নি। আর পরিচয় এমন কি-ই বা আছে? তোমার বর যিনি, তিনি হচ্চেন আমার মায়ের বাপ। আমি তাই ছেলেবেলা থেকে সেজদামশাই বলে ডাকি। বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমার বাবা আর তোমার শ্বশুর—দু'জনে ভারী বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা পড়ে, ডান হাতটা ভেঙ্গে গিয়ে বাবার যখন চাকরি গেল,

তখন তোমার শ্বশুর এই বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তার অনেক পরে আমার জন্ম হয়। সেজদা তখন আট বছরের ছেলে। তাঁর মা ত তাঁর জন্ম দিয়েই মারা যান; বড় দু' ছেলে আগে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। তাই আমার মা আসা পর্যন্তই হলেন এ বাড়ির গিন্নী। তার পরে বাবা মারা গেলেন, আমরা এ বাড়িতেই রইলুম। তার অনেক পরে তোমার শ্বশুর মারা গেলেন, আমরা কিন্তু রয়েই গেলুম। এই সবে পাঁচ বছর হল পলাশীর ঘোষাল-বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়ে সেজদা আমাকে দূর করে দিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলেও যা হোক একটু জোর থাকত।

বড়বৌ এই ঘরে নাকি? বলিয়া একটি বৃদ্ধগোছের বেঁটেখাটো গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃণাল কহিল, এসো, এসো। অচলার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ঐটি আমার কর্তা ঠানদি। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, ওই বাহাত্তুরে বুড়োর সঙ্গে আমাকে মানায়? এ জন্মের রূপ-যৌবন কি সব মাটি হয়ে গেল না ভাই?

অচলা জবাব দিবে কি, লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ভদ্রলোকটির নাম ভবানী ঘোষাল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, বিশ্বাস করবেন না ঠানদি—সব মিছে কথা। ওর কেবল চেষ্টা—আমাকে খেলো করে দেয়। নইলে, বয়স ত আমার এই সবে বায়ান্ন কি তি—

মৃণাল কহিল, চুপ করো, চুপ করো। এই সেজদাটি যে আমার কি শত্রু, তা ভগবানই জানেন। আমাকে সবদিকে মাটি করেছেন। আচ্ছা, এই বুড়োর হাতে দেওয়ার চেয়ে, হাত-পা বেঁধে কি আমায় জলে ফেলে দেওয়া ভাল হত না ঠানদি? সত্যিই বলো ভাই।

অচলা তেমনি আরক্তমুখে নীরব হইয়াই রহিল।

ঘোষাল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অচলার লজ্জানত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,

বাঁচালেন ঠানদি, এ ছুঁড়ীর অহঙ্কার এতদিনে ভাঙল। রূপের দেমাকে এ চোখে-কানে দেখতেই পেত না।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কেমন এইবার হল ত? বনদেশে এতদিন শিয়াল-রাজা ছিলে, শহরের রূপ কারে বলে, এইবার চেয়ে দেখো।

মৃণাল কহিল, তাই বৈ কি! আমার যেখানে অহঙ্কার সেখানে ভাঙতে যায়—সাধ্যি কার? বলিয়া স্বামীর প্রতি সে যে গোপন কটাক্ষ করিল, অচলার চোখে সহসা তাহা পড়িয়া গেল।

ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন, শুনলেন ত ঠানদি,—একটু সাবধানে থাকবেন, দুজনের যে ভাব, যে আসা-যাওয়া, বলা যায় না—আর আমি ত বাহাত্তুরে বুড়ো, মাঝে থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! নিজেরটি সামলে চলবেন—হিতৈষী বুড়োর এই অনুরোধ।

মৃণাল, তোরা কি সারারাত্রি এই নিয়েই থাকবি?

কি করব সেজদা?

একবার রান্নাঘরের দিকেও যাবিনে?

মৃণাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি ভুল হয়েই গেছে সেজদা, উড়ে বামুনটাকে আমার আগে দেখে আসা উচিত ছিল। আচ্ছা, তোমরা বাইরে যাও, আমরা যাচ্চি।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কে?

মৃণাল কহিল, আমি আর ঠানদি। অচলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমি যখন এসেচি, তখন এ সংসারের সমস্ত চার্জ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবো সেজদি।

মহিম এবং ভবানী বাহিরে চলিয়া গেল। মৃণাল অচলাকে পুনরায় কহিল, আমার দু’দিন আগে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু শাশুড়ির হাঁপানির জ্বালায় কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হও সেজদি,

আমি এখ্‌খুনি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। বলিয়া মৃণাল রান্নাঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল এবং গাঢ় মেঘ কাটিয়া গিয়া নবমীর জ্যোৎস্নায় আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল।

রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া মৃণাল অচলার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, ঠানদিদির চেয়ে সেজদি ডাকটা ভালো, কি বল সেজদি?

অচলা মৃদুস্বরে কহিল, হাঁ।

মৃণাল কহিল, সম্পর্কে তুমি বড় হলেও বয়সে আমি বড়। তাই ইচ্ছে হয়, আমাকেও তুমি মৃণালদিদি বলে ডেকো, কেমন?

অচলা কহিল, আচ্ছা।

মৃণাল কহিল, আজ তোমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে আনলুম; কিন্তু কাল একেবারে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে দেব, কেমন?

অচলা কহিল, চাবিতে আমার কাজ নেই ভাই।

মৃণাল হাসিয়া কহিল, কাজ নেই? বাপ রে, ও কি কথা! ভাঁড়ারটা কি তুচ্ছ জিনিস সেজদি যে, বলচ—তার চাবিতে কাজ নেই? গিন্নীর রাজত্বের ওই ত হল রাজধানী গো।

অচলা কহিল, হোক রাজধানী, তাতে আমার লোভ নেই। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভারী লোভ। শিগ্‌গির ছেড়ে দিচ্চিনে মৃণালদিদি।

মৃণাল দুই বাহু বাড়াইয়া অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সতীনকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না করে, ঘরে ধরে রাখতে চাও—এ তোমার কি-রকম বুদ্ধি সেজদি?

অচলা আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এই ঠাট্টাগুলো আমার ভাল লাগলো না ভাই। আচ্ছা, এ দেশে সবাই কি এই রকম করে তামাশা করে?

মৃণাল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, না গো ঠানদি, করে না। এ শুধু আমিই করি, সবাই এ জিনিস পাবে কোথায় যে করবে?

অচলা কহিল, পেলেও আমরা মুখে আনতে পারিনে ভাই। আমাদের কলকাতার সমাজে অনেকে হয়ত ভাবতে পর্যন্ত পারে না যে, কোন ভদ্রমহিলা এ-সব মুখে উচ্চারণ করতে পারে।

মৃণাল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরঞ্চ জোর করিয়া অচলাকে আর একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমাদের শহরের ক'জন ভদ্রমহিলা আমার মত এমন করে জড়িয়ে ধরতে পারে, বল ত সেজদি? সবাই বুঝি সব কাজ পারে? এই ত তোমাকে কতক্ষণই বা দেখেচি, এর মধ্যেই মনে হচ্ছে, আমার বোন ছিল না, একটি ছোট বোন পেলুম। আর এ শুধু কথার কথা নয়, সারাজীবন ধরে আমাকে এর প্রমাণ যোগাতে হবে—তা মনে রেখো। এখানে আর ঠাট্টা-তামাশা চলবে না।

অচলা শিক্ষিতা মেয়ে। এই পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধসমাজের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন যে কিভাবে কাটিবে, তাহা বাটীতে পা দিয়াই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। এ সুযোগ সে সহজে ছাড়িয়া দিল না। পরিহাসকে গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া কহিল, মৃণালদিদি, সত্যই কি এর প্রমাণ তুমি সারা জীবনভোর যোগাতে পারবে?

মৃণাল বলিল, আমরা ত শহরের মহিলা নই ভাই—যোগাতে হবে বৈ কি! যে সত্য তোমাকে ছুঁয়ে করে ফেললুম, সে ত মরে গেলেও আর উলটোতে পারব না!

অচলা এ কথার আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; হাসিয়া কহিল, শিগ্‌গির পালাবে না, তাও অমনি বল।

মৃণাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বোকা পেয়ে বুঝি ক্রমাগত ফাঁস জড়াতে চাও সেজদি? কিন্তু সে ত আগেই বলেচি ভাই, ভাল করে চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে পালাব না।

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, চার্জ বুঝে নেবার আমার একতিল আগ্রহ নেই।

মৃণাল বলিল, সেইটে আমি করে দিয়ে তবে যাবো, কিন্তু বেশিদিন আমার ত বাড়ি ছেড়ে থাকবার জো নেই ভাই! জান ত, কত বড় সংসারটি আমার মাথার ওপর।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, জানিনে।

মৃণাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেজদা আমার কথা তোমাকে আগে বলেন নি?

অচলা কহিল, না, কোনদিন নয়। তাঁর বাড়িঘর সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানিয়েছিলেন; কিন্তু যা সকলের আগে জানানো উচিত ছিল, সেই তোমার কথাই কেন যে কখনো বলেন নি, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হচ্ছে মৃণালদিদি!

মৃণাল অন্যমনস্কের মত বলিল, তা বটে।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে বুঝি ওঁর প্রথম বিয়ের কথা হয়?

মৃণাল তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, তবে হল না কেন? হলেই ত বেশ হত।

এতক্ষণে কথাটা মৃণালের কানের ভিতর গিয়া ঘা দিল। সে অচলার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, সে হবার নয় ব'লে হল না।

অচলা তথাপি প্রশ্ন করিল, হবার বাধা কি ছিল? তুমি ত আর সত্যিই তাঁর কোন আত্মীয়া নও? তা ছাড়া, ছেলেবেলায় যে ভালবাসা জন্মায় তাকে উপেক্ষা করাও ত ভালো কাজ নয়!

তাহার প্রশ্নের ধরনে মৃণাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে অচলার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ-সব কি তুমি খুঁজে বেড়াচ্চ সেজদি? তুমি কি মনে কর, ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই? না, মানুষে বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ-জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায় আসে!

অচলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা মৃণালদিদি, আমি তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃণালের কাছে তাহা অগোচর রহিল না। সে অচলার হাতখানি সস্নেহে মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, সেজদি তুমি শুধু সেদিন স্বামী পেয়েচ, কিন্তু আমি এই পাঁচ বচ্ছর ধরে তাঁর সেবা করচি। আমার এই কথাটা শুনো ভাই, স্বামীর এই দিকটা কোনদিন নিজের বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করো না। তাতে বরং ঠকাও ঢের ভাল, কিন্তু জিতে লাভ নেই।

যদু বাহির হইতে কহিল, দিদি, বাবুদের খাবার জায়গা হয়েছে।

আচ্ছা চল, আমি যাচ্চি, বলিয়া মৃণাল হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মুখখানা কাছে টানিয়া আনিয়া একটু চুমা খাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ওলো সেজদি!

অচলা পাশের ঘর হইতে ব্যস্ত হইয়া এ ঘরে আসিয়া পড়িল।

মৃণালের কোমরে আঁচল জড়ানো—সে একটা ছোট দেরাজ একলাই টানাটানি করিয়া সোজা করিয়া রাখিতেছিল। অচলা ঘরে ঢুকিতেই, সে মহা রাগতভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে মুখপোড়া মেয়ে, তুমি নবাবের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর আমি তোমার শোবার ঘর গুছিয়ে দেব? নাও বলচি ওই ঝাঁটাটা তুলে—ঐ কোণটা পরিষ্কার করে ফেল। বলিয়া হাসি আর চাপিতে না পারিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া হরির মাও পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে কহিল, তোমার এক-কথা দিদি! বাড়িতে কত গণ্ডা দাসদাসী—দিদিমণির কি কোনদিন ঝাঁটা হাতে করা অভ্যাস আছে নাকি, যে আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ঘর ঝাঁট দিতে যাবে? আমি দিচ্চি, বলিয়া সে ঝাঁটাটা তুলিতে যাইতেছিল—মৃণাল কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, তুই থাম্ মাগী। দিদিমণিকে আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস নাকি যে, সালিসি করতে এসেচিস? বলিয়া অচলার হাতের মধ্যে ঝাঁটা গুঁজিয়া দিয়া হরির মাকে হাসিয়া বলিল, ওরে তোর দিদিমণি ইচ্ছে করলে যে কাজ পারে, তা তোর সাতগণ্ডা পাড়াগাঁয়ের মেয়েতে পারে না। অচলাকে কহিল, নাও ত সেজদি, ঐ কোণটা চট্ করে ঝেড়ে ফেল ত।

অচলা ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মৃণালদিদি, তুমি যাদুবিদ্যে জানো, না?

মৃণাল কহিল, কেন বল দেখি?

অচলা বলিল, তা নইলে এই বাড়ি পরিষ্কার করবার জন্য ঝাঁটা হাতে নিয়েচি, এ ভোজবিদ্যে নয় ত কি?

মৃণাল কহিল, তুমি নেবে না ত কে নেবে গো? তোমার বাড়ি ঝাঁট-পাট দেবার জন্যে কি ও-পাড়া থেকে পদির মাসী আসবে নাকি? নাও, কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, সন্ধ্যা হয়।

অচলা কাজ করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, নিজেও একদণ্ড বসবে না, আমাকেও খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে, সত্যি বলচি মৃণালদিদি, এই পাঁচ-ছ'দিন যে খাটান আমাকে খাটিয়েচ, চা-বাগানের কর্তারাও বোধ করি তাদের কুলীদের এত করে খাটায় না।

মৃণাল কাছে আসিয়া তাহার চিবুকের উপর আঙুলের একটা ঘা দিয়া বলিল, তাই ত, ঘরদোর দেখে মনে হচ্ছে, বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে, খাটুনি বলছিস ভাই সেজদি—যেদিন স্বামী-পুত্র ঘরকন্না নিয়ে, নাবার খাবার সময় পাবে না, শুধু তখনি ত এই মেয়েমানুষ-জন্মটা সার্থক হবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমার সেদিন আসে—এখুনি খাটুনির হয়েচে কি গিন্নী! বলিয়া হাসিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।

হরির মা হঠাৎ ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সেই আশীর্বাদ কর দিদি, শুধু সেই আশীর্বাদই কর। তাহার অচলার মাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সেই সাধ্বী অত্যন্ত অসময়ে যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন একরত্তি মেয়েকে হরির মায়ের হাতেই সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই মেয়ে এখন এতবড় হইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।

মৃণাল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, আ মর্! ছিঁচকাঁদুনী মাগী, কাঁদিস কেন?

হরির মা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাঁদি কি সাধে দিদি! তোমার কথা শুনে কান্না যে কিছুতে ধরে রাখতে পারিনে। মাইরি বলচি, তুমি না এসে পড়লে এ বাড়িতে একটা রাতও যে আমাদের কি করে কাটত, তাই আমি ভেবে পাইনে।

আজ ছয় দিন হইল, মৃণাল এ বাটীতে আসিয়াছে। আসিয়া পর্যন্ত বাড়ি-ঘরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষগুলোর পর্যন্ত চেহারা বদলাইয়া দিবার কার্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার সব কাজকর্ম, হাসিঠাট্টার মধ্যে হইতে একটা যাই-যাই ভাব অচলাকে পীড়া দিতেছিল। কারণ, মৃণালের কাজে কথায়, আচারে ব্যবহারে এতবড় একটা সহজ আত্মীয়তা ছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া অচলা উঁকি মারিয়া তাহার নূতন জীবনের অচেনা ঘরকন্নাকে চিনিয়া লইবার সময় পাইতেছিল এবং ইহার চেয়েও একটা বড় জিনিসকে তাহার ভাল করিয়া এবং বিশেষ করিয়া চিনিবার কৌতূহল হইয়াছিল, সে স্বয়ং মৃণালকে। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে সচ্ছল নহে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত হাত-দুখানির পানে চাহিলেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ স্বামী—কোন দিক দিয়াই যাহাকে তাহার উপযুক্ত বলিয়া অচলার মনে হয় না; তাহার উপর বাড়িতে পরিশ্রমের অন্ত নাই—জরাজীর্ণ শাশুড়ি মর মর অবস্থায় অহর্নিশি গলায় ঝুলিতেছে; কারণে-অকারণে তাহার বকুনি-ঝকুনির বিরাম নাই—এ কথা সে মৃণালের নিজের মুখেই শুনিয়াছে-অথচ কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবনযাত্রার পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারে না। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন-কিছুর যেন অস্তিত্ব নাই—এমনি এই মূর্খ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাঁকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও মলিনতার অতীত, ঠিক তেমনি যেন এই লেখাপড়া না-জানা দরিদ্র পল্লী-লক্ষ্মীটিও সর্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহের ক্লান্তি, না আছে

তাহার মুখের শ্রান্তি। সুতরাং অচলাকেও সে যে সকল অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, যদিচ তাহার কোনটার সহিত তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানটা যেন অতি-বড় লজ্জার কথা, এমনই অচলার মনে হইতেছিল। নিজের ভাগ্যটাকেও যে একবার ধিক্কার দিবার জন্য সে একমুহূর্ত বসিয়া শোক করিবে, এ ছয়টা দিনের মধ্যে সে ফাঁকটুকু পর্যন্ত তাহার মিলে নাই—সমস্ত সময়টা সে কাজ দিয়া, হাসি-গল্প দিয়া এমনি ভরাট করিয়া গাঁথিয়া আনিতেছিল। তাই তাহার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিত মাত্রেই অচলার মনে হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত মেটেবাড়িটা তাহার দরজা-জানালা-দেয়ালসমেত যেন তাসের ঘরের মত চক্ষের নিমিষে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে, মৃণালদিদি চলিয়া গেলে এখানে সে একদণ্ডও তিষ্ঠিবে কি করিয়া?

সন্ধ্যার পর একসময়ে অচলা কহিল, কেবল যে পালাই পালাই করচ মৃণালদিদি, বাপের বাড়ি এসে কে এত শীঘ্র ফিরে যায় বল ত? তা হবে না—আমি যতদিন না কলকাতায় ফিরে যাব, ততদিন তোমাকে থাকতেই হবে।

মৃণাল কহিল, কি করব ভাই সেজদি, শাশুড়িবুড়ী না নিজে মরবে, না আমাকে একদণ্ড ছেড়ে দেবে। আমি বলি, বুড়ী তুই মর্। তোর ছেলের বয়স ষাট হতে চলল, শেষে তাকে খেয়ে তবে যাবি? তা এত যে দিবারাত্রি কাসে, দমটা ত একবারও আটকে যায় না!

অচলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমাকে বুঝি তিনি দেখতে পারেন না?

মৃণাল মাথা নাড়িয়া কহিল, দুটি চক্ষে না।

অচলা কহিল, আর তুমি?

মৃণাল বলিল, আমিও না। বুড়ীকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে আমি পাঁচ-সিকের হরির-লুট দেব মানত করে রেখেচি যে!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না মৃণালদিদি! তুমি সংসারে কাকে যে দেখতে পারো না, তা তোমার মুখের কথা শুনে কিছুতেই বলবার জো নেই! হয়ত এই বুড়ীকেই তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস।

মৃণাল হাসিমুখে কহিল, সবচেয়ে বেশি ভালবাসি? তা হবে। বলিয়া অচলার গাল টিপিয়া দিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাই-যাই করিয়া মৃণালের আবার কিছুদিন গড়াইয়া গেল। একদিন হঠাৎ অচলার চোখে পড়িল, যাবার দিকে তাহার মুখে যত তাড়া, কাজের দিকে তত নয়। সত্যই চলিয়া যাইতে সে যেন ঠিক এত উৎসুক নয়। এতদিন তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে সে যেভাবে চিনিয়া লইতেছিল, এখন তাহার আবরণের বাহিরে আসিয়া, পৃথিবীর সে চেহারা তাহার চোখে যেন আর রহিল না। এ বাটিতে পা দিয়া পর্যন্ত যখনই তাহাকে স্বামীর সঙ্গে কোন-একটা হাসি-তামাশা করিতে দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে যেন সুচ ফুটিতে লাগিল। এ-সব কিছুই নয়, ইহার মধ্যে যথার্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নাই—মন খারাপ করিবার কোন হেতু নাই—তাহার মন বড় অশুচি—এমনি করিয়া আপনাকে সে যতই শাসন করিবার চেষ্টা করে, ততই কোথা হইতে সংশয়ের বিপরীত তর্ক তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বারংবার মুখ তুলিয়া তাহাকে ভ্যাঙচাইতে থাকে। মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়। সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই, তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি! যে তামাশা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতেও পারে! অথচ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিতমুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই কোথায় কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজকাল এ চিন্তা কোনমতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না।

মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজকর্ম করিতে করিতেও তাহার এক শ'বার মনে হয়, সে নিজে মেয়েমানুষ হইয়া যখন বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষার বেদনা বহন করিতে থাকিয়াও ইহাকে কোনমতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না, একত্র এতকাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষমানুষে এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

মৃণাল আসিলেই যে উড়ে বামুন তাহার রান্নাঘরের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিত, এ কথা অচলা জানিত না। এবারেও সে ছুটি পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; কিন্তু অচলা কেবলই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, মৃনাল নিজের হাতে রাঁধিয়া মহিমকে খাওয়াইতে যেন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আজ সকালে সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, মৃণালদিদি, আজ তোমার ছুটি।

মৃণাল বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিসের ভাই সেজদি?

অচলা কহিল, রান্নার। আজ আমিই রাঁধব।

মৃণাল অবাক হইয়া বলিল, পোড়া কপাল! তুমি আবার রাঁধবে কি?

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বাঃ, আমি বুঝি জানিনে? বাড়িতে আমি ত কতদিন রেঁধেছি। সে হবে না মৃণালদি, আজ আমি রাঁধবই।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া মৃণাল হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল; কহিল, সে কি হয়, আমি থাকতে তুমি কি দুঃখে রান্নাঘরের ধুঁয়োর মধ্যে কষ্ট পেতে যাবে ভাই?

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অচলা জিদ করিয়া বলিল, তা হলে বামুন থাকতে তুমিই বা কেন কষ্ট কর? এবেলা আমি নিশ্চয় রাঁধব।

কেন যে তাহার এই আগ্রহ, মৃণাল তাহার কিছুই বুঝিল না। সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বা রে মেয়ে। একে একে বুঝি তুমি আমার সব কেড়েকুড়ে নিতে চাও? সবই ত নিয়েছ, দুটো দিন রেঁধে খাইয়ে যাবো তাও বুঝি সইচে না? এখন থেকে সতীনের হিংসে শুরু হল বুঝি?

অচলার বুকের ভিতরটায় আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মৃণালের শেষ কথাটা গিয়া তাহার ঈর্ষার ব্যথায় সজোরে ঘা দিল। সে একমুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া শুধু সংক্ষেপে কহিল, না, আজ আমিই রাঁধব।

এতক্ষণে মৃণাল দেখিতে পাইল, অচলা রাগ করিয়াছে। তাই আর তর্কাতর্কি না করিয়া বিষণ্ণমুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হলে তুমিই রাঁধো গে। আচ্ছা চল, কোথায় কি আছে, দেখিয়ে দিয়ে আসি।

মহিম যে এতক্ষণ ঘরেই ছিল, তাহা দু'জনের কেহই জানিত না। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মহিম অচলাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মৃণাল যে-ক'দিন আছে ওই রাঁধুক না।

কেন যে সে আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা জানিত। কিন্তু সে কথা ত খুলিয়া বলা চলে না।

অচলা আরও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ চাপিয়া শুধু কহিল, না, আমিই রাঁধতে যাচ্চি, বলিয়াই বাদানুবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

অচলা জোর করিয়া রাঁধিতে গেল। রান্নার কাজে সে কাহারও চেয়েই খাটো ছিল না; কিন্তু এদিকে সে মন দিতেই পারিল না। বিগত দিনের সমস্ত কাহিনী নড়িতে চড়িতে কেবলই খচখচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত মহিম কোনদিনই তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের অনতিকাল পূর্বে সুরেশকে লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এই-সকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া মনে করিয়া আজ সহসা সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মহিম তাহার প্রতি চিরদিনই উদাসীন; এমন কি পিতার অভিমতে পূর্ব-সম্বন্ধ যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনও মহিম

যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহার যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এখানে আসা অবধি মৃণাল ও অচলা একসঙ্গে আহারে বসিত। দুপুরবেলা হরির মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া অচলা মৃণালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মৃণালদিদির জ্বরের মত হয়েছে, তিনি খাবেন না।

অচলা কোন কথা না কহিয়া মৃণালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মৃণাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া ছিল, অচলা কহিল, খাবে চল মৃণালদিদি।

মৃণাল চাহিয়া দেখিয়া, একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি খাও গে ভাই সেজদি, আমার শরীর ভাল নেই।

অচলা শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? জ্বর?

মৃণাল কহিল, তাই মনে হচ্চে। আজ উপোস করলেই সেরে যাবে।

অচলা হেঁট হইয়া হাত দিয়া মৃণালের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, আমি অত বোকা নই মৃণালদিদি, খাবে চল।

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মাইরি বলচি, সেজদি, আমার খাবার জো নেই। কেন তুমি আবার কষ্ট করে ডাকতে এলে ভাই! বরং চল, আমি না হয় গিয়ে তোমার সুমুখে বসচি।

অচলা কঠিন হইয়া কহিল, একজন অভুক্ত বন্ধুকে মুখের সামনে বসিয়ে রেখে খাবার শিক্ষা আমরা পাইনি মৃণালদিদি।

মৃণাল তথাপি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, আর বন্ধুর যদি ভোজনের উপায় না থাকে তা হলে?

অচলা তেমনিভাবে জবাব দিল, নেই কেন আগে শুনি? তোমার জ্বর হয়নি, হয়েছে রাগ। নিজে না খেয়ে আমাকেও শুকোবে, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে ত স্পষ্ট করে বল, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, স্বামীর দিব্য করে বলচি সেজদি, আমি এতটুকু রাগ করিনি। কিন্তু আমার খাবার জো নেই। চল দিদি, আমি তোমাকে কোলে করে বসে খাওয়াই গে।

অচলা কহিল, তা হলে জ্বর-টর নয়? ওটা শুধু ছল।

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এতক্ষণে বুঝলুম। কিন্তু গোড়াতেই যদি মুখ ফুটে বলে দিতে মৃণালদিদি, আমার ছোঁয়া তুমি ঘৃণায় মুখে দিতে পারবে না, তা হলে এই অন্যায় জিদ করে তোমাকে কষ্ট দিতুম না, নিজেও দাসী-চাকরের সামনে লজ্জায় পড়তুম না। তা সে যাক—আমাকে মাপ করো ভাই, কিন্তু দুধ ত ছোঁয়া যায় না শুনেছি, তাই এক বাটি এনে দি—আর যদু গিয়ে দোকান থেকে কিছু সন্দেশ কিনে আনুক। কি বল?

প্রথমটা মৃণাল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল; খানিক পরে সে ভাব কাটিয়া গেলেও সে কথা কহিল না, অধোমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

অচলা পুনরায় খোঁচা দিয়া কহিল, কি বল?

মৃণাল আঁচলে চোখ মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল, এখন থাক।

অচলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মৃণাল মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বুড়া শাশুড়িকে তাহার রাঁধিয়া দিতে হয়; তিনি অতিশয় শুচিবাই-প্রকৃতির লোক; এ কথা শুনিলে কোনকালে যে তাহার জলস্পর্শ করিবেন না, নিদারুণ অভিমানে এ কথা সে আভাসেও অচলার কাছে প্রকাশ করিল না।

অচলা রান্নাঘরে গিয়া সেখানকার কাজকর্ম সারিয়া হাত ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আর যে-কোন কারণেই হোক, কেবল ঘৃণায় যে তাহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন মৃণাল স্পর্শ করে নাই এ কথা মিথ্যা বলিয়াই অচলা

মনে মনে জানিত বলিয়া অমন করিয়া আজ আঘাত করিয়াছিল। সত্য বলিয়া বুঝিলে, মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও অচলা পারিত না। অথচ যে প্রভাত আজ কলহের দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যাহ্নে ভগবান কাহারও অদৃষ্টেই যে প্রস্তুত অন্ন মাপান নাই, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিল।

অপরাহ্নবেলায় গরুর গাড়ি আসিয়া সদরে উপস্থিত হইল। মৃণাল অচলার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, নমস্কার করতে এসেছি—সেজদি, বাড়ি চললুম। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, একটা ডাক দিয়ো, আবার এসে হাজির হব। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু যাবার সময় একটা কথাও কবে না ভাই? বলিয়া ক্ষণকাল উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অচলা একটা কথাও কহিল না, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়াই মৃণাল দেখিতে পাইল, মহিম বাড়ি ঢুকিতেছে। কহিল, একটু দাঁড়াও সেজদা, তোমাকেও একটা নমস্কার করি।

মহিম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু না খেয়েই বাড়ি চললি মৃণাল? না হয়, রাত্রিটা থেকে সকালেই যাসনে!

মৃণাল শুধু একটুখানি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না সেজদা, যদু গাড়ি ডেকে এনেছে, আজ যাই—কিন্তু আর একদিন নিয়ে এসো। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইল। বলিল, মাথা খাও সেজদাদামশাই, আর একদিন আনতে যেন ভুলো না ভাই।

আজ মহিম হাসিয়া ফেলিল। কহিল, পোড়ামুখী, তোর স্বভাব কি কোনদিন যাবে না রে?

মরলে যাবে, তার আগে নয়, বলিয়া আর একবার হাসিয়া মৃণাল গিয়া গাড়িতে উঠিল।

আজই এত অকস্মাৎ মৃণাল চলিয়া যাইতে পারে, অচলা তাহা কল্পনাও করে নাই। মৃণাল নিজে খায় নাই, তাহাকে খাইতে দেয় নাই, এই অপরাধের সব চেয়ে বড় দণ্ড অচলা যে কি করিয়া দিবে, একলা ঘরে বসিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত সে এই চিন্তাই করিতেছিল। যে ভালবাসে, তাহাকে ঘৃণা করার অপবাদ দেওয়ার মত গুরুতর শাস্তি আর নাই, এ কথা ভালবাসাই বলিয়া দেয়। এই গুরুদণ্ডই মৃণালের প্রতি মনে মনে বিধান করিয়া অচলা বসিয়া ছিল। মৃণালদিদি যে তাহাকে ব্রাহ্মমেয়ে বলিয়া অন্তরের মধ্যে ঘৃণা করে, উঠিতে বসিতে এই খোঁচা দিয়া সে আজকের শোধ লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

অথচ অভুক্ত মৃণাল বিদায় লইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহারও চোখের জলে দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মৃণালের মুখে সেই একফোঁটা হাসির শব্দ তপ্তমরুর মত চক্ষের পলকে তাহার উদ্‌গত অশ্রু শুষ্ক করিয়া ফেলিল; এবং দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সমস্ত চিত্ত দিয়া উভয়ের বিদায়ের পালা দর্শন করিয়া ঠিক বজ্রাহত তরুর মত নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনতিকাল পরে মহিম আসিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার আজন্ম শিক্ষা-সংস্কার তাহাকে ইতরতার হাত হইতে রক্ষা করিল। প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ করিয়া, কঠোর হাসি হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করার মত বিড়ম্বনা বোধ করি সংসারে অল্পই আছে, না?

মহিম স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলছ ত? বুঝতে পারি, প্রথমটা তোমার নানাপ্রকার কষ্ট হবে; কিন্তু মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনাও হবে না, এ আমি কিছুতেই ভাবিনি। কেননা, তার সঙ্গে কোনদিন কারও ঝগড়া হয়নি।

অচলা কহিল, আমার সঙ্গেই যে পাড়াসুদ্ধ লোকের চিরকাল ঝগড়া হয়, এ খবরই বা তুমি কোথায় শুনলে?

মহিম ধীরে ধীরে বলিল, তোমার সমস্তদিন খাওয়া হয়নি,—থাক, এ-সব কথায় এখন কাজ নেই।

অচলা অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মৃণালদিদিও সমস্তদিন না খেয়েই বাড়ি গেলেন ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতে ত তোমার আপত্তি হয়নি!

মহিম আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ-সব তুমি কি বলচ অচলা?

অচলা কহিল, আমি এই বলচি যে, কি এমন গুরুতর অপরাধ তোমার কাছে করেচি, যাতে এই অপমানটা আমাকে না করলে তোমার চলছিল না?

মহিম হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কহিল, কি বলছ? এ-সব কথার মানে কি?

অচলা অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মানে এই যে, কি অপরাধে আমাকে এই অপমান করলে তুমি? তোমার কি করেছি আমি?

মহিম বিহ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তোমাকে অপমান করেছি?

অচলা বলিল, হাঁ, তুমি।

মহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মিছে কথা।

অচলা মুহূর্তকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, আমি কোনদিন মিছে কথা বলিনে। কিন্তু সে কথা যাক; এখন তোমার নিজের যদি সত্যবাদী বলে অভিমান থাকে, সত্য জবাব দেবে?

মহিম উৎসুক-দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল।

অচলা প্রশ্ন করিল, মৃণালদিদি যা করে আজ চলে গেলেন, তাকে কি তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমান করা বলে না?

মহিম বলিল, কিন্তু তাতে আমাকে জড়াতে চাও কেন?

অচলা কহিল, বলচি। আগে বল, তাতে কি বলা হয় এখানে?

মহিম কহিল, বেশ, তাই যদি হয়—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, হয় নয়, ঠিক জবাব দাও।

মহিম কহিল, হাঁ, পাড়াগাঁয়েও অপমান বলেই লোকে মনে করে।

অচলা কহিল, করে ত? তবে তুমি সমস্ত জেনে শুনে এই অপমান করিয়েছ। তুমি নিশ্চয় জানতে, তিনি আমার ছোঁয়া রান্না খাবেন না। ঠিক কি না? বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া মহিমের বুকের ভিতর পর্যন্ত যেন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। মহিম তেমনি অভিভূতের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে সুরেশের চিৎকার আসিয়া পৌঁছিল—মহিম! কোথা হে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একি, সুরেশ যে! এস এস, বাড়ির ভেতরে এস। ভাল ত?

মহিমের স্বাগত-সম্ভাষণ সমাপ্ত হইবার পূর্বে সুরেশ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের গ্লাডস্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, হ্যাঁ, ভাল। কিন্তু কি রকম, একা দাঁড়িয়ে যে? অচলা বধূঠাকুরানী একমুহূর্তে সচলা হয়ে অন্তর্ধান হলেন কিরূপে? তাঁর প্রবল বিশ্রম্ভালাপ মোড়ের ওপর থেকে যে আমাকে এ বাড়ির পাত্তা দিলে।

বস্তুতঃ অচলার শেষ কথাটা রাগের মাথায় একটু জোরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক দ্বারের বাহিরেই তাহা সুরেশের কানে গিয়াছিল।

সুরেশ কহিল, দেখলে মহিম, বিদুষী স্ত্রী-লাভের সুবিধে কত? ক'দিনই বা এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের প্রেমালাপের ধরনটা পর্যন্ত এমনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, খুঁত বের করে দেয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরও তা সাধ্য নেই।

মহিম লজ্জায় আকর্ণ রাঙ্গা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ ঘরের দিকে চাহিয়া অচলাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, অত্যন্ত অসময়ে এসে রসভঙ্গ করে দিলুম বৌঠান, মাপ কর। মহিম, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসবার কিছু থাকে ত নিয়ে চল, একটু বসি। হাঁটতে হাঁটতে ত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—ভাল জায়গায় বাড়ি করেছিলে ভাই—চল, চল, কলকাতায় চল।

চল, বলিয়া মহিম তাহাকে বাহিরের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল।

সুরেশ কহিল, বৌঠান কি আমার সামনে বের হবেন না নাকি? পর্দানশীন?

মহিম জবাব দিবার পূর্বেই পাশের দরজা ঠেলিয়া অচলা প্রবেশ করিল। তাহার মুখে কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নমস্কার করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু এমন অকস্মাৎ যে?

তাহার প্রফুল্ল হাসিমুখ সুখ-সৌভাগ্যের প্রসন্ন বিকাশ কল্পনা করিয়া সুরেশের বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন জ্বলিয়া উঠিল। হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, এখন দেখচি বটে, এমন অকস্মাৎ এসে পড়া উচিত হয়নি। কিন্তু কাণ্ডটা কি হচ্চিল? Their first difference না,—আসা পর্যন্ত এইভাবে মতভেদ চলচে? কোন্‌টা?

অচলা তেমনি হাসিমুখে কহিল, কোন্‌টা শুনলে আপনি বেশ খুশি হন বলুন? শেষেরটা ত? তা হলে আমার তাই বলা উচিত—অতিথিকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই।

সুরেশের মুখ গম্ভীর হইল; কহিল, কে বললে নেই? বাড়ির গৃহিণীর সেই ত হল আসল কাজ—সেই ত তার পাকা পরিচয়।

অচলা হাসিতে হাসিতে কহিল, গৃহই নেই, তার আবার গৃহিণী! এই দুঃখীদের কুঁড়ের মধ্যে কি করে যে আজ আপনার রাত্রি কাটবে, সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কিন্তু ধন্য আপনাকে, জেনে শুনে এ দুঃখ সইতে এসেছেন।

স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, নয়নবাবুকে ধরে চন্দ্রবাবুর বাড়িতে আজ রাতটার মত ওঁর শোবার ব্যবস্থা করা যায় না? তাঁদের পাকা বাড়ি—বসবার ঘরটাও আছে, ওঁর কষ্ট হতো না!

সৌজন্যের আবরণে উভয়ের শ্লেষের এই-সকল প্রচ্ছন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে মহিম মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কি করিয়া থামাইবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমনি অবস্থায় সুরেশ নিজেই তাহার প্রতিকার করিল; সহসা হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েচে বৌঠান, বরং একটু চা-টা দাও, খেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তার পরে নয়নবাবুকে বল, শ্রবণবাবুকে বল—

চন্দ্রবাবুর পাকা ঘরে শোবার জন্যে সুপারিশ ধরতে রাজি আছি। কিন্তু যাই বল মহিম, এর ওপর এত টান সত্যি হলে, খুশি হবার কথা বটে।

মহিমের হইয়া অচলাই তাহার উত্তর দিল; সহাস্যে কহিল, খুশি হওয়া না হওয়া মানুষের নিজের হাতে; কিন্তু এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এর ওপর টান না জন্মে বড়লাটের রাজপ্রাসাদের ওপর টান পড়লে সেইটে ত হত মিথ্যে। যাক, আগে গায়ে জোর হোক, তার পর কথা হবে। আমি চায়ের জল চড়াতে বলে এসেচি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে হাজির করে দিচ্চি—ততক্ষণ মুখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন; বলিয়া অচলা হাসিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইতেই সুরেশের বুকের জ্বালাটা যেন বাড়িয়া উঠিল। নিজেকে সে চিরদিনই দুর্বল এবং অস্থিরমতি বলিয়াই জানিত, এবং এজন্য তাহার লজ্জা বা ক্ষোভও ছিল না। ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধবেরা যখন মহিমের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে খেয়ালী প্রভৃতি বলিয়া অনুযোগ করিত, তখন সে মনে মনে খুশি হইয়া বলিত, সে ঠিক যে, তাহার সঙ্কল্পের জোর নাই, সে প্রবৃত্তির বাধ্য; কিন্তু হৃদয় তাহার প্রশস্ত—সে কখনও হীন বা ছোট কাজ করে না। সে নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না, পাত্রাপাত্র হিসাব করিয়া দান করিতে পারে না—মন কাঁদিয়া উঠিলে গায়ের বস্ত্রখানা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া চলিয়া আসিতে তাহার বাধে না—তা সে যাহাকে এবং যে কারণেই হোক; কিন্তু এ কথা কাহারও বলিবার জো নেই যে, সুরেশ কাহাকেও দ্বেষ করিয়াছে, কিংবা স্বার্থের জন্য এমন কোন কাজ করিয়াছে, যাহা তাহার করা উচিত ছিল না। সুতরাং আজন্মকাল হৃদয়ের ব্যাপারে যাহার একান্ত দুর্বল বলিয়াই অখ্যাতি ছিল এবং নিজেও যাহা সে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত, সেই সুরেশ যখন অকস্মাৎ অচলার সম্পর্কে শেষ-মুহূর্তে আপনার এত বড় কঠোর সংযমের পরিচয় পাইল, তখন নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির দেখা পাইয়া কেবল আত্মপ্রসাদই লাভ করিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় গর্বে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।অচলার বিবাহের পরে দুটো দিন সে

আপনাকে নিরন্তর এই কথাই বলিতে লাগিল—সে শক্তিহীন অক্ষম নয়—সে প্রবৃত্তির দাস নয়; বরঞ্চ আবশ্যক হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিটাকেই সে বুকের ভিতর হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। বন্ধুত্ব যে কি, তাহার সুখের জন্য একজন যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, এইবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী বুঝুন গিয়া।

কিন্তু কোন মিথ্যা দিয়াই দীর্ঘকাল একটা ফাঁক ভরাইয়া রাখা যায় না। আত্মসংযম তাহার সত্য বস্তু নয়, ইহা আত্মপ্রতারণা। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ না কাটিতেই এই মিথ্যা সংযমের মোহ তাহার বিস্ফারিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে লাগিল, মন তাহার বারংবার বলিতে লাগিল, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সে পাইল কি? ইহা তাহাকে কি দিল? কোন্ অবলম্বন লইয়া সে আপনাকে এখন খাড়া রাখিবে? পিসিমা বলিলেন, বাবা, এইবার তুই এমনি একটি বৌ ঘরে আন্, আমি নিয়ে সংসার করি।

একদিন সমাজের দোরগোড়ায় কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, কাজটা তাঁহার ভাল হয় নাই। মহিমের সহিত বিবাহ দিতে ত গোড়াগুড়িই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—শুধু সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল বলিয়াই তিনি অবশেষে মত দিলেন। ঘরে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল, এই বিবাহ দ্বারা তাহাদের কেহই যেন সুখী না হয়। নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার অপরাধ বন্ধুও অনুভব করুন, অচলাও যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মরে। কিন্তু তাই বলিয়া মন তাহার ছোট নয়। এই অকল্যাণ কামনার জন্য নিজেকে সে অনেকরকম করিয়া শাসিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পীড়িত প্রতারিত হৃদয় কিছুতেই বশ মানিল না—নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলের মত নিরন্তর ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমনি করিয়া মাস-খানেক সে কোনমতে কাটাইয়া দিয়া একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্যাগ হাতে মহিমের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এখন দেখতে পাচ্চো মহিম, আমার কথাটা কতখানি সত্যি?

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা?

সুরেশ বিজ্ঞের মত বলিল, আমার পল্লীগ্রামে বাস নয় বটে, কিন্তু এর সমস্তই আমি জানি। আমি তথাপি কি সাবধান করে দিইনি যে, গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে একটা ঘোরতর বিরোধ বাধবে?

মহিম সহজভাবে কহিল, কৈ, তেমন বিরোধ ত কিছু হয়নি।

বিরোধ আর বল কাকে? তোমার বাড়িতে কেউ খেলে কি? সেইটেই কি যথেষ্ট অশান্তি অপমান নয়?

আমি খেতে কাউকে বলিনি।

বলনি? আচ্ছা, কৈ, বৌভাতে আমাকে ত নেমন্তন্ন করনি মহিম?

ওটা হয়নি বলেই করিনি।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বৌভাত হয়নি? ওঃ—তোমাদের যে আবার—কিন্তু এমন করে ক'টা উপদ্রব এড়ানো যাবে মহিম? আপদ-বিপদ আছে, ছেলেমেয়ের কাজ-কর্ম আছে—সংসার করতে গেলে নেই কি? আমি বলি—

যদুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজে থালায় করিয়া মিষ্টান্ন লইয়া অচলা প্রবেশ করিল। সুরেশের শেষ কথাটা তাহার কানে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার মুখের ভাবে সুরেশ তাহা ধরিতে পারিল না। দুই বন্ধুর জলযোগ এবং চা-পান শেষ হইলে মহিম কাঁধের উপর চাদরটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের জমিদার মুসলমান, তাঁহার ছেলেটিকে মহিম ইংরাজি পড়াইত। জমিদারসাহেব নিজে লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার ঔদার্য ছিল, মহিমের সহিত সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এইজন্য গ্রামের লোক সমাজের দোহাই দিয়া আজও তাহার উপর উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই।

অচলা কহিল, আজ পড়াতে না গেলেই কি হতো না?

মহিম কহিল, কেন?

অচলার মনের জোর ও অন্তরের নির্মলতা যত বড়ই হোক, সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে তাহার আকস্মিক অভ্যাগমে কোন রমণীই সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরেশকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার হৃদয় যত মহৎই হোক, সে হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না—এমন কি, ভয়ই করিত। এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একলা ফেলে—

মহিম কহিল, তাতে অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া তুমি ত রইলে—

অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না। সুরেশের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাদের উড়ে বামুনটি এমনি পাকা রাঁধুনী যে, তার সঙ্গে না থাকলে কিছুই মুখে দেবার জো থাকবে না। আমি বলি, তুমি বরঞ্চ—

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। ঘণ্টা-দুই বৈ ত নয়। বলিয়া ঘরের কোণ হইতে সে লাঠিটা তুলিয়া লইল। একে ত মহিমের কাজের ধারা সহজে বিপর্যস্ত হয় না, তাহাতে এই একটা সামান্য কারণ লইয়া বারংবার নির্বন্ধ প্রকাশ করিতেও অচলার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে ভয়টা তাহার সুরেশের চোখে ধরা পড়িয়া লজ্জাটা শতগুণ হইয়া উঠে।

মহিম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইয়া সুরেশ অচলাকে হাসিয়া কহিল, কেন নিজের মুখ হেঁট করা! চিরকাল জানি, ও সে পাত্রই নয় যে, কারও কথা রাখবে।

তুমি বরং যা হোক একখানা বই আমাকে দিয়ে নিজের কাজে যাও—আমার দিব্যি সময় কেটে যাবে।

কথাটা হঠাৎ অচলাকে বাজিল যে, বাস্তবিকই মহিম কোনদিন কোন অনুরোধই তাহার রক্ষা করে না। হউক না ইহা তাহার সুমহৎ গুণ, কিন্তু তবুও সুরেশের মুখ হইতে স্বামীর এই আজন্ম কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় তাহারই সম্মুখে আজ তাহাকে অপমানকর উপেক্ষার আকারে বিঁধিল। কোন কথা না কহিয়া, সে নিজের ঘরে গিয়া, যদুকে দিয়া একখানা বাংলা বই পাঠাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ কতদিন এখানে থাকবে তোমাকে বললে?

এমনি ত নানা কারণে আজ সারাদিনই স্বামীর উপর তাহার মন প্রসন্ন ছিল না; তাহাতে এই প্রশ্নের মধ্যে একটা কুৎসিত বিদ্রূপ নিহিত আছে কল্পনা করিয়া সে চক্ষের নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল; কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

মহিম অবাক হইয়া গেল। সে সোজাভাবেই কথাটা জানিতে চাহিয়াছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাহাদের এতক্ষণের আলাপের মধ্যে এ প্রশ্নটা সে বন্ধুকে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই এবং সুরেশ নিজে হইতে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুরেশ নিশ্চয়ই অচলাকে তাহা বলিয়াছে।

মহিমকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অচলা নিজেই বলিল, এ কথার মানে এত সোজা যে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবারও দরকার নেই। তোমার বিশ্বাস যে, সুরেশবাবু কোন সঙ্কল্প নিয়েই এখনে এসেছেন, এবং তা সফল হতে কত দেরি হবে সে আমি জানি। এই ত?

মহিম আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, আমার ও-রকম কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু মৃণালের ব্যবহারে আজ তোমার মন ভাল নেই, তুমি কিছুই ধীরভাবে বুঝতে পারবে না। আজ শোও, কাল সে কথা হবে। বলিয়া নিজেই বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিল।

অচলাও শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে সারাদিন যে বিরক্তি উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, সামান্য একটা কলহের আকারে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারিলে হয়ত সে সুস্থ হইতে পারিত; কিন্তু এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে নিজের মধ্যেই শুধু পুড়িতে লাগিল। অথচ যে প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাকে অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গায়ে পড়িয়া আন্দোলন করায় যে লজ্জা এবং ইতরতা আছে, তাহাও তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে শুধু কল্পনায় স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, জ্বালাময়ী প্রশ্নোত্তরমালায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া শয্যায় ছটফট করিতে লাগিল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া অচলা ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যদু কেৎলি হাতে করিয়া রান্নাঘরে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কিছু বলে গেছেন যদু?

যদু কহিল, এক প্রহর বেলার মধ্যেই ফিরে আসবেন বলে গেছেন।

মহিম প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের ক্ষেতখামার দেখিতে যাইত; ফিরিয়া আসিতে কোনদিন বা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।

অচলা প্রশ্ন করিল, নতুনবাবু উঠেছেন?

যদু কহিল, উঠেছেন বৈ কি! তিনিই ত চা তৈরি করতে বলে দিলেন।

অচলা তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুরেশ বহুক্ষণ পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া, খোলা দরজার সুমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কালকের সেই বইখানা পড়িতেছে। অচলার পদশব্দে সুরেশ বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার মুখের উপর রাত্রিজাগরণের সমস্ত চিহ্ন দেদীপ্যমান। চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, গণ্ড পাংশু, ওষ্ঠ মলিন—সে যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার দুই চক্ষু ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না।

তাহার চাহনির ভঙ্গীতে অচলা বিস্মিত হইল, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিল না; কহিল, কখন উঠলেন? আমার উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল।

তাই ত দেখছি, বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। সুমুখের দেওয়ালের গায়ে বহুদিনের পুরাতন একটা বড় আরশি টাঙ্গান ছিল; ঠিক সেই সময়েই অচলার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ায়, সুরেশের চাহনির অর্থ একমুহূর্তেই তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং নিজের শ্রীহীনতার লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এই মুখখানা কেমন করিয়া লুকাইবে, কোথায় লুকাইবে, সুরেশের মিথ্যা ধারণার কি করিয়া প্রতিবাদ করিবে—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, যাই, আপনার চা নিয়ে আসি গে।

সুরেশ কোন কথা বলিল না, শুধু একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট-দশেক পরে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অচলা পুনরায় যখন প্রবেশ করিল, তখন সুরেশ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল। চা খাইতে খাইতে সুরেশ কহিল, কৈ, তুমি চা খেলে না?

অচলা হাসিয়া কহিল, আমি আর খাইনে।

কেন খাও না?

আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া, এ জায়গাটা গরম না কি, খেলে ঘুম হয় না। কাল ত প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি। হাসিয়া বলিল, একটা রাত ঘুম না হলে চোখমুখের কি যে শ্রী হয়—পোড়া-মুখ যে আর লোকের সামনে বার করা যায় না। বলিয়া লজ্জিত মুখে হাসিতে লাগিল।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ তোমার ছেলেবেলার অভ্যাস, চা খেতে মহিম অনুরোধ করে না?

অচলা হাসিয়া বলিল, অনুরোধ করলেই বা শুনবে কে? তা ছাড়া এ আর এমন কি জিনিস যে না খেলেই নয়?

এ হাসি যে শুষ্ক হাসি সুরেশ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি ত জানই, ভূমিকা করে কথা বলা আমার অভ্যাসও নয়, পারিও নে। কিন্তু স্পষ্ট করে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কি তুমি রাগ করবে?

অচলা হাসিমুখে কহিল, শোন কথা! রাগ করব কেন?

সুরেশ কহিল, বেশ। তা হলে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখানে সুখে আছ কি?

অচলার হাসিমুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, এ প্রশ্ন আপনার করাই উচিত নয়।

কেন নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি সুখে নেই—এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায়।

সুরেশ একটুখানি ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, মনটা কি ন্যায়-অন্যায় ভেবে নিয়ে তবে মনে করে অচলা? কেবল মাস-দুই পূর্বে এ ভাবনা শুধু যে আমার উচিত ছিল তাই নয়, এ ভাবনায় অধিকার ছিল। আজ দু'মাস পরে সব অধিকার যদি ঘুচে থাকে ত থাক, সে নালিশ করিনে, এখন শুধু সত্যি কথাটা জেনে যেতে চাই। এসে পর্যন্ত একবার মনে হচ্ছে জিতেছ, একবার মনে হচ্ছে হেরেছ। আমার মনটা ত তোমার অজানা নেই—একবার সত্যি করে বল ত অচলা, কি?

দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল; কিন্তু প্রাণপণে তাহাদের শক্তি প্রতিহত করিয়া অচলা বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বেশ আছি।

সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, ভালই।

ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ অকস্মাৎ যেন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আর একটা কথা। তোমার জন্যে যে আমি কত সয়েচি, সে কি তোমার কখনো—

অচলা দুই কানে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত আলোচনা আপনি মাপ করবেন।

সুরেশ খোলা দরজায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া অচলার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, না, মাপ আমি করতেই পারিনে, তোমাকে শুনতেই হবে।

তাহার চোখে সেই দৃষ্টি—যাহা মনে পড়িলে আজও অচলা শিহরিয়া ওঠে। একটুখানি পিছাইয়া গিয়া সভয়ে কহিল, আচ্ছা বলুন—

সুরেশ কহিল, ভয় নেই, তোমার গায়ে আমি হাত দেব না—আমার এখনো সে জ্ঞান আছে। বলিয়া পুনরায় চৌকির উপরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, আমি তোমার ওপর সমস্ত অধিকার হারালেও, আমার ওপর তোমার সমস্ত অধিকার বর্তমান আছে।

অচলা বাধা দিয়া কহিল, এ মনে রাখায় আমার কোন লাভ নেই, কিন্তু—, বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল, কথাটা যেন সজোরে আঘাত করিয়া সুরেশকে পলকের জন্য বিবর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সেই মুহূর্তে নিজেও স্পষ্ট অনুভব করিল অনুতাপের কথা তাহার নিজের পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সে কোমলকণ্ঠে বলিল, সুরেশবাবু, এ-সব কথা আমারও শোনা পাপ, আপনারও বলা উচিত নয়। কেন আপনি এ-সব কথা তুলে আমাকে দুঃখ দিচ্চেন?

সুরেশ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, দুঃখ কি পাও অচলা?

অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?

সুরেশ তাহার সেই দৃষ্টি অচলার মুখের উপর হইতে নামাইল না বটে, কিন্তু অচলার দুই চক্ষু নত হইয়া পড়িল। সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল, ব্যস্, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর চাইনে। বলিয়া এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তুমি যখন পাষাণ নও, তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেছি, তখন তোমারও দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার থাক—এই বর আজ মাগি—আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও। বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অচলার চোখ দিয়াও তাহার বিগত দিবারাত্রির সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইবার গলিয়া ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি সময়ে ঠিক দ্বারের বাহিরেই জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কি হে সুরেশ, চা-টা খেলে?

সুরেশ সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে কোনমতে মুখ নিচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাঠের ভিতর এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আপনাকে সংবরণ করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

মানব-চিত্ত যে অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে পারে, সুরেশের তখন সেই অবস্থা। সে চট করিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল; সলজ্জ হাস্যে, উদারভাবে স্বীকার করিল যে, সে বাস্তবিকই ভারী দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মহিম সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, এমন কি তাহার হেতু পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না।

সুরেশ তখন নিজেই নিজের কৈফিয়ত দিতে লাগিল। কহিল, যিনি যাই বলুন মহিম, এ আমি জোর করে বলতে পারি যে, এদের চোখে জল দেখলে কোথা থেকে যেন নিজেদের চোখেও জল এসে পড়ে—কিছুতে সামলানো যায় না। আমি না গিয়ে পড়লে কেদারবাবু ত এ যাত্রা কিছুতেই বাঁচতেন না, কিন্তু বুড়ো আচ্ছা বদমেজাজী লোক হে মহিম, একটিমাত্র মেয়ে, তবুও তাকে খবর দিতে দিলে না। বিয়ের দিন থেকে সেই যে ভদ্রলোক চটে আছে, সে চটা আর জোড়া লাগল না। বললুম, যা হবার, সে ত হয়েই গেছে—

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, চা পেয়েছ ত হে?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ পেয়েছি। কিন্তু বাপের কাছে এ-রকম ব্যবহার পেলে কার চক্ষে না জল আসে বল? পুরুষমানুষই সব সময় সইতে পারে না, এ ত স্ত্রীলোক।

মহিম বলিল, তা বটে। রাত্রে তোমার শোবার কোন ব্যাঘাত হয়নি সুরেশ, বেশ ঘুমোতে পেরেছিলে? নতুন জায়গা—

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, না, নতুন জায়গায় আমার ঘুমের কোন ত্রুটি হয়নি—একপাশেই রাত কেটে গেছে। আচ্ছা মহিম, কেদারবাবু তাঁর অসুখের খবর তোমাদের একেবারেই দিলেন না, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার ভেবে দেখ দেখি!

মহিম একান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য বৈ কি! বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, হাতমুখ ধুয়ে একটু বেড়াতে বার হবে নাকি? যাও ত একটু চটপট সেরে নাও ভাই, আমাকে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে। এখনও আমার সকালের কাজকর্মই সারা হয়নি।

সুরেশ তাহার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া কহিল, গল্পটা বেশ লাগছে—এটা শেষ করে ফেলি।

তাই কর। আমি ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আসছি, বলিয়া মহিম উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে পিছন ফিরিবামাত্রই সুরেশ চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল, কোন্ অদৃশ্য হস্ত এক মুহূর্তের মধ্যে আগাগোড়া মুখখানার উপরে যেন এক পোঁচ লজ্জার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

যে দ্বার দিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল, সেই খোলা দরজার প্রতি নির্নিমেষ চাহিয়া সুরেশ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অযাচিত জবাবদিহির সমস্ত নিষ্ফলতা ক্রুদ্ধ অভিমানে তাহার সর্বাঙ্গে হূল ফুটাইয়া দংশন করিতে লাগিল।

দুই বন্ধুর কথোপকথন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অচলা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। মহিম কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিবার অব্যবহিত পরেই সে কবাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মহিম মুখ তুলিয়া চাহিতেই অচলা স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি তোমার কাছে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেছেন?

অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া মহিম জিজ্ঞাসুমুখে নীরব রহিল।

অচলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথাটা বুঝি বুঝতে পারলে না?

মহিম কহিল, না, কথাগুলো প্রিয় না হলেও স্পষ্ট বটে; কিন্তু তার অর্থ বোঝা কঠিন। অন্ততঃ আমার পক্ষে বটে।

অচলা অন্তরের ক্রোধ যথাশক্তি দমন করিয়া জবাব দিল, এ-দুটোর কোনটাই তোমার কাছে কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে স্বীকার করা। সুরেশবাবুকে যে কথা তুমি স্বচ্ছন্দে জানিয়ে এলে, সেই কথাটাই আমাকে জানাবার বোধ করি তোমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার বাবা কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন যে, তাঁর সাংঘাতিক অসুখের খবরটাতে তুমি কান দেওয়া আবশ্যক মনে কর না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুবই করি। কিন্তু যেখানে সে আবশ্যক নেই, সেখানে আমাকে কি করতে বল?

অচলা কহিল, কোন্‌খানে আবশ্যক নেই শুনি?

মহিম ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কঠোরকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, যেমন এইমাত্র সুরেশের ছিল না। আর যেমন এ নিয়ে তোমারও এতখানি রাগারাগি করে আমার মুখ থেকে কড়া টেনে বার করবার প্রয়োজন ছিল না। যাক, আর না। যার তলায় পাঁক আছে, তার জল ঘুলিয়ে তোলা আমি বুদ্ধির কাজ মনে করিনে। বলিয়া মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, অচলা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে সে দাঁত দিয়া সজোরে অধর চাপিয়া রহিল, ঠিক যেন একটা আকস্মিক দুঃসহ আঘাতের মর্মান্তিক চিৎকার সে প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছে মনে হইল। তারপরে কহিল, তোমার বাইরে কি বিশেষ জরুরি কোন কাজ আছে? দু’ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না?

মহিম কহিল, তা পারব।

অচলা কহিল, তা হলে কথাটা স্পষ্ট হয়েই যাক। জল যখন সরে আসে, তখনই পাঁকের খবর পাওয়া যায়, এই না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

অচলা বলিল, নিরর্থক জল ঘুলিয়ে তোলার আমিও পক্ষপাতী নই, কিন্তু সেই ভয়ে পঙ্কোদ্ধারটাও বন্ধ রাখা কি ভাল? একদিন যদি ঘোলায় ত ঘোলাক না, যদি বরাবরের জন্যে পাঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়! কি বল?

মহিম কঠিনভাবে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি দরকারী কাজ আমার পড়ে রয়েছে—এখন সময় হবে না।

অচলা ঠিক তেমনি কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল, তোমার এই ঢের বেশি দরকারী কাজ সারা হয়ে গেলে ফুরসত হবে ত? ভাল, ততক্ষণ আমি না হয় অপেক্ষা করেই রইলুম। বলিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে স্নান করিবার প্রসঙ্গ লইয়া বাহিরে সুরেশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার তখন মুখের শ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন চেহারা সুরেশ চোখ তুলিবামাত্র অনুভব করিল। মহিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না।

অচলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি হচ্ছে?

সুরেশ ব্যাগের মধ্যে তাহার কল্যকার ব্যবহৃত জামা-কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, কহিল, একটার মধ্যেই ত ট্রেন, একটু আগেই ঠিক করে নিচ্চি।

অচলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি আজই যাবেন নাকি?

সুরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, কেন বলুন ত?

সুরেশ তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই বলিল, আর থেকে কি হবে? তোমাদের একবার দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তবে উঠে আসুন। এ-সব কাজ আপনাদের নয়, মেয়েমানুষের; আমি গুছিয়ে সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমাকে কিছু করতে হবে না—এ কিছুই নয়—এ অতি—

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অচলা ব্যাগটা তাহার সুমুখ হইতে টানিয়া লইয়া সমস্ত জিনিসপত্র উপুড় করিয়া ফেলিয়া ভাঁজ করা কাপড় আর একবার ভাঁজ করিয়া ধীরে ধীরে ব্যাগের মধ্যে তুলিতে লাগিল। সুরেশ অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, এর কিছুই আবশ্যক ছিল না—সে যদি—আমি নিজেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথারই প্রত্যুত্তর করিল না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে করিতে কহিল, আপনার ভগিনী কিংবা স্ত্রী থাকলে তাঁরাই করতেন, আপনাকে করতে দিতেন না; কিন্তু আপনার ভয় যদি বন্ধুটি ফিরে এসে দেখতে পান—এই না? কিন্তু তাতেই বা কি, এ ত মেয়েমানুষেরই কাজ।

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র মহিমের সহিত তাহার যাহা হইয়া গিয়াছে, অচলা তাহা নিশ্চয়ই জানে না। তাই কথাটা পাড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহার সাহস হইল না, অথচ ভয় করিতেও লাগিল, পাছে সে আসিয়া পড়িয়া আবার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া ফেলে।

ব্যাগটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, বাবার অসুখের কথা না তুললেই ছিল ভাল। এতে তাঁর অপমানই শুধু সার হল—উনি ত গ্রাহ্যই করলেন না।

সুরেশ চকিত হইয়া কহিল, কি বললে তোমাকে মহিম?

অচলা তাহার ঠিক জবাব না দিয়া পাশের দরজাটা চোখ দিয়া দেখাইয়া কহিল, ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই সমস্ত শুনেচি।

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সেজন্যে আমি তোমার কাছে মাপ চাচ্চি অচলা।

অচলা মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কেন?

সুরেশ অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, কারণ ত তুমি নিজেই বললে। আমার নিজের দোষে তাঁকে তোমাকে দুজনকে আজ আমি অপমান করেছি; সেইজন্যেই তোমার কাছে বিশেষ করে ক্ষমা প্রার্থনা করচি অচলা!

অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল। সহসা তাহার সমস্ত চোখমুখ যেন ভিতরের আবেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, যাই কেননা আপনি করে থাকেন সুরেশবাবু, সে ত আমার জন্যেই করেছেন? আমাকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই ত আজ আপনার এই লজ্জা। তবুও আমার কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এত বড় অমানুষ আমি নই। কিসের জন্যে আপনি লজ্জিত হচ্ছেন? যা করেছেন, বেশ করেছেন।

সুরেশের বিস্মিত হতবুদ্ধিপ্রায় মুখের পানে চাহিয়া অচলা বুঝিল, সে তাহার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আজই আপনি যাবেন না, সুরেশবাবু! এখানে লজ্জা যদি কিছু পেয়ে থাকেন সে ত আমারই লজ্জা ঢাকবার জন্যে; নইলে নিজের জন্যে আপনার ত কোন দরকারই ছিল না! আর বাড়ি আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও ত কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আজ আমি নিমন্ত্রণ করচি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছুদিন থাকুন।

তাহার সাহস দেখিয়া সুরেশ অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত-হৃদয়ে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, মহিম তাহার বাহিরের

কাজ সারিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। অচলা তখন পর্যন্ত ব্যাগটা সম্মুখে লইয়া মেঝের উপর বসিয়া এই দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; পাছে মহিমের আগমন জানিতে না পারিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে যে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে মহিম, কাজ সারা হল তোমার?

হাঁ হল, বলিয়া মহিম ঘরে পা দিয়াই অচলাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও কি হচ্ছে?

অচলা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া কহিল, আপনি আমারও ত বন্ধু—শুধু বন্ধুই বা কেন, আমাদের যা করছেন, তাতে আপনি আমার পরমাত্মীয়। এমন করে চলে গেলে আমার লজ্জার, ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে ত আমি কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারব না।

সুরেশ শুষ্ক হাসিয়া কহিল, শোন কথা মহিম! তোমাদের দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম বাস্! কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অনর্থক বেশিদিন ধরে রেখে তোমাদেরই বা লাভ কি, আর আমারই বা সহ্য করে ফল কি বল?

মহিম ধীরভাবে জবাব দিল, বোধ করি রাগ করে চলে যাচ্ছিলে; কিন্তু সেটা উনি পছন্দ করেন না। অচলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, তুমি পছন্দ কর নাকি?

মহিম জবাব দিল, আমার কথা ত হচ্ছে না।

সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তার এই অপ্রিয় আলোচনা কোনমতে থামাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্লতার ভান করিয়া সহাস্যে কহিল, এ কি মিথ্যে অপবাদ দেওয়া! রাগ করব কেন হে, আচ্ছা লোক ত তোমরা! বেশ, খুশিই যদি হও, আরও দু-একদিন না হয় থেকেই যাবো। বৌঠান, কাপড়গুলো আর তুলে কাজ নেই, বের করেই ফেলো। মহিম, চল হে, তোমাদের পুকুর থেকে আজ স্নান করেই আসা যাক; তার পরে বাড়ি গিয়ে না হয় একশিশি কুইনিনই গেলা যাবে।

চল, বলিয়া মহিম জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা নূতন জুতার সুতীক্ষ্ণ কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভান করে, ঠিক তাহাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসিখুশিতে কাটাইয়া দিল; কিন্তু আর একজন, যাহাকে আরও গোপনে এই দংশনের অংশ গ্রহণ করিতে হইল, সে পারিল না।

স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্যের কাছে এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এত বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে অপমানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সে আজও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল। সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, এই তীক্ষ্ণ-ধীমান অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্তেই যেন তাহারি মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আজ সকালবেলার পরে মহিম আর বাটীর বাহির হয় নাই; সুতরাং দিনের বেলায় ভাত খাওয়া হইতে শুরু করিয়া রাত্রির লুচি খাওয়া পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়টাই এইভাবে কাটিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানার উপর ছটফট করিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, সারারাত্রি আলো জ্বেলে পড়লে আর একজন ঘুমোতে পারে না। তোমার কাছে এটুকু দয়াও কি আর আমি প্রত্যাশা করতে পারিনে?

তাহার কণ্ঠস্বরে মহিম চমকিয়া উঠিয়া এবং তাড়াতাড়ি বাতিটা নামাইয়া দিয়া কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে মাপ করো। বলিয়া বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। এই প্রার্থিত অনুগ্রহলাভের জন্য অচলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না, কিন্তু ইহা তাহার নিদ্রার পক্ষেও লেশমাত্র সাহায্য করিল না। বরঞ্চ যত সময় কাটিতে লাগিল, এই নিঃশব্দ অন্ধকার যেন

ব্যথায় ভারী হইয়া প্রতি মুহূর্তেই তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সহিতে না পারিয়া এক সময়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, সংসারে ভুল করলেই তার শাস্তি পেতে হয়, এ কথা কি সত্যি?

মহিম অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, অভিজ্ঞ লোকেরা তাই ত বলেন।

অচলা পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তবে যে ভুল আমরা দু'জনেই করেছি, যার কুফল গোড়া থেকেই শুরু হয়েচে, তার শেষ ফলটা কি-রকম দাঁড়াবে, তুমি আন্দাজ করতে পারো?

মহিম কহিল, না।

অচলা কহিল, আমিও পারিনে। কিন্তু ভেবে ভেবে আমি এটুকু বুঝেছি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ বলেই এই শাস্তির বেশি ভার পুরুষের বহা উচিত।

মহিম বলিল, আরও একটু ভাবলে দেখিতে পাবে, মেয়েমানুষের বোঝা তাতে এক তিল কম পড়ে না। কিন্তু পুরুষটি কে? আমি, না সুরেশ?

অচলা যে শিহরিয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্যেও মহিম তাহা অনুভব করিল।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে একদিন আমাকে মুখের ওপরেই অপমান করতে শুরু করবে, এ আমি ভেবেছিলুম। আর এও জানি, এ জিনিস একবার আরম্ভ হলে কোথায় যে শেষ হয়, তা কেউ বলতে পারে না; কিন্তু আমি ঝগড়া করতেও পারব না, কিংবা বিয়ে হয়েচে বলেই ঝগড়া করে তোমার ঘর করতেও পারব না। কাল হোক, পরশু হোক, আমি বাবার ওখানে ফিরে যাবো।

মহিম কহিল, তোমার বাবা কিন্তু আশ্চর্য হবেন।

অচলা বলিল, না। তিনি জানতেন বলেই আমাকে বারংবার সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এর ফল কোনদিন ভাল হবে না। কলকাতায় চলে,

কিন্তু পল্লীগ্রামে সমাজ, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ত্যাগ করে শুধু স্ত্রী নিয়ে কারও বেশি দিন চলে না। সুতরাং তিনি আর যাই হোন, আশ্চর্য হবেন না।

মহিম কহিল, তবে তাঁর নিষেধ শোনোনি কেন?

অচলা প্রাণপণ-বলে একটা উচ্ছ্বসিত শ্বাস দমন করিয়া লইয়া কহিল, আমি ভাবতুম, তুমি কিছুই না বুঝে কর না।

সে ধারণা ভেঙ্গে গেছে?

হাঁ।

তাই ভাগের কারবারে সুবিধে হলো না টের পেয়ে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছো?

হাঁ।

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে যেয়ো। কিন্তু একে ব্যবসা বলেই যদি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ কথাটাও ভুলো না যে, ব্যবসা জিনিসটাকেও বুঝতে সময় লাগে। সে ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে আমাকে জানিয়ো, আমি তখনি গিয়ে নিয়ে আসব।

অচলার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া বলিল, ভুল মানুষের বাব বার হয় না। তোমার সে কষ্ট স্বীকার করবার দরকার হবে, মনে করিনে।

মহিম কহিল, মনে করা যায় না বলেই তাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে আজ আমাকে মাপ কর, আমি আর বকতে পারচি নে।

অচলা আঘাত পাইয়া বলিল, আমাকে কি তুমি তামাশা করচ? তা যদি হয়, তোমার ভুল হচ্ছে। আমি সত্যই কাল-পরশু চলে যেতে চাই।

মহিম কহিল, আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে।

অচলা হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে রাখবে? সে তুমি কিছুতেই পারো না, জানো?

মহিম শান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বেশ ত, সেও ত আজই রাত্রে নয়। কাল-পরশু যখন যাবে, তখন বিবেচনা করে দেখলেই হবে। ঢের সময় আছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। বলিয়া সে মাথার বালিশটা উলটাইয়া লইয়া সমস্ত প্রসঙ্গ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিল এবং বোধ করি বা পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চা খাইতে বসিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিম ত মাঠের চাষবাস দেখতে আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে বোধ হয়?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার জো নেই।

সুরেশ চায়ের বাটিটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, এক হিসেবে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তার কাজের একটা গতি আছে, যা কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ চলবেই।

অচলা কহিল, কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল বলেন?

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা বলি, কেননা, এ ক্ষমতা আমার নিজের সাধ্যাতীত। দুর্বল হওয়ার যে কত দোষ, সে ত আমি জানি; তাই যে স্থিরচিত্ত, তাকে আমি প্রশংসা না করে পারিনে। কিন্তু আজ আমাকে ছুটি দাও, আমি বাড়ি যাই।

অচলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, যান। আমি কাল যাচ্চি।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, তুমি কোথায় যাবে কাল?

কলকাতায়।

হঠাৎ কলকাতায় কেন? কৈ, কাল এ মতলব ত শুনিনি?

বাবার অসুখ, তাই তাঁকে একবার দেখতে যাবো।

সুরেশের মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, অসুস্থ বাপকে হঠাৎ দেখবার ইচ্ছে হওয়া কিছু সংসারে আশ্চর্য ঘটনা নয়; কিন্তু ভয় হয়, পাছে বা আমার জন্যেই একটা রাগারাগি করে—

অচলা তাহার কোন জবাব দিল না। যদু সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, সুরেশ ডাকিয়া কহিল, তোর বাবু মাঠ থেকে ফিরেছেন রে?

যদু কহিল, তিনি ত আজ সকালে বার হননি! তাঁর পড়বার ঘরে ঘুমোচ্চেন।

অচলা তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মহিম একটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া দুই পা টেবিলের উপরে তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। একটা লোক রাত্রের অতৃপ্ত নিদ্রা এইভাবে পোষাইয়া লইতেছে, সংসারে ইহা একান্ত অদ্ভুত নহে, কিন্তু অচলার বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে স্বচক্ষে দেখিল, তাহার স্বামী দিনের কর্ম বন্ধ রাখিয়া এই অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিস পড়িল যাহা ইতিপূর্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে; কপালের উপর যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে, এক বৎসর পূর্বেও সেখানে সে-সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখের চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত, পীড়িত। সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নিঃশব্দেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিকদানিটা পায়ে ঠেকিয়া যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতেই মহিম চোখ মেলিয়া চাহিল, অচলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, এখন ঘুমাচ্চো যে? অসুখ করেনি ত?

মহিম চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি জানি, অসুখ না হওয়াই ত আশ্চর্য!

অচলা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই সুরেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল, মহিম অদূরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল; অচলা দ্বারের নিকট আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, কাল আমিও যাচ্ছি। সুবিধে হলে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

সুরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই নাকি? বলিয়াই মহিমের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠানকে তুমি কাল কলকাতা পাঠাচ্চ নাকি মহিম?

স্ত্রীর এই গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতায় মহিমের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুখের ভাব প্রসন্ন রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে নাটক তৈরি করার রীতি নেই। কালই বা কেন, আজই ত তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

সুরেশের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; অচলা চক্ষের পলকে তাহা লক্ষ্য করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, সুরেশবাবু, আমাদের শহরে বাড়ি বলে লজ্জিত হবার কারণ নেই। অসুস্থ বাপ-মাকে দেখতে যাওয়া যদি পাড়াগাঁয়ের রীতি না হয়, আমি ত বলি আমাদের শহরের নাটকই ঢের ভাল। আপনি না হয় আজকের দিনটেও থেকে যান না, কাল একসঙ্গেই যাবো।

তাহার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল, না না, আমার আর থাকবার জো নেই বৌঠান! তোমার ইচ্ছে হলে কাল যেয়ো, কিন্তু আমি আজই চললুম। বলিতে বলিতেই সে তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার উত্তেজনার আবেগ অচলাকেও একবার যেন মূল হইতে নাড়িয়া দিল। সে অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এখনও ট্রেনের অনেক দেরি সুরেশবাবু, এরি মধ্যে যাবেন না—একটু দাঁড়ান। আমার দুটো কথা দয়া করে শুনে যান। তাহার আর্ত কণ্ঠস্বরের আকুল অনুরোধে উভয় শ্রোতাই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

অচলা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু, কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে বলো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।

মহিম বিহ্বলের ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি জানো মহিম, উনি ব্রাহ্মমহিলা। নামে স্ত্রী হলেও ওঁর ওপর পাশবিক বলপ্রয়োগের তোমার অধিকার নেই।

মহিম মুহূর্তকালের জন্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া শান্তস্বরে স্ত্রীকে কহিল, তুমি কিসের জন্যে কি করচ, একবার ভেবে দেখ দিকি অচলা। সুরেশকে কহিল, পশু-বল, মানুষ-বল, কোন জোরই আমি কারও উপর কোন দিন খাটাই নে। বেশ ত সুরেশ, তুমি যদি থাকতে পার, আজকের দিনটা থেকে ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও না। আমি নিজে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব—তাতে গ্রামের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিকটুও হবে না। একটুখানি থামিয়া বলিল, একটু কাজ আছে, এখন চললুম। সুরেশ, যাওয়া যখন হলই না, তখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অচলা মূর্তির মত চৌকাঠ ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ মিনিট-খানেক হেঁটমুখে থাকিয়া হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, বাঃ রে, বাঃ। বেশ একটি অঙ্ক অভিনয় করা গেল! তুমিও মন্দ করনি, আমি ত চমৎকার! ওর বাড়িতে ওর স্ত্রী নিয়ে ওকেই চোখ রাঙ্গিয়ে দিলুম। আর চাই কি? আর বন্ধু আমার মিষ্টিমুখে একটু হেসে ঠিক যেন বাহবা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি অচলা, ও আড়ালে শুধু গলা ছেড়ে হোহো করে হাসবার জন্যেই কাজের ছুতো করে বেরিয়ে গেল। যাক, আরশিখানা একবার আন ত বৌঠান, দেখি নিজের মুখের চেহারা কি-রকম দেখাচ্চে! বলিয়া চাহিয়া দেখিল, অচলার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যে শয্যা স্পর্শ করিতেও আজ অচলার ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল, তাহাই যখন সে যথানিয়মে প্রস্তুত করিতে অপরাহ্ণবেলায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল—মানব-চিত্ত সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারই অগোচর রহিবে না।

যন্ত্র-চালিতের মত অভ্যস্ত কর্ম সমাপন করিয়া ফিরিবার মুখে পাশের ছোট টেবিলটির প্রতি অকস্মাৎ তার চোখ পড়িয়া গেল; এবং ব্লটিং প্যাডখানির উপর প্রসারিত একখানি ছোট্ট চিঠি সে চক্ষের নিমিষে পড়িয়া ফেলিল। মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই, মৃণাল লিখিয়াছে—সেজদামশাই গো, করছ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ-দুটি ক্ষয়ে গেল যে!

বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা নড়িল না। ঠিক পাথরে-গড়া মূর্তির পলকবিহীন দৃষ্টি সেই একটি ছত্রের উপর পাতিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ চিঠি কবেকার, কখন, কে আনিয়া দিয়া গেছে—সে কিছুই জানে না। মৃণালের বাটী কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার বাড়ি ঢুকিতে হয়, কোন্ পথটার উপর, কিজন্য সে এমন করিয়া তাহার ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার কিছুই জানিবার জো নাই। সম্মুখের এই ক'টি কালির দাগ শুধু এই খবরটুকু দিতেছে যে, কোন্ এক পরশু হইতে একজন আর একজনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া চোখ নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু দেখা মিলে নাই।

এদিকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার নিজের চোখ-দুটি বেদনায় পীড়িত এবং কালো কালো অক্ষরগুলা প্রথমে ঝাপসা এবং পরে যেন ছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও এমনি একভাবে দাঁড়াইয়া হয়ত সে আর কতক্ষণ চাহিয়া থাকিত; কিন্তু

নিজের অজ্ঞাতসারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ভিতরে ভিতরে যে নিশ্বাসটা উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যখন অবরুদ্ধ স্রোতের বাঁধ ভাঙ্গার ন্যায় অকস্মাৎ সশব্দে গর্জিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই শব্দে সে চমকিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। দ্বারের বাহিরে মুখ তুলিয়া দেখিল, সন্ধ্যায় আঁধার প্রাঙ্গণতলে নামিয়া আসিয়াছে এবং যদু চাকর হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরে দিতে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ফিরে এসেছেন, যদু?

যদু কহিল, না মা, কৈ এখনও ত তিনি ফেরেন নি।

এতক্ষণে অচলার মনে পড়িল, দুপুরবেলার সেই লজ্জাকর অভিনয়ের একটা অঙ্ক শেষ হইলে, সেই যে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। স্বামীর প্রাত্যহিক গতিবিধি সম্বন্ধে আজ তাহার তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সুরেশের আসা পর্যন্ত এমনই একটা উৎকট ও অবিচ্ছিন্ন কলহের ধারা এ বাটীতে প্রবাহিত হইয়াছিল যে তাহারই সহিত মাতামাতি করিয়া অচলা আর সব ভুলিয়াছিল। সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল। মৃণালের কথাটা সে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মৃণালের একটিমাত্র ছত্র তাহার সমস্ত পুরাতন দাহ লইয়া যখন উল্টা-স্রোতে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একমুহূর্তে প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার সেই ভুল-করা স্বামীরই অন্য নারীতে আসক্তির সংশয় হৃদয় দগ্ধ করিতে সংসারে কোন চিন্তার চেয়েই খাটো নয়।

লেখাটুকু সে আর একবার পড়িবার জন্য চোখের কাছে তুলিয়া ধরিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় হাতখানা তাহার আপনি ফিরিয়া আসিল। সে চিঠি সেইখানেই তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল, অচলা ঘরের বাহিরে আসিয়া, বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—সব মিথ্যা। এই ঘরদ্বার, স্বামী-সংসার, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা কিছুই সত্য নয়—কোন কিছুর জন্যেই মানুষের তিলার্ধ হাত-পা বাড়াইবার পর্যন্ত আবশ্যকতা নাই। শুধু মনের ভুলেই মানুষে ছটফট করিয়া মরে, না হইলে পল্লীগ্রাম শহরই বা কি, খড়ের ঘর রাজপ্রাসাদই বা কি, আর স্বামী-স্ত্রী, বাপ-মা, ভাই-বোন সম্বন্ধই বা কোথায়! আর কিসের জন্যেই বা রাগারাগি, কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি করিয়া মরে! দুপুরবেলা অত বড় কাণ্ডের পরেও যে স্বামী স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে কাটাইতে পারে, তাহার মনের কথা যাচাই করিবার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন? সমস্ত মিথ্যা! সমস্ত ফাঁকি! মরীচিকার মতই সমস্ত অসত্য! কিন্তু সংসার তাহার কাছে এতদূর খালি হইয়া যাইতে পারিত না, একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরে তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া, সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত। অন্য নারীর সহিত সেই পল্লীবাসিনী সদানন্দময়ীর আচরণ একবার মনে করিয়া দেখিলে তার নিজের মনটাকে ঐ ক'টা কথার কালিমাই এমন করিয়া কালো করিয়া দিতে বোধ করি পারিত না।

যদু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, চায়ের জল গরম হয়েছে কি?

অচলা ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল, কহিল, কোন্ বাবু?

যদু জোর দিয়া বলিল, আমাদের বাবু। এইমাত্র তিনি ফিরে এলেন যে। চায়ের জল ত অনেকক্ষণ গরম হয়ে গেছে মা।

চল যাচ্ছি, বলিয়া অচলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খানিক পরে চা এবং জলখাবার চাকরের হাতে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মহিম অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতেছে এবং সুরেশ ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের কাছে মুখ লইয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছে। যেন কেহই কাহারো উপস্থিতি আজ জানিতেও পারে নাই। এই যে অত্যন্ত লজ্জাকর সঙ্কোচ দুটি চিরদিনের

বন্ধুর মাঝখানে আজ সহজ শিষ্টাচারের পথটা পর্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপলক্ষটা মনে পড়িতেই অচলার পা-দুটি থামিয়া গেল।

অচলাকে দেখিয়া মহিম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সুরেশকে চা দিতে এত দেরি হ'ল যে?

অচলার মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হইল না। সে মুহূর্তকাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলে, সুরেশ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল; কহিল, মহিম কৈ, সে এখনো ফেরেনি নাকি?

সঙ্গে সঙ্গেই মহিম প্রবেশ করিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যে মিনিট-দশেক ধরিয়া তাহারই কানের কাছে বারান্দার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, এই বাহুল্য কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিল না।

তার পরেই সমস্ত চুপচাপ। অচলা নিঃশব্দে অধোমুখে দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া এক বাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল।

মহিম কহিল, একটু অপেক্ষা কর, বলিয়া নিজেই চট করিয়া উঠিয়া কবাটে খিল লাগাইয়া দিল। চক্ষের নিমেষে তাহার ছয়-নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল; এবং হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া খানিকটা চা চলকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানা মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, দোর বন্ধ করলে যে?

তাহার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা ও প্রশ্নের ভঙ্গীতে অচলারও ঠিক সেই কথাই মনে পড়িয়া মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধ করি বা একবার

যেন সে চিৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার যে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল। তার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাকরটা এসে পড়ে, এই জন্যেই—নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে, এখনো তেমনি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জানলে আমি দোর বন্ধ করতাম না।

সুরেশ চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হাসিবার মত মুখের ভাব করিয়া বলিল, বাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন হে? তুমি আমার উপর গুলি চালাবে—বাঃ—প্রাণের ভয়! আমি? কবে আবার তুমি দেখলে? আচ্ছা যা হোক—

তাহার অসংলগ্ন কৈফিয়ত শেষ হইবার পূর্বেই মহিম কহিল, সত্যই কখনো ভয় পেতে তোমাকে দেখিনি। প্রাণের মায়া তোমার নেই বলেই আমি জানতাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশি করে বাজল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট করে আনতে পারে—না, সুরেশ কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চলবে না।

সুরেশ তবুও কি একটা জবাব দিতে চাহিল; কিন্তু এবার তাহার গলা দিয়া স্বরও ফুটিল না, ঘাড়টাও সোজা করিতে পারিল না; সেটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

তুমি ভেতরে যাও অচলা, বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

এইবার সুরেশ মাথা তুলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, শোন কথা। অমন কত গণ্ডা বন্দুক-পিস্তল রাতদিন নাড়াচাড়া করে বুড়ো হয়ে এলুম, এখন ওর একটা ভাঙ্গা ফুটো রিভলভারের ভয়ে মরে গেছি আর কি! হাসালে যা হোক, বলিয়া সুরেশ নিজেই টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে যোগ দিবার মত লোক ঘরের মধ্যে অচলা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে কিন্তু যেমন ঘাড়

হেঁট করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি ভাবেই আরও কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে মহিম নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহ নাই। পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মাটিতে মাদুর পাতিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া অচলা শুইয়া আছে। স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল। পাশে একটা খালি তক্তপোশ ছিল, মহিম তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, কেমন, কাল তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া ত ঠিক?

অচলা নীচের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

মহিম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার ওপর করতে পারব না।

কিন্তু অচলা তেমনি পাষাণ-মূর্তির মত নিঃশব্দ স্থির হইয়া রহিল দেখিয়া মহিম বলিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ওপর আমার অন্য নালিশ আছে। আমার স্বভাব ত জানো। শুধু বিয়ের পর থেকেই ত নয়, অনেক আগেই ত আমাকে জানতে যে, আমি সুখ-দুঃখ যাই হোক, নিজের প্রাপ্য ছাড়া একবিন্দু উপরি পাওনা কখনো প্রত্যাশা করিনে—পেলেও নিইনে। ভালবাসার ওপর ত জোর খাটে না অচলা। না পারলে হয়ত তা দুঃখের কথা, কিন্তু লজ্জার কথা ত নয়। কেন তবে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলে? কেন আমাকে না জানিয়ে ভেবে নিয়েছিলে, আমি জোর করে তোমাকে আটক রাখবো? কোনদিন কোন বিষয়েই ত আমি জোর খাটাই নি। তাঁরা তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে—আর আমাকে জানালে কি কোন উপায় হতো না? তোমার প্রাণের দামটা কি শুধু তাঁরাই বোঝেন?

অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালোবাসো না।

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলিনি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বলতে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে? বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে?

অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে করো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে—দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর। শুধু আমাদেরই—

মহিম প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আমার টেবিলের ওপর?

অচলা মুখে আঁচল গুঁজিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আর কোন জবাব না পাইয়া মহিম আস্তে আস্তে তাহার টেবিল দেখিতে গেল। তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর খান-কতক বই পড়িয়াছিল; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সেইগুলা উলটিয়া-পালটিয়া দেখিয়া, তাহার নীচে, আশেপাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া স্ত্রীর অভিযোগের কিছুমাত্র তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, বিমূঢ়ের ন্যায় ফিরিয়া আসিবার পথে শোবার ঘরটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ভিতরে একটা পা দিয়াই মৃণালের সেই চিঠিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িবামাত্রই, অকস্মাৎ অন্ধকারে বিদ্যুৎহানার মতই আজ একমুহূর্তে মহিম পথ দেখিতে পাইল। অচলা যে কি ইঙ্গিত করিয়াছে, আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেটুকু হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বিছানার উপর বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেমন করিয়া সে প্রথম

দিনটিতে আসিয়াছিল, যেভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, সতীন বলিয়া সে অচলাকে যত পরিহাস করিয়াছে—একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল।

পল্লীগ্রামের এইসকল রহস্যালাপের সহিত যে মেয়ে পরিচিত নয়, প্রতিদিন তাহার যে কিরূপ বিঁধিয়াছে, এবং যে নিজেও যখন কোনদিন এই পরিহাসে খোলা মনে যোগ দিতে পারে নাই, বরঞ্চ স্ত্রীর সম্মুখে লজ্জা পাইয়া বারংবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সেই লজ্জা যদি এই উচ্চশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী রমণীর ধারণায় অপরাধীর সত্যকার লজ্জা বলিয়া ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়া থাকে ত আজ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে সে কি দিয়া? বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতেই আজ অনেক সত্য তাহাকে দেখা দিতে লাগিল। কেমন করিয়া অচলার হৃদয় ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গ দিনের পর দিন বিষাক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর আশ্রয় প্রতিমুহূর্তে কারাগার হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এই প্রাণান্তকর অবরোধের মধ্যে হইতে পরিত্রাণ পাইবার সেই যে আকুল প্রার্থনা সুরেশের কাছে তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে যে তাহার অন্তরের কোন্ অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও আজ মহিমের মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রহিল না। অচলাকে সে যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অচলার এতদিন এত কাছে থাকিয়াও, তাহার এত বড় মনোবেদনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকাটাকে সে গভীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু এমন করিয়া আর ত একটা মুহূর্তও চলিবে না! স্ত্রীর হৃদয় ফিরিয়া পাইবার উপায় আছে কি না, তাহা কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে, অনুমান করাও আজ দুঃসাধ্য। কিন্তু অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও স্বামী বলিয়া যাহাকে সে একদিন আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই কাছে অপমান এবং লাঞ্ছনা পাইয়া যে আজ তাহাকে ফিরিতে হইতেছে, এত বড় ভুল ত তাহাকে জানানো চাই।

মহিম ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অচলার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, কবাট রুদ্ধ এবং ঠেলিয়া দেখিল, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। আস্তে আস্তে বার-দুই ডাকিয়া যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন শুধু যে জোর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিবারই তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাহা নহে, একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া নিজেও যেন বাঁচিয়া গেল।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু যাহার অভাবে পার্শ্বের স্থানটা আজ শূন্য পড়িয়া রহিল, ও-ঘরে সে অনশনে মাটিতে পড়িয়া আছে মনে করিয়া কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া গিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে দ্বিধা করিতে করিতে অনেক রাত্রে বোধ করি সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা মুদ্রিত-চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধূমে ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সন্নিকটে এমন একটা শব্দ উঠিয়াছে যাহা কানে প্রবেশমাত্রই সর্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত-পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মাথার ভিতর দিয়া যেন ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘর এবং যে ঘরে আজ অচলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বারান্দার একটা কোণ বিদীর্ণ করিয়া প্রধূমিত অগ্নিশিখা উপরের সমস্ত জামগাছটাকে রাঙ্গা করিয়া ফেলিয়াছে।

পল্লীগ্রামে খড়ের ঘরে আগুন ধরিলে তাহা নিবাইবার কল্পনা করাও পাগলামি, সে চেষ্টাও কেহ করে না; পাড়ার লোক, যে যাহার জিনিসপত্র ও গরু-বাছুর সরাইতে ছুটাছুটি করে, এবং ভিন্ন পাড়ার লোক একদিকে মেয়েরা এবং একদিকে পুরুষেরা সমবেত হইয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগে হায় হায় করিয়া এবং কি পরিমাণের দ্রব্য-সম্ভার দগ্ধ হইতেছে এবং কি করিয়া এ সর্বনাশ ঘটিল, তাহারই

আলোচনা করিয়া সমস্ত বাড়িটা ভস্মসাৎ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তার পরে ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বাকি রাত্রিটুকু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় সকালবেলা একে একে গাড়ু-হাতে দেখা দেয়; এবং আলোচনার জেরটুকু সকালের মত শেষ করিয়া বাড়ি গিয়া স্নানাহার করে। কিন্তু একজনের গৃহপ্রাঙ্গণের বিরাট ভস্মস্তূপ আর একজনের জীবনযাত্রার লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।

মহিম পল্লীগ্রামের লোক, সকল কথাই সে জানিত। তাই নিরর্থক চেঁচামেচি করিয়া অসময়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল না। বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাহার আম-কাঁঠালের এত বড় বাগানটা অতিক্রম করিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত যে আর কাহারও গৃহ স্পর্শ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের সারের যে কয়টা ঘরে সুরেশ এবং চাকর-বাকরেরা নিদ্রিত ছিল, অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার তখনও তাহাদের বিলম্ব ছিল। বিলম্ব ছিল না শুধু অচলার ঘরটার। সে তাহারই দ্বারে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা ঠিক যেন জাগিয়াছিল, এমনিভাবে উত্তর দিল, কেন?

মহিম কহিল, দোর খুলে বেরিয়ে এস!

অচলা শ্রান্তকণ্ঠে জবাব দিল, কি হবে? আমি ত বেশ আছি!

মহিম কহিল, দেরি করো না, বেরিয়ে এসো—বাড়িতে আগুন লেগেছে।

প্রত্যুত্তরে অচলা একবার ভয়জড়িতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, তার পরে সমস্ত চুপচাপ! মহিমের পুনশ্চ ব্যগ্র আহ্বানে সে আর সাড়াও দিল না। ঠিক এই ভয়ই মহিমের ছিল; কারণ বাটীতে আগুন লাগা যে কি ব্যাপার, তাহার কোনপ্রকার ধারণাই অচলার ছিল না। মহিম ঠিক বুঝিল, ইতিপূর্বে সে চোখ বুজিয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু চোখ মেলিয়া যে দৃশ্য তাহাকেও কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপর্যাপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত সমস্ত ঘরটা চোখে পড়িবামাত্র অচলারও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য মহিম

প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে একটা কবাট নাড়িয়া উঁচু করিয়া হাঁসকলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং মূর্ছিতা স্ত্রীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইবার সে বাটীর অন্য সকলকে সজাগ করিবার জন্য নাম ধরিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সুরেশ পাংশুমুখে বাহির হইয়া আসিল, যদু প্রভৃতি অপর সকলেও দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, তাহার পরেই একটা প্রচণ্ড শব্দে অচলা সচেতন হইয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ প্রাণপণ-বলে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মহিম সকলকে লইয়া যখন বাহিরের খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন বড় ঘরের চালে আগুন ধরিয়াছে। এইবার তাহার মনে পড়িল, অচলার অলঙ্কার প্রভৃতি দামী জিনিস যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ঘরে এবং আর মুহূর্ত বিলম্ব করিলে কিছুই বাঁচানো যাইবে না।

অচলা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; সে সজোরে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, সে হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে? কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। যাক, সব পুড়ে যাক।

না গেলে চলবে না, অচলা, বলিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মহিম সেই জমাট ধূমরাশির মধ্যে দ্রুতবেগে গিয়া প্রবেশ করিল। যদু চেঁচাইতে চেঁচাইতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

সুরেশ এতক্ষণ পর্যন্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; অকস্মাৎ সংবিৎ পাইয়া, সে পিছু লইবার উপক্রম করিতেই অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোরকণ্ঠে কহিল, আপনি যান কোথায়?

সুরেশ টানাটানি করিয়া বলিল, মহিম গেল যে—

অচলা তিক্তস্বরে বলিল, তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দেব না।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না—এ যেন সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল।

মিনিট দুই-তিন পরেই মহিম দুই হাতে দু'টা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতে হাতছাড়া করো না, আমরা বাইরের ঘরে যদি কিছু বাঁচাতে পারি, চেষ্টা করি গে।

অচলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠোর মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল, তেমনি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই অচলার বুকের ভিতরটা হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সে কোনমতে সংবরণ করিতে পারিল না। এ কি হইয়াছে! মাথার চুল ধুলাতে, বালুতে, ভস্মে রুক্ষ, বিবর্ণ; শীর্ণ বিরসমুখ অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসিয়া একটা রাত্রির মধ্যেই তাহার অমন সুন্দর স্বামীকে যেন বুড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কলরব করিতেছে। পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন সে ত সমস্তই গিয়াছে দেখা যাইতেছে। তা যাক—কিন্তু শাল-দোশালা গহনাপত্র তাই-বা আর কত ঐ একটিমাত্র তোরঙ্গে রক্ষা পাইয়াছে—এই লইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ইহাদেরই একটু দূরে নির্বাণোন্মুখ অগ্নিস্তূপের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। ও-পাড়ার ভিখু বাঁড়ুয্যে—অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি—বাতের জন্য এ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; এখন লাঠিতে ভর দিয়া সদলবলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহিম অগ্রসর হইয়া গেল। বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, মহিম, তোমার বাবা অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আর আমি ভিন্ন ছিলাম না। আমরা দু'জনে হরিহর-আত্মা ছিলাম।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ইহাতে তাহার কোন সংশয় নাই। শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, এই কাণ্ডটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্বাহ্লেই জানিতেন।

মহিম চকিত হইয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বে-ই বেড়ার আড়ালে অচলা জিনিসপত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, সেও শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া

উঠিল। ভূমিকা এই পর্যন্ত করিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু শুধু হয় না বাবা!

আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না, এতবড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অকর্মটাই না করলে বল দেখি।

মহিম কথাটা বুঝিতে পারিল না। তিনি নিজের কথাটার তখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সবাই বলাবলি করি যে, কিছু একটা ঘটবেই। কৈ, আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হল না কেন! বাবা, বেম্মও যা, খ্রিস্টানও তাই। সাহেব হলেই বলে খ্রিস্টান, আর বাঙালী হলেই বলে বেম্ম। এ আমাদের কাছে—যাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেছে—তাদের কাছে চাপা থাকে না।

উপস্থিত সকলেই ইহাতে অনুমোদন করিল। তিনি উৎসাহ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ওটাকে ত্যাগ করে—

মহিম হাত তুলিয়া বলিল, থামুন। আপনাদের আমি অসম্মান করতে চাইনে, কিন্তু যা নয়, তা মুখে আনবেন না। আমি যাঁকে ঘরে এনেচি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই; না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে। বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বাঁড়ুয্যেমশাই সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাঠি ঠকঠক করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে যাহা বলিতে বলিতে গেলেন তাহা মুখে না আনাই ভাল।

অচলা সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

যদু আসিয়া কহিল, মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বাবু পালকিবেহারা ডেকে আনতে বললেন। আনব?

অচলা আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবুকে একবার ডেকে দাও ত যদু।

পালকি?

এখন থাক।

মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইতেই মহিম বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হয়ত সে স্বামীর হাত-দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত, হয়ত বা আরও কিছু ছেলেমানুষি করিয়া ফেলিত; কি করিত, তা সে তাহার অন্তর্যামীই জানিতেন; কিন্তু সকাল হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে কৌতূহলী লোক; অচলা আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, পালকি কেন?

মহিম কহিল, ন'টার ট্রেন ধরতে পারলেই ত সবদিকে সুবিধে। একটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে স্নানাহার করতে পারবে। কাল রাত্রেও ত কিছু খাওনি।

আর তুমি?

আমি! মহিম আর একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমারও যা হোক একটা উপায় হবে বৈ কি।

তা হলে আমারও হবে। আমি যাবো না।

কি উপায় হবে বল?

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। একবার তাহার মুখে আসিল—বনে, গাছতলায়! কিন্তু সে ত সত্যই সম্ভব নয়। আর পাড়ায় কাহারও বাটীতে একটা ঘণ্টার জন্যও আশ্রয় লওয়া যে কত অপমানজনক, সে ইঙ্গিত ত সে এইমাত্র ভাল করিয়াই পাইয়াছে। মৃণালের কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাহা নহে, বারংবার স্মরণ হইয়াছে; কিন্তু লজ্জায় তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

মহিম আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি সঙ্গে যাবো? তাতে লাভ কি?

অচলা বলিল, লাভ-লোকসান দেখবার ভার আজ থাকে আমি নেব। তোমার শুভানুধ্যায়ী এখানে বেশি নেই, সে আমি জানতে পেরেচি। তা ছাড়া, তোমার মুখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই যা হয়ে গেছে, সে তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি পাচ্ছি। আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখানে তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি যেতে পারবো না।

মহিমের মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থির হইয়া রহিল।

অচলা বলিতে লাগিল, কেন তুমি অত ভাবচ? আমার গয়নাগুলো ত আছে। তা দিয়ে পশ্চিমে যেখানে হোক কোথাও একটা ছোট বাড়ি অনায়াসে কিনতে পারবো। যেখানেই থাকি, আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে তুমি পারবে না। সে চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। আর বলেইচি ত তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।

যদু অদূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পালকি আনতে যাবো মা?

উত্তরের জন্য অচলা উৎসুক-চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিম ইহার জবাব দিল। যদুকে আনিতে হুকুম করিয়া স্ত্রীকে বলিল, কিন্তু আমি ত এখুনি যেতে পারিনে।

শুনিয়া অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে অচলার বুক ভরিয়া গেল। সে অন্তরের আবেগ সংবরণ করিয়া সহজভাবে কহিল, সে সত্যি, এক্ষুণি তোমার যাওয়া হয় না; কিন্তু সন্ধ্যের গাড়িতে নিশ্চয় যাবে বল? নইলে আমি খাবার নিয়ে বসে বসে ভাবব, আর—

কিন্তু মন্তব্যটা তাহার মহিমের দীর্ঘশ্বাসে যেন নিবিয়া গেল। সে মলিন হইয়া সভয়ে কহিল, ও বেলা যেতে পারবে না? তবে এই অন্ধকার রাত্রে কার বাড়িতে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে থামিয়া গেল। যাহার বাটীতে তাহার স্বামীর রাত্রি যাপনের সম্ভাবনা, সে কথা মনে হইতেই তাহার মুখশ্রী গম্ভীর ও বিবর্ণ

হইয়া উঠিল। বোধ করি, তাহার মনের কথা মহিম বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমাকে কোথায় যেতে বল?

অচলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কেন, বাবার ওখানে।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

না, কেন? সেও কি তোমার নিজের বাড়ি না?

মহিম তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

অচলা কহিল, না হয় সেখানে কেবল দুটো দিন থেকেই আমরা পশ্চিমে চলে যাবো।

না।

অচলা জানিত, তাহাকে টলানো সম্ভব নয়। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, তবে চল, এখান থেকেই আমরা পশ্চিমের কোন শহরে গিয়ে উঠি গে। আমি সঙ্গে থাকলে কোথাও আমাদের কষ্ট হবে না আমি বেশ জানি। কিন্তু গহনাগুলো ত বেচতে হবে; সে কলকাতা ছাড়া হবে কি করে?

মহিম আর একদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। অচলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, পশ্চিমেও ত বড় শহর আছে, সেখানেও ত বিক্রি করা যায়? আমার বাক্সে প্রায় দু' শ টাকা আছে, এখন তাতেই ত আমাদের যাওয়া হতে পারে? চুপ করে রইলে যে? বল না শিগগির!

মহিম স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল; বলিল, তোমার গহনা নিতে পারব না অচলা।

অকস্মাৎ একটা গুরুতর ধাক্কা খাইয়া যেন অচলা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, কেন পারবে না, শুনতে পাই?

মহিম তাহার উত্তর দিল না এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ অচলা একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, পৃথিবীতে স্বামী কি কেবল তুমি একটি? দুঃসময়ে তাঁরা নেন কি করে? স্ত্রীর গহনা থাকে

কি জন্যে? এত কষ্টে এগুলো বাঁচাতে গেলেই বা কেন? বলিয়া সে ছোট টিনের বাক্সটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আর বিপদের দিনে যদি কোন কাজেই না লাগে ত মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি হবে? আগুন এখনও জ্বলচে, আমি টান মেরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই—তোমার মনে যা আছে করো। বলিয়া যে আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল।

মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে কহিল, আমি সমস্ত ভেবে দেখলাম অচলা। কিন্তু, তুমি ত জানো, আমি কোন কাজ ঝোঁকের ওপর করিনে; কিংবা আর কেউ করে, সেও চাইনে, তুমি যা দিতে চাচ্ছো, তা নিজের বলে নিতে পারলে আজ আমার সুখের সীমা থাকত না; কিন্তু কিছুতেই নিতে পারিনে। দুঃখ দেখে তোমার মত আরও একজন আরও ঢের বেশি আমাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও যেমন দয়া, এও তেমনি দয়া; কিন্তু এতে না তোমাদের, না আমার, কারও শেষ পর্যন্ত ভাল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অচলা আর সহ্য করিতে পারিল না। কান্না ভুলিয়া বোধ করি প্রতিবাদ করিবার জন্যই দৃপ্ত চক্ষু-দুটি উপরে তুলিবামাত্র স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিতে দেখিতে পাইল, কতকটা দূরে তাহাদের যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঘাটের পাশে বাঁধানো নিমগাছতলায় সুরেশ হাতে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। অচলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল এবং উচ্ছ্রিত মাথা তাহার আপনি হেঁট হইয়া গেল।

কিন্তু মহিম যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত আপন মনেই বলিতে লাগিল, শুধু যে কখনো শান্তি পাবো না তা নয়, তোমাকে বারংবার বঞ্চিত করতে পারি, এ সম্বন্ধই কোনদিন আমাদের মধ্যে হয়নি। একটুখানি থামিয়া কহিল, অচলা, নিজেকে রিক্ত করে দান করবার অনেক দুঃখ। কিন্তু ঝোঁকের ওপর হয়ত তাই একমুহূর্তে পারা যায়, কিন্তু তার ফলভোগ হয় সারা জীবন ধরে। আমি জানি, একটা ভুলের জন্যে তোমাদের মনস্তাপের অবধি নেই। আবার একটা ভুল হয়ে

গেলে, তুমি না পারবে কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারবে আমাকে মাপ করতে। এ ক্ষতি সইবার মত সম্বল তোমার নেই; এ কথা আজ না টের পেতে পারো, দু'দিন পরে পারবে। তাই তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারব না।

কথাগুলা অচলার বুকের ভিতর বিঁধিল। স্বামীর চক্ষে সে যে কত পর তাহা আজ যেমন অনুভব করিল, এমন আর কোনদিন নয়; এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালের স্মৃতিতে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেও কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এতক্ষণ ধরে যা বোঝাচ্ছো সে আমি বুঝেছি। হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত তোমার মুখ দেখে দয়া হওয়াতেই আমার যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিলুম। হয়ত দু'দিন পরে আমাকে সত্যি এর জন্যে অনুতাপ করতে হতো; সব ঠিক, কিন্তু দ্যাখো অপরের মনের ইচ্ছে বুঝে নেবার মত যত বুদ্ধিই তোমার থাক, তোমাকে বুঝিয়ে দেবারও জিনিস আছে। স্ত্রীর জিনিস জোর করে নেওয়া ত দূরের কথা, হাত পেতে নেবার সম্বল তোমারই বা কি আছে? আর তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। এটুকু বিবেক-বুদ্ধি যে এখনো তোমাতে বাকি আছে, আজ থেকে তাই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু যেখানেই থাকি, একদিন না একদিন তোমাকে সব কথা বুঝতেই হবে। হবেই হবে। বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কান্না রোধ করিল।

ন'টার ট্রেনে সুরেশও বাটী ফিরিতেছিল। গত রাত্রের অগ্নিকাণ্ড তাহাকে কেমন যেন একরকম করিয়া দিয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিবার যেন শক্তিই তাহাতে ছিল না। গাড়ি আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব ছিল; সুরেশ মহিমকে স্টেশনের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, মহিম, আগুন লাগার জন্যে আমাকে ত তুমি সন্দেহ করোনি?

মহিম তাহার হাতদুটো সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, ছি!

সুরেশের দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, কাল থেকে এই ভয়ে আমার শান্তি নেই মহিম।

মহিম নীরবে শুধু একটু তাহার হাতের মধ্যে চাপ দিল। তাহার পরে কহিল, সুরেশ, একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে আনে। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে, সে তুমি কোনদিন করতে পার না বলে আজও আমি বিশ্বাস করি। একটুখানি থামিয়া কহিল, সুরেশ, তুমি ভগবান মানো না বটে, কিন্তু যে যথার্থ মানে সে অহর্নিশি প্রার্থনা করে, এ বিশ্বাস তিনি যেন তার না ভেঙ্গে দেন।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়িতে অচলা এবং তাহার দাসীকে তুলিয়া দিয়া মহিম সুরেশের কাছে আসিতেই সে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, তোমার কালকের ক্ষতিটা পূর্ণ করে দেবার প্রার্থনাটা আমার কিছুতেই মঞ্জুর করলে না, কিন্তু তোমার ভগবান তোমার প্রার্থনা যেন মঞ্জুর করেন ভাই। আমাকে যেন আর তিনি ছোট না করেন, বলিয়াই সে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ওদিকে জানালায় মুখ রাখিয়া অচলা যদুর সঙ্গে এতক্ষণ চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল, মহিম নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, মৃণালদিদির স্বামী নাকি আজ মারা গেছেন?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঘণ্টা-খানেক পূর্বে মারা গেছেন শুনলাম।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রায় দশ-বারোদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোনদিন তুমি আবশ্যক মনে করোনি?

মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে, ভাবিতে ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তখনও কেদারবাবু আগেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে আসিয়া বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হয়ত একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, দরজায় ঠিকা গাড়ির কঠোর শব্দে চোখ মেলিয়া দেখিলেন, সুরেশ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কন্যা ও ঝি অবতরণ করিল। ঘুমের ঝোঁক তাঁহার নিমিষে উড়িয়া গেল; কি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া গলা বাড়াইয়া চিৎকার করিলেন, অচলা যে? সুরেশ, তুমি কোথা থেকে? কি, ব্যাপার কি? এ-সব কি কাণ্ড-কারখানা, আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে!

অচলা উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল। সুরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, মহিমের টেলিগ্রাফ পাননি?

কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, কৈ, না!

সুরেশ একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল, তা হলে হয় সে টেলিগ্রাফ করতে ভুলেছে, না হয় এখনো এসে পৌঁছায় নি।

কেদারবাবু কহিলেন, টেলিগ্রাফ যাক, ব্যাপার কি, তাই আগে বল না! তুমি এদের কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সুরেশ বলিল, কাল রাত্রিতে আগুন লেগে মহিমের বাড়ি পুড়ে গেছে।

বাড়ি পুড়ে গেছে? সর্বনাশ! বল কি—বাড়ি পুড়ে গেল? কেমন করে পুড়ল? মহিম কৈ? তুমি এদের পেলে কোথায়? এক নিশ্বাসে এতগুলা প্রশ্ন করিয়া কেদারবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বলিল, এদের সেখান থেকেই নিয়ে আসচি। আমি সেখানেই ছিলাম কিনা।

কেদারবাবুর মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিলেন, তুমি ছিলে সেখানে? কবে গেলে, আমি ত কিছু জানিনে। কিন্তু সে কৈ?

সুরেশ বলিল, মহিম ত আসতে পারছে না, তাই—

তাঁহার গম্ভীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, এ-সব ভাল কথা নয়। অতিশয় মন্দ কথা। যৎপরোনাস্তি অন্যায়। এ-সব ত আমি কোনমতেই—, বলিতে বলিতে তিনি চোখ তুলিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন।

অচলা এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার এই সংশয় তাহার মর্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এই অকস্মাৎ আগমনের হেতু যে তিনি লেশমাত্র বিশ্বাস করেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখে আর রক্তের চিহ্ন রহিল না।

কেদারবাবু এখানে ভুল করিলেন। মেয়ের মুখের চেহারায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। আরাম-চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া হাতের কাগজখানা মুখের উপরে টানিয়া নিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা ভাল বোঝ তোমরা কর। আমি কালই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো।

সুরেশ ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ের সহিত কহিল, এ-সব আপনি কি বলচেন কেদারবাবু? আপনি বা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কেন, আর হয়েছেই বা কি? বলিয়া সে একবার অচলার প্রতি একবার তাহার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল; কিন্তু কাহারও মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

কেদারবাবুর কাছে কোন জবাব না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাক, আমার ওপর মহিম যা ভার দিয়েছিল তা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন। আমার নাওয়া-খাওয়া এখনো হয়নি, আমি বাড়ি চললুম। বলিয়া সে কয়েক পদ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কেদারবাবু উঠিয়া বসিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিলেন, আহা, যাও কেন ছাই।ব্যাপারটা কি, তবু শুনিই না। আগুন লাগল কি করে?

সুরেশ অভিমান-ভরে বলিল, তা জানিনে।

তুমি গেলে কবে সেখানে?

দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে। আমি খাইনি এখনো, আর দেরি করতে পারিনে, বলিয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা, নাওয়া-খাওয়া ত তোমাদের কারও হয়নি দেখচি, কিন্তু জলে পড়নি এটাও ত বাড়ি, এখানেও ত চাকরবাকর আছে। অচলা, ডাকো না একবার বেয়ারাটাকে— দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস, বোস, সুরেশ, ব্যাপারটা কি হলো, খুলেই সব বল শুনি।

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত্রে ঘুমুচ্চি, মহিমের চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখি, সমস্ত ধুধু করে জ্বলছে; খড়ের ঘর, নিবোবার উপায়ও ছিল না, সে বৃথা চেষ্টাও কেউ করলে না—সর্বস্ব পুড়ে গেল আর কি!

কেদারবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বল কি হে, সর্বস্ব পুড়ে গেল? কিছুই বাঁচাতে পারা গেল না? অচলার গয়নাপত্রগুলো?

সেগুলো বেঁচেচে।

তবু রক্ষে হোক! বলিয়া বৃদ্‌ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবু, কি করে আগুনটা লাগল?

সুরেশ কহিল, বললুম ত আপনাকে, সে খবর এখনো জানা যায়নি। তবে গ্রামের মধ্যে বড় কেউ আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, তা জেনে এসেছি।

নেই বুঝি?

না।

কেদারবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া পরিশেষে আর একটা গভীর নিঃশ্বাস

মোচন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাও, স্নান করে এসো গে সুরেশ, আর বেলা করো না। দেখি, রান্না-বান্নার কি যোগাড় হচ্ছে। বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আহারাদির পরেও তিনি সুরেশকে মুক্তি দেন নাই। সে একটা আরাম-চৌকির উপরে অর্ধনিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। অচলাও সেই যে স্নানান্তে তাহার ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল, আর তাহার কোন সাড়াশব্দ ছিল না। বিশ্রাম ছিল না শুধু কেদারবাবুর। এখন যে টেলিগ্রাম আসা না আসার বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল না, তাহারই জন্য সমস্ত বেলাটা ছটফট করিয়া, সন্ধ্যার সময় অসময়ে ঘুমানো উচিত নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, তোমরা যে বললে, সে টেলিগ্রাম করেচে—কৈ তার ত কিছুই দেখিনে। তোমরা ট্রেনেতে এসে পড়লে, আর তারের খবর এতক্ষণেও পৌঁছল না। আচ্ছা, দাঁড়াও ত দেখি, বলিয়া মেয়ের মুখের জবাব না শুনিয়াই চটিজুতা ফটফট করিতে করিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নীচে হইতে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অচলার দাসীকে ধরিয়া তিনি নানাপ্রকারে জেরা করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে আশ্চর্য হইয়া বারংবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, সে কি বাবু, আগুন লেগে ঘরদোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, চক্ষে দেখে এলুম, আর আপনি বলছেন, পোড়েনি! আর আগুন যদি না-ই লাগবে, তবে ঘরদোর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল কি করে, একবার বিবেচনা করে দেখুন দেখি!

সুরেশ সমস্তই শুনিতেছিল; সে মাথা তুলিয়া দেখিল, অচলা চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া পাংশু-মুখে কান পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিতেছে। শুষ্ক উপহাসের ভঙ্গিতে কহিল, তোমার বাবার হল কি, বলতে পারো?

অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

সুরেশ কহিল, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি উনি বিশ্বাস করেন নি। ওঁর ধারণা, আগুন লাগার গল্পটা আমাদের আগাগোড়া বানানো। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি-মিথ্যে একদিন টের পাবেনই, কিন্তু ওঁর সন্দেহটা এমন যে, এখানে আসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।

অচলা শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর আসবেন না?

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বোধ করি সম্ভব নয়। আমারও ত কিছু আত্মসম্মান বোধ আছে। কোন লোককে দিয়ে আমার ব্যাগটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার এখানে আসা না-আসার সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

তা হলে কাল সকালেই দিয়ো। অনেক দরকারী জিনিস আমার ওর মধ্যে আছে, বলিয়া সে কেদারবাবুর জন্যে অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু ফিরিয়া আসিয়া কিছু আশ্চর্য হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা বোধ হইল না।

রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শয্যার উপর ছটফট করিয়া অচলা উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা, বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সম্মুখের রাজপথের উপর লোকচলাচলের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণের জন্যেও অন্যমনস্ক হয়।

তাহার ঘরের ও-দিকের কবাট খুলিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, তখনও বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিল, চাকরেরা গ্যাস বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই ভিতর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চিরদিন তিনি দশটা বাজিতে না বাজিতেই শয্যা গ্রহণ করেন; কিন্তু আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই দাসীর গলা শুনা গেল। সে বলিতেছে, এখন সোয়ামী

মারা গেছে—আর যে মৃণাল-দিদিমণি শ্বশুরঘর করে, এমন ত আমার মনে হয় না বাবু। জামাইবাবুর সঙ্গে কি যে দাদা-নাতনী সুবাদ, তা তেনারাই জানে।

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু শুধু হুঁ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

অচলা বুঝিল, ইতিপূর্বে অনেক কথাই হইয়া গিয়াছে। মৃণালের সম্বন্ধে, মহিমের সম্বন্ধে, তাহার সম্বন্ধে—কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পাছে নিজের সম্বন্ধে নিরতিশয় অপ্রিয় কথা নিজের কানেই শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু কিসে যেন তাহার পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কেদারবাবু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, দু'জনের তা হলে বনিবনাও হয়নি বল?

ঝি কহিল, মোটে না বাবু, মোটে না। একটি দিনের তরে না।

এই দাসীটিকে অচলা নির্বোধ বলিয়াই এতদিন জানিত; আজ দেখিল, বুদ্ধি তাহার কাহারো অপেক্ষা কম নয়।

কেদারবাবু আবার মিনিট-খানেক মৌন থাকিয়া বলিলেন, কাল রাতে তা হলে কারও খাওয়া হয়নি বল? সুরেশ যাওয়া পর্যন্তই একরকম ঝগড়াঝাঁটিতেই দিন কাটছিল?

দাসীর উত্তর শুনা গেল না বটে, কিন্তু পিতার মুখের মন্তব্য শুনিয়াই বুঝা গেল, সে গ্রীবা আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অভিমত ব্যক্ত করিল। কারণ, পরক্ষণেই কেদারবাবু একটা গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, এমনটি যে একদিন ঘটবে, আমি আগেই জানতুম। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ত বাপ-মায়ের কথা গ্রাহ্য করে না; নইলে আমি ত সমস্তই একরকম ঠিক করে এনেছিলুম। আজ তা হলে ওর ভাবনা কি! বলিয়া আর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

ঝি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কহিল, তাই বলুন ত বাবু, নইলে আজ ভাবনা কি! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে কিনা একটা খোড়ো মেটে বাড়ি! তাও রইল কৈ? আজ জামাইবাবুও ত—, বলিয়া সেও কথাটাকে শেষ না করিয়াও একটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলিয়া দিল।

কপাল! বলিয়া কেদারবাবু মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই যা; বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আলো নিবাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অচলা পা টিপিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতার উদারতা, তাঁহার ভদ্রতাবোধের ধারণা কোনদিনই তাহার মনের মধ্যে খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল না, কিন্তু সে যে বাটীর দাসীর সহিত নিভৃতে আলোচনা করিবার মত এত ক্ষুদ্র, ইহাও সে কখনও ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার নিজের মন ছোট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বামী, তাহার পিতা, তাহার দাসী, তাহার বন্ধু—সবাই যখন তাহারই মত ভূমিতলে পড়িয়া, তখন কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কোনদিন যে সে এই ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এ ভরসা সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কেদারবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিবাহে জামাই যাহাতে পাস-করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এম. এ. পাস করিয়াছে, দেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার গাড়ি করিয়া আসিয়া একটা উলটা রকমের খবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদারবাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্মতত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মেয়েমানুষে যাহার কাছে গাড়িপালকি চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্তব্য হয় ত এত বড় অযাচিত সুযোগ কোনমতেই যে হাতছাড়া করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেশি চিন্তা করিতে হয় নাই।

এমন কি, বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ করিয়া বিবাহের পূর্বেই হাজার-পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই; এবং বাড়িটা যখন তাহার থাকিবে, তখন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।

অথচ হতভাগা মেয়েটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল—কিছুতেই বাগ মানিল না। অতএব শেষ পর্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাঁহাকে মেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। তা ছাড়া, যে কথাটা এখন তাঁহাকে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিতে হইল তাহা এই যে, টাকাটা এইবার

ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জিনিসটা লেখাপড়ার মধ্যে না থাকায় এবং পরিশোধের রাস্তাটাও খুব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে না পড়ায়, ইহার চিন্তাটাকেও তিনি হৃদয়ের মধ্যে তেমনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সুতরাং, প্রশ্নটা যদিচ মনের মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তেমনি ঝাপসা হইয়া রহিল।

অচলা শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা কেদারবাবু পছন্দ করিতেন না। বাটী নাই অজুহাতে অধিকাংশ সময় দেখাও দিতেন না। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া মেয়ের দুর্ব্যবহারে বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াই রহিলেন।

এইভাবে দিন কাটিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজে পুত্রাধিক সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। তিনি স্বয়ং ঋণের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে যৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই যুবকটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন গভীর ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কন্যার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের ন্যায় উদয় হইত যে, দুর্ভাগা মেয়েটা এমন রত্ন চিনিল না, উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, সে যেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিম তাঁহার দু চক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কন্যা যে নারীধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীত্যাগের গভীর দুষ্কৃতি সর্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে যত বড় হউক, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে।

অন্যপক্ষে, পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব পূর্বে যেমনি থাক, যেদিন তিনি শুধুমাত্র টাকার লোভেই মহিমকে বর্জন করিয়া সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ

করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এবং পরিশোধের কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাহার কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে মানুষ হিসাবে কেদারবাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল কাল রাত্রে, যখন সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল, তিনি নিজের কন্যার চরিত্রের সম্বন্ধে গোপনে দাসীর মতামত গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজি আপনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া চোখে পড়িল, যে মুহূর্তে সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে, তাহাকে সে ভালবাসে না, সে মুহূর্তেই নারীর সর্বোত্তম মর্যাদাও জগৎসংসার হইতে তাহার জন্য মুছিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচারিকার কাছে ছোট, এমন কি সেই সুরেশের মত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে তাহাকে লালসার সঙ্গিনী কল্পনা করাও তাহার পক্ষে আর দুরাশা নয়। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এমনি ছোট? এই ত সেদিন সে যাহার ভালবাসাকেই সর্বজয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহারই মধ্যে সে কথা কি সবাই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। এই ঔদাসীন্যের নিগূঢ় অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি যেন আগুন দিয়া পোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ-বা প্রভাতের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এ সময়ে কেহই ত ঘরে বসিয়া নাই, আর আমিই বা যথার্থ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে দণ্ড তিনিই দিবেন; কিন্তু নির্বিচারে যে-কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথা পাতিয়া লইব কিসের জন্য?

অচলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্ত গ্লানি যেন জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু তাঁহার আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেয়ারা কেৎলিতে গরম চায়ের জল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, কেদারবাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং বাটিটা হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম-চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সমস্ত লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে যাচিয়া তাঁহার চা তৈরি করিয়া দিতে কিংবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের মূর্তির মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। এমন কি, এইভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার সহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কিনা এবং না হইলেই বা সে কি উপায় করিবে, এই জটিল সমস্যার কোথাও একটু নিরালায় বসিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে যখন

সে উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কেদারবাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের জিনিসগুলা সরাইবার জন্য বেয়ারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়িতে তুলে দাও ত। শেভ করবার জিনিসগুলো পর্যন্ত তার মধ্যে আছে। দেরি করো না, আমি এখ্‌খুনি যাবো।

যে আজ্ঞে বলিয়া সে চলিয়া গেলে আবার সমস্ত কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের কোন খবর পাওয়া গেল?

কেদারবাবু মুখ তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য!

তার পরে আবার সমস্ত চুপচাপ। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ব্যাগ তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি তা হলে চললুম। মহিমের চিঠি এলে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন, বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই সহসা কেদারবাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর সুরেশ, আমি আসচি। বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়াই চটিজুতার পটাপট শব্দ করিয়া একটু দ্রুতবেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ অবধি অচলা অধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই বিস্মিত সুরেশ অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অচলার ত্রস্তপীড়িত ও একান্ত মলিন দুই চক্ষুর উপর গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, আমি যে কত দুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েচি তা বলে জানাতে পারিনে।

অচলা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এত বড় পাষণ্ড ভাবতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও মনে করিনি।

এ অভিযোগেও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, আমার এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে এখ্খুনি মহিমের কাছে গিয়ে তাকে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কেদারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেইখানা সুরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিলেন, গড়িমসি করে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঁচ হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখেই দিলুম—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়িটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।

সুরেশ স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আমি ত আপনার কাছে হ্যান্ডনোট চাইনি কেদারবাবু!

কেদারবাবু বলিলেন, তুমি চাওনি সত্য, কিন্তু আমার ত দেওয়া উচিত। এতদিন যে দিইনি, সেই আমার যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে সুরেশ, কাগজখানা তুমি পকেটে তুলে রাখো। বুড়ো হয়েচি, হঠাৎ যদি মরে যাই, টাকাটার গোল হতে পারে।

সুরেশ আবেগের সহিত জবাব দিল, কেদারবাবু, সুরেশ আর যাই করুক, সে টাকা নিয়ে কখনো কারোর সঙ্গে গোল করে না। তা ছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন, এ টাকা আমি চাইনে—এ আমি আমার বন্ধুকে যৌতুক দিয়েচি।

কেদারবাবু বলিলেন, তা হলে সে তোমার বন্ধুকেই দিয়ো, আমাকে নয়। আমি যা নিয়েছি, সে আমারই ঋণ।

সুরেশ কহিল, বেশ, আমার বন্ধুকেই দেবো, বলিয়া কাগজখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই, কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন, খবরদার সুরেশ! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেচি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না বলে দিচ্ছি। বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার আরাম-কেদারায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা সুরেশ চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ওইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলার প্রতি ফিরাইয়া দেখিল, সে একমুহূর্তে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। প্রবল চেষ্টায় একবার সুরেশ কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার শুষ্ককণ্ঠ একটা অব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন স্পষ্ট কিছুই বাহির হইল না। আবার ফিরিয়া দেখিল, কেদারবাবু দুই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া তেমনি পড়িয়া আছেন। আর সে কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট-খানেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কন্যা ও পিতা ঠিক তেমনি একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা নিষ্ঠুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নীচে সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়িখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার ঘুরের শব্দে বুঝিতে পারা গেল এবং পরক্ষণেই বেহারা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাগজ। আর কিছু বলিতে হইল না, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, নিয়ে যা বলচি ব্যাটা, নিয়ে যা সুমুখ থেকে। বেরো বলচি—

হতবুদ্ধি বেহারাটা মনিবের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেই, তিনি কন্যার প্রতি অগ্নি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর আরও একপর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার যদি আর কোনদিন কোন ছলে আমার বাড়ি ঢোকবার চেষ্টা করে ত তাকে পুলিশে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলুম অচলা!

নিজের নাম শুনিয়া অচলা তাহার একান্ত পাণ্ডুর মুখখানি ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া ব্যথিত ম্লান চক্ষুদুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে মেলিয়া চাহিয়া রহিল.

পিতা কহিলেন, টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে বন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড যেন এ কথা মনে রাখে।

কন্যা তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তর্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হ্যান্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘুষ দেওয়া যায় না, এ কথা আমি তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়ব। এ বাড়ি আমি নিজে বিক্রি করে নিজের ঋণ পরিশোধ করে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো—আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, তা বলে রাখচি।

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা বাধা পাইল বটে, কিন্তু তার পরে স্থির অবিচলিত-কণ্ঠে কহিল, ঋণ-পরিশোধ না করে বাড়িটা আমার জন্যে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলে ত এ কাজ আমাকেই করতে হতো।

কেদারবাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, তোমরা যা করে এসেছ, শুধু তাইতেই ত আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারচি নে, তা তুমি জানো?

অচলা তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, না, আমি জানিনে। আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, তার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা হলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর যারই অভাব থাক, ডুবে মরবার মত জলের অভাব ছিল না। বলিতে বলিতেই কান্নায় তাহার গলা ধরিয়া আসিল, কহিল, কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি করচ, শুধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেচি, নইলে—

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার, শোক করিবার অর্থাৎ কন্যার নিন্দিত আচরণে সর্বপ্রকার গভীর বিষাদের কারণ একমাত্র তাঁহারাই ঘটিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপর পক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তিরস্কার করিয়া তীব্র অভিমানে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। তাই অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, এই নাও—এ আবার এক কাণ্ড!

ইহার পরে আট-দশদিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, বাটীর চাকর-দাসীর কাছেও মুখ-দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। বিগত কয়দিনের মত আজও সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার জন্য খোলা জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল।

শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল তাহাও নহে, অথচ অভ্যাসমত উপরে-নীচে, আশেপাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। এমনি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বাকি নাই, সহসা দেখিতে পাইল, সুরেশের গাড়ি তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং পুলিশ দেখিয়া চোর যেভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট-কুড়ি পরে তাহার রুদ্ধ দরজায় ঘা পড়িল ; এবং বাহির হইতে তাহার পিতা স্নিগ্ধস্বরে ডাক দিলেন, মা অচলা, জেগে আছো কি?

কিন্তু সাড়া না পাইয়া অধিকতর কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, বেলা গেছে মা, ওঠো। সুরেশের পিসীমা তোমাকে নিতে এসেছেন, মহিম নাকি ভারী পীড়িত।

অচলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে দ্বার খুলিয়া দিতেই সুরেশের পিসিমা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

কেদারবাবু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একান্তে বসিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের চলে আসার পর থেকেই মহিমের ভারী জ্বর। খুব সম্ভব রাত্রে হিম লেগে দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে। বলিয়া সুরেশের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আমি ভেবে

সারা হয়ে যাচ্ছি, এদের পাঠিয়ে পর্যন্ত সে একটা সংবাদ দিলে না কেন? সুরেশ আমার দীর্ঘজীবী হোক, সে গিয়ে বুদ্ধি করে তাকে এখানে না এনে ফেললে কি যে হতো তা ভগবানই জানেন। বলিয়া সস্নেহ অনুতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

সুরেশের পিসীমা অচলার বাহুর উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন ভয় নেই মা, সে দু'দিনেই ভাল হয়ে যাবে।

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আলনা হইতে শুধু গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শীতের অপরাহ্নে ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি গায়ে, অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল; কিন্তু পুরোবর্তী ঐ বিধবার সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন, চল মা, আমিও সঙ্গে যাচ্চি, বলিয়া চটি-জুতা পায়ে দিয়াই সকলের অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহিমের প্রতি অচলার সকলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী হইয়াও সে একটি দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পায় নাই। এই লইয়া সুরেশও বন্ধুর সহিত ছেলেবেলা হইতে অনেক বিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কৃপণের ধনের মত মহিম সেই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এমনি একান্ত করিয়া আগলাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখ দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে থাক, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোনদিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।

সুতরাং বাড়ি যখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃপিতামহের ভস্মীভূত গৃহস্তূপের প্রতি চাহিয়া মহিমের বুকে যে কি শেল বিঁধিল, তাহার মুখ দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। মৃণালের বৈধব্যেও স্বামীর দুঃখের পরিমাণ করা তাহার তেমনি অসাধ্য। যেদিন নিজের মুখে শুনাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেদিন সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে এমনি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এত বড় নির্বোধও সে নহে যে, সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্যকে যথার্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মনের মধ্যে কোন সংশয়ই উঁকি মারিত না। তাই সেদিন স্টেশনের উপরে সে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারংবার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সহিষ্ণুতার ওই মিথ্যা মুখোশের অন্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ।

আজ তাহার পীড়ার সংবাদটাকে লঘু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার জন্য কেদারবাবু যখন সহজ গলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্চর্য হন নাই, বরঞ্চ এত বড় দুর্ঘটনার পরে এমনিই কিছু একটা মনে মনে আশঙ্কা

করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অন্তরে যে ভাব একমুহূর্তের জন্যও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিমিশ্র উৎকণ্ঠা বলাও সাজে না।

সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। পিসীমা এক দিকের দরজা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাহার পার্শ্বে অচলা পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। শুধু কেদারবাবু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের দিকে শূন্যদৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন। সুরেশের মত দয়ালু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলে ভূ-ভারতে নাই; মহিমের একগুঁয়েমির জ্বালায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে দেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, শুধু চোর-ডাকাত, শিয়াল-কুকুরের বাস, সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাস করার শাস্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে,—এমনি সমস্ত সংলগ্ন-অসংলগ্ন মন্তব্য তিনি নিরন্তর এই নির্বাক রমণী-দুইটির কর্ণে নির্বিচারে ঢালিয়া চলিতেছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেদারবাবু স্বভাবতঃই যে এতটা হালকা প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়-আনন্দ কোন সংযমের শাসনই মানিতেছিল না। তাঁহাদের পরম মিত্র সুরেশের সহিত প্রকাশ্য বিবাদ, একমাত্র কন্যার নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কদর্য সংশয়ের গোপন গুরুভার বিগত কয়েকদিন হইতে তাঁহার বুকের উপর জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসীমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অসুখের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই দেন নাই। যদি সে রাত্রির দৈব-দুর্বিপাকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া একটু জ্বরভাবই হইয়া থাকে ত সে কিছুই নহে। পিসীমা দুই-তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছিলেন; হয়ত সে সময়ও লাগিবে না, হয়ত কাল সকালেই সারিয়া যাইবে। পীড়ার সম্বন্ধে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, সুরেশ স্বয়ং গিয়া তাহাকে আপনার বাড়িতে ধরিয়া

আনিয়াছে এবং যে-কোন ছলে তাহার স্ত্রীকে তাহার পার্শ্বে আনিয়া দিবার জন্য নিজের পিসীমাকে পর্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে। কন্যা জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আজ এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ায়, এই অবিশ্রাম বকুনির মধ্যেও তাঁহার নিরতিশয় আত্মগ্লানির সহিত মনে হইতে লাগিল, ওখানে পৌঁছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ভদ্র যুবকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি করিয়া? কিন্তু তাঁহার কন্যার সর্বদেহের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে বুঝিয়াছিল, শুধু বুঝিতে পারিতেছিল না, সুরেশ তাহাকে ধরিয়া আনিল কিরূপে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ি সুরেশের বাটীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়িবারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেদারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সহসা উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই অচলার চকিত দৃষ্টি গিয়া তাহার উপরে পড়িল এবং লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুরেশ একজন প্রবীণ ইংরাজকে সসম্ভ্রমে গাড়িতে তুলিয়া দিতেছে এবং আর একজন সাহেবী-পোশাকপরা বাঙালী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইঁহারা যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ইঁহাদের গাড়ি আসিয়া গাড়িবারান্দায় লাগিল। সুরেশ দাঁড়াইয়া ছিল, কেদারবাবু চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, মহিম কেমন আছে সুরেশ? অসুখটা কি?

সুরেশ কহিল, ভাল আছে। আসুন।

কেদারবাবু অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখটা কি তাই বল না শুনি?

সুরেশ কহিল, অসুখের নাম করলে ত আপনি বুঝতে পারবেন না কেদারবাবু! জ্বর, বুকে একটু সর্দি বসেছে। কিন্তু আপনি নেমে আসুন, ওঁদের নামতে দিন।

কেদারবাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, একটু সর্দি বসেছে। তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই করতে পার! আমি ছেলেমানুষ নই সুরেশ, দু'জন ডাক্তার কেন? সাহেব-ডাক্তারই বা কিসের জন্যে? বলিতে বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশ নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া বলিল, পিসীমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্চি।

অচলা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না, তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না; নামিতে গিয়া পাদানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না, সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে নামিয়া পিসীমার পিছনে পিছনে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মিনিট-কয়েক পরে দ্বারের ভারী পর্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মহিম বোধ করি তাহার বাটীর সম্বন্ধে কি-সব বলিতেছিল। সেই জড়িতকণ্ঠের দুটা কথা কানে প্রবেশ করিবামাত্রই আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, ইহা অর্থহীন প্রলাপ এবং রোগ কতদূর গিয়া দাঁড়াইয়াছে; মুহূর্তকালের জন্য সে দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া আপনাকে দৃঢ় করিয়া রাখিল।

যে মেয়েটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বরফ দিতেছিল, সে ফিরিয়া চাহিল এবং ধীরপদে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড়ভাবে বিরাজ

করিতেছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই; এখন মুখোমুখি স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই ক্ষণকালের জন্য উভয়েই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল; একবার অচলার সমস্ত দেহ দুলিয়া নড়িয়া উঠিল; কি একটা বলিবার জন্য ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ছিন্নলতার মত মৃণালের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাহিয়া দেখিল, সে পিতার ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একজন দাসী গোলাপজলের পাত্র হইতে তাহার চোখেমুখে ছিটা দিতেছে এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুরেশ একখানা হাতপাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, স্মরণ করিতে তাহার কিছুক্ষণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতে লজ্জায় মরিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, একটু বিশ্রাম কর মা, এখন উঠে কাজ নাই।

অচলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, এখন উঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সুরেশও অস্ফুটে বোধ করি এই কথারই অনুমোদন করিল। অচলা নীরবে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রত্যুত্তরে কেবল পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঘুমোবার জন্যে ত এখানে আসিনি বাবা—আমার কিছুই হয়নি—আমি ও-ঘরে যাচ্চি। বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ বাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্মৃত হয় নাই। রোগীর কক্ষ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাহিয়া দেখিল; কহিল, তুমি এসে

একটুখানি বসো সেজদি, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই গে। বরফের টুপিটা গড়িয়ে না পড়ে যায়, একটু নজর রেখো। বলিয়া সে অচলাকে নিজের জায়গায় বসাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নিমোনিয়া রোগ সারিতে সময় লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এ যাত্রায় আর তাহার ভয় নাই, এ কথা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের অর্থহীন বাক্য, চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সমস্তই শান্ত এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

দিন-দশেক পরে একদিন অপরাহ্নবেলায় মহিম শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এ বৎসর সর্বত্রই শীতটা বেশী পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রোগীর খাটের সহিত একটা বড় তক্তপোশ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়াছিল। সকলের চোখ-মুখেই একটা নিরুদ্বিগ্ন তৃপ্তির প্রকাশ; শুধু পিসীমা গৃহকর্মে অন্যত্র নিযুক্ত এবং কেদারবাবু তখনও বাড়ি হইতে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই।

সুরেশের প্রতি চাহিয়া মৃণাল হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিল, এইবার আমার ছাড়পত্র মঞ্জুর করতে হুকুম হোক সুরেশবাবু, আমি দেশে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাশুড়ি হয়ত বা মরেই গেল।

সুরেশ কহিল, এখনও কি তাঁর বেঁচে থাকা দরকার নাকি? না, তাঁর জন্য আপনার যাওয়া হবে না।

মৃণাল পলকের তরে ঘাড় ফিরাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘনিশ্বাসই চাপিয়া লইল; তাহার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, শুধু আপনিই নয় সুরেশবাবু, এ প্রশ্ন পূর্বে আমিও অনেকবার করেছি। মনেও হয়, এখন তাঁর যাওয়া মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাঁচনের মালিক যিনি, তাঁর ত সে

খেয়াল নেই, থাকলে হয়ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মানুষ নিস্তার পেত।

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথায় বোধ করি তাহার স্বামীর মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল, তার মানে যিনি অন্তর্যামী তিনি জানেন, মানুষ শত দুঃখেও নিজের মৃত্যু চায় না।

মৃণালের মুখের উপর একটা গোপন বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না সেজদি, তা নয়। এমন সময় সত্যিই আসে যখন মানুষে যথার্থই মরণ-কামনা করে। সেদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে শাশুড়ি-ঠাকরুনকে বিছানায় পেলুম না। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুরঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, তিনি গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের কাছে করজোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইচেন। বলছেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কায়মনে তোমার সেবা করে থাকি ত আজ আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাইনে, স্বর্গ চাইনে, শুধু এই চাই ঠাকুর, তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না—আমি এ মুখ আমার বৌমার কাছে বার করতে পারচি নে। বলিতে বলিতেই মৃণাল ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের কত বড় সুগভীর বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। সুরেশের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও সামান্য দুঃখেই সে কাতর হইয়া পড়িত; আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাও দিদি, তোমার বুড়ো শাশুড়ির সেবা করে কর্তব্য কর গে, আমি আর তোমাকে আটকে রাখব না। এই হতভাগ্য দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ । এমন জিনিসটি বোধ করি, আর কোন দেশ দেখাতে পারে না। বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-মুখে একবার অচলার প্রতি

চাহিল। কিন্তু সে জানালার বাহিরে একখণ্ড ধূসর মেঘের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল বলিয়া তাহার কাছ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কিন্তু মৃণাল লজ্জা পাইয়া নিজের দিক হইতে আলোচনাটাকে অন্য পথে সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, নেই বৈ কি! আপনি সব দেশের খবর জানেন কিনা! আচ্ছা, সেজদার চেয়ে আপনি বড় না ছোট?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেশ সহাস্যে কহিল, কেন বলুন ত?

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, না, আমাকে আর আপনি নয়। আমি দিদি হলেও যখন বয়সে ছোট, তখন—মেজদা? নদা?—বলুন, বলুন, শিগ্‌গির বলুন, কি?

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার তাহার দিকে চাহিল। অনেকদিন পূর্বে যেদিন এই মেয়েটি এমনি দ্রুত, এমনি অবলীলাক্রমে তাহার সহিত সেজদি সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মৃণালের চরিত্রের এই দিকটা সুরেশের জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল, নদা! নদা! তোমার সেজদার চেয়ে আমি প্রায় দেড় বছরের ছোট।

মৃনাল কহিল, তা হলে নদা, দয়া করে একটি লোক ঠিক করে দিন, যে আমাকে কাল সকালের গাড়িতে রেখে আসবে।

যাইবার অনুমতি এইমাত্র সুরেশ নিজে দিলেও সে যে কাল সকালেই যাইতে উদ্যত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। তাই ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, আর দুটো দিনও কি থাকতে পারবে না দিদি? তোমার ওপর ভার দিয়ে আমরা মহিমের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা করতে আমি হাসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেচি বলে মনে হয় না। কি বল অচলা?

প্রত্যুত্তরে অচলা শুধু মাথা নাড়িল।

মৃণাল সুরেশের চিন্তিতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি সেজন্যে একটুকুও ভাববেন না। যার জিনিস, তারই হাতে দিয়ে যাচ্ছি, নইলে আমিও হয়ত যেতে পারতুম না। আপনার ত মনে আছে, আমাদের কি রকম তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছিল। তাই কোনো বন্দোবস্ত করেই আসা হয়নি। কাল আমাকে ছুটি দিন নদা, আবার যখনই হুকুম করবেন, তখনই চলে আসব।

সুরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সহসা বলিয়া বসিল, আচ্ছা মৃণাল, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শুধু কেবল একটা বুড়ো শাশুড়ির সেবা করে, আর পূজো-আহ্নিক করে তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে কি করে, আমি তাই শুধু ভাবি।

মৃণালের মুখের উপর পুনরায় ব্যথার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, সময় কাটাবার ভার ত আমার ওপর নেই নদা। যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা সে যেন হলো। কিন্তু তোমার শাশুড়ি ত বেশীদিন বাঁচবেন না, আর মহিমকেও ডাক্তারের হুকুমমত ভাল হয়ে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর শহরে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হবে। তখন একলাটি সেখানে তুমি থাকবে কি করে?

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, সে উনিই জানেন।

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, নদা বুঝি এ-সব মানেন না?

কি সব?

এই যেমন ভগবান—

না।

তবে বুঝি আমাদের জন্যে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল নদা?

সুরেশ এ প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না মৃণাল, তা নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার তেমনি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে, তা আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু এ-সব আলোচনা থাক দিদি, হয়ত আমার প্রতি তোমার একটা ঘৃণা জন্মে যাবে।

মৃণাল তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, আচ্ছা থাক।

সুরেশ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, এটা আবার কি হলো মৃণাল?

কোন্‌টা নদা?

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ পায়ের ধূলো নেওয়াটা?

মৃণাল কহিল, বড়ভাইয়ের ধূলো নিতে কি আবার দিনক্ষণ দেখাতে হয় নাকি? বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

আচ্ছা মেয়ে ত! বলিয়া সস্নেহে-হাস্যে সুরেশ অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখ শ্রাবণ-আকাশের মত ঘন মেঘে যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এমনি বোধ হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া এ-সম্বন্ধে কোনোপ্রকার প্রশ্নের আভাসমাত্র দিবার পূর্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিবার অজস্র অবকাশ দিয়া ত্বরিতপদে মৃণালের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল? মৃণালের প্রণাম করার সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নিজের ভিতর হইতেই নিশ্চয় অনুমান করিতে লাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না ফেলিতে কেনই-বা অচলা ওরূপ বিবর্ণমুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। নিজের ব্যবহার ও কথাবার্তাগুলা সে

আগাগোড়া বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করিয়াও কিন্তু কোন কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ পাশাপাশি এত বড় দুটা ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং তাহারই কোন অজ্ঞাত নিন্দিত আচরণই যে এই অনর্থের মূল, এ সংশয় তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ-সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাত্রিটা সে এক-রকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রভাতে একসময়ে অচলাকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, তোমাকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।

অচলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অগোচর ছিল না। গত রাত্রির সেই তাহার অদ্ভুত আচরণের এই কৈফিয়ত দিতে হইবে বুঝিয়া সে আরক্ত-মুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

সুরেশ আস্তে আস্তে বলিল, কাল মৃণাল হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে গেল, তুমিও মুখ ভার করে রাগ করে চলে গেলে, সে কি তার শাশুড়ির মরণের কথা বলেছিলুম বলে?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, এ-রকম প্রসঙ্গ কি তোমার তোলা উচিত ছিল? সে বেচারার স্বামী নেই, শাশুড়ির মৃত্যুতে তার নিঃসহায় অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি!

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচতে পারেন না, এ ত মৃণাল নিজেও বোঝে। তা ছাড়া সে নিঃসহায় হবেই বা কেন?

অচলা জবাব দিল, এ কথা আমরা ত তাকে একবারও বলিনি। বরঞ্চ তুমিই তাকে নানারকমে ভয় দেখালে, দেশে সে একলাটি থাকবে কেমন করে?

সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে সে যাবার পূর্বে আমার কি তাকে সাহস দেওয়া উচিত নয়? তার যে কোন ভয় নেই, এ কথা কি তাকে—বলিতে বলিতেই অকৃত্রিম করুণায় তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পরদুঃখকাতর সহৃদয় যুবকের সহস্র দয়ার কাহিনী তাহার চক্ষের নিমিষে মনে পড়িয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তোমার সাহস দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। যখন সে সময় আসবে, তখন আমি চুপ করে থাকব না।

সুরেশ আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ তাহার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই ত তোমার যোগ্য কথা! এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা! বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় হাত ছাড়িয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তাহার যে উচ্ছ্বাস মুহূর্তপূর্বে পরার্থপরতার নির্মল আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল, এই লজ্জিত পলায়নে তাহা এক নিমিষেই কদর্য কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরিয়া উঠিল এবং সর্বাঙ্গ বারংবার শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্তী একখানা চেয়ারের উপর সে নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পীড়িত স্বামীর শয্যায় গিয়া নিজের আসনটি গ্রহণ করিতে আজ সমস্ত সকালটা তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

যাই যাই করিয়াও যাইতে মৃণালের দিন-দুই দেরি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল, আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই মিথ্যা নিদ্রার হেতু নিশ্চিত অনুমান করিয়াও চুপি চুপি কহিল, ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সেজদি। কি বল?

প্রত্যুত্তরে অচলার ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল। মৃণাল মনে মনে বুঝিল, এ ছলনা সে ছাড়াও আরো একটি নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অচলা অন্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষার ভাব পোষণ করে, তাহা সে মহিমের কাছে কোনদিন আভাসমাত্র না পাইয়াও জানিত। এই

একান্ত অমূলক দ্বেষ তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। কিন্তু তথাপি অচলা যে নিজের হীনতা দিয়া আজিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্বলতাটুকুকে বিকৃত করিয়া দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। মুহূর্তকালের নিমিত্ত তাহার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া কানে কানে কহিল, তুমি ত সব জান সেজদি, আমার হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। বলো, ভাল হয়ে আবার যখন দেশে ফিরবেন, বেঁচে থাকি ত দেখা হবে।

নীচে কেদারবাবু বসিয়াছিলেন। মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিলেন। জামার হাতায় অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, মা, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমরা যমের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। যখনি ইচ্ছে হবে, যখনই একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে ভুলো না মা। আমার বাড়ি তোমার জন্যে রাত্রি-দিন খোলা থাকবে মৃণাল।

অচলা অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃণাল তাহাকে দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল, যমের বাপের সাধ্যি কি বাবা, ওঁর কাছ থেকে সেজদাকে নিয়ে যায়! যেদিন সেজদির হাতে পৌঁছে দিয়েছি, সেইদিনই আমার কাজ চুকে গেছে।

কেদারবাবুর মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

দুইজন বৃদ্ধগোছের কর্মচারী ও একজন দাসী মৃণালকে দেশে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের সকলকে লইয়া স্টেশনের অভিমুখে ঘোড়ার গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া গেলে কেদারবাবুর অন্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন, অদ্ভুত, অপূর্ব মেয়ে!

সুরেশের মনটাও বোধ করি এইভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া সায় দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি কেদারবাবু! এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি, এমন নিপুণ

কাজকর্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও, এমন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে যে মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চিরকালটা আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, কোনদিন গ্রামের বাইরে পর্যন্ত যায়নি।

কেদারবাবু ইহা সত্য বলিয়া জানিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ!

সুরেশ কহিল, যথার্থই তাই। ওর পানে চেয়ে চেয়ে আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, এই যে জন্মান্তরের সংস্কার বলে একটা প্রবাদ আছে, কি জানি সত্যি নাকি! বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই হোক, এ কয়দিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে, এ মেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারাজীবন এমন জীবন্মৃত করে রাখা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ। ও আমার মেয়ে হলে আমি কোনমতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতুম না।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করতেন?

বৃদ্ধ উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন, আমি আবার বিবাহ দিতুম। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর ওই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছে, তারা ওর মিত্র নয়, ওর শত্রু। শত্রুর কার্যকে আমি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতুম না।

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তাছাড়া ওর স্বামীর ব্যবহারটাই একবার মনে করে দেখ দিকি সুরেশ। সে লোকটার দু-দুটো স্ত্রী গত হতে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন এমন মেয়েকে বিবাহ করতে রাজি হলো তখন নিজের সুখ-সুবিধে ভিন্ন স্ত্রীর ভবিষ্যতের দিকে পাষণ্ড কতটুকু দৃষ্টিপাত করেছিল, কল্পনা কর দেখি।

সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভালমন্দ তর্ক তুলচি নে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চিৎকার করে ম'লেও আমি মানবো না, এই ব্যবস্থাই ওই দুধের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ। ওর এমন এতটুকু কিছু নেই, যার মুখ চেয়ে ও একটা দিন কাটাতে পারে। সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিস পেয়েছ সুরেশ, যে ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য করে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ওর জন্যেই রাতারাতি বদলে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে! মেয়েটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন ফেটে যেতে থাকে।

সুরেশ জবাব দিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে, চৌকাঠে ভর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্যন্ত মূর্তির মত দাঁড়াইয়াছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা যখনই সুরেশের মুখের দিকেই দিকে চাহিয়া দেখে, তখনই তাহার মনে হয়, সে বিমনা হইয়া আছে এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

দুই দিন পরে একদিন অপরাহ্নে সুরেশ নীচের বারান্দার একধারে রৌদ্রের মধ্যে আরাম-কেদারাটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল, তাহারই জন্য চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্বে কোনদিন ঘটে নাই; তাই সে আশ্চর্য হইয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়ারা কৈ? আজ তুমি যে!

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই একটা ছোট টিপয় চেয়ারের পাশে টানিয়া চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিল এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে আর সুরেশের সাহস হইল না। শুধু চায়ের পেয়ালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সুরেশবাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল বলে মনে করেন না?

সুরেশ চায়ের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, করি। তার কারণ, কুসংস্কার আজও আমার অতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

অচলা চিন্তা করিবার নিজেকে আর মুহূর্ত অবসর না দিয়া বলিল, তাহলে মৃণালের মত মেয়েকে বিবাহ করতে আপনার ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুরেশ চায়ের বাটিটা হাতে করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, এ কথার মানে?

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজভাবে বলিল, আপনার কাছে আমি অসংখ্য ঋণে ঋণী। তা ছাড়া আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আপনাকে আমি সুষ্ঠু, সহজ, সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্বীকার করুন।

এক নিশ্বাসে মুখস্থর মত এতগুলা কথা বলিয়া অচলা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

সুরেশ পাথরে-গড়া মূর্তির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, এতে তুমি কি সত্যিই সুখী হবে?

অচলা কহিল, হাঁ।

সে রাজি হবে?

তাই ত আমার বিশ্বাস।

সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস তা নয়। বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত। এদের মুখের কথায় সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, একটা

একটা করে হাত-পা কাটতে থাকেলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজী করানো যাবে না। এ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করে মাঝ থেকে আমাকে তার কাছে মাটি করে দিও না অচলা। আমাকে সে দাদা বলে ডেকেছে, তার কাছে আমি সম্মানটুকু বজায় রাখতে চাই।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। সুরেশের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি বলে জেনে রাখবেন সুরেশবাবু! বলিয়া স্তম্ভিত অভিভূত সুরেশের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়াই এ গর্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

একজনের উচ্ছ্বসিত অকপট প্রশংসার মধ্যে যে আর একজনের কত বড় সুকঠোর আঘাত ও অপমান লুকাইয়া থাকিতে পারে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কেহই বোধ করি তাহা মুহূর্তকাল পূর্বেও জানিত না। সুরেশ হাতের বাটি হাতে লইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, এবং অচলা তাহার ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া মর্মান্তিক ক্রন্দনের দুর্নিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল,—পাশেই মহিমের ঘর, পাছে বিন্দুমাত্র শব্দও তাহার কানে গিয়া পৌঁছে। বস্তুতঃ অন্তর্যামী ভিন্ন সে কান্নার ইতিহাস আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী-জীবনের সতীত্ব যে কতবড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই প্রথম যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিল। সেদিন সুরেশের সংস্পর্শে পিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সে অন্যায় উপদ্রব মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেই যখন সতীত্বের পাদপদ্মে অমন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যকার স্থানটাও আর তাহার দৃষ্টির অগোচর রহিল না।

আরও একটা জিনিস। সুস্পষ্ট বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ, আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়মন-নিষ্ঠাই যে সতীত্ব, এ কথা তাহার অবিদিত ছিল না। শুধু দেহ বা শুধু মন কোনটাই যে একাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তথাপি মন যখন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিহ্বা যখন এ কথা উচ্চরবে ঘোষণা করিতেও সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু কোনদিন তাহার

আপনাকে ছোট বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সুরেশের মুখের সুস্পষ্ট বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা যোগ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এক বুক-ফাটা বেদনার আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া মৃণালের প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল, তাহা নহে; কিন্তু এই মেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ লাভ করিল, ইহা সে জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবে না, ইহা আপনার কাছে আপনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে পিতার লাঠির আওয়াজ এবং পিছনে সুরেশের পদশব্দ শুনিতে পাইল। বুঝিল, তাঁহারা মহিমকে দেখিতে চলিয়াছেন, এবং অল্পকাল পরেই পিতার কণ্ঠস্বরে তাহার আহ্বান শুনিয়া সে বেশ করিয়া আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ও-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, আজ ব্যাপার কি? দুটোর সময় সুরুয়া দেবার কথা, চারটে বাজে যে! ও কি, চোখ-মুখ অমন ভারী কেন? ঘুমুচ্ছিলে না কি?

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রোগীকে সুরুয়া দিবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা মৃণালই করিত। চাকর চড়াইয়া দিত, সে আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে নামাইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভারটা অচলার উপরেই পড়িয়াছিল। আজ সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আগুন বহুক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা শুকাইয়া পুড়িয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাবু এ কথা শুনিয়া অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কঠিনভাবে বলিলেন, তখনি ত তোমাকে বলেছিলুম সুরেশ, এখন একজন ভাল নার্স না রাখলে মহিমকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের মেয়েকে কি আমার চেয়ে তোমরা বেশি বোঝো?

সুরেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত ম্লান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন ধীরে ধীরে কহিল, নার্সের হাতে আমার ওষুধ পর্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হবে না সুরেশ। তবে ওঁকে সাহায্য করবার একজন লোক দাও। কাল-পরশু দুটো রাত্রিই ওঁকে সারারাত্রি জাগতে হয়েছে। দিনের বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ না পেলে কলের মানুষকে দিয়েও কাজ পাবে না ভাই।

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও মিথ্যা নয়। সুরেশ খুশী হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাবু নিজের রূঢ়বাক্যে লজ্জা পাইয়া কোন-কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে তাহার অনেকবার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রুগ্ন স্বামীর কাছে বহু অপরাধের জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহার মত পাপিষ্ঠাকে তিরস্কার হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় কোনমতেই এ প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

সুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে সে একবার করিয়া মহিমের ঘরে ঢুকিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে শুইতে যাইত। মৃণাল থাকিতে সে প্রায় সারারাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং তাহার আবশ্যকও ছিল; কিন্তু কয়দিন হইতে দেখা গেল, সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে দাসী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষণকালের জন্য একটিবার মাত্র নিজে আসিয়া সংবাদ গ্রহণ করে। তাহার এই নূতন আচরণ সকলের অগ্রে অচলারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন হইয়াই ছিল; কিন্তু যেদিন মহিম নিজে ইহার উল্লেখ করিল, তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল তিনি অধিকাংশ সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার

হেতু কি, তাহাও সে জানে না। মহিম চুপ করিয়া শুনিল, কোনপ্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নীচে নামিতেছিল, এবং সুরেশও কি একটা কাজে এই সিঁড়ি দিয়াই উপরে উঠিতেছিল; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবামাত্রই অন্যদিকে সরিয়া গেল। সে যে সর্বপ্রকারে তাহাকেই পরিহার করিয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না; এবং একদিন যাহা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, আজ তাহার সেই মনই সুরেশের আচরণে বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অচলার সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত ওঠা-বসার মধ্যেও নিভৃত হৃদয়তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জ্বালা করিতেই লাগিল, তাহা এই যে সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন কাজ করিতেছে, যাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ নেই। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি মাঝে বিকট ভয়ে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না। প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত, অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে; তথাপি ছায়ার মত এ কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল এবং বোধ করি বা, এই বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত দিবারাত্রির একটুকু কাল স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস করিল না। পাশের যে ঘরটা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কয়দিনের মধ্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; এমন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই জব্বলপুরে চেঞ্জে যাইবার কথাবার্তা চলিতেছে। সেদিন সকালবেলা অচলা মেঝের উপর বসিয়া একটি স্টোভে স্বামীর জন্য দুধ গরম করিতেছিল; দুধ মুহুর্মুহুঃ উথলিয়া উঠিতেছিল,

কোন দিকে চাহিবার তাহার এতটুকু অবসর নাই, মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল, সে জানিত না—হঠাৎ স্বামীর দীর্ঘশ্বাস কানে যাইতেই সে মুখ তুলিয়া একটিবারমাত্রই চাহিয়াই পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

মহিম কোনদিন বেশি কথা কহে না; কিন্তু আজ সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোনদিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয়, আমার একটা দিনও কাটবে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করেনি, কিন্তু কি জানি, যখনই জ্ঞান হতো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম; কেবলি মনে হতো হয়ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে—এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন করে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতে বাঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধতেই হবে। আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ। বলিয়া মহিম একটুখানি হাসিল।

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতেই লাগিল, কোন কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও।

তবুও অচলা জবাব দিল না, তেমনি অধোমুখেই বসিয়া রহিল। প্রথমটা মহিম একটুখানি বিস্মিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল, স্বামীর কাছে অচলা চোখের জল গোপন করিবার জন্যই অমন করিয়া একভাবে অধোমুখে বসিয়া আছে।

কেন যে সুরেশ বড়-একটা আসে না, তাহার হেতু নিশ্চয় করিয়া মহিম না বুঝিলেও কতকটা অনুমান করে নাই, তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা

আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ, অচলা যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জনে অকস্মাৎ দেখা হইতে পারে, এই ভয়েই সে যে ঘর ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে না, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল। আজ তাই সারাদিন ধরিয়া মন যেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া কাটাইল। তাহার শয্যার কিছু দূরে একটা চৌকি ছিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার উপরে বসিয়া অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লান্তিবশতঃ সেখানেই অবশিষ্ট রাতটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে মহিমের ডাকে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা দিয়া দেখিল, বেলা হইয়া গিয়াছে।

মহিম কি-একটা কাজ বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল, এবং স্ত্রীর আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিজের গায়ের কাপড় কি হলো?

অচলা ততোধিক বিস্ময়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া যেখানা সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানা সুরেশের। স্বামীর প্রশ্নটা তাহাকে যেন চাবুক মারিল। লজ্জায় ব্যথায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এ যে কি করিয়া ঘটিল, তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্মরণ হইল, গত রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে সে নিজের শালখানা পাট করিয়া তাঁহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অঞ্চলমাত্র গায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে জাগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু স্ত্রীর একান্ত লজ্জিত ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মহিম সস্নেহে সকৌতুকে হাসিল।

কহিল, এতে লজ্জা কি অচলা? চাকরটাই হয়ত উলটা-পালটা করে তোমারটা তার ঘরে দিয়ে তারটা এখানে রেখে গিয়েছে। না হয় সুরেশ নিজেই

হয়ত কাল বিকেলবেলা ফেলে গিয়েছে, রাত্রে চিনতে না পেরে তুমি গায়ে দিয়েছ। বেয়ারাকে ডেকে বদলে আনতে বলে দাও।

দিই, বলিয়া সেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া যখন অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে ওভাবে নিদ্রিত দেখিয়া আপনার গাত্রবাসখানি দিয়া ঘুমন্ত তাহাকে সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না। সে চোখ বুজিয়া সে আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার জন্য এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য সে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং হয়ত প্রতি রাত্রেই আসিয়া থাকে, কেহ জানিতেও পারে না।

এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না; এবং ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্রপ্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এ চৌর্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোনমতেই সায় দিতেছে না, ইহাও তাহার অগোচর রহিল না এবং কোথায় কিসে যে তাহাকে এতদিন উঠিতে বসিতে বিঁধিতেছিল, তাহাও যেন একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

কেদারবাবুর এক বাল্যবন্ধু জব্বলপুর শহরে বাস করেন; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে এ স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার নিজের বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের যদি আসাই হয়, ত সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কেদারবাবু আসিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ; এবং মাঘ মাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে এবং পথের অল্পস্বল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে সমর্থ, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্তব্য। যুবা-বয়সে তিনি নিজে একবার জব্বলপুরে গিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জগদীশের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন, তিনি মায়ের মত মহিমকে যত্ন করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষে তাঁহারও আর একবার দেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিম চুপ করিয়া এই-সকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহহীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রস্থান করিলে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, জব্বলপুর ত বেশ জায়গা, তোমার যেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবছ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোনদিন হব কিনা, তার আমি আশা করিনে।

অচলা বলিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর করে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশী দিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য এতদিন রুদ্ধ হইয়া ছিল, সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু-একটা করিয়া বসে এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে

একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ে ব্যথায় সে উন্মুক্ত দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আবার যখন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল তখন স্বামী-স্ত্রীর কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল, জগদীশবাবু টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছেন, তাঁর বাসার কাছে আমাদের জন্যে তিনি একটা ছোট বাড়ি ঠিক করেছেন।

মহিম কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু বলে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারেন। কিন্তু দু'জনে গিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না। তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার জন্যে টেলিগ্রাম করতে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার জবাব। বলিয়া সে হলদে খামখানা স্বামীর বিছানার উপর ছুড়িয়া দিল।

মহিম হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা। অচলা যে স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাইতে চাহে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কল্যকার আচরণ, যাহা আজিও তাহার কাছে তেমনি দুর্বোধ্য, তেমনিই দুর্জ্ঞেয়, তাহাই স্মরণ করিয়া কোনরূপ অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে যাত্রার উদ্যোগ পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। সেদিন দুপুরবেলা সে বাটীতে আসিয়া তাহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিল, কেদারবাবু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় মা?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয়, পিতা হইয়া কন্যাকে এ কথা জানাইতে কেদারবাবু লজ্জা বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিমের বর্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশীদিন ত নয়।

তা ছাড়া, জগদীশের ওখানে তার কোন অসুবিধেই হতো না। এই অল্পকালের জন্যে বেশী কতকগুলো খরচপত্র করে—

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বলছিলেন বুঝি?

না না, মহিম কিছু বলেন নি, শুধু আমি ভাবছি—

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে আমি সমস্ত ঠিক করে নেবো, বলিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করিল এবং পরদিনই লুকাইয়া তাহার দুখানা গহনা বিক্রি করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসিমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন স্থির করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

যাইবার দিন-দুই পূর্ব হইতেই অচলার সারা প্রাণটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্বামিগৃহবাস ব্যতীত তাহাকে জীবনে কখনো অন্যত্র যাইতে হয় নাই, আজিও সে পশ্চিমের মুখ দেখে নাই। সেখানে কত প্রাচীন কীর্তি, কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, কত নদ-নদী, জলপ্রপাত, এমন কত কি আছে, যাহার গল্প লোকের মুখে শুনা ভিন্ন নিজে দেখিবার কল্পনা কোনদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এইবার সেই-সকল আশ্চর্য সে স্বচক্ষে দেখিতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্বামী ভগ্নদেহ ফিরিয়া পাইবে, একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সর্বকার্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সেখানে জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও সুগম, তিনি ভাল হইলে হয়ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাহাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচিরভবিষ্যতে যে-সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের কচি মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল।

এমনি কত কি যে সুখের স্বপ্ন দিবানিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার ইয়ত্তা নাই। আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। আর তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ রহিল না—অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত নির্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ তাহার বড় সাধ হইতে লাগিল, যাইবার আগে একবার মৃণালকে দেখে এবং সমস্ত বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জানা-অজানা সকল অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা মাগিয়া লয়। আর সুরেশের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সে যে পরম বন্ধু হইয়াও লজ্জায় সঙ্কোচে তাহাদের দেখা দিতে পারে না, তাহার এই দুর্ভাগ্যের গোপন বেদনাটি সে আজ যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোনদিন করে নাই। তাঁহারও কাছে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবার আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তিনি কাল হইতেই গৃহে নাই।

যাইবার দিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িত আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা হইয়াছে, কিছু কিছু স্টেশনেও পাঠানো হইয়াছে, টিকিট পর্যন্ত কেনা হইয়া গিয়াছে। অচলার জন্যও সেকেন্ড ক্লাস টিকিট কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া মহিমকে বলিয়াছিল, টাকা মিথ্যে নষ্ট করবার সাধ থাকে ত কিনতে দাও গে। আমি সুস্থ সবল, তা ছাড়া কত বড়লোকের মেয়েরা ইন্‌টার ক্লাসের মেয়েগাড়িতে যাচ্ছে, আর আমি পারিনে? আমি দেড়া ভাড়ার বেশি কোনমতেই যাবো না।

সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ দুটা দিন সুরেশের দেখা নাই। কিন্তু আজ সকালে দুর্যোগের জন্যই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক, সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দহীন কক্ষের মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দমকা বাতাসের মত

গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আতিশয্য উপচাইয়া পড়িতেছিল, বলিল, সুরেশবাবু, এ জন্মে আমাদের আর মুখ দেখবেন না নাকি? এত বড় অপরাধটা কি করেছি, বলুন ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের বাড়ি পুড়িয়া গেলে আশেপাশের গাছগুলার যে চেহারা অচলা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের এই মুখখানা এমনি করিয়াই তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল—সে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেচে, সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ কথা বলনি।

শুধু পলকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ নত করিয়া কহিল, না, আমার কোন অসুখ করেনি, আমি ভালই আছি; বলিয়া সেই বইখানার পাতা উলটাইতে উলটাইতে পুনরায় কহিল, আজই ত তোমরা যাবে, সমস্ত ঠিক হয়েছে? কতকাল হয়ত আর দেখা হবে না।

কিন্তু মিনিট-খানেক পর্যন্ত অপর পক্ষ হইতে উত্তর না পাইয়া সুরেশ বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখাচোখি হইবামাত্রই বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুরেশের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া, আপনাকে সংযত করিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার কখ্‌খনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

সুরেশ মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার জন্যে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের বাহির হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবু, আপনার চা—বলিতে বলিতে সে পর্দা সরাইয়া

ঘরে প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণেই অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ ক'দিন থেকে কোথায় গেছে জানো? পিসীমাকেও কিছু বলে যায়নি; সে কি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে না নাকি?

অচলা আস্তে আস্তে কহিল, আজ ত তিনি বাড়িতেই আছেন।

মহিম কহিল, না। এইমাত্র আমাকে ঝি বলে গেল, সে সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পূর্বেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে ছেলেবেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—শুধু কেবল এইটুকু কৃতজ্ঞতার জন্যও একবার তাহাকে আমাদের ওখানে আহ্বান করা উচিত—

আর তাহাকে ভয় নাই—লজ্জিতাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আর লজ্জা দিয়ো না—তাহার অন্তরের এই-সকলের একটা কথাও জিহ্বা আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্যন্ত পারিল না; নিঃশব্দে নিরুত্তরে হাতের কাছে যে-কোন একটা কাজের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিল। নীচে কেদারবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল এবং পিসীমা পূর্ণঘট প্রভৃতি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরেরা জিনিসপত্র গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিল, শুধু যিনি গৃহস্বামী, তাঁহারই কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ, এই বলিয়া প্রকাশ্যে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না—ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে এমনিই যেন সকলকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেদারবাবু কন্যাকে একটু নিরালায় পাইয়া মাথায় হাত দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, সতীলক্ষ্মী হও মা, মায়ের মত হও। বুড়োবয়সে না বুঝে অনেক মন্দ কথা বলেচি মা, রাগ করিস নে; বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়িতে উঠিতে গিয়া অচলাকে একান্তে ক্ষুণ্ণস্বরে চুপি চুপি কহিল, সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। একটা কথা তাকে বলবার জন্যে আমি দু'দিন পথ চেয়ে ছিলাম।

পিতার বাক্যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দ্বারের অন্তরালে পিসীমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। অচলা প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি গদগদ-কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা, স্বামীকে নীরোগ করে শিগ্‌গির ফিরিয়ে এনো, এই প্রার্থনা করি।

এই আমার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ পিসীমা !—বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে গাড়িতে গিয়া বসিল। কথাটা কেদারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিজে অমার্জনীয় লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া স্টেশন হইতে পশ্চিমের গাড়ি ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি-টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। লোকের পায়ে পায়ে জলে-কাদায় সমস্ত প্লাটফর্ম ভরিয়া উঠিয়াছে,—যাত্রীরা পিছল বাঁচাইয়া ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে মোটঘাট লইয়া জায়গা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এমনি সময় অচলা চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে।

বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায় কেদারবাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিতে না আসিতে তিনি চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেছ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ—তোমার উপদেশ, নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখলুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সারতে পারি কি না! বাস্তবিক বলচি ম—

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ। তা ছাড়া, নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছ, আজ সকালবেলা পর্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘূণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল, অচলা!

কিন্তু অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সুরেশ ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া অকস্মাৎ ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু আর ত দেরি নেই। চল চল, গাড়িতে উঠে তার পরে কথাবার্তা। চলুন কেদারবাবু, বলিয়া সে কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে একপ্রকার যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার জায়গায় বসাইয়া দিয়া অচলাকে মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। শুধু গাড়ি ছাড়িবার সময় সুরেশ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে গিয়া বসিল, তখনই তাহাকে বলিলেন, তুমি সঙ্গে আছ, আশা করি, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। মেয়েদের গাড়িটা একটু দূরে রইল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো সুরেশ এবং মহিমকে আর-একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌঁছেই খবর দিতে যেন ভুল হয় না—দেখো। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকব, বলিয়া চোখের জল চাপিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মলিন মুখ ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ পর্যন্ত দুই বন্ধুরই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িলে ঠাণ্ডার ভয়ে মহিম কম্বল মুড়ি দিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ সেইখানে একভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে যে-কেহ বলিতে পারিত, ওই দুটো চোখের দৃষ্টি আজ কোনমতেই স্বাভাবিক নয়—ভিতরে অতি বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটিতে থাকিলে মানুষের চোখ দিয়া কিছুতেই অমন কঠিন আলো ফুটিয়া বাহির হয় না।

শ্লো প্যাসেঞ্জার ছোট-বড় প্রত্যেক স্টেশনেই ধরিতে ধরিতে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাহিরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি সমভাবেই বর্ষিতে লাগিল। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিবার উপক্রম করিলে, মহিম তাহার আবরণের

ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু শুয়ে নিলে না কেন সুরেশ? এমন সুবিধে ত বরাবর আশা করা যায় না।

সুরেশ চমকিয়া বলিল, হাঁ, এই যে শুই।

এই চমকটা এমনই অসঙ্গত ও অকারণে কুণ্ঠিত দেখাইল যে, মহিম সবিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অগোচরে কি একটা অপরাধ করিতেছিল, ধরা পড়ার ভয়েই এমন ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ি আসিয়া থামিল।

সুরেশ আপনার অবস্থাটা অনুভব করিয়া একটুখানি হাসির আভাসে মুখখানা সরস করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই এমনি চমকে উঠেছিলুম—

মহিম শুধু কহিল, হুঁ; কিন্তু এই অনাবশ্যক কৈফিয়তটাও তাহার ভাল লাগিল না।

সুরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কিনা একবার খবর নিতে পারলে—

কিন্তু জল পড়চে না?

ও কিছুই নয়, আমি চট করে দেখে আসচি, বলিয়া সুরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মেয়েগাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, অচলা ইতিমধ্যে একটি সমবয়সী সঙ্গী পাইয়াছে এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। সে-ই অগ্রে সুরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ ফিরিয়া বসিল, অচলা চাহিয়া দেখিতেই সুরেশ কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করিল। অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার জলে ভিজতে হবে না, যাও। বলিয়াই কিন্তু নিজের জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু যাঁর জন্যে ভাবনা তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

সুরেশ কহিল, তা আছে, কিন্তু তোমার কিছু খাবার, কিংবা শুধু একটু জল—

অচলা সহাস্যে বলিল, না গো না, আমার কিছু চাইনে। কিন্তু তুমি নিজে কি জলে ভিজে অসুখ করতে চাও নাকি?

সুরেশ পলকমাত্র অচলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল, কহিল, অনেকদিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগ্যের কাছে অসুখ পর্যন্ত ঘেঁষতে চায় না যে!

কথা শুনিয়া অচলার কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে সুরেশ মুখ তুলিয়াই তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে কোনমতে ইহাকে একটা পরিহাসের আকার দিতে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, একবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাব যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেষ করিতে পারিল না, তাহার অদৃশ্য লজ্জা এই ছদ্ম রহস্যের বাহ্য প্রকাশকে যেন অর্ধপথেই ধিক্কার দিয়া থামাইয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, সুরেশ কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার র‍্যাপারের একটা খুঁট অচলার হাতের মুঠার মধ্যে। সে ফিসফিস করিয়া অকস্মাৎ তর্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে ডেকেছি, এ কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে কেন? কেন আমাকে অমন অপ্রতিভ করলে?

ঠিক এই কথাটাই সুরেশ তখন হইতে সহস্রবার তোলাপাড়া করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাই প্রত্যুত্তরে কেবল করুণকণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছি অচলা।

অচলা লেশমাত্র শান্ত না হইয়া তেমনি উত্তপ্তস্বরে জবাব দিল, না বুঝে বৈ কি! সকলের কাছে আমার শুধু মাথা হেঁট করবার জন্যেই তুমি ইচ্ছে করে বলেচ।

ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছিল; সুরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে দুরুদুরু বক্ষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; সে কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া আর একজনের হৃৎস্পন্দন একেবারে থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মহিম ঠিক তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, উনিই বুঝি আপনার বাবু?

অন্যমনস্ক অচলা শুধু একটা হুঁ দিয়াই আর একটা জানালার বাহিরে গাছপালা, মাঠ-ময়দানের প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে সুরেশের কাছে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার প্রবৃত্তিমাত্র রহিল না।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার মনের ক্ষোভ কাটিয়া গিয়া মুখ নির্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার সঙ্গিনীর সহিত স্বচ্ছন্দচিত্তে কথাবার্তায় যোগ দিতে পারিল; যে লজ্জা ঘণ্টা-কয়েকমাত্র পূর্বে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় স্টেশনে সুরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাঙ্গামা করতে কে বলে দিচ্ছে বল ত? তোমার বন্ধুরত্নটি বুঝি?

এ বিষয়ে সুরেশ কাহারো যে বলার অপেক্ষা রাখে না, অচলা তাহা ভাল করিয়াই জানিত, তথাপি এই অযাচিত যত্নটুকুর পরিবর্তে সে এই স্নিগ্ধ খোঁচাটুকু না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সুরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সে চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল। তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সহসা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় কুণ্ঠায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এই আরক্ত আভাসটুকু সুরেশ দুই চক্ষু দিয়া যেন আকণ্ঠ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সংবাদের জন্যই সুরেশকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল। তাঁহার কোনপ্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি না, বা কিছু আবশ্যক আছে কি না—একবার আসিতে পারেন কি না, এই-সকল একটি একটি করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ-সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাম্ভীর্যের সহিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ি বদল করতে হবে? কত রাত্রে সেখানে পৌঁছবে জানেন? একবার জেনে এসে আমাকে বলে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া সুরেশ একটু আশ্চর্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই মেয়েটি তাহার জায়গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিয়াছে। অচলা অন্তরের বিরক্তি গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনাদের বাড়িতে বুঝি কেউ চা-রুটি খায় না?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাত্ম্য থেকে বুঝি কোন বাড়ি নিস্তার পেয়েচে ভাবেন? ও ত সবাই খায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় ঘৃণায় সরে বসলেন?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে বলিল, না ভাই, ঘৃণায় নয়—পুরুষেরা ত সমস্ত খায়, তবে আমার শ্বশুর এ-সব পছন্দ করেন না, আর—আমাদের মেয়েমানুষের ত—

একদিন এমনি একটা খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার লইয়া মৃণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেদিনও সে যে-কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেমনি একটা অন্তর্জ্বালায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, এবং মেয়েটির কথা শেষ না হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনাকে বিব্রত করতে আমি চাইনে, আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে এসে আপনার জায়গায় বসুন; বলিয়া চক্ষের

নিমিষে চা এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে একেবারে সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি, সে ইহাই ভাবিল, এতক্ষণের এত আলাপ, এত কথাবার্তার যে বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখিল না, না জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিলেও আকাশে ঘন মেঘ উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আসিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি নামিয়া যাইবে, সে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল।

অচলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে আপনি মাপ করুন।

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না।

অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন খারাপ থাকলে কি যে করে ফেলি, তার কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি, ভাল হন ভালই, না হলে ঐ বিদেশে কি যে হবে, তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখলে ত পীড়িত বলে মনে হয় না।

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়িতেই আছেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দেখেন নি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই বন্ধুটি তাঁহার স্বামী কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে যে হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছিল, এ কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু তাহার বিস্ময়কে অচলা সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহণ করিল। সুরেশের সহিত তাহার আচরণ ও বাক্যালাপে সে নিজের অন্তরে জ্বালা দিয়া বিকৃত করিয়া হিন্দুনারীর চক্ষে ইহা কিরূপ বিসদৃশ দেখাইয়াছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল এবং একান্ত নিরর্থক ও বিশ্রী জবাবদিহির স্বরূপে বলিয়া ফেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল দেখিয়া অচলা সসঙ্কোচে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমাদের আচার-ব্যবহার আপনারা সমস্ত বুঝতে না পারলেই আমাদের অদ্ভুত বলে ভাববেন না।

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবিনে, বরঞ্চ আপনারাই যে-কোন কারণে হোক আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান। কেমন করে জানলুম? আমাদেরই দুই-একটি আত্মীয় আছেন, যাঁরা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেচি, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সে কারণটি কি?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন, বলিয়া হাসিয়া প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দিয়া কহিল, আচ্ছা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসুন না।

কোথায়, আরায়?

মা গো! সেখানে কি মানুষ থাকে! আমার উনি ঠিকেদারী কাজ করেন বলেই আমাকে মাঝে মাঝে আরায় গিয়ে থাকতে হয়। আমি ডিহরীর কথা বলচি। শোন নদীর ওপর আমাদের ছোট বাড়ি আছে, সেখানে দু'দিন থাকলে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত-দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীর ত অনুমতি চাই! তিনি না বললে ত যেতে পারিনে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস, তাই বৈ কি! আমরা সেবা করতে দাসী বলে বুঝি সব তাতেই দাসী? মনেও করবেন না। হুকুম দেবার বেলায় আমরাই ত কর্তা। সে দেশ পছন্দ না হলে সোজা ডিহরীতে চলে আসবেন—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে বলে দিলুম। অনুমতি নিতে হয় আমি নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এই স্বামী-সৌভাগ্যবতী মেয়েটি তাহার আনন্দের আতিশয্যে অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আরা স্টেশন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, তাহা ট্রেনের মন্দগতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত-দুটি পুনরায় নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেশভরে বলিল, আমার সময় হল, আমি চললুম, কিন্তু আপনি ভেবে ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করতে পাবেন না বলে যাচ্ছি। আপনার কোন ভয় নেই, স্বামী আপনার খুব শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু কথা দিন, ফেরবার পথে একটিবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সেদিন যদি পাই, নিশ্চয় আপনাকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনাকে আমি চিনতে পেরেচি। এই আমি বলে যাচ্চি, আপনার এত বড় ভক্তি-ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না; এমন হতেই পারে না।

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি আসিয়া প্লাটফর্মে থামিল। মেয়েটির ছোট দেবর অন্যত্র ছিল, সে আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা তাহার কানের কাছে মুখ

আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাম ত মুখে আনবেন না জানি, কিন্তু আপনার নিজের নামটি কি বলুন ত? যদি কখনো ফিরে আসি, কি করে আপনার খোঁজ পাব?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাক্ষুসী। ডিহরীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেই সে আমার সন্ধান বলে দেবে। কিন্তু দু'জনে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিব্যি রইল, আমি পথ চেয়ে থাকবো। শোন নদীর উপরেই আমাদের বাড়ি। এই বলিয়া মেয়েটি দুই হাত জোড় করিয়া হঠাৎ একটা নমস্কার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাষ্পীয় শকট আবার ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি-অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আলোর মুখ, আনন্দের মুখ আর সে কখনও দেখিবে না—ইহা হইতে এ জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই। সঙ্গিবিহীন নির্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগাগোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং এইবার তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এত বড় দুঃখ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোনমতে আয়ত্ত করিতে পারিল না। অদম্য তরঙ্গের মত সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীদের মনে পড়িল, পিসীমাকে মনে পড়িল, মৃণালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে মেয়েটি রাক্ষুসী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া গেল, তাহাকে মনে পড়িল,—যদু চাকরটা পর্যন্ত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বার বার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলের নিকট সে যেন জন্মের

শোধ বিদায় লইয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, বক্ষের মধ্যে তাহার এমনি ব্যথা বাজিতে লাগিল।

এইভাবে নিরন্তর অশ্রুবিসর্জন করিয়া, গাড়ি যখন পরের স্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন বেদনাতুর হৃদয় তাহার অনেকটা শান্ত হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, যদি কোন স্ত্রীলোক যাত্রী এই দুর্যোগের রাত্রেও তাহার কক্ষে দৈবাৎ পদার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ নামিয়া গেল, কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামরার সন্নিকটেও কেহ আসিল না।

গাড়ি ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসিল এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন অচিন্তনীয় কারণে তাহার দুঃখার্ত চিত্ত অকস্মাৎ সুখের কল্পনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নতুন নহে; যেদিন বায়ুপরিবর্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এমনি স্বপ্নই দেখিয়াছিল। আজও সে তেমনি তাহার রুগ্ন স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনন্দ ও সুখ-শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে বিভোর হইয়া গেল।

কখন এবং কতক্ষণ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে যাইবামাত্রই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, দ্বারের কাছে সুরেশ দাঁড়াইয়া এবং সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া অজস্র জল-বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরেশ চিৎকার করিয়া কহিল, শিগ্‌গির নেমে পড়, প্লাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলার দুই চক্ষে ঘুম তখনও জড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল, এলাহাবাদ স্টেশনে জব্বলপুরের গাড়ি বদল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া শশব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জলের মধ্যে তাঁকে

নামাবে কি করে? এখানে পালকি-টালকি কিছু কি পাওয়া যায় না? নইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে সুরেশবাবু।

সুরেশ কি যে জবাব দিল, জলের শব্দে তাহা বুঝা গেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হস্তে অচলার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া ও-দিকের প্লাটফর্মের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ট্রেনটা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারই একটা যাত্রিশূন্য ফার্স্টক্লাস কামরার মধ্যে অচলাকে ঠেলিয়া দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তুমি স্থির হয়ে বসো, তাকে নামিয়ে আনি গে।

তা হলে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো। বলিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাত্রবস্ত্রটা সুরেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পোস্টের উপর দূরে দূরে স্টেশনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে যে আলোক এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া যাত্রীরা ছুটাছুটি করিতেছে, কুলীরা মোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্মচারীরা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—ঝাপসা ছায়ার মত তাহা দেখা যায় মাত্র। ক্রমশঃ তাহাও বিরল হইয়া আসিল, স্টেশনের ঘণ্টা তীক্ষ্ণরবে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অজগরের ন্যায় ফোঁসফোঁস শব্দে তাহা আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া প্লাটফর্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অখণ্ড অন্ধকার ব্যতীত সম্মুখে আর কোন ব্যবধানই রহিল না।

আবার ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ইহা যে এ গাড়ির জন্য অচলা তাহা বুঝিল, কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, জিনিস-পত্র সমস্ত তোলা হইল

কি না, না কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিয়াদা সর্বাঙ্গে কম্বল ঢাকিয়া নীল লণ্ঠন হাতে বেগে চলিয়াছে। সুমুখে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, সমস্ত প্যাসেঞ্জার উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ মেমসাহেব।

অচলা কতকটা সুস্থির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায় লোকটা কহিল, নয় বাজকে—

নয় বাজকে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছিতে ত রাত্রি প্রায় শেষ হইবার কথা। ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। উপরে ছাদ ছিল না, তাই আকাশের বৃষ্টি ছাড়া গাড়ির ছাদ হইতে জল ছিটাইয়া তাহার চোখে-মুখে সূচের মত বিঁধিতেছিল। সে হাতের আলোকটা সবেগে নাড়িয়া দিয়া, মোগলসরাই! মোগলসরাই!—বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এমনি সময়ে সুরেশ তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভয় নেই—আমি পাশের গাড়িতেই আছি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার চেহারা, তা সে যত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্তে এই কি-একটা নূতন স্টেশনেই বা গাড়ি বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার গায়ের জামা সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার বার মুখ বাহির করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা সে-ই জানে, কিন্তু এ কথা তাহার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ গাড়িতে তাহার স্বামী নাই—সে একেবারে অনন্যনির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন এক দিগ্বিহীন নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতে পারে না! এই গাড়িতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন।

সুরেশ যাই হোক, এবং সে যাই করুক, একজন নিরপরাধা রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া এই অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দিবে, এতবড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এ সোজা কথাটুকু যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত ভালবাসার কথা মুখে আনিয়াছিল কোন্ মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই।

সহসা একটা প্রবল ঝাপটা তাহার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল এবং ততক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া

দেখিল, সর্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই। বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে, অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাতে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না এবং কিছু কিছু পরিবর্তন করিবার মানসে কম্পিতহস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গাড়ির গতি অতি মন্দ হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা স্টেশনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ স্টেশন জানিবার উপায় নাই। তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশবাবু!

এই কামরায় জন-দুই বাঙালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয়ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর তীব্র আর্তনাদের মত শুধু সুরেশকেই নয়, উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা; তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ির উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনিই একটা রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধদৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখচি নে—কৈ তিনি? কোন্ গাড়িতে তাঁকে তুলেচ?

চল দেখিয়ে দিচ্চি, বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল এবং যেদিক হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেইদিক পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূলুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং স্তব্ধমুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুললে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও থাক—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও—না হয়, শুধু বলে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্ছি; বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্চো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য। গাড়ি চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে নিরাশা যেন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন করে তোমার—

এতবড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দিকে ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার

পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে পা-দুটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এ কাজ আমি পারি বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি করেচ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বল; বলিয়া সে আর একবার তাহার পা-দুটা ধরিয়া তাহারই পরে সজোরে মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু পা-দুটা যাহার, সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ন্যায় কেবল নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিল।

বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ-হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ-সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সহসা অচলা তাহার ভূ-শয্যা ছাড়িয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াতেই সুরেশের যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, পরের স্টেশন সন্নিকটবর্তী হওয়ায় গাড়ির বেগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অচলা কেন যে এমন করিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সুরেশ ডান হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বস। মহিম এ গাড়িতে নেই।

নেই! তবে কোথায় তিনি? বলিতে বিলিতে অচলা সম্মুখের বেঞ্চের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সুরেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার মুখের উপর হইতে রক্তের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি, এতক্ষণের এত কান্নাকাটি, এত মাথা-কোটাকুটির মধ্যেও হৃদয়ে, তাহার সমস্ত প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধেও একপ্রকার অব্যক্ত অন্তর্নিহিত আশা ছিল, হয়ত এ-সকল আশঙ্কা সত্য নহে, হয়ত

প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের দুঃসহ বেদনা ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ই শুধু কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসেই অবসান হইয়া গিয়া পুলকে সমস্ত চরাচর রাঙা হইয়া উঠিবে। এমনি কিছু একটা অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ত তখনও তাহার আগাগোড়া বুক খালি করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করে নাই। কেননা, এই ত তখন পর্যন্তও তাহার সংসারে যাহা-কিছু কামনার সমস্ত বজায় ছিল; অথচ একটা রাত্রিও পোহাইল না, আর তাহার কিছু নাই—একেবারে কিছু নাই। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে জীবনটা একেবারে দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমা ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল! এতবড় পরিমাণবিহীন বিপত্তিতে তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই বোধ করি কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। উভয়ে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি আসিয়া একটা অজানা স্টেশনে লাগিল এবং অল্পকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জানালার কাচ তুলিয়া দিয়া কয়েকবার পায়চারি করিয়া সহসা অচলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম ভাল আছে। এতক্ষণে বোধ হয় সে এলাহাবাদে পৌঁছেছে। একটুখানি থামিয়া বলিল, ওখান থেকে জব্বলপুরেও যেতে পারে, কলকাতায়ও ফিরে আসতে পারে।

অচলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

সেই অশ্রু-কলঙ্কিত মুখের উপর দুঃখ-নিরাশার চরম প্রতিমূর্তি আর-একবার সুরেশের চোখে পড়িল। তাহার ভুল যে কত বড় হইয়া গিয়াছে, এ কথা আর তাহার অগোচর ছিল না এবং ইহার জন্য আজ সে নিজেকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারিত। কিন্তু যাহার সহস্র ছলনা তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই ভুলের মধ্যেই বারংবার অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়াছে, সেই ছলনাময়ীর বিরুদ্ধেও তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ সে অচলার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমরা

সশরীরে নরকেই যাচ্চি। যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর পর্যন্ত টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে না! এখন শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে মিথ্যাচারী কাপুরুষ পরস্ত্রীকে এমন করিয়া বিপথে ভুলাইয়া আনিয়াও অসঙ্কোচে এত বড় নির্লজ্জ অপবাদ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাকে বলিবার আর কাহার কি থাকে!

সুরেশ আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাষাণ-প্রতিমার সুমুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন একা তোমারই সর্বনাশ! কিন্তু সর্বনাশ বলতে যা বোঝায়, তা আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানো? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করিনে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেয়েমানুষের যা-কিছু অস্ত্র-শস্ত্র তোমার তূণে সে-সব প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আছে, তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো? আমি পুরুষমানুষ—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলি করতে হবে। বলিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়া মুখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যে উপচাইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া সুরেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়! তুমি অসূর্যস্পশ্যা হিন্দুর ঘরের কুলবধূ নও, এতটুকুতে তোমাদের জাত যাবে না। তুমি যেখানে খুশি নেমে চলে

যাও। আমি চিঠি লিখি দিচ্ছি, মহিমকে দেখিও, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্চি, তোমার বাপকে দিয়ো—তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চিন্তা কি অচলা, এ এমনি কি বেশি অপরাধ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না, তাহার জ্বলন্ত শূল কোথায় কি কাজ করিল। খাবারের লোভে বন্যপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায় তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেইভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, এ এমনি কি ভয়ানক অপরাধ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপরে বলেছিলে, একজন পরপুরুষকে ভালবাস—সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চলে আসতে চেয়েছিলে এবং এলেও তাই; স্মরণ হয়? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আসতে সেধেছিলে মনে পড়ে? তার চেয়েও কি এটা বেশি অপরাধ? আরও কত-কি প্রতিদিনের অসংখ্য খুঁটিনাটি! তাই আজ আমার এত সাহস! আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি। ভেবেছিলুম, প্রথমে একটুখানি চমকে উঠবে মাত্র। তার বেশি তোমার কাছে আশা করিনি। তোমাকে বার বার বলে দিচ্চি অচলা, তুমি সতী-সাবিত্রী নও। সে তেজ, সে দর্প তোমার সাজে না, মানায় না—সে তোমার একান্ত অনধিকারচর্চা! বলিয়া সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে নির্জীব হইয়া থামিতেই অচলা মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থামবেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন। আমাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে সংসারে যত কটু কথা, যত কুৎসিত বিদ্রূপ, যত অপমান আছে, সব করুন; বলিয়া মেঝের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ রোদনের বিদীর্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল, এই আমি চাই, এই আমার দরকার! এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ! পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।

সুরেশ দেয়ালে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুদীর্ঘ কেশভার স্রস্তবিপর্যস্ত হইয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত গাত্রবাস ধূলায় কাদায় মলিন কদর্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সেদিকে সুরেশ পা বাড়াইতে পারিল না। নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূপতিত পক্ষিণীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে কোন এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্তের সাক্ষ্য লইতে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার গাড়ির গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া ধীরে ধীরে স্টেশনে আসিয়া থামিল। সুরেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলায় বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তুমি উঠে বসো, আমি আমার ঘরে চললুম। সকাল হলে তুমি যেখানে নামতে চাইবে আমি নামিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে, আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্টা করো না, তাতে কোনো ফল হবে না। বলিয়া সুরেশ কপাট খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝবে না, কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্যার মীমাংসার ভার আমি নিলুম। আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘটতে দেব না—এর সমস্ত ঋণ আমি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে যাবো, বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেনের টানা ও একঘেয়ে শব্দের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই সুরেশের তন্দ্রা ভাঙ্গিতেছিল বটে, কিন্তু চোখের পাতার ভার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর যেন তাহাতে ছিল না। ভিজা কাপড়ে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, বস্তুতঃ সে যে অসুখে পড়িতে পারে এবং বর্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্রপরিবর্তনের উদ্যম একটা অসাধ্য অভিলাষের মতই তাহার মনের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা সুপরিচিত কণ্ঠের

ডাক পৌঁছিল—কুলী! কুলী! সে অর্ধসজাগভাবে চোখ মেলিয়া দেখিল, গাড়ি কোন্ একটা স্টেশনে থামিয়া আছে, এবং কখন অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্ষান্তবর্ষণ ধূসর মেঘের মধ্য দিয়া একপ্রকারের ঘোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেকে নামিতেছে, অনেকে চড়িতেছে, এবং তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি শোকাচ্ছন্ন রমণীমূর্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এ অচলা। একজন কুলী ঘাড়ে একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে সে তাহাকে কি-একটা জিজ্ঞাসা করিয়া গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণ পর্যন্ত সুরেশ নিশ্চেষ্টভাবে শুধু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ি ছাড়িবার বেলের শব্দ প্লাটফর্মের কোন এক প্রান্ত হইতে সহসা ধ্বনিয়া উঠিয়া তড়িৎস্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে একমুহূর্তে এক করিয়া তাহার সমস্ত জড়িমা ঘুচাইয়া দিল, এবং পলকের মধ্যে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিটবাবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ পিছন হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, দাঁড়িয়ো না, চল আমি টিকিট দিচ্ছি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠায় ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ার পূর্বেই সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নলিখিত মত কথার্বাতা হইল।

সুরেশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা কলকাতাতেই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্যদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়াই জবাব দিল, কলকাতায় আমি কার কাছে যাবো?

কিন্তু এখানে?

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয়ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সেজন্য আমার নালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেষ সময়ে কিছু ভিক্ষা চাই।

অচলা তেমনি নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোঝাবারও নয়, আমি বোঝাতেও চাইনে। আমার জিনিস আমার সঙ্গেই যাক। যেখানে গেলে এখানের আগুন আর পোড়াতে পারবে না, আমি সেই দেশের জন্যই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু আমাকে দাও, আমি হাতজোড় করে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তথাপি অচলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

সুরেশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেচি, অনেক দুঃখ দিয়েচি; কিন্তু পরে যে ভাল থাকার দম্ভে ওপরে বসে তোমার মাথায় কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে কালো করে তুলবে, সে আমি মরেও সইতে পারবো না। আমার জন্যে তোমাকে আর দুঃখ না পেতে হয়, বিদায় হবার আগে আমাকে এইটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে যাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন, অকস্মাৎ তপ্ত-অশ্রুতে অচলার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে অবিকৃত রাখিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুরেশ পকেট হইতে টাইম-টেবিলখানা বাহির করিয়া গাড়ির সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন

কোনদিকে যাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে বিশ্বাস করো না, এই শুধু আমি চাই। আমা হতে তোমার আর কোন অকল্যাণ হবে না, এ কথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করচি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে যে সম্মত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

লোকে দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকর্ষণ করিবার আশঙ্কায় স্টেশনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে দু'জনের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল, বড় রাস্তার উপরে সম্রাট শের শাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শহরের একপ্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে দু'জনে ক্ষণকালের জন্য নিজেদের মর্মান্তিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একখানা গরুর গাড়ি করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতিও চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নামিতে গিয়া পলকের জন্য সুরেশের মুখের প্রতি অচলার দৃষ্টি পড়িয়া মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। তাহার দুই চোখ ভয়ানক রাঙ্গা অথচ মুখের উপর কিসে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক ঝড়ঝাপটের মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া সুরেশ মনি-ব্যাগটা সেখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার মনে হয়, নিতে লজ্জা করো না।

অচলার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, এ কথার অর্থ কি? কিন্তু পারিল না।

সুরেশ কহিল, এই সুমুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামাকাপড়গুলো ছেড়ে

আসি। কি জানি, এইগুলোর জন্যেই বোধ করি এ-রকম বিশ্রী ঠেকচে; বলিয়া সে অচলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া ঠিক মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া কোণের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেলে অচলা একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভারী ব্যাগটা টানিয়া টানিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং তাহারই উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাস্তার উপরে লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই ঘরের সম্মুখে ব্যাগের উপরে বসিয়া আশা ও আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতে পারিল না। কিছুক্ষণ সূর্য উঠিয়াছে। শীতের দিনের ধূলি-ধূসরিত তরুশ্রেণী কল্যকার ঝড়-জলে স্নাত ও নির্মল হইয়া প্রভাতসূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। সিক্ত-স্নিগ্ধ রাজপথের উপর দিয়া বিগত-ক্লেশ পান্থ প্রফুল্লমুখে চলিতে শুরু করিয়াছে; কদাচিৎ দুই-একটা এক্কাগাড়ি ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে রাখাল-বালকেরা গো-মহিষের দল লইয়া অদ্ভুত ও অসম্ভব আত্মীয়সম্বন্ধের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোন গ্রামপ্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্তী কোন এক কুটির হইতে গমভাঙ্গা যাঁতার শব্দে মিশিয়া হিন্দুস্থানী গৃহস্থ-বধূর অশ্রান্ত অপরিচিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সবসুদ্ধ লইয়া এই যে একটি নূতন দিনের কর্মস্রোত তাহার চেতনায় ধীরে ধীরে গতিশীল হইয়া উঠিতেছিল, ইহারই বিচিত্র প্রবাহে তাহার দুঃখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। ঠিক কিসের জন্য, কেন সে এখানে এভাবে বসিয়া, তাহার স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল জন-দুই পল্লী বালকের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে! তাহারা আঙ্গিনার একপ্রান্ত হইতে শুধু বিস্ফারিতচক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়াছিল। এই জীর্ণ মলিন পান্থশালার প্রাচীন দিনের গৌরব-ইতিহাস ছেলে-দুটার জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান হওয়া অবধি এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সমাগম যে এ গৃহে কখনো ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া অচলাকে জানাইয়া দিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া নিত্য-নিয়মিত খেলা করিতে আসিয়া আজ সহসা এই আশ্চর্য ব্যাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে-দুটা নিমিষে অন্তর্ধান হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাহার মনে পড়িল, প্রায় ঘণ্টা-দুই পূর্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আর দেখা দেয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে জানিবার জন্য সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং অবরুদ্ধ কবাটের ভিতর হইতে কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সামনেই যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র আবেগে ও বিকট ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার সমস্ত দেহমন যেন পাষাণ হইয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার, শুধু ওদিকের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া খানিকটা আলো ঢুকিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে আলো-আঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছন্ন ধূলা-বালির উপরে সুরেশ চিত হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গায়ে তখনো সেই-সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর হইতে কতকগুলা জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেষ-কথাগুলা অচলার মনে পড়িল; সে ডাক্তার, সে শুধু মানুষের জীবনটা ধরিয়া রাখিবার বিদ্যাই শিখিয়াছিল, তাহা নয়, তাহাকে নিঃশব্দে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল না। মনে পড়িল, নিদারুণ ভুলের জন্য তাহার সেই উৎকট আত্মগ্লানি; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদায় চাওয়া, সেই আশ্বাস দেওয়া—সর্বোপরি তাহার সেই বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত; সমস্তই একসঙ্গে এক নিশ্বাসে যেন ওই অবলুণ্ঠিত দেহটার কেবল একটিমাত্র পরিণামের কথাই তাহার কানে কানে কহিয়া দিল। সেইখানে সেই দ্বার ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল—তাহার এমন সাহস হইল না যে, আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন দেহটার প্রতি চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। যে তাহারই জন্য এত বড় দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া হতাশ্বাসে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জনা করিতে পারে না, এত বড় কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে, এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিজের অপরাধও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

সুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সেদিন পর্যন্ত যতকিছু কামনা-বাসনা, যত ভুলভ্রান্তি, যত মোহ, যত ছলনা, যত আগ্রহ-আবেগ উভয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সমস্তই একে একে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিজের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে হইল, শুধু কেবল নিজের নয়, অনেকের অনেক পাতকের গুরুভার বহন করিয়াই আজ সুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সমস্ত শাস্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিংবা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে!

ওই লোকটির সংসারে উপভোগ করিবার অনেক সাজ-সরঞ্জাম, অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, লেশমাত্র আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অচলাকে আজ ফিরিয়া ফিরিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে যে যথার্থই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, সে কথা আজ ওই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

আবার তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গতরাত্রে গাড়ির মধ্যে তাহাদের বিস্তর কঠিন কটু কথা, বিস্তর ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে-সকল যে কত বড় অর্থহীন প্রলাপ, অচলা তখন তাহার কি জানিত। ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম নাই, বিচার-

বিবেক ভালমন্দ-বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে, সে যে এই-সব সমাজের হাতেগড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ-সকল বিধিনিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করিয়া মনে হইল, মৃতদেহটা যেন একটুখানি নড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্তস্বরের সঙ্গে সুরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। সে মরে নাই—জীবিত আছে; একটা প্রচণ্ড আগ্রহবেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং ভগ্নকণ্ঠে কহিল, সুরেশবাবু!

আহ্বান শুনিয়া সুরেশ দুই আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া অশ্রুর আকারে দুই চক্ষু দিয়া নিরন্তর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত পূর্বের অশ্রুর সহিত এ অশ্রুর কতই না প্রভেদ!

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সংগোপনে পীড়া দিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিচিত স্থানে সুরেশের মৃতদেহ লইয়া সে কি উপায় করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কাহাকে বলিবে—হয়ত অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, অনেক কুৎসিত প্রশ্ন উঠিবে—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে, হয়ত পুলিশে টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে—সেই-সকল অনাবৃত প্রকাশ্যতার লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যে অন্তরে অন্তরে পীড়িত, কিরূপ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্তটা বোধ করি সে নিজেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিমেয় লাঞ্ছনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না যেন আর থামিতে চাহিল

না, এবং সে মরে নাই, শুধু ইহাতে তাহার প্রতি অচলার সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে সুরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছ কেন অচলা?

অচলা ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন করে শুয়ে রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ, এমনই মধুর যে, শুধু সুরেশের নয়, অচলার নিজের মধ্যেও কেমন একপ্রকার মোহের সঞ্চার করিল। সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘুম পেয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আমি ত ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার করে যা হোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা তৈরি করে দিতে পারতুম। ট্রেনের সময় হতে ত ঢের দেরি ছিল।

সুরেশ কোন জবাব দিল না, শুধু বিগলিত স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম! তোমার কি জ্বর হয়েছে নাকি!

সুরেশ কহিল, হুঁ। তা ছাড়া এ জ্বর সহজে সারবে বলেও আমার মনে হয় না। বোধ হয়—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসই পড়িল। তাহার উদ্বেলিত সমস্ত স্নেহ-মমতা একমুহূর্তে জমিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। সহ্য করিবার, ধৈর্য ধরিবার তাহার যে কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাটুকু গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,

কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অভাবিতপূর্ব বিপদের মেঘে তাহার আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকু যখন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন মৃত্যু ভিন্ন জগতে আর প্রার্থনীয় বস্তু তাহার দ্বিতীয় রহিল না।

ইহাকে এইভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিল না। কিন্তু যাহার পীড়ার সর্বপ্রকার দায়িত্ব, সমস্ত গুরুভার তাহার মাথায় পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে, কি পরিচয়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, অহর্নিশি কি অভিনয় করিবে, এই-সকল চিন্তা বিদ্যুৎবেগে তাহার মাথায় প্রবাহিত হওয়ায় সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে, না সজোরে মাথা কুটিয়া এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা হাতে হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটারই যেন কূল-কিনারা পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন স্টেশন হইতে পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কেদারবাবু সাত-আটদিন গাঁটের বাত ও সর্দিজ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা-জামাতার কুশল-সংবাদের অভাবে অতিশয় চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জব্বলপুরের বন্ধুকে একখানা পোস্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না, এইটুকু মাত্র খবর দিয়াছেন। ছত্র-কয়টি কেদারবাবু বার বার পাঠ করিয়া বিবর্ণমুখে শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চশমার কাচ-দুটা ঘন ঘন মুছিতে লাগিলেন। তাহাদের কি হইল, কোথায় গেল, সংবাদের জন্য তিনি কাহাকে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সকল আপদে-বিপদে যে ব্যক্তি কায়মন দিয়া সাহায্য করিত সেই সুরেশও নাই, সে-ও সঙ্গে গিয়াছে।

ঠিক এমনি সময়ে বেহারা আসিয়া আর-একখানি পত্র তাঁহার সুমুখেই রাখিয়া দিল। কেদারবাবু কোনমতে নাকের উপর চশমাখানা তুলিয়া দিয়া ব্যগ্রহস্তে চিঠিখানি তুলিয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কন্যা অচলার নামে। মেয়েলি হাতের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আগ্রহে অপরের চিঠি খোলা-না-খোলার প্রশ্ন তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, 'তোমার মৃণাল'। তাহার পর এখানিও তিনি আদ্যোপান্ত বার বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চশমা মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা জগদীশ্বর জানেন। বহুক্ষণে চশমা পরিষ্কারের কাজটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আর-একবার চিঠিখানি

আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র-মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—সেজদা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না সত্য, জিজ্ঞাসা করিলেও ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু আমি ত মেয়েমানুষ, আমি ত সব বুঝিতে পারি! আচ্ছা সেজদি, ঝগড়া-বিবাদ কাহার না হয় ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া এত অভিমান! তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-মনের বর্তমান অবস্থা না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অন্যায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি যাই বলিতেই তুমি স্বচ্ছন্দে সায় দিয়া বলিলে, আচ্ছা, তাই হোক, যাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবল ভাবি সেজদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার মৃতকল্প স্বামীটিকে এত সহজে এই বনের মধ্যে বিসর্জন দিলে এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আটদিন বলি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিসপত্র লইয়া বাড়ি ঢুকিলেন, আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। তোমাদের কেন ঝগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার বদলে তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন, এ-সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতে চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিব্য রহিল, তুমি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসিবে। জানই ত ভাই, আমার শাশুড়িকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার জো নাই। তবুও হয়ত আমি নিজে গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজদা এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একবার এস, একবার নিজের চোখে তাঁকে দেখ, তখন বুঝিবে, এই অসঙ্গত মান করিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছ। এ বাড়িও তোমার, আমিও তোমার, সেইজন্য এ বাড়িতে আসিতে কোন দ্বিধা করিবে না। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম, শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজদা যেন শুনিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি—তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনশ্চ দিয়া কৈফিয়ত দিয়াছে যে, যেহেতু স্বামীর অনুপস্থিতিতে তুমি একটা বেলাও সুরেশবাবুর বাটীতে থাকিবে না জানি, তাই তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানাতে লিখিলাম। ভরসা করি, এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কেদারবাবু হাত হইতে চিঠিখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চশমা-মোছার কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। এটুকু বুঝা গিয়াছে, মহিম জব্বলপুরের পরিবর্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোথায়, তাহার কি হইল, এ-সকল কথা হয় মহিম জানে না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

ঠাৎ মনে হইল, সুরেশই বা কোথায়? সে যে তাহাদের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বাটীতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার দেখা করিতই। তাহার পরে পিতার বুকের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাৎ শূলের মত আসিয়া পড়িল, সে আঘাতে তিনি আর সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কেদারাটায় হেলান দিয়া পড়িয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দুপুরবেলা দাসী সুরেশের বাটী হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার পিসীমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠিপত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছেন।

রাত্রে নিভৃত শয়ন-কক্ষে কেদারবাবু প্রদীপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানি লইয়া বসিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি দাঁড়াইবার মত কোথাও এতটুকু জায়গা পাওয়া যায়। না হইলেও যে তিনি কোথায় গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন, ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী ; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন ভদ্রলোক বাঁচিতে পারে, এ কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সেই আজন্ম-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধু-বান্ধব সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথাও

অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ-জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই দুঃসহ দুর্ভর দিন-কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে যে তাঁহার চিন্তার অতীত এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

সারারাত্রির মধ্যে তিনি একবার চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ায় আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এতবড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের সূর্য অপরাহ্ণবেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোন নদের পার্শ্ববর্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধু-ধু করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলোবাটীর বারান্দায় রেলিং ধরিয়া অচলা সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়াবাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি?

অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। যে মেয়েটি একদিন 'রাক্ষুসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা স্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল, এ সেই। কাছে আসিয়া অচলার উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত শ্রীহীন মুখের প্রতি মুহূর্তকাল দৃষ্টি রাখিয়া অভিমানের সুরে কহিল, আচ্ছা দিদি, সবাই দেখচে সুরেশবাবু ভাল হয়ে গেছেন; ডাক্তার বলচেন, আর একবিন্দু ভয় নেই, তবু যে দিবারাত্রি তোমার ভাবনা ঘোচে না, মুখে হাসি ফুটে না, এটা কি তোমার বাড়াবাড়ি নয়? আমাদের কর্তারা আছেন, তাঁদের অসুখ-বিসুখেও আমরা ভেবে সারা হই, কিন্তু মাইরি বলচি ভাই, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

অচলা মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোন উত্তর দিল না।

মেয়েটি রাগ করিয়া বলিল, ইস্! ফোঁস করে যে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বড়! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া যখন অচলার নিকট হইতে

কোনপ্রকার জবাব পাইল না, তখন তাহার একখানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, সত্যি কথা বলো ভাই, আমাদের বাড়িতে তোমার একদণ্ডও মন টিকছে না, না? বোধ হয় খুব অসুবিধে আর কষ্ট হচ্ছে, সত্যি না?

অচলা নদীর দিকে যেমন চাহিয়াছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবার উত্তর দিল, কহিল, তোমার শ্বশুর আমার যে উপকার করেছেন সে কি এ-জন্মে কখনো ভুলতে পারবো ভাই!

মেয়েটি হাসিল; কহিল, ভোলবার জন্যই যেন তোমাকে আমি সাধাসাধি করে বেড়াচ্চি! এবং পরক্ষণেই কৃত্রিম অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, আর সেজন্যই বুঝি তখন বাবার অত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিলে না? তুমি ভাবলে, বুড়ো যখন তখন—

অচলা একান্ত বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, না, এমন কখ্‌খনো হতে পারে না।

রাক্ষুসী জবাব দিল, পারে না বৈ কি! তবু যদি না আমি নিজে সাক্ষী থাকতুম! ঠাকুরঘর থেকে আমার কানে গেল,—সুরমা! ও-মা সুরমা! এমন চার-পাঁচবার শুনলুম, বাবা ডাকছেন তোমাকে! পূজোর সাজ করছিলুম, একপাশে ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখি তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। সত্যি বলছি দিদি, তামাশা করছি নে!

অচলাই শুধু মনে মনে বুঝিল, কেন বৃদ্ধের 'সুরমা' আহ্বান তাহার বিমনাচিত্তের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই। তথাপি সে লজ্জায় অনুতাপে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, বোধ হয় তাই ঘরের মধ্যে—

রাক্ষুসী বলিল, কোথায় ঘরের মধ্যে। যাঁর জন্যে ঘর, তিনি যে তখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। উঠান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ঠিক এমনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বলিয়া একটু থামিয়া হাসিমুখে বলিল, কিন্তু তুমি ত আর

তোমাতে ছিলে না ভাই, যে বুড়ো-সুড়োর ডাক শুনতে পাবে! যা ভেবেছিলে, তা যদি বলি ত—

অচলা নীরবে পুনরায় নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, এই-সকল ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র করিল না। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রাক্ষুসী নামের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না; এবং নামও তাহার রাক্ষুসী নয়, বীণাপাণি। জন্মকালে মা মরিয়াছিল বলিয়া পিতামহী রাগ করিয়া এই অপবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী ও শ্বশুর-শাশুড়ির নিকট হইতে এ দুর্নাম সে গোপন রাখিতে পারে নাই।

অচলাকে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্বাক হইতে দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জা পাইল, অনুতপ্ত-স্বরে বলিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, তোমাকে কি একটা ঠাট্টাও করবার জো নেই ভাই? আমি কি জানিনে, বাবাকে তুমি কত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর? তাঁর কাছে ত আমরা সমস্ত শুনেচি।

তিনি সকালে বেড়িয়ে আসছিলেন, আর তুমি এই অজানা জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার খুঁজতে ছুটেছিলে। তারপরে তিনি তোমার সঙ্গে গিয়েই সরাই থেকে তোমার স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এ সবই ভগবানের কাজ দিদি, নইলে এ বাড়িতে যে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বে, সেদিন গাড়িতে এ কথা কে ভেবেছিল? কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হলো না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের এখানে যে তোমার একদণ্ডও ভাল লাগচে না, সে আমি টের পেয়েচি। কিন্তু কেন? কি কষ্ট, কি অসুবিধে এখানে তোমাদের হচ্ছে ভাই, তাই কেবল জানতে চাইচি; বলিয়া পূর্বের মত এবারও ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ এই মেয়েটির মনে হইল, যে-কোন কারণেই হোক, সে উত্তরের জন্য মিথ্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তখন যাহাকে তাহার শ্বশুর সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছেন এবং সে নিজে সুরমাদিদি বলিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মুখখানা জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর

ধারা বহিয়া যাইতেছে; বীণাপাণি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া শূন্যদৃষ্টি অন্যত্র সঞ্চারিত করিল।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সদ্যপ্রাপ্ত একখানা মাসিকপত্র হইতে একটা ছোটগল্প বীণাপাণি অচলাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। একখানা বেতের চৌকির উপর অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অচলা কতক-বা শুনিতেছিল, কতক-বা তাহার কানের মধ্যে একেবারেই পৌঁছিতেছিল না, এমনি সময়ে বীণাপাণির শ্বশুর রামচরণ লাহিড়ী মহাশয় সিঁড়ি হইতে 'মা রাক্ষুসী' বলিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বীণাপাণি একখানি চৌকি টানিয়া বৃদ্ধের সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

এই বৃদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিয়া অচলার মুখের প্রতি সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, একটা কথা আছে মা। ভট্‌চায্যিমশাই এইমাত্র এসেছিলেন, তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর নামে সঙ্কল্প করে নারায়ণকে তুলসী দিচ্ছিলেন, তা কাল শেষ হবে। তবে কাল তোমাকে মা, কষ্ট স্বীকার করে একটু বেলা পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে। তিনি আমাদের বাড়িতেই নারায়ণ এনে কাজ সমাপ্ত করে যাবেন, আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। কথা শুনিয়া অচলার সমস্ত মুখ একেবারে কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে বৃদ্ধের তাহা নজরে পড়িল না, কিন্তু বীণাপাণির পড়িল। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, জন্মকাল হইতে এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে এবং পীড়িত স্বামীর কল্যাণে ইহা যে কত উৎসাহ ও আনন্দের ব্যাপার, তাহা সে সংস্কারের মতই বুঝে, কিন্তু অচলার মুখের চেহারার এই উৎকট পরিবর্তনে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তথাপি সখীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, নারায়ণকে তুলসী দেওয়ালে ত তুমি সুরেশবাবুর জন্যে, তবে উনি উপোস না করে দিদিকে করতে হবে কেন?

বৃদ্ধ সহাস্যে কহিলেন, তিনি আর তোমার এই দিদিটি কি আলাদা মা? সুরেশবাবু ত তাঁর এ অবস্থায় উপবাস করতে পারবেন না, তাই তোমার সুরমাদিদিকেই করতে হবে। শাস্ত্রে বিধি আছে মা, কোন চিন্তা নাই।

অচলা ইহারও প্রত্যুত্তরে যখন হাঁ-না কোন কথাই কহিল না, তখন তাহার এই নিরুদ্যম নীরবতা অকস্মাৎ এই শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধেরও যেন চোখে পড়িয়া গেল। তিনি সোজা অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে সুরমা? বলিয়া একান্ত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সহসা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁকে বললে তিনিই করবেন বোধ হয়।

তাহার পরে সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অনুভব করিল না, কিন্তু শুধু অন্তর্যামী ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে, বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। ভৃত্য আলো দিয়া গেল, কিন্তু দুজনেই সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মাসিকপত্রে সেই অত বড় উত্তেজক ও বলশালী গল্পের বাকিটুকু শেষ করিবার মত জোরও কাহারও মধ্যে রহিল না।

বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই দুইটি ক্ষুব্ধ মৌন লজ্জিত নারীর চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

এইভাবেই হয়ত আরও বহুক্ষণ কাটিতে পারিত, কিন্তু কি ভাবিয়া বীণাপাণি সহসা তাহার চৌকিটা অচলার পাশে টানিয়া আনিল এবং নিজের ডান

হাতখানি সখীর কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, ও-পারের ওই চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি। যেন অমনি অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি—ও কি, এমন শিউরে উঠলে কেন ভাই?

অচলা মুহূর্তকাল নির্বাক থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, হঠাৎ কেমন যেন শীত ক'রে উঠল ভাই।

বীণাপাণি উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গরম কাপড় আনিয়া অচলার সর্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিল, কহিল, একটা কথা তোমাকে ভারী জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। যদি রাগ না কর ত—

অজানা আশঙ্কায় অচলার বুকের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। পাছে বেশি কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া যায়, এই ভয়ে সে শুধু কেবল একটা 'না' বলিয়াই স্থির হইল।

বীণাপাণি আদর করিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিতে লাগিল, এখন যেন তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোটবোন। কিন্তু সেদিন গাড়িতে ত আমি তোমার কেউ ছিলাম না, তবে কেন নিজের পরিচয় আমার কাছ থেকে অমন করে লুকোতে চেয়েছিলে? যিনি স্বামী, তাঁকে বললে কেউ নয়—বললে, পীড়িত স্বামী অন্য কামরায়, তাঁকে নিয়ে জব্বলপুরে যাচ্ছো, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারনি। আমি ঠিক চিনেছিলাম, উনি তোমার কে। আবার বললে তোমরা ব্রাহ্ম, বলিয়া একবার সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু এখন দেখছি, তোমার কর্তাটির পৈতের গোছা দেখলে, বিষ্ণুপুরের পাচক ঠাকুরের দল পর্যন্ত লজ্জা পেতে পারে। আচ্ছা ভাই, কেন এত মিথ্যা কথা বলেছিলে বল ত?

অচলা জোর করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, যদি না বলি?

বীণাপাণি কহিল, তা হলে আমিই বলব! কিন্তু আগে বল, যদি ঠিক কথাটি বলতে পারি, কি আমাকে দেবে?

অচলার বুকের মধ্যে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। তাহার মুখের উপরে যে মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ঘনাইয়া আসিল, বাতির ক্ষীণ আলোকে বীণাপাণির তাহা চোখে পড়িল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সে মুখ টিপিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, কিছু দাও আর না দাও, যদি সত্যি কথাটি বলতে পারি, আমাকে কি খাওয়াবে বল অচলাদিদি।

অচলার নিজের নামটা নিজের কানে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণ হইতেই সে একপ্রকার অর্ধচেতনে অর্ধ-অচেতনের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, আমাদের দুই বোনের কিন্তু তত দোষ নেই ভাই, দোষ যত আমাদের কর্তা দুটির। একজন জ্বরের ঘোরে তোমার সত্যি নামটি প্রকাশ করে দিলেন, আর অপরটি তাই থেকে তোমার সত্যি পরিচয়টি ভেবে বার করে আনলেন।

অচলা প্রাণপণ-বলে তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি পরিচয়টি কি শুনি?

বীণাপাণি বলিল, সত্যি হোক আর নাই হোক ভাই, বুদ্ধি যে তার আছে, সে কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে। তিনি একদিন রাত্রে হঠাৎ এসে বললেন, তোমার অচলাদিদির কাণ্ডটা কি জানো গো? তিনি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি রাগ করে বললুম, যাও, চালাকি করতে হবে না। এ কথা দিদির কানে গেলে ইহজন্মে আর তিনি তোমার মুখ দেখবেন না।

অচলা চেয়ারের হাতায় দুই মুঠা কঠিন করিয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, তিনি বললেন, মুখ আমার তিনি দেখুন, আর নাই দেখুন, এ কথা যে সত্য, আমি দিব্য করে বলতে পারি। জা-ননদের সঙ্গে

ঝগড়া করেই হোক, আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতেই হোক, স্বামী নিয়ে তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সুরেশবাবুর ত ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, তোমার দিদি তাঁকে সমুদ্রে ডুবতে হুকুম করলেও তাঁর না বলার শক্তি নাই। তার পরে যেখানে হোক একটা ছদ্মনামে অজ্ঞাতবাসে দুটিতে থাকবেন, যতদিন না বুড়ো-বুড়িস পৃথিবী খুঁজে সেধে-কেঁদে তাঁদের বৌ-বেটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যদি না আসল ঘটনা হয় ত তুমি আমাকে—

আমি বললুম, আচ্ছা, তাই যেন হলো, কিন্তু গাড়িতে আমার মত একটা অপরিচিত মুখ্যু মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে বলবার দিদির কি এমন গরজ হয়েছিল? কর্তা তাতে হেসে জবাব দিলেন, তোমার দিদিটি যদি তোমার মত বুদ্ধিমতী হতেন, তা হলে হয়ত কোন গরজই হ'ত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই নয়। যাই শুনলেন, তোমার বাড়ি ডিহরীতে, তুমি দুদিন পরে ডিহরীতেই যাবে, তখনই তিনি অচলার বদলে সুরমা, ডিহরীর বদলে জব্বলপুরযাত্রী এবং হিন্দুর বদলে ব্রাহ্ম-মহিলা হয়ে উঠলেন। এটা তোমার মাথায় ঢুকল না রাক্ষুসী, যাঁরা টিকিট কিনে জব্বলপুর যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ গাড়ি বদল করে এদিকেই বা ফিরবেন কেন, আর পীড়িত স্বামী নিয়ে কোন বাঙালীর বাড়িতে না উঠে ওই অতদূর হিন্দুস্থানী পল্লীতে, একটা ভাঙ্গা সরাইয়ের মধ্যে গিয়েই বা হাজির হবেন কেন? বলিতে বলিতেই বীণাপাণি অকস্মাৎ পার্শ্বে হেলিয়া অচলার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং স্নেহে প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, বল না দিদি, কি হয়েছিল? আমি কোনদিন কাউকে কোন কথা বলব না—এই তোমাকে ছুঁয়ে আজ আমি দিব্যি করচি।

বীণাপাণির মুখে তাহাদের সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কারের মিথ্যা ইতিহাস শুনিয়া অচলার সমস্ত দেহটা যেন একখণ্ড অচেতন পদার্থের মত সখীর আলিঙ্গনের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্তি ধরিয়া এক-পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে চাহিয়া

দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয়রূপে মুখ ফিরাইয়া আর-এক পথে চলিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শমাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না। শুধু দুই চক্ষের অবিশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ ব্যতীত বহুক্ষণ পর্যন্ত কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ আর তাহার মধ্যে অনুভূত হইল না।

এমন কতক্ষণ কাটিল। বীণাপাণি আপন অঞ্চলে বার বার করিয়া অচলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে করুণস্বরে কহিল, সুরমাদিদি, তুমি বয়সে বড় হলেও ছোটবোনের কথাটা রাখো ভাই, এইবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি বলচি, এ যাত্রা তোমাদের সুযাত্রা নয়। অনেক দুঃখে হাতের নোয়াটা যদি বজায় রয়েই গেছে দিদি, তখন অভিমান করে আর গুরুজনদের দুঃখ দিয়ো না, আর তাঁদের ভাবিয়ো না। হেঁট হয়ে শ্বশুর-ঘরে ফিরে যেতে কোন লজ্জা, কোন অগৌরব নেই দিদি।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, চুপ করে রইলে যে ভাই। যাবে না? মা-বাপের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সুরেশবাবু কখনো ভাল নেই। তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে তিনি খুশিই হবেন, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

অচলা চোখ মুছিয়া এইবার সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, বীণাপাণি তেমনি উৎসুক-মুখে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রথমটা উত্তর দিতে তাহার অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু শুদ্ধমাত্র নির্বাক্ রহিয়াই যে ওই মেয়েটির কাছে মুক্তি পাওয়া যাইবে না, তাহাতে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন সমস্ত সংকোচ জোর করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কোন পথ নাই বীণা।

বীণাপাণি বিশ্বাস করিল না। কহিল, কোন পথ নেই? তোমাকে আমি বেশীদিন জানিনে সত্যি, কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে

দিব্যি করে বলতে পারি, তুমি এমন কাজ কখনো করতে পারো না দিদি, যার জন্যে কেউ তোমার কোনদিকের পথ বন্ধ করতে পারে। আচ্ছা, তোমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বলে দাও, আমরা ত পরশু সকালের গাড়িতে বাড়ি যাচ্ছি, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব, দেখি বুড়ো-বুড়ি আমাকে কি জবাব দেন। তোমার যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ি, তাঁরা আমারও তাই—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন লজ্জা নেই।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, তোমরা পরশু দেশে যাবে, এ কথা ত শুনিনি? এখানে কে কে থাকবেন?

বীণাপাণি কহিল, কেউ না, শুধু চাকর-দরোয়ান বাড়ি পাহারা দেবে। আমার জাঠ-শাশুড়ি অনেকদিন থেকেই শয্যাগত, তাঁর প্রাণের আশা আর নেই—তিনি সকলকেই একবার দেখতে চেয়েছেন।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুরবাড়িটি কোথায়?

বীণাপাণি বলিল, কলকাতার পটলডাঙ্গায়।

পটলডাঙ্গা নাম শুনিয়া অচলার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বীণা, তা হলে আমাদেরও এ-বাড়ি ছেড়ে কালই যেতে হয়। এখানে থাকা ত আর চলে না।

বীণাপাণি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই বুঝি তোমাদের বাড়ি ফেরবার জন্য এত সাধাসাধি করচি? এতক্ষণে বুঝি আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে! না দিদি, আমার ঘাট হয়েছে, তোমাকে কোথাও যেতে আর কখনো আমি বলব না; যতদিন ইচ্ছে এই কুঁড়েঘরে তোমরা বাস কর, আমাদের কারও আপত্তি নেই।

কিন্তু এই সদয় নিমন্ত্রণের অচলা কোন উত্তরই দিতে পারিল না। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের যাওয়া কি সত্যই স্থির হয়ে গেছে?

বীণাপাণি কহিল, স্থির বৈ কি। আজ আমাদের গাড়ি পর্যন্ত রিজার্ভ করা হয়েচে। বাবার ঘরে যদি একবার উঁকি মারো ত দেখতে পাবে বোধ হয়, পনের-আনা জিনিসপত্রই বাঁধাছাঁদা ঠিকঠাক।

দাসী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিল, বৌমা, মা একবার তোমাকে রান্নাঘরে ডাকচেন।

যাই, বলিয়া সে একটু হাসিয়া সহসা আর একবার দুই বাহু দিয়া অচলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কানে কানে কহিল, এতদিন লোকের ভিড়ে অনেক মুশকিলেই তোমাদের দিন কেটেচে। এবার খালি বাড়ি—কেউ কোথাও নেই—আপদ-বালাই আমিও দূর হয়ে যাবো—এবার বুঝলে না ভাই দিদিমণিটি? বলিয়া সখীর কপোলের উপর দুটি আঙুলের একটু চাপ দিয়াই দ্রুতবেগে দাসীর অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

এক টুকরা আনন্দ, খানিকটা দক্ষিণা হাওয়ার মত এই সৌভাগ্যবতী তরুণী লঘুপদে দৃষ্টির বাহিরে অপসৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার কানে কানে বলা শেষ কথা-দুটি অচলা দুই কানের মধ্যে লইয়া সেইখানে পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি এবং কল্যকার দিনটা মাত্র বাকী । তাহার পরে আর কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নাই—এই নির্জন নীরব পুরীর মধ্যে—কাছে এবং দূরে, তাহার যতদূর দৃষ্টি যায়—ভবিষ্যতের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিল—কেবল একাকী এবং কেবলমাত্র সুরেশ ব্যতীত আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দিন প্রতি মুহূর্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই—আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার পর্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।

বীণাপাণি বলিয়াছিল, সুরমাদিদি, শ্বশুর-ঘর আপনার ঘর, সেখানে হেঁট হয়ে যেতে মেয়েমানুষের কোন শরম নেই।

হায় রে, হায়! তাহার কে আছে, আর কি নাই, সে জমাখরচের হিসাব তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে রাখিয়াছে! তথাপি আজও তাহার আপনার স্বামী আছে এবং আপনার বলিতে সেই তাহাদের পোড়া ভিটাটা এখনও পৃথিবীর অঙ্ক হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও সে একটা নিমিষের তরেও তাহার মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আবদ্ধ পশুর চোখের উপর হইতে যতক্ষণ না এই বাহিরের ফাঁকটা একেবারে আবৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন সে একই স্থানে বারংবার মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার অবাধ্য মনের প্রচণ্ড কামনা তাহার বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিয়া বাহিরের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে সুরেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রিত, মধ্যের দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত এবং তাহারই এ-ধারে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া আপনার আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকিয়া হিন্দুস্থানী দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সমস্ত বাটীর মধ্যে কেহ যে জাগিয়া আছে, তাহার আভাসমাত্র নাই—শুধু সেই যেন অগ্নিশয্যার উপরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন এই পালঙ্কের উপরেই তাহার পার্শ্বে বীণাপাণি শয়ন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার স্বামী উপস্থিত, সে তাহার নিজের ঘরে শুইতে

গিয়াছে, এবং পাছে এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া নিজের বিক্ষিপ্ত পীড়িত চিত্ত অকস্মাৎ তাহাদেরই অবরূদ্ধ কক্ষের সুষুপ্ত পর্যঙ্কের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হিংসায়, অপমানে, লজ্জার অণু-পরমাণুতে বিদীর্ণ হইয়া মরে, এই ভয়ে সে যেন আপনাকে আপনি প্রচণ্ড শক্তিতে টানিয়া ফিরাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহটা তার তীব্র তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পার্শ্বের কোন একটা ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। গায়ের গরম কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই অনুভব করিল, এই শীতের রাত্রেও তাহার কপালে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। তখন শয্যা ছাড়িয়া মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখিতে পাইল, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর খণ্ড-চন্দ্র ঠিক সম্মুখেই দেখা দিয়াছে, এবং তাহারই স্নিগ্ধ মৃদু কিরণে শোনের নীল জল বহুদূর পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস তাহার তপ্ত ললাটের উপর স্নেহের হাত বুলাইয়া দিল এবং সেইখানে সেই জানালার উপরে সে তাহার অদৃষ্টের শেষ সমস্যা লইয়া বসিয়া পড়িল।

এই কথাটা অচলা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই অভিশপ্ত, হতভাগ্য জীবনের যাহা কিছু সত্য, সমস্তটাই লোকের কাছে শুধু কেবল একটা অদ্ভুত উপন্যাসের মত শুনাইবে এবং যেদিন হইতে এই কাহিনীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, সেইদিন হইতে যত মিথ্যা এ জীবনে সত্যের মুখোশ পরিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটি একটি করিয়া মনে করিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যে ভাগ্যবিধাতা তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটিকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত, এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করিল না, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরকে সে যদি শিশুকাল হইতে ভগবান বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে ত সে শিক্ষা তাহার একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বর! তোমার এত বড়

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কৌতুক করিয়া আমোদ করিবার আর কি ছাই কিছুই ছিল না!

মনে মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি এবং কোথায় ছিল সুরেশ। ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লোকেরই কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না? আবার সে মিথ্যাটা কি তাহার নিজের মুখ দিয়াই প্রচার হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল? অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? স্বামীকে সে অনেক দুঃখেই পাইয়াছিল, কিন্তু সে সহিল না—তাহার চরম দুর্দশার বোঝা বহিয়া অকস্মাৎ একদিন সুরেশ গিয়া অভিসম্পাতের মত তাহাদের দেশের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহার সুখের নীড় দগ্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্যটাও যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, এ কথা বুঝিতে আর যখন বাকি রহিল না, তখন আবার কেন তাহার পীড়িত স্বামীকে তাহারই ক্রোড়ের উপরে আনিয়া দেওয়া হইল! যাহাকে সে একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল, সেবার ভিতর দিয়া আবার তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি বিধাতার সঙ্কল্প ছিল, তবে আজ কেন তাহার দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-অপমানের আর কূলকিনারা নাই?

অচলা দুই হাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, জগদীশ্বর! রোগমুক্ত স্বামীর স্নেহাশীর্বাদে সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই যদি একদিন আমাকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলে, তবে এতবড় দুর্গতির মধ্যে আবার ঠেলিয়া দিলে কিসের জন্য? সে যে সঙ্কোচ মানে নাই, এত কাণ্ডের পরেও সুরেশকে সঙ্গে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হইবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছিবে না—কিন্তু অন্তর্যামী, আমার অদৃষ্টে

তুমিও কি ভুল বুঝিলে? এই বুকের ভিতরটায় চিরদিন কি রহিয়াছে, সে কি তোমার চোখেও ধরা পড়িল না?

পিতার চিন্তা, স্বামীর চিন্তা সে যেন প্রাণপণ-বলে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, আজও সকল ভাবনাকে সে কাছে ঘেঁষিতে দিল না; কিন্তু তাহার মৃণালের কথাগুলা মনে পড়িল, আর মনে পড়িল পিসীমাকে। আসিবার কালে স্নেহার্দ্র করুণ-কণ্ঠে সতী-সাধ্বী বলিয়া তিনি যত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেই-সব। তাহার সম্বন্ধে আজ তাঁহাদের মনোভাব কল্পনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ মর্মান্তিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত বোধশক্তি তাহার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দেহ-মনের সেই অশক্ত অভিভূত অবস্থায় জানালার গায়ের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, এমন সময় পিছনে মৃদু পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, খালি-গায়ে খালি-পায়ে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়ত সে কিছু বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। ইহাকে দমন করিয়া কথা কহিতে বোধ হয় আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাই পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি করিয়াই গরাদের উপর মাথা রাখিল; কিন্তু যে অশ্রু এতক্ষণ তাহার চোখ দিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে পড়িতেছিল, সে যেন অকস্মাৎ কূল ভাঙিয়া উন্মত্ত-ধারায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, রাত্রির গভীর নীরবতা গৃহের ভিতরে-বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিল। পিছনে দাঁড়াইয়া সুরেশ পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ—সহসা তাহার সমস্ত দেহটা বাতাসে বাঁশপাতার কত কাঁপিতে লাগিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই সে দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অচলা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল, কিন্তু অতি বড় বিস্ময় এই যে, যে লোকটা তাহার এতবড় দুঃখের মূল, তাহার এই ব্যবহারে

আজ অচলার উৎকট ঘৃণা বোধ হইল না, বরঞ্চ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, তুমি এ ঘরে এসেচ কেন?

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কণ্ঠস্বরের অভাবেই সে জবাব দিতে পারিল না।

অচলা ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, শীতে তোমার হাত কাঁপচে, যাও, খালি-গায়ে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় গে।

সুরেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল—অচলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, তা হলে তুমিও আমার ঘরে এসো।

অচলা মুহূর্তকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, না, আজ নয়। এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল।

এই শান্ত সংযত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঠিক কি ছিল, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অচলা তাহার প্রতি না চাহিয়াই পুনশ্চ কহিল, আমি জেগে আছি জানতে পেরে কি তুমি এ ঘরে ঢুকেছিলে?

সুরেশ আহত হইয়া বলিল, নইলে কি তোমাকে ঘুমন্ত জেনেই ঢুকেছি, এই তুমি আশা কর?

আশা! অচলা মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিল। এই তীক্ষ্ণ কঠিন হাসি দীপের অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেও সুরেশের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসি যেন স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল, ওরে কাপুরুষ! নিদ্রিত রমণীর কক্ষে যে চোরের মত প্রবেশ করিতে নাই, পুরুষের এ মহত্ত্ব কি তুমি আজও দাবী কর? কিন্তু মুখে কোন কথাই কহিল না। ক্ষণেক পরে গবাক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার শরীর ভাল নেই, আর জেগো না—যাও, শোও গে। বলিয়া সে ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া গায়ের কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আড়ষ্টভাবে সুরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই-একজন দাস-দাসী ব্যতীত দিন পাঁচ-ছয় হইল, বাটীর সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কেবল যাওয়া ঘটে নাই কর্তার। কি একটা জরুরী কাজের অজুহাতে তিনি শেষ-সময়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। এ-কয়দিন রামচরণবাবু নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বড়-একটা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। হঠাৎ আজ প্রত্যুষেই তিনি সাড়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুরমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শীতের দিনের এমন প্রভাতে তখন পর্যন্ত কেহ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, আহ্বান শুনিয়া অচলা শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই সুরেশও আর একটা দরজা খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। এই সদ্যনিদ্রোত্থিত দম্পতিকে বিভিন্ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি যে সহসা বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সুরেশ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অচলার চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

রামবাবু সুরেশের দিকে চাহিয়া একটু অনুতাপের সহিত কহিলেন, তাই ত সুরেশবাবু, হাঁকাহাঁকি করে অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, বড় অন্যায় হয়ে গেল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, অন্যায় কিছুই নয়। তার কারণ আমি জেগেই ছিলুম, বাইরে থেকে ডেকে কেন, ঢাক পিটেও আমার ঘরের শান্তিভঙ্গ করতে পারতেন না। কিন্তু এত ভোরেই যে?

বৃদ্ধ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আজ আমার সুরমা-মায়ের ওপর একটু উপদ্রব করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে, বলিয়া একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমার পালকি প্রস্তুত, এখুনি বার হতে হবে,

বোধ করি দুটো-তিনটের আগে আর ফিরতে পারবো না; এই বুড়োটার জন্যে আজ চারটি ডাল-ভাত ফুটিয়ে রেখো মা, অত বেলায় এসে যেন না আর আগুন-তাতে যেতে হয়।

এই পরম নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখনও আহার করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এমন কি, সকলের সে ঘরে যাওয়ার পর্যন্ত অধিকার ছিল না; এবং স্বপাক আহার তাঁহার মাঝে মাঝে অভ্যাস ছিল বলিয়াই মেয়েরা বাড়ি ছাড়িয়া দেশে যাইতে পারিয়াছিল। এ-কয়দিন তাঁহার সেই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটির উপর ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সে বিস্ময়ে, এবং সকলের চেয়ে বেশী ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

রামবাবু সেই ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, তুমি ভাবছ মা, এ বুড়ো আজ বলে কি! রান্না-খাওয়া নিয়ে যার এও বাছবিচার, অত হাঙ্গামা, তার আজ হলো কি? তা হোক। রাক্ষুসীর হাতে খেতে যখন আপত্তি হয় না, তখন তুমিই বা দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিলে অপ্রবৃত্তি হবে কেন? আর হোক ভাল, না হোক ভাল, মা, অতখানি বেলায় ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেলতে যেতে পারব না। বলিয়া অচলার নিরুত্তর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভাবচ, এ বুড়োটার মধ্যে হঠাৎ যদি এতবড় ঔদার্যই জন্মে থাকে তবে আমাকে কষ্ট না দিয়ে হিন্দুস্থানী বামুনঠাকুরের হাতে খেলেই ত হতো। না গো মা, তা হতো না।

আজও এ বুড়োর তেমনি গোঁড়ামি, তেমনি কুসংস্কার আছে—মরে গেলেও ঐ সন্ধ্যা-গায়ত্রীহীন হিন্দুস্থানী 'মহারাজে'র অন্ন আমার গলা দিয়ে গলবে না। আর আমার রাক্ষুসী মাকে আর তোমাকে এরই মধ্যে একবার এক করে নিতে পেরেচি, সেও সত্য নয়, কিন্তু যতই দেখচি, আমার মনে হচ্চে, এই মা-জননীটিও

যদি একদিন রেঁধে দেন, সে যে আমার অন্নপূর্ণার অন্ন হবে না, এ আমি কোনমতেই মানব না। কিন্তু আর ত দেরি করতে পারিনে মা, বাকি যেটুকু বলবার রইল, সেটুকু খেতে খেতেই বলব আর সেই বলাই তখন সবচেয়ে সত্যিকার বলা হবে। বলিয়া বৃদ্ধ চলিবার উপক্রম করিতেই অচলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে না করিতে যে কথাটা সকলের পূর্বে মুখে আসিয়া পড়িল, তাহাই বলিয়া ফেলিল, কহিল, কিন্তু আমি ত ভাল রাঁধতে জানিনে। আমার রান্না আপনার ত পছন্দ হবে না।

বৃদ্ধ রামবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, এই কথাটা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল মা?

অচলা কহিল, সকলেই কি রাঁধতে জানে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, সকলেই জানে, তাই কি আমি বলচি?

অচলা এ কথার হঠাৎ কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশের পক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। অচলার বিবর্ণ মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সে তাহার বেদনা বুঝিল। এই বৃদ্ধের সংস্কার, তাঁহার হিন্দু আচার ভাল হউক, মন্দ হউক, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা যে অচলার অগোচর নাই এবং এই ভদ্রনারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন কথার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিতেছে না, ইহা তাহার শ্রীহীন পাণ্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখহাত ধোয়ার অছিলায় দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তা হলে আমি চললুম, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামচরণবাবুও সুরেশের অনুসরণ করিলেন। মুহূর্তকাল অচলা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরেই নিজেকে জোর করিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়া ডাকিল, একবার শুনুন—

বৃদ্ধ ফিরিয়া দেখিলেন, সুরমা কি যেন বলিতে চাহিয়াও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, আর একটা কথা তোমাকে জানাবার আছে মা। তোমার সঙ্কোচ যখন কোনমতেই কাটতে চাইচে না, তখন—কি জান সুরমা, ছেলেবেলায় আমি ছিলাম পাড়ার মেজদা। তোমার বাপের চেয়ে হয়ত বয়সে ছোটও হব না। তা হলে আমাকে কেন মেজ-জ্যাঠামশাই বলে ডেকো না মা!

এই বৃদ্ধ যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অচলা তাহা জানিত। ভালবাসার এই প্রকাশ্যতায় তাহার চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িল। তাই সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বলবে?

অচলা তেমনি নীরবে ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া এইবার বোধ হয় সে নিজের সমস্ত শক্তিই এক করিয়া শুধু অস্ফুটে বলিল, কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামচরণবাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন, সত্যিকারের, না পাঁচজন কলকাতায় এসে দু'দিন শখ করে যেমন হয়, তেমনি? তারা ব্রাহ্মদের দলে বসে হিঁদুদের কোসে গালাগালি দেয়—তেমন গাল সত্যিকারের ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আনতেও পারে না—তার পরে ঘরে ফিরে সমাজে দাঁড়িয়ে সে ব্রাহ্মদের নাম করে আবার এমনি গালিগালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিঁদুদের চৌদ্দপুরুষও কখনো উচ্চারণ করতে পারে না। বলি, তেমনি তা মা? তা হয় ত আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

অচলার চোখমুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কেবলমাত্র কহিল, না তিনি সত্যিকার ব্রাহ্ম।

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ একটু যেন দমিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তা হলেনই বা বাবা ব্রাহ্ম, মেয়ে ত আর তাঁর খাতক নয়

যে, এখন ভয় করতে হবে। বরঞ্চ যাঁর সঙ্গে তুমি ধর্ম ভাগ করে নিয়েচ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ওই সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কর্ম ত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না! কিন্তু তুমি যত ফন্দিই কর না, সুরমা, জ্যাঠামশাইকে আজ আর ফাঁকি দিতে পারচ না। আজ তোমাকে রেঁধে ভাত দিতেই হবে। তাই বাপের শিক্ষার গুণে সেদিন উপোস করতে চাওনি বটে! আজ তার সুদসুদ্ধ উসুল করে তবে ছাড়বো। বলিয়া তিনি পুনরায় চলিয়া যান দেখিয়া অচলা এতক্ষণ পরে তাহার অভিভূত ভাবটাকে একনিমিষে অতিক্রম করিয়া গেল। সুস্পষ্টকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমি ব্রাহ্মমহিলা হলে আপনি আমার হাতে খাবেন না?

বৃদ্ধ বলিলেন, না। কিন্তু সে ত তুমি নও। সে ত তুমি হতে পার না।

অচলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাও যদি হতো, তা হলে কি শুধু আমার ধর্মমতটা আলাদা বলেই আমি আপনার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে যেতুম?

বৃদ্ধ বলিলেন, অস্পৃশ্য হবে কেন মা, অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তোমার হাতে খেতে পারতাম না।

এ সম্বন্ধে আজ তাহার অনেক কথাই জানা প্রয়োজন! তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, কেন পারতেন না, সে কি ঘৃণায়?

বৃদ্ধ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিল, বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনার মায়া-দয়া যে কত বড়, তার অনেক সাক্ষী এ পৃথিবীতে আছে জানি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। তবে আপনার মত মানুষের মন যে কেমন করে এত অনুদার হতে পারে, তাই আমি ভেবে পাইনে। আপনি কি করে মানুষকে এমন ঘৃণা করতে পারেন?

বৃদ্ধ অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি ঘৃণা করি? কাকে মা? কখন মা?

অচলা বলিল, যার হাতের ছোঁয়া আপনার অস্পৃশ্য, সে আপনার ঘৃণার পাত্র—তাকেই আপনি মনে মনে ঘৃণা করেন। আর ঘৃণা যে করেন, তাও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ভুলে গেছেন। আমাদের ওই হিন্দুস্থানী চাকরটার কথা ছেড়ে দিন, পাচকটার হাতের রান্নাও যে কোনমতেই আপনার গলা দিয়ে গলবে না, সেও আপনি নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন। এতে দেশের কত ক্ষতি, কত অবনতি হয়েচে সে ত—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, অচলার উত্তেজনাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার কথা হঠাৎ শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, মা, ঘৃণা আমরা কোন মানুষকেই করিনে। যে নালিশ তুমি করলে, সে নালিশ সাহেবেরা করে—তাদের কাছে তোমার বাবার শেখা—আর তাঁর কাছে তুমি শিখেচ। নইলে মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয়, আমাদেরও ছিল, আজও আছে।

এই সময় নীচে হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতেছিল, বৃদ্ধ সেদিকে একমুহূর্ত কান পাতিয়া কহিলেন, সুরমা খাওয়া জিনিসটা যাদের মধ্যে মস্ত বড় জিনিস, মস্ত ঘটা-পটার ব্যাপার, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। আমাদের ভাতে-ভাত খাওয়াটা তুচ্ছ বস্তু, সেটুকুর আজ একটু যোগাড় করে রেখো—মুখে দিতে দিতে তখন আলোচনা করা যাবে, ঘৃণাটা আমরা কাকে কত করি এবং দেশের অবনতি তাতে কতখানি হচ্চে—কিন্তু গোলমাল বাড়চে—আর নয় মা, আমি চললুম। বলিয়া তিনি একটু দ্রুতবেগে নামিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় অপরাহ্নবেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যেদিন জানতে পারবেন, আজ আপনার জাত গেছে, সেদিন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্চি।

বৃদ্ধ সস্নেহে মৃদুহাস্যে ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা মা, তাই হবে, বলিয়া আচমন করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ যতক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত অচলা সমস্ত দৃষ্টি দিয়া যেন ওই আওয়াজটাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল, তার পর কখন যে সে শব্দ মিলাইল, কখন যে বাহিরের সংসার তাহার চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া তাহাকে পাথর করিয়া দিল, সে টেরও পাইল না।

অনেকদিনের হিন্দুস্থানী দাসীটি বাংলা কথার সঙ্গে বাঙালীর আচার-ব্যবহার কায়দা-কানুনও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, সে কি একটা কাজে এদিকে আসিয়া বহু-মার বসিয়া থাকার ভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল এবং বয়োজ্যেষ্ঠার অধিকারে তাহার শেখা-বাংলা তর্জন-শব্দে বেলার দিকে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না এমনভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই চলিবে?

অচলা চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বেলা আর নাই, শীতের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। একটা দীপ্তিহীন নিষ্প্রভতা শ্রান্তির মত আকাশের সর্বাঙ্গে ভরিয়া আসিয়াছে, লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল, আমি যে একেবারে সন্ধ্যার পরেই খাব বলে ঠিক করেছি লালুর মা। আজ ক্ষিদে-তেষ্টা এতটুকু নেই।

লালুর মা বিস্মিত হইয়া কহিল, বড়বাবুর খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি খাবে, একটু আগেই যে বললে বহু-মা?

নাঃ—একেবারে রাত্রিতেই খাবো, বলিয়া আর বেশি বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই অচলা ত্বরিতপদে উপরে চলিয়া গেল।

একটু সময় পাইলেই সে উপরের বারান্দায় রেলিং-এর পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিত। আজিকার রাত্রেও সেইরূপ বসিয়াছিল, হঠাৎ রামবাবুর চটিজুতার শব্দ পাইয়া অচলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি হাতের হুঁকাটা এককোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা করতে এলাম সুরমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানী বাবাটি ঠিক, না এই বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথাটি ঠিক, তর্কটার যা হোক একটা নিষ্পত্তি না করে আজ আর নীচে যাচ্চিনে।

অচলা বুঝিল, এ সেই জাতিভেদের প্রশ্ন, শ্রান্তস্বরে বলিল, আমি তর্কের কি জানি জ্যাঠামশাই!

রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে, তুমি কি সোজা লোকের বেটি নাকি মা! তবে কথাটা নাকি একেবারে মিথ্যে, তাই যা রক্ষা, নইলে ও-বেলায় ত হেরে গিয়েছিলাম আর কি!

অচলার কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়; সেই এই তর্কযুদ্ধ হইতে আত্মরক্ষার একটুখানি ফাঁক দেখিতে পাইয়া কহিল, তা হলে আর তর্ক কি জ্যাঠামশাই! আপনারই ত জিত হয়েছে! একটুকু থামিয়া বলিল, যে হেরে গেছে, তাকে আবার দু'বার করে হারিয়ে লাভ কি আপনার?

রামবাবু তৎক্ষণাৎ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, সংসারে তিনি অনেক জিনিস দেখিয়াছেন; সুতরাং, এই অবসন্ন কণ্ঠস্বরও যেমন তাঁহার অগোচর রহিল না, এই মেয়েটি যে সুখে নাই, ইহার

মনের মধ্যে কি যে একটা ভয়ানক বেদনা পাঁজার আগুনের মত অহর্নিশি জ্বলিতেছে, ইহাও তেমনি এই শ্রান্ত-পাণ্ডুর মুখের উপরে আর একবার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ একটা হাসিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, নাঃ—ছুতো খাটল না মা! বুড়ো মানুষ, বকতে ভালবাসি—সন্ধ্যাবেলা একলাটি প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে; তাই ভাবলুম, মিথ্যে-টিথ্যে বলে মাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে দুটো গল্প করি গে, কিন্তু ছল ধরা পড়ে গেল। বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুঁকাটার জন্য একবার হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

তিনি যে যাইবার জন্য এটি সংগ্রহ করিতেছেন, অচলা তাহা বুঝিল এবং নীচে গিয়া একাকী এই বৃদ্ধের যে অনেক দুঃখেই সময় কাটিবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাই সে চকিতের ন্যায় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিজেই তাহা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের প্রসারিত হস্তে দিতে দিতে বলিল, আপনি যত খুশি তামাক খেতে চান, এইখানে বসে খান, কিন্তু এখন উঠে যেতে আপনাকে আমি কিছুতে দেব না।

বৃদ্ধ হুঁকা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে বাপ্ রে, একদম অতখানি রাশ ঢিল দিও না মা, আখের সামলাতে পারবে না। আমার মুখ-বুজে তামাক খাওয়া যে কি ব্যাপার, তা ত দেখনি! তার চেয়ে বরঞ্চ একটু-আধটু বলতে দাও যে—

মানুষের দম আটকে না যেতে পায়, না জ্যাঠামশাই? আচ্ছা, তাই ভাল। কিন্তু কি নিয়ে বকুনি শুরু করবেন বলুন ত?

রামবাবু মুখ হইতে একগাল ধূঁয়া-উপরের দিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তবেই মুশকিলে ফেললে মা। মহা-বক্তার লোককেও এ প্রশ্ন করলে তার মুখ বন্ধ হয়ে আসে যে!

আচ্ছা জ্যাঠামশায়, কোনদিন যদি জানতে পারেন, জোর করে যার হাতে আজ ভাত খেয়েচেন, তার চেয়ে নীচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ

নেই, তখন কি করবেন? প্রায়শ্চিত্ত? আর শাস্ত্রে যদি তার বিধি পর্যন্ত না থাকে, তা হলে?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা হলে ত ল্যাঠা চুকেই গেল মা, প্রায়শ্চিত্ত আর করতে হবে না।

কিন্তু আমার উপর তখন কি-রকম ঘৃণাই না আপনার হবে!

কখন মা?

যখন টের পাবেন, আমার একটা জাত পর্যন্ত নেই।

রামবাবু হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে মা। আর 'তোমাদের' বলি কেন, জানো সুরমা, আমার নিজের ছেলের মুখ থেকেও এ নালিশ শুনেচি। সে ত স্পষ্টই বলে, এই খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার থেকেই সমস্ত দেশটা ক্রমাগত সর্বনাশের দিকে তলিয়ে যাচ্চে। কারণ, এর মূলে আছে ঘৃণা, এবং ঘৃণার ভিতর দিয়ে কোন বড় ফল পাওয়া যায় না।

অচলা মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইল। এ বাড়িতেও যে এ-সকল আলোচনা কোন্ অবকাশ দিয়া পথ পাইতে পারে, এ তাহার ধারণাই ছিল না। কহিল, কথাটা কি তবে মিথ্যে?

রামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কি না, সে জবাব নাই দিলাম মা। কিন্তু সত্যি নয়। শাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনে চলি, এইমাত্র। যারা আরও একটু বেশি যায়—এই যেমন আমার গুরুদেব, তিনি নিজে রেঁধে খান, মেয়েকে পর্যন্ত হাত দিতে দেন না। তাই থেকে কি এই স্থির করা যায়, তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে ঘৃণা করেন!

অচলা জবাব দিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হুঁকাটায় আর গোটা-কতক টান দিয়া বলিলেন, মা, যৌবনে আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েচি। কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, আর কতরকমের লোক, কতরকমের আচার-ব্যবহার, সে-সব নাম হয়ত তোমরা জান না—কোথাও খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আছে, কোথাও বা তার আভাস পর্যন্ত শোনেনি, তবু ত মা, তারা চিরদিন তেমনি অসভ্য, তেমনি ছোট। বলিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় পুনরায় গোটা-দুই নিষ্ফল টান দিয়া বৃদ্ধ শেষবারের মত সেটাকে থামের কোণে ঠেস দিয়া রাখিলেন। অচলা যেমন নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল।

রামবাবু নিজেও খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আসল কথা জান সুরমা, তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েছ। তারা উন্নত, তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু করে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বলতে, ঠিক অমনি করে চলতে না শিখলে আর উন্নতির কোন আশা-ভরসাই নেই।

এই সকল তর্ক-যুক্তি অচলা বাংলা দৈনিক কাগজে অনেক পড়িয়াছে, তাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। হাসিটুকু বৃদ্ধ দেখিলেন, কিন্তু যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে নিজের পুনরাবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিলেন, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে যখন যাই, তখন জানা-অজানা কত লোকের মধ্যে গিয়েই না পড়ি। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার সেখানে নেই, করবার কথাও কখনো মনে হয় না; কিন্তু ঘৃণার মধ্যে এর জন্ম হলে কি এত সহজে সে কাজ পেরে উঠতাম! এই ত আমি কারও হাতেই প্রায় খাইনি, কিন্তু পথের অতিবড় দীন-দুঃখীকেও যে কখনো মনে মনে ঘৃণা করেচি—

অচলা ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে জানিনে জ্যাঠামশাই? এত দয়া সংসারে আর কার আছে?

দয়া নয় মা, দয়া নয়,—ভালবাসা। তাদেরই আমি যেন বেশী ভালবাসি। কিন্তু আসল কথা কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষই বা

কি, ধীরে ধীরে যখন সে হীন হয়ে যাবে, তখন সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সান্ত্বনা লাভ করে। মনে করে, এই সহজ বাধাটুকু সামলে নিয়েই সে রাতারাতি বড় হয়ে উঠবে। আমাদেরও ঠিক সেই ভাব। কিন্তু যেটা কঠিন, সেটা মূল শিকড়—

কথাটা শেষ করিবার আর সময় পাইলেন না। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাতেই সুরেশকে দেখিতে পাইয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি ত হিন্দু, আপনি ত আমাদের জাতিভেদ মানেন?

সুরেশ থতমত খাইয়া গেল—এ আবার কি প্রশ্ন? যে চোরাবালির উপর দিয়া তাহারা পথ চলিয়াছে, তাহাকে প্রতি হাত যাচাই না করিয়া হঠাৎ পা বাড়াইলে যে কোন্ অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইবে, তাহার ত স্থিরতাই নাই। এখানে সত্যটাই সত্য কি না সাবধানে হিসাব করিতে হয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না। তখন শুষ্ক একটু হাসিয়া দ্বিধাজড়িতস্বরে কহিল, আমরা কি, সে ত আপনি বেশ জানেন রামবাবু।

রামবাবু কহিলেন, বেশ জানি বলেই ত জানতাম। কিন্তু আপনার গৃহিণীটি যে একেবারে আগাগোড়া ওলট-পালট করে দিতে চাচ্ছেন। বলছেন, জাতি-ভেদের মত এত বড় অন্যায়, এত বড় সর্বনাশকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না, ম্লেচ্ছর অন্ন আহার করতেও তাঁর আপত্তি নেই এবং এ শিক্ষা জন্মকাল থেকে তাঁর ব্রাহ্ম বাবার কাছেই পেয়েছেন। ওঁর হাতে খেয়ে আজ আমার জাত গেছে কি না এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন কি না, এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। আপনি কি বলেন?

সুরেশ নির্বাক্। অচলার মেজাজ তাহার অবিদিতও নয় এবং সেখানে বিদ্রোহের অগ্নি যে অহরহ জ্বলিয়াই আছে, এ খবরও তাহার নূতন নয়। কিন্তু সেই আগুন আজ অকস্মাৎ যে কিজন্য এবং কোথা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে,

ইহাই অনুমান করিতে না পারিয়া সে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শুষ্ক হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণেক পরেই আত্মসংবরণ করিয়া পূর্বের মত আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার চেষ্টাটা শুধু হাসিকে আচ্ছন্ন করিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিল মাত্র।

সুরেশ বলিল, উনি আপনাকে তামাশা করচেন।

রামবাবু গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, উচিত না হলেও এ কথা ভাবতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণেও যখন হিন্দুঘরের মেয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করতে চাইলেন না—তুলসী দেওয়ার দিনটাতেও কিছুতে উপবাস করলেন না—ভাল, এ যদি তামাশা হয় ত কিছু কঠিন তামাশা বটে। আচ্ছা সুরেশবাবু, বিবাহ ত আপনার হিন্দু মতেই হয়েছিল?

সুরেশ কহিল, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, তা আমি জানি। অচলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, যদিচ তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে মা, কিন্তু তোমার বাবার ব্রাহ্ম হওয়ায় আর কোন দুঃখ নাই। এমন ব্রাহ্ম আমি অনেক জানি, যাঁরা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন, অল্প-স্বল্প অনাচারও করেন; কিন্তু মেয়ের বিয়ের বেলা আর হিসাবের গোল করেন না। যাক, আমার একটা ভাবনা দূর হল।

কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক বেশি ভাবনা দূর হইয়া গেল সুরেশের। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক বলেছেন রামবাবু, আজকাল এই দলের লোকই বেশি। তাঁরা—

হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কথার মাঝখানেই অচলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন গর্জন করিয়া উঠিল। সে সুরেশের মুখের উপর দুই চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, এত অপরাধের পরেও তোমার অপরাধ বাড়াতে লজ্জা হয় না? আবার তা আমারই মুখের উপরে? তুমি জানো, এ-সব মিথ্যে? তুমি জানো,

বাবা ঠক নন, তিনি মনে-জ্ঞানে যথার্থই ব্রাহ্ম-সমাজের। তুমি জানো, তিনি—, বলিতে বলিতেই সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ প্রথমটা থতমত খাইল, কিন্তু ঘাড় ফিরাইয়া বৃদ্ধের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ সেও যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, মিছে কথা কিসের? তোমার বাবা কি হিন্দুঘরে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না? তুমিও সত্যি কথা বলো!

অচলা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বোধ হয় মুহূর্তকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, সে কথা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন? তার হেতু কি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী তুমি নিজেই জানো না? তুমি ঠিক জানো আমি কি, আমার বাবা কি, কিন্তু এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করতে আমার শুধু যে প্রবৃত্তি হয় না তাই নয়, আমার লজ্জা করে। তোমার যা ইচ্ছে হয়, ওঁকে বানিয়ে বল, কিন্তু আমি শুনতে চাইনে। বল—আমি চললুম। বলিয়া সে একরকম দ্রুতপদেই পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের নিমিত্ত উভয়েই যেন নিশ্চল পাথরের মত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বোধ করি নিতান্তই মনের ভুলে একবার তাঁর হুঁকাটার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু তখনই হাতটা টানিয়া লইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, আজকাল শরীরটা কেমন আছে সুরেশবাবু?

সুরেশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বেশ আছে; বলিয়াই বোধ হয় সত্য কথাটা স্মরণ হইল, কহিল, বুকে এইখানটায় একটুখানি ব্যথা—কি জানি কাল থেকে আবার বাড়লো না—

রামবাবু বলিলেন, তবেই দেখুন দেখি সুরেশবাবু, এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রি পর্যন্ত কি আপনার বাইরে ঘুরে বেড়ান ভাল?

ঠিক ঘুরে বেড়াই নি রামবাবু! সেই বাড়িটার জন্যে আজ দু'হাজার টাকা বায়না দিয়ে এলুম।

রামবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, নদীর উপর বাড়িটি ভালই। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতেন, আমি হয়ত নিষেধ করতাম। সেদিন কথায় কথায় যেন বুঝেছিলাম, সুরমার এখানে বাস করার একান্ত অনিচ্ছা। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মত নিয়েছেন, না কেবল নিজের ইচ্ছেতেই কিনে বসলেন?

সুরেশ এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া শুধু কহিল, অনিচ্ছার বিশেষ কোন হেতু দেখিনে। তা ছাড়া বাস করবার মত কিছু কিছু আসবাবপত্রও কলকাতা থেকে আনতে দিয়েছি, খুব সম্ভব কাল-পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

রামবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা কি ভাবিয়া ডাক দিয়া উঠিলেন, সুরমা!

অচলা সাড়া দিল না, কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে নীরবে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার চৌকিতে আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, মা, তোমার স্বামী যে আমাদের দেশে মস্তবড় বাড়ি কিনে ফেললেন। এই বুড়ো জ্যাঠামশাইকে আর ত ফেলে চলে যেতে তুমি পারবে না মা।

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, শুধু বাড়ি আর আসবাবপত্র নয়, আমি জানি, গাড়িঘোড়াও আসচে। আর তার চেয়েও বেশি জানি, সমস্তই কেবল তোমারি জন্যে। বলিয়া তিনি সহাস্যে একবার সুরেশ ও একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু সেই গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ হইতে আনন্দের এতটুকু চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। এই অস্পষ্ট আলোকে হয়ত ইহা অপরের ঠিক লক্ষ্য না পাইতে

পারিত, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষু তাহা এড়াইল না। তথাপি তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মা, তোমার মতটা—

অচলা এইবার কথা কহিল, বলিল, আমার মতের ত আবশ্যক নেই জ্যাঠামশাই।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সে কি একটা কথা মা! তুমিই ত সব, তোমার ইচ্ছেতেই ত—

অচলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই না, আমার ইচ্ছায় কিছুই আসে-যায় না। আপনি সব কথা বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও আমি পারব না—কিন্তু আর আমাকে দরকার না থাকে ত আমি যাই—

বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না এবং তাহার আবশ্যকও হইল না; সহসা হিন্দুস্থানী দাসী একটা কড়ায় এক কড়া আগুন লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি তাহারই উপর গিয়া পড়িল। রামবাবু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি বেহারাটাকে আনতে হুকুম দিয়েছিলুম, সে আবার আর একজনকে হুকুম দিয়েছে দেখচি। আমার এই ব্যথাটায় একটু—

অগ্নির প্রয়োজনের আর বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইল না, কিন্তু তাহার জন্য ত আর একজন চাই। রামবাবু অচলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে নিমিষে মুখ ফিরাইয়া লইয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার ভারী ঘুম পেয়েছে, জ্যাঠামশাই, আমি চললুম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহার কপাট রুদ্ধ হওয়ার শব্দ আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দাসীর হাত হইতে আগুনের মালসাটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, তা হলে চলুন সুরেশবাবু—

আপনি?

হ্যাঁ, আমিই। এ নতুন নয়, এ কাজ এ জীবনে অনেক হয়ে গেছে; বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং মালসাটা ঘরের মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না সুরেশবাবু, না, এ কোনমতেই চলতে পারে না—কোনমতেই না। আমি নিশ্চয় জানচি, কি একটা হয়েচে—আমি একবার আপনার—; কিন্তু থাক সে কথা—যদি প্রয়োজন হয় ত এ বুড়ো আর একবার—, বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

সুরেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু ছেলেমানুষের মত প্রথমটা তাহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপর চোখের জল গোপন করিতে মুখ ফিরাইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কোচের উপর সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল এবং সন্নিকটে একখানা চৌকি টানিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাহার পীড়িত বক্ষে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিলেন, এমন সময়ে উভয়েই দ্বার খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, অচলা প্রবেশ করিতেছে। সে বিনা আড়ম্বরে কহিল, রাত অনেক হয়েছে, জ্যাঠামশাই, আপনি শুতে যান।

সেইজন্যেই ত অপেক্ষা করে আছি মা, বলিয়া বৃদ্ধ চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এতক্ষণ দু'জনেরই শুধু কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হল বৈ ত নয়! এ-সব কাজ কি আমরা পারি? অচলার প্রতি চেয়ারটা ঈষৎ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, যার কর্ম তাকেই সাজে মা, এই নাও, বসো—আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। বলিয়া বৃদ্ধ বিপুল শ্রান্তির ভারে মস্ত একটা হাই তুলিয়া গোটা-দুই তুড়ি দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইলেন, এবং ঘরের বাহির হইয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিতে করিতে সহাস্যে কহিলেন, ঢুলতে ঢুলতে যে হাত-পা পুড়িয়ে বসিনি সেই ভাগ্য, কি বলেন সুরেশবাবু?

সুরেশ কোন কথা কহিল না, শুধু নিমীলিত নেত্রের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া একটা নমস্কার করিল।

অচলা নীরবে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনটি অধিকার করিয়া বসিল এবং সেক দিবার ফ্লানেলটা উত্তপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার ব্যথা হলো কেন? কোন্‌খানটায় বোধ হচ্চে?

সুরেশ চোখ মেলিল না, উত্তর দিল না, শুধু হাত তুলিয়া বক্ষের বাম দিকটা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। সে এমনি যে, মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এই নির্বাক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত এমনি নীরবেই সমাপ্ত

হইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না। সহসা অচলার ফ্লানেলসুদ্ধ হাতখানা সুরেশ তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অচলার মুখের উপর উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না; সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল, কেবল কহিল, ছাড়ো, আরও একটু সেক দিয়ে দিই।

সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। একমুহূর্ত পূর্বে যেমন মনে হইয়াছিল, এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল, এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই, সর্বদিক সর্বকাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এমনি অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে—কোনদিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

অচলা বাধা দিল না, জোর করিল না; মনে হইল, ইহার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শুধু কেবল তাহার শান্ত মুখখানা একেবারে পাথরের মত শীতল ও কঠোর হইয়া উঠিল। সুরেশের চৈতন্য ছিল না—বোধ হয় সৃষ্টির কঠিনতম তমিস্রায় তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে এ মুখ-চুম্বন করার লজ্জা ও অপমান আজ তাহার কাছে ধরা পড়িতেও পারিত। ধরা পড়িল না সত্য, কিন্তু সুদ্ধমাত্র শান্তিতেই বোধ করি এই উন্মাদনা যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন অচলা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আরও ক্ষণকাল দু'জনেরই যখন চুপ করিয়া কাটিল, তখন সুরেশ অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, অচলা, এমন করে আর আমাদের

কতদিন কাটবে? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কহিতে লাগিল, তোমার কষ্ট আমি জানি, কিন্তু আমার দুঃখটাও একবার ভেবে দেখ। আমি যে গেলুম।

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে বাড়ি কিনেচ?

সুরেশ বিপুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, সে ত তোমারই জন্য অচলা!

অচলা ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, আসবাবপত্র, গাড়ি-ঘোড়াও কি কিনতে পাঠিয়েচ?

সুরেশ তেমন করিয়াই উত্তর দিল, কিন্তু সমস্তই ত তোমারই জন্যে।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। এ-সকলে তাহার কি প্রয়োজন, এ-সকল সে চায় কি না—ওই লোকটার কাছে এ প্রশ্ন করার মত নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কি আছে? তাই এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া মৌন হইয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করিল, রামবাবুর কাছে কি তুমি আমার বাবার নাম করেচ? বাড়ি কোথায় বলেচ?

সুরেশ বলিল, না।

আর কি সেক দেবার দরকার আছে?

না।

তা হলে এখন আমি চললুম। আমার বড় ঘুম পাচ্চে। বলিয়া অচলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আগুনের পাত্রটা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া কবাট বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আজ আর একটা কথা বলে যাও অচলা। তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও? সত্যি বলো?

অচলা কহিল, সে কোথায়?

সুরেশ বলিল, যেখানে হোক। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, কেউ জানে না—তেমন কোন দেশে। সে দেশ যত—

আগ্রহে আবেশে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, অচলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে সে একান্ত স্বাভাবিক ও সরল গলায় আস্তে আস্তে জবাব দিল, এদেশেও ত আমাদের কেউ চিনত না। আজও ত আমাদের কেউ চেনে না।

সুরেশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, ক্রমশঃ জানতে পারবে? খুব সম্‌ভব পারবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা ত অন্য দেশেও আছে?

সুরেশ উল্লাসে চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, তা হলে এখানেই স্থির। এখানেই তোমার সম্মতি আছে, বল অচলা? একেবারে স্পষ্ট করে বলে দাও—, বলিতে বলিতে কিসে যেন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কিন্তু ব্যগ্র পদ মেঝের উপর দিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অচলা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়া এক ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সুরেশের নূতন বাটীতে অপর্যাপ্ত আসবাব ও সাজসরঞ্জাম কলিকাতা হইতে আসিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া লইবার দিকে কোন পক্ষেরই কোন গা নাই। একজোড়া বড় ঘোড়া ও একখানা অতিশয় দামী গাড়ি পরশু আসিয়া পর্যন্ত কোন্ একটা আস্তাবলে সহিস-কোচম্যানের জিম্মায় রহিয়াছে, কেহই খোঁজ লয় না। দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় একদিন দুপুরবেলায় বৃদ্ধ রামবাবু এক হাতে হুঁকা এবং অপর হাতে একখানি নীলরঙের চিঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

অচলা রেলিং-এর পার্শ্বে বেতের সোফার উপর অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া একখানা বাংলা মাসিকের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, জ্যাঠামশাইকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। রামবাবু চিঠিখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও সুরমা, তোমার রাক্ষুসীর পত্র। সে এতদিন তোমাকে লিখতে পারেনি ব'লে আমার চিঠির মধ্যেই যেমন অসংখ্য মাপ চেয়েছে, তেমনি অসংখ্য প্রণামও করেচে। তাকে তুমি মার্জনা

কর। বলিয়া তিনি হাসিমুখে কাগজটুকু তাহার হাতে দিয়া অদূরে একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং নদীর দিকে চাহিয়া একমনে হুঁকা টানিয়া টানিয়া ধূঁয়ায় অন্ধকার করিয়া তুলিলেন।

অচলা পত্রখানি আদ্যোপান্ত বার-দুই পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, এঁরা সকলেই তা হলে পরশু সকালের গাড়িতে এসে পড়বেন? পিসীমা কে, জ্যাঠামশাই? আর তাঁর রাজপুত্রবধূ, রাজপুত্র, গার্জেন টিউটার—

রামবাবু হাসিয়া কহিলেন, রাক্ষুসী বেটী তামাশা করার একটা সুযোগ পেলে ত আর ছাড়বে না। পিসীমা হলেন আমার বিধবা ছোট ভগিনী আর রাজপুত্রবধূ হলেন তাঁর মেয়ে—ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর স্ত্রী—তা সে যাই বলুক, রাজা-রাজড়ার ঘরই সে বটে। রাজপুত্র হলো তার বছর-দশেকের ছেলে—আর শেষ ব্যক্তিটি যে কি, তা ত চোখে না দেখলে বলতে পারিনে মা। হবেন কোন বেশি মাইনের চাকর-বাকর। বড়লোকের ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, এটা-ওটা-সেটা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে যুগিয়ে দিয়ে সাবালক-নাবালক উভয় পক্ষের মান রাখেন—এমনি কিছু একটা হবেন বোধ করি। কিন্তু সেজন্যে ত ভাবচিনে সুরমা, আসুন, খান-দান, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, দু'দিন স্থগিত হয় ত খুব খুশীই হবো; কিন্তু চিন্তা এই যে, বাড়িটি ত আমার ছোট, রাজা-রাজড়ার কথা ভেবে তৈরিও করিনি, ঘরদোরের বন্দোবস্তও তার উপযোগী নয়। সঙ্গে দাস-দাসীও আসবে হয়ত প্রয়োজনের তিনগুণ বেশি। আমি তাই মনে করচি, তোমার বাড়িটাকে যদি—

অচলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই জ্যাঠামশাই, তা ছাড়া একলা অত দূরে থাকি কি তাঁদের সুবিধে হবে?

রামবাবু কহিলেন, সময় আছে, যদি এখন থেকেই লাগা যায়। আর জায়গা প্রস্তুত থাকলে কোথায় কার সুবিধে হবে, সে মীমাংসা সহজেই হতে পারবে। সুরেশবাবু ত শোনামাত্রই টমটম ভাড়া করে চলে গেছেন—তোমার

গাড়িও তৈরি হয়ে এলো বলে; তুমি নিজে যদি একটু শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিতে পারো মা, আমিও তা হলে সে ফুরসতে জুতোজোড়াটা বদলে একখানা উড়ুনি কাঁধে ফেলে নিই। তোমার ঘর-সংসারের বিলিব্যবস্থা ত সত্যি সত্যি আমরা পেরে উঠবো না।

অচলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আচ্ছা, আমি কাপড়টা বদলে নিচ্ছি, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়, অস্পষ্টও নয়। আত্মীয় রাজকুমার ও রাজমাতার স্থান-সঙ্কুলান করিতে এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে এবার তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, এ কথা অচলা সহজেই বুঝিল; কিন্তু বুঝা সহজ হইলেই কিছু তাহার ভার লঘু হইয়া ওঠে না। মনের মধ্যে সেটা যতদূর গেল, ততদূর গুরুভার স্টিল রোলারের ন্যায় যেন পিষিয়া দিয়া গেল।

এতদিনের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও কেহ তাহাকে বাটীর বাহির করিতে সম্মত করিতে পারে নাই। মিনিট-পনেরো পরে আজ প্রথম যখন সে নিজের অভ্যস্ত সাজে প্রস্তুত হইয়া শুধু এইজন্যই নামিয়া আসিল, তখন চারিদিকের সমস্তই তাহার চক্ষে নূতন এবং আশ্চর্য বলিয়া ঠেকিল, এমন কি আপনাকে আপনিই যেন আর-একরকম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড জুড়ি; নব-পরিচ্ছেদে সজ্জিত কোচম্যান মনিব জানিয়া উপর হইতে সেলাম করিল; সহিস দ্বার খুলিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ রামবাবু যখন সম্মুখের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন তখন সমস্তটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার আচ্ছন্ন দৃষ্টি গাড়ির যে অংশটার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিল, তাহাই বোধ হইল, এ কেবল বহুমূল্য নয়, এ শুধু ধনবানের অর্থের দম্ভ নয়, ইহার প্রতি বিন্দুটি যেন কাহার সীমাহীন প্রেম দিয়া গড়া।

কঠিন পাথরের রাস্তার উপর চারজোড়া খুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জুড়ি ছুটিল, কিন্তু অচলার কানের মধ্যে তাহা শুধু অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় হয়ত শেষ পর্যন্ত এমন অভিভূত হইয়াই থাকিত, কিন্তু সহসা রামবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া উঠিল। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, মা, ওই তোমার বাড়ি দেখা যায়। লোকজন দাসদাসী সবই নিযুক্ত করা হয়ে গেছে, মোটামুটি সাজানো-গোছানোর কাজও বোধ করি এতক্ষণে অনেক এগিয়ে এলো, শুধু তোমাদের শোবার ঘরটিতে মা, আমি কাউকে হাত দিতে মানা করে দিয়েছি। তাঁর যাবার সময় বলে দিলাম, সুরেশবাবু, বাড়ির আর যেখানে যা খুশি করুন গে, আমি গ্রাহ্য করিনে, শুধু মায়ের ঘরটিতে কাজ করে মায়ের আমার কাজ বাড়িয়ে দেবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি সলজ্জ হাসিমুখের আশায় চোখ তুলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

তিনি কেন যে এমন করিয়া থামিয়া গেলেন, অচলা তাহা সেই মুহূর্তেই বুঝিল, তাই যতক্ষণ না গাড়ি নূতন বাংলোর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া এই বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিল।

গাড়ির শব্দে সুরেশ বাহিরে আসিল, দাসদাসীরাও কাজ ফেলিয়া অন্তরাল হইতে সভয়ে তাহাদের নূতন গৃহিণীকে দেখিতে আসিল; কিন্তু সে মুখের প্রতি চাহিয়া কেহই কোন উৎসাহ পাইল না।

রামবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীরবে নামিয়া আসিল, সুরেশের প্রতি একবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না; তার পরে তিনজনেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এই নূতন বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতরে-বাহিরে উপরে-নীচে কোথাও যে আনন্দের লেশমাত্র আভাস আছে, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত কোনদিকে চাহিয়া কাহারো চক্ষে পড়িল না।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু ইহার মধ্যে ভুল যে কত বড় ছিল, তাহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বাটী সাজাইবার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এই-সকল অত্যন্ত মহার্ঘ ও অপর্যাপ্ত উপকরণরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া একটি চিন্তা সকলের মনে বার বার ঘা দিতে লাগিল যে, যাহার টাকা আছে সে খরচ করিয়াছে, এ একটা পুরাতন কথা বটে; কিন্তু এ ত শুধু তাই নয়। এ যেন একজনকে আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কাজের ভিড়ের মধ্যে, জিনিসপত্র নাড়ানাড়ির মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা অনেক হইল, চোখাচোখি অনেকবার হইল, কিন্তু সকলের ভিতর হইতেই একটা অনুচ্চারিত বাক্য, অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রহিয়া রহিয়া কেবল এইদিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে লাগিল।

বাড়িটার ধোয়া-মোছার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইতেই সারা বেলাটা গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তিনজনেই যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়িতে আসিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা ধূসর রঙের খণ্ডমেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদী পার হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছপালার উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সৌন্দর্য দু'চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে বৃদ্ধ রামবাবু জানালার বাহিরে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যাহারা বৃদ্ধ নয়, প্রকৃতির সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিবারই

যাহাদের বয়স, তাহারাই কেবল গাড়ির দুই গদী-আঁটা কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনেকদিন পূর্বেকার একটি স্মৃতি অচলার মনের মধ্যে একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, অনেকদিন পরে আজ আবার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল—যেদিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এমনি গাড়ি করিয়াই ফিরিতেছিল। যেদিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যেদিন সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই—বহুকাল পরে কেন যে সহসা আজ সেই কথাটাই স্মরণ হইল, ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরের নিগূঢ় ছবিটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিতে লাগিল।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! এই গাড়ি, ওই বাড়ি ও তাহার কত কি আয়োজন সমস্তই তাহার—সমস্তই তাহার স্বামীর আদরের উপহার বলিয়া একদিন সবাই জানিল; আবার একদিন আসিবে, যখন সবাই জানিবে ইহাতে তাহার সত্যকার অধিকার কানাকড়ির ছিল না—ইহার আগাগোড়াই মিথ্যা! সেদিন লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? অথচ আজিকার জন্য এ কথা কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, ইহার সবটুকুই সুদ্ধমাত্র তাহারই পূজার নিমিত্ত সযত্নে আহরিত হইয়াছে এবং ইহার আগাগোড়াই স্নেহ দিয়া, প্রেম দিয়া, আদর দিয়া মণ্ডিত। এই যে মস্ত জুড়ি দিগ্বিদিক কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া ছুটিয়াছে, ইহার সুকোমল স্পর্শের সুখ, ইহার নিস্তরঙ্গ অবাধ গতির আনন্দ—সমস্তই আজ তাহার! আজ যে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া ওই অগণিত দাসদাসী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্য দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গা-যমুনার মতই পাশাপাশি বহিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকে সে অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি বাটী পৌঁছিয়া

বৃদ্ধ রামবাবু তাঁহার সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে চলিয়া গেলে, সে যখন অকস্মাৎ শ্রান্তি ও মাথা-ব্যথার দোহাই দিয়া অত্যন্ত অসময়ে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরের কবাট রুদ্ধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল, তখন একমাত্র লজ্জা ও অপমানই যেন তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। সুদ্ধমাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায়?

অথচ যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিনের শয্যা বা তরুমূলবাস কোনটাকেই কাহাকেও কামনার বস্তু বলিতে সে শুনে নাই। সেখানে প্রত্যেক চলাফেরা, মেলামেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; যেখানে হিন্দুধর্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই; সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে,—যাহার প্রত্যেক নরনারীই সংসারের আকণ্ঠ-পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়াই উঠিয়াছে।

তাই এই নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য জিনিসটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ কথাতেও মন তাহার কোন মতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়, অথচ গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই যত সম্পদ, যত উপকরণ—এই দেহটাকে সর্বপ্রকারে সুখে রাখিবার মত যত বিবিধ আয়োজন আজ অযাচিত তাহার পদতলে আসিয়া

ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে অবিশ্রান্ত এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ফেলিতে লাগিল।

অথচ দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চরণ করে, তেমনি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্যি হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অসম্ভব, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাহাদের অনুরূপ সকল সমাজেই বিধবার আবার বিবাহ হয়, হিন্দু নারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না। তাই জীবন-মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই মন এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই কেননা পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম ও পরকালের গদা ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।

বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া রামবাবু ডাকিয়া বলিলেন, জলস্পর্শ না করে শুয়ে পড়লে মা, শরীরটা কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?

অচলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, এ যেন তাহার বাবার গলা। রাগ করিয়া অসময়ে শুইয়া পড়িলে ঠিক এমনি উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে তিনি কবাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেন।

এই চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ঠাঁই দিত না, কিন্তু এই স্নেহের আহ্বানকে সে ঠেকাইতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাড়া দিল, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তি এতদিনে অত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বরাবর একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন; এ বাটীতে ইহাদের আজ শেষ দিন মনে করিয়াই বোধ হয় এক নিমিষে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গেলেন। এক হাত অচলার কাঁধের উপর রাখিয়া, অন্য হাতে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত পরেই সহাস্যে বলিলেন, বুড়ো জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দুষ্টামি মা? কিছু হয়নি, এসো, বলিয়া হাত ধরিয়া আনিয়া বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন।

অদূরে আর একটা চৌকির উপর সুরেশ বসিয়াছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিল। কথা ছিল, রাত্রে ধীরে-সুস্থে বসিয়া সারাদিনের কাজকর্মের একটা আলোচনা করা হইবে, সে সেইজন্যই শুধু একাকী বসিয়া রামবাবুর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রতিই চাহিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি ত কোন্ এক বিলিতি বাপের মেয়ে—দিনক্ষণ পাঁজি-পুঁথি মানেন না। তখন আপনি নিজে মানুন, না মানুন, বিশেষ যায়-আসে না—কিন্তু আমার এই তিন-কুড়ি বছরের কুসংস্কার ত যাবার নয়! কাল প্রহর-দেড়েকের ভেতরেই একটা শুভক্ষণ আছে—

সুরেশ ইঙ্গিতটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াই প্রশ্ন করিল, কিসের শুভক্ষণ?

রামবাবু ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারিলেন না। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এর পরে কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে পাঁজিতে আর দিন খুঁজে পেলাম না—তাই ভাবছিলাম—

কথাটা এবার সুরেশ বুঝিল বটে, কিন্তু হাঁ-না কোনপ্রকার জবাব দিতে না পারিয়া সভয়ে গোপনে একবার মুখ তুলিয়া অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া আর

চোখ নামাইতে পারিল না, দেখিল, সে দুটি স্থির দৃষ্টি তাহারই উপর নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

অচলা শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাল সকালেই ত আমরা ও-বাড়ি যেতে পারি?

বিস্ময়াভিভূত সুরেশের মুখে এই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর কিছুতেই বাহির হইল না। সে শুধু অনিশ্চিত কণ্ঠে কোনমতে এই কথাটাই বলিতে চাহিল যে, সে বাড়ি এখনও সম্পূর্ণ বাস করিবার মত হয় নাই। তাহার মেঝেগুলা হয়ত এখনও ভিজা, নূতন দেয়ালগুলা হয়ত এখনও কাঁচা—হয়ত অচলার কোন একটা অসুখ-বিসুখ, না হয়ত তাহার—

কিন্তু আপত্তির তালিকাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলা একটু যেন হাসিয়াই বলিল, তা হোক গে। যে দুর্দিনে শিয়াল-কুকুর পর্যন্ত তার ঘর ছাড়তে চায় না, সেদিনেও যদি আমাকে অজানা জায়গায় গাছতলায় টেনে আনতে পেরে থাকো ত একটু ভিজে মেঝে, কি একটু কাঁচা দেওয়ালের ভয়ে তোমাকে আমার জন্যে ভেবে সারা হতে হবে না। সেদিন যার মরণ হয়নি সে আজও বেঁচে থাকবে।

রামবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, আপনি একটুও ভাববেন না জ্যাঠামশাই। আমরা কাল সকালেই যেতে পারবো। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারবো না জ্যাঠামশাই, আমরা কালই বিদায় হবো। বলিতে বলিতেই যে কাঁদিয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিজের ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ রামবাবু ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি একবার সুরেশের আনত মুখের প্রতি, একবার ওই অবরুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিয়া কেবলই এই বিফল প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ কি হইল? কেন হইল? কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কিন্তু অন্তর্যামী ভিন্ন এই মর্মান্তিক অভিমানের আর কে উত্তর দিবে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মলিন আকাশতলে সমস্ত সংসারটাই কেমন একপ্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সজ্জিত গাড়ি দ্বারে দাঁড়াইয়া; কিছু কিছু তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি তাহার মাথায় তোলা হইয়াছে; পাঁজির শুভমুহূর্তে অচলা নীচে নামিয়া আসিল এবং গাড়িতে উঠিবার পূর্বে রামবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, মা, বুড়োমানুষের মা হওয়া অনেক ল্যাঠা। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে, আর মাইল-দুই তফাতে পালিয়েই পরিত্রাণ পাবে যেন মনে করো না।

অচলা সজল চক্ষু-দুটি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমি ত তা চাইনে জ্যাঠামশাই!

এই করুণ কথাটুকু শুনিয়া বৃদ্ধের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত মেয়েটি আবার যেন পরিচয়ের বাহিরে কতদূরেই না সরিয়া যাইতেছে। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিলেন, সে কি আমি জানিনে মা! নইলে স্বামী নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্ছ, চোখে আবার জল আসবে কেন? কিন্তু তবুও ত আটকাতে পারলাম না। বলিয়া হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, কাছে ছিলে, রাত্রিদিন উপদ্রব করতাম, এখন সেইটে পেরে উঠবো না বটে, কিন্তু এর সুদসুদ্ধ তুলে নিতেও ত্রুটি হবে না, তাও কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো।

সুরেশ পিছনে ছিল, সে আজ এই প্রথম যথার্থ ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, আমার এখানে আপনি সুখে ছিলেন না, সে আমি জানি সুরেশবাবু। নিজের গৃহে এবার এইটেই যেন দূর হয়, আমি কায়মনে আশীর্বাদ করি।

সুরেশ কোন কথাই কহিল না, কেবল আর-একবার হেঁট করিয়া প্রণাম করিয়া গাড়িতে গিয়া বসিল।

রামবাবু আর একদফা আশীর্বাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও একখানা এক্কা আনিতে বলিয়া দিয়াছেন। হয়ত বা বেলা পড়িতে না পড়িতেই গিয়া হাজির হইবেন, কিন্তু তখন রাগ করিলে চলিবে না। এই বলিয়া পরিহাস করিতে গিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

গাড়ি চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ভালই হইল যে, ইহারা সময় থাকিতে চলিয়া গেল। এখানে শুধু যে স্থানাভাব, তাই নয়, তাঁহার বিধবা ভগিনীটির স্বভাবটিও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অপরের নাড়ীর খবর জানিতে তাহার কৌতূহলের অবধি নাই। সে আসিয়াই সুরমাকে কঠিন পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তাহার ফল আর যাহাই হোক, আহ্লাদ করিবার বস্তু হইবে না। এই মেয়েটির কিছুই না জানিয়াও তিনি জানিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই ভদ্রমহিলা। কোন একটা সুবিধার খাতিরে সে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিবে না; সে যে ব্রাহ্ম-পিতার কন্যা, সে যে নিজেও ছোঁয়াছুঁয়ি ঠাকুরদেবতা মানে না, ইহার কোনটাই গোপন করিবে না। তখন এ বাটীতে যে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিতেও হৃদ্‌কম্প হয়। কিন্তু ইহা ত গেল তাঁহার নিজের সুখ-সুবিধার কথা। আরও একটা ব্যাপার ছিল, যাহাকে তিনি নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিতেন না। তাঁহার মেয়ে ছিল না, কিন্তু প্রথম সন্তান তাঁহার কন্যা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে অচলার জননী হইতে পারিত, সুতরাং বয়স বা চেহারার সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধাটা যে তাঁহার কত বড় ছিল, তাহা সেই অচেনা মেয়েটিকে যেদিন পথে পথে কাঁদিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিলেন সেইদিনই টের পাইয়াছিলেন। সেদিন মনে হইয়াছিল, সেই বহুদিনের হারানো সন্তানটিকে যেন হঠাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছেন; এবং তখন হইতে সে ক্ষুধাটা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছে

এবং অন্তরেও অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু কি যেন একটা গভীর রহস্য এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া তাঁহাদের অগোচরে আছে; তাই থাক—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা আড়ালেই থাকুক, চেষ্টা করিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া আর কাজ নাই।

একদিন রাক্ষুসী একটুমাত্র আভাস দিয়াছিল যে, বোধ হয় ভিতরে একটা পারিবারিক বিবাদ আছে—বোধ হয় কলহ করিয়া সুরেশবাবু স্ত্রী লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ যেদিন অচলা আপনাকে ব্রাহ্মমহিলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ সুরেশের কণ্ঠে ইতিপূর্বেই যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল, সেদিন বৃদ্ধ চমকিত হইয়াছিলেন, আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এই গুপ্ত রহস্যের যেন একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; সেদিন নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল, সুরেশ ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করিয়াই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এই বিশ্বাসই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এই বৃদ্ধলোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্ম-সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুশি হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে লুকোচুরি, ইহার সৌন্দর্য, ইহার মাধুর্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারী মুগ্ধ করিত। ইহাকে না জানিয়া প্রশ্রয় দিতে যেন সমস্ত মন তাঁহার রসে ডুবিয়া যাইত। তাই যখনই এই দুটি বিদ্রোহী প্রণয়-অভিমান তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের আকারে প্রকাশ পাইত, তখন অতিশয় ব্যথার সহিত তাঁহার এই কথাটাই মনে হইত, পরগৃহের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত গণ্ডির মধ্যে যে মিলন কেবল ঠোকাঠুকি খাইতেছে, তাহাই হয়ত নিজের বাটির স্বাধীন ও প্রশস্ত অবকাশে সংসারের অসংখ্য কাজে ও অকাজে শান্তি ও সামঞ্জস্যে স্থিতিলাভ করিবে।

তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছিল, গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীর পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মনে মনে হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, মা, যাবার সময় এই বুড়োটার উপর বড় অভিমান করেই গেলে। ভাবলে, আপনার লোকের খাতিরে জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে না; কিন্তু দু-চারদিন পরে যেদিন গিয়ে দেখতে পাবো, চোখে-মুখে হাসি আর আঁটচে না, সেদিন এর শোধ নেব। সেদিন বলব, এই বুড়োটার মাথার দিব্যি রইল মা, সত্যি করে বল দেখি, আগেকার রাগের মাত্রাটা এখন কতখানি আছে? দেখব বেটি কি জবাব দেয়। বলিয়া প্রশান্ত নির্মল হাস্যে তাঁহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই থালায় সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার হাতের তৈরি এই মিষ্টি যদি না খান জ্যাঠামশাই ত সত্যি সত্যিই ভারী ঝগড়া হয়ে যাবে!

স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করার মাঝে মাঝেও মেয়েটার সেই লুকাইবার চেষ্টাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুড়োর ভারী হাসি পাইতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে ক্ষোভ গতরাত্রি হইতে নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ফিরিবার পথেই কল্পনার স্নিগ্ধ বর্ষণে জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

কাল সকালেই সকলে পৌঁছিবেন, তার আসিয়াছে। সঙ্গে রাজকুমার নাতি এবং রাজবধূ ভাগিনেয়ীর সংস্রবে সম্ভবতঃ লোকজন কিছু বেশি আসিবে। আজ তাঁহার বাটিতে কাজ কম ছিল না। উপরন্তু আকাশের গতিকও ভাল ছিল না। কিন্তু পাছে জল আসিয়া পড়ে, পাছে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে রামবাবু বেলা পড়িতে না পড়িতে এক্কা ভাড়া করিয়া, বকশিশের আশা দিয়া দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পথেই জলো হাওয়ার সাক্ষাৎ মিলিল এবং এ বাটীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু কিছু বর্ষণও শুরু হইয়াছে।

অচলা বাহির হইয়া কহিল, এই দুর্যোগের মধ্যে আজ আবার কেন এলেন জ্যাঠামশাই? আর একটু হলেই ত ভিজে যেতেন।

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে ভাবী আনন্দের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বুড়ার মন দমিয়া গেল। এজন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না—কে যেন তাঁহার কল্পনার মালাটাকে একটানে ছিঁড়িয়া দিল। তথাপি মুখের উৎসাহ বজায় রাখিয়া কহিলেন, ওরে বাস রে, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল, জলে ভেজাটাকে সামলাতে পারব, কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র হয়ে চিরটা কাল কে থাকবে মা?

এই দুর্বোধ মেয়েটাকে বুড়া কোনদিনই বেশ ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রির ব্যবহারে ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আজিকার আচরণে যেন একবারে দিশাহারা, আত্মহারা হইয়া গেলেন। সে যে কোনকালে, কোন কারণেই ওরূপ করিতে পারে, তেমন স্বপ্ন দেখাও যেন অসম্ভব। কথা ত মাত্র এইটুকু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ঠিক পাগল হইয়া গিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উপুড় হইয়া হুহু স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, কেন আমাকে আপনি এত ভালবাসেন—আমি যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু এক হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহার্দ্র চিত্ত সেই-সব সামাজিক অনুমোদিত বিবাহের কথা, আত্মীয়স্বজন, হয়ত-বা বাপ-মায়ের সহিত বিদ্রোহ-বিচ্ছেদের কথা, বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগের কথা—এই-সকল পুরাতন, পরিচিত ও বহুবারের অভ্যস্ত ধারা ধরিয়াই যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আর একটা নূতন খাদ খনন করিবার কল্পনামাত্র করিল না। এমনি করিয়া এই নির্বাক্ বৃদ্ধ ও রোরুদ্যমানা তরুণী বহুক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পরে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, এতে আর লজ্জা কি মা! তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার সেই সতীলক্ষ্মী মা, অনেককাল

আগে কেবল দু’দিনের জন্য আমার কোলে এসেই চলে গিয়েছিলে—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বুকে ফিরে এসেছ—আমি যে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম সুরমা! বলিয়া তাহাকে নিকটবর্তী একটা চেয়ারে বসাইয়া নানারকমে পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কোন লজ্জা, কোন শরম নাই। যুগে যুগে চিরদিনই ইহা হইয়া আসিতেছে। যিনি সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘর করিতে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ, আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে, আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে যত্নে তুলিয়া লইবে। দেখ দেখি মা, আমার এ আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হইবে না।

এমনি কত-কি বৃদ্ধ মনের আবেগে বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সার যাহা ছিল, তাহা থাক, কিন্তু তাহার ভারে যেন শ্রোতাটির আনত মাথাটি ধীরে ধীরে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। চাপিয়া বৃষ্টি আসিয়াছিল। এমনি সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল, সুরেশ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া কোথা হইতে হনহন করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। দেখিবামাত্রই অচলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জল হাত বাড়াইয়া লইয়া অশ্রুজলের সমস্ত চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রামবাবু বুঝিলেন, সুরমা যে-জন্যই হোক, চোখের জলের ইতিহাসটা স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চায়।

সে উপরে উঠিয়া রামবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাবার্তা পরে হবে সুরেশবাবু, আমি পালাই নি। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

সুরেশ হাসিয়া কহিল, এ কিছুই না। বলিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল,—জ্যাঠামশায়ের কথাটা শুনতে

দোষ কি? এক মাস হয়নি তুমি অতবড় অসুখ থেকে উঠেছ—বার বার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?

তাহার বাক্য ও চাহনির মধ্যে এত বড় ব্যবধান ছিল যে, দুজনেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এই বিস্ময়ের স্রোতটা বহিতে লাগিল ঠিক বিপরীত মুখে। সুরেশ কোন জবাব না দিয়া নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, আর রামবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেই বাহিরের বারিপাতের আর বিরাম নাই; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টির প্রকোপ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের আকর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রামবাবুর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, ফিরে যেতে বড় কষ্ট হবে জ্যাঠামশাই, আজ রাত্তিরেই কি না গেলে নয়?

তিনি হাসিলেন, মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিলেন, কষ্টের জন্য না হোক, এই দুর্যোগে এই নূতন জায়গায় তোমাদের ছেড়ে আমি যেতাম না। কিন্তু কাল সকালেই যে ওঁরা সব আসবেন, রাত্রির মধ্যেই আমার ত ফিরে না গেলেই নয় সুরমা। কিন্তু মনে হচ্ছে, এ-রকম থাকবে না, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই কমে আসবে। আমি এই সময়টুকু অপেক্ষা করে দেখি।

এই প্রসঙ্গে কাল যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচনা সংসারের দিকে, সমাজের দিকে, ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য ইহলোক পরলোক কত দিকেই না ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ে এমনি মগ্ন হইয়া রহিলেন যে, সময় কতক্ষণ কাটিল, রাত্রি কত হইল, কাহারও চোখেও পড়িল না। বাহিরে গর্জন ও বর্ষণ উত্তরোত্তর কিরূপ নিবিড়, অন্ধকার কত দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কেহ দৃষ্টিপাত করিল না; এই বৃদ্ধের মধ্যে যে জ্ঞান, যে

ভূয়োদর্শন, যে ভক্তি সঞ্চিত ছিল, তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রীটির কাছে তাহা অবাধে উৎসারিত হইতে পাইয়া এই কেবলমাত্র দুটি লোকের নিরালা সভাটিকে যেন মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া দিল। অচলার শুধু এই চেতনাটুকু অবশিষ্ট রহিল যে, সে এমন একটি লোকের হৃদয়ের সত্য অনুভূতির খবর পাইতেছে, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে একান্তভাবেই লাভ করিয়াছে।

হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া উভয়েই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, মা, রাত অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে—আপনার খাবার কি দিয়ে যাবে?

অচলা চমকিয়া কহিল, বারোটা বাজে? বাবু?

তিনি এইমাত্র খেয়ে শুতে গেছেন।

সে যে সেই গিয়াছে, আর আসে নাই, ইহা শুধু এখনই চোখে পড়িল। অচলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শোবার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। রামবাবু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা, বড় অন্যায় হয়েছে। তোমাকে এমন ধরে রাখলাম যে, তাঁর খাওয়া হল কি না, তুমি চোখে দেখতেও পেলে না। এখন যাও মা তুমি খেতে—

অচলা এ-সকল কথায় বোধ হয় কোন কান দিল না। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, কোচম্যান গাড়ি জুতে ঠিক সময়ে আনেনি কেন?

ভৃত্য কহিল, নূতন ঘোড়া, এই ঝড়-জল-অন্ধকারে বার করতে তার সাহস হয় না।

তা হলে আর কোন গাড়ি আনা হয়নি কেন?

ভৃত্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অর্থ অপরাধ স্বীকার করা নয়, বরঞ্চ প্রতিবাদ করা যে, এ হুকুম ত তাহারা পায় নাই।

রামবাবু উৎকণ্ঠার পরিবর্তে লজ্জা পাইয়াই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, গাড়ির আবশ্যক নেই—না গেলেও ক্ষতি নেই—কেবল প্রত্যুষে স্টেশনে গিয়ে হাজির হতে পারলেই চলবে। আমি রাত্রে কিছুই খাইনে, আমার সে ঝঞ্ঝাটও নেই—শুধু তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুতে যাও মা, কথায় কথায় বড্ড রাত হয়ে গেছে—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। এই বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে নীচে যাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং মিনিট-পনের পরে সে উপরে আসিতে, ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এক মিনিট দেরি নয় মা, তুমি শুতে যাও। আমি এই বসবার ঘরের কোচখানার উপর দিব্যি শুতে পারব, আমার কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা হবে না—শুধু তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।

বৃদ্ধের সনির্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্যসম বৃদ্ধের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার দ্বারাই পাইয়া আসিয়াছে, সে লোভেই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কণ্ঠরোধ করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের নির্জন শয়নমন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামিহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতর পঙ্কে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়মাল্য পরিয়া তাহাকে কোনমতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

নূতন স্থানে রামবাবুর সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষতঃ মনের মধ্যে চিন্তা থাকায় অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বৃষ্টি থামিয়াছে বটে কিন্তু ঘোর কাটে নাই। চাকরেরা কেহ উঠিয়াছে কিনা, দেখিবার জন্য বারান্দার একপ্রান্তে আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কে যেন টেবিলে মাথা পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, সুরমা, তুমি যে? এত ভোরে উঠেছ কেন মা?

সুরমা একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্ধমৃত নারীদেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা দুটিখানি গরম মুড়ি দিয়া চা খাওয়া শেষ করিয়া কেদারবাবু একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইতে মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন, মা, তোমার এই গরম মুড়ি আর পাথরের বাটির চা'র ভেতরে যে কি অমৃত আছে জানিনে, কিন্তু এই একটা মাসের মধ্যে আর নড়তে পারলুম না।

অচলার সম্পর্কে মৃণাল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, কেন তুমি পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত হও বাবা, তোমার এ—আমি কি সেবা করতে জানিনে?

তোমার এ মেয়ে কি—এই কথাটাই মৃণাল অসাবধানে বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু চাপিয়া গিয়া অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিল। তাই বোধ করি, এ ইঙ্গিত কেদারবাবু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁহার সহসা করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, কৈ আর পালাতে ব্যস্ত হই মা! তোমার তৈরি চা, তোমার হাতের রান্না, তোমার এই মাটির ঘরখানি ছেড়ে আমার স্বর্গে যেতেও ইচ্ছা করে না। ওই ছোট্ট জানালার ধারটিতে বসে আমি কতদিন ভাবি মৃণাল, আর দুটো বৎসর যদি ভগবানের দয়ায় বাঁচতে পাই ত কলকাতার মধ্যে থেকে সারা জীবন ধরে যত ক্ষতি নিজে করেচি, তার সবটুকু পূরণ করে নেব। আর সেই মূলধনটুকু হাতে নিয়েই যেন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কত বড় বেদনার ভিতর দিয়া তিনি এই কথাগুলি বলিলেন এবং কিরূপ মর্মান্তিক লজ্জায় কলিকাতার আজন্মপরিচিত পল্লী ও বাসভবন ছাড়িয়া, চিরদিনের আশ্রিতসমাজ ত্যাগ করিয়া এই বনের মধ্যে পর্ণ-কুটিরে বাকি দিনগুলা কাটাইবার

অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, মৃণাল তাহা বুঝিল, এবং সেইজন্যই কোন উত্তর না দিয়া চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এইখানে একটু গোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রায় মাস-খানেক হইল, কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই। মহিমের অসুখের সময় সুরেশের কলিকাতার বাটীতে এই বিধবা মেয়েটির সহিত তিনি প্রথম পরিচিত হন, কিন্তু এখানে তাহার নিজের বাটিতে আসিয়া যে পরিচয় ইহার পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন যেন সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেল। এই বন্ধন হইতেই বৃদ্ধ কোনমতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অন্যত্র কত কাজই না তাঁহার বাকি পড়িয়া আছে।

মহিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়াই সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যায়। যাবার সময় মৃণাল ধরিয়া রাখিতে টানাটানি করে নাই, কারণ শিশুকাল হইতে সেজদার সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রতি, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি তাহার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, অচলার সহিত দেখা করা এখন উচিত নয় বলিয়াই কেবল মহিম এমন করিয়া পলায়ন করিতেছে। সে মনে করিয়াছিল, তাহার পত্র পাইয়া কেদারবাবু কন্যা-জামাতার একটা মিটমাট করিয়া দিতে এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসিলেন তিনি একাকী।

আজিও পরিষ্কার কিছুই হয় নাই, শুধু সংশয়ের বোঝায় উত্তরোত্তর ভারাক্রান্ত দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া নীরবে বহিয়াছে। কেবল উপরের দিকে চাহিয়া একটু বুঝা গিয়াছে যে, আকাশে দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর যদি কোনদিন কাটে ত কাটিতে পারে, কিন্তু তাহার পিছনে অন্ধকারই সঞ্চিত হইয়া আছে, চাঁদের জ্যোৎস্না নাই।

সুরেশের পিসীমা নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া মৃণালকে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র কেদারবাবুর হাতে পড়িয়াছে। মহিম কোন একটা বড় জমিদার-সরকারের গৃহশিক্ষকের কর্ম লইয়াছে জানাইয়া যে সংবাদ দিয়াছে, সে চিঠিখানিও তিনি বার বার পাঠ করিয়াছেন, কোথাও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহার কন্যার উল্লেখমাত্র নাই, তথাপি চিঠি দু'খানির প্রতি ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ, দুর্ভাগ্য পিতার কর্ণে কেবল একটা কথাই এক শ'বার করিয়া বলিয়াছে, যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তিই তাঁহার নাই।

অচলা শুধু যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাই নয়, শিশুকালে যখন তাহার মা মরে, তখন হইতে তিনিই জননীর স্থান অধিকার করিয়া বুকে করিয়া এই মেয়েটিকে মানুষ করিয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই মেয়ের গভীর অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ কালি হইয়া আসিতেছিল, অথচ অমঙ্গল যে পথ ইঙ্গিত করিতেছিল, সে পথ সকল পিতার পক্ষেই জগতে সর্বাপেক্ষা অবরুদ্ধ।

গ্রামের দুই-চারিজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সঙ্কোচে কাহারও গৃহে যাইতেন না। মৃণাল অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলিতেন, কাজ কি মা! আমার মত ম্লেচ্ছের কারও বাড়ি না যাওয়াই ত ভাল।

মৃনাল কহিত, তা হলে তাঁরাই বা আসবেন কেন?

বৃদ্ধ এ কথার আর কোন জবাব না দিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন। সেখানে চাষীদের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করিতেন। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা, গৃহস্থালীর কথা, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা—এমনি কত কি আলোচনা করিতে বেলা বাড়িয়া উঠিলে তবে ঘরে ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে চা খাওয়ার পরে এই ছিল তাঁর কাজ।

জন্মকাল হইতে তাঁহারা চিরদিন কলিকাতাবাসী। শহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লীগ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—আত্মীয়-কুটুম্বও ধর্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব অধিকাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছুই না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নয়। যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারাজীবন কাটাইয়া দেয়, শহরের মুখ দেখা যাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি একপ্রকার পশু বলিয়াই জানিতেন এবং সেই সমাজটাকেও বন্যসমাজ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য যখন তাহার তীক্ষ্ণ বিষদাঁত দুটো তাঁহার মর্মের মাঝখানে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন যতই এই-সকল লেখাপড়া-বিহীন পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাহার ধর্ম, তাহার সভ্যতা, তাহার বিধি-বিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন, ইহারা লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে। নীতির মোটা কথাগুলা ইহারা জানে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই, কারণ জগতের সকল ধর্মই যে মূলে এক, এবং তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লাও যে একই বস্তু, এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বার বার বলিতে থাকে, ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশী জানি? কিসের জন্য ইহাদের

সমাজ, ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি? আর সে দূর এত বড় দূর যে, এই-সব আপনজনের কাছে আজ একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি।

এমনিধারা মন লইয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা। মৃণাল আসিয়া বলিল, কাল তোমার শরীর ভাল ছিল না বাবা, আজ যেন আবার পুকুরে স্নান করতে যেয়ো না। তোমার জন্যে আমি গরম জল করে রেখেছি।

একেবারে করে রেখেচ। বলিয়া কেদারবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মৃণাল আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়ান, পরনে পট্টবস্ত্র, মুখখানি প্রসন্ন, তাহার সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া যেন অত্যন্ত নির্মল শুচিতা বিরাজ করিতেছে—তাহার প্রতি চোখ রাখিয়া বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন, এ কষ্ট কেন করতে গেলে মা, এত ত দরকার ছিল না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি ত কলকাতার মানুষ, কলের জলই আমার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু তুমি আমাকে এমন আশ্রয় দিয়েছ মৃণাল যে তোমার এঁদো পুকুর পর্যন্ত আমার খাতির না করে পারেনি। ওর জলে আমার কোনদিন অসুখ করে না—আমি পুকুরেই নাইতে যাবো মা।

মৃণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হতে পারবে না। কাল তোমার অসুখ করেছিল, আমি ঠিক জানি, আমি জল নিয়ে আসি গে—তুমি তেল মাখতে বসো। বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হলো, কিন্তু আজ এই কথাটা আমাকে বল দেখি মৃণাল, পরকে এমন সেবা করার বিদ্যাটা তুমি এটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন করে শিখলে? এমনটি যে আর আমি কোথাও দেখিনি মা।

লজ্জায় মৃণালের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, না, পর নই—আমি তোমার ছেলে। কিন্তু এমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাব আজ দিয়ে তবে যেতে পাবে।

মৃণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি সলজ্জ হাসিমুখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শক্ত কাজ যে, চেষ্টা করে শিখতে হবে? এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বাবা—

তা যাক, বলিয়া কেদারবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছুদিন থেকে ভাবচি মৃণাল। মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখি জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার জো নেই মা! এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও না কোথাও, কোন না কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের এই বিরাট-বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিনরাত ভাবচি। আমি ভাবি এই যে—কিন্তু তোমার জল যে একেবারে—

থাক না মা জল। পুকুর ত আর শুকিয়ে যাচ্চে না। আমি ভাবি এই যে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শিশুর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথাই শিখে নিচ্ছে, সে ত আর তাঁর খবর নেই! আজও ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্রে-তন্ত্রে কানাকড়ির বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তবু যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পাঁশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমন করে কোষাকুষি নিয়ে বসে যাই।

মৃণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধর্ম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে? তাকেও ত দোষ কেউ দিতে পারে না।

কেদারবাবু বলিলেন, কেউ পারে কিনা আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি করতে বসব না। সে ভাল হোক, মন্দ হোক, এ বয়সে তাকে ত্যাগ করবার সামর্থ্য নেই, বদলাবারও উদ্যম নেই। এই রাস্তা ধরেই জীবনের শেষ পর্যন্ত চলতে হবে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি—যখন দেখি, এইটুকু বয়সে এত বড় আত্মবিসর্জন, যিনি স্বর্গে গেছেন, তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠা, তাঁর মাকেই মা জেনে—আচ্ছা, থাক থাক, আর বলব না। কিন্তু আমিও যার মধ্যে মানুষ হয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম মা, তাকেও ত মনে মনে তুলনা না করে থাকতে পারিনে। সমাজ ছাড়া যে ধর্ম, তার প্রতি আর যে আস্থা কোন মতেই টিকিয়ে রাখতে পারিনে মৃণাল।

মৃণাল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যকে যে তিনি এমনি করিয়া নিজের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার উপরেই আরোপ করিবেন, ইহা তাহার কাছে অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল। বলিল, বাবা, ঠিক এমনি করে যখন আমাদের সমাজটাকে দেখতে পাবেন, তখন এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন আমরাও নিজেদের দোষগুলো আপনার কাঁধের বদলে সমাজের কাঁধেই তুলে দিতে ব্যস্ত। আমরাও—

কিন্তু কথাটা শেষ না হইতে কেদারবাবু বাধা দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিন্তু আমি ত ব্যস্ত নই মা! তোমাদের সমাজে থাক না দোষ, থাক না ত্রুটি—কিন্তু তুমি ত আছ। এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও খুঁজে পাব না।

আবার মৃণালের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, বলিল, এমন করে আমাকে যদি তুমি এক শ'বার লজ্জা দাও বাবা, তা হলে এমনি পালাব যে, কিছুতেই আর আমাকে খুঁজে পাবে না, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে ম্লানমুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আমিও তোমাকে আজ বলে রাখছি মা, এই কাজটিই তোমাকে কিছুতে করতে দেব না। তুমি আমার চোখের মণি, তুমি আমার মা, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। এই অনাথ অকর্মণ্য

বুড়োটার ভার থেকে ছুটি নেবার দিন যেদিন তোমার আসবে মা, সে হয়ত বেশি দূরে নয়, কিন্তু সে আমাকে চোখে দেখতে হবে না, তাও আমি বেশ জানি। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমার একটা কাজ এখনো বাকী রয়েচে, সেটা মহিমের সঙ্গে দেখা করা। কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্চে, একবার স্পষ্ট করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এমনও ত হতে পারে, সে বেঁচে নেই?

কেন বাবা, তুমি ও-সব ভয় করচ?

ভয়? বৃদ্ধের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কহিলেন, সন্তানের মরণটাই বাপের কাছে সবচেয়ে বড় নয় মা!

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর চেয়েও যে দুর্গতি পিতার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আভাসমাত্রেই মৃণাল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন এই সাধ্বী বিধবা মেয়েটির লজ্জাটা যেন ঠিক একটা মুগুরের মত কেদারবাবুর বুকে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাকী চুপ করিয়া নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে তেলের বাটিটা টানিয়া লইলেন।

আজ সকালবেলাটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের কিছু পর হইতেই মেঘলা করিয়া আসিতে লাগিল। কেদারবাবু এই মাত্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পশ্চিমের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়াছিলেন, সম্মুখে একটা পুষ্পিত পেয়ারাগাছ ফুলে ফুলে একবারে ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে অসংখ্য মৌমাছির আনন্দ-কলরবের আর অন্ত নাই। অদূরে লম্বা দড়িতে বাঁধা মৃণালের স্বহস্ত-পরিমার্জিত চিকন পরিপুষ্ট গাভীটি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া চরিয়া ফিরিতেছে এবং তাহার পিঠের উপর দিয়া পল্লীপথের কতকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাবা, তোমার চা-টা এইবার নিয়ে আসি গে?

কেদারবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, এর মধ্যে নিয়ে আসবে মা।

বাঃ—বেলা বুঝি আর আছে?

তিনি একটু হাসিয়া বালিশের তলা হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন, কিন্তু এখনো যে তিনটে বাজেনি মা!

মৃণাল কহিল, নাই বাজলো বাবা তিনটে; ও-বেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া হয়নি।

কেদারবাবু মনে মনে বুঝিলেন, আপত্তি নিষ্ফল। তাই বলিলেন, আচ্ছা আনো। মৃনাল মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, তুমি যে বড় বল, তুমি গরম চিঁড়ে বড্ড ভালবাসো?

কথাটা ত মিছে বলিনে মা!

তবে, তাও দুটি আনি?

তাও আনবে? আচ্ছা আনো গে, বলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জোর করিয়া একটু হাসিলেন। মৃণাল চলিয়া গেলে আবার সেই জানালাটার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াই দেখিলেন, সমস্ত ঝাপসা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পরক্ষণেই পাঁচ-ছয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপটপ করিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া জামার হাতায় বৃদ্ধ জলের রেখাদুটি মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানি শান্ত এবং সহজ দেখাইবার চেষ্টায় এমার্সনের খোলা বইটা চোখের সুমুখে তাড়াতাড়ি মেলিয়া ধরিলেন।

তাহার পাতার ভিতরে যাই থাক, মনের মধ্যে এই কথাটারই ছাপ পড়িতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য অজ্ঞেয় ব্যাপার এই সৃষ্টিটা! সংসারের দিনগুলা যখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিল, তখনই কি এই দীর্ঘজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সকল আয়োজন বাতিল করিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জন করিবার প্রয়োজন পড়িল; বেশ দেখিতেছি, আমার মানবজন্মের সমস্ত অতীতটাই একপ্রকার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—অথচ এ কথা বুঝিতেও ত বাকী নাই, এই সুদীর্ঘ ফাঁকি ভরিয়া তুলিতে এই একটা মাসই যথেষ্ট হইল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মৃণাল পাথর-বাটিতে চা এবং রেকাবিতে চিঁড়ে-ভাজা লইয়া প্রবেশ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিতে করিতে কহিলেন, আজ খাওয়া যে আমার ভাল হয়নি তা এখন টের পাচ্ছি। কিন্তু দেখ মা—

না বাবা, তুমি কথা কইতে শুরু করলে সব জুড়িয়ে যাবে।

কেদারবাবু নীরবে চায়ের বাটিটা মুখে তুলিয়া দিলেন এবং শেষ হইলে নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি এই কামনাই কেবল করি মৃণাল, তুমি আসচে-বারে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাও। বুকে করে মানুষ করার বিদ্যেটা আমার খুব শেখা আছে মা, সেইটে যেন সেবার সারাজীবন ভরে খাটাবার অবসর পাই।

শেষ দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এই ধরনের আলোচনাকেই মৃণাল সবচেয়ে ভয় করিত। তাই তাঁহার অপরিস্ফুট আবেগের প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সহাস্যে কহিল, বা, বেশ ত বাবা, তোমার অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিও যেন একজন হই।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, অনেক নয় মা, অনেক নয়। কেবল তুমি একা—আমার একটি মেয়ে। একলা তুমি আমার সমস্ত বুক জুড়ে থাকবে। এবার যা কিছু তোমার কাছে শিখে যাচ্ছি, সেগুলি আবার একটি একটি করে আমার মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে আবার ঠিক এমনি করে বুড়ো-বয়সে সমস্তটুকু তার কাছ থেকে ফিরে নিয়ে পরজন্মের পথে যাত্রা করব। বলিয়াই তিনি অলক্ষ্যে একবার চোখের কোণে হাত দিয়া লইলেন।

মৃণাল ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, তুমি কেবল আমাকে অপ্রতিভ কর বাবা। আমি কি জানি বল ত?

এই যে মা আমার খাওয়া হয়নি, আমি নিজে জানলাম না, কিন্তু তুমি জানতে।

ও ত ভারী জানা! যার চোখ আছে, সেই ত দেখতে পায়।

কিন্তু ওই চোখটাই যে সকলের থাকে না মৃণাল! বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি এই দেখে মা, ভগবান কোথায়, কবে আর কি উপায়ে যে মানুষের যথার্থ আপনার জনটিকে মিলিয়ে দেন, তা কেউ জানে না! এর না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন সম্পর্কের বালাই, না আছে

সময়ের হিসাব। নিমিষে কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়—কেবল বুক ভরে যখন তাকে পাই, তখনই মনে হয়, এতকাল এতবড় ফাঁকাটা সয়েছিলুম কেমন করে?

মৃণাল আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক কথা বাবা, নইলে তোমার একটা মেয়ে যে এই বনের মধ্যে ছিল, এতদিন ত তার কোন খোঁজখবর রাখোনি।

কেদারবাবু কহিলেন সাধ্য কি মা রাখি, তিনি যতদিন না হুকুম করেন। আবার হুকুম যখন দিলেন তখন কোথাও এতটুকু বাধল না, কিসে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। আজ লোকে দেখচে, এই ত কেবল একটা মাসের পরিচয়; কিন্তু আমি জানি, এ ত শুধু আমার বাসা-ভাড়ার হিসাব নয় যে, পাঁজির পাতার সঙ্গে এর মাসকাবারি গণনার মিল হবে! এ যেন কত যুগ-যুগান্তকাল ধরে কেবল তোমার ছায়াতেই বসে আছি—এর আবার দিন মাস বছর কি! বলিয়া তিনি আবার একটু থামিলেন।

মৃণাল নিজেও কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে দুঃখের চিতা নীরবে জ্বলিতেছিল, সে যেন কেমন করিয়া নিবিয়া আসিল বলিয়া; এবং ইহারই শেষ আভাসটুকু তাঁহার মুখের উপর যে দীপ্তিপাত করিয়াছে, সেই ম্লান আলোকে কোথাকার কোন্ সুগভীর স্নেহ যেন অসীম করুণায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না, মৃণালের আনতদৃষ্টি মেঝের উপর তেমনি স্থির হইয়া রহিল। এই নীরবতা কেদারবাবুই ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মৃণাল, আমি এক ধর্ম ত্যাগ করে যখন আর এক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তখন বাইরের কাছে না হোক অন্ততঃ নিজের কাছেও একটা জবাবদিহির দায়ে পড়েছি। সেটা এতদিন কোনমতে এড়িয়ে গেছি বটে, কিন্তু আর বুঝি ঠেকাতে পারিনে। ধর্ম সম্বন্ধে এখন এই কথাটা যেন বুঝতে পারচি—

পলকের জন্য মৃণাল একটুখানি চোখ তুলিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই মা, ভয় নেই, আমি বারংবার তোমার নাম উল্লেখ করে আর তোমাকে সঙ্কোচে ফেলব না, কিন্তু এতকাল পরে এই সত্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি যে, লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম-বস্তুটিকে পাবার জো নেই।

মৃণাল তাঁহার অন্তরের বাক্যটি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সে কথা সত্যি হতে পারে বাবা, কিন্তু যে ধর্মটি আমি ভাল বুঝেছি, তাকে গ্রহণ করতে হলেই যে লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করতে হবে, আমি ত তার কোন প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

কেদারবাবু বলিলেন, আমিও যে ঠিক একদিন পেয়েছিলুম তাও না। কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈ কি মৃণাল! কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ ত আমরা প্রীতির ভেতর দিয়ে, প্রেমের ভেতর দিয়ে করিনে! যাকে ত্যাগ করে যাই, তার সম্বন্ধে সেই যে মন ছোট হয়ে থাকে, সে ত কোনকালেই ঘোচে না; সেইজন্যই ত আজ মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকেচি মা। কিন্তু তোমরা যে জন্ম থেকেই আপনা-আপনি অতি সহজেই পেয়েচ, সে ভাল হোক, মন্দ হোক, তাকেই অবলম্বন করে চলেচ। তফাতটা একটু চিন্তা করে দেখ দেখি!

মৃণাল মৌন হইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিবার মত জবাবটা সে সহসা খুঁজিয়া পাইল না।

কেদারবাবু নিজেও মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, মা! আজ অনেকদিনের ভুলে যাওয়া কথাও ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, কিন্তু এতকাল এরা কোথায় লুকিয়ে ছিল!

মৃণাল চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কার কথা বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, আমারি কথা মা। বড় হবার মত বুদ্ধিও ভগবান দেননি, বড়ও কখনো হতে পারিনি। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে মিশেই

কাটিয়েচি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য হয়ে গেছেন, তাঁদের উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেছি। তাঁদের সেই-সব কতদিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্ছে। তুমি বলছিলে মৃণাল, ধর্মান্তর-গ্রহণের মধ্যে ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষারেষি থাকবেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও ত এতকাল তাই বুঝেচি, তাই বলে বেড়িয়েচি। কিন্তু আজ দেখতে পেয়েছি, প্রয়োজন ছিলই। আজ দেখতে পেয়েছি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই বলে অভিযোগ করে যে, দেশে-বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট করে দিতে পেরেছি, ততখানি খ্রিস্টান পাদ্রীরাও পেরে ওঠেনি—নালিশটা ত আজ তাদের মিথ্যে বলেও ওড়াতে পারিনে মা! বস্তুতঃ বিদেশী বিধর্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর ত কেউ নেই।

মৃণাল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। বলিতে লাগিলেন, মৃণাল, রেষারেষি যদি নাই-ই থাকবে, তা হলে আমাদের মধ্যে যাঁরা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি, সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শপদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্মের মন্দিরে, ধর্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম' কে রেমো, 'হরি' কে হোরে, 'নারায়ণ' কে নারাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে একথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধা-ঘাটে আসুক। মা, ধর্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল-ঠোকায় আমাদের সমাজসুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম, শ্রদ্ধায় তেমনি রুক্ষ হয়ে উঠত—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও একতিল কম পড়ত না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে, তা থাক, কিন্তু ধর্মের লেশমাত্রও কোনখানে থাকবার জো ছিল না।

মৃণাল ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, বাবা, এ-সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্চ? তাঁরা সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার নমস্য! বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল। এই ভক্তিমতী তরুণীর নম্রনত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ যেন বিভোর হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে বাহিরে দাসীর আহ্বানে মৃণাল উঠিয়া চলিয়া গেলেও তিনি তেমনি একভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ি কেন ডাকিতেছিলেন শুনিয়া খানিক পরে মৃণাল ফিরিয়া আসিতেই কেদারবাবু অকস্মাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, মৃণাল, এমনি পরের দোষ-ত্রুটির নালিশ করতে কি সারা জীবনটা আমার কাটবে? এর থেকে কি কোন কালেই মুক্তি পাব না মা?

মৃণাল কহিল, তোমার মশারির কোণটা একটু ছিঁড়ে গেছে বাবা, একবারটি সরে বসো না, ওটুকু সেলাই করে দি। বলিয়া সে কুলুঙ্গি হইতে সেলাইয়ের ক্ষুদ্র কৌটাটি পাড়িয়া লইতেই বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া একটা মোড়ায় গিয়া বসিলেন এবং ওই কর্মনিরত নির্বাক মেয়েটির আনত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে কোনদিকে মুখ না তুলিয়াই আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া কেদারবাবুর দুই চক্ষু নিতান্ত অকারণেই বারংবার অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ মার্জনা করিতে লাগিলেন।

সেলাই শেষ করিয়া মৃণাল কৌটাটি তাহার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলা তুমি কি খাবে বাবা?

প্রশ্ন শুনিয়া কেদারবাবু হঠাৎ একটা বড়রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার অশ্রুকরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও-বেলায় খাবার কথা ভাববার জন্যে এ-বেলায় ব্যাকুল হবার আবশ্যক নেই মা, সে চিন্তা যথাসময়েই হতে পারবে। কিন্তু তুমি একবার স্থির হয়ে বসো দিকি মা! একটু

থামিয়া বলিলেন, এ অপরাধের আজই শেষ। আমার মুখ থেকে আর কখনো কারও নামে অভিযোগ শুনবে না মৃণাল। একটু থামিয়াই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার উপরে তুমি বিরক্ত হয়ো না মা, আমি ঠিক এর জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি।

তাঁহার সজল কণ্ঠস্বরে মৃণাল চকিত হইয়া বলিল, অমন কথা তুমি কেন বললে বাবা, আমি কি কোনদিন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েচি!

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, কখনো না মা, কখনো না। তুমি আমার মা কিনা, তাই এই বুড়ো ছেলের সকল অত্যাচার-উপদ্রবই সস্নেহে হাসিমুখে সয়ে আসচ। কিন্তু এতকাল পরে সে সত্যটা আজ বুকের রক্ত দিয়ে পেয়েচি, তাকেই কেবল তোমাকে দেখাতে চেয়েচি মৃণাল, পরের নিন্দা-গ্লানি করতে চাইনি। আজ যেন নিশ্চয় জানতে পেরেছি, ধর্ম জিনিসটাকে একদিন যেমন আমরা দল বেঁধে মতলব এঁটে ধরতে চেয়েছি, তেমন করে তাকে ধরা যায় না। নিজে ধরা না দিলে হয়ত তাকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মূর্তিতে যেদিন মানুষের চরম বেদনার উপর পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান, তখন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারা চাই। একটুকু ভুলভ্রান্তির ভর সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরে যান। কিন্তু, তার মত দুর্ভাগ্য আমার অতিবড় শত্রুর জন্যেও আমি কামনা করতে পারিনে মৃণাল।

যে প্রসঙ্গকে মৃণাল ক্রমাগত বাধা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, এ যে তাহারই ইঙ্গিত, ইহা অনুভব করিয়াই তাহার সঙ্কোচ ও বেদনার অবধি রহিল না, কিন্তু আজ আর সে যে-কোন একটা ছুতা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল না, নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ক্রমান্বয়ে বাধা পাইয়া কেদারবাবু নিজের দৃষ্টিও এদিকে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু তিনিও কোন খেয়াল করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, মা, এ কথা বার বার বলেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না যে, তুমি ছাড়া এত বড় সংসারে

আমার আপনার জন আর কেউ কোনদিন ছিল না; তাই বুঝি আমার শেষ-জীবনের সমস্ত বোঝা সমস্ত ভাল-মন্দ কি করে জানিনে, তোমার উপরে এসেই স্থিতিলাভ করেছে। যিনি সকল বিধি-ব্যবস্থার মালিক, এ তাঁরই ব্যবস্থা, আমি অসংশয়ে বুঝে নিয়েচি বলেই আর আমার কোন লজ্জা, কোন কুণ্ঠা নেই। গলগ্রহ বলে প্রথম আমার ভারী বাধ-বাধ ঠেকেছিল, কিন্তু আজ আমার মন থেকে তার সমস্ত বালাই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মৃণাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। কেদারবাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তবু কেমন বাধে মৃণাল, তবু কেমন গলা দিয়ে কথাটা কিছুতে বার হতে চায় না।

তবে থাক না বাবা—নাই বললে আজ তেমন কথা।

কেদারবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, আর থাকবে না—আর থাকলে চলবে না, আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সে সুরেশের সঙ্গেই—

এ সংশয় মৃণালের নিজের মনেও বহুবার ঘা দিয়া গিয়াছে, তাই সে শুধু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বহিয়া গেল, কেদারবাবু প্রবল চেষ্টায় যেন আপনাকে আপনি পরাভূত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, একবার মহিমের কাছে যেতে চাই মৃণাল, একটিবার তার মুখের কথা শুনতে চাই—শুধু এরই জন্যে আমার বুকের মধ্যেটা যেন অনুক্ষণ হুহু করে জ্বলে যাচ্চে। কিন্তু একাকী গিয়ে তার কাছে আমি কেমন করে দাঁড়াব?

মৃণাল তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া তাহার সকরুণ চক্ষু-দুটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের লজ্জিত ভীত মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, কেন বাবা তুমি একলা যাবে—যদি যেতেই হয় ত আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাবো।

সত্যি যাবে মা?

যাবো বৈ কি বাবা। তা ছাড়া, তোমাকে একলা আমি ছেড়েই বা দেব কেন? তুমি যেখানেই যাও না, আমি সঙ্গে না গিয়ে কিছুতেই ছাড়ব না, তা বলে

রাখচি। আমাকে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না বাবা, আমি কোথাও একটু বেড়াতে পাইনে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কোন কথা কহিলেন না, কেবল দুই করতল মুখের উপর চাপা দিয়া নিজের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া গেল, এই শুষ্ক শীর্ণ দেহখানির একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভেতরের অব্যক্ত বেদনায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃনাল নিঃশব্দে তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল, একটি কথা, একটি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ পর্যন্ত করিল না। একমাত্র কন্যার ঘৃণ্যতম দুর্গতিতে যে পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার তাহার কি-ই বা ছিল!

এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে পরে বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, মা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মৃণালের বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু সে প্রাণপণে অশ্রু নিরোধ করিয়া সাড়া দিল, কেন বাবা?

সংসারে ব্যথার পরিমাণ যে এত বড়ও হতে পারে, এ ত কখনো ভাবিনি মৃণাল? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোথাও কোন পথ নেই? কেউ কি জানে না?

কিন্তু বাবা, লোকে মৃত্যুর শোকও ত সহ্য করতে পারে!

কেদারবাবু বলিলেন, আমার পক্ষে সে মৃত, এই ত তুমি বলচ মা। এক হিসাবে তাই বটে। অনেকবার আমার মনেও হয়েছে—কিন্তু মৃত্যুর শোক যেমন বড়, তার শান্তি, তার মাধুর্য তেমনি বড়। কিন্তু সে সান্ত্বনার উপায় কৈ মৃণাল? এর দুঃসহ গ্লানি, অসহ্য লজ্জা আমার বুকের পথ জুড়ে এমনি বেধে আছে যে কোথাও তাদের নাড়িয়ে রাখবার এতটুকু ফাঁক নেই। বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বুকের উপর হাতখানি পাতিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, সন্তানের মৃত্যু যিনি দেন, তাঁকে আমরা এই বলে ক্ষমা করি যে, তাঁর কার্যকারণ আমরা জানিনে! আমরা—

মৃণাল হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, আমরাও তা হলে তাই করতে পারি? যে কেউ হোক না, যার কার্যকারণ আমাদের জানা নেই, তাকে মাপ করতেই যদি না পারি, অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার করে তাকে অপরাধী করে রাখব না।

বৃদ্ধ ঠিক যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি অপরের মুখের প্রতি একাগ্র করিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মৃণাল সলজ্জমুখে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, তা ছাড়া আমি সেজদার কাছেই শুনেচি বাবা, যে, সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে করলে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

কেদারবাবু উত্তেজনায় সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এ অপরাধও কি কেউ কোনদিন মাপ করতে পারে মৃণাল?

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি তেমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, কখনও নয়, কখনও নয়। বাপ হয়ে তার এ দুষ্কৃতি আমি কোনমতেই ক্ষমা করব না। ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়—এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলে দিলাম।

মৃণাল ধীরে ধীরে বলিল, যোগ্য-অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা, তাকে ক্ষমা বলা চলে না। তা ছাড়া ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায়, যে ক্ষমা করে, সে কি কিছুই পায় না বাবা?

বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মেয়েটির এই শান্ত স্নিগ্ধ কথাগুলি একমুহূর্তেই তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এমন করে ত আমি ভেবে দেখিনি মৃণাল! তোমার কাছে আজ যেন আবার এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলুম মা। ঠিক কথাই ত। যে গ্রহণ করে, লাভের খাতায় তাকে কি কেবল ষোল-আনা উসুল দিয়ে দাতার অঙ্কে শূন্য বসাতে হবে? এমন কিছুতেই সত্য হতে পারে না। ঠিক

ঠিক! কার অপরাধ কত বড়, সে বিচার যার খুশি সে করুক, আমি ক্ষমা করব কেবল আমার পানে চেয়ে! এই না মা তোমার উপদেশ?

কেন বাবা, এই-সব বলে আমার অপরাধ বাড়াচ্চ?

তোমার অপরাধ? সংসারে তারও কি স্থান আছে মা?

মৃণাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ বুঝি মা আমাকে আবার ডাকচেন—আমি এখুনি আসচি বাবা। বলিয়া সে দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মৃণাল উঠিয়া গেল, কিন্তু কেদারবাবু সেদিকে আর যেন লক্ষ্যই করিলেন না। কেবল নিজের কথার সুরে মগ্ন থাকিয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন, আমি বাঁচিলাম! আমি বাঁচিলাম মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে। দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দু'চক্ষু বাঁধা, মৃত্যু ভিন্ন আর যখন আমার সমস্ত রুদ্ধ, তখন হাতের পাশেই যে মুক্তির এত বড় রাজপথ উন্মুক্ত ছিল, এ খবর তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারিত! ক্ষমার কথা ত কখনো ভাবিতেই পারি নাই। যদি কখনো মনে হইয়াছে, তখনি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সজোরে, সগর্বে ইহাই বলিয়াছি, না, কদাচ না! মেয়ে হইয়া এত বড় অপরাধ যে করিতে পারিল, বাপ হইয়া এত বড় দান তাহাকে কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে কৃপণ, পিতা হইয়া যাহা তুই দিতে পারিস না, অপরে তাহা দিবে কি করিয়া? আরে সে তোর কতটুকু বা লইয়া যাইবে? তোর ক্ষমার সবটুকু যে তোর আপন ঘরেই ফিরিয়া আসিবে। তোর মৃণাল-মায়ের এই তত্ত্বটাকে একবার দু'চক্ষু মেলিয়া দেখ্ । বলিয়া তিনি ঠিক যেন কিছু একটা দেখিবার জন্যই দু'চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে প্রাণপণ-বলে কহিতে লাগিলেন, আমি ক্ষমা করিলাম, আমি ক্ষমা করিলাম! সুরেশ, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। অচলা, তোমাকেও ক্ষমা করিলাম! পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ যে-কেহ যেখানে আছ, আমি সকলকে ক্ষমা করিলাম! আজ হইতে কাহারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিমান, কোন নালিশ নাই, আজ আমি মুক্ত, আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি পরমানন্দময়! বলিতে বলিতেই অনির্বচনীয় করুণায় তাঁহার দু'চক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং হাত-দুটি একত্র করিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ের উপর রাখিতেই সেই নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে পিতৃস্নেহ যেন অজস্র অশ্রুধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর

কম্পিত ওষ্ঠাধর-দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! মা! তুই কোথায় আছিস—একবার কেবল ফিরিয়া আয়! আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি—মা, তোর সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা লইয়াই আর একবার পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া আবার তেমনি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না, শুধু তুই আর আমি—

বাবা!

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়া মৃণালের মুখের পানে চাহিলেন, বোধ করি, একবার আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—মা! মা! আমার বুক ফেটে গেল। সবাই তাকে কত দুঃখ, কত ব্যথাই না দিচ্চে! আর আমি পারি না!

মৃণাল কিছুই বলিল না, শুধু কাছে আসিয়া তাঁহার ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নীরবে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহার নিজের দু'চোখ বাহিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম ফাল্গুনের এই মেঘ-ঢাকা দিনটি হয়ত এমনিভাবেই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ কেদারবাবু চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন, মৃণাল, মহিমকে চিঠি লিখলে কি জবাব পাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না বাবা? আমার ত মনে হয় কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর উত্তর পাবো।

তুমি কি তাঁকে কিছু লিখেছ?

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চিঠিতে কি লেখা হয়েছে, এ কথা বৃদ্ধ সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাইরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখনো খানিক বেলা আছে, আমি একটু ঘুরে

আসি। বলিয়া তিনি গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লাঠিটি হাতে করিলেন, কিন্তু দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখ মা—

কি বাবা?

আমি ভয় করচি—না, ভয় ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবচি যে—

কিসের বাবা?

কি জানো মা, আমি ভাবচি—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর মৃণাল, আমরা যেতে চাইলে মহিম আপত্তি করবে?

এই ভয় এবং ভাবনা দুই-ই মৃণালের যথেষ্ট ছিল এবং মনে মনে ইহার জবাবটাও সে একপ্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, এখন সে খোঁজে আমাদের কাজ কি বাবা? তাঁর ঠিকানা জানলেই আমরা চলে যাবো—তার পরে সেজদা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, তখন দুনিয়ায় জানবার মত অনেক কথা আপনি জানা যাবে বাবা। সে আর কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না।

কেদারবাবু মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, তা হলে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মৃণাল কহিল, সত্যি। কিন্তু আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না বাবা, বরঞ্চ তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ আবার একটা কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ঠিক এমনি এক ফাল্গুনের অপরাহ্নবেলায় এই বাঙলা দেশের বাহিরে আরও দুটি নর-নারীর চোখের জল সেদিন এমনি অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; সুরেশ যখন শিলমোহর করা বড় খামখানি অচলার হাতে দিয়া কহিল, এতদিন দিই দিই করেও এ কাগজখানি তোমার হাতে দিতে আমার সাহস হয়নি, কিন্তু আজ আমার আর না দিলেই নয়।

অচলা খামখানি হাতে লইয়া দ্বিধাভাবে কহিল, তার মানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় আমার সাহস হয় না, এমন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য বস্তু আবার কি ছিল, এ ত তুমি ভাবচো? ভাবতে পারো—আমিও অনেক ভেবেচি। এর মানে যদি কিছু থাকে, একদিন ত প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অনেক অপমান, অনেক দুঃখের বোঝাই ত সংসারে তুমি আমার কাছে অর্থ না বুঝেই নিয়েচ—একে তেমনি নাও অচলা।

অচলা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কি আছে?

সুরেশ হাতজোড় করিয়া কহিল, এতদিন যা কিছু তোমার কাছে পেয়েছি, ডাকাতের মত জোর করেই পেয়েছি। কিন্তু আজ শুধু একটি জিনিস ভিক্ষে চাইচি—এ কথা তুমি জানতে চেয়ো না।

অচলা চুপ করিয়া রহিল, ইহার পরে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে পর্দার আড়াল হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবুজী, এক্কাওয়ালা বলচে, আর দেরি করলে পৌঁছুতে রাত্রি হয়ে যাবে। পথে হয়ত ঝড়বৃষ্টিও হতে পারে।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, আজ আবার তুমি কোথায় যাবে? এমন সময়ে?

সুরেশ হাসিমুখে সংশোধন করিয়া কহিল, অর্থাৎ এমন অসময়ে। যাচ্ছি ওই মাঝুলিতেই। প্লেগের ডাক্তার কিছুতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ গ্রামগুলো একেবারে শ্মশান হয়ে পড়েচে। এবার পাঁচ-সাত দিন থাকবে হবে—আর কে জানে, হয়ত একেবারেই বা থেকে যেতে হবে। বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অচলা স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজেও কিছু কিছু সংবাদ জানিত; সাত-আট ক্রোশ দূরে কতকগুলা গ্রাম যে সত্যই এ বৎসরে প্লেগে শ্মশান হইয়া যাইতেছে, এ খবর সে শুনিয়াছিল। শহর হইতে এতদূরে এই ভীষণ মহামারীতে দরিদ্রের চিকিৎসা করিতে যে চিকিৎসকের অভাব ঘটিবে,

ইহাও বিচিত্র নয়। সুরেশ বহু টাকার ঔষধ-পথ্য যে গোপনে দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, ইহাও সে টের পাইয়াছিল; এবং নিজেও প্রায় ভোরে উঠিয়া কোথাও-না-কোথাও চলিয়া যায়। ফিরিতে কখনো সন্ধ্যা, কখনো রাত্রি হয়—পরশু ত আসিতে পারে নাই, কিন্তু সে যে বাড়ি ছাড়িয়া, তাহাকে ছাড়িয়া, একেবারে কিছুদিনের মত সেই মরণের মাঝখানে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাই কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কেবল নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই যে মহাপাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপ-পুণ্য মানে না, যে কেবলমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এত বড় সর্বনাশ অবলীলাক্রমে সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি সে যখনই চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাহারই পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিষে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওই লোকটির ওষ্ঠের কোণে তখনও একটুখানি হাসির রেখা ছিল—অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু সেইটুকু হাসির মধ্যেই যেন অচলা বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য ভরা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। মুখে তাহার উদ্বেগ নাই, উত্তেজনা নাই, এই যে মৃত্যুর মধ্যে গিয়া নামিয়া দাঁড়াইতে যাত্রা করিয়াছে—তথাপি মুখের উপর শঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। তবে এই নিরীশ্বর ঘোর স্বার্থপরের কাছেও কি তাহার নিজের প্রাণটা এতই সস্তা! সংসারে ভোগ ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝে না—ভোগের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মগ্ন রহিয়াও কি বাঁচিয়া থাকাটা তাহার এমনি অকিঞ্চিৎকর, এমনি অবহেলার বস্তু যে, এতই সহজে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে এক নিমিষে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল? হয়ত না ফিরিতেও পারি! ইহা আর যাহাই হোক, পরিহাস নয়। কিন্তু কথাটা কি এতই সহজে বলিবার?

অকস্মাৎ ভিতরের ধাক্কায় সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল; হাতের কাগজখানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, এটা কি তোমার উইল?

সুরেশও প্রশ্ন করিল, যা এইমাত্র ভিক্ষে দিলে অচলা, তাই কি তবে ফিরে নিতে চাও?

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি জানতে চাইনে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারবো না।

কেন?

প্রত্যুত্তরে অচলা সেই খামখানাই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি আমার যাই কেননা করে থাকো, আমার জন্যে তোমাকে আমি মরতে দেবো না।

সুরেশ জবাব দিল না। অচলা নিজের কথায় একটু লজ্জা পাইয়া কথাটাকে হালকা করিবার জন্য পুনশ্চ কহিল, তুমি বলবে, তোমার জন্যে মরতে যাবো কোন্ দুঃখে, আমি যাচ্চি গরীবদের জন্য প্রাণ দিতে, বেশ তাও আমি দেব না।

কথাটা শুনিয়াই দপ্ করিয়া সুরেশের মহিমকে মনে পড়িল এবং বুকের ভিতর হইতে একটা নিশ্বাস উত্থিত হইয়া স্তব্ধ ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কারণ জীবনের মমতা যে কত তুচ্ছ এবং কতই না সহজ, ইহাকে যে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটিমাত্র সাক্ষী আজও আছে, সে কেবল মহিম। আজিকার এই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয় ত সেই সঙ্গীহীন একান্ত নীরব মানুষটিই কেবল মনে মনে বুঝিবে, সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়—ইহকাল-পরকাল কোন কিছুর আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।

চোখ-দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সংবরণ করিয়া ফেলিল। বরঞ্চ মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কারও জন্যেই মরতে চাইনে অচলা! চুপ করে নিরর্থক বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই যাচ্ছি একটু ঘুরে বেড়াতে। মরব কেন অচলা, আমি মরব না।

তবে এ উইল কিসের জন্য?

কিন্তু এটা যে উইল, সে ত প্রমাণ হয়নি।

না হোক, কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?

চলেই যে যাবো, আর যে ফিরব না, সেও ত স্থির হয়ে যায়নি!

যায়নি বৈ কি! এই বিদেশে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে তুমি— বলিয়াই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ উঠিতে গিয়াও বসিয়া পড়িল। একটা অদম্য আবেগ জীবনে আজ সে এই প্রথম সংযত করিয়া লইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, অচলা, আমি ত তোমার সঙ্গী নই। আজও তুমি একা, আর সেদিন যদি সত্যিই এসে পড়ে ত তখনও এর চেয়ে তোমাকে বেশি নিরাশ্রয় হতে হবে না।

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল, সেই অশ্রুভরা দু'চক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, আমার কাছে আর তুমি কি চাও, আর আমার কি আছে? এবং বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক্কাওয়ালা—

আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে সবুর করতে বল।

অনতিবিলম্বে সহিস আসিয়া জানাইল যে, গাড়ি তৈরি হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ি কেন?

সহিস যাহা কহিল, তাহাতে বুঝা গেল, মাইজি ও-বাড়িতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু দাসী বলিতেছে, ঘরের দরজা বন্ধ এবং অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, ইহাই সে জানিতে চায়।

আচ্ছা, সবুর কর।

এ ঘরের ভিতরের দিকের কবাটটা খোলাই ছিল, ইহারই পর্দা সরাইয়া সুরেশ নিঃশব্দে তাহাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তেমনি নিঃশব্দে অদূরে একটা চৌকির উপর উপবেশন করিল। এ কক্ষ তাহাদের দু'জনের, এখানে সে অনধিকার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ওই যে প্রশস্ত শুভ্র-সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে, উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই, সে কাঁদিতেই লাগিল এবং তাহারই প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া সুরেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন হইতে নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা—ইহার সম্মিলিত মাধুর্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমিষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, প্রভাত-রবিকরে পল্লবপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনিই করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; যে প্রস্রবণ বাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা, তাই স্থূলটার প্রতি সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা-আপনি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আজ তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ একমুহূর্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সে অদৃশ্য ধরা হইতে বিচ্যুত করিয়া পাওয়াটা যে কত বড় বোঝা, এ যে কত বড় ভ্রান্তি, এ তথ্য আজ তাহার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া একফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?

অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তেমনি নীরবে পড়িয়া রহিল। সুরেশ বলিল, তোমার গাড়ি তৈরি, আজ তুমি রামবাবুদের ওখানে বেড়াতে যাবে?

তথাপি সাড়া না পাইয়া বলিল, যদি ইচ্ছা না থাকে ত আজ না হয় ঘোড়া খুলে দিক। আমিও বোধ হয় আজ আর বার হতে পারব না। এক্কা ফিরিয়ে দিতে বলে দিই গে। বলিয়া যে বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তথায় দশ-পনের মিনিট সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা নিজেই জানে না; হঠাৎ শাড়ির খসখস শব্দে সচেতন হইয়া সুমুখেই দেখিল অচলা। সে চোখের রক্তিমা যতদূর সম্ভব জল দিয়া ধুইয়া ধনী গৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় একেবারে সজ্জিত হইয়াই আসিয়াছিল। কহিল, ওঁদের ওখানে আজ একবার যাওয়া চাই-ই।

এই সাজসজ্জা তাহার নিজের জন্য নয়, ইহা যে তথাকার আগন্তুক রাজ-অতিথিদের উপলক্ষ করিয়া, এ কথা সুরেশ বুঝিল, তথাপি এই মণিমুক্তাখচিত রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরী নারী ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিস্ময়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, চাই-ই কেন?

রাক্ষুসী জ্বর নিয়েই কলিকাতা থেকে ফিরেছে—খবর পেলুম, জ্যাঠামশাই নিজেও নাকি কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন।

আসা পর্যন্ত তুমি কি একদিনও তাঁদের বাড়ি যাওনি?

না।

তাঁরাও কেউ আসেন নি?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

রামবাবু নিজেও আসেন নি?

না।

এ বাটীতে আসিয়া পর্যন্ত সুরেশ প্লেগ লইয়া আপনাকে এমনি ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যে, গৃহস্থালী ও আত্মীয়তার এই-সকল ছোটখাটো ত্রুটি সে লক্ষ্য করে নাই। তাই কথা শুনিয়া যাথার্থই বিস্ময়ভরে কহিল, আশ্চর্য! আচ্ছা যাও।

অচলা বলিল, আশ্চর্য তাঁদের তত নয়, যত আমাদের। একজনের জ্বর, একজন নিজেও অসুখে না পড়া পর্যন্ত আত্মীয়দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। উচিত ছিল আমাদেরই যাওয়া।

আচ্ছা, যাও। একটু সকাল সকাল ফিরো।

অচলা একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

আমাকে কেন?

অচলা রাগ করিয়া কহিল, নিজের অসুখের কথা মনে করতে না পারো, অন্ততঃ ডাক্তার বলেও চল।

আচ্ছা চল, বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

এক্কাওয়ালা বেচারা কোন কিছুই হুকুম না পাইয়া তখনও অপেক্ষা করিয়াছিল। নীচে নামিয়া তাহাকে দেখিয়াই অচলা খামকা রাগিয়া উঠিয়া বেহারাকে তাহার কৈফিয়ত চাহিল এবং ভাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে আদেশ করিল। সে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কাল—

অচলাই তাহার জবাব দিল, কহিল না। বাবুর যাওয়া হবে না, এক্কার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠিয়া সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, আজ অচলা সহসা তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিয়া পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল। গাড়ি চলিতে লাগিল, কেহই কোন কথা কহিল না, পাশাপাশি বসিয়া দু’জনেই দুইদিকের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ি যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা!

কেন?

আজকাল আমি কি ভাবি জানো?

না।

এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উলটো। তখন ভাবতুম, কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে।

এই অচিন্ত্যপূর্ব একান্ত নিষ্ঠুর আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ ত—

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল। তোমরা যাকে বল পাপের ফল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।

অচলা চোখ তুলিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?

সুরেশ লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া জবাব দিল, বেশ ধর তাই।

ওই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অচলা একেবারে নীরব হইয়া গেল! তাহার রুদ্ধ হৃদয় মথিত করিয়া কেবল এই কথাটাই চারিদিকে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল, এ সেই সুরেশ!

এ সেই সুরেশ! আজ ইহারই কাছে সে দুঃসহ বোঝা, আজ সেই-ই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে! কথাটা মুখের উপর উচ্চারণ করিতেও আজ তাহার কোথাও বাধিল না।

অথচ পরমাশ্চর্য এই যে, এই লোকটিই তাহার সীমাহীন দুঃখের মূল! কাল পর্যন্ত ইহার বাতাসে সমস্ত দেহ বিষে ভরিয়া গিয়াছে!

মেঘাবৃত অপরাহ্ন-আকাশতলে নির্জন রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া এই দুটি নরনারী একেবারে নির্বাক! সুরেশ কি ভাবিতেছিল সেই জানে, কিন্তু তাহার উচ্চারিত বাক্যের কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করিয়াও আজ নূতন ভয়ে অচলার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ নাই—সে একা। এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ আকুল, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া সে সংসারসমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যেই তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না, তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। আজ তাহার কেউ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে, কোথাও কেহ নাই; সংসারে সে একেবারেই সঙ্গ-বিহীন! এই কথা মনে করিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সহসা তাহার অশক্ত অবশ ডান হাতখানি খপ করিয়া সুরেশের ক্রোড়ের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া চাহিল। অচলা নিরুদ্বেগ-কণ্ঠ প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, আর কি তুমি আমাকে ভালবাস না?

সুরেশ হাতখানি তাহার সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কহিল, এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃসংশয়ে দিতে পারিনে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।

অচলা আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু করুণকণ্ঠে কহিল, তুমি আর কোথায়ও আমাকে নিয়ে চল—

যেখানে কোন বাঙালী নেই?

হাঁ। যেখানে লজ্জা আমাকে প্রতিনিয়তই বিঁধবে না—

সেখানে কি আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে অচলা? এ কি সত্য? বলিতে বলিতেই আকস্মিক আবেগে সে তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

অপমানে আজও অচলার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তবুও সে ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি বলিল, হাঁ। এক সময় তোমাকে আমি ভালবাসতুম। না না—ছি—কেউ দেখতে পাবে। বলিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু হাতখানি তাহার মুঠার মধ্যে ধরাই রহিল, সে তাহারই উপর পরম স্নেহে একটুখানি চাপ দিয়া কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

গাড়ি বড় রাস্তা ছাড়িয়া রামবাবুর বাংলোসংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিরাট ওয়েলার যুগলবাহিত বিপুলভার অশ্বযান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে দেখিতে গাড়িবারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।

জমকালো নূতন পোশাকপরা সহিসেরা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতরণ করাইল। অচলার দৃষ্টি ছিল উপরের বারান্দায়। তথায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষুসীও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বহুদিনের পর চোখে চোখে হইতে দুই সখীর মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামবাবু নীচেই ছিলেন, তিনি গায়ের বালাপোশখানা ফেলিয়া দিয়া আনন্দে সস্নেহে আহ্বান করিলেন, এসো এসো, আমার মা এসো!

এই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আবাহনে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইল; কিন্তু তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। চোখে চোখে মিলিল, কিন্তু সে চোখে আর পলক পড়িল না। সর্বাঙ্গে মণি-মুক্তা অচলার

তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মানিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না, কিন্তু তাহাদেরি মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বৃদ্ধের ভুল হইল। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহাকে সহসা লজ্জায় ম্লান ও বিপন্ন কল্পনা করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অচলার আনত ললাট দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, থাক মা, তোমাকে পায়ের ধূলা নিতে হবে না, তুমি ওপরে যাও—

অচলা কিছুই বলিল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

রামবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, ইনি—

সুরেশ কহিল, বিলক্ষণ! আমরা যে এক ক্লাসের—ছেলেবেলা থেকে দু'জনে আমরা—, বলিয়া সহসা হাসির চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, কি মহিম, হঠাৎ তুমি যে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। মহিম মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

হতবুদ্ধি বৃদ্ধ সুরেশের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সুরেশও প্রত্যুত্তরে আর একটা হাসির প্রয়াস করিতে গেল, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িতে অকস্মাৎ গুরুতর শব্দ শুনিয়া দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা গোলমাল উঠিল; রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে দুই-তিনটি ধাপ উঠিতে পারিয়াছিল মাত্র, তাহার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার পথে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া অচলা এই কথাটাই ভাবিতেছিল, আজিকার এই মূর্ছাটা যদি না ভাঙ্গিত। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিবার বীভৎসতাকে সে মনে স্থান দিতেও পারে না, কিন্তু এমনি কোন শান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু—হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়া—তার পরে আর না জাগিতে হয়। মরণকে এমন সহজে পাইবার কি কোন পথ নাই? কেউ কি জানে না?

সুরেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি যে আর কোথাও যেতে চেয়েছিলে, যাবে?

চল।

এর পরে কাল ত এখানে মুখ দেখানো যাবে না।

কিন্তু তিনি ত কোন কথাই কাউকে বলবেন না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। মহিমকে আমি জানি, সে ঘৃণায় আমাদের দুর্নামটা পর্যন্ত মুখে আনতে চাইবে না।

কথাটা সুরেশ সহজেই কহিল, কিন্তু শুনিয়া অচলার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তারপরে যতক্ষণ না গাড়ি গৃহে আসিয়া থামিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নির্বাক হইয়া রহিল। সুরেশ তাহাকে সযত্নে, সাবধানে নামাইয়া দিয়া কহিল, তুমি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর গে অচলা, আমার কতকগুলো জরুরি চিঠিপত্র লেখবার আছে। বলিয়া সে নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যেজন্য এতবড় দুর্গতি

তাহার ভাগ্যে ঘটিল। এ চিন্তা নূতন নয়, যখন-তখন ইহাই সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত এবং শিশুকাল হইতে যতদূর স্মরণ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিত। আজ অকস্মাৎ মৃণালের একদিনের তর্কের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া সমস্ত আলোচনাই সে একটির পর একটি করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। নিজের বিবাহিত জীবনটা স্বামীর সহিত একপ্রকার তাহার বিরোধের মধ্যে দিয়াই কাটিয়াছে। কেবল শেষ কয়টি দিন তাঁহার রুগ্নশয্যায় স্বামীকে সে বড় আপনার করিয়া পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের যখন আর কোন শঙ্কা নাই, মন যখন নিশ্চিন্ত নির্ভর হইয়াছে, তখনকার সে স্নিগ্ধ, সহজ ও নির্মল আনন্দের মাঝে অপরের দুর্ভাগ্য ও বেদনা যখন তাহার বড় বেশি বাজিত তখন একদিন মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিয়াছিল, ঠাকুরঝি, তুমি যদি আমাদের সমাজের, আমাদের মতের হতে, তোমার সমস্ত জীবনটাকে আমি ব্যর্থ হতে দিতুম না।

মৃণাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি করতে সেজদি, আমার আবার একটা বিয়ে দিতে?

অচলা কহিয়াছিল, নয় কেন? কিন্তু থামো ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না। ও মল্লযুদ্ধ এত হয়ে গেছে যে, হবে শুনলেও আমার ভয় করে।

মৃণাল তেমনি সহাস্যে বলিয়াছিল, ভয় করবার কথাই বটে। কারণ তাঁদের হুড়োমুড়িটা যে কখন কোন্‌দিকে চেপে আসবে তার কিছুই বলবার জো নাই। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবোনি সেজদি, যে, তাঁরা যুদ্ধ করেন কেবল যুদ্ধ ব্যবসা বলে, কেবল তাতে গায়ে জোর আর হাতে অস্ত্র থাকে বলে। তাই তাঁদের জিতহার শুধু তাঁদেরই, আমাদের যায় আসে না। আমাদের ত কোন পক্ষই কোন কথা জিজ্ঞেসা করেন না।

অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু করলে কি হতো?

মৃণাল বলিয়াছিল, সে ঠিক জানিনে ভাই। হয়ত তোমারি মত ভাবতে শিখতুম, হয়ত তোমার প্রস্তাবেই রাজি হতুম, একটা পাত্রও হয়ত এতদিনে জুটে যেতে পারত। বলিয়া সে হাসিয়াছিল।

এই হাসিতে অচলা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল, সে আমি জানি। কিন্তু আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, যাঁরাই এই নিয়ে যুদ্ধ করেন, তাঁরা কি সবাই ব্যবসায়ী? কেউ কি সত্যিকার দরদ নিয়ে লড়াই করেন না?

মৃণাল জিভ কাটিয়া বলিয়াছিল, অমন কথা মনে আনলেও পাপ হয় সেজদি। কিন্তু তা নয় ভাই। কাল সকালেই ত আমি চলে যাচ্ছি, আবার কবে দেখা হবে জানিনে, কিন্তু যাবার আগে একটা তামাশাও কি করতে পারব না? বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া পরে গম্ভীর হইয়া কহিয়াছিল, কিন্তু তুমি ত আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না ভাই। বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। স্বামীকে ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে তাই সকল বিচার-বিতর্কের বাইরে।

বিস্মিত অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, বেশ তাও যদি হয়, ধর্ম কি মানুষের বদলায় না ঠাকুরঝি?

মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্মের মতামত বদলায়, কিন্তু আসল জিনিসটি কে আর বদলায় ভাই সেজদি? তাই এত লড়াই-ঝগড়ার মধ্যেও সেই মূল জিনিসটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েছে। স্বামীর দোষ-গুণের আমরাও বিচার করি, তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদলায়—আমারাও ত ভাই মানুষ! কিন্তু স্বামী জিনিসটি আমাদের ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাঁকে আর আমরা বদলাতে পারিনে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল, এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল, ওটা থাকবে বলেই আছে। ধর্ম যখন থাকবে না, তখন ওটাও থাকবে না। বেড়াল-কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই।

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, এত যদি তোমার সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন, তাঁদের এত সন্দেহ, এত সাবধান হওয়া তবু কিসের জন্যে? এত পর্দা, এত বাধাবাধি—সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এত জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝতুম পরীক্ষার অবকাশ থাকলে।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল চমকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, এ বিধি-ব্যবস্থা যাঁরা করে গেছেন, উত্তর জিজ্ঞাসা কর গে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ-মায়ের কাছে যা শিখেছি, তাই কেবল পালন করে আসচি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর করে বলতে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্মের ব্যাপার, পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থই নিতে পেরেচে, তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনা-আপনি যাচাই হয়ে গেছে। বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়োমানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্‌র, রূপ-গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশি ছিল না, কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল। এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তার পরে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উপমাটা হয়ত ঠিক হবে না সেজদি; কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, বাপ তাঁর কানা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর সুরূপ ছেলে মুহূর্তের তরে হয়ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম তাতে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। যাবার সময়ে তাঁর সর্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান, এ ত তুমি জানো। কিন্তু নিজের পিতৃত্বের

প্রতি সংশয়ে যদি কখনো তাঁর পিতৃধর্ম ভেঙ্গে যায়, তখন এই স্নেহের বাষ্পও কোথাও খুঁজে মেলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা আলাদা ভাই, আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ কথা আমার ভুলেও বিশ্বাস করো না যে, স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে যে যত বড়, যত বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে। সে পর্দার ভিতরে ডুববে, বাইরেও ডুববে।

তাহাই ত হইল। তখন এ সত্য অচলা উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু আজ মৃণালের সেই চোরাবালি যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অহরহ রসাতলের পানে টানিতেছে, তখন বুঝিতে আর বাকি নাই, সেদিন কি কথাটা সে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নিরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তাহার গর্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ-সকল তাহার কোন কাজে লাগিল না। তাহার বিপদ আসিল অত্যন্ত সঙ্গোপনে বন্ধুর বেশে; সে আসিল জ্যাঠামহাশয়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ছদ্মরূপ ধরিয়া। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ ও নির্বন্ধাতিশয্যে যে দুর্যোগের রাত্রে সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সেদিন একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, সে তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম—যাহা মৃণাল তাহাকে জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তাহার বাহিরের খোলসটাই বড় হইয়া তাহার ধর্মকে পরাভূত করিয়া দিল। তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া, কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকে চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়াছে; যে ধর্ম গুপ্ত, যে ধর্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাহিরের সহিত

সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল, এই আবরণের মোহ কাটাইয়া আপনাকে নগ্ন করিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না, জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আমার এতদিনের পর্বত-প্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমার সত্যকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না; জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবে না, তোমার সতী-সাধ্বী পুত্রবধূর ঘরের দ্বারও কাল আমার মুখের উপর রুদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা আমার জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। সে সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ আমার সহিবে না। বরঞ্চ এই আশীর্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠামশায়, আমার এতদিনের সতী নামের বদলে তোমাদের কাছে আজকার কলঙ্কই যেন আমার অক্ষয় হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায় রে! এ কথা তাহার মুখ দিয়া সেদিন কিছুতেই বাহির হইতে পারে নাই।

আজ নিষ্ফল অভিমান ও প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার বারংবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং এই অখণ্ড বেদনাকে মহিমের সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ছুরি দিয়া চিরিতে লাগিল।

এমন করিয়া প্রায় অর্ধেক রাত্রি কাটিল। কিন্তু সকল দুঃখেরই নাকি একটা বিশ্রাম আছে, তাই অশ্রু-উৎসও একসময়ে শুকাইল এবং আর্দ্র চক্ষুপল্লব দুটিও নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। সুরেশের জন্য দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু সে ঘরে আসিয়াছিল কিনা, ঠিক বুঝা গেল না। বাহিরে আসিতে বেহারা জানাইল, বাবুজী অতি প্রত্যুষেই এক্কা করিয়া মাঝুলি চলিয়া গিয়াছে।

কেউ সঙ্গে গেছে?

না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, প্লেগে মরতে চাস ত চল্‌।

তাই তুমি নিজে গেলে না, কেবল দয়া করে এক্কা ডেকে এনে দিলে? আমাকে জাগালি না কেন?

বেহারা চুপ করিয়া রহিল।

অচলা নিজেও একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিল, এক্কা ডেকে আনলে কে? তুই?

বেহারা নতমুখে জানাইল, ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না; কাল তাহাকে বিদায় দিবার সময় আজ প্রত্যুষেই হাজির হইতে বাবু নিজেই গোপনে হুকুম দিয়াছিলেন।

শুনিয়া অচলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নয়। কাল সন্ধ্যার ঘটনার সহিত ইয়ার সংস্রব নাই। না ঘটিলেও যাইত—যাওয়ার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করে নাই, শুধু তাহারি ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কবে ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন?

সে সানন্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, খুব শীঘ্র, পরশু কিংবা তরশু, নয় তার পরের দিন নিশ্চয়।

অচলা আর কোন প্রশ্ন করিল না। কাল সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া আঘাত কত লাগিয়াছিল, ঠিক ঠাহর হয় নাই, আজ আগাগোড়া দেহটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর রামবাবুর তত্ত্ব লইতে আসার আশঙ্কায় সমস্ত মনটাও যেন অনুক্ষণ কাঁটা হইয়া রহিল। মহিম কোন কথাই যে প্রকাশ করিবে না, ইহা সুরেশের অপেক্ষা সে কম জানিত না, তবুও সর্বপ্রকার দৈবাতের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাকে আগলাইয়া সমস্ত চিত্ত যেমন হুঁশিয়ার হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই তাহার সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের দরজায় পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল। রাত্রে আর তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া এইবার সে শয্যা আশ্রয় করিল। পাশের টিপয়ে শূন্য ফুলদানি চাপা দেওয়া কোথাকার এক কবিরাজী ঔষধালয়ের

সুবৃহৎ তালিকাপুস্তক ছিল, টানিয়া লইয়া তাহারই পাতার মধ্যে শ্রান্ত চোখ-দুটি মেলিয়া হঠাৎ এক সময়ে সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া কোন্ এক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের রোগশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বামুনঘাটি মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বেহারা বলিয়াছিল, বাবু ফিরিবেন পরশু কিংবা তরশু কিংবা তাহার পরের দিন নিশ্চয়।

কিন্তু এই তাহার পরের দিনের নিশ্চয়তাকে সমস্তদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিবার মত শক্তি আর অচলার ছিল না। এই তিনদিনের মধ্যে রামবাবু একদিনও আসেন নাই। তাঁহার আসাটাকে সে সর্বান্তঃকরণে ভয় করিয়াছে, অথচ এই না আসার নিহিত অর্থকে কল্পনা করিয়াও তাহার দেহ কাঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ইতিমধ্যে পীড়া যে বাড়িতেও পারে, এ কথা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কেবল আজ সকালে ও-বাড়ির দরোয়ান আসিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পাঁড়েজির নিকট হইতেই বিদায় লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে কেন আসিয়াছিল, কি খবর লইয়া গেল, কোন কথা অচলা ভয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পর হইতেই এই বাড়ি, ঘরদ্বার, এই-সব লোকজন সমস্ত হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, রঘুবীর, তোমার বাড়ি ত এই দিকে, তুমি মাঝুলি গ্রামটা জানো?

সে কহিল, অনেককাল পূর্বে একবার বরিয়াত গিয়েছিলাম মাইজী।

কতদূর হবে বলতে পারো?

রঘুবীর এদেশের লোক হইলেও বহুদিন বাঙালীর সংস্রবে তাহার অনেকটা হিসাববোধ জন্মিয়াছিল, সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া কহিল, ক্রোশ ছয়-সাতের কম নয় মাইজী।

আজ তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো?

রঘুবীর ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে? সেখানে যে ভারী পিলেগের বেমারী।

অচলা কহিল, তুমি না যেতে পারো, আর কোন চাকরকে রাজি করিয়ে দিতে পারো? সে যা বকশিশ চায়, আমি দেবো।

রঘুবীর ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মাইজী, তুমি যেন পারবে, আর আমি পারব না? কিন্তু রাস্তা নেই, আমাদের ভারী গাড়ি ত যাবে না। এক্কা কিংবা খাটুলি— তার কোনটাতেই ত তুমি যেতে পারবে না মাইজী!

অচলা কহিল, যা জোটে, আমি তাতেই যেতে পারবো। কিন্তু আর ত দেরি করলে চলবে না রঘুবীর। তুমি যা পাও একটা নিয়ে এসো।

রঘুবীর আর তর্ক না করিয়া অল্পকালের মধ্যেই একটা খাটুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নিজের লোটা-কম্বল লাঠিতে ঝুলাইয়া সেটা কাঁধে ফেলিয়া বীরের মতই পদব্রজে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ির খবরদারীর ভার দরোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যদের উপরে দিয়া কোন এক অজানা মাঝুলির পথে অচলা যখন একমাত্র সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া আজ গৃহের বাহির হইল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার নিজের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্নের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার বার বার মনে হইল, এই বিচিত্র জগতে এমন ঘটনাও একদিন ঘটিবে, এ কথা কে ভাবিতে পারিত।

ধূলা-বালির কাঁচা পথ একটা আছে। কিন্তু কখনও তাহা সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুপ্ত, অবরুদ্ধ। গৃহস্থের সুবিধা ও মর্জিমত তাহার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া কখনো বা নদীর ধার দিয়া, কখনো বা গৃহপ্রাঙ্গণের উপর দিয়াই সে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম কিছুদূর পর্যন্ত তাহার কৌতূহল মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। একটা মৃতদেহ একখণ্ড বাঁশে বাঁধিয়া কয়েকজন লোককে নিকট দিয়া বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া সংক্রমণের ভয়ে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াছিল,

জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিসে মরিয়াছে, ইহার বয়স কত এবং কে কে আছে। কিন্তু পথের দূরত্ব যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, বেলা তত পড়িয়া আসিতে লাগিল এবং কাছে ও দূর গ্রামের মধ্য হইতে কান্নার রোল যত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, ততই সমস্ত মন যেন কি একপ্রকার জড়তায় ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ হইতে তাহার তৃষ্ণাবোধ হইয়াছিল, এখানেই কতকটা পথ নদীর উচ্চ পাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ঘাটের কাছে আসিয়া সে ডুলি থামাইয়া অবতরণ করিল এবং হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইবার জন্য নীচে নামিতেই তাহার চোখে পড়িল, গোটা-দুই অর্ধগলিত শব অনতিদূরে আটকাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বীভৎস বিকৃতি তাহার মনের উপর এখন কোন আঘাতই করিল না। অত্যন্ত সহজেই সে হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহার খাটুলিতে বসিল। কোন অবস্থাতেই ইহা সে তাহার পক্ষে সম্ভবপর, কিছুকাল পূর্বে এ কথা বোধ করি সে চিন্তাও করিতে পারিত না।

ইহার পর হইতেই প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্য, কদাচিৎ কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘরদ্বার রুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন—মনে হয় যেন কুটীরগুলা পর্যন্ত মরণকে অনিবার্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। এই মৃত্যুশাসিত নির্জন পল্লীগুলির ভিতর দিয়া চলিতে রঘুবীর ও বাহকদিগের চাপা-গলা এবং ত্রস্ত-ভীত পদক্ষেপে প্রতিমুহূর্তেই অচলাকে বিপদের বার্তা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভয়ই হইল না, ইহার সহিত তাহার যেন কোন আজন্ম পরিচয় আছে, সমস্ত অন্তঃকরণ এমনি নির্বিকার হইয়া রহিল।

এইভাবে বাকি পথটা অতিবাহিত করিয়া ইহারা যখন মাঝুলিতে উপস্থিত হইল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। অচলার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, তাহাদের পথের দুঃখ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইবে। গ্রামের কৃতজ্ঞ নরনারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সংবর্ধনা করিয়া ডাক্তার সাহেবের দরবারে লইয়া যাইবে,

তথায় রোগী ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনায়, ঔষধ-পথ্যের বিতরণের ঘটায় সমস্ত স্থানটা ব্যাপিয়া যে সমারোহ চলিতেছে, তাহার মধ্যে অচলার নিজের স্থানটা যে কোথায় হইবে, ইহার চিত্রটা সে একপ্রকার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল, তাহার কল্পনা কেবল নিছক কল্পনাই। তাহার সহিত ইহার কোথাও কোন অংশে মিল নাই, বরঞ্চ যে চিত্র পথের দুই ধারে দেখিতে দেখিতে সে আসিয়াছে, এখানেও সেই ছবি। এখানেও পথে লোক নাই, বাড়িঘর-দ্বার রুদ্ধ, ইহার কোথায় কোন্ পল্লীতে সুরেশ বাসা করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়াই যেন কঠিন।

এই গ্রামে প্রত্যহই একটা হাট আজও বসে বটে এবং অন্য সময়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরাদমে চলিতেও থাকে সত্য, কিন্তু এখন দুর্দিনের বেচা-কেনা সারিয়া লোকজন অপরাহ্ণের বহু পূর্বেই পলাইয়াছে—ভাঙ্গা হাটের স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছে মাত্র।

রঘুবীর খোঁজাখুঁজি করিয়া একটা দোকান বাহির করিল। বৃদ্ধ দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করিতেছিল; সে কহিল, তাহার ছেলেমেয়েরা সবাই স্থানান্তরে গিয়াছে, কেবল তাহারা দুইজন বুড়া-বুড়ী দোকানের মায়া কাটাইয়া আজিও যাইতে পারে নাই। সুরেশের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সন্ধান দিতে পারিল যে, ডাক্তার নন্দ পাঁড়ের নিমতলার ঘরে এতদিন ছিলেন বটে, কিন্তু এখনও আছেন কিংবা মামুদপুরে চলিয়া গিয়াছেন সে অবগত নয়।

মামুদপুর কোথায়?

সিধা ক্রোশ-দুই দক্ষিণে।

নন্দ পাঁড়ের বাড়িটা কোন্ দিকে?

বৃদ্ধ বাহির হইয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া একটা বিপুল নিমগাছ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে গেলেই দেখা যাইবে।

অনতিকাল পরে ভীত পরিশ্রান্ত বাহকেরা যখন নিমতলায় আসিয়া খাটুলি নামাইল, তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। বাড়িটা বড়, পিছনের দিকে দুই-একটা পুরাতন ইঁটের ঘর দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশই খোলার। সম্মুখে প্রাচীর নাই—চমৎকার ফাঁকা। গৃহস্বামীকে দরিদ্র বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু একটা লোকও বাহির হইয়া আসিল না। কেবল প্রাঙ্গণের একধারে বাঁধা একটা টাটু-ঘোড়া ক্ষুৎপিপাসার নিবেদন জানাইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সদর দরজা খোলা ছিল, রঘুবীর সাহস করিয়া ভিতরে গলা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল, পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের উপর সুরেশ শুইয়া আছে এবং কাছেই খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বাবুজী।

সুরেশ চোখ মেলিয়া চাহিল এবং কনুইয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, কে, বেয়ারা? রঘুবীর?

রঘুবীর সেলাম করিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভুর রক্ত-চক্ষুর প্রতি চাহিয়া তাহার মুখের কথা সরিল না।

তুই এখানে?

রঘুবীর পুনরায় সেলাম করিল এবং বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শুধু কেবল বলিল, মাইজী—

এবার সুরেশ বিস্ময়ে সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে পাঠিয়েছেন?

রঘুবীর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, তিনি নিজেই আসিয়াছেন।

জবাব শুনিয়া সুরেশ এমন করিয়া তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন কথাটাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। তার পরে চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল, কিছুই বলিল না।

অচলা আসিয়া যখন নীরবে খাটিয়ার একধারে তাহার গায়ের কাছেই উপবেশন করিল, তখন কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তেমনি নিমীলিত-নেত্রে মৌন হইয়া রহিল, ভদ্রতা রক্ষা করিতে সামান্য একটা 'এসো' বলিয়াও ডাকিতে পারিল না। শিশুকাল হইতে চিরদিন অত্যধিক যত্ন-আদরে লালিত-পালিত হইয়া আবেগে ও প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছে, ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোনকালে হয় নাই। এই শিক্ষা জীবনে সে প্রথম পাইয়াছিল, কেবল সেইদিন, যেদিন তাহার মুখের হাসিকে পদাঘাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া মহিম ঘরে চলিয়া গেল। সেদিন একনিমেষে তাহার বুকের মধ্যে নীরবে যে কি বিপ্লব বহিয়া গেল, সে শুধু অন্তর্যামীই জানিলেন এবং আজও কেবল তিনিই দেখিলেন, ঐ শান্ত অচঞ্চল দেহটার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কতবড় ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। সেদিনও মহিমের আঘাতকে সে যেমন করিয়া সহ্য করিয়াছিল, আজও তেমনি করিয়াই সে তাহার উন্মত্ত আবেগের সহিত নিঃশব্দে লড়াই করিতে লাগিল—তাহার লেশমাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পাইতে দিল না।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, কিন্তু বাহকদের আহ্বানে রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেলে, সেই শব্দে সুরেশ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। কহিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ? অচলা মুখ তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, না।

সুরেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, চিঠি না পেয়েই এসেছ, আশ্চর্য! যাই হোক, এ ভালই হল যে একবার দেখা হল। বলিয়া একটা কথার জন্য তাহার আনত মুখের প্রতি একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নিজেই কহিল, আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হল—খুব সম্ভব যতদিন বাঁচবে, এর জের মিটবে না, কিন্তু সমস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশি ভালবাসতে তা আমিও বুঝিনি, বোধ হয় তুমিও কোনদিন বুঝতে পারোনি! না?

কিন্তু অচলা তেমনি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল, তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই।

যা আছে, সে এই দেহটার ধর্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে কোনমতে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো—হয়ত যা সর্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম, তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ভিক্ষে দিতে। কিন্তু আর তার সময় নেই; আমি অপেক্ষা করবার অবসর পেলাম না। বলিয়া সে পুনরায় কনুইয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিল এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে নিজের দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অচলার আনত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একজনের এই একাগ্র দৃষ্টি আর একজনের সন্নত দৃষ্টিকে যেন আকর্ষণ করিয়া তুলিল—কিন্তু পলকমাত্র। অচলা তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জার সহিত কহিল, এদেশ থেকে ত সবাই পালিয়েছে—এখানকার কাজ যদি তোমার শেষ হয়ে থাকে ত বাড়ি, কিংবা আরও কত দেশ আছে—তুমি চল, ডিহরীতে আর একদণ্ড টিকতে পাচ্চিনে।

সে আমার বেশি আর কে জানে? বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অনেক কষ্টে আজ সকালে দু'খানা চিঠি পাঠাতে পেরেছি। একখানা তোমাকে, আর একখানা মহিমকে। সে যদি না এর মধ্যে চলে গিয়ে থাকে ত নিশ্চয় আসবে, আমি জানি।

শুনিয়া অচলা ভয়ে, বিস্ময়ে চমকিয়া উঠল, কহিল, তাঁকে কেন?

সুরেশ তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেকদিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েছি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েছে! তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েছে। এত ধৈর্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই!

অচলার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সে অধোমুখে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। সুরেশ বলিল, আমার চিঠির মধ্যে প্রায় সব কথাই লেখা আছে—পড়লেই টের পাবে। সেদিন তোমার হাতে আমার সমস্ত সম্পত্তির পাকা উইলখানাই দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তার অনেক জিনিসই তুমি নিতে পারো, কিন্তু আমি বলি, নিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি বেঁচে থাকলেও যেমন গরীব-দুঃখীরাই সমস্ত পেতো, আমার মরণের পরেও যেন তারাই পায়। আমার কিছুর সঙ্গেই আর তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখ না অচলা—তুমি নিশ্চিন্ত হও, নির্বিঘ্ন হও—আমার সমস্ত সংস্রব থেকে তুমি নিজেকে যেন সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারো। চেষ্টা করলে পৃথিবীতে অনেক দুঃখই সহা যায়—আমার দেওয়া দুঃখেও যেন একদিন তুমি অনায়াসে সইতে পারো।

তাহার আচরণে ও কথা বলার ভঙ্গিতে অচলার মনের মধ্যে আসিয়া পর্যন্তই কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল, এই শেষের কথাটায় সে যথার্থই ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এ-সব কথা তুলচ কেন? উঠে বস না! যাতে আমরা এখনি বার হয়ে পড়তে পারি, তার উদ্যোগ করে দাও না!

তাহার আশঙ্কা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াও সুরেশ কোন উত্তর দিল না। যে বৃদ্ধা খুঁটি ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছিল, সে সজাগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এখন ঘরের মধ্যে যাবেন, না আলোটা বাইরে এনে দেবে—তাহারও কোন জবাব দিল না; মনে হইতে লাগিল, সহসা যেন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বিগ্ন অচলা তাহার পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিতে যাইতেছিল, সুরেশ চোখ মেলিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, এখনও তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয়নি অচলা, আমি মরতে বসেছি—আমার বাঁচবার বোধ করি আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা অস্ফুট, অব্যক্ত কণ্ঠস্বর অচলার গলা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তার পরেই সে মূর্তির মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আগে থেকেই আমি উইল করে রেখেছি বটে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে, আমি ইচ্ছে করে মরচি, সে অন্যায়, সে মিথ্যা—সে আমার মরার বেশি ব্যথা হবে। আমি সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি করিনি, কিন্তু কাজে লাগল না। যদি কখনো তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাদের তুমি এই কথাটা বলো যে, সংসারে আরও পাঁচজনের যেমন মৃত্যু হয়, তাঁরও মৃত্যু তেমনি হয়েছে,—মরণকে কেবল এড়াতে পারেন নি বলেই মরেছেন, নইলে মরবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। মরণের মধ্যে আমার কোন হাত, কোন বিশেষত্ব ছিল, এই অপরাধটা আমাকে যেন কেউ না দেয়।

অচলা কিছুই বলিল না। কথা কহিবার শক্তি যে তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল, এ কথা সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে তাহার ভয়ার্ত মুখের প্রতি চাহিয়া সুরেশ ধরিতে পারিল না। ক্ষণকাল আপনাকে সে সংবরণ করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি না এসে থাকতে পারিনে বলেই তোমাকে লুকিয়ে সেদিন ভোরবেলায় পালিয়ে এসেছিলুম। এসে দেখি, গ্রাম প্রায় শূন্য। এ বাড়িতে একটা চাকর মরেছে এবং তার কোন গতি না করেই বাড়িসুদ্ধ সবাই পালাতে উদ্যত হয়েছে। তাদের নিরস্ত করতে পারলুম না বটে; কিন্তু মড়াটার একটা উপায় হল। ফিরে এসে ভাবলুম, আমিও বাড়ি চলে যাই; কিন্তু দুপুরবেলা মামুদপুর থেকে একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে, তার মায়ের খুব অসুখ। তাকে অস্ত্র করতে গিয়েই নিজের এই বিপদ ঘটালুম। এমন অনেক ত করেছি, আমি সাবধানও কম নই, কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য এমনি যে, এক্কার চাকায় বুড়ো আঙুলের পিছনটা যে ঘষে গিয়েছিল, সেটা কেবল চোখে পড়ল হাতের রক্ত ধুতে গিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে যা করবার সমস্তই করলুম, বাড়ি যাবার উপায় থাকলে আমি চলেই যেতুম, কিছুতেই থাকতুম না, কিন্তু কোন উপায় করতে পারলুম না। কাল রাত্রে জ্বরবোধ হ'ল—এ যে কিসের জ্বর সে যখন বুঝতে আর বাকি রইল

না, তখন অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় একটা লোক দিয়ে তোমাদের দু'জনকে দু'খানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি।

অচলা অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এখন ত উপায় আছে, আমার ডুলিতে তোমাকে নিয়ে এখনি আমি বেরিয়ে পড়ব—আর একমিনিট থাকতে দেব না।

কিন্তু তুমি?

আমি হেঁটে যাবো—আমার কথা তুমি কিছুতে ভাবতে পাবে না।

হেঁটে যাবে? এতটা পথ?

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর বাধা দিয়ো না, বলিতে বলিতেই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ পলকমাত্র মৌন হইয়া রহিল, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, তাই চল। কিন্তু বোধ হয়, এর আর প্রয়োজন ছিল না।

অচলা বাহিরে আসিয়া দেখিল, গাছতলায় বসিয়া রঘুবীর নীরবে চানাভাজা চর্বণ করিতেছে। কহিল, রঘুবীর, বাবুর বড় অসুখ, তাঁকে এক্ষুণি নিয়ে যেতে হবে। ডুলিওয়ালাদের বল, তারা যত টাকা চায়, আমি তার চেয়ে বেশি দেব—কিন্তু আর একমিনিটও দেরি নয়।

প্রভুপত্নীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রঘুবীর চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কিন্তু তারা ত দু'জনকে বইতে পারবে না মাইজী!

না না, দু'জনকে নয়। আমি হেঁটে যাবো, কিন্তু আর একমিনিটও দেরি চলবে না রঘুবীর, তুমি শিগ্‌গির যাও—কোথায় তারা?

রঘুবীর কহিল, ভাড়ার টাকা নিয়ে তারা দোকানে গেছে খাবার কিনতে। এখুনি ডেকে আনচি মাইজী, বলিয়া সে অভুক্ত চানাভাজা গাত্রবস্ত্রের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে একপ্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া অচলা সুরেশের শিয়রে বসিল, এবং হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুনিয়ার মা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া অনতিদূরে মেঝের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার অপর্যাপ্ত ধূমে সমস্ত স্থানটা কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইটা সরাইতে গিয়া একটা ঔষধের শিশি অচলার চোখে পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, একি তোমার ওষুধ?

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই। কাল নিজেই তৈরি করেছিলুম, কিন্তু খাওয়া হয়নি। দাও—

কথাটা অচলাকে তীব্র আঘাত করিল, কিন্তু না খাওয়ার হেতু লইয়াও আর সে কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। ঔষধ দিয়া শিয়রে আসিয়া সে আবার তেমনি নীরবে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ হইতেই সুরেশ মৌন হইয়াই ছিল, কিন্তু সে নিঃশব্দে কত বড় যাতনা সহিতেছে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া অচলার বুক ফাটিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছে—রঘুবীরের দেখা নাই। মাঝে মাঝে সে পা টিপিয়া উঠিয়া গিয়া দরজায় মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া নাই। অথচ পাছে এই উৎকণ্ঠা তাহার কোনমতে সুরেশের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়েও সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল, খুঁটির কাছে মুনিয়ার মায়ের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল—এমন সময় ক্ষুধিত পথশ্রান্ত রঘুবীর ভগ্নদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে জানাইল বেহারারা ডুলি লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিল না।

অচলা সমস্ত ভুলিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহারা কখন গেল? কোন্ পথে গেল? এবং কিজন্য গেল? আমাদের যা-কিছু, সমস্ত দিলেও কি আর একখানা সংগ্রহ করা যায় না?

রঘুবীর অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই নিদারুণ বিপত্তি তাহারই অবিবেচনায় ঘটিয়াছে, ইহা সে জানিত; তাই সে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তবেই ফিরিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আরও একজন তাহারি মত নিঃশব্দে স্থির হইয়া শয্যার 'পরে পড়িয়া রহিল। এই চঞ্চলতার লেশমাত্রও যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। রঘুবীর চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে বলিল, ব্যস্ত হয়ে কি হবে অচলা, তাদের পেলেও কোনও লাভ হতো না। এই ভাল—আমার এই ভাল।

আর অচলা কথা কহিল না, কেবল সেই অনন্ত পথযাত্রীর তপ্ত ললাটে ডান হাতখানি রাখিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চারিদিকে জনহীন পুরী মৃত্যুর মত নির্বাক্ হইয়া আছে। বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে—সেইদিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ইহার কি প্রয়োজন ছিল! ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘেরিয়া এতবড় একটা কদর্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল? দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা, সকল স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে? তার পরে সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগ যুগ পড়িয়া রহিবে? এখানে কি চিতার দাহচিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে?

কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি কেবল এতবড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

কিন্তু সহসা চিন্তাটাকে সে যেন সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। কে যেন দুই হাত দিয়া চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিতে বসিয়াছিল। সেই সময় সুরেশও জল চাহিল। হেঁট হইয়া মুখে তাহার জল দিয়া আবার অচলা স্থির হইয়া বসিল। তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চোখ হইতে নিদ্রার আভাসটুকু পর্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দুটি শুষ্ক চোখ মেলিয়া আবার সে নীরব আকাশের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বহুদিন পূর্বে অনেক যত্ন করিয়া যে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল—আজ তাহারই শেষ সর্বনাশ যেন তাহারই মনের মধ্যে ছায়াবাজির ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতেছে—কত শত-সহস্র চিতা জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্য একেবারে যেন আচ্ছন্ন একাকার হইয়া গিয়াছে!

কিছুক্ষণের জন্য সুরেশ বোধ হয় তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সাড়া ছিল না। কিন্তু এমন করিয়া যে কতক্ষণ গেল, কি করিয়া বাহিরে যে সময় কাটিতে লাগিল, কি করিয়া যে রাত্রি প্রভাতের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেদিকেও অচলার চৈতন্য ছিল না। তাহার নিমীলিত চক্ষের কোণ বাহিয়া জল পড়িতেছিল, স্রস্ত হাতদুটি সুরেশের বালিশের উপর পড়িয়া, সে একান্ত-মনে বলিতেছিল, হে ঈশ্বর! আমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথার পরিবর্তে একে তুমি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লও; আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই—এত বড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি কত যে সহিয়াছি, সে ত তুমি জান—আর আমাকে বাঁচিতে দিয়ো না প্রভো! আমাকেও তোমার কাছে টানিয়া লও!

কথাগুলি সে যে কতভাবে কতরকমে মনে মনে আবৃত্তি করিল, তাহার অবধি নাই—অশ্রুজলও যে কত ঝরিয়া পড়িল তাহারও সীমা নাই।

মাইজী।

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, অচলা চমকিয়া দেখিল, রঘুবীর কাহার যেন প্রবেশের অপেক্ষায় সদর-দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি রঘুবীর? বলিয়াই যাহার সহিত তাহার চোখে চোখে দেখা হইয়া গেল, সে মহিম। একবার সে কাঁপিয়া উঠিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল।

দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য মহিমের পা উঠিল না, এখানে এমন করিয়া যে আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখন সুরেশ কেমন আছে?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া বোধ হয় ইহাই জানাইতে চাহিল, সে ইহার কিছুই জানে না।

মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া মহিম সুরেশের ললাট স্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সেই জ্যোতিহীন রক্তনেত্রের প্রতি চাহিয়া মহিমের গলা দিয়া সহসা স্বর ফুটিল না। তার পরে কহিল, কেমন আছ সুরেশ?

ভালো না—চললুম। তুমি আসবে আমি জানি—আমার সুমুখে এসে বস।

মহিম উঠিয়া গিয়া শয্যার একাংশে তাহার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, ডিহরীতে ডাক্তার আছে, আমার এক্কায় কোনমতে—

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না টানাটানি করো না, মজুরী পোষাবে না। আমাকে quietly যেতে দাও।

কিন্তু এখনো ত—

হ্যাঁ, এখনো হুঁশ আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছে। আমার জীবনটা গরীব-দুঃখীর কাজে লাগাতে পারলুম না, কিন্তু সম্পত্তিটা যেন তাদের কাজে লাগে মহিম। তাই কষ্ট দিয়ে এতদূর তোমাকে টানে এনেছি, নইলে মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মহিম নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, ও-সব আমি বিশ্বাসও করিনে, ভালও বাসিনে। একটা দিনের ক্ষমার প্রতি আমার লোভও নেই। ভাল কথা, একটা উইল আছে। অচলাকে আমি কিছুই দিইনি—আর তাকে অপমান করতে আমার হাত উঠল না। তবে দরকার বোঝ ত সামান্য কিছু দিয়ো।

মহিম ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আর আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছো সুরেশ?

সুরেশ বলিল, ঠিক এই জন্যই যে, তোমাকে জড়ানো যায় না। যার লোভ নাই, যার ন্যায়ান্যায়ের বিচার—হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, কিন্তু সারারাত তুমি বসে আছ অচলা—যাও, হাতমুখ ধোও গে। মুনিয়ার মা সমস্ত দেখিয়ে দেবে—যাও—

সে উঠিয়া গেলে কহিল, কেবল একটা জিনিসের জন্য আমার ভারী দুঃখ হয়। অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক! এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে! পিসীমাকে একটু দেখো—শোকটা তাঁর ভারী লাগবে।

বৃদ্ধ মুনিয়ার মা ঔষধের শিশি লইয়া কাছে দাঁড়াইতেই সে উত্ত্যক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, না না, আর ঔষধ নয়। একটু জল দে। একটা নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলুম মহিম, আমার ড্রয়ারে আছে—পারো ত পড়ো।

মহিম তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না, অধোমুখে শুনিতেছিল—এইবার চোখ তুলিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সুরেশ থামাইয়া দিয়া বলিল, আর না মহিম, একটু ঘুমুই। খাবার-দাবার সমস্ত যোগাড় আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভাল লাগবে না। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

মহিম ক্ষণকাল চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার শেষ অনুরোধ একটা রাখবে সুরেশ ?

কি?

তুমি ভগবানকে কোনদিন ভাবোনি, তাঁর কথা—ও আমার ভাল লাগে না। বলিয়া সুরেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মহিম প্রাণপণে একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রামবাবু বাড়ি ছিলেন না। পরদিন বক্সার হইতে ফিরিয়া মহিমের চিঠি পড়িয়া বাহির হইতে মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না—সমস্ত পথ ঘোড়াটাকে নির্মম ছুটাইয়া আধমরা করিয়া তুলিয়া যখন মাঝুলিতে পৌঁছিলেন তখন বেলা অবসান হইতেছে। পুলিশের দারোগা ভাবিয়া দোকানী স্বয়ং পথ দেখাইয়া নন্দ পাঁড়ের নিমতলায় আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এক্কা হইতে অবতরণকালে সসম্মানে ঘোড়ার লাগাম ধরিল। ইহারই কাছে খবর পাইয়া জানিলেন, অচলাও আসিয়াছে। সদর-দরজা খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে বাকি রহিল না। ঘণ্টা-দুই হইল সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে। খাটিয়ার উপর তাহার মৃতদেহ আপাদমস্তক চাপা দেওয়া এবং অনতিদূরে পায়ের কাছে অচলা চুপ করিয়া বসিয়া।

অকস্মাৎ এই দৃশ্য বৃদ্ধ সহিতে পারিলেন না—মা গো! বলিয়া উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র, তার পরে তেমনি অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই আর্তকণ্ঠ যেন শুধু তাহার কানে গেল, কিন্তু ভিতরে পৌঁছিল না।

মহিম বাটীর মধ্যে কাঠের সন্ধান করিতেছিল, ক্রন্দনের শব্দে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, সুরেশ এই কতক্ষণ মারা গেল রামবাবু! আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, নইলে একলা বড় অসুবিধে হতো।

রামবাবু নীরবে চোখ মুছিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কি করিয়া ওই মেয়েটার চোখের উপর ঐ ভীষণ নিদারুণ কার্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার কূলকিনারা ভাবিয়া পাইলেন না।

মহিম কহিল, নদী দূরে নয়, রঘুবীর কিছু কিছু কাঠ বয়ে নিয়ে গেছে, আরও কিছু কাঠ পাওয়া গেছে—সেইটে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তিনজনেই ওকে নিয়ে যেতে পারবো। নইলে গ্রামে আর লোক নেই, থাকলেও বোধ হয় কেউ বাঙালীর মড়া ছোঁবে না।

রামবাবু তাহা জানিতেন। অচলার অগোচরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা দু'জন আর কে?

মহিম বলিল, রঘুবীরও হয়ত সাহায্য করতে পারে।

শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, না না, সে কিছুতেই হলে চলবে না। ব্রাহ্মণের শব আর কাকেও আমি ছুঁতে দিতে পারব না। নদী যখন দূরে নয়, তখন আমাদের দু'জনকেই যেমন করে হোক নিয়ে যেতে হবে।

বেশ তাই, বলিয়া মহিম পুনরায় ভিতরে গিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। রামবাবু সেই বারান্দায় একপ্রান্তে মুখ ফিরাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার বয়স হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছেন, অনেক গভীর শোকের মধ্যে দিয়াও তাঁহাকে ধীরে ধীরে পথ চলিতে হইয়াছে। সুদুঃসহ দুঃখের সে করুণ সুর একে একে তাঁহার হৃদয়-বীণায় বাঁধা হইয় গিয়াছে, আজিকার এই ব্যাপারটা সেই তারে ঘা দিয়া যেন কেবলি বেসুরে বাজিতে লাগিল। একদিন এই সুরমাই জ্যাঠামশাই বলিয়া তাঁহার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—সে ছবি তিনি ভুলেন নাই। আজও তাঁহার পিতৃস্নেহ যেন সেই বস্তুটার লোভেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবেন তিনি জানেন না, তাহাকে প্রবোধ দিবার মত সংসারে কোথায় কি আছে তাহাও তিনি অবগত নন; তবুও তাঁহার শোকাতুর মন যেন কেবলি চাহিতে লাগিল, একবার মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, ভয় কি মা! আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু সে সুর বাজিল কৈ? তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটাইতে কেহ ত একপদ অগ্রসর হইয়া আসিল না! সুরমা যে তেমনি নীরবে, তেমনি দূরতম অনাত্মীয়ের ব্যবধান দিয়া আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিল!

দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, ইহাদের অনেক দুর্জ্ঞেয় বেদনা, নির্বাক্ মর্মপীড়ার পাশ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, প্রছন্ন রহস্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে তাঁহাকে খোঁচা দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন আপনাকে আহত হইতে দেন নাই—সমস্ত সংশয় স্নেহের আবরণে চাপা দিয়া, বাহিরের আকাশ নির্মল মেঘমুক্ত রাখিয়াছেন; কিন্তু আজ সদ্যবিধবার ওই একান্ত অপরিচিত নিষ্ঠুর ধৈর্য তাঁহার এতদিনের আড়াল-করা স্নেহের গা চিরিয়া কলুষের বাষ্পে হৃদয় যেন ভরিয়া দিতে লাগিল।

সূর্য অস্ত গেল। মহিম ওদিকের কাজ একপ্রকার শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, রামবাবু, এইবার ত ওকে নিয়ে যেতে হয়। অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, আলোটা জ্বেলে দিয়েছি, তুমি মুনিয়ার মার কাছে বসে থাকো, আমাদের ফিরতে বোধ হয় খুব বিলম্ব হবে না।

অচলা কোন কথাই বলিল ন। রামবাবু আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মাথা নাড়িলেন। অচলার আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধ স্বর পরিষ্কার করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, মা, একথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর শেষ কর্তব্য ত তোমাকে করতে হবে। তোমাকেই ত মুখাগ্নি—বলিতে বলিতে তিনি হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলার শুষ্ক মুখ, ততোধিক শুষ্ক চোখ-দুটি বৃদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্তকাল স্থির হইয়া রহিল, তার পরে শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, মুখাগ্নির আবশ্যক হয় ত আমি করতে পারি। হিন্দুধর্মে এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে, তা আর আমি ব্যর্থ করতে চাইনে। আমি তাঁর স্ত্রী নই।

রামবাবু বজ্রাহতের ন্যায় পলকহীন চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, তুমি সুরেশের স্ত্রী নও?

অচলা তেমনি অবিচলিতস্বরে বলিল, না, উনি আমার স্বামী নন।

চক্ষের নিমিষে রামবাবুর সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের সে মূর্ছা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার বিদ্যুদ্বেগে বার বার তাঁহার মনের মধ্যে আবর্তিত হইয়া সংশয়ের ছায়ামাত্রও কোথাও অবশিষ্ট রহিল না। এ কে, কার মেয়ে, কি জাত—হয়ত-বা বেশ্যা—ইহাকে মা বলিয়াছেন, ইহার ছোঁয়া খাইয়াছেন—ইহার হাতের অন্ন তাঁহার ঠাকুরকে পর্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। কথাগুলা মনে করিয়া ঘৃণায় যেন সর্বাঙ্গ তাঁহার ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল এবং যে স্নেহ এতদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধায় মাধুর্যে করুণায় অভিষিক্ত রাখিয়াছিল, মরুভূমির জলকণার ন্যায় সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আভাস পর্যন্ত রহিল না।

কিন্তু কেবল তিনিই নন, মহিমও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে চকিত হইয়া কহিল, সে যখন হবার জো নেই রামবাবু, চলুন, আমরা নিয়ে যাই।

চলুন, বলিয়া বৃদ্ধ স্বপ্নচালিতের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিজের দুর্ঘটনার কাছে আর সমস্ত দুর্ঘটনাই একেবারে ছায়ার মত ম্লান হইয়া গিয়াছে—তাঁহার দুই কান জুড়িয়া কেবল বাজিতেছে— জাতি গেল, ধর্ম গেল, এই মানব—জন্মটাই যেন ব্যর্থ বৃথা হইয়া গেল।

সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেমন তেমন করিয়া সমাধা করিতে অধিক সময় লাগিল না। সমস্তক্ষণ রামবাবু একটা কথাও কহিলেন না এবং ফিরিয়া আসিয়া সোজা এক্কা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি যাচ্চেন?

রামবাবু কহিলেন, হাঁ। আমাকে ভোরের ট্রেনে কাশী যেতে হবে, এখন না বেরোলে সময়ে পৌঁছুতে পারব না।

তাঁহার মনের ভাব মহিমের অবিদিত ছিল না এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যে তিনি কাশী ছুটিতেছেন, ইহাও সে বুঝিয়াছিল; তাই অতিশয় সঙ্কোচের সহিত কহিল, আমি বিদেশী লোক, এদিকের কিছুই জানিনে। দয়া করে যদি এঁর কোন যাবার ব্যবস্থা—, কথাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলাকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে বৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন— দয়া! আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু?

মহিম এ প্রশ্নের প্রতিবাদ করিল না। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, বোধ হয় দু— তিন দিন ওঁর খাওয়া হয়নি। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে ভয়ানক অবস্থায় ফেলে যাওয়া—

তাহার এ কথাও শেষ করিবার সময় মিলিল না। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্মগত সংস্কার আঘাত খাইয়া প্রতিহিংসায় ক্রুর হইয়া উঠিয়াছিল; তাই তীব্র শ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ— আপনিও যে ব্রাহ্ম, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু মশাই, যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন, আমার সর্বনাশের পরিমাণ বুঝলে, এই কুলটার সম্বন্ধে দয়ামায়া মুখেও আনতেন না। বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, যাক, ব্রহ্মজ্ঞানে আর কাজ নেই— প্রাণ বাঁচাতে চান ত উঠে বসুন, জায়গা হবে।

মহিম নিঃশব্দে নমস্কার করিল। সর্বনাশের পরিমাণ লইয়াও দ্বন্দ্ব করিল না, প্রাণ বাঁচাইবার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিল না। তিনি চলিয়া গেলে শুধু বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল মাত্র।

সর্বনাশের পরিমাণ! তাই বটে!

ভিতরে বসিয়া গাড়ির শব্দে অচলাও ইহা অনুভব করিল। কেন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, একটা কথা পর্যন্ত বলিয়া গেলেন না, তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এতক্ষণ সুরেশের অনিবার্য মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া একটা অন্তরাল রচিয়াছিল, তাহাও নাই; এইবার মহিম অত্যন্ত সম্মুখে, অত্যন্ত

কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আর তাহার মন কিছুতেই সাড়া দিতে চাহিল না। নিজের জন্য লজ্জা বোধ করিতেও সে যেন ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

মহিম আসিয়া দেখিল, সে কেরোসিনের আলোটা সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, এখন তুমি কি করবে?

আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল; শেষে বলিল, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব।

এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শঙ্কিত হইল। এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই — যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধুধু করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই— একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।

উপদ্রুত, অপমানিত, ক্ষতবিক্ষত নারী— হৃদয়ের এই চরম বৈরাগ্যকে সে চিনিতে পারিল না। একের অভাব অপরের হৃদয়কে এমন নিঃস্ব করিয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার সমস্ত মন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু নিজের দুঃখ দিয়া জগতের দুঃখের ভার সে কোনদিন বাড়াইতে চাহে না, তাই আপনাকে আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। পাছে এই বক্ষভরা তিক্ততা তাহার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল; তার পরে সহজ গলায় বলিল, আমি কেন তোমাকে হুকুম দেব অচলা, আর তুমিই বা তা শুনতে বাধ্য হবে কিসের জন্য?

কিন্তু তুমি ছাড়া আর যে কেউ নাই, কেউ ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না! বলিয়া অচলা তেমনি একইভাবেই মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহিম কহিল, এই কি আমার কাছ তুমি প্রত্যাশা কর?

বোধ হয় প্রশ্নটা অচলার কানেই গেল না। সে নিজের কথার রেশ ধরিয়া যেন আপনাকে আপনিই বলিতে লাগিল, তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্চি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে— আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!

মহিম কোন জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু এই নৈরাশ্যের কণ্ঠস্বর, এই নিরভিমান, নিঃসঙ্কোচ, নির্লজ্জ উক্তি আবার তাহার চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। এই সুর কানের মধ্যে লইয়া সে বাহিরে প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাই ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! আপনার ভারে সে আপনি ভারাক্রান্ত, আবার তাহারি মাথায় সুরেশ যে তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির গুরুভার চাপাইয়া এইমাত্র কোথায় সরিয়া গেল, এ বোঝাই বা সে কোথায় গিয়া কি করিয়া নামাইবে?

রঘুবীর অনেক পরিশ্রমে খবর লইয়া আসিল যে, ডিহরীর পথে ক্রোশ—তিনেক দূরে কাল সকালেই একটা হাট বসিবে, চেষ্টা করিলে সেখানে গো—শকট পাওয়া যাইতে পারে।

মহিমকে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে সঙ্কোচের সহিত জানাইল, নিজে সে এখনি যাইতে পারে, কিন্তু এ গ্রামে বোধ হয় কেহ ভয়ে আসিতে চাহিবে না। কিন্তু মাইজী যদি এই পথটুকু—অচলা শুনিয়া বলিল, চল; এবং তৎক্ষণাৎ উঠিতে গিয়া সে পা টলিয়া পড়িতেছিল, মহিম হাত বাড়াইতেই সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে স্থির করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লজ্জায় বিতৃষ্ণায় মহিমের সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, নিজের হাতটা সে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল আজ না হয় থাক।

কেন? এই যে তুমি বললে, এখানে থাকা উচিত নয়। আর ডিহরী থেকে গাড়ি আনিয়ে যেতেও কালকের দিন কেটে যাবে?

কিন্তু তুমি যে বড় দুর্বল—

অচলা হাত ছাড়ে নাই, সে হাত ছাড়িল না। শুধু মাথা নাড়িয়া কহিল, না চল। আর আমি দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল যেতে পারব।

চল, বলিয়া মহিম রঘুবীরকে অগ্রবর্তী করিয়া যাত্রা করিল। সে মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া আপনাকে আপনি সহস্রবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহার শেষ হইবে কোথায়? এ যাত্রা থামিবে কখন এবং কি করিয়া?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ডিহরীর বাটীতে পৌঁছিয়া অচলা সেই মোটা খামখানি বাহির করিয়া বলিল, এই তার উইল। মহিম হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার মধ্যে সুরেশের চিঠি আছে। পত্রে কোন্ অচিন্তনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, কোন্ দুর্গম রহস্যের পথের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তদ্দণ্ডেই জানিবার জন্য মনের মধ্যে তাহার ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড ইচ্ছাকে সে শান্তমুখে দমন করিয়া কাগজখানি পকেটে রাখিয়া দিল।

অচলা কহিল, তুমি কি আজই ডিহরী থেকে চলে যাবে?

হাঁ, এখানে থাকবার আর আমার সুবিধা হবে না।

আমাকে কি চিরকাল এখানেই থাকতে হবে?

মহিম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও?

অচলা কহিল, কাল থেকেই আমি তাই কেবল ভাবচি। শুনেচি, বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু,— বলিতে বলিতেই তাহার বড় বড় চোখ—দুটি জলে টলটল করিতে লাগিল। এই প্রথম তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

মহিমের বুকে করুণার তীর বিঁধিল, কিন্তু সে কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমিও জানিনে, তবে খোঁজ নিতে পারি।

কখনো তোমাকে চিঠি লিখলে কি তুমি জবাব দেবে না?

প্রয়োজন থাকলে দিতে পারি। কিন্তু আমার গুছিয়ে নিয়ে বার হতে দেরি হবে—আমি চললুম।

অচলা তাহার শেষ দুঃখকে আজ মনে মনে স্বামীর পায়ে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়া সেইখানেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি বাহির হইয়া গেলে চৌকাঠ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথে চলিতে চলিতে মহিম ভাবিতেছিল, রামবাবুর বাটীতে আর একমুহূর্তও থাকা চলে না, অথচ শহরের মধ্যে আর কোথাও একটা দিনের জন্য আশ্রয় লওয়া অসম্ভব। যেমন করিয়াই হোক, এ দেশ হইতে আজ তাহাকে বাহির হইতে হইবে, তা ছাড়া নিজের জন্য তাহার এমন একটা নিরালা জায়গার প্রয়োজন, যেখানে দু'দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া শুধু কেবল খামখানার ভিতর কি আছে, তাই নয়, আপনাকে আপনি চোখ মেলিয়া দেখিবার একটুখানি অবসর মিলিবে।

অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাবিহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাহার গৃহ যখন বাহির এবং ভিতর হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে ঐখানে দাঁড়াইয়াই ভস্মসাৎ হইল—এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পাইল না। কিন্তু আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্য পড়ে নাই—সামঞ্জস্য করিবার জন্য পড়িয়াছে। আজ একবার তাহার জমা-খরচের খাতাখানা না মিলাইয়া দেখিলে আর চলিবে না। কোথাও একটু নির্জন স্থান আজ তাহার চাই-ই চাই।

বাটীতে পৌঁছিয়া নিজের জিনিসপত্রগুলা সে তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইল, পাঁচটার ট্রেনের আর ঘণ্টা-খানেক মাত্র সময় আছে। রামবাবুর কাশী হইতে ফিরিতে সম্ভবতঃ বিলম্ব হইবে, কারণ যথার্থই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়াছেন এবং তাহার পূর্বে জলস্পর্শ করিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লওয়া চলে না। এই কর্তব্যটা সংক্ষিপ্ত পত্রে শেষ করিয়া

দিতে সে কাগজ-কলম লইয়া বসিল। দুই-এক ছত্র লিখিয়াই তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ মুখের উগ্র উত্তপ্ত বিদ্রূপগুলাই তাহার মনে হইতে লাগিল; এবং ইহারই সহিত আর একজনের অশ্রুজলে অস্পষ্ট অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের কাতর প্রার্থনাও তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তন্দ্রার মধ্যে বেদনার ন্যায় এতক্ষণ পর্যন্ত ইহা তাহার চৈতন্যকে সম্পূর্ণ জাগ্রত রাখিয়াও রাখে নাই, ঘুমাইয়া পড়িতে দেয় নাই, কিন্তু রামবাবুর সেই কথাগুলা যেন ধাক্কা মারিয়া চমক ভাঙ্গিয়া দিল।

এই প্রাচীন ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় বেশিদিনের নয়, কিন্তু ইঁহার দয়া, ইঁহার দাক্ষিণ্য, ইঁহার ভদ্রতা, ইঁহার অকপট ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী সে শুনিয়াছে—এইগুলি এখন অকস্মাৎ তাহার রুদ্ধ চক্ষুতে যেন একটা সম্পূর্ণ অপরিদৃষ্ট দিক নির্দেশ করিয়া দিল।

এই বৃদ্ধ অচলাকে তাঁহার সুরমা—মা বলিয়া, কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মেয়েটি ভিন্ন তিনি কখনো কোন পরগোত্রীয়ার হাতের অন্ন স্পর্শ করেন নাই, ইহাও মহিমের কাছে স্নেহচ্ছলে গল্প করিয়াছেন, সুতরাং সর্বনাশটা যে তাঁহার কোন্ দিক দিয়া পৌঁছিয়াছিল, ইহা অনুমান করা মহিমের কঠিন নয়; কিন্তু এখন এই কথাটাই সে মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিবে, কিন্তু এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় একনিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম, এবং মানবজীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের

ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে, সে কোন্ সত্যবস্তু বহন করিতেছে? যাহা ধর্ম সে ত বর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা!

তাহার সহসা মনে হইল, তবে কি তাহার নিজের পলায়নটাও—কিন্তু চিন্তাটাকেও সে তেমনি সহসা দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলমটাকে তুলিয়া লইল এবং ক্ষুদ্র পত্র অবিলম্বে শেষ করিয়া স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ট্রেন আসিলে যে কামরার দ্বার খুলিয়া মহিম ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল, সেই পথেই একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন, এ কি, মহিম যে?

মৃণাল পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সেজদা, যাচ্ছো কোথায়? বলিয়া উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিল মহিম গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে।

মহিম কহিল, আমি কলকাতায় যাচ্চি; সুরেশবাবুর বাড়ি বললেই গাড়োয়ান ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে অচলা আছে।

কেদারবাবু আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিম বলিল, সুরেশের মৃত্যু হয়েছে। অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।

মৃণাল তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুধু কহিল, পাবে বৈ কি, সেজদা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ খবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।

মহিম কথা কহিল না। বোধ হয় নিজেকে সে এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রমণীর কাছ হইতে গোপন করিবার জন্যেই মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ির বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মৃণাল বৃদ্ধের স্খলিত ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চল বাবা, আমরা যাই।

চন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের পিতৃ-শ্রাদ্ধের ঠিক পূর্বের দিন কি একটা কথা লইয়া তাহার খুড়া মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার মনান্তর হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, পরদিন মণিশঙ্কর উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্রজের পারলৌকিক সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন, কিন্তু একবিন্দু আহার্য স্পর্শ করিলেন না, কিংবা নিজের বাটীর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে চন্দ্রনাথ করজোড়ে কহিল, কাকা, দোষ করি, অপরাধ করি, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার ছেলের মত—এবার মার্জনা করুন।

পিতৃতুল্য মণিশঙ্কর উত্তরে বলিলেন, বাবা, তোমরা কলকাতায় থেকে বি. এ., এম. এ. পাশ করে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়েছো, আমরা কিন্তু সেকালের মূর্খ, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ খাবে না। এই দেখ না কেন, শাস্ত্রকারেরাই বলেছেন, যেমন, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

শাস্ত্রোক্ত বচনটির সহিত আধুনিক পণ্ডিত ও সেকেলে মূর্খের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও মণিশঙ্কর যে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, খুড়ার সহিত আর সে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। আর পিতার জীবদ্দশাতেও দুই সহোদরের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল না। কিন্তু আহার-ব্যবহারটা ছিল। এখন সেইটা বন্ধ হইল। চন্দ্রনাথের পিতা যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাটীতে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, শুধু এক অপুত্রক মাতুল এবং দ্বিতীয় পক্ষের মাতুলানী।

সমস্ত বাড়িটা যখন বড় ফাঁকা ঠেকিল, চন্দ্রনাথ তখন বাটীর গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিল, সরকারমশায়, আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাব, আপনি বিষয়-

সম্পত্তি যেমন দেখছিলেন, তেমনি দেখবেন। আমার ফিরে আসতে বোধ করি বিলম্ব হবে।

মাতুল ব্রজকিশোর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই; তোমার মন খারাপ হয়ে আছে, এ সময় বাটীতে থাকাই উচিত।

চন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না। বিষয়-সম্পত্তির সমুদয় ভার সরকার মহাশয়ের উপর দিয়া, এবং বসত-বাটীর ভার ব্রজকিশোরের উপর দিয়া অতি সামান্যভাবেই সে বিদেশ-যাত্রা করিল। যাইবার সময় একজন ভৃত্যকেও সঙ্গে লইল না।

ব্রজকিশোরকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার স্ত্রী হরকালী বলিল, একটা কাজ করলে না?

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ?

এই যে বিদেশে গেল, একটা কিছু লিখে নিলে না কেন? মানুষ কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। যদি বিদেশে ভালমন্দ হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তখন তুমি দাঁড়াবে কোথায়?

ব্রজকিশোর কানে আঙুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি, ছি, এমন কথা মুখে এনো না।

হরকালী রাগ করিল। কহিল, তুমি বোকা, তাই মুখে আনতে হয়েছে, যদি সেয়ানা হ’তে, আমাকে মুখে আনতে হ’ত না।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক, তাহা ব্রজকিশোর স্ত্রীর কৃপায় দুই-চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর চন্দ্রনাথ নানা স্থানে একা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। তাহার পর গয়ায় আসিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাংবাৎসরিক পিণ্ডদান করিল, কিন্তু তাহার বাটী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না—মনে করিল, কিছুদিন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া যাহা হয় করিবে। কাশীতে মুখোপাধ্যায় বংশের পাণ্ডা হরিদয়াল ঘোষাল। চন্দ্রনাথ

একদিন দ্বিপ্রহরে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী চন্দ্রনাথের অপরিচিত নহে, ইতিপূর্বে কয়েকবার সে পিতার সহিত এখানে আসিয়াছিল। হরিদয়ালও তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন। অকস্মাৎ তাহার এরূপ আগমনে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। উপরের একটা ঘর চন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে, চন্দ্রনাথের যতদিন ইচ্ছা তিনি এইখানে থাকিবেন।

এ কক্ষের একটা জানালা দিয়া ভিতরের রন্ধনশালার কিয়দংশ দেখা যাইত। চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত অনেক সময় এইদিকে চাহিয়া থাকিত। রন্ধন-সামগ্রীর উপরেই যে আগ্রহ তাহা নহে, তবে রন্ধনকারিণীকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত।

বিধবা সুন্দরী। কিন্তু মুখখানি যেন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া গেছে! যৌবন আছে কি গিয়াছে, সেও যেন আর চোখে পড়িতে চাহে না। তিনি আপন মনে আপনার কাজ করিয়া যান, নিকটে কেবল একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিতে থাকে। চন্দ্রনাথ অতৃপ্তনয়নে তাহাই দেখে।

কিছুদিন তিনি চন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হইলেন না। আহার্য সামগ্রী ধরিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃ বাহির হইতে লাগিলেন। একে ত চন্দ্রনাথ বয়সে ছোট, তাহাতে এক স্থানে অধিক দিন ধরিয়া থাকিলে একটা আত্মীয়-ভাব আসিয়া পড়ে। তখন তিনি চন্দ্রনাথকে খাওয়াইতে বসিতেন—জননীর মত কাছে বসিয়া যত্নপূর্বক আহার করাইতেন।

আপনার জননীর কথা চন্দ্রনাথের স্মরণ হয় না—চিরদিন মাতৃহীন চন্দ্রনাথ পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিল। পিতা সে স্থান কতক পূর্ণ রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ কোমল স্নেহ তথায় ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রনাথের বুকের যে অংশটা খালি পড়িয়াছিল, শুধু তাহাই পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, অভিনব মাতৃস্নেহ-রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিজের বলিতে কেহ ত নাই বলিয়াই জানি, কিন্তু ইনি কে?

হরিদয়াল কহিলেন, ইনি বামুন-ঠাকরুন!

কোন আত্মীয়?

না।

তবে এদের কোথায় পেলেন?

হরিদয়াল কহিলেন, সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলতে হলে, ইনি প্রায় তিন বৎসর হ'ল স্বামী এবং ওই মেয়েটিকে নিয়ে তীর্থ করতে আসেন। কাশীতে স্বামীর মৃত্যু হয়। দেশেও এমন কোন আত্মীয় নেই যে ফিরে যান। তার পর ত দেখছ।

আপনি পেলেন কিরূপে?

মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে মেয়েটি ভিক্ষে করছিল।

চন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি জানেন কি?

ঠিক জানি না। নবদ্বীপের নিকট কোন একটা গ্রামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন-দুই পরে আহারে বসিয়া চন্দ্রনাথ বামুন-ঠাকরুনের মুখের পানে চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোন্ শ্রেণী?

বামুন-ঠাকরুনের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। এ প্রশ্নের হেতু তিনি বুঝিলেন। কিন্তু যেন শুনিতে পান নাই, এই ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাই দুধ আনি গে।

দুধের জন্য অত তাড়াতাড়ি ছিল না। ভাবিবার জন্য তিনি একেবারে রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কন্যা সরযূবালা হাতা করিয়া দুধ ঢালিতেছিল, জননীর বিবর্ণ-মুখ লক্ষ্য করিল না। জননী কন্যার মুখপানে একবার চাহিলেন, দুধের বাটি হাতে লইয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, হে দীন-দুঃখীর প্রতিপালক, হে অন্তর্যামী, তুমি আমাকে মার্জনা ক'রো। তাহার পর দুধের বাটি আনিয়া নিকটে রাখিয়া উপবেশন করিলে, চন্দ্রনাথ পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল।

একটি-একটি করিয়া সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি যান না কেন? সেখানে কি কেউ নেই?

খেতে দেয় এমন কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ মুখ নিচু করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, আপনার একটি কন্যা আছে, তার বিবাহ কিরূপে দেবেন?

বামুন-ঠাকরুন দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বিশ্বেশ্বর জানেন।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, ভাল ক'রে আপনার মেয়েটিকে কখন দেখিনি,—হরিদয়াল বলেন খুব শান্ত-শিষ্ট। দেখতে সুশ্রী কি?

বামুন-ঠাকরুন ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, আমি মা, মায়ের চক্ষুকে ত বিশ্বাস নেই বাবা; তবে সরযূ বোধ হয় কুৎসিত নয়। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, কাশীতে কত লোক আসে যায়, কিন্তু এত রূপ ত কারও দেখিনি।

ইহার তিন-চারি দিন পরে একদিন প্রভাতে চন্দ্রনাথ বেশ করিয়া সরযূকে দেখিয়া লইল। মনে হইল, এত রূপ আর জগতে নাই। রান্নাঘরে বসিয়া সরযূ তরকারি কুটিতেছিল। সেখানে অপর কেহ ছিল না। জননী গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, এবং হরিদয়াল যথানিয়মে যাত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চমকিত হইল। জড়সড় হইয়া বলিল, আজ্ঞে।

তুমি রাঁধতে পারো?

সরযূ মাথা নাড়িয়া কহিল, পারি।

কি কি রাঁধতে শিখেছ?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল, কেননা, পরিচয় দিতে হইলে অনেক কথা কহিতে হয়।

চন্দ্রনাথ মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, তাই অন্য প্রশ্ন করিল, তোমার মা ও তুমি দুই জনেই এখানে কাজ কর?

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, করি।

তুমি কত মাইনে পাও?

মা পান, আমি পাই নে। আমি শুধু খেতে পাই।

খেতে পেলেই তুমি কাজ কর?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, মনে কর, আমি যদি খেতে দিই, তা হ'লে আমারও কাজ কর?

সরযূ ধীরে ধীরে বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করব।

তাই ক'রো।

সেইদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়াল ঠাকুরকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে সরকার মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিল—

আমি কাশীতে আছি। এখানে এই মাসের মধ্যেই বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। মাতুল মহাশয়কে এ কথা বলিবেন এবং আপনি কিছু অর্থ, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্র আসিবেন।

সেই মাসেই চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিল।

তাহার পর বাড়ি যাইবার সময় আসিল। সরযূ কাঁদিয়া বলিল, মার কি হবে?

আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কথাটা বামুন-ঠাকরুণের কানে গেল। তিনি কন্যা সরযূকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, সরযূ, সেখানে গিয়ে তুই আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করিস, কিন্তু আমার নাম কখনো মুখে আনিস না। যত দিন বাঁচবো কাশী ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে যদি কখনো তোমাদের এ অঞ্চলে আসা হয়, তা হ'লে আবার দেখা হতে পারে।

সরযূ কাঁদিতে লাগিল।

জননী তাহার মুখে অঞ্চল দিয়া কান্না নিবারণ করিলেন, এবং গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বাছা, সব জেনেশুনে কি কাঁদতে আছে?

কন্যা জননীর কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডাকিল, মা—

তা হোক। মায়ের জন্য যদি মাকে ভুলতে হয়, সেই ত মাতৃভক্তি মা!

চন্দ্রনাথ অনুরোধ করিলেও তিনি ইহাই বলিলেন। কাশী ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইতে পারিবেন না।

চন্দ্রনাথ বলিল, একান্ত যদি অন্যত্র না যাবেন, তবে অন্ততঃ স্বাধীনভাবে কাশীতে বাস করুন।

বামুন-ঠাকরুন তাহাও অস্বীকার করিয়া বলিলেন, হরিদয়াল ঠাকুর আমাকে মেয়ের মত যত্ন করেন এবং নিতান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমিও তাঁকে পিতার মত ভক্তি করি; তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।

চন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃখিনীর আত্মসম্ভ্রম বোধ আছে, সাধ করিয়া তিনি কাহারও দয়ার পাত্রী হইবেন না। কাজেই তখন শুধু সরযূকে লইয়া চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিল।

এখানে আসিয়া সরযূ দেখিল, প্রকাণ্ড বাড়ি! কত গৃহসজ্জা, কত আসবাব—তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে মনে মনে ভাবিল, কি অনুগ্রহ! কত দয়া!

চন্দ্রনাথ বালিকা বধূকে আদর করিয়া কহিল, বাড়িঘর সব দেখলে? মনে ধরেচে ত?

সরযূ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িল।

চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মনের কথা বুঝিতে চাহে নাই; প্রত্যুত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই দুই হাতে সরযূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কি বল, মনে ধরেছে ত?

লজ্জায় সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে কোনরূপে সে বলিয়া ফেলিল, সব তোমার?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিল, হাঁ, সব তোমার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সরযূ বড় হইয়াছে। স্বামীকে সে কত যত্ন করিতে শিখিয়াছে। চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারে যে, সে কথা কহিবার পূর্বেই সরযূ তাহার মনের কথা বুঝিয়া লয়। কিন্তু সে যদি শুধু দাসী হইত, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব খুঁজিয়াও চন্দ্রনাথ এমন আর একটি দাসী পাইত না, কিন্তু শুধু দাসীর জন্যই কেহ বিবাহ করে না—স্ত্রীর নিকট আরও কিছুর আশা রাখে। মনে হয়, দাসীর আচরণের সহিত স্ত্রীর আচরণটি সর্বতোভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। সরযূর ব্যবহার বড় নিরীহ, বড় মধুর, কিন্তু দাম্পত্যের সুনিবিড়-পরিপূর্ণ সুখ কিছুতেই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে, এত যত্ন-আদরেও উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই সরিতে চাহিল না। একদিন সে সরযূকে হঠাৎ বলিল, তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাক কেন? আমি কি কোন দুর্ব্যবহার করি?

সরযূ মনে মনে ভাবিল, এ কথার উত্তর কি? তুমি নিজে জানো না? তাহার পর ভাবিল, তুমি দেবতা, কত উচ্চ, কত মহৎ,—আর আমি? সে তুমি আজও জানো না। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি শুধু তোমার আশ্রিতা। তুমি দাতা, আমি ভিখারিণী।

তাহার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না,—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় না—তেমনি অবিশ্রাম বহিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার সন্ধান পাইল না—অতি বড় দুর্ভাগারা যেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু আজ অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপালোকে যখন সে দেখিতে পাইল, পদ্মের মত ডাগর সরযূর চক্ষু

দুটিতে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া সহসা তাহাকে সে কাছে টানিয়া লইল। বুকের উপর মুখ লুটাইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ কহিল, থাক, ওসব কথায় আর কাজ নেই—বলিয়া দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিল, মুদিত চক্ষের উপর সরযূ একটা তপ্ত-নিশ্বাস অনুভব করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, একবার চেয়ে দেখ দেখি—

সরযূর চোখের পাতা দুইটি আকুলভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল, সে কিছুতেই চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তোমার বড় ভয়, তাই চাইতে পারলে না সরযূ। কিন্তু পারলে ভাল হ'ত, না হয়, একটা কাজ ক'রো, আমার ঘুমন্ত মুখ ভাল করে চেয়ে দেখো—এ মুখে ভয় করবার মত কিছু নেই। বুকে শুয়ে আছ, ভিতরের কথাটা কি শুনতে পাও না? তাই বড় দুঃখ হয় সরযূ—আমাকে তুমি বুঝতেই পারলে না।

তবু সরযূ কথা কহিতে পারিল না, শুধু মনে মনে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, আমি পদাশ্রিতা দাসী, দাসীকে চিরদিন দাসীর মতই থাকিতে দিয়ো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের মাতুলানী হরকালীর মনে আর তিলমাত্র সুখ রহিল না। ভগবান তাহাকে এ কি বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এ সংসারটা কাহারো নিকট কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত বোধ হয়, তাহাদের চেষ্টা করিয়া এখানে একটা পথের সন্ধান করিতে হয়। কেহ পথ পায়, কেহ পায় না। অনেক দিন হইতে হরকালীও এই সংসার-কাননে একটা সংক্ষেপ-পথ খুঁজিতেছিল, চন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুতে একটা সুরাহাও হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিবাহ, বধূ সরযূ, চন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পত্নীপ্রেম, তাহার এই পাওয়া-পথের মুখটা একেবারে পাষাণ দিয়া যেন গাঁথিয়া দিল। হরকালীর একটি বছর পাঁচেকের বোনঝি পিতৃগৃহে বড় হইয়া আজ দশ বছরেরটি হইয়াছে, কিন্তু সে কথা যাক। নানা কারণে হরকালীর মনের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

অবশ্য আজও সে-ই গৃহিণী, তাহার স্বামী কর্তা—এ সমস্ত তেমনিই আছে। আজ পর্যন্ত সরযূ তাহারই মুখ চাহিয়া থাকে, কোন অসন্তোষ বা অভিমান প্রকাশ করে না। দেখিলে মনে হয়, সে এই পরিবারভুক্ত একটি সামান্য পরিজন মাত্র। হরকালীর স্বামী এইটুকু দেখিয়াই খুশি হইয়া যেই বলিতে যান—বৌমা আমার যেন—, হরকালী চোখ রাঙ্গা করিয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, চুপ কর, চুপ কর। য বোঝ না, তাতে কথা কয়ো না। তোমার হাতে দেওয়ার চেয়ে বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে ছিল ভাল।

ব্রজকিশোর মুখ কালি করিয়া উঠিয়া যান।

হরকালীর বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু সরযূর আজও পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হয় নাই,—তবু তাহার আসা অবধি দুই জনের মনে মনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রাণপণ করিয়াও হরকালী জয়ী হইতে পারে না। একফোঁটা মেয়ের শক্তি দেখিয়া

হরকালী মনে মনে অবাক হয়। বাহিরের লোক এ কথা জানে না যে, এই অন্তর-যুদ্ধে সরযূ ডিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা জারি করে নাই। নিজের ডিক্রি নিজে তামাদি করিয়া বিজিত অংশ তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এখানেই হরকালীর একেবারে হার হইয়াছে।

হরকালী বুঝিতে পারে, সরযূ বোবা কিংবা হাবা নহে। অনেকগুলি শক্ত কথারও সে এমন নিরুত্তর অবনতমুখে উত্তর দিতে সমর্থ যে, হরকালী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়, কিন্তু না পারিল সে এই মেয়েটির সহিত সন্ধি করিতে, না পারিল তাহাকে জয় করিতে। সরযূ যদি কলহ-প্রিয় মুখরা হইত, স্বার্থপর নির্দয় হইত, তাহা হইলেও হরকালী হয়ত পথ খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সরযূ নিজ হইতে এতখানি করুণা তাহাকে দিয়া রাখিয়াছে যে হরকালী অপরের করুণা ভিক্ষা করিবার আর অবকাশ পায় না।

সরযূ অন্তরে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে যে, এ বাটীর সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী, হরকালী কেহ না, তাই বাহিরে সে কেহ না হইয়া হরকালীকেই সর্বময়ী করিয়াছে। ইহাতেই হরকালী আরও ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

শুধু একটি স্থান সরযূ একেবারে নিজের জন্য রাখিয়াছিল, এখানে হরকালী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পায় না। স্বামীর চতুষ্পার্শে সে এমন একটি সূক্ষ্ম দাগ টানিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে, আর কেহ চন্দ্রনাথের শরীরে আঁচড়টিও কাটিতে পারে না। এই দাগের বাহিরে হরকালী যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু ভিতরে আসিবার অধিকার ছিল না। বুদ্ধিমতী হরকালী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই একফোঁটা মেয়েটি কোন্ এক মায়ামন্ত্রে তাহার নখদন্তের সমস্ত বিষ হরণ করিয়া লইয়াছে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর গত হইল। সে এগারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সতরোয় পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সন্মান-জ্ঞানটা যেমন পুরুষের মধ্যে আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তেমন নাই। পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্যায় আছে—যেমন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট প্রভৃতি। ত্রিশবর্ষীয় একজন যুবা বিশ বছরের একজন যুবার প্রতি মুরুব্বিয়ানার চোখে চাহিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়েমহলে এটা খাটে না। তাহার বিবাহকালটা পর্যন্ত বড় ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, জননী, পিসিমা অথবা ঠাকুরমাতার নিকট অল্পস্বল্প উমেদারি করে নারী-জীবনে যাহা কিছু অল্পবিস্তর শিখিবার আছে, শিখিয়া লয়;—তাহার পরই একেবারে প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া বসে। তখন ষোল হইতে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত তাহার সমবয়সী। স্থানভেদে হয়ত বা কোথাও এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এমনি। অন্ততঃ চন্দ্রনাথের গ্রাম-সম্পর্কীয়া ঠানদিদি হরিবালার জীবনে এমনটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে পশ্চিমদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া সরযূ আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরিবালা এক থালা মিষ্টান্ন এবং একগাছি মোটা যুঁইয়ের মালা হাতে লইয়া একেবারে সরযূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালাগাছটি তাহাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, আজ থেকে তুমি আমার সই হ’লে। বল দেখি সই—

সরযূ একটু বিপন্ন হইল। তথাপি অল্প হাসিয়া কহিল, বেশ।

বেশ ত নয় দিদি, সই ব’লে ডাকতে হবে।

ইহাকে আদরই বল, আর আবদারই বল, সরযূর জীবনে ঠিক এমনটি ইতিপূর্বে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই এই আকস্মিক আত্মীয়তাকে সে মনের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিল না। একদণ্ডে একজন দিদিমার বয়সী লোকের গলা ধরিয়া ‘সই’ বলিয়া আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু হরিবালা

যে ছাড়েন না। ইহাতে অভিনবত্ব কিংবা অস্বাভাবিকতা যে কিছু থাকিতে পারে, হরিবালার তাহা ধারণায় নাই। তাই সরযূর মুখ হইতে প্রিয়সম্বোধনটির বিলম্ব দেখিয়া একটু গম্ভীরভাবে, একটু ম্লান হইয়া তিনি কহিলেন, আমার মালা ফিরিয়ে দাও, আমি আর কোথাও যাই।

সরযূ বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপ্রতিভ হয় নাই, ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সইয়ের সন্ধানে নাকি?

ঠানদিদি একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, বাঃ! এই যে বেশ কথা কও। তবে যে লোকে বলে, ওদের বৌ বোবা!

সরযূ হাসিতে লাগিল।

ঠানদিদি বলিলেন, তা শোন। এ গাঁয়ে তোমার একটিও সাথী নাই। বড়লোকের বাড়ি ব'লেও বটে, তোমার মামীর বচনের গুণেও বটে, কেউ তোমার কাছে আসে না, জানি। আমি তাই আসব। আমার কিন্তু একটা সম্পর্ক না হ'লে চলে না, তাই আজ 'সই' পাতালুম। আর বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু হরিনামের মালা নিয়েও সারা দিনটা কাটাতে পারি না। আমি রোজ আসব।

সরযূ কহিল, রোজ আসবেন।

হরিবালা গর্জিয়া উঠিলেন, আসবেন কি লা? বল সই, তুমি রোজ এস। 'তুই' বলতে পারবি নে, না?

সরযূ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, রক্ষা কর ঠানদিদি, গলায় ছুরি দিলেও তা পারব না।

ঠানদিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তা না হয় নাই বলিস। কিন্তু 'তুমি' বলতেই হবে। বল—সই তুমি রোজ এস।

সরযূ চোখ নিচু করিয়া সলজ্জহাস্যে কহিল, সই, তুমি রোজ এস।

হরিবালার যেন একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, আসব।

পরদিন হইতে হরিবালা প্রায়ই আসেন, শত-কর্ম থাকিলেও একবার হাজিরা দিয়া যান। ক্রমশঃ পাতানো সম্বন্ধ গাঢ় হইয়া আসিল। সময়ে সরযূও ভুলিল যে, হরিবালা তাহার সমবয়সী নহেন, কিংবা এই গলায় গলায় মেশামেশি সকলের কাছে তেমন সুন্দর দেখিতে হয় না।

এই অন্তরঙ্গতা হরকালীর কেমন লাগিত, বলিতে পারি না, কিন্তু চন্দ্রনাথের বেশ লাগিল। স্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে প্রায়ই তাহার কথাবার্তা হইত। ঠানদিদির এই হৃদ্যতায় সে আমোদ বোধ করিত। আরও একটু কারণ ছিল। চন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বড় স্নেহ করিত; সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ভালবাসা না থাকিলেও স্নেহের অভাব ছিল না। সে মনে করিত, সকলের ভাগ্যেই একরূপ স্ত্রী মিলে না। কাহারো বা স্ত্রী দাসী, কাহারো বা বন্ধু, কাহারো বা প্রভু! তাহার ভাগ্যে যদি একটি পুণ্যবতী, পবিত্রা, সাধ্বী এবং স্নেহময়ী দাসী মিলিয়াছে ত, সে অসুখী হইয়া কি লাভ করিবে? তাহার উপর একটা কথা প্রায়ই তাহার মনে হয়, সেটা সরযূর বিগত দিনের দুঃখের কাহিনী। শিশুকালটা তাহার বড় দুঃখেই অতিবাহিত হইয়াছে। দুঃখিনীর কন্যা হয়ত সারা-জীবনটা দুঃখেই কাটাইত; হয়ত বা এতদিনে কোন দুর্ভাগ্য দুশ্চরিত্রের হাতে পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিত, না হয় দাসীবৃত্তি করিতে গিয়া শত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিত; তা ছাড়া, এত অধিক রূপ-যৌবন লইয়া নরকের পথও দুরূহ নহে;—তাহা হইলে?

এই কথাটা মনে উঠিলেই চন্দ্রনাথ গভীর করুণায় সরযূর লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা সরযূ, আমি যদি তোমাকে না দেখতুম, যদি বিয়ে না করতুম, এতদিন তুমি কার কাছে থাকতে বল ত?

সরযূ জবাব দিত না; সভয়ে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিত। চন্দ্রনাথ সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত রাখিত। যেন সাহস দিয়া মনে মনে বলিত, ভয় কি!

সরযূ আরও কাছে সরিয়া আসিত—এসব কথায় সত্যই সে বড় ভয় পাইত। চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, তা নয় সরযূ, তা নয়। তুমি দুঃখীর ঘরে গিয়ে কেন জন্মেছিলে, জানিনে; কিন্তু তুমিই আমার জন্ম-জন্মান্তরের পতিব্রতা স্ত্রী! তুমি সংসারের যে-কোন জায়গায় ব'সে টান দিলে আমাকে যেতেই হ'ত। তোমার আকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম, সরযূ!

এই সময় তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত, সরযূর সমস্ত স্নেহ, প্রেম, যত্ন, ভক্তি এক করিলেও বোধ করি তাহার তুলনা হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব, যে তৃপ্তি, বালিকা সরযূকে বিবাহ করিবার সময় একদিন আত্মপ্রসাদের ছদ্মবেশে চন্দ্রনাথের নিভৃত-অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শতচেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না।

হৃদয়ের এক অজ্ঞাত অন্ধকার কোণে আজও সে বাসা বাঁধিয়া আছে। তাই, যখনই সেটা মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, তখনই চন্দ্রনাথ সরযূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে, আমি বড় আশ্চর্য হই সরযূ, যাকে চিরদিন দেখে এসেচ, তাকে কেন আজও তোমার চিনতে বিলম্ব হচ্চে। আমি তো তোমাকে কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম, তুমি আমার! কত যুগ, কত কল্প, কত জন্ম-জন্ম ধ'রে আমার! কি জানি, কেন আলাদা হয়েছিলুম, আবার এক হয়ে মিলতে এসেচি।

সরযূ বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহে, কে বললে, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি?

উৎসাহের অতিশয্যে চন্দ্রনাথ সরযূর লজ্জিত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে, পেরেচ? তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে থাক? আমি ত

কোন দুর্ব্যবহার করিনে—আমি যে আমার নিজের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি সরযূ।

সরযূ আবার স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলে। চন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করে, বল, কেন ভয় পাও সরযূ? সরযূ আর উত্তর দিতে পারে না। স্বামীকে স্পর্শ করিয়া সে মিথ্যা কথা কি করিয়া মুখে আনিবে? কি করিয়া বলিবে যে, ভয় করে না? সত্যই যে তাহার বড় ভয়! সে যে কত সত্য, কত বড় ভয়, তাহা সে ছাড়া আর কে জানে?

তা কথাটা কি বলিতেছিলাম! চন্দ্রনাথ হরিবালার আগমনে আমোদ বোধ করিত। সরযূ একটি সখী পাইয়াছে, দু'টা মনের কথা বলিবার লোক জুটিয়াছে—ইহাই চন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ।

একদিন সরযূ সমস্ত দুপুরটা হরিবালার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল; হরিবালা আসিলেন না । সরযূ মনে করিল, জল পড়িতেছে, তাই আসিলেন না। এখন বেলা যায়-যায়, সমস্ত দিনটা একা কাটিয়াছে, হরকালীও আজ বাটী নাই। সরযূ তখন সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এ ঘরটিতে কেহ প্রবেশ করিত না। সরযূও না। চন্দ্রনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, আজ বুঝি তোমার সই আসেনি?

না।

তাই বুঝি আমাকে মনে পড়েছে?

সরযূ ঈষৎ হাসিল। ভাবটা এই যে, মনে সর্বদাই পড়ে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সরযূ বলিল, জলের জন্য বোধ হয় আসতে পারেনি।

বোধ হয়, তা নয়। আজ কাকার ছোটমেয়ে নির্মলাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে। শীঘ্রই বিয়ে হবে। তারই আয়োজনে ঠানদিদি বোধ হয় মেতেছেন।

সরযূ বলিল, বোধ হয়।

তাহার পর চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দুঃখ হয় যে, আমরা একেবারে পর হয়ে গেছি—মামীমা কোথায়?

তিনিও বোধ হয় সেইখানে।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সরযূ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি ভাবচ, বল না।

চন্দ্রনাথ একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া সরযূর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বিশেষ-কিছু নয় সরযূ। ভাবছিলাম, নির্ম্মলার বিয়ে, কাকা কিন্তু আমাকে একবার খবরটাও দিলেন না, অথচ মামীমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনেই শুধু পর!

তাহার স্বরে একটু কাতরতা ছিল, সরযূ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমাকে পায়ে স্থান দিয়েই তুমি আরও পর হয়ে গেছ; না হ'লে বোধ হয় এত দিনে মিল হ'তে পারত।

চন্দ্রনাথ হাসিল, কহিল, মিল হয়ে কাজ নেই। তোমার পরিবর্তে, কাকার সঙ্গে মিল ক'রে যে আমার মস্ত সুখ হ'ত, সে মনে হয় না। আমি বেশ আছি। যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন যদি কাকার মত নিতে হ'ত, তা হ'লে এমন ত বোধ হয় না যে, তোমাকে কখনো পেতুম—একটা বাধা নিশ্চয় উঠত। হয় কুল নিয়ে, না হয় বংশ নিয়ে—যেমন ক'রেই হোক এ বিয়ে ভেঙ্গে যেত।

ভিতরে ভিতরে সরযূ শিহরিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরের মধ্যে অন্ধকার করিয়াছিল, তাই তাহার মুখখানি দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতখানি কাঁপিয়া উঠিয়া সরযূর সমস্ত মনের কথা চন্দ্রনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, এখন বুঝতে পেরেছ, মত না নিয়ে ভাল করেচি কি মন্দ করেচি?

সরযূ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি জানি! আমার মত শত-সহস্র দাসীরও ত তোমার অভাব হ'ত না!

চন্দ্রনাথ সরযূর কোমল হাতখানি সস্নেহে ঈষৎ পীড়ন করিয়া বলিল, তা জানিনে। আমার দাসী একটি, তার অভাবের কথাই ভাবতে পারি। শত-সহস্রের ভাবনা ইছে হয় তুমি ভেবো।

পরদিন হরিবালা আসিলেন; কিন্তু মুখের ভাবটা কিছু স্বতন্ত্র। ফস করিয়া গলা ধরিয়া সই-সই বলিয়া তিনি ব্যস্ত করিলেন না, কিংবা বিন্তি খেলিবার জন্য তাস আনিতেও পুনঃ পুনঃ সাধাসাধি পীড়াপীড়ি করিলেন না! মলিনমুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

সরযূ বলিল, সইয়ের কাল দেখা পাইনি।

হ্যাঁ দিদি—কাল বড় কাজ ছিল। ও-বাড়িতে নির্মলার বিয়ে।

তা শুনেছি। সব ঠিক হ'ল কি?

হরিবালা সে কথার উত্তর না দিয়া সরযূর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, সই, একটা কথা—সত্যি বলবি?

কি কথা ?

যদি সত্যি বলিস, তা হ'লেই জিজ্ঞাসা করি—না হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন লাভ নেই।

সরযূ চিন্তিত হইল। বলিল, সত্যি বলব না কেন?

দেখিস দিদি—আমাকে বিশ্বাস করিস ত?

করি বৈ কি।

তবে বল্ দেখি, চন্দ্রনাথ তোকে কতখানি ভালবাসে?

সরযূ একটু লজ্জিত হইল, বলিল, খুব দয়া করেন।

দয়ার কথা নয়। খুব একেবারে বড় বেশি ভালবাসে কিনা?

সরযূ হাসিল। বলিল, বড় বেশি কিনা—কেমন ক'রে জানব?

সত্যি জানিস নে?

না।

সত্যই সরযূ ইহা জানিত না। হরিবালা যেন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, স্ত্রী জানে না স্বামী তাকে কতখানি ভালবাসে! এইখানেই আমার বড় ভয় হয়।

হরিবালার মুখের ভাবে একটা গভীর শঙ্কা প্রচ্ছন্ন ছিল, সরযূ তাহা বুঝিয়া নিজেও শঙ্কিত হইল। বলিল, ভয় কিসের?

আর একদিন শুনিস। তার পর তাহার চিবুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, এত রূপ, এত গুণ, এত বুদ্ধি নিয়ে সই, এত দিন কি ঘাস কাটছিলি?

সরযূ হাসিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখনও কথাটা প্রকাশ পায় নাই। হরিদয়াল ঘোষালের সন্দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। একজন ভদ্রলোকের মত দেখিতে অথচ বস্ত্রাদি জীর্ণ এবং ছিন্ন আজ দুই-তিন দিন হইতেই বামুন-ঠাকরুন সুলোচনা দেবীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া যাইতেছিল। সুলোচনা ভাবিত, হরিদয়াল তাহা জানেন না; কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন।

আজ দ্বিপ্রহরে দয়ালঠাকুর এবং কৈলাসখুড়া ঘরে বসিয়া সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, এমন সময় অন্দরের প্রাঙ্গণে একটা গোলযোগ উঠিল। কে যেন মৃদুকণ্ঠে সকাতরে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে, এবং অপরে কর্কশকণ্ঠে তীব্র-ভাষায় তিরস্কার করিতেছে এবং ভয় দেখাইতেছে। একজন স্ত্রীলোক, অপর পুরুষ। দয়ালঠাকুর কহিলেন, খুড়ো, বাড়িতে কিসের গোলমাল হয়?

কৈলাসখুড়ো বলিলেন, কিস্তি! সামলাও দেখি বাবাজী!

আবার অনেকক্ষণ নি:শব্দে কাটিল।ভিতরের গোলমাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দয়ালঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।খুড়ো, একটু ব’স, আমি দেখে আসি।

খুড়া তাঁহার কোঁচার টিপ এক হাতে ধরিয়া কহিলেন, এবার যে দাবা চাপা গেল।

দয়ালঠাকুর পুনর্বার বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু গোলমাল কিছুতেই থামে না। তখন দয়ালঠাকুর অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, সুলোচনা দুই হাতে সেই লোকটার পা জড়াইয়া আছে এবং সে উত্তরোত্তর চাপা-কণ্ঠে কহিতেছে, আমার কথা রাখ, না হ’লে যা বলছি তাই করব!

সুলোচনা কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় মার্জনা কর। তুমি একবার সর্বনাশ করেছ, যা-একটু বাকী আছে, সেটুকু আর নাশ করো না।

সে কহিতেছে, তোমার মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছে, দু'হাজার টাকা দিতে পারে না? আমি টাকা পেলেই চ'লে যাব।

সুলোচনা কহিল, তুমি মাতাল, অসচ্চরিত্র!—দু'হাজার টাকা তোমার কত দিন? তুমি আবার আসবে, আবার টাকা চাইবে,—আমি কিছুতেই তোমায় টাকা দেব না।

আমি মদ ছেড়ে দেব। ব্যবসা করব; আর কখনও তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না।

সুলোচনা সে কথার উত্তর না দিয়া ভূমিতলে মাথা খুঁড়িয়া যুক্ত-করে কহিল, দয়া কর—টাকার জন্য আমি সরযূকে অনুরোধ করতে পারব না।

দয়ালঠাকুর যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহই দেখে নাই, তাই এসব কথা জোরে জোরেই হইতেছিল। দয়ালঠাকুর এইবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা দুজনেই চমকিত হইল—দয়ালঠাকুর এই অপরিচিত লোকটার নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি কার অনুমতিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছ?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন বুঝিল, কাজটা তেমন আইন-সঙ্গত হয় নাই, তখন সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কঠিন মুষ্টিতে হরিদয়াল তাহার হাত ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে পুনর্বার কহিলেন, কার অনুমতিতে?

পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, সুলোচনার কাছে এসেছি।

তাহার মুখ দিয়া তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, এবং সর্বাঙ্গে হীনতা এবং অত্যাচারের মলিন-ছায়া পড়িয়াছে। দয়ালঠাকুর ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া সেইরূপ কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কার হুকুমে?

হুকুম আবার কি?

লোকটার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সহসা যেন তাহার স্মরণ হইল, প্রশ্নকর্তার উপর তাহার জোর আছে এবং এ বাড়ির উপরেও কিঞ্চিৎ দাবী আছে।

দয়ালঠাকুর এরূপ উত্তরে অসম্ভব চটিয়া উঠিলেন, উচ্চস্বরে কহিলেন, ব্যাটা মাতাল, জান, তোমাকে এখনি জেলে দিতে পারি!

সে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, জানি বৈ কি!

দয়ালঠাকুর প্রায় প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, জান বৈ কি! চল্ ব্যাটা, এখনি তোকে পুলিশে দেব।

লোকটা ঈষৎ হাসিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন পুলিশের নিকট যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি নাই। কহিল, এখনই দেবে?

দয়ালঠাকুর ধাক্কা দিয়া বলিলেন, এখনি।

লোকটা ধাক্কা সামলাইয়া স্থির হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, ঠাকুর, একেবারে অত বিক্রম প্রকাশ করো না, পুলিশে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব ক'রে দিয়ো। আমি তোমাকে কাশী ছাড়া করতে পারি, জান?

দয়ালঠাকুর উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব্যাটা পাজী, আজ আমার চল্লিশ বছর কাশীবাস হ'ল, এখন তুমি কাশী-ছাড়া করবে?

তিনি ভাবিয়াছিলেন, লোকটা তাঁহাকে গুন্ডার ভয় দেখাইতেছে। অনেকে এ কথায় হয়ত ভয় পাইত, কিন্তু এই দীর্ঘকালের কাশীবাসে দয়ালঠাকুরের এ ভয় ছিল না। বলিলেন, ব্যাটা, আমার কাছে গুন্ডাগিরি!

গুন্ডাগিরি নয় ঠাকুর, গুন্ডাগিরি নয়। পুলিশে নিয়ে চল। সেখানেই সব কথা প্রকাশ করব।

কোন্ কথা প্রকাশ করবে?

যা জানি। যাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। যাতে সমস্ত দেশের লোক শুনবে যে, তুমি জাতিচ্যুত অব্রাহ্মণ।

আমি অব্রাহ্মণ!

রাগ করো না, ঠাকুর। তুমি জাতিচ্যুত । শুধু তাই নয়। তোমার কাছে যত ভদ্রসন্তান বিশ্বাস ক'রে এসেছে, এই তিন বৎসরের মধ্যে যত লোককে তুমি অন্ন বেচেছ, সকলেরই জাত গেছে। সকলকেই আমি সে কথা বলবো।

দয়ালঠাকুর ভয় পাইলেন। ভয়ের যথার্থ কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্বেই উদ্ধত কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল। তথাপি বলিলেন, আমি লোকের জাত মেরেছি?

তাই। আর প্রমাণ করবার ভারও আমার।

ঠাকুর নরম হইয়া কণ্ঠস্বর কিছু কম করিয়া বলিলেন, কথাটা কি, ভেঙ্গে বল দেখি বাপু?

লোকটা মৃদু হাসিয়া কহিল, একাই শুনবে, না, দু'-দশজন লোক ডাকবে। আমি বলি, দু'-চারজন লোক ডাক। দু'-চারজন পাড়াপড়শীর সামনে কথাটা শোনাবে ভাল।

দয়ালঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, রাগ করো না বাপু, আমি হঠাৎ বড় অন্যায় কাজ করেছি। কিছু মনে করো না। এস, ঘরে চল।

দুই জনে একটা ঘরে আসিয়া বসিলে দয়ালঠাকুর কহিলেন, তার পর?

সে কহিল, সুলোচনা—যার হাতে আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়, তাকে কোথায় পেলেন?

এইখানেই পেয়েছি। দুঃখীর কন্যা, তাই আশ্রয় দিয়েছি।

টাকাওয়ালা লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু সে কি জাত, তার অনুসন্ধান করেছেন কি?

দয়ালঠাকুরের সমস্ত মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা, বিধবা, শুদ্ধাচারিণী, তার হাতে খেতে দোষ কি?

ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং বিধবা, এ কথা সত্যি, কেউ যদি কুলত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, তাকেও কি শুদ্ধাচারিণী বলা চলে? না, তার হাতে খাওয়া যায়?

দয়ালঠাকুর জিভ কাটিয়া বলিলেন, শিব! শিব! তা কি খাওয়া যায়!

তবে তাই! পনরো-ষোল বৎসর পূর্বে সুলোচনা তিন বছরের একটি মেয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে, এবং তাকেই আশ্রয় দিয়ে আপনি নিজের এবং আর পাঁচজনের সর্বনাশ করেছেন।

প্রমাণ?

প্রমাণ আছে বৈ কি! তার জন্য ভাববেন না । যাঁর সঙ্গে কুলত্যাগ করেন, সেই অসীম প্রেমাস্পদ রাখাল ভট্‌চায এখনো বেঁচে আছেন।

দয়াল লোকটার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন ইহারই নাম রাখাল। বলিলেন, তুমি কি ব্রাহ্মণ?

লোকটা মলিন উড়ানির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিছিন্ন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, না, না, গোয়ালা!

দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখে তো চামার ব'লে মনে হয়েছিল। যা হোক, নমস্কার।

সে ব্যক্তি রাগ করিল না। বলিল, নমস্কার। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান খ্রীষ্টান বলাও চলে। আমি জাত মানিনে—আমি পরমহংস।

তুমি অতি পাষণ্ড।

সে বলিল, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখচি না, কেননা, ইতিপূর্বে অনেকেই অনুগ্রহ ক'রে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েচি, তা এখনো বুঝি। কিন্তু আমিই রাখালদাস।

দয়ালের মুখখানি অপরিসীম ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কোনমতে মনের ভাব দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এখন কি করতে চাও? সুলোচনাকে নিয়ে যাবে?

আজ্ঞে না। তাতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, আমি অত নরাধম নই।

প্রাণের দায়ে দয়াল এ পরিহাসটাও পরিপাক করিলেন। তারপব বলিলেন, তবে কি চাও? আবার এসেচ কেন?

টাকা চাই। দারুণ অর্থাভাব, তাই আপাততঃ এসেছি। হাজার-দুই পেলেই নিঃশব্দে চলে যাব, জানাতে এসেছি।

এত টাকা তোমায় কে দেবে?

যার গরজ। আপনি দেবেন—সুলোচনার জামাই দেবে—সে বড়লোক।

দয়াল তাহার স্পর্ধা দেখিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্ত সে অতিশয় ধূর্ত এবং কৌশলী, তাহাও বুঝিলেন। বলিলেন, বাপু আমি দরিদ্র, অত টাকা কখনও চোখে দেখিনি।

তবে সুলোচনার জামাই দিতে পারে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দেবে না। তাকে চেন না, ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে দু'হাজার ত ঢের দূরের কথা—দুটো পয়সাও আদায় করতে পাববে না। তুমি যে বুদ্ধিমান লোক তা টের পেয়েছি, কিন্তু সে আরও বুদ্ধিমান। বরং আর কোন ফন্দি দেখ—এ খাটবে না।

রাখাল দয়ালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, সে ভাবনা আমার। দেখা যাক, যত্নে কৃতে যদি—

দয়াল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক বাবা, দেবভাষাটাকে আর অপবিত্র করো না।

রাখাল সপ্রতিভভাবে বলিল, যে আজ্ঞে। কিন্তু আর ত বসতে পাচ্চিনে—বলি তাঁর ঠিকানাটা কি?

দয়াল বলিলেন, সুলোচনাকেই জিজ্ঞাসা কর না বাপু।

রাখাল কহিল, সে বলবে না, কিন্তু আপনি বলবেন।

যদি না বলি?

রাখাল শান্তভাবে বলিল, নিশ্চয়ই বলবেন। আর না বললে কি করব, তা ত পূর্বেই বলেছি।

দয়ালের মুখ শুকাইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছুই ত করিনি বাপু।

রাখাল বলিল, না, কিছু করেন নি। তাই এখন কিছু করতে বলি। নাম-ধামটা ব'লে দিলে জামাইবাবুকেও দুটো আশীর্বাদ ক'রে আসি, মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি। অনেক দিন দেখিনি।

দয়ালঠাকুর রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমায় সাহায্য করব না। তোমার যা ইচ্ছা কর। অজ্ঞাতে একটা পাপ করেছি, সে জন্য না হয় প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার আর ভয় কি?

ভয় কিছুই নেই, তবে পাণ্ডা-মহলে আজই একথা রাষ্ট্র হবে। তার পর যেমন ক'রে পারি, অনুসন্ধান ক'রে সুলোচনার জামাইয়ের কাছে যাব, এবং সেখানেও এ কথা প্রকাশ করব! নমস্কার ঠাকুর, আমি চললাম।

সত্যিই সে চলিয়া যায় দেখিয়া দয়াল তাহার হাত ধরিয়া পুনর্বার বসাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বাপু, তুমি যে অল্পে ছাড়বার পাত্র নও তা বুঝেছি। রাগ করো না। আমার কথা শোন। এর মধ্যে তুমি এ কথা নিয়ে আর আন্দোলন করো না। হপ্তাখানেক পরে এস তখন যা হয় করব।

মনে রাখবেন, সেদিন এমন ক'রে ফেরালে চলবে না। দয়াল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি কি সত্যিই বামুনের ছেলে?

আজ্ঞে।

দয়াল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! আচ্ছা, হপ্তাখানেক পরেই এস—এর মধ্যে আর আন্দোলন করো না, বুঝলে?

আজ্ঞে, বলিয়া রাখাল দুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাল কথা। গোটা-দুই টাকা দিন তো। মাইরি, মনিব্যাগ্‌টা কোথায় যে হারালাম, বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াল রাগে তাহার পানে আর চাহিতেও পারিলেন না। নিঃশব্দে দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, সে তাহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু সেইখানে দয়াল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশনে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু সুলোচনা কোথায়? আজ তিন দিন ধরিয়া হরিদয়াল আহার, নিদ্রা, পূজা-পাঠ, যাত্রীর অনুসন্ধান, সব বন্ধ রাখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত কাশী খুঁজিয়াও যখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বিশ্বেশ্বর! এ কি দুর্দৈব? অনাথাকে দয়া করিতে গিয়া শেষে কি পাপ সঞ্চয় করিলাম!

গলির শেষে কৈলাসখুড়োর বাটী। হরিদয়াল সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ডাকিলেন, খুড়ো, বাড়ি আছ?

কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন, কৈলাস প্রদীপের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ সাজাইয়া একা বসিয়া আছে; বলিলেন, খুড়ো, একাই দাবা খেলচ?

খুড়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এস বাবাজী, এই চালটা বাঁচাও দেখি।

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া মনে মনে গালি পাড়িয়া কহিলেন, নিজের জাত বাঁচে না, ও বলে কিনা দাবার চাল বাঁচাও!

কৈলাসের কানে কথাগুলো অর্ধেক প্রবেশ করিল, অর্ধেক করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল বাবাজী?

বলি, সেদিনের ব্যাপারটা সব শুনেছিলে?

কি ব্যাপার?

সেই যে আমাদের ভিতরের সেদিনকার গোলযোগ!

কৈলাস কহিলেন, না বাবাজী, ভাল শুনতে পাইনি। গোলযোগ বোধ করি খুব আস্তে আস্তে হয়েছিল; কিন্তু সেদিন তোমার দাবাটা আচ্ছা চেপেছিলাম!

হরিদয়াল মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিয়া কহিলেন, তা ত চেপেছিলে, কিন্তু কথাগুলো কিছুই শোননি?

কৈলাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, কিছুই প্রায় শুনতে পাইনি। অত আস্তে আস্তে গোলমাল করলে কি ক'রে শুনি বল? কিন্তু সেদিনকার খেলাটা কি রকম জমেছিল, মনে আছে? মন্ত্রীটা তুমি কোনমতেই বাঁচাতে পারতে না—আচ্ছা, এই ত ছিল, কৈ বাঁচাও দেখি কেমন—

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মন্ত্রী চুলোয় যাক! জিজ্ঞেস করি, সেদিনকার কথাবার্তা কিছু শোননি?

খুড়া হরিদয়ালের বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া এইবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি বাবাজী, স্মরণ ত কিছুই হয় না।

হরিদয়াল ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, আচ্ছা সংসারের যেন কোন কাজই না করলে, কিন্তু পরকালটা মান ত?

মানি বৈ কি!

তবে! সেকালের একটা কাজও করেছ কি? একদিনের তরেও মন্দিরে গিয়েছিলে কি?

কৈলাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি বল দয়াল, মন্দিরে যাইনি! কত দিন গিয়েছি।

দয়াল তেমনি গম্ভীর হইয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি এই বিশ বৎসর কাশীবাসী হয়েছ, কিন্তু বোধ হয় বিশ দিনও ঠাকুর দর্শন করনি—পূজা-পাঠ ত দূরের কথা!

কৈলাস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না দয়াল, বিশ দিনের বেশি হবে; তবে কি জান বাবাজী, সময় পাই না ব'লেই পূজোটুজোগুলো হয়ে উঠে না। এই দেখ না, সকাল বেলাটা শম্ভু মিশিরের সঙ্গে এক চাল বসতেই হয়—লোকটা খেলে ভাল।

এ বাজি শেষ হ'তেই দুপুর বেজে যায়, তারপর আহ্নিক সেরে পাক করতে, আহার করতে বেলা শেষ হয়। তারপর বাবাজী, গঙ্গা পাঁড়ের—তা যাই বল, লোকটার খেলার বড় তারিফ—আমাকে ত সেদিন প্রায় মাত করেছিল। ঘোড়া আর গজ দু'টো দু'কোণ থেকে চেপে এসে—আমি বলি বুঝি—

আঃ থামো না খুড়ো—দুপুর বেলা কি কর, তাই বল।

দুপুর বেলা! গঙ্গা পাঁড়ের সঙ্গে—তার গজ দু'টো—এই কালই দেখ না—

দয়াল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়েচে, হয়েচে—দুপুর বেলা গঙ্গা পাঁড়ে আর সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানা—আর তোমার সময় কোথায়!

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন—হরিদয়াল অধিকতর গম্ভীর হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু খুড়ো, দিনও ত আর বেশি নেই। পরকালের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর সে কথা কিছু কিছু ভাবাও দরকার। দাবার পুঁটলিটা আর সঙ্গে নিতে পারবে না।

কৈলাস হঠাৎ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, না না দয়াল, দাবার পুঁটুলিটা বোধ করি সঙ্গে নিতে পারব না। আর প্রস্তুত হ'বার কথা বলচ বাবাজী? প্রস্তুত আমি হয়েই আছি। যেদিন ডাক আসবে, ঐটে কারো হাতে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হয়ে পড়ব—সেজন্যে চিন্তার বিষয় আর কি আছে?

কিছুই নেই? কোন শঙ্কা হয় না?

কিছু না, বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল, যেদিন কমলচরণ আমার মুখের পানেই চোখ রেখে চোখ বুজলে, সেদিন থেকেই শঙ্কা, ভয় প্রভৃতি উপদ্রবগুলো তাদের পিছনে পিছনেই চলে গেল—কেমন ক'রে যে গেল, সে কথা একদিনের তরে জানতে পারলাম না বাবাজী—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দু'টি ছলছল করিয়া আসিল।

দয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, থাক সে-সব কথা। এখন আমার কথাটা শুনবে?

বল বাবাজী।

দয়াল তখন সেদিনের কাহিনী একে একে বিবৃত করিযা শেষে বলিলেন, এখন উপায়?

শুনিতে শুনিতে কৈলাসের সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হইল। কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, এমন হয় না, হরিদয়াল। সুলোচনা সতী-সাবিত্রী ছিলেন।

দয়াল কহিলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকে সকলই সম্ভব।

ছি, অমন কথা মুখে এনো না। মানুষ-মাত্রেই পাপপুণ্য ক'রে থাকে—এতে স্ত্রী-পুরুষের কোন প্রভেদ দেখিনে। বাবাজী, তোমার জননীর কথা কি স্মরণ হয় না, সে স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলেচ?

হরিদয়াল লজ্জিত হইলেন, অথচ বিরক্তও হইলেন, কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু এখন যে জাত যায়।

কৈলাস বলিলেন, একটা প্রায়শ্চিত্ত কর। অজানা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই কি?

আছে, কিন্তু এখানকার লোকে আমাকে যে একঘরে করবে?

করলেই বা—

হরিদয়াল এবার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, করলেই বা! কি বলছ! একটু বুঝে বল খুড়ো।

বুঝেই বলছি, দয়াল! তোমার বয়সও কম হয়নি—বোধ করি পঞ্চাশ পার হ'ল। এতটা বয়স জাত ছিল, বাকি দু'চার বছর না হয় নাই রইল, বাবাজী, এতই কি তাতে ক্ষতি?

ক্ষতি নেই? জাত যাবে, ধর্ম যাবে, পরকালে জবাব দেব কি?

কৈলাস কহিলেন, এই জবাব দেবে যে একজন অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছেলে।

হরিদয়াল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহার মনের সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তবে সুলোচনার জামায়ের ঠিকানা দেব না।

কিছুতেই না। এক ব্যাটা বদমায়েস—মাতাল—সে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, আর এক ভদ্র-সন্তানের কাছে টাকা আদায় করবে, আর তুমি তার সাহায্য করবে?

কিন্তু না করলে যে আমার সর্বস্ব যায়! একজনও যজমান আসবে না। আমি খাব কি ক'রে?

কৈলাস বলিলেন, সে ভয় করো না। আমি সরকার বাহাদুরের কল্যাণে বিশ টাকা পেন্সন পাই, খুড়োভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব, আর দাবা খেলব, ঘর থেকে কোথাও বেরোব না।

বিরক্ত হইলেও এরূপ বালকের মত কথায় হরিদয়াল হাসিয়া বলিলেন, খুড়ো, আমার বোঝা তুমিই বা কেন ঘাড়ে নেবে, আর আমিই বা কেন পরের হাঙ্গামা মাথায় বয়ে জাত-ধর্ম খোয়াব? তার চেয়ে—

কৈলাস বলিলেন, ঠিক ত। তার চেয়ে তাদের নাম-ধাম ঠিকানা ব'লে দিয়ে একজন দরিদ্র বালিকাকে তার স্বামী, সংসার, সন্মান, সমস্ত হ'তে বঞ্চিত ক'রে এই বুড়ো হাড়গোড়গুলো ভাগাড়ের শিয়াল-কুকুরের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে! বাঁচাও গে বাবাজী, কিন্তু আমাকে বলতে এসে ভাল করনি। তবে যখন মতলব নিতেই এসেছ, তখন আর একটা কথা ব'লে দিই। ৺কাশীধাম, মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। এখানে বাস ক'রে তাঁর সতী মেয়েদের পিছনে লেগে মোটের উপর বড় সুবিধা হবে না বাবা।

হরিদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, খুড়ো কি এবার শাপ-সম্পাত করচ!

না। তোমরা কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন, আমাদের শাপ-সম্পাত তোমাদের লাগবে না—সে ভয় তোমার নেই, কিন্তু যে কাজে হাত দিতে যাচ্চ, বাবা, সে বড় নিরাপদ জিনিস নয়। সতী-সাবিত্রীকে যমে ভয় করে। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্চি। অনেকদিন একসঙ্গে দাবা খেলেচি—তোমাকে ভালও বাসি।

হরিদয়াল জবাব দিলেন না, মুখ কালি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কৈলাস বলিলেন, বাবাজী, কথাটা তাহ'লে রাখবে না?

হরিদয়াল বলিলেন, পাগলের কথা রাখতে গেলে পাগল হওয়া দরকার।

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন, হরিদয়াল বাহির হইয়া গেলেন।

কৈলাস দাবার পুঁটুলিটা টানিয়া লইয়া গ্রন্থি বাঁধিতে বাঁধিতে মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয় ওর কথাই ঠিক। আমার পরামর্শ হয়ত সংসারে সত্যই চলে না। মানুষ মরিলে লোকাভাব হইলে কেহ কেহ ডাকিতে আসে—দাহ করিতে হইবে। রোগ হইলে ডাকিতে আসে—শুশ্রূষা করিতে হইবে। আর সতরঞ্চ খেলিতে আসে। কৈ, এত বয়স হইল, কেহ ত কখন পরামর্শ করিতে আসে নাই!

কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়াও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, কেন, এই সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জিনিসটা লোক-গ্রাহ্য হয় না, কেন এই সহজ প্রাঞ্জল ভাষাটা সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সেই রাত্রেই হরিদয়াল অনেক চিন্তার পর মন স্থির করিয়া চন্দ্রনাথের খুড়ো, মণিশঙ্করকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, চন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় এক বেশ্যা-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরিদয়াল সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া মণিশঙ্করকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার সহজেই বিশ্বাস হইল, সংবাদটা অসত্য নহে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, এস্থলে কর্তব্য কি? এ সংবাদটা তাঁহার পক্ষে সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক, গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। এত ভার তাঁহার একা বহিতে ক্লেশ বোধ হইল, তাই স্ত্রীকে নিরিবিলিতে পাইয়া মোটামুটি খবরটা জানাইয়া বলিলেন, আমার পরামর্শ নিলে কি এমন হ'ত? না এতবড় জুয়াচুরি ঘটতে দিতাম? যাই হউক, কথাটা এখন প্রকাশ করো না, ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিতে সময় লাগে, দুই-চারি দিন অপেক্ষা করিতে হয়, স্ত্রীলোক এতটা পারে না, তাই হরিদয়ালের পত্রের মর্মার্থ দুই-চারি কান করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মেয়ে দেখার দিন হরিবালা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে সেদিন জানিতে আসিয়াছেলেন, চন্দ্রনাথ সরযূকে কতখানি ভালবাসেন। সেদিন মেয়ে-মহলে অস্ফুট-কলকণ্ঠে এ প্রশ্নটা খুব উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল, কেননা, তাহারাই প্রথমে বুঝিয়াছিল যে, শুধু ভালবাসার গভীরতার উপরেই সরযূর ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

সকলেই চাপা গলায় কথা কহে, সকলের মুখেচোখে প্রকাশ পায় যে, একটা পৈশাচিক আনন্দ-প্রবাহ এই কোমল

প্রথমটা হরকালী বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বলিলেন, কি হয়েছে?

রামময়ের বৃদ্ধা জননী ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কি হবে বড়গিন্নী, যা হবার তাই হয়েছে—সর্বনাশ হয়েচে। এই বলিয়া তিনি কাহিনীটা আর একবার আগাগোড়া বিবৃত করিয়া গেলেন। বলিবার সময় অল্পস্বল্প ভুল-

ভ্রান্তি যাহা ঘটিল, তাহা আর পাঁচজনে সংশোধন করিয়া দিল। এইরূপে হরকালী হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সত্যই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা কতটা তাঁহার নিজের এবং কতটা আর একজনের, সেই কথাটাই বেশ করিয়া অনুভব করিতে তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের মধ্যে দ্বার বন্ধ করিলেন, যাঁহারা ভাল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তিত-বিমর্ষমুখে একে একে সরিয়া পড়িলেন। নিভৃত ঘরের মধ্যে আসিয়া হরকালীর আশঙ্কা হইল, তাঁহার দগ্ধ অদৃষ্টে এতবড় সুসংবাদ শেষ পর্যন্ত টিকিবে কি না! তিনি ভাবিলেন, যদি নাই টিকে, উপায় নাই। কিন্তু যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াই থাকে, যদি ভগবান এতদিন পরে সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোনঝিটি এখনও আছে,—এখনও সে পরের হাতে গিয়া পড়ে নাই—এই তার সময়। যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত যে প্রাণপণ করিয়া দেখিতেই হইবে, তাহাতে আর তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি মুখ ম্লান করিয়া যখানে চন্দ্রনাথ লেখাপড়া করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহার মুখের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া চন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মামীমা।

হরকালী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, দুঃখী ব'লে কি আমাদের শাস্তি দিতে হয়!

চন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কি করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

হরকালী বলিতে লাগিলেন, আর বাকি কি? একমুঠো ভাতের জন্য জাত গেল, ধর্ম গেল। বাবা, খাবার থাকলে কি তুমি এমন ক'রে আমাদের সর্বনাশ করতে পারতে!

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনেকটা শান্তভাবে কহিল, হয়েছে কি?

হরকালী আঁচল দিয়া মিথ্যা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া কপালে যা হবার তাই হয়েছে। আমার সোনার চাঁদ তুমি, তোমাকে ডাকিনীরা ভুলিয়ে এই কাণ্ড করেচে।

পায়ে পড়ি মামিমা, খুলে বল!

আর কি বলব? তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস কর।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল। বলিল, খুড়োকেই যদি জিজ্ঞাসা করব, তবে তুমি অমন করচ কেন?

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কচ্চি বাবা,—আর কেন?

চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, কিন্তু ওরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইয়াছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, যদি সর্বনাশ হয়েই থাকে ত অন্য ঘরে যাও—আমার সামনে অমন করো না।

হরকালী তখন চন্দ্রনাথের মৃত-জননীর নামোচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—ওগো, তুমি আমাদের ডেকে এনেছিলে, আজ তোমার ছেলে তাড়িয়ে দিতে চায় গো।

চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, খুলে না বললে, কেমন করে বুঝব মামী, কিসে তোমাদের সর্বনাশ হ'ল। সর্বনাশ সর্বনাশই করছো, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলতে পারলে না।

হরকালী আর একবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, কিছুই জান না—বাবা?

না।

তোমার খুড়োকে কাশী থেকে তোমাদের পাণ্ডা চিঠি লিখেচে।

কি লিখেচে?

হরকালী তখন ঢোক গিলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বাবা, কাশীতে তোমাকে একা পেয়ে ডাকিনীরা ভুলিয়ে যে বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েচে।

চন্দ্রনাথ বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিল, কার গো?

শিরে করতাড়না করিয়া হরকালী বলিলেন, তোমার।

চন্দ্রনাথ কাছে সরিয়া আসিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কার বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে? আমার?

হাঁ।

তার মানে, বিয়ের পূর্বে সরযূ বেশ্যাবৃত্তি করত? মামীমা, ওকে যে দশ বছরেরটি ঘরে এনেচি, সে কথা কি তোমার মনে নাই?

তা ঠিক জানিনে চন্দরনাথ, কিন্তু ওর মায়ের কাশীতে নাম আছে।

তবে সরযূর মা বেশ্যাবৃত্তি করত। ও নিজে নয়?

হরকালী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, ও একই কথা বাবা, একই কথা।

চন্দ্রনাথ ধমক দিয়া উঠিল, কাকে কি বলচ মামী? তুমি কি পাগল হয়েছ?

ধমক খাইয়া হরকালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাগল হবারই কথা যে বাবা! আমাদের দু'জনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দাও—তারপর যেদিকে দু'চক্ষু যায়, আমরা চলে যাই। এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল।

চন্দ্রনাথ রাগের মাথায় বলিল, সেই ভাল।

তবে চলে যাই?

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাও।

তখন হরকালী আবার সশব্দে কপালে করাঘাত করিলেন, হা পোড়াকপাল! শেষে এই অদৃষ্টে ছিল!

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তবু পরিষ্কার ক'রে বলবে না?

সব ত বলেছি।

কিছুই বলনি—চিঠি কৈ?

তোমাব কাকার কাছে।

তাতে কি লেখা আছে?

তাও ত বলেছি।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। গভীর লজ্জায় ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত বার-দুই শিহরিয়া উঠিয়া সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—ছিঃ!

হরকালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন—এমন ভীষণ কঠোর ভাব কোন মৃত-মানুষের মুখেও কেহ কোন দিন দেখে নাই। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ কহিল, কৈ চিঠি দেখি?

মণিশঙ্কর নিঃশব্দে বাক্স খুলিয়া একখানি পত্র তাহার হাতে দিলেন। চন্দ্রনাথ সমস্ত পত্রটা বার-দুই পড়িয়া শুষ্ক-মুখে প্রশ্ন করিল, প্রমাণ?

রাখালদাস নিজেই আসচে।

তাঁর কথায় বিশ্বাস কি?

তা বলতে পারিনে। যা ভাল বিবেচনা হয়, তখন করো।

সে কি জন্য আসছে? এ কথা প্রমাণ ক'রে তার লাভ?

লাভের কথা ত চিঠিতেই লেখা আছে। দু'হাজার টাকা চায়।

চন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল, এ কথা প্রকাশ না হ'লে সে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারত, কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েচে। আপনি এক হিসাবে আমার উপকার করেছেন—এতগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মণিশঙ্কর লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল বলেন যে, তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তথাপি স্মরণ হইল, তাঁহার দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, স্ত্রীকে না বলিলে কে জানিতে পারিত? সুতরাং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এ গ্রাম আমাদের। অথচ একজন দীন, লম্পট ভিক্ষুক আমাকে অপমান করবার জন্য আমার গ্রামে আমার বাড়িতে আসচে যে কি সাহসে সে কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইনে, কিন্তু এই কথাটা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কাকা, আমার মৃত্যু হলে কি আপনি সুখী হন?

মণিশঙ্কর জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও এনো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আর কোনদিন আনবার আবশ্যক হবে না। আপনি আমার পূজনীয়, আজ যদি কোন অপরাধ করি মার্জনা করবেন। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি নিন, নিয়ে আমার 'পরে প্রসন্ন হোন। শুধু যেখানেই থাকি, কিছু কিছু মাসহারা দেবেন—ঈশ্বরের শপথ ক'রে বলচি, এর বেশি আর কিছু চাইব না। কিন্তু এ সর্বনাশ আমার করবেন না।

তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল এবং অধর দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কোনমতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইয়া ফেলিল।

মণিশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথের ডান-হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রজের তুমি একমাত্র বংশধর—আমি ভিক্ষা চাইচি বাবা, আর এ বৃদ্ধকে তিরস্কার করো না।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তিরস্কার করি না কাকা। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের পর দেশত্যাগ করা ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই, সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম।

মণিশঙ্কর বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, দেশত্যাগ করবে কেন? না জেনে এরূপ বিবাহ করেচ, তাতে বিশেষ লজ্জার কারণ নেই—শুধু একটা প্রায়শ্চিত্ত করা বোধ করি প্রয়োজন হবে। চন্দ্রনাথ মৌন হইয়া রহিল। মণিশঙ্কর উৎসাহিত হইয়া পুনরপি কহিলেন, উপায় যথেষ্ট আছে। বউমাকে পরিত্যাগ ক'রে একটা গোপনে প্রায়শ্চিত্ত কর। আবার বিবাহ কর, সংসারী হও—সকল দিক রক্ষা হবে।

চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সংসারাভিজ্ঞ মণিশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কহিল, কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারব না কাকা।

মণিশঙ্কর কহিলেন, পারবে চন্দ্রনাথ। আজ বিশ্রাম কর গে, কাল সুস্থিরচিত্তে ভেবে দেখো এ কাজ শক্ত নয়। বউমাকে কিছুতেই গৃহে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু প্রমাণ না নিয়ে কিরূপে ত্যাগ করতে অনুমতি করেন?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অধিক প্রমাণ যাতে না হয় সে উপায় করব। কিন্তু তোমাকেও আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেই গোল মিটবে।

কে মেটাবে?

আমি মেটাব।

কিন্তু কিছুমাত্র অনুসন্ধান না ক'রেই—

ইচ্ছা হয়, অনুসন্ধান পরে করো। কিন্তু একথা যে মিথ্যা নয়, তা আমি তোমাকে নিশ্চয় বললাম।

চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল; মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে। শয্যার উপর পড়িয়া শূন্যদৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া মানুষ ঘুমাইয়া যেমন করিয়া কথা কহে, ঠিক তেমনি করিয়া সে ঐ একটা কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল। সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে, সে বেশ্যার কন্যা। কথাটা সে অনেকবার অনেক রকম করিয়া নিজের মুখে উচ্চারণ করিল, নিজে কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু মনে বুঝিতে পারিল না। সে সরযূকে ত্যাগ করিয়াছে,—সরযূ বাটীর মধ্যে নাই, ঘরের মধ্যে নাই, চোখের সুমুখে নাই, চোখের আড়ালে নাই, সে আর তাহার নাই। বস্তুটা যে ঠিক কি এবং কি তাহার সম্পূর্ণ আকৃতি, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিল না। অথচ মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, কাজটা শক্ত নয়। কাজটা শক্ত কি সহজ, পারা যায় কি যায় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবাব মত শক্তি মানুষের হৃদয়ে আছে কি না, তাহাও সে স্থির করিতে পারিল

না। সে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল এবং এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিল—কোনটা স্পষ্ট, কোনটা ঝাপসা—ঘুমের ঘোরে কি একরকমের অস্পষ্ট ব্যথা তাহার সর্বাঙ্গে যেন নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাও সে অনুভব করিল, তাহার পর সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, এমন সময় সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, মায়া-মমতার ঠাঁই নাই, রাগ করিবার, ঘৃণা করিবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত অবোধ্য লজ্জার গুরুভারে তাহার সমস্ত দেহ-মন ধীরে ধীরে অবশ ও অবনত হইয়া একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমনি সময়ে বাতি জ্বালিয়া আনিয়া ভৃত্য রুদ্ধ-দ্বারে ঘা দিতেই চন্দ্রনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কপাট খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের উপর আলো লাগিয়া তাহার মোহের ঘোর আপনা আপনিই স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল এবং তাহারই ভিতর দিয়া এখন হঠাৎ সন্দেহ হইল, কথাটা সত্য কি?

সরযূ নিজে জানে কি? জানিয়া শুনিয়া তাহার সরযূ তাহারই এত বড় সর্বনাশ করিবে, এ কথা চন্দ্রনাথ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া সরযূর শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া সরযূ বসিয়া ছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই, যেন একফোঁটা রক্তও নাই। চন্দ্রনাথ একেবারেই বলিল, সব শুনেচ?

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

সব সত্য?

সত্য।

চন্দ্রনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িল,—এতদিন বলনি কেন?

মা বারণ করেছিলেন, তুমিও জিজ্ঞাসা করনি।

তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম, তাই তোমরা এইরূপে শোধ দিলে!

সরযূ অধোমুখ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এখন দেখচি কেন তুমি অত ভয়ে ভয়ে থাকতে, এখন বুঝচি এত ভালবেসেও কেন সুখ পাইনি, পূর্বের সব কথাই এখন স্পষ্ট হয়েচে। এই জন্যই বুঝি তোমার মা কিছুতেই এখানে আসতে স্বীকার করেন নি।

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রনাথ বিগত দিনের সমস্ত কথা স্মরণ করিল। সেই কাশীবাস, সেই চিরশুদ্ধ মূর্তি সরযূর বিধবা মাতা,—সেই তাঁর কৃতজ্ঞ সজল চক্ষু দু'টি, স্নিগ্ধ শান্ত কথাগুলি। চন্দ্রনাথ সহসা আর্দ্র হইয়া বলিল, সরযূ, সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার?

পারি। আমার মামার বাড়ি নবদ্বীপের কাছে। রাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ি আমার মামার বাড়ির কাছেই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মা তাঁকে ভালবাসতেন। দু'জনের একবার বিয়ের কথাও হয়, কিন্তু তাঁরা নিচু ঘর ব'লে বিয়ে হতে পায়নি। আমার বাবার বাড়ি হালিশহর। আমার যখন তিন বৎসর বয়স তখন বাবা মারা যান, মা আমাকে নিয়ে নবদ্বীপ ফিরে আসেন। তার পর আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমাকে নিয়ে মা চন্দ্রনাথ বলিল, তার পরে?

আমরা কিছুদিন মথুরায় থাকি, বৃন্দাবনে থাকি, তার পর কাশীতে আসি। সেই সময়ে রাখাল মদ খেতে শুরু করে। মায়ের কিছু অলঙ্কার ছিল, তাই নিয়ে রোজ ঝগড়া হ'ত। তার পর একরাত্রে সমস্ত চুরি ক'রে পালায়। সে সময় মায়ের হাতে একটি পয়সাও ছিল না। সাত-আট দিন আমরা ভিক্ষা ক'রে কোনরূপে থাকি, তার পরে যা ঘটেছিল, তুমি নিজেই জান।

চন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে সরযূর আনত মুখের দিকে ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি সরযূ, তুমি এই! তোমরা এই!

সমস্ত জেনে শুনে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে, কি মহাপাপিষ্ঠা তুমি!

সরযূর চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। অধিকতর কঠোর হইয়া বলিল, এখন উপায়?

সরযূ চোখের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি ব'লে দাও।

তবে কাছে এস।

সরযূ কাছে আসিলে চন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু আমার সে সাহস হয় না—তোমাকে বিশ্বাস হয় না—আমি সব বিশ্বাস হারিয়েচি।

মুহূর্তের মধ্যে সরযূর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিল, অশ্রুমলিন চোখ দু'টি মুহূর্তের জন্য চকচক করিয়া উঠিল, বলিল, আমাকে বিশ্বাস নেই?

কিছু না—কিছু না, তুমি সব পার।

সরযূ স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, তুমি যে আমার কি, তা তুমিও জান। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে। আজ আমার মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় ব'লে দেব, বল, শুনবে?

শুনব। দাও ব'লে কি উপায়!

সরযূ বলিল, আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি?

চন্দ্রনাথের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইল, যেন পলাইয়া না যাইতে পারে, কহিল, হয়। হয় সরযূ, হয়। বিষ খেতে পারবে?

পারব।

খুব সাবধানে, খুব গোপনে।

তাই হবে।

আজই।

সরযূ কহিল, আচ্ছা, আজই। চন্দ্রনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া সে স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা আশীর্বাদও করলে না?

চন্দ্রনাথ উপর দিকে চাহিয়া বলিল, এখন নয়। যখন চলে যাবে, যখন মৃতদেহ পুড়ে ছাই হবে, তখন আশীর্বাদ করব।

সরযূ পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই করো।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সে আর একবার উঠিয়া গিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি বিষ খেলে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না ত?

কিছু না।

কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না ত?

নিশ্চয় করবে। কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করব।

সরযূ বলিল, বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব, সেইখানা দেখিয়ো।

চন্দ্রনাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, তাই করো। বেশ ক'রে লিখে নীচে নিজের নাম স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখো—কেউ যেন না বুঝতে পারে, আমি তোমাকে খুন করেচি। আর একটা কথা, ঘরের দোর-জানালা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ো—একবিন্দু শব্দ যেন বাইরে না যায়। আমি যেন শুনতে না পাই—

সরযূ দ্বার ছাড়িয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আর একবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে যাও—বলিয়াই তাহার কি যেন সন্দেহ হইল—হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, রোসো আর একটু দাঁড়াও। সে

প্রদীপ কাছে আনিয়া স্বামীর মুখের দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ দুই চোখে একটা অমানুষিক তীব্র-দ্যুতি—ক্ষিপ্তের দৃষ্টির মত তাহা ঝকঝক করিয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, চোখে কি দেখচ সরযূ?

সরযূ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিছু না, আচ্ছা যাও।

চন্দনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল-বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল—সেই ভাল—সেই ভাল—আজই।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে সরযূ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া মনে মনে কহিল, আমি বিষ খেতে কিছুতেই পারব না। একা হ'লে মরতে পারতাম কিন্তু আমি ত আর একা নই—আমি যে মা। মা হয়ে সন্তান বধ করব কেমন ক'রে। তাই সে মরিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সুখের দিন যে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেও তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

গভীর রাত্রে চন্দ্রনাথ সহসা তাহার স্ত্রীর ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সমস্ত শুনিয়া উন্মত্ত-আবেগে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। অস্ফুটে বারংবার কহিতে লাগিল, এমন কাজ কখনো করো না সরযূ, কখনো না। কিন্তু ইহার অধিক সে ত আর কোন ভরসাই দিতে পারিল না। তাহার এই বৃহৎ ভবনে এই হতভাগিনীর জন্য এতটুকু কোণের সন্ধানও ত সে খুঁজিয়া পাইল না, যেখানে সরযূ তাহার লজ্জাহত পাংশু মুখখানি লুকাইয়া রাখিতে পারে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও একবিন্দু মমতাও সে কল্পনা করিতে পারিল না, যাহার আশ্রয়ে সে তপ্ত অশ্রুরাশির একটি কণাও মুছিতে পারে। কাঁদিয়া কাটিয়া সে সাত দিনের সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। ভাদ্র মাসের এই শেষ সাতটি দিন সে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া চিরদিনের মত নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইতে যাইবে। ভাদ্র মাসে ঘরের কুকুর বিড়াল তাড়াইতে নাই,—গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, তাই সরযূর এই আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। একদিন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, আমার দুরদৃষ্ট আমি ভোগ করব, সে জন্য তুমি দুঃখ করো না। আমার মত দুর্ভাগিনীকে ঘরে এনে অনেক সহ্য করেছ, আর করো না। বিদায় দিয়ে আবার সংসারী হও, আমার এমন সংসার যেন ভেঙ্গে ফেলো না।

চন্দ্রনাথ হেঁটমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকে। ভালমন্দ কোন জবাবই খুঁজিয়া পায় না। তবে, এই কথাটা তাহার মনে হইতেছে, আজকাল সরযূ যেন মুখরা হইয়াছে। বেশি কিছু কথা কহিতেছে। এতদিন তাহার মনের মধ্যে যে ভয়টা ছিল, এখন তাহা নাই। দু'দিন পূর্বেও সে মুখ ঢাকিয়া, মুখোশ পরিয়া এ সংসারে বাস করিতেছিল; তখন সামান্য বাতাসেও ভয় পাইত, পাছে তাহার ছদ্ম আবরণ খসিয়া পড়ে, পাছে তাহার সত্য পরিচয় জানাজানি হইয়া যায়। এখন তাহার সে ভয় গিয়াছে। তাই এখন নির্ভয়ে কথা কহিতেছে। এ জীবনে তাহার যাহা-কিছু ছিল, সেই স্বামী, তাহার সর্বস্ব, সমাজের আদালত ডিক্রি জারি করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। এখন সে মুক্তঋণ, সর্বস্বহীন সন্ন্যাসিনী। তাই সে স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহে, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে। আর সেদিনের রাত্রে দুইজন দুইজনকে ক্ষমা করিয়াছে। চন্দ্রনাথ বিষ খাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহার এ আত্মগ্লানি সরযূর সব দোষ ঢাকিয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে হরকালী একখন্ড কাগজে টিকিট আঁটিয়া স্বামীকে দিয়া মাথামুণ্ডু কত-কি লিখাইতেছিলেন।

ব্রজকিশোর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লিখে কি হবে?

হরকালী তাড়া দিয়া বলিলেন, তোমার যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তা'হলে জিজ্ঞেস করতে না। একবার আমার কথা না শুনে এইটি ঘটেছে, আর কোন বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না।

হরকালী যাহা বলিলেন, সুবোধ শিশুর মত ব্রজকিশোর তাহা লিখিয়া লইলেন। শেষ হইলে হরকালী স্বয়ং তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক হয়েছে। নির্বোধ ব্রজকিশোর চুপ করিয়া রহিলেন। অপরাহ্নে হরকালী কাগজখানি হাতে লইয়া সরযূর কাছে আসিয়া কহিলেন, বউমা, এই কাগজখানিতে তোমার নামটি লিখে দাও।

কাগজ হাতে লইয়া সরযূ মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন মামীমা?

যা বলচি, তাই কর না বউমা!

কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুনতে পাব না?

হরকালী মুখখানা ভারী করিয়া কহিলেন, এটা বাছা তোমারই ভালর জন্য। তুমি এখানে যখন থাকবে না, তখন কোথায় কিভাবে থাকবে, তাও কিছু আমরা আর সন্ধান নিতে যাবো না। তা বাছা, যেমন করেই থাক না কেন, মাসে পাঁচ টাকা ক'রে খোরাকি পাবে। একি মন্দ?

ভাল-মন্দ সরযূ বুঝিত। এবং এই হিতাকাঙ্ক্ষিণীর বুকের ভিতর যতটুকু হিত প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাও বুঝিল, কিন্তু যাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নদীগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে আর খানকতক ইট বাঁচাইবার জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না। সরযূ সেই কথা ভাবিলো। তথাপি একবার হরকালীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। সেই দৃষ্টি! যে-দৃষ্টিকে হরকালী সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, ভয় করিতেন, আজিও তিনি এ চাহনি সহিতে পারিলেন না। চোখ নামাইয়া বলিলেন, বউমা!

হাঁ মামীমা, লিখে দিই। সরযূ কলম লইয়া পরিষ্কার করিয়া নিজের নাম সই করিয়া দিল।

আজই দোসরা আশ্বিন—সরযূর চলিয়া যাইবার দিন। প্রাতঃকাল হইতে বড় বৃষ্টি পড়িতেছিল, হরকালী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, পাছে যাওয়া না হয়।

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযূ ঘরের দ্রব্য-সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছিল। মূল্যবান বস্ত্রাদি একে একে আলমারিতে বন্ধ করিল। সমস্ত অলঙ্কার লৌহসিন্দুকে পুরিয়া চাবি দিল, তাহার পর স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়া নিজে ভূমিতলে পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। গৃহত্যাগের সময় যত নিকটে আসিতেছে, ক্লেশ তত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এই সাত দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, আজ সেভাবে কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার শঙ্কা হইল, পাছে, এই শেষ

দিনটিতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, যাইবার সময় পাছে নিতান্ত তাড়িত ভিক্ষুকের মত দেখিতে হয়। আত্মসম্মানটুকুকে সে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছিল; সেইটুকুকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ আসিলে সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, এস, আজ অমার যাবার দিন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ আর-এক দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সরযূ কাছে আসিয়া বলিল, এই চাবি নাও। যত দিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিও না।

চন্দ্রনাথ রূদ্ধস্বরে কহিল, যেখানে হয় রেখে দাও।

সরযূ হাত দিয়া টানিয়া চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কাঁদবার চেষ্টা করচ?

চন্দ্রনাথের মনে হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়াছে। সরযূ তখনই তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল, মনে ক'রে দেখ কোন দিন একটা পরিহাস করিনি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাশা করলাম, রাগ করো না। তাহার পর কহিল, যা-কিছু ছিল, সমস্ত বন্ধ ক'রে আলমরিতে রেখে গেলাম, দেখো, মিছামিছি আমার একটি জিনিসও যেন নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল, নিরাভরণা সরযূর হাতে শুধু চার-পাঁচ গাছি কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। সরযূর এ মূর্তি তাহার দুই চোখে শূল বিদ্ধ করিল, কিন্তু, কি বলিবে সে? আজ দু'খানা অলঙ্কার পরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কি করিয়া সে এই দেবীর প্রতিমূর্তিটিকে অপমান করিবে? সরযূ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি যাচ্চি ব'লে অনর্থক দুঃখ করো না, এতে তোমার হাত নেই, আমি তা জানি।

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, আর পারিল না, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ির সময় স্টেশনে যাইতে হইবে। বৃষ্টি আসিয়াছে, বাটীর বৃদ্ধ সরকার দুই-একখানি কাপড় গামছায় বাঁধিয়া কোচম্যানের কাছে গিয়া বসিল। সেই সীতাদেবীর কথা বোধ করি তাহার মনে পড়িয়াছিল, তাই চোখের জলও বড় প্রবল হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান, আমি ভৃত্য—তাই আজ আমার এই শাস্তি!

যাইবার সময় সরযূ হরকালীর মনের ভাব বুঝিয়া ডাকিয়া প্রণাম করিল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, মামীমা, বাক্সটা একবার দেখ।

হরকালী অপ্রতিভ হইলেন—না না না, থাক;—ততক্ষণে কিন্তু টিনের বাক্স উন্মোচিত হইয়া হরকালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লোভ সংবরণ করা অসম্ভব। বক্রদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, ভিতরে দুই-এক জোড়া সাধারণ বস্ত্র, দুই-তিনটা পুস্তক, কাগজে আবৃত দুইখানা ছবি, আরও দুই-একটা কি কি রহিয়াছে। সরযূ কহিল, শুধু এই আছে।

হরকালী ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই সরযূ গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া ফটক বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতলের জানালা খুলিয়া মণিশঙ্কর তাহা দেখিলেন। আজ তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, বুঝি কাজটা ভাল হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি মণিশঙ্কর ঘুমাইতে পারিলেন না। সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহার দুই কানের মধ্যে একটা ভারী গাড়ির গভীর আওয়াজ গুমগুম শব্দ করিতে লাগিল। প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, গেটের উপর একজন অপরিচিত লোক দীনবেশে অর্ধ-সুপ্তাবস্থায় বসিয়া আছে। কাছে যাইতেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একজন পথিক। মণিশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সে পিছন হইতে ডাকিল, মণিশঙ্করবাবুর বাড়ি কি এই?

তিনি ফিরিয়া বলিলেন, এই।

তাঁহার সহিত কখন দেখা হ'তে পারে, ব'লে দিতে পারেন?

আমার নাম মণিশঙ্কর।

লোকটা সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কাছেই এসেছি।

মণিশঙ্কর তাহার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কাশী থেকে কি আসছ বাপু?

আজ্ঞে হাঁ।

দয়াল পাঠিয়েছে?

আজ্ঞে হাঁ।

টাকার জন্য এসেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

মণিশঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তবে আমার কাছে কেন? আমি টাকা দেব, তাই কি তুমি মনে করেচ?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। দয়ালঠাকুর ব'লে দিয়েচেন, আপনি টাকা পাবার সুবিধে করে দিতে পারবেন।

মণিশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, পারব। তবে ভেতরে এস।

দুইজনে নির্জন-কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। মণিশঙ্কর বলিলেন, সমস্ত তবে সত্য?

সমস্ত সত্য। এই বলিয়া সে কয়েকখানা পত্র বাহির করিয়া দিল। মণিশঙ্কর তাহা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বলিলেন, তবে বউমার দোষ কি?

তার দোষ নেই, কিন্তু মায়ের দোষে মেয়েও দোষী হয়ে পড়েছে।

তবে যার নিজের দোষ নেই, তাকে কি জন্য বিপদগ্রস্ত করচ?

আমারও উপায় নেই। টাকার জন্য সব করতে হয়।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, এ দুর্নাম প্রকাশ পেলে আমারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। চন্দ্রনাথ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাখালদাস মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি নিরুপায়।

সে কথা তোমার দিকে তাকালেই জানা যায়। ধর, টাকা যদি আমি নিজেই দিই, তা হ'লে কি রকম হয়!

ভালই হয়! আর ক্লেশ স্বীকার ক'রে চন্দ্রনাথবাবুর নিকট যেতে হয় না।

টাকা পেলেই তুমি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে, আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, এ নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

কত টাকা চাই?

অন্ততঃ দুই সহস্র।

মণিশঙ্কর বাহিরে গিয়া নায়েব লক্ষীনারায়ণকে ডাকিয়া দুই-তিনটি কথা বলিয়া দিলেন, তাহার পর ভিতরে আসিয়া একসহস্র করিয়া দুইখানি নোট বাক্স খুলিয়া রাখালদাসের হাতে দিয়া বলিলেন, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে সরকারী খাজনা ঘর, সেখানে ভাঙ্গিয়ে নিয়ো, আর কোথাও ভাঙ্গান যাবে না । আর কখনো

এ দিকে এসো না। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট নই, তাই আর যদি কখনো এ দিকে আসবার চেষ্টা কর, জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও বলে দিলাম।

রাখালদাস চলিয়া গেল।

প্রাণপণে হাঁটিয়া অপরাহ্ণে সে শহরে উপস্থিত হইল। তখন কাছারি বন্ধ হইয়াছে। কোন কাজ হইল না। পরদিন সময়ে রাখালদাস খাজাঞ্চীর নিকট দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, টাকা চাই।

খাজাঞ্চীবাবু নোট দুইখনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, বসো, বলিয়া বাইরে গিয়া একজন পুলিশের দারোগা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাখালকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই নোট চুরি হয়েছে। জমিদার মণিশঙ্করবাবুর লোক বলচে, কাল সকালে ভিক্ষার ছল ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকে এই দু'খানি নোট চুরি করেচে। নোটের নম্বর মিলচে।

রাখালদাস কহিল, জমিদারবাবু নিজে দিয়েছেন।

খাজাঞ্চী কহিল, বেশ হাকিমের কাছে বলো।

যথাসময়ে হাকিমের কাছে রাখাল বলিল, যাঁর টাকা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সমস্ত পরিষ্কার হবে। বিচারের দিন ডেপুটির আদালতে জমিদার মণিশঙ্কর উপস্থিত হইয়া হলফ লইয়া বলিলেন, তিনি লোকটাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই। নোট তাহারই বাক্সে ছিল, কাহাকেও দেন নাই। রাখাল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা কহিতে চাহিল, হাকিম তাহা কতক কতক লিখিয়া লইলেন, কতক বা মণিশঙ্করের উকিল-মোক্তার গোলমাল করিয়া দিল। মোটের উপর, কথা কেহই বিশ্বাস করিল না, ডেপুটি তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিদয়ালের বাটীতে পুরাতন দাসীটি পর্যন্ত নাই। বামুন-ঠাকরুন ত সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। সরযূ যখন প্রবেশ করিল, তখন বাটীতে কেহ নাই, শূন্য বাটী হাহা করিতেছে। বৃদ্ধ সরকার কাঁদিয়া কহিল, মা, আমি তবে যাই?

সরযূ প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল—দয়ালঠাকুরের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না—ইচ্ছাও ছিল না।

সন্ধ্যার সময় দয়াল বাটী আসিলেন। সরযূকে দয়াল বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, কে?

সরযূ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া বলিল, আমি।

সরযূ!—দয়াল বিস্মিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে দেখিলেন, সরযূর গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, পরিধেয় বস্ত্র সামান্য, দাসদাসী কেহ সঙ্গে আসে নাই, অদূরে একটা বাক্স মাত্র পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েচে। তাড়িয়ে দিয়েচে?

সরযূ মৌন হইয়া রহিল।

দয়ালঠাকুর তখন অতিশয় কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন, এখানে তোমার স্থান হবে না। একবার আশ্রয় দিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে—আর নয়।

সরযূ মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

মাগী পালিয়েচে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে স'রে পড়েচে, যেমন চরিত্র, সেইরূপ করেচে। রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বলা যায় না—হয়ত কোথাও খুব সুখেই আছে।

সেইখানে সরযূ বসিয়া পড়িল। সে যে অবশেষে তাহার মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত হারাতে চাইনে! যারা আদর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, শেষকালে তারা কি তোমার মাথা রাখবার একটু কুঁড়েও বেঁধে দিতে পারেনি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে? যাও এখান থেকে।

এবার সরযূ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, দাদামশাই, মা নেই, আমি যাব কোথায়?

হরিদয়ালের শরীরে আর মায়া-মমতা নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কাশীর মত স্থানে তোমাদের স্থানাভাব হয় না। সুবিধামত একটা খুঁজে নিয়ো। তিনি নাকি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন, তাই এমন কথাটাও কহিতে পারিলেন।

সরযূর স্বামী তাঁহাকে গৃহে স্থান দেয় নাই, হরিদয়াল দিবেন কেন? ইহাতে তাঁহাকে দোষ দিবার কিছু নাই, সরযূ তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহারও যে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্বামীর গৃহে দু'দিনের আদর-যত্নে অতিথির মত গিয়াছিল—এখন বিদায় হইয়া আসিয়াছে। এ সংসারে, সেই যত্নপরায়ণ গৃহস্থ আর ফিরিয়া দেখিবে না, অতিথিটি কোথায় গেল! বড় যাতনায় তাহার নীরব-অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। এই তাহার সতেরো বছর বয়স—তাহার সব সাধ ফুরাইয়াছে! মাতা নাই, পিতা নাই, স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন। দাঁড়াইবার স্থান নাই, আছে শুধু কলঙ্ক, লজ্জা আর বিপুল রূপযৌবন ।

এ নিয়ে বাঁচা চলে, কিন্তু সরযূর চলে না। সে ভাবিতেছিল, তাহার কত আয়ু, আর কতদিন বাঁচিতে হইবে! যতদিন হউক, আজ তাহার নূতন জন্মদিন। যদিও দুঃখকষ্টের সহিত তাহার পূর্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু এরূপ তীব্র অপমান এবং লাঞ্ছনা কবে সে ভোগ করিয়াছে? দয়ালঠাকুর উত্তরোত্তর উত্তেজিত-কণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন, এবার চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ব'সে রইলে যে?

সরযূ আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাব?

আমি তার কি জানি ?

সরযূ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাদামশাই, আজ রাত্রি—

দূর দূর, একদণ্ডও না।

এবার সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে মনে একটু সাহস হইল, মনে করিল, যাহার কাছে শত অপরাধেও ভিক্ষা চাহিবার অধিকার ছিল, তাহার কাছেই যখন চাহি নাই, তখন পরের কাছে চাহিব কি জন্য? মনে মনে বলিল, আর কিছু না থাকে কাশীর গঙ্গা ত এখনও শুকায় নাই, সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও যায় না; এ দুঃখের দিনে একটি দুঃখী মেয়েকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইবে। আমার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে সেখানে থাকিবেই। সরযূ চলিতে লাগিল, কিন্তু চলিতে পারিল না, আবাব বসিয়া পড়িল।

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, এমন বিপদে তিনি জন্মে পড়েন নাই। তাঁহার গলাটা শুকাইয়া আসিতেছিল; পাছে অবশেষে দমিয়া পড়েন, এই ভয়ে চিৎকার করিয়া কহিলেন, অপমান না হলে বুঝি যাবে না? এই বেলা দূর হও—

এমন সময় সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল, বাবাজী!

হরিদয়াল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন । ঐ বুঝি খুড়ো আসচে। বলিতে বলিতেই কৈলাসচন্দ্র এক হাতে দাবার পুঁটুলি, অপর হাতে হুঁকা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে এইমাত্র আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; গোলমাল শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হরিদয়ালের তিরষ্কার ও গালিগালাজ শুনিতেছিলেন । তাই যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাতে দাবার পুঁটুলি ও হুঁকা ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছিল না। সোজা সরযূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সরযূ যে! কখন এলে মা?

সরযূ কৈলাসখুড়োকে চিনিত, প্রণাম করিল।

তিনি আশীর্বাদ করিলেন, এস মা, এস। তোমাদের ছেলের বাড়িতে না গিয়ে এখানে কেন মা? তাহার পর হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া সরযূর টিনের বাক্সটা

একেবারে কক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, চল মা, সন্ধ্যা হয়। কথাগুলি তিনি এরূপভাবে কহিলেন, যেন তাহাকে লইবার জন্যই আসিয়াছিলেন!

সরযূ কোন কথাই পরিস্কার বুঝিতে পারিল না, অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন, কহিলেন, তোর বুড়ো ছেলের বাড়ি যেতে লজ্জা কি? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বলবে না, মা-ব্যাটায় মিলে নূতন করে ঘরকন্না করব। চল মা, দেরি করিস নে।

সরযূ তথাপি উঠতে পারিল না। হরিদয়াল হাঁকিয়া বলিলেন, খুড়ো, কি করচো?

কিছু না বাবাজী। কিন্তু তখনই সরযূর খুব নিকটে আসিয়া হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিবার মত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, চল্ না মা, বসে বসে কেন মিছে কটু কথা শুনচিস?

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া হরিদয়াল কহিলেন, খুড়ো কি একে বাড়ি নিয়ে যাচ্চ?

খুড়ো জবাব দিলেন, না বাবা, রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্চি।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কিন্তু খুড়ো কাজটি ভাল হচ্চে না। কাল কি হবে, ভেবে দেখো।

কৈলাস তাহার উত্তর দিলেন না, কিন্তু সরযূকে কহিলেন, শিগ্‌গির চল না মা, নইলে আবার হয়ত কি ব'লে ফেলবে।

সরযূ দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িল। কৈলাসচন্দ্রও ঘাড়ে বাক্স লইয়া পশ্চাতে চলিলেন।

হরিদয়াল পিছন হইতে কহিলেন, খুড়ো, শেষে কি জাতটা দেবে?

কৈলাসচন্দ্র না ফিরিয়াই বলিলেন, বাবাজী, নাও ত দিতে পারি।

আমাদের সঙ্গে তবে আহার বন্ধ হ'ল।

কৈলাসচন্দ্র এবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কবে কার বাড়িতে দয়াল, কৈলাসখুড়ো পাত পেতেছে?

তা না পাত, কিন্তু সাবধান করে দিচ্চি।

কৈলাস ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাশীবাসের মধ্যে আজ তাঁহার এই প্রথম ক্রোধ দেখা দিল। বলিলেন, হরিদয়াল, আমি কি কাশীর পাণ্ডা, না যজমানের মন জুগিয়ে অন্নের সংস্থান করি? আমাকে ভয় দেখাচ্চ কেন? আমি যা ভাল বুঝি, তাই চিরদিন করেচি, আজও তাই করব। সেজন্য তোমার দুর্ভাবনার আবশ্যক নেই।

হরিদয়াল শুষ্ক হইয়া কহিলেন, তোমার ভালর জন্য—

থাক বাবাজী! যদি এই পঁয়ষট্টি বছর তোমার পরামর্শ না নিয়েই কাটাতে পেরে থাকি, তখন বাকি দু'চার বছর পরামর্শ না নিলেও আমার কেটে যাবে। যাও বাবাজী, ঘরে যাও।

হরিদয়াল পিছাইয়া পড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র বাটীতে পৌঁছিয়া বাক্স নামাইয়া সহজভাবে বলিলেন, এ ঘরবাড়ি সব তোমার মা, আমি তোমার ছেলে। বুড়োকে একটু-আধটু দেখো, আর তোমার নিজের ঘরকন্না চালিয়ে নিয়ো, আর কি বলব?

কৈলাসের আর কোন কথা কহিবার ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সরযূ বহুক্ষণ অবধি অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোন কথাই আর বলিবার নাই।

সরযূ আশ্রয় পাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকালে প্রাতঃসমীরণ যখন স্নিগ্ধ-মধুর সঞ্চরণে চন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিত, সারা রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের পর চন্দ্রনাথ এই সময়টিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার পর তপ্ত সূর্যরশ্মি জানালা দিয়া তাহার মুখের উপর, চোখের উপর পড়িত, চন্দ্রনাথের আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু ঘুমের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, পাতায় পাতায় জড়াইয়া থাকিত, তথাপি সে জোর করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। সারাদিন কাজকর্ম নাই, আমোদ নাই, উৎসাহ নাই, দুঃখ-ক্লেশও প্রায় নাই; সুখের কামনা ত সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। শীর্ণকায়া নদীর উপর দিয়া সন্ধ্যার দীর্ঘ ভারবাহী তরণী যেমন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া মন্থরগমনে স্বেচ্ছামত ভাসিয়া যায়, চন্দ্রনাথের ভাবী দিনগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া এক সূর্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত ভাসিয়া যাইতে থাকে। সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে, যে দিগন্ত-প্রসারিত কালোমেঘ তাহার মুখের সূর্যকে জীবনের মধ্যাহ্নেই আচ্ছাদিত করিয়াছে, এই মেঘের আড়ালেই একদিন সে সূর্য অস্তগমন করিবে। ইহজীবনে আর সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে না। তাহার নীবব, নির্জন কক্ষে এই নিরাশার কালো ছায়াই প্রতিদিন ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল এবং তাহারি মাঝখানে বসিয়া চন্দ্রনাথ অলস-নিমীলিত চোখে দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

হরকালী বলেন, এই অগ্রহায়ণ মাসেই চন্দ্রনাথের আবার বিবাহ হইবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকে। এই চুপ করিয়া থাকা সম্মতি বা অসম্মতির লক্ষণ, তাহা নির্ণয় করিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার তর্ক-বিতর্ক হয়। মণিশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলা যায় না।

এবার কার্তিক মাসে দুর্গাপূজা। মণিশঙ্করের ঠাকুর-দালান হইতে সানাইয়ের গান প্রাতঃকাল হইতে গ্রামবাসীদের কানে কানে আগামী আনন্দের বার্তা ঘোষণা করিতেছে। চন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। নিমীলিতচক্ষে বিছানায় পড়িয়া শুনিতেছিল, একে একে কত কি সুর বাজিয়া যাইতেছে। কিন্তু একটা সুরও তাহার কাছে আনন্দের ভাষা বহিয়া আনিল না; বরঞ্চ ধীরে ধীরে হৃদয়-আকাশ গাঢ় কালোমেঘে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, এখানে আর ত থাকা যায় না; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নে, রাত্রির গাড়িতে এলাহাবাদ যাব।

এ কথা হরকালী শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, ব্রজকিশোর আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি মণিশঙ্কর নিজে আসিয়াও অনুরোধ করিলেন যে আজ ষষ্ঠীর দিনে কোথাও গিয়া কাজ নাই।

চন্দ্রনাথ কাহারও কথা শুনিল না।

দুপুরবেলা হরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরযূ গিয়া অবধি এ বাটীতে তিনি আসেন নাই।

চন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, হঠাৎ ঠানদিদি কি মনে ক'রে!

ঠানদিদি জবাব না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ বিদেশে যাচ্চ?

চন্দ্রনাথ বলিল, যাচ্চি।

পশ্চিমে যাবে?

যাবো।

হরিবালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দাদা, আর কোথাও যাবে কি?

চন্দ্রনাথ হরিবালার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল, না। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল।

হরিবালা যে কত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে তাঁহার লজ্জা করিতেছেল, সাহসও হইতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, তার একটা উপায় করলে না? দুইজনের দেখা হওয়া অবধি দুইজনেই মনে মনে তাহার কথাই ভাবিতেছিল,—তাই এই সামান্য কথাটিতে দুইজনের চক্ষেই জল আসিয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ সামলাইয়া লইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, উপায় আর কি করব দিদি?

কাশীতে সে আছে কোথায়?

বোধ হয়, তার মায়ের কাছে আছে।

তা আছে, কিন্তু—

চন্দ্রনাথ মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি?

ঠানদিদি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রাগ করো না দাদা—

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ঠানদিদি তেমনি মৃদু মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ো দাদা—আজ যেন সে একলা আছে, কিন্তু দু'দিন পরে—

চন্দ্রনাথ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, কি দু'দিন পরে?

বড় বড় দু'ফোটা চোখের জল হরিবালা চন্দ্রনাথের সম্মুখেই মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তার পেটে যা আছে, ভালয় ভালয় তা যদি বেঁচে-বত্তে থাকে, তা হ'লে—

চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, ঠানদিদি আজ বুঝি ষষ্ঠী?

হ্যাঁ, ভাই।

আজ তা হ'লে—

যাবে না মনে কচ্চ?

তাই ভাবছি।

তবে তাই করো। পূজোর'পর যেখানে হয় যেয়ো, এ ক'টা দিন বাড়িতেই থাক।

কি জানি কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত হইল।

বিজয়ার পর একদিন চন্দ্রনাথ গোমস্তাকে ডাকিয়া বলিল, সরকারমশাই, কাশীতে তাকে রেখে আসবার সময় হরিদয়াল কি কিছু ব'লে দিয়েছেলেন?

সরকার কহিল, তাঁর সঙ্গে আমার ত দেখা হয় নি।

চন্দ্রনাথ ভয় পাইয়া কহিল, দেখা হয় নি? তবে কার কাছে দিয়ে এলেন? তার মায়ের সঙ্গে ত দেখা হয়েছিল?

সরকার মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না, বাড়িতে ত কেউ ছিল না।

কেউ ছিল না? সে বাড়িতে কেউ থাকে কি না, সে সংবাদ নিয়েছিলেন ত? হরিদয়াল আর কোথাও উঠে যেতেও ত পারেন!

সরকার কহিল, সে সংবাদ নিয়েছিলাম। দয়াল ঘোষাল সেই বাড়িতে থাকতেন।

চন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পর্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে, টাকাকড়ি ত কিছু পাঠাই নি।

পাঠান নি! চন্দ্রনাথ বিস্ময়ে, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় পাংশুবর্ণ হইয়া কহিল, কেন?

সরকার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কহিল, মামাবাবু বলেন, পাঁচ টাকার হিসাবে কিছু পাঠালেই হবে।

জবাব শুনিয়া চন্দ্রনাথ অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল।

পাঁচ টাকার হিসাবে? কেন, টাকা কি মামাবাবুর? আপনি প্রতি মাসে কাশীর ঠিকানায় পাঁচ শ টাকা করে পাঠাবেন।

সরকার, যে আজ্ঞে, বলিয়া স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

হরকালী এ কথা শুনিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে পাগল হয়েচে। সরকারকে তলব করিয়া অন্তরাল হইতে জোর করিয়া হাসিলেন। হাসির ছটা ও ঘটা বৃদ্ধ সরকার শুনিতেও পাইলো, বুঝিতেও পারিল। হরকালী কহিলেন, সরকারমশাই, কত টাকা পাঠাতে বলেচে?

প্রতিমাসে পাঁচ শ টাকা।

ভিতর হইতে পুনর্বার বিদ্রূপের হাসি শুনিয়া সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

হরকালী অনেক হাসিয়া পরিশেষে গম্ভীর হইলেন। ভিতর হইতে বলিলেন, আহা, বাছার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। সে পোড়া-কপালীর যেমন অদৃষ্ট! আমি পাঁচ টাকা ক'রে দিতে বলেচি, তাই রেগে উঠেচে। বলে, পাঁচ শ টাকা করে দিও। বুঝলেন সরকারমশায়, চন্দ্রনাথের ইচ্ছা নয় যে, এক পয়সাও দেওয়া হয়।

কথাটা কিন্তু সরকার মহাশয় প্রথমে তেমন বুঝিল না; কিন্তু মনে মনে যত হিসাব করিল, তত বোধ হইতে লাগিল, হরকালীর কথাটাই সত্য। যাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে কি কেহ ইচ্ছাপূর্বক অত টাকা দেয়?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তা আপনি যা বলেন।

বলব আর কি! এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না?

সরকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই হবে।

হ্যাঁ, তাই। আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। চন্দ্র না দেয়, আমার হিসেব থেকে পাঁচ টাকা পাঠাবেন।

হরকালী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া নিজের হিসাবে হাতখরচ পাইতেন।

সরকার মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় বলিল, তাই পাঠাব।

চন্দ্রনাথ বাড়ি নাই। এলাহাবাদ গিয়াছে। সরকার মহাশয় তাহাকে পত্র লিখিয়া মতামত জানিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু পরে মনে হইল, এরূপ অসম্ভব

কথা লইয়া অনর্থক তোলাপাড়া করিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়া লাভ নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উপরিউক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরে আর কোন পরিবর্তন হউক বা না হউক, কৈলাশখুড়ার জীবনে বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেদিন তাঁহার কমলা চলিয়া গিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার কমলচরণ সর্বশেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করিয়া ইহজীবনের মত চক্ষু মুদিয়াছিল, সেই দিন হইতে বিপুল বিশ্বও কৈলাশচন্দ্রের পক্ষে চক্ষু মুদিয়াছিল; কিন্তু সরযূর ওই ক্ষুদ্র শিশুটি তাঁহাকে পুনর্বার সেই বিস্মৃত-সংসারের স্নেহময় জটিল-পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেদিন তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু-দু'টি বহুদিন পরে আর-একবার জলে ভরিয়া গিয়াছিল, চক্ষু মুছিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ঘরে বিশ্বেশ্বর এসেছেন।

তখনও সে ছোট ছিল; 'বিশু' বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিতে পারিত না, শুধু চাহিয়া থাকিত। তখন সে সরযূর ক্রোড়ে, লখীয়ার মার ক্রোড়ে এবং বিছানায় শুইয়া থাকিত; কিন্তু যেদিন হইতে সে তাহার চঞ্চল পা-দু'টি চৌকাঠের বাহিরে লইয়া যাইতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, দুধের চেয়ে জল ভাল এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া পরিষ্কার-অপরিষ্কার সর্ববিধ জলপাত্রেই মুখ ডুবাইয়া সরযূকে ফাঁকি দিয়া আকণ্ঠ জল খায় এবং যেদিন হইতে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহার শুভ্রকোমল উদর এবং মুখের উপর কয়লা কিংবা ধূলার প্রলেপ দিতে পারিলেই দেহের শোভা বাড়ে, সেইদিন হইতে সে সরযূর কোল ছাড়িয়া মাটি এবং তথা হইতে কৈলাসচন্দ্রের ক্রোড়ে স্থান করিয়া লইয়াছে। সকালবেলা কৈলাসচন্দ্র ডাকেন, 'বিশু', বিশু মুখ বাড়াইয়া বলে, 'দাদু'; কৈলাসচন্দ্র বলেন, 'চল ত দাদা, শম্ভু মিশিরকে এক বাজি দিয়ে আসি', সে অমনি দাবার পুঁটলিটা হাতে লইয়া 'তল' বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরে। কৈলাসচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সরযূকে ডাকিয়া বলেন, মা, বিশু আমার

একদিন পাকা খেলোয়াড় হবে। সরযূ মুখ টিপিয়া হাসে, বিশু দাবার পুঁটলি হাতে লইয়া বৃদ্ধের কোলে বসিয়া দাবা খেলিতে বাহির হয়। পথে যাইতে যদি কেহ তামাশা করিয়া কহে, খুড়ো, বুড়ো-বয়সে কি আরও দুটো হাত গজিয়েছে?

বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া বলেন, বাবাজী, এ হাত-দুটোতে আর জোর নেই, বড় শুকনো হয়ে গেছে; তাই দু'টো নতুন হাত বেরিয়েচে, যেন সংসারের গাছ থেকে প'ড়ে না যাই।

তাহারা সরিয়া যায়—বুড়োর কাছে কথায় পারিবার জো নেই।

শম্ভু মিশিরের বাটীতে সতরঞ্চ খেলার মধ্যে শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। দাদামহাশয়ের জানুর উপর বসিয়া, লাল রঙের কোঁচা ঝুলাইয়া, গম্ভীরভাবে চাহিয়া থাকে, যেন দরকার হইলে সেও দুই-একটা চাল বলিয়া দিতে পারে।

হস্তীদন্তনির্মিত বলগুলা যখন একটির পর একটি করিয়া তাহার দাদামহাশয়ের হস্তে নিহত হইতে থাকে, অতিশয় উৎসাহের সহিত বিশ্বেশ্বর সেগুলি দুই হাতে লইয়া পেটের উপর চাপিয়া ধরে। কিন্তু লাল রঙের মন্ত্রীটার উপরই তাহার ঝোঁকটা কিছু অধিক। সেটা যতক্ষণ হাতে না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে তাগিদ দিয়া কহে, দাদু ঐতে? কৈলাসচন্দ্র খেলার ঝোঁকে অন্যমনস্ক হইয়া কহেন, দাঁড়া দাদা—। কখনও হয়ত বা সে আশেপাশে সরিয়া যায়, কৈলাসচন্দ্রের মনটিও চঞ্চলভাবে একবার বিশু ও একবার সতরঞ্চের উপর আনাগোনা করিতে থাকে, গোলমালে হয়ত বা একটা বল মারা পড়ে—কৈলাসচন্দ্র অমনি ফিরিয়া ডাকেন, দাদু, হেরে যাই যে—আয় আয় ছুটে আয়। বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া তাহার পূর্বস্থান অধিকার করিয়া বসে, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরও দ্বিগুণ উৎসাহ ফিরিয়া আসে। খেলা শেষ হইলে সে লাল মন্ত্রীটা হাতে লইয়া দাদামহাশয়ের কোলে উঠিয়া বাটী ফিরিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্রের এইরূপে নূতন ধরনের দিনগুলা কাটে। পুরাতন বাঁধা নিয়মে বিষম বাধা পড়িয়াছে। সাবেক দিনের মত দাবার পুঁটলি আর সব সময়ে তেমন যত্ন পায় না, হয়ত বা ঘরের কোণে একবেলা পড়িয়া থাকে; শম্ভু মিশিরের সহিত রোজ সকালবেলা হয়ত বা দেখাশুনা করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। গঙ্গা পাঁড়ের দ্বিপ্রাহরিক খেলাটা ত একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আর তেমন লোক জমে না,—মুকুন্দ ঘোষ ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়াছে—কৈলাসচন্দ্রকে রাত্রে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে সময়টা তিনি প্রদীপের আলোকে বসিয়া নূতন শিষ্যটিকে খেলা শিখাইতে থাকেন; বলেন, বিশু, ঘোড়া আড়াই পা চলে।

বিশু গম্ভীরভাবে বলে, ঘোয়া—

হাঁ ঘোড়া—

ঘোয়া চলে—ভাবটা এই যে, ঘোড়া চলে।

হাঁ, ঘোড়া চলে, আড়াই পা চলে।

বিশ্বেশ্বরের মনে নূতন ভাবোদয় হয়, বলে গায়ী চয়ে—

কৈলাসচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না দাদা, এ ঘোড়া গাড়ি টানে না। সে ঘোড়া আলাদা।

সরযূ এ সময়ে নিকটে থাকিলে, পুত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

বিশু আঙুল বাড়াইয়া বলে, ঐতে। অর্থাৎ সেই লাল রঙের মন্ত্রীটা এখন চাই। বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেন না যে, এতগুলা দ্রব্য থাকিতে ঐ লাল মন্ত্রীটার উপরেই তাহার এত নজর কেন?

প্রার্থনা কিন্তু অগ্রাহ্য হইবার জো নাই। বৃদ্ধ প্রথমে দুই-একটা 'বোড়ে' হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন; বিশু বড় বিজ্ঞ, কিছুতেই ভুলিত না। তখন

অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রার্থিত বস্তুটি তুলিয়া দিয়া বলিতেন, দেখিস দাদা, যেন হারায় না।

কেন?

মন্ত্রী হারালে কি খেলা চলে?

চয়ে না?

কিছুতেই না।

বিশু গম্ভীর হইয়া বলিত, দাদু—মন্‌তী!

হাঁ দাদু—মন্ত্রী!

সেদিন ভোলানাথ চাটুয্যের বাটীতে কথা হইতেছিল, কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, বিশু, চল দাদা, কথা শুনে আসি।

বিশ্বেশ্বর তখন লাল কাপড় পরিয়া, জামা গায়ে দিয়া, টিপ পরিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দাদুর কোলে চড়িয়া কথা শুনিতে গেল। কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণকণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত মৃগ-শাবক কাতরনয়নে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আহা, রাজা ভরত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময় বিশু একটু সরিয়া বসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন।

তাহার পর কথক গাহিলেন, সেই মৃগ-শিশু কেমন করিয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে তাঁহার ছিন্ন স্নেহডোর আবার গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই শতভগ্ন মায়াশৃঙ্খল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে জড়াইয়া দিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই মৃগ-শিশু নিত্যকর্ম পূজাপাঠ, এমন কি, ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে আসিয়াও অংশ লইয়া যাইত। ধ্যান করিবার সময়ে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেন, সেই নিরাশ্রয় পশু-শাবকের সজলকরুণ-দৃষ্টি তাঁহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার পর সে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে কুটীর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া

পুষ্পকাননে, তাহার পর অরণ্যে, ক্রমে সুদূর অরণ্যপথে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ফিরিয়া আসিবার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে রাজা ভরত উৎকণ্ঠিত হইতেন। সঘনে ডাকিতেন, আয়, আয়, আয়! তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে আজন্ম মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া গেল,—বনের পশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না, কেহ সে আকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন, প্রতি কন্দরে কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না। প্রথমে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল, পূজাপাঠ উঠিয়া গেল—তাঁহার ধ্যান, চিন্তা—সব সেই নিরুদ্দেশ স্নেহাস্পদের পিছে পিছে অনুদ্দেশ বনপথে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

কবি গাহিলেন, মৃত্যুর কালোছায়া ভূলুণ্ঠিত ভরতের অঙ্গ অধিকার করিয়াছে, কণ্ঠ রূদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তৃষিত ওষ্ঠ ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেন এখনও ডাকিতেছেন, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সবলে বক্ষে চাপিয়া হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্তরের অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আয়, আয়, আয়!

সভায় কেহই বৃদ্ধের এ ক্রন্দন অস্বাভাবিক মনে করিল না। কারণ, বয়সের সহিত সকলেরই কেহ না কেহ হারাইয়া গিয়াছে। সকলেরই হৃদয় কাঁদিয়া ডাকিতেছে—ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কৈলাসচন্দ্র চক্ষু মুছিয়া বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন, চল দাদা, বাড়ি যাই—রাত্তির হয়েচে।

বিশু কোলে উঠিয়া বাড়ি চলিল। অনেকক্ষণ একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ঘুম পাইয়াছিল, পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ি গিয়া কৈলাসচন্দ্র সরযূর নিকট তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, নে মা, তোর জিনিস তোর কাছে থাক।

সরযূ দেখিল, বুড়োর চক্ষু-দুটি আজ বড় ভারী হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দুই বৎসরের মধ্যে চন্দ্রনাথের সহিত তাহার বাটীর সম্বন্ধই ছিল না। শুধু অর্থের প্রয়োজন হইলে সরকারকে পত্র লিখিত, সরকার লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া দিত।

দুঃখ করিয়া হরকালী মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। ব্রজকিশোর ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিতেন। মণিশঙ্করও দুই-একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে।

প্রথমে চন্দ্রনাথ সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিত না, কিন্তু, যেদিন হরিবালা লিখিলেন, তুমি সুবিধা পাইলে একবার আসিয়ো, কিছু বলিবার আছে, সেই দিন চন্দ্রনাথ তল্পি বাঁধিয়া গাড়িতে উঠিল।

হরিবালা যদি কিছু কহেন, যদি কোন পত্র, যদি কোন হস্তলিপি দেখাইতে পারেন, যদি সেই বিগত সুখের একটু আভাস তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইলে—কিছু নয়। তথাপি চন্দ্রনাথ বাটী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু এতখানি পথ যে আশায় ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল, বাটীতে আসিয়া তাহার কিছুই মিলিল না। হরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ঠানদিদি, আর কিছু বলবে না?

না, আর কিছু না।

নিরাশ হইয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কেন মিথ্যা ক্লেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনলে?

বাড়ি না এলে কি ভাল দেখায়? তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, যা হবার হয়েছে—এখন তুমি সংসারী না হ'লে আমাদের দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে না।

চন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা আমি কি করব?

কিন্তু মণিশঙ্কর কিছুতেই ছাড়িলেন না। হাত ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমাকে মাপ কর। সেই দিন থেকে যে জ্বালায় জ্বলে যাচ্চি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।

চন্দ্রনাথ বিপন্ন হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

মণিশঙ্কর পুনরপি বলিতে লাগিলেন, আবার বিবাহ ক'রে সংসারধর্ম পালন কর। আমি তোমার মনোমত পাত্রী অন্বেষণ করে রেখেচি, শুধু তোমার অভিপ্রায় জানবার অপেক্ষায় এখনও কথা দিইনি। বাবা, এক সংসার গত হ'লে লোকে কি দ্বিতীয় সংসার করে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, এক সংসার গত হয়েচে—সে সংবাদ পেলে পারি।

দুর্গা—দুর্গা—এমন কথা বলতে নেই বাবা।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল।

মণিশঙ্কর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার মনে হয়, আমিই তোমাকে সংসারত্যাগী করিয়েচি। এ দুঃখ আমার ম'লেও যাব না।

চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করেচেন?

মণিশঙ্কর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কলকাতায়; তুমি একবার নিজে দেখে এলেই হয়।

চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কালই যাব।

মণিশঙ্কর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাই করো। যদি পছন্দ হয় আমাকে পত্র লিখো, আমি বাটীর সকলকে নিয়ে একেবারে কলকাতায় উপস্থিত হব।

কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, আমার আর বাঁচবার বেশি দিন নেই চন্দ্রনাথ, তোমাকে সংসারী এবং সুখী দেখলেই স্বচ্ছন্দে যেতে পারব।

পরদিন চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিল। সঙ্গে মাতুল ব্রজকিশোরও আসিয়াছিলেন। কন্যা দেখা শেষ হইলে ব্রজকিশোর বলিলেন, কন্যাটি দেখিতে মা-লক্ষ্মীর মত।

চন্দ্রনাথ মুখ ফারাইয়া রহিল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

স্টেশনে আসিয়া টিকিট লইয়া দুইজনে গাড়িতে উঠিলে ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বাবাজী, পছন্দ হয়েছে ত?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন,—এমন মেয়ে, তবু পছন্দ হ'ল না?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি সরযূকে দেখেন নাই।

তাহার পর নির্দিষ্ট স্টেশনে ট্রেন থামিলে ব্রজকিশোর নামিয়া পড়িলেন। চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট লইয়াছিল।

ব্রজকিশোর বলিলেন, তবে কতদিনে ফিরবে?

কাকাকে প্রণাম জানিয়ে বলবেন, শীঘ্র ফেরবার ইচ্ছা নেই।

মণিশঙ্কর সে কথা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, যা হয় হবে। আমার দেহটা একটু ভাল হ'লেই নিজে গিয়ে বউমাকে ফিরিয়ে আনব। মিথ্যা সমাজের ভয় ক'রে চিরকাল নরকে পচতে পারব না—আর সমাজই বা কে? সে ত আমি নিজে।

হরকালী এ সংবাদ শুনিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, মরবার আগে মিন্‌সের বায়াত্তুরে ধরেচে! সরকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রনাথ কি বললে?

সরকার কহিল, আজ পর্যন্ত কত টাকা কাশীতে পাঠানো হয়েচে?

শুধু এই জিজ্ঞেস করেছিল—আর কিছু না?

না।

হরকালী মুখের ভাব অতি ভীষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ সঙ্কল্প পরিবর্তন করিয়া কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সঙ্গে যে দুইজন ভৃত্য ছিল, তাহারা গাড়ি ঠিক করিয়া জিনিসপত্র তুলিল; কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহাতে উঠিল না; উহাদিগকে ডাকবাংলায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে অন্য পথে চলিয়া গেল। পথে চলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ, নিজের প্রতি পদক্ষেপ নিজের বুকের উপরেই যেন পদাঘাতের মত বাজিতে লাগিল, তথাপি চন্দ্রনাথ চলিতে লাগিল, থামিতে পারিল না। ক্রমেই হরিদয়ালের বাটীর দূরত্ব কমিয়া আসিতেছে। এ সমস্তই যে তাহার বিশেষ পরিচিত পথ! গলির মোড়ের সেই ছোট চেনা দোকানটি—ঠিক তেমনি রহিয়াছে। দোকানের মালিক ঠিক তত বড় ভুঁড়িটি লইয়াই মোড়ার উপর বসিয়া ফুলুরি ভাজিতেছে। চন্দ্রনাথ একবার দাঁড়াইল, দোকানদার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সাহেবী পোশাক-পরা লোকটিকে সাহস করিয়া ফুলুরি কিনিতে অনুরোধ করিতে পারিল না, একবার চাহিয়াই সে নিজের কাজে মন দিল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। এই মোড়ের শেষে—আর ত তাহার পা চলে না। সঙ্কীর্ণ কাশীর পথে যেন বিন্দুমাত্র বাতাস নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ হইতেছে, দুই-এক পা গিয়া সে দাঁড়ায়—আবার চলে, আবার দাঁড়ায়, পথ আর ফুরায় না, তথাপি মনে হয়, এ পথ যেন না ফুরায়! পথের শেষে না জানি কিবা দেখিতে হয়! তারপর হরিদয়ালের বাটীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, ডাকিতে চাহিল, কিন্তু গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

বদ্ধ-স্বর, ভগ্ন-শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন সাহস করিয়া ডাকিল, ঠাকুর, দয়ালঠাকুর! কেহ উত্তর

দিল না। পথ দিয়া যাহারা চলিয়া যাইতেছিল, অনেকেই চন্দ্রনাথের রীতিমত সাহেবী পোশাক দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রনাথ আবার ডাকিল, দয়ালঠাকুর!

এবার ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে উত্তর আসিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

যে উত্তর দিল সে একজন বাঙ্গালী দাসী।

সে দ্বার পর্যন্ত আসিয়া চন্দ্রনাথের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া লুকাইয়া পড়িল কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পলাইয়া গেল না। অন্তরাল হইতে বলিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

কখন আসবেন?

দুপুরবেলা।

চন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দ, শঙ্কা ও লজ্জা তিনের সংমিশ্রণে বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে সরযূ আছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে আর কেউ নেই?

না।

তারা কোথা?

কারা?

একজন স্ত্রীলোক—

এই আমি ছাড়া আর ত কেউ এখানে নাই!

একটা ছোট ছেলে?

না, কেউ না।

চন্দ্রনাথ পইঠার উপরে বসিয়া পড়িল, এরা তবে গেল কোথায়?

দাসী বিব্রত হইয়া পড়িল। বলিল, না গো, এখানে কেউ থাকে না। আমি আর ঠাকুরমশাই থাকি। এক মাসের মধ্যে কোন যজমানও আসেনি।

চন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মনে যে-সব কথা উঠিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বহুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতদিন এখানে আছ?

প্রায় দেড় বছর।

তবুও কাউকে দেখনি? একজন গৌরবর্ণ স্ত্রীলোক আর একটি ছেলে, না হয় মেয়ে, না হয় শুধু ঐ স্ত্রীলোকটি, কেউ না, কাউকে দেখনি?

না, আমি কাউকে দেখিনি।

কারো মুখে কোন কথা শোননি?

না

চন্দ্রনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সেইখানে দয়ালঠাকুরের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই সরযূ আর বাঁচিয়া নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল, তথাপি শুনিয়া যাওয়া উচিত, এই জন্যই বসিয়া রহিল। এক-একটি মিনিট এক-একটি বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে হরিদয়াল ঠাকুর বাটী আসিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি চমকিত হইলেন, পরে চিনিতে পারিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, তাইত, চন্দ্রবাবু যে, কখন এলেন?

চন্দ্রনাথ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, অনেকক্ষণ, এরা কোথায়?

হ্যাঁ এরা—তা এরা—

চন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণপণ-শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে শেষ হ’ল?

কি শেষ হল?

চন্দ্রনাথ শুষ্ক-ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, সরযূ কবে মরেছে ঠাকুর?

ঠাকুর এবার বুঝিয়া বলিলেন, মরবে কেন, ভালই আছে।

কোথায় আছে?

কৈলাসখুড়োর বাড়িতে।

সে কোথায়?

এই গলির শেষে। কাঁটালতলার বাড়িতে।

কপাল টিপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ পুনর্বার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে এখানে নেই কেন?

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, মন্দ নয়; এবং মিথ্যা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, আপনি যাকে বাড়িতে জায়গা দিতে পারলেন না, আমি দেব কি বলে? আমারো ত পাঁচজনকে নিয়েই কাজ?

চন্দ্রনাথ বুঝিল, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটু ভাবিয়া বলিল, কৈলাসখুড়ার বাড়িতে কেমন ক'রে গেল?

তিনি নিজে নিয়ে গেছেন।

কে তিনি?

কাশীবাসী একজন দুঃখী ব্রাহ্মণ।

সরযূ তাঁকে আগে থেকেই চিনত কি?

হ্যাঁ, খুব চিনত।

তাঁর বয়স কত?

বুড়া হরিদয়াল মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাঁর বয়স বোধ হয় ষাট-বাষট্টি হবে। সরযূকে মা ব'লে ডাকেন।

সেখানে আর কে আছে?

একজন দাসী, সরযূ আর বিশু।

বিশু কে?

সরযূর ছেলে।

চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া বলিল, যাই।

হরিদয়াল গতিরোধ করিলেন না। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। গলির শেষে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, কৈলাসখুড়ার বাড়ি কোথায় জান? সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

চন্দ্রনাথ একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট-দেহ একটি শিশু ঘরের সম্মুখের বারান্ডায় বসিয়া একথালা জল লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে পরম পরিতোষের সহিত দেখিতেছিল, তাহার কচি মুখখানির কালো ছায়া কেমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার সহিত সহাস্যে পরিহাস করিতেছে। চন্দ্রনাথ তাহাকে একেবারে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। দেখিলে বোধ হয়, অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে যাওয়া তাহার কাছে নূতন নহে। সে চন্দ্রনাথের নাকের উপর কচি হাতখানি রাখিয়া, মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি কে?

চন্দ্রনাথ গভীর-স্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আমি বাবা।

বাবা?

হ্যাঁ বাবা, তুমি কে?

আমি বিতু!

চন্দ্রনাথ ঘড়ি-চেন বুক হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল, পকেট হইতে ছুরি, পেন্সিল, মনিব্যাগ যাহা পাইল, তাহাই পুত্রের হস্তে গুঁজিয়া দিল; হাতের কাছে আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না যাহা পুত্রহস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বিশু অনেকগুলি দ্রব্য হাতের মধ্যে পাইয়া পুলকিত হইয়া বলিল, বাবা!

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে তাহার ছোট মুখখানি নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা!

এই সময় লখীয়ার মা বড় গোল করিল। সে হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল যে, একজন সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশুকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একেবারে রান্নাঘরে ছুটিয়া গেল। বাটীতে আজ কৈলাসচন্দ্র নাই, অনেক দিনের পর তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে গিয়াছিলেন; সরযূও এই কিছুক্ষণ হইল মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে বসিয়াছিল। লখীয়ার মা সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাইজি!

কি রে!

ঘরের ভেতরে সাহেব ঢুকে বিশুকে কোলে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে।

সরযূ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে আবার কি? বলিয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিতে চাহিল, দেখিতে পাইল না।

লখীয়ার মা তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া বলিল, যেয়ো না—বাবাজী আসুন।

সরযূ তাহা শুনিল না, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বোধ হইল, দাসীর কথা অসত্য নহে, একজন সাহেবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অস্ফুটে বিশ্বেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছে। সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকটে গেল। যাহার ছায়া দেখিলে সে চিনিতে পারিত, তাহাকে চক্ষের নিমিষে চিনিতে পারিল—তাহার স্বামী—চন্দ্রনাথ!

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, গলায় আঁচল দিয়া, পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, সরযূ মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, সরযূ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্তা হইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, বড় রোগা হয়েচ।

সরযূ মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিল, যেন বলিতে চাহে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! তাহার পর চন্দ্রনাথ বিশুকে লইয়া একটু অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সরযূ তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল, গায়ের কোট-শার্ট একে একে খুলিয়া লইল, পাখা লইয়া বাতাস করিল, গামছা ভিজাইয়া পা মুছাইয়া দিল। এ-সকল কাজ সে এমন নিয়মিত শৃঙ্খলায় করিল, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম, প্রত্যহ এমনি করিয়া থাকে। যাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবার আশামাত্র ছিল না, আজ অকস্মাৎ কতদিন পরে তিনি আসিয়াছেন। কত অশ্রু, দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছড়াছড়ি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। সরযূ এমন ভাবটি প্রকাশ করিল যেন স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজিও আসিয়াছেন, হয়ত একটু বিলম্ব হইয়াছে—একটু বেলা হইয়াছে।

কিন্তু চন্দ্রনাথের ব্যবহারটি অন্য রকমের দেখাইতেছে। বিশুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ যেন ঘরে আর কেহ নাই, বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছে। ঘরে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশ্বেশ্বর ভিন্ন আর কেহ ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, চন্দ্রনাথ নিজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেইটুকু ঢাকিবার জন্যই প্রাণপণে মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সরযূ বলিল, খোকা, খেলা কর গে।

বিশু শয্যা হইতে নামিয়া পড়িতেছিল, চন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে নামাইয়া দিল। ইতিপূর্বে সে জননীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিল, তাই নামিয়াই পিতার

চরণপ্রান্তে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া ছুটিয়া পলাইল। চন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু সে ততক্ষণে স্পর্শের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সরযূ তাহার বুকের কাছে হাত দিয়া কহিল, শরীরে যে তোমার কিছু নেই, অসুখ হয়েছিল?

না, অসুখ হয়নি।

তবে বড় বেশি ভাবতে বুঝি?

চন্দ্রনাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তোমার কি মনে হয়?

সরযূ সে কথার উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল—বেলা হয়েচে, স্নান করবে চল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ির কর্তা কোথায়?

তিনি আজ মন্দিরে পূজো করতে গেছেন, বোধ করি, সন্ধ্যার পরে আসবেন।

তুমি তাঁকে কি ব'লে ডাক?

বরাবর জ্যাঠামশায় বলে ডাকি, এখনও তাই বলি।

চন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কারা এসেছে?

হরি আর মধু এসেচে। তারা ডাকবাংলায় আছে।

এখানে আনতে বুঝি সাহস হ'ল না?

চন্দ্রনাথ এ কথার উত্তর দিল না।

চন্দ্রনাথ আহারে বসিয়া সুমুখে একথালা লুচি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। অপ্রসন্নভাবে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এ আবার কি? কুটুম্বিতে করচো, না তামাশা করচো?

সরযূ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মলিন-মুখে বলিল, খাবে না?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরযূর মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুপুরবেলা কি আমি লুচি খাই?

সরযূ মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্‌ত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, আজ যে তুমি আমাকে প্রথম খেতে দিলে তা নয়; আমি কি খাই, তাও বোধ করি ভুলে যাওনি।

সরযূর চোখে জল আসিতেছিল; ভাবিতেছিল, সেই দিন যে ফুরাইয়া গিয়াছে,—কহিল, ভাত খাবে? কিন্তু—

কিন্তু কি? শুকিয়ে গেছে?

না, তা নয়,—আমি এখানে রাঁধি!

বাড়িতেও ত রাঁধতে?

সরযূ একটু থামিয়া কহিল, আমার হাতে খাবে?

এইবার চন্দ্রনাথ মুখ নত করিল। এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই যে, সরযূ পর হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাহার স্পর্শিত অন্নব্যঞ্জন আহার করা যায় না। কিন্তু সরযূর কথার ভিতর বড় জ্বালা ছিল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, সরযূ, দুপুরবেলা আমার চোখের জল না দেখলে কি তোমার তৃপ্তি হবে না? সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—যাই, তবে আনি গে। রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সে বড় কান্না কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিল, জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, আবার অশ্রু আসে, আবার মুছিতে হয়, সরযূ আর আপনাকে কিছুতে সামলাইতে পারে না। কিন্তু স্বামী অভুক্ত বসিয়া আছেন, তখন অন্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইল। কাছে বসিয়া, বহুদিন পূর্বের মত যত্ন করিয়া আহার করাইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র হাতে লইয়া, আর একবার ভাল করিয়া কাঁদিবার জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বেলা দুইটা বাজিয়াছে। চন্দ্রনাথের ক্রোড়ের কাছে বিশ্বেশ্বর পরম আরামে ঘুমাইয়াছে। সরযূ প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, সমস্ত কাজকর্ম সারা হ'ল?

কাজ কিছুই ছিল না। জ্যাঠামশাই এখনও আসেন নি। তাহার পর সরযূ ঘরকন্নার কথা পাড়িল। বাড়ির প্রতি ঘর, প্রতি সামগ্রী, মাতুল-মাতুলানী, দাস-দাসী, সরকারমশায়, হরিবালা সই, পাড়া-প্রতিবেশী, একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময়টুকুর মধ্যে দু'জনের কাহারও মনে পড়িল না যে, সরযূর এ-সব জানিয়া লাভ নাই, কিংবা এ-সকল সংবাদ দিবার সময় চন্দ্রনাথেরও ক্লেশ হওয়া উচিত—একটু লজ্জা, একটু বিমর্ষতা, একটু সঙ্কোচের আবশ্যক। একজন পরম আনন্দে প্রশ্ন করিতেছে, অপরে উৎসাহের সহিত উত্তর দিতেছে। নিতান্ত বন্ধুর মত দুইজনে যেন পৃথক হইয়াছিল, আবার মিলিয়াছে।

সহসা সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে করলে কোথায়?

এটা যেন নিতান্ত পরিহাসের কথা!

চন্দ্রনাথ বলিল, পশ্চিমে।

কেমন বৌ হ'ল?

তোমার মত।

এই সময় সরযূ বুকের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করিল, সামলাইতে পারিল না, বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া পড়িল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরযূ একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তখন শিয়রে বসিয়া ক্রোড়ের উপর তাহার মাথাটা তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চোখ বুজিল। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল এবং অস্পষ্ট কি বলিল, বোঝা গেল না।

চন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভয় পাইয়া জলের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। লখীয়ার মা নিকটেই ছিল, জল লইয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। বলিল, বাবু, এখনি সেরে যাবে, অমন মাঝে মাঝে হয়।

তাহার পর মুখে চোখে জল দেওয়া হইল, বাতাস করা হইল, বিশু আসিয়া বার-দুই চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিল, মা!

সরযূর চৈতন্য হইল, লজ্জিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। লখীয়ার মা আপনার কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে চন্দ্রনাথের মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল।

সরযূ হাসিল। বড় ক্ষীণ, অথচ বড় মধুর হাসিয়া বলিল, ভয় পেয়েছিলে?

চন্দ্রনাথের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, এইবারে গড়াইয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল; বলিল, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেল।

সরযূ মনে মনে ভাবিল, তোমার কোলে মাথা ছিল—সে সুকৃতি কি এ হতভাগিনীর আছে? প্রকাশ্যে কহিল, এমন ধারা মাঝে মাঝে হয়।

তা দেখচি! তখন হ'ত না, এখন হয়, সেও বুঝি। বলিয়া চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে মরিচা-ধরা একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া সরযূর আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই তোমার চাবির রিং—আমার কাছে গচ্ছিত রেখে চ'লে এসেছিলে, আজ আবার ফিরিয়ে দিলাম। চেয়ে দেখ, কখন কি ব্যবহার হয়েচে ব'লে মনে হয়?

সরযূ দেখিল, তাহার আদরের চাবির রিং মরিচা ধরিয়া একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে। হাতে লইয়া বলিল, তাকে দাওনি কেন?

চন্দ্রনাথের শুষ্ক ম্লানমুখ অকস্মাৎ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, দুই চোখে অসীম স্নেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, তাকেই ত দিলাম সরযূ।

সরযূ ঠিক বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে সস্নিগ্ধ-দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি নূতন বৌর কথা বলচি। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাকে দাওনি কেন?

চন্দ্রনাথ আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সহসা দুই হাত বাড়াইয়া সরযূর মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, তাকেই দিয়েছি সরযূ, তাকেই দিয়েচি। স্ত্রী আমার দুটি নয়, একটি। কিন্তু সে আমার পুরানো হয় না—চিরদিনই নতুন। প্রথম যেদিন তাকে এই কাশী থেকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ফুলটির মত বুকে ক'রে নিয়ে যাই সেদিনও যেমন নতুন, আজও আবার যখন সেই বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে নিতে এসেচি এখনও তেমনি নতুন।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া ছেলে কোলে লইয়া সরযূ স্বামীর পায়ের নিকট বসিয়া বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে তোমার যাওয়া হবে না—আজ রাত্তিরে তোমাকে থাকতে হবে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তাই ভাবচি, আজ বুঝি আর যাওয়া হয় না।

সরযূ অনেকক্ষণ অবধি একটা কথা কহিতে চাহিতেছিল, কিন্তু লজ্জা করিতেছিল, সময়ও পায় নাই। এখন তাহা বলিল, তোমার কাছে আর লজ্জা কি—?

চন্দ্রনাথ সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরযূ বলিল, ভেবেছিলাম, তোমাকে একখানা চিঠি লিখব।

লেখনি কেন, আমি ত বারণ করিনি।

সরযূ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, ভয় হ'ত, পাছে তুমি রাগ কর। আবার কবে তুমি আসবে?

যখন আসতে বলবে, তখনি আসব।

সরযূ একবার মনে করিল, সেই সময় বলিবে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিল, মানুষের শরীরে বিশ্বাস নাই। এখন না বলিলে হয়ত বলাই হবে না। চন্দ্রনাথ হয় ত আবার আসিবে, কিন্তু সে হয়ত ততদিনে পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। তাই বিবেচনা করিয়া বলিল, তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

সে কথা ত হয়ে গেল—আর কিছু বলবে?

সরযূ কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই,—এমন ক'রে বেঁচে থাকা আর ভাল দেখাচ্চে না।

চন্দ্রনাথ ভাবিল, ইহা পরিহাসের মত শুনাইতেছে না। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সরযূর মুখ আবার বিবর্ণ হইয়াছে। সভয়ে কহিল, সরযূ কোন শক্ত রোগ জন্মায় নি ত?

সরযূ ম্লান হাসিয়া কহিল, তা বলতে পারিনে! বুকের কাছে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা টের পাই।

চন্দ্রনাথ বলিল, আর ঐ মূর্চ্ছাটা?

সরযূ হাসিল, ওটা কিছুই নয়।

চন্দ্রনাথ মনে মনে বলিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন সর্বস্বান্ত হইয়াও তোমাকে আরোগ্য করিব।

সরযূ কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত?

চাই কি?

নিজের কিছু চাই না। তবে, আমার যখন মৃত্যু-সংবাদ পাবে, তখন—এই সময় সে খোকাকে চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, তখন একবার এখানে এসে খোকাকে নিয়ে যেয়ো

চন্দ্রনাথ বিপুল আবেগে বিশ্বেশ্বরকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল।

এই সময় বাহির হইতে কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, দাদা, বিশু!

বিশ্বেশ্বর পিতার ক্রোড় হইতে ছটফট করিয়া নামিয়া পড়িল,—দাদু যাই।

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল,—ঐ এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও বাহিরে আসিল। কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথকে কখনও

দেখেন নাই—দেখিলেও চিনতেন না, চাহিয়া রহিলেন। খোকা পরিচয় করিয়া দিল। হাত বাড়াইয়া বলিল, ওতা বাবা।

চন্দ্রনাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কৈলাসচন্দ্র আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস বাবা, এস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কাল এদের নিয়ে যাব, তখন কৈলাসচন্দ্রের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে এককালে শতাধিক কামান দাগার মত শব্দ করিয়া উঠিল! নিজে কি কহিলেন, নিজের কানে সে শব্দ পৌঁছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিল, অস্ফুট ক্রন্দনের মত বহুদূর হইতে কে যেন কহিল, এমন সুখের কথা আর কি আছে!

সরযূ এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না, তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর পদযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, পায়ের ধূলা দিয়ে হতভাগিনীকে এইখানেই রেখে যাও, আমাকে নিয়ে যেয়ো না।

চন্দ্রনাথ বলিল, কেন?

সরযূ জবাব দিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের কাতর মুখখানি তাহার চোখের উপরে কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমার স্বামী, আমি যদি নিয়ে যাই, তোমার অনিচ্ছায় কিছু হবে না। আমি বিশুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

সরযূ দেখিল তাহার কিছুই বলিবার নাই।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সেদিনের মত কোলে তুলিয়া লইলেন। দাবার পুঁটুলি হাতে করিয়া শম্ভু মিশিরের বাড়ি আসিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী! আজ আমার সুখের দিন—বিশুদাদা আজ তার নিজের বাড়ি যাবে। বড় হয়েছে ভাই, কুঁড়েঘরে আর তাকে ধ'রে রাখা যায় না।

মিশিরজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র সতরঞ্চ পাতিয়া বল সাজাইয়া বলিলেন, আজ আমোদের দিনে এস, তোমাকে দু বাজি মাত ক'রে যাই।

খেলার প্রারম্ভেই কিন্তু কৈলাসচন্দ্র একে একে বল হারাইতে লাগিলেন। গজ চালিতে নৌকা, নৌকা চালিতে ঘোড়া, এমনি বড় গোলমাল হইতে লাগিল। মিশিরজী কহিল, বাবুজী, আজ তোমার মেজাজ চৈন নাই, বহুত গল্‌তি হোতা। ক্রমে এক বাজির পর আর এক বাজি কৈলাসচন্দ্র হারিয়া খেলা উঠাইয়া পুঁটুলি বাঁধিতে বসিলেন, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা বাঁধিলেন না। বিশুর হাতে দিয়া বলিলেন, দাদা, মন্ত্রীটা তোমাকে দিলাম, আর কখনও চাব না। পথে আসিতে যাহার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই এই সুখবরটা জানাইয়া দিলেন।

আজ সর্বকর্মেই বৃদ্ধের বড় উৎসাহ। কিন্তু কাজ করিতে কাজ পিছাইয়া পড়িতেছে। দাবাখেলার মত বড় ভুলচুক হইয়া যাইতেছে। যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল ভুলচুক ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযূ তাহা দেখিয়া গোপনে শতবার চক্ষু মুছিল। বৃদ্ধের কিন্তু মুখের উৎসাহ কমে নাই, এমন কি সরযূ যখন আড়ালে ডাকিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখনও তিনি অশ্রুসংবরণ করিয়া হাসিয়া আশীর্বাদ করিলেন, মা আমার কাঁদিস নে। তোর বুড়ো জ্যাঠার আশীর্বাদে তুই রাজরানী হবি। আবার যদি কখনো আসিস, তোদের এই কুঁড়েঘরটিকে ভুলে যেন আর কোথাও থাকিস নে।

সরযূ আরও কাঁদিতে লাগিল, বুকের মাঝে শুধু সেই দিনের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, যেদিন সে নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইয়া কাশীতে আসিয়াছিল। আর আজ!

সরযূ বলিল, জ্যাঠামশাই, আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না যে—

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, আর ক'টা দিন মা? কিন্তু মনে মনে বলিলেন, এইবার ডাক পড়েছে, এতদিনে তপ্ত প্রাণটার জুড়োবার উপায় হয়েছে ।

সরযূ চোখ মুছিতে মুছিতে আকুলভাবে বলিল, আমার মায়া-দয়া নেই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, ছি মা, ও-কথা ব'লো না—আমি তোমাকে চিনেচি।

রাত্রি দশটার সময়ে সকলে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ির সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে।

বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা তখনও বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ছিল। বৃদ্ধ নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমে সে কাঁদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যখন তিনি মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, বিশু, দাদা! তখন সে হাসিয়া উঠিল, দাদু।

দাদাভাই আমার, কোথায় যাচ্চ?

বিশু বলিল, দাত্তি। তাহার পর মন্ত্রীটা দেখাইয়া কহিল, মন্‌তী।

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, হ্যাঁ দাদা! মন্ত্রী হারিয়ো না যেন।

এ গজদন্ত-নির্মিত রক্ত-রঞ্জিত পদার্থটা সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে তাহাকে অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সেও ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হারাবো না—মন্‌তী!

ট্রেন আসিলে সরযূ পুনরায় তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া গাড়িতে উঠিল। বৃদ্ধের আন্তরিক আশীর্বচন ওষ্ঠাধরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভিতরেই রহিয়া গেল।

ট্রেন ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে চন্দ্রনাথের ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, দাদু!

দাদু!

মন্ত্রী!

সে মন্ত্রীটা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, দাদু—মন্‌তী!

হারাস নে—

না।

এইবার বৃদ্ধের শুষ্কচক্ষে জল আসিয়া পড়িল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি সরযূর জানালার নিকট মুখ আনিয়া কহিলেন, মা, তবে যাই—আর একবার জোর করিয়া ডাকিলেন, ও দাদু—

গাড়ির শব্দে এবং লোকের কোলাহলে বিশ্বেশ্বর সে আহ্বান শুনিতে পাইল না। যতক্ষণ গাড়ির শেষ শব্দটুকু শুনা গেল, ততক্ষণ তিনি একপদও নড়িলেন না। তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ি পৌঁছিয়া চন্দ্রনাথের যেটুকু ভয় ছিল, খুড়ো মণিশঙ্করের কথায় তাহা উড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথ, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যে পাপ করেনি তার আবার প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? বধূমাতার কোন পাপ নেই, অনর্থক প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে তাঁর অবমাননা করো না। মণিশঙ্করের মুখে এরূপ কথা বড় নূতন শোনাইল। চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি আবার কহিলেন, বুড়ো হয়ে অনেক দেখেছি যে, দোষ-লজ্জা প্রতি সংসারে আছে। মানুষের দীর্ঘ-জীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়, দীর্ঘ-পথটির কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচু-নীচু থাকে, তাই বাবা, লোকের পদস্খলন হয়; তারা কিন্তু সে কথা বলে না, শুধু পরের কথা বলে। পরের দোষ, পরের লজ্জার কথা চিৎকার ক'রে বলে, সে শুধু আপনার দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জন্যেই। তারা আশা করে, পরের গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা পড়ে যাবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল। মণিশঙ্কর একটু থামিয়া পুনর্বার কহিলেন, আর একটা নূতন কথা শিখেছি—শিখেছি যে, পরকে আপনার করা যায়; কিন্তু যে আপনার, তাকে কে কবে পর করতে পেরেছে? এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু বিশু আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। তার পুণ্যে সব পবিত্র হয়েছে। আজ দ্বাদশী। পূর্ণিমার দিন তোমার বাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ করেচি। তখন দাদা ছিলেন, কাজকর্ম সবই তিনি করতেন। আমি কখনও কিছু করতে পাইনি—তাই মনে করছি, বিশুর আবার নূতন করে অন্নপ্রাশন দেব।

চন্দ্রনাথ চিন্তা করিল, কিন্তু সমাজ?

মণিশঙ্কর হাসিলেন, বলিলেন, সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত

মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্য ভেব না। আর একটা কথা বলি—এতদিন তা বলিনি, বোধ হয় কখনও বলতাম না, কিন্তু ভাবচি, তোমার কাছে একথা প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হবে না। তোমার রাখাল ভট্‌চায্যের কথা মনে হয়?

হয়। হরিদয়াল ঠাকুরের পত্রে পড়েছিলাম।

আমার পরিবারের যদি কিছু লজ্জার কথা থাকে, শুধু সেই প্রমাণ করতে পারত, কিন্তু সে আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, আমি তাকে জেলে দিয়েছি। কিছুদিন হল সে খালাস হয়ে কোথায় চলে গেছে, আর কখনও এ দেশে পা বাড়াবে না।

মণিশঙ্কর তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। সে সকল কাহিনী শুনিয়া চন্দ্রনাথের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

তাহার পর পূর্ণিমার দিন খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হইল। গ্রামের কেহই কোন কথা কহিল না। তাহারা মণীশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করিল যে, একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল,—হয় ত সে একটা জমিদারী চাল মাত্র!

হরকালী আলাদা রাঁধিয়া খাইলেন,—তাঁহারা এ গ্রামে আর বাস করিবেন না—বাড়ি যাইবেন। হরকালী বলিলেন, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ধর্মটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা সুখের কথাই হউক আর দুঃখের কথাই হউক, চন্দ্রনাথ তাঁহাদের পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে মাসিক একশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে।

উৎসবের শেষে অনেক রাত্রে নাচ-গান বন্ধ হইলে ঘরে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখিল সর্ব অলঙ্কার-ভূষিতা রাজরাজেশ্বরীর মত নিদ্রিত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সরযূ স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।

আজ পূর্ণিমা।

চন্দ্রনাথ বলিল, ইস।

সরযূ মৃদু হাসিয়া বলিল, সই আজ কিছুতেই ছাড়লেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে এক-পা এক-পা করিয়া বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বাঁধান তুলসী-বেদীর উপর তখনও দীপটা জ্বলিতেছিল, তথাপি এ কি ভীষণ অন্ধকার! এইমাত্র সবাই ছিল, এখন আর কেহ নাই। শুধু মাটির প্রদীপটি সেই অবধি জ্বলিতেছে; তাহারও আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এইবার নিবিয়া যাইবে। সরযূ এটি স্বহস্তে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় আসিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অবসন্ন চক্ষু দুইটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিল। কিন্তু কানের কাছে সেই অবধি যেন কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, দাদু! স্বপ্ন দেখিলেন, রাজা ভরত তাঁহার বুকের মাঝখানটিতে মৃত্যুশয্যা পাতিয়া ক্ষীণ ওষ্ঠ কাঁপাইয়া বলিতেছে,—ফিরে আয়! ফিরে আয়!

সকালবেলায় শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, বাহিরে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, বিশু! তাহার পর মনে পড়িল, বিশু নাই, তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

দাবার পুঁটুলি হাতে লইয়া শম্ভু মিশিরের বাড়ি চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, দাদাভাই আমার চলে গেছে।

দাদাভাইকে সবাই ভালবাসিত। মিশিরজীও দুঃখিত হইল। দাবার বল সাজান হইলে মিশিরজী কহিল, বাবুজী, তোমার উজীর কি হ'ল?

কৈলাসচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, —তাই ত, মিশিরজী, সেটা নিয়ে গেছে। লাল উজীরটা সে বড় ভালবাসত। ছেলেমানুষ কিছুতেই ছাড়লে না।

তিনি যে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দাবা-জোড়াটি অঙ্গহীন করিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে লজ্জা করিল।

মিশিরজী কহিল, তবে অন্য জোড়া পাতি?

পাত।

খেলায় কৈলাসচন্দ্রের হার হইল। শম্ভু মিশির তাঁহার সহিত চিরকাল খেলিতেছে, কখনও হারাইতে পারে নাই। হারিবার কারণ সে সহজেই বুঝিল। বলিল, বাবুজী, খোকাবাবু তোমার বিলকুল ইলিম সাথে লে গিয়া বাবুজী!

বাবুজীর মুখে শুষ্ক-হাসির রেখা দিল। বলিলেন, এস, আর এক বাজি দেখা যাক।

বহুৎ আচ্ছা।

খেলার মাঝামাঝি অবস্থায় কৈলাসচন্দ্র কিস্তি দিয়া ভুলিয়া বলিলেন, বিশু!

শম্ভু মিশির হাসিয়া ফেলিল। কিস্তি কথাটা সে বুঝিত, বলিল, বাবুজী, কিস্তি, বিশু নয়। দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন।

শম্ভু মিশির কিস্তি দিয়া বলিল, বাবুজী, এইবার তোমার দো পেয়াদা গিয়া।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, দাদা, আয়, আয়, শিগগির আয়। পরে কিছুক্ষণ যেন তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল যেন এইবার একটি ক্ষুদ্র-কোমল-দেহ তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শম্ভু মিশির বিলম্ব দেখিয়া বলিল, বাবুজী, পেয়াদা নাহি বাঁচনে পারবে। বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, তাই ত, বোড়ে দু’টো মারা গেল!

তাহার পর খেলা শেষ হইল। মিশিরজী জয়ী হইল, কিন্তু আনন্দিত হইল না। বলগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, বাবুজী, দোসরা দিন খেলা হবে। আজ আপনা তবিয়ৎ বহুৎ বে-দুরস্ত—মেজাজ একদম দিক্ আছে।

বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দুই প্রহর হইল। মনে হইতেছিল, বিশু ত নাই, তবে আর তাড়াতাড়ি কি।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লখীয়ার মা একা রন্ধনশালায় বসিয়া পাকের যোগাড় করিতেছে। আজ তাঁহাকে নিজে রাঁধিতে হইবে, নিজে বাড়িয়া খাইতে হইবে—একা আহার করিতে হইবে। ইচ্ছামত আহার করিবেন, তাড়াতাড়ি নাই, পীড়াপীড়ি নাই—বিশ্বেশ্বরের দৌরাত্ম্যের ভয় নাই! বড় স্বাধীন! কিন্তু এ যে

ভাল লাগে না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, একমুঠো চাল, দু’টা আলু, দু’টা পটল, খানিকটা ডালবাটা। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—মনে পড়িল, দুই বৎসর আগেকার কথা। তখন এমনি নিজে রাঁধিতে হইত—এই লখীয়ার মা-ই আয়োজন করিয়া দিত। কিন্তু তখন বিশুও আসে নাই, চলিয়াও যায় নাই।

কাঁটালতলায় তাহার ক্ষুদ্র খেলাঘর এখনও বাঁধা আছে। দুটো ভগ্ন-ঘট, একটা ছিন্নহস্তপদ মাটির পুতুল, একটা দু পয়সা দামের ভাঙ্গা বাঁশী। ছেলেমানুষের মত বৃদ্ধ সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনার শোবার ঘরে রাখিয়া দিলেন।

দুপুরবেলা আবার গঙ্গা পাঁড়ের বাড়িতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আবার লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আর তেমন সম্মান নাই; তখন দিগ্বিজয়ী ছিলেন, এখন খেলামাত্র সার হইয়াছে। সেদিন যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা শিখাইয়াছিলেন, সে আজ চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারেন, সে আজ মাথা উঁচু করিয়া স্বেচ্ছায় একখানা নৌকা মার দিয়া খেলা আরম্ভ করে।

পূর্বের মত এখনও খেলিবার ঝোঁক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই-একটা শক্ত চাল এখনও মনে পড়ে—কিন্তু সোজা খেলায় বড় ভুল হইয়া যায়। দাবাখেলায় গর্ব ছিল—আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শম্ভু মিশির এখনও সম্মান করে; সে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।

বাড়িতে আজকাল তাঁহার বড় গোলযোগ বাধিতেছে। লখীয়ার মা দস্তুরমত রাগ করিতেছে; দু-একদিন তাহাকে চোখের জল মুছিতেও দেখা গিয়াছে। সে বলে, বাবু, খাওয়া-নাওয়া একেবারে কি ছেড়ে দিলে? আয়না দিয়া চেহারাটা দেখ গে!

কৈলাসচন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহেন, বেটী, রাঁধাবাড়া সব ভুলে গেছি—আর আগুন-তাতে যেতে পারিনে।

সে বহুদিনের পুরানো দাসী, ছাড়ে না, বকা-ঝকা করিয়া এক-আধ মুঠা চাউল সিদ্ধ করাইয়া লয়।

এমন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর তিন-চারদিন ধরিয়া কৈলাসখুড়োকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শম্ভু মিশির এ কথা প্রথমে মনে করিল। সে দেখিতে আসিল। ডাকিল, বাবুজী!

লখীয়ার মা উত্তর দিল। কহিল, বাবুর বোখার হয়েছে।

মিশিরজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া বলিল, বাবুজী বোখার হ'ল কি?

কৈলাসচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, হ্যাঁ মিশিরজী, ডাক পড়েচে, তাই আস্তে আস্তে যাচ্ছি।

মিশিরজী কহিল, ছিয়া ছিয়া—রাম রাম! আরাম হো যায়েগা।

আর আরাম হবার বয়স নেই ঠাকুর—এইবার রওনা হ'তে হবে।

কবিরাজ বোলায় ছিলে?

কৈলাস আবার হাসিলেন, আটষট্টি-বছর বয়সে কবিরাজ এসে আর কি করবে মিশিরজী?

আটষট্ বয়স—বাবুজী! আউর আটষট্ আদমী জিতে পারে।

কৈলাসচন্দ্র সে কথায় উত্তর না দিয়া সহসা বলিলেন, ভাল কথা মিশিরজী! আমার দাদাভাই চিঠি লিখেছে—ও লখীয়ার মা, জানালাটা খুলে দে ত, মিশিরজীকে পত্রখানা পড়ে শুনাই। বালিশের তলা হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বহুক্লেশে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হিন্দুস্থানী শম্ভু মিশির কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না।

রাত্রে শম্ভু মিশির কবিরাজ ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ বাঙ্গালী—কৈলাসচন্দ্রের সহিত জানাশুনা ছিল। তাঁহার প্রশ্নের দুই-একটা উত্তর দিয়া কহিলেন, কবিরাজমশাই, দাদাভাই চিঠি লিখেচে, এই পড়ি শুনুন।

দাদাভায়ের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ছিল না। তিনি বলিলেন, কার পত্র?

দাদু—বিশু—লখীয়ার মা, আলোটা একবার ধর ত বাছা—

প্রদীপের সাহায্যে তিনি সবটুকু পড়িয়া শুনাইলেন। কবিরাজ শুনিলেন কিনা কৈলাসচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। সরযূর হাতের লেখা বিশুর চিঠি, বৃদ্ধের ইহাই সান্ত্বনা, ইহাই সুখ। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলে, কৈলাসচন্দ্র শম্ভু মিশিরকে ডাকিয়া বিশ্বেশ্বরের রূপ, গুণ, বুদ্ধি এ-সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু জ্বর কমিল না; বৃদ্ধ তখন একজন পাড়ার ছেলেকে ডাকিয়া বিশুকে পত্র লিখাইলেন—মোট কথা এই যে, তিনি ভাল আছেন, তবে সম্প্রতি শরীরটা কিছু মন্দ হইয়াছে, কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নাই।

কৈলাসখুড়ার প্রাণের আশা আর নাই শুনিয়া হরিদয়াল দেখিতে আসিলেন। দুই-একটা কথাবার্তার পর কৈলাসচন্দ্র বালিশের তলা হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবাজী, পড়।

পত্রখানা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, দুই-এক জায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভাল পড়া যায় না। হরিদয়াল যাহা পারিলেন পড়িলেন। বলিলেন, সরযূর হাতের লেখা।

তার হাতের লেখা বটে, আমার দাদার চিঠি।

নীচে তার নাম আছে বটে!

বৃদ্ধ কথাটায় তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, তার নাম, তার চিঠি, সরযূ কেবল লিখে দিয়েছে। সে যখন লিখতে শিখবে, তখন নিজের হাতেই লিখবে।

হরিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, পড়লে বাবাজী? বিশু আমার রাত্তিরে দাদু দাদু ব'লে কেঁদে ওঠে, সে ভুলতে পারে? এই সময় গণ্ড বাহিয়া দু' ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িল।

লখীয়ার মা নিকটে ছিল, সে দয়ালঠাকুরকে ইশারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুর, যাও, তুমি থাকলে সারাদিন ঐ কথাই বলবে।

আর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অবস্থা নেহাত মন্দ হইয়াছে, শম্ভু মিশির আজকাল রাত্রিদিন থাকে, মাঝে কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া যায়। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সংজ্ঞা ছিল না; সন্ধ্যার পর একটু জ্ঞান হইয়াছিল, তাহার পর অর্ধচেতনভাবে পড়িয়া ছিলেন। গভীর রাত্রে কথা কহিলেন, বিশু দাদা, আমার মন্ত্রীটা! এবার দে, নইলে মাত হয়ে যাব! শম্ভু মিশির কাছে আসিয়া বলিল, বাবুজী কি বলচে?

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন, যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনের সময় হাত বাড়াইয়া পাইতেছেন না। তাহার পর হতাশভাবে পাশ ফিরিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, বিশু, বিশ্বেশ্বর, মন্ত্রীটা একবার দে ভাই, মন্ত্রী হারিইয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল্?

এ বিশ্বের দাবাখেলায় কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে। শম্ভু মিশির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। লখীয়ার মা প্রদীপ মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিল, বৃদ্ধের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, শুধু ওষ্ঠাধর তখনও যেন কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রী-হারা হয়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই, দে।

পরদিন দয়ালঠাকুর চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, গতরাত্রে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

চরিত্রহীন

এক

পশ্চিমের একটা বড় শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কি-একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই শহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদমর্যাদানুসারে যাহা কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সৎকর্মটা কি শুনি?

তাহারা কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহূত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিবেন এবং সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এইজন্যই।

উপেন্দ্র আর কোন প্রশ্ন না করিয়াই রাজী হইলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এতই ভাল করিয়া পাশ করিয়াছিলেন যে, ছাত্রমহলে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের অবধি ছিল না। ইহা তিনি জানিতেন। তাই, কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে তাহারা যখনই আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আবেদন ও উপরোধকে মমতায় কোনদিন উপেক্ষা করিয়া ফিরাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে ডিঙ্গাইয়া আদালতের লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইবার পরও ছেলেদের জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়া হইতে ফুটবল, ক্রিকেট ও ডিবেটিং ক্লাবের সেই উঁচু স্থানটিতে গিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে বসিতে হইত।

কিন্তু এই জায়গাটিতে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না—কিছু বলা আবশ্যক। একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলা চাই ত হে! সভাপতি

সেজে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকা ত আমার কাছে ভাল ঠেকে না—কি বল তোমরা?

এ ত ঠিক কথা। কিন্তু তাহাদের কাহারো কিছুই জানা ছিল না। বাহিরের প্রাঙ্গণের একধারে একটা প্রাচীন পুষ্পিত জবা বৃক্ষের তলায় এই ছেলের দলটি যখন উপেন্দ্রকে মাঝখানে লইয়া সংসারের যাবতীয় সম্ভব-অসম্ভব সৎকর্মাবলীর তালিকা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দিবাকরের ঘর হইতে একজন নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপেন্দ্র দিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। বাহিরের একটি ছোট ঘরে দিনের বেলায় তাহার লেখাপড়া এবং রাত্রে শয়ন চলিত। বয়স প্রায় উনিশ; এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছিল।

উপেন্দ্রর দৃষ্টি এই পলাতকের উপর পড়িবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, সতীশ, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস যে! এদিকে আয়—এদিকে আয়!

ধরা পড়িয়া সতীশ অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন দেখিনি যে?

অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইয়া সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতদিন এখানে ছিলাম না উপীনদা, এলাহাবাদে কাকার কাছে গিয়াছিলাম।

কথাটা ভাল করিয়া শেষ না হইতেই একজন ছাঁটা-দাড়ি টেরি-চশমাধারী যুবক চোখ টিপিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া বসিল, মনের দুঃখে নাকি সতীশ?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবারেও তাহাকে পাঠান হয় নাই এ সংবাদ সকলেই জানিত, তাই কথাটা এমন বেয়াড়া বিশ্রী শুনাইল যে, উপস্থিত সকলেই লজ্জায় মুখ নত করিয়া মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। যুবকটির পরিহাস ও দাঁতের হাসি কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তখনি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সতীশ তাহার হাসিমুখ লইয়া বলিল, ভূপতিবাবু, মন থাকলেই মনে দুঃখ হয়। পাস করার আশাই বলুন আর ইচ্ছেই বলুন, আমার ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকেই

ছেড়েছি। শুধু বাবা ছাড়তে পারেননি। তাই, মনের দুঃখে কাউকে দেশান্তরী হতে হলে তাঁর হওয়াই উচিত ছিল; অথচ তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন। কিন্তু যা বল উপীনদা, এবারে তাঁরও চোখ ফুটেছে।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসির কথা ইহাতে ছিল না, কিন্তু এই ভূপতিবাবুর অভদ্র পরিহাস যে সতীশকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, ইহাতেই সকলে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবারে তা হলে তুই ছেড়ে দিলি?

সতীশ বলিল, আমি কি কোনদিন ধরেছিলাম যে আজ ছেড়ে দেব? আমি কোনদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল। এবারে আমি আত্মরক্ষা করব। এমন দেশে গিয়ে বাস করব যেখানে পাঠশালাটি পর্যন্ত নেই।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু কিছু করা ত দরকার। মানুষে একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না, পারা উচিতও নয়।

সতীশ বলিল, না, চুপ করে থাকব না। এলাহাবাদ থেকে একটা নূতন মতলব পেয়ে এসেছি। একবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখব সেটার কি করতে পারি।

বিস্তারিত বিবরণের আশায় সকলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে সলজ্জ হাস্যে বলিল, আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া, তেমনি ওলাউঠা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে সময়ে হয়ত একজনও ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমি সেইখানে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে দেব। আমার মা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে হাজার-কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে। ঐ দিয়ে আমাদের দেশের বাড়ির বৈঠকখানাঘরে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে দেব। তুমি হেসো না উপীনদা, তুমি নিশ্চয় দেখো, এ আমি করব। বাবাকেও সম্মত করেছি। তাঁকে বলেছি, মাস-খানেক পরেই কলকাতা গিয়ে হোমিওপ্যাথি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস-খানেক পরে কেন?

সতীশ বলিল, একটু কাজ আছে। দক্ষিণপাড়া নবনাট্যসমাজ ভেঙ্গে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে, আমাদের বিপিনবাবু হয়েছেন ওই দলের কর্তা। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করে তিনিই আমাকে এনেছেন, আমি কথা দিয়েছি তাঁদের কনসার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

শুনিয়া সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সতীশও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণে উচ্চহাসি মৃদু হইয়া আসিলে সতীশ বলিল, একটা বাঁশীর অভাব হচ্ছে, সেইজন্যেই আজ দিবাকরের কাছে এসেছিলাম। যদি থিয়েটারের রাতটায় আমাকে উদ্ধার করে দেয় ত আর বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে ও?

সতীশ বলিল, আর কি বলবে—পরীক্ষা সন্নিকট। এটা আমার মাথাতে ঢোকে না উপীনদা, দুই বৎসরের পড়াশুনার পরীক্ষা কেমন করে লোকের একটা রাতের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। আমি বলি, যাদের সত্যিই যায় তাদের যাওয়াই উচিত। এমন পাস করার মর্যাদা যাদের কাছে থাকে থাক আমার কাছে ত নেই। তুমি রাগ করতে পারবে না উপীনদা, আমি তোমাকে যত জানি এঁরা তার সিকিও জানেন না। জিমন্যাস্টিকের আখড়া থেকে ফুটবল ক্রিকেটে চিরদিন তোমার সাক্‌রেদি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অনেকদিন অনেক রকমেই তোমার সময় নষ্ট হতে দেখেছি, অনেকগুলো পরীক্ষা দিতেও দেখলাম, সেগুলো রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাস করতেও দেখলাম, কিন্তু কোনদিন তোমাকে ত একজামিনের দোহাই পাড়তে শুনলাম না।

উপেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, আমি যে বাঁশী বাজাতে জানিনে সতীশ।

সতীশ বলিল, আমিও অনেক সময়ে ওই কথাই ভাবি। সংসারের এই জিনিসটা কেন যে তুমি জানলে না, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সে কথা যাক—তোমাদের দুপুর রোদের এ কমিটিটি কিসের?

শীতের রৌদ্র পিঠে করিয়া মাথায় রযান পার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছিল। বেলা যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই নজর করে নাই। সতীশের কথায় বেলার দিকে চাহিয়া সকলেই এককালে চিন্তিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাভঙ্গের মুখে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু তা হলে?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত বলেছি, আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের স্বামীজীর উদ্দেশ্যটা যদি পূর্বাহ্ণে একটু জানা যেতো ত ভারী স্বস্তি পেতাম। নিতান্ত বোকার মত কোথাও যেতে বাধবাধ ঠেকে।

ভূপতি কহিল, কিন্তু কোন কথাই তিনি বলেন না। বরং এমনও বলেন, যাহা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাহা বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার সময় ও সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত একেবারে না বলাই ভাল। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলে।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। এতক্ষণে সকলেই বাহির হইয়া রাস্তার একধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কি উপীনদা?

উপেন্দ্রকে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, সতীশবাবু, আপনাকেও চাঁদার খাতায় সই করতে হবে। কেন, এখন আমরা ঠিক করে বলতে পারব না। পরশু অপরাহ্ণে কলেজের হলে স্বামীজী নিজেই বুঝিয়ে বলবেন।

সতীশ বলিল, তা হলে আমার বোঝা হলো না ভূপতিবাবু। পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল—আমি অনুপস্থিত থাকলে চলবে না।

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি সতীশবাবু! থিয়েটারের সামান্য ক্ষতির ভয়ে এরূপ মহৎ কাজে যোগ দেবেন না? লোকে শুনলে বলবে কি?

সতীশ কহিল, লোকে না শুনেও অনেক কথা বলে—সে কথা নয়। কথা আপনাদের নিয়ে। কিছু না জেনেও এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা যতটা মহৎ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, আমি যদি ততটা না পারি ত আমাকে দোষ দেবেন না। বরং যা জানি, যার ভালমন্দ কিসে হয় না হয় বুঝি, সেটা উপেক্ষা করে, তার ক্ষতি করে একটা অনিশ্চিত মহত্ত্বের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমার কাছে ভাল ঠেকে না।

উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বয়সে এবং লেখাপড়ায় ভূপতিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। সতীশের কথায় হাসিয়া বলিলেন, সতীশবাবু, স্বামীজীর মত মহৎ ব্যক্তি যে ভাল কথাই বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে ভালই হবে, এ বিশ্বাস করা ত শক্ত নয়।

সতীশ বলিল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে শক্ত নয় মানি। এই দেখুন না, এন্ট্রান্স পাস করাও শক্ত কাজ নয়, অথচ, পাস করা দূরে থাক, তিন-চার বৎসরের মধ্যে আমি তার কাছে ঘেঁষতে পারলাম না। আচ্ছা, এই স্বামীজী লোকটিকে পূর্বে কখনও দেখেছেন কিংবা এঁর সম্বন্ধে কোনদিন কিছু শুনেছেন?

কেহই কিছু জানে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিল।

সতীশ বলিল, এই দেখুন, এক গেরুয়া বসন ছাড়া আর তাঁর কোন সার্টিফিকেট নেই। অথচ আপনারা মেতে উঠেছেন এবং আমি নিজে কাজ ক্ষতি করে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারিনে বলে সবাই রাগ করছেন।

ভূপতি বলিল, মেতে উঠি কি সাধে সতীশবাবু! এই গেরুয়া কাপড়-পরা লোকগুলি সংসারকে যে অনেক জিনিসই দিয়ে গেছেন। সে যাই হোক, আমি রাগ করিনি, দুঃখ করছি। জগতের সমস্ত বস্তুই সাফাই সাক্ষীর হাত ধরে হাজির হতে পারে না বলে মিথ্যা বলে ত্যাগ করতে হলে অনেক ভালো জিনিস হতেই

আমাদের বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। আপনিই বলুন দেখি, যখন সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা সাধতেন, তখন কতটুকু রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন? কতটুকু ভালমন্দ তার বুঝেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। সঙ্গীতের একটা আদর্শ যদি আমার সুমুখে না থাকত, মিষ্ট রসাস্বাদের আশা যদি না করতাম, তা হলে এত কষ্ট করে সা-রে-গা-মা সাধতাম না। ওকালতির মধ্যে টাকার গন্ধ আপনি যদি অত করে না পেতেন, তা হলে একবার ফেল করেই ক্ষান্ত দিতেন, বারংবার এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করে আইনের বইগুলো মুখস্থ করতেন না। উপীনদাও হয়ত একটা ইস্কুল-মাস্টারি নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতেন।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একগুণ খোঁচা যে দশগুণ করিয়া সতীশ ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল।

রোষ চাপিয়া রাখিয়া ভূপতি কহিলেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। একটা জিনিসের ভালমন্দ যে কত রকমে প্রমাণ হতে পারে, তাই হয়ত আপনি জানেন না।

কথায় কথায় সকলেই ক্রমশঃ রাস্তার একধারে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মাপ করুন ভূপতিবাবু! ছয় রকম 'প্রমাণ' ও ছত্রিশ রকম 'প্রত্যক্ষে'র আলোচনা এত রোদে সহ্য হবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যার পর বাবার বৈঠকখানায় যাবেন, যেখানে দুপুর-রাত্রি পর্যন্ত কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে। প্রফেসার নবীনবাবু, সদর-আলা গোবিন্দবাবু, মায় এ-বাড়ির ভট্‌চায্যিমশায় পর্যন্ত এই নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চুলোচুলি করতে থাকেন। পাশের ঘরেই আমার আড্ডা। হেরফেরগুলো বেশ কায়দা করে এখনও পেকে উঠেনি বটে, কিন্তু গায়ে আমার রং ধরেচে। অসময়ে

পেকে গাছতলায় পড়ে শিয়াল-কুকুরের পেটে যেতে চাইনে। তাই, এটা বাদ দিয়ে আর কিছু যদি বলবার থাকে ত বলুন, না হয় অনুমতি করুন, বিদায় হই।

যুক্তহস্ত সতীশের কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। রুষ্ট ভূপতি দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় তর্কের সূত্র হারাইয়া গেল, এবং এমন অবস্থায় যাহা প্রথমেই মুখে আসে তাহাই তর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন— আপনি তা হলে দেখছি ঈশ্বরও মানেন।

কথাটা যে নিতান্তই অসংলগ্ন ও ছেলেমানুষের মত হইল, তাহা ভূপতির নিজের কানেও ঠেকিল।

সতীশ ভূপতির আরক্ত মুখের 'পরে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উপেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও উপীনদা, ভূপতিবাবু এবারে কোণ নিয়েচেন। আমার মত দশ-বারোটা কুকুরেও এবারে আর ঘেঁষতে পারবে না। ভূপতির প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক করেছেন ভূপতিবাবু, 'চোর-চোর' খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলাই ভাল।

এই অপবাদের আঘাতে আগুন হইয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি চুপ কর ভূপতি, আমি এই লোকটিকে জব্দ কচ্ছি। বুড়ি ছোঁয়া, কোণ নেওয়া এ-সব কি কথা রে সতীশ? বাস্তবিক তোর যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতি, তাতে সন্দেহ হতেই পারে, তুই ঈশ্বর পর্যন্ত মানিস নে।

সতীশ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! ঈশ্বর মানিনে? ভয়ঙ্কর মানি। থিয়েটারের আড্ডা ভাঙবার পরে দুপুর-রাত্রে গোরস্থানের পাশ দিয়ে একলা ফিরবার পথে যখন বিশ্বাসের জোরে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়, তোমরা ভালমানুষের দল তার কি খবর রাখ? হাসছ কি উপীনদা, ভূত-প্রেত মানি, আর ঈশ্বর মানিনে?

তাহার কথায় ক্রুদ্ধ ভূপতি পর্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সতীশবাবু, ভূতের ভয় করলেই ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—এ দুটি কি তবে আপনার কাছে এক?

সতীশ বলিল, একেবারে এক। পাশাপাশি রাখলে চেনবার জো নেই। শুধু আমার কাছেই নয়, আপনার কাছেও বটে, উপীনদার কাছেও বটে, এবং যাঁরা শাস্ত্র লেখেন তাঁদের কাছেও বটে। ও এক কথাই। না মানেন ত বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু মানলে আর রক্ষা নেই। দায়ে-ঘায়ে, আপদে-বিপদে, অনেক তরফ দিয়ে অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, বাগ্‌বিতণ্ডাও বিস্তর শুনেছি, কিন্তু যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। ছোট একটুখানি নিরাকার ব্রহ্মই মানো, আর হাত-পা-ওয়ালা তেত্রিশ কোটি দেবতাই স্বীকার কর, কোন ফন্দিই খাটে না। সমস্ত এক শিকলে বাঁধা। একটিকে টান দিলেই সব এসে হাজির হবে। ওই স্বর্গ-নরক আসবে, ইহকাল-পরকাল আসবে, অমর আত্মা এসে পড়বে, তখন কবরস্থানের দেবতাগুলিকে ঠেকাবে কি দিয়ে? কালীঘাটের কাঙালীর মত? সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও! নিমেষের মধ্যে যে যেখানে আছেন এসে ঘিরে ধরবেন। ঈশ্বর মানি, আর ভূতের ভয় করিনে-সে হবার জো নেই ভূপতিবাবু!

যেরূপ ভঙ্গী করিয়া সে কথার উপসংহার করিল তাহাতে সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত লঘুবয়স্ক দুইজন বালকের হাস্য-কোলাহলে রবিবারের অলস মধ্যাহ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর স্ত্রী সুরবালার প্রেরিত যে চাকরটা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বিড়বিড় করিতে ছিল, সে পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কলহের যে মেঘখানা ইতিপূর্বে আকার ধারণ করিতেছিল, এই সমস্ত হাসির ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল তাহার উদ্দেশ রহিল না।

কেহই হুঁশ করিল না, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণে বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঝি-র দল উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও রান্নাঘরে বামুনঠাকুরেরা কর্মত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া দিতেছে।

দুই

মাস-তিনেক পরে কলিকাতার একটা বাসায় একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে হঠাৎ স্থির করিয়া বসিল, আজ সে স্কুলে যাইবে না। সে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িতেছিল। এই কামাই করিবার সঙ্কল্পটা তাহার মনের মধ্যে সুধা বর্ষণ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে বিকল দেহটাকে সবল করিয়া তুলিল। সে প্রফুল্ল-মুখে উঠিয়া বসিয়া তামাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিল সাবিত্রী। সে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙলো বাবু?

সাবিত্রী বাসার ঝি এবং গৃহিণী। চুরি করিত না বলিয়া খরচের টাকাকড়ি সমস্তই তাহার হাতে। একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট-দুটি পান ও দোক্তার বসে দিবারাত্রি রাঙ্গা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহসুখ-বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্তরিক স্নেহ-মমতা ছিল। অথচ, কেহ সুখ্যাতি করিলে বলিত, যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু! তা ছাড়া, বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের কাছে নিন্দে করে বলবেন, বাসার এমন ঝি যে, পেট ভরে দু'বেলা খেতেও দেয় না—ও অপযশের চেয়ে একটু খাটা ভালো, বলিয়া হাসিমুখে কাজে চলিয়া যাইত। বাসার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন-তখন বকশিশ দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারা দিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বোধ করি এইজন্যই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত

বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বাসার সকলেই ইহা জানিত, এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জবাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।

সতীশ কহিল, হাঁ, ঘুম ভাঙলো। বলিয়াই বালিশের তলা হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাবিত্রী টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, সকালবেলায় আবার কি আনতে হবে?

সতীশ বলিল, সন্দেশ! কিন্তু আমার জন্যে নয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জন্যে কিনে নিয়ে যেও।

সাবিত্রী রাগ করিয়া টাকাটা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, রেখে দিন আপনার টাকা। আমার বাবু সন্দেশ খেতে ভালবাসে না।

সতীশ টাকাটা পুনরায় ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, আমার মাথা খাও সাবিত্রী, এ টাকা আমাকে কিছুতেই ফিরুতে পারবে না, আমি সত্যি তোমার বাবুকে সন্দেশ খেতে দিয়েছি।

সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, যখন-তখন আপনি মেয়েমানুষের মত মাথার দিব্যি দেন, এ ভারী অন্যায়। বাবু-টাবু আমার নেই। বাবু আমার আপনি—আপনারা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও টাকা। কিন্তু বলো, আমরা ছাড়া যদি আর কোন বাবু থাকে ত তার মাথা খাই।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমার বাবু কি আপনার সতীন যে, মাথা খাচ্ছেন?

সতীশ কহিল, আমি তাঁর মাথা খাচ্ছি, না তিনি আমার খাচ্ছেন? আমি ত বরং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি!

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চাকর-দাসীর সঙ্গে এ-রকম করে কথা কইলে ছোটলোক প্রশ্রয় পেয়ে যায়, আর মানে না, একটু বুঝে সমঝে কথা কইতে হয় বাবু, নইলে লোকেও নিন্দা করে। বলিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ এ বেলা কি রান্না হবে?

রন্ধনশালা সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সতীশ যে একজন গুণী লোক সে পরিচয় সাবিত্রী পূর্বেই পাইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ সকালবেলা একবার করিয়া আসিয়া সতীশের হুকুম লইয়া যাইত, এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বামুনঠাকুরের দ্বারা সমস্তটুকু নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করাইয়া লইত।ইতিমধ্যে চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, সতীশ আর একবার কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, যা খুশী।

সাবিত্রী বলিল, আবার রাগও আছে যে!

সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিল, পুরুষমানুষ, রাগ থাকবে না? আজ আমি খাবও না।

সাবিত্রী বলিল, আর কোথাও জুটেছে বোধ হয়? কিন্তু সে যাই হোক সতীশবাবু, ইস্কুলে আপনাকে যেতেই হবে তা বলে রাখছি।

এই অল্পকালের মধ্যেই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ব্যাপারটা পুনরায় সতীশকে বোঝার মত চাপিয়া ধরিতেছিল, এবং নানা ছলে নানা উপলক্ষে সে যে কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল, সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। আজ সেই ছলনার পুনরাবৃত্তির সূত্রপাতেই সে টের পাইল।

সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, শুভকর্মের গোড়াতেই টুকো না বলচি।

সাবিত্রী কহিল, তা ত বললেন। কিন্তু এন্ট্রান্স পাস করতে চব্বিশ বছর কেটে গেল, এই ডাক্তারি পাস করতে চৌষট্টি বছর কেটে যাবে যে!

সতীশ রাগতভাবে বলিল, মিথ্যা কথা বলো না সাবিত্রী। আমি এন্ট্রান্স পাস করিনি।

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটাও করেন নি?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। হিংসুটে মাস্টারগুলো আমাকে পাস করতে যেতেই দেয়নি।

সাবিত্রী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিল, তবে এটা হবে কি?

কোন্‌টা?

এই ডাক্তারিটা?

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাবিত্রী, গাধার মত লোকগুলো একজামিন-পাস করে কি করে বলতে পার?

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, গাধার মতন, কিন্তু গাধা নয়। যারা ঠিক গাধা, তারা পারে না।

সতীশ ব্যস্তভাবে দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই স্থির হইয়া বসিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, কেউ যদি শোনে ত সত্যিই নিন্দে করবে। আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গাধা বলছ, এর কোন কৈফিয়তই দেওয়া চলবে না।

হায় রে! কর্মদোষে আজ সাবিত্রী বাসার দাসী! তাই সে এই আঘাতটুকু সহ্য করিয়া লইয়া বলিল, তা বটে! বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ আর একবার অলসের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনের মধ্যে কর্মহীন সারা দিনের যে ছবিটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রীর কথার ঘায়ে তাহার অনেকটাই মলিন হইয়া গেল এবং যে ব্যথাটুকু বহন করিয়া সাবিত্রী নিজে চলিয়া গেল, তাহাও তাহার ছুটির আনন্দকে বাড়াইয়া দিয়া গেল না, এবং যদিচ সে মনে মনে বুঝিল আজ আর কামাই করিয়া লাভ হইবে না, তত্রাচ কিছুই

না করিবার লোভও সে ত্যাগ করিতে না পারিয়া অলস বিরক্ত মুখে বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু যথাসময়ে স্নানের জন্য তাগিদ পড়িল। সতীশ উঠিল না; বলিল, তাড়াতাড়ি কি? আমি আজ ত বার হবো না।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সে হবে না। আপনাকে ইস্কুলে যেতেই হবে—যান, আপনি স্নান করে খেয়ে নিন।

সতীশ বলিল, তোমাকে কি আমার অছি বহাল করা হয়েছে যে, এমন করে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছ? আজ আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

সাবিত্রী একটুখানি হাসিল; বলিল, না যান ত স্নান করে খেয়ে নিন। আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায় সেটা দেখতে পান না?

সতীশ বলিল, এ কি রকম দাসী-চাকর যে নটা বাজতে না বাজতে কষ্ট পায়! নাঃ—এ বাসা আমাকে বদলাতেই হবে, না হলে শরীর টিকবে না দেখচি।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, তা হলে আমাকেও বদলাতে হবে। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের কথাটা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ততক্ষণ কিন্তু আপনাকে এই বাসার নিয়মই মেনে চলতে হবে—ইস্কুলেও যেতে হবে। নিন, উঠুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে। বলিয়াই সতীশের ধুতি ও গামছা স্নানের ঘরে রাখিয়া আসিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিত। আজ সে স্নান করিয়া আসিয়া পূজার আসনে বসিয়া দেরী করিতে লাগিল। সাবিত্রী দুই-তিনবার আসিয়া দেখিয়া গিয়া দরজার বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, আর কেন, বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! ইস্কুলে যেতে হবে না আপনাকে, দয়া করে দুটি খেয়ে নিয়ে আমাদের মাথা কিনুন।

সতীশ আরও মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পূজা-আহ্নিকের সময় গোলমাল করলে কি হয় জানো?

সাবিত্রী বলিল, কোশাকুশি সামনে নিয়ে ছল করলে কি হয় জানেন?

সতীশ চোখ কপালে তুলিল, ছল করছিলাম! কখ্খন না।

সাবিত্রী কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। তারপরে বলিল, তা আপনিই জানেন। কিন্তু আপনারও ত অন্যদিন এত দেরী হয় না—যান, ভাত দেওয়া হয়েছে; বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ শীতের মধুর মধ্যাহ্নে বাসা নির্জন ও নিস্তব্ধ। এ বাসার সকলেই কেরানী। তাঁহারা অফিসে গিয়াছেন। বামুনঠাকুর বেড়াইতে গিয়াছে, বেহারী বাজার করিতে গিয়াছে, সাবিত্রীরও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সতীশ নিজের ঘরে প্রথমে দিবানিদ্রার মিথ্যা চেষ্টা করিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিয়া যা-তা ভাবিতেছিল। তাহার শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। সেটা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের খোলা ছাদের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ফেলিল। ছাদের একপ্রান্তে বসিয়া সাবিত্রী চুল শুকাইতেছিল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা বই দেখিতেছিল। জানালা খোলা-দেওয়ার শব্দে সে চকিত হইয়া মাথার উপরে আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনতিকাল পরেই সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, ডাকছিলেন আমাকে?

সতীশ বলিল, না, ডাকিনি ত।

আপনার পান, জল আনব?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আনো।

সাবিত্রী পান, জল আনিয়া বিছানার কাছে রাখিয়া দিয়া, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা একে একে বেশ করিয়া খুলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়াই বলিল, যাই, আপনার তামাক সেজে আনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী কোথায়?

বাজারে গেছে, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিয়া খোলা দরজার সুমুখে বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আজ মিথ্যে কামাই করলেন।

সতীশ কহিল, এইটেই সত্যি! আমার ধাতটা কিছু স্বতন্ত্র, তাই মাঝে মাঝে এ-রকম না করলে অসুখ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া আমি রীতিমত ডাক্তার হতেও চাইনে। অল্প-স্বল্প কিছু কিছু শিখে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়ে একটা বিনি-পয়সার ডাক্তারখানা খুলে দেব। চিকিৎসার অভাবে দেশের গরীব-দুঃখীরা ওলাউঠায় উজাড় হয়ে যায়, তাদের চিকিৎসা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সাবিত্রী বলিল, বিনি-পয়সার চিকিৎসায় বুঝি ভাল শেখার দরকার নেই? ভাল ডাক্তার কেবল বড়লোকের জন্যে, আর গরীবের বেলাই হাতুড়ে। কিন্তু তাই-বা হবে কি করে? আপনি চলে গেলে বিপিনবাবুর ভারী মুশকিল হবে যে!

বিপিনবাবুর উল্লেখে সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, মুশকিল আবার কি, আমার মত বন্ধু তাঁর ঢের জুটে যাবে। তা ছাড়া, ওখানে আমি আর যাইনে!

সাবিত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল, যান না? তা হলে আর ওঁকে গান-বাজনা শেখায় কে?

সতীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, গান-বাজনা বুঝি আমি শেখাই?

সাবিত্রী বলিল, কি জানি বাবু, লোক ত বলে।

কেউ বলে না—এ তোমার বানানো কথা।

আপনাকে বিপিনবাবুর মোসাহেব বলে; এও বুঝি আমার বানানো কথা!

কথা শুনিয়া সতীশ আগুন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ ছিল। বিপিনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাহিরের লোকের সমালোচনার বিষয় হইলে সেই সমালোচনার ফল সাধারণতঃ কি দাঁড়ায়, ইহা সে বিদিত ছিল। কলিকাতাবাসী বিপিনের সাংসারিক অবস্থা ও তাহার আমোদ-প্রমোদের অপর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জামের মাঝখানে প্রবাসী সতীশের স্থানটা লোকের চোখে যে নীচে নামিয়াই পড়িবে, সতীশের অন্তরস্থ এই উৎকণ্ঠিত সংশয় সাবিত্রীর তীক্ষ্ণ ঘায়ে একেবারে উগ্রমূর্তি

ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে দুই চোখ দীপ্ত করিয়া গর্জিয়া উঠিল, কি, আমি মোসাহেব—কে বলে শুনি?

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, কার নাম করব বাবু? যাই, রাখালবাবুর বিছানাটা রোদে দিয়ে আসি।

বিছানা থাক—নাম বল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, কুমুদিনী।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, তাকে তুমি জানলে কি করে?

সাবিত্রী বলিল, তিনি আমাকে কাজ করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমাকে? সাহস ত কম নয়! তুমি কি বললে?

এখনো বলিনি—ভাবচি। বেশী মাইনে, কম কাজ তাই লোভ হচ্চে।

সতীশের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল, এ বিপিনের মতলব। তোমার নাম সে প্রায়ই করে বটে।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, করেন? তা হলে বোধ করি আমাকে মনে ধরেছে!

সতীশ সাবিত্রীর মুখের প্রতি ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, ধরাচ্ছি; এক শ' টাকা ফাইন দিয়ে অবধি লোকজনকে আর চাবকাই নি—আবার দেখচি কিছু দিতে হলো! আচ্ছা তুমি যাও।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। রাখালের বিছানাগুলি রৌদ্রে দিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, সতীশ জামা গায়ে দিয়াছে, এবং বাক্স খুলিয়া একতাড়া নোট লুকাইয়া পকেটের মধ্যে লইতেছে। সাবিত্রী দুই চৌকাঠে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কোথায় যাওয়া হবে?

কাজ আছে—পথ ছাড়ো।

কি কাজ শুনি?

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সরো।

সাবিত্রী সরিল না। হাসিয়া বলিল, ভগবান আপনাকে কোন গুণ থেকে বঞ্চিত করেননি দেখচি। ইতিপূর্বে জরিমানা দেওয়াও হয়ে গেছে!

সতীশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, কথা কহিল না।

সাবিত্রী কহিল, এ ত আপনার ভারী অন্যায়! কোথায় কাজ করি, না-করি আমার ইচ্ছে—আপনি কেন বিবাদ করতে চান?

সতীশ বলিল, বিবাদ করি না-করি আমার ইচ্ছে, তুমি কেন পথ আটকাও?

সাবিত্রী হাতজোড় করিয়া বলিল, আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি এলে যাবেন।

সতীশ ফিরিয়া গিয়া খাটের উপর বসিতেই সাবিত্রী বাহিরে আসিয়া খট্ করিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া জানালা দিয়া আস্তে আস্তে বলিয়া গেল, শান্ত না হলে দোর খুলব না—নীচে চললুম।বলিয়া সে সত্যই নীচে নামিয়া গেল। বাহিরে যাইতে না পারিয়া সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গায়ের জামাটা মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিনের সহিত তাহার আলাপ এলাহাবাদে। কলিকাতায় আসিয়া ইহা যথেষ্ট ঘনীভূত হইলেও এই বাসার মধ্যে তাহার যখন-তখন আসা-যাওয়াটা যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছিল, ইহা সে নিজেও লক্ষ্য করিতেছিল। আজ সাবিত্রীর কথায় সেই হেতুটা একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সতীশের বন্ধু বলিয়া এবং বড়লোক বলিয়া এ বাসায় তাহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। সতীশের অনুপস্থিতিতেও তাহার আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়, এ ভার সতীশ নিজেই সাবিত্রীর উপরে দিয়াছিল। এই খাতির-যত্ন বিপিনবাবু যে পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া লইতেছিলেন এ সংবাদ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সতীশ যখন-তখন পাইতেছিল। নিজের মনের এই সরল উদারতার তুলনায় বিপিনের এই কদাকার লুব্ধতা গভীর কৃতঘ্নতার মত আজ তাহাকে বিঁধিল এবং সমস্ত নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সৌহার্দ্য, ঘনিষ্ঠতা

একমুহূর্তেই তাহার কাছে বিষ হইয়া গেল। বাহ্যতঃ সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু মর্মান্তিক আক্রোশ পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র পশুর মত ক্রমাগত তাহার অন্তরের মধ্যে এ-কোণ ও-কোণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী জানালার বাহির হইতে আস্তে আস্তে বলিল, রাগ পড়ল বাবু?

সতীশ জবাব দিল না।

দোর খুলিয়া সাবিত্রী ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আচ্ছা এ কি অত্যাচার বলুন ত?

সতীশ কোনদিকে না চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের অত্যাচার?

সাবিত্রী বলিল, সকলেই নিজের ভাল খোঁজে। আমিও কোথাও যদি একটু ভাল কাজ পাই, আপনি তাতে বাদ সাধেন কেন?

সতীশ উদাসভাবে বলিল, বাদ সাধব কেন? তোমার ইচ্ছে হলে যাবে বৈ কি!

সাবিত্রী কহিল, অথচ, আমার নূতন মনিবটিকে মারধর করবার আয়োজন কচ্চেন।

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, তুমি কি করতে সাবিত্রী? তোমার জিনিসটি যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়—

কিন্তু আমি কি আপনার জিনিস? বলিয়াই সাবিত্রী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর্—তা—নয়—কিন্তু—

সাবিত্রী বলিল, কিন্তুতে আর কাজ নেই—আমি যাব না। সতীশের পিরানটা মাটিতে লুটাইতেছিল, সাবিত্রী তুলিয়া লইয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া ফেলিল। বাক্সে চাবি লাগানই ছিল, নোটগুলি ভিতরে রাখিয়া চাবি

বন্ধ করিয়া চাবি নিজের রিঙে পরাইতে পরাইতে বলিল, আমার কাছে রইল। টাকার আবশ্যক হলে চেয়ে নেবেন।

সতীশ বলিল, যদি চুরি কর?

সাবিত্রী সে কথায় হাসিয়া আঁচল-বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, আমি চুরি করলে আপনার গায়ে লাগবে না।

সতীশ সাবিত্রীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে সে কি দেখিতে পাইল সে-ই জানে, চমকিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, তোমাদের বাড়ি কোন্ দেশে?

বাঙলা দেশে।

তার বেশী আর বলবে না?

না

বাড়ি কোথায় না বল, কি জাত বল?

সাবিত্রী একটুখানি হাসিয়া বলিল, তাই বা জেনে কি হবে? হাতে ভাত খাবেন না ত!

সতীশ ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিল, সম্ভব নয়। কিন্তু জোর করে একবারে না বলতেও পারিনে।

সাবিত্রী তাহার দুই আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু সতীশের মুখের উপর নিবন্ধ করিয়া মুহূর্তকাল পরেই হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে অনির্বচনীয় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া বলিল, না বলতে পারেন না—কেন বলুন ত?

অকস্মাৎ সতীশের মাথায় যেন ভূত চাপিয়া গেল। তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ গাঢ়-স্বরে বলিয়া ফেলিল, কেন জানিনে সাবিত্রী, কিন্তু তুমি রেঁধে দিলে খাব না বলা আমার পক্ষে শক্ত।

শক্ত? আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে? ঐ যাঃ—রাখালবাবুর পাশ-বালিশটা রোদে দিতে ভুলেছি, বলিয়াই চক্ষের নিমিষে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটা কথা শুনে যাও সাবিত্রী, বলিয়াই সহসা সতীশ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তাহার অঞ্চলের ক্ষুদ্র একপ্রান্ত ধরিয়া ফেলিল। সাবিত্রী দুই চক্ষে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া 'ছি! আসচি।' বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার এই অকস্মাৎ সত্রাস পলায়ন, এই চাপা গলায় 'আসচি', এই চোখের বিদ্যুৎ—বজ্রাগ্নির মত সতীশের সমস্ত দুর্বুদ্ধিকে এক নিমিষে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। কুৎসিত লজ্জার ধিক্কারে তাহার সমস্ত শরীর শূলবিদ্ধ সর্পের মত গুটাইয়া গুটাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইহজন্মে সে আর সাবিত্রীকে মুখ দেখাইতে পারিবে না এবং পাছে কোনো প্রয়োজনে সে আবার আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সে তৎক্ষণাৎ একখানা র্যা পার টানিয়া লইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া পড়িল। তিন-চারিটা সিঁড়ি বাকী থাকিতে সতীশ উপর হইতে সাবিত্রীর গলা আবার শুনিতে পাইল। সে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, একেবারে খাবার খেয়ে বেড়াতে যান বাবু, নইলে ফিরে আসতে দেরী হলে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু যেন শুনিতেই পাইল না, এইভাবে সতীশ ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা সাবিত্রী যখন রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, কিছু মনে করো না সাবিত্রী।

সাবিত্রী বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি মনে করব না?

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ যা হোক! আমার সময় নেই—কি রান্না হবে বলুন।

আমি জানিনে—তোমার যা ইচ্ছে।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি কাণ্ড বলুন ত! আজো পাদমেকং ন গচ্ছামি নাকি?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, নটা বেজে গেছে যে!

সময় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদে সতীশ লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিল, বাজুক গে—আমার আর ভাল লাগছে না।

এই সকল অন্যায় আলস্য, বৃথা সময় নষ্ট, সাবিত্রী একেবারে দেখিতে পারিত না। তাই সে কিছুদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। একটু রুক্ষস্বরেই প্রশ্ন করিল, বলি, কি ভাল লাগচে না? পড়তে যাওয়া?

সতীশ নিজেও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল—জবাব দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়া সাবিত্রী ইহা বুঝিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, লেখাপড়া ভাল লাগছে না! এখন ভাল লাগছে বুঝি মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করা? যান আপনি ইস্কুলে। অনর্থক বাসায় বসে থেকে উপদ্রব করবেন না।

তাহার তিরস্কারের মধ্যে যদিচ আন্তরিক স্নেহ ও একান্ত মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার ভঙ্গীটা সতীশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চোখ-মুখ তাহার ক্রোধে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল, যা মুখে আসে তাই যে বল দেখছি? প্রশ্রয় পেলে শুধু কুকুরই মাথায় ওঠে না, মানুষকেও মনে করে দিতে হয়।

এ যে গালি-গালাজ! সাবিত্রী মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর আরো নত করিয়া বলিল, হয় বৈ কি সতীশবাবু! না হলে আপনাকেই বা মনে করে দিতে হবে কেন এটা ভদ্রলোকের বাসা, বৃন্দাবন নয়। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দুঃসহ বিস্ময়ে সতীশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাবিত্রী যে তাহাকে এমন করিয়া বিঁধিতে পারে, এ কথা সে ত মনে স্থান দিতেও পারিত না। কতক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোনমতে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইয়া পড়িবার ছলে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার অপমানাহত ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে লাগিল এবং যতই সে নিজের এই অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যবহারের কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না, ততই তাহার মনের মধ্যে একটা কথাই বারংবার আনাগোনা করিয়া দাগ কাটিতে লাগিল। কেন যে সে আঁচল ধরিয়াছিল, কি কথা তাহার বলিবার ছিল এবং সাবিত্রী অমন করিয়া পলাইয়া না গেলে সে কি বলিত, কি করিত, তাহার অপদস্থ ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণ নিরন্তর এই সমস্ত তিক্ত প্রশ্নে সাবিত্রীর অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর নিষ্ঠুরভাবে অবিশ্রাম বিঁধিতে লাগিল। এমনি করিয়া সারা দিন সে নিজের অস্ত্রে নিজে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দিন-শেষে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোনমতে খেয়ার মাঝিদের বিনীত আক্রমণ এড়াইয়া নির্জীবের মত একখণ্ড পাথরের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

কাল যখন সাবিত্রীর কাছে মনের দুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ায় লজ্জায় বাসা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়াছিল, তখন সে লজ্জার মধ্যে কেমন করিয়া যেন একটু মাধুর্য মিশিয়াছিল। কে যেন আড়ালে থাকিয়া অংশ লইয়াছিল। কিন্তু আজ সাবিত্রীর বিদ্রূপের বহ্নিতে সেই রসের লেশটুকু পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়া নিঃসঙ্গ লজ্জা একেবারে শুষ্ক কঠিন হইয়া তাহার বুকের মধ্যে আড় হইয়া বাধিল। সেদিন তাহার আত্মসম্ভ্রম শুধু মাথা হেঁট করিয়াছিল, আজ তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আবার সবচেয়ে বাজিতে লাগিল এই দুঃখটা যে, এই স্ত্রীলোকটিকে সে যতদিন যত পরিহাস করিয়াছে, তাহার সমস্তরই আজ একটা কদর্থ করা হইবে। কাল সকালবেলা পর্যন্ত সত্যই যে তাহার পরিহাসের মধ্যে রহস্য ভিন্ন দ্বিতীয় অর্থ ছিল না, নির্জন মধ্যাহ্নের ওইটুকু অসংযমের পরে সে কথা ত মুখে আনিবারও আর পথ রহিল না। আসক্তি যে বহুদিন হইতে লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল না, এ কথা ত সাবিত্রী কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না। সে বলিবে, এঁর মনে এই ছিল! কিন্তু তাহার মনে ত কিছুই ছিল না। এই সত্যটা বুঝাইয়া বলিবার সময়-সুযোগ তাহার কবে মিলিবে? সে সৎ ছেলে নয়, সে লজ্জাও তাহার খুব বেশী ছিল না, কিন্তু ভণ্ডামির অপবাদ সহ্য করিবে সে কি করিয়া? সে মনে মনে বলিল, যদি চোর, তবে চোরের মত সিঁদকাঠি-হাতেই ধরা পড়িল না কেন? সাবিত্রী যেন মনে মনে হাসিয়া বলিবে, এই সাধু জটা-কমণ্ডলু পিঠে বাঁধিয়া ত্রিশূল দিয়া সিঁদ খুঁড়িতেছিল—ধরা পড়িয়াছে। এই অপবাদের কল্পনা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে বসিয়া কখন যে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল না। কখন ভাঁটা শেষ হইয়া জোয়ারের জল পায়ের কাছে উঠিয়াছে, কখন কলিকাতার অন্ধ্ররন্ধ্র গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কখন মাথার উপরে আকাশ কালো হইয়া নক্ষত্র ফুটিয়াছে, কিছুই সে টের পায় নাই।

শীতের জোলো হাওয়ায় তাহার শীত করিতে লাগিল এবং ওপারের চটকলের ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল। তখন সতীশ উঠিয়া পড়িয়া বাসার অভিমুখে চলিল। এই সময়টায় কিছুক্ষণের জন্য বোধ করি, সে তাহার কাল্পনিক আশঙ্কাটা ভুলিয়াছিল; কিন্তু চলিতে চলিতে বাসার দূরত্ব যতই হ্রাস পাইতে লাগিল, মন তাহার পুনর্বার সেই অনুপাতেই ছোট হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে গলির মোড়ের কাছে আসিয়া পা আর উঠে না, এমনি হইল। ধীরে ধীরে কোনমতে সে বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাসা নিস্তব্ধ! কোথাও কেহ যে জাগিয়া আছে এমন মনে হইল না এবং যদিচ সে

জানিত, এত রাত্রে সাবিত্রী নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিয়া গেছে, তথাপি দ্বারে ঘা দিতে, শব্দ করিতে সাহস হইল না। ভয় করিতে লাগিল, পাছে সে-ই আসিয়া দোর খুলিয়া দেয়। ঠিক এমনি সময়ে কবাট আপনি খুলিয়া গেল। একমুহূর্ত সতীশ কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কে, বেহারী?

হাঁ বাবু।

সকলের খাওয়া হয়ে গেছে?

হয়েছে।

ঝি চলে গেছে?

আজ্ঞা হাঁ, আমাকে বসে থাকতে বলে এইমাত্র গেল।

শুনিয়া সতীশ বাঁচিয়া গেল। খুশী হইয়া তাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া, প্রফুল্লমুখে উপরে উঠিয়া গেল।

বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার খাবার—

খাবার থাক বেহারী—আমি খেয়ে এসেছি।

বেহারী বলিল, আপনার পান, জল ওই টেবিলের উপর আছে।

আচ্ছা, তুই শুগে যা।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

কলহ করিয়া অবধি সাবিত্রীর মন ভাল ছিল না। সতীশ তাহাকে কটূক্তি করিলেও ফিরাইয়া বলা যে তাহার উচিত হয় নাই, এই অনুতাপ তাহাকে সমস্ত দুপুরবেলাটা ক্লেশ দিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার পরে কোন একসময়ে নিভৃতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইবার আশায় অপেক্ষা করিতে করিতে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহার আশা আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। সে জানিত এ কলিকাতায় বিপিন ভিন্ন সতীশের যাইবার স্থান নাই। তাই সর্বাগ্রেই ভয় হইল পাছে সে সেই দলেই মিশিয়া থাকে। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সতীশ আসিল

না। আর কোথাও যাইবার কথা মনে করিতে না পারিয়া সংশয় যখন বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া উঠিল, তখন প্রতীক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাহার ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল যে, ক্ষমা চাহিবার জন্য সে এমন লোকেরও পথ চাহিয়া আছে। তাই বেহারীকে বসিতে বলিয়া সাবিত্রী অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরে গিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত দেহটা কি এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে প্রভাতের জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

ঘরের ছোট টাইমপিস্‌টিতে সব ক'টা বাজিয়া গেল, সে জাগিয়া থাকিয়া শুনিল এবং প্রভাতের জন্য আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ভোর থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়া কাপড় ছাড়িয়া চোখে মুখে জল দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথ দিয়া তখন মারোয়াড়ী রমণীরা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিল, সেইদিকে মুখ করিয়া সাবিত্রী যেই বলিল, মা গঙ্গা, গিয়ে যেন সব ভাল দেখি, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া তপ্ত অশ্রুতে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল এবং এই কল্পিত আশঙ্কায় সমস্ত মন পরিপূর্ণ করিয়া সে পথ দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে সহস্রবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিল, ভাল থাক। যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু ভাল থাক। বাসায় পৌঁছিয়া ডাকাডাকির পরে বেহারী দরজা খুলিয়া দিয়াই সংবাদ দিল—সতীশবাবু অনেক রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং কোথা হইতে খাইয়া আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ যে প্রথমেই দেওয়া প্রয়োজন এই বৃদ্ধের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সাবিত্রী উপরে উঠিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ললাট কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, খাননি বুঝি?

না, তাঁর খাবার ত ঢাকা পড়ে রয়েছে।

সাবিত্রী শুধু একটা হুঁ বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নির্ভয় হইবামাত্রই আবার ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন বেলা হইলে সতীশের ঘুম ভাঙ্গিল এবং ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হইল সাবিত্রী! ঠিক সেই মুহূর্তেই সমস্ত মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মুখের পানে একবারমাত্র চাহিয়াই সতীশ মাথা হেঁট করিল। খানিক পরে সাবিত্রী বলিল, কি রান্না হবে জানতে এলুম।

সতীশ কোনদিকে না চাহিয়া বলিল, রোজ যা হয় তাই হোক।

'আচ্ছা', বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার দাঁড়াইল, কহিল, লেখা পড়ার মত বাবুর কি খাওয়া-দাওয়াও আর ভাল লাগছে না?

সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, আমি খেয়ে এসেছিলাম।

সে ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু কোথায়, এ কথাও সাবিত্রী ঘৃণায় জিজ্ঞাসা করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ দু' দিন ধরে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কিসের ভয়ে শুনি? অসুবিধা হলে আমাকে ত জবাব দিতেই পারেন।

সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, তোমার অপরাধ? তা ছাড়া আমি ত জবাব দেবার কর্তা নই, বাসা আমার একলার নয়।

সাবিত্রী বলিল, একলার হলে জবাব দিতেন বোধ হয়। আচ্ছা, আমি না হয় নিজেই যাচ্চি।

সতীশ উত্তর দিল না, মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি গেলে আপনি খুশী হন? আপনার পায়ে পড়ি সতীশবাবু, হাঁ না একটা জবাব দিন।

তবু সতীশ নিরুত্তর হইয়া রহিল। কারণ, সাবিত্রী যে এ বাসার কতখানি, তাহা সে জানিত এবং এমন করিয়া সে হঠাৎ চলিয়া গেলে কিছুই চাপা থাকিবে না, তখন সমস্ত কথাটা মুখে মুখে ঘাঁটাঘাঁটি হইতে হইতে কিরূপ জঘন্য আকার ধারণ করিবে, তাহাই নিশ্চয় অনুমান করিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমাকে মাপ কর সাবিত্রী! যে ক'টা দিন আমি আছি, সে ক'টা দিন অন্ততঃ তুমি কোথাও যেও না।

অন্য কোনো সময় হইলে সে তখনি ক্ষমা করিত, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে সে নাকি একটা অমূলক সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতেছিল, তাই এই মৃদু কণ্ঠস্বরকে ছলনা কল্পনা করিয়া নির্দয় হইয়া উঠিল এবং তাহারি গলার অনুকরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, আপনি এত আড়ম্বর করে মাপ চেয়ে সাধু হতে চাচ্চেন কিসের জন্যে! আমার মত নীচ স্ত্রীলোকের আঁচল ধরে এই কি নূতন টেনেছেন যে, লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছেন? তার চেয়ে বাড়ি চলে যান, কলকাতায় থেকে মিথ্যে নষ্ট হবেন না। লেখাপড়া আপনার কাজ নয়।

যে সতীশ উগ্র-প্রকৃতিতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, কথা সহ্য করা যাহার কোনদিন স্বভাব নয়, সে এখন এতবড় অপমানের কথাতেও নির্বাক হইয়া রহিল। অপরাধী মন তাহার অসহ্য গুরুভারগ্রস্ত ভারবাহী জীবের মত এমনি নিরুপায়ভাবে পথের উপরে দুমড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সাবিত্রীর এই পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠুর আঘাতেও সে কিছুতেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। সাবিত্রীর কিন্তু চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার স্পর্ধা যে ক্রোধকেও ডিঙ্গাইয়া গেল, ইহা তাহার নিজের কানেও বাজিল। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

তিন

আজও সাবিত্রী সমস্ত কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সারা দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। সতীশ যদি কালকের মত আজও রাগ করিত কিংবা একটা কথারও উত্তর করিত ত ভাল হইত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে যথানিয়মে আহারাদি শেষ করিয়া পড়িতে চলিয়া গেল এবং ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ঘরে বসিয়া রহিল। আড়ালে থাকিয়া সাবিত্রী সমস্তই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু কোনরকম ছুতা করিয়াও আজ তাহার ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বে সে নিজে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিয়া আসিত, আজ বেহারীকে পাঠাইয়া দিল এবং সন্ধ্যার সময় সে-ই গিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া আসিল।

রোজ এই সময়টায় রাখালবাবুর ঘরে পাশার আড্ডা বসিত, আজও বসিল এবং ঘোর কলরব থাকিয়া থাকিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। সামনের খোলা ছাদে কেহই ছিল না। সাবিত্রী এদিকে ওদিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সতীশের ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশ বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়া বোধ করি কড়িকাঠ গুণিতেছিল, উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দেব?

সতীশ বলিল, দাও।

পুনর্বার সাবিত্রীকে নির্বাক্ হইতে হইল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, লোকে কি বলবে বলুন ত?

সতীশ কোন উত্তর করিল না।

সাবিত্রী বলিল, আপনি আমাকে থাকতে বললেন, কিন্তু নিজে কি রকম কাণ্ডই করছেন বলুন দেখি?

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, আমি কোন কাণ্ডই করিনি, চুপ করে আছি মাত্র।

সাবিত্রী বলিল, এই চুপ করে থাকাটাই যে সবচেয়ে বিশ্রী। সবাই যখন চুপ করে নেই, আপনি তখন চুপ করে থাকলেই ত কথা উঠবে—ওটা কি সাধ? মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া বলিল, ঐ যে খুঁচিয়ে ঘা করার একটা কথা আছে আপনি ঠিক তাই করছেন। দোষ নেই, অথচ দোষী সেজে বসে আছেন। এই নিয়ে পাঁচজনে কানাকানি করবে, হাসি-কৌতুক করবে, এ যদি বা আপনার বরদাস্ত হয়, আমার ত হবে না—আমাকে দেখছি তা হলে নিতান্তই যেতে হবে।

সতীশ মনে মনে অস্থির হইয়া বলিল, দোষ কি কিছুই করিনি?

সাবিত্রী বলিল, না। একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন দেখি, মনটা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার সম্বন্ধে আপনার মত দোষ—সাবিত্রী আর বলিতে পারিল না। ধাবমান অশ্ব অকস্মাৎ গভীর খাদের মুখে আসিয়া তাহার দুই পা অগ্রসৃত করিয়া যেভাবে প্রাণপণে রুখিয়া দাঁড়ায় সাবিত্রীর চলন্ত জিহ্বা ঠিক সেইভাবে থামিল। তাহার এই আকস্মিক নিস্তব্ধতায় বিস্মিত সতীশ মুখ তুলিতেই চোখাচোখি হইল—নিজের লজ্জায় সাবিত্রী নিজেই মরিয়া গেল। সে যে এই কথাটাই বলিতে গিয়াছিল যে, তাহার মত নারীর সম্বন্ধে ওরূপ অপরাধে লজ্জার হেতু নাই, এই লজ্জাতেই তাহার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

সতীশও কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী থামাইয়া দিয়া বলিল, চুপ করুন। আপনিও বুঝুন। মিথ্যে তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন না। ও বেহারী, বাবুর আহ্নিকের জায়গাটা একটু শিগগির করে ধুয়ে দাও, আমি অনেকক্ষণ আসন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচি।

বেহারী কি-একটা কাজে এদিকে আসিতেছিল, তৎক্ষণাৎ জল আনিতে ফিরিয়া গেলে সাবিত্রী লাঞ্ছিত অভিমানের সুরে কহিল, আপনার ব্যবহারে আজ

দুদিন যে আমি উত্তরোত্তর কি রকম অতিষ্ঠ হয়ে উঠচি, এ কি চোখ চেয়ে একবার দেখতেও পাচ্ছেন না? আশ্চর্যি!

তাহার এত দ্রুত এত কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ সতীশের ঘটিল না, তবুও তাহার ভিতরকার গ্লানিটা যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর ন্যায় অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তোমাকে কি অপমান করিনি?

সাবিত্রী অধীর হইয়া বলিল, না বুঝলে আপনাকে আমি বোঝাব কি করে? একশ'বার হাজারবার বলচি, ওতে আমার মত মেয়েমানুষের কোন অপমান হয়নি। আপনি দয়া করে সুস্থ হোন—এইটুকু শুধু আপনার পায়ে আমি মিনতি জানাচ্ছি।

প্রত্যুত্তরে সতীশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী তাহার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, এই যে বেহারী!

বেহারী ঘটিতে জল আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সাবিত্রী তাহার হাত হইতে ঘটি লইয়া ঘরের একটা কোণ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া সতীশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, যান, হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করতে বসুন। কোশাকুশি ওই কুলুঙ্গি তে আছে, বলিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া সতীশের দুর্বিষহ হৃদয়-ভারটা নিঃশেষে তুলিয়া লইয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ মন দিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া উঠিয়াই দেখিল ইতিমধ্যে কে নিঃশব্দে আসিয়া আসন পাতিয়া তাহার খাবার রাখিয়া গিয়াছে। যদিও ঘরে আর কেহ ছিল না, তথাপি সে নিশ্চয় বুঝিল সে একা নহে। আসনে বসিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, এখন এত বেশী খেলে আর ত খেতে পারব না।

বাহির হইতে জবাব আসিল, খেতেও হবে না, বিপিনবাবুর ওখান থেকে নিমন্ত্রণ করে গেছে।

সতীশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, যাও—জ্বালাতন করো না, আমি কোথাও যেতে পারব না।

সাবিত্রী আড়াল হইতে বলিল, সে কি হয়! বলে গেছেন কোথায় যেতে হবে আপনি জানেন এবং না গেলে তাঁদের সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। গান-বাজনা—

হয় হোক, বলিয়া সতীশ এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল এবং শেষ হইয়া গেলে বিছানার শিয়রে আলো তুলিয়া আনিয়া ভালছেলের মত একখানা ডাক্তারি বই খুলিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে কোনমতেই মন দিতে পারিল না। তাহার দুশ্চিন্তামুক্ত মন বন্ধন-মুক্ত ঘোড়ার মতই বিনা প্রয়োজনে সর্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রান্নাঘরে তখন রান্না চাপাইয়া দিয়া বামুনঠাকুর বেহারীকে দিয়া গাঁজা ডলাইতেছিল এবং রাখালবাবুর ঘরে পাশার কোলাহল উত্তরোত্তর দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল।

সতীশ ডাকিল, সাবিত্রী!

সাবিত্রী তখনও চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া ছিল, বলিল, আজ্ঞে!

সতীশ কহিল, বিপিনবাবুর নিমন্ত্রণে যাওয়া মহাপাপ। পাপ না বুঝে করেছি বটে, কিন্তু বুঝে করব না।

সাবিত্রী বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, পাপ কেন?

সতীশ কহিল, আমি জানি কোন্ জায়গায় তাঁর গান-বাজনার আয়োজন চলছে। শুধু সেই স্থানটায় যাওয়াই একটা পাপের কাজ।

বেশ ত, তেমন স্থানে নাই গেলেন।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু তারা যে সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে এমন মনে হয় না। তাই তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি—যদি কেউ আসে—ফিরিয়ে দিয়ো। বলো, আমি বাড়ি নেই—রাত্রে আসব না, বুঝেছ?

সাবিত্রী বলিল, বুঝেছি।

সতীশ একটা কর্তব্য পালন করিয়া সুস্থভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কোথা দিয়ে জোলো হাওয়া আসছে সাবিত্রী—জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। সতীশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ

কৃতজ্ঞতায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা সাবিত্রী, তুমি নিজে নীচ স্ত্রীলোক বল কেন?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সত্যি কথা বলব না?

সতীশ বলিল, এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। তুমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করিব না।

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন করবেন না?

তা জানিনে। বোধ হয়, সত্যি নয় বলেই নীচের মত তোমার ব্যবহার নয়, কথাবার্তা নয়, আকৃতি নয়—এত লেখাপড়াই বা তুমি শিখলে কোথায়?

সাবিত্রী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবার হাসিয়া বলিল, এত—কত শুনি?

সতীশ তাহাই ব্যাখ্যা করিতে খোলা বই একপাশে রাখিয়া হঠাৎ হাঁ করিয়াই থামিয়া গেল। অদূরে বাহিরে অতি দ্রুত জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং মুহূর্ত পরেই তাহার ঘরের অতি সন্নিকটে মত্তকণ্ঠে গম্ভীর ডাক আসিল, সতীশবাবু।

সতীশ বুঝিল, এ বিপিনের দল, তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। আর কোন কথা ভাবিল না—বিবর্ণমুখে ফস করিয়া ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

অদূরে মেঝের উপর বসিয়া সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি করলেন?

পর মুহূর্তেই অন্ধকার কবাটের সম্মুখে দুই মূর্তি আসিয়া খাড়া হইল। একজন কহিল, এই ত সতীশবাবুর ঘর।

আর একজন কহিল, বেহারাটা যে বললে বাবু ঘরেই আছেন!

প্রথম ব্যক্তি রাগ করিয়া কহিল, ঘর ত অন্ধকার। ভদ্রলোকে কি কখন সন্ধ্যার সময় বাসায় থাকে? তোমার যত—

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার উত্তরে অস্ফুটে কি একটা বলিয়া পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া অনিশ্চিত কম্পিত-হস্তে আলো জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিছানার মধ্যে সতীশের দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। সে বিলাতী কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘামিতে লাগিল, এবং অন্ধকার মেঝের উপর সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

দীপ-শলাকা জ্বলিয়া উঠিল। এই যে এখানে বসে কে হে! প্রথম ব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া সন্ধান করিয়া আলো জ্বালিতেই সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, সতীশবাবু কোথায়?

সাবিত্রী নিঃশব্দে বিছানা দেখাইয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেই মাতাল দুইজন অট্টহাসি জুড়িয়া দিল। সে হাসির শব্দ ও অর্থ সাবিত্রীর কানে গিয়া পৌঁছিল এবং কম্বলের মধ্যে সতীশ বারংবার নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

তাহারা সতীশকে টানিয়া তুলিল এবং জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল; এবং যতক্ষণ না তাহাদের বিকট হাস্যধ্বনি বাটীর বাহিরে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল ততক্ষণ পর্যন্ত সাবিত্রী একটা অন্ধকার কোণে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া বজ্রাহতের মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাসার কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। রান্নাঘরে বামুনঠাকুর এইমাত্র গাঁজার কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া ইহার মোক্ষ দান করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা বেদে কিরূপ লেখা আছে তাহাই ভক্ত বেহারীকে বুঝাইয়া বলিতেছিল, এবং ও-ঘরে রাখালবাবুর দল হাড়ের পাশা মানুষের চীৎকার শুনিতে পায় কি না তাহাই যাচাই করিতে লাগিল।

রাস্তায় আসিয়া তিনজনেই একখানা গাড়িতে চড়িয়া বসিল, ইহাদের উন্মত্ত হাসি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সতীশ তীক্ষ্ণভাবে বলিল, হয় আপনারা থামুন, না হয় মাপ করুন, আমি নেমে যাই।

প্রথম ব্যক্তি 'আচ্ছা' বলিয়াই ভয়ঙ্কর রবে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার সঙ্গী তাহাকে ধমক দিয়া থামিতে বলিয়া তাহার অপেক্ষাও জোরে হাসিয়া উঠিল। এই মাতাল দুটার সহিত বাক্যব্যয় বিফল বুঝিয়া সতীশ নিষ্ফল ক্রোধে জানালার বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

রাত্রে অন্ধকার বারান্দায় সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বোধ করি, সন্ধ্যার লজ্জাকর ঘটনাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় বেহারী আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় তোমাকে জল খেতে ডাকছেন।

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া অবসন্নভাবে কহিল, আজ আমি খাব না বেহারী।

বেহারী সাবিত্রীকে স্নেহ করিত, মান্য করিত। চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবে না কেন মা, অসুখ করেনি ত?

না, অসুখ করেনি, কিন্তু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমরা খাওগে যাও বেহারী।

বেহারী বলিল, তবে চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা চল। কিন্তু একটা কথা আছে বেহারী, সতীশবাবু এখনো ফেরেন নি, তুমি জেগে থাকতে পারবে ত?

বেহারী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমার সেই কোমরের বাতটা—

তবে কি হবে বেহারী—

বেহারী একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আজ যদি তুমি ঠাকুরমশাইকে হুকুম দিয়ে—

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিল, সে হবে না বেহারী। বামুন মানুষকে আমি শীতে কষ্ট দিতে পারব না।

অনিচ্ছুক বেহারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই না হয় থাকব। তবে চল, তোমাকে রেখে আসি।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া বলিল, কাজ নেই বেহারী, তুমি খেয়ে নাও গে—তার পরেই যাব।

বেহারী চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল, এবং অন্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ সতীশের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে মাতালের হাতে পড়িয়াছে, ইহা চোখে দেখিয়া তাহার কোনমতেই ঘরে ফিরিতে মন সরিতেছিল না। যদিচ, ইতিপূর্বে ইহারই নির্বুদ্ধিতায় নিদারুণ লাঞ্ছিত হইয়া জ্বালায় ছটফট করিয়া সে প্রত্যুষেই কর্মত্যাগের সঙ্কল্প স্থির-নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ রাত্রের মত এই লোকটিকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া, তাহার অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কোন একটা উপায় না করিয়া সে কোনমতেই ঘরে ফিরিতে পারিল না। বেহারী খাইয়া আসিলে বলিল, তুমি শুতে যাও বেহারী, আমিই আছি।

বেহারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, ঘরে যাবে না?

বাবু ফিরে আসুন। তার পরে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?

কেন পারব না মা? নিশ্চয় পারব।

তবে সেই ভাল। আমি আছি, তুমি শোও গে।

বেহারী খুশী হইয়া চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই একটা র্যা পার গায়ে দিয়া বসিয়া রহিল। এই মাতাল দুটো যাহা চোখে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ

করিবেই ইহাতেও তাহার যেমন লেশমাত্র সংশয় ছিল না, এ ঘটনার দ্বিতীয় অর্থও যে কেহ গ্রহণ করিবে না, ইহাতেও তাহার তেমনি সন্দেহ রহিল না। বিপিনবাবু লোকটিকে সাবিত্রী জানিত। সে এ কথা নিশ্চয় শুনিবে এবং এ বাসায় যখন তাহার গতিবিধি আছে তখন কেহই বঞ্চিত থাকিবে না। তাহার পরেও আর কোন্ মুখে সতীশ এখানে একদণ্ডও থাকিবে! এই অভিশস্তির লজ্জা সে কি করিয়া সহ্য করিবে? দৈবাৎ যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ত গেলই; নিজের সম্বন্ধে সে এইখানে থামিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও সতীশের সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিই খুঁজিয়া পাইল না।

ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, অথচ সতীশের দেখা নাই। নিকটে কোন প্রতিবেশীর ঘরের ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুটা বাজিয়া গেল—নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে তাহা স্পষ্ট শোনা গেল। এলোমেলো শীতল বায়ু খোলা ছাদের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া তাহার দুটি চক্ষুকে ঘুমে চাপিয়া ধরিতে লাগিল, তথাপি সে জাগিয়া থাকিয়া বাহির-দরজায় কান পাতিয়া রাখিল। এমনি করিয়া শুইয়া বসিয়া রাত যখন আর বড় বাকী নাই, এমন সময়ে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াই বুঝিল গাড়ি তাহাদেরই বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। সাবিত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গিয়া দরজার পার্শ্বে আসিয়া সর্তক হইয়া দাঁড়াইল। পাছে আর কেহ থাকে এই ভয়ে সহসা খুলিতে সাহস করিল না। বিলম্ব হইতে লাগিল, কেহ দরজায় ঘা দিল না। যে গাড়িখানা আসিয়াছিল তাহাও ফিরিয়া গেল। অকস্মাৎ সাবিত্রী আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে অর্গল মুক্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ বাহিরের চৌকাঠে হেলান দিয়া পাংশুমুখে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। তাহার কাপড়ে চাদরে কাদা, মাথা এবং কপালের একধারে রক্তের রেখা অদূরবর্তী গ্যাসের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে সতীশের মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বাবু, ওপরে চলুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বেশ আছি।

সাবিত্রী চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও লেগেছে?

না, লাগেনি, বেশ আছি।

এ যে রাস্তা, ঘরে চলুন।

সতীশ পুনর্বার মাথা নাড়িয়া বলিল, না, যাব না, বেশ আছি।

সাবিত্রী ধমক দিয়া বলিল, উঠুন বলছি।

ধমক খাইয়া সতীশ রক্তবর্ণ বিহ্বল-চক্ষে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিল, চল।

তখন তাহারি কাঁধে ভর দিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বহু ক্লেশে বহু বিলম্বে টলিতে টলিতে অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। জড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, সাবিত্রী, তোমার ঋণ আমি কোন জন্মে শুধতে পারব না।

সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা, আপনি ঘুমোন।

সতীশ চোখের নিমেষে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি ঘুমোব? কখ্খন না।

পুনর্বার সাবিত্রী ধমক দিয়া উঠিল, আবার!

সতীশ শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তোমার ধার—

সাবিত্রী 'আচ্ছা' বলিয়া উঠিয়া গেল এবং আলো কাছে আনিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিয়া ধুইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পড়ে গেলেন?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, পড়িনি।

সাবিত্রী সজল-কণ্ঠে বলিল, আর যদি কোনদিন মদ খান আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল, কোনদিন খাব না।

আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করুন, বলিয়া সাবিত্রী তাহার দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিল।

সতীশ নিজের দুই হাতের মধ্যে তাহার জলসিক্ত শীতল হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, দিব্যি কচ্ছি।

সাবিত্রী হাত টানিয়া লইয়া বলিল, মনে থাকবে?

না থাকলে তুমি মনে করে দিয়ো।

আচ্ছা, আমি আসচি আপনি ঘুমোন, বলিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে সাবধানে কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সুমুখেই শুকতারা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া সাবিত্রী দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ঠাকুর! তুমি সাক্ষী থেকো।

রাত্রের অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পথে গরুর গাড়ির শব্দ এবং ও-পাড়ার ময়দার কলের বাঁশী শোনা যাইতে লাগিল। সাবিত্রী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া রান্নাঘরের একটা কোণে র্যা পার মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই নিদ্রা-কাতর দুই চক্ষু তাহার ঘুমে মুদ্রিত হইয়া গেল।

চার

বেলা দশটার পর কোনমতে স্নানাহ্নিক সারিয়া লইয়া দিবাকর রান্নাঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া খাতির করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই গো! তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো, বড় বেলা হয়ে গেছে।

পার্শ্বেই ভাঁড়ার। তাহার গলার শব্দে মামাতো বড়বোন মহেশ্বরী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ও দিবু, তোর জন্যেই অপেক্ষা কচ্ছি দাদা! একবার ওপরে গিয়ে ঠাকুরপূজোটি সেরে এস। সমস্ত যোগাড় ঠিক আছে, লক্ষ্মী ভাইটি আমার যাও।

মহেশ্বরী এ-বাড়ির বড়মেয়ে এবং গৃহিণী। বছর-চারেক পূর্বে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ি আসিয়াছেন।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি পারব না দিদি। আমার কলেজের প্রথম ঘণ্টা আজো তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

মহেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হবে বলে ঠাকুরপূজো হবে না রে!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, ভট্‌চায্যিমশাই কোথা? তাঁর হলো কি?

মহেশ্বরী কহিলেন, তিনি বাবার সঙ্গে পাশায় বসেচেন। এখন কত বেলায় যে উঠবেন তার ঠিকানা কি?

দিবাকর কহিল, মেজদাকে বল দিদি; আজ তাঁর কাছারি বন্ধ আছে।

মহেশ্বরী বলিলেন, ধীরেনের কাল থেকে শরীর ভাল নেই। সে স্নান করবে না—পূজো করবে কি করে?

তবে ছোটদাকে বল। তিনি সেই বারোটার পরে আদালতে বার হন, এখনো তার ঢের দেরী আছে।

মহেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কি যে তর্ক করিস দিবা, তার কোন ঠিকানা নেই। কাল রাত্তিরে উপীন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত ঘুম থেকে ওঠেনি। এতটা বেলা হলো মুখ ধুলে না, চা খেলে না। রাত জেগে তার দেহটাই কি ভাল আছে? তা ছাড়া সে কি কোনদিন পূজো করে যে আজ যাবে পূজো করতে?

এদিকে বামুনঠাকুর ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। দিবাকর কহিল, কোন-না-কোন কাজে একটা-না-একটা বিঘ্ন এসে প্রায় রোজ আমার প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়—আমি পরীক্ষা দেব কেমন করে?

মহেশ্বরী রাগিয়া উঠিতেছিলেন, বলিলেন, পরীক্ষা না দিলেও যদি-বা চলে, ঠাকুরপূজো না হলে চলতে পারে না। দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় আমার নেই—আরো কাজ আছে।

বামুনঠাকুর হাঁক দিয়া কহিল, দিবাবাবু, ভাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে—আসুন না শিগ্‌গির।

মহেশ্বরী তাহাকে তর্জন করিয়া উঠিলেন, তোমার কোন আক্কেল নেই ঠাকুর! আমি ওকে পূজো করতে পাঠাচ্ছি—তুমি কচ্চ ডাকাডাকি। ভাত তুলে নিয়ে যাও—পূজো করে এলে দিয়ো, বলিয়াই ভাঁড়ার-ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। সেখানে পূজার সাজ প্রস্তুত ছিল। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিত্যপূজার নিমিত্ত একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তিনি বাড়িতেই থাকেন। কর্তা শিবপ্রসাদের ন্যায় তাঁহারও পাশাখেলার ঝোঁক খুব বেশী। শিবপ্রসাদ কিছুদিন হইল সরকারী চাকরিতে পেনশন লইয়া তাঁহার পশ্চিমের বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। সকালে চা-পানের পরে পুরোহিতমশায়কে ডাক পাড়ে। 'ভূতো, ভট্‌চায্যিমশায়কে একবার ডাক। একদান রঙে বসা যাক।' পরে একদান দু'দান করিয়া বেলা বাড়িয়া উঠে—পুরোহিতের পূজা করিবার অবকাশ হয় না। ইতিপূর্বে

পূজার জন্য তাগিদ দিয়া মহেশ্বরী চাকর পাঠাইতেন, কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও আর উঠা হইত না—পূজার সময় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া যাইত, কাহারো হুঁশ হইত না। ইদানীং পিতার শরীর ভাল নাই, অথচ খেলার ঝোঁকে থাকেন ভাল মনে করিয়া মহেশ্বরী আর পুরোহিতকে ডাকেন না—একে-ওকে-তাকে দিয়া, অর্থাৎ দিবাকরকে দিয়া নিত্যপূজা সারিয়া লন।

সকালে চা খাইবার অভ্যাস এবং অবকাশ দিবাকরের ছিল না। প্রত্যহ প্রভাতেই তাহাকে চাকরের সঙ্গে বাজারে যাইতে হইত। আজ বাজার হইতে ফিরিয়া কোনমতে নিত্যকর্ম সারিয়া লইয়া সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল।

দিবাকর পূজা করিতে গেল, কিন্তু আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পরের বাড়ি থাকার সুখ এই! যদিও সে তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হইবার পর হইতেই এই পরের বাড়িতে আছে এবং ইহার অনেক দুঃখ অভ্যাসও হইয়াছে, কিন্তু মানুষের যে জিনিসটি কোন দুঃখেই মরে না—সেই ভবিষ্যতের আশা—আঘাত খাইয়া তাহার বুকের ভিতর হইতে আজ ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার সর্বশরীর জ্বালা করিতেছিল, সে সিংহাসন হইতে ঠাকুর নামাইয়া ঠক্ করিয়া তাম্রকুণ্ডের উপর ফেলিল, এবং বিনা মন্ত্রে গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া ভিজা ঠাকুর তুলিয়া রাখিল। তার ফুল দেওয়া, তুলসীপত্র সাজাইয়া দেওয়া, ঘণ্টা বাজান প্রভৃতি হাতের কাজগুলা অভ্যাসমত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বিদ্বেষের জ্বালায় জিহ্বা তার একটি মন্ত্রও আবৃত্তি করিল না।

এমন করিয়া পূজার তামাশা শেষ করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন মনে হইল বটে পূজা করা একেবারেই হয় নাই এবং ফিরিয়া বসিবে কি না সে দ্বিধাও একবার জাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়িল তাহার কলেজের প্রথম ঘণ্টা শেষ হইতেছে। আর সে কোনদিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোজা বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, মহেশ্বরী ভাঁড়ার হইতে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, খেয়ে গেলিনে রে?

না—সময় নেই।

মহেশ্বরী বলিলেন, তবে কলেজ থেকে একটু সকাল করে ফিরে আসিস—ও বামুনঠাকুর, দিবাবাবুর জন্যে যেন সমস্ত ঠিক থাকে।

দিবাকর উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহিরের ছোট ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া কাপড় পরিতে পরিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সামনের বৈঠকখানা হইতে তখনও পাশাখেলার হুঙ্কার শোনা যাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া দিবাকর পিছন ফিরিয়া দেখিল, ঝি দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

ঝি কহিল, ছোটবৌমা একবার ডাকচেন।

যাচ্ছি, তুমি যাও।

ঝি চলিয়া গেলে দিবাকর ছোটো টাইমপিসটির পানে চাহিয়া মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বাঁ হাতের বইগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া জামার হাতায় আর একবার ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া ভিতরে ফিরিয়া গেল।

দিবাকরকে ডাকিতে পাঠাইয়া সুরবালা নিজের ঘরের সুমুখেই অপেক্ষা করিতেছিল। দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কি?

সুরবালা প্রকাশ্যে কথা কহিত না, আড়ালে কহিত। মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া দিয়া বলিল, একবার ঘরে এস; বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দেখাইয়া দিল—মেঝের উপর আসন পাতা, একবাটি দুধ এবং রেকাবিতে দুই-চারিটি সন্দেশ,—দেখাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে তবে ইস্কুলে যাও।

দিবাকর কোন কথা না বলিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

অদূরে শয্যার উপর তাহার ছোটদাদা উপেন্দ্রনাথ তখনও নিদ্রিতের মত পড়িয়া ছিলেন, দিবাকর খাইয়া চলিয়া যাইতেই মাথা তুলিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, এ আবার কি?

সুরবালা খাবার জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেছিল, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জেগে আছ নাকি?

ঘণ্টা-দুই। এগারোটা পর্যন্ত মানুষে ঘুমুতে পারে?

সুরবালা হাসিয়া কহিল, তুমি সব পার। নইলে মানুষে কি এগারোটা পর্যন্ত পড়ে থাকতে পারে?

উপেন্দ্র কহিলেন, সকলে পারে না, কিন্তু আমি পারি। তার কারণ, শুয়ে থাকার মত ভাল জিনিস সংসারে আমি দেখতে পাইনে। সে যাই হোক, দিবাকরের—

সুরবালা বলিল, ঠাকুরপো রাগ করে না খেয়ে কলেজে যাচ্ছিলেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলুম!

হেতু?

সুরবালা বলিল, রাগ সত্যিই হয়। ও বেচারার সকালে পড়বার জো নেই—বাজারে যেতে হবে, ফিরে এসে ঠাকুরপূজো করতে হবে। কোনদিন এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। বল দেখি, কখনই বা খায়, কখনই বা পড়তে যায়?

ঠিক বুঝলাম না। ভট্‌চায্যিমশায়ের জ্বর নাকি?

সুরবালা কহিল, জ্বর হবে কেন? বাবার সঙ্গে পাশায় বসেছেন আর তাঁরই বা অপরাধ কি? বাবা ডেকে পাঠালে ত তিনি না বলতে পারেন না।

উপেন্দ্র কহিল, তা ত পারেন না, কিন্তু আগে তিনি চাকরের সঙ্গে সকালে বাজারে যেতেন না?

সুরবালা কহিল, দিন-কতক শখ করে গিয়েছিলেন মাত্র। না হলে ঠাকুরপোকেই বরাবর যেতে হয়।

হুঁ, বলিয়া উপেন্দ্র পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেই সুরবালা সভয়ে বলিয়া উঠিল, কর কি, আবার পাশ ফেরো যে!

উপেন্দ্র চুপ করিয়া আরো মিনিট-পাঁচেক পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন ঠাকুরপূজা হইল না, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবাকর অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে কলেজে চলিয়াছিল। বাড়িতে এইমাত্র যে-সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সে আলোচনা ভিন্ন ভাবিতেছিল ঠাকুরের পূজা হইল না। অনেকদিনের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এ কাজটিকে সে অবহেলা করে নাই, করিবার কথাও কোনদিন মনে উদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই কারণেই সে আজিকার কথা স্মরণ করিয়া পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। যদিও যুক্তিতর্ক দ্বারা বারংবার মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, ভগবান একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ নহেন, সুতরাং একস্থানে ভোগ না জুটিলেও অন্যত্র জুটিয়াছে; তবু সেই যে তাহাদের অভুক্ত গৃহদেবতাটি তাঁহার নিত্যপূজা ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রুদ্ধমুখে সিংহাসন বসিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রতিহিংসার আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না।

কলেজ গিয়া শুনিল, প্রফেসারের অসুখ হওয়ায় প্রথম ঘণ্টার ক্লাস বসে নাই—শুনিয়া দিবাকর প্রফুল্ল হইল। পরীক্ষা নিকট হইতেছে বলিয়া ছাত্রেরা হাজিরির হিসাবের নিমিত্ত কলেজের কেরানীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ অন্যান্য ছাত্রেরা যখন ওই উদ্দেশ্যে অফিস-ঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল তখন দিবাকরও প্রস্তুত হইল। কিন্তু অফিসের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরপূজা না করিবার কথা স্মরণ হইবামাত্র সে থামিয়া দাঁড়াইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়ালে যে?

দিবাকর সংক্ষেপে উত্তর করিল, আজ থাক!

থাকবে কেন, এস না, আজই দেখে নিই।

না থাক, বলিয়া সে ফিরিয়া গেল। হাজিরি সম্বন্ধে মনে মনে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহের মীমাংসা করিবার সাহস আজিকার দিনে তাহার কোনমতেই হইল না।

খাইয়া না আসিলেও তাহার বাটী ফিরিবার তাড়া ছিল না। নানা কারণে আজ ক্ষুধা ছিল না। ছুটির পরে কলেজের ফটকের নিকটে আসিয়া দেখিল, তাহাদের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রের দল দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক-কোলাহল করিতেছে, দিবাকর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল এবং যে পথটা বরাবর গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে, সেইদিকে চলিয়া গেল। ভাঙ্গা বাঁধানো-ঘাট মৃতের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। একদিন যে ইহার দেহ ছিল, রূপ ছিল, প্রাণ ছিল, স্থানে স্থানে ইঁটের ভগ্নস্তূপ সেই কথাই বলে, আর কিছুই বলে না। কবে, কে বাঁধাইয়াছিল, কে আসিয়া বসিত, কাহারা স্নান করিত, কোথাও কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই। শীতের শীর্ণ গঙ্গা তাহারি এক প্রান্ত দিয়া অবিশ্রাম একটানা স্রোতে সমুদ্রে চলিয়াছে। তীরে পলির উপরে যবের শীষ মাথা তুলিয়া রৌদ্রের উত্তাপ ও গঙ্গার বায়ু গ্রহণ করিতেছে। তাহারি একধারে বালুময় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া দিবাকর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। একদিকে ছোট একখণ্ড ইষ্টকস্তূপের উপর জুতা খুলিয়া রাখিল, পিরান খুলিয়া ভারী বাঁধান বইগুলা চাপা দিল। তাহার পরে জলে নামিয়া হাতমুখ ধুইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া অভুক্ত গৃহদেবতাকে স্মরণ করিল। আগাগোড়া সমস্ত মন্ত্র সাবধানে আবৃত্তি করিয়া গঙ্গায় জলগণ্ডূষ ভাসাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইয়া গিয়াছে। জামা গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া, বই লইয়া যখন সে চলিয়া গেল তখনো একটু বেলা ছিল। তখনো হিন্দুস্থানী রমণীরা ঘাটের একান্তে বসিয়া মাথায় সাজিমাটি ঘষিতেছিল।

পাঁচ

সুরবালার পিতা ঠিকাদারি কাজে বিপুল সম্পত্তি উপার্জন করিয়া তাঁহার বক্সারের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দুই মেয়ে। সুরবালা বড়, শচী ছোট। তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই, সে বাপের বাড়ি বক্সারেই থাকে।

বাপের বাড়িতে সুরবালার ডাকনাম ছিল পশুরাজ। এইটি তাহার পিতামহের দেওয়া। পাড়ার কানা-খোঁড়া কুকুর-বিড়াল, বিলাতী ইঁদুর, পায়রা-পাখিতে প্রায় শতাধিক জীব তাহার আশ্রয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কোনটিকে কোন দিন সে মমতায় বিদায় করিতে পারে নাই, এখনো তাহারা শচীর কর্তৃত্বে অক্ষয় হইয়া আছে। সুরবালার নামের বিবরণ মহেশ্বরী জানিতেন, তাঁহার দ্বারাই নামটি এখানেও প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বড়, তাঁহারা সংক্ষেপে পশু বলিয়া ডাকিতেন, চাকর-দাসীরাও কেহ বা পোশ-বৌঠাক্‌রুন কেহ বা ছোট বৌঠাক্‌রুন বলিয়া ডাকিত।

অনেক রাত্রে কাজকর্ম সারা হইলে সুরবালা ঘরে আসিলে উপেন্দ্র বলিলেন, পশু তোমার বাবা শচীর পাত্র ঠিক করতে আবার তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। শচী তোমার চেয়ে কত ছোটো জানো?

সুরবালা বলিল, তা আর জানিনে! আমার কোলে একটি ভাই হয়ে আঁতুড়েই মারা যায়, তার পরে শচী। তা হলে আমার চেয়ে প্রায় ছ-সাত বছরের ছোটো।

এ হিসাবে তার বয়স বার-তের?

তা হবে বৈ কি! রোগা বলেই শুধু এতদিন পর্যন্ত রাখা গেছে। আমার মতন বাড়ন্ত গড়ন হলে ভারী বিপদ হতো।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বিপদ আর কিসের? তোমার বাপের টাকার অভাব ত নেই, ও জিনিসটা থাকলে সব জিনিসই সুলভ হয়ে পড়ে। তোমার সময়ে আমি যে-রকম তাড়া করে গিয়ে পড়েছিলাম, সে-রকম তাড়া করে যাবার লোক সংসারে কম নেই।

সুরবালা বলিয়া উঠিল, তুমি কি বাবার টাকা দেখে গিয়েছিলে?

না বলতে পারলেই তোমার কাছে মান থাকে বটে, কিন্তু মিথ্যে কথাই বা বলি কেমন করে?

কিন্তু এইটেই যে মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা কেন?

মিথ্যে বলেই মিথ্যে কথা। তুমি যখন- তখন বল বটে, কিন্তু তুমি বাবার টাকা দেখে যাওনি। বাবার টাকা থাক না থাক, তোমাকে যেতেই হতো। আমি যেখানে, যে ঘরে জন্মাতুম, আমাকে আনবার জন্যে তোমাকে সেইখানেই যেতে হতো– বুঝতে পাচ্ছ?

উপেন্দ্র গাম্ভীর্যের ভান করিয়া বলিলেন, কতক পাচ্ছি। কিন্তু ধর, যদি তুমি কায়েতের ঘরে জন্মাতে?

সুরবালা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ যা হোক তুমি। বামুনের ঘরের মেয়ে কখন কায়েতের ঘরে জন্মায়? এই বুদ্ধি নিয়ে বুঝি ওকালতি কর?

উপেন্দ্র অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তাও বটে। এইজন্যেই বোধ করি পসার হচ্ছে না।

সুরবালা নিজের কথায় ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনার স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেন পসার হবে না, খুব পসার হবে। তবে, একটু দেরী হতে পারে, এই যা। কিন্তু তাও বলি, তোমার পসারের দরকারই বা কি? হাসিয়া বলিল, বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমার সামনে হাজির থাকলে আমি তোমাকে পাঁচ শ’ টাকা

করে দিতে পারি। বাবা আমাকে মাসে মাসে ত আড়াই শ’ টাকা দেন, আরো আড়াই শ’ টাকা না হয় চেয়ে নেব!

উপেন্দ্র বলিলেন, তা যেন নিলে; কিন্তু আমাকে করতে হবে কি? বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

সুরবালা বলিল, হাঁ। আর নিতান্ত দাঁড়াতে না পারলে, না হয় বসো।

আর নিতান্ত বসতে না পারলে না হয় শোবো? কি বল?

সুরবালা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, না, শুতে পাবে না। বসতে না পারলে আবার দাঁড়াতে হবে। হাকিমের সামনে বেয়াদপি করলে তোমার ফাইন হবে।

ফাইন দিতে না পারলে?

আটক থাকতে হবে। চারটের পরেও বের হতে পাবে না– বুঝেছ?

উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বুঝেছি–হাকিম কিছু কড়া–চাকরি বজায় রাখতে পারলে হয়।

সুরবালা তাহার দুটি কোমল বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, হাকিম কড়া নয় গো, কড়া নয়। চাকরি তোমার বজায় থাকবে–একটি দিন শুধু পরীক্ষা করেই দেখ না। ক্ষণকাল পরে সুরবালা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বাবার চিঠির জবাব দেবে?

উপেন্দ্র কহিলেন, খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই, পাত্র আপনি হাজির হবে—এই জবাব দেব।

ছিঃ, ও কি কথা! তাঁর সঙ্গে কি তামাশা চলে?

এতক্ষণ তবে কি তুমি আমার সঙ্গে তামাশা কচ্ছিলে?

সুরবালা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, দেখ, তামাশা করিনি, কিন্তু বাবাকে এ কথা লেখবার দরকার নেই। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি শচীর পাত্র ঠিক হয়েই আছে এবং সে ছাড়া তার অন্য পথও নেই, কিন্তু তোমার মুখে ও- কথা শুনলে বাবা রাগ করবেন।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই শচীর পাত্র ঠিক হয়ে আছে। তাকে আমিও জানি, তুমিও জানো।

সুরবালা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে বল না?

উপেন্দ্র বলিলেন, এখন না। সব ঠিক করে তবে তোমাকে জানাব।

সুরবালা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি—শচীর একটু দোষ আছে, সেই দোষটুকু গোপন করে পাত্র স্থির করা উচিত নয়। তাতে ফল ভাল হবে না।

উপেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, দোষ আবার কি?

সুরবালা বলিল, বলছি। বাবার ইচ্ছে বোধ হয় ওইটুকু দোষ গোপন রাখা। না হলে তিনি নিজেই তোমাকে জানাতেন। শচী দেখতে-শুনতে লেখাপড়ায় ভালই, বাবার টাকাও আছে সত্যি, কিন্তু শচীকে কি তুমি ভাল করে দেখনি?

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখেছি, কিন্তু ভাল করে দেখবার সাহস—

পায়ে পড়ি তোমার। আগে আমার কথা শোন, তারপর যা খুশী বলো। তুমি ত জানই, শচী ছেলেবেলা থেকে রোগা। দু-তিনবার ভারী ভারী ব্যামোতে মরতে মরতে বেঁচেছে।তারি একবার ব্যারাম সেরে গেল, কিন্তু বাঁ পা আগাগোড়া ফুলে পেকে উঠল। ডাক্তার অস্ত্র করে তাকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু পা আর সোজা হলো না। সেই অবধি একটু খুঁড়িয়ে চলে। ডাক্তার বলেছিলেন, বয়স হলে সেরে যেতেও পারে, কিন্তু এই আশ্বাসের উপর বিশ্বাস করে কে বিয়ে করতে সম্মত হবে? যে সত্যিই ভাল ছেলে, তার ভাল মেয়েও জুটবে—জেনেশুনে সে শচীর মত মেয়েকে বিয়ে করবে না। আর যে শুদ্ধমাত্র টাকার লোভে রাজী হবে সে অসৎ পাত্র।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া শুনিয়া বলিলেন, আমি ত শচীকে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু কোনদিন খুঁড়িয়ে চলতে ত দেখিনি।

সুরবালা মৃদু হাসিয়া কহিল, পুরুষেরা কোন্ জিনিসটা দেখতে পায়! কিন্তু মেয়েদের চোখকে ত ফাঁকি দেওয়া চলবে না—তারা চক্ষের নিমেষে দোষ ধরে ফেলবে।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু তার ত মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে না যে, মেয়েদের চোখকে ভয় করতে হবে!

সে কি কথা! ঠকিয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে ত কানা মেয়েরও বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পরে?

উপেন্দ্র ভাবিতেছিলেন, কথা কহিলেন না।

সুরবালা পুনরায় বলিল, গত পূজার সময় আমাদের বক্স্যারের বাড়িতে ঠিক এই রকম কথাই হয়েছিল। পিসিমা ও মা দুইজনেই বলেছিলেন যে, বিয়ের আগে এ-সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। হয়ে গেলে জামাইকে বলে দিলেই হবে।

উপেন্দ্র বলিলেন, বেশ ত।

বেশ নয়, আমি এই কথাই বলি। আমি বলি যে, শাশুড়ী-ননদকে বাদ দিয়ে একলা জামাই নিয়ে চলে না। শচীর যে স্বামী হবে, সে ওকে ভালবাসবেই, কিন্তু তুচ্ছ একটা খুঁত নিয়ে প্রথমেই যদি ও তাদেরী বিদ্বেষের চোখে পড়ে যায় ত কোনদিন সুখে ঘরকন্না করতে পারবে না।

উপেন্দ্র বলিলেন, পারবে। কেননা, দিবাকর তোমার বোনকে অযত্ন করতে পারবে না, তুমি কিংবা দিদিও শচীকে গঞ্জনা দেবে না।

কথা শুনিয়া সুরবালা অবাক হইয়া গেল। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, তবে কি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে?

উপেন্দ্র বলিলেন, হাঁ।

কিন্তু বাবা ত রাজী হবেন না।

কেন?

ওর মা-বাপ নেই, বাড়ি-ঘর নেই-এক কথায় কিছুই নেই যে!

উপেন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, সব আছে, কেননা, আমি আছি।

সুরবালা কহিল, তবুও বাবা সম্মত হবেন না।

উপেন্দ্র কঠিন হইয়া বলিলেন, আর তুমিও হবে না এইটেই বোধ করি আসল কথা!

সুরবালা চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্রও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অপরদিকে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, রাত অনেক হলো-এখন ঘুমোও।

সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুরবালা জাগিয়া রহিল। হঠাৎ একসময়ে যখন তাহার নিশ্চয় বোধ হইল স্বামী নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছেন, তখন দুই চক্ষে তপ্ত অশ্রু তাহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্বামীর অসীম স্নেহে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথাই ভাবিতে লাগিল যে, এ সাত-আট বৎসরের ঘনিষ্ঠ মিলনেও কেন সে এই লোকটির অন্ত পাইল না। প্রথম প্রথম অনেকবার সে মনে করিয়াছে যে, এই খামখেয়াল লোকটির মেজাজের কিছুই ঠিক নাই। কখন কি হেতু যে ইহার রাগ হইয়া পড়ে জানিবার বা বুঝিবার জো নাই, কিন্তু শেষে একসময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া এটুকু সে বুঝিয়াছিল, ইঁহাকে সম্যক্ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার কোনদিন হউক বা না হউক, ইহার কোন কাজ বা কথা অহেতুক বা অনিশ্চিত-প্রকৃতি লোকের মত নহে। বিশেষ করিয়া সেইজন্যই দুর্বোধ স্বামীটিকে লইয়া তাহার ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। খোঁচা খাইয়া সে যখন-তখন এই দুঃখই করিত, ভগবান তাহার অদৃষ্ট যদি এমন ভালই করিলেন তবে সেই অদৃষ্টকে মানাইয়া চলিবার মত বুদ্ধি তাহাকে দিলেন না কেন? আজিও যতই সে মনে মনে এই কথার আলোচনা করিয়া ভিতরে ভিতরে কারণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল, ততই সে নিজের কোন দোষ না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতে

লাগিল। ভগিনীর সম্বন্ধে ভগিনীর এই স্বাভাবিক আশঙ্কা কি কারণে যে দোষাবহ এই কথা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে শীতের সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তাহারি পরিমাণ করিয়া দূরে সরকারী কাছারির ঘণ্টা একে একে বাজিয়া যাইতে লাগিল।

ছয়

পরদিন দ্বিপ্রহরের পরে মহেশ্বরী আহারে বসিলে উপেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। মহেশ্বরী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, মেজবৌ, উপীনকে একটা আসন পেতে দাও।

উপেন্দ্র কহিলেন, আসন থাক দিদি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

শুনিবার জন্য মহেশ্বরী তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

উপেন্দ্র বলিল, শ্বশুরমশাই শচীর পাত্র ঠিক করবার জন্যে পরশু একখানা জরুরী চিঠি লিখেছেন। তুমি ওদের সমস্ত কথা যত জানো তত আর কেউ জানে না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, শচীর দেহে কি কোন দোষ আছে?

মহেশ্বরীর স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শেষদিকে প্রায় চার-পাঁচ বৎসর বক্সারে প্র্যাকটিস করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে সুরবালার পিতারই একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া কাছাকাছি ছিলেন বলিয়া উভয় পরিবারে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সুরবালার বিবাহের সম্বন্ধ মহেশ্বরীই স্থির করিয়াছিলেন।মহেশ্বরী ক্ষণকাল উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, পশু কি বলে?

সে বলে, শচী একটু খোঁড়া।

মহেশ্বরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, খোঁড়া নয়; তার ছেলেবেলায় অস্ত্র হবার দরুন বাঁ পাটা একটু টেনে চলত—তা এতদিনে বোধ করি সেরে গেছে।

আর দোষ নেই ত?

না।

শুনি ত শ্বশুরমশায়ের অগাধ সম্পত্তি—তোমার কি মনে হয় দিদি?

আমারও ত তাই মনে হয়।

উপেন্দ্র তখন আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, তবে তোমাকে একটা কথা বলি দিদি। শচীরা দুই বোনেই যখন ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে, তখন এত বিষয় বেহাত হতে দেওয়া ত সুবুদ্ধির কাজ নয়।

মহেশ্বরী হাসিমুখে বলিলেন, তা ত নয়; কিন্তু উপায়টা কি শুনি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

উপেন্দ্রও হাসিয়া বলিল, হাসি নয় দিদি। পশুকেও ক্ষ্যাপাবার জন্যে এ কথা বলিনি। আমি দিবার কথা মনে করেছি।

শুনিবামাত্রই মহেশ্বরীর মুখ কালি হইয়া গেল। তিনি দিবাকরকে দেখিতে পারিতেন না। তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইয়াও বলিল, কি বল দিদি?

মহেশ্বরী নতমুখে চিন্তার ভান করিয়া ভাত মাখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, বেশ ত।

উপেন্দ্র কহিল, শুধু বেশ হলে ত চলবে না দিদি, এ কাজ তোমারি! পশুর বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে, এখন সে বলে, তার মত ভাগ্যবতী যেন সবাই হয়। আমার বিশ্বাস, তুমি যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে।

মহেশ্বরী চিন্তিত-মুখে কহিলেন, কিন্তু শচীর একটু খুঁত আছে যে!

উপেন্দ্র কহিল, আছে বলেই ত তোমাকে হাত দিতে বলছি। তোমার পুণ্যে সমস্ত নিখুঁত হয়ে যাবে।

উপেন্দ্রর কথায় মহেশ্বরীর চিত্ত ক্রমশঃ আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, বলিলেন, কিন্তু উপীন, দিবাকরের মেজাজ বুঝতে পারিনে। বাড়ির মধ্যে থেকেও সে যে বাড়ি-ছাড়া পর। সেইজন্যেই ভয় হয়, পাছে ওইটুকু খুঁত নিয়ে শেষে একটা মস্ত অ-সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এক কথা—দিবাকর কি রাজী হবে?

কেন হবে না দিদি! এ সংসারে তার আপনার বলতে কিছুই নেই। সমস্তই যাকে নিজের হাতে না করলে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার জায়গা হবে না, তার এ সুবিধে ত্যাগ করা শুধু বোকামি নয়—পাপ।

মহেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, একি তোর ওকালতি ব্যবসা উপীন যে, শুধু মক্কেলের টাকার পরেই দুটি চোখ রেখে আর সমস্ত দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিতে হবে? পছন্দ-অপছন্দ বলে একটা কথা আছে ত।

উপেন্দ্র বলিল, থাকে থাক দিদি। যারা ওই নিয়ে তোলাপাড়া করতে চায় করুক, কিন্তু আমরা ও-দলে যেতে চাইনে। আর, শচীর মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার ত বিয়ে করাই চলে না।

উপেন্দ্রর ব্যগ্রতায় মহেশ্বরী কৌতুক বোধ করিলেন। বলিলেন, সে বোধ হয় আজ কলেজে যায়নি; একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখ না, তার মতটা কি! বোধ করি সে তার ঘরেই আছে।

আছে? কে রে ওখানে, ভূতো? একবার দিবাবাবুকে ডেকে দে ত রে, বল, দিদি একবার ডাকচেন।

ক্ষণকাল পরে দিবাকর ঘরে ঢুকিতেই উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করলাম দিবা। পরীক্ষা-শেষেই দিন স্থির করা যাবে। দিদি, ভট্চায্যিমহাশয়কে পাঁজিটা দেখতে বলো, আর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর মতটাও একবার জেনে নিয়ো। শচীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে তিনি ভারী খুশী হবেন। তুই হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! তোর ছোট-বৌঠাকরুনের ছোটবোন শচী—তাকে দেখেছিস না? দেখিস নি? তা শচীকে দেখবার প্রয়োজনও নেই। একটু পূর্বেই দিদিকে বলছিলাম, তার মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার বিবাহ করা চলে না। ছেলেবেলায় বাঁ পায়ে অস্ত্র হওয়ায় এই পাটা বুঝি একটু টেনে চলত। সে কথায় এইমাত্র আমি দিদিকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, একটু খুঁত, একটু ত্রুটি, দিবাকর আত্মীয় হয়ে যদি মার্জনা করতে না পারে ত অপরে করবে কি করে?

তা ছাড়া, ছোটখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে হৈচৈ করা ত উচ্চশিক্ষার ফল নয়—সে নীচতা। নির্দোষ নিখুঁত এ জগতে পাওয়া যায় না, সে আশা করে বসে থাকা আর পাগলামি যে এক, দিবা তা বোঝে। আর তোমাকে বলতে কি দিদি, দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে সুরবালার আনন্দের সীমা থাকবে না। ওঃ—তোর বুঝি সময় নষ্ট হচ্ছে? তবে এখন যা—আমিও শ্বশুরমশায়কে একটা চিঠি লিখে দি গে, বলিয়াই উপেন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন এবং মহেশ্বরীকে কটাক্ষে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহেশ্বরী মুখ নীচু করিয়া ভাত নাড়িতে লাগিলেন এবং দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রবল ঝড় যেমন করিয়া খড়কুটা ধূলাবালি উড়াইয়া লইয়া যায়, উপেন্দ্র যে তেমনি করিয়া বাধা-বিঘ্ন ওজর-আপত্তি নিজের ইচ্ছামত উড়াইয়া লইয়া গেলেন, নিস্তব্ধ হইয়া দুইজনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণেও যখন কোনও কথাও উঠিল না, তখন দিবাকর ধীরে ধীরে বলিল, এ-সব কি দিদি?

মহেশ্বরী মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, সবই ত শুনলে!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, এত তাড়া কিসের জন্যে?

মহেশ্বরী বলিলেন, শচীর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং আগামী সমস্ত বছরই অকাল।

ইহার পরে আর কোনও কথা দিবাকরের মাথায় আসিল না, কিন্তু মনে পড়িল, উপেন্দ্র এতক্ষণ পত্র লিখিতেছেন এবং একটু পরেই জরুরী পত্র লইয়া চাকর ডাকঘরে ছুটিয়া যাইবে। সে কোনও দিন বিবাহ করিবে না, এই তাহার জীবনের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প এমন অকস্মাৎ একটানে ভাসিয়া যাইতেছে মনে হইবামাত্র সে অস্থির হইয়া উপেন্দ্রের ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিতেই সুরবালা তাহার অপ্রসন্ন মুখের পরে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া আলমারির পাশে

সরিয়া গেল। উপেন্দ্র টেবিলের কাছে কাগজ-কলম লইয়া বসিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

দিবাকর যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা ঠিকমত ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পায় নাই, এবং ওদিকে অঞ্চলের একপ্রান্ত আলমারির পাশে দেখা যাইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেন্দ্র কহিলেন, কি রে?

দিবাকর কথা না কহিয়া আলমারির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র সে ইঙ্গিত দেখিয়াও দেখিলেন না, বলিলেন, আমার সময় নেই দিবা—

দিবাকর কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন?

উপেন্দ্র বলিলেন, না, তাড়াতাড়ি ত নয়। এখনো যেমন করে হোক প্রায় মাস-দুই সময় আছে—তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে —

তবে আজই চিঠি লেখার প্রয়োজন কি! কিছুদিন পরে লিখলেও ত হয়।

হতে পারে; কিন্তু কিছুদিন পরে লিখলে কি সুবিধে হবে শুনি?

দিবাকর আস্তে আস্তে বলিল, ভেবে দেখা উচিত।

উপেন্দ্র বলিলেন, উচিত বৈ কি! তুমি বিয়ের ভাবনা ভাবো, তোমার পরীক্ষার ভাবনা আমি ভাবি গে।

কিন্তু এরূপ দায়িত্ব-গ্রহণের পূর্বে—

বিজ্ঞের মত কিছু বলা আবশ্যক। আচ্ছা, ওই চেয়ারে বসো। ভেবে কি দেখতে চাও শুনি?

দিবাকর নিরুত্তর হইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখ দিবাকর, যে বস্তুরই হোক, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখা মানুষের সাধ্য নয়। যিনি যতবড় বিচক্ষণ পণ্ডিতই হোন না কেন, শেষ ফলটুকু ভগবানের হাত থেকেই নিতে হয়। তবে আগে থেকে যেটুকু ভেবে দেখতে পারা

যায় সেটুকুর জন্যে ত আধ-ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না, তুমি কিছুদিনের সময় চাও কেন?

দিবাকর মুখ তুলিয়া বলিল, সকলেই কি এত দ্রুত ভাবতে পারে?

পারে, কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, এলোমেলো ভাবনার অন্তও নেই, আর মীমাংসাও হয় না। দু-চার দিন কেন, দু-চার বছরেও স্থির হয় না। তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি যেটুকু লোকে ভেবে দেখে, সেটুকু এই যে, প্রতিপালন করতে পারব কি না। কিন্তু শচীকে বিয়ে করলে সে চিন্তা ত তোমাকে কোনও দিনই করতে হবে না। দ্বিতীয় কথা, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে। অবশ্য, সে মীমাংসা একজনের হয়ে অপরে করতে পারে না। তুই কি সেই কথাই ভাবছিস?

শচীর রূপের ইঙ্গিতে দিবাকরের অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, কখ্‌খন না।

তা হলে ত ভালই হলো। কেননা, এই কথাটা যতই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন, বাইরের আড়ম্বর আছেই। প্রথমেই ওই যে রূপের কথাটা এসে পড়ে, সেটা মানুষের অন্তরে বাইরে এমনি ভেলকি লাগিয়ে দেয় যে, ওরই ভালমন্দ অত্যন্ত সাবধানে নিরূপণ করাই মুখ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ, ওটা ত কিছুই নয়। যে বস্তুটি না পেয়ে লোকে সারাজীবন হায় হায় করে, সেটি আড়ালেই থেকে যায়। পছন্দ করবার যে সার সামগ্রী, সে জিনিসটি লাভ করতে না পারলে সংসার বিফল হয়ে দাঁড়ায়, সেটির উপরে ত জোর চলে না, তাই তাকে বিনা-পরীক্ষায় নির্বিচারে ভগবানের দোহাই দিয়ে লোকে গ্রহণ করে, আর যেটা কিছুই নয়, দু-চারদিনেই যা নষ্ট হতে পারে, চোখ চাইলেই যার দোষ-গুণ ধরা পড়ে, তার পরীক্ষার আর অন্ত থাকে না। দিবাকর, সাড়ে-পনেরো আনাই যদি চোখ বুজে নিতে পার ত বাকী দুটো পয়সার জন্যে গুরুজনের অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করো না, বরং আমি আশীর্বাদ করি, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হোক,

কোনদিন এ কথাটা ভুলো না যে, রূপই মানুষের সবটুকু নয়, কিংবা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যচর্চাই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়।

দিবাকর মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল। উপেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষকালে বলিলেন, এখন তবে তুই যা।

দিবাকর মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার রুচি নেই ছোড়দা, আমাকে মাপ কর। বিশেষ বড়লোকের মেয়ে।

অকস্মাৎ এরূপ উত্তর ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি অল্পভাষী দিবাকরের কথার গুরুত্ব বুঝিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াও তাঁহার স্বভাব নয়। সুমুখের কাগজ-কলম একপাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, রুচি নেই! তা না থাকতে পারে, কিন্তু বড়লোকের মেয়ের অপরাধটা কি শুনি?

দিবাকর কহিল, অপরাধ নয়, কিন্তু আমি দরিদ্র।

উপেন্দ্র বলিলেন, এর অর্থ এই যে, গরীবের ঘরের মেয়ে তোমাকে যেরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা- ভক্তি করবে, ধনীর মেয়ে সেরূপ করবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীর কাছে সম্মান বা ভক্তির কতটুকু ধারণা তোমার আছে? অবশ্য যদি গোঁ ধরে বসো যে, বিয়ে করবে না, সে আলাদা কথা, কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত অমূলক দোষের ভার আর একজনের কাঁধে তুলে দিয়ে নিজের দারিদ্র্যের জবাবদিহি করতে চেয়ো না। আমাদের পুরাণ ইতিহাস ত পড়েছ। তাতে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী স্ত্রীর যে উল্লেখ আছে, তাঁরা রাজা-রাজড়া ঘরের মেয়ে হয়েও কোন দরিদ্র ঘরের মেয়ের চেয়ে গুণে খাটো ছিলেন না। বড়লোকের ঘরের মেয়ের বিরুদ্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে বলেই যে তা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে, এর কোন হেতু আমি দেখতে পাইনে।

.

দিবাকর ভিন্ন আরো একটি শ্রোতা অত্যন্ত মনোনিবেশ করিয়া আড়ালে থাকিয়া শুনিতেছিল, তাহার অঞ্চলপ্রান্তে চোখ পড়িবামাত্র উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, বড়লোকের ঘরের আর একটি মেয়ে এই বাড়িতেই আছে, এর অর্ধেক রূপ-গুণ নিয়েও যদি শচী আসে ত পৃথিবীর যে-কোন স্বামীই যেন তা ভাগ্য বলে জ্ঞান করে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, রুচি নেই বলছিলে? ছেলেবেলায় পাঠশালে যেতেও ত তোমার রুচি দেখিনি। ধর্মকর্মেও কারো কারো রুচি থাকে না, জন্মভূমির উপরেও কারো বা অত্যন্ত অরুচি, কিন্তু তাই বলে কি এই-সব রুচির প্রশ্রয় দিতে হবে?

হঠাৎ এই সময়ে আলমারির পিছনে চুড়ির শব্দে চকিত হইয়া দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্তের মধ্যে কি যে স্থির করিল সেই জানে, সুরবালার নিকটে আসিয়া কহিল, বৌদি, তুমি যদি সুখী হও আমি ছোড়দাকে চিঠি লিখতে বলে দি।

সুরবালা তন্ময় হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল, একটা অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তির তরঙ্গ তাহার সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কামনা ও সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে ভাসাইয়া আনিয়া স্বামীর ইচ্ছার পদতলে বারংবার আত্মসমর্পণ করিতেছিল। সে কিছুই স্থির করে নাই, কিন্তু অঞ্চলে চোখ মুছিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া একান্তচিত্তে কহিল, উনি কোনদিন মিথ্যে বলেন না। আমি বলছি ঠাকুরপো, তোমাদের ভাল হবে এবং আমিও অত্যন্ত সুখী হব।

দিবাকর মুহূর্তমাত্র উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া অপর্যাপ্ত আলোক তাঁহার মুখের ‘পরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে মুখে উদ্বেগ নাই, দুশ্চিন্তার এতটুকু দাগ নাই — অত্যন্ত পবিত্র ও মঙ্গলময় বোধ হইল।

দিবাকর কহিল, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে আমি যাই—বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সুমুখের কেদারায় আসিয়া সুরবালা বসিল। সজল চোখ দুটি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল,

তুমি আমাকেও মাপ কর। আমি ভুল বুঝেছিলুম; তুমি যা করতে চাইচো, তাতে শচীর ভালই হবে। এইবারটির মত তুমি আমাকে মাপ কর।

সাত

উপেন্দ্র চিঠিখানি শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

তাহার পরক্ষণ হইতে দিবাকর কেবলই ভাবিতে লাগিল তাহার বিবাহের কথা। শচী কেমন, সে কি করে, কি ভাবে, কি পড়ে, তাহার সহিত বিবাহ হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই-সব। রাত্রে পড়াশুনায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। আজ তাহার মন মাতাল হইয়া উঠিল। অথচ মাতাল যেমন তাহার কল্পনার আতিশয্যে স্পষ্ট করিয়া কিছুই ভাবিতে পারে না, তাহার মনও তেমনি সুস্পষ্ট কিছুই উপলব্ধি না করিতে পারিয়া আকাশ-কুসুম গাঁথিয়া ফিরিতে লাগিল, কিছুতেই কাজ করিল না।

পরীক্ষার ভয় চাবুকের মত যতবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পাঠে নিযুক্ত করিল, ততবারই সে উধাও হইয়া গিয়া আর একদিকে স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অবধি এই বিদ্রোহী মনের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া কিছুই না করিতে পারিয়া দিবাকর অনুতাপ করিতে লাগিল যে, তাহার সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন! কিসের নেশা যে তাহাকে অকস্মাৎ এমন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হেতু খুঁজিতে গিয়াই যে কথা মনে আসিল, অত্যন্ত লজ্জার সহিত দিবাকর তাহার প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিল যে, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা এবং একান্ত বিতৃষ্ণা। যদি পূজনীয় কাহারো মন এবং মান রক্ষা করিতেই হয় ত নিতান্ত উদাসীনের মতই করিবে। এই বলিয়া দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত উচ্চকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মনকে আজ সংযমে রাখা শক্ত। সে যে খেলার মাঝখান হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে আকাশ কুসুমের অর্ধেক গাঁথা মালা ফেলিয়া রাখিয়া জবরদস্তি পড়া মুখস্থ

করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ অনুক্ষণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। তা ছাড়া এই যে কল্পনার বসন্ত বাতাস এইমাত্র তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সে স্পর্শ কি মধুর! তাহার চতুর্দিকে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি চলিতেছিল—সে কি সুন্দর! সূর্যের দিকে মুখ তুলিয়া চক্ষু বুজিলেও যেমন আলোকের সঞ্চার বিচিত্র বর্ণে অনুভূত হইতে থাকে, পড়া তৈরির একান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াও অস্পষ্ট মাধুর্যের সাড়া তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত দেহে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কণ্ঠস্বর তাহার মন্দ হইতে মন্দতর, দৃষ্টি তাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত ধরপাকড় বাদাবাদির মাঝখানে হঠাৎ এক সময়ে সে নিজেই এই নূতন খেলায় মাতিয়া গেল। তাহার চোখের সুমুখে অসংখ্য আলো, কানের কাছে অগণিত বাদ্য ও মনের মাঝখানে একটা বিবাহের বিরাট সমারোহ অবতীর্ণ হইয়া আসিল; এবং ইহারই কেন্দ্রস্থলে সে নিজেকে বরবেশে কল্পনা করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে এ পর্যন্ত যত-কিছু সে শুনিয়াছিল, যাহা-কিছু সে দেখিয়াছিল, ছায়াবাজির মত সমস্তই মনের মাঝখান দিয়া বিচিত্র বর্ণে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথাও সে স্থির হইতে পারিল না, কিছুই ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, শুধু বিস্মিত পুলকে স্বপ্নাবিষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

আট

বিপিনের নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসার পরদিন আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া সতীশচন্দ্র যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, তখন বেলা দশটা। তাহার ঘর তখনও বন্ধ। আজ সকাল হইতেই মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই খর-উত্তাপে সমস্ত জানালা-দরজা তাতিয়া উঠিয়া এই রুদ্ধ ঘরের ভিতরটা যে কিরূপ অসহ হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ সে নিজে টের না পাইলেও তাহার সর্বশরীর ইহার জবাবদিহি করিতেছিল।

সমস্ত বিছানা ঘামে ভাসিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় জলের অভাবে উন্মত্তের মত হাহাকার করিতেছে। এমনিধারা দেহ-মন লইয়া সতীশচন্দ্র ভগবানের নূতন দিনের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং ব্যস্ত হইয়া শিয়রের জানলাটা খুলিয়া ফেলিতেই এক ঝলক রৌদ্র তাহার মুখের উপর গায়ের উপর পড়িয়া যেন তাহাকে একমুহহূর্তে দগ্ধ করিয়া দিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি মাতামাতি করিয়া বেলা দশটায় ঘুম ভাঙ্গার গ্লানি মাতালেই জানে। এই গ্লানি পরিপাক করিয়া সতীশ, বেহারী বেহারী, করিয়া ডাকিতে লাগিল। বেহারী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ বলিল, শিগগির এক গ্লাস জল আন ত রে!

বেহারী প্রশ্ন করিল, তামাক দিতে হবে না?

না, জল আন।

চান করবেন না?

এখন না, তুই জল আন।

বেহারী তথাপি গেল না, কহিল, আহ্নিকের—

আহ্নিকের ইঙ্গিতে সতীশ আগুন হইয়া ধমক দিয়া উঠিল, পাজী কোথাকার, তোর অত খোঁজ কেন? যা, জল আন গে!

ধমক খাইয়া বেহারী জল আনিতে নীচে নামিয়া গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া সাবিত্রী সুপারি কুচাইতেছিল, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, সতীশবাবু তামাক দিতে বললেন?

বেহারী মুখ ভার করিয়া কহিল, না, জল চাই।

স্নান করলেন না, আহ্নিক করলেন না—জল কি হবে?

বেহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি তার জানি কি! হুকুম হলো জল চাই, নিয়ে যাচ্চি।

সাবিত্রী জাঁতি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি—তুমি খানিকটা বরফ কিনে আনো গে।

বেহারী পয়সা লইয়া বরফ কিনিতে গেল।

সাবিত্রী উপরে উঠিয়া গিয়া কহিল, যান, চান করে আসুন, আমি ততক্ষণ আহ্নিকের জায়গা করে রাখি।

সতীশ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, বেহারী কোথায়?

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, সে বরফ কিনতে গেছে। বাবু, দোষ করে শাস্তি নেওয়া ভাল—তাতে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে কোনও দিন কি জল খান যে, আজ জলের জন্যে হাঙ্গামা কচ্ছেন? যান, দেরী করবেন না।

সাবিত্রীর কাছে প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া সতীশ উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেল।

আহারান্তে সতীশ আর একবার নিদ্রার আয়োজন করিতেই সাবিত্রী আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাকে যেন দেখিতেই পায় নাই এইভাবে সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, রাত্রের কথাগুলো বাবুর মনে আছে কি না জানতে এলুম।

সতীশ জবাব দিল না।

সাবিত্রী কহিল, তবে ঘুম ভাঙ্গলে দয়া করে একবার ডেকে পাঠাবেন, সেগুলো একবার মনে করে দিয়ে যাবো। বলিয়া কবাট বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিগত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সতীশের মনে থাকা সম্ভবও নয়, ছিলও না। বিপিনবাবুর মজলিস হইতে কখন কেমন করিয়া আসিয়াছিল, কাহার সহিত আসিয়াছিল, আসিয়া কি করিয়াছিল—এ-সমস্ত তাহার মনের মধ্যে এলোমেলো ও অস্পষ্ট হইয়াছিল। এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার স্পৃহা যে তাহার একেবারেই ছিল না তাহা নহে, কিন্তু একটা অনির্দেশ্য লজ্জার আশঙ্কা তাহাকে যেন কোনমতেই পা বাড়াইতে দিতেছিল না। তাহার সান্ধ্য কীর্তিটাই মনে ছিল। এইটাই এতক্ষণে তাহার মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতির আকাশে শুকতারার মত জ্বলিতেছিল, কিন্তু অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ দুষ্টগ্রহও যে ওই মেঘের আড়ালেই উদ্যত হইয়া আছে, সাবিত্রীর ইঙ্গিত সেইদিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিবামাত্রই তাহার চোখের ঘুম মরুভূমির বাষ্পের মত উবিয়া গেল। গত সন্ধ্যায় হতবুদ্ধি হইয়া প্রদীপ নিবাইয়া ফেলার ফলটা যে শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে সত্যকার দোষ কিছুই ছিল না বলিয়া তাহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া সে একরকম করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দোষ না করার মধ্যে যে একটা সত্যকার জোর প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেই জোর তাহার অজ্ঞাতসারেও তাহাকে আশ্রয় দিতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী এখন যাহা বলিয়া গেল, যে অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্দেশ করিয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সাহস তাহার কোথায়? তাহার মাতাল হইবার অভিজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু অচেতন হইয়া পড়িবার অভিজ্ঞতা সে কোথায় পাইবে? সে কেমন করিয়া আন্দাজ করিবে, সে কি করিয়াছিল না-করিয়াছিল! কত মাতালকে কত কাণ্ড করিতে সে ত নিজের

চোখেই দেখিয়াছে। এখন নিজের বেলা কোন্ কাজটাকে সে কি সাহসে অসম্ভব বলিয়া দূরে সরাইয়া দিবে? তাই এই সম্ভব-অসম্ভবের সমস্যা তাহার যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, পীড়িত-চিত্ত তাহার ততই সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে রেখা টানিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পুনর্বার তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আর একবার উঠিয়া বসিয়া জীবনে মদ স্পর্শ না করিবার প্রতিজ্ঞা আবার একবার উচ্চারণ করিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

জানালা খুলিয়া দিয়া সতীশ ডাকিল, বেহারী!

বেহারী রাখালবাবুর বিছানা রোদে দিতেছিল, ডাক শুনিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ বলিল, আচ্ছা, যা কচ্চিস কর—সাবিত্রীকে এক গ্লাস জল আনতে বলে দে!

বেহারী বলিল, আমিই আনচি বাবু, তিনি এখন আহ্নিক করচে।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহ্নিক করচে কি রে?

আজ্ঞে, তিনি ত রোজ করে। একাদশীর দিনে একফোঁটা জলও খায় না। আমরা কত বলি বাবু, কিন্তু তিনি মাছও খায় না, রাত্তিরেও খায় না—তিনি ভদ্দরনোক কিনা তাই।

সতীশ অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, ভদ্দরলোক কি রে—

হাঁ বাবু, ভদ্দরনোক। বলিয়া বেহারী জল আনিতে যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া বলিল, সাবিত্রী রাত্রে যদি ভাত খায় না তবে কি খায়?

কি আর খাবে বাবু! থাকলে কোনদিন একটু জলটল খায়—না থাকলে কিছুই খায় না।

বাসার আর কেউ জানে?

বেহারী বলিল, ঠাকুরমশায় জানে, আমি জানি, আর কেউ জানে না। তিনি বলতে মানা করে দেছে।

সতীশ বলিল, আচ্ছা, তুই জল আন।

বেহারী দুই-এক পা যাইতেই সতীশ পুনর্বার ডাকিল, আচ্ছা বেহারী—

আজ্ঞে?

ভদ্দরলোক তুই জানলি কেমন করে?

জানি বৈ কি বাবু! ভদ্দরনোকের মেয়ে শুধু অদেষ্টের ফেরে—

আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা জল আন।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। সাবিত্রীকে সাধারণ দাসীর সহিত এক করিয়া দেখিতে কোথায় যে তাহার একটা ব্যথা বাজিত, কেন যে মন তাহার হীনতা ও গুপ্ত লাঞ্ছনার চাপে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিত, তাহা সে কিছুতে ধরিতে পারিতেছিল না। আজ বেহারীর মুখের এতটুকু পরিচয়েই শুধু আনন্দিত বিস্ময়ে নহে, তাহার সমস্ত মন যেন কোন আপরিচিতের ক্লেদাক্ত বাহুপাশ হইতে অকস্মাৎ মুক্তি

পাইয়া পবিত্র হইয়া বাঁচিল। সে বেহারীর কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে একমুহূর্ত দ্বিধা করিল না।

জল আনিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কোন কারণে দেরী হইতেছে মনে করিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তবু বেহারীর দেখা নাই। পিপাসায় তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, সে আর একবার বেহারীকে ডাকিবে মনে করিয়া উঠিয়া বসিয়াই দেখিল জলের গ্লাস হাতে লইয়া সাবিত্রী আসিতেছে। এই আচারপরায়ণা হতভাগিনীকে

আজ সে নূতন চক্ষে দেখিল এবং সেই পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহার হৃদয়ের অন্ধ্র-রন্ধ্র করুণায় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল। যে কথা অন্য কোন সময়ে তাহার মুখে বাধিত, এখন বাধিল না। সে হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া সমস্তটুকু নিঃশেষে পান করিয়া খালি গ্লাস নীচে রাখিয়া দিয়া বলিল, অনেক কথা আছে।

সাবিত্রী মৌন-মুখে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল, প্রথম দফায় আমাকে মাপ করতে হবে।

সাবিত্রী শান্ত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিতীয় দফায়?

সতীশ বলিল, কাল কখন কি করে এসেছিলাম বলতে হবে।

সাবিত্রী উত্তর দিল, শেষ রাত্রে গাড়ি করে।

তার পরে?

রাস্তার উপরেই শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভাল করিনি। তুলে আনলে কে?

আমি।

আর কে ছিল? এতবড় জড় পদার্থটাকে ওপরে তোলা হলো কি প্রকারে?

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, আপনার ভয় নেই—বাসায় কেউ কিছুই জানে না।

সতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাঁচলাম! কিন্তু তোমার সঙ্গে কোন রকমের দুর্ব্যবহার করিনি ত?

না।

সতীশ অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিল, তবে কি কথা মনে করে দিতে চাচ্ছিলে?

আপনার শপথ। আপনি দিব্যি করেছেন আর কোন দিন মদ খাবেন না।

হঠাৎ দিব্যি করতে গেলাম কেন? এ-রকম দুর্বুদ্ধি ত আমার হবার কথা নয়।

বোধ করি আমার কথায় হয়েছিল।

সতীশ কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, আমার মনে পড়েছে সাবিত্রী। তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করেছি, না?

সাবিত্রী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সতীশ বলিল, তাই হবে; কিন্তু, কাল সন্ধ্যার কথাটা তোমার মনে আছে ত?

এবার সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া সাবিত্রী বলিল, আছে।

লোকে শুনতে পাবে বোধ হয়; তার উপায় হবে কি?

সাবিত্রী সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, হবে আবার কি! অন্য কোন বাসায়, না হয় বাড়ি চলে যান।

তুমি?

সাবিত্রীর মুখে কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। শান্ত সহজভাবে বলিল, আমি ভাবিনে। এ বাসার বাবুরা রাখেন, ভালোই; না রাখেন আর কোথাও কাজের চেষ্টা করে চলে যাব; যেখানে খাটবো, সেইখানেই দুটি খেতে

পাব। আর কোন কথা আছে?

সতীশের সমস্ত মন যেন পর্বতের শিখর হইতে গড়াইয়া পাদমূলে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহার এখানে থাকা না থাকায় সাবিত্রীর কিছু আসে যায় না। এ সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন! সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আর তাহার কোন কথা বলিবার নাই। কারণ, সাবিত্রীর এই নিঃশঙ্ক সংক্ষিপ্ত জবাবের পরে আর কোন প্রশ্নই তাহার মুখে আসিল না। অথচ, কত কথাই না তাহার বলিবার ছিল। সাবিত্রী খালি গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল, সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হায় রে মানুষের মন! এ যে কিসে ভাঙ্গে, কিসে গড়ে, তাহার কোন তত্ত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই যে কতটুকু আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, আবার কত প্রচণ্ড আঘাতও হাসিমুখে সহ্য করে তাহার কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। অথচ, এই মন লইয়া মানুষের অহঙ্কারের অবধি নাই। যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, যাহাকে চিনিতে পর্যন্ত পারা যায় না, কেমন করিয়া 'আমার'

বলিয়া তাহার মন যোগানো যায়! কেমন করিয়াই বা তাহাকে লইয়া নিরুদ্বেগে ঘর করা চলে!

সাবিত্রী অনেকক্ষণ চলিয়া গেলেও সতীশ তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরটা ঠিক দুঃখে-কষ্টে নয়, কি একরকমের জ্বালায় যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। যাহাকে ভালবাসি, সে যদি ভাল না বাসে, এমন কি ঘৃণাও করে, তাও বোধ করি সহ্য হয়, কিন্তু যাহার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেইখানে ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াটাই সবচেয়ে নিদারুণ! পূর্বেরটা ব্যথাই দেয়, কিন্তু শেষেরটা ব্যথাও দেয়, অপমানও করে। আবার এ ব্যথার প্রতিকার নাই, এ অপমানের নালিশ নাই। যাহার ভালবাসিবার কথা নহে, সে ভালবাসে না—ইহাতে কাহারও কি বলিবার থাকে! তাই, এই না-থাকাটাতেই লাঞ্ছনা এত বেশী বাজে—বেদনার হেতু খুঁজিয়া মিলে না বলিয়াই ব্যথা এমন অসহ্য হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, সাবিত্রীর এই নিশ্চিন্ত ও সরল কর্তব্য নির্ধারণ শুধু তাহার একলার হৃদয়ের মানচিত্রটাই উদ্ঘাটিত করিল না, তাহা সতীশের নিজের হৃদয়ের ছবিটাও বাহিরের আলোকে টানিয়া আনিয়া ফেলিল। এই দু'খানি মানচিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিয়াছিল, সাবিত্রী ভালবাসে, সে বাসে না। এখন দেখিল ঠিক বিপরীত, সেই বাসে, সাবিত্রী বাসে না। এই ঘৃণিত কথাটা স্বীকার করিতে শুধু লজ্জাতেই তাহার মাথা কাটা গেল না, নিজের মনের এই নীচ প্রবৃত্তিতে তাহার নিজের উপরে ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তাহার গত রাত্রির কাজগুলা লজ্জাকর সন্দেহ নাই; তাহার জীবনে এমন অনেক রাত্রির অনেক লজ্জা জমা হইয়া আছে সত্য, কিন্তু এই ইতরতার তুলনায় সে-সমস্তই একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল!

এ বাসায় ত আর একদিনও থাকা চলিবে না। এখানে থাকা না থাকা সম্বন্ধে সে যে সম্পূর্ণ উদাসীন নয়, এ কথা সে ত কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। সে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, বেদনার গুরুভারে মন যদি

তাহার ভাঙ্গিয়া অণু-পরমাণু হইয়াও যায়, তথাপিও না। কোনমতেই এই নীচতাকেই প্রশ্রয় দিয়া সে একেবারে অধঃপথে যাইবে না।

বাহিরে যে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, ঘরের মধ্যে সতীশের হুঁশ ছিল না। সহসা বাসায় প্রত্যাগত কেরানীদের শব্দ-সাড়ায় সে চকিত হইয়া জানালার বাহিরে উঁকি মারিয়াই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটা পিরান গায়ে দিয়া চাদর কাঁধে ফেলিয়া অলক্ষিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। এখনি হাত-মুখ ধুইবার প্রস্তাব লইয়া সাবিত্রী আসিয়া পড়িবে এবং খাবার জন্য জিদ করিতে থাকিবে। আজ তাহার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না; কিন্তু সাবিত্রী সে কথা কোনমতে বিশ্বাস করিবে না, অনুরোধ করিবে, পীড়াপীড়ি করিবে, হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই-সমস্ত মৌখিক স্নেহের বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে তাহার জীবনে আজ এই প্রথম সে নিজকে অকৃত্রিম ঘৃণার সহিত দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দর্জিপাড়ার একটা গলির মোড়ে হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল—ছোটবাবু না?

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হ্যাঁ, মোক্ষদা নাকি?

মোক্ষদা বহুদিন পূর্বে তাহাদের পশ্চিমের বাড়িতে দাসীর কাজ করিত, ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আর ফিরিতে পারে নাই। বলিল, হাঁ বাবু, আমি। ছোটবাবু, আমার একখানা চিঠি পড়ে দেবেন?

সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতবড় শহরে একখানি চিঠি পড়িয়ে নেবার আর কি লোক পেলে না ঝি? কৈ, চিঠি কোথায়?

ঝি বলিল, চিঠিখানি আমার ঘরে আছে বাবু। সাহস করে অচেনা লোককে দিয়ে পড়াতে পারিনি, পাছে আর কিছু বা থাকে। তবে আমাদের বাড়িতেই একটি মেয়ে আছে, সে লিখতে পড়তে জানে, কিন্তু তাকেও আজ দু'দিন ধরে পাচ্চিনে, এত রাত্তির করে বাড়ি ফেরে যে তখন আর সময় হয় না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি তোমার কত দূরে?

ঝি বলিল, এখান থেকে একটু দূর পড়ে বৈ কি! বড় রাস্তার ওধারে একটা গলির মধ্যে। বাবু, যদি আপনার ঠিকানাটা বলে দেন, তা হলে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি না হয় কালই যাই, চিঠিটা পড়িয়ে আনি।

আচ্ছা, বলিয়া সতীশ তাহার শোভাবাজারের ঠিকানাটা বলিয়া দিল, এবং কোথা দিয়া কেমন করিয়া যাইতে হয়, বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পথ চলিতে লাগিল। কতক্ষণ আসার পরে ঝি এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, বলতে সাহস পাইনে বাবু, যদি একবার পায়ের ধূলা দেন, ঘর আমার এখান থেকে আর বেশী দূরে নয়।

সতীশ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা চল।

তাহার আজ বাসায় ফিরিতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রি অধিক হইলে, সাবিত্রী ঘরে চলিয়া গেলে বাসায় ফিরিবে, এই সঙ্কল্প করিয়াই সে বাহির হইয়াছিল। তাই, সহজেই সম্মতি দিয়া গোটা-দুই গলি পার হইয়া তাহারা একটা মেটে দোতলা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'একটু দাঁড়ান', বলিয়া মোক্ষদা ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল। ওধারের কোণের ঘরে একটি ছোট টুলের উপর পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘরখানি দেখাইয়া দিয়া সবিনয়ে বলিল, একটু বসুন, আমি তামাক সেজে আনি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ছোট ঘরটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সতীশ আরাম বোধ করিল। একধারে একটা জলচৌকির উপর মাজাঘষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন ঝকঝক করিতেছে এবং তাহারই পাশে একটি ছোট আলনাতে কয়েকটি কাপড় গোছান রহিয়াছে। দেওয়ালে ব্রাকেটের উপর একটি টাইমপিস ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। সতীশ চৌকাঠের বাহিরে জুতা খুলিয়া

রাখিয়া তক্তপোশে পাতা সাদা ধবধবে বিছানাটির উপর গিয়া বসিল এবং ঘরের অন্যান্য আসবাবগুলির মনে মনে পরীক্ষা লইতে লাগিল। প্রথমেই নজর পড়িয়া গেল একটি ছোট শেল্ফের উপরে। কতকগুলি বই সাজানো ছিল, সতীশ উঠিয়া গিয়া একখানা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং প্রথম পাতা উলটাইতেই দেখিতে পাইল, ইংরাজী অক্ষরে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাম লেখা। সে বইখানি রাখিয়া দিয়া আরও তিন-চারিখানি বই খুলিয়া ওই একই নাম দেখিয়া বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

মোক্ষদা বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিল।

সতীশ হুঁকা হাতে লইয়া বলিল, ঝির ঘরটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উঠতে ইচ্ছে করে না।

মোক্ষদা একটুখানি হাসিয়া বলিল, উঠবেন কেন বাবু, বসুন। এ ঘরটি কিন্তু আমার নয়, আর একটি মেয়ের।

সতীশ প্রশ্ন করিল, তিনি কোথায়?

মোক্ষদা বলিল, সে এক বাবুদের বাসায় কাজ করে। আসতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়, তাই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে। আমাকে মাসী বলে ডাকে।

সতীশ বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু ভুবনবাবুটি আসবেন কখন?

ঝি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভুবনবাবু আবার কে?

ভুবনচন্দ্র মুখুয্যে—চেনো না?

অকস্মাৎ ঝি ভ্রূ প্রসারিত করিল—ও! আমাদের মুখুয্যেমশাই? না না, তাঁকে আর আসতে হবে না!

কেন, মারা গেছেন নাকি?

মোক্ষদা দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া বলিল, না, মারা যাননি, কিন্তু গেলেই ছিল ভাল। তিনি বামুনমানুষ, বর্ণের গুরু, আমাদের মাথার মণি, নারায়ণতুল্য। তাঁকে

অভক্তি করছি নে, তাঁর চরণের ্ধূলো নিচ্চি; কিন্তু কোনদিন দেখা পেলে তিনটি ঝ্যাঁটা মুখে গুনে মারব, তবে আমার নাম মোক্ষদা।

সতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাগের মাথায় বামুনমানুষকে যেন অভক্তি করে মেরে বসো না! বেশ ভক্তি করে গুনে গুনে মেরো, তাতে পাপ হবে না। কিন্তু তিনি লোকটি কে?

মোক্ষদা উদ্ধতভাবে বলিয়া উঠিল, লোকটির পরিচয় আর কি দেব বাবু, তিনি মানুষ নয়, চামার। এই মেয়েটিকে যে পথে বসিয়ে গেলি বাপু, এই কি তোর আপনার লোকের কাজ হলো? ছি ছি, গলায় দেবার দড়ি জুটল না!

সতীশ অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কে তিনি? কি করেছেন তিনি?

হঠাৎ দ্বারের বাহির হইতে জবাব আসিল, লোকটিকে আপনি চেনেন না, কি হবে আপনার তাঁর কথা শুনে?

সতীশ চমকিয়া উঠিল।

মোক্ষদা মুখ ফিরাইয়া কহিল, সাবি নাকি! কখন এলি তুই?

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইমাত্র আসছি। বাবুটিকে কোথায় পেলে মাসী?

মোক্ষদা কহিল, ইনিই আমাদের ছোটবাবু, সাবিত্রী। আজ দু'দিন হলো বৌমার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি, তা পড়াতে পাইনি, তাই বললুম বাবু যদি দয়া করে পায়ের ধূলো দেন।

সাবিত্রী বলিল, তবে পায়ের ধূলো তোমার ঘরে না দিয়ে আমার ঘরে কেন?

মোক্ষদা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তা রাগ করিস কেন সাবি, আমার ঘরে ত ভদ্রলোককে বসানো যায় না, তাই তোর ঘরে বসিয়েছি। কত বড়দরের লোক এঁরা—কোথায় আহ্লাদ করবি, না রাগ করছিস?

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, রাগ করব কেন মাসী, রাগ নয়। কিন্তু অমনি অমনি পায়ের ধূলো নিলে যে পাপ হয়। কিছু জলযোগ করান উচিত—হাঁ বামুনঠাকুর, আপনার ক্ষিদে পেয়েছে কি?

সতীশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সাবিত্রীর অভদ্র প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া মোক্ষদা বলিয়া উঠিল, এ তোর কি-রকম কথার ছিরি সাবিত্রী। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি এইরকম করে কথা কইতে হয়?

সাবিত্রী জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, এ আর মন্দ কথা কি মাসী? আচ্ছা, ওঁর ক্ষিদের কথা না হয় আর জিজ্ঞাসা করব না, তুমি কিন্তু দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আনো, আমি ততক্ষণ জায়গা করে রাখি।

মোক্ষদা অস্ফুটে বকিতে বকিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলে সাবিত্রী কহিল, কাল রাত থেকেই ত একরকম উপোস চলছে—বিকেলবেলা যে কেমন করে পালিয়ে এলেন তাও টের পেলুম না। এখন উঠুন, সন্ধে-আহ্নিক করে কিছু

খান। ওই আলনার ওপরে কাচা কাপড় আছে, পরে আমার সঙ্গে আসুন—না না, দেরী নয়, উঠুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই।

সাবিত্রী বলিল, না থাকলেও খেতে হবে। তার প্রথম কারণ, ক্ষিদে নেই এ কথা বিশ্বাস করলুম না, দ্বিতীয় কারণ—

সতীশ মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত করিয়া বলিল, দ্বিতীয় কারণটা মিছে কথা, ওই প্রথমই সব। সমস্ত বিষয়েই তোমার জিদ আর জবরদস্তি। এই জিদের সঙ্গে কারু পারবার জো নেই।

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তবে মিথ্যে চেষ্টা করা কেন?

সতীশ আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, তা নয় সাবিত্রী! আজ আমার চেষ্টা কোনমতেই মিথ্যা হবে না। হয় তোমার

দ্বিতীয় কারণ বলো, না হয় সত্যি বলছি তোমাকে, আমি কোনমতেই এখানে কিছু খাবো না।

সতীশের গোঁ দেখিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভাবছি আজ আপনি এলেন কেন? আজ আমার জন্মদিন তাই, নিজে এসে যখন দাসীর ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন শুধু শুধু আপনাকে ছেড়ে দিতে পারিনে। 'পারিনে' বলিয়াই সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেলো বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের গোপন ব্যথাটা তাহারই কণ্ঠস্বরের মুক্ত পথ ধরিয়া এমনি অকস্মাৎ সতীশের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল যে, কয়েক-মুহূর্তের জন্য সতীশের সমস্ত বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী সাবিত্রী ইহা চক্ষের নিমিষে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত কথাটাকে সহজ পরিহাসে পরিণত করিয়া হাসিয়া বলিল, ভগবান আজ আপনাকে আমার অতিথি করে পাঠিয়েছেন, সুতরাং খেতেও হবে, দক্ষিণাও নিতে হবে,—আজ নিতান্তই জাতটা মারা গেল দেখচি।

এতক্ষণে সতীশের সহজ শক্তি ফিরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আজ তোমার জন্মদিন?

সাবিত্রী বলিল, সত্যি।

সতীশ বলিল, তবে এমন দিনে যদি এসেই পড়েচি ত দোকানের কতকগুলো বাসী মেঠাই-মণ্ডা খেয়ে পেট ভরাব না। তা ছাড়া ও-সব ত আমি কোনদিনই খাইনে।

সাবিত্রীও তাহা জানিত। মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিল, কিন্তু আজ যে রাত হয়ে গেছে!

সতীশ বলিল, হলোই বা রাত। আজ বাসায় ফিরে গিয়ে ত বকুনি খেতে হবে না যে, রাতকে আজ ভয় করতে হবে। যাই বল তুমি, কোন মতেই আমি ও-সব খাব না।

তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া গেল।

সতীশ বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র কুটীর এবং এই নির্মল শুভ্র শয্যা ছাড়িয়া যাইতে কোনমতেই তাহার

মন উঠিতেছিল না, অথচ, আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বসিয়া থাকিবারও কোনও সদুপায় ছিল না। এখন, এই খাবার তৈরির বিলম্বের সম্ভাবনা তাহাকে যেন একটা আসন্ন কর্তব্যের কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া গেল।

সে পাশবালিশটা জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চলিয়া যাইবার সময় সাবিত্রী বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল, ইহাও যেমন সে টের পাইয়াছিল, তাহার 'তুমি' সম্ভাষণও সে তেমনি লক্ষ্য করিয়াছিল। নির্জন ঘরের মধ্যে এই নবলব্ধ তথ্য দুটি, যাদুকর ও তাহার মায়াকাঠির মত তাহার মনের মধ্যে অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। আজই দুপুরবেলা যে-সমস্ত ভালবাসার আবর্জনা তাহার মনের ভিতর হইতে ভাটার টানে বাহিরের দিকে ভাসিয়া গিয়াছিল, জোয়ারের উলটা স্রোতে আবার তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। আজই দুপুরবেলায় আত্মাভিমানের আঘাতের সুতীব্র জ্বালা নিজের মনের নীচ প্রবৃত্তির দিকে তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, জ্বালার উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই সে চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া গেল। এমনি করিয়া নিজেকে লইয়া খেলা করিতে করিতে একসময়ে বোধ করি সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশ ফিরিয়া দেখিল সাবিত্রী মোক্ষদাকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। মোক্ষদা চিঠিখানি সতীশের হাতে দিয়া বলিল, দেখুন ত বাবু, বৌমা কি লিখেচেন?

সতীশ সমস্তটা পড়িয়া লইয়া বলিল, তাঁদের ফিরতে এখনও মাস-দুই দেরী আছে।

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, আর কোন কথা নেই?

সতীশ চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, না, আর বিশেষ কিছু নেই।

আমার মাইনের কথাটা বাবু?

না, সে কথা নেই।

টাকার কথা নাই শুনিয়া মোক্ষদা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিঠির জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, তা থাকবে

কেন, থাকবে যত-সব বাজে কথা! দিন চিঠি। কাল সাবিত্রী আমাকে একখানা জবাব লিখে দিস ত। হাঁ লা, বাবুর খাবার দিবি কখন? রাত কি হয়নি?

সাবিত্রী বলিল, বামুনঠাকুর সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে না, অমনি খাবে?

মোক্ষদা বিরক্ত হইয়াই ছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, শোনো কথা একবার! এ কি তোর পুরুতঠাকুর, না ভট্‌চায্যিবামুন পেয়েচিস যে পূজো-আহ্নিক করতে যাবে?

সতীশ হাসিয়া বলিল, ও কি ঝি, সব ভুলে গেলে! আমি ত চিরকালই সন্ধ্যে-আহ্নিক করি।

মোক্ষদার বোধ করি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেলে। অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ও মা, তাই ত!

সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, দে মা, শিগ্‌গির বাবুর একটা জায়গা করে দে। তোর ঘরে ত সমস্তই ঠিক আছে। দে মা, দে, আর দেরী করিস নে—বলিতে বলিতে মোক্ষদা স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে, সতীশের আহারের সময় ঘরে কেহ উপস্থিত নাই—অন্ধকার বারান্দা হইতে মোক্ষদা ইহা লক্ষ্য করিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রুষ্টস্বরে বলিল, এ

তোর কি রকম আক্কেল সাবিত্রী! এ কি কাঙ্গালী-ভোজন হচ্চে যে, যা হোক দুটো ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছিস!

সাবিত্রী কি ভাবিতেছিল, চমকিয়া বলিল, দরকার হলে উনি চেয়ে নেবেন।

এমন বুদ্ধি না হলে আর দাসীবৃত্তি করতে যাস! কোথায় তুই নিজে দাসী-চাকর রাখবি, না—

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, নিজেই দাসী হয়ে আছি। তাতেই বা দোষ কি মাসী, খেটে খেতে লজ্জা নেই।

মোক্ষদা রাগিয়া বলিল, কে বললে নেই? আমার মত বয়সে না থাকতে পারে, কিন্তু তোর বয়সে আছে। তা থাক না থাক, বাবুকে যখন খেতে বলেছিস, তখন বসে থেকে খাওয়াগে যা। মানুষের কপাল ফিরে যেতে বেশী দেরী লাগে না!

সাবিত্রী চলিতে উদ্যত হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বকচো মাসী! উনি শুনতে পাবেন যে!

মোক্ষদা তৎক্ষণাৎ স্বর নত করিয়া বলিল, না না, শুনতে পাবেন কেন! আর একটা কথা তোকে বলে রাখি বাছা। ভগবান কপালের মাঝখানে যে দুটো চোখ দিয়েছেন সে দুটো একটু খুলে রাখিস। ঘড়ির চেন, হীরের আংটি না থাকলেই মানুষকে ছোটো মনে করিস নে।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মোক্ষদা আবার পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, শোন্ সাবিত্রী!

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

আয় দেখি একবার আমার ঘরে, একখানা ঢাকাই কাপড় বের করে দি, পরে যা।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, তুমি বার কর গে মাসী, আমি এখনি আসচি।

সতীশের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চোখ বুজে খাচ্চো নাকি?

সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কিন্তু, চোখ দুটি ত ঘুমে ঢুলে আসচে দেখচি।

বাস্তবিকই তাহার অত্যন্ত ঘুম পাইতেছিল। গত রাত্রির উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার আজ অসময়েই তাহার চোখের পাতা দুটিকে ভারী করিয়া আনিতেছিল, সে সলজ্জ-হাস্যে কবুল করিয়া বলিল, হাঁ, ভারী ঘুম পাচ্চে।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু চাই কি?

সতীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না, কিছু না; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বাহিরে পায়ের শব্দে সাবিত্রী টের পাইল, মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বলিল, বাবু আমাকে একখানি ঢাকাই শাড়ি কিনে দিতে হবে।

সে কোনদিনই কিছু চাহে না, সুতরাং এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া সতীশ আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মোক্ষদার আগমন টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, সত্যি চাই?

সত্যি বৈ কি!

পরবে কখন?

আজ পরবার সময় নেই বলে কোনও দিন সময় হবে না, এমন কি কথা আছে! তা ছাড়া আর একটি কথা; আমি খেটে খাই বলে মাসী দুঃখ করছিলেন, তাই মনে কচ্চি আর খেটে খাবো না—এখন থেকে বসে বসে খাবো।

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ ত।

শুধু বেশ হলেই ত হবে না, ওই সঙ্গে একটি দাসী না হলেও আর মান থাকচে না—তাও আপনাকে রেখে দিতে হবে। আপনাকেই—কথাটা সে শেষ

করিতে পারিল না, মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া উৎকট হাসির বেগ রোধ করিতে লাগিল।

মোক্ষদা কাঁচা লোক নহে। সে একমুহূর্তে সমস্তটা বুঝিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু বুঝি সাবিত্রীকে চেনেন?

সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, মাসীর সঙ্গে এতক্ষণ বুঝি তামাশা হচ্ছিল? তা এ ত ভালো কথা, আহ্লাদের কথা! আগে বললেই ত চুকে যেত! বলিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া দিল এবং বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত রহিল না। মিনিট দুই এইভাবে নীরবে কাটিবার পরে সাবিত্রী সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, রাত হলো, বাসায় যাবে না?

সতীশ শুষ্ক-গলায় বলিল, না গেলে থাকব কোথায়?

এইখানেই থাকবে। না যেতে পার ত কাজ নেই—মাসী এখনও জেগে আছে, আমি তার বিছানাতেই শুতে পারব—বলিয়া সাবিত্রী সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একমুহূর্তের জন্য সতীশ নির্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নাঃ—চললাম।

আচ্ছা, আর একটু বোসো, বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া গিয়া সতীশের জুতাজোড়াটা বাহির হইতে তুলিয়া আনিল, এবং আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিয়া

জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে কহিল, বাসার লোক যদি জানতে পারে?

কেমন করে জানবে?

আমিই যদি বলে দি!

কি বলবে তুমি—বলবার ত কিছু নেই।

সাবিত্রী আবার একটু হাসিয়া বলিল, কিছুই নেই? সত্যি বলচো?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলবার কথা না থাকলে কি জানি, আজ তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারতুম কি না। বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তুমি বাসায় যাও। কিন্তু এই দুষ্টুবুদ্ধি যদি না ছাড় ত একদিন সমস্ত প্রকাশ করে দেব তা বলে দিচ্ছি।

এ কি রহস্য! ইহার ভিতরের কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া সতীশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বললেই বা। বাসার লোক ত আমার গার্জেন নয়।

সাবিত্রী কহিল, নয় জানি। কিন্তু মাসী আমার সে ভারও অনায়াসে নিতে পারবে। তার জিভকে ঠেকিয়ে রাখবে কি দিয়ে?

মোক্ষদার ইঙ্গিতে সতীশ মনে মনে ভয় পাইলেও মুখে বলিল, টাকা দিয়ে।

সাবিত্রী বলিল, তাতে শুধু টাকার অপব্যয় হবে, কাজ হবে না। তা ছাড়া মাসীকেই না হয় টাকায় বশ করবে, কিন্তু আমাকে বশ করবে কি দিয়ে?

সতীশ ফস করিয়া বলিয়া ফেলিল, ভালবাসা দিয়ে।

সাবিত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে কঠিন চাপা-হাসির আভাস দেখা দিল, কহিল, এই নিয়ে চারবার হলো।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, ইতিপূর্বে আরও তিনজন এই জিনিসটিই দিতে চেয়েছিলেন।

তুমি নাওনি?

না। জঞ্জাল জড় করে রাখবার মত জায়গা নেই আমার।

সতীশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সাবিত্রীর বিদ্রূপের হাসি এবং কণ্ঠস্বর কিছুই তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই, তাই তাহার দুপুরবেলার কথাগুলোও মনে পড়িয়া গেল, এবং পড়ামাত্রই প্রেমের নদীতে জোয়ার শেষ হইয়া ভাটার টান ধরিল। সাবিত্রীর কথাগুলাকে সে তামাশা বলিয়া ভুল করিল না। হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তারা নির্বোধ! তাদের এমন বস্তু দেওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল যা বাক্সে তুলে রাখতে কারো জঞ্জাল বলে মনে হয় না। আমিও নির্বোধ কম নই, কেননা, আমিও ভুলেছিলাম ও-বস্তুটা তোমাদের কত অবহেলার সামগ্রী! এতটা বয়সে এত বড় ভুল হওয়া আমার উচিত ছিল না। আচ্ছা, চললাম।

কথাটা সাবিত্রীকে শূলের মত বিঁধিল। 'তোমাদের' বলিয়া সতীশ যে তাহাকে কাহাদের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিল, সাবিত্রীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু পরিহাস কলহে পরিণত হইয়া হাতাহাতির উপক্রম হইতেছে দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল। সতীশ কিন্তু থামিতে পারিল না, বলিল, শিকারী বঁড়শিতে মাছ গেঁথে খেলিয়ে যেমন করে আমোদ করে, এতদিন আমাকে দিয়ে বোধ করি তুমি সেই তামাশাই করছিলে,—না?

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না। তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বঁড়শিতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মত বড় মাছ তুমি নও।

সতীশ নির্মমভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, নই আমি?

সাবিত্রী কহিল, না, নও তুমি। তাহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সতীশের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, অসচ্চরিত্র! আমার

মত একটা স্ত্রীলোককে ভালবেসে ভালবাসার বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? যাও তুমি—আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যে অপমান করো না।

এই অপমানে সতীশ আরও নির্দয় হইয়া উঠিল। এবার অমার্জনীয় কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আমি অসচ্চরিত্র! কিন্তু সে যাই হোক সাবিত্রী, তোমার নামটা কিন্তু তোমার বাপ-মা সার্থক দিয়েছিলেন।

সাবিত্রী সরিয়া গিয়া চৌকাঠ ধরিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল, যাও! তাহার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ অপমান ও ক্রোধের অসহ্য জ্বালায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বলিল, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে না? কিংবা আর কোনও খেলা—আর কিছু—

হঠাৎ দুজনের চোখাচোখি হইল। সাবিত্রী এক-পা কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর,—তুমি যাও! তুমি যাও! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও! না যাও ত মাথা খুঁড়ে মরব—তুমি যাও!

তাহার কণ্ঠস্বরের উত্তরোত্তর এবং অস্বাভাবিক তীব্রতায় অকস্মাৎ সতীশ ভীত হইয়া উঠিল এবং আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অন্ধকার বারান্দার শেষ পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে থামিতে হইল। কোন্ দিকে সিঁড়ি, কোন্ দিকে পথ, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, দেশলাই নাই। এই নিরুপায় অবস্থা-সঙ্কটের মাঝখানে মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তাহাকে সাবিত্রীর ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতে হইল। বাহির হইতে দেখিল, সাবিত্রী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। আস্তে আস্তে ডাকিল, সাবিত্রী! সাবিত্রী সাড়া দিল না। পুনর্বার ডাকিয়াও সাড়া না পাইয়া সতীশ ঘরের মধ্যে আসিয়া সাবিত্রীর মাথায় হাত দিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, চক্ষু মুদ্রিত এবং মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া বুঝিল, সাবিত্রী মূর্ছিত হইয়া আছে। মুহূর্তের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা ভয় ও সঙ্কোচের উদয় হইল বটে, কিন্তু

পরক্ষণেই সাবিত্রীর অচেতন দেহটা তুলিয়া লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, এবং চাদরের এক অংশ কলসীর জলে ভিজাইয়া লইয়া মুখের উপর, চোখের উপর ছিটাইয়া দিয়া একখানা হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন পরেই সাবিত্রী চোখ মেলিয়া মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, তুমি যাওনি?

সতীশ চুপ করিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সাবিত্রী বিছানা হইতে উঠিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল, তোমাকে দোর খুলে দিয়ে আসি।

তার পরে নিঃশব্দে পথ দেখাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং দ্বার খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মূর্ছিত সাবিত্রীকে শয্যায় শোয়াইতে সেই যে মুহূর্তের জন্য তাহার অচেতন দেহখানি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে হইয়াছিল, সেই অবধি সতীশ কি রকম যেন অন্যমনস্ক হইয়াছিল; এখন দরজার বাহিরে আসিতেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল এবং কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিতেই সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, না, আর একটি কথাও না, তোমার দেহটাকে ত তুমি পূর্বেই নষ্ট করেছ, কিন্তু সে না হয় একদিন পুড়েও ছাই হতে পারবে, কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গালে আর কালি মাখিয়ো না। হয় তুমি কালই ও-বাসা ছেড়ে চলে যাও, না হয়, আমি আর ওখানে যাবো না। বলিয়াই সাবিত্রী উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নয়

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কেন যে সাবিত্রী অবিশ্রাম আকর্ষণ করে, কেনই বা কাছে আসিলে এমন নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়, সেদিন সারা রাত্রি ধরিয়া ভাবিয়াও ইহার একটা অস্পষ্ট কারণও খুঁজিয়া পাইল না। গত রাত্রির এক একটা কথা এখন পর্যন্ত তাহার হাড়ের মধ্যে ঝনঝন করিয়া বাজিতেছিল। তাই সে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গেল এবং একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া মুটে ডাকিয়া জিনিসপত্র বোঝাই দিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া বাসার সকলেই আশ্চর্য হইল। বেশী হইল বেহারী। সে কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি তবে বাড়ি যাচ্ছেন?

সতীশ তাহার হাতে গোটা-পাঁচেক টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, না বেহারী, বাড়ি নয়—স্কুলের কাছেই একটা বাসা পেয়েছি, তাই যাচ্ছি।

বেহারী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলল, কিন্তু সে ত এখনো আসেনি বাবু।

সতীশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসেনি? আচ্ছা, তুই বিছানাগুলো আমার বেঁধে দে, আমি ততক্ষণ রাখালবাবুর ঘর থেকে একবার আসি। বলিয়াই বাসার দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিতে রাখালবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; বোধ করি এই আলোচনাই চলিতেছিল। কারণ, তাহাকে দেখিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাখাল একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সতীশবাবু এমন হঠাৎ যে!

সতীশ হাতের টাকাগুলো টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, হঠাৎ একদিন এসেও ছিলাম, হঠাৎ একদিন চলেও যাচ্ছি। এই টাকাগুলোতেই বোধ

করি হবে, যদি না হয়, হিসাব হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন, বাকী টাকা পাঠিয়ে দেব।

রাখাল বলিলেন, জানাব কোথায়?

আমার স্কুলের ঠিকানায় একখানা কার্ড লিখে ফেলে দেবেন, তা হলেই পাব, বলিয়া সতীশ আর কোনও সওয়াল-জবাবের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে একটা চাপা-হাসির শব্দ সতীশের কানে আসিয়া পৌঁছিল। বেহারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া হাতের ছোট পুঁটলিটি কপাটের আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া, রাখালকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবু, আমার সতের দিনের মাইনেটা হিসাব করে দিন, আমাকে এখুনি বাবুর সঙ্গে যেতে হবে।

রাখাল বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুই যাবি, এখানে কাজ করবে কে? যাব বললেই ত যাওয়া হয় না।

বেহারী কহিল, কেন হবে না বাবু! আমাকে যে যেতেই হবে!

রাখাল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হবে বললেই হবে! রীতিমত নোটিশ দেওয়া চাই, জানিস!

বেহারী কহিল, সে তখন একদিন সময়মত এসে দিয়ে যাব। এখন মাইনেটা দিন, আমাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।

রাখাল আর কোনও জবাব না দিয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া সতীশের ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, সতীশবাবু, এইগুলো কি কাজ?

সতীশ বিছানা বাঁধিতেছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোনগুলো?

রাখাল উদ্ধতভাবে কহিল, ঝি আসেনি। সে ত আগেই গেছে দেখছি, আবার বেহারীকে নিতে চান কেন? দোষ করলেন আপনি, শাস্তি ভোগ করবো কি আমরা?

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনার কথা ত বুঝলাম না।

রাখাল গলার সুর চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বুঝবেন কেন, না বোঝাই যে সুবিধে। নিজে না গেলে আপনাকে ত বার করতেই হতো; কিন্তু সে যা হোক, একটা সহজ ভদ্রতার জ্ঞানও কি মানুষের থাকতে নেই?

সতীশের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি এ সমস্ত কি বলছেন?

ঈর্ষার বহ্নি রাখালকে দগ্ধ করিতেছিল, বলিলেন, বলছি ঠিক, আপনিও বুঝছেন ঠিক! সতীশবাবু, কোন কথাই আমাদের অজানা নেই। আচ্ছা যান আপনি—কি কালসাপকেই ঘরে আনা হয়েছিল, এমন বাসাটা লণ্ডভণ্ড করে দিলে।

সতীশ রাখালের একটা হাত চাপিয়া বলিল, কি বলছেন রাখালবাবু?

রাখাল জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, যান—যান, ন্যাকা সাজবেন না। যান আপনি, দূর হোন।

বেহারী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, সতীশবাবু, যেতে দেন ওঁকে, কোথায় ওঁর দরদ, কোথায় ওঁর জ্বালা, সে একদিন আপনাকে আমি বলব। আমি সমস্ত জানি। আসুন, আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই।

রাখাল পদশব্দে বাড়ি কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল, সতীশ চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, এ-সব কি বেহারী!

বেহারী বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যাব বাবু, এখানে থাকতে পারব না।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমার সঙ্গে? এখানে কাজ করবে কে?

বেহারী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিল, যার ইচ্ছে করুক, আমি সঙ্গে যাবই! একজন চাকর না থাকলে ত আপনার চলবে না বাবু!

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা আগে বললেই ত পারতিস বেহারী?

বেহারী জবাব দিল না। নিঃশব্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া মুটের মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিল। সে যে যাইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

নূতন বাসায় আসিয়া সতীশ ভাবিতেছিল, সে এমন হইয়া গেল কিরূপে? যে-সে তাহাকে শুধু যে অপমান করিতেই সাহস করে, তাহাই নহে, অপমান করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিত্রাণ পায় কেন? তাহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি একতিলও কমে নাই, অথচ কেন সে মুখ তুলিয়া জোর করিয়া কথা কহিতে পারে না? কেন সে নতমুখে সমস্তই সহ্য করে? নিজের মনের এই শোচনীয় দুর্বলতা আজ তাহাকে অত্যন্ত বাজিল এবং তদপেক্ষা বাজিল এই দুঃখটা যে, প্রতিকার করিবার সাধ্যও যেন তাহার হাতছাড়া হইয়া গেছে। রাখালের ক্রুদ্ধ ভাষা যে, সে-রাত্রির ঘটনারই ইঙ্গিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

ইহাই মনে করিয়া সতীশ লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। বিপিনের লোক তাহাকে কেমন করিয়া কিভাবে ধরিয়াছিল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া সে ভয়ে মড়ার মত পড়িয়াছিল, বুদ্ধিমান তাহারা কেমন করিয়া সমস্ত চালাকিটা বুঝিতে পারিয়া আচ্ছাদনের ভিতর হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি চিত্তগ্রাহী দুর্লভ বিবরণ সত্যে-মিথ্যায়, অলঙ্কারে-আড়ম্বরে জড়াইয়া বর্ণিত হইবার সময়টা উপস্থিত সকলে কিরূপ উৎকট আনন্দ, আগ্রহ ও উচ্চ-হাস্যের সহিত উপভোগ করিয়াছে, তাহার আগাগোড়া চেহারাটা কল্পনায় এতই মর্মান্তিক ও বীভৎস হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও সতীশের সমস্ত মুখ বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আবার, ইহাদেরই সম্মুখে রাখাল তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, সে একটি কথাও বলিতে পারে নাই! এই কথা সাবিত্রী শুনিয়া কি মনে করিবে!

কিন্তু কোন কথাই সে বলিবে না। স্তব্ধ হইয়া সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিবে, একটা জবাবও দিবে না। তাহার আত্মসম্মানবোধ যে কত বৃহৎ, ইহাও যেমন সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, তাহার ব্যথিত মুখের চেহারাটাও সে কল্পনায় আজ সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল। সতীশ মনে মনে বলিল বটে, আমার নিজের নির্বুদ্ধিতায় যে অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে, অসহায়া সাবিত্রীকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া আসা উচিত হয়

নাই, কিন্তু, উচিত যে কি হইতে পারিত তাহাও সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সাবিত্রী কি নিজেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলে নাই! সে কি দর্প করিয়া বলে নাই, উহাতে সে কোন অপমানই বোধ করে না!

বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু আপনার চান করবার সময় হয়েছে। তাহার কণ্ঠস্বরে আজ যেন একটু বিশেষ অর্থ ছিল।

সতীশ লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

হায় রে! মন যখন তাহার ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, তখনও নিয়মিত কোন কাজেই অবহেলা করিবার পথ ছিল না। সে স্কুলে গেল, কিন্তু ক্লাসে ঢুকিতে পারিল না। বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একসময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই কিসের নৈরাশ্যে যেন সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নূতন ঘরটিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া লইতে বেহারী যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে তাহা বুঝা গেল, কিন্তু অপটু হস্তের প্রথম চেষ্টা কোথাও চাপা পড়ে নাই, তাহাও তাহার তেমনি চোখে পড়িল। বেহারী সরবৎ তৈরী করিয়া আনিল, তামাক সাজিয়া দিল, এবং দোকান হইতে পানের দোনা কিনিয়া আনিয়া কাছে রাখিল। বৃদ্ধের অনভ্যস্ত এই-সব সেবার চেষ্টায় সতীশ মনে মনে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুছিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল, যাহা হইবার হইয়াছে, এ-সব কথা সে আর মনেও আনিবে না, লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, হয় ঐ লইয়াই থাকিবে, না হয়, বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু সেদিন ঐ যে মূর্ছিতা নারীর তপ্ত স্পর্শটুকু লইয়া সে বাসায় ফিরিয়াছিল, সে উত্তাপ তাহার সমস্ত সংযমের চেষ্টাকে গলাইয়া শেষ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেহারী মনে মনে সমস্তই বুঝিতেছিল, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার সাহস তাহার ছিল না। তাই সে বিষণ্ণ-মুখে চুপ করিয়া দ্বারের বাহিরে বসিয়া

রহিল। প্রায় দশটা বাজে, সে আস্তে আস্তে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বাবু, আলোটা নিবিয়ে দেব কি?

সতীশ কহিল, দে, কিন্তু তুই শুবি কোথা বেহারী?

আমি এইখানেই আছি বাবু, আমার মাদুরটা দোর গোড়াতেই পেতেছি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, এ-বাসায় কি চাকরদের শোবার ঘর নেই?

বেহারী বলিল, নীচে একটা খালি ঘর আছে, কিন্তু আপনার যদি কিছু দরকার হয়, তাই এখানেই থাকব।

সতীশ ব্যস্‌ত হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি রে, তুই শুতে যা। বুড়োমানুষ, হিমে থাকিস নি।

হিম কোথায় বাবু, বলিয়া সেইখানেই বেহারী গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, রাত কত হলো রে?

বেশী হয়নি বাবু, বোধ করি দশটা বেজেছে।

সতীশ আবার মৌন হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুই সাবিত্রীদের ঘর চিনিস না বেহারী?

বেহারী উঠিয়া বসিয়া বলিল, চিনি বৈ কি বাবু। কতদিন তাকে পৌঁছে দিয়েছি।

সতীশ আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বেহারী বলিল, একবার গিয়ে দেখে আসব কি?

এবারে সতীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তুই যাবি কোথা? সে যে অনেক দূর!

বেহারী কহিল, দূর কিছুই নয় বাবু।

সতীশ ভাবিতে লাগিল, কথা কহিল না।

বেহারী আস্তে আস্তে বলিল, বাবু, যদি ঘণ্টা-খানেকের ছুটি দেন ত দেখে আসি। সকালবেলা আসেনি, বোধ হয় অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকবে।

তথাপি সতীশ কথা কহিল না।

বেহারী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে অভ্যাসমত কথা বলিতে পায় নাই, উপরন্তু, বলিবার বিষয় ইতিমধ্যে এত বেশী সঞ্চয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একবার বলিল, নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না বাবু, আর একবার তামাক সেজে দেব কি?

সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সাড়া দিল না। তবুও বেহারী কিছুক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, শেষে হতাশ হইয়া গায়ে কাপড়টা আর একবার টানিয়া সেইখানেই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ঠিক সময়ে সতীশ স্কুলে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্নে বেহারী হাতের কাজকর্ম সারিয়া লইয়া সদ্য নিযুক্ত পাঁড়েঠাকুরের উপর বাসার খবরদারির ভার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সতের দিনের মাহিনা আদায়ের অছিলায় পুরাতন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অথচ, তাহার এ ভয় ছিল, পাছে রাখালবাবু কোনগতিকে অফিসে না গিয়া থাকেন। তাই ঘরে ঢুকিয়াই নূতন ভৃত্যটার নিকটে সংবাদ জানিয়া লইয়া নির্ভয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া গলা বড় করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই, প্রাতঃপ্রেণাম হই।

ঠাকুরমশাই গাঁজা খাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কল্যাণ হোক! তার পর মাথা সোজা করিয়া চোখ চাহিয়া বলিলেন, ও কে, বেহারী! আয় বোস।

বেহারী কাছে আসিয়া পদধূলি লইয়া বসিল। চক্রবর্তী গামছার খুঁট খুলিয়া খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া বেহারীর হাতে দিয়া বলিলেন, ও-বাসায় তা হলে রাঁধচে কে?

বেহারী উঠিয়া গিয়া হাতের তেলোয় ফোঁটা কয়েক জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, একটা খোট্টা বামুন। একেবারে জানোয়ার!

চক্রবর্ত্তী খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভগবান ওদের ল্যাজ দিতে ভুলেছেন তাই যা! তাহার পরে বাসার নূতন হিন্দুস্থানী চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমাদের এখানে কালই এক ব্যাটা ভূতকে ধরে আনা হয়েছে, তা সে—বিদ্যে ওর—তার সাক্ষী দ্যাখ না বেহারী, আজ সকালে এক কলকে বার করে দিয়ে বললুম, কৈ তৈরী কর দেখি বাপু! মনে করলুম, বিদ্যেটা একবার দেখিই না। তা বললে বিশ্বাস করবি নে বেহারী ব্যাটা জিনিসটাকেই মাটি করে ফেললে। তা তোদের ওখানে কষ্ট হবে না, সাবিত্রী আমার চালাক মেয়ে, দু'দিনেই শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম করে নেবে।

তাঁহার নিজের পনের আনা বিদ্যাও যে ঐ গুরুর কাছেই শেখা, সে-কথাটা চাপিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, কিন্তু তাও বলি বেহারী, হাঁড়ি ধরলেই হয় না, বাবুভায়াদের খুশী করা, তাঁদের পাতে রান্না তুলে দেওয়া, বড় সামান্য বিদ্যে নয়—বাম্‌নায়ের জোর চাই! ও খোট্টা-মোট্টার কর্ম্মই নয়। কিন্তু আমার এখানে কাজ করা আর পোষাবে না, সে তোকে আগে থেকেই বলে রাখলুম। তুই বলিস দেখি আমার নাম করে সাবিত্রীকে। সে তখনি বলবে, যাও বেহারী, চক্রবর্ত্তীকে ডেকে আনো, না হয় দু'টাকা মাইনে বেশী নেবে। সতীশবাবু কিন্তু কখখনো না বলবেন না। তাঁর মেজাজ জানি ত। বিশেষ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ গতিং। আমি দু'টাকা বেশী পেলে সে কিছু আর অপাত্রে পড়বে না, বলিয়া চক্রবর্ত্তী নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

বেহারী অবাক হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, ঠাকুরমশাই, সাবিত্রী ত ওখানে নেই।

চক্রবর্ত্তী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা নেই নেই! তুই আমার নাম করে বলিস, তার পরে যা হয় আমি দেখে নেব।

বেহারী মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বাঁ হাতের পদার্থটা ডান হাতে লইয়া কহিল, ছুঁয়ে দিব্যি করে বলচি দেব্‌তা, সে ওখানে যায়নি।

চক্রবর্তী এতবড় শপথের পরে আর সন্দেহ করিতে পারিলেন না; রীতিমত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুই বলিস কি বেহারী! সে ত এখানেও আসেনি! তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখালবাবু সতীশবাবু বেচারাকে যে—আচ্ছা, তুই যা—একবার তাকে দেখে আয়, তার পরে আমি আছি আর রাখালবাবু আছেন। আমাকে সে-বামুন পাসনি বেহারী!

তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে বেহারীর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, সে কলিকাটি চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সতীশবাবুই বা গেলেন কেন? তিনি বলেন, ইস্কুল দূর পড়ে—এটা কিন্তু কাজের কথাই নয়।

চক্রবর্তী সাবধানে আগুন তুলিতে তুলিতে বলিলেন, না, ভেতরে কথা আছে। অতঃপর দুজনে মিলিয়া কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া বেহারী উঠিয়া পড়িল এবং উদ্বিগ্নমুখে সাবিত্রীর ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল সাবিত্রীর অসুখ হইয়াছে।

সাবিত্রীদের বাটীর সদর-দরজা খোলা ছিল, বেহারী নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। প্রায় সকল ঘরেরই কপাট বন্ধ, ভাড়াটেরা দিবানিদ্রা দিতেছে। বেহারী ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা কবাট বন্ধ ছিল। তাহার আড়ালে সাবিত্রী মাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এবং অদূরে তক্তাপোশের উপর বিছানায় বিপিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে। পদশব্দে চকিত হইয়া সাবিত্রী মুখ বাড়াইয়া অকস্মাৎ বেহারীকে দেখিয়া একমুহূর্তে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, এস বেহারী, বসো। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিল

এবং অত্যন্ত সমাদর করিয়া বসাইয়া নিজে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, খবর সব ভাল বেহারী?

বেহারী মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাল। তার পর সাবিত্রীর মুখে আর কথা যোগাইল না। উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বেহারী হঠাৎ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, চললুম, আমার আবার অনেক কাজ।

সাবিত্রী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এখনি যাবে? একটু বসো না!

বেহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না, চললুম।

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজা পর্যন্ত আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ বেহারী, বাবুরা খুব রাগ করেছেন?

বেহারী চলিতে চলিতে বলিল, আমি জানিনে ত, আমরা ওখানে আর নেই!

সাবিত্রী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, নেই? বাসা ভেঙ্গে গেছে নাকি?

বেহারী বলিল, না ভাঙ্গেনি। শুধু সতীশবাবু আর আমি চলে গেছি।

কেন তোমরা গেলে বেহারী?

সে অনেক কথা, বলিয়া পুনর্বার বেহারী চলিবার উদ্যোগ করিতেই সাবিত্রী দুই হাত দিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, আর একটিবার তোমাকে উঠে গিয়ে বসতে হবে বেহারী।

বেহারী অটলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আমার সময় নেই।

তবে কাল একটিবার আসবে, বলো?

বেহারী তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না, আমার সময় হবে না।

পলকমাত্র সাবিত্রী তাহার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। অভিমানে সমস্ত বক্ষ পূর্ণ করিয়া শান্তভাবে বলিল, আচ্ছা, তবে যাও। এই কথা তাঁকে বলো গিয়ে।

কথাটা বেহারীকে আঘাত করিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, তিনি ত তোমার কথা জানতে চাননি।

চাননি?

না।

সাবিত্রী স্থির হইয়া প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লইয়া শুষ্কস্বরে বলিল, কোনদিন জানতে চাইলে বলবে বোধ হয়?

বেহারী বলিল, না। আমি মেয়েমানুষ নই—আমার শরীরে দয়ামায়া আছে—বলিয়াই আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী সেইখানে চৌকাঠের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরে-বাহিরে আর একবার আগুন ধরিয়া উঠিল।

আজ সকালে সে বাড়ি ছিল না। কালী-দর্শন করিতে কালীঘাটে গিয়াছিল। সেই অবকাশে কোথা হইতে বিপিন জন-দুই ইয়ার লইয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছে, এবং মোক্ষদার হাতে দু'খানা নোট দিয়া সাবিত্রীর ঘরের তালা খুলিয়া বিছানায় বসিয়াছে। আরো মদ আনাইয়া বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছে—এ সব কোনও কথা সাবিত্রী জানিত না। বেলা বারোটার সময় সে বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, এই বাটীর ভাড়াটে, দুজন প্রবীণা মাতাল হইয়া বকাবকি করিতেছে, এবং তাহার মাসী মোক্ষদা সামনের বারান্দায় কাৎ হইয়া পড়িয়া ভাঙ্গা গলায় নিজের মনে বিদ্যাসুন্দরের গান আবৃত্তি করিতেছে। বাড়িময় মুড়ি, কড়াই-ভাজা, হাঁসের ডিমের খোলা, কাঁকড়া-চিবানো, চিংড়ি মাছের খোলা ছড়াছড়ি যাইতেছে—পা ফেলিবার স্থান নাই। মোক্ষদা সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়াই শিথিল-বস্ত্র কোমরে জড়াইতে জড়াইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে তাহার গলা জড়াইয়া কান্না জুড়িয়া দিল—মা, এমন সব বাবু যার, তার আবার কষ্ট, তার আবার চাকরি করা! আমি কিন্তু তোর গরীব মাসী সাবিত্রী—মুখে তাহার

উগ্র মদের গন্ধ; গালে, কপালে, কাপড়ে, সর্বাঙ্গে হলুদের শুকনো দাগ, নিশ্বাসে কাঁচা পিঁয়াজের কুৎসিত তীব্র গন্‌ধ! অসহ্য ঘৃণায় সাবিত্রী তাকে সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, মাসী, তুমিও মদ খাও! তুমিও মাতাল?

ঠেলা খাইয়া মোক্ষদা কান্না বন্ধ করিয়া, চোখ রাঙ্গা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতাল? আলবত্‌ মাতাল! পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা কর গে যা—তারা বলবে মোক্ষদা মাতাল! আমারো একদিন ছিল লো, আমারো একদিন ছিল। আমিও একদিন চব্বিশ ঘণ্টা মদে ডুবে থাকতুম! তুই তার জানবি কি—কালকের মেয়ে!

তাহার তর্জনে গর্জনে কুণ্ঠিত হইয়া সাবিত্রী শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কিন্তু তুমি ত খাও না—আজ হঠাৎ খেতে গেলে কেন?

মোক্ষদা আরো রাগিয়া উঠিয়া বলিল, হঠাৎ আবার কি! আমরা হঠাৎ-খাইয়ে মেয়েমানুষ নই। জিজ্ঞাসা কর গে যা তোর বাবুকে, যে এক গেলাস খেয়ে উলটে পড়ে আছে, তাকে! ওরে, আমরা মরি, তবু মর্যাদা হারাইনে—আঁচলে দু'খানা নোট বেঁধে দিয়েচে, তবে গেলাস ধরেছি।—বলিয়া আঁচলটা সদর্পে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বললেই ছুটে গিয়ে গিলব, সে মোক্ষদা আমি নই।

সাবিত্রী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন নাকি?

মোক্ষদা কহিল, না হলে আর এত কাণ্ড করলে কে? কিন্তু তাও বলি, খাও বললেই খাব কেন? মান-ইজ্জত নেই কি?

ইতিপূর্বে বারান্দার ওধারে যাহারা আপোসে বচসা করিতেছিল, উচ্চ-কণ্ঠস্বরে কলহের আশ্বাস পাইয়া তাহারা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধু বলিল, ওগো, মান-ইজ্জত আমাদেরও আছে, ঠেস দেওয়া কথা আমরাও বুঝি। তবে নাকি সাবিত্রী মেয়ের মত, তার বাবু আমাদের হাতে ধরে সাধাসাধি করতে লাগল, তাই খাওয়া। না হলে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা গর্জন করিয়া উঠিল, হলোই বা সাবিত্রীর বাবু! হলোই বা জামাই!কুড়ি টাকা আঁচলে বেঁধেছি তবে গেলাস ছুঁয়েছি!

কথা শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইতেছিল। বলিয়া উঠিল, থামো মাসী, থামো! চুপ করো!

মোক্ষদা বলিল, চুপ করব কেন? যা বলব সামনেই বলব। তল্লাটের লোক জানে, পষ্ট বলিয়ে যদি কেউ থাকে ত সে মুকি!

এবার বিধুও গলা চড়াইয়া দিয়া বলিল, পষ্ট বলতে শুধু তুই জানিস, তা নয়। আমরাও জানি। জামায়ের কাছে দু'খানা নোট নিয়ে মদ খেয়েচিস, তিনখানা পেলে না জানি—

মোক্ষদা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, যত বড় মুখ নয়—আর বলিতে পাইল না। সাবিত্রী হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, এবং জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার ঘরের মধ্যে ফেলিয়া শিকল তুলিয়া দিল। তথা হইতে মোক্ষদা অকথ্য অশ্রাব্য ভাষা অবিশ্রাম বর্ষণ করিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী বিধুর দুটো হাত ধরিয়া বলিল, মাসী, আমাকে মাপ কর। সমস্ত দোষ আমার।

তাহার নম্র-কথায় শান্ত হইয়া বিধু বলিল, তোর কি সাবি? মুকিকে চিরকাল জানি ঐ রকম। একটু খেলে আর রক্ষে নেই, পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করবে। ঐ তার স্বভাব। যা, তুই নিজের ঘরে যা। বলিয়া বিধু সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রোষে ও ক্ষোভে তাহার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করিতেছিল। সতীশ যে এতবড় নির্লজ্জ হইতে পারে, প্রকাশ্যে দিনের বেলায় এমন উন্মত্ত আচরণ করিতে পারে, ইহা ত সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। তাই কাল্পনিক নহে, একটা সত্যকার ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে বিরাট তরঙ্গের মত গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে তাহার প্রিয়তম

অকস্মাৎ সে যেন তাহারি চোখের সুমুখে মরিয়া গেল, যাহাকে সে মাত্র দুইদিন পূর্বে কটুকথায় অপমান করিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে যখন এত সত্বর, এত সহজে, তাহার সমস্ত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া এমন হীন, এমন কদাকার হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার, তাহার আর কিছুই রহিল না। তাহার দুই চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু একফোঁটা জল আসিল না। তাহার সর্বস্ব, তাহার দেবতা, কল্পনার স্বর্গ, তাহার ভ্রষ্টজীবনের ধ্রুবতারা, তাহার ইহকাল-পরকাল সমস্তই যেন একমুহূর্তে ঐ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টরাশির মাঝখানে লুটাইয়া পড়িল।

সাবিত্রী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরের দিকে যাইতে কিছুতেই পা উঠিল না। তাহার মনে পড়িল, এই সেদিন রাত্রে তাহাকে স্পর্শ করিয়া সতীশ শপথ করিয়াছিল। আজ যখন সে এরই মধ্যে সব ভুলিয়া, মাতাল হইয়া তাহারি শয্যার উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহার মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিবে আর কি করিয়া?

এমন সময় নীচে বাড়িউলীর গলার শব্দ শোনা গেল। তিনিও আজ বাটী ছিলেন না। আসিয়াই একজনের নিকটে মোক্ষদা ও বিধুর বিবরণ, এবং সেই সঙ্গে আর যাহা কিছু সমস্তটুকু শুনিয়া ক্রোধভরে উপরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সম্মুখেই রাশীকৃত এঁটোকাঁটা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্প্রতি প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া আসিয়া তাঁহার বাচ—বিচারের অন্ত ছিল না। সাবিত্রীকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন, সাবি, তোকে ত ভাল মেয়ে বলেই জানতুম—এ সমস্ত কি অনাছিষ্টি বল ত বাছা!

সাবিত্রী সংক্ষেপে কহিল, আমি বাড়ি ছিলুম না।

বাড়িউলী কহিলেন, এখন ত আছিস, এখন এগুলো মুক্ত করবে কে? আমি? না বাছা, আমার বাড়িতে এ-সব অনাচার চলবে না। যে যার ঘরে বসে যা ইচ্ছে করো, আমি বলতে যাব না, কিন্তু বাইরে বসে এ-সব কাণ্ড হবে না।

আমি যে মাড়িয়ে যাব, ছোঁয়াছুঁয়ি করে জাতজন্ম খোয়াব, তা পারব না। এই বলিয়া তিনি দেওয়াল ঘেঁষিয়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া, কোনও মতে তাঁহার ও-ধারের ঘরে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী আর দাঁড়াইয়া রহিল না। সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া, সমস্ত স্থানটা ধুইয়া-মুছিয়া পুনর্বার স্নান করিয়া আসিল এবং একখানা শুষ্ক বস্ত্রের জন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া বিছানার দিকে চাহিয়াই সে ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা গো? এ যে বিপিনবাবু!

মদ্যপ গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন,— জাগিল না। বাহিরের আর কেহ এ শব্দ শুনিতে পাইল না। সাবিত্রী দুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতে লাগিল, এবং মাথার মধ্যে হঠাৎ মূর্ছার লক্ষণ অনুভব করিয়া দ্বারের আড়ালে কবাটে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ভাব কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তবুও সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিল না। ইতিপূর্বে যে ক্ষোভে, যে দুঃখে তাহার অন্তরটাও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল, যাহার নির্লজ্জ আচরণের লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল, সে লজ্জা সত্য নহে, এ সতীশ নয়, আর একজন, তাহা চোখে দেখিয়াও তাহার সে ক্ষোভ, সে দুঃখ যেন বিন্দুমাত্রও নড়িয়া বসিল না। বরং বুক যেন আরো ভারী, অন্তর যেন আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। শয্যার দিকে সে আর চাহিতেও পারিল না। এইবার তাহার দুই চোখ ভরিয়া বড় বড় অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হায় রে রমণীর ভালবাসা! এত দুঃখে, ইহারই মধ্যে কখন যে সে গোপনে নিঃশব্দে সতীশের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সেবা করিবার, সুস্থ করিবার পিপাসায় আর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কখন যে তাহাকে দেখিবার, কথা কহিবার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সংবাদ বোধ করি তাহার অন্তর্যামীও টের পান নাই। এখন সেই দিককার সমস্ত আশা এই মুহূর্তে মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবামাত্রই তাহার সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন এক দিগ্বিহীন শূন্যতার

মাঝখানে ডুবিয়া গেল। ঠিক এই সময়টাতেই তাহার দ্বারের বাহিরে বেহারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দশ

সতীশের চিত্তের মাঝে একটা বহ্নির শিখা যে অহর্নিশ জ্বলিতেই লাগিল, এ কথা সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া তাহার অতবড় সবল দেহটাও যে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, ইহা সে স্পষ্ট অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বেহারীকে ডাকিয়া বলিল, জিনিসপত্র আর একবার বাঁধতে হবে রে, আজ সন্ধ্যার গাড়িতে বাড়ি যাব।

বেহারী প্রশ্ন করিল, দেশের বাড়িতে, না পশ্চিমের বাড়িতে বাবু?

পশ্চিমের বাড়িতে, বলিয়া সতীশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিবার টাকা তাহার হাতে দিয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

বেহারীর আনন্দ ধরে না। তার বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমের মুখ সে আজও দেখে নাই। সেই পশ্চিমে আজ রওনা হইতে হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সোরগোল করিয়া বাঁধাছাঁদা শুরু করিয়া দিল। পাঁড়ে আসিয়া আহারের আহ্বান করিল। বেহারী হাসিমুখে বলিল, ঠাকুরজী, তুমি খেয়ে নাও গে। আমার ভাত একধারে ঢাকা দিয়ে রেখো, যদি সময় পাই ত তখন দেখা যাবে,—এখন ত আমার মরবার ফুরসত নেই। পাঁড়েজী আগের কথাটা বুঝিয়াই চলিয়া গেল। শেষের কথাগুলো বুঝিতেও পারিল না, পারার প্রয়োজনও বোধ করিল না।

হাতের কাজ সম্পন্ন করিয়া বেহারী বাহিরে চলিয়া গেল। বাজারে যাইতে হইবে। তা ছাড়া ও-বাসার চক্রবর্তীকে এ সংবাদ দেওয়া চাই। সাবিত্রীর চিন্তাকে সে সেদিন ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়াছিল, আজও মনে ঠাঁই দিল না।

আজ সকাল হইতেই সতীশের মাথা ধরিয়াছিল। বেলা বারোটার পরে সে রীতিমত জ্বর লইয়া বাসায় আসিল। বেহারী বাড়ি ছিল না। সে বেলা তিনটা আন্দাজ একরাশ জিনিস মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল।

এই সময়টায় প্রায় চারিদিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া সতীশ ভয় পাইল। পরদিন জ্বর ও যন্ত্রণা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। সন্ধ্যার পরে সতীশ চিন্তিতমুখে বেহারীকে বলিল, জ্বর যদি শীঘ্র না ছাড়ে, তুই একলা পারবিনে ত।

বেহারী ছলছল চোখে সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি বাবু!

সতীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, একবার ওকে—তাই ভাবছি বেহারী, একবার সাবিত্রীকে খবর দিলে হয় না? বোধ করি, ডাক্তার ডাকতেও হবে।

কোন কারণেই সাবিত্রীকে আহ্বান করিতে বেহারীর লেশমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু সে মনের ভাব দমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা, যাচ্ছি।

তখন হইতে সতীশ উন্মুখ হইয়া রহিল। তার জ্বরের যন্ত্রণা যেন আপনিই কমিয়া গেল। ঘণ্টা-দুই পরে বেহারী একা ফিরিয়া আসিলে সতীশ সভয়ে চাহিয়া রহিল।

বেহারী বলিল, সে বাড়ি নেই বাবু।

বাড়ি নেই! তবে ও-বাসায় একবার গেলি না কেন?

বেহারী বলিল, সে-বাসায় ও আর যায় না। তিন-চারদিন ঘরেও যায় না। কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

তার মাসীও জানে না?

না, তাকেও বলে যায়নি।

সতীশ চুপ করিয়া রহিল। বেহারী চোখের জল কোনমতে নিবারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রীর যে ইতিহাস সে তার মাসীর নিকটে শুনিয়া আসিয়াছিল এবং যে কথা সে নিজে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত, কোনও মতেই সে সংবাদ আজ এই রুগ্ন লোকটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পরদিন ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। সতীশ ঔষধের শিশি হাতে লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিল। এই দেখিয়া বেহারী আর একবার অশ্রু নিরোধ করিয়া সাবিত্রীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। মোক্ষদা রাঁধিতেছিল, বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, আজকেও আসেনি গা?

মোক্ষদা হাতের খুন্তিটা উদ্যত করিয়া চোখমুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, না বাছা, না।

কতবার তোমাকে বলব, সে আর আসবে না। যখন অসময় ছিল, তখন ছিল মাসী। এখন যে তার সুসময়।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বেহারী মৃদুকণ্ঠে জানাইল, আজও সাবিত্রী ফিরিয়া আসে নাই।

দিন-দুই পরে ঔষধ না খাইয়াও সতীশের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে ভাত খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বেহারীকে ডাকিয়া বলিল, আর নয়, আজই রওনা হওয়া চাই।

সেই দিনই সতীশ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এগার

উপেন্দ্র সতীশের শীর্ণ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভায়ার কি এই ডাক্তারি শেখার নমুনা নাকি?

সতীশ হাসিয়া কহিল, হলো না উপীনদা।

উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হলো না কি রে?

সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, ডাক্তারি আমার সহ্য হল না উপীনদা।

উপেন্দ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সতীশের উন্নত দেহটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ভালই হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে অনর্থক কতকগুলো জীবহত্যা করতিস, তার পাপ থেকে ভগবান তোকে রক্ষা করেছেন।

মাস-খানেক পরে আর একদিন উপেন্দ্র সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যেতে হবে সতীশ।

সতীশ হাতজোড় করিয়া বলিল, ঐ হুকুমটি করো না উপীনদা। কলকাতা বেশ শহর, চমৎকার দেশ, সব ভাল, কিন্তু আমাকে যেতে বলো না।

কথাটা সতীশ তামাশার ছলেই বলিতে গেল বটে, কিন্তু সে ছলনা তাহার চাপা ব্যথাটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার ছদ্মহাসি বেদনার বিকৃতিতে এমনই রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল যে, উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, সতীশ কি যেন সেখানে করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাঁহার কাছে গোপন করিতেছে। ক্ষণেক পরে বলিলেন, তবে থাক সতীশ। তোর শরীরও ভাল নয়, আমি একাই যাই।

উপেন্দ্রর মনের ভাব অনুমান করিয়া সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কবে যাবে উপীনদা?

আজ।

আজই? আচ্ছা চলো, আমিও যাই। বলিয়া হঠাৎ সম্মত হইয়া সতীশ ঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যেই কলিকাতার জন্যই অধীর হইয়া উঠিল। বেহারীকে বলিল, আর একবার তল্পী বেঁধে ফ্যাল বেহারী, কলকাতায় যেতে হবে।

বেহারী চিন্তিত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, কবে বাবু?

সতীশ সহাস্যে বলিল, কবে কি রে! আজই রাত্রের ট্রেনে।

আচ্ছা, বলিয়া বেহারী মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ তাহার অপ্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, বেহারীর এখানে ত কাজকর্ম নেই, তাই ওখানে খাটুনির ভয়ে যেতে চায় না। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সতীশ বৃদ্ধের মনের কথা একেবারেই বুঝে নাই।

ইতিপূর্বে একদিন সতীশ কথায় কথায় বেহারীকে বলিয়াছিল, আচ্ছা বেহারী, এতদিনে সাবিত্রী ত নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে, কিন্তু তখন কোথায় গিয়েছিল বলতে পারিস?

বেহারী সংক্ষেপে বলিয়াছিল, না বাবু! বলিলে ত সে অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু একদিন সাবিত্রীর মুখের উপর সে নাকি তাহার পুরুষত্বের অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছিল, কোন উপলক্ষেই সেইটুকু গর্বকে সে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না।

যেদিন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সতীশ নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুক্তকরে আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়াছিল, ভগবান, যা কর তুমি ভালর জন্যই কর! সেদিন সৃষ্টিকর্তার কোন্ বিশেষ কর্মটা স্মরণ করিয়া যে সে এতবড় ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি সে বলিতে পারিত না। অথচ কতবড় সঙ্কটের মুখ হইতে সে যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে, কতবড় দুশ্ছেদ্য জালের ফাঁস কত সহজে ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পাইয়াছে ইহা সে নিশ্চিত জানিত, এবং এ সৌভাগ্যকে সে কৃতজ্ঞতার সহিতই

গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অন্তরশায়ী অবোধ মন তাহার সেদিকে দৃক্‌ পাতমাত্র করে নাই, উপুড় হইয়া পড়িয়া নিশিদিন একভাবেই কাঁদিয়া কাটাইতেছিল। তবু চেষ্টা করিয়া সে পূর্বের মতই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব, থিয়েটার, গান-বাজনার আখড়া প্রভৃতিতে মিশিতেছিল, কিন্তু কোনক্রমেই পূর্বের মত আর মিলিতে পারে নাই। বরং যে লোক ঘরের গৃহিণীর সহিত কলহ করিয়া বাহিরের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে আসে, তাহারই মত সে ছিদ্রান্বেষী ও অসহিষ্ণু হইয়া নির্বিচারে সমস্তই দংশন করিয়া ফিরিতেছিল। এমনি করিয়া দিনযাপনের মাঝখানে হঠাৎ আজ কলিকাতা যাইবার আহ্বান শুনিয়াই তাহার বিদ্রোহী গৃহলক্ষ্মী ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাত্রা করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সেই রাত্রেই কলিকাতার উদ্দেশে উপেন্দ্র ও সতীশ মেল-গাড়ির একখানা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় চড়িয়া বসিলেন।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে উপেন্দ্র জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু সতীশ জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

মেল-ট্রেন সব স্টেশনে থামে না। প্রান্তর, নদ-নদী, গ্রাম, পথ অতিক্রম করিয়া হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সেই দ্রুত ধাবনের পরিমাণ করিয়া কদাচিৎ নিঃসঙ্গ অদূরবর্তী বনস্পতি নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। দিগন্তে বৃক্ষরাজি ও বাঁশঝাড় অন্ধকার করিয়া আছে এবং তাহারই নিম্নে নদীর বক্রাংশে শুভ্র জলরেখা জানালার নীল কাচের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। বাহিরে বৃক্ষ, গুল্ম, মাঠ, লাইনের পাশে উলুবন ও শুষ্ক জল-খাদ সর্বত্র ম্লান জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইয়া আছে। সতীশের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এই পথে কতবার সে আসিয়াছে, গিয়াছে, এই নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি কতবার সে এমনি ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখিয়া গেছে, কিন্তু কোনদিন এমনভাবে তাহার চোখে ধরা দেয়

নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্তই বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, মৃত। কেহই কাহারও জন্য ব্যাকুল নয়, কেহই কাহারও মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া নাই। সবাই স্থির, সবাই উদ্বেগশূন্য, সবাই আপনা-আপনি সম্পূর্ণ। এই নির্বিকার, উদাসীন ধরিত্রীর পানে চাহিয়া থাকিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে চোখ মুছিয়া সরিয়া আসিয়া বেঞ্চের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া পড়িয়া, তোরঙ্গ খুলিয়া একটা সানাই বাহির করিয়া উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, গাড়ির শব্দে যদি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত না হয় ত বাঁশীর শব্দেও হবে না। আমি ত ঘুমুতে পারিনে, বলিয়া সে আর একবার জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া বসিল এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উপেন্দ্রর সাড়া পাওয়া গেল না। ভগবান সতীশকে গাহিবার গলা এবং বাজাইবার হাত দিয়াছিলেন। এদিকে তিনি কৃপণতা করেন নাই। শিশুকাল হইতে শুরু করিয়া এই বিদ্যাটাই সে শিক্ষা করিয়াছিল এবং শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তেমনি করিয়াই শিখিয়াছিল। সতীশ বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সেই শুদ্ধসুন্দর অনির্বচনীয় সঙ্গীত-সৃষ্টি বুঝিবার লোক কেহ ছিল না—শুধু বাহিরে আকাশের খণ্ড চন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল এবং মাটির উপর সুপ্ত জ্যোৎস্নার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে গাড়ির গতি যখন মন্দ হইয়া আসিল এবং বুঝা গেল, স্টেশন নিকটে আসিয়াছে, তখন সে বাঁশী নামাইয়া রাখিল।

উপেন্দ্র হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, নাঃ, যদি শিখতে হয় ত সানাই বাজাতে শিখব। সেদিন তোর সেতার শুনে মিথ্যে একটা সেতার কিনে ফেললাম। টাকাগুলোই মাটি।

সতীশ হাসিয়া বলিল, রক্ষে কর উপীনদা, তাই বলে যেন সানাই কিনো না। ঘরে বসে ও যন্ত্রটা শেখবার চেষ্টা করলে আর পাড়ায় লোক টিকতে পারবে না।

উপেন্দ্র লেশমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন, না, শিখি ত তোরই ঘরে বসে শিখব। বলিতে দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

পরদিন অনেক বেলায় গাড়ি হাওড়ায় থামিলে উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কোথায় যাবি রে?

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ও আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে।

তোর যাবার জায়গা নেই?

বেশ যা হোক তুমি!

এ সম্বন্ধে আর কোন কথাও হইল না।

স্টেশনে নামিতেই একজন বিলাতী পোশাক-পরা বাঙ্গালী সাহেব উপেন্দ্রর হাত ধরিলেন। ইনি উপেন্দ্রর বাল্যবন্ধু জ্যোতিষ রায়, ব্যারিস্টার। 'তার' পাইয়া লইতে আসিয়াছেন। বাহিরে তাঁহার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। অল্পস্বল্প জিনিসপত্র যাহা সঙ্গে ছিল, কুলি গাড়ির উপরে তুলিয়া দিলে তিনজনে ভিতরে উঠিয়া বসিলেন। বেহারী কোচ-বাক্সে চড়িয়া বসিল এবং কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। অনেক পরে, অনেক রাস্তা-গলি পার হইয়া বড় বড় থাম দেওয়া প্রকাণ্ড একটা বাটীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ি থামিল। তিনজনে নামিয়া গেলেন।

বারো

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। উপেন্দ্র ও সতীশ পাথুরেঘাটায় একটা অতি সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উপেন্দ্র কহিলেন, এই গলিটাই নিশ্চয় বোধ হচ্চে।

সতীশ সন্দেহ প্রকাশ করিল, এর ভেতরে থাকতে পারে না, এটা কখনও নয়।

ভাঙ্গা দেওয়ালের গায়ে টিন মারা আছে, খুব সম্ভব ইহাতে একদিন গলির নাম লেখা ছিল, এখন আর পড়া যায় না। সতীশ বলিল, ভাল করে না জেনে ঢোকা যায় না, এটা পাতাল-প্রবেশের সুড়ঙ্গও হতে পারে!

উপেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তুই তবে প্রহরী হয়ে থাক, আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসি।

সতীশ প্রথমে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, পরে উপেন্দ্রর পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিল, উপীনদা, আমাদের মত বম্বেটে লোকেরাও এ-সব স্থানে সন্ধ্যের পরে আসতে সাহস করে না, তোমার খুব সাহস ত!

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বোম্বেটের সাহস কি ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী সতীশ? দুষ্কর্ম করতে পারাকেই সাহস বলে না।

সতীশ সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া অত্যন্ত সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিল। পায়ের নীচেই দুর্গন্ধ-পঙ্কিল খোলা নর্দমা, ক্ষীণদৃষ্টি সতীশের তাহাতে পড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল। একস্থানে ক্ষুদ্র গলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সতীশ পিছন হইতে উপেন্দ্রর জামার খুঁট টানিয়া ধরিল—উপীনদা, করচ কি, এই রাত্রে মারা পড়বে নাকি?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আমার এতক্ষণে ঠিক মনে পড়েচে। আর একটা বাড়ির পরেই তেরো নম্বরের বাড়ি। প্রায় বছর-আষ্টেক আগে একদিন মাত্র এখানে এসেছিলাম, সেইজন্যেই প্রথমে চিনতে পারিনি। এখন চিনেছি, এই পথই বটে।

সতীশ বিশ্বাস করিল না। বলিল, পথ বটে, কিন্তু তোমার আমার জন্যে নয়। যাদের জন্যে বিশেষ করে এই পথের সৃষ্টি, তাদের কারো সঙ্গে গা ঠেকাঠেকি হয়ে গেলে, এ রাত্রে স্নান করে মরতে হবে, এইবেলা ফিরে যাই চল।

উপেন্দ্র জবাব না দিয়া সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং আরো একটু আগে আসিয়া একটা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুই সিগারেট খাস, তোর পকেটে দেশলাই আছে; একবার জ্বেলে দেখ দেখি, এটা ক'নম্বরের বাড়ি।

সতীশ আলো জ্বালিয়া বেশ করিয়া বাড়ির নম্বর পরীক্ষা করিয়া বলিল, ভাল পড়া গেল না, কিন্তু চৌকাঠের গায়ে খড়ি দিয়ে ১৩ নম্বর লেখা আছে। বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি আমি, বাড়ির নম্বর তেরোই হোক আর তিপ্পান্নই হোক, এখানে তোমার প্রয়োজনটা কি হতে পারে?

উপেন্দ্র উত্তর না দিয়া ডাকিতে লাগিলেন, হারানদা! ও হারানদা!

উপরে, নীচে, কাছে, দূরে সর্বত্র অন্ধকার, শব্দমাত্রই নাই। সতীশ ভীত হইয়া উঠিল, উপেন্দ্র আবার ডাকিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণে উপরের জানালা ঈষৎ মুক্ত করিয়া স্ত্রীকণ্ঠে সাড়া আসিল, কে?

উপেন্দ্র বলিলেন, দরজা খুলে দিতে বলুন। হারানদা কোথায়?

যাচ্চি, একটু দাঁড়ান।

ক্ষণপরেই দরজা খোলার শব্দের সহিত ক্ষীণ আলোর রেখা পথের উপরে আসিয়া পড়িল। উপেন্দ্র দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্নরচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটিমাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেন্দ্রর গা ঠেলিয়া দিল। উপেন্দ্র সচকিত ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, হারানদা কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বলিল, তিনি উপরে আছেন। উঠতে হাঁটতে পারেন না। মা-ও আজ সাত-আটদিন শয্যাগত, বাড়ির মধ্যে শুধু আমি ভাল আছি। আপনি উপেন্দ্রবাবু ত? আমরা আশা করেছিলুম আপনি কাল আসবেন, তাই প্রস্তুত ছিলাম না। রান্নাঘরে থাকলে এদিকের সাড়াশব্দ শোনা যায় না, অনেক ডাকাডাকি করতে হয়। ওপরে আসুন, এখানে বড় ঠাণ্ডা,—বলিয়াই পথ দেখাইয়া উপরে যাইবার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। দুই-তিন ধাপ উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া হাতের আলোটা নীচু করিয়া বলিল, সাবধানে উঠিবেন, সিঁড়ির ইট অনেকগুলো খসে গেছে।

ইহার আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা চাহিবামাত্রই উভয়ে টের পাইলেন এবং সতর্ক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোঠা-বাড়ি। পূর্বে উপরতলায় চার-পাঁচটি ঘর ছিল, তাহার গোটা-দুই একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং একটা আগামী বর্ষায় পড়িবার জন্য ঠিক হইয়া আছে। বাকী তিনটার মধ্যে সুমুখের ঘরটায় তিনজনেই প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই বোঝা গেল, অত্যন্ত অনধিকার-প্রবেশ হইয়াছে। মূষিকের দল তখন জীর্ণ ও পুরাতন অব্যবহার্য শয্যা ও উপাধান হইতে তুলা বাহির করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, অসময়ে আলোক ও জনসমাগমে ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরময় ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ার, ভাঙ্গা কাঠের তোরঙ্গ, ভাঙ্গা টিন, খালি শিশি-বোতল এবং আরও

কত কি প্রাচীন দিনের গৃহসজ্জার ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারি একধারে একটা তক্তপোশ পাতা। ছেঁড়া গদি, ছেঁড়া তোশক, ছেঁড়া বালিশ প্রভৃতি গাদা করিয়া জোর করিয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া তাহারই একাংশে একটা মাদুর পাতা রহিয়াছে। এটা অভ্যাগতদের জন্য।

স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর কেরোসিনের ডিবাটা রাখিয়া দিয়া কহিল, একটু অপেক্ষা করুন, আমি সংবাদ দিই। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্রই সতীশ জুতাসুদ্ধ সেই অভ্যাগতের আসনটির উপর লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, ও কি ও?

সতীশ ফিসফিস করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল, আগে প্রাণ রক্ষে হোক, তার পরে ভদ্রতা রক্ষে হবে; দেখচ না, পায়ের কাছে আলো দেখে ঘরের সমস্ত সাপ-খোপ ছুটে আসচে।

সতীশ যেমন করিয়া ভয় দেখাইল, তাহাতে বিচার-বিতর্কের আর অবসর রহিল না। উপেন্দ্রও লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তক্তপোশের সেই সঙ্কীর্ণ জায়গাটিতে স্থানাভাবে উভয়ে যখন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিয়া সেই সময়ে কবাটের সুমুখে দাঁড়াইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইঁহারা যে ভয় পাইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বলিল, এটি আমার শ্বশুরের ভিটা, আপনারা অমর্যাদা করছেন!

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন এবং সতীশের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, এমনি ভয় দেখিয়ে দিলে,— এমনি করে উঠল—

সতীশ নামিল না। কিন্তু বিনয় করিয়া বলিল, ভয় কি সাধে দেখাই উপীনদা। আমার বিদ্যে চাণক্য শ্লোকের বেশী নয় জানি, কিন্তু এটুকু শিখেচি যে, আত্মরক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি, আত্মরক্ষার্থে একটু নিরাপদ জায়গা বেছে নেওয়া কি অন্যায় কাজ হয়েছে? আপনার শ্বশুরের ভিটার অসম্মান করা আমাদের সাধ্য নয়, বরং যথেষ্ট সম্মাননার সঙ্গেই আপনার আশ্রিত প্রজাপুঞ্জের পথ ছেড়ে দিয়ে এইটুকু জায়গায় দুজনে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। ইহার পরিহাস যে এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীটিকে ব্যথিত করে নাই, বরং ইহার ভিতর যে সরলতা ও সমবেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল, এই তরুণী অতি সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের 'পরে ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাইয়া উপেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত আরাম বোধ করিলেন। তাহার মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, প্রজাপুঞ্জ আপনার সুমুখে কখনই ওর উপরে অত্যাচার করতে সাহস করবে না। এখন ওই লোকটি বোধ করি নেমে আসতে পারে।

নিশ্চয়, বলিয়া কেরোসিনের ডিবাটা হাতে তুলিয়া লইয়া বধূ সতীশের দিকে চাহিয়া ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া বলিল, এখন নির্ভয়ে রাজদর্শনে চলুন।

এইটুকু হাস্য-পরিহাসেই অপরিচিতের দূরত্বটা যেন একেবারেই কমিয়া গেল, এবং তিনজনেই প্রফুল্লমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজ-দর্শনেচ্ছু উপেন্দ্র ও সতীশ হাসিমুখে আর একটি ঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ক্রুদ্ধ গুরুমশায়ের অতর্কিত চড় খাইয়া হাস্য-নিরত শিশু-ছাত্রের মুখের ভাবটা যেমন করিয়া বদলায়, এই দুজনের মুখের হাসি তেমনি করিয়া এক-নিমেষে কালি হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে লাঞ্ছিত ভাবটা কাটিয়া গেলে উপেন্দ্র অদূরবর্তী শয্যার নিকটে গিয়া ডাকিলেন,—হারানদা!

হারান নির্জীবের মত পড়িয়া ছিলেন, অস্ফুটে বলিলেন, এস ভাই, এস। আর উঠতে বসতে পারিনে, তোমাকেও ক্লেশ দিলুম। এইটুকু বলিয়াই তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র ধপ করিয়া বিছানার একদিকে বসিয়া পড়িলেন। দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া গেল এবং সমস্ত বক্ষপঞ্জর দুলাইয়া দিয়া একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কথা কহিতে সাহস করিলেন না—দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ওদিকে সতীশচন্দ্র মস্ত একটা কাঠের সিন্দুকের উপর শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল।

মলিন ও শতচ্ছিন্ন শয্যার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, ঘরে অন্য আলো নাই, এইটুকু আলো রক্তশূন্য বিবর্ণ শীতল মুখের ’পরে লইয়া হারানের জীবন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া আছে। সূর্যের উত্তাপ ও আকাশের বায়ু হইতে চিরদিন বিচ্ছিন্ন এই গৃহের অস্থিমজ্জায় যে জীর্ণতা ও অন্ধকার লালিত ও পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এই কন্‌কনে শীতের রাত্রে অত্যল্প আলোকে, কুষ্ঠরোগের মত তাহা সমস্ত দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া পড়িয়াছে। এই দিবানিশি অবরুদ্ধ গৃহের রুদ্ধ দুষ্ট বায়ু আত্মঘাতীর মুখোদ্গত বিষাক্ত ফেনের মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া গৃহবাসীর কণ্ঠনালী যেন প্রতিমুহূর্তে রুদ্ধ করিয়া আনিতেছে। দ্বারে মৃত্যুদূতের প্রহরা পড়িয়াছে। সমস্ত দিকে চাহিয়া সতীশ বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে, এখানে মানুষের জীবন থাকে কি করিয়া? অনতি দূরে বধূটি দাঁড়াইয়া ছিল, সেদিকে একবার চাহিয়াই সে আরো যেন ভয় পাইয়া গেল। কোথায় গেল ঐ অতুল রূপ! কোথায় গেল ঐ হাসি; তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন কোন্ এক প্রেতলোকের পিশাচ উঠিয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বামী যার এই, সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোঁপা বাঁধে, টিপ পরে! একমুহূর্তের জন্য তাহার সমস্ত নারীজাতির উপরেই ঘৃণা জন্মিয়া গেল।

এমন সময়ে হারান ডাকিলেন, কিরণ, উপীন এসেছে মা জানেন?

বধূ কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তার বলে গেছেন ঘুমুলে তাঁকে যেন জাগানো না হয়।

হারান মুখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, চুলোয় যাক গে ডাক্তার, তুমি যাও, বলো গে তাঁকে।

উপেন্দ্র নিকটে বসিয়া সমস্তই শুনিতে পাইতেছিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আজ রাত্রে জানিয়ে প্রয়োজন নেই হারানদা। কাল সকালে জানালেই হবে।

উপেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া হারান অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া গিয়াছে। তাই, এই নিরপরাধিনী সেবাপরায়ণা বধূটির অকারণ তিরস্কারে একটা ব্যথা অনুভব করিয়া একটুখানি সান্ত্বনার ইঙ্গিত করিতে একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখা গেল না। কিরণময়ীর আনত মুখে দীপের আলোক পড়ে নাই।

মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ বধূ দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং হারান পূর্বের মত হাঁপাইতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ সতীশের কাছে আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনতিকাল পরেই হারান হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া কাছে আসিতে ইশারা করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাত-আট বছর পরে দেখা, এর মধ্যে একবারও কি তোমার এখানে আসা হয়নি?

ইহার মধ্যে অনেকবারই উপেন্দ্রকে এদিকে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। বলিলেন, অসুখটা কি হারানদা?

হারান কহিলেন, জ্বর, কাসি ইত্যাদি। এখন ও-প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নেই, সমস্তই শেষ হয়েছে।

ওধারে সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট সতীশ মনে মনে মাথা নাড়িল।

হারান পুনশ্চ বলিলেন, আমারও তোমার কথা মনে পড়েনি, সময়ে মনে পড়লে হয়ত কাজ হতো।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিজেই বলিলেন, কাজ আর কি হতো, তা নয়, থাক গে ও-সব কথা, একটা কাজ করো ভাই, আমার হাজার দুই-টাকার লাইফ-ইন্‌সিওর আছে, আর আছে এই ভাঙ্গা বাড়িটা, তুমি উকীল, একটা লেখাপড়া করে দাও, যেন সব জিনিসের উপর তোমারি পুরো হাত থাকে। তার পরে রইলে তুমি, আর আমার বুড়ো মা।

উপেন্দ্র বলিলেন, আর তোমার স্ত্রী?

আমার স্ত্রী কিরণ? হাঁ, ও ত আছেই। ওর বাপ-মা কেউ বেঁচে নেই, ওকেও দেখো।

উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চোখে মুমূর্ষুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সতীশ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, উপীনদা, রাত্রি দশটা বেজে গেছে, ওখানে ওঁরা বোধ হয় ব্যস্ত হচ্চেন।

হারান চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এটি কে উপীন?

আমার বন্ধু, একসঙ্গেই কলকাতায় এসেছি। এখন তবে আসি হারানদা, কাল সকালেই আবার আসব।

না, কাল নয়, একেবারে কাগজ তৈরী করে পরশু এসো। যা-কিছু আমার আছে, আর যা-কিছু আমার বলবার আছে, সেইদিনেই বলে দেব, কোথায় আছ এখানে?

শহরের একধারে একজন বন্ধুর ওখানে উঠেছি।

যাইতে উদ্যত হইলে হারান ডাকিয়া বলিলেন, কিরণ?

উপেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক হারানদা! সতীশের পকেটে দেশলাই আছে, স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারব। তিনি বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন।

তদুত্তরে হারান কি যে বলিলেন, বোঝা গেল না।

সতীশ কবাট খুলিতেই বোধ হইল কে যেন দ্রুতপদে সরিয়া গেল। সে সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সতীশ?

কিছু না—তুমি এস, বলিয়া সে উপেন্দ্রর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নিবিড় অন্ধকার! একে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে মেঘ করিয়া আছে, তাহার উপরে চতুষ্পার্শ্বের উঁচু বাড়িগুলো সেই অন্ধকারকে যেন ঠেলিয়া আনিয়া নীচের অপ্রশস্ত উঠানটির উপরে এই ভাঙ্গা খোলা বারান্দার ভিতরে একেবারে জমাট বাঁধাইয়া দিয়াছে। দু'জনে আন্দাজ করিয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেই দেখিলেন, নীচে সেই কেরোসিনের ডিবাটা রাখিয়া কিরণময়ী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। যাইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আলো দেখাচ্ছি, সাবধানে নেমে আসুন। আপনাদের জন্যই বসে আছি।

এই অন্ধকার শীতল রাত্রে, এই দুরন্ত হিমের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভিজা মাটির উপর একাকিনী বধূকে তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং তাহার আসন্ন বৈধব্যের কথা মুহূর্তে স্মরণ করিয়া উপেন্দ্রর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সদরের কবাট তখনও বন্ধ করা হয় নাই, নীচে নামিয়াই সতীশ একেবারে গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু উপেন্দ্র পিছন হইতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণময়ী তাহার সকরুণ তীব্র চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপরে পাতিয়া একটা বিশেষ ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্র হতবুদ্ধির মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু, আপনি আমাদের কে?

এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর উপেন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না। সে পুনরায় বুঝাইয়া বলিল, আপনি আমার স্বামীর কি কোন আত্মীয়? এতদিন এ বাড়িতে এসেছি, কিন্তু কোনদিন আপনার নাম ওঁর কাছেও শুনিনি, মার কাছেও শুনিনি। শুধু যেদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয়, সেদিন শুনি—তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

বাহির হইতে সতীশ ডাকিল, উপীনদা, এস না!

উপেন্দ্র বলিলেন, না, আত্মীয় নয়—তবে বিশেষ বন্ধু। বাবা যখন নওয়াখালিতে ছিলেন, হারানদার পিতাও সরকারী স্কুলে মাস্টারি করতেন, আমাকেও বাড়িতে পড়াতেন। হারানদা আর আমি অনেকদিন একসঙ্গে পড়ি।

কিরণময়ী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ওঃ এই! এর জন্যে লেখাপড়া করা! আচ্ছা উপীনবাবু, আপনি সমস্তই নিজের নামে লিখে নেবেন?

বিলম্ব দেখিয়া সতীশ মুখ বাড়াইয়াছিল, সে-ই চট করিয়া জবাব দিয়া ফেলিল, সেই রকম ত স্থির হয়েছে।

হারানের ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ে, কে যে দ্রুতপদে বাহিরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহা সে পূর্বেই বুঝিয়াছিল।

বধূ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে, আপনিও আছেন। বেশ কথা! ভাল কথা! এতদিন এত কষ্ট করেও যা করে হোক দু'সন্ধ্যা দু'মুঠো জুটেছিল—এখন পথে দাঁড়াতে হবে। তাই হোক, আপনারাই সমস্ত ভাগ করে নিন।

উপেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সতীশ জবাব দিল, যার জিনিস সে যদি দিয়ে যায়, কারো কিছু বলবার নেই।

কিরণময়ীর দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আমার আছে। মরণকালে মতিচ্ছন্ন হয়, আমার স্বামীর তাই হয়েছে। কিন্তু আপনারা লিখে নেবার কে?

সতীশ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, তা জানিনে, কিন্তু হারানবাবুর আজো যে বুদ্ধি আছে, আমার অন্তর্যামী এ কথায় সায় দিচ্ছেন।

কিরণময়ী অত্যন্ত বিদ্রূপের স্বরে জবাব দিল, চমৎকার যুক্তি! লোকে কথায় বলে—যাক লোকের কথা। উপেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করে জানব, শেষকালে ইনি পথে বসাবেন না? কেমন করে বিশ্বাস করব, ইনি ফাঁকি দেবেন না?

এতবড় আঘাত হঠাৎ উপেন্দ্রর যেন অসহ্য বোধ হইল; কি একটা বলিতেও গেল, কিন্তু না বলিয়া চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইতে লাগিল।

সতীশ মৃদুস্বরে বলিল, বৌঠাকরুন, জানবার আবশ্যক আপনার নেই।

কিরণময়ীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। এই বিদ্রূপাত্মক আত্মীয় সম্বোধনের স্পর্ধায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, বৌঠাকরুন! আবশ্যক নেই!

সতীশ বলিল, না। আপনি নিজের অধিকার যদি নিজে নষ্ট না করতেন, হারানবাবুর এ সতর্কতার আবশ্যক ছিল না। এত রাত্রে রাগারাগি করবেন না—একটু বুঝে দেখুন দেখি।

তীব্র কার্বলিকের গন্ধে সাপ যেমন করিয়া তাহার উদ্যত ফণা মুহূর্তে সংবরণ করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করে, এই নিরুপমা, এই লীলাকৌশলময়ী তেজস্বিনী যুবতী চক্ষের পলকে তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, আমার কথা উনি কি বলেচেন শুনি?

উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই গর্বিতা নারীর সন্দিগ্ধ তিরস্কার তাঁহাকে তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিলেও তাঁহার উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-অন্তঃকরণ সতীশের এই গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে যে অন্যায় উত্তেজনার দ্বারা কি একটা গুপ্ত রহস্য টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সতীশকে বাধা দিয়া কিরণময়ীকে

বলিলেন, কেন আপনি সতীশের পাগলামিতে কান দিয়ে নিজেকে উদ্বিগ্ন করচেন! স্বামীর বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই—আপনি নিশ্চিন্ত হোন। তবে বোধ করি, আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে মনে করেই, হারানদা একটা লেখাপড়ার কথা তুলেচেন। কিন্তু আপনার অমতে ত কোনমতেই হতে পারবে না। রাত্রি অনেক হয়েছে, কবাট বন্ধ করে দিন। চল্ সতীশ, আর দেরী করিস নে। সতীশকে ঠেলিয়া দিয়া গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কাল-পরশু আবার দেখা হবে—নমস্কার।

তের

সেই জনশূন্য গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুইজনে একটা ভাড়াটে-গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া রাস্তার মন্দীভূত জনস্রোতের পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। উপেন্দ্র ব্যথিত-চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কালই বাড়ি ফিরিয়া যাইব। ভাল হোক, মন্দ হোক, আমার হাত দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ফিরিবার পূর্বে এইটুকু দেখিয়া যাইব যে হারানদার চিকিৎসা হইতেছে—তার পরে? তার পরে আর কিছুই নয়—আট বৎসর যে লোক মনের বাহিরে পড়িয়াছিল, সে বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে। এই বলিয়া দেহ-লগ্ন কীট-পতঙ্গের ন্যায় এই বিরক্তিকর চিন্তাকে গা-ঝাড়া দিয়া সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উপেন্দ্র গাড়ির মধ্যেই একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ, একটা চুরুট দে ত রে, ভারী ঠাণ্ডা।

সতীশ পকেট হইতে চুরুট প্রভৃতি বাহির করিয়া হাতে দিয়া তেমনি বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

উপেন্দ্র চুরুট ধরাইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ ধূমোদ্গার করিতে করিতে সতীশকে শুনাইয়া বলিলেন, ভিতরের অন্ধকার যেন এমনি করে ধুঁয়োর মত বার হয়ে যায়।

সতীশ সায় দিল না।

ঝড়্-ঝড়্ করিয়া ভাড়াটে-গাড়ি পরিচিত অপরিচিত রাস্তা-গলি ঘর- বাড়ি দোকান- বাজার পার হইয়া চলিতে লাগিল, চুরুট পুড়িয়া গেল, তাহার ধুঁয়া কোথায় আকাশে মিলাইয়া গেল, তথাপি দুইজনে রাস্তার দুইধারে তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। উপেন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, সতীশ নিশ্চয়ই এই সমস্ত

আন্দোলন করিতেছে এবং যা হোক একটা কিছু স্থির করিতেছে, না হইলে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহে; এবং কি যে সম্ভবতঃ তাহার আলোচ্য বিষয় সেই অনুমান করিতে গিয়া উপেন্দ্রের আগাগোড়া সমস্তই স্মরণ হইয়া গেল। গোপনে শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিলেন, কি কাণ্ডই ঘটিয়াছে! এবং যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যতই শোচনীয় হউক না কেন, সমস্তরই একটা সঙ্গত হেতু তিনি ইতিমধ্যে নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সতীশ যে কি দেখিয়া এই অসহায়া অপরিচিতার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেইটাই কোনমতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাড়ির বধূ যে নিজের উদ্যত বিপদের আশঙ্কা হইতে শুদ্ধমাত্র আত্মরক্ষার জন্যও দুটা রূঢ় কথা বলিতে পারে, এমন সোজা কথাটাও যে সতীশ বুঝিতে পারে নাই, এইটাই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সতীশ লেখাপড়া না করুক, নির্বোধ নহে। উপেন্দ্র ইহা জানিতেন বলিয়াই এত বেশী পীড়া অনুভব করিলেন। মুমূর্ষু হারানের উইলের প্রস্তাবে একটা বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই উপেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কথা ভাবিয়াছিলেন। বাল্যসখার জীবন্মৃত দেহটার পাশে বসিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই অনাথা রমণী দুটির যাবজ্জীবন ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। একটা স্বাস্থ্যকর তীর্থে একটি ছোট রকমের বাড়ি কিনিয়া দিবেন। তাহা গাছপালা দিয়া, সৎ ও ভদ্র প্রতিবেশী দিয়া, শান্ত অথচ সুদৃঢ়ভাবে ঘেরা থাকিবে। গৃহপালিত গো-বৎসের সেবা করিয়া, অতিথি-ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া বার-ব্রত আচরণ করিয়া এই দুটি নারীর দিনগুলি যেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়া যাইবে, ইহার খসড়া-চিত্রটাই কল্পনায় মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। এই ছবিটির একধারে গাছপালার আড়ালে, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পিছনে নিজের একটুখানি স্থান বোধ করি আপন অজ্ঞাতসারেই চিহ্নিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমনি সময়ে কিরণময়ীর কদর্য অভিযোগ, সংশয়ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ তপ্তশ্বাস ঘূর্ণা ঝড়ের মত সে ছবির চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিল। উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ কি ভাবছিস রে!

সতীশ বাহির হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া উপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাবচি কি জানো উপীনদা, ছেলেবেলায় একটা বাংলা নভেল পড়েছিলাম—সেই কথাই ভাবছি!

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, কি নভেল?

সতীশ বলিল, নাম মনে নেই। গ্রন্থকারের নামটাও ঠিক মনে পড়ে না—কিন্তু খুব বড়লোক। কিন্তু গল্পটা স্পষ্ট মনে আছে—এমনি সুন্দর।

উপেন্দ্র কৌতূহলী হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সতীশ অনুযোগের স্বরে বলিল, চিরকাল ইংরেজী পড়েই দিন কাটালে উপীনদা, কোনও দিন বাংলার দিকে চাইলে না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন সব বই আছে যে, একবার পড়লে জ্ঞান জন্মে যায়। এই বলিয়া সে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আগে গল্পটা বল্ শুনি, তার পরে দেখা যাবে, কতটা জ্ঞান জন্মায়।

সতীশ হাসিল। রাগ করবে না বল?

না—তুই বল্।

সতীশ বলিল, অতি সুন্দর গল্প। বইতে লেখা আছে, একজন বড়লোক জমিদার নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মেঘ করিয়া ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। তিনি ত ভয়ে ডাঙায় উঠিয়া পড়িলেন। সুমুখের একটা মস্তবড় ভাঙ্গা-বাড়ি, বৃষ্টির ভয়ে তাহাতেই ঢুকিলেন, বাড়িটার ঘরে ঘরে অন্ধকার—জনমনুষ্য নাই। সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে উপরের একটা ঘরে দেখিলেন, মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ছেঁড়া-বিছানায় একটা লোক মর-মর হইয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার পদ্মপলাশাক্ষী রূপসী স্ত্রী লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। সে রাত্রে সে কি-একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। আচ্ছা উপীনদা, তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস করো?

উপেন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, না। তার পরে?

সতীশ বলিল, তার পরে সেই রাত্রেই লোকটা মারা গেল। জমিদারবাবু সেই পদ্মপলাশাক্ষী বিধবাকে ঘরে আনিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। চতুর্দিকে ছি ছি পড়িয়া গেল। আর সেই দুঃখে তাঁর প্রথম স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

পুনঃ পুনঃ পদ্মপলাশাক্ষীর উল্লেখে উপেন্দ্র বুঝিলেন, সতীশ বিষবৃক্ষের পঙ্কোদ্ধার করিতেছে এবং সতীশের এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয়ে অন্য সময়ে বোধ করি খুব হাসিতেন, কিন্তু এখন হাসি আসিল না। এই এলোমেলো আখ্যানের ভিতর হইতে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত তীরের মত আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। এ ত সতীশের স্মৃতি নয়—এ তাহার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা যে কি, এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া বিষবৃক্ষের ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই কথাটা মনে করিয়া উপেন্দ্র গভীর লজ্জায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিলেন।

সতীশ অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্রর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। সতীশ ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া পুনরায় কহিল, খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না উপীনদা।

উপেন্দ্র উত্তর দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বাংলা নভেলের কথা থাক। কিন্তু কি রকম উপদেশ দিতে চাও শুনি?

সতীশ হাসিয়া বলিল, এই দেখ উপীনদা, তুমি রাগ করেচ। তোমাকে উপদেশ আমি দিতে পারিনে—কিন্তু পা ধরে অনুরোধ করতে পারি, ওখানে তোমার গিয়ে কাজ নেই—ওঁরা ভাল লোক নন।

ওঁরা-টা কারা শুনি?

সতীশ বলিল, রাগ কোরো না উপীনদা, বহুবচনটা ভদ্রতা মাত্র। আমি হারানবাবুর কথা বলিনি—তিনি ভাল-মন্দের বাইরে গিয়েছেন। তাঁর মাকেও চোখে দেখিনি, আমি তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ করেচি।

তৃতীয় ব্যক্তির অপরাধ? দেখ সতীশ, তোমার বাবা যদি আর একজনকে তাঁর সর্বস্ব লিখে দেবার সঙ্কল্প করেন, তুমি বোধ করি, খুব আনন্দ কর, না?

না; আশীর্বাদ করো উপীনদা, বাবার যেন সে দরকার না হয়। তিনি আমাকে তাঁর ভাল ছেলে বলে আহ্লাদ করেন না জানি, আমি তাঁর মন্দ ছেলে, কিন্তু এই মন্দ ছেলেটি তাঁর মৃত্যুর সময় সাজগোজ করে টিপ পরে ঘুরে বেড়াবে না। আজ আমার বাচালতা মাপ কর উপীনদা, কিন্তু, তোমার একটুখানি চোখ থাকলেও দেখতে পেতে, হারানবাবুর এ-রকম প্রস্তাব কেবল খেয়াল নয়, বরং অনেকদিনের অনেক চিন্তার ফল।

সতীশ পুনশ্চ বলিল, তুমি মনে কোরো না উপীনদা, হারানবাবু তোমাকে সমস্ত ভারার্পণ করবার সময়ে তাঁর স্ত্রীর কথাটাই ভুলে ছিলেন, কিংবা লজ্জায় বলতে পারছিলেন না। বরং আমার বিশ্বাস, তুমি যদি নিজে উল্লেখ না করতে, তিনি স্বেচ্ছায় কোন কথাই বলতেন না।

উপেন্দ্র মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইতে থাকিলেও এতক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া শুনিতেছিলেন; কিন্তু পরস্ত্রী সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতীশ, তুমি যে এত ইতর হয়ে গেছ, আমার ধারণা ছিল না; বোধ করি, তুমি আলাপ পরিচয়েরও নীচে গেছ।

সতীশ হাসিল। বলিল, ইতর কিসে? মন্দকে মন্দ বলচি, এইজন্যে?

ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার অধিকার?

অধিকার আবার কি! ওটা ইংরাজী কথা, বাংলায় ওর মানে হয় না। আমাদের সমাজে অত সূক্ষ্ম বিচার চলে না। জেলখানার কয়েদীকে চোর বলতেও

অনেকে আপত্তি করেন, কিন্তু সে কথা ত সাধারণ পাঁচজনে মেনে চলতে পারে না।

সেটা আলাদা কথা। চুরি প্রমাণ হবার পরে তাকে চোর বলে, চোর জেলে যায়, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে কি প্রমাণ তুমি পেয়েছ?

প্রমাণ না হয়েও অনেকে জেলে যায়, সেটা জজসাহেবের হাতে। আমরা যেটা বুঝতে পারিনে, তিনি সেটা বোঝেন। আবার তুমি-আমি যেটা জলের মত সোজা দেখি, অতবড় জজসাহেবের কাছে হয়ত সেটা পাহাড়-পর্বত! আজ তোমার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। মনে কোরো না ভুল বকচি উপীনদা। এতবড় দুনিয়াটা চোখের উপর রেখেও অনেকে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পায় না। তুমি রাগ করবে জানি, কেননা চিরকালটা তুমি ভালর সঙ্গে মিশে, ভাল দেখে, ভাল হয়েই আছ, কিন্তু আমার মত ভাল-মন্দ দেখে যদি পাকা হতে, আমার এত কথা বলবার আবশ্যক হতো না, তোমার নিজের চোখেই অনেক জিনিস ধরা পড়ে যেত!

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সমস্ত জিনিস চোখে পড়বার প্রয়োজন আমার নেই, কিংবা পাকা হবার জন্যে তোর মত ইতর হতেও পারব না। তুই এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর, গাড়ি ফটকের মধ্যে ঢুকছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস সতীশ, কাঁচার দাম যে কি, সে কেবল তখন বুঝবি যখন আরও পাকা হবি।

পরদিন উঠিতে উপেন্দ্রর বেলা হইয়া গেল। বহুক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে, তাহা জানালার ফাঁক দিয়া আলোর পানে চাহিয়াই বোঝা গেল। উপেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঘরে সতীশ ছিল না, সে কোথায় গিয়াছে। বাহিরে বেহারী দাঁড়াইয়া ছিল, আসিয়া সংবাদ দিল, সতীশবাবু সামনের বাগানে কুস্তি করিতেছেন এবং নীচে চা দেওয়া হইয়াছে, তথায় সাহেব প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়া আছেন।

উপেন্দ্র অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেই জ্যোতিষ হাত ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনী সরোজিনী অপেক্ষা করিয়া

ছিলেন। তিনি খবরের কাগজটা ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথ চেয়ে বসেছিলুম। শেষে মেজদা বললেন, নিশ্চয়ই কোন নির্দয় বন্ধু পথ হতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন, এবং আপনারা হয়ত রাত্রে ফিরতেই পারবেন না। ফিরতে কাল কত রাত্রি হয়েছিল উপীনবাবু?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বারোটা। বিশেষ কাজে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে সকলকে ক্লেশ দিয়েছি।

জ্যোতিষ বলিলেন, সেটুকু আমরা বুঝি। আমরা মনে করিনি, তোমরা মিছামিছি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। সতীশবাবু গেলেন কোথায়?

বেহারী হাজির হইয়া নিবেদন করিল, সতীশবাবু বাগানের ওদিকে কুস্তি করিতেছেন এবং তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বেহারী চলিয়া গেলে, জ্যোতিষ উপেন্দ্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কুস্তি কি হে! আরো কেউ আছেন নাকি?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত জানিনে। কুস্তি বোধ হয় নয়, ছেলেবেলা থেকে ওর ব্যায়াম করা অভ্যাস, তাই কোনও রকম কিছু করচে বোধ হয়।

সরোজিনী কাল দুপুরবেলা মিউজিয়ম দেখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরিয়া শুনিতে পান, উপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধু আসিয়াছেন। তখন কিন্তু ইঁহারা পাথুরেঘাটার উদ্দেশে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাবু কে উপীনবাবু? আমি ত দেখিনি।

কাল যে সময়ে আমরা আসি, আপনি ছিলেন না। সতীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, যদিও বয়সে অনেক ছোটো—ঐ যে—

সতীশ ঘরে প্রবেশ করিল। কি সুন্দর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ! কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম রহিয়াছে, সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখে রক্তাভা পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

সরোজিনী মুহূর্তমাত্র চাহিয়াই চোখ নত করিলেন।

জ্যোতিষ বলিলেন, বেহারী বলছিল, আপনি কুস্তি করছিলেন। কিন্তু কুস্তিই করুন, আর যাই করুন, আপনার দেহের দিকে চাইলে হিংসে হয়, আমাদের মত চার-পাঁচজনেও বোধ করি আপনার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

সতীশ একটুখানি হাসিয়া বলিল, বিনা-পরীক্ষায় অতবড় সার্টিফিকেট দেবেন না। তা ছাড়া শুধু গায়ের জোর নিয়েই বা কি হবে, আমার আর কোন জোরই নেই।

কথার শেষদিকটায় দুঃখের আভাস বাজিল। সরোজিনী চা ঢালিতে ঢালিতে মনে মনে আন্দাজ করিলেন, সতীশবাবুর সাংসারিক অবস্থা বোধ করি ভাল নয়। জ্যোতিষ পূর্বেই উপেন্দ্রর নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে চায়ের বাটিগুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষ বলিলেন, আসুন সতীশবাবু, সমস্তই প্রস্তুত।

সতীশ সরিয়া আসিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আপনারা শুরু করে দিন, আমি স্নান না করে কিছুই খাইনে।

বিলক্ষণ! আমি ত এ কথা জানিনে, তবে যান, আর দেরী করবেন না,—বেয়ারা—

না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। স্নান আমার যথাসময়েই হবে, তা ছাড়া সকালবেলা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। মধ্যাহ্নের ভোজনটা আমার সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে কিছু বেশী—সেটা অসময়ে চা প্রভৃতি বাজে জিনিস খেয়ে নষ্ট করতে ভালবাসি নে। তার চেয়ে আমি ঐ হারমনিয়মটা খুলে দুটো ভজন করি, আপনাদের দু'কাজই চলুক।

গান গাইবার প্রস্তাবে সরোজিনী অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, সেই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়া মুখ নত করিল।

কথাটা তাহার নিজের কানেও কেমন কেমন শুনাইল। জ্যোতিষ হাসিয়া বলিলেন, বোনটি আমার গান পেলে আর কিছুই চায় না। না না সতীশবাবু, আপনি—

উপেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, না না তবে কি? ও স্নান না করে খায় না, সকালবেলা খায় না। আমরা ওকে ক্রমাগত সাধ্য-সাধনা করতে থাকি, আর চা'র বাটি ঠাণ্ডা জল হয়ে যাক। নে সতীশ, তোর কি ভজন-টজন আছে সেরে নে, আমার আরও কাজ আছে। বলিয়া চা'র বাটি মুখে তুলিয়া দিলেন।

জ্যোতিষ মনে মনে অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ দূরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, ইহার পরে আর তাহার গান গাহিবার উৎসাহ রহিল না। সরোজিনী বিমর্ষ হইয়া নতমুখে চা নাড়িতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র চা খাইতে খাইতে বলিলেন, কোথাও ওকে নিয়ে যদি স্বস্তি পাওয়া যায়! এমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব ওর, একটা-না-একটা কিছু বাধিয়ে দেবেই। ও যে সকালবেলা গান গাইবার বদলে সানাই বাজাবার প্রস্তাব করেনি, এই ভাগ্য।

কথাটার মধ্যে যে সত্যের আভাস বিন্দুমাত্রও ছিল, তাহা কেহই অনুমান করিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চা-খাওয়া চলিতে লাগিল। ওদিকে সতীশ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া ঘরের ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক সময়ে সরোজিনী আস্তে আস্তে উপেন্দ্রকে বলিলেন, সকালে আপনি গান শুনতে দেননি, আপনার ভারী অন্যায়।

উপেন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা, এ বেলা তার প্রতিকার হতে পারবে, আসুক সতীশ।

জ্যোতিষ বলিলেন, বাস্তবিক উপেন, যে ঠাণ্ডা পড়েছে, কোথাও বার হতে ইচ্ছা হয় না, একটু গান-বাজনা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু সতীশবাবু কৈ? ডাক্তারি করতে যাননি ত?

উপেন্দ্র বলিলেন, হতেও পরে। আলাপী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে বোধ হয়।

সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, সতীশবাবু ডাক্তার বুঝি?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ।

জ্যোতিষ বলিলেন, না হে উপেন, শুধু স্কুলে পড়লে হবে না। কোন ভাল হোমিওপ্যাথের সঙ্গে যদি কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে পারেন, তা হলেই কিছু শিখবেন। না হলে ঐ যে কথায় বলে, শতমারী সহস্রমারী—কেবল মেরে মেরেই বেড়াবেন! আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কেমন বনিবনাও হয় বলা যায় না—তুমি যে-রকম সার্টিফিকেট দিচ্ছ—

উপেন্দ্র বলিলেন, লোক ভাল হলে নিশ্চয় বনবে, অন্যথায় রক্তারক্তি ঘটবে।

সরোজিনী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ বলিলেন, আরও ভাল।

উপেন্দ্র বলিলেন, ভালই। ওকে চিনতে পেরে, ওর দোষগুণ সমস্ত বুঝে নিয়ে, যে ওর মন পাবে, সে বড় ভাল জিনিসটিই পাবে। কিন্তু পাওয়াই শক্ত। ও যে জটিল বা দুর্বোধ তা নয়, বরং খুব সোজা, খুব স্পষ্ট। আমার মনে হয়, এত স্পষ্ট বলেই মানুষে ওকে ভুল বোঝে।

মতে অনৈক্য হলে আমরা যেখানে ভদ্রতার দোহাই পাড়ি এবং শিষ্টভাবে মতভেদ করে মন ভার করে চলে আসি, ও সেখানে হাতাহাতি করে মীমাংসা করেই আসে, মন ভার করে আসে না। ছেলেবেলা থেকে ওকে জানি, কখনও দেখিনি ওর মুখের কথা আর মনের কথা আলাদা হয়েছে। এত ভালবাসি এইজন্যেই।

জ্যোতিষ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এইজন্যেই সাধারণের মাঝে নিয়ে চলাফেরা শক্ত বলছিলে?

জ্যোতিষের দিকে তখন উপেন্দ্রর মন ছিল না। তাই তাঁহার কথাগুলা কানে গেলেও অন্তরে প্রবেশ করিল না। বাল্যবন্ধুর বিরুদ্ধে কাল রাত্রির ব্যবহার ও রূঢ় ভাষা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে ক্লেশ দিতেছিল, সেইজন্য কথায় কথায় মন তাঁহার গত দিনের অতি নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর-দিনের ছোট-বড় কলহ-বিবাদে বিভিন্ন পাড়ার সম ও অসম-বয়সীদের সহিত হাতাহাতি, পেটাপেটি, বাদ-বিসংবাদ এবং আরও অনেক আপদ-বিপদে সর্বত্র সতীশ তাহার মস্ত দেহ ও মস্ত জোর লইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সমস্ত স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মাঝখানে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং জ্যোতিষের কথায় উপেন্দ্র যখন বলিলেন, হ্যাঁ এইজন্যই। ঠিক এইজন্যই চিরকাল ওকে এত ভালবাসি। জ্যোতিষ ও সরোজিনী উভয়েই বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। এই অসংবদ্ধ কথার কেহই অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সময় রহিল না। নিঃশব্দে পর্দা সরাইয়া সতীশ প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইলেন সরোজিনী। তিনিই আনন্দকলরবে সংবর্ধনা করিয়া উঠিলেন—বেশ হয়েছে, সতীশবাবু এসে পড়েচেন।

সতীশ নীরবে সকলকে চাহিয়া দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি? উপীনদা আমাকে আর মুখ দেখাতে দেবে না, বলিয়া অনতিদূরে একটা কোচের উপর বসিতে গেলে, উপেন্দ্র হাত দিয়া হারমনিয়ম যন্ত্রটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, একেবারে ঐখানে গিয়ে বসো, সরোজিনী এইমাত্র আমাকে দোষ দিচ্ছিলেন, শুধু আমার জন্যেই ও-বেলা গান হতে পায়নি।

সতীশ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকৌতুকে বলিল, এখন ত গান হতে পারবে না—এটা যে আমার সানাই বাজাবার সময় উপীনদা!

সে রাত্রে একটু অধিক রাত্রে সভা ভাঙ্গিবার পরে বিছানায় শুইয়া সরোজিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, উনি যদি আমাদের কোনো আত্মীয় হতেন ত ওঁর কাছেই শিখতুম। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য তাহার একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নিযুক্ত ছিল। ইহারই স্থানে সতীশকে কল্পনা করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

চোদ্দ

উপেন্দ্র ও সতীশ চলিয়া গেলে কবাট রুদ্ধ করিয়া সেইখানেই কিরণময়ী দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মতই জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষঃস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে। হাতের দীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদ ভঙ্গী করিয়া বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম। দিয়ে যেখানে হোক চলে যেতুম। ডাকাডাকি চেঁচামেচি করে একটু একটু করে পুড়ে মরত, শত্রুতা করবার সময় পেত না। শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে ঘাম দিয়াছিল। সেগুলা হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে সহসা নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কেন সংবাদ দিতে দিলুম! কেন নিজের পায়ে কুড়ুল মারলুম! কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, সমস্তই ওই হতভাগী বুড়ীর কাজ। ছেলের সঙ্গে মতলব করে ও-ই এমন ঘটিয়েছে।

সতীশের কথাগুলা বিছার কামড়ের মত রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এই দুটি লোক যে কতক শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কত এবং কি কি শুনিয়াছে, সেইটা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সে আরও ছটফট করিতে লাগিল। তাহাকে স্বামী ও শাশুড়ী দুজনে মিলিয়া বুঝাইয়াছিল, উপীনের মত লোক নাই। সে আসিয়া পড়িলে আর কোনো দুঃখ থাকিবে না। কেন সে বিশ্বাস করিয়াছিল! কেন সে নিজের হাতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া এই ক্রোধোন্মত্তা নারী ইহাদিগকে মিথ্যাবাদী, কুচক্রী, শয়তান, শয়তানী প্রভৃতি কত কি বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না! ক্রোধ ও হিংসা তাহার হৃদয়ে যে আক্ষেপ তুলিয়াছে তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিবার ভাষাও তাহার মনে পড়িল না। তখন সে

কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ওই অর্ধমৃত মানুষটির রাত্রি আর না পোহায়।

দিন-দুই পরে সকালে কিরণ রান্নাঘরে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কিরণ বঁটি হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, মা আজ ভাল আছেন। তাঁকে বল্ গে।

ঝি কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তিনি সেই ও-ঘরেই বসে আছেন।

তাহার কথার বিশেষ অর্থটার দিকে কিরণ লেশমাত্র মনোযোগ না দিয়া সহজভাবে কহিল, ওর ওষুধ কেউ ত খায় না, তবু কেন যে ও আসে জানিনে। তুই নিজের কাজে যা, ও আপনিই চলে যাবে।

এই ডাক্তারটির ঔষধ যে ব্যবহারে আসে না, ঝির নিকট ইহা নূতন সংবাদ নহে। সুতরাং উল্লেখের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কেন যে সে আসে, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নূতন। সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার সময় সে ঘরে গিয়াছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ কি এমন ঘটিল যে ডাক্তারের এ বাটীতে আসা অনাবশ্যক হইয়া উঠিল! তথাপি সাহস করিয়া আর একবার বলিল, না হয় তরকারি আমি কুটে দিচ্চি, তুমি একবার যাও না।

কিরণময়ী সহসা অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল, তুই যা যা। নিজের কিছু কাজকর্ম থাকে ত কর গে।

এই আকস্মিক ও অত্যন্ত অনাবশ্যক উগ্রতায় ঝি এতটুকু হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে খুব পুরাতন না হইলেও একেবারে নূতন নয়। ইতিপূর্বে এরূপ অকারণ তীব্রতার পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন ধারাটি সে স্মরণ করিতে পারিল না। আর কোন সময়ে সেও বোধ করি রাগ করিত, কিন্তু আজ করিল না, অতি বিস্ময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া

সে ধীরে ধীরে ও-ঘরে দ্বারের কাছে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন আপনি যাও।

ডাক্তার পায়ের কাছে ব্যাগটা রাখিয়া সেই তক্তপোশটার উপরেই উদ্বিগ্ন-মুখে বসিয়াছিল; কহিল, ব্যস্ত আছে কি গো! কাজ আমারো ত আছে!

ঝি বলিল, তবে যাও না বাবু।

ডাক্তার অবাক হইয়া গেল; কহিল, একবার বল গে, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।

ঝি বলিল, আপনি বোঝ না কেন ডাক্তারবাবু! আমি খুব বলেছি—আর বলতে পারব না। ও-সব আমি কিছু জানিনে, আজ আপনি যাও, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এই অবহেলা ও লাঞ্ছনা প্রথমটা ডাক্তারকে গভীর আঘাত করিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা লজ্জাকর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তাহার মনে উদয় হইবামাত্রই সে ভিতরকার ব্যাপারটা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আপত্তি ছিল না এবং অপেক্ষা করিয়াই রহিল, কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিয়া চলিয়া যাইবে মনে করিয়া হাতব্যাগটা তুলিয়া লইয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল, দ্বারের সুমুখে কিরণময়ী। ডাক্তার উদ্যত অভিমান দমন করিয়া বলিল, একটু সরো, বড় দেরী হয়ে গেল, আরো অনেক রুগী পথ চেয়ে বসে আছে—মা ভাল আছেন আজ?

ভাল আছেন, বলিয়া কিরণময়ী পথ ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তারের কিন্তু পা উঠিল না। অথচ যাওয়ার প্রস্তাব নিজে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও শক্ত হইয়া পড়িল।

কিরণময়ী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, যাও না।

ডাক্তার মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; কহিল, তুমি কি মনে কর আমি যেতে জানিনে?

আমি কি পাগল যে মনে করব তুমি যেতে জান না? হ্যাঁ ডাক্তার, কতগুলি রুগী তোমার পথ চেয়ে আছে শুনি?

বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

কুপিত ডাক্তারের প্রথমে ইচ্ছা করিল ঐ মুখ চড় মারিয়া বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু সেটা ত সম্ভব নহে, শুধু বলিল, যাও তুমি।

আমি যাব কোথায়? বাড়ি আমার, যেতে হলে তোমাকেই হয়!

আমি যাচ্ছি, বলিয়া সে গমনোদ্যত হইতেই কিরণময়ী দুই চৌকাটে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, যাচ্চো, কিন্তু জেনে যাও, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের বিস্ময়কর পরিবর্তনে ডাক্তার শঙ্কিত হইল। কিন্তু মুখে বলিল, বেশ তাই, এই শেষ যাওয়া।

কিরণময়ী বলিল, সত্যিই শেষ যাওয়া। যখন এসে পড়েছ তখন স্পষ্ট করেই সবটা জেনে যাও। আচ্ছা, ঐ ওখানে বসো, সমস্ত খুলে বলচি, বলিয়া ডাক্তারের হাতব্যাগটা লইয়া নিজে মেঝের উপর রাখিয়া দিল এবং হাত দিয়া চৌকি দেখাইয়া দিয়া বলিল, রাঁধতে হবে, বেশী সময় নেই, সংক্ষেপে বলচি—

এমন সময়ে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, দু'জন বাবু আসচে। সেই সঙ্গেই নীচে জুতার শব্দ শুনিয়া কিরণময়ী ব্যাধ-ভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় ঝিকে সবেগে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ডাক্তার ও ঝি আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনতিকাল পরেই জুতার শব্দ দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। ডাক্তার দেখিল, দুটি অপরিচিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক দুটি দেখিলেন, ডাক্তার। তাহার কোটের পকেট হইতে বুক-পরীক্ষার চোঙটা গলা বাড়াইয়া পরিচয় জানাইয়া দিল। উপেন্দ্র, সতীশ দেখিলেন ডাক্তারের মুখ অতিশয় শুষ্ক। দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার নীরব। মুখ তাহার আরো কালি হইয়া গেল।

উপেন্দ্র অধিকতর শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কি রকম দেখলেন?

তথাপি ডাক্তার কথা কহিল না, বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

ঝি কহিল, তুমি যাও না ডাক্তারবাবু, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া ব্যাগটা তুলিয়া বলিল, আমি যাই, অনেক কাজ আছে আমার, বলিয়াই উপেন্দ্র, সতীশের মাঝখান দিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। এবং এই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঝিটি যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

সেই নিস্তব্ধ ভাঙ্গা বাড়ির ভাঙ্গা বারান্দার উপর বেলা ন'টার সময়ে উপেন্দ্র, সতীশ নির্বাক-বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশ বলিল, উপীনদা, হারানবাবুর মা কি পাগল?

উপেন্দ্র বলিলেন, ও হারানদার মা নয়, আর কেউ—বোধ করি ঝি। কিন্তু আমি ভাবচি, ডাক্তার ও-রকম করে গেল কেন?

সতীশ বলিল, ঠিক চোরের মত যেন ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে গেল।

উপেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, প্রায়। কাউকে ত দেখা যায় না, ঐ ঘর হারানদার না?

সতীশ বলিল, হাঁ, যাই চল।

কিন্তু হঠাৎ ঢুকতে সাহস হয় না। আমার ভয় হচ্চে হয়ত কিছু ঘটেছে।

সতীশ কহিল, সে হলে চীৎকার করবার লোক জুটত—তা নয়।

এমন সময় দেখিতে পাওয়া গেল, ও-ধারের বারান্দা ঘুরিয়া বধূ আসিতেছে। মনে হইল, যেন এইমাত্র সে কাঁদিতেছিল—চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। কাল দীপের আলোকে যে মুখ সুন্দর দেখাইয়াছিল, আজ দিনের বেলা, সূর্যালোকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এমন সৌন্দর্য আর কোনদিন চোখে পড়ে নাই। জীবিতও না, ছবিতেও না।

বধূ কহিল, আজ আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। ভেবেছিলুম আসব বলে গেলেও হয়ত আসতে পারবেন না। সতীশের দিকে চাহিয়া সহসা মৃদু হাসিয়া কহিল, ঠাকুরপো যে!

আজ সতীশ মাথা হেঁট করিল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হারানদা কেমন?

বধূ সংক্ষেপে উত্তর দিল, তেমনি। আসুন ও-ঘরে যাই।

হারানের ঘরে তাঁর জননী অঘোরময়ী শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। উপেন্দ্র প্রণাম করিতেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

হারান শ্রান্তকণ্ঠে নিষেধ করিয়া বলিল, চুপ কর মা।

উপেন্দ্র লজ্জায় দুঃখে একধারে বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ এদিক ওদিক চাহিয়া মুখ যথাসাধ্য ভারী করিয়া সেই কাঠের সিন্দুকটির উপর গিয়া বসিল।

বধূ মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইয়া সতীশের দিকে বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ করিয়া বাহির হইয়া গেল, যেন স্পষ্ট শাসাইয়া গেল, তোমরা কাজটা ভাল করিতেছ না।

পনর

সতীশ স্থির করিল, সে ডাক্তারী পড়া ছাড়িবে না। তাই পরদিন সন্ধ্যার সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া তাহার সাবেক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, বাড়িওয়ালাকে ধরিয়া ছয় মাসের বন্দোবস্ত করিল এবং নিকটবর্তী হিন্দু-আশ্রমে গিয়া সন্ধান করিয়া এক পাচক নিযুক্ত করিয়া খুশী হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বেহারীকে কহিল, আমরা কালই চলে আসব—কি বলিস বেহারী?

বেহারী সম্মতি জানাইল।

পথে চলিতে চলিতে সতীশ বলিল, কাজটা ভাল হয় না বেহারী। যাই হোক সে আমার ঢের করেছে; তা ছাড়া একরকম ধরতে গেলে আমার জন্যেই তার ও-বাসার কাজটা গেল, একবার খবর দেওয়া উচিত।

বেহারী বুঝিল, কাহার কথা হইতেছে—চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিতে লাগিল, যে কেউ হোক না কেন, পথের ভিখিরী হলেও দুঃখে পড়লে দেখা চাই—না হলে মানুষ-জন্মই বৃথা।

কিন্তু আমি তাদের বাড়িতে ঢুকব না—গলির মধ্যেও না—মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকব; তুই একটিবার গিয়ে জেনে আসবি, কষ্টে পড়েছে কিনা। কষ্টে ত নিশ্চয় পড়েছে—সে আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, তাই কোন রকমে কিছু দিয়ে আসা। বেহারী নিঃশব্দে পিছনে চলিতে লাগিল। সতীশ বলিল, কিন্তু আমাকে সে সব কথা বলবে না, অথচ তোর কাছে কিছুই লুকোবে না। বুঝলি না বেহারী!

বেহারী তথাপি কথা কহিল না।

সাবিত্রীদের গলির মোড়ে আসিয়া সতীশ দাঁড়াইল। বলিল, বেশী দেরী করিস নে যেন।

বেহারী গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, সতীশ কাছাকাছি পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—দূরে যাইতে সাহস করিল না, পাছে নির্বোধ বেহারী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আর কোথাও যায়।

মিনিট-দশেক পরেই বেহারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নেই!

সতীশ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কখন ফিরে আসবে?

বেহারী কহিল, সে আর আসবে না। দু'মাস হতে চললো একদিনও আসে না!

সতীশ গ্যাস পোস্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিল, মিথ্যা কথা। তোকে ঠকিয়েছে।

বেহারীও দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ ঠকায়নি। সত্যিই সে আর আসে না। সত্যিই সে বাড়ি চলে গেছে।

তার ঘরের জিনিস?

পড়ে আছে। সে আর এমন কি জিনিস বাবু, যে তার জন্যে মায়া হবে!

সতীশ রাগিয়া বলিল, এমনই বা সে কি বড়লোক যে হবে না? তুই নিতান্ত বোকা, তুই বুঝে চলে এলি সে আর আসে না! একি হতে পারে বেহারী, একটা লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর কেউ তার খবর নিলে না? আমি পুলিশে জানাব।

বেহারী মৌন-নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ বলিল, মোক্ষদা কি বলে, সে জানে না? আমি বিশ্বাস করি না। সে নিশ্চয়ই জানে। আমি যাচ্চি তার কাছে।

বেহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আপনি যাবেন না, বাবু!

কেন যাব না? কেন তারা লুকোচ্চে? আমি কাউকে খেয়ে ফেলতে এসেছি, যে আমার কাছে লুকোচুরি! আমি বলছি তোকে, যেমন করে পারি আমি জানব সে কোথায় আছে।

বেহারী ভীত হইয়া কহিল, তার মাসীর দোষ নেই বাবু। সাবিত্রী নিজের ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে গেছে। ঝগড়া করে গেছে—কাউকে জানিয়ে যায়নি।

সতীশ ধমকাইয়া উঠিল—তবু বলবি জানিয়ে যায়নি! জানিয়ে গেছে—নিশ্চয়ই গেছে।

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু সে শহরেই আছে।

কোন্ ঠিকানায় আছে? গাধার মত হাঁ করে থাকিস নে বেহারী! কি হয়েছে বল।

বেহারী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, আপনি দুঃখ পাবেন তাই—না হলে সব কথা সবাই জানে—

আমিও জানি।

সতীশ অধীর হইয়া উঠিল—কি জানিস তাই বল্ না?

বেহারী আবার চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তোর পায়ে পড়ি হারামজাদা, শিগগির বল।

বেহারী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জুতার ধূলা মাথায় লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল।

বাবু আমাকে নরকে ডুবালেন। একটু আড়ালে চলুন, বলচি, বলিয়া অন্ধকার গলিটার ভিতরে ঢুকিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

সতীশ সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

বেহারী ঢোক গিলিয়া বলিল, সাবিত্রীর মাসী মনে করেছে সে আপনার কাছে আছে। কিন্তু আমি জানি, তা নয়।

সতীশ অস্থির হইয়া বলিল, তুই খুব পণ্ডিত। সে আমিও জানি—তার পরে কি বল্।

সবুর করুন বাবু, বলচি, বলিয়া বেহারী আর একবার বেশ করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল, আমার খুব আশা হচ্চে—

কি আশা হচ্চে?

বেহারী মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, সে ঐখানেই গেছে; ঐ বিপিনবাবুর কাছেই—

কোন্ বাবু? আমাদের বিপিন?

হাঁ বাবু তিনিই—হাঁ হাঁ—ওখানেই বসবেন না, চান করতে হবে! রাজ্যের লোক যে ওখানে—

সতীশ সে কথা কানেও তুলিল না। ওধারের দেওয়ালে পিঠ দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া শুষ্ক ভাঙ্গা-গলায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে তার মাসী কেন মনে করলে সে আমার কাছে আছে?

বেহারী কহিল, সাবিত্রী যেদিন বিপিনবাবুকে অপমান করে বিদেয় করে দেয়, সেদিন স্পষ্ট করে বলে, সে সতীশবাবু ছাড়া আর কারো কাছে যাবে না—বাড়ির লোক আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের ঝগড়া শুনেছিল।

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া নিজেকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রশ্ন করিল, তবে তুই কেমন করে জানলি, সে বিপিনবাবুর কাছেই গেছে?

বেহারী মৌন হইয়া রহিল।

সতীশ বলিল, বল্।

বেহারী আর একবার ইতস্ততঃ করিল, সাবিত্রীর কাছে সেই যে বলিবে না বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছিল, তাহা মনে করিল। শেষে আর একবার ঢোঁক গিলিয়া কহিল, আমি নিজের চোখে দেখে গেছি।

সতীশ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

বেহারী বলিল, আমরা যেদিন বাসা বদল করি, তার পরদিন দুপুরবেলায় আমি আসি। তখন বিপিনবাবু সাবিত্রীর বিছানায় ঘুমুচ্ছিলেন।

সতীশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা!

বেহারী চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, না বাবু, সত্যি কথাই বলচি।

সতীশ তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, সাবিত্রী নিজে কোথায় ছিল?

সাবিত্রী সেই ঘরেই ছিল। বাইরে এসে আমাকে মাদুর পেতে বসালে। জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বাবুরা রাগ করেছেন কিনা, আমরা বাসা বদলালুম কেন এই-সব।

তার পরে?

আমি রেগে চলে এলুম। সেইদিন থেকেই সে বাবুর সঙ্গে চলে গেছে।

এতদিন বলিস নি কেন?

বেহারী চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তুই নিজের চোখে দেখেছিস না শুনেছিস?

না বাবু, আমার স্বচক্ষে দেখা! একেবারে নিরীক্ষণ করে দেখা!

আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্—তোর চোখে দেখা! বামুনের পায়ে হাত দিচ্ছিস, মনে থাকে যেন!

বেহারী তৎক্ষণাৎ নত হইয়া সতীশের পায়ে হাত দিয়া বলিল, সে কথা আমার দিবা রাত্রই মনে থাকে বাবু! আমার স্বচক্ষে দেখা।

সতীশ আবার একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাসায় যা। উপেনদাকে বলিস, আজ রাত্রে আমি ভবানীপুরে যাব, ফিরব না।

বেহারী বিশ্বাস করিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি রে, কাঁদিস কেন?

বেহারী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবু, আমি আপনার ছেলের মত, আমাকে লুকোবেন না। আমিও সঙ্গে যাব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বেহারী বলিল, বুড়ো হয়েছি সত্যি, কিন্তু জাতে গোয়ালা। একগাছা হাতে পেলে এখনো পাঁচ-ছ'জনের মোয়াড়া রাখতে পারি। আমরা দাঙ্গা করতেও জানি, দরকার হলে মরতেও জানি।

সতীশ শান্তভাবে বলিল, আমি কি দাঙ্গা করতে যাচ্চি? আহাম্মক কোথাকার! বলিয়াই চলিয়া গেল।

বেহারী এবার বোধ হয় বুঝিল কথাটা মিথ্যা নয়। তখন চোখটা মুছিয়া ফেলিয়া সেও প্রস্থান করিল।

সতীশ ময়দানের দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছিল। কোথায় যাইবে, স্থির করে নাই—কিন্তু কোথাও তাহাকে যেন শীঘ্র যাইতেই হইবে। তাহার প্রধান কারণ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছিল, একমুহূর্তেই তাহার মুখের চেহারায় এমন একটা বিশ্রী পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়ানো চলে না।

ময়দানের একটা নিভৃত অংশে গাছতলায় বেঞ্চ পাতা ছিল। সতীশ তাহার উপরে গিয়া বসিল এবং নির্জন দেখিয়া স্বস্তি বোধ করিল। অন্ধকার বৃক্ষতলে বসিয়া প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, কি করা যায়! প্রশ্নটা কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার দুই কানের মধ্যে অর্থহীন প্রলাপের মত ঘুরিতে লাগিল। শেষে উত্তর পাইল, কিছুই করা যায় না।

প্রশ্ন করিল, সাবিত্রী এমন কাজ করিল কেন?

উত্তর পাইল, এমন কিছুই করে নাই, যাহাতে নূতন করিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন করিল, এতবড় অবিশ্বাসের কাজ করিল কি জন্য?

উত্তর পাইল, কোন্ বিশ্বাস তোমাকে সে দিয়াছিল, তাই আগে বল?

সতীশ কিছুই বলিতে পারিল না। বস্তুতঃ সে ত কোন মিথ্যা আশাই দেয় নাই। একদিনের জন্যও ছলনা করে নাই। বরং, পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছে, শুভ কামনা করিয়াছে, ভগিনীর অধিক স্নেহ-যত্ন করিয়াছে। সেই রাত্রির কথা সে

স্মরণ করিল। সেদিন নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। কে এমন করিতে পারিত! কে নিজের বুকে শেল পাতিয়া লইয়া তাহাকে অক্ষত রাখিত? সতীশের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু, এ সংশয় তাহার কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না, যে, এই প্রশ্নোত্তরমালায় কোথায় যেন একটা ভুল থাকিয়া যাইতেছে।

সে আবার প্রশ্ন করিল, কিন্তু, তাকে যে ভালবাসিয়াছি।

উত্তর পাইল, কেন বাসিলে? কেন জানিয়া বুঝিয়া পঙ্কের মধ্যে নামিলে?

প্রশ্ন করিল, তা জানিনে। পদ্ম তুলিতে গেলেও ত পাঁক লাগে।

.

উত্তর পাইল, ওটা পুরাতন উপমা—কাজে লাগে না। মানুষ ঘরে আসিবার সময় পাঁক ধুইয়া পদ্ম লইয়া আসে।

তোমার পদ্মই বা কি, আর এ পাঁক কোথায় ধুইয়াই বা ঘরে আসিতে?

প্রশ্ন করিল, না হয়, নাই ঘরে আসিতাম।

উত্তর পাইল, ছিঃ! ও-কথা মুখেও আনিও না।

তাহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে স্তব্ধ হইয়া নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ত তার আশা ছাড়িয়াই ছিলাম। তাহাকে পাইতেও চাহি না, কিন্তু আমাকে সে এমন করিয়া অপমান করিল কেন? একবার জিজ্ঞাসা করিল না কেন? কি দুঃখে সে এ কাজ করিতে গেল? টাকার লোভে করিয়াছে, এ কথা যে কোনমতেই ভাবিতে পারি না? বিপিনের মত অনাচারী মদ্যপকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিব কি করিয়া? তবে কেন?

গঙ্গার শীতল বাতাসে তাহার শীত করিতে লাগিল। সে র্যা পারটা আগাগোড়া মুড়িয়া দিয়া চোখ বুজিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িতেই সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত সে মুখে নাই! গর্বে

দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ, পরিণত যৌবনের ভারে গভীর অথচ রসে, লীলায় চঞ্চল—সেই মুখ, সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তাহার সেই অকৃত্রিম সেবা! এমন সে তাহার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন্ পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে! নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই বা কি হইবে! তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ, করিয়া এতবড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল, তাহারি উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।

সতীশ আর যাই হোক,—ভগবান আছেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, ছোটবড় সকলেই একদিন তাঁর কাছে জবাবদিহি করিতে হয়, এ কথাগুলা অসংশয়ে বিশ্বাস করিত। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান! কার হাত দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ তোমারি হুকুমে সাবিত্রী দাতা, আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক, মন্দ হোক, সে বিচার আর যে-ই করুক আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জ্বালা, সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কৃতঘ্ন হয়ে না থাকি।

ওদিকে জ্যোতিষসাহেবের বাড়িতে সন্ধ্যার পরে, বসিবার ঘরে সরোজিনী, জ্যোতিষ, উপেন্দ্র এবং আরও একজন খর্বাকৃতি গোঁফ-দাড়ি-কামানো গুলিভাঁটার মত শক্ত-সমর্থ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শশাঙ্কমোহন। ইনিও বিলাত-প্রত্যাগত—সুতরাং সাহেব। অল্পদিনেই সরোজিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা প্রাণপণে ব্যক্ত করতে প্রয়াস পাইতেছেন। সে প্রয়াস যে কতদূর সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সে শুধু বিধাতাপুরুষই জানিতেছিলেন। আজ সতীশের

প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র তাহার অসাধারণ গায়ের জোর এবং অদ্ভুত সাহসের ইতিহাস শেষ করিয়া, আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ও তদপেক্ষা আশ্চর্য শিক্ষার কথা পড়িয়াছিলেন। অদূরে সোফার উপর বসিয়া সরোজিনী দুই হাতের উপর চিবুক রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। এমনি সময়ে বেহারী ভগ্নদূতের মত ঘরে ঢুকিয়া সতীশের ভবানীপুর যাওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিল।

উপেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তার কে আছে সেখানে?

বেহারী সংক্ষেপে 'জানি না' বলিয়াই চলিয়া গেল।

সতীশের জন্যই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অতএব সকলেই নিরাশ হইলেন।

সরোজিনী সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তবে আর কি হবে!

জ্যোতিষ তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে একটুখানি হাসিলেন; কিন্তু, দমিলেন না শুধু শশাঙ্কমোহন। বরং খুশী হইয়া প্রস্তাব করিলেন, এখন সরোজিনীই কর্ণধার হউন। সঙ্গীত হইতে কতটা পরিমাণে আনন্দ আহরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল তাহা তিনিই জানিতেন, কিন্তু সরোজিনী দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিতেই বলিয়া বসিলেন, বরং আমি ত বলি, পুরুষের গান গাওয়াটাই ভুল। তার স্বভাবতঃ গলা মোটা এবং ভারী, সুতরাং শিক্ষা তার যতই হোক এবং যত ভাল করেই গাইবার চেষ্টা করুন না কেন, কোনমতেই শোনবার যোগ্য হতে পারে না।

এ কথার আর কেহ যদিও প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু সরোজিনী করিল। সে বলিল, আপনার কাছে নিশ্চয়ই যোগ্য নয়। হারমোনিয়ম পিয়ানোর গোড়ার মোটা ও ভারী পর্দাগুলো তৈরী করাও হয়ত ভুল, কিন্তু তবু সেগুলো তৈরিও হচ্চে, লোকেও কিনচে।

শশাঙ্কমোহনের তরফে এ কথার উত্তর ছিল না। তথাপি তিনি তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ ঈষৎ রক্তাভ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সরোজিনী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, মাকে খবর দিয়ে আসি—তিনি আবার খাবার নিয়ে বসে থাকবেন।

উপেন্দ্র চকিত হইয়া বলিলেন, ওহো, তার খাওয়া-দাওয়া বুঝি ঐ-দিকেই হচ্ছে—হমব্যাগ্!

উপেন্দ্রর বলার মধ্যে যে আন্তরিক স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না এবং সতীশ তাঁহার নিতান্ত স্নেহাস্পদ না হইলে তিনি এ ভাষা যে মুখে আনিতেও পারিতেন না ইহা সরোজিনী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে কহিল, এ আপনার ভারী অন্যায়। তাঁর রুচি যদি আপনার কুরুচির সঙ্গে না মেলে ত দোষ আপনার—তাঁর নয়! আচ্ছা, মাকে বলেই আসচি। বলিয়া সরোজিনী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইতেই শশাঙ্কমোহন উপেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনার বন্ধু বুঝি খুব গোঁড়া?

উপেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, কম নয়। পূজো-আহ্নিকও করে জানি।

সতীশ যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া মদ খাইত, এ কথা তিনি জানিতেন না, বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না।

শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করিলেন, কি করেন তিনি?

উপেন্দ্র বলিলেন, কিছুই না; কোনদিন যে কিছু করবে এ ভরসাও কারো নেই।

এই সংবাদে শশাঙ্কমোহনের মনের উপর হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল। খুশী হইয়া বলিলেন, তাইতেই!

জ্যোতিষ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কথাটি ঠিক হলো না, উপেন। শারীরিক উৎকর্ষটা কিছুই নয় নাকি? তা ছাড়া আমি ত তাঁর গানে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। যা কিছু তিনি করেছেন, আমাদের এদেশে সে সম্মান যদি তাঁর নাও মেলে, দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দোষ আমাদেরই—তাঁর নয়। মকদ্দমার নথি-পত্র না ঘেঁটে, এটর্নির সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করে, হাকিমের তাড়া না খেয়েও যার ষোলআনা আদায় হয়েই আছে, সে যদি একটু এদিকে না তাকায় ত সংসারটা নিতান্ত মারোয়াড়ীর কাপড়ের দোকান হয়ে দাঁড়ায়। আমার ত তোমার বন্ধুটিকে দেখে সত্যিই হিংসা হয়। ভাল কথা, বৃদ্ধের আয় কত হে?

এই সময় সরোজিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া তাহার দাদার চৌকির পিঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার দাদা?

জ্যোতিষ বলিলেন, সতীশবাবুর বাবার।

উপেন্দ্র বলিলেন, ঠিক জানি না, বোধ করি, প্রায় দু'লাখ।

জ্যোতিষ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, রাজা নাকি হে!

উপেন্দ্র বলিলেন, না, রাজা নয়, তবে বরাবরই ওরা বড় জমিদার। তার ওপর বৃদ্ধ বিশেষ করেই বৃদ্ধি করেছেন।

জ্যোতিষ চৌকিতে হেলান দিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একেবারে সৌভাগ্যের প্রিয়তম পুত্র! স্বাস্থ্য, শক্তি, রূপ, ঐশ্বর্য! মানুষ যা-কিছু কামনা করে, একাধারে সমস্তই।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, একটা মারাত্মক দোষও আছে। পরের দায় যেচে ঘাড়ে নিয়ে অসময়ে অপঘাতে মারা না পড়ে ত তুমি যা বলচ সে-সবই ঠিক বটে।

জ্যোতিষ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, অপঘাতে মারা পড়বে কেন?

উপেন্দ্র বলিলেন, অসম্ভব নয়, এবং পূর্বে হয়েও গেছে। রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটাও ঠিক তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের অন্যায় অত্যাচারের ধারণাটা সত্যযুগের মতই থাকে, এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা-না-থাকার উপর আমি ত বেশী আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন, সেটা ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাঙলাদেশে এসে জন্মেছে।

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু যাই বল, শুনে শ্রদ্ধা হয়।

উপেন্দ্র বলিলেন, হয়ও না! সংসারে বাস করতে গেলে অনেক ছোটখাটো মন্দ জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে হয়—এ শিক্ষা ওর আজো হয়নি। কোনদিন হবে কি না জানি না, কিন্তু যদি না হয়, শেষকালের ফলটা মধুর হবে না। ওরও না, ওর আত্মীয়-বন্ধুদেরও না।

জ্যোতিষ বলিলেন, কিন্তু তুমি ওর আত্মীয়-বন্ধু, তুমি কেন শেখাও না?

উপেন্দ্রর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমি ওর বন্ধু বটে, কিন্তু এ শিক্ষার ভার এ-রকম বন্ধুর উপরে নয়। যিনি সব বন্ধুর বড় বন্ধু হবেন, যিনি সমস্ত আত্মীয়ের উপর আত্মীয় হবেন, এ বিদ্যা হয় তিনি শেখাবেন, না হয় চিরদিন ওকে অশিক্ষিত হয়েই থাকতে হবে।

সরোজিনী এতক্ষণ নীরবে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ ফিরাইয়া বোধ করি একটুখানি হাসি গোপন করিল।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু সতীশের কথা আজ এই পর্যন্ত। আমাকে উঠতে হবে, খান-দুই চিঠি লেখবার আছে।

জ্যোতিষেরও জরুরী কাগজপত্র দেখিবার ছিল, তাঁহারও বসিবার জো ছিল না, তাই তিনিও উঠি-উঠি করিতেছিলেন। কিন্তু সকলের পূর্বেই উঠিয়া পড়িল

সরোজিনী। একবার মনে হইল সে উপেন্দ্রকে কি কথা যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু শেষে কিছুই বলিল না, কাহাকেও একটি ক্ষুদ্র নমস্কার পর্যন্ত করিল না—অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজিকার সভা যেমন করিয়া জমিবার কথা ছিল, তেমন করিয়া জমিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভাঙ্গিল আরো বিশ্রী করিয়া।

উপেন্দ্র কিছুই জানিতেন না, তিনি কিছুই জানিলেন না।

ষোল

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কিরণময়ী স্বামীর পীড়া উপলক্ষে এই কয়টা দিন উপেন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাইয়া তাহাকে চিনিল। ইহাতে শুধু যে তাহার স্বার্থহানির ব্যাকুল আশঙ্কাটাই তিরোহিত হইল তাহা নহে, এই অপরিচিতের উদ্দেশে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার সমস্ত হৃদয় জলভারাক্রান্ত মেঘের মত বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল। এমন লোক সে কখন দেখে নাই। এমন লোকের সংসর্গে আসিতে পারার ভাগ্য কোন দিন সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তাই এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই সে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-দুঃখ ইহারই হাতে নিঃশঙ্কচিত্তে তুলিয়া দিল, এবং নির্ভয়ে নির্ভর করিতে পারা যে কি, তাহা এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া তাহার চিরকারারুদ্ধ প্রাণ যেন মুক্ত পথের আলোক দেখিতে পাইল।

উপেন্দ্র প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া মুমূর্ষু বন্ধুর সেবা করিতেছিলেন। প্রয়োজন হিসাবে এ সেবার মূল্য ছিল না, কারণ হারানের জীবনের আশা আদৌ ছিল না—কিন্তু, এই সেবা, কিরণময়ীর চোখে তাঁহার স্বামীর শুষ্ক দেহটাকেও আজ মহামূল্য করিয়া দিল। এই অর্ধমৃত দেহটার লোভেই অকস্মাৎ সে ভয়ানক লুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার আচার-ব্যবহারের এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্তন মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়াইয়া হারানও লক্ষ্য করিলেন। ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর-যত্ন করেন নাই; বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষা দান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে

এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। এমনি করিয়াই এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী শৈশব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য মাধুর্য হইতে নির্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এমনি স্নেহপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াই সে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্মেও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। অঘোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাঁহার রূপসী বধূ যে ইদানীং সতীধর্মেরও সম্পূর্ণ মর্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু, পুত্র তাঁহার মৃতকল্প, দুঃসহ দুঃখের দিন সমাগতপ্রায়। এই মনে করিয়াই বোধ করি, বধূর বিসদৃশ আচার-ব্যবহারও উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যে ডাক্তার হারানের চিকিৎসা করিতেছিল, সে যে কি আশায় বিনা ব্যয়ে ঔষধপথ্য যোগাইতেছে, কেন সংসারের অর্ধেক ব্যয়ভারও বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না। কিন্তু মৃতকল্প সন্তানের চিকিৎসার কাছে কোন অন্যায়কেই বড় করিয়া দেখিবার তাঁহার সাহস ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। অধিকন্তু তিনি পুত্রবধূকে ভালবাসিতেন না। উপেন্দ্রও যে এই জালে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইতেছিল,তাহার অকাতর অর্থব্যয় এবং অক্লান্ত সেবার গোপন উদ্দেশ্য যে, আশৈশব বন্ধুত্বকে অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে আর একস্থানে মূল বিস্তার করিতেছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহও ছিল না, আপত্তিও ছিল না। কাল হইতে উপেন্দ্র আসে নাই। এই কথা অঘোরময়ী তাঁহার ঘরের চৌকাঠের বাহিরে একখানা জীর্ণ মলিন বালাপোশ গায়ে দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

শীতের সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই, কিন্তু এ বাড়ির ভিতরটায় ইহারই মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। সূর্যদেব কখন উদয় হন, কখন অস্ত যান, সুদিনেও সে সংবাদটা এ বাটীর লোকে রাখে নাই, এখন দুঃখের দিনে তাঁহার সহিত প্রায় সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

অঘোরময়ী ডাকিলেন, বৌমা, সন্ধ্যেটা জ্বেলে দিয়া একবার বস ত মা, একটা কথা আছে।

কিরণময়ী তাঁহারই ঘরের মধ্যে কাজ করিতেছিল, বলিল, এখনো সন্ধ্যে হয়নি মা, তোমার বিছানাটা পেতে দিয়েই যাচ্চি।

আঘোরময়ী বলিলেন, আমার আবার বিছানা! শোবার সময় আমিই পেতে নেব। না না, তুমি যাও মা, প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। দিবারাত্রি খেটে খেটে দেহ তোমার আধখানি হয়ে গেল, সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখা যে দরকার মা। বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অনতিকাল পরে বধূ কাছে আসিয়া বসিতে গেলে, তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আগে প্রদীপগুলো—

বধূ শ্রান্তভাবে বলিল, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্চ মা, সন্ধ্যের এখনো ঢের দেরী আছে।

অঘোরময়ী বলিলেন, তা হোক—নীচে যে অন্ধকার, একটু বেলা থাকতেই সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দেওয়া ভাল। এখনি হয়ত উপীন এসে পড়বে, কাল থেকে সে আসেনি—কৈ বৌমা, এখনো তোমার ত গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা হয়নি দেখচি—কি কচ্ছিলে গা এতক্ষণ?

শ্বশ্রূর কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ এই বিরক্তির আভাসে বিস্মিত বধূ ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি রোজ এমনি সময়ে গা ধুই, না কাপড় ছাড়ি মা? এখনো ত আমার রান্নাঘরেরই কাজ মেটে না! তার পরে—

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তার পরের কাজ তার পরে হবে বৌমা, এখন যা বলি শোন।

বধূ যাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, যাই প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেই বসি।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া উঠিলেন—আমার কাছে এখন মিছিমিছি বসে থেকে কি হবে বাছা! কাজ আগে, না বসা আগে? দিন দিন তুমি কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছো বৌমা!

তাঁহার স্নেহের অনুযোগ হঠাৎ তিরস্কারের আকার ধরিতেই কথাগুলো অত্যন্ত শক্ত ও রুক্ষ হইয়া কিরণময়ীর কানে গিয়া বিঁধিল। সেও রাগ করিয়া জবাব দিল, তোমরাই আমাকে কি-রকম করে তুলচ মা। সব সময়ে উলটো উলটো কথা বললে শোনা চুলোয় যাক, বুঝতেই ত পারা যায় না। কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করেই বল না? বলিয়া উত্তরের জন্য মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বধূর দ্রুতপদে চলিয়া যাওয়া যে কি, তাহা এ বাড়ির সকলেই বুঝিত, অঘোরময়ীও বুঝিলেন।

কিরণময়ী নীচে-উপরে আলো জ্বালিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘরে যখন প্রদীপ দিতে আসিল, তখন শাশুড়ী কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার কান্না যখন-তখন, যে-সে কারণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কিরণময়ী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার হরিনামের মালাটা এনে দেব মা?

শাশুড়ী বালাপোশের কোণে চোখ মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন, দাও।

সে ঘরে গিয়া দেয়ালে টাঙ্গান মালার ঝুলিটা পাড়িয়া আনিয়া হাতে দিতে গেলে তিনি ঝুলিটা না লইয়া বধূর হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া একটুখানি বসো মা, বলিয়া টানাটানি করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া তাহার মুখে কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিরণময়ী শক্ত হইয়া বসিয়া এই-সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

খানিক পরে অঘোরময়ী আর একবার বালাপোশের কোণে চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, শোকে-তাপে আমি পাগল হয়ে গেছি, আমার সামান্য একটা কথায় রাগ করলে কেন বল ত মা?

কিরণ অবিচলিতভাবে বলিল, শোক-তাপ তোমার ত একলার নয় মা। আমরাও মানুষ, সেটা ভুলে গিয়ে একটা কথা বলাই যে যথেষ্ট। না হলে হাজার কথাতেও রাগ হয় না।

অঘোরময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সে কথা কি জানি না মা, জানি। কিন্তু আমার একে একে সবাই গেল, এখন তুমিই আমার সব, তুমিই আমার ছেলেমেয়ে। হারানের শোকে যদি বুক বাঁধতে পারি, ত তোমার মুখ চেয়েই পারব। বলিয়া আর একবার বালাপোশ চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু, এ ছলনায় কিরণ ভুলিল না। সে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়াও শান্তভাবেই বলিল, তুমি কি করে বুক বাঁধবে, সেটা এখন থেকে ঠিক করে রেখেচ, কিন্তু আমি কি করে বুক বাঁধব, সেটা ত ভাবোনি মা! আবার তাও বলি— এ-সব কথা এখনি বা কেন? যখন সত্যই বুক বাঁধাবাঁধির দিন আসবে, তখন সময়ের টানাটানি হবে না; ও-সময় এত কম করে আসে না, মা, যে আগে থেকে ঠিক হয়ে না থাকলে সময়ে কুলোয় না।

বধূর কথাগুলি মধুর না শুনাইলেও ইহার ভিতরে যে কতখানি শ্লেষ ছিল, অঘোরময়ী ধরিতে পারিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, সময় আসা বৈ কি মা, উপীন সেদিন যে সাহেব ডাক্তারকে এনেছিলেন, তিনিও ত ভাল কথা কিছুই বলে গেলেন না। আমি তাই কেবলি ভাবছি বৌমা, উপীন যদি এ সময়ে না এসে পড়ত, তা হলে কি দুর্দশাই না আমাদের হতো।

বৌ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া তিনি একটু উৎসাহিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন, ওকে ছেলেবেলা থেকেই জানি কিনা! ন'খালিতে ওরা দুটি ভায়ের মত আসত যেত— তখন হতেই আমাকে মাসী বলে ডাকত। যেমন বড়লোকের ছেলে,

তেমনি নিজেও বড় হয়েছে। সেদিন আমাকে কাঁদতে দেখে বললে, মাসীমা, আমাকে হারানদার ছোট বলেই মনে করবেন, এর বেশী আমার আর কিছুই বলবার নেই। আমি বললুম, বাবা, আমাকে কোন একটি তীর্থস্থানে রেখে দিস। যে-ক'টা দিন বাঁচি, যেন গঙ্গাস্নান করতে করতে মা গঙ্গার কোলে আমার হারানের কাছে যেতে পারি।

আর তিনি বলিতে পারিলেন না, এইবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বৌ চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। তিনি কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভার লঘু করিয়া পরিশেষে চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, থেকে থেকে এই কথাই মনে ওঠে, ও যদি না এসে পড়ত! নীচে কে ডাকলে না বৌমা?

বৌ কহিল, নীচে ঝি বাসন ধুচ্ছে, কেউ ডাকলেই খুলে দেবে।

শাশুড়ী অস্থির হইয়া বলিলেন, না না বৌমা, তুমিই যাও। ঝি কাজে ব্যস্ত থাকলে কিছুই শুনতে পায় না।

কিরণ কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমারও কাজ আছে মা, খাবার তৈরী—

অঘোরময়ী অকস্মাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন—খাবার ত পালিয়ে যাচ্চে না বাছা! তুমি কিছুই বোঝ না কেন গা? যে না হলে—

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার বুঝেও কাজ নেই। আমাদের আপনার লোক সবাই গেলেও যদি আমাদের দিন চলে ত উপীনবাবু না থাকলেও আটকাবে না।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরময়ী ক্রোধে কথা কহিতে পারিলেন না; এবং যতক্ষণ বধূকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাঁহার জ্বলন্ত চোখ দুটো আগুন ছড়াইয়া তাহাকে যেন ঠেলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিল। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রোধের সহিত ঝিকে পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। সে শীতের ভয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই খনখন ঝনঝন শব্দ করিয়া মাজা-ধোয়া সারিয়া লইতেছিল,

তাঁহার ক্রুদ্ধ আহ্বান শুনিতে পাইল না। তখন ঘরের প্রদীপটা হাতে লইয়া বারান্দার ধারে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুই কি কানের মাথা খেয়েচিস লা? শুনতে পাসনে, উপীনবাবু একঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কচ্চেন!

এ চীৎকার ঝি শুনিতে পাইল এবং উপেন্দ্রর নাম শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া কবাট খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু, কেহই নাই। বাহিরে গলা বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, ভাল করিয়া দেখিয়াও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেউ নেই ত মা!

অঘোরময়ী প্রদীপ-হাতে উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, নেই কি রে! আমি যে নিজের কানে তার ডাক শুনলুম। তুই গলির মধ্যে গিয়ে একবার দেখলি নে কেন?

ঝি বলিল, দেখেছি, কেউ নেই।

কথাটা বিশ্বাস করিবার মত নয়। উপীন কাল আসে নাই, আজও আসিবে না? তাই বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, তুই আর একবার ভাল করে দেখ্ দেখি, কেউ আছে কিনা?

বাহিরে অন্ধকার গলির মধ্যে যাইতে ঝির আপত্তি ছিল। সেও বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, তোমার এ কি কথা মা! তিনি কি লুকোচুরি খেলচেন যে, অন্ধকার গলির মধ্যে গিয়ে হাতড়ে দেখতে হবে!—বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অঘোরময়ী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। পীড়িত সন্তানের সংবাদ লইবার উৎসাহও তাঁহার রহিল না। তাঁহার ফিরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে কাল আসে নাই, আজিও আসিল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারূপ কারণ খুঁজিয়া ফিরিবার মধ্যে এ কথাটি তাঁহার কিন্তু একবারও মনে হইল না যে, সে কলিকাতাবাসী নহে, অন্যত্র তাহার বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন আছে—তথায় ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভব। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ

তাঁহার মনে হইল, রাগ করে নাই ত? কথাটা আবৃত্তি করিতেই তাঁহার অন্তঃকরণ আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং বধূর ক্ষণপূর্বের আচরণের সহিত মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়াই সন্দেহ সুদৃঢ় হইল,—তাই ত বটে! বৌ যদি এমন কিছু—তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

কিরণময়ী প্রজ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। জ্বলন্ত ইন্ধনের উজ্জ্বল রক্তাভ আলোক প্রচুর পরিমাণে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। মাথায় কাপড় ছিল না, আজ সে চুল বাঁধে নাই—এলোমেলো চুলের রাশি কোনমতে জড়াইয়া রাখিয়াছিল।

অঘোরময়ী দ্বারের সম্মুখে নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ যে বস্তুটি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। যে স্তব্ধ মুখের উপরে উনানের রক্তাভ আলোক বিচিত্র তরঙ্গের মত খেলিয়া ফিরিতেছিল, সেই মুখ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে। এ মুখে খুঁত আছে কিনা সে আলোচনা চলে না। নিখুঁত বলিয়াও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহা আশ্চর্য! ইহাকে পূর্বে দেখেন নাই—ইহা অপূর্ব! নির্নিমেষ-চোখে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ দিয়া তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সেই শব্দে বধূ চকিত হইয়া দেখিল শাশুড়ী দাঁড়াইয়া। স্খলিত আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া কহিল, তুমি এখানে কেন মা?

স্বর শুনিয়া তাঁহার আরও চমক লাগিয়া গেল; এমন শান্ত, এমন করুণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনও শোনেন নাই। খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তুমি একলাটি রান্না করচ মা, তাই একবার বসতে এলুম।

বধূ তাঁহার দিকে একটা পিঁড়ি ঠেলিয়া উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে আবার বিরক্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। গন্ধ যেমন বাতাস আশ্রয় করিয়া ফুলের বাহিরে আসে, অথচ ঝড়ে উড়িয়া যায়, কিরণময়ীর তৎকালীন মনের ভাবটা শাশুড়ীর আকস্মিক আগমনে তেমনি মুহূর্তের মধ্যে

বাহিরে আসিয়াই এই ছদ্ম-স্নেহের ঝড়ে উড়িয়া গেল। ইহা সত্য নহে—কদর্য প্রতারণা মাত্র; কিন্তু কথা কাটাকাটি করিতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না, নিরন্তর ঝগড়া করিয়া সে সত্যই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অঘোরময়ী বলিলেন, ঝিকে একবার ডেকে দিয়ে যাব?

কিরণময়ী অন্তরস্থ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তভাবে বলিল, কি দরকার মা। আমি রোজই একলা রাঁধি—একলা থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। বরং উনি ঘরে একলা আছেন—তাঁর কাছে গিয়ে কেউ বসলে ভাল হয়।

পীড়িত সন্তানের উল্লেখে জননী আঘাত পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই যাই। তুমিও একটু শীঘ্র করে কাজ সেরে চলে এস মা।

ইতিমধ্যে উপেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন, সতীশও আর একটি দিন মাত্র উপেন্দ্রর সঙ্গে হারানকে দেখিতে আসিয়াছিল—আর আসে নাই।সে নিজের ব্যথা লইয়াই বিব্রত ছিল। উপেন্দ্র তাহার অন্যমনস্ক ভাব এবং এ বাটীতে আসিতে অনিচ্ছা জানিয়া তাহাকে আর আহ্বান করেন নাই, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা একাকীই স্থির করিতেছিলেন। শুধু কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার দিন সতীশকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে এবং তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ সতীশ ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই উপেন্দ্রর পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন,—ভরসা করি, তোমার লেখাপড়া ভালই হইতেছে। কয়দিন হারানদার সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়াছি। যদিও জানি, সংবাদ দিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই দাও নাই, তথাপি তাঁহার চিকিৎসাটা কিরূপ হইতেছে, লিখিয়া জানাইবে।

সতীশের পিঠে চাবুক পড়িল। সে একদিনও যাইয়া সংবাদ লয় নাই। ইতিমধ্যে ও-বাটীতে কত কি ঘটিয়া থাকিতে পারে, অথচ, তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া উপীনদা বাড়ি গিয়াছেন। সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। বেহারী

জলখাবার আনিতেছিল, ধাক্কা খাইয়া তাহার থালা গেলাস ছড়াইয়া পড়িল—সতীশ ফিরিয়া দেখিল না। রাস্তায় আসিয়া একখানা খালি গাড়িতে চড়িয়া বসিল এবং দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিয়া পথের দিকে সতর্ক হইয়া রহিল। তাহার ভয় ছিল পাছে চিনিতে না পারায় গলিটা পার হইয়া যায়। মিনিট-কুড়ি পরে, যখন গাড়ি ছাড়িয়া সে ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও বেলা আছে। পায়ের নীচে খোলা নর্দমা ও চলিবার পথ, এবং মাথার উপরে আকাশ ও আলো তখনও অন্ধকারে একাকার হয় নাই। দ্রুতপদে হাঁটিয়া ১৩ নম্বর বাটীর সম্মুখে আসিতেই কবাট খুলিয়া গেল। কে যেন তাহারি জন্য অপেক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া ছিল। সতীশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, সহসা প্রবেশ করিতে পারিল না।

কবাটের পার্শ্বেই কিরণময়ী, সে তাহার হাসিমুখ একটুখানি বাহির করিয়া ভারী সমাদরের সহিত কহিল, এস ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে রইলে যে!

আবার সেই ঠাকুরপো! লজ্জায় সতীশের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু, তখনি সামলাইয়া লইয়া বিনীতভাবে কহিল, আপনি দেখচি আমাকে এখনো মাপ করেন নি।

কিরণময়ী কহিল, না, তুমি ত মাপ চাওনি। চাইবার আগেই গায়ে পড়ে দিলে, মানী লোকের অমর্যাদা করা হয়। অমর্যাদা করবার মত কম-দামী জিনিস ত তুমি নও ঠাকুরপো।

তাহার এই প্রসন্ন রহস্যালাপের মধ্যেও এমন একটা গভীর কারুণ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সতীশ আনতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কোন দাম নেই বৌঠাকরুন! আমার কোন অমর্যাদা হবে না—আমাকে আপনি মাপ করুন।

কিরণময়ী একটুখানি হাসিয়া বলিল, এমন জিনিস অনেক আছে ঠাকুরপো, যাকে ক্ষমা করলেই তার শেষ হয়ে যায়। আজ তোমাকে ক্ষমা করতে গিয়ে যদি আবার সতীশবাবু বলে ডাকতে হয়, তা হলে বলে রাখচি ঠাকুরপো, সে ক্ষমা তুমি পাবে না। তোমাকে ধরে রাখবার ঐ একটুখানি শেকল তুমি নিজে

আমার হাতে তুলে দিয়েচ, সেটি যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফিরিয়ে নেবে, তত নির্বোধ এই বৌঠাকরুনটি নয়। এই বলিয়া সে একটু বিশেষভাবে ঘাড় নাড়িল। কিন্তু সতীশ চমকাইয়া উঠিল। এই শিকল-বাঁধাবাঁধির উপমাটা তাহার ভাল লাগিল না, বরং হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহাকে অসাবধান পাইয়া এই মেয়েটি যেন সত্যই কিসের শক্ত শিকল তাহার পায়ে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহূর্তেই তাহার সমস্ত সহজবুদ্ধি আত্মরক্ষার্থে সাজিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় তাহার চক্ষে যে দৃষ্টি কর্তব্য-ত্রুটির ধিক্কারে কুণ্ঠিত ও লজ্জায় বিনম্র দেখাইয়াছিল, ধাক্কা খাইয়া তাহা সন্দিগ্ধ ও তীব্র হইয়া উঠিল।

কিরণময়ী কহিল, তোমার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেছে ঠাকুরপো, হয়ত এখনো জল খাওয়াও হয়নি। এস, কিছু খাবে চল।

সতীশ কিছুই না বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল এবং এই সমস্ত রহস্য-কৌতুকের কতটুকু শুধুই রহস্য এবং কতটুকু নয়, অত্যন্ত সংশয়ের সহিত ইহাই বিচার করিতে সে এই রহস্যময়ীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

উপরে উঠিয়া বৌ ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আজ ঝিকে নিয়ে মা কালীবাড়ি গেছেন। রান্নাঘরে বসে তুমি আমার লুচি বেলে দেবে, আমি ভেজে তুলব—পারবে ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি যে পারবে, সে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়—এস।

সতীশ অন্তরের দ্বন্দ্ব থামাইয়া রাখিয়া ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করিল, লুচি বেলতে পারি সে কথা কি আমার গায়ে লেখা আছে বৌঠাকরুন?

কিরণময়ী বলিল, লেখা পড়তে জানা চাই ঠাকুরপো। সে রাত্রে আমার গায়েতেই কি কিছু লেখা ছিল—অথচ তুমি পড়েছিলে?

সতীশ আবার মুখ হেঁট করিল। রান্নাঘরে গিয়া প্রথমে এমনিধারা ঠোকাঠুকি এবং তার পরে দুজনে মিলিয়া খাবার তৈরির মধ্যে যখন এই সংঘর্ষের উত্তাপ অনেকটা শীতল হইয়া গেল, তখন কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার

অনেক কথাই তোমার উপীনদার মুখে শুনেছি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তিনি এখন এখানে নেই বুঝি? বাড়ি ফিরে গেছেন, না?

সতীশ, 'হাঁ' বলিলে, কিরণময়ী কহিল, আমি জানি, তিনি এখানে নেই, কিন্তু মা বিশ্বাস করতে চান না। মা বলেন, তাঁকে না জানিয়ে উপীনবাবু কখনই যাবেন না—তাঁকে বুঝি হঠাৎ যেতে হয়েছে?

সতীশ ইহা ঠিক জানিত না। বস্তুতঃ সে কিছুই জানিত না। ইতিমধ্যে ইহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া দুই বন্ধুতে যে-সকল অপ্রিয় কথা হইয়া গেছে, তাহাও বলা যায় না—সতীশ চুপ করিয়া রহিল। তাঁহার না বলিয়া চলিয়া যাইবার কারণ সে কিছুতেই অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু কিরণময়ী কথাটা চাপা পড়িতে দিল না, কহিল, কাজটা তোমার দাদার ভাল হয়নি ঠাকুরপো, জানিয়ে গেলে কেউ তাঁকে ধরে রাখত না, অথচ, মা এমন ভেবে সারা হতেন না। আমি কোন রকমেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে যে, উপেনবাবু চিরকাল এ দেশেই থাকেন না; অন্যত্র তাঁর ঘর-বাড়ি আছে, কাজকর্ম আছে—এ-সমস্ত ছেড়ে কতদিন মানুষে পরের দুর্ভাগ্য নিয়ে আটকে থাকতে পারে? কিন্তু বুড়োমানুষের কাছে কোন যুক্তিই যুক্তি নয়—তাঁদের নিজের প্রয়োজনের বাড়া সংসারে আর কিছু তাঁরা দেখতেই পান না।

সতীশ সে কথার ঠিক জবাব না দিয়া বলিল, উপীনদা এতদিন বাইরে ছিলেন, এই ত আশ্চর্য! কোথাও বেশিদিন থাকা তাঁর স্বভাব নয়। বিশেষ, বিয়ের পর থেকে একটা রাতও কোথাও রাখতে হলে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। আগে, সমস্ত বিষয়েই তিনি আমাদের কর্তা ছিলেন, এখন, একে একে সব ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণ নিয়েছেন—আদালতে নিতান্তই না গেলে নয়, তাই বোধ করি, একটিবার যান। এই একবার দেখুন না—

বৌ বাধা দিয়া বলিল, বসো ঠাকুরপো, তোমার খাবার জায়গা করে দিয়ে বসি। তুমি খেতে খেতে গল্প করবে, সেই বেশ হবে। বলিয়া আসন পাতিয়া

থালের উপর পরিপাটি করিয়া আহার্য সাজাইয়া দিয়া কাছে বসিয়া একান্ত আগ্রহের সহিত বলিল, তার পরে?

সতীশ একখণ্ড লুচি মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, সে একটা বিয়ে দিতে যাবার কথা, বৌঠাকরুন! উপীনদা একজন মস্ত ঘটক—কত লোকের যে বিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই। আমাদের দলের একটি ছেলের বিয়ে, উপীনদা ঘটকালি থেকে শুরু করে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন নিজের হাতে করেন। অথচ, বিয়ের রাত্রে দাদাকে আর পাওয়া গেল না। ছোটবৌর শরীর ভাল নেই বলে কিছুতেই ঘর থেকে বার হলেন না। আমরা সমস্ত লোক মিলে ওঃ—সে কি অনুরোধ, বৌঠাকরুন! কিন্তু কিছুতেই না। পাথরের দেবতা হলে বর পাওয়া যেত, কিন্তু উপীনদাকে রাজী করা গেল না। ভাল আছি বলে ছোটবৌ নিজে অনুরোধ করাতে বললেন, তোমার ভাল-মন্দ বিবেচনা করবার ভার আমার ওপরে, তোমার নিজের ওপরে নয়, তুমি চুপ করো।

কিরণময়ী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত বিগত জীবন, তাহারই হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃস্থলে নামিয়া আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া কি যেন একটা রত্ন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সতীশ কিছুই বুঝিল না। কোন্ কাহিনী কোথায় কি করিয়া বাজে, সে তার কি সংবাদ রাখে! সে বলিয়া চলিল, এই অনুপস্থিতিতে কে কিরূপ নিন্দা করিয়াছিল, কে কি বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছিল, কত আনন্দ পণ্ড হইয়াছিল, এই-সব।

কিন্তু শ্রোতা কোথায়? এই তুচ্ছ কাহিনী হইতে কিরণময়ী তখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ একসময়ে সতীশ তাহার লুচি খাওয়া ও গল্প বলা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি শুনচেন না—কি ভাবচেন?

কিরণময়ী চকিত হইয়া হাসিয়া বলিল, শুনচি বৈ কি ঠাকুরপো! কিন্তু আমি বলি, অসুখ-বিসুখে যত্ন করাই ত ভাল।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি করা কি ভাল? এই সেবার ছোটবৌর পান-বসন্ত হয়েছিল, উপীনদা আট-দশদিন তাঁর শিয়র থেকে উঠলেন না। বাড়িতে এত লোক আছে, তাঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল?

কিরণময়ী ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার উপীনদা কি ছোটবৌকে বড্ড ভালবাসেন?

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল, ওঃ—ভয়ানক ভালবাসেন।

কিরণময়ী আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ছোটবৌ দেখতে কেমন ঠাকুরপো? খুব সুন্দরী?

হাঁ, খুব সুন্দরী।

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার মতন?

সতীশ মুখ নীচু করিয়া রহিল; খানিক পরে কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এ কথা সত্যিই জানতে চান?

সত্যি বৈ কি ঠাকুরপো।

সতীশ বলিল, দেখুন, আমার মতামতের বেশী দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তা হলে এই বলি আমি, আপনার মত রূপ বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই।

কিরণময়ী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে নীচে ডাকাডাকির শব্দে সে উঠিয়া পড়িল। মা কালীবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সতীশ তাহার জল-খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই অঘোরময়ীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তিনি মুখপানে চাহিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপীনের ভাই না বৌমা? সে কোথায়?

কিরণময়ী বলিল, তিনি বাড়ি ফিরে গেছেন।

অঘোরময়ী সংক্ষেপে 'ভাল' বলিয়া তাঁহার সিন্দূর ও চন্দনচর্চিত মুখখানি কালি করিয়া তাঁহার ছেলের ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সতীশ কহিল, আমি তবে যাই বৌঠাকরুন।

কিরণময়ী অন্যমনস্কভাবে বলিল, এস।

সতীশ দুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উপীনদা চিঠি দিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, হারানদার চিকিৎসা কিরূপ হচ্ছে।

কিরণময়ী বলিল, চিকিৎসা বন্ধ আছে। যে ডাক্তার দেখছিল, তাঁকে দেখান অমত; অথচ, কি মত, তাও বলে যাননি।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি কথা! চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করে বসে আছেন—এ কি রকম ব্যবস্থা?

ব্যবস্থা না করেই তিনি চলে গেছেন। আমার মনে হচ্চে, একবার যেন তিনি বলেছিলেন, সতীশ রইল, সে-ই ব্যবস্থা করবে—তুমি তো আসনি ঠাকুরপো।

সতীশ ক্ষণকাল অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালেই আসব, বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ চলিয়া গেলে, কিরণময়ী স্বামীর ঘরের কবাট একটুখানি খুলিয়া দেখিয়া লইল, তিনি একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া মায়ের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। তাঁহার আজো সন্ধ্যায় জ্বর আসে নাই, এই খবরটুকু লইয়াই সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল, এবং বাহিরের অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া অপূর্ব মমতার সহিত এইটুকুকে মনের মধ্যে লালন করিতে লাগিল। আজ সতীশের মুখে উপেন্দ্রর অধঃপতনের ইতিহাস তাহার সমস্ত বক্ষ মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, আজ তাই যাহা কিছু এখানে আসিয়া পড়িল, তাহাই মধুর হইয়া কিরণময়ীকে অনির্বচনীয় রসে স্নিগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

সতর

সে রাত্রে সতীশ চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত কিরণময়ী অন্ধকার বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং রান্না চাপাইয়া দিয়া পুনর্বার স্তব্ধ হইয়া বসিল।

তাহার বুকের মাঝখানে আজ সতীশ নিজের অজ্ঞাতসারে আসর বাঁধিয়া সুরবালা প্রভৃতি অপরিচিত নর-নারীর দল আনিয়া এই যে এক অদ্ভুত নাটকের অস্পষ্ট অভিনয় শুরু করিয়া দিয়া সরিয়া গেল, নির্জন ঘরের মধ্যে একলাটি বসিয়া তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার লোভ একদিকে কিরণময়ীর যেমন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে কিসের অনির্দেশ্য শঙ্কায় তাহার হাত-পা চোখের দৃষ্টি তেমনি ভারী করিয়া দিতে লাগিল। এ যেন অন্ধকার রাত্রির ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পের মত তাহাকে ক্রমাগত এক-হাতে টানিতে এবং আর-হাতে ঠেলিতে লাগিল। এমনি করিয়া বিচিত্র স্বপ্নজালের মধ্যে সে যখন নিরতিশয় অভিভূত তেমনি সময়ে জুতার পদশব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বারের বাহিরেই ডাক্তার অনঙ্গমোহন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিরণময়ী মাথার কাপড় অনেকখানি টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার ইহা দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলেন।

ইতিপূর্বে এই ডাক্তারটি ঠিক এই জায়গায় অনেকবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং পদ্মহস্তের রান্নার লোভে অতিথি হইবার আবেদন জানাইয়া পুনঃ পুনঃ রহস্য করিয়া গেছেন, সেই পুরাতন পরিহাসের পুনরাবৃত্তির কল্পনা করিয়াই কিরণময়ীর সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কঠিন হইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ডাক্তার রহস্য করিলেন না, ক্রুদ্ধ গম্ভীর-মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দশ-বারো দিন বাইরে থাকতে

হয়েছিল বলে হারানবাবুর জন্য বড় চিন্তিত হয়েছিলুম, কিন্তু এসে দেখচি উদ্বেগের কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না উনি ভালই ছিলেন।

ভাল থাকলেই ভাল। আমাকে তাহলে আর আবশ্যক নেই, কি বল?

কিরণময়ী তাহার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

ডাক্তার কহিলেন, তোমাদের আবশ্যক না থাকলেও আমার আবশ্যক এখনও শেষ হয়নি, এইটুকু বলবার জন্যই আমাকে এতদূর পর্যন্ত আসতে হলো।

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, বেশ ত, মা এখনও জেগে আছেন, তাঁকে বলা দরকার—আমাকে বলা নিরর্থক।

ডাক্তার মুখখানা অতি ভীষণ করিয়া পুনর্বার কহিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকেই আসচি। তিনিও বলেন, প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন যে শেষ হয়েচে, সে আমিও বুঝেচি, কিন্তু ডাক্তার-বিদায় বলে একটা কথা আছে, সেটা ভুলে গেলে ত চলে না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার শ্লেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ পাঁচ-ছ' মাস পরে এই ভারটা তুমিই নেবে, কিংবা তোমার শাশুড়ীই নেবেন, সে তোমাদের কথা, কিন্তু যাও বললেই ত ডাক্তার যায় না কিরণ।

ডাক্তারের মুখ দিয়া তাহার নিজের নাম আজ হঠাৎ যেন তীরের মত তাহাকে বিঁধিল। সে এমনি শিহরিয়া উঠিল যে, ওই ক্ষীণ আলোকেও ডাক্তার তাহা দেখিতে পাইলেন।

কিরণময়ী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান আপনি, টাকা?

ডাক্তার হাসির ভান করিয়া বলিলেন, 'আপনি' কেন কিরণ? এখানে আর কেউ উপস্থিত নেই, 'তুমি' বললেও দোষ হবে না। কিন্তু এতদিন কি চেয়েছিলুম শুনি? সে কি টাকা?

পুনর্বার কিরণময়ীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিলেন, টাকা চাইনে এ কথা বলা শক্ত। এখন তোমার ও-অভাব যখন নেই, তখন টাকা দিয়েই বিদেয় কর। আমি—দু'দিকেই ঠকতে রাজী নই। কিন্তু, তুমি যে এতদিনে আমার মনের কথাটা টের পেয়েছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আজ আর বেশী বিরক্ত করব না, বলি, কাল একবার আসতে পারি?

এই লোকটি ভিতরে ভিতরে যে কিরূপ দগ্ধ হইতেছিল এবং এই-সমস্ত যে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ভস্মাবশেষ, কিরণময়ী তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াও শান্ত-দৃঢ়স্বরে মুখ তুলিয়া কহিল, না। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনি এনে দিচ্ছি, বলিয়াই পাশের দরজা খুলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

এইবার ডাক্তার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিরণকে তিনি চিনিতেন। কোথায় কি যে আনিতে গেল, হঠাৎ এত রাত্রে কি একটা অসম্ভব কাণ্ড করিয়া কোথাকার হাঙ্গামা কোথায় টানিয়া আনিবে, এই দুর্ভাবনা তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই চাপিয়া ধরিল। সে আঘাত খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া

নির্দয় প্রতিঘাত করিবেই। সেই নিঃসন্দেহ প্রতিশোধের কঠোরতা কল্পনা করিয়া অনঙ্গমোহন আশঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

ফিরিয়া আসিতে কিরণময়ীর বিলম্ব হইল না। সে নীরবে নতমুখে আঁচলে বাঁধা কতকগুলা অলঙ্কার ডাক্তারের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, এই নিন আপনি। আপনার দাবী যে কত, সে হিসাব এতদিন পরে করতে যাওয়া বৃথা। অত সময়ও আমার নেই, ধৈর্যও থাকবে না—যা-কিছু আমার ছিল, সমস্তই আপনাকে এনে দিয়েছি, এই নিয়ে আমাদের মুক্তি দিন,—আপনি যান।

অনঙ্গ পাংশুমুখে চুপ করিয়া রহিলেন; কিরণ কহিল, দেরী করচেন কিসের জন্য? বিশ্বাস করুন, আর আমার কিছুই নেই—যা ছিল সমস্তই এনে দিয়েচি—রাত হচ্চে, আপনি বিদেয় হোন।

অনঙ্গ সভয়ে বলিলেন, আমি ত তোমার গায়ের গয়না চাইনি—টাকা চেয়েছিলুম মাত্র। তাও—

কিরণ অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, গয়না যে টাকা, সে কথা বোঝবার বয়স আপনার হয়েচে। অনর্থক ছুতো করে কেন মিছে দেরী করচেন!

এবার অনঙ্গ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, না, আমি কিছুতেই এ-সব নিতে পারব না।

কিরণময়ী অদূরে বসিয়া পড়িয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেন পারবেন না? আপনি দয়া করচেন কাকে? আপনাকে যা দিলুম, কোনমতেই আর তা ফিরিয়ে নিতে পারব না, এ কথা নিশ্চয় বললুম। একমুহূর্তে মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি যদি নাও নেন, কাল সমস্তই গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেব, কিন্তু বাড়িতে রেখে কোনমতেই আমার স্বামীর অকল্যাণ করব না,—বলিয়া পা দিয়া সেগুলা ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, নিন তুলুন ও-সব! শেষ কথাগুলা এতই কঠিন শুনাইল যে, হতবুদ্ধি অনঙ্গমোহন হেঁট হইয়া সেগুলা কুড়াইতে লাগিলেন।

কিরণময়ী ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া উগ্রতা সংবরণ করিয়া নিরতিশয় ঘৃণাভরে কহিল, নিয়ে যান। এ-সব চিহ্ন এ বাড়িতে থাকা পর্যন্ত আমার মুখে অন্নজল রুচবে না, চোখে ঘুম আসবে না।

ডাক্তার সবগুলি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিরণময়ী অধীরভাবে কহিল, রাত অনেক হলো যে!

ডাক্তার কহিলেন, যাচ্চি। কিন্তু তুমিও ভুল করলে। এ-সব আমি দিইনি, সমস্তই তোমার নিজের। তবুও কেন যে আমি না নিলে গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবে, বুঝতে পারলুম না। আমাকে মাপ কর কিরণ।

কিরণময়ী ধমকাইয়া উঠিল—আবার নাম করে! হাঁ, ওগুলো আমার জিনিসই বটে, কিন্তু ঐ-গুলোর মায়াতেই আপনার সাহায্য নিয়েছিলুম।—রাত ঢের হলো যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার নিজের নাম-ছাপানো একখণ্ড কার্ড বাহির করিয়া বলিলেন, আমার বাড়ির ঠিকানাটা—

দিন,—বলিয়া কিরণময়ী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল এবং পিছাইয়া আসিয়া জ্বলন্ত উনানে উহা নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এর বেশী আমার আবশ্যক হবে না। আপনি এইমাত্র ক্ষমা চাইছিলেন না? আপনাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারব বলেই আপনার সমস্ত ঋণ, সমস্ত সম্বন্ধ, নিঃশেষ করে দিলুম। কোনদিন কোন কারণে যেন আপনাকে আমার মনে না পড়ে, যাবার সময় শুধু এই কথা বলে যান। আর কোনরূপ প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার রান্নার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

বাহিরে ডাক্তারের পায়ের শব্দ যখন তাহার কানে দূরে চলিয়া গেল, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া

দেখিল, উনুন নিবিয়া গিয়াছে। ফুঁ দিয়া জ্বালিয়া দিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গেছে, তথাপি সে উঠিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাহিরের অন্ধকারে তখনও কি-একটা আতঙ্ক যেন তাহারই জন্য হাত বাড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বুকের ভিতরটা এমনি অশান্ত হইয়া উঠিল যে, দুই বাহু দিয়া সজোরে চাপিয়া রাখিল। এই বিদায়ের পালাটা একদিন তাহাকে সমাপন করিতেই হইবে, ইহা সে নিশ্চয় জানিত, কারণ আগাছা তাহার সর্বদেহে মূল বিস্তার করিয়া তাহাকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করিতেছে এ কথা সে যতই মনে করিয়াছে, ততই মন তাহার তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই

বীভৎস বন্ধনপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার মত জোর সে নিজের মধ্যে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এমনি করিয়া দিন বহিয়া গিয়াছে—অনুক্ষণ সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সেই এতবড় শক্ত কাজটা যে এত সহজে হইয়া গেল, তাহাই কিরণময়ী চুপ করিয়া বসিয়া অন্তরে

অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। প্রয়োজনের অনুরোধে যে পাপ নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড় করিয়াছে, সে যে আজ ‘যাও’ বলিতেই গেল, এমন অসম্ভব কেমন করিয়া হইল! মান-ভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্নাকাটি, মর্মস্পর্শী অনুনয়-বিনয়, এ কাজের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারগুলা যাহার কল্পনামাত্র তাহাকে প্রতিদিন তপ্তশেলে বিঁধিয়া গেছে, সে-সমস্তই যে বাকী রহিল! সে কি আর একদিনের জন্য, না সত্যই সমস্ত নিঃশেষ হইল!

হঠাৎ দুয়ার খোলার শব্দে কিরণ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ঝি বলিতেছে, উনুন নিবে যে জল হয়ে গেছে বৌমা! রাতও ত কম হয়নি।

কিরণময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার আছে, না গেছে রে?

সে ত প্রায় দু’ঘণ্টা হলো; হাতের প্রদীপটা উজ্জ্বল করিতে করিতে বলিল, কিন্তু তোমাকেও বলি বৌমা,—অকস্মাৎ জিহ্বা তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সম্পূর্ণ নিরাভরণা বধূর সর্বাঙ্গ বার বার নিরীক্ষণ করিয়া মেঝের উপর প্রদীপটা ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,—এ-সব কি কাণ্ড বৌমা!

আঠার

দিবাকরের বড় দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল। কাল সকালে সে গোপনে বি. এ. ফেল হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিল, এবং সন্ধ্যাবেলায় তাহারই বিবাহের কথাবার্তা তাহারই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপীনদাকে হৃষ্টচিত্তে, পরম উৎসাহে ভট্চায্যি মহাশয়ের সহিত আলাপ করতে শুনিয়া যথার্থই সে অকপটে নিজের মরণ-কামনা করিয়াছিল। সদ্য-পুত্রহারা জননী যেমন ব্যথায় ঘুমাইয়া পরেন, ব্যথায় জাগিয়া উঠেন, সেই হতভাগিনীর মতই আজ সে ব্যথা লইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরের পূর্বদিকের সার্সীর গায়ে আলোর আভাস লাগিয়াছে। আজ, এই আলোকের সহিত সে নিজে লেশমাত্র সম্বন্ধ অনুভব করিল না। দিবসের এই প্রথম রশ্মিকণাটুকুকে যে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিয়া লইতে হয়, এ কথা তাহার মনেও পরিল না। পান্থশালার সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির মুখের মত এই আলোক-কণাটুকুর পানে সে পরম ঔদাস্যভরে চাহিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। স্বচ্ছ কাঁচের বাহিরে অসীম নীলাকাশ দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, এই বিরাট সৃষ্টির কোথাও কোনও কোণে তাহার জন্য একটুকু স্থান আছে কিনা। তাহার পর যতদূর দেখা যায় তলাইয়া দেখিল, না কোথাও নাই। সৃষ্টিকর্তা এত সৃজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপরে, নীচে, আশেপাশে, জলে-স্থলে সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও তাহার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই। তাহার মা নাই, বাপ নাই, গৃহ নাই, বুঝি জন্মভূমিও নাই। না, যথার্থই আপনার বলিতে কোথাও কিছুই নাই। এই যে অতি ক্ষুদ্র কক্ষটুকু, শত-সহস্র বন্ধনে যাহার সহিত সে জড়িত, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যাহা তাহাকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তাহার নিজের নয়—এ তাহার মামার বাড়ি। এ আশ্রয় তাহার জননীর নহে—বিমাতার।

এইরূপে দুঃখের চিন্তা যখন ক্রমশঃ জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়া পারিতেছিল, অকস্মাৎ উপেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে তাহা এক

মুহূর্তে সোজা পথে ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, উপেন্দ্র

ভৃত্যকে কি একটা আদেশ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তিনি ত কোনদিকে না চাহিয়াই সোজা চলিয়া গেলেন, কিন্তু, দিবাকর নিজের সেই দুই চোখে ব্যথা অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মনে হইল, ছোড়দার উন্নত দৃঢ় ললাটের উপর কতকটা সূর্যরশ্মি যেন ধাক্কা খাইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর একবার শয্যা আশ্রয় করিয়া নির্জীবের মত চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং দুশ্চিন্তারাশি তদ্দণ্ডেই তাহাকে আবার চাপিয়া ধরিল।

আজিও অভ্যাসমত তাহার প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল বটে, কিন্তু গত রাত্রিতে সে যে ঘুমাইতে পারে নাই, দুঃস্বপ্ন- ভূতপ্রেতের দল সারারাত্রিই এই দেহটাকে লইয়া টানাছেঁড়া করিয়া এইমাত্র ফেলিয়া গেছে, তাহাদের পরিত্যক্ত নিশ্বাসের বাষ্প এখনও ঘরের কোণে জমা হইয়া আছে, ইহা সে চোখ বুজিয়াই অনুভব করিতে লাগিল। আবার মনে পড়িল, সে ফেল হইয়াছে,—তাহার অনেক দুঃখের লেখাপড়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আজ

এ সংবাদ সবাই শুনিবে। তার পরে? তার পরে ধুঁয়া যেমন একটুখানি রন্ধ্রের সাহায্যে সমস্ত ঘর নিমিষে ব্যাপ্ত করিয়া ঘোলা করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া একটিমাত্র নিষ্ফলতার ক্ষুদ্র দ্বার ধরিয়া নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে তাহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বেলা প্রায় আটটা। সে দুই-হাত মুঠা করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, না, কোন মতেই না। ছোড়দা রাগ করুন, কিংবা বৌদি দুঃখ করুন, এ আমি কিছুতেই পারব না। যিনি গৃহলক্ষ্মী হবেন, হয় তিনি আমার গৃহেই আসবেন, না হয়

কোনদিনই আসবেন না। পারি, সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করব, না পারি অন্ততঃ অসম্মানের মধ্যে টেনে আনব না। এ সঙ্কল্প হতে কেউ আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

দিবাকর ধীর-পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুরবালার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, বৌদি!

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠের আহ্বান আসিল, ঘরে এস।

দিবাকর প্রবেশ করিয়া দেখিল, আলমারি উজাড় করিয়া সুরবালা নতমুখে বসিয়া তোরঙ্গ সাজাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিল, ছোড়্দা মফঃস্বলে যাবেন?

সুরবালা তেমনিভাবে কহিল, না, কলকাতায় যাবেন।

ইহার পরে আর দিবাকরের মুখে কথা যোগাইল না। নিজের নির্জন ঘরের মধ্যে যে শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া এতদূরে আনিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় সে শক্তি অন্তর্ধান করিল। সে মৌনমুখে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া শুরু করা যায়।

এমন সময় বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই উপেন্দ্র পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকলেন। দিবাকর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই উপেন্দ্র ‘দাঁড়া’ বলিয়া ধীরে-সুস্থে খাটের উপর বসিলেন এবং জামা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফেল হলি কি করে? রোজ রাত্রি একটা পর্যন্ত জেগে জেগে এতদিন তবে করেছিলি কি?

এ কথার আর জবাব কি? দিবাকর অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, এ বাড়িতে থেকে তোর কিছু হবে না দেখচি। যা, কলকাতায় গিয়ে পড়্ গে, তা হলে যদি মানুষ হতে পারিস।

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, বৌদির কাছে কি দরবার করতে এসেছিলি? বিয়ে করবি নে, এই ত?

কথা শুনিয়া দিবাকর বাঁচিয়া গেল। তাহার সমস্ত দুঃখ যেন একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে সহসা হাসিয়া ফেলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

উপেন্দ্র হাসিলেন, যদিচ সে হাসির মর্ম্ম কেহ বুঝিল না, তারপরে বলিলেন, আচ্ছা, এখন মন দিয়া পড়্ গে—আগামী অঘ্রান পর্যন্ত তোর ছুটি—তার এখনও অনেক বাকী। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, সতীশ টেলিগ্রাফ করেছে, হারানদার অবস্থা ভারী খারাপ—আমি রাত্রির ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না, এই এগারটার গাড়িতেই যাব, একবার থারমোমিটারটা দাও ত দেখি, জ্বরটা বাড়ল কি না—ওকি, অত বড় তোরঙ্গ কি হবে? একটা ছোটখাটো দেখে দাও না।

সুরবালা কাপড় পাট করিয়া তোরঙ্গ বোঝাই করিতেছিল, কাজ করিতে করিতে মৃদুস্বরে কহিল, ছোট তোরঙ্গে দুজনার কাপড় আঁটবে না,—আমিও সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিলেন, তুমি যাবে! ক্ষেপে গেলে নাকি?

সুরবালা মুখ না তুলিয়াই বলিল, না। পরে দিবাকরের উদ্দেশে কহিল, ঠাকুরপো, একটু শিগগির করে স্নান করে খেয়ে নাও, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

দিবাকর সবিস্ময়ে উপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুইও কি পাগল হলি নাকি? হারানদার ভারী ব্যারাম, বোধ করি দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমি যাচ্চি তাঁর সৎকার করতে, তোরা তার মাঝখানে যাবি কোথায়? যা, তুই নিজের কাজে যা।

সুরবালা এবার মুখ তুলিল। দিবাকরের দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি আদেশ করছি ঠাকুরপো, তুমি প্রস্তুত হও গে। তোমার ছোড়দা তিনদিন জ্বরে ভুগছেন, আজও জ্বর ছাড়েনি—তাই আমিও সঙ্গে যাব, তোমাকেও যেতে হবে। যাও, দেরী করো না।

উপেন্দ্র মনে মনে ভারী আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি ইতিপূর্বে কোনদিন সুরবালার এরূপ কণ্ঠস্বর শোনেন নাই। সে যে স্বচ্ছন্দে একজন পুরুষমানুষকে এমন ছোট ছেলেটির মত হুকুম করিতে পারে, তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে বোধ করি তিনি বিশ্বাস করিতেই পারিতেন না। তথাপি তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, আমি যাচ্চি বিপদের মাঝখানে। তোমরা কেন সঙ্গে গিয়ে সেই বিপদ বাড়িয়ে তুলবে? তোমার যাওয়া হবে না। তাঁহার শেষ কথাটা কিছু কঠোর শুনাইল।

সুরবালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া পূর্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, কেন তুমি সকলের সামনে সব কথায় আমাকে বকো? তুমি অসুখ নিয়ে বাইরে গেলে আমি সঙ্গে যাবোই। নটা বাজে, দাঁড়িয়ে থেকো না ঠাকুরপো, যাও।

দিবাকরের সুমুখে নিজের রূঢ়তায় উপেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, বকবো কেন তোমাকে, বকিনি। কিন্তু বাবা শুনলে কি মনে করবেন বল ত? যা দিবাকর, তুই খেয়ে নে গে।

সুরবালা কহিল, বাবা আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছেন।

এর মধ্যে তাঁর কাছেও গিয়েছিলে?

হাঁ, যাই তোমার দুধ নিয়ে আসি, বলিয়া সুরবালা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। উপেন্দ্র গলার উড়ানিটা আলনা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। সুরবালা যে সঙ্গে যাইবেই, স্বামীর অসুস্থ দেহটা সে যে কিছুতেই চোখের আড় করিবে না, ইহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না। দিবাকর প্রস্তুত হইবার জন্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, জিদ করিয়া সুরবালা এই যে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল, কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাহার কি মীমাংসা করা যাইবে! কোথায় গিয়া উঠা যাইবে! হারানদাদার ওখানে অসম্ভব, কারণ, শুধু যে সেখানে স্থানাভাব, তাহা নহে, সেখানে কিরণময়ীর স্বামী মরিতেছে। তথাপি তাহারই চোখের উপর সুরবালা যে নিজের স্বামীর বিন্দু-পরিমাণ পীড়াটুকুও উপেক্ষা

করিবে না, শোভন-অশোভন কিছুই মানিবে না, স্বামীর স্বাস্থ্যটুকু অনুক্ষণ সতর্ক প্রহরা দিয়া ফিরিবে, ব্যাপারটা মনে করিয়াও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল। বন্ধু জ্যোতিষের বাটীতে উপস্থিত হওয়াও প্রায় তদ্রূপ। সুরবালা বিষম হিন্দু; এই বয়সেই রীতিমত জপ-তপ আরম্ভ করিয়াছে,—সে বাটীতে এতটুকু অহিন্দু-আচার চোখে দেখিলে হয়ত জলগ্রহণ পর্যন্ত করিবে না। অতবড় বাটীর মধ্যে একমাত্র মায়ের আচার-বিচার বিশেষ কোন কাজেই লাগিবে না। তা ছাড়া, সেখানে সরোজিনী তাহার প্রায় সমবয়সী। তাহার বাড়িতে বসিয়া তাহাকেই ছুঁই ছুঁই করিয়া বাস করা সুখেরও নয়, উচিতও নয়। বাকী রহিল সতীশ। উপেন্দ্র শুনিয়াছিলেন, তাহার নূতন বাসায় সে একা থাকে। স্থানও যথেষ্ট। বিশেষতঃ সেও এই জপ-তপের দলভুক্ত। সতীশ ও দিবাকর—আচারনিষ্ঠ এই দুটি দেবর লইয়া সুরবালা ভালই থাকিবে।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সতীশকে তার করিয়া দিলেন, তিনি রওনা হইয়াছেন।

সংবাদ পাইয়া সতীশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ভগবান সতীশকে যথার্থ-ই দেহ-মনে বড় শক্ত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাই সেদিন হইতে মুমূর্ষু হারানের হতভাগ্য পরিবারের সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া যেমন বহিতেছিল, সাবিত্রী বিপিনের ইতিহাসটাও সেদিন সে তেমনি সহ্য করিয়া লইয়াছিল।

এই ইতিহাস জানিত শুধু বেহারী এবং তাহার পরম পূজ্যপাদ চক্রবর্তীমশাই। বেহারী মনে করিত, সে সাবিত্রীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। তাই কাল দুপুরবেলাতেও সে চক্রবর্তীর প্রসাদ পাইয়া ক্ষুদ্র কলিকাটি উপুড় করিয়া দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, ছি, ছি, দেবতা, মেয়েটা করলে কি! বাবুকে আমার সে চিনলে না, তাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধলে। শেষকালে কিনা বিপিনবাবুর সঙ্গে চলে গেল!

চক্রবর্তী হেলিয়া দুলিয়া জবাব দিলেন, বেহারী, নিমাই-সন্ন্যাসে লেখা আছে, ‘মুনিনাঞ্চ মতভ্রম’, না হলে সাবিত্রীর মত মেয়ে এতবড় আহাম্মুকি করে ফেলবে কেন! কিন্তু এই বলে রাখচি তোকে, পস্তাতে তাকে হবেই। মেয়েটা দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, আমার সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে, শুনে শুনে, বাবু—ভায়াদের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইতেও শিখেছিল, যুবোকাল, সতীশবাবুর নজরেও লেগে গিয়েছিল, টিকে থাকতে পারলে আখেরে ভাল হতো। কিন্তু আমার একটা মতলব পর্যন্ত ত নিলে না! ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেলে কি চলে? রাজ্যের লোক বিপদে পড়লেই যে ছুটে এসে এই চক্কোত্তিমশায়ের পা-দুটো ধরে, তা কেন? এই সেদিন সদির মা—

সদির মার ভাল-মন্দের জন্যে বেহারীর কৌতূহল ছিল না, সে কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, কিন্তু যাই বল দেবতা, বাবু বলতে হয় ত আমার মনিবকে। বড়লোক কলকাতা শহরে ঢের দেখলুম, কিন্তু এমন জোয়ান, এমন বুকের পাটা ত কারু দেখলুম না। যেন হাতীকে দাঁত, মরদ্‌কে বাত্‌! সেই যে সেদিন বলে দিলুম, বাবু, আর না, বাস্‌! ঘেন্নায় একটি দিন তার নাম পর্যন্ত মুখে আনলেন না, অথচ, কতখানিই না ভালবাসতেন—কি বলেন ঠাকুরমশাই?

চক্রবর্তী মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, সেকথা ত শুরুতেই বলে দিয়েছি। এই থেকেই যত খুন-জখম, জেল, ফাঁসি—একবার চোখাচোখি হয়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে বিহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; পাংশু-মুখে সভয়ে বলিল, না না, ঠাকুরমশাই, বাবু আমার সে ধাতের লোক নয়। কিন্তু, কোন্‌ ঠিকানায় সে আছে জান কি? এর মধ্যে পথে-টথে কখন—

চক্রবর্তী অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন, মুখ্যু বলে আর কাকে! সে কি বিপিনবাবুর কাছে দাসীবৃত্তি করতে গেছে বেহারী, যে, পথে-ঘাটে দেখা হবে? সে নিজেই এখন কত গণ্ডা দাসদাসী রেখেচে দেখ গে যা!

বেহারী নিরুদ্বিগ্ন হইল। স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে বটে। তাই ত মনে করলুম, যাই একবার ঠাকুরমশায়ের কাছে, দেখি তিনি কি বলেন! তাই বল দেবতা, আশীর্বাদ কর সে রাজরানী হোক, গাড়ি-পালকি চড়ে বেড়াক, দুজনের চোখাচোখি এ জন্মে আর যেন না হয়! এই বলিয়া সে মনের আনন্দে চক্রবর্তীর পদধূলি মাথায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি সতীশ বাসার বাহির হইলেই ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বেহারী এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকিত, পাছে দৈবাৎ কোথাও দুজনের দেখা হইয়া যায়। সতীশ যে অত্যন্ত বদ্‌রাগী, এ সংবাদ সে বাটীর পুরাতন দাসদাসীর মুখে শুনিয়া আসিয়াছিল এবং সাবিত্রী যত বড় গর্হিত কাজ করিয়াছে তাহাতে খুনোখুনি কাটাকাটি হয় ইহাও তাহার এতটা বয়সে অবিদিত ছিল না। শুধু সাবিত্রী যে কোনদিন দাসদাসী লইয়া যানবাহনে চলাফেরা করিতে পারে এই সম্ভাবনাটাই তাহার মাথায় ঢোকে নাই। আজ চক্রবর্তীর মুখের আশ্বাসবাক্যে সে নির্ভর হইয়া বাঁচিল। সাবিত্রীর উপরে বিষম ক্রোধ তাহার পড়িয়া গেল, সে নিরুদ্বেগে পথ চলিতে চলিতে প্রতি মুহূর্তে আশা করিতে লাগিল, হয়ত মস্ত একটা জুড়ির উপর রাজরানী-বেশে এইবার সে সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে। সাবিত্রীকে বেহারী সত্যই ভালবাসিত। সে কি, কিংবা কোন্ পথে তাহার রানী হওয়া সম্ভব, এ-সকল অনাবশ্যক প্রশ্ন তাহার মনে ঠাঁই পাইত না। চিরদিনই সাবিত্রী তাহার পরম স্নেহের, পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। সে দুঃখী, সে তাহাদের মত লোকের সঙ্গে এক আসনে দাঁড়াইয়া দাসীবৃত্তি করে মনে করিতেও তাহার লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা হেঁট হইয়া যাইত। তথাপি সেইদিন হইতে অন্তরে বড় দুঃখ, বড় যাতনা পাইয়াই বেহারী তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ যেই শুনিল, সাবিত্রী তাহার মনিবের পথের কণ্টক, সুখের অন্তরায় নয়, সে সর্বান্তঃকরণে বারংবার আশীর্বাদ করিতে লাগিল, সাবিত্রী সুখী হোক, নির্বিঘ্ন হোক, রাজরাজেশ্বরী হোক।

উনিশ

হারানের জীবন-মরণের লড়াই ক্রমশঃ যেন একটা করুণ তামাশার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুধার্ত সাপের মত মৃত্যু তাহাকে যতই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে জঠরে টানিতেছিল, ব্যাঙের মত ততই সে দুই পায়ে তাহার চোয়াল আটকাইয়া ধরিয়া কোন এক অদ্ভুত কৌশলে দিনের পর দিন মৃত্যু এড়াইয়া যাইতেছিল। বস্তুতঃ, অশেষ দুঃখময় প্রাণটা তাহার যেন কোনমতেই শেষ হইবে না, এমনি মনে হইতেছিল।

এই বিপদে সতীশ আসিয়াছিল সাহায্য করিতে। কিন্তু কিরণময়ীর স্বামী-সেবা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে নিজেও অনেক দেখিয়াছে, স্ত্রীলোকের স্বামীর বড় কেহ নাই, তাহাও জানিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোন মানুষ যে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া এতবড় পণ্ডশ্রম এমন প্রাণ ঢালিয়া করিতে পারে, তাহা ত সে কল্পনা করিতেও পারিত না।

এ কি আশ্চর্য সেবা! প্রত্যহ সারারাত্রি একভাবে শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া সমস্তদিন এ কি অক্লান্ত পরিশ্রম! অথচ, মুখের উপর অবসাদ-বিষাদের দাগটুকু পর্যন্ত নাই। মুখ দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই কতবড় বিপদ তাহার মাথার উপর আসন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সতীশ তাহার এই বৌঠানটিকে যথার্থই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিয়াছিল। তাঁহার এই একান্ত উদ্বেগলেশহীন পতিসেবা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলই মনে হইতেছিল, যে কারণেই হউক, বৌঠানের আশা হইয়াছে স্বামী বাঁচিবেন। অতএব, শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে যে কি বেদনাই বাজিবে ইহাই কল্পনা করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং কি উপায়ে এই

অপ্রিয় সত্য গোচর করা যায়, ইহাই তাহার অনুক্ষণ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন একদিন ছিল, যখন নিজের সম্বন্ধে সতীশের ভারী বিশ্বাস ছিল, সে বুদ্ধিমান; লোকচরিত্র বুঝিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। কিন্তু সাবিত্রীর কাছে ঘা খাইয়া অবধি এ দর্প তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেল, সংসারে ইহাও যখন সম্ভব হইতে পারিল, তখনই সে টের পাইয়াছিল লোকচরিত্র সে কিছুই বুঝে না। মানুষের মনের ভিতর কি আছে, না আছে, তা লইয়া যার খুশী সে আলোচনা করিয়া বড়াই করুক, সে আর করিবে না। কথাটা স্মরণ করিলেও তাহার লজ্জা ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না, যে, এই বুদ্ধির গর্বেই সে এই বৌঠানটির সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়াছিল এবং উপীনদাকে শিখাইতে গিয়াছিল।

আজ সকালে সতীশ ও-বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিল কিরণময়ী তেমনি প্রসন্ন শান্তোজ্জ্বল মুখে একা গৃহকর্ম করিতেছেন। দুই-তিনদিন শাশুড়ী আবার অসুখে পড়িয়াছেন। গত রাত্রে জ্বরটা কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কিরণময়ীর মুখ দেখিয়া কোন কথাই অনুমান করিবার জো ছিল না বলিয়া প্রত্যহ সতীশকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই জানিতে হইত। আজ প্রশ্ন করিতেই তিনি কাজ হইতে মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, আর দেরী করার আবশ্যক নেই, তোমার দাদাকে একবার আসতে লেখ।

সতীশ ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন বৌঠান?

কিরণময়ী মুখের উপর দিয়া শরতের একখণ্ড লঘু মেঘ ভাসিয়া গেল মাত্র। এ মুখের সহিত যাহার বিশেষ পরিচয় নাই, এ ছায়াটুকু তাহার নজরে পড়িবে না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এইবার বোধ করি যন্ত্রণার শেষ হয়ে এসেছে—তুমি একখানা টেলিগ্রাফ করে দাও।

সতীশ ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ আমি জানতুম বৌঠান। কিন্তু পাছে তুমি ভয় পাও, তাই বলতে সাহস করিনি।

কিরণময়ী সহজভাবে বলিলেন, ভয় পাবার কথা বৈ কি ঠাকুরপো, তাঁর শ্বাসের লক্ষণ পরশু টের পাই, কাল রাত্রে আরও একটু বেড়েচে। এ কমবে না, তাই একবার তাঁকে আসতে বলচি।

সতীশ এ খবর জানিত না, চমকিয়া বলিল, কৈ, সে ত আমি টের পাইনি। তুমিও বলনি।

কিরণময়ী কহিলেন, না। ও এত ধীরে ধীরে উঠেচে যে, পরের টের পাবার কথাও না। তবে আজ বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু বিপদের'ওপর বিপদ, দেখ ঠাকুরপো, কাল থেকে মায়ের অসুখটাও বাঁকা পথ-ধরেচে। এইমাত্র দেখলুম বেশ জ্বর, মাঝে মাঝে ভুলও বকচেন,—বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। কিন্তু, এ হাসি দেখিলে কান্না পায়।

সতীশের চোখে জল আসিল, সে সজল-কণ্ঠে আস্তে আস্তে কহিল, উপীনদা আসুন।

কিরণময়ী কহিলেন, আর একটা খবর শুনবে ঠাকুরপো?

সতীশ মৌনমুখে চাহিয়া রহিল, কিরণময়ী বলিলেন, পরশুদিন বিকালে একটা উকীলের চিঠি পাই, তাতে জানা গেল, বছর-দুই পূর্বে উনি এক বন্ধুর জামিন হয়ে হাজার-তিনেক টাকা কর্জ করেন। বন্ধু ব্যবসা ফেল করে সুদে-আসলে প্রায় হাজার-চারেক টাকা এঁর মাথায় তুলে দিয়ে বিষ খেয়ে মরেছেন। সে টাকা এই ভাঙ্গা বাড়ির ইঁট-কাঠ বেচে শোধ হতে পারবে কিনা, উকীল সেই সংবাদটা অতি অবশ্য জানতে চেয়েছেন। বলিয়া তিনি আবার ঠিক তেমনি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সতীশ মুখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে চোখ তুলিয়া দেখিতেও সাহস করিল না, প্রশ্নের জবাব দিতেও ভরসা করিল না।

সতীশ উপেন্দ্রকে টেলিগ্রাফ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা দশটা। আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। কিরণময়ী শাশুড়ীর জন্য সাগু তৈরী করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, বোসো ঠাকুরপো। তাঁহার গলাটা ঈষৎ ভারী। সতীশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, চোখে অশ্রু নাই বটে, কিন্তু পাতা দুটি ভিজা। সে অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। আজ কিরণময়ী আসন দিবার কথাও তুলিলেন না। সে কোথায় বসিল, কি করিল, বোধ করি তাহা দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কোন সামান্য বিষয়েও কিছুমাত্র ত্রুটি এ পর্যন্ত সতীশ দেখে নাই। এতদিনের এত আসা-যাওয়া, এত মেশামেশির মধ্যে একটি দিনের তরেও সে বৌঠানের সহজ সরল ব্যবহারে সৌজন্যের এতটুকু অভাব, ঘনিষ্ঠতার বিন্দুপ্রমাণ অনাচার খুঁজিয়া পায় নাই, তাই আজ এইটুকুমাত্র অবহেলা যেন চোখে আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল, কি গুরুভারে বৌঠানের সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বহুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একসময় কিরণময়ী যেন আপনাকে আপনি তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বোধ হয় এতক্ষণ তিনি এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, কহিলেন, আচ্ছা বল ত ঠাকুরপো, যমের সঙ্গে এই-সব দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট মিটে যাবার পরে আমার চাকরি করা উচিত, না ভিক্ষে করা উচিত।

কথাটা সতীশ বুঝিতে পারিল। কহিল, উপীনদাকে জিজ্ঞেস কোরো, তিনি জবাব দেবেন।

কিরণময়ী কহিলেন, জিজ্ঞেস না করেও বুঝতে পারচি, হয়ত দয়া করে তিনি আমাকে দুটো খেতে দেবেন, কিন্তু, এই পরের উপর নির্ভর করে থাকাই ত ভিক্ষে করা ঠাকুরপো!

সতীশ হঠাৎ বোধ করি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, মুখ ফুটে বললেই রূঢ় হয় তা জানি ঠাকুরপো, কিন্তু কথাটা যে সত্যি! ক্ষণকাল থামিয়া কহিলেন, মনে কোরো না তোমার দাদাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি তাঁকে চিনেচি! বুঝেচি, অনাথাকে দিতে তিনি জানেন, কিন্তু, শুধু দেওয়াই ত নয়, নেওয়াও ত আছে। দিয়ে কখনও দেখিনি ঠাকুরপো, কিন্তু, সারাজীবন পরের মন যুগিয়ে নিতে পারা যে কম কঠিন নয়, সে কথা যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েচি।

তথাপি সতীশ উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু, কিরণময়ীর যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, কহিলেন, এই পৃথিবীর সঙ্গে কারবার আমার বেশিদিনের নয়—দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিতে এখনও ঢের বাকী। এই দীর্ঘ জীবনের হিসেব-নিকেশে দোষঘাট ভুলভ্রান্তি হতেও পারে। তখন, তিনিই বা কি বলে দেবেন, আর আমিই বা কোন্ মুখে হাত পাতব? তখন যে আবার গোড়া থেকে নিজের পথে নিজে চলতে হবে।

এতক্ষণ সতীশ শ্রদ্ধার সহিত, ব্যথার সহিত, তাঁহার ভাবী আশঙ্কার কথাগুলা শুনিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় যেন খোঁচা খাইয়া চমকিয়া উঠিল। কহিল, ও-কি কথা বৌঠান! দোষঘাট সকলেরই হয়, ভুলভ্রান্তি হবে কেন?

কিরণময়ী সতীশের উৎকণ্ঠিত বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন। একমুহূর্তে নিজের ব্যগ্র উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শান্ত কোমল করিয়া কহিলেন, কে জানে ঠাকুরপো, আমিও ত মানুষ।

হাসি দেখিয়া সতীশ নিজের ভ্রম বুঝিল। মুহূর্তের উত্তেজনায় তাহার মন যে কু-অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়াছিল, সেই লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমাকে মাপ কোরো বৌঠান, আমি যেমন নির্বোধ, তেমনি অশুচি!

কিরণময়ী জবাব দিলেন না, আবার একটু হাসিলেন মাত্র।

অকস্মাৎ সতীশের অনুতপ্ত অপরাধী মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু, কেবল উপীনদার কথাই হবে কেন? তিনিই কি সব, আমি কেউ নয়? আমি তোমাকে তাঁর আশ্রয় নিতে দেব না।

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিলেন, সে ত এক কথাই ঠাকুরপো। তুমি আর তোমার দাদা ত পর নয়। তোমার আশ্রয়ে তোমারও ত মন যুগিয়ে ভিক্ষে নিতে হবে।

সতীশ বলিল, না, হবে না, তার কারণ, আমি তোমার ছোট ভাই, কিন্তু উপীনদা তোমার স্বামীর বন্ধু। দরকার হয়, আমার বোনের ভার আমিই নিতে পারব।

কিন্তু যদি তোমার মন যুগিয়ে না চলতে পারি?

আমিও তোমার মন যুগিয়ে চলব না।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, যদি দোষ অপরাধ করি?

সতীশ জবাব দিল, তা হলে ভাই-বোনে ঝগড়া হবে।

কিরণময়ী আবার প্রশ্ন করিলেন, জীবনে যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, সে কি আমার এই ছোট ভাইটিই ক্ষমা করতে পারবে?

সতীশ মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া সহসা অত্যন্ত ব্যথিতস্বরে কহিল, এ ভুল-ভ্রান্তির মানে আমি বুঝতে পারিনে বৌঠান। ছোট ভাইকে অর্থ বুঝিয়ে বলা আবশ্যক মনে কর, বল, আবশ্যক না মনে কর, বলো না। কিন্তু অর্থ তোমার যাই হোক, যে অপরাধ মনে আনাও যায় না, তাও যদি সম্ভব হয়, তবুও ভুলতে পারব না দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই!

তাহার সাবিত্রীর কথা মনে পড়িল। কহিল, বৌদি, আজ তোমার এই ছোট ভাইটির অহঙ্কার মার্জনা কর—কিন্তু, যে অপরাধ এ জীবনে আমি ক্ষমা করতে পেরেচি, সে অপরাধ ক্ষমা করতে স্বয়ং ভগবানের বুকেও বাজত। বলিয়াই চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সতীশ নড়িয়া

চড়িয়া বসিয়া পুনরায় গাঢ়স্বরে কহিল, আজ আমাকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিদি, যে-সতীশ নিজের দুর্বুদ্ধির স্পর্ধায় তোমাকে বৌঠান বলে ব্যঙ্গ করেছিল, সে তোমার এ-ভাইটি নয়। বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, সে আমি নই! সে কখনো তোমাদের চিনতে পারেনি, কখনো তোমাদের পূজা করতে শেখেনি, তাই জগন্নাথকে সে কাঠের পুতুল বলে উপহাস করেছিল। নিজের মহাপাতকের ভরা নিয়ে সে ডুবে গেছে বৌদি, সে আর নেই। বলিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

কিরণময়ী নির্নিমেষ চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে অতি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি করে আমাদের চিনলে ভাই?

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়াই বলিল, সে কথা গুরুজনের সুমুখে বলবার নয় বৌদি!

বলবার নয়? এ কি কথা! অকস্মাৎ সংশয়ে, ভয়ে কিরণময়ীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ডাকিল, ঠাকুরপো?

কেন, বৌদি!

মুখ তোল দেখি?

সতীশ মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মুখ উঁচু করিল।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তুমি যে একটা বড় ব্যথা নিয়ে এস যাও, সে আমি অনেকদিন টের পেয়েচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার অধিকার ছিল না বলেই জানতে চাইনি। কিন্তু আজ তুমি আমার ছোট ভাই—কি হয়েচে বল।

সতীশ মাথা হেঁট করিয়া বলিল, সে লজ্জার কথা বৌঠান।

কিরণময়ী কহিলেন, হোক লজ্জার। তবু তোমার এই বোনটিকে তার ভাগ দিতে হবে। ব্যথা তোমাকে আমি একা বয়ে বেড়াতে দেব না।

তার পরে একটু একটু করিয়া কিরণময়ী গোড়া হইতে এই দুঃখের অনেকখানি ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া লইয়া শেষে কহিলেন, কিন্তু, কেন এমন কাজ করলে?

সতীশ নির্বাক হইয়া রহিল।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, কে সে?

সতীশ মুখ নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, হতভাগিনী—

কিন্তু কোথায় সে?

জানিনে।

খোঁজ করোনি?

সতীশ মৃদুস্বরে কহিল, না, তার আবশ্যক নেই। শুনেছি সে ভাল আছে।

কিরণময়ী ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভাল আছে! ছি ছি, কেন এমন করে নিজেকে ঠকতে দিলে!

এবার সতীশ আর একবার মুখ উঁচু করিল। সুস্পষ্ট-কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ঠকিনি বৌদি, কারণ আমি ভালবাসতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঠকেছে সে,—সে ভালবাসতে পারেনি।

তার পরে?

সতীশ কহিল, প্রথমে সে নিজের মন বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন পারলে, তখনই সে চলে গেল।

না বলে লুকিয়ে গেল?

সতীশ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নয়। যাবার আগে সাবধান করে গেল, একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে যেন কালি না মাখাই।

কিরণময়ী গভীর বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, কি বলে গেল?

সতীশ পুনরায় তাহা কহিলে, কিরণময়ী কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই কথাগুলা অস্ফুটে বারংবার আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আবার যখন দেখা হবে ঠাকুরপো, তাকে একবার আমাকে দেখাবে?

সতীশ বিপিনের কথা স্মরণ করিয়া কহিল, কিন্তু আর ত দেখা হবে না বৌদি!

কিরণময়ীর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি দেখা দিল। কহিলেন, আবার দেখা হবে।

কবে হবে? না হওয়াই ত মঙ্গল।

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কবে যে হবে তা জানিনে। কিন্তু যদি কখন দুঃখে পড়, বিপদে পড়, তখনই দেখা হবে—সে দেখায় মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। ঠাকুরপো, সে যেখানেই থাক, তোমার নিজের চেয়েও সে তোমার অধিক মঙ্গলাকাঙিক্ষণী, এ কথা যেন কোনদিন ভুলো না।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিরণময়ী মুমূর্ষু স্বামীর উত্তপ্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য বাহিরে দাঁড়াইলেন। দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিরণময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন ঠাকুরপো এমন করে বসে? বাসায় যাওনি কেন?

সতীশ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বৌঠান।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—আজ আর বাসায় যাব না।

কিরণময়ী আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছি ছি, সে কি কথা? খাওয়া হবে না, শোয়া হবে না না না, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বাসায় যাও আজ তোমার কোন ভয় নেই।

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভয় থাক আর না থাক, আজ আমি তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারব না। তা ছাড়া আমি দোকান থেকে খেয়ে এসেচি।

কিরণময়ী কহিলেন, সে হতে পারবে না। আমি জানি, তোমার দোকানের জলখাবারে পেট ভরে না। আমাকে তা হলে আবার রাঁধতে হয়, সে না হয় রাঁধলুম, কিন্তু এই ক'দিন ধরে তোমার সময়ে নাওয়া-খাওয়া হয়নি, কাল পরশু ভাল করে ঘুমোতে পাওনি, দেহের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়ে গেছে ঠাকুরপো, আর না। আজ রাত্রে এখানে থাকলে অসুখ হয়ে পড়বে, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল, আমার দিন-দুই আহার-নিদ্রা একটু কম হলেই অসুখ হবে, আর তুমি যে এই একমাস শোওনি? যা খেয়ে দিন-রাত কাটাচ্চ, তা মানুষকে দেখতে দিচ্চ না বটে, কিন্তু ভগবান ত দেখছেন। তারপর অবিশ্রান্ত এই খাটুনি,—এতেও তুমি দাঁড়িয়ে রয়েচ, আর এইটুকুতে আমি মরে যাব?

কিরণময়ী কহিলেন, তার মানে তুমিও কি একমাস না খেয়ে, না শুয়ে দাঁড়াতে পার?

সতীশ কহিল, সে কথা বলচি নে, কিন্তু—

কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, এতে আবার কিন্তু আছে কোন্‌খানটায়? ঠাকুরপো, আমি যে মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষের কি কখনো অসুখ হয়, না মেয়েমানুষ মরে? কোথায় শুনেচ, অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে?

সতীশ কহিল, না শুনিনি। বরঞ্চ শুনেচি, মেয়েমানুষ অমর।

কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, সত্যিই তাই। প্রাণ থাকলে তবে যায়, না থাকলে যায় না। ভগবান মেয়েমানুষের দেহে তা কি দিয়েছেন, যে যাবে? আমার ত মনে হয়, এ জাতকে গলায় দড়ি বেঁধে দশ-বিশ বছর টাঙ্গিয়ে রেখে দিলেও মরে না।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তোমার এ-সব তামাশা আমি শুনতে চাইনে বৌঠান, শুনলেও পাপ হয়।

কিরণময়ী এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, হঠাৎ মেয়েমানুষের এতবড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেচ কেন বল ত?

সতীশ বলিল, বৌঠান, আমি বেশ বুঝতে পারি, যখন-তখন তুমি স্ত্রীলোকের নাম করে শুধু নিজের উপরেই কঠোর বিদ্রূপ কর। কেন কর জানিনে; কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তোমার নিজের মুখ থেকেও আমি যেন সইতে পারি না। ওতে আমাকে ভারী আঘাত করে। আচ্ছা চললুম।

শোন ঠাকুরপো!

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি?

সত্যি রাগ করলে নাকি?

রাগ হয় বৌঠান। সংসারে দু’টি লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি—উপীনদাকে আর তোমাকে, একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখি। এখানে নীচ ধরনের ঠাট্টা-তামাশা আমার সহ্য হয় না। চললুম, হয়ত খেয়ে আবার আসব,—বলিয়া সতীশ দুপদুপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিরণময়ী চোখ বুজিয়া চৌকাঠে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই কানের মধ্যে কেবলি প্রতিধ্বনি ঘুরিতে লাগিল—আমি একজনকে ভাবলেই দুজনকে দেখি।

কুড়ি

ভাষায় হউক, ইঙ্গিতে হউক, কখন কাহারও কাছে সতীশ সাবিত্রীর উল্লেখ করে নাই। তাই যখন হইতে এ কথা কিরণময়ীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন হইতেই তাহার দেহ ভরিয়া অমৃত-স্রোত বহিয়াছে। কিরণময়ীকে সতীশ দেবী মনে করিত, তাঁহার সমস্ত কথাই একান্ত শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করিত। তিনি বলিয়াছিলেন, দুঃখের দিনে আবার দেখা হইবে। সেই অবধি তাহার নিভৃত অন্তরবাসী শোকার্ত বিচ্ছেদ সেই পরম ঈপ্সিত দুঃখের দিনের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ দুঃখ কিভাবে কতদিনে যে তাহাকে দেখা দিয়া দয়া করিবে, এই চিন্তা লইয়া সে ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে রাত্রি আটটার সময় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া, যেদিকে যে বস্তুটির দিকে চাহিল, তাহাই আজ একটু বিশেষভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিতে গিয়া দেখিল, কাপড়গুলি গোছানো—থাক-করা। হরিণের শিঙে টাঙানো আহ্নিক করিবার কাচা কাপড়খানি কোঁচানো। বসিতে গিয়া দেখিল, চেয়ারের উপরে রাখা ময়লা কাপড়ের রাশ আজ নাই। দু হপ্তা ধরিয়া রজক আসে না, সুতরাং ময়লা বস্ত্রের রাশি প্রত্যহ বসিবার চৌকিটার উপরেই ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিতেছিল। বসিবার সময় সতীশ সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বসিত, উঠিয়া গেলে বেহারী আবার যথাস্থানে তুলিয়া দিত। সাতদিন ধরিয়া প্রভু ও ভৃত্য এই কার্যই করিতেছিল, হঠাৎ আজ সেগুলি পুঁটুলি-বাঁধা হইয়া আলনার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। বিছানার চাদর, বালিশের অড় অতিশয় মলিন ছিল, আজ সাদা ধপধপ করিতেছে। মশারিটা চিরদিন অভদ্রের মত উটমুখো হইয়াই টাঙ্গানো থাকিত, সেটাও আজ চারিকোণ সোজা করিয়া ভদ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোটার এক কোণে বরাবর কালি উঠিত, আজ সেটার কোন বালাই নাই—চমৎকার

জ্বলিতেছে। সবদিকেই একটা শ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সতীশ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল; কিন্তু বৃদ্ধ বেহারীর এই আকস্মিক রুচি-পরিবর্তনের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইল না। ডাকিল, বেহারী?

বেহারী অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল, সুমুখে আসিয়া কহিল, আজ্ঞে?

সতীশ বলিল, বেশ বেশ! যদি পারিস এ-সব, তবে কেন ঘরদোর এত নোংরা করে রাখিস? ভারী খুশী হলুম।

বেহারী সবিনয়ে মুখখানা ঈষৎ অবনত করিয়া বলিল, আজ্ঞে আপনার একখানা তারের চিঠি এসেছে।

কৈ রে? বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেই টেবিলের উপর রক্ষিত হলদে খামখানা চোখে পড়িল। খুলিয়া দেখিল উপীনদার সংবাদ! তিনি সাড়ে-নয়টার ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিবেন। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে-আটটা বাজিয়াছিল, ব্যস্ত হইয়া কহিল, শিগ্‌গির একখানা গাড়ি নিয়ে আয় বেহারী, উপীনদা আসচেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেহারী গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া সংবাদ দিল এবং কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে নিয়ে বাসায় ফিরবেন ত?

সতীশ চিন্তা করিয়া কহিল, না, আজ রাতে আর ফিরব না।

উপীনদা যে সোজা হারানবাবুর ওখানেই উপস্থিত হইবেন, সতীশের তাহাতে সংশয়মাত্র ছিল না। কারণ, তাঁহার সস্ত্রীক আসিবার খবর টেলিগ্রামে ছিল না।!

সতীশ ইত্যবসরে খান-দুই লুচি গিলিয়া লইতেছিল, বেহারী আড়াল হইতে কহিল, বাবু, একটা নিবেদন আছে।

প্রার্থনা জানাইতে হইলে বেহারী পণ্ডিতী ভাষা প্রয়োগ করিত।

সতীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি নিবেদন?

‘আজ্ঞে’, বলিয়া বেহারী চুপ করিল।

সতীশ প্রশ্ন করিল, কি আজ্ঞে শুনি?

বেহারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, গোটা-তিরিশ টাকা হলে—

সতীশ বিস্মিত হইয়া কহিল, পরশুও ত তিরিশ টাকা নিলি; বাড়ি পাঠিয়েছিলি?

বেহারী মৃদুস্বরে কহিল, আজ্ঞে, অভিপ্রায়টা তাই ছিল বটে, কিন্তু চক্রবর্তীঠাকুরের বাড়িতে—

চক্রবর্তীর নামে সতীশ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, সে টাকা চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েচে—এ টাকাটা কাকে দান করা হবে শুনি?

আজ্ঞে, দান নয়, একজন বড় দুঃখে পড়ে—

কর্জ চাইচে?

আজ্ঞে, কর্জ আর তাকে কি দেব—

সতীশ অধীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, তোমার থাকে, তুমি দাও গে বেহারী, আমি এত বড়লোক নই যে, রোজ টাকা নষ্ট করতে পারি। আমি দিতে পারব না।

এবার বেহারী জিদ করিয়া বলিল, না দিলেই নয় বাবু। না হয় আমার মাইনে থেকে দিন।

মাহিনার নামে সতীশ চমকাইয়া উঠিল, মাইনের টাকা? এ পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছিস বল ত বেহারী।

বেহারী বলিল, যেমন নিয়েচি, তেমনি ছেলেদের দেশে তিন বিঘে জমি, একজোড়া হেলে খরিদ করে দিয়েছি। তা ছাড়া একখানা নতুন ঘর তুলেও দিয়েছি—এ কি আমার মাইনের টাকা থেকে? আমার টাকা আপনার কাছেই জমা আছে—আজ তাই থেকে দিন।

সতীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছেলেদের জন্যে কিনে দিয়ে আমার ভারী উপকার করেচ। যা, আমার টাকা নেই, বলিয়া উড়ুনিটা কাঁধে ফেলিয়া স্টেশনের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

বেহারী নিজের ঘরে আসিয়া কহিল, মা, আহ্নিক-টাহ্নিক করে এখন একটু জল খাও, কাল সকালে আমি যেমন করে পারি দেব।

সাবিত্রী ঘরের মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু দিলেন না?

বেহারী বলিল, জানো ত মা, পরের দুঃখের নাম করে যখন চেয়েচি তখন পাবই। আমার দাতাকর্ণ মনিব। এখন না দিয়ে ইস্টিশানে চলে গেলেন, কিন্তু কাল সকালে যখন ফিরে আসবেন, তখন, ডেকে দেবেন। তোমার কোন চিন্তা নেই মা, এখন উঠে একটু জল-টল খাও, সারাদিন শুকিয়ে আছো।

সাবিত্রীর কৃশ পাণ্ডুর মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। কহিল, ভালই হয়েচে, আজ রাত্রে আর ফিরবেন না। তা হলে কাল দুপুরবেলার গাড়িতেই কাশী চলে যেতে পারব, কি বল বেহারী?

বেহারী বলিল, নিশ্চয় মা! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার মনিবও মনিব, তোমার মনিবও মনিব। দেশে থেকে বুড়ী একখানা দুঃখ জানিয়ে পত্তর দিয়েছিল—বাবুকে পড়াতে গেলুম, পড়ে বললেন, বেহারী, তোর কি কিছু নেই নাকি রে? বললুম, গরীব-দুঃখীর আর কি থাকে বাবু? আর কথা কইলেন না। চারদিন পরে ছ'শ টাকা হাতে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন—জমি-জায়গা কিনলুম,—গরু-বাছুর করলুম,—ঘর-দুয়ার তুললুম—ছেলেদের হাতে দিয়ে একমাসের মধ্যে মনিবের পায়ের তলায় ফিরে এলুম। বুড়ী কেঁদে বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, একবার দর্শন করে আসি। বললুম, না রে, আর ঋণ বাড়াস নে। তুই গেলেই দু-এক শ' তোর হাতে দিয়ে দেবেন। আর এই তোমার মনিব! অসুখে পড়ে পাঁচ-সাত টাকার ওষুধ খরচ হয়েছে বলে তোমাকে স্বচ্ছন্দে বললে, ধার শোধ করে তবে যাও! চাকরি করতে গিয়ে কত দুঃখ পেতেছিলে মা, আর আমরা কিছুই না জেনে বিপিনবাবুর নাম করে তোমার কত নিন্দেই না করেচি! মার্জনা কর মা, নইলে আমার জিভ খসে যাবে।

বিপিনের ইঙ্গিতে সাবিত্রী ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া অস্ফুটে ছি ছি করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চাপিয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, স্নান করব বেহারী, একখানা কাপড় দিতে পারবে?

কাপড়? বেহারী মলিন হইয়া কহিল, তোমার আশীর্বাদে একখানা কেন, পাঁচখানা দিতে পারি। কোন দুঃখই নেই মা, কিন্তু শুদ্দুরের পরা-কাপড় কেমন করে তোমাকে পরতে দেব মা? বরং চল, বাবুর একখানা ধোয়া কাপড় বার করে দিই গে।

বেহারী দেব-দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তিমান। অতএব প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া সাবিত্রী সম্মত হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান করিয়া সাবিত্রী সতীশের ধোয়া দেশী বস্ত্র পরিয়া মনে মনে একটু হাসিল। তাহার ঘরে তাহারই কোশাকুশিতে আহ্নিক করিল এবং বেহারীর সযত্ন-আহরিত বিলাতী চিনিতে প্রস্তুত পরম পবিত্র কাঁচাগোল্লা সন্দেশ সমস্ত দিনের অনাহারের পর আহার করিয়া সুস্থ বোধ করিল।

তাহার পান ও দোক্তা খাওয়ার কু-অভ্যাস ছিল। অথচ দোকানের তৈরী পান খাইত না জানিয়া বেহারী ইতিমধ্যে কিছু পান সুপারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেইগুলি একটা থালায় করিয়া হাজির করিতেই সাবিত্রী হাসিয়া কহিল, বেহারী, আমাকে একটুও ভোলনি দেখচি।

বেহারী জবাব দিল, তবু ত আমি মানুষ। তোমাকে একবার দেখলে পশুপক্ষীতেও ভুলতে পারে না যে মা! বলিয়া টেবিলের উপর হইতে আলো আনিয়া দোরগোড়ায় রাখিল, এবং থালাটা কাছে দিয়া পান সাজিতে বলিয়া দোক্তা-তামাকের সন্ধানে রান্নাঘরে হিন্দুস্থানী পাচকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক পুরোভাগে লইয়া মেঝের উপর সাবিত্রী পান সাজিতে বসিয়াছিল। মাথায় কাপড় নাই, আর্দ্র কেশভার সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দু-একটা চূর্ণ-কুন্তল আঁচলের কালো পাড়ের

সহিত মিশিয়া কাঁধ হইতে কোলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে।নারীর রোগ-ক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের যে নিজস্ব গোপন মাধুর্য আছে, তাহাই এই কৃশাঙ্গীর সদ্যস্নাত মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। সে কিছু অন্যমনস্ক, চিন্তামগ্ন। সহসা দূরবর্তী জুতার পদশব্দ সন্নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তথাপি তাহার কানে গেল না। যখন গেল, তখন উপেন্দ্র সতীশ একেবারে দরজার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধ্যান ভাঙ্গিয়া মুখ তুলিয়া সাবিত্রী বিবর্ণ আত্মহারা হইয়া গেল, এবং সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে বঙ্গরমণীর জন্ম-জন্মার্জিত অন্ধ-সংস্কার তাহাকে অপরিসীম লজ্জায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এবং পরমুহূর্তেই সে দুই হাত বাড়াইয়া তাহার আরক্ত মুখের উপরে আবক্ষ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল।

সতীশ হতবুদ্ধির মত বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী! তুমি!

সুরবালা এতক্ষণে আলোকের সাহায্যে বেহারী ও দিবাকরের সঙ্গে উপরে উঠিয়াছিল; উপেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাস্, আর এস না সুরবালা, ঐখানে দাঁড়াও।

সুরবালা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন?

উপেন্দ্র সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিলেন, দিবাকর, তোর বৌদিকে গাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যা। সতীশ, আমিও চললুম—বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেলেন।

একুশ

উপেন্দ্রর পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল। অবসন্ন, অভুক্ত, সস্ত্রীক—এই অন্ধকার রাত্রি—তত্রাচ, এতটুকু সংশয়, বিন্দুপ্রমাণ দ্বিধা তাঁহার মনে জাগিল না। সতীশের ঘরের মধ্যে বসিয়া যে তরুণী নিদারুণ লজ্জায়, ভয়ে, অমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। ঘৃণায় সেই যে বিমুখ হইলেন, আর মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না।

কিন্তু, এ কি ঘটিয়া গেল! মুহূর্ত পরেই অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল। সহস্র পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখেও আর যে তাহার লজ্জা করিবার অধিকার ছিল না, মুহূর্তের ভুলে এ কথা ভুলিয়া আজ সে এ কি বিষম ভুল করিয়া বসিল! তাহার মনে হইতে লাগিল, এই তাহার শরমের ক্ষুদ্র মুখাবরণটুকু যেন নিমিষে দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া কুৎসিত লজ্জায় তাহার পদনখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। এতটুকু লজ্জা বাঁচাইতে গিয়া যে লজ্জার পাহাড় তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মুহূর্ত পূর্বে এ কথা কে ভাবিয়াছিল!

শ্বাসরোধের উপক্রমে মানুষ প্রাণপণে যেমন করিয়া মুখখানা বাহির করিবার চেষ্টা করে, সাবিত্রী ঠিক তেমনি করিয়া তাহার মুখের ঘোমটাটা মাথার উপরে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া ঋজু হইয়া বসিল; প্রশ্ন করিল, উনি কে?

সতীশ আচ্ছন্নের মত দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, আচ্ছন্নের মতই উত্তর দিল—উপীনদা আর বৌঠান।

অ্যাঁ, ঐ উপীনদা? ঐ বৌঠাক্‌রুন? ওঁরা! সাবিত্রী তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, তবে সর সর, ফিরিয়ে আনি। ছি ছি, আমি যে কেউ নই—বাসার সামান্য একটা দাসী মাত্র! সর—সর—

উপীন যে কে, সাবিত্রী তাহা বিলক্ষণ জানিত। সতীশের কথায় বার্তায় অনেকবার অনেক পরিচয় তাঁর পাইয়াছিল।

এতক্ষণে সতীশের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই চেঁচামেচি, এই মহা ত্রস্তব্যস্ত ভাব তাহার সমস্ত বিহ্বলতা মুহূর্তে ঘুচাইয়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিল। এইবার সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দ্বার রোধ করিয়া কহিল, না।

সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, না কি গো? সর্বনাশ কোরো না সতীশবাবু, পথ ছাড়ো। আমার সত্য পরিচয় তাঁদের জানতে দাও।

সতীশ পথ ছাড়িল না। পরন্তু, তাহার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে সর্প-জিহ্বার মত দ্বিধাভিন্ন বিষাক্ত হাসির অতিসূক্ষ্ম আভাস দেখা দিল কি? বোধ করি দেখা দিল। কহিল, ওঃ—তোমার সর্বনাশ! না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কি তোমার সত্য পরিচয় নিজে আগে শুনি?

সাবিত্রী সহসা জবাব দিতে পারিল না, শুধু চাহিয়া রহিল। এমনি নিরুত্তর চাহনি সতীশ পূর্বেও দেখিয়াছে। কিন্তু এ ত সে নয়! এ চাহনিতে এতবড় আঘাতেও আজ আগুন জ্বলিল কৈ? এ কি আশ্চর্য স্নিগ্ধ-করুণ চোখ দুটি! এ কি সেই সাবিত্রী?

ক্ষণেক পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, আমার পরিচয়? ঐ ত বললুম—বাসার দাসী। সতীশবাবু দয়া করুন—আমি তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এই অন্ধকার অজানা শহরে তাঁরা কি পথে পথে বেড়াবেন? সেই কি ভাল হবে?

সতীশ তিলার্ধ বিচলিত না হইয়া জবাব দিল—তাঁদের ভাল-মন্দ বোঝবার ভার তাঁদের ওপরেই থাক। কিন্তু পথে পথে বেড়ানোও ঢের ভাল—তবুও আমি কিছুতেই বৌঠানকে আর এ বাড়ি মাড়াতে দিতে পারব না।

কেন পারবে না? আমি এ-বাড়ি মাড়িয়েচি বলে? সতীশবাবু, মা বসুমতীও কি আমার স্পর্শে অশুচি হয়ে যান?

সতীশ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কেন?

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। মাটির দিকে চাহিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে বলিল, আপনি আমার পুরোনো মনিব। তাই, অসময়ে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছিলুম।

সতীশ বিদ্রূপ করিয়া হাসিল, কহিল, অসময়ে ভিক্ষা চাইতে? কিন্তু মনিব তোমার ত একটি নয় সাবিত্রী। এতদিন একে একে সব মনিবের বাড়িগুলোই ঘুরে এলে বোধ করি?

সতীশের নিষ্ঠুরতম আঘাত তাহার বুকের ভিতরটা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু আর সে মুখ তুলিল না—কথাটি কহিল না।

সতীশ পুনরায় কহিল, বিপিনবাবু তোমাকে তাড়ালেন কেন? তাঁর শখ মিটে গেল বোধ করি?

সাবিত্রী তেমনি নিরুত্তর।

হঠাৎ সতীশের বেহারীর প্রার্থনা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, কি ভিক্ষা চাও? ত্রিশটা টাকা, না?

সাবিত্রী হেঁট-মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

আচ্ছা—বলিয়া সতীশ দেরাজের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষের পলকে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার থামিল।

এই গৃহের যে নূতন পারিপাট্য কিছুক্ষণ পূর্বে তাহাকে এত আনন্দ দিয়াছিল, এখন তাহাই তাহাকে যেন মারিতে লাগিল। অদূরে ঐ যে শয্যা, ইহাও ঐ স্ত্রীলোকটার হস্তরচিত। স্টেশনে যাইবার পূর্বে ইহারই উপরে শুইয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিয়া গিয়াছিল স্মরণ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হইল। চোখ ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিয়া কয়েকখানা নোট টানিয়া বাহির করিয়া সাবিত্রীর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যাও যাও, নিয়ে বিদেয় হও—আর কখনো এসো না।

সাবিত্রী তিনখানি মাত্র নোট গণিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়টুকু সতীশ নীরবে চাহিয়াছিল। সাবিত্রী দাঁড়াইবামাত্র তাহাকে কি একটা বলিতে গিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

হায় রে! এ সংবাদ সে ত রাখে নাই। শেষ-জ্যৈষ্ঠের খর-রৌদ্রের মত তাহার তপ্ত ক্রোধ যখন এই হতভাগিনীকে নিরুপায় নির্বাক ধরাতলের মত দগ্ধ করিতেছিল, তখনই অলক্ষ্য আকাশে তাহার বিন্দু বিন্দু বারি-সঞ্চয়ে গুরু মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সে যে এমন অজ্ঞাতসারে এত শীঘ্র, এত নিঃশব্দ সঞ্চরণে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে এ কথা ত সতীশ জানিত না। তাহার কণ্ঠ, তাহার মুখ, তাহার চক্ষু যেন কিসের অদৃশ্য আক্রমণে চাপিয়া আসিতে লাগিল,—সহসা সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করিয়া ডাকিল, সাবিত্রী!

আজ্ঞে।

গল্পে শুনতুম, অমুক অমুককে ঘৃণা করে। আমার বিশ্বাস হতো না। ভাবতুম, ওটা শুধু রাগের কথা। কখনও ভেবে পাইনি, মানুষ কি করে মানুষকে ঘৃণা করতে পারে। আজ দেখছি পারে—লোক লোককে ঘৃণা করতে পারে। সাবিত্রী, শপথ করে বলচি, আমি মরণ এড়াতেও আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারিনে।

সাবিত্রী নির্বাক।

আচ্ছা সাবিত্রী, সংসারে টাকার বড় তোমাদের ত আর কিছু নেই,—নইলে ঐ তিনখানা নোট কিছুতেই হাত দিয়ে তুলতে পারতে না—আজ আমার কাছে যা আছে, তোমাকে সমস্ত দেব, একটা কথা আমাকে সত্যি বলে যাও।

জিজ্ঞাসা করুন।

করচি, বলিয়া সতীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, প্রশ্ন করতেও লজ্জা করে, তবু জানতে সাধ হয় সাবিত্রী, কখন কোনদিন কি কাউকে ভালবাস নি?

সাবিত্রী পলকমাত্র মৌন থাকিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট-কণ্ঠে কহিল, কি হবে আপনার আমার কথা জেনে?

সতীশ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

সাবিত্রী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, সংসারে অনেক কথাই ত আপনি জানেন না; তবু ত দিন কেটে যায়,—এ কথাটা না জানলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

হয়ত হবে না, বলিয়া সতীশ দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সাবিত্রীর কানে গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই তাহার রোগপাণ্ডুর কৃশ মুখখানির উপর সতীশের চোখ পড়িল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার অসুখ নাকি সাবিত্রী?

সাবিত্রী চোখের পলকে মুখ নামাইয়া বলিল, না।

বড় রোগা দেখলুম যেন।

ও কিছু না, বলিয়া সাবিত্রী যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

চললে?

সাবিত্রী নিরুত্তরে দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধকণ্ঠের ডাক আসিল, সাবিত্রী, সত্যই কি একটা দিনের জন্যেও আমাকে ভালবাস নি?

সাবিত্রী চৌকাঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল, আর মুখ ফিরাইল না।

ভিতরের সজলকণ্ঠ এবার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সাবিত্রী, একটিবার বলে যাও, আমি এতদিন কি শুধু ঘুমের ঘোরেই এই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়িয়েচি? আমার ভাগ্যে কি সবই ভুল, সবই মিথ্যে? এই অপরিসীম দুঃখটাও কি আমার অদৃষ্টে আগাগোড়া ফাঁকি?

সাবিত্রী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাবু, আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই বেহারীর কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলুম, কিন্তু সত্যি বলচি আপনাকে, এমন হাঙ্গামায় পড়ব জানলে আসতুম না।

সতীশ অবাক হইয়া রহিল। এ কণ্ঠস্বর শান্ত এবং মৃদু, কিন্তু কোমলতার লেশমাত্র নাই। ক্ষণকাল পূর্বে সে ত এ গলায় তাহার কাছে ভিক্ষা চাহে নাই।

সে পুনরায় কহিল, আপনি শপথ করে বললেন, আমাকে ঘৃণা করেন, আপনারা খুশী হলে ভালবাসতেও পারেন, রাগ হলে ঘৃণা করতেও পারেন—আপনারা করেও থাকেন তাই, কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা। এ-পথে যখন পা দিয়েছি, তখন সুপথ-কুপথ যাই হোক, এই ধরে না চললে ত উপায় নেই।

সতীশ নির্বাক স্তব্ধ। শুধু বিহ্বল-বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার থামিল। তাহার নিজের কথা নিজের বুকেই মৃত্যুশেল হানিতেছে, তথাপি, মরণাহত সৈনিকের মত শেষবারের মত সতীশের লজ্জাকর প্রণয়ের উপরে খড়্গাঘাত করিল। কহিল, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, কোনদিন আপনাকে ভালবেসেছিলুম কিনা? না, বাসিনি। সে সমস্তই ছিল আমার ছলনা। কাকে ভালবাসি সে খবর ত পেয়েছেন!

শুনিয়া সতীশের হঠাৎ মনে হইল, তাহার গৃহ-প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়া দলিয়া পিষিয়া খড়ের পিণ্ড করিয়া কে যেন তাহারই চোখের উপরে

ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, যাও—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে।

সাবিত্রী চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সতীশ চাহিয়া দেখিল না, শুধু অতি মৃদু একটুখানি শেষ পদশব্দ শুনিতে পাইল।

নীচে বেহারীর ঘরে নিব-নিব হইয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল, সেই ঘরে সাবিত্রী অর্ধ-মুদ্রিত চক্ষে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া কিছু একটা যেন ধরিতে চাহিল, এবং পরক্ষণেই ভূমিতলে মুখ গুঁজিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বেহারী উপেন্দ্র প্রভৃতিকে জ্যোতিষ সাহেবের বাড়ির দিকে খানিকটা পথ আগাইয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং অন্ধকারে লুকাইয়া সাবিত্রীর শেষ কথাগুলা শুনিতেছিল। আজ সারাদিন ধরিয়া সে তাহার সহিত কত গল্পই করিয়াছিল; নিষ্ঠুর গৃহস্থের ঘরে কাজ করিতে গিয়া যে দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছিল, রোগে পড়িয়া যত যন্ত্রণা সহিয়াছিল, শুনিতে শুনিতে বেহারী কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এইমাত্র বাবুর সাক্ষাতে কেন যে সাবিত্রী আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গেল, তাহার কোন তত্ত্বই বুড়া খুঁজিয়া পাইল না। সাবিত্রী নামিয়া গেলে সে-ও আঁধারের আশ্রয়ে বাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া নীচে আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রাস্তায় ছুটিয়া গেল। এদিকে ওদিকে কোথাও না পাইয়া আবার বাড়ি ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘরটা খুঁজিতে আসিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার পর সাবধানে সরিয়া আসিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মুখের কাছে আসিয়া ডাকিল, এমন করে মাটিতে পড়ে কেন মা?

সাড়া না পাইয়া সস্নেহ-কণ্ঠে বলিল, রোগা দেহ, ঠাণ্ডায় অসুখ করবে যে মা! উঠে বোস, আমি একটা মাদুর পেতে দিই।

সাবিত্রী নির্বাক্, স্থির।

বেহারী বিস্মিত হইল। ভাল দেখা যাইতেছিল না, প্রদীপটা মুখের কাছে আনিয়া একটু ঝুঁকিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়াই বুড়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা গো, এ কি করলি মা!

সাবিত্রীর নয়ন মুদ্রিত, সমস্ত মুখ নীলবর্ণ। এতবড় চিৎকারেও সে সাড়া দিল না—তেমনি মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

উপরের ঘরে সতীশ তখনও একই ভাবে মূর্তির মত বসিয়া ছিল, বেহারীর কান্নার শব্দে চমকিয়া উঠিল। রান্না ফেলিয়া বামুনঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল।

সতীশ বেহারীর ঘরে ঢুকিয়া সাবিত্রীর মাথার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং আলো লইয়া মুখপানে চাহিয়াই বুঝিল সে মূর্ছিত হইয়াছে। কহিল, চেঁচাস নে বেহারী, ওর মুখেচোখে জল দে—বামুনকে বল্, একটা পাখা নিয়ে বাতাস করুক।

সাহস পাইয়া বেহারী সজোরে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং হিন্দুস্থানী পাচক প্রাণপণে পাঙ্খা হাঁকিতে লাগিল।

খানিক পরে সাবিত্রী নিশ্বাস ফেলিল এবং পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

সতীশ কহিল, ঠাকুর বেশী করে খানিকটা গরম দুধ নিয়ে আসুক; আর ভিজে কাপড়টা শিগগির ছেড়ে ফেলতে বল বেহারী।

ঠাকুর দুধ আনিতে গেল, বেহারী মৃদুস্বরে বোধ করি তাহাই কহিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ পুনরায় কহিল, সুস্থ বোধ করলে কোথায় ও যাবে, জিজ্ঞাসা করে একটা গাড়ি ডেকে দিস বেহারী—এর ওপর যেন হেঁটে না যায়।

সাবিত্রীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষীণ আলোকে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল।

সতীশ আরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, আর যদি সুস্থ বোধ না করে, না হয়, আমার ঘরেই শুতে বলিস, আমি আর কোথাও যাচ্চি।

সাবিত্রী শিহরিয়া অনুভব করিল, বুঝি-বা সে কোনমতেই আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

সতীশ একটা ক্ষুদ্র চাবি বেহারীর কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর দ্যাখ, দেরাজের চাবিটা তোর কাছেই রইল, যা টাকার দরকার হয়, যাবার সময় যেন নিয়ে যায়, রুগ্ন শরীরে যেন—

সতীশের কথাগুলা বিষ এবং অমৃতে মিশিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। সতীশ কহিল, আমি পাথুরেঘাটায় যাচ্চি বেহারী—কাল ফিরতে বোধ করি একটু বেলা হবে। এক-পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, সাবিত্রী, কোন সঙ্কোচ কোরো না, যা আবশ্যক হয় নিয়ো—আমি চললুম।

সতীশ চলিয়া গেল।

সাবিত্রী আর একবার ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বুকফাটা-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, ওগো, কেন তুমি এই পাপিষ্ঠাকে এত ভালবেসেছিলে? এই যে শপথ করলে আমাকে ঘৃণা কর, এই কি ঘৃণা করা? তোমাকে এই দুঃখ দেওয়া, এত মিথ্যা বলা, সবই তোমার স্নেহের আগুনে পুড়ে কি ছাই হয়ে গেল? কে আমাকে বলে দেবে কি করলে আমি তোমার ঘৃণা পাব?

বেহারী এই কান্নার বিন্দুমাত্র অর্থও বুঝিতে পারিল না, একটুখানি কাছে সরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আচ্ছা, কেন মা, বাবুর কাছে এত মিথ্যে কথা বললে? যেখানে যাওনি, যে দোষ করনি, কি জন্যে সেই-সব নিজের ঘাড়ে নিয়ে এত অপরাধী হয়ে রইলে?

সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ধর্ম জানেন বেহারী, আমার সমস্ত কথাই মিথ্যে। বলতে বুক ফেটে গেছে, তবুও বলতে হয়েছে। কিন্তু, কোন কাজেই ত এলো না বেহারী, কোন কাজেই যে এলো না।

বেহারী মূঢ়ের মত মুখপানে চাহিয়া বলিল, মিথ্যে আবার কি কাজে আসে মা?

সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ঠিক জানো বেহারী, কোন কাজেই কি আসে না?

বেহারী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তা আসে বৈ কি। আদালতে মিথ্যাতেই ত কাজ হয়—সেখানে মিথ্যা কথারই ত জয়-জয়কার।

সাবিত্রী জবাব দিল না। বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, কেন এত মিথ্যা বলে গেলুম, হয়ত একদিন বুঝতে পারবে। কিন্তু সে কথা যাক, বেহারী, আমার দুটি কথা রাখবে?

রাখব বৈ কি মা। কি কথা?

একটা কথা এই যে, আমি চলে গেলেও কোনদিন বাবুকে জানিয়ো না, আমি তাঁকে আগাগোড়া মিথ্যে বলে গিয়েছিলুম।

বেহারী মৌন হইয়া রহিল। সাবিত্রী কহিল, আর একটা কথা—আমার ঠিকানা তোমাকে লিখে জানাব। যদি কখনো বোঝো, আমার আসা দরকার, আমাকে জানিয়ো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই বেহারী, আমি ছাড়া ওঁকে কেউ শাসন করতেও পারবে না, আমার চেয়ে বিপদের দিনে কেউ সেবা করতেও পারবে না।

বেহারী কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, সব জানি মা।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে চললুম, ওঁকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলুম—দেখো বেহারী, আমার দুটি কথা রেখো। ভগবান করুন, তোমরা সুখে থাকো—আমার এই পোড়ামুখ নিয়ে যেন আর তোমাদের সামনে আমাকে আসতে না হয়। বলিয়া সাবিত্রী চোখ মুছিয়া অগ্রসর হইল।

রাস্তায় আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া সাবিত্রীকে তুলিয়া দিয়া বেহারী গড় হইয়া প্রণাম করিল। চোখ মুছিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, মা, আমারও

একটি নিবেদন আছে। আজ যেমন ছেলে বলে মনে করেছিলে, দরকার হলে আবার স্মরণ করবে?

করব বৈ কি।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বেহারী আর একবার পথের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল।

বাইশ

পাথুরেঘাটায় চললুম,—বলিয়া সতীশ রাত্রি এগারোটার সময় বাসার বাহিরে আসিয়া খানিকটা পথ চলিয়াই বুঝিল ক্লান্তির সীমা নাই। পা অচল, সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী। কত বড় গভীর অবসাদ তাহার দেহ-মনে আজ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের এমনই আর একটা রাত্রির কথা স্মরণ হইল,—যেদিন বেহারী সাবিত্রীদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, সে নাই, বিপিনবাবুর কাছে চলিয়া গিয়াছে। সেদিন সংবাদটা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল। পরক্ষণেই অভিমান ও অপমানের যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেল্লার নির্জন প্রান্তরে, স্তব্ধ আকাশের তলে চোখের জলে নিবিয়া না গেলে, যেখানে যতদিনে হউক, সাবিত্রীকে দগ্ধ না করিয়া শান্ত হইত না, তেমনি রাত্রি ত আজিও আসিয়াছিল, তবে তেমনি করিয়া আগুন জ্বলিল না কেন?

একখানা খালি গাড়ি যাইতেছিল, ডাকিয়া কহিল, পাথুরেঘাটায় যাবি রে?

গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া রাস্তার আলোকে সতীশের প্রতি চাহিয়াই ভাবিল—মাতাল। বলিল, সে যে অনেকদূর! তিন টাকা কিরায়া লাগবে বাবু—টাকা আছে ত?

'আছে', বলিয়াই সতীশ চড়িয়া বসিল এবং গাড়ির একটা কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল। ক্লান্তি তাহাকে এমন করিয়াই ছাইয়া ফেলিয়াছিল যে, ইহার অধিক কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না।

অনেক পরে অনেক পথ ঘুরিয়া গাড়োয়ান বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ঠিকানায় যাবেন বাবু, ঠিক করে বলে দিন। মিছিমিছি ঘুরতে পারিনে।

সতীশ নিজের বাসার ঠিকানা দিল। কিছু পরে গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে পৌঁছিল। বহু ডাকাডাকির পরে বেহারী আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলে সতীশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী, সাবিত্রী কি আমার ঘরে?

বেহারী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না বাবু, সে ত নেই। তখুনি চলে গেছে।

গেছে?

হাঁ বাবু, সে নেই।

সতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বেহারীর শয্যার একাংশে বসিয়া পড়িল। এই না থাকাটা সুখের কিংবা দুঃখের, সতীশ ঠিক যেন উপলব্ধি করিতে পারিল না।

বেহারী খানিক পরে মৃদুস্বরে কহিল, আমি গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলুম। চলুন, আপনার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসি।

না থাক, আমিই জ্বেলে নিতে পারব, বলিয়া সতীশ উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন তাহার অতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিল,তখন বেলা হইয়াছিল।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটিকার মত সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিয়া কত কাণ্ডই না এই একটা রাত্রির মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে! সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত চিহ্নগুলার মাঝখানে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মন অসাড় হইয়া রহিল। বেহারী আসিয়া তামাক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া কহিল, শোন বেহারী, কাল কখন সে এখানে এসেছিল রে?

সাবিত্রী চলিয়া যাওয়া অবধি তাহার সকল প্রকার দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া বেহারীর ব্যথিত মনটা ভিতরে ভিতরে ভারী কাঁদিতেছিল। সে অবনতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, দুপুরবেলা।

কেমন করে সে এ-বাড়ির সন্ধান পেলে?

সে ত জানিনে বাবু।

সতীশ তাহার মুখপানে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হাঁ রে বেহারী, তুই কি সত্যিই আমাকে এতবড় গরু পেয়েচিস যে, এটাও বুঝতে পারিনে? সত্যি কথা বল্।

বেহারী আশ্চর্য হইয়া তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সতীশ কহিল, চেয়ে রইলি যে! তুই বিপিনের ওখানে যাসনে? সাবিত্রীর সঙ্গে তোর দেখাশুনা কথাবার্তা হয় না?

না বাবু, বলিয়া বেহারী বাহির হইবার উপক্রম করিতেই সতীশ অধিকতর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাঁড়া, যাসনে। তুই তাকে এখানে আসতে শিখিয়ে দিসনি?

বেহারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

সতীশ ধমক দিয়া উঠিল—ফের না!

বেহারী অবনত-মস্তকে ছিল, চমকাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, ফের না? তবে কেমন করে সেই শয়তানটা এ বাসার সন্ধান পেলে? যাও তুমি, তার কাছে গিয়েই থাক গে, আমার দরকার নেই। আমি ঘরের মধ্যে শত্রু পুষতে পারব না। আজই তুমি যাও—তোমাকে জবাব দিলুম।

বেহারী একটি কথাও কহিল না। শুধু তাহার বিস্ময়-প্রসারিত দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

এই অশ্রু সতীশ দেখিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, রাত্রে কোথায় গেল সে?

বেহারী চোখ মুছিয়া বলিল, জানিনে। চিঠি লিখে তার ঠিকানা জানাবে বলে গেছে।

সতীশ আবার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া নরম হইয়া কহিল, ভারী রোগা দেখলুম, খুব ব্যারাম হয়েছিল বুঝি?

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তাই বুঝি সেখানে আর জায়গা হল না?

বেহারী তেমনি মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

সতীশ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি বেহারী, আমার বাসায় আর যেন সে না ঢোকে। কিংবা কোন রকম ছুতো করেও আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে। আমার চাবি কৈ? যাবার সময় কত টাকা তাকে দিলি?

বিহারী চাবি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, টাকা দিইনি।

দিসনি? কেন দিলি নে? তোকে ত দিতে বলে গিয়েছিলুম।

সে নিতে চায়নি, বলিয়া বেহারী বাহির হইয়া গেল। সতীশ তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া ফিরাইল। সাবিত্রী উপস্থিত নাই, বেহারী তাহাকে ভালবাসে—সুতরাং, এই বেহারীকে আঘাত করিতে পারিলেও যেন কতকটা ক্ষোভ মিটে। সে সুমুখে আসিতেই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—তার পরে তোমাদের কি কি পরামর্শ হলো?

বেহারী আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবু, সাবিত্রী কি পরামর্শ করবে আমার মত লোকের সঙ্গে? আপনার চরণে দোষ-ঘাট করে থাকি, মাথা পেতে দিচ্চি, যা ইচ্ছে হয় শাস্তি দিন, কিন্তু বুড়ো মানুষকে এমন করে পোড়াবেন না। বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশের নিজের চোখের কোণও সহসা যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল; আচ্ছা তুই যা, — বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আর একবার শুইয়া পড়িল এবং চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তাহার মুখ দিয়া যে ভাষাই সাবিত্রীর উদ্দেশে বাহির হউক না কেন, তাহার সেই রোগতপ্ত শীর্ণ মুখের স্মৃতি ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় কাঁদাইতেছিল। এখন বেহারীর কথায় পরিষ্কার যদিও কিছুই হইল না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল সাবিত্রী যেন সত্যই আর কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল? বছর-দুই পূর্বে সতীশদের নবনাট্য-সমাজে বিল্বমঙ্গল

প্লে হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার সেই কথাটা মনে পড়িল—'তবু কেন ভুলিতে না পারি তারে?' এ কি আশ্চর্য! যে সাবিত্রী দুষ্টগ্রহের মত তাহাকে শুধু অবিশ্রাম দুঃখ দিতেছে, যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও নিজের মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছে, সে তাহার কেহ নয়—উভয়ের কোন বন্ধনই নাই—যাহার বিরুদ্ধে আজ তাহার ঘৃণার অন্ত নাই, তবুও তাহারই জন্য কেন সমস্ত মন জুড়িয়া হাহাকার উঠিতেছে! এ কি বিচিত্র ব্যাপার! এমন ভীষণ বিদ্বেষ এবং এতবড় আকর্ষণ একই সঙ্গে কি করিয়া তাহার বুকের ভিতরে স্থান পাইতেছে! হায় রে! এ যদি সে একটিবার দেখিতে পাইত, তাহার নিভৃত অন্তরবাসী তাহার সমস্ত চক্ষু-কর্ণ দৃঢ়রুদ্ধ করিয়া এখনও এক বিশ্বাসে অটল হইয়া আছে—সে শুধু আমারই—আমার বড় আর তাহার কিছুই নাই—যাহাকে কোন প্রতিকূল সাক্ষ্য, এমন কি, সাবিত্রীর বিরুদ্ধে তাহার নিজের মুখের কথাও তিলার্ধ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহা হইলে হয়ত সতীশ এই পরমাশ্চর্যের অর্থ বুঝিতে পারিত।

তেইশ

ঘণ্টা-দুই পরে সতীশ পাথুরিয়াঘাটার উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মনে মনে কহিল, উঃ কি শয়তান! যাক, আমিও বাঁচিয়া গেলাম। আমার কাঁধের উপর হইতে ভূত নামিয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উপীনদাকে আজ মুখ দেখাইব কেমন করিয়া? কারণ, আগুনে হাত দিলে কি হয়, ইহা যেমন সে নিশ্চিত জানিত, তাহার আবাল্য-সুহৃৎ উপীনদাকে সে ঠিক তেমনি চিনিত। তাঁহার কাছে এ-সকল অপরাধের ক্ষমা নাই, আজন্ম স্নেহের মূল্যেও বিন্দুপরিমাণ প্রশ্রয় কিনিবার ভরসা নাই, এ কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে বিদিত ছিল?

কিরণময়ীদের বাটীর সদর দরজা খোলা ছিল। সেইখানে আসিয়া সতীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে সমস্ত কথা আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে হইল, শুধু কি উপীনদা তাহার পরম মিত্র, গুরু এবং আদর্শ? তাঁর চেয়ে যথার্থ আপনার কে আছে? সেই উপীনদার পাশে গিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার তাহার আর এতটুকু পথ নাই। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, আজ দেখা হইবামাত্রই তাঁহার সেই অত্যন্ত কঠোর শুদ্ধ-চক্ষের জ্বলন্ত চাহনি তাহাদের আজন্ম বন্ধুত্ব, স্নেহ, প্রেম সমস্তই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দিবে—কিছুই ক্ষমা করিবে না।

আবার ইহাই কি সব? এ বাটীর কবাটও নিশ্চয়ই তাহার মুখের উপর আজ হইতে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আর এখানে প্রবেশ করিবে সে কোন্ মুখ লইয়া?

কিন্তু, এত ক্ষতি, এত লাঞ্ছনা যাহার জন্য, এতবড় সর্বনাশ যে সাধিয়া গেল, সে তাহার কে ছিল? যে নিজে ধরা দেয় নাই, অথচ বাঁধিয়া গেল; দুঃখ

ভোগ করে নাই, অথচ দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া গেল। যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসাধ্য! নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ মনে মনে কহিল, সাবিত্রী, দুঃখ দিয়াছ, সেজন্য আর দুঃখ নাই—কিন্তু সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া এ কি বিষম বিড়ম্বনায় আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গেলে!

দাসী হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া কহিল, বৌমা ডাকচেন আপনাকে।

সতীশ চমকিয়া চাহিল। প্রশ্ন করিল, উপেন্দ্রবাবু এসেছেন?

হাঁ, কাল অনেক রাত্তিরে।

তাঁর ছোটভাই? বৌঠাকরুন?

দাসী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কৈ না। তিনি একলা এসেছেন। এসে পর্যন্ত আমাদের বাবুর কাছে বসে আছেন।

বাবু কেমন আছেন?

দাসী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর বাবু! শেষ হলেই হয়।

সতীশ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বৌঠান কোথায়?

তিনি এইমাত্র স্নান করে রান্নাঘরে গেলেন।

সতীশ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পা টিপিয়া যথাসাধ্য পদশব্দ বাঁচাইয়া সোজা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। কিরণময়ী বোধ করি অপেক্ষা করিয়াই ছিল, সতীশ দ্বারের কাছে আসিতেই উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে—ও কি ঠাকুরপো, চোখ-মুখ যে ভয়ানক বসে গেছে—রাত্রে ঘুমোও নি নাকি?

প্রশ্নটা সতীশের কানে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার মুখখানা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়াই তৎক্ষণাৎ নিবিয়া ছাই হইয়া গেল। কহিল, হাঁ, সারারাত্রি জেগে তাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করেচি। শুনে সন্তুষ্ট হলে ত? আর এখানে যেন না ঢুকি, এই ত? কিন্তু সেই ছোটলোক উপীনবাবুকে বোলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি সত্য কথাই বলতাম। সংসারে সে ছাড়া সত্যি কথা বলতে পারে,

এমন লোক আরও আছে। তা ছাড়া সে আমার এমন কেউ নয় যে, ভয়ে মিথ্যে বলতে হতো। বোলো তাকে—বুঝলে বৌঠান! বলিয়াই সতীশ ফিরিয়া চলিল।

অকস্মাৎ সতীশের এই ভাব, এই অত্যুগ্র কণ্ঠস্বর—কিরণময়ী যেন দিশাহারা হইয়া গেল। সতীশ বড় ঘরের দরজা পার হইয়া যায় দেখিয়া কিরণময়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, যেয়ো না ঠাকুরপো, শোনো—

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, কি হবে শুনে? সত্যি বলচি বৌঠান, সে যে এতবড় ছোটলোক, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। যেখানে সে থাকে, সেখানে আমি থাকিনে। আজ বুঝতে পারচি, হঠাৎ কেন সেদিন বাবা ও-রকম চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বোলো সেই ইতরটাকে, আমি তাকে গ্রাহ্যও করিনে।

কিরণময়ী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কাকে? কি বলচ ঠাকুরপো?

ঠিক বলচি বৌঠান, ঠিক বলচি। তাকে বললেই সে বুঝবে। কিন্তু তোমাকেও বলে যাই আজ—বিনা দোষে তোমার বাড়ির দরজা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিলে বটে,—কিন্তু একদিন বুঝবে—সতীশ যত মন্দই হোক, তাকে বিশ্বাস করে কেউ কোনদিন ঠকেনি। আর একটা কথা তাকে বোলো, সে যত ইচ্ছে—প্রাণভরে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করে যেন, কিন্তু আমিও তাকে আর মুখ দেখাব না, সেও যেন আমাকে—হঠাৎ সতীশ দরজার দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া ঝড়ের বেগে প্রস্থান করিল। তাহারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কিরণময়ীরও দুই চক্ষু পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ উপেন্দ্রর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি চেঁচামেচি শুনিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘরের কবাট ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

কিরণময়ীর একবার মনে হইল, ব্যাপারটা কি, উপেন্দ্র তাহা জানিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না, নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে সরিয়া গেলেন।

কিরণময়ীর বিস্ময়ের অবধি নাই। এ কি কাণ্ড! সতীশ তাহার উপীনদাকে এমন করিয়া তাহারি মুখের উপর অপমান করিয়া গেল কেমন করিয়া? কিসের জন্য? সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া হাতের কাজগুলা যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে একটা গভীর ক্ষুব্ধ বিস্ময় সহস্র রূপ ধরিয়া নিরন্তর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার ঘরের মধ্যে যে এতবড় একটা বিপদ আসন্ন হইয়া রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্য সে তাহাও ভুলিল, শুধু ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর সতীশ বাসায় ফিরিয়া গেছে, তার পরে এই একটা রাত্রির মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিতে পারে যাহাতে সে এমন উন্মত্ত আচরণ করিয়া চলিয়া গেল।

অথচ উপেন্দ্র একটা কথাও জানিতে চাহিলেন না। তাহার মনে হইল, ক্ষণকালের জন্য উপেন্দ্রর শুষ্ক কঠিন মুখের উপর যেন দুঃসহ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য কিংবা শুধু তাহারই মনের কল্পনা, তাই বা কে জানে!

উপেন্দ্র ফিরিয়া গিয়া মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে তাঁহার পূর্ব স্থানটিতে বসিয়া রহিলেন। তিনি স্বভাবতঃই শান্ত-প্রকৃতির। সহসা কাহারো সপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেই সহজ নির্মল বিচার-ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, কাল রাত্রে যখন সুরবালা প্রভৃতিকে জ্যোতিষের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গভীর রাত্রে একাকী হারানের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, হারানের শ্বাসকষ্ট তখন ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিতরে সংজ্ঞা আছে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপারটা তাঁহার কি ভীষণ ঠেকিয়াছিল! অথচ, কোথাও যেন এতটুকু ব্যাকুলতা নাই। ইতিপূর্বে তিনি যে দুই-একটা মৃত্যুশয্যা চোখে দেখিয়াছিলেন, ইহার সহিত তাহাদের কতবড় প্রভেদ। রোগীর শিয়রে তেমনি একটা তেলের প্রদীপ অত্যন্ত ম্লান হইয়া জ্বলিতেছে, মা ঘরের একটা কোণে মাদুর পাতিয়া নিদ্রিত—শুধু কিরণময়ী জাগিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারও আচরণে উদ্বেগের কোন লক্ষণ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহার নিশ্চয় বোধ

হইয়াছিল, সে যেন পরম ঔদাস্যে স্বামীর মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মায়েরও কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব,—নিজের রোগ ও রুগ্নদেহ লইয়াই অস্থির।

কাল রাত্রে উপেন্দ্র যেন অত্যন্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, শুধু যে মৃত্যুর বিভীষিকাই এই দুটি রমণীর মধ্যে আর ছিল না তাহা নহে, পরন্তু ইহার বাঁচিয়া থাকাটাই যেন একটা বাঁধের মত হইয়া এই ক্ষুদ্র পরিবারটির সুখ-দুঃখের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করিয়া, আবর্জনায় নিরতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, এর অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলেই ইহারা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

উপেন্দ্র আজিও কিরণময়ীকে চিনিতে পারেন নাই—সে সুযোগই তাঁহার ঘটে নাই। কিন্তু সতীশ চিনিয়াছিল। তাই প্রথম যেদিন ইঁহারা হারানের আহ্বানে এ বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিরণময়ীর সে রাত্রির আচরণ সতীশ ত ভুলিয়া ছিলই, অধিকন্তু নিজের রূঢ়তার সহস্র অপরাধ স্বীকার করিয়া, তাঁহার ক্ষমা লাভ করিয়া, ভাইয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু উপেন্দ্রর সে অবকাশ ঘটে নাই। তাই কাল রাত্রে ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্তেই তাঁহার অপ্রসন্নচিত্ত মায়ের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিবিড় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই সকালে কিরণময়ী যখন চা দিয়া গেল তিনি স্পর্শও করিলেন না।

সকালে সতীশের আসা-যাওয়া আঘোরময়ী টের পান নাই। তখন তিনি নীচে নিজের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলের পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল না, নিষেধও করিল না। হঠাৎ তাঁহার চায়ের বাটির প্রতি চোখ পড়ায় কান্নার সুরে প্রশ্ন করিলেন, কৈ বাবা, চা খেলে না যে?

উপেন্দ্র সংক্ষেপে কহিলেন, না—

অঘোরময়ী অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন,—না না, সে হবে না বাবা—সারা রাত্রি জেগে আছ,—এর উপর আবার তোমার অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়লে আমি আর বাঁচব না উপীন।

উপেন্দ্র কথা কহিলেন না, শুধু কেবল অঘোরময়ীর মুখের পানে একটা তিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহার অর্থবোধ করা অঘোরময়ীর সাধ্য ছিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিতেই লাগিলেন, কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল কিরণময়ী। এই ঘরে এই মৃতকল্প সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া পরের ছেলের জন্য জননীর এই উৎকট ব্যাকুলতা কত যে অসঙ্গত ও অশোভন দেখাইল, তাহা তাহার তীব্র বুদ্ধির অগোচর রহিল না। কিন্তু সে যাই হোক, উপেন্দ্রও কেন যে এই একটা তুচ্ছ অনুরোধের বিরুদ্ধে এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহারও কারণ কিরণময়ী অনুমান করিতে পারিল না। ইঁহার আচরণটাও তাহার চোখে কম অরুচিকর ঠেকিল না।

এই জেদাজেদি স্থগিত হইল ডাক্তারের আগমনে। সাহেব ডাক্তার মিনিট দুই-তিন পরীক্ষার পরে তাঁহার শেষ জবাব দিয়া গেলেন, এবং এই সঙ্গে ভরসাও দিয়া গেলেন যে, আগামী শেষ-রাত্রির এদিকে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বেলা তখন দশটা। কিরণময়ী একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আপনার একবার সেখানে দেখা দিয়ে আসাও ত দরকার।

উপেন্দ্র কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তেমন দরকার নেই। তাঁরা সমস্ত জানেন।

কিরণময়ী কহিল, তবুও একবার যান। এখন ত কোন ভয় নেই—ততক্ষণ স্নান করে একটু বিশ্রাম করে ফিরে আসতে পারবেন।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিরণময়ী মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, একটুখানি বুঝে দেখুন, স্নানাহার না করে উপোস করে এখন মুখোমুখি বসে থেকে কোন ফল নেই। গাড়িতে এসেচেন, কাল সমস্ত রাত্রি জেগে বসে আছেন, তার ওপর

আজ সারা দিনরাত্রি এমন করে বসে থাকলে অসুখ হয়ে পড়তে পারে। সতীশঠাকুরপোও নেই—এ সময় আপনি যদি—তা ছাড়া আপনাকে সত্যিই বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে। আমি বসে আছি—ততক্ষণ আপনি একটুখানি ঘুরে আসুন। কথা শুনুন—উঠুন।

সহসা উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিয়া ফেলিল। এমন করিয়া এত কথা কিরণময়ী আর কখনো তাঁহার সাক্ষাতে কহে নাই। এ কণ্ঠস্বরে শুভাকাঙ্ক্ষার আতিশয্য নাই, অথচ কি দৃঢ়! কি কোমল! উপেন্দ্রর কানের মধ্যে কিরণময়ীর এই প্রথম সস্নেহ অনুরোধ কি অপরূপ হইয়াই ঠেকিল! বহুদিন পূর্বে একদিন রাত্রে যে তীব্রকণ্ঠ, যে কঠিন ভাষা ইহারই কাছে সে শুনিয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার কি আশ্চর্য প্রভেদ!

উপেন্দ্র কোনদিকে না চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাদের আজ কিরকম হবে?

কিরণময়ী কহিল, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাদের আজ যে দুঃখের দিন, তার ত কেউ ভাগ নিতে পারবে না। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না, এইবেলা উঠে পড়ুন!

সত্য কথা বলিবার এ কি অদ্ভুত শান্ত-কঠিন ভঙ্গী! মুহূর্তের জন্য উপেন্দ্র সমস্ত ভুলিয়া তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি কিরণময়ীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। প্রথমেই চোখ পড়িল তাহার সিঁথার পুরোভাগে সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখাটা—নারী-সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—এ জীবনের পরম শ্রেয়ঃ এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নাই—আয়তির সমস্ত গৌরব বহন করিয়া এখনও বিদ্যমান আছে। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে উপেন্দ্রর সর্বশরীর একবার কাঁপিয়া নড়িল উঠিল।

কিরণময়ী তাহা দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহার আভাসমাত্রও তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। কহিল, আপনি উঠুন, আমি একটু দুধ খাইয়ে দিই।

উপেন্দ্র সরিয়া বসিয়া কহিল, ওষুধটা—

কিরণময়ী ব্যথিত স্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আর তাতে কাজ নেই। অনেক ওষুধই জোর করে খাইয়েচি, আর খাওয়াতে চাইনে।

উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না। ঔষধের অনাবশ্যকতা সে নিজেও কম জানিত না। স্বামীকে দুধ পান করাইয়া সে পুনর্বার অনুরোধ করিতেই উপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অতিশীঘ্র স্নানাহার করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইতেই কিরণময়ী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আসবার সময় সতীশঠাকুরপোর বাসাটা হয়ে আসবেন কি?

উপেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেন?

কিরণময়ী কহিল, আমার ত লোক নেই যে, তাঁর বাসায় একবার পাঠাব, সেই জন্যে বলছিলুম, আপনি যদি একবার—

উপেন্দ্রর সহসা মনে হইল, এই ডাকিতে পাঠাইবার প্রস্তাবের দ্বারা তাহাকেই যেন বিশেষভাবে একটু খোঁচা দেওয়া হইল। তাই তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তাকে কি আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার তাৎপর্য কিরণময়ীর অগোচরে রহিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া নিজের কণ্ঠস্বরের দ্বারা আর তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিল না। শুধু বলিল, এ দুঃসময়ে ত আমার সকলকেই প্রয়োজন উপীনবাবু। তা ছাড়া, কেন যে হঠাৎ তিনি আপনার উপর অমন রাগ করে চলে গেলেন, তাও ত জানিনে। তাই ভাবচি, একবার তাঁকে ডেকে আনবার চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

উপেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। সে ত আমারই বন্ধু, আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই স্থির করে নিতে পারব। তবে, আপনার যদি বিশেষ কাজ থাকে ত—তার কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে পারি—আমার নিজের যাবার সময় হবে না।

কিরণময়ী মৃদুস্বরে কহিল, সেই ভাল। লোক পাঠিয়ে দেবেন। তার আসাই চাই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বোঝাপড়া যবে হয় হোক, কিন্তু আমি তার বোন। আমার এতবড় বিপদের দিনে আমাকে শাস্তি দিতে আপনাদের আমি দেব না।

না না, তার আবশ্যক কি, আমি খবর পাঠিয়ে দেব—বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। অবশ্য, ভাই-বোনের নূতন সম্বন্ধ কোথায় কিভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহা স্থির করিয়া দিবার ভার তাহার উপরে নাই, এ কথা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু তথাপি যে আত্মীয়তার ধারা একদিন শুধু তাহার মধ্য দিয়াই পথ পাইয়াছিল, সে যে আজ তাহাকেই অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এ সংবাদ তাহাকে আঘাত না করিয়া পারিল না। বন্ধুর প্রতি সে যা খুশী করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের এই ভাই-বোনের নিকটতম সম্বন্ধের মধ্যে কিরণময়ী কোন বন্ধুকেই যে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না, ইহা বুঝিবার পক্ষে সে অস্পষ্টতার লেশমাত্র স্থান রাখে নাই।

ক্ষুদ্র গলি দ্রুতপদে পার হইয়া আসিয়া উপেন্দ্র বড় রাস্তায় গাড়ি ভাড়া করিল। অন্ধকার-শীতল মৃত্যুপুরীর বাহিরে, শহরের এই প্রখর সূর্যালোকদীপ্ত, জীবন্ত, কর্মচঞ্চল রাজপথের উপরে দাঁড়াইয়াও কিন্তু সে আরাম বোধ করিল না। মনের ভিতরটায় কেমন যেন একরকম জ্বালা করিতেই লাগিল।

আবশ্যক হইলে কিরণময়ী যে কিরূপ উগ্রভাবে কঠিন হইয়া উঠিতে পারে, তাহা সে একদিন দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার শান্ত বিরুদ্ধতাও যে তাহা অপেক্ষা অল্প কঠিন নয়, আজিকার এই গুটি কয়েক কথাতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল। সতীশের সহিত তাহার যে একটা বিবাদ ঘটিয়াছে, কিরণময়ী তাহা টের পাইয়াছে বুঝা গেল। কিন্তু, কলহের কারণ যাহাই হোক, দোষ-গুণের বিচার সে নিজেই করিবে, আর কাহাকেও হাত দিবে না, এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল।

চব্বিশ

নারীর সম্বন্ধে উপেন্দ্রর মত পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের মধ্যে মস্ত ভুল ছিল। এমন নারীও আছে, যাহার সম্মুখে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। জোর খাটে না, মাথা অবনত করিতে হয়। এমনি নারী কিরণময়ী। সেই প্রথম পরিচয়ের রাত্রে ইহারই সম্বন্ধে উপেন্দ্র সতীশের কাছে, মুখে অন্যরূপ কহিলেও অন্তরে সকরুণ অবজ্ঞার সহিত ভাবিয়াছিল, ইহারা সেই-সব উগ্র-স্বভাবা রমণী—যাহারা অতি সামান্য কারণেই জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদের মত বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিয়া বসে। আজ দেখিতে পাইল, না, তাহা নয়। ইহারা একান্ত সঙ্কটের মধ্যেও মাথা ঠিক রাখিতে জানে, এবং লেশমাত্র উগ্র না হইয়াও অবলীলাক্রমে আপন ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারে। এ বাটীতে সতীশের আসা-যাওয়া উচিত-অনুচিত যাই হোক, কিরণময়ী ডাকিয়াছে, এ খবরটা সতীশকে দিতেই হইবে।

এই কথাটা পথে যাইতে যাইতে সে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন আক্ষেপে ভরিয়া উঠিল। কারণ, সতীশকে অত ভালবাসিত বলিয়াই, তাহার উপর আজ উপেন্দ্রর বিতৃষ্ণার যেন অন্ত ছিল না। সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার বিচার আর একদিন হইবে, কিন্তু আজ যে সতীশ প্রকাশ্যে, তাহারি মুখের উপর তাহার চিরদিনের অধিকৃত অগ্রজের সম্মানিত আসনটিকে সদর্পে মাড়াইয়া গেল, কোন সঙ্কোচ মানিল না, সকল দুঃখের চেয়ে এই দুঃখই উপেন্দ্রর মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছিল।

কিছুদিন পূর্বে উপেন্দ্র বাড়িতে বসিয়াই একখানা অনামা পত্রে সতীশের কথা শুনিয়াছিল। সে পত্র, রাখালের লেখা। যখন দুজনের ভাব ছিল, তখন

সতীশের নিজের মুখেই রাখাল তাহার এই পরম বন্ধুটির বহু অসাধারণ কাহিনী অবগত হইয়াছিল। উপেনদার অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি এবং তাহার তুষার-শুভ্র অকলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতি এবং সকল গর্বের বড় গর্ব ছিল তাহার সেই উপীনদার অপরিমেয় স্নেহ। সেইখানে ঘা দেওয়ার মত মারাত্মক আঘাত যে সতীশের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, ধূর্ত রাখাল তাহা ঠিক বুঝিয়াছিল।

কিন্তু, সে পত্র তখন কোন কাজই করে নাই। উপেন্দ্র চিঠি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পত্র-প্রেরকের উদ্দেশে হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যেই হও এবং সতীশের যত গোপনীয় কথাই জানিয়া থাকো, আমি তোমার চেয়েও তাহাকে বেশী জানি; এবং দিন-দুই পরে সতীশের পিতার প্রশ্নে সহাস্যে কহিয়াছিল, সতীশ ভালই আছে। তবে, বোধ করি, কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া সাবেক বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। সে লোকটা একখানা অনামা পত্রে তাহার সম্বন্ধে যা-তা লিখিয়া জানাইয়াছে।

বৃদ্ধ উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরকম যা-তা উপীন?

উপেন্দ্র জবাব দিয়াছিল, সে-সকল মিথ্যা গল্প শুনিয়া আপনার সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। আমি ত সতীশকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আমি জানি, সে এমন কিছু করিবে না যাহাতে আত্মীয় কাহারও মাথা হেঁট হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তাহার সেই বিশ্বাসের শিরে বজ্রপাত হইল সাবিত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়া। সতীশের নির্জন কক্ষের মধ্যে প্রসাধননিরতা একাকিনী রমণী! তাহার সে কি সুগভীর লজ্জা! এবং সমস্ত লজ্জা ছাপাইয়া সেই দুটি আয়ত চক্ষুর ব্যথিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে কি ত্রাসই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে কি ভুল করিবার? এক মুহূর্তেই উপেন্দ্রর মনের মধ্যে রাখালের সেই বিস্মৃতপ্রায় চিঠিখানির আগাগোড়া একেবারে যেন আগুনের অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রশ্ন করিবার, সংশয় করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

সে চিঠিখানিকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে রাখাল চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাতে সাবিত্রীর নাম ত ছিলই, নানাবিধ বিবরণের মধ্যে তাহার ভ্রূর উপর একটি ছোট কাল আঁচিলের কথা উল্লেখ করিতেও সে ভুলে নাই। চিহ্নটি এতই সুস্পষ্ট যে, পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহা উপেন্দ্রর লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল।

সতীশকে ডাকিয়া দিবার অপ্রিয় কাজটা যাইবার পথেই শেষ করিয়া যাইবে কি না, স্থির করিতে করিতেই ভাড়াটে গাড়ি জ্যোতিষ-সাহেবের বাটীর সম্মুখীন হইল এবং ফটকে প্রবেশ করিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি কিসে যেন বাড়ির দক্ষিণ দিকের দোতলা কক্ষের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইল।

উপেন্দ্র মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যাহা নিঃসংশয়ে প্রত্যাশা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই। উন্মুক্ত সুদীর্ঘ বাতায়ন ধরিয়া একখানি স্তব্ধ প্রতিমা এই পথের পরেই যেন সমস্ত প্রাণমন পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এতটা দূর হইতে ভাল করিয়া দেখা সম্ভব নহে, তবুও তাহার মনশ্চক্ষে ওই বাতায়নবর্তিনীর ওষ্ঠাধরের ঈষৎ কম্পনটুকু হইতে চক্ষুপল্লব-প্রান্তের জলের রেখাটি পর্যন্ত এড়াইল না। তাহার এতক্ষণকার চিন্তাজ্বালা, অভিমান ও অপমানের ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা মুছিয়া গিয়া শুধু কেবল এই একটা কথা মনে জাগিল, সুরবালার সারারাত্রি এবং এই-সমস্ত সকালটা না জানি কি করিয়াই কাটিয়াছে। যে সাধ্য থাকিলে হয়ত তাহাকে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না, সে যে এই অপরিচিত শহরের মধ্যে গভীর রাত্রে তাহার অসুস্থ স্বামীকে একাকী বাড়ির বাহিরে যাইতে দিয়া এতটা বেলা পর্যন্ত কিরূপ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া একদিকে তাহার যেমন হাসি পাইল, অন্যদিকে তেমনি চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

সরোজিনী বোধ করি খবর পাইয়া সেইমাত্র ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইয়াছিল, উপেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহার চোখ-মুখ হাসির ছটায় ভরিয়া গেল। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতেই বলিয়া উঠিল, বাইরে আর একদণ্ডও নয়, একেবারে উপরে চলুন।

উপেন্দ্র যথাসাধ্য গম্ভীর-মুখে হেতু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। সরোজিনী তখন সহাস্যে কহিল, বেশ মানুষটিকে কাল রাত্রে আমার জিম্মা করে দিয়েছিলেন—না নিজে ঘুমিয়েছে, না আমাকে ঘুমুতে দিয়েছে। সারারাত্রি গাড়ির শব্দ শুনেচে, আর জানালা খুলে দেখেচে—ও কি, চিঠি লিখতে বসে গেলেন যে! না না, সে হবে না—একবার দেখা দিয়ে এসে তার পরে যা ইচ্ছে করুন—এখন নয়।

বাহিরের বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের উপর লিখিরাব সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল, উপেন্দ্র একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া কহিল, বরং চিঠি লিখে তার পরে যা বলুন করতে পারি, কিন্তু তার পূর্বে নয়। পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না—ইচ্ছে হয় গিয়ে খবর দিতে পারেন।

সরোজিনী তেমনি হাসিমুখে বলিল, আমার খবর দেবার দরকার নেই—তিনিই আমাকে খবর দিতে বাইরে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, পাঁচ মিনিট আমি দাঁড়িয়ে রইলুম—আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে তবে যাব।

উপেন্দ্র আর জবাব না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে তাহার মুখের উপর ব্যথা ও বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি যে অদূরে দাঁড়াইয়া সরোজিনী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পত্র সমাপ্ত করিয়া তাহা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিল। কোচ্‌ম্যান আসিয়া সরোজিনীকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল, গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বেরুবেন নাকি?

সরোজিনী কহিল, হাঁ। আমার ছোট পিয়ানোটা মেরামত করতে দিয়েচে, সেইটে একবার দেখে আসব।

উপেন্দ্র খুশী হইয়া কহিল, ঠিকানা লেখা আছে, একটু কষ্ট স্বীকার করে এই চিঠিখানা সহিসকে দিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। বলিয়া উপেন্দ্র সরোজিনীর প্রসারিত হাতের উপর চিঠিখানি রাখিয়া দিল।

সরোজিনী কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার শিরোনামার প্রতি চাহিয়া রহিল। ঐ দুই ছত্র নাম ও ঠিকানা পড়িতে এতটা সময় লাগে না। তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, সতীশবাবু এবার আমাদের বাড়িতে উঠলেন না কেন?

সে ত আমাদের সঙ্গে আসেনি—সতীশ বরাবরই এখানে আছে।

সংবাদ শুনিয়া সরোজিনী চমকিয়া গেল। উপেন্দ্রর এ-সকল লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, থাকিলে সে আশ্চর্য হইত।

সরোজিনী নিজের লজ্জা চাপা দিতে সহজভাবে বলিবার চেষ্টা করিল, তিনি কখনো এদিকে মাড়ান না—অথচ এতদিন এত কাছে রয়েচেন।

উপেন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া আর একটা কিছু ভাবিতেছিল, কহিল, বোধ করি, আপনাদের কথা তার মনে নেই। কথাটা কত সহজ, কিন্তু কি কঠিন হইয়াই আর একজনের কানে বাজিল!

ভাল কথা, দিবাকর কৈ, তাকে দেখছিনে যে?

তিনি দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেড়াতে গেছেন। চলুন, আপনাকে সঙ্গে করে আগে ভিতরে দিয়ে আসি; বলিয়া সরোজিনী বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

মিনিট-কুড়ি পরে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়িতে উঠিয়া বসিল এবং আদেশমত গাড়ি সতীশের বাসার অভিমুখে রওনা হইল, তখন ভিতরে বসিয়া সরোজিনীর বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল এবং গাড়ি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, হৃৎস্পন্দন ততই যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঠিক মনে হইতে লাগিল, সে এমনই কি একটা গুরুতর কাজের ভার লইয়া চলিয়াছে— যাহার সিদ্ধির উপর তাহার নিজেরই যেন সমস্ত ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ নির্ভর করিয়া আছে।

অনতিকাল পরে গাড়ি সতীশের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং সহিস পত্রখানি হাতে করিয়া নামিয়া গেল। সরোজিনী গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষিয়া আড়ষ্ট হইয়া কান পাতিয়া দরজার উপর সহিসের করাঘাত শুনিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ এবং তাহার ভিতরে যাওয়া অনুভব করিল এবং তাহার পর প্রতি-মুহূর্তে কাহার সুপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসিবার আশঙ্কায় ও আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ কণ্টকিত হইয়া বসিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, গাড়ি এবং গাড়ির ভিতরে যে বসিয়া আছে, সহিসের কাছে তাহার পরিচয় অবগত হইয়া সতীশ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার একবারও মনে হইল না, যে ব্যক্তি এতকাল এত কাছে বাস করিয়াও এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে, এ সংবাদ তাহাকে হয়ত অণুমাত্রও বিচলিত না করিতে পারে।

আবার সহিসের কণ্ঠস্বর দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল—সে দ্বার রুদ্ধও হইল এবং ক্ষণকাল পরেই সে চিঠি হাতে লইয়া একা ফিরিয়া আসিল। কহিল, বাবু বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? মুহূর্তকালের জন্য সরোজিনী সুস্থ হইয়া বাঁচিল। মুখ বাড়াইয়া কহিল, চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে এলি কেন, রেখে আয়।

সহিস জানাইল, বাবু কলিকাতায় নাই, বেলা দশটার ট্রেনে বাড়ি চলিয়া গেছেন।

কথাটা শুনিয়া কেন যে তাহার এই বাসাটা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া লইবার দুর্দমনীয় স্পৃহা হইল, তাহার হেতু সে ঠিকমত নিজেও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু, পরক্ষণেই নামিয়া আসিল এবং আর একবার কবাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হিন্দুস্থানী পাচক জিনিসপত্রের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহার সাহায্যে সমস্ত ঘরগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া নীচে আসিবার পথে দড়ির আলনায় ঝুলানো একটা অর্ধমলিন চওড়া পাড়ের শাড়ির প্রতি সরোজিনীর দৃষ্টি পড়িল।

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করায় ব্রাহ্মণ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিল এ বস্ত্রখানি মা-জীর।

সাবিত্রী অপরাহ্নবেলায় স্নান করিয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত বস্ত্রখানি শুকাইতে দিয়াছিল, তাহা তখন পর্যন্ত তেমনিই টাঙ্গানো ছিল। সরোজিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই মাইজীর সম্বন্ধে যতটুকু অবগত হইল, তাহাতে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। যে-সকল ব্যাপার সচরাচর এবং সহজভাবে ঘটে না, এবং যাহার মধ্যে পাপ আছে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে না পারিলেও সকলেই নিজের বুদ্ধি অনুসারে একরকম করিয়া বুঝিতে পারে। এই হিন্দুস্থানীটিও সস্ত্রীক উপেন্দ্রর আসা এবং অমন করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া হইতে আজ সকালে মনিবের অকস্মাৎ প্রস্থানের মধ্যে মাইজীটির যে সংস্রব ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ করিয়া সতীশের উদ্‌ভ্রান্ত আচরণ কোন লোকেরই দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই সে সাবিত্রীর অসুখ প্রভৃতি অনেক কথাই কহিল এবং তাহাকে দেখা-শুনা করিবার জন্যই যে তাহার মনিবকে এমন ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া অকস্মাৎ প্রস্থান করিতে হইয়াছে তাহাও সে একরকম করিয়া বুঝাইয়া দিল। সরোজিনী এই একটি নূতন তথ্য অবগত হইল যে, উপেন্দ্ররা সর্বপ্রথমে এই বাড়িতেই আসিয়াছিলেন, মোট-ঘাট নামানো পর্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত তুলিয়া লইয়া সেই গাড়িতেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহারা কেহই সতীশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তাহার পরে আজ এই পত্র,—স্পষ্ট বুঝা গেল, উপেন্দ্র তাঁহার বন্ধুর আকস্মিক প্রস্থানের কথাটা বিদিত নহেন। অধীর ঔৎসুক্যে সে ক্রমাগত এই রমণীটির সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া ইহার বয়স এবং সৌন্দর্যের যে তালিকা পাইল তাহা সত্যকে ডিঙ্গাইয়াও বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়িতে উপবেশন করিল, তখন তাহার পিয়ানো সারানোর শখ চলিয়া গেছে এবং অজ্ঞাত গুরুভারে বুকের ভিতরটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই রহস্যময়ী যে কে, এবং কি সূত্রে আসিয়াছিল তাহা জানা গেল না। কিন্তু একটা লুকোচুরির অস্তিত্ব তাহার মনের মধ্যে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিল।

সতীশ ও কিরণময়ীর উপর বিরক্তি ও অভিমান উপেন্দ্রের যত বড়ই হউক, তাহাকে প্রাধান্য দিয়া কর্তব্য অবহেলা করা তাহার স্বভাব নয়। তাই আহারাদির পর পাথুরেঘাটার বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়াই তাহার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু নিদারুণ শ্রান্তি আজ তাহাকে পরাস্ত করিল। অধিকন্তু সুরবালা এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল যে, তাহা অবহেলা করিয়া যাওয়াও অসাধ্য হইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-কয়েক পরে তাহার উৎকণ্ঠিত নিদ্রা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা আর নাই। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই পাশের টিপয়ের উপর চিঠিখানার উপর চোখ পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র তেমনি বন্ধ রহিয়াছে—যে কারণেই হউক, তাহা সতীশের হাত পড়ে নাই। সাড়া পাইয়া সুরবালা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সতীশ-ঠাকুরপো এখানে নেই, বেলা দশটার গাড়িতে বাড়িতে চলে গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া উপেন্দ্রের মুখ কালি হইয়া গেল। প্রথমেই মনে হইল, এই অপরিচিত শহরের মধ্যে হারানের আসন্ন মৃত্যু-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য এখন একাকী তাহাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। উঃ, সে কত কাজ! এবং ভীষণ নিদারুণ! লোক ডাকা, জিনিসপত্র যোগাড় করা, সদ্যবিধবা ও জননীর কোলের ভিতর হইতে তাহার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ টানিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া! এই মর্মান্তিক শোকের দৃশ্য কল্পনা করিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী ও সমস্ত চিত্ত পাথুরেঘাটার প্রতিকূলে মুখ বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে ভিতরে ভিতরে সতীশের উপর কতখানি নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল, তাহা এইবার অভিমান ও অপমানের আবরণ ভেদ করিয়া দেখা দিল।

এই-সকল কার্য উপেন্দ্রর নিতান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সাধ্যমত কোনদিন সে ইহার মধ্যে পড়িতে চাহিত না। কিন্তু সতীশের কাছে তাহা কতই না সহজ! দেশে এমন লোক মরে নাই, যেখানে সে তাহার কর্মপটু সুস্থ সবল দেহটি লইয়া

সর্বাগ্রে উপস্থিত হয় নাই, এবং সমস্ত অপ্রিয় কার্য নিঃশব্দে বিনা-আড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়া দেয় নাই। এ দুঃসময়ে সকলেই তাহাকে খুঁজিত, এবং তাহার আগমনে শোকার্ত ও বিপন্ন গৃহস্থ এই দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা এবং সাহস পাইত। সে যখন একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন ক্ষণকালের জন্য উপেন্দ্র কোনদিকে চাহিয়া আর পথ দেখিতে পাইল না।

সুরবালা স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হারানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সতীশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। সরোজিনী ফিরিয়া আসিয়া কথা বাহির করিবার জন্যে গল্পচ্ছলে যাহা বিবৃত করিয়াছিল, তাহা হইতেই সে কাল রাত্রির ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, সতীশ যে তাহার স্বামীর কত বড় বন্ধু, তাহা জানিত বলিয়াই এই ব্যথাটা এখন এড়াইয়া গেল।

সুরবালার সাংসারিক বুদ্ধির উপরে উপেন্দ্রর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না বলিয়াই সে কোনদিন স্ত্রীর কাছে কোন সমস্যার উল্লেখ করিত না, কিন্তু এইমাত্র সে নিজেকে এতই বিপন্ন ভাবিতেছিল যে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, সে যে আমাকে এই বিপদের মাঝে ফেলে রেখে চলে যাবে সুরো, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একা এই অজানা জায়গায় আমি কি উপায় করি! বলিয়া উপেন্দ্র যেন অসহায় শিশুর মত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু আশ্চর্য, স্বামীর এতবড় বিপদের বার্তা পাইয়াও সুরবালার মুখে লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। সে কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া পুনরায় বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া ধীরভাবে কহিল, তা অত ভাবচ কেন, এ কলকাতায় কারো জন্যেই কারো আটকায় না। তোমার চা তৈরী হয়েছে, হাতমুখ ধুয়ে তুমি চা খেয়ে নাও। ছোটঠাকুরপোকে সঙ্গে করে আমিও যাচ্চি চল।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিল, তুমি যাবে?

সুরবালা অবিচলিতভাবে কহিল, যাব বৈ কি! মেয়েমানুষের এ দুঃসময়ে কাছে থাকা মেয়েমানুষেরই কাজ—বলিয়া সে অনুমতির জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া পাশের ঘর হইতে চা আনিয়া হাজির করিল এবং দিবাকরকে সংবাদ দিয়া নিজে প্রস্তুত হইবার জন্য শীঘ্র বাহির হইয়া গেল।

গৃহস্থের ঘরে ঘরে যখন সবেমাত্র সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনি সময়ে তাহারা পাথুরেঘাটার বাড়িতে প্রবেশ করিল। সদর দরজা খোলা, কিন্তু নীচে কোথাও কেহ নাই। অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়ি শ্মশানের মত স্তব্ধ। উভয়কে সাবধানে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপেন্দ্র নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া হারানের রুদ্ধ কবাটের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে শুধু একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কানে আসিয়া বাজিল। কম্পিতহস্তে দ্বার ঠেলিয়া চাহিতেই আঁধার শয্যাতলে আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত হারানের মৃতদেহ চোখে পড়িল। তাহার দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সদ্যবিধবা উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল—সে একবার মাথা উঁচু করিয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর্তকণ্ঠে 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়াই উপেন্দ্রর পদতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই চক্ষের নিমেষে সুরবালা উদ্‌ভ্রান্ত হতবুদ্ধি স্বামীকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া কিরণময়ীর মুখখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল।

পঁচিশ

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা-রক্তে গঠিত এই মানব-দেহে সমস্ত বস্তুরই একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। মাতৃস্নেহও অসীম নহে, তাহারও পরিমাণ আছে। গুরুভার অহর্নিশ অবিচ্ছেদে টানিয়া ফিরিয়া রক্ত-চলাচল যখন বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে, তখন সেই সীমারেখার একান্তে দাঁড়াইয়া জননীও আর সন্তানকে বহন করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা স্নেহের অভাবে কিংবা ক্ষমতার অভাবে সে মীমাংসার ভার অন্তর্যামীর হাতে, মায়ের হাতে নয়। তাই সেদিন যখন হারানের মৃতদেহ মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হইয়া শ্মশানে চলিয়া গেল, তখন অঘোরময়ীর বক্ষ ভেদিয়া যে দীর্ঘশ্বাস সেই অসীমেরই পদপ্রান্তে এই মৃত্যুর বার্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা আরও কিছু সঙ্গে লইয়া গেল কি না, সে অনুমান করিবার সাধ্য মানুষের নাই।

তাঁহার অত্যন্ত জ্বরের উপরেই হারানের মৃত্যু ঘটে। তারপর আট-দশ দিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া গেছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

শ্রাদ্ধটা কোনমতে শেষ হইয়া গেলে তিনি উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, বাবা, পাশের বাড়ির মল্লিকদের বড়বৌ কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ বেড়াতে যাবেন, আমার কি সেই সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না?

কেন হতে পারবে না মাসী, স্বচ্ছন্দে হতে পারে। কিন্তু—, বলিয়া সে একবার কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

কিরণময়ী বুঝিতে পারিয়া কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই ঠাকুরপো, আমি ঝিকে নিয়ে বেশ থাকতে পারব।

উপেন্দ্র কিন্তু ইহাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিংবা এও ত স্বচ্ছন্দে হতে পারে। দিবাকর ঠাকুরপো ত কলকাতায় থেকেই বি. এ. পড়বেন স্থির হয়েছে, তাঁকে কেন আমার কাছেই রেখে দাও না? একটা অজানা বাসায় থাকার চেয়ে আমার চোখের উপর থাকা ত ঢের ভাল। যত্নও হবে, কলকাতায় একলা রাখার যে-সব ভয় আছে, সে ভয়ও থাকবে না। বলিয়া সে উপেন্দ্রর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

অঘোরময়ী একেবারে পূর্ণ সম্মতি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে হলে ত আর কোন কথাই নেই উপীন—তাই কর বাবা, তাই কর। সে ছেলেটারও যত্ন হবে, এ হতভাগীও যা হোক একটু নাড়াচাড়া করে বাঁচবে। তিনি কোনগতিকে একটু বাহির হইয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচেন। এতশীঘ্র এমন সোজা পথ আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু উপেন্দ্র কিরণময়ীর সাহস দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন একটা অভাবনীয় প্রস্তাব সে মুখ দিয়া বাহির করিল যে কি করিয়া, ইহাই ত সে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না। দিবাকর যাই হউক, সে শিশু নহে, —সেও প্রাপ্তযৌবন পুরুষ।

অথচ ঠিক যেন শিশুর মতই এই সর্বরূপ-যৌবনা রমণী একাকিনী এই নির্জন গৃহমধ্যে তাহাকে লালন-পালন ও মানুষ করিয়া দিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া উপেন্দ্রর মুখ দিয়া ভালমন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। এই রমণী যে কিরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতী তাহা জানিতে তাহার বাকী নাই। সে যে সঙ্গত-অসঙ্গত সাংসারিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা সবিশেষ জানিয়া বুঝিয়াই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে তাহাতেও সংশয় নাই—তবে, এ কি কথা? কেমন করিয়া কহিল?

নিমেষের মধ্যে সে তাহার সংশয়োত্তেজিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ-শক্তি জাগ্রত ও একত্র করিয়া এই অনন্ত সৌন্দর্যময়ীর অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করিতে চাহিল,

কিন্তু কোনখানে তাহারা প্রবেশের পথ পাইল না। বরঞ্চ কোথায় যেন সবেগে প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু, এই যে মুহূর্তকালের জন্য উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল, ইহাতে দুজনের মধ্যে যেন একটা নূতন পরিচয়ে চেনাশুনা হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এমন শুদ্ধ শান্ত ও একান্ত আত্মসমাহিত বৈরাগ্যের মূর্তি সে আর কখনও দেখে নাই। সেদিন রাত্রে ইহার বেশের পারিপাট্য দেখিয়া সদ্যসমাগত তাহার ও সতীশের দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, ইহার তুলনা নাই—এমন করিয়া সাজিতে না পারিলে বুঝি কাহারও সাজাই হয় না, আজ আবার তাহারই এই রুক্ষ শিথিল অসংবদ্ধ কেশপাশ ও বিধবার সাজ দেখিয়া মনে হইল, এমন বুঝি আর কোন দিন ইহাকে দেখায় নাই। অত্যন্ত অকস্মাৎ নবলব্ধ চেতনার মত এই একটি কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল যে, সৌন্দর্যের এই যে অপরিসীম সমাবেশ, ইহা ঠিক যেন অগ্নিশিখার মতই তরঙ্গিত হইয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতেছে—ইহাকে দুই চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্পর্শ করিতে নাই—যে করে, সে মরে। এই তীব্র শিখারূপিণী বিধবা যে অসঙ্কোচে অকুতোভয়ে দিবাকরকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে, সে ইহার সত্যকার অধিকারের গর্বেই করিয়াছে। দুঃসাহস বা স্পর্ধা প্রকাশ করে নাই।

উপেন্দ্র তখনও কথা কহিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে এই বিধবার কাছে দিবাকর একেবারে নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুর মতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল; এবং সেদিন কেন সতীশকে ছোট ভাইটির মত কাছে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাও আজ একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। পরিতৃপ্ত মন তাহার নিঃশব্দ করযোড়ে এই মহামহিমময়ীর সম্মুখে নিজের অপরাধ বারংবার স্বীকার করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইল। তিনজনই নির্বাক্; কিরণময়ী প্রথমে কথা কহিল। তাহার দুই চক্ষের করুণ দৃষ্টি তেমনিই উপেন্দ্রর

মুখের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, দিবাকরকে আমার কাছে কি রাখতে পারবে না ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল, কেন পারব না বৌঠান! আপনি যদি তার ভার নেন, সে ত আমার পরম ভাগ্য। এতকাল পরে উপেন্দ্র আজ প্রথম তাহাকে আত্মীয়ার মত সম্বোধন করিল। কহিল, দিবাকর আমার সঙ্গেই ত এসেছিল, কখন একলা চলে গেছে বুঝি, নইলে এখনই তাকে ডেকে বলে দিতাম।

কথা শুনিয়া কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল। এবার তাহারই মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। অকস্মাৎ আনন্দের বন্যায় তাহার দুই কূল যেন ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া তুলিল। তাই সে ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র মুখ ফিরাইয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইতে লাগিল। এইটুকু আত্মীয় সম্বোধন! তা কতটুকুই বা! কিন্তু ইহারই জন্য সে যেন কত যুগ হইতে তৃষ্ণার্ত হইয়া ছিল, তাহার এমনি মনে হইল। সতীশ এই বলিয়া ডাকিয়াছে, দিবাকর তাহাই বলিয়া ডাকে, কিন্তু তাহাতে ইহাতে কি অপরিমেয় ব্যবধান! এই আহ্বানটুকুর দ্বারা এতদিন পরে উপেন্দ্র যে তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিল, হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, ইহার প্রচণ্ড বেগ সে বুঝি-বা সহ্য করিতেই পারিবে না।

কিন্তু, ইহাদের এই আকস্মিক মৌনতায় অঘোরময়ী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একজন যদি-বা রাজী হইল, আর একজন মুখ ফিরাইয়া রহিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, বাবা উপীন, তা হলে আমার যাবার ত কোন বিঘ্নই নেই। কিন্তু সে ত আর দেরী নেই, আমি কেন এখনি গিয়ে মল্লিকগিন্নীকে বলে আসিনে?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমি ত বলেছি মাসীমা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তোমার বৌমা সম্মত হলেই

হলো। তাঁরও যখন মত আছে, তখন তোমার তীর্থযাত্রার কোন বাধাই ত আমি দেখিনে।

তবে যাই বাবা, আমি এখনি গিয়ে তাকে বলে আসি। জেনেও আসি, কবে তাঁদের যাওয়া হবে; বলিয়া অঘোরময়ী আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝিকে ডাকিয়া লইয়া প্রফুল্লমুখে নীচে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার এই ত্বরাটুকুতে উপেন্দ্র মনে মনে তৃপ্তি বোধ করিয়া কহিল, ভালই হলো। যেমন করে হোক, এখন দিন-কতক ওঁর বাইরে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

কিরণময়ী কিছুই বলিল না। এই সময়টুকুর মধ্যে সে কেমন যেন একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব না পাইয়া উপেন্দ্র পুনরায় কহিল, আপনার যথার্থ সম্মতি আছে ত বৌঠান?

উপেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে সে ক্ষণকাল অবোধের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সহসা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। কহিল, আছে বৈ কি ঠাকুরপো, নিশ্চয় আছে। এ যে কি অন্ধকূপ, সে শুধু আমরাই জানি। যান যান, দিন-কতক এই দুঃখের গণ্ডী থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচুন।

তাহার কথাগুলি এমন করিয়াই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, উপেন্দ্র ব্যথা অনুভব করিল। পীড়িত-চিত্তে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ দুঃখের গণ্ডী থেকে শুধু তাঁর নয় বৌঠান, আপনারও বার হওয়া উচিত।

কিরণময়ী কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আমার আর কে আছে ঠাকুরপো, কার কাছে যাব?

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, আপনার বাপের বাড়িতে কি কেউ নেই?

কিরণময়ী হাসিল। কহিল, বাপের বাড়ি যে কোথায়, তাই ত জানিনে, মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম, তাঁদের খবরও আট-দশ বছর জানিনে। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সেই যে এ-বাড়িতে ঢুকেছি, মরণ না হলে বোধ করি আর বার হতেই পারব না।

উপেন্দ্র অধিকতর ব্যথিত হইল। একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তবে আপনিও কেন মাসীমার সঙ্গে পশ্চিমে যান না! বেড়ানোও হবে, তীর্থ করাও হবে, বলিয়া, সে কিরণময়ীর ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কারণ, এমন প্রস্তাবে সে কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করিল না। তেমনি নিরুৎসাহ-মুখে নীরবে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্রর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, সে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। কহিল, আপনি এই বাড়ির জন্যে ভাবচেন ত? কোন চিন্তা করবেন না। আমি দেখবার শোনবার বন্দোবস্ত করতে পারব। কোন জিনিস নষ্ট হবে না।

এইবার কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। কহিল, তুমি আমার সেই প্রথম রাত্রির পাগলামি স্মরণ করে বুঝি এ কথা বললে ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, না, না, তা নয়। কিন্তু তাও যদি হয়, তাকেই বা পাগলামি বলচেন কেন? ও-অবস্থায় ও-রকম সতর্ক হওয়া ত সকলেরই উচিত।

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, ঐ অতখানি সতর্ক হওয়া ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র কহিল, নয় কেন? নিজের ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মমতা কার নেই? ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা কার হয় না? না, না, অমন কথা আপনি বলবেন না। তাতে অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না।

না থাকলেই ভাল। কিন্তু আমি ত এখন সেটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনে; এবং হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, তোমাকেও সন্দেহ! ছি, ছি, কি কটুকথাই না বলেছিলুম! মনে হলে এখন নিজেই লজ্জায় মরে যাই। বলিতে বলিতেই তাহার স্বভাবসুন্দর মুখখানি সকৃতজ্ঞ অনুতাপে যেন বিগলিত হইয়া গেল। উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, কিন্তু সে মমতা এখন কৈ ঠাকুরপো? একটিবারও ত

মনে হয় না, এ বাড়ি-ঘর আমার থাকবে কি যাবে! থাকে থাক, না থাকে যাক! ভাবি, পথের গাছতলা ত কেউ ঘুচাতে পারবে না। আমার সেই ঢের হবে।

উপেন্দ্র ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সদ্য-বিধবার বৈরাগ্যের এই ক'টি কথায় তাহার হৃদয় শ্রদ্ধায় করুণায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

কিরণময়ী কহিল, বাড়ির জন্যে নয় ঠাকুরপো, কিন্তু মায়ের সঙ্গে তীর্থে গিয়েই বা আমি কি শান্তি পাব? সে-সকল স্থান মাত্রেই ত বহু লোকের ভিড় শুনি।

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তীর্থস্থানে লোকের ভিড় তো হয়ই বৌঠান, কিন্তু আপনার আর কিছু না হোক, তীর্থ করা ত হবে। সে-ও ত একটা কাজ।

আবার কিরণময়ী উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, কিছু বলিল না। সে কেন যে হাসিল, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া উপেন্দ্র কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্য হইয়া দেখিল, পাশের ঘর হইতে দিবাকর বাহির হইল।

তুই কি এতক্ষণ ও-ঘরেই ছিলি না কি রে?

কিরণময়ী কহিল, দিবাকর ঠাকুরপো দয়া করে আমার বইগুলি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কত বই কি হয়েই আছে বৌদি! কিন্তু খুলে দেখলে জানা যায়, তিনি কি যত্ন করেই সমস্ত পড়েছিলেন।

কিরণময়ী সায় দিয়া কহিল, সত্যিই তাই। যাকে পড়া বলে, তিনি তেমনি করেই পড়তেন। তোমার হাতে ওখানা কি বই ঠাকুরপো?

দিবাকর সলজ্জভাবে কহিল, আমি সংস্কৃত জানিনে, তবু একবার পড়বার চেষ্টা করব। এখানি কঠোপনিষৎ?

কিরণময়ী কহিল, এত বই থাকতে পছন্দ হলো কঠোপনিষৎ।

দিবাকর প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন বৌদি, এর চেয়ে ভাল বই সংসারে আর কি আছে? তবে আমার পক্ষে হয়ত অনধিকারচর্চা। বুঝতে পারব না। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা ত উচিত।

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া কহিল, যা মনে করেচ ঠাকুরপো, তা নয়। অমন করে চেষ্টা করবার কোন মূল্য এর নেই। তবে স্থানে স্থানে মন্দ লাগে না বটে। হাতে কাজকর্ম না থাকলে আত্মা-টাত্মার নানারূপ আজগুবি গল্প পড়লে সময়টা কেটে যায়, এই পর্যন্ত।

তামাশা শুনিয়া দিবাকরের মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, বলেন কি বৌদি, শুনেছি উপনিষৎ যে বেদ! এর প্রতি-অক্ষর যে অভ্রান্ত সত্য!

তাহার বিস্ময়ের পরিমাণ দেখিয়া কিরণময়ী আবার হাসিল। কহিল, কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই।

দিবাকর দুই কানের মধ্যে আঙুল দিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেদ মিথ্যা! আর বলবেন না! বলবেন না! শুনলেও পাপ হয়—বেদ মিথ্যা! লোকে কথায় বলে বেদবাক্য। এ কি মানুষের তৈরী যে মিথ্যা হবে? এ যে বেদ!

তাহার কাণ্ড দেখিয়া কিরণময়ী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকর কান হইতে আঙুল খুলিয়া লইয়া নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া কহিল, সত্যিই পাপ হয় বৌদি। বেদ কখন মিথ্যা হয়? এ কি বাজে ধর্মগ্রন্থ যে, শিবের উক্তি বলে লোকে দুটো প্রক্ষিপ্ত রচা-শ্লোক, দশটা বানানো উপকথা ঢুকিয়ে দেবে? বেদ মানেই যে সাক্ষাৎ সত্য।

কিরণময়ী মুখের হাসি চাপিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, কি জানি ঠাকুরপো, ওঁর কাছে যা শুনেছিলুম তাই বললুম। কিন্তু তুমিও ত এইমাত্র স্বীকার করলে, ধর্মগ্রন্থ যার নাম, তাতেও শিবের উক্তি বলে মিথ্যা উক্তি ঢোকানো আছে।

দিবাকর মানিয়া লইল। কিছুদিন পূর্বেই পুরাণ সম্বন্ধে সে মাসীক পত্রিকার সমালোচনা পড়িয়াছিল; কহিল, অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু উপকথা, মিথ্যা শ্লোক যে আছে, এ কথা অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু, সে ত বেশী দিন চলে না বৌদি। যা মিথ্যা, তা দু'দিনেই ধরা পড়ে যায়।

কি করে ধরা পড়ে ঠাকুরপো?

দিবাকর কহিল, সে আমি ঠিক জানিনে বৌদি। কিন্তু, যা মিথ্যা, তার খুঁটিনাটি আলোচনা করলেই পণ্ডিতেরা টের পান কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত; কিন্তু তাই বলে আপনি বেদ সত্য বলে স্বীকার করতে চান না, এ অন্যায়, বড় অন্যায়।

উপেন্দ্র এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। কিরণময়ীর এই সমস্ত উগ্র পরিহাসের তাৎপর্য যে কি তাহা ঠিক অনুমান করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বাগ্ বিতণ্ডা শুনিতেছিল। কিরণময়ী তাহার পানে একবার কটাক্ষে চাহিয়া বোধ করি একটু হাসি গোপন করিল। পরে গম্ভীর হইয়া দিবাকরকে কহিল, কি জানো ঠাকুরপো, আমি একবার একটা ধর্মশাস্ত্রে পড়েছিলুম যে, এক ব্রাহ্মণের ছেলে কোন কারণে যমের সঙ্গে দেখা করতে যায়। যম তখন বাড়ি ছিলেন না, —বোধ করি বা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন—তিন দিন পরে ফিরে এসে, বাড়ির লোকের কাছে শুনতে পেলেন, ব্রাহ্মণ-বালক উপোস করে আছে। কিচ্ছুটি খায়নি। একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি! যম ত বড় দুঃখিত হয়ে পড়লেন। শেষে অনেক বিনয় করে বললেন, তুমি বাপু তিন দিনের উপোসের বদলে তিনটি বর নাও। আচ্ছা—

কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই দিবাকর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ কোন্ উপন্যাস শুরু করে দিলেন বৌদি?

কিরণময়ী নিরীহভাবে কহিল, কি করব ঠাকুরপো, যা পড়েছিলুম তাই বলচি। আচ্ছা এমন কাণ্ড হতে পারে বলে কি তোমার বিশ্বাস হয়?

দিবাকর জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয় না। অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? ধর্মশাস্ত্রেই ত আছে।

থাক ধর্মশাস্ত্রে। এ প্রক্ষিপ্ত—উপন্যাস!

উপন্যাস কি করে টের পেলে ঠাকুরপো?

বৌদি, সকলেরই একটু-আধটু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। আমি বেশী কিছু জানিনে বটে, কিন্তু এ যে মিথ্যা ঘটনা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এমন হতেই পারে না।

কিরণময়ী কহিল, ঠাকুরপো, এমনি করে সবাই নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই সত্য-মিথ্যা ওজন করে। এ ছাড়া আর মানদণ্ড নেই। কিন্তু এ জিনিস সকলের এক নয়—তুমি যাকে সত্য বলে বুঝতে পার, আমি যদি না পারি ত আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।

দিবাকর তৎক্ষণাৎ কহিল, নিশ্চয় না।

কিরণময়ী কহিল, তবেই দেখ ঠাকুরপো, এতেই যখন অমিল হলে দোষ দেওয়া যায় না, তখন, যে জিনিস বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুয়েরই বাইরে, তার সম্বন্ধে মতের কত অনৈক্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের গরমিল নেই। আমরা দুজনেই মনে করি, এ ঘটনা, আমাদের বুদ্ধির বাইরে, তাই, এটা উপন্যাস, না ঠাকুরপো?

কিরণময়ী যে তাহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দিবাকর সংক্ষেপে কহিল, হ্যাঁ।

কিরণময়ী পুনর্বার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বেশ বেশ। কিন্তু, আমার এই উপন্যাসটির শেষ-ভাগটা তোমার হাতের ঐ বইখানিতেই পাবে।

দিবাকর চকিত হইয়া কহিল, এই উপনিষদে?

কিরণময়ী তেমনি কৌতুকভরে কহিল, হ্যাঁ, ওতেই পাবে, বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। কিন্তু যদি পাও, তখন তোমার প্রতি-বর্ণটি অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হবে না ত?

দিবাকর জবাব দিল না। হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

কিরণময়ী উপেন্দ্রর নির্বাক মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার কি মত ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র শুধু একটুখানি হাসিল, কিছুই বলিল না।

দিবাকর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এটা রূপক হতেও পারে।

কিরণময়ী কহিল, তা পারে। কিন্তু রূপক ত সত্য ঘটনা নয়। ঐ বইখানি যে আগাগোড়াই মিথ্যা, তা না হতে পারে। কিন্তু আগাগোড়া যে সত্য নয়, সে কথা বুদ্ধির তারতম্য হিসেবে বেছে নিতে হবে না? তাই তোমার বুদ্ধিতে যদি বার-আনা সত্য বলে ঠেকে, আমার বুদ্ধিতে হয়ত পনের-আনা মিথ্যে বলে মনে হতে পারে। তাতেও ত আমার অন্যায় হবে না ঠাকুরপো!

দিবাকর হাতের বইখানির প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ীর কথাগুলা তাহার বুকে বেদনার মত বাজিতে লাগিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বৌদি, যাকে আপনি মিথ্যা ঘটনা বলচেন, তার হয়ত কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকতে পারে। তাই—

তাই মিথ্যার অবতারণা? তুমি যা আন্দাজ করছ তা হতে পারে, আমি মেনে নিচ্চি। তবুও সেটা আন্দাজ ছাড়া আর কিছু নয়; আর অভিসন্ধি যাই থাক, পথটা সাধু পথ নয়। এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। তবেই মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বুঝতে পারে। আজ না পারে ত কাল পারে। সে না পারে ত আর একজন পারে। না-ও যদি পারে, তবুও তাকে মিথ্যার ভূমিকা দিয়ে মুখরোচক করার চেষ্টার মত অন্যায় আর নেই। ঠাকুরপো, মিথ্যা পাপ, কিন্তু মিথ্যায়-সত্যে জড়িয়ে বলার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।

দিবাকর বিমর্ষ মলিন-মুখে চুপ করিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কোমলস্বরে কহিল, এতে দুঃখিত হবার ত কিচ্ছু নেই ঠাকুরপো। যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই। একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, তাই বলে এমন কথাও মনে ভেবো না যে, আমি অসত্য বলে বুঝেছি বলেই তা অসত্য হয়ে গেছে। আমার মোট কথাটা এই যে, সত্য-মিথ্যা যাই হোক, তাকে বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। চোখ বুজে মেনে নেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। তাতে তারও গৌরব বাড়ে না, তোমারও না।

দিবাকর অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা বৌদি, যে বস্তু বুদ্ধির বাইরে, তার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা বুদ্ধিপূর্বক কি করে স্থির করবেন?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, করব না ত। যা বুদ্ধির বাইরে, তাকে বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যিনি করবেন, তাঁকেও কোনমতে সহ্য করব না। তুমি এই-সব বই পড়নি ঠাকুরপো, পড়লে দেখতে পাবে, সর্বত্র এই চেষ্টা, আর এই জিদ। কেবল গায়ের জোর আর গায়ের জোর। যে মুখে বলচেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলচেন, যেন এইমাত্র সমস্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোনমতে উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করবার জন্যে পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেন? যে লোক জীবনে রাঙ্গা রঙ দেখেনি, তাকে কি মুখের কথায় বোঝান যায় রাঙ্গা কি? আর তাই না বুঝলে না মানলে রাগারাগি, শাপ-সম্পাৎ আর ভয় দেখানোর সীমা-পরিসীমা থাকে না। কেবল বড় বড় কথার

মারপ্যাঁচ। নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার এ-সব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই। যদি কিছু থাকে ত সে এই যে, যাঁরা এ-সকল কথা আবিষ্কার করেচেন, তাঁরাই প্রকারান্তরে বলচেন, এ-সম্বন্ধে কেউ চিন্তামাত্র করবে না—সব নিষ্ফল, সমস্ত পণ্ডশ্রম।

দিবাকর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পরে ধীরে ধীরে কহিল, বৌদি, আপনি আত্মা মানেন না?

না।

কেন?

মিথ্যে কথা বলে। তা ছাড়া এমন দম্ভ আমার মনে নেই যে, সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই মহামূল্য আমিটির কোনদিন ধ্বংস হবে না। এমন কামনাও করিনি যে, আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমিটি বেঁচে থাকুক।

আচ্ছা ঈশ্বর? তাঁকেও কি আপনি স্বীকার করেন না?

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, অত ভয়ে ভয়ে বলচ কেন ঠাকুরপো? এতে ভয়ের কথা কিছু নেই; না, আমি অস্বীকারও করিনে।

দিবাকর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলোর রেখা দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁকে আপনি কি করে চিন্তা করেন?

কিরণময়ী কহিল, যে বস্তুকে অজ্ঞেয় বলে নিশ্চয় বুঝেচি, তাকে চিন্তা করাও যায় না, করিও নে। বস্তুতঃ, অচিন্তনীয়কে চিন্তা করব কি দিয়ে? তাই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা কোনদিন আমার নেই। একটা জিনিসকে বাড়িয়ে বড় করা যায়, আরও বাড়ালে আরো বড় করা যায় তাও জানি, কিন্তু, তাকে টেনে টেনে অনন্ত করে তোলা যায়, এ ভুল আমার কখনো হয় না।

তবে কি তাঁকে ভাবাই যায় না?

যায় ঠাকুরপো, ছোট করে নিয়ে ভাবা যায়। মানুষের দোষ-গুণ জড়িয়ে দিয়ে ছোটখাট ঠাকুর-দেবতা করে নিয়ে, নিরক্ষর লোকে যেমন করে ভক্তি দিয়ে

ভাবে, তেমনি করেই শুধু যায়। নইলে, জ্ঞানের অভিমানে ব্রহ্ম করে নিয়ে যারা ভাবতে চায়, তারা শুধু নিজেকে ঠকায়। কিন্তু, আজ আর না। এ-সব কথা আর একদিন হবে। উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, কিন্তু, তুমি ঠাকুরপো, ভারী সেয়ানা। আমরা যখন ঝোঁকের উপর তর্কাতর্কি করে নিজেদের ফাঁকা করে ফেললুম, তুমি তখন মুখ বুজে নিজেকে একেবারে গোপন করে রাখলে। আমি জানি, তুমি সমস্ত জানো, কিন্তু নিজের মনের একটি কথাও কাউকে জানতে দিলে না।

উপেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। কহিল, না বৌঠান, আমি এ সম্বন্ধে একেবারে মহামূর্খ। আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধু আপনার কথাই শুনছিলুম।

কিরণময়ীও হাসিয়া বলিল, বিদ্রূপ করচ বুঝি ঠাকুরপো!

না বৌঠান, সত্যি কথাই বলচি। কিন্তু ভাবচি, আপনার এইটুকু বয়সের মধ্যে এত পড়লেন বা কবে, এত ভাবলেন বা কবে?

প্রশংসা শুনিয়া কিরণময়ীর অন্তঃকরণ পুলকে, গর্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা দমন করিয়া বিনয়ের সহিত কহিল, না না, ও-কথা বলো না ঠাকুরপো, আমিও মহামূর্খ। কিছুই জানিনে। তবে শুধু এইটুকু জেনেছি বটে যে, কিছুই জানবার জো নাই। তাই, এই-সমস্ত শাস্ত্রের জবরদস্তি আর দাম্ভিক উক্তি দেখলেই আমার গা-জ্বালা করে ওঠে—কিছুতেই যেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। কেবলই মনে হয়, তুমিও জান না, আমিও জানিনে। তবে বাপু, তোমার এত গায়ের জোর, এত বিধি-নিষেধের ঘটা, এত মিথ্যে নিয়ে ভরতি করা কেন? সমস্ত কাজেই যে ভগবান তাঁদের মধ্যস্থ রেখে কাজ করেছেন, এমনি দাম্ভিক অনুশাসনের বহর? খেতে, শুতে, বসতে ভগবানের দোহাই, আর ধর্মের দাঁত-খিচুনি! কেন বাপু? কেন এমন করে হাঁচব, আর তেমন করে কাসব? অথচ, এত তেজ যে, কোথাও এতটুকু কারণ পর্যন্ত কেউ দেখাবার দরকার মনে করেন নি। শুধু জবরদস্তি। তোমরা গো-হত্যার ব্রহ্ম-হত্যার পাতক হবে, তুমি উচ্ছন্ন

যাবে, তোমার চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে? কেন যাবে? কে তোমাকে বলেচে? শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, সমস্তই এই গায়ের জোর আর চোখ-রাঙ্গানি। বাস্তবিক, এত অন্যায় জোর সহ্য হয় না ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিন্তু দিবাকর তাহার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, কিন্তু সে জোর হয়ত আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা করেচেন।

কিরণময়ী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, অত ভালয় কাজ নেই ঠাকুরপো! যেন তাঁরাই শুধু মানুষ হয়ে দেশসুদ্ধ গরুর পাল লাঠির গুঁতো দিয়ে ভাল পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজের ভাল কে চায় না? বুঝিয়ে বললেই ত হয়, বাপু, এইজন্যে তোমার ভাল—তাই, এই-সব বিধি-নিষেধ তৈরী করে দিলুম। আমাকেও ত বুঝতে দেওয়া চাই কেন এই পথে আমার মঙ্গল। তাতে ত এত চোখ-রাঙ্গানি, এত মিথ্যে উপন্যাস রচনা করবার আবশ্যক হত না। বলিতে বলিতে তাহার ভিতরের ক্রোধটা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর অকস্মাৎ সেই প্রথম রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। এ সেই মূর্তি! পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যপশুর সেই মর্মান্তিক গর্জন। কিন্তু, কি চায় এ? কিসের বিরুদ্ধে ইহার এত আক্রোশ? শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারের কোন্ অনুশাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া এই বিধবা মুক্তি প্রার্থনা করে?

তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে উপেন্দ্র সবিনয় হাস্যের সহিত কহিল, আমরা দুজনে ত জবার দিতে পারিলাম না বৌঠান; কিন্তু একজন আছে—যার কাছে আপনাকেও তর্কে হেরে আসতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

কিরণময়ী নিজের উত্তেজনা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অবশেষে মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সেও হাসিয়া কহিল, এমন কে বল ত ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি তামাশা মনে করবেন না। সত্যিই বলচি, সেখানে তাকে জিতে আসা ভারী কঠিন। তার পড়াশুনা যে বেশী আছে

তা নয়, কিন্তু তর্কের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম। সেও এ-সমস্ত বিশ্বাস করে—তাকে নিরুত্তর করে দিয়ে আসতে পারেন, তবে ত বুঝি।

কিরণময়ী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা না পারি, অন্ততঃ কিছু শিখেও আসতে পারব ত? হাসিয়া কহিল, কে তিনি ঠাকুরপো? আমাদের ছোটবৌ নয় ত?

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, সে-ই। বাস্তবিক বৌঠান, তার বিচার করবার শক্তি অদ্ভুত। তর্কের বুদ্ধি দেখে সময়ে সময়ে আমি যথার্থই মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি কি জবাব দেব, কি প্রশ্ন করব, তা যেন খুঁজেই পাই না। হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকি।

উপেন্দ্রর মুখে সুরবালার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কিরণময়ীর মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। অথচ, ইহাতে যোগ দেয়, তাহাও ইচ্ছা করিল, কিন্তু ঈর্ষার বেদনা সর্বাঙ্গ বেড়িয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। সহসা সে কথা কহিতেই পারিল না।

কিন্তু, উপেন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, তার সঙ্গে আপনার বোধ করি এ প্রসঙ্গে আলোচনা কোনদিন হয়নি?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। মোটে দুটি দিন ত সে এখানে এসেছিল। সেও আবার এমন সময় নয় যে কোন কথাবার্তা হয়। চল না ঠাকুরপো, আজ একবার তোমার তর্কবীরকে দেখে আসি।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, না বৌঠান, সে তার্কিক একেবারেই নয়। বস্তুতঃ, এই বিষয়টা ছাড়া সে তর্কই করে না—যা বলবেন, তাই মেনে নেবে। দিন-তিনেক পরে সে বাড়ি ফিরে যাবে—অনুমতি করেন ত এইখানেই নিয়ে আসি।

কিরণময়ী ত্রস্ত হইয়া কহিল, না ঠাকুরপো, না, এখানে এনে তাকে কষ্ট দিতে চাইনে। যে দুটি দিন ক্লেশ স্বীকার করে এসেছিল, সেই আমার বহু ভাগ্য। আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, এত

বড় তার্কিক গুরু থাকতেও তোমরা দুটি ভাই আমার জবাব দিতে পারলে না কেন?

কথাগুলো কিরণময়ী সরল পরিহাসের আকারেই বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার বেদনার ভারে শেষ কথাগুলি ভারী হইয়া প্রকাশ পাইল।

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান, সে-সব যুক্তি তার শেখা যায় না। কতবার ত শুনেচি, কোনমতেই আয়ত্ত করতে পারলাম না। যারা ভগবান মানে, তারা বলবে এ তাঁরই ডান হাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সত্যি বলচি বৌঠান, আমার অনেকবার ঈর্ষা হয়েচে যে, এর সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি আমি পেতাম, তা হলে ধন্য হয়ে যেতাম!

কিরণময়ী ঠিক বুঝিতে পারিল না, কি এ! তথাপি তাহার সমস্ত মুখ কালো হইয়া গেল; এবং ইহা নিজেই সে স্পষ্ট অনুভব করিয়া কোনমতে একটুকরা শুষ্ক হাসি দিয়া পুরোবর্তী এই দুই পুরুষের দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে আবৃত করিয়া ফেলিতে চাহিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখে হাসি ফুটিল না।

সহসা সে একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, চল ঠাকুরপো, আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করে আসব। তোমারও যার জন্যে হিংসা হয়, এ দুর্লভ বস্তু কি, তা না দেখে আমি কোনমতেই স্বস্তি পাব না।

তাহার এই আগ্রহাতিশয্যে উপেন্দ্র কোনমতেই আর হাসি চাপিতে পারিল না। কিরণময়ী ঈর্ষায় এত আচ্ছন্ন না হইয়া পড়িলে তাহার এতক্ষণের ছদ্ম গাম্ভীর্য চক্ষের পলকে ধরিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু, সেদিকে তাহার দৃষ্টিই ছিল না। কহিল, না ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ছি, ছি, অমন কথা মুখে আনবেন না বৌঠান। আপনি বয়সে ছোট হলেও আমার পূজনীয়া। বেশ ত, মাসীমা ফিরে আসুন, চলুন আজই আপনাকে নিয়ে যাই।

ছাব্বিশ

প্রায় অপরাহ্নবেলায় কিরণময়ী জ্যোতিষবাবুদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরনে মোটা থানের কাপড়, গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই, সুদীর্ঘ রুক্ষ কেশরাশি বিপর্যস্তভাবে মাথায় জড়ানো, দুই-একটা চূর্ণকুন্তল কপালে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; চোখে তাহার শ্রান্ত উদাস দৃষ্টি। যেন বৈধব্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মূর্তিমতী হইয়াছে। সে মুখের পানে চাহিলেই চক্ষু আপনিই যেন তাহার পদপ্রান্তে নামিয়া আসে। সরোজিনী বাহিরের বারান্দায় একটা চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিল, চোখ তুলিয়া অকস্মাৎ এই আশ্চর্য রূপ দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া গেল। সে কিরণময়ীকে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহার নাম এবং সৌন্দর্যের খ্যাতি সুরবালার মুখে শুনিয়াছিল মাত্র। কিন্তু, সে সৌন্দর্য যে এই প্রকার, তাহা কল্পনাও করে নাই।

উপেন্দ্র তাহার পরিচয় দিল, আমাদের বৌঠাকরুন—সরোজিনী!

সরোজিনী কাছে আসিয়া নমস্কার করিল।

কিরণময়ী তাহার হাত ধরিয়া সহাস্যে কহিল, তোমার নাম আমি সকলের কাছে শুনেছি ভাই, তাই আজ একবার চোখে দেখতে এলুম।

প্রত্যুত্তরে সরোজিনী কি বলিবে, তাহা তখনও খুঁজিয়া পাইল না। অপরিচিত নরনারীর সহিত মিশিতে, আলাপ করিতে সে শিশুকাল হইতেই শিক্ষিত এবং অভ্যস্ত, কিন্তু এই আশ্চর্য বিধবা নারীর সম্মুখে সে নির্বাক হইয়া রহিল।

উপেন্দ্রর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়া কিরণময়ী কহিল, কিন্তু আজ ত আর বেলা নেই। বেশিক্ষণ থাকবার সময় হবে না—চল ঠাকুরপো, একেবারে

ছোটবৌয়ের ঘরে গিয়ে বসি গে; বলিয়া সে সরোজিনীর করতলে একটু চাপ দিয়া ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু, যে ঝোঁকের বশে কিরণময়ী আজ এই অসময়ে সুরবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, সেই উত্তেজনার হেতুটা আর তাহার অগোচর ছিল না। পথে আসিতে আসিতে তাহার অনেকবার মনে হইয়াছিল, তাহার সহিত মাত্র দুটি দিনের পরিচয়, সেই সুরবালার বিশ্বাস এবং বিদ্যাবুদ্ধি যাহাই হউক, অকারণে তাহার ঘর চড়িয়া আক্রমণ করিতে যাওয়ার মত অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য ইহাতেও তাহার সন্দেহ ছিল না। অথচ কিছুতেই ফিরিতে পারে নাই। কিসে যেন তাহাকে ক্রমাগত টানিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিল। অন্যায়! অসঙ্গত! এ কথাও সে মনে মনে বার বার বলিল; কিন্তু, প্রেয়সী ভার্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্যকে উপেন্দ্র ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে চক্ষের নিমিষে পরাস্ত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল।

কোনমতেই সে ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। অথচ, গোড়া হইতেই তাহার এই খটকা বাজিয়াছিল যে, সতীশের কাছে উপেন্দ্রর যে পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মন বার বার বলিতেছিল, ইচ্ছা করিলে উপেন্দ্র জবাব দিতে পারিত। কিন্তু, কথাটি কহে নাই, শুধু মৃদু মৃদু হাসিয়াছে। কেন? কিসের জন্য? সে কি শুধু সুরবালার কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ করিয়া দিবার জন্য? কিন্তু সুরবালা যদি কোন উত্তর না দেয়? স্বামীর মত অম্‌নি মুখ টিপিয়া হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে? কি করিয়া সে তাহার বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিবে?

এমনি ভাবিতে ভাবিতে যখন সে সরোজিনীর পিছনে পিছনে সুরবালার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন মেঝের উপর বসিয়া কাশীদাসী মহাভারত হইতে ভীষ্মের শরশয্যা পড়িয়া সুরবালা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অকস্মাৎ কিরণময়ীকে দেখিয়া শশব্যস্তে বই মুড়িয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া পরম সমাদরে কহিল, দিদি এস।

সেইখানে কার্পেটের উপর বসাইয়া বলিল, আমি কাল তোমার ওখানে যাব মনে করেছিলুম দিদি।

কিরণময়ী কহিল, আমিও তাই আজ এলুম ভাই।

উপেন্দ্র অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়াই কহিল, কান্না হচ্ছিল—ওটা মহাভারত বুঝি?

সুরবালা মহা লজ্জায় আঁচল দিয়া নিজের চোখ দুটি ক্রমাগত মুছিতে লাগিল।

উপেন্দ্র কহিল, কেন যে তুমি ঐ মিথ্যে রাবিশ বইখানা নিয়ে প্রায়ই সময় নষ্ট কর, আমি ত ভেবে পাইনে। তার উপর কান্নাকাটি, চোখের জলের—কথাটা শেষ হইল না। সুরবালা চোখ মোছা ভুলিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এক শ'বার কি তুমি বল যে—

উপেন্দ্র কহিল, বলি যে ওর আগাগোড়া মিথ্যে। আর কিছু না।

এ-সকল বিষয়ে তাহাকে রাগাইতে বেশী বিলম্ব হইত না। সে তাহার রুষ্ট আরক্ত চোখ দুটি স্বামীর মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, মহাভারত মিথ্যে? অমন কথাটি তুমি কখনো মুখে এনো না। এ তামাশা নয়—এতে অপরাধ হয় তা জান?

উপেন্দ্র বলিল, জানি, কিচ্ছু হয় না। আচ্ছা, ওঁদের জিজ্ঞেস কর—ওঁরাও বিশ্বাস করেন না।

এবার সুরবালা কিরণময়ীর মুখের পানে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, শোন কথা দিদি! তোমরা মহাভারত বিশ্বাস কর না। ওঁর ঐ রকম কথা। যা হোক একটা বলে দিলেই হলো।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রীর এই অদ্ভুত বাক্‌বিতণ্ডার সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, ইহা একটা অভিনয় এবং তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া ইহার অন্তরালে কি একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

উপেন্দ্র সরোজিনীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনি মহাভারতের গল্পগুলো সত্য মনে করেন?

সরোজিনী সরলভাবে বলিল, কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আগাগোড়াই সত্য কেউ মনে করে না, আমিও করিনে।

সুরবালা প্রথমে অবাক হইল, তাহার পর তামাশা মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু সরোজিনীর আরও দুই-চারিটা কথায় এবং উপেন্দ্রর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচায় অধিকতর বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং দেখিতে দেখিতে তিনজনের তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিন্তু, তখন পর্যন্ত কিরণময়ী একটি কথাও কহে নাই। কারণ, এই-সকল বাদানুবাদ পরিহাস ভিন্ন যে আর কিছু হইতে পারে তাহা মনে করিতেই পারিল না। যাহার সহিত সে দর্শন লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সে যখন সমস্ত মহাভারতটাই অখণ্ড সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছে—এমন অচিন্তনীয় ব্যাপার সত্য বলিয়া সে কেমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করিবে! এদিকে তর্ক এবং কথা কাটাকাটি অবিরাম চলিতে লাগিল। কিন্তু কিরণময়ী শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুরবালার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সন্দেহের ঘোর বাষ্পের মত মিলাইয়া গেল। দেখিল সুরবালার কণ্ঠস্বর, চোখের চাহনি, সমস্ত মুখখানি, এমন কি সর্বাঙ্গ হইতে সংশয়-লেশহীন দৃঢ় প্রত্যয় যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। এই বিপুল বিরাট গ্রন্থখানি তাহার কাছে প্রত্যক্ষ-সত্য। এ ত কৌতুক নয়, এ যেন জীবন্ত বিশ্বাস!

তাহার পর কিছুক্ষণের জন্য কে কি বলিতে লাগিল, সেদিকে তাহার চেতনা রহিল না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত এই সুরবালার মধ্যে একটা অপরিচিত ভাবের আকৃতি দেখিতে লাগিল। তাহা অদৃষ্টপূর্ব!

কিন্তু, এরূপ কতক্ষণ থাকিত বলা যায় না, সহসা সে উপেন্দ্র ও সরোজিনীর সমবেত উচ্চ হাসির শব্দে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল। দেখিতে পাইল, হাসির ছটায় সুরবালা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বেচারা একা। তাই, সে কিরণময়ীকে হঠাৎ মধ্যস্থ মানিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা দিদি, এ কি মিথ্যে কখনও হতে পারে?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়া হাসি দমন করিয়া কহিল, বৌঠান, তর্কটা এই, সরোজিনী বলচেন, ভীষ্মের শরশয্যার সময় অর্জুন যে বাণ দিয়া পৃথিবী বিদীর্ণ করে গঙ্গা এনেছিলেন, সে মিথ্যা কথা। কখনো আনেন নি।

সুরবালা স্বামীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি আনেন নি, তবে শোন বলি। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে জল খেতে চাইলেন। দুর্যোধন সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল আনলে, তিনি খেলেন না! এ ত আর মিথ্যে নয়। গঙ্গা যদি না এলেন, তবে তাঁর পিপাসা মিটল কিসে?

সরোজিনী অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, কিসে! যদি বলি পিপাসা মিটল তাঁর সেই ভৃঙ্গারের জলে! তিনি দুর্যোধনের সেই ভৃঙ্গারের জলই খেয়েছিলেন।

এবার সুরবালা ভয়ানক উত্তেজিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, তবে লেখা আছে কেন খাননি? আর তাই যদি তিনি ভৃঙ্গারের জলই খাবেন, তা হলে অর্জ্জুনের অত কষ্ট করে বাণ দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে গঙ্গা আনবার কি দরকার হয়েছিল! তা বল? দিদি, তুমিই বল, এ ত আর কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না? বলিয়া সে ক্রুদ্ধ অথচ করুণ দুই চক্ষুর দ্বারা কিরণময়ীকে আবেদন জানাইল। মুহূর্তমধ্যে উপেন্দ্রর উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া গেল।

সরোজিনীও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপেন্দ্র কহিল, নিন বৌঠান, জবাব দিন। গঙ্গা যদি না এলেন, তবে পিপাসা মিটল কিসে? আর পিপাসা যখন মিটল তখন গঙ্গা আসবেন না কেন? বলিয়া আর একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য! কিরণময়ী এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। সে বিস্ময়স্তব্ধ-নেত্রে ক্ষণকাল সুরবালার মুখপানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ বিপুল আবেগে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল, মিথ্যে নয় বোন, কোথাও এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই। গঙ্গা এসেছিলেন বৈ কি! তুমি যা বুঝেছ, যা পড়েচ, সব সত্যি। সত্যি ত সবাই চিনতে পারে না দিদি, তাই ঠাট্টা-তামাশা করে। বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল।

সরোজিনী এবং উপেন্দ্র উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। তাহাকে তেমনি বুকে চাপিয়া রাখিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিল, বোন, যারা অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছে, তারা জানে, আজ তুমি যেমন করে বিচার করে দিলে, এর চেয়ে বেশী বিচার কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন পণ্ডিত কোনদিন করতে পারেন নি—তাঁদের সবাইকে এমনি করেই নিজেদের মনের কথা বলতে হয়েছে। এ কথা যে জানে, তার সাধ্য নেই আজ তোমার মুখের কথা কয়টি শুনে হাসে। বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, তুমি বোধ করি, ভাই, আমার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছ। হবারই কথা। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক হতবুদ্ধি হইয়াছিল উপেন্দ্র নিজে। বস্তুতঃ, কিরণময়ীর এই অদ্ভুত ভাব-পরিবর্তনের হেতু সে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। যে, মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার তুলাদণ্ডই সে গ্রাহ্য করে না, এবং যে-বস্তু ইহার বাহিরে, তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করে না, সে সুরবালার এই একান্ত সরল ও ছেলেমানুষিতে বিচলিত হইল কি প্রকারে! তাহাকে বুকে

টানিয়া লইয়া যে কথাগুলি এইমাত্র কহিল, সে ত মনরাখা কথা নয়! তা ছাড়া সে নিশ্চয় জানিত, যাহা বলিয়াছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সুরবালার সাধ্য নয়। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তাহার আকস্মিক উদ্গত অশ্রু। সে আসিল কি প্রকারে! এতদ্ব্যতীত আর একটা কথা। উপেন্দ্র নিঃসংশয়ে জানিত, এই প্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি নর-নারী আবেগ প্রকাশ করিতে কিছুতেই চাহে না। কোনমতে প্রকাশ পাইলেও তাহাদের লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কিন্তু, লেশমাত্র লজ্জাও সে যে নিজের ব্যবহারে অনুভব করিয়াছে, সে লক্ষণ ত সম্পূর্ণ অপরিচিতা সরোজিনীর কাছেও ধরা পড়িল না।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিরণময়ী সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিল।

দিবাকর বাড়ি ছিল না; সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ইতস্ততঃ করিয়াও উপেন্দ্রকে একাই ভিতরে গিয়া বসিতে হইল। কিন্তু কিরণময়ী আর তাহাকে যেন লক্ষ্যই করিল না। গাড়ির একটা কোণে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অমন চুপচাপ বসিয়া থাকাও অপ্রীতিকর। তা ছাড়া উপেন্দ্র নিশ্চয় বুঝিতেছিল কিরণময়ী কিছু ভাবিতেছে। কিন্তু কি ভাবিতেছে, তাহাই যাচাই করিবার জন্য কহিল, দেখে এলেন ত! এই বুদ্ধিমতীটিকে নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়। কিন্তু, এমনিই ত তাঁকে আঁটবার জো নেই, তাতে আপনি আজ তামাশা করে যে সার্টিফিকেট দিয়ে এলেন, এবার আর তার নাগাল পাওয়াই যাবে না।

কিরণময়ী ইহার কোন উত্তর করিল না। একটুখানি অপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয় বৌঠান। ও এত বড় বোকা যে জন্মাবধি কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

কিরণময়ী তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিল, কেন জানেন? একে ত তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা তাকে চতুর্দিকে ঘিরে দিবা-রাত্রি পাহারা দিয়ে আছে,—তা ছাড়া, যা ঘটেনি, সেইটুকু সে নিজের বুদ্ধি খরচ করে বানিয়ে বলবে সে ক্ষমতাই ওর নেই।

কিরণময়ী রুদ্ধকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিল, ভালই ত।

উপেন্দ্র কহিল, অতটাই যে ভাল, তা আমার মনে হয় না বৌঠান। সংসার করতে গেলে একটু-আধটু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। যাতে কারো কোন ক্ষতি নেই, অথচ একটা অশান্তি, একটা উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাতে দোষ কি? আমি ত বলি বরং ভালই।

বেশ ত, শেখাতে পার না?

শিখবে কি করে বৌঠান? একটি অতি ছোট মিথ্যের জন্য যুধিষ্ঠিরের দুর্গতি হয়েছিল সে যে মহাভারতে লেখা আছে। দেব-দেবতারা যেরকম হাঁ করে তার পানে চেয়ে বসে আছে, তাতে জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বললে আর কি তার রক্ষা আছে! তারা হিড়হিড় করে টেনে ওকে নরকে ডুবিয়ে দেবে। একটু থামিয়া কহিল, বৌঠান, ঠাকুর-দেবতার চেহারা ও চোখ বুজে এমনি স্পষ্ট দেখতে পায় যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কেউ ঢাল-খাঁড়া নিয়ে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে, কেউ বাঁশী হাতে করে এমনি প্রত্যক্ষ হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ান যে, শুনে আমার গা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। আর কারো মুখ থেকে ও-রকম শুনলে আমি মিথ্যা বানানো গল্প বলে হেসেই উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে এ অপবাদ ত মুখে আনবারই জো নেই। বলিয়া, শ্রদ্ধায় প্রেমে গর্বে বিগলিত-চিত্তে সস্নেহ কৌতুকের স্বরে কহিল, তাই দেখে-শুনে ওকে মানুষ না বলে একটি জানোয়ার বললেও চলে। বলিহারি তাঁর বুদ্ধি—যিনি ছেলেবেলায় ওর পশুরাজ নাম রেখেছিলেন—ও কি বৌঠান?

গাড়ি মোড় ফিরিতেই পথের উজ্জ্বল গ্যাসের আলোক সহসা কিরণময়ীর মুখের উপর আসিয়া পড়ায় উপেন্দ্র অত্যন্ত চমকিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

উপেন্দ্র লজ্জায় স্তব্ধ অধোবদনে বসিয়া রহিল না। না জানিয়া যেখানে সে আনন্দ মাধুর্যে মগ্ন হইয়া স্নেহে সম্ভ্রমে পরিহাসের পর পরিহাস করিয়া চলিতেছিল, আর একজন সেইখানে ঠিক তাহারই মুখের সম্মুখে বসিয়া কি জানি কিসের বেদনায় নিঃশব্দ রোদনে বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছিল।

পাথুরেঘাটার বাটীতে উভয়ে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পথটাই কিরণময়ী মৌন হইয়া ছিল; কিন্তু ভিতরে পা দিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আ, আমার পোড়া কপাল! কেবল ঘুরিয়ে নিয়েই ত বেড়াচ্চি। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত একফোঁটা জলটুকু যে খেতে পেলে না ঠাকুরপো, তা আর এ হতভাগীর চোখে পড়ল না। হাত-মুখ ধোবে? তবে থাক গে। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস, দুখানা লুচি ভেজে দিতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। তুই কাঠের উনুনটা জ্বেলে দিয়ে তবে বাড়ি যাস্ ঝি! যা মা, চট করে যা। লক্ষ্মী মা আমার।

ঝি কবাট খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, এবং অমনি ঘরে যাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু আদেশ পালন করিতে আবার তাহাকে উপরে যাইতে হইল। সদর দরজা বন্ধ করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিন্তু এই লুচি ভাজার প্রস্তাবে উপেন্দ্র একেবারে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না বৌঠান! আজ আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি ফিরে গিয়েই খাব—আমার জন্যে কোনমতেই কষ্ট করতে পারবেন না।

পারব না কেন?

উপেন্দ্র কহিল, না না, সে কিছুতেই হবে না—কোনমতেই না।

কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল, হাসিমুখে বলিল, তুমি ঠাকুরপো বড্ড যশের কাঙাল। এত যশ নিয়ে রাখবে কোথায় বল ত?

সহসা এরূপ মন্তব্যের হেতু বুঝিতে না পারিয়া উপেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইল।

কিরণময়ী কহিল, তা বৈ কি ঠাকুরপো! তোমার পরোপকারের যশ এমন নিঃস্বার্থ, এমন নির্লিপ্ত হওয়া চাই, যেন স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও তার জোড়া না থাকে। আমাদের জন্যে তুমি যা করেছ ঠাকুরপো, তাতে আমি বুক চিরে পা ধুইয়ে দিতে গেলেও ত তোমার আপত্তি করা সাজে না। আর এই দুটো খাবার তৈরী করে দেওয়ার কথাতেই ঘাড় নাড়চ? ছি, ছি, কি আমাদের তুমি ভাবো বল ত? মানুষ নই আমরা? না, মানুষের রক্ত আমাদের দেহে বয় না!

উপেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, এ-সব কোন কথা ভেবেই আমি আপত্তি করতে যাইনি বৌঠান। আমি শুধু—

শুধু কি ঠাকুরপো? তবে বুঝি ঘরে ফেরবার তাড়ায় কি বলছি না বলছি হুঁশ ছিল না?

উপেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। পরিহাস আবার সহজপথে ফিরিয়া আসায় সে খুশী হইয়া সহাস্যে কহিল, ও বদনামটা আমার আছে বটে বৌঠান, সে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু এখন সেজন্য নয়। যথার্থই আমি ভেবেছিলুম, আজ আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ক্লান্ত হয়ে পড়েচি? হলুমই বা! বলিয়া কিরণময়ী পুনরায় একটু হাসিল। তার পরে সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, হায় রে! আজ যদি আমার সতীশ-ঠাকুরপো থাকতেন! তা হলে নিজের কথা আর নিজের মুখে বলতে হতো না। তিনি সহস্রবদন হয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিতেন। না ঠাকুরপো, আমার নিজের ত ও-সব শ্রান্তি-ক্লান্তির শখ করবার অবস্থাই নয়, তা ছাড়া, বাঙালীর ঘরের কোন মেয়ের পক্ষেই ও বদনামটা বোধ করি খাটে না! আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই

হোক, পুরুষমানুষের খাওয়া হয়নি শুনলে বাঙালীর মেয়ে মরতে বসলেও একবার উঠে দাঁড়ায়। তা জানো?

উপেন্দ্র এবার হাসিয়া কহিল, জানি বৈ কি বৌঠান, বেশ জানি। স্বীকার করছি অপরাধ হয়েচে—আর না। ক্ষিদেও পেয়েছে, চলুন কি খেতে দেবেন।

এসো, বলিয়া কিরণময়ী পথ দেখাইয়া রান্নাঘরের অভিমুখে চলিল। শাশুড়ীর ঘরের সুমুখে আসিয়া দোর ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, তিনি অকাতরে ঘুমাইতেছেন।

রান্নাঘরে আসিয়া সতীশকে যেমন পিঁড়ি পাতিয়া বসাইত, তেমনি করিয়া উপেন্দ্রকে বসাইল।

ঝি উনুন জ্বালিয়া দিয়া অন্যান্য আয়োজন করিতে বাহির হইয়া গেলে কিরণময়ী তাহার এই নূতন অতিথিটির প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার কষ্ট হবে বলে না খেয়ে চলে যাবার এই যে প্রস্তাবটি করেছিলে, সেটি যদি আর কোথাও আর কারো সামনে করে বসতে, আজ তা হলে তোমাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হতো জানো?

উপেন্দ্র বলিল, জানি। কিন্তু এখানে ত আর সে শাস্তিভোগের ভয় ছিল না বৌঠান!

ঝি ময়দার থালাটা রাখিয়া চলিয়া গেল। কিরণময়ী সুমুখে টানিয়া লইয়া নতমুখে মৃদুস্বরে কহিল, বলা যায় না ঠাকুরপো, কপালে শাস্তি লেখা থাকলে কিসে যে কি ঘটে, কোথায় এসে কোন্ ভোগ ভুগতে হয়, আগে থাকতে তার কোন হিসেবই পাওয়া যায় না। অদৃষ্টের লেখা কি এড়ান যায়? যায় না ঠাকুরপো, তারা আপনি এসে ঘাড়ে পড়ে।

উপেন্দ্র রহস্যটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। শুধু কহিল, তা বটে। কিরণময়ীও তখনিই আর কোন কথা কহিল না। একবার শুধু উপেন্দ্রর মুখপানে

চাহিয়াই চোখ নত করিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল। বোধ হইল, সে যেন চুপি চুপি হাসিতেছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময়ে চোখ না তুলিয়াই কহিল, আচ্ছা, আজ এত ঘটা করে বৌ দেখাতে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়টা কি ছিল এখন বল দেখি?

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, ঘটা-পটা ত কিছুই করিনি বৌঠান।

কিরণময়ী বলিল, তবে বুঝি আমার বলতে ভুল হয়েচে। বলি, এত রকমের ছল-চাতুরী করে যাওয়া হলো কেন?

উপেন্দ্র কহিল, ছল-চাতুরীই বা কি করলুম?

কিরণময়ী কহিল, এই যেমন বোকা-টোকা নানারকম কথার বাঁধুনি করে। কিন্তু মিছে কতকগুলো কথা – কাটাকাটি করে আর কি হবে ঠাকুরপো? সে বৌটিকে বোকা বলেই যদি জানতে পেরে থাক, এ বৌঠানটিরও ত কতক পরিচয় পেয়েচ? অত সহজে ভোলাতে পারবে বলেই কি মনে কর?

না, তা করি না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। কারণ, যেমন লঘু করিয়া উপেন্দ্র জবাব দিতে চাহিয়াছিল, তেমনি করিয়া পারে নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়াই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিরণময়ী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, জানিতে দিল না। তেমনি সহজ পরিহাসের স্বরে কহিল, তবে?

উপেন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য অনুভব করিয়া মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল, এই অবকাশে সেও নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, বৌঠান, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ কাজ? কিন্তু ছল-চাতুরী না করলে ত আপনি যেতেন না। আমি যে কতবড় নির্বোধকে নিয়ে ঘর করি সে ত দেখতে পেতেন না।

কিরণময়ী কহিল, সে দেখে আমার লাভ?

উপেন্দ্র বলিল, লাভ আপনার নয়, লাভ আমার। সবাই নিজের দুঃখ জানিয়ে দুঃখটা কম করে ফেলতে চায়। মানুষের স্বভাবই এই। তাই ছল-চাতুরী করে যদি কিছু ক্লেশ দিয়েই থাকি ত সে আপনার দয়া পাবার জন্যেই। আর কোন কারণে নয়।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পরে কথা কহিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না, কহিল, আর যে পারিনে ঠাকুরপো, এই ব্যাজস্তুতির পালাটা এইবার বন্ধ কর না। তোমার নির্বোধটিকে নির্বোধ বলে যদি কিছু কম ভালবাসতে, তা হলেও না হয় আর কিছুক্ষণ শোনা যেতে পারত। একটু দয়াও হয়ত পেতে। কিন্তু সতীশ-ঠাকুরপোর কাছে যে আমি সব শুনেচি। বেশ ত, ভাল না হয় তাকেই খুবই বাসো, কিন্তু তাই বলে কি এমন করে ঢাক পিটে বেড়াতে হয়? একটু বাধ-বাধও কি করে না?

কথা শুনিয়া উপেন্দ্র যে কি বলবে, কি ভাবিবে, ঠাহর করিতেই পারিল না। এ কি বলিবার ভঙ্গী! এ কি কণ্ঠস্বর! পরিহাস ত ইহা কিছুতেই নয়, কিন্তু কি এ? বিদ্রূপ? ঈর্ষা? বিদ্বেষ? এ কিসের আভাস, এই বিধবা রমণী এই রাত্রে, এই নির্জন ঘরের মধ্যে আজ তাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়া বসিল!

আর কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

ঝি দরজার বাহির হইতে একবার কাসিল। তার পরে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া কহিল, আর ত আমি থাকতে পারিনে বৌমা। সদরটা একটু বন্ধ না করে দিলেও ত যেতে পারচি নে।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, যাবি? তবে একটুখানি বসো ঠাকুরপো, আমি সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। বলিয়া সে চলিয়া যাইবামাত্রই এই ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া উপেন্দ্রর অন্তঃকরণ এমন এক অভাবনীয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল যাহা জীবনে কখনো সে অনুভব করে নাই। তাহার উন্মুক্ত চরিত্র চিরদিন

স্ফটিকস্বচ্ছ প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে। কোথাও কখনও বাধা পায় নাই। কোথাও কোনদিন বিন্দুমাত্র কলঙ্কের বাষ্প আসিয়াও তাহাতে ছায়া ফেলিয়া যায় নাই। কিন্তু আজ এই নির্জন কক্ষের মধ্যে সেই একান্ত নির্মলতা যেন মলিন হইয়া উঠিল।

সাতাশ

দাসীকে বিদায় দিয়া কিরণময়ী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন বসিল, উপেন্দ্র ঘাড় তুলিয়া একবার চাহিতে পর্যন্ত পারিল না। কিরণময়ীর তাহা দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু, সেও কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

মিনিট-দশেক এইভাবে যখন গেল, তখন কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের এই রকম চুপচাপ বসে থাকতে দেখে, কি মনে করে বল দেখি? বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

এ হাসি উপেন্দ্র চোখে না দেখিলেও অন্তরে অনুভব করিল। কহিল, হয়ত ভাল মনে করে না।

তবে?

কি করব বৌঠান, কোন কথাই যেন খুঁজে পাচ্চিনে।

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, পাচ্চ না? আচ্ছা, আমি খুঁজে বার করে দিচ্চি। কিন্তু মাঝখানে একটা খবর দিয়ে রাখি যে, আমার খাবার তৈরী থেকে তোমাকে খাইয়ে বিদায় করা পর্যন্ত আধ-ঘণ্টার বেশী লাগবে না। এই সময়টুকুর জন্যে তুমি একটুখানি প্রসন্নমুখে কথা কও, অমন মনভারী করে বসে থেকো না।

উপেন্দ্র জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ বলুন।

কিরণময়ী আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, তবু ভাল, বৌঠানের মান রেখে একটু হেসেচ। তোমাকে দেখে পর্যন্ত একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় ঠাকুরপো। কিন্তু শুনে আবার উলটো বুঝে রাগ করে বসবে না ত?

না, রাগ কিসের?

কি জানো ঠাকুরপো, ভাল ভাল কাব্যে পড়া যায় ত, তা আমাদের দেশেরই বল, আর বিদেশেরই বল, প্রথম চোখের দেখাতেই একটা প্রগাঢ় ভালবাসা—আচ্ছা, এ কি সম্ভব বলে মনে কর?

উপেন্দ্রর মুখ চক্ষের পলকে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, ভাল-মন্দ কোন কাব্য সম্বন্ধেই আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই বৌঠাকরুন, এ-সব আমি জানিনে।

কিরণময়ী বলিল, সে কি কথা ঠাকুরপো? এত লেখাপড়া শিখেচ, এতগুলো পাস করে কত টাকার জলপানি আদায় করেচ, আর কাব্য সম্বন্ধে কিছুই জান না? শকুন্তলা, রোমিও-জুলিয়েট এ দুটোও কি তোমাকে পড়তে হয়নি?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু পড়ে পাস করতে ত সম্ভব-অসম্ভব স্থির করতে হয়নি। বইয়ে যা লেখা আছে মুখস্থ করে লিখে দিয়ে এসেছিলুম। আপনার মত কোন পরীক্ষক কখনো প্রশ্ন করেন নি—তা হয় কি না। আমাকে মাপ করতে হবে বৌঠান, এ-সব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে পারব না।

কিরণময়ী বিষণ্ন হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, শুনে রাগ করবে না ত?

কিন্তু রাগ ত করিনি।

না করলেই ভাল, বলিয়া কিরণময়ী জ্বলন্ত উনানের উপর ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিল।

খান তিন-চার লুচি নীরবে ভাজিয়া তুলিয়া কিরণময়ী সহসা বলিল, যে কথা আমি জানতে চেয়েছিলুম, সে আলোচনাই তুমি করতে চাইলে না। আমার কপাল! কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, প্রণয়কে লোক অন্ধ বলে কেন?

উপেন্দ্র কহিল, বোধ করি চোখ থাকলে যে-পথে মানুষ যায় না—এতে তেমন পথেও তাকে নিয়ে যায়।

কিরণময়ী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, যায় কি? কথাটি কি সত্যি, ভালবাসা অন্ধ?

সত্যি বৈ কি। অনেকের অনেক অভিজ্ঞতাই ত প্রবাদ-বচন।

কিরণময়ী কহিল, বেশ কথা। তা যদি হয়, কানা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়। তার জন্যে দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্তে পড়ে, কেউ ত তুলে ধরতে ছুটে আসে না। বরং আরও তার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্তেই মাটি চাপা দিয়ে চায়। যে-সত্য মানুষ নিজেই প্রচার করে, প্রয়োজনের সময় সে সত্যের কোন মর্যাদাই রাখে না! আমার কথাটা বুঝতে পারচো ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারচি বৈ কি!

কিরণময়ী কহিল, পারবে বলেই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি। কিন্তু তা হলেই দেখ, অপরের বেলায় অনেক জিনিস জেনেও জোর করে ভুলতে চায়। অন্ধকে চক্ষুষ্মানের শাস্তি দিয়ে আপনাকে বাহাদুর মনে করে। পরকে বিচার করবার সময় এ একটা তার মনেও পড়ে না যে, চোখ হারালে তার নিজেরও খানায় পড়বার সম্ভাবনা ওই লোকটার চেয়ে একটুও কম থাকে না।

উপেন্দ্র একটুখানি অপ্রসন্ন বিস্ময়ের সহিত কহিল, তা না হতে পারে, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্চিনে বৌঠান, এ-সব আলোচনা কেন করচেন? সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, আপনার জীবনের সঙ্গে এ মীমাংসার কোন সম্বন্ধ নেই।

কিরণময়ী উপেন্দ্রর অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়াও হাসিল, কহিল, অন্ধ আলোচনা করে খানায় পড়ে না ঠাকুরপো, পড়ে আলোচনা করে। আমি যে পড়িনি কিংবা পড়বার জন্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্চিনে, সেই বা কি করে জানলে?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু আপনি ত অন্ধ নন। আমি যে আপনার বড় বড় দুটো চোখ দেখতে পেয়েছি বৌঠান।

কিরণময়ী বলিল, ঐখানেই ত মুশকিল ঠাকুরপো, দু'রকমের অন্ধ আছে কিনা! যারা চোখ বুজে চলে, তাদের সম্বন্ধে ত ভাবতে হয় না—তাদের চেনা যায়। কিন্তু, যারা দু'চোখ চেয়ে চলে, দেখতে পায় না, তাদের নিয়েই যত গোল। তারা নিজেরাও ঠকে, পরকেও ঠকাতে ছাড়ে না।

উপেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাছে উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী সহসা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াই যেন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমার যে বড় বড় দুটো চোখ দেখেছিলে বললে ঠাকুরপো, সে কবে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

উপেন্দ্র বলিল, সে আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরেই। সেদিন আপনাকে যে দেখেচে তার কোনদিন আপনাকে ভুল হবে না। কেন যে আপনি নিজেকে অন্ধ বলে ভয় করচেন, সে আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি এ কথা সত্য নয়। সেদিন আপনার দুটি চোখে যে জ্যোতি আমি দেখতে পেয়েছিলাম, তাতে নিশ্চয় জানি যত অন্ধকারই আপনার চারিপাশে ঘনিয়ে আসুক, আপনাকে ভুলোতে পারবে না। আপনি ঠিক পথটি দেখে চিরজীবন চলে যেতে পারবেন।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা এতক্ষণে বোধ হয় বুঝেছি ঠাকুরপো। সেদিন যেমন করে আমি চৈতন্য হারিয়ে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে গিয়েছিলুম, তাই দেখে বোধ করি তোমার এ ধারনা জন্মেছে।

উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেও পারে, কিন্তু সে দেখা কি ভুল করবার বৌঠান?

শুনিয়া কিরণময়ী একটুখানি হাসিল। তার পরে অসঙ্কোচে একান্ত সহজকণ্ঠে কহিল, ভুল বলেই ত মনে হয়। আমি ত আমার স্বামীকে ভালবাসতুম না।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁকে কোনদিন ভালবাসি নি। আর শুধু আমিই নয়, তিনিও আমাকে বাসেন নি। তবে কি সে-দিনের সেটা আমার ছলনা? তাও নয় ঠাকুরপো, সেও সত্যি। সত্যিই, সেদিন জ্ঞান হারিয়েছিলুম,— বলিয়া উপেন্দ্রর স্তম্ভিত মুখ দেখিয়া সে একটুখানি থমকিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা জোর করিয়া কাটাইয়া বলিল, না, ভয় পেলে আমার চলবে না। তোমার কাছে আমার সব কথা আজ বলতেই হবে।

উপেন্দ্র কষ্টে মুখ তুলিয়া কহিল, চলবে না কেন? আমি শুনতে চাইনে, তবু আমাকে শুনতেই হবে কেন?

কিরণময়ী বলিল, তার কারণ তুমি আমার গুরু। তোমার কাছে সমস্ত স্বীকার না করে আমি কোনমতেই শান্তি পাব না।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—আমার মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখেছিলে ঠাকুরপো, সে চোখের ভুল নয়, সত্যি; কিন্তু সে বড় ক্ষণিকের। স্বামীকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি, কিন্তু কায়মনে ভালবাসতে চেষ্টা করতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, তিনি বাঁচলেন না, আমারও সে চেষ্টা স্থায়ী হলো না।বইয়ে এ-সব কথা পড়ে কখনো বা ভাবতুম মিছে কথা, কখনো বা ভাবতুম কবির কল্পনা, কখনো বা মনে করতুম, হয়ত আমার মধ্যে ভালবাসার শক্তি নেই বলেই এ-রকম মনে হয়। এ শক্তি আমার আছে কিনা আজও জানিনে ঠাকুরপো, কিন্তু ভালবাসার সাধ যে আমার কত বেশী, সে কথা প্রথমে টের পাই তোমাকে দেখে। তাই তুমিই গুরু। একটুখানি থামিয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই কহিল, দু'দিন পরে তোমরা চলে যাবে। আবার যখন দেখা হবে, তখন নিজের কথা বলবার মত মনের অবস্থা হয়ত থাকবে না। হয়ত এই বলার জন্যে তখন লজ্জায় মরে যাব না। না ঠাকুরপো, সে হবে না, আজই তোমাকে আমার সমস্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে তবে আমি নিরস্ত হবে।

উপেন্দ্র কাতর হইয়া বলিল, বৌঠান, আজ নানা কারণে আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় কি বলা উচিত, কি উচিত নয়, ভাবতে না পেরে—না না, বৌঠান, আমি অনুরোধ করচি, আর একদিন এসে আপনার সমস্ত কথা শুনে যাব, কিন্তু আজ নয়।

কিরণময়ী কহিল, ঠিক এই জন্যই ত আজই সমস্ত কথা শুনোতে চাই ঠাকুরপো। পাছে সেদিন লজ্জা এসে বাধা দেয়, সাংসারিক ভাল-মন্দর বিচার-বুদ্ধি মুখ চেপে ধরে। আজ আমার রেখে-ঢেকে, বুঝে-সমঝে, সাজিয়ে-বাঁচিয়ে বলবার সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই—আজই ত বলবার দিন। এর পরে হয়ত তুমি ইহজন্মে আর আমার মুখ দেখবে না,—তবু প্রার্থনা করি আরো কিচ্ছুক্ষণ এই দুর্বুদ্ধি, এই উন্মাদ মন আমার থাক ঠাকুরপো, আমি তোমার কাছে সমস্ত যেন খুলে বলতে পারি!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্রর নির্মল শুদ্ধ সদন্তঃকরণ অজানা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শেষবারের মত বাধা দিয়া বলিল, বৌঠান, মানুষ-মাত্রেরই গোপনীয় কথা থাকে। সে ত কারো কাছে খুলে দেবার আবশ্যকতা নেই। বরঞ্চ প্রকাশ করাতেই বেশী অমঙ্গল। শুধু তোমার আমার নয়, আরো দশজনের।

কিরণময়ী কোন উত্তর করিল না। লুচিগুলি ভাজা শেষ হইয়াছিল, একটি থালায় পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল, তুমি খাও, আমি বলাটা শেষ করে ফেলি।

নাই বললেন বৌঠান।

কিরণময়ী কহিল, আমি হাতজোড় করে মিনতি জানাচ্চি ঠাকুরপো, আর আমাকে বাধা দিয়ো না। সমস্ত শুনে তোমার ইচ্ছা হয় আমার শাশুড়ীর সঙ্গে আমারও ভার নিয়ো, না ইচ্ছে হয়, আমার নিজের পথ আমি নিজে খুঁজে নেব। আমি অনেককে ঠকিয়েছি ঠাকুরপো, কিন্তু তোমাকে ঠকাতে পারব না।

তবে বলুন, বলিয়া উপেন্দ্র একখণ্ড লুচি ছিঁড়িয়া মুখে পুরিয়া দিল।

কিরণময়ী কহিল, তোমাকে বলেছি ত ঠাকুরপো, স্বামীকে আমি ভালবাসি নি; ভালবাসা পাইনি। সেজন্যে আমাদের কোন খেদ ছিল না। বাড়ির মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক,—তিনি আমাকে প্রাণপণে পড়িয়েই খুশী, আর একজন ঘোর স্বার্থপর—তিনি প্রাণপণে আমাকে খাটিয়ে নিয়েই খুশী ছিলেন। এমনি করেই দিন কেটেছিল, এবং কেটেও যেত বোধ করি, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে সব উলটে-পালটে গেল। স্বামী অসুখে পড়লেন। তাঁর কাছে আমি বই পড়েছি অনেক। নাটক নভেলও কম পড়িনি, কিন্তু দুজনেই পড়ে পড়ে শুধু হাসতুম। ভালবাসার নামগন্ধও আমাদের বাড়িতে ছিল না, তাই এক-একজন লোক যেমন থাকে জন্ম-বধির, জন্মান্ধ, আমার স্বামীও ছিলেন তেমনি জন্ম-নীরস। কিন্তু, আমার মধ্যে যে কত রস ছিল তা তখনও জানতে পারিনি বটে, কিন্তু এটা একদিন হঠাৎ টের পেয়ে গেলুম যে, ভালবাসার এবং তা ফিরিয়ে পাবার তৃষ্ণাটা আমারও কোন মেয়ের চেয়েই কম,—না না, এর মধ্যেই ও-গুলো অমন করে ঠেলে রাখলে চলবে না—

উপেন্দ্র বিরসমুখে কহিল, কেমন যেন খেতে ভাল লাগচে না বৌঠান।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন হইয়া কি যেন চিন্তা করিয়া লইয়া কহিল, আমি জানি ঠাকুরপো, আর একটু পরেই লুচি-তরকারির স্বাদ তোমার জিভের উপর বিষিয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো ত তার দেরী ছিল। আর একখানা খেতে পারতে।

উপেন্দ্র আরও মলিন হইয়া গেল।

কিরণময়ী তাহার প্রতি চাহিয়াই কহিতে লাগিল, যদি বলি, তোমার এই না-খাওয়ার দুঃখটা আমার নিজের ডান হাতটা নষ্ট হওয়ার চেয়েও আমার কাছে বেশী, সে ত তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু, কর আর না কর, আমি ত জানি এ সত্যি। তবু থামবার জো নেই ঠাকুরপো—আমাকে বলতেই হবে।

বেশ বলুন।

বলি। আমার স্বামীর পীড়ায় শুধু আমার গহনাগুলো ছাড়া সঞ্চিত যা-কিছু ছিল যখন সব একে একে গেল, তখন এলেন একজন টাটকা পাস-করা ডাক্তার—আচ্ছা ঠাকুরপো, অনঙ্গ ডাক্তারকে তোমরা দেখেছিলে না?

উপেন্দ্র কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী বিষের মত একটুখানি হাসিয়া কহিল, তিনিই! হায় রে পোড়া কপাল! এ-ঘরে স্বামী মর-মর, ও-ঘরে গেলুম তাঁকে নিয়ে ভালবাসার স্বাদ মিটোতে।

উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কথা কহিতে গেল, কিন্তু কে যেন গলাটা তাহার চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠরোধ করিল। খানিকক্ষণ প্রবল চেষ্টার পরে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল, শুনেই তোমার ঘাড় হেঁট হয়ে গেল ঠাকুরপো, তবু ত সেই অনঙ্গ ডাক্তারকে তুমি চেন না। চিনলে বুঝতে পারতে, কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের মাঝখানে জমাট বেঁধে ছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল। কি জানো ঠাকুরপো, যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু সে খবর পেলুম সেই জল গলায় ঢেলে দিয়ে। তার পরে—উঃ, সে কি গা-বমি-বমির দিনগুলোই কেটেছে। বলিতে বলিতেই তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। একটা উৎকট দুর্গন্ধময় বিষাক্ত উদ্গার যেন তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কিরণময়ী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু বমি করতেও পারলুম না ঠাকুরপো, শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধরলেন। অনঙ্গ তখন সংসারের অর্ধেক ভার নিয়েছিল।

উপেন্দ্র সেই একভাবে পাথরে-গড়া মূর্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার নির্বাক নত মুখের দিকে একবার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কিরণময়ী বলিল, তার পরে আসক্তি-ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে যে গরল অহরহ উঠতে

লাগল ঠাকুরপো, দেব-দানবের নিষ্ঠুর আকর্ষণে মন্দার-পীড়িত বাসুকিও বোধ করি ততখানি বিষ তার অতবড় মুখ দিয়ে ছড়াতে পারেনি! আমার মনে হয়, এ বাড়ির প্রত্যেক ইট-কাঠ, দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা পর্যন্ত বিষে নীল হয়ে আছে।

একটুখানি থামিয়া কহিল, কতদিনে কেমন করে যে এর শেষ হতো, আমি জানিনে। কত ভেবেচি, কিন্তু কোনদিকে কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিনি। কিন্তু কি অমৃত হাতে করেই তুমি উদয় হলে ঠাকুরপো, কোথায় বা গেল বিষের জ্বালা, আর কোথায় বা রইল বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা। চোখের পলকে এ-সব এমনি তুচ্ছ হয়ে গেল যে, অনঙ্গকে বিদায় দিতে আমার একটা মিনিটও লাগল না। তুমিই যেন এসে আমার কানে কানে উপায় বলে দিয়ে গেলে! জানো ত ঠাকুরপো, মেয়েমানুষ গহনা কত ভালবাসে! আমার বড় দুঃখের গহনাগুলি ছিল যেন আমার বুকের পাঁজর। ওই যেখানে মাথা হেঁট করে তুমি এখন বসে আছ, ঠিক ঐখানেই সেই পাঁজরগুলো খসিয়ে তার পায়ে ঢেলে দিলুম। আমার প্রতি আসক্তি তার যত বড়ই হোক, এতগুলো গহনা হাতে পেলে সে যে আর কখনো মুখ দেখাবে না, জন্মের মত রেহাই দিয়ে সে যে চলে যাবে, এ মন্ত্রটা তুমিই যেন আমাকে শিখিয়ে দিলে। উঃ—কত ভয়, কত ভাবনাই ছিল আমার, পাছে এই দুর্দিনের চাপে একদিন সেই গয়নাগুলোই আমার নষ্ট হয়ে যায়। তাই ত গেল—কৈ ধরে রাখতে তাদের ত পারলুম না। কিন্তু, আঃ—সে কি তৃপ্তি, সে কি আশ্চর্য আনন্দ ঠাকুরপো? এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যায় যখন সেইগুলোর লোভে সে তার বীভৎস পুচ্ছপাশ আমার সর্বাঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে চোরের মত নিঃশব্দে সরে গেল, মনে হল বাঁচলুম! আমি বাঁচলুম।

উপেন্দ্রর মনে পড়িল তাহার এবং সতীশের মাঝখান দিয়া একদিন সকালে চোরের মত অনঙ্গ ডাক্তার সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী কহিতে লাগিল, তোমার মনে পড়ে কি ঠাকুরপো আমার সে রাতের উগ্রমূর্তি? সেদিন কত কাণ্ডই করেছিলুম। আড়ি পেতে তোমাদের কথাবার্তা শোনা, নীচে গিয়ে তোমাদের চোখ রাঙ্গিয়ে কত ভয় দেখান, তার পরে তোমরা চলে গেলে। নিজের বিষের সে কি জ্বালা! কিন্তু তার বদলে যে দুটি জিনিস পেলুম ঠাকুরপো, সে আমার স্বর্গ, সে আমার অমৃত। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হয়েছিলেন, আমিও যেন তেমনি বদলে গেলুম। অহল্যা মানুষ হয়ে কি পেয়েছিলেন জানিনে, কিন্তু আমি যা পেলুম, তার তুলনা নেই। আমার ভাই ছিল না, সতীশকে পেলুম আমার মায়ের পেটের ভাই, আর পেলুম তোমাকে—ছিঃ! অমন মলিন হয়ো না ঠাকুরপো, পুরুষমানুষের কি অত লজ্জা সাজে?

উপেন্দ্র জোর করিয়া মাথা সোজা করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, যা লজ্জার বস্তু, মেয়ে-পুরুষের উভয়েরই সমান বৌঠান। আমি এ-সব কথা শুনতে চাইনে—হয় আপনি চুপ করুন, না হয় আমি এই মুহূর্তেই উঠে যাব।

কিরণময়ী কহিল, জোর করে নাকি?

উপেন্দ্র কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী কহিল, তা হলে আমিও জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু বলে রাখচি ঠাকুরপো, এই জোরের পরীক্ষায় আমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

এই উত্তরের পর উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই গো, ভয় নেই—তোমার অনিচ্ছায় গায়ে পড়ে তোমার গায়ে হাত দেব এত উন্মাদ এখনো হইনি। ইচ্ছা হয় উঠে যাও—আমি বাধা দেব না।

উপেন্দ্র অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মেঘে ঢাকা চাঁদ চোখে দেখা না গেলেও চারিদিকে ঝাপসা জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে আসল বস্তুটা যেমন জানা যায়,

এই দুটি নর-নারীর গোপন সম্বন্ধটাও এতক্ষণ পর্যন্ত ততটুকু মাত্রই আড়ালে ছিল। কিন্তু হাওয়া উঠিয়াছে, মেঘ দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, অন্তরের মধ্যে উপেন্দ্র তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়াই এমন করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বিফল হইয়া গেল। সহসা একটা দমকা বাতাসে সমস্ত আবরণ ছিঁড়িয়া দিয়া যতদূর দেখা যায়, সম্মুখের আকাশ অনাবৃত হইয়া উঠিল।

কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, যাক, তোমাকে যে ভালবাসি তা জানিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম। এখন তোমার যা খুশী করো, আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু মনে করো না ঠাকুরপো, আমি অন্ধ-আশায় ভুলে এ কথা জানালুম। আমি তোমাকে চিনি, আমি জানি এ নিষ্ফল। একেবারে নিষ্ফল; রক্ষক হয়ে এসে যে তুমি ভক্ষক হতে পারবে না, কোনমতেই না, এ আমি জানি।

এতক্ষণে উপেন্দ্র কথা কহিল, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ শ্রদ্ধা যদি আমার ‘পরে আছে, তবে জানালেন কেন?

কিরণময়ী কহিল, তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, না জানালে আমি পাগল হয়ে যেতুম। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে সব কথা না বলে তোমার আশ্রয় নেওয়া আমার অসম্ভব।

তা হলে আমার কেবল মনে হতো সুরবালাই আমাকে যেন খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে—কিন্তু এখন যদি এর পরেও তুমি আমার ভার নাও—মনে হবে এ শুধু তোমারই খাচ্চি-পরচি, আর কারো নয়। আচ্ছা, সুরবালাকে আমার কথা বলবে ত?

উপেন্দ্র কহিল, না।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিল, না কেন? শুনলে সে কষ্ট পাবে?

উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান, কষ্ট সে পাবে না। সে ভারী বোকা। ভদ্রলোকের মেয়ে স্বামী ছাড়া আর কোন লোককে কোন অবস্থাতেই ভালবাসতে

পারে, এ কথা হাজার বললেও তার মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু অনুমতি করেন ত এখন উঠি।

কথাটা কিরণময়ীকে তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, কিন্তু সে সহজকণ্ঠে কহিল, অনুমতি না করে ত উপায় নেই, করতেই হবে। কিন্তু আর একটু বসো। তোমাকে যে ভালবেসেছিলুম সেইটেই শুধু বলা হলো, কিন্তু ভুলতে যে চেয়েছিলুম, আজ, সে কথাটাও ত তোমার জানা চাই। কিন্তু তাতে কে আমার গুরু জান ঠাকুরপো? সেই যে নির্বোধের অগ্রগণ্য মেয়েটি ছোটবৌ হয়ে তোমাদের বাড়িতে ঢুকেচেন তিনিই।

উপেন্দ্রর মুখে বিস্ময়ের একটুখানি আভাস দেখিয়া কিরণময়ী কহিল, হাঁ তিনিই—তোমরা যাকে পশুরাজ বলে তামাশা কর, সেই সুরবালাই আমার গুরু। তুমি যা শেখালে, তিনি তাই ভুলিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি আমার নমস্য।

উপেন্দ্র মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কহিতে লাগিল, তোমাকে বার বার বলচি ঠাকুরপো, আজ যে তোমার পায়ে আমার লজ্জা-শরমের সমস্ত জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিলুম, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই। আমি জানি তোমার সুরবালা আছে। আর আছে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্রতা। সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্রের মত শক্ত। তার গায়ে দাগ দিতে পারি, সে আমার সাধ্য নয়। কিন্তু জান ত ঠাকুরপো, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব, যা তার সাধ্যাতীত, তাতেই তার সবচেয়ে লোভ। ভগবানকে পাওয়া যায় না বলেই মানুষ এমন করে সব দিয়ে তাঁকে চায়। তাই আমার মনে হয়, তুমি আমার এতবড় অপ্রাপ্য বস্তু না হলে বোধ করি তোমাকে এত ভাল আমি বাসতুম না। কিন্তু যাক সে কথা।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী কহিল, একলব্যের যেমন দ্রোণ গুরু, আমার গুরু তেমনি সুরবালা। কিন্তু কেমন করে হলো, সেই কথাটা জানিয়ে তোমাকে আজ ছুটি দেব। ঐ যেখানে তুমি খেতে বসেচ ঠাকুরপো, একদিন রাত্রে সতীশ-ঠাকুরপোও তেমনি খেতে বসেছিলেন।

কিসে মনে নেই, হঠাৎ তোমাদের কথা উঠে পড়ল। জান ত, ভাইটি আমার তোমাদের কথায় একেবারে মেতে ওঠেন। তখন তাঁকে সামলানোই শক্ত। আমার নিজেরও তখন প্রায় সেই দশা। ভালবাসার মদ তখন সবেমাত্র পাত্র ভরে খেয়ে তোমার নেশায় তখন আমার হাত-পা অবশ, দুই চক্ষু ঢুলে ঢুলে আসছে, এমনি সময়ে সতীশ-ঠাকুরপো কত নজীর কত দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, তুমি তোমার সুরবালাকে কত ভালবাসো। কবে তুমি তার পান-বসন্ত হলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলে, কবে সে তোমার একটুখানি মাথা-ধরা নিয়ে সারারাত্রি পাখা হাতে শিয়রে বসে কাটিয়াছিল—এমনি কত দিন-রাতের কত ছোটখাটো কাহিনী।তাঁর ত সে-সব শোনা-কথা। হয়ত বা কোনটা মিথ্যে, না হয় ত বাড়ানো, কিন্তু তাতে আমাদের দুজনের কারো কোন ক্ষতি হলো না। তোমাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে প্রেমের গঙ্গা বয়ে যাচ্চে, আমরা দুটি ভাই-বোনে দেখতে দেখতে যেন তাতে ডুবে তলিয়ে গেলুম। তার পর অনেক রাত্রিতে সতীশ বাসায় চলে গেলেন, আমি কিন্তু এই রান্নাঘরে বসে রইলুম। কতক্ষণ জানিনে, বেরিয়ে দেখি সুমুখেই শুকতারা। আমার হঠাৎ মনে হলো সুরবালার মুখখানি যেন এমনি। এমনি মধুর, এমনি উজ্জ্বল। ঠিক এমনিধারাই বুঝি তার মুখ থেকে চোখ ফেরান যায় না। মনে মনে তাকে বললুম, তোমাকে ত দেখিনি তুমি কেমন, কিন্তু যেমনই হও, আজ থেকে তুমি হলে আমার গুরু।

তোমার কাছ থেকেই আমি স্বামীপ্রেমের পাঠ নিলুম। ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি—এ আমি আর ছাড়তে পারব না। ভালবাসা আমার চাই-ই—ভাল আমাকে বাসতেই হবে। তবে, অন্যকে ভালবেসে কেন এ ব্যর্থ করি? আজও ত আমার স্বামী বেঁচে আছেন, এখনো ত বিধবা হইনি—তবে, কেন এ ভুল করি? তোমার মত আজ থেকে আমিও আমার স্বামীকেই ভালবাসব—আর কারুকে নয়। বলামাত্রই আমার মন যেন তার সমস্ত শক্তি এক করে সায় দিয়ে বললে, ‘ভালবাসা ফিরে পাবার তোমার আশা নেই সত্যি, কিন্তু তবুও তোমাকে তাঁকেই

ভালবাসতে হবে।' কিন্তু আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরপো, তিনি বাঁচলেন না। আমার বড় সাধের সাধনা অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল। তাই তাঁর মৃত্যুর দিনে আমার যে চেহারা তোমরা দেখতে পেয়েছিলে, তার মধ্যে একবিন্দু ছলনা ছিল না—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যে করুণ এবং আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, উপেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কথা কহিল না। কিরণময়ী নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, যারা মূর্খ, যারা গোঁড়া, তারা বুঝবে না বটে, কিন্তু তুমি ত জানো সংসারের সমস্ত জিনিসেরি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সে নিয়ম অগ্রাহ্য করে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কখনো তাদের সেই চিরমধুর সম্বন্ধে পৌঁছুতে পারে না। বিয়ের মন্ত্র কর্তব্যবুদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেও পারে, কিন্তু মাধুর্য দেওয়ার শক্তি ত তার নেই। সে শক্তি আছে শুধু ঐ প্রকৃতির হাতে। তাঁর দেওয়া নিয়ম-পালনের মধ্যে যখন সময় ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন দুজনেই দু পায়ে সে নিয়ম মাড়িয়ে গেছি, তার কোন সম্মানই রাখিনি, আজ অসময়ে স্বামী যখন মৃতকল্প তখন প্রয়োজন বলে তাঁর কাছে যাব আমি কোন্ পথে? কিন্তু তবুও হাল ছেড়ে আমি দিইনি ঠাকুরপো। আশা ছিল একটা পথ বুঝি তখনও খোলা ছিল। সে তাঁর সেবা। ভেবেছিলুম আমরণ স্বামী-সেবা নিয়েই হয়ত বা একদিন তাঁকে পাবো, কিন্তু এমনি হতভাগিনী আমি—সেটুকু অবসরও আমার মিলল না, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

উপেন্দ্র সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, কিরণময়ীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। কহিল, শুনেছি, আপনি যেমন তাঁর সেবা করেছেন তেমন মানুষে পারে না। সেদিকে স্ত্রীর কর্তব্যে আপনার লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি।

কিরণময়ী বলিল, তা হয়ত ঘটেনি, কিন্তু মানুষে না পারলে আমিই বা কি করে পারলুম ঠাকুরপো? তা নয়,—তেমন সেবা স্ত্রীলোকমাত্রই পারে। কিন্তু আমি ত কর্তব্য বলে কিছুই করিনি, আমার অন্য সমস্ত পথ বন্ধ ছিল বলে আমি চেয়েছিলুম আমার সেবার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে। তাই সেদিকে সাধ্যমত

কখনো অবহেলা করিনি। ভেবেছিলুম, একবার যদি তাঁকে বুকের মধ্যে পাই, যতদিন বাঁচি, যেখানে যেভাবেই থাকি, ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা আমার নিষ্ফল হয়ে গেল।

তাঁকে পেতে শুরু করেছিলুম বটে কিন্তু পেলুম না। প্রথম থেকে সেই যে তুমি আমার বুক জুড়ে রইলে, কোনমতেই সেখান থেকে তোমাকে আর নড়াতে পারলুম না,—আমার স্বামীকেও আমার অন্তরের মধ্যে পেলুম না।

উপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অনেক রাত্রি হয়েছে বৌঠান, আমি চললাম।

কিরণময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল,চল তোমাকে দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সদরটা বন্ধ করে আসি। কাল দেখা হবে?

না, কাল আমি বাড়ি যাবো।

আর কোনদিন দেখা হবে?

হওয়াই ত সম্ভব। নমস্কার বৌঠান!

নমস্কার ঠাকুরপো। দিবাকরকে এখানে পাঠাবে কি?

পাঠাব বৈ কি বৌঠান। তার বাপ-মা নেই, আমিই তাকে এতদিন দেখে এসেচি। আজ থেকে তাকে মানুষ করবার ভার আপনি যখন নিতে চেয়েছেন, সে ভার আপনার হাতেই সঁপে দিলুম।

কিরণময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। কহিল, এত কথা শোনার পরও তুমি এতবড় বিশ্বাসের ভার আমার উপর কি করে দেবে ঠাকুরপো। তুমি যে দিবাকরকে কত ভালবাস সে ত আমি জানি।

উপেন্দ্র দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িয়া কহিল, সেইজন্যেই ত দিলাম বৌঠান। আমি যাকে ভালবাসি তার অমঙ্গল আপনার দ্বারা কখনো হবে না এই ত আমার ভরসা—বলিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

কিরণময়ী অন্ধকার গলির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আর একটা কথা বলে যাও ঠাকুরপো, সতীশ কি কলকাতায় নেই?

উপেন্দ্র দূর হইতেই জবাব দিল, না।

কিরণময়ী পুনরায় প্রশ্ন করিল, সে যখন আমাকে না জানিয়ে চলে গেছে, তখন অনেক দুঃখেই গেছে ঠাকুরপো। তাকে কি তুমি এ বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছিলে?

উপেন্দ্র কহিল, দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দিইনি।

কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইচ্ছাই ছিল দিলে না কেন?

উপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী কহিল, এমন ইচ্ছে কেন হয়েছিল তাও কি জানতে পারিনে।

উপেন্দ্র কহিল, আমার ভুল হয়ে থাকতেও পারে। যাই হোক, কোথায় সে আছে খোঁজ করে আপনার কাছে আসতে তাকে চিঠি লিখে দেব। তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন—বলিয়া উপেন্দ্র দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকার গলি পার হইয়া গেল।

আটাশ

যে পাকা রাস্তাটা বরাবর সাঁওতাল পরগনার ভিতর দিয়া বৈদ্যনাথ হইতে দুমকায় গিয়াছে, তাহারই ধারে বাগানের মধ্যে বৈদ্যনাথ হইতে প্রায় ক্রোশ-দুই দূরে একটা বাঙ্‌লো ছিল। কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া সতীশ খোঁজ করিয়া এই বাড়িটা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্যই সে এই নিরালায় অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং যখন দেখিতে পাইল, ইহার আশেপাশে গ্রাম সম্মুখের রাস্তাটায় লোক-চলাচলও নিতান্ত বিরল, তখন খুশী হইয়াই বলিয়াছিল, 'এই আমার চাই। এমনি নির্জন নীরবতাই আমার প্রয়োজন।' কলিকাতা হইতে সে যে অপযশ ও দুঃখের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল, বিরলে বসিয়া একটা একটা করিয়া এইগুলারই হিসাব-নিকাশ করা তাহার মনোগত অভিপ্রায়। প্রথম দফায় সাবিত্রীকে তাহার যারপরনাই ঘৃণা করা প্রয়োজন, দ্বিতীয় দফায় পাথুরেঘাটার বৌঠাকরুনকে ভোলা চাই এবং তৃতীয় দফায় উপীনদার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেই হইবে। এই-সমস্ত কঠিন কাজ এই বনের মধ্যে বসিয়া শেষ করাই তাহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে ছিল বেহারী এবং একজন এদেশী পাচক-ব্রাহ্মণ। বেহারীর কাজ ছিল বাবুর সেবা করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু পাচকের সহিত বাদানুবাদ করিয়া তাহাকে মূর্খ এবং আনাড়ী প্রতিপন্ন করা, আর অন্যের কাজ ছিল ভাত ডাল সিদ্ধ করিয়া বাকী সময়টুকু বেহারীর সহিত কলহ করিয়া সে যে বাজারের পয়সা দুই হাতে চুরি করিতেছে ইহাই সাব্যস্ত করা। অতএব এ-পক্ষের দিনগুলা ত এক রকম করিয়া কাটিতে লাগিল, কিন্তু প্রভু যিনি, তিনি অনুক্ষণ কেবল তত্ত্ব-চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনই যে সকল অনর্থের মূল, বৈরাগ্যই যে পরম বস্তু, পাখির ডাকই যে চরম সঙ্গীত, বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতই যে সৌন্দর্যের

নিখুঁত আদর্শ, এই সত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার সম্প্রতি সাধনার বস্তু। সুতরাং, বারান্দার উপর একখানা ভাঙ্গা আরাম-কেদারায় সতীশ সারাদিন গাছের ডালে পাখির কিচিমিচি কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল, মহুয়া বৃক্ষে বাতাসের সোঁসোঁ শব্দ কোন্ রাগ-রাগিণীতে পূর্ণ, চিন্তা করিতে লাগিল, আকাশে যা-তা মেঘ দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং দূরে পাহাড়ের গায়ে শুষ্ক বাঁশ-পাতায় আগুন ধরিলে সারারাত্রি জাগিয়া চাহিয়া রহিল।

এদিকে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দিয়া সাত্ত্বিক আহার ধরিল এবং কোথা হইতে একটা সাদা পাথরনুড়ি কুড়াইয়া আনিয়া দিনের বেলা পূজা এবং রাত্রে আরতি করিতে শুরু করিয়া দিল।

অথচ, এই নব-প্রণালীর জীবনযাত্রার সহিত তাহার কোনকালেই পরিচয় ছিল না। ইতিপূর্বে চিরকাল তাহার কাছে পাখির শব্দের চেয়ে সেতারের শব্দই মিষ্ট লাগিয়াছে, বাতাসের মধ্যে রাগ-রাগিণীর অস্তিত্ব কখনো সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই এবং আকাশের গায়ে মেঘোদয় কোনদিনই তাহাকে বিচলিত করে নাই। বস্তুতঃ প্রকৃতি-দেবীর এই-সকল শোভা-সম্পদ, তা সে যতই থাক, খবর লইবার ফুরসত সতীশের কোনকালে ছিল না। যেখানে গান-বাজনা, যেখানে থিয়েটার কনসার্ট, যেখানে ফুটবল ক্রিকেট, সেখানেই সতীশ দিন কাটাইয়াছে। কোথায় মারপিট করিতে হইবে, কোন্ আসরে ষ্টেজ বাঁধিতে হইবে, কার বাড়ির মড়া পোড়াইতে হইবে, কার দুঃসময়ে দশটা টাকা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে, এই ছিল তাহার কাজ।

পাখির গানে মাধুর্য আছে কি না, কোকিল পঞ্চমে ডাকে কি ডাকে না, আকাশপটে কার তুলি রঙ ফলায়, নদীর জল কুলকুল শব্দে কোন্ বানী ঘোষণা করে, কামিনী-কাঞ্চন সংসারে কতখানি অনর্থের মূল—এ-সব সূক্ষ্মতত্ত্ব কোনকালেই তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই এবং সেজন্যে দুঃখ করিতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। সে সোজা মানুষ, সংসারের কারবার সে সোজা করিয়াই করিতে

পারে। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে নির্বিচারেই ভালবাসে এবং তাহাতে ঘা পড়িলে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। পৃথিবীতে দুটি লোককে সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিল। একজন সাবিত্রী, আর একজন তাহার উপীনদা। সাবিত্রী তাহাকে ফাঁকি দিয়া কদাচারী বিশ্বাসঘাতক বিপিনকে সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, উপীনদা কোন প্রশ্ন না করিয়াই একটা অন্ধকার রাত্রে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শুধু দাঁড়াইবার একটা জায়গা ছিল, সে কিরণময়ীর কাছে। কিন্তু সে দ্বারটাও রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার আর তাহার সাহস হইল না। তাই সে এই নির্জনে আসিয়া আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষীর সঙ্গে জোর করিয়া একটা নূতন সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া বৈরাগ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু চিরকাল যে লোক আমোদ-প্রমোদ বন্ধু-বান্ধব লইয়া হৈচৈ করিয়া কাটাইয়াছে, তাহার এই অভিনব চেষ্টায় বুড়া বেহারীর চোখে যখন-তখন জল আসিতে লাগিল।

সে হয়ত কোনদিন আসিয়া বলে, বাবু, দুজন ভদ্দর বাঙালী সুমুখের রাস্তা দিয়ে বোধ করি ত্রিকূট দেখতে যাচ্ছেন—

কথা শেষ না হইতেই সতীশ 'কৈ রে?' বলিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই 'যাক গে' বলিয়া বিমর্ষমুখে তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়ে।

বেহারী বলে, ডেকে একবার আলাপ-টালাপ—

সতীশ কহে, কিসের জন্যে? তার পরে একটুখানি উচ্চ ধরনের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলে, আমার আর ও-সব আলাপ-টালাপের দরকার নেই—ভালই লাগে না। জানিস বেহারী, বনের পাখিরা আজকাল আমাকে গান শোনায়, গাছপালা কথা কয়, বাতাস হু হু করে আমার কানে কত রাজ্যের গল্প বলে যায়, আমার কি আর বাজে লোকজনের সঙ্গে হাসি-তামাশায় সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় রে? আমার যথার্থ বন্ধু যদি বলতে হয় ত এরাই—বুঝলি নে বেহারী? বেহারী নিরুত্তর ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়।—কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রভুর এই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠস্বর তাহার কানের মধ্যে রি রি করিতে থাকে।

বেহারীর একটা স্বভাব ছিল, সে কথা দিয়া কথা ভাঙ্গিতে পারে না। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা যে লোভ সামলাইতে পারে না, এই ছোটলোক বেহারীর সে শক্তি ছিল। সে মনে মনে একপ্রকার করিয়া বুঝিতে পারিত সাবিত্রী সে রাত্রে কি একটা জুয়াচুরি করিয়া গিয়াছিল। সে যে সতীশের অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী এবং সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত, বেহারীর তাহাতে সংশয় ছিল না। কেন যে সে, যে দোষ করে নাই তাহাই স্বীকার করিয়া এবং যে-পাপ কোনদিন ছিল না তাহারই বোঝা স্বহস্তে নিজের মাথায় তুলিয়া তাহার প্রভুকে এত ব্যথা দিয়া গেল, এই কথাটা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও সে মীমাংসা করিতে পারিত না। তবে কিনা সাবিত্রীর উপর বেহারীর অসীম ভক্তি ছিল। তাহাকে মা বলিত এবং শাপভ্রষ্টা দেবী মনে করিত। তাই নিজের বুদ্ধিতে কূল-কিনারা না পাইয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে, শেষকালে একটা কিছু ভালই হইবে; এবং এই ভালর আশাতেই সে ও-সম্বন্ধে একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিল। প্রভুর মুখ দেখিয়া সাবিত্রীর আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে মাঝে মাঝে যখন তাহার ভারী একটা আবেগ উপস্থিত হইত, তখন এই বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিত যে, আমার মা'র চেয়ে বাবুকে ত আর আমি বেশী ভালবাসি নে, তিনি নিজেই যখন এ দুঃখ দিয়ে গেলেন, তখন আমি কেন ব্যাঘাত ঘটাই? তিনি না বুঝে ত আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে যাননি।

এমনি করিয়াই ইহাদের নির্জনবাসের দিনগুলা কাটিতেছিল। এবং বোধ করি আরও কিছুকাল কাটিতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধা পড়িল।

যাহাকে বলে কাল-বৈশাখী, সেদিন সময়টা ছিল তাই। সমস্ত দিনমানটায় যদিচ দুর্যোগের কোন লক্ষণ ছিল না, কিন্তু অপরাহ্নের কাছাকাছি মিনিট-কুড়ির মধ্যেই আকাশে প্রবল ঝড় উঠিল। ক্ষণকালেই সতীশ অশ্ব-পদশব্দে চকিত হইয়া গলা উঁচু করিয়া দেখিল একটা ভালো ঘোড়া পিঠের উপর সাজসজ্জা লইয়া ঝড়ের

সঙ্গে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। সতীশ ডাকিয়া কহিল, বেহারী, ও কার ঘোড়া ছুটে পালাল জানিস রে?

বেহারী ঘরের মধ্যে বাতি পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, কোন বাবু-টাবুর হবে বোধ হয়।

সতীশ প্রশ্ন করিল, এদিকে বাবু- টাবু আবার কে আছে রে?

বেহারী কহিল, এদিকে নাই থাকলো, দেওঘর থেকে প্রায়ই ত বাবু-ভায়ারা গাড়ি করে ত্রিকূট দেখতে, তপোবন দেখতে আসে। তাদেরই কারো হবে। ঝড়ের ভয়ে ছুট মেরেচে।

তা হলে ত তার ভারী মুশকিল, বলিয়া সতীশ পুনরায় তাহার আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু কথাটা সে মন হইতে তাড়াইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেই হোন, সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে বিপদ ত সোজা নয়। এ জায়গায় গাড়ি পালকি ত দূরের কথা, একটা লোকের সাহায্য পাওয়াও কঠিন। তা ছাড়া সন্ধ্যারও বিলম্ব নাই, সম্ভবতঃ বৃষ্টিও নামিবে। সতীশ থাকিতে পারিল না, লাঠিটা বারান্দার কোন হইতে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া দেখিল, পাথরের কুচিগুলো ঝড়ের বেগে ছর্‌রার মত গায়ে বিঁধিতেছে এবং সমস্ত পথটা ধূলা- বালুতে অন্ধকার হইয়া গেছে। হঠাৎ সেই অন্ধকার হইতে ঝড়ের মুখে একটা হোহো চীৎকার ভাসিয়া আসিল। হোলির দিনের ছুটি পাইয়া হিন্দুস্থানী, দরোয়ানের দল যে-ধরনের চীৎকার-শব্দে পথে বাহির হইয়া পড়ে—এ সেই। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য সতীশ সেই ধূলার মধ্যে কতকটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল, পথের উপরে একটা টমটম; এবং সেটাকে বেষ্টন করিয়া আট-দশজন লোক আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে।কাহারও মাথায় টুপি,কাহারও মাথায় পাগড়ি—সকলেরই হিন্দুস্থানী পোশাক।

আনন্দটা কিসের জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে সতীশ আরও কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইল, টমটমের একটা হাতল ধরিয়া একটি

স্ত্রীলোক মাথা গুঁজিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লোকগুলা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহা হিন্দুস্থানী জিহ্বা ছাড়া উচ্চারণ করিতে পারে এতবড় জিভ পৃথিবীর আর কোন জাতের নাই। সতীশের প্রথমে মনে হইল, ইহারা এই দিকে কোথাও এই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া আমোদ করিতে আসিয়াছিল, এখন ঘোড়া পলাইয়া যাওয়ায় এ আর এক প্রকারের আমোদ করিতেছে। একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়, কিন্তু কি জানি কেন আজ সে কোনমতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ঠিক এমনি সময়ে তাহার সবিস্ময় দৃষ্টি পড়িল মেয়েটির পোশাকের উপর। সন্ধ্যা ও ধুলাবালির আঁধারেও মনে হইল, তাহার পরনের কাপড়খানা যেন বাঙালী-মেয়ের মত করিয়া পরা। পায়ে জুতা, কিন্তু সে জুতা লক্ষ্ণৌয়ের লপেটা নয়—ইংরাজ রমণীরা যাহা পায়ে দেয়, তাই।

অকস্মাৎ মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, মশাই, আমাকে বাঁচান।

‘বাঁচান’! একমুহূর্তে সতীশের বৈরাগ্যের নেশা ছুটিয়া গেল। কামিনী-কাঞ্চন যে একান্ত হেয় এ তত্ত্ব ভুলিয়া গেল—বাঘের মত লাফ দিয়া সে একেবারে মেয়েটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি হয়েছে?

মেয়েটি এতক্ষণ পর্যন্ত একাকী অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়াছিল, এইবার মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি? হয়েছে কি?

এরা আমাকে বড্ড অপমান করচে!

অপমান করচে! কে এরা?

জানিনে।

জান না? সতীশ একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কে? কোথা থেকে এখানে এলে? তোমার সঙ্গের লোক কৈ? গাড়ি কার?

মেয়েটি চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, আমার সহিস ঘোড়া ধরতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে—আর কেউ নেই। আমি ত্রিকূট দেখতে এসেছিলুম—প্রায় আসি—সেখান থেকে এরা আমাকে বিরক্ত করতে করতে আসচে।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, বেশ করেছে। আপনি কি মেমসাহেব যে টমটম হাঁকিয়ে এত দূরে এসেচেন! আপনি কি ইংরাজের মেয়ে যে, যেখানে ইচ্ছে একলা গেলেও কোন ভয় নেই? আমাদের দেশী লোক অসহায় দেশী মেয়ে পেলেই তাকে অপমান করবে— অত্যাচার করবে—এই এ দেশের নিয়ম, এ কি আপনার বাপ-মায়েরা জানেন না? বলিয়া হিন্দুস্থানীদের যেটি সকলের বড় তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, তুমলোক খাড়া কাহে হ্যায়?

সে বলিল, হামারা খুশী!

তাহাদের চোখের পানে চাহিলেই বুঝা যায় তাহার হয় ভাঙ, না হয় গাঁজা, না হয় দুই-ই সেবন করিয়াছে।

সতীশ হাত তুলিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া সংক্ষেপে কহিল, যাও—

উত্তরে লোকটা মুখখানা অতি বিকৃত করিয়া কহিল, আরে, যাও রে—

প্রত্যুত্তরে সতীশ তাহার গালের উপর এমন একটা চড় কশাইয়া দিল যে, সে ঐ 'রে' শব্দটাই আর একটুখানি টানিবার অবসর পাইল মাত্র, তার পরে অজ্ঞান হইয়া পথের উপর ঘুরিয়া শুইয়া পড়িল; এবং সেই মুহূর্তেই তাহার পাশের নিরীহ গোছের রোগা ছোকরাটা বিনাদোষে সতীশের বাঁ হাতের চড় খাইয়া প্রথমে টমটমের সহিসের বসিবার জায়গায় এবং তাহার পরে চাকার তলায় চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল। বাকী কয়েকজন কতক বা নেশার গুণে, কতক বা চড়ের কল্যাণে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সতীশ সুমুখের লোকটাকে আহ্বান করিয়া বলিল, অব্ তুম আও—

প্রত্যুত্তরে সে বিদ্যুদ্বেগে সকলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ তখন মেয়েটিকে কহিল, উঠুন—

মেয়েটি নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।সতীশ কহিল, জল এলো বলে—আসুন আমার সঙ্গে। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি কি টাউন পর্যন্ত হাঁটতে পারব?

সতীশ বলিল, টাউনে নয়, আমার বাসায়। ঐ বাগানের মধ্যে। জল আসচে, আর দাঁড়িয়ে ভাবলে হবে না। না যান ত এখানেই দাঁড়িয়ে ভিজুন—আমি চললুম।

মেয়েটি কহিল, চলুন না। আপনার সঙ্গে যাব তার আর ভাবব কি?

ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে শুরু করিয়াছিল এবং ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইলেও থামে নাই। দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে আসিয়া বাগানের গেটের সম্মুখে সতীশ সহসা থামিয়া কহিল, আমার বাসায় কিন্তু স্ত্রীলোক নেই—আমি একা থাকি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে আপনার রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ করে কে? নিজে?

না, চাকর আছে। কিন্তু তারাও স্ত্রীলোক নয়।

নাই হলো, কিন্তু আপনি দাঁড়ালেন কেন? যেতে যেতে বলুন না।

সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, তাই বলচি যে আমার ওখানে স্ত্রীলোক নেই। এই রাত্রে ভিতরে যাবার পূর্বে আপনাকে জানানো উচিত।

মেয়েটি কহিল, যদি উচিত, তবে ওখানেই জানালেন না কেন? আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারচি নে—আমার হাত-পা কাঁপচে। তা ছাড়া আমার বড় তেষ্টাও পেয়েছে।

আসুন আসুন, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া অন্ধকার বাগানের মধ্যে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইল। এই-সমস্ত বিশ্রী ঘটনার পরে মেয়েটি যে কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া সতীশ লজ্জা পাইল। একটু পরেই সে ধীরে ধীরে কহিল, আপনার গলা যেন কোথায় শুনেচি মনে হয়।

মেয়েটি তাহার জবাব দিল না। কিন্তু বুঝিতে পারিল, সতীশ অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। বারান্দায় উঠিয়া সে সতীশের ভাঙ্গা আরাম-চেয়ারের উপর গিয়া বসিয়াই কহিল, সঙ্গে বেহারী আছে ত? বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, বেহারী, আমার জন্যে এক গ্লাস জল আন ত?

বেহারী ওদিকের ঘরে ছিল। ডাক শুনিয়া জল লইয়া উপস্থিত হইল। বারান্দার দেওয়ালের গায়ে মিটমিট করিয়া একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, সেই ক্ষীণ আলোকেও সে মেয়েটিকে দেখিবামাত্র চিনিয়া সবিস্ময়ে কহিল, দিদিমণি, আপনি যে?

সে অনেক কথা, বলিয়া মেয়েটি নিজে উঠিয়া বেহারীর হাত হইতে জলের গেলাস লইয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া বেহারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিতে হবে যে বেহারী। ঠিকানা বলে দিলে, এই রাত্তিরে তুমি বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে কি?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিমণি, আমি ত শহরের কিছুই চিনিনে। তা ছাড়া, বুড়োমানুষ, এই জল-ঝড় অন্ধকারে পথ চলতে পারব না।

তা হলে কি হবে বেহারী? ঘোড়াটা যদি গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে থাকে, দাদা ভেবে সারা হয়ে যাবেন। কোন উপায়ে তাঁকে জানাতেই হবে যে ভয় নেই, আমি নিরাপদে আছি।

বেহারী চিন্তা করিয়া কহিল, আমাদের বামুনঠাকুর এই দেশের লোক, পথঘাট সব চেনে। জ্যোতিষ-সাহেবের বাসা বলে দিলে নিশ্চয় যেতে পারবে। তাকে গিয়ে ডেকে আনি, বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ চিনিল মেয়েটি কে। কহিল, দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দিন।

মেয়েটি কহিল, সে ত দিতেই হবে।

সতীশ বলিল, অমনি লিখে দেবেন, বোনকে মেমসাহেব করে তোলবার ফলটা আজ কি হয়েছিল, সাহেব-মানুষ শুনলে হয়ত খুশীই হবেন।

খোঁটা খাইয়া সরোজিনী ক্রুদ্ধ হইল। তাহার আজিকার আচরণ দৈব-বিড়ম্বনায় অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, এবং সেজন্য তাহার নিজেরও অনুশোচনা কম হয় নাই, কিন্তু, আর একজন তাই বলিয়া বারংবার মেমসাহেবের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিলে সহা যায় না। সে তিক্তস্বরে জবাব দিল, দাদাকে আপনিই লিখে দিন, তাঁর বোনকে কি বিপদে আজ একাকী রক্ষা করেছেন।

তাঁহার বিরক্তির হেতুটা সতীশ বুঝিল। কিন্তু নিজে এই-সকল সাহেবিয়ানা সে একেবারে দেখিতে পারিত না। বলিল, লেখাই উচিত। তবু যদি আপনাদের সমাজের একটু চেতনা হয়।

সরোজিনী কহিল, আমাদের সমাজের প্রতি আপনার খুব ঘৃণা হয়—না? ধারণা এই যে আমরা মানুষ নই?

সতীশ বলিল, আমার ধারণা যাই হোক, নিজের ধারণা আপনারা ছাড়া বাঙলাদেশে আর মানুষ নেই, এই না?

সরোজিনী কহিল, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে এ ধারণা যাঁদের আছে, আমি তাঁদের দোষ দিইনে।

সতীশ বলিল, সে জানি। সেই জন্যেই আজ আপনার শাস্তি আরো ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল। ওখানে আপনাকে চিনতে পারলে আমি চুপ করে চলে আসতাম—কথাও কইতাম না।

সরোজিনী কহিল, শাস্তিটা কি শুনি? অপমান আর অত্যাচার—এই ত?

সতীশ কহিল, তাই।

সরোজিনী কহিল, তা হলে এতক্ষণে বুঝতে পেরেচি, কেন বলছিলেন অসহায়া স্ত্রীলোকের অপমান করাটাই আপনাদের দেশী লোকের চরিত্র। আপনার উচিত ছিল আমার বাকী অপমানটা বাড়িতে এনে নিজেই করা। এখন চেনা লোক বলে বাধচে বলেই আপনার রাগ।

সরোজিনীর কথার ঝাঁজে সতীশ রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, ঠিক তাই। আপনাকে অপমান করতে না পেরেই আমার যত রাগ। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। আপনাদের সাহেব-মেমের অভিধানে সে কথাটাও হয়ত লেখা নেই।

সরোজিনীর ওষ্ঠাধরে একটা চাপা-হাসির ছটা মেঘাবৃত বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তবুও সে ক্রোধের স্বরেই জবাব দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর এত বেশী কৃত্রিম যে তাহা অতি বড় অমনোযোগী শ্রোতার কানেও ঠেকে। সরোজিনী বলিল, না নেই। এই সাহেব-মেমগুলো যেমন অকৃতজ্ঞ, তেমনি পাষণ্ড। আপনি দলে না এলে তাদের পরিত্রাণের উপায় নেই। আসবেন তাদের দলে?

প্রত্যুত্তরে সতীশও হাসি চাপিয়া কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, এমনি সময়ে বেহারী হনুমান পাঁড়েজীকে আনিয়া হাজির করিল। সরোজিনী হাতের ব্যাগটা খুলিয়া গোটা পাঁচেক টাকা বাহির করিয়া চেয়ারের হাতার উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার বকশিশ পাঁড়েজী, যদি এখনি শহরে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে পার,—বলিয়া সে নাম-ধাম যথাশক্তি নির্দেশ করিয়া দিল।

পাঁড়েজী তাহার এক মাসের আয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া একমুহূর্তে রাজী হইয়া পত্রের জন্য হাত বাড়াইল। তাহার প্রসারিত করকমলে সরোজিনী টাকা কয়টি অর্পণ করিয়া চিঠি লিখিবার জন্য ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লিখিবার টেবিল সুমুখেই ছিল। অনতিকাল পরে সে পত্র আনিয়া পাঁড়েজীর হাতে দিল। পাঁড়েজী সাবধানে তাহা মেরজাইয়ের মধ্যে রক্ষা করিয়া বাম-হস্তে হারিকেন লণ্ঠন এবং ডান-হস্তে সুদীর্ঘ বংশ-যষ্টি গ্রহণ করিয়া বাহিরের মুষলধার-বারিপাতের মধ্যে চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বেহারী কুণ্ঠিতভাবে কহিল, বাবু, ঠাকুর কখন যে ফিরবে তার ঠিক নেই—রান্নার কি হবে?

সতীশ সরোজিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কথাটাকে চাপা দিবার জন্য তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, ওঃ—সে হবে তখন।

বেহারীর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। বলিল, কি করে হবে, আমি ত ঠাউরে পাইনে বাবু।

সতীশ অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, তোর ঠাওরাতে হবে না বেহারী, তুই যা না। সে-সব আমি ঠিক করে নেব। তাছাড়া, আজ আমার ক্ষিদেও নেই।

বেহারী এক পা-ও নড়িল না। কারণ কথাটা সে একেবারে বিশ্বাস করিল না। কারণ, একে ত সাধারণ পাঁচজনের অপেক্ষা মনিবের ক্ষুধার পরিমাণ বেশী, তা ছাড়া এতদিনের চাকরির মধ্যে সে তাঁহার এই বস্তুটার অভাব একটা দিনও লক্ষ্য করে নাই। সংক্ষেপে কহিল, সে কি হয় বাবু!

সতীশ তিরস্কার করিয়া বলিল, এই তোর দোষ বেহারী, তুই সব কথায় তর্ক করিস। বলছি সে-সব ঠিক করে নেব, তুই যা, তা নয়, মুখের ওপর দাঁড়িয়ে সমানে জবাব করচিস।

বেহারী ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া যাইতেছিল, সরোজিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিল, আজ আমার জন্যেই তোমাদের যত বিপদ বেহারী। রান্নার যোগাড় কি কিছু হয়নি?

বেহারী কহিল, হবে না কেন দিদিমণি, কিন্তু রাঁধবে কে? ঠাকুরের ফিরে আসতে যে কত দেরী হবে তার ত ঠিকানা নেই। বলিয়া অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

সরোজিনী কহিল, মেমসাহেব বা যাই হই, তবু আপনার সঙ্গে একই জাত ত। তার হাতে খেলে কি কারো জাত যাবে?

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ হাসিল। কহিল, জাত যাবে কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু মেমসাহেবের হাতের রান্না গলা দিয়ে যাবে কি না সেইটেই আসল কথা।

ইস! তাই বৈ কি! মেমসাহেবের হাতের রান্না খেলে তিনি ভুলতে পারবেন না, বলিয়া সরোজিনী হাসি ও এসেন্সের গন্ধে সমস্ত স্থানটা যেন তরঙ্গিত করিয়া ত্বরিৎপদে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার পানে চাহিয়া সতীশ ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিল।

জুতা-মোজার পরিবর্তে পা-দুখানি খালি, রেশমের জামা-কাপড়ের বদলে শুদ্ধমাত্র শেমিজের উপর সতীশের একখানি সাদাসিধে লালপেড়ে ধুতি পরা। দেখিয়া সতীশের দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিল, কি চমৎকারই আপনাকে মানিয়েচে! যেন লক্ষ্মীঠাকরুনটি!

কথা শুনিয়া সরোজিনীর শিরার মধ্যে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। কিন্তু দারুণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কহিল, যান—ঠাট্টা করলে রাঁধব না বলে দিচ্ছি। তখন উপোস করতে হবে।

কিন্তু এই লজ্জার প্রকাশটাকে সে তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া ফেলিল। কারণ সে জানিত, লজ্জাকে প্রশ্রয় দিলে তাহা উৎকট হইয়া উঠে। তাই মাথা তুলিয়া সহাস্যে কহিল, সুখ্যাতি পরে হবে। এখন রান্নাঘরটা কোন পাড়ায়, দেখিয়ে দিতে বলে দিন। বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেল।

উনত্রিশ

রাঁধা এবং খাওয়া শেষ হইয়া গেল, বারান্দায় দুখানা চেয়ারে দুজনে মুখোমুখি বসিয়া ছিল।

সরোজিনী কহিল, একটা কথা আমাদের কারো মনে হলো না যে, দাদার বাড়ির ঠিকানা ঠাকুর যদি না পায় ত নিজেই একটা গাড়ি ডেকে আনবে। কিন্তু, তা না হলে কি হবে সতীশবাবু?

সতীশ কহিল, কথাটা মনে হলেও বিশেষ কোন কাজ হতো না। এত রাত্রে, এত দূরে কোন গাড়িওয়ালাই বোধ করি আসতে চাইত না। হয় আপনাকে এইখানেই রাত্রিবাস করতে হবে, না হয় হাঁটতে হবে। এ-ছাড়া তৃতীয় উপায় নেই।

আমি হাঁটতে পারি, কিন্তু আপনি ছাড়া কারো সঙ্গে নয়।

তার মানে? আমার সঙ্গে গেলেই কি বিপদের সম্ভাবনা নেই?

নেই কেন, আছে। কিন্তু তার সব ভার আপনার উপরে। জবাবদিহি আপনাকেই করতে হবে, আমাকে নয়।

সতীশ কহিল, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন? আমার অপরাধ?

আর কারো কাছে না করুন, নিজের কাছে ত করতে হবে! বলিয়া হঠাৎ সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

সতীশ আর তাহার প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিল, দু'জনের ক্ষণিক নীরবতার মাঝখান দিয়া লজ্জার একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

কে আসছে না?—বলিয়া সরোজিনী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া অন্ধকার বাগানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক পরে সে যখন 'কেউ না', বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং কাপড়চোপড় আর একবার বেশ করিয়া সামলাইয়া লইয়া উপবেশন করিল, তখন সতীশ কোন কথাই কহিতে পারিল না।

অতঃপর উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন বাহিরে ঝড় থামিলেও বৃষ্টি থামে নাই। মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ এবং চারিদিকে মহুয়ার বনের মধ্যে সে অন্ধকার দশগুণ গভীর হইয়াছিল। তাহারই একান্তে স্বল্পালোকিত বারান্দার উপর এই দুটি তরুণ-বয়স্ক নর-নারী মুখোমুখী বসিয়াও কথার অভাবে যখন নীরব হইয়া রহিল, তখন আর একটি অন্ধ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিশ্চয়ই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং সেই চাপা হাসির দীপ্তি কালো মেঘের আড়ালে রহিয়া রহিয়া খেলা করিতে লাগিল।

বাহিরের প্রকৃতি তাহার আকাশ-বাতাস-আলো-অন্ধকারের লীলায় মানুষের মনোভাব ও হৃদয়বৃত্তিকে যে কেমন করিয়া টানিয়া লইতে পারে, সতীশ কিছুকাল পূর্বে একদিন রাত্রে তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। সেদিন বেহারীর মুখে বিপিনের সহিত সাবিত্রীর গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ দুঃখের সাগরে ডুবিয়া গেছে মনে করিয়া সে যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একাকী ছুটিয়া গিয়া কেল্লার জনহীন নীরব প্রান্তরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তখন, এমনিই কালো আকাশ তাহার শীতল হাতখানি দিয়া সতীশের সমস্ত জ্বালা মুছিয়া দিয়া, সেই সাবিত্রীকেই ক্ষমা করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। আবার, আজিকার এই উদ্দাম-চঞ্চল বহিঃপ্রকৃতি তাহার সমস্ত সজীবতার স্পর্শ দিয়া সতীশের নিরাশা-পীড়িত চিত্তকে আজ আবার আর এক পথে দুর্নিবার বেগে ঠেলিতে লাগিল।

সরোজিনী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আপনার এই বনবাসের অর্থটা কি?

সতীশ কহিল, অর্থ একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।

তা ত আছে। কিন্তু, কাউকে না বলে পালিয়ে এলেন কেন?

কিন্তু পালিয়ে এসেচি এ খবর কে দিলে?

সরোজিনী একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ খবর আমি নিজেই আবিষ্কার করেচি! আপনি যেদিন সকালে চলে এলেন, আমি নিজেই সেদিন আপনার বাসায় গিয়েছিলুম।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বুঝেছি। উপীনদা বোধ করি আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন, আর আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে যাবেন, সে আমি জানতাম, কিন্তু আমি নেই দেখে কি বললেন তিনি?

সরোজিনী কহিল, নিশ্চয় কিছু বলেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। কারণ, তিনি নিজে সেখানে যাননি, আমাকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে?

সরোজিনী বলিল, আমি গিয়ে শুনলুম আপনি সকালের গাড়িতে চলে গেছেন। কি মনে হলো, বামুনঠাকুরকে বলে দরজা খুলিয়ে সমস্ত বাসাটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। বাইরের বারান্দায় একখানা শাড়ি শুকোচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, এ কাপড় মাইজীর। তাঁর অসুখ, আপনি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছেন। আচ্ছা, তিনি কে? কৈ, এ বাসায় ত তাঁকে দেখছি নে?

সতীশ পাংশু-মুখে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, বামুনঠাকুর বললে, আমি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়েছি? রাস্কেল! মিথ্যাবাদী! উপীনদা তাই বিশ্বাস করলেন?

সতীশের মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, উপীনবাবু ত ছিলেন না। আর বিশ্বাস করলেই বা দোষ কি? এ মাইজী আপনার কে সতীশবাবু?

সতীশ রুক্ষ হইয়া বলিল, আমার আবার কে? কেউ না, আমাদের সাবেক বাসার দাসী। শয়তান বদমাইশ মেয়েমানুষ। বুড়ো-বয়সে ব্যারামে মরচে, তাই

এসেছিল কিছু ভিক্ষে চাইতে। আমি তাকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছি! হারামজাদা বেটা আমার মুখের সামনে এ কথা বললে তার—

সরোজিনীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাসী! কিন্তু, তাতে আপনি এত উত্তেজিত হচ্চেন কেন?

সতীশ কহিল, অন্যায় অপবাদ দিলে কে উত্তেজিত না হয় বলুন?

তিনি সে রাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন?

সতীশ ঠিক তেমনি উত্তপ্ত-স্বরে কহিল, হাঁ পড়েছিল; কিন্তু তাতেই বা কি? তার অজ্ঞান হওয়াটা কি আমার অপরাধ? আর আপনিই বা তার সম্বন্ধে এত সসম্মানে কথা কইচেন কেন? বাড়ির দাসী-চাকরকে কি আপনারা 'আপনি' 'আজ্ঞা' করে কথা বলেন?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে আনন্দের চাঁদ উঠিয়াছিল, কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল। একবার তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিল, কেন সে-রাত্রে উপেন্দ্র তাহার বাসায় সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু প্রশ্ন করিল না। মনে মনে সে একপ্রকার বুঝিয়াছিল—ইহাতে এমন একটা কিছু আছে যাহা উপেন্দ্র নিজেও প্রকাশ করিতে পারে নাই এবং সতীশও পারিবে না।

কিন্তু এই ক্ষুব্ধ নীরবতা উভয়কেই যেন পীড়িত করিতে লাগিল। আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সরোজিনী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করতে পারি?

সতীশ ঈষৎ অভিমানের সুরে কহিল, কি কথা?

আপনি এতদিন আমাদের এত কাছ থেকেও কখনো দেখা দেননি কেন?

সতীশের তরফে এ প্রশ্নের জবাব ছিল না। কহিল, নানা কারণে সময় পাইনি।

কারণটা কি? লেখাপড়া?

না, লেখাপড়া আমার নামমাত্র। তাতে আমাকে কোনদিন কোথাও যেতে বাধা দেয় না।

তবে?

সতীশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দেখুন, সত্যি কথাটা আপনাকে বলতে পারি। আপনাদের কথা কখনো যে আমার মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু কি জানেন, আমাদের যে-রকম সমাজ, যে-রকম তার শিক্ষা, তাতে আপনাদের মধ্যে যেতে কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকে। বোধ হয় এই জন্যই যেতে পারিনি।

সরোজিনী কহিল, বোধ হয়! কিন্তু, কি-রকম আপনাদের সমাজের শিক্ষা একটু শুনতে পাই কি? উপীনবাবুদের সমাজের সঙ্গে বোধ করি তার বিশেষ কোন মিল নেই, কারণ, তাঁর মেলামেশা করতে বাধে না।

সতীশের বাসার সেই অজ্ঞাত স্ত্রীলোকটির প্রসঙ্গ উত্থিত হওয়া পর্যন্তই তাহার অন্তরে একটা জ্বালা ধরিয়াছিল। এই এলোমেলো কৈফিয়তে সেই ঈর্ষার দাহ আরও একমাত্রা বাড়িয়া গেল। সতীশকে সে লুকাইয়া না ভালবাসিলে ইহার সমস্ত লুকোচুরিটা হয়ত তাহার কাছে লুকানই থাকিত, কিন্তু প্রণয়ের অন্তর্দৃষ্টিকে অত সহজে প্রতারিত করা গেল না। ব্যাপারটা ঠিক না জানিয়াও তাহার হৃদয় কেমন করিয়া যেন আসল কথাটা বুঝিয়া লইল। সতীশ ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত সরোজিনীর প্রতি চাহিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কলহের চাপা সুরটা সতীশের কানের মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে বাজিয়া সাবিত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সরোজিনীও যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে এমন সম্ভাবনা সতীশের মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না। সুতরাং তাহার এই উত্তপ্ত প্রশ্নোত্তর-মালার যথার্থ হেতু সে সত্যকার আলোকে দেখিতে পাইল না। ইহাকে উচ্চশিক্ষিতা রমণীর নিছক স্পর্ধিত অভিমান কল্পনা করিয়া সে নিজেও মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল এবং জবাবও

দিল তেমনি করিয়া। কহিল, উপীনদার সমাজ ও শিক্ষা যে কি, সে ত বেশ জানেন! কিন্তু, তবুও তিনি হয়ত আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন, কিন্তু, আর কেউ না পারলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এর কোন মানে নেই। যাই হোক, আমাকে মাপ করবেন, এ-সব আলোচনার আমি কোন সার্থকতা দেখতে পাইনে।

সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং সতীশও নিঃশব্দে অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল।

একটা গাড়ি আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং জ্যোতিষবাবু উচ্চকণ্ঠে সতীশের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে আলোক ও লোকজন সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ ইত্যাদি যথারীতি সমাধা করিয়া জ্যোতিষ যখন ভগিনীকে লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, তখন সতীশ সরোজিনীকে প্রশ্ন করিল, একটা খবর আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। হারানবাবু বলে উপীনদার একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁর কি হয়েছে বলতে পারেন?

জ্যোতিষ আশ্চর্য হইয়া তাহার জবাব দিলেন, বাঃ, আপনি শোনেন নি? তিনি ত মারা গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী এঁরা কোথায় আছেন জানেন?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল। কহিল, তাঁরা বাড়িতেই আছেন। স্থির হয়েচে, দিবাকরবাবু তাঁদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়বেন—তিনি তাঁদের ভার নেবেন।

জ্যোতিষ হঠাৎ ভগিনীকে প্রশ্ন করিলেন, হারানবাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিলেন না?

সরোজিনী কহিল, হাঁ, অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথাবার্তা কয়েছিলেন।

তাহার নিজের কথা কি হইয়াছিল, স্বামীর শোক বৌঠান কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি জানিবার জন্য সতীশ সরোজিনীর মুখের প্রতি একটা উৎসুক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কারণ, তাহার নিজের সম্বন্ধে আলোচনা যে খরতর হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোকে হয় সরোজিনী তাহার মুখের ইঙ্গিত বুঝিল না, না হয় বুঝিয়াও সতীশের কৌতূহল নিবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করিল না। সে দাদাকে অগ্রসর হইবার জন্য একটুখানি ঠেলা দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর দেরী করো না দাদা, চল—

হাঁ বোন চল, বলিয়া সতীশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আর একবার অসংখ্য ধন্যবাদ সতীশবাবু। কাল-পরশু একদিন যেন গরীবের ওখানে পদধূলি পড়ে।

সতীশ প্রতি-নমস্কার করিয়া অব্যক্ত-স্বরে যাহা কহিল, তাহা বুঝা গেল না। সরোজিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া এইবার সতীশের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঠিক কেন যে পড়িতে লাগিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে অবধারিত করিতে পারিল না, কিন্তু, কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট অনুভূতি তাহাকে বারংবার জানাইতে লাগিল, তাহার সাবিত্রী, তাহার বৌঠান, তাহার উপীনদা সকলেই একই কালে তাহাকে চিরদিনের তরে বিসর্জন দিয়াছে। এই নির্জন কুটীর ছাড়িয়া তাহার যাইবার স্থান আর নাই।

ত্রিশ

মাস-দুই পূর্বে হারানের মৃত্যুর সময় দিবাকর মাত্র দুই-চারি দিনের জন্য কলিকাতায় বাস করিয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এবার কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে বি. এ. পড়িবে স্থির হওয়ায় তাহার নূতন কেনা স্টিলের তোরঙ্গ ভরিয়া কেতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় লইয়া দিবাকর হারানবাবুর পাথুরেঘাটার বাড়িতে একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিরণময়ী তাহাকে অল্পবয়স্ক ছোটভাইটির মত সস্নেহে গ্রহণ করিল।

মাতুলাশ্রমে সুরবালা ভিন্ন দিবাকরকে যত্ন করিবার কেহ ছিল না। আবার সে যত্নের মধ্যেও মহেশ্বরীর খরদৃষ্টি, শনির দৃষ্টির মত অনেক রস অনেক সময়ে শুকাইয়া শুষ্ক করিয়া দিত। কিন্তু এখানে সে-সকল কোন উৎপাতই ছিল না।

অযত্ন-পালিত টবের গাছ দৈবাৎ ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া অপর্যাপ্ত রসের আস্বাদে তাহার বুভুক্ষু শীর্ণ শিকড়গুলা যেভাবে মাটির মধ্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিতে থাকে, কিরণময়ীর আশ্রয়েও দিবাকরের ঠিক সেই মত হইল।

মহানগরীর বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে তাহার সঙ্কুচিত আশা ও সঙ্কীর্ণতার ভবিষ্যৎ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। নিজেকে সে বড় করিয়া অনুভব করিল। বি. এ. ফেল করিয়া বিদ্যাভ্যাসের পুরাতন বন্ধন তাহার ছিন্ন হইয়াছে, অথচ নূতন বন্ধনের এখনও বিলম্ব আছে, এই মধুর অবকাশ-কালটায় সে নিরন্তর সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিল।

সে থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া স্বপ্ন দেখিল, জু দেখিয়া অবাক হইল, মিউজিয়ম দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, শিবপুরে সরকারী বাগান দেখিয়া প্রবন্ধ লিখিল,

প্রাসাদতুল্য সৌধশ্রেণীর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; অবশেষে একদিন গাড়ি চাপা পড়িয়া পা মচকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আঘাত যৎসামান্য। কিরণময়ী তাড়াতাড়ি চুন-হলুদ গরম করিয়া আনিয়া প্রলেপ দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কি চাপা পড়লে ছোট্‌ঠাকুরপো? ঘোড়ার গাড়ি, না গরুর গাড়ি?

দিবাকর মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, ঘোড়ার গাড়ি।

কিরণময়ী কহিল, তবু রক্ষা। নইলে এই খোঁড়া-পা নিয়ে আবার জরিমানা দিতে থানায় যেতে হতো।

দিবাকর লজ্জিত-মুখে বলিল, কিছুই লাগেনি, এ কাল সকালেই সেরে যাবে।

কিরণময়ী কহিল, তা যাবে। কিন্তু বেশী দূরে আর যেয়ো না। শুনেছি নাকি একদল ছেলেধরা কলকাতায় এসেচে।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল; অঘোরময়ী নানা তীর্থে ঘুরিয়া একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে যে দু-একদিন তিনি দিবাকরকে দেখিয়াছিলেন তখন পুত্রশোকে হৃদয়-মন এমনি মুহ্যমান ছিল যে, ইহার মুখখানা চোখেই পড়ে নাই। আজ এই শ্মশ্রুগুম্ফহীন নধরকান্তি চারুদর্শন ছেলেটির পানে চাহিবামাত্রই তাঁহার মায়ের প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল। বলিলেন, দিবু, আমি সম্পর্কে তোর মাসীমা হই, আমাকে মাসীমা বলে ডাকিস বাবা!

ইহারও মা-বাপ বাঁচিয়া নাই শুনিয়া তাঁহার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল এবং বড় বড় দু'ফোঁটা চোখের জল অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ভগবান আমার হারানকে কেড়ে নিয়েও যদি হতভাগিনীকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তবে যে ক'টা দিন বাঁচি, তুই বাবা আমাকে ছেড়ে কোথাও যাসনে। বলিয়া হাত দিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি-প্রান্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এবং চোখের জল দেখিয়া দিবাকর নিজের চোখের জল লুকাইয়া সুমুখ

হইতে সরিয়া গেল। ইহার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার দিবাকরের প্রতি অপত্যস্নেহ, যাদুকরের মায়াতরুর মত শাখায় পল্লবে বাড়িয়া উঠিল। আসল কথা এই যে, এই পুত্রহীনা জননী কিছুকাল প্রবাস-যাপনের পর বাটী ফিরিয়া পুত্রের অভাবটা সমস্ত হৃদয় দিয়া পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিলেন। এই বাটীতেই মাস-কয়েক পূর্বে যখন তাঁহার নিজের ছেলে মরিয়াছিল, তখন সেই সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর শোকই তাঁহার মাতৃত্বের খোরাক যোগাইয়া কোনমতে তাঁহাকে খাড়া রাখিয়াছিল, এখন সেই শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়ায় তাঁহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের অভাবে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সন্তান-পরিত্যক্ত সেই শূন্য সিংহাসনে দিবাকরকে তিনি অত্যন্ত সমারোহে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

একদিকে তিনি এবং অপরদিকে কিরণময়ী—এই দু'জনের মাঝখানে পড়িয়া এ বাটীতে দিবাকরের যত্ন-আদরের আর অবধি রহিল না।

ক্ষুধা না থাকিলে যে কৈফিয়ত দিতে হয়, সামান্য অসুখেও পুনঃ পুনঃ জবাবদিহি করিতে হয়, স্নেহের এই-সকল নিগূঢ় রহস্য তাহার এই বিংশবর্ষব্যাপী জীবনে আদৌ জানা ছিল না। জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রথম কয়েকটা দিন তাহার বাধ-বাধ ঠেকিয়াছিল, চিরাভ্যস্ত অনধিকারের সঙ্কোচ একদমে কাটিতে চাহে নাই, তথাপি অল্পদিনেই তাহার বিশীর্ণ মন এই দুটি নারীর অপরিমিত স্নেহে অপরিমিতরূপে প্রসারিত হইয়া গেল। অবশেষে কোন একদিন যে তাহার বহু ক্লেশার্জিত দুঃখসহ অভ্যাসগুলি শুষ্ক ত্বকের মত দেহ হইতে অজ্ঞাতসারে ঝরিয়া পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

এদিকে ক্রমশঃ যাহা দেখিবার ছিল, দেখা হইয়া গেল। পুনর্বার গাড়ি-চাপা পড়ার আর যখন সম্ভাবনা রহিল না, তখন সে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে শুরু করিয়া দিল এবং সামান্য দিনেই এক মাসিকপত্রের উৎসাহী এবং মান্য লেখক হইয়া উঠিল। ছেলেবেলা হইতে তাহার গান-বাজনা এবং সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। 'হায়', 'আছিল' প্রভৃতি দিয়া কবিতা মিলাইতে পারিত, এখন দিবাকর

বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়া গল্প লিখিতে লাগিল। কতকগুলি কলেজের ছেলেরা মিলিয়া ‘চন্দ্রোদয়’ নাম দিয়া এক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল, ইহাতেই দিবাকর মাতিয়া উঠিল।

এখন সে আর যখন তখন বাড়ির বাহির হয় না, তার ঢের কাজ। ভাঙ্গা ছাদের এক নির্জন কোণে খাতা-পেনসিল লইয়া গম্ভীর-মুখে বসিয়া থাকে—স্নানাহারের কথা মনে থাকে না—বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া নামাইয়া আনিতে হয়। তাহার মানস-রাজ্যের এই নূতন উৎপাতগুলি অঘোরময়ী সভয়ে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ বাড়িরই দোষ! হারান আমার লিখে-পড়ে প্রাণটা দিলে, একেও দেখচি সেই রোগেই ধরেচে—না বাপু পরের ছেলে—

কিরণময়ী সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, হাসিয়া কহিল, সে ভাবনা করো না মা, উনি যে লেখাপড়ায় মন দিয়েচেন, তাতে পরমায়ু কমে না, বরং বাড়ে।

ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত ‘চন্দ্রোদয়ে’ ‘বিষের ছুরি’ গল্প বাহির হইল। ‘সূর্যোদয়’ পত্রিকা তাহার সমালোচনা করিয়া বলিলেন, বাঙালীর গৌরব, সুপ্রসিদ্ধ নবীন লেখক শ্রীযুক্ত দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একখানি প্রেমের নিখুঁত ছবি।

অতঃপর এই নিখুঁত ছবিখানিতে কি কি আছে এবং সমালোচক মহাশয় কেমন করিয়া পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং এইরকম আর একখানি দেখিবার আশায় কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, উপসংহারে সে আভাসও দিয়াছেন।

এই নির্লজ্জ চাটুতাকে নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দিবাকর তিলার্ধ ইতস্ততঃ করিল না। তাহার কারণ এই যে, মানব-জীবনের যে সময়টায় আশা এবং আকাশকুসুম কল্পনার মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া পৃথক হইয়া দাঁড়ায় নাই, এটা তাহার সেই অবস্থা—প্রথম যৌবন। ইতিমধ্যেই সে দুই-চারিজন ভক্ত বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে সাহিত্যের জরির টুপি মাথায় পরিয়া বসিয়াছিল, ‘সূর্যোদয়ে’র সম্পাদক তাহারই চারিপাশে একছড়া পুঁতির মালা জড়াইয়া দিলেন।

এই অপরূপ সাহিত্যের কিরীট মাথায় পরিয়া দিবাকর একদিন সকালে গর্বোজ্জ্বল মুখে রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহার সেই 'সূর্যোদয়' কাগজখানা।

কহিল, বৌদি, বড় ব্যস্ত নাকি?

কিরণময়ী রাঁধিতেছিল, বলিল, না, আর বড় ব্যস্ত নই ভাই—প্রায় শেষ হলো। তোমার হাতে ও কাগজখানা কি ছোট্‌ঠাকুরপো?

ওঃ, এখানা? এটা একটা মাসিকপত্র—'সূর্যোদয়'—নূতন বেরুচ্চে। কিন্তু যাই বল বৌদি, লিখচে বেশ।

কিরণময়ী 'সূর্যোদয়ে'র অস্তিত্বও অবগত ছিল না, আগ্রহ সহকারে বলিল, সত্যি? তা হলে একবার দেখবো।

এখনি দেখবে?

না এখন নয়—আমার বিছানায় রেখে দাও গে—দুপুরবেলা দেখব।

দুপুরবেলা কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে কিরণময়ী 'সূর্যোদয়' খুলিয়া বসিল।

এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে ঠিক জায়গাটাতেই চোখ পড়িয়া গেল। দিবাকর পাশের ঘরেই ছিল, উঠিয়া গিয়া তাহাকে কহিল, কৈ ঠাকুরপো, 'বিষের ছুরি' কৈ? সমালোচনা দেখালে, এবার আসল জিনিস বার করো।

দিবাকর সলজ্জ বিনয়ের সহিত কহিতে লাগিল, ওঃ, সেই গল্পটা তা—ও—সে—কিছুই নয় বৌদি—তাড়াতাড়ির লেখা—

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হোক, দাও, বলিয়া নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া 'চন্দ্রোদয়' পত্রিকাখানি টানিয়া বাহির করিয়া সেইখানেই সেটা খুলিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। সে নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল, কিন্তু দিবাকর আশা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র উত্তেজনা গোপন করিয়া মিছামিছি একখানা বইয়ের পাতা উলটাইতে লাগিল। তাহার 'বিষের ছুরি' গল্পের নায়িকা অসামান্যা সুন্দরী এবং

ষোড়শী। ধনবান জমিদার-কন্যা হইয়াও দৈবচক্রে এক দরিদ্র রূপবান যুবককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। জমিদার ঘটনা অবগত হইয়া নায়ক বিজয়েন্দ্রকুমারকে দেশছাড়া করিয়াছে। কিন্তু, নগেন্দ্রনন্দিনী কিছুই জানে না—বসন্তসন্ধ্যায় মালতীকুঞ্জে বসিয়া আপন মনে মালা গাঁথিতেছে। ওদিকে রূপে মুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র গাছের আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কিন্তু আকাশে উঠিতে সাহস করিতেছে না। প্রভাত কল্পনা করিয়া মধ্যে মধ্যে কোকিল কুহুকুহু করিয়া উঠিতেছে, উপরে লুব্ধ ভ্রমর গুনগুন করিয়া নিদ্রালসা মালতীর ঘুম ভাঙ্গাইতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে কে আসে ওই? বিজয়েন্দ্র না? হাঁ, সেই বটে! কিন্তু এ কি বেশ? গেরুয়া বস্ত্র, কপালে বিভূতি, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ যে! নগেন্দ্রনন্দিনীর হাত হইতে মালতীর মালা পড়িয়া গেল। বিজয়েন্দ্র নিকটে আসিয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, বিদায়! চলিলাম!

নগেন্দ্রনন্দিনীর মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। মনে হইল, হৃৎপিণ্ড যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। তাহার চোখে চাঁদের আলো মসীবর্ণ হইয়া গেল, কর্ণবিবরে কুহুধ্বনি পেচক-চিৎকারে পরিণত হইল। যুবতী আর দাঁড়াইতে পারিল না—ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এ পর্যন্ত পড়িয়া কিরণময়ী সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, ছোট্‌ঠাকুরপো নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাস? না?

দিবাকর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি?

হাঁ গো তুমি; নিশ্চয়ই তুমি লুকিয়ে কাউকে ভালবাস।

এই আকস্মিক অপবাদের প্রবল লজ্জায় দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মুহূর্তকাল পরে কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, আমি? ছিঃ—রাম বল—কখ্‌খন না—কিছুতেই না—

না! ঠাকুরপোকে কোনদিন বৃশ্চিক দংশন করেনি?

না—কোনদিন না।

কিরণময়ী কহিল, আশ্চর্য! কাউকে কোনদিন দংশন করতেও দেখনি?

না, তাও দেখিনি।

কিরণময়ী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, হৃদয়ও যে তোমার কোনদিন শতধা বিদীর্ণ হয়েছে, তাও মনে হচ্চে না। কোনদিন ভালবাস নি, একটি ছোট্ট বৃশ্চিকও কখনও চোখে দেখনি, বজ্রাঘাতের ব্যথাও যে কেমন, তাও জান না, তবে বিরহ যে এমন ভয়ানক টের পেলে কি করে?

কিরণময়ী যে তাহাকে কোন্ দিকে ঠেলিতেছিল, দিবাকর ক্রমশঃ তাহা বুঝিতেছিল—মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তা বুঝি জানা যায় না?

কিরণময়ী বলিল, কেমন করে যায় আমি ত জানিনে—কিন্তু শুনে কিংবা পরের বই থেকে চুরি করে লেখা যায়—সে কথা ঠিক।

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি কি চুরি করেছি বলতে চাও?

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, তাই চাই। চুরি করেচ ত নিশ্চয়ই, তা ছাড়া চুরি যে করেচ তাও টের পাওনি এমনি অন্ধ তুমি। রাগ করো না ঠাকুরপো, কিন্তু এক বৃশ্চিক আর বজ্রাঘাত ছাড়া হাতে তোমার আর কোন সম্বল নেই; এইটুকুমাত্র পুঁজি নিয়ে এই সমুদ্রে পাড়ি জমাবে? নভেল-লেখা এত ছোট জিনিস নয়। তবে যদি লাফ মেরে সমুদ্র ডিঙোতে চাও, তাতেও দেবতার আশীর্বাদ চাই—অমনি হয় না। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়বাক্যে দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত যাহার কাছে শুধু ভাল কথা আর অম্ল-মধুর পরিহাস লাভ করিয়াই আসিয়াছে, তাহারই কাছে এই তাচ্ছিল্য ও শুষ্ক ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তবে এত লোক যে লিখচে তাদের সবাই কি ভালবেসেছে, না বিচ্ছেদের জ্বালা সয়েচে? কবে জ্বালা

সইতে পাব, সেই আশায় বসে থাকতে গেলে ত দেখচি সাহিত্য-চর্চাই ছেড়ে দিতে হয়।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, একে সাহিত্য-চর্চা বলে? একে বলে অনধিকার-চর্চা।—বলিতে বলিতেই তাহার মুখের হাসি অকস্মাৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহার নিজের কথাগুলাই যেন ডুব মারিয়া বুকের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া রক্তে ভিজিয়া ভারী এবং রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া আসিল। মলিনমুখে কহিল, আমার কথা আজ তুমি বুঝবে না ঠাকুরপো, আর আশীর্বাদ করি, কোনদিন যেন বুঝতেও না হয়, কিন্তু আমি ত তোমার বয়সে বড়, এই কথাটা আমার শুনো ঠাকুরপো, যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা করো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।

দিবাকর কথা কহিল না। কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ভারি গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, এ রাগ-অভিমানের কথা নয় ঠাকুরপো, এ দৈবের কথা, এ অতিবড় দুর্ভাগ্যের কথা। এ সংসারে যে দু-চারজন হতভাগ্যের এই নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায়, এ গুরুভার তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও, তাতে কাজও হয়ত হয়, অকাজও কমে! অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারী করে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি। গিল্টি দিয়ে তোমার মত আনাড়ীকেই ভোলাতে পারবে, কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোনার রং চিনেছে, এ দুঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হয়ে গেছে, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে ছোট্‌ঠাকুরপো!

দিবাকর নরম হইয়া কহিল, তবে কল্পনা কি কিছুই নয়?

কিরণময়ী কহিল, কিছুই নয় এ কথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা গড়তেও যদি বা পারে, প্রাণ দিতে পারে না; বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না। সেই পথ দেখবার আলোর সন্ধান তুমি যতদিন না পাচ্চ, ততদিন তোমার বৃশ্চিক শুধু তোমাকেই দংশন করবে, আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারবে না।

তাহার শেষ কথাটায় দিবাকর মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল, এবং মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমি ভাবচি ছোট্‌ঠাকুরপো, তোমার এই ‘সূর্যোদয়’ মহাশয়ের অশ্রু সংবরণ না করতে পারার হেতুটা কি? নগেন্দ্রনন্দিনী শেষকালে বিষ খেয়ে ম’ল না ত?

ক্রুদ্ধ দিবাকর জবাব দিল না।

কিরণময়ী গল্পের শেষ-দিকপানে ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে পড়িতে লাগিল, কিন্তু শ্মশানে ওই কাহার শব নীত হইতেছে? কিসের পশ্চাতে ওই অসংখ্য লোক বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে? কাহার শোকে নৃপতিতুল্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার উন্মত্তবৎ হইয়াছেন? অহো! এ কি করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য! বিজয়েন্দ্র ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিরণময়ী আর পড়িতে পারিল না। হাসিয়া বইখানা দিবাকরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বেলা গেল, যাই, তোমার খাবার তৈরী করি গে, বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

একত্রিশ

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন দুপুরবেলায় দিবাকর কিরণময়ীর ঘরে ঢুকিয়া বিশেষ একটু আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মেঝেয় বসিয়া একখানা হাতের লেখা মূল সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করিতেছে। কিরণময়ী সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের চেয়ে যে বেশী লেখাপড়া করিয়াছে এবং বাংলা-ইংরাজী দুই-ই একটু ভাল করিয়া জানে, দিবাকর তাহা জানিত। কিন্তু তাই বলিয়া সে ভাল যে হাতের লেখা পুঁথি পড়িবার মত এতটা ভাল, এমন কথা দিবাকর স্বপ্নেও মনে করে নাই। চক্ষের পলকে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া সে সেখানেই বসিয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাতের পাতাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, হঠাৎ এমন অসময়ে যে?

দিবাকর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, তুমি পড়ছিলে তা মনে করিনি বৌদি। আমি বলি বুঝি—

ঘুমুচ্ছি। তাই নিরিবিলি ভেবে জাগাতে এসেচ?

দিবাকর লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, যখন-তখন ওরকম ঠাট্টা করলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব, তা বলে দিচ্চি বৌদি।

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, পালাব বললেই কি পালানো যায় ঠাকুরপো? গোলক ধাঁধার পথ জানা চাই। আচ্ছা বসো বসো, রাগ করে আর উঠতে হবে না। আমি মনে করি ঠাকুরপো, দোর দিয়ে বসে বুঝি বিষের ছুরির পর খাঁড়া-টাঁড়া একটা কিছু বড় জিনিস তৈরী করচ। তাই আমিও ডাকিনি। নইলে আমারই কি দুপুরবেলায় রামায়ণ পড়া ভাল লাগে?

দিবাকর প্রশ্ন করিল, রামায়ণ তুমি বিশ্বাস কর?

কিরণময়ী কহিল, করি।

দিবাকর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কিন্তু অনেকেই করে না। বাস্তবিক, এর মধ্যে এত মিথ্যা, এত অসম্ভব, এত প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার আছে যে, সে কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া পুঁথিটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এই ত মূল গ্রন্থ, কৈ, প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলি বার করে দাও দেখি?

দিবাকর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি কি করে বার করব বৌদি, আমি ত সংস্কৃত জানিনে।

কিরণময়ী কহিল, জান না বলেই অমন কথা চট করে তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো। বিদ্যে না থাকলেই অবিদ্যে এসে জোটে। তার ফলেই মানুষ যা জানে না তাই অপরকে বেশী করে জানাতে চায়; যা বোঝে না তাই বেশী করে বোঝাতে চায়। এই বদ্ অভ্যাসটা ছাড় দেখি।

দিবাকর নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কথাটা বলিবার তাহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, ধর্মগ্রন্থে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস দেখাইলে বৌদি খুশী হইবে।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া কহিল, লেখা হচ্চে কেমন?

দিবাকর কহিল, আমি ত আর লিখিনে।

কিরণময়ী অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, লেখ না? বল কি ঠাকুরপো? কিন্তু যা লিখেছিলে, সে ত মন্দ হয়নি। কেন ছাড়লে বল দেখি?

দিবাকর বলিল, কেন লজ্জা দাও বৌদি, আমি তার পরে অনেক ভেবে দেখেচি, তোমার কথাই সত্যি। আমার সে লেখা পরের ঠিক চুরি না হোক, অনুকরণ বটে! যথার্থ-ই ত,—আমি ভালবাসার কি জানি যে অত কথা লিখতে গেলাম! তাই এখন আর আমি লিখিনে—শুধু ভাবি।

ভাবো? দিনরাত কি ভাবো বল ত? আমাকে নয় ত?

দিবাকর কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, অথচ, দেখচি নভেল লেখার ঝোঁকটাও আমি কাটাতে পারব না। আজ তাই এই মনে করে এলাম যে, তোমার কাছেই আমি শিখব।

কিরণময়ী বলিল, আমার কাছে আবার কি শিখবে ঠাকুরপো, ভালবাসা?

দিবাকর প্রবল লজ্জা কোনমতে দমন করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সমস্তই শিখব। দরকার হয় তাও শিখব।

কিরণময়ীও মুখখানা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, কিন্তু তাতে একটা গোল আছে ঠাকুরপো। আমাকে ধরে ভালবাসা শিখতে গেলে লোকে বলবে কি?

দিবাকর তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাও, আমি চললুম, তোমার কেবলি ঠাট্টা।

কিরণময়ী খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তাই স্পষ্ট করে বল না ভাই, যে তুমি ঠাট্টা চাও না, সত্যি চাও।

দিবাকর হাতখানা প্রবলবেগে টানিয়া লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী মনে মনে হাসিয়া তাহার পুঁথি বন্ধ করিল। তার পরে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া খানিক পরে দিবাকরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দিবাকর মুখ ভারী করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কিরণময়ী কহিল, রাগ করে পালিয়ে এলে কেন বল ত?

দিবাকর মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, ও-সব ঠাট্টা-তামাশা আমার ভাল লাগে না।

কিরণময়ী একটুখানি চুপ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তুমি যে আমার দেওর হও ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে যে ঠাট্টা-তামাশারই সুবাদ। এ-সব না করে বাঁচি কি করে বল দেখি ভাই?

এই সস্নেহ কোমল স্বরে দিবাকরের রাগ পড়িয়া গেল। আজ তাহার সহসা প্রথম মনে হইল, সত্যিই ত! আমার লজ্জা পাবার ত কিছু নাই। আমাদের সম্পর্ক যে ঠাট্টা-তামাশারই সম্পর্ক।

তা কথাটা মিথ্যাও নয় যে, বাঙালী সমাজে দেবর-ভাজের মধ্যে একটি মধুর হাস্য-পরিহাসের সম্বন্ধই বিরাজিত রহিয়াছে; এবং কোথায় ঠিক কোন্‌খানে যে ইহার সীমারেখা তাহাও অনেকের চোখে পড়ে না, এবং পড়িবার প্রয়োজনও মনে করে না। কিন্তু এই নির্দোষ হাস্য-পরিহাসের আতিশয্যে কত সময়ে যে কত বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া এক সময়ে সমস্ত পারিবারিক বন্ধন কলুষিত করিয়া তোলে, সে হিসাব কয়জনে রাখে?

দিবাকর মুখ ফিরাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, আমি গেলুম শিখতে, আর তুমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে।

কিরণময়ী বিছানার একপাশে বসিয়া কহিল, কি শিখতে গিয়েছিলে?

দিবাকর বলিল, ঐ যে বললুম, গল্প লেখার ঝোঁক আমি কিছুতে কাটাতে পারব না। তাই মনে করেচি, তুমি শিখিয়ে দেবে, বলে দেবে, আমি লিখে যাব।

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, সে ত আমারই লেখা হবে ঠাকুরপো।

হয় হোক, কিন্তু আমার শেখা হবে। শুধু জানলে ত হয় না, ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকাও ত চাই।

তা ত চাই; কিন্তু ব্যক্ত করবে কি শুনি?

সেই ত তুমি বলে দেবে বৌদি!

কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া বলিল, তবে অন্য লোক ধর গে ঠাকুরপো, এ কাজ আমার নয়। জলের মাছ যদি বুঝতে চায় মরুভূমিতে মানুষ কি করে তৃষ্ণায় মরে, তা হলে অন্য লোকের প্রয়োজন, আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে কুলোবে না।

দিবাকর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদি, মরুভূমির তৃষ্ণা আমার জানা নেই সত্য, কিন্তু আমি জলচরও নই। তোমাদের মত ডাঙার উপরেই যখন আমারও বাস, তখন পিপাসার ধারণাটাও আছে। একবার বলেই দেখ না বুঝতে পারি কি না।

কিরণময়ী কথা কহিল না। শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

দিবাকরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, এই যে এতক্ষণ রামায়ণ পড়ছিলে বৌদি, আমি তার কথাই বলি। সীতার যে রূপের আগুনে রাবণ সপরিবারে ধ্বংস হয়ে গেল, নারীর এই রূপ জিনিসটা কি? আর একা রাবণই নয়, এমন অনেক রাবণের ইতিহাসই ত আছে। কবিরা বলেন, রূপের পিপাসা। তুমিও সেইরকম উপমাই দিলে। তুমি মনে করো না বৌদি, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করচি—আমি জানি, তোমার পায়ের কাছে বসে আমি অনেক কাল শিখতে পারি,—আমি শুধু জানতে চাই, একে পিপাসা বলা হয় কেন? জল দেখলেই কিছু মানুষের পিপাসা পেয়ে ওঠে না, তবে রূপ দেখলেই বা তার পিপাসা পাবে কেন?

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পায় নাকি ঠাকুরপো?

এই হাসি ও প্রশ্নের যথার্থ তাৎপর্য ধরিতে না পারিয়া দিবাকর মুহূর্তকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় পায়।

তাহার সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত সাহস অনুক্ষণ রহস্যালাপের ভিতর দিয়া ইতিমধ্যে যে কতখানি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও জানিত না। বলিল, না পেলে সংসারে বড় বড় কবিরা শকুন্তলাও লিখতেন না, রোমিও-জুলিয়েতও লিখতেন না। তাই ত জানতে চাই, বৌদি, নারীর এই রূপ জিনিসটা আসলে কি? আর ভালোবাসাই বা তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে কেন?

কিরণময়ী গম্ভীর হইয়া কহিল, নাঃ, তোমার অবস্থা তত খারাপ নয়।

দিবাকর দুঃখিত হইয়া বলিল, সব কথা যদি কেবল হেসেই উড়িয়ে দেবে বৌদি, তবে থাক। আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করব না।

তাহার মুখ দেখিয়া কিরণময়ী বিষাদের ভান করিয়া বলিল, আমি মূর্খ মেয়েমানুষ ঠাকুরপো, এ-সব বড় বড় কথার কি জানি বল ত, যে রাগ করচ?

দিবাকর আর একদিনের কথা স্মরণ করিল। যেদিন বেদকেও তাচ্ছিল্যের সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়া সে কানে আঙ্গুল দিয়াছিল। বলিল, আমি জানি বৌদি, তুমি ভয়ানক পণ্ডিত। তুমি ইচ্ছে করলে সব বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার।

কিরণময়ী বলিল, পারি? আচ্ছা, তবে যদি বলি রমণীর রূপ একটা ভ্রম মাত্র। আসলে এটা কিছুই নয়—মরীচিকার মত মিথ্যা। বিশ্বাস করবে?

দিবাকর কহিল, না। তার কারণ, মরীচিকাও মিথ্যা নয়—সে যা তাই। আয়নাতে মানুষের ছায়া পড়ে। সেটা ছায়া, মানুষ নয়, এ ত জানা কথা। ছায়াকে মানুষ বলে ধরতে গেলেই ভুল করা হয়। কিন্তু রূপ ত সেরকম কোন জিনিসের ছায়া নয়। সাপকে দড়ি বলে ধরতে যাওয়া ভুল, মরীচিকাকেও জল বলে ছুটে ধরতে যাওয়া ভুল, কিন্তু রূপের পিছনে মানুষ যে নিছক রূপের তৃষ্ণাতেই ছুটে যায় বৌদি।

কিরণময়ী বলিল, ঠাকুরপো, এইমাত্র আরসিতে ছায়া দেখার একটা উপমা দিয়েছিলে। যেদিন বুঝবে রূপটাও মানুষের ছায়া, মানুষ নয়—সেইদিনই শুধু ভালবাসার সন্ধান পাবে। কিন্তু সে যাক। জিজ্ঞেসা করি, রূপের পিছনেই বা মানুষ ছুটে যায় কেন?

তা জানিনে। ভ্রমরকে ছেড়েও গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে গিয়েছিল, এইটে আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকে।

কিন্তু তার ফল কি দাঁড়াল?

ফল যাই দাঁড়াক বৌদি, সে বিচারের ভার মানুষের হাতে নয়। রোহিণীর রূপ ছিল, গুণ ছিল না। কিন্তু রূপের সঙ্গে গুণ থাকলে গোবিন্দলালের কি হতো বলা যায় না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। এই বি. এ. ফেল করা ছেলেটির উপর মনে মনে তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। শুধু ফেল করার জন্য নয়, পাস করিলেও সে মনে করিত ইহারা শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া পাস করিতেই পারেস আর কিছু পারে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইহাদের শিক্ষিত মন যে তর্ক করিতেও সক্ষম, এ ধারণাই তাহার ছিল না। কহিল, রূপ যে ছায়া নয়, এ কথা অত নিঃসংশয়ে স্থির করে রেখো না। যাই হোক, জিজ্ঞেসা করি ঠাকুরপো, এ-সমস্ত কি তুমি নিজেই ভেবেচ, না কারো ভাবা কথা শুনে বলচ?

দিবাকর মৃদু হাসিয়া বলিল, না বৌদি, এ আমার নিজেরই কথা। ছেলেবেলা থেকে ভগবান আমাকে অনেক কথাই ভাববার সুবিধে দিয়েছিলেন।

কিরণময়ী মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অথচ এত সুবিধাতেও রূপের তত্ত্ব খুঁজে পেলে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সতীশ-ঠাকুরপোও একদিন আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আরও একজন করেছিলেন, আর আজ তুমিও করচ। আমি ভাবচি, আমার রূপ দেখেই কি তোমাদের এই প্রশ্ন মনে আসে?

হঠাৎ দিবাকর চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল, সে মুখ নীচু করিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর বৌদি, আমি জানতাম না।

কিরণময়ী হাসিমুখে বলিল, এক-আধবার নয় ভাই, তোমাকে এক শ'বার মাপ করলুম; বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে যেন নিজের মনেরই একটা আগন্তুক দ্বিধাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল; এবং অতুল সুন্দর গ্রীবা ঈষৎ উন্নত করিয়া কেমন যেন একটা মৃদু করুণ-সুরে বলিতে লাগিল, ঠাকুরপো, আজ যত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, তার সত্য উত্তর যদি দিতে যাই, কথাগুলো

আমার দম্ভের মত শোনাবে। সেইটা তোমাকে ভুলতে হবে। নইলে নিজের ভুলে আমাকে ভুল বুঝে সমস্তই গোলমাল করে ফেলবে। আমার কথাটা বুঝতে পারচ ঠাকুরপো?

দিবাকর নীরবে ঘাড় নাড়িল।

কিরণময়ী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিতে লাগিল, আমার দেহের এই রূপটা শুধু তোমাদের পুরুষের চোখে নয়, আমার নিজের চোখেও একটা অদ্ভুত জিনিস। তাই এর কথা আমি অনেক ভেবেচি। যা ভেবেচি, হয়ত তাই ঠিক, হয়ত না। কিন্তু সে যাই হোক, আমার এ ভাবনা আর একটি দেওরকে বলতে যখন লজ্জা করিনি, তখন তোমাকে বলতেও পেছুব না। আমার নিজেকে দেখে কি মনে হয় জান? মনে হয় সন্তান-ধারণের জন্য যে-সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।

দিবাকর নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার স্তব্ধ মুখের উপর নবীন যৌবনের একটা সদ্যজাগ্রত ক্ষুধার মূর্তি অকস্মাৎ অনুভব করিয়া সসঙ্কোচে থামিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তাহাকে স্পর্ধার সহিত অতিক্রম করিয়া বলিল, বাস্তবিক ঠাকুরপো, এইখানে রূপের যেন একটা কূল পাওয়া যায়। এই জন্যই নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আকৃষ্ট করে তাকে মাতাল করে না। আবার যেদিন সে সন্তান-ধারণের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও ঠিক তাই। ভেবে দেখ ঠাকুরপো, শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ-যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

দিবাকর ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু—

কিরণময়ী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুর জায়গা এর মধ্যে নেই। বিশ্ব চরাচরের যেদিকে খুশী চেয়ে দেখ, ওই এক কথা ঠাকুরপো, সৃষ্টিতত্ত্বের

মূলকথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে, এর প্রতি অণু-পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্তন, এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোনমতেই থামাতে পারে না।

দিবাকর আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে ত চারিদিকেই মারামারি কাটাকাটি বেধে যেত!

কিরণময়ী কহিল, মাঝে মাঝে যায় বৈ কি। কিন্তু মানুষের লোভ দমন করবার শক্তি, স্বার্থত্যাগের শক্তি, সমাজের শাসন-শক্তি, এতগুলো বিরুদ্ধ-শক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে একসঙ্গে আগুন ধরে যেতে পায় না। অথচ, এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই মানত না। রূপের আকর্ষণে তার সেই দুর্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম,—অমন অবাক্ হয়ে যেয়ো না ঠাকুরপো, একেই শৌখিন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরী হয়।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া কহিল, কোথায় পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না, আর কোথায় স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ! যে লোক পশুর প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, সে শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র প্রণয়ের কতটুকু মর্যাদা বোঝে? এ বস্তু সে পাবে কোথায়? তুমি কিসের সঙ্গে কার তুলনা দিচ্চ বৌদি?

তুলনা দিইনি ভাই, দুটো যে একই জিনিস, তাই শুধু বলচি। ঠাকুরপো, ইঞ্জিনের যে জিনিসটা তাকে সুমুখে ঠেলে, সেই জিনিসটাই তাকে পিছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। যে ভালবাসতে পারে, সেই কেবল সুন্দর-অসুন্দর সব

ভালবাসাতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, অপরে পারে না। তুমি গোবিন্দলালের কথা বলছিলে, তার যে বস্তুটা ভ্রমরকে ভালবেসেছিল, ঠিক সেই বস্তুটাই তাকে রোহিণীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরলাল তা পারেনি। সে সাংসারিক ভালমন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, সুবিধে-অসুবিধে চিন্তা করে আত্মসংযম করেছিল, কিন্তু গোবিন্দলাল পারলে না। অথচ হরলাল লোকটা গোবিন্দলালের চেয়ে ভাল ছিল না—অনেক মন্দ ছিল। তবু সে যাকে ঘৃণায় ত্যাগ করে গেল, আর একজন তাকেই মাথায় তুলে নিলে।

নেওয়াটা নানা কারণে ব্যর্থ নিষ্ফল হতেও পারে, কিন্তু সমস্ত দুঃখ-গ্লানি-লজ্জার অতিরিক্ত একটা বৃহত্তর সার্থকতার ইঙ্গিত যে একজনকে আর একজনের কাছে টেনে নিয়ে যায়নি, এমন কথাও ত জোর করে কেউ বলতে পারে না ভাই!

দিবাকর ক্ষোভের সহিত বলিল; তোমার সমস্ত কথা যদিচ আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু পবিত্র প্রণয় যে স্বর্গীয় নয়, এমন অদ্ভুত কথা আমি কিছুতেই মানতে পারিনে, বৌদি!

কিরণময়ী কহিল, তোমার মানামানির ওপর ত কিছু নির্ভর করে না ঠাকুরপো! আমাদের এই দেহটিও ত নিতান্ত নশ্বর, একেবারে পার্থিব বস্তু, কিন্তু তাতে ত দুঃখের কারণ দেখিনে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যতদিন না সে তার জড় দেহটার মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চয় করে, ততদিন প্রেমের সিংহদ্বার তার সম্মুখে বন্ধই থাকে। সে সিংহদ্বার সে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই ডিঙিয়ে যায়। তার পূর্বে সে তার বাপ-মাকে ভাই-বোনকে ভালবাসে, বন্ধু-বান্ধবকেও ভালবাসে, কিন্তু তার পঞ্চভূতের দেহটা বড় না হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বর্গীয় প্রেমের কোন সংবাদ রাখবারই তার অধিকার জন্মায় না। ততদিন পর্যন্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তাকে একতিল নড়াতে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণ ত চিরদিনই আছে, কিন্তু সে আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে গাছের পাকা ফলটিই পারে, কাঁচায় পারে না। তার আঁশ, শাঁস পৃথিবীর রসেই পাকে, স্বর্গের রসে পাকে না। সুন্দর ফুল রূপ দিয়ে, গন্ধ

দিয়ে, মধু দিয়ে মৌমাছি টেনে এনে ফলে পরিণত হয়, সেই ফল আবার ঠিক সময়ে মাটিতে পড়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়—এই তার প্রকৃতি, এই তার প্রবৃত্তি, এই তার স্বর্গীয় প্রেম। বিশ্ব জুড়ে এই যে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির খেলা, রূপের খেলা চলেছে, স্বর্গীয় নয় বলে এতে দুঃখ করবার বা লজ্জা পাবার ত কিছুই দেখিনে।

একটুখানি থামিয়া কিরণময়ী বলিল, অবশ্য অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যদি চোখ বুজেই আরাম পাও, আমি চাইতে তোমাকে বলিনে, কিন্তু, প্রবৃত্তির তাড়না চাইনে, স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করব—প্রেমের ব্যবসা অত সোজা নয়।

দিবাকর প্রশ্ন করিল, পৃথিবীতে তবে পবিত্র প্রেম, ঘৃণিত প্রেম, এ দুটো আছে কেন?

কিরণময়ী হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার তর্কটা ঠিক সতীশ-ঠাকুরপোর মত হলো। সংসারে ও-দুটো থাকবার কথা বলেই আছে। মানুষের প্রবৃত্তি জিনিসটা যুক্তি নয় বলেই আছে। যাকে ঘৃণিত বলচ, সেটা আসলে সুবুদ্ধির অভাব। অর্থাৎ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপর চাপান, আর প্রেমকে কুৎসিত ঘৃণিত বলা সমান কথা। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারে একের অপরাধ অপরের মাথায় চেপে যায়, বলিয়া সহসা কিরণময়ী চুপ করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে কি কথা যেন তলাইয়া দেখিয়া আসিল। পরক্ষণেই কহিল, তোমাকে পূর্বেই বলেচি, জীবের প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি রক্তকণা নিজের উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকাশ করবার লোভ কোনমতেই সংবরণ করিতে পারে না। যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্য দেহ-সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য শিরায়-উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলে গ্লানি করা হয়। তাৎপর্য না বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস বলে সান্ত্বনা লাভ করে।

কিন্তু আজ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি ঠাকুরপো, এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য। সূর্যের আলোর মত সত্য! ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য! কোন প্রেমই কোনদিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।

কথা শুনিয়া দিবাকর যথার্থই বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহার কেমন যেন বুকের ভিতর শিরশির করিতে লাগিল। এমন উত্তপ্ত তীব্র কণ্ঠস্বর ত সে কোনদিন শুনে নাই, চোখের এমন উত্তপ্ত উৎকট চাহনিও কখন লক্ষ্য করে নাই।

ভয়ে ভয়ে ডাকিল, বৌদি?

কেন ঠাকুরপো?

আমার মতো নির্বোধকে উপদেশ দিতে তোমার বোধ করি ধৈর্য থাকে না।

সে কি ঠাকুরপো, আমার ত বেশ ভালই লাগচে।

দিবাকর একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, ভাল লাগলে তোমার মুখ দিয়ে এ-সব উলটো-পালটা কথা বার হবে কেন? এইমাত্র তুমি নিজেই বললে, যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসার নাম কুৎসিত প্রেম, আবার বলচ, এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই বিজ্ঞের দল এর মন্দ আখ্যা দেয়,—তবে কোনটা সত্য?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ বলিল, দুটোই সত্য।

বিধবা রোহিণীকে ভালবাসা কি গোবিন্দলালের মন্দ কাজ হয়নি?

ভালবাসা কি একটা কাজ যে তার ন্যায়-অন্যায় হবে? স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটাই তার মন্দ কাজ হয়েছিল।

দিবাকর আবার একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, ছেড়ে চলে যাওয়া ত নিশ্চয়ই মন্দ কাজ। সহস্রবার মন্দ কাজ। কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়ে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসাও কি নিতান্ত অন্যায় নয়?

তাহার উত্তেজনায় কিরণময়ী হাসিল, কহিল, ঠাকুরপো, নিজেদের অমন শক্তিমান মনে করতে নেই, অহঙ্কারটা একটু কম থাকা ভাল। তুমি কি ভাবো, ইচ্ছা করলেই মানুষ যা খুশী তাই করতে পারে? গোবিন্দলাল ইচ্ছা করলেই রোহিণীকে ভালবাসতে পারত, আবার নাও পারত, এই কি তোমার ধারণা?

না, তা আমার ধারণা নয়। ইচ্ছার সঙ্গে চেষ্টা থাকা চাই।

কিরণময়ী কহিল, আবার তার সঙ্গে ক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা থাকা চাই।শুধু চেষ্টা করলেই হয় না। ঐ ছাদের কোণে বসে যদি তোমার মাথায় গাছ গজিয়েও যায়, তবু তুমি কালিদাসের মত আর একটা ‘মেঘদূত’ লিখতে পারবে না। মেঘ দেখে তোমার ঝড়-জলের আশঙ্কাই হবে। সর্দি লাগবার ভয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠবে—বিরহীর দুঃখ ভাববার সময় পাবে না। হাজার চেষ্টা করলেও না। এই অক্ষমতা অস্থিমজ্জাগত—একে অতিক্রম করা যায় না। এই বলিয়া সে চুপ করিল।

দিবাকরও জবাব দিল না। মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন শব্দ রহিল না। নিস্তব্ধ ঘরের কোণ হইতে শুধু একটা জীর্ণ প্রাচীন ধূলি-মলিন ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কিরণময়ী হঠাৎ বড় মিঠা-গলায় কথা কহিল। বলিল, তোমাকে আরও দু-একটা কথা বলতে চাই। সেদিন তোমার ‘বিষের ছুরি’ নিয়ে যাই কেন না বলে থাকি ঠাকুরপো, আমি এও দেখেছিলুম যে, তোমার মধ্যে একটা জিনিষ আছে যা যথার্থই প্রেমিক, যথার্থই কবি। এই জিনিসটিকে যদি মেরে ফেলতে না চাও ত পরকে অপরাধী করার সুখ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতেই হবে। এ কথা কোনদিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয়। নীতিশাস্ত্রের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে বর্ণে নাও মেলে, তাতে লজ্জা পেয়ো না। আমি জানি, মানুষ পরের অক্ষমতা আর অপরাধ এক তুলাদণ্ডেই ওজন করে শাস্তি দেয়, কিন্তু তাদের বাটখারা ধার করে এনে তোমার কাজ চলবে না। তুমি

বারংবার গোবিন্দলালের উল্লেখ করেছিলে। সেই গোবিন্দলাল যে কত বড় শক্তির সম্মুখে পরাস্ত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে গিয়েছিল, এ সংসারে যারা নিছক ভাল-মন্দ বিচারের ভার নিয়েচে, এ প্রশ্ন তাদের নয়, এ প্রশ্ন তোমার। খুনের অপরাধে জজসাহেব যখন হতভাগ্যের প্রাণদণ্ড করেন, তখন তিনি বিচারক, কিন্তু অপরাধীর অন্তরের দুর্বলতা অনুভব করে যখন তিনি দণ্ড লঘু করেন, তখন তিনি কবি। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, এমনি করেই সংসারের ভুল, ভ্রান্তি, অপরাধ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে না। কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর করে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ।

দিবাকর একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা হলে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?

কিরণময়ী কহিল, ঠিক জানিনে। হতেও পারে।শুনি, মন্দের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়াও নাকি কবির কাজ। কিন্তু, ভালর উপর অত্যন্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া কি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ নয়? তা ছাড়া পাপকে যতদিন না সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া যাবে, যতদিন না মানুষের হৃদয় পাথরে রূপান্তরিত হবে, ততদিন এ পৃথিবীতে অন্যায় ভুল-ভ্রান্তি থেকেই যাবে, এবং তাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দিতেও হবে। পাপ দূর করবার সাধ্যও নাই, সহ্য করবার ক্ষমতাও যাবে, তাতেই বা কি সুবিধা হবে ঠাকুরপো?

দিবাকর জবাব দিল, সুবিধেই ত সব নয়। অসুবিধের মধ্যেও ত ন্যায়ধর্ম পালন করা চাই। যা শুভ, যা নির্মল, যা সূর্যের আলোর মত, তাকেই ত সকলের উপর স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

কিরণময়ী কহিল, না। পাপ যদি না মানুষের রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত, তা হলে তোমার কথাই সত্য হতো। এক ন্যায় ছাড়া সংসারে আর কিছুই থাকতে

পেত না। দয়া, মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলির নাম পর্যন্তও কারো জানা থাকত না। তুমি সূর্যের আলোর সাদা রঙের সঙ্গে ন্যায়ের তুলনা দিচ্ছিলে! কিন্তু, সাদা রঙ কি সবগুলো রঙের মিশ্রণে জন্মায় না? এই সাদা আলো যেমন বাঁকা কাঁচের মধ্যে দিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে, ন্যায়ও তেমনি অন্যায়, অধর্ম, পাপ, তাপের বাঁকা পথ দিয়ে দয়া, মায়া, ক্ষমায় বিচিত্র হয়ে দেখা দেয়। অন্যায়কে ক্ষমা করলে অধর্মকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা মানি, কিন্তু অধর্মও যে তারই একটা রূপ নয়, এ কথাও ত স্বীকার না করে পারিনে। তর্ক করে হয়ত আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঠাকুরপো, কিন্তু যে ক্ষমা ভালবাসার মধ্যে জন্মলাভ করে, সেই ভালবাসার মর্ম যদি কখনো পাও, তখনই বুঝবে অন্যায়, অধর্ম, অক্ষমতাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্মেরই অনুশাসন। কিন্তু বেলা যে পড়ে গেছে ঠাকুরপো, আজ ক্ষিদে-তেষ্টা কি তোমার পায়নি?—বলিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দিবাকর খাবার খাইতে বসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আজ সমস্ত দুপুরটা আমার বড় আনন্দে কেটেছে। কত নূতন কথাই যে শিখলাম, তা আর বলতে পারিনে।

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, অনেক কথা শিখেচ? আমাকে তা হলে তোমার গুরু বলে মানা উচিত।

দিবাকর উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয়। এক শ' বার তোমাকে গুরু বলে স্বীকার করছি। সত্যি বলচি বৌদি, এমনি যদি চিরকাল তোমার কাছে থাকতে পাই ত আর আমি কিছু চাইনে।

বল কি! এর মধ্যেই এত টান?

দিবাকরের চিত্ত আর একভাবে মগ্ন হইয়াছিল, সরল মনে কহিল, তোমাকে ছেড়ে আর একটা দিনও কোথাও থাকতে পারব না বৌদি।

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, চুপ চুপ, কেউ যদি শুনতে পায় ত অবাক হয়ে যাবে।

দিবাকর সচেতন হইয়া নিদারুণ লজ্জায় একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বত্রিশ

শয্যা রচনা করিতে করিতে কিরণময়ী তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া ম্লান করুণস্বরে কহিল, একি তোমার চাকরি, না ব্যবসা ঠাকুরপো, যে মনিবের মর্জির উপর কিংবা দোকানের কেনা-বেচার ওপর সফলতা-বিফলতা নির্ভর করবে? এ যে নিজের বুকের ধন। বাইরে লোকের সাধ্য কি ঠাকুরপো, একে বিফল করে! বলিয়া মুহূর্তকাল চোখ বুজিয়া রহিল।

দিবাকর ভক্তিনত-চিত্তে সেই সুন্দর তদগত মুখখানির প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা বৌদি, তুমি কি চোখ বুজলেই তোমার স্বামীর মুখ অন্তরে দেখতে পাও?

কিরণময়ী চোখ চাহিয়া একটুখানি যেন চকিত হইয়া বলিল, স্বামীর? হুঁ, দেখতে পাই বৈ কি ভাই। যিনি আমার যথার্থ স্বামী, তিনি নিশিদিনই আমার এইখানে আছেন, বলিয়া আঙুল দিয়া নিজের বক্ষঃস্থল নির্দেশ করিল।

দিবাকর কথাটাকে সরলভাবে গ্রহণ করিয়া বিনম্র-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ দেখে লাভ কি বৌদি? তুমি ঠাকুর-দেবতাও মান না, ইহকাল-পরকালও স্বীকার কর না, মরণের পরে কেমন করে তাঁর কাছে তুমি যাবে?

কিরণময়ী কহিল, মরণের পর আমি কারো কাছেই যেতে চাইনে ঠাকুরপো।

কোথাও কারুর কাছেই নয়? একেবারে একা থাকতে চাও? বলিয়া দিবাকর যেন হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল এবং তাহার প্রশ্ন শুনিয়া কিরণময়ীও ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কিন্তু যখন-তখন আমার নিজের কথা এত শুনতে চাও কেন বল ত ঠাকুরপো?

কি জানি বৌদি, আমার ভারী শুনতে ইচ্ছা করে।

কিরণময়ী বিছানার চাদর পাতিবার ছলে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, আমি একজনের কাছে যেতে চাই, কিন্তু, সে মরণের ওপারে নয়—এপারেই।

দিবাকর কহিল, কিন্তু তিনি ত মরণের ওপারে চলে গেছেন। এপারে কেমন করে আর তাঁকে পাবে?

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, সে আমার এখনো এপারে আছেই। এতদিন চলেও যেতুম, শুধু—

শুধু কি বৌদি?

শুধু যদি একবার জানাতো আমাকে চায় কি না।

দিবাকর পুনরায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কে এপারে আছে? কে জানাবে, সে তোমাকে চায় কি না? কি যে তুমি বল বৌদি!

কিরণময়ীর মুখের উপর পলকের জন্য একটা ম্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষণকালেই তাহা অপসৃত হইয়া আবার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং কৃত্রিম ক্রোধের সুরে কহিল, তুমি ত বড় দুষ্টু ঠাকুরপো! নিজে মুখ ফুটে কিছুই বলতে চাও না, কেবল আমার মুখ থেকে এক শ'বার শুনতে চাও? যাও, তার খবর আমি তোমাকে দিতে পারব না। বলিয়া মুখটা একটুখানি আড়াল করিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। দিবাকর এ হাসি দেখিতে পাইল এবং একটা অজ্ঞাত আবেগে তাহার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততালে চলিতে লাগিল। একটুখানি সামলাইয়া কহিল, আমার আবার কি কথা আছে বৌদি যে মুখ ফুটে তোমাকে বলব?

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত করে এতদিন যে শেখালুম, সবই কি ব্যর্থ হলো? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ দিকি, একটা ভয়ানক কথা ওখানে তোলপাড় করে বেড়াচ্চে কি না? সত্যি বলো?

দিবাকর মন্ত্রমুগ্ধবৎ কহিল, কি কথা? কি শেখালে তুমি?

কিরণময়ী কহিল, অবাক করলে ঠাকুরপো! এ বয়সেই কি অভিনয় করতেই শিখেচ? কিন্তু তুমি মুখ ফুটে না বললে, আমিও বলছিনে, এতে আমারই বুক ফাটুক, আর তোমারই বুক ফেটে যাক! বলিয়াই হঠাৎ হেঁট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দিবাকর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী এ পর্যন্ত তাহাকে কতবার কত প্রকারে পরিহাস করিয়াছে, সহস্রবার সহস্র ছলে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই পরিহাস, এ স্পর্শ তাহার কানের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গের স্নায়ু-শিরায় যেন প্রজ্বলিত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেল। নিজের দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটির এতবড় আশ্চর্য দ্রুতবেগ সে কখনো অনুভব করে নাই।

তেত্রিশ

অনেকদিন পরে আজ আবার সকালবেলায় অঘোরময়ী পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণীর সহিত কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, মায়ের আরতি হইয়া গেলে, একটু রাত্রি করিয়া বাড়ি ফিরিবেন।

রাত্রি প্রায় আটটা। দিবাকর নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। এই স্বল্প আলোকে যে 'দুর্গেশনন্দিনী' বইখানা সে ইতিপূর্বে পড়িতেছিল, সেখানা মুখের উপর চাপা দিয়া বোধ করি বা মনে মনে সে আয়েষার কথাই চিন্তা করিতেছিল, কিরণময়ী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছোটঠাকুরপো, কি ঘুমোচ্চ নাকি?

দিবাকর মুখের উপর হইতে বইখানা না তুলিয়াই কহিল, না, ভারী মাথা ধরেচে।

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হলে ত বেশ চিকিৎসা হচ্চে। মাথার ওপর আলো জ্বেলে রাখলে কি মাথা ছাড়ে নাকি ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, বইটা কালই ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই শেষ করে ফেলচি।

কিরণময়ী কহিল, চোখ বুজে আয়েষাকে ভাবলে বই শেষ হবে না ভাই, চোখ চেয়ে পড়তে হবে। তা না হয় খেয়েদেয়েই শেষ করো—এখন চল, খাবার জুড়িয়ে যাচ্চে।

দিবাকরের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না; সে শ্রান্ত অনুনয়ের সুরে কহিল, এখন থাক বৌদি। মাসীমা আসুন, তার পরে খাব।

কিরণময়ী কহিল, তাঁরা কতক্ষণে ফিরবেন তার ঠিক কি ঠাকুরপো? আজ আমার নিজের শরীরও ভাল নয়। মনে করছি, তাঁর ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে

একটু শোব। ওঠো, তোমাকে খাইয়ে দিই গে, বলিয়া সে কাছে আসিয়া বইখানা দিবাকরের মুখের উপর হইতে তুলিয়া লইল।

অদূরে দিবাকরের লোহার তোরঙ্গটা ছিল। কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া পুনরায় তাড়া দিয়া কহিল, ওঠো না গো।

আমার উঠতে ইচ্ছে করে না বৌদি। তার চেয়ে বরং একটা গল্প কর আমি শুনি।

শুধু গল্প শুনে ত পেট ভরে না ঠাকুরপো, সময়ে খেতেও হয়। কি বল?

দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি, আমার নাওয়া-খাওয়া-শোয়া নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, কেন জান না?

না বললে কেমন করে জানব?

এটি তোমার মিছে কথা ভাই। না বললেও জানা যায়, আর তুমিও ঠিক জান।

দিবাকরের মুখচোখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সহসা কেমন যেন একটা উদাস করুণ-সুরে কথা কহিল। বলিল, আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

একটা কেন ভাই, এক শ'টা করো। কিন্তু আগে খেয়েদেয়ে আমাকে ছুটি দাও—তার পরে না হয় সারারাত ধরে তোমার কথার জবাব দেব। কেমন রাজী? বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

দিবাকর এই পরিহাসের একটা পাল্টা জবাব দিবার প্রয়াস করিয়া কৃত্রিম সহানুভূতির স্বরে বলিল, বেশ ত বৌদি! তুমি বুঝি ঐ শক্ত বাক্সটার উপর সমস্ত রাত বসে আমার কথার জবাব দেবে?

কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। কহিল, ঐটার ওপর বসলে যদি তোমার ব্যথা লাগে ঠাকুরপো, না হয় তোমার নরম বিছানার উপরেই উঠে বসব। কেমন? তা হলে ত আর ক্ষোভ থাকবে না।

আবার দিবাকরের কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে লজ্জায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিরণময়ী উঠিয়া আসিয়া বলিল, নাও ওঠো—আমাকে ছুটি দাও, আর পাশ ফিরে শুতে হবে না।

রান্নাঘর হইতে ঝির গলা শুনা গেল—আমি এখানে থেকে শুনতে পাচ্চি বৌমা, তুমি পাও না গা? মা যে নীচে ডাকাডাকি কচ্চেন।

কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই তোরঙ্গটার উপর বসিল। রাগ করিয়া বলিল, আস্পর্ধা ত কম নয় ঝি? আমি গিয়ে দোর খুলে দেব, তুই পারিস নে?

আমার হাত জোড়া, তাই বলা বৌমা! বলিয়া ঝি বকিতে বকিতে দুমদুম করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দ্বার খুলিতেই অঘোরময়ী বকিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব কানের মাতা খেয়েচিস ঝি? এ যে আধ-ঘণ্টা ধরে কড়া নাড়চি আমরা।

এবার ঝিও গর্জিয়া উঠিল, কানের মাতা চোখের মাতা না খেলে কি আর তোমার বাড়িতে কেউ চাকরি করতে আসে মা? এবার চোখকানবালা কাউকে রাখো গে মা, আমাকে জবাব দাও। রান্নাঘর থেকে আমি সদর-দরজার ডাক শুনতে পাব না!

অঘোরময়ী নরম হইয়া বলিলেন, বৌমা কোথায়?

ঝি অস্ফুট ঝঙ্কারে কহিল, দেওরকে নিয়ে সারাদিন সোহাগ হচ্চে—আর কি হবে! ঐ যে দোর খুলে দিতে বলেছিলুম বলে আমায় চোখ রাঙ্গিয়ে আস্পর্ধা

দেখিয়ে দিলে! ও মা! এ যে বড়বাবু! বলিয়া ঝি অপ্রতিভ হইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

অঘোরময়ী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, উপীন, আয় বাবা ওপরে আয়।

চল মাসীমা যাচ্ছি, বলিয়া উপেন্দ্র অঘোরময়ীর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত কথাই তাহার কানে গিয়াছিল।

উপরে আসিয়া অঘোরময়ী তীব্রকণ্ঠে ডাক দিলেন, কোথায় আছ একবার বার হও না বৌমা? উপীন এসেছে যে—

অন্ধকার ঘরের ভিতর বসিয়া কিরণময়ীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল এবং বিছানার মধ্যে দিবাকরের সর্বাঙ্গ শিথিল হিম হইয়া গেল।

অঘোরময়ী পুনরায় ডাক দিলেন, গেলে কোথায়? একখানা মাদুর-টাদুর পেতে দাও না বৌমা—উপীন দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি গো?

কিরণময়ী বাহিরে আসিয়া বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া দিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

উপেন্দ্র কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন বৌঠান?

কিরণময়ী নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ। তুমি কেমন ঠাকুরপো? বৌ ভাল আছে? খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ যে? কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। গলার মধ্যে কোথাও যেন লেশমাত্র রস নাই, এমনি শুষ্ক, এমনি নীরস।

উপেন্দ্র কহিল, মক্কেলের পয়সায় আসা বৌঠান, আবার কাল বিকেলেই ফিরে যেতে হবে। কালীঘাটের দরকার সেরে বেরিয়েই দেখি মাসীমা। সেই পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছি। দিবাকরের খবর কি বলুন ত? সে না দেয় চিঠিপত্র, না দেয় একটা খবর। বেরিয়েছে বুঝি?

কিরণময়ী কহিল, মাথা ধরেছে বলে শুয়েচেন। কি জানি, বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েচেন।

অঘোরময়ীর মেজাজ আজ ভাল ছিল না। একে ত বধূর দোষ দেখাইতে পারিলে সে সুযোগ তিনি কোনদিন ছাড়িতেন না, তাহাতে দিবাকরের প্রতিও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। সকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের অছিলায় দিবাকর অস্বীকার করিয়াছিল। তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই ত তুমি তার ঘর থেকে বেরুলে বৌমা, সে ঘুমুচ্ছে কিনা তাও জানো না?

না, জানিনে, বলিয়া কিরণময়ী শাশুড়ীর প্রতি একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, দিবাকর?

সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাক দিলেন, দিবাকর ঘুমিয়েছিস?

সে জাগিয়াই ছিল, এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সাড়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিয়া অব্যক্তস্বরে কহিল, কখন এলে ছোড়দা?

সকালে। তোর মাথা ধরেছে নাকি?

সামান্য।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, মাথা ধরবে না বাছা! প্রথম প্রথম তবু যা হোক একটু ঘুরে-ফিরে আসতে। এখন একেবারে বাড়ির বার হও না। সকালে বললুম, দিবু আমার সঙ্গে একবার কালীবাড়ি চল ত বাছা। ‘না মাসীমা,কাজ আছে’। তোমার কি কাজ ছিল বল ত বাপু?

দিবাকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করেচিস। কোন্ কলেজে ভর্তি হলি?

দিবাকর মৃদুস্বরে বলিল, কলেজ খুললেই ভর্তি হব। এখনো হইনি।

খুললে ভর্তি হব! এখনো হইনি! অসহ্য ক্রোধে উপেন্দ্রর দুই চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল—ষোলো-সতর দিনের বেশী সমস্ত কলেজ খুলে গেছে—তুই তাও বুঝি জানিস নে?

দিবাকরের মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। সে না করিয়াই সবাই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, ফিরে এসে না হয় আপনাদের কাছেই থাকব, কিন্তু আজ আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে।

জগৎতারিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, আজই এখ্‌খনি? কেন উপীন?

উপেন্দ্র সতীশের কঠিন পীড়ার উল্লেখ করিয়া তাহার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির সংবাদ যতদূর জানিত বিবৃত করিয়া পকেট হইতে বেহারীর পত্রখানি সরোজিনীর হাতে দিয়া কহিল, সাড়ে এগারোটার সময় ট্রেন আছে, যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে আমাকে তাতেই যেতে হবে। যদি ফিরে আসতে পারি, তখন আপনার আশ্রয়েই থাকব।

ভাবিয়া লইল, পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই বিষাক্ত চুম্বন এবং এই নিষ্ঠুর বাসি, দিবাকর তাহার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সহ্য করিল, কিন্তু রাত্রে যখন এক শয্যায় শয়ন করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, সে হবে না, বৌদি, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেখানে হোক বাইরে এক জায়গায় পড়ে থাকি গে, কিন্তু তোমার এ হুকুম পালন করিবার জন্যে কিছুতেই আমি এ-ঘরে রাত্রি কাটাতে পারব না—কিছুতেই না—কিছুতেই না।

কিরণময়ী তখন বিছানা পাতিতেছিল—ফিরিয়া চাহিল। দিবাকর আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ কোনমতেই হবে না।

কিরণময়ী প্রথমটা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না। কহিল, কি হবে না ঠাকুরপো, শোয়া?

দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতের উপরে দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি কি মনে কর, সমস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, দিব্যি ভালমানুষটার মত দেশে ফিরে গিয়ে, তোমার উপীনদাদার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলবে, তুমি সাধু! তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু করে চলবে? সে হবে না ঠাকুরপো! সব কথা আমার বুঝবে না, বোঝবার প্রয়োজনও নেই—তুমি সাধু হও, না হও, সেজন্যও ভাবি না; কিন্তু অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে, তখন তোমার উপীনদাদার ঘাড়েও উঁচু করে চলবার মত মাথা কিছুতেই রাখব না—এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো। বলিয়াই আবার সে তাহার শয্যা-রচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং অদূরে গদি-আঁটা বেঞ্চের উপর দিবাকর আড়ষ্ট হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্ব দান করিয়া হরিশচন্দ্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এ বিতৃষ্ণা কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই কানের মধ্যে কোথাকার অস্ফুট রোদন প্রবাহের মত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে মাঝে কাহাদের ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস রহিয়া রহিয়া গর্জিয়া উঠিতে লাগিল। ভোরের দিকে একটা দোলা খাইয়া সে একেবারে সজাগ হইয়া উঠিয়াই বুঝিল, বাহিরে প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে এবং জাহাজ দুলিতে শুরু করিয়াছে। চোখ চাহিয়া দেখিল, তাহার বক্ষের উপর কিরণময়ীর কোমল বাম হস্ত নিদ্রিত কালসর্পের মত পড়িয়া আছে। পাছে সজাগ হইয়া উঠিয়াই দংশন করে, এই আশঙ্কায় সে যেন উঠিতে সাহস করিল না, আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাতাস এবং দোলনের বেগ ক্রমেই

বর্ধিত হইতে লাগিল এবং কিরণময়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিবাকরের বক্ষস্থিত শিথিল হস্ত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাহিরে ও কি—ঝড় নাকি?

দিবাকর বলিল, হাঁ।

তবে উপায়?

দিবাকর কথা কহিল না।

কিরণময়ী বলিল, জাহাজ যেন ডুবে যায়, এই প্রার্থনাই বোধ করি ভগবানের কাছে জানাচ্চ—না ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, না।

ছোট্ট একটুখানি 'না'—তুমি মানুষ, না পাথরের, ঠাকুরপো? বলিয়াই সে সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তী ◌াঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অঘোরময়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি করে খবর জানবে উপীন? দুজনের কি যে রাতদিন ফষ্টি-নষ্টি, হাসি-তামাশা, ফুস্-ফুস্ গল্প-গুজব হয় তা ওরাই জানে! আমি বার বার বলি বৌমা, ও পরের ছেলে, লেখাপড়া করতে এসেচে, ওর সঙ্গে অষ্টপ্রহর অত কেন? হলোই বা দেওর—বৌ-মানুষের সোমও ছেলের কাছে একটু সরম-ভরম থাকবে না? তা কে কার কথা শোনে!

উপেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুই বসে আছিস উপীন,—তাই—নইলে এতক্ষণে এসে আমার চুলের মুঠি ধরত—ও আমার এমন নক্ষী বৌ! আমি দিব্যি করে বলতে পারি উপীন, সমস্ত দোষ ঐ হতভাগীর।

কিরণময়ী নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—একটি কথারও জবাব দিল না। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরময়ী তেমনি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, ওগো বড়মানুষের মেয়ে! বাছা আমার সারাদিন উপোসী—কিছু খাওয়া-দাওয়ার উয্যুগ কর গে? অমন করে চলে গেলে ত হবে না!

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে সহজ-সুরে কথা কহিল, তাই ত যাচ্চি মা। উপেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, পালিয়ো না যেন ঠাকুরপো। আমার খান-কতক লুচি ভেজে আনতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না।

স্তব্ধ, মূর্ছিতপ্রায় দিবাকরকে কহিল, ছোট্‌ঠাকুরপো, তোমাকে অমনি দিয়ে দিই গে—রান্নাঘরে এসো। মা, ঝিকে একবার দোকানে পাঠিয়ে দেব, ঠাকুরপোর জন্যে কিছু মিষ্টি কিনে আনবে?

অঘোরময়ী কিংবা উপেন্দ্র কেহই তাহার জবাব দিতে পারিল না। এই বধূটির অপরিমেয় সংযম এবং অসীম অহঙ্কার যেন একই কালে বুদ্ধির অতীত হইয়া ইহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক বজ্রাহতপ্রায় করিয়া রাখিল।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক কথাবার্তা কহিয়া অঘোরময়ী তাঁহার আহ্নিক এবং মালা-জপ সাঙ্গ করিতে উঠিয়া গেলেন। কিরণময়ী কাছে আসিয়া কহিল, আমার ঘরে তোমার খাবার দিয়েচি ঠাকুরপো, ওঠো।

উপেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কিরণময়ী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আজ এই দিয়েই যা হোক দুটো খাও ঠাকুরপো, বেশী কিছু করতে গেলেই অনর্থক রাত হয়ে পড়ত।

উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ দীপালোকে তাহার মুখখানা পাথরের মত কঠিন দেখাইতেছিল। খাবারের থালাটা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, বৌঠান, খাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি খেতে আসিনি—আপনার সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা কইতে এসেছি।

কিরণময়ী কহিল, আমার বহু ভাগ্য, কিন্তু খাবে না কেন?

উপেন্দ্র ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার কঠিন মুখ যেন কঠিনতর দেখাইতে লাগিল। কহিল, আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্চে।

কিরণময়ী নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে খেয়ে কাজ নেই, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। বলিল, ঘৃণা হবার কথাই বটে! কিন্তু তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনব আমি কখনো ভাবিনি। সে শুধু একটি লোক ছিল যে ঘৃণায় থালাটা সরিয়ে দিতে পারত—সে সতীশ। তুমি নও ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র ক্রোধে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তেমনি শান্ত কঠোরভাবে বলিতে লাগিল, তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত? কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা, তুমিও ত তাই। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েচে, সেটা শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখোনি! নিজের বেলা বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশী মিঠে লাগে ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিল, বৌঠান, স্মরণ করে দিচ্চি যে, আজও আমার সুরবালা বেঁচে আছে। সে বলে, আমাকে যে একবার ভালবেসেছে, তার সাধ্য নেই আর কাউকে ভালবাসে। আমি এই ভরসাতেই শুধু দিবাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম! ভেবেছিলুম এ-সব বিষয়ে সুরবালার কখনো ভুল হয় না।

কথাটা শেষ না হইতেই কিরণময়ী অত্যন্ত অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া কহিল, থামো ঠাকুরপো। তার ভুল হয়েছে তোমার হয়নি, এ কথা এমন অসংশয়ে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে?

উপেন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত হয়ে যাচ্চে, আমার তর্ক করবার সময় নেই। আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু এই কথাটা নিশ্চয় জেনে রাখবেন যে, ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না—সে সাধ্যই নেই আপনার। শুধু সর্বনাশ করতেই পারবেন। ছি ছি—শেষকালে কিনা দিবাটাকে—

ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কিন্তু সুমুখে চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর সমস্ত মুখ এমনি বিবর্ণ হইয়া গেছে—ঠিক যেন কে তাহার বুকের মাঝখানে অকস্মাৎ গুলি করিয়াছে।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হলো বাবা উপীন?

না মাসীমা, আর খেলুম না—ভারী অসুখ করচে।

অসুখ করচে? সে কি রে? তা হলে আজ না হয় এইখানেই শো—আর যাসনে বাবা।

না মাসীমা, আমাকে যেতেই হবে, বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। দিবাকরের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল, দিবা?

দিবাকর প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তরের কথা শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন। অব্যক্ত-কণ্ঠে সাড়া দিয়া কম্পিতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র কহিলেন, তোর বাক্স-বিছানা বেঁধে নে—আমার সঙ্গে যাবি।

অঘোরময়ী বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি উপীন, রাত্তিরে ছেলেমানুষ কোথা যাবে?

আমার সঙ্গে যাবে, তার চিন্তা কি মাসীমা। নে রে, শিগগির ঠিক করে নে—আমি গাড়ি ডেকে আনি।

অঘোরময়ী উপেন্দ্রর হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, না বাবা, আজ অমাবস্যার রাত্রে ওর কিছুতে যাওয়া হবে না। ছেলেমানুষ একটা অন্যায় না হয়

করে ফেলেচে,—এখানে না রাখিস কাল-পরশু যাবে, কিন্তু আজ রাত্রে কিছুতে আমি ওকে যেতে দিতে পারব না।

বাধা পাইয়া উপেন্দ্র হতাশ হইয়া কহিল, কিন্তু ওকে একটা রাত্রিও আমার এখানে রাখতে ইচ্ছে হয় না মাসীমা। আচ্ছা, আজ অমাবস্যার রাত্রিটা যাক, কিন্তু কাল সকালে আর বাধা দেবেন না—বেলা দশটার মধ্যেই যেন জ্যোতিষের বাড়ি গিয়ে পৌঁছয়। বলিয়া অঘোরময়ীকে একটা নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। সদর দরজার কাছে অন্ধকারে পিছন হইতে চাদরে টান পড়িল। মুখ ফিরাইতেই কিরণময়ী চক্ষের পলকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহার পা চাপিয়া ধরিল—আমার বুক ফেটে যাচ্চে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত মিথ্যে! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে!

চুপ করুন। অনেক অভিনয় করেছেন—আর না। বলিয়া উপেন্দ্র অসহ্য ঘৃণায় তাহার মাথাটা সজোরে ঠেলিয়া দিতেই সে পা ছাড়িয়া দিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

নাস্তিক! অপবিত্র, 'ভাইপার'! বলিয়া উপেন্দ্র দৃকপাতমাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া বসিল। কি যেন তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর ফুটিল না। শুধু উন্মুক্ত দরজার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া রহিল এবং চোখ দিয়া যেন আগুন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকদিন পূর্বে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখে এমনি উন্মত্ত চাহনি, এমনি প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল, যেদিন সতীশকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্র প্রথম দেখা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আবার আজ শেষ বিদায়ের দিনেও তাহার বিরুদ্ধে সেই দুটি চোখের মধ্যে তেমনি করিয়াই আগুন জ্বলিতে লাগিল।

ওমা, এ যে বৌমা! এখানে এমন করে বসে কেন মা?

তুই ঘরে যাচ্ছিস বুঝি ঝি? বলিয়া কিরণময়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে আয় বাছা, তোকে দুটো কথা বলে নিই, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে নিজের ঘরে টানিয়া আনিল, এবং প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাক্স খুলিয়া একজোড়া রূপার মোটা মল ঝির হাতে দিয়া কহিল, তোর মেয়েকে পরতে দিলুম ঝি—না না, আমার মাথা খাস, তোকে নিতেই হবে,—আর কখনো যদি দেখা না হয়; বলিতে বলিতেই সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এ সব কি কাণ্ড বৌমা! বলিয়া ঝি বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুই ছাড়া আমার আপনার কেউ নেই ঝি! আমাকে বাঁচা—আমাকে এখান থেকে পরিত্রাণ কর। এখানে থাকলে আমার বুক ফেটে যাবে!

ঝি নিঃশব্দে কিরণময়ীর আপাদ-মস্তক বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, সমস্তই বুঝি বৌমা, আমিও ত মেয়েমানুষ! আমার মিন্‌সে যেদিন পুকুরঘাটে কেঁদে বলেছিল, চললুম মুক্তো, আর হয়ত দেখা হবে না! তখন আমিও ত তার পায়ে পড়ে কেঁদে বলেছিলুম, ওগো, আমায় সঙ্গে নাও! ফেলে রেখে গেলে আমার বুক ফেটে যাবে। তা কাল সকালেই বুঝি ছোটবাবু এখান থেকে চলে যাচ্ছে বৌমা?

কিরণময়ী বলিল, হুঁ। কিন্তু কলকাতায় আমাদের থাকা হবে না ঝি। কোথায় যাই বল দেখি?

ঝি লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কহিল, তবে আরাকানে যাও মা, মনের সুখে থাকবে। আমার ছোটবোনও সেখানে—আমার নাম করলে তোমাদের সে মাথায় করে রাখবে। আজ ত মঙ্গলবার—কাল ভোরেই জাহাজ ছাড়বে। যাবে মা সেখানে?

কিরণময়ী ঝির হাত ধরিয়া বলিল, যাব।

ঝি ভরসা দিয়া বলিল, তবে তোমরা ঠিক হয়ে থেকো, আমি ভোরবেলায় গাড়ি এনে তোমাদের নিয়ে যাব! কাক-পক্ষী জানতে পারবে না—তোমরা কোথায় গেলে। যাও মা, যাও, ছোটবাবুকে ছেড়ে তুমি বাঁচবে না, বলিয়া ঝি আঁচল তুলিয়া এবার নিজের চক্ষে দিল।

ঠাকুরপো?

রাত্রি বোধ করি তখন ভোর হইয়া গেছে, দিবাকর চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ঠিক সম্মুখেই কিরণময়ী দাঁড়াইয়া।

দিবাকর চমকিয়া কহিল, একি, বৌদি যে!

হাঁ ঠাকুরপো, আমিই, বলিয়া কিরণময়ী বিহ্বল দিবাকরের বুকের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িল। কহিল, ঠাকুরপো, আমাকে ছেড়ে নাকি তুমি যাবে? কৈ যাও দেখি!

প্রত্যুত্তরে দিবাকর একটা কথাও কহিতে পারিল না—শুধু তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

কিরণময়ী উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, ছিঃ! কান্না কেন ভাই!

বৌদি, আমি যে নিরুপায়! ছোড়দা যে আজ সকালেই আমাকে চলে যেতে বলেছেন!

উপেন্দ্রর নামমাত্রই কিরণময়ী ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিল, কে ছোড়দা! কে সে! সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশী আপনার? তোমাকে না দেখতে পেলে কি তার বুক ফেটে যায়? না ঠাকুরপো, সংসারে কারু সাধ্য নেই আর আমাদের আলাদা করে রাখে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—চল আমরা যাই।

কোথায় বৌদি?

আমি যেখানে নিয়ে যাব সেইখানে ঠাকুরপো।

আচ্ছা চল, বলিয়া দিবাকর উঠিতে উদ্যত হইল। একবার তাহার মনে হইল, সে বুঝি জাগিয়া নাই, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চৌত্রিশ

কাঁচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানিয়া আনে, তেমন করিয়া দুর্নিবার জাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্ধ-সচেতন বিমূঢ়-চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট কিনিয়া আরাকান যাত্রী-জাহাজে চড়িয়া বসিল। এ জাহাজে ভিড় না থাকায়, জাহাজের কর্তৃপক্ষ স্বামী-স্ত্রী জানিয়া একটা কেবিনের মধ্যেই দিবাকর ও কিরণময়ীর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইখানে কিরণময়ীকে বসাইয়া দিয়া দিবাকর ডেকের একটা নিভৃত অংশে রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ডেকের প্যাসেঞ্জারের ভিড় কমিয়া গেলে, কুলিদের গোলমাল থামিয়া আসিল। নোঙ্গর তোলার কর্কশ শব্দে জাহাজের সম্মুখ দিকটার মত দিবাকরের বুকের ভিতরটাও কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকালেই জাহাজ ভাগীরথীর মাঝামাঝি ভাসিয়া আসিল এবং অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিতে লাগিল। যখন ঠিক বোঝা গেল জাহাজ চলিয়াছে, তখন দিবাকরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল এবং সে তাহার দুই করতল মুখের উপরে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রুদ্ধ করিয়া লজ্জা নিবারণ করিল। পূর্বদিকের আকাশটা তখন তরুণ সূর্যের আভায় রক্তাভ হইয়াছিল এবং তখনও তাহার নিঃসন্দিগ্ধ উপীনদাদা জ্যোতিষ-সাহেবের বাটীতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। পলায়নোদ্দেশে বাটীর বাহির হওয়া পর্যন্ত যে ভীষণ অব্যক্ত গ্লানি দিবাকরের চিত্তের মাঝে জমা হইয়া উঠিতেছিল, ইহার শেষের দিকটা যে কত কুৎসিত এবং নিদারুণ, এইবার তাহার চক্ষের উপর সে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। একজন ভদ্র-গৃহস্থবধূকে কুলের বাহিরে কোন এক অজানা দেশে সে নিজে লইয়া যাইতেছে, এমন অসম্ভব কাণ্ড তাহার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ কোথাও সত্যকার আশ্রয় পায় নাই। তাহার শিক্ষা,

সংস্কার, চরিত্র, স্কুল, কলেজ, দেশ, বন্ধু-বান্ধব এবং সর্বোপরি তাহার পিতৃসম উপীনদাদা—এই সমস্ত হইতে সে যে কিরূপ নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এখনই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিল, যখন দেখিল জাহাজ সত্যই চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার উপীনদাদার কাছে আজিও সে বালক-মাত্র। সেই উপীনদাদার মনের ভাবটা এই সংবাদে কি হইয়া যাইবে, তাহা মনে করিতে গিয়াই তাহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইতে চাহিল। সেইখানে দুই জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল এবং এক নিমিষে তাহার অদম্য চক্ষের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় কিরণময়ী তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, একবারটি ঘরে এসো।

বহু চেষ্টায় ও বহুক্ষণে দিবাকর তাহার চক্ষের জল শুষ্ক করিয়া অধোমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া কেবিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরণময়ী দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দিবাকরকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, মুখপানে চাহিয়া অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছিলে কেন ভাই?

প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের চোখের জল আবার গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, সত্যি করে বল দেখি ঠাকুরপো, তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

দিবাকর কিছুই বলিতে পারিল না। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

কিরণময়ী তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

এমন বহুক্ষণ কাটিল; বহুক্ষণে দিবাকরের অশ্রুর ধারা আপনিই নিঃশেষ হইয়া গেলে, সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কোন কথা না বলিয়া

দরজা খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। জাহাজ তখন নদীর তীর ঘেঁষিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মাটি বাঁচাইয়া, জল মাপিয়া মন্দগতিতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে এবং ছোটবড় জেলেডিঙি ও মালবোঝাই নৌকার ক্ষুদ্র যাত্রীরা মস্ত জাহাজের মস্ত মর্যাদা রক্ষা করিয়া তফাত দিয়া অতি সাবধানে বাহিয়া যাইতেছে।

দিবাকর রেলিংয়ের পার্শ্বে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল এবং দূরে-অদূরে, জলে-স্থলে, যাহা-কিছু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহারই কাছে মনে মনে অত্যন্ত বেদনার সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করিতে করিতে অন্তরের অসহ্য দুঃখ অন্তর্যামীকে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণে আবার কেবিনের মধ্যে ডাক পড়িল।

কিরণময়ী বলিল, বেলা অনেক হলো, স্নান করে এস। আমি ততক্ষণ তোমার খাবার ঠিক করে রাখি।

সে নিজে এইমাত্র স্নান করিয়া লইয়াছিল। পিঠের উপর আর্দ্র চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া কেবিনের মেঝেতে বসিয়া হাঁড়ির মুখ খুলিয়া কি কতকগুলা আহার্য-সামগ্রীর জমা-খরচের হিসাব করিতেছিল। রাতের মধ্যে সে ঝিকে দিয়া এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল।

দিবাকর জবাব দিল, তুমি খাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষিদে নেই বৌদি।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, সে হবে না। তুমি না খেলে আমারও খাওয়া হবে না। তুমিই এখন আমার সর্বস্ব—তোমাকে না খাইয়ে আমি কিছুতেই খেতে পারব না।

কথা শুনিয়া দিবাকর লজ্জায় মরিয়া গেল এবং কোনো কথা না বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই কিরণময়ী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে সপ্তরথীর ব্যূহ ঠাকুরপো, পালাচ্চ কোথায়? প্রবেশের পথ আছে, কিন্তু বার হবার পথ কি সবাই জানে? যদি সে ইচ্ছেই ছিল, এ বিদ্যে তোমার উপীনদাদার কাছ থেকে শিখে নাওনি কেন?

একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, তামাশা নয় ঠাকুরপো, আমার অবাধ্য হয়ো না—স্নান করে এসে কিছু খাও, তার পরে বাইরে রেলিঙ ধরে যত খুশী কেঁদো, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু এও বলে রাখি ঠাকুরপো, চোখের জলের এর পরে বিস্তর প্রয়োজন হবে, অপ্রয়োজনে বাজে খরচ করে তখন যেন আপসোস করতে না হয়।

দিবাকর জবাব দিল না। আগন্তুক দিনের এই নিষ্ঠুরতম পরিণামের ইঙ্গিত নতশিরে বহন করিয়া স্নানের জন্য নীরবে বাহির হইয়া গেল। শূন্য কক্ষে কিরণময়ীও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বিদ্রূপের শূল শুধু দিবাকরকেই বিদ্ধ করিল না, তাহা সহস্রগুণিত হইয়া নিজের বক্ষের মাঝে ফিরিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দিবাকর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জাহাজের যে-অংশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল সেইখানে নামিয়া গেল, এবং বিভিন্ন প্রদেশের নানা বর্ণের যাত্রীদের মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। এই ভারতবর্ষের মধ্যে কত বিভিন্ন জাতি, কত বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, কত অজ্ঞাত ভাষা যে প্রচলিত রহিয়াছে, দিবাকর এই তাহা প্রথম দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। জাহাজের খোলের মধ্যেই সেই জনতা এবং নানাবিধ ভাষার সংমিশ্রণে যে অপরূপ শব্দরাশি উত্থিত হইতেছে তাহাই বা কি বিচিত্র! সে সিঁড়ি বাহিয়া তথায় নামিয়া গেল এবং নির্বাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্প একটুখানি স্থান দখল করিয়া লইতে যাত্রীদের মধ্যে ইতিপূর্বে যে প্রবল ঠেলাঠেলি রেষারেষি এবং তর্জন-গর্জন চলিয়াছিল, তখন তাহা থামিয়া আসিয়াছে। যাত্রীরা নিজেদের অধিকৃত স্থানটুকুর উপর শয্যা বিছাইয়া জিনিসপত্রের বেড়া দিয়া যথাসাধ্য নিরাপদ হইয়া এইবার প্রতিবেশীর প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পাইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের একটা সন্তোষজনক পরিচয় গ্রহণে উৎসুক।

এক অংশে দিবাকরের দৃষ্টি পড়িতেই একজন বাঙালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, বাবুমহাশয়, একবার এদিকে আসুন, এদিকে আসুন—

লোকটির পাশে একজন মজবুত গোছের স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সেও সোৎসুকনেত্রে সেই অনুরোধেরই সমর্থন করিল। দিবাকর বহু পরিশ্রমে বহু লোকের তিরস্কার ও চোখরাঙানি মাথায় করিয়া ভিড়ের মধ্যে সাবধানে পা ফেলিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেই লোকটি নিকটস্থ তোরঙ্গের উপর স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, এটা আমার টিনের পেটি নয় মশাই, আসল লোহার,— আপনি স্বচ্ছন্দে বসুন। মশায়, আপনারা?

দিবাকর বলিল, ব্রাহ্মণ।

তৎক্ষণাৎ লোকটি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবাকরের জুতার উপর হইতেই পদধূলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিল, ভাবছিলাম এ কটা দিন বুঝি বা বৃথায় যায়। মশায় আছেন কোথায়?

দিবাকর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপরে দেখাইয়া দিলে, সে বলিল, কেবিনে আছেন? তা যেখানেই থাকুন দিনান্তে একটিবার পদধূলি থেকে বঞ্চিত করবেন না। যাবেন কোথায়, রেঙ্গুনে?

দিবাকর মাথা নাড়িয়া বলিল, না আরাকানে।

আরাকানে ত আমিও থাকি। আজ বিশ বৎসর ওখানে আছি, মহাশয়কে ত কখন দেখিনি। এই প্রথম যাচ্ছেন? সেখানে কেউ আত্মীয় আছেন বুঝি? নেই? তা হোক— কিছু চিন্তা করবেন না। মশায়ের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি ওখানকার একজন বাড়িওয়ালা, অনেকগুলো ঘর আমার খালি পড়ে আছে। তা যাবেন আপনি—আমার সঙ্গেই। পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া বলিল, ইনি বাড়িউলী।

বাড়িউলী এতক্ষণ অনিমেষ-দৃষ্টিতে দিবাকরের পানে চাহিয়াছিল। অত্যন্ত ভারী ও মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিবার সঙ্গে আছেন বুঝি?

দিবাকর মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কোনমতে জানাইয়া দিল, আছেন। স্ত্রীলোকটির কথা বাঁকা বাঁকা, কপালে উলকি, সীমন্তে মস্ত চওড়া সিন্দূরের দাগ, নাকে নথ এবং দুই কানে বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। মাথায় যে একটুখানি আঁচল দেওয়া ছিল, উৎসাহের আবেগে তাহাও নামিয়া পড়িল। কহিল, ভালই হলো। আরাকান বড় মন্দ জায়গা মশায়,—মগের দেশ। কিন্তু আমার বাড়িতে কারো দাঁত ফোটাবার জো নেই—আমি তেমনি বাড়িউলী নই। কামিনীকে ভয় করে না এমন লোক ওদেশে নেই। থাকবেন আমার বাড়িতেই, কোন ভয় নেই। ভাড়া পাঁচ টাকা করে, তা দেবেন আপনি চার টাকা করেই,—হাঁ বাড়িআলা, তোমাদের বাংশালে একটা কাজ জুটবে না?

বাড়িআলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তা—তা জুটবে বৈ কি!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, মশায়ের নাম—

হরিশ ভট্টাচায্যি! না, না, ও করবেন না—অপরাধ হবে। আমি ব্রাহ্মণ নই, কৈবর্ত। একটু শাস্তর-টাস্তর জানা আছে বলে লোকে আদর করে ভট্‌চায বলে ডাকে। ত্রিকণ্ঠি মালা ধারণ করেছি, মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেছি,—আর কেন মশায়, ঢের ত করে দেখলুম; এখন প্রায় দু'হাজার আড়াই হাজার খরচ করে চার ধামে ঘুরে এলুম বাড়িতেও বছর-চারেক মাকে আনলুম,—আর কেন! তাই বাড়িউলীকে মাঝে মাঝে বলি, বাড়িউলী আরাকানে যা-কিছু আছে বিক্রি সিক্রি করে কোথাও একটা তীর্থধামে গিয়ে থাকি চল। বলিয়া লোকটা উদাসমুখে উপরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বাড়িউলীও তাহার স্বাভাবিক মোটা গলায় প্রত্যুত্তর করিল, আমিও তাই বলি। কাঁচা-বয়সে অদিষ্টের ফেরে যা করেছি, তা ত করেইছি—সে কিছু আর আমার গায়ে লেখা নেই—আমিও বলি, বাড়িআলা, আর নয়, এইবার যাই চল। বলিয়া সেও ঊর্দ্ধনেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দিবাকর পাকা লোক নয়, এই সমস্ত ইতিহাসের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়িউলী কথা কহিল। বলিল, হাঁ বাড়িআলা, এইবার তবে চিঁড়েগুলি ভিজিয়ে দিই?

বাড়িআলার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল, দাও।

সংসার অনভিজ্ঞ দিবাকর এ ইঙ্গিতের তাৎপর্যটা এখন বুঝিতে পারিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এখন যাই,—আবার আসব তখন।

হরিশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিবাকর অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় ডেকের একখানা আরাম-চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কখন যে জাহাজ নদীর ঘোলা জল পার হইয়া গেল, কখন যে অগাধ কৃষ্ণবর্ণ লবণাম্বুরাশির মাঝখানে ভাসিয়া আসিল, তাহা জানিতেও পারিল না। অস্ফুট-কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া সম্মুখে দেখিল রাঙ্গা-সূর্য অস্ত যাইতেছে। বহু লোক তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে তাহাই দেখিতেছে। যে সূর্যাস্তের বিবরণ সে ইতিপূর্বে ইংরাজী বাংলা অনেক পুস্তকে অনেকবার পড়িয়াছে, এই সেই সূর্যাস্ত! এই সেই সত্যকার সমুদ্র! চতুর্দিকে চাহিয়া একবার সে অনন্ত জলরাশি দেখিয়া লইল এবং পরক্ষণে অস্তগমোন্মুখ সূর্যদেবকে নমস্কার করিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সূর্য অস্ত গেল, সে চাহিয়া রহিল, আকাশ ম্লান হইয়া আসিল সে চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল সে চাহিয়া রহিল, ক্রমে আকাশ ও জল গাঢ় কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিল, তবুও দিবাকর তেমনি করিয়াই চেয়ারে পড়িয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

নৈশ শীতল বায়ু হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছে, উপর ডেক প্রায় জনশূন্য, মাথার উপরে কৃষ্ণপক্ষের গভীর কালো আকাশ, নীচে সাগরের তেমনি গভীর কালো জল, তাহারি মাঝখানে দিবাকর নিজের অন্তরের সুগভীর কালিমাকে

নিমজ্জিত করিয়া দিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তি বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে হঠাৎ কাহার কোমল হস্তস্পর্শে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ফিরিয়া দেখিল, কিরণময়ী।

কিরণময়ী বলিল, কি হচ্চে ঠাকুরপো! তুমি কি মৃত্যু পণ করে অনশন-ব্রত নিয়েচ?

দিবাকর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মাত্র উত্তরের অপেক্ষা করিয়া, ঘরে এস, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে কেবিনের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং মেঝের উপরে পাতা শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া কহিল, কিছুই যদি না বোঝ, এটা অন্ততঃ ত বুঝতে পারচ যে, শত কান্নাকাটিতেও জাহাজ তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না, সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও না। আরাকানে তোমাকে যেতেই হবে। তবে কেন মিছে নিজে শুকিয়ে আমাকে শুকোচ্চ? যা দিই, যা পার খাও, তারপরে জাহাজ যখন আরাকানে পৌছবে, যেখানে খুশী নেবে যেয়ো, যখন খুশী ফিরে এসো—তোমার দিব্যি করে বলচি ঠাকুরপো, আমি বাধা দেব না। বলিতে বলিতেই কিরণময়ীর কণ্ঠস্বর উগ্র এবং ক্ষুৎপিপাসাতুর দুই চক্ষু আগুনের মত দীপ্ত হইয়া উঠিল।

দিবাকর মুখ তুলিয়া মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। আজ এতদিন পরে তাহার মনে হইল, যবনিকার অন্তরালে সে যেন সত্য বস্তুটির অকস্মাৎ দেখা পাইয়া গেল। কিরণময়ীর সুন্দর দুই চক্ষের বাসনাদীপ্ত বুভুক্ষু দৃষ্টির মাঝে আর যাই কেন না থাক, তাহার জন্য সেখানে একবিন্দু ভালোবাসা নাই। তথাপি সে কোন কথা কহিল না, নীরবে দৃষ্টি আনত হইয়া উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিল।

ক্ষণপরেই কিরণময়ী উঠিয়া গেল এবং একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে কিছু মিষ্টি একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া আনিয়া দিবাকরের সম্মুখে আনিয়া জানু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিল এবং জোর করিয়া একহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া

একটির পর একটি করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া সবগুলি নিঃশেষ করিয়া কিরণময়ী মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া লইল, পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই বিষাক্ত চুম্বন এবং এই নিষ্ঠুর বাসি, দিবাকর তাহার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সহ্য করিল, কিন্তু রাত্রে যখন এক শয্যায় শয়ন করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, সে হবে না, বৌদি, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেখানে হোক বাইরে এক জায়গায় পড়ে থাকি গে, কিন্তু তোমার এ হুকুম পালন করিবার জন্যে কিছুতেই আমি এ-ঘরে রাত্রি কাটাতে পারব না—কিছুতেই না—কিছুতেই না।

কিরণময়ী তখন বিছানা পাতিতেছিল—ফিরিয়া চাহিল। দিবাকর আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ কোনমতেই হবে না।

কিরণময়ী প্রথমটা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না। কহিল, কি হবে না ঠাকুরপো, শোয়া?

দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতের উপরে দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি কি মনে কর, সমস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, দিব্যি ভালমানুষটার মত দেশে ফিরে গিয়ে, তোমার উপীনদাদার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলবে, তুমি সাধু! তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু করে চলবে? সে হবে না ঠাকুরপো! সব কথা আমার বুঝবে না, বোঝবার প্রয়োজনও নেই—তুমি সাধু হও, না হও, সেজন্যও ভাবি না; কিন্তু অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে, তখন তোমার উপীনদাদার ঘাড়েও উঁচু করে চলবার মত মাথা কিছুতেই রাখব না—এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো। বলিয়াই আবার সে তাহার শয্যা-রচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং অদূরে গদি-আঁটা বেঞ্চের উপর দিবাকর আড়ষ্ট হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্ব দান করিয়া হরিশচন্দ্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এ বিতৃষ্ণা কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই কানের মধ্যে কোথাকার অস্ফুট রোদন প্রবাহের মত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে মাঝে কাহাদের ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস রহিয়া রহিয়া গর্জিয়া উঠিতে লাগিল। ভোরের দিকে একটা দোলা খাইয়া সে একেবারে সজাগ হইয়া উঠিয়াই বুঝিল, বাহিরে প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে এবং জাহাজ দুলিতে শুরু করিয়াছে। চোখ চাহিয়া দেখিল, তাহার বক্ষের উপর কিরণময়ীর কোমল বাম হস্ত নিদ্রিত কালসর্পের মত পড়িয়া আছে। পাছে সজাগ হইয়া উঠিয়াই দংশন করে, এই আশঙ্কায় সে যেন উঠিতে সাহস করিল না, আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাতাস এবং দোলনের বেগ ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল এবং কিরণময়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিবাকরের বক্ষস্থিত শিথিল হস্ত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাহিরে ও কি—ঝড় নাকি?

দিবাকর বলিল, হাঁ।

তবে উপায়?

দিবাকর কথা কহিল না।

কিরণময়ী বলিল, জাহাজ যেন ডুবে যায়, এই প্রার্থনাই বোধ করি ভগবানের কাছে জানাচ্ছ—না ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, না।

ছোট্ট একটুখানি 'না'—তুমি মানুষ, না পাথরের, ঠাকুরপো? বলিয়াই সে সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, জাহাজ যদি

ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদা পড়বে—সে কেমন হবে ঠাকুরপো!

এই কাল্পনিক চিত্রের ঘৃণিত পরিকল্পনা দিবাকরকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল এবং কিরণময়ীর বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে সজোরে মুক্ত করিয়া টলিতে টলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঁয়ত্রিশ

ডেকের উপর একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বুকের ভিতরটায় যে কি-রকম করিতে লাগিল, তাহাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করা ভিন্ন বুদ্ধিপূর্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তাহার ছিল না। জাহাজের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ছুটিয়া আসিয়া আবার মিলাইতেছে—এমনি করিয়া আঘাত-অভিঘাতের আশ্চর্য খেলা, দিবাকর আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। উপরে পূর্বদিকের আকাশে দিগন্ত হইতে ধূসর মেঘ পাহাড়ের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারি পশ্চাতে তরুণ সূর্য উঠিল কি না, রশ্মির একটি রেখাও সে সংবাদ নীচে বহন করিয়া আনিবার পথ পাইল না। পরক্ষণেই ডেকের উপরে খালাসীরা ব্যস্ত হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং উপরে কাপ্তানের ঘণ্টা মুহুর্মুহুঃ শব্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝড়ের বেগ যে উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে, এ ইঙ্গিত আকাশের মেঘ এবং সিন্ধুর তরঙ্গ ব্রীজের কাপ্তান হইতে নীচের কামিনী বাড়িউলী পর্যন্ত সকলের কাছেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিল। এমন সময় একজন খালাসী আসিয়া কহিল, বাবু, বৃষ্টি পড়তে আর দেরী নেই, ঝড়জলে বাইরে বসে কেন কষ্ট পাবেন, কেবিনে যান। দেখুন, সেখানে এতক্ষণ হয়ত বা কি হচ্ছে!

দিবাকর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে সেখানে?

খালাসী চট্টগ্রামবাসী মুসলমান। হাসিমুখে দুর্বোধ্য উচ্চারণে বলিল, কিছু হয়নি। কিন্তু জাহাজ ভারী দুলচে কিনা—তাই বলচি বাবু, গিয়ে দেখুন, মেয়েরা কি কচ্চেন। এত দুলানি সহ্য করা ভারী শক্ত। দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বুঝিল, খালাসীর কথা অত্যন্ত সত্য। টলিয়া পড়িতেছিল, সে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন বাবু, আপনাকে দিয়ে আসি। ইহার সাহায্যে কোনক্রমে দিবাকর কেবিনের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল কিরণময়ী বিছানা ছাড়িয়া পাশের লোহার বেঞ্চের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহারই একপ্রান্ত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। দিবাকর শিয়রের কাছে গিয়া বসিল, বলিল, কষ্ট হচ্চে বৌদি?

কিরণময়ী কথা কহিল না, মাথা তুলিল না, শুধু নিঃশব্দে দিবাকরের কোলের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। জাহাজ ওলট-পালট করিতে লাগিল, বাহিরে ক্রুদ্ধ পবন গোঁগোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত জলকণা প্রবলতর বেগে ক্ষুদ্র জানালার মোটা কাঁচের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং বসিয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া সে সঙ্কীর্ণ বেঞ্চের উপরেই কিরণময়ীর মাথার কাছে মাথা রাখিয়া মূর্ছাগ্রস্তের ন্যায় শুইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, শুয়ে পড়লে, মাথা ঘুরচে বুঝি?

দিবাকর কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, ঝড় ত ক্রমেই বাড়চে, জাহাজ ডুববে বলে কি মনে হয়?

দিবাকর বলিল, না।

কিরণময়ী কহিল, হাঁ, নয় না,—তুমি কি আদালতে সাক্ষি দিচ্ছ ঠাকুরপো? বলিয়া সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, ডুবলে ভাল হতো। যদি না-ই ডোবে, তা হলেই বা এমনি করে আমাদের ক'দিন চলবে?

দিবাকর উত্তর দিল না দেখিয়া কিরণময়ী দিবাকরের হাত দিয়া নাড়িয়া বলিল, শুনতে পাচ্চ কি?

পাচ্চি। যতদিন পারে চলুক।

তার পরে?

তার পরেও সমুদ্রে জল থাকবে, গলায় দেবার মত দড়িও জুটবে। যেটা হোক একটা বেছে নিলেই হবে।

এতক্ষণ পরে দিবাকরের মুখে একটা কঠিন কথা শুনিয়া কিরণময়ী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পরে সহজ-গলায় বলিল, না, তা করো না—বাড়ি ফিরে যাও। তুমি পুরুষমানুষ, গিয়ে যা হোক একটা কিছু বললেই চুকে যাবে। খুব সম্ভব, সে প্রয়োজনও হবে না,—তোমার আপনার লোক কেউ এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইবে না।

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। এমন প্রস্তাবটি যত বড় লোভনীয় হোক, সে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আর তুমি?

কিরণময়ী পূর্বের মত সহজ শান্তস্বরে বলিল, আমি? যেখানে যাচ্ছি—আমাকে সেখানেই থেকে যেতে হবে।

দিবাকর কহিল, কি করে থেকে যাবে, কে আছে সেখানে?

কিরণময়ী কহিল, কেউ না।

তবে?

তবুও থেকে যেতে হবে।

দিবাকর উৎকণ্ঠায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, একটু স্পষ্ট করেই বল না বৌদি? বলচ কেউ নেই, অথচ থেকে যাবে কি করে, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি সেখানে একা থাকবে নাকি?

কিরণময়ী হাসিল। সে হাসি দিবাকর দেখিতে পাইল না, পাইলে বুঝিত। কিরণময়ী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, না ঠাকুরপো, একা থাকতে পারব না,—আমার সে বয়স নয়। কিন্তু তোমার কাছে ও-সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। বলিয়াই সে দিবাকরের ডান হাতটা মুখের উপর টানিয়া লইয়া ব্যথার সহিত বলিল, কিন্তু তোমাকে নিরর্থক কষ্ট দিলুম। সে জন্যে মাপ চাইচি ঠাকুরপো।

দিবাকর আবার অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। সব কথা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল না, কিন্তু এটুকু বুঝিল যে, ঘরে ফিরিবার অন্ধকার পথে যে-আশার দীপ-শিখাটি মুহূর্ত পূর্বেই সে মূঢ়ের মত জ্বালিয়া তুলিয়াছিল, আবার তাহা নিবাইয়া ফেলিবার সময় হইল।

প্রদীপ নিবিল বটে, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধ বাষ্পে দিবাকরের বুকের ভিতরটা একেবারে বোঝাই হইয়া গেল। সে অবরুদ্ধ নিশ্বাসের গভীর বেদনায় খাড়া উঠিয়া বসিয়া তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি তামাশা করছিলে বৌদিদি এতক্ষণ?

মুখচোরা লজ্জা-নম্র দিবাকরের এই আকস্মিক উগ্রতায় কিরণময়ী চমকিত হইল। বলিল, কোন্ তামাশা ঠাকুরপো?

আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কথা! এ বিদ্রূপের কি কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল?

কিরণময়ী কহিল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ত কিছুই করিনি।

তবে এ কি সত্যি?

সত্যি বৈ কি ভাই!

তুমি একা থেকে যাবে, এও তবে সত্যি!

এও সত্যি।

ওঃ—তাই বুঝি আরাকানে যাচ্চ! কিন্তু কার কাছে কি ভাবে থাকবে শুনি?

প্রত্যুত্তরে কিরণময়ী শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। তাহাদের এই পালানোটা যে দিবাকরের পক্ষে কিরূপ ভয়াবহ, ইহার লজ্জা যে কিরূপ দুঃসহ, সে তাহার সমস্তই জানিত; এবং এই নিদারুণ অবস্থা-সঙ্কটে পড়িয়া তাহার মনটা যে কতদূর বিকল হইয়া গেছে, কিছুই কিরণময়ীর অবিদিত ছিল না। দিবাকরকে সে ভালও বাসে নাই—বাসাও অসম্ভব। তথাপি আশ্চর্য এই যে, ইহারই পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যে কিরণময়ী মনে মনে এতক্ষণ ব্যথাই পাইতেছিল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে দিবাকর তাহার রুক্ষস্বর ও তীব্রতর প্রশ্নে ভিতরের ঈর্ষার জ্বালাটা একেবারে অত্যন্ত সুগোচর করিয়া ফেলিল, সেই মুহূর্তেই কিরণময়ীর অন্তরের নিভৃত বেদনাটা হর্ষে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। এই পুলকের আরও একটা বড় কারণ ছিল। ইতিপূর্বে অপরিণত-বুদ্ধি এই তরুণ যুবকটি তাহার প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য-তৃষ্ণায় এই আশ্চর্য নারীর অলৌকিক রূপের পানে যখন তিল-তিল করিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল, কিরণময়ী তখন দেখিয়াও দেখে নাই, জানিয়াও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। কেমন করিয়া সে মধুচক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, কোথায় তাহার মধু সঞ্চিত হইতেছিল, নিরতিশয় অবহেলায় এদিকে সে দৃষ্টিপাত করে নাই। কিন্তু, আজ যখন খোঁচা খাইয়া অকস্মাৎ মধু ঝরিয়া পড়িল, তখন, এই নির্বাসনে যে-লোক তাহার একমাত্র অবলম্বন, তাহারই মধুচক্রের সযত্ন-সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন মধু-ভাণ্ডারের প্রতি কিরণময়ী তাহার একান্ত সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। হাসিয়া বলিল, কার কাছে কিভাবে থাকব, সে খবর শুনে তোমার লাভ কি ঠাকুরপো? যখন ফিরেই যাবে, তখন এ অনাবশ্যক কৌতূহলের কোন সার্থকতাই নেই।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। পরে কহিল, ফিরে যাবই এ কথা ত আমি একবারো বলিনি। ওটা তোমারই মুখের কথা—আমার নয়।

কিরণময়ী বলিল, সে ঠিক। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তোমার মনের কথাই বার হয়ে এসেছে,—বলিয়াই সে তীব্র প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু প্রতিবাদ আসিল না। কিরণময়ী তাহাকে ভাবিবার সময় দিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিল। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল—বাহিরে ঝড়-জলের অশ্রান্ত আক্রমণে জাহাজের মেরুমজ্জা কাঁপিতে লাগিল, খালাসীদের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, কিরণময়ীর ধৈর্যের বাঁধও ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু এ ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটির নিস্তব্ধতা অক্ষুণ্ণ হইয়াই রহিল।

দিবাকর প্রতিবাদ করিবে না ইহাতে কিরণময়ীর যখন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কি তোমার ফিরে যাওয়াই স্থির হলো?

দিবাকর বলিল, না।

কিরণময়ী আর কোন প্রশ্ন করিল না।

ছত্রিশ

সেই রাত্রেই ঝড়জল কমিয়া গেল। সারাদিন অবিশ্রাম মাতামাতি করিয়া মত্ত সিন্ধু ভোরের দিকে শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু উপরের আকাশ প্রসন্ন হইল না—মুখ ভারী করিয়া রহিল।

সকালে ক্ষণকালের জন্য সূর্যোদয় হইল বটে, কিন্তু সূর্যদেব এই জাহাজের ভয়ার্ত অর্ধমৃত যাত্রীদিগকে বাস্তবিক সান্ত্বনা দিয়া গেলেন, কিংবা চোখ রাঙ্গাইয়া অন্তর্ধান হইলেন, নিশ্চিত বুঝা গেল না।

এমনি সময়ে দিবাকর বাহিরে আসিয়া একটা ক্যাম্বিসের আরাম-চৌকির উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িল। কি জানি কেন, আত্মগ্লানির তুষানল আজ তাহাকে আর তেমন করিয়া দগ্ধও করিতেছিল না। লজ্জার বারিধিও আজ তত দুস্তর বোধ হইল না—কোথায় যেন নীল রঙের গাছপালায় ঘেরা একটা অস্পষ্ট কূল ঝাপসা হইয়া চোখে পড়িতে লাগিল। বুকের অসহ্য বোঝাটা এইভাবে যখন হালকা হইয়া আসিয়াছে, তখন স্থির হইয়া বসিয়া দিবাকর আর একবার কিরণময়ীর তর্কটার উপরে নিজের প্রবৃত্তির দাগা বুলাইয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল। কাল রাত্রে কিরণময়ী এই বলিয়া তর্ক করিয়াছিল যে, আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি! সুতরাং, কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিতেছি কি না। আবার এ অধিকার বাহিরের দিকে যেমন, ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি। নিজের উপরেও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারো চেয়ে তুচ্ছ নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপরে অন্যায় করা। এই আমার কথা।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সে আরও বলিয়াছিল, আমরা চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি করিয়া যেমন পরের অধিকারে হাত দিয়া অন্যায় করি, মাতালকে পয়সা যোগাইয়াও ঠিক তাই করি। কেননা, সেখানে তাহার ভাল থাকিবার অধিকারে হাত দিই।

দিবাকর চুপ করিয়া শুনিতেছিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় কহিয়াছিল, যদিও সামাজিক লোকের এই অনধিকার অত্যন্ত ব্যাপক এবং কোথায় ইহার সীমারেখা, কোথায় পা দিলে অনধিকার প্রবেশ হবে না, এই নিয়ে সংসারে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক মতভেদ, তবুও সীমা যে একটা আছেই সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এই সীমা অতিক্রম করবার ক্ষমতা কারও নেই, সমাজেরও না। সমাজ এই সীমা অতিক্রম করে শুধু যে পরকেই নষ্ট করে, তা নয়, নিজেকেও দুর্বল করে—ধ্বংস করে। তোমার এতটা মন ভারী করে থাকবার প্রয়োজন হতো না ঠাকুরপো, যদি একবার এই কথাটিই ভেবে দেখতে যে, আমাকে বাড়ির বাইরে এনে কারো সত্যিকার অধিকারে পা দিয়েছ কি না। আমি বিধবা, আমার উপর কারো ন্যায়সঙ্গত দাবী নেই, তুমিও অবিবাহিত, তোমার হৃদয়ের উপরেও কারো অধিকার নেই। অতএব, আমাকে ভালবেসে তুমি অন্যায় কিছুই করনি, এ কথাটা বোঝা ত শক্ত নয়।

দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়াছিল, সে কি বৌদি, অবৈধ-প্রণয় যদি অন্যায় নয়, তবে সংসারে আর অন্যায় আছে কোথায়?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, অবৈধ কোথায়? যাকে অবৈধ বলে মনে করচ, সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়। ভাল, তোমার অবৈধ জিনিসটি কি শুনি?

দিবাকর উদ্দীপ্ত হইয়া জবাব দিয়াছিল, যাহা বিবাহের দ্বারা সুপবিত্র নয়—যাকে সমাজ স্বীকার করবে না—যাকে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ঘৃণার চক্ষে দেখবে, তাই অবৈধ। এ সোজা কথা।

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, কৈ সোজা? একটু ভেবে দেখলে সোজা কথাও এমনি বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার অনেক বাঁকা জিনিসই হার মেনে যায়। তোমাকে ত অনেকবার বলেচি ঠাকুরপো, তোমার ঐ সুপবিত্র অপবিত্র জ্ঞানটা সংস্কার,—যুক্তি নয়। এই সংসারেই স্ত্রী-পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে, যাকে কোনমতেই পবিত্র বলা যায় না। আমি নজির তুলে আর কথা বাড়াতে চাইনে ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছে হয় ইতিহাস-পুরাণ পড়ে দেখো। অথচ, সে-সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিল এবং অবশেষে বিয়ের মন্ত্র দিয়েও সুপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরপো, আমাদের ঐ পাথুরেঘাটার বাড়ির পাশে যদি কণ্বমুনির আশ্রম থাকত, তা হলে শকুন্তলা যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন, তাতে শুধু মুনিঠাকুরের জাত-গুষ্টি নয়—সমস্ত পাথুরেঘাটার লোককে একঘরে হয়ে থাকতে হতো। কৈ, সে প্রণয়কাহিনী পড়তে ত কোন সতী-সাধ্বীরই চোখমুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে না!

না না, ব্যস্ত হয়ে উঠো না ঠাকুরপো, আমি সতী-সাধ্বীর ওপর কটাক্ষ করচি নে;কিংবা একালে-সেকালে মিলিয়েও দিচ্চিনে। একাল একালই হয়ে থাক, এবং তাঁরা যে যেখানে আছেন, ভাল হয়েই থাকুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, কিন্তু সেকালের শকুন্তলাকে কেন যে একালের কোন নর-নারীই অন্তরে অন্তরে মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারে না এইটেই বিচিত্র।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিয়াছিল, ঘৃণা কেন যে করতে পারে না, জানো ঠাকুরপো, শুধু পারে না এইজন্যেই যে, মিলন তাঁর যেভাবেই হোক, মিলনের আদর্শকে তিনি খাঁটি রেখেছিলেন। যে বন্ধনে এক মুহূর্তেই নিজেকে চিরদিনের মত বেঁধে ফেলেছিলেন সে-বন্ধন পাকা নয় বলে মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন সঙ্কোচ রাখেন নি। তা যদি রাখতেন, তা হলে কালিদাস যতবড় এবং যত মধুর করেই লিখুন না, কোন মানুষের হৃদয়ই এমনি করে

টেনে নিতে পারতেন না। কোন্‌খানটায় আসল কথা, একটু ভাল করে ভেবে দেখ দেখি?

দিবাকরের একটা কথাও ভাল লাগে নাই। সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিল, আদর্শ যেমনই হোক, আজকালকার সমাজ একে স্বীকার করবে না। আর, সমাজে যা স্বীকৃত হবে না, তা বৈধই হোক, অবৈধই হোক, তাতে সমাজকে আঘাত করাই হবে। সমাজে থেকে সমাজকে আঘাত করা, আর আত্মহত্যা করা ত সমান কথা।

কিরণময়ী জবাব দিয়াছিল, ঠাকুরপো, সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়! তোমাকে পূর্বেই ত বলেচি, সব জিনিসেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়। লেখাপড়া শেখার জন্যেই হোক, দেশের জন্যেই হোক, বিলাত যাওয়াটাও সমাজ স্বীকার করেনি। এই নিয়ে একে বারংবার ঘা খেতে হয়েছে। তবু এমনি কঠিন পণ তার, আজও অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারেনি। এতে কি তুমি সমাজের সৎ-বিবেচনার প্রশংসা কর?

দিবাকর বলিয়াছিল, না করিনে। ভাল মনে করার হেতু নেই বলে।

কিরণময়ী কহিয়াছিল, ঠিক তাই। কিন্তু, এই নিঃসংশয়ে স্পষ্ট উত্তর কোথায় পাচ্চ? নিজের বুদ্ধি-বিচারের কাছে—সমাজের কাছে নয় ত?

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যদি সব কাজে নিজের বুদ্ধি-বিচার খাটাতে যায়, তা হলেও ত সমাজ টিকে না!

কিরণময়ী বলিয়াছিল, আমি ত তোমাকে এতক্ষণ এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করচি। সব কাজে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলেও যেমন সমাজ থাকে না, সমাজ যদি সব সময়ে এবং সব কাজে নিজের মতটাই চালাতে যায়, তাতেও মানুষ টিঁকে না। মানুষই ভুল করতে, অন্যায় করতে জানে, আর সমাজই জানে

না ঠাকুরপো? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তায় হোক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক, অন্যায় জিদের বশে হোক—যেভাবেই হোক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল। সে-অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, এমন ক্ষমতা তোমাদের ভগবানেরও নেই!

দিবাকর ইহার উত্তরে কোন কথাই কহে নাই। কিরণময়ীও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, অথচ, এই সীমা কোন সমাজেই চিরদিন একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকে না; প্রয়োজন মত সরে বেড়ায়।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কে সরায়?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, কেউ সরায় না। যে নিয়মে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সরে, সেই নিয়মে এও আপনি সরে। সরেছে কিনা তখন টের পাওয়া যায়, যখন কেউ একে আঘাত করে।

এতক্ষণ পর্যন্ত দিবাকর কিরণময়ীর যুক্তি-তর্কের সমস্তটাই এই পালানোর অনুকূলে মিলাইয়া লইতে গিয়া মনের মধ্যে বাধাই পাইতেছিল। একে ত এই কাজটাকে যৎপরোনাস্তি গর্হিত বলিয়া তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং সমস্ত অপরাধই সে সবিনয়ে গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল, যখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এই গর্বিতা নারী এতবড় অপরাধকেও অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে চাহে না, বরঞ্চ সমাজকেই দোষী করিতে চায়, তখন তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, অথচ শক্ত কথা বলাও তাহার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত। তাই সে শুধু একটুখানি বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিল, এই যেমন সমাজকে আমরা আঘাত করলুম! এখন দেখা যাক, কতখানি দর্প আর কতখানি মোহ সমাজের ছোটে! কি বল বৌদি?

কিরণময়ী দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দিবাকরের প্রতি চাহিয়া জবাব দিয়াছিল, আমরা আঘাত করলাম কৈ ঠাকুরপো? ভয়ে পালিয়ে যাওয়া, আর দাঁড়িয়ে ঘা দেওয়া কি এক জিনিস যে এতে সমাজের দর্প চূর্ণ হবে? এতে

দর্প ত তার বেড়েই যাবে। কিন্তু তুমি বি. এ. পর্যন্ত পড়েচ, না? বলিয়া গায়ের চাদরটা মাথা পর্যন্ত টানিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে মন্দীভূত ঝড়ের চাপাকান্না ভেদ করিয়া উপরে জাহাজের ঘণ্টায় বারটা বাজিয়া গেল। ডেকের একটা চেয়ারের উপর দীর্ঘশ্বাস বুকে করিয়া দিবাকর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ ধরাগলায় ডাক আসিল, ঠাকুরপো!

দিবাকর চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সাড়া দিল, কেন বৌদি?

কিরণময়ী কহিল, তুমি ফিরেই যাও।

দিবাকর জোর দিয়া বলিল, কিছুতেই না।

কিরণময়ী কহিল, না কেন? না বুঝে একটা অন্যায় করেছ। বুঝতে পেরেও তার প্রতিকার করবে না, পাপের বোঝা বয়ে বেড়াবে, আমি ত তার প্রয়োজন দেখিনে ঠাকুরপো।

দিবাকর কহিল, তুমি দেখ না, আমি দেখি। তা ছাড়া ফিরে গেলেই কি পাপের বোঝা নেমে যাবে বৌদি?

কিরণময়ী কহিল, আজই যে যাবে, এ কথা বলিনে। কিন্তু দু'দিন পরে যেতেও ত পারে।

দিবাকর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাবো কোথায়?

কিরণময়ী কহিল, তোমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তোমার উপীনদার কাছে। সমস্তই ত তোমার আছে।

দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা কিছু আমার আছে বলচ—তা আমার নেই, এ কথা তুমি জান। আছে শুধু উপীনদা, কিন্তু তাঁকে কি তুমি চিনতে পারনি? তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে বল বৌদি?

হাঁ, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে বলি।

দিবাকর খানিক চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, ভেবেছিলাম তাঁকে তুমি চিনেছ। কিন্তু চেননি। আমিও যে চিনি তাও নয়। হয়ত

ভাল করে তাঁকে চেনাই যায় না। কিন্তু শিশুকাল থেকে তাঁরই হাতে মানুষ হয়ে এটুকু বুঝতে পেরেচি যে, এর পর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে আমার পক্ষে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ।

হঠাৎ কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল। দিবাকরের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কেন, তিনি কি এতই নিষ্ঠুর? যে-দোষ তোমার নয়, সে কথা বুঝিয়ে বললেও কি তোমাকে শাস্তি দেবেন? এ কখনই সম্ভব হতে পারে না ঠাকুরপো!

কিরণময়ীর আকস্মিক উৎসাহ দিবাকর লক্ষ্য করিল না। দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কের মত আস্তে আস্তে বলিল, তাঁকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। কেমন করে তিনি সমস্তই জানতে পারেন। অবশ্য, তোমার মত করে আমি ভাবতে পারিনে যে, আমার দোষ নেই, কিন্তু যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, যদি সত্যই আমি নির্দোষ হই, তা হলে যেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, সেই দিনই তিনি জানতে পারবেন। কিন্তু দাঁড়াতে পারব না। তুমি শাস্তির কথা বলছিলে—কি করে জানব বৌদি, কি শাস্তি তিনি দেবেন! আজও কোনো দিন আমাকে তিনি শাস্তি দেননি।

আর সে বলিতে পারিল না। দুই করতল চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া গেল।

কিরণময়ী কোন কথাই বলিল না—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের বিপ্লব শুধু তাহার অন্তর্যামী জানিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দিবাকর কথা কহিল। নিরতিশয় ব্যথিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাল তুমি বললে, উপীনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে-রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল, কোন্ রাগে যে এ কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাইনে। হেতু তোমার হয়ত কিছু আছেই, কিন্তু সে কারণ যাই হোক, ও-মাথা হেঁট করবার দুঃখ যে কত বড় তা যদি জানতে, অমন কথা মুখেও আনতে না।

তা ছাড়া ও-সব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায়, তবে কোনদিন নিজেদের মাথা তুলবো আমরা কোন্ দিকে চেয়ে? তুমি সে চেষ্টা করো না। যতক্ষণ না তিনি হেঁট হয়ে আমাদের পানে তাকান, ততক্ষণ তাঁর মাথা হেঁট করবার ক্ষমতা সংসারে কারও নেই বৌদি। এই কথাটা আমার সত্যি বলে বিশ্বাস করো।

সেই গভীর রাত্রে এই দুটি বিপরীত প্রকৃতি, উপেন্দ্রর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তটে আসিয়া সহসা একান্তভাবে সম্মিলিত হইল। যেখানে কোন বিরোধই ছিল না, যেখানে বলিবার অপেক্ষা শুনিবার, বুঝাইবার অপেক্ষা বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাই নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রত্যুষে কখন যে দিবাকর শয্যা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, ঘুমন্ত কিরণময়ী টের পায় নাই। তাই ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দিবাকরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাল রাত্রে কথায় কথায় কিরণময়ী অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিল। দিবাকর যে সত্যই কত নিঃসহায়, এবং তাহার উপীনদাদা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে তাহার পক্ষে কিরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ইহা অত্যন্ত নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা অবধি কিরণময়ী তাহার নারী-হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে এতটুকু স্বস্তি পাইতেছিল না।

এই সরল, বিনীত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র যুবকটিকে তাহার জীবনের প্রারম্ভেই অকারণে কক্ষভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ার অপরাধ তাহার ঘুমের মধ্যেও তাহাকে বিঁধিয়াছিল। তাই সে ঘুম ভাঙ্গিতেই একটা অভিনব স্নেহের সহিত বেদনার সহিত এই নিরপরাধ হতভাগ্যের দিকে প্রথমেই মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দিবাকর নাই। উঠিয়া বাহিরে সন্ধান করিয়া দেখিল, দেখা গেল না। তাহাদের 'বয়'কে ডাকিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিল, সেও দেখা পাইল না।

সেই অবধি কিরণময়ী উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আজ এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও বহুদূরাগত মৃদু সুগন্ধের মত একটি অস্পষ্ট আনন্দের আভাস উপলব্ধি করিয়া তাহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অতি তুচ্ছ দিবাকর, যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, কোনদিন ভালবাসিতে পারে না, বুদ্ধির বিপাকে তাহারই ঘর করিতে হইবে, ভালবাসার অভিনয় করিতে হইবে, জাহাজে উঠিয়া পর্যন্ত এই ধিক্কার ভিতরে ভিতরে তাহাকে যেন পাগল করিয়া আনিতেছিল।

আবার এইখানে শেষ নয়। এই দেখানো ভালবাসার টানাটানি একদিন ছিঁড়িবেই ছিঁড়িবে, এই ছদ্মলীলা একদিন যে কিছুতেই ভাল লাগিবে না, ডাক্তার অনঙ্গমোহন সে-শিক্ষা ভাল করিয়াই দিয়াছিল। সেই দুর্দিনেই যে প্রাণান্তকর ঘৃণার ফাঁস কাটিয়া কাটিয়া তাহার গলায় বসিতে থাকিবে, সে দড়িটা যে সে কোন্ অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিবে এ দুশ্চিন্তার সে কোথাও শেষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু, কাল গভীর রাত্রে উপেন্দ্রর রাজসিংহাসন-তলে বসিয়া উভয়ের সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া এই নিরীহ ছেলেটার জন্যই করুণায় ব্যথায় কিরণময়ী একদিকে যেমন পীড়িত হইয়া উঠিল, এই অবশ্যম্ভাবী ঘৃণার বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইয়া তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একলা ঘরের মধ্যে বসিয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বারংবার এই কথাই বলিতে লাগিল, আর আমার ভয় নেই—আমার কোন ভয় নেই। যাকে ভালবাসতে পারব না, অন্ততঃ স্নেহ দিয়েও তার মনের কালি অনেকখানি মুছে দিতে পারব। তথাপি একটা ভয় তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল,—পাছে অগ্নির প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া একদিন দিবাকর পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। তাহার রূপের আকর্ষণের যে কি দুর্নিবার শক্তি, ইহাও ত তাহার অবিদিত ছিল না।

মনে পড়িল তাহার মৃত স্বামীর কথা। সেই শুষ্ক কঠোর মূর্তিমান বিদ্যার অভিমান! বিজ্ঞানের শক্ত বেড়া দিয়া যিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দিবারাত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন—সেই স্বামী। তাঁহার কাছে সে ত একদিনও যাইতে পারে নাই, তবু ত দিন কাটিয়াছিল।

লিখিয়া পড়িয়া, ভাত রাঁধিয়া, শাশুড়ীর বকুনি খাইয়া, ঘরের কাজকর্ম করিয়া দিনের বেলা কাটিত; রাত্রে পরকালের বিরুদ্ধে আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, নালিশ করিয়া, গ্লানি করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত দূষিত বিষাক্ত করিয়া দিয়া ক্লান্ত জর্জর হইয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত; আবার প্রভাত হইত, আবার রাত্রি আসিত, এমনি করিয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়িতে ভিক্ষা দাও মা, বলিয়া ভিখারী প্রবেশ করে নাই। কেমন আছ, বলিয়া প্রতিবেশী সংবাদ লয় নাই; একদিনের জন্য সূর্যের কিরণ আলো ফেলে নাই, এক মুহূর্তের জন্য আকাশের বায়ু পথ ভুলিয়া প্রবেশ করে নাই,—তবু দীর্ঘ দশ বৎসর গত হইয়াছিল। তাহার মা-বাপের কথা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে বালিকা-বয়সে কালনার কাছে একটা ক্ষুদ্র গ্রামের কোন এক নিরানন্দ মাতুল-সংসার হইতে বাহির হইয়া একদিন বধূর সজ্জায় এই অন্ধকার বাড়িটাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামী ছোট ছাত্রীটির মত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সেদিন পর্যন্ত গুরু-শিষ্যার কঠোর সম্বন্ধ আর ঘুচে নাই। স্বামী একদিনের জন্যও আদর করেন নাই, ভালবাসিতেন কি না, একদিনের জন্যও সে কথা বলিয়া যান নাই।

বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী পাঠ দিতেন, পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠ মুখস্থ করিতে না পারিলে তিরস্কার করিতেন, প্রহারও না করিতেন নয়। রাগ-অভিমানের পরিবর্তে কোনদিন সাধেন নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলে কোনদিন ঘুম ভাঙ্গাইয়া খাইতে বলেন নাই—এই ত তাহার বধূ-জীবনের ইতিহাস!

শাশুড়ীর পরীক্ষা ছিল আরও কঠোর। সেখানে অতি ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তিরও ক্ষমা ছিল না। অঘোরময়ী তাঁহার রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি-খুন্তি হইতে পোড়া কাঠ পর্যন্ত সবগুলির চিহ্নই এই ছোট বধূটির দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন কি একটা অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়া তিনি বালিকার সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া দিলেন। দুঃখে অভিমানে বধূ যখন রান্নাঘরের এক কোণে মুখ ঢাকিয়া

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন পিঠের উপরে জ্বলন্ত কাঠের খোঁচা দিয়া অঘোরময়ী চুপ করিতে আদেশ করিলেন। সেই দগ্ধ-ক্ষত আরোগ্য হইতে কিরণময়ীর এক মাস লাগিয়াছিল।

হঠাৎ যেন সেই ক্ষতটাই জ্বালা করিয়া উঠিল। কিরণময়ী মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হইয়া আবার স্থির হইয়া বসিল।

কবে যে সে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পা দিয়াছিল, এ কথা সে মনে করিতে পারে না। সে কথা স্মরণ করাইবার কোন স্মৃতিই তাহার নাই। বোধ করি বা ঊষার মত নিঃশব্দেই সে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহঙ্কারে দেহের কূল-উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল।

কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী-কর্ত্রী হইয়া উঠিল, এ কথা সে একবারো ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। স্বামী বলিতেন, সুখই জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ্য! দয়া, ধর্ম, পুণ্য, এ সমস্তই ওই উপলক্ষ্য। হয় ইহকাল নয় পরকালে; হয় নিজের, না হয় পাঁচজনের; হয় স্বদেশের, না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে সুখের সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই জীবের কর্ম, এবং জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে ফেলিয়া সমস্ত ভালমন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের সেদিকে চাহিয়ো না। কিরণ, তুমি কেবল এটি বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কি না।

কিরণ কহিত, ঠিক তাই; কিন্তু কি করিয়া জানিব, আমার কাজে সংসারে সুখের সমষ্টি বাড়িতেছে? সুখের চেহারা ত সকলের কাছে এক নয়।

হারান তাহার জ্যোতিহীন চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য ঝুল-মাখানো অন্ধকার কড়ি-বরগার দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিত, খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে এক নয় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে এক। তোমাকে তাহারি উপরে বিচার করিতে হইবে।

কিরণময়ীর কাছে সুখের কোন রূপই সুস্পষ্ট নয়, সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিত, 'খণ্ড খণ্ড করিয়া', 'সমগ্র করিয়া' ও-সব কথার কথা। নিজের কিসে সুখ হয়, এইটিই বড় জোর মানুষে বুঝতে পারে; তাও আবার সব সময়ে সব অবস্থায় ঠিকমত পারে না। যখন নিজের সম্বন্ধেই মানুষ নির্ভুল নয়, তখন সমস্ত জগতের দায় হাতে করতে যার সাহস হয় হোক, আমার হয় না। ওই, ওপারের জুটমিলের কাজীরা হয়ত মনে করে, যদি সম্ভব হয় কাশীর সমস্ত মন্দিরগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়ে পাটের কল তৈরী করতে পারলেই মানুষের সুখের মাত্রা বাড়বে, কিন্তু সবাই কি তাই মনে করবে! সুখ জিনিসটি যে কি, এ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, ততক্ষণ আমি তোমার কোন কথাই শুনব না; বলিয়া কিরণময়ী যাইবার উপক্রম করিতেই হারান হাত ধরিয়া বলিতেন, একটু বসো। এত পড়াশুনার পরেও যদি তুমি এত অল্পেই রেগে ওঠ, তা হলে সমস্তই মিছে হয়ে যায়। দেখ কিরণ, আমি তোমাকে সত্যিই বলি,—সুখ জিনিসটি যে কি, আমি ঠিক জানিনে। কোন দেশে কেউ কখনও জেনেছিল কিনা তাও আমার জানা নেই—ওটা বোধ হয় জানাই যায় না। আমাদের দেশে বহু পূর্বেই তিন রকম দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা হয়ে গেছে—ও-তিনটে বাদ দিয়ে যে জিনিসটি পাওয়া যায়, তাই যে সুখ—তাও বলা চলে না।

প্রত্যুত্তরে কিরণময়ী অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিত, কিছুই যখন বলা চলে না, তখন কারো সুখের কল্পনাকে পরিহাস করাও যেমন অসঙ্গত, সাধারণভাবে সংসারে সুখের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাও তেমনি ক্ষ্যাপামি। ভাল-মন্দ মেপে দেবার পূর্বেই তোমার তুলাদণ্ডটির দণ্ডটি নির্ভুল হওয়া চাই। সেইটি নির্ভুল করবে যে তুমি কোন্ আদর্শে, আমি তাই ত ভেবে পাইনে।

হারান ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, কিরণ, জানি তোমার মনের গতি কোন্ দিকে ঝুঁকে আছে। কিন্তু, যতদিন তুমি পরকালের কল্পনা, আত্মার কল্পনা, ঈশ্বরের কল্পনা, প্রভৃতি জঞ্জালগুলি মনের মধ্যে থেকে পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে না ফেলতে পারবে, ততদিন সংশয় তোমার থেকেই যাবে। সুখই যে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য এবং সুখী হওয়াই যে জীবনের চরম সার্থকতা, এ কথা বুঝেও বুঝবে না। কেবলই মনে হতে থাকবে, কে জানে, হয়ত বা আরো কিছু আছে। অথচ এই আরো কিছুর সন্ধান কোনোদিনই খুঁজে পাবে না। এ তোমাকে ব্যস্ত করে রাখবে, অথচ গতি দেবে না, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে, কিন্তু পরিতৃপ্তি দেবে না। পথের গল্পই বলবে, কিন্তু কোনদিন পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না।

এইভাবে, শিক্ষা ও সংস্কারের মাঝখানে কিরণময়ী মানুষ হইয়া উঠিয়াছে,—আজ তাহার একটি একটি করিয়া সে কথা মনে পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া তাহার চিন্তার ধারা যখন বর্তমান দুঃখকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া অতীত দিনের অগাধ অতল দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছিল, এমনি এক সময়ে কোথা হইতে দিবাকর শুষ্ক ম্লানমুখে কেবিনের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই কিরণময়ীর দুঃস্বপ্নের ঘোর এক নিমিষে কাটিয়া গেল; সে মুখখানি স্নেহ-হাস্যে উজ্জ্বল করিয়া তিরস্কারের স্বরে কহিল, ব্যাপার কি বল ত ঠাকুরপো? কি করে বেড়াচ্চো, খেতে-দেতে হবে না নাকি? আচ্ছা ছেলে বাপু!

তাহার কণ্ঠস্বরে দিবাকর এতদিনের পরে একেবারে চমকিয়া গেল। অকস্মাৎ মনে পড়িল যে, কত শত সহস্র বৎসর বহিয়া গিয়াছে, বৌদিদির এই কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায় নাই। সে স্বরে বিদ্বেষ-বিদ্রূপের জ্বালা নাই, তাহা যথার্থই স্নেহের বেদনায় কোমল, মানুষের কান সেখানে ভুল করে না—কি করিয়া সে যেন চিনিতে পারে। দিবাকর অভিভূতের ন্যায় চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী পুনরায় মৃদু হাসিয়া কহিল, সকালবেলা থেকে এতক্ষণ ছিলে কোথা শুনি?

দিবাকর আস্তে আস্তে বলিল, নীচে।

নীচে! এতটা বেলা পর্যন্ত নীচে বসে কেন? একবার উপরে এসে কিছু মুখে দিয়ে যাবারও বুঝি ফুরসত পাওনি?

প্রত্যুত্তরে দিবাকর শুধু অপলক-চক্ষে চাহিয়াই রহিল—মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

কিরণময়ী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কি করছিলে নীচে?

তাহার মুখের উপর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেই নির্মল স্নেহ-হাস্য, কণ্ঠে ভালবাসার তেমনি অনুরাগ, যাহা কলিকাতায় প্রথম আসিয়া ইঁহারই কাছে লাভ করিয়া দিবাকর কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল, সে কোনমতে তাহা নিবারণ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বৌদি, নীচে একজন বাঙালী পরিবার নিয়ে আরাকানে যাচ্ছে,—তাঁদের সেখানে বাড়ি পর্যন্ত আছে—

কিরণময়ী উৎসুক হইয়া বলিল, বল কি ঠাকুরপো?

দিবাকর কহিল, সত্যি, বৌদি, বেশ লোক তাঁরা—

কিরণময়ী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, তা হলে আমরা ত তাঁদের বাড়ি গিয়েই উঠতে পারি। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ভাব করে দিতে পার না?

দিবাকর খুশী হইয়া বলিল, কেন পারব না? বাড়িউলীটি বলছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার—

কিরণময়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িউলীটি আবার কে ঠাকুরপো?

দিবাকর কামিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কহিল, হরিশবাবু ওই বলেই তাঁর স্ত্রীকে ডাকেন যে। একখানা বাড়ি আছে কিনা তাঁদের।

শুনিয়া কিরণময়ী মৌন হইয়া রহিল। কারণ, এই 'বাড়িউলী' শব্দটি সে ইতিপূর্বে কলিকাতার দাসীদের মুখে যে-সকল গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছে, তাঁহারা কেহই ভদ্রগৃহিণী নহেন। তাই দিবাকর যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিবার জন্য উদ্যত হইল, তখন কিরণময়ী একটু হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তিনি ভালো লোক ত ঠাকুরপো?

দিবাকর তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, চমৎকার মানুষ তাঁরা বৌদি! একবার আলাপ হলে—

কিরণময়ী বলিল, না হয় আজ থাক ঠাকুরপো। আর একদিন—

দিবাকর মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি, তিনি এখুনি আসতে চাচ্চেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠতেই হবে, তখন,...যাবো বৌদি ডেকে আনতে? বলিয়া দিবাকর প্রায় অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখ, মুখ, কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া ছোটভায়ের স্নেহের আবদার তাহার ভুলটাকে যেন তপ্ত শূলের মত করিয়া কিরণময়ীর হৃদয়ে বিঁধিল। অকস্মাৎ প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল এবং উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে কিরণময়ী মুখ ফিরাইয়া কোনমতে বলিল, আচ্ছা, তবে যাও—

কথাটা সত্য যে, একটা অজানা-স্থানে যাইবার পথে বন্ধুলাভ কম ভাগ্য নয়। অবশেষে এই মনে করিয়াই বোধ করি সে দিবাকরের ব্যগ্র অনুরোধ স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু সে যখন সত্যই তাহাকে ডাকিয়া আনিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, তখন নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া কিরণময়ী মনের মধ্যে ভারী একটা লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে বাঙালীর মেয়ে, তাহার বয়স হইয়াছে কি জানি তাহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা! দিবাকরের সহিত তুলনায় তাহার নিজের বয়সটাই শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাঙালী

সমাজে এমনি দৃষ্টিকটু যে, কেবল এই কথাটা মনে করিয়াই কিরণময়ীর হৃদয় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

অনতিকাল পরেই দিবাকরের পিছনে বাড়িউলী আসিয়া হাজির হইল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই কিরণময়ী টের পাইল এ ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক নহে। যাহারা কলিকাতায় দাসীবৃত্তি করিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই একজন। তাহার বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, হাসিমুখে কহিল, এসো, বসো।

রূপ দেখিয়া বাড়িউলী ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল, বাবুর মুখে শুনে বাড়িআলা বললে, যা বাড়িউলী, বামুন-মাকে একটা নমস্কার করে আয়। তা মগের দেশে যাচ্চো বটে বৌমা, কিন্তু এই কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে টুঁ শব্দ করে যায় এমন ব্যাটা-বেটি কেউ নেই। খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব না? বলিয়া খ্যাংরার অভাবে বাড়িউলী শুধু হাতটাই একবার উঁচু করিয়া নাড়িয়া দিল।

কিরণময়ী খুশী হইয়া বলিল, বাঁচলুম বাছা, নতুন জায়গায় যেতে কতই না ভয় হচ্ছিল, কতই না দুজনে ভাবছিলুম।

বাড়িউলী কহিল, ভয় কি মা? আমি আরাকানের একটা ডাকসাইটে বাড়িউলী। নাম করলে যমে পথ ছেড়ে দেয়। তা চল বাছা, আমার ওখানে কোন কষ্ট হবে না। ভাড়া পাঁচ টাকা করেই বাঁধা, তা তোমরা চার টাকা করেই দিয়ো; তার পরে বাবুর একটা কাজকর্ম হলে সে তখন বোঝা যাবে। আর সেজন্যে চিন্তা করো না বৌমা, আমার বাড়িআলা গিয়ে যে সাহেবকে ধরবে, সে নাকি আবার না বলবে? তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে তেমন খাতির আমরা রাখিনে, বলিয়া কামিনী ওষ্ঠাধর প্রসারিত করিয়া ঘাড়টা বার-দুই দক্ষিণে ও বামে হেলাইয়া দিল।

কিরণময়ী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, ভগবান তোমাদের ভাল করবেন বাছা।

তাহার মুখের প্রতি বাড়িউলী হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এ কি কাণ্ড বৌমা! এমনি মাথা ঘষেচ যে একফোঁটা সিঁদুরের দাগ পর্যন্ত সিঁথিতে নেই! কৌটাটা একবার দাও, পরিয়ে দিয়ে যাই।

কিরণময়ী ইহার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঁ হাতটা দেখাইয়া কহিল, না বাছা, মাথা ঘষার জন্যে নয়। নোয়া-সিঁদুর আমার এক বছর থেকে মা-কালীর পায়ে বাঁধা আছে। ও বছর বাবুর প্রাণের আশা আর ছিল না,—সিঁদুর নোয়া বাঁধা রেখেই ও-দুটো কোনমতে বজায় রাখতে পেরেছি মা, বলিয়া সে একটুখানি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আড়চোখে দিবাকরের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানা লজ্জায় কুণ্ঠায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাই ত বলি মা! বলিয়া বাড়িউলীও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিল, তা আমাদের আরাকানেও কালীবাড়ি আছে। পৌঁছেই একটা পূজো-আচ্চা যা হোক দিয়ে নোয়া-সিঁদুর ছাড়িয়ে নিয়ো বৌমা, নইলে পাঁচজনে পাঁচরকম ভাবতেও বা পারে। এমন হারামজাদা জায়গা আরাকানের মত আর ত্রিসংসারে আছে নাকি! শুধু আমাদের ভয়েই যা একটু শাসন আছে, নইলে—

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, সেই কথাই ত বাবুর সঙ্গে আজ দু'দিন ধরে কেবলই হচ্ছে। কত সুখ্যাতিই যে উনি তোমাদের করছিলেন, সে আর তোমার মুখের সামনে কি বলব! জাহাজে উঠে পর্যন্তই দুজনে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্চি, বাছা, কি হবে! তা ভগবান—

কথাটা শেষ হইতেও পাইল না,—ভয় কি মা! বলিয়া অভয় দিয়া বাড়িউলী আত্মশ্লাঘায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে উভয়ের ঘর-কন্না সুখ-দুঃখের গল্প এমনি জমিয়া উঠিল যে, কে বলিবে দশ মিনিট পূর্বে দুজনের লেশমাত্র পরিচয়ও ছিল না।

অদূরে চৌকিটার উপর দিবাকর সেই যে আসিয়াই বসিয়া পড়িয়াছিল, আর উঠে নাই। কিরণময়ী কত মিথ্যা যে কিরূপে অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে

বলিয়া যাইতে পারে, শুনিতে শুনিতে সে যেন একপ্রকার হতচেতনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণের পর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে উঠিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী বলিয়া উঠিল, সারাদিন খাওনি, আবার বাহিরে যাচ্চ যে?

প্রত্যুত্তরে দিবাকর যাহা কহিল তাহা শোনা গেল না, কিন্তু বুঝা গেল। কিরণময়ী ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, তা হবে না। তুমি একবার বাইরে গেলে আর শিগগির আসবে না, আমি বেশ জানি। বাড়িউলীর মুখের পানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত চিরকালটা এই আমার জ্বালা! খাওয়ার জন্যে যেন মারামারি করতে হয় বাছা। আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি যাই, তাই জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতে পারি বাড়িউলী, আর কোন মেয়ে হলে তার শুধু চোখের জল আর উপোস সার হতো।

নিদারুণ লজ্জায় দিবাকরের মাথাটা একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল।

বাড়িউলী হাসিয়া বলিল, হাঁ বাবু, এমন করে বুঝি দুটিতে বিদেশে গিয়ে ঘরকন্না করবে! কিন্তু আমার বাড়িতে সে হবে না বাবু, বৌমাকে জ্বালাতন করতে আমি কিছুতেই দেব না, তা বলে দিচ্ছি। কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়াই হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বলিল, হাঁ বৌমা, বাবু বুঝি তোমার চেয়ে বেশী বড় নয়, যেন সমবয়সী বলে মনে হয়,—না?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া কহিল, কুলীনের ঘর বাছা, আমিই যে বড় হয়ে যাইনি, এই আমার ভাগ্যি! তা প্রায় সমবয়সী বৈ কি! ওঁর জন্ম বোশেখ মাসে, আমার জন্ম আষাঢ়ে—এই মোটে দুটি মাসের বড় বৈ ত নয়। অনেকে যে আমাকেই বয়সে বড় বলে ঠাওরায়! মা গো! কি লজ্জা! বলিয়া কিরণময়ী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বাড়িউলী এ হাসিতে যোগ দিল না। বরঞ্চ গম্ভীরমুখে কহিল, কুলীনের ঘরে আর লজ্জা কি মা! দশ বছরের বরের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর বিয়েও

যে হয়ে যায় শুনি। তা হোক মা, সে জন্যে নয়, তবে গিয়ে পূজোটা দিয়ে নোয়া-সিঁদুর পরো, নইলে এ' স্ত্রী মানুষকে যেন মানায় না। এখন তবে উঠি, তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর, আবার না হয় সন্ধ্যের পরে আসব, বলিয়া বাড়িউলী কিরণময়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গাত্রোত্থান করিল।

সাঁইত্রিশ

সতীশের অরণ্যবাসের ব্যবস্থাটা যদিচ আজও তেমনি আছে বটে, কিন্তু তাহার সেই বৈরাগ্যসাধনের ধারাটা ইতিমধ্যেই যে কতখানি বিপথে সরিয়া গিয়াছে, তাহা যে-কেহ তাহাকে মাস-দুই পূর্বে দেখিয়াছে তাহারই চোখে পড়িবে।

যে লোক স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া এই নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে একাকী বাস করিতে আসিয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বেশভূষার প্রতি অনুরাগের হেতুটাই বা কি এবং কেনই বা পাখির গানের পরিবর্তে তাহার নিজের গানের খাতাটা আবার তোরঙ্গের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল, বেহালা, সেতার, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলাই বা কেন তাহাদের অনাদৃত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সাবেক দিনের মত টেবিলের উপরে আসিয়া জুটিল, তাহার মুখচোখের সেই মলিন ছায়াটাই বা কি করিয়া সহসা তিরোহিত হইয়া গেল—এ-সব ভাবিবার কথা বটে!

বস্তুতঃ, মাস দুই-তিন পূর্বের সতীশকে এখন হঠাৎ যেন চেনাই ভার!

কিন্তু এই এতবড় অদ্ভুত পরিবর্তনের আসল কারণটা হয়ত এখানে খুলিয়া না বলিলেও চলিত, কিন্তু পাছে সাঁওতাল-পরগণার অসাধারণ জলহাওয়ার গুণ মনে করিয়া কতকগুলা নির্বোধের দল ছুটিয়া আসিয়া পড়ে, এই শুধু ভয়!

সুতরাং এটুকু আভাসে বলা প্রয়োজন যে, কোন পক্ষ হইতেই যদিচ বিবাহের প্রস্তাবটাকে এখনও স্পষ্ট করিয়া উত্থাপিত করা হয় নাই, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাছে সতীশ-সরোজিনীর মনের কথাটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে বাকী ছিল না।

সরোজিনীর জননী জগৎতারিণীর আগ্রহটাই যে এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী, তাহা বছর খানেক পূর্বে কলিকাতাতেই জানা গিয়াছিল। কিন্তু আগ্রহ এবং

ব্যাকুলতা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ করি সমস্ত লোকের মধ্যে শুদ্ধ মাত্র তাঁরই মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ছিল, কি জানি তাঁর শিক্ষিতাভিমানিনী কন্যা চিরদিনের সমাজ ও সংস্কার কাটাইয়া সতীশকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে কি না! সম্প্রতি তিনি বাপের বাড়ি শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াই কথাটা তিনিই পাকা করিয়া লইবেন এমনই একটা ইঙ্গিত যাইবার সময় জগৎতারিণী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকালে সতীশ বেহালায় নূতন তার চড়াইতেছিল, বেহারীর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি জ্যোতিষবাবুর বাড়ির সরকার। জগৎতারিণীর সঙ্গে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সরকার নমস্কার করিয়া জানাইল, মা আপনাকে আজ আহারের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।

খবর শুনিয়া সতীশের বুকের রক্ত চমক খাইয়া গেল, কহিল, তিনি কবে ফিরে এলেন?

সরকার কহিল, আজ তিনদিন হলো।

প্রায় ছয়-সাতদিন হইল সতীশ ওদিকে যায় নাই। তাহাদের সম্বন্ধটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইবার পর হইতে জ্যোতিষবাবুর বাড়িতে যখন-তখন বেড়াইতে যাইতে তাহার লজ্জা করিত। কহিল, আচ্ছা, মাকে জানাবেন আমি দশটা-এগারটার মধ্যেই গিয়ে হাজির হব।

যে আজ্ঞা, বলিয়া লোকটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াও জগৎতারিণী আহারের কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, সতীশ সন্ধ্যার পূর্বে আসিবে না। এখন সরকারের মুখে খবর শুনিয়া তিনি ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

আজ ছিল একাদশী। তাঁহার নিজের জন্য কোনরূপ আয়োজনের আবশ্যক ছিল না, এবং যে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার দ্বারা তাঁহার রাঁধাবাড়ার কাজ চলিত, তিনিও দিন-দুই হইতেই শান্তিপুরের কল্যাণে ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত ছিলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরকারকে কহিলেন, তুমি এবেলা খাবার কথা বলে আসতে গেলে কেন? তোমার কি কোন বুদ্ধিই নেই?

সরকার ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি বলিনি, তিনি নিজেই এবেলার কথা বলেছিলেন।

জগৎতারিণী তখন রাগ করিয়া হুকুম করিলেন, তবে তুমিই যাও বাপু, ভাল মাছ-টাছ কোথায় পাওয়া যায়, শিগগির নিয়ে এসো।

আজ সকাল হইতেই যেজন্য তাঁহার মন বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার হেতু ছিল। সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইবার পরে তিনি খবর পাইয়াছেন কাল রাত্রে সহসা শশাঙ্কমোহন পুনরায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন। এই লোকটাকে উৎকট সাহেবীয়ানার জন্য তিনি কোনদিন দেখিতে পারিতেন না, এবং বিশেষ করিয়া যখন হইতে শুনিয়াছিলেন সে সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী তখন হইতে লোকটি তাঁহার দু'চক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল। দিন-কুড়ি পূর্বে যখন সে কি উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছিল তখন জগৎতারিণী তাহাকে একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ অসম্ভব। তবুও বেহায়া লোকটা বলা

নাই, কহা নাই, আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়াই তাঁহার চিত্ত সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, এ সংবাদ একটুখানি পূর্বাহ্ণে জানিতে পারিলে আজ সতীশকে হয়ত তিনি নিমন্ত্রণ করিতেই পাঠাইতেন না। কেন এ খবর যথাসময়ে তাঁহাকে জানান হয় নাই বলিয়া তিনি জ্যোতিষ হইতে বাড়ির বেহারাটা পর্যন্ত সকলের উপরেই চটিয়া গিয়াছিলেন। সরোজিনী বাহিরে

বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া কোনমতে মায়ের চোখ এড়াইয়া উপরে যাইতেছিল—শশাঙ্কমোহনের আগমন সেও জানিত না। কিন্তু জগৎতারিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার আপাদমস্তক ক্ষণকাল নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া গূঢ় ক্রোধের স্বরে বলিলেন, বেড়ানো হলো ত? এখন জুতা-মোজাটা একদণ্ড ছাড় বাছা! সতীশ আজ এখানে খাবে, আমি নিজে না রাঁধলে ত তোমাদের এই খ্রিষ্টানের বাড়িতে সে জলস্পর্শ করবে না। যাও, ঘাগ্‌রা-টাগ্‌রা ছেড়ে আমার রান্নাঘরে এসো গে। বুড়ো মায়ের একটুখানি সাহায্য করলে তোমাদের যীশুখৃষ্ট রাগ করবেন না বাছা, যাও।

মা রাগিলে যে কিরূপ অগ্নিমূর্তি হইতেন এবং সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে লঙ্ঘন করিয়া যা মুখে আসে বলিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সরোজিনী কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমি এখুনি আসচি মা।

কিন্তু মায়ের রাগ তাহাতে কিছুমাত্র শান্ত হইল না; বলিলেন, এসেই বা আমার কি মাথা কিনবে মা? সতের-আঠার বছরের মেয়ে হলে, আজও এক মুঠা চাল সিদ্ধ করতে শিখলে না। আমরাও গরীবের ঘরের মেয়ে ছিলুম না মা, কিন্তু ও-বয়সে সংসার চালিয়ে এসেচি। বামুনমেয়ে আজ যদি চলে যায়, আমাকে তা হলে খাবার অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। যে ঘর-সংসারে ধর্ম-কর্ম নেই, সে ঘরে ছেলেমেয়ে পেটে ধরাই বৃথা! এই কঠোর মন্তব্য অত্যন্ত কঠিন করিয়া ব্যক্ত করিয়া জগৎতারিণী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া নিজেই রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কেন যে তাঁহার নিজের ছেলে-মেয়ে এবং নিজের সংসারের আচার-ব্যবহারের উপর এই মর্মান্তিক আক্রোশ, তাহা তাঁহার পূর্ব-ইতিহাস হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।

জগৎতারিণীর পরলোকগত স্বামী পরেশনাথ ওকালতি করিয়া অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়াও যখন অনেক বয়সে অধিকতর উপার্জনের আশায় ব্যারিস্টার হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন স্ত্রী কান্নাকাটি করিয়া, উপবাস করিয়া, মাথা

খুঁড়িয়া অশেষ প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পরেশনাথ কোন কথা শুনিলেন না, জগৎতারিণীকে এবং বারো বৎসরের পুত্র জ্যোতিষ ও ছয় বৎসরের কন্যা সরোজিনীকে দেশের মাটিতে রাখিয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। প্রথম কয়েকদিন জগৎতারিণী একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বামীর উপর চিত্ত তাঁহার চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গেল। কিছুদিনের পর পরেশনাথ ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন, কলিকাতায় নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নূতন ধরনে বাড়িঘর সাজাইতে শুরু করিলেন, বয়-বাবুর্চি নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু জগৎতারিণী নীরবে পৃথক হইয়া রহিলেন—স্বামীর গৃহকর্মে লেশমাত্র যোগদান করিলেন না। এমনি করিয়া দিন দিন স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ নিদারুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। বাক্যালাপ ত বন্ধই ছিল, সংবাদ লওয়াও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল।

একদিন জ্যোতিষ আসিয়া কহিল মা, বাবা আমাকে বিলেতে পাঠাতে চাচ্চেন।

এ আশঙ্কা জননীর ছিলই, তিনি অত্যন্ত কঠিন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে?

জ্যোতিষ কহিল, বোধ করি মাস-দুয়ের মধ্যেই।

আচ্ছা, বলিয়া মা মুখ অন্ধকার করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বিলাত-যাত্রার দিন তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখ হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া গেল। পরেশনাথ সরোজিনীকে সঙ্গে করিয়া বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, জগৎতারিণী শান্তিপুরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার খুড়শ্বশুর গোবিন্দবাবু সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বাটীতে

আহারাদি করেন নাই। সুতরাং স্ত্রীর গৃহত্যাগের কারণ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু জগৎতারিণী আসিলেন না। পরেশনাথ সরোজিনীকে বোর্ডিঙে ভরতি করিয়া দিলেন এবং প্র্যাক্‌টিস প্রায় ছাড়িয়া শূন্য বাটীতে অদ্ভুত কীর্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন। জগৎতারিণী পিত্রালয়ে থাকিয়া স্বামীর অধঃপতনের সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বাধা দিবার লেশমাত্র চেষ্টা করিলেন না। যে স্বামী তাঁহাকে আত্মীয়-সমাজের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার উপর জগৎতারিণীর অভিমানের অবধি রহিল না।

এমনি করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া মাকে আনিতে গেল, কিন্তু মা অটল হইয়া রহিলেন, গৃহে ফিরিলেন না। কাঁদিয়া কহিলেন, সব ত শুনেচিস জ্যোতিষ, এখন যাতে তোরা সুখে থাকিস, তাই কর গে বাবা, কিন্তু আমাকে সে নরকের মাঝে আর টানিস নে—ও আমি সইতে পারব না।

জ্যোতিষ কহিল, আমরা আলাদা বাসা করে থাকব মা, তোমাকে সে বাড়ির ছায়াও মাড়াতে হবে না। আমি যা উপার্জন করব, তাতেই আমাদের কোনমতে দুঃখকষ্টে চলে যাবে তুমি এসো।

অনেক কষ্টে জগৎতারিণী সম্মত হইলেন এবং পুত্রকে কলিকাতা আলাদা বাসা ঠিক করিতে বলিয়া দিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষ এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মায়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অত বিলম্বের আবশ্যক হইল না। পাঁচদিন পরেই সে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার খালি পা, খালি গায়ে একখানা শাল জড়ানো দেখিয়াই জগৎতারিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

জ্যোতিষ যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহার তৃতীয় রাত্রেই অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছিল।

নিদারুণ অভিমানে একদিন জগৎতারিণী বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আবার একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাড়িতেই ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ইহলোকে আর দেখা হইল না।

মেয়েকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়ি আনিলেন এবং তাহার আগাগোড়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতিষকে আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, বোনের বিয়ে দিবি কবে বল্ দেখি?

জ্যোতিষ মায়ের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, ওর চেয়েও অনেক বড় বয়সের মেয়েদের বিয়ে হচ্চে মা, তুমি নির্ভাবনায় থাকো। জগৎতারিণী বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিলেন, নির্ভাবনায় থাকব কি রে! তোর বাপ যা করে গেছেন সে ত ফিরবে না জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে ত বামুনের মেয়েকে মোসলমান খ্রিষ্টানদের হাতে দিতে পারব না, তাতে মেয়ের বিয়ে হোক আর নাই হোক। তোর জন্যে ভাবনি, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারবে—সে বিধান আমি কাকার কাছ থেকে জেনেই এসেচি, কিন্তু হাজার প্রায়শ্চিত্ত করেও ত মেয়ের বয়স কমাতে পারা যাবে না? তার উপায় হবে কি?

জ্যোতিষ কহিল, তোমাকে বয়স কমাতে হবে না মা, কিন্তু দু'দিন সবুর করতে হবে। আমি ভাল বামুনের ছেলে এনে দেব, তোমাকে মোসলমান খ্রিষ্টানের ঘরে খুঁজে বেড়াতে হবে না।

জগৎতারিণী রাগিয়া বলিলেন, তুই আরও সবুর করতে বলিস জ্যোতিষ?

জ্যোতিষ জবাব দিল, দোষ ত আমার নয় মা, যে সবুর করতে বলায় অপরাধ হবে। দোষ তোমার এবং বাবার। আমি ত ছিলুম বিদেশে।

এ কথা যে সত্য, তাহা জগৎতারিণী মনে মনে বুঝিলেন, কিন্তু সৎ-ব্রাহ্মণসন্তান কোথায় কেমন করিয়া জুটিবে তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। বলিলেন, যা ভাল বুঝিস কর বাছা, কিন্তু আমি কিছুর মধ্যেই নেই তা আগে থেকে বলে দিয়ে যাচ্চি, বলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাজে চলিয়া গেলেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জ্যোতিষ পিতার শ্রাদ্ধ করিল।

ইহার অনতিকাল পরেই পাত্র জুটিল একজন বিলাত-ফেরত বাঙালী সাহেব। ব্যারিস্টারি পাস করিয়া তিনি বছর-দুই পূর্বে দেশে ফিরিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহনের রঙ্‌টা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ—তিনি বাংলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভুল। অল্পদিনেই তাঁহার নিয়মিত আসা-যাওয়াটা অনিয়মিত এবং সরোজিনীর প্রতি মনের ভাবটা অস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

জগৎতারিণী পর্দার আড়াল হইতে ভাবী জামাতাকে অবলোকন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই আক্রোশ মিটাইলেন মেয়ের উপর। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, তুই বেহায়ার মত যার-তার সামনে বার হস কেন বল ত?

সরোজিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রুদ্ধা জননী আর কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর শশাঙ্কমোহন অনেকবার আসিলেন গেলেন, কিন্তু যাহার জন্য যাতায়াত তাহার দেখা পাইলেন না। মায়ের অনুশাসন স্মরণ করিয়া সরোজিনী অত্যন্ত সতর্ক হইয়া অন্তরালে রহিল। জ্যোতিষ লক্ষ্য করিয়া একদিন ভগিনীকে কহিলেন, সরো, আজকাল তুই অমন পালিয়ে থাকিস কেন রে?

সরোজিনী মুখ নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, মা—আর কিছুই বলিতে হইল না, জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া গেলেন। এ বাড়িতে ঐ একটা অক্ষরই যথেষ্ট।

প্রায় মাস-দুই পরে একদিন সকালে সেই পাত্রটির তরফ হইতেই প্রস্তাব লইয়া জ্যোতিষ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া রীতিমত বকুনি খাইল।

ছেলেকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মা কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরাও ত বিলেতে ছিলি বাছা, কিন্তু ওই রকমটি হয়েছিস কি?

জ্যোতিষ ধীরে ধীরে বলিল, সবাই একই রকম হয় না মা, কেউ কেউ একটু-আধটু বদলেও যায়। কিন্তু তাই বলে এমন ছেলে কি হাতছাড়া করা ভাল? শশাঙ্ক ব্যারিস্টার হয়ে এসেচে, এর মধ্যেই একটু পসারও করেচে, আমার ত মনে হয় না মা, বিয়ে হলে সরোজিনী মন্দ হাতে পড়বে। চাল-চলনে যা একটু তফাত ঘটেচে, সেটুকু যদি মাপ করে নিতে পার মা, ভবিষ্যতে বোধ করি ভালই হবে।

মা বলিলেন, আমি বলচি জ্যোতিষ, এ কোনদিন ভাল হবে না। তা ছাড়া বিদেশে গিয়েই যে বিদেশী হয়ে যায়, তাকে ত আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আর এই বা কেমন কথা যে, হিন্দুস্থানে গেলে হিন্দুস্থানী হব, কাবুলে গেলে কাব্‌লি হব, কটকে গিয়ে উড়ে হয়ে যাব—না না জ্যোতিষ, তুই ওকে বিদায় কর বাছা। ওটা মানুষ নয়—বাঁদর। বাঁদরের হাতে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও মেয়ে দিতে পারব না।

কাহারও সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেও যেমন জগৎতারিণীর বিলম্ব ঘটিত না, তাঁহার প্রকাশিত মতামতের মধ্যেও তেমনি সংশয়-দ্বিধার অবকাশ মাত্র থাকিত না। তা ছাড়া, যে অপরাধে তিনি স্বামী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সে অপরাধ যে তিনি কোন প্রলোভনেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, একটা কথা কিন্তু ভেবে দেখবার আছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা?

জ্যোতিষ কহিল, সরোজিনীকে তোমরা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছ, তাতে তার অমতেও কাজ করা চলবে না। সেটা সবচেয়ে মন্দ কাজ হবে। শিশুকাল থেকে ওর ভার তোমরা নিলে না, দিলে বিদেশী মেমদের ওপর। এখন বড় হয়ে ওর মনের টানটা যে কোন্ দিকে ঝুঁকে থাকবে সেটা বোঝা ত শক্ত নয় মা।

জগৎতারিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

এই কথাটা তিনি মনে মনে অস্বীকার করিতেও পারিলেন না, অথচ, প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারাও অসম্ভব।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, বেশ ত জ্যোতিষ, তোমরা সবাই যদি সায়েব-মেম হতে চাও হও, কিন্তু তার আগে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এতই যদি সহ্য করতে পেরে থাকি, এও সইতে পারব।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিয়া কহিল, তা হলে আমাকেও কাশীতে গিয়ে থাকতে হবে। মাকে ছেড়ে যে আমার কোথাও থাকা চলবে না, সে ত দেশে ফিরেই ঠিক হয়ে গেছে মা।

জগৎতারিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার মনের সমস্ত আগুন একমুহূর্তেই নিবিয়া জল হইয়া গেল। ক্ষণকাল গভীর স্নেহে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না বাছা, তুই আমাদের কাশীর বাড়িটা খালি করে দিতে চিঠি লিখে দে। আমি যে চিরকাল উপস্থিত থেকে নিজের মত নিয়ে তোদের বিব্রত করে রাখব, সেটা উচিতও নয়, দরকারও নয়।

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, তাই ভাল মা, চল, সবাই গিয়ে কাশীতে থাকা যাক।

মাতা-পুত্রে উক্ত কথোপকথন কলিকাতার বাটীতে যেদিন হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পরেই উপেন্দ্র সতীশকে লইয়া জ্যোতিষের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পরের ঘটনা পাঠকের অবিদিত নাই।

জগৎতারিণী সতীশকে দেখিলেন। তাহার গলায় মোটা পৈতা, সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, সে মোসলমানের ছোঁয়া পাউরুটি বিস্কুট খায় না, সে শ্রীমান্, নিষ্ঠাবান্, তাহার পিতার অগাধ টাকা—জগৎতারিণী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার পরে ক্রমশঃ যখন আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করিলেন, সে বিলাতে গিয়া পাস না করিলেও, এমন কি এতগুলা কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও মেয়ের মনে অশ্রদ্ধার ভাব নাই, কি জানি, হয়ত বা সে মনে মনে—তখন হইতে জগৎতারিণীর

চোখে সংশয়ের চেহারা আবার পরিবর্তিত এবং এতকালের পুঞ্জীভূত বেদনাও সহজ হইয়া উঠিবার পথ পাইল। সতীশের মুখের মাতৃসম্বোধনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল।

কিন্তু, তার পরে বহুদিন পর্যন্ত সতীশের আর দেখা ছিল না। ইহার প্রত্যেক দিনটিই জগৎতারিণীকে বিঁধিয়া গিয়াছে, তথাপি নিজে উদ্যোগী হইয়া এ সম্বন্ধে কোন উপায়ই খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস করেন নাই। তাঁহার বড় একটা ভয় ছিল, পাছে চেষ্টা করিতে গেলেই একটা অত্যন্ত মন্দ সংবাদ শুনিতে হয়।

তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার নিজের কন্যার মতামতের উপরেই শুধু বিবাহের সমস্ত ফলাফল নির্ভর করে না। কারণ সতীশের বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত আছেন। কি জানি তিনি কি বলিবেন। তা ছাড়া সতীশ নিজেই যে বিলাত-ফেরতের বাড়িতে বিবাহ করিতে ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইবে না, তাহারও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

এমনি করিয়া অনেকদিন অনেক দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া সেদিন হঠাৎ যখন বৈদ্যনাথে আসিয়া দেখিতে পাইলেন সতীশ বসিয়া গল্প করিতেছে, তখন আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সতীশ কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

সে কলিকাতা হইতে পালাইয়া আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছিল। সরোজিনীই তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, ইহা জ্যোতিষ গল্প করিয়া মাকে শুনাইল। নিজের কন্যার দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি সতীশের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিলেন, এবং এই উপলক্ষে ইংরাজী শিখিয়া ইংরেজের নকল করাকে অজস্র গালি পাড়িয়া বলিলেন, বাবা সতীশ, তুমি যে মেয়েটাকে রক্ষা করেছ এ কথা যেন ওরা কোনদিন না ভুলে যায়। কিন্তু জঙ্গলের

মধ্যে একলা থাকার দরকার কি সতীশ? তুমি এ-বাড়ির ছেলে, যতদিন আমরা এখানে আছি, ততদিন এই বাড়িতেই এসে কেন থাক না?

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ আছি মা। আমার সেখানে কোন কষ্ট নেই।

জগৎতারিণী কহিলেন, কষ্টের জন্য নয় বাবা, একা থাকার অনেক বিপদ। এ বাড়িতে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, তুমি চলে এস। জল-হাওয়া সেখানেও যা, এখানেও ত তাই।

সরোজিনী কহিল, তা হলে ওঁর জাত যাবে মা।

জগৎতারিণী তখনও ভিতরের কথা জানিতেন না, মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুই ত খুব মেয়ে সরি! কেন, আমরা কি, যে আমাদের এখানে, লোকের জাত যাবে? না বাবা সতীশ, তুমি ওর কথা বিশ্বাস করো না। আর তাই যদি হবে, উপীন বৌ নিয়ে আমাদের বাড়িতে অতদিন থেকে গেলেন কি করে? তাঁদের কৈ জাত গেল না? তুই অমন মিছে করে ওকে ভয় দেখাস নে বলে দিচ্চি।

সরোজিনী মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল; সতীশ কহিল, না মা, জাত যাবে কেন? আমি ত প্রায় প্রত্যহই আসি, রাত্রের খাওয়াটাও ত আমার এ বাড়িতেই হয়।

শুনিয়া জগৎতারিণী পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, তাই এসো বাবা। অন্ততঃ আমি যে ক'দিন আছি, আমার কাছেই তোমাকে রোজ খেয়ে যেতে হবে। বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলে সরোজিনী কহিল, আপনি যে আমাকে গান শেখাবেন বলেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমি ত প্রায় রোজ আসি, শিখলেই ত পারেন।

সরোজিনী বলিল, আপনি এলেই ত সমস্ত ভদ্রলোক আপনার গান শুনতে আসেন—তার মধ্যেই বুঝি শেখা যায়?

সতীশ হাসিয়া কহিল, ‘নো অ্যাডমিশন’ বলে ফটকে দরোয়ান বসিয়ে দিন না কেন?

সরোজিনী বলিল, তার চেয়ে মা যা বললেন তাই করুন। সেই জঙ্গলের মধ্যে আর পড়ে থাকবেন না।

কিন্তু জঙ্গলে থাকার প্রয়োজন আর যাহাকেই বলা যাক, সরোজিনীর কাছে বলা চলে না। সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় কহিল, আচ্ছা, দাদা যে বললেন, পাঁচ-ছ’দিন পরে কলকাতায় যাবেন, তখন আমাদের দেখবে কে?

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, ক’দিনের জন্য যাবেন?

সরোজিনী কহিল, অন্ততঃ সাত-আটদিন তাঁকে সেখানে থাকতেই হবে।

সতীশ কহিল, তা হলে সে ব্যবস্থা তিনিই করে যাবেন। আর এত ভয়ই বা কি জন্যে? আপনারা ত আমাদের হিন্দুর ঘরের মত অসূর্যস্পশ্যা নন যে, বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকলেই মুশকিলে পড়ে যাবেন। আপনারই বরঞ্চ কত পুরুষের—

সরোজিনীর মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, কি আমরা করি শুনি? পুরুষের কান কেটে নিই? না, হিন্দুর ঘরের মেয়ে নই আমরা?

সতীশ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটা সারিয়া লইবার জন্য মুখ তুলিয়াই দেখিতে পাইল, সম্মুখে শশাঙ্কমোহন ব্যারিস্টারকে লইয়া জ্যোতিষ ঘরে ঢুকিতেছেন। অন্যদিনের মত আজও তিনি স্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দেখেন ব্যারিস্টার সাহেব ফার্স্টক্লাস কামরা হইতে অবতরণ করিতেছেন।

ঘরে পা দিয়াই শশাঙ্কমোহন সরোজিনীর দিকে হাত বাড়াইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া করমর্দন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং নিজের এইরূপ অকস্মাৎ আগমনের কৈফিয়তস্বরূপে কহিলেন, কেন যে সহসা কলিকাতা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, কেন যে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া স্টেশনে আসিয়া দেওঘরের

ফার্স্টক্লাস টিকিট কিনিয়া বসিলেন, তাহার হেতু নিজেই এখন পর্যন্ত জানেন না। অতঃপর নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া ব্যারিস্টার-সাহেব অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু সরোজিনীর পাংশু মুখ দিয়া দুই-একটা সাধারণ কথা ছাড়া কথাই বাহির হইল না।

মিনিট-দশেক পরে সতীশকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ঘাড়টা একটু কাত করিয়া বিস্ময়ের কণ্ঠে সরোজিনীকে কহিলেন, এঁকে কোথায় দেখেচি বলে মনে হচ্ছে না!

সরোজিনীর পাংশু মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে কহিল, বলতে পারি না কোথায় দেখেছেন।

অনতিকাল পরে জগৎতারিণী খাবার দিয়া সতীশকে যখন ডাকিতে পাঠাইলেন তখন দেখা গেল, সতীশ কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে তিন দিন পর্যন্ত সতীশের আর দেখা না পাইয়া জগৎতারিণী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ছেলেকে নিভৃতে ডাকিয়া কড়া করিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকটি আর কতদিন এখানে থাকবে জ্যোতিষ? বরঞ্চ আমি বলচি, তোমরা ওঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও যে, তাঁর থাকবার আর কোন আবশ্যক নেই।

মাতৃ-আজ্ঞা জ্যোতিষ কিভাবে পালন করিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রস্থানের পূর্বে শশাঙ্কমোহন নিঃসংশয়ে শুনিয়া গেলেন যে, যে-জন্য তাঁহার আসা সে আশা লেশমাত্র নাই, এবং সতীশই যে সেই ভাগ্যবান পাত্র, তাহাও জানিতে তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না।

সাহেবের মুখ কালো হইয়া উঠিল, কিন্তু আঘাতটা তিনি ভদ্রভাবেই গ্রহণ করিলেন। এমন কি, যাইবার সময় তিনি সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও চেষ্টা করিলেন না।

ট্রেনে উঠিয়া বসিয়া বিদায় লইবার ঠিক পূর্বক্ষণেই অত্যন্ত অকস্মাৎ জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাবু কোথায় যে ডাক্তারি শেখবার চেষ্টা করছিলেন, তা হয়েচে?

জ্যোতিষ মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় না। হোমিওপ্যাথি স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন মাত্র।

ওঃ, হোমিওপ্যাথিক স্কুল! বলিয়া শশাঙ্ক অন্য কথা পাড়িলেন।

আটত্রিশ

সহসা ভ্রাতার অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎতারিণীকে তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং সতীশের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবার তখন সুযোগ পান নাই। আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া কথাটা পাড়িবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সকালে উঠিয়াই সরকারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যাহার আগমন সবচেয়ে অপ্রীতিকর, অকস্মাৎ সেই শশাঙ্কমোহন সকালের ট্রেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া জগৎতারিণীর বিরক্তির আর অবধি রহিল না। মানুষের অত্যন্ত কামনার বস্তু হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহার সন্দেহের আর হিসাব-নিকাশ থাকে না। সুতরাং ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে সরোজিনীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা দিয়া মনে হইল, শশাঙ্কর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের মধ্যে হয়ত বা এই হতভাগা মেয়েটারও কোন হাত আছে। তাঁহার ব্যারিস্টার ছেলেকে ত তিনি কোনদিনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। তাঁহার হিন্দু আচারভ্রষ্ট ছেলে-মেয়েরা যে সতীশের আচারপরায়ণতা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, এ কথা তিনি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

মেয়েকে কটূক্তি করিয়া তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ঝিকে রান্নার আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কন্যার প্রতি চাহিয়া জননীর চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি সে স্নান সারিয়া লইয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া মায়ের রান্নাঘরে ঢুকিয়া অপটুহস্তে বঁটিতে তরকারি কুটিতেছিল এবং ঝি অদূরে বসিয়া দেখাইয়া দিতেছিল।

জগৎতারিণী নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, হিঁদুর মেয়ের যে আর কোন পোশাকেই সাজে না, তোকে দেখে আজ তা টের পেলুম বাছা! তোর পানে চেয়ে এত আহ্লাদ আর আমার কোনদিন হয়নি।

সরোজিনী লজ্জায় মুখ নত করিয়া কাজ করিতে লাগিল; মা তাহাকেই খোঁচা দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সব বুঝি মা, সব বুঝি। তা সে যতই পাস করুক, বাঁদর ছাড়া তাকে আমি কিছুই বলিনে। আর যার ইশারা পেয়েই কেন না বেহায়াটা আবার ফিরে আসুক, আমি থাকতে তা হবে না, তা সত্যি করে বলে দিচ্চি বাছা!

একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, জ্যোতিষ বলে, ছেলেবেলায় যে যেমন শিক্ষা পেয়ে আসে, মনের টানটা তার সেইদিকেই যায়। কিন্তু তাই বা সত্যি হবে কেন? দিন-রাত হ্যাট-কোট পরে না থাকলে পছন্দ হবে না, এই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মা?

আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া জগৎতারিণী রাঁধিতে বসিয়া একসময়ে কহিলেন, আমার মনের বাসনা ভগবান যদি পূর্ণ করেন, তুই দেখিস দিকি বাছা, তাতে তোর ভালই হবে।

সরোজিনী আনতমুখে মায়ের মনের বাসনাটা স্পষ্ট শুনিবার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল, জগৎতারিণী আর তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, নিজের মনে রাঁধিতে লাগিলেন। তিনি নীরবে মনে মনে কি আলোচনা করিতে লাগিলেন সরোজিনী তাহা বুঝিল এবং হ্যাট-কোটধারী সম্বন্ধে যে লজ্জাকর অপবাদের ইঙ্গিতে তাহাকে পুনঃ বিদ্ধ করিলেন, তাহারও প্রতিবাদ করা কঠিন ছিল না, কিন্তু নিরতিশয় অসহিষ্ণু-প্রকৃতি জগৎতারিণীকে কোন কথাই শেষ পর্যন্ত শুনানো যায় না জানিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় দশটা বাজে এমন সময় একটা গোল বাধিল। সরকারমশাই কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া একটা প্রকাণ্ড বড় রুইমাছ আনিয়া হাজির

করিলেন। জগৎতারিণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, বাঃ—বেশ মাছ কিন্তু—

সরোজিনী কহিল, সতীশবাবুর আসতে এখনও দেরী আছে মা, এখনও দশটা বাজেনি।

জগৎতারিণী বলিলেন, বাজা-বাজির কথা নয় মা, আজ আমার একাদশী, আমি ত মাছ ছোঁব না। ভাবচি, তোদের বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে কি? আচ্ছা দেখ ত এলোকেশী, ও-ঘরের রান্না কতদূর এগুলো?

ঝি বাহিরে যাইতেই সরোজিনী লজ্জিত-মুখে আস্তে আস্তে বলিল, তুমি দেখিয়ে দিলে আমি কি পারব না?

জগৎতারিণী বিস্মিত-মুখে বলিলেন, পারবি তুই?

পারব না? তুমি কেবল দেখিয়ে দাও।

ঝি থমকিয়া দাঁড়াইল। এমন চারু-দর্শন বৃহদায়তন রোহিত একটা আনাড়ীর হাতে পড়িয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, সে কি হতে পারে মা, বাইরের লোক খাবে যে।

জগৎতারিণী ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক, সতীশ আমার বাইরের লোক নয়, সে আমার ঘরের ছেলে। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে এলোকেশী, ওধারের উনুনটা বেশ করে নিকিয়ে দিয়ে মাছ কুটে আন্। তুইও এক কাজ কর মা। গরদের কাপড় পরে ত সুবিধে হবে না—আচ্ছা তা হোক, না হয় আঁচলটা বেশ করে কোমরে জড়িয়ে নে। হাসিয়া বলিলেন, আজ আঁশ-হাতেই তোর হাতেখড়ি হয়ে যাক, সরি, আশীর্বাদ করি, চিরকাল আজকের দিনের মত যেন তোর আঁশ-হাতই হয়।

এই আশীর্বাদে সরোজিনী মুখখানি আরও একটু অবনত করিল। ঘণ্টা-খানেক পরে জ্যোতিষ মায়ের কাছে কি একটা কাজের জন্য রান্নাঘরের দরজার

কাছে আসিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, ওখানে রাঁধে কে মা? সরো না কি?

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, চিনতে পারিস কি না!

চিনতে না পারারই কথা মা। কিন্তু ও কি সত্যই রাঁধচে, না তোমার ঢাক ঘাড়ে করে আছে?

মা একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, রাঁধাবাড়ার কাজে কি হিঁদুর মেয়েকে শিখতে হয় রে, এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু—

কি মা?

ছেলেকে একটু আড়ালে লইয়া জগৎতারিণী বলিলেন, কিন্তু আমি এখন ভাবছি সতীশ শুনলে কি জানি ওর হাতে খাবে কি না!

জ্যোতিষ হাসিয়া উঠিতেই সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। জ্যোতিষ কহিল, মা, তুমি সতীশকে মস্ত একটা মনু-পরাশর গোছের লোক ভাবো কেন বল দেখি?

মা বলিলেন, সে তোদের চেয়ে ত ভাল?

জ্যোতিষ কহিল, এমনই বা কি ভাল শুনি? ঐ সরো গিয়ে তাদের ভাত-ডাল রেঁধে দিয়ে এসেছিল বলে সে রাত্রে খেতে পেয়েছিল, নইলে উপোস করে থাকতে হতো—সে জান?

মা পুলকিত বিস্ময়ে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কবে রে?

জ্যোতিষ সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন।

তিনি আনন্দে বিহ্বলপ্রায় হইয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে মেয়েকে বলিলেন, ধন্যি মেয়ে মা তুই! আমি তখন থেকে ভেবে মরচি, আর তুই চুপ করে আছিস?

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, ওই বা কি করে জানবে মা, তুমি নিজের মনে ভেবে সারা হচ্চ? কিন্তু সেদিন ত খেতে পাইনি, আজ খেয়ে দেখি পোড়ারমুখী পেট থেকে পড়েই কেমন রাঁধতে শিখেছে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

জগৎতারিণী মেয়ের লজ্জাবনত মুখখানির পানে চাহিয়া গভীর স্নেহে কহিলেন, লজ্জা কি মা? আপনার জনকে রেঁধে-বেড়ে খেতে দেবে এর চেয়ে সৌভাগ্য মেয়েমানুষের কি আর আছে! আমি আহ্নিকটা ততক্ষণ সেরে নি গে, বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

তার পর সমস্ত দিন গেল, কিন্তু সতীশের দেখা নাই। না আসার কারণও কেহ জানাইয়া গেল না। সারাদিন ছটফট করিয়া জগৎতারিণী সন্ধ্যার পর জ্যোতিষকে ডাকিয়া বলিলেন, তার নিশ্চয় কিছু একটা হয়েচে, কাউকে খবর নিতে একবার পাঠিয়ে দিলিনে কেন?

জ্যোতিষ নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, কাকে ততদূর আবার পাঠাতে যাব মা!

জগৎতারিণী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, কেন, দরোয়ান একবার যেতে পারত না?

দরকার কি মা?

তুই বলচিস কি জ্যোতিষ? তার অসুখ-বিসুখ হলো, না কি হলো, একবার খবর নেওয়াও আবশ্যক নয়?

কি আবশ্যক? সে আমাদের আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়, তার জন্যে ভেবে মরার আমি কোন প্রয়োজনই দেখিনে, বলিয়া জ্যোতিষ বাহিরে চলিয়া গেল।

সতীশের সম্বন্ধে ছেলের মুখে জবাব শুনিয়া জগৎতারিণী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

মাত্র এই একটা বেলার মধ্যে সতীশ আর তাহাদের কেহ নয়? তাঁহার মুখের উপর ছেলের এই স্পর্ধিত উত্তর ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কাছে দুঃস্বপ্নের মত ঠেকিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্তেই কত কি যে তাঁর উপবাসক্ষীণ মাথার মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল, তাহা ভাল করিয়া ঠাহর করিতেও পারিলেন না।

ধীরে ধীরে উপরে গিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িয়া সরোজিনীকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়া জগৎতারিণী মেয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সরি, সতীশ এলো না কেন জানিস?

সরোজিনী বলিল, না।

কন্যার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে জগৎতারিণী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, না! যদি জানোই না, তবে লোক পাঠিয়ে জানতে কি হয়েছিল? এও কি আমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

সরোজিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাদা বললেন লোক পাঠাবার দরকার নেই।

কেন নেই, সেইটাই জানতে চাই। যাও এখ্‌খুনি দরোয়ানকে পাঠিয়ে দাও, তার খবর নিয়ে আসুক।

সে ত নেই মা, দাদা তাকে উপীনবাবুকে টেলিগ্রাম করতে পাঠিয়েছেন!

উপীনবাবুকে! হঠাৎ তাকে টেলিগ্রাম করা কেন?

আমি সব কথা জানিনে মা, তুমি দাদাকে জিজ্ঞাসা কর, বলিয়া সরোজিনী মাকে এক প্রকার উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গেল।

এইবার জগৎতারিণীর অকস্মাৎ মনে হইল সতীশকে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার হেতু যে কি, তাহা কেহই তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে চাহে না বটে, কিন্তু সে যে গুরুতর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং এই ভীষণ অনিষ্টের মূলে যে ঐ শশাঙ্কমোহন এবং এই দুরভিসন্ধি লইয়াই সে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। কিন্তু, কারণ যতবড় ভয়ানকই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেও যে ছেলে-মেয়েরা তাঁহার অনুমতি না লইয়া সতীশকে মানা করিয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার চিত্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ এলোকেশীকে দিয়া

জ্যোতিষকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই সতীশকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছিস?

জ্যোতিষ আশ্চর্য হইয়া বলিল, না, এ তোমাকে কে বললে?

উপীনকে তুই সতীশের কথা নিয়ে টেলিগ্রাম করেচিস?

হ্যাঁ।

সতীশ কি করেচে?

জ্যোতিষ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা করেচে, সে যদি সত্যি হয়, তা হলে তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধই নেই।

এ খবর তোকে কে দিলে, শশাঙ্কমোহন? দুষ্টু লোক, ওর কথা আমি একতিল বিশ্বেস করিনে।

জ্যোতিষ কহিল, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তা হলেও আমি বলচি মা, সতীশের ছায়া মাড়াতেও আমাদের ঘৃণা হওয়া উচিত।

ছেলের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে জগৎতারিণী নরম হইয়া বলিলেন, বেশ ত, আমাকে খুলেই বল না বাছা কি হয়েচে। সতীশ কিছু চুরি-ডাকাতিও করেনি, খুন করেও পালিয়ে আসেনি যে, তার ছায়া মাড়াতেও তোমাদের ঘৃণা হবে। ছেলেমানুষ, মনের ভুলে যদি কিছু দোষ-ঘাট করেই থাকে—এমন কত লোকই ত করে—শুধরে নিতে কতক্ষণ?

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মা, সে সব অপরাধ মাপ করা যায় না। অন্ততঃ সরোজিনী পারবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

জগৎতারিণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, অপরাধটা কি শুনি?

কাল শুনো মা। উপীনের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত এ আলোচনায় আর কাজ নেই, বলিয়া জ্যোতিষ দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণ উত্তেজনার আবেগে জগৎতারিণী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে চলিয়া যাইতেই একেবারে নির্জীবের মত শয্যা গ্রহণ করিলেন, দীর্ঘশ্বাস

ফেলিয়া বলিলেন, ভগবান! এ কলিকালে কি কাউকে বিশ্বাস করবার তুমি জো রাখোনি ঠাকুর!

আভাসে অনুমানে তিনি অনেক কথাই বুঝিলেন। তাই শুধু সতীশের জন্য নয়, স্বামীর কথা মনে পড়িয়াও তাঁহার দু'চক্ষু বাহিয়া এখন হুহু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রাত্রে একবার মেয়েকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন, এলোকেশী সরোজিনীর সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুনিয়া তিনি কপালে করাঘাত করিলেন। যে মেয়ে এত দুঃসংবাদ শুনিয়াও ঘুমাইতে পারে, অর্থাৎ সে যে সতীশের চেয়ে মনে মনে ওই বাঁদরটার প্রতি বেশী অনুরাগী, এ কথা মনে করিয়া তাঁহার মেয়ের প্রতি ক্রোধ ও অশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না।

পরদিন বেলা প্রায় তিনটা বাজে, গেটের থামে সাইকেল কাত করিয়া রাখিয়া সতীশ বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার শুষ্ক মুখ, এলোমেলো রুক্ষ চুল, উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না। জ্যোতিষ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ করেচে নাকি সতীশবাবু?

সতীশ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না।

কেহই আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া সতীশ মনে মনে বিস্মিত হইল। সে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল আজ উপস্থিত হওয়ামাত্র অভিযোগ-অনুযোগের অন্ত থাকিবে না। তাই, সে তখন বাড়ির ভিতরের দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিয়া নিজেই কহিল, কালকের অপরাধের জন্যে আগে মায়ের কাছে মাপ চেয়ে আসি, তার পরে অন্য কাজ।

শশাঙ্ক এতক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে সতীশের পানে চাহিয়া ছিল, সে-ই কথা কহিল। বলিল, মা এখন ঘুমোচ্চেন, তাঁকে জাগিয়ে মাপ চাইবার এত তাড়া কি? একটু বসুন, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার কথার ধরনে সতীশ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে আলোচনা?

শশাঙ্ক কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দুর্ভাগ্যক্রমে আছে বৈ কি।

জ্যোতিষকে দেখাইয়া কহিল, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি ওঁর একজন পরম বন্ধু—না না, জ্যোতিষবাবু, আপনি উঠবেন না—ও কি, আপনারাই বা পালালে চলবে কেন? আমার যা নালিশ তা আপনাদের সামনেই করতে চাই। দুজনেই বসুন,—বসিয়া সরোজিনীর প্রতি একটা কটাক্ষ করিল। কিন্তু সরোজিনী এমনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল যে, সে ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না।

শশাঙ্ক সুমুখের টেবিলের উপর একটা চড় মারিয়া বলিল, আমার ছেলেবেলা থেকেই এই স্বভাব যে, যাদের ভালবাসি, তাদের সম্বন্ধে কিছুতেই চোখ বুজে উদাসীন থাকতে পারিনে। তাই গতবারে শুনেই মনে মনে বললুম, এ ত ভাল কথা নয়। সতীশবাবুর এই নির্জন-বাসের একটা খবর নেওয়া উচিত। আপনি হয়ত রাগ করবেন সতীশবাবু, কিন্তু আমিও ত আমার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে পারিনে। কি বলেন জ্যোতিষবাবু?

জ্যোতিষ নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল। সতীশও চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সমস্ত শ্রোতাদের সমবেত নীরবতার মাঝখানে শশাঙ্কর উত্তেজনার বেগ আপনিই ঢিলা হইয়া আসিল। সে অপেক্ষাকৃত সংযত-কণ্ঠে কহিল, জ্যোতিষ আমার পরম বন্ধু বলেই আপনাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করবার আমার অধিকার আছে। আপনি ত জানেন—

কথার মাঝখানেই সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বন্ধুত্বের কথা কিছুই জানিনে, কিন্তু আপনার প্রশ্ন কি শুনি?

শশাঙ্ক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, আমি জানতে চাই আপনি এখানে এসে আছেন কেন?

সতীশ কহিল, আমার ইচ্ছে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?

শশাঙ্ক থতমত খাইয়া জ্যোতিষকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, সতীশবাবুর কলকাতার বাসা খুঁজে বার করতে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েচে। রাখালবাবুকে উনি চেনেন, তিনি বললেন—

সতীশের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, চুলোয় যাক রাখালবাবু। আপনার নিজের কথা বলুন।

এবার জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া বলিল, সতীশবাবু, শশাঙ্ক আমার অনুরোধেই আপনাকে জিজ্ঞেসা করচে। আপনি ইচ্ছা করলে জবাব না দিতেও পারেন, কিন্তু ওঁকে অপমান করবেন না। আমাদের সঙ্গে আপনি যে ব্যবহার করেচেন তাতে কোন প্রশ্ন না করাই উচিত ছিল, শুধু আমার মায়ের জন্যই আপনার নিজের মুখ থেকে একবার শোনার প্রয়োজন। বেশ, আমিই না হয় প্রশ্ন করচি, সাবিত্রী কে? এবং তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধই বা কি?

সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, সাবিত্রী কে তা আমি জানিনে জ্যোতিষবাবু। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি-সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে।

কেন?

কারণ, বললেও আপনারা বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু যেমন করেই হোক, আমাদের বুঝা একান্ত আবশ্যক। ভাল, তাকে কোথায় এনে রেখেচেন, এ সংবাদ দিলে বোধ করি বুঝতে পারব।

সতীশ জ্যোতিষের মুখের উপর তাহার জ্বলন্ত চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, দেখুন জ্যোতিষবাবু, আমি কোনদিন গায়ে পড়ে আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করিনি, সুতরাং প্রশ্নোত্তরের ছলে কতকগুলো অপ্রিয়

কথা-কাটাকাটির দরকার মনে করিনে। আমি বুঝতে পেরেচি, কি ঘটেচে। অতএব, আপনাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন আমি নিজেই জানাচ্চি। সাবিত্রী কোথায় গেছে আমি জানিনে। কেন, কি বৃত্তান্ত, এ-সব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে এ কথা খুব সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম, তাকে মাথায় করে রাখতুম। এ কথা শুধু আপনাদের সাক্ষাতে নয়, সমস্ত পৃথিবীর সামনে স্বীকার করতেও আমি লজ্জা বোধ করিনে। আশা করি, এর পরে আপনাদের আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই। থাকলেও আমি জবাব দিতে পারব না।

সতীশের এই সুস্পষ্ট এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকলেই যুগপৎ বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। সরোজিনীর মুখের উপরেই তাহার এই অমানুষিক হৃদয়হীন স্পর্ধা তাহার অসীম নির্লজ্জতাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গেল। বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া জ্যোতিষ প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, আপনার কাছে আমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই। যেটুকু ছিল, উপীনের জবাবে সেটুকু পূর্ণ হয়েচে। এই দেখুন, বলিয়া সে টেলিগ্রামের কাগজখানা সম্মুখে ছুড়িয়া দিল।

উপীনদার টেলিগ্রাম? কৈ দেখি, বলিয়া সতীশ ব্যগ্রহস্তে কাগজখানা তুলিয়া লইল। ভাঁজ খুলিয়া ধীরে ধীরে সমস্তটা পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া, ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তার পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সমস্ত সত্য। আমার উপীনদা কখনও মিথ্যা বলেন না। যথার্থই আমি ভাল নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারও সংস্রব রাখা উচিত নয়। বোধ করি নিজেই এ কথা মনে মনে টের পেয়েছিলাম বলেই এই জঙ্গলের মধ্যে এমন করে একদিন পালিয়ে এসেছিলাম। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর যেন কোন মন্ত্রবলে জলভারাক্রান্তের

ন্যায় গদগদ হইয়া আসিল। কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না এবং সতীশ নিজেও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরক্ষণেই একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসের

সঙ্গে তাহার মনে হইল, একটা বড় জটিল সমস্যার আজ অত্যন্ত অদ্ভুত মীমাংসা হইয়া গেল। কাল সকালেও তাহার জগৎতারিণীর নিমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কত চিন্তাই না মনে উদয় হইয়াছিল! সরোজিনীর হৃদয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ কবে যে তাহার অন্তরে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, এইমাত্র এ কথা সে স্মরণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নিভৃত অন্তরের মধ্যে তাহার আকাঙ্ক্ষা ত ছিলই! না হইলে এমনটি ঘটিয়াছিল কি করিয়া?

এ অমৃত সঞ্জাত হইয়াছিল কোন্ সিন্ধু মন্থন করিয়া? সাবিত্রীকে হারাইয়া পর্যন্ত এই সত্যটার সে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিল যে, যুবতী রমণীর মন পাওয়া এক, কিন্তু সে পাওয়া কাজে লাগানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কারণ,পাওয়া যখন নর-নারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে, নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, বাহিরের সংসার তাহার সাড়া পায় না, কিন্তু যেদিন এই সংসারের সম্মতি না লইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না, সেই দিনই দারুণ দুঃখের দিন। এ পাওয়া যে কত কঠিন, এ রত্ন যে কত দুর্লভ, বাহিরের সংসার সে বিচারের দিক দিয়া যায় না—সে কেবল তাহার শাস্ত্র লইয়া, সমাজ লইয়া, লোকাচার লইয়া বিরুদ্ধস্বরে কলরব করে, বাধা দেয়, নিষ্ফল করে—এই শুধু তাহার কাজ। সরোজিনীকে হয়ত সে ভালবাসে। সেদিকেও প্রতিদান যদি এমনি উন্মুখ হইয়াই উঠিয়া থাকে ত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে সে কোন্‌খানে! উভয়ের সমাজ যে বিভিন্ন। কালও তাহার বৃদ্ধ পিতার চিন্তিত গম্ভীর মুখ বারংবার মনে পড়িয়াছে, উপীনদাদাদের বাড়ির শুষ্ক ভট্টাচার্যের শুষ্কতর তীব্রস্বর সহস্রবার তাহার কানে আসিয়া বিঁধিয়াছে, পাড়ার শত্রু-মিত্র সমস্ত লোকের তীব্র শিরশ্চালন তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর বহুবার ধাক্কা মারিয়া গিয়াছে, তবুও এই বিরুদ্ধ জগতের সমস্ত লোকের সম্মিলিত 'না' 'না' রবের মাঝখানে শুধু কেবল নিঃশব্দ সরোজিনীর লজ্জাবনত মুখখানিই তাহাকে সবল রাখিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আজ আর কোন ভয় নাই। একদিনে অচিন্তনীয় উপায়ে সমস্ত গ্রন্থি সমস্ত দুশ্চিন্তার শান্তি হইল। বাঁচা গেল!

কথাটা নিজের মনে বলিয়াই সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সবাই ঠিক তেমনি নীরবে অধোবদনে বসিয়া আছে। সরোজিনীর মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, প্রায় কিছুই দেখা গেল না। তখন তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিল, তুমি—আপনি আমার সাবেক বাসায় একদিন যাঁর কাপড় শুকোতে দেখে এসেছিলেন, তাঁর নাম সাবিত্রী। আমি ভেবেছিলুম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা আপনাকে জানাব, কিন্তু কোনদিন সে সুযোগ হলো না, সে সাহসও ছিল না। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জ্যোতিষবাবু, দোষ আমার। এ আমি প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই, মনে আমার সুখ ছিল না। বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, আমি কোন বিষয়ে কাউকে ঠকাই নি, ও-সব আমি জানিও নে। তবু বলবারও আমার কিছু নেই।

জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না।

সতীশ নিজেও বোধ করি যেন একটা কঠিন বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া ফেলিল।

কহিল, আমি চললাম। আমার একটা অনুরোধ, আমার কথা আলোচনা করে আপনারা মন খারাপ করবেন না। আমি কখনো কোন ছলে আর আপনাদের সুমুখে আসব না—আমাকে আপনারা ভুলে যাবেন। বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতিষ পার্শ্বে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, সরোজিনীর মাথাটা একেবারে তাহার জানুর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে!—ওরে, ও সরো, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে না উঠিতে সরোজিনীর শিথিল মুষ্টি চেয়ারের হাতল হইতে স্খলিত হইয়া সে নীচে কার্পেটের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অভিমান ও অপমানের

ক্রোধে জ্যোতিষের বুদ্ধি এমনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সতীশের বিদায়-পালাটা সরোজিনীর সাক্ষাতে ঘটিলে যে আঘাতটা তাহার কি কঠিন হইয়া বাজিবে এ হিসাবই তাহার মনে ছিল না।

তাই, অনেক শুশ্রূষার পর সরোজিনীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে সে যখন কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন জ্যোতিষের মাথায় একেবারে বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভগিনীকে শুধু যে সে প্রাণাধিক ভালবাসিত তাই নয়, তাহার সর্বরূপলাবণ্যবতী শিক্ষিতা ভগিনীর দৃপ্ত আত্মমর্যাদাজ্ঞানের উপরেও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যে এত ভালও বাসিতে পারে যে, এ-সব কিছুই কোনো কাজে লাগিবে না, সমস্ত জানিয়াও সে একটা চরিত্রহীন লম্পটের পরম অন্যায়ের পদতলে সমস্ত বিসর্জন দিয়া চেতনা হারাইয়া শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত লুটাইয়া পড়িবে, এ আশঙ্কা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার মুখের উপর বেদনার যে ছবি ফুটিয়া উঠিতে সে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখিল, সে যে কত বড়, তাহা নিরূপণ করিবার শক্তি এবং অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, তথাপি সে বহুক্ষণ পর্যন্ত অসাড়ের মত বসিয়া থাকিয়া শশাঙ্কমোহনের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন?

শশাঙ্ক বলিল, না, তেমন কিছু জরুরী কাজ নেই সেখানে।

জ্যোতিষ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে ডিনারটা শশাঙ্কমোহনকে একাই সমাধা করিতে হইল, কারণ, জ্যোতিষের একেবারেই সাড়া পাওয়া গেল না।

জগৎতারিণী একটি একটি করিয়া ছেলের মুখে সমস্ত শুনিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, এ-সব আমারই পোড়া কপালের ফল, জ্যোতিষ। পরলোকগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া

কহিলেন, নিজে ত সারাজীবন এই নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মলুম, বাকিটুকু ছেলে-মেয়েদের জন্যেই যদি না জ্বলতে হবে ত ষোল-আনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! বেশ বাবা, তোমাদের যাকে পছন্দ হয় তার সঙ্গেই বোনের বিয়ে দাও গে, আমি আর কথাটি কব না।

আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, মন অন্তর্যামী—তাই হঠাৎ ওর আসা শুনেই সেদিন বুক আমার দমে গিয়েছিল জ্যোতিষ।

কিন্তু জ্যোতিষ কোন কথা কহিল না। সে মনে মনে বুঝিতেছিল যে ব্যাপারটা অত সহজ নহে। সুতরাং যাহা হইয়া গেছে, তাহা হইয়া গেছে বলিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না, হয়ত বা একদিন এই চরিত্রহীনটাকেই নিজে গিয়া সাধিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

কাল সারাদিনের মধ্যে সে সরোজিনীকে একবার ঘরের বাহিরে পর্যন্ত আসিতে দেখে নাই, কিন্তু আজ বিকালে চা খাইতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল সরোজিনী ইতিপূর্বেই আসিয়াছে এবং শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে আস্তে আস্তে গল্প করিতেছে।

জ্যোতিষ কাছে আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। যদিচ ভগিনীর শ্রীহীন মলিন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না, তবুও বুকের উপর হইতে একটা ভারী পাথর নামিয়া গেল।

খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনেক কথাবার্তা হইল, কিন্তু সেদিনের কেহই কোন ইঙ্গিত করিল না। সন্ধ্যার পরে অনেকটা স্বচ্ছন্দচিত্তে ভগিনীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া জ্যোতিষ মনে মনে কহিল, দুর্ঘটনাকে সে যত বড় ভাবিয়াছিল, তত বড় নয়। হয়ত বা অনতিকাল মধ্যেই আবার সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবে, তাহার এমন আশাও হইল।

সেইদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে আলাপ-আলোচনা চলিল। এমন কি জ্যোতিষ তাহার আশার কথাটাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিল। বস্তুতঃ সরোজিনী যে

তাহার প্রথম ঝঞ্ঝাট সামলাইয়া লইবার পরেও সতীশের এতবড় ঘৃণিত আচরণের সঙ্গে মনে মনে শশাঙ্কমোহনের তুলনা করিয়া দেখিবে না, ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই উভয়ের বোধ হইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সরোজিনী তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালার সামনে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পথের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ মনে হইল খানিক দূরে একখানা বোঝাই-দেওয়া গরুর গাড়ির পিছনে পিছনে যে দুটি লোক ছাতা মাথায় ধীরে ধীরে চলিয়াছে, তাহার একজন বেহারী। সরোজিনী সতর্ক হইয়া গরাদে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি ক্রমশঃ তাহার জানালার কাছে আসিতে একটা লোক মুখ তুলিয়া উপর পানে চাহিতেই স্পষ্ট দেখা গেল সে বেহারী। সরোজিনী হাত নাড়িয়া আহ্বান করিতেই বেহারী তাহার সঙ্গীকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ছাতি মুড়িয়া জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সরোজিনী কহিল, বেহারী, ঢুকেই বাঁ-হাতি সিঁড়ি। ওপরে এসো।

তখন বাড়ির সকলেই দিবানিদ্রায় সুপ্ত, বেহারী অনতিবিলম্বে সিঁড়ি দিয়া সরোজিনীর উপরের ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিল।

সরোজিনী মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, তোমাদের গাড়ি ত সেই রাত্রি এগারটার পরে—এখনো তার ঢের সময় আছে। ঠাকুর সঙ্গে আছে, সে জিনিসপত্র মুটে দিয়ে নামিয়ে রাখতে পারবে, তুমি একটু বসো।

জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিয়াছিল সতীশ এখানকার বাসা উঠাইয়া অন্যত্র চলিয়াছে।

বেহারী তাহার উড়ুনীর অঞ্চলে কপালের ঘাম মুছিয়া মেঝের উপর উপবেশন করিল।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সরোজিনী এইপ্রকারে ভূমিকা করিল; কহিল, আচ্ছা বেহারী, তুমি ত কখনো বামুনের মেয়ের কাছে মিথ্যা কথা বলো না।

বেহারী জিভ কাটিয়া কহিল, বাপ্ রে! তা হলে কি রক্ষে আছে দিদিমণি! সাতজন্ম কাশীবাস করলেও যে এ পাপের মোচন হবে না।

সরোজিনী স্নিগ্ধদৃষ্টিতে এই পল্লীবাসী ধর্মভীরু বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া স্নেহহাস্যে কহিল, সে ত জানি বেহারী, তুমি কখনো মিছে বলো না, কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করব, সে তুমি কারো কাছে বলতে পাবে না—তোমার মনিবের কাছেও না।

বেহারী কহিল, আমার দরকার কি দিদিমণি, কারো কাছে বলবার!

সরোজিনী একটুখানি মৌন থাকিয়া আসল কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাবিত্রী মেয়েটি কে বেহারী?

বেহারী সরোজিনীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমার সাবিত্রী মায়ের কথা জিজ্ঞেসা কচ্চ দিদিমণি! জানিনে দিদিমণি, মা-জননী আমার কার শাপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে এত দুঃখ পাচ্চেন! আহা, মা যেন লক্ষ্মীর প্রতিমে!

অনেকদিন হইয়া গেল বেহারী সাবিত্রীর নামটা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করিবার সুযোগ পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর গদগদ এবং চোখের দৃষ্টি অশ্রুজলে ঝাপসা হইয়া উঠিল।

সাবিত্রীর উল্লেখমাত্রই বুড়োর এতখানি ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া গেল।

বেহারী হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, মা আমার যেদিন রাখালবাবুর মেসে দাসীবৃত্তি করতে এলেন, তখন মানুষগুলো সব দেখে অবাক হয়ে গেল। মুখে যেন হাসিটি লেগেই রয়েছে। রাখালবাবু ম্যানেজার, আর আমি ত চাকর, কিন্তু মায়ের কাছে সবাই সমান—সবাইকে সমান যত্ন| একাদশীর দিন কাঠফাটা উপোস করেও কখনও মায়ের মুখ বেজার দেখিনি দিদিমণি।

বৃদ্ধ যেন সমস্ত হৃদয় দিয়া কথা কহিতেছিল। তাই এই তাহার অকৃত্রিম ভক্তি-উচ্ছ্বাসে সরোজিনী মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার বিদ্বেষের জ্বালাও যেন

গলিয়া অর্ধেক ঝরিয়া পড়িল। বেহারী কহিতে লাগিল, দিদিমণি, শাস্তরে লেখা আছে, মা-লক্ষ্মী একবার কি যেন একটা অপরাধ করে নারায়ণের হুকুমে দাসী-বৃত্তি করেছিলেন, আমার মাও যেন ঠিক তেমনি কোন দোষে চাকরি করতে এসে নানান দুঃখ পেয়ে শেষকালে চলে গেলেন। যেদিন চলে গেলেন, সেদিনটা আমার বুকের মাঝে আজও যেন গাঁথা হয়ে আছে দিদিমণি।

সরোজিনী আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, তিনি এখন কোথায় আছেন বেহারী?

বেহারী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিল না, মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জান না বেহারী?

বেহারী এবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক জানিনে বটে, কিন্তু তবুও জানি। কিন্তু সে কথা জানাতে যে মায়ের মানা আছে দিদিমণি, আমি ত বলতে পারব না।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, মানা কেন?

মানা যে কেন, তাহা বেহারী নিজেও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। তথাপি এই নিষেধ চিরদিন মান্য করিয়া চলা, সে কেমন আছে জানিতে না পাওয়া, তাহাকে এ জীবনে আর একবার চক্ষে দেখিতে না পাওয়া, এ-সকল যে বেহারীর পক্ষে কত দুরূহ তাহা সে শুধু নিজেই জানিত। বিশেষ করিয়া যখনই কোন কথাবার্তায় তাহার মায়ের বিরুদ্ধে সতীশের তীব্র কুৎসিত ইঙ্গিত প্রকাশ পাইত, তখন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে তাহার মনের মধ্যে আবেগের ঝড় বহিয়া যাইত, কিন্তু তবুও বুড়া আজ পর্যন্ত তাহার শপথ ভঙ্গ করে নাই। যদি কোনদিন অসহ্য হইয়াছে, তখনই সে এই কথাই স্মরণ করিয়াছে যে, সাবিত্রী যখন নিজে এতবড় কলঙ্ক নীরবে বহন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভিতরে এমন কিছু একটা আছে, যাহা তাহার বুদ্ধির অগোচর। সাবিত্রীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।

কিন্তু, এখন আর একজন যখন সে কথা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া ফেলিতে তাহার প্রাণটাও আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বলতে পারি দিদিমণি, তুমি যদি আমার বাবুকে না বল।

সরোজিনী মনে মনে ভারী আশ্চর্য হইল। বেহারী জানে অথচ সতীশ জানে না এবং তাহাকেই জানাইতে বিশেষ করিয়া সাবিত্রীর নিষেধ—ইহার কি কারণ সে ভাবিয়া পাইল না। কহিল, না বেহারী, আমি কাউকে বলব না, তুমি বল।

বেহারী মিনিট-দুই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহাতে অসত্যের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে কিনা, তাহার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ইতিহাস সে একটি একটি করিয়া বিবৃত করিয়া বলিল।

সাবিত্রী যে সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত এবং এইজন্যই যে রাখালবাবু গায়ের জ্বালায় ঝগড়া করিয়া বাবুকে বাসা হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং সতীশবাবু মাঝে মাঝে মদও খাইতেন, ইত্যাদি কোন কথাই সে গোপন করিল না।

সমস্তক্ষণ সরোজিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া শুনিল। বোধ করি এমন একাগ্রচিত্তে, এত মনোযোগ দিয়া আর কেহ কখনও কাহারও কথা শুনে নাই। যে রাখালবাবুর কাছে শশাঙ্কমোহন খবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দৈবাৎ সে লোকটির ইতিহাসও আজ সরোজিনীর অপরিজ্ঞাত রহিল না।

সাবিত্রীর কোথায় বাড়ি, কিংবা তাহার পিতৃকুল বা শ্বশুরকুলের পরিচয় কি, সকল সন্ধান বেহারী না দিতে পারিলেও সে যে ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিধবা, সুরূপা, লেখাপড়া জানে—শুধু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল, এ কথা সে বার বার করিয়া কহিয়া বলিল, এত ত ভালবাসতেন, কিন্তু তবুও বাবু মাকে যেন বাঘের মত ভয় করতেন দিদিমণি! মদ খেয়ে বাসায় ঢোকবার

পর্যন্ত তাঁর সাহস ছিল না। বিপিনবাবু বলে বাবুর একজন বজ্জাত বন্ধু ছিল, তার সঙ্গে মিশে গান-বাজনা করতে বাবু একটা কুস্থানে যাতায়াত করতেন, মায়ের কানে যাওয়ামাত্রই সেখানে যাওয়া তাঁর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এমন ক্ষমতা হলো না যে, আমার সাবিত্রী মাকে তুচ্ছ করে আর সেখানে যান! বলিয়া বেহারী সগর্বে সরোজিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সতীশের উপর আর একজন নারীর এতবড় অধিকারের সংবাদ সরোজিনীর বুকে শেলের মত বিঁধিল, তথাপি সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বেহারী, তাঁকে এত ভয় করবার সতীশবাবুর দরকার কি ছিল?

বেহারী যেমন বুঝিয়াছিল তেমনি বলিল, আমার মা যে ভয়ানক রাশভারী লোক ছিলেন দিদিমণি! শুধু আমাদের বাবুই নয়, বাসাসুদ্ধ লোক তাকে মনে মনে ভয় করত যে। একটা দিনের কথা বলি। সেদিন অনেক রাত্তিরে বাবু কোথা থেকে মদ খেয়ে আর একটা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। ভেবেছিলেন অত রাত্তিরে সাবিত্রী মা নিশ্চয়ই তার বাসায় চলে গেছে। আমি জেগে ছিলাম, দোর খুলে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, সাবিত্রী চলে গেছে না বেহারী? বললাম, না বাবু, আজ তিনি যাননি—এখানেই আছেন। যেই শোনা, অমনি মদের বোতল রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে চোরের মত বাসায় ঢুকলেন।

ভয়ে নেশাটেশা চোখের পলকে উবে গেল। বল ত দিদিমণি, তিনি ছাড়া বাবুকে কি আর কেউ কোনদিন শাসন করতে পারবে!

সরোজিনী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, সতীশবাবু কি এখনো মদ খান বেহারী?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আবার শুরু করতে কতক্ষণ দিদিমণি? তাইতে ত আজ দু'দিন ধরে কেবলি ভাবচি এই দুঃসময়ে আমার সাবিত্রী মা যদি একবার আসতেন।

সরোজিনী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বেহারী?

বেহারী কহিল, আমি বরাবর দেখি, বাবু মন খারাপ হলেই মদ খেতে আরম্ভ করেন। এক উপীনবাবুকে ভয় করেন, তা তাঁর সঙ্গেও কি জানি কি হয়ে গেছে। সে রাত্রিতে তিনি বাসায় উঠে হঠাৎ সাবিত্রী মাকে চোখে দেখতে পেয়েই সেই যে চলে গেলেন, তার পর থেকে কেউ আর কারও নাম করেন না। তবে বল দিকি দিদিমণি, মা ছাড়া বাবুকে আর কে সামলাতে পারে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, অসুখের খবর পাওয়া পর্যন্ত এই পাঁচ-ছ'টা দিন বাবুর যে কি করে কেটেচে, সে তো আমি চোখের ওপরেই দেখলুম। পরশু ঘুম থেকে উঠে তারের খবর পেয়ে সেই যে মুখ থুবড়ে পড়লেন, সারাদিন আর উঠলেন না। তার পরে রাত্তিরের গাড়িতে বাড়ি চলে গেলেন।আমাকে শুধু এই কথাটি বলে গেলেন, বেহারী, তোরা সব নিয়ে-থুয়ে বাড়ি চলে আয়।

সরোজিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, কার অসুখ বেহারী?

বেহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, যাবার পথে বাবু তোমাদের বলে যাননি দিদিমণি?

সরোজিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কার অসুখ?

বেহারী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা হলে মনের ভুলে অমনি সোজা চলে গেছেন, এ বাড়িতে ঢোকেন নি। যেদিন সকালে এখানে নেমন্তন্ন খেতে আসবেন, সেইদিনই চিঠি এলো বুড়োবাবুর অসুখ। তাই আর খেতে আসতে পারলেন না। টেলিগ্রাফ করে নিজেই সারাদিন পোস্টাফিসে দাঁড়িয়ে কাটালেন। কিন্তু কোন খবর এলো না। তার পরে পরশু সকালে একেবারে শেষ খবর এলো। রাত্তিরের গাড়িতে বাবু বাড়ি চলে গেলেন।

সরোজিনী চমকিয়া উঠিল, সতীশবাবুর বাবা মারা গেলেন?

বেহারী বলিল, হাঁ দিদিমণি।

কি হয়েছিল?

অনেক বয়স হয়েছিল, শুধু একটা উপলক্ষ করে প্রাণটা বেরিয়ে গেল, বলিয়া বেহারী আর্দ্রচক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, অন্য কিছুর জন্যে দুঃখ করিনে, কিন্তু, এই বুড়োটা ছাড়া বাবুর আপনার বলতে আর কেউ রইল না। তাই এই দুটো দিন এই শুধু ভাবচি, এখন থেকে কি যে করতে থাকবেন, তা মা দুর্গাই জানেন। বলিয়া বৃদ্ধ চাদরের প্রান্তে তাহার সিক্ত চোখ দুটো একবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইল।

সরোজিনীর নিজের চোখেও জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। কহিল, এবার থেকে সতীশবাবু ভাল হয়েও যেতে পারেন। মন্দই যে হবেন, এ ভয় তোমার কেন হচ্চে বেহারী?

বেহারী অন্যমনস্কের মত বলিল, কি জানি! তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার মুখে

ফুল-চন্দন পড়ুক দিদিমণি, বাবু ভালই হোন—আর যেন সেদিকে মতিগতি না হয়।কিন্তু যাবার সময় গাড়িতে উঠে নাকি বললেন, যাক, এক রকমে বাঁচা গেল বেহারী, সংসারে আর কারো জন্যে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে না। তোমাকে সত্যি বলচি দিদিমণি, সেই থেকে যখনই মনে পড়চে তখনই বুকের ভিতর হুহু করে উঠচে।হাতে কত টাকাই ত এবার পড়বে—সঙ্গী-সাথীও বাবুর সব ভাল নয়—মন্দ পথে গেলে এখন কে ঠেকাবে? শুধু পারে আমার মা। বলিয়া বেহারী অজ্ঞাতসারে আর একবার তাহার শ্রোতার বক্ষে তপ্ত শেল হানিয়া হাত-দুটো জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

সরোজিনী আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত বেহারী, তাঁকেই কেন আসতে চিঠি লিখে দাও না?

বেহারী বলিল, ঠিকানা ত জানিনে। নিজে যদি একবার কাশী যেতে পারতাম, যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু আমার ত সে জো নেই; বাবুকে একলা ফেলে রেখে যেতেও ত মন সরে না। তা ছাড়া,

আমি ত কখনো কাশী যাইনি,—সে দেশ ত চিনিনে, বলিয়া সে নিরুপায়ের মত সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিল। স্পষ্ট বুঝা গেল সতীশের এই পরম হিতৈষী বৃদ্ধ ভৃত্য প্রভুর অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাহার কাছে নীরবে আশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু সরোজিনী তাহাকে কোন ভরসাই দিল না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিল।

আজ তা হলে আসি দিদিমণি, বলিয়া বেহারী উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া হাতজোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কি বেহারী?

একটা কথা নিবেদন করব দিদিমণি?

সরোজিনী অনেক কষ্টে একটুখানি ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, কি কথা?

বেহারী তেমনি যুক্তকরে করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি গোয়ালা চাষা, তাতে বুড়োমানুষ। কি বলতে যদি কি বলে ফেলি, অপরাধ নেবেন না?

সরোজিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রাণপণে তাহা নিরোধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল,না।

তাহার মুখের এই একটিমাত্র 'না' শব্দ শুনিয়াই বেহারীর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে নিজেকে চাষা প্রভৃতি বলিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার সহস্র পরিচয় দিলেও সে আসলে নির্বোধ ছিল না। সুতরাং কেন যে সরোজিনী সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহাকে পথ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কেন যে সে এমন গভীর মনোনিবেশপূর্বক তাহার কাহিনী শুনিতেছিল, সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অকস্মাৎ সূর্যের আলোর মত নির্মল হইয়া উঠিল। এবং না জানিয়া সে যে তরুণীকে এতক্ষণ ধরিয়া বিঁধিয়া এত বেদনা দিয়াছে, সেজন্য তাহার মনস্তাপের

অবধি রহিল না। তখন বেহারী নিরতিশয় করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি জানি তোমার কথা কখনো ঠেলতে পারবেন না—তুমিও ইচ্ছে করলে বাবুকে অসময়ে রক্ষে করতে পার। কিন্তু আমার মন বলে,তুমি যেন তাঁকে ত্যাগ করেছ মা। বেহারী এই প্রথম সরোজিনীকে মাতৃ-সম্বোধন করিল। 'মা' বলিয়া কাজ আদায় করিবার ফন্দিটা বুড়া বেশ জানিত।

সরোজিনীর অশ্রু আর মানা মানিল না, দুই চক্ষু প্লাবিয়া বড় বড় ফোঁটা ঝরঝর করিয়া বুড়ার সাক্ষাতেই ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, না বেহারী, আমার দ্বারা কিছু হবে না—আমি আর তাঁর কোন কথায় নেই।

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মা বলে ডেকেচি, আমি তোমার ছেলের মত। দোষ-ঘাট তাঁর যাই হয়ে থাক, আমি ঘাট মানচি, বলিয়া বেহারী ঝুঁকিয়া পড়িয়া সরোজিনীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত আমার বাবুকে চেনো? এই বিপদের দিনে অভিমান করে তাঁকে মেরে ফেলতে তোমাকে ত আমি কিছুতেই দেব না মা!

সরোজিনীর নিদারুণ অভিমান গলিয়া গিয়া সতীশকে ক্ষমা করিবার জন্য একবার উন্মুখ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ার মুখের সাবিত্রীর সমস্ত প্রসঙ্গ মনে পড়িয়া তাহার বিগলিত চিত্ত চক্ষের পলকে পুনরায় শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িয়া শান্ত কঠোর-স্বরে কহিল, না বেহারী, তুমি ভয় করো না, সাবিত্রী এসে পড়লেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু, আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন উপকার হবে না।

এই নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তরের জন্য বেহারী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার নিজের সর্বজয়ী ভালবাসার কাছে এই শুষ্ক কণ্ঠস্বর এমন কঠিন হইয়া বাজিল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তার পরে আর একটি কথাও না বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঊনচল্লিশ

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রীকে লইয়া উপেন্দ্র মাস পাঁচ-ছয় নৈনিতালে বাস করিয়া মাত্র কয়েকদিন হইল বক্সারে ফিরিয়া আসিয়াছে। এটা সুরবালার শেষ ইচ্ছা। সেদিন, সন্ধ্যার পর স্নিগ্ধ দীপালোকের পানে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া এই পরলোকের যাত্রীটি ধীরে ধীরে স্বামীর হাতের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বলিল, তোমার কথায় আর কখনো কোনদিন সন্দেহ হয় না। আজ আমাকে একটি কথা সত্যি করে বলবে? ভুলোবে না বল?

উপেন্দ্র মুমূর্ষু স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কি কথা পশু?

সুরবালা মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, তোমাকে আমি আবার পাব ত?

উপেন্দ্র স্ত্রীর কপালের উপর হইতে রুক্ষ চুলগুলি সরাইয়া দিয়া শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, পাবে বৈ কি!

আচ্ছা, কতদিনে পাব? আমি ত শিগগিরই চললুম, কিন্তু ততদিন কোথায় তোমার জন্যে বসে থাকব?

স্বর্গে থাকবে। সেখানে থেকে আমাকে সর্বদাই দেখতে পাবে।

কিন্তু, একলাটি কেমন করে থাকব আমি? আচ্ছা, ডাক্তারে সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে? এমন কোন ওষুধ নেই যাতে আমি বাঁচি? আমি গেলে তোমার হয়ত কত কষ্টই হবে।

একফোঁটা চোখের জল উপেন্দ্র কোনমতেই সামলাইতে পারিল না—টপ করিয়া সুরবালার কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সমস্ত হৃদয়টা তাহার মথিত করিয়া নালিশ ধ্বনিয়া উঠিল, ভগবান! স্বামীর বুকে এতবড় ভালবাসাই শুধু দিলে, কিন্তু এতটুকু শক্তি দিলে না যে, স্নেহাস্পদটিকে সে একটা দিনও বেশী ধরিয়া রাখে।

সুরবালা শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, তোমার কান্না আমি সইতে পারিনে,—আমার আর একটি কথা রাখবে?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রাখব।

সুরবালা কহিল, তা হলে আমার ছোটবোন শচীর সঙ্গে ছোটঠাকুরপোর বিয়ে দিয়ো, আমি অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, দু-চারদিনে পড়ার এমন কি ক্ষতি হবে,—একবার কলকাতা থেকে আসতে টেলিগ্রাফ করে দাও না।

উপেন্দ্রর বুকে আর একবার শেল বিঁধিল। দিবাকরকে সুরবালা যে কত ভালবাসিত তাহা সে জানিত। তথাপি তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। দিবাকরের চরম কীর্তি চিরদিনই সে পত্নীর কাছে গোপন রাখিয়াছিল, আজও তাহা প্রকাশ করিল না। টেলিগ্রাফ করিবার অনুরোধটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু তার সঙ্গে শচীর বিয়ে দিতে প্রথমে ত তোমার মত ছিল না পশু! শুধু আমার মতেই শেষে মত দিয়েছিলে। এখন আমার নিজের মত বদলে গেছে, শচীর জন্যে ঢের ভাল সম্বন্ধ আমি ঠিক করে দেব, কিন্তু এ বিয়েতে কাজ নেই সুরো।

সুরবালা বলিল, না, সে হবে না। ছোটঠাকুরপোর সঙ্গেই শচীর বিয়ে দিয়ো।

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন বল ত?

সুরবালা কহিল, তার মুখ দেখে তুমি কোনদিন আর আমাদের পর হতে পারবে না। তা ছাড়া সে বাড়িতে থাকলে তোমাকেও দেখতে পারবে।

উপেন্দ্র অন্যমনস্কের মত কহিল, আচ্ছা, যদি অসম্ভব না হয় দেব।

ইহার তিনদিন পরে খবর পাইয়া উপেন্দ্রর নিষেধসত্ত্বেও মহেশ্বরী আসিয়া পড়িলেন। সুরবালা তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, আমি গেলে ওঁর ওপরে একটু দৃষ্টি রেখো দিদি। আমি ত জানি, উনি আর কখনো বিয়ে করবেন

না, কিন্তু ভারী কষ্ট হবে। তোমরা সবাই ওঁকে দেখো, তোমাদের কাছে এই আমার শেষ মিনতি, বলিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেশ্বরী তাহার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচদিন কাটিল, তাহার পরে একদিন সকালে স্বামীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া, সমস্ত পাড়াটা শোকের সাগরে মগ্ন করিয়া দিয়া সতীসাধ্বী স্বর্গে চলিয়া গেল।

উপেন্দ্র শান্ত-স্থিরভাবে পত্নীর শেষ কর্তব্য সমাপন করিয়া মহেশ্বরীকে লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। উপেন্দ্রর পিতা শিবপ্রসাদবাবু পুত্রের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ছেলের মুখ দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, না, যতটা ভয় পেয়েছিলাম সে-রকম নয়। এমন কি, তিনি অচিরভবিষ্যতে আর একটি টুকটুকে বধূ ঘরে আনিবার আশাও হৃদয়ে স্থান দিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী বোধ করি অলক্ষ্যে থাকিয়া বৃদ্ধের জন্য সেদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

দিন-কয়েক পরেই উপেন্দ্রকে শামলা মাথায় দিয়া কোর্টে বাহির হইতে দেখিয়া শিবপ্রসাদ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। এমন কি, পুলকের আতিশয্যে পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য কাছে ডাকিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক হিত-কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, উপীন, তোমাকে আর বোঝাব কি বাবা, তুমি নিজেই সমস্ত জানো, সমস্তই বোঝো! এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আজ যা আছে, কাল তা নেই, কাল যা আছে, আজ তা নেই—কেউ কারো নয়—সব মিছে, সমস্তই মায়ার খেলা! এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো বাবা, কখনো আখের নষ্ট করো না। প্রাণপণে উন্নতি করবার এই ত সময়। কে কার? শাস্ত্রে আছে, চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি! অর্থাৎ কিনা, মান বল, সম্ভ্রম বল, সমস্তই হচ্ছে টাকা। টাকা রোজগারের ওপরেই সমস্ত নির্ভর। দেখ না, সতীশের বাবা

কিরকম টাকাটা রেখে গেলেন বল দেখি? বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। উপেন্দ্র আনত-মুখে নিঃশব্দে সমস্ত শুনিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কাছারি চলিয়া গেল।

আদালতে সতীশের দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি এই দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে সতীশের কথা পাড়িলেন। উপেন্দ্রর ধারণা ছিল যে, সতীশ পিতার মৃত্যু হইতে বাড়িতেই আছে, কিন্তু এখন শুনিতে পাইল যে, সে বাড়িতেই আছে বটে, কিন্তু এখানের নহে, দেশের। টুনুবাবু সতীশের বৈমাত্রেয় বড় ভাই। কোনদিন তাহাকে সুনজরে দেখেন নাই—এক বাড়িতে বাস করিয়াও কখনো তাহার একটা সংবাদ পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ সতীশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেও অন্যায় হয় না। পিতার মৃত্যুতে অর্ধেক শরিক হইয়া সে দাদার আরও বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। বলিলেন, এর মধ্যেই প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে মস্ত দুই ডিসপেনসারী খুলেচে, এক শ' টাকা মাইনে দিয়ে এক ডাক্তার এনেচে, তা ছাড়া বাড়িটাকে পর্যন্ত হাসপাতাল করে তুলেচে।

উপেন্দ্র সহজভাবে বলিল, হাঁ, এ মতলব তার অনেকদিন থেকেই ছিল, শুধু টাকার অভাবেই এতদিন পারেনি বোধ করি।

টুনুবাবু শ্লেষ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, সে তো আমিও বোধ করি হে উপীন। কিন্তু, শুধু ডিস্‌পেনসারি খোলার মতলবই ত তুমি জানতে, কিন্তু তার সাধন-ভজনের মতলবটা ত আর জানতে না ভায়া।

উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাধন-ভজন কি রকম?

টুনুবাবু বলিলেন, এই যেমন চক্র, কারণ, পঞ্চমকার ইত্যাদি। শুধু ফিলানথ্রপিস্ট নয় হে, 'সতীশস্বামী' এখন একজন উঁচুদরের সাধক। গেরুয়া বসন, বড় বড় চুল-দাড়ি, রুদ্রাক্ষ-মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—সদাই ঘূর্ণিত লোচন! তার একটা সই নেবার জন্যে রাসবিহারীকে পাঠিয়েছিলাম, সে ত ভয়ে

দু’দিন কাছেই ঘেঁষতে পারেনি—আর এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, তার চাকর বেহারী আমাকে লিখে পাঠিয়েচে—জবাব দেওয়া এখনো হয়নি, তাই পকেটে পকেটেই ঘুরচে, বলিয়া তিনি একখানা হলদে রঙের ভাঁজকরা কাগজ বাহির করিয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

নিরুপায় বেহারী সতীশের অগ্রজের কাছে উপায় ভিক্ষা করিয়া এই পত্রখানি পাঠাইয়াছে। খুব সম্ভব, সে গ্রামের কোন অজ্ঞ বালককে ধরিয়া পত্রখানি লিখাইয়া লইয়াছে। আগাগোড়া চিঠিখানি পড়া গেল না বটে, কিন্তু যতটুকু গেল, ততটুকু উপেন্দ্রকে বহুক্ষণের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া রাখিল।

তাহার আবাল্যসুহৃদ, তাহার ডান হাত, তাহার ছোট ভাই—সেই সতীশ আজ অধঃপাতের এতই নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে যে, গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যে এই সমস্ত বীভৎস কীর্তি করিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ ত করেই না, বরঞ্চ ধর্মসাধন করিতেছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। হয়ত সেই কুলটা দাসীটাও সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তা ছাড়া, বেহারীর পত্রের ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে, গ্রামের নিষ্কর্মা কয়েকজন লোকও তাহার সঙ্গী জুটিয়াছে।

অন্যমনস্ক হইয়া উপেন্দ্র চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া আদালত হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, টুনুবাবুকে ফিরাইয়া দিবার কথা তাহার মনে পড়িল না।

বেহারী পত্রখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়া প্রথম কয়েকদিন স্বয়ং টুনুবাবুর প্রত্যাশা করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, পরে একখানি উত্তরের জন্য অধীর হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, না আসিলেন বড়বাবু, না আসিল তাঁহার একখণ্ড জবাব।

বিশেষ করিয়া ‘থাকোবাবা’র দৌরাত্ম্যেই বেহারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, সিদ্ধ-পুরুষ। সতীশের মন্ত্র-গুরু। অষ্টপ্রহর মদ ও গাঁজায় মেজাজ দুর্বাসা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। মুখ এত খারাপ যে, শুধু রাগের উপর নয়, তাঁহার বহাল-তবিয়তের আলাপেও কানে আঙুল দিতে হয়।

কিন্তু ইহাই নাকি তান্ত্রিক সিদ্ধ-সাধুর একটা লক্ষণ। তা ছাড়া সতীশের গুরু যে!

বেহারীর নিজের তরফ হইতেও ইহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অল্প ছিল না; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সতীশের কোনরূপ অনিষ্টের গন্ধ পাইলেও বেহারী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিত।

'গুরুবাবা'র শিক্ষকতায় সতীশ ও তাহার দলের নিশীথের নিভৃত চক্রসাধনা ও ততোধিক নিভৃত আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি এতদিন বেহারী কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু যেদিন দিনের বেলা সতীশ মদ ও গাঁজা 'বাবা'র প্রসাদ পাইল, সে দৃশ্য এই ভৃত্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। সতীশের অবর্তমানে সে গুরুবাবার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া জোড়হাতে ভক্তিভরে কহিল, বাবা, আপনি দিনের বেলায় আর বাবুকে গাঁজা-মদ খাওয়াবেন না।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। 'বাবা' একমুহূর্তেই সপ্তমে চড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তুই শালা মদ বলিস!

বেহারী বিনীত স্বরে কহিল, কি জানি, আমাদের দেশে ত ওরে মদই কয়।

'বাবা' বলিলেন, মদ! কিন্তু তোর শালার কি? তুই বলবার কে?

বেহারীও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, সেও দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি বাবুর চাকর।

ওরে আমার চাকর! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 'বাবা' একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি তোর বাবুর বাবা, তা জানিস!

বেহারী বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া বলিল, খবরদার! আমার সামনে ও-সব তুমি বলো না, তা বলে দিচ্চি!

থাকোবাবার এমনিই ত দিবারাত্রির মধ্যে সহজ-চৈতন্য প্রায়ই থাকে না, বেহারীর তিরস্কারে একেবারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কি করবি রে

শালা! বলিয়া সুমুখের খড়মটা তুলিয়া লইয়া বেহারীর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন।

নাক দিয়া বেহারীর ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল, এবং একমুহূর্তেই তাহার হৃদয়ের কোন্ এক অজ্ঞাত স্থান হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার গরম রক্ত একেবারে মগজে চড়িয়া গেল। সে ঘরের কোণ হইতে 'বাবা'র চারি হাত দীর্ঘ লোহার ত্রিশূল চক্ষের নিমেষে টানিয়া লইয়া 'বাবা'র মাথার উপর উদ্যত করিয়া ধরিল। ভয়ে দুই হাত সুমুখে তুলিয়া 'বাবা' কুকুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই অমানুষিক চিৎকারে বেহারীর নিজেরও চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে হাতের ত্রিশূলটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি?

বেহারী বলিল, হাঁ। কিন্তু, সে নিজের রক্তপাতের উল্লেখ করিল না।

সতীশ পলকমাত্র স্থির থাকিয়া বলিল, তোকে এ-বাড়িতে থাকতে দিতে আর পারব না। কিন্তু তোকে জবাবও দেব না। শ'-দুই টাকা নিয়ে তুই বাড়ি যা, তোর মাইনে আমি মাসে মাসে তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

বেহারী নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

সে ক্ষোভ প্রকাশ করিল না, ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল না, দুই শত টাকা উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া প্রভুর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ উপরের বারান্দা হইতে যতক্ষণ দেখা গেল তাহার পানে চাহিয়া রহিল। ক্রমে বিধু পালের দোকানের আড়ালে তাহার দেহটা যখন অদৃশ্য হইল তখন শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক—এতদিনে বেহারীটাও গেল।

এবার আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই মহামায়ার পূজা। এখন তাহার দেরী ছিল, কিন্তু সতীশের বন্ধু-মহলে ইহারই মধ্যে আলোচনা উঠিয়াছে, এবার মায়ের কি কি করা চাই। মহাষ্টমীর জন্য এখন হইতেই যে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু

ভাদ্রের মাঝামাঝি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল; এমন কি, দুই-চারিটি সান্নিপাতিক জ্বরের জন্যও ডাক্তারবাবুর হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হইয়া গেল।

আজ কয়দিন হইতেই সতীশের দেহটা তেমন ভাল বোধ হইতেছিল না। বেহারী যেদিন চলিয়া গেল সে রাত্রে জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট অনুভব করিল। হয়ত একাদশীর জন্য হইয়া থাকিবে বলিয়া সে পরদিন সকালে উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু যাহা বাস্তব, যাহার ভার আছে, তাহাকে অত সহজে উড়ানো চলে না। সমস্তদিন ধরিয়া তাহাকে মানিতেই হইল যে, তাহার দেহ সুস্থ নয়।

তিনদিন পরে, পূর্বপ্রথামত আজিকার চতুর্দশী রাত্রিতেও ঘটা করিয়া পূজার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সতীশ স্বয়ং যোগ দিতে এবার অস্বীকার করিল। অপরাহ্নবেলায় গুরুবাবা আসিয়া সতীশের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া কমণ্ডলু দেখাইয়া হাস্যপূর্বক কহিলেন, বাবা, এর ওপর ত যমের অধিকার নেই। তা ছাড়া, তুমি যে মূলাধার, তুমি না থাকলে যে সব পণ্ড।

গুরুজীর কথা সতীশ অগ্রাহ্য করিত না, তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজী হইল। বস্তুতঃ, বেহারীকে বিদায় করার পর হইতে সমস্ত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া এ-সব তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যদিচ, কোনমতেই তাহার বিশ্বাস হয় না যে, বেহারী একেবারে চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, তথাপি যত শীঘ্র হয় তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রাণ তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, আরও একটা চিন্তা তাহাকে ভিতরে ভিতরে যাতনা দিতেছিল। কি জানি, বেহারী নিজের বাড়িতেই গেছে, কিংবা তাহাদের পশ্চিমের বাড়িতেই গেছে; গিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রচার করিয়া কি একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টায় আছে, কিংবা, আর কোন মতলব করিতেছে। যাই হোক, তাহাকে আবার চোখে না দেখা পর্যন্ত সতীশ কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার পূর্বেই দ্বিতলের ঘরটিতে সমবেত হইয়া দুই-এক পাত্র সেবন করার পরে সতীশের সেই নির্জীব ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, তবুও অন্তরে

পীড়ার গ্লানি তাহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়াই দিতেছিল। ঠিক এমনিই সময়ে পাশের ঘরে অকস্মাৎ বেহারীর গলা শুনিতে পাইয়া সতীশ পুলকিত-বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হাঁক দিয়া ডাকিল, বেহারী নাকি রে?

বেহারী দ্বারের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে সাড়া দিল, আজ্ঞে!

‘গুরুবাবা’র মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, এ ব্যাটা আবার ফিরে এলো নাকি বাবা? শালা ও-ঘরে ঢুকেছে কেন!

এই ঘরেই তাঁদের নিশীথ-চক্রের আয়োজন চলিতেছিল।

সতীশ এ-সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই বাড়ি গিয়েছিলি নাকি রে?

বেহারী কহিল, আজ্ঞে না, আমি কাশী গিয়েছিলুম।

কাশী? কাশীতে কেন?

মাকে আনতে।

সতীশ চমকিয়া উঠিল। বেহারী কাহাকে যে ‘মা’ বলে সতীশ তাহা জানিত। কহিল, সে কাশীতে থাকে নাকি?

আজ্ঞে হাঁ।

তুই তার ঠিকানা জানতিস?

বেহারী কহিল, না। কিন্তু, আমি জানতুম, মা যেখানেই থাকুন, বাবার মন্দিরে একদিন দেখা হবেই।

দেখা হয়েছিল?

আজ্ঞে হাঁ।

সতীশের বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেখানে যাওয়া তোর ভাল কাজ হয়নি। তাদের মান-সম্ভ্রম লজ্জা-শরমের জ্ঞান নেই,—

তোকে আহাম্মক পেয়ে তোর সঙ্গে যদি চলেই আসত, আজ তা হলে তুই কি বিপদেই পড়্‌তিস বল্ ত?

বেহারী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ তখন নিজেই আবার কহিতে লাগিল, বাড়ি ঢুকতে ত দিতাম না,—ফটকের বাইরে থেকেই দরোয়ান দিয়ে দূর করে দিতাম। তাকে নিয়ে এই রাত্রে তুই কি মুশকিলে পড়ে যেতিস ভেবে দেখ্ দেখি? সাধে কি আর লোকে তোদের ভেমো-গয়লা বলে রে! আচ্ছা, যা, খাওয়া-দাওয়া কর গে যা। কালীচরণ, বেশ একটু বড় করে একপাত্র দাও ত ভাই।

হুকুমমাত্র কালীচরণ একপাত্র 'কারণ' মূল সাধকের হাতে তুলিয়া দিল।

বেহারী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বাবু, মা একবার আপনাকে ডাকচেন!

সতীশ পাত্র মুখে তুলিতে যাইতেছিল, চমকিয়া কহিল, কে ডাকচেন বললি?

বেহারী বলিল, মা।

সতীশ হতবুদ্ধির মত হাতের পাত্রটা পিকদানিতে উপুড় করিয়া দিয়া কহিল, তোর সঙ্গে এসেচে? তা আগে বললি নে কেন?

বেহারী তাহার জবাব না দিয়া পুনরায় কহিল, তিনি এখুনি একবার ডাকচেন।

সতীশ গলা একটু খাটো করিয়া বলিল, তুই বল্ গে বেহারী, যে, বাবুর জ্বর হয়েচে, তাই বাইরে জন-কয়েক বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছেন। আধ-ঘণ্টা পরে যাচ্চি, বল্ গে যা।

বেহারী তাহার হাতের পাশের দরজাটা চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা এই যে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, একবার বেরিয়ে আসুন।

সতীশ চকিত হইয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলি-সংকেতে প্রশ্ন করিল, এই ঘরে?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, হাঁ, এই যে।

সতীশ চট করিয়া গোটা-দুই লবঙ্গ এলাচ মুখে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহার পাশের দরজার অন্তরালেই সাবিত্রীর অঞ্চল-প্রান্ত দেখা যাইতেছে! সে যে স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বোকা বেহারীকে বেশ করিয়া দুই গালে চড়াইয়া দেয়।

সাবিত্রী উঁকি মারিয়া দেখিয়া চুপি চুপি কহিল, ঘরের ভিতরে এসো।

এই কণ্ঠস্বরের সুরে তাহার বুকের সমস্ত তারগুলা যেন বাঁধা ছিল,—সমস্ত এক সঙ্গে ঝমঝম করিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে ঘরে ঢুকিতেই সাবিত্রী কহিল, জ্বর হয়েচে বলছিলে যে?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, জ্বর হয়েচে ত।

কৈ দেখি? বলিয়া সতীশের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া সতীশের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমকিয়া বলিল, হাঁ—সত্যিই জ্বর যে! গা যেন পুড়ে যাচ্চে,—এসো, আমি বিছানা করে দিচ্চি, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল। বেহারী, বাবুর ঘরে একটা আলো জ্বেলে দেবে এসো, বলিয়া সাবিত্রী তেতালার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সে বাড়ি ঢুকিয়াই বাবুর শোবার ঘরটা বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল।

পালঙ্কের উপর শয্যা প্রস্তুত করাই ছিল, শুধু আঁচল দিয়া একবার ঝাড়িয়া দিতেই সতীশ শান্ত বালকের মত চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। শিয়রে এবং পায়ের দিকের জানালা দুটা বন্ধ করিয়া দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুটি থাকেন কোন্ ঘরে?

বেহারী পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিলে সাবিত্রী কহিল, তাঁর কি কি আছে ওখানে নীচে দিয়ে এসো বেহারী। বাইরের এক সার ঘর ত অমনি পড়ে আছে—তার কোন একটাতে বেশ থাকতে পারবেন তিনি। বেহারী চলিয়া যাইতেছিল, সাবিত্রী ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি যাঁরা বাবুকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁদেরও

বাড়ি যেতে বলে দিয়ো। বলো, বাবুর জ্বর বেশী হয়েচে, আর নামতে পারবেন না।

সতীশ একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না, মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

বেহারী বীর-দর্পভরে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্থান করিতে সাবিত্রী বলিল, আর উঠো না যেন। আমি খাবার ব্যবস্থাটা ঠিক করে দিয়ে আসি। বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চলিয়া গেল।

তাহার ভয় ছিল, 'সাধুবাবা' বোধ হয় বিদ্রোহ করিবেন, তাই অলক্ষ্যে আসিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল।

পরক্ষণেই ওধারের দরজা দিয়া বেহারী প্রবেশ করিয়া জোর গলায় কহিল, মা বলে দিলেন, আপনারা বাড়ি যান। বাবুর জ্বর বেড়েচে, আজ আর তাঁর নামা চলবে না। 'থাকোবাবা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার জিনিসপত্তর ঠাকুর, নীচে নিবারণের ঘরের পাশের ঘরে রেখে দিতে মা হুকুম দিয়েচেন। তুমি সেইখানেই থাকবে।

'বাবা'র উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, মা কে বেহারী?

বেহারী কটুকণ্ঠে জবাব দিল, সে খোঁজে তোমার দরকার কি ঠাকুর? যা বলচি তাই কর,—নীচে যাও। মনে মনে কহিল, কে তা টের পাবে। বিনি পয়সার মদ-গাঁজা খেয়ে খড়ম মারা তোমার কাল আমি বার করব।

সকলেই হতবুদ্ধির ন্যায় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কেহই বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু আদেশ যখন সত্যকার আদেশরূপে অকুণ্ঠিত-স্বরে বাহির হইয়া আসে, তা সে যাহারই মুখ দিয়া আসুক, মানুষ কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুভব করিতে পারে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না।

বেহারী রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী বামুনঠাকুরকে দিয়া দুধ জ্বাল দিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কহিল, রাত হয়ে গেল, তোমার ত এখনও পর্যন্ত স্নান-আহ্নিক হয়নি মা। সারাদিন গাড়িতে একফোঁটা জল পর্যন্ত খাওনি,—চল, আগে তোমাকে স্নানের জায়গা-টায়গাগুলো দেখিয়ে দিয়ে আসি, ততক্ষণে বাবুর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া হয়ে যাবে এখন। বলিয়া সাবিত্রীকে একরকম জোর করিয়াই লইয়া গেল।

তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া বেহারী বাবুর জন্য তামাক সাজিয়া গুড়গুড়িটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া বাবুর ঘরে ঢুকিল। সতীশ চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, চোখ মেলিয়া কহিল, কে বেহারী?

হাঁ বাবু, তামাক সেজে এনেচি।

আয়। সে কোথায় রে?

বেহারী কহিল, এখন পর্যন্ত একফোঁটা জল মুখে যায়নি। তাই জোর করে চান করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসচি বাবু!

সতীশ কহিল, বেশ করেচিস। কিন্তু, তোকে আমি খুঁজছিলাম বেহারী।

বেহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—কেন বাবু? দেহটা এখন কেমন আছেন?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাল নেই বেহারী। তোকে তাই আমি খুঁজছিলাম। দোরটায় খিল দিয়ে আমার কাছে এসে একটু বস।

বেহারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিত-চিত্তে প্রভুর পায়ের কাছে আসিয়া মেঝের উপর উবু হইয়া বসিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বেহারী, তুই ফাঁড়া মানিস?

বেহারী সবিস্ময়ে কহিল, ফাঁড়া? ফাঁড়া মানিনে আবার? পাঁজিপুঁথির লেখা কখনো কি মিথ্যে হতে পারে বাবু?

সতীশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এবার আমার একটা মস্ত ফাঁড়া আছে বেহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; বলিল, না না, অমন কথা বলবেন না বাবু!

সতীশ নিজের মনে বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি টের পেয়েচি বেহারী, এই জ্বরই আমার শেষ জ্বর,—এবার আমি আর বাঁচব না।

চক্ষের পলকে বেহারী প্রভুর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ও-কথা মুখে আনবেন না বাবু, আপনার সব আপদ-বালাই নিয়ে আমি যেন মরি, আমার পেরমাই নিয়ে আপনি বেঁচে থাকুন বাবু, আমরা সবাই তা হলে মরে যাব, একটি প্রাণীও বাঁচব না। বলিতে বলিতে বেহারী হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতীশ গম্ভীর-মুখে বলিল, মরা-বাঁচার কথা ত বলা যায় না বেহারী, যদি না-ই বাঁচি, তোকে যা জিজ্ঞেসা করব, সত্যি কথা বলবি?

বেহারী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি বাবু, একটি কথাও মিছে বলব না।

কিছুই লুকোবি নে বল্?

না বাবু, একটি কথাও গোপন করব না।

তখন সতীশ কহিল, আচ্ছা বস গে।

বেহারী চোখ মুছিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলে, সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাবিত্রীকে কোথায় পেলি বল্ দেখি?

ঐ যে বললুম কাশীতে।

সেখানে বিপিনবাবুর সঙ্গে তোর দেখা হলো?

বেহারী জিভ কাটিয়া ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, রাম! রাম! সে হারামজাদা আমাদের কে যে তার সঙ্গে দেখা হবে বাবু!

সতীশ কহিল, কিন্তু তুই যে নিজের চোখে তাকে ওর বিছানায়—

বেহারী দুই হাত তুলিয়া সতীশকে কথাটা শেষ করিতেও দিল না। সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া নিজের গালে-মুখে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া গোটাকতক সশব্দে চড় কশাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, তার শাস্তি এই! এই! এই! তবু, না জেনে

বলেছিলুম বলেই এখনো পাঁচজনের কাছে মুখ বার করতে পারচি, না হলে এই জিভটা আমার এতদিন পচে খসে পড়ত।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি হলো রে তোর?

বেহারী লজ্জা পাইয়া তখন স্থির হইয়া বসিয়া একটি একটি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। এতটুকু বাড়াইল না, একবিন্দু গোপন করিল না। নিজে যাহা জানিত, মোক্ষদার কাছে, চক্রবর্তীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সাবিত্রীর নিজের মুখ হইতে যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছিল, সমস্ত একে একে ব্যক্ত করিয়া কহিল।

সতীশ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বেহারীর মুখেও আর কথা রহিল না।

বহুক্ষণ পরে সতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এতদিন এ-সব কথা তবে বলিস নি কেন বেহারী?

বেহারী কহিল, কতদিন বলবার জন্যে আমার যেন বুক ফেটে যেত বাবু, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটোতে পারতুম না।

কেন শুনি?

আমার সাবিত্রী-মায়ের মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ ছিল বাবু।

সতীশ আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, সে যেন হলো বেহারী, কিন্তু সেদিন রাত্রে সাবিত্রী নিজের মুখেই ত বলে গিয়েছিল সে বিপিন ছাড়া কাউকে চায় না,—তার সঙ্গেই সে চলে যাচ্চে। তার কি বল দেখি?

বেহারী বলিল, এই কথাটা আমি নিজেও বুঝতে পারিনে বাবু। তবু আমি নিশ্চয় জানি, এ মিথ্যে! মিথ্যে! একেবারে ঘোর মিথ্যে! এ যদি মিথ্যে না হয় ত আমার একটা ছেলেও যেন বাঁচে না বাবু। মায়ের যাবার সময় কেঁদে বললুম, কেন এ মিথ্যে কলঙ্কের ডালি নিজের মাথায় তুলে নিলে মা? তবু, মা আমাকে প্রকাশ করবার হুকুম দিলে না। আমায় নিজেও কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বেহারী, আমার মাথার দিব্যি রইল বাবা, বাবুকে এ-সব কথা তুমি বলো না। তিনি আমাকে

ঘেন্না করুন, আর কখনো মুখ না দেখুন, সেও আমার ঢের ভাল, তবু তাঁকে বলো না যে, আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে চলে গেলুম। বলিয়া বেহারী সে-রাত্রের স্মৃতির বেদনায় ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু, প্রভুর চোখ দিয়াও যে হুহু করিয়া জল পড়িতেছিল, বৃদ্ধ ভৃত্য তাহা দেখিতেও পাইল না।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তুই বুঝতে পারিস নি বেহারী, কিন্তু আমি বুঝেছি, কেন সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছিল। কিন্তু মিথ্যের ত জয় হয় না বেহারী—

বাহির হইতে দ্বারে করাঘাত পড়িল—ও কি দোর বন্ধ করে ঘুমোলে নাকি গো? খিল খুলে দাও।

বেহারী প্রভুর মুখের পানে চাহিল, কিন্তু প্রভু নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাহির হইতে পুনরায় শব্দ আসিল—দোর খুলে দাও না, হাত পুড়ে গেল যে!

বেহারী উঠিয়া কবাট খুলিয়া নীরবে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল।

চল্লিশ

এক বাটি গরম দুধ হাতে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সেটা পাশের টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিল। তাহার পরনে ধপধপে গরদের শাড়ি, সদ্যস্নাত সুদীর্ঘ সিক্ত কেশভার পিঠ ছাড়াইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সতীশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সাবিত্রীকে আজ যেন সে এই প্রথম দেখিল।

কিন্তু সে সতীশের আর্দ্র চক্ষু-পল্লব এই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইল না। একটুখানি সরিয়া কাছে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, দোর দিয়ে বসে প্রভু-ভৃত্যে কি পরামর্শ হচ্ছিল শুনি? বেহায়া আপদটাকে কি করে ফটকের বাইরে দূর করে দেওয়া যায়, এই না?

সতীশ সাড়া দিল না। পাছে কথা কহিলে কণ্ঠস্বরে ভিতরের দুর্বলতা ধরা পড়ে, এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, ছেলেবেলায় সেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা-বাঁধার গল্প পড়েচ ত? আমিও দেখতে চাই এ-ক্ষেত্রে ঘণ্টা বাঁধতে কে এগিয়ে আসে। তুমি নিজে, না তোমার ও সাধুজীটি!

তবুও সতীশ কথা বলিল না, যেমন চুপ করিয়া ছিল তেমনি রহিল।

একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সাবিত্রী কাছে বসিল। কিন্তু এবার তাহার পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইল। কহিল, তামাশা যাক, কাণ্ডটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? উপীনদার সঙ্গে ঝগড়া করলে, শেষে কিনা সরোজিনীর সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে চলে এলে। তা না হয় একদিন মিটে যাবে জানি, কিন্তু একি হচ্ছে? আমার গা-ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলে মদ ছোঁবে না, তা মদ চুলোয় যাক, গাঁজা

খেতে ধরেচ! তাও আবার সোজা করে নয়,—যত সমস্ত অভাগার দল জুটিয়ে, গেরুয়া কাপড় পরে যন্ত্র-মন্ত্রের ঢাক পিটে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে খাওয়া চলেচে!

সাবিত্রীর মুখে সরোজিনীর উল্লেখে সতীশের গা জ্বলিয়া গেল। বেহারী যে কিছুই বলিতে বাকী রাখে নাই, তাহা সে বুঝিল। একবার তাহার ঠোঁটে আসিয়া পড়িল তোমার জন্যেই আমার সর্বনাশ—তুমিই আমার শনি! কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া শুধু ধীর-গম্ভীর গলায় সংক্ষেপে বলিল, বুক ফুলিয়ে মদ-গাঁজা খাওয়ার দোষ কি?

দোষ কি সে তুমি জানো না?

না

আচ্ছা, তাও যদি না জানো, এটা ত জানো যে, আমার গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে খাবে না?

তুমি আমার কে যে, কবে জোর করে দিব্যি করিয়ে নিয়েচ বলে সে একটা মস্ত বাধা!

সাবিত্রী কোনমতে হাসি চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ নয় আমি? একেবারেই কেউ নয়?

সতীশও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে মদের গেলাস পিকদানিতে ঢেলে ফেলে এলাচ চিবোতে চিবোতে এসেছিলে কেন?

সে শুধু তুমি বকাবকি করবে এই ভয়ে।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তবু সাবিত্রী কেউ নয়। আচ্ছা, এখন একটু দুধ খেয়ে ঘুমোও। বলিয় উঠিয়া গিয়া দুধের বাটিটা হাতে লইয়া সতীশের সুমুখে দাঁড়াইল। সতীশ আপত্তি করিল না, উঠিয়া বসিয়া সমস্ত দুধটুকু পান করিয়া শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বাটিটা হাতে করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আহ্নিক সারা হয়েছে?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ।

কি খেলে?

এখনো খাইনি। এইবার গিয়ে যা হোক কিছু খাব।

শোবে কোথায়?

দেখি, ফটকের বাইরে কোথাও একটু জায়গা-টায়গা পাওয়া যায় কিনা! নইলে গাছতলায়। বলিয়া নিজেই একটু হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করতেও কি একটু কষ্ট হয় না? ধন্য তুমি! বলিয়া পরম স্নেহে সতীশের কপালের উপর হইতে চুলগুলি হাত দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে গিয়া তাহার ললাটের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। বেহারী ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, মা, তোমার বিছানাটা—

সাবিত্রী পাশের ঘরটা হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই ঘরটাতেই আমার বিছানা হবে বেহারী, বাবুর জ্বরটা কিছু বেশী বোধ হচ্ছে—আমি এই পাশের ঘরেই শোবো। মাঝের দরজাটা খোলা থাকবে—তোমাকেও আজ এই ঘরের মেঝেতেই শুতে হবে। সতীশকে কহিল, আর রাত জেগো না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, বলিয়া ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

অল্পকাল পরে সামান্য কিছু আহার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে পাশের ঘরেই একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল এবং ক্লান্ত চক্ষু-দুটি তাহার দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিতে সাবিত্রী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল, শয্যার উপর সতীশ যাতনায় ছটফট করিতেছে। কপালে হাত দিয়া দেখিল উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার শীতলস্পর্শে সতীশ চোখ মেলিল—দু'চক্ষু জবাফুলের মত রাঙ্গা।

জ্বরের অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রী ভয়ে সেই শয্যার উপরেই ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করে তাহার এ ক্ষমতা রহিল না।

সতীশ তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া নিজের তপ্ত ললাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি কালকেই টের পেয়েছিলাম। কালই আমি বেহারীকে বলেছি— এই জ্বর আমার শেষ জ্বর—এবার আমি আর বাঁচব না।

জ্বরের তীব্র যাতনায় সে এমন করিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া এই কথাগুলি কহিল যে, সাবিত্রী তাহাকে সান্ত্বনা দিবে কি, অদম্য কান্নায় তাহার নিজেরই কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; এবং সমস্ত রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে বলিয়া অনুশোচনায় তাহার নিজের মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সতীশ কহিল, আমার একটা সাহস যে তুমি আমার কাছে আছ, বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

আজ সে-ই তাহার সকলের বড় অবলম্বন, কাল রাত্রে যাহাকে সে অভিমানের স্পর্ধায় বলিয়াছিল, তুমি আমার কে!

কিন্তু ক্ষণকালের জন্য সাবিত্রীর এ সাধ্যটুকুও রহিল না যে, বেহারীকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে বলে। শুধু সতীশের একটা উচ্ছ্রিত বাহুর উপর হাত রাখিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরেই সতীশ আবার এ-পাশে ফিরিল। আবার সাবিত্রীর হাতটা টানিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ত কিছু কিছু ডাক্তারি পড়েচি, আমি নিশ্চয় জানি আমার এ জ্ঞান হয়ত ও-বেলা পর্যন্ত থাকবে না, কিন্তু এখনো আমার বেশ হুঁশ আছে। কিন্তু সে জ্ঞান যদি আর আমার ফিরে না আসে ত উপীনদাকে বলো, ওই দেরাজের মধ্যে আমার উইল আছে। সে আমার মুখ দেখবে না জানি, কিন্তু এও জানি, আমার মরণের পরে আমার শেষ ইচ্ছার সে অপমান করবে না। সাবিত্রী, সংসারে এক তুমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তার চেয়ে আমার বেশী আপনার নেই।

উইলের উল্লেখ সাবিত্রীকে আত্মহারা করিয়া দিল, এবং এতকালের সংযমের বাঁধ আজ তাহার একমুহূর্তের আবেশে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

বেহারী প্রায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া ভোরবেলাটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

তখন সতীশ দুই হাত দিয়া জোর করিয়া সাবিত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অশ্রু-উৎস নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপরে টানিয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।

তাহার মুখ, তাহার চিবুক, তাহার গলা সাবিত্রীর দুই চক্ষুর অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং সে প্রবাহ যে তাহার প্রাণাধিকের রোগোৎপন্ন প্রবল প্রদাহকেও কতখানি ভিজাইয়া শীতল করিল, তাহা অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না বটে, কিন্তু সংসারে ওই বৃদ্ধ বেহারীর বিস্ময়মুগ্ধ বিহ্বল চক্ষু ছাড়া তাহার আর দ্বিতীয় সাক্ষী রহিল না।

বাহিরে শরতের স্নিগ্ধ প্রভাত তখন দিনের আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রী আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া প্রিয়তমের মুখ হইতে সমস্ত অশ্রুচিহ্ন সযত্নে মুছিয়া লইল, উঠিয়া আসিয়া ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিতেই স্বর্ণাভ রৌদ্রকিরণে ঘর ভরিয়া গেল।

বেহারীর চোখ দিয়া তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল, সাবিত্রী মুখের ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া শান্ত সহজ-কণ্ঠে শুধু কহিল, ভয় কি বেহারী, আমি থাকতে ওঁর কোন ভয় নেই,—বাবু ভাল হয়ে যাবেন। আমি ততক্ষণ বাবুর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে বিছানা বদলে দিই, তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো গে, বলিয়া রোগশয্যায় পুনরায় ফিরিয়া গেল।

ডিস্পেন্সারির ডাক্তারবাবু আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সতীশকে পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, তাই ত! এ যে নিমোনিয়ার লক্ষণ দেখি। ভয় নেই, রোগ এখনও বাড়তে পারেনি।

ভরসা দিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, ডাক্তারবাবু স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য নীচে চলিয়া গেলেন, সতীশ কষ্টে একটুখানি হাসিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, ভয় আমি একতিল করিনে। বলিয়া বালিশের তলায় হাত দিয়া একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, এটা চিনতে পার সাবিত্রী? নিজে ইচ্ছে করে একদিন যাকে আঁচলে বেঁধেছিলে, আজ আমিই তাকে তোমার আঁচলে বেঁধে দিই, বলিয়া সাবিত্রীর অশ্রুসিক্ত আঁচলখানি টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার চাবির রিংটা বাঁধিয়া দিয়া, একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সাবিত্রীর প্রতি বেহারীর নির্ভরতার অন্ত ছিল না; তাহার কাছে সাহস পাইয়া সে প্রথমটা প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু সে ত ছেলেমানুষ নহে, দিন-কয়েক পরে সে-ই সাবিত্রীর মুখের চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট দেখিতেছিল, এই অসীম কর্মপটু সহিষ্ণু রমণীর শান্ত মুখের উপর একটা পাণ্ডুর ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

আট-দশদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে সাবিত্রীকে নিভৃতে পাইয়া সহজ-কণ্ঠে কহিল, মা, এই বুড়োকে ভুলিয়ে কি হবে? তোমার ওই কচি বুকে যা সহ্য হবে, তাই এই বুড়ো হাড়ে কি সইবে না মা? তার চেয়ে আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।

সাবিত্রী একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তোমাকে এখনো বলিনি বেহারী, কিন্তু তোমার নাম করে উপীনবাবুকে আজ সকালে আমি চিঠি লিখে দিয়েচি। দু'দিন অপেক্ষা করে দেখি, যদি তিনি না আসেন, তোমাকে নিজে একবার তাঁর কাছে যেতে হবে বেহারী।

বেহারী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমাকে না বলে এ কাজ কেন করলে মা!

কেন বেহারী, তিনি কি আসবেন না?

বেহারী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি আসতেও পারেন, কিন্তু আমাকে কেন একবার জানালে না মা?

কেন বেহারী?

বেহারী সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। কথাটা বলা দরকার। কিন্তু এই অত্যন্ত অপমানকর বাক্যটা তাহার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইতে চাহিল না।

সাবিত্রী কহিল, এ-সময়ে তাঁর আসা যে নিতান্ত দরকার বেহারী?

বেহারী বহু কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া উঠিল, সে ত জানি মা, কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত লোক বাবুর বিছানা ঘিরে থাকলেও ত তাঁকে বাঁচাতে পারা যাবে না, সে-কথা কেন ভেবে দেখনি মা!

সাবিত্রী কহিল, ভেবেচি বেহারী। আমি বাড়ির যেখানে হোক নুকিয়ে থেকে আমার কাজ করতে পারব, কিন্তু উপীনবাবুর যে না এলেই নয়! তা ছাড়া আমি মেয়েমানুষ, এ বিপদের কতটুকু ভাল-মন্দই বা বুঝি! না বেহারী, তিনি আসুন।

বেহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, উপীনবাবুর কথা জানিনে মা, কিন্তু বাবুর কথা জানি। নির্বোধ বটে, কিন্তু এই ষাট বচ্ছর ধরে সংসারটা ত দেখচি? কটা পুরুষমানুষ তোমার চেয়ে ভাল-মন্দ বেশী বোঝে মা? তা সে যাই হোক, তুমি কাছ থেকে সরে গেলে এ-যাত্রা বাবুকে যে ফেরাতে পারব না, এ কথা আমি তোমার পা ছুঁয়ে পর্যন্ত দিব্যি করে বলতে পারি। এমন কাজ কোরো না মা, তুমি আমার বাবুকে ছেড়ে আর কোথাও পালিয়ে থেকো না।

এ কথা বেহারীর চেয়ে সাবিত্রী যে কম জানিত তাহা নহে, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে হাতের কাছে না পাইলে সতীশের ব্যাকুলতা যে কতখানি

বাড়িবে, সে সতীশই জানে; কিন্তু এই নিদারুণ রোগশয্যায় সতীশকে চোখের আড়াল করিয়া সাবিত্রী আপনিই বা বাঁচিবে কি করিয়া? তাহাদের প্রতি উপেন্দ্রর ঘৃণা তাহার অবিদিত ছিল না। তিনি আসিলে তাহাকে আত্মগোপন করিতেই হইবে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই—সমস্তই সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু যাহার জন্য এতদিন এত দুঃখ সহিয়াছে, তাহার জন্য এ দুঃখও সহিবে; এই মনে করিয়াই সে উপেন্দ্রকে পীড়ার সমস্ত বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া, আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

সাবিত্রী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না বেহারী, সে হতে দিতে পারব না। তিনি পরশুর মধ্যে না এসে পড়লে, তোমাকে নিজে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে।

বেহারী ম্লানমুখেই কহিল, এ কথা কেন বলচ মা! আমি চাকর, আমাকে যা হুকুম করবে, তাই আমাকে করতে হবে। কিন্তু আমিও ত মানুষ? তোমার চোরের মত নুকিয়ে থাকা যদি কোনদিন সয়ে উঠতে না পারি মা, আমাকে গাল দিতে পারবে না, তা কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্চি, বলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেল।

কিন্তু, সাবিত্রীর সে চিঠি উপেন্দ্রর হাতে পড়িল না। পিতা ও মহেশ্বরীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে মাস-খানেক পূর্বে নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জলহাওয়া বদলাইতে পুরী যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে কাহারো সহিত পরিচয় ছিল না বলিয়া প্রথম রাত্রে তাহাকে একখানা ছোট-রকম হোটেলে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল পরদিন সকালে একটা ভাল জায়গা অনুসন্ধান করিয়া লইবে। স্বত্বাধিকারী ভুবন মুখুয্যে মহাশয় কিন্তু খাতির-যত্নের অবধি রাখিলেন না—আলাদা ঘরে বিছানা করিয়া দিলেন, এমন কি, যতদিন খুশী এখানে থাকিলেও যত্নের ত্রুটি হইবে না ভরসা দিলেন।

সকালে একজন প্রৌঢ়া-গোছের স্ত্রীলোক ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া উপেন্দ্রকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ঝাঁটাটা ফেলিয়া গড় হইয়া প্রণাম

করিয়া কহিল, বাবুর কি কোন ব্যারাম হয়েছিল? বড্ড রোগা দেখচি যে! সে চেহারা নেই, সে বর্ণ নেই—

উপেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমি যে মোক্ষদা, বাবু, আপনাকে চিনিনে?

উপেন্দ্রর মনে পড়িল, এ সেই মোক্ষদা, যে বহুকাল পূর্বে সতীশের বাড়িতে চাকরি করিত। কহিল, তুমি এখানে চাকরি কর বুঝি?

মোক্ষদা সলজ্জভাবে কহিল, না—হাঁ—তা একরকম চাকরি করা বৈ কি! মুখুয্যেমশাই বললে, আর কলকাতায় পড়ে থাকা কেন, বরং চল কোন তীর্থস্থানে গিয়ে থাকি গে। যা হোক একটা হোটেল-টোটেল করে—

উপেন্দ্র বাধা দিয়া কহিলেন, তা হোটেল চলচে ভাল?

তাঁহার বিরক্তি মোক্ষদার দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, অমনি চলে যাচ্ছে। তা বাবু, এই বয়সে আমার চাকরি করতেই বা হবে কেন? আর মুখুয্যেরই বা ছায়া মাড়াতে হবে কেন? মেয়েটাকে ধরতে গেলে আমিই ত একরকম মানুষ করলুম। মাসী বলে ডাকত, সত্যিকারের মাসীর মতই তাকে বুকে করে রেখেছিলুম, এ না জানে কে? সাবি বললে, মাসী, এ-সব করব না, আমি চাকরি করে মাসী-বোনঝির পেট চালাব। তাই সই। বাবুদের মেসের বাসায় চাকরি করে দিলুম, বাবুরা ঝি বলে ভাবত না, বাড়ির গিন্নী বলে মানত। না যাবে সে, না আজ আমাকে এ-সব করতে হবে। কিন্তু যাই বল বাবু, আমি সত্য কথা বলব,—আমাদের ছোটবাবু হতেই ত আজ আমার এত দুঃখ।

উপেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ছোটবাবু কে? আমাদের সতীশ?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ। ছুঁড়ি কি চোখেই যে ছোটবাবুকে দেখলে, তার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে! আর তাই, ছোটবাবুকেই কি ধরা-ছোঁয়া দিলে? তাও দিলে না। বিপিনবাবু লক্ষপতি জমিদার। আমার বাসায় রাত নেই, দিন নেই, হাঁটাহাঁটি কাঁদাকাটি করে পায়ের তলা ক্ষইয়ে ফেললে। সোনা রূপা

জড়োয়া গয়নায় দশ হাজার টাকা ধরে দিতে চাইলে, কিন্তু ছুঁড়ি ত তার মুখ পর্যন্ত দেখলে না! কি মেয়ের তেজ বাবা, দশ দশ হাজার টাকার মায়া যেন খোলামকুচির মত পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের ঘর-দুয়ার জিনিসপত্তর পর্যন্ত ফেলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়ে, চেতলার কোন্ এক বামুনের ঘরে ছ'মাস চাকরি করে খেটে খেটে হাড়-পাঁজরা সার করে শেষে কোথায় যে চলে গেল, মা দুর্গাই জানেন, হতভাগী বেঁচে আছে না মরে গেছে! বলিয়া মোক্ষদা পূর্বস্মৃতির আবেগে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

উপেন্দ্র চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মোক্ষদা চোখ মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ বাবু, ছোটবাবু এখন কোথায়? একবার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর খোঁজ-টোজ কিছু জানেন কি না!

উপেন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, সতীশ যে এখন ঠিক কোথায়, তা আমিও জানিনে। শুনেচি তাদের দেশের বাড়িতে আছে। আচ্ছা, এই সাবিত্রী মেয়েটি কে মোক্ষদা?

মোক্ষদা একমুহূর্তেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া বলিল, কে! কুলীন বামুনের মেয়ে বাবু, আসল কুলীনের মেয়ে! বাছা ন'বছর বয়সে বিধবা হয়ে ঘরেই থাকে, এই মুখপোড়া মিন্‌সে বিয়ে করব, রাজরানী করব বলে ভুলিয়ে বের করে নিয়ে এসে শেষে হাড়ির হাল করে ফেলে পালালো। আমি যাই, তাই মুখ দেখি,—নইলে বামুন নয়, ও চামার! চামারের হাতের জল খেতে আছে ত, ওর নেই।

উপেন্দ্র বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, কার কথা বলচ মোক্ষদা?

মোক্ষদা উদ্ধতভাবে বলিল, এই মুখপোড়া ভুবন মুখুয্যে! নইলে এমন চামার ত্রিসংসারে আর কে আছে, তুই বড় ভগিনীপতি, তোর এই কাজ? অ্যাঁ!

উপেন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই হোটেল যাঁর? তিনি?

মোক্ষদা কহিল, হাঁ বাবু, হাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া হাভাতে মিনসে। অতঃপর অনুপস্থিত মুখুয্যেকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, কিন্তু কি করতে পারলি তার? অকূলে ভাসিয়ে দিলি, তা ছাড়া কোনদিন তার গা ছুঁতে পারলি কি? নিয়ে এসে, আজ নয় কাল করে মাস-খানেক কাটিয়ে যেদিন বললি বিয়ে হবে না, সেইদিনই মুখে নাথি মেরে দূর করে দিলে! ছেলেমানুষ অল্পবুদ্ধি মেয়ে, তবু কি আর কখনো তার ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে পারলি! এ ত আর মুকি নয়, যে দুটো সোহাগের কথা বলে ভুলোবি? সে সাবিত্রী! যে দশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়নায় নাথি মেরে চলে যায়—সে!

উপেন্দ্র অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তোমার মুখুয্যেমশাইকে একবার ডাকতে পার, দুটো কথা জিজ্ঞাসা করব?

মোক্ষদা কহিল, মিন্‌সে বাজারে গেছে। একটুখানি থামিয়া পুনরায় বলিল, মাঝে একদিন রাস্তায় চক্কোবত্তি-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ঠাকুর বলে আর কাঁদে—মাকে আমার সবাই ভালবাসত। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি দয়া-মায়া কিনা!

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্রবর্তীঠাকুর কে?

মোক্ষদা বলিল, তিনি বাবুদের মেসের বাসায় রাঁধত কিনা, সব কথাই জানত। বেহারীর মুখে শুনে সমস্ত আমাকে বললেন। চেতলার বামুনবাড়ি থেকে ব্যারাম হয়ে মা আমার ছুটি চাইলে, তা—আচ্ছা বাবু, বামুন মাত্রেই কি এত নিষ্ঠুর! সে স্বচ্ছন্দে বললে, তোমার ওষুধের দেনা হয়েচে সাত টাকা। দিয়ে, তবে যাও। টাকা ক'টি শোধবার জন্যে সাবিত্রী সতীশবাবুর বাসায় সারা পথ হেঁটে আসে। তা ছোটবাবুর একদিকে মেজাজটা খুব উঁচু কিনা—টাকাকড়ি চাইলে তা যতই হোক, কখনো না বলেন না ত! কিন্তু এমনি পোড়া অদেষ্ট যে, সেই রাতেই বাবুর কোন্ এক মুখপোড়া বন্ধু পরিবার নিয়ে এসে হাজির। সমস্তদিনের পর চানটি কোরে বাছা সেই ঘরে উঠেচে, অমনি তাঁরা এসে পড়লেন। বন্ধুমানুষ, এসেচিস, রাতটা থাক! তা নয়, রাগ করে পরিবারের হাত ধরে ফরফর করে

বেরিয়ে গেলেন। ছোটবাবু ত অবাক। কিন্তু সাবি আমার বড় অভিমানী মেয়ে। তার কি এ অপমান সয়! জল-গ্রহণ না করে বাছা সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ত তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

উপেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই রাত্রের নিষ্ঠুর ইতিহাস চোখের উপর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল; এবং বার বার মনে হইতে লাগিল, মোক্ষদার কাহিনী যদি অর্ধেকও সত্য হয়, তাহা হইলে যাহার নামটাকে পর্যন্ত সে ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, সে কি আশ্চর্য নারী!

মোক্ষদা নিজের কাজে চলিয়া গেল, কিন্তু উপেন্দ্র সেইখানে নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া রহিল। ছয়মাস পূর্বেও সে এ-সকল কথা কানেও তুলিত না। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহা লেশমাত্রও কলঙ্কের বাষ্পে কলুষিত, তাহা চিরদিনই তাঁহার কাছে বিষবৎ ত্যাজ্য। যে সতীশকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, আজ মোক্ষদার কথায় তাহারই চোখের পাতা ভারী এবং দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। তাহার মর্মরের মত শুভ্র হৃদয় পাথরের মতই কঠিন ছিল, তবে কেন যে আজ অজ্ঞাত নারীর কলঙ্কিত প্রণয়-বেদনার কাহিনী সেই অকলঙ্ক শুভ্রতায় ছায়াপাত করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইত এ দুর্বলতা এতদিন সেই পাষাণ-তলেই চাপা ছিল,—শুধু সুরবালা যখন তাহার অর্ধেক শক্তি হরণ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সুযোগ পাইয়া ইহাই প্রচণ্ড উৎসের মত তাহার পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সুরবালা যে তাহাকে কতখানি শক্তিহীন করিয়া গিয়াছে, জানিতে পারিলে উপেন্দ্র আজ ভয় পাইত।

কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু শূন্যদৃষ্টি লইয়া সুমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, এবং কোন্ অজানা সাবিত্রীর ভালবাসার ইতিহাস তার সুরবালার শেষ-মুহূর্তের সেই অনির্বচনীয় করুণ চোখ-দুটির মত তাহার চোখের উপর চোখ পাতিয়া স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চমক ভাঙ্গিল ভুবন মুখুয্যের কণ্ঠস্বরে। লোকটা সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আমাকে কি ডেকেছিলেন?

উপেন্দ্র কহিল, বসো। তুমি সাবিত্রীকে চেনো?

মুখুয্যে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

তার সম্বন্ধে যা জানো আমাকে বলতে পারবে?

আজ্ঞে পারব, বলিয়া এই নির্লজ্জ লোকটা তাহার গভীর অপরাধের ইতিহাস একে একে ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, আমিও ভদ্রলোকের ছেলে বাবু, কিন্তু আগে যদি তাকে চিনতে পারতুম, এ পথে পা দিয়ে আজ বিদেশে হোটেলের রাঁধুনি-বামুনের কাজ করে দিন কাটাতে হতো না। শুধু আমার এই স্বস্তি যে, তার দেহে প্রাণ থাকতে কেউ তাকে নষ্ট করতে পারবে না।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তাতে তোমার স্বস্তিটা কি?

মুখুয্যে কহিল, তবু পরকালে জবাব দিতে পারব সে নষ্ট হয়ে যায়নি।

তাহাকে বিদায় দিয়া উপেন্দ্র তেমনি অসাড়ের মতই বসিয়া রহিল, শুধু তাহার মন তাহাকে অবিশ্রাম এই বলিয়া বিঁধিতে লাগিল, ভাল কর নাই উপেন, ভাল কর নাই। যে নিরুপায় নারী এতবড় প্রলোভন অনায়াসে জয় করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে অপমান করার তোমার অধিকার ছিল না।

সেইদিন অপরাহ্নেই উপেন্দ্র ভুবন মুখুয্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

কিন্তু কিছুতেই সমুদ্রের জলবায়ু তাহাকে খাড়া করিতে পারিল না। বেলা যতই পড়িয়া আসিতে থাকে, চোখমুখ জ্বালা করিয়া জ্বর আসে এবং প্রতিদিনান্ত যে তাহাকে তিল তিল করিয়া তাহার পরলোকবাসিনী স্বামীহারা সুরবালার কাছেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে, ইহাই যেন সে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে থাকে।

এইভাবে সমুদ্রতটের এই নির্জনবাসে ইহকালের মিয়াদ যখন প্রতিদিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, এমনি এক সকালের ডাকে বেহারীর পত্র বাটীর ঠিকানা হইতে পুনঃপ্রেরিত হইয়া উপেন্দ্রর হাতে আসিয়া পৌঁছিল।

যাহাকে মনে পড়িলেই তাহার বুকে ছুঁচ ফুটিয়াছে, তাহার সেই চিরদিনের বন্ধুকে অপমান করিয়া ত্যাগ করার দুঃখ যে তাঁহার অন্তরে অহরহ কত বড় হইয়া উঠিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন, কিন্তু, আজ যখন তাহারই কঠিন পীড়ার সংবাদ বহন করিয়া বেহারীর পত্র চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব নিবেদন করিল, তখন অনেকদিনের পরে উপেন্দ্রর শুষ্ক ওষ্ঠাধরে হাসি দেখা দিল। সে বেচারা জানে না, যাহার দিনগুলা পর্যন্ত গণনায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহারই হাতে সে আর একজনের সেবার গুরুভার ন্যস্ত করিতে চাহিতেছে। তবুও উপেন্দ্র সেইদিনই তল্পি বাঁধিয়া পুরী ত্যাগ করিলেন।

একচল্লিশ

জ্যোতিষ হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া বাটীতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল সম্মুখের বারান্দায় দুখানা আরাম-চৌকির উপর শশাঙ্ক ও সরোজিনী মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতেছে।

শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে জবাবদিহি করিল, আজ কাজকর্ম একটু সকাল সকাল শেষ হয়ে গেল, ভাবলুম এইখান থেকেই চা খেয়ে একসঙ্গে ক্লাবে যাব।

বেশ, বেশ। বলিয়া জ্যোতিষ একটুখানি হাসি গোপন করিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

সরোজিনী দাদার সঙ্গে সঙ্গে আসিবার উপক্রম করিতেই জ্যোতিষ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে কহিল, অতিথিকে একলা ফেলে—এ তোর কি বুদ্ধি বল ত সরো?

সরোজিনী আরক্ত-মুখে পুনরায় চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। ভগিনীর এই লজ্জাটুকু জ্যোতিষের চোখে পড়িতে বাকী রহিল না।

জননীর আদেশে তাহাকে আদালত হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া তবে জলযোগ করিতে হইত। মায়ের সহিত দেখা হইতেই কহিল, শশাঙ্ক এসেচেন, আজ খাবার বাইরে পাঠিয়ে দাও মা।

মা বলিলেন, আচ্ছা। বাইরে সরি আছে বুঝি?

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা মা, এমন মানুষ কোথায় আছে জানো, যার শরীরে দোষ নেই, শুধুই গুণ?

প্রশ্নটাকে জগৎতারিণী প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, কেন তোরা যখন-তখন আমাকে ও-কথা বলিস জ্যোতিষ? আমি ত অনেক বার বলেচি, আর আমার আপত্তি নেই। তোরা ভাল বুঝিস ওর হাতেই সরিকে দে না।

জ্যোতিষ কহিল, দোষ ছাড়া মানুষ নেই মা। কিন্তু আমি অনেকরকম করে ভেবে দেখেচি, সরোজিনী অসুখী হবে না। তা ছাড়া, ও বড় হয়েচে, ওর অমতেও কাজ করা যায় না। বলিয়াই দেখিতে পাইল, সরোজিনী আসিয়া ধীরে ধীরে দাদার পিঠ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

মা ভাঁড়ার ঘরের দরজার ভিতর হইতে কথা কহিতেছেন, সুতরাং তিনি কন্যার আগমন টের পাইলেন না। জ্যোতিষের কথার উত্তরে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, এ কথা ত আমি কোনদিন বলিনে জ্যোতিষ, ঐ ধাড়ি-মেয়ের বিয়ে তার অমতেই দেওয়া হোক। আমার যা সাধ ছিল, সে যখন তোরা দু’ ভাই-বোনে মিলে ঘুচিয়ে দিলি, তখনই কি মেয়ের মনের ভাব আমি বুঝিনি বাছা! আমি সব বুঝি, বুঝেই ত মুখ বুজে আছি। এখন আমাকে মিথ্যে খোঁটা দেওয়া জ্যোতিষ, বলিয়া তিনি জলখাবার সাজাইতে বসিলেন। সঙ্কোচে, লজ্জায় সরোজিনী মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। মা কিন্তু তাহার কিছুই জানিলেন না। জ্যোতিষ জবাব দিবার পূর্বেই তিনি নিজের কথার অনুবৃত্তিস্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—যাকে পেলে তোমার বোন খুশী হবেন, তাকেই দাও গে বাছা, আমার মত আর বার বার জানতে হবে না। আমার মত আছে, তোমাদের বলে দিলাম।

ভগিনীর নিরতিশয় সঙ্কোচে জ্যোতিষ নিজেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তবুও জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু মতটা প্রসন্নমনে দেওয়া চাই মা!

জগৎতারিণী কহিলেন, প্রসন্নমনেই দিচ্চি বাছা, প্রসন্নমনেই দিচ্চি। আমাকে আর বিরক্ত করো না তোমরা।

জ্যোতিষ একটুখানি চুপ করিয়া ভাবিয়া দেখিল, ব্যাপারটা যদি এতটাই গড়াইল, তবে মায়ের বিরক্তি সত্ত্বেও আজই একটা মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। কারণ; তাহাদের ক্লাবে, লাইব্রেরিতে এ কথাটা আজকাল প্রায়ই আলোচিত হইতেছে, অথচ, ঠিক কি হইবে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। বাড়িতেও কথাটা প্রায়ই উঠে বটে, কিন্তু এমনি করিয়াই থামিয়া যায়—অগ্রসর হইতে পারে না। শশাঙ্ককেও এইরূপ অনিশ্চিতের মধ্যে দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা যায় না। সুতরাং বর-কন্যার সুনিশ্চিত কামনার বিরুদ্ধে জননীর স্পষ্ট অনিচ্ছা জ্যোতিষ মাথায় পাতিয়া লইয়াই যা হোক একটা কিছু এখনি স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য কহিল, তা হলে আমি মনে করচি মা, দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে পরশু রবিবারেই কথাটা পাকা হয়ে যাক,—কি বল?

মা বলিলেন, ভালই ত।

সরোজিনী ধীরে ধীরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

রবিবারের সকালে জ্যোতিষের বসিবার ঘরটা বন্ধু-বান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। নব-দম্পতির বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা হইবার পরে এইখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজেরও একটা আয়োজন করা হইয়াছিল। আজ শশাঙ্কর বেশভূষাতেই শুধু যে বিশেষ একটু পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছিল তাহা নয়, তাহার মুখ-চোখেও আজ এমন একটু শ্রী ফুটিয়াছিল—যাহাতে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। কয়েকটি মহিলাও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ছিল না শুধু সরোজিনী। বেহারাকে দিয়া ডাকাইবার পরে জ্যোতিষ নিজে গিয়া তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্বর হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিল। অন্য কোনদিন হইলে তাহার এই আচরণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু আজ মার্জনা পাইবার অধিকার আছে বলিয়া সস্নেহ-কৌতুকে অতিথিরা জ্যোতিষকেই শুধু তাড়া দিয়াছিলেন মাত্র।

তার পরে অনেক ডাকাডাকিতে বেলা দশটার কাছাকাছি সরোজিনী যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার চেহারা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহার মুখ পাণ্ডুর, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, যেন সারারাত্রি সে এতটুকু ঘুমায় নাই। জ্যোতিষ নির্বাক হইয়া শুধু ভগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল,—আকৃতি দেখিয়া সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার অপেক্ষাও শতগুণ বড় বিস্ময় যে মুহূর্তকাল পরেই তাহার অদৃষ্টে ছিল তাহা সে জানিত না। সেই প্রচণ্ড বিস্ময় যেন উপেন্দ্রর অতীতের ছায়া লইয়া সম্মুখের পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, এ কি, উপীন নাকি!

সরোজিনী কহিল, উপীনবাবু!

বস্তুতঃ, দিনের বেলা না হইলে তাহাকে বোধ হয় ইহারা চিনিতেই পারিত না। সহসা নিজের চক্ষুকেই যেন অবিশ্বাস হয়—যেন ভাবা যায় না মানুষের দেহ এমন করিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে! উপেন্দ্র একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, শরীরটা তেমন ভাল নেই,—পুরী থেকে আসচি। আজ ব্যাপার কী?

সরোজিনী উঠিয়া আসিয়া উপেন্দ্রর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি অসুখ হয়েচে উপীনবাবু? বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্র তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টানিয়া কহিল, অসুখ ত একটা নয় বোন।

উপেন্দ্র আজ এই প্রথম সরোজিনীকে ভগিনী সম্বোধন করিল। সরোজিনী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, চলুন, ও ঘরে বসি গিয়ে, বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া এই জনাকীর্ণ কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘরের সমস্ত আনন্দ-উৎসব একেবারে যেন নিবিয়া গেল। জ্যোতিষ আসিয়া যখন সরোজিনীকে কহিল, উপীন ততক্ষণ বিশ্রাম

করুক, তুমি একবার ও ঘরে এস; সরোজিনী তখন ঘাড় নাড়িয়া শুধু সংক্ষেপে বলিল, আজ থাক দাদা।

জ্যোতিষ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, থাকবে কি রকম?

সরোজিনী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজ থাক।

জগৎতারিণী খবর পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, কেমন করে এত রোগা হলি বাবা! কিন্তু আর কোথাও তোর থাকা হবে না উপীন, আমার কাছে থেকে ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে এ অসুখ সারবে না।

সরোজিনী জোর দিয়া বলিল, হাঁ উপীনদা, তোমাকে আমাদের কাছেই থাকতে হবে। সেও আজ এই প্রথম উপেন্দ্রকে দাদা বলিয়া ডাকিল। উপেন্দ্র যে চিকিৎসার জন্যই পুরী হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সবাই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, ফিরে এসে না হয় আপনাদের কাছেই থাকব, কিন্তু আজ আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে।

জগৎতারিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, আজই এখ্খনি? কেন উপীন?

উপেন্দ্র সতীশের কঠিন পীড়ার উল্লেখ করিয়া তাহার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির সংবাদ যতদূর জানিত বিবৃত করিয়া পকেট হইতে বেহারীর পত্রখানি সরোজিনীর হাতে দিয়া কহিল, সাড়ে এগারোটার সময় ট্রেন আছে, যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে আমাকে তাতেই যেতে হবে। যদি ফিরে আসতে পারি, তখন আপনার আশ্রয়েই থাকব।

জগৎতারিণীর মাতৃহৃদয় আলোড়িত হইয়া আবার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সতীশকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন,—সেই সতীশ আজ পীড়িত, কিন্তু উপেন্দ্র এই দেহ লইয়া তাহার সেবা করিতে চলিয়াছে শুনিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে উপেন্দ্রর খাবার ব্যবস্থা করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরোজিনী চিঠিখানি আগাগোড়া দুইবার তিনবার পড়িয়া সেখানি ফিরাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, তোমার সঙ্গে আমিও যাব উপীনদা!

উপেন্দ্র কহিল, এত বেলায় অনর্থক স্টেশনে গিয়া কি হবে বোন?

সরোজিনী কহিল, স্টেশনে নয়, সতীশবাবুর বাড়িতে,—আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিল, পাগল হয়েচ? তুমি সেখানে যাবে কি করে?

তোমার সঙ্গে।

উপেন্দ্র কহিল, ছিঃ, তা কি হয়? এঁরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন, আর তুমিই বা সেখানে যাবে কেন?

সরোজিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না, আমি যাবই। বলিয়া উঠিয়া গেল।

অফিস-ঘরে একটা কোচের উপর বসিয়া জ্যোতিষ নিভৃতে শশাঙ্কর সহিত কথা কহিতেছেন, বোধ করি এই আলোচনাই হইতেছিল, সরোজিনী আস্তে আস্তে গিয়া দাদার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিতেই তিনি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি রে সরো?

সরোজিনী দাদার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সতীশবাবুর ভারী অসুখ।

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তাই ত শুনলুম। উপেন এই এগারোটার ট্রেনেই যাচ্চে নাকি?

সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।

জ্যোতিষ চমকাইয়া কহিলেন, তুমি যাবে? কোথায় যাবে?

সরোজিনী কহিল, সেখানে।

জ্যোতিষ ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, সেখানে মানে? সতীশের বাড়িতে নাকি?

সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ।

শশাঙ্ক দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। জ্যোতিষ উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, তুই পাগল হলি নাকি? তার অসুখ ত তোর কি? তুই যাবি কেন?

সরোজিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি যাব না ত কে যাবে? না দাদা, তাঁর শক্ত অসুখ, আমাকে যেতেই—আর সে বলিতে পারিল না। কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া দাদার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জ্যোতিষের চোখের উপর হইতে অনেক দিনের একটা কালো পর্দা যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণা হাওয়ায় চক্ষের পলকে ছিঁড়িয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া পরে বোনের মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আচ্ছা যা। সঙ্গে ঝি আর দরোয়ানও যাক। কেমন থাকে গিয়েই টেলিগ্রাফ করিস—আমি কাল-পরশু তা হলে রমণী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পড়বো। বলিয়া তাহাকে একটু সুমুখে টানিবার চেষ্টা করিতেই সরোজিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

শশাঙ্ক মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া সেই প্রশ্নই করিল, সতীশবাবুর অসুখ, তাতে উনি কেন যাবেন এ ত বুঝতে পারলুম না জ্যোতিষবাবু? এ-সব কি ব্যাপার বলুন ত?

জ্যোতিষের কানে এ প্রশ্ন পৌঁছিল কিনা বলা শক্ত। সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল—তার জন্যে ও এত ব্যাকুল হবে এ ত স্বপ্নেও ভাবিনি! এরা বলে একরকম— করে অন্যরকম—এ-সব কি কাণ্ড হতে চলল!

স্টেশনে নামিয়া উপেন্দ্র যে ভদ্র যুবকটির কাছে সতীশের গ্রামের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগ্যক্রমে সে ছোকরা তাহারই ডিস্‌পেন্‌সারির কম্পাউন্ডার, নিজের কি একটা কাজে স্টেশনে আসিয়াছিল। বাবুর বাড়িই গন্তব্য স্থান শুনিয়া সে বিস্তর ছুটাছুটি করিয়া একখানা মাত্র পালকি সরোজিনীর জন্য যোগাড় করিতে পারিল এবং উপেন্দ্রকে কহিল, ঐ ত মহেশপুর দেখা যাচ্ছে, চলুন না, কথা কইতে কইতে হেঁটে যাই,—যেতে আধ-ঘণ্টাও লাগবে না। নইলে, গোরুর গাড়িতে গেলে অনেক দেরী হবে।

হাঁটিবার অবস্থা উপেন্দ্রর নয়, কিন্তু গো-শকটের ভয়ে পদব্রজেই স্বীকার করিলেন।

সরোজিনীকে পালকিতে বসাইয়া দিয়া এবং দরোয়ান ও দাসীকে সঙ্গে দিয়া উপেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে রওনা হইয়া পড়িলেন। তাহার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়,—খুব চালাক চটপটে, নাম এককড়ি।তাহার ভরসা আছে, আর বছর-খানেক কোনমতে তাহাদের পাস-করা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘুরিতে পারিলে সেও আলাদা প্র্যাক্‌টিস করিতে পারিবে। তাহার মতে ডাক্তারিটা কিছুই নয়, ও কেবল একটু হাতযশ হওয়া চাই। নইলে যে বাঁচবার সে বাঁচে, যে মরবার সে কিছুতেই বাঁচে না।

উপেন্দ্রের তাহাতে কিছুমাত্র মতভেদ নাই জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাবু এখন কেমন আছেন?

এককড়ি কহিল, বাবু? আজ বাইশ দিন হলো, তিনি ত ভাল হয়ে গেছেন। মশায়, সমস্ত ওষুধ আমিই দিয়েচি। বলিয়া সে বার-কয়েক নিজের বুক নিজেই ঠুকিয়া দিল।

উপেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, অসুখটা কি খুব বেশী হয়েছিল, এককড়িবাবু?

এককড়ি কহিল, বেশী? তিনি ত মরেই গেছলেন। গিন্নীমা না এসে পড়লে ত শিবের অসাধ্যি ছিল। হবে না মশাই? দিনরাত থাকোবাবার সঙ্গে মদ আর মদ, গাঁজা আর গাঁজা। কি না কালীসিদ্ধ হচ্চে। ছাই হচ্চে! ও-সব কি আমরা ডাক্তারেরা বিশ্বাস করি মশাই? আমরা সায়েন্টিফিক্ মেন। কিন্তু গিন্নীমা এসেই থাকোবাবার বাবাত্বি বের করে দিলেন—টান মেরে ত্রিশূল-ফ্রিশূল ফেলে দিয়ে দূর করে দিলেন। ব্যাটা দিন-কতক কি কম কাণ্ডই করলে! সেই যেন বাবু,—একে তেড়ে মারতে যায়, ওকে তেড়ে মারতে যায়,—একদিন সামান্য কথায় মশাই, আমাকে এমনি দাঁতঝাড়া দিয়ে উঠল! আমি নেহাত নাকি ভালমানুষ, কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাইনে, নইলে, আর কেউ হলে দিত ব্যাটার মাথাটা সেদিন ফাটিয়ে। বলিয়া এককড়ি হাতের ছাতাটা একবার শূন্যে আস্ফালন করিয়া লইল।

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, গিন্নীমা কে?

এককড়ি কহিল, তা কি জানি মশাই। সবাই বলে গিন্নীমা, আমিও বলি গিন্নীমা।

উপেন্দ্র কহিলেন, তাঁকে তুমি দেখেচ?

এককড়ি কহিল, হাঁ সে এক-রকম দেখাই বৈ কি।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর বয়স কত বলতে পার?

এককড়ি একটু ভাবিয়া কহিল, তা চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে বোধ হয়। নইলে বাবুকে কি কেউ শাসন করতে পারে মশাই? ডাক্তারবাবু ত বলেন, তিনি না এলে ত হয়েই গেছল।

এককড়ির সঙ্গে উপেন্দ্র যখন সতীশের বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বেলা ডোবে-ডোবে। সরোজিনী পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, তাহার পালকি ফটকের বাহিরে বটগাছতলায় নামাইয়া দরোয়ান অপেক্ষা করিতেছে। সুমুখেই দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেখানে লোকজনের অসম্ভব জনতা।

এককড়ি সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীচের বসিবার ঘরে বসাইয়া বেহারীকে ডাকিতে গেল, কিন্তু তাহার দেখা মিলিল না। ডাক্তারবাবুও বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন, সমস্ত লোক ভিড় করিয়া তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

উপেন্দ্রর এই গিন্নীমা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংশয় ছিল, তাই সরোজিনীকে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া সোজা সুমুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সতীশ শয্যার উপর ঘুমাইতেছিল। তাহার শিয়রে বসিয়া সাবিত্রী জ্বরের কাগজখানা নিবিষ্ট-মনে পরীক্ষা করিতেছিল। ও-ধারের খোলা জানালা দিয়া সূর্যাস্ত-আভা মেঝের উপর রাঙ্গা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এমনি সময় দ্বারের ভারী পর্দা সরানোর শব্দে সাবিত্রী মুখ তুলিয়া দেখিল—একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই আগন্তুক নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনি উঠবেন না-আমি উপেন। আপনি সাবিত্রী ত?

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।কিন্তু ভয়ে, লজ্জায়, সঙ্কোচে একেবারে যেন মরিয়া গেল।

উপেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ ঘুমুচ্চে? এখন কেমন আছে?

সাবিত্রী পূর্বেই মতই মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাল আছেন।

উপেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে খাটের একাংশে আসিয়া বসিলেন। নিজের কর্তব্য তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, আমাকে সে চিঠি যে আপনিই লিখেছিলেন তা এখন বুঝতে পারচি। আমাকে আসতে বলে নিজের সুখ-দুঃখ,ভাল-মন্দ যে আপনি কতখানি তুচ্ছ করেছিলেন, মনে করবেন না সে আমি বুঝিনি। এই ত চাই। এই ত নিজের পরিচয়।

সাবিত্রীর মনে হইল,সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। এ বুঝি আর কেহ, এ বুঝি সতীশের সে উপীনদা নয়।

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়। তোমাকে আমি সাবিত্রী বলে ডাকব, তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকো; আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন।

সাবিত্রী নীরবে উঠিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া উপেন্দ্রর পায়ের কাছে প্রণাম করিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রর জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অধোমুখে প্রশ্ন করিল, আসতে এত দেরী হলো কেন? চিঠি কি সময়ে পাননি?

উপেন্দ্র সাবিত্রীর কাজে বাধা দিলেন না। সহজভাবে বলিলেন, না ভাই, পাইনি। আমি পরশু পুরীতে তোমার চিঠি পেয়ে আসচি। কিন্তু তোমার যে একটা ভারী শক্ত কাজ বাকী রয়েচে দিদি,—কথাটা এইখানে উপেন্দ্রর মুখে বাধিয়া গেল।।

সাবিত্রী জুতাজোড়াটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া মোজা খুলিতে খুলিতে বলিল, কি কাজ দাদা?

তথাপি উপেন্দ্রর মুখে একবার বাধিল। তার পর যেন জোর করিয়াই ভিতরের সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি ছাড়া এ কাজ আর কারুর সাধ্য নয় করে। আর একজন পারত, সে সুরবালা—

সাবিত্রী মৌনমুখে অপেক্ষা করিয়া আছে দেখিয়া উপেন্দ্র কহিলেন,সরোজিনীর নাম শুনেচ?

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, শুনেচি।

সমস্তই শুনেচ বোধ হয়?

সাবিত্রী তেমনিই মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে সমস্তই জানে।

তখন উপেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, সতীশের অসুখ শুনে তাকে কোনমতেই ধরে রাখা গেল না, আমার সঙ্গে সে এসেচে। নীচের ঘরে অপেক্ষা করে বসে আছে,—তার কোন উপায় কর দিদি।

সাবিত্রী ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তিনি এসেছেন! আমি এখুনি গিয়ে—কিন্তু আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারি দাদা?

এ ইঙ্গিত উপেন্দ্র বুঝিলেন। দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,তুমি যেতে পারো না? আমার ছোটবোন সংসারে কি কোন মেয়ের চেয়ে ছোট সাবিত্রী, যে, কোথাও তার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হবে? আমার বোন,পৃথিবীতে সে কি সোজা পরিচয় দিদি!

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার মাথাটা উপেন্দ্রর দুই পায়ের উপর একেবারে লুটাইয়া পড়িল।বার বার করিয়া সেই শীর্ণ পা-দুখানির ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া সে যখন সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,তখন তাহার মুখে আবরণ নাই, দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানির উপর নারী-চরিত্রের বৃহৎ মহিমা উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চোখ মুছিয়া সাবিত্রী যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, উপেন্দ্র পিছন হইতে বলিলেন, যাও দিদি, যার বোন বলে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে,তাকে বোলো,আমরা দু'ভাই-বোন আজ পর্যন্ত কখনো সংসারে ছোট কাজ করিনি।

সাবিত্রী চলিয়া গেলে তিনি নিদ্রিত সতীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকলেন, সতে? ওরে সতীশ?

ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া রহিল।

তোর উপীনদা—আমায় চিনতে পারিস নে?

উপীনদা! সতীশ বিহ্বল-চক্ষে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কি রে, এখনো চিনতে পারিস নি?

সতীশ ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে কথা কহিল—যেন এখনো তাহার ঝোঁক কাটে নাই—এমনিভাবে কহিল, চিনতে পেরেচি। তুমি এসেচ উপীনদা?

হাঁ ভাই, এসেচি।

তবে পা-দুটি একবার তোল না উপীনদা,অনেকদিন তোমার পায়ের ্ধূলো মাথায় দিতে পাইনি।

উপেন্দ্র দুই হাত বাড়াইয়া তাহার চিরদিনের বন্ধুকে বুকে টানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত অচেতন মূর্তির মত উভয়ে উভয়ের বক্ষ-সংলগ্ন থাকিবার পরে উপেন্দ্র আস্তে আস্তে বলিলেন, আর দেরী করিস নে সতীশ, একটু শিগগির সেরে ওঠ ভাই, আমার অনেক কাজ তোর জন্যে পড়ে রয়েচে।

কি কাজ উপীনদা? বলিয়া সতীশ পায়ের শব্দে পিছনে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাবিত্রীর হাত ধরিয়া সরোজিনী আসিতেছে!

সে একবার উপেন্দ্রর পানে চাহিয়া, আর একবার ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া এই দুটি রমণীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে যে নিজের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করিতে সাহস করিতেছে না তাহা উপেন্দ্র এবং সাবিত্রী উভয়েই বুঝিল।

সরোজিনী মুহূর্তকাল সতীশের কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিতে লাগিল। কেহই কথা কহিল না, কিন্তু এই কান্নার ভিতরে যে কত বড় বেদনা ও ক্ষমাভিক্ষা ছিল, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সতীশ নির্বাক কাষ্ঠপুত্তলির মত বসিয়া রহিল,তাহার হৃদয়ের একপ্রান্ত অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেমন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর প্রান্ত তেমনি নিদারুণ সমস্যার অভিঘাতে ভীত, সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখে কথা নাই,—দিবাশেষের এই প্রায়ান্ধকার স্তব্ধ ঘরটার মধ্যে

শুধু কেবল সরোজিনীর দুর্নিবার ক্রন্দনের বেগ তাহার প্রাণপণ শাসনের নীচে রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নীরবতা ভঙ্গ হইল উপেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে। তিনি সরোজিনীর মাথার উপর ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কহিলেন, অপরাধ যারই হয়ে থাক সতীশ, আমার এই বোনটিকে আজ তুই মাপ কর। ওর বুকের ভেতরের অনেক দিনের অনেক সঞ্চিত দুঃখ আজ তোকে সেবা করবার জন্যেই আমার সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েচে। কিন্তু সাবিত্রী, তুমি দিদি অমন মুখটি বিমর্ষ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত হবে না! তোমার এই মরণোন্মুখ দাদাটির অনেক উৎপাত অনেক ভার আজ থেকে তোমাকে বইতে হবে বোন। এসো, আমার কাছে এসে বসো।

সাবিত্রীর নামে সরোজিনীর লজ্জা, শরম, বেদনা সমস্ত ভুলিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাকে উপেন্দ্রর কোনরূপ আত্মীয়া বলিয়াই মনে করিয়াছিল।

সাবিত্রী নিঃশব্দে আসিয়া উপেন্দ্রর পায়ের কাছে মেঝের উপর বসিল। উপেন্দ্র তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি মনে করো না দিদি, তোমার কাছে মাপ চেয়ে তোমার আমি অমর্যাদা করব। কিন্তু সতীশ, তুই আমাকে মাপ কর। তোর যত অপমান, যত অনিষ্ট আমি করেচি, সমস্ত আজ ভুলে যা ভাই।

সতীশ কথা কহিবে কি, সে অবাক হইয়া শুধু নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্র একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আমি বুঝেচি, সতীশ, তোরা কি ভাবচিস। ভাবচিস যে, সেই উপীনদা ছেলেমানুষের মত এত বকে কেন! কিন্তু তোরা জানিস নে ভাই, কতকাল তোদের উপীনদার এই মুখখানা একেবারে মূক হয়ে ছিল। তাই, যত কথা জমা হয়েছিল, সব আজ মাতালের মত বেরিয়ে আসচে, কাকে আটকে রাখি বল ত!

উপেন্দ্রর কথার ভঙ্গীতে সতীশের বুকের ভিতরটায় কি এক রকমের অজানা ভয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল, কি একটা কথা সে জানিতেও চাহিল, কিন্তু, না পড়িল তাহার প্রশ্নটা মনে, না তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। সে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই উপেন্দ্র সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া সতীশকে বলিলেন, তুই ভাল হ’, আশীর্বাদ করি তোরা সুখী হ’—আমি আমার এ বোনটিকে নিয়ে চলে যাব। বলিয়া উপেন্দ্র আস্তে আস্তে সাবিত্রীর মাথার উপর আঙুলের ঘা মারিয়া কহিলেন, তুমি ছাড়া আমার ভার নেবার আর কেউ নেই দিদি। আর যে অসুখ, তাতে আর কাউকে কাছে ডাকতে সাহসও হয় না, হওয়া উচিতও নয়। শুধু তোমার মত যার পরের জন্যই কেবল বেঁচে থাকা, আমার সেই বোনটির ওপরেই নিজেকে সঁপে দিতে পারি। যাবে দিদি আমার সঙ্গে? সতীশকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে,—তা হলোই বা। এর চেয়ে কত বেশী দুঃখ-কষ্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ করে তোলেন ভাই!

সতীশের মনের মধ্যে এতক্ষণের সেই বিস্মৃত প্রশ্নটা যেন বিদ্যুতের রেখায় খেলিয়া গেল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, উপীনদা, আমাদের পশু-বৌঠান কেমন আছেন? তাঁর যে অসুখ শুনে এসেছিলাম।

উপেন্দ্র একমুহূর্তের জন্য দাঁত দিয়া জোর করিয়া অধর চাপিয়া ধরিলেন, তার পরে অভ্যাসমত একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পশু নেই—মারা গেছে।

সরোজিনী চেঁচাইয়া উঠিল, সুরবালা-বৌদি নেই?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না।

সতীশ মোটা বালিশটায় হেলান দিয়া মূর্চ্ছাহতের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সুরবালা নাই, সে মারা গেছে! এই বার্তা উপেন্দ্রর মুখ দিয়া অতি সহজেই বাহির হইয়া আসিল; কিন্তু এ 'নাই' যে কি না-থাকা, এ যাওয়া যে কি যাওয়া, সতীশের চেয়ে কে বেশী জানে! সরোজিনীর চেয়ে কে বেশী দেখিয়াছে! সাবিত্রীর চেয়ে কে বেশী শুনিয়াছে!

তথাপি সুরবালা নাই—সে মরিয়াছে। সতীশের মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভগবান নিলেন, তার আর নালিশ কি! কিন্তু এ সময়ে দিবা-ছোঁড়াটা যদি কাছে থাকত! মা-বাপ নেই, ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে এত বড় করলাম, সেও কোথায় গেল! কি জানি মরবার আগে একবার তাকে দেখতে পাব কি না।

সতীশ তেমনি মূর্চ্ছাহতের মত থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, দিবার কি হলো উপীনদা?

উপেন্দ্র কহিলেন, কি জানি তার কি হলো! কলকাতায় হারানদার বাড়িতে থেকে পড়তে দিলাম—এ লজ্জার কথা কারুকে বলাও যায় না, বলতে ইচ্ছেও করে না—বাড়িতে আজও জানে, সে কলকাতায় পড়চে, সুরো তাকে ভারী ভালবাসতো, সে বেচারা মরবার আগে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু এ সাধ তার পূর্ণ করতে পারলাম না। হারানবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় যে চলে গেল তার উদ্দেশও নেই।

তিনজন শ্রোতাই একসঙ্গে অব্যক্ত-কণ্ঠে কি একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথাই স্পষ্ট হইল না।

তার পরে সমস্ত নীরব। সমস্ত ঘরটা যেন একটা শূন্য শ্মশানের মত থমথম করিতে লাগিল।

কেহই উপেন্দ্রর মুখের পানে চাহিতেও পারিল না, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল, তাহাদের এতদিনের দুঃখ-কষ্ট-মান-অভিমানগুলা যেন এই অভ্রভেদী বেদনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে।

সাবিত্রী সতীশের কাছে সকল কথাই শুনিয়াছিল। সকল কথাই জানিত। সে ভাবিতে লাগিল, এই বিপুল শূন্যতা এই লোকটা কি দিয়া ভরিয়াছে! এ ব্যথা, সে কেমন করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে এত সহজে বহিয়া বেড়াইতেছে! বুকের ভিতরে যাহার এতবড় হাহাকার, বাহিরে তাহার এতটুকু আক্ষেপ নাই কেন? এ কি পাইয়াছে? কে ইহার সুখ-দুঃখ এমন সহজ সুসহ করিয়া দিয়াছে!

সে পায়ের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, দাদা, এ-সব ব্যারামে তোমার পক্ষে পাহাড়ের হাওয়া খুব ভাল, না?

উপেন্দ্র তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, হাঁ ভাই, তাই ত ডাক্তারেরা বলেন, কিন্তু ভগবান যাকে তলব করেন, তার কিছুই কাজে লাগে না।

সাবিত্রী বলিল, তা হোক দাদা, আমরা কিন্তু পাহাড়ে গিয়েই থাকব।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

মহামায়ার পূজা আসন্ন হইয়া আসিল এবং সতীশ সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি সুখ-স্বপ্নের মত অতিবাহিত হইয়া গেল। আরও কিছুদিন এখানে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু উপেন্দ্রর দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রী ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করিবার জন্য দিন স্থির করিয়া ফেলিল। উপেন্দ্রর আপত্তির বিরুদ্ধে জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না দাদা। সতীশবাবুর অসুখ আর নেই, কিন্তু, তাঁর শরীর সবল হবার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে তোমাকে আর খুঁজে পাব না। পরশু আমাদের যেতেই হবে, তুমি অমত করো না দাদা।

উপেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু, তা হলেই কি আমাকে খুঁজে পাবে দিদি?

সাবিত্রী তর্ক না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। উপেন্দ্রর দিনগুলা এখানে শান্তিতে কাটিতেছিল, তাই যাবার জন্য তাঁহার তাড়া ছিল না এবং যাত্রার দিন

যে সত্যিই এত আসন্ন হইয়াছে তাহাও বোধ করি তিনি বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু সতীশের মুখ শুকাইল। কারণ, এই জিদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহা যে কোন বাধা মানে না এবং যে-কেহ ইহার সংস্রবে আছে, তাহাকেই যে শেষ পর্যন্ত নত হইতে হয়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং ত্রয়োদশী যে কিছুতেই পার হইবে না, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু, কোন কথা কহিল না। পরদিনও এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার সাক্ষাতেই বেহারী সজলনয়নে সাবিত্রীকে যখন প্রশ্ন করিল, আবার কতদিনে দেখা দেবে মা, তখনও সতীশ মৌন হইয়া রহিল।

সাবিত্রী সতীশের মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, তোমার বাবুর যেদিন বিয়ে হবে বেহারী, তখন আবার দেখা হবে। অবিশ্যি তোমার বাবু যদি দয়া করে আনেন তবেই।

দিন-দশেক পূর্বে সরোজিনীকে লইয়া যাইবার জন্য জ্যোতিষ নিজে আসিলে উপেন্দ্রর মধ্যস্থতায় বিবাহের পাকা কথাবার্তাই হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, স্থির হইয়াছিল তাহার কালাশৌচ গত হইলেই বিবাহ হইবে। সাবিত্রী এখন সেই ইঙ্গিতই করিল এবং সতীশ চুপ করিয়াই শুনিল।

যাবার দিন সকালে উপেন্দ্র একটু চিন্তান্বিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোর শরীর কি তেমন সুস্থ বোধ হচ্চে না, সতীশ? কাল থেকে যেন তোকে ভারী শুক্‌নো দেখাচ্চে।

সতীশ উদাস-কণ্ঠে কহিল, না, বেশ ভালই ত আছি।

উপেন্দ্র চলিয়া গেলে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিল। তাহার দু’চক্ষু রাঙ্গা, চোখের পল্লব ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চাহিলেই চোখে পড়ে। মাথার দিব্যের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া বলিল, কথা রাখবে?

সতীশ বলিল, রাখব।

মদ গাঁজা হাত দিয়েও কখনো ছোঁবে না?

না।

আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তন্ত্র-মন্ত্রের দিকেও যাবে না?

না।

যতদিন না শরীর একেবারে সারে দু’দিন অন্তর চিঠি লিখবে?

লিখব।

তাতে কোন কথা লুকোবে না?

না।

তবে চললুম, বলিয়া সাবিত্রী তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশ বিছানার উপর বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। বিদায় দিবার জন্য নীচে নামিবার চেষ্টাও করিল না।

বাহিরে দুখানা পালকি প্রস্তুত ছিল। কাছে দাঁড়াইয়া উপেন্দ্র ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ করিতেছিলেন, মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সাবিত্রী ধীর-পদবিক্ষেপে আসিয়া অন্যটায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেই বেহারী ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, একবার ফিরে চল মা, বাবু কি একটা বিশেষ দরকারে ডাকচেন।

সাবিত্রী ফিরিয়া গেল, উপেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সাবিত্রী ঠিক এই ভয়ই করিতেছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সতীশ ও-ধারে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। বিছানার সন্নিকটে আসিয়া হাসির ভান করিয়া কহিল, ব্যাপার কি? আমাদের ট্রেন ফেল করে দেবে নাকি?

সতীশ মুখ ফিরিয়া একেবারেই হাত বাড়াইয়া সাবিত্রীর গায়ের চাদরটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বসো। আমি তোমাকে যেতে দেব না। এ আমার গ্রাম,

আমার বাড়ি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে এ সাধ্য দশটা উপীনদার নেই।

সাবিত্রী অবাক হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, সতীশের চোখে এমন একটা হিংস্র তীব্র দৃষ্টি, যাহাকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

সাবিত্রী বুঝিল জোর খাটিবে না। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছি, ও কি কথা! তিনি ত আমাকে জোর করে নিয়ে যাননি—তাঁর স্ত্রী নেই, ভাই নেই, তুমি নেই—এতবড় সাংঘাতিক অসুখে সেবা করবার কেউ নেই। তাই ত তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্চেন। একে কি জোর করা বলে?

সতীশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও মিছে কথা—স্তোক দেওয়া। তিনি তাঁর বন্ধু জ্যোতিষবাবুর মুখ চেয়েই শুধু তোমাকে সরিয়ে নিতে চান। এই দু'দিন আমি দিবা-রাত্রি ভেবে দেখেছি, যে চুপ করে সহ্য করে, সবাই তার ওপর অত্যাচার করে। তা সে কারণ যার যাই থাক, আমি তোমাকে যেতে দেব না। যাক্, এ নিয়ে তর্কাতর্কি করে মাথা গরম করতে আমি চাইনে—বেহারীকে দিয়ে নীচে বলে পাঠাও তোমার যাওয়া হবে না। বেহা—

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বেশ, তার না হয় ভাল মতলবই নেই, কিন্তু তুমিই বা আমাকে নিয়ে করবে কি শুনি?

সতীশ মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি বলি বিয়ে করব!

সাবিত্রী বলিল, আর আমি যদি বলি আমার তাতে মত নেই?

সতীশ কহিল, তোমার মতামতে কিছুই আসে যায় না।

সাবিত্রী সভয়ে হাসিয়া বলিল, তবে কি জোর করে বিয়ে করবে নাকি? বলিয়া মুখের হাসিকে গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া তাহার ললাট হইতে রুক্ষ চুলগুলি গভীর স্নেহে হাত দিয়া ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, ছি,

এমন কথা কখনো ভ্রমেও মনে কোরো না। আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝোনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেচে, তিনি বুঝেচেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা আজ তুমি ঝোঁকের উপর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করে অপরাধী হয়ে থেকো না। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এই চোখের জল সতীশকে আজ শান্ত করিতে পারিল না, বরং সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, সমস্ত মিথ্যে। তুমি এমনি করেই নিজেকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রেখে আমার সর্বনাশ করেচ। উপীনদাই বলেছেন, তুমি সংসারে কারো চেয়ে ছোট নয়—এই সত্য কথা।

সাবিত্রী বলিল, না, তা নয়। দাদা এখন সমাজের অতীত, ইহলোকের অতীত, তাই তাঁর মুখে যা সত্য, অন্যের মুখে অন্যের প্রয়োজনে সে সত্য নয়।তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যে হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই,আমি ত তাকে মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন! ওগো, এ অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করো না!

সতীশ দুই হাত দিয়া সাবিত্রীর দুটো হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, এ-সব কথা শোনবার আজ আমার ধৈর্য নেই, বোঝবার শক্তি নেই, আজ শুধু আমাকে ছুঁয়ে তুমি এই সত্য কথাটা সোজা করে বল, আমাকে তুমি ভালবাস কি না? বলিয়া সে যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত শরীরটাকে পর্যন্ত উন্মুখ করিয়া সাবিত্রীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল।

এই একান্ত ব্যথিত ব্যগ্র চোখ-দুটির পানে চাহিয়া সাবিত্রীর আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কহিল, ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্য আমার এত সুখ, আমার এতবড় দুঃখ? ওগো, তাই ত তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না! বলিয়া আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া কহিল, আজ আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করব না। এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেবার যোগ্যতাও এর নেই। এই দেহ নিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েচি, এ ত আমি কোনমতেই ভুলতে পারব না! এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূজা হবে না। আজ কি করে তোমাকে সে কথা বোঝাব! এত ভাল যদি না বাসতুম, হয়ত এমন করে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হতো না। বলিয়া সাবিত্রী বারংবার চক্ষু মার্জনা করিল।

সতীশ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তবে আর চাইনে। কিন্তু তোমার মন? এ দিয়ে ত তুমি কাউকে কখনও ভোলাতে যাওনি! এ ত আমার।

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ কহিল,না, এ দিয়ে কোনদিন কাউকে ভোলাতে চাইনি—এ তোমারই। এখানে তুমিই চিরদিন প্রভু। বলিয়া সে বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিল, অন্তর্যামী জানেন, যতদিন বাঁচব, যেখানে যেভাবেই থাকি, এ তোমার চিরদিন দাসীই থাকবে।

সতীশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, ভগবানের নাম নিয়ে আজ যে অঙ্গীকার করলে এই-ই আমার যথেষ্ট। আমি এর বেশী কিছু চাইনে।

তাহার কথার ভাবে সাবিত্রী মনে মনে আবার শঙ্কিত হইল।

এমনি সময়ে বেহারী দ্বারের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল, মা, বাবু বললেন আর ত সময় নেই।

চল যাচ্ছি, বলিয়া সাবিত্রী উঠিতে গেল, সতীশ জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া বলিল, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ যাবার সময় আমাকে একটা ভিক্ষে দিয়ে যাও।

আমার কি আছে যে তোমাকে দেব? কিন্তু কি চাই বল?

সতীশ কহিল,আমি এই ভিক্ষা চাই, কেউ কখনো যদি আমাদের সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করে, আমার স্বামীত্ব স্বীকার করবে বল?

সাবিত্রী ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তথাপি এই অদ্ভুত অনুরোধে হাসিল। কহিল, কেন বল ত? সাক্ষীর জোরে শেষকালে জোর করে ঘরে পুরবে নাকি?

সতীশ কহিল, তোমার নিজের বুকের অন্তর্যামীই আমাদের সাক্ষী—অন্য সাক্ষীতে আমাদের দরকার নেই। আর, বাইরের সাক্ষীর জোরে শেষকালে ঘরে পুরব এই তোমার ভয়? কিন্তু, নিজের জোরে আজই যদি ঘরে পুরি ত কে ঠেকাবে বল ত?

সাবিত্রী দ্বিরুক্তি করিল না।

সতীশ কহিল, তোমার যেখানে-সেখানে যা খুশী ভাবে থাকা আমার পছন্দ নয়।

সাবিত্রীর মুখ উত্তরোত্তর পাংশু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এ অবস্থায় সতীশকে উত্তেজিত করিবার ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিল, উপীনদা পাথরের দেবতা, নইলে রক্ত-মাংসের দেবতা হলেও আমি সঙ্গে পাঠাতাম না। আচ্ছা, আজ যাচ্চ যাও, কিন্তু বেশীদিন বোধ করি সেখানে রাখা আমার সুবিধে হয়ে উঠবে না।

তোমার ইচ্ছে, বলিয়া সাবিত্রী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিয়াল্লিশ

অপরাহ্ন সাড়ে-পাঁচটায় কাঠের কারখানার ছুটি হইলে দিবাকর আরাকানের একটা রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ধুলায় ধুলায়, করাতের গুঁড়ায় তাহার সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গলায় উত্তরীয় নাই, পিরানখানি জীর্ণ মলিন, নানাস্থানে সেলাই করা, পরিধেয় বস্ত্রও তদুপযুক্ত, ডান পায়ের জুতাটার গোড়ালি ক্ষইয়া একপেশে হইয়া গেছে, বাঁ পায়ের বুড়া আঙ্গুলের ডগাটা জুতার সুমুখ দিয়া দেখা যাইতেছে—হঠাৎ দেখিলে যেন চেনাই যায় না,—সারাদিন পেটে অন্ন নাই—এ অবস্থায় সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসীক চার টাকা ভাড়ায় নীচের তলার একটি ঘরে তাদের বাসা। অপ্রশস্ত বারান্দাটির একধারে রান্না হয়, একধারে কাঠ ঘুঁটে জলের বালতি প্রভৃতি ঠেসাঠেসি করিয়া রাখা।

দিবাকরের পায়ের শব্দে পাশের একটা ঘর হইতে বাড়িউলী বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আসা হলো? তা বেশ, এ-সব কি বাপু তোমাদের! রান্না-বাড়া নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই—কেবলি রাত-দিন ঝগড়া, কিচি-কিচি, দাঁতের বাদ্যি—এ যে আমাদের শুদ্ধ লক্ষ্মী ছাড়িয়ে দেবার জো করলে তোমরা।

দিবাকর ম্লান-মুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সে দুপুরবেলায় ভাত খাইতে আসিয়া কিরণময়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই পুনরায় তাহার কাজে ফিরিয়া গিয়াছিল; এখন ছুটি হইবার পরে বাসায় আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বাড়িউলীর রাগ পড়িল না, সে পুনরায় কহিল, ও তোমার বিয়ে করা পরিবার নয় বাপু, যে এত জোর-জুলুম নাগিয়েচ। বের করে যেমন এনেছিলে, সেও তেমনি ধর্ম রেখেচে। এখন তোমারও যা হোক একটা চাকরি-বাকরি হয়েচে—এইবার সরে যাও। আর কেন বাপু তাকে দুঃখ দেওয়া! অমন

সোমত্ত মেয়েমানুষটা খাওয়া-পরা বিহনে একেবারে শুক্‌নো কাঠ হয়ে গেল যে! একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, নইলে ওর ভাবনা কি? মোড়ের মাথায় গোলদার মারাড়িবাবু আমাকে নিত্য লোক পাঠাচ্চে। বলে, সোনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে। আর তোমারি বা মেয়েমানুষের ভাবনা কি বাপু? ভাত ছড়ালে নাকি কাকের অভাব! যাও, সরে যাও। আমার কথা শোন, ক'দিন থেকে বলচি, আর তোমাদের বনিবনাও হবে না।

দিবাকর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, থাক থাক, আমার কথায় কাজ নেই। কিন্তু ওঁরও কি তাই মত নাকি? তুমিই তা হলে তাঁর মন্ত্রিমশাই কিনা!

ঠিক এই সময়ে কিরণময়ী তাহার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের দৈহিক, মানসিক, সর্বপ্রকার পরিবর্তন যে কত দ্রুত কিরূপ একান্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

আজ তাহার প্রতি চাহিয়া হঠাৎ কে বলিবে এ সেই সৌন্দর্যের প্রতিমা কিরণময়ী! ছয় মাস পূর্বে সেই যে একদিন সে সমাজকে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়া মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এক অবোধ অপরিণামদর্শী যুবককে রূপ ও ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বপ্রকার সার্থকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়াছিল, আজ সেই প্রতারণার ফাঁসিই কিরণময়ীর নিজের গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে।

পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে গিয়া সেই দিবাকরের বুকের ভিতর হইতেই আজ বাসনার যে রাক্ষস বাহির হইয়া আসিয়াছে, আত্মরক্ষা করিতে তাহারই সহিত অহর্নিশি লড়াই করিতে করিতে কিরণময়ী আজ ক্ষত-বিক্ষত।

তাহার মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিপর্যস্ত, বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ, মুখের উপর কি একপ্রকারের শুষ্ক ক্ষুধা যেন হতাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, দেহের সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া কদর্য শ্রীহীনতায় দৃষ্টি পীড়িত হয়—সেই মূর্তিমতী অলক্ষ্মীর মত

সে ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষুধার্ত দিবাকর গর্জন করিয়া উঠিল।

নির্লজ্জতার অন্ত নাই। সেই মুখচোরা দিবাকর যে আজ একবাড়ি লোকের সামনে এই ভাষা হাঁকিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহা প্রত্যয় করা সহজ নয়। কিন্তু বাস্তবিকই সে চীৎকার করিয়া কহিল, কি গো বৌঠান, তাই নাকি? এখন মারোয়াড়ী, মুসলমান, মগ, মাদ্রাজী—এদের দরকার নাকি? ওঃ—তাই দিনরাত ঝগড়া? তাই আমি হয়েছি দু'চক্ষের বিষ?

কিরণময়ী প্রথমটা যেন কিছু বুঝিতে পারিল না এমনিভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার জবাব দিল বাড়িউলী। সে এক-পা আগাইয়া আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিল, কেন চাইবে না শুনি? আমরাও আর গেরস্তর মাঠাকরুন নই গো, যে একজনকেই কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। আমরা হলুম সুখের পায়রা—বেবুশ্যে! যেখানে যার কাছে সুখ পাব, সোনা-দানা পাব, তার কাছেই যাব। এতে লজ্জাই বা কি, আর ঢাকাঢাকিই বা কিসের জন্য!

দিবাকর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল, তুই থাম্ মাগী! যাকে জিজ্ঞাসা করচি সে বলুক।

এবার বাড়িউলীও বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল, মারমুখী হইয়া কহিল, কি! আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে মাগী! বেরো বলচি আমার বাড়ি থেকে।

দিবাকরও রুখিয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে তাহার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও বোধ করি কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না যে, সে একটা অন্ত্যজ গণিকার মুখে এতখানি অপমানের পরেও কোমর বাঁধিয়া তুই-তোকারি করিয়া বিবাদ করিতেছে! কিন্তু, সে ত আর উপেন্দ্র-সুরবালার স্নেহে, শাসনে, লালিত-পালিত সে দিবাকর নাই! তাই, সেও চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, কি! আমাকে বেরো? ভাড়া খাসনে তুই?

বাড়িয়ালী ঠিক তেমনি তর্জন করিয়া কহিল, ইস্! ভাড়া দেনেবালা! তোকে ছি! তোর গলায় দেবার দড়ি জোটে না রে! বেরো বলচি, নইলে ঝাঁটা মেরে দূর করব।

আচ্ছা, বের করাচ্চি! বলিয়া দিবাকর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া নির্বাক কিরণময়ীকে সজোরে ধাক্কা মারিল। সমস্তদিন ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত, অবসন্ন কিরণময়ী সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না, প্রথমটা গিয়া সে একটা রঙের শূন্য বালতির উপর পড়িয়া তথা হইতে গড়াইয়া একটা ঘুঁটের ঝুড়ির উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

উন্মত্ত দিবাকর বলিল, যাও বেরোও। কে তোমার মারোয়াড়ী আছে,—দূর হও। বলিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

বাড়িউলী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। কারখানা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত পুরুষের দল যে-যাহার হাত-মুখের কালিঝুলি প্রক্ষালিত করিতেছিল, চিৎকারে চকিত হইয়া হাতের সাবান ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। বাড়িউলী সুউচ্চ নাকীসুরে নালিশ করিতে লাগিল—বৌটাকে মেরে ফেলেছে গো! হতভাগা ছোঁড়াটাকে তোমরা মারতে মারতে দূর করে দাও—আর না আমার বাড়ি ঢোকে।

বাড়িউলীর আদেশে তাহারা ভিড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেই কিরণময়ী মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, ঝগড়াঝাঁটি কার ঘরে না হয়? আমার গায়ে হাত দিয়েচে তা তোমাদের কি? তোমরা ঘরে যাও, বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

লোকগুলা বিক্রম-প্রকাশের সুযোগ হারাইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া গেল। বাড়িউলী বাহিরে দাঁড়াইয়া গালে হাত দিয়া শুধু বলিল, অবাক কাণ্ড!

দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরণময়ী দেশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিল। কাঠের ঘর অপ্রশস্ত হইলেও দীর্ঘ, একধারে দড়ির খাটের উপর দিবাকরের শয্যা,

অপর প্রান্তের কাঠের মেঝের উপর কিরণময়ীর বিছানাটি গুটান রহিয়াছে। পায়ের দিকে কতকগুলি হাঁড়ি-কলসী উপরি উপরি সাজানো এবং সেই কোণেই কাঠের শিকায় রান্নার হাঁড়ি, কড়া, চাটু প্রভৃতি তোলা রহিয়াছে। ইহাই তাহাদের গৃহস্থালীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম।

আলো জ্বালিয়া কিরণময়ী দ্বারের কাছে মেঝের উপর স্থির হইয়া বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই—খাটের উপর দিবাকর ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া,—এমনি বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া থাকার পরে কিরণময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া সহজভাবে কহিল, হাঁড়িতে ভাত রান্না আছে, বেড়ে দিই, খাও।

দিবাকর রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না।

তাহার কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, এতক্ষণ সে নীরবে কাঁদিতেছিল।

কিরণময়ী বলিল, না কেন? সারাদিন খাওনি, আজ না খেলেও কাল খেতে হবে। খাওয়া-পরার উপর রাগ করা কারও চলে না—হাত-মুখ ধুয়ে এসে যা পারো দুটি খাও—আমি ভাত বেড়ে দিচ্চি।

দিবাকর সাড়া দিতে পর্যন্ত পারিল না। লজ্জায় অনুশোচনায় সে পুড়িয়া যাইতেছিল। সে সত্যই কিরণময়ীকে ভালবাসিয়াছিল।

এখানে আসা অবধি অনেকদিন পর্যন্ত বাহিরের কেহ জানিতে না পারিলেও, ভিতরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে আসক্তি ও বিরক্তির যে নির্মম সংগ্রাম উভয়ের মধ্যে প্রত্যহ ঘটিতেছিল, তাহার সমস্ত অভিঘাতই দিবাকর নীরবে সহ্য করিয়াছিল।

কিছুদিন হইতে এই সমর প্রকাশ্য ও অত্যন্ত দুর্বার হইয়া উঠিবার মধ্যেও এমন উত্তেজনা বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু, আজিকার পূর্বে কোনদিন সে এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া এতবড় পাশব আচরণ করে নাই। বস্তুতঃ, কোন কারণে কোন অত্যাচারের ফলেই সে যে কিরণময়ীর গায়ে হাত তুলিতে পারে,

এবং সত্য সত্যই এইমাত্র তুলিয়াছে তাহা এখনও সে ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। তাই, ঘরে ঢুকিয়া সে স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার বিছানায় আসিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু ক্ষণেক পরেই কিরণময়ী যখন নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাড়ির লোকের আক্রমণ ও নির্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল, তখনই শুধু তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কিরণময়ীর অনুরোধ শেষ না হইতেই তরঙ্গ যেমন শৈলমূলে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সজোরে এই রমণীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, আমি পশু, আমাকে মাপ কর বৌদি।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ নির্বিকার স্তব্ধ থাকিয়া আগের মতই সহজ-কণ্ঠে কহিল, তোমার একার দোষ নয়, মানুষমাত্রকেই এ-সব কাজ পশু করে ফেলে। আমাকেও একতিল কম পশু করেনি ঠাকুরপো!

দিবাকর প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, অন্য কারও কথায় আমার কাজ নেই, বৌদি, কিন্তু আমার আজকের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? আমাকে বলে দাও,—আমি তাই প্রাণপণে করব।

কিরণময়ী কহিল অপরাধ আবার কি? শোননি, এতে মানুষে মানুষকে খুন করে ফেলে? তুমি ত শুধু ঠেলে দিয়েছ,—অপরাধ আমি করিনি? সব কি কেবল তোমারই দোষ? কিন্তু, যাক গে এ-সব। সমস্ত অভিযোগ-অনুযোগের আজ শেষ হয়ে গেছে—এতে তোমারও ভবিষ্যতে আর দরকার হবে না,আমারও না। এখন যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে বসো। আমি যেন আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে।

দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। কিরণময়ীর কণ্ঠস্বরে সে বুঝিয়াছিল, আর কথাবার্তা কহিতেও সে ইচ্ছুক নয়।

সমস্তদিন উপবাসের পর দিবাকর খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আঁচাইতে গেল। তাহার মনের গ্লানিটাও কমিয়া আসিয়াছিল। আঁচাইয়া হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকিয়া

একটু আশ্চর্য হইয়াই দেখিল কিরণময়ী তাহার বিছানাটা গুটাইয়া খাট হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, নামাচ্চ কেন?

কিরণময়ী অবিচলিত—স্বরে কহিল, আগে বললে হয়তো তোমার খাওয়া হতো না, তাই বলিনি। আজ থেকে আমাদের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। রাত এখনো বেশী হয়নি, আজকের মত কালীবাড়িতে গিয়ে শোও গে, কাল সুবিধে মত একটা বাসা খুঁজে নিয়ো। আর যদি এ দেশে না থাকতে চাও, পরশু স্টিমার আছে, আমি টাকা দেব, দেশে ফিরে যেয়ো। মোট কথা, যা ইচ্ছে হয় করো, আমার সঙ্গে আর তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

দিবাকর হতজ্ঞানের মত কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কিরণময়ীর মমতা-লেশহীন এক-একটি শব্দ যেন কঠিন পাষাণখণ্ডের মত তাহাদের মাঝখানে চিরদিনের অভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে।

তাহার কথা শেষ হইলে, সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, আর তুমি?

কিরণময়ী কহিল, আমার কথা শুনে তোমার লাভ নেই, তবে এ দেশে যদি থাকো, কাল-পরশু শুনতেই পাবে।

দিবাকর কহিল, তা হলে বাড়িউলীর কথাই সত্যি—সেই খোট্টা মারোয়াড়ীটাই—

কিরণময়ী কঠিনস্বরে জবাব দিল, হতেও পারে। কিন্তু, আর যাই হোক, তোমার কাঁধে ভর দিয়ে অধঃপথে নেমেছিলুম বলেই যে তার শেষ ধাপটি পর্যন্ত তোমাকেই আশ্রয় করেই নামতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমার শরীর ভাল নেই, এখুনি শুয়ে পড়ব—আর তুমি অনর্থক দেরী করো না, যাও! কাল সকালে তোমার জিনিসপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

দিবাকর কহিল, এত তাড়া! আজ রাত্রের মতও আমাকে তুমি থাকতে দেবে না?

কিরণময়ী কহিল, না।

দিবাকর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, তা হলে আমার শুধু সর্বনাশ করবার জন্যই বিপদে টেনে এনেছিলে? কোনদিন ভালও বাসনি?

কিরণময়ী কহিল, না; কিন্তু তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করচি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেচি। আর আমার? যাক আমার কথা। সমস্তই আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে। আর, এই ভুলের জন্যেই আজ তোমার পায়ে ধরে মাপ চাচ্চি ঠাকুরপো।

এই নির্বিকার পাষাণ-প্রতিমার মুখের প্রতি চাহিয়া দিবাকর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার সর্বনাশের ধারণা নেই তোমার, তাই তুমি এত সহজে মাপ চাইতে পারলে। কিন্তু, এই সর্বনাশের চেয়েও আজ আমার ভালবাসা অনেক বড়, তাই এখনো বেঁচে আছি, নইলে বুক ফেটে মরে যেতুম। কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলো। যার কাছে তুমি যাবে, তাকেও ত ভালবাস না, হয়ত চেনোও না, তবু আমাকে ছেড়ে সেখানে যেতে চাও কেন? আমি ত কোনদিন তোমার কোন অনিষ্ট করিনি! কিন্তু সত্যিই কি যাবে?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সত্যিই যাব। তার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, না, আজ আর কিছুই গোপন করব না। আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক ও-সব কিছুই মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে। জীবনে কেবল একটা লোকের কাছে একদিন হার মেনেছিলুম—সে সুরবালা। কিন্তু সে কথা থাক। সত্যি বলচি ঠাকুরপো, আমি মানি শুধু ইহকাল, আর এই সুন্দর দেহটাকে। কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল যে, এই দিয়ে অনঙ্গের মত পতঙ্গটাকেও একদিন মজাতে চেয়েছিলুম।—বলিয়া ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া সে সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া কহিল, তার পরে একদিন—যেদিন সত্যি সত্যিই ভালবাসলুম ঠাকুরপো, সেদিনই টের পেলুম, কেন আমার সমস্ত দেহটা এতদিন এমন করে এর জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছিল!

দিবাকর ব্যগ্র হইয়া কহিল, কাকে ভালবাসলে বৌদি?

কিরণময়ী একটু হাসিয়া, যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, ভেবেছিলুম, আমার এ ভালবাসার তুলনা বুঝি তোমাদের স্বর্গেও নেই। কিন্তু সে গর্ব টিকল না। সেদিন মহাভারতের গল্প নিয়ে সেই যে মেয়েটার কাছে হেরে এসেছিলুম, আবার তার কাছেই হার মানতে হলে—ভালবাসার দ্বন্দ্বেও মাথা হেঁট করে ফিরে এলুম। মোহের ঘোর কেটে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাকে রূপ দিয়ে ভোলাতে পারি এ সাধ্য আমার নেই।

দিবাকরের একবার মনে হইল তাহার নিবিড় অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

কিরণময়ী কহিতে লাগিল, সেই মেয়েটার কাছে একটা জিনিস শেখবার বড় লোভ হয়েছিল—সে আমার আপন স্বামীকে ভালবাসা—হয়ত শিখতেও পারতুম, কিন্তু, এমনি পোড়া অদৃষ্ট, সে পথও দু'দিনে বন্ধ হয়ে গেল। ভাল কথা, কি জিজ্ঞাসা করছিলে ঠাকুরপো, তোমাকে ভালবাসিনি কেন? কে বললে বাসিনি? বেসেছিলুম বৈ কি! কিন্তু বয়সে আমি বড়, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকে তোমাকে ছোটভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত এই ছটা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম-নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায় লজ্জায় কেমন করে শিউরে ওঠে, তা কি একটা দিনও বুঝতে পারনি ঠাকুরপো? যাও, এবার তুমি সরে যাও। আমার পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক না থাক, কিন্তু এই দেহটার ওপর তোমার লুব্ধদৃষ্টি আর আমি সইতে পারিনে। বলিয়া সে বিছানাটা তুলিয়া আনিয়া দিবাকরের সুমুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর তোমাকে আমার

বিশ্বাস হয় না। আমার আরও একটি ছোটভাই আজও বেঁচে আছে। সেই সতীশের মুখ চেয়েও আমার চিরদিন তোমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তুমি যাও—

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিছানাটা তুলিয়া লইয়া বাহিরের অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তেতাল্লিশ

সকাল বেলা কিরণময়ী শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কাজ করিতেছিল, কামিনী বাড়িউলী আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া কহিল, গেছে ছোঁড়া? বালাই গেছে। কাল আমারে যেন মারমুখী! আরে, তোর কর্ম মেয়েমানুষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গোরু পুষত না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে বললে সে গেছে?

বাড়িউলী আসিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, নাও আর ঢঙ করতে হবে না। কে বললে? আমি হলুম বাড়িউলী, আমাকে আবার বলবে কে গা? নিজে কান পেতে শুনেচি। নইলে কি এতকাল এ-বাড়ি রাখতে পারতুম, কোন্‌কালে পাঁচ-ভূতে খেয়ে ফেলত তা জানো?

কিরণময়ী নীরবে গৃহকর্ম করিতে লাগিল; জবাব না পাইয়া বাড়িউলী নিজেই বলিতে লাগিল, কতদিন থেকে বলচি বৌমা, তাড়াও আপদটাকে। তা না, থাক কোথায় যাবে! আরে, কোথায় যাবে তার আমি জানি কি! অত ভাবতে গেলে ত চলে না। খাও, পরো, মাখো, সোনা-দানা গায়ে তোলো, সঙ্গে সঙ্গে পীরিতও কর। তা এ কোন্‌ দিশি ছিষ্টিছাড়া পীরিত করা বাছা!

কিরণময়ী একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার দৃষ্টি আনত করিল। বাড়িউলী বুঝিল, তাহার বহুদর্শিতার উপদেশাবলী কাজে লাগিতেছে। সতেজে কহিতে লাগিল, আর এই কি বাছা, তোমার পিরিত করবার সময়? সোমত্ত মেয়েমানুষ, এখন শুধু দু'হাতে লুটবে। তার পর দু'পয়সা হাতে করে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে ভারী বয়সে পীরিত করো না, কে তোমাকে মানা করচে! হাতে পয়সা থাকলে কি ছোঁড়ার অভাব? কত গণ্ডা চাই? দু'পায়ে যে তখন জড়ো করে উঠতে পারবে না।

কিরণময়ী বিমনা হইয়াছিল,—কি জানি সব কথা তাহার কানে গেল কি না। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না।

বাড়িউলীর নিজের ঘরের কাজ তখনও বাকী ছিল। তাই আর দেরী করিতে না পারিয়া দুপুরবেলায় পুনরায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।

এ বাটীর সকলেই প্রায় কারখানায় চাকরি করে। সকালে কাজে যায়, দুপুরবেলা খাইবার ছুটি পাইয়া ঘরে আসে এবং স্নানাহার সারিয়া পুনরায় কাজে গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেদিনের মত অবসর পায়।

আজও সকলে কাজ চলিয়া গেলে বেলা দুটো-আড়াইটার পর বাড়িউলী আসিয়া পুনরায় দরজার কাছে দাঁড়াইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, খাওয়া হলো বৌমা? কি রাঁধলে?

কিরণময়ী আজ উনানে আগুন পর্যন্ত দেয় নাই, তথাপি বাড়িউলীর প্রশ্নে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ হয়েচে। এসো, বসো।

বাড়িউলী দরজার কাছে আসন গ্রহণ করিল। সে ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিয়াছিল কিরণময়ীর মন ভাল নাই, তাই সহানুভূতির স্বরে কহিল, তা হবে বৈ কি বাছা, দু'দিন মনটা খারাপ হবে। একটা পশু-পক্ষী পুষলে মন কেমন করে, তা এ ত মানুষ। যেমন করে হোক, ছ-সাতটা মাস ঘর-সংসারও ত করতে হয়েচে! তা ঐ দুটো দিন—তিন দিনের দিন আর কেউ নাম-গন্ধও করে না বৌমা, চোখের ওপর কত গণ্ডা দেখলুম।

কিরণময়ী জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, সে ত সত্যিই।

বাড়িউলী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল, সত্যি নয়? তুমিই বল না বাছা, সত্যি নয় কি! আবার নতুন মানুষ আসুক, নতুন করে আমোদ-আহ্লাদ কর,—বাস্, সব শুধরে গেল। কি বল, এই নয়?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল বটে, কিন্তু এই গায়ে-পড়া আলাপে ক্রমশঃ চিত্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ বাড়িউলী চোখ-মুখ কুঞ্চিত ও গলা খাটো করিয়া কহিল, ভাল কথা মনে পড়েচে বৌমা, খোট্টা মিন্‌সেকে ত সকালেই খবর পাঠিয়েছিলুম। ব্যাটার আর তর্‌ সয় না, বলে, লোকজন কাজে বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলাতেই আসব। কি জানি, এখুনি এসে পড়বে নাকি—

কিরণময়ী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—এখানে কেন?

বাড়িয়ালী কথাটাকে অত্যন্ত কৌতুকের মনে করিয়া কৃত্রিম ক্রোধের ছলে কহিল, আ মর্‌ ছুঁড়ি, সে আসবে না ত কি তুই সেখানে যাবি নাকি? তোর কথা শুনলে যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়। বলিয়া শুষ্ক হাসির ছটায় ঢলিয়া একেবারে কিরণময়ীর গায়ের উপর গিয়া পড়িল।

কিরণময়ী কথা কহিল না, শুধু একটুখানি সরিয়া বসিল। বাড়িউলী আত্মীয়তার আবেশে আজ প্রথম তাহাকে ‘তুই’ সম্বোধন করিয়াছিল।

কিন্তু, সখিত্বের এই একান্ত মাখামাখি সম্ভাষণ এই ইতর স্ত্রীলোকটার মুখ হইতে কিরণময়ীর কানের ভিতর গিয়া একেবারে তীরের মত বিঁধিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে আজিও যে মহিমা মূর্ছাহতের মত পড়িয়া ছিল, এই একটিমাত্র শব্দের কঠিন পদাঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মুহূর্তমধ্যেই ভদ্রনারীর লুপ্ত মর্যাদা তাহার মনের মধ্যে দৃপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও সে আত্মসংবরণ করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

বাড়িউলী ইহার কিছুই লক্ষ্য করিল না, সে আপনার ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল, তুই দেখিস দিকিন বৌ, ছ’মাসের মধ্যে যদি না তোর বরাত ফিরিয়ে দিতে পারি ত, আমার কামিনী বাড়িউলী নাম নয়। তুই শুধু আমার কথামত চলিস্‌—আর আমি কিছুই চাইনে।

কিরণময়ীর মনে হইল, ঐ স্ত্রীলোকটা তাহার কানের সমস্ত স্নায়ুশিরা যেন পোড়ানো সাঁড়াশি দিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু নিষেধ করিবার কথা তাহার মুখে ফুটিল না। শুধু চুপ করিয়া শুনিতেই লাগিল।

বাড়িউলী কহিল, খোট্টা মারোয়াড়ী; দু'পয়সা আছে। ঝোঁকে পড়েচে, দু'হাত দিয়ে দুয়ে নে; তার পর যাক না বেটা গোল্লায়,—আবার কত এসে জুটবে। এমন হয়ে আছিস তাই,—নইলে তোর রূপটা কি সোজা রূপ বৌ!

এমনি সময়ে বাহিরের বারান্দার প্রান্ত হইতে ভাঙ্গা-গলার ডাক আসিল, বাড়িউলী?

এই যে যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া বাড়িউলী বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী দুই হাত বাড়াইয়া তাহার আঁচলটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, না না, এখানে কিছুতেই না—এ ঘরে কেউ যেন না ঢোকে।

বাড়িউলী হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন? কে আছে এখানে?

কিরণময়ী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, কেউ থাক, না থাক—এখানে না—কিছুতেই না—

আগন্তুক লোকটার পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

বাড়িউলী অবাক হইয়া কহিল, তুই ত আর কারো কুলের বৌ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি? তুই হলি বেবুশ্যে।

কিরণময়ী চীৎকার করিয়া উঠিল, কি আমি? আমি বেশ্যা?

তাহার মনে হইল, বজ্রাগ্নি-রেখা তাহার পদতল হইতে উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া বুঝি বাহির হইয়া গেল।

তাহার আরক্ত চক্ষু ও তীব্র কণ্ঠস্বরে বাড়িউলী বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, তা নয় ত কি বল্? ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে—এখন আমরাও যা, তুইও সেই পদার্থ। ভদ্দরনোক আসচে, নে ঘরে বসা।

এই ‘ভদ্দরনোক’টির কাছে বাড়িউলী টাকা খাইয়াছিল এবং আরও কিছুর প্রত্যাশা রাখে। ভদ্রলোক দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, কেয়া বাড়িউলী, খবর সোব ভাল?

বাড়িউলী আঁচল টানিয়া লইয়া বিনয়-সহকারে কহিল, যেমন তোমাদের মেহেরবানি। যাও, ঘরে গিয়ে বসো গে—আমি পান সেজে আনি। একটু হাসিয়া বলিল, এখন এ ঘর-দোর সব তোমার বাবুজী; ভাল করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে হবে তা কিন্তু বলে রাখচি।

আচ্ছা আছা, সে সোব হোবে, বলিয়া লোকটা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিতে গেল।

কিরণময়ীর স্নায়ু-শিরার সহিষ্ণুতা ইস্পাতের অপেক্ষাও দৃঢ়, তাই এতক্ষণ পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। তাহার রূপ-যৌবনের এই অপরিচিত হিন্দুস্থানী খরিদ্দারের গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্য হারাইয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

লোকটা চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া এই আকস্মিক বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বাড়িউলীর প্রবল চিৎকারে বাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোক কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া মুহূর্তে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল এবং কেহ জল, কেহ পাখা লইয়া হতভাগিনীর শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আর বাড়িউলী দোরগোড়ায় বসিয়া তারস্বরে অবিশ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিল, সে এই কাজে চুল পাকাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু, এখনও এত নষ্টামি, এত ঢঙ শিখিতে পারে নাই। আজও নাগর দেখিয়া দাঁত-কপাটি লাগাইবার কৌশল তাহার আয়ত্ত হয় নাই।

অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার মধ্যে আবার এক নূতন গোলমাল শোনা গেল। সদর দরজায় কে একটা নূতন বাবু আসিয়া দিবাকর ও বৌঠানের নাম ধরিয়া মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়াছে খবর আসিল। চাকরটার কাছে বাড়িউলী আগন্তুক

বাবুর সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতেই এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রকাণ্ড একটা চামড়ার ব্যাগ বামহস্তে স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া লইয়া সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিল, বৌঠান!

তাহার ডান হাতের আঙুলে প্রকাণ্ড একটা হীরার আংটি রবিকরে ঝলমল করিয়া উঠিল, বাড়িউলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিল, কাকে খুঁজছেন?

দিবাকর থাকে এখানে?

বাড়িউলী বলিল, না।

আমার বৌঠান? কিরণময়ী বৌঠান? কোন্ ঘরে থাকেন?

বাড়িউলীর সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারিজন কৌতূহলী স্ত্রীলোক গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, সেই ত মূর্ছা হয়েছে গো।

মূর্ছা হয়েছে? কৈ দেখি, বলিয়া আগন্তুক ভদ্রলোক তিন লাফে ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচেতন কিরণময়ী তখন মাটিতে পড়িয়া। সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে—চক্ষু মুদ্রিত, মুখ পাংশু, চুলের রাশি সিক্ত বিপর্যস্ত, অঙ্গের বসন স্রস্ত—

আগন্তুক সতীশ। তাহার চোখ পড়িল হিন্দুস্থানীটার উপর। এতক্ষণ সে কাছে সরিয়া আসিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়াছিল। সতীশ বিস্মিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিল, এই, তুম্ কোন্ হ্যায়?

তাহার হইয়া বাড়িউলী জবাব দিল, আহা উনি যে আমাদের মারোয়াড়ীবাবু গো। ঐ যে—

কিন্তু পরিচয় দেওয়া শেষ হইবার পূর্বেই সতীশ লোকটাকে দরজা নির্দেশ করিয়া কহিল, বাহার যাও—

মারোয়াড়ীর টাকা আছে, সে নবীন প্রেমিক, বিশেষতঃ এতগুলা স্ত্রীলোকের সামনে সে হীন হইতেও পারে না, সুতরাং সাহসে ভর করিয়া কহিল, কাহে?

অসহিষ্ণু সতীশ কাঠের মেঝের উপর সজোরে পা ঠুকিয়া ধমক দিল, বাহার যাও উল্লু!

সমস্ত লোকগুলার সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা পর্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া মারোয়াড়ী বাহির হইয়া গেল।

সতীশ কিরণময়ীর দেহের উপর তাহার স্খলিত বস্ত্র তুলিয়া দিয়া নিজেই একটা হাতপাখা লইয়া সবেগে বাতাস করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সমবেত নারীমণ্ডলী বিচিত্র কলরব করিতে লাগিল। ইহাদের নানাবিধ আলোচনার মধ্য হইতে সতীশ অল্পকালের মধ্যে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিয়া লইল। বাড়িউলী আক্ষেপ এবং অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, সে তাহার পিতাঠাকুরের বয়সেও এমন সৃষ্টিছাড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই যে, বেবুশ্যেকে বেবুশ্যে বলিলে তাহার চোখ উলটাইয়া দাঁত-কপাটি লাগিয়া যায়।

মিনিট-কুড়ি পরে সংজ্ঞা পাইয়া কিরণময়ী মাথার বসন তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল; ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ঠাকুরপো?

সতীশ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, হাঁ বৌঠান, আমি। কিন্তু কি কাণ্ড বল ত! যেমন কাপড়-চোপড়, তেমনি ঘরদোর, তেমনি শ্রী,—কে বলবে যে ইনি সতীশের দিদি! যেন কোথাকার একটা অনাথা পাগলী! ছেলেমানুষি ত ঢের হলো, এখন কালকের জাহাজে বাড়ি চল। মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, আর দরকার নেই, তোমরা ঘরে যাও।

কিরণময়ী নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত অধোমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু বাহিরে লেশমাত্র ব্যক্ত হইল না।

মেয়েরা বাহির হইয়া গেলে সতীশ কহিল, সে শুয়োর কৈ বৌঠান?

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই কহিল, এতদিন ত এইখানেই ছিল, কাল রাত্রে অন্যত্র গেছে।

কেন?

আমি চলে যেতে বলেছিলুম বলে।

কিন্তু ডাকলে কি একবার আসে না?

ডাকিয়ে দেখচি, বলিয়া কিরণময়ী বহিরে গিয়া বাড়ির চাকরকে কালীবাড়ি পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কহিল, তুমি আসবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ঠাকুরপো।

সতীশ কহিল, আমার আসাটা কি আমার নিজেরই স্বপ্নের অতীত নয় বৌঠান?

তা বটে, বলিয়া কিরণময়ী আবার ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অনেক কথাই জানিবার আবশ্যক ছিল, সতীশ যে তাহাদের বাটীর মুক্ত দাসীর কাছে সন্ধান লইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝা শক্ত নয়, কিন্তু অকস্মাৎ এতকাল পরে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে এতদূরে আসার যথার্থ হেতু অনুমান করা সত্যই কঠিন।

কিন্তু আসিবার হেতু সতীশ নিজেই ক্রমশঃ ব্যক্ত করিল, কহিল, কাল জাহাজ আছে, তোমাদের নিতে এসেচি বৌঠান।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, উপীনঠাকুরপো পাঠিয়েছেন ত? বেশ, দিবাকরকে নিয়ে যাও। প্রার্থনা করি সে যেন যেতে পারে।

সতীশ কহিল, শুধু পরের হুকুম তামিল করতেই এতদূরে আসিনি, আমার নিজের তরফ থেকেও বড় তাগিদ আছে। ভাবচ, তবে এতকাল পরে কেন? খবর পাইনি। তার পরে বাবা মারা গেলেন, নিজেও যেতে বসেছিলুম, হয়ত আর দেখাই হতো না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জগতের সমস্ত স্নেহ যেন সতীশের সর্বাঙ্গে বর্ষিত হইল। ক্ষণকাল পরে করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি কার কাছে যাব ঠাকুরপো, আমার কে আছে?

আমার কাছে যাবে বৌঠান, আমি আছি।

কিন্তু আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি ভাল হবে?

সতীশ কহিল, তোমার কি মনে নেই বৌঠান, অনেকদিন আগে এই ভাল-মন্দ একদিন চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল, যেদিন ছোটভাই বলে আমাকে ডেকেছিলে? অন্যায় যদি কিছু করে থাকো, তার জবাব দেবে তুমি, কিন্তু আমার জবাবদিহি এই যে, আমি ছোটভাই,—তোমাকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

কথা শুনিয়া কিরণময়ীর মনে হইতে লাগিল, কোথাও ছুটিয়া গিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, কিন্তু ঠাকুরপো সমাজ আছে ত?

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, না নেই। যার টাকা আছে,গায়ের জোর আছে,তার বিরুদ্ধে সমাজ নেই। ও দুটো জিনিসই আমার একটু বেশী রকম যোগাড় হয়ে গেছে বৌঠান।

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে কিরণময়ীর মুখে হাসি আসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, টাকা আর গায়ের জোরে তুমি সমাজ না মানতে পার, কিন্তু নিজের অশ্রদ্ধার হাত থেকে এই পাপিষ্ঠাকে বাঁচাবে কি করে?

সতীশ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি গোঁয়ার মুখ্যুমানুষ বৌঠান, অত তর্কের জবাব দিতেও আমি পারিনে, অত চুলচিরে লোকের ভাল-মন্দর হিসেব করতেও আমি জানিনে। আর, এ কি সত্যযুগ যে, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে? এ হলো কলিকাল, অন্যায়-অকাজ ত লোকে করবেই! তার কে আবার জমাখরচ খতিয়ে বসে আছে? আমার উলটো বিচার, তা ভালই বল আর মন্দই বল বৌঠান, আমি দেখি কে কি কাজ করেচে! হারাণদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামিসেবা, সে ত আমিই চোখে দেখেচি। সেই তুমি হবে অসতী! এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। তা সে যাই হোক, নিয়ে তোমাকে আমি যাবই। অসুখটায় একটু কাহিল আমাকে করেচে

বটে, তা এ-পাড়ার লোকের সাধ্যি নেই যে, তোমাকে সাহায্য করে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। কাল তোমাকে কাঁধে করে জাহাজের ওপর আমি তুলবই, তা সে তুমি যত আপত্তিই কর না কেন?

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিল। অপরাধের সমস্ত কালিমা বিদূরিত হইয়া সরল স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটায় তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল, সে যেন কোন গর্হিত কর্মই করে নাই, শুধু রাগ করিয়া দুটো দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি হইতে বাপের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, স্নেহময় দেবর ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতে বসিয়াছে।

এমনি সময়ে কবাটের বাহির হইতে ডাক দিয়া দিবাকর প্রবেশ করিল। কহিল, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে? বলিয়াই তাহার খাটের উপর দৃষ্টি পড়ায় যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বাহিরের আলোক হইতে ঘরের অন্ধকারে ঢুকিয়া প্রথমে সে সতীশকে দেখিতে পায় নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সতীশ হাসিয়া কহিল, আমি উপীনদা নই রে, সতীশদা—কুকাজের রাজা। আমাকে দেখে অমন শুকিয়ে কাঠ হবার দরকার নেই। নে বস্, বস্। উপীনদার পরোয়ানা নিয়ে এসেছি, কাল ভোর সাড়ে-ছটার আগেই জাহাজ ছাড়বে মনে থাকে যেন।

দিবাকর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ পরে কহিল, আমি যাব না সতীশদা।

সতীশ কহিল, তোর ঘাড় যাবে। উপীনদার হুকুম—জীবিত কি মৃত, বিদ্রোহী দিবাকরের মুণ্ডু চাই-ই!

দিবাকর কহিল, তবে তার মরা মুণ্ডই নিয়ে যেয়ো সতীশদা। সে আমি কাল সকালে ছ'টার মধ্যে তোমাকে অনায়াসে দিতে পারব।

সতীশ মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বলিল, আরে বাপ রে, ছেলের রাগ দেখ! কিন্তু যাবিনে কেন?

দিবাকর কহিল, তুমি কি পাগল হয়েছ সতীশদা? সংসারে কি কেউ আছে, এর পরে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে?

সতীশ বলিল, বেশ ত, মাথা উঁচু করতে আপত্তি থাকে, নীচু করে গিয়েই দাঁড়াস্। কিন্তু যেতে তোকে হবেই। আরে, তুই আর এ কি এমন বেশী করেছিস যে লজ্জায় মরে যাচ্চিস? আমি যে-সব কাণ্ড এর মধ্যে করে বসে আছি, সে-সব গিয়ে শুনিস। মায় 'পঞ্চমকার' পর্যন্ত! ভূত-সিদ্ধি—বেতাল-সিদ্ধি—এ-সব নাম শুনেচিস কোন কালে? নে, চল্, উপীনদা আর সে উপীনদা নেই—আমরা পাঁচজনে তাকে একরকম ঠিক করেই এনেচি। বৌঠান, যা গুছিয়ে নেবার নাও, আমি টিকিট কিনতে চললুম।

তাহার শেষ কথাটা কিরণময়ীর কানে খট করিয়া বাজিল, জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক করে আনা কি-রকম ঠাকুরপো?

সতীশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, গেলেই দেখতে পাবে বৌঠান।

তাহার শুষ্ক হাসি কিরণময়ী লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত তোমাকে বলেচি ঠাকুরপো, আমি যেতে পারবো না।

দিবাকরও দৃঢ়স্বরে কহিল, আমিও কিছুতে যাব না সতীশদা, তুমি মিথ্যে আমার জন্যে টাকা নষ্ট করো না।

সতীশ উঠিতে যাইতেছিল, হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। উপেন্দ্রর পীড়ার সংবাদ এখনও পর্যন্ত সে গোপন রাখিয়াছিল, কিন্তু আর রাখা চলিল না, কহিল, আমি অনেক গর্ব করে বলে এসেচি তাদের আনবই। আমার মুখ তোমরা না হয় নাই রাখবে, কিন্তু তিনি কি তোমাদের কাছে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন যে, এই ব্যথা তাঁকে দিতে হবে? আমি শুধু-হাতে ফিরে গেলে তাঁর যে কত বাজবে, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। দিবাকর, এত অধর্ম করিস নে

রে! তোকে দেখবার জন্যই তাঁর প্রাণটা এখনো আটকে রয়েছে, নইলে অনেক আগেই যেত।

উভয় শ্রোতাই একসঙ্গে অস্ফুটে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সতীশ কহিতে লাগিল, এই মাঘের শেষে যক্ষ্মারোগে পোশ্‌-বৌঠান যখন স্বর্গে গেলেন, তখনই বোঝা গেল উপীনদাও চললেন। কিন্তু তাঁর যাবার তাড়া যে এত ছিল সে কেউ আমরা টের পাইনি। চিরকালই কম কথা কন,—স্বর্গের রথ একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির না হওয়া পর্যন্ত একটা খবরও দিলেন না যে, তাঁর সমস্তই প্রস্তুত। তোর ভয় নাই রে দিবাকর, নির্ভয়ে চল্‌। আমাদের সে উপীনদা আর নেই। এখন সহস্র অপরাধেও আর অপরাধ নেন না,—শুধু মুচকে মুচকে হাসেন,—ছি ছি, ঐ ্ধূলোবালির ওপর ওখানে অমন করে শুয়ো না বৌঠান। আচ্ছা, আমরা বাইরে যাচ্চি, তুমি একটু শোও—উঠো না যেন।—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সতীশ পায়ের উপর একটু ঠেলা দিয়াই বুঝিল, কিরণময়ী সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—ইচ্ছা করিয়া ভূ-শয্যা গ্রহণ করে নাই।

সতীশ এবং দিবাকর উভয়েই পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে সতীশ ধীরে ধীরে কহিল, ঠিক এই ভয়ই আমার ছিল দিবাকর। আমি জানতুম এ-খবর উনি সইতে পারবেন না।

দিবাকর চকিত হইয়া সতীশের মুখের প্রতি চাহিল, সতীশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এতদিন এত কাছে থেকেও কি তুই এ কথা টের পাসনি দিবা? আবার ভয় হয়, বুঝি বা বৌঠানকে আমি মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু তবুও নিয়ে যেতেই হবে। এ জগতে দুটি লোক কিছুতেই সে শোক সইতে পারবে না, কিন্তু একটি ত স্বর্গে গেছেন, আর একটি—কিন্তু যা, জল নিয়ে আয় দিবাকর, আমি বাতাস করি—ও কি রে, কথা কস্‌নে কেন?

অকস্মাৎ দিবাকরের আপাদমস্তক বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে অচেতন কিরণময়ীর দুই পদতলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি সমস্ত বুঝেচি বৌদি, তুমি আমার পূজনীয়া গুরুজন তবে, কেন এতকাল গোপন করে আমাকে নরকে ডোবালে! আমি এ মহাপাপ থেকে কি করে উদ্ধার পাবো বৌদি!

চুয়াল্লিশ

উপেন্দ্র বলিয়াছিলেন, সাবিত্রী, হাড়-ক'খানা আমার গঙ্গায় দিস দিদি—অনেক জ্বালায় জ্বলেচি, তবু একটু ঠাণ্ডা হব।

সাবিত্রীকে তিনি আজকাল কখনো 'তুমি' কখনো 'তুই' যা মুখে আসিত, তাই বলিয়াই ডাকিতেন। সাবিত্রী তাঁহার সেই শেষ ইচ্ছা এবং শেষ চিকিৎসার জন্য কিছুদিন হইল কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া সিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার পর এক পসলা ঝড়বৃষ্টি হইয়া গেলেও আকাশে মেঘ কাটে নাই। উপেন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত চোখ-দুটি মেলিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, সুমুখের জানালাটা একটু খুলে দে দিদি, সেই বড় নক্ষত্রটি একবার দেখি।

সাবিত্রী তাঁহার কপালের রুক্ষ চুলগুলি ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, গায়ে জোলো-হাওয়া লাগবে যে দাদা!

লাগুক না বোন! আর আমার তাতে ভয় কি?

ভয় তাঁহার শুধু আজ কেন, যেদিন হইতে সুরবালা গিয়াছে সেদিন হইতেই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সাবিত্রীর ত ভয় ঘুচে নাই। তাহার বুঝি যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণই আশ; তাই মৃত্যু যখন শিয়রের পাশে তাহার সঙ্গে সমান আসন দখল করিয়া বসিয়া গেছে, তখনও সে তুচ্ছ জোলো-হাওয়াটাকে পর্যন্ত ঘরে ঢুকিতে দিতে সাহস পায় না। অনিচ্ছুককণ্ঠে কহিল, কিন্তু নক্ষত্র ত দেখা যায় না দাদা, আকাশে যে মেঘ করে আছে।

উপেন্দ্র ম্লান চক্ষু-দুটি উৎসাহে বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, মেঘ? আহা, অসময়ে মেঘ দিদি, খুলে দে, খুলে দে—একবার দেখে নিই, আর ত দেখতে পাব না।

বাহিরে আর্দ্র বায়ু জোরে বহিতেছিল; সাবিত্রী কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিল জ্বর বাড়িতেছে; মিনতি করিয়া বলিল, ভাল হও, মেঘ কত দেখবে দাদা,— বাইরে ঝড় বইচে, আজ আমি জানালা খুলতে পারব না।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উপেন্দ্র রাগ করিয়া বলিলেন, ভাল চাস তো খুলে দে সাবিত্রী, নইলে বর্ষার দিনে যখন মেঘ উঠবে, তখন কেঁদে কেঁদে মরবি তা বলে দিয়ে যাচ্চি। আমি আর দেখবার সময় পাব না।

সাবিত্রী আর প্রতিবাদ না করিয়া একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিল।

সেই খোলা জানালার বাহিরে উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল, তাহারি আলোকচ্ছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া উপেন্দ্রর কিছুতেই যেন আর সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল।

সাবিত্রী নিজেও একটা গরাদে ধরিয়া সেইদিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উপেন্দ্রর দৃষ্টি হঠাৎ তাহার উপরে পড়িতে মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা দে দে, জানালা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বস। কিন্তু এত মায়া ত ভাল নয় দিদি। একটুখানি গায়ে হাওয়া লাগতে দিতে চাও না, কিন্তু আমি চলে গেলে কি করবে বল ত!

সাবিত্রী জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি ত আমাকে কাজ দিয়ে যাবে বলেছ। আমি তাই সারাজীবন ধরে করব। তুমি আমার চোখের ওপরেই দিনরাত থাকবে!

পারবে করতে?

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বলিল, কেন পারব না দাদা? তোমার কথায় উনি ত কখনো না বলবেন না।

উপেন্দ্র হাসিমুখে কহিল, উনি কে? সতীশ ত?

সাবিত্রী ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার সলজ্জ মৌন মুখের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, সাবিত্রী, সতীশ যে আমার কি, সে পরের পক্ষে বোঝা শক্ত। বাইরে থেকে যেটা দেখা যায়, তাতে সে আমার সঙ্গী, আমার আজন্ম সুহৃৎ। কিন্তু যে সম্বন্ধটা দেখা যায় না, সেখানে সতীশ আমার ছোটভাই, আমার শিষ্য, আমার চিরদিনের অনুগত সেবক। সেই রাত্রে তুই যদি দিদি, আত্মপ্রকাশ করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস, আমার শেষজীবনটা হয়ত এত দুঃখে কাটত না। দিবাকরও হয়ত আমাকে এত ব্যথা দেবার সুযোগ পেত না।

সাবিত্রী সজল-চক্ষে কহিল, আমি ফেরাতে তোমাদের চেয়েছিলুম দাদা, কিন্তু উনি কিছুতেই যেতে দিলেন না, দুই চৌকাঠে হাত দিয়ে আমার পথ আটকে রাখলেন। বললেন, আমি তোমাদের সামনে গেলে তোমাদের অপমান করা হবে।

তাঁরই ইচ্ছে, বলিয়া উপেন্দ্র উপর দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন।

বাড়িতে উপেন্দ্রর পিতা শিবপ্রসাদ বাতে শয্যাগত, তাঁহাকে এবং সংসার ফেলিয়া মহেশ্বরী সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু মেজভাই অভিভাবক হইয়া কলিকাতার বাসায় ছিলেন, তাঁহার এবং আর একজনের পদশব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল।

পরক্ষণেই তিনি কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কবিরাজ উপেন্দ্রর নাড়ী দেখিয়া জ্বর পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করিতেই উপেন্দ্র হাতজোড় করিয়া কহিল, ঐটে আমাকে মাপ করতে হবে কবিরাজমশাই। আপনার অগোচর ত কিছু নেই—তবে, যাবার সময়ে আর কেন দুঃখ দেবেন।

প্রাচীন চিকিৎসকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, আমরা চিকিৎসক, আমাদের শেষ-মুহূর্তটি পর্যন্ত যে নিরাশ হতে নেই বাবা। তা ছাড়া ভগবান সমস্ত আশা শেষ করে দিলেও ত যাতনা নিবারণ করবার জন্যে ঔষধ দেওয়া চাই।

উপেন্দ্র আর প্রতিবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

তখন ঔষধ পরিবর্তন করিয়া, ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভরসা ত বিন্দুমাত্রও ছিল না, অধিকন্তু আজ সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া গেলেন যে, রোগীর, মৃত্যুক্ষণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

তিনদিন পরে সোমবারের সকালবেলা সাবিত্রী একখানি টেলিগ্রাফ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, কাল সকালে তাঁরা জাহাজে উঠেছেন।

কারও নাম দেয়নি সতীশ? কৈ দেখি?

উপেন্দ্রর প্রসারিত হাতের উপর সাবিত্রী কাগজখানি তুলিয়া দিল।

কাগজখানি তিনি উলটিয়া-পালটিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সাবিত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। এই নিশ্বাসটুকুর অর্থ সাবিত্রীর অগোচর রহিল না।

যাবার সময় সতীশ তাহাকে নিভৃতে বলিয়া গিয়াছিলেন, কিরণময়ীর দেখা পাইলে সে যেমন করিয়া হোক তাহাকে ফিরাইয়া আনিবেই। তাহাদের ভাই-বোন সম্বন্ধটাও সে উল্লেখ করিয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই।

এই পরমাশ্চর্য রমণীকে একবার চোখে দেখিবার কৌতূহল সাবিত্রীর বহুদিন হইতে ছিল, কিন্তু, পাছে কাণ্ডজ্ঞানহীন সতীশ তাহাকে এই বাটীতেই আনিয়া হাজির করে, এ আশঙ্কাও তাহার যথেষ্ট ছিল। কহিল, তিনি সব দিক বিবেচনা করে কাজ করেন না; আমার ভয় হয় দাদা, পাছে কিরণ বৌঠানকে তিনি এখানেই এনে তোলেন।

উপেন্দ্রর পাংশু ওষ্ঠাধরে বেদনার একটুখানি শুষ্ক হাসি দেখা দিল, কহিলেন, এ বাড়িতে সে আসবে কেন বোন? এদেশে যদি সে ফিরেও আসে, তার অন্য হেতু আছে, কিন্তু সে ত আর সাবিত্রী নয়, সে ত আর নির্বোধ নয়, তোর মত ইহকাল-পরকাল এক করে বসে নেই, সে কেন সাধ করে এই ভয়ানক ব্যাধির গারদের মধ্যে ঢুকতে যাবে বল ত?—বলিতে বলিতেই সাবিত্রীর পানে চাহিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, করুণায়, বেদনায় তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

সাবিত্রী দৃষ্টি আনত করিয়া কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া উপেন্দ্র পুনরপি কহিলেন, অথচ আশ্চর্য দ্যাখ্ সাবিত্রী, একসময়ে সে নাকি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালবেসেছিল।

শুনিয়া সাবিত্রী সত্যই আশ্চর্য হইল, কারণ এ কথাটা সে সতীশের কাছে শুনে নাই। কহিল, ওঁর কাছে শুনেছিলুম তাঁর স্বামিসেবার কাহিনী— এ কি তবে সত্যি নয় দাদা?

উপেন্দ্র বলিলেন, তাও সত্যি বোন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তোকে আর সুরোকে না জানলে আমার মনে হত, এমন সেবাও বুঝি আর কোন মেয়েমানুষ পারে না, স্বামীকে এত ভালাবাসাও বুঝি আর কারো সাধ্য নয়।

সাবিত্রী কহিল, কিন্তু, এ জিনিস কখনো ছলনা হতে পারে না দাদা।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, না, ছলনা ত নয়। সে ত কখনো কাউকে দেখাতে চায়নি, কখনো কারো কাছে প্রকাশও করেনি। তার পতিসেবার সাক্ষী শুধু ভগবানই ছিলেন, আর ছিলুম আমরা দু'জন—সতীশ আর আমি। পরক্ষণেই তাঁহার ডাক্তার অনঙ্গমোহনের কথা মনে পড়িল। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আজ ত আমার কারো উপর রাগ নেই, ঘৃণা নেই, বিতৃষ্ণা নেই—আজ আমার বড় ব্যথার সঙ্গে কি মনে হচ্ছে জানিস দিদি,—মনে হচ্চে সে সারা জীবন শুধু হাতড়েই বেড়িয়েচে, কিন্তু কোন দিন কিছু পায়নি। আমাকেও সে কখনো ভালোবাসেনি। এতটুকু ভালবাসলে কি কেউ এত ব্যথা দিতে পারে? দিবাকর যে

আমাদের কি ছিল, সে ত সে জানত! তার হাতেই ত তাকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, আমার স্নেহের বস্তুকে সেও স্নেহের চক্ষে দেখবে। উঃ—কত বড় ভুলই হয়েছিল!

উপেন্দ্র কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, তাই ভাবচি, সতীশ যদি না বুঝে সকলকে নিয়ে এখানেই এসে ওঠে!

সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে কিছুতেই হতে পারবে না দাদা, তাঁর বোনের থাকবার ব্যবস্থা তিনিই করুন, কিন্তু এখানে নয়।

উপেন্দ্র কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল, অঘোরময়ী কেমন করিয়া পীড়ার সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রের গুণরাশির বিরাট তালিকা নাকী-সুরে মুখে মুখে রচনা করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিলেন।

এ পীড়ার সাংঘাতিকতার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন

যে, এ পোড়ামুখ লইয়া ভিক্ষা করার পথও যখন হতভাগীর জন্য হারাইয়াছে, এবং কিছু একটা ঘটিলে না খাইয়া শুকাইয়া মরাই যখন অনিবার্য, তখন উপীনের সমস্ত বালাই লইয়া তাঁহার মরণ হইতেছে না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপেন্দ্র এত দুঃখেও হাসিয়া কহিলেন, খেতে পাবে না কেন মাসী? সাবিত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন, আমি গেলেও আমার এই বোনটিকে রেখে গেলুম, তোমাদের ও কষ্ট দেবে না।

অঘোরময়ী সাবিত্রীকে ইতিপূর্বে দেখেন নাই। সুতরাং কঠোর পরিশ্রমে ও নিরতিশয় মনঃকষ্টে শ্রীহীন এই সম্পূর্ণ

অপরিচিত ভগিনীটির পানে চাহিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু, কৌতূহল-নিবৃত্তির উদ্যোগ করিতেই সাবিত্রী কাজের ছুতা করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বৃহস্পতিবার দিন বেলা দশটা-এগারোটার সময় সতীশ জাহাজঘাটে নামিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছিল, দেখিল, বেহারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল। কিরণময়ী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, বেহারীর একবার সন্দেহ হইল হয়ত তিনিই। সে পূর্বে কখনো দেখে নাই, শুধু শুনিয়াছিল ইনি অসাধারণ রূপসী। অথচ রূপের বিশেষ কিছুই এই মলিন বস্ত্র-পরিহিতা সাধারণ রমণীটির মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া সে এই স্ত্রীলোকটিকে অপর কেহ মনে করিয়া, আস্তে আস্তে বলিল, বাবু, মা বলে দিলেন, সেই বৌটি যদি এসে থাকে, তাঁকে আর কোথাও রেখে আপনারা দু'জনে বাসায় আসবেন। সঙ্গে আনবেন না যেন।

সতীশ ক্ষুধা-তৃষ্ণায়-শ্রান্তিতে এমনিই বিরক্ত হইয়া ছিল, বেহারীর এই অপমানকর প্রস্তাবটা কিরণময়ীর মুখের উপরেই হইতে শুনিয়া আগুন হইয়া কহিল, কেন শুনি? তাঁকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে আমরা বাসায় গিয়ে উঠব? যা বল গে, আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইনে।

বেহারীর মুখ চুন হইয়া গেল। কিরণময়ী তখন সরিয়া আসিয়া একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, এ ত ঠিক কথা ঠাকুরপো। এতে রাগ করবার ত কিছু নেই। এখন বাবু কেমন আছেন বেহারী?

বেহারী জবাব দিবার পূর্বেই সতীশ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কে তোকে বলতে পাঠিয়েছে,—সাবিত্রী? তার ভারী আস্পর্ধা হয়েচে দেখচি।

সাবিত্রীর প্রতি এই রূঢ় ভাষায় ব্যথিত হইয়া বেহারী কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি ঠিক বলচেন মা। বাবু না বুঝেই রাগ করচেন। এ-সব খারাপ ব্যারামে কেউ কি সেখানে যেতে চায়? উপীনবাবু কাল রাত্তিরে

সাবিত্রী-মাকে ডেকে নিজেই বললেন, ভয় নেই, কিরণ বৌঠান আমার ব্যারামের নাম শুনলে এ বাসায় কেন, এ পাড়ায় ঢুকবেন না। সাবিত্রী-মার মত সকলের ত আর মরা-বাঁচার—

কিরণময়ীর ম্লান মুখখানি ব্যথায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, এ কথা কি বাবু বলেছিলেন বেহারী?

বেহারী মাথা নাড়িয়া উৎসাহে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই সতীশ ধমক দিয়া উঠিল, তুই থাম, হতভাগা গাধা।

ধমক খাইয়া বেহারী সঙ্কুচিত হইয়া গেল, কিরণময়ী কহিল, ওর ওপর রাগ করলে কি হবে ঠাকুরপো? তারপরে বেহারীর প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার বাবুকে বলো ভয় নেই, তাঁর হুকুম না পেয়ে আমি সেখানে যাব না। সতীশকে কহিল, ঠাকুরপো, আজ আমাকে কোন হোটেলে রেখে,—একটা ছোট বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায় না?

সতীশ উত্তেজিতভাবে বলিল, কলকাতা শহরে বাড়ির ভাবনা বৌঠান, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সমস্ত ঠিক করে ফেলব। আয় রে দিবাকর, একটু পা চালিয়ে আয়, বলিয়া ডাক দিয়া সে কিরণময়ীকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল।

গাড়ি চলিয়া গেলে ক্ষুব্ধ লজ্জিত বেহারী বিষণ্ণ-মুখে ধীরে ধীরে বাসার দিকে প্রস্থান করিল।

সুবিধা পাইলেই সাবিত্রী সকালে তাড়াতাড়ি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া যাইত। সতীশ ফিরিয়া আসিবার পরে এ-কয়দিন সে প্রায় নিত্যই গঙ্গাস্নান করিতে আসিত।

দিন-চারেক পরে, একদিন সকালে সে স্নানাহ্নিক করিয়া উঠিয়াই দেখিল, ঘাটের উপরে

একটা গোলমাল বাধিয়াছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে নামাবলী-গায়ে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে

করিতে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, কোথাকার একটা পাগলী আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়াছে। পাছে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নানের সমস্ত পুণ্যটা মাটি করিয়া দেয়, এই ভয়ে বৃদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। পাগলী নির্বন্ধ-সহকারে অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে, ঠাকুর, ভগবানকে আপনি বিশ্বাস করেন? তাঁকে ডাকলে তিনি আসেন? কি করে আপনারা তাঁকে ডাকেন? আমি পারিনে কেন? আমার বিশ্বাস হয় না কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কহিতেছেন, দেখবি মাগী, পাহারাওয়ালা ডাকবো? পথ ছাড় বলছি।

দুই-চারিজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকও আশেপাশে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, পাগল নয়, পাগল নয়, দেখচ না, ছুঁড়ি সারারাত মদ খেয়েছে।

শুনিতে পাইয়া পাগলী কাতর হইয়া কহিল, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে গো, আমি মদ খাইনে। ঐ ওখানে আমার বাসা—আমি শুধু তোমাদের হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান কি সত্যি আছেন? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার? ভক্তি করতে পার? আমি পারিনে কেন? আমি ত পরশু থেকে তাঁকে কত ডাকচি! বলিতে বলিতেই তাহার দুই চোখ বহিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাবিত্রীরও তাহাকে পাগল বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু তথাপি, এই অপরিচিতা উন্মাদিনীর অশ্রুজল-সিক্ত অদ্ভুত ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার আপনার শত-দুঃখ-বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের উপর যেন হাহাকার করিয়া পড়িল, এবং মুহূর্তেই তাহারও দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। পাগলীর দৃষ্টি হঠাৎ এদিকে পড়িতেই সে বৃদ্ধকে ছাড়িয়া সাবিত্রীর সুমুখে আসিয়া কহিল, তুমিও ত পূজা-আহ্নিক কর, তুমি আমাকে বলে দিতে পার?

চারিদিকে ভিড় জমা হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাবিত্রী খপ করিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে চমকিয়া কহিল, আমাকে আপনি ছুঁলেন?

সাবিত্রী কহিল, তাতে কোন দোষ নেই। আপনি বাড়ি চলুন, পথে যেতে যেতে আপনার উত্তর দেব, বলিয়া হতভাগিনীর হাত ধরিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

দুই-একটা কথা কহিয়াই সাবিত্রী বুঝিল, স্ত্রীলোকটি উন্মাদ নয়, কিন্তু কোন দিকে মন দিবার মতও তাহার মনের অবস্থা নয়, কথার মাঝখানেই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ভগবানকে দিনরাত জানাচ্চি, তাঁর পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেচি, তাই তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও। আচ্ছা ভাই, এ কি হতে পারে? উপোস করে দিনরাত ডাকলে কি সত্যি সত্যিই তাঁর দয়া হয়? তুমি জানো? বলিয়া সে তীব্রদৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল।

সাবিত্রী কি যে জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, পরক্ষণেই সে সাবিত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, যাই আমি গঙ্গাস্নান করে আসি। গঙ্গাস্নানে অনেক পাপ কেটে যায়—না? বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়াই যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

পঁয়তাল্লিশ

সাবিত্রীর দুই চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আজ তাহারই ক্রোড়ের উপর উপেন্দ্র মৃত্যুশয্যা বিছাইয়াছে। শীর্ণশীতল পা-দুখানির উপর মুখ গুঁজিয়া দিবাকর নিঃশব্দ-রোদনে অন্তরের অসহ্য দুঃখ নিবেদন করিয়া দিতেছে। তাহার পরিতাপ, তাহার ব্যথা, অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে! ও ঘরে মহেশ্বরী ভূমিশয্যায় পড়িয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিতেছেন। এই সর্বগ্রাসী শোকের মধ্যে শুধু একা সতীশই একা স্থির হইয়া পাশে বসিয়া আছে।

আজ সকাল হইতে উপেন্দ্রর মুখ দিয়া রহিয়া রহিয়া যে রক্তধারা পড়িতেছে, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা রোধ করা গেল না। নিশ্বাস ক্রমশঃই ভারী এবং কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া উপেন্দ্র নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দে পড়িয়া ছিলেন এবং চক্ষু মেলিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুটে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত কত দিদি, এ কি ফুরোবে না?

সাবিত্রী আঁচল দিয়া তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তের রক্ত-রেখা মুছিয়া লইয়া হেঁট হইয়া কহিল, আর বেশী বাকী নেই দাদা! এখন কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

উপেন্দ্র বলিল, না দিদি, সকলের যা হয় তাই হচ্চে, বেশী হবে কেন?

একটু স্থির থাকিয়া তেমনিভাবে বলিলেন, সতীশ, বৌঠানকে কি খুঁজে পাওয়া গেল না?

আজ চার দিন হইতে কিরণময়ী সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। কলিকাতায় পৌঁছিবার দিনই সতীশ কাছাকাছি বাসা ভাড়া করিয়া, দাসী নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত আবশ্যকীয় আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উপেন্দ্রর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সে দুই-তিন দিন নিজে যাইয়া খোঁজ লইতে পারে নাই। তিন দিন পরে গিয়া

দেখিল কোন জিনিস সে স্পর্শ করে নাই। নূতন হাঁড়িটা কিনিয়া যেখানে রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিল সেটা সেইখানে সেই অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। চুলার গায়ে একবিন্দু কালির দাগ পর্যন্ত নাই।

ঝি আসিয়া বলিল, কাজ কার করব বাবু? বৌমা সেই যে এসে জানলার গরাদে ধরে রাস্তার পানে চেয়ে বসল, আর উঠল না, চান করলে না, মুখে জল দিলে না—পাতা-বিছানা পড়ে রইল, উঠে এসে একবার শুলে না। তার পরে কাল সকাল থেকে ত আর দেখচি নে। জিনিসপত্তর কি করবে বাবু কর, আমি খালি ঘরে পাহারা দিয়ে থাকতে পারব না।

খরব শুনিয়া সতীশ মাথায় হাত দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ঝির হাতে আরও পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি লোক দিয়া অনুসন্ধানের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু ফল হয় নাই।

সমস্ত কথাই উপেন্দ্রর কানে গিয়াছিল।

সাবিত্রীর অত্যন্ত ব্যথার সহিত মাঝে মাঝে মনে হইত, সেদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে যাহাকে দেখিয়াছিল, সে-ই কিরণময়ী নয় ত? কিন্তু কিরণময়ী যে অসামান্য সুন্দরী! সে পাগলীটার মধ্যে রূপ থাকিলেও তাহাকে সুন্দরী বলা ত যায় না!

কিন্তু সে কেন গেল, কোথায় গেল, কি জন্যে গেল?

উপেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তরে সতীশ শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

আর তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না, এবং পরক্ষণেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এইভাবে বাকী রাত্রিটুকুর অবসান হইল।

বেলা দশটার পর আবার একবার চোখ মেলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও কে, সরোজিনী?

সরোজিনী মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া শয্যার উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উপেন্দ্র আস্তে আস্তে ডান হাতটি তুলিয়া তাহার মাথার উপর রাখিয়া

বলিলেন, এসেচ দিদি? তোমাকেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না—আজ না এলে হয়ত আর দেখাই হতো না, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, আজ আর সব কথা স্মরণ করিবার তাঁহার শক্তি নাই। হঠাৎ যেন মনে পড়ায় ডাকিলেন, সতীশ কৈ রে?

ও-ধারের জানালা ধরিয়া সতীশ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র বলিলেন, তোদের বিয়েটা আমার চোখে দেখে যাবার সময় হলো না সতীশ, কিন্তু এই লক্ষ্মী বোনটিকে আমার তুই কোনদিন দুঃখ দিসনে। তোর ডান হাতটা একবার দে ত রে, আয়, আমিই তোদের প্রথম পুরুতের কাজ করে যাই। বলিয়া নিজের কঙ্কালসার হাতখানি উপরের দিকে তুলিলেন। সাবিত্রীর আনত মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য সতীশের বুকের ভিতরটায় ধক করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রর কম্পিত হাতখানি নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের মধ্যে ধরিয়া ফেলিল।

উপেন্দ্র মনে মনে জগৎতারিণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, সতীশ, তুই সরোজিনীর মাকে ত জানিস। তাঁর কাছে আমি জোর করে কথা দিয়েছিলুম যে, আমার সতীশ ভাইটিকে তোমাকেই দেব। দেখিস রে, আমার মরণের পরে কেউ যেন না বলতে পারে আমার কথা তুই রাখিস নি।

সতীশ চোখের জল আর সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া কহিলেন, না উপীনদা, এ কথা কেউ বলবে না তোমার কথা আমি অবজ্ঞা করেছি কিন্তু তবু ত গোপন করা চলে না—আমার সকল কথাই ত খুলে বলা দরকার। আমি ভাল নই, বহু দোষ, বহু অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন। বরঞ্চ আমাকে তুমি এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোন লোভে, কোন দুর্বলতায় তাকে না অস্বীকার করি, যে আমাকে ভালবাসতে

শিখিয়েছে; বলিয়া সে সাবিত্রীর মুখের প্রতি মুখ তুলিতেই দুজনের চারি চক্ষের দেখা হইয়া গেল। কিন্তু তখনই উভয়ে দৃষ্টি আনত করিল।

উপেন্দ্র হাসিলেন, বলিলেন, আজও কি সে কথা আমার জানতে বাকী আছে সতীশ? আমি সব জানি। সমস্ত জেনেই তোদের আমি এক করে দিয়ে গেলুম।

সতীশ বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুখী হতে পারবেন?

জবাব দিতে গিয়া উপেন্দ্র সাবিত্রীর মুখের পানে একবার চাহিবামাত্রই সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, সে ভার আমি নিলুম দাদা,—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

উপেন্দ্র কথা কহিলেন না, শুধু নির্নিমেষ-চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্যে নয়, সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।

শুনিয়া পাষাণ-মূর্তির মত সাবিত্রী নতনেত্রে বসিয়া রহিল। আজ সতীশ আর একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমাত্র অধিকার রহিল না। তাহার ভাবনার, তাহার বাসনার, তাহার পরম সুখের, চরম দুঃখের, তাহার সুদুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাঁহার অন্তরের দুর্জয় অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করেন,

ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার অবনত মুখের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি সমস্তই টের পাচ্ছি বোন, কিন্তু বইতে না পারলে কি এ ভার তোকে দিয়ে যেতাম রে?

প্রত্যুত্তরে সাবিত্রী শুধু তাঁহার কপালের চুলগুলি নাড়িয়া দিল।

অকস্মাৎ সতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল, অ্যাঁ, এ যে বৌদি?

সাবিত্রী চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, এ সেই গঙ্গার ঘাটের পাগলী। পা টিপিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিতেছে। চক্ষের পলকে ঘরটা একেবারে চকিত হইয়া উঠিল।

কিরণময়ীর সুদীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি মুখে, কপালে, পিঠের উপর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পরনের বস্ত্র ছিন্ন মলিন, চোখে শূন্য তীব্র চাহনি—এ যেন কোন উন্মাদ শোকমূর্তি ধরিয়া সহসা ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সতীশের পানে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, খুঁজে আর পাইনে ঠাকুরপো। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি, কেউ কি ছাই বলে দিতে পারলে না বাড়িটা কোথায়। আজ কালীবাড়ি থেকে আসছিলুম, ভাগ্যে বেহারীর সঙ্গে পথে দেখা হলো—তাই তার পেছনে পেছনে আসতে পারলুম।

উপেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেমন আছ ঠাকুরপো? উপেন্দ্র হাত নাড়িয়া জানাইল—ভাল নয়।

কিরণময়ী অত্যন্ত বেদনার সহিত কহিল, মরে যাই! সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল, ভগবান আছেন! তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হতো! সহসা তাহার চক্ষু দিবাকরের পাণ্ডুর মুখের উপর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আহা! তুমি কেন অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ, ঠাকুরপো, তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে? বলিয়াই উপেন্দ্রর

প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ওকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে, সে সত্য একদিনের জন্যে ভাঙ্গিনি—ওকে প্রাণপণে রক্ষে করে এসেচি। কিন্তু আর আমার সময় নেই—এবার ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও।

হঠাৎ শান্ত হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে? হয়ত ভাল হয়ে যাবে। শুনেচি এমন কত লোকে ভাল হয়ে গেছে।

একদিন যে রমণীর রূপেরও সীমা ছিল না, বিদ্যা-বুদ্ধিরও অবধি ছিল না, এ সেই কিরণময়ী, আজ সে কি বলিতেছে, সে নিজেই জানে না।

সতীশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঃ—করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং এতদিনের পর উপেন্দ্রর চোখ দিয়া কিরণময়ীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হেঁট হইয়া আঁচল দিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, আহা কেঁদো না ঠাকুরপো, ভাল হয়ে যাবে।

এইবার সাবিত্রীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, সেদিন তোমার সঙ্গেই গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল না গা? একটু সর না ভাই, তোমার মত আমিও একটু ঠাকুরপোকে কোলে নিয়ে বসি!

সরোজিনী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আমাকে চিনতে পার বৌদি?

কিরণময়ী অত্যন্ত সহজ গলায় বলিল, পারি বৈ কি। তুমি ত সরোজিনী।

সরোজিনী কহিল, চল বৌদি, আমরা ও-ঘরে গিয়ে একটু গল্প করি গে,—বলিয়া একরকম জোর করিয়াই পাশের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

তাহারা গৃহের বাহির হইতে না হতেই উপেন্দ্রর সংজ্ঞা লোপ হইল, বোধ করি পরিশ্রম ও উত্তেজনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। সাবিত্রী তেমনি কোলে করিয়াই বসিয়া রহিল, আর সে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিবার জন্য উঠিল না।

সমস্ত দুপুরবেলাটা অজ্ঞান অবস্থায় কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর জ্বর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

চোখ মেলিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, সাবিত্রী। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বসে আছিস বোন? তোকে ছেড়ে যেতেই আমার চোখে জল আসে সাবিত্রী।

সাবিত্রী কাঁদিয়া কহিল, আমাকেও তুমি সঙ্গে নাও দাদা।

উপেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া সতীশকে বলিলেন, বৌঠান কোথায় রে?

সতীশ বলিল, নীচের ঘরে ঘুমুচ্চেন, তাঁকে আমি চোখে চোখেই রেখেছি।

চোখে চোখেই রাখিস ভাই, যতদিন না আবার প্রকৃতিস্থ হন। কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অন্তরের আঘাত যে কত দুঃসহ, সে উপলব্ধি করার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত নিদারুণ হোক, অতবড় বুদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

সতীশ বলিল, সে আমি জানি উপীনদা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তোমার দিবাকরের ভারও আমি নিলাম যদি বিশ্বাস করে দিয়ে যাও।

প্রত্যুত্তরে উপেন্দ্র শুধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেক কথা, অনেক উত্তেজনা জীবন-দীপের শেষ তৈলকণাটুকু পর্যন্ত পুড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। অল্পক্ষণেই দেখা গেল মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, নিঃশ্বাস আছে কিনা সন্দেহ।

ধরাধরি করিয়া সকলে নীচে নামাইয়া ফেলিল—উপেন্দ্রর নিষ্পাপ বিরহ-জর্জর প্রাণ তাঁহার সুরবালার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।তখন সকলের বিদীর্ণ কণ্ঠের গগনভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বাড়িটা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু নীচের ঘরে কিরণময়ী নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেই লাগিল।

দত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেকালে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টারবাবু বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দেশ করিতেন, তাহারা তিনখানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত। তিনজনের কি ভালবাসাই ছিল! এমন দিন ছিল না, যেদিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে ন্যাড়া বটতলায় একত্র না হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত! তিন জনেরই বাড়ি ছিল হুগলির পশ্চিমে। জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘ্ড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমালী ও রাসবিহারী আসিত দুইখানি পাশাপাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে। জগদীশ যেমন ছিল সবচেয়ে মেধাবী, তাহার অবস্থাও ছিল সবচেয়ে মন্দ। পিতা একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। যজমানি করিয়া বিয়া-পৈতা দিয়াই সংসার চালাইতেন। বনমালীরা সঙ্গতিপন্ন জমিদার। তাহার পিতাকে লোকে বিত্তশালী ব্যক্তি বলিয়াই জানিত, অথচ পল্লীগ্রামের সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। রাসবিহারীদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল। জমিজমা চাষবাস পুকুর-বাগান,—পাড়াগাঁয়ে যাহা থাকিলে সংসার চলিয়া যায়—সবই ছিল। এ সকল থাকা সত্ত্বেও যে ছেলেরা কোন শহরে বাসা ভাড়া না করিয়া—ঝড় নাই, জল নাই, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় পাতিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত, তাহার কারণ, তখনকার দিনে কোন পিতামাতাই ছেলেদের এই ক্লেশ-স্বীকার করাটাকে ক্লেশ বলিয়াই ভাবিতে পারিতেন না; বরঞ্চ মনে করিতেন, এতটুকু দুঃখ না করিলে সরস্বতী ধরা দিবেন না। তা কারণ যাই হোক; এমনি করিয়াই ছেলে তিনটি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। বটতলায় বসিয়া ন্যাড়া বটকে সাক্ষী করিয়া তিন বন্ধুতে প্রতিদিন এই প্রতিজ্ঞা করিত, জীবনে কখনও তাহারা পৃথক হইবে না, কখনও বিবাহ করিবে না, এবং উকিল হইয়া তিনজনেই একটা বাড়িতে থাকিবে; টাকা রোজগার

করিয়া সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে জমা করিবে, এবং তাই দিয়া দেশের কাজ করিবে।

এই ত গেল ছেলেবেলার কল্পনা। কিন্তু যেটা কল্পনা নয়, সত্য, সেটা অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। বন্ধুত্বের প্রথম পাক্‌টা এলাইয়া গেল বি. এ. ক্লাসে। কলিকাতায় কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বক্তৃতার বড় জোর। সে জোর পাড়াগাঁয়ের ছেলে-তিনটি হঠাৎ সামলাইতে পারিল না—ভাসিয়া গেল! গেল বটে, কিন্তু বনমালী এবং রাসবিহারী যেরূপ প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইল, জগদীশ সেরূপ পারিল না—ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে সর্বাপেক্ষা মেধাবী বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। তাহাতে তাহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ও দুটির সে বালাই ছিল না। কিছুকাল পূর্বে পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে বনমালী তখন কৃষ্ণপুরের জমিদার, এবং রাসবিহারী তাহাদের রাধাপুরের সমস্ত বিষয়-আশয়ের একচ্ছত্র সম্রাট।

অতএব অনতিকাল পরেই এই দুই বন্ধু ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিদুষী ভার্যা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের সে সুবিধা হইল না। তাহাকে যথাসময়ে আইন পাশ করিতে হইল, এবং এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের এগারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনের নিমিত্ত এলাহাবাদে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের যে কাজ কলিকাতায় নিতান্ত সহজ মনে হইয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া তাহাই একান্ত কঠিন ঠেকিল। বৌ-মানুষ শ্বশুরবাড়ি আসিয়া ঘোমটা দেয় না, জুতামোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়—তামাশা দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল; এবং গ্রাম জুড়িয়া এমনি একটা কদর্য হৈ হৈ শুরু হইয়া গেল যে, একান্ত নিরুপায় না হইলে আর কেহ স্ত্রী লইয়া সেখানে বাস করিতে পারে না। বনমালীর উপায় ছিল, সুতরাং সে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল; এবং একমাত্র জমিদারির উপর

নির্ভর না করিয়া ব্যবসা শুরু করিয়া দিল। কিন্তু রাসবিহারীর অল্প আয়। কাজেই সে নিজের পিঠের উপর একটা এবং বিদুষী ভার্যার পিঠের উপর একটা কুলা চাপা দিয়া কোনমতে তাহার দেশের বাটীতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল। অতএব এই তিন বন্ধুর একজন এলাহাবাদে, একজন রাধাপুরে এবং আর একজন কলিকাতায় বাসা করায়, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া, এক বাড়িতে বাস করিয়া, এক সিন্দুকে টাকা জমা করিয়া দেশ উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাটা আপাততঃ স্থগিত রহিল; এবং যে ন্যাড়া বটবৃক্ষ সাক্ষ্য ছিলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া নীরবে মনে মনে বোধ করি হাসিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক দিন গেল। ইতিমধ্যে তিন বন্ধুর কদাচিৎ কখনও দেখা হইত বটে, কিন্তু ছেলেবেলার প্রণয়টা একেবারে তিরোহিত হইল না। জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ দিয়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, 'তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া, ছেলেবেলায় যে পাপ করিয়াছি, তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার দয়াতেই আমি উকিল হইয়া সুখে আছি, এ-কথা কোন দিন ভুলি নাই।

বনমালী তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'বেশ। তোমার ছেলের দীর্ঘজীবন কামনা করি। কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার কোন আশাই নাই। তবে, যদি কোন দিন মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব। চিঠি লিখিয়া বনমালী মনে মনে হাসিল। কারণ বছর-দুই পূর্বে তাহার অপর বন্ধু রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়া ছিল। বাণিজ্যের কৃপায় সে এখন মস্ত ধনী। সবাই তাহার মেয়েকে ঘরে আনিতে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'মাস-ছ'মাসের কথা নয়, পঁচিশ বৎসরের কাহিনী বলিতেছি। বনমালী প্রাচীন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এইবার শয্যা আশ্রয় করিয়া টের পাইয়াছিলেন, আর বোধ হয় উঠিতে হইবে না। তিনি চিরদিনই ভগবৎপরায়ণ ও ধর্মভীরু। মরণে তাঁহার ভয় ছিল না, শুধু একমাত্র সন্তান বিজয়ার বিবাহ দিয়া যাইবার অবকাশ ঘটিল না মনে করিয়াই কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। সেদিন অপরাহ্নকালে হঠাৎ বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়াছিলেন, মা, আমার ছেলে নেই বলে আমি এতটুকু দুঃখ করিনে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু তোর এইটুকু মাথার উপর আমার এত বড় বিষয়টা রেখে যেতেও আমার একবিন্দু ভয় হয় না। তোর মা নেই, ভাই নেই, একটা খুড়ো-জ্যাঠা পর্যন্ত নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আমার সমস্ত বজায় থাকবে। শুধু একটা অনুরোধ করে যাই মা, জগদীশ যাই করুক, আর যাই হোক, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তাকে ভালবাসি—এই কথাটা ভুলিস নে মা। তার একটি ছেলে আছে—তাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি সে বড় সৎ ছেলে। বাপের দোষে সে যেন না দণ্ড ভোগ করে, এই আমার অনুরোধ।

বিজয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিল, বাবা, তোমার আদেশ আমি কোন দিন অমান্য করব না। জগদীশবাবু যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে তোমার মতই মান্য করব; কিন্তু তাঁর অবর্তমানে, সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনো চোখে দেখনি, আমিও দেখিনি। আর যদি সত্যিই তিনি লেখাপড়া শিখে থাকেন, অনায়াসেই ত পিতৃ-ঋণ শোধ করতে পারবেন।

বনমালী মেয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিয়াছিলেন, ঋণ ত কম নয় মা! ছেলেমানুষ, এ যদি না শুধতে পারে?

মেয়ে জবাব দিয়াছিল, যে না পারে, সে কুসন্তান বাবা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

বনমালী তাঁহার এই সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করেন নাই; শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত কাজকর্মে ভগবানকে মাথার উপর রেখে যা কর্তব্য, তাই করো মা। তোমাকে বিশেষ কোন আদেশ দিয়ে আমি আবদ্ধ করে যেতে চাইনে। বলিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিয়াছিলেন, জানিস মা বিজয়া, এই জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই সে তোকে তার এই ছেলেটির নাম কোরে চেয়ে নিয়েছিল। আমিও মা, কথা দিয়েছিলাম; বলিয়া তিনি যেন উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার এই কন্যাটি শিশুকালেই মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া তিনিই তাহার পিতামাতা উভয়ের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বিজয়া পিতার কাছে মায়ের আবদার করিতেও কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই; কহিয়াছিল, বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাওনি।

কেন মা?

তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতেও চাইতে না?

বনমালী বলিয়াছিলেন, রাসবিহারীর কাছে যখন শুনেছিলাম, ছেলেটি নাকি তার মায়ের মতই দুর্বল—এমন কি, ডাক্তারেরা তার দীর্ঘজীবনের কোন আশাই করেন না, তখন তাকে কাছে পেয়েও একবার আনিয়ে দেখতে চাইনি। এই কলকাতা শহরেই কোন্ একটা বাসায় থেকে সে তখন বি. এ. পড়ত। তার পরে নিজের নানান অসুখে-বিসুখে সে কথা আর ভাবিনি। কিন্তু এখন দেখছি, সেটাই আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে মা। তবু, তোকে সত্য বলছি বিজয়া, সে-

সময় জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিয়াছিলেন, আজ জগদীশকে সবাই জানে—একটা অকর্মণ্য জুয়াড়ি, অপদার্থ মাতাল। কিন্তু এই জগদীশই একদিন আমাদের সকলের চেয়ে ভাল ছেলে ছিল। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বলছি না, মা, সে অনেকেরই থাকে; কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আমি কাউকে দেখিনি; এই ভালবাসাই তার কাল হয়েছে। তার অনেক দোষ আমি জানি, কিন্তু যখনি মনে পড়ে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হয়ে গেছে, তখন তোর মায়ের কথা স্মরণ করে আমি ত মা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারিনে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সতীলক্ষ্মী। তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, বাবা, শুধু এই আশীর্বাদই করে যাই, যেন ভগবানের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে। শুনেছি নাকি মায়ের এই শেষ আশীর্বাদটুকু নিষ্ফল হয়নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকী কি আছে মা?

বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, এইটাই কি সংসারে সব চেয়ে বড় পারা বাবা?

মরণ প্রতীক্ষায় বনমালীর দিন কাটিতেছিল, কন্যার প্রশ্নে তাঁহার শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, এইটিই সব চেয়ে বড় পারা মা! সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছু নেই বিজয়া। তুমি নিজে কোন দিন পারো আর না পারো, এ যে পারে, তার পায়ে যেন মাথা পাততে পারো—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্বাদ করে যাই।

পিতৃবক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সেদিন বিজয়ার মনে হইয়াছিল, কে যেন বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়া তাহার পিতার বুকের ভিতর হইতে তাহার নিজের বুকের গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত চাহিয়া দেখিতেছে। এই অভূতপূর্ব পরমাশ্চর্য অনুভূতি সেদিন ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ছিল। বনমালী কহিয়াছিলেন, ছেলেটির নাম নরেন। তার বাপের মুখে শুনেছি, সে ডাক্তার

হয়েছে—কিন্তু ডাক্তারি করে না। এখন যদি এ দেশে সে থাকতো, এই সময়ে একবার তাকে আনিয়ে চোখের দেখা দেখে নিতাম।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

বনমালী বলিয়াছিলেন, তার মামার কাছে—বর্মায়। জগদীশের এখন ত আর সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই, তবু তার মুখের দুই-একটা ভাসা ভাসা কথায় মনে হয়, যেন সে ছেলে তার মায়ের সমস্ত সদ্‌গুণই পেয়েছে। ভগবান করুন, যেখানে যেমন করেই থাক যেন বেঁচে থাকে।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া, বিলাসবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইয়া গেলে, বনমালী বলিয়াছিলেন, তবে তুমি নীচে যাও মা, আমি একটু বিশ্রাম করি।

বিজয়া পিতার শিয়রের বালিশগুলি গুছাইয়া দিয়া, পায়ের উপর শালখানি যথাস্থানে টানিয়া দিয়া, আলোটা চোখের উপর হইতে আড়াল করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পিতার জীর্ণ বক্ষ ভেদিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল। সেদিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।

বিলাসবিহারী রাসবিহারীর পুত্র। সে এই কলকাতা শহরে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ প্রথমে এফ. এ. এবং পরে বি. এ. পড়িতেছে। বনমালী সমাজ ত্যাগ করিয়া অবধি বড় একটা দেশে যাইতেন না। যদিচ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশেও জমিদারি অনেক বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সে-সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল।

সেই সূত্রেই বিলাসের এ বাটীতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়া কিছুদিন হইতে অন্য যে-কারণে পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাস-দুই হইল বনমালীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতার এত বড় বাড়িতে বিজয়া এখন একা। তাহার দেশের বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনা রাসবিহারীই করিতে লাগিলেন, এবং সেই সূত্রে তাহার একপ্রকার অভিভাবক হইয়াও বসিলেন। কিন্তু নিজে থাকেন গ্রামে, সেইজন্য পুত্র বিলাসবিহারীর উপরেই বিজয়ার সমস্ত খবরদারির ভার পড়িল। সে-ই তাহার প্রকৃত অভিভাবক হইয়া উঠিল।

তখন এই সময়টায়, প্রতি ব্রাহ্মপরিবারে 'সত্য', 'সুনীতি', 'সুরুচি' এই শব্দগুলা বেশ বড় করিয়াই শিখানো হইত। কারণ বিদেশে পড়িতে আসিয়া হিন্দু যুবকেরা যখন পিতামাতার বিরুদ্ধে, দেবদেবীর বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সমাজের বাঁধানো খাতায় নাম লিখাইয়া বসিত, তখন এই শব্দগুলাই চাড়া দিয়া তাহাদের কাঁচা মাথা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া রাখিত—ঝুঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে দিতো না। তাহারা কহিত, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করিবে। মায়ের অশ্রুজলই বল, আর বাপের দীর্ঘনিশ্বাসই বল, কিছুই দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ও-সব দুর্বলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে, নচেৎ আলোকের সন্ধান পাইবে না। কথাগুলা বিজয়াও শিখিয়াছিল।

আজ গ্রাম হইতে বিলাসবাবু বৃদ্ধ মাতাল জগদীশের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। বিজয়ার সে পিতৃবন্ধু বটে, কিন্তু বিলাসবাবু যখনই বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া জগদীশ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, তখন ব্রাহ্মধর্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া এই দুর্ভাগা পিতৃসখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। বিলাস বলিতে লাগিল, জগদীশ মুখুয্যে আমার বাবারও ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন;

কিন্তু তিনি তার মুখ পর্যন্ত দেখতেন না। টাকা ধার করতে দু’বার এসেছিল, বাবা চাকর দিয়ে তাকে ফটকের বার করে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা বলেন, এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করা হয়।

বিজয়া সায় দিয়া কহিল, অতি সত্য কথা।

বিলাস উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, বন্ধুই হোক, আর যেই হোক, দুর্বলতা-বশে কোনমতেই ব্রাহ্মসমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃঋণ শোধ করতে পারে ভাল, না পারে, আইনমত আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ছেড়ে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই। কারণ এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য করতে পারি। সমাজের কোন ছেলেকে বিলাত পর্যন্ত পাঠাতে পারি; ধর্ম-প্রচারে ব্যয় করতে পারি; কত কি করতে পারি। কেন তা না করব বলুন?

তা ছাড়া জগদীশবাবু কিংবা তাঁর ছেলে আমাদের সমাজভুক্ত নয় যে, তাকে দয়া করা আবশ্যক। আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সমস্ত ঠিক করে ফেলবেন বলে আজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিজয়া মৃত পিতার শেষ কথাগুলা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিলাস সজোরে প্রবলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, না, আপনাকে ইতস্তত করতে আমি কোন মতেই দেব না। দ্বিধা, দুর্বলতা—পাপ! শুধু পাপ নয়, মহাপাপ! আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তার বাড়িটায় আপনার নাম করে—যা কোথাও নেই, কোথাও হয়নি—আমি তাই করব। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেশের হতভাগ্য মূর্খ লোকগুলোকে ধর্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের মূর্খতার জ্বালাতেই বিরক্ত হয়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কি

না। তাঁর কন্যা হয়ে কি আপনার উচিত নয়—এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা! বলুন, আপনি এ কথার উত্তর দিন।

বিজয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিলাস দৃপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত বড় নাম, কত বড় সাড়া পড়ে যাবে, ভেবে দেখুন দেখি? হিন্দুদের স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার উপর—যে, ব্রাহ্মসমাজে মানুষ আছে; হৃদয় আছে, স্বার্থত্যাগ আছে; যাঁকে তারা নির্যাতন করে দেশ থেকে বিদায় করে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদেরই মঙ্গলের জন্য এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা কি বিরাট মর‍্যাল এফেক্ট হবে, বলুন দেখি। বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল। শুনিতে শুনিতে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক, এত-বড় নামের লোভ সংবরণ করা আঠারো বছরের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি, পিতার কথাগুলি স্মরণ করিয়া সে দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর ছেলের নাম শুনেচি নরেন্দ্র। এখন সে কোথায় আছে, জানেন?

জানি। হতভাগ্য পিতার মৃত্যুর পরে সে বাড়ি এসে এখন দেশেই আছে।

আপনার সঙ্গে বোধ হয় আলাপ আছে?

আলাপ? ছিঃ! আপনি আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি! বলিয়া বিজয়াকে একেবারে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিলাসবাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ত ভাবতেই পারিনে যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আলাপ করছি। তবে, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ একটা পাগলের মত নূতন লোক দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। শুনলাম, সেই নরেন মুখুয্যে।

বিজয়া কৌতূহলী হইয়া কহিল, পাগলের মত? শুনেছি নাকি ডাক্তার?

বিলাসবাবু ঘৃণায় সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ঠিক পাগলের মত। ডাক্তার? আমি বিশ্বাস করিনে। মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা তেমনি রোগা।

বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ করি দূর থেকে গোনা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই। ছোঃ—

বস্তুতঃ চেহারা লইয়া গর্ব করিবার অধিকার বিলাসের ছিল। কারণ সে বেঁটে, মোটা এবং ভারি জোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দেশ করা যাইত না। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়িটা যদি আমরা সত্যই দখল করে নিই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠবে না?

বিলাস জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, একেবারে না। আপনি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে এমন একজনও পাবেন না, যার ঐ মাতালটার উপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল। আহা বলে, এমন লোক ও-অঞ্চলে নেই। একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু তাও যদি না হত আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে আনাও উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আপনার একবার দেশে যাওয়া কর্তব্য।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আমরা কখনই ত সেখানে যাইনে।

বিলাস জোর দিয়া বলিল, সেইজন্যেই ত বলি, আপনার যাওয়া চাই ই! প্রজাদের একবার তাদের মহারানীকে দেখতে দিন। আমার ত নিশ্চয়ই মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা অপরাধ।

লজ্জায় বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে আনত মুখে কি-একটা বলিবার উপক্রম করিতেই, বিলাস বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ইতস্ততঃ করবার এতে কিচ্ছু নেই। একবার ভেবে দেখুন দিকি, কত কাজ সেখানে আপনার করবার আছে! এ-কথা আজ আপনার মুখের ওপরেই আমি বলতে পারি, যে আপনার বাবা সমস্ত দেশের মালিক হয়েও যে কতকগুলো ক্ষেপা কুকুরের ভয়ে আর কখনো গ্রামে ফিরে গেলেন না, সে কি ভাল কাজ করেছিলেন? এই কি

আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ? এ যে কোন সমাজেরই আদর্শ নয়, তাতে আর ভুল কি!

বিজয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়ি ত বাস করবার উপযুক্ত নয়।

বিলাস বলিল, আপনি হুকুম দিন, একবার বলুন সেখানে যাবেন—আমি দশ দিনের মধ্যে তাকে বাসের উপযুক্ত করে দেব। আমার উপর নির্ভর করুন, যাতে সে বাড়ি আপনার মর্যাদা সম্পূর্ণ বহন করতে পারে, আমি প্রাণপণে তার বন্দোবস্ত করে দেব। দেখুন, একটা কথা আমার বহুদিন থেকে বার বার মনে হয়—আপনাকে শুধু সামনে রেখে আমি কি যে করে তুলতে পারি, তার বোধ করি সীমা-পরিসীমা নেই।

বিজয়াকে সম্মত করাইয়া বিলাস প্রস্থান করিলে, সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহা তাহার দেশ, সেখানে সে জন্মাবধি কখনও যায় নাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে পিতার মুখে তাহার কত বর্ণনাই না শুনিয়াছে ! দেশের গল্প করিতে তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ ধরিত না। কিন্তু তখন সে-সকল কাহিনী তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না; যেমন শুনিত, তেমনি ভুলিত।

কিন্তু আজ কোথা হইতে অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিস্মৃত বিবরণ একেবারে আকার ধরিয়া তাহার চোখের উপর দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের বাড়ি কলিকাতার এই অট্টালিকার মত বৃহৎ ও জমকালো নয় বটে, কিন্তু সেই ত তাহার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা! সেখানে পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, তাঁদেরও বাপ-মা, এমন কত পুরুষের সুখে-দুঃখে উৎসবে-ব্যসনে যদি দিন কাটিয়া থাকে, তবে তাহারই বা কাটিবে না কেন?

গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া পিতার সঙ্গে তাহার কত দিন কত কথা হইয়া গেছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই ইজিচেয়ারটার উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া, আমার দেশের বাড়িতে কখনও এ দুঃখ পাইনি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা-ছাদই আমার শেষ সূর্যাস্তটুকুকে এমন করে কোনদিন আড়াল ক'রে দাঁড়ায় নি। তুই ত জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ-দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুলবাগানের ধারের ছোট্ট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টলটল করে উঠেছে; আর তার পরপারে বাঁশবনের আড়াল থেকে সূয্যিঠাকুর এখনো যাই-যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি। ঐ ত মা, গলির মোড়ে দেখতে পাচ্ছিস, দিনের কাজ শেষ করে ঘরপানে মানুষের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু এই দশ-বারো হাত জমিটুকু ছেড়ে তাদের সঙ্গে যাবার ত আর একটুও পথ নেই। এমনি করে এই সন্ধ্যাবেলায় সেখানেও উলটো স্রোত ঘরপানে বয়ে যেতে দেখেছি; কিন্তু তার প্রত্যেক গরু-বাছুরটির গোয়ালঘরের পরিচয় পর্যন্ত জানতাম, মা। বলিয়া অকস্মাৎ একটা অতি গভীর শ্বাস হৃদয়ের ভিতর হইতে মোচন করিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। যে গ্রাম একদিন তিনি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এত সুখৈশ্বর্যের মধ্যেও যে তাহারই জন্য তাঁহার ভিতরটা কাঁদিতে থাকিত, ইহা যখন-তখন বিজয়া টের পাইত। তথাপি, একটা দিনের জন্যও সে ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখে নাই; কিন্তু আজ বিলাসবাবু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলে, পরলোকগত পিতৃদেবের কথাগুলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বেদনার হেতু অকস্মাৎ একমুহূর্তেই তাহার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার এই বিপুল জনারণ্যের মধ্যেও তিনি যে কিরূপ একাকী দিন যাপন করিয়া গেছেন, আজ তাহা সে চোখের উপর দেখিতে পাইয়া একেবারে ভয়

পাইয়া গেল; এবং আশ্চর্য এই যে, যে গ্রাম, যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই, তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বহুকাল-পরিত্যক্ত জমিদার-বাটী বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে অদৃষ্টপূর্ব বিচিত্র আসবাব-সকল গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া নিত্য আসিতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র কন্যা দেশে বাস করিতে আসিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শুধু কেবল কৃষ্ণপুরের নয়, রাধাপুর, বজ্রপুর, দিঘড়া প্রভৃতি আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গেল। এমনই ত ঘরের পাশে জমিদারের বাস চিরদিনই লোকের অপ্রিয়, তাহাতে জমিদারের না থাকাটাই প্রজাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার বাস করিবার বাসনাটা সকলের কাছেই একটা অন্যায় উৎপাতের মত প্রতিভাত হইল। ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না, আবার জমিদার-কন্যার প্রত্যাবর্তনের শুভ-উপলক্ষে সে যে কোন্ নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে, তাহা হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্বত্রই এক অশুভ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরলোকগত বৃদ্ধ জমিদার বনমালী যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও এই সুখটুকু ছিল যে, কোন গতিকে কলিকাতায় গিয়া একবার তাঁহার কাছে পড়িতে পারিলে, কাহাকেও নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে হইত না। কিন্তু জমিদার-কন্যার বয়স অল্প, মাথা গরম; রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতিও গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না। তিনি মেমসাহেব, ম্লেচ্ছ; সুতরাং অদূরভবিষ্যতে রাসবিহারীর দৌরাত্ম্য কল্পনা করিয়া কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না—পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরও না, পৈতাহীন শূদ্রেরও না। এমনি ভয়ে, ভাবনায় বর্ষাটা গেল। শরতের প্রারম্ভেই এক মধুর প্রভাতে মস্ত দুই ওয়েলার বাহিত খোলা ফিটনে চড়িয়া তরুণী জমিদার-কন্যা শত নরনারীর সভয় কৌতূহলদৃষ্টির

মাঝখান দিয়া হুগলী স্টেশন হইতে পিতৃ-পিতামহের পুরাতন আবাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

বাঙালীর মেয়ে—আঠারো-উনিশ-কুড়ি পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই—সে প্রকাশ্যে জুতামোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সঙ্গোপনে করিতে লাগিল, আবার জমিদারের নজর লইয়া একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া নানাপ্রকার আনন্দ ও মঙ্গল-কামনা জানাইয়াও যাইতে লাগিল। এমন করিয়া পাঁচ-ছয়দিন কাটিবার পরে, সেদিন সকালবেলা বিজয়া চা-পানের পর নীচের বসিবার ঘরে বিলাসবাবুর সহিত বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছিল, বেহারা আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চান।

বিজয়া কহিল, এইখানে নিয়ে এসো।

এই কয়দিন ক্রমাগতই তাহার ইতর-ভদ্র প্রজারা নজর লইয়া যখন-তখন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল; সুতরাং প্রথমে সে বিশেষ কিছু মনে করে নাই। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে ভদ্রলোকটি বেহারার পিছনে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই বিজয়া বিস্মিত হইল।

তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ, কিন্তু তদনুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ কৃশ। বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাইতেছে। সে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। ইতিপূর্বে যে-কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, শুধু যে নজরের টাকা হাতে লইয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাই নয়, তাহারা সভয়ে, কুণ্ঠার সহিত প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু, এ লোকটির আচরণে সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তাহার আগমনে শুধু যে বিজয়াই বিস্মিত হইয়াছিল, তাই নয়, বিলাসও কম আশ্চর্য হয় নাই। বিলাসের গ্রামান্তরে বাস হইলেও এ-দিকের সকল

ভদ্রলোককেই সে চিনিত; কিন্তু এই যুবকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটিই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীমশাই আপনার প্রতিবেশী, পাশের বাড়িটিই তাঁর। আমি শুনে অবাক হয়ে গেছি যে, তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালের দুর্গাপূজা নাকি আপনি এবার বন্ধ করে দিতে চান? এর মানে কি? বলিয়া সে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রশ্ন এবং তাহা জিজ্ঞাসা করার ধরনে বিজয়া আশ্চর্য এবং মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

তাহার উত্তর দিল বিলাস। সে রুক্ষস্বরে কহিল, আপনি কি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন নাকি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন, সেটা ভুলে যাবেন না।

আগন্তুক হাসিয়া একটুখানি জিভ কাটিয়া কহিল, সে আমি ভুলিনি, এবং ঝগড়া করতেও আসিনি। বরঞ্চ, কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি বলেই ভাল করে জেনে যেতে এসেছি।

বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিল, বিশ্বাস হয়নি কেন?

আগন্তুক কহিল, কেমন করে হবে বলুন দেখি? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করবেন—এ বিশ্বাস না হওয়াই ত স্বাভাবিক।

ধর্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক বিলাসের কাছে ছেলেবেলা হইতেই অতিশয় উপাদেয়। সে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হলেই যে কারও কাছে তার অর্থ থাকবে না, কিংবা আপনি ধর্ম বললেই সকলে তাকে শিরোধার্য করে মেনে নেবে, তার কোন হেতু নেই। পুতুলপূজো আমাদের কাছে ধর্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় বলে মনে করিনে।

আগন্তুক গভীর বিস্ময়ে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনিও কি তাই বলেন নাকি?

তাহার বিস্ময় বিজয়াকে যেন আঘাত করিল, কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া সে সহজ সুরেই জবাব দিল, আমার কাছে কি আপনি এর বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা করে এসেছিলেন?

বিলাস সগর্বে হাস্য করিয়া কহিল, বোধ হয়। কিন্তু, উনি ত বিদেশী লোক—খুব সম্ভব আপনাদের কিছুই জানেন না।

আগন্তুক ক্ষণকাল নীরবে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকেই কহিল, আমি বিদেশী না হলেও, এ গ্রামের লোক নয়—সে কথা ঠিক। তবুও এ আমি সত্যিই আপনার কাছে আশা করিনি। পুতুল-পূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হলেও, সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরানো ঝগড়া আমি এখানে তুলব না। আপনারা যে ব্রাহ্মসমাজের তা-ও আমি জানি। কিন্তু এ ত সে নয়। গ্রামের মধ্যে এই একটি পূজা। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। এই বলিয়া আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, গ্রাম আপনার, প্রজারা আপনার ছেলেমেয়ের মত; আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণে বেড়ে যাবে, এই আশাই ত সকলে করে। কিন্তু তা না হয়ে এতবড় দুঃখ, এতবড় নিরানন্দ বিনা অপরাধে আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন, এ বিশ্বাস করা কি সহজ? আমি ত বিশ্বাস করতে পারিনি।

বিজয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। দুঃখী প্রজাদের নামে তাহার কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু বিলাসবাবু বিজয়ার সেই নিঃশব্দ স্নেহার্দ্র-মুখের প্রতি চাহিয়া ভিতরে ভিতরে উষ্ণ এবং উদ্বিগ্ন হইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, আপনি অনেক কথা কইচেন। সাকার-নিরাকারের তর্ক আপনার সঙ্গে করব, এত অপর্যাপ্ত সময় আমাদের নেই। তা' সে চুলোয় যাক, আপনার মামা একটি কেন, একশ'টা পুতুল গড়িয়ে ঘরে বসে পুজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তিই নেই। শুধু

কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ করে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।

আগন্তুক একটুখানি হাসিয়া কহিল, অহোরাত্র ত বাজে না! তা' সকল উৎসবেই একটু হৈচৈ গণ্ডগোল হয়, বলিয়া বিজয়াকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া বলিল, অসুবিধে যদি কিছু হয়, না হয় হলই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার আপনি সইবেন না ত কে সইবে?

বিজয়া তেমনি নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল। বিলাস শ্লেষের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি ত কাজ আদায়ের ফন্দিতে ছেলেমেয়ের উপমা দিলেন, শুনতেও মন্দ লাগল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিজেই যদি মুসলমান হয়ে মামার কানের কাছে মহরম শুরু করে দিতেন, তাঁর সেটা ভাল বোধ হত কি? তা' সে যাই হোক, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের, বাবা যে হুকুম দিয়েছেন, তাই হবে। কলকাতা থেকে ওঁকে দেশে এনে, মিছামিছি একরাশ ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কানের মাথা খেয়ে ফেলতে আমরা দেব না—কিছুতেই না।

তাহার অভদ্র ব্যঙ্গ ও উষ্মার আতিশয্যে আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বিলাসের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার বাবা কে এবং তাঁর নিষেধ করবার কি অধিকার, আমার জানা নেই; কিন্তু আপনি যে মহরমের অদ্ভুত উপমা দিলেন, এটা হিন্দুর রোশনচৌকি না হয়ে সেই মুসলমানদের মহরমের কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য হলে কি করতেন শুনি? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয়!

বিলাস অকস্মাৎ চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া ভীষণকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হয়ে কথা কও বলে দিচ্চি, নইলে এখনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব তিনি কে এবং তাঁর কি অধিকার!

আগন্তুক আশ্চর্য হইয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র তাহার মুখে দেখা দিল না। দেখা দিল বিজয়ার মুখে। তাহার বাটীতে বসিয়া

তাহারই এক অপরিচিত অতিথির প্রতি এই একান্ত অশিষ্ট আচরণে ক্রোধে, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুহূর্তকালমাত্র বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বিজয়ার প্রতি চোখ ফিরাইয়া কহিল, আমার মামা বড়লোক নন, তাঁর পূজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটিই একমাত্র আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের আনন্দ-উৎসব। হয়ত আপনার কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি এটুকু আপনি সহ্য করে নিতে পারবেন না?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, না, পারবেন না, একশবার পারবেন না। কতকগুলো মূর্খ চাষার পাগলামি সহ্য করবার জন্যে কেউ জমিদারি করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি যাও—মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট কোরো না। বলিয়া সে হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল।

তাহার উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা তাহার মুখে প্রত্যুত্তর যোগাইল না। কিন্তু পিতার কাছে বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই—সে শান্ত, ধীরভাবে বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন বলেই এঁদের পূজো নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমি বলি, হলই বা তিন-চারদিন একটু গোলমাল—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাস তেমনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—সে অসহ্য গণ্ডগোল! আপনি জানেন না বলেই—

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, তা হোক গণ্ডগোল—তিন দিন বৈ ত নয়! আর আপনি আমার অসুবিধের ভাবনা ভাবচেন—কিন্তু কলকাতা হলে কি করতেন বলুন ত? সেখানে অষ্টপ্রহর কেউ কানের পাশে তোপ দাগতে থাকলেও ত চুপ করে সহ্য করতে হতো? বলিয়া আগন্তুক যুবকটির পানে চাহিয়া কহিল, আপনার

মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতিবার যেমন করেন, এবারেও তেমনি পূজো করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

আগন্তুক এবং বিলাসবাবু উভয়েই বিস্ময়ে অবাক হইয়া বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আপনি তবে এখন আসুন, বলিয়া বিজয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিও আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধন্যবাদ ও প্রতি-নমস্কার করিয়া এবং বিলাসকেও একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য ক্রুদ্ধ বিলাস আর একদিকে চক্ষু ফিরাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু দুজনের কেহই জানিতে পারিল না যে, এই অপরিচিত যুবকটিই তাহাদের সর্বপ্রধান আসামী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে চলিয়া গেলে, মিনিট-খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা চকিত হইয়া মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ না থাকিলে তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয়ত পরিসীমা থাকিত না। বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আমাদের কথাটা যে শেষ হতেই পেলে না। তা হলে তালুকটা নেওয়াই আপনার বাবার মত?

বিলাস জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল—সেইভাবেই কহিল, হুঁ।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর মধ্যে কোন রকম গোলমাল নেই ত?

বিলাস বলিল, না।

বিজয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, আজ কি তিনি ও-বেলায় এদিকে আসবেন?

বিলাস কহিল, বলতে পারিনে।

বিজয়া হাসিয়া কহিল, আপনি রাগ করলেন নাকি?

এবার বিলাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল, রাগ না করলেও পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।

কথাটা বিজয়াকে আঘাত করিল, তবু সে হাসিমুখেই কহিল, কিন্তু এতে তাঁর মানহানি হয়েছে—এ ভুল ধারণা আপনার কি করে জন্মাল? তিনি স্নেহবশে মনে করেছেন, আমার কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্ট হবে না এইটেই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের কথা ত কিছুই নেই বিলাসবাবু!

বিলাসের গাম্ভীর্যের মাত্রা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না; সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার এস্টেটের দায়িত্ব নিজে নিতে চান,

নিন, কিন্তু এর পরে বাবাকে আমায় সাবধান করে দিতেই হবে, নইলে পুত্রের কর্তব্যে ত্রুটি হবে।

এই অচিন্তনীয় রূঢ় প্রত্যুত্তরে বিজয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল; এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত কহিল, বিলাসবাবু, এই সামান্য বিষয়টাকে যে আপনি এমন করে নিয়ে এত গুরুতর করে তুলবেন, এ আমি মনেও করিনি। ভাল, আমার বোঝবার ভুলে যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে, আমি অপরাধ স্বীকার করছি, ভবিষ্যতে আর হবে না। এই বলিয়া বিজয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, ইহার পরে কাহারও কোন কথাই আর থাকিতে পারে না—দোষ-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না যে, দুষ্ট ব্রণের মত এমন মানুষও আছে, যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন মতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তাই বিলাস যখন প্রত্যুত্তরে কহিল, তা হলে পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জানিয়ে পাঠান যে রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন, তার অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়, তখন বিজয়ার দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটির হিংস্র প্রকৃতিটা একমুহূর্তেই একেবারে পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিল।

সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সেটা কি ঢের বেশী অন্যায় কাজ হবে না? আচ্ছা, আমি নিজেই নাহয় চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি নিচ্চি।

বিলাস বলিল, এখন অনুমতি নেওয়া-না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি তাঁকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে অশ্রদ্ধার পাত্র করে তুলতে চান, আমাকেও তা হলে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

বিজয়ার অন্তরটা অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংযম করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, এই কর্তব্যটা কি শুনি?

বিলাস বলিল, আপনার জমিদারি শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।

আপনার নিষেধ তিনি শুনবেন, আপনি মনে করেন?

অন্ততঃ সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অন্য দিকে চাহিয়া, তেমনি শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, বেশ, আপনি যা পারেন করবেন; কিন্তু অপরের ধর্ম-কর্মে আমি বাধা দিতে পারব না।

তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা সত্ত্বেও তাহার ভিতরের ক্রোধ গোপন রহিল না। বিলাস তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার বাবা কিন্তু এ কথা বলতে সাহস করতেন না।

বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল; কহিল, আমার বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি বিলাসবাবু। কিন্তু সে নিয়ে তর্ক করে কি হবে? আমার স্নানের বেলা হল, আমি উঠলুম। বলিয়া সে সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই ক্রোধোন্মত্ত বিলাসের মুখের উপর হইতে তাহার ধার-করা ভদ্রতার মুখোশ একমুহূর্তে খসিয়া পড়িল। সে নিজেও স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া, নিরতিশয় কটুকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম।

বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, পলকমাত্র এই বর্বরটার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাস শুষ্ক হইয়া উঠিল।

সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্যবশতঃই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে, ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্বলকে পীড়া দিতে, ভীতুকে আরও ভয় দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে—তা সে যাই থাক এবং হেতু যত

অসংলগ্নই হোক। কিন্তু বিজয়া যখন তিলার্ধ অবনত না হইয়া তাহাকেই তুচ্ছ করিয়া দিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন এই গায়ে-পড়া কলহের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তাহাকে তাহার নিজের কাছেও অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, মুখখানা কালি করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ি চলিয়া গেল।

অপরাহ্নকালে রাসবিহারী ছেলে সঙ্গে করিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। আমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেওয়ায় আমাকে ঢের বেশী অপ্রতিভ করা হয়েছে। তা যাক, বিষয় যখন তোমার, তখন এ কথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনে। কিন্তু বারংবার এ রকম ঘটলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমাকে তফাত হতেই হবে, তা জানিয়ে রাখছি।

বিজয়া কোন উত্তর দিল না; বরঞ্চ মৌনমুখে সে অপরাধটা একরকম স্বীকার করিয়াই লইল। রাসবিহারী তখন কোমল হইয়া বিষয়-সংক্রান্ত অন্যান্য কথাবার্তা তুলিলেন। নূতন তালুকটা খরিদ করিবার আলোচনা শেষ করিয়া বলিলেন, জগদীশের দরুন বাড়িটা যখন তুমি সমাজকেই দান করলে মা, তখন আর বিলম্ব না করে এই পূজার ছুটিটা শেষ হলেই তার দখল নিতে হবে—কি বল?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনি যা ভাল বুঝবেন,তাই হবে। টাকা পরিশোধ করবার মেয়াদ ত তাঁদের শেষ হয়ে গেছে!

রাসবিহারী কহিলেন, অনেক দিন। জগদীশ তার সমস্ত খুচরা ঋণ ত্রকত্র করবার জন্যে তোমার বাবার কাছে আট বছরের কড়ারে দশ হাজার টাকা কর্জ নিয়ে কবালা লিখে দেয়। শর্ত ছিল, এর মধ্যে শোধ দিতে পারে ভালই; না পারে, তার বাড়ি-বাগান-পুকুর—তার সমস্ত সম্পত্তিই আমাদের। তা আট বৎসর পার হয়ে এটা নয় বৎসর চলছে।

বিজয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, শুনতে পাই, তাঁর ছেলে এখানে আছেন; তাঁকে ডেকে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে দেখলে হয় না, যদি কোন উপায় করতে পারেন?

রাসবিহারী মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা পারবে না—পারবে না। পারলে—

পিতার কথাটা শেষ না হইতেই বিলাস হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনরূপে ধৈর্য ধরিয়া ছিল, আর পারিল না। কর্কশস্বরে বলিল, পারলেই বা আমরা দেব কেন? টাকা নেবার সময় সে মাতালটার হুঁশ ছিল না—কি শর্ত করছি? এ শোধ দেব কি কোরে?

বিজয়া বিলাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ করে গেছেন—

বিলাস পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিল, হাজার করে গেলেও সে যে একটা—

রাসবিহারী বাধা দিলেন,—তুমি চুপ কর না বিলাস।

বিলাস জবাব দিল, এ সব বাজে সেন্টিমেন্ট আমি কিছুতেই সইতে পারিনে—তা' সে কেউ রাগই করুক, আর যাই করুক। আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাইনে, সত্য কাজ করতে পেছিয়ে দাঁড়াই নে!

রাসবিহারী উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাসিবার মত মুখ করিয়া বার বার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, তা বটে, তা বটে। আমাদের বংশের এই স্বভাবটা আমারও গেল না কিনা! বুঝলে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্য-ধর্ম গ্রহণ করতে ভয় পাইনি।

বিজয়া কহিল, বাবা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে আদেশ করে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রতি যেন অত্যাচার না করি | বলিতে বলিতেই

তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। স্নেহময় পিতার অনুরোধ যে তাঁহার জীবিতকালে অসঙ্গত খেয়াল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে আজ তাহাই দুরতিক্রম্য আদেশের মত তাহাকে বাধা দিতেছিল |

বিলাস কহিল, তবে তিনিই কেন সমস্ত দেনাটা নিজে ছেড়ে দিয়ে গেলেন না শুনি?

বিজয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া, রাসবিহারীর মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিল, জগদীশবাবুর ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানানো হয়, এই আমার ইচ্ছে।

তিনি জবাব দিবার পূর্বেই বিলাস নির্লজ্জের মত আবার গর্জন করিল, সে যদি আরো দশ বৎসর সময় চায়? তাই দিতে হবে নাকি? তা হলে দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠার আশা সাগরের অতল-গর্ভে বিসর্জন দিতে হবে দেখছি!

বিজয়া ইহার উত্তর না দিয়া রাসবিহারীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা, জানতে পারবেন না কি ?

রাসবিহারী অতিশয় ধূর্ত লোক; তিনি ছেলের ঔদ্ধত্যের জন্য মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাহিরে তাহারই মতটাকে সমীচীন প্রমাণ করিতে একটুখানি ভূমিকাচ্ছলে ধীরভাবে কহিলেন, দেখ মা, তোমাদের মতান্তরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কওয়া উচিত নয় | কারণ, কিসে তোমাদের ভালো সে আজ নাহয় কাল তোমরাই স্থির করে নিতে পারবে, এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না; কিন্তু কথা যদি বলতে হয় মা, বলতেই হবে—এ ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্ছে। জমিদারি চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মানতে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, কার গরজ বেশি, তোমার না জগদীশের ছেলের? তার ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকতো, সে কি নিজে এসে একবার চেষ্টা করে দেখত না? সে ত জানে, তুমি এসেছ। এখন আমরাই

যদি উপযাচক হয়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সময় নেবে, কিন্তু তাতে ফল শুধু এই হবে যে, সে টাকাও দিতে পারবে না, তোমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও চিরদিনের জন্যে ডুবে যাবে। বেশ করে ভেবে দেখ দেখি মা, এই কি ঠিক নয়?

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী ক্ষণকাল পরে কহিলেন, বেশ ত, তার অগোচরে ত কিছুই হতে পারবে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায় তখন নাহয় বিবেচনা করেই দেখা যাবে। কি বল মা?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে মনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। রাসবিহারী আজ বিজয়াকে চিনিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিলেন, এ মেয়েটির বয়স কম কিন্তু সে যে তাহার পিতার বিষয়ের মালিক, ইহা সে জানে, এবং তাহাকে মুঠার ভিতরে আনিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং একটা কথা লইয়াই বেশী টানা-হেঁচড়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য-উপাসনার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া মুহূর্তকালমাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, আমার অনেকগুলো চিঠিপত্র লিখতে আছে—আপনার কি আমাকে কোন আবশ্যক আছে?

বিলাস রূঢ়ভাবে জবাব দিল, কিছু না। আপনি যেতে পারেন।

আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বোলব কি?

না, দরকার নেই।

আচ্ছা নমস্কার, বলিয়া বিজয়া দুই করতল একবার একত্র করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিঘ্‌ড়ায় স্বর্গীয় জগদীশবাবুর বাড়িটা সরস্বতীর পরপারে। ইহা গ্রামান্তরে হইলেও নদীতীরের কতকগুলি বাঁশঝাড়ের জন্যেই বনমালীবাবুর বাটীর ছাদ হইতে তাহা দেখা যাইত না। তখন শরৎকালের অবসানে সরস্বতীর জলধারা শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল, এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদিগের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ অপরাহ্ণবেলায় বিজয়া বৃদ্ধ দরোয়ান কানহাইয়া সিংকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ও-পারের বাবলা, বাঁশ, খেজুর প্রভৃতি গাছপালার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের আরক্ত-আভা মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে—অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে উভয় তীরের এটা-ওটা-সেটা দেখিতে দেখিতে বরাবর উত্তরমুখে চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে আসিয়া তাহার চোখে পড়িল—নদীর মধ্যে গোটা-কয়েক বাঁশ একত্র করিয়া পারাপারের জন্য একটা সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বিজয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিতে পাইল, অনতিদূরে বসিয়া একজন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মাছ ধরিতেছে। সাড়া পাইয়া লোকটি মুখ তুলিয়া নমস্কার করিল। ঠিক সেই সময়ে বিজয়ার মুখের উপর সূর্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কি না জানি না; কিন্তু চোখাচোখি হইবামাত্রই তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি একেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল। যে মাছ ধরিতেছিল, সে পূর্ণবাবুর সেই ভাগিনেয়টি, যে সেদিন মামার হইয়া তাহার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল। বিজয়া প্রতি-নমস্কার করিতেই সে কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, বিকেলবেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা মন্দ জায়গা নয় বটে, কিন্তু এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয়ও কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধানে করে দেয়নি?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না; এবং পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া ত লোক চিনে ধরে না! আমি ত বরং না জেনে এসেচি, আপনি যে জেনে-শুনে জলের ধারে বসে আছেন? কৈ দেখি, কি মাছ ধরলেন?

লোকটি হাসিয়া কহিল, পুঁটি মাছ। কিন্তু দু' ঘণ্টায় মাত্র দুটি পেয়েছি। মজুরি পোষায় নি। কিন্তু কি করি বলুন, আপনার মত আমিও প্রায় বিদেশী বললেই হয়। বাইরে বাইরে দিন কেটেছে, প্রায় কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ-পরিচয় নেই—কিন্তু বিকেলটা ত যা করে হোক কাটাতে হবে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, আমারও প্রায় সেই দশা। আপনাদের বাড়ি বুঝি পূর্ণবাবুর বাড়ির কাছেই?

লোকটি কহিল, না। হাত দিয়া নদীর ওপার দেখাইয়া বলিল, আমাদের বাড়ি ঐ দিঘ্‌ড়ায়। এই বাঁশের পুল দিয়ে যেতে হয়।

গ্রামের নাম শুনিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বোধ হয় জগদীশবাবুর ছেলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন?

লোকটি মাথা নাড়িবামাত্রই বিজয়া একান্ত কৌতূহলবশে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তিনি কি রকম লোক, আপনি বলতে পারেন?

কিন্তু, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের অভদ্র প্রশ্নে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা লোকটির দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া বলিল, তার বাড়ি ত আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন; এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আর ফল কি? কিন্তু যে সদুদ্দেশ্যে নিলেন সে -কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেছে।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, একেবারে নেওয়া হয়ে গেছে—এই বুঝি এদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

লোকটি বলিল, হবারই কথা। জগদীশবাবুর সর্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রিকবালায় বাঁধা ছিল। তাঁর ছেলের সাধ্য নেই, তত টাকা শোধ করেন—মিয়াদও শেষ হয়েছে—খবর সবাই জানে কিনা!

বাড়িটি কেমন?

মন্দ নয়, বেশ বড় বাড়ি। যে জন্যে নিচ্ছেন, তার পক্ষে ভালই হবে। চলুন না, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

চলিতে চলিতে বিজয়া কহিল, আপনি যখন গ্রামের লোক, তখন নিশ্চয় সমস্ত জানেন। আচ্ছা, শুনেছি নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল করেই ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন। কোন ভাল জায়গায় প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ কোরে আরও কিছুদিন সময় নিয়েও কি বাপের ঋণটা শোধ করতে পারেন না?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয়। শুনেছি, চীকিৎসা করাই নাকি তার সঙ্কল্প নয়।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে তাঁর সঙ্কল্পটাই বা কি শুনি? এত খরচ-পত্র করে বিলেতে গিয়ে কষ্ট করে ডাক্তারি শেখবার ফলটাই বা কি হতে পারে। লোকটি বোধ হয় একেবারেই অপদার্থ।

ভদ্রলোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, অসম্ভব নয়। তবে শুনেছি নাকি নরেনবাবু নিজে চিকিৎসা করে রোগ সারানোর চেয়ে, এমন কিছু একটা নাকি বার করে যেতে চান, যাতে ঢের ঢের বেশী লোকের উপকার হবে। শুনতে পাই, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রমও খুব করেন।

বিজয়া চকিত হইয়া কহিল, সে ত ঢের বড় কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ি-ঘরদোর গেলে কি করে এসব করবেন? তখন ত রোজগার করা চাই! আচ্ছা, আপনি ত নিশ্চয় বলতে পারবেন, বিলেত যাওয়ার জন্যে এখানকার লোকে তাঁকে ‘একঘরে’ করে রেখেছে কি না।

ভদ্রলোক কহিল, সে ত নিশ্চয়। আমার মামা পূর্ণবাবু তারও ত একপ্রকার আত্মীয়, তবুও পূজোর ক'দিন বাড়িতে ডাকতে সাহস করেন নি—কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না। নিজের কাজকর্ম নিয়ে আছেন, সময় পেলে ছবি আঁকেন—বাড়ি থেকে বারই হন না। ঐ তাঁর বাড়ি, বলিয়া আঙুল দিয়া গাছপালায় ঘেরা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

এই সময় বুড়া দরোয়ান পিছন হইতে ভাঙা-বাঙলায় জানাইল যে, অনেকদূর আসিয়া পড়া হইয়াছে, বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, কথায় কথায় অনেক পথ এসে পড়েছেন।

তাহাকেও সেই বাঁশের সেতু দিয়াই গ্রামে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং ফিরিবার মুখেও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, তা হলে তাঁর কোন আত্মীয়-কুটুম্বের ঘরেও আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন?

লোকটি কহিল, একেবারেই না।

বিজয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া কহিল, তিনি যে কারও কাছে যেতে চান না, সে কথা ঠিক। নইলে এই মাসের শেষেই ত তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আর কেউ হলে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গেও একবার দেখা করার চেষ্টা করতেন।

লোকটি কহিল, হয়ত তাঁর দরকার নেই—নয় ভাবেন, লাভ কি। আপনি ত আর সত্যিই তাঁকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারবেন না!

বিজয়া কহিল, না পারলেও, আর কিছুকাল থাকতে দিতেও ত পারা যায়! দেনার দায়ে হাজার হলেও ত একজনকে তার বাড়ি-ছাড়া করতে সকলেরই কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার কথাবার্তার ভাবে বোধ হয়, যেন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি নয়?

লোকটি শুধু হাসিল, কোন কথা কহিল না। পুলটির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ছোট ছিপটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, এই আমাদের গ্রামে ঢোকবার পথ। নমস্কার। বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সেই বংশ-নির্মিত পুলটির উপর দিয়া টলিতে টলিতে কোনমতে পার হইয়া সঙ্কীর্ণ বন্যপথের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুদিনের বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিং বিজয়াকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সে দরোয়ানীর ন্যায্য অধিকারকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বাবুটি কে মাইজী?

বিজয়া কিন্তু এতটাই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে, বুড়ার প্রশ্ন তাহার কানেই পৌঁছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত নীরব মাধুর্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল—লোকটি কে, এবং আবার কবে দেখা হইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসবিহারী বলিলেন, আমরাই নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরাই যদি তাকে রদ করতে যাই, আর পাঁচজন প্রজার কাছে সেটা কি-রকম দেখাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি মা।

বিজয়া কহিল, এই মর্মে একখানা চিঠি লিখে কেন তার কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আসতে সাহস করেন না।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, অপমান কিসের?

বিজয়া বলিল, তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন, তাঁর প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করব না।

রাসবিহারী বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, মহা মানী লোক দেখচি! তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের যেচে তাঁকে থাকতে দিতে হবে?

বিজয়া কাতর হইয়া কহিল, তাতেও দোষ নেই কাকাবাবু! অযাচিত দয়া করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

রাসবিহারী কহিলেন, ভাল, লজ্জা নাহয় নেই; কিন্তু আমরা যে সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেচি, তার কি হবে বল দেখি?

বিজয়া বলিল, তার অন্য কোন ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব।

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন, তুমি অন্য ব্যবস্থাও করতে পার সে আমি বুঝলুম; কিন্তু কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি মা, যাকে আজ পর্যন্ত কখনো চোখেও দেখনি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার অত ব্যথা কেন? ভগবানের করুণায় তোমার আরও পাঁচজন প্রজা

আছে, আরও দশজন খাতক আছে; তাদের সকলের জন্যেই কি এই ব্যবস্থা করতে পারবে, না, পারলেই তাতে মঙ্গল হবে—সে জবাব আমাকে দাও দেখি বিজয়া?

বিজয়া কহিল, আপনাকে ত বলেচি, এটা বাবার অনুরোধ। তা ছাড়া আমি শুনেচি—

কি শুনেচ?

বিদ্রূপের ভয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের কথাটা বিজয়া কহিল না, শুধু বলিল, আমি শুনেচি, তিনি 'একঘরে'। গৃহহীন করলে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়িতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা ছাড়া, 'গৃহহীন' কথাটা মনে করলেই আমার ভারি কষ্ট হয় কাকাবাবু।

রাসবিহারী কণ্ঠস্বর করুণায় গদ্‌গদ করিয়া বলিলেন, তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কতবড় হতে পারে, একটু ভেবে দেখ দেখি? আর আমার দীর্ঘ জীবনে এই কি প্রথম অপ্রিয় কর্তব্যের সুমুখে দাঁড়িয়েছি বিজয়া? না, তা নয়! কর্তব্য চিরদিনই আমার কর্তব্য! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবি-দাওয়া নেই। বনমালী যে কঠোর দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত করে গেছেন, সে ভার আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহন করতেই হবে—তাতে যত দুঃখ-কষ্টই না আমাকে ভোগ করতে হোক।

হয় আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দাও, নইলে কিছুতেই তোমার এ অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

বিজয়া অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। পিতার অপরাধে তাহার নিরপরাধ পুত্রকে গৃহ-ছাড়া করার সঙ্কল্প ,তাহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতে লাগিল, বয়সের অনুপাত কষিয়া এই বৃদ্ধ যে তাহার অষ্টগুণ অধিক ব্যথা সহ্য করিয়াও কর্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা সে মনের মধ্যেও ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিল না—বরঞ্চ এ যেন শুধু একজন নিরুপায় হতভাগ্যের প্রতি

প্রবলের একান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই তাহাকে বাজিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালন করিবার সাহসও তাহার নাই। অথচ ইহাও তাহার অগোচর ছিল না যে, পল্লীগ্রামে সমারোহপূর্বক ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার খ্যাতিলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বৃদ্ধ পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী এই জিদ এবং জবরদস্তি করিতেছে।

রাসবিহারী আর কিছু বলিলেন না। বিজয়াও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নীরবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার পরদুঃখকাতর স্নেহকোমল নারীচিত্ত এই বৃদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বিষয়ী লোক; এ কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, যে মালিক, তাহাকে তর্কের বেলায় ষোল আনা পরাজয় করিয়া আদায়ের বেলায় আট আনার বেশী লোভ করিতে নাই। কারণ সে পাওনা শেষ পর্যন্ত পাকা হয় না। সুতরাং দাক্ষিণ্য-প্রকাশের দ্বারা লাভবান হইবার যদি কোন সময় থাকে ত সে এই! বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা, তোমার জিনিস তুমি দান করবে, আমি বাদ সাধব কেন? আমি শুধু এই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল তা স্বার্থের জন্যও নয়, রাগের জন্যেও নয়, শুধু কর্তব্য বলেই চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয়, তোমার বাবার বিষয়—সব এক হয়েই তোমাদের দুজনের হাতে পড়বে; সেদিন বুদ্ধি দেবার জন্যে এ বুড়োকেও খুঁজে পাবে না। সেদিন তোমাদের উভয়ের মতের অমিল না হয়, সেদিন তোমার স্বামীর প্রত্যেক কাজটিকে যাতে অভ্রান্ত বলে শ্রদ্ধা করতে পার, বিশ্বাস করতে পার—কেবল এই আমি চেয়েছি। নইলে দান করতে, দয়া করতে সেও জানে, আমিও জানি। কিন্তু সে দান অপাত্রে হলে যে কিছুতে চলবে না, এই শুধু তোমার কাছে আমার প্রমাণ করা। এখন বুঝলে মা, কেন আমরা জগদীশের ছেলেকে একবিন্দু দয়া করতে চাইনি এবং কেন সে দয়া একবারে অসম্ভব? বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহ-

হাস্যে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই পরম সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না—বিজয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, এখন বুঝলে মা বিজয়া, বিলাস ছেলেমানুষ হলেও কতদূর পর্যন্ত ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে! ঐ যে তোমাকে বললুম, আমি ত এই কাজেই চুল পাকালুম, কিন্তু জমিদারি-কাজে ওর চাল বুঝতে আমাকে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে চিন্তা করতে হয়।

বিজয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

সাড়ে-চারটে বাজে বলিয়া রাসবিহারী লাঠিটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিলাস যে কি রকম উতলা হয়ে উঠেছে, তা প্রকাশ করে বলা যায় না। তার ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা সমস্তই হয়েছে এখন ওই। এখন ঈশ্বরের চরণে কেবল প্রার্থনা আমার এই, যেন সে শুভদিনটি আমি চোখে দেখে যেতে পারি। বলিয়া তিনি দুই হাত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলেন। দ্বারের কাছে আসিয়া তিনি সহসা দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছোকরা একবার আমার কাছে এলেও নাহয় যা হোক একটা বিবেচনা করার চেষ্টা করতুম; কিন্তু তাও ত কখনও—অতি হতভাগা, অতি হতভাগা! বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে দেখতে পাচ্চি—বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সেইখানে একভাবে বসিয়া বিজয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অকস্মাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় যাই দেখিল, বেলা পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদীতীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল, এবং আজিও সে বৃদ্ধ দরোয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিক সেইখানে বসিয়া আজিও সেই লোকটি মাছ ধরিতেছিল। অনেকটা দূর হইতে বিজয়া তাহা দেখিতে পাইলেও কাছাকাছি আসিয়া যেন দেখিতেই পায়

নাই , এমনভাবে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক দিয়া উঠিল, সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা?

কথাটা কানে যাইবামাএই তাহার মূল পর্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল । যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেকদিন এবং অনেক কথাবার্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে। বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটি ছিপ রাখিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সহাস্যে কহিল, হাঁ দেশের প্রতি আপনার সত্যিকার টান আছে বটে। এমন কি, তার ম্যালেরিয়াটা পর্যন্ত না নিলে আপনার চলছে না দেখছি।

বিজয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? কিন্তু দেখে ত তা মনে হয় না।

লোকটি বলিল, ডাক্তারদের একটু সবুর করে নিতে হয়। অমন তাড়াতাড়ি—

কথাটা শেষ না হইতেই বিজয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ডাক্তার নাকি?

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তা বৈ কি! একজন কতবড় ডাক্তারের প্রতিবেশী আমরা! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে তবে ত আমাদের—কি বলেন?

বিজয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিল না; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, শুধু প্রতিবেশী নয়, তিনি যে আপনার একজন বন্ধু, সে আমি অনুমান করেছিলুম। আমার কথা তাঁকে গল্প করেছেন নাকি?

লোকটা হাসিয়া কহিল, আপনি তাকে একটা অপদার্থ হতভাগা মনে করেন, এ ত পুরোনো গল্প—সবাই করে। এ আর নূতন করে বলবার দরকার কি? তবে একদিন হয়ত সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

বিজয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে দেখা করায় তাঁর লাভ কি? কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ত আমি এ রকম কথা আপনাকে বলিনি।

না বলে থাকলেও বলাই ত উচিত ছিল।

উচিত ছিল কেন?

যার বাড়ি-ঘরদোর বিকিয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে। আমরাও বলি। সুমুখে না পারি, আড়ালেও ত আমরা বলতে পারি।

বিজয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনি ত তাঁর খুব ভাল বন্ধু!

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক। এমন কি, তার হয়ে আমি নিজেই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম, আপনি সদুদ্দেশ্যেই তার বাড়িখানি গ্রহণ করচেন।

বিজয়া একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

কথায় কথায় আজ তাহারা আরও একটু অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দেখা গেল, ও-পারে একদল লোক সার বাঁধিয়া নরেন্দ্রবাবুর বাটীর দিকে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হইতে পনর পর্যন্ত সকল বয়সের লোকই ছিল। লোকটি দেখাইয়া কহিল, ওরা কোথায় যাচ্ছে জানেন? নরেনবাবুর ইস্কুলে পড়তে।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এ ব্যবসাও করেন নাকি? কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, বিনা পয়সায়—ঠিক না?

লোকটি হাসিমুখে কহিল, তাকে ঠিক চিনেচেন। অপদার্থ লোকের কোথাও আত্মগোপন করা চলে না। পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিল, নরেন বলে, আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈতৃক পেশা; তাই সময়ে-অসময়ে জমিতে দু'বার লাঙ্গল দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারির খেলা বলে! কোন্ জমিতে কখন

সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকার চাষ করা বলে—এ-সব জানেই না। বিলাত থাকতে ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে এ বিদ্যেটাও সে শিখে এসেছিল। ভাল কথা, একদিন যাবেন তার ইস্কুল দেখতে? মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাপ-ব্যাটা-ঠাকুদ্দায় মিলে যেখানে পাঠশালা বসে, সেখানে?

যাইবার জন্য বিজয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহল দমন করিয়া শুধু কহিল, না থাক । জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, অতবড় বাড়ি থাকতে তিনি গাছতলায় পাঠশালা বসান কেন?

লোকটি বলিল, এ-সব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না! তাদের হাতেনাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিসটা রীতিমত শিখে করলে দু-গুণো, এমন কি চার-পাঁচ-গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্যে মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে বসে থাকা দরকার নয়। এখন বুঝলেন, কেন তার পাঠশালা গাছতলায় বসে?

একবার যদি তার ইস্কুলের মাঠের ফসল দেখেন, আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা নিশ্চয়ই বলতে পারি। এখনো ত বেলা আছে—আজই চলুন না—ঐ ত দেখা যাচ্চে।

বিজয়ার মুখের ভাব ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া আসিতেছিল; কহিল, না, আজ থাক।

লোকটি সহজেই বলিল, তবে থাক। চলুন, খানিকটা আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি— বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচ-ছয় বিজয়া একটা কথাও কহিল না, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ লজ্জার হেতুও সে ভাবিয়া পাইল না। লোকটি পুনরায় কথা কহিল, বলিল, আপনি ধর্মের জন্যই যখন তার বাড়িটা নিচ্চেন—এই ক' বিঘে জমি যখন ভাল

কাজেই লাগছে, তখন এটা ত আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারেন? বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিজয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, এই অনুরোধ করবার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আপনার কোন অধিকার আছে? বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, লোকটির হাসিমুখের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সে বলিল, এ অধিকার দেবার ওপর নির্ভর করে না, নেবার ওপর নির্ভর করে। যা ভাল কাজ, তার অধিকার মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাছে পায়—মানুষের কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে আপনি মনে মনে বিরক্ত হলেন, পেলে কারা পেতো জানেন? দেশের নিরন্ন কৃষকেরা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দরিদ্র ভগবানের একটা বিশেষ মূর্তি। তাঁর সেবার অধিকার ত সকলেরই আছে। সে অধিকার নরেনের কাছে চাইতে যাব কেন বলুন? বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া চলিতে চলিতে বলিল, কিন্তু আপনার বন্ধু ত শুধু এই জন্যেই এখানে বসে থাকতে পারবেন না?

লোকটি কহিল, না। কিন্তু তিনি হয়ত আমার ওপরে এ ভার দিয়ে যেতে পারেন।

বিজয়ার ওষ্ঠাধরে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, সে আমি অনুমান করেছিলুম।

লোকটি বলিল, করবারই কথা কিনা। এ সকল কাজ আগে ছিল দেশের ভূস্বামীর। তাদের ব্রহ্মোত্তর দিতে হত। এখন সে দায় নেই বটে, কিন্তু তার জের মেটেনি। তাই দু-চার বিঘে কেউ ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করলেই তারা পূর্ব-সংস্কারবশে টের পান। বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও এ হাসিতে যোগ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। এই সরল পরিহাস তাহার অন্তরের কোথায় গিয়া যেন বিঁধিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে

চলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেও ত আপনার বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারেন?

কিন্তু আমি ত এখানে থাকিনে। বোধ হয়, এক সপ্তাহ পরেই চলে যাবো।

বিজয়া অন্তরের মধ্যে যেন চমকাইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু বাড়ি যখন এখানে তখন নিশ্চয়ই ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়।

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আর বোধ হয় আমাকে আসতে হবে না।

বিজয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে মনে মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে অযথা প্রশ্ন করা আর কোনমতেই উচিত হইবে না; কিন্তু কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কহিল, এখানে বাড়ির লোকের ভার নেবার লোক আপনার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—

লোকটি হাসিয়া বলিল, না, সে রকম লোক কেউ নেই।

তা হলে আপনার বাপ-মা—

আমার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই—এই যে, আপনার বাড়ির সুমুখে এসে পড়া গেছে। নমস্কার, আমি চললুম—বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়া আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না; কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভেতরে আসবেন না ?

না, ফিরে যেতে আমার অন্ধকার হয়ে যাবে, নমস্কার।

বিজয়া হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল, আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারীবাবুর কাছে যেতে বলতে পারেন না?

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, তাঁর কাছে কেন?

তিনিই বাবার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখেন কিনা!

সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে কেন বলছেন?

বিজয়া এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোকটি ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বোধ করি প্রতীক্ষা করিল। পরে কহিল, আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—আমি আসি, বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়াদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের এই দিকের অংশটা খুব বড়। সুদীর্ঘ আম-কাঁঠাল গাছের তলায় তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল, বুড়া দরোয়ান কহিল, মাইজী, একটু ঘুরে সদর রাস্তা-দিয়ে গেলে ভাল হতো না?

এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মত মনের অবস্থা বিজয়ার ছিল না, সে শুধু একটা 'না' বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। যে দুইটা কথা তাহার মনকে সর্বাপেক্ষা অধিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটা এই যে, এত কথাবার্তার মধ্যেও শুধু নারীর পক্ষে ভদ্ররীতি-বিগর্হিত বলিয়াই ইহার নামটা পর্যন্ত জানা হইল না। দ্বিতীয়টি এই যে, দু'দিন পরে ইনি কোথায় চলিয়া যাইবেন—প্রশ্নটা শতবার মুখে আসিয়া পড়িলেও, শতবারেই কেবল লজ্জাতেই মুখে বাধিল। ইঁহার সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথম হইতেই বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, ইনি যেই হোন যথেষ্ট সুশিক্ষিত, এবং পল্লীগ্রাম জন্মস্থান হইলেও অনাত্মীয় ভদ্রমহিলার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিবার শিক্ষা এবং অভ্যাস ইঁহার আছে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও এ শিক্ষা যে তিনি কি করিয়া কোথায় পাইলেন, ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে পা দিতেই, পরেশের মা আসিয়া জানাইল যে, বহুক্ষণ পর্যন্ত বিলাসবাবু বাহিরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাহার মন ক্লান্তি ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকটি সেই যে সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই, কিন্তু আজ যে-কারণেই আসিয়া থাক, যে লোকটির চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার কিছুই না জানিয়াও, উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ ব্যবধান সৃষ্টি না করিয়া বিজয়া পারিল না। শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমি বাড়ি এসেছি—তাঁকে জানান হয়েছে পরেশের মা?

পরেশের মা কহিল, না দিদিমণি, আমি এক্ষুনি পরেশকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

ও মা, তা আর হয়নি? তিনি যে বলেছিলেন, তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে হবে।

বিলাসবাবুই যে এ বাটীর ভবিষ্যৎ কর্তৃপক্ষ, এ সংবাদ আত্মীয়-পরিজন কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং সেই হিসাবে আদর-যত্নেরও ত্রুটি হইত না। বিজয়া আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে সে নীচে আসিয়া খোলা দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল, বিলাস বাতির সম্মুখে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছে। তাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একেবারেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি নিশ্চয় ভেবেচ আমি রাগ করে এতদিন আসিনি। যদিও রাগ আমি করিনি, কিন্তু করলেও যে সেটা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হতো না, সে আজ আমি তোমার কাছে প্রমাণ করবো।

বিলাস এতদিন পর্যন্ত বিজয়াকে ‘আপনি’ বলিয়া ডাকিত। আজিকার এই আকস্মিক ‘তুমি’ সম্বোধনের কারণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, যে বিজয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সে কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। বিলাস সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল, আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে এইমাত্র কলকাতা থেকে আসচি, এখন পর্যন্ত বাবার সঙ্গেও দেখা করতে পারিনি। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ করে থাকতে পার, কিন্তু আমি ত পারিনে! আমার দায়িত্ব-বোধ আছে—একটা বিরাট কার্য মাথায় নিয়ে আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারিনে। আমাদের ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে—সমস্ত স্থির করে এলুম; এমন কি, নিমন্ত্রণ করা পর্যন্ত

বাকী রেখে আসিনি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই না আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে! যাক—ওদিকের সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারা কারা আসবেন, তাও এই কাগজখানায় আমি টুকে এনেচি—একবার পড়ে দেখ, বলিয়া বিলাস আত্মপ্রসাদের প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুমুখের কাগজখানা বিজয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া চৌকিতে হেলান দিয়া বসিল।

তথাপি বিজয়া কথা কহিল না—নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধেও লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না; যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল। এতক্ষণ পরে বিলাসবিহারী বিজয়ার নীরবতা সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিল, ব্যাপার কি! এমন চুপচাপ যে?

বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি ভাবচি, আপনি যে নিমন্ত্রণ করে এলেন, এখন তাঁদের কি বলা যায়?

তার মানে?

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু স্থির করে উঠতে পারিনি।

বিলাস সটান সোজা হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি? তুমি কি ভেবেছ, এই ছুটির মধ্যে না করতে পারলে আর শীঘ্র করা যাবে? তাঁরা ত কেউ তোমার—ইয়ে নন যে, তোমার যখন সুবিধে হবে, তখনই তাঁরা এসে হাজির হবেন? মনস্থির হয়নি তার অর্থ কি শুনি?

রাগে তাহার চোখ-দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল। বিজয়া অধোমুখে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভেবে দেখলুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ করবার দরকার নেই।

বিলাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সমারোহ! সমারোহ করতে হবে এমন কথা ত আমি বলিনি! বরঞ্চ যা স্বভাবতঃই শান্ত, গম্ভীর—তার কাজ নিঃশব্দে সমাধা করবার মত জ্ঞান আমার আছে। তোমাকে সেজন্য চিন্তিত হতে হবে না।

বিজয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।

বিলাস প্রথমটা এমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। পরে কহিল, আমি জানতে চাই, তুমি যথার্থ ব্রাহ্মমহিলা কিনা।

বিজয়া তীব্র আঘাতে যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু বলিল, আপনি বাড়ি থেকে শান্ত হয়ে ফিরে এলে তার পরে কথা হবে—এখন থাক। বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সে পুনরায় বসিয়া পড়িল। বিলাস সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও সে নিজের ব্যবহার সুসংযত বা ভদ্র করিতে শিখে নাই—সে চাকরটার সম্মুখেই উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জানো?

বিজয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। ভৃত্য প্রস্থান করিলে ধীরে ধীরে কহিল, সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে করবো—আপনার সঙ্গে নয়। বলিয়া একবাটি চা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

বিলাস তাহা স্পর্শ না করিয়া সে কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিল, আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করলে কি হয় জানো?

বিজয়া বলিল, না। কিন্তু সে যাই হোক না, আপনার দায়িত্ববোধ যখন এত বেশী, তখন আমার অনিচ্ছায় যাঁদের নিমন্ত্রণ করে অপদস্থ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভার নিজেই বহন করুন, আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।

বিলাস দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া হাঁকিয়া কহিল, আমি কাজের লোক—কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসি নে—তা মনে রেখ বিজয়া।

বিজয়া স্বাভাবিক শান্তস্বরে জবাব দিল, আচ্ছা, সে আমি ভুলব না।

ইহার মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল, তাহা বিলাসবিহারীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা যাতে না ভোলো, সে আমি দেখব।

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চায়ের বাটির মধ্যে চামচাটা ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া বিলাস নিজেও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আপনাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এত বড় বাড়ি তবে কি কাজে লাগবে শুনি? এ ত আর শুধু শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না।

এবার বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিল, না। কিন্তু এ বাড়ি যে নিতেই হবে, সে ত এখনো স্থির হয়নি।

জবাব শুনিয়া বিলাস ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। মাটিতে সজোরে পা ঠুকিয়া পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, হয়েছে, একশ বার স্থির হয়েছে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করে এনে অপমান করতে পারব না—এ বাড়ি আমাদের চাই-ই। এ আমি কোরে তবে ছাড়বো—এই তোমাকে আজ আমি জানিয়ে গেলুম। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সেইদিন হইতে বিজয়ার মনের মধ্যে এই আশাটা অনুক্ষণ যেন তৃষ্ণার মত জাগিতেছিল যে, সেই অপরিচিত লোকটি যাইবার পূর্বে অন্ততঃ একটিবারও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া অনুরোধ করিতে আসিবেন। যত কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, সমস্তগুলি তাহার অন্তরের মধ্যে গাঁথা হইয়া ছিল, একটি কথাও সে বিস্মৃত হয় নাই। সেইগুলি সে মনে মনে অহর্নিশ আন্দোলন করিয়া দেখিয়াছিল যে, বস্তুতঃ সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে এ ধারণা তাঁহার জন্মিতে পারে যে তাহার কাছে আশা করিবার তাঁহার বন্ধুর একেবারে কিছু নাই। বরঞ্চ তাহার বেশ মনে পড়ে নরেন, যে তাহার পিতৃবন্ধুর পুত্র, এ উল্লেখ সে করিয়াছে; সময় পাইলে ঋণ-পরিশোধ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আছে কিনা, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তবে যাহার সর্বস্ব যাইতে বসিয়াছে তাহার ইহাতেও কি চেষ্টা করিবার মত কিছুই ছিল না! যেখানে কোন ভরসাই থাকে না সেখানেও ত আত্মীয়-বন্ধুরা একবার যত্ন করিয়া দেখিতে বলে। এ বন্ধুটি কি তাঁহার তবে একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

নদীতীরের পথে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যহই এই আশা করিত যে, একবার না একবার তিনি আসিবেনই। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভুত ডাক্তার বন্ধুটি।

বৃদ্ধ রাসবিহারীর সহিত দেখা হইলে তিনি ছেলের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে কোন কথা হইয়াছে ইহার আভাসমাত্র দিলেন না। বরঞ্চ ইঙ্গিতে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন সঙ্কল্প একপ্রকার সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। এই লইয়া যে আর কোনপ্রকার আন্দোলন উঠিতে পারে, তাহা যেন তাঁহার মনেই আসিতে

পারে না। বিজয়া নিজেই সঙ্কোচে কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না। অগ্রহায়ণ শেষ হইয়া গেল, পৌষের ঠিক প্রথম দিনটিতেই পিতাপুত্র একত্র দর্শন দিলেন। রাসবিহারী কহিলেন, মা, আর ত বেশী দিন নেই, এর মধ্যেই ত সমস্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে হবে।

বিজয়া সত্য সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, তিনি নিজে ইচ্ছে করে চলে না গেলে তো কিছুই হতে পারে না।

বিলাসবিহারী মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; তাহার পিতা কহিলেন, কার কথা বলচ মা, জগদীশের ছেলে ত? সে তো কালই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদটা যথার্থই বিজয়ার বুকের ভিতর পর্যন্ত গিয়া আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ বিলাসের দিক হইতে এমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে সে কোন মতে না তাহার মুখ দেখিতে পায়। এই ভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর জিনিসপত্র কি হল? সমস্ত নিয়ে গেছেন?

বিলাস পিছন হইতে হাসির ভঙ্গিতে বলিল, থাকবার মধ্যে একটা তে-পেয়ে খাট ছিল—তার উপরেই বোধ করি তাঁর শয়ন চলত, আমি সেটা বাইরে গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছি, তাঁর ইচ্ছে হলে নিয়ে যেতে পারেন—কোন আপত্তি নেই।

বিজয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপর সুস্পষ্ট বেদনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী ভর্ৎসনার কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন, ওটা তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান তাকে যতই দণ্ড দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বলছি নে যে, তুমি অন্তরে তার জন্যে কষ্ট পাচ্চ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্তব্য। জগদীশের ছেলের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল? তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বললে না কেন? দেখতুম যদি কিছু—

পিতার কথাটা শেষ হইতেও পাইল না—পুত্র তাঁহার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত আর কাজ ছিল না বাবা! তুমি কি যে বল তার ঠিকানাই নেই। তা ছাড়া আমার পৌঁছোবার পূর্বেই ত ডাক্তারসাহেব তাঁর তোরঙ্গ, প্যাঁটরা, যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়েছিলেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ হাম্‌বাগ কোথাকার! বলিয়া সে আরও কিসব বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মুখের প্রতি আড়চোখে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, না বিলাস, তোমার এ-রকম কথাবার্তা আমি মার্জনা করতে পারিনে। নিজের ব্যবহারে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।

কিন্তু বিলাস লেশমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া জবাব দিল, কিজন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে, কিন্তু যে দাম্ভিক বাড়ি বয়ে অপমান করে যায়, তাকে আমি মাপ করিনে। অত ভণ্ডামি আমার নেই।

তাহার জবাব শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য হইয়া উঠিল। রাসবিহারী কহিলেন, কে আবার তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান করে গেল? কার কথা তুমি বলছ?

বিলাস ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, জগদীশবাবুর সু-পুত্র নরেনবাবুর কথাই বলছি বাবা। তিনিই একদিন ঠিক এই ঘরে বসেই আমাকে অপমান করে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে চিনতুম না তাই—বলিয়া ইঙ্গিতে বিজয়াকে দেখাইয়া কহিল, নইলে ওঁকেও অপমান করে যেতে সে কসুর করেনি—তোমরা জান সে কথা?

বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাইতেই, বিলাস তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, পূর্ণবাবুর ভাগ্নে বলে পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্যন্ত অপমান করে গিয়েছিল, সে কে? তখন যে তাকে ভারি প্রশ্রয় দিলে। সে-ই নরেনবাবু! তখন

নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস করতো তবেই বলতে পারতুম, সে পুরুষমানুষ! ভণ্ড কোথাকার!

সহসা পিতাপুত্র উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ বেদনায় একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটির আর বিলম্ব নাই। সুতরাং জগদীশের বাটীর প্রকাণ্ড হলঘরটা মন্দিরের জন্য, এবং অপরাপর কক্ষগুলি কলিকাতার মান্য অতিথিদের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে। স্বয়ং বিলাসবিহারী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সাধারণ নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অল্প নয়। যাঁহারা বিলাসেরই বন্ধু, স্থির হইয়াছিল তাঁহারা রাসবিহারীর বাটীতে এবং অবশিষ্ট বিজয়ার এখানে থাকিবেন। মহিলা যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও এইখানেই আশ্রয় লইবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইয়াছিল।

সেদিন সকালবেলায় বিজয়া স্নান সারিয়া নীচে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া পরেশ একহাতে মায়ের কোঁচড় হইতে মুড়ি লইয়া চিবাইতেছে, অপরহস্তে রজ্জুবদ্ধ একটা গরুর গলায় হাত বুলাইয়া অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিতেছে। গরুটাও আরামে চোখ বুজিয়া গলা উঁচু করিয়া ছেলেটার সেবা গ্রহণ করিতেছে।

এই দুটি বিজাতীয় জীবের সৌহৃদ্যের সহিত তাহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কি যে সংযোগ ছিল বলা কঠিন; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। এ বাটীতে এ ছেলেটি তাহার ভারী অনুগত। সে চোখ মুছিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কৌতুকের সহিত কহিল, হাঁ রে পরেশ, তোর মা বুঝি তোকে এই কাপড় কিনে দিয়েছে? ছিঃ—এ কি আবার একটা পাড় রে?

পরেশ ঘাড় বাঁকাইয়া, আড়চোখে চাহিয়া নিজের পাড়ের সঙ্গে বিজয়ার শাড়ীর চমৎকার চওড়া পাড়টা মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিল। তাহার ভাব বুঝিয়া বিজয়া নিজের পাড়টা দেখাইয়া কহিল, এম্‌নি না হলে কি তোকে মানায়! কি বলিস রে?

পরেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, মা কিচ্ছু কিনতে জানে না যে।

বিজয়া কহিল, আমি কিন্তু তোকে এমনি একখানা কাপড় কিনে দিতে পারি, যদি তুই—কিন্তু 'যদি'তে পরেশের প্রয়োজন ছিল না। সে সলজ্জ হাস্যে মুখখানা আকর্ণ-প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কখন দেবে?

দিই, যদি তুই আমার একটা কথা শুনিস।

কি কথা?

বিজয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তু তোর মা কি আর কেউ শুনলে তোকে পরতে দেবে না।

এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবার মত মনের অবস্থা পরেশের নয়। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মা জানবে ক্যাম্‌নে? তুমি বল না, আমি এক্ষুণি শুনব।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই দিঘ্‌ড়া-গাঁ চিনিস?

পরেশ হাত তুলিয়া বলিল, ওই ত হোথ্‌থা। গুটিপোকা খুঁজতে কতদিন দিঘ্‌ড়ে যাই।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে সবচেয়ে বড় কাদের বাড়ি, তুই জানিস?

পরেশ বলিল, হিঁ—বামুনদের গো। সেই যে আর বছর রস খেয়ে তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ্যালো। এই যেন হেথায় গোবিন্দের মুড়কি-বাতাসার দোকান, আর ওই হোত্থায় তেনাদের দালান।গোবিন্দ কি বলে জানো মাঠান? বলে, সব মাগ্যি-গোণ্ডা, আধ পয়সায় আর আড়াই গোণ্ডা বাতাসা মিলবে না, এখন মোটে দু' গোণ্ডা। কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সার আনতে দাও মাঠান, আমি তা হলে সাড়ে-পাঁচ গোণ্ডা নিয়ে আসতে পারি।

বিজয়া কহিল, তুই দু'পয়সার বাতাসা কিনে আনতে পারবি?

পরেশ কহিল, হিঁ—এ হাতে এক পয়সার সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে নিয়ে বলব, দোকানী, এ হাতে আরো সাড়ে-পাঁচ গোণ্ডা গুণে দাও। দিলে বলব, মাঠান বলে দেছে দুটো ফাউ—নাঃ? তবে পয়সা দুটো হাতে দেব, নাঃ?

বিজয়া হাসিয়া কহিল, হাঁ, তবে পয়সা দিবি। আর অমনি দোকানীকে জিজ্ঞেস করে নিবি, ওই যে বড় বাড়িতে নরেনবাবু থাকত, সে কোথায় গেছে! বলবি—যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেটা আমাকে চিনিয়ে দিতে পার দোকানী? কি রে পারবি ত?

পরেশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, হিঁ—পয়সা দুটো দাও না তুমি। আমি ছুট্টে গে নে আসি।

আমি যা জিজ্ঞেসা করতে বললুম?

পরেশ কহিল, হিঁ—তা-ও।

বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবিনে তো?

পরেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, তুমি পয়সা আগে দাও না! আমি ছুট্টে যাই।

আর তোর মা যদি জিজ্ঞেস করে, পরেশ, গিয়েছিলি কোথায়, কি বলবি?

পরেশ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত হাস্য করিয়া কহিল, সে আমি খুব বলতে পারব। বাতাসার ঠোঙা এমনি কোরে কোঁচড়ে নুকিয়ে বলব, মাঠান পাঠিয়ে ছ্যালো—ঐ হোত্থা বামুনদের নরেনবাবুর খবর জানতে গেছলাম। তুমি দাও না শিগ্‌গির পয়সা।

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই কি বোকা ছেলে রে পরেশ, মায়ের কাছে কি মিছে কথা বলতে আছে? বাতাসা কিনতে গিয়েছিলি, জিজ্ঞেস করলে তাই বলবি। কিন্তু দোকানীর কাছে সে খবরটা জেনে আসতে ভুলিস নে যেন। নইলে কাপড় পাবিনে, তা বলে দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলিয়া পরেশ পয়সা লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে, বিজয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে সংবাদ জানিবার

কৌতূহলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই, যাহা সে যে-কোন লোক পাঠাইয়া অনেকদিন পূর্বেই স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিত, তাহাই যে কেন এখন তাহার কাছে এতবড় সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, একবার তলাইয়া দেখিলে এই লুকোচুরির লজ্জায় আজ সে নিজেই মরিয়া যাইত। কিন্তু লজ্জাটা নাকি তাহার চিন্তার ধারার সহিত অজ্ঞাতসারে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিবার দৃষ্টি যে কোনকালে তাহার চোখে ছিল, ইহাও আজ তাহার মনে পড়িল না।

কয়েকখানা চিঠি লিখিবার ছিল। সময় কাটাইবার জন্য বিজয়া টেবিলে গিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিল। কিন্তু কথাগুলা এমনি এলোমেলো অসংবদ্ধ হইয়া মনে আসিতে লাগিল যে, কয়েকটা চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কলম রাখিয়া দিতে হইল।পরেশের দেখা নাই। মনের চাঞ্চল্য আর দমন করিতে না পারিয়া বিজয়া ছাদে উঠিয়া তাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণে দেখা গেল সে হনহন করিয়া নদীর পথ ধরিয়া আসিতেছে। বিজয়া কম্পিতপদে শঙ্কিত-বক্ষে নীচে নামিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই ছেলেটা বাতাসার ঠোঙা কোঁচড়ে লুকাইয়া চোরের মত পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সেগুলি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, দু' পয়সায় বারো গোণ্ডা এনেছি মাঠান।

বিজয়া সভয়ে কহিল, আর দোকানী কি বললে?

পরেশ ফিসফিস করিয়া বলিল, পয়সায় ছ' গোণ্ডার কথা কাউকে বলতে মানা করে দেছে। বলে কি জান মা—

বিজয়া বাধা দিয়া কহিল, আর সেই বামুনদের নরেনবাবুর কথা—

পরেশ কহিল, সে হোতা নেই—কোথায় চলে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মাঠান, বারো গোণ্ডায়—

বিজয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, নিয়ে যা তোর বার গোণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে—বলিয়া সরিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই অচিন্তনীয় রূঢ়তায় ছেলেটা এতটুকু হইয়া গেল। সে এত দ্রুত গিয়াছে এবং আসিয়াছে, এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বার গণ্ডা সওদা করিয়াছে, তবুও মাঠানকে প্রসন্ন করিতে পারিল না মনে করিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে ঠোঙা দুইটা হাতে করিয়া মলিনমুখে কহিল, এর বেশী যে দেয় না মাঠান!

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এদিকে না চাহিয়াও সে ছেলেটার অবস্থা অনুভব করিতেছিল। তাই খানিক পরে সদয়কণ্ঠে কহিল, যা পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।

পরেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব?

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়া কহিল, সব। ওতে আমার কাজ নেই।

পরেশ বুঝিল এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাপড়ের কথাটা স্মরণ হইতেই আরও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।আস্তে আস্তে কহিল, ভট্‌চায্যিমশায়ের কাছে জেনে আসব মাঠান?

কে ভট্‌চায্যিমশাই? কি জেনে—বলিয়া উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াই বিজয়া মুখ ফিরাইয়াই থামিয়া গেল। মুখের বাকী কথাটুকু তাহার মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। বারান্দার উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ নরেন্দ্রকে দেখা গেল এবং পরক্ষণেই সে ঘরে পা দিয়া হাত তুলিয়া বিজয়াকে নমস্কার করিল।

পরেশ বলিল, কোথায় গেছে নরেন্দরবাবু—

বিজয়া প্রতি-নমস্কারেরও সময় পাইল না, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা যা, যা,—আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।

পরেশ বুঝিল, এও রাগের কথা। ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, কাণা ভট্‌চায্যিমশাই ত তেনাদের পাশের বাড়িতেই থাকে মাঠান। গোবিন্দ-দোকানী যে বললে—

বিজয়া শুষ্ক হাসিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

পরেশের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এখন যা না পরেশ। ভারী ত কথা, তার আবার—সে আর একদিন তখন জেনে আসিস না হয়। এখন যা।

পরেশ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নরেনবাবুর খবর জানতে চান? তিনি কোথায় আছেন তাই?

অস্বীকার করিতে পারিলেই বিজয়া বাঁচিত, কিন্তু মিথ্যা বলিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। সে কোনমতে ভিতরের লজ্জা দমন করিয়া বলিল, হাঁ। তা সে একদিন জানলেই হবে।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কোন দরকার আছে?

প্রশ্ন তাহার কানের মধ্যে ঠিক বিদ্রূপের মত শুনাইল। কহিল, দরকার ছাড়া কি কেউ কারও খবর জানতে চায় না?

কেউ কি করে না করে, সে ছেড়ে দিন। কিন্তু তার সঙ্গে তো আপনার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে; তবে আবার কেন তার সন্ধান নিচ্চেন? দেনাটা কি সব শোধ হয়নি?

বিজয়ার মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে উত্তর দিল না। নরেন নিজেও তাহার ভিতরের উদ্বেগ সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না।পুনরায় কহিল, যদি আরও কিছু ঋণ বার হয়ে থাকে তা হলেও আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই, যা থেকে সেই বাকি ঋণটা পরিশোধ হতে পারবে। এখন আর তাঁর খোঁজ করা—

কে আপনাকে বললে আমি দেনার জন্যেই তাঁর অনুসন্ধান করছি?

তা ছাড়া আর যে কি হতে পারে, আমি ত ভাবতে পারিনে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁকে চেনেন না!

তিনিও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁকে চিনি।

নরেন হাসিল, কহিল, তিনি আপনাকে চেনেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন না। ধরুন, আমিই যদি বলি, আমার নাম নরেন, তা হলেও ত আপনি—

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হলেও আমি বিশ্বাস করি, এবং বলি এই সত্যি কথাটা অনেকদিন পূর্বেই আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত ছিল।

ফুঁ দিয়া আলো নিবাইলে ঘরের চেহারা যেমন বদল হয়, বিজয়ার প্রত্যুত্তরে চক্ষুর নিমেষে নরেনের মুখ তেমনি মলিন হইয়া গেল। বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ কহিল, অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি সমান বলে আপনার মনে হয় না? আমার ত হয়। তবে কিনা আমরা ব্রাহ্ম, এই যা বলেন।

নরেনের মলিনমুখ এইবার লজ্জায় কালো হইয়া উঠিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে নিজের অলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় কিছুই ছিল না।শেষ দিনটায় পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠল না। এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

এ প্রশ্ন গোড়াতেই করিয়া বসিলে এ পক্ষেও উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হইত। কিন্তু যে আলোচনা একবার শুরু হইয়া গেছে, নিজের ঝোঁকে সে অনেক কঠিন স্থান আপনি ডিঙাইয়া যায়। তাই সহজেই বিজয়া জবাব দিতে পারিল। কহিল, ক্ষতি একজনের ত কতরকমেই হতে পারে। আর যদি হয়েও থাকে, সে ত হয়েই গেছে, আপনি ত এখন তার উপায় করতে পারবেন না। সে যাক। আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চাইলে কি—

রাগ করব? না না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতদিন এত কথাবার্তাতেও এই লোকটির যে পরিচয় বিজয়া পায় নাই, একমুহূর্তের হাসিটুকু তাহাকে সে খবর দিয়া গেল। তাহার

মনে হইল, ইহার সমস্ত অন্তর-বাহির একেবারে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। যে লোক সর্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছেও ইহার না না-ই বটে, এবং ঠিক এইজন্যই বোধ করি সে তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া আর প্রশ্ন করিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন আছেন কোথায়?

নরেন বলিল, আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসি এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর বাড়িতেই আছি।

আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে, তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানে না?

জানে বৈ কি?

তবে?

নরেন্দ্র একটুখানি ভাবিয়া বলিল, যে ঘরটায় আছি, সেটাকে ঠিক বাড়ির মধ্যে বলা যায় না, আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি, সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরা আপত্তি করে না। তবে বেশী দিন থেকে তাঁদের বিব্রত করা চলবে না, সে ঠিক। বলিয়া সে একটুখানি থামিল। কহিল, আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন তো, কেন এসব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার আরও কিছু দেনা বেরিয়েছে, এই না?

উত্তর দিবার জন্যই বোধ করি বিজয়া তাহার মুখপানে চাহিল। কিন্তু সহসা হাঁ—না কোন কথাই তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না।

নরেন্দ্র কহিল, পিতৃঋণ কে না শোধ দিতে চায়, কিন্তু সত্যি বলচি আপনাকে, স্বনামে-বেনামে এমন কিছু আমার নেই, যা বেচে দিতে পারি।শুধু মাইক্রস্কোপ্‌টা আছে, তাও বেচে তবে বিদেশে যাবার খরচটা যোগাড় করতে হবে। পিসিমার অবস্থাও খারাপ—এমন কি, সেখানে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত—বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিজয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সে ঘাড় ফিরাইল।

নরেন্দ্র বলিল, তবে যদি এই দয়াটা করেন, তা হলে বাবার দেনাটা আমি নিজের নামে লিখে নিতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আপনি রাসবিহারীবাবুকে একটু বললেই আর তিনি এ নিয়ে এখন পীড়াপীড়ি করবেন না।

পরেশ আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিল, মাঠান, মা বলচে, বেলা যে অনেক হয়ে গেল—ঠাকুরমশাইকে ভাত দিতে বলবে?

সুমুখের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া নরেন্দ্র চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জিত হইয়া বলিল, ইস্! বারোটা বাজে! আপনার ভারী কষ্ট হল।

বিজয়া চোখের জল সামলাইয়া লইয়াছিল; কহিল,আপনি কি জন্যে এসেছিলেন, সে ত বললেন না?

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, সে থাক। বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পিসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর? এখন সেখানেই ত যেতে হবে?

নরেন্দ্র কহিল, হ্যাঁ।দূর একটু বৈ কি—প্রায় ক্রোশ-দুই।

বিজয়া অবাক হইয়া বলিল, এই রোদের মধ্যে এখন দু' ক্রোশ হাঁটবেন? যেতেই তো তিনটে বেজে যাবে।

তা হোক, তা হোক, নমস্কার। বলিয়া নরেন পা বাড়াইতেই বিজয়া দ্রুতপদে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে আজ রাখতেই হবে। এত বেলায় না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।

নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, খেয়ে যাব? এখানে?

কেন, তাতে কি আপনারও জাত যাবে নাকি?

প্রত্যুত্তরে পুনরায় তেমনি প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, না, সে ভয় আমার দুনিয়ায় আর নেই। তা ছাড়া ভগবান আমার

প্রতি আজ ভারী প্রসন্ন, নইলে এত বেলায় সেখানে যে কি জুটত, সে ত আমি জানি।

তবে একটু বসুন, আমি আসচি, বলিয়া বিজয়া তাহার প্রতি না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নরেন্দ্র পুনরায় সেই কথাই বলিল, কহিল, এত বেলা পর্যন্ত উপোস করে আমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াবার কোন দরকার ছিল না। অন্য দেশে এ প্রথা নেই।

বিজয়া হাসিমুখে জবাব দিল, বাবা বলতেন, সে দেশের ভারী দুর্ভাগ্য, যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে বসে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।

নরেন্দ্র কহিল, কেন তা বলেন? অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমাদের দেশেও ত অনেকের বাড়িতে খেয়েছি, তাঁদের মধ্যেও ত এ প্রথা চলে দেখেছি।

বিজয়া কহিল, বিলিতি প্রথা যাঁরা শিখেছেন,তাঁদের বাড়িতে হয়ত চলে, কিন্তু সকলের নয়। আপনি নিজে সেদেশে অনেক দিন ছিলেন বলেই আপনার ভুল হচ্ছে। নইলে পুরুষদের সামনে বার হই, দরকার হলে কথা কই বলেই আমরা সবাই মেমসাহেবও নই, তাদের চাল-চলনেও চলিনে।

নরেন্দ্র কহিল, না চললেও চলা ত উচিত। যাদের যেটা ভাল, তাদের কাছে সেটা ত নেওয়া চাই।

বিজয়া বলিল, কোন্‌টা ভাল, একসঙ্গে বসে খাওয়া? বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি কি জানবেন মেয়েদের কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে থাকে? আমি ত বরঞ্চ আমাদের অনেক অধিকার ছাড়তে রাজী আছি কিন্তু এটি নয়—ও কি, সমস্ত দুধই যে পড়ে রইল! না, না—মাথা নাড়লে হবে না। কখনই আপনার পেট ভরেনি, তা বলে দিচ্ছি।

নরেন হাসিয়া বলিল, আমার নিজের পেট ভরেছে কি না, সেও আপনি বলে দেবেন!এ ত বড় অদ্ভুত কথা। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথাটা শুনিয়া বিজয়া নিজেও একটু হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সে ঐটুকু দুধ না খাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বেলা পড়িলে বিদায় লইতে গিয়া নরেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বিষয়ে আজ আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাকে রোদের মধ্যে আপনি যেতে দিলেন না, না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না, একটু কম খাওয়া দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন—এ সব কেমন করে সম্ভব? শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না—আমি শ্লেষ বা বিদ্রূপ করার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি নে—কিন্তু আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি, এ রকম কেমন করে সম্ভব হয়।

বিজয়া কোন উপায়ে এই অলোচনার হাত থেকে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, সব বাড়িতেই এই রকম হয়ে থাকে। সে থাক, আপনি আর কতদিনের মধ্যে বিদেশ যাবার ইচ্ছা করেন?

নরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, পরশু। কিন্তু আমি ত আপনার একেবারেই পর; আমার দুঃখ-কষ্টতে সত্যই ত আপনার কিছু যায় আসে না, তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বলবার জো নেই যে, আমি আপনার লোক নই। পাছে কম খাই বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে সুমুখে বসে রইলেন। আমার বোন নেই, মা-ও ছেলেবেলায় মারা গেছেন। তাঁরা বেঁচে থাকলে এমনি ব্যাকুল হতেন কি না আমি ঠিক জানিনে; কিন্তু আপনার যত্ন করা দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছি। অথচ এ-কিছু আর যথার্থই সত্যি হতে পারে না, সে আমিও জানি, আপনিও জানেন; বরঞ্চ একে সত্যি বললেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যা বলে ভাবতেও যেন ইচ্ছে করে না।

বিজয়া জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল; সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে সে কি আপনি আর কোথাও দেখেন নি?

ভদ্রতা! তাই হবে বোধ হয়। বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। তার পরে হাত তুলিয়া আবার একবার নমস্কার করিয়া কহিল, যেমন কোরে হোক বাবার ঋণটা যে সমস্ত শোধ হয়েছে, এই আমার ভারী তৃপ্তি। আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি চললুম। বলিয়া সে যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে অস্ফুট আহ্বান আসিল, একটু দাঁড়ান—

নরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইতে, বিজয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মাইক্রস্কোপ্‌টার দাম কত?

নরেন্দ্র কহিল, কিনতে আমার পাঁচশ' টাকার বেশী লেগেছিল, এখন আড়াই 'শ টাকা—দু'শ টাকা পেলেও আমি দিই। কেউ নিতে পারে আপনি জানেন? একেবারে নূতন আছে বললেও হয়।

তাহার বিক্রি করিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত কমে দেবেন, আপনার কি তার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে?

নরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাজ? কিছুই হয়নি।

এই নিশ্বাসটুকুও বিজয়ার লক্ষ্য এড়াইল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার নিজেরই একটা অনেকদিন থেকে কেনবার সাধ আছে, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। কাল একবার দেখাতে পারেন?

পারি। আমি সমস্ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, যাচাই করবার সময় নেই বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি, নিলে আপনি ঠকবেন না।

আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিল, টাকার বদলে দাম হয় না, এ এমনি জিনিস। আমার আর কোন উপায় যে নেই, নইলে—আচ্ছা, দুপুরবেলায় আমি নিয়ে আসব।

সে চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল, বিজয়া অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল; তার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন খালি হইয়া গেছে—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন ছিল না, কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্যন্ত কোন কাজেই লাগিবে না। অথচ সেজন্য ক্ষোভ বা দুঃখ কিছুই মনের মধ্যে নাই। এমনি শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার পানে চাহিয়া মূর্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কি করিয়া যে সময় কাটিতেছিল তাহার খেয়াল ছিল না। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, কখন চাকরে আলো দিয়া গেছে সে টেরও পায় নাই। তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চোখের জলে। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া দেখিল, কখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অজ্ঞাতসারে পড়িয়া বুকের কাপড় পর্যন্ত ভিজিয়া গেছে। ছি ছি—চাকর-বাকর আসিয়াছে, গেছে—হয়ত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে—হয়ত তাহারা কি মনে করিয়াছে—লজ্জায় আজ সে প্রয়োজনেও কাহাকেও কাছে ডাকিতে পারিল না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তেমনি বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া রহিল; অমনি বস্তু-বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল। তাহার পরে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার মনে নাই, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিল তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গেছে—প্রথমেই মনে পড়িল তাহাকে, যাহার সহিত সে জীবনে পাঁচ-ছয় দিনের বেশি কথা পর্যন্ত বলে নাই। আর মনে পড়িল, যে অজ্ঞাত বেদনা তাহার ঘুমের মধ্যেও সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তাহারই সহিত কেমন করিয়া যেন সেই লোকটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখনই মনে পড়ে সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে কোথায় তাহার একটি চোখ এবং একটি কান সারাদিন পড়িয়া আছে, তখন নিজের কাছেই তাহার ভারী লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এ যে শুধু সেই যন্ত্রটা দেখিবার কৌতূহল, একবার সেটা দেখা হইয়া গেলেই সমস্ত আগ্রহের

নিবৃত্তি হইবে, আজ না হয় ত কাল হইবে—এমন করিয়াও আপনাকে আপনি অনেকবার বুঝাইল, কিন্তু কোন কাজেই লাগিল না; বরঞ্চ, বেলার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেন রহিয়া রহিয়া আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌষের মধ্যাহ্নসূর্য ক্রমশঃ এক পাশে হেলিয়া পড়িল; আলোকের চেহারায় দিনান্তের সূচনা দেখিয়া বিজয়ার বুক দমিয়া গেল। কাল যে লোক চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, আজ সে যদি এতদূরে আসিতে এতখানি সময় নষ্ট করিতে না পারে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! তাহার শেষ সম্বলটুকু যদি অপর কাহাকেও বেশি দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহাকেই বা কি দোষ দিবে কে? তাহাদের শেষ কথাবার্তাগুলি সে বার বার তোলাপাড়া করিয়া নিরতিশয় অনুশোচনার সহিত মনে করিতে লাগিল যে মনের মধ্যে তাহার যাহাই থাক, মুখে সে এ সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য একেবারেই প্রকাশ করে নাই।

ইহাকে অনিচ্ছা কল্পনা করিয়া সে যদি শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া গিয়া থাকে ত দর্পিতার উচিত শাস্তিই হইয়াছে বলিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কঠিন তিরস্কার বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার জবাব সে কোনদিকে চাহিয়াই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু পরেশকে কিংবা আর কাহাকেও কোন ছলে তাঁহার কাছে পাঠান যায় কিনা, পাঠাইলেও তাহারা খুঁজিয়া পাইবে কিনা, তিনি আসিতে স্বীকার করিবেন কিনা, এমনি তর্ক-বিতর্ক করিয়া ছটফট করিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া ঘর-বাহির করিয়া যখন কোনমতেই তাহার সময় কাটিতেছিল না, এমনি সময়ে পরেশ ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল, মাঠান, নীচে এসো, বাবু এসেছে।

বিজয়ার মুখ পাংশু হইয়া গেল—কে বাবু রে?

পরেশ কহিল, কাল যে এসেছ্যালো—তেনার হাতে মস্ত একটা চামড়ার বাক্স রয়েছে মাঠান।

আচ্ছা, তুই বাবুকে বসতে বল গে, আমি যাচ্ছি।

মিনিট দুই-তিন পরে বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। আজ তাহার পরনের কাপড়ে, মাথার ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলে এমন একটা বিশেষত্ব ও পারিপাট্য ছিল যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। গতকল্যের সঙ্গে আজকের এই প্রভেদটায় ক্ষণকালের জন্য নরেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার বিস্মিত-দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিজয়ার নিজের দৃষ্টি যখন নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায়-শরমে সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। মাইক্রস্কোপের ব্যাগটা এতক্ষণ তাহার হাতেই ছিল, সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, নমস্কার। আমি বিলেতে থাকতে ছবি আঁকতে শিখেছিলাম। আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুকতেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, যে ছবি আঁকতে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ কি সুন্দর!

বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; এবং এ কথা একমাত্র ইহার মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে। কিন্তু তথাপি নিজের আরক্ত মুখখানা যে সে কোথায় লুকাইবে, এই দেহটাকে তাহার সমস্ত সাজসজ্জার সহিত যে কি করিয়া বিলুপ্ত করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত—তা ছাড়া, একটি জিনিস কিনব বলেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁকবার জন্যে ত ডাকিনি।

জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুটকণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আর কখনো সে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া বিজয়া হাসিল। স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কৈ দেখি আপনার যন্ত্র।

নরেন বাঁচিয়া গেল। এই যে দেখাই, বলিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বাক্স খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বসিবার ঘরটায় আলো কম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া বিজয়া পাশের ঘরটা দেখাইয়া কহিল, ও-ঘরে এখনো আলো আছে, চলুন, ঐখানে যাই।

তাই চলুন, বলিয়া সে বাক্স হাতে লইয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ছোট টিপয়ের উপর যন্ত্রটি স্থাপিত করিয়া উভয়ে দুই দিকে দুখানা চেয়ার লইয়া বসিল। নরেন কহিল, এইবার দেখুন। কি করে ব্যবহার করতে হয়, তার পরে আমি শিখিয়ে দেব।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই তাহারা ভাবিতেও পারে না কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিসটির ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এমনি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডও যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মুঠার ভিতর ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটির সাহায্যেই পাওয়া যায়। এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আহ্বান করিল। বিলাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার পরে তাহার জ্ঞানের পিপাসা এই জীবাণুতত্ত্বের দিকেই গিয়াছিল। তাই একদিকে যেমন ইহার সহিত তাহার পরিচয়ও একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংগ্রহও তেমনি অপর্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে-সমস্তই সে তাহার এই প্রাণাধিক যন্ত্রটির সহিত বিজয়াকে দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল এ-সকল না দিলে শুধু শুধু যন্ত্রটা লইয়া আর একজনের কি লাভ হইবে। প্রথমে ত বিজয়া কিছু দেখিতে পায় না—শুধু ঝাপসা আর ধোঁয়া। নরেন যতই আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে সে কি দেখিতেছে ততই তাহার হাসি পায়। সেদিকে তাহার চেষ্টাও নাই মনোযোগও নাই। দেখিবার কৌশলটা নরেন প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক কলকবজা নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাটা সহজ করিয়া তুলিবার বিধিমতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু দেখিবে কে? যে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর একজনের

বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিশ্বাসে তাহার এলোচুল উড়িয়া সর্বাঙ্গ কণ্ঠকিত করিতেছে, হাত হাতে ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে—তাহার কি আসে-যায় জীবাণুর স্বচ্ছদেহের অভ্যন্তরে কি আছে, না আছে, দেখিয়া? কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে, আর কে যক্ষ্মায় গৃহ শূন্য করিতেছে চিনিয়া রাখিয়া তাহার লাভ কি? করিলেও ত সে তাহাদের নিবারণ করিতে পারিবে না! সে ত আর ডাক্তার নয়! মিনিট-দশেক ধস্তাধস্তি করিয়া নরেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সোজা উঠিয়া বসিল; কহিল, যান, এ আপনার কাজ নয়। এমন মোটাবুদ্ধি আমি জন্মে দেখিনি।

বিজয়া প্রাণপণে হাসি চাপিয়া কহিল, মোটাবুদ্ধি আমার, না আপনি বোঝাতে পারেন না।

নিজের রূঢ় কথায় নরেন মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, আর কি করে বোঝাবো বলুন?

আপনার বুদ্ধি আর কিছু সত্যিই মোটা নয়, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, আপনি মন দিচ্চেন না। আমি বকে মরচি, আর আপনি মিছামিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নীচু করে শুধু হাসচেন।

কে বললে আমি হাসচি?

আমি বলচি।

আপনার ভুল।

আমার ভুল? আচ্ছা বেশ, যন্ত্রটা ত আর ভুল নয়, তবে কেন দেখতে পেলেন না?

যন্ত্রটা আপনার খারাপ, তাই!

নরেন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, খারাপ! আপনি জানেন এ রকম পাওয়ারফুল মাইক্রস্কোপ্ এখানে বেশী লোকের নেই! এমন স্পষ্ট দেখাতে—

বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অত্যন্ত ব্যগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া বিজয়ার মাথার সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল।

উঃ—করিয়া বিজয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন? শিঙ্ বেরোয়।

নরেনও হাসিল। কহিল, বেরোতে হলে আপনার মাথা থেকেই তাদের বার হওয়া উচিত।

তা বৈ কি! আপনার এই পুরোনো ভাঙা যন্ত্রটাকে ভালো বলিনি বলে, আমার মাথাটা শিঙ্ বেরোবার মত মাথা!

নরেন হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ শুষ্ক হইল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে সত্যি বলচি, ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই বলেই আপনার সন্দেহ হচ্চে আমি ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা করচি, কিন্তু আপনি পরে দেখবেন।

বিজয়া কহিল, পরে দেখে আর কি কোরব বলুন? তখন আপনাকে আমি পাবো কোথায়?

নরেন তিক্তস্বরে বলিল, তবে কেন বললেন, আপনি নেবেন? কেন মিথ্যে কষ্ট দিলেন?

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তখন আপনিই বা কেন না বললেন, এটা ভাঙা?

নরেন মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, একশবার বলচি ভাঙা নয়, তবু বলবেন ভাঙা?

কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, তাই ভাল। আমি আর তর্ক করতে চাইনে—এটা ভাঙাই বটে। আপনি আমার এইটুকুমাত্র ক্ষতি করলেন যে, কাল আর যাওয়া হল না। কিন্তু সবাই আপনার

মত অন্ধ নয়—কলকাতায় আমি অনায়াসেই বেচতে পারি, তা জানবেন। আচ্ছা, চললুম—বলিয়া সে যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পুরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, এখুনি যাবেন কি করে? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।

না, তার দরকার নেই।

দরকার আছে বৈ কি।

নরেন মুখ তুলিয়া কহিল, আপনি মনে মনে হাসচেন। আমাকে কি উপহাস করচেন?

কাল যখন খেতে বলেছিলাম, তখন কি উপহাস করেছিলাম? সে হবে না, আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন, আমি এখুনি আসচি, বলিয়া বিজয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সমস্ত ঘরময় রূপের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরেই সে স্বহস্তে খাবারের থালা এবং চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল। টিপয়টা খালি দেখিয়া কহিল, এর মধ্যে বন্ধ করে ফেলেচেন—আপনার রাগ ত কম নয়!

নরেন্দ্র উদাসকণ্ঠে জবাব দিল, আপনি নেবেন না তাতে রাগ কিসের? কিন্তু ভেবে দেখুন ত, এতবড় একটা ভারী জিনিস এতদূর বয়ে আনতে, বয়ে নিয়ে যেতে কত কষ্ট হয়!

থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু, কষ্ট ত আমার জন্য করেন নি, করেছেন নিজের জন্যে। আচ্ছা, খেতে বসুন, আমি চা তৈরি করে দিই।

নরেন খাড়া বসিয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, আচ্ছা, আমিই না হয় নেব, আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

নরেন্দ্র নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বলিল, আপনাকে দয়া করতে ত আমি অনুরোধ করিনি!

বিজয়া কহিল, সেদিন কিন্তু করেছিলেন, যেদিন মামার হয়ে বলতে এসেছিলেন।

সে পরের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। এ অভ্যাস আমার নয়!

কথাটা যে কতদূর সত্য, বিজয়ার তাহা অগোচর ছিল না। সেই হেতু একটু গায়েও লাগিল। কহিল, যাই হোক, ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না—এইখানেই থাকবে। আচ্ছা, খেতে বসুন।

নরেন সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

বিজয়া কহিল, কিছু একটা আছে বৈ কি।

জবাব শুনিয়া নরেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ করি, মনে মনে এই কারণটা অনুসন্ধান করিল, এবং পরক্ষণেই হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, সেইটে কি, তাই আমি আপনার কাছে স্পষ্ট শুনতে চাই। আপনি কি কেনবার ছলে কাছে আনিয়ে আটকাতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি ত তা হলে দেখচি আমাকেও আটকাতে পারেন? অনায়াসে বলতে পারেন, বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।

বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, কালীপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি করচিস? ও-গুলো নামিয়ে রেখে যা পান নিয়ে আয়।

ভৃত্য কেৎলি প্রভৃতি টেবিলের একধারে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে বিজয়া নিঃশব্দে নতমুখে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং অদূরে চৌকির উপর নরেন্দ্র মুখখানা রাগে হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞেয় ব্যাপার তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা শুনিয়াছে; কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় শুরু হইয়াছে, কি তাহার কার্য, কেমন তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস, এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনো শুনিয়াছে তাহার মনে হইল না। যে যন্ত্রটাকে সে এইমাত্র ভাঙ্গা বলিয়া উপহাস করিতেছিল তাহারই সাহায্যে কি অপূর্ব এবং অদ্ভুত ব্যাপার না তাহার দৃষ্টিগোচর হইল! এই রোগা এবং ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটা যে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, ইহাই ত বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু শুধু তাহাই নয়; জীবিতদের সম্বন্ধে ইহার জ্ঞানের গভীরতা, ইহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিবার অসামান্য শক্তির পরিচয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ সামান্য লোকের মত ইহাকে রাগাইয়া দেওয়াও কত না সহজ! শেষাশেষি সে কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানেও প্রবেশ করিতেছিল না। শুধু মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজের ঝোঁকে সে যখন নিজেই বকিয়া যাইতেছিল, শ্রোতাটি হয়ত তখন ইহার ত্যাগ, ইহার সততা, ইহার সরলতার কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

হঠাৎ এক সময়ে নরেনের চোখে পড়িয়া গেল যে সে মিথ্যা বকিয়া মরিতেছে। কহিল, আপনি কিছুই শুনচেন না।

বিজয়া চকিত হইয়া বলিল, শুনচি বৈ কি।

কি শুনলেন, বলুন তো?

বাঃ—একদিনেই বুঝি সবাই শিখতে পারে?

নরেন হতাশভাবে কহিল, না, আপনার কিছু হবে না। আপনার মত অন্যমনস্ক লোক আমি কোন কালে দেখিনি।

বিজয়া লেশমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, একদিনেই বুঝি হয়? আপনারই নাকি একদিনে হয়েছিল?

নরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আপনার যে একশ বচ্ছরেও হবে না। তা ছাড়া এ সব শেখাবেই বা কে?

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি। নইলে ঐ ভাঙা যন্ত্রটা কে নেবে?

নরেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।

বিজয়া কহিল, তা হলে ছবি-আঁকা শিখিয়ে দিন। সে ত শিখতে পারব?

নরেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাও না। যে বিষয়ে মানুষের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না, তাতেই যখন মন দিতে পারলেন না, মন দেবেন ছবি আঁকাতে? কিছুতেই না।

তা হলে ছবি-আঁকাও শিখতে পারব না?

না।

বিজয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, কিছুই শিখতে না পারলে কিন্তু মাথায় সত্যিই শিঙ্ বেরোবে।

তাহার মুখের ভাবে ও কথায় নরেন পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, সেই হবে আপনার উচিত শাস্তি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, তা বৈ কি। আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই তাই কেন বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি করছে, আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে বলে আসি। বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া, দ্বারের পর্দা সরাইয়া অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া থামিয়া গেল। সম্মুখেই

বসিবার ঘরের দুটা চৌকি দখল করিয়া পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী বসিয়া আছেন। বিলাসের মুখের উপর কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। বিজয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখন এলেন কাকাবাবু? আমাকে ডাকেন নি কেন?

রাসবিহারী শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রায় আধ-ঘণ্টা এসেছি মা। তুমি ও-ঘরে কথায়-বার্তায় ব্যস্ত আছ বলে আর ডাকিনি। ওই বুঝি জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?

পাশের ঘর পর্যন্ত শব্দ না পৌঁছায়, বিজয়া এমনি মৃদুস্বরে বলিল, একটা মাইক্রস্কোপ্ বিক্রি করে উনি এখান থেকে যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।

বিলাস ঠিক যেন গর্জন করিয়া উঠিল—মাইক্রস্কোপ্! ঠকাবার জায়গা পেলে না ও!

রাসবিহারী মৃদু র্ভৎসনার ভাবে ছেলেকে বলিলেন, ও কথা কেন? তার উদ্দেশ্য ত আমরা জানিনে—ভালও ত হতে পারে!

বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, যা জানিনে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করিনে। তার উদ্দেশ্য মন্দ নাও ত হতে পারে—কি বল মা? বলিয়া একটু থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিলেন, অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না, সেও ঠিক। তা সে যাই হোক গে, ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীন হলেও না হয় কখনো কালে-ভদ্রে দূরে-টুরে দেখতে কাজে লাগতেও পারে!—ও কে কালীপদ? ও ঘরে আলো দিতে যাচ্ছিস? অমনি বাবুটিকে বলে দিস আমরা কিনতে পারব না—তিনি যেতে পারেন।

বিজয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, তাঁকে বলেছি আমি নেব।

রাসবিহারী কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, নেবে? কেন? তাতে প্রয়োজন কি?

বিজয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কত দাম চান?

দু' শ টাকা।

রাসবিহারী দুই ভ্রূ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, দু'শ? দু'শ টাকা চায়? বিলাস তা হলে নেহাত—কি বল বিলাস, কলেজে তোমার এফ. এ. ক্লাসে কেমিস্ট্রীতে ত এসব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচ—দু'শ টাকা একটা মাইক্রস্কোপের দাম? কালীপদ, যা—ওঁকে যেতে বলে দে—এসব ফন্দি এখানে খাটবে না।

কিন্তু যাহাকে বলিতে হইবে, সে যে নিজের কানেই সমস্ত শুনিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কালীপদ যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া বিজয়া তাহাকে শান্ত অথচ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিয়া দিল, তুমি শুধু আলো দিয়ে এসো গে, যা বলবার আমি নিজেই বলব।

বিলাস শ্লেষ করিয়া তাহার পিতাকে কহিল, কেন বাবা, তুমি মিথ্যে অপমান হতে গেলে? ওঁর হয়ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকী আছে।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, কিন্তু ক্রোধে বিজয়ার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিলাস তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিয়া ফেলিল, আমরাও অনেক রকম মাইক্রস্কোপ্ দেখেচি বাবা, কিন্তু হো হো করে হাসবার বিষয় কখনো কোনটার মধ্যে পাইনি।

কাল খাওয়ানোর কথাও সে জানিতে পারিয়াছিল, আজ উচ্চহাস্যও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। বিজয়ার আজিকার বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈর্ষার বিষে সে এমনি জ্বলিয়া মরিতেছিল যে, তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকাবাবু?

রাসবিহারী অলক্ষ্যে পুত্রের প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিজয়াকে কহিলেন, কথা আছে বৈ কি মা! কিন্তু তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি?

একটু থামিয়া কহিলেন, আর—ভেবে দেখলাম, ওকে কথা যখন দিয়েচ, তখন যাই হোক সেটা নিতে হবে বৈ কি। দু'শ টাকা বেশী, না, কথাটার দাম বেশী! তা না হয়, ওকে কাল একবার এসে টাকাটা নিয়ে যেতে বলে দিক না মা?

বিজয়া এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি কাল কথা হতে পারে না কাকাবাবু?

রাসবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন মা?

বিজয়া মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া দ্বিধা-সংকোচ সবলে বর্জন করিয়া কহিল, ওঁর রাত হয়ে যাচ্চে—আবার অনেক দূর যেতে হবে। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার এই স্পর্ধিত প্রকাশ্যতায় বৃদ্ধ মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেও বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝকঝক করিতেছে, এবং কি-একটা সে বলিবার চেষ্টায় যেন যুদ্ধ করিতেছে। ধূর্ত রাসবিহারী অবস্থাটা চক্ষের নিমেষে বুঝিয়া লইয়া তাহাকে কটাক্ষে নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে কহিলেন, বেশ ত মা, আমি কাল সকালেই আবার আসব। বিলাস, অন্ধকার হয়ে আসচে বাবা, চল, আমরা যাই—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ছেলের বাহুতে একটু মৃদু আকর্ষণ দিয়া তাহার অবরুদ্ধ দুর্দাম ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়া সেই অবধি বিলাসের প্রতি একেবারেই চাহে নাই। সুতরাং তাহার মুখের ভাব ও চোখের চাহনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও মনে মনে সমস্ত অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালীপদ এ ঘরে বাতি দিতে আসিয়া কহিল, ও-ঘরে আলো দিয়ে এসেচি মা।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া নিজেকে সংযত করিয়া পরক্ষণে দ্বারের পর্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে এ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন ঘাড় হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিঃশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বিজয়ার কাছে ধরা পড়িল। একটুখানি চুপ করিয়া নরেন দুঃখের সহিত কহিল, এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। কি জানি কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলেন, আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা আমিও বলেচি, ওঁরাও বলে গেলেন।

বিজয়ার মনের ভিতরটায় তখনো জ্বালা করিতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অন্তরের দাহ দুই চক্ষে দীপ্ত হইয়া উঠিল; অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙে। আপনি সমস্ত কথা নিজের কানে শুনেছেন বলেই বলচি যে, আপনার সম্বন্ধে তাঁরা যে সব অসম্মানের কথা বলেছেন, সে তাঁদের অনধিকার চর্চা। কাল তাঁদের আমি তা বুঝিয়ে দেব।

অতিথির অসম্মান যে তাহার কিরূপ লাগিয়াছে নরেন তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু শান্ত সহজভাবে কহিল, আবশ্যক কি? এ সব জিনিসের ধারণা নেই বলেই তাঁদের সন্দেহ হয়েচে, নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের কোন লাভ নেই। আপনার নিজেরও ত প্রথমে নানা কারণে সন্দেহ হয়েছিল, সে কি অসম্মান করার জন্যে? তাঁরা আপনার আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার জন্যে তাঁদের ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে—আমি যাই।

কাল কি পরশু একবার আসতে পারবেন?

কাল কি পরশু? কিন্তু আর ত সময় হবে না। কাল আমি যাচ্ছি, অবশ্য কালই চলে যাওয়া হবে না, কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হবে। কিন্তু আর দেখা করবার—

বিজয়ার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে না পারিল মুখ তুলিতে, না পারিল কথা কহিতে। নরেন আপনিই একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি নিজে এত

হাসাতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় এমন রাগ হয়? আমিই বরঞ্চ একবার রেগে আপনাকে মোটাবুদ্ধি প্রভৃতি কত কি বলে ফেলেচি; কিন্তু তাতে ত রাগ করেন নি, বরঞ্চ মুখ টিপে হাসছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আপনাকে আমার সর্বদা মনে পড়বে—আপনি ভারী হাসাতে পারেন।

ক্ষান্ত-বর্ষণ বৃষ্টির জল দমকা হাওয়ায় যেমন করিয়া পাতা হইতে ঝরিয়া পড়ে, তেমনি শেষ কথাটায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিজয়ার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু পাছে হাত তুলিয়া মুছিতে গেলে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দে নতমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিতে লাগিল, এটা নিতে পারলেন না বলে আপনি দুঃখিত—বলিয়াই সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া এই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমিষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এ কি, আপনি কাঁদচেন?

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

এ সকল ব্যাপার সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। সে জীবাণুদের চিনে, তাহাদের নাম-ধাম, জ্ঞাতি-গোত্রের কোন খবর তাহার অপরিজ্ঞাত নয়, তাহাদের কার্যকলাপ রীতিনীতি সম্বন্ধে কখনো তাহার একবিন্দু ভুল হয় না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সমস্ত হিসাব তাহার নখাগ্রে—কিন্তু এ কি! যাহাকে নির্বোধ বলিয়া গালি দিলে লুকাইয়া হাসে, এবং শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তদগত হইয়া প্রশংসা করিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, এমন অদ্ভুত প্রকৃতির জীবকে লইয়া সংসারের জ্ঞানিলোকের সহজ কারবার চলে কি করিয়া! সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই বিজয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

ওটা আমার, আপনি রেখে দিন, বলিয়া কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেটা নামাইয়া রাখিয়া নরেন হতবুদ্ধির মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আরও মিনিট-খানেক চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া অবশেষে শূন্য-হাতে অন্ধকার পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল।

বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ব্যাগ আছে মালিক নাই। সে টাকা আনিতে নিজের ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না সামলাইতে যে এতক্ষণ গেছে, তাহার হুঁশ ছিল না। ডাক শুনিয়া কালীপদ বাহিরে আসিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে মুখে সাংসারিক কাজের বিরাট ফর্দ দাখিল করিয়া কহিল সে ভিতরে ছিল, জানেও না বাবু কখন চলিয়া গিয়াছেন। দরোয়ান কানাই সিং আসিয়া বলিল, সে ড়হর ডাল নামাইয়া চাপাটি গড়িতেছিল, কোন্ ফুরসতে যে বাবু চুপ্‌সে বাহির হইয়া গেছেন, তাহার মালুম নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিলাসবিহারীর প্রচণ্ড কীর্তি—পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল। একে একে অতিথিগণের সমাগম ঘটিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার নয়, আশপাশ হইতেও দুই-চারিজন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাল সেই শুভদিন। আজ সন্ধ্যায় রাসবিহারী তাঁহার আবাস-ভবনে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

সংসারে স্বার্থহানির আশঙ্কা কোন কোন বিষয়ী লোককে যে কিরূপ কুশাগ্রবুদ্ধি ও দূরদর্শী করিয়া তুলে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

সমবেত নিমন্ত্রিতগণের মাঝখানে বসিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া অর্ধমুদ্রিতনেত্রে তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ পরলোকগত বনমালীর উল্লেখ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান করে নিলেন—তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এতটুকু নালিশ নেই; কিন্তু সে যে আমাকে কি করে রেখে গেছে, আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতেও পারবেন না। যদিচ আমাদের সাক্ষাতের দিন প্রতিদিন নিকটবর্তী হয়ে আসচে, সে আভাস আমি প্রতিমুহূর্তেই পাই, তবুও সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর অসীম করুণায় সেই দিনটিকে যেন আরও সন্নিকটবর্তী করে দেন। এই বলিয়া তিনি জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ আত্ম-সমাহিত ভাবে মৌন থাকিয়া পুনরায় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যের খেলাধূলা, কিশোর বয়সের পড়াশুনা—তারপর যৌবনে সত্যধর্ম গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলেন, কিন্তু বনমালীর কোমল হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হল না—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য

করে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। উঃ—সে কি নির্যাতন! তথাপি মনে মনে বললাম, সত্যের জয় হবেই। তাঁর মহিমায় একদিন জয়ী হবই। সেই শুভদিন আজ সমাগত—তাই এখানে এতকাল পরে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বনমালী আমাদের মধ্যে আজ নেই—দু'দিন পূর্বেই তিনি চলে গেছেন; কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ওই, তিনি উপর থেকে আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করচেন। এই বলিয়া তিনি পুনরায় মুদিত নেত্রে স্থির হইলেন।

উপস্থিত সকলের মনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বিজয়ার দু'চক্ষে অশ্রু টলটল করিতে লাগিল। রাসবিহারী চক্ষু মেলিয়া সহসা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া। পিতার সর্বগুণের অধিকারিণী—কিন্তু কর্তব্যে কঠোর! সত্যে নির্ভীক! স্থির! আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী। এমনি অটল, এমনি দৃঢ়চিত্ত। এরা বাহিরে এখনও আলাদা হলেও অন্তরে—হ্যাঁ, আর একটি শুভদিন আসন্ন হয়ে আসচে যেদিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এঁদের সম্মিলিত নবীন-জীবন ধন্য হবে।

একটি অস্ফুট মধুর কলরবে সমস্ত সভাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহিলাটি পাশে বসিয়া ছিলেন, তিনি বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিলেন। রাসবিহারী একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, ঐ তাঁর একমাত্র সন্তান—এটি তাঁর চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু সমস্ত অপরাধ আমার। আজ আপনাদের সকলের কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি—এর জন্যে দায়ী আমি একা। পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত যে মানব-জীবন, এ শুধু আমরা মুখেই বলি, কিন্তু কাজে ত করি না! সে যে এত শীঘ্র যেতে পারে সে খেয়াল ত করলাম না!

এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব হইলেন। তাঁহার অনুতাপবিদ্ধ অন্তরের ছবি উজ্জ্বল দীপালোকে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, কিন্তু এবার আমার চৈতন্য

হয়েচে। তাই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে, এই আগামী ফাল্গুনের বেশী আর আমার বিলম্ব করবার সাহস হয় না। কি জানি, পাছে আমিও না দেখে যেতে পারি।

আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। রাসবিহারী দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বনমালী তাঁর যথাসর্বস্বের সঙ্গে মেয়েকেও যেমন আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমিও তেমনি ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার কর্তব্য সমাপন করে যাবো। ওঁরাও তেমনি আপনাদের আশীর্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ করে সত্যকে আশ্রয় করে কর্তব্য করুন। যেখান থেকে ওঁদের পিতাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল সেইখানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যধর্ম প্রচার করুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বৃদ্ধ আচার্য দয়ালচন্দ্র ধাড়া মহাশয় ইহার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন।

রাসবিহারী তখন বিজয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মা, তোমার বাবা নেই, তোমার জননী সাধ্বীসতী বহু পূর্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে এ কথা আজ আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হত না। লজ্জা করো না মা, বল, আজ এখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্যে আমন্ত্রণ করে রাখি।

বিজয়া কথা কহিবে কি ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ক্ষণকালমাত্র অপেক্ষা করিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও মা, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না—আমরা সমস্ত বুঝেছি।

তাহার পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিলেন, আমি আগামী ফাল্গুনেই আর একবার আপনাদের পদধূলির ভিক্ষা জানাচ্ছি।

সকলেই বার বার করিয়া তাঁদের সম্মতি জানাইতে লাগিলেন। বিজয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে—প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না।

রাসবিহারী চক্ষের পলকে ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ঠিক ত মা, ঠিক ত! এ যে আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মা কিনা, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধরে দিলে।

বিজয়া নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল। রাসবিহারী ইহাও লক্ষ্য করিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, সকলই তাঁর ইচ্ছা। একটু পরে কহিলেন, তাই হবে। কিন্তু তারও ত আর বিলম্ব নেই।

সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে। আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা হয়ে রইল। বিলাসবিহারী, বাবা, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে—কাল প্রভাত থেকে ত কাজের অন্ত থাকবে না,—আমাদের আহারের আয়োজনটা—না—না, চাকরদের উপর আর নির্ভর করা নয়—তুমি নিজে যাও,—চল, আমিও যাচ্ছি—তা হলে আপনাদের অনুমতি হলে আমি একবার—বলিতে বলিতেই তিনি পুত্রের পিছনে পিছনে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রীতি-ভোজনের কার্য সমাধা হইয়া গেল। আয়োজন প্রচুর হইয়াছিল, কোথাও কোন অংশে ত্রুটি পড়িল না। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, একটা থামের আড়ালে অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়া পালকির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাসবিহারী তাহাকে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন মা? এসো এসো—ঘরে বসবে এসো।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কাকাবাবু, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে মা?

না, লাগবে না।

রাসবিহারী তখন পাশে দাঁড়াইয়া ‘ঘরের লক্ষ্মী’ প্রভৃতি বলিয়া আর একদফা আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পাথরের মূর্তির মত নির্বাক হইয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, তোমাকে সে কথাটা বলতে একেবারেই ভুলে গেয়েছিলাম মা। সেই মাইক্রস্কোপের দামটা তাঁকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

আট-দশ দিন হইয়া গেল, নরেন্দ্র সেই যে সেটা রাখিয়া গেছে, আর আসে নাই। এই কয়টা দিন যে বিজয়ার কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে। তাহার পিসীর বাড়ির দূরত্বটাই সে জানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে যে কোথায় কোন্ গ্রামে তাহা জিজ্ঞাসা করে নাই। এই ভুলটা তাহাকে প্রতিমুহূর্তে তপ্ত শেলে বিঁধিয়া গেছে; কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এখন রাসবিহারীর কথায় সে চকিত হইয়া বলিল, কখন দিলেন?

রাসবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জানি তার পরের দিনেই হবে বুঝি। শুনলাম, তুমি সেটা কিনবে বলেই রেখেছ। কথা, কথা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে, তখন ঠকাই হোক আর যাই হোক, টাকা দেওয়াও হয়েছে—এই ত আমি সারা জীবন বুঝে এসেছি মা। দেখলাম সে বেচারার ভারী দরকার—টাকাটা হাতে পেলেই চলে যায়—গিয়ে যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করে। হাজার হোক সেও ত আমার পর নয় মা, সেও ত এক বন্ধুরই ছেলে। দেখলাম চলে যাবার জন্যে ভারী ব্যস্ত—পেলেই চলে যায়। আর তোমার দেওয়াও দেওয়া, আমার দেওয়াও দেওয়া। তাই তখনি দিয়ে দিলাম। তার ধর্ম তার কাছে—দশ টাকা বেশী নিয়ে থাকে, নিক।

বিজয়ার মুখের ভিতর জিভটা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল,—কিছুতেই যেন তার কথা ফুটিবে না এমনি মনে হইল। কিছুক্ষণের প্রবল চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল, কোথায় তাঁকে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী কেমন করিয়া জানি না, প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য বুঝিয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, না—না, বল কি, টাকাটা দু'বার করে নিলে নাকি? কিন্তু কৈ সে রকম ত তার মুখ দেখে মনে হল না? আর কাকেই বা দোষ দেব। এমনি করে লোকের কথায় বিশ্বাস করে ঠকতে ঠকতেই ত দাড়ি পাকিয়ে দিলাম। না হয়, আর দু''শ গেল। তা সে টাকাটা আমিই দেব—চিরকাল এই রকম দণ্ড বইতে বইতে কাঁধে কড়া পড়ে গেছে মা, আর লাগে না। যাক সে আমি—

বিজয়া আর কিছুতেই সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে ভয় করচেন কাকাবাবু? দু'বার করে টাকা নেবার লোক তিনি নন—না খেতে পেয়ে মরবার সময় পর্যন্ত নন। কিন্তু কোথায় দেখা হল? কবে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক বাঁচা গেল! টাকাটাও ত কম নয়—দু'শ যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ দেখা হতেই—কে দাঁড়িয়ে? বিলাস? পালকির কি হল, বল দেখি? ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে যে! যে কাজটা আমি নিজে না দেখব, তাই কি হবে না! বলিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া তিনি ও-ধারের একটা থামকে বিলাস কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এমন একদিন ছিল, যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু আজ শুধু বিলাস কেন, এতবড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় এবং কি-একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত সশঙ্কিত হইয়া ওঠে। এই জিনিসটাকেই সে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ সারিয়া পালকিতে উঠিয়া পর্যন্ত নানাদিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিতে করিতে বাটী আসিতেছিল।

তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব ঠিক কি ছিল, তাহা জানিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কোনমতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে, এ সম্ভাবনা কোন দিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

অথচ এই যে একটা অনাসক্ত উদাসীন লোক আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে সহসা ধূমকেতুর মত উঠিয়া আসিল এবং একনিমেষে তাহার বিশাল পুচ্ছের প্রচণ্ড তাড়নায় সমস্ত লণ্ডভণ্ড বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া তাহার সুনির্দিষ্ট পথের রেখাটা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কোথায় যে নিজে সরিয়া গেল—চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া গেল না—ইহা সত্য কিংবা নিছক স্বপ্ন ইহাই বিজয়া তাহার সমস্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া আজ ভাবিতেছিল। যদি স্বপ্ন হয় সে মোহ কেমন করিয়া কতদিনে কাটিবে, আর যদি সত্য হয় তবে তাহাই বা জীবনে কি করিয়া সার্থক হইবে?

ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছেও ঘেঁষিল না। আজ যে আশঙ্কাটা তাহার মনে বার বার উঠিতে লাগিল তাহা এই যে, যে-চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার চিত্তকে অহর্নিশ আন্দোলিত করিতেছে তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে, কিংবা সে শুধুই তাহার আকাশকুসুমের মালা? এর নিদারুণ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিয়া তাহাকে কে দিবে?

তাহার মা নাই, পিতাও পরলোকে; ভাই-বোন ত কোনদিনই ছিল না—আপনার বলিতে একা রাসবিহারী ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু, তিনিই বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। অথচ কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তিনি এমন তাড়া করিয়া তাহাকে তাহার আজন্ম-পরিচিত কলিকাতার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন সে আজ বিজয়ার কাছে জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে। এই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, আজ সমস্তই তাহার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বিদেশ যাত্রায় নরেনকে অযাচিত সাহায্য দান, নিজের গৃহে এই খাওয়ানোর আয়োজন, সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব, তাহার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন-সম্মতি বলিয়া অসংশয়ে প্রচার করা—তাহাকে সকল দিক দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে এই বৃদ্ধের চেষ্টা-পরম্পরার কিছুই আর তাহার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই।

কিন্তু রহস্য এই যে, অত্যাচার-উপদ্রবের লেশমাত্র চিহ্নও রাসবিহারীর কোন কাজে কোথাও বিদ্যমান নাই, অথচ বৃদ্ধের বিনম্র স্নেহসরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত বড় দুর্নিবার তাড়না যে তাহাকে অহরহ ঠেলিয়া জালের মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উপায়-বিহীনত্বের ছবিটা এমনি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও বিজয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্তের জন্য ঘুমাইতে পারিল না; তাহার পরলোকগত পিতাকে বারংবার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া

কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ‘বাবা, তুমি ত এঁদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন করে তাঁদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে?’

এক সময় সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেনের সর্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ-ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন পিতা এই সর্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না; কেন তাহারই বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া গেলেন? আর তাই যদি গেলেন, তবে কেন তাহার স্বাধীনতার পথ এমন করিয়া সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করিয়া গেলেন? সমস্ত উপাধান সিক্ত করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল তাহার এই ক্রুদ্ধ অভিমানের নিষ্‌ফল নালিশ আজ সেই স্বর্গবাসী পিতার কানে কি পৌঁছিতেছে না? আর প্রতিকারের উপায় কি তাহার হাতে আর একবিন্দুও নাই?

পরদিন পরেশের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। উঠিয়া শুনিল, তাহার বাহিরের ঘর নিমন্ত্রিতগণের অভ্যাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—শুধু সে-ই উপস্থিত নাই। এই ত্রুটি সারিয়া লইতে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে কি—আজিকার সারা দিনব্যাপী উৎসবের হাঙ্গামা মনে করিতেই তাহার ভারী যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিল।

শীতের প্রভাত-সূর্যালোক বাগানের আমগাছের মাথায় মাথায় ভরিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে সম্মুখের মাঠের উপর দিয়া রাখাল বালকেরা খেলা করিতে করিতে গরু চরাইতে চলিয়াছে। দেশে আসিয়া পর্যন্ত এই দৃশ্যটি দেখিতে তাহার কোন দিন ক্লান্তি জন্মে নাই। অনেক দিন অনেক দরকারী কাজ ফেলিয়াও সে বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজ সে ভাবিয়াই পাইল না এতদিন কি মাধুর্য ইহাতে ছিল! বরঞ্চ এ যেন

একটা অত্যন্ত পুরানো বাসী জিনিসের মত তাহার কাছে আগাগোড়া বিস্বাদ ঠেকিল। এই দৃশ্য হইতে সে তাহার শ্রান্ত চোখ-দুটি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইতেই দেখিতে পাইল, কালীপদ এক-এক লাফে তিন-তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া উপরে উঠিতেছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে মহাব্যস্ততার ইঙ্গিত জানাইয়া হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, মা শিগগির, শিগগির! ছোটবাবু ভয়ানক রেগে উঠেছেন। আজ এত দেরিও করতে আছে!

কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ একরাশি বারুদের মধ্যে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, ভৃত্যের এই সংবাদটাও বিজয়ার দেহ-মনে ঠিক তেমনি ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ সে কথা কহিতে পারিল না, তাহার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে অসহ্য দাহ ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। কালীপদ সেই চোখের পানে চাহিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি-একটা পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিতেই, বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি নীচে যাও কালীপদ—বলিয়া নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

এ বাটীতে 'ছোটবাবু' বলিতে যে বিলাসবিহারীকে এবং 'বড়বাবু' বলিতে তাহার পিতাকে বুঝায়, বিজয়া তাহা জানিত। কিন্তু এই দুটি পিতা-পুত্র এখানে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের ক্রোধের গুরুত্ব আজ চাকর-বাকরদের কাছে বাড়ির মনিবকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে, এ খবর বিজয়া এই প্রথম পাইল। আজ সে স্পষ্ট দেখিল, ইহারই মধ্যে বিলাস এখানকার সত্যকার প্রভু এবং সে নিজে তাহার শাসিত কৃপার পাত্রী। এ তথ্য যে তাহার মনের আগুনে জলধারা সিঞ্চিত করিল না তাহা বলাই বাহুল্য।

আধ-ঘণ্টা পরে সে যখন হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, তখন চা খাওয়া চলিতেছিল। উপস্থিত সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, এবং তাহার মুখ-চোখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলা অস্ফুট-কণ্ঠের উদ্বিগ্ন প্রশ্নও ধ্বনিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা বিলাসবিহারীর

তীব্র কটুকণ্ঠে সমস্ত ডুবিয়া গেল। সে তাহার চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ঘুমটা এ-বেলায় না ভাঙলেই ত চলত। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গস্‌টেড্ হয়ে উঠ্‌চি, এ কথা না জানিয়ে আর আমি পারলাম না।

বিরক্তি জানাইবার অধিকার তাঁহার আছে—এ একটা কথা বটে! কিন্তু এতগুলি বাহিরের লোকের সমক্ষে ভাবী স্বামীর এই কর্তব্যপরায়ণতা নিরতিশয় অভদ্রতার আকারেই সকলকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করিল। কিন্তু বিজয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। যেন কিছুই হয় নাই, এমনিভাবে সে সকলকেই প্রতি-নমস্কার করিয়া যেখানে বৃদ্ধ আচার্য দয়ালবাবু বসিয়াছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিজয়া তাঁহার কাছে গিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আপনার চা খাওয়ার কোন বিঘ্ন হয়নি ত? আমার অপরাধ হয়ে গেছে—আজ সকালে আমি উঠতে পারিনি।

বৃদ্ধ দয়াল স্নেহার্দ্র স্বরে একেবারেই 'মা' সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা, আমাদের কারও কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু কোথাও কোন ত্রুটি ঘটতে দেননি। কিন্তু তোমাকে ত তেমন ভাল দেখাচ্ছে না মা; অসুখ-বিসুখ ত কিছু হয়নি?

ইনি সর্বদা কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বিজয়া পূর্ব হইতে ইঁহাকে চিনিত না। কালও সে ভাল করিয়া ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়া দেখিবামাত্রই এই বৃদ্ধের শান্ত, সৌম্য মূর্তি যেন নিতান্ত আপনার জন বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিল এবং ইঁহার স্নিগ্ধ সুকোমল কণ্ঠস্বরে তাহার স্বর্গীয় পিতার কণ্ঠস্বরের আভাস জ্ঞাপন করিল।

দয়াল একটা কৌচের উপর বসিয়াছিলেন, পাশে একটু জায়গা ছিল। তিনি সেই স্থানটুকু নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দাঁড়িয়ে কেন মা, বোস এইখানে; অসুখ-বিসুখ ত কিছু করেনি?

বিজয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় বাঁকাইয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে যে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করিলেন। প্রত্যুত্তরে এবার বিজয়া মাথা নাড়িয়া কোনমতে শুধু কহিল, না।

এই ধরা-গলার সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না—তিনি মুহূর্তকালের জন্য মৌন থাকিয়া, ব্যাপারটা অনুভব করিয়া মনে মনে শুধু একটু হাসিলেন। যিনি এ বাটীর মালিকের জায়গাটি কিছু পূর্বেই দখল করিয়া বসিয়াছেন তিনি যদি তাঁর ভাবী-পত্নী গৃহস্বামিনীকে একটু তিক্ত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন ত আনাড়ীদের কাছে তাহা যত রূঢ়ই ঠেকুক, যাঁরা যৌবনের ইতিহাসটুকু পড়িয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন, তেমন জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ যদি মনে মনে একটু হাস্যই করেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তখন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা এই নবীনা অভিমানিনীটিকে সুস্থ হইবার সময় দিতে নিজেই ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়সেই এই সত্য-ধর্মের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির অসংখ্য প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, ভগবানের আশীর্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; কিন্তু মা, যে মন্দির তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, তাকে বজায় রাখতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হবে। আমি নিজেও ত পাড়াগাঁয়েই থাকি; আমি বেশ দেখছি, এ ধর্ম এখনও আমাদের পল্লীসমাজের রস নিয়ে যেন বাঁচতেই চায় না। তাই আমার মনে হয়, একে যদি যথার্থই জীবিত রাখতে পার মা, এ দেশে একটা সত্যিই বড় সমস্যার মীমাংসা হবে। তোমাদের এই উদ্যমকে আমি যে কি বলে আশীর্বাদ করব এ আমি ভেবেই পাইনে।

বিজয়ার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বলে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমার আর কোন উৎসাহ নেই, এর লেশমাত্র সার্থকতা আর আমি দেখতে পাইনে। কিন্তু,

সে কথা চাপিয়া গিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, একটা জটিল সমস্যার সমাধান হবে আপনি কেন বলছেন?

দয়াল কহিলেন, তা বৈ কি মা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বাঙলার পল্লীর সহস্রকোটি কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে শুধু আমাদের এই ধর্মই পারে। কিন্তু এও জানি, যার যেখানে স্থান নয়, যার যেখানে প্রয়োজন নেই, সে সেখানে বাঁচে না। কিন্তু চেষ্টায়, যত্নে যদি একটিকেও বাঁচাতে পারা যায়, সে কি মস্ত একটা আশা-ভরসার আশ্রয় নয়? আমাদের বাঙালী-ঘরের দোষ-গুণের কথা তুমি নিজেও ত কম জানো না, সেইগুলি সব অন্তরের মধ্যে ভাল করে একটুখানি তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি।

বিজয়া আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাহার মধ্যে যথার্থই স্বাভাবিক ছিল, আচার্যের শেষ-কথাটায় তাহাই আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংস্পর্শে একটা মস্ত নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাতেই পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছিল। সে বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ প্রতিঘাত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই ক্রোধ ও বিরক্তিতে প্রায় অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দয়াল যখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্তি ও স্নিগ্ধকণ্ঠের আহ্বানে বিলাসের চেষ্টার এই বিশেষ দিকটায় চোখ মেলিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বিজয়া সত্য সত্যই যেন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয়ত বাস্তবিকই হৃদয়হীন এবং ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয়ত প্রবল ধর্মানুরক্তির একটা প্রকাশমাত্র। মানুষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। তাহার মনে পড়িল, সে কোথায় যেন পড়িয়াছে, সংসারে সকল বড় কার্যই কাহারো-না-কাহারো ক্ষতিকর হয়; যাঁহারা এই কার্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকের মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেই জন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্মম ও

নিষ্ঠুরের মত দেখিতে হন। চিরদিনের শিক্ষা ও সংস্কারবশে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ বিজয়ার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সেই ধর্মের বিস্তৃতিতে দেশের এতখানি মঙ্গল নির্ভর করিতেছে শুনিয়া তাহার উচ্চশিক্ষিত সত্যনিষ্ঠ মন বিলাসকে অন্তরে ক্ষমা না করিয়া পারিল না। এমন কি, সে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, 'সংসারে যাহারা বড় কাজ করিতে আসে তাহাদিগের ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেই তাহাদিগকে দোষী করা অসঙ্গত, এমন কি অন্যায়; এবং অন্যায়কে অন্যায় বুঝিয়া কোন কারণেই প্রশ্রয় দিতে পারিব না।'

বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে উঠিতেছিলেন। বিজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী ছেলেকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কি একটা কথা বলিবার পরে, বিলাস এই সুযোগটার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল, তোমার শরীরটা কি আজ সকালে ভাল নেই বিজয়া?

আধ-ঘণ্টা পূর্বেও হয়ত বিজয়া প্রশ্নটাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যা হোক একটা-কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু, এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সহজভাবে বলিল, না, ভালই আছি। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বলেই বোধ করি একটু অসুস্থ দেখাচ্চে।

বিলাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। নিজের সমূহ ক্ষতি বুঝিয়াও আত্মসংবরণ করিতে পারে না। বিলাস তাহাদেরই একজন। তাহার প্রতি বিজয়ার আচরণ প্রতিদিন যতই অপ্রীতিকর হইতেছিল, তাহার নিজের আচরণও ততোধিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ঘাত-প্রতিঘাতের আগুন প্রতি মুহূর্তেই যখন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল, এবং পক্বকেশ অভিজ্ঞ পিতার পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুযোগ সহিষ্ণুতার পরম লাভ ও চরম সিদ্ধির নিভৃত গভীর উপদেশ অনভিজ্ঞ উদ্ধত পুত্রের কোন কাজেই লাগিতেছিল না, তখন

বিজয়ার মুখের এই একটিমাত্র কোমল বাক্য বিলাসের স্বভাবটাকেই যেন বদলাইয়া দিল। সে স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ যতদূর সাধ্য কোমল করিয়া কহিল, তা হলে তুমি এ-বেলায় রোদে আর বার হয়ো না। সকাল সকাল স্নানাহার সেরে যদি একটু ঘুমোতে পার, সেই চেষ্টা করো। সিজন চেঞ্জের সময়টা ভাল নয়— অসুখ-বিসুখ না হয়ে পড়ে। এই বলিয়া মুখের চেহারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বোধ করি বা নিজের ব্যবহারের জন্য একবার ক্ষমা চাহিতেও উদ্যত হইল; কিন্তু এ বস্তুটা তাহার স্বভাবে নাকি একেবারেই নাই, তাই আর কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে ভদ্রলোকদিগের অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যতদূর দেখা যায় বিজয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল, আজ তাহার অকস্মাৎ বোধ হইল, সেটার যেন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের বিশেষ একটা জায়গায় দুখানা ভাল চেয়ার আজ পাশাপাশি রাখা হইয়াছিল। তাহার একটাতে যখন অত্যন্ত সমারোহের সহিত বিজয়াকে বসান হইল, তখন পার্শ্বের অন্য আসনটা যে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পলকের জন্য বিজয়ার মনের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই বিলাস আসিয়া যখন তাহার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তখন সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশী সময় লাগিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পোড়া তুবড়ির খোলাটার ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর মত এই ব্রাহ্মমন্দির হইতেও পাছে সমারোহশেষে লোকের দৃষ্টি অবজ্ঞায় অন্যত্র সরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিলাসবিহারী উৎসবের জেরটা যেন কিছুতেই আর নিকাশ করিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু যাঁহারা নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়িঘর আছে, কাজকর্ম আছে, পরের খরচে কেবল আনন্দে মাতিয়া থাকিলেই চলে না, সুতরাং শেষ একদিন তাহাদের করিতেই হইল। সেদিন বৃদ্ধ রাসবিহারী ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া শেষের দিকে বলিলেন, যাঁহার অসীম করুণায় আমরা পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে পারিয়াছি, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম, নিরাকার পরমব্রহ্মের পাদপদ্মে এই মন্দির যাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণ হোক। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে অচির-ভবিষ্যতে সেই দুটি নির্মল নবীন জীবন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইবে—সেই শুভ-মুহূর্ত দেখিতে ভগবান যেন আমাদের জীবিত রাখেন। এই বলিয়া সেই দুটি নবীন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মা বিজয়া, বিলাস, তোমরা এঁদের প্রণাম কর। আপনারাও আমার সন্তানদের আশীর্বাদ করুন।

বিজয়া ও বিলাস পাশাপাশি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রবীণ ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিল, তাঁহারাও অস্ফুটকণ্ঠে ইহাদের আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পরে সভাভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পর বিজয়া যখন বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার মনের মধ্যে কোন বিরোধ, কোন চাঞ্চল্য ছিল না। ধর্মের আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আপনাকে আপনি কেবলই বলিতে লাগিল,

'পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়—বরঞ্চ ধর্মের জন্য, পরের জন্য সে সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়ঃ।'

বিলাসের সহিত তাহার মতের আর কোথাও যদি মিল না হয়, ধর্ম সম্বন্ধে যে তাহাদের কোন দিন অনৈক্য ঘটিবে না, একথা সে জোর করিয়াই নিজেকে বুঝাইল। বিছানায় শুইয়াও সে বার বার ইহাই কহিতে লাগিল—এ ভালই হইল যে তাহার মত একজন স্থিরসংকল্প, স্বধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ লোকের সহিত তাহার জীবন চিরদিনের জন্য মিলিত হইতে যাইতেছে। ঈশ্বর তাহার দ্বারা নিজের অনেক কার্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন বলিয়াই এমন করিয়া তাহার মনের গতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন বিলাস সকলকেই করজোড়ে আবেদন করিল, তাঁহারা যদি অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া আসিয়াও মন্দিরের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ত, তাহারা আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। এ অনুরোধ অনেকেই স্বীকার করিয়াই বাড়ি গেলেন।

রাসবিহারী আসিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, তোমরা মন্দিরের স্থায়িত্ব যদি কামনা কর ত দয়ালবাবুকে এখানে রাখবার চেষ্টা কর।

বিজয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সম্ভব কাকাবাবু?

রাসবিহারী হাসিয়া কহিলেন, সম্ভব না হলে বলব কেন মা? তাঁকে ছেলেবেলা থেকে জানি—এক রকম আমারই বাল্যবন্ধু। অবস্থা ভাল না হলেও দয়াল খাঁটি লোক। তোমার জমিদারিতে কোন একটা কাজ দিয়ে তাঁকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। মন্দিরের বাড়িতেও ঘরের অভাব নেই, স্বচ্ছন্দে দু-চারটে ঘর নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে পারবেন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি বিজয়ার সত্যকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক হীনাবস্থা শুনিয়া সেই শ্রদ্ধায় করুণা যোগ দিল। সে তৎক্ষণাৎ

রাসবিহারীর প্রস্তাব আনন্দে অনুমোদন করিয়া বলিল, ওঁকে এইখানেই রাখুন। আমি সত্যই ভারী খুশী হব কাকাবাবু।

তাহাই হইল। দয়াল আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। পৌষ শেষ হইয়া মাঘের মাঝামাঝিতে আসিয়া পৌঁছিল। জমিদারি এবং মন্দিরের কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল—কোথাও যে কোন বিরোধ বা অশান্তি আছে তাহা কাহারও কল্পনায় উদয় হইল না।

নরেন্দ্রের কোন সংবাদ নাই। থাকিবার কথাও নহে। শুধু দু'দিনের জন্য সে দেশে আসিয়াছিল, দু'দিন পরে চলিয়া গেছে। তবে একটা ব্যথা বিজয়ার মনে বাজিত, যখনই সেই মাইক্রস্কোপ্‌টার প্রতি তাহার চোখ পড়িত। আর কিছু নয়—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশি করিয়াও জিনিসটার দাম দেওয়া হইত। আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দু'দিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি এই লোকটার প্রতি এত মমতা জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। না হইলে, মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই—কিন্তু, সারাজীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। তাই, সেই দু'দিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত, তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত। এমনি করিয়া মাঘ মাসও শেষ হইয়া গেল।

ফাল্গুনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়া চারিদিকে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। দিন-দুই হইতে দয়ালবাবু জ্বরে পড়িয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিজয়া কাপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিল। বুড়া দরোয়ান কানাই সিং লাঠি আনিতে তাহার ঘরে গিয়াছিল, এবং সেই অবকাশে বাহিরের ঘরে বসিয়া বিজয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া লইতেছিল।

নমস্কা—র।

বিজয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেছে।

তাহার হাতের পেয়ালা হাতে রহিল, শুধু অভিভূতের মত নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। না করিল প্রতি-নমস্কার, না বলিল বসিতে।

একটা চেয়ারের পিঠে নরেন্দ্র তাহার লাঠিটা হেলান দিয়া রাখিল, আর একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল; কহিল, এ কাজটা আমারও এখনো সারা হয়নি—আর এক পেয়ালা চা আনতে হুকুম করে দিন ত।

দিই, বলিয়া বিজয়া হাতের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কালীপদকে বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তথাপি এ কথা স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারো সহিত সহজভাবেই কথাবার্তা অসম্ভব। মিনিট পাঁচ-ছয় সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যখন দেখিল, কালীপদ চা লইয়া যাইতেছে, তখন সেও তাহার পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কালীপদ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়েছেন। আপনি কোথাও বার হচ্ছিলেন, আমি এসে বাধা দিয়েচি। কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশী আপনাকে আটকে রাখব না।

বিজয়া কহিল, আচ্ছা, আগে আপনি চা খান। বলিয়া হঠাৎ পশ্চিমদিকের জানালাটার প্রতি নজর পড়ায় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও জানালাটা কে খুলে দিয়ে গেল?

নরেন্দ্র বলিল, কেউ না, আমি।

কি করে খুললেন?

যেমন করে সবাই খোলে—টেনে। কোন দোষ হয়েছে?

বিজয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না; এবং মুহূর্ত কয়েক তাহার লম্বা সরু সরু আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার আঙুলগুলো কি লোহার? ঐ জানালাটা বন্ধ থাকলে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা না দিয়ে শুধু টেনে খুলতে পারে, এমন লোক আমি দেখিনি।

কথা শুনিয়া নরেন হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। এ সেই হাসি। মনে পড়িয়া বিজয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসি থামিলে নরেন সহজভাবে কহিল, সত্যি, আমার আঙুলগুলো ভারী শক্ত। জোরে টিপে ধরলে যে-কোন লোকের বোধ করি হাত ভেঙ্গে যায়।

বিজয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। ঢুঁ মারলে—

কথাটা শেষ না হইতেই নরেন আবার তেমনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এই লোকটির হাসি প্রভাতের আলোর মত এমনি মধুর, এমনি উপভোগের বস্তু যে, কোনমতেই যেন লোভ সংবরণ করা যায় না।

নরেন পকেট হইতে দু'শ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, সেইজন্যেই এসেছি। আমি জোচ্চোর, আমি ঠক, আরও কত কি গালাগালি ওই ক'টা টাকার জন্যে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপনার টাকা নিন—দিন আমার জিনিস।

বিজয়ার মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, আর কি কি বলে পাঠিয়েছিলুম, বলুন ত?

নরেন কহিল, অত আমার মনে নেই। সেটা আনতে বলে দিন, আমি সাড়ে ন'টার গাড়িতেই কলকাতা ফিরে যাবো। ভাল কথা, আমি কলকাতাতেই বেশ একটা চাকরি পেয়েচি—অতদূর আর যেতে হয়নি।

বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার ভাগ্য ভাল।

নরেন বলিল, হাঁ। কিন্তু আমার আর সময় নেই, ন'টা বাজে—চক্ষের নিমিষে বিজয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল; কিন্তু নরেন তাহা লক্ষ্যও করিল না, কহিল, আমাকে এখুনি বার হতে হবে—সেটা আনতে বলে দিন।

বিজয়া তাহার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, এই শর্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল যে, আপনি দয়া করে টাকা এনেছেন বলেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?

নরেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, না, তা নয় সত্যি; কিন্তু আপনার ত ওতে দরকার নেই।

আজ নেই বলে কোন দিন দরকার হবে না এ আপনাকে কে বললে?

নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি বলচি, ও জিনিস আপনার কোন কাজেই লাগবে না। অথচ, আমার—

বিজয়া উত্তর দিল, তবে যে বিক্রি করে যাবার সময় বলেছিলেন, ওটা আমার অনেক উপকারে লাগবে! আমাকে ঠকিয়ে গেছেন বলে পাঠিয়েছিলুম বলে আপনি আবার রাগ কচ্চেন? তখন এক রকম কথা আর এখন একরকম কথা?

নরেন লজ্জায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেখুন, তখন ভেবেছিলুম, অমন জিনিসটা আপনি ব্যবহারে লাগাবেন, এ রকম ফেলে রেখে দেবেন না। আচ্ছা, আপনি ত জিনিস বাঁধা রেখেও টাকা ধার দেন, এও কেন তাই মনে করুন না! আমি এ টাকার সুদ দিচ্চি।

বিজয়া কহিল, কত সুদ দেবেন?

নরেন্দ্র বলিল, যা ন্যায্য সুদ আমি তাই দিতে রাজী আছি।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি রাজী নই। কলকাতায় যাচাই ক'রে দেখিয়েচি ওটা অনায়াসে চার শ' টাকায় বিক্রি করতে পারি।

নরেন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ তাই করুন গে—আমার দরকার নেই। যে দু'শ টাকায় চারশ টাকা চায়, তাকে আমি কিছুই বলতে চাইনে।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণে হাসি দমন করিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন কেবল এই লোকটি ছাড়া সংসারে আর কাহারও কাছে বোধ করি সে আত্মগোপনে করিতে পারিত না। কিন্তু সেদিকে নরেনের দৃষ্টিই ছিল না। সে তীক্ষ্ণভাবে কহিল, আপনি যে একটি শাইলক, তা জানলে আমি আসতাম না।

বিজয়া ভাল-মানুষটির মত কহিল, দেনার দায়ে যখন আপনার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে নিয়েছিলুম তখনও ভাবেন নি?

নরেন কহিল, না। কেন না, তাতে আপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দু'জনে করে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্যে অপরাধী নই। আচ্ছা, আমি চললুম।

বিজয়া কহিল, খেয়ে যাবেন না?

নরেন উদ্ধতভাবে কহিল, না, খাবার জন্যে আসিনি।

বিজয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার—আপনি হাত দেখতে জানেন?

এইবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ধরা পড়িয়া গেল। নরেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? টাকা আপনার ঢের থাকতে পারে, কিন্তু সে জোরে ও-অধিকার কারও জন্মায় না জানবেন—আপনি একটু হিসেব করে কথা কইবেন; বলিয়া সে লাঠিটা তুলিয়া লইল।

বিজয়া কহিল, নইলে আপনার গায়ে জোর আছে, এবং হাতে লাঠি আছে এই ত?

নরেন লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া হতাশভরে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, ছি ছি—আপনি যা মুখে আসে তাই বলচেন। আপনার সঙ্গে আর পারিনে।

কিন্তু মনে থাকে যেন। বলিয়া আর সে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

একাকী ঘরের মধ্যে নরেন হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার জন্যই আমার যখন দেরি হয়ে গেল, তখন আপনারও চলে যাওয়া হবে না। আপনি হাত দেখতে জানেন—চলুন আমার সঙ্গে।

নরেন যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করিল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে হাত দেখতে?

তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইবার বিজয়া গম্ভীর হইল, কহিল, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। আমাদের যিনি নূতন আচার্য হয়ে এসেছেন—তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—আজ দু'দিন হ'ল তাঁর ভারী জ্বর হয়েছে; চলুন, একবার দেখে আসবেন।

আচ্ছা চলুন।

বিজয়া কহিল, তবে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটিকে ত আপনি চেনেন—তিন-চার দিন তারও জ্বর। তার মাকে আনতে বলে দিয়েচি। বলিতে বলিতেই পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ছেলের সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়িটা দেখে একটু ওষুধ-টষুধ যদি দিতেন—

নরেন কহিল, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া-টাওয়া লাগিয়ো না, ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি।

মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এদিকে ভারী বসন্ত হচ্ছে—একটু সাবধানে রাখ্‌তে বলে দেবেন।

বিজয়ার মুখ কালি হইয়া গেল—বসন্ত! বসন্ত হবে কেন?

নরেন কহিল, হবে কেন, সে অনেক কথা। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু কাল ওর পানে চাইলেই জানতে পারবেন। আমার মনে হচ্চে, আপনার আচার্যবাবুকেও আর দেখবার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কাল-পরশুই টের পাবেন।

ভয়ে বিজয়ার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু—আমারও কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।

নরেন হাসিল, কহিল, ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েচে তা আপনার ভয়। বেশ ত, জ্বরই যদি একটু হয়ে থাকে তাতেই বা কি? আশেপাশে বসন্ত দেখা দিয়েছে বলেই যে গ্রামসুদ্ধ সকলেরই তাই হতে হবে তার কোন মানে নেই।

বিজয়ার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল, কহিল, হলেই বা আমাকে দেখবে কে? আমার কে আছে?

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, দেখবার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিছু হবে না আপনার।

বিজয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, না হলেই ভাল। কিন্তু কাল রাত্রে আমার সত্যিই খুব জ্বর হয়েছিল। তবুও সকালবেলা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দয়ালবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলুম।

এখনও আমার একটু একটু জ্বর রয়েছে, এই দেখুন—বলিয়া সে ডান হাত বাড়াইয়া দিল। নরেন কাছে গিয়া তাহার কোমল শিথিল হাতখানি নিজের শক্তিমান কঠিন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুহূর্তকাল পরেই ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আজ আর কিছু খাবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন গে। কোন ভয় নেই, কাল-পরশু আবার আমি আসব।

আপনার দয়া—বলিয়া বিজয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কথাটা তীরের মত গিয়া নরেনের মর্ম্মমূলে বিঁধিল। প্রত্যুত্তরে আর সে কোন কথাই বলিল না বটে, কিন্তু নীরবে লাঠিটি তুলিয়া লইয়া যখন ঘরের বাহির হইয়া গেল তখন এই ভয়ার্ত রমণীর অসহায় মুখের দয়া-ভিক্ষা তাহার বলিষ্ঠ পুরুষ-চিত্তকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত মথিত করিতে লাগিল।

পরদিন কাজের ভিড়ে কোনমতেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে পা দিতেই কালীপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, মায়ের বড় জ্বর বাবু, আপনি একেবারে ওপরে চলুন।

নরেন্দ্র বিজয়ার ঘরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন সে প্রবল জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। কে একজন প্রৌঢ়া নারী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে এবং অদূরে চৌকির উপর পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী মুখ ভয়ানক গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়ের কাহারই চিত্ত যে ডাক্তারের আগমনে আশায় ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল না তাহা না বলিলেও চলে।

বিলাসবিহারী ভূমিকার লেশমাত্র বাহুল্য না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নাকি পরশু এসে বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?

কথাটা এতবড় মিথ্যা যে হঠাৎ কোন জবাব দিতেই পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া বিজয়া রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তাহার পরে দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, আসুন।

নিকটে আর কোন আসন না থাকায় নরেন তাহার শয্যার একাংশে গিয়াই উপবেশন করিল। চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হতো না—আমি সমস্ত দিন পথ পানে চেয়েছিলাম।

নরেন্দ্র ডাক্তার—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রবল জ্বর উগ্র নেশার মত অনেক আশ্চর্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে না অন্তরে কোথাও হয়ত থাকে না। কিন্তু অনতিদূরে বসিয়া দুর্ভাগ্য পিতা-পুত্রের মাথায় চুল পর্যন্ত ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নরেন সহজে সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্নমুখে কহিল, ভয় কি, জ্বর দু'দিনেই ভাল হয়ে যাবে।

তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত করুণসুরে কহিল, কিন্তু আমি ভাল না-হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চলে গেলে আমি হয়ত বাঁচব না।

জবাব দিতে গিয়া নরেন মুখ তুলিতেই দুইজোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। দেখিল, একান্ত সন্নিকটবর্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বাহ্নে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—বিজয়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইল না। চোখের হিংস্র-দৃষ্টি শুধু মানুষ কেন, অনেক জানোয়ার পর্যন্ত বুঝিতে পারে। সুতরাং এই লোকটি যত সোজা মানুষ হোক, এবং সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার যতই অল্প থাকুক, এ কথাটা সে একনিমেষেই টের পাইল যে ওই চেয়ারে আসীন পিতা-পুত্রের চোখের চাহনিতে আর যে ভাবই প্রকাশ করুক,হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করে নাই। ইঁহারা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা সে জানিত। সে মাইক্রস্কোপ্‌টা বিজয়াকে দেখাইতে আসিয়া সে নিজের কানেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিল; এবং রাসবিহারী চাকরের হাতে যেদিন তাহার দাম পাঠাইয়াছিলেন সেদিনও হিতোপদেশ-ছলে বৃদ্ধ কম কটু কথা শুনাইয়া আসেন নাই। কিন্তু সে যখন সত্যই ঠকাইয়া যায় নাই, এবং জিনিষটা আজ যখন দুই শতের স্থানে চারি শত ঘুরাইয়া আনিতে পারে, যাচাই হইয়া গেছে, তখন সেদিক দিয়া কেন যে এখনো তাঁহাদের রাগ থাকিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর এই বসন্তের ভয় দেখাইয়া যাওয়া! কিন্তু সে ত ভয় দেখাইয়া যায় নাই—বরঞ্চ ঠিক উলটা। এ মিথ্যা আর কেহ প্রচার করিয়াছে, কিংবা বিজয়ার নিজের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পূর্বেই বিলাসবিহারী আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ভৃত্য কালীপদ বোধ করি নিছক কৌতূহলবশেই পর্দা একটুখানি ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়াছিল, বিলাসের চোখে পড়িতেই সে একেবারে হিন্দী-গর্জন ছাড়িল। খুব সম্ভব, হিন্দীভাষায় অধিক রোক্ প্রকাশ পায়। কহিল, এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুরসী লাও।

ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। কালীপদ ‘শূয়ারকা বাচ্চা’ এবং ‘লাও’ কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, কিন্তু ‘কুরসী’ বস্তুটি যে কি, তাহার আন্দাজ করিতে

না পারিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাসবিহারী নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ও ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসো কালীপদ, বাবুকে বসতে দাও। কালীপদ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে তিনি ছেলের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শান্ত-উদারকণ্ঠে বলিলেন, রোগা-মানুষের ঘর—অমন হেস্টি হয়ো না বিলাস। টেম্পার লুজ করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না।

ছেলে উদ্ধতভাবে জবাব দিল, মানুষ এতে টেম্পার লুজ করে না ত করে কিসে শুনি? হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে যে ভদ্রমহিলার সম্মান রাখতে পর্যন্ত জানে না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায় বিজয়ারও ঠিক তেমনি জ্বরের আচ্ছন্ন ঘোরটা ঘুচিয়া গেল। সে নিঃশব্দে নরেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কালীপদ তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিয়া রাখিয়া যাইতেই নরেন্দ্র বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাতে বসিল। রাসবিহারী বিজয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটু প্রসন্ন হাস্য করিয়া পুত্রকেই উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন, আমি সমস্তই বুঝি বিলাস। এ ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক, তাও মানি, কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে সবাই ইচ্ছা করে অপরাধ করে না। সকলেই যদি সব রকম রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার জানত, তা হলে ভাবনা ছিল কি? সেই জন্যে রাগ না করে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয়।

এই দোষ-ত্রুটি যে কাহার, তা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিলাস কহিল, না বাবা, এ-রকম impertinence সহ্য হয় না। তা ছাড়া আমার এ বাড়ির চাকরগুলো হয়েছে যেমন হতভাগা তেমনি বজ্জাত। কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর করে তবে ছাড়ব।

রাসবিহারী আবার একটু হাস্য করিয়া সস্নেহ তিরস্কারের ভঙ্গীতে এবার বোধ করি ঘরের দেওয়ালগুলোকে শুনাইয়া বলিলেন, এর মন খারাপ হয়ে থাকলে যে কি বলে, তার ঠিকানাই নেই। আর শুধু ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্যন্ত অসুখ শুনে কি-রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম! বাড়িতেই হল একজনের বসন্ত, তার উপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্র কোন কথা কহে নাই; এইবার সে বাধা দিয়া কহিল, না, আমি কোন রকম ভয় দেখিয়ে যাইনি।

বিলাস মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া সতেজে কহিল, আল্‌বৎ ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালীপদ সাক্ষী আছে।

নরেন কহিল, কালীপদ ভুল শুনেচে।

প্রত্যুত্তরে বিলাস আর একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, তাহার পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, আঃ—কি কর বিলাস? উনি যখন অস্বীকার করছেন, তখন কি কালীপদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।

তথাপি বিলাস কি যেন বলিবার প্রয়াস করিতেই বৃদ্ধ কটাক্ষে নিষেধ করিয়া বলিলেন, এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না বিলাস, স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও আমি ত ভেবে পাইনে।

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা বলেই থাকেন তাতেই বা কি? কত পাস-করা ভাল ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারের যে ভ্রম হয়, উনি ত ছেলেমানুষ। বলিয়া নরেন্দ্রের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, যাক—জ্বর ত তা হলে অতি সামান্যই আপনি বলছেন? চিন্তা করবার ত কোন কারণ নেই এই ত আপনার মত?

নরেন্দ্র আসিয়া পর্যন্ত অনেক অপমান নীরবে সহিয়াছিল, কিন্তু এইবার একটা বাঁকা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, আমার বলায় কি আসে যায় বলুন? আমার ওপর ত নির্ভর করছেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর মতামত নেবেন।

কথাটার নিহিত খোঁচা যাই থাক, এ জবাব দিবার তাহার অধিকার ছিল। কিন্তু বিলাস একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া মারমুখী হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—তুমি কার সঙ্গে কথা কইচ মনে করে কথা কয়ো বলে দিচ্চি। এ ঘর না হয়ে আর কোথাও হলে তোমার বিদ্রূপ করা—

এই লোকটার কারণে-অকারণে প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য—কোথায় তাহার ব্যবহারের মধ্যে কি অপরাধ ঘটিতেছে কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। আসল কারণ হইতেছে এই যে, কোথায় যে ওই লোকটার অন্তর্দাহ, নরেন্দ্র তাহা আজিও জানিত না। বিজয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশীর দল যখন বিলাসের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত, তখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এই নবীন বৈজ্ঞানিকের অখণ্ড মনোযোগ কীটাণুকীটের সম্বন্ধ-নিরূপণেই ব্যাপৃত থাকিত; গ্রামের জনশ্রুতি তাহার কানে পৌঁছিত না। তাহার পরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যখন কথাটা পাকা হইয়া রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকি রহিল না তখন সে কলিকাতায় চলিয়া গেছে। আজ পিতা-পুত্রের কথার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে কি যেন একটা অনির্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথার মত তাহাকে বাজিতেছিল বটে, কিন্তু চিন্তার দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার সময় কিংবা প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। ঠিক এই সময়ে বিজয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রের মুখের প্রতি ব্যথিত, উৎপীড়িত দুটি চক্ষু ক্ষণকাল নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আমি যতদিন বাঁচব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু

এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করা স্থির করেছেন, তখন আর আপনি নিরর্থক অপমান সইবেন না। কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়ালবাবুকে একবার দেখে যাবেন শুধু এই মিনতিটি রাখবেন। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া শুইল। রাসবিহারী অনেক পূর্বেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, বিলক্ষণ! তুমি যাঁকে ডেকে পাঠিয়েছ তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য!

তারপর ছেলেকে নানাপ্রকার র্ভৎসনার মধ্যে বারংবার এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া উৎকণ্ঠায় বিলাসের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব-কথার মর্মোদঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র কোন কথা কহিল না। পিতা ও পুত্রের নিকট হইতে তত্ত্বকথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লাঠি ও ছোট ব্যাগটি হাতে করিয়া তেমনি নীরবে বাহির হইয়া গেল। রাসবিহারী পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলে, নরেন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একমাত্র ও অদ্বিতীয়রূপে বিজয়ার ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়া দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রকে পাশের একটা ঘরে বসাইয়া তিনি ভূমিকাচ্ছলে কহিলেন, পাঁচজনের সামনে তোমাকে বাবুই বলি আর যাই বলি, বাবা, এটা কিন্তু ভুলতে পারিনে তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে। বনমালী, জগদীশ দুইজনেই স্বর্গীয় হয়েছেন, শুধু আমিই পড়ে আছি। কিন্তু আমরা তিনজনে যে কি ছিলাম সে আভাস তোমাকে ত সেইদিনই দিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে বলতে পারিনে—নরেন আমার বুক যেন ফেটে যেতে চায়।

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ রাসবিহারীর আর একদিনের কথাগুলা যেন মনে পড়ায় বলিয়া উঠিলেন, ওই দরকারী যন্ত্রটা বিক্রি করায় আমি সত্যিই তোমার উপর বড় বিরক্ত হয়েছিলাম নরেন। একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখ বাবা, এই বিরক্ত হয়েছিলাম কথাটা বড় রূঢ়। হইনি বলতে পারলেই সাংসারিক হিসাবে হয় ভাল—বলতে শুনতে সব দিকেই নিরাপদ—কিন্তু যাক। বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা যা অসাধ্য তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। কত লোকের অপ্রিয় হই, কত লোকে গাল দেয়, বন্ধুরা বলেন, 'বেশ, মিথ্যা বলতে যখন কোন কালেই পারলে না রাসবিহারী, তখন, তা বলতেও আমরা বলিনে, কিন্তু, একটু ঘুরিয়ে বললেই যদি গালমন্দ হতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাই কেন করো না?' আমি শুনে শুধু অবাক হয়ে ভাবি বাবা, যা ঘটেনি, তা বানিয়ে বলা, ঘুরিয়ে বলা যায় কি করে? এরা আমার ভালই চায়, তা বুঝি, কিন্তু সেই মঙ্গলময় আমাকে যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে অসাধ্যসাধন করিই বা আমি কেমন করে? যাক বাবা, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি কোন দিনই ভালবাসি নে—এতে আমার বড় বিতৃষ্ণা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, তাই এত কথা বলা। বলিয়া উদাস-নেত্রে কড়িকাঠের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন, আর একটা কথা কি জান নরেন, এই সংসারে চিরকাল আছি বটে, চুল পাকিয়েও ফেললাম সত্য,কিন্তু কি করলে, কি বললে যে এখানে সুখ-সুবিধে মেলে তা আজও এই পাকা-মাথাটায় ঢুকল না। নইলে, তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম এ কথা মুখের ওপর বলে তোমার মনে আজ ক্লেশ দেব কেন?

নরেন বিনয়ের সহিত বলিল, যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার ত কিছু নেই।

রাসবিহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন না না, ও কথা বলো না নরেন—কঠোর কথা মনে বাজে বৈ কি! যে শোনে তার ত বাজেই, যে বলে, তারও কম বাজে না বাবা। জগদীশ্বর!

নরেন অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী অন্তরের ধর্মোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া লইয়া পরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তার পরে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, সে কি কথা! সে অনেক দুঃখই নিজের অমন আবশ্যকীয় জিনিসটা বিক্রি করে গেছে। তার মূল্য যাই হোক, কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে তখন, আর ত ভাবাও চলে না, দাম দিতেও বিলম্ব করা চলে না।

মনে মনে বললাম, আমার বিজয়া-মা যখন ইচ্ছে, যতদিনে ইচ্ছে টাকা দিন, কিন্তু আমি টাকাটা পাঠিয়ে দিই-ই। সে বেচারা যখন ঐ টাকা নিয়েই তবে বিদেশে যাবে, একটা দিনও ত দেরি করা কর্তব্য নয়। তার উপর সে যখন আমার জগদীশের ছেলে!

নরেন তখনকার কটু কথাগুলা স্মরণ করিয়া বেদনার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তার কি দাম দেবার দেবার ইচ্ছে ছিল না?

বৃদ্ধ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, না, সে কথা আমার ত মনে হয়নি নরেন। কিন্তু তবে কি জান—না, থাক। বলিয়া তিনি সহসা মৌন হইলেন।

চারিশত টাকায় যাচাই করা কথাটা একবারে নরেনের জিহ্বায় আসিয়া পড়িল, কিন্তু সেই সঙ্গেই কেমন একটা ক্লেশ বোধ হওয়ার এ সম্বন্ধে আর কোন কথা সে কহিল না।

রাসবিহারী এইবার দরকারী কথাটা পাড়িলেন। তিনি লোক চিনিতেন। নরেনের আজিকার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, এখনও সে আসল কথাটা জানে না এবং এই সকল অন্যমনস্ক ও উদাসীন-প্রকৃতির মানুষগুলোর একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে নিজ হইতে অনুসন্ধান করিয়াও ইহারা কোন দিনই কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন,

বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ তেমনি লজ্জা কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন, বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ তেমনি লজ্জা বোধ করেছি। ওই মাইক্রস্কোপ্‌টার কথাই বলি। বিজয়া একবার যদি তার মত নিয়ে সেটা কিন্ত, তা হলে ত কোন কথাই উঠতে পারত না। তুমিই বল দেখি, এ কি তার কর্তব্য ছিল না?

বিজয়ার কর্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্র জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী কহিলেন, তার অসুখের খবর পেয়েই বিলাস যে কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, এ ত আমার বুঝতে বাকি নেই। হওয়াই স্বাভাবিক—সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত দায়িত্ব ত শুধু তারই মাথার উপরে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক স্থির করা ত তারই কাজ। তার অমতে ত কিছুই হতে পারে না। বিজয়া নিজেও ত অবশেষে তা বুঝলেন, কিন্তু দুদিন পূর্বে চিন্তা করলে ত এ-সব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটতে পারত না। নিতান্ত বালিকা নয়—ভাবা ত উচিত ছিল।

কেন যে উচিত ছিল, তাহা তখন পর্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নরেন বৃদ্ধের প্রশ্নে সায় দিতে পারিল না। কিন্তু তবুও তাহার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করিতে লাগিল। অথচ, বুঝিয়া লইবার মত কথাও তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু শঙ্কিত দুই চক্ষু বৃদ্ধের মুখের প্রতি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

রাসবিহারী বলিলেন, তুমি কিন্তু বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখতে পাবে না। আর একটা অনুরোধ আমার এই রইল নরেন, এদের বিবাহ ত বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাকো, শুভকর্মে যোগ দিতে হবে তা বলে রাখলাম।

নরেন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

রাসবিহারী তখন পুলকিত-চিত্তে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, এ বিবাহ যে মঙ্গলময়ের একান্ত অভিপ্রেত, এবং বর-কন্যার জন্মকাল হইতেই যে স্থির

হইয়া ছিল, এবং এই প্রসঙ্গে বিজয়ার পরলোকগত পিতার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইয়াছিল ইত্যাদি বহু প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভাল কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে হবার কি আশা—

নরেন্দ্র কহিল, হাঁ। একটা বিলাতি ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েছি।

রাসবিহারী খুশি হইয়া বলিলেন, বেশ—বেশ। ওষুধের দোকান—কাঁচা পয়সা। টিকে থাকতে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে।

নরেন এ ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

শুনিয়া রাসবিহারী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে মাইনেটা কি-রকম দিচ্চে?

নরেন্দ্র কহিল, পরে কিছু বেশী দিতে পারে। চার শ টাকা মাত্র দেয়।

চার শ! রাসবিহারী বিবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, আহা, বেশ—বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম।

এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল দেখিয়া নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। দয়ালবাবুর দুই-চারিটা বসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল, সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন?

রাসবিহারী অম্লান মুখে জানাইলেন তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সে কেমন আছে বলিতে পারেন না।

উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাকে আবার একবার উপরে যাইতে হইবে। ছেলে তখনও অপেক্ষা করিয়া আছে; সে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা করিল, তাহারও খবর লওয়া আবশ্যক। বারান্দার শেষ পর্যন্ত আসিয়া নরেন মুহূর্তের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আপনি আমার হয়ে বিলাসবাবুকে একটা কথা

জানাবেন। বলবেন, প্রবল জ্বরে মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। বিজয়ার সম্বন্ধে ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতগতিতেই প্রস্থান করিল।

স্নান নাই, আহার নাই, মাথার উপর কড়া রৌদ্র—মাঠের উপর দিয়া নরেন্দ্র দিঘ্ড়ায় চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে বারংবার প্রশ্ন করিতেছিল, তাহার কিসের গরজ? কে একটা স্ত্রীলোক তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই সে যাহাকে কখনো চোখেও দেখে নাই তাহাকে দেখিবার জন্য এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠ ভাঙ্গিতেছে! এই অন্যায় অনুরোধ করিবার যে তাহার একবিন্দু অধিকার ছিল না তাহা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, এবং ইহা রক্ষা করিতে যাওয়াও নিজের সম্মানের হানিকর ইহাও সে বার বার করিয়া আপনাকে বলিতে লাগিল, অথচ মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেও পারিল না। এক-পা এক-পা করিয়া সেই দিঘ্ড়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং অনতিকাল পরে সেই নিতান্ত স্পর্ধিত অনুরোধটাকেই বজায় রাখিতে নিজের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক টুকরা কাগজের উপর নরেন নিজের নামের সঙ্গে তাহার বিলাতী ডাক্তারী খেতাবটা জুড়িয়া দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেইটা পাঠ করিয়া দয়াল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এতবড় একটা ডাক্তার পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে ইহা তাঁহার নিজেরই যেন একটা অশোভন স্পর্ধা ও অপরাধের মত ঠেকিল এবং ইহাকেই বঞ্চিত করিয়া নিজে এই বাটীতে বাস করিতেছেন এই লজ্জায় কি করিয়া যে মুখ দেখাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণেক পরে একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে যুবক যখন তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন মুগ্ধনেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ব্যাধি তাঁহার যাই হোক, এবং যত বড়ই হোক, আর ভয় নাই—এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বস্তুতঃ রোগ অতি সামান্য, চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নাই আশ্বাস পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এমন কি ডাক্তারসাহেবকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হইবে কিনা ভাবিতে লাগিলেন । বিজয়া নিজে শয্যাগত হইয়াও তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই; সে-ই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে শুনিয়া কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে দয়ালের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন চিকিৎসক ও প্রাচীন আচার্যের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল।নরেন্দ্রর চিত্তের মাঝে আজ অনেকখানি গ্লানি জমা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের সন্তোষ, সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতার সংস্পর্শে তাহার অর্ধেক পরিষ্কার হইয়া গেল। কথায় কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্মসম্বন্ধীয় পড়াশুনা যদিচ নিতান্তই যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসেন এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসায়ই যেন ধর্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই,

এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকল ধর্মই তাঁহাকে খাঁটি জিনিসটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন। এরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ বিলাসবিহারীর কানে গেলে তাঁহার আচার্য পদ বহাল থাকিত কিনা ঘোর সন্দেহ, কিন্তু বৃদ্ধের শান্ত, সরল ও বিদ্বেষ-লেশহীন কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীরও তিনি অনেক গুণগান করিলেন। তিনি যাহারই কথা বলেন, তাহারই মত সাধু পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই বলেন। বৃদ্ধের মানুষ চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্র মনে মনে হাসিল। পরিশেষে বিলাসের প্রসঙ্গেই তিনি আগামী বৈশাখে বিবাহের উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত জানাইলেন যে, সে উপলক্ষে তাঁহাকেই আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই বিজয়ার অভিলাষ; এবং এই বিবাহই যে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের যথার্থ আদর্শ হওয়া উচিত এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেও তিনি বিরত হইলেন না।

কিন্তু বৃদ্ধ সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে নিজে এতদূর বিহ্বল হইয়া না উঠিলে অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন, এই শেষের আলোচনা কি করিয়া তাঁহার শ্রোতার মুখের উপর কালির উপর ঢালিয়া দিতেছিল।

স্নানাহারের জন্য তিনি নরেন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিয়াও রাজী করাইতে পারিলেন না। ঘণ্টা-দেড়েক পরে নরেন্দ্র যখন যথার্থ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন কোথায় যে তাহার ব্যথা, কেন যে সমস্ত মন উদ্‌ভ্রান্ত-বিপর্যস্ত, সমস্ত সংসার এরূপ তিক্ত, বিস্বাদ হইয়া গেছে তাহা জানিতে তাহার বাকী রইল না। নদী পার হইতেই বাম দিকে অনেকদূরে জমিদার-বাটীর সৌধ-চূড়া চোখে পড়ায় আর একবার নূতন করিয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা মাঠের পথ ধরিয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আজ অকস্মাৎ এত বড় আঘাত না খাইলে সে হয়ত এত সত্বর নিজের মনটাকে চিনিতে পারিত না। এতদিন তাহার

জানা ছিল এ জীবনে হৃদয় তাহার একমাত্র শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। সেখানে কোন কালে আর কোন জিনিসেরই যে জায়গা মিলিবে না, তাহা এমন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত বলিয়াই জগতের অন্যান্য সমস্ত কামনার বস্তুই তাহার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ আঘাত খাইয়া যখন ধরা পড়িল হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে এমনিই একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে, তখন ব্যথায় ও বিস্ময়েই শুধু চমকিয়া গেল না, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। আজ কোন কথারই যথার্থ মানে বুঝিতে তাহার বাধিল না। বিজয়ার সমস্ত আচরণ, সমস্ত কথাবার্তাই যে প্রচ্ছন্ন উপহাস এবং এই লইয়া বিলাসের সহিত না জানি সে কতই হাসিয়াছে, কল্পনা করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় বার বার করিয়া শিহরিতে লাগিল। এই ত সেদিন যে তাহার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেও একবিন্দু দ্বিধা করে নাই, তাহারই কাছে দৈন্য জানাইয়া তাহার শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত বিক্রয় করিতে যাইবার চরম দুর্মতি তাহার কোন্ মহাপাপে জন্মিয়াছিল? নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, এ আমার ঠিকই হইয়াছে। যে লজ্জাহীন সেই নিষ্ঠুর রমণীর একটা সামান্য কথায় নিজের সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া এতদূরে ছুটিয়া আসিতে পারে এ শাস্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। বেশ করিয়াছে, বিলাস তাহাকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছে।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল, যে মাইক্রস্কোপ্‌টা এত দুঃখের মূল, সেইটাকে লইয়াই কালীপদ দাঁড়াইয়া আছে। সে কাছে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, মাঠান আপনাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন তিক্তস্বরে কহিল, কেন?

কেন তাহা কালীপদ জানিত না। কিন্তু জিনিসটা যে ডাক্তারবাবুর, এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যত প্রকারের অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া সম্মুখে এবং দ্বারের

অন্তরাল হইতে কিছুই কালীপদর অবিদিত ছিল না। সে বুদ্ধি খাটাইয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি ফিরে চেয়েছিলেন যে!

নরেন্দ্র মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, না চাইনি। দাম দেবার টাকার নেই আমার।

কালীপদ বুঝিল ইহা অভিমানের কথা। সে অনেক দিনের চাকর, টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিজয়ার মনের ভাব এবং আচরণের বহু দৃষ্টান্ত সে চোখে দেখিয়াছে। সে তাহার সেই জ্ঞানটুকু আরও একটু ফলাও করিয়া একটু হাসিয়া, একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, ইঃ, ভারী ত দাম। মাঠানের কাছে দু-চার শ টাকা নাকি আবার টাকা! নিয়ে যান আপনি। যখন যোগাড় করতে পারবেন দামটা পাঠিয়ে দেবেন। অর্থ-সম্বন্ধে তাহার প্রতি বিজয়ার এই অযাচিত বিশ্বাস নরেন্দ্রের ক্রোধটাকে একটু নরম করিয়া আনিলেও তাহার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা দূর করিতে পারিল না। তাই সে যখন দুই শতের পরিবর্তে চারি শত দিবার অক্ষমতা জানাইয়া কহিল, না না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও কালীপদ, আমার দরকার নেই। দু'শ টাকা বদলে চার শ' টাকা আমি দিতে পারব না, তখন কালীপদ অনুনয়ের স্বরেই বলিয়া উঠিল, না ডাক্তারবাবু, তা হবে না—আপনি সঙ্গে নিয়ে যান—আমি গাড়িতে তুলে দিয়ে যাবো।

এই জিনিসটা সম্বন্ধে তাহার নিজের একটুখানি বিশেষ গরজ ছিল। বিলাসকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না বলিয়া তাহার প্রতি অনেকটা আক্রোশবশতঃই নরেনের প্রতি তাহার একপ্রকার সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সেইজন্য দরোয়ানকে দিয়া পাঠাইতে বিজয়া আদেশ করিলেও কালীপদ নিজে যাচিয়া এতটা পথ এই ভারী বাক্সটা বহিয়া আনিয়াছিল। নরেন্দ্র মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছে কল্পনা করিয়া সে আরও একটু কাছে ঘেঁষিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, আপনি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু। মাঠান ভাল হয়ে চাই কি দামটা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারেন।

এই ইঙ্গিত শুনিয়া নরেন্দ্র অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বটে! সে ডাকিয়াছে অথচ বিলাস তাহার অপমান করিয়াছে— এ বুঝি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ কৃপার বকশিশ!

কিন্তু প্ল্যাটফর্মের উপর আরও লোকজন ছিল বলিয়াই সে যাত্রা কালীপদর একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নরেন্দ্র কোনমতে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বাহিরের পথটা হাত দিয়া নির্দেশ করিয়া শুধু বলিল—যাও আমার সুমুখ থেকে। বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া আর একদিকে চলিয়া গেল। কালীপদ হতবুদ্ধি বিহ্বলের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল তাহার মাথার ঢুকিল না। মিনিট পনরো পরে গাড়ি আসিলে নরেন্দ্র যখন উঠিয়া বসিল তখন কালীপদ আস্তে আস্তে সেই ফার্স্টক্লাস কামরার জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, ডাক্তারবাবু!

নরেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়াছিল, মুখ ফিরাইতেই কালীপদর মলিন মুখের উপর চোখ পড়িল। চাকরটার প্রতি নিরর্থক রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাই একটু হাসিয়া সদয়কণ্ঠে কহিল, আবার কি?

সে এক টুকরা কাগজ এবং পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল, আপনার ঠিকানাটা একটুখানি যদি—

আমার ঠিকানা নিয়ে কি করবে?

আমি কিছু করব না—মাঠান বলে দিলেন—

মাঠানের নামে এবার নরেন্দ্রর আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, অকস্মাৎ সে প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো সামনে থেকে বলচি—পাজী নচ্ছার কোথাকার!

কালীপদ চমকিয়া দু'পা হটিয়া গেল—এবং পরক্ষণেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপরের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বিজয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল। পদশব্দে চোখ মেলিতেই কালীপদ কহিল, ফিরিয়ে দিলেন—নিলেন না।

বিজয়ার দৃষ্টিতে বেদনা বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পাইল না। কালীপদ হাতের কাগজ ও পেন্সিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে বলিল, বাবা, কি রাগ! ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় যেন তেড়ে মারতে এলেন। ইহার উত্তরেও বিজয়া কথা কহিল না।

সমস্ত পথটা কালীপদ আপনা আপনি মহলা দিতে দিতে আসিতেছিল, মনিবের আগ্রহের জবাবে সে কি বলিবে? কিন্তু সে-পক্ষে লেশমাত্র উৎসাহ না পাইয়া সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিজয়ার দৃষ্টি তেমনি নির্বিকার, তেমনি শূন্য। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই বিজয়া এই একটা মিথ্যা কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই সে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর সারিতে দেরি হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু দুর্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। এদিকে ফাল্গুন শেষ হইতে চলিল, মধ্যে শুধু চৈত্র মাসটা বাকী; বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই ছেলের বিবাহ দিবেন রাসবিহারীর ইহাই সঙ্কল্প। কিন্তু পাত্র যত দিন দিন পরিপুষ্ট ও কান্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন,কন্যা তেমনি শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অথচ চেষ্টার কোন দিকে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না—তবে কি! সেই মাইক্রস্কোপ্-ঘটিত ব্যাপারটা বাহিরে হইতে কেমন করিয়া না জানি একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই পিতা-পুত্রের কানে গিয়াছিল। শুনিয়া ছোটতরফ যতই লাফাইতে লাগিল, বড়তরফ ততই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ছেলেকে তিনি বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই সকল ছোটখাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়ানো শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাই নয়, তাহার অসুস্থ দেহের উপর হাঙ্গামা করিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটাও অসম্ভব নয়। বিলাস পৃথিবীর আর যত লোককেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, পিতার পাকাবুদ্ধিকে সে মনে মনে খাতির করিত। কারণ ঐহিক ব্যাপারে সে বুদ্ধির উৎকর্ষতার এত অপর্যাপ্ত নজির রহিয়া গেছে যে তাহার প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সন্দেহ করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই লইয়া বুকের মধ্যে তাহার যত বিষই গাঁজাইয়া উঠিতে থাকুক, প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু আর সহিল না। সেদিন হঠাৎ অতি তুচ্ছ কারণে সে কালীপদকে লইয়া পড়িল; এবং

প্রথমটা এই-মারি-ত-এই-মারি করিয়া অবশেষে তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিতে গোমস্তার প্রতি হুকুম করিয়া তাহাকে ডিসমিস্ করিল।

চিকিৎসক বিজয়ার সকালে-বিকালে যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন সকালে সে নদীর তীরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বাটী ফিরিতেই কালীপদ অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিল, মা, ছোটবাবু আমাকে জবাব দিলেন।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কালীপদ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কর্তাবাবু স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তেনার কাছে কখন গালমন্দ খাইনি মা, কিন্তু আজ—বলিয়া সে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; তার পরে কান্না শেষ করিয়া যাহা কহিল; তাহার মর্ম এই যে, যদিচ সে কোন অপরাধ করে নাই, তথাপি ছোটবাবু তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর কাছে সেই বাক্সটা দিতে যাওয়ার কথা কেন আমি তাঁহাকে নিজে জানাই নাই, কেন আমি তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজয়া চৌকির উপর অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল—বহুক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায়?

কালীপদ বলিল, কাছারি-ঘরে বসে কাগজ দেখচেন।

বিজয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আচ্ছা, দরকার নেই—এখন তুই কাজ কর গে যা। বলিয়া সে নিজেও চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, বিলাস কাছারি-ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে আজ সে তত্ত্ব লইতে বাড়ি ঢুকিল না তাহা সে বুঝিল।

দয়াল আরোগ্য হইয়া আবার নিয়মিত কাজে আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে ফিরিবার সময় এক-একদিন বিজয়া তাঁহার সঙ্গ লইত, এবং কথা কহিতে কহিতে কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিত।

নরেনের প্রতি দয়ালের অন্তঃকরণ সম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পীড়ার কথা উঠিলে বৃদ্ধ এই নবীন চিকিৎসকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়

সহস্র-মুখ হইয়া উঠিতেন। বিজয়া চুপ করিয়া শুনিত কিন্তু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না বলিয়াই দয়াল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইঁহাকে ডাকাইয়াই একবার বিজয়ার অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভিতরের রহস্য তখনো তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়াই বিজয়ার নীরব উপেক্ষায় তিনি মনে মনে পীড়া অনুভব করিয়া সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন, হোক সে ছেলেমানুষ, কিন্তু যে-সব নামজাদা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যা চিকিৎসা করিয়া টাকা এবং সময় নষ্ট করচে, তাদের চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কিন্তু, এই গোপন রহস্যের আভাস পাইতে তাঁহার বেশী দিন লাগিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরেই একদিন সহসা তিনি বিজয়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, কালীপদকে আর ত আমি বাড়িতে রাখতে পারিনে মা।

বিজয়ার এ আশঙ্কা ছিলই; তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

দয়াল কহিলেন, তুমি যাকে বাড়িতে রাখতে পারলে না, আমি তাকে রাখব কোন্ সাহসে বল দেখি মা?

বিজয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কিন্তু সেটাও ত আমারই বাড়ি।

দয়াল লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তা ত বটেই। আমরা সকলেই ত তোমার আশ্রিত মা। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আপনাকে রাখতে নিষেধ করেছেন?

দয়াল চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়া বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে আমার কাছেই কালীপদকে পাঠিয়ে দেবেন। সে আমার বাবার চাকর, তাকে আমি বিদায় দিতে পারব না।

দয়াল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, কাজটা ভাল হবে না মা। তাঁর অবাধ্য হওয়াও তোমার কর্তব্য নয়।

বিজয়া ভাবিয়া বলিল, তা হলে আমাকে কি করতে বলেন?

দয়াল কহিলেন, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কালীপদ নিজেই বাড়ি যেতে চাচ্চে। আমি বলি, কিছুদিন সে তাই যাক।

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, তবে তাই হোক। কিন্তু যাবার আগে এখানে তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বৃদ্ধ মুখ তুলিতেই এই তরুণীর মলিন মুখের উপর একটা নিবিড় ঘৃণার ছবি দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ইহার পর চার-পাঁচদিন দয়ালকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিজয়া কাছারি-ঘরে সংবাদ লইয়া জানিল, তিনি কাজেও আসেন নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছে, লোক পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া প্রয়োজন কিনা, এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে তাঁহারই কাশির শব্দে বিজয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

দয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না। হঠাৎ তাঁহারই অসুখের বাড়াবাড়িতে কয়েকদিন তিনি বাহির হইতে পারেন নাই। নিজেকেই পাক করিতে হইতেছিল। অথচ তাঁহার নিরুদ্বেগ মুখের চেহারায় বিজয়া বুজিতে পারিল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

দয়াল বলিলেন, আজ ভাল আছেন। নরেনবাবুকে চিঠি লিখতে কাল বিকেলে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো আনা আরোগ্য হয়ে গেছে।

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ভাল হবে না? আপনাদের সকলের কি সোজা বিশ্বাস তাঁর উপরে?

দয়াল বলিলেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস ত শুধু শুধু হয় না মা, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি কিনা, মনে হয়, ঘরে পা দিলেই যেন সমস্ত ভাল হয়ে যাবে।

তা হবে, বলিয়া বিজয়া আবার একটুখানি হাসিল। এবার দয়াল নিজেও একটু হাসিয়া কহিলেন, শুধু তাঁরই চিকিৎসা করে যাননি মা, আরও একজনের ব্যবস্থা করে গেছেন বলিয়া তিনি টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজ মেলিয়া ধরিলেন।

একখানা প্রেসক্রিপশান। উপরে বিজয়ার নাম লেখা। লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্রই ওই কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বাণ হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল। পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়াই একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজের কৃতিত্বের পুলকে এমনি বিভোর হইয়াছিলেন যে, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। বলিলেন, তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা করতে দেব না মা। ওষুধটা একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে, তা বলে দিচ্চি।

বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা—

বৃদ্ধ গর্বে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, ইস! তাই বুঝি! এ কি তোমার নেটিভ ডাক্তার পেয়েছ মা, যে দক্ষিণা দিলেই ব্যবস্থা লিখে দেবে? এ যে বিলাতের বড় পাস-করা ডাক্তার! নিজের চোখে না দেখে যে এঁরা কিছুই করেন না। এঁদের দায়িত্ববোধ কি সোজা মা?

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিজয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, নিজের চোখে দেখে কি রকম? কে বললে আমাকে তিনি দেখে গেছেন? এ শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই ওষুধ লিখে দিয়েছেন।

দয়াল বার বার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, না। তা কখনই নয়। কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে, তখন ঠিক তোমার সুমুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে ভাল করেই দেখে গেছেন—বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে বলেই—

বিজয়া হঠাৎ চমকিয়া কহিল, তাঁর কি সাহেবি পোশাক ছিল? মাথায় হ্যাট ছিল?

দয়াল কৌতুকের প্রাবল্যে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, কে বলবে যে খাঁটি সাহেব নয়? কে বলবে আমাদের স্বজাতি বাঙালী? আমি নিজেই যে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলুম মা।

সুমুখ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক চোখের উপর দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে দেখিতে গিয়াছেন—অথচ সে একটি বারের বেশী দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে নাই। পুলিশের কোন ইংরাজ কর্মচারী হইবে ভাবিয়া বরঞ্চ সে অবজ্ঞায় চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি ঝড় বহিয়া গেল বৃদ্ধ তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মাঝে শুধু চৈত্র মাসটা বাকী। বৈশাখের প্রথম, না হয় বড় জোর দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিবাহ। বললাম মায়ের যে শরীর সারে না ডাক্তারবাবু, একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে—তাঁহার মুখের কথাটা ঐখানেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এভাবে অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই দেখিল, বিলাস ঘরে ঢুকিতেছে। একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহার আগমনে বন্ধ হইয়া গেল—প্রবেশমাত্রই অনুভব করিয়া বিলাসের চোখমুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। ঠিক সম্মুখে প্রেস্‌ক্রিপশানটা পড়িয়া ছিল, দৃষ্টি পড়ায় হাত দিয়া সেখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া

আগাগোড়া তিন-চারবার করিয়া পড়িয়া যথাস্থলে রাখিয়া দিয়া কহিল, নরেন ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশান দেখচি। এলো কি করে—ডাকে নাকি?

কেহই সে কথার উত্তর দিল না। বিজয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিলাস হিংসায়-পোড়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার! তাই বুঝি এঁদের ওষুধ খাওয়া হয় না, শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে; তার পরে ফেলে দেওয়া হয়! তা না হয় হোলো কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরিটি কাগজখানি পাঠালেন কি করে শুনি? ডাকে নাকি?

এ প্রশ্নেরও কেহ জবাব দিল না।

সে তখন দয়ালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি ত এতক্ষণ খুব লেকচার দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছিল—বলি, আপনি কিছু জানেন?

এই জমিদারী সেরেস্তায় বিলাসবিহারীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করা অবধি দয়াল মনে মনে তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। কালীপদর মুখে শুনিতেও কিছু বাকি ছিল না। সুতরাং প্রেস্‌ক্রিপসনখানা হাতে করা পর্যন্তই তাঁহার বুকের ভিতরটা বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছিল। এখন প্রশ্ন শুনিয়া মুখের মধ্যে জিভটা তাঁহার এমনি আড়ষ্ট হইয়া গেল যে কথা বাহির হইল না।

বিলাস একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধমক দিয়া কহিল, একেবারে যে ভিজেবেড়ালটি হয়ে গেলেন? বলি জানেন কিছু?

চাকরির ভয় যে ভারাক্রান্ত দরিদ্রকে কিরূপ হীন করিয়া ফেলে, তাহা দেখিলে ক্লেশবোধ হয়। দয়াল চমকিয়া উঠিয়া অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আমিই এনেচি।

ওঃ—তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে?

দয়াল তখন জড়াইয়া জড়াইয়া কোন মতে ব্যাপারটা বিবৃত করিলেন।

বিলাস স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, গেল বছরের হিসাবটা আপনাকে সারতে বলেছিলাম, সেটা সারা হয়েছে?

দয়াল বিবর্ণমুখে কহিলেন, আজ্ঞে, দু'দিনের মধ্যেই সেরে ফেলব।

হয়নি কেন?

বাড়িতে ভারী বিপদ যাচ্ছিল, রাঁধতে হতো—আসতেই পারিনি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিত কটুকণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, আসতেই পারিনি! তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছেন! বলিয়া তীব্রস্বরে কহিল, আমি তখনই বাবাকে বলেছিলাম, এ সব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চলবে না।

এতক্ষণ পরে বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার মুখের ভাব প্রশান্ত, গম্ভীর; কিন্তু দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেচে জানেন? আপনার বাবা নন—আমি।

বিলাস থমকিয়া গেল। তাহার এরূপ কণ্ঠস্বরও সে আর কখনো শুনে নাই, এরূপ চোখের চাহনিও আর কখন দেখে নাই। কিন্তু নত হইবার পাত্র সে নয়। তাই পলকমাত্র স্থির থাকিয়া জবাব দিল, যেই আনুক, আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই, কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

বিজয়া কহিল, যাঁর বাড়িতে বিপদ তিনি কি করে কাজ করতে আসবেন?

বিলাস উদ্ধতভাবে বলিল, অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে। কিন্তু সে শুনতে গেলে ত আমার চলে না! আমি দরকারী কাজ সেরে রাখতে হুকুম দিয়েছিলাম, হয়নি কেন সেই কৈফিয়ত চাই। বিপদের খবর জানতে চাইনে।

বিজয়ার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, সবাই মিথ্যাবাদী নয়—সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না; অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য দেয় না। সে যাক, কিন্তু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন, দরকারী কাজ হওয়া চাই-ই, তখন

নিজে কেন সেরে রাখেন নি? আপনি কেন চারদিন কাজ কামাই করলেন? কি বিপদ হয়েছিল আপনার শুনি?

বিলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কহিল, আমি নিজে খাতা সেরে রাখব! আমি কামাই করলাম কেন!

বিজয়া কহিল, হাঁ তাই। মাসে মাসে দু'শ টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা ত আমি শুধু শুধু আপনাকে দিইনে, কাজ করবার জন্যেই দিই।

বিলাস কলের পুতুলের মত কেবল কহিল, আমি চাকর? আমি তোমার আমলা?

অসহ্য ক্রোধে বিজয়ার প্রায় হিতাহিত-জ্ঞান লোপ হইয়াছিল; সে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দিল, কাজ করবার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয় তাকে ও-ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে সয়ে এসেছি; কিন্তু যত সহ্য করেচি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান, নীচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ করতে পারেন করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারিতে আর ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

বিলাস লাফাইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী কম্পিত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার এত সাহস!

বিজয়া কহিল, দুঃসাহস আমার নয়, আপনার। আমার স্টেটেই চাকরি করবেন, আর আমারই উপর আমারই উপর অত্যাচার করবেন! আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমারই বাড়িতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমারই চোখের সামনে অপমান করবার এ সকল স্পর্ধা কোথা থেকে আপনার জন্মাল?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকারে ঘর ফাটাইয়া বলিল, অতিথির বাপের পুণ্য যে, সেদিন তার গায়ে হাত দিইনি—তার একটা হাত ভেঙ্গে দিইনি। নচ্ছার, বদমাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার। আর কখনো যদি তার দেখা পাই—

চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া গোপাল কানাই সিংকে ডাকিয়া আনিয়াছিল; দ্বারপ্রান্তে তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়া বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং স্বাভাবিক করিয়া কহিল, আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে তাঁর গায়ে হাত দেবার অতি-সাহস আপনার হয়নি। তিনি উচ্চশিক্ষিত বড় ডাক্তার। সেদিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয়ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না করে সহ্য করেই চলে যেতেন, কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলেও অবহেলা করবেন না, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার শখ যদি আপনার থাকে ত হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয় আপনার মত আরও পাঁচ-সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখ থেকে দেবেন, কিন্তু বিস্তর চেঁচামেচি হয়ে গেছে, আর না। নীচে থেকে চাকর-বাকর দরোয়ান পর্যন্ত ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। যান, নীচে যান; বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের দরজা দিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ছেলের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া ক্রোধে,বিরক্তিতে ও আশাভঙ্গের নিদারুণ হতাশ্বাসে রাসবিহারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদির খোলস একমুহূর্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি তিক্ত-কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে বাপু, হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই—কৈবর্ত ত? বামুন-কায়েতের ছেলে হলে ভদ্রতাও শিখতিস, নিজের ভালমন্দ কিসে হয়, না হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম কোরে বেড়াও গে। উঠতে বসতে তোকে পাখিপড়া করে শেখালাম যে, ভালয় ভালয় কাজটা একবার হয়ে যাক, তার পরে যা ইচ্ছে হয় করিস; কিন্তু তোর সবুর সইল না, তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে! সে হলো রায়-বংশের মেয়ে! ডাকসাইটে হরি রায়ের নাতনি, যার ভয়ে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার! মান-ইজ্জত গেল, এতবড় জমিদারির আশা-ভরসা গেল, মাসে মাসে দু-দশ টাকা মাইনে বলে আদায় হচ্ছিল, সে গেল—যা এখন চাষার ছেলে চাষ-বাস করে খেগে যা! আবার আমার কাছে এসেছেন চোখ রাঙ্গিয়ে তার নামে নালিশ করতে? যা যা—সুমুখ থেকে সরে যা হতভাগা বোম্বেটে শয়তান।

ঘটনাটা না ঘটিলেই যে ঢের ভাল হইত, তাহার বিলাস নিজেও বুঝিতেছিল। তাহাতে পিতৃদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্তি দেখিয়া তাহার সতেজ আস্ফালন নিবিয়া জল হইয়া গেল। তথাপি কি একটু কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিতেই ক্রুদ্ধ পিতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় ছেলেকে যাই বলুন, কাজের বেলায় রাসবিহারী ক্রোধের উত্তেজনাতেও কখনো তাড়াহুড়া করিয়া কাজ মাটি করেন নাই, আলস্য করিয়াও

কখনো ইষ্ট নষ্ট করেন নাই। তাই সেদিনটা তিনি ধৈর্য ধরিয়া বিজয়াকে শান্ত হইবার সময় দিয়া পরদিন তাঁহার নিজস্ব শান্তি এবং অবিচলিত গাম্ভীর্য লইয়া বিজয়ার বসিবার ঘরে দেখা দিলেন, এবং চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়ার ক্রোধোন্মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেলে, সে নিজের অসংযত রূঢ়তা এবং নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর এবং কর্মচারীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে সে এই যে একটা নাটকের অভিনয় করিয়া বসিল, হয়ত বা ইহারই মধ্যে তাহা নানা আকারে পল্লবিত এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামের বাটীতে বাটীতে পুরুষমহলে আলোচিত হইতেছে, এবং পুকুর ও নদীর ঘাটে মেয়েদের হাসি-তামাশার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই কদর্যতা কল্পনা করিয়া সে সেই অবধি আর ঘরের বাহির পর্যন্ত আসিতে পারে নাই। লজ্জা শতগুণে বাড়িয়া গেছে আরও এই মনে করিয়া যে, আজ যাহাকে সে ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করিতে সঙ্কোচ মানে নাই, দুই দিন বাদে স্বামী বলিয়া তাহার গলায় বরমাল্য পরাইবার কথা রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকী নাই।

তাই রাসবিহারী যখন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দ প্রসন্ন-মুখে আসন গ্রহণ করিলেন তখন বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিতেও পারিল না। কিন্তু ইহারই জন্য সে প্রত্যেক মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করিয়াছিল, এবং যে-সকল যুক্তিতর্কের তরঙ্গ এবং অপ্রিয় আলোচনা আলোড়িত হইয়া উঠিবে, তাহার মোটামুটি খসড়াটা কাল হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সে একপ্রকার স্থির হইয়াই বসিয়া রহিল। কিন্তু, বৃদ্ধ ঠিক উলটা সুর ধরিয়া বিজয়াকে একেবারে অবাক করিয়া দিলেন। তিনি ক্ষণেক কাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, শুনে পর্যন্ত যে আমার কি আনন্দ হয়েছে তা জানাবার জন্যে আমি কালই ছুটে আসতাম—যদি না সেই অম্বলের ব্যথাটা আমাকে বিছানায় পেড়ে

ফেলত। দীর্ঘজীবী হও মা, আমি এই ত চাই! এই ত তোমার কাছে আশা করি। বলিয়া অত্যন্ত উচ্চভাবের আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনা জানাই, সুখে-দুঃখে, ভালতে-মন্দতে, যেন আমাকে তিনি যা ধর্ম, যা ন্যায় তার প্রতিই অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখবার সামর্থ্য দেন। এই বলিয়া তিনি যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া, বোধ করি, সেই সর্বশক্তিমানকেই প্রণাম করিলেন।

পরে চোখ চাহিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতেই ভেবে পাইনে বিজয়া, বিলাস আমার মত একটা খোলা ভোলা উদাসীন লোকের ছেলে হয়ে এত বড় পাকা বিষয়ী হয়ে উঠলো কি করে? যার বাপের আজও সংসারে কাজকর্মের জ্ঞান, লাভ-লোকসানের ধারণাই জন্মালো না, সে এই বয়সের মধ্যেই এরূপ দৃঢ়কর্মী হয়ে উঠল কেমন করে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য, কিছুই বোঝবার জো নেই মা। বলিয়া আর একবার মুদ্রিত-নেত্রে তিনি মাথা নত করিলেন।

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জিনিসেরই ত অত্যন্ত ভাল নয়! জানি, বিলাসের কাজ-অন্ত প্রাণ। সেখানে সে অন্ধ। কর্তব্য-কর্মে অবহেলা তার বুকে শূলের মত বাজে; কিন্তু তাই বলে কি মানীর মান রাখতে হবে না? দয়ালের মত লোকেরও কি ত্রুটি মার্জনা করা আবশ্যক নয়? জানি, অপরাধ ছোট-বড় ধনী-নির্ধন বিচার করে না। কিন্তু তাই ব'লে কি তাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে? সব বুঝি। কাজ না করাও দোষ, খবর না দিয়ে কামাই করাও খুব অন্যায়, আপিসে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করাও আপিস মাস্টারের পক্ষে বড় অপরাধ; কিন্তু, দয়ালকেও কি—না মা, আমরা বুড়োমানুষ, আমাদের সে তেজও নেই, জোরও নেই—সাহেবরা বিলাসের কর্তব্যনিষ্ঠার যত সুখ্যাতিই করুক, তাকে যত বড়ই মনে করুক—আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাল বলতে পারব না। নিজের ছেলে বলে ত এ

মুখ দিয়ে মিথ্যে বার হবে না মা! আমি বলি, কাজ না হয় দুদিন পরেই হত, না হয় দশ টাকা লোকসানই হত; কিন্তু তাই বলে কি মানুষের ভুলভ্রান্তি দুর্বলতা ক্ষমা করতে হবে না?

তোমার জমিদারির ভালমন্দের পরেই যে বিলাসের সমস্ত মন পড়ে থাকে সে তার প্রত্যেক কথাটিতেই বুঝতে পারি। কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না মা। আমি নিজে সংসার-বিরাগী হলেও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে গৃহস্থের পরম ধর্ম তা স্বীকার করি। তার উন্নতি করা আরও ঢের বড় ধর্ম; কারণ সে ছাড়া জগতের মঙ্গল করা যায় না। আর বিলাসের হাতে তোমাদের দুজনের জমিদারি যদি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, এমন কি দশ গুণ হয় শুনতে পাই, আমি তাতেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হব না। আর হচ্চেও তাই দেখতে পাচ্ছি। সব ঠিক, সব সত্যি—কিন্তু, তাই বলে যে বিষয়ের উন্নতিতে কোথাও একটু সামান্য বাধা পৌঁছলেই ধৈর্য হারাতে হবে সেও যে মন্দ। আমি তাই সেই অদ্বিতীয় নিরাকারের শ্রীপাদপদ্মে বার বার ভিক্ষা জানাচ্চি মা, তাঁর উদ্ধত অবিনয়ের জন্যে যে শাস্তি তাকে তুমি দিয়েছ, তার থেকেই সে যেন ভবিষ্যতে সচেতন হয়। কাজ! কাজ! সংসারে শুধু কাজ করতেই কি এসেছি! কাজের পায়ে কি দয়ামায়াও বিসর্জন দিতে হবে! ভালই হয়েছে মা, আজ সে তোমার হাত থেকেই তার সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলে!

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। রাসবিহারী কিছুক্ষণ যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া পরে মুখ তুলিলেন। একটু হাস্য করিয়া, কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমার দুটি সন্তানের একটি প্রচণ্ড কর্মী, আর একটির হৃদয় যেন স্নেহ-মমতা-করুণার নির্ঝর! একজন যেমন কাজে উন্মাদ, আর একটি তেমনি দয়া-মায়ায় পাগল! আমি কাল থেকে শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবচি, ভগবান এই দুটিকে যখন জুড়ি মিলিয়ে তাঁর রথ চালাবেন, তখন দুঃখের সংসারে না জানি কি স্বর্গ-ই নেমে আসবে! আমার আর এক প্রার্থনা মা, এই অলৌকিক বস্তুটি চোখে

দেখবার জন্যে তিনি যেন আমাকে একটি দিনের জন্যেও জীবিত রাখেন। বলিয়া এইবার তিনি টেবিলের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, অথচ, আশ্চর্য, ধর্মের প্রতিও ত তার সোজা অনুরাগ নয়! মন্দির-প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না সে করেছে! যে তাকে জানে না, সে মনে করবে বিলাসের ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া বুঝি সংসারের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। শুধু এরই জন্যে সে বুঝি বেঁচে আছে—এ ছাড়া আর বুঝি সে কিছু জানে না! কিন্তু কি ভুল দেখ মা, নিজের ছেলের কথায় এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছি যে, তোমাকেই বোঝাচ্ছি। যেন আমার চেয়ে তাকে তুমি কম বুঝেছ! যেন আমার চেয়ে তার তুমি কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী! বলিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার এত আনন্দ ত শুধু সেই জন্যেই মা। আমি যে তোমার হৃদয়ের ভিতরটা আরশির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার কল্যাণের হাতখানি যে বড় উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে।আর তাও বলি, তুমি ছাড়া এ কাজ করতে পারেই বা কে, করবেই বা কে? তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলের যে তুমিই সঙ্গিনী! তোমার হাতেই যে তার সমস্ত শুভ নির্ভর করছে! তার শক্তি, তোমার বুদ্ধি; সে ভার বহন করে চলবে তুমি পথ দেখাবে।তবেই ত দু'জনের জীবন একসঙ্গে সার্থক হবে মা! সেইজন্যেই ত আজ আমার সুখ ধরছে না! আজ যে চোখের উপরে দেখতে পেয়েছি বিলাসের আর ভয় নেই, তার ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও আর আশঙ্কা করতে হবে না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত চিন্তা, এত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ-জীবন সফল করে তোলবার এতবড় বুদ্ধি ঐটুকু মাথার মধ্যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে মা? আজ আমি যে একবারে অবাক হয়ে গেছি!

বিজয়ার সর্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, ইস্, দশটা বাজে যে! একবার দয়ালের স্ত্রীকে দেখতে যেতে হবে যে!

বিজয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

ভালই আছেন, বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয়নি। বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে বিজয়া। বল রাখবে?

বিজয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, সে হবে না, সন্তানের ঐ আব্দারটি মাকে রাখতেই হবে। বল রাখবে!

বিজয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, বলুন।

তখন রাসবিহারী কহিলেন, সে যে শুধু আহার-নিদ্রাই পরিত্যাগ করেছে তাই নয়—অনুতাপেও দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানি; কিন্তু তোমাকে মা এ-ক্ষেত্রে একটু শক্ত হতে হবে। কাল অভিমানে সে আসেনি, কিন্তু আজ আর থাকতে পারবে না—এসে পড়বেই; কিন্তু ক্ষমা চাইবামাত্র যে মাপ করবে, সে হবে না—এই আমার একান্ত অনুরোধ। যে অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিয়েছ, অন্ততঃ সে শাস্তি আরও একটা দিন সে ভোগ করুক।

এই বলিয়া বিজয়ার মুখের উপর বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন, তোমার নিজের যে কত কষ্ট হচ্ছে, সে কি আমার অগোচর আছে মা? তোমাকে কি চিনিনে? তুমি আমারই ত মা! বরঞ্চ তার চেয়েও বেশী ব্যথা পাচ্চো সেও আমি জানি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি পূর্ণ না হলে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই গভীর দুঃখ আরো একটা দিন সহ্য না করলে যে সে মুক্ত হবে না! শক্ত না হতে পার তার সঙ্গে দেখা করো না; কিন্তু আজ সে বিফল হয়েই ফিরে যাক। এ যন্ত্রণা আরও কিছু তাকে ভোগ করতে দাও—এই আমার একান্ত অনুরোধ বিজয়া!

রাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে আবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই সকল কথা, এরূপ ব্যবহার তাঁহার কাছে সে একেবারেই

প্রত্যাশা করে নাই। বরঞ্চ ঠিক বিপরীতটাই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে মনে মনে চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস একাকী আঘাত খাইয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু প্রতিঘাতের বেলা সে যে একলা আসিবে না, এবং তখন রাসবিহারীর সহিত তাহার যে একটা অত্যন্ত কড়ারকমের বোঝাপড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্ন মূর্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

এখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলে শুধু তাহার বুকের উপর হইতে ভয়ের একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল না—সে যে একসময়ে এই লোকটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, সে কথাও মনে পড়িল, এবং কেন যে এতবড় শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, তাহারও ঝাপসা আভাসগুলা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনও একটা সংশয় তাহার অন্তরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, হয়ত সে এই বৃদ্ধের যথার্থ সঙ্কল্প না বুঝিয়াই তাঁহার প্রতি মনে মনে অবিচার করিয়াছে; এবং তাহার পরলোকগত পিতৃ-আত্মা আবাল্য সুহৃদের প্রতি এই অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, কৈ, তিনি ত সত্যকার অপরাধের বেলায় নিজের ছেলেকেও মাপ করেন নাই! বরঞ্চ আমি যেন তাহাকে সহজে ক্ষমা করিয়া তাহার শাস্তিভোগের পরিমাণটা কমাইয়া না দিই, তিনি বার বার সেই অনুরোধই করিয়া গেলেন।

আর একটা কথা—বৃদ্ধের সকল অনুরোধ উপরোধ আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা সকলের চেয়ে গোপন থাকিয়াও সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল সেটা বিলাসের অসীম ভালবাসা এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রবল ঈর্ষা।

এই জিনিসটা বিজয়ার নিজের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, তা নয়; কিন্তু বাহিরের আলোড়নে তাহা যেন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল।

এতদিন যাহা শুধু তাহার হৃদয়ের তলদেশেই থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বাহিরের আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়া হৃদয়ের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই রাসবিহারী বহুক্ষণ চলিয়া গেলেও তাঁহার আলাপের ঝঙ্কার দুই কানের মধ্যে লইয়া বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে জানালার বাহিরে চাহিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। ঈর্ষা বস্তুটা সংসারে চিরদিনই নিন্দিত সত্য, তথাপি সেই নিন্দিত দ্রব্যটা আজ বিজয়ার চক্ষে বিলাসের অনেকখানি মলিনতা ফিকা করিয়া ফেলিল, এবং যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া এই দুটি পিতাপুত্রের সহস্র রকমের প্রতিহিংসার বিভীষিকা কাল হইতে তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত নিরুদ্যম ও নির্জীব করিয়া আনিতেছিল, আজ আবার তাহাদিগকেই আপনার জন ভাবিতে পাইয়া যে যেন হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

কালীপদ আসিয়া বলিল, মাঠান, তাহলে এখন আমার যাওয়া হল না ব'লে বাড়িতে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই?

বিজয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা—

কালীপদ চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া সলজ্জদ্বিধাভরে কহিল, না হয় আমি বলি কি কালীপদ, চিঠি যখন লিখে দেওয়াই হয়েছে, তখন মাসখানেকের জন্যে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এস। ওঁর কথাটাও থাক, তোমার একবার বাড়ি যাওয়া—অনেকদিন ত যাওনি, কি বল?

কালীপদ মনে মনে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা, আমি মাস-খানেক ঘুরেই আসি মাঠান। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিলে এই দুর্বলতায় বিজয়ার কি একরকম যেন ভারী লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আর একবার ফিরাইয়া ডাকিয়া নিষেধ করিয়া দিতেও পারিল না। সেও লজ্জা করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীরের ধারে যে কয়টা ঘর লইয়া বিজয়ার জমিদারির কাজকর্ম চলিত, তাহার সম্মুখেই এক সার ঘন-পল্লবের লিচুগাছ থাকায় বসতবাটীর উপরের বারান্দা হইতে ঘরগুলার কিছুই প্রায় দেখা যাইত না। তা ছাড়া, পূর্বদিকের প্রাচীরের গায়ে যে ছোট দরজাটা ছিল তাহা দিয়া যাতায়াত করিলে কর্মচারীদের কে কখন আসিতেছে যাইতেছে তাহার কিছুই জানিবার জো ছিল না।

সেই অবধি দয়াল বাড়ির মধ্যে আর আসেন নাই। কাজ করিতে কাছারিতে আসেন কি না, সঙ্কোচবশতঃ সে সংবাদও বিজয়া লয় নাই, আর বিলাসবিহারী যে এদিক মাড়ান না তাহা কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই সে স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিল। মধ্যে শুধু একদিন সকালে মিনিট-দশেকের জন্য রাসবিহারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে দুই-চারিটা অসুখের কথাবার্তা ছাড়া আর কোন কথাই হয় নাই।

মানুষের অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু মুখের যেটুকু প্রসন্নতা এবং সৌহার্দ্য লইয়া সেদিন তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ওকালতি করিয়া গিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সে ভাব তাঁহার পরিবর্তিত হইয়াছে নিশ্চয় বুঝিয়া বিজয়া উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল। মোটের উপর সবটুকু জড়াইয়া একটা অতৃপ্তি অস্বস্তির মধ্যেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এমন করিয়া আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

আজ অপরাহ্নবেলায় বিজয়া বাটীর কাছাকাছি নদীর তীরে একটুখানি বেড়াইবার জন্য একাকী বাহির হইতেছিল, বৃদ্ধ নায়েবমশাই একতাড়া খাতাপত্র বগলে লইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কি কোথাও বার হচ্চেন? কানাই সিং কৈ?

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, এই কাছেই একটুখানি নদীর তীরে ঘুরে আসতে যাচ্চি। দরোয়ানের দরকার নেই। আমাকে কি আপনার কোন আবশ্যক আছে?

নায়েব কহিল, একটু ছিল মা। না হয় কালকেই হবে। বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই বিজয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দরকার যদি একটুখানিই হয় ত আজই বলুন না। অত খাতাপত্র নিয়ে কোথায় চলেছেন?

নায়েব সেইগুলাই দেখাইয়া কহিল, আপনার কাছেই এসেছি। গত বছরের হিসাবটা সারা হয়েচে—মিলিয়ে দেখে একটা দস্তখত করে দিতে হবে। তা ছাড়া, ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন হাল সনের জমাখরচটাতেও রোজ-তারিখে আপনার সই নেওয়া চাই।

বিজয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। নায়েব সঙ্গে আসিয়া টেবিলের উপর সেগুলা রাখিয়া দিয়া একখানা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বিজয়া বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, এ হুকুম ছোটবাবু কবে দিলেন?

আজ সকালে দিয়েছেন।

আজ সকালে তিনি এসেছিলেন?

তিনি ত রোজই আসেন।

এখন কাছারি-ঘরে আছেন?

নায়েব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এইমাত্র চলে গেলেন।

সেদিনের হাঙ্গামা কোন আমলারই অবিদিত ছিল না। নায়েব বিজয়ার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া ধীরে ধীরে অনেক কথাই কহিল। বিলাসবিহারী প্রত্যহ ঠিক এগারোটার সময় কাছারিতে উপস্থিত হন; কাহারও সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা কহেন না, নিজের মনে কাজ করিয়া পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরিয়া যান। দয়ালবাবুর বাটীতে অসুখ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার আসিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাঁহাকে ছুটি দিয়াছেন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার মনিবের গোচর করিল।

বিজয়া লজ্জিতমুখে নীরবে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া বুঝিল, বিলাস এই নূতন নিয়ম নিদারুণ অভিমানবশেই প্রবর্তিত করিয়াছে। তথাপি এমন কথাও কহিল না যে, এতদিন যাঁহার সই লইয়া কাজ চলিতেছিল, আজও চলিবে—তাহার নিজের সই অনাবশ্যক। বরঞ্চ বলিল, এগুলো থাক, কাল সকালে একবার এসে আমার সই নিয়ে যাবেন। বলিয়া নায়েবকে বিদায় দিয়া সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দিনের আলো ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল, এবং প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যার শান্ত আকাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি তাহার উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কতক্ষণ যে সে এমনি একভাবে বসিয়া কাটাইত বলা যায় না; কিন্তু বেহারা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্রীকে একাকী দেখিয়া যেমন চমকাইয়া উঠিল বিজয়া নিজেও তেমনি লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে আসিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

যে জিনিসটি তাহার চোখে পড়িল, সে তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত। সে কি কোন কারণে কোন ছলেও আর এ বাড়িতে পা দিতে পারে? অথচ সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল সেদিনের সেই সাহেবটিই হ্যাট্-সমেত প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট দীর্ঘদেহ লইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাধারণ বাঙালীর অন্ততঃ আড়াই গুণ লম্বা পা ফেলিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

আজ আর তাহাকে পুলিশ কর্মচারী বলিয়া ভুল হয় নাই। কিন্তু আনন্দের সেই অপরিমিত দীপ্ত রেখাটিকে যে তাহার বিশ্বজোড়া ভয় ও নিরাশার অন্ধকার চক্ষের পলকে গিলিয়া ফেলিল। গাছপালায় ঘেরা, আঁকাবাঁকা পথের মাঝে মাঝে তাহার দেহ অদৃশ্য হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পথের কাঁকরে তাহার জুতার শব্দ ক্রমেই সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে বুঝিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো ভয়ানক অন্যায়, কিন্তু দ্বারের বাহির হইতে অবহেলায় বিদায় দেওয়াও যে অসাধ্য!

এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কোন দিকে খুঁজিয়া না পাইয়া, যে মুহূর্তে পথের বাঁকে কামিনী গাছের পাশে সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্তেই সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ নায়েব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, নিজের মনে চলিয়াছিল; অকস্মাৎ সাহেব দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সাহেবের প্রশ্নে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন হইয়া জবাব দিল, হাঁ, উনি বাহিরের ঘরেই আছেন, বলিয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই বিজয়ার কানে গেল। ক্ষণেক পরেই ঘরে ঢুকিয়া নরেন্দ্র নমস্কার করিল। লাঠি এবং টুপি টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে কহিল, এই যে দেখচি আমার ওষুধে চমৎকার ফল হয়েছে। বাঃ!

ক্ষণেক পূর্বেই বিজয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল, আজ বুঝি সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না—একটা কথার জবাব পর্যন্ত তাহার মুখে ফুটিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই লোকটির কেবল কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই শুধু যে তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচই ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া গেল তাই নয়, তাহার হৃদয়ের অন্ধকার, অজ্ঞাত কোণে সুরবাঁধা বীণার তারের উপর কে যেন না জানিয়া আঙুল বুলাইয়া দিল; এবং একমুহূর্তেই বিজয়া তাহার সমস্ত বিষাদ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি করে জানলেন? আমাকে দেখে, না কারো কাছে শুনে?

নরেন্দ্র বলিল, শুনে। কেন, আপনি কি দয়ালবাবুর কাছে শোনেন নি যে, আমার ওষুধ খেতে পর্যন্ত হয় না, শুধু প্রেস্‌ক্রিপশানটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্ধেক কাজ হয়। বলিয়া নিজের রসিকতায় প্রফুল্ল হইয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল।

বিজয়া বুঝিল, সে দয়ালের কাছে সমস্ত শুনিয়াই তবে আজ ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। তাই এই অসঙ্গত উচ্চহাস্যে মনে মনে রাগ করিয়া ঠোক্কর দিয়া

বলিল, ওঃ—তাই বুঝি বাকি অর্ধেকটা সারাবার জন্যে দয়া করে আবার ওষুধ লিখে দিতে এসেছেন?

খোঁচা খাইয়া নরেনের হাসি থামিল। কহিল, বাস্তবিক বলচি, এ এক আচ্ছা তামাশা।

বিজয়া কহিল, তাই বুঝি এত খুশী হয়েছেন?

নরেনের মুখ গম্ভীর হইল। কহিল, খুশি হয়েছি! একেবারে না। অবশ্য এ কথা একেবারে অস্বীকার করতে পারিনে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ করেছিলাম, কিন্তু তার পরেই বাস্তবিক দুঃখিত হয়েচি। বিলাসবাবুর মেজাজটা তেমন ভাল নয় সত্যি—অকারণে খামকা রেগে উঠে পরকে অপমান করে বসেন, কিন্তু তাই বলে আপনিও যে অসহিষ্ণু হয়ে কতকগুলো অপমানের কথা বলে ফেলবেন সেও ত ভাল নয়। ভেবে দেখুন দিকি, কথাটা প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কতবড় একটা লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। আমার জন্যে আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—

এই লোকটির হৃদয়ের পবিত্রতায় বিজয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, কিন্তু হাসিও চাপতে পাচ্ছেন না। বলিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

নরেন জোর করিয়া এবার ভয়ানক গম্ভীর হইয়া কহিল, কেন আপনি বার বার তাই মনে করচেন? যথার্থই আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েচি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, সেই দিনই নীচে তাঁর বাবা সমস্ত কথা জানিয়ে বললেন, ঈর্ষা! দয়ালবাবুও কাল তাই বললেন। শুনে আমি কি লজ্জা পেয়েচি বলতে পারিনে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাকে ঈর্ষা করবার মত কি আমার আছে আমি তাও ত ভেবে পাইনে। আপনারা ব্রাহ্মসমাজের,আবশ্যক হলে সকলের সঙ্গেই কথা

কন—আমার সঙ্গেও কয়েছেন। এতে এমন কি দোষ তিনি দেখতে পেয়েছেন, আমি ত খুঁজে পাইনে। যাই হোক, আমাকে আপনারা মাপ করবেন—আর ওই বাংলায় কি বলে——অভি—অভিনন্দন! আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্ছি—আপনারা সুখী হোন।

সে নিজের আচরণের উল্লেখ করিতে গিয়াও যে বিজয়ার সেদিনের আচরণ সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত করে নাই, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় বিজয়ার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে চোখের জল সামলাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সেদিন কালীপদকে দিয়ে হঠাৎ স্টেশনে মাইক্রস্কোপটা পাঠিয়েছিলেন কেন বলুন ত?

বিজয়া রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আপনার জিনিস আপনি নিজেই ত ফিরে চেয়েছিলেন।

নরেন বলিল, তা বটে; কিন্তু দামের কথাটা ত তাকে দিয়ে বলে পাঠান নি? তা হলে ত আমার—

বিজয়া কহিল, না। জ্বরের উপর আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সে ভুলের শাস্তিও ত আপনি আমাকে কম দেননি!

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু কালীপদ যে বললে—

বিজয়া বাধা দিয়া বলিল, সে আমি শুনেচি। কিন্তু যাই কেন না সে বলুক, আপনাকে উপহার দেবার মত স্পর্ধা আমার থাকতে পারে—এমন কথা কি করে আপনি বিশ্বাস করলেন? আর সত্যিই তাই যদি করে থাকি, নিজের হাতে কেন শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে আমার অপমান করলেন? আপনার আমি কি করেছিলুম? বলিতে বলিতেই তাহার গলা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল।

নরেন লজ্জিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে। মুখ তাহার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল শুধু তাহার গ্রীবার উপর হীরার কণ্ঠীর একটুখানি—দীপালোকে বিচিত্র রশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। উভয়েই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর নরেন্দ্র ক্ষুণ্ণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কাজটা যে আমার ভাল হয়নি সে আমি তখনি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছিল। কালীপদর দোষ কি?

তার ওপর রাগ করা কিছুতেই আমার উচিত হয়নি। আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন, ঐ ঈর্ষা জিনিসটা যে কত মন্দ এবার আমি ভাল করেই টের পেয়েছি। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকেই বেড়ে চলে তাই নয়; সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এখন ত আমি বেশ জানি, আমাকে ঈর্ষা করার মত ভ্রম বিলাসবাবুর আর কিছু হতেই পারে না। তাঁর বাবাও সে জন্যে লজ্জা এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আপনি শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে, আমার নিজেরও তখন বড় কম ভুল হয়নি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আপনার ভুল কি-রকম?

নরেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, আমাকে নিরর্থক ও-রকম অপমান করায় আপনি যে সত্যিই ক্লেশ বোধ করেছিলেন, সে ত আপনার কথা শুনে সবাই বুঝতে পেরেছিল। তার উপর রাসবিহারীবাবু যখন নীচে গিয়ে তাঁর ছেলের ওই ঈর্ষার কথাটা তুলে আমাকে দুঃখ করতে নিষেধ করলেন, তখন হঠাৎ দুঃখটা আমার যেন বেড়ে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল নিশ্চয় কিছু কারণ আছে; নইলে শুধু শুধু কেউ কারুকে হিংসা করে না। আপনাকে আজ আমি যথার্থ বলচি, তারপর আট-দশদিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাবতুম। আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই মনে পড়ত। তাই ত বলছিলুম—এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। কাজকর্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

এর কি আবশ্যক ছিল বলুন ত! আর শুধু কি তাই? দু-তিনদিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখবার জন্যে। দিন-কতক সে আচ্ছা পাগলা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, একটা কথার জবাব দিল না, নীরবে উঠিয়া পাশের দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল; এবং আর একজনের মুখের হাসি চক্ষের পলকে নিবিয়া গেল। যে পথে সে বাহির হইয়া গেল, সেই অন্ধকারের মধ্যেই নির্নিমেষে চাহিয়া নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিল, না জানিয়া এ আবার কোন্ নূতন অপরাধের সে সৃষ্টি করিয়া বসিল!

সুতরাং বেহারা আসিয়া যখন কহিল, আপনি যাবেন না, আপনার চা তৈরি হচ্চে—তখন নরেন ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, আমার চা দরকার নেই ত।

কিন্তু মা আপনাকে বসতে বলে দিলেন, বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। ইহাও নরেন্দ্রকে কম আশ্চর্য করিল না।

প্রায় মিনিট-পনের পরে চাকরের হাতে চা এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল। সে যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখের উপর হইতে রোদনের ছায়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই তাহা অস্পষ্ট দীপালোকে হয়ত আর কাহারও চোখে ধরা পড়িত না—কিন্তু ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না, কিন্তু এবার আর সে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই সতর্ক হইতে শিখিয়াছিল। যেদিন প্রায় অপরিচিত হইয়াও অন্তরের সামান্য কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া হাত দিয়া বিজয়ার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছিল, আজ আর তাহার সেদিন ছিল না। তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

চাকর টেবিলের উপর চা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয়া তাহারই পাশে খাবারের থালা রাখিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। নরেন তৎক্ষণাৎ

থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া এমনিভাবে আহারে মন দিল যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে কাটিবার পর বিজয়াই প্রথমে কথা কহিল। নীরবতার গোপন ভার আর সে সহিতে না পারিয়া হঠাৎ যেন জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল, কৈ, আপনার সেই পাগলা ভূতটার কথা শেষ করলেন না?

নরেন বোধ করি অন্য কথা ভাবিতেছিল, তাই সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার কথা বলচেন?

বিজয়া কহিল, সেই পাগলা ভূতটা, যে দিন-কতক আপনার কাঁধে চেপেছিল, সে নেবে গেছে ত?

এবার নরেনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ গেছে।

বিজয়া কহিল, যাক। তাহলে বেঁচে গেছেন বলুন। নইলে আরও কত দিন যে আপনাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াত কে জানে!

নরেন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, হাঁ।

বিজয়া পুনরায় ভাল কিছু একটা বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু হঠাৎ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল আকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল। পরের ঘাড়ের ভূত ছাড়ার আনন্দের জের টানিয়া চলা কিছুতেই আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন ধীরেসুস্থে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, আর দশ মিনিট সময় আছে, আমি চললুম।

বিজয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কলকাতায় ফিরে যাবার এই বুঝি শেষ ট্রেন?

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল, আরও একটা আছে বটে, সে কিন্তু ঘণ্টা-দেড়েক পরে। চললুম—নমস্কার। বলিয়া লাঠিটা তুলিয়া একটু দ্রুতপদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাস যথাসময়ে কাছারিতে আসিয়া নিজের কাজ করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কর্মচারী পাঠাইয়া বিজয়ার মত লইত, কিন্তু আপনি আসিত না। তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইলে যে নিজে যাচিয়া আসিবে না, ইহাও বিজয়া বুঝিয়াছিল। অথচ তাহার আচরণের মধ্যে অনুতাপ এবং আহত অভিমানের বেদনা ভিন্ন ক্রোধের জ্বালা প্রকাশ পাইত না বলিয়া বিজয়ার নিজেরও রাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

বরঞ্চ, আপনার ব্যবহারের মধ্যেই কেমন যেন একটা নাটক অভিনয়ের আভাস অনুভব করিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভারী লজ্জা করিত। প্রায়ই মনে হইত, কত লোকেই না জানি এই লইয়া হাসি-তামাশা করিতেছে। তা ছাড়া যে লোক সকলের চক্ষেই এতদিন সর্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া জমিদারির কাজে-অকাজে সে যাহাদিগকে শাসন করিয়া শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের কাছে তাহাকে অকস্মাৎ এতখানি ছোট করিয়া দিয়া বিজয়া আপনার নিভৃত হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা অনুভব করিতেছিল। পূর্বের অবস্থাকে ফিরাইয়া না আনিয়া শুধু এই ঘটনাকে কোনমতে সে যদি সম্পূর্ণ ‘না’ করিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত। এমনি যখন তাহার মনের ভাব, সেই সময় হঠাৎ একদিন বিকালে কাছারির বেহারা আসিয়া জানাইল বিলাসবাবু দেখা করিতে চান।

ব্যাপারটা একেবারে নূতন। বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসতে বল। তাহার মনের ভিতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল; কিন্তু বিলাস প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নমস্কার করিয়া

কহিল, আসুন। বিলাস আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, কাজের ভিড়ে আসতে পারিনে, তোমার শরীর ভাল আছে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সেই ওষুধটাই চলছে?

বিজয়া ইহার উত্তর দিল না, কিন্তু বিলাসও প্রশ্নের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, কাল নব-বৎসরের নূতন দিন—আমার ইচ্ছা হয় সকলকে একত্র করে কাল সকালবেলা একটু ভগবানের নাম করা হয়।

সে যে তাহার প্রশ্ন লইয়া পীড়াপীড়ি করিল না, কেবল ইহাতেই বিজয়ার মনের উপর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ত খুব ভাল কথা।

বিলাস বলিল, কিন্তু নানা কারণে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধে হলো না। যদি তোমার অমত না হয় ত আমি বলি এইখানেই—

বিজয়া তৎক্ষণাৎ সম্‌মত হইয়া সায় দিল, এমন কি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে ঘরটাকে একটুখানি ফুল-পাতা-লতা দিয়ে সাজালে ভাল হয় না? আপনাদের বাড়িতে ত ফুলের অভাব নেই—যদি মালীকে হুকুম দিয়ে কাল ভোর থাকতেই—কি বলেন? হতে পারে না কি?

বিলাস বিশেষ কোন প্রকার আনন্দের আড়ম্বর না দেখাইয়া সহজভাবে বলিল, বেশ, তাই হবে। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে দেব।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, কাল ত বৎসরের প্রথম দিন—আচ্ছা, আমি বলি কি অমনি একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে কি—

বিলাস এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিল এবং উপাসনার পরে জলযোগের আয়োজন যাহাতে ভাল রকম হয়, সে বিষয়ে নায়েবকে হুকুম দিয়া যাইবে জানাইল। আরও দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরে সে বিদায় গ্রহণ করিলে বহুদিনের পরে বিজয়ার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও উল্লাসের দক্ষিণা-বাতাস দিতে

লাগিল। সেদিনকার সেই প্রকাশ্য সংঘর্ষের পর হইতে অব্যক্ত গ্লানির আকারে যে বস্তুটি তাহাকে অনুক্ষণ দুঃখ দিতেছিল, তাহার ভার যে কত ছিল, আজ নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেমন অনুভব করিল এমন বোধ করি কোনদিন করে নাই। তাই আজ তাহার ব্যথার সহিত মনে হইতে লাগিল, এই কয়েকদিনের মধ্যে বিলাস পূর্বেকার অপেক্ষা যেন অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে। অপমান ও অনুশোচনার আঘাত ইহার প্রকৃতিকে যে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে তাহা চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া অজ্ঞাতসারে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, এবং বৃদ্ধ রাসবিহারীর সেদিনের কথাগুলি চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বিলাসবিহারী তাহাকে যে অত্যন্ত ভালবাসে তাহা ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে, সর্বপ্রকারেই ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও সঙ্গোপনে এই ভালবাসার কথা বিজয়ার মনে স্থান পায় না। বরঞ্চ, সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে একাকী ঘরের মধ্যে সঙ্গ-বিহীন প্রাণটা যখন ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কল্পনার নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে যে আসিয়া তাহার পাশে বসে, সে বিলাস নয়, আর একজন। অলস মধ্যাহ্নে বইয়ে যখন মন বসে না, সেলাইয়ের কাজও অসহ্য বোধ হয়, প্রকাণ্ড শূন্য বাড়িটা রবি-করে খাঁ খাঁ করিতে থাকে তখন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন এই শূন্য গৃহই পূর্ণ করিয়া যে ঘরকন্নার স্নিগ্ধ ছবিটি তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে থাকে, তাহার মধ্যে কোথাও বিলাসের জন্য এতটুকু স্থান থাকে না।অথচ, যে লোকটি সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে, সংসার-যাত্রার দুর্গম পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের অপেক্ষা অনেক কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না। তবুও এই অকেজো মানুষটারই সমস্ত অকাজের বোঝা সে নিজে সারাজীবন মাথায় লইয়া চলিতেছে মনে করিতেও বিজয়ার সমস্ত দেহ-মন অপরিমিত আনন্দবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিলাস চলিয়া গেলে বিজয়ার এই মনোভাবের আজও যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল তাহা নহে,

কিন্তু আজ সে বিনা প্রার্থনায় বিলাসের দোষের পুনর্বিচারের ভার হাতে তুলিয়া লইল, এবং ঘটনাচক্রে তাহার স্বভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বাস্তবিক স্বভাব যে তাহার এত হীন নহে, কাহারও সহিত কোন তর্ক না করিয়া সে আপনা-আপনি তাহা মানিয়া লইল।

এমন কি, নিরতিশয় উদারতার সহিত ইহাও আজ সে আপনার কাছে গোপন করিল না যে, বিলাসের মত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া জগতে অধিকাংশ লোকেই হয়ত ভিন্নরূপ আচরণ দেখাইতে পারিত না। সে যে ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার অপরাধই তাহাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বার বার স্মরণ করিয়া আজ সে করুণামিশ্রিত মমতার সহিত তাহাকে মার্জনা করিল।

সকালে উঠিয়া শুনিল, বিলাস বহুপূর্বেই লোকজন লইয়া ঘর-সাজানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, আমাকে ডেকে পাঠান নি কেন?

বিলাস স্নিগ্ধস্বরে বলিল, দরকার কি!

বিজয়া একটু হাসিয়া প্রসন্নমুখে জবাব দিল, আমি বুঝি এতই অকর্মণ্য যে এদিকেও কিছু সাহায্য করতে পারিনে? আচ্ছা, এখন বলুন আমি কি করব?

অনেক দিনের পর বিলাস আজ হাসিল, কহিল, তুমি শুধু নজর রেখো, আমাদের কাজে ভুল হচ্ছে কিনা।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া হাসিমুখে একটা কোচের উপর গিয়া বসিল। খানিক পরেই প্রশ্ন করিল, খাবার বন্দোবস্ত?

বিলাস ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সমস্ত ঠিক হচ্চে—কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা, আমি কেন সেই দিকেই যাইনে?

বেশ ত। বলিয়া বিলাস পুনরায় কাজে মন দিল।

বেলা আটটার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিজয়া অনেকবার আনাগোনা করিয়া অনেক ছোটখাট ব্যাপারে বিলাসের পরামর্শ

লইয়া গেছে—কোথাও বাধে নাই। না জানিয়া কখন যে সঞ্চিত বিরোধের গ্লানি কাটিয়া উভয়ের কথাবার্তার পথ এমন সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল, দুইজনের কেহই বোধ করি খেয়াল করে নাই।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে একবারে অপদার্থ মনে করে বাদ দিলেন কিন্তু আমিও আপনার একটা ভুল ধরেচি তা বলচি।

বিলাস একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অপদার্‌থ একবারও মনে করিনি, কিন্তু ভুল কি রকম?

বিজয়া বলিল, আমরা আছি ত মোটে চার-পাঁচজন, কিন্তু খাবারের আয়োজন হয়ে পড়েচে প্রায় কুড়ি জনের, তা জানেন?

বিলাস কহিল, সে ত বটেই। বাবা তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরা ক'জন, কে কে আসবেন, তা ত ঠিক জানিনে।

বিজয়া ভয়ানক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, সে ত আমাকে বলেন নি?

বিলাস নিজেও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে কাল আমি যাবার পরে বাবা তোমাকে চিঠি লিখে জানান নি?

না।

কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট বললেন—বিলাস থমকিয়া গেল।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, কি বললেন?

বিলাস ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হয়ত আমারই শোনবার ভুল হয়েছে। তিনি চিঠি লিখে জানাবেন বলে বোধ করি ভুলে গেছেন।

বিজয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু তাহার মনের ভিতর জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা সহসা যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুর দল একে একে দেখা দিতে লাগিলেন।

ইঁহাদের সকলেই ব্রাহ্মসমাজের নহেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা রাসবিহারীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের পরিচিত করাইতে গিয়া অচির-ভবিষ্যতে এই মেয়েটির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বিজয়া অস্ফুট-কণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এই সকল প্রচলিত ভদ্রতা-রক্ষার কার্যে সে যখন ব্যাপৃত, তখন অদূরে বাগানের সঙ্কীর্ণ পথে দয়ালবাবু দেখা দিলেন। কিন্তু তিনি একা নহেন, একজন অপরিচিত তরুণী আজ তাঁহার সঙ্গে। মেয়েটি সুশ্রী, বয়স বোধ করি বিজয়ার অপেক্ষা কিছু বেশী। কাছে আসিয়া দয়াল তাহাকে আপনার ভাগ্নী বলিয়া পরিচয় দিলেন। নাম নলিনী, কলিকাতার কলেজে বি. এ. পড়ে। এখনো গরমের ছুটি শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু মামীর অসুখে সেবা করিবার জন্য কিছু পূর্বেই দিন-দুই হইল মামার কাছে আসিয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে, গ্রীষ্মের অবকাশটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবে।

নলিনীকে যে বিজয়া কলিকাতায় একেবারে দেখে নাই তাহা নহে, কিন্তু আলাপ ছিল না। তথাপি এতগুলি পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে আজ সেই তাহার কাছে সকলের চেয়ে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইল। বিজয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল, এবং পাশে বসাইয়া ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উপাসনা সাড়ে-নয়টার সময় শুরু করিবার কথা। তখনো কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া, সকলেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় রাসবিহারীর উচ্চকণ্ঠ ঘরের মধ্যে হইতে শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আদর করিয়া কাহাকে যেন বলিতেছিলেন, এসো বাবা, এসো। তোমার কত কাজ, তুমি যে সময় করে আসতে পারবে এ আমি আশা করিনি।

এই সম্মানিত কাজের ব্যক্তিটি কে জানিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিল নরেন্দ্র। কিন্তু অসম্ভব বলিয়া হঠাৎ তাহার প্রত্যয় হইল না। নলিনীও একই সঙ্গে কৌতূহলবশে মুখ তুলিয়া কহিল, নরেন্দ্রবাবু।

রাসবিহারী তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং সে সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘটনাটা এমনি অচিন্তনীয় যে, বিজয়ার সমস্ত চিন্তাশক্তি পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত হইয়া গেল। আর সে সেদিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না কিন্তু, রাসবিহারীর সবিনয় অভ্যর্থনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই উভয়কে লইয়া রাসবিহারী ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তখন বৃদ্ধ শান্ত, গম্ভীর স্বরে এই দুইটি যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমাদের বাপেদের সম্পর্কে তোমরা দুজনে যে ভাই হও, এই কথাটাই আজ তোমাদের আমি বিশেষ করে বলতে চাই বিলাস।

বনমালী গেলেন, জগদীশ গেছেন, আমারও ডাক পড়েছে। ইহজগতে আমাদের যে শুধু দেহ ব্যতীত আর কিছুই ভিন্ন ছিল না এ কথা তোমরা আজকালকার ছেলেরা হয়ত বুঝবে না, বোঝা সম্ভবও নয়—আমি বোঝাতেও চাইনে। শুধু কেবল আজ নব-বৎসরের এই পুণ্যদিনটিতে তোমাদের উভয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে, তোমাদের গৃহ-বিচ্ছেদের কালি দিয়ে এই বৃদ্ধের বাকী দিন ক'টা আর অন্ধকার করে তুলো না। তাঁহার শেষ কথাটা কাঁপিয়া উঠিয়া ঠিক যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন আর সহিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বিলাসের একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত কহিল, বিলাসবাবু, আমার সকল অপরাধ আপনি মাপ করুন। আমি ক্ষমা চাইচি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস হাত ছাড়িয়া দিয়া নরেন্দ্রকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, অপরাধ আমিই করেচি নরেন। আমাকেই তুমি ক্ষমা কর।

বৃদ্ধ রাসবিহারী মুদিত-নেত্রে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হে সর্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বর! এই দয়া, এই করুণার জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী নমস্কার! এই বলিয়া তিনি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, এবং চাদরের কোণে চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, আজিকার শুভ-মুহূর্ত তোমাদের উভয়ের জীবনে অক্ষয় হোক। আপনারাও আশীর্বাদ করুন! এই বলিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দয়াল ভিন্ন কেহই কিছু জানিতেন না, সুতরাং এই মর্মস্পর্শী করুণ অনুষ্ঠানের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহাদের বাস্তবিকই বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধভাবে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, মেয়েরা যে বলে শাঁকের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে, আমারও হয়েছিল তাই। আমার এ-ও ছেলে, ও-ও ছেলে—বলিয়া নরেন-বিলাসকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, আমার ডান হাতেও যেমন ব্যথা, বাঁ হাতেও তেমনি। কিন্তু আপনাদের কৃপায় আজ আমার বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। আমি কি আর বলব।

ভিতরের ব্যাপারটা তলাইয়া না বুঝিলেও প্রত্যুত্তরে সকলেই হর্ষসূচক একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিলেন।

রাসবিহারী ঘাড়টা একটুখানি মাত্র হেলাইয়া উত্তরীয়-প্রান্তে পুনরায় চক্ষু মার্জনা করিয়া নিকটবর্তী আসনে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া উপস্থিত কাহারও অনুমান করিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, হৃদয় তাঁহার অনির্বচনীয় ভাবরাশিতে এমনি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে যে বাক্যের আর তিলার্ধ স্থান নাই। দয়াল তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভগবৎ-উপাসনার প্রারম্ভে ভূমিকাচ্ছলে বলিলেন, যেখানে

বিরুদ্ধ-হৃদয় সম্মিলিত হয়, তথায় ভগবানের আসন পাতা হয়। সুতরাং আজ এখানে পরম পিতার আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই।

অতঃপর তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তি ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন সমস্তই সত্য এবং মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল। সকলের চক্ষু-পল্লবেই একটা সজলতার আভাস দেখা দিল; শুধু রাসবিহারীর নিমীলিত চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষ হইয়া গেলেও একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি অচেতন, কিংবা সচেতন বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা গেল না।

আর একজন, যাহার মনের কথা টের পাওয়া গেল না সে বিজয়া। সারাক্ষণ সে আনতনেত্রে পাষাণ-মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, তখন মুখখানা শুধু পাথরের মতই অস্বাভাবিকরূপে সাদা দেখাইল।

দয়ালের ভক্তি-গদগদ ধ্বনির প্রতিধ্বনি তখন অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছিল, এমনি সময়ে রাসবিহারী চক্ষু মেলিলেন; এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন, আমার সে সাধনার বল নাই, কিন্তু দয়ালের মহাবাক্য যে কত বড় সত্য আজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সম্মিলিত হৃদয়ের সন্ধিস্থলে যে সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, আজ তাহার অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার জীবন চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া গেল। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দয়ালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, দয়াল! ভাই! এ শুধু তোমারই পুণ্যে, তোমারই আশীর্বাদে।

দয়ালের চোখ ছলছল করিয়া আসিল কিন্তু তিনি কোন কথা কহিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাশের ঘরেই জলযোগের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এখন বিলাস সেই ইঙ্গিত করিতেই রাসবিহারী তাহাকে বাধা দিয়া অভ্যাগতগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের কাছে আজ আর একটি বিষয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

বনমালী বেঁচে থাকলে আজ তাঁর কন্যার বিবাহের কথা তিনিই আপনাদিগকে জানাতেন, আমাকে বলতে হতো না; কিন্তু এখন সে ভার আমার উপরেই পড়েছে। এখন আমি বর-কন্যার পিতা। আমি এই মাসেরই শেষ-সপ্তাহে পূর্ণিমা-তিথিতে বিবাহের দিন স্থির করেচি—আপনারা সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করুন যেন শুভকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এই বলিয়া তিনি একজোড়া মোটা সোনার বালা পকেট হইতে বাহির করিয়া দয়ালের হাতে দিলেন।

দয়াল সেই দুটি লইয়া বিজয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, শুভকর্মের সূচনায় কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কামনা করি মা, হাত দুটি একবার দেখি!

কিন্তু সেই আনতমুখী, মূর্তির মত আসীনা রমণীর নিকট হইতে লেশমাত্র সাড়া আসিল না। দয়াল পুনরায় তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন; তথাপি সে তেমনি স্থির বসিয়া রহিল। নলিনী পাশেই ছিল; সে মামার অবস্থাসঙ্কট অনুভব করিয়া হাসিয়া বিজয়ার হাত দুটি তুলিয়া ধরিল, এবং দয়াল না জানিয়া এক-জোড়া অত্যাচারের হাতকড়ি আশীর্বাদের সুবর্ণ-বলয় জ্ঞানে সেই মূর্ছিত-প্রায় নিরুপায় নারীর অশক্ত অবশ দুটি হাতে একে একে পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু কেহই কিছু জানিল না। বরঞ্চ ইহাকে মধুর লজ্জা কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ভাবিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং নিমিষে শুভকামনার কলগুঞ্জনে সমস্ত ঘরটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময়টায় কি করিয়া যে বিজয়া আত্মসংবরণ করিয়া অতিথিদের সম্ভ্রম এবং মর্যাদা রক্ষা করিল তাহা

অন্তর্যামী ভিন্‌ন আর যে লোকটির অগোচর রহিল না সে রাসবিহারী। কিন্তু তিনি আভাসমাত্র দিলেন না। জলযোগ সমাপন করিয়া একটি লবঙ্গ মুখে দিয়া হাসিমুখে কহিলেন, মা, আমি চললুম। বুড়োমানুষ রোদ উঠলে আর হাঁটতে পারব না। বলিয়া আর একপ্রস্থ আশীর্বাদ করিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সবাই চলিয়া গিয়াছে। শুধু বিজয়া এবং নলিনী তখনও বাহিরের বারান্দায় একধারে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। বিজয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কত যে সুখী হলুম, সে বলতে পারিনে। এখানে এসে পর্যন্ত আমি একবারে একলা পড়ে গেছি—এমন কেউ নেই যে দুটো কথা বলি। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সময় পাবেন আসবেন।

নলিনী খুশী হইয়া সম্মত হইল।

তখন বিজয়া কহিল, আমি নিজেও হয়ত ও-বেলায় আপনার মামীমাকে দেখতে যাব। কিন্তু তখনই রৌদ্রের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, দয়ালবাবু নিশ্চয় কাছারিতে ঢুকেছেন, ডেকে পাঠাই—বলিয়া বেহারার সন্ধানে পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই নলিনী বাধা দিয়া বলিল, তিনি ত এখন বাড়ি যাবেন না, একেবারে সন্ধ্যাবেলায় ফিরবেন।

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আগে বলেন নি কেন? আমি দরোয়ানকে ডেকে দিচ্চি, সে আপনার—

নলিনী কহিল, না, দরোয়ানের দরকার নেই, আমি নরেন্দ্রবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি তাঁর মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন।

বিজয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় ছিল নাকি? কৈ, আমি ত এ কথা জানতুম না।

নলিনী কহিল, পরিচয় কিছুই ছিল না। শুধু পরশুদিন মামার চিঠি পেয়ে স্টেশনে এসে দেখি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেছি।

বিজয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি?

নলিনী কহিল, কিন্তু কি চমৎকার লোক দেখেছেন! দু'দিনেই যেন কত দিনের আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এ-বেলায় আমাদের ওখানেই উনি স্নানাহার করে বিকেলবেলা কলকাতায় যাবেন, স্থির হয়েছে। আমার মামীমা ত ওঁকে একবারে ছেলের মত ভালবাসেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ চমৎকার লোক।

নলিনী কহিতে লাগিল, ওঁর সঙ্গে যে কারও কখনো মনোমালিন্য ঘটতে পারে, এ আমি চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতুম না। আমি বড় খুশী হয়েছি যে, আজ বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মিল হয়ে গেল; কিন্তু কি চমৎকার লোক ওঁর বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে সকলেরই ওঁর মত হবার চেষ্টা করা উচিত। রাসবিহারীবাবুর আদর্শ যেদিন ব্রাহ্মসমাজের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিনই বুঝব আমাদের ব্রাহ্মধর্ম সফল হল, সার্থক হল! কি বলেন? ঠিক নয়?

অদূরে দেখা গেল, নরেন্দ্র টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছে। বিজয়া নলিনীর প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া শুধু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ঐ যে উনি আসচেন।

নরেন্দ্র কাছে আসিয়া বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে, এরই মধ্যে দুজনের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। বাস্তবিক, আজ বছরের প্রথম দিনটায় আমার ভারী সুপ্রভাত! সকালটা চমৎকার কাটল। দেখে আশা হচ্ছে, এ বছরটা হয়ত ভালই কাটবে। কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বলুন ত?

বিজয়া উত্যক্তস্বরে কহিল, একদিনের মধ্যে ও প্রশ্ন কতবার করা দরকার বলুন ত?

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছি, না? তা হোলই বা। আচ্ছা, খপ্ কোরে অমন রেগে যান কেন বলুন দেখি? ওটা ত আপনার ভারী দোষ। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও কোন মতে হাসি চাপিয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত জবাব দিল, ও বিষয়ে সবাই কি আপনার মত নির্দোষ হতে পারে? তবুও দেখুন, কালীপদর মত এমনও সব নিন্দুক আছে যারা আপনার মত সাধুকেও বদ্‌রাগী বলে অপবাদ দেয়।

কালীপদর নামে নরেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, আপনি ভয়ানক অভিমানী, কিছুতেই কারও দোষ মার্জনা করতে পারেন না। কিন্তু 'এমন সব'-এর সবটা কারা শুনি? কালীপদ আর আপনি নিজে, এই ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর স্টেশনে যারা দেখেছে তারাও।

নরেন কহিল, আর?

বিজয়া কহিল, আর যারা শুনেছে তারাও।

নরেন কহিল, তা হলে আমার সম্বন্ধে রাজ্যসুদ্ধ লোকেরই এই মত বলুন?

বিজয়া পূর্বের গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়াই জবাব দিল, হাঁ। আমদের সকলের মতই এই।

নরেন কহিল, তা হলে ধন্যবাদ। এইবার আপনার নিজের সম্বন্ধে সকলের মত কি, সেইটে বলুন। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার ইঙ্গিতে বিজয়ার মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে নেই—পাপ হয়। সেটা বরঞ্চ আপনি বলুন। কিন্তু এখন নয়, নাওয়া-খাওয়ার পরে। বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, এ কাজটা এখানেই সেরে নিলে ভাল হত না? বলিয়া সে নলিনীর মুখের প্রতি চাহিল।

নলিনী কহিল, কিন্তু মামীমা যে অপেক্ষা করে থাকবেন।

বিজয়া কহিল, আমি এখ্‌খুনি লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি।

নলিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কহিল, আমাকে যেতেই হবে। মামীমা রোগী মানুষ, বাড়িতে সমস্ত দুপুরবেলাটা কেউ কাছে না থাকলে চলবে না।

কথাটা সত্য, তাই সে আর জিদ করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিয়া নলিনী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, কিন্তু আপনি না হয় এখানেই স্নানাহার করুন নরেনবাবু, আমি গিয়ে মামীমাকে জানাব। শুধু যাবার সময় একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন।

আর আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ নরাধম পেয়েছেন যে, এই রোদের মধ্যে আপনাকে একলা ছেড়ে দেব? বলিয়া নরেন সহাস্যে বিজয়ার মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার কাছে একদিন ত ভালরকম খাওয়া পাওনা আছেই— সেদিন না হয় সকাল সকাল এসে এই খাওয়াটার শোধ তোলবার চেষ্টা করব। আচ্ছা নমস্কার। নলিনীকে কহিল, আর দেরি নয়, চলুন। বলিয়া হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া দিল।

নলিনী নামিয়া কাছে আসিল, কিন্তু আর একজন যে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষে যে শান-দেওয়া ছুরির আলো ঝলসিতে লাগিল, তাহা দুজনের কেহই লক্ষ্য করিল না; করিলে বোধ করি, নরেন্দ্র দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিতে সাহস করিত না—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যে জিনিসটা শুরু থেকেই এত দুঃখের মূল, যার জন্যে আমার দেশময় অখ্যাতি, আমাকেই কেন সেটা আজকের আনন্দের দিনে বকশিশ করে দিন না? সেই দুশো টাকাটা কাল-পরশু যেদিন হয় পাঠিয়ে দেব। বলিয়া আরও একবার হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সুবিধা হইল না। বরঞ্চ ও-পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে একেবারে অপ্রত্যাশিত কড়া জবাব আসিল। বিজয়া কহিল, দাম নিয়ে দেওয়াকে আমি উপহার দেওয়া বলিনে, বিক্রি করা বলি। ও-রকম উপহার দিয়ে আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন; কিন্তু

আমাদের শিক্ষা আর এক রকম হয়েছিল। তাই আজ আনন্দের দিনে সেটা বেচতে ইচ্ছে করিনে।

এই আঘাতের কঠোরতায় নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমনিই ত সে বিজয়ার মেজাজের প্রায় কোন কূল-কিনারা পায় না—তাহাতে আজ তাহার বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার দাহ যখন অকস্মাৎ অকারণে বাহির হইয়া পড়িল তখন নরেন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিল না। সে ক্ষণকাল তাহার কঠিন মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিল, আমার একান্ত দীন অবস্থা আমি ভুলেও যাইনি, গোপন করবার চেষ্টাও করিনি যে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

নলিনীকে দেখাইয়া কহিল, আমি এঁকেও আমার সমস্ত ইতিহাস বলেছি। বাবা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ি-ঘরদ্বার যা-কিছু এখানে ছিল সর্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে, কিছুই কারো কাছে লুকোই নি। উপহার দিয়েছি এ কথা বলিনি। আচ্ছা, বলুন ত এসব কি আপনাকে জানাই নি?

নলিনী সলজ্জে সায় দিয়া কহিল, হ্যাঁ।

বিজয়ার মুখ বেদনায়, লজ্জায়, ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে শুধু বিহ্বল আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই অপরিসীম বেদনাকে বিমথিত করিয়া নরেন্দ্র ম্লানমুখে পুনশ্চ কহিল, আমার কথায় আপনি প্রায়ই অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেন। হয়ত ভাবেন, নিজের অবস্থাকে ডিঙ্গিয়ে আমি নিজেকে আপনাদের সমান এবং সমকক্ষ বলে প্রচার করতে চাই—হতেও পারে সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখতে পারিনে, কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষে। কিন্তু যাক, অসম্ভ্রম যদি করে থাকি আমাকে মাপ করবেন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথটার মধ্যে দুজনের শুধু এই কথাটাই হইল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, কি উপহার দেবার কথা বলেছিলেন?

নরেন্দ্র ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, আর একদিন এ কথা আপনাকে বলব—কিন্তু আজ নয়।

সেই বাঁশের পুলটার কাছে আসিয়া নরেন সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আজ আমাকে মাপ করতে হবে—আমি ফিরে চললুম। কিন্তু নলিনীকে বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায় দেখিয়া পুনরায় বলিল, এইভাবে হঠাৎ ফিরে যাওয়ায় আমার অন্যায় যে কি পর্যন্ত হচ্চে, সে আমি জানি। কিন্তু তবুও ক্ষমা করতে হবে—আজ আমি কোন মতে যেতে পারব না। আপনার মামীমাকে বলে দেবেন আমি আর একদিন এসে—

তাহার সঙ্কল্পের এই আকস্মিক পরিবর্তনে নলিনী যত আশ্চর্য হইয়াছিল, এখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঢের বেশী আশ্চর্য হইল। বোধ হয়, এই জন্যই সে এবিষয়ে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া তাহাকে শুধু কহিল, আপনার যে খাওয়া হলো না। কিন্তু আবার কবে আসবেন?

পরশু আসবার চেষ্টা করব, বলিয়া নরেন যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুতপদে রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মাঠ পার হইতে আর যখন দেরি নাই, এমন সময় দেখিল কে একটা ছেলে হাত উঁচু করিয়া তাহারই দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। সে যে তাহার জন্য ছুটিতেছে, এবং হাত তুলিয়া তাহাকেই থামিতে ইঙ্গিত করিতেছে অনুমান করিয়া নরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাঠান ডেকে পাঠালেন তোমাকে। চল।

আমাকে?

হিঁ—চল না।

নরেন্দ্র নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, তুই বুঝতে পারিস নি রে—আমাকে নয়।

পরেশ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হিঁ তোমাকেই। তোমার মাথায় যে সাহেবের টুপি রয়েছে। চল।

নরেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোর মাঠান কি বলে দিলে তোকে?

পরেশ কহিল, মাঠান সেই চিলের ছাত থেকে দৌড়ে নেমে এসে বললে, পরেশ ছুটে যা—এই সোজা গিয়ে বাবুকে ধরে আন। মাথায় সাহেবের টুপি—যা—ছুটে যা—তোকে খুব ভাল একটা লাটাই কিনে দেব। চল না।

এতক্ষণে ইহার ব্যগ্রতার হেতু বুঝা গেল। সে লাটাইয়ের লোভে এই রৌদ্রের মধ্যে ইঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোনমতে ছাড়িয়া যাইবে না। তাহার একবার মনে হইল ছেলেটিকে নিজেই একটা লাটাইয়ের দাম দিয়া এইখান হইতে বিদায় করে। কিন্তু আজই এমন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইবার কি কারণ, সে কৌতূহলও কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু যাওয়া উচিত কি না স্থির করিতে তাহার আরও কিছুক্ষণ লাগিল; এবং শেষ পর্যন্ত স্থিরও কিছু হইল না; তবুও অনিশ্চিত পথ তাহার ওই দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সমস্ত রাস্তাটা সে ডাকিবার কারণটাই মনে মনে হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু ডাকাটাই যে সব চেয়ে বড় কারণ সেটা আর তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরের ঘরে পা দিতেই বিজয়া আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল। দুটি আর্দ্র উৎসুক চক্ষু তাহার মুখের উপর পাতিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, না খেয়ে এত বেলায় চলে যাচ্ছেন যে বড়? আমি মিছামিছি রাগ করি, আমি ভয়ানক মন্দ লোক—আর নিজে?

নরেন গভীর বিস্ময়ভরে বলিল, এর মানে? কে বলেছে আপনি মন্দ লোক, কে বলেছে ও-সব কথা আপনাকে?

বিজয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; কহিল, আপনি বলেছেন। কেন নলিনীর সামনে আমাকে অমন করে অপমান করলেন? আমাকেই অপমান করলেন, আবার আমাকেই শাস্তি দিতে না খেয়ে চলে যাচ্ছেন? কি করেছি আপনার আমি? বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বোধ করি, তাহাই সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ও-দিকের জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন হতবুদ্ধির মত বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এ অভিযোগের কোথায় কি যে জবাব আছে তাহাও যেন খুঁজিয়া পাইল না, ইহার কারণই বা কি তাহাও তেমনি ভাবিয়া পাইল না।

স্নানের জল প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে বেহারা জানাইয়া গেলে বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে শুধু কহিল, আর দেরি করবেন না, যান।

স্নান সারিয়া নরেন্দ্র আহারে বসিল। বিজয়া একখানা পাখা হাতে করিয়া তাহার অদূরে আসিয়া যখন উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত সংগোপনে তাহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল। বাতাস করিতে উদ্যত দেখিয়া নরেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আমাকে হাওয়া করবার দরকার নেই, আপনি পাখাটা রেখে দিন।

বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। বাবা বলতেন, মেয়েমানুষকে শুধু হাতে কখনও বসতে নেই।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়াও ত হয়নি!

বিজয়া কহিল, না। পুরুষমানুষদের খাওয়া না হলে আমাদের খেতেও নেই।

নরেন খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, ব্রাহ্ম হলেও ত আপনাদের আচার-ব্যবহার আমাদের মতই।

বিজয়া এ কথা বলিল না যে, অনেক ব্রাহ্মবাড়িতেই তাহা নয়, বরঞ্চ ঠিক উলটো, শুধু তাহার পিতাই কেবল এই-সকল হিন্দু-আচার নিজের বাড়িতে বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরঞ্চ কহিল, এতে আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই। আমরা বিলেত থেকেও আসিনি, কাবুল থেকেও আমাদের আচার-ব্যবহার আমদানী করে আনতে হয়নি। এ-রকম না হলেই বরং আশ্চর্য হবার কথা।

চাকর দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, মা, সরকারমশাই হিসেবের খাতা নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কি যেতে বলে দেব?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আজ আর আমার দেখবার সময় হবে না, তাঁকে কাল একবার আসতে বলে দাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, এইটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়।

কোন্‌টি?

চাকরদের মুখের এই ডাকটি। বলিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মমহিলাও বটে, আলোকপ্রাপ্তাও বটে, এবং বিশেষ করে বড়মানুষও বটে। এমনি আলোক-পাওয়া অনেক বাড়িতেই আমাকে আজকাল চিকিৎসা করতে যেতে হয়। তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে ‘মেম-সাহেব’। সত্যিকারের মেম-সাহেবরা এঁদের যে চক্ষে দেখে, তা জানেন বলেই বোধ করি মাইনে-করা চাকরদের দিয়ে ‘মেম-সাহেব’ বলিয়ে নিয়ে আত্মমর্যাদা বজায় রাখেন। বলিয়া প্রকাণ্ড একটা পরিহাসের মত হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাস্যে বাড়িটা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। বিজয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। নরেনের হাসি থামিলে সে পুনরায় কহিল, বাড়ির দাসী-চাকরের মুখের মাতৃ-সম্বোধনের চেয়ে ‘মেম-সাহেব’ ডাকটা যেন বেশী ইজ্জতের! প্রথম দিন আমি বুঝতেই পারিনি বেহারাটা ‘মেম’ বলে কাকে? চাকরটা কি বললে জানেন? বলে, ‘আমি অনেক সাহেব-বাড়িতে চাকরি করেচি, সত্যকারের মেম-সাহেব কি, তা খুব জানি। কিন্তু, কি করব ডাক্তারবাবু?

নতুন হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা গিন্নীকে ‘মাইজী’ বলে ফেলেছিল বলে মেম-সাহেব তার একটাকা জরিমানা করে দিলেন। চাকরিটা যে বজায় রইল এই তার ভাগ্যি। এমনি রাগ। আচ্ছা, আপনি বোধ হয় এরকম অনেক দেখেছেন, না?

বিজয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

নরেন কহিল, আমাকে এইটে একদিন দেখতে হবে, এই সব মেম-সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাকে মা বলে, না ‘মেম-সাহেব’ বলে ডাকে! বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দে আর একবার ঘর ফাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

বিজয়া হাসিমুখে কহিল, খেয়ে-দেয়ে সমস্ত দিন ধরে পরচর্চা করে আমোদ করবেন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমাকে কি আজ খেতে দেবেন না?

নরেন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দু-চার গ্রাস গিলিয়া লইয়াই সব ভুলিয়া গেল। কহিল, আমিও ত চার-পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম, কিন্তু এই দিশী-সাহেবরা—

বিজয়া তর্জনী তুলিয়া কৃত্রিম শাসন করার ভঙ্গীতে কহিল, আবার পরের নিন্দে!

আচ্ছা, আর নয়—বলিয়া সে পুনরায় আহারে মন দিয়াই কহিল, কিন্তু আর খেতে পাচ্ছিনে—

বিজয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাঃ—কিছুই ত খাননি। না, এখন উঠতে পাবেন না। আচ্ছা, না হয় পরের নিন্দে করতে করতেই অন্যমনস্ক হয়ে খান, আমি কিছু বলব না।

নরেন হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল,আপনি এতেই বলছেন খাওয়া হল না—কিন্তু আমার কলকাতার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন ত অবাক হয়ে যাবেন। দেখছেন না, এই ক’মাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হয়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন-ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজী, তেমনি

বদমাইশ জুটেছে চাকরটা। সাত-সকালে রেঁধে রেখে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই—আমার কোন দিন ফিরতে হয় দুটো, কোন দিন বা চারটে বেজে যায়।

সেই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত—দুধ কোন দিন বা বেড়ালে খেয়ে যায়, কোন দিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি করে রাখে—সে দেখলেই ঘৃণা হয়। অর্ধেক দিন ত একেবারেই খাওয়া হয় না।

রাগে বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, এমন সব চাকর-বাকরদের দূর করে দিতে পারেন না? নিজের বাসায় এত টাকা মাইনে পেয়েও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?

নরেন কহিল, এক হিসাবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে দু শ' টাকা চুরি করে নিলে, একদিন নিজেই কোথায় একশ' টাকার নোট হারিয়ে ফেললুম। অন্যমনস্ক লোকের ত পদে পদে বিপদ কিনা! একটুখানি থামিয়া কহিল, তবে নাকি দুঃখ-কষ্ট আমার অনেকদিন থেকেই সয়ে গেছে, তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের উপর খাওয়ার কষ্টটা এক-একদিন যেন অসহ্য বোধ হয়।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নরেন কহিতে লাগিল, বাস্তবিক, চাকরি আমার ভালও লাগে না, পারিও না। অভাব আমার খুবই সামান্য—আপনার মত কোন বড়লোক দু'বেলা চারটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম ত আমি আর কিছুই চাইতুম না—কিন্তু, সে-রকম বড়লোক কি আর আছে? বলিয়া আর এক দফা উচ্চহাসির ঢেউ তুলিয়া দিল। বিজয়া পূর্বের মতই নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেন কহিল, কিন্তু আপনার বাবা বেঁচে থাকলে, হয়ত এ সময়ে আমার অনেক উপকার হতে পারত—তিনি নিশ্চয় আমাকে উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন।

বিজয়া উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে জানলেন? তাঁকে ত আপনি চিনতেন না?

নরেন কহিল, না, আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেন নি। কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন জানেন? তিনিই। আচ্ছা, আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনও তিনি কিছু বলে যাননি?

বিজয়া কহিল, বলাই ত সম্ভব। কিন্তু আপনি ঠিক কি ইঙ্গিত করচেন, তা না বুঝলে ত জবাব দিতে পারিনে।

নরেন ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, থাক গে। এখন এ আলোচনা একবারেই নিষ্প্রয়োজন।

বিজয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, না, বলুন। আমি শুনতে চাই।

নরেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল, যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, তা শুনে আর কি হবে বলুন?

বিজয়া জিদ করিয়া কহিল, না, তা হবে না। আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন।

তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নরেন হাসিল; কহিল, বলা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়—বলতে আমার নিজেরও লজ্জা হচ্চে। হয়ত আপনার মনে হবে আমি কৌশলে আপনার সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে—বিজয়া অধীর হইয়া কথার মাঝখানেই বলিল, আমি আর খোশামোদ করতে পারিনে আপনাকে—পায়ে পড়ি, বলুন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে।

না, এখ্‌খুনি—

আচ্ছা বলচি বলচি। কিন্তু একটা কথা পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাড়িটার বিষয়ে কোন কথা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেন নি?

বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। নরেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, আচ্ছা,রাগ করতে হবে না আমি বলচি। যখন বিলেত যাই তখনই বাবার কাছে শুনেছিলুম আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচ্চেন।

আজ তিনদিন হল, দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। যে ঘরটায় ভাঙ্গাচোরা কতকগুলো আসবাব পড়ে আছে, তারই একটা ভাঙ্গা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল—বাবার জিনিস বলে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখলুম, খান-দুই চিটি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ হয় শেষ-বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেলতে শুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিতই একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তার পরে নীচের দিকে এক জায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছিলেন, বাড়িটার জন্যে ভাবনা নেই—নরেন আমারও ত ছেলে, বাড়িটা তাকে যৌতুক দিলাম।

বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তার পরে?

নরেন কহিল, তার পরে সব অন্যান্য কথা। তবে এ পত্র বহুদিন পূর্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদলে গিয়েছিল বলেই কোন কথা আপনাকে বলে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।

পিতার শেষ ইচ্ছাগুলি বিজয়ার অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, তা হলে বাড়িটা দাবী করবেন বলুন, বলিয়া হাসিল।

নরেন নিজেও হাসিল। প্রস্তাবটা চমৎকার পরিহাস কল্পনা করিয়া কহিল, দাবী নিশ্চয় করব, এবং আপনাকেও সাক্ষী মানব। আশা করি সত্য কথাই বলবেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, নিশ্চয়। কিন্তু সাক্ষী মানবেন কেন?

নরেন কহিল, নইলে প্রমাণ হবে কিসে? বাড়িটা যে সত্যই আমার সে কথা ত আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

বিজয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, অন্য আদালতের দরকার নেই—বাবার আদেশই আমার আদালত। ও বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

তাহার মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ঠিক রহস্যের মত শোনাইল না বটে, কিন্তু সে ছাড়া যে আর কি হইতে পারে তাহাও মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিজয়ার পরিহাসের ভঙ্গী এত নিগূঢ় যে, শুধু মুখ দেখিয়া জোর করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নরেন্দ্র নিজেও ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, তা হলে তাঁর চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় বাড়িটা দিয়ে দেবেন?

বিজয়া কহিল, না, চিঠি আমি দেখতে চাই। কিন্তু, এই কথাই যদি তাতে থাকে তাঁর হুকুম আমি কোন মতেই অমান্য করব না।

নরেন্দ্র কহিল, তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্যন্ত এই ছিল তারই বা প্রমাণ কোথায়?

বিজয়া উত্তর দিল, ছিল না তার ত প্রমাণ নেই।

নরেন্দ্র কহিল, কিন্তু, আমি যদি না নিই? দাবী না করি?

বিজয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পিসীর ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস, অনুরোধ করলে তারা দাবী করতে অসম্মত হবেন না।

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, এ বিশ্বাস আমারও আছে। এমন কি, হলফ করে বলতেও রাজী আছি।

বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নরেন্দ্র পুনরায় কহিল, অর্থাৎ, আমি নিই, না নিই, আপনি দেবেনই?

বিজয়া কহিল, অর্থাৎ বাবার দান করা জিনিস আমি আত্মসাৎ করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া নরেন মনে মনে বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। কিন্তু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, ও বাড়ি যখন সৎকর্মে দান করেছেন তখন আমি না নিলেও আপনার আত্মসাৎ করার পাপ হবে না। তা ছাড়া, ফিরিয়ে নিয়ে কি করব বলুন? আপনার কেউ নেই যে তারা বাস করবে।

আমাকে বাইরের কোথাও না কোথাও কাজ করতেই হবে। তার চেয়ে যে ব্যবস্থা, হয়েছে, সেই ত সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আরও এক কথা এই যে বিলাসবাবুকে কোনও মতেই রাজী করাতে পারবেন না।

এই শেষ কথাটায় বিজয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, নিজের জিনিসে অপরকে রাজী করানোর চেষ্টা করার মত অপর্যাপ্ত সময় আমার নেই। কিন্তু, আপনি ত আর এক কাজ করতে পারেন। বাড়ি যখন আপনার দরকার নেই, তখন তার উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা হলে চাকরিও করতে হবে না, অথচ নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। আপনি সম্মত হোন নরেনবাবু।

এই একান্ত মিনতিপূর্ণ অনুনয়ের স্বর অকস্মাৎ শরের মত গিয়া নরেনের হৃদয়ে বিঁধিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; এবং যদিচ বিজয়ার অবনতমুখে এই মিনতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পড়িয়া লইবার সুযোগ মিলিল না, তথাপি ইহা পরিহাস নয় সত্য, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। পিতৃঋণের দায়ে তাহাকে গৃহহীন করিয়া এই মেয়েটি যে সুখী নয়, বরঞ্চ হৃদয়ে ব্যথাই অনুভব করিতেছে, এবং কোন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া তাহার দুঃখের ভার লঘু করিয়া দিতে চায় ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু, তাই বলিয়া এরূপ প্রস্তাবও ত স্বীকার করা চলে না। যাহা প্রাপ্য নয় গরীব বলিয়া তাহাই বা কিরূপে ভিক্ষা লইবে? আরও একটা কথা আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপার পূর্বে একেবারেই সমস্যা ছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন এই লোকটির কাছে সহজ হইয়া গেছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বিলাসের সম্বন্ধে বিজয়া আবেগের উপর যাহাই কেন না বলুক, তাহার বাধা ঠেলিয়া শেষ পর্যন্ত এ সঙ্কল্প কিছুতেই কার্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাতে শুধু কেবল তাহার লজ্জা এবং বেদনাই বাড়িবে আর কিছু হইবে না।

কিছুক্ষণ তাহার অবনত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরলকণ্ঠে বলিল, আপনার মনের কথা আমি বুঝেচি। গরীবকে কোন একটা ছলে কিছু দান করতে চান, এই ত?

ঠিক এই কথাটাই আজ একবার হইয়া গেছে। তাহারই পুনরাবৃত্তিতে বিজয়া বেদনায় ম্লান হইয়া চোখ তুলিয়া কহিল, এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই, আপনি জানেন?

নরেন মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তবে আসল কথাটা কি শুনি?

বিজয়া কহিল, সত্যি কথাই আমি বরাবর বলেচি; আপনার পাপ মন বলেই শুধু বিশ্বাস করতে পারেন নি। আপনি গরীব হোন, বড়লোক হোন, আমার কি? আমি কেবল বাবার আদেশ পালন করবার জন্যেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্চি।

নরেন সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, ওর মধ্যেও একটু মিথ্যে রয়ে গেল—তা থাক। কিন্তু খুব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ত করচেন; কিন্তু বাবার হুকুমমত ফিরিয়ে দিতে হলে আরও কত জিনিস দিতে হয় জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়।

বিজয়া কহিল, বেশ। নিন, আপনার সম্পত্তি ফিরিয়ে নিন।

এইবার নরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, খুব বড় গলায় চিৎকার করে ত আমাকে দাবী করতে বলচেন। আমি না করলে আমার পিসীমার ছেলেদের দাবী করতে বলবেন, ভয় দেখাচ্চেন। কিন্তু, তাঁরই আদেশমত দাবী আমার কোথা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, জানেন কি? শুধু কেবল ওই বাড়িটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়, তার ঢের-ঢের বেশী।

বিজয়া উৎসুক হইয়া কহিল, বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন?

নরেন বলিল, তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু তিনি ওইটুকু দিয়েই আমাকে বিদায় করেন নি। যেখানে যা কিছু আছে দেখচেন, সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবী শুধু ওই বাড়িটা করতে পারি তাই নয়। এ বাড়ি,

এই ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেয়ালগিরি-খাট-পালঙ্ক, বাড়ির দাস-দাসী-আমলা-কর্মচারী, মায় তাদের মনিবটিকে পর্যন্ত দাবী করতে পারি, তা জানেন কি? বাবার হুকুম—দেবেন এই সব?

বিজয়ার পদনখ হইতে চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু, সে কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। নরেন সগর্বে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, কেমন, দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন! বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, এইবার বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার প্রবল হাস্য সহসা যেন মার খাইয়া রুদ্ধ হইল। বিজয়ার মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্র নাই—এমনি একটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নরেন উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আমি কি সত্যি সত্যিই এই সব দাবী করতে যাচ্চি, না করলেই পাব? বরঞ্চ আমাকেই ত তা হলে ধরে নিয়ে পাগলা গারদে পুরে দেবে।

বিজয়া এ-সকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, কৈ দেখি বাবার চিঠি?

নরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, বেশ, আমি কি পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্চি নাকি? আর সে দেখেই বা লাভ কি আপনার?

তা হোক। দরোয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন। সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।

এত তাড়া?

হাঁ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদ্রাহীন রজনীর পরিপূর্ণ ক্লান্তি লইয়া বিজয়া সকালে নীচের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমিদা্রী সেরেস্তার খেরো-বাঁধানো খাতাগুলি টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে, এবং বৃদ্ধ গোমস্তা অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে সবিনয়ে কহিল, মা, এগুলো আজ ফিরে চাই-ই।

তাহাকে ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিজয়া উপরের খাতাটা তুলিয়া লইয়া জানালা-সংলগ্ন কৌচের উপর গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মনোযোগ দিবার শক্তিই ছিল না—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বারংবার হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়া জানালার বাহিরে এখানে-ওখানে পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, বাগানের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী পরেশকে কি-সকল প্রশ্ন করিতেছেন। আঙুল তুলিয়া কখনও নীচের ঘর, কখনও বা ছাদের উপর নির্দেশ করিতেছেন। দু'জনের কাহারও একটা কথাও না শুনিয়া বিজয়া চক্ষের নিমেষে বৃদ্ধের ক্রূর ইঙ্গিতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

খানিক পরে তিনি ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারি-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পরেশ বাড়ির দিকে আসিতেছিল, বিজয়া জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোকে কি জিজ্ঞেসা করছিলেন রে?

পরেশ কহিল, আচ্ছা মাঠান, সরকারমশায়ের কাছে টাকা নিয়ে আমি ঘুড়ি-নাটাই কিনতে চলে গেনু না? ডাক্তারবাবুর ভাত খাবার বেলা কি আমি বাড়ি ছিনু মাঠান?

বিজয়া কহিল, না।

পরেশ কহিল, তবে বড়বাবু বলে, কি কথা হয়েছিল বল ব্যাটা, নইলে সেপাই দিয়ে তোকে বেঁধে জলবিছুটি দেওয়াব।আমি বন্নু, নতুন দরোয়ান

তোমাকে মিথ্যে মিথ্যে নাগিয়েচে। মাঠান বললে পরেশ, ছুট্টে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন, তোকে ভাল নাটাই কিনে দেব—তাই না ছুট্টে গেনু? কিন্তু, বড়বাবুকে বোলো না মাঠান। তোমাকে বলতে তিনি মানা করে দেছে।

জানাইবে না বলিয়া ভরসা দিয়া বিজয়া পরেশকে বিদায় করিল, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাতা খুলিয়া বসিল; কিন্তু এবার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খাতার লেখা একেবারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু রাত্রি-জাগরণে নয়, অসহ্য ক্রোধে আরক্ত চক্ষু দুটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতে লাগিল। অনতিকাল পরেই রাসবিহারী দ্বারের বাহিরে লাঠির শব্দ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবেশ করিলেন; এবং বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অল্প একটুখানি কাশিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আজ এত সকালে যে?

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চোখ দুটি যে ভয়ানক রাঙ্গা দেখাচ্ছে মা? ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগেনি ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

রাসবিহারী তাহা কানে না তুলিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, না বললে ত শুনবো না মা। হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, নয় কোন রকম কিছু—না, আমার কিছুই হয়নি।

কিন্তু, ও-রকম চোখ লাল হবার কারণ ত একটা কিছু—

বিজয়া আর প্রতিবাদ না করিয়া কাজে মন দিল দেখিয়া রাসবিহারী থামিয়া গেলেন। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, রোদের ভয়েই সকালে আসতে হল মা। দলিল-পত্রগুলো একবার দেখতে হবে—শুনচি নাকি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মামলা রুজু করবে।

জমিদারি-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক দলিলগুলি বনমালী নিজের কাছেই রাখিতেন। একে ত এ সকলের সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তাহাতে অন্যত্র খোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি কোন দিন কাছ-ছাড়া করেন নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার সময় বিজয়া এগুলি সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং নিজের শোবার ঘরের লোহার আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তাঁরা মামলা করবেন কে বললে?

রাসবিহারী বিজ্ঞভাবে অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন, কেউ বলেনি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। তা না হলে কি এতবড় জমিদারিটা এতদিন চালাতে পারতাম?

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কতটা দাবী করছেন?

রাসবিহারী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হবে বৈ কি—খুব কম হলেও সেটা বিঘে-দুই হবে।

বিজয়া তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, এই! তা হলে তাঁরাই নিন। এটুকু জায়গা নিয়ে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী অত্যধিক বিস্ময়ের ভান করিয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, এরকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করিনি মা। আজ বিনা বাধায় যদি দু'বিঘে ছেড়ে দিই, কাল যে আবার দু'শ বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না তাই বা কে বললে?

কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না। সে সহজভাবে প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সত্যিই ত আর দু'শ বিঘে আমাদের ছাড়তে হচ্ছে না! আমি বলি, সামান্য কারণে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী মর্মাহত হইলেন। বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই হতে পারে না মা, কিছুতেই হতে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর করে গেছেন, এবং যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি বিনা প্রতিবাদে দু'বিঘে

কেন, দু'আঙুল জায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম হবে। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে যার জন্যে পুরোনো দলিলগুলো একবার ভাল করে দেখা দরকার। একবার কষ্ট করে ওঠো মা, বাক্সটা উপর থেকে আনিয়ে দাও।

বিজয়া উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিল, আরও কারণ আছে?

রাসবিহারী বলিলেন, হাঁ।

বিজয়া কহিল, কি কারণ?

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া জবাব দিলেন, কারণ ত একটা নয়—মুখে মুখে তার কি কৈফিয়ত তোমাকে দেব মা?

এই সময় সরকারমশায় তাঁহার খাতাপত্রের জন্য আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিতেই, বিজয়া লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, এ-বেলায় আর হয়ে উঠল না, ও-বেলা এসে নিয়ে যাবেন।

সরকার 'যে আজ্ঞে', বলিয়া ফিরিতেছিল—বিজয়া ডাকিয়া বলিল, একটা কাজ আছে কিন্তু। কাছারির ওই নতুন দরোয়ানটা কতদিন বাহাল হয়েছে জানেন?

সরকার কহিল, মাস-তিনেক হবে বোধ হয়।

বিজয়া কহিল, তা যতই হোক, ওকে আর দরকার নেই। এখনো এ মাসের প্রায় কুড়ি দিন বাকী, এই ক'টা দিনের মাইনে বেশী দিয়ে আজই 'ওকে জবাব দেবেন।

সরকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। ইচ্ছাটা তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস করিল না।

বিজয়া তাহা বুঝিয়াই কহিল, না, দোষের জন্য নয়, তবে লোকটাকে আমার ভাল লাগে না বলেই ছাড়িয়ে দিচ্চি। কিন্তু, মাইনেটা পুরো মাসের দেবেন।

রাসবিহারীর মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পলকের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিলেন, তা হলে বিনা দোষে কারো অন্ন মারাটা কি ভালো মা?

বিজয়া তাহার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরকার ভরসা পাইয়া কহিতে গেল—তা হলে তাকে—

হাঁ, বিদায় করে দেবেন—আজই। বলিয়া বিজয়া খাতায় মন দিল। সরকার তবুও কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে রাসবিহারী মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, একটু কষ্ট স্বীকার করে না উঠলেই যে নয় মা। পুরোনো দলিলগুলো একবার আগাগোড়া বেশ করে পড়া যে চাই-ই।

বিজয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, কেন?

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বললাম বিশেষ কারণ আছে। তবুও বারবার এক কথা বলবার ত আমার সময় নেই, বিজয়া।

বিজয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আস্তে আস্তে কহিল, তা বলেছেন সত্যি; কিন্তু কারণ ত একটাও দেখান নি।

না দেখালে কি তুমি উঠবে না? বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া এবার তিনি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তার মানে, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

বিজয়া নিরুত্তর অধোমুখে কাজ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না। তাহার এই নীরবতার অর্থ এত সুস্পষ্ট, এত তীক্ষ্ণ যে, ক্রোধে রাসবিহারীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকিয়া বলিলেন, কিসের জন্যে আমাকে তুমি এতবড় অপমান করতে সাহস কর বিজয়া? কিসের জন্যে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর শুনি?

বিজয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আমাকেও ত আপনি বিশ্বাস করেন না! আমার পয়সায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে মনের ভাব কি হয় আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন, এবং তার পর আমার সম্পত্তির মূল দলিলপত্র হস্তগত করার তাৎপর্য যদি আমি আর কিছু বলে সন্দেহ করি, সে কি অস্বাভাবিক? না সে আপনাকে অপমান করা?

রাসবিহারী একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এতবড় পাকা চাল কলিকাতায় বিলাসিতার মধ্যে যত্ন-আদরে প্রতিপালিত একটা অনভিজ্ঞ বালিকার কাছে ধরা পড়িতে পারে এ সম্ভাবনা তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই; এবং ইহাই সে মুখের উপর অসঙ্কোচে নালিশ করিবে—সে ত স্বপ্নের অগোচর!

রাসবিহারী অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; এবং এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া এই অসহায় বালিকার প্রতি নির্ম্মমভাবে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। বন্ধুর কর্তব্য বলেই তোমার চলাফেরার প্রতি আমাকে নজর রাখতে হয়েচে। একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধরে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে, তার মানে কি আমি বুঝতে পারিনে? শুধু কি তাই? সেদিন দুপুর রাত্রি পর্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাশা গল্প করেও তোমার যথেষ্ট হল না, সে রাত্রে কলকাতায় ফিরতে পারলে না, ছল করে তাকে এইখানেই থাকতে হল। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল! সমাজে কারও সামনে মাথা তোলবার যে আর জো রইল না।

কথাটা এত বড় মর্মান্তিক না হইলে হয়ত বিজয়া অপমানে ক্রোধে সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এ আঘাত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী আড়চোখে চাহিয়া তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড মহিমা বিজয়ার রক্তহীন মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপরে বলিলেন, তবে এগুলো কি ভাল, না এ-সকল নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়?

বিজয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনরায় জোর দিয়া কহিলেন, না, চুপ করে থাকলে হবে না বিজয়া—তোমাকে জবাব দিতে হবে।

তবুও যখন বিজয়া কথা কহিল না, তখন তিনি হাতের লাঠিটা পুনরায় মেঝেতে ঠুকিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন, না, চুপ করে থাকলে চলবে না। এ-সকল গুরুতর ব্যাপার—জবাব দেওয়া চাই।

এতক্ষণে বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পাংশু ওষ্ঠাধর একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল, ব্যাপার যত গুরুতর হোক, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি?

রাসবিহারী তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, তা হলে একে তুমি মিথ্যে কথা বলে উড়োতে চাও নাকি?

বিজয়া আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল—আমি উড়োতে কিছুই চাইনে কাকাবাবু। শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বলতে চাই; এবং মিথ্যে বলে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানেন, তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।

রাসবিহারী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি প্রথমটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু শেষটার জন্য আদৌ ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই যে বিজয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা দুর্নাম-প্রচারকারী বলিয়া তাঁহারি মুখের উপর অভিযোগ করিতে পারে, এ তাঁহার কল্পনারও অতীত। তাঁর নিজের কথা আর মুখে যোগাইল না—শুধু বিজয়ার কথাটাই কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করিলেন—মিথ্যে কথা বলে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানি?

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি গুরুজন—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবার আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিলপত্র এখন থাক, মামলা-মকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে তখন আপনাকে ডেকে পাঠাব,বলিয়া পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়ার সর্বাগ্রে মনে হইয়াছিল, কাল প্রভাতেই সে যেমন করিয়া হোক কলিকাতায় পলাইয়া এই ব্যাধের ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু, উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইল তাহাতে জালের ফাঁসি যে শুধু বেশী করিয়া চাপিয়া বসিবে তাই নয়, অপবাদের ধুয়া সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া সেখানকার আকাশ পর্যন্ত কলুষিত করিতে বাকী রাখিবে না। তখন কলিকাতার সমাজেই বা সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? অথচ, এখানেও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। যদিচ নিশ্চয় বুঝিতেছিল রাসবিহারী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নয়, বরঞ্চ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই এই দুর্নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং একান্ত নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই বাহিরে এ মিথ্যা প্রচার করিবেন না, তবুও দিন-দুই পরে কাছারির গোমস্তা যখন হিসাব সই করাইতে বিজয়ার দর্শন প্রার্থনা করিল, তখন সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া চাকরকে দিয়া খাতাপত্র উপরে চাহিয়া আনাইল। আজ নিজের কর্মচারীকেও দেখা দিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল পাছে কোন ছিদ্র দিয়া এ কথা তাহার কানে গিয়া থাকে, এবং তাহার চক্ষেও অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি লুকাইয়া থাকে।

একটা জিনিস সে যেমন ভয় করিতেছিল তেমনি প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল—তাহার পিতার পত্র লইয়া নরেন নিজেই উপস্থিত হইবে। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল পিয়নের হাত দিয়া। চিঠি আসিল বটে, কিন্তু সে ডাকে। নরেন নিজে আসিল না। কেন যে সে আসিল না তাহা অনুমান করিতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না। সে ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল পাছে রাসবিহারী কোন ছলে এ কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহার এ বাটীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। চিঠি হাতে করিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু, এত

সহজেই যদি এ দিকের পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়, এমনি অনায়াসে সেও যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি তাহারি মাথায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এ দুর্নামের বোঝা—তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক—সে বহিয়া বেড়াইবে কোন্ অবলম্বনে? তখন এই মিথ্যা ভারই যে পরম সত্যের মত তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে!

এমনি অভিভূতের মত স্থির হইয়া বসিয়া সে যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। তাহার বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এইবার তাহার পরলোকগত পিতৃদেবের হাতের লেখা কাগজ-দুটি মাথায় চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার করিয়া চোখ মুছিয়া চিঠি-দুটি পড়িতে গেল, বার বার অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। অবশেষে অনেক বিলম্বে অনেক যত্নে যখন পড়া শেষ করিল, তখন পিতার আন্তরিক বাসনা তাহার কাছে আর অবিদিত রহিল না। এক সময়ে তিনি যে শুধু তাহারি জন্য নরেনকে মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এ সত্য একেবারে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল; এবং এ কথা আর যাহারি অগোচরে থাকুক, রাসবিহারীর যে ছিল না, তাহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না।

আরও পাঁচ-ছয়দিন কাটিয়া গেলে, একদিন সকালে বিজয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল বাড়িতে রাজমজুর লাগিয়াছে। তাহারা ভারা বাঁধিয়া সমস্ত বাড়িটা চুনকাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কারণ ভাবিতে গিয়া তাহার অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ শিথিল করিয়া মনে পড়িল, আগামী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র সাতদিন বাকী।

সারাদিন সতেজে কাজ চলিতে লাগিল, অথচ, সে একজন কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না ইহা কাহার আদেশে হইতেছে, কিংবা কেন এ বিষয়ে তাহার মতামত জানা হইল না।

বিকালবেলায় আজ অনেক দিনের পরে বিজয়া কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ দয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্চি মা।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, আর ত দেরি নেই, নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সমাদরের সঙ্গে আনবার চেষ্টা করতে হবে—তাই তাঁদের সব নাম-ধাম জানতে পারলে—

বিজয়া শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিমন্ত্রণপত্র বোধ হয় আমার নামেই ছাপান হবে?

এ বিবাহ যে সুখের নয় দয়াল তাহা মনে মনে জানিতেন। সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, না মা, তোমার নামে হবে কেন? রাসবিহারীবাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক, তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।

বিজয়া কহিল, স্থির কি তিনিই করেছেন?

দয়াল ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ, তিনিই করেছেন বৈ কি।

বিজয়া কহিল, তবে এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই।

দয়াল ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। বিজয়া সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে-চিঠিগুলো আপনি নরেনবাবুকে দিয়েছিলেন সে কি আপনি পড়েছিলেন?

দয়াল বলিলেন, না মা, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন? নরেনের পিতার নাম দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এ যখন তাঁর জিনিস, তখন তাঁর ছেলের হাতেই দেওয়া উচিত। একবার মনে হয়েছিল বটে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু—কোন দোষ হয়েছে কি মা?

বৃদ্ধকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাঁর বাবার জিনিস তাঁকে দিয়েছেন, এ ত ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি?

দয়াল বলিলেন, না, কোন কথাই না। কিন্তু কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আমি কালই তোমাকে বলতে পারি।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, কালই বলতে পারবেন কেমন করে?

দয়াল কহিলেন, তা বোধ হয় পারি। আজকাল তিনি প্রত্যহই আমাদের ওখানে আসেন কিনা।

বিজয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর অসুখ আবার বেড়েচে, কৈ, সে কথা ত আপনি আমাকে বলেন নি!

দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন, না, এখন তিনি বেশ ভালই আছেন। নরেনের চিকিৎসা আর ভগবানের দয়া। বলিয়া তিনি হাত জোড় করিয়া তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে দয়ালের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তবে কেন তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়?

দয়াল প্রসন্ন-মুখে কহিতে লাগিলেন, আবশ্যক না থাকলেও জন্মভূমির মায়া কি সহজে কাটে মা! তা ছাড়া, আজকাল নরেনের কাজকর্ম কম, সেখানে বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই—তাই সন্ধ্যেবেলাটা এখানেই কাটিয়ে যান। বিশেষ, আমার স্ত্রী ত তাকে একেবারে ছেলের মতোই ভালবাসেন। ভালবাসার ছেলেও বটে। কিন্তু কথায় কথায় যদি এতদূরেই এসে পড়লে মা, একবার চল না কেন তোমার এ বাড়িতে?

চলুন, বলিয়া বিজয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি ত এমন নির্মল, এমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক আমার এতটা বয়সে কখনো দেখতে পাইনি। নলিনীর ইচ্ছে সে বি. এ. পাশ

করে ডাক্তারি পড়ে। এ বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ, কত সাহায্য যে করেন তার সীমা নেই।

বিজয়া চমকিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ এতদূরে আসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার এই সন্দেহটাই এতক্ষণ তাহার বুকের ভিতরে বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতেছিল। দয়াল ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, তবে আর গিয়ে কাজ নেই মা—তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচ।

বিজয়া কহিল, না চলুন।

তাহার গতির মৃদুতা লক্ষ্য করিয়াই দয়াল ক্লান্তির কথা তুলিতেছিলেন; কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিতে পাইলে এ কথা তিনি মুখে আনিতেও পারিতেন না।

তখন প্রতি পদক্ষেপে যে কঠিন ধরণী বিজয়ার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল, এ কথা অনুমান করা দয়ালের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি পুনরায় নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, নরেনের সাহায্যে এর মধ্যেই নলিনী অনেকগুলো বই শেষ করে ফেলেচে। লেখাপড়ায় দু'জনারই বড় অনুরাগ।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে বিজয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না?

দয়াল বিশেষ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের সন্দেহ মা?

এ প্রশ্নের জবাব বিজয়া তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না। তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। শেষে বলিল, আমার মনে হয় নলিনীর সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট করে স্বীকার করা উচিত।

দয়াল সায় দিয়া কহিলেন, ঠিক কথা। কিন্তু তার ত এখনো সময় যায়নি মা। বরঞ্চ আমার মনে হয়, দুজনের পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।

বিজয়া বুঝিল, এ প্রশ্ন অপরের মনেও উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু, নলিনীর পক্ষে ত ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁর মন স্থির করতে হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—

সঙ্কোচ ও বেদনার কথাটা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু, দয়াল বোধ করি সমস্যার এই দিকটা তেমন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, সত্যি কথা। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেছি, তাতে—কিন্তু, তোমাকে ত বলেছি, নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে, তিনি যে ভুলেও কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন এ ত আমি ভাবতে পারিনে।

তিনি ভাবিতে নাই পারুন, কিন্তু তবুও ঠিক সেই সময়েই অন্যায় যে কোথায় এবং কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন।

উভয়ে যখন দয়ালের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটা টেবিলের দু'দিকে দুখানা চেয়ারে বসিয়া নরেন্দ্র ও নলিনী। সম্মুখে খোলা বই। অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া উঠায় পড়া ছাড়িয়া তখন ধীরে ধীরে আলোচনা শুরু হইয়াছিল। নলিনী এই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে-ই বিজয়াকে প্রথমে দেখিতে পাইয়া কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিল। কিন্তু, বিজয়ার মুখ বেদনায় যে বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহা সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তাহার চোখে পড়িল না। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন?

বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নের উত্তরও দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নলিনীকে কহিল, কৈ, আপনি ত আর একদিনও গেলেন না?

নরেন সুমুখে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, আর আমাকে বুঝি চিনতেও পারলেন না?

বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, চিনতে পারলেই চেনা দরকার নাকি?

নলিনীকে কহিল, চলুন আপনার মামীমার সঙ্গে আলাপ করে আসি। বলিয়া পলকমাত্র এদিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে একপ্রকার ঠেলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

নলিনী সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, কিন্তু চা না খেয়ে যেন পালাবেন না নরেনবাবু।

নরেন ইহারও জবাব দিতে পারিল না—বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং বৃদ্ধ দয়াল তাহার এই অপ্রত্যাশিত লজ্জার অংশ লইবার জন্য বিরসমুখে সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু, তবুও কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলি সন্দেহ হইতে লাগিল, যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল ইহা ঠিক সেই বস্তুই নয়—এই অকারণ অবমাননার অন্তরালে দৃষ্টির আড়ালে যাহা রহিয়া গেল তাহা আর যাহাই হোক উপেক্ষা অবহেলা নয়।

কিছু পরে চায়ের জন্যে উপরে ডাক পড়িলে আজ নরেন্দ্র দয়ালের অনুরোধ এড়াইয়া নীচেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া দয়াল উপরে যাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কহিল, আমি ঘরের লোক, আমার কথা ভাববেন না দয়ালবাবু। কিন্তু, আপনার মান্য অতিথিটির সম্মান রাখা আবশ্যক। আপনি শীঘ্র যান।

দয়াল দুঃখিত এবং লজ্জিতভাবে উপরে যাইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, তা হলে তুমি কি একটু বসবে?

ভৃত্য আলো দিয়া গিয়াছিল। নরেন খোলা বইটা কাছে টানিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, বসবো বৈ কি!

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার তিনজনে নীচে নামিয়া আসিলে নরেন বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ না থাকিয়া চলিয়া গেলেই বোধ করি ইঁহারা আরাম অনুভব করিতেন, কারণ এই তাহার একাকী অপেক্ষা করাটাই সকলকে একসঙ্গে যেন লজ্জা ও কুণ্ঠার কশাঘাত করিল।

নলিনী সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনার চা নীচে আনতে বলে দিয়েচি—এলো বলে নরেনবাবু!

কিন্তু বিজয়া তাহাকে কোনপ্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কানাই সিং দ্বারের কাছে বসিয়া ছিল, লাঠি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে-দূরে যাহা-কিছু দেখা যায়—আকাশ-প্রান্তর, গ্রামান্তের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গেছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।

বাড়ি আসিতেই খবর পাইল রাসবিহারী কি জন্য সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া আছেন। শুনিতেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং

কোন কথা না কহিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু, ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না যে শত বিলম্বেও এই পরম সহিষ্ণু লোকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে না। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া যখন আছেন, তখন, রাত্রি যত বেশী হোক, সাক্ষাৎ না করিয়া কোন মতেই নড়িবেন না।

অনতিকাল মধ্যেই দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া পরেশ জানাইয়া দিল বড়বাবু আসিতেছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চটিজুতার ও লাঠির শব্দ যুগপৎ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিজয়া কহিল, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসবিহারী চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, আমি তাই এতক্ষণ এদের বলছিলাম যে, এতগুলো চাকর-বাকরের মধ্যে এ হুঁশ কারও হলো না যে, বাড়ি থেকে দুটো লণ্ঠন নিয়ে যায়! দয়ালেরও এ ভয় হওয়া উচিত ছিল যে, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় নির্ভর না করে সঙ্গে একটা আলো দেওয়া প্রয়োজন! তাই ভাবি, ভগবান! এ সংসারে আত্মীয়-পরে কী প্রভেদটাই তুমি করে রেখেচ! বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। কিন্তু, বিজয়া কিছুই কহিল না। তখন রাসবিহারী একবার কাশিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, যা করবার সবই আমি করে রেখেচি; শুধু তোমার নামটা একটু লিখে দিতে হবে মা, এটা আবার কালকেই পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

বলিয়া কাগজখানা বিজয়ার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিজয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝিল, ইহা তাহাদের ব্রাহ্মবিবাহ আইনমতে রেজেস্ট্রি করিবার আবশ্যক দলিল। ছাপা এবং হাতের লেখা আগাগোড়া দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিল। বেশী সময় যায় নাই, কিন্তু, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। তাহার এতক্ষণের এতবড় বেদনা অকস্মাৎ কি একপ্রকার কঠিন ঔদাসীন্য ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল।

তাহার মনে হইল, জগতের সমস্ত পুরুষ একছাঁচে ঢালা। রাসবিহারী, দয়াল, বিলাস, নরেন্দ্র—আসলে কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রভেদ নাই। শুধু বুদ্ধি ও অবস্থার তারতম্যে যা-কিছু প্রভেদ বাহিরে প্রকাশ পায়—এইমাত্র; নহিলে নিজের সুখ ও সুবিধার কাছে নীচতায়, কৃতঘ্নতায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় নারীর পক্ষে ইহারা সকলেই সমান। আজ দয়ালের আচরণটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশী বাজিয়াছিল। কারণ, কেমন করিয়া যেন তাহার অসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের একাগ্র কামনার জিনিসটি ইনি জানিতেন। অথচ এই দয়ালের জন্য সে কি না করিয়াছে! সমস্ত হৃদয় দিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, একান্ত আপনার ভাবিয়াছে। কিন্তু, নিজের ভাগিনেয়ীর কল্যাণের পার্শ্বে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, তিনি এই শ্রদ্ধা ও স্নেহের কোন মর্যাদাই রাখিলেন না। তাঁহার চোখের নীচেই যখন দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া রমণীর মর্মান্তিক দুঃখের পথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন কতটুকু দ্বিধা, কতটুকু করুণা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল! তবে রাসবিহারীর সহিত মূলতঃ তাঁহার পার্থক্য কোন্‌খানে এবং কতটুকু? আর নরেন্দ্রের কথাটা সে গোড়া হইতেই চিন্তার বাহিরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহাকে বিচার করার ভান করিল না। শুধু এই কথাটাই এখন সে আপনাকে আপনি বারংবার বলিতে লাগিল, যদি সকলেই সমান, তবে বিলাসের বিরুদ্ধেই বা তাহার বিদ্বেষ কিসের? বরঞ্চ সে-ই ত সব চেয়ে নির্দোষ! সে-ই ত অপরাধ করিয়াছে সর্বাপেক্ষা কম! বস্তুতঃ, তাহারই ত শুধু বাক্যে এবং ব্যবহারে সামঞ্জস্য দেখা গেল! তাহার যা-কিছু অপরাধ সে ত শুধু তাহারই জন্য। একটু স্থির থাকিয়া বিজয়া আপনাকে আপনি পুনরায় বুঝাইল যে, বিলাসের ভালবাসা সত্য এবং সজীব বলিয়াই সে নীরবে সহিতে পারে নাই, বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া বাধা দিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'যাও' বলিতেই সস্তা ভদ্রতা বাঁচাইয়া অভিমানভরে চলিয়া যায় নাই! এই যদি অপরাধ তবে শাস্তি দিবার অধিকার আর যাহারই থাক, তাহার নাই। আরও একটা ব্যাপার মনে পড়িল, সে এই কঠিন বাস্তব সংসার। সেদিক দিয়া

চিন্তা করিলে এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের চেয়ে বড় দেখা যায়। সেই অপদার্থ নরেনের তুলনায় তাহাকে ত কোন মতেই উপেক্ষার পাত্র বলা সাজে না।

কিন্তু, রাসবিহারী তাহার গম্ভীর নির্বাক মুখের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তা হলে মা—এ ঘরে কালি-কলম আছে, না নীচ থেকে আনতে বলে দেব?

বিজয়া চমকিয়া চাহিল। অতীতের কুৎসিত, কদাকার স্মৃতির উপরে তাহার চিন্তার ডোর ধীরে ধীরে একখানি সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই স্বার্থান্ধ বৃদ্ধের নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা ছুরির মত পড়িয়া তাহাকে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করিয়া আগাগোড়া অনাবৃত করিয়া দিল; এবং পরক্ষণেই বিজয়া একবারে মরিয়ার মত নির্দয় হইয়া কহিল, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি কাকাবাবু, আপনার কি এই মত যে, পাপ যতই বড় হোক, টাকার তলায় সমস্ত চাপা পড়ে যায়?

রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন, কেন, কেন মা?

বিজয়া অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বলিল, নইলে, আমার অতবড় পাপটাকে উপেক্ষা করে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতেন?

রাসবিহারী লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হতবুদ্ধির মত বলিলেন, সে ত মিথ্যে কথা। অতিবড় শত্রুও ত তোমাকে ও অপবাদ দিতে পারে না মা!

বিজয়া কহিল, শত্রু হয়ত পারে না। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি, বিলাসবাবু কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবেন?

রাসবিহারী কহিলেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না। তোমাকে! বিলাস! আচ্ছা—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, বিলাস! বিলাস!

বিলাস নিকটে কোথাও বোধকরি প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন, শোন কথা বিলাস! আমার বিজয়া মা বলচেন তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? শোন একবার—

বিলাস সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না—প্রশ্নটা যেন সে বুঝিতেই পারিল না, এমনি ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয়া কহিল, সেদিন কাকাবাবু বাড়ির চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করে আমাকে এসে বলেছিলেন যে, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিভৃতে নরেনবাবুর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেও তৃপ্ত হইনি; অবশেষে তিনি ট্রেন না পাবার অছিলায় সে রাত্রিটা এইখানে কাটিয়েই সকালবেলা চলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায়—

কথাটা রাসবিহারীর উচ্চকণ্ঠে চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, কখ্‌খনো না! কখ্‌খনো না! এ যে অসম্ভব! এ যে ঘোর মিথ্যা—এ যে একবারেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিলাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে কহিল, না আমি শুনিনি।

রাসবিহারী আবার চেঁচাইতে লাগিলেন, কেমন করে শুনবে বিলাস—এ যে ভয়ানক মিথ্যা! এ যে দারুণ—তাই আমি দরোয়ান ব্যাটাকে—তুমি দেখো দিকি, পরেশ ছোঁড়াটাকে আমি কি রকম শাস্তি দিই! আমি—

বিলাস কহিল, পৃথিবী-সুদ্ধ লোক যদি এ কথার সাক্ষ্য দিত তবুও বিশ্বাস করতাম না।

বিজয়া কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন করতেন না? সে কি আমার বিষয়ের জন্যে?

রাসবিহারী এই কথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বকিতে শুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

বিলাসের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। শুধু শান্ত স্থির স্বরে জবাব দিল, না। তোমার বিষয়ের উপর আমার লেশমাত্র লোভ নেই।

সমস্ত কক্ষটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এবং এই নীরবতার ভিতর দিয়াই এতক্ষণে একই সঙ্গে সকলের যেন সমস্ত ব্যাপারটার কদর্য শ্রীহীনতা চোখে পড়িয়া গেল। এ যেন হাটের মধ্যে একটা বেচা-কেনার পণ্য লইয়া দুই পক্ষে তীব্র কঠোর দরদস্তুর চলিতেছিল। যাহাতে লজ্জা, শরম, শ্রী, শোভার কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না—শুধু দুটা মানুষ এক উলঙ্গ স্বার্থের দুই দিকে দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া পরস্পরের কাছে ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে টানা-হেঁচড়া করিতেছিল।

রাসবিহারী তাঁহার বহু ক্লেশার্জিত পরিণত বয়সের প্রশান্ত গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়া যেভাবে একটা ইতরের মত গণ্ডগোল চেঁচামেচি করিতেছিলেন, বিলাসের ভাষা ও সংযমের সম্মুখে সে ত্রুটি তাঁহাকেও যেমন বাজিল, বিজয়াও নিজের একান্ত লজ্জাহীন প্রগল্ভতায় মর্মে মরিয়া গেল। বিপদ যত গুরুতরই হোক, কোন ভদ্রমহিলাই যে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার চরিত্রকে মীমাংসার বিষয়ীভূত করিয়া পুরুষের সহিত এমন করিয়া মর্যাদাহীন বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তাহার বোধ হইল। মনে হইল, দাম্পত্য-জীবনের যত কিছু মাধুর্য, যত কিছু পবিত্রতা আছে সমস্তই যেন তাহার জন্য একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিলাসই আবার কথা কহিল। বলিল, বিজয়া, বাবা যাই করুন, যাই বলুন, আমরা তাঁকে বুঝতে পারি না পারি—কিন্তু এই কথাটা আমাদের কোন মতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—যিনি ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি কখনো অন্যায় করতে পারেন না। আমি বলচি তোমাকে, তোমাকে ছাড়া তোমার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আমাদের লেশমাত্র স্পৃহা নাই।

বিজয়া তাহার পাংশু মুখ ও মলিন চোখ দুটি বিলাসের মুখের ওপর ক্ষণকাল স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন?

বিলাস অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিজয়ার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আমার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে বিজয়া, আজ তা হলে আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলচি।

শুধু মুহূর্তকাল উভয়ে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজয়া আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া কলম তুলিয়া লইল। পলকের জন্য হয়ত একবার দ্বিধা করিল, হয়ত করিল না—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া কাগজখানি রাসবিহারীর হাতে আনিয়া দিয়া কহিল, এই নিন।

রাসবিহারী দলিলখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বনমালীর শোকে অনেক অশ্রু ব্যয় করিয়া , এবং নিরাকার পরব্রহ্মের অসীম করুণার বিস্তর গুণগান করিয়া রাত্রি হইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পিতৃদেব চলিয়া গেলে বিলাস আর একবার গম্ভীর এবং কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি জানি আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু, সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালবাসাকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিতাম, তা হলে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যেতাম—বিজয়া, তুমি যাকে ভালবেসেচ, তাকেই বরণ কর! আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে! বাবার কাছে আমি আজীবন মিথ্যা শিক্ষা পেয়ে আসিনি।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, কিন্তু, একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা, যাকে ভালবাসা বলে মানুষ ভুল করে, সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর বিবাহের চরম লক্ষ্য? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হতে পারে না। এই বিরাট উদ্দেশ্য সত্য! মুক্তি! পরব্রহ্মপদে যুগ্ম আত্মার একান্ত আত্মসমর্পণ! আমি বলচি

তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে। এই নরেন যখন আসেনি, তখনকার কথাগুলো একবার স্মরণ কর দেখি বিজয়া!

কি একটা বলিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে বাক্‌রোধ হইয়া গেল—মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে শুধু কেবল হাত দুটি কপালে তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়াই পাশের দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদারুণ সংশয়ের বেড়া-আগুনের মধ্যে বিজয়ার চিত্ত যে কতদূর পীড়িত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনাকে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত সে ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়াই বুঝিল, তাহার মন খুব শান্ত হইয়া গেছে। কারণ, মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের আভাসটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে চাহিতে মনে হইল সমস্ত আকাশটা যেন শ্রাবণ-প্রভাতের মত ধূসর মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে শয্যাত্যাগ করা না-করা তাহার সমান বলিয়া বোধ হইল, এবং কেন যে অন্যান্য দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সামান্য বেলা হইলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত লজ্জিত হইয়া উঠিত—মনে হইত, অনেক সময় নষ্ট হইয়া গেছে, আজ তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার এমন কি কাজ আছে যে, দু-একঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে না! বাটীতে দাস-দাসী ভরা, বৃহৎ জমিদারি সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যদি এমনি আরামে, এমনি শান্তিতে কাটিয়া যায়, ত তার চেয়ে আর ভাল জিনিস কি আছে? জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল গাছতলার সবুজ রঙটা পর্যন্ত আজ কি একরকম বদলাইয়া গিয়া তাহার পাতাগুলা পর্যন্ত স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, অশান্তি-উপদ্রব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর কিছু নাই—একটা রাত্রির মধ্যেই সমস্ত যেন একেবারে মুনি-ঋষির তপোবন হইয়া উঠিয়াছে।

হৃদয়জোড়া এই চরম অবসাদকে শান্তি কল্পনা করিয়া বিজয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ত আরও বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু পরেশের মা আসিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে শান্তিভঙ্গ করিয়া দিল। যে লোক প্রত্যুষেই

শয্যাত্যাগ করে, তাহার পক্ষে এতখানি বেলায়—সে উৎকণ্ঠিতচিত্তে বারংবার ডাকাডাকি করিয়া কপাট খোলাইয়া তবে ছাড়িল।

হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বিজয়া নীচে নামিতেছিল; শুনিল, বাহিরে রাসবিহারী আজ স্বয়ং আসিয়া জনমুজরদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুটি দিন আর বাকী, এইটুকু সময়েই সমস্ত বাড়িটাকে মাজিয়া ঘষিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজয়া একটু পূর্বেই ভাবিয়াছিল, গতরাত্রে যে দুরূহ সমস্যার শেষ এবং চরম নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কোনও কারণে কাহারও দ্বারা যাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না, তাহার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ লইয়া আর সে মনে মনেও কখনো বিতর্ক করিবে না। তাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্যেই হইয়াছে এ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াটুকুও আর পড়িতে দিবে না। কিন্তু সহসা দেখিতে পাইল তাহা সম্ভব নয়। রাসবিহারী নীচে আছেন, নামিলেই মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে ইহা মনে করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ বিমুখ হইয়া আপনিই সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়াও যখন সময় কাটিতে চাহিল না, তখন অকস্মাৎ তাহার বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িল। বহুকাল কাহারও সহিত দেখা- সাক্ষাৎ নাই, চিঠিপত্রও বন্ধ ছিল, আজ তাহাদিগকেই স্মরণ করিয়া সে কয়েকখানা পত্র লিখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনের মধ্যে তাহার কত না বেদনা সঞ্চিত হইয়া ছিল। চিঠির মধ্যে দিয়া তাহাদিগকেই মুক্তি দিতে গিয়া সে দেখিতে দেখিতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সময় কাটিল, কত যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই খেয়াল ছিল না। এমনি সময়ে পরেশের মা দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, বেলা যে একটা বেজে গেল দিদিমণি, খাবে না?

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া পুনশ্চ লেখায় মনঃসংযোগ করিতে যাইতেছিল, পরেশের মা সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ও মা, ডাক্তারবাবু আসচেন যে। বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক সোজা বারান্দার অপর প্রান্তে পরেশের পিছনে নরেন্দ্র আসিতেছে।

ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার সে উপরে আসিলেও নিজের ইচ্ছায় এমন বিনা সংবাদে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহা বিজয়া ভাবিতেও পারিত না। তাহার মুখ শুষ্ক, বড় বড় রুক্ষ চুল এলোমেলো; কিন্তু সে ঘরে পা দিয়াই যখন বলিয়া উঠিল, সেদিন আমাকে চিনতে চাননি কেন, বলুন ত? বলিয়া একটা চৌকি অধিকার করিয়া বসিল। তখন তাহার মুখে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার সর্বদেহে হৃদয়-ভারাক্রান্ত ক্লান্তি এমন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল যে, বিজয়া জবাব দিবে কি, দুর্বিষহ বেদনায় একেবারে চমকিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হয়েছে নরেনবাবু? কোন অসুখ করেনি ত?

নরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না সেরে গেছে। হয়েও ছিল সামান্য একটু জ্বর, কিন্তু তাতেই হঠাৎ এমন দুর্বল করে ফেলেছিল যে, আগে আসতে পারিনি—কিন্তু সেদিন দোষটা কি করেছিলাম, আজ বলুন ত?

পরেশ দাঁড়াইয়া ছিল; বিজয়া তাহাকে কহিল, তোর মাকে শিগগির কিছু খাবার আনতে বল গে যা পরেশ। নরেনকে কহিল, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বোধ করি!

না, কিন্তু তার জন্যে আমি ব্যস্ত হইনি।

কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়েচি, বলিয়া বিজয়া পরেশের পিছু পিছু নিজেও নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে খাবারের থালার উপর একবাটি গরম দুধ লইয়া নিজেই উপস্থিত হইল এবং নিঃশব্দে অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহারে মন দিয়া

নরেন সহাস্যে কহিল, আপনি একটি অদ্ভুত লোক। পরের বাড়িতে চিনতেও চান না এবং নিজের বাড়িতে এত বেশী চেনেন যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সেদিনের কাণ্ড দেখে ভাবলুম, খবর দিলে হয়ত দেখাই করবেন না, তাই বিনা সংবাদেই পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেছি। এখন দেখছি তাতে ঠকিনি।

বিজয়া কোন কথা কহিল না। নরেন্দ্র নিজেও একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, এই সামান্য জ্বর, কিন্তু এত নির্জীব করে ফেলেছে যে, আমি আপনিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আপনাদের সঙ্গে আমার শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে আজ হয়ত আসতাম না। এই পথটা আসতে আমার সত্যিই ভারী কষ্ট হয়েছে।

বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে রহিল; বোধ করি সে কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিল না। নরেন দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিয়া কহিল, আপনারা বোধ করি শোনেন নি যে, আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমার আজকে তাড়াতাড়ি আসবার এও একটা কারণ, বলিয়া পকেট হইতে একখানা লাল রঙের চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু, দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। সেই দিন সকালেই আমাদের জাহাজ করাচী থেকে ছাড়বে।

বিজয়া ভীত হইয়া বলিল, করাচী থেকে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

নরেন কহিল, সাউথ আফ্রিকায়। পশ্চিমেও একটা যোগাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু চাকরি যখন করতেই হবে, তখন বড় দেখে করাই ভাল। আমার পক্ষে পাঞ্জাবও যা, কেপ- কলোনিও ত তাই। কি বলেন? হয়ত আমাদের আর কখনো দেখাই হবে না।

শেষের কথাগুলা বোধ করি বিজয়ার কানেও গেল না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, নলিনী কি রাজী হয়েছেন? হলেও বা আপনি এত শীঘ্র কি করে যেতে পারেন, আমি ত বুঝতে পারিনে! তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরেই বা তিনি কেমন করে মত দিলেন?

নরেন হাসিমুখে বলিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান! এখনও কাউকে সমস্ত কথা বলা হয়নি বটে, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে দিবার ধৈর্যও বিজয়ার রহিল না, সে মাঝখানেই একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, সে কোনমতেই হতে পারে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন যে, ইচ্ছে থাক না-থাক দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়িতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোন মতেই তাঁকে তত দূর নিয়ে যেতে পারবেন না।

নরেনের মুখ মলিন হইয়া গেল। বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত? এখানে আসবার পূর্বেই দয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তিনিও শুনে হঠাৎ চমকে উঠে, এই-রকম কি একটা আপত্তি তুললেন, আমি বুঝতেই পারলাম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের উপরেই বা আমার যাওয়া-না-যাওয়া কেন নির্ভর করে, আর তিনিই বা কিসের জন্য বাধা দেবেন এ-সব যে ক্রমেই হেঁয়ালি হয়ে উঠছে। কথাটা কি, আমাকে খুলে বলুন দেখি!

বিজয়া স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেন নি?

নরেন একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, না, কোন দিন নয়!

বিজয়ার মুখের উপর সহসা এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ আরক্ত করিয়া দিল। কিন্তু, চক্ষের পলকে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, না করলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব ত কারও কাছে গোপন নেই!

নরেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, এ অনিষ্ট কার দ্বারা হয়েছে, আমি তাই শুধু ভাবছি। তাঁর নিজের দ্বারা কদাচ ঘটেনি, কেননা তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন—এ অসম্ভব। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসম্ভব কেন?

নরেন কহিল, সে থাক। তবে, একটা কারণ এই যে, আমি হিন্দু এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজের। তা ছাড়া, আমাদের জাতও এক নয়।

বিজয়া মলিন হইয়া কহিল, আপনি কি জাত মানেন?

নরেন কহিল, মানি বৈ কি। হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ আছে, একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না—এ কি আপনিও মানেন না?

বিজয়া কহিল, মানি, কিন্তু ভাল বলে মানিনে। আপনি শিক্ষিত হয়ে একে ভাল বলে মানেন কি করে?

নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু ঘোলাটে ধরনের হয়। বিশেষ করে আমার মত যারা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে জীবাণুর মত তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়। তাই এ ক্ষেত্রে আমাকে নাহয় মাপ করেই নিন না।

বিজয়া বুঝিল, নরেন্দ্র জাতিভেদের ভাল-মন্দর প্রশ্নটা কৌশলে এড়াইয়া গেল, তাই রুষ্টমুখে কহিল, আচ্ছা, অন্য জগতের কথা থাক। কিন্তু জাত যেখানে এক, সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্ম্মমতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বলতে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি ত একঘরে। আপনার কাছেও কি কোন ব্রাহ্মকুমারী বিবাহযোগ্যা নয় মনে করেন? এত অহঙ্কার আপনার কিসের জন্যে? আর এই যদি সত্যিকার মত, তবে সে কথা গোড়াতেই বলে দেননি কেন?

বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু নরেন্দ্রের দৃষ্টিকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে কিছু আশ্চর্য হইয়াই কহিল, কিন্তু এখন যা বলচেন, এ ত আমার মত নয়।

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।

নরেন্দ্র কহিল, না। আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন, এ আমার সত্যিকার কেন, মিথ্যাকার মতও নয়। তা ছাড়া, নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি, তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে; এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝবেন। সুতরাং আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাঁর অমত না হলেই আপনি যেখানে খুশী যেতে পাবেন মনে করেন?

নরেনের বুকের মধ্যে কথাগুলো তড়িৎ-রেখার ন্যায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও গিয়া টেবিলের উপরে সেই লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্রের উপর পড়িল। সে এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক, আমি আপনার অমতেও কিছু করতে পারিনে। কিন্তু আপনি ত আমার সমস্ত কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজ্ঞাত নেই। বিদেশে সে সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ হতেও পারে; কিন্তু এ দেশে এত বড় নিষ্কর্মা দীন-দরিদ্রের থাকা না-থাকায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

বিজয়া আনত-মুখে ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি দীন-দরিদ্র ত নয়। আপনার সমস্তই আছে, ইচ্ছে করলেই ত সমস্ত ফিরে নিতে পারেন!

নরেন কহিল, ইচ্ছে করিলেই পারিনে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছিলেন, সে আমার মনে আছে, এবং চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই—সে অধিকার আমার নেই।

বিজয়া তেমনি অধোমুখে থকিয়াই প্রত্যুত্তর করিল, আছে বৈ কি! বিষয় আমার নয়, বাবার। নইলে সেদিন তাঁর যথাসর্বস্ব দাবীর কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আনতে পারতেন না। আমি হলে কিন্তু এখানেই থামতুম

না। তিনি যা দিয়ে গেছেন, সমস্ত জোর করে দখল করতুম, তার একতিল ছেড়ে দিতুম না।

নরেন কোন কথা কহিল না। বিজয়াও আর কিছু না বলিয়া নতনেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট-দুই এমনি নীরবে কাটিবার পরে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বিজয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, নরেনের সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক রকম হইয়া গেছে। দুজনের চোখাচোখি হইবামাত্রই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নলিনী ঠিকই বুঝেছিল বিজয়া, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মত একটা অকেজো অপদার্থ লোককেও যে কারও কোন প্রয়োজন হতে পারে, এ আমি অসম্ভব বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম করনি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাগলামি বিজয়া!

আজ এতদিন পরে তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিজয়ার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; সে মুখের উপর সজোরে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে লাগিলে।

নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়াল ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

দয়াল দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত নিঃশব্দে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে বিজয়ার কাছে গিয়া তাহার সোফার একান্তে বসিয়া মাথার উপর ডান হাতটি রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, মা।

সে তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিল এবং প্রাণপণে এই লজ্জাকর ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু এই করুণ সুরে মাতৃ-সম্বোধনের ফল একেবারে বিপরীত হইল। কি জানি, তাহার মৃত পিতাকে মনে পড়িয়াই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল কি না—সে চক্ষের পলকে বৃদ্ধের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এ সংসারে একমাত্র তিনিই শুধু এই মর্মান্তিক রোদনের আগাগোড়া ইতিহাসটা জানিতেন। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হল মা—শুধু আমিই এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল—সে সমস্তই জানত। কিন্তু, সে জানত, নরেনই মনে মনে তোমাকে—কিন্তু নির্বোধ আমি সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উলটো খবর দিয়ে শুধু এই দুঃখ ঘরে ডেকে আনলাম। এখন বুঝি আর কোন প্রতিকার—

দেওয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে বিজয়ার দুর্জয় দুঃখের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে অনুভব করিয়া, দয়াল অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, এর কি আর কোন উপায় হতে পারে না মা?

বিজয়া তেমনি মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না—না, মরণ ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।

দয়াল কহিতে গেলেন, ছি মা, কিন্তু—

বিজয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না—না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমি কথা দিয়েছি—বেঁচে থাকতে সে আমি ভাঙ্গতে পারব না দয়ালবাবু। মরতে না পারলে আমি—, বলিতে বলিতেই আবার তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দয়ালের গলা দিয়াও আর কথা বাহির হইল না। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে শুধু হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরেশের মা বাহির হইতে ছেলেকে দিয়া বলাইল, মাঠান, বেলা তিনটে বেজে গেল যে!

সংবাদ শুনিয়া দয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং স্নানাহারের জন্য নির্বন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরেশ পুনরায় কহিল, তোমার জন্যে কেউ যে খেতে পারছি নে মাঠান।

তখন চোখ মুছিয়া বিজয়া উঠিয়া বসিল, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দয়াল কহিলেন, নরেন, তোমারও ত এখনো খাওয়া হয়নি?

নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, না।

তবে আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

চলুন, বলিয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দয়ালের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আসন্ন বিবাহোৎসব উপলক্ষে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পরে পিতাপুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দয়াল এমনি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন যে কাহারও আগমন লক্ষ্যও করিলেন না। তিনি কখন আসিয়াছেন, কতক্ষণ বসিয়া আছেন, বিজয়া জানিত না। কিন্তু তাঁহার সেই তদগত ভাব দেখিয়া ধ্যান ভাঙ্গিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও যখন দেখিতে পাইল, তিনি একই ভাবে বসিয়া আছেন, তখন ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল চকিত হইয়া কহিলেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি মা।

বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তা হলে ডাকেন নি কেন?

দয়াল কহিলেন, তোমরা কথা কইছিলে বলে আর বিরক্ত করিনি। কাল দুপুরবেলা আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল মা। না মা, না সে কিছুতেই হবে না। পাছে ‘না’ বলে বিদায় কর, সেই ভয়ে এই পথ হেঁটে আবার নিজে এসেছি। কিন্তু দুপুর রোদে হেঁটে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি; আমি পালকি-বেহারা ঠিক করে রেখেছি, তারা এসে তোমাকে ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধের সকরুণ কথায় বিজয়ার চোখ ছলছল করিয়া আসিল; কহিল, একটা চিঠি লিখে পাঠালেও আমি ‘না’ বলতুম না। কেন অনর্থক আবার নিজে হেঁটে এলেন?

দয়াল উঠিয়া আসিয়া বিজয়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, মনে থাকে যেন, বুড়ো ছেলেকে কথা দিচ্ছ মা। না গেলে আবার আমাকে ছুটে আসতে হবে— কোন মতেই ছাড়ব না।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

কিন্তু এই আগ্রহাতিশয্যে সে মনে মনে বিস্মিত হইল। একে ত ইতিপূর্বে কোনদিনই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে সান্ধ্যভোজনের পরিবর্তে এই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য এইরূপ বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কেমন যেন ঠিক সহজ এবং সাধারণ নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল। আজ দুপুরবেলাও যে এই অকারণ নিমন্ত্রণের সঙ্কল্প তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চিত; অথচ ইহারই মধ্যে যানবাহনের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিয়া আসিতে তিনি অবহেলা করেন নাই।

মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বিজয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কারণটা কি, শুনতে পাইনে?

দয়াল লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, না মা, সেটি তোমাকে পূর্বাহ্নে জানাতে পারব না।

বিজয়া কহিল, তা না বলেন, নিমন্ত্রিতদের নাম বলুন?

দয়াল কহিলেন, তুমি ত সবাইকে চিনবে না মা। তাঁরা আমার ঐ পাড়ারই বন্ধু। যাঁদের চিনবে, তাঁদের একজনের নাম রাসবিহারী, অপরের নাম নরেন্দ্র।

দয়াল চলিয়া গেলে বিজয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া বসিয়া মনে মনে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল, কি একটা অশুভ সংশয়ে মনের অন্ধকার নিরন্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কিন্তু পরদিন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত যখন পালকি আসিয়া পৌঁছিল না, বিজয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তখন একদিকে যেমন বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে তেমনি একটা আরাম বোধ করিতে লাগিল।

পরেশের মা সঙ্গে যাইবে, এইরূপ একটা কথা ছিল। সে বোধ করি এইবার লইয়া দশবার আসিয়া কিছু খাইবার জন্য বিজয়াকে পীড়াপীড়ি করিল, এবং বুড়া দয়ালের ভীমরতি হইয়াছে কিনা, এবং নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিল। অথচ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কারণ সত্যই যদি কোন অচিন্তনীয় কারণে তিনি নিমন্ত্রণ করিবার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ত তাঁহাকে অপরিসীম লজ্জায় ফেলা হইবে। এই অভূতপূর্ব অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত মন কি করিবে, কিছুই যখন নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল, পালকি আসিতেছে।

বিজয়া যখন যাত্রা করিল, তখন বেলা অপরাহ্ন। রাসবিহারী তাঁহার জনমজুর লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পালকির পার্শ্বে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, দয়ালের হঠাৎ এমন লোক খাওয়ানোর ধুম পড়ে গেল কেন, সে ত জানিনে। সন্ধ্যার পর আমাকেও যেতে হবে, বিশেষ করে বলে গেছেন। কিন্তু পালকি পাঠাতে রাত্রি করলে যেতে পারব না, সে কিন্তু বলে দিয়ো মা।

দয়ালের বাটীর দ্বারের উপর আম্র-পল্লবের সারি দেওয়া, উভয় পার্শ্বে জলপূর্ণ কলস— বিজয়া বিস্মিত হইল। ভিতরে পা দিতেই—দয়াল গ্রামস্থ জন-কয়েক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন—ছুটিয়া আসিয়া 'মা' বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বিজয়া রুষ্ট অভিমানের সুরে কহিল, ক্ষিদেয় আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, এই বুঝি আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন?

দয়াল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আজ যে তোমাদের খেতে নেই মা। নরেন ত নির্জীব হয়ে শুয়েই পড়েছে। আজ একটা দিনের জন্যে অন্ততঃ কানা ভট চায্যিমশায়ের শাসন মানতেই হবে যে।

দ্বিতলের সম্মুখের হলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এগুলা কি, ঠিক না বুঝিয়াও বিজয়ার নিভৃত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পর্যন্ত সাহস করিল না।

দয়াল অত্যন্ত সহজভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পরেই লগ্ন—আজ যে তোমার বিবাহ বিজয়া! ভাগ্যক্রমে দিনক্ষণ সমস্ত পাওয়া গেছে—না গেলেও আজই দিতে হত, কিছুতেই অনাথা করা যেত না; তা যাক, সমস্তই ঠিকঠাক মিলে গেছে। তাই ত কানা ভটচায্যিমশাই হেসে বললেন, এ যেন তোমাদের জন্যেই পাঁজিতে আজকের দিনটি সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কহিল, আপনি কি আমার হিন্দু-বিবাহ দেবেন?

দয়াল কহিল, হিন্দু—বিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু সাম্প্রদায়িক মত মানুষকে এমনি বোকা করে আনে যে, কাল সমস্ত বেলাটা ভেবে ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কোন কুল- কিনারা খুঁজে পাইনি। কিন্তু নলিনী আমাকে একটি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিলে। বললে, মামা, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও; নইলে ব্রাহ্ম— বিবাহের ছল করে যদি অপাত্রে দান কর ত অধর্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্চায্যিমশাই পড়াবেন কিংবা আচার্যমশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায় মামা? এতবড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হয়ে গেল বিজয়া। মনে মনে বললুম, ভগবান! তোমার ত কিছুই অগোচর নেই! এদের বিবাহ আমি যে—কোন মতেই দিই না, তোমার কাছে যে অপরাধী হব না, সে নিশ্চয় জানি। তবুও বললুম, কিন্তু একটা কথা আছে যে নলিনী! বিজয়া যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা যে তারই উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। এ সত্য ভাঙ্গবে কি করে?

নলিনী বললে, মামা তুমি ত জান, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনো সায় দেননি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হল? তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন করে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় করে তুলতে হবে?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তুই এ-সব শিখলি কোথায় মা?

নলিনী বললে, আমি নরেনবাবুর কাছেই শিখেছি। তিনি বার বার বললেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্যভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে বলে করে।

একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তুমি নরেনকে জান না মা, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, তাও হয়ত ঠিক জান না। সে এমন ছেলে যে, অসত্যের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হত না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে করে দেখ দিকি বিজয়া!

বিজয়া কিছুই কহিল না। নিঃশব্দে নতমুখে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিল। কানে কানে কহিল, তোমাকে সাজাবার ভার আজ নরেনবাবু আমাকে দিয়েছেন। চল, বলিয়া তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখে বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গত মাতা-পিতার আশীর্বাদের মত আসিয়া পড়িল।

যিনি সম্প্রদান করিতে বসিলেন, শোনা গেল, তিনি কোন্ এক সুদূর-সম্পর্কে বিজয়ার পিসী। একচক্ষু ভট্টাচার্যমশাই মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া দাবী করিলেন, দুই-তিন পুরুষ পূর্বে তাঁরাই ছিলেন জমিদার-বাটীর কুল-পুরোহিত।

বিবাহ অনুষ্ঠান সমাধা হইয়া গিয়াছে—বর-বধূকে তুলিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে রাসবিহারী আসিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। দয়াল উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, এস ভাই, এস। শুভকর্ম নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গিয়েছে—আজকের দিনে আর মনের মধ্যে কোন গ্লানি রেখো না ভাই—এদের তুমি আশীর্বাদ কর।

রাসবিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহজ গলায় কহিলেন, বনমালীর মেয়ের বিবাহটা কি শেষে হিঁদুর মতেই দিলে দয়াল? আমাকে একটু জানালে ত এর প্রয়োজন হত না।

দয়াল থতমত খাইয়া কহিল, সমস্ত বিবাহই ত এক ভাই।

রাসবিহারী কঠোরস্বরে কহিলেন, না। কিন্তু বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্বাসন-দুঃখও একবার ভেবে দেখলে না?

নলিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল—সে কহিল, তাঁর মেয়ে তার স্বর্গীয় পিতার সত্যকার আজ্ঞাটাই পালন করছে, অনুষ্ঠানের কথা ভাববার সময় পায়নি। আপনি নিজেও ত বনমালীবাবুর যথার্থ ইচ্ছাটা জানতেন। তাতে ত ত্রুটি হয়নি।

রাসবিহারী এই দুর্মুখ মেয়েটার প্রতি একটা ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, হুঁ। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইতেছিলেন—নলিনী আবদারের সুরে কহিল, বাঃ—আপনি বুঝি বিয়ে-বাড়ি থেকে শুধু শুধু চলে যাবেন? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে! আমি মামাকে দিয়ে কত কষ্ট করে আপনাকে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছি।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, শুধু আর একটা অগ্নিদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

দেনা-পাওনা

এক

চণ্ডীগড়ে ৺চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন্ এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির-সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারিভুক্ত। কেমন করিয়া এবং কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমনি নিঃসহায় দেবতার ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী সাধারণ পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্যটা কেবল এই যে, চণ্ডীগড় গ্রামের অধিকাংশই এখন চণ্ডীর হস্তচ্যুত। দেবতার হয়ত ইহাতে যায়-আসে না; কিন্তু তাঁহার সেবায়েত যাঁহারা, এ ক্ষোভ তাঁহাদের আজিও যায় নাই; তাই আজিও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতে ছাড়ে না এবং মাঝে মাঝে সেটা তুমুল হইয়া উঠিবারই উপক্রম করে। অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসর-খানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভূতপূর্ব ভূস্বামী কালীমোহনবাবু পর্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া ইহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে দেয় নাই।

সেই জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য-পরিদর্শনচ্ছলে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের মধ্যে একটা সামান্য রকমের কাছারিবাড়ি বরাবরই আছে, কিন্তু বাঁকুড়া জেলার এই অসমতল পাহাড়-ঘেঁষা গ্রামখানির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম থাকায়, এবং বিশেষতঃ বালুময় বারুইয়ের জল অত্যন্ত রুচিকর বলিয়া এই জীবানন্দেরই মাতামহ রাধামোহনবাবু গ্রামপ্রান্তে নদীতীরে শান্তিকুঞ্জ নাম দিয়া একখানি বাংলো-বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র কালীমোহন কোনদিন এখানে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং একদিন যে গৃহের রূপ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, মর্যাদা ছিল—চারিদিকের যে উদ্যান দিবারাত্রি ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাই আবার আর একদিন আর এক হাতে অযত্ন-অবহেলায় জীর্ণ মলিন ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল।

এখানে মালী ছিল না, রক্ষক ছিল না, আশেপাশে লোকালয় ছিল না, কেবল বারুইয়ের শুষ্ক উপকূলে মস্ত একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ি বনজঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অবমানিত গৌরবের মত অহর্নিশি শূন্য খাঁখাঁ করিত। কতকাল ধরিয়া যে এখানে কেহ প্রবেশ করে নাই, কতকাল ধরিয়া যে কাছারির প্রধান কর্মচারী সদরে কেবল মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করিয়া আসিতেছে, তাহা হিসাব করিয়া লইবার কেহ নাই।

এই যখন অবস্থা, তখন অকস্মাৎ একদিন সায়াহ্নবেলায় মাত্র জন-দুই লোক সঙ্গে লইয়া নূতন ভূস্বামী আসিয়া গ্রামের কাছারিবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; পালকি হইতে অবতরণ পর্যন্ত করিলেন না, কেবল গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি দিনকয়েক শান্তিকুঞ্জে বাস করিবেন এবং পরক্ষণেই গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় এককড়ির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হয়ত সেখানে প্রবেশ করিবার পথ নাই, হয়ত সমস্ত দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে, হয়ত ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকের দল

বসবাস করিয়া আছে—তথায় কি যে আছে, আর কি যে নাই, তাহার কোন জ্ঞানই এককড়ির ছিল না।

এই সন্ধ্যাবেলায় কোথায় লোকজন, কোথায় আলোর বন্দোবস্ত, কোথায় খাবার-দাবার আয়োজন—হঠাৎ এখন সে কি করিবে, কাহার শরণাপন্ন হইবে, চিন্তা করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভারী এবং মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চাকরি ত গেছেই—সে যাক্, কিন্তু এই দুর্দান্ত নবীন মনিবের যে-সকল ইতিবৃত্ত সে ইতিমধ্যে লোকপরম্পরায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোনটাই তাহাকে কোন ভরসা দিল না এবং এই যে খবর নাই, এত্তেলা নাই, এই হঠাৎ শুভাগমন, এ যখন কেবল তাহারই জন্য, তখন ইঁহারই জমিদারিতে বাস করিয়া ছেলেপুলে লইয়া কোথায় পালাইয়া যে সে আত্মরক্ষা করিবে, ইহার কোন কিনারাই তাহার চোখে পড়িল না।

মনিবকে সে কখনো চোখে দেখে নাই—তাহার প্রয়োজন হয় নাই, আজও সে সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথপ্রান্তে বাহকেরা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পালকির ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে যে মুখের চেহারা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার অনেক গাফিলতি, অনেক চুরির এইবার যে একটা কঠোর বোঝাপড়া সরজমিনে বসিয়া চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অংশ আর কাহারও স্কন্ধে আরোপ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, ইহাই যখন সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে কাছারির বড় পেয়াদা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারা তাগাদায় গিয়াছিল; পথের মধ্যে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দীমশাই, হুজুর আসছেন না?

এককড়ি চোখ তুলিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

বিশ্বম্ভর আশ্চর্য হইয়া ক্ষণকাল এককড়ির পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, হুঁ কি গো নন্দীমশাই? স্বয়ং হুজুর আসচেন যে!

এককড়ি মনে মনে একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বিকৃত স্বরে জবাব দিল, আসচেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এত্তেলা নেই, হুজুর আসচেন! হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না!

এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ সহসা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিশ্বম্ভর মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মগজ যেমন পরিষ্কার তেমনি ঠাণ্ডা, এবং পিয়াদা হইলেও গোমস্তার সহিত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককড়িকে সে ভিতরে লইয়া গিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই সান্ত্বনা দান করিল, এবং মদের বোতল, মাংস এবং আনুষঙ্গিক আরও একটা বস্তুর গোপন ইঙ্গিত করিয়া এতবড় আশার বাণী শুনাইতেও ইতস্ততঃ করিল না যে, পুরুষের ভাগ্যের সীমা যখন দেবতারাও নির্দেশ করিতে পারেন না, তখন হুজুরের নজরে পড়িলে নন্দীমশায়ের অদৃষ্টেও কেন যে একদিন সদরের নায়েবী পদ মিলিবে না, এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

অনতিকাল মধ্যেই এককড়ি যখন জনকয়েক লোক, গোটা-দুই আলো এবং সামান্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিকুঞ্জের ভাঙ্গা গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিল ,ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ডালপালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পথটাকে চলনসই করা হইয়াছে; তথাপি এই বনময় অন্ধকার পথে সহসা প্রবেশ করিতে বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও ভরসা হইল না। এবং প্রবেশ করিয়াও পা ফেলিতে প্রতিপদেই তাহাদের গা ছমছম করিতে লাগিল। বিঘা-দশেক ভূমি ব্যাপিয়া এই বন, সুতরাং পথও অল্প নহে, তাহা অতিক্রম করিবার দুঃখও অল্প নহে। কোথাও একটা দীপ নাই, কেবল চাতালের একধারে যেখানে বাহকেরা পালকি নামাইয়া রাখিয়া একত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে তাহারই অদূরে একখণ্ড জ্বলন্ত শুষ্ককাষ্ঠ হইতে কতকটা স্থান যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত হইয়াছে। খবর পাইয়া ভৃত্য আসিয়া এককড়িকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। সমস্ত কক্ষ মদের গন্ধে পরিপূর্ণ, এককোণে

মিটমিট করিয়া একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে এবং অপরপ্রান্তে একটা ভাঙ্গা তক্তপোশের উপর বিছানা পাতিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়া আছেন। লোকটা অত্যন্ত রোগা এবং ফরসা; বয়স অনুমান করা অতিশয় কঠিন, কারণ উপদ্রবে অত্যাচারে মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে সুরাপূর্ণ কাঁচের গেলাস এবং তাহারই পার্শ্বে বিচিত্র আকারের একটা মদের বোতল প্রায় শেষ হইয়াছে। বালিশের তলা হইতে একটা নেপালী কুকরির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং তাহারই সন্নিকটে একটা খোলা বাক্সের মধ্যে একজোড়া পিস্তল সাজান রহিয়াছে।

এককড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনিব কহিলেন, তোমার নাম এককড়ি নন্দী? তুমিই এখানকার গোমস্তা?

ভয়ে এককড়ির হৃৎপিণ্ড দুলিতেছিল, সে অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুজুর!

সে ভাবিয়া আসিয়াছিল এইবার এই বাড়ির কথা উঠিবে, কিন্তু হুজুর তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছারির তসিল কত?

এককড়ি বলিল, আজ্ঞে, প্রায় হাজার-পাঁচেক টাকা।

হাজার-পাঁচেক? বেশ আমি দিন-আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার-দশেক টাকা চাই।

এককড়ি কহিল, যে আজ্ঞে।

তাহার মনিব বলিলেন, কাল সকালে তোমার কাছারিতে গিয়ে বসব—বেলা দশটা-এগারোটা হবে—তার পূর্বে আমার ঘুম ভাঙ্গে না। প্রজাদের খবর দিও।

এককড়ি সানন্দে মাথা নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে। কারণ ইহা বলা বাহুল্য যে খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের গুরুভারে এককড়ি আপনাকে নিরতিশয়

প্রপ্রীড়িত বা বিপন্ন জ্ঞান করে নাই। সে পুলকিত-চিত্তে কহিল, আমি রাত্রের মধ্যেই আজ চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দেব যেন কেউ না বলতে পারে সে সময়ে খবর পায়নি।

জীবানন্দ মাথা হেলাইয়া সম্মতি দান করিলেন, এবং মদের পাত্রটা মুখে তুলিয়া সমস্তটা এক চুমুকে পান করিয়া সেটা ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতে দিতে বলিলেন, এককড়ি, তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতী মদের দোকান নেই! তা না থাক, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক’টা দিন চলে যাবে, কিন্তু মাংস আমার রোজ চাই।

এককড়ি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল, এ আর বেশী কথা কি হুজুর, মা চন্ডীর সরেস মহাপ্রসাদ আমি রোজ হুজুরে দিয়ে যাবো।

হুজুর খুশী হইয়া কহিলেন, বেশ, বেশ। তার পরে বোতল হইতে কতকটা সুরা পাত্রে ঢালিয়া তাহা পান করিলেন, এবং মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ির সাহস বাড়িতেছিল, কহিল, আজ্ঞে করুন?

তিনি মুখের মধ্যে গোটা-দুই লবঙ্গ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ করিনি—বোধ হয় কখনো করবও না।

এককড়ি মৌন হইয়া রহিল। তখন এই মদ্যপ ভূস্বামী একটা শুষ্কহাস্য করিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়েচ ত? আর ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—শুকদেব হয়েও উঠিনি—বলি, কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এককড়ি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল, মুখ ফুটিয়া জবাব দিতে পারিল না; কিন্তু যে নির্লজ্জ উক্তিতে জমিদারের গোমস্তার পর্যন্ত লজ্জা বোধ হয়, এ কথা যিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিলেন, তিনি ইহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

কহিলেন, অপর সকলের মত চাকরকে দিয়ে এ-সব কথা বলাতে আমি ভালবাসি নে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা, এখন যাও। আমার বেহারাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিও; ওরা তাড়িটা আস্‌টাও বোধ করি খায়। সেদিকেও একটু নজর রেখো। আচ্ছা যাও।

এককড়ি মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল; হুজুর হঠাৎ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাহার অনেকদিনের একটা পুরাতন ক্ষত ছিল—মনিবের প্রশ্নটা ঠিক সেইখানেই আঘাত করিল। কিন্তু বেদনাটাকে সে একটা সংযমের আবরণ দিয়া নিরুৎসুককণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে না, তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি—তা সে হুজুরের প্রজা নয়।

তারাদাসটা কে?

এককড়ি কহিল, গড়চণ্ডীর সেবায়েত।

এই সেবায়েতদিগের সহিত জমিদারি সংস্পর্শে এককড়ির অনেক কলহ-বিবাদ হইয়া গেছে, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ কোন ক্ষোভ ছিল না; কিন্তু বৎসর-দুই পূর্বে একটা পাকা কাঁঠাল গাছ লইয়া যে লড়াই বাধে, সে জ্বালা তাহার যায় নাই। কারণ কাঁঠালের তক্তাগুলা ছিল তাহার নিজের বাটীর জন্য এবং সেই হেতু শেষ পর্যন্ত তাহাকেই নতি স্বীকার করিয়া গোপনে মিটমাট করিয়া লইতে হয়।

এককড়ি কহিতে লাগিল, কি করব হুজুর, সদরে আরজি করে সুবিচার পাই নে—দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেন না, নইলে চক্কোত্তিকে ঢিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এও নিবেদন করচি, হুজুর আশকারা দিলে ওরা প্রজা বিগড়ে দেবে—তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।

হুজুরের কিন্তু নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি নিস্পৃহ জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তারাদাসের নামটাই ত করলে, এককড়ি—আবার ওরা এল কারা?

এককড়ি কহিল, চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তিমশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসল সর্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদমাশগুলো হয়েচে যেন একেবারে তার গোলাম।

জমিদারবাবুর কানে বোধ করি সমস্ত কথাগুলি পৌঁছিল না। তিনি তেমনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, হবারই কথা। কত বয়স? দেখতে কেমন?

এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ-চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে যেন এক কাটখোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলী ছিরি, না আছে মেয়েলী ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া বসিলেন। উৎসাহ ও কৌতূহলে দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বল কি এককড়ি? ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি? না হয় চুয়াড়ের মতই দেখতে, তবু ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে—সর্বনাশীই বা হল কি করে, আর বোম্বেটে বদমাশের দলই বা তার জুটলো কোথা থেকে?

এককড়ি কহিল, তা আর আশ্চর্যি কি হুজুর! বলিয়া সে ভৈরবীর যে ইতিহাসটা দিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটা সাধারণ উপাধি। যেমন বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং ইহার পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁহার নাম ছিল মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়েত কখনও পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এ পদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

আন্দাজ বৎসর পনর-ষোল হইবে হঠাৎ একদিন জানা যায় মাতঙ্গিনী ভৈরবীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কথাটা অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পদত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতে হয়।

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হলে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়?

এককড়ি কহিল, হাঁ হুজুর।

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন?

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর! মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীর আর ভৈরবী স্পর্শ করিবারও জো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখী গরীবের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না। এই-ই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, বল কি এককড়ি, এক্কেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুরা ঢেলে দেওয়া—গরম মসলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই; কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখচি। লোকগুলো কি আর খামকা তার পায়ে পায়ে জড়ায়! কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে-মোহন্ত আর কি! তার দোষ নেই; কিন্তু মাতুর পরে ইনি জুটলেন কি করে?

এককড়ি বলিল, চক্কোত্তিমশাই হচ্চেন মাতঙ্গিনীর ভাগ্নে। ঢাকা না কোথায় কোন্ মহাজনের আড়তে খাতা লিখছিলেন, চিঠি পেয়ে চলে এলেন, সঙ্গে একটা

বছর-দশেকের মেয়ে। কোথা থেকে একটা পাত্রও জুটিয়ে আনলেন—কি জাত, কার ছেলে, কোথায় ঘর—রাতারাতি বিয়ে হল, রাতারাতি চালান দিয়ে দিলেন—তারপর দিব্যি গদিতে বসিয়ে রাজভোগে আছেন। কেবা কথা কয়, কেবা জিজ্ঞেসা করে? গাঁয়েও মানুষ নেই, রাজারও শাসন নেই! বলিয়া সে জমিদারকেই কটাক্ষ করিল। কিন্তু চাহিয়া বুঝিল এ বক্রোক্তি নিষ্ফল হইয়াছে। রাজা নিমীলিতচক্ষে এক নিমিষেই যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা নাই—পাছে তাহার কিছুমাত্র অবিবেচনায় এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে সে পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া মনে মনে মাতালের পিতৃপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমনি সময়ে জীবানন্দ ঠিক সহজ মানুষের মতই পুনরায় কথা কহিলেন। বলিলেন, বছর-পনর পূর্বে না? আচ্ছা, এই তারাদাস লোকটা কি দেখতে খুব বেঁটে আর ফরসা?

এককড়ি কহিল, না হুজুর, চক্কোত্তিমশায়ের রঙ ফরসা বটে, কিন্তু ইনি খুব দীর্ঘাঙ্গ।

দীর্ঘাঙ্গ? আচ্ছা, লোকটা যে ঢাকায় মহাজনের গদিতে খাতা লিখত এ তুমি জানলে কি করে? এমন ত হতে পারে সে কলকাতায় রাঁধুনি বামুনের কাজ করত?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, সত্যিই তিনি খাতা লিখতেন। তাঁর ছ'মাসের মাইনে বাকী ছিল, আমিই নালিশ করবার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে টাকাটা আদায় করে দিই।

জীবানন্দ কহিলেন, তা হলে সত্যি। আচ্ছা, এই লোকটাই কি বছর-পাঁচেক পূর্বে একটা প্রজা উৎখাতের মামলায় মামার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি মস্ত একটা মাথায় ঝাঁকানি দিয়া বলিল, হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এরা কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, পঞ্চাশ-ষাট বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কাল তুমি নিজে গিয়ে একে জানিয়ে এসো যে বিঘে পিছু দশ টাকা আমার নজর চাই। আমি আটদিন আছি।

এককড়ি কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর হুজুর।

না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে একফোঁটা নেই। সেলামী না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্য নয়, তাঁহার কন্যা কাটখোট্টা ষোড়শী ভৈরবীর কথাই স্মরণ করিয়া। জমিদার ত একদিন চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাকে যে এই গ্রামেই বাস করিতে হইবে। একবার সে অস্ফুটে বলিতেও গেল, কিন্তু হুজুর—

কিন্তু বক্তব্যটা উহার অধিক অগ্রসর হইতে পাইল না। হুজুর মাঝখানেই থামাইয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু এখন থাক এককড়ি। আমার টাকার দরকার, পাঁচ-ছ'শ টাকা আমি ছাড়তে পারব না, ওটা তাদের দিতেই হবে। কাল চক্রবর্তীকে খবর দিও যেন কাছারিতে হাজির থাকে। দলিলপত্র কিছু থাকে ত তাও সঙ্গে আনতে পারে। রাত হল, এখন তুমি যেতে পারো। লোকজনদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিও—সদরে ফিরে তোমাকে মনে রাখব।

হুজুর মা-বাপ, বলিয়া এককড়ি আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।

তারাদাস চক্রবর্তী আদেশমত প্রথম দিন হাজির হইয়া নজর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি ছয় ঘণ্টাকাল তীক্ষ্ণ রৌদ্রে খাড়া দাঁড়াইয়াও স্বীকার করেন নাই; কিন্তু সর্বসমক্ষে কান ধরিয়া ওঠ-বোস, ঘোড়দৌড় এবং ব্যাঙের নাচ নাচাইবার প্রস্তাবে আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। চণ্ডীমাতার নিকট কায়মনে জমিদারগোষ্ঠীর বংশলোপের আবেদন করিয়া, প্রকাশ্যে পাঁচদিনের কড়ারে টাকা আদায় দিবার অঙ্গীকারে অব্যাহতি পাইয়া বাড়ি আসেন। আজ সেই দিন, কিন্তু সকাল হইতে কোথাও তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না।

ইতিমধ্যে প্রত্যহ মহাপ্রসাদ যোগাইতে হইয়াছে; পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল, চালের লাউ-কুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে—ষোড়শী প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তারাদাস কিছুতেই একটা কথাও কহিতে দেয় নাই, তাহার হাতে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া যেমন করিয়া হোক নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতার অপমান হইতে আরম্ভ করিয়া এই-সকল নির্যাতন সে কোনমতে এতদিন সহিয়াছিল, কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ক্রোধ একমুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পিতার নিঃশব্দ অন্তর্ধানের হেতু ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের ভার তাহার মন একাকী যেন আজ আর বহিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া সমস্ত সকাল ও মধ্যাহ্ন যখন

অপরাহ্নে গড়াইয়া পড়িল, তখন রাত্রের অন্ধকারে উপবাসী পিতার গোপনে ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা করিয়া সে দুটো রাঁধিতে বসিয়াছিল, এমন সময়ে মন্দিরের পরিচারিকা আসিয়া যে অত্যাচার বর্ণনা করিল, তাহা এই—

মাতাল ভূস্বামীর হঠাৎ খেয়াল হইয়াছে যে, অতঃপর নিষিদ্ধ মাংস ত নহেই, এমন কি বৃথা মাংসও ভোজন করিবেন না। অথচ পাঁঠার মাংস যথেষ্ট সুস্বাদু বা রুচিকর নহে। তাই আজ জমিদারের লোক ডোমপাড়া হইতে একটা খাসি আনিয়া মন্দিরে হাজির করে এবং তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়া দিতে বলে। পুরোহিত প্রথমটা আপত্তি করে, কিন্তু শেষে আদেশ শিরোধার্য করিয়া উহাকেই উৎসর্গ করিয়া যথারীতি বলি দিয়া দেবীর মহাপ্রসাদ করিয়া দেয়।

শুনিবামাত্রই ষোড়শী হাঁড়িটা দুম্ করিয়া চুলা হইতে নামাইয়া দিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতবেগে মন্দিরে চলিয়াছিল, বহির্দ্বারে জন-চারেক হিন্দুস্থানী পাইক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে বাড়িটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ইহারা জমিদারের পালকি-বেহারা। মুখে তাড়ির দুর্গন্ধ, চোখগুলো রাঙ্গা— অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। যে লোকটা বাংলা শিখিয়াছে, সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, শালা ঠাকুরমোশাই ঘোরে আছে? শালা টাকা দেবে, না ভেগে ফিরচে!

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। পাছে এই দুর্বিনীত মদমত্ত পশুগুলা হঠাৎ তাহাকেই অপমান করিয়া বসে এই ভয়ে সে দুর্জয় ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, বাবা বাড়ি নেই।

কোথা ছিপ্‌ছে?

আমি জানি নে, বলিয়া ষোড়শী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা হাত বাড়াইয়া একটা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে ত তুই চোল। গোলায় গামছা লাগিয়ে খিঁচে লিয়ে যাবো।

এ অপমান ষোড়শীকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল, সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া কহিল, খবরদার বলচি। চল্ আমিই যাবো—তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখি গে। বলিয়া সে পরিণাম-ভয়হীন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথে দুই-একজন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু ষোড়শী ভ্রূক্ষেপও করিল না। জমিদারের লোকগুলা পিছনে হল্লা করিয়া চলিয়াছে, ইহার অর্থ পল্লীগ্রামের কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই শুধু নয়, কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া এতবড় অবমাননাকে আর নিজের মুখে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতে তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

কাছারিবাড়ি বেশী দূরে নয়, এককড়ি সম্মুখেই ছিল। সে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে—আমি কিছুই জানিনে—সর্দারজী, হুজুরের কাছে নিয়ে যাও। বলিয়া সে শান্তিকুঞ্জের উদ্দেশে অঙ্গুলিসংকেত করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ষোড়শী নিজের বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

কোথায় যাইতে হইবে বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

লোকটা এককড়ির প্রদর্শিত দিকটা নির্দেশ করিয়া কেবল কহিল, চল্।

এ যাইতেই হইবে, তবুও কহিল, আমার কাছে ত টাকা নেই সর্দার, হুজুরের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে?

কিন্তু সর্দার বলিয়া যাহাকে ভিক্ষা জ়ানানো হইল, সে এই আবেদনের ধার দিয়াও গেল না। শুধু প্রত্যুত্তরে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া বলিল, চল্ মাগী চল্।

আর ষোড়শী কথা কহিল না। এই লোকগুলা স্থানান্তর হইতে আসিয়াছে, তাহার মর্যাদার কোন ধারণাই ইহাদের নাই। সুতরাং টাকার জন্য, খাজনার জন্য নরনারী নির্বিচারে সামান্য প্রজার প্রতি যে আচরণে নিত্য অভ্যস্ত, এ ক্ষেত্রেও তাহাদের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। অনুনয় বিনয় নিষ্ফল কাঁদাকাটায় কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না।অবাধ্য হইলে হয়ত পথের মধ্যেই টানাহেঁচড়া বাধাইয়া দিবে। প্রকাশ্য রাজপথে অপমানের এই চরম কদর্যতার চিত্র তাহাকে মুখ বাঁধিয়া যেন সুমুখের দিকে ঠেলিয়া দিল।

পথে রাখাল বালকেরা গরু লইয়া ফিরিয়াছে, কৃষকেরা দিনের কর্ম শেষ করিয়া বোঝা মাথায় ঘরে চলিয়াছে—সবাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; ষোড়শী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, কাহাকেও কিছু বলিবার উদ্যম করিল না, কেবল মনে মনে কহিতে লাগিল, মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিল। সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত নীরবে শান্তিকুঞ্জের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল; থামিবার আপত্তি করিবার কোথাও এতটুকু চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

যে ঘরে আনিয়া তাহাকে হাজির করা হইল এটা সেই ঘর, এককড়ি যেখানে সেদিন প্রবেশ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তেমনি আবর্জনা, তেমনি মদের গন্ধ। সাদা, কালো, লম্বা, বেঁটে নানা আকারের শূন্য মদের বোতল চারিদিকে ছড়ানো। শিয়রের দেয়ালে খান-দুই চকচকে ভোজালি টাঙ্গানো, এককোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়ে রাখা, হাতের কাছে একটা ভাঙ্গা তেপায়ার উপর একজোড়া পিস্তল, অদূরে ঠিক সুমুখের বারান্দায় কি একটা বন্যপশুর কাঁচা চামড়া ছাদ হইতে ঝুলানো—তাহার বিকট দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে লাগিতেছে। বোধ হয় খানিক পূর্বেই গুলি করিয়া একটা শিয়াল মারা হইয়াছে। সেটা তখন পর্যন্ত মেঝেয় পড়িয়া—তাহারই রক্ত গড়াইয়া কতকটা স্থান রাঙ্গা হইয়া আছে। জমিদার শয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া শুইয়া কি একখানা

বই পড়িতেছিলেন। মাথার কাছে আর একটা মোটা বাঁধানো বইকে বাতিদান করিয়া মোমবাতি জ্বালানো হইয়াছে; সেই আলোকে চক্ষের পলকে অনেক বস্তুই ষোড়শীর চোখে পড়িল। বিছানায় বোধ করি কেবল চাদরের অভাবেই একটা বহুমূল্যের শাল পাতা, তাহার অনেকখানি মাটিতে লুটাইতেছে; দামী সোনার ঘড়িটার উপরে আধপোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের সূক্ষ্ম রেখাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে; খাটের নীচে একটা রূপার পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলা হাড়গোড় হয়ত সকাল হইতেই পড়িয়া আছে; তাহারই কাছে পড়িয়া একটা জরি-পাড়ের ঢাকাই চাদর, বোধ হয় হাতের কাছে হাত মুছিবার রুমাল বা গামছার অভাবেই ইহাতে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

বইয়ের ছায়ায় লোকটার মুখের চেহারা ষোড়শী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তবুও তাহার মনে হইল ইহাকে সে আয়নার মত স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে। ইহার ধর্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্ম্মম, এ পাষাণ। ইহার মুহূর্তের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য কোন মর্যাদা নাই! এই পিশাচপুরীর অভ্যন্তরে এই ভয়ঙ্করের হাতের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে কল্পনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ষোড়শীর সকল ইন্দ্রিয় যেন অচেতন হইয়া পড়িতে চাহিল

সাড়া পাইয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বাহির হইতে সর্দার ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া চক্রবর্তীর উদ্দেশে একটা অকথ্য গালি দিয়া কহিল, হুজুর! উস্‌কো বেটিকো পাকড় লায়া।

কাকে? ভৈরবীকে? বলিয়া জীবানন্দ বই ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বোধ হয় এ হুকুম সে দেয় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা।

তাহারা চলিয়া গেলে ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। এনেচ?

ষোড়শীর শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল, কিছুতেই স্বর ফুটিল না।

জীবানন্দ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কহিল, আনোনি জানি। কিন্তু কেন?

এবার ষোড়শী প্রাণপণ চেষ্টায় জবার দিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমাদের নেই।

না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটকে থাকতে হবে। তার মানে জানো?

ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া রহিল। অসম্ভব বলিয়া সে এখানে কিছুই ভাবিতেও পারিল না।

তাহার এ ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা দূর হইতেও বোধহয় জীবানন্দের চোখে পড়িল, এবং মূর্ছা হইতে তাহার এই আত্মরক্ষার চেষ্টাটাও বোধ হয় তাহার অগোচর রহিল না; মিনিটখানেক সে নিজেও কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া এই মৃতকল্প অচেতনপ্রায় রমণীর একেবারে মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আরতির পূর্বে পূজারী যেমন করিয়া দীপ জ্বালিয়া প্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া এই মহাপাপিষ্ঠ স্তব্ধ গম্ভীর মুখে এই সন্ন্যাসিনীর নিমীলিত চক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।

তিন

নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোনদিন দেখিতে পায় না। সেই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত নারী-রূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্যস্ত চুলে, তাহার উপবাস-কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায় তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস-লীলা এই বিশ বর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়াছে—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্যই যে এই ব্যভিচারের ঘূর্ণাবর্তের অতলে তলাইয়াছে, তাহার দাগটুকু পর্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই; লালসার সেই অগ্নিজিহ্বা আজ যখন অকস্মাৎ বাধা পাইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য এই অপরিচিত বিস্ময়ে তাহার মদোন্মত্ত বিকৃত দৃষ্টি স্তব্ধ, গম্ভীর এবং আবিষ্ট হইয়া রহিল।

ভৈরবীকে মাথায় কাপড় দিতে নাই, সে অধোমুখে চোখ বুজিয়া হতজ্ঞানের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জীবানন্দ নীরবে ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিল, এবং মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্যুপরি পান করিতে লাগিল।

মিনিট-পনর এইভাবে নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, হঠাৎ এক সময়ে সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইল এতক্ষণে সে তাহার মূর্ছিতপ্রায় পশুপ্রকৃতিটাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রশ্ন করিল, তোমার নাম ষোড়শী, না?

এ পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়স কত?

কিন্তু তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর কঠিন হইল, কহিল, চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না। জবাব দাও।

ষোড়শী অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে কহিল, আমার বয়স আটাশ।

জীবানন্দ বলিল, বেশ। তাহলে খবর যদি সত্য হয় ত এই উনিশ-কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েচ। দিতে পারবে না কেন?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আপনাকে ত আগেই জানিয়েছি আমার টাকা নেই।

এই সশঙ্ক মৃদু কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে সত্যের দৃঢ়তা ছিল তাহা জমিদারের কানে বাজিল। সে এ লইয়া আর তর্ক করিল না; কহিল, বেশ, তা হলে আরও দশজনে যা করচে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক দাও গে।

ষোড়শী কহিল, তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রি করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল, নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেননা আমার চাই। এই চাইটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটি অধিকার! তোমার যখন দেওয়া চাই-ই তখন—বুঝলে?

ষোড়শী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল, জীবানন্দ কহিতে লাগিল, ভাবে মনে হয় তুমি লেখাপড়া কিছু জানো; তা যদি হয় ত জমিদারের প্রাপ্যটা নিয়ে আর হাঙ্গামা করো না—দিয়ো।

ষোড়শী এবার সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, ওটা কি আপনি জমিদারের প্রাপ্য বলতে চান?

জীবানন্দ কহিল, প্রাপ্য বলতে চাইনে; ওটা তোমাদের দেয় এই বলতে চাই। তোমার মনে হতে পারে বটে, অন্য জমিদারকে ত দিতে হয়নি। তার কারণ, তাঁরা আমার মত সরল ছিলেন না। স্পষ্ট করে দাবী করেন নি, কিন্তু প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বেদখল করে নিয়েছেন। তাঁরা একরকম বুঝেছিলেন, আমি একরকম বুঝি। যাক, এত রাত্র কি একা বাড়ি যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

এতক্ষণ ও এতগুলা কথাবার্তায় ষোড়শীর ভয়টা কতকটা অভ্যাস হইয়া আসিতেছিল, সে সবিনয়ে কহিল, আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ সবিস্ময়ে কহিল, একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারী কষ্ট হবে যে! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তাহার কথা ও হাসির ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট যে, যে আশঙ্কা ষোড়শীর কমিতেছিল, তাহাই একবারে চতুর্গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, না, আমাকে এখুনি যেতেই হবে। বলিয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই জীবানন্দ তেমনি সহাস্যে কহিল, বেশ ত টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরও অনেক রকমের সুবিধে—

কিন্তু প্রস্তাব শেষ হইতে পাইল না। ইহার মুখে নিজের নাম শুনিয়াই ষোড়শী অকস্মাৎ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আপনার টাকা, আপনার সুবিধা আপনার থাক্, আমাকে যেতে দিন। বলিয়াই সে যথার্থই এবার এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু যে লোকগুলাকে এই লোকটাও তাহার সঙ্গে দিতে সাহস করে না তাহাদিগকেই সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বাক্য ও কার্যের কোন প্রতিবাদ জমিদার করিল না, কিন্তু তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি মদ খাও?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার জন-দুই অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথা।

জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার পূর্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি?

ষোড়শী কহিল, সত্যি।

জীবানন্দ কহিল, মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ কহিল, শুনেছ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমি বা এমন দলছাড়া গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী এই কথা বলিতে গেল যে ভাল হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু সহসা একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর তাহাকে মাঝখানেই থামাইয়া দিল। জমিদার জীবানন্দ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনও জানতে চাইনে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেছে, তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়িতেই থাকবে।

হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল। জীবানন্দ কহিতে লাগিল, তোমার সম্বন্ধে কি করে এতটা সহ্য করেচি জানিনে, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ইহা ভিত্তিহীন শূন্য আস্ফালন নহে, তাহা শুনিলেই বুঝা যায়। ষোড়শী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, গলায় আঁচল দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কেবল কহিল, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কেন বল ত? এ-রকম কান্নাও নতুন নয়, এ-রকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচি নে। কিন্তু তাদের সব স্বামী-পুত্র ছিল—কতকটা নাহয় বুঝতেও পারি।

তাহাদের স্বামী-পুত্র ছিল। শুনিয়া ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই! পনর-ষোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে ত তুমি চোখেও দেখনি। তাছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী যুক্তহস্তেই দাঁড়াইয়া ছিল, অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন! যথার্থ বলচি আপনাকে, কখনো কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ হাঁক দিয়া ডাকিল, মহাবীর—

ষোড়শী আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ কহিল, আচ্ছা, ও বাহাদুরি কর গে ওদের ঘরে গিয়ে, মহাবীর—

ষোড়শী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, কারও সাধ্য নেই আমাকে প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা-কিছু দুর্দশা, যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক। আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক।

কিন্তু এতবড় অভিযোগেও জীবানন্দ হাসিল; সে হাসি যেমন কঠিন তেমনি নিষ্ঠুর। কহিল, তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম,

শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্চিনে।

মহাবীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সাড়া দিল, হুজুর!

জীবানন্দ সম্মুখের কবাটটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী গলদশ্রুনয়নে কহিল, আমার সর্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

জীবানন্দ কহিল, দু-এক দিন। তারপরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ ভারী বেড়েচে—আর বেশী বিরক্ত করো না—যাও।

মহাবীর তাড়া দিয়া বলিল, আরে ওঠ্ না মাগী—চোল্।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই অকস্মাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। জীবানন্দ ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, খবরদার শুয়োরের বাচ্চা, ভাল করে কথা বল্। ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে ধরে আনিস ত গুলি করে মেরে ফেলব। বলিতে বলিতেই মাথার বালিশটা তাড়াতাড়ি পেটের নীচে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং যাতনায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া কহিল, আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝাপড়া হবে। এই—যা না আমার সুমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর আস্তে আস্তে বলিল, চলিয়ে—

ষোড়শী নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্দেশমত পাশের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবানন্দ কহিল, একটু দাঁড়াও—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে বলিল, জানি।

জীবানন্দ কহিল, তা হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা—ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে,

যার গায়ে বাংলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর্।

বাতির আলোকে ষোড়শী কম্পিতহস্তে বাক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিল, এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ তীব্র বেদনায় আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া কহিল, ঐ ত বললুম খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারচি নে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক আছে, তার অর্ধেকেরও কম। একটু বেশি হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙ্গাতে পারবে না।

ষোড়শী সন্ধান করিয়া ঝিনুক বাহির করিল, কিন্তু পরিমাণ স্থির করিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে যখন সে নির্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নির্বিচারে সেই বিষ হাত বাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ মুখে ফেলিয়া দিল। প্রশ্ন করিল না, পরীক্ষা করিল না, একবার চোখ মেলিয়া দেখিল না।

চার

পার্শ্বের অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাবীর চলিয়া গেল, কিন্তু ভিতর হইতে বন্ধ করিবার উপায় না থাকায় ষোড়শী সেই রুদ্ধ দ্বারেই পিঠ দিয়া অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহ ও মন শ্রান্তি ও অবসাদের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং রাত্রের মধ্যেও হয়ত আর কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তথাপি ঘুমাইয়া পড়াও ত কোনমতে চলিবে না। এখানে একবিন্দু শৈথিল্যের স্থান নাই। এখানে একান্ত অসম্ভবের বিরুদ্ধেও তাহাকে সর্বতোভাবে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাকী রাত্রিটা যেমন করিয়াই কাটুক, কাল তাহার সতীত্বের অতিশয় কঠোর পরীক্ষা হইবে তাহা সে নিজের কানেই শুনিয়াছে এবং ইহা হইতে বাঁচিবার কি উপায় আছে তাহাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

নিজের পিতার কথা মনে করিয়া ষোড়শী ভরসা পাইবে কি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাঁহাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি যেমন ভীতু, তেমনি নীচাশয়। অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া এ দুর্ঘটনা জানিয়াও হয়ত তিনি প্রকাশ করিবেন না, বরঞ্চ সামাজিক গোলযোগের ভয়ে চাপিয়া দিবারই চেষ্টা করিবেন। মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিবেন, ষোড়শীকে একদিন জমিদার ছাড়িয়া দিবেই, কিন্তু কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেব-সম্পত্তি হইতেই যদি বঞ্চিত হইতে হয় ত লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্কটাই ঢের বেশী ভারী হইয়া উঠিবে।

উপরন্তু নজরের টাকাটার সম্বন্ধেও যে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে ইহাও ষোড়শী স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। তা ছাড়া, এই দুর্দান্ত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তিনি করিবেনই বা কি! ছয়-সাত ক্রোশের মধ্যে একটা থানা নাই, চৌকি নাই—পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলেও যে পরিমাণ সময়, অর্থ এবং

লোকবলের প্রয়োজন তাহার কোনটাই তারাদাসের নাই। অতএব অত্যাচার যত বড়ই হোক, এই সুবৃহৎ শক্তির সম্মুখে অবনতশিরে সহ্য করা ব্যতীত আর যে গত্যন্তর নাই, এই কথাটাই চোখে আঙ্গুল দিয়া ষোড়শীকে বার বার দেখাইয়া দিতে লাগিল।

অথচ সমস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে মিশিয়া তাহার আর একটা চিন্তার ধারা নীরবে অনুক্ষণ বহিয়া যাইতেছিল—সে ওই তাহার চণ্ডীমাতা, যাঁহাকে শিশুকাল হইতে সে কায়মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ যে লোকটা ও-ঘরে ঘুমাইতেছে—যাহার গূঢ়, ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া তাহার কানে পৌঁছিতেছে, উহার ধর্ম ও অধর্ম, ভাল ও মন্দ, আপনার ও পর—পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি কি গভীর নির্ম্মম অবহেলা!

নারীর চোখের জলে উহার করুণা নাই, রমণীর রূপ ও যৌবনে উহার মমতা নাই, আকর্ষণ নাই, স্বামী-পুত্রবতীর সতীধর্মকে নিতান্ত নিরর্থক হত্যা করিতে উহার বাধে না, তাহাদের হৃদয়ের রক্তে দুই পা ভরিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না, যে নিজের প্রাণটাকে পর্যন্ত এইমাত্র তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহারি প্রদত্ত বিষ অসঙ্কোচে চোখ মুদিয়া ভক্ষণ করিল, এতটুকু দ্বিধা করিল না, অশ্রদ্ধা ও অনাসক্তির এই অপরিমেয় পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কি মা-চণ্ডীই তাহার পরিত্রাণের পথ করিতে পারিবেন!

এমনি করিয়া সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করিল নিদারুণ আঁধার ব্যতীত এতটুকু আলোক-রশ্মিও চোখে পড়িল না। তখন পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস তাহার ওই একমাত্র দেবতার মন্দির ঘুরিয়াই কেবল কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল।

ভোরের দিকে বোধ করি সে একটুখানি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ পিঠের উপর একটা চাপ অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, জানালা দিয়া সূর্যের আলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহির হইতে যে দ্বার ঠেলিতেছিল, সে কহিল, আপনি বেরিয়ে আসুন, আমি এককড়ি।

ষোড়শী গায়ের বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বার খুলিয়া সম্মুখেই দেখিতে পাইল, গত রাত্রির সেই শয্যার উপর জীবানন্দ প্রায় তেমনিভাবেই বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। কাল দীপের স্বল্প আলোকে তাহার মুখখানা ষোড়শী ভাল দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ একমুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ অত্যাচার তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে কত বড় গভীর আঘাত করিয়াছে। বয়স ঠিক অনুমান হয় না—হয়ত চল্লিশ, হয়ত আরও বেশী—রগের দুইধারে কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, প্রশস্ত ললাট রেখায় ভরা, তাহারি উপরে কালো কালো ছাপ পড়িয়াছে। যক্ষ্মারোগীর চোখের মত দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ এবং তাহারই নীচে শীর্ণ নাকটা যেন খাঁড়ার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মুখখানা অত্যন্ত ম্লান, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া ভিতরের কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন কালিমাব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

জীবানন্দ হাত নাড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, তোমার ভয় নেই, কাছে এসো।

ষোড়শী ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইল। জীবানন্দ কহিল, পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন—এলেন বলে।

ষোড়শী মনে মনে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না। জীবানন্দ বলিতে লাগিল, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশখানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা কাল রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হতো না, কে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভারী রাগ। গত বৎসর দু’বার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পারেনি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে, বলিয়া সে একটু হাসিল।

এককড়ি মুখ চুন করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষে নেই।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সম্ভব বটে। ষোড়শীকে কহিল, শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পারো।

ষোড়শী জবাব দিতে গিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ কহিল, আইন। তা ছাড়া কে-সায়েবের হাতে পড়েচি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে, এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজত-বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিন বা তখন হতো কে!

ষোড়শী হঠাৎ উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ কহিল, হ্যাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতেই ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলেনি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার জো নেই।

ষোড়শী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কালকের ব্যথাটা কি আপনার সারেনি?

জীবানন্দ কহিল, না ভয়ানক বেড়েচে। তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ কহিল, শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচ, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আছো। তা বদলে, তোমার সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের ত কথাই নেই।

এককড়ি এই কথাগুলারই বোধ হয় প্রতিধ্বনি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। ষোড়শী সোজা জীবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ কথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন? তারপরেও কি আমার জমিতে, টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

জীবানন্দের মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, এবং সেই পাণ্ডুর মুখের তীক্ষ্ণ তীব্র দুটি চক্ষে কোথা হইতে তাহার গত রাত্রির তেমনি স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একটা কথাও কহিল না, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে! জীবনে আজও ত তুমি পাপ করোনি—ও তুমি পারবে না সত্যি।

একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকাকড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি! তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি বলো—জমিদারের তরফ থেকে আর কোন উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি কতকগুলা বলিতে গেল, কিন্তু বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে পুনঃপুনঃ করাঘাতের শব্দে এবারেও তাহা বলা হইল না, কেবল তাহার মুখখানাই সাদা হইয়া রহিল।

জীবানন্দ সাড়া দিয়া কহিল, খোলা আছে, ভিতরে আসুন। এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে দেখা গেল ছোট-বড় জনকয়েক পুলিশ-কর্মচারীর পিছনে দাঁড়াইয়া স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে তারাদাস চক্রবর্তী। সে ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া বলিল, ধর্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, মা-চণ্ডীর ভৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেলতো ধর্মাবতার!

কে-সাহেব ষোড়শীর আপাদমস্তক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।

চক্রবর্তী চেঁচামেচি করিয়া উঠিল, না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা! গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে পুনশ্চ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে?

না, আমি আপনি এসেচি।

এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী শুধু কহিল, আমার কাজ ছিল।

সাহেব একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, সমস্ত রাত্রিই কাজ ছিল?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, হাঁ, সমস্ত রাত্রিই আমার কাজ ছিল। ওঁর অসুখ করেছিল বলে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি।

তারাদাস চেঁচাইয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, সমস্ত মিছে, সমস্ত বানানো। আগাগোড়া শিখানো কথা।

সাহেব তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন, এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে রিভলবার দুটো বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন, আশা করি এ-সকল রাখবার আপনার হুকুম আছে? এবং তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহির হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল, হামারা ঘোড়া লাও, এবং ক্ষণেক পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বুঝা গেল, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

পাঁচ

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল, পুলিশ-কর্মচারীও আপনার অনুচরগণকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিলেন—এইবার তারাদাসের নিজের অবস্থাটা তাহার কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে যেন এক মোহাবৃত প্রগাঢ় কুহেলিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ মধ্যাহ্ন-সূর্যকিরণে তাহার বাষ্পটুকু পর্যন্ত উড়িয়া গিয়া দুঃখের আকাশ একেবারে দিগন্ত ব্যাপিয়া ধূধূ করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও ছায়া, কোথাও আশ্রয়, কোথাও লুকাইবার স্থান নাই—কেবল সে আর তাহার মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

সমস্ত জেলার যিনি ভাগ্যবিধাতা, তাঁহার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সুলভে লাভ করিয়া কল্পনা তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল এ কেবল ওই অত্যাচারী মাতালটাকে হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই নয়, এ তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর অপর্যাপ্ত দান। তাঁহার বরহস্তের দশ অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে আজ যে বস্তু ঝরিয়া পড়িবে, সে শুধু ওই জমিদারগোষ্ঠীর সর্বনাশ নয়, এ তাহার জমিজমা ও টাকা-মোহরের রাশি। তাহার একমাত্র আশঙ্কা ছিল, পাছে না তাহারা সময়ে পৌঁছিতে পারে, পাছে সংবাদ দিয়া কেহ পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেয়; এবং এ-পক্ষে তাহার চিন্তা, পরিশ্রম ও উদ্যমের অবধি ছিল না। ইহার বিফলতার দণ্ডও সে যে না ভাবিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু সে নিষ্ফলতা পৌঁছিল যখন এই দিক দিয়া, ষোড়শীর স্বহস্তের আঘাতেই যখন কামনার এতবড় পাষাণ-প্রাসাদ ভিত্তিসমেত ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন প্রথমটা তারাদাস মূঢ়ের মত চেঁচামেচি করিল, তার পর হতজ্ঞানের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ এক বুকফাটা ক্রন্দনে উপস্থিত

সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, বাবুমশাই, আমার কি হবে! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে!

ইন্‌স্পেক্টরবাবুটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক, তিনি শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিলেন, এবং আশ্বাস দিয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন, ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তোমার সহায় রইলেন—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না। বলিয়া তিনি কটাক্ষে একবার জীবানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তারাদাস চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্‌স্পেক্টরবাবু মুচকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, না ঠাকুর, রাগ করেন নি। তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক একটা আছে।

বলিয়া আর একবার জমিদারের শয্যার প্রতি তিনি আড়-চোখে চাহিয়া লইলেন। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ তাঁহার যাই হোক, জমিদারের তরফ হইতে কিন্তু ইহার কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক। যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব্-ইন্‌স্পেক্টরবাবুটির বয়স কম, তিনি অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরটি তবে কি একাই যাবেন নাকি?

কথাটায় সবাই হাসিল। যে চৌকিদার দু'জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। এমন কি এককড়ি পর্যন্ত মুখ রাঙ্গা করিয়া কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এই কদর্য ইঙ্গিতে তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিয়া

উঠিল, যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ওর মুখ দেখব, আবার ওকে বাড়ি ঢুকতে দেবো আপনারা ভেবেচেন!

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সহাস্যে কহিলেন, মুখ তুমি না দেখতে পারো, কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর। কিন্তু যার বাড়ি, তাকে বাড়ি ঢুকতে না দিয়ে আবার যেন নতুন ফ্যাসাদে পড়ো না।

তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমিই ভৈরবী করেছি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে। এই বলিয়া সে সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া বলিল, নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্পেক্টর থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থামো ঠাকুর, থামো। রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল্‌, আর দেরি করো না।

এতক্ষণ পর্যন্ত ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

পুলিশের ছোটবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু জবাব দিল ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে। কহিল, আপনারা যান, আমার যেতে দেরি আছে।

দেরি আছে? হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! এই বলিয়া তারাদাস উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বোধ হয় তাহাকে যথার্থই কঠিন আঘাত করিত, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরবাবু ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। চল, ভালমানুষের মত ঘরে চল।

এই বলিয়া তিনি লোকটাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়াই গেলেন, কিন্তু তারাদাস তাঁহার হিত কথায় কর্ণপাতও করিল না। যতদূর শোনা গেল, সে সুউচ্চ-কণ্ঠে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে যা-তা বলিতে বলিতে এবং তাহাকে অচিরে হত্যা করিবার কঠিনতম শপথ পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিতে করিতে গেল।

পুলিশের সম্পর্কীয় সকলেই যথার্থ বিদায় গ্রহণ করিল, কিংবা কোথাও কেহ লুকাইয়া রহিয়া গেল, এ-বিষয় নিঃসংশয় হইতে ধূর্ত এককড়ি পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে জীবানন্দ ইঙ্গিত করিয়া ষোড়শীকে আর একটু নিকটে আহ্বান করিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে না কেন?

ষোড়শী কহিল, এঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'-চার দিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, তাই দিন।

জীবানন্দ শয্যার এক নিভৃত প্রদেশে হাত দিয়া একতাড়া নোট টানিয়া বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার কিছুতে লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধ-বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী শান্ত-নম্রকণ্ঠে বলিল, কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দের পাংশু মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য লজ্জার আরক্ত আভা ভাসিয়া গেল, কহিল, কথা যাই থাক ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভাল।

ষোড়শী তাহার মুখের উপর দুই চক্ষুর অচপল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল, কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য করে এসেছেন।

জীবানন্দ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, বেশ, আজ যদি সে মত আপনার বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখে দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ নীরবে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার চোখে পলক পর্যন্ত পড়িল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় পেরেছি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী হাসিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকে না, কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ নিরুৎসুক-কণ্ঠে বলিল, কিছু কিছু মনে আছে বৈ কি। তোমার মায়ের হোটেলে যখন মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, তখন তুমি ছ-সাত বছরের মেয়ে; কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিনতে পেরেচ!

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুভব করিয়া ষোড়শী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া অবশেষে সহজভাবে বলিল, তার কারণ অলকার বয়স তখন ছ-সাত নয়, ন-দশ বৎসর ছিল; এবং আপনার মনেও হতে পারে তার মা তাকে আপনার বাহন বলে পরিহাস করতেন। তা ছাড়া আপনার মুখের আর যত বদলই হোক, ডান চোখের ওই তিলটির কখনো পরিবর্তন হবে না। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ কহিল, পড়ে। তাঁর সম্বন্ধে তারাদাস যা বলতে বলতে গেল তাও বুঝতে পারচি। তিনি বেঁচে আছেন?

না। বছর-দশেক পূর্বে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে। আপনাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, না?

জীবানন্দর শীর্ণ মুখের উপর এবার উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, হাঁ। একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

সহসা ষোড়শীর ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া সহজভাবে কহিল, আপনি সে জন্যে কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না। অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, যৌতুক বলেই দিয়েছিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, আজ অপর্যাপ্ত সম্পদের দিনে সে-সব দুঃখের কথা হয়ত মনে হতে চাইবে না, হয়ত সেদিনের একশ' টাকার মূল্য আজ হিসেব করাও কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এমনি দুর্দিনই ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারী বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারী ছিল না।

জীবানন্দ আহত হইয়া কহিল, তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ওই ক'টা টাকার জন্য তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

ষোড়শী কহিল, বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি! কিন্তু থাক্ ও-সব বিশ্রী আলোচনা। আপনাকে ত এইমাত্র বলেচি, আজ আর সেই তুচ্ছ টাকা ক'টার মূল্য-নিরূপণ সম্ভব হবে না, কিন্তু ওইমাত্র ছিল অলঙ্কার মায়ের জীবনের সঞ্চয়। মেয়ের কোন একটা সদ্গতি করবার ও-ছাড়া আর কিছু যখন তাঁর হাতে ছিল না, তখন টাকা-ক'টির সঙ্গে মেয়েটাকেও আপনারই হাতে দিতে হলো। কিন্তু বিবাহ ত আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাশা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে কাল প্রথম দেখা।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

ষোড়শী ধৈর্য হারাইল না। তেমনি শান্ত গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরপরাধ নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, ষোড়শী, তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, অনেক কথাই ঠিক জানো না। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি সাক্ষী দিতেন—তিনি সত্যি কি চেয়েছিলেন। তোমার বাবাকে আজকের পূর্বে কখনো দেখিনি, কেবল সেই সম্প্রদানের রাত্রে নামটা মাত্র শুনেছিলাম। কিন্তু তিনিই যে তারাদাস, তুমিই যে অলকা, সে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আজও ত কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই!

জীবানন্দ কহিল, নাই থাক্, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

বিবাহের গণ্ডি টেনে রেখেছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, অলকাই আমি কিনা তা নিয়েও আপনার দুশ্চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কিন্তু কেন যে ওঁদের সঙ্গে গেলুম না, কেন যে নিজের সর্বনাশের কোথাও কিছু বাকী রাখলুম না, সেই কথাটাই আজ আপনাকে বলে যাব। কাল আপনার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা আমি লেখাপড়া জানি; লিখতে-পড়তে ত ওই এককড়িও জানে, সে নয়, কিন্তু আমার যিনি গুরু তিনি হাতে রেখে কিছু দান করেন না, তাই আজ তাঁরই পায়ে নিজেকে এমন করে বলি দিতেও আমার বাধল না।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে —

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা! কিন্তু সেই ত মিথ্যে।

বিয়ে ত হয়নি। তা ছাড়া, সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। আমি সারারাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও গল্প করলে

সর্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু কমবে না। কিন্তু ও-কথা ত আর আমি ভাবচি নে। আমার বড় দুঃখ এখন আর আমি নিজে নয়—সে আপনি।। কাল ভেবেছিলুম আপনার বুঝি সাহসের আর অন্ত নেই—নিজের প্রাণটাও বুঝি তার কাছে ছোট, কিন্তু আজ দেখতে পেলাম সে ভুল। শুধু যে এক নিরপরাধ নারীর কলঙ্কের মূল্যেই আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাই নয়, একদিন যে অনাথ মেয়েটিকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েই কেবল আত্মরক্ষা করেছিলেন, আজ তাকে চেনবার সাহস পর্যন্ত আপনার হয়নি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেমে গেছি যে, গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে, কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে বীজগাঁর জমিদার-বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভালো কাজ হতো?

ষোড়শী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্য কাজ হতো এ জানি। যার সমস্ত দুর্ভাগ্য জেনেও যাকে হাত পেতে নিতে আপনার বাধেনি, তাকে অমন করে ফেলে না পালালে এতবড় লাঞ্ছনা আজ আপনার ভাগ্যে ঘটতো না। সেই সত্যই আজ আপনাকে এ দুর্গতি থেকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এ-সব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চললুম—আপনি কোন-কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেন না।

জীবানন্দ কিছুই কহিল না, কিন্তু এককড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইয়া সে হঠাৎ যেন কাঙ্গাল হইয়া বলিয়া উঠিল, এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন—একবার খবর দিয়ে আনতে পারো? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

ষোড়শী চমকিয়া উঠিল। নিজের অভিমান ও উত্তেজনার মধ্য দিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবদ্ধ ছিল।

এককড়ি কহিল, ডাক্তার আছে বৈ কি হুজুর—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের খাসা হাতযশ। বলিয়া সে সমর্থনের জন্য ভৈরবীর প্রতি চাহিল।

ষোড়শী কথা কহিল না, কিন্তু জীবানন্দ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর এক মিনিট দেরি করো না। আর ঐখানে সব খালি বোতল পড়ে আছে—কাউকে বলে দাও গরম জল করে আনুক। কোথায় গেল এরা?

এককড়ি কহিল, ঐ কথাটাই ত নিবেদন করতে আসছিলাম, হুজুর, পুলিশের ভয়ে কে যে কোথায় সরেছে, কাউকে খুঁজে পেলাম না।

কেউ নেই, সব পালিয়েচে?

সব, সব, জনপ্রাণী নেই। ওরা কি আর মানুষ হুজুর! কৈ, আমি ত—

জীবানন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আনা কি হবে না এককড়ি?

এককড়ি বাধা পাইয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, হবে না কেন হুজুর, আমি নিজেই যাচ্চি, এখনো তিনি ঘরেই আছেন। কিন্তু গরম জল করতে গেলে ত বড় দেরি হয়ে যাবে? তা ছাড়া হুজুরকে একলা—

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার সময় হইল না। ভিতরের একটা উচ্ছ্বসিত দুঃসহ বেদনায় জীবানন্দের মুখখানা চক্ষের পলকে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই দমন করিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া কেবল অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উঃ—আর আমি পারিনে!

ষোড়শীকে কিসে যেন কঠিন আঘাত করিল। এত বড় করুণ, হতাশ কণ্ঠস্বরও যে এমন দুর্দান্ত পাষণ্ডের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত। আসলে মানুষ যে কত দুর্বল, কত নিরুপায়, দুঃখে বেদনায় মানুষে মানুষে যে কত এক, কত আপনার, এই কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখের

কোণে জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু এক মুহূর্তে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে হতবুদ্ধি এককড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, তুমি বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনো গে-এককড়ি, এখানে যা করবার আমি করব এখন। পথে কাউকে যদি দেখতে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো, বলো পুলিশের ভয় আর কিছু নেই।

এককড়ি আশ্চর্য হইল না, বরঞ্চ খুশী হইয়া বলিল, ডাক্তারবাবুকে যেখানে পাই আমি আনবই। কিন্তু রান্নাঘরটা কি আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, দরকার নেই, আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব। তুমি কিন্তু কোন কারণে কোথাও দেরি করো না।

আজ্ঞে না, আমি যাব আর আসব, বলিতে বলিতে এককড়ি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

সন্ধান করিয়া রান্নাঘর হইতে যখন ষোড়শী বোতলের জল গরম করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল, তখনও লোকজন কেহ ফিরিয়া আসে নাই। জীবানন্দ তেমনি উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, তুমি? ডাক্তার আসেনি?

ষোড়শী কহিল, এখনও ত তাদের আসবার সময় হয়নি। বলিয়া সে হাতের বোতল দু'টা শয্যার একধারে রাখিয়া দিল।

জীবানন্দ কথাটাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না; কহিল, এখনও আসবার সময় হয়নি? ডাক্তার কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী কহিল, জানি, কিন্তু পনর মিনিটের মধ্যেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সবে পনর মিনিট? আমি ভেবেছি দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা, কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আনতে গেছে। হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! বলিয়া সে চুপ করিয়া আবার উপুড় হইয়া শুইল। তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল নিরাশ্বাসের কোথাও যেন আর শেষ রহিল না।

ষোড়শী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, ডাক্তার আসবেন বৈ কি। গরম জলের বোতল ততক্ষণ কেন টেনে নিন না?

জীবানন্দ তেমনিভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ও থাক। ওতে আমার কিছু হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে।

ষোড়শী সহসা কোন প্রতিবাদ করিল না। এই উপায়হীন রোগগ্রস্ত লোকটির মুখ হইতে তাহার নিজের শিশুকালের নামটা এতক্ষণ পরে যেন এই প্রথম তাহার কানে কানে গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা অজানা রহস্যের অর্থ বলিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় ইহাতেই মগ্ন হইয়া সে নিজের ও পরের, সুমুখের ও পশ্চাতের সমস্তই ভুলিয়া গিয়া অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ জীবানন্দের প্রশ্নেই তাহার হুঁশ হইল।

অলকা!

নামটাকে আর সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল, আজ্ঞে?

জীবানন্দ বলিল, এখনও সময় হয়নি? হয়ত তিনি আসবেন না, হয়ত কোথাও চলে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসিবেন—তিনি কোথাও যাননি।

বাড়িতে কেউ কি এখনও ফিরে আসেনি?

ষোড়শী বলিল, না।

জীবানন্দ একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বোধ হয় তারা আর আসবে না, বোধ হয় এককড়িও একটা ছল করে চলে গেল।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বোধ হয় একটা ব্যথা সামলাইয়া লইয়া একটু পরেই বলিল, সবাই গেছে, তারা যেতে পারে—কেবল তোমারই যাওয়া হবে না।

কেন?

বোধ করি আমি বাঁচব না—তাই। আমার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্চে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ। অলকা, আমাকে মাপ কর।

ষোড়শী নির্বাক হইয়া রহিল। জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি ঠাকুর-দেবতা মানিনে, দরকারও হয় না; কিন্তু একটু আগেই মনে মনে

ভাবছিলুম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি-অবধি নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্চে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়ে যেতে হবে।

ষোড়শী তেমনি নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, মানুষ অমরও নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখেনি, কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচি নে—উঃ—মাগো! বলিতে বলিতে তাহার সর্বশরীর ব্যাটার অসহ্য তীব্রতায় যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল তাহার কেবল দেহই নয়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে এবং বিবর্ণমুখে দুই নিমীলিত চক্ষের নীচে রক্তহীন ওষ্ঠাধর একটা অত্যন্ত কঠিন রেখায় সংবদ্ধ হইয়া গেছে।

পলকের জন্য কি একটা সে ভাবিয়া লইল, বোধ হয় একবার একটু দ্বিধাও করিল; তার পরে এই পীড়িতের শয্যায় হতভাগ্যের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। গরম জলের বোতল-দু'টা সাবধানে তাহার পেটের কাছে টানিয়া দিতে জীবানন্দ কেবল ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ মেলিয়াই আবার মুদ্রিত করিল। ষোড়শী আঁচল দিয়া তাহার ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিল, এবং হাতপাখার অভাবে সেই অঞ্চলটাই জড় করিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলিয়া ষোড়শীর ক্রোড়ের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

মিনিট দশ-পনর এমনি নীরবে কাটিবার পরে জীবানন্দই প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল, অলকা!

ষোড়শী কহিল, আপনি আমাকে ষোড়শী বলে ডাকবেন।

আর কি অলকা হতে পারো না?

না।

কোনদিন কোন কারণেই কি—

আপনি অন্য কথা বলুন।

কিন্তু অন্য কথা জীবানন্দের মুখ দিয়া আর বাহির হইল না, শুধু নিবারিত দীর্ঘশ্বাসের শেষ বাতাসটুকু তাহার বক্ষের সম্মুখটাকে ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দিয়া শূন্যে মিলাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কষ্টটা কিছুই কমেনি?

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বোধ হয় একটু কমেচে। আচ্ছা, যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী বলিল, না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোনও উপকার করাই কারও সম্ভব নয়।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুশী হয়?

ষোড়শী কহিল, তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন?

জীবানন্দ এইবার একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এ দোষ আজও কেউ আমাকে দেয়নি। তা ছাড়া এখন বলচি বলেই যে ভাল হয়েও বলবো, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনই বটে! এমনই বটে! সারাজীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

ষোড়শী নীরবে আর একবার তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। জীবানন্দ হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, সন্ন্যাসিনীর কি সুখদুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী বলিল, কিন্তু সে ত আপনার হাতের মধ্যে নয়!

জীবানন্দ বলিল, যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

ষোড়শী বলিল, তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন, তখনই জানাবো।

তাহার হাতটাকে জীবানন্দ সহসা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বার বার মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, আর ভাল হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যে আমাকে বল! মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখটার আজ একটা সদ্গতি হোক।

ষোড়শী আপনার হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও মিনিট-খানেক স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হোক, সকলের মত আমিও তোমাকে আজ থেকে ষোড়শী বলেই ডাকব। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি এত যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক কথাই ভেবেচি। বোধ হয় তোমার কথাটাই বেশী। আমি বেঁচে গেলুম, কিন্তু তোমার যে এখানে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমার কথা থাক।

জীবানন্দ বাধা পাইয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বুঝেচি ষোড়শী! তোমার জন্যে আমি ভাবি এও আর তুমি চাও না। এমনিই হওয়া উচিত বটে! বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ চোখ মেলিয়া কহিল, তুমিও চললে?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। ঘরটা ভারী নোংরা হয়ে রয়েচে, একটু পরিষ্কার করে ফেলি। বলিয়া সে সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গৃহকার্যে নিযুক্ত হইল। ঘরের অধিকাংশ জানালা-দরজাই এ পর্যন্ত খোলা হয় নাই; বিস্তর টানাটানি করিয়া সেগুলি খুলিয়া ফেলিতেই উন্মুক্ত আকাশ দিয়া একমুহূর্তে আলো ও বাতাসে ঘর ভরিয়া গেল; মেঝের উপর আবর্জনার রাশি নানাস্থানে প্রতিদিন স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল, একটা ঝাঁটা সন্ধান করিয়া আনিয়া ষোড়শী সমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং অঞ্চল দিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বালিশ-

দু'টা যখন যথাস্থানে গুছাইয়া দিল, তখনও, জীবানন্দ একটা কথা কহিল না, কেবল তাহার মলিন মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ আলোক যেন কোথা হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করিতেছিল। ষোড়শী কাজ করিতেছিল, সে শুধু দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাকে নীরবে অনুসরণ করিতেছিল, যেন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা কি, সমস্ত বেদনা ভুলিয়া সে সংসারের সর্বোত্তম বিস্ময়ের মত জীবনে এই প্রথম দেখিতেছিল।

সহসা বাহিরে অনেকগুলা পদশব্দ শুনিয়া ষোড়শী ঝাঁটাটা রাখিয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। এককড়ি দ্বারের কাছে মুখ বাহির করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু এসেচেন।

ষোড়শী কহিল, তাঁকে নিয়ে এস। বলিয়া সে তাহার পূর্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

পরক্ষণেই যে চিকিৎসকের হাতযশ এ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেই বল্লভ ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ষোড়শীকে এখানে এভাবে দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

এককড়ি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, ঐ যে হুজুর। যদি ভাল করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বকশিশের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকব।

ডাক্তার নীরবে আসিয়া শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে কাঠের চোঙ্গাটা বাহির করিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। বিস্তর ঘষামাজা করিয়া তিনি বেশ বড় ডাক্তারের মতই রায় দিলেন—অত্যাচার করিয়া রোগ জন্মিয়াছে, সাবধান না হইলে প্লীহা কিংবা লিভার পাকা অসম্ভব নয় এবং তাহাতে ভয়ের কথাও আছে। কিন্তু সাবধান হইলে নাও পাকিতে পারে, এবং তাহাতে ভয়ও কম। তবে একথা নিশ্চয় যে ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কিনা বলতে পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, যদি যেতে পারেন, তা হলে সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে থাকলে ভাল হবে কি না বলতে পারেন?

ডাক্তার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, আজ্ঞে না হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে, এ কথা নিশ্চয় যে, এখানে থাকলে ভাল হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

জীবানন্দ মনে মনে বিরক্ত হইয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না। ডাক্তার ঔষধের জন্য লোক পাঠাইবার ইঙ্গিত করিয়া উপযুক্ত দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এককড়ি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারের বাহিরে পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হবে এককড়ি?

এককড়ি সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি হুজুর, ওষুধ এলো বলে। বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিক্সচার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না এককড়ি, তোমাদের বল্লভের মিক্সচার তোমাদেরই থাক, আমাকে তুমি কেবল কলকাতা যাবার একটা বন্দোবস্ত আজই করে দাও। এই বলিয়া তিনি যে দ্বার দিয়া ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত পূর্বে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিল, সেইদিকে উৎসুকচক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। মিনিট দু-তিন পরে তাঁহার অধৈর্য আর মানা মানিল না, কহিলেন, ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে তুমি যাবার একটা ব্যবস্থা কর গে এককড়ি! আজ যাওয়া আমার চাই-ই।

এ সঙ্কেত এককড়ি চক্ষের নিমিষে বুঝিল, এবং যে আজ্ঞে হুজুর, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল,

এবং মিনিট-পনর বিলম্বে যখন সে যথার্থই আসিল, তখন একাকীই আসিল; কহিল, তিনি নেই, বাড়ি চলে গেছেন হুজুর!

জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন? এমন হতেই পারে না এককড়ি!

বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। অলকা কোন ব্যবস্থা না করিয়াই চলিয়া গেল, একটা কথা বলিয়া গেল না—ডাক্তারের অভিমতটুকু শুনিয়া যাইবার পর্যন্ত তাহার ধৈর্য রহিল না—এ কথা জীবানন্দ কিছুতেই যেন মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এককড়ি বলিল, হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু যাবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে গোপাল কাওরা বসে আছে, সে দেখেচে ভৈরবী সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ আর প্রতিবাদ করিলেন না। এককড়ি কহিল, তাহলে একটু বেলাবেলি যাত্রা করবার ব্যবস্থা করি গে হুজুর?

হাঁ, তাই কর, বলিয়া জীবানন্দ পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। এককড়ি কলিকাতা যাত্রার বিস্তর খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রভুর নিকট হইতে কোন কথারই প্রত্যুত্তর আসিল না। কথাগুলা তাঁহার কানেই গেল কি না তাহাও ঠিক বুঝা গেল না।

সাত

জমিদারের বিলাসকুঞ্জ হইতে ষোড়শী যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন বেলা বোধ হয় ন'টা-দশটা। এমন করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার বিশ্রী ঠেকিতে লাগিল, কিন্তু তখনই মনে হইল, বলিয়া কহিয়া বিদায় লইয়া আসাটা আরও অশোভন, আরও বাড়াবাড়ি হইত। কিন্তু গেটের বাইরে আসিয়া দেখিল আর একপদও অগ্রসর হওয়া চলে না। এবার নাবী বর্ষায় কৃষকদের ধান্য-রোপণের কাজকর্ম তখনও মাঠে শেষ হইয়া যায় নাই, উহাদের মাঝখান দিয়া গ্রামের একমাত্র পথ। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই পথের উপর দিয়া মুখ উঁচু বা নিচু করিয়া কোনভাবেই হাঁটিয়া যাইতে তাহার পা উঠিল না। আকাশের বিদ্যুৎ একমুহূর্তে অন্ধকারের পর্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেয়, দূরের ঐ চাষীগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া চক্ষের পলকে ষোড়শীর বিগত রাত্রিটাকে তাহার কাছে অত্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিল। আবরণের নীচে যে এত জিনিস ঢাকা ছিল, কোন মানুষের জীবনেই যে একটা রাত্রির মধ্যে এতবড় ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতে পারে, দেখিতে পাইয়া সে ক্ষণিকের জন্য যেন হতজ্ঞান হইয়া রহিল। সম্পূর্ণ একটা দিনও কাটে নাই, মাত্র কাল সায়াহ্নবেলায় অপমানের প্রবল তাড়নে দিগ্বিদিক্ না ভাবিয়া এই পথ দিয়াই সে হাঁটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার পরে? তাহার পরের ঘটনা ঘটিতে মানুষের বহু যুগ লাগিতে পারে, অথচ তাহার লাগে নাই। এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল, তাই আজ পরিচিত পথটারই ও ধারে তাহার জন্য কি যে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা কল্পনা করিতেও পারিল না। ফটকের বাহিরে বাগানের ধার দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ নদীর দিকে গিয়াছে, কেবলমাত্র সম্মুখের রাস্তাটা বলিয়াই সে এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে গ্রাম নাই, গরু-ছাগল চরাইতে ক্বচিৎ কোন

রাখাল বালক ভিন্ন এ পথে সচরাচর কেহ চলে না—এই নিরালা স্থানটায় সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিয়া সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ঘরে ফিরিবে মনে করিয়া একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিল; তাহাতে বর্তমানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তাহার মনে ছিল না। এইবার যে ভবিষ্যৎ সাগ্রহে তাহার পথ চাহিয়া আছে, তাহার কথাই একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের ছোট গ্রামে এতক্ষণ কোন কথাই কাহারো অবিদিত নাই; জমিদার তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সারারাত্রি আটক রাখিয়াছে—এই কয়দিনের অত্যাচারে গ্রামে ইহা এমনিই একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, এজন্য বিশেষ কোনরূপ চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। এমন কি, কেন যে সে মিথ্যা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কবল হইতে জমিদারকে উদ্ধার করিয়াছে, এ রহস্যোদ্ভেদ করিবারও গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব হইবে না।

এ যে একটা বড় রকমের ঘুষের ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিবে। কিন্তু আসল বিপদ হইতেছে তাহার পিতা তারাদাসকে লইয়া! বহুকাল হইতেই উভয়ের সহজ-সম্বন্ধটা বাহিরের অগোচরে ভিতরে ভিতরে পচিয়া উঠিতেছিল, এইবার তাহা ঘৃণার বাষ্পে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকিবে। ইহার শিখা কাহারও দৃষ্টি হইতে আড়াল করা সম্ভব হইবে না। সংসারে সে লোকটার অসাধ্য কার্য নাই। তাহার অনেক কুকর্মে বাধা দিয়া পিতা ও কন্যার মধ্যে অনেক গোপন সংগ্রাম হইয়া গেছে, চিরদিন পিতাকেই পরাভব মানিতে হইয়াছে, অথচ, নানা কারণে এতকাল তাহাকে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে মৌন থাকিতেই হইয়াছে। কিন্তু আজ যখন তারাদাস ক্রোধবশে একবার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এই কলঙ্কের কালি দুই হাতে ছড়াইয়া নিজের সঙ্গে আর একজনের সর্বনাশ করিয়া তবে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। ইহা যে অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে আঁধার

করিয়া তুলিবে, তাহাও ষোড়শী দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই অন্ধকারের অভ্যন্তরে যে কি সঞ্চিত আছে, তাহার কোন আভাসই তাহার চোখে পড়িল না। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এইখানে বসিয়া ভিতরের উদ্যোগ-আয়োজনের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিতে লাগিল, এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জীবানন্দের মুখের অলকা নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমাভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা, এমনি কত-কি যেন একটা ভুলে-যাওয়া কবিতার ভাঙ্গাচোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিতে লাগিল; অথচ সে সঙ্কট ওই গ্রামখানার মধ্যে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া আছে, তাহার বিভীষিকা সেই মনের মধ্যেই অনুক্ষণ তেমনি ভীষণ হইয়াই রহিল।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সূর্যদেব অপর প্রান্তে হেলিয়া পড়িলেন, এবং তাহারই একটা দীপ্ত রশ্মি হইতে মুখ ফিরাইতে গিয়া হঠাৎ বহুদূরে পরপারের মাঠের মধ্যে জমিদারের পালকিখানা তাহার চোখে পড়িল। এই দিকেই যখন তাহারা গিয়াছে, তখন এক সময়ে নিকট দিয়াই গিয়াছে, সে খেয়াল করে নাই, হয়ত চেষ্টা করিলে একটু দেখা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন অজ্ঞাতসারে শুধু কেবল তাহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এবং সায়াহ্ন সন্ধ্যায় অবসান হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ষোড়শী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখনও মানুষ চেনা যায়, কিন্তু মাঠে লোক ছিল না। এবং এই নির্জন পথটা অতিক্রম করিয়া যখন নিজের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু সদর দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া সে যেন একটা কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘুরিয়া খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখিল ভিতর হইতে তাহা আবদ্ধ; ইহাই সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু এই কবাটটা সে বাহির হইতে

খুলিবার কৌশল জানিত। অনতিবিলম্বে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে ঘরে তালা বন্ধ, কেহ কোথাও নাই—সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শূন্য খাঁখাঁ করিতেছে।

সন্ন্যাসিনীকে অনেক উপবাস করিতে হয়, খাওয়ার কথা তাহার মনেও ছিল না; কোথাও নিরালায় একটু শুইতে পাইলেই সে আপাততঃ বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার যখন উপায় নাই, তখন বারান্দার উপরেই একধারে সে নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তারাদাস গৃহে নাই, কেন নাই, কি জন্য নাই, কোথায় গিয়াছে, এই-সকল কূট প্রশ্নমালা হইতে তাহার নিরতিশয় শ্রান্ত দেহ-মন অত্যন্ত সহজেই সরিয়া দাঁড়াইল। এবং রাত্রিটার মত যে সে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পাইবে, এই তৃপ্তিটুকু লইয়াও সে দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ভোরবেলা ষোড়শীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তাহার অব্যবহিত পরেই সদর দরজায় চাবি খোলার শব্দ হইল, এবং যে বিধবা স্ত্রীলোকটি মন্দিরের ও গৃহের কাজকর্ম করে, সে আসিয়া প্রবেশ করিল। ষোড়শীকে দেখিয়া সে অধিক বিস্মিত হইল না—কখন এলে মা, রাত্তিরেই? খিড়কির দোর খুলে ঢুকেছিলে বুঝি?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে সে বলিল, এই কথাই সক্কলে বলাবলি করছিল মা, রাজাবাবু ত অ-বেলায় চলে গেল, এইবার তোমাকে ছেড়ে দেবে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি? কি করব মা, ঘরের চাবি বাবাঠাকুর ত রেখে যায়নি, সঙ্গে নে গেছে। তা হোক গে, দোকান থেকে ডাল-চাল এনে দি, কাঠকুটো দুটো যোগাড় করে দি, চান করে এসে যা হোক দু'মুঠো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও। তার পরে যা হবার তা হবে।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায় গেছেন জানিস রানীর মা?

রানীর মা কহিল, শুনচি ত মা, কে নাকি তার বোনের মেয়ে আছে, তাকেই আনতে গেছে—এলো বলে। আজ বড়কর্তাবাবুর নাতির মানত পূজো,

আজ কি আর কোথাও থাকবার জো আছে? মন্দিরে ত পহর রাত থাকতে ধুম লেগে গেছে মা!

ষোড়শীর দপ্ করিয়া মনে পড়িল, আজ মঙ্গলবার, আজ জনার্দন রায়ের দৌহিত্রের মানত পূজা উপলক্ষে জয়চণ্ডীর মন্দিরে তুমুল কাণ্ড। আজ কোনমতে কোথাও তাহার লুকাইয়া থাকিবার পথ নাই। সে দেবীর ভৈরবী, এতবড় ব্যাপারে তাহাকে হাজির হইতেই হইবে।

এইখানে জনার্দন রায়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। লোকটি যেমন ধনী, তেমনি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়ার উপলক্ষে ষোড়শীর সহিত ইঁহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে, সে কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এবং কেবল ষোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। জমিদার ইঁহাকে খাতির করে, এককড়ি ইঁহার হাত-ধরা। অনাদায়ী বৎসরে ইনিই জমিদারের সদর খাজনার যোগান দেন। দুই শত বিঘা ইঁহার নিজ চাষ এবং ধান-চাল-গুড় হইতে তেজারতি ও বন্ধকী কারবার ইঁহার একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অথচ এই বড়কর্তাই একদিন অতি নিঃস্ব ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এ সমস্তই তাঁহার মধ্যম জামাতা মিস্টার বসুর টাকা। তিনি পশ্চিমের কোন্ একটা হাইকোর্টের বড় ব্যারিস্টার। বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিয়াছেন। আজ তাঁহারই একমাত্র পুত্রের সর্ববিধ মঙ্গল-কামনায় চণ্ডীর পূজার আয়োজন হইতেছে। এবং আয়োজন কেবল আজ নয়, মাসাধিক কাল হইতেই গ্রামের মধ্যে ইহার কথাবার্তা চলিয়াছে। বড়কর্তার যে মেয়েটি এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, সেই হৈমবতীকে ষোড়শী ছেলেবেলায় চিনিত। তাহার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু ছোটই হইবে। মন্দির-প্রাঙ্গণে যে ছোট্ট পাঠশালাটি এখনও বসে, সকলের সঙ্গে সেও পড়িতে আসিত; এবং খেলাচ্ছলে যদি কোনদিন ষোড়শী উপস্থিত হইত, দেবীর ভৈরবী বলিয়া সকলের সঙ্গে সেও প্রণাম করিয়া পদধূলি

লইত। আজ সে বড়ঘরের ঘরণী। আজ হয়ত তাহার দেহে সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের মণিমাণিক্য ধরে না, আজ হয়ত সে তাহাকে চিনিতেও পারিবে না। কিন্তু একদিন এমন ছিল না। সেদিন তাহার রূপ এবং বয়স কোনটাই বেশী ছিল না; তবু যে এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, শুনা যায়, সে কেবল এই দেবীর মাহাত্ম্যে। কোন্ এক অমাবস্যায় নাকি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী-দর্শনে আসিয়াছিলেন; রায় মহাশয় গোপনে এই কন্যার কল্যাণেই কি-সব যাগ-যজ্ঞ করাইয়া লইয়াছিলেন। এই পুত্রটিও নাকি তাঁহারই করুণায়। হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীকেই মানত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে।

দাসী কাজ করিতে করিতে কহিল, মা, মন্দিরে আজ হঠাৎ কখন ডাক পড়ে বলা যায় না, এই বেলা কেন চানটানগুলো সেরে নিলে না?

ষোড়শী অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, মন্দিরের ডাক পড়ার নামে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সেজন্য না হোক, বেলা বাড়িবার পূর্বেই নিভৃতে স্নান করিয়া আসাই ভাল মনে করিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পুষ্করিণীতে চলিয়া গেল। এই পুকুরটায় পাড়ার কেহ বড় একটা আসে না, তাই সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ভিজা কাপড় ছাড়িবার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, গা-মাথা মুছিবার একটা গামছা পর্যন্ত বাহিরে নাই। রানীর মা লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। সে তারাদাসকে দেখিতে পারিত না, রাগ করিয়া কহিল, বিটলে খড়কুটোটি পর্যন্ত তালাবন্ধ করে গেছে—আমার একখানি কাচা মটকার কাপড় আছে মা, নে আসবো? তাতে ত দোষ নেই?

ষোড়শী কহিল, না, থাক।

ভিজে কাপড় গায়ে শুখোবে মা, অসুখ করবে যে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। দাসী তাহার শুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যথার সহিত বলিল, ক'দিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে! মেলেচ্ছ ব্যাটাদের ঘরে

যে তুমি জলটুকু ছোঁবে না তা আমি বেশ জানি। এইবেলা দুটো চাল-ডাল দোকান থেকে না হোক, আমার বাড়ি থেকে এনে রেখে যাইনে মা?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, ও-সব এখন থাক রানীর মা।

এই দাসীটি কায়স্থের মেয়ে। তাহার বোধ-শোধ ছিল, এ লইয়া আর নিষ্ফল পীড়াপীড়ি করিল না। কাজকর্ম শেষ করিয়া, যাইবার সময় প্রশ্ন করিল, বাবাঠাকুরকে মন্দিরে দেখতে পেলে কি একবার আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে দেব?

ষোড়শী কহিল, থাক, তার আবশ্যক নেই।

দাসী কহিল, তালা দেবার দরকার নেই, দোরটা তুমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দাও। কিন্তু, আচ্ছা মা, কেউ যদি কোন কথা জিজ্ঞেসা করে ত কি—

ষোড়শী ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, হাঁ, বলো আমি বাড়িতেই আছি। এবং রানীর মা চলিয়া গেলে সে দ্বার আর রুদ্ধ হইল না, তেমনিই উন্মুক্তই রহিল। সুমুখের বারান্দার উপরে নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া ঘণ্টা দুই-তিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ষোড়শী জানিতেও পারে নাই; কেবল একটা নির্দিষ্ট বেদনার মত তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটা ছিল যে, এইবার তাহার একটা অত্যন্ত কঠোর দুঃসময় আসিতেছে। পরীক্ষাচ্ছলে একটা অতিশয় কদর্য আন্দোলন এইবার গ্রামের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিবে। অথচ যুদ্ধের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহার মন কিছুতেই বদ্ধপরিকর হইতে চাহিল না, বরঞ্চ সে যেন কেবলি তাহার কানে কানে এই কথাই কহিতে লাগিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, এই সকল কথার বড় কথাটা আজ তোমার মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একদিন যে তোমার এই দেহটা দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, এই-সকল সত্যের বড় সত্যটা আজ তোমার কিছুতেই অস্বীকার করিলে চলিবে না। তোমাকে পণ রাখিয়া মিথ্যার বাজি যাহারা খেলিতেছিল, মরুক না তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া, তুমি এইবার মুক্তি লইয়া বাঁচো।

ঠিক এমনি সময়ে দ্বার খুলিয়া মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, মা, এঁরা একবার তোমাকে ডাকচেন।

চল, বলিয়া ষোড়শী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন, কোথায় বা কাহারা ডাকিতেছেন, প্রশ্নমাত্র করিল না, যেন এইজন্যই সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার উদ্যত বিপদ সম্বন্ধে পুরোহিত বেচারার বোধ হয় কিছু আভাস দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভৈরবীর মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার কোন কথাই মুখে আসিল না।

আজ মন্দির-প্রাঙ্গণের বড় দ্বার খোলা। প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল ও-ধারের দেয়ালের গায়ে-গোটা-দুই কালো রঙের পাঁঠা বাঁধা আছে, এবং বারান্দার এক প্রান্তে পূজার উপকরণ ভারে ভারে স্তূপাকার করা হইয়াছে। তথায় পাঁচ-ছয়জন বর্ষীয়সী রমণী বাক্যে এবং কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন, এবং সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড কলরব উঠিয়াছে প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরের মধ্যে।

সেখানে রায়মহাশয়ের সুদৃশ্য এবং প্রশস্ত সতরঞ্চি বিছানো রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে মধ্যবর্তী করিয়া গ্রামের প্রবীণের দল যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন হইয়া সম্ভবতঃ বিচার করিতেছে এবং তাহা ষোড়শীকে লইয়া। এতক্ষণ কে শুনিতেছিল বলা যায় না, অথচ আশ্চর্য এই যে, যাহার শোনা সবচেয়ে প্রয়োজন, সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই এই শতকণ্ঠের উদ্দাম বক্তৃতা একেবারে পলকে নিবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষ হইতেই কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না। পুরুষেরা সকলেই ষোড়শীর পরিচিত, এবং মেয়েরাও যখন কাজ ফেলিয়া একে একে থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহারাও তাহার অপরিচিত নয়; কেবল যে মেয়েটি সকলের পরে মন্দিরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঠিক তাহার সম্মুখের জোড়া-থামটা আশ্রয় করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, সে অচেনা হইলেও ষোড়শী একমুহূর্তে বুঝিল, এই

হৈমবতী। এই মেয়েটি তাহার স্বামিগৃহ ছাড়িয়া বহুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি আসিতে পারে নাই; তাই তাহার সম্বন্ধে জনশ্রুতিও এই বাপের বাড়ির দেশে উত্তরোত্তর বিবিধ হইয়াই উঠিতেছিল। সে অখাদ্য খানা খায়, ঘাগরা এবং জুতা-মোজা পরে, রাস্তায় পুরুষদের হাত ধরিয়া বেড়ায়, সে একেবারে খ্রীষ্টান মেমসাহেব হইয়া গেছে—এমনি কত কি! আজ কিন্তু ষোড়শী তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। পরনে একখানি মূল্যবান বেনারসী শাড়ি এবং গায়ে দু-একখানা দামী অলঙ্কার ব্যতীত, জুতা-মোজা-ঘাগরার কিছুই ছিল না। বরঞ্চ তাহার সিঁথির সিঁদুর এবং পায়ের আলতা বেশ মোটা করিয়াই দেওয়া, দেখিলে কোনমতেই মনে হয় না এ-সকল সে বিশেষ করিয়া কেবল আজকার জন্যই ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সে সুন্দরী সত্য, কিন্তু অসাধারণ নয়। দেহের রঙটা হয়ত একটু ময়লার দিকেই, তবে ধনী-ঘরের মেয়েরা যেমন নিরন্তর মাজিয়া-ঘষিয়া বর্ণটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে ইহাও তেমনি—তাহার অধিক নয়। নিমিষের দৃষ্টিপাতেই ষোড়শীর মনে হইল এই ধনী-গৃহিণী ধনের আড়ম্বরেও যেমন তাহার দেহকে বস্ত্রালঙ্কারের দোকান করিয়া সাজায় নাই, লজ্জা এবং নির্লজ্জতা কোনটার বাড়াবাড়িতেও তেমনি তাহার শিশুকালের গ্রামখানিকে বিড়ম্বিত করিয়া তোলে নাই। মেয়েটি নীরবে চাহিয়া রহিল, হয়ত শেষ পর্যন্ত এমনি নীরবেই রহিবে, কিন্তু ইহারই সম্মুখে নিজের আসন্ন দুর্গতির আশঙ্কায় ষোড়শীর লজ্জায় ঘাড় হেঁট হইয়া গেল।

আরও মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে বৃদ্ধ সর্বেশ্বর শিরোমণি প্রথমে কথা কহিলেন, ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সাধুভাষায় তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন, তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর এই সঙ্কল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য সুসিদ্ধ হবে না।

ষোড়শীর মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার গলায় জড়িমা ছিল না। কহিল, বেশ! তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

তাহার এই কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্টতায় সর্বেশ্বর শিরোমণি নিজের গলাতেও যেন জোর পাইলেন, বলিলেন, কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখলে আর চলবে না। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাক ত?

একজন তাহাকে ডাকিতে গেল। ষোড়শীর মুখে যে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, তাহার পিতার নামে সেইখানেই তাহা বাধিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, কেন চলবে না? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে নিজেই যেন চমকিয়া গেল।

ভিড়ের মধ্যে হইতে কে একজন কহিল, সে তোমার বাবার মুখেই শুনতে পাবে।

ষোড়শী এ কথার আর কোন উত্তর দিল না, চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতা কে-একটি বছর-দশেকের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে আর একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। ইঁহাদের কাহাকেও ষোড়শী পূর্বে দেখে নাই, তথাপি বুঝিল উনিই পিসী এবং এই মেয়েটিই সেই অচেনা পিসীর কন্যা।

এ-সমস্তই যে রায়মহাশয়ের কৃপায়, তাহা ভিতরে ভিতরে সকলেই জানিত, ষোড়শীরও অজানিত নয়। রায়মহাশয় নীরব থাকিলেও তাঁহার চোখের উৎসাহ পাইয়াও তারাদাস প্রথম কথা কহিতে পারিল না, পরে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা কহিল, তাহারও অধিকাংশ স্পষ্ট হইল না, কেবল একটা কাজের কথা বুঝা গেল যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইহাকে সেবায়েত হইতে অপসারিত না করিলে ভাল হইবে না।

ইহাই যথেষ্ট। একটা কলরব উঠিল, অনেকেই রায় দিলেন যে এতবড় গুরুতর ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি খাটিতে পারে না। পারে না তাহা ঠিক। যাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন তাঁহারাও এই সত্যটাই মানিয়া লইলেন। কারণ, কেন পারে না, এমন প্রশ্ন করিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিল না। অথচ আশ্চর্য এই যে, ঠিক তাহাই ঘটিল। কোলাহল থামিলে শিরোমণি এই নিষ্পত্তিটিই বোধ হয় আর একটু ফলাও করিতে যাইতেছিলেন, সহসা একটি মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবা?

সবাই মুখ তুলিয়া চাহিল। রায়মহাশয় নিজেও মুখ তুলিয়া এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া পরিশেষে কন্যার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া সস্নেহে সাড়া দিলেন, কেন মা?

হৈম মুখখানি আরও একটু বাড়াইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, সাহেব যে রাগ করেচেন, এ কি করে জানা গেল?

বড়কর্তা প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন, তারপরে বলিলেন, জানা গেছে বৈ কি মা! বেশ ভাল করেই জানা গেছে। বলিয়া তিনি তারাদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

হৈম পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কহিল, পরশু থেকে ত সমস্তই শুনচি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

রায়মহাশয় ইহার ঠিক জবাবটা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলেন, নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম তারাদাসের পুরোবর্তী সেই ছোট মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিল, ঐটিকে যখন যোগাড় করে এনেচেন, তখন মিথ্যে বলা কি এতই অসম্ভব বাবা? তা ছাড়া সত্যি-মিথ্যে ত যাচাই করতে হয়, ও-ত একতরফা রায় দেওয়া চলে না।

কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল, এমন কি ষোড়শী পর্যন্ত বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ইহার উত্তর দিলেন সর্বেশ্বর শিরোমণি। তিনি স্মিতহাস্যে মুখখানি সরস করিয়া কহিলেন, বেটী কৌঁসুলির গিন্নী কিনা, তাই জেরা ধরেচে। আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। বলিয়া তিনি হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান! বলি, এটা ত মানিস?

হৈম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মানি বৈ কি।

শিরোমণি বলিলেন, তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কইচে পাগলী? বলিয়া তিনি প্রবল হাস্যে সমস্ত স্থানটা গরম করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে হৈম কহিল, আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণি জ্যাঠামশাই। অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে কথার বৃষ্টি করে গেলেন! আমি বলেচি ওঁকে দিয়ে পূজো করালে আমার কাজ সিদ্ধ হবে না, এর বিন্দুবিসর্গও ত সত্যি নয়!

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, রায়মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, কে তোমাকে বললে হৈম সত্যি নয়, শুনি?

হৈম একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমিই বলচি, সত্যি নয় বাবা। তার কারণ আমি কখনো অমন কথা বলা ত দূরে, মনেও করিনে। আমি ওঁকে দিয়েই পূজো করাবো; এতে আমার ছেলের কল্যাণই হোক আর অকল্যাণই হোক। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারচেন না, কিন্তু আমার আপনাকে তেমনি মনে আছে। চলুন মন্দিরে, আমাদের সময় বয়ে যাচ্চে। বলিয়া সে একপদ অগ্রসর হইয়া বোধ হয় তাহার কাছেই যাইতেছিল, কিন্তু নিজের মেয়ের কাছে অপমানের এই নিদারুণ আঘাতে পিতা ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন; তিনি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কখনো না। আমি বেঁচে থাকতে ওঁকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস বল

ত ওর মায়ের কথাটা! একবার শুনুক সবাই। ভেবেছিলাম ওটা আর তুলতে হবে না, সহজেই হবে।

শিরোমণি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, না তারাদাস, থাক। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না রায়মশাই! ও-ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজেই বলে যাক। কি বলেন চৌধুরীমশাই? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চায? কেমন, ও-ই নিজেই বলুক!

গ্রামের এই দুই দিক্‌পালের সাংঘাতিক অভিযোগে উপস্থিত সকলেই যেন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর কি একটা বলিবার চেষ্টায় বারংবার কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে হয়ত সে কি একটা বলিয়াও ফেলিত, কিন্তু হৈম দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আপনি কিছুতেই কোন কথা বলবেন না। পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেব না। ওঁরা যা পারেন করুন, চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে। বলিয়া সে আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ষোড়শীকে একপ্রকার জোর করিয়াই সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

আট

মন্দিরের অভ্যন্তরে একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ষোড়শী কহিল, না বোন, আমি পূজো করব না।

কেন? বলিয়া হৈম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবীর মুখ ম্লান, কোনরূপ আনন্দ বা উৎসাহের লেশমাত্র নাই এবং তাহার প্রশ্নের উওর সে যেন একটু চিন্তা করিয়াই দিল। কহিল, এর কারণ যদি কখনো বলবার দরকার হয়, সে শুধু তোমাকেই বলব, কিন্তু আজ নয়। তা ছাড়া আমি নিজেও বড়-একটা পূজা করিনে ভাই, যিনি এ কাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানেই দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়।

সন্তানের প্রতি ভৈরবীর এই ঐকান্তিক আশীর্বচনেও মায়ের মন হইতে অপ্রসন্নতা ঘুচিল না। সে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু আজকের দিনটা যে একটু অন্যরকমের দিদি! আপনি নিজের হাতে পূজো না করলে যে ওঁদের কাছে ভারী ছোট হয়ে যাবো! বলিয়া সে একবার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ষোড়শীর নিজের দৃষ্টিও উহাকে অনুসরণ না করিয়া পারিল না। দেখিল সকলে এইদিকেই চাহিয়া আছে। তাহাদের চোখ ও মুখের উপর উৎকট কলহের চিহ্ন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক যেন অধীর সৈনিকের দল কেবলমাত্র তাহাদের অধিপতির ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বহু দুঃখে তাহাদের যুদ্ধ-বেগ সংযত করিয়া আছে। কিন্তু রায়মহাশয় সে ইঙ্গিত দিলেন না। তিনি ঘোর সংসারী লোক, মুহূর্তেই বুঝিলেন উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে ধনী কন্যা-জামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। অল্পকালেই তাঁহার রক্তচক্ষু অবনত হইয়া আসিল, এবং কাহাকেও আর একটি কথাও না কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে

মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া গেলেন। দুই-চারিজন অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাঁহার সঙ্গ লইল না। বৃদ্ধ শিরোমণিমহাশয় রহিয়া গেলেন, এবং অনেকেই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি গড়ায় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

হৈম মিনতি করিয়া কহিল, মা-ভৈরবীর আশীর্বাদ আমরা মাতা-পুত্র মাথায় করে নিলাম, কিন্তু সে আশীর্বাদ আমি আপনাকে দিয়েই পাকা করে নিতে চাই দিদি।বেশ, আমি অপেক্ষা করতে পারব; পূজো আজ বন্ধ থাক—যেদিন আপনি আদেশ করবেন, এই উদ্যোগ-আয়োজন আবার নাহয় সেই দিনই হবে।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে সুবিধে আর হবে কিনা এ কথা ত আজ তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারবো না বোন!

হৈম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তবে কি মা-চণ্ডীর ভৈরবী আর আপনি থাকবেন না?

ষোড়শী শুধু বলিল, আজও ত তাই আছি।

হৈম কহিল, তবে? বলিয়াই দেখিতে পাইল দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া শিরোমণি দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তিনি সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা আর আমি সেই কথাই ত এতক্ষণ বকে মরচি গো! ভালো, আমাদের সবুর সইবে। উনি কাল হোক, পরশু হোক, দু'দিন পরে হোক, দশদিন পরে হোক, পূজা করুন। দিন তার জবাব!

হৈম ষোড়শীর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিল না।

শিরোমণি ভৈরবীর ম্লানমুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মা হৈম, এ ত সোজা প্রশ্ন নয়! এ পীঠস্থান, জাগ্রত দেবতা, দেবীর ভৈরবী ছাড়া এ দেব-অঙ্গ স্পর্শ করা ত যে-সে স্ত্রীলোকের কর্ম নয়! বুকের জোর থাকে, থাকুন উনি মায়ের ভৈরবী—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা জানি সে আর ওঁর সাধ্যই নেই।

ইঙ্গিতটা এতই সুস্পষ্ট যে লজ্জায় হৈমর পর্যন্ত মাথা হেঁট হইয়া গেল। যোড়শী নিজেও অভিভূতের মত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ আপনাকে আপনি ধাক্কা মারিয়া যেন সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তুলিল। শিরোমণিকে সে কোন উত্তর করিল না, কিন্তু বুড়ো পূজারীকে হঠাৎ একটা ধমক দিবার মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ছোট ঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্ততঃ করচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইল, দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো, বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ করে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিল, অনেক আয়োজন করেচ, এ-সব নষ্ট করা উচিত হবে না ভাই। আমি আশীর্বাদ করে যাচ্চি এতেই তোমার ছেলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। আমার নিজের পূজা-আহ্নিক এখনো বাকী রয়েচে, আমি এখন চললাম—সময় যদি পাই ত আবার আসব। এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদ না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্তকয়েকের জন্য সকলেই নির্বাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু ক্ষণপরেই অপমান ও অবহেলায় বৃদ্ধ শিরোমণি অঙ্কুশ-আহত পশুর ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়সোচিত মর্যাদাবোধ ও ছদ্মগাম্ভীর্য কোথায় ভাসিয়া গেল, দৃষ্টিবহির্ভূত যোড়শীর উদ্দেশে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, এবার মন্দিরে ঢুকলে গলাধাক্কা খেয়ে মরতে হবে জানিস! নষ্‌ট মেয়েমানুষ কোথাকার! ভেবেচিস গাঁয়ে মানুষ নেই? আজও জনার্দন রায় বেঁচে, আজও সর্বেশ্বর শিরোমণি মরেনি, তা জানিস!

এই-সকল অভিযোগ ও আস্ফালনের প্রতিবাদ করিবার তথায় কেহ ছিল না, বরঞ্চ তাঁহারই পোষকতায় রমণীগণের মধ্য হইতে বর্ষীয়সী কে একজন বলিয়া ফেলিল, হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে দূর কর শিরোমণিমশাই! বড় অহঙ্কার! বড় অহঙ্কার! জমিদারের বাগানবাড়িতে একরাত একদিন কাটিয়ে এসে বলে কিনা বাবুর অসুখ হয়েছিল! হয়েই যদি থাকে ত তোর কি! কিন্তু, বলিতে বলিতেই সহসা প্রতিমার প্রতি চক্ষু পড়িতেই তাঁহার ঈর্ষা-পীড়িত উচ্ছৃঙ্খল রসনা চক্ষের

পলকে শান্ত ও সংযত হইয়া গেল; নিজের দুই কান তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হাতে স্পর্শ করিয়া কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ও কোমল করিয়া অতঃপর কহিতে লাগিলেন, মায়ের ভৈরবী, নিন্দে করলে মহাপাপ হবে, নিন্দে আমি করচি নে, কিন্তু তাই বলে কি এতটা ভাল! সাহেব ভালমানুষ, তাই ছেড়ে দিলে, নইলে মিথ্যের দায়ে নিজের বাপের হাতেই যে দড়ি পড়ত!

কিন্তু ইহাতে উপস্থিত কেহই আর কথা যোগ করিল না। ষোড়শী যাহাই করুক সে যে চণ্ডীমাতার ভৈরবী এই সত্যটা হঠাৎ উত্থাপিত হইয়া না পড়িলে কুকথার প্রবাহটা বোধ করি এমন করিয়া তখনি থামিত না। কিন্তু তাই বলিয়া শিরোমণিমহাশয়ের রাগ পড়ে নাই, তিনি পুনশ্চ কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হৈম মলিন অবসন্ন মুখখানি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ও-সব কথা এখন থাক শিরোমণি জ্যাঠামশাই! তাড়াতাড়ি ত নেই—এখন আমার ছেলের পূজোটি হয়ে যাক।

তাই হোক, তাই হোক, বলিয়া শিরোমণি তাঁহার দুঃসহ বিরক্তি ও ক্রোধ তখনকার মত সংবরণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হৈম অদূরে একধারে নির্জীবের মত নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। এই লজ্জাকর ও নিরতিশয় অপ্রিয়কর আলোচনা সে এইভাবে বন্ধ করিয়া দিল সত্য, পুরোহিতও সাড়ম্বরে দেবীর পূজা করিয়া দিলেন, কিন্তু হৈম তাহার অন্তরের মধ্যে উৎসাহ বা আনন্দের লেশমাত্র খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পিতা ও লোকগুলার দুর্ব্যবহারে এবং বিশেষ করিয়া ওই ব্রাহ্মণের জঘন্য ইতরতায় তাহার যেমন বিতৃষ্ণা জন্মিল, ষোড়শীর অদ্ভুত আচরণেও তাহার মনের ভিতরটা তেমনি অজ্ঞাত গ্লানি ও সংশয়ের ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। তথাপি পুরোহিতের কাজটা কলের মত অবাধে চলিল। জাগ্রত দেবতার পূজা, বলিদান, হোম প্রভৃতি যাহা-কিছু অনেক সময় লইয়া সমস্তই ধীরে ধীরে সমাধা হইয়া আসিল, তাহার পুত্রের কল্যাণে শুভকর্মে কোথাও কোন বিঘ্নই ঘটিল না, কিন্তু ষোড়শী আর ফিরিল না।

দাসীর ক্রোড়ে ছেলেকে দিয়া হৈম যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন,। আসিয়া দেখিল তাহার পিতা কিংবা শিরোমণিমহাশয় কেহই এতক্ষণ আলস্যে সময় কাটান নাই। বাহিরের বসিবার ঘরে তুমুল কোলাহল হইতেছে। তাহার প্রাবল্য দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল একযোগে অনেকগুলি বক্তাই স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস করিতেছেন। অলক্ষ্যে কোনমতে পাশ কাটাইয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না; তিনি হাত নাড়িয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, হৈম, এদিকে একবার শুনে যা ত মা?

সে ক্লান্তদেহে মলিনমুখে ধীরে ধীরে গিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই দেখিল তথায় একটিমাত্র প্রাণী নীরবে বসিয়া আছেন, যাঁহাকে শ্রোতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—সে তাহার স্বামী মিস্টার এন.বসু, ব্যারিস্টার। সকলের সমবেত বক্তৃতার উপলক্ষ একমাত্র তিনিই। বেলা দেড়টার ট্রেনে তাঁহার আসিবার একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কিছু ছিল না। স্বামীকে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, তখন না বুঝে-সুঝে আমাদের কথায় হঠাৎ রাগ করে ফেললে মা, কিন্তু এখন নিজের কানেই ত সব শুনলে? ব্যাপার বুঝতে ত আর তোমার বাকী নেই, এখন তুমিই বল দেখি মা, অমন মেয়েমানুষকে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে রাখা যায়? এ ত ছেলেখেলা নয়!

হৈম অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব দিল, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।

তাহার পিতা হাস্য করিলেন, কহিলেন, করব বৈ কি মা, করব বৈ কি! করতেই ত গিয়েছিলাম। নির্মল এসেচে ভালই হয়েচে। যদি একটা মামলা-মকদ্দমাই বাধে ত বল পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে বোধ করি তিনি জমিদারের সাহায্যের আশঙ্কাই করিলেন, কিন্তু শিরোমণি খামকাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং হাঁকিয়া কহিলেন, ঘাড় ধরে বার করে দেব তার আবার নালিশ-ফরিয়াদ কি হে

জনার্দন! জামাইবাবাজী যখন উপস্থিত আছেন, তখন তিনিই বিচার করুন। তিনিই আমাদের জজ, তিনিই আমাদের ম্যাজিস্টর! আমরা অন্য জজ-ম্যাজিস্টর মানিনে। কি বল হে যোগেন ভায়া? তুমি কি বল হে মিত্তিরজা? এই বলিয়া তিনি কয়েকজনের মুখের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। এ ক্ষেত্রে যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার সম্মতিগ্রহণের তাৎপর্য ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু এটা বুঝা গেল, বড়লোক এবং দানশীল জামাইবাবাজী বিচার করুন, আর না করুন, ভবিষ্যতে তাঁহার অনুগ্রহলাভের পথটা শিরোমণি নিজের জন্য কথঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং সুগম করিয়া রাখিলেন।

এই জামাইবাবাজী মানুষটির মাথার ডগা হইতে জুতার তল পর্যন্ত সমস্তই নিষ্কলঙ্ক সাহেবী। সুতরাং প্রত্যুত্তরে মৃদু-মধুর হাসিয়া তিনিও যে জবাবটুকু দিলেন তাহাও নিখুঁত সাহেবী। কহিলেন, এই-সব মোহন্ত-মোহন্তানী জাতের লোকগুলোর ব্যাপার সবাই জানে, এরা যেমন অসাধু তেমনি অসচ্চরিত্র। এদের অসাধ্য কাজ নেই। কোন কারণেই এদের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। কিন্তু আপনাদের ভৈরবীটি ঠিক কি করেচেন না-করেচেন সেটাও নিশ্চিত জানা উচিত।

শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, বাবা নির্মল, জানার আর বাকী কোথাও কিছুই নেই—কি বল মা, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? তা ছাড়া তার মা—সেই যে একটা মস্ত কথা। এই বলিয়া তিনি হৈমর দিকে বিশেষ একটু কটাক্ষ করিলেন।

হৈম অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সলজ্জ নীরবতায় ইহাই সকলে অনুভব করিলেন যে, সে ভৈরবীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ভাল কথা বলিবারও তাহার কিছু নাই।

জনার্দন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা, সমস্ত দিন উপোস করে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, যাও, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। ভৈরবীকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েচে, যদি আসে ত তোমাকে খবর দেবো।

হৈম চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে যে লোকটা ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম এই যে, ভৈরবী কেবল যে তাহার প্রজা দিগম্বর ও বিপিনকে দিয়া তালা ভাঙ্গাইয়া সমস্ত ঘরগুলা দখল করাইয়া লইয়াছেন তাই নয়, রায়মহাশয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিতেও সম্মত হন নাই। শুধু কেবল ফকির-সাহেবের অনুরোধেই অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই আসিতে পারেন।

বোধ হয় আসিতে পারেন! তা বটে! জ্বলন্ত অঙ্গারে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং সামান্য একটা স্ত্রীলোকের অভাবনীয় দুঃসাহস ও স্পর্ধায় সম্ভ্রান্ত পুরুষগুলির মুখ দিয়া যে-সকল শব্দ ও বাক্যাবলীর প্রবাহ নিঃসৃত হইল তাহার আদ্যোপান্ত উল্লেখ না করিয়াও একটা কথা বলা আবশ্যক যে, এই ভ্রষ্টা নারীকে কেবল এই মুহূর্তেই গ্রাম হইতে বিদূরিত করা নয়, ইহাকে তালাভাঙ্গা ও অনধিকার-প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়া জেল খাটানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অসংশয়ে প্রকাশ করিলেন। শুধু জামাতাবাবাজীই এই কোলাহলে যোগদান করিলেন না, খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার সাহেবী ও ব্যারিস্টারী এই উভয় মর্যাদা রক্ষা করিতে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে জামাতা-সাহেব প্রশ্ন করিলেন, এই ফকিরসাহেবটি কে? হঠাৎ ইনি জুটলেন কি করে?

ইহার সম্বন্ধে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি তাহার সারোদ্ধার করিয়া কহিলেন, ভালো না ছাই! মোচলমান আবার সিদ্ধপুরুষ! সে-সব কিছু নয়, তবে লোকটা কারও মন্দ-টন্দ করে না। বারুইয়ের ওপর একটা বটগাছের তলায় আড্ডা; অনেককাল আছে—তবে মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার আসে। বছর-দুই ছিল না, আবার শুনচি নাকি দিন পাঁচ-ছয় হলো ফিরেচে। হয়ত ওরই মতলবে তালা ভেঙ্গেচে। বলা কিছু যায় না—হাজার হোক ম্লেচ্ছ ত!

জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আজ এলেন কি করে?

তারাদাস এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এবার কথা কহিল। বলিল, ও-পারের ওই বটগাছের সঙ্গে জায়গাগুলো সব মা-চণ্ডীর। তাই থেকে আলাপ। ফকির-সাহেব ষোড়শীকে বড় ভালবাসেন, থাকলে ওখানে ষোড়শী প্রায়ই যায়। তাঁর কাছে পড়াশুনাও করে দেখেচি।

জামাই-সাহেব একটু হাসির ভাবে কহিলেন, ভালবাসে! বিদ্যাচর্চাও চলে! এই ফকির-সাহেবটির বয়স কত?

তারাদাস লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বুড়োমানুষ তিনি। বয়স ষাট-বাষট্টির কম নয়, মা বলে ডাকেন। একবার ষোড়শীর ভারী অসুখ হয়েছিল—প্রায় মরতে বসেছিল—উনিই ভাল করেন।

সাহেব বলিলেন, ওঃ—তাই নাকি! তবে কি জানো বাপু, ওদিকেও সাধু-ফকির, এদিকেও ডাকিনী-যোগিনী! এই-সব ভৈরব-ভৈরবীর দলটাকে—কিন্তু শেষ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ স্ত্রীর মুখের একাংশে চক্ষু পড়িয়া এই বেফাঁস কথাটা ওখানেই রহিয়া গেল। আর কেহই কথা যোগ করিল না, কেবল অপ্রতিহতগতি শিরোমণি নিবৃত্ত হইলেন না। অপরাধের বাকীটুকু সদম্ভে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তিনিই কেবল বলিয়া উঠিলেন, একশো' বার বাবাজী, একশো' বার! এই-সব ভণ্ড বেটা-বেটীরা যেমন নষ্ট তেমনি ভ্রষ্ট। তিনি বাম ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া বোধ করি তাঁহার যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার মাথা-নাড়াটাও অন্ততঃ প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু এবার তাহারাও নির্বাক্ রহিল, এবং দ্বারের অন্তরালবর্তিনী হৈমবতীর শুষ্ক মুখখানি ক্ষণেকের জন্য একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া, সেই ভণ্ড মুসলমান ফকির ধীরপদক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সংশয় রহিল না যে শিরোমণির উচ্চকণ্ঠ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে উভয়ে যখন নিকটে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কাহারও মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। একটা অভ্যর্থনা না, বসিতে বলার একটা সামান্য ভদ্রতা-রক্ষা পর্যন্ত না। অথচ মনে মনে সকলেই যেন বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শিরোমণির পর্যন্ত মনে হইতে লাগিল, কি যেন ঠিক হইল না—কিসে যেন ভারী একটা ত্রুটি হইয়াছে অথচ সবাই তেমনিই বসিয়া রহিলেন।

মিস্টার বসুসাহেবের কাছে উভয় আগন্তুকই একবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মিনিট দুই-তিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা তিনি দুইজনকেই আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিলেন। এই ফকিরটির মাথার চুল হইতে দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ সমস্তই একেবারে তুষার-শুভ্র, অঙ্গে মুসলমান ফকিরের সাধারণ পোশাক। সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহার অধিক কিছু নয়, অথচ মনে হয় এই সবল সুদীর্ঘ দেহের উপরে এগুলি সমস্ত যেন তাদের সামান্যতাকে বহু ঊর্ধ্বে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার গায়ের রঙ জলে ভিজিয়া এবং রৌদ্রে পুড়িয়া এমন একপ্রকার হইয়াছে, যাহা আগে কি ছিল কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ফকিরের মুখ ও চোখের উপর সামান্য একটুখানি উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আরও একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারই অন্তরালে যে চিত্তখানি বিরাজ করিতেছে, তাহা যেমন শান্ত তেমনি নিরুদ্বেগ এবং তেমনি ভয়হীন। ইঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল ষোড়শী। তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার সুন্দর সুগঠিত, অনাবৃত মাথাটি ভরিয়া রুক্ষ বিস্রস্ত কেশ-ভার, তাহার উপবাস-কঠিন, যৌবন-সন্নদ্ধ দেহের সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত আশ্চর্য সুষমা, সর্বোপরি তাহার নত-নেত্রের অপরিদৃষ্ট বেদনার অনুক্ত ইতিহাস—সমস্ত একসঙ্গে মিশিয়া ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

এই আচ্ছন্ন ভাবটা তাঁহার কাটিয়া গেল ফকিরের একটা কথার ধাক্কায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্বলতায় তিনি অকারণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার কথার

জবাবে খামকা রূঢ় হইয়া উঠিলেন। ফকির নিজেদের প্রথামত অভিবাদন করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুসাহেব, আপনি কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন? বাবুসাহেব তখন উত্তর দিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, তুমি যেতে পারো।

ফকির রাগ করিলেন না। একটু হাসিয়া ষোড়শীকে দেখাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, আসামীকে কিন্তু আমিই হাজির করেচি বাবুসাহেব। উনি ত আসতেই চাননি। নেহাত দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ সবাই মিলে হট্টগোল করে যে বিচার তাতে বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশী হয়। আর সেও ত সকালবেলাই একদফা সাঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু আপনার নাম শুনে আমি বললুম, চল, মা, আমরা যাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, তাতে বাইরের লোক—যদি সম্ভব হয় তিনি সুমীমাংসাই করে দেবেন।

ব্যারিস্টার-সাহেব মনে মনে বুঝিলেন, এই ফকিরের সম্বন্ধে তিনি ভুল ধারণা করেন নাই। ইনি যেই হোন, অশিক্ষিত সাধারণ ভিক্ষুকশ্রেণীর নয়। সুতরাং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকেও কতকটা ভদ্র হইতে হইল; কহিলেন, এঁরা ত তালা-ভাঙ্গা এবং অনধিকার-প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়ে ওঁকে প্রথমটা জেল খাটিয়ে নিতে চান। আর শুনলাম তালা-ভাঙ্গা নাকি আপনার হুকুমেই হয়েচে।

ফকির হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাপ রে, একা কেবল অপরাধী নয়, তার সঙ্গে আবার তার সাহায্যকারী! কিন্তু বাবুসাহেব, আমি শুধু তালা ভাঙ্গবারই মতলব দিয়েচি, কিন্তু আইন ভাঙ্গবার পরামর্শ দিইনি। বাড়িটা দেবোত্তর সম্পত্তি, এবং মা ভৈরবীই তার অভিভাবিকা। তারাদাস খামকা যদি তালা বন্ধ না করতে যেতেন ত ভাল ভাল তালাগুলো এমন ভেঙ্গে নষ্ট করতে হতো না। তারাদাসের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তারাদাস, ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিলেন বাবা? কিন্তু যেই দিন সুবুদ্ধি দেননি।

তারাদাস ইহার উত্তর দিতে পারিল না, এবং অন্য কেহও যখন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, নির্বাক্ হইয়া রহিল, তখন শিরোমণি সাড়ম্বরে গাত্রোত্থান

করিয়া কহিলেন, ওকে ভৈরবী কে করেছিল জানেন ফকির-সাহেব? সে ওই তারাদাস। এখন ও যদি ওকে না রাখতে চায় ত সে তার ইচ্ছা। এই আমার মত।

ফকির কহিলেন, শিরোমণিমশাই, মতটাও আপনার বটে, ইচ্ছাটাও তারাদাসের সত্য, কিন্তু সম্পত্তিটা অন্যের। এই অন্য লোকটি এ দুটোর কোনটাতেই সম্মত নয়! কি করবেন বলুন!

তাঁহার উত্তর এবং সেটা বলিবার ভঙ্গীতে ব্যারিস্টার-সাহেব হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, এদের নালিশ এই যে, বর্তমান ভৈরবী যে অপরাধ করেছেন তাতে দেবীর সেবায়েত হবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। উনি তার কিছু সাফাই দিতে পারেন কি? বলিয়া তিনি ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইলেন।

ফকির কহিলেন, ওঁকে আসামী করেই আপনাদের সুমুখে দাঁড় করিয়েচি, আবার অপরাধ অপ্রমাণ করবার বোঝাটাও ওঁকেই বইতে অনুরোধ করব, এতবড় জুলুম ত আমি পেরে উঠব না বাবুসাহেব।

ব্যারিস্টার-সাহেব মনে মনে লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন, কিন্তু শিরোমণি তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যে ভৈরবীকে পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটক রেখেছিল, সে আমরা সবাই জানি, তবে কেন সে সকালে ম্যাজিস্টার-সাহেবের কাছে মিছে কথা বললে যে, সে স্ব-ইচ্ছায় গিয়েছিল, আর জমিদারের অসুখ হলো বলেই সমস্ত রাত্রি নিজের ইচ্ছায় সেখানে ছিল! ও যদি নিষ্পাপ ত এ কথার জবাব দিক।

ফকির জবাব দিলেন, কহিলেন, জমিদারের অত্যাচার ও অনাচারে উনি যে রাগের মাথায় নিজেই গিয়েছিলেন এ কথা ত মিথ্যে নয় শিরোমণিমশাই? এবং তিনি যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়েছিলেন, এ ঘটনাও সত্য।

জনার্দন রায় এতক্ষণ নীরবেই সমস্ত বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, এই যদি সত্য হয় ফকিরসাহেব, ত নিজের বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীকে বাঁচাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল? তাঁর অসুখ ত ওঁর কি? অসুখে সেবা করবার জন্য ত বীজগাঁয়ের জমিদার পালকি পাঠিয়ে নিয়ে যায়নি? মোট কথা আমরা ওকে রাখব না—আমরা ভিতরের ব্যাপার জানি। তা ছাড়া, ওর যদি কিছু বলবার থাকে ওকেই বলতে দিন। আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দুধর্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই!

তাঁহার কথার ঝাঁজ এবং তীক্ষ্ণতা কিছুক্ষণ অবধি যেন ঘর ভরিয়া রিরি করিয়া বাজিতে লাগিল। ব্যারিস্টার-সাহেব নিজেও কেমন একপ্রকার অস্বচ্ছন্দ এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন, এবং বাক্যহীনা ভৈরবীর নিস্তব্ধ বক্ষঃকুহরেও কি একটা উত্তর বাহিরে আসিবার জন্য বারবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই চিহ্ন ফকিরসাহেব ষোড়শীর মুখের উপরে চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন, তার পরে জনার্দন রায়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, রায়মশায়, অনেকদিনের কথা হলো, আপনার হয়ত মনে নেই, মন্দিরের দক্ষিণে ঐ যে বুড়ো নিমগাছটা, তারই তলায় তখন থাকি। ষোড়শী তখন এতটুকু মেয়ে, তখন থেকেই মা বলে ডাকি—মুসলমান হয়েও যে ভুলটা করে ফেলেচি সেটা আজ আমাকে মাপ করতে হবে। সেই মায়ের এতবড় বিপদে কি না এসে থাকতে পারি?

জিনিসটা ত তুচ্ছ নয়। তা না হলে আজই সকালে যখন ওঁরই মুখ থেকে ওঁর মায়ের লজ্জার কাহিনী টেনে বার করতে চেয়েছিলেন, তখন আপনার নিজের ওই মা'টির কাছে ধমক খেয়ে অমন বিহ্বল ব্যাকুল হতে আপনাকে হতো না। এই বলিয়া ফকির দ্বারসংলগ্ন মূর্তিবৎ স্থির হৈমবতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন।

হতবুদ্ধি জনার্দন হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিলেন, ও-সব বাজে কথা।

ফকির তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, পাকা বীজও পাথরের উপর পড়ে বাজে হয়ে যায়, আমার এতটা বয়সে সে আমি জানতুম। আমি কাজের কথাও বলচি। ওই মহাপাপিষ্ঠ জমিদারটিকে কেন যে মা আমার বাঁচাতে গেলেন সে আমিও জানিনে—জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনি। আমার বিশ্বাস, কারণ ছিল—আপনাদের বিশ্বাস সেই হেতুটা মন্দ। এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করবার জন্যেও অন্যের গ্লানি করা আমাদের ধর্মে নিষেধ, তাই আমি সে নজির দেব না। কিন্তু আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রায়মশায়। এ যদি কেবল তারাদাসের সঙ্গেই হতো, হয়ত আমি মাঝে পড়তে যেতাম না, কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিসের জন্য শুনি? ষোড়শী ত একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান-ইজ্জত অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমিজমা, বাড়িঘরদ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি? কিন্তু থাক রায়মশায়, আপনার মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের চোখের সুমুখে আর আপনার মহাপাপের ভরা উন্মুক্ত করে ধরব না।

এই বলিয়া সেই মুসলমান ফকির নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিদারুণ অভিযোগের শেষ বাক্যটা যেন শেষ হইয়াও নিঃশেষ হইল না। কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেবল একটা তীব্র কণ্ঠের রেশ যেন চারিদিকের প্রাচীর হইতে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেবল ধিক্! ধিক্! করিতে লাগিল।

হৈম কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র করিল না; নীরবে নতমুখে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল, এবং ব্যারিস্টার-সাহেব সেইখানে তাঁহার চৌকির উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ফকির ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মা, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সদর দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া হৈম। তাহার দুইচক্ষু ছলছল করিতেছে; সে অশ্রু-সজল দৃষ্টি ফকিরের মুখের প্রতি তুলিয়া কহিল, বাবা, আমার স্বামীকে আপনি মাপ করুন।

ফকির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা?

হৈম তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, আমার স্বামীকে নিয়ে যদি আপনার আশ্রমে যাই আপনি দেখা করবেন?

এবার ফকির হাসিলেন; তারপরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, করব বৈ কি মা! তোমাদের দুজনের নিমন্ত্রণ রইল, সময় পেলে যেয়ো।

নয়

মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগটা যে ওখানেই মিটিয়া শেষ হইয়া গেল না ষোড়শী তাহা ভাল করিয়াই জানিত; কিন্তু বিপত্তি যেদিক দিয়া তাহাকে পুনশ্চ আক্রমণ করিল তাহা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এখানে থাকিলে ফকিরসাহেব মাঝে মাঝে এমন আসিতেন বটে, কিন্তু মাত্র কাল সন্ধ্যাকালে তিনি গিয়াছেন, মাঝে একটা দিন কেবল গিয়াছে, আবার আজই প্রত্যুষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এইরূপ তাঁহার কোনদিন নিয়ম নয়। ষোড়শী সেইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া নিত্যক্রিয়াগুলি সারিয়া লইতে ঘরে ঢুকিতেছিল, অসময়ে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া, একটা আসন পাতিয়া দিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এত সকালে যে?

তিনি উপবেশন করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ফকির মানুষ, সংসারে সুখ-দুঃখের ধার বড় ধারিনে মা, তবুও কাল রাত্রিটায় ভাল করে ঘুমোতে পারিনি, ষোড়শী, দেহধারণের এমনই বিড়ম্বনা। কবে যে এটা মাটির তলায় যাবে!

ষোড়শী শারীরিক পীড়ার কথাই মনে করিয়া কহিল, আপনার কি কোন অসুখ করেচে?

ফকির ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না আমার শরীর ভালই আছে। কাল বিকেলে এঁরা সকলেই আমার কুটীরে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, সঙ্গে জামাইবাবু-সাহেবও ছিলেন, এককড়িও ছিল। তাকে চিনি এই যা—নইলে সে অনেক কথাই বললে। তবুও দু-একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না মা!

ষোড়শী কহিল, বলুন।

ফকির বলিলেন, দেখ মা, আমি মুসলমান, তোমাদের দেব-দেবীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকা উচিতও নয়, নেইও—কিন্তু তোমাকে আমি মা বলে ডাকি; তুমি কি জানিয়েছ স্বহস্তে আর কখনো চণ্ডীর পূজা করতে পারবে না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, এ কথা সত্য।

ফকির বলিলেন, কিন্তু এতকাল ত তোমার সে বাধা ছিল না?

ইহার উত্তরে ষোড়শী যখন মৌন হইয়া রহিল, তখন তিনি কহিলেন, যাঁরা তোমাকে চান না তাঁরা যদি তোমার এই নূতন আচরণটা মন্দ বলেই গ্রহণ করেন, তাতে ত কোন জবাব দেওয়া যায় না ষোড়শী?

ইহারও কোনরূপ সদুত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া ষোড়শী যখন তেমনি নীরব হইয়া রহিল, তখন ফকিরের মুখও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, এর কারণ বলবার হলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই বলতে। এ ছাড়া এককড়ি আরও একটা কথা বললে। সে বললে, জমিদারবাবু ভারী আশা করেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে যাবে। এমন কি, আর একটা পালকি আনিয়ে যাই যাই করেও তাঁর শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল হয়ত তুমি ফিরে আসবে।

এবার ষোড়শী কথা কহিল, বলিল, তাঁর আশা-ভরসার জন্যও কি আমাকে দায়ী হতে হবে?

ফকির তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। কিন্তু কথাটা শুনতেও নাকি বিশ্রী, তাই উল্লেখ করলাম। আচ্ছা মা, যে ব্যাপারটায় সকল কুৎসিত কথার সৃষ্টি তার যথার্থ হেতুটা কি তুমি আমাকে বলতে পারো না? ও লোকটাকে যে তুমি কেন এমন করে বাঁচিয়ে দিলে এর কোন মীমাংসাই ত খুঁজে পাইনে ষোড়শী?

ষোড়শীর প্রথমে মনে হইল এ প্রশ্নেরও সে কোন উত্তর দিবে না, কিন্তু বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন মুখের স্নেহ-করুণ চোখ-দুটির প্রতি চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে

পারিল না, কহিল, ফকিরসাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হতো?

ফকির বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বোধ করি বা একটু বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, সে বিবেচনার ভার ত তোমার নয় মা, সে রাজার। তাই তাঁর জেলেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করান। কিন্তু এই যদি হয়ে থাকে, তুমি অন্যায় করেচ বলতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ফকির বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এর ত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তার অর্থ?

ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ ত তুমি জানো! তার শাস্তি হওয়া উচিত।

এবার ষোড়শী বহুক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের উচিত, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারব না।

ফকির কহিলেন, ব্যাপার কি ষোড়শী?

ষোড়শী অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্যই বাহির হইল না। দাসী সংসারের কাজ করিতে আসিতেছিল, দ্বারের কাছে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ফকির আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, এখন তা হলে আমি চললাম।

ষোড়শী কেবল হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল; তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর বিষণ্ণতাই শুধু যে কেবল ষোড়শীর সমস্ত দিন সকল কাজকর্মের মধ্যেই যখন-তখন মনে হইতে লাগিল তাই নয়, যে অনুচ্চারিত বাক্য তিনি সহসা দমন করিয়া লইয়া নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, তাহাও নানা আকারে নানা ছন্দে তাহার কানে বাজিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই সাধু ব্যক্তি যে শ্রদ্ধা, যে স্নেহ এতদিন তাহার প্রতি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন ঠিক কিছু না জানিয়াও আজ যেন তাহাকে খর্ব করিয়া লইয়া গেলেন। এই ক্ষতি যে কত বড়, তাহার পরিমাণ সে নিজে ছাড়া আর কেহই অধিক জানিত না।

কিন্তু তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইবারও কোন পন্থা তাহার চোখে পড়িল না। তাহার বাল্য ইতিহাস কাহারও কাছে ব্যক্ত করা চলে না, এমন কি এই ফকিরের কাছেও না। কারণ ইহাতে যে-সকল পুরাতন কাহিনী উঠিয়া পড়িবে তাহা মেয়ের পক্ষে যতবড় লজ্জার কথাই হোক, তাহার যে মা আজ পরলোকে তাঁহাকেই সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে একেবারে পথের ধূলায় টানিয়া আনা হইবে। এবং এইখানেই ইহার শেষ নয়। স্বামিস্পর্শ ভৈরবীর একান্ত নিষিদ্ধ। কত যুগ হইতে এই নিষ্ঠুর অনুশাসন ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাল-মন্দ যাই হোক, জীবনানন্দের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া একটা রাত্রির জন্যও তাহাকে যে-হাত দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইয়াছে, সেই হাত দিয়া আর যে দেবীর সেবা করা চলিবে না তাহা নিশ্চিত, অথচ এইখানেই এই দেবীর প্রাঙ্গণতলেই তারাদাস যখন তাহাকে অজ্ঞাতকুলশীল একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল তখন সে কোন আপত্তিই করে নাই; এবং সমস্ত জানিয়াও যে সে নিঃসঙ্কোচে এতকাল ভৈরবীর কার্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার জবাবদিহি আজ যদি সমস্ত ক্রুদ্ধ হিন্দুসমাজের কাছে করিতে হয়, ত সে যে কি হইবে সে তাহার চিন্তাতীত। আবার এ-সকল ত গেল কেবল একটা দিকের কথা, কিন্তু যে দিকটা একেবারেই তাহার আয়ত্তাতীত, তথায় কি যে হইবে সে তাহার কি জানে? যে

জীবানন্দ একদিন তাহাদের বিবাহটাকে কেবল পরিহাস করিয়া গিয়াছিল, সে যদি আজ সমস্ত ইতিহাসটাকে নিছক গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, ত তাহাকে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সে নিজে ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবিত নাই।

গৃহস্থালী-সম্বন্ধে রানীর মায়ের দুই-একটা কথার উত্তরে ষোড়শী কি যে জবাব দিল তাহার ঠিকানা নাই। মন্দিরের পুরোহিত কি একটা বিশেষ আদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়া অন্যমনস্ক ভৈরবীর কাছে কি যে হুকুম পাইল তাহা ভাল বুঝিতেই পারিল না। নিত্যনিয়মিত পূজা-আহ্নিকে বসিয়া আজ ষোড়শী কোনমতেই মনস্থির করিতে পারিল না, অথচ যে জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্ ভ্রান্ত এবং চঞ্চল হইয়া রহিল, তাহার যথার্থ রূপটাও তাহাকে ধরা দিল না—কেবলমাত্র কতকগুলা অস্ফুট অনুচ্চারিত বাক্যই সমস্ত সকালটা একটা অর্থহীন প্রলাপে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। রান্নার উদ্যোগ-আয়োজন পড়িয়া রহিল, সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল না – এ-সকল তাহার ভালই লাগিল না। এমনি করিয়া সমস্ত দিনটা যখন কোথা দিয়া কিভাবে কাটিয়া গেল, একপ্রকার ঘোলাটে মেঘলায় শীতের দিনের অপরাহ্ণ যখন অসময়েই গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সে একাকী ঘরের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল, এবং ফকিরসাহেবকে স্মরণ করিয়া বারুইয়ের প্রপারে তাঁহারই আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। এমন অনেকদিন হইয়াছে সে একটুখানি ঘুরিয়া তাহার অনুগত বিপিন কিংবা দিগম্বরকে তাহাদের বাটীর সম্মুখ হইতে ডাক দিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ পাড়ার পথ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যাইতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না—একাকীই মাঠের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার মনেও পড়িল না যে, ঘরগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল।

এই পথটা বেশী নহে, বোধ করি অর্ধ ক্রোশের মধ্যেই, এবং নদীতেও এমন জল এসময়ে ছিল না যাহা স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া পার হওয়া না যায়, সুতরাং অভ্যাসবশত: এদিকে চিন্তিত হইবার কিছুই ছিল না। কেবল ফিরিয়া আসার কথাটাই একবার মনে হইল, অথচ ভিতরে ভিতরে বোধ হয় তাহার ভরসা ছিল যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার হইয়াই আসে ত ফকিরসাহেব কিছুতেই তাহাকে নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া দিবেন না, কিছু একটা উপায় করিবেনই। মনের এই অবস্থাই তাহাকে জনহীন পথ ও ততোধিক নির্জন বালুময় নদীর উপকূলে আসন্ন সন্ধ্যা জানিয়াও দ্বিধামাত্র করিতে দিল না, বারুইয়ের প্রপারে সোজা সেই বিপুল বটবৃক্ষতলে সাধুর আশ্রমে আনিয়া উপনীত করিল এবং প্রথমেই যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তিনি ফকিরসাহেব নহেন, রায়মহাশয়ের জামাতা ব্যারিস্টার-সাহেব। আজ তাঁহার পরিধানে কোট-প্যান্টের পরিবর্তে সাধারণ ভদ্রবাঙালীর ধুতি-চাদর প্রভৃতি ছিল। তিনিও ঠিক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; কি করিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বোধ হয় কেবলমাত্র অভ্যাসবশতই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোনমতে একটা নমস্কার করিলেন।

ভৈরবী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কোথায়?

বসুসাহেব কহিলেন, আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। হয়ত কাছাকাছি কোথাও গেছেন মনে করে আমিও প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে আছি।

ভৈরবী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি সন্ধ্যার সময় কোথাও থাকেন না, বোধ হয় এখুনি এসে পড়বেন।

বসুসাহেব কহিলেন, এখানে থাকলে তাই তাঁর নিয়ম বটে, আমিও শুনে এসেচি। কিন্তু সন্ধ্যা ত হলো। আকাশের গতিকও তেমন ভাল নয়, বলিয়া তিনি সম্মুখে মাঠের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষোড়শীও তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া নীরব হইল।

পশ্চিম দিগন্তে তখন কালো কালো খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে জমা হইয়া উঠিতেছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের ঘনায়মান অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উভয়ের কেহই কিছুক্ষণের জন্য কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ এই বিসদৃশ অবস্থায় দুজনেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। এবং বোধ হয় এই মৌনতার সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই যেন বসুসাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কাল আমি চলে যাচ্চি, শীঘ্র আর আসা হবে কিনা জানিনে, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে আর একবার দেখা না করে চলে যেতে হৈম আমাকে কিছুতেই দিলে না, তাই—কিন্তু তিনি ত কোথাও চলে যাননি? এই বলিয়া তিনি দু-এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলেন, এবং অনতিদূরবর্তী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া গলা বাড়াইয়া ক্ষণকাল ঘরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ভাল দেখা যায় না, কিন্তু কোথাও কিছু আছে বলেও মনে হয় না।

মুসলমান ফকিরেরা ধুনি জ্বালে কিনা জানিনে, কিন্তু এই রকম কি একটা জল দিয়ে কে যেন নিবিয়ে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্চে। আপনি দেখুন দেখি, আমি আর ভিতরে যাবো না। তা হলে নিরর্থক অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। বলিয়া তিনি ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কথাটা শুনিয়াই ষোড়শীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার থাকা-না-থাকার পরীক্ষা না করিয়াই তাহার নিশ্চয় মনে হইল সংসারে তাহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন, এবং এই নীরব প্রস্থানের হেতু জগতে সে ছাড়া আর কেহ জানে না। ষোড়শী যন্ত্রচালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও যে কিছু নাই, এই ছোট ঘরখানি আজ যে একেবারে একান্ত শূন্য, সে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে কেবল এই কথাটাই অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তিনি যথার্থ-ই দোষীজ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, এবং

তাহার আভাসমাত্র দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেইখানে পাষাণ-মূর্তির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া তাহার অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। ফকির যে তাহাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাহার চেয়ে বেশী আর কে জানে? তথাপি না জানিয়া যে তিনি অপরাধীর পক্ষ লইয়া বিবাদ করিয়াছেন, এই লজ্জা ও গ্লানি সেই সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীকে এমন করিয়া আজ স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এবং যে বেদনা লইয়া তিনি নীরবে বিদায় লইয়াছেন, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। অথচ একথা জানাইবার অবকাশ যে তাহার কবে মিলিবে, কিংবা কোনদিন মিলিবে কি না, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে আজ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এমনি একইভাবে তাহার অনেকক্ষণ কাটিল, এবং বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ কাটিত, সহসা মুক্তদ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে একটা দমকা বাতাস অনুভব করিয়া তাহার চৈতন্য হইল, বাহিরে আর একজন হয়ত এখনও তাহার অপেক্ষা করিয়া আছেন।কিন্তু ইতিমধ্যে যে আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে পারে এবং বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় ও জলের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহার মনেও আসে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল অনতিদূরে একটা শুষ্ক বৃক্ষকান্ডের উপর বসুসাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তাঁহাকে এইভাবে বাস্তবিক অপেক্ষা করিতে দেখিয়া ষোড়শী মনে মনে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিল।

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কৈ, ফকির ত এখনো এলেন না, আসবেন বলে কি আপনার আশা হয়?

ষোড়শী অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, কি জানি, বোধ হয় না-ও আসতে পারেন।

বসু কহিলেন, ফকিরসাহেবের জিনিসপত্র কি ছিল আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর ঘরটি ত একেবারে খালি – এমন হঠাৎ চলে যাওয়া কি আপনার সম্ভব মনে হয়?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, একেবারে অসম্ভবও নয়। এমনি সহসা তিনি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যান।

আবার কতদিনে ফিরে আসেন?

কিছু ঠিক নেই। এবার ত প্রায় বছর-তিনেক পরে ফিরে এসেছিলেন।

বসু কহিলেন, তা হলে চলুন আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

চলুন, বলিয়া ষোড়শী অগ্রসর হইতেই বসু কহিলেন, কিন্তু যাবার সুযোগ ত দেখচি ষোল আনাই হয়েচে। একে ত বালির ওপর পথের চিহ্নমাত্র নেই, তাতে অন্ধকার এমনি যে নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যায় না।

ষোড়শী নীরবে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিয়াছিল, কিছুই বলিল না।

বসু কহিলেন, হাওয়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি পড়চে। গাছতলা পার হলেই ভিজতে হবে। এ কথাতেও ষোড়শী যখন কথা কহিল না, তখন বসু কহিলেন, দেখুন, পথঘাট আমি কিছুই চিনিনে, তা ছাড়া শুনেচি এ অঞ্চলে সাপখোপের ভয়টাও খুব বেশী। এই ভয়ানক অন্ধকারে কি—

ষোড়শী থামিল না, চলিতে চলিতেই কহিল, পথ আমি চিনি। আপনি আমার ঠিক পিছনে পিছনে আসুন।

বসুসাহেব হাসিলেন, কহিলেন, অর্থাৎ সর্পাঘাতের দুর্ঘটনা ঘটে ত আপনার উপর দিয়েই যাক। তা বটে! আপনি সন্ন্যাসিনী, এ প্রস্তাব আপনি করতেও পারেন, কিন্তু আমার মুশকিল এই যে, আমিও পুরুষমানুষ। অবশ্য এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না জানি, এমন কি হৈমকেও না, কিন্তু তবুও ওটা ঠিক পেরে উঠব না।

এবার ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাহেবের কথা শুনিয়া তাহারও মুখে হাসি ফুটিল। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তা হলে কি-রকম করতে বলেন?

সাহেব কহিলেন, বলা শক্ত। কিন্তু পরামর্শ স্থির হবার পূর্বেই ভিজে উঠতে হবে। বটপত্রে আর বৃষ্টি মানচে না।

কথাটা সত্য। কারণ উপরের জলধারা ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে নামিতে শুরু করিয়াছিল। ষোড়শী কহিল, আপনি বরঞ্চ ওই ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি হৈমকে খবর দিয়ে আলো এবং লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিই গে। আমার অভ্যাস আছে, এ জলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাহেব কহিলেন, অত্যন্ত মনোরম প্রস্তাব। কারণ, বাঙালী সাহেব হয়ে উঠলে যা হন সে আপনি বেশ জানেন দেখচি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আজও একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেছে, হৈম মাঝে থাকায় আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের এখনও সম্পূর্ণ একাকার হয়ে উঠতে পায়নি। এ প্রস্তাবও অচল, সুতরাং চলাই স্থির। চলুন।

বৃক্ষতল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দু'জনেই বুঝিলেন, অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ, বায়ুবেগে বৃষ্টিধারাই যে কেবল গায়ে সূচের মত বিঁধিতেছে তাই নয়, ইতিপূর্বে যে শুষ্ক বালুকারাশি আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া শূন্যে উড়িয়াছে জলধারায় ধুইয়া মাটিতে না পড়া পর্যন্ত চোখ চাহিয়া পথ চলা দুঃসাধ্য।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে ষোড়শী হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার লাগল নাকি?

বসুসাহেব কোনমতে সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া কহিলেন, হাঁ, কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু নয়। চশমাসুদ্ধ চোখ আমার চারটে বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা চার ভাগের এক ভাগ থাকলেও বাঁচতাম। চলুন।

ষোড়শী চলিল না, একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সত্যিই ভাল দেখতে পাচ্চেন না?

বসু কহিলেন, সত্যি। তারপরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বিস্তর ইংরাজী বই মুখস্ত করে সাহেব হতে হয়েচে—তার দক্ষিণাটাও তারা বেশ বড় করেই নিয়েচে। কিন্তু তাই বলে আর দাঁড়িয়ে ভেজাবেন না—এগোন, দু'চক্ষু বুজে চললে যতটা দেখতে পাওয়া যায়, আমি ততটা দেখতে পাবই, এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ভরসা দিচ্চি।

ষোড়শীর কণ্ঠস্বর করুণায় কোমল হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে নদীটা পার হতে আপনার ত ভারী কষ্ট হবে!

বসু বলিলেন, তা ঠিক জানিনে। তবে নদী পার হবার পূর্বেও বিশেষ আরাম পাচ্চিনে। কিন্তু তাই বলে এই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ষোড়শী এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, আপনি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আসুন, এই বলিয়া সে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

এই অপরিচিতা নারীর আচরণ ও সাহস দেখিয়া বাক্‌পটু ব্যারিস্টার ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু সে ওই ক্ষণকালমাত্রই। তারপরে সেই প্রসারিত হাতখানি নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় আশ্রয় করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, চলুন। এইবার আমি সত্যি সত্যিই দু'চক্ষু বুজে চলতে পারব।

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রসর হইলে বসুসাহেব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি আমি সেদিন ভদ্র ব্যবহার করিনি। তার জন্যে ক্ষমা চাইচি, আপনি আমাকে মাপ করবেন।

ষোড়শী এ কথার উত্তরেও কিছুই বলিল না, তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বসু কহিলেন, আপনি হৈমর ছেলেবেলার বন্ধু। আমার সেদিনের আচরণ যাই হোক, আমাকেও ঠিক শত্রু বলেই মনে রাখবেন না। বলিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিলেন।

ষোড়শী একেবারেই নির্বাক। বসুসাহেব নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এঁরা যে আপনাকে সহজে ছাড়বেন তা মনে হয় না। খুব সম্ভব মামলা-মকদ্দমাও হবে। ফকিরসাহেব হয়ত সত্যিই চলে গেছেন, আমিও বোধ হয় থাকব না—

ষোড়শী কিছুই বলিল না। তিনি নিজেও একটু মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আপনি নিজে আর দেবীর পূজো করবেন না বলেচেন, এ কি রাগ করে?

ষোড়শী এবার জবাব দিল, কহিল, না।

তা হলে এর কি সত্যিই কোন কারণ আছে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু কথা কহিল, বলিল, আমরা এবার নদীতে এসেচি, আপনাকে একটু সাবধানে নামতে হবে।

ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই হইল না। ষোড়শী সযত্নে সাবধানে তাঁহাকে জল পার করিয়া লইয়া গেল। আসিবার সময় সাহেব জুতা খুলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর সাহস করিলেন না, যেমন ছিলেন তেমনই গিয়া পরপারে উঠিলেন। একটি তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল, বাঁচলাম।

এই মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া দিয়া সাহেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, পূজারী একজন আছেন বটে, কিন্তু পূজাটা আপনারও একটা কাজের মধ্যেই। অথচ সে প্রশ্নটা আপনি চাপা দিলেন। এদিকে যে ভীষণ দুর্দান্ত শয়তান জমিদারটাকে বাঁচানো আপনার কর্তব্যের অঙ্গ ছিল না, তাঁকে যে উপায়ে বাঁচালেন

তা কেবল আশ্চর্য নয়, অদ্ভুত। এই দুটো ব্যাপারই এমন দুর্বোধ্য যে, গ্রামের লোক বুঝলে না বলে অভিমান করা চলে না।

ষোড়শী তেমনি মৃদুস্বরেই এ অনুযোগের জবাব দিয়া কহিল, অভিমান আমি করিনি।

বসু বলিলেন, করেন নি! সেও অদ্ভুত। আপনার বাবার আচরণ আবার আরও অদ্ভুত। হৈম বলে—কিন্তু হৈমর কথা এখন থাক। কিন্তু আমি বলি, এদের সমস্ত অপরাধটা কেন বুঝিয়েই বলুন না? তাতে কতটা কাজ হবে আমি জানিনে, কিন্তু সে যাই হোক, নারীর সুনামটা ত অবহেলার বস্তু নয়! বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু ষোড়শী কোন প্রত্যুত্তরই যখন দিল না, তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বুঝা গেল এই সুনাম-দুর্নাম সম্বন্ধে সাধারণ রমণীর মত আপনার বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই। আর সাধারণও ত আপনি নন। তা ছাড়া চুপ করে থাকার এই এও অদ্ভুত! বাস্তবিক, আপনার সকলই অদ্ভুত। বলিয়া নিজে একটুখানি চুপবজিদ— করিয়া কহিলেন, সেদিন একটিবার মাত্র আপনাকে দেখেছি, আর আজ হাত ধরে এগিয়ে চলেচি। যাকে আশ্রয় করেচি, তিনিও আমার কাছে যেমন অন্ধকার, যার মধ্যে দিয়ে চলেচি সেও তেমনি অন্ধকার। তবুও নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে যাত্রা করার কোন বাধা হয়নি। আপনাকে ভক্তি না করে থাকবার জো নেই। এই বলিয়া আবার কিছুক্ষণ কোন একটা কথার প্রত্যাশায় থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী। শ্বশুরমশাই আমার যাই কেন করুন না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এই-সব মামলা-মকদ্দমা করায় আপনার গরজ কি?

ষোড়শী এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, কোন গরজ নেই।

তা হলে?

ষোড়শী কহিল, আপনি কোন আশঙ্কা করবেন না; নিরুপায় দুর্বল নারীর ভাগ্যে চিরদিন যা হয়ে আসচে, এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

কথার খোঁচাটা বসুসাহেবের বিঁধিল কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করিলেন না, প্রতিঘাতও করিলেন না। তারপর উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। ঝড় এবং জল কোনটাই থামে নাই বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার প্রকোপ মন্দীভূত হইল, এবং পথে বাঁকটা ঘুরিতেই অদূরে সনাতন মাইতির কুটীরের আলোক দু'জনেরই চোখে পড়িল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তেমন অন্ধকার আর নেই, আপনি এই পথ ধরে সোজা গেলেই রায়মশায়ের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছুবেন।

আর আপনি?

আমার পথ এই বাঁ দিকের বাগানের ভেতর দিয়ে।

বসু হাত ছাড়িলেন না, কহিলেন, পরের মুখে শুনেচি আপনি অতিশয় শিক্ষিতা, আমি নিজে কতটুকু জেনেচি সে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এর বেশী জানবার অবকাশ আর যদি কখনো ভাগ্যে নাও ঘটে, আজকের এই অভিযানের স্মৃতিটা আমার চিরদিন বড় শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে থাকবে।

ষোড়শী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু, কেবলমাত্র এইটুকুই যদি কেউ বাইরে থেকে দেখে থাকে, তার সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে না।

সাহেব মনে মনে চমকিয়া গেলেন। তারপরে সেই ধরা-হাতটির উপর আর একটুখানি চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না, বানিয়ে বলা গল্পের মত শোনাবে। তাই একে ঘুলিয়ে নোংরা করে না তুলে বরঞ্চ চুপ করে থাকাই ভাল। এই না?

ষোড়শী ইহার জবাব না দিয়া কহিল, আমার জন্যে অপেক্ষা করে অনেক ভিজেছেন, অনেক দুঃখ পেয়েচেন—আর না। আমিও চললুম।

হৈমকে কি কিছু বলে পাঠাবেন না??বসু কহিলেন, এই কথাটাই হয়ত আমাকে অনেকদিন ধরে ভাবতে হবে। কাল আমরা যাচ্চি—

ষোড়শী একমুহূর্ত কি ভাবিয়া কহিল, না। কেবল তার ছেলেকে আশীর্বাদ করচি, যদি ইচ্ছে হয় এইটুকু জানাবেন। বলিয়াই সে আর কোন প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধকার বনপথ ধরিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব সেইখানে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা নমস্কার পর্যন্ত করা হইল যে ফকিরের জন্য এই, তাঁহার উদ্দেশে একটা নমস্কার পর্যন্তও জানানো হইলতনা— না। তাহার পরে নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

দশ

বসুসাহেব যখন শ্বশুরবাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারই জন্য বাড়িময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়া গেছে। ঘরে এবং বাইরে যেখানে যত আস্ত এবং ভাঙ্গা লণ্ঠন ছিল সংগ্রহ হইয়াছে, এবং এই দুর্যোগের রাত্রে এগুলিকে কার্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বাড়িসুদ্ধ সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। চাকর-বাকর ও আত্মীয় অনুগত লইয়া একটা অভিযানের দল তৈরি হইয়াছে এবং রায়মহাশয় নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন কাহারা কোন্ দিকে যাইবে, কোন্ পথ, কোন্ মাঠ, কোন্ বন-জঙ্গল অনুসন্ধান করিবে, বারংবার উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে কেবল উদ্বেগ নয়, আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু যে ভয়টা তাঁহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগদী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্যন্ত ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে কোথাও একাকী পাইয়া যদি তাহাদেরইলেখা আছে— ভৈরবী-মায়ের প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া সহসা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠে ত সেখানেও বিচারের আশা করা বৃথা।

হৈম একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, পিতার আশঙ্কাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু তখন পর্যন্ত সে ভিতরের আসল কথাটা জানিত না। এইটাই আত্মপ্রকাশ করিল তাহার জননীর কথায়। তিনি হঠাৎ বাহিরে আসিয়া স্বামীকে কঠোর অনুযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে জামাই মানুষ, তাকে কেন তোমাদের ঝগড়ার মধ্যস্থ মানা? যার পেছনে ডাকাতের দল রয়েচে তাকে করবে তোমরা জব্দ? যেখানে পাও আমার নির্মলকে খুঁজে এনে

দাও, নইলে যেখানে দু’চক্ষু যায় এই অন্ধকারে আমি বেরিয়ে যাবো। বলিয়া তিনি কাঁদ-কাঁদ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণের জন্য কন্যা ও পিতা উভয়েই নির্বাক্ বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জনার্দন রায় আত্মসংবরণ করিয়া সান্ত্বনা ও সাহসসূচক কি একটা কথা হৈমকে বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে জামাতা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছে, জামা-কাপড় জুতা কাদামাখা। শ্বশুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া কিন্তু পরক্ষণেই যে সাহেব জামাইকে তিনি যথেষ্ট খাতির এবং ভয় করিতেন,,গেল— তাহাকেই আনন্দের উৎকট প্রাবল্যে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সাহেব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া হাতের ভাঙ্গা ছড়িটা রাখিয়া দিলেন, এবং পায়ের জুতা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া ফেলার মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, আত্মীয়-পর সকলে একযোগে ও নির্বিশেষে প্রশ্ন করিতে লাগিল, কি করিয়া এ দুরবস্থা ঘটিল এবং কোথায় ঘটিল?

রায়মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে পরে হবে, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। মা হৈম, দাঁড়িয়ে থেকো না, একটা শুকনো কাপড়চোপড় দাও গে।

বাটীর মধ্যে শাশুড়ী ও সমবেত কুটুম্বিনীগণের প্রশ্নের উত্তরে নির্মল জানাইল, সে ওপারে ফকিরসাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আশ্রমে নাই।

ওপারের নামে একপ্রকার আতঙ্কসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। রায়মহাশয় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া! আমাকে বললে ত তাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিনলে কি করে?

নির্মল কহিল, পথ চেনবার আমার দরকার হয়নি, হলে পারতাম না।

কিন্তু এলে কি করে?

একজন আমাকে হাত ধরে এনে বাড়ির সামনে দিয়ে গেছেন।

—কে? কে? কি নাম তার??চতুর্দিকে প্রশ্ন উঠিল

নির্মল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, কি জানি, নামটা জানাতে হয়ত তাঁর আপত্তি আছে।

রায়মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আপত্তি? কখ্‌খনো না, আমাদের দেশের লোককে তুমি চেনো না। কিন্তু যেই হোক তাকে খুশী করে দেওয়া চাই ত? বলিয়া চাকরটাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন, অধর, চাটুয্যে যদি বাইরে থাকে, এখনি বলে দে কাল সকালেই খবর নিয়ে যেন বকশিশ দেওয়া হয়। পুরো টাকাই যেন তার হাতে পড়ে—কেটে যেন কিছু না রাখে। চাটুয্যেটা আবার যে কৃপণ! বলিয়া তিনি ঔদার্যের আবেগে প্রথমে গৃহিণী ও পরে কন্যা-জামাতার মুখের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর নিরালা ঘরের মধ্যে স্বামীকে একাকী পাইয়া হৈম কহিল,বাবা ত পুরস্কারের ঘোষণা করে দিলেন, পুরো টাকাটা দেবার চেষ্টাও হয়ত কিছু হবে, কিন্তু ফল হবে না।

নির্মল কহিল, না, আসামীকে পাওয়া যাবে না।

হৈম একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি সেই দয়ালু লোকটিকে কি পুরস্কার দিলে?

নির্মল কহিল, দেওয়া জিনিসটা কি তুমি এতই সহজ মনে কর? ও কি কেবলমাত্র দাতার মর্জির উপরেই নির্ভর করে?

তা হলে দিতে পারোনি?

না, দেবার চেষ্টাও করিনি।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার উচিত। বাবা তাঁকে বার করতে পারবেন না, কিন্তু আমি পারব।

নির্মল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার মনে হয় তোমার বাবার মত তুমিও তাঁকে খুঁজে পাবে না।

হৈম বলিল, যদি পাই ত আমাকেও কিছু পুরস্কার দিয়ো। কিন্তু আমি তাঁকে চিনেছি। কারণ তোমার মত অন্ধ মানুষকে যে এই ভয়ানক অন্ধকারে নির্বিঘ্নে নদী পার করে ঘরের সামনে রেখে যেতে পারে, অথচ আত্মপ্রকাশ করে না, তাকে চিনতে পারা শক্ত নয়। তা ছাড়া সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢেকে আমিও একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘরদোর খোলা; তিনি নেই বটে, কিন্তু তারাদাস ঠাকুর সমস্ত দখল করে বসে আছেন।

লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। পথে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সে বলে দিলে, ষোড়শীকে সে সোজা নদীর পথে যেতে দেখেচে। এখন বুঝলে, যে দয়ালু লোকটি তোমাকে দিয়ে গেছেন তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি একেবারে হাত ধরে রেখে গেছেন?

নির্মল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, সত্যই তাই। যে মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন আমি অন্ধের সমান, সেই মুহূর্তে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্য এ কাজ তুমি পারতে না।

হৈম অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া কহিল, না।

তাহার স্বামী কহিল, তা জানি। ইহার পরে কি করিয়া কি হইল সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, অথচ এ ছাড়া আমার পক্ষে যে কি উপায় ছিল জানিনে। আবার ওদিকে তাঁর বিপদের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখ। আমাকে তিনি সামান্যই জানতেন এবং তাও বোধ হয় ভাল করে জানতেন না। তবুও আমাকেই এই যে নির্জন অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে এলেন, এর দায়িত্বটা কত বিশ্রী, কত ভয়ঙ্কর! বস্তুতঃ পথ চলতে চলতে আমার অনেকবার ভয় হয়েচে যদি কারো সুমুখে পড়ি, তার চোখে এটা কি রকম দেখাবে? দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু আজ নিশ্চয় বুঝেচি এঁর সম্বন্ধে বিচার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয় সতীত্ব

জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই একটা বাহুল্য বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয় এর সুনাম-দুর্নাম একে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।

হৈম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি জমিদারের ঘটনা মনে করেই এ-সব বলচ?

নির্মল বলিল, আশ্চর্য নয়। এই স্ত্রীলোকটি ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, ইনি যেমন গভীর, তেমনি শিক্ষিত, তেমনি নিঃশঙ্ক। শাস্ত্রে বলে, সাত পা একসঙ্গে চললে বন্ধুত্ব হয়; এতবড় পথটায় এই দুর্ভেদ্য আঁধারে নিতান্ত তাঁকেই নির্ভর করে অনেক পা আমরা একসঙ্গে চলে এসেচি, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেচি, কিন্তু কালও তিনি যেমন রহস্যে ঢাকা ছিলেন আজও তেমনি রয়ে গেলেন।

হৈম কহিল, তোমার জেরাও মানলে না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলে না?

নির্মল কহিল, না, কোনটাই হলো না।

হৈম এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্মল কহিল, এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে চাও? কিন্তু নিজেকে জানতেও যে দেরি লাগে হৈম। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে থমকিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল হৈমও তাহার প্রতি দুই চক্ষের স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া আছে। তাহার মুখে কি ভাব প্রকাশ পাইল, প্রদীপের স্বল্প আলোকে ঠিক বোঝা গেল না, এবং সে নিজেও যে নিজের পূর্বকথার যোগ রাখিয়া হঠাৎ কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্বেই হৈম ধীরে ধীরে কহিল, সে ঠিক। তবু পুরুষমানুষদের বুঝতে হয়ত একটু দেরিই হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিশাপ যে, আমরণ নিজের অদৃষ্টকে বুঝতেই তার কেটে যায়। আচ্ছা তুমি

ঘুমোও, আমি এখনি আসচি, বলিয়া সে আর কোন কথার পূর্বেই উঠিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্মল তাহার হাত ধরিল না—রহস্যের অন্তরালে স্ত্রীর এই অর্থহীন সংশয় ও অবিচারের বেদনা তাহাকে যেন অকস্মাৎ ক্রোধে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সুমুখের বড় ঘড়িটায় অত্যন্ত ক্লেশকর মিনিটের কাঁটাটা নড়িতে নড়িতে নীচে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু তখন পর্যন্তও যখন সে ফিরিয়া আসিল না, তখন আর সে একাকী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দায় একটা থামের পাশে হৈম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাটে সমস্ত ভিজিয়া গেছে। হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া কহিল, তুমি কি পাগল হয়েচে হৈম?

ইহার অধিক আর তাহার মুখেও আসিল না, আসার প্রয়োজনও বোধ করিল না। প্রদীপের আলোকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, অশ্রুর আভাস চোখের কোণ হইতে তখন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

এগার

সকালে উঠিয়া হৈম নিজের গতরাত্রির ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। নির্দোষ ও চরিত্রবান স্বামীর প্রতি এই অহেতুক অভিমানের উৎপাতটাকে সে ঝড়-জল ও দুর্যোগের মধ্যে তাহার আকস্মিক নিরুদ্দেশের আতঙ্কটার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতে চাহিল, কিন্তু সমস্ত প্রাণটাকে খুলিয়া দিয়া যে হাসি তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিছুতেই আজ তাহার আর নাগাল পাইল না। চোখের বালি বাহির হইয়া গিয়াছে বুঝিয়াও অবোধ চোখ-দুটা যেন তাহার কোনমতে নিঃশঙ্ক হইতে চাহিল না। শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিয়াছেন—সাড়ে-দশটা না কিছুতেই উত্তীর্ণ হয়। মা ভাঁড়ার ঘরে যাত্রার আয়োজন ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা করিতে অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার মুহূর্তের অবকাশ নাই, এমনি সময়ে সদর হইতে ডাক আসিল, রায়মহাশয় কন্যাকে আহ্বান করিয়াছেন।

হৈম বাহিরে আসিয়া দেখিল কিসের যেন একটা উৎসব চলিয়াছে। পিতা ফরাসের উপর বাঁধা-হুঁকা হাতে বার দিয়া বসিয়াছেন, শিরোমণিমহাশয় আছেন, জমিদারের গোমস্তা এককড়ি নন্দী আছে, তারাদাস আছে, আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, তাহার স্বামীও একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবল্যে সবাই একযোগে সংবাদটা হৈমর গোচর করিতে গিয়া প্রথমটা কিছু বুঝাই গেল না। শিরোমণির দাঁত নাই, কিন্তু আওয়াজ আছে—তাহার বিপুল শক্তি মুহূর্তেই আর সমস্ত থামাইয়া দিয়া যাহা প্রকাশ করিল তাহা এইরূপ—কাল ভয়ানক দুর্যোগের রাত্রে মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে—নির্বিঘ্নে শত্রুপুরী হস্তগত হইয়াছে। ভৈরবী বাড়ি ছিল না, চরের মুখে খবর পাইয়া তারাদাস সেই মেয়েটাকে লইয়া এই অবকাশে গিয়া সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে।

বিবাদ করা দূরে থাক, ভয়ে সে কথাটি পর্যন্ত বলে নাই, সামান্য কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া রাত্রেই বাহির হইয়া গেছে। প্রাচীরের বাহিরে মন্দির-সংলগ্ন যে চালাটার মধ্যে দূরের যাত্রীরা কেহ কেহ রান্নাবাড়া করিয়া খায়, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এ-সমস্ত মা-চণ্ডীর কৃপা এবং এই কৃপাটা আর একটুখানি বৃদ্ধি পাইলেই তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়াও কঠিন কাজ হইবে না।

উৎফুল্ল তারাদাস উপরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সবিনয় হাস্যে কহিল, সমস্তই মায়ের কাজ—যা করবার তিনি করেছেন, নইলে অতবড় রায়বাঘিনী একেবারে ভেড়া হয়ে গেল! তামাকটি ধরিয়া সবে ফুঁ দিচ্চি, মেয়েটা পাশে বসে চা-সিদ্ধটুকু ছেঁকে দিচ্চে, এমনি সময়ে কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির। আমাদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল; খানিক পরে আস্তে আস্তে বললে, বাবা, আমি ত কখনও বলিনি তুমি যাও, কিংবা এখানে থেকো না। নিজে রাগ করে চলে গিয়ে কত কষ্ট না পেলে!

আমি বললাম, হঃ—

দোরের উপরে উঠে বলল, এ ঘরে তুমি কি তালা দিয়েচ বাবা?

বললাম, হঃ—দিইচি। কি করবি কর্।

চুপ করে থেকে বললে, তোমার সঙ্গে আমি কিছুই করব না বাবা, তোমরা থাকো। কেবল ঘরটা একবার খুলে দাও, আমার কাপড় দুখানা নিই।

দিলাম খুলে। মা চণ্ডীর দয়ায় আর কোন দাঙ্গা করলে না; পরবার খান-দুই কাপড়, একটা কম্বল, আর একটা ঘটি নিয়ে অন্ধকারেই ভিজতে ভিজতে দূর হয়ে গেল। মাকে গড় হয়ে নমস্কার করে বললাম, মা এমনি দয়া যেন ছেলের ওপর থাকে। তোর নাম না করে কখনো জলগ্রহণ করিনে!

শিরোমণি হাত নাড়িয়া কহিলেন, থাকবে! থাকবে! আমি বলচি তারাদাস, মা মুখ তুলে চাইবেন। নইলে তাঁর জগদম্বা নামই যে বৃথা!

এককড়ি কহিল, কিন্তু ঠাকুর, যাই বল মায়ের গদি কখনো খালি থাকতে পারবে না, তোমার মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করতে বিলম্ব করলেও চলবে না বলে রাখচি।

রায়মহাশয় পোড়া হুঁকাটা পাশের লোকটির হাতে দিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, হবে, হবে, সব হবে, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব, তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। জামাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি বাবা, ছুঁড়ির কাছ থেকে একছত্র লিখিয়ে নেওয়া ত চাই? চাই বৈ কি! তাও হবে—ডেকে আনিয়ে দুটো ধমক দিয়ে এও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু তাও বলে রাখচি তারাদাস, কদমতলার ওই জমিটি নিয়ে হাঙ্গামা করলে চলবে না। ধানের আড়তটা আমার সামনে সরিয়ে না আনলে চারিদিকে আর চোখ রাখতে পারচি নে। মেলার নাম করে ষোড়শীর মত ঝগড়া করলে কিন্তু—

কথাটা সমাপ্ত করিতেও হইল না। অনেকেই তারাদাসের হইয়া রাজী হইয়া গেল, এবং সে নিজে জিভ কাটিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, অমন কথা মুখেও আনবেন না রায়মশাই, আপনারাই ত সব! হাতীর সঙ্গে মশার বিবাদ! কি বল মা? বলিয়া সে একটা ভাল কথা কিংবা একটুখানি ঘাড়-নাড়া কিংবা এমনি কিছু একটা শুনিবার প্রত্যাশায় হৈমর মুখের প্রতি চাহিল, এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার উপরে গিয়া পড়িল। হৈম কিছুই কহিল না; পরন্তু তাহার মুখের চেহারায় ষোড়শীর সেই প্রথম বিচারের দিনটাই সকলের দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ যেন কোথা হইতে আসিয়া পলকের নিমিত্ত ঘরের মধ্যে ছায়াপাত করিল—কিন্তু পলকমাত্রই। রায়মহাশয় সোজা হইয়া বসিয়া তামাকের জন্য একটা উচ্চ হাঁক দিয়া কহিলেন—বাবা নির্মল, যাত্রার সময়টা শিরোমণিমশায় দশটার মধ্যেই দেখে দিয়েচেন; মেয়েদের কাণ্ড—একটু সকাল সকাল তৈরি না হতে পারলে বার হওয়াই যাবে না।

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর কিছু বলিবার পূর্বেই হৈম নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মুখ-হাত ধোয়া হইতে স্নান পর্যন্ত সমাধা করিতে বসুসাহেবের বেশী বিলম্ব হইল না। বাটীর মধ্যে পা দিয়াই শাশুড়ীর উচ্চকণ্ঠ রান্নাঘর হইতে শুনা গেল, তিনি মেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন। সে যে ঘরের মধ্যে কি করিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। নির্মল ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল হৈম মেঝের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, তোমার মা যে ভারী বকাবকি করচেন? তা ছাড়া সময় ত বেশী নেই।

হৈম কহিল, ঢের সময় আছে—আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

কেন?

হৈম কহিল, কেন কি? ষোড়শীর এতবড় বিপদে তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই যাবো?

নির্মল কহিল, বেশ ত দেখা করেই এসো না। তারও ত সময় আছে।

হৈম বলিল, আর তুমিই বা একবার দেখা না করে কি করে যেতে পারবে?

এই যে সেই গতরাত্রির প্রতিক্রিয়া তাহা মনে মনে বুঝিয়া নির্মল কহিল, চেষ্টা করলে তাও বোধ হয় পারা যাবে। অসম্ভব রকমের শক্ত কাজ নয়, কিন্তু আমি একবার দেখা করে গেলেই যে এ বিপদে তার সুবিধে হবে মনে হয় না।

হৈম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না, সে কোনমতেই হবে না।

হবে না কেন? তা ছাড়া আমার যে সেই সৈদাবাদের চামড়ার মামলা আছে—

থাক তোমার চামড়ার মামলা, একটা তার করে দাও। আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

বেশ ত, চল নাহয় দুজনে একবার দেখা করেই আসি? সে সময় ত আছে।

হৈম মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, সে তোমার সেখানে হয়, কিন্তু এখানে হয় না। আর এত লোকের সামনে বাবাই বা কি মনে করবেন? রাত্রে আমরা লুকিয়ে যাবো।

নির্মলের যথার্থই অত্যন্ত জরুরি মকদ্দমা ছিল, তা ছাড়া কোন্ ছুতায় যে যাওয়া এমন হঠাৎ স্থগিত করা যাইতে পারে, সে ভাবিয়া পাইল না, বিশেষতঃ শ্বশুরের সঙ্গে ইহাতে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিন্তা করিয়া কহিল, সে হয় না হৈম, যেতে আমাদের আজ হবেই। আর মনে হয় আমরা মাঝে পড়ে বিপদটা হয়ত তাঁর আরও বাড়িয়ে তুলব। আমার কথা শোন, চল, অযাচিত মধ্যস্থতায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হয়।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে ত তুমি জানো, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আর, কালকের অপরাধে যদি আমাকে তুমি শাস্তি দিতেই চাও, ত ফেলে রেখে যাও। আমি আর তোমাকে আটকাবো না।

নির্মল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নয়, আজ যাওয়া হইল না শুনিয়া শাশুড়ীঠাকুরানী আশ্চর্য হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং ততোধিক খুশী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্বশুরমহাশয় শুধু একটা হুঁ বলিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্যও হইলেন না, উদ্বিগ্নও হইলেন না, এবং যাহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া খুশির কথা মুখে আনিবে না।

মকদ্দমার ব্যবস্থা করিতে নির্মল তার করিয়া দিল এবং কাজটা যে কেবল নিরর্থক নয়—মন্দ, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল, তবুও সেই মনটাই তাহার সারাদিন একান্ত সংগোপনে সেই দিনান্তের জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিল। বিগত

রাত্রির হৈমর কান্নাটা যে কত হাস্যাস্পদ, কত অসম্ভব, অপেক্ষাও অসম্ভব, সমস্ত দিন ধরিয়া এ কথা তার বহুবার মনে হইয়াছে, তবুও সেই একফোঁটা চোখের জল যেন কোনোমতেই আর শুকাইতে চাহিল না এবং প্রতি মুহূর্তেই সে এমনই একটা অজ্ঞাত ও অচিন্তপূর্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া চলিল, যাহা একই কালে মাধুর্য ও তিক্ততায় মিশিয়া একাত্ম হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারেও পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার প্রয়াস নিষ্ফল বুঝিয়া হৈম স্বামী ও তাহার পশ্চিমা চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া যখন ষোড়শীর নূতন বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ষোড়শী একখানি কম্বলের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সম্মুখে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন। এস দিদি, এস। বলিয়া সে গুটানো কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া পাতিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হৈম কহিল, দিদির এই নতুন ঘরখানির আর যা দোষ থাক, অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণিমশাই এমন কি আমার বাবা পর্যন্ত দিতে পারবেন না। এই আশ্চর্য বস্তুটি দেখাবার লোভ দিয়েই আজ এঁকে ধরে রেখেচি, নইলে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে দুপুরের গাড়িতে চলে গিয়েছিলেন আর কি! স্বামীকে কহিল, কেমন, এ না দেখে গেলে অনুতাপ করতে হ’তো?

নির্মল কহিল, দেখেও ত কিছু কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভাল। তাহার পর ষোড়শীর শান্ত মলিন মুখখানির উপর নিজের স্নিগ্ধ চোখ দুটি রাখিয়া বলিল, আমরা সমস্তই শুনেচি। কিন্তু এ পাগলামি কেন করতে গেলে দিদি, এ-ঘরে তুমি ত থাকতে পারবে না! আবেগে ও করুণায় শেষ দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

কিন্তু ষোড়শীর গলায় ইহার প্রতিধ্বনি বাজিল না। সে অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, অভ্যাস হয়ে যাবে। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই। তা ছাড়া, বাবার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হৈম প্রশ্ন করিল, তা হলে সমস্তই ছেড়ে দিলে?

ইহার উত্তর তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল, সে কহিল, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবারাত্রি বিবাদ করে টিকতে পারে না। ষোড়শীকে কহিল, এই ভাল। যদি স্বেচ্ছায় এইখানে থাকাই সঙ্কল্প করে থাকেন, এবং কুটীরও অভ্যাস হয়ে যাবে বিশ্বাস করে থাকেন—সংসারে কিছুই ত্যাগ করা আপনার শক্ত হবে না।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল, এবং তাহার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা গেল না।

হৈম বলিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, বিষয়-আশয় ছাড়া তোমার কঠিন নয়, কুঁড়েও তোমার সইবে আমি জানি, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয়, সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে আবার মিথ্যে কাজের সৃষ্টি হয় তার গুরুভারটাই সওয়া যায় না।

হৈম কহিল, কিন্তু এককড়ি নন্দী যে কথা এবং কাজ দুই-ই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্চে? মেয়েমানুষের জীবনে সে যে অসহ্য।

ষোড়শী লেশমাত্র উত্তেজিত হইল না, আস্তে আস্তে কহিল, আমি যতদূর শুনেচি, এককড়ি মিথ্যে ত বিশেষ বলেনি। জমিদারবাবু হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না—আমি তাঁর সেবা করেচি। এ ত অসত্য নয়।

হৈম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একজনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল, কহিল, কিন্তু সকলেই ত সব কাজ পারে না দিদি। আর্তের সেবা করারও ত একটা ধারা আছে।

ষোড়শী তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছে বৈ কি। কিন্তু স্থান কাল না বুঝে কেবল বাইরে থেকে ধারাটা স্থির করে দেওয়া যায় না হৈম। আপনি কি বলেন? এই বলিয়া সে নির্মলের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল।

নির্মল এ ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কহিল, অন্ততঃ আমি ত কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনে। তা ছাড়া কাজের ধারা সকলের একও নয়—এই যেমন সন্ন্যাসিনীর।

স্বামীর এই উক্তিটাকে হৈম তলাইয়া দেখিল না, কহিল, হোক সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাঁর কি ধর্ম নেই? তিনি কি নারী নয়? আপনাকে সে ঘর থেকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, অথচ বললেন নিজে গিয়েছিলেন। এই মিথ্যের কি আবশ্যক ছিল? তাঁর অসুখ ত কেবল নিজের দোষে। তবুও এতবড় ঘোর পাপিষ্ঠকে বাঁচাবার আপনার কি দরকার ছিল? এর পরেও মানুষে যদি সন্দেহ করে, সে কি তাদের দোষ?

স্ত্রী কথা শুনিয়া নির্মল ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে জানিত, অভিযোগ করিতে হৈম ঘর হইতে বাহির হয় নাই—বাড়ি চড়িয়া অপমান করিবার মত ক্ষুদ্র এবং হীন সে নয়, বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটা বড় রকমের ভরসা দিতেই সে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কথায় কথায় এ-সকল কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল! কিন্তু পাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া আরও বেশী কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আবশ্যক হইল না। ষোড়শী হাসিয়া বলিল, তোমার স্বামী বলছিলেন সন্ন্যাসিনীর ধর্ম অ-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, এই যেমন কুঁড়ের মধ্যে নিরাশ্রয়, ধূলোবালির ওপর একাকী বাস করা তোমার সহ্য হবে না। বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া কহিল,

সত্যিই আমাকে ঘরে থেকে টেনে-হিঁচড়ে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আমি রাগের মাথায় আপনিই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নির্মল কহিল, কিন্তু আপনার রাগ আছে বলে ত মনে হয় না?

ষোড়শী হাসি চাপিয়া শুধু বলিল, আছে বৈ কি! হৈমকে কহিল, কিন্তু সে তর্ক আমি করচি নে, সত্যিই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু ঘোর পাপিষ্ঠ বলে কি তাকে বাঁচাবার অধিকারও কারও নেই? তোমার স্বামী উকিল, তাঁকে বরঞ্চ সময়মত জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নির্মল বলিল, সময়মত সাধারণ বুদ্ধিতে একটা জবাব দিতেও পারি, কিন্তু ওকালতি বুদ্ধিতে ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ষোড়শী কহিল, তা ছাড়া এমন ত হতে পারে, সজ্ঞানে অনেক কর্ম্মই তিনি করেন না—

হৈম বাধা দিয়া কহিল, তাই বলে কি নিজের বাপের বিরুদ্ধেও যেতে হবে? এও কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম?

ষোড়শী রাগ করিল না, হাসিমুখে কহিল, সন্ন্যাসিনীর হোক না হোক মেয়েমানুষের অন্ততঃ এমন জিনিস সংসারে থাকতে পারে যা বাপেরও বড়। তাই যদি না হতো হৈম, এই ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে তোমার পায়ের ধূলোই বা পড়ত কি করে?

হৈম শশব্যস্তে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, অমন কথা তুমি মুখেও এনো না দিদি। আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধূলোবালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেমনি কঠিন, তেমনি খাঁটি—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয়, দেশ-সুদ্ধ লোক

সবাই ভুল করেচে, কেউ কিছু জানে না—তুমি ইচ্ছে করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। কেন দিচ্চ না দিদি?

ষোড়শী তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাদের যাওয়ার কথা ছিল, হলো না কেন? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে?

হৈম তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, কাল রাত্রে কে একে হাত ধরে নদী মাঠ প্রান্তর নির্বিঘ্নে পার করে এনে বাড়িতে দিয়ে গেছেন, আমার বাবা তাঁকে পুরো এক টাকা বকশিশ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু টাকাটা তাঁর হাতে পড়বে না, কারণ তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। এই অন্ধ মানুষটিকে অমন করে দিয়ে না গেলে যে কি হতো সে কেবল আমিই জানি, আর আমিই কেবল তাঁর নাম জানি। কিন্তু টাকাকড়ি ত তাঁকে দেবার জো নেই—তাই কেবল একটু পায়ের ধূলো নিতে—বলিয়া সে তাহার হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ষোড়শী নিজের মুঠাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া কেবল একটু হাসিল।

হৈম বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কোণটা মুছিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, পায়ের ধূলো দিতে হবে না দিদি, মুঠোটা একটু আলগা কর—আমার হাত ভেঙ্গে গেল। শক্ত কেবল মনই নয়, হাতটাও কম নয়! ইস্পাতের তলোয়ারটা কি সাধে মনে পড়ে! কিন্তু এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয় এই প্রবাসী বোনটিকে তখন স্মরণ করবে?

ষোড়শী তাহার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

হৈম কহিল, তাহলে কথা দিতে চাও না?

ষোড়শী বলিল, আমার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় এই কি আমি চাইতে পারি ভাই?

নির্মল কহিল, ঝগড়া না করেও ত অনেক জিনিস করা যায়?

ষোড়শী বলিল, আমি বলি তা-ও আপনাদের চেষ্টা করে কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবাসী বোনটিকেও আমি ভুলে যাবো না। আমার খবর আপনারা পাবেন।

চাকরটা এতক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়াছিল, সে কহিল, মা, কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে—মেঘ উঠেচে।

হৈম বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া এবার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্মল হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চিরদিন ঋণীই রয়ে গেলাম, শোধ দেবার আর কোন পথ রইল না। আদালতের মানুষ, বিষয়-সম্পত্তিওয়ালা ভৈরবীর কাজে লাগলেও লাগতে পারতাম, কিন্তু কুঁড়েঘরের সন্ন্যাসিনীরা আমাদের হাতের বাইরে। সমস্ত না ছেড়েও উপায় ছিল না সত্যি, কিন্তু ছেড়েও যে উপায় হবে তা ভরসা হয় না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে বললে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়েচি? আমি ত কিছুই ছাড়িনি।

নির্মল ও হৈম উভয়েই অবাক্ হইয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছাড়েন নি? কোন স্বত্বই ত্যাগ করেন নি?

ষোড়শী তেমনি শান্তসহজ-কণ্ঠে কহিল, না কিছুই না। আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার এক তিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষমানুষ, তাঁদের জোর আছে, কিন্তু সেই জোরটা তাঁদের ষোল আনা সপ্রমাণ না করে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার জো নেই—মাটির একটা ঢেলা পর্যন্ত না। নির্মলবাবু, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু সংসারে সেটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।

কথা শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলে নাই—অন্ধকারে তাহার মুখ, তাহার চোখ, তাহার ক্ষীণ দেহের অস্পষ্ট ঋজুতা ভিন্ন আর

কিছুই লক্ষ্য হইল না, কিন্তু ওই শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরও যে মিথ্যা আস্ফালন উদ্গীর্ণ করে নাই, তাহা মর্মের মাঝখানে গিয়া উভয়কেই সবলে বিদ্ধ করিল।

অনতিদূরে পথের বাঁকটার কাছে একটা গোলমাল শুনা গেল। আগে এবং পিছনে কয়েকটা আলোর সঙ্গে গোটা-দুই পালকি চলিয়াছে।

অন্ধকারে নজর করিয়া দেখিয়া নির্মল কহিল, জমিদারবাবু তাহলে আজই পদধূলি দিলেন দেখচি।

ষোড়শী ভিতর হইতে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, জমিদারবাবু! তাঁর কি আসবার কথা ছিল? বলিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্মল কহিল, হাঁ, তাঁর নদীর ধারের নরককুণ্ডর ঝাড়ামোছা চলছিল। এককড়ি বলছিল, শরীর সারাবার জন্যে হুজুর আজকালের মধ্যেই স্বরাজ্যে পদার্পণ করবেন। করলেনও বটে।

ষোড়শী নির্বাক্ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায় লইয়া নির্মল আস্তে আস্তে কহিল, যত দূরেই থাকি, আমরা বেঁচে থাকতে নিজেকে একেবারেই নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় ভেবে রাখবেন না। বলিয়াই সে হৈমর হাত ধরিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইল। ষোড়শী তেমনি স্থির তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল, এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

বারো

বিপুলকায় মন্দিরের প্রাচীরতলে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পালকি দুটা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। এই অত্যন্ত আঁধারে মাত্র ওই গোটা-কয়েক আলোর সাহায্য মানুষের চক্ষে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ষোড়শীর মনে হইল লোকটিকে সে যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এবং শুধু কেবল তিনিই নয়, তাঁহার পিছনে ঘেরাটোপ ঢাকা যে পালকিটি গেল, তাহার অবরোধের মধ্যেও যে মানুষটি নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহারও শাড়ির চওড়া কালাপাড়ের একপ্রান্ত ঈষন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া আছে, সেটুকুও যেন তাহার চোখে পড়িল। তাহার হাতের তীর-কাটা চুড়ির স্বর্ণাভা লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য যে খেলিয়া গেল এ-বিষয়েও তার সংশয় রহিল না। তাহার দুই কানে হীরার দুল ঝলমল করিতেছে, তাহার আঙুলে আঙটির পাথরে সবুজ রঙ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সহসা কল্পনা তাহার বাধা পাইয়া থামিল। তাহার স্মরণ হইল এ সমস্তই সে এইমাত্র হৈমর গায়ে দেখিয়াছে। মনে পড়িয়া একাকী অন্ধকারেও সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী! চণ্ডী! বলিয়া সে সম্মুখের মন্দিরের উদ্দেশে চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়া দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে আর দুটি নর-নারীর চিন্তায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। ক্ষণেক পূর্বেও সকল কথাবার্তার মধ্যেও ঝড়বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে নাড়া দিয়া গেছে। উপরে কালো ছেঁড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছে, হয়ত দুর্যোগের মাতামাতি অচিরেই আরম্ভ হইয়া যাইবে। বিগত রাত্রির অর্ধেক দুঃখ ত তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, বাকী রাতটুকুও মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কোনমতে কাটিয়াছে, এই প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা তাহার অভ্যাস নয়—দেবীর ভৈরবীকে এ-সকল ভোগ করিতেও হয় না, তবুও কাল

তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। যে বাড়ি, যে ঘরদ্বার স্বেচ্ছায় সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে দান করিয়া আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে সারাদিন আজ কোন চিন্তাই সে করে নাই; কিন্তু এখন হঠাৎ সমস্ত মন যেন তাহার একেবারে বিকল হইয়া গেল। এই নির্জন পল্লীপ্রান্তে একাকিনী এই ভাঙ্গা স্যাঁতসেঁতে গৃহের মধ্যে কি করিয়া তাহার রাত্রি কাটিবে? নিজের আশেপাশে চাহিয়া দেখিল। স্তিমিত দীপালোকে ঘরের ও-দিকের কোণ দুইটা আবছায়া হইয়া আছে, তাহারই মাঝে মাঝে ইন্দুরের গর্তগুলা যেন কালো কালো চোখ মেলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের বুজাইতে হইবে; মাথার উপরে চালে অসংখ্য ছিদ্র, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি শুরু হইলে সহস্রধারে জল ঝরিবে, দাঁড়াইবার স্থানটুকু কোথাও রহিবে না, এইসব লোক ডাকাইয়া মেরামত করিতে হইবে; কবাটের অর্গল নিরতিশয় জীর্ণ, ইহার সংস্কার সর্বাগ্রে আবশ্যক, অথচ দিন থাকিতে লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই অরক্ষিত, পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে—কেবল আজ নয়—দিনের পর দিন বাস করিবে সে কেমন করিয়া?

তাহার মনে পড়িল, এইমাত্র বিদায়ক্ষণে নির্মলের কথার উত্তরে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ শীঘ্র আর হয়ত দেখা হইবে না। সে ভরসা দিয়া বলিয়া গেছে নিজেকে একেবারে নিরুপায় না ভাবিতে। হয়ত সহস্র কাজের মধ্যে এ কথা তাহার মনেও থাকিবে না। থাকিলেও, পশ্চিমের কোন্ একটা সুদূর শহরে বসিয়া সে সাহায্য করিবেই বা কি করিয়া, এবং তাহা গ্রহণ করিবেই বা সে কোন্ অধিকারে? আবার হৈমকে মনে পড়িল। যাইবার সময় একটিও কথা বলে নাই, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে যখন তাঁহার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল, তখন তাঁহার প্রত্যেক কথাটিকে সে যেন নীরবে অনুমোদন করিয়া গেল। সুতরাং স্বামী ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী যে তাহার অনুচ্চারিত বাক্য সহজে বিস্মৃত হইবে না, ষোড়শী তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিল।

হৈমর সহিত পরিচয় তাহার বহুদিনব্যাপীও নয়, ঘনিষ্ঠও নয়। অথচ কোনমতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার কম্বলের শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, তখন এই মেয়েটিকে তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল। সেই যে সে প্রথম দিনটিতেই অযাচিত তাহার দুঃখের অংশ লইয়া গ্রামের সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, বোধ করি বা আরও একজনের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কাল তাহার পাশে দাঁড়াইতে এখানে আর কেহ থাকিবে না; প্রতিকূলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেই থাকিবে, কিন্তু আপনার বলিতে, একটা সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করিতেও লোক মিলিবে না, অথচ এই ঝঞ্ঝা যে কোথায় গিয়া কি করিয়া নিবৃত্ত হইবে তাহারও কোন নির্দেশ নাই। এমনি করিয়া এই নির্বান্ধব জনহীন আলয়ে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া সে অদূর ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত বিপদের ছবিটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু কখন অজ্ঞাতসারে যে এই পরিপূর্ণ উপদ্রবের আশঙ্কাকে সরাইয়া দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত এক অভিনব অপরিজ্ঞাত ভাবের তরঙ্গ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে উত্তাল হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল না। এতদিন জীবনটাকে সে যেভাবে পাইয়াছে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী—ইহার যে দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে—স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার অধিকারিণীগণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলা লোকের মুখে মুখে কোথাও বা সদাচারের পুণ্যকাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরবী-জীবনের সুনির্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় ও জটিল অনেক গলিঘুঁজি অনেককেই পার হইতে হইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ

কখনো করে নাই, কিংবা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্যনির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে; একটা দিনের তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই।

চণ্ডীর সেবায়েত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নরনারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখ-দুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে; দেবীর অনুগ্রহলাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে; এ-সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণীহৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল ভেদিয়া এই-সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এমনি কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই, সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল।

কাল দুর্যোগের রাত্রে নির্মলের হাত ধরিয়া নদী পার করিয়া আনিয়া সে তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল; হয়ত দুটি লোক ছাড়া এ কথা আর কেহ জানে না, এবং এখন এইমাত্র সেই স্বল্পদৃষ্টি লোকটির আহ্বানে হৈম যে তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, এ কথাও বোধ করি কয়েকটি লোক ছাড়া আর কেহ জানিবে না, কিন্তু কাল এবং আজিকার এই একই কর্তব্যের কত বড়ই না পার্থক্য!

আর একবার তাহার চোখের উপর হৈমর কাপড়ের পাড়টুকু হইতে, তাহার আঙুলের সবুজ রঙের আঙটি হইতে তাহার কানের হীরের দুল পর্যন্ত সমস্ত খেলিয়া গেল, এবং সর্বপ্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্রান্ত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দৃষ্টির বাহিরে ওই মেয়েটির প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন অনুসরণ করিয়া চলিল। সে দেখিতে পাইল, স্বামীর হাত ছাড়িয়া এইবার তাহাকে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিতে হইবে, সেখানে তাহার চিন্তিত ও ব্যাকুল পিতামাতার শত-সহস্র তিরস্কার ও কৈফিয়ত নিরুত্তরে মাথায় করিয়া লজ্জিত দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে হয়ত তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে; কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্যবেক্ষণ করা চাই—ত্রুটি না হয়; ছেলেকে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে—সে অভুক্ত না থাকে; পরে নিজেও খাইয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন—দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘ পথে কাহার কি চাই—তাহাকেই যোগাইতে হইবে, তাহাকে সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে।

নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সে মনের মাঝখানে গৃহিণীপনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে এই কথাই তাহার মনে হইল।

অনতিদূরে একখণ্ড কাঠের উপর সংস্থাপিত মাটির প্রদীপটা নিব-নিব হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এতবড় সম্মানিত গরীয়সী নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমণীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরে আর কেহ নাই, ক্ষণকালের এতটুকু দুর্বলতা জগতে কেহ কখনো জানিবেও না, শুধু কেবল যে দেবীর সেবিকা সে, সেই চণ্ডীর উদ্দেশ্যে আর একবার যুক্তকরে নতশিরে কহিল, মা, বৃথা চিন্তায় সময় বয়ে গেল, তুমি ক্ষমা করো।

রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক জানিবার জো নাই, কিন্তু অনুমান করিল অনেক হইয়াছে। তাই শয্যাটুকু আরও একটু বিস্তৃত করিয়া এবং প্রদীপে আরও খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শ্রান্তচক্ষে ঘুম আসিতেও বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না; কিন্তু বাহিরে দ্বারের কাছেই একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বাতাসেও একটু জোর ধরিয়াছিল, শিয়াল-কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়, তবুও ক্ষণকাল কান পাতিয়া থাকিয়া সভয়ে কহিল, কে?

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ভয় নেই, মা, তুমি ঘুমোও – আমি সাগর।

কিন্তু এত রাত্তিরে তুই কেন রে?

সাগর কহিল, হরখুড়ো বলে দিলে, জমিদার এয়েচে, রাতটাও বড় ভাল নয়——মা একলা রয়েচে, যা সাগর, লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার বস্ গে। তুমি শুয়ে পড় মা, ভোর না দেখে আমি নড়ব না।

ষোড়শী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই যদি হয় সাগর, একা তুই কি করবি, বাবা?

বাহিরের লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, একা কেন, মা, খুড়োকে একটা হাঁক দেব। খুড়ো-ভাইপোয় লাঠি ধরলে জান ত, মা, সব। সেদিনকার লজ্জাতেই মরে আছি, একটিবার যদি হুকুম দিয়ে পাঠাতে মা।

এই দুইটি খুড়া ও ভাইপো—হরিহর ও সাগর ডাকাতি অপবাদে একবার বছর-দুই করিয়া জেল খাটিয়াছিল। জেলের মধ্যে বরঞ্চ ছিল ভাল, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া ইহাদের প্রতি বহুকাল যাবৎ একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ কর্মচারীর দৌরাত্ম্যের অবধি ছিল না। কোথাও কিছু একটা ঘটিলে দুইদিকের টানাটানিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইত। স্ত্রীপুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে।

এই অযথা পীড়ন ও অহেতুক যন্ত্রণা হইতে ষোড়শী ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছিল। বীজগাঁর জমিদারি হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে স্থান দিয়া এবং নানা উপায়ে পুলিশকে প্রসন্ন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যাপারটা ইহাদের অনেকখানি সুসহ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি দস্যু অপবাদগ্রস্ত এই দুইটি পরম ভক্ত ষোড়শীর সকল সম্পদে বিপদে একান্ত সহায়। শুধু কেবল নীচ জাতীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়াই সঙ্কোচে তাহারা দূরে দূরে থাকিত, এবং ষোড়শী নিজেও কখনো কোনদিন তাহাদের কাছে ডাকিয়া ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে নাই। অনুগ্রহ কেবল দিয়াই আসিয়াছে, ফিরিয়া কখনো গ্রহণ করে নাই, বোধ করি প্রয়োজনও হয় নাই। আজ এই নির্জন নিশীথে সংশয় ও সঙ্কটের মাঝে তাহাদের আড়ম্বরহীন এই স্নেহ ও নিঃশব্দ সেবার চেষ্টায় ষোড়শীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, তোদের জাতের মধ্যেও বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, না রে? কে কি বলে?

বাহির হইতে সাগর আস্ফালন করিয়া জবাব দিল, ইস্! আমাদের সামনে! দুই তাড়ায় কে কোথায় পালাবে ঠিক পায় না মা!

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ সলজ্জে অনুভব করিল, ইহার কাছে এরূপ প্রশ্ন করাই তাহার উচিত হয় নাই। অতএব কথাটাকে আর না বাড়াইয়া মৌন হইয়া রহিল। অথচ চোখেও তাহার ঘুম ছিল না। বাহিরে আসন্ন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারি খবরদারিতে একজন জাগিয়া বসিয়া আছে জানিলেই যে নিদ্রার সুবিধা হয় তাহা নয়, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে এই কথাই পাড়িল, কহিল, যদি জল আসে তোর যে ভারী কষ্ট হবে সাগর, এখানে ত কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই।

সাগর কহিল, নাই থাকল মা। রাত বেশী নেই, প্রহর-দুই জলে ভিজলে আমাদের অসুখ করে না।

বাস্তবিক ইহার কোন প্রতিকারও ছিল না, তাই আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ষোড়শী অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। কহিল, আচ্ছা, তোরা কি সব সত্যিই মনে করেচিস জমিদারের পিয়াদারা আমাকে সেদিন বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

সাগর অনুতপ্ত স্বরে কহিল, কি করবে মা, তুমি যে একলা মেয়েমানুষ! এ পাড়ায় মানুষ বলতেও কেউ নেই, আমরা খুড়ো-ভাইপোও সেদিন হাটে গিয়ে তখনও ফিরতে পারিনি। নইলে সাধ্য কি মা, তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়!

ষোড়শী মনে মনে বুঝিল এ আলোচনাও ঠিক হইতেছে না, কথায় কথায় হয়ত কি একটা শুনিতে হইবে; কিন্তু থামিতেও পারিল না, কহিল, তাদের কত লোকজন, তোরা দুটিতে থাকলেই কি আটকাতে পারতিস?

বাহির হইতে সাগর মুখে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বলিল, কি হবে, মা, আর মনের দুঃখ বাড়িয়ে! হুজুরও এয়েছেন, আমরাও জানি সব। মায়ের কৃপায় আবার যদি কখনো দিন আসে, তখন তার জবাব দেব। তুমি মনে করো না, মা, হরখুড়ো বুড়ো হয়েছে বলে মরে গেছে। তাকে জানতো মাতু ভৈরবী, তাকে জানে শিরোমণিঠাকুর।

জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুৎ আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি, সেও মনে আছে—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু তোমার হুকুম হলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আটকাবে না!

ষোড়শী মনে মনে শিহরিয়া কহিল, বলিস কি সাগর, তোরা এমন নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের!

সাগর কহিল, এইটুকু! কেবল এইটুকুর জন্যেই কি আজ তোমার এই দশা! জমিদার এসেছে শুনে খুড়ো যেন জ্বলতে লাগল। তুমি ভেবো না মা, আবার যদি কিছু একটা হয়, তখন সেও কেবল এইটুকুতেই থেমে থাকবে!

ষোড়শী কহিল, হাঁরে সাগর, তুই কখনো গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়েছিলি?

বাহিরে বসিয়া সাগর যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার আশীর্বাদে অমনি একটু রামায়ণ-মহাভারত নাড়তে চাড়তে পারি। কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করলে মা?

ষোড়শী বলিল, তোর কথা শুনলে মনে হয় খুড়ো তোর না বুঝতেও পারে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি। সেদিন আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি সাগর, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, আমি কেবল রাগের মাথায় আপনি চলে গিয়েছিলাম।

সাগর কহিল, সে আমরাও শুনেচি, কিন্তু সারারাত যে ঘরে ফিরতে পারলে না, মা, সেও কি রাগ করে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু যে জন্যে তোদের এত রাগ, সে দশা আমার ত আমি নিজেই করেচি। আমি ত নিজের ইচ্ছাতেই বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েচি।

সাগর কহিল, কিন্তু এতকাল ত এ আশ্রয় নেবার ইচ্ছে হয়নি মা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর যেন উগ্র ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তারাদাস ঠাকুরের ওপরও আমাদের রাগ নেই, রায়মশায়কেও আমরা কেউ কিছু বলব না, কিন্তু জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়ব না। জান মা, আমাদের বিপিনের সে কি করেচে? সে বাড়ি ছিল না—তার লোকজন তার ঘরে ঢুকে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, থাক সাগর, ও-সব খবর আর তোরা আমাকে শোনাস নে।

সাগর চুপ করিল, ষোড়শী নিজেও বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাগর পুনরায় যখন কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরে গূঢ় বিস্ময়ের আভাস ষোড়শী স্পষ্ট অনুভব করিল। সাগর কহিল, মা, আমরা তোমার প্রজা, আমাদের দুঃখ তুমি না শুনলে শুনবে কে?

ষোড়শী কহিল, কিন্তু শুনেও ত অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিকার করতে পারব না বাছা।

সাগর কহিল, একবার ত করেছিলে। আবার যদি দরকার হয় তুমিই পারবে। তুমি না পারলে আমাদের রক্ষা করতে কেউ নেই মা।

ষোড়শী বলিল, নতুন ভৈরবী যদি কেউ হয় তাকেই তোদের দুঃখ জানাস।

সাগর চমকিয়া কহিল, তাহলে তুমি কি আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবে মা? গ্রামসুদ্ধ সবাই যে বলাবলি করচে—সে সহসা থামিল, কিন্তু ষোড়শী নিজেও এ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে

কহিল, দেখ্ সাগর, তোদের কাছে এ কথা তুলতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব ত শুনেচিস? গ্রামের আরও দশজনের মত তোরা নিজেও দেখচি বিশ্বাস করেচিস, তার পরেও কি তোরা আমাকেই মায়ের ভৈরবী করে রাখতে চাস রে?

বাহিরে বসিয়া সাগর আস্তে আস্তে উত্তর দিল, অনেক কথাই শুনি মা, এবং আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনে কেনই বা তুমি সে-রাত্রে ঘরে ফিরলে না, আর কেনই বা সকালবেলা সাহেবের হাত থেকে হুজুরকে বাঁচালে। কিন্তু সে যাই হোক মা, আমরা ক'ঘর ছোটজাত ভূমিজ তোমাকেই মা বলে জেনেচি; যেখানেই যাও আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা-চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে। তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘরদোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব অশান্তি ঘটাবি। এমন ত হতে পারে, আমার নিজেরই আর এ-সমস্ত ভাল লাগচে না।

সাগর সবিস্ময়ে কহিল, ভাল লাগচে না?

ষোড়শী বলিল, আশ্চর্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায় না?

এবার প্রত্যুত্তরে লোকটি কেবল একটা হুঁ বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু রাত আর বেশী বাকী নেই মা, আকাশে মেঘও কেটে যাচ্ছে, এইবার তুমি একটু ঘুমোও।

ষোড়শীর নিজেরও এ-সকল আলোচনা ভাল লাগিতেছিল না, তাহাতে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল। সাগরের কথায় আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে-চক্ষে ঘুম যতক্ষণ না আসিল, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া উহারই কথাগুলো তাহার মনে হইতে লাগিল, এই যে লোকটি বিনিদ্রচক্ষে বাহিরে বসিয়া রহিল, তাহাকে সে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে; ইতর

ও অন্ত্যজ বলিয়া এতদিন শুধু তুচ্ছ ও ছোট কাজেই লাগিয়াছে, কোনদিন কোন সম্মানের স্থান পায় নাই, আলাপ করিবার কল্পনা ত কাহারও স্বপ্নেও উঠে নাই, কিন্তু আজ এই দুঃখের রাত্রে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া তাহার অনেক কথাই বাহির হইয়া গেছে, এবং তাহার ভালমন্দ হিসাব করিবার দিন হয়ত একদিন আসিতেও পারে; কিন্তু শ্রোতা হিসাবে এই ছোটলোকটিকে সে একান্ত ছোট বলিয়া আজ কিছুতেই ভাবিতে পারিল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সকাল আর নাই—ঢের বেলা হইয়াছে; এবং অনতিদূরে অনেকগুলা লোক মিলিয়া তাহারই রুদ্ধ দরজার প্রতি চাহিয়া কি যেন একটা তামাশার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও এতটুকু পর্দা, এতটুকু আব্রু নাই। সহসা মনে হইল, তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ না করিয়া দিলে এই লোকগুলার উৎসুকদৃষ্টি হইতে বুঝি সে বাঁচিবে না। এই ক্ষুদ্র গৃহটুকু যত জীর্ণ যত ভগ্নই হোক, আত্মরক্ষা করিবার এ-ছাড়া আর বুঝি সংসারে দ্বিতীয় স্থান নাই, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখিতে পাইল ভিড় ঠেলিয়া এককড়ি নন্দী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।সবিনয়ে কহিল, গ্রামে হুজুর পদার্পণ করেছেন, শুনেচেন বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তা এই এককড়ি ইতিপূর্বে কোনদিন তাহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাহার বিনয়, তাহার এই সম্ভাষণের পরিবর্তন ষোড়শীকে যেন বিদ্ধ করিল, কিন্তু কিছু একটা জবাব দিবার পূর্বেই সে পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেচেন।

কোথায়?

এই যে কাছারিবাড়িতে। সকাল থেকে এসেই প্রজার নালিশ শুনচেন। যদি অনুমতি করেন ত পালকি আনতে পাঠিয়ে দিই?

সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছিল; ষোড়শীর মনে হইল তাহারা যেন এই কথায় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।তাহার ভিতরটা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া

উঠিল, কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, এটা তাঁর প্রস্তাব, না, তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি সসম্ভ্রমে বলিল, আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ স্বয়ং হুজুরের আদেশ।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, তোমার হুজুরের কপাল ভাল।জেলের ঘানি টানার বদলে পালকি চড়ে বেড়াচ্চেন, তাও আবার শুধু স্বয়ং নয়, পরের জন্যও ব্যবস্থা করচেন।কিন্তু বল গে এককড়ি, আমার পালকি চড়ার ফুরসত নেই—আমার ঢের কাজ।

এককড়ি কহিল, ও-বেলায় কিংবা কাল সকালেও কি একটু সময় পাবেন না?

ষোড়শী কহিল, না।

এককড়ি কহিল, কিন্তু হলে যে ভালো হতো। আর দশজন প্রজার যে নালিশ আছে।

ষোড়শী কঠোরস্বরে উত্তর দিল, বিচার করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজার করুন গে। কিন্তু আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। এই বলিয়া সে গামছাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তের

জমিদারের নিভৃত-নিবাস সাজাইতে গুছাইতে দিন-চারেক গিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, হুজুর এবার একাদিক্রমে মাস-দুই চণ্ডীগড়ে বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আজ সকালবেলাতেই উত্তরদিকের বড় হলটায় মজলিশ বসিয়াছিল। ঘরজোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে সাদা জাজিম বিছানো এবং মাঝে মাঝে দুই-চারিটা মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের একধারে আজ গ্রামের মাতব্বরেরা বার দিয়া বসিয়াছিলেন—জমিদারের কাছে তাঁহাদের মস্ত নালিশ ছিল। রায়মহাশয় ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন, ঘোষজা ছিলেন, বোসজা ছিলেন, এমন কি তারাদাস ঠাকুরও ইঁহাদের আড়ালে মুখ নীচু করিয়া ও কান খাড়া করিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়াছিলেন। আরও যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহই যদিচ অবহেলার বস্তু নহেন, তবুও ইঁহাদের নাম ধাম ও বিবরণ সবিস্তারে বিদিত না হইলেও পাঠকের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে না বিবেচনা করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইলাম। যাই হোক, ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অভিযোগের ভূমিকাটা একপ্রকার শেষ হইয়া গেলেও আসল কথাটি উঠি-উঠি করিয়াও থামিয়া যাইতেছিল—ঠিক যেন মুখে আসিয়াও কাহারও বাহির হইতে চাহিতেছিল না।

জীবানন্দ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও একটুখানি দূরে একটা তাকিয়ার উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া তিনি মন দিয়াই যেন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মন প্রফুল্ল। একেবারে স্বাভাবিক না হইলেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াও সন্দেহ হয় না। খুব সম্ভব মদের ফেনা তখনও তাঁহার মগজের সমস্ত অলিগলি দখল করিয়া বসে নাই। সুমুখের বড় বড় খোলা দরজা দিয়া বারুইয়ের শুক্‌না বালু ও ভিজা মাটির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং পাশের ঘরটাতেই বোধ করি রান্না হইতেছিল বলিয়া তাহারই রুদ্ধ দ্বারের কোন্ একটা

ফাঁক দিয়া একজাতীয় শব্দ ও গন্ধ মাঝে মাঝে এই বাতাসেই ভর দিয়া লোকের কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে উপাদেয় ও রুচিকর হইলেও শিরোমণিমহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বার-দুই কাশিয়া ও উত্তরীয়-প্রান্তে নাকের ডগাটা মার্জনা করিয়া, উঠিয়া গিয়া আর এক ধারে বসিতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, শিরোমণিমশায়ের কি অর্ধভোজন হয়ে গেল নাকি?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল, শিরোমণির নাকের ডগার মত মুখখানাও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না; ওটা আপনাদের মাচণ্ডীরই মহাপ্রসাদ। তবে যিনি রাঁধচেন তাঁর গোত্রটি ঠিক জানিনে, হয়ত এক না হতেও পারে।

শিরোমণি আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক, তা হোক। ব্রাহ্মণ পাচক—দরিদ্র হলেও একটা গোত্র আছে বৈ কি।

জীবানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, জানিনে ঠাকুর, ও-সব বালাই ওর কিছু আছে কি না। কিন্তু হাতা-বেড়ির সঙ্গে মিলে সোনার চুড়ির আওয়াজটাও আমার বড় মিঠে লাগে। আর সেই হাতে পরিবেশন করলে—তা নিমন্ত্রণ করলে ত আর—, বলিয়া তিনি পুনশ্চ প্রবল হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া দিলেন।

শিরোমণি অধোবদন হইলেন, এবং ভিতরের কদর্য ব্যাপার যদিচ সকলেই জানিতেন, তথাপি এই অভাবনীয় প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় উপস্থিত কেহই লোকটার মুখের প্রতি সহসা চাহিতে পর্যন্ত পারিল না।

হাসি থামিলে তিনি কহিলেন, সদালাপ ত হলো। এবং দয়া করে মাঝে মাঝে এলে এমন আরও ঢের হতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

কিন্তু উত্তরে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না, সকলে যেমন নীরবে বসিয়াছিল তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, বলতে কি আপনাদের লজ্জাবোধ হচ্চে?

এবার রায়মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, নন্দীমশাই ত সমস্ত জানেন, তিনি কি হুজুরের গোচর করেন নি?

জীবানন্দ কহিলেন, হয়ত করেচেন, কিন্তু আমার মনে নেই। তা ছাড়া, তার গোচর করার প্রতি খুব বেশী আস্থা না রেখে ব্যাপারটা আপনারাই বলুন। দ্বিরুক্তি দোষ ঘটতে পারে, কিন্তু কি আর করা যাবে। জমিদারের গোমস্তা—একটু মোকাবিলে হয়ে থাকা ভাল। ঠিক না?

প্রভুর মুখে এককড়ির এই সুখ্যাতিটুকুতে রায়মহাশয় মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, হুজুর সর্বজ্ঞ। ভৃত্যের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, কিন্তু, আমাদের অভিযোগ—

কি অভিযোগ?

জনার্দন রায় কহিলেন, আমরা গ্রামস্থ ষোল আনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা দেখতে পাচ্চি। ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়? এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন।

তারাদাস সাড়া দিল না, জাজিমটার অংশবিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, এবং রায়মহাশয়ের আনত মুখের 'পরেও একটা ফ্যাকাশে ছায়া পড়িল। কিন্তু মুখরক্ষা করিলেন শিরোমণিঠাকুর। তিনি সবিনয়ে কহিলেন রাজার কাছে প্রজা সন্তানতুল্য, তা দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় স্থির করেচি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমাদের নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জমিদার চকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, কেন? তার অপরাধ?

দুই-তিনজন প্রায় সমস্বরে জবাব দিয়া ফেলিল, অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ একে একে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জনার্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেচেন রায়মশায়, যার জন্য তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

জনার্দন মুখ তুলিয়া শিরোমণিকে চোখের ইঙ্গিত করিতেই জীবানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেচেন, বুড়োমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

রায়মহাশয়ের চোখে ও মুখে দ্বিধা ও অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, দেব-দ্বিজে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উপস্থিত হয়েচেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েচে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

কিন্তু জনার্দন রায় অত সহজে ভুল করিবার লোক নহেন; প্রত্যুত্তরে তিনি শিরোমণির প্রতি একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্চেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

খোঁচা খাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ ভৈরবী রাখব না হুজুর! তার স্বভাব-চরিত্র ভারী মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্চি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল; একমুহূর্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

তৎক্ষণাৎ অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, ইহাতে কাহারও কোন সংশয় নাই—এ গ্রামসুদ্ধ সবাই জানিয়াছে। জনার্দন মুখে কিছু না কহিলেও চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তাই সুবিচারের আশায় বেছে বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের কাছে এসে পড়েছেন রায়মহাশয়? বিশেষ সুবিধে হবে বলে ভরসা হয় না।

এ কথার ইঙ্গিত সকলে বুঝিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু জনার্দন এবং শিরোমণি বুঝিলেন। জনার্দন মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু শিরোমণি জবাব দিলেন। বলিলেন, আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদের তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

কথা শুনিয়া জীবানন্দের মুখের ভাব একটু সহজ হইয়া আসিল; মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, দেখুন শিরোমণিমশাই, অতি-বিনয়ে আপনাদের খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নিই। আমি শুধু জানতে চাই, এ অভিযোগ কি সত্য?

সাগ্রহে রায়মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল। শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, অভিযোগ? সত্য কি না! আচ্ছা, আমরা না হয়, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত! রাজদ্বার! যথাধর্ম বলো—

তারাদাস একবার পাংশু, একবার রাঙ্গা হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমেষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম বললেও শুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্য হইতে অস্ফুট উদ্যম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্‌ব্লার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল; তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকালবেলাতেই আপনাদের বাক্যসুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ যে! কি হলো আপনাদের যথাধর্মের?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর, আমি যথাধর্ম বলব।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্মের যথাটা যদি বা থাকে, ধর্মটা থাকবে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই—ধর্মাধর্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে, তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান—এই না?

সবাই একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না?

জনার্দন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দ আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি

বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও নাহয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবীদেরও ভৈরব নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেশসুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত দেবী নিজেও খুশী হবে না—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাকি হাতে গোনা যেতো না। কি বলেন শিরোমণিমশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব?

এই বলিয়া তিনি শিরোমণি অপেক্ষা রায়মহাশয়ের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন। এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিবে কি, সকলে যেন বুদ্ধি-বিহ্বল হইয়া গেল। জমিদারের কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা, বক্তব্য সত্য না মিথ্যা, তাৎপর্য বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাশা না তিরস্কার, কেহ ঠাহর করিতেই পারিল না।

সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী শৌখিন যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তার ইংরেজী বাংলা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলা খোলা চিঠিপত্র। জীবানন্দ দেখিয়া কহিলেন, কি হে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হতো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি সময় হবে?

জীবানন্দ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, না, এখনও হয় না, অন্য সময়েও হবে না।কিন্তু অনেকটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। এই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না

একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা তো দেখচি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতী সুধার গন্ধ কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্ছে। কি বলেন সাহেব, ডিক্রি জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানাহেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্যতেজ যদি কিছু বাকী থাকতো ত এই ইউদি-বেটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হতো না।

প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কি বলচেন দাদা? থাক থাক, আর একসময়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া সে ফিরেতে উদ্যত হইতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি, মণি-মাণিক্যের এ-পিঠ ও-পিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরী-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই! টাকা! টাকা! এর নালিশ আর তার নালিশ, অমুকের ডিক্রি আর তমুকের কিস্তিখেলাপ—ওহে, ও তারাদাস, সে-দিনটা নেহাত ফসকে গিয়েছিল, কিন্তু হতাশ হয়ো না ঠাকুর, যা করে তুলেচি, তাতে মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হতে খুব বেশী বিলম্ব হবে বলে আশঙ্কা হয় না। প্রফুল্ল, রাগ করো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকী রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ, নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবেন না, সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যদি কেউ সন্ধান করে আনেন? তা হলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

রায়মহাশয় ম্লানমুখে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বেলা হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন ত এখন আমরা আসি।

জীবানন্দ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর জাঁক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

রায়মহাশয় না বসিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সে ভার আমাদের।

কিন্তু আর কাউকে ত বহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা-চণ্ডীও সামলাতে পারবেন না, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ-লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেহারা আসিয়া প্রভুর ব্যগ্রব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণপাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেদিন ভৈরবীকে যে কাছারীতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিলে?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে দিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন?

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়েছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, এত লোকের সামনে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন না, না?

না।

কেন?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িল না, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এমনি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আসতে পারবেন না, এ কথা যত লোক দাঁড়িয়েছিল সবাই শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে বলো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য, এত সরল ঔদাস্য, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা, তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাঁদের কোন জবাব দিয়েছিলে?

আজ্ঞে না।

তা হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি করো না।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা হলে আসি?

আসুন।

রায়মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, অনুমতি হয় ত আর একদিন চরণ দর্শন করতে আসব।

বেশ, আসবেন।

সকলেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা জমিদারের হাঁক শুনিতে পাইলেন, বেয়ারা—

অনেকখানি পথ কেহই কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না। অবশেষে শিরোমণি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া রায়মহাশয়কে একপাশে একটু টানিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন, জনার্দন, জমিদারকে তোমার কিরূপ মনে হয় ভায়া?

জনার্দন সংক্ষেপে বলিলেন, মনে ত অনেক রকমই হলো।

মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জাশরম আদৌ নেই।

না।

কিন্তু দিব্যি সরল। মাতাল কিনা! দেখলে, দেনার দায়ে চুল পর্যন্ত বাঁধা, তাও বলে ফেললে।

জনার্দন বলিলেন, হুঁ।

শিরোমণি বলিলেন, কিছুই থাকবে না, সব ছারখার হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

জনার্দন বলিলেন, খুব সম্ভব।

হয়ত বেশীদিন বাঁচবেও না।

হতেও পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া শিরোমণি পুনশ্চ বলিলেন, যা ভাবা গিয়েছিল, বোধ হয় ঠিক তা নয়—নেহাত হাবাবোকা বলে মনে হয় না। কি বল?

জনার্দন শুধু জবাব দিলেন, না।

কিন্তু বড় দুর্মুখ। মানীর মান-মর্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দন চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়াও শিরোমণি কহিলেন, কিন্তু দেখেচ ভায়া কথার ভঙ্গী—অর্ধেক মানে বোঝাই যায় না। সত্য বলচে, না আমাদের বাঁদর নাচাচ্চে ঠাওর করাই শক্ত। জানে সব, কি বল?

রায়মহাশয় তথাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীর কাছাকাছি আসিয়া শিরোমণি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে বলিলেন, ভায়াকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্চে—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন ভয় হচ্চে, না?

রায়মহাশয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তার আর কথা কি? কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল—না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া—পয়সার জোর আছে—কিন্তু বাঘের গর্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দন একটু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি ভয় পেয়ে এলেন নাকি?

শিরোমণি বলিলেন, না না ভয় নয়, কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেয়ে এলে, তা ত তোমার মুখ দেখেও অনুভব হচ্চে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য। এককড়ির মুখে ঠাকরুনটির হুমকিও ত শুনলে? আমিও মেলা কথা কয়ে এসেচি—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় নাকি! দুয়ের মাঝে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি!

জনার্দন উদাসকণ্ঠে কহিলেন, সকলই চণ্ডীর ইচ্ছা। বেলা হয়ে গেল—ও-বেলায় একবার আসবেন।

তা আসবো।

গলির মোড় ফিরিতে বাঁ দিকের গাছের ফাঁকে মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা দিতেই বৃদ্ধ শিরোমণি হাত তুলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, কানে এবং নাকে হাত দিলেন, কিন্তু অস্ফুটে কি প্রার্থনা যে করিলেন তাহা শোনা গেল না। তার পরে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

চোদ্দ

অন্যান্য স্থানের মত চণ্ডীগড়েও দিন আসে যায়, বাহির হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। দেবীর সেবা সমভাবে চলিতেছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া তেমনি আসিতেছে, যাইতেছে, মানস করিতেছে, পূজা দিতেছে, পাঁঠা কাটিতেছে, প্রসাদের ভাগ লইয়া পূজারীর সহিত তেমনি বিবাদ করিতেছে, এবং ঠিক তেমনি মুক্তকণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রতিবেশীর অখ্যাতি প্রচার করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রমাণ দিতেছে। বস্তুতঃ কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই; বিদেশীর বুঝিবার জো নাই যে, ইতিমধ্যে হাওয়ার বদল হইয়াছে, এবং ঝঞ্ঝার পূর্বক্ষণের ন্যায় চণ্ডীগড়ের মাথার আকাশ গোপন ভারে থমথম করিতেছে। এ গ্রামের সাধারণ চাষাভূষারাও যে ঠিক নিশ্চয় করিয়া কিছু বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ষোড়শীর সম্বন্ধে মোড়ল-পদবাচ্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই দীনদুঃখীরা তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভালবাসিত। এককড়ি নন্দীর উৎপাত হইতে বাঁচিবার সেই কেবল একমাত্র পথ ছিল। ছোটখাটো ঋণ যখন আর কোথাও মিলিত না, তখন ভৈরবীর কাছে গিয়া হাত পাতিতে তাহাদের বাধিত না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া আসার জন্য ইহাদের সত্য সত্যই বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, তাহারা জানিত পিতা ও কন্যার মনোমালিন্য একদিন না একদিন মিটিবেই। ষোড়শীর দুর্নামের কথাটাও অপ্রকাশ ছিল না। কেবল সে-ই বলিয়া ইহা না রটিলেই ভাল হইত; না হইলে দেবীর ভৈরবীদের স্বভাব-চরিত্র লইয়া মাথা গরম করার আবশ্যকতা কেহ লেশমাত্র অনুভব করিত না—দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ ইহা এতই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া মায়ের মন্দির লইয়া যে তুমুল কাণ্ড বাধিবে, কর্তারা তারাদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই হুজুরের কাছে আনাগোনা করিয়া কি-যেন-

কি-একটা ওলটপালট ঘটাইবার মতলব করিবেন, এবং ওই যে অচেনা ছোট মেয়েটাকে কোথা হইতে কিসের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে—এমনি সব সংশয়ের বিদ্যুৎ কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যখন চমকিতে লাগিল, তখন চোখের আড়ালে কোথায় আকাশের গায়ে যে অকালের মেঘ জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে দেশের ভালই হইবে না, এই ভাবটাই সকলের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের মত আবর্তিত হইতে লাগিল।

সেদিন অষ্টমী তিথির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকসমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। প্রতিমার অনতিদূরে বারান্দার একাধারে বসিয়া ষোড়শী আরতির উপকরণ সজ্জিত করিতেছিল, তারাদাস ও সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ষোড়শী কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিল না। এককড়ি কহিল, মা মঙ্গলা, তোমার চণ্ডীমাকে প্রণাম কর।

পূজারী কি একটা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী চোখ না তুলিয়াও ইহা লক্ষ্য করিল। মেয়েটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পূজারী কহিল, মায়ের সন্ধ্যারতি কি তুমি দেখবে মা? তাহলে দেবীর দক্ষিণে ওই যে আসন পাতা আছে ওর ওপরে গিয়ে বসো।

এককড়ি ষোড়শীর প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে কহিল, ওঁর নিজের স্থান উনি নিজেই চিনে নেবেন ঠাকুর, তোমাকে চেনাতে হবে না, কিন্তু মায়ের জিনিসপত্র যা যা আছে দেখিয়ে দাও দিকি।

পূজারী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখিয়ে দিতে হবে বৈ কি, সমস্তই একটি একটি করে দেখাতে হবে। লিস্টির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। মা, ওই যে ও-দিকে বড় সিন্দুক দেখা যাচ্চে, ওতে পূজার পাত্র এবং সমস্ত পিতল-কাঁসার তৈজসাদি তালাবন্ধ আছে, বড় বড় কাজকর্মে শুধু বার করা হয়। আর এই যে গুলবসানো ছোট কাঠের সিন্দুকটি, এতে মখমলের চাঁদোয়া,

ঝালর প্রভৃতি আছে, আর এই কুঠরিটির মধ্যে সতরঞ্চি, গাল্‌চে, কানাত—বসবার আসন এই-সব—

এককড়ি কহিল, আর—

পূজারী বলিলেন, আর ওই যে পূবের দেওয়ালের গায়ে বড় বড় তালা ঝুলচে, ওটা লোহার সিন্দুক, মন্দিরের সঙ্গে একেবারে গাঁথা। ওর মধ্যে মায়ের সোনার মুকুট, রামপুরের মহারানীর দেওয়া মোতির মালা, বীজগাঁর জমিদারবাবুদের দেওয়া সোনার বাউটি, হার, আরও কত শত ভক্তের দেওয়া কত কি সোনা-রূপার অলঙ্কার, তা ছাড়া টাকাকড়ি, দলিলপত্র, সোনা-রূপার বাক্স—অর্থাৎ মূল্যবান যা-কিছু সমস্তই ওই সিন্দুকটিতে।

এককড়ি কহিল, আমি আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। কিন্তু ও-সব কেবল তোমার মুখেই আছে, না সিন্দুকটা হাতড়ালে কিছু পাওয়া যাবে! ওই ত উনি বসে আছেন, চাবিটা চেয়ে এনে একবার খুলে দেখাও না। গ্রামের ষোল আনার প্রার্থনা মঞ্জুর করে হুজুর কি হুকুম দিয়েচেন শোননি? চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বে সমস্তই যে একদফা মিলিয়ে দেখতে হবে।

পূজারী হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। মন্দির হইতে ষোড়শীর কর্তৃত্ব যে ঘুচিয়া গেছে তাহা সে শুনিয়াছে এবং নন্দী মহাশয়ের প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য করাও যে অতিশয় সাংঘাতিক তাহাও জানে, কিন্তু কর্মনিরতা ওই যে ভৈরবী অনতিদূরে বসিয়া স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াও শুনিতেছে না, তাহাকে মুখের সম্মুখে গিয়া শুনাইবার সাহস তাহার নাই। সে ভয়ে ভয়ে কহিল, কিন্তু তার ত এখনো দেরি আছে নন্দীমশাই। এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে এল—

তারাদাস এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবং সঙ্কোচ ও ভয়ের চিহ্ন কেবল পূজারীর মুখে-চোখেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়। আস্তে আস্তে কহিল, মিলিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব হবে নন্দীমশাই, একটু সকাল করে এসে আর একদিন এ কাজটা সেরে নিলে হবে না? কি বলেন?

এককড়ি চিন্তা করিয়া কহিল, আচ্ছা, তাই না হয় হবে। পূজারীকে কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন চক্রবর্তীমশাই, এই শনিবারেই সংক্রান্তি। ষোল আনা পঞ্চায়েতি নাটমন্দিরেই হবে। হুজুর স্বয়ং এসে বসবেন। উত্তর ধারটা কানাত দিয়ে ঘিরে দিয়ে তাঁর জন্যে মখমলের গালচেটা পেতে দিতে হবে। আলোর সেজ-কটাও তৈরি রাখা চাই।

এককড়ি একটু জোর গলায় কথা কহিতেছিল, সুতরাং অনেকেই কৌতূহলবশে বারান্দার নীচে প্রাঙ্গণে আসিয়া জমা হইয়াছিল। সে তাহাদের শুনাইয়া আরও একটু হাঁকিয়া পূজারীকে কহিল, সেদিন ভিড় ত বড় কম হবে না—ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মঙ্গলা মেয়েটাকে আদর করিয়া কহিল, কি গো মা ক্ষুদে ভৈরবী! দেখেশুনে সব চালাতে পারবে ত? তবে আমরা আছি, হুজুর এখন থেকে নিজে দৃষ্টি রাখবেন বলেছেন, নইলে ভার বড় সহজ নয়। অনেক বিদ্যেবুদ্ধির দরকার। বলিয়া ষোড়শীর প্রতি আড়চোখে চাহিয়া দেখিল সে ঠাকুরের পূজার সজ্জায় তেমনি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আছে। তারাদাসকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো ঠাকুরমশাই, নূতন অভিষেকের দিনক্ষণ কিছু স্থির হয়েচে শুনেচ? লোকে ত আমাদের একেবারে ব্যস্ত করে তুলেচে, নাবার খাবার সময় দিতে চায় না।

প্রত্যুত্তরে তারাদাস অস্ফুটে কি যে বলিল বুঝিতে পারা গেল না। তাহার সদর দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, তখন পিছনে পিছনে অনেকেই গেল এবং গুঞ্জনধ্বনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা গেল, কিন্তু চণ্ডীর আরতির প্রতীক্ষায় যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা দূর হইতে ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; এমন ভরসা কাহারও হইল না কাছে গিয়া একটা প্রশ্ন করে।

যথাসময়ে দেবীর আরতি শেষ হইল। প্রসাদ লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলে মন্দিরের ভৃত্য যখন দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিল, তখন ষোড়শী পূজারীকে

নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, চক্রবর্তীমশাই, ঠাকুরের সেবায়েত আমি, না এককড়ি নন্দী?

চক্রবর্তী লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি বৈ কি মা, তুমিই ত মায়ের ভৈরবী।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ অন্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যত দিন আছি, গোমস্তার চেয়ে আমার মান্যটা মন্দিরের ভেতর বেশী থাকা দরকার। ঠিক না?

পূজারী কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মা! কিন্তু—

ষোড়শী কহিল, ওই কিন্তুটা তোমাকে সে ক'টা দিন বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এই শান্ত মৃদুকণ্ঠ পূজারীর অত্যন্ত সুপরিচিত; সে অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল, এবং ষোড়শীও আর কিছু কহিল না। মন্দিরদ্বারে তালা পড়িলে সে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল, এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার পর্ণকুটীরখানি ঘেরিয়া বহু লোক জড় হইয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিতেই লোকগুলা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলির আশায় একযোগে প্রায় পঁচিশখানি হাত বাড়াইয়া দিতে ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, ওরে, অত ধূলো পায়ে নেই রে নেই, আবার আমাকে নাইয়ে মারিস নে, আমার মন্দিরের বেলা হয়ে গেছে। কি হয়েচে বল্?

ইহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রজা; হাত জোড় করিয়া কহিল, মা, আমরা যে মারা যাই! সর্বনাশ হয় যে!

তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ, তেমনি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্যন্ত পারে নাই। এই- সকল মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নিজের হাসিমুখখানি চক্ষের পলকে মলিন হইয়া গেল। বুড়া বিপিন মাইতি অবস্থা

ও বয়সে সকলের বড়; ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কি সর্বনাশ হলো বিপিন?

বিপিন কহিল, কে একজন মাদ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠকে মাঠ জমিদার-তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্বস্ব। কেউ তা হলে আর বাঁচব না—না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মারা যাবো মা!

ব্যাপারটা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তাহলে তোদের শুকিয়ে মরাই ভাল। যা, বাড়ি যা, সকালবেলা আর আমার সময় নষ্ট করিস নে।

কিন্তু তাহার হাসিতে কেহ যোগ দিতে পারিল না, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, না মা, এ সত্যি।

ষোড়শী বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, না রে না, এ কখনো সত্য হতেই পারে না, তোদের সঙ্গে সে তামাশা করেচে। বিশ্বাস না করিবার তাহার বিশেষ হেতু ছিল। একে ত এই-সকল জমিজমা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে সমস্ত মাঠ শুধু কেবল বীজগ্রামের সম্পত্তিও নহে। ইহার কতক অংশ ৺চণ্ডীমাতার এবং কিছু রায়মহাশয়ের খরিদা। অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও ইহা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বিপিন মাইতি যখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, কাল কাছারিবাটীতে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দীমহাশয় নিজের মুখে জানাইয়া দিয়াছেন এবং তথায় জনার্দন ও তারাদাস উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহার পিতা তারাদাসই দলিলে দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তখন অপরিসীম ক্রোধ ও বিস্ময়ে ষোড়শী বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ কর্ গে।

বিপিন নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তাও কি হয় মা? রাজার সঙ্গে কি বিবাদ করা চলে? কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে—ভিটেটুকু পর্যন্তও থাকবে না!

ষোড়শী কহিল, তা বলে বাপ-পিতামহের কালের পৈতৃক বিষয়টুকু তোরা মুখ বুজে ছেড়ে দিবি?

বিপিন কহিল, তুমি যদি কৃপা করে আমাদের বাঁচিয়ে দাও মা, দীনদুঃখী আমাদের নইলে ছেলেপিলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই ত তোমার কাছে সবাই ছুটে এসেচি।

ষোড়শী একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহাদের কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই; তাই এই একান্ত বিপদের দিনে দল বাঁধিয়া অপরের কৃপাভিক্ষা করিতে তাহারা বাহির হইয়াছে। এই সব নিরুদ্যম ভরসাহীন মুখের সকরুণ প্রার্থনায় তাহার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোরা এতগুলো পুরুষমানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবি নে, আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাবো তোদের বাঁচাতে? রাগ করো না বিপিন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জমি না হয়ে মাইতিগিন্নীকে যদি জমিদারবাবু এমনি জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রি করে দিতেন, আর সে আসতো তাকে দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি?

ষোড়শীর এই অদ্ভুত উপমায় অনেকের মুখই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধের চোখের কোণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল, মা, আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, আমার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু মাইতিগিন্নীর পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটা আছে, তারা তখন জেল কেন, ফাঁসিকাঠের ভয় পর্যন্ত করবে না, একথা তোমাকে মা-চণ্ডীর দিব্যি করেই জানিয়ে যাচ্চি।

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শী বাধা দিয়া কহিল, তাই যদি সত্যি হয় বিপিন, তোমার সেই পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটাকে ব'লো এই

পিতা-পিতামহের কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে একতিল ছোট নয়। এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেছেন।

বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঠিক! ঠিক কথা মা! আমাদের মা-ই ত বটে। ছেলেদের এখনি গিয়ে আমি এ কথা জানাবো, কিন্তু তুমি আমাদের সহায় থেকো।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আমি কেন বিপিন, মা-চণ্ডী তোমাদের সহায় থাকবেন। কিন্তু আমার পূজোর সময় বয়ে যাচ্চে বাবা, আমি চললুম। বলিয়া সে দ্রুতপদে গিয়া আপনার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর গলা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সকলকে ডাকিয়া কহিতেছে, তোরা সবাই শুনলি ত রে, শুধু গর্ভধারিণীই মা নয়, যিনি পালন করেন, তিনিও মা। যা হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।

পনর

চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক ও গাজন-উৎসবের উত্তেজনায় দেশের কৃষিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এতবড় পর্বদিন তাহাদের আর নাই। নরনারী-নির্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া সন্ন্যাসের ব্রত ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ের গৈরিক দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই, চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসা-যাওয়া শেষ হইতেছে না—প্রাঙ্গণসংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে। পূজা দিতে, তামাশা দেখিতে, বেচাকেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

ষোড়শী মনের অশান্তি দূর করিয়া দিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও কাজে লাগিয়া গেছে—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাহার মন্দির ছাড়িবার জো নাই। বিকালের দিকে মন্দিরের রকে বসিয়া সে নিবিষ্টচিত্তে হিসাবের খাতাটায় জমা-খরচের মিল করিতেছিল, নানা জাতীয় শব্দতরঙ্গ অভ্যস্ত ব্যাপারের ন্যায় তাহার কানে পশিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল না, এমন সময়ে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত নীরবতা খোঁচার মত যেন তাহাকে আঘাত করিল। চোখ তুলিয়া দেখিল স্বয়ং জীবানন্দ চৌধুরী। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকগুলি ভদ্রব্যক্তি। রায়মহাশয়, শিরোমণি ঠাকুর, তারাদাস, এককড়ি এবং গ্রামের আরও অনেকে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও তিন-চারিজনকে সে চিনিতে পারিল না; কিন্তু পরিচ্ছদের

পারিপাট্য দেখিয়া অনুভব করিল ইঁহারা কলিকাতা হইতে বাবুর সঙ্গে আসিয়াছেন। খুব সম্ভব পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করাই অভিপ্রায়। জন-চারেক ভোজপুরী পাইক-পেয়াদাও আছে। তাহাদের মাথায় রঙ্গিন পাগড়ি ও কাঁধে সুদীর্ঘ যষ্টি। অনতিকাল পূর্বে হোলী-উৎসবের সমস্ত চিহ্ন আজও তাহাদের পরিচ্ছদে দেদীপ্যমান। মনিবের শরীর-রক্ষা ও গৌরব-বৃদ্ধি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ষোড়শী ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার তাহার খাতায় পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। জীবানন্দ আর কখনও এখানে আসেন নাই; তিনি সকৌতুকে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রাচীন শিরোমণি-মহাশয় তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া সেখানে যা-কিছু আছে—তাহার ইতিহাস, তাহার প্রবাদ-বাক্য—সমস্তই এই নবীন জমিদার প্রভুটিকে শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন।

এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই দলটি আসিয়া এক সময়ে মন্দিরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল, এবং মিনিট-দুই পরেই পূজারী আসিয়া ষোড়শীকে কহিল, মা, বাবু তোমাকে নমস্কার জানিয়ে একবার আসতে অনুরোধ করলেন।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা চল, যাচ্চি। বলিয়া সে তাহার অনুবর্তী হইয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে তাহার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, সকলের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে আমি কি হুকুম দিয়েছি শুনেচ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাকে বিদায় করা হয়েছে, এবং ওই ছোট মেয়েটিকে নূতন ভৈরবী করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের দিন স্থির হয়নি, কিন্তু শীঘ্রই হবে। কাল সকালে রায়মশায় প্রভৃতি আসবেন। তাঁদের কাছে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?

ষোড়শী বহু পূর্ব হইতেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই তাহার কণ্ঠস্বরে কোনপ্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না, সহজকণ্ঠে কহিল, আমার বক্তব্যে আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ কহিলেন, না। তবে পরশু সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে, ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ?

ষোড়শী বলিল, তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ অধর দংশন করিয়া কহিলেন, পারবে?

ষোড়শী কহিল, পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ কহিলেন, তারা মরবে।

ষোড়শী কহিল, মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি ত এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবানন্দ একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নেই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দলিলে দস্তখত করে দিয়েচেন। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার আর কোন হুকুম আছে?

জীবানন্দ স্পষ্ট অনুভব করিলেন বলিবার সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর তাচ্ছিল্যের আভাসে যেন স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দিয়া কহিলেন, না, আর কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, তাহলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

বল।

ষোড়শী কহিল, কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরশু মন্দিরের কোথাও সভাসমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনো না, কিছুতেই না। এ-সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্চি—এবং শুধু জীবানন্দ ছাড়া যে যেখানে ছিল ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জনার্দন রায় এতক্ষণ কথা কহেন নাই; কলরব থামিলে অকস্মাৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুন?

ইহার শেষ কথাটার শ্লেষ উপলব্ধি করিয়াও ষোড়শী সহজ বিনীতকণ্ঠে কহিল, আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়!

সত্যই তাই। এবং এই নিবেদনের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই, বোধ করি জীবানন্দ তাহা বুঝিলেন, কিন্তু দেশের যাঁহারা, তাঁহারা নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাই এই নম্র কণ্ঠস্বরে উপহাস কল্পনা করিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন। জনার্দন রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতেই হবে। আমি বলচি হতে হবে এবং দলের মধ্য হইতে একজন কটূক্তি পর্যন্ত করিয়া ফেলিল।

কথাটি ষোড়শীর কানে গেল, এবং মুখের ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। পলকমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া জীবনন্দকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া কহিল, ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়।তবে ও-সব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

এই মুখ, এই কণ্ঠস্বর, এই একান্ত অবহেলা হঠাৎ জীবানন্দকেও তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, এবং তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরও তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্চি, কালই এ-সব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

জোর করে?

হাঁ, জোর করে।

সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক?

হাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই হোক।

ষোড়শী আর কোন তর্ক করিল না। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর সবিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টা রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলা তোরা দেখে রাখ্; এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিস নে—শুধু গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি। এই বলিয়া সে আর দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া মন্দপদে বারান্দা পার হইয়া গেল। ষোড়শীকে বিশ বছর ধরিয়া লোকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে জানিবার যে কিছু বাকী আছে কেহ মনেও করে নাই। কিন্তু

আজ তাহার প্রকৃতির এই অসাধারণ দিকটার প্রথম পরিচয় পাইয়া হুজুর হইতে পিয়াদা পর্যন্ত যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ষোল

চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল—’শিব-শম্ভু’র গাজন-উৎসবে কোথাও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিল না। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানীরা দোকান ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়াধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল। চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আবহাওয়ায় সুখ-দুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল, কেবল চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর দেহের মধ্যে কি যে রোগ প্রবেশ করিল তাহার সে চেহারা আর ফিরিয়া আসিল না—কি একপ্রকার ভয়ে ভয়ে মন যেন তাহার অহর্নিশি চকিত হইয়াই রহিল। উৎসবের কয়টা দিন যেন নির্বিঘ্নে কাটাই সম্ভব এ আশা ষোড়শীর ছিল, কারণ দেবতার ক্রোধোদ্রেকের দায়িত্ব আর যে-কেহ মাথায় করিতে চা’ক, জনার্দন চাহিবে না সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু এইবার?

তবুও দিনগুলা এমনি নিঃশব্দে কাটিতে লাগিল যেন আর কোন হাঙ্গামা নাই, সমস্ত মিটিয়া গেছে। কিন্তু সত্য সত্যই মিটিয়া যে কিছু যায় নাই, অলক্ষ্যে গোপনে কঠিন কিছু-একটা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এ আশঙ্কা শুধু ষোড়শীর নহে, মনে মনে প্রায় সকলেরই ছিল। সেই মাঠসংক্রান্ত কৃষকদের কাছে আজ সে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিল। কথা ছিল তাহারা দেবীর সন্ধ্যা-আরতির পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে জমা হইবে, কিন্তু আরতি শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আটটা ছাড়াইয়া নয়টা এবং নয়টা ছাড়াইয়া দশটা বাজিতে চলিল, কিন্তু কাহারও দেখা নাই। প্রণাম করিতে যাহারা নিত্য আসে, প্রসাদ লইয়া একে একে তাহারা প্রস্থান করিল, পূজারী অন্তর্হিত হইল, এবং মন্দিরের ভৃত্য দুয়ার রুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিল। আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই, এবং কি-একটা ঘটিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই,

কিন্তু ঠিক তাহা জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। এমনি সময়ে ধীরে ধীরে সাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া ষোড়শী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, এত দেরি যে সাগর? কিন্তু আর কেউ ত আসেনি? এরা কি তবে খবর পায়নি বাবা?

সাগর কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘরে ঘরে তোমার ইচ্ছে জানিয়ে এসেচি।

ষোড়শী শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে?

সাগর বলিল, আজ বোধ করি কেউ আর সময় করে উঠতে পারলে না। হুজুরের কাছারি-বাড়িতে ষোল আনার পঞ্চায়েতি ছিল, তা এইমাত্র সাঙ্গ হলো। পঞ্চু, অনাথ, রামময়, নবকুমার, অক্ষয় মাইতি, মায় আমাদের বুড়ো বিপিনখুড়ো পর্যন্ত তার সাজোয়ান ব্যাটাদের নিয়ে। কেউ বাদ যায়নি মা, আমি একটা বাতাপিনেবু গাছের তলায় দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ষোড়শী কহিল, ভাল করিস নি সাগর, কেউ দেখে ফেললে—

সাগর হাসিয়া বলিল, একা যাইনি মা, ইনি সঙ্গে ছিলেন, বলিয়া সে বাঁ হাতের সুদীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সস্নেহে সসম্ভ্রমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু এইখানে হবার যে কথা ছিল?

সাগর কহিল, কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না। তাঁরা ত এদিককার মানুষ—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনেন!

ষোড়শী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সভায় কি স্থির হলো?

সাগর কহিল, তা সব ভাল। এই মঙ্গলেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তবে তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ-খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী কহিল, প্রার্থনা জানাতে হবে কার কাছে?

সাগর বলিল, বোধ হয় হুজুরের কাছেই।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, আর সকলের? যাদের জমিজমা সব গেল তাদের?

সাগর বলিল, ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তা থেকে তারা বাদ যাবে না। এই যে সেদিন প্রজার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজারের নজর দাখিল হলো তার খতের কাগজগুলো ত রায়মশাইয়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও জায়গা পায়নি, নইলে তিনি একটা হুকুম দিতে না দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবই বা কেন?

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, আর তোদের?

সাগর কহিল, আমাদের খুড়ো-ভাইপোর? একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থাও তিনি করেচেন, সাত-সাতটা দিন কিছু আর চুপ করে বসে ছিলেন না। পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে কোথাও একটা ডাকাতি হতে যা দেরি। জানো ত মা, বছর-দুই করে একবার খেটে এসেচি, এবার দশ বছরের মত একেবারে নিশ্চিন্ত। খুড়োর গঙ্গালাভ তার মধ্যেই হবে, তবে আমার বয়সটা এখনও কম, হয়ত আর-একবার দেশের মুখ দেখতেও পাবো। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ষোড়শী ভয় পাইয়া কহিল, হাঁ রে, এ কি তোরা সত্যি বলে মনে করিস?

সাগর বলিল, মনে করি? এ ত চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি মা। জেলের বাইরে আমাদের রাখতে পারে এ সাধ্যি আর কারও নেই। বেশী নয়, দু'মাস এক মাস দেরি, হয়ত নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে মা।

ষোড়শী কহিল, আর যারা ওখানে গেছে, তাদের?

সাগর বলিল, তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দুটো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবে না। নালিশগুলো

সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তার পরে রায়মশায়ের নিজ জোতে জন খেটে দু'মুঠো জোটে ভাল, না হয় আসামের চা-বাগান ত আছে।

কেমন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেনের-ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমিজমা হাল-বলদ। দু-মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সব্বায়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। এই সেদিন যাহারা দল বাঁধিয়া তাহার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল, আজ অক্ষম জানিয়া প্রবলের চোখের ইঙ্গিতে তাহারই বিরুদ্ধে তাহারা মন্ত্রণা করিতে একত্র হইয়াছে—সেদিনের সমস্ত কল্পনা তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল। যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মজ্ঞানবিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলে না, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার একটুখানি আশ্বাস লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য, ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের এই ক্ষুদ্র কৌশলটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া দিল, তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব-বিধানে কৈ? এই যে সাগর সর্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, দুর্বলের এতবড় স্পর্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে—অব্যাহতির কোন পথ নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, এ-সব তুই শুনলি কার মুখে?

সাগর কহিল, স্বয়ং হুজুরের মুখে।

তাহলে এ-সকল তাঁরই মতলব?

সাগর চিন্তা করিয়া কহিল, কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাগর, তুই বলতে পারিস, জমিদার আমার উপর অত্যাচার করেন না কেন? আমি ত ভাঙা কুঁড়েয় একলা থাকি, ইচ্ছে করলেই ত পারেন?

সাগর হাসিল, কহিল, কে তোমাকে বললে মা তুমি একলা থাকো? মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই,—গুরুর নিষেধ আছে, বলিতে বলিতে সহসা তাহার বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল লাঠির গায়ে যেন ইস্পাতের সাঁড়াশির মত চাপিয়া বসিল, কহিল, যার ভয়ে চণ্ডীর মন্দিরে না বসে ষোল আনা বসতে গেল আজ এককড়ির কাছারি-বাড়িতে, তারই ভয়ে কেউ তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। হরিহর সর্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে, তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শীর দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, সাগর, এ কি সত্য?

সাগর হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের লাঠিটা ষোড়শীর পায়ের নীচে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশ ত মা, সেই আশীর্বাদ কর না যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়াই আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল, কহিল, আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর সহাস্যে কহিল, মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচি নে মা।

ষোড়শী কহিল, কেবল প্রাণ দিতেই পারিস, আর নিতে পারিস নে?

সাগর কহিল, একটা হুকুম দিয়ে আজ রাত্রেই কেন যাচাই কর না মা? এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখের উপর দুই চোখ মেলিয়া ধরিতে ষোড়শী বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সাগরের চাহনি এক পলকে বদলাইয়া গেছে। সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—নিষ্প্রভ, সঙ্কুচিত গভীর দৃষ্টি—এ যেন আর সে সাগর নয়, এ যেন আর কেহ। সাগর কথা কহিল। কণ্ঠস্বর শান্ত কঠিন, অত্যন্ত ভারী। কহিল, রাত বেশী হয়নি—ঢের সময় আছে। মা চণ্ডীর কপাট তাই এখনো খোলা আছে মা, আমি তোমার হুকুম শুনতে পেয়েচি। বেশ, তাই হবে মা, পাপের শেষ করে দেব—সকালেই শুনতে পাবে, তোমার সাগর সর্দার মিছে অহঙ্কার করে যায়নি। তাহার পিতৃ-পিতামহের হাতের সুদীর্ঘ লাঠিখানা ত ষোড়শীর পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

ষোড়শী কথা কহিতে গেল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নিষেধ করিতে চাহিল, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না, ভূমিকম্পের সমুদ্রের মত অকস্মাৎ সমস্ত বুক জুড়িয়া দোলা উঠিল, এবং নিমেষের জন্য সাগরের এই একান্ত অপরিচিত ঘাতকের মূর্তি তাহার চোখের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাগর কি যেন একটা কহিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, কেবল এইটুকুমাত্র উপলব্ধি করিল যে, সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে।

সতর

ষোড়শীর যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সাগর চলিয়া গেছে।

মন্দিরের ভৃত্য ডাকিয়া কহিল, মা, এবার দোর বন্ধ করি?

কর, বলিয়া সে চাবির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেবেলা হইতে জীবনটা তাহার যথেষ্ট সুখেরও নয়, নিছক আরামেও দিন কাটে নাই; বিশেষ করিয়া যে অশুভ মুহূর্তে বীজগ্রামের নূতন জমিদার চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে উপদ্রবের ঘুর্ণিহাওয়া তাহাকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া নিরন্তর অশান্ত, চঞ্চল ও বিশ্রামহীন করিয়া রাখিয়াছে। তবুও সে-সকল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায়, আজ যেখানে সাগর সর্দার তাহাকে এইমাত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অথচ যথার্থই সে যে এতবড় ভয়ঙ্কর কিছু একটা এই রাত্রির মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী বিশ্বাস করিল না। অথবা এ আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে সত্য সত্যই স্থান পাইল না যে, যে লোক হত্যা, রক্তপাত ও হিংসার সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজনে পরিবৃত হইয়া অহর্নিশি বাস করে, পাপ তাহার যত বড়ই হোক, কেবলমাত্র সাগরের লাঠির জোরেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি দৈব বলিয়া যে শক্তির কাছে সকল অঘটনই হার মানে, তাহারই ভয়ে বুকের মধ্যে তাহার মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল।

মন্দিরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্য চাবির গোছা হাতে আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত অনেক হয়েচে মা, সঙ্গে যেতে হবে কি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, কোথায় বলাই?

তোমাকে পৌঁছে দিতে মা।

পৌঁছে দিতে? না, বলিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাহির হইয়া গেল।

প্রত্যহের মত এই পথটুকুর মধ্যেও অতি সর্তকতা আজ তাহার মনেই হইল না। রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকার, কিন্তু এ-কয়দিনের ন্যায় ঝাপসা মেঘের আচ্ছাদন আজ ছিল না। স্বচ্ছ নির্মল কৃষ্ণা-দ্বাদশীর কালো আকাশ এইমাত্র যেন কোন্ অদৃশ্য পারাবারে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার আর্দ্র গা-মাথায় এখনও যেন জল মাখানো রহিয়াছে। মন্দির হইতে ষোড়শীর কুটীরখানির ব্যবধান যৎসামান্য; এই আঁকাবাঁকা পায়ে-হাঁটা ধূসর পদরেখাটির উপরে একটি স্নিগ্ধ আলোক অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে; তাহারই উপর দিয়া সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শেষ চৈত্রের এই কয়টা দিন গ্রামে জনমজুর মিলে না, তথাপি তাহার অনুগত ভক্ত প্রজারা আঙ্গিনার চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরের কিছু কিছু সংস্কার করিয়া তাহারই গায়ে একখানি ছোট চালা বাঁধিবার জন্য তৈরি করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অর্গল নূতন হইয়াছে, এবং দেওয়ালের গায়ে ফাটা ও গর্ত যত ছিল, বুজাইয়া নিকিয়া মুছিয়া ঘরটিকে অনেকটা বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

তালা খুলিয়া ষোড়শী এই ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আলো জ্বালিয়া সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাহার অনেক কাজ বাকী ছিল। রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা তাহার ছিল না বটে; দেবীর প্রসাদ যাহা-কিছু আঁচলে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিত, তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিন্তু আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্মগুলি সে সর্বসমক্ষে মন্দিরে না করিয়া নির্জন গৃহের মধ্যেই সম্পন্ন করিত, তাহার পরে অনেক রাত্রি জাগিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিত।

এ-সকল তাহার প্রতিদিনের নিয়ম; তাই প্রতিদিনের মত আজও তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কর্মের তাগিদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু পা-দুটা কোনমতেই আজ খাড়া হইতে চাহিল না; এবং যে দরজা উন্মুক্ত রহিল, উঠি উঠি করিয়াও

তাহাকে সে বন্ধ না করিয়া তেমনি জড়ের মত স্থির হইয়া প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সে সাগরের কথা ভাবিতেছিল। মন্দিরের অনতিদূরবর্তী ভূমিজ পল্লীস্থ এই দুঃস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত এবং বড় হইয়া ইহাদের দুঃখদুর্দশার চিহ্ন যতই বেশী করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল ততই স্নেহ তাহার সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল চণ্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন—পরের ক্ষেতে মজুরি করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দন, না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে। ভূতপূর্ব ভৈরবীদের আমলে দেবীর অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল, তাঁহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতি বৎসর ভাগে বিলি হইত, এবং এই উপলক্ষে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি থাকিত না। অথচ লাভ কিছুই ছিল না; তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু-বা প্রজারা লুটিয়া খাইত, এবং অবশিষ্ট আদায় যদি-বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই-সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয়-সাত পূর্বে ফকিরসাহেবের নির্দেশমতে নির্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। এবং সেই কলহই পরবর্তী কালে নানা অজুহাতে নানা তুচ্ছ কাজে আজ এই আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর ও হরিহর সর্দার তখন জেল খাটিতেছিল। খালাস পাইয়া তাহার মন্দিরে ষোড়শীর কাছে আসিয়া একদিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। কহিল, মা, আমরা খুড়ো-ভাইপোয়েই কি কেবল কূলকিনারা পাবো না, শুধু ভেসে ভেসে বেড়াব?

ষোড়শী রাগ করিয়া কহিল, তোরা ভাসতে যাবি কেন হরিহর—জেলের অমন সব বাড়িঘর হয়েচে তবে কিসের জন্যে?

সাগর নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া রহিল; কিন্তু বুড়ো হরিহর তেমনি জোড়হাতে কহিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র বলে তুমিও কি কুমাতা হবে? আমাদেরও একটা পথ করে দাও।

ষোড়শী একটু নরম হইয়া কহিল, তোমার কথাগুলি ত ভাল হরিহর, তা ছাড়া তুমি বুড়ো হয়েও গেছ, কিন্তু তোমার ভাইপোটি ত অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে রইল, দোষটুকু পর্যন্ত স্বীকার করলে না—ও কি কখনো শান্ত হতে পারবে?

হরিহর নিজের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বুড়ো হয়ে গেছি, না মা? চুলগুলোও সব পেকে গেছে, বলিয়া সে মুচকাইয়া একটু হাসিতেই সাগরের সমস্ত মুখ শান্ত হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্তে খুড়ো-ভাইপোর চোখে চোখে নিঃশব্দে বোধ হয় এই কথাই হইয়া গেল যে, এই ভাল। তোমার এই প্রাচীন বাহু দুটির শক্তির কোন সংবাদ যে রাখে না, তাহার কাছে এমনি সহাস্যে সবিনয়ে স্বীকার করাই সবচেয়ে শোভন।

বুড়ো কহিল, অহঙ্কার নয় মা, অভিমান। ওটুকু ও পারে করতে—সাগর কখনো ডাকাতি করে না।

ষোড়শী আশ্চর্য হইয়া কহিল, ও কি তবে বিনাদোষে শাস্তিভোগ করলে? যা সবাই জানে, তা সত্য নয়—এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও হরিহর?

তাহার অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অকারণে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বাজিল, তথাপি বুড়া হরিহর কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাইপো সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। কহিল, কি হবে মা, তোমার সে কথা শুনে? তোমরা ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারবে না! ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলে, সেও সত্যি পাওনার দাবিতে, আবার যখন জেলে দিলে, সেও তেমনি সত্যি সাক্ষীর জোরে। জজসাহেবের আদালত থেকে মা চণ্ডীর মন্দির পর্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা! চল, ছোটখুড়ো, আমরা ঘরে যাই। বলিয়া সে চট করিয়া হেঁট হইয়া

ভৈরবীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। হরিহর নিজেও প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া সলজ্জ-কণ্ঠে কহিল, রাগ করো না মা, ও ব্যাটা ঐ রকম গোঁয়ার, ও কথা কারু সইতে পারে না। বলিয়া সেও ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগমন করিল।

হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা দস্যু; যতক্ষণ দেখা গেল ষোড়শী স্তব্ধবিস্ময়ে এই হীনবীর্য, অবমানিত, অধঃপতিত বাঙলাদেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতেই ষোড়শী সাগরকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, তোদের কাছে বাবা, কাল আমি অন্যায় করেছি। বিঘে দশ-পনর জমি আমার এখনো আছে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে তাই ভাগ করে নে। মায়ের খাজনা তোরা যা খুশি দিস্, কিন্তু অসৎপথে আর কখনো পা দিবিনে এই আমার শর্ত।

সেই অবধি সাগর আর হরিহর তাহার ক্রীতদাস। তাহার সকল কর্মে সকল সম্পদে তাহারা ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে, সকল বিপদে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছে। এই যে ভাঙ্গা কুটীর, এই সঙ্গীবিহীন বিপদাপন্ন জীবন, তবু যে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করে না, সে যে কিসের ভয়ে এ কথা ত তাহার অবিদিত নাই। তথাপি সেই সাগরের যে মূর্তি আজ সে চোখে দেখিয়া আসিল তাহাতে ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার আর তাহার কিছুই রহিল না। সে ডাকাতি করে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার অসাধ্য কিছু নাই— তাহার সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ আজও তেমনি সজীব আছে, এবং মুহূর্তের আহ্বানে তাহারা আজও তেমনি সাজিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সংশয় আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

ছেঁড়া একখানা কাগজের টুকরা একপাশে পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার প্রদীপের আলোকে চোখে পড়িল, হৈমর চিঠির জবাবে সেদিন যে চিঠিখানা সে লিখিয়াও ভাল হইল না ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া

আর একখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল ইহা তাহারই অংশ। অনেক রাত্রি জাগিয়া দীর্ঘ পত্র যখন শেষ হয়, তখন একবার যেন সন্দেহ হইয়াছিল এত কথা না লিখিলেই হইত—পরের কাছে আপনাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করা হয়ত কিছুতেই ঠিক হইল না, কিন্তু নিদ্রাহীন সেই গভীর রাত্রে ঠিক করিবার ধৈর্যও আর তাহার ছিল না। কিন্তু পরদিন ডাকে ফেলিয়া দিতে যখন পাঠাইল, তখন না পড়িয়াই পাঠাইয়া দিল। তাহার ভয় হইল পাছে ইহাও সে ছিঁড়িয়া ফেলে—পাছে আজও তাহার হৈমকে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া না ওঠে। এ কয়দিন যাহা ভুলিয়াছিল, আজ একে একে সেই চিঠির কথাগুলাই মনে পড়িয়া তাহার ভারী লজ্জা করিতে লাগিল—ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত। ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্যবসিত হইত, কখনো হৈম, কখনো নির্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই একসময়ে সমস্ত সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত, এবং সকল শক্তি দিয়া বর্জন করিতে চাহিত। সেই উতলা আবেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পত্রখণ্ড খান খান করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল। মনে মনে দৃঢ়বলে কহিল, কিসের জন্য হৈমদের এত কথা আমি বলিতে গেলাম! কোন্ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? কিসের জন্য লইব? দেবীর ভৈরবীপদের মধ্যে কি আছে যে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিব? যে-কেহ নিক না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর-ডাকাত। যাহার যত শক্তি সে তত বড়ই দস্যু। সুবিধা ও সামর্থ্য মত অপরের গলা টিপিয়া কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের কাজ।

এই ত সংসার, এই ত সমাজ, এই ত মানুষের ব্যবসা! পীড়িত ও পীড়কের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু যে অহর্নিশি এমন ভয়ে ভয়ে আছি! কিসের জন্য আমার এতবড় মাথাব্যথা! কিসের জন্য এতবড় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছি! এই ভৈরবীর আসন ত্যাগ করা কিসের জন্য এতবড় কঠিন! মুহূর্তের জন্য মনে হইল এ কাজ তাহার পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়, কাল সকালেই সে এককড়ি ও জনার্দন রায়কে লিখিয়া পাঠাইয়া ভৈরবীর সকল দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিতে পারে, কোথাও কোন টান, কোন ব্যথা তাহার বাজিবে না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের কুলুঙ্গিতে তাহার কালি কলম ও কাগজ থাকিত; পাড়িয়া লইয়া এই চিঠিখানা তখনই লিখিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া সহসা তাহার লেখনী রুদ্ধ হইল। সর্দার ও সাগরকে মনে পড়িল—পৃথিবী-জোড়া কাড়াকাড়ি ও দস্যুপনার মাঝখানে কেবল এই দুটি দস্যুই আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সহসা নিজের কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, তার পরে? দাঁড়াইবার কোথাও স্থান নাই—সবাই ত্যাগ করিয়াছে। কাল যাহারা তাহাকে ঘেরিয়া ছিল, আজ তাহারা শাসনের ভয়ে, জমিদারের গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহারই বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতি করিয়া আসিয়াছে। অথচ সে বেশীদিনের কথা নয়, ইহাদিগকেই—কিন্তু থাক সে কথা। এই অত্যন্ত ছোটদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নাই।এককড়ি, জনার্দন, শিরোমণি, তাহার পিতা তারাদাস, আর এই জমিদার—পুরানো ও নূতন অনেক কথা—কিন্তু সেও থাক; এ আলোচনাতেও আজ আর কাজ নাই। তাহার ফকিরসাহেবকে মনে পড়িল। তিনি যে কি ভাবিয়া এমন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন তাহার জানা নাই; কাহাকেও তিনি কোন হেতু, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্বেও তিনি এমনি নীরবে চলিয়া গেছেন; স্নেহ দিয়া, ভক্তি দিয়া, সসম্ভ্রমে বিদায় দিবার কোন অবসর কাহাকেও দেন নাই, হয়ত ইহাই তাঁহার প্রস্থানের পদ্ধতি। তবুও কেমন করিয়া যেন ষোড়শীর মনের মধ্যে ব্যথা একটা বিঁধিয়াই

ছিল, তাঁহার এই যাওয়াটাকে কোনক্রমে সে তাঁহার অভ্যাস বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিল না। তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, মা, আমি নিজের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছেদ করিতে চাই, লোকের সঙ্গে নয়। তাই লোকালয়ের মায়া কাটাতে পারিনে—মানুষের মাঝখানে বাস করতেই ভালবাসি। তুমিও তোমার দেহটাকে যখন দেবতাকেই দিয়েছ, তখন সেই কথাটাই সকলের আগে মনে রেখো। কোন ছলে নিজের বলে যেন ভুল না হয়। দেবতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে আত্মবঞ্চনার চেয়ে বরঞ্চ দেবতাকে ছাড়াও ভাল। আজ এই বঞ্চনাই ত তাহাকে জালের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। আজ যদি তিনি থাকিতেন! একবার যদি সে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিতে পারিত! বহুপূর্বে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, মা, যখন আমাকে তোমার যথার্থ প্রয়োজন হবে, সত্যই ডাকবে, যেখানেই থাকি আমি তখনি এসে দাঁড়াব। আজ ত তার সেই প্রয়োজন!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাহির হইতে ডাক আসিল, একবার ভিতরে আসতে পারি কি?

ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এতবড় অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিল না।

আমি আসতে পারি কি?

আসুন, বলিয়া ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মুদিতচক্ষে সর্বাঙ্গ দিয়া আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপের আলোকে চাহিয়া দেখিল—ফকিরসাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী। চক্ষে আর পলক পড়িল না—চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত যেন পাষাণ হইয়া গেল। গৃহের দীপশিখা স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-মানুষ এক নিমিষে পাথর হইয়া গেল, তাহাকে চিনিবার মত আলো ছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ যে সত্যই সে নয়, আর কেহ, তাহা অনুভব

করিয়া জীবানন্দর ভয় ভাঙ্গিল। গম্ভীরমুখে কহিল, এরূপ পতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য-অর্ঘ্য, আসনাদি কই?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এই হতভাগ্য জীবনে সে অনেককে দেখিয়াছে। সে জনার্দনকে দেখিয়াছে, সে এককড়ি নন্দীকে দেখিয়াছে, সে তাহার আপনার পিতাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে দেখিয়াছে; কিন্তু মানুষের পাষণ্ডতা যে এতদূরে উঠিতে পারে, এ কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাহার সময় লাগিল। জীবানন্দ এদিক-ওদিক চাহিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বলের আসনখানি পাড়িয়া লইল; পাতিতে গিয়া খোলা দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, খিলটা একেবারে দিয়েই বসিনে কেন? তোমার সাগরচাঁদটি শুনেচি নাকি আমাকে তেমন ভালবাসে না। কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়—এসে পড়্‌লে হয়ত বা কিছু মনেই করবে। ছোটলোক বৈ ত নয়! বলিয়া সে এইবার একটু হাসিল।

ষোড়শীর গা কাঁপিতে লাগিল। সে নিশ্চয় বুঝিল লোকটা একাকী আসে নাই, তাহার লোকজন নিকটেই লুকাইয়া আছে, এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগই সে প্রত্যহ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ ভীষণ কিছু একটা করিতে পারে—হত্যা করাও অসম্ভব নয়। এবং এই উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সে সম্পূর্ণ গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

জীবানন্দ কহিল, তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে—পাবারই কথা। কিন্তু তাই বলে চেঁচিও না। সঙ্গে গাদা-পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু পারবে না। বলিয়া সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনশ্চ পকেটেই রাখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যাক না। এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল, এবং অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গলবন্ধ করিয়া দিল, যাহার গৃহ তাহার অনুমতির অপেক্ষামাত্র করিল না।

ষোড়শীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার কথা কহিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিল, তার পরে স্বর যখন ফুটিল, তখন সেই স্বর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কহিল, সাগর নেই—

জীবানন্দ বলিল, নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী কহিল, আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ কহিল, জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাষ্পও জানতাম না।

ষোড়শী বলিল, নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমাকে মারতে এসেচেন। কিন্তু আপনার কি করেচি আমি?

জীবানন্দ কহিল, লোক নিয়ে মারতে এসেচি! তোমাকে? মাইরি না! বরঞ্চ মন কেমন করছিল বলে দেখতে এসেচি।

ষোড়শ আর কথা কহিল না। তাহার চোখে জল আসিতেছিল, এই কদর্য উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। এবং সেই শুষ্ক চক্ষু ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; এবং অদূরে বসিয়া আর একজন তাহারই আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহারি মত চুপ করিয়া রহিল।

আঠার

অলকা?

বলুন।

তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বুঝি?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই আবার অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল; দেবী-রানী তাকে ধরে আনিয়েছিল সত্যি, কিন্তু অম্বুরী তামাক খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুলব না, বলি, বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী স্থির করিয়াছিল এই পাষণ্ড আজ তাহাকে যত অপমানই করুক সে নিরুত্তরে সহ্য করিবে, কিন্তু জীবানন্দের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটায় হঠাৎ কেমন যেন তাহার সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দিল; বলিয়া ফেলিল, আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হতো না।

জীবানন্দ হাসিল, কহিল, তা বটে। টানা-হেঁচড়া দড়িদড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াসুদ্ধ সকলে দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না—হাঁ অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি।

ষোড়শী আরক্ত অধোমুখে নির্বাক হইয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিল, যৎসামান্য অনুরোধ ছিল, কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে ঠিক জামাই-আদর করবে না, এমন কি শ্বশুরবাড়ি এসেচি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বলচি।

ষোড়শী কোন কথাই কহিল না; এই কদর্য পরিহাসে অন্তরে সে যে কিরূপ লজ্জা বোধ করিল, মুখ তুলিয়া তাহা জানিতেও দিল না।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ মুহূর্তকয়েক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, অম্বুরী তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত; কিন্তু ধুঁয়া নয় এখন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু তাহার নাম ধরিয়া শেষ প্রশ্নটা তাহাকে মৌন থাকিতে দিল না, মুখ তুলিয়া বলিল, কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ হাসিয়া মাথা নাড়িল। কহিল, এবারে ভুল হলো! ওর জন্যে লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েচ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে যদি চাইতেই হয় ত চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের দিকে ঠেলে দেয় না। ডাল-ভাত, মেঠাই-মণ্ডা, চিড়ে-মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

ষোড়শী স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিল, সকালে আজ মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থ দেহ যে কি, আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম—ধারে ধারে কতদূর যে হাঁটলাম বলতে পারিনে—ফিরতে ইচ্ছেই হলো না। সূর্যদেব অস্ত গেলেন, একলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বলতে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগলো। ফেরবার পথে তাই বোধ হয় আর বাড়ি গেলাম না, ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়েই এসে দাঁড়ালাম ওই মন্‌সা গাছটার পেছনে। দেখি দোর খোলা, আলো জ্বলছে। পিস্তল ছাড়া আমি এক পা বাড়াইনে—ওটা পকেটেই ছিল, তবু গা ছমছম করতে লাগল। জানি ত বাবাজীবনরা আড়ালে-আবডালে কোথাও

আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেঝের ওপর তুমি চুপ করে বসে। আপনাকে আর সামলাতে পারলাম না। বাস্তবিক নেই কিছু?

ষোড়শী একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ি গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার বাড়ির খবর আমার চেয়ে বেশী জানো। বলিয়া সে একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি না মিলাইতেই ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনি সারাদিন খাননি, আর বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হতে পারে?

একজনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস গোপন রহিল না, কিন্তু আর একজন নিতান্ত ভালমানুষটির মত শান্তভাবে বলিল, পারে বৈ কি। আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি।

আজ খামকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা! বলিয়া সে তেমনি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আজ আসি। কিন্তু সত্যি সত্যিই থাকতে না পেরে যদি আর কোনদিন এসে পড়ি ত রাগ করতে পাবে না বলে যাচ্ছি।

এই লোকটির একান্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার যে চেহারা একদিন ষোড়শী নিজের চোখে দেখিয়াছিল তাহা মনে হইল। মনে হইল, কদাচারী, মদোন্মত্ত, নিষ্ঠুর মানুষ এ নয়; যে জমিদার মিথ্যা দিয়া তাহার সর্বনাশ করতে উদ্যত হইয়াছে, সে আর কেহ। সে আর কেহ যে সেদিন মন্দির হইতে বিদায় দিতে তাহাকে অসঙ্কোচে হুকুম দিয়াছিল! তবু একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই অস্ফুটে কহিল, দেবীর প্রসাদ সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

পারব না? তাই বল! বলিয়া সে আসনে ফিরিয়া গিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, প্রসাদ খেতে পারব না? শিগগির নিয়ে এসো, ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমার কিরূপ অচলা ভক্তি একবার দেখিয়ে দিই!

তাহার সুমুখের স্থানটুকু ষোড়শী জল-হাত দিয়া মুছিয়া লইল, এবং রান্নাঘরে গিয়া শালপাতায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যাহা কিছু ছিল, বহিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখুন যদি খেতে পারেন।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে দেখতে হবে না, কিন্তু এ ত তোমার জন্যে?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আপনার জন্যে আলাদা করে এনে রেখেছিলাম কি না তাই জিজ্ঞেসা করচেন?

জীবানন্দ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো না, তা জিজ্ঞেসা করিনি, আমি জিজ্ঞেসা করচি, আর নেই ত?

ষোড়শী কহিল, না।

তা হলে এ যে পরের মুখের গ্রাস একরকম কেড়ে খাওয়া অলকা?

ষোড়শী কহিল, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে কি আপনার হজম হয় না?

এ কথার উত্তর জীবানন্দ আর হাসিমুখে দিতে পারিল না। কহিল, কি জানি, নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না অলকা। কিন্তু সে যাক, তুমি খাবে কি? বরঞ্চ অর্ধেকটা রেখে দাও।

ষোড়শী কহিল, তাতে আমারও হবে না, আপনারও পেট ভরবে না।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না ভরুক, কিন্তু তোমাকে ত সারা রাত্রি অনাহারে থাকতে হবে না।

আজ খাবার কথা ষোড়শীর মনেও ছিল না—জীবানন্দ না আসিলে ও-সকল পড়িয়াই থাকিত, সে হয়ত স্পর্শও করিত না। কিন্তু সে কথা না বলিয়া

কহিল, ভৈরবীদের অনাহার অভ্যাস করতে হয়। তা ছাড়া আমার একটা রাত্রির কষ্টের ভাবনা ভেবে আপনি কষ্ট না-ই পেলেন। বরঞ্চ মিথ্যে দেরি না করে বসে যান; ঠাকুর-দেবতার প্রসাদের প্রতি অচলা ভক্তির সাফাই প্রমাণ দিন।

তা দিচ্চি, কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করচি জেনে যে উৎসাহ আর নেই—

বেশ, কম উৎসাহ নিয়েই শুরু করুন। বলিয়া ষোড়শী একটু হাসিয়া কহিল, আমাকে বঞ্চনা করায় নতুন অপরাধ আর আপনার হবে না। কিন্তু যা নিয়ে তর্ক চালিয়েচেন তাতে আমারি লজ্জা করচে। এবার থামুন।

জীবানন্দ আর কথা না কহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মিনিট-দুই পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, প্রায় পনর বছর হলো, না? আজ একটা বড়লোক হতে পারতাম।

ষোড়শী নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রায় বছর পনর পূর্বের ইঙ্গিতটা সে বুঝিল; কিন্তু শেষের কথাটা বুঝিল না।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি—সে ত নিজের চোখেই দেখে এসেচ, কিন্তু এমন একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?

ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল।

জীবানন্দ কহিল, আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা—

আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকাইয়া দিল। এ জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ডাকে নাই, ইহা একবারে নূতন; কিন্তু ভৈরবী-জীবনের সংযমের কঠোরতা তাহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দিল না। সে একমুহূর্ত থামিয়া কহিল, অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করেছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই

প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। না জেনে আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেচি তা সত্যি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েচে, এতবড় কঠিন মেয়েমানুষটিকে অভিভূত করেছে, সে মানুষটি কে?

ষোড়শী আশ্চর্য হইয়া কহিল, তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ কহিল, না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বার বার চুপ করে গেছে।

আপনি খান, বলিয়া ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই-চারি গ্রাস আহারের পর জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি বেশী খেতে পারিনে—

বেশী খেতে আপনাকে বলিনে। সাধারণ লোকে যা খায়, তাই খান।

আমি তাও পারিনে। খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

ষোড়শী কহিল, না, হয়নি, প্রসাদের ওপর অভক্তি দেখালে বাবাজীবনদের ডেকে দেব।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিল, সে তুমি পারবে না। তোমার জোর আমি জানি। পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিস্ট্রেট- সাহেবটি পর্যন্ত একদিন তার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন এ অস্বীকার করবার সাধ্য তোমার নেই।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল, জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, কহিল, আমি যখন একলা থাকি, সে রাত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে কোথা দিয়ে যে সময় কাটে বলতে পারিনে। বিশেষ করে চাকরদের ঘরে পাঠানোর ভয়ে তোমার সেই হাতজোড় করে কান্না! ভোলনি বোধ হয়?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ বলিল, তার পরে সেই শূলব্যথা। একলা ঘরে তুমি আর আমি। শেষে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমার রাত কাটল। তারপরের ঘটনাগুলো আর ভাবতে ভাল লাগে না। তোমাকে ঘুষ দিতে যাবার কথা মনে হলে আমার পর্যন্ত যেন লজ্জায় গা শিউরে উঠে। এই সেদিন পুরীতে যখন মর-মর হলাম, প্রফুল্ল বললে, দাদা, অলকাকে একবার আনিয়ে নিন। আমি বললাম, সে আসবে কেন? প্রফুল্ল বললে, গায়ের জোরে। আমি বললাম, গায়ের জোরে ধরে এনে লাভ হবে কি? সে উত্তর দিলে, ঠাকরুন একবার আসুন ত, তার পরে এর লাভ-লোকসানের হিসেব হবে। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু এতবড় ভক্ত তোমার আর নেই।

এই ভক্ত লোকটির পরিচয় জানিতে ষোড়শীর কৌতূহল হইল, কিন্তু সে-ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিল।

জীবানন্দ কহিল, রাত অনেক হলো, তোমাকে আর বসিয়ে রাখতে পারিনে। এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী কহিল, আপনার কি-একটা যে কাজের কথা ছিল?

কাজের কথা? কিন্তু বিশেষ কি কথা ছিল আমার আর মনে পড়চে না। এখন কেবল একটা কথাই মনে পড়চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। বড্ড খোশামোদের মত শোনাল, না? কিন্তু এ-রকম খোশামোদ করতেও যে পারি, এর আগে তাও জানতাম না। হাঁ অলকা, তোমার কি সত্যি আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ বলিল, আর তোমার মা যে আমাকে দিয়েছিলেন, সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে কহিল, না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেননি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্যও কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোনপ্রকার উত্তর দিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না। মিনিট-পাঁচেক যখন এইভাবে কাটিয়া গেল, তখন ষোড়শী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং ম্লান দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার অবসরে চাহিয়া দেখিল, সে যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়া গেছে। এই ধ্যান ভাঙ্গিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে নিজেই যখন কথা কহিল, তখন মনে হইল কে যেন কতদূর হইতে কথা কহিতেছে।

অলকা, এ কথা তোমার সত্য নয়।

কোন কথা?

জীবানন্দ কহিল, তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচি নে। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে ঠকাবার সুযোগ ভগবান আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলুন।

জীবানন্দ কহিল, আমি সত্যবাদী নই, কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সে-রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছেও আর হলো না।

তবে কি ইচ্ছে হলো?

জীবানন্দ কহিল, থাক, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝবে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বৈ লাভ আমার হবে না, কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাই নি।

ষোড়শী এই ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, আপনার না-পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

তাহার কঠোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল। কহিল, অলকা, আমি নির্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করব। তোমার মায়ের এতবড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজি হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হলো, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেন্ট তাতে শান্ত হলো না। ছ'মাস জেলে গেলাম— সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ পেলাম না।

ষোড়শী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিল, তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেন্ট ছিল। মাস-খানেক পূর্বে রেলগাড়িতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্ধান হন। ফলে আরও দেড় বৎসর। একুনে এই বছর-দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু আবার যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

জীবানন্দের আত্মকাহিনীর এক অধ্যায় শেষ হইল। তার পরে দু'জনেই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত কত?

বোধ হয় আর বেশী বাকী নেই।

তা হলে এ অন্ধকারে বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই।

কাজ নেই? তার মানে?

ষোড়শী কহিল, কম্বলটা পেতে দিই, আপনি বিশ্রাম করুন।

জীবানন্দের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, কহিল, বিশ্রাম করব? এখানে?

ষোড়শী কহিল, ক্ষতি কি?

কিন্তু বড়লোক জমিদারের যে এখানে কষ্ট হবে অলকা?

ষোড়শী বলিল, হলেও থাকতে হবে। গরীবের দুঃখটা আজ একটুখানি জেনে যান।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল, ইচ্ছা হইল বলে, আমি জানি সব, কিন্তু বুঝিবার মানুষটা যে মরিয়াছে। কিন্তু এ-কথা না বলিয়া কহিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

অলকা শান্তভাবে জবাব দিল, সে সম্ভাবনা ত রইলই।

উনিশ

জীবানন্দের উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে এবং রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজ সরিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিতে ষোড়শী বাহিরে চলিয়া গেলে, তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুকরাখানি জীবানন্দের চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এটুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে সে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপসা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোনমতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয় না। এই পত্র তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। একবার, দুইবার শেষ করিয়া যখন সে আরও একবার পড়িতে শুরু করিয়াছে, তখন ষোড়শীর পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিল, সবটুকু থাকলে পড়ে বড় আনন্দ পেতাম! যেমন অক্ষর তেমনি ভাষা–ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ষোড়শী তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য করিয়াও কহিল, একবার উঠুন, কম্বলটা পেতে দিই।

জীবানন্দ কান দিল না, বলিল, নরপিশাচটি যে কে তা সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, কিন্তু তাকে নিধন করতে যে দেবতার আবাহন হয়েছে তিনি কে? নামটি তাঁর শুনতে পাইনে?

এবারেও ষোড়শী আপনাকে বিচলিত হইতে দিল না। শীতের দিনে আকস্মিক একটা দখিনা বাতাসের মত তাহার মনের ভিতরটা আজ অজানা পদধ্বনির আশায় যেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে জীবানন্দের বিদ্রূপ বেশ

স্পষ্ট হইয়া পৌঁছিল না, সে তেমনি সহজভাবেই কহিল, সে হবে। এখন আপনি একটু উঠে দাঁড়ান আমি এটা পেতে দিই।

জীবানন্দ আর কথা কহিল না, একপাশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহার কাজ করা দেখিতে লাগিল। ষোড়শী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে সমস্ত ঘরখানি পরিষ্কার করিল, পরে কম্বলখানি দু' পুরু করিয়া বিছাইয়া চাদরের অভাবে নিজের একখানি কাচা কাপড় সযত্নে পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আমার কিন্তু বালিশ নেই–

দরকার হলেই পাবো গো–অভাব থাকবে না এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেই ষোড়শী মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া আরক্তমুখে কহিল,কিন্তু ওটা তুলে ফেললেন কেন, শুধু কম্বল ফুটবে যে!

জীবানন্দ উপবেশন করিয়া কহিল, তা জানি, কিন্তু আতিশয্যটা আবার বেশী ফুটবে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর চোখের পলকে কে যেন ছাই মাখাইয়া দিল।

জীবানন্দ কহিল, তাঁর নামটি?

ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কার নাম?

জীবানন্দ হাতের পত্রখণ্ডের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, যিনি দৈত্যবধের জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন? যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি–আর বলব?

এই ব্যঙ্গের সে জবাব দিল না, কিন্তু চোখের উপর হইতে তাহার মোহের যবনিকা খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ধর্মলেশহীন, সর্বদোষাশ্রিত এই পাষণ্ডের আশ্চর্য অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত

ক্ষমামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছিল, ইহা সে সহসা ভাবিয়া পাইল না। এবং চিত্তের এই ক্ষণিক বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার অনুশোচনায় তিক্ত, সতর্ক ও কঠোর হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল পরে জীবানন্দ পুনশ্চ যখন সেই এক প্রশ্নই করিল, তখন ষোড়শী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ কহিল, প্রয়োজন আছে বৈ কি? আগে থেকে জানতে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতেও পারি।

ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর আত্মরক্ষায় কি শুধু আমারই অধিকার নেই?

জীবানন্দ বলিয়া ফেলিল, আছে বৈ কি।

ষোড়শী কহিল, তা হলে সে নাম আপনি পেতে পারেন না। আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তাই যদি হয়, রক্ষা পাওয়া আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ক্রুটি হবে না জেনো।

ষোড়শীর মুখে আসিল বলে, তা জানি, একদিন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল। সেদিন নিরপরাধা নারীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া তোমার প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং তোমার আজিকার বাঁচিয়া থাকিবার দামটাও হয়ত ততবড়ই আর একজনকে দিতে হইবে, কিন্তু সে কোন কথাই কহিল না। তাহার মনে হইল, এতবড় নরপশুর কাছে অতবড় দানের উল্লেখ করার মত ব্যর্থতা আর ত কিছু হইতেই পারে না।

জীবানন্দের হুঁশ হইল। তাহার এতবড় ঔদ্ধত্যের যে জবাব দিল না, তাহার কাছে গলাবাজির নিষ্ফলতা তাহার নিজের মনেই বাজিল। তাহার উত্তেজনা কমিল, কিন্তু ক্রোধ বাড়িয়া গেল। কহিল, অলকা, তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা নয়।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, জানবেন বৈ কি, নইলে তাঁর উদ্দেশে ঝগড়া করবেন কেন? তা ছাড়া, পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ শক্ত হইয়া কহিল, সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী বলিল, আর একখানা পাঠিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু সোজা তাঁকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এই-সব শব্দভেদী বাণ কি সেই বীরপুরুষের শিক্ষা নাকি?

ষোড়শী কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ বলিল, তার পরে, আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায়মশাইকে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেছেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশী।

ষোড়শী চমকিয়া গেল। কলঙ্কের ঘূর্ণি-হওয়ার মাঝখানে পড়িয়া তাহার দেহের কোথাও দাগ লাগিতে আর বাকী ছিল না, কিন্তু ইহার বাহিরে দাঁড়াইয়াও যে আর একজন অব্যাহতি পাইবে না, ইহা সে ভাবে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন?

জীবানন্দ কহিল, সমস্তই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলাম না– আমার আনন্দ করবার কথা এ নয়। সেই ঝড়জলের রাত্রির কথা মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী বেটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই বলবার জো নেই। আমি যখন গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী কহিল, যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে সে কি এতবড় দোষের?

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু তাকে গোপন করাটা? এই চিঠির টুকরোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয়? এ আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, আবশ্যক হয়ত যথাস্থানে পৌঁছে দেব। আমার মত ইনিও তোমার একবার বিচার করতে বসেছিলেন না? দেখচি তোমার বিচার করবার বিপদ আছে। বলিয়া সে মুচকি হাসিল।

ষোড়শী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপদের বার্তা জানাইয়া বাস্তবিক সে যে একজনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আর একজনকে পত্র লিখিয়াছে, একজনের নাম করিয়া আর একজনকে আসিতে ডাকিয়াছে–সেই ডাকটা যখন এই ছেঁড়া চিঠির টুকরা হইতে এই লোকটাকে পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিল না, তখন সম্পূর্ণ পত্রটা কি হৈমর চক্ষুকেই ঠকাইতে পারিবে? এবং ঠিক সেইদিকে কেহ যদি আজ আঙুল তুলিয়া হৈমর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে ত লজ্জার কিছু আর বাকী থাকিবে না।

তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র–তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাসদাসী, তাহার ঐশ্বর্য, তাহার সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ধারা–যে ছবি সে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে–সমস্ত একনিমেষে কলুষের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে মনে করিয়া সে নিজের কাছেই যেন মুখ দেখাইতে পারিল না। আর এই যে পাপিষ্ঠ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত, নিরপরাধ একজন রমণীর সর্বনাশ করিতে কোন কুণ্ঠা মানিবে না, ষোড়শীর মনে হইল এ জীবনে এতবড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং এ বিষ যে হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নির্মল আসিবেই! তাহার যত অসুবিধাই হোক, এই দুঃখের আহ্বান সে যে উপেক্ষা করিতে পারিবে না–নিজের মনের এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের লজ্জায়

সে যেন পুড়িতে লাগিল। তখন তাহারই কলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া শ্বশুর ও জামাতায়, পিতা ও কন্যায়, জমিদার ও প্রজায় সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া যে লড়াইয়ের আবর্ত উঠিবে, তাহার বীভৎসতার কালো ছায়া তাহার সাংসারিক দুঃখ-কষ্টকে কোথায় যে ঢাকিয়া ফেলিবে সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

বোধ করি মিনিট পাঁচ-ছয় নিস্তব্ধতার পরে ঠিক এইসময়ে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেমন, অনেক কথাই জানি, না?

ষোড়শী অভিভূতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ।

এ-সব তবে সত্য বল?

ষোড়শী তেমনি অসঙ্কোচে কহিল, হ্যাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ অবাক হইয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে তাহার নিজের মুখেও সহসা কথা যোগাইল না। শুধু কহিল,—ওঃ—সত্যি! তাহার পরে হাত বাড়াইয়া স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দিতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাহলে তুমি কি করবে মনে কর?

কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

তোমাকে? বলিয়া জীবানন্দ স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তৈলবিরল প্রদীপের বাতিটা অকারণে শুধু শুধু কেবল উস্‌কাইতে লাগিল। খানিক পরে যখন সে কথা কহিল, তখনও তাহার চক্ষু সেই দীপশিখার প্রতি। কহিল, তাহলে এঁরা সকলে তোমাকে অসতী বলে—

এতক্ষণ পরে সে কথার মাঝখানে বাধা দিল, কহিল, সে কথা এখানে কেন? এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাই নি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কোন কারণ দেখাবার দরকার নেই।

জীবানন্দ বলিল, তা বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যে কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী, এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি-একটা বলিতে গিয়াও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল দেখিয়া জীবানন্দ আপনাকে আর একবার অপমানিত জ্ঞান করিল। বলিল, একটা উত্তর দিতেও চাও না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভাল। বেশ! কিন্তু সমস্ত স্পষ্টই বোঝা গেছে। এই বলিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল।

কিন্তু ইহাতেও ষোড়শীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইল না, কহিল, স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে বলুন?

তাহার প্রশ্ন ও অচঞ্চল কণ্ঠস্বরের গোপন আঘাতে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য শতগুণ বাড়িয়া গেল, কহিল, তোমাকে কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে।

সত্যকার অভিভাবক তুমি নয়, আমি। পূর্বে কি হতো আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে। এ-রকম চিঠি তার লেখা চলবে না। বলিয়া সে মুখ তুলিতেই তাহার ঈর্ষার ক্রূরদৃষ্টি ষোড়শীর চোখে পড়িতে তাহার নিজের দৃষ্টি একমুহূর্তে যেমন যোজনবিস্তৃত হইয়া গেল, তেমনি লালসার তপ্ত নিঃশ্বাস নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করিয়া বিশ্বসংসারে যেন তাহার অরুচি ধরিয়া গেল। মনে হইল হৈম, তাহার সংসার, এই দেবমন্দির, তাহার অসহায় প্রজাদের দুঃখ, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ কিছুরই আর তাহার কাজ নাই—সকল বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া অজানা কোথাও গিয়া লুকাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সকলের চেয়ে বেশী মনে হইল নির্মল যেন না আসে। অনেকক্ষণ নীরবে স্থির থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, বেশ, তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে, সে নিয়ে আমি ঝগড়া করব না, আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভাল হবে, আমি যাবো।

ইহাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া জীবানন্দ জ্বালার সহিত কহিল, তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও তা আমি দেখব।

ষোড়শী তেমনি নম্রকণ্ঠে বলিল, আমি যখন যেতে চাচ্চি, তখন কেন আপনি রাগ করচেন? কিন্তু আপনার উপর এই ভার রইল, যেন মন্দিরের সত্যিই ভাল হয়।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কবে যাবে?

ষোড়শী উত্তর দিল, আপনারা যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন–যখনি বলবেন।

জীবানন্দর ক্রোধ বাড়িল বৈ কমিল না, কহিল, কিন্তু নির্মলবাবু? জামাইসাহেব?

ষোড়শী কাতর হইয়া বলিল, তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, আমার মুখে তাঁর নামটা পর্যন্ত সহ্য হয় না? ভাল। কিন্তু তোমাকে কি দিতে হবে?

আমাকে কিছুই দিতে হবে না।

জীবানন্দ কহিল, এ ঘরখানা পর্যন্ত ছাড়তে হবে জানো? এ-ও দেবীর।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে কহিল, জানি, যদি পারি ত কালই ছেড়ে দেব।

কালই? ভাল, কোথায় থাকবে ঠিক করেচ?

ষোড়শী কহিল, এখানে থাকব না, এর বেশী কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার সময়েও আমি এর বেশী কিছুই চিন্তা করব না।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল এতক্ষণ কোথায় যেন তাহার ভুল হইতেছিল।

ষোড়শী বলিল, আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের বোঝা আপনার উপর রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু আমার বাবা বড় দুর্বল, তাঁর উপর ভার দিয়ে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ও কথায় বিচলিত হইয়া জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্য সত্যই চলে যেতে চাও নাকি?

ষোড়শী তাহার পূর্বকথার অনুবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিল, আর আমার দুঃখী দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা–এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকে দিয়ে চললাম।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী কহিল, সে তারাই আপনাকে জানাবে। কেবল আমি শুধু আপনার কথাটাই যাবার আগে তাদের জানিয়ে যাবো। হঠাৎ সে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া কহিল, কিন্তু এখন আমি চললাম–আমার স্নান করতে যাবার সময় হলো। বলিয়া সে তাহার কাপড় ও গামছা আলনা হইতে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল।

জীবানন্দ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, স্নানের সময়? এই রাত্রে?

রাত্রি আর নেই। আপনি এবার বাড়ি যান। বলিতে বলিতেই ষোড়শী ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এ অকারণ আকস্মিক ব্যগ্রতায় জীবানন্দ নিজেও ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকী রয়ে গেল অলকা?

ষোড়শী কহিল, আপনি বাড়ি যান।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না। কথা আমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করে রইলাম।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, আপনার পায়ে পড়ি, আমার জন্যে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। বলিয়া সে বামদিকে বনপথ ধরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুড়ি

সেদিন প্রাতঃকালটা হঠাৎ একটা ঘন কুয়াশায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রায়মহাশয় সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন; একজন ভদ্রব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কে ও?

আমি নির্মল, বলিয়া জামাতা কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই আকস্মিক আগমনে তিনি কোনরূপ বিস্ময় বা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, কে আছিস রে, নির্মলের জিনিসপত্রগুলো সব হৈমর ঘরে রেখে আয়। তা গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত বাবা? খোকা, হৈম, এরা সব ভাল আছে ত?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সকলে ভাল আছে।

রায়মহাশয় কহিলেন, কিন্তু একা এলে কেন নির্মল, মেয়েটাকে সঙ্গে আনলে ত আর একবার দেখা হতো?

নির্মল বলিল, দু’-চার দিনের জন্যে আবার–

রায়মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, এ কি দু’-চার দিনের ব্যাপার বাবা, দু’-চার মাসের দরকার। যাও, ভেতরে যাও–মুখ-হাত ধোও গে।

নির্মল ভিতরে আসিয়া দেখিল এখানেও সেই একই ভাব। যে প্রকারেই হোক তাহার আসার সম্ভাবনা কাহারও অবিদিত নয়, এবং সেজন্য কেহই প্রসন্ন নহেন। মুখ-হাত ধোয়া, কাপড়-ছাড়া প্রভৃতি সমাধা হইলে গরম চা এবং কিছু জলখাবার শ্বশ্রুঠাকুরানী স্বহস্তে আনিয়া জামাতাকে নিজে খাওয়াইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈম কি আসতে চাইলে না?

নির্মল কহিল, না।

তারা জানে তুমি কেন আসছ?

নির্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানে বৈ কি, সমস্তই জানে।

তবু মানা করলে না?

তাঁহার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বরে নির্মল পীড়া অনুভব করিয়া বলিল, মানা কেন করবে মা? সে ত জানে আমি অন্যায় কাজে কোনদিনই হাত দিইনে।

আর তার বাপই কেবল অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বেড়ায়, এই কি সে জানে নির্মল? বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নতমুখে স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই কেন না জানুক বাছা, এ তুমি করতে পারবে না—এ কাজে তোমাকে আমি কোনমতেই নামতে দিতে পারব না। শ্বশুর-জামাইয়ে লড়াই করবে, গাঁয়ের লোক তামাশা দেখবে, তার আগে আমি জলে ডুব দিয়ে মরব, তোমাকে বলে রাখলাম বাবা।

নির্মল আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু যে পীড়িত, যে অসহায়, তাকে রক্ষা করাই ত আমাদের ব্যবসা মা।

শাশুড়ী কহিলেন, কিন্তু ব্যবসাই ত মানুষের সমস্ত নয় বাছা। উকিল-ব্যারিস্টারেরও মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, শ্বশুর-শাশুড়ী আছে—গুরুজনের মান-মর্যাদা রাখার ব্যবস্থা সংসারে তাদের জন্যেও তৈরি হয়েছে।

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হয়েচে বৈ কি মা, নিশ্চয় হয়েছে। তাহার পরে সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া বলিল, আর শেষ পর্যন্ত হয়ত লড়াই-ঝগড়া কিছুই না হতে পারে।

গৃহিণীর মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইল না, কহিলেন পারে, কিন্তু সে শুধু তোমার শ্বশুরের সর্বরকমে হার হলেই পারে। কিন্তু তার পরে আর তাঁর রায়মশাই হয়ে এ গ্রামে বাস করা চলবে না। তা ছাড়া ষোড়শী দুর্বলও নয়, অসহায়ও নয়। তার ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের দল আছে, তাকে জমিদার ভয় করে। তার একখানা চিঠির জোরে মানুষ পাঁচ শ' ক্রোশ দূর থেকে ঘরদোর ছেলেপুলে ফেলে চলে আসে, আমরা যা এক শ' খানা চিঠিতে পারিনে। তারা হলো ভৈরবী, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র কত কি জানে। তা সে থাক ভাল, যাক ভাল, আমার ক্ষতি নেই—তার

পাপের ভরা সে-ই বইবে, কিন্তু চোখের ওপর আমার নিজের মেয়ের সর্বনাশ আমি হতে দেব না নির্মল, তা লোকে যাই বলুক আর যাই করুক!

নির্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যেভাবেই হোক, এদিকে জানাজানি হইতেও কিছু বাকী নাই, এবং ষড়যন্ত্রেরও কোন ত্রুটি ঘটে নাই। তাহার শ্বশুর সকল আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ছিদ্র বাহির করিবার জো নাই। তাহার চুপচাপ প্রকৃতির শাশুড়ীঠাকুরানী যে এমন মজবুত করিয়া কথা কহিতে জানেন, ইহা সে মনে করে নাই, এবং যাহা কিছু কহিলেন সে যে তাঁহার নিজের কথা তাহাও সে মনে করিল না, কিন্তু জবাব দিবারও কিছু খুঁজিয়া পাইল না। এই আর্জি যিনি মুসাবিদা করিয়া আর একজনের মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল দিক চিন্তা করিয়াই দিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই, যে নিছক পরোপকার-মানসেই সে যে পশ্চিমের একপ্রান্ত হইতে স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এ উত্তর সে কোনমতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করার পরে নির্মল যখন বাটীর বাহির হইল, তখন কর্তা সদরে বসিয়াছিলেন। তিনি কোথায়, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিরর্থক প্রশ্নে সময় নষ্ট করিলেন না, শুধু একটু সকাল সকাল ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, এই শ্রান্তদেহে অধিক বেলায় স্নানাহার করিলে অসুখ করিতে পারে।

শিরোমণিমহাশয় পাশে বসিয়া কি বলিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, বাবাজী—না?

রায়মহাশয় বলিলেন, হাঁ।

শিরোমণি ডাকিয়া আলাপ করিবার উদ্যম করিতেই জনার্দন বাধা দিয়া বলিলেন, নির্মল পালাচ্চে না, তোমার কথাটা শেষ কর, আমাকে উঠতে হবে।

নির্মল নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শ্বশুর যে তাহাকে অতি-কৌতূহলী প্রতিবেশীর অপ্রিয় জেরার দায় হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন, ইহা অনুভব করিয়া তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ষোড়শীর সহিত সে দেখা করিতে চলিয়াছিল। দিন-দুই পূর্বে যে উৎসাহ লইয়া, মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া লইয়া সে তাহার প্রবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে আর ছিল না। যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সকল দুঃখ তাহার হরণ করিয়াছিল, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অভিযোগের আক্রমণে এইমাত্র তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সমবেত ও প্রবল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার একক পৌরুষ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন, দুর্বল, পরিত্যক্ত, নির্জিত নারীর নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে এই গ্রামে পদার্পণ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কত না বল, কত না শোভা, কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার সকল কার্যেরই ইতিমধ্যে একটা কারণ প্রকাশ হইয়া গেছে। তাহা যেমন কদর্য, তেমনি কালো। কালিতে লেপিয়া একাকার হইতে আর বাকী কিছু নাই। শ্বশুরকে সে কোনদিন আদর্শপুরুষ মনে করে নাই; তিনি পল্লীগ্রামের বিষয়ী লোক, সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন, অতএব পরলোকের খরচের পাতাটিও সাদা পড়িয়া থাকিবার কথা নয়, ইহা সে বেশ জানিত, এবং মনে মনে ক্ষমাও করিত; কিন্তু আজ যখন সে মন্দিরের প্রাচীর ঘুরিয়া পায়ে-হাঁটা সেই সরু পথ ধরিয়া ষোড়শীর কুটীর অভিমুখে পা বাড়াইল, তখন সংক্ষুব্ধ চিত্ততলে তাহার একদিকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবিড় হইয়া দেখা দিল, তেমনি অন্য দিকে বিশেষ কিছু না জানিয়াও ষোড়শীর প্রতি অভিমান ও বিরক্তিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, যে স্ত্রী অনাত্মীয় অপরিচিতপ্রায় পুরুষের কৃপাভিক্ষা করিয়া পত্রদ্বারা আহ্বান করিবার সঙ্কোচ অনুভব করে না, এবং সে কথা নির্লজ্জ দাম্ভিকার ন্যায় পথে-ঘাটে প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে আর যাহাই হোক সম্মানের উচ্চ আসনে বসানো চলে না। কিন্তু অকস্মাৎ চিন্তা তাহার এইখানে বাধা পাইয়া থামিল। পত্রবহুল মনসাগাছের বাঁক ফিরিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি সন্নিকটবর্তিনী ষোড়শীর আনত মুখের উপরে গিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে বেড়ার দড়ি বাঁধিতেছিল, আগন্তুকের পদশব্দ

শুনিতে পাইল না, এবং ক্ষণকালের জন্য নির্মল না পারিল নড়িতে, না পারিল চোখ ফিরাইতে। এই ত সেদিন, তবুও তাহার মনে হইল এ সে ভৈরবী নয়। অথচ পরিবর্তন যে কোন্‌খানে তাহাও ধরিতে পারিল না। সেই রাঙ্গা-পাড়ের গৈরিক শাড়ি-পরা, তেমনি রুক্ষ এলোচুল, গলায় তেমনি রুদ্রাক্ষের মালা, তেমনি মুখের উপরে উপবাসের একটি শীর্ণ ছায়া–সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূলটি পর্যন্ত তেমনি হাতের কাছে ঠেস দিয়া রাখা–কিছু বদলায় নাই, তবুও অপরিচিত, অজানা মোহে তাহাকে মুহূর্তকয়েকের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া দিল। দড়ির গ্রন্থি টানিয়া দিয়া ষোড়শী মুখ তুলিয়াই একটু চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ছাড়িয়া দিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নির্মল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিন্তু আপনার কাজে যে বাধা দিলাম।

ষোড়শী সকৌতুকে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেড়া-বাঁধা বুঝি আমার কাজ? আর হলোই বা কাজ, কুটুম্বকে খাতির করাটা বুঝি কাজ নয়? শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের আদর হয়নি, কিন্তু শালীর কুঁড়েঘর থেকে ভগিনীপতিকে অনাদরে ফিরতে দেব না। আসুন, ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। খোকা, হৈম, চাকর-বাকর সব ভাল আছে? আপনি নিজে ভাল আছেন?

নির্মল কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সবাই ভাল আছে, কিন্তু আজ আর বসব না।

ষোড়শী কহিল, কেন শুনি? তার পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া আরও একটু কাছে আসিয়া বলিল, একদিন হাত ধরে অন্ধকারে পার করে এনেছিলাম মনে পড়ে? দিনের বেলায় ওতে আর কাজ নেই, কিন্তু চলুন বলচি। যে এত দূর থেকে টেনে আনতে পারে, সে এটুকুও টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

নির্মল লজ্জা বোধ করিল, আঘাত পাইল। এই আচরণ, এই কথা ষোড়শীর মুখে কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়। বিদুষী সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে সে শান্তসমাহিত দৃঢ়, এমন কি কঠোর বলিয়া জানিত। সংসারে রমণীর পর্যায়ভুক্ত

করিয়া কল্পনা করিতে যেন তাহার বাধিত। তাহাকে অনেক ভাবিয়াছে—কর্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই ষোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে—সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও চিন্তাকে সে পদ্ধতি দিবার, শৃঙ্খলিত করিবার সাহস পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু সেই ষোড়শী আজ যখন অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার অতি-ঘনিষ্ঠতায় অকস্মাৎ নিজেকে ছোট করিয়া, মানবী করিয়া, সাধারণ মানবের কামনার আয়ত্তাধীন করিয়া দিল, নির্মল অন্তরের একপ্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল, তেমনি আর একপ্রান্ত তাহার কি একপ্রকার কলুষিত আনন্দে একনিমিষে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

নির্মলকে ঘরে আনিয়া ষোড়শী কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পথে কষ্ট হয়নি?

নির্মল বলিল, না। কিন্তু মন্দিরে আজ আপনার কাজ নেই?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আজ মন্দিরের রবিবার কিনা! তাহার পরে বলিল, কাজ আছে, সকালে একদফা করেও এসেচি। যেটুকু বাকী আছে সেটুকু বেলাতে করলেও হবে। হাসিয়া কহিল, জামাইবাবু, এ আপনাদের কোর্ট-কাছারি নয়, মন্দির। ঠাকুর-দেবতারা তাদের দাসদাসীদের কখনো মুহূর্তের ছুটি দেন না, কানে ধরে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন।

কিন্তু এ চাকরি ত আপনি ইচ্ছে করেই নিয়েচেন।

ইচ্ছে করে? তা হবে। বলিয়া ষোড়শী সহসা একটুখানি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, আসার একটু খবর দিলেন না কেন?

নির্মল কহিল, সময় ছিল না। কিন্তু তার শাস্তিস্বরূপ শ্বশুরবাড়িতে যে খাতির পাইনি, অন্ততঃ তাঁরা যে আমাকে দেখে খুশী হননি, এ কথা আপনি জানলেন কি করে? এবং আমার আসার সংবাদ আসার পূর্বেই কে প্রচার করে দিল বলতে পারেন?

ষোড়শী কহিল, বলতে পারিনে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

নির্মল বলিল, আন্দাজ করতে ত আমিও পারি, কিন্তু সত্যি কে করেচে, এবং কোথায় সে খবর পেলে, জানেন ত আমাকে বলুন। আশা করি আপনার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়নি?

ষোড়শী হাসিল, কহিল, কোন আশা করতেই আমি কাউকে নিষেধ করিনে। কিন্তু জেনে আপনার লাভ কি? আপনি এসেচেন এ খবরও সত্যি, আমারই জন্যে এসেচেন এ কথাও ঠিক। তার চেয়ে বরঞ্চ বলুন, আসা সার্থক হবে কি না? আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কি না?

নির্মল কহিল, প্রাণপণে চেষ্টা করব বটে।

যদি কষ্ট হয় তবুও?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যদি কষ্ট হয় তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। নির্মল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, হাসলেন যে?

ষোড়শী কহিল, হাসচি—আগেকার দিনে ভৈরবীরা বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত। আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি করত? চরিয়ে বেড়াত, না লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাশা দেখত! বলিতে বলিতেই সে একেবারে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

নির্মলের দেহ-মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই কঠিন আবরণের নীচে যে রহস্যপ্রিয় কৌতুকময়ী চঞ্চল নারী-প্রকৃতি চাপা দেওয়া আছে, তাহার অপর্যাপ্ত হাসির প্রস্রবণ যে ব্রতোপবাসের সহস্রবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় আজও শুকায় নাই—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে তেমনি জীবন্ত—এই কথা স্মরণ করিয়া সর্বশরীরে তাহার কাঁটা দিল।পরিহাসে নিজেও যোগ দিয়া হাসিয়া কহিল, হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো। অর্থাৎ আমার শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীঠাকরুন ইতিমধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন, এবং অনেক অপ্রিয় অসত্য শুনিয়ে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, না, তাঁরা কেউ আসেন নি। আমি যে মন্ত্রেতন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেচি এটা অসত্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রিয় হবে কেন নির্মলবাবু? তা ছাড়া আপনার আসার ধরন দেখে নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে হয়ত বা নিতান্ত মিথ্যা না হতেও পারে। তাহার মুখে হাসির আভাস লাগিয়াই রহিল, কিন্তু গলার শব্দ বদলাইয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে ও কণ্ঠস্বরে সহসা যেন আর সঙ্গতি রহিল না।

নির্মল আশ্চর্য, অবাক হইয়া রহিল। ইহার কতটুকু পরিহাস এবং কতখানি তিরস্কার, এবং কিসের জন্য তাহা সে কিছুতে ভাবিয়া পাইল না।

ষোড়শী নিজেও আর কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার আনত মুখের পরে যে অপ্রত্যাশিত লজ্জার আরক্ত আভা পলকের নিমিত্ত ছায়া ফেলিয়া গেল, ইহা তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু সে ঐ পলকের জন্যই। ষোড়শী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে কহিল, কুটুমের অভ্যর্থনা ত হলো। অবশ্য হাসি-খুশি দিয়ে যতটুকুই পারি ততটুকুই–তার বেশী ত সম্বল নেই ভাই–এখন আসুন, বরঞ্চ কাজের কথা কওয়া যাক।

তাহার ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকে এবার সে সংশয়ের সহিত গ্রহণ করিতে চাহিল, তবুও তাহার মন ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, বলুন।

ষোড়শী কহিল, দুটি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায়মহাশয়, আর একটি জমিদার–

নির্মল বলিল, আর একটি আপনার বাবা। এঁরাই ত আপনাকেও বঞ্চিত করতে চান।

বাবা? হ্যাঁ, তিনিও বটে। এই বলিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল বলিল, আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শত্রুতা করেন?

ষোড়শী বলিল, দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রি করে ফেলতে চান, কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার জো নাই।

নির্মল সহাস্যে কহিল, সে আমি সামলাতে পারব। বলিয়া সে কটাক্ষে ভৈরবীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ষোড়শী নীরব হইয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খানিক পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

কি সে-সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিল না; শান্তস্বরে বলিল, সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্মলবাবু! আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্মল বিস্মিত হইয়া কহিল, এই কথা নিজের মুখে বলতে চান? সে যে স্বীকার করার সমান হবে।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল সসঙ্কোচে কহিল, ওরা যে বলে—

কারা বলে?

অনেকেই বলে সে সময়ে আপনি—

কোন্ সময়ে?

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ সবলে দমন করিয়া বলিল, সেই ম্যাজিস্ট্রেট আসার দিনে। তখন আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, তারা কি দেখেছিল নাকি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নাই—যদি দেখে থাকে, তা সত্যি, জমিদারের মাথা আমিই কোলে করে বসেছিলাম।

নির্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, তার পরে?

ষোড়শী শান্ত মুখখানি হাসির আভাসে একটু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, তার পরে দিন কেটে যাচ্চে। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসাতে পারিনে। সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকে।

কি মিথ্যে?

সব। ধর্ম, কর্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা-কিছু সমস্তই—

তবু ভৈরবীর আসন চাই?

চাই বৈ কি। আর আপনি যদি বলেন, চাই না—

না, না, আমি কিছুই বলিনে। এই বলিয়া নির্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে—এখন আমি চললাম।

ষোড়শীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমারও মন্দিরের কাজ আছে। কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

নির্মল অনিশ্চিত অস্ফুটকণ্ঠে কি একটা কহিল, ভাল শোনা গেল না। ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, সন্ধ্যার পর আজই ত আমাকে নিয়ে মন্দিরে একটা হাঙ্গামা আছে, আসবেন?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শী মুচকিয়া একটু হাসিল, তার পরে কুটীরের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া মন্দিরের অভিমুখে বহির্গত হইল।

একুশ

শ্বশুর-জামাতা একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। শাশুড়ীঠাকুরানী দধি ও মিষ্টান্ন আনিতে স্থানান্তরে গেলে রায়মহাশয় কহিলেন, ষোড়শীর সঙ্গে তোমার দেখা হলো নির্মল?

নির্মল মুখ না তুলিয়াই কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কি বলে সে?

এরূপ একটা সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সম্বন্ধে?

মন্দিরের সম্বন্ধে। বেটী ভৈরবীগিরি ছাড়বে, না চণ্ডীগড়ের নাম পর্যন্ত ডোবাবে? দেশের লোক ত আর বাইরের দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারে না এমনি হয়ে উঠেছে।

নির্মল চুপ করিয়া রহিল। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীদিগের বিরুদ্ধে এ অপবাদ আবহমানকাল প্রচলিত আছে, এবং সেজন্যে গ্রামের কেহ কোনদিন লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। স্বয়ং চণ্ডীমাতাও কখনো আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া লোকে জানে না। ইহাদের রীতিনীতি, আচার-অনাচার সমস্তই সে শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে মন তাহার নিরপেক্ষভাবেই ছিল। বিশেষতঃ ষোড়শীর অপবাদ সে বিশ্বাস করে নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই সে খুশী হইত; কিন্তু এই প্রমাণকেই তাহার ভৈরবী-পদের একমাত্র দাবী বলিয়া সে একদিনও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার শ্বশুরের ইঙ্গিত নূতনও নয়, ভীষণও নয়, অথচ এই কয়টা কথাতেই অকস্মাৎ আজ তাহার মন যখন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, তখন নিজের মনের বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া সে যথার্থই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রায়মহাশয় পুনশ্চ কহিলেন, কি বল হে?

নির্ভুল ও সময়োপযোগী উত্তর দিবার সময় ও অবস্থা নির্মলের ছিল না, সে শুধু পূর্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া কহিল, ভৈরবীদের দুর্নাম ত চিরদিনই আছে।

রায়মহাশয় অস্বীকার করিলেন না, বলিলেন, আছে। কিন্তু দুর্নাম জিনিসটা ত মন্দ, চিরকালের দোহাই দিয়েও মন্দটাকে চিরকাল চালানো চলে না। কি বল?

কিন্তু সে যে মন্দ এ কি নিশ্চিত প্রমাণিত হয়ে গেছে?

রায়মহাশয় অসংশয়ে কহিলেন, গেছে।

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে গেল? নিশ্চয়-প্রমাণ কে দিলে?

রায়মহাশয় বলিলেন, যে দিয়েচে সে আজও দেবে। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যেয়ো, তার পরে বোধ হয় শ্বশুর-জামাই দু' জনকে দু' দিকে দাঁড়িয়ে আর সমস্ত গ্রামের হাসি-তামাশা কুড়োতে হবে না। এই ত তোমার ব্যবসা, অতএব নিশ্চয়-প্রমাণ যে কাকে বলে সে আমাকে আর তোমাকে বলে দিতে হবে না।

গৃহিণী পাথরের থালে মিষ্টান্ন ও বাটিতে দধি লইয়া প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, কৈ বাবা, খাচ্চো না যে?

এই যে খাচ্চি, বলিয়া নির্মল আহারে মনোনিবেশ করিল।

কর্তা কহিলেন, নির্মলকে দিয়ে, আমার জন্যে একটু দুধ এনে দাও, শরীরটা ভালো নেই, দই আর খাবো না।

গৃহিনী প্রস্থান করিলে রায়মহাশয় বলিলেন, অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে সে তোমাকে হাতে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, তার জন্যে শুধু তুমি কেন বাবা, আমরা পর্যন্ত কৃতজ্ঞ; যে উপকার করে, তার অপকার করতে মন চায় না, কিন্তু এ ত আমাদের নিজেদের কথা নয় নির্মল, এ গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেব-দেবতার কথা, সুতরাং যা বড় কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে।

সে রাত্রের ঘটনা যে অপ্রকাশ নাই তাহা সে শুনিয়াছিল, অথচ নিজে গোপন করিয়াছিল বলিয়া লজ্জিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

কর্তা বলিতে লাগিলেন, দেব-দেবীরা ত কথা কন না, কিন্তু তাঁরা শোধ নেন। গ্রামের ভালো যে কখনো হয়নি, উত্তরোত্তর অবনতি হয়েই আসচে, মনে হয় এও তার একটা কারণ। প্রমাণের কথা বলছিলে, কিন্তু তুমি যে আসচো এই বা আমরা জানলাম কি করে? তুমি সন্তানতুল্য, তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে আমার বাধে, কিন্তু না বললেও নয়। জমিদারবাবু সে রাত্রে বোধ করি খেয়ে যাবার ফুরসত পাননি, ষোড়শী খাবার আনতে ঘরের বাইরে যেতে তাঁর চোখ পড়ল একটা চিঠির টুকরোর 'পরে। বোধ হয় তোমাকে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে হৈমকেই লিখেছিল। সেখানাও আজ দেখতে পাবে, তিনি সকালবেলা আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্মল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মিথ্যা কথা। সে নির্লজ্জ, নিজে অপরাধী, সেই মাতাল পাজী বদমাইশটার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? হতেই পারে না।

রায়মহাশয় শুধু একটু মৃদু হাসিলেন। অবিচলিতস্বরে কহিলেন, হতে পারে, এবং হয়েছে। জমিদার লোকটা যে নির্লজ্জ, মাতাল, পাজী, বদমাইশ তাও জানি। বোধ হয় আরও ঢের বেশী, নইলে তার কলঙ্কের কথাটা মুখে আনতেও পারত না। ওর নিষ্ঠুরতার অবধি নেই। গ্রামের মঙ্গলের জন্যও এ কাজে হাত দেয়নি, ঠাকুর-দেবতা ও মানে না। জোর করে মন্দিরে খাসি বলি দিয়ে খেয়েছিল। আবশ্যক হলে ও-পাষণ্ড মুরগী, শুয়োর, এমন কি গো-বধ করেও খেতে পারে।

তবুও তাঁকে আপনি সাহায্য করতে চান?

না, আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই।

নির্মল অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, আপনার কাঁটা উঠবে কি না জানিনে, কিন্তু সে নিষ্কণ্টক হবে। দেবীর যে সম্পত্তিটা সে বিক্রি করতে চায়, ষোড়শী ভৈরবী থাকতে তার সুবিধে হবে না।

রায়মহাশয় কহিলেন, সে গেলেও সুবিধে হবে না—আমি আছি।

তিনি আছেন এতবড় ঘটনাটা নির্মল বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, জমিদারের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু দেবীরও সুবিধা হইবে না। তবে সে সুবিধাটা যে কাহার হইবে তাহাও মুখ দিয়া বাহির করিল না।

রায়মহাশয় স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, বাবা নির্মল, তুমি বড় আইনব্যবসায়ী, অনেক বোঝ, কিন্তু সংসারে এসে খালি-হাতে আমাকে যখন লড়াই শুরু করতে হয়েছিল, তখন শুধু কেবল বিষয়-সম্পত্তি জমা করেই কাটাই নি, মাথার ভেতরেও কিছু কিছু সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমাকে লোকে বলেচে ওই জমিটুকুর ওপরেই জমিদারের লোভ—ষোড়শী কড়া মেয়ে, ও থাকতে কিছু হবার নয়, তাই নিজেদের কলঙ্কটা রটিয়ে তাকে তাড়াতে চায়। আচ্ছা বাবাজী, বীজগাঁর জমিদারের কাছে ওটুকু কতটুকু সম্পত্তি? তার টাকার দরকার, একটা না হলে আর একটা বিক্রি করবে—আটকাবে না। কিন্তু যেখানে তার সত্যিকার আটকেচে, সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই জঙ্গলের মাঝে মাসের পর মাস সে আর পারে না, শহরের মানুষ শহরে যেতে চায়। নির্মল, হৈমর মত তুমিও আমার ছেলে, তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু ওই ছুঁড়িটার ভালই যদি করতে চাও ত বলে দিয়ো তার ভয় নেই। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরির মুনাফা বেশী নয়, যা তার যাবে, জমিদার তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেবে, এ আমি শপথ করে বলতে পারি। সে তাকে কষ্ট দিতেও চায় না—কষ্ট দেবেও না, দু নৌকোয় পা দিয়ে থাকবার অসম্ভব লোভটা যদি সে একবার ত্যাগ করে।

নির্মল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুরকে সে অনেকটা জানিত—এতটা জানিত না। এই শ্বশুর ষোড়শীর কল্যাণের পথ যাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাতে তর্ক করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আর তাহার রহিল না।

শাশুড়ীর দুধ গরম করিয়া আনিতে বিলম্ব হইল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর পাতের কাছে বাটি নামাইয়া রাখিয়া আহারের স্বল্পতার জন্য জামাতাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন, এবং এই ত্রুটি সংশোধন করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অদূরে উপবেশ করিলেন।

কর্তা দুধের বাটি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, কিন্তু মেয়েটার একটা প্রশংসা না করে পারা যায় না—বেটী বিদ্যের যেন সরস্বতী। জানে না এমন শাস্ত্রই নেই।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, তা আর বলতে! দেখেচ ত কাজকর্মে সে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার শিরোমণিঠাকুর ভয়ে যেন কেঁচো হয়ে যান। চলে গেলে বুড়োর মুখ সহস্রধারে ফোটে, কিন্তু সুমুখে নিন্দে করবার ভরসা পান না।

কর্তা কহিলেন, না না, নিন্দে করবেন কেন, তিনি বরঞ্চ সুখ্যাতিই করেন।

গৃহিণী নাকের মস্ত নথে একটা নাড়া দিয়া ততখানিই প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হাঁ, বুড়ো সেই পাত্র কিনা! হিংসেয় ফেটে মরেন, আবার সুখ্যাতি করবেন! মনে নেই সেই অন্তর বোনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে কি কাণ্ডই না দিন-কতক করে বেড়ালেন! তা ছাড়া, ছুঁড়ি এদিকে যাই করে থাক, শোকে, দুঃখে, আপদে-বিপদে, গরীব-দুঃখীর এমন মা-বাপও গ্রামে কেউ নেই। যখনি যে কাজেই ডাকো, মুখে হাসিটি যেন লেগে আছে, না বলতে জানে না।

কর্তা খুশী হইলেন না, বলিলেন, হুঁ, সব ভৈরবীই ও-সব করে থাকে।

গৃহিণী বলিলেন, সব? কেন, মাতঙ্গিনীঠাকরুনকে কি আমি চোখে দেখিনি নাকি?

দেখে থাকলেও ভুলে গেছো।

গৃহিণী রাগ করিয়া জবাব দিলেন, ভুলিনি কিছুই। আজও তাঁর কাছে একশ' টাকা পাই–না বলে উড়িয়ে দিলেন। ষোড়শী কখনো কাউকে ঠকিয়ে খায়নি, মিছে কথাও বলেনি।

কর্তা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, না–যুধিষ্ঠির! এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ত ভাবি এঁর কল্যাণেই নাতির মুখ আমরা দেখতে পেলাম। না বাবা, যে যাই বলুক, ঠক-জোচ্চোর সে মেয়ে নয়। তাইতে যখন শুনতে পেলাম ঠাকুরের পুজো করাটি সে ছেড়ে দিয়েচে, তখনি সন্দেহ হলো এ আবার কি? নইলে কারও কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিনি।

কর্তা চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন, কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বলি তার কল্যাণে ত নাতি পেলে, কিন্তু নাতির কল্যাণে মানসপুজোটি তিনি কেন অস্বীকার করলেন একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো না? বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নির্মলের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, ষোড়শীর ওপর থেকে দেখচি মায়ের ভক্তি আজও একেবারে যায়নি।

না বাবা, মিছে কথা কেন বলব, তার মুখখানি মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। এঁরা সকলে মিলে কেন যে তার বিপক্ষে এত লেগেচেন আমি ভেবেই পাইনে।

নির্মল একটুখানি মৃদু হাসিয়া কর্তার খোঁচার অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু মা, তার মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যের কথাটাও একটু ভেবো–

শাশুড়ী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, দাসী আসিয়া ঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, কে একজন জামাইবাবুকে ডাকতে এসেচে—বাবু খবর দিতে বললেন।

নির্মল হাতমুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যে বৈঠক বসিবে তাহারই আলোচনা শুরু হইয়া গেছে। শিরোমণিমহাশয়ের আজ অমাবস্যার উপবাস, তিনি নির্মলকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং বাবাজীকে হঠাৎ চিনিতে পারেন নাই, বলিয়া নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি দোষারোপ করিলেন। যে লোকটা থামের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল সে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ভৈরবীঠাকরুন অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাঁর সহিত বিশেষ কথা আছে।

নির্মলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল। সে পিছনে না চাহিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিল সকলে উৎসুক- কৌতুকে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরে যে গোপন বিদ্রূপ আছে, তাহা তাহাকে অপমানিত করিল; অন্য সময় হয়ত সে ইহাকে অত্যন্ত সহজে অবহেলা করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে নিজের মধ্যে সে-জোর খুঁজিয়া পাইল না, কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না, চল, আমি যাচ্ছি। বরঞ্চ যেন লজ্জিত হইয়াই লোকটাকে বলিয়া ফেলিল, বল গে, আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।

শিরোমণি গায়ে পড়িয়া কহিলেন, ওকে জিরোবার একটু সময় দাও তোমরা—কি বল হে? বলিয়া তিনি চোখের একটা ইশারা করিয়া অকারণে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা সে হাসিতে প্রকাশ্যে যোগ দিল, কেহ বা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল।

নির্মল সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, শিরোমণি ডাকিয়া কহিলেন, বলি, বাবাজীকে কি ও বেটী কৌঁসুলি খাড়া করেচে নাকি?

নির্মল উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তভাবে কহিল, মকদ্দমা বাধলে সে কাজ করতে হবে বোধ হয়।

শিরোমণি এ উত্তরের আশা করেন নাই, একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, তা যেন করলে, কিন্তু বলে রাখি বাবাজী, এ পুঁটি মাছের প্রাণ নয়, বাঘা–ভাল্কোর সঙ্গে লড়াই–মকদ্দমা হাইকোর্টে না গড়িয়ে থামবে না, তা নিশ্চয় জেনো।

নির্মল কহিল, মামলা-মকদ্দমা কোথায় গিয়ে থামে এ ত আমার জানবার কথা শিরোমণিমশায়।

শিরোমণি কহিলেন, সে ত বটেই, এ হলো তোমার ব্যবসা, তুমি আর জানবে না! কিন্তু আরও ত ঢের খরচপত্র আছে, সে দেবে কে? বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কিন্তু এ হাসিতে এবার কেহ যোগ দিল না।

নির্মল কহিল, অভাব হলে আমি দেব।

তাহার জবাব শুনিয়া শুধু শিরোমণি নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। রায়মহাশয় নিজেও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, তোমাদের ঠাট্টা- তামাশার সম্পর্ক নয় নির্মল, বিশেষতঃ শিরোমণিমশাই প্রাচীন এবং সম্মানিত ব্যক্তি–উপহাস করা তোমার সাজে না।

নির্মল চুপ করিয়া রহিল; শিরোমণি সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, টাকা ত দেবে, কিন্তু দেবার গরজটা কি একটু শুনতে পাইনে?

নির্মল বলিল, আমার গরজ শুধু আপনাদের অন্যায় অত্যাচার। আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন ত শুনতে পাবেন, জীবনে অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি।

যে লোকটা ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তখনও যায় নাই; কহিল, আপনার কখন, যাবার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবো?

আমার সময়মত দেখা করব বলো। বলিয়া সে বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

সায়াহ্নবেলায় জনার্দন রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া কহিলেন, মন্দিরে সকলে উপস্থিত হয়েচেন, তোমাকে তাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, যদি যাও ত আর বিলম্ব করো না।

নির্মল বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার যাওয়া কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

জনার্দন কহিলেন, যাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দেবীর আরতি শুরু হইল। মাতার বহুবিধ গৌরবের বস্তুই কালক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীর সংখ্যা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তেমনি বজায় আছে। সেই সম্মিলিত তুমুল বাদ্যনিনাদ নির্মল ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইল। কথা ছিল, আরতি শেষ হইলে পঞ্চায়েত বসিবে, অতএব সেই সুপবিত্র ধ্বনি থামিবার পর সে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নাই, প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত নাট-বাঙ্গালায় গোটা-দুই লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে এবং তাহাই বহুলোক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সেই অন্ধকারে নির্মলকে কেহ চিনিল না, সে জন-দুই লোকের কাঁধের উপর উঁকি মারিয়া দেখিল তথায় কে একজন বাবুগোছের ভদ্রলোক হাতমুখ নাড়িয়া কি-সব বলিতেছেন। কিছুই শোনা গেল না, কিন্তু মানুষের আগ্রহ দেখিয়া এ কথা বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কাহারও নিন্দা ও গ্লানি করিতেছেন। এই ব্যক্তিই যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তাহা সে আন্দাজ করিল, অতএব বক্তব্যবস্তু যে ষোড়শীর জীবনচরিত তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে যদিচ তাহার

প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু দুই-একটা কথা শুনিবার লোভও সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া পায়ের দুই আঙুলে ভর দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্তেই মনে লাগিয়া গেল, তখনও জীবানন্দ চৌধুরী আসল বস্তুতে অবতীর্ণ হয় নাই–ষোড়শীর মায়ের ইতিবৃত্তেরই আখ্যান চলিতেছিল, অবশ্য সমস্তই শোনা কথা। সাক্ষী তারাদাস অদূরে বসিয়া–এই-সকল অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে কিরূপে এই পীঠস্থান ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপবিত্র হইয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ তিরোহিত হইতেছে–

পিছনে পিঠের উপর একটু চাপ পড়িতে ফিরিয়া দেখিল কে একজন অন্ধকারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ইশারা করিল এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে নির্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এই সুগঠিত দীর্ঘ ঋজুদেহ ষোড়শী ভিন্ন আর কাহারও নহে। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া অনুযোগের কণ্ঠে কহিল, ছি, ছি, কি দাঁড়িয়ে যা-তা শুনচেন! কতকগুলো কাপুরুষ মিলে দু' জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে–তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। চলুন আমার ঘরে, সেখানে ফকিরসাহেব বসে আছেন, আপনাকে পরিচিত ক' রে দিই গে।

তিনি কবে এলেন?

কি জানি। বিকেলবেলা ফিরে গিয়ে দেখি আমার ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর রাখতে পারলাম না, প্রণাম করে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসালাম, সমস্ত ইতিহাস মন দিয়ে শুনলেন।

শুনে কি বললেন?

শুধু একটু হাসলেন। বোধ হলো যেন সমস্তই জানতেন। কিন্তু হাঁ নির্মলবাবু, আপনি নাকি বলেচেন আমার মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন? একি সত্যি?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ সত্যি।

কিন্তু কেন নেবেন?

নির্মল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ করি আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার হচ্চে বলেই।

কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? বলিয়াই ষোড়শী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক, সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কূট-কচালে শাস্ত্রের—না? আসুন, আমার ঘরে আসুন।

তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ফকিরসাহেব নাই। কহিল, কোথায় গেছেন, বোধ হয় এখনি ফিরে আসবেন। প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাতা-আসনখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন। হাঙ্গামা, হৈচৈ, গণ্ডগোলের মাঝে এমন সময় পাইনে, যে বসে দু' দণ্ড গল্প করি। আচ্ছা, মকদ্দমার যেন সকল ভারই নিলেন, কিন্তু যদি হারি, তখন ভার কে নেবে? তখন পেছবেন না ত?

নির্মল জবাব দিতে পারিল না, তাহার কান পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে কহিল, হারবার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই।

তা বটে। বলিয়া একবার একটুখানি যেন ষোড়শী বিমনা হইয়া পড়িল, কিন্তু পলকমাত্র। সহসা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কেমন আছে নির্মলবাবু? কি করে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।

অকস্মাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে নির্মল আশ্চর্য হইল। ষোড়শী একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আমি কিন্তু হৈম হলে এই-সমস্ত পরোপকার করা আপনার ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালমানুষ নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না—রাত্রি-দিন চোখে চোখে রাখতাম।

ইঙ্গিত এত সুস্পষ্ট যে নির্মলের বুকের মধ্যেটা বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে একই সঙ্গে ও একই কালে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এবং সেই অসংবৃত অবসরে মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া গেল, চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে শুরু হয়, চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায় না, এ কথা কি আজও জানতে তুমি পারোনি?

পেরেচি বৈ কি, বলিয়া ষোড়শী হাসিল। বাহিরে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে ইনি এসেচেন।

কে? ফকিরসাহেব?

না, জমিদারবাবু। বলে পাঠিয়েছিলাম সভা ভাঙ্গলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসচেন। সঙ্গে লোকজন বিস্তর, স্ত্রীলোকের ঘরে একাকী আসতে বোধ করি সাধুপুরুষের ভরসায় কুলোয় নি। পাছে দুর্নাম হয়। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা নির্মলের একেবারে ভাল লাগিল না। সে বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আপনি বলেন নি কেন?

বেশ! একবার তুমি একবার আপনি, বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, উনি ভারী ভদ্রলোক, লড়াই করেন না। তা ছাড়া, আপনাদের ত পরিচয় নেই–সেটাও একটা লাভ। বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন–আমার কুঁড়ে আর একবার পবিত্র হ' লো।

জীবানন্দ চৌকাঠে পা দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ইনি? নির্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিমুখে জবাব দিল, হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

বাইশ

অনুমান যে ভুল নয়, লোকটি যে সত্য সত্যই নির্মল বসু, তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবানন্দ প্রথমে চমকিত হইল, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া লইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সে সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারি পাওয়া পর্যন্ত যে-সব কীর্তি করা গেছে, তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হতো।

নির্মলের গোড়া হইতেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির এই লজ্জাহীন, অনাবৃত রসিকতার চেষ্টায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া কি একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু বলিতে হইল না। ষোড়শী জবাব দিল, কহিল, চৌধুরীমশায়, উকিল-ব্যারিস্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন? আন্দামান প্রভৃতি বড় ব্যাপার না হোক, কিন্তু ছোট বলে এ দেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতে পারে না?

জীবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া হঠাৎ যাহা মুখে আসিল কহিল। বলিল, ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, এই যেমন মন্দিরে দাঁড়িয়ে এইমাত্র একদফা দিয়ে এলেন।

জীবানন্দ ইহার কোন জবাব দিল না। নির্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার শ্বশুরমহাশয়ের মুখে শুনলাম আপনি আসচেন—আশা করেছিলাম মন্দিরেই আলাপ হবে।

ষোড়শী বলিল, সে আমার দোষ চৌধুরীমশায়। উনি এসেও ছিলেন এবং সদালাপে যোগ না দিন, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে শোনবার চেষ্টাও

করেছিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম। বললাম, চলুন নির্মলবাবু, ঘরে বসে বরঞ্চ দুটো গল্প-সল্প করা যাক।

জীবানন্দ মনের উত্তাপ চাপিয়া কতকটা সহজ গলাতেই কহিল, তা হলে আমি এসে পড়ে ত ব্যাঘাত দিলাম।

ষোড়শী বলিল, দিয়ে থাকলেও আপনার দোষ নেই–আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু কেন? গল্প করতে নয় বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, না গো মশায়, না–বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। আজ আপনাকে আমি ভারী বক্‌বো। তাহার কণ্ঠস্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া নির্মল ও জীবানন্দ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ষোড়শী হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি, ছি, ওখানে অত কি করছিলেন বলুন ত? একটা সভার আড়ম্বর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু' জন অসহায় স্ত্রীলোকের কি কুৎসাই রটনা করছিলেন! এর মধ্যে একজন আবার বেঁচে নেই। এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া, কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত?

সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিনি। এই নিন মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন হিসাবের খাতা। বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা-কিছু অলঙ্কার, যত-কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েচি।

জীবানন্দ বোধ করি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কহিল, বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী বলিল, তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

তাই যদি হয় ত এই চাবিটাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

তাঁকেই যে দিলাম। বলিয়া ষোড়শী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কিন্তু সেই হাসি দেখিয়া এইবার জীবানন্দের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ ত আমি নিতে পারিনে। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে যে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। একদিন চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ এটুকু চোখ বুজে নেবার সাহস হওয়া আপনার উচিত। অপরকে বিশ্বাস করবার শক্তি আপনার সত্য সত্যই এত কম, এ কথা আমি কোনমতে স্বীকার করতে পারিনে। নিন–ধরুন, বলিয়া সে খাতা এবং চাবির গোছা মাটি হইতে তুলিয়া একরকম জোর করিয়া জীবানন্দের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ আমি বাঁচলাম। আমার কোন ভারই ত কোনদিন নেননি, এইটুকুও না নিলে যে ধর্মে পতিত হবেন। তা ছাড়া, পরকালে জবাব দেবেন কি? বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে কহিল, পরকালের চিন্তায় ত আপনার ঘুম হয় না, সে আমি জানি, কিন্তু যা হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে তা বলে দিচ্চি। তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যেন ইহার শেষ দিকে কোমলতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। কহিল, আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভার। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি, কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। নির্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার কথাবার্তা শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না নির্মলবাবু?

নির্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আশ্চর্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘূণাগ্রে জানান নি?

ষোড়শী হাসিমুখে কহিল, আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকিরসাহেব।

এ সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েচেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, না, তিনি আজ সকাল পর্যন্ত কিছুই জানতেন না, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার কাল রাত্রের রচনা। যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েচেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাশা করচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই মরফিয়া খাওয়ার চেয়ে শক্ত ঠেকচে!

এতক্ষণ পরে নির্মল তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, আপনি ত তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাশা দেখছেন, কিন্তু আমাকে কাজকর্ম বাড়িঘর ফেলে রেখে এই তামাশা দেখতে আট শ'   মাইল ছুটে আসতে হয়েছে। এ যদি সত্য হয়, আপনি যা চেয়েছিলেন অন্ততঃ সেটা পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোল আনাই লোকসান। একে তামাশা বলব কি উপহাস বলব ভেবেই পাচ্চিনে। বলিয়া সে লোকটার মুখের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে, দেখিতে পাইল তাহার দুই চক্ষু আকস্মিক বেদনার ভারে যেন ভারাক্রান্ত। সে জবাব কিছুই দিল না, শুধু একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

নির্মল ষোড়শীকে প্রশ্ন করিল, এ-সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী বলিল, না নির্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাশার সময়? আমি সত্য সত্যই অবসর নিলাম।

নির্মল কহিল, তা হলে বড় দুঃখে পড়েই এ কাজ আপনাকে করতে হলো!

ষোড়শী উত্তর দিল না। নির্মল নিজেও একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আমি আপনাকে বাঁচাতে এসেছিলাম, বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, তবু কেন যে হতে দিলেন না তা আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হতো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে তেমনি উত্তাল হয়ে উঠত। এবং সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না। বলিয়া সে যে কাহাকে কটাক্ষ করিল তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিল। কিন্তু জীবানন্দ নীরব হইয়া রহিল, এবং ষোড়শী নিজেও ইহার কোন প্রতিবাদ করিল না।

নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা হলে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী বলিল, সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

কোথায় থাকবেন?

এ সংবাদও আপনাকে আমি পরে দেবো।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, মা! ষোড়শী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, ভূতনাথ? আয় বাবা, ঘরে নিয়ে আয়। মন্দিরের ভৃত্য আজ একটা বড় ঝুড়ি ভরিয়া দেবীর প্রসাদ, নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। ষোড়শী হাতে লইয়া জীবানন্দের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, সেদিন আপনাকে পেটভরে খেতে দিতে পারিনি, কিন্তু আজ সে ত্রুটি সংশোধন করে তবে ছাড়ব। নির্মলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আর আপনি ত ভগিনীপতি, কুটুম্ব—আপনাকে শুধু শুধু যেতে দিলে ত অন্যায় হবে। অনেক তিক্ত কটু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন বসুন দিকি দু' জনে খেতে। মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকবে না।

নির্মল কহিল, দিন। কিন্তু জীবানন্দ অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি খেতে পারব না।

পারবেন না? কিন্তু পারতেই যে হবে।

জীবানন্দ তথাপি মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, মিথ্যে মাথা নাড়া চৌধুরীমশায়। যে সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবো না, তা যদি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ত মিছেই এতকাল ভৈরবীগিরি করে এলাম! বলিয়া সে জল-হাতে উভয়েরই সম্মুখের স্থানটা মুছিয়া লইয়া শালপাতা পাতিয়া মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

মিষ্টান্ন যে আজ যথার্থ-ই জীবানন্দের গলায় বাধিতেছিল, ইহা লক্ষ্য করিতে ষোড়শীর বিলম্ব হইল না। সে গলা খাটো করিয়া কহিল, তবে থাক, এগুলো আর আপনার খেয়ে কাজ নেই, আপনি শুধু দুটো ফল খান। বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া তাঁহার পাতার একধারে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, কি হলো আজ? সত্যিই ক্ষিদে নেই নাকি? না থাকে ত জোর করে খাবার দরকার নেই। দেহের মধ্যে যে অসুখের সৃষ্টি করে রেখেচেন, সে মনে হলেও আমার ভয় হয়।

নির্মল একমনে খাইতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই কণ্ঠস্বরের অনির্বচনীয়তা খট্ করিয়া তাহার কানে বাজিয়া অকারণে বহুদূরবর্তী হৈমকে তাহার স্মরণ করাইয়া দিল। দু' জনের অনেক হাস্য-পরিহাসের বিনিময় হইয়া গেছে, আজ সকালেও এই ষোড়শীর কথায় ও ইঙ্গিতে সর্বশরীরে তাহার পুলকের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেছে; কিন্তু এ গলা ত সে নয়! মাধুর্যের এরূপ নিবিড় রসধারা ত তাহাতে ঝরে নাই! মিষ্টান্নের মিষ্ট তাহার মুখে বিস্বাদ এবং ফলের রস তিতো লাগিয়া আহারের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া গেল। খানিক পরে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শী সবিস্ময়ে কহিল, আপনারও যে ওই দশা হলো নির্মলবাবু, খেলেন কৈ?

নির্মল বলিল, যা খেতে পারি তা আপনার বলবার আগেই খেয়েচি, অনুরোধের অপেক্ষা করিনি।

খাবারগুলো আজ বুঝি তা হলে ভাল দেয়নি?

তা হবে। অন্যদিন কেমন দেয় সে ত জানিনে! বলিয়া সে হাত ধুইবার উপক্রম করিল। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহলের একান্ত অভাব শুধু ষোড়শীর নয়, জীবানন্দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু এ লইয়া কেহ আর আলোচনা তুলিল না। বাহিরে আসিয়া ষোড়শী মুখ-হাত ধুইবার জল দিয়া এবং সাজা পান হাতে দিয়া তাহা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের বা তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না।

নির্মল কহিল, আমি এখন তা হলে যাই–

আপনি বাড়ি ফিরবেন কবে?

আমার আর ত কোন প্রয়োজন নেই, হয়ত কালই ফিরতে পারি।

ছেলেকে, হৈমকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।

নির্মল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?

ষোড়শী নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, এতবড় অহঙ্কারের কথা কি আমি বলতে পারি নির্মলবাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার আবশ্যক হবে না।

নির্মল ম্লানমুখে হাসির প্রয়াস করিয়া কহিল, আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না।

নির্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চললাম। যদি সকালের গাড়িতে যাওয়া হয় ত, আর বোধ হয় দেখা করবার সময় পাবো না। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে, যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন। বলিয়া সে আর

কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবঞ্চিতের লজ্জা ও জ্বালা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহার বুকের মধ্যে ধকধক করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং বিফল-মনোরথ মাতাল যেমন করিয়া তাহার মদের দোকানের রুদ্ধ-দুয়ার হইতে ফিরিবার পথে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, তেমনি করিয়া সে সমস্ত পথটা মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি বাঁচিয়া গেলাম। স্বেচ্ছাচারিণীর মোহের বেষ্টন হইতে বাহির হইতে পারিয়া আমার হৈমকে আবার ফিরিয়া পাইলাম। কথাগুলো কেবলমাত্র বারংবার আবৃত্তি করিয়াই সে তাহার পীড়িত, আহত হৃদয়ের কাছে যেন সপ্রমাণ করিতে চাহিল যে, এ ভালই হইল যে, ষোড়শীর গৃহের দ্বার তাহার মুখের উপর চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন পরে জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকারে একটা খুঁটি ঠেস দিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নির্মলবাবু কি চলে গেলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, ষোড়শী তেমনি চুপ করিয়াই রহিল।

জীবানন্দ কহিল, ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী পথের দিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতে আপনার ক্ষতি কি?

আমার ক্ষতি? না, তা বোধ করি কিছু নেই, কিন্তু তোমার ত থাকতে পারে? তুমি কি তাঁকে বুঝতে পেরেছ?

ষোড়শী কহিল, আমার যতটুকু দরকার তা পেরেছি বৈ কি।

তা হলে ভাল। বলিয়া সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া যেন নিজের মনেই কহিল, তাঁকে মনে রাখবার জন্যে কি রকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন, দরখাস্ত মঞ্জুর করলে ত? বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে সেই অন্ধকারেও দু' জনের চোখে চোখে মিলিল।

ষোড়শী দৃষ্টি অবনত করিল না, বলিল, আমি তাঁকে যতখানি জানি, তার অর্ধেকও যদি আমাকে জানবার তাঁর সময় হতো, এতবড় বাহুল্য আবেদন আমার কাছে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেও পারতেন না। আমার যা-কিছু কল্পনা, যত-কিছু আনন্দের ভাবনা, সে ত কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে-ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছিঁড়ির অবধি নেই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। অথচ এর বাষ্পও তিনি জানেন না, কোনদিন হয়ত জানতেও পারবেন না।

জীবানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল, সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়ায় ষোড়শী নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই মৌন থাকার পরে জীবানন্দ ধীরে ধীরে কথা কহিল। বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারী লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্যি জবাব দিতে পারতে অলকা?

জীবানন্দের মুখে এই অলকা নামটা ষোড়শীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি তাহার কোন্‌খানে যে গিয়া আঘাত করিত, সে ভাবিয়া পাইত না। বিশেষ করিয়া তাহার প্রশ্ন করার এই কৌতুককর ভঙ্গীতে ষোড়শীর হাসি পাইল; কহিল, আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন, তার পরে আমি আর কোন একটা তেমনি অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এতবড় সত্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সে-কাজ করবার আপনার আবশ্যক নেই—আমি বুঝেচি। অপবাদ আপনারা দিয়েচেন বলেই তাকে সত্যি করে তুলতে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয়

গ্রহণ করব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে-কথাটা আমি ভুলে যেতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশায়?

তুমি আমাকে চৌধুরীমশায় বল কেন?

তবে কি বলব? হুজুর?

না, অনেকে যা বলে ডাকে–জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী বলিল, বেশ ভবিষ্যতে তাই হবে।

জীবানন্দ কহিল, ভবিষ্যতে কেন, আজই বল না?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। ভিতরে প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। সে ঘরে আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। জীবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ষোড়শী বিস্মিত হইয়া কহিল, রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ি গেলেন না? আপনার লোকজন কৈ?

আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

একলা বাড়ি যেতে আপনার ভয় করবে না?

না, আমার পিস্তল সঙ্গে আছে।

তবে তাই নিয়ে বাড়ি যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ কহিল, তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তভাবে বলিল, রাত হয়েছে, আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্চি, তারা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ বুঝিল কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্চি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

আবার সেই নাম! জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সত্যই সে চলিয়া যাইবে।

কবে যাবে?

কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

কাল? কালই যেতে পারো? বলিয়া জীবানন্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আশ্চর্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়! যাতে তুমি যাও, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি, অথচ তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেলো। নির্মলবাবু মস্ত লোক, মস্তবড় ব্যারিস্টার, তিনি আছেন তোমার পক্ষ নিয়ে—হাঙ্গামা বাধাবে, লড়াই শুরু হবে—আমরা জিতবো, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রি করেচি, ও নিয়ে আর কোন গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর তোমাকে ত যা বলব তাই করতে হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েচি, কিন্তু আর যে একটা দিক আছে—তুমি নিজেই সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, তামাশাটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, তা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি—আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে, আমার মত তোমারও ভুল হচ্চে—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি?

কথাগুলি এত চমৎকার এবং এমন নূতন যে হঠাৎ বিস্ময় লাগে, ইহা জীবানন্দের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। জবাব দিতে ষোড়শীর একটু থামিতে হইল। শেষে সায় দিয়া বলিল, হতে পারে বৈ কি। শুধু এই খবরটা নিশ্চয় জানি, যা আমি স্থির করেচি, সে আর অস্থির হবে না।

জীবানন্দ বলিয়া উঠিল, বাপরে বাপ! তোমার পুরুষমানুষ, আর আমার মেয়েমানুষ হওয়া উচিত ছিল; আচ্ছা, সেইখানেই বা তোমার চলবে কি করে?

ষোড়শী পূর্বের মতই সহজ গলায় উত্তর দিল, এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কোনমতে করতে পারিনে।

জীবানন্দ রাগ করিয়া বলিল, তুমি কিছুই পারো না, তুমি পাথর। চুলে আমার পাক ধরে এলো, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম—তোমার কাছে কি এখন আমি হাতজোড় করে কাঁদতে পারি তুমি ভেবেচ?

ষোড়শী কহিল, দেখুন অনেক রাত্রি হ' লো, এখনো আমার আহ্নিক পর্যন্ত সারা হয়নি—

পুরোহিতের কাশি এবং পায়ের শব্দ বাহিরে শোনা গেল; সে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের দোর বন্ধ করে চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি—এঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ষোড়শী কহিল, ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জীবানন্দ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, এগুলোও তা হলে তুমি রায়মশায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না।

শুধু আমাকেই হবে?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর না দিয়া ঘরের তালাটা হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং জীবানন্দ বাহিরে আসিতেই কবাট বন্ধ করিয়া তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া পুরোহিতের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শুধু একাকী জীবানন্দ সেই অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তেইশ

ব্যারিস্টার-সাহেব চলিয়া গেছেন, ষোড়শী চলিয়া যাইতেছে—মন্দিরের চাবি-তালা সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু মূল্যবান সমস্ত আদায় হইয়া গেছে, ইত্যাদি সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। শিরোমণি আনন্দের আবেগে মুক্তকচ্ছ আলুথালু বেশে রায়মহাশয়ের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নির্মলের যাবার সময়ে বিদায়ের পালাটা বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। মনে মনে বোধ করি এই সকল আলোচনাতেই জনার্দনের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা শিরোমণির ছিল না, তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত তুলিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে!

জনার্দন মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি?

শিরোমণি বলিলেন, ব্যাপার কি! দশখানা গাঁয়ে রাষ্ট্র হতে বাকী আছে নাকি? বেটী চাবিপত্র যা-কিছু সমস্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে যে! বলি, শোননি নাকি?

যে ভদ্রলোক সকাল হইতে বসিয়া এ মাসে সুদের কিছু টাকা মাপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছিল, সে কহিল, বেশ! যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, আর খবর পেলেন ঘেঁটুমনসা? এ-সব করলে কে শিরোমণি খুড়ো, সমস্তই ত রায়মশায়।

শিরোমণি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল চাবিটা শুনচি নাকি গিয়ে পড়েচে জমিদারের হাতে? ব্যাটা পাঁড় মাতাল—দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারুপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না।

ক্রমশঃ একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল, জমিদারের হাত হইতে চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া হুজুর যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার মাতাল হইয়া পড়িবার পূর্বেই সেটা হস্তগত করা প্রয়োজন। সেটা তাঁহার হাতে যাওয়ার সম্বন্ধে জনার্দন নিজের সামান্য একটু ত্রুটি ও অবিবেচনা স্বীকার করিয়া লইয়াই কহিলেন, সমস্তই স্থির করে রেখেছিলাম, হঠাৎ উনি যে মাঝ থেকে চাবি হাত করবেন, সেটা আর খেয়াল করিনি। এখন সহজে দিলে হয়। দশ দিন পরে হয়ত বলে বসবে, কৈ কিছুই ত সিন্দুকে ছিল না! কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবে না–একটি পাই পয়সা না।

সকলে এ কথা স্বীকার করিল। অনেকের এমনও মনে হইল, ইহার চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

এই দল যথাসময়ে এবং যথোচিত সমারোহে যখন জমিদারের শান্তিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল, জমিদার তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া। মদের বোতল ও গ্লাসের পরিবর্তে জমিদারির মোটা মোটা খাতাপত্র তাঁহার সম্মুখে। একধারে বসিয়া তাঁহার সহচর প্রফুল্লচন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সে-ই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শিরোমণি সকলের অগ্রে কথা কহেন, এবং সকলের শেষে অনুতাপ করেন, এ ক্ষেত্রেও তিনিই কথা কহিলেন, বলিলেন, হুজুরের পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু বিলম্ব করেই আমরা সকলে–

জীবানন্দ খাতাপত্র এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, বিলম্ব না করে এলেও হুজুরের নিদ্রার ব্যাঘাত হতো না শিরোমণিমশায়, কারণ দিনের বেলা তিনি নিদ্রা দেন না।

কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর–

শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্য নয়, এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যে। এই যেমন আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা–, বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুষড়িয়া গেল। জীবানন্দ কহিলেন, কিন্তু যেজন্যে ত্বরা করে আসতে চেয়েছিলেন তার হেতুটা শুনি?

জনার্দন রায় নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইলেন, মনে মনে কহিলেন, এত ভয়ই বা কিসের? প্রকাশ্যে বলিলেন, মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্মল যে-রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল–

জীবানন্দ কহিলেন, তিনি সোজা হলেন কি করে?

এই ব্যঙ্গ জনার্দন অনুভব করিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার ধার দিয়াও গেলেন না, খুশী হইয়া সদর্পে কহিলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর সইতে পারছিলেন না।।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে। তার পরে?

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু পাপ ত দূর হলো, এখন–বল না জনার্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না? এই বলিয়া তিনি রায়মশায়কে হাত দিয়া ঠেলিলেন।

জনার্দন চকিত হইয়া কহিলেন, মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েছি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুনতে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেচে।

জীবানন্দ সায় দিয়া কহিলেন, তা করেচে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি বলিলেন, বেটী এখনও আছে, কিন্তু কখন যে কোথায় চলে যায় সে ত বলা যায় না।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেজন্যে আপনাদের এত উদ্বেগ কেন?

উত্তরের জন্য তিনি জনার্দনের প্রতি চাহিলেন। জনার্দন সাহস পাইয়া কহিলেন, দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা-কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলছেন যে, ষোড়শী থাকতে থাকতেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভাল হয়। হয়ত—

হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দন সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না, শেষে বলিলেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর!

কিন্তু আজ আমার সময় নাই রায়মশাই।

জনার্দন মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, প্রায় এইপ্রকার ফন্দি করিয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন! শিরোমণি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, চাবিটা জনার্দন ভায়ার হাতে দিলে আজই সন্ধ্যার পূর্বে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও আর কোন দায়িত্ব থাকে না—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক না?

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিল না কেবল যাহার হাতে চাবি। সে শুধু একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ব্যস্ত কি শিরোমণিমশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত, ভিখিরীর কাছে থেকে আর আদায় হবে না। আপনারা আজ আসুন, আমার যেদিন অবসর হবে, মিলিয়ে দেখতে আপনাদের সকলকেই আমি সংবাদ দেব।

ফন্দি খাটিল না দেখিয়া সবাই মনে মনে রাগ করিল। রায়মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, সে ত ঠিক কথা রায়মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বৈ কি।

দ্বারের বাহির হইয়াই শিরোমণি জনার্দনের গা টিপিয়া কহিলেন, দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশী দিন।

জনার্দন শুধু বলিলেন, হুঁ। যা ভয় করা গেল, তাই হ' লো দেখছি।

শিরোমণি কহিলেন, এবার গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটী যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

একজন কহিল, হুজুর চাবি আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আবার! এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে জীবানন্দ খোলা দ্বারের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিল; প্রফুল্ল কহিল, দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন, চাবিটা ওঁদের দিয়ে দিলেই ত হতো!

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, হতো না প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল মনে মনে বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল, কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানারকম জড়োয়া গয়না, কত কি দলিলপত্র, তা ছাড়া সোনারূপোর বাসন-কোসনও কম নয়। কতকাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের

যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল, বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনীর হাতে?

জীবানন্দ রাগ করিল না, কহিল, নিতান্ত মিথ্যা বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, এ আমি চাইনি প্রফুল্ল। আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি করলাম জনার্দন রায়কে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর কারণ?

জীবানন্দ কহিল, বোধ হয় সে ভেবেছিল, এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপলে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি।

জীবানন্দ হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না; কহিল, সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আমার আর যতদিকেই থাক, আমাকে চিনতে না পারার অপরাধ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি একটা দিনের তরেও করিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এই মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি ঠিক করে নেয়, কিছুই বলবার জো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে মরফিয়া নিয়ে চোখ বুজে খাওয়ার গল্পটা তোমার কাছে করেছিলাম, সেই হলো তার সকল তর্কের শেষ তর্ক, সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না, এদিকেও মরি, ওদিকেও মরি—সে ছাড়া আর কারও পানে চাইবার পথ ছিল না—এ-সমস্ত ষোড়শী একদম ভুলে বসে আছে, শুধু একটি কথা তার মনে জেগে রয়েছে, যে নিজের প্রাণটা নিঃসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল, তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে? ব্যস্‌, যা-কিছু ছিল সমস্ত দিলে চোখ বুজে আমার হাতে

তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াতো, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেত না।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, অতিশয় খাঁটি কথা দাদা। অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলুন, তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন—জমানো মোহরগুলোয় যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধা যায় ত, শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষলধারে বর্ষণ শুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ কহিল, প্রফুল্ল, এইজন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল হাত জোড় করিয়া বলিল, এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক, কিন্তু মোসাহেবি করে এ অধীনের গলায় চুঙ্গি পর্যন্ত কাঠ হয়ে গেল। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডালভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক' বার নেওয়া হ' লো প্রফুল্ল?

বার-চারেক। এই বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন, তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে-মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাত অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নিচু বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেচে, সত্যিকারের রক্ত বলতে বোধ করি ছিটেফোঁটাও আর বাকী নেই। আজ ভাবচি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে খপ্ করে ভৈরবী ঠাকরুনের এক খামচা পায়ের ধূলো নিয়ে গিলে ফেলব। আপনার অনেক ভালমন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলা আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল পুনশ্চ হাতজোড় করিয়া কহিল, তাহলে বসুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবি-পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার-পাঁচেক টাকা লিখে রেখেচেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, তা হলে এবার আমাকে তুমি সত্যি সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল তেমনি করজোড়ে কহিল, আশীর্বাদ করুন, এই সুমতিটুকু শেষ পর্যন্ত যেন বজায় থাকে।

জীবানন্দ মৌন হইয়া রহিল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাচ্চেন তিনি?

জানিনে।

কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

তাও জানিনে।

প্রফুল্ল কহিল, জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। সহসা তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল, কহিল, বাপ রে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা! মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম, মনে হল, যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে পাথরে গড়া। ঘা মেরে মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছেমত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সেই বস্তুই নয়। পারেন ত ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, তা হলে প্রফুল্ল এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল সবিনয়ে জবাব দিল, গুরুজনের আশীর্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বৈ কি।

জীবানন্দ কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু কি করবে স্থির করেচ?

প্রফুল্ল বলিল, অভিলাষ ত আপনার কাছে ব্যক্ত করেচি। প্রথমে চারটি ডালভাতের যোগাড়ের চেষ্টা করব।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল কহিল, হয়। তার কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকির-সাহেব। আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্নিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল মুখরোচক দুটো খোশামোদ-টোশামোদ করে যদি একটা কোন ভালরকমের ওষুধ-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেন্ট নিয়ে বেচে দু' পয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারী চালাক, সেদিক দিয়েই গেল না। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী-মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্ছেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন, তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, এঁর সদুপদেশেই বোধ করি তিনি চলে যাচ্চেন?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। বরঞ্চ এঁর উপদেশের বিরুদ্ধেই তিনি চলে যাচ্চেন।

জীবানন্দ উপহাস করিয়া কহিল, বল কি প্রফুল্ল, ফকিরসাহেব শুনি যে তাঁর গুরু! গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল কহিল, এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল কহিল, বিরাগের হেতু আপনি। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি এ কথা আপনাকে শোনানো ভাল হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন—পাছে কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সকলের চেয়ে বড় ভয়। নইলে দেশের লোককে তিনি ভয় করেন নি।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল একটুখানি হাসিয়া কহিল, দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকী রয়ে গেল, যদি বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ এ কথারও কোনও উত্তর দিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়, বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ আনিয়া উপস্থিত করিল; জীবানন্দ হাত নাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা—দরকার নেই।

ভৃত্য বুঝতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রফুল্ল কহিল, কখন দরকার সেইটে বলে দিন না।

জীবানন্দ সহসা কখন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রফুল্লের প্রশ্নে চোখ তুলিয়া কহিল, এখন ত নিয়ে যা—দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। সে চলিয়া যাইতেছিল, জীবানন্দ ডাকিয়া কহিল, হাঁ রে, তোদের চা আছে?

প্রফুল্ল কহিল, শোন কথা! চা নেই ত আমি বেঁচে আছি কি করে?

তবে, তাই এক বাটি নিয়ে আয়।

বেহারা প্রস্থান করিলে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে?

জীবানন্দ বলিল, অরুচি নয়—কিন্তু আর খাবো না।

প্রফুল্ল হাসিল, এবং ক্ষণেক পূর্বে তাহারই প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে ক' বার হ' লো দাদা?

জীবানন্দ রাগ করিল না, সেও হাসিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া কহিল, এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকী থাক প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

প্রফুল্ল মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, প্রত্যুত্তর করিল না।

চাকর আলো দিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বাহিরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, জীবানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই একটু ঘুরে আসি–

প্রফুল্ল আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ, কাপড় ছাড়লেন না?

থাক গে।

আপনার সহচর? গাদা পিস্তলটি?

সেও থাক! আজ একলাই ঘুরতে চললাম।

প্রফুল্ল ভয়ানক আপত্তি করিয়া বলিল, না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

জীবানন্দ দুই-পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, ওকে আর আমি ছুঁচ্চিনে প্রফুল্ল–

প্রফুল্ল বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ হলো কি দাদা? না হয় পাইকদের ডেকে দিই, তাদের কেউ সঙ্গে যাক।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও না। আজ থেকে আমি এমনি একলা বার হব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার, আর আমার থেকে কারও কোন ভয় না হোক; তার পরে যা হয় তা আমার ঘটুক–আমি কারও কাছে নালিশ করব না। এই বলিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে একাকী বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

পরিপূর্ণ সুরাপাত্র অসম্মানে ফিরিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গ করিয়াছে। করিবারই কথা। লিভারের দুঃসহ যাতনায় ও চিকিৎসকের তাড়নায় শয্যাগত জীবানন্দের জীবনে এ অভিনয় আরও হইয়া গেছে; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সুস্থদেহে মদের বদলে চা খাইয়া বাটীর বাহির হওয়া খুব সম্ভব এই প্রথম। সমস্ত জগৎটা তাহার বিস্বাদ ঠেকিল, এবং শান্তিকুঞ্জের ঘন-ছায়ায় ঘেরা পথের মধ্যে যেদিকে চাহিল, সেই দিক হইতেই একটা অস্ফুট কান্নার সুর আসিয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার অভ্যস্ত জীবনের নীচে তাহারই যে আরও একটা সত্যকার জীবন আজও বাঁচিয়া আছে এ খবর সে জানিত না। গেট পার হইয়া যখন মাঠের পথে বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পরিণত হইতেছিল। একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে, আর একদিকে বৈশাখের শস্প-শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায় না, রাখাল বালকেরা গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে–সান্ধ্য আকাশতলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল। এই পথে, এমনি নির্জন সন্ধ্যায় সে আরও কতবার যাতায়াত করিয়াছে; কিন্তু এতদিন ধরিত্রী যেন এই তাঁহার শান্ত দুঃখের ছবিখানি মাতালের রক্তচক্ষু হইতে একান্ত সঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওপারের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর বহিয়া উষ্ণ বায়ু আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার গায়ে লাগিতেছিল; কিছুই নূতন নয়–সেইদিকে চাহিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় যেন আজ তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, মা পৃথিবী, তোমার দুঃখের তপ্ত নিশ্বাসটুকুও কি লজ্জায় এতদিন চেপে

রেখেছিলে, পাষণ্ড বলে জানতে দাওনি? সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই, নিজের ছাড়া কারও সুখ-দুঃখের কখনও ভাগ পাইনি—সেও কি মা, আমার দোষ? আজ আছি, কাল যদি না থাকি, দুনিয়ার কারও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এ কথা কি তুমিই কোনদিন ভেবেচ মা?

এ অভিযোগ যে সে কাহার কাছে করিল, মা বলিয়া যে সে বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, বোধ হয় সে নিজেই ঠিকমত উপলব্ধি করে নাই, তথাপি গিরিগাত্র-স্খলিত উপলখণ্ড-সকল যেমন নির্ঝরের পথ ধরিয়া আপনার ভারবেগে আপনিই গড়াইয়া চলে, তেমনি করিয়াই তাহার সদ্য উৎসারিত আকস্মিক বেদনার অনুভূতি চোখের জলের পথ ধরিয়া কথার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের জলনিকাশের জন্য চাষারা একবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল।

নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনই শুধু সর্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই। স্থানটা তখন পর্যন্ত অসমতল অবস্থাতেই ছিল। দরিদ্র-পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, আহা! কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে! কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হয়ত পেট ভরে দু' বেলা খেতেও পাবে না। কেনই বা মানুষে এ-সব করে? জায়গাটা অন্ধকারেই ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, হাতে টাকা থাকলে কালই মিস্ত্রি লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আর তাদের দুঃখ পেতে হতো না। আচ্ছা, কত টাকা লাগে? সে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া গেল, এবং সমস্তটা মন দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার

ছিল না, কত ইঁট, কত চুন-বালি, কত কাঠ, কি কি আবশ্যক কিছুই সে জানিত না, কিন্তু কথাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সেইখানে ভূতের মত অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া সে কেবলই মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, এই ব্যয় তাহার সাধ্যাতীত কি না।

পথের ও-ধার দিয়া কি একটা ছুটিয়া গেল? হয়ত কুকুর কিংবা শিয়াল হইবে, কিন্তু তাহার চমক ভাঙ্গিল। পরের জন্য দুঃখ বোধ করা এমনই অভ্যাসবিরুদ্ধ যে, চমক ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমস্ত তামাশাটা একমুহূর্তে ধরা পড়িয়া তাহার ভারী হাসি পাইল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া আসিয়া শুধু বলিল, বাঃ, বেশ ত কাণ্ড! কেউ যদি দেখে ত কি ভাববে! জীবানন্দ আজ মদ না খাইয়াই বাহির হইয়াছিল, তাহার আজিকার এই মনের দুর্বলতার হেতু সে বুঝিল, অবসাদগ্রস্ত চিত্তের মাঝে কেন যে আজ অকারণে কেবল কান্নার সুরই বাজিয়া উঠিতেছে, ইহারও কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। আরও একটা জিনিস, নিজের সম্বন্ধে আজ তাহার প্রথম সন্দেহ হইল যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস আজ তাহার সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া একেবারে স্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে আপন বলিয়া দাবী করিবার দাবী হয়ত তাহার চিরদিনের মত হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিসের জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিল ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় জোর করিয়া যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তখন স্থিরসঙ্কল্প হয়ত কিছুই ছিল না, হয়ত অগোচরে অস্পষ্টরূপে অনেক কথাই ছিল–যাহা এখন একেবারে লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।গৃহত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই মনে পড়িল না। কিন্তু গৃহে ফিরিতেও ইচ্ছা করিল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া পায়ে-হাঁটা যে পথটা মাঠের উপর দিয়া কোনাকুনি চণ্ডীগড়ের দক্ষিণ ঘুরিয়া গিয়াছে, অন্ধকারে সেই পথেই সে পা বাড়াইল।

পথটা দীর্ঘ এবং বন্ধুর, প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু ধাক্কা খাইয়া, হোঁচট খাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ততল তাহার কখন যে ইট, কাঠ, চুন এবং সুরকির চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে জানিতেও পারিল না।

জিনিসটা কিছুই নয়, ছোট একটা সাঁকো, বীজগ্রামের জমিদারের কাছে তাহার চেয়ে তুচ্ছ বস্তু আর ত কিছু হইতেই পারে না। সেটা তৈরি করার মধ্যে না আছে শিল্প, না আছে সৌন্দর্য; তবুও এই শিল্পসৌন্দর্যহীন সামান্য বস্তুটাই যেন কত দুঃখীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মনের মধ্যে আজ এক নূতন রসে ভরিয়া অসামান্য হইয়া দেখা দিল! তাহাকে কতপ্রকারে ভাঙ্গিয়া কতরকমে গড়িয়া সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিল না। অথচ এ-সকল যে শুধু তাহার অবসন্ন মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সত্যবস্তু নয়, কাল দিনের বেলা ইহার চিহ্নমাত্র রহিবে না, এ কথাও সে বিস্মৃত হইল না, উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মত কোথায় যেন বিঁধিয়াই রহিল। অথচ আজ রাত্রির মত এই ছেলেমানুষিটাকে সে কোনমতেই ছাড়িতে পারিল না, প্রশ্রয় দিয়া দিয়া কল্পনার পরে কল্পনা যোজনা করিয়া অবিশ্রাম চলিতে লাগিল।

সহসা কালো আকাশপটে চণ্ডী মন্দিরের চূড়া দেখা দিল। এতদূর আসিয়াছে তাহার হুঁশ ছিল না; আরও কাছে আসিয়া মন্দিরের ছোট দরজাটা তখনও খোলা আছে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবীর আরতি অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত প্রাঙ্গণে ঘোর অন্ধকার, শুধু নাটমন্দিরের একধারে মিটমিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। জীবানন্দ নিকটে গিয়া দেখিল জন চার-পাঁচ মশার ভয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, শুধু কে একজন থামের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছে। জীবানন্দ আরও একটু কাছে গিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি?

লোকটি জীবানন্দের ধপধপে সাদা পরিচ্ছদ অন্ধকারেও অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভদ্রব্যক্তি বলিয়া বুঝিল, কহিল, আমি একজন যাত্রী বাবু।

ওঃ–যাত্রী! কোথায় যাবে?

আজ্ঞে, আমি যাবো শ্রীশ্রীপুরীধামে।

কোথা থেকে আসচো? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী? এই বলিয়া জীবানন্দ ঘুমন্ত লোকগুলিকে দেখাইয়া দিল।

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি একাই আসচি মানভূম জেলা থেকে। এদের কারও বাড়ি মেদিনীপুর, কারও বাড়ি আর কোথাও–কোথায় যাবে তাও জানিনে। দু' জন ত কেবল আজ দুপুরবেলাতে এসেছে।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল,আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দু' বেলা খেতে পায়, না?

লোকটা বিব্রত হইয়া পড়িল। লজ্জিতভাবে কহিল, কেবল খাবার জন্যেই সবাই থাকে না বাবু। পায়ে-হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল না, তাই ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হল। মা ভৈরবী নিজের চোখে দেখে হুকুম দিলেন, যতদিন না সারে এখানে থাকো।

জীবানন্দ কহিল, বেশ ত, থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই হে।

কিন্তু মা ভৈরবী ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে শুনতে পেয়েচ? তা না-ই তিনি থাকলেন, তাঁর হুকুম ত আছে। তোমাকে যেতে বলে সাধ্য কার? তোমার যতদিন না পা সারে, তুমি থাকো। এই বলিয়া জীবানন্দ তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

লোকটা প্রথমে একটু ভয় ও সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব রহিল না। এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকার এই নির্জন নিস্তব্ধ দেবায়তনের একান্তে পরাক্রান্ত এক ভূস্বামী ও দীন গৃহহীন আর এক ভিক্ষুকের সুখ-দুঃখের আলোচনা একেবারে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে কৈবর্ত, বাটী

আগে ছিল মানভূম জেলার বংশীতট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন এক শহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, উপযুক্ত দুই পুত্র একে একে চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কোন উপায় করিতে পারে নাই; অবশেষে জীর্ণ ঘরখানি সে তাহার বিধবা ভ্রাতুষ্কন্যাকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ জীবনে আর তাহার ফিরিবার আশা নাই, ইচ্ছা নাই; এই বলিয়া সে ছেলেমানুষের মত হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবানন্দের চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরের কান্না তাহার কাছে নতুন বস্তু নয়, এ সে জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোনদিন এতটুকু দাগ পর্যন্ত ফেলিতে পারে নাই, আজও সে ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারিল না, কিন্তু অন্ধকারে জামার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল কোথাও ছুটিয়া গিয়া যে স্ত্রী তাহার মরে নাই, যে ছেলে তাহার জন্মে নাই, যে গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাদেরই জন্য এই অপরিচিত লোকটার মতই ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। খানিক পরে সে কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, বাবু, আমার মত দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ কহিল, ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় জায়গা, এর কোথায় কে কিভাবে আছে বলবার জো নেই।

ইহার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা শক্তি এই সামান্য লোকটার ছিল না, জীবানন্দ নিজেও তাহা আশা করিল না, কিন্তু থামিতেও পারিল না। তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্বতা তাহার কানে এমন অমৃত সিঞ্চন করিল যে, সে লোভ সে সামলাইতে পারিল না। বলিতে লাগিল, দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নাই। তা হলে সবাই

তাকে এড়িয়ে চলতে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই মানুষ তাকে টের পায়। কিন্তু কোন্ পথে যে তার আনাগোনা আজও কেউ তার খোঁজ পেলে না। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও–অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তুমি চিনতে পারনি।

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কথাও বুঝিল না, সাথী যে কে আছে তাহাও জানিল না।

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি মায়ের নাম করছিলে ভাই, আমি বাধা দিলাম। আবার শুরু কর, আমি চললাম, কাল এমনি সময়ে হয়ত আবার দেখা হবে।

লোকটি কহিল, আর ত দেখা হবে না বাবু, আমি পাঁচদিন আছি, কাল সকালেই চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা সারেনি, তুমি হাঁটতে পারো না।

সে কহিল, মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম, তিনদিনের বেশী আর কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে! মা চণ্ডীর কপাল ভাল! এই বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হলো কিরকম? কি খেলে ভাই?

সে কহিল, যারা তিনদিন আসেনি তারা সবাই মায়ের প্রসাদ পেলে।

আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশী হয়ে গেছে!

লোকটি ভালমানুষ, সহসা কাহারও নিন্দা করা স্বভাব নয়, বলিল, ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

তাই হবে। বলিয়া জীবানন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। খুব সম্ভব অনাহূত যাত্রীদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই এমনি একটা নিয়ম ছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহা মানিয়া চলিতে পারিত না। এখন তারাদাস এবং এককড়ি নন্দী উভয়ে মিলিয়া জমিদারের নাম করিয়া সে ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যদি হয়, অভিযোগ করিবার খুব বেশী হেতু নাই, কিন্তু মন তাহার কোনমতেই এ কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। অন্তর হইতে সে বার বার কহিতে লাগিল, এমন হইতেই পারে না! এমন হইতেই পারে না! বুভুক্ষুকে আহার দিবার আবার বিধিব্যবস্থা কি! ওই যে ক্ষুধার্ত অতিথি ওইখানে অনাহারে বসিয়া রহিল, ক্ষুধাকে তাহার বাঁধিয়া রাখিবে ইহারা কোন্ আইনকানুনে? কহিল, ওহে ভাই, কাল আবার আমি আসব, কিন্তু চুপি চুপি চলে যেতে পারবে না, তা বলে যাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলেন?

জীবানন্দ কহিল, বললেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবে না? ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মন্দিরের বারান্দায় থামের আড়ালে মানুষের চাপা-গলা শুনিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে মনে করিল, নিভৃতে কেহ আরাধনা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার কানে গেল। কে একজন বলিতেছে, আমাদের মায়ের সর্বনাশ যে করেচে তার সর্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়ব না বলে দিচ্চি।

অন্যজন জবাব দিল, মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো—ফাঁসি যেতে হয়, তাও যাবো।

আর একজন বলিল, হঃ—আমাদের আবার জেল! আমাদের আবার ফাঁসি! মা চলে যেতে চাচ্চে, আগে যাক—

অন্ধকারে না চিনিল মানুষ, না চিনিল গলা, তবু মনে হইল একজনের গভীর কণ্ঠস্বর সে কোথাও যেন শুনিয়াছে, একেবারে অপরিচিত নয়। চেষ্টা

করিলে হয়ত মনে করিতেও পারিত, কিন্তু আজ তাহার সেদিকে মনই গেল না। সে ত অনেকের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে–অতএব নিজেই ত সে ইহার লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছাই হইল না। মনে মনে হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়! আহা!

অলক্ষ্যে নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্মল কালো আকাশ তারায় তারায় ঠাসা। সেই অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া অদৃশ্য আলোকের আভাস অন্ধকার পথের মাটিকে ধূসর করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠিন মাটির স্তূপ পথশ্রান্ত পথিকের মত কতকাল ধরিয়া যেন নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার ইতিহাস নাই, তাহারই একটি পাশে গিয়া সে ঠিক তেমনি করিয়াই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল।

সুমুখে কতকটা পতিত জমির একধারে ষোড়শীর কুটীর, গাছের আড়ালে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাহার মনে হইল অনেকগুলি মানুষ যেন সার বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনতিদূর দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ইহাদের কথাবার্তা হইতে জীবানন্দ এইটুকু সংগ্রহ করিল যে, ষোড়শীর গোযান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং কাল প্রত্যুষেই সে চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভক্ত প্রজার দল তাহার পদধূলি লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। ষোড়শীকে নিষেধ করিবার পথ নাই, নিষেধ করিলে সে শুনিবে না, এই কয়দিনে এতটুকু তাহাকে সে চিনিয়াছে–কিন্তু মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে যত অন্যায় করিয়াছে, একটি একটি করিয়া এতকাল পরে তাহার তালিকা করা অসম্ভব, কিন্তু সেই-সকল অগণিত অত্যাচারের সমষ্টি আজ তাহার চোখের উপর স্তূপাকার হইয়া উঠিল।

ইহাকে সরাইয়া রাখিবার স্থান সংসারে সে কোথাও দেখিল না। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহাকে লজ্জাবোধ করিয়াছে, গণিকা বলিয়া তাহাকেই কামনা করিবার শয়তানী সে যে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া পাইল না। আজ সমস্ত হৃদয় তাহার ষোড়শীকে একান্ত-মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী, অথচ চিরদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার পরে মিথ্যা জমা করিয়া, সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কৈ?

হঠাৎ সম্মুখেই দেখিতে পাইল কে একজন দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারে চিনিতে বিলম্ব হইল না, ডাকিল, অলকা?

ষোড়শী চমকিয়া দাঁড়াইল। এ যে জীবানন্দ তাহা সে ডাক শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। একটু সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি জানি, এমনিই বসে ছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্চো, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এই একটা বেলার মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ষোড়শী বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কহিল, আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে, সে ত আপনি জানেন।

জীবানন্দ বলিল, জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—একগাছা লাঠিও সঙ্গে নেই।

ষোড়শী কহিল, শুনেচি। প্রফুল্লবাবু আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কাছে খবর পেলাম আজ আপনি নিরস্ত্র বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে গেছেন, এবং—

এবং ঝোঁকের উপর মদ না খেয়ে বার হয়ে গেছি, না?

ষোড়শী কহিল, হাঁ। কিন্তু চণ্ডীগড়ে এ কাজ আর আপনি ভবিষ্যতে করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, এ কাজ আমি প্রত্যহ করব এবং যতদিন বাঁচব—করব। প্রফুল্ল তোমাকে এত কথা বলেচে, এ কথা বলেনি যে, এ জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি পৃথিবীতে আমার শত্রু আছে এ আমি একদিনও আর স্বীকার করব না?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার যুক্তি লইয়াও তর্ক করিল না, এ কথার স্থায়িত্ব লইয়াও প্রশ্ন করিল না। জীবানন্দের মুখের চেহারা অন্ধকারে সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু এই তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিশীথে এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তাহার দুই কান ভরিয়া এক আশ্চর্য সুরে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আপনার কি হবে?

জীবানন্দ কহিল, কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছ, সঙ্গে থাকব, তার পরে যখন যাবার সময় হবে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাবো।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। জীবানন্দ কহিল, যাবার দিনে আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না অলকা। আমার জীবনের দাম তুমি ত জানো, আর হয়ত দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কতরকমে দয়া করে গেছ, আমার শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেই-সব কথাই স্মরণ করব।

ষোড়শী কহিল, আচ্ছা আসুন—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে চলার পরে জীবানন্দ কহিল, লোকে বলে, ও দয়ার যোগ্য নয়। আচ্ছা অলকা, দয়ার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? দয়া যে করে সে ত নিজের গরজেই করে। নইলে, দয়া পাবার যোগ্যতা আমার ছিল এত বড় দোষারোপ করতে ত শুধু অতি বড় শত্রু নয়, তুমি পর্যন্ত পারবে না।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বলিল, আমার চেয়ে আপনার বড় শত্রু সংসারে বুঝি আর কেউ নেই?

জীবানন্দ বলিল, না।

মন্দিরে প্রবেশ করার পরে জীবানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মজা দেখ অলকা, যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সবচেয়ে বড় বাধা। ষোড়শী জিজ্ঞাসু-মুখে ফিরিয়া চাহিতে কহিল, আজ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত এই মন্দিরেই বসে ছিলাম। ভৈরবী নেই, এখন জমিদার কর্তা। হুজুরের নাম করে তাই এরই মধ্যে যাত্রীদের উপর তে-রাত্রির আইন জারি হয়ে গেছে। তোমার সেই যে খোঁড়া অতিথিটি, পা না সারা পর্যন্ত যাকে তুমি থাকতে অনুমতি দিয়েছ, তার মুখেই শুনতে পেলাম হুজুরের কড়া হুকুমে আজ তার অন্ন বন্ধ। সে বেচারা অভুক্ত বসে চণ্ডীনাম জপ করছিল—হুজুরের কল্যাণ হোক, কাল সকালেই নাকি আবার তাকে চলে যেতে হবে, পা-দুটো তার থাক আর যাক।

ষোড়শী কহিল, আমার বাবা বুঝি হুকুম দিয়েছেন?

জীবানন্দ বলিল, শুধু তোমার বাবা কেন, গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে অনেক বাবাই এ গ্রামে আছেন, আর হুজুরের সুনামে ত স্বর্গ-মর্ত্য ছেয়ে গেল। লোকটার কাছে বসে বসে তাই ভাবছিলাম অলকা, তোমার যাবার পরে সন্ন্যাসিনীর আসনে বসে এই সব বাবার দল যে তাণ্ডব-কাণ্ড বাধাবে তাকে আমি সামলাবো কি করে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

জীবানন্দ নিজেও বহুক্ষণ অবধি মৌন থাকিয়া মনে মনে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল, অকস্মাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী শান্তকণ্ঠে শুধু কহিল, না। তার পরে সে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, জীবানন্দ কহিল, আর একটা দিন?

ষোড়শী বলিল, না।

তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা করে যাও।

কিন্তু তাতে কি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ–নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, লোকে জানবে আমি তোমাকেই শাস্তি দিয়েচি, তুমি সহ্য করেচ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। তুমি যাবার আগে তোমার মা-চণ্ডীকে জানিয়ে যাও, যে এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই।

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবার মুখে সহসা জীবানন্দ দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, তোমার ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাটি আমাকে বলে দাও, কি করলে তোমাকে আমি কেবল একটি দিন কাছে রাখতে পারি। তার পরে তুমি–

ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, আপনার পাইক-পিয়াদারা কি কেউ নেই যে এত অনুনয়-বিনয়? আপনি ত জানেন, আমি কারও কাছে নালিশ করব না।

জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাগ করিল না, প্রতিঘাত করিল না, সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যাও, অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন করব না। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, কিন্তু যে নিজে ধরা দেবে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী পথ ছাড়া পাইয়াও পা বাড়াইল না, কহিল, আমি কোথায় যাচ্চি সে কৌতূহল বোধ করি আর আপনার নেই?

জীবানন্দ কহিল, কৌতূহল? বোধ হয় তার সীমা নেই–কিন্তু তাতে আর জ্বালা নেই অলকা। আমি কেবল এই কামনা করি, সেখানে কষ্ট তোমাকে যেন

কেউ না দেয়। তোমার প্রতি যারা বিরূপ তারা যেন তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারে। হঠাৎ গলাটা যেন তাহার ধরিয়া আসিল, কিন্তু নিজের দুর্বলতাকে আর সে প্রশ্রয় দিল না, মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিয়া কহিল, আমি জানি, যে লোক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায়, তার সঙ্গে লড়াই চলে না। যেদিন আমাদের হাতে তোমার চাবি ফেলে দিলে সেইদিন তোমার কাছে আমাদের একসঙ্গে সকলের হার হলো। তোমার জোরের আজ অবধি নেই–তবু ত মানুষের মন বোঝে না। যতদিন বেঁচে থাকব, এ আশঙ্কা আমার কোনদিন ঘুচবে না।

ষোড়শী সেইখানে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ–

কি অনুরোধ অলকা?

ষোড়শী মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া কহিল, সে আপনি জানেন।

জীবানন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, হয়ত জানি, হয়ত ভেবে দেখলে জানতেও পারব–কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলে সাবধানে থাকতে–কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠব না। আজই কিছুক্ষণ পূর্বে এই মন্দিরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে দু' জন দেবতার চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের যে সর্বনাশ করেছে তার সর্বনাশ না করে তারা বিশ্রাম করবে না–আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সমস্ত শুনলাম–দু' দিন আগে হলে হয়ত মনে হতো, সে বুঝি আমি–দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হ' লো না–কি অলকা?

না, কিছু নয়, বলিয়া ষোড়শী জোর করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে জীবানন্দ দেখিতে পাইল না, সহসা তাহার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। কহিল, চলুন আমার ঘরে গিয়ে একটুখানি আজ বসতে হবে। আমাকে গাড়িতে তুলে না দিয়ে বাড়ি যেতে আপনাকে দেব না। আসুন–

পঁচিশ

গরুর গাড়ির নীচে চাদর মুড়ি দিয়া গাড়োয়ান শুইয়াছিল, সে ষোড়শীর পায়ের শব্দ অনুভবে বুঝিয়া কহিল, মা, শৈবাল-দীঘি ত দশ-বারো ক্রোশের পথ, একটু রাত থাকতে বার না হলে পৌঁছতে কাল প্রহর বেলা উৎরে যাবে।

ষোড়শী বলিল, আচ্ছা, তাই হবে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, কোথায় যাচ্চি বোধ করি শুনতে পেলেন?

জীবানন্দ কহিল, পেলাম বৈ কি।

ষোড়শী কহিল, বেশী দূরে নয়। আপনার আক্রোশ এ পথটুকু অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারবে।

কিন্তু তোমার ওপর আক্রোশ ত আমার নেই।

ঘর খুলিয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল, কহিল, আমার একটিমাত্র কম্বল গাড়িতে পাতা। আপনাকে বসতে দিই এমন কিছু নেই। নির্ম্মলবাবু হলে আঁচল বিছিয়ে দিতাম, কিন্তু আপনাকে ত তা মানাবে না। এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিয়া ঘরের কোণ হইতে একখানি কুশাসন গ্রহণ করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিয়া বলিল, যদি অপরাধ না নেন ত–

জীবানন্দ নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

এতবড় শ্লেষের উত্তর না পাইয়া ষোড়শী মনে মনে বিস্মিত হইল। প্রদীপের আলো অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, ষোড়শী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেটা হাতে করিয়া জীবানন্দের মুখের কাছে আনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, কি ভাবচেন বলুন ত?

আমার ভাবনার কি অন্ত আছে?

অন্ত না থাকে আদি ত আছে, তাই বলুন।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নেই। যার অন্ত নেই তার আদিও থাকে না।

ষোড়শীর মুখে আসিয়া পড়িল, ও-সকল কেবল দর্শনশাস্ত্রের বুলি—শুধু বাক্য—ও লইয়া সংসার চলে না, কিন্তু জীবানন্দের মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখে স্বর বাহির হইল না। মনে মনে সে সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুভব করিল, একটা কেবল সুচতুর উত্তর দিবার জন্যই এ কথা আজ সে বলে নাই, এ লইয়া আর বাদানুবাদ করিতে সে চাহে না। যাহাকে একান্তই নিষ্ফল বলিয়া বুঝিয়াছে সে লইয়া আর তর্ক কেন?

সেইখানে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ষোড়শী উঠিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া হাত ধুইল, কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

কি?

এই ঘরে একদিন আমার কাছে আপনি চেয়ে খেয়েছিলেন, আজ তেমনি আমার চাওয়ায় আপনাকে খেতে হবে।

দাও। ক্ষিদেও পেয়েচে।

সে জানি। আমরা পুরুষমানুষের মুখের পানে চাইলেই টের পাই। বলিয়া ষোড়শী জল-হাতে মুছিয়া লইয়া সামনেই ঠাঁই করিয়া দিল। দেবীর প্রসাদ আজ ছিল না, কিন্তু প্রজারা আজ তাহাকে অনেক-কিছু দিয়া গিয়াছিল, তাহাই পাতায় করিয়া সাজাইয়া আনিতে ষোড়শী রান্নাঘরে চলিয়া গেলে একাকী চারিদিকে চাহিয়া সেদিনের সেই দোয়াত ও কলমটা কুলঙ্গির উপরে তাহার চোখে পড়িল। মিনিট-দুই চিন্তা করিয়া সে তাহা পাড়িয়া আনিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহার সাদা অংশটা ছিঁড়িয়া লইয়া প্রদীপের সুমুখে আসিয়া সে পত্র লিখিতে বসিল। বোধ হয় তিন-চারি ছত্রের বেশী নয়, শেষ করিয়া ভাঁজ করিল, এবং উপরে ষোড়শীর নাম লিখিয়া তাহা পকেটে রাখিয়া দিল। খানিক পরে খাবার লইয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল। শালপাতায় জলে-ভিজানো সরু ধানের

চিড়া, শালপাতার ঠোঙ্গায় দধি, আর একটা পাতায় কিছু ফলমূল ও চিনি, এবং ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একটুখানি মলিন হাসিয়া বলিল, সেদিন ধনীর দেওয়া ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আর আজ গরীবের ঘরের চিড়ে দই আর একটু চিনি। এ কি আপনার মুখে রুচবে?

জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়া বলিল, তুমি খেতে দিলে মুখের জন্যে ভাবিনে অলকা, কিন্তু পেটে সহ্য হলে হয়; আমার আবার সেই কলিকের ব্যথাটায়—

কথা শেষ না হতেই ষোড়শী চক্ষের পলকে পাতাটা টানিয়া লইল। ব্যাকুল ম্লানমুখে কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার পোড়াকপাল, তাই ভুলেছিলাম! কিন্তু এ ত আপনাকে আমি প্রাণান্তে খেতে দিতে পারব না।

জীবানন্দ নিজের কথায় লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, বেশী না খেলে বোধ হয় ক্ষতি হবে না।

ষোড়শী বলিল, বোধ হয়। বোধ হয় নিয়ে আপনাদের চলে, কিন্তু আমাদের চলে না।

কিন্তু এর জন্যে ত তোমার দুঃখ হবে।

ষোড়শী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, দুঃখ হবে কি গো? যাবার সময় তোমার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েচি, কিচ্ছু দিতে পারিনি—আমি তো কেঁদেই মরে যাবো। একটু মৌন থাকিয়া হঠাৎ ভারী একটা অনুনয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, ও-বেলা নানা ঝঞ্ঝাটে রাঁধতে পারিনি, এ-বেলা সন্ধ্যার পর রেঁধেছি। ভাত, মাছের ঝোল—

মাছের ঝোল কি-রকম?

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, কেন, আমি কি বিধবা নাকি? আমি ত সব খাই।

এতক্ষণ পরে জীবানন্দ হাসিল, বলিল, তা হলে সেগুলি সব নিজের জন্যে রেখে আমাকে দয়া করে ফলার খাওয়াতে গেলে কেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আমার দোষ হয়েচে, অপরাধ হয়েচে—একশ ’ বার ঘাট স্বীকার করচি। যদি বলেন ত আপনার কাছে আমি দশ হাত মেপে নাকে খত দিতে পারি। এই বলিয়া সে ভিজা-চিড়ার পাতাটা তুলিয়া ভাত ও মাছের ঝোল আনিতে হাসিমুখে উঠিয়া গেল।

ষোড়শীর প্রশ্নের উত্তরে জীবানন্দ যখন বলিয়াছিল, তাহার ভাবনার আদি-অন্ত নাই, তখন সে মিথ্যা বলে নাই, বোধ করি বাড়াইয়াও বলে নাই। এ জীবনে নিজের জীবনকে সে কখনও আলোচনার বিষয় করে নাই, এবং কোনদিন কোন প্রয়োজনই তাহার মুহূর্তের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পায় নাই। তাই তাহার ক্ষণকালের রুমালের প্রয়োজন ক্ষণপরের ঢাকাই চাদরের ঢের বড়; তাই আস্তরণের অভাবে শয্যায় তাহার বহুমূল্য শাল পাতা, এইজন্যই সে হাতের কাছে অ্যাশ-ট্রে না পাইলে সোনার ঘড়ির ডালার উপরে জ্বলন্ত চুরুট রাখিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে সত্যবস্তু নয়, যে আসে নাই, সেই অনাগতের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। নারীর যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তাহার আসক্তি, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায় না, সেই তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব—তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিল না। কিন্তু গ্রহবশে যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে ইহার কোন সন্ধানই সে জানিত না। কিসের জন্য যে অলকার আশেপাশে মন তাহার অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় যৌবন যাহার ক্ষুব্ধ নিপীড়িত, রূপ যাহার কঠিন ও কান্তিহীন, তাহাকে অনুক্ষণ কামনা করিয়া সংসার যখন তাহার এমনি বিস্বাদ হইয়া গেল, তখন কারণাতীত এই মোহের কৈফিয়ত সে যে নিজের কাছেই খুঁজিয়া পাইত না। কোন্ অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন্ অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন, এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইত না।

ভাত খাইতে বসিয়া একসময় সে বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে খোলা দোরের দিকে পিঠ করিয়া ষোড়শী বসিয়াছিল, এই একটা সাধারণ প্রশ্নের ঠিকমত জবাব না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, আপনি কি ভাবচেন, আমার উত্তর দিচ্চেন না?

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া কহিল, কিসের?

ষোড়শী বলিল, এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ি যাওয়া উচিত? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্যই বুঝিতে পারিল না, কহিল, কাজ নেই?

ষোড়শী বলিল, কৈ, আমি ত আর দেখতে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

কিন্তু তুমি ত অসতী নও। এই বলিয়া জীবানন্দ চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকালমাত্র তাহাদের চোখে চোখে মিলিল, তাহার পরে ষোড়শী মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথাবার্তার মধ্যে যে বস্তুটা সে লক্ষ্য করে নাই, এই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে এই প্রথম দেখিতে পাইয়া সে যথার্থই বিস্মিত হইল।

জীবানন্দের চোখে বুদ্ধির সেই অতি-তীক্ষ্ণতা ছিল না, মুখের কথার মত চাহনি তাহার স্পষ্ট, সরল এবং স্থূল। তাহার বক্রোক্তি ও অভিমান যে এই লোকটির কাছে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এ কথা ত এতদিন আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানতেন।

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু নির্মল তোমাকে ভালবাসে এ ত সত্য।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার আরক্ত মুখ অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়া কহিল, সে কি আমার দোষ? আর কেউ যদি ভালবাসার কদর্যতায় জীবন আমার দুর্ভর করে তোলে, সেও কি আমার অপরাধ? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে তাহার মুখ দেখিয়া অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার দোষের জন্যে ত আর এরা দায়ী নয়। এই বলিয়া সে সম্মুখের অন্ন-পাত্রটা দেখাইয়া বলিল, খাওয়া বন্ধ হ' লো কেন? সবই যে পড়ে রইল।

না, এই ত খাচ্চি, বলিয়া সে আহারে মন দিল।

গাড়োয়ান হাঁকিয়া কহিল, মা আর কি বেশী দেরি হবে?

না বাবা, আর বেশী দেরি হবে না। গলা খাটো করিয়া কহিল, চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে, তা বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় যাবো বল?

কেন, আপনার নিজের বাড়িতে, বীজগাঁয়ে।

বেশ, তাই যাবো।

কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকেশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম। তা ছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই–অতিথি-অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়–এ-সব না করেই কি তুমি চলে যেতে বলচ?

ষোড়শী মুশকিলে পড়িল। কিন্তু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব সাধু সঙ্কল্প কি কাল সকাল পর্যন্ত থাকবে?

জীবানন্দ এই পরিহাসে যোগ দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বলিল, কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশী থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে ক' টা দিন আগেকার মত সাবধানে থাকবেন বলুন?

এ কথারও সে জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। ষোড়শী জিদ করিল না, কিন্তু কথার চেয়ে এই নীরবতা জীবানন্দের ভিতরের পরিবর্তন তাহার কাছে অধিকতর সুব্যক্ত করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বাহিরে আসিয়া ষোড়শী তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিল; একমাত্র গামছাটা পুঁটলির কাজে নিযুক্ত হইয়া আগে হইতেই গাড়ির মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, নিজের অঞ্চলটা সে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, এই নিন।

জীবানন্দ হাতমুখ মুছিয়া হঠাৎ বলিল, এ কিন্তু তুমি আর কাউকে দিতে পারতে না অলকা।

শ্রী জীবানন্দ চৌধুরী

ষোড়শী আঁচলটা তাহার টানিয়া লইয়া আনতমুখে শুধু কহিল, ঘরে এসে আর একটু বসুন, গুছিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়তে আর বেশী দেরি হবে না। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে আপনি যেতে পাবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ তোমাকে নির্বাসিত করার কাজটা নিঃশেষ করেই যেতে পারি। ভালো, আমি তাই করে যাবো, কিন্তু তোমারও একটা কাজ রইল। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করব না ত কে করবে–সে অভিযোগ আমি একটিবারও কারো কাছে করিনি–কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র দাবী করব, আমি তার বেশী আর দুঃখ না পাই। এই বলিয়া সে ঘরে আসিয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া কহিল, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি, এইবার কিছু মুখে দাও, আমি ততক্ষণ অন্ধকারে খানিক ঘুরে আসি। ঠিক সময়ে উপস্থিত হবো। এই বলিয়া সে বাহির হইবার উপক্রম

করিতেই চক্ষের পলকে ষোড়শী দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। এত কথার মধ্যেও যে এই পরদুঃখ-বিমুখ আত্মসর্বস্ব লোকটি তাহার না খাইবার অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি মনে রাখিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সূচ ফুটিল, চিঠিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ত আমাকেই লেখা, আপনার সুমুখেই কি এ পত্র আমি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ কহিল, পারো, কিন্তু অনাবশ্যক। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশী দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত তোমাকে যেতেও হতো না। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পারো তার চেয়ে আনন্দ আমার নেই।

ষোড়শী কহিল, তা হলে পড়ি?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। ষোড়শী কাগজখানি হাতের পর মেলিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া সেই ছত্র-কয়েকের লিখনটুকু একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার নাম লিখা থাকিলেও, বস্তুত এ পত্র তাহার নয়। ভিতরে ছিল—

ফকিরসাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল-দীঘি আমার। এই গ্রামের মুনাফা পাঁচ ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা-কিছু প্রয়োজন,

করিবেন; সে খরচ আমিই দিব। কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজিস্টারী করিয়া দিব।

ষোড়শী বাহিরে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি এত খবর কোথায় পেলে? আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্চি এই বা তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ কহিল, কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শুনেও অন্ধকারে আমি যাদের চিনতে পারিনি, তুমি তাদের চিনলে কি করে?

ষোড়শী ইহার ঠিক জবাবটা দিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও নাকি?

প্রশ্নটা দুজনের কানেই অদ্ভুত ঠেকিল। জীবানন্দ প্রথমে জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে কিরকম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট করতে পারব না। এখানে আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। আমার অনেক গেছে, কত যে গেছে শুনলে তুমি চমকে যাবে—কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারব না।

ষোড়শী সভয়ে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসিনী। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব নেই—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব আছে কি নাই, এ কথা তাহাকে বলিবার স্পর্ধা যাহার হইল তাহাকে সে আর কি বলিবে?

গাড়োয়ান প্রাঙ্গণ হইতে তাড়া দিয়া বলিল, মা, রাত পোহাতে যে আর দেরি নেই।

চল বাবা, যাচ্চি। বলিয়া ষোড়শী তেলটুকু প্রদীপের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ক্ষীণ দীপশিখা সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ঘরে তালা বন্ধ করিবার আবশ্যক ছিল না, জীর্ণদ্বারে শুধু শিকলটি তুলিয়া দিয়া, গলায় অঞ্চল দিয়া জীবানন্দের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমি চললাম।

জীবানন্দ কহিল, খাবার সময়টুকুও হল না।

না। প্রজারা জানে আমি ভোরবেলায় যাত্রা করব, তারা এসে পড়বার পূর্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই। একটু হাসিয়া কহিল, এক-আধ দিন না খেলে আমাদের মরণ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, অলকা, তোমার মা একদিন তোমাকে আমার হাতে দিয়েছিলেন, তবু তোমাকে পেলাম না, কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।

ইহার জবাব ষোড়শী খুঁজিয়া পাইল না। শুধু কথাগুলোর একটা অব্যক্ত, অপরিসীম ব্যাকুল ধ্বনি তাহার দুই কান আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। গাড়ি মোড় ফিরিবার পূর্বেও সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল শেষ-নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে ঠিক সেইখানেই সে তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি প্রভাত হইতে তখন খুব বেশী বিলম্ব ছিল না, জীবানন্দ মাঠের পথ ধরিয়া তাহার গৃহে ফিরিল। কিছুক্ষণ হইতে একটা অস্ফুট কোলাহল তাহার কানে যাইতেছিল, কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুমুখের আকাশে ঊষার আরক্ত আভার মত রাঙ্গা আলো তাহার চোখে পড়িল। এবং চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই শব্দ ও আলোক উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল, বহুলোকের ব্যর্থ চীৎকার ও ছুটাছুটির মধ্যে বীজগ্রামের জমিদার-গোষ্ঠীর প্রমোদ-

ভবন, তাহার মাতামহের অত্যন্ত সাধের শান্তিকুঞ্জ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে আর বিলম্ব নাই।

ছাব্বিশ

সকাল হইতে না হইতে চণ্ডীগড়ের সমস্ত ইতর-ভদ্র হাহাকার করিয়া আসিয়া পড়িল। শিরোমণি আসিলেন, রায়মহাশয় আসিলেন, তারাদাস আসিলেন, এবং আরও অনেক ভদ্র ব্যক্তি—পোড়া শান্তিকুঞ্জের সব পুড়িল না, দৈবাৎ কিছু রক্ষা পাইল। এবং যাহা পুড়িল তাহার দাম কত, এবং যাহা বাঁচিল তাহা সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর কিনা, ইত্যাদি তথ্য সবিস্তারে ও নিশ্চয় করিয়া আহরণ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। এবং ইহা কেমন করিয়া হইল ও কে করিল? সকলের মাঝখানে এককড়ি নন্দী তুমুল কাণ্ড করিতে লাগিল। সর্বনাশ যেন তাহারই হইয়া গেছে। সে সর্বসমক্ষে ডাক ছাড়িয়া প্রকাশ করিল যে, এ কাজ সাগর সর্দারের। সে ও তাহার জন-দুই সঙ্গীকে কেহ কেহ কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। থানায় এত্তেলা পাঠানো হইয়াছে, পুলিশ আসিল বলিয়া। সমস্ত ভূমিজ-গোষ্ঠীকে যদি না সে এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাইতে পারে ত তাহার নাম এককড়ি নন্দী নয়-বৃথাই সে এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামি করিয়া মরিল!

নির্বাপিতপ্রায় অগ্ন্যুত্তাপ হইতে একটু দূরে একটা বটবৃক্ষছায়াতলে সভা বসিয়াছিল। জীবানন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মুখের উপর শ্রান্তির অবসন্নতা ছাড়া উদ্বেগ বা উত্তেজনা কিছুই ছিল না, একটু হাসিয়া কহিলেন, তা হলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েচ, সে খবর ত আমি জানি। আগুন লাগাতে কেউ তাদের চোখে দেখেনি, মিথ্যে সন্দেহের উপর পুলিশ যদি তাদের উপর অত্যাচার করে, সত্যি কাজের জন্য তোমাকেও তার ভাগ নিতে হবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল। এককড়ি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, পরে ইহাকে পরিহাসের আকৃতি দিতে শুষ্ক-হাস্যের সহিত বলিল, হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাতপুরুষ হলো হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়াও আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আমাকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না, কিন্তু এর উপর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু' পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তা হলে লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে।

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল। এককড়ি জবাব দিতে পারিল না—ক্রোধে মুখ কালো করিয়া শুধু মনে মনে তাহার বংশলোপ কামনা করিল। নদীর দিকের চাকরদের ঘরগুলা বাঁচিয়াছিল, তাহারই দ্বিতলের গোটা-দুই ঘরে উপস্থিত মত বাস করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া জীবানন্দ অভ্যাগত হিতাকাঙ্ক্ষীর দলটিকে বিদায় দিয়া কেবল তারাদাস ঠাকুরকেই কাল সকালে একবার দেখা করিতে আদেশ করিলেন।

তারাদাস কহিল, কাল রাত্রে ষোড়শী চলে গেছে—

আমি খবর পেয়েচি।

গোটাকয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্চে না—

তা হলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

এই অগ্নিদাহের সম্বন্ধে অচিরকালমধ্যে মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল। জমিদার সে রাত্রে গৃহে ছিলেন না, ইহা লইয়া অধিক আলোচনা অনেকের কাছেই নিষ্প্রয়োজন মনে হইল, কিন্তু ষোড়শী ভৈরবীর যাওয়ার সহিত যে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং এ কাজ যাহারা করিয়াছে জানিয়া-বুঝিয়াও যে জমিদার তাহাকে অব্যাহতি দিলেন এই কথা লইয়া অনুমান ও সংশয়-প্রকাশের অবধি রহিল না। রায়মহাশয় বিষয়ী লোক, এককড়ির ফাঁদের মধ্যে জীবানন্দ পা

দিল না দেখিয়া ইঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িল, কিন্তু নিজের জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে তিনিও একজন পাণ্ডা, এবং জমিদারের গৃহ যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল তাহারা আশেপাশেই কোথাও অবস্থিতি করিতেছে, এই কথা স্মরণ করিয়া বিছানার মধ্যে তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। পাহারার জন্য চারিদিকে লোক মোতায়েন করিয়াও তিনি সারারাত্রি বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি! তাঁহার অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্যসঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা—এই সকল রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটিতে লাগিল—তবুও দিনগুলা যা হোক করিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহাতে ভাবিয়া পার পাইবার আর পথ রহিল না। আদালতের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদার ও তাঁহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। যে জমিটা তাঁহারা একত্রে আকের চাষ ও গুড়ের কারখানা করিতে মান্দ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করিয়াছিলেন, তাহাই বাতিল ও নাকচ করিবার আবেদন। খবর আসিয়াছে কোর্টের প্রস্তাবে ও ইঙ্গিতে কলেক্টর সাহেব স্বয়ং সরজমিনে আসিয়া তদন্ত করিয়া যাইবেন। অনেক টাকার ব্যাপার, অতএব এককড়ির সহযোগে অনেক ঢেরা-সই করিয়াছেন, অনেক বন্ধকী তমসুক ও কর্জার খত প্রস্তুত করিয়াছেন—একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিবার যতপ্রকার গলিঘুঁজি আছে অতিক্রম করিয়াছেন—সেই-সব মনশ্চক্ষে উপলব্ধি করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ইহার চেয়েও একটা বড় কথা এই যে, এই-সকল হীন, মূর্খ, মৃতকল্প চাষীর দল এতবড় সাহস পাইল কি করিয়া যে, গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও এই দুর্দান্ত জীবানন্দ চৌধুরী ও জনার্দন রায়ের নামে নালিশ করিয়া বসিল! জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে, আবাদের দিনে একমুষ্টি

বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে পড়িয়া হত্যা দেয়, তাহারা আদালতে দাঁড়াইবার টাকা পাইল কাহার কাছে? এ দুর্মতি তাহাদের কে দিল? সে কি এই সোজা কথাটা ইহাদের বলিয়া দিতে পারিল না যে, কেবল জেলা-আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলিয়াও একটা ব্যাপারও আছে, যেখানে জীবানন্দ-জনার্দনকে ডিঙ্গাইয়া সাগর সর্দার কখনও জয়ী হইতে পারে না!

ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরি, দরিদ্রের জন্য নয়—তাঁহার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিস্টার জামাই আছে, বিশ্বস্ত উকিল-মোক্তার আছে—এবং আরও কত কি সুবিধা-সুযোগ আছে—এইসকল আপনাকে আপনি বলিয়া জনার্দন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুবিধা বিশেষ হইল না। কারণ, এ ত শুধু টাকাকড়ি, জমিজমা, কেনা-বেচাই নয়, এতদুপলক্ষে যে-সকল অসামান্য কার্যগুলা সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধির কেতাবের পাতায় পাতায় যে-সকল কঠিন বাক্য লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহাদের নিষ্ঠুর চেহারা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিল।

এ কথা রাষ্ট্র হইতে যে অবশিষ্ট নাই, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রায়মহাশয় তাহা জানিতেন, তাই দিনের বেলাটা কোনমতে কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে এককড়িকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং জমিদার-সরকার হইতে ইহার কিরূপ বিহিত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এককড়ি কহিল, হুজুরের কাছে ত এখনও পেশ করাও হয়নি।

জনার্দন রাগ করিয়া কহিলেন, করনি ত কর গে। বুড়ো বয়সে কি শেষে ফাটক খাটবো নাকি?

তাঁহার শঙ্কা ও ব্যাকুলতায় এককড়ি হাসিয়া বলিল, ভয় কি রায়মশাই, ফাটক খাটতে হয় ত আমিই খাটবো, আপনাদের যেতে দেব না। কিন্তু গরীবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, ভুলবেন না।

জনার্দন খুশী হইয়া কহিলেন, সে ত জানি এককড়ি, তুমি থাকতে ভয় নেই, তুমি যা বোঝো উকিলের বাবাও তা বোঝে না, কিন্তু জানো ত সব? কে সাহেব নাকি নিজে তদারকে আসচে—ব্যাটা মহা বদমাশ। কিন্তু ভেতরের খবর কিছু জানো? কে ব্যাটাদের বুদ্ধি দিলে বল ত? টাকা কে যোগালে?

এককড়ি অসঙ্কোচে ষোড়শীর নাম করিয়া বলিল, টাকা যোগালেন মা চণ্ডী, আর কে? তাতেই ত তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গেল।

ছুঁড়ী আছে কোথায় বল ত?

এককড়ি কহিল, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েচে—জানতে একদিন পারবই।

জনার্দন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, খবরটা নিয়ো। হাঙ্গামাটা কেটে যাক, তারপরে।

এককড়ি নন্দী সেদিন এইখানে আহারাদি করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ি গেল। অভিমান করিয়া বলিল, সেদিন সাগর সর্দারের প্রসঙ্গে আপনারা সবাই তাঁর মন যুগিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সেদিন খবরটি দিয়ে রাখলে আজ এ বিপদ আপনাদের ঘটতো না।

জনার্দন সলজ্জে ত্রুটি স্বীকার করিলেন। এককড়ি তখন প্রভুর সম্বন্ধে বিশেষ একটি সংবাদ তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মদ খেয়ে বরঞ্চ ছিল ভাল, এখন কথা বলাই ভার! কলিক্ লেগেই আছে—এতকালের অভ্যাস, হয়ত আর বেশীদিন নয়।

জনার্দন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কহিলেন, সত্যি সত্যিই খায় না নাকি?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, এটা সত্যি যে খায় না। সূর্যদেব পশ্চিমে ওঠাও সহজ—কিন্তু কি জানেন রায়মশাই, ভয়ানক একগুঁয়ে লোক—সেদিন সারাদিনের যন্ত্রণায় রাত্রে হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এলো, ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে বললেন, আমার কথা রেখে অন্ততঃ এক-চামচে খান—হার্ট ফেল্ করতে পারে—

বাবুর কিন্তু ভয়ই হলো না। একটু হেসে বললেন, এতকালের মধ্যে ও-বেচারা কখ্‌খনো ফেল করেনি, সমানে চলেছে, আজ যদি একদিন করেই ফেলে ত আর দোষ দেব না, কিন্তু আমি জীবনভোরই ফেল করে আসচি, আজ অন্ততঃ একটা দিনও আমাকে পাশ করতে দিন। কেউ খাওয়াতে পারলে না।

বল কি!

এককড়ি কহিল, খেয়াল চেপেছে বাড়ি মেরামত থাক, ওই টাকায় মাঠের মাঝখানে এক সাঁকো, আর রূপসী বিলের উত্তরধারে একটা মস্ত বাঁধ তুলতে হবে। ইঞ্জিনিয়রবাবু এসেছিলেন, হিসেব করে বললেন, ও টাকায় দশখানা বাড়ি মেরামত হতে পারে। তার একভাগ এদিকে দিয়ে বাড়িটা রক্ষা করুন; কিন্তু কিছুতেই না। দেওয়ানজী বাপের বয়সী বুড়োমানুষ, বললেন, জমিদারি বাঁধা পড়বে যে! বাবু বললেন, প্রজারা সব বছর বছর খাজনা যোগাচ্চে আর মরচে। তাদের জমি বাঁচাবার জন্যে যদি জমিদারি বাঁধা পড়ে ত পড়ুক না। ও শোধা যাবে।

রায়মহাশয় চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, মাথা খারাপ-টারাপ হয়নি ত?

ইহার দিন-দুই পরে খবর লইয়া যখন জনার্দন জানিতে পারিলেন এককড়ি আজও সে কথা হুজুরে পেশ করে নাই, তখন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অপদার্থ ও ভীতু বলিয়া মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। সাহেব হঠাৎ যদি একদিন এত্তেলা পাঠাইয়া সরজমিনে আসিয়া পড়ে ত বিপদের অবধি থাকিবে না। সকল দিকে প্রস্তুত না থাকিলে যে কি ঘটিতে পারে বলা যায় না। স্থির করিলেন, পরদিন দেখা করিয়া নিজেই সকল কথা নিবেদন করিবেন—পরের উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করিলে মরিতে হইবে।

সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপরে লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি, টিকটিকি, শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন-চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না, জন পাঁচ-ছয় লোক ছুটিয়া আসিয়া যে খবর দিল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বেশী নয়, কাঠা-দশেক পরিমাণ বড় রাস্তার উপরেই একটা জায়গা কিছুকাল হইতে রায়মহাশয় দখল করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, দোকান-ঘরটা এইখানে সরাইয়া আনিবেন।

সম্পত্তি চঁণ্ডীর এবং এই লইয়া ষোড়শীর সহিত তাঁহার বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরাক্রান্ত জনার্দন রায়কে সে বাধা দিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা দলিলও ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিত না।

আজ সকালে এইটাই তাহার বে-দখল করা হইয়াছে। জনার্দন ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেকেই হাজির আছেন। শিরোমণি, তারাদাস, গগন চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন তাঁহার দলভুক্ত ভদ্রব্যক্তিদের সমক্ষে জীবানন্দ চৌধুরী নিজে হুকুম দিয়া এবং নিজের লোক দিয়া তাঁহার বেড়া ভাঙ্গাইয়া মন্দির-সংলগ্ন ভূখণ্ডের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। কেহই প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই।

জনার্দন দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, এসব করার আগে হুজুর ত আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতেন?

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, তাতে অনর্থক দেরি হতো বৈ ত নয়, খবর আপনার কাছে পৌঁছবেই জানি।

জনার্দন বলিলেন, খবর পৌঁছেচে, কিন্তু একটা দিন আগে পৌঁছলে মামলা-মকদ্দমাটা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, এতেও ত বাধা উচিত নয় রায়মশাই। ভৈরবীদের হাতে দেবীর অনেক সম্পত্তিই বেহাত হয়ে গেছে, আবার সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে হুজুর! শুনতে পাই, সমস্ত গ্রামখানিই নাকি একদিন মা চণ্ডীর ছিল, এখন কিন্তু–

খোঁচাটা সকলেই উপভোগ করিলেন। শিরোমণি ঠাকুর ত জনার্দন রায়ের বুদ্ধি ও বাক্-চাতুর্যে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

জীবানন্দের মুখের চেহারায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। বলিলেন, তার ত্রুটি হবে না রায়মশাই। মা চণ্ডীর সমস্ত দলিল-পত্র, নক্শা, ম্যাপ প্রভৃতি যা-কিছু ছিল আমি কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আপনারা আমার সহায় থাকবেন।

শিরোমণি জয়ধ্বনি করিলেন; কিন্তু কথাটা সত্য হইলে কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরিবে চিন্তা করিয়া ক্রোধে ও শঙ্কায় জনার্দনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার চেয়েও ঢের বড় বিপদ তাঁহার মাথার পরে ঝুলিতেছে স্মরণ করিয়া আজিকার মত তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। যে উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে হইল, আমার নাহয় দু-একশ' বিঘা টান ধরিতে পারে, কিন্তু নিজে যে সমস্ত চণ্ডীগড় গিলিয়া বসিয়াছেন তাহার কি? সুতরাং কথাটা যে নেহাত বাজে, নিছক ধোঁকা দিবার জন্যই বলা এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বাড়ি ঢুকিয়া তামাকের জন্য একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বসিবার ঘরে পা দিয়াই কিন্তু তিনি চমকিয়া গেলেন।

একধারে লুকাইয়া বসিয়া এককড়ি। তাহার মুখ শুষ্ক, চেহারা ম্লান–কি হে, তুমি যে হঠাৎ এখানে? তোমার পাগলা মনিব ত ওদিকে লাঠালাঠি বাধিয়েচেন।

এককড়ি কহিল, জানি। আর সেই পাগলের কাছেই এখনি একবার আমাদের ছুটতে হবে।

জনার্দন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল ত?

এককড়ি কহিল, ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যুগিয়েছে জানতে পারলাম না; কিন্তু এটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেন না। দলিল তৈরির কথা পর্যন্ত না।

জনার্দনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটার একগুঁয়েমির যে ভয়ানক ইতিহাস সেদিন শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—এ কি লঙ্কাকাণ্ড করবে নাকি শেষে!

সাজা তামাক তাঁহার পুড়িতে লাগিল, স্নানের জল ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, জনার্দন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। জীবানন্দ তখন মন্দিরের একটা ভাঙ্গা খিলান পরীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তারাদাস অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিল, জনার্দন একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন।

জীবানন্দ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না কিসের ব্যাপার, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা এবং প্রাঙ্গণের একধারে এককড়ি নন্দীকে দেখিতে পাইয়া কাল রাত্রের কথা স্মরণ হইল। বলিলেন, কিন্তু উপায় কি রায়মশাই? সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে—তাছাড়া তার বিস্তর ক্ষতিও হবে। সুতরাং মকদ্দমা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দন আকুল হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

তাঁহার শান্তকণ্ঠ ও নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া জনার্দন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না। মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়—জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয়, আপনিও হয়ত বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তাই বা কি করা যাবে রায়মশাই! শখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, তখন ফল তার খেতেই হবে বৈ কি।

জনার্দন আর জবাব দিলেন না। ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন। এককড়ি সব কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই, সে দ্রুতপদে কাছে আসিতেই তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এ আমদের সর্বনাশ করবে এককড়ি, আমার নির্মলকে একটা টেলিগ্রাফ করে দাও—সে একবার এসে পড়ুক।

সাতাশ

চণ্ডীগড় হইতে নির্মল অনেক দুঃখ পাইয়াই গিয়াছিল। ইহার ভাল এবং সকল সংস্রব হইতে নিজেকে সে চিরকালের মত বিযুক্ত করিয়া যাইতেছে, যাইবার সময়ে ইহাই ছিল তাহার একান্ত অভিলাষ। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা গত হইয়াছে তাহা আর যেন না ফিরিয়া আসে, ইহার কোন সংযোগসূত্রই আর যেন না জীবনে তাহার কোথাও অবশিষ্ট রহিয়া যায়। সে সোজা মানুষ। বিলাস ও সাহেবিয়ানার মধ্যে দিয়াও সে সংসারের সোজা পথটি ধরিয়াই চলিতে চাহিত। হৈমই ছিল তাহার একমাত্র—তাহার গৃহিণী, তাহার প্রিয়তমা, তাহার সন্তানের জননী—সৌন্দর্যে, স্নেহে, নিষ্ঠায়, বুদ্ধিতে ইহার বড় যে কোন মানুষই কোনদিন কামনা করিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারিত না, অথচ এতবড় সম্পদ তুচ্ছ করিয়াও যে মন তাহার একদিন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া আসা পর্যন্ত এই বিড়ম্বনা যখনই মনে হইত তখনই দুইটা কথা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। প্রথম এই যে, এই দুর্মতির ইতিহাস তাহাকে হৈমর কাছ হইতে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে হইবে; এবং দ্বিতীয়, ষোড়শীর চরিত্র। ইহার সম্বন্ধে বস্তুতঃ কিছুই সে জানে না, তবুও যে কেন একদিন মন তাহার আসক্ত হইয়াছিল, নিজের চিত্তকে এই প্রশ্নই বারংবার করিয়া কেবল একটা উত্তরই নির্মল নিঃসংশয়ে পাইতেছিল, ষোড়শী চরিত্রহীনা। অসম্ভব বস্তুতে মন তাহার প্রলুব্ধ হয় নাই, হইতেই পারে না। সে পাওয়ার বাহিরে নয়, ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মন তাহার অমন করিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথা স্মরণ করিয়া সে একপ্রকার সান্ত্বনা লাভ করিত, এবং মনে মনে বলিত, ও-পথে আর কখনও নয়। হৈমর বাপের বাড়ি, ইচ্ছা হয় সে যাক, কিন্তু নিজে সে চণ্ডীগড়ের নাম কখনও মুখে আনিবে না।

সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়া হৈমর কাছে শুনিল মায়ের চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, রাত্রে লুকাইয়া ষোড়শী কোথায় যে চলিয়া গেছে কেহই জানে না।

নির্মল পরিহাসের চেষ্টায় জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কেউ জানে না কোথায় গেছে? সাগর সর্দারও না, এমনকি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী পর্যন্ত না?

হৈম রাগ করিয়া কহিল, তোমার এক কথা। সাগর জানলেও জানতে পারে, কিন্তু জমিদার জানবে কি করে? মেয়েদের নামে একটা দুর্নাম দিতে পারলে যেন তোমরা বাঁচো!

তা বটে। বলিয়া নির্মল বাহিরে যাইতেছিল, হৈম ডাকিয়া কহিল, আরও একটা কাণ্ড হয়েচে। সেই রাত্রে জমিদারের শান্তিকুঞ্জ কে একদম পুড়িয়ে দিয়েছে।

বল কি!

হাঁ। লোকের সন্দেহ, রাগ করে সাগর পুড়িয়েছে। কিন্তু জমিদারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যে মিথ্যে দুর্নামটা তাঁর গ্রামের সকলে মিলে দিলে, তা সত্যি হলে কি কখনো জমিদারেরই বাড়ি পুড়ত? তুমিই বল?

নির্মল চুপ করিয়া রহিল। হৈম কহিল, যে যাই কেন না বলুক, আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি তিনি নির্দোষী। চণ্ডীর এমন ভৈরবী আর কখনো ছিল না। তাঁর দয়াতেই ছেলের মুখ দেখতে পেয়েচ, তা জানো?

এ কথারও নির্মল কোন উত্তর দিল না। সকল ঘটনা জানিতে, চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না, কিন্তু এ ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শীর সকল সম্পর্ক হইতে আপনাকে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেই, এই ছিল তাহার পণ। কিন্তু পরদিন সকাল না হইতেই যখন শ্বশুরের জরুরি তার আসিয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার মেলে

শাশুড়ীর চিঠি আসিল, পত্র পাওয়ামাত্র জামাই না আসিয়া পৌঁছিলে তাহার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এ যাত্রা কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, জেল তাঁহাকে খাটিতেই হইবে, তখন হৈম কাঁদিতে লাগিল, এবং নির্মলকে আর একবার তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র বাঁধিবার হুকুম দিয়া তাহার কাজের বন্দোবস্ত করিতে বাটী হইতে বাহির হইতে হইল।

দিন-দুই পরে হৈমকে সঙ্গে করিয়া নির্মল চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, একটা ভয়ের মধ্যে সকলের দিন কাটিতেছে। কে যে কখন আগুন ধরাইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। চারিদিকে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, কর্তা শুকাইয়া যেন অর্ধেক হইয়া গেছেন, কোথাও বাহির হন না–এতবড় প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নিজের গ্রামের মধ্যেই এতবড় দুর্গতি দেখিয়া নির্মল বিস্মিত হইল। এখান হইতে বেশী দিন সে যায় নাই, কিন্তু কি পরিবর্তন! খবর যাহা পাইল তাহা অত্যন্ত উলটা-পালটা রকমের, বিশেষ কিছু বুঝা গেল না; কেবল একটা সংবাদে সকলেরই মিল হইল যে, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গেছে। সে মদ ছাড়িয়াছে, প্রজাদের দিয়া নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া দিয়াছে, যে টাকায় পোড়া বাড়ি মেরামত করা উচিত ছিল, তাই দিয়া মাঠের সাঁকো তৈরি করাইতেছে–এমনি কত কি গল্প, কিন্তু হঠাৎ কিসের জন্য সে এরূপ হইল, তাহা কেহই জানে না। এই লোকটিকে নির্মল অতিশয় ঘৃণা করিত; ইহারই কাছে দরবার করিতে যাইতে হইবে মনে করিয়া সে অতিশয় সঙ্কুচিত হইল। অথচ ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে কি পথ আছে তাহাও চোখে পড়িল না। ভূমিজ প্রজারা অত্যন্ত বিরুদ্ধে! একে ত তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে, এবং তাহা সম্পাদন করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই, তাহাতে তাহাদের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভৈরবী মাতার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে ক্রোধের তাহাদের সীমা নাই। তাহারা কোন কথা শুনিবে না।

এদিকে মাদ্রাজী সাহেবের বিস্তর ক্ষতি, তাঁহার কল-কব্জা আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষতিপূরণ করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। জমির দখল তাঁহারই চাই-ই। বিশেষতঃ নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া যে এটর্নির দ্বারা তিনি কাজ চালাইতেছেন তিনি যেমন রুক্ষ, তেমনি অভদ্র, তাঁহার কাছে কোন সুবিধারই আশা নাই। একমাত্র ভরসা নিজেদের মধ্যে এক হওয়া; যেহেতু, আর যাহাই হোক, পিনাল কোডের সেই দুরন্ত ধারাগুলোয় তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। নিজেদের মধ্যে কবুল জবাব দিলে আর কোন রাস্তা নাই, অথচ সেই পাগল লোকটা শাসাইয়া রাখিয়াছে হাকিমের কাছে সে কোন কথাই লুকাইবে না। এই কথা নির্মল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু আসিয়া অবধি সে যে-সকল গল্প শুনিল, বিশেষ করিয়া সেই মদ ছাড়ার কাহিনী—হার্টফেলের ভয় দেখাইয়াও ডাক্তারে যাহাকে এক ফোঁটা গিলাইতে পারে নাই, সেই ভীষণ একগুঁয়ে লোকটার মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল চাপিয়াছে, কে তাহার কৈফিয়ত দিবে? অথচ, সে আসিয়াছে এই দুর্মদ একান্ত অবোধ ব্যক্তিকে সুবুদ্ধি দিতে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে, ভয় দেখাইতে হইবে, অনুনয়-বিনয় করিতে হইবে—কি যে করিতে হইবে সে কিছুই জানে না। এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর কার্য হইতে নির্মলের সমস্ত চিত্ত যেন বিদ্রোহ করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? দুষ্কৃতকারী যে হৈমর পিতা। তাঁহাকে যে বাঁচাইতেই হইবে। হৈম কাঁদিতে লাগিল, শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, এককড়ি চোরের মত আনাগোনা করিতে লাগিল, শ্বশুর না খাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—অথচ মাঝে কেবল একটি দিন বাকী, পরশু দিন আসিবেন হাকিম তদন্ত করিতে।

অপরাহ্নের কাছাকাছি জীবানন্দের সহিত দেখা হইল তাহার মাঠের মাঝখানে। এতকাল জল-নিকাশের পথ ছিল না, তাই সাঁকো তৈরি হইতেছিল। প্রশান্ত হাস্যে দুই হাত বাড়াইয়া আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিল, আপনার আসার খবর আমি কালই পেয়েছি। ভাল আছেন আপনি? বাড়ির সব

ভাল? তাহার কথায় আচরণে গরিমা নাই, কৃত্রিমতা নাই–যেমন সহজ, তেমনি খোলা–তাহাকে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এতখানির জন্য নির্মল প্রস্তুত ছিল না; তাহার আপনাকে আপনি যেন ছোট মনে হইল। মাথা যদি ইঁহার খারাপ হইয়াও থাকে ত লজ্জা পাইবার নয়। জীবানন্দের কুশল প্রশ্নের উত্তর নির্মল শুধু মাথা নাড়িয়াই দিল এবং প্রতি প্রশ্ন করিবার কথা হঠাৎ তাহার মনে হইল না।

জীবানন্দ কহিল, আপনি কুটুম্ব মানুষ, সমস্ত গ্রামের আদরের বস্তু, কিন্তু ইচ্ছে করে এমন জায়গায় এসে দেখা করলেন যে–সহসা মিস্ত্রী ও মজুরদের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কহিল, বাবারা, আজ আমাদের একটু রাত্রি পর্যন্ত খাটতে হবে। সপ্তাহ ধরে মেঘ করচে, আজকালের মধ্যেই হয়ত জল হবে।

কিন্তু তা হলে ত কোনমতেই চলবে না। আমরা এমন কাজ করে যাবো যে, আমাদের নাতি-পুতিদের পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে বলতে হবে যে, হাঁ, সাঁকো করেছিল তারা, সত্যিকারের দরদ দিয়েই করেছিল। সেই ত আমাদের মেহন্নতয়ানা!

লোকগুলা গলিয়া গেল। বীজগাঁয়ের ভয়ঙ্কর জমিদার একসঙ্গে খাটিতেছেন, তাঁহার মুখের এই কথা; তাহারা সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানাইল যে, তাহাদেরও সেই ইচ্ছা। জ্যোৎস্না যদি না মেঘে ঢাকে ত তাহারা রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাজ করিবে।

নির্মল কহিল, আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ বলিল, আর একদিন হলে হয় না?

না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ হাসিল; কহিল, তা বটে। অকাজের বোঝা বহাতে যাঁরা এতদূর টেনে এনেছেন, তাঁরা কি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবেন!

খোঁচাটা নির্মলের গায়ে বাজিল। সে কহিল, সে ত ঠিক কথা। অকাজ মানুষ করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরীমশায়। না হলে আপনাকেই বা এই মাঠের মাঝখানে বিরক্ত করবার আমার প্রয়োজন হত কেন?

জীবানন্দ কিছুমাত্র রাগ করিল না, তেমনি প্রসন্নমুখে বলিল, আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইনি নির্মলবাবু। যে জন্যে আপনি এসেছেন, সে যে আপনার কর্তব্য, এ বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, না হলে আপনিই বা আসবেন কেন? কিন্তু কর্তব্যের ধারণা ত সকলের এক নয়। রায়মহাশয়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে; আপনার আসার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি বাস্তবিক খুশী হবো, কিন্তু আমার কর্তব্যও আমি ঠিক করে ফেলেচি। এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্মলের মুখ ম্লান হইল। সে একটু ভাবিয়া কহিল, দেখুন, ভালই হলো যে অপ্রিয় আলোচনার ভূমিকার অংশটা আপনি দয়া করে আমাকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন। এসে অবধি আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনেচি—

জীবানন্দ সহাস্যে বলিল, একটা এই যে আমার মাথার ঠিক নেই, সত্য কিনা বলুন?

নির্মল কহিল, সংসারে সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে অকস্মাৎ কারও কর্তব্যের ধারণা যদি অত্যন্ত প্রভেদ হয়ে যায় ত দুর্নাম একটা রটেই। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ কহিল, সত্য বৈ কি। তাহার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য নাই, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তথাপি নির্মল নিঃসংশয়ে বুঝিল ইহা ফাঁকি নয়। বলিল, এমন ত হতে পারে আপনার কবুল-জবাবে আপনিই শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ কহিল, নির্মলবাবু, আপনার কথাটা হলো ঠিক সেই পাঠশালার গোবিন্দের মত। পণ্ডিতমশাই! মুকুন্দও যে আম চুরি করছিল! অর্থাৎ, বেতটা

চারিয়ে না পড়লে তার পিঠের জ্বালা কমবে না। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তাহার সকৌতুক হাসির ছটায় নির্মলের মুখ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া সে জোর করিয়া তাহা নিবারণ করিয়া কহিল, রক্ষে করুন আপনি, এ আমি স্বপ্নেও চাইনে। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে, রায়মশাই নিস্তার লাভ করে সুস্থদেহে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নন্দীমশাইও আর কোথাও গোমস্তাগিরি কর্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই।

নির্মল আইন ব্যবসায়ী, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, কহিল, এমন ত হতে পারে কারও কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, বেশ ত, পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু তাদের অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়। তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, আপনি ভালই জানেন অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।

নির্মল মনে মনে প্রমাদ গণিয়া কহিল, আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারি, এই ক
’ টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

না না, আর কোথাও না—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে তাদের কাছে ছ হাজার টাকা আদায় করেচি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দন রায়—সে শোধ করতেই হবে। কিন্তু অপ্রীতিকর আলোচনায় আর কাজ নেই নির্মলবাবু, আমি মনঃস্থির করেচি।

এই ছ হাজার টাকার ইঙ্গিত নির্মল বুঝিল না, কিন্তু এটা বুঝিল যে তাহার শ্বশুরমহাশয় অনেক পাকে আপনাকে জড়াইয়াছেন যাহা মুক্ত করা সহজ নয়। সে শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুরমশায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা-মকদ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য—শেষ পর্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, চিকিৎসক কি জাল করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্মলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, জানেন ত, অনেক সময় ওষুধের নাম করলে আর খাটে না! সে যাই হোক, আপনি জমিদার, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়, আপনাকে শক্ত কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই। কিংবা হঠাৎ কি কারণে আপনার ধর্ম-জ্ঞান এরূপ প্রচণ্ড হয়ে উঠল তাও জানবার কৌতূহল নেই, কিন্তু একটা কথা বলে যাই যে, এ জিনিস আপনার স্বাভাবিক নয়। গভর্নমেন্ট যদি প্রসিকিউট করে ত জেলের মধ্যে একদিন তা উপলব্ধি করবেন। আপনি সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম করচেন।

জীবানন্দ কহিল, এ কথা আপনার সত্য, কিন্তু ভ্রম যতক্ষণ আছে ততক্ষণ রজ্জুটাই ত আমার সত্য!

নির্মল বলিল, কিন্তু তাতে মরণ আটকাবে না। আরও একটা সত্য কথা আপনাকে বলে যাই। এইসব নোংরা কাজ করা আমার ব্যবসা নয়। আপনাকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি, এবং এক পাপিষ্ঠের জন্য আর এক পাপিষ্ঠকে অনুরোধ করতে আমি লজ্জা বোধ করি; কিন্তু সে আপনি বুঝবেন না—সে সাধ্যই আপনার নেই।

জীবানন্দের মুখের উপর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। লেশমাত্র উত্তেজনা নাই, তেমনি সৌম্য-শান্তকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনাকে আমি ঘৃণা করিনে নির্মলবাবু, শ্রদ্ধা করি, এ বোঝবার সাধ্যও ত আপনার নেই!

তাহার নির্বিকার স্বচ্ছন্দতায় নির্মল জ্বলিতে লাগিল, এবং এই প্রত্যুত্তরকে কদর্য উপহাস কল্পনা করিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিল, চোর-ডাকাতদের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা বস্তু আছে, নিজেদের মধ্যে তারাও তা ভাঙ্গে না। বিশ্বাসঘাতককে তারা ঘৃণা করে। কিন্তু জীবনব্যাপী দুরাচারে বুদ্ধি যার বিকৃত, তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—আমি চললাম। এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে পিছন ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল অনেকেই হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সে ম্লানমুখে শুধু একটু হাসিয়া বলিল, সময় যেটুকু নষ্ট করলি বাবারা, সেটুকু কিন্তু পুষিয়ে দিস্। কথাটা নির্মলের কানে গেল।

দিন-চারেকের মধ্যেই কৃষককুলের চিরদিনের দুঃখ দূর করিয়া জল-নিকাশের সাঁকো তৈরি শেষ হইল, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভিড় করিয়া লোক দেখিতে আসিল, কিন্তু যে ইহা নির্মাণ করিল, সেই জীবানন্দ শয্যাগত হইয়া পড়িল। এ পরিশ্রম সে সহ্য করিতে পারিল না। এই অজুহাতে এবং সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নানা কৌশলে নির্মল তদন্তের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে-দিনও সমাগতপ্রায়। কেবল দুটা দিন বাকী। বাঁচিবার একমাত্র পথ ছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া জনার্দন তারাদাসকে দিয়া চণ্ডীমাতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করাইলেন, এবং নিজে মন্দিরের একান্তে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় কায়মনে ডাকিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপায় যেন এ যাত্রা জীবানন্দ আর না ওঠে। সাহেব সরজমিনে আসার পূর্বেই যেন কিছু একটা হইয়া যায়।

মেয়েকে লইয়া ষোড়শীর হাতে-পায়ে গিয়া পড়ার কথাও মনে হইয়াছিল, কারণ ছোটলোকদের যদি কেহ ঠেকাইতে পারে ত কেবল সে-ই পারে, কিন্তু কোথায় সে? সাতদিনের সময় পাইয়া হৈমর নিশ্চিত ভরসা হইয়াছিল ছেলেকে

সঙ্গে করিয়া গিয়া একবার কাঁদিয়া পড়িতে পারিলে সে কিছুতেই না বলিতে পারিবে না; কিন্তু সে আশা যে বৃথা হইতে বসিল।

এই কয়দিন প্রায় প্রত্যহই নির্মলকে সদরে যাইতে হইতেছিল। এই যে বিশ্রী মামলাটা বাধিবে, তাহার সকল ছিদ্রপথই যে আগে হইতে বন্ধ করা আবশ্যক। সেদিন দুপুরবেলায় সে রেজেস্ট্রী আপিসের বারান্দার একধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া কতকগুলা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের নকল লইয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল, হঠাৎ সুমুখেই ডাক শুনিল, জামাইবাবু, সেলাম। ভাল আছেন?

নির্মল চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ফকিরসাহেব। তাঁহারও হাতে একতাড়া কাগজ।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, শুনেছিলাম আপনাকে ডাকলেই আপনার দেখা মেলে। এ-কয়দিন মনে মনে আমি প্রাণপণে ডাকছিলাম।

ফকির হাসিলেন, কহিলেন, কেন বলুন ত?

ষোড়শীকে আমার বড় প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন আমাকে দেখা করতেই হবে।

ফকির বিস্মিত হইলেন না, আনন্দও প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, দেখা না হওয়াই ত ভাল।

নির্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি হয়ত সর্বজ্ঞ। তা যদি হয়, জানেন ত আমাদের কত বড় প্রয়োজন?

ফকির কহিলেন, না, আমি সর্বজ্ঞ নয়, কিন্তু মা ষোড়শী কোন কথাই আমাকে গোপন করেন না। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখা হওয়া না-হওয়ার কথা তিনিই জানেন, আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যাপার আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন

আপনিই একাকী তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখেই এ কথা শুনেচি।

নির্মল কহিল, আর আজ ঠিক সেইটি উলটে দাঁড়িয়েচে ফকিরসাহেব। এখন কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত তিনিই পারেন।

ফকিরের মুখ অপ্রসন্ন হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য তিনি কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কেবল কহিলেন, চণ্ডীগড়ের খবর আমি জানিনে। কিন্তু আমি বলি, তাঁর ভাল করার ভার ভগবানের উপর আপনি ছেড়ে দিন। আমার মাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না নির্মলবাবু।

বিগত দিনের সমস্ত দুঃখের ইতিহাস নির্মলের মনে পড়িল। ইহার জবাব দেওয়া কঠিন, সে শুধু কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

জায়গাটাকে শৈবাল-দীঘি বলে।

সেখানে সুখে আছেন?

এইবার ফকির মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এই নিন! মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না। আমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ। তবে মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আদালতে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির কহিলেন, তা বটে! সন্ন্যাসী ফকিরের এ স্থান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারের মোহ ত মানুষকে সহজে ছাড়ে না বাবা, তাই শেষ বয়সে আবার বিষয়ী হয়ে উঠেচি। ভাল কথা, বিনা পয়সায় আপনার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আর পাব না, এবং আপনাকেই কেবল বলা যায়। আমার এই কাগজগুলি যদি দয়া করে একবার দেখে দেন।

নির্মল হাত বাড়াইয়া কহিল, এ কিসের কাগজ?

একটা দান-পত্রের খসড়া। বলিয়া ফকির তাঁহার কাগজের বাণ্ডিল নির্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন। পরের কাজ করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি নির্মলের ছিল না; সে নিস্পৃহের মত তাহা গ্রহণ করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার পাক খুলিয়া পাঠে নিযুক্ত হইল। কিন্তু কয়েক ছত্র পরেই অকস্মাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখ গম্ভীর এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই দানের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর নয়, কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া তাহার বিবরণ, সেইগুলির উপর কোনমতে চোখ বুলাইয়া লইয়া অবশেষে শেষ পাতায় আসিয়া যখন তাহার জীবানন্দের সেই চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন লাইন-কয়েকের সেই লিখনটুকু এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্মল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফকির তার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্মলের মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ।

ফকির কহিল, খসড়াটা ঠিক ত?

নির্মল কহিল, ঠিক। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির বলিলেন, নইলে এ দান ষোড়শী নিতেন না। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হবে নির্মলবাবু? এই বলিয়া তিনি উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু জবাব পাইলেন না। নির্মলের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়াই রহিল, মন যে তাহার কোথায় গিয়াছিল ফকির বোধ করি তাহা অনুমান করিতেও পারিলেন না।

আটাশ

অকস্মাৎ দিনকয়েকের অবিশ্রান্ত বারিপাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম এমন অচল হইয়া গেল যে, অপ্রতিহত-গতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁহার তদন্তের চাকাটাকে ঠেলিয়া আনিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার হুকুম ছিল, বর্ষণ কমিলেই তিনি চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিবেন, এবং সেই হুকুম তামিলের দিন পড়িয়াছে আজ। খবর পৌঁছিয়াছে, গ্রামের বাহিরে বারুইয়ের তীরে তাঁহার তাঁবু খাটানো হইতেছে, মুরগী, আণ্ডা, দুধ, ঘি প্রভৃতি যোগান দেওয়ার কাজে এককড়ি প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে এবং খুব সম্ভব দ্বিপ্রহরের দিকেই চণ্ডীগড়ে তাঁহার ঘোড়ার পদধূলি পড়িবে।

জোর করিয়া বলিবার জো নাই দুর্যোগ থামিল, কিংবা আবার চারিদিক আকুল করিয়া আসিবে। বাড়ি পোড়ার পরে, বাহিরের দিকে যে দ্বিতল ঘর দুখানিতে জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারই একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় ক্যাম্পখাট পাতিয়া সে সকালবেলায় বারুইয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। পাহাড়ের ঘোলা জল নামিয়া নদীর সেই শীর্ণ দেহ আর নাই; উদ্দাম স্রোত তটপ্রান্তে সবেগে আঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—জীবানন্দ কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার ঠিকানা নাই। জ্বর এবং তাহার আজন্ম সহচর বক্ষশূল কমিয়াছে, কিন্তু সারে নাই। আজও সে শয্যাশায়ী, উঠিতে হাঁটিতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পৌঁছানোর খবর পাইলে সে পালকিতে করিয়া নিজে গিয়া দেখা করিবে। মিথ্যা কিছুই বলিবে না তাহা সে স্থির করিয়াছে—যেমন করিয়া মদ-ছাড়া সে স্থির করিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া; যেমন করিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল, এ জীবনে দুঃখ কাহাকেও আর দিবে না, ঠিক তেমন করিয়াই ইহাও সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আজ যথার্থই তাহার কাহার বিরুদ্ধেও কোন বিদ্বেষ,

কোন নালিশ ছিল না; সে মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিতেছিল যে, অপরাধ ত মানুষেই করে, অন্যায় ত মানুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহার সাক্ষ্যে সে ছাড়া আর কেহ শাস্তি পাইবে চিন্তা করিয়া সে বাস্তবিক বেদনা বোধ করিতেছিল। কি করিয়া বলিলে যে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, এই কথাই যে কতরূপে সে আলোচনা করিতেছিল তাহার নির্দেশ নাই, কিন্তু কোন বিষয়ই সুশৃঙ্খলায় শেষ পর্যন্ত ভাবিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল একই সমস্যা একই মীমাংসা লইয়া বার বার তাহার সুমুখে আসিতেছিল। এই লইয়া সে যখন প্রায় হয়রান হইয়া উঠিয়াছিল, এমনি সময় সম্পূর্ণ একটা নূতন জিনিসের উপর গিয়া তাহার মন এবং দৃষ্টি একই সময়ে স্থিতিলাভ করিল। একখানা ছোট নৌকা স্রোতের অনুকূলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসিতেছিল, এবং তাহার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই মাঝি ডাঙ্গার উপরে নোঙ্গর ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার গতিরোধ করিল। এ নদীতে নৌকা চলাচল অত্যন্ত বিরল। বৎসরের অধিকাংশ দিন যথেষ্ট জল থাকে না বলিয়াই শুধু নয়, বর্ষাকালেও একটানা খরস্রোতে যাতায়াতের সুবিধা বড় হয় না। বিশেষতঃ তাহারই বাটীর সম্মুখে আসিয়া যখন এমন করিয়া থামিল, তখন কৌতূহলে সে বালিশে ঠেস দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া দেখিল জন-দুই পুরুষ এবং তিনজন রমণী নামিয়া আসিতেছেন। ঘন-পল্লব গাছের অন্তরালে ইঁহাদের স্পষ্ট দেখা না গেলেও একজনকে জীবানন্দ নিশ্চয় চিনিতে পারিল, তিনি জনার্দন রায়। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভব তাঁহার পত্নী এবং অপরটি তাঁহার কন্যা, হয়ত কোথাও গিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আসার সংবাদ পাইয়া ত্বরা করিয়া ফিরিয়াছেন।

শুধু একটা কথা সে বুঝিতে পারিল না, নিজেদের ঘাট ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নৌকা বাঁধিবার হেতু কি। হয়ত সুবিধা ছিল না, হয়ত ভুল হইয়াছে, হয়ত–বা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিপথে পড়া তাঁহার ইচ্ছা নয়; কিন্তু সে যাই হোক, লোকটা যখন রায়মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা, তখন কষ্ট করিয়া বসিয়া থাকা

নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া জীবানন্দ আবার শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মনে মনে হাসিয়া কহিল, অপরাধের সাজা দিবার মালিক কি একা আদালত? এই মানুষটিকে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব হয়ত, কখনো দেখেও নাই, দেখিলেও হয়ত চিনিত না। তবুও ইহার শঙ্কা ও সতর্কতার অবধি নাই। স্ত্রী ও কন্যার কাছে এই যে ভীরুতার লজ্জা, দণ্ডের পরিমাণে ইহাই কি সামান্য?

সহসা কে একজন আসিয়া তাহার শিয়রের দিকে বসিয়া পড়ার চাপে তুচ্ছ ক্যাম্প-খাটখানা মচ্ করিয়া উঠিল। জীবানন্দ চমকিয়া চাহিয়া কহিল, কে? বারান্দায় প্রবেশ করিবার পদশব্দও সে কাহারও পায় নাই, যে বসিয়াছিল সে তাহার কপালের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিল, আমি।

জীবানন্দ হাত বাড়াইয়া সেই হাতখানি নিজের দুর্বল হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, এই নৌকাতে তুমি এলে?

হ্যাঁ।

রায়মহাশয় তোমাকে ধরে নিয়ে এলেন, তাঁকে বাঁচাতে হবে?

হাঁ, কিন্তু সে হৈমর বাবাকে, জনার্দন রায়কে নয়।

বুঝেচি। কিন্তু প্রজারা মকদ্দমা ছাড়বে কেন, সাগর স্বীকার করবে কেন?

আমার কাছে তারা স্বীকার করেচে।

করেচে? আশ্চর্য! বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, না আশ্চর্য নয়। তারা আমাকে মা বলে।

আমি তা জানি। জীবানন্দের হাতের মুঠা শিথিল হইয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ভালই হয়েছে। আজ সকাল থেকেই আমি ভাবছিলাম অলকা, এই ভয়ানক শক্ত কাজ আমি করব কি করে? আমি বাঁচলাম, আর আমার কিছুই করবার রইল না। তুমি সমস্তই করে দিয়েচ।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, তোমার করবার আর কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাজ এখনো বাকী রয়ে গেছে। এই বলিয়া সে জীবানন্দের যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহা নিজের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, নৌকা আমার প্রস্তুত, কোনমতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এইসকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়। চল। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দের বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, কেবল একজনের প্রবল বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, যেখানে আমার দু' চোখ যাবে।

কখন যেতে হবে?

এখনই। সাহেব এসে পড়ার আগেই।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ?

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।

জীবানন্দ খুশী হইয়া বলিল, ঠিক কথা অলকা। কিন্তু দেরি করলে ত চলবে না। এখন থেকে ত আমাদের দু' জনকে এ ভার মাথায় নিতে হবে।

ষোড়শী সহসা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, দাসীকে এইটুকু শুধু ভিক্ষে দেবেন, প্রজাদের ভার নেবার চেষ্টা করে আর ভারী করে তুলবেন না। সমস্ত জীবন ধরেই ত নানাবিধ ভার বয়ে এসেছেন, এখন অসুস্থ দেহ একটু বিশ্রাম করলে কেউ নিন্দে করবে না। কিন্তু কে সাহেব এসে পড়তে পারে, চলুন।

প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ শুধু একটুখানি হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এমন করে আমার সমস্ত ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়ো না অলকা–আমাকে দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেখো কখ্খনো ঠকবে না।

কথা শুনিয়া অলকার দু' চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে, তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া লইয়া হাতের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল ত এখন। নৌকাতে বসে তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না।

সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

দেবদাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল; এবং নিমিষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দসাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না-কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠাশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপছন্দ করে। তাহার পিতারও নিষেধ ছিল। নানা কারণে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোর জিম্মায় থাকিবে।

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙ্গা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখন বা ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, কখন বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাসখানেক হইল পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবতঃ এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোর ন করিয়াছিলেন, তাই সে

নিবিষ্টমনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু-যত্নের চিত্রটি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশী যে মিল ছিল তাহা নয়; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অঙ্ক হয় না।

ভুলো শান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, কি আঁক?

মণকষা-

শেলেটটা দেখি-

ভাবটা এই যে, তাহার নিকট এ-সব কাজে শ্লেটখানি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্লেট দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভুলো ডাকিয়া লিখিতে লাগিল যে, এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে-

এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। হাত-পা-ভাঙ্গা বেঞ্চখানার উপর সর্দার-পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন নির্বাচন করিয়া যথানিয়মে আজ তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন বসিয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একরাশি চুন গাদা করা ছিল। এটি পণ্ডিত মহাশয় কবে কোন্ যুগে নাকি সস্তা দরে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, মানস ছিল, সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহা জানি না। কিন্তু এই শ্বেত-চূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা এবং যত্নের অবধি ছিল না। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে, এইজন্য প্রিয়পাত্র এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা

করিবার ভার পাইয়াছিল এবং তাই সে বেঞ্চের উপর বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া থাকিত।

ভোলানাথ লিখিতেছিল-এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে,-ওগো বাবা গো-তাহার পর খুব শব্দ-সাড়া হইল। পার্বতী ভয়ানক উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া হাততালি দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সদ্যঃনিদ্রোত্থিত গোবিন্দ পণ্ডিত রক্তনেত্রে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, গাছতলায় ছেলের দল একেবারে সার বাঁধিয়া হৈহৈ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং তখনি চক্ষে পড়িল যে, ভগ্ন বেঞ্চের উপর একজোড়া পা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং চুনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। চীৎকার করিলেন, কি-কি-কি রে!

বলিবার মধ্যে শুধু পার্বতী ছিল। কিন্তু সে তখন ভূমিতলে লুটাইতেছে এবং করতালি দিতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বিফল প্রশ্ন ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া গেল, কি কি-কি রে!

তাহার পর শ্বেতমূর্তি ভোলানাথ চুন ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় আবার চীৎকার করিলেন, গুয়োটা তুই!-তুই ওর ভেতর!

অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-

আবার!

দেবা শালা-ঠেলে-অ্যাঁ-অ্যাঁ-মণকষা-

আবার গুয়োটা!

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া, মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়েচে?

ভুলো আরো কাঁদিতে লাগিল-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া চুন ঝাড়াঝাড়ি হইল, কিন্তু সাদা এবং কাল রঙে সর্দার-পোড়োকে কতকটা ভূতের মত দেখাইতে লাগিল এবং তখনও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না।

পণ্ডিত বলিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে পালিয়েচে? বটে?

ভুলো বলিল-অ্যাঁ-অ্যাঁ-

পণ্ডিত বলিলেন, এর শোধ নেব।

ভুলো কহিল,-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-

পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন, ছোঁড়াটা কোথায়-

তাহার পর ছেলেদের দল রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দেবাকে ধরা গেল না। উঃ-যে ইঁট ছোঁড়ে-!

ধরা গেল না?

আর একজন বালক পূর্বকথার প্রতিধ্বনি করিল-উঃ-যে-

থাম বেটা-

সে ঢোক গিলিয়া একপাশে সরিয়া গেল। নিষ্ফল-ক্রোধে পণ্ডিতমশাই প্রথমে পার্বতীকে খুব ধমকাইয়া উঠিলেন; তাঁহার পর ভোলানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, চল্, একবার কাছাড়িবাড়িতে কর্তাকে বলে আসি।

ইহার অর্থ এই যে, জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের নিকট তাঁহার পুত্রের আচরণের নালিশ করিবেন।

তখন বেলা তিনটা আন্দাজ হইয়াছিল। নারায়ণ মুখুয্যেমশায় বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন এবং একজন ভৃত্য হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। সছাত্র পণ্ডিতের অসময় আগমনে কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, গোবিন্দ যে!

গোবিন্দ জাতিতে কায়স্থ-ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভুলোকে দেখাইয়া সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মুখুয্যেমশায় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, তাইত, দেবদাস যে শাসনের বাইরে গেছে দেখচি!

কি করি, আপনি হুকুম করুন।

জমিদারবাবু নলটা রাখিয়া দিয়া কহিলেন, কোথা গেল সে?

তা কি জানি? যারা ধরতে গিয়েছিল, তাদের ইঁট মেরে তাড়িয়েচে।

তাঁহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নারায়ণবাবু বলিলেন, বাড়ি এলে যা হয় করব।

গোবিন্দ ছাত্রের হাত ধরিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া গিয়া মুখ ও চোখের ভাবভঙ্গীতে সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবদাসের পিতা সে অঞ্চলের জমিদার হইলেও তাহাকে আর পাঠশালে ঢুকিতে দিবেন না। সেদিন পাঠশালার ছুটি কিছু পূর্বেই হইল; যাইবার সময় ছেলেরা অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন কহিল, উঃ! দেবা কি ষণ্ডা দেখেচিস!

আর একজন কহিল, ভুলোকে আচ্ছা জব্দ করেচে।

উঃ, কি ঢিল ছোঁড়ে!

আর একজন ভুলোর তরফ হইতে কহিল,-ভুলো শোধ নেবে দেখিস।

ইস্-সে ত আর পাঠশালায় আসবে না যে শোধ নেবে।

এই ক্ষুদ্র দলটির একপাশে পার্বতীও বই-শ্লেট লইয়া বাড়ি আসিতেছিল। সে নিকটবর্তী একজন ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মণি, দেবদাদাকে আর পাঠশালায় সত্যি আসতে দেবে না?

মণি বলিল, না-কিছুতেই না।

পার্বতী সরিয়া গেল- কথাটা তার বরাবরই ভাল লাগে নাই।

পার্বতীর পিতার নাম নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয় জমিদারের প্রতিবেশী অর্থাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের খুব বড় বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার ছোট এবং পুরাতন সেকেলে ইঁটের বাড়ি। তাঁহার দু-দশ বিঘা জমিজমা আছে, দু-চার ঘর যজমান আছে, জমিদারবাড়ির আশা-প্রত্যাশাটা আছে,-বেশ স্বচ্ছন্দ পরিবার-বেশ দিন কাটে।

প্রথমে ধর্মদাসের সহিত পার্বতীর সাক্ষাৎ হইল। সে দেবদাসের বাটীর ভৃত্য। এক বৎসর বয়স হইতে আজ দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাকে লইয়াই আছে-পাঠশালায় পৌঁছিয়া দিয়া আসে এবং ছুটির সময় সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনে। এ কাজটি সে যথানিয়মে প্রত্যহ করিয়াছে এবং আজিও সেইজন্যই পাঠশালায় যাইতেছিল। পার্বতীকে দেখিয়া কহিল, কৈ পারু, তোর দেবদাদা কোথায়?

পালিয়ে গেছে-

ধর্মদাস ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, পালিয়ে গেছে কি রে?

তখন পার্বতী ভোলানাথের দুর্দশার কথা মনে করিয়া আবার নূতন করিয়া হাসিতে শুরু করিল,-দেখ্ ধম্ম, দেবদা-হি হি হি-একেবারে চুনের গাদায়-হি হি-হু হু-একেবারে ধম্ম চিৎ করে-

ধর্মদাস সব কথা বুঝিতে না পারিলেও হাসি দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া লইল; পরে হাস্য সংবরণ করিয়া জিদ করিয়া কহিল, বল না পারু, কি হয়েচে?

দেবদা ঠেলে ফেলে দিয়ে-ভুলোকে-চুনের গাদায়-হি হি হি-

ধর্মদাস এবার বাকীটা বুঝিয়া লইল এবং অতিশয় চিন্তিত হইল; বলিল, পারু সে এখন কোথায় আছে জানিস?

আমি কি জানি!

তুই জানিস-বলে দে। আহা তার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েচে।

তা ত পেয়েচে-আমি কিন্তু বলব না।

কেন বলবি নে?

বললে আমাকে বড় মারবে। আমি খাবার দিয়ে আসব।

ধর্মদাস কতকটা সন্তুষ্ট হইল-কহিল, তা দিয়ে আসিস, আর সন্ধ্যের আগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।

আনব।

বাটীতে আসিয়া পার্বতী দেখিল, তাহার মা এবং দেবদাসের মা উভয়েই সব কথা শুনিয়াছেন। তাহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। হাসিয়া গম্ভীর হইয়া সে যতটা পারিল কহিল। তাহার পর আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমিদারদের একটা আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানটা তাহাদেরই বাটীর নিকটে, এবং ইহারই একান্তে একটা বাঁশঝাড় ছিল। সে জানিত, লুকাইয়া তামাক খাইবার জন্য দেবদাস এই বাঁশঝাড়ের মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। পলাইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইলে ইহাই তাহার গুপ্তস্থান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বতী দেখিল, বাঁশঝোপের মধ্যে দেবদাস ছোট একটা হুঁকা-হাতে বসিয়া আছে এবং বিজ্ঞের মত ধূমপান করিতেছে। মুখখানা বড় গম্ভীর-যথেষ্ট দুর্ভাবনার চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া সে খুব খুশী হইল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবেই কহিল, আয়।

পার্বতী কাছে আসিয়া বসিল। আঁচলে যাহা বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাৎ দেবদাসের চক্ষে পড়িল। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে তাহা খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া কহিল, পারু, পণ্ডিতমশাই কি বললে রে?

জ্যাঠামশায়ের কাছে বলে দিয়েচে।

দেবদাস হুঁকা নামাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বাবাকে বলে দিয়েচে?

হাঁ।

তারপর?

তোমাকে আর পাঠশালায় যেতে দেবে না।

আমি পড়তেও চাই না।

এই সময়ে তাহার খাদ্যদ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দেবদাস পার্বতীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, সন্দেশ দে।

সন্দেশ ত আনিনি।

তবে জল দে।

জল কোথায় পাব?

বিরক্ত হইয়া দেবদাস কহিল, কিছুই নেই, ত এসেচিস কেন? যা, জল নিয়ে আয়।

তাহার রুক্ষস্বর পার্বতীর ভাল লাগিল না; কহিল, আমি আবার যেতে পারিনে-তুমি খেয়ে আসবে চল।

আমি কি এখন যেতে পারি?

তবে কি এইখানেই থাকবে?

এইখানে থাকব, তারপর চলে যাব-

পার্বতীর মনটা খারাপ হইয়া গেল। দেবদাসের আপাত-বৈরাগ্য দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল,-কহিল, দেবদা, আমিও যাব।

কোথায়? আমার সঙ্গে? দূর-তা কি হয়?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, যাবই-

না,-যেতে হবে না-তুই আগে জল নিয়ে আয়-

পার্বতী আবার মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই-

আগে জল নিয়ে আয়-

আমি যাব না-তুমি তা হলে পালিয়ে যাবে।

না-যাব না।

কিন্তু পার্বতী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাই বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় হুকুম করিল, যা বলচি!

আমি যেতে পারব না।

রাগ করিয়া দেবদাস পার্বতীর চুল ধরিয়া টান দিয়া ধমক দিল-যা বলচি।

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর তাহার পিঠে একটা কিল পড়িল-যাবিনে?

পার্বতী কাঁদিয়া ফেলিল-আমি কিছুতেই যাব না।

দেবদাস একদিকে চলিয়া গেল। পার্বতীও কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে দেবদাসের পিতার সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখুয্যেমশাই পার্বতীকে বড় ভালবাসিতেন। বলিলেন, পারু, কাঁদচিস কেন মা?

দেবদা মেরেচে।

কোথায় সে?

ঐ বাঁশবাগানে বসে তামাক খাচ্ছিল।

একে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন হইতেই তিনি চটিয়া বসিয়াছিলেন-এখন এই সংবাদটা তাঁহাকে একেবারে অগ্নিমূর্তি করিয়া দিল। বলিলেন, দেবা বুঝি আবার তামাক খায়?

হাঁ খায়, রোজ খায়। বাঁশবাগানে তার হুঁকো নুকোন আছে-

এতদিন আমাকে বলিস নি কেন?

দেবদাদা মারবে বলে।

কথাটা কিন্তু ঠিক তাই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস পাছে শাস্তি ভোগ করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া দিয়াছে। এই তাহার সবে আট বৎসরমাত্র বয়স-রাগ এখন বড় বেশী; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা নিতান্ত কম ছিল না। বাড়ি গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়িল,-সে রাত্রে ভাত পর্যন্ত খাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবদাসকে পরদিন খুব মারধর করা হইল-সমস্তদিন ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার পর, তাহার জননী যখন ভারী কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন দেবদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পরদিন ভোরবেলায় সে পলাইয়া আসিয়া পার্বতীর ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইল-ডাকিল, পারু! আবার ডাকিল, পারু!

পার্বতী জানালা খুলিয়া কহিল, দেবদা!

দেবদাস ইশারা করিয়া বলিল, শিগগির আয়।দু’জনে একত্র হইলে দেবদাস বলিল, তামাক খাবার কথা বলে দিলি কেন?

তুমি মারলে কেন?

তুই জল আনতে গেলি না কেন?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাস বলিল, তুই বড় গাধা-আর যেন বলে দিসনে।

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তবে চল্, ছিপ কেটে আনি। আজ বাঁধে মাছ ধরতে হবে।

বাঁশঝাড়ের নিকট একটা নোনাগাছ ছিল, দেবদাস তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বহুকষ্টে একটা বাঁশের ডগা নোয়াইয়া পার্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, দেখিস যেন ছেড়ে দিসনে, তা হলে পড়ে যাব।

পার্বতী প্রাণপণে টানিয়া ধরিয়া রহিল। দেবদাস সেইটা ধরিয়া একটা নোনাডালে পা রাখিয়া, ছিপ কাটিতে লাগিল। পার্বতী নীচে হইতে কহিল, দেবদা, পাঠশালে যাবে না?

না।

জ্যাঠামশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

বাবা আপনি বলেচেন, আমি আর ওখানে পড়ব না। বাড়িতে পণ্ডিত আসবে।

পার্বতী একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। পরে বলিল, কাল থেকে গরমের জন্য আমাদের সকালবেলা পাঠশালা বসে, আমি এখনি যাব।

দেবদাস উপর হইতে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

এই সময়ে পার্বতী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল,-অমনি বাঁশের ডগা উপরে উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস নোনাডাল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বেশী উঁচু ছিল না বলিয়া তেমন লাগিল না, কিন্তু গায়ে অনেক স্থানে ছড়িয়া গেল। নীচে আসিয়া ক্রুদ্ধ দেবদাস একটা শুষ্ক কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পার্বতীর পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে-সেখানে সজোরে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হয়ে যা।

প্রথমে পার্বতী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যখন ছড়ির পর ছড়ি ক্রমাগত পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে ও অভিমানে চক্ষু-দুটি আগুনের মত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, এই আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি-

দেবদাস রাগিয়া আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, এখনি বলে দিগে যা-বয়ে গেল।

পার্বতী চলিয়া গেল। যখন অনেকটা গিয়াছে, তখন দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী শুনিয়াও শুনিল না-আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দেবদাস আবার ডাকিল, ও পারু, শুনে যা না!

পার্বতী জবাব দিল না। দেবদাস বিরক্ত হইয়া, কতকটা চীৎকার করিয়া, কতকটা আপনার মনে বলিল, যাক-মরুক গে।

পার্বতী চলিয়া গেলে, দেবদাস যেমন-তেমন করিয়া দুই-একটা ছিপ কাটিয়া লইল। তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী বাড়ি

ফিরিয়া আসিল। তাহার গালের উপর ছড়ির দাগ নীল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। প্রথমেই ঠাকুরমার চক্ষে পড়িল। তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন-ওগো, মা গো, কে এমন করে মারলে পারু?

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্বতী কহিল, পণ্ডিতমশাই।

ঠাকুরমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, চল্ ত একবার নারাণের কাছে যাই, দেখি সে কেমন পণ্ডিত! আহা-বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে!

পার্বতী পিতামহীর গলা জড়াইয়া কহিল, চল।

মুখুয্যে মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিতামহী পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকগুলি পুরুষের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের পারলৌকিক অশুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যেরও তেমন ভাল ব্যবস্থা করিলেন না। শেষে স্বয়ং গোবিন্দকে নানামতে গালি পাড়িয়া বলিলেন, নারাণ, দেখ ত মিনসের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কি করে মেরেচে একবার দেখ। বলিয়া গালের উপর নীল দাগগুলা বৃদ্ধা অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখাইতে লাগিলেন।

নারায়ণবাবু তখন পার্বতীকে প্রশ্ন করিলেন, কে মেরেচে পারু?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তখন ঠাকুরমাই আর একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, আবার কে! ঐ গোঁয়ার পণ্ডিতটা।

কেন মারলে?

পার্বতী এবারও কথা কহিল না। মুখুয্যেমশাই বুঝিলেন, কোন দোষ করার জন্য মার খাইয়াছে-কিন্তু এরূপ আঘাত করা উচিত হয় নাই, প্রকাশ করিয়া তাহাই বলিলেন। শুনিয়া পার্বতী পিঠ খুলিয়া বলিল, এখানেও মেরেচে।

পিঠের দাগগুলা আরও স্পষ্ট, আরো গুরুতর। তাই দু'জনেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিবেন, মুখুয্যে

মহাশয় এরূপ অভিসন্ধিও প্রকাশ করিলেন; এবং স্থির হইল যে, এরূপ পণ্ডিতের নিকট ছেলেমেয়ে পাঠান উচিত নহে।

রায় শুনিয়া পার্বতী খুশী হইয়া ঠাকুরমার কোলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাটীতে পৌঁছিয়া পার্বতী জননীর জেরায় পড়িল। তিনি ধরিয়া বসিলেন, কেন মেরেচে বল্?

পার্বতী বলিল, মিছিমিছি মেরেচে।

জননী কন্যার খুব করিয়া কান মলিয়া দিয়া বলিলেন, মিছিমিছি কেউ কখন মারে?

দালান দিয়া সেই সময় শাশুড়ী যাইতেছিলেন, তিনি ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বলিলেন, বৌমা, মা হয়ে তুমি মিছিমিছি মারতে পার, আর সে মুখপোড়া পারে না?

বৌমা বলিল, শুধু-শুধু কখনো মারেনি। যে শান্ত মেয়ে-কি করেচে, তাই মার খেয়েচে।

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন-আচ্ছা, তাই নাহয় হলো, কিন্তু ওকে আর আমি পাঠশালে যেতে দেব না।

একটু লেখাপড়া শিখবে না!

কি হবে বৌমা? একটা-আধটা চিঠিপত্র লিখতে পারলে, দু'ছত্র রামায়ণ-মহাভারত পড়তে শিখলেই ঢের। পারু কি তোমার জজিয়তি করবে, না উকিল হবে?

বৌমা অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। সেদিন দেবদাস বড় ভয়ে-ভয়েই বাড়িতে প্রবেশ করিল। পার্বতী যে ইতিমধ্যে সমস্তই বলিয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু বাড়ি আসিয়া যখন তাহার অণুমাত্র আভাসও প্রকাশ পাইল না, বরঞ্চ মায়ের কাছে শুনিতে পাইল- আজ গোবিন্দ পণ্ডিত পার্বতীকেও অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে, তাই আর সে পাঠশালায় যাইবে না-

তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহার ভাল করিয়া আহার করাই হইল না; কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া পার্বতীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, তুই আর পাঠশালে যাবিনে?

না।

কি করে হল রে?

আমি বললুম, পণ্ডিতমশায় মেরেচে।

দেবদাস খুব একগাল হাসিয়া, তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া মত প্রকাশ করিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমতী এ পৃথিবীতে আর নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে পার্বতীর গালের নীল দাগগুলি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আহা!

পার্বতী একটু হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি?

বড় লেগেচে, না রে পারু?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

আহা, কেন অমন করিস, তাই ত রাগ হয়- তাই ত মারি।

পার্বতীর চোখে জল আসিল; মনে ভাবিল জিজ্ঞাসা করে, কি করি! কিন্তু পারিল না।

দেবদাস তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আর অমন করো না, কেমন?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দেবদাস আর একবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা-আর কখনও তোকে আমি মারব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন যায়-এ দুটি বালক-বালিকার আমোদের সীমা নাই-সমস্ত দিন ধরিয়া রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া মারধর খায়, আবার সকালবেলায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়-আবার তিরস্কার-প্রহার ভোগ করে। রাত্রে নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়; আবার সকাল হয়, আবার পলাইয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। অন্য সঙ্গীসাথী বড় কেহ নাই, প্রয়োজনও হয় না। পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট। সেদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরেই দুইজনে বাঁধে গিয়া নামিয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সমস্ত জল ঘোলা করিয়া,পনরটা পুঁটিমাছ ধরিয়া যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর জননী কন্যাকে রীতিমত প্রহার করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দেবদাসের কথা ঠিক জানি না; কেননা এ-সব কাহিনী সে কিছুতেই প্রকাশ করে না। তবে পার্বতী যখন বসিয়া খুব করিয়া কাঁদিতেছিল, তখন-বেলা দুইটা-আড়াইটার সময়, একবার জানালার নীচে আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়াছিল, পারু, ও পারু! পার্বতী বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। তাহার পর সমস্ত দিনটা সে অদূরবর্তী একটা চাঁপাগাছে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল; এবং সন্ধ্যার পর বহু পরিশ্রমে ধর্মদাস তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

তবে শুধু সেই দিনটা মাত্র। পরদিন পার্বতী সকালবেলা হইতে দেবদাদার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল, কিন্তু দেবদাস আসিল না-সে পিতার সহিত নিকটবর্তী গ্রামে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল। দেবদাস যখন আসিল না, পার্বতী তখন ক্ষুণ্নমনে একাকী বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। কাল বাঁধে নামিবার সময় দেবদাস তিনটা টাকা পার্বতীকে রাখিতে দিয়াছিল-পাছে হারাইয়া যায়। আঁচলে

সে টাকা-তিনটা বাঁধা ছিল। সে আঁচল ঘুরাইয়া, নিজে ঘুরিয়া বহুক্ষণ একা কাটাইয়া দিল। সঙ্গীসাথী কেহ মিলিল না; কেননা তখন সকালবেলায় পাঠশালা বসে। পার্বতী তখন ওপাড়ায় চলিল। সেখানে মনোরমাদের বাড়ি। মনোরমা পাঠশালে পড়ে, বয়সে কিছু বড়, কিন্তু পারুর বন্ধু। অনেকদিন দেখাশুনা হয় নাই। আজ সময় পাইয়া পার্বতী ওপাড়ায় তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মনো, বাড়ি আছিস?

মনোরমার পিসীমা বাহিরে আসিলেন।

পারু?

হ্যাঁ,-মনো কোথায় পিসীমা?

সে ত পাঠশালায় গেছে-তুমি যাওনি?

আমি পাঠশালায় যাইনি-দেবদাও যায় না।

মনোরমার পিসীমাতা হাসিয়া কহিলেন,-তবে ত ভাল! তুমিও যাও না, দেবদাদাও যায় না?

না। আমরা কেউ যাইনে।

সে ভাল কথা; কিন্তু মনো পাঠশালায় গেছে।

পিসীমা বসিতে বলিলেন, কিন্তু পার্বতী ফিরিয়া আসিল। পথে রসিক পালের দোকানের কাছে তিনজন বৈষ্ণবী রসকলি পরিয়া খঞ্জনী-হাতে ভিক্ষায় চলিয়াছিল, পার্বতী তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, ও বোষ্টমী! তোমরা গান করতে জান?

একজন ফিরিয়া চাহিল-জানি বৈ কি বাছা!

তবে গাও না।

তখন তিনজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিল, অমনি কি গান হয় মা, ভিক্ষে দিতে হয়। চল, তোমাদের

বাড়ি গিয়ে গা'ব।

না, এইখানে গাও।

পয়সা দিতে হয় যে মা!

পার্বতী আঁচল দেখাইয়া কহিল, পয়সা নেই-টাকা আছে।

আঁচলে বাঁধা টাকা দেখিয়া তাহারা দোকান হইতে একটু দূরে গিয়া বসিল। তাহার পর খঞ্জনী বাজাইয়া তিনজনে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কি গান হইল, কি তাহার অর্থ-পার্বতী এ-সব কিছুই বুঝিল না। ইচ্ছা করিলেও হয়ত বুঝিতে পারিত না। কিন্তু মনটি তাহার সেই নিমেষে দেবদাদার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল।

গান শেষ করিয়া তাহারা কহিল, কৈ, কি ভিক্ষে দেবে দাও তো মা!

পার্বতী আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া টাকা-তিনটা তাহাদের হাতে দিল। তিনজনেই অবাক হইয়া তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, কার টাকা বাছা?

দেবদাদার।

সে তোমকে মারবে না?

পার্বতী একটু ভাবিয়া কহিল, না।

একজন কহিল, বেঁচে থাক মা।

পার্বতী হাসিয়া কহিল, তোমাদের তিনজনের বেশ ভাগে মিলেচে, না গো?

তিনজনেই মাথা নাড়িয়া বলিল, তা মিলেচে। রাধারানী তোমার ভাল করুন। বলিয়া তাহারা আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়া গেল, যেন এই দানশীলা ছোট মেয়েটি শাস্তি ভোগ না করে। পার্বতী সেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পরদিন সকালবেলাই দেবদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। তার হাতে একটা লাটাই ছিল-তবে ঘুড়ি নাই, সেইটা কিনিতে হইবে। পার্বতীকে কাছে পাইয়া কহিল, পারু, টাকা দে।

পার্বতীর মুখ শুকাইল,-বলিল, টাকা নেই!

কি হল?

বোষ্টমীদের দিয়ে দিয়েচি। তারা গান গেয়েছিল।

সব দিয়ে দিয়েচিস?

সব। তিনটি টাকা ত ছিল।

দূর গাধা, সব বুঝি দিতে হয়!

বাঃ! তারা যে তিনজন ছিল! তিন টাকা না দিলে তিনজনের কি ভাগে মেলে?

দেবদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি হলে দুই টাকা দিতুম, বলিয়া সে লাটাইয়ের বাঁট দিয়া মাটির উপর আঁচড় কাটিয়া কহিল, তা হলে তারা দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি ভাগে পেত।পার্বতী ভাবিয়া কহিল, তারা কি তোমার মত আঁক কষতে জানে?

দেবদাস মণকষা পর্যন্ত পড়িয়াছিল; পার্বতীর কথাটায় খুশী হইয়া কহিল, তা বটে!

পার্বতী দেবদাসের হাত ধরিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাকে মারবে, দেবদা।

দেবদাস বিস্মিত হইল-মারব কেন?

বোষ্টমীরা বলেছিল, তুমি আমাকে মারবে।

কথা শুনিয়া দেবদাস মহা খুশী হইয়া পার্বতীর কাঁধের উপর ভর দিয়া কহিল, দূর- না দোষ করলে কি আমি

মারি?

দেবদাস বোধ হয় মনে করিয়াছিল যে, পার্বতীর এ কাজটা তাহার পিনাল কোডের ভিতরে পড়ে না; কেননা, তিন টাকা তিনজনে বেশ ভাগ করিয়া লইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ, যে বোষ্টমীরা পাঠশালায় মণকষা পর্যন্ত পড়ে নাই

তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে দুই টাকা দিলে, তাহাদের প্রতি কতকটা অত্যাচার করা হইত। তাহার পর সে পার্বতীর হাত ধরিয়া ঘুড়ি কিনিবার জন্য ছোটবাজারের দিকে চলিল,-লাটাইটা সেইখানে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিল বটে, কিন্তু আর কাটিতে চাহে না। দেবদাসের জননী বড় গোলযোগ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেবা যে মুখ্যু চাষা হয়ে গেল,-একটা যা হয় উপায় কর।

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, দেবা কলকাতায় যাক। নগেনের বাসায় থেকে বেশ পড়াশুনা করতে পারবে।

নগেনবাবু সম্পর্কে দেবদাসের মাতুল হইতেন। কথাটা সবাই শুনিল। পার্বতী শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল। দেবদাসকে একা পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিল, দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতা যাবে?

কে বললে?

জেঠামশাই বলেচেন।

দূর-আমি কিছুতে যাব না।

আর যদি জোর করে পাঠিয়ে দেন?

জোর?

দেবদাস এই সময় এমন একটা মুখের ভাব করিল, যাহাতে পার্বতী বেশ বুঝিল যে, জোর করিয়া কোন কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ নাই। সেও ত তাহাই চায়। অতএব, নিরতিশয় আনন্দে আর একবার তাহার হাত ধরিয়া, আর একবার ঝুলিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, দেখো, যেন যেয়ো না দেবদা।

কখ্খন না-

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার রহিল না। তাহার পিতা রীতিমত বকাঝকা করিয়া, এমন কি তিরস্কার ও প্রহার করিয়া ধর্মদাসকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে

কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার দিন দেবদাস মনের মধ্যে বড় কে-শ অনুভব করিল; নূতন স্থানে যাইতেছে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল বা আনন্দ হইল না। পার্বতী সেদিন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। কত কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? প্রথমে অভিমানে কিছুক্ষণ দেবদাসের সহিত কথা কহিল না; কিন্তু শেষে যখন দেবদাস ডাকিয়া বলিল, পারু, আবার শিগগির আসব; যদি না পাঠিয়ে দেয় ত পালিয়ে আসব।

তখন পার্বতী প্রকৃতিস্থা হইয়া নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনেক কথা কহিয়া শুনাইল। তাহার পর ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া, পোর্টমাণ্টো লইয়া, জননীর আশীর্বাদ ও চক্ষের জলের শেষ বিন্দুটি কপালে টিপের মত পরিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

তখন পার্বতীর কত কষ্ট হইল; কত চোখের জলের ধারা গাল বহিয়া নীচে পড়িতে লাগিল; কত অভিমানে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। প্রথম কয়েকদিন তাহার এইরূপে কাটিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সমস্তদিনের জন্য তাহার কিছুই করিবার নাই। ইতিপূর্বে পাঠশালা ছাড়িয়া অবধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু গোলমালে, হুজুগে কাটিয়া যাইত; কত কি যেন তাহার করিবার আছে,-শুধু সময়ে কুলাইয়া উঠে না। এখন অনেক সময়, কিন্তু এতটুকু কাজ খুঁজিয়া পায় না। সকালবেলা উঠিয়া কোনদিন চিঠি লিখিতে বসে। বেলা দশটা বাজিয়া যায়, জননী বিরক্ত হইয়া উঠেন; পিতামহী শুনিয়া বলেন, আহা, তা লিখুক। সকালবেলা ছুটোছুটি না করিয়া লেখাপড়া করা ভাল।

আবার যেদিন দেবদাসের পত্র আইসে, সেদিনটি পার্বতীর বড় সুখের দিন। সিঁড়ির দ্বারে চৌকাঠের উপর কাগজখানি হাতে লইয়া সারাদিন তাহাই পড়িতে থাকে। শেষে মাস-দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। পত্র লেখা কিংবা পাওয়া আর তত ঘন ঘন হয় না; উৎসাহটা যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিয়াছে।

একদিন পার্বতী সকালবেলায় জননীকে বলিল, মা, আমি আবার পাঠশালায় যাব।

কেন রে?-তিনি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমি নিশ্চয় যাব।

তা যাস। পাঠশালা যেতে আমি আর কবে তোকে মানা করেচি মা?

সেইদিন দ্বিপ্রহরে পার্বতী দাসীর হাত ধরিয়া, বহুদিন-পরিত্যক্ত শ্লেট ও বইখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেই পুরাতন স্থানে গিয়া শান্ত, ধীরভাবে উপবেশন করিল।

দাসী কহিল, গুরুমশাই, পারুকে আর মারধর করো না; আপনার ইচ্ছায় পড়তে এসেছে। যখন তার ইচ্ছে হবে পড়বে, যখন ইচ্ছা হবে না বাড়ি চলে যাবে।

পণ্ডিত মহাশয় মনে মনে কহিলেন, তথাস্তু। মুখে বলিলেন, তাই হবে।

একবার তাঁহার এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল যে জিজ্ঞাসা করেন, পার্বতীকেও কেন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু সে কথা কহিলেন না। পার্বতী দেখিল, সেইখানে সেই বেঞ্চের উপরেই সর্দার-পোড়ো ভুলো বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে একবার হাসি আসিবার মত হইল, কিন্তু, পরক্ষণেই চোখে জল আসিল। তাহার পর তাহার ভুলোর উপর বড় রাগ হইল। মনে হইল, যেন সে-ই শুধু দেবদাসকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এমন করিয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল।

অনেক দিনের পর দেবদাস বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতী কাছে ছুটিয়া আসিল-অনেক কথাবার্তা হইল। তাহার বেশী কিছু বলিবার ছিল না,-থাকিলেও বলিতে পারিল না। কিন্তু দেবদাস অনেক কথা কহিল। সমস্তই প্রায় কলিকাতার কথা। তাহার পর, একদিন গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইল। দেবদাস আবার কলিকাতায় চলিয়া গেল। এবারও কান্নাকাটি হইল বটে, কিন্তু সেবারের মত তাহাতে তেমন

গভীরতা রহিল না। এমনি করিয়া চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এই কয় বৎসরে দেবদাসের স্বভাবের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, দেখিয়া পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল। ইতিপূর্বে দেবদাসের যে-সমস্ত গ্রাম্যতা-দোষ ছিল, শহরে বাস করিয়া সে-সব আর একেবারে নাই। এখন তাহার বিলাতী জুতা, ভাল জামা, কাপড়, ছড়ি, সোনার ঘড়ি-চেন, বোতাম-এ-সব না হইলে বড় লজ্জা করে। গ্রামে নদীতীরে বেড়াইতে আর সাধ যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে বন্দুক-হাতে শিকারে বাহির হইতেই আনন্দ পায়। ক্ষুদ্র পুঁটিমাছ ধরার বদলে বড় মাছ খেলাইতে ইচ্ছে হয়। শুধু কি তাই? সমাজের কথা,রাজনীতির চর্চা,সভা-সমিতি-ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা। হায় রে! কোথায় সেই পার্বতী, আর তাহাদের সেই তালসোনাপুর গ্রাম! বাল্যস্মৃতিজড়িত দুই-একটা সুখের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না, তাহা নয়-কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে-সকল আর বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।

আবার গ্রীষ্মের ছুটি হইল। পূর্ব বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে দেবদাস বিদেশ বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটী যায় নাই। এবার পিতামাতা উভয়েই জিদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাই ইচ্ছা না থাকিলেও দেবদাস বিছানাপত্র বাঁধিয়া তালসোনাপুর গ্রামের জন্য হাওড়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন বাটী আসিল, সেদিন তাহার শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই বাহির হইতে পারিল না। পরদিন পার্বতীদের বাটীতে আসিয়া ডাকিল, খুড়ীমা!

পার্বতীর জননী আদর করিয়া ডকিলেন, এস বাবা, ব’স।

খুড়ীমার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, পারু কোথায় খুড়ীমা?

ঐ বুঝি ওপরের ঘরে আছে।

দেবদাস উপরে আসিয়া দেখিল, পার্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছে; ডাকিল, পারু!

প্রথমে পার্বতী চমকিত হইয়া উঠিল, তারপর প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কি হচ্ছে পারু?

সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই-তাই পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তার পর, দেবদাসের লজ্জা করিতে লাগিল-কহিল, যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেল। শরীরটা ভাল নয়।

দেবদাস চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পার্বতী এই তের বছরে পা দিয়াছে-ঠাকুরমাতা এই কথা বলেন। এই বয়সে শারীরিক সৌন্দর্য অকস্মাৎ যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কিশোরীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে। আত্মীয়স্বজন হঠাৎ একদিন চমকিত হইয়া দেখিতে পান যে, তাঁহাদের ছোট মেয়েটি বড় হইয়াছে। তখন পাত্রস্থা করিবার জন্য বড় তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়। চক্রবর্তী-বাড়িতে আজ কয়েক দিবস হইতেই সেই কথার আলোচনা হইতেছে। জননী বড় বিষণ্ন; কথায় কথায় স্বামীকে শুনাইয়া বলেন, তাইত, পারুকে আর ত রাখা যায় না। তাঁহারা বড়লোক নহেন, তবে ভরসা এই যে, মেয়েটি অতিশয় সুশ্রী। জগতে রূপের যদি মর্যাদা থাকে, ত পার্বতীর জন্য ভাবিতে হইবে না। আরও একটা কথা আছে-সেটা এইখানেই বলিয়া রাখি। চক্রবর্তী-পরিবারে ইতিপূর্বে কন্যার বিবাহে এতটুকু চিন্তা করিতে হইত না, পুত্রের বিবাহে করিতে হইত। কন্যার বিবাহে পণ গ্রহণ করিতেন এবং পুত্রের বিবাহে পণ দিয়া মেয়ে ঘরে আনিতেন। নীলকণ্ঠের পিতাও তাঁহার কন্যার বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং এ প্রথাটাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, পার্বতীকে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিবেন। পার্বতীর জননী এ কথা জানিতেন; তাই স্বামীকে কন্যার জন্য তাগাদা করিতেন। ইতিপূর্বে পার্বতীর জননী মনে মনে একটা দুরাশাকে স্থান দিয়াছিলেন -ভাবিয়াছিলেন, দেবদাসের সহিত যদি কোন সূত্রে কন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারেন! এ আশা যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা মনে হইত না। ভাবিলেন, দেবদাসকে অনুরোধ করিলে বোধ হয় কোন সুরাহা হইতে পারে। তাই বোধ হয় নীলকণ্ঠের জননী কথায় কথায় দেবদাসের মাতার কাছে কথাটা এইরূপে পাড়িয়াছিলেন-আহা বৌমা, দেবদাসে আর আমার পারুতে কি ভাব! এমনটি কৈ কোথাও ত দেখা যায় না!

দেবদাসের জননী বলিলেন, তা আর হবে না খুড়ী, দু'জনে ভাইবোনের মতই যে একসঙ্গে মানুষ হয়ে এসেচে।

হাঁ মা হাঁ-তাইত মনে হয়, যদি দু'জনের-এই দেখ না কেন বৌমা, দেবদাস যখন কলকাতায় গেল, বাছা তখন সবে আট বছরের; সেই বয়সেই ভেবে ভেবে যেন কাঠ হয়ে গেল। দেবদাসের একখানা চিঠি এলে, সেখানা যেন একেবারে ওর জপমালা হয়ে উঠত। আমরা সবাই ত তা জানি!

দেবদাসের জননী মনে মনে সমস্ত বুঝিলেন। একটু হাসিলেন। এ হাসিতে বিদ্রূপ কতটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল জানি না, কিন্তু, বেদনা অনেকখানি ছিল। তিনিও সব কথা জানিতেন, পার্বতীকে ভালও বাসিতেন। কিন্তু বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে যে! তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটু'! ছি ছি! বলিলেন, খুড়ী, কর্তার ত একেবারে ইচ্ছা নয় এই ছেলেবেলায়, বিশেষ পড়াশুনার সময়ে দেবদাসের বিয়ে দেন। তাই ত কর্তা আমাকে এখনও বলেন, বড়ছেলে দ্বিজদাসের ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে কি সর্বনাশটাই করলে। লেখাপড়া একেবারেই হল না।

পার্বতীর ঠাকুরমা একেবারে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তবুও কহিলেন, তা ত সব জানি বৌমা, কিন্তু কি জান-পারু, ষেটের বাছা একটু অমনি বেড়েচেও বটে, আর বাড়ন্ত গড়নও বটে, তাইতে-তাইতে-যদি নারাণের অমত-

দেবদাসের জননী বাধা দিলেন; বলিলেন, না খুড়ী, এ কথা আমি তাঁকে বলতে পারব না। দেবদাসের এ সময়ে বিয়ের কথা পাড়লে তিনি কি আমার মুখ দেখবেন!

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। দেবদাসের জননী কর্তার খাবার সময় কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, পারুর ঠাকুমা আজ তার বিয়ের কথা পেড়েছিলেন।

কর্তা মুখ তুলিলেন; বলিলেন, হাঁ, পারুর বয়স হল বটে; শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

তাইতে ত আজ কথা পেড়েছিলেন। বললেন, দেবদাসের সঙ্গে যদি-

স্বামী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তুমি কি বললে?

আমি আর কি বলব! দু'জনের বড় ভাব; কিন্তু তাই বলে কি বেচা-কেনা, চক্রবর্তী-ঘরের মেয়ে আনতে পারি? তাতে আবার বাড়ির পাশে কুটু'-ছি ছি!

কর্তা সন্তুষ্ট হইলেন; কহিলেন, ঠিক তাই। কুলের কি মুখ হাসাব? এ-সব কথায় কান দিও না।

গৃহিণী শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিলেন, না-আমি কান দিইনে; কিন্তু তুমিও যেন ভুলে যেয়ো না।

কর্তা গম্ভীরমুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া বলিলেন, তা হলে এতবড় জমিদারি কোন্‌কালে উড়ে যেত!

জমিদারি তাঁহার চিরদিন থাকুক, তাহতে আপত্তি নাই; কিন্তু পার্বতীর দুঃখের কথাটা বলি। যখন এই প্রস্তাবটা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইয়া নীলকণ্ঠের কানে গেল, তখন তিনি মাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, মা, কেন এমন কথা বলতে গিয়েছিলে?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলকণ্ঠ কহিতে লাগিলেন, মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না, বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়। দেখো, তোমাদের বলে রাখলুম-এক হপ্তার মধ্যেই আমি স'ন্ধ স্থির করে ফেলবো। বিয়ের ভাবনা কি?

কিন্তু যাহার জন্য পিতা এতবড় কথাটা বলিলেন, তাহার যে মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছোটবেলা হইতে তাহার একটা ধারণা ছিল যে, দেবদাদার উপর তাহার একটু অধিকার আছে। অধিকার কেহ যে হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাহা নয়। প্রথম সে নিজেও ঠিকমত কিছুই বুঝিতে পারে নাই,-অজ্ঞাতসারে, অশান্ত মন দিনে দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত

করিয়া লইয়াছিল যে, বাহিরে যদিও একটা বাহ্য আকৃতি তাহার এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ এই হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।

কিন্তু দেবদাসের স'ন্ধে এই কথাটা ঠিক খাটানো যায় না। ছেলেবেলায় যখন সে পার্বতীর উপর দখল পাইয়াছিল, তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া কর্মের উৎসাহে ও অন্যান্য আমোদ-আহ-াদের মধ্যে পার্বতীকে সে অনেকটা ছাড়িয়াই দিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত না যে, পার্বতী তাহার সেই একঘেয়ে গ্রাম্য-জীবনের মধ্যে নিশিদিন শুধু তাহাকেই ধ্যান করিয়া আসিয়াছে। শুধু তাই নয়। সে ভাবিত, ছেলেবেলা হইতে যাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়াই জানিয়াছিল, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত আবদারই এতদিন যাহার উপর খাটাইয়া লইয়াছে, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়াই তাহা হইতে এমন অকস্মাৎ পিছলাইয়া পড়িতে হইবে না। কিন্তু তখন কে ভাবিত বিবাহের কথা? কে জানিত সেই কিশোর-বন্ধন বিবাহ ব্যতীত কোনমতেই চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় না! 'বিবাহ হইতে পারে না', এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাক্সক্ষা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু দেবদাসকে সকালবেলাটায় পড়াশুনা করিতে হয়; দুপুরবেলা বড় গরম, ঘরের বাহির হওয়া যায় না, শুধু বিকেলবেলাটাতেই ইচ্ছা করিলে একটু বাহির হইতে পারা যায়। এই সময়টাতেই কোনোদিন বা সে জামাজোড়া পরিয়া, ভাল জুতা পায়ে দিয়া, ছড়ি-হাতে ময়দানে বাহির হইত। যাইবার সময় চক্রবর্তীদের বাড়ির পাশ দিয়াই যাইত,-পার্বতী উপরে জানালা হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহা দেখিত। কত কথা মনে পড়িত। মনে পড়িত, দু'জনেই বড় হইয়াছে,-দীর্ঘ প্রবাসের পর পরের মত এখন পরস্পরকে বড় লজ্জা করে। দেবদাস সেদিন অমনি চলিয়া গিয়াছিল; লজ্জা করিতেছিল,তাই ভাল করিয়া কথাই কহিতে পারে নাই। এটুকু পার্বতীর বুঝিতে বাকী ছিল না।

দেবদাসও প্রায় এমনি করিয়া ভাবে। মাঝে মাঝে তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অমনি মনে হয়, ইহা কি ভাল দেখাইবে?

এখানে কলিকাতার সেই কোলাহল নাই, আমোদ-আহ-াদ,থিয়েটার, গানবাজনা নাই-তাই কেবলই তাহার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই পার্বতী এই পার্বতী হইয়াছে! পার্বতী মনে করে, সেই দেবদাস-এখন এই দেবদাসবাবু হইয়াছে! দেবদাস এখন প্রায়ই চক্রবর্তীদের বাটীতে যায় না। কোনদিন যদি-বা সন্ধ্যার সময় উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকে, খুড়ীমা, কি হচ্ছে?

খুড়ীমা বলেন, এসো বাবা, বোস।

দেবদাস অমনি কহে-না থাক খুড়ীমা, একটু ঘুরে আসি।

তখন পার্বতী কোনদিন বা উপরে থাকে, কোনদিন বা সামনে পড়িয়া যায়। দেবদাস খুড়ীমার সহিত কথা কহে, পার্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। রাত্রে দেবদাসের ঘরে আলো জ্বলে। গ্রীষ্মকালের খোলা জানালা দিয়া পার্বতী সেদিকে বহুক্ষণ হয়ত চাহিয়া থাকে-আর কিছুই দেখা যায় না। পার্বতী চিরদিন অভিমানিনী। সে যে কে-শ সহ্য করিতেছে, ঘৃণাগ্রে এ কথা কেহ না বুঝিতে পারে, পার্বতীর ইহা কায়মন চেষ্টা। আর জানাইয়াই বা লাভ কি? সহানুভূতি সহ্য হইবে না, আর তিরস্কার-লাঞ্ছনা?-তা তার চেয়ে ত মরণ ভাল। মনোরমার গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। এখনও সে শ্বশুরবাড়ি যায় নাই, তাই মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে। পূর্বে দুই সখীতে মিলিয়া মাঝে মাঝে এই-সব কথাবার্তা হইত, এখনও হয়; কিন্তু পার্বতী আর যোগ দেয় না-হয় চুপ করিয়া থাকে, নাহয় কথা উলটাইয়া দেয়।

পার্বতীর পিতা কাল রাত্রে বাটী ফিরিয়াছেন। এ কয়দিন তিনি পাত্র স্থির করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। এখন বিবাহের সমস্ত স্থির করিয়া ঘরে আসিয়াছেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বর্ধমান জেলায় হাতীপোতা গ্রামের জমিদারই পাত্র।

তাঁহার অবস্থা ভাল, বয়স চল্লিশের নীচেই,-গত বৎসর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, তাই আবার বিবাহ করিবেন। সংবাদটা যে বাটীর সকলেরই চিত্তর ন করিয়াছিল, তাহা নহে, বরং দুঃখের কারণই হইয়াছিল; তবে একটা কথা এই যে, ভুবন চৌধুরীর নিকট হইতে সর্বরকমে প্রায় দু'তিন হাজার টাকা ঘরে আসিবে। তাই মেয়েরা চুপ করিয়া ছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা দেবদাস আহারে বসিয়াছিল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন, পারুর যে বিয়ে।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে?

এই মাসেই। কাল মেয়ে দেখে গেছে। বর নিজেই এসেছিল।

দেবদাস কিছু বিস্মিত হইল,-কৈ, আমি ত কিছু জানিনে মা!

তুমি আর কি করে জানবে? বর দোজবরে-বয়স হয়েছে; তবে বেশ টাকাকড়ি নাকি আছে, পারু সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।

দেবদাস মুখ নীচু করিয়া আহার করিতে লাগিল। তাহার জননী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ওদের ইচ্ছা ছিল এই বাড়িতে বিয়ে দেয়।

দেবদাস মুখ তুলিল-তারপর?

জননী হাসিলেন-ছিঃ, তা কি হয়! একে বেচা-কেনা ছোটঘর, তাতে আবার ঘরের পাশে বিয়ে, ছি ছি-বলিয়া মা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন। দেবদাস তাহা দেখিতে পাইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা পুনরায় কহিলেন, কর্তাকে আমি বলেছিলাম।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বললেন?

কি আর বলবেন! এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না,-তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

দেবদাস আর কথা কহিল না।

সেইদিন দ্বিপ্রহরে মনোরমা ও পার্বতীতে কথোপকথন হইতেছিল। পার্বতীর চোখে জল,-মনোরমা বোধ করি এইমাত্র মুছিয়াছে। মনোরমা কহিল, তবে উপায় বোন?

পার্বতী চোখ মুছিয়া কহিল, উপায় আর কি? তোমার বরকে তুমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?

আমার কথা আলাদা। আমার পছন্দ ছিল না, অপছন্দও হয়নি; তাই আমার কোন কষ্টই ভোগ করতে হয় না। কিন্তু তুমি যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচ বোন!

পার্বতী জবাব দিল না,-ভাবিতে লাগলি।

মনোরমা কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, পারু, বরটির বয়স কত?

কার বরটির?

তোর।

পার্বতী একটু হিসাব করিয়া বলিল, বোধ হয় উনিশ।

মনোরমা অতিশয় বিস্মিত হইল; কহিল, সে কি, এই যে শুনলুম প্রায় চল্লিশ!

এবারে পার্বতীও একটু হাসিল; কহিল, মনোদিদি, কত লোকের বয়স চল্লিশ থাকে, আমি কি তার হিসাব রাখি? আমার বরের বয়স উনিশ-কুড়ি এই পর্যন্ত জানি।

মুখপানে চাহিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, কি নাম রে?

পার্বতী আবার হাসিয়া উঠিল-এতদিনে বুঝি তাও জানো না।

কি করে জানব!

জান না? আচ্ছা, বলে দিই। একটু হাসিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া পাবর্তী তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, জানিস নে-শ্রীদেবদাস-

মনোরমা প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল। পরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আর ঠাট্টায় কাজ নেই। নাম কি, এই বেলা বল্, আর ত বলতে পাবিনে-

এই ত বললুম।

মনোরমা রাগ করিয়া কহিল, যদি দেবদাস নাম- তবে কান্নাকাটি করে মরচিস কেন?

পার্বতী সহসা মলিন হইয়া গেল। কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল, তা বটে। আর ত কান্নাকাটি করব না-

পারু।

কি!

সব কথা খুলে বল্ না বোন! আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

পার্বতী কহিল, যা বলবার সবই ত বললুম।

কিন্তু কিছুই যে বোঝা গেল না রে!

যাবেও না। বলিয়া পার্বতী আর-একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মনোরমা ভাবিল, পার্বতী কথা লুকাইতেছে,-তাহার মনের কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। বড় অভিমান হইল; দুঃখিত হইয়া কহিল, পারু, তোর যাতে দুঃখ, আমারও ত তাতে তাই বোন। তুই সুখী হ, এই ত আমার আন্তরিক প্রার্থনা। যদি কিছু তোর লুকোন কথা থাকে, আমাকে বলতে না চাস্, বলিস নে। কিন্তু এমন করে আমাকে তামাশা করিস নে।

পার্বতীও দুঃখিতা হইল, কহিল, ঠাট্টা করিনি দিদি। যতদূর নিজে জানি, ততদূর তোমাকেও বলেচি। আমি জানি, আমার স্বামীর নাম দেবদাস; বয়স উনিশ-কুড়ি-সেই কথাই ত তোমাকে বলেচি।

কিন্তু এই যে শুনলুম, তোর আর-কোথায় স'ন্ধ স্থির হয়েচে!

স্থির আর কি! ঠাকুরমার সঙ্গে ত আর বিয়ে হবে না, হলে আমারই সঙ্গে হবে; আমি ত কৈ এ খবর শুনিনি!

মনোরমা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা এখন বলিতে গেল। পার্বতী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, ও-সব শুনেচি।

তবে? দেবদাস তোকে-

কি আমাকে?

মনোরমা হাসি চাপিয়া বলিল, তবে স্বয়’রা বুঝি? লুকিয়ে লুকিয়ে পাকা বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে?

কাঁচা-পাকা এখনও কিছুই হয়নি।

মনোরমা ব্যথিতস্বরে কহিল, তুই কি বলিস পারু, কিছুই ত বুঝতে পারিনে।

পার্বতী কহিল, তা হলে দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

কি জিজ্ঞাসা করবে? সে বিয়ে করবে কি না, তাই?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তাই।

মনোরমা ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি পারু? তুই নিজে এ কথা জিজ্ঞাসা করবি?

দোষ কি দিদি?

মনোরমা একেবারে অবাক হইয়া গেল-বলিস কি রে? নিজে?

নিজেই। নইলে আমার হয়ে আর কে জিজ্ঞাসা করবে দিদি?

লজ্জা করবে না?

লজ্জা কি? তোমাকে বলতে লজ্জা করলুম?

আমি মেয়েমানুষ-তোর সই, কিন্তু সে যে পুরুষমানুষ পারু।

এবার পার্বতী হাসিয়া উঠিল; কহিল, তুমি সই, তুমি আপনার-কিন্তু তিনি কি পর? যে কথা তোমাকে বলতে পারি, সে কথা কি তাঁকে বলা যায় না?

মনোরমা অবাক হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী হাসিমুখে কহিল, মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিস নে। তিনি আমার স্বামী না হলে, আমার সমস্ত লজ্জা-শরমের অতীত না হলে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মরতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি! তাঁর কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

মনোরমা মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তঁকে কি বলবি? বলবি যে পায়ে স্থান দাও?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই বলবো, দিদি।

আর যদি সে স্থান না দেয়?

এবার পার্বতী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, তখনকার কথা জানিনে দিদি।

বাটী ফিরিবার সময় মনোরমা ভাবিল, ধন্য সাহস! ধন্য বুকের পাটা! আমি যদি মরেও যাই ত এমন কথা মুখে আনতে পারিনে।

কথাটা সত্য। তাই ত পার্বতী বলিয়াছিল, ইহারা অনর্থক মাথায় সিন্দূর পরে, হাতে নোয়া দেয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি বোধ হয় একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও ম্লান জ্যোৎস্না আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। পার্বতী বিছানার চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,-কেহ জাগিয়া নাই। তাহার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাড়াগ্রামের পথ, একেবারে স্তব্ধ, একেবারে নির্জন-কাহারও সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিল না। সে বিনা বাধায় জমিদারবাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ির উপর বৃদ্ধ দরোয়ান কিষণ সিংহ খাটিয়া বিছাইয়া তখনও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছিল; পার্বতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ না তুলিয়াই কহিল, কে?

পার্বতী বলিল, আমি।

দ্বারবানজী কণ্ঠস্বরে বুঝিল স্ত্রীলোক। দাসী মনে করিয়া, সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে লাগিল। পার্বতী চলিয়া গেল। গ্রীষ্মকাল; বাহিরে উঠানের উপর কয়েকজন ভৃত্য শয়ন করিয়া ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ-বা নিদ্রিত, কেহ-বা অর্ধ-জাগরিত। তন্দ্রার ঘোরে কেহ-বা পার্বতীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু দাসী ভাবিয়া কথা কহিল না। পার্বতী নির্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এ বাটীর প্রতি কক্ষ, প্রতি গবাক্ষ তাহার পরিচিত। দেবদাসের ঘর চিনিয়া লইতে তাহার বিল' হইল না। কপাট খোলা ছিল এবং ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পার্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিদ্রিত। শিয়রের কাছে কি একখানা বই তখনও খোলা পড়িয়াছিল,-ভাবে বোধ হইল, সে এইমাত্র যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা শুধু টক্টক্ শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত সুপ্ত।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা!-

দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়া সাড়া দিল, উঁ-

ও দেবদা-

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই, ঘরে দীপও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল, এ কি! পারু নাকি?

হাঁ, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল- কহিল, এত রাত্রে?

পার্বতী উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা এসেচ নাকি?

পার্বতী বলিল, হাঁ।

দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, বল কি! পথে ভয় করেনি?

পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় ত করে! কেন এসেচ?

পার্বতী জবাব দিল না, কিন্তু মনে মনে কহিল, এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।

বাড়ি ঢুকলে কি করে? কেউ দেখেনি ত?

দরোয়ান দেখেচে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দরোয়ান দেখেচে? আর কেউ?

উঠানে চাকরেরা শুয়ে আছে-তাদের মধ্যেও বোধ হয় কেউ দেখে থাকবে।

দেবদাস বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কেউ চিনতে পেরেচে কি? পার্বতী কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া

অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, তারা সবাই আমাকে জানে, হয়ত-বা কেউ চিনে থাকবে।

বল কি? এমন কাজ কেন করলে পারু?

পার্বতী মনে মনে কহিল, তা তুমি কেমন করে বুঝবে? কিন্তু কোন কথা কহিল না,-অধোবদনে বসিয়া রহিল।

এত রাত্রে! ছি ছি! কাল মুখ দেখাবে কেমন করে?

মুখ নীচু করিয়াই পার্বতী বলিল, আমার সে সাহস আছে।

কথা শুনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, ছি ছি-এখনও কি তুমি ছেলেমানুষ আছ? এখানে, এভাবে আসতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হল না?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না।

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণ দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো-যদি না আমি নিশ্চয় জানুতম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?

পার্বতী তেমনি অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষ মানুষ। আজ নাহয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে; দুদিন পরে কেউ মনে রাখবে না-কবে কোন্ রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমায় পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।

ও কি পারু?

আর আমি-

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ? না, আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।

ও কি পারু? কাঁদচ?

দেবতা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

সহসা দেবদাস পার্বতীর হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল-পার্বতী!

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল-এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু শুভ্র শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

পার্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রুব্যাকুল ঘন দীর্ঘশ্বাস দুলিয়া দুলিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। টং টং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কি?

বাপ-মায়ের একেবারে অমত, তা শুনেচ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল যে, সে শুনিয়াছে। তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে আর কেন?

জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন করিয়া অন্ধভাবে মাটি চাপিয়া ধরে, সেটা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ঠিক তেমনি করিয়া পার্বতী অজ্ঞানের মত দেবদাসের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মুখপানে চাহিয়া কহিল, আমি কিছুই জানতে চাইনে, দেবদা!

পারু, বাপ-মায়ের অবাধ্য হব?

দোষ কি? হও।

তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?

পার্বতী কাঁদিয়া বলিল, তোমার পায়ে-

আবার দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের রাত্রি, আর অল্পক্ষণেই প্রভাত হইবে দেখিয়া দেবদাস পার্বতীর হাত ধরিয়া কহিল, চল, তোমাকে বাড়ি রেখে আসি-

আমার সঙ্গে যাবে?

ক্ষতি কি? যদি দুর্নাম রটে, হয়ত কতকটা উপায় হতে পারবে-

তবে চল।

উভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন পিতার সহিত দেবদাসের অল্পক্ষণের জন্য কথাবার্তা হইল।

পিতা কহিলেন, তুমি চিরদিন আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ, যতদিন বাঁচিব, ততদিনই জ্বালাতন হইতে হইবে। তোমার মুখে এ কথায় আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

দেবদাস নিঃশব্দে অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, আমি ইহার ভিতর নাই। যা ইচ্ছা হয়, তুমি ও তোমার জননীতে মিলিয়া কর।

দেবদাসের জননী এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন-বাবা, এতও আমার অদৃষ্টে ছিল!

সেই দিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পার্বতী এ কথা শুনিয়া কঠোর মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। গতরাত্রের কথা কেহই জানে না, সেও কাহাকে কহিল না। তবে মনোরমা আসিয়া ধরিয়া বসিল, পারু, শুনলাম দেবদাস চলে গেছে?

হাঁ-

তবে, তোর উপায় কি করেচে?

উপায়ের কথা সে নিজেই জানে না, অপরকে কি বলিবে? আজ কয়দিন হইতে সে নিরন্তর ইহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু কোনক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, তাহার আশা কতখানি এবং নিরাশা কতখানি। তবে একটা কথা এই যে, মানুষ এমনি দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কুলকিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মনে বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল, সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই

দিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে। পার্বতীর এই অবস্থায় সে কতকটা জোর করিয়া আশা করিতেছিল যে, কাল রাত্রের কথাটা নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। বিফল হইলে তাহার দশা কি হইবে, এটা তাহার চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, দেবদাদা আবার আসিবে, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে, পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না।

কিন্তু দিন-দুই পরে পার্বতী এইরূপ পত্র পাইল-

পার্বতী, আজ দুইদিন হইতে তোমার কথাই ভাবিয়াছি। পিতামাতার কাহারও ইচ্ছা নহে যে, আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে সুখী করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এতবড় আঘাত দিতে হইবে, যাহা আমার দ্বারা অসাধ্য। তা ছাড়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ কাজ করিবই বা কেমন করিয়া? তোমাকে আর যে কখন পত্র লিখিব, আপাততঃ এমন কথা ভাবিতে পারিতেছি না। তাই এ পত্রেই সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি। তোমাদের ঘর নীচু। বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে মা কোনমতেই ঘরে আনিবেন না; এবং ঘরের পাশে কুটু', ইহাই তাঁহার মতে নিতান্ত কদর্য। বাবার কথা-সে ত তুমি সমস্তই জান। সে রাত্রের কথা মনে করিয়া বড় কে-শ পাইতেছি। কারণ, তোমার মত অভিমানিনী মেয়ে কতবড় ব্যথায় যে সে-কাজ পারিয়াছিল, সে আমি জানি।

আর এক কথা- তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই-আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় কে-শ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা করিয়া আমাকে ভুলিও, এবং আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি সফল হও।

-দেবদাস।

পত্রখানা যতক্ষণ দেবদাস ডাকঘরে নিক্ষেপ করে নাই, ততক্ষণ এক কথা ভাবিয়াছিল; কিন্তু রওনা করিবার পরমুহূর্ত হইতেই অন্য কথা ভাবিতে লাগিল। হাতের ঢিল ছুঁড়িয়া দিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। একটা অনির্দিষ্ট শঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্রমে ক্রমে জড় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ ঢিলটা তাহার মাথায় কিভাবে পড়িবে। খুব লাগিবে কি? বাঁচিবে ত? সে-রাত্রে পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সে কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, পোস্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিবার পথে প্রতি পদক্ষেপে দেবদাসের ইহাই মনে পড়িতেছিল। কাজটা ভাল হইল কি? এবং সকলের উপরে দেবদাস এই ভাবিতেছিল যে, পার্বতীর নিজের যখন কোন দোষ নাই, তখন কেন পিতামাতা নিষেধ করেন? বয়সের বৃদ্ধির সহিত, এবং কলিকাতায় থাকিয়া, সে এই কথাটি বুঝিতে পারিতেছিল যে, শুধু-লোক-দেখানো কুলমর্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া নিরর্থক একটা প্রাণনাশ করিতে নাই। যদি পার্বতী না বাঁচিতে চাহে, যদি সে নদীর জলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইতে ছুটিয়া যায়, তা হইলে বিশ্বপতির চরণে কি একটা মহাপাতকের দাগ পড়িবে না?

বাসায় আসিয়া দেবদাস আপনার ঘরে শুইয়া পড়িল। আজকাল সে একটা মেসে থাকে। মাতুলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে,-সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না। যে ঘরে দেবদাস থাকে, তাহারই পাশের ঘরে চুনিলাল বলিয়া একজন যুবক আজ নয় বৎসর হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কলিকাতা বাস বি এ পাস করিবার জন্য অতিবাহিত হইয়াছে- আজিও সফলকাম হইতে পারেন নাই বলিয়া এখনো এইখানেই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। চুনিলাল তাঁহার নিত্যকর্ম সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, ভোর নাগাদ বাটী ফিরিবেন। বাসায় আর কেহ এখনও আসেন নাই। ঝি আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, দেবদাস দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পর একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। খাইবার সময় দেবদাসকে ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উঠিল না। চুনিলাল কোনদিন রাত্রে বাসায় আসে না, আজিও আসে নাই।

তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাসায় দেবদাস ব্যতীত কেহই জাগিয়া নাই। চুনিলাল গৃহপ্রত্যাবর্তন করিয়া দেবদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ কিন্তু আলো জ্বলিতেছে; ডাকিল, দেবদাস কি জেগে আছ নাকি হে?

দেবদাস ভিতর হইতে কহিল, আছি, তুমি এর মধ্যে ফিরলে যে?

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, হাঁ, শরীরটা আজ ভাল নেই, বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দেবদাস, একবার দ্বার খুলতে পার?

পারি, কেন?

তামাকের জোগাড় আছে?

আছে। বলিয়া দেবদাস দ্বার খুলিয়া দিল। চুনিলাল তামাক সাজিতে বসিয়া কহিল; দেবদাস, এখনো জেগে কেন?

রোজ রোজই কি ঘুম হয়?

হয় না?

চুনিলাল যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আমি ভাবতুম তোমাদের মত ভাল ছেলেরা কখনো দুপুর রাত্রের মুখ দেখেনি-আমার আজ একটা নূতন শিক্ষা হল।

দেবদাস কথা কহিল না। চুনিলাল আপনার মনে তামাক খাইতে খাইতে কহিল, দেবদাস, বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত যেন ভাল নেই। তোমার মনে যেন কি কে-শ আছে।

দেবদাস অন্যমনস্ক হইয়াছিল। জবাব দিল না।

মনটা ভাল নেই, না হে?

দেবদাস হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ব্যগ্রভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা চুনিবাবু, তোমার মনে কি কোন ক্লে-শ নেই?

চুনিলাল হাসিয়া উঠিল-কিছু না।

কখন এ জীবনে ক্লেশ পাওনি?

এ কথা কেন?

আমার শুনতে বড় সাধ হয়।

তা হলে আর একদিন শুনো।

দেবদাস বলিল, আচ্ছা, চুনি, তুমি সারারাত্রি কোথায় থাক?

চুনিলাল মৃদু হাসিয়া কহিল, তা কি তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু ঠিক জানিনে।

চুনিলালের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এ-সব আলোচনার মধ্যে আর কিছু না থাক, একটা চক্ষুলজ্জাও যে আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের দোষে সে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল। কৌতুক করিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, দেবদাস, ভাল করে জানতে হলে কিন্তু ঠিক আমার মত হওয়া চাই। কাল আমার সঙ্গে যাবে?

দেবদাস একবার ভাবিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল, শুনি, সেখানে নাকি খুব আমোদ পাওয়া যায়। কোন কষ্ট মনে থাকে না; এ কি সত্যি?

একেবারে খাঁটি সত্যি।

তা যদি হয়, ত আমাকে নিয়ে যেয়ো-আমি যাবো।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুনিলাল দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল, সে ব্যস্তভাবে জিনিসপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, যাবে না?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হাঁ, যাবো বৈ কি।

তবে এ-সব কি করচ?

যাবার উদ্যোগ করচি।

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, মন্দ উদ্যোগ নয়; কহিল, ঘরবাড়ি কি সব সেখানে নিয়ে যাবে নাকি হে?

তবে কার কাছে রেখে যাব?

চুনিলাল বুঝিতে পারিল না। কহিল, জিনিসপত্র আমি কার কাছে রেখে যাই? সব ত বাসায় পড়ে থাকে।

দেবদাস যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ তুলিল। লজ্জিত হইয়া কহিল, চুনিবাবু, আজ আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সে কি হে? কবে আসবে?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি আর আসব না।

বিস্ময়ে চুনিলাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেবদাস কহিতে লাগিল- এই টাকা নাও; আমার যা কিছু ধার আছে, এই থেকে শোধ করে দিয়ো। যদি কিছু বাঁচে, বাসার দাসী-চাকরকে বিলিয়ে দিয়ো। আমি আর কখনো কলকাতায় ফিরব না।

মনে মনে বলিতে লাগিল, কলকাতায় এসে আমার অনেক গেছে, অনেক গেছে।

আজ যৌবনের কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধার ভেদ করিয়া তাহার চোখে পড়িতেছে- সেই দুর্দান্ত দুর্বিনীত কিশোর বয়সের সেই অযাচিত পদদলিত রত্ন আজ সমস্ত কলিকাতার তুলনাতেও যেন অনেক বড়, অনেক দামী। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া বলিল, চুনি শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান উন্নতি-যা কিছু, সব সুখের জন্য। যেমন করেই দেখ না কেন, নিজের সুখ বাড়ানো ছাড়া এ-সকল আর কিছুই নয়-

চুনিলাল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তবে তুমি কি আর লেখাপড়া করবে না নাকি?

না। লেখাপড়ার জন্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আগে যদি জানতাম, এতখানির বদলে আমার এইটুকু লেখাপড়া হবে, তাহলে আমি জন্মে কখনো কলিকাতার মুখ দেখতাম না।

তোমার হয়েছে কি?

দেবদাস ভাবিতে বসিল; কিছুক্ষণ পরে কহিল, আবার যদি কখন দেখা হয়, সব কথা বলব।

রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। বাসায় সকলে এবং চুনিলাল নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, দেবদাস গাড়িতে সমস্ত দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া চিরদিনের মত বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চুনিলাল রাগ করিয়া বাসার অপর সকলকে বলিতে লাগিল-এইরকম ভিজে-বেড়ালগোছ লোকগুলোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমিষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ স'ন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করে না-সবটুকুর বিচার না করিয়া, সবটুকুর ধারণা করিয়া লয় না; দুটো দিক দেখিয়া চারিদিকের কথা কহে না। কিন্তু আর একরকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক ইহার উলটা। কোন জিনিস বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য ইহাদের নাই, কোন-কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে-ইহা ভাল কিংবা মন্দ; তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ-সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময় বেশী কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর না হইলে, অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে; আর উঠিতে পারে না, আর বসিতে পারে না, আর আলোকের পানে চাহিয়া দেখে না; নিশ্চল, মৃত জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ দেবদাস।

পরদিন প্রাতঃকালে সে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, দেবা, কলেজের কি আবার ছুটি হল?

দেবদাস 'হাঁ' বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় চলিয়া গেল। পিতার প্রশ্নেও সে এমনি কি-একটা জবাব দিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল। তিনি ভাল বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া কহিলেন, গরম এখনো কমেনি বলে আবার ছুটি হয়েচে।

দিন-দুই দেবদাস ছটফট করিয়া বেড়াইল। কেননা, যাহা কামনা তাহা হইতেছে না-পার্বতীর সহিত নির্জনে মোটেই সাক্ষাৎ হইল না। দিন-দুই পরে

পার্বতীর জননী দেবদাসকে সুমুখে পাইয়া বলিলেন, যদি এসেচিস বাছা, ত পারুর বিয়ে পর্যন্ত থেকে যা।

দেবদাস কহিল, আচ্ছা।

দুপুরবেলা আহারাদি শেষ হইবার পর পার্বতী নিত্য বাঁধে জল আনিতে যাইত। কক্ষে পিত্তল-কলসী লইয়া আজিও সে ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিতে পাইল, অদূরে একটা কুলগাছের আড়ালে দেবদাস জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। একবার তাহার মনে হইল, ফিরিয়া যায়; একবার মনে হইল, নিঃশব্দে জল লইয়া প্রস্থান করে; কিন্তু তাড়াতাড়ি কোন কাজটাই সে করিতে পারিল না। কলসীটা ঘাটের উপর রাখিতে গিয়া বোধ হয় একটু শব্দ হওয়ায় দেবদাস চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পারু, শুনে যাও।

পার্বতী ধীরে ধীরে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেবদাস একটিবার মাত্র মুখ তুলিল, তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী কহিল, দেবদা, আমাকে কিছু বলবে?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হুঁ,-বোসো। পার্বতী বসিল না, আনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর্যন্ত যখন কোন কথাই হইল না, তখন পার্বতী এক-পা এক-পা করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে ফিরিয়া চলিতে লাগিল। দেবদাস একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার পর পুনরায় জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, শোন।

পার্বতী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তথাপি দেবদাস আর কোন কথা কহিতে পারিল না দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া গেল। দেবদাস নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরিয়া দেখিল; পার্বতী জল লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। তখন সে ছিপ গুটাইয়া ঘাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমি এসেচি।

পার্বতী ঘড়াটা শুধু নামাইয়া রাখিল, কথা কহিল না।

আমি এসেচি, পারু!

পার্বতী কিছুক্ষণ কথা না কহিয়া, শেষে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তুমি আসতে লিখেছিলে, মনে নেই?

না।

সে কি পারু! সে-রাত্রের কথা মনে পড়ে না?

তা পড়ে। কিন্তু সে-কথায় আর কাজ কি?

তাহার কণ্ঠস্বর স্থির, কিন্তু অতি রুক্ষ। কিন্তু দেবদাস তাহার মর্ম বুঝিল না; কহিল, আমাকে মাপ কর, পারু। আমি তখন অত বুঝিনি।

চুপ কর। ও-সব কথা আমার শুনতেও ভাল লাগে না।

আমি যেমন করিয়া পারি, মা-বাপের মত করিব। শুধু তুমি-

পার্বতী দেবদাসের মুখপানে একবার তীক্ষè দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই? তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই?

দেবদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, তা আছে বৈ কি পারু, কিন্তু তাঁদের ত অমত নেই,-তুমি শুধু-

কি করে জানলে তাঁদের অমত নেই? সম্পূর্ণ অমত।

দেবদাস হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল-না গো, তাঁদের একটুকুও অমত নেই-সে আমি বেশ জানি। শুধু তুমি-

পার্বতী কথার মাঝখানেই তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, শুধু আমি! তোমার সঙ্গে? ছিঃ-

চক্ষের পলকে দেবদাসের দুই চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। কঠিনকণ্ঠে কহিল, পার্বতী! আমাকে কি ভুলে গেলে?

প্রথমটা পার্বতী থতমত খাইল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া শান্ত কঠিনস্বরে জবাব দিল, না, ভুলব কেন? ছেলেবেলা থেকে তোমাকে

দেখে আসচি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ভয় করে আসচি-তুমি কি তাই আমাকে ভয় দেখাতে এসেচ? কিন্তু আমাকেই কি তুমি চেন না? বলিয়া সে নির্ভীক দুই চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে দেবদাসের বাক্য-নিঃসরণ হইল না; পরে কহিল, চিরকাল ভয় করেই আমাকে এসেচ,-আর কিছু না?

পার্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আর কিছুই না।

সত্যি বলচ?

হাঁ, সত্যিই বলচি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নেই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান্ বুদ্ধিমান্-শান্ত এবং স্থির। তিনি ধার্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দেবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

একবার দেবদাস একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, একবার যেন একটু পথ ছাড়িতেও উদ্যত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়পদে মুখ তুলিয়া কহিল-এত অহঙ্কার!

পার্বতী বলিল, নয় কেন? তুমি পার, আমি পারিনে? তোমার রূপ আছে, গুণ নেই-আমার রূপ আছে, গুণও আছে। তোমরা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবাও ভিক্ষে করে বেড়ান না। তা ছাড়া, দুদিন পরে আমি নিজেও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকবো না, সে তুমি জানো?

দেবদাস অবাক হইয়া গেল।

পার্বতী পুনরায় কহিয়া উঠিল-তুমি ভাবচ যে, আমার অনেক ক্ষতি করবে। অনেক না হোক, কিছু ক্ষতি করতে পার বটে, সে আমি জানি। বেশ, তাই করো। আমাকে শুধু পথ ছেড়ে দাও।

দেবদাস হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ক্ষতি কেমন করে করবো?

পার্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল-অপবাদ দিয়ে। তাই দাও গে যাও।

কথা শুনিয়া দেবদাস বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল-অপবাদ দেব আমি!

পার্বতী বিষের মত একটুখানি ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, যাও, শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দাও গে; সে রাত্রে তোমার কাছে একাকী গিয়েছিলাম, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র করে দাও গে। মনের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনা পেতে পারবে। বলিয়া পার্বতীর দর্পিত ক্রুদ্ধ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

কিন্তু দেবদাসের বুকের ভিতরটায় রাগে অপমানে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। সে অব্যক্তস্বরে কহিল, মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাব আমি? এবং পরক্ষণেই সে ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরাইয়া ধরিয়া ভীষণকণ্ঠে কহিল, শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়। বলিয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, দেখতে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভ্রমর বসে থাকে। এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।

দেবদাসের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া লইয়া সজোরে পার্বতীর মাথায় আঘাত করিল; সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

পার্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, দেবদা, করলে কি!

দেবদাস ছিপটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে দিতে স্থিরভাবে উত্তর দিল, বেশী কিছু নয়, সামান্য খানিকটা কেটে গেছে মাত্র।

পার্বতী আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল-ও গো, দেবদা!

দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, জলে ভিজাইয়া পার্বতীর কপালের উপর বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, ভয় কি পারু! এ আঘাত শীঘ্র

সেরে যাবে-শুধু দাগ থাকবে। যদি কেউ কখনো এ কথা জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা কথা বলো; নাহয়, সত্য বলে নিজের কলঙ্ক নিজেই প্রকাশ করো।

ও গো, মা গো!-

ছিঃ অমন করে না পারু। শেষ-বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোনার মুখ আরশিতে মাঝে মাঝে দেখবে ত? বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিতে উদ্যত হইল।

পার্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাদা গো-

দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে একফোঁটা জল।

বড় স্নেহজড়িতকণ্ঠে কহিল, কেন রে পারু?

কাউকে যেন বলো না।

দেবদাস নিমেষে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পার্বতীর চুলের উপর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, ছিঃ- তুই কি আমার পর পারু? তোর মনে নেই, দুষ্টামি করলে ছেলেবেলায় কত তোর কান মলে দিয়েচি।

দেবদাদা-মাপ কর আমাকে।

তা তোকে বলতে হবে না ভাই। সত্যিই কি পারু, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস? কবে তোর ওপর রাগ করেছিলাম? কবে মাপ করিনি?

দেবদাদা-

পার্বতী, তুমি ত জানো আমি বেশী কথা বলতে পারিনে; বেশী ভেবেচিন্তে কাজ করতেও পারিনে। যখন যা মনে হয় করি। বলিয়া দেবদাস পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল, তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি ত সুখ পেতে না; কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটত।

এই সময় বাঁধের অন্যদিকে কাহারা আসিতেছিল। পার্বতী ধীরে ধীরে জলে আসিয়া নামিল। দেবদাস চলিয়া গেল। পার্বতী যখন বাটী ফিরিয়া আসিল,

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুমা না দেখিয়াই কহিতেছিলেন, পারু, পুকুর খুঁড়ে কি জল আনচিস দিদি!

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পার্বতীর মুখপানে চাহিবামাত্রই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও মা গো! এ সর্বনাশ কেমন করে হল?

ক্ষতস্থান দিয়া তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল; বস্ত্রখণ্ড প্রায় সমস্তটাই রক্তে রাঙ্গা। কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো মা গো! তোর যে বিয়ে পারু!

পার্বতী স্থিরভাবে কলসী নামাইয়া রাখিল। মা আসিয়া কাঁদিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ সর্বনাশ কি করে হলো, পারু!

পারু সহজভাবে বলিল, ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম। ইঁটে মাথা লেগে কেটে গেছে।

তাহার পর সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেবদাস সত্য কথাই কহিয়াছিল- আঘাত বেশী নয়। চার-পাঁচ দিনেই শুকাইয়া উঠিল। আরো আট-দশ দিন অমনি গেল। তাহার পর একদিন রাত্রে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। উৎসবে ঘটাপটা তেমন হইল না। ভুবনবাবু নির্বোধ লোক ছিলেন না,-প্রৌঢ় বয়সে আবার বিবাহ করিতে আসিয়া ছোকরা সাজাটা ভাল বোধ করেন নাই।

বরের বয়স চল্লিশের নীচে নহে,-কিছু উপর; গৌরবর্ণ, মোটাসোটা নন্দদুলাল ধরনের শরীর। কাঁচাপাকা গোঁফ, মাথার সামনে একটু টাক। বর দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। ভুবনবাবু শান্ত-গম্ভীরমুখে কতকটা যেন অপরাধীর মত, ছাদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কানমলা প্রভৃতি অত্যাচার উপদ্রব হইল না; কারণ, অতখানি বিজ্ঞ গম্ভীর লোকের কানে কাহারও হাত উঠিল না। শুভদৃষ্টির সময় পার্বতী কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। ওষ্ঠের কোণে একটু হাসির রেখা,-ভুবনবাবু ছেলেমানুষটির মত দৃষ্টি অবনত করিলেন। পাড়ার মেয়েরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চক্রবর্তী মহাশয় ছুটাছুটি করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। প্রবীণ জামাতা লইয়া তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমিদার নারাণ মুখুয্যে আজ কন্যাকর্তা। পাকা লোক-কোন পক্ষে, কোনদিকেই ত্রুটি হইল না। শুভকর্ম সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে চৌধুরীমহাশয় একবাক্স অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। পার্বতীর সর্বাঙ্গে সে-সকল ঝলমল করিয়া উঠিল। জননী তাহা দেখিয়া আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিলেন। নিকটে জমিদার-গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন,- তিনি সস্নেহে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আজ চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস নে দিদি!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মনোরমা পার্বতীকে একটা নির্জন ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া আশীর্বাদ করিল-যা হল, ভালই হল। এখন থেকে দেখবি-কত সুখে থাকবি।

পার্বতী অল্প হাসিয়া বলিল, তা থাকব। যমের সঙ্গে কাল একটুখানি পরিচয় হয়েছে কিনা!

ও কি কথা রে!

সময়ে সব দেখতে পাবি।

মনোরমা তখন অন্য কথা পাড়িল; কহিল, একবার ইচ্ছে করে, দেবদাসকে ডেকে এনে এই সোনার প্রতিমা দেখাই!

পার্বতীর যেন চমক ভাঙ্গিল। পারিস দিদি? একবার ডেকে আনতে পারা যায় না?

কণ্ঠস্বরে মনোরমা শিহরিয়া উঠিল,-কেন পারু!

পার্বতী হাতের বালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্যমনস্কভাবে কহিল, একবার পায়ের ধূলা মাথায় নেব-আজ যাব কিনা!

মনোরমা পার্বতীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, দুজনে বড় কান্না কাঁদিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার-পিতামহী দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতে কহিলেন, ও পারু, ও মনো, তোরা বাইরে আয় দিদি!

সেই রাত্রিতেই পার্বতী স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আর দেবদাস? সে রাত্রিটা সে কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার খুব যে কে-শ হইতেছিল, যাতনায় মর্মভেদ হইতেছিল, তাহা নয়। কেমন একটা শিথিল ঔদাস্য ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছিল। নিদ্রার মধ্যে শরীরের কোন একটা অঙ্গে হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া সেটার উপর যেমন কোন অধিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং বিস্মিত স্তম্ভিত মন মুহূর্ত ঠাওরাইতে পারে না, কেন তাহার আজন্ম-সঙ্গী চিরদিনের বিশ্বস্ত অঙ্গটা তাহার আহ্বানে সাড়া দিতেছে না; তাহার পর ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যায়, ধীরে ধীরে জ্ঞান জন্মে যে, এটা আর তাহার নিজের নাই; দেবদাস এমনি ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বুঝিতেছিল যে, সময়ে সংসারটার অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হইয়া, তাহার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার উপর মিথ্যা রাগ-অভিমান আর কিছুই খাটিবে না। সাবেক অধিকারের কথাটা ভাবিতে যাওয়াই ভুল হইবে। তখন সূর্যোদয় হইতেছিল। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কোথায় যাই। হঠাৎ স্মরণ হইল তাহার কলিকাতার বাসাটা। সেখানে চুনিলাল আছে। দেবদাস চলিতে লাগিল। পথে বার-দুই ধাক্কা খাইল, হোঁচট খাইয়া অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিল-টাল খাইয়া একজনের গায়ের উপর পড়িতেছিল,-সে মাতাল বলিয়া ঠেলিয়া দিল। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনশেষে মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিবাবু তখন বেশবিন্যাস করিয়া বাহির হইতেছিলেন। -এ কি, দেবদাস যে!

দেবদাস নীরবে চাহিয়া রহিল।

কখন এলে হে? মুখ শুকনো, স্নানাহার হয়নি-ও কি-কি! দেবদাস পথের উপরেই বসিয়া পড়িতেছিল, চুনিলাল হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। নিজের শয্যার উপর বসাইয়া, শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি দেবদাস?

কাল বাড়ি থেকে এসেচি।

কাল? সমস্তদিন তবে ছিলে কোথায়? রাত্রেই বা কোথায় ছিলে?

ইডেন গার্ডেনে।

পাগল নাকি! কি হয়েছে, বল দেখি?

শুনে কি হবে?

না বল, এখন খাওয়া-দাওয়া করো। তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?

কিছুই আনিনি।

তা হোক, এখন খেতে বোস।

তখন জোর করিয়া চুনিলাল কিছু আহার করাইয়া,শয্যায় শুইতে আদেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি রাত্রে এসে তোমাকে তুলব। বলিয়া সে তখনকার মত চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দেবদাস তাহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। না ডাকিয়া, সে নিজে একখানা ক'ল টানিয়া লইয়া, নীচে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রির মধ্যে দেবদাসের ঘুম ভাঙ্গিল না, প্রভাতেও না। বেলা দশটার সময় সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, চুনিবাবু, কখন এলে হে?

এইমাত্র আসচি।

তবে তোমার কোনরকম অসুবিধা হয়নি!

কিছু না।

দেবদাস কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু, আমার যে কিছু নেই, তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে?

চুনিলাল হাসিল। সে জানিত, দেবদাসের পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। তাই হাসিয়া কহিল, আমি প্রতিপালন করব! বেশ কথা। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক, কোন ভাবনা নেই।

চুনিবাবু, তোমার আয় কত?

ভাই, আমার আয় সামান্য। বাটীতে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তা দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে এখানে বাস করি। তিনি প্রতিমাসে সত্তর টাকা হিসাবে পাঠিয়ে দেন। এতে তোমার আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

তুমি বাড়ি যাও না কেন?

চুনিলাল ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, সে অনেক কথা।

দেবদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে আহারাদির জন্য ডাক পড়িল। তাহার পর দুইজনে স্নানাহার শেষ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলে চুনিলাল বলিল, দেবদাস, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেচ?

না।

আর কারো সঙ্গে?

দেবদাস তেমনি জবাব দিল, না।

তাহার পর চুনিলালের হঠাৎ অন্য কথা স্মরণ হইল। কহিল, ওহো, তোমার এখনো বিয়েই হয়নি যে!

এই সময় দেবদাস অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণেই চুনিলাল দেখিল, দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আরও দুইদিন অতীত হইল। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে দেবদাস সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। মুখ হইতে সেই ঘন ছায়া যেন অনেকটা সরিয়া গিয়াছে বোধ হইল। চুনিলাল জিজ্ঞাসা করিল, আজ শরীর কেমন?

বোধ হয় অনেকটা ভাল। আচ্ছা চুনিবাবু, রাত্রে তুমি কোথায় যাও?

আজ চুনিলাল লজ্জিত হইল; বলিল, হাঁ, তা যাই বটে, কিন্তু সে কথা কেন?

আচ্ছা,-আর তুমি কেন কলেজে যাও না?

না-লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েচি।

ছিঃ, তা কি হয়? মাস-দুই পরে তোমার পরীক্ষা। পড়াও তোমার মন্দ হয়নি, এবার কেন পরীক্ষা দাও না!

না-পড়া ছেড়ে দিয়েচি।

চুনিলাল চুপ করিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাও-বলবে না? তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

চুনিলাল দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি জান দেবদাস,আমি খুব ভাল জায়গায় যাইনে।

দেবদাস যেন আপনার মনে কহিল, ভাল আর মন্দ! ছাই কথা!-চুনিবাবু, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

তা নিতে পারি। কিন্তু তুমি যেয়ো না।

না, আমি যাবই। যদি ভাল না লাগে, আর না হয় যাব না। কিন্তু তুমি যে সুখের আশায় প্রত্যহ উন্মুখ হয়ে থাকো-যাই হোক চুনিবাবু, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

চুনিলাল মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, আমার দশা! মুখে বলিল, আচ্ছা তাই যেয়ো।

অপরাহ্¦বেলায় ধর্মদাস জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। দেবদাসকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেব্তা? আজ তিন-চারদিন ধরে মা কত যে কাঁদচেন-

কেন রে?

কিছু না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন? একখানা পত্র বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, মার চিঠি।

চুনিলাল ভিতরের খবর বুঝিবার জন্য উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। দেবদাস পত্র পাঠ করিয়া রাখিয়া দিল। জননী বাটী আসিবার জন্য আদেশ ও অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত বাটীর মধ্যে তিনিই শুধু দেবদাসের অকস্মাৎ তিরোধানের কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মদাসের হাত দিয়া লুকাইয়া অনেকগুলি টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। ধর্মদাস সেগুলি হাতে দিয়া কহিল, দেব্তা, বাড়ি চল।

আমি যাব না। তুই ফিরে যা।

রাত্রিতে দুই বন্ধু বেশবিন্যাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ-সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু চুনিলাল কিছুতেই সামান্য পোশাকে বাহির হইতে রাজী হইল না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি চীৎপুরের একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুনিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামিনীর নাম চন্দ্রমুখী-সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যে এই কয়দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে নিজেই জানিত না। চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদাহের ন্যায় বুকের ভিতর প্রজ্ব¡লিত হইয়া উঠিল। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, চুনিবাবু, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় আনলে? তার তীব্রকণ্ঠ ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুনিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুনিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, চল চল, ভিতরে গিয়ে বসি।

দেবদাস আর কিছু কহিল না-ঘরের ভিতরে আসিয়া নীচের বিছানায় বিষণ্ন নতমুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া পড়িল। ঝি রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল-দেবদাস স্পর্শও করিল না। চুনিলাল মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঝি কি করিবে ভাবিয়া না

পাইয়া অবশেষে চন্দ্রমুখীর হাতেই হুঁকাটা দিয়া প্রস্থান করিল। সে দুই-একবার টানিবার সময়, তীক্ষèদৃষ্টিতে দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ নিরতিশয় ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য! আর কি বিশ্রীই দেখতে!

ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে আরও বার-দুই গুড়গুড় করিয়া শব্দ হইল, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়া আর ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন চুনিলালের হাতে হুঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়গুড় করিয়া হুঁকার শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা যেন বড় ভয়ে ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাৎ নিরর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে, প্রত্যেকেই যেমন নীরবে নিজের মনে ফুলিতে থাকে, এবং ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ মিছামিছি কহিতে থাকে, তাইত! এমনি তিনজনেই মনে মনে বলিতে লাগিল, তাইত! এ কেমন হইল!

যেমনই হোক, কেহই স্বস্তি পাইতেছিল না। চুনিলাল হুঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না,-তাই। ঘরে দুইজনে বসিয়া রহিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আপনার যখন পায়ের ধূলো পড়েচে-

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, পায়ের ধূলোর কথা নয়। টাকা নাও ত?

তা নিই বৈ কি। না হলে আমাদের চলবে কিসে?

থাক, অত শুনতে চাইনে। বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির করিল এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল-একবার চাহিয়াও দেখিল না কত টাকা দিল।

চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, এরি মধ্যে যাবেন?

দেবদাস কথা কহিল না-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না, বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা ছাড়া, অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবদাস সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির পথেই চুনিলালের সহিত দেখা হইল। সে আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্চ দেবদাস?

বাসায় যাচ্চি।

সে কি হে?

দেবদাস আরও দুই-তিনটি সিঁড়ি নামিয়া পড়িল।

চুনিলাল কহিল, চল, আমিও যাই।

দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চল।

একটু দাঁড়াও, একবার উপর থেকে আসি।

না, আমি যাই, তুমি পরে এসো-বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

চুনিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেইভাবে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া কহিল, বন্ধু চলে গেল?

হ্যাঁ।

চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর ত নিয়ে যাও; তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ো।

চুনিলাল কহিল, সে ইচ্ছে করে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন?

এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল; কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল, ইচ্ছে করে নয়, আমার টাকা নেই বলে রাগ করে দিয়ে গেছে। হাঁ চুনিবাবু, লোকটা কি পাগল?

একটুও না। তবে আজ কদিন থেকে বোধ করি ওর মন ভালো নেই।

কেন মন ভালো নেই-কিছু জানো?

তা জানিনে। বোধ হয় বাড়িতে কিছু হয়ে থাকবে।

তবে এখানে আনলে কেন?

আমি আনতে চাইনি, সে নিজে জোর করে এসেছিল।

চন্দ্রমুখী এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। কহিল, জোর করে নিজে এসেছিল, সমস্ত জেনে?

চুনিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা বৈ কি! সমস্তই ত জানত। আমি ত আর ভুলিয়ে আনিনি!

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল, চুনি, আমার একটি উপকার করবে?

কি?

তোমার বন্ধু কোথায় থাকেন?

আমার কাছে।

আর-একদিন তাকে আনতে পারবে?

তা বোধ হয় পারব না। এর আগেও কখনো সে এ-সব জায়গায় আসেনি, পরেও বোধ হয় আর আসবে না। কিন্তু কেন বল দেখি?

চন্দ্রমুখী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, চুনি, যেমন করে হোক, ভুলিয়ে আর একবার তাকে এনো।

চুনি হাসিল; চোখ টিপিয়া কহিল, ধমক খেয়ে ভালবাসা জন্মাল নাকি?

চন্দ্রমুখীও হাসিল; কহিল, না দেখে নোট দিয়ে যায়-এটা বুঝলে না?

চুনি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না-না, নোট-ফোটের লোক আলাদা-সে তুমি নও। কিন্তু সত্যি কথাটা বল ত?

চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যিই একটু মায়া পড়েচে।

চুনি বিশ্বাস করিল না; হাসিয়া কহিল, এই পাঁচ-মিনিটের মধ্যে?

এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল। বলিল, তা হোক। মন ভালো হলে আর একদিন এনো-আর একবার দেখব। আনবে ত?

কি জানি!

আমার মাথার দিব্যি রইল।

আচ্ছা-দেখব।

দশম পরিচ্ছেদ

পার্বতী আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মস্ত বাড়ি। নূতন সাহেবী ফ্যাশনের নহে, পুরাতন সেকেলে ধরনের। সদর মহল, অন্দর মহল, পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা, কাছারি-বাড়ি, তোশাখানা, কত দাসদাসী-পার্বতী অবাক হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী বড়লোক, জমিদার। কিন্তু এতটা ভাবে নাই। অভাব শুধু লোকের। আত্মীয়, কুটু’-কুটু’িনী কেহই প্রায় নাই। অতবড় অন্দর মহল জনশূন্য। পার্বতী বিয়ের কনে, একেবারে গৃহিণী হইয়া বসিল। বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য একজন বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। ইনি ভিন্ন কেবল দাসদাসীর দল।

সন্ধ্যার পূর্বে একজন সুশ্রী সুন্দর বিংশবর্ষীয় যুবাপুরুষ প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কহিল, মা, আমি তোমার বড়ছেলে।

পার্বতী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ঈষৎ চাহিয়া দেখিল, কথা কহিল না। সে আর একবার প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমি তোমার বড়ছেলে-প্রণাম করি।

পার্বতী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন কপালের উপর পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া এবার কথা কহিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, এস বাবা, এস।

ছেলেটির নাম মহেন্দ্র। সে কিছুক্ষণ পার্বতীর মুখপানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তৎপর অদূরে বসিয়া পড়িয়া বিনীতস্বরে বলিতে লাগিল, আজ দুবছর হল আমরা মা হারিয়েচি। এই দুবছর আমাদের দুঃখে-কষ্টেই দিন কেটেচে। আজ তুমি এলে,-আশীর্বাদ কর মা, এবার যেন সুখে থাকতে পাই।

পার্বতী বেশ সহজ গলায় কথা কহিল। কেননা, একেবারে গৃহিণী হইতে হইলে অনেক কথা জানিবার এবং বলিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ কাহিনী অনেকের কাছেই হয়ত একটু অস্বভাবিক শুনাইবে। তবে যিনি পার্বতীকে আরও

একটু ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইবেন, অবস্থার এই নানারূপ পরিবর্তনে পার্বতীকে তাহার বয়সের অপেক্ষা অনেকখানি পরিপক্ক করিয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া নিরর্থক লজ্জা-শরম, অহেতুক জড়তা-সঙ্কোচ তাহার কোনদিনই ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর সব ছেলেমেয়েরা কোথায় বাবা?

মহেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, বলচি। তোমার বড় মেয়ে, আমার ছোটবোন তার শ্বশুরবাড়িতেই আছে। আমি চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু যশোদা কিছুতেই আসতে পারলে না।

পার্বতী দুঃখিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, আসতে পারলে না, না ইচ্ছা করে এলো না?

মহেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, ঠিক জানিনে মা।

কিন্তু তাহার কথার ও মুখের ভাবে পার্বতী বুঝিল, যশোদা রাগ করিয়াই আইসে নাই; কহিল, আর আমার ছোটছেলে?

মহেন্দ্র কহিল, সে শিগগির আসবে। কলকাতায় আছে, পরীক্ষা দিয়েই আসবে।

ভুবন চৌধুরী নিজেই জমিদারির কাজকর্ম দেখিতেন। তা ছাড়া, স্বহস্তে নিত্য শালগ্রাম-শিলার পূজা করা, ব্রত-নিয়ম-উপবাস, ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচর্যা-এই সব কাজে তাঁহার সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। নূতন বিবাহ করিয়া কোনপ্রকার নূতন আমোদ-আহ্লাদ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোনদিন ভিতরে আসিতেন, কোনদিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলেও অতি সামান্যই কথাবার্তা হইত-শয্যায় শুইয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া, চোখ বুজিয়া বড়জোর বলিতেন, তা তুমিই হলে বাড়ির গৃহিণী, সব দেখেশুনে, বুঝেপড়ে নিজেই নিয়ো-

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত, আচ্ছা।

ভুবন বলিতেন, আর দেখ, তা এই ছেলেমেয়েরা,-হাঁ, তা এরা তোমারই ত সব-

স্বামীর লজ্জা দেখিয়া পার্বতীর চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি আবার একটু হাসিয়া কহিতেন, হাঁ, আর এই দেখ, এই মহেন তোমার বড়ছেলে, সেদিন বি এ পাস করেছে,-এমন ভাল ছেলে, এমন দয়ামায়া-কি জান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা-

পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত, আমি জানি, সে আমার বড়ছেলে-

তা জানবে বৈ কি! এমন ছেলে কেউ কখনও দেখেনি। আর আমার যশোমতী, মেয়ে ত নয়-প্রতিমা। তা আসবে বৈ কি! আসবে বৈ কি! বুড়ো বাপকে দেখতে আসবে না! তা সে এলে তাকে-

পার্বতী নিকটে আসিয়া টাকের উপর মৃণালহস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিত, তোমাকে ভাবতে হবে না। যশোকে আনবার জন্য আমি লোক পাঠাব-নাহয় মহেন নিজেই যাবে।

যাবে! যাবে! আহা, অনেকদিন দেখিনি-তুমি লোক পাঠাবে?

পাঠাব বৈ কি। আমার মেয়ে, আমি আনতে পাঠাব না!

বৃদ্ধ এই সময়ে উৎসাহে উঠিয়া বসিতেন। উভয়ের স'ন্ধ ভুলিয়া পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিতেন-তোমার ভাল হবে। আমি আশীর্বাদ করচি-তুমি সুখী হবে-ভগবান তোমার দীর্ঘায়ু করবেন।

তাহার পর হঠাৎ কি-সব কথা বৃদ্ধের যেন মনে পড়িয়া যাইত। পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিতেন, বড়মেয়ে, ঐ এক মেয়ে,-সে বড় ভালবাসত-

এ সময়ে কাঁচা-পাকা গোঁফের পাশ দিয়া একফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িত। পার্বতী মুছাইয়া দিত। কখনো কখনো বা চুপি চুপি বলিতেন, আহা, তারা সবাই আসবে, আর-একবার বাড়িঘরদোর জমজম করবে-আহা,

আগে কি জমকালো সংসারই ছিল! ছেলেরা, মেয়ে, গিন্নী-হৈচৈ-নিত্য দুর্গোৎসব। তারপর একদিন সব নিবে গেল। ছেলেরা কলকাতায় চলে গেল, যশোকে তার শ্বশুর নিয়ে গেল। তারপর অন্ধকার শ্মশান-

এই সময় আবার গোঁফের দু'পাশ ভিজিয়া বালিশ ভিজিতে শুরু করিত। পার্বতী কাতর হইয়া মুছাইয়া দিয়া কহিত, মহেনের কেন বিয়ে দিলে না?

বুড়ো বলিতেন, আহা, সে ত আমার সুখের দিন। তাইত ভেবেছিলাম কিন্তু কি যে ওর মনের কথা, কি যে ওর জিদ-কিছুতেই বিয়ে করল না। তাইত বুড়ো বয়সে-বাড়ি ঘর খাঁখাঁ করে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির মতই সমস্তই মলিন, একটা জলুস কিছুতেই দেখতে পাইনে-তাইতেই-

কথা শুনিয়া পার্বতীর দুঃখ হইত। করুণসুরে, হাসির ভান করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিত, তুমি বুড়ো হলে আমিও শিগগির বুড়ো হয়ে যাব। মেয়েমানুষের বুড়ো হতে কি বেশী দেরি হয় গা?

ভুবন চৌধুরী উঠিয়া বসিয়া একহাতে তাহার চিবুক ধরিয়া নিঃশব্দে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন। কারিগর যেমন করিয়া প্রতিমা সাজাইয়া, মাথায় মুকুট পরাইয়া দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে থাকে, একটু গর্ব, আর অনেকখানি স্নেহ সেই সুন্দর মুখখানির আশেপাশে জমা হইয়া উঠে, ভুবনবাবুরও ঠিক তেমনি হয়।

কোনদিন বা তাঁহার অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আহা, ভাল করনি-

কি ভালো করিনি গো?

ভাবছি-এখানে তোমাকে সাজে না-

পার্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, খুব সাজে! আমাদের আবার সাজাসাজি কি?

বৃদ্ধ আবার শুইয়া পড়িয়া যেন মনে মনে বলিতেন, তা বুঝি-তা বুঝি। তবে, তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দেখবেন।

এমনি করিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে একবার চক্রবর্তী মহাশয় কন্যাকে লইতে আসিয়াছিলেন, -পার্বতী নিজেই ইচ্ছা করিয়া গেল না। পিতাকে কহিল, বাবা, বড় অগোছাল সংসার, আর কিছুদিন পরে যাব।

তিনি অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, মেয়েমানুষ এমনি জাতই বটে!

তিনি বিদায় হইলে পার্বতী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, আমার বড়মেয়েকে একবার নিয়ে এস।

মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল। সে জানিত, যশোদা কিছুতেই আসিবে না। কহিল, বাবা একবার গেলে ভাল হয়।

ছিঃ তা কি ভাল দেখায়! তার চেয়ে চল, আমরা মা-ব্যাটায় মেয়েকে নিয়ে আসি।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল-তুমি যাবে?

ক্ষতি কি বাবা? আমার তাতে লজ্জা নাই; আমি গেলে যশোদা যদি আসে-যদি তার রাগ পড়ে, আমার যাওয়াটা কি এতই কঠিন!

কাজেই মহেন্দ্র পরদিন একাকী যশোদাকে আনিতে গেল। সেখানে সে কি কৌশল করিয়াছিল জানি না, কিন্তু চারদিন পরে যশোদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন পার্বতীর সর্বাঙ্গে বিচিত্র নূতন বহুমূল্য অলঙ্কার; এই সেদিন ভুবনবাবু কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন-পার্বতী আজ তাহাই পরিয়া বসিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে যশোদা ক্রোধ-অভিমানের অনেক কথা মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে আসিয়াছিল। নূতন বৌ দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে-সব বিদ্বেষের কথা তাহার মনেই পড়িল না। শুধু অস্ফুটেই কহিল, এই!

পার্বতী যশোদার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। কাছে বসাইয়া হাতে পাখা লইয়া কহিল, মা, মেয়ের উপর নাকি রাগ করেচ?

যশোদার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া গেল। পার্বতী তখন সে সমস্ত অলঙ্কার একটির পর একটি করিয়া যশোদার অঙ্গে পরাইতে লাগিল। বিস্মিতা যশোদা কহিল, এ কি?

কিছুই না। শুধু তোমার মেয়ের সাধ।

গহনা পরিতে যশোদার মন্দ লাগিল না এবং পরা শেষ হইলে তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির আভাস দেখা দিল। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া নিরাভরণা পার্বতী কহিল, মা, মেয়ের উপর রাগ করেচ?

না, না-রাগ কেন? রাগ কি?-

তা বৈ কি মা, এ তোমার বাপের বাড়ি, এতবড় বাড়ি, কত দাসদাসীর দরকার। আমি একজন দাসী বৈ ত নয়! ছি মা, তুচ্ছ দাসদাসীর ওপর কি তোমার রাগ করা সাজে?

যশোদা বয়সে বড়, কিন্তু কথা কহিতে এখনো অনেক ছোট। সে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বাতাস করিতে করিতে পার্বতী আবার কহিল,-দুঃখীর মেয়ে, তোমাদের দয়ায় এখানে একটু স্থান পেয়েচি। কত দীন, দুঃখী, অনাথ তোমাদের দয়ায় এখানে নিত্য প্রতিপালিত হয়; আমি ত মা তাদেরই একজন। যে আশ্রিত-

যশোদা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল, এখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি মা-

পার্বতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

যশোদা কহিল, দোষ নিও না মা।

পরদিন মহেন্দ্র যশোদাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, কি রে, রাগ থেমেচে?

যশোদা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত দিয়া কহিল, দাদা, রাগের মাথায়-ছি ছি, কত কি বলেচি। দেখো যেন সে-সব প্রকাশ না পায়।

মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। যশোদা কহিল, আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত যত্ন-আদর করতে পারে?

দিন-দুই পরে যশোদা পিতার নিকট নিজে কহিল, বাবা, ওখানে চিঠি লিখে দাও-আমি এখন দু'মাস এখান থেকে যাব না।

ভুবনবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কেন মা?

যশোদা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই-এখন দিনকতক ছোটমা'র কাছে থাকি!

আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সন্ধ্যার সময় পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েচ। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

পার্বতী কহিল, সে আবার কি?

কি তা তোমাকে বোঝাতে পারিনে। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্মগ্লানি থেকে আজ আমাকে নিষ্কৃতি দিলে।

সন্ধ্যার আঁধারে পার্বতী দেখিল না যে তাহার স্বামীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। আর বিনোদলাল-সে ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র, পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ি আসিয়া আর পড়িতেই গেল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর দুই-তিনদিন দেবদাস মিছিমিছি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল- অনেকটা পাগলের মত। ধর্মদাস কি কহিতে গিয়াছিল, তাহাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া ধমকাইয়া উঠিল। গতিক দেখিয়া চুনিলালও কথা কহিতে সাহস করিল না। ধর্মদাস কাঁদিয়া বলিল, চুনিবাবু, কেন এমন হল?

চুনিলাল বলিল, কি হয়েচে ধর্মদাস?

একজন অন্ধ আর-একজন অন্ধকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভিতরের খবর দু'জনের কেহই জানে না। চোখ মুছিতে মুছিতে ধর্মদাস বলিল, চুনিবাবু, যেমন করে হোক দেবদাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর লেখাপড়া যদি করবে না, ত এখানে থেকে কি হবে?

কথাটা খুব সত্য। চুনিলাল চিন্তা করিতে লাগিল। চারি-পাঁচদিন পরে একদিন ঠিক তেমনি সন্ধ্যার সময় চুনিবাবু বাহির হইতেছিল-দেবদাস কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল, চুনিবাবু, সেখানে যাচ্চ?

চুনিলাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে গেল, হাঁ-না, বল ত আর যাইনে।

দেবদাস কহিল, না, যেতে বারণ করচি নে; কিন্তু একটি কথা বল, কি আশায় সেখানে তুমি যাও?

আশা আর কি? এমনি সময় কাটে।

কাটে? কৈ, আমার সময় ত কাটে না! আমি সময় কাটাতে চাই।

চুনিলাল কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি তাহার মনের ভাব মুখে পড়িতে চেষ্টা করিল। তাহার পর কহিল, দেবদাস, তোমার কি হয়েচে খুলে বলতে পারো?

কিছুই ত হয়নি।

বলবে না?

না চুনি, বলবার কিছুই নেই।

চুনিলাল বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া কহিল, দেবদাস, একটা কথা রাখবে?

কি?

সেখানে আর একবার তোমাকে যেতে হবে। আমি কথা দিয়েচি।

যেখানে সেদিন গিয়েছিলাম-সেইখানে ত?

হাঁ-

ছিঃ-আমার ভাল লাগে না।

যাতে ভাল লাগে, আমি করে দেব।

দেবদাস অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, চল যাই।

অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুনিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে। একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে-অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষন্নমুখে চাহিয়া চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল-দেবদাস, আর খেয়ো না।

দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটি করিল, কেন?

অল্পদিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।

সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাকব বলে শুধু মদ খাই।

এ কথা চন্দ্রমুখী অনেকবার শুনিয়াছে। এক-একবার তাহার মনে হয় দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে। দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আড় হইয়া বালিশে হেলান দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, আমার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই এখানে বসে থাকি-জ্ঞান থাকে না, তাই তোমার মুখের পানে চেয়ে কথা কই- চন্দ-র-তবু অজ্ঞান হইনে-তবু একটু জ্ঞান থাকে-তোমাকে ছুঁতে পারিনে-আমার বড় ঘৃণা হয়।

চন্দ্রমুখী চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, দেবদাস, কত লোক এখানে আসে, তারা কখনো মদ স্পর্শও করে না।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিল। টলিয়া টলিয়া ইতস্ততঃ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিল,-স্পর্শ করে না? আমার বন্দুক থাকলে তাদের গুলি করতাম। তারা যে আমার চেয়েও পাপিষ্ঠ-চন্দ্রমুখী!

কিছুক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার পর আবার কহিল, যদি কখনও মদ ছাড়ি-যদিও ছাড়ব না-তা হলে আর কখন ত এখানে আসব না। আমার উপায় আছে, কিন্তু তাদের কি হবে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, বড় দুঃখে মদ ধরেচি-আমাদের বিপদের, দুঃখের বন্ধু! আর তোমাকে ছাড়তে পারিনে,-

দেবদাস বালিশের উপর মুখ রগড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল। দেবদাস ভ্রূকুটি করিল-ছিঃ, ছুঁয়ো না-এখনো আমার জ্ঞান আছে। চন্দ্রমুখী, তুমি ত জান না-আমি শুধু জানি আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব-তবু আসব, তবু বসব, তবু কথা কব-নাহলে যে উপায় নেই। তা কি তোমরা কেউ বুঝবে? হাঃ-হাঃ-লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে মাতাল হই-এমন উপযুক্ত স্থান জগতে কি আর আছে! আর তোমরা-

দেবদাস দৃষ্টি সংযত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার বিষণ্ন মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি! লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব-স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে-তোমরাই তার দৃষ্টান্ত।

তাহার পর চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চুপি চুপি কহিতে লাগিল-চন্দ্রমুখী বলে, সে আমাকে ভালবাসে-আমি তা চাইনে-চাইনে-চাইনে-লোকে থিয়েটার করে, মুখে চুনকালী মাখে-চোর হয়-ভিক্ষা করে-রাজা হয়-রানী হয়-ভালবাসে-কত ভালবাসার কথা বলে-কত কাঁদে-ঠিক যেন সব সত্য! চন্দ্রমুখী আমার

থিয়েটার করে, আমি দেখি! কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে-একদণ্ডে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল-আর কোন্ পথে আমি চলে গেলাম। এখন একটা সমস্ত জীবনব্যাপী মস্ত অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। একটা ঘোর মাতাল-আর এই একটা-হোক, তাই হোক-মন্দ কি! আশা নেই, ভরসা নেই-সুখও নেই, সাধও নেই-বাঃ বহুৎ আচ্ছা-

তাহার পর দেবদাস পাশ ফিরিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না। অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ভিজাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত বালিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাখা লইয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই দ্বিজদাস ও দেবদাস ও গ্রামের অনেকেই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের সৎকার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। দ্বিজদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়াছে-পাড়ার পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আর দেবদাস শান্তভাবে একটা থামের পার্শ্বে বসিয়া আছে। মুখে শব্দ নাই, চোখে একফোঁটা জল নাই। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না- কেহ সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিতেছে না। মধুসূদন ঘোষ নিকটে গিয়া একবার বলিতে গিয়াছিল,-তা বাবা কপালে-

দেবদাস হাত দিয়া দ্বিজদাসের দিকটা দেখাইয়া বলিল, ওখানে।

ঘোষজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া-হাঁ, তা উনি-কত বড় লোক, ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আর কেহ নিকটে আসিল না। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, দেবদাস অর্ধমূর্ছিত জননীর পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে অনেকগুলো স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পার্বতীর পিতামহীও উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গাগলায় সদ্যবিধবা শোকার্ত জননীকে স'োধন করিয়া কহিলেন, বউমা, চেয়ে দেখ মা, দেবদাস এসেচে।

দেবদাস ডাকিল, মা।

তিনি একবারমাত্র চাহিয়া বলিলেন, বাবা! তাহার পর নিমীলিত চোখের কোণ হইতে অজস্র অশ্রু বহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস জননীর চরণে কিছুক্ষণ মুখ ঢাকিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গেল মৃত পিতার শয়নকক্ষে। চোখে জল নাই, গম্ভীর শান্তমূর্তি। রক্তনেত্র ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। যে-কেহ সে মূর্তি দেখিতে পাইলে বোধ করি ভীত হইত। কপালের দুই পার্শ্বে উভয় শিরা

স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, বড় বড় রুক্ষ কেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ কালিমাখা হইয়াছে-কলিকাতার জঘন্য অত্যাচারের পর এই দীর্ঘ রাত্রিজাগরণ, তাহার পর পিতার মৃত্যু! এক বৎসর পূর্বে যে-কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল-এখন বোধ হয় তাহাকে হঠাৎ সে চিনিতে পারিত না। কিছুক্ষণের পর পার্বতীর জননী সন্ধান করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন,-দেবদাস!

কেন খুড়ীমা?

এমন করলে ত চলবে না বাবা!

দেবদাস তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি করেচি খুড়ীমা?

খুড়ীমা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। দেবদাসের মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,-দেব্তা-বাবা!

কেন খুড়ীমা?

দেব্তা-চরণ-বাবা-

বুকের কাছে মুখ রাখিয়া দেবদাস এইবার একফোঁটা অশ্রুবিসর্জন করিল।

শোকার্ত পরিবারেরও দিন কাটে। ক্রমে প্রভাত হইল, কান্নাকাটি অনেক কমিয়া আসিল। দ্বিজদাস একেবারে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার জননীও উঠিয়া বসিয়াছেন,-চোখ মুছিতে মুছিতে দিনের কাজ করিতেছেন। দুইদিন পরে দ্বিজদাস দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, পিতার শ্রাদ্ধকার্যে কত ব্যয় করা উচিত?

দেবদাস অগ্রজের মুখপানে চাহিয়া কহিল, যেমন উচিত বিবেচনা করেন।

না ভাই, এখন শুধু আমার বিবেচনায় চলবে না। তুমি বড় হয়েচ, তোমার মত জানা আবশ্যক।

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কত নগদ টাকা আছে?

বাবার তবিলে দেড় লাখ টাকা জমা আছে। আমার বিবেচনায় হাজার-দশেক টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট হবে-কি বল?

আমি কত পাব?

দ্বিজদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, তা তুমিও অর্ধেক পাবে। দশ হাজার খরচ হলে, তোমার সত্তর হাজার ও আমার সত্তর হাজার থাকবে।

মা কি পাবেন?

মা নগদ টাকা কি করবেন? তিনি বাটীর গিন্নী-আমরা প্রতিপালন করব।

দেবদাস একটু চিন্তা করিয়া বলিল, আমার বিবেচনায়, আপনার ভাগের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হোক এবং আমার ভাগের পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে। বাকি পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আমি পঁচিশ হাজার নেব, বাকী পঁচিশ হাজার টাকা মায়ের নামে জমা থাকবে। আপনার কি বিবেচনা হয়?

প্রথমে দ্বিজদাস যেন লজ্জিত হইলেন; পরে কহিলেন, উত্তম কথা। কিন্তু আমার, কি জান-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে; তাদের বিয়ে, পৈতা দেওয়া,-অনেক খরচ। তা এই পরামর্শই ভাল। একটু থামিয়া বলিলেন, তা একটু লিখে দিলেই-

লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে কি? কাজটা ভাল দেখাবে না। আমার ইচ্ছা, টাকাকড়ির কথা-এ সময়ে গোপনেই হয়।

তা ভাল কথা; কিন্তু কি জানো ভাই-

আচ্ছা, আমি লিখেই দিচ্চি। সেইদিনই দেবদাস লেখাপড়া করিয়া দিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দেবদাস নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির পার্শ্বে পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পার্বতী মুখপানে চাহিয়াছিল-চিনিতে যেন তাহার কে-শ হইতেছিল। দেবদাস গম্ভীর শান্তমুখে কাছে আসিয়া কহিল, কখন এলে পার্বতী?

সেই কণ্ঠস্বর! আজ তিন বৎসর পরে দেখা। অধোমুখে পার্বতী কহিল-সকালবেলা এসেচি।

অনেকদিন দেখা হয়নি। বেশ ভাল ছিলে?

পার্বতী মাথা নাড়িল।

চৌধুরীমশাই ভাল আছেন? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

সব ভাল। পার্বতী একটিবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তিনি কেমন আছেন-কি করিতেছেন। এখন যে কোন প্রশ্নই খাটে না।

দেবদাস কহিল, এখন কিছুদিন আছ ত?

হাঁ।

তবে আর কি-বলিয়া দেবদাস বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। সে কথা বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়, তাই তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধের পরদিবস পার্বতী ধর্মদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহার হাতে একগাছা সোনার হার দিয়া কহিল, ধর্ম, তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো-

ধর্মদাস মুখপানে চাহিয়া আর্দ্র চক্ষু আরো আর্দ্র করিয়া বলিল, আহা, তোমাকে কতদিন দেখিনি; সব ভাল খবর ত দিদি?

সব ভাল। তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে?

তা আছে পারু।

তুমি ভাল আছ?

এইবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধর্মদাস কহিল, কৈ আর ভাল! এইবার যেতে ইচ্ছে করে-কর্তা গেলেন। ধর্মদাস শোকের আবেগে কত কি হয়ত কহিত, কিন্তু তাহাতে পার্বতী বাধা দিল। এ-সব সংবাদ শুনিবার জন্য সে হার দেয় নাই।

পার্বতী কহিয়া উঠিল, সে কি কথা ধর্ম, তুমি গেলে দেবদাদাকে দেখবে কে?

ধর্মদাস কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, যখন ছেলেমানুষটি ছিল, তখন দেখেচি। এখন না দেখতে হলেই বাঁচি, পারু।

পার্বতী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, ধর্ম, একটি কথা সত্য বলবে?

কেন বলব না দিদি!

তবে সত্যি করে বল, দেবদা এখন কি করে?

করে আমার মাথা আর মুণ্ডু।

ধর্মদাস, খুলে বল না?

ধর্মদাস পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, খুলে আর কি বলব দিদি! এ কি আর বলবার কথা! এবারে কর্তা নাই, দেবদার হাতে অগাধ টাকা হল; এবারে কি আর রক্ষা থাকবে?

পার্বতীর মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে আভাসে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু শুনিয়াছিল। শুষ্ক হইয়া কহিল, বল কি ধর্মদাস? সে মনোরমার পত্রে যখন কতক শুনিয়াছিল, তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধর্মদাস মাথা নাড়িয়া কহিতে লাগিল-আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুধু বোতল বোতল মদ। তিনদিন, চারদিন ধরে কোথায় পড়ে থাকে- ঠিকানা নাই। কত টাকা উড়িয়ে দিলে,-শুনতে পাই, কত হাজার টাকার নাকি তাকে গয়না গড়িয়ে দিয়েচে।

পার্বতীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল-ধর্মদাস, এ-সব সত্যি?

ধর্মদাস নিজের মনে কহিতে লাগিল,-তোর কথা হয়ত শুনতে পারে- একবার বারণ করে দে। কি শরীর কি হয়ে গেল-এমনধারা অত্যাচারে ক'টা দিন বা বাঁচবে? কাকেই বা এ কথা বলি? মা, বাপ, ভাই-এদের এ কথা বলা যায় না। ধর্মদাস শিরে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ইচ্ছে করে মাথা খুঁড়ে মরি পারু, আর বাঁচতে সাধ নেই।

পার্বতী উঠিয়া গেল। নারাণবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এ বিপদের সময় দেবদাসের কাছে যাওয়া একবার উচিত। কিন্তু, তাহার এত সাধের দেবদাদা এই হইয়াছে! কত কথাই যে মনে

পড়িতে লাগিল, তাহার অবধি নাই। যত ধিক্কার সে দেবদাসকে দিল, তাহার সহস্রগুণ আপনাকে দিল; সহস্রবার তাহার মনে হইল, সে থাকিলে কি এমন হইতে পারিত! আগেই সে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছিল, কিন্তু, সে কুঠার এখন তাহার মাথায় পড়িল। তাহার দেবদাদা এমন হইয়া যাইতেছে-এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্বস্ব,-আজ অনাহারে মরিতেছে! পার্বতী প্রতিজ্ঞা করিল, আজ সে দেবদাসের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে।

এখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিল' আছে,-পার্বতী দেবদাসের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবদাস শয্যায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল। তাহার মুখ বিষন্ন, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাদ দিই?

পার্বতী সলজ্জ নীলোৎপল চক্ষু-দুটি একবার তাহার পানে রাখিয়া, পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্তে বুঝাইয়া দিল, এ কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মত বিঁধিয়া আছে। আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না।

আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, বুঝেচি রে, বুঝেচি। লজ্জা হচ্ছে, না?

তবুও পার্বতী কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, তাতে আর লজ্জা কি? দু'জনে মিলেমিশে একটা ছেলেমানুষী করে ফেলে-এই দেখ্ দেখি-মাঝে থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল! রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি, আমিও কপালের ওপর ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েচে!

দেবদাসের কথার ভিতর শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না; প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনে মনে বলিল, দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার স'ল। তুমি আমাকে ভালবাসিতে-তাই দয়া করে, আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।

পারু!

মুখ হইতে অঞ্চল না খুলিয়া পার্বতী কহিল, কি?

তোর উপর আমার বড় রাগ হয়-

এইবার দেবদাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে লাগিল-বাবা নাই, আজ আমার কি দুঃখের দিন; কিন্তু তুই থাকলে কি ভাবনা ছিল! বড়বৌকে জানিস ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকানো নেই; বল্ দেখি মাকে নিয়ে এ সময়ে কি করি! আর আমারই বা যে কি হবে, কিছুই বুঝে পাই না। তুই থাকলে নিশ্চিত হয়ে-সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে-ও কি রে পারু!

পার্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দেবদাস কহিল, কাঁদছিস বুঝি? তবে আর বলা হল না।

পার্বতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বল।

দেবদাস মুহূর্তে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, পারু, তুই নাকি খুব পাকা গিন্নী হয়েচিস রে?

ভিতরে ভিতরে পার্বতী চাপিয়া অধর দংশন করিল; মনে মনে বলিল, ছাই গৃহিণী। শিমুলফুল দেবসেবায় লাগে কি?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল-বড় হাসি পায়! ছিলি তুই এতটুকু-কত বড় হলি। বড় বাড়ি, বড় জমিদারি, বড় বড় ছেলেমেয়ে-আর চৌধুরীমশাই, সবাই বড়-কি রে পারু!

চৌধুরীমশাই পার্বতীর বড় আমোদের জিনিস; তাঁকে মনে হইলেই তাহার হাসি পাইত। এত কষ্টেও তাই তার হাসি আসিল।

দেবদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, একটা উপকার করতে পারিস?

পার্বতী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

পার্বতী ঢোক গিলিয়া, কাশিয়া বলিল-ভাল মেয়ে? কি করবে?

পেলে বিয়ে করি। একবার সংসারী হতে সাধ হয়।

পার্বতী ভাল মানুষটির মত কহিল, খুব সুন্দরী ত?

হাঁ, তোর মত।

আর খুব ভালমানুষ?

না, খুব ভালমানুষে কাজ নেই-বরং একটু দুষ্টু,-তোর মত আমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারবে।

পার্বতী মনে মনে কহিল, সে ত কেউ পারবে না দেবদাদা; কেননা তাতে আমার মত ভালবাসতে পারা চাই। মুখে কহিল, পোড়া মুখ

আমার, আমার মত কত হাজার তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্য হয়।

দেবদাস কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটি আপাততঃ দিতে পারিস দিদি?

দেবদাদা, সত্যি বিয়ে করবে?

এই যে বললাম।

শুধু এইটি সে খুলিয়া বলিল না যে, তাকে ভিন্ন এ জীবনে অন্য স্ত্রীলোকে তার প্রবৃত্তি হইবে না।

দেবদাদা, একটি কথা বলব?

কি?

পার্বতী আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি মদ খেতে শিখলে কেন?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল, কহিল, খেতে কি কোন জিনিস শিখতে হয়?

তা নয়, অভ্যাস করলে কেন?

কে বলেচে,ধর্ম্মদাস?

যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি? দেবদাস প্রতারণা করিল না; কহিল, কতকটা বটে।

পার্বতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েচ, না?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, দিইনি, গড়িয়ে রেখেচি। তুই নিবি?

পার্বতী হাত পাতিয়া বলিল, দাও। এই দেখ, আমার একটিও গয়না নেই।

চৌধুরীমশাই তোকে দেননি?

দিয়েছিলেন; আমি সমস্ত তাঁর বড়মেয়েকে দিয়ে দিয়েচি।

তোর বুঝি দরকার নেই?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া মুখ নীচু করিল।

এইবার সত্যই দেবদাসের চোখে জল আসিতেছিল। দেবদাস অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, কম দুঃখে আর স্ত্রীলোক নিজের গহনা খুলিয়া বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু চোখের জল চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মিছে কথা, পারু। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি, কাউকেই গয়না দিইনি।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, তাই আমি বিশ্বাস করি।

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর পার্বতী কহিল, কিন্তু, প্রতিজ্ঞা কর-আর মদ খাবে না!

তা পারিনে। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করতে পার, আমাকে আর একটিবারও মনে করবে না?

পার্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল। দেবদাস চকিত হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া কহিল, সন্ধ্যা হল, এখন বাড়ি যা পারু!

আমি যাব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

আমি পারিনে।

কেন পার না?

সবাই কি সব কাজ পারে?

ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারে।

তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পার?

পার্বতীর সহসা যেন হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তা কি হয়?

দেবদাস শয্যার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, পার্বতী, দোর খুলে দাও।

পার্বতী সরিয়া আসিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর!

দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিল-পারু, জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না তাতে বিশেষ লাভ আছে? আজকার প্রতিজ্ঞা কাল হয়ত থাকবে না-কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী র্কবি?

আবার বহুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোথায় কোন ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কহিল, ওরে পারু, দোর খুলে দে-

পার্বতী কথা কহে না।

ও পারু-

আমি কিছুতেই যাব না, বলিয়া পার্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ-আবেগে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল-বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার-কিছুই দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে ডাকিল-পারু!

পার্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল, দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট!

দেবদাস কাছে সরিয়া আসিল। তাঁহার চক্ষেও জল-কিন্তু, স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, তা কি আর জানিনে রে?

দেবদা, আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না-আমার যে আজন্মের সাধ-

অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল-তারও ত সময় আছে।

তবে আমার কাছে চল; এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই!

তোর বাড়ি গেলে খুব যত্ন করবি?

আমার ছেলেবেলার সাধ! স্বর্গের ঠাকুর! আমার এ সাধটি পূর্ণ করে দাও! তারপর মরি-তাতেও দুঃখ নেই।

এবার দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ি চল।

দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, আচ্ছা যাব।

আমাকে ছুঁয়ে বল, যাবে?

দেবদাস অনুমান করিয়া পার্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, এ কথা কখনও ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি-তোমার দুঃখ ঘোচে-আমি যাব। মরবার আগেও আমার এ কথা স্মরণ থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটীতে থাকিয়া, দেবদাস একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সুখ নাই, শান্তি নাই, একান্ত একঘেয়ে জীবন। তার উপর ক্রমাগত পার্বতীর চিন্তা; আজকাল সব কাজেই তাহাকে মনে পড়ে। আর, ভাই দ্বিজদাস এবং পতিব্রতা ভাতৃজায়া দেবদাসের জ্বালা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

গৃহিণীর অবস্থাও দেবদাসের ন্যায়। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সুখই ফুরাইয়া গিয়াছে। পরাধীনভাবে এ বাড়ি তাঁহার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ কয়দিন হইতে তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করিতেছেন; শুধু দেবদাসের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন-দেবদাস, একটি বিয়ে কর-আমি দেখে যাই। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? একে অশৌচ অবস্থা, তার উপর আবার মনোমত পাত্রীর সন্ধান করিতে হইবে। আজকাল তাই গৃহিণীর মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে, সে-সময় পার্বতীর সহিত বিবাহ দিলেই বেশ হইত। একদিন তিনি দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, আর ত পারিনে-দিনকতক কাশী গেলে হয়। দেবদাসেরও তাই ইচ্ছা, কহিল, আমিও তাই বলি। ছয় মাস পরে ফিরে এলেই হবে।

হাঁ বাবা, তাই কর। শেষে ফিরে এসে, তাঁর কাজ হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখে আমি কাশীবাস করব।

দেবদাস স্বীকৃত হইয়া, জননীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিন-চারদিন ধরিয়া দেবদাস চুনিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ করিল।

একবার দেখা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে মোটেই মনে পড়ে নাই। দেবদাসের যেন একটু লজ্জা করিল, একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই চন্দ্রমুখীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল,-এখানে নয়।

সম্মুখে একটা গ্যাসপোস্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, বলতে পার সে স্ত্রীলোকটি কোথায় গেছে?

জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া কহিল, তুমি কি দেবদাস?

হাঁ।

দাঁড়াও, দোর খুলে দিই।

দ্বার খুলিয়া সে কহিল, এস-

কণ্ঠস্বর যেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকারও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, চন্দ্রমুখী কোথায় বলতে পার?

স্ত্রীলোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, পারি; ওপরে চল।

এবার দেবদাস চিনিতে পারিল-অ্যাঁ, তুমি?

হাঁ আমি। দেবদাস, আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

উপরে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্রমুখীর পরনে কালাপেড়ে ধুতি, কিন্তু মলিন। হাতে শুধু দু'গাছি বালা, অন্য অলঙ্কার নাই। মাথার চুল এলোমেলো। বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী পূর্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছে। কহিল, তোমার অসুখ হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া কহিল, শারীরিক একটুও নয়। তুমি ভাল করে বোস।

দেবদাস শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মত তাহারও দুর্দশার সীমা নাই। একটিও আসবাব নাই- আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিষ্কৃত, দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, লোহার

কাটী এখনো পোঁতা আছে, দুই-একটায় লাল ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্রাকেটের উপর আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশেপাশে মাকড়সা মনের মত করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈলদীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে-তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরনের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, চন্দ্র, এমন দুর্দশা কেমন করে হল?

চন্দ্রমুখী ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, দুর্দশা তোমাকে কে বললে? আমার ত ভাগ্য খুলেচে।

দেবদাস বুঝিতে পারিল না; কহিল, তোমার গায়ের গয়নাই বা গেল কোথায়?

বেচে ফেলেচি।

আসবাবপত্র?

তাও বেচেচি।

ঘরের ছবিগুলোও বিক্রি করেচ?

এবার চন্দ্রমুখী হাসিয়া সম্মুখের একটা বাড়ি দেখাইয়া কহিল, ও বাড়ির ক্ষেত্রমণিকে বিলিয়ে দিয়েচি।

দেবদাস কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু কোথায়?

বলতে পারিনে। মাস-দুই হল ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসেনি।

দেবদাস আরও আশ্চর্য হইল-ঝগড়া কেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, ঝগড়া কি হয় না?

হয়। কিন্তু কেন?

দালালি করতে এসেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

কিসের দালালি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, পাটের। তার পর কহিল, তুমি বুঝতে পার না কেন? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল, মাসে দু শ' টাকা, একরাশ অলঙ্কার, আর দরজার সুমুখে এক সেপাই। বুঝলে?

দেবদাস বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, কৈ, সে-সকল ত দেখিনে?

থাকলে ত দেখবে। আমি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

তাদের অপরাধ?

অপরাধ বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

দেবদাস বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল, সেই পর্যন্ত আর কেউ এখানে আসেনি?

না। সেই পর্যন্ত কেন, তুমি যাবার পরদিন থেকেই এখানে কেউ আসে না। শুধু চুনি মাঝে মাঝে এসে বসত, কিন্তু মাস-দুই থেকে তাও বন্ধ।

দেবদাস বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে কহিল, চন্দ্রমুখী, তবে দোকানপাট সব তুলে দিলে?

হাঁ-দেউলে হয়ে পড়েচি।

দেবদাস সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, কিন্তু খাবে কি করে?

এই যে শুনলে কিছু গহনাপত্র ছিল, বিক্রি করেচি।

সে আর কত?

বেশী নয়। প্রায় আট-ন' শ টাকা আমার আছে। একজন মুদীর কাছে রেখে দিয়েচি-সে আমাকে মাসে কুড়ি টাকা দেয়।

কুড়ি টাকায় আগে ত তোমার চলত না?

না, আজও ভাল চলে না। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকী, তাই মনে করচি, হাতের এই দু'গাছা বালা বিক্রি করে, সমস্ত পরিশোধ করে দিয়ে আর কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে?

তা এখনো স্থির করিনি। কোন সস্তা মুলুকে যাব-কোন পাড়াগ্রামে-যেখানে কুড়ি টাকায় মাস চলে।

এতদিন যাওনি কেন? যদি সত্যিই তোমার আর-কিছু প্রয়োজন নেই ত এতদিন মিথ্যা কেন ধার-কর্জ বাড়ালে?

চন্দ্রমুখী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার জীবনে এ কথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল। দেবদাস বলিল, চুপ করলে যে?

চন্দ্রমুখী শয্যার একপ্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, রাগ করো না; যাবার আগে আশা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। ভাবতাম, তুমি হয়ত আর-একবার আসবে। আজ তুমি এসেচ, এখন কালই যাবার উদ্যোগ করব। কিন্তু কোথায় যাই বলে দেবে?

দেবদাস বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, শুধু আমাকে দেখবার আশায়? কিন্তু কেন?

একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি বোধ হয়, তাই। আজ তোমার মনে পড়বে কিনা জানিনে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে,-যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম; কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্বে কত লোক এখানে এসেচে গেছে, কিন্তু কারো ভিতরে কখনো তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত, উপযুক্ত অথচ অনুচিত রূঢ় ব্যবহার। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাশার মত কিছু দিয়ে গেলে। এ-সব মনে পড়ে কি?

দেবদাস চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রমুখী পুনরায় কহিতে লাগিল, সেই অবধি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা নূতন জিনিস দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে পারিনি-তুমি এলে বড় ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই ভাল লাগত না।

তার পর আবার কি যে মতিভ্রম ঘটল-এই দুটো চোখে অনেক জিনিসই আর-এক রকম দেখতে লাগলাম। পূর্বের ‘আমি’র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম- যেন সে ‘আমি’ আর নয়। তার পরে তুমি মদ ধরলে। মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার ওপর বড় রাগ হত। কিন্তু তুমি মাতাল হলে রাগ হত না, কিন্তু বড্ড দুঃখ পেতাম।-বলিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসের পায়ের উপর হাত রাখিয়া ছলছলচক্ষে কহিল, আমি বড় অধম, আমার অপরাধ নিয়ো না। তুমি যে কত কথা কইতে, কতবড় ঘৃণায় সরিয়ে দিতে; আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লে-থাক্ সে-সব বলব না, হয়ত আবার রাগ করে বসবে।

দেবদাস কিছুই কহিল না-নূতন ধরনের কথাবার্তা তাহাকে কিছু কে-শ দিতেছিল। চন্দ্রমুখী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিল, একদিন তুমি বললে- আমরা কত সহ্য করি। লাঞ্ছনা, অপমান-জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রবের কথা- সেইদিন থেকেই বড় অভিমান হয়েচে- আমি সব বন্ধ করে দিয়েচি।

দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দিন চলবে কি করে?

চন্দ্রমুখী কহিল, সে ত আগেই বলেচি।

মনে কর, সে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়-

চন্দ্রমুখী ভয় পাইল না। শান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য নয়, কিন্তু তাও ভেবেচি। বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নেব।

দেবদাস ভাবিয়া কহিল, তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উদ্যোগ কর।

কালই করব। বালা দু’গাছা বেচে, একবার মুদীর সঙ্গে দেখা করব।

দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল,-বালা বিক্রি করো না, তবে মুদীর সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু যাবে কোথায়? কোন তীর্থস্থানে?

না দেবদাস! তীর্থধর্মের উপর আমার তত আস্থা নেই। কলকাতা থেকে বেশী দূরে যাব না, কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব।

কোন ভদ্র-পরিবারে কি দাসীবৃত্তি করবে?

চন্দ্রমুখীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব? শরীরের দুঃখ কোনদিন সইনি, এখনো সইতে পারব না। আর বেশী টানাটানি করলে হয়ত ছিঁড়ে যাবে।

দেবদাস বিষন্নমুখে ঈষৎ হাসিল; কহিল, কিন্তু শহরের কাছে থাকলে আবার হয়ত প্রলোভনে পড়বে-মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই।

এবার চন্দ্রমুখীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল, সে কথা সত্যি, মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু আমি আর প্রলোভনে পড়ব না। স্ত্রীলোকের লোভ বড় বেশী তাও মানি, কিন্তু যা-কিছু লোভের জিনিস যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করচি তখন আর আমার ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঝোঁকের ওপর ছাড়তাম, তাহলে হয়ত সাবধান হবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একটা দিনও ত আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি। আমি যে বেশ সুখে আছি।

তথাপি দেবদাস মাথা নাড়িল; কহিল, স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল-বড় অবিশ্বাসী।

এবার চন্দ্রমুখী একেবারে কাছে আসিয়া বসিল। হাত ধরিয়া কহিল, দেবদাস!

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিল, এখন আর বলিতে পারিল না-আমাকে স্পর্শ করো না।

চন্দ্রমুখী স্নেহ-বিস্ফারিত চক্ষে, ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে, তাহার হাত-দুটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, আজ শেষ দিন, আজ আর রাগ করো না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার বড় সাধ হয়।-বলিয়া সে

ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে দেবদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, পার্বতী তোমাকে কি বড় বেশী আঘাত করেচে?

দেবদাস ভ্রূকুটি করিল, বলিল, এ কথা কেন?

চন্দ্রমুখী বিচলিত হইল না। শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, আমার কাজ আছে। তোমাকে সত্যি বলচি, তুমি দুঃখ পেলে আমারও বড় বাজে। তা ছাড়া আমি বোধ হয় অনেক কথাই জানি। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে তোমার মুখ থেকে অনেক কথাই শুনেচি। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হয় না যে, পার্বতী তোমাকে ঠকিয়েচে। বরঞ্চ মনে হয়, তুমি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েচ। দেবদাস, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, এ সংসারে অনেক জিনিস দেখেচি। আমার কি মনে হয় জান? নিশ্চয় মনে হয়, তোমারই ভুল হয়েচে। মনে হয়, চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলে স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বলবার-অনায়াসে বল, কিন্তু তারা তা পারে না। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না; পারলেও তা সবাই বোঝে না। কেননা, বড় অস্পষ্ট হয়-তোমাদের মুখের কাছে চাপা পড়ে যায়। তার পরে অখ্যাতিটাই লোকের মুখে মুখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

চন্দ্রমুখী একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, এ জীবনে ভালবাসার ব্যবসা অনেকদিন করেচি, কিন্তু একটিবারমাত্র ভালবেসেচি। সে ভালবাসার অনেক মূল্য। অনেক শিখেচি, জান ত ভালবাসা এক, আর রূপের মোহ আর। এ দু'য়ে বড় গোল বাধে, আর পুরুষেই বেশী গোল বাধায়। রূপের মোহটা তোমাদের চেয়ে আমাদের নাকি অনেক কম, তাই একদণ্ডেই আমরা তোমাদের মত উন্মত্ত হয়ে উঠিনে। তোমরা এসে যখন ভালবাসা জানাও, কত কথায়, কত ভাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ করে থাকি। অনেক সময় তোমাদের মনে কে-শ দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সঙ্কোচ বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘৃণা বোধ হয়, তখনও হয়ত লজ্জায় বলতে পারিনে-

আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তার পরে একটা বাহ্যিক প্রণয়ের অভিনয় চলে; একদিন, যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষমানুষ রেগে অস্থির হয়ে বলে, কি বিশ্বাসঘাতক! সবাই সেই কথা শোনে, সেই কথাই বোঝে। আমরা তখনও চুপ করে থাকি। মনে কত কে-শ হয়, কিন্তু কে তা দেখতে যায়?

দেবদাস কোন কথা কহিল না। সেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়ত একটা মমতা জন্মায়; স্ত্রীলোক মনে করে এই বুঝি ভালবাসা! শান্ত ধীরভাবে সংসারের কাজকর্ম করে, দুঃখের সময় প্রাণপণে সাহায্য করে, তোমরা কত সুখ্যাতি কর,-মুখে মুখে তার কত ধন্য ধন্য! কিন্তু হয়ত তখনো তার ভালবাসার বর্ণপরিচয় হয় না। তার পরে যদি কোন অশুভ মুহূর্তে তাহার বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছটফট করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন-বলিয়া সে দেবদাসের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তখন তোমরা চিৎকার করে বলে ওঠো-কলঙ্কিনী! ছিঃ ছিঃ!

অকস্মাৎ দেবদাস চন্দ্রমুখীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল-চন্দ্রমুখী, ও কি!

চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই দেবদাস, আমি তোমার পার্বতীর কথা বলচি নে। বলিয়া সে মৌন হইল।

দেবদাসও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কের মত কহিল, কিন্তু কর্তব্য আছে ত! ধর্মাধর্ম আছে ত!

চন্দ্রমুখী বলিল, তা ত আছেই। আর আছে বলেই, দেবদাস, যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য করে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি-যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ-অশান্তি আনতে চায় না। কিন্তু কি বলছিলাম দেবদাস,-আমি নিশ্চয় জানি, পার্বতী তোমাকে একবিন্দুও ঠকায়নি, তুমি আপনাকেই ঠকিয়েচ। আজ এ কথা বোঝবার তোমার সাধ্য নেই আমি

জানি; কিন্তু যদি কখনো সময় আসে, তখন হয়ত দেখতে পাবে আমি সত্য কথাই বলেছিলাম।

দেবদাসের দু'চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কেমন করিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, চন্দ্রমুখীর কথাই সত্য। এই চোখের জল চন্দ্রমুখী দেখিতে পাইল, কিন্তু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। মনে মনে বলিতে লাগিল, তোমাকে আমি অনেকবার অনেক রকমে দেখেচি, আমি তোমার মন জানি। বেশ বুঝেচি, সাধারণ পুরুষের মত তুমি সেধে ভালবাসা জানাতে পারবে না। তবে রূপের কথা-রূপ কে না ভালবাসে? কিন্তু তাই বলেই যে তোমার অতখানি তেজ রূপের পায়ে আত্মবিসর্জন করে ফেলবে, সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পার্বতী হয়ত খুব রূপবতী; কিন্তু, তবে মনে হয়, সে-ই তোমাকে আগে ভালবেসেছিল, আগে সে কথা জানিয়েছিল। মনে মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়িল, নিজেকে দিয়েই বুঝেচি, সে তোমাকে কত ভালবাসে!

দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি বললে? চন্দ্রমুখী কহিল, কিছু না। বলছিলাম যে সে তোমার রূপে ভোলেনি। তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে, সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।-বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি যে কি আকর্ষণ, তা যে কখন তোমাকে ভালবেসেছ সে জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে?

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদৃ বলিতে লাগিল,-এ রূপ ত চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তার পরে দিন শেষ হলে আগুনের সঙ্গে চিতায় ছাই হয়ে যায়।

দেবদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, আজ এ-সব তুমি কি বলচ?

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া বলিল, এমন বিপদ আর নেই দেবদাস, যাকে ভালবাসি না, সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়! কিন্তু আমি শুধু পার্বতীর জন্য ওকালতি করছিলাম-নিজের জন্য নয়।

দেবদাস উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল, এবার আমি যাই।

আর একটু বসো। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি, কখনো এমন করে হাত-দুটি ধরে কথা বলতে পাইনি-এ কি তৃপ্তি! বলিয়াই হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

দেবদাস আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাসলে যে?

ও কিছুই নয়, শুধু একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। সে আজ দশ বছরের কথা-যখন আমি ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে আসি। তখন মনে হতো কত না ভালবাসি, বুঝি প্রাণটাও দিতে পারি। তারপর একদিন তুচ্ছ একটা গয়না নিয়ে দু'জনের এমনি ঝগড়া হয়ে গেল যে, আর কখন কেউ কারো মুখ দেখলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, সে আমাকে মোটেই ভালবাসত না,-নাহলে একটা গয়না দেয় না!

আর একবার চন্দ্রমুখী নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শান্ত গম্ভীরমুখে মৃদু মৃদু কহিল-ছাই গয়না! তখন কি জানতাম একটু সামান্য মাথাধরা সারাবার জন্যেও অকাতরে এই প্রাণটা পর্যন্ত দেওয়া যায়! তখন না বুঝতাম সীতা-দময়ন্তীর ব্যথা, না বিশ্বাস করতাম জগাই-মাধাইয়ের কথা। আচ্ছা দেবদাস, এ জগতে সকলই সম্ভব, না?

দেবদাস কিছুই বলিতে পারিল না; হতবুদ্ধির মত ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি যাই-

ভয় কি, আরো একটু বসো। আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাইনে-সেদিন আমার কেটে গেছে। এখন তুমিও আমাকে যতখানি ঘৃণা কর, আমিও আমাকে ততখানি ঘৃণা করি; কিন্তু দেবদাস একটা বিয়ে কর না কেন?

এতক্ষণে দেবদাসের যেন নিঃশ্বাস পড়িল; একটু হাসিয়া কহিল, উচিত বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না।

না হলেও কর। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেও অনেক শান্তি পাবে। তা ছাড়া আমারও একটা উপায় হয়। তোমার সংসারে দাসীর মত থেকেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারব।

দেবদাস সহাস্যে কহিল, আচ্ছা, তখন তোমাকে ডেকে আনব।

চন্দ্রমুখী তাহার হাসি যেন দেখিতেই পাইল না; কহিল, দেবদাস, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।

কি?

তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইলে কেন?

কোন দোষ হয়েচে কি?

তা জানিনে। কিন্তু নতুন বটে! মদ খেয়ে জ্ঞান না হারালে, কখন ত পূর্বে আমার মুখ দেখতে না!

দেবদাস সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিষণ্নমুখে কহিল, এখন মদ ছুঁতে নেই-আমার পিতার মৃত্যু হয়েচে।

চন্দ্রমুখী বহুক্ষণ করুণচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এর পরে আর খাবে কি?

বলতে পারিনে।

চন্দ্রমুখী তাহার হাত-দুটি আর একটু টানিয়া লইয়া অশ্রু-ব্যাকুলস্বরে কহিল, যদি পার ছেড়ে দিয়ো, অসময়ে এমন সোনার প্রাণ নষ্ট করো না।

দেবদাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি চললাম। যেখানে যাও, সংবাদ দিয়ো-আর যদি কখনও কিছু প্রয়োজন হয়, আমাকে লজ্জা করো না।

চন্দ্রমুখী প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বলিল, আশীর্বাদ কর, যেন সুখী হই। আর একটা ভিক্ষা,-ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন দাসীর প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করো।

আচ্ছা।-বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী যুক্তকরে কাঁদিয়া বলিল, ভগবান! আর একবার যেন দেখা হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৎসর-দুই হইল পার্বতী মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। জলদবালা বুদ্ধিমতী ও কর্মপটু। পার্বতীর পরিবর্তে সংসারের অনেক কাজ সে-ই করে। পার্বতী এখন অন্যদিকে মন দিয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। নিজের ছেলেপুলে নাই বলিয়া পরের ছেলেমেয়েদের উপর তাহার বড় টান। গরীব-দুঃখীর কথা দূরে থাক, যাহাদের কিছু সংস্থান আছে, তাহাদিগের পুত্র-কন্যারও অধিকাংশ ব্যয়ভার সে-ই বহন করে। ইহা ভিন্ন ঠাকুরবাড়ির কাজ করিয়া, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ-খঞ্জের পরিচর্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। স্বামীকে প্রবৃত্তি দিয়া পার্বতী আর একটা অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছে। সেখানে নিরাশ্রয়, অসহায় লোক ইচ্ছামত থাকিতে পারে-জমিদার-সংসার হইতেই তাহার খাওয়া-পরা মিলে। আর একটা কাজ পার্বতী বড় গোপনে করে, স্বামীকেও তাহা জানিতে দেয় না। দরিদ্র ভদ্র-পরিবারে লুকাইয়া অর্থ সাহায্য করে। এটি তাহার নিজের খরচ। স্বামীর নিকট হইতে প্রতি মাসে যাহা পায়, সমস্তই ইহাতে ব্যয় করে। কিন্তু যেমন করিয়া যাহাই ব্যয় হউক, সদর-কাছারির নায়েব-গোমস্তার তাহা জানিতে বাকী থাকে না। নিজেদের মধ্যে তাহারা বলাবলি করিতে থাকে। দাসীরা লুকাইয়া শুনিয়া আসে যে, সংসারে ব্যয় আজকাল ডবলের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে; তহবিল শূন্য-কিছুই জমা হইতেছে না। সংসারে বাজে-খরচ বৃদ্ধি পাইলে দাসদাসীর যেন তাহা মর্মান্তিক হয়। তাহাদের কাছে জলদ এ-সব কথা শুনিতে পায়। একদিন রাত্রে সে স্বামীকে কহিল, তুমি কি এ বাড়ির কেউ নয়?

মহেন্দ্র বলিল, কেন বল দেখি?

স্ত্রী কহিল, দাসদাসীরা দেখতে পায়, আর তুমি পাও না? কর্তার নতুনগিন্নী-অন্ত প্রাণ, তিনি ত আর কিছু বলবেন না; কিন্তু তোমার বলা উচিত।

মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল না, কিন্তু উৎসুক হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, কিসের কথা?

জলদবালা গম্ভীর হইয়া স্বামীকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল-নতুন মার ছেলেমেয়ে নাই, তাঁর কেন সংসারে টান হবে, সব উড়িয়ে দিলেন, দেখতেও পাও না?

মহেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি করে!

জলদ কহিল, তোমার চোখ থাকলে দেখতে পেতে। আজকাল সংসারের দ্বিগুণ খরচ-সদা ব্রত, দান-খয়রাত, অতিথি-ফকির। আচ্ছা, তিনি যেন পরকালের কাজ করচেন; কিন্তু তোমারও ত ছেলেমেয়ে হবে? তখন তারা খাবে কি? নিজের জিনিস বিলিয়ে দিয়ে কি শেষে ভিক্ষে করবে নাকি?

মহেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, তুমি কার কথা বলচ, মার কথা?

জলদ কহিল, আমার পোড়া কপাল যে এ-সব আবার মুখ ফুটে বলতে হয়।

মহেন্দ্র কহিল, তাই তুমি মার নামে নালিশ করতে এসেচ?

জলদ রাগ করিয়া বলিল, আমার নালিশ-মকদ্দমার দরকার নেই। শুধু ভেতরের খবরটা জানিয়ে দিলুম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।

মহেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার বাপের বাড়িতে রোজ হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদারের বাড়ির খরচের ব্যাপার কি বোঝ?

এবার জলদও রাগিয়া উঠিল; বলিল, তোমার মার বাপের বাড়িতেই বা ক'টা অতিথিশালা আছে শুনি?

মহেন্দ্র আর তর্কাতর্কি না করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সকালে উঠিয়া পার্বতীর কাছে আসিয়া কহিল, কি বিয়ে দিলে মা, একে নিয়ে সংসার করাই যে যায় না। আমি কলকাতায় চললুম।

পার্বতী অবাক হইয়া কহিল, কেন বাবা?

তোমাদের নামে কটুকথা বলে-ওকে ত্যাগ করলুম।

পার্বতী কিছুদিন হইতেই বড়বৌয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, সে যে আমার বড় ভাল মেয়ে! তার পর সে জলদকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, বৌমা, ঝগড়া হয়েচে বুঝি?

সকাল হইতেই জলদ স্বামীর কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইয়াছিল, শাশুড়ীর কথায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমারই দোষ মা। কিন্তু ঐ দাসীরাই খরচপত্রের কথা নিয়ে বলাবলি করে।

পার্বতী তখন সমস্ত শুনিল। নিজে লজ্জিত হইয়া বধূর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, বৌমা, তুমি ঠিক বলেচ। কিন্তু আমি মা তেমন সংসারী নই, তাই খরচের দিকটা আমার স্মরণ ছিল না।

তাহার পর মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, বিনাদোষে রাগ করো না-তুমি স্বামী, তোমার মঙ্গলচিন্তার কাছে স্ত্রীর আর সব তুচ্ছ হওয়া উচিত। বৌমা তোমার লক্ষ্মী।

কিন্তু সেইদিন হইতে পার্বতী হাত গুটাইয়া আনিল। অতিথিশালার ঠাকুরবাড়ির আর তেমন সেবা হইল না; অনাথ, অন্ধ, ফকির অনেকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কর্তা শুনিয়া পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, কনেবৌ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ফুরাল নাকি?

পার্বতী সহাস্যে উত্তর দিল, শুধু দিলেই চলবে কেন? দিনকতক জমা করাও ত চাই-দেখচ না, খরচ কত বেড়ে গেছে!

তা যাক। আমার আর ক'দিন। দিনকতক সৎকর্ম করে পরকালের দিকটা দেখা উচিত।

পার্বতী হাসিয়া কহিল, এ যে বড় স্বার্থপরের মত কথা গো! নিজেরটাই দেখবে, আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে যাবে? দিনকতক আবার চুপ করে থাকো, তার পর আবার সব হবে। কাজ মানুষের ত আর ফুরিয়ে যায় না!

কাজেই চৌধুরী মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

পার্বতীর এখন কাজ কমিয়াছে, তাই ভাবনাটা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত ভাবনারই একটা ধরন আছে। যাহার আশা আছে, সে একরকম করিয়া ভাবে; আর যাহার আশা নাই, সে অন্যরকম ভাবে। পূর্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে, সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, দুঃখ আছে, উৎকণ্ঠা আছে; তাই মানুষকে শ্রান্ত করিয়া আনে-বেশীক্ষণ ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশাহীনের সুখ নাই, দুঃখ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ তৃপ্তি আছে। চোখ দিয়া জলও পড়ে, গভীরতাও আছে-কিন্তু নিত্য নূতন করিয়া মর্মভেদ করে না। হালকা মেঘের মত যথা-তথা ভাসিয়া চলে। যেখানে বাতাস লাগে না, সেখানে দাঁড়ায়; আর যেখানে লাগে, সেখান হইতে সরিয়া যায়; তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে। পার্বতীর আজকাল ঠিক তাই হইয়াছে। পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়া অস্থির, উদ্দেশ্যহীন হতাশ মনটা চট্ করিয়া একবার তালসোনাপুরের বাঁশঝাড়, আমবাগান, পাঠশালা-ঘর, বাঁধের পাড় প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে। আবার হয়ত এমন কোন স্থানে লুকাইয়া পড়ে যে, পার্বতী নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আগে হয়ত ঠোঁটের কোণে হাসি আসিয়াছিল, এখন হয়ত একফোঁটা চোখের জল টপ্ করিয়া কোষার জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তবু দিন কাটে। কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবাশুশ্রূষা করিয়াও কাটে, আবার সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও কাটে। কেহ কহে, লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা! কেহ কহে, অন্যমনস্কা উদাসিনী! কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য এক রকমের

পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ থমথমে জোয়ার-গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। বাড়ির কেহ কারণ জানে না, শুধু আমরা জানি। মনোরমা কাল গ্রাম হইতে একখানা পত্র লিখিয়াছে। যাহা লিখিয়াছে, তাহা এইরূপ-

পার্বতী, অনেকদিন হইতে দু'জনের কেহ কাহাকেও পত্র লিখি নাই, সেজন্য দোষটা উভয়তঃ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একটা মিটমাট হইয়া যায়। দু'জনেই দোষ স্বীকার করিয়া অভিমানটা কম করি। কিন্তু আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। ভরসা করি, শীঘ্র উত্তর দিবে। আজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছি। আমরা গৃহস্থঘরের মেয়েরা শারীরিক ভালমন্দ তেমন বুঝি না। মরিলে বলি, গঙ্গায় গিয়াছে; আর বাঁচিয়া থাকিলে বলি, ভাল আছে। আমিও তাই ভাল আছি। কিন্তু এ তো গেল নিজের কথা, বাজে কথা। কাজের কথাও এমন যে কিছু আছে, তাও নয়। তবে একটা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কাল হইতে ভাবিতেছি দিব কিনা। দিলে তোমার কে-শ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না-যেন মারীচের দশা হইয়াছে। দেবদাসের কথা শুনিয়া তোমার ত দুঃখ হইবেই, কিন্তু আমিও যে তোমার কথা মনে করিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে তুমি যে অভিমানিনী, তার হাতে পড়িলে এতদিন হয় জলে ডুবিতে, না হয় বিষ খাইতে। আর তার কথা আজ শুনিলেও শুনিবে, দু'দিন পরে হইলেও শুনিবে, কেননা, যে কথা সংসারসুদ্ধ লোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?

আজ প্রায় ছয়-সাতদিন হইল, সে এখানে আসিয়াছে। তুমি ত জান, জমিদারগৃহিণী কাশীবাসী হইয়াছেন, আর দেবদাস কলিকাতাবাসী হইয়াছে। বাড়ি আসিয়াছে শুধু দাদার সহিত কলহ করিতে, আর টাকা লইতে। শুনিলাম, এমন সে মধ্যে মধ্যে আসে; যতদিন টাকার যোগাড় না হয়, ততদিন থাকে,-টাকা পাইলেই চলিয়া যায়।

তাহার পিতা মরিয়াছেন আজ আড়াই বছর হইল। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, এইটুকু সময়ের মধ্যে সে নাকি তাহার অর্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিজদাস নাকি বড় হিসাবী লোক, তাই কোনমতে পৈতৃক সম্পত্তি নিজে রাখিয়াছে, না হইলে এতদিনে পাঁচজন লুটিয়া লইত। মদ ও বেশ্যায় সর্বস্বান্ত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এক পারে যম! আর তারও বোধ হয় বেশী দেরি নাই। সর্বরক্ষা-যে বিবাহ করেনি।

আহা, দুঃখও হয়। সে সোনার বর্ণ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই-এ যেন আর কেহ! রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, নাক যেন খাঁড়ার মত উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। কি কুৎসিত যে হইয়াছে, তোমাকে আর তা কি বলিব! দেখিলে ঘৃণা হয়, ভয় করে। সমস্ত দিন নদীর ধারে, বাঁধের পাড়ে বন্দুক-হাতে পাখি মারিয়া বেড়ায়। আর রৌদ্রে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে বাঁধের পাড়ে সেই কুলগাছটার তলায় মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ি গিয়া মদ খায়-রাত্রে ঘুমায় কি ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবান জানেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলাম; দেখি দেবদাস বন্দুক-হাতে ধীরে ধীরে শুষ্কমুখে চলিয়া যাইতেছে। আমাকে চিনিতে পারিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,-আমি ত ভয়ে মরি! ঘাটে জনপ্রাণী নাই-আমি সেদিন আর আমাতে ছিলাম না। ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনরূপ মাতলামী কি বদমায়েসী করে নাই। নিরীহ ভদ্রলোকটির মত শান্তভাবে বলিল, ‘মনো, ভাল আছ ত দিদি?’

আমি আর করি কি, ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, ‘হুঁ।’

তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সুখে থাক বোন, তোদের দেখলে বড় আহ-াদ হয়’। তারপর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি উঠি ত পড়ি-প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইলাম। মা গো! ভাগ্যে হাত-টাত কিছু ধরিয়া ফেলে নাই! যাক তার কথা-সে-সব দুর্বৃত্তের কথা লিখিতে গেলে চিঠিতে কুলায় না।

বড় কষ্ট দিলাম কি বোন? আজিও তাহাকে যদি না ভুলিয়া থাক ত কষ্ট হইবেই। কিন্তু উপায় কি? আর, সেজন্য রাঙ্গা পায়ে যদি অপরাধ হইয়া থাকে ত নিজ গুণে তোমার স্নেহকাঙ্ক্ষিণী মনোদিদিকে ক্ষমা করিও।

কাল পত্র আসিয়াছিল। আজ সে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, দুটো পালকি আর বত্রিশ জন কাহার চাই, আমি এখনি তালসোনাপুরে যাব।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, পালকি বেহারা আনিয়ে দিচ্চি, কিন্তু দুটো কেন মা?

পার্বতী কহিল, তুমি সঙ্গে যাবে বাবা। পথে যদি মরি, মুখে আগুন দেবার জন্য বড়ছেলেকে প্রয়োজন। মহেন্দ্র আর কিছু কহিল না। পালকি আসিলে দুইজনে প্রস্থান করিল।

চৌধুরী মহাশয় শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিন্তু কারণ বলিতে পারিল না। তখন তিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া আরও পাঁচ-ছ'জন দরোয়ান, দাসদাসী পাঠাইয়া দিলেন।

একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, পথে দেখা হলে পালকি ফিরিয়া আনতে হবে কি?

তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, না,তাতে কাজ নেই। তোমরা সঙ্গে যেয়ো-যেন কোনো বিপদ-আপদ ঘটে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পর পালকি-দুইটা তালসোনাপুরে পৌঁছিল, কিন্তু দেবদাস গ্রামে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

পার্বতী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, অদৃষ্ট! মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

মনো বলিল, পারু কি দেবদাসকে দেখতে এসেছিলে?

পার্বতী বলিল, না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।

মনোরমা অবাক হইল। কহিল, বলিস কি? লজ্জা করত না?

লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব-তাতে লজ্জা কি?

ছিঃ ছিঃ-ও কি কথা! একটা সম্পর্ক পর্যন্ত নেই-অমন কথা মুখে এনো না।

পার্বতী ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক-আধবার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন তাই এ কথা শুনলে।

পরদিন প্রাতঃকালে পার্বতী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় পালকিতে উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজ দুই বৎসর হইতে অশথঝুরি গ্রামে চন্দ্রমুখী ঘর বাঁধিয়াছে। ছোট নদীর তীরে একটা উঁচু জায়গায় তাহার ঝরঝরে দু'খানি মাটির ঘর; পাশে একটা চালা,তাহাতে কাল রংয়ের একটা পরিপুষ্ট গাভী বাঁধা থাকে। ঘর-দুইটির একটিতে রান্না, ভাঁড়ার; অপরটিতে সে শোয়। উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রমা বাগদীর মেয়ে রোজ নিকাইয়া দিয়া যায়। চতুর্দিকে ভেরেণ্ডার বেড়া, মাঝখানে একটা কুলগাছ, আর একপাশে তুলসীর ঝাড়। সম্মুখে নদীর ঘাট-লোক লাগাইয়া, খেজুর গাছ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে ভিন্ন এ ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। বর্ষার সময় দু'কূল পুরিয়া চন্দ্রমুখীর বাটীর নীচে পর্যন্ত জল আসে। গ্রামের লোক ব্যগ্র হইয়া কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসে। নীচে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া দিয়া যায়। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়ালা, বাগদী, দু'ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর-দুই মুচীর বাস। চন্দ্রমুখী এ গ্রামে আসিয়া দেবদাসকে সংবাদ দেয়; উত্তরে সে আরও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই টাকা চন্দ্রমুখী গ্রামের লোককে ধার দেয়। আপদে-বিপদে সবাই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে-টাকা লইয়া বাড়ি যায়। চন্দ্রমুখী সুদ লয় না-তাহার পরিবর্তে কলাটা, মূলাটা ক্ষেতের শাক-সবজি তাহারা ইচ্ছা করিয়া দিয়া যায়; আসলের জন্যও কখনো পীড়াপীড়ি করে না। যে দিতে পারে না, সে দেয় না।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলে, আর তোকে কখনও দেব না।

সে নম্রভাবে বলে, মা ঠাকরুন, আশীর্বাদ কর, এবার যেন ভাল ফসল হয়।

চন্দ্রমুখী আশীর্বাদ করে। আবার হয়ত ভাল ফসল হয় না, খাজনার তাগাদা পড়ে- আবার আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়-চন্দ্রমুখী আবার দেয়। মনে মনে হাসিয়া বলে, তিনি বাঁচিয়া থাকুন, আমার টাকার ভাবনা কি!

কিন্তু তিনি কোথায়! প্রায় ছয় মাস হইল, সে কোন সংবাদ পায় নাই। চিঠি লিখিলে জবাব আসে না, রেজেষ্ট্রি করিয়া দিলে ফিরিয়া আসে। একঘর গয়লাকে চন্দ্রমুখী নিজের বাটীর কাছে বসাইয়াছে, তাহার পুত্রের বিবাহে সাড়ে-দশ গণ্ডা টাকা পণ দিয়াছে, একজোড়া লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছে। তাহারা সপরিবারে চন্দ্রমুখীর আশ্রিত এবং নিতান্ত অনুগত। একদিন সকালবেলা চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, তালসোনাপুর এখান থেকে কতদূর জানো?

ভৈরব চিন্তা করিয়া কহিল, দুটো মাঠ পার হলেই কাছারি।

চন্দ্রমুখী প্রশ্ন করিল, সেখানে বুঝি জমিদার থাকেন?

ভৈরব কহিল, হাঁ, তিনি মুলুকের জমিদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিন বছর হল তিনি স্বর্গে গিয়াছেন; যত প্রজা একমাস ধরে সেখানে নুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তাঁর দুই ছেলে আছে, মস্ত বড়লোক-রাজা।

চন্দ্রমুখী কহিল, ভৈরব, আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার?

ভৈরব বলিল, কেন পারব না মা, যেদিন ইচ্ছা চল।

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া বলিল, তবে চল না কেন ভৈরব, আমরা আজই যাই।

ভৈরব বিস্মিত হইয়া কহিল, আজই? তারপর চন্দ্রমুখীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা হলে মা তুমি শিগগির রান্না করে নাও, আমিও দুটো মুড়ি বেঁধে নিই।

চন্দ্রমুখী বলিল, আমি আর রান্না করব না ভৈরব, তুমি মুড়ি বেঁধে নাও।

ভৈরব বাড়ি গিয়া কিছু মুড়ি ও গুড় চাদরে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিল। একগাছা লাঠি হাতে লইয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তবে চল; কিন্তু তুমি কিছু খাবে না মা?

চন্দ্রমুখী বলিল, না ভৈরব, আমার এখনো পূজা-আহ্নিক হয়নি; যদি সময় পাই ত সেখানে গিয়ে ও-সব করব।

ভৈরব আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। পিছনে চন্দ্রমুখী বহু কষ্টে আলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অনভ্যস্ত কোমল পা-দুটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইল, রৌদ্রে সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্নানাহার কিছুই হয় নাই; তবু চন্দ্রমুখী মাঠের পর মাঠ পার হইয়া চলিতে লাগিল। মাঠের কৃষকেরা আশ্চর্য হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রমুখীর পরিধানে একখানা লালপেড়ে কাপড়, হাতে দু'গাছা বালা, মাথায় কপালের উপর পর্যন্ত আধ-ঘোমটা; সমস্ত দেহ একখানা মোটা বিছানার চাদরে আবৃত। সূর্যদেবের অস্ত যাইতে যখন আর অধিক বিল' নাই,সেই সময়ে দুইজনে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রমুখী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভৈরব, তোমার দুটো মাঠ এতক্ষণে কি শেষ হল?

ভৈরব পরিহাসটা বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে বলিল, মাঠাকরুন, এইবার এসেচি; কিন্তু তোমাদের এই সুখী শরীরে আজ কি আর ফিরে যেতে পারবে?

চন্দ্রমুখী মনে মনে বলিল, আজ কেন, কালও বোধ করি এ পথ হাঁটতে পারব না।

প্রকাশ্যে কহিল, ভৈরব, গাড়ি পাওয়া যায় না?

ভৈরব বলিল, যায় বৈ কি মা, গরুর গাড়ি ঠিক করব?

গাড়ি ঠিক করিতে আদেশ করিয়া চন্দ্রমুখী জমিদারবাটী প্রবেশ করিল।

ভৈরব গাড়ির বন্দোবস্তে অন্যদিকে গেল। অন্দরে উপরের বারান্দায় বড়বৌ (আজকাল জমিদারগৃহিণী) বসিয়া ছিলেন। একজন দাসী সেইখানে চন্দ্রমুখীকে লইয়া উপস্থিত করিল। উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিল।

চন্দ্রমুখী নমস্কার করিল। বড়বধূর দেহে অলঙ্কার ধরে না, চোখের কোণ দিয়া অহঙ্কার ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠোঁট-দুটা ও দাঁতগুলা পান ও মিসিতে প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে। একদিকের গাল উঁচু, বোধ হয় দোক্তা আর পানে ভরা আছে। এমন টান করিয়া চুল বাঁধা যে খোঁপাটা মাথার ডগায় উঠিয়াছে। দু'কানে ছোট বড় বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। নাকের একদিকে নাকচাবি, অপর দিকে মস্ত ফুটা-বোধ হয় শাশুড়ির আমলে তাহাতে নথ পরা হইত।

চন্দ্রমুখী দেখিল, বড়বৌয়ের বেশ মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেহ, বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ, গোল ধরনের মুখ-পরনে কালাপেড়ে শাড়ি, গায়ে একটা দামী জামা-সেইটা দেখিয়া চন্দ্রমুখীর ঘৃণা বোধ হইল। আর বড়বৌ দেখিলেন, চন্দ্রমুখীর বয়স হইলেও শরীরে রূপ ধরে না। দু'জনেই বোধ করি সমবয়সী, কিন্তু বড়বৌ মনে মনে তাহা স্বীকার করিলেন না। এ গ্রামে পার্বতী ভিন্ন অতখানি রূপ তিনি আর কাহারও দেখেন নাই। আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে গা?

চন্দ্রমুখী কহিল, আমি আপনারই একজন প্রজা; কিছু খাজনা বাকী পড়েচে তাই দিতে এসেচি।

বড়বৌ মনে মনে খুশী হইয়া বলিলেন, তা এখানে কেন? কাছারিবাড়ি যাও না।

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া কহিল, মা, আমরা দুঃখী মানুষ, সব খাজনা ত দিতে পারিনে। শুনেচি, আপনার বড় দয়া; তাই আপনার কাছেই এসেচি, দয়া করে কিছু মাপ করে দেন।

এরূপ কথা বড়বৌ জীবনে এই প্রথম শুনিলেন। তাঁর দয়া আছে, খাজনা মাপ করিতে পারেন-কাজেই চন্দ্রমুখী একেবারে প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িল। বড়বৌ কহিলেন, তা বাছা, দিনের মধ্যে এমন কত টাকা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়, কত লোক আমাকে ধরে; আমি না বলতে পারি না, এজন্য কর্তা আমার উপর কত রাগ করেন।-তা তোমার কত টাকা বাকী পড়েচে?

বেশী নয় মা, মোটে দু'টাকা; কিন্তু আমাদের কাছে তাই যেন পাহাড়; সমস্ত দিন আজ পথ চলে এসেচি।

বড়বৌ কহিলেন, আহা, তোমরা দুঃখী লোক, আমাদের দয়া করাই উচিত। ও বিন্দু, একে বাইরে নিয়ে যা, দেওয়ানমশাইকে আমার নাম করে বলে দে, যেন দু'টাকা মাপ করা হয়। তা বাছা, তোমার বাড়ি কোথায়?

চন্দ্রমুখী বলিল, আপনারই রাজত্বে-ওই অশথঝুরি গাঁয়ে। আচ্ছা মা, কর্তারা এখন দু'শরিক, না?

বড়বৌ বলিলেন, পোড়া কপাল! ছোট শরিক আর কি আছে? দু'দিন পরে আমারই সব হবে।

চন্দ্রমুখী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা? ছোটবাবুর বুঝি ধার-কর্জ?

বড়বৌ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কাছে সব বাঁধা। ঠাকুরপো একেবারে ব'য়ে গেছে! কলকাতায় মদ-বেশ্যা এই নিয়েই আছে। কত টাকা উড়িয়ে দিলে তার কি আদি-অন্ত আছে!

চন্দ্রমুখীর মুখ শুকাইল, একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ মা, ছোটবাবু কি তাহলে বাড়িও আসেন না?

বড়বৌ বলিলেন, আসবে না কেন! যখন টাকার দরকার হয়, আসে। ধার করে, বিষয় দেয়-চলে যায়। এই মাস-দুই হল এসে বার হাজার টাকা নিয়ে গেছে। বাঁচবার আকারও নেই, গা-ময় কুচ্ছিত রোগ জন্মেচে-ছিঃ ছিঃ-

চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিল-মলিনমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?

বড়বৌ কপালে একটা করাঘাত করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, পোড়া দশা! তা কেউ কি জানে? কোথায় কোন্ হোটেলে খায়-যার-তার বাড়িতে পড়ে থাকে-সেই জানে,-আর যম জানে।

চন্দ্রমুখী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি যাই-

বড়বৌ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, যাবে? ওরে ও বিন্দু-

চন্দ্রমুখী বাধা দিয়া বলিল, থাক মা, আমি আপনিই কাছারিতে যেতে পারব, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া দেখিল, ভৈরব অপেক্ষা করিয়া আছে-গো-শকট প্রস্তুত। সেই রাত্রে চন্দ্রমুখী বাটী ফিরিয়া আসিল। সকালবেলা ভৈরবকে আবার ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, আমি আজ কলকাতায় যাব; তুমি ত যেতে পারবে না, তাই তোমার ছেলেকে সঙ্গে নেব, কি বল?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় কেন মা, বিশেষ কোন কাজ আছে কি?

হাঁ ভৈরব, বিশেষ কাজ আছে।

আবার কবে আসবে মা?

সে কথা বলতে পারিনে ভৈরব। হয়ত শীঘ্র ফিরে আসব, হয়ত-বা দেরি হবে। আর যদি না আসি, এ সব ঘরবাড়ি তোমার রইল।

প্রথমে ভৈরব অবাক হইয়া গেল। তাহার পর তাহার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। কহিল, ও কি কথা মা! তুমি না এলে এ গাঁয়ে লোক যে কেউ বাঁচবে না।

চন্দ্রমুখী সজলচক্ষে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকি ভৈরব, আমি দু'বছর হল এখানে এসেচি। তার পূর্বে কি তোমরা বেঁচে ছিলে না?

ইহার উত্তর মূর্খ ভৈরব দিতে পারিল না, কিন্তু চন্দ্রমুখী অন্তরে সমস্তই বুঝিল। ভৈরবের ছেলে কেল্লা শুধু সঙ্গে যাইবে। গাড়িতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময় পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে

লাগিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা! দেবদাসের জন্য না হইলে কলিকাতার রানীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।

পরদিন সে ক্ষেত্রমণির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্বের বাসাতে এখন অন্য লোক আসিয়াছে। ক্ষেত্রমণি অবাক হইয়া গেল-দিদি যে! কোথায় ছিলে এতদিন?

চন্দ্রমুখী সত্য গোপন করিয়া বলিল, এলাহাবাদে ছিলাম।

ক্ষেত্রমণি ভাল করিয়া নজর দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, তোমার গহনাগাঁটি কি হল দিদি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সব আছে।

সেই দিন মুদীর সহিত দেখা করিয়া কহিল, দয়াল, কত টাকা আমি পাব?

দয়াল বিপদে পড়িল-তা বাছা, প্রায় ষাট-সত্তর টাকা। আজ না হোক দু'দিন পরে দিব।

তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যদি আমার কিছু কাজ করে দাও।

কি কাজ?

দু' দিন খাটতে হবে এই মাত্র। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া করবে-বুঝলে?

দয়াল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি বাছা।

ভাল বাড়ি। বেশ ভাল বিছানা, বালিশ, চাদর, আলো, ছবি, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল-বুঝলে?

দয়াল মাথা নাড়িল।

আরশি, চিরুনি, রং-করা দু'জোড়া কাপড়, গায়ের জামা, আর-ভাল গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায় জান?

দয়াল মুদী ঠিকানা বলিয়া দিল।

চন্দ্রমুখী কহিল, তবে তাও এক সেট ভাল দেখে কিনতে হবে-আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে নেব। তারপর হাসিয়া কহিল, আমাদের যা চাই, জানো ত সব,-একজন ঝিও ঠিক করতে হবে।

দয়াল কহিল, কবে চাই বাছা?

যত শীঘ্র হয়। দু’-তিন দিনের মধ্যে হলেই ভাল হয়। বলিয়া চন্দ্রমুখী তাহার হাতে একশত টাকার নোট দিয়া কহিল,-ভালো জিনিস নিয়ো, সস্তা করো না।

তৃতীয় দিবসে সে নূতন বাটীতে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলরামকে লইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল এবং সন্ধ্যার পূর্বে আপনি সাজিতে বসিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া তাহাতে পাউডার দিল, আলতা গুলিয়া পায়ে দিল, পান খাইয়া ওষ্ঠ রঞ্জিত করিল। তাহার পর সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়া জামা আঁটিয়া রং-করা কাপড় পরিল; বহুদিন পরে চুল বাঁধিয়া আবার টিপ পরিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, পোড়া অদৃষ্টে আরও কি আছে!

পাড়াগাঁয়ের ছেলে কেবলরাম সহসা এই অভিনব সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল; দিদি, এ কি!

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, কেবল, আজ আমার বর আসবে।

কেবলরাম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রমণি বেড়াইতে আসিল,-দিদি, এ আবার কি?

চন্দ্রমুখী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, এ-সব চাই ত আবার!

ক্ষেত্রমণি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিদির যত বয়স বাড়চে, রূপও তত বাড়চে।

সে চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী বহুদিন পূর্বের মত আবার জানালার পার্শ্বে উপবেশন করিল। নির্নিমেষচক্ষে রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। এই তাহার কাজ;

এই করিতে সে আসিয়াছে-যতদিন এখানে থাকিবে, ততদিন ইহাই করিবে। নূতন লোক কেহ হয়ত আসিতে চায়, দ্বার ঠেলাঠেলি করে; কেবলরাম মুখস্থর মত ভিতর হইতে কহে-এখানে নয়।

পুরাতন পরিচিত কেহ বা আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রমুখী বসাইয়া হাসিয়া কথা কহে, কথায় কথায় দেবদাসের কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহারা বলিতে পারে না-অমনি বিদায় করিয়া দেয়। রাত্রি অধিক হইলে নিজে বাহির হইয়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যে দ্বারে দ্বারে কান পাতিয়া কথাবার্তা শুনিতে চায়-নানা লোকে নানা কথা বলে, যাহা শুনিতে চায়, তাহা কিন্তু শোনা যায় না-কেহ বা মুখ ঢাকিয়া হঠাৎ মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়-স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়ায়-শশব্যস্ত চন্দ্রমুখী সরিয়া যায়। দুপুরবেলা পুরাতন পরিচিত সঙ্গিনীদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় প্রশ্ন করে,-কেহ দেবদাসকে জান?

তাহারা জিজ্ঞাসা করে, কে দেবদাস?

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া পরিচয় দিতে থাকে-গৌরবর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল, কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ, বড়লোক-অজস্র টাকা খরচ করে, কেউ চেন কি?

কেহই সন্ধান দিতে পারে না। হতাশ বিষণ্নমুখে চন্দ্রমুখী বাড়ি ফিরিয়া যায়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া থাকে। ঘুম পাইলে বিরক্ত হয়; মনে মনে কহে, এ কি তোমার ঘুমাইবার সময়?

ক্রমে একমাস অতীত হইল, কেবলরামও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রমুখীর নিজেরও সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি সে এখানে নাই। তবুও আশায় ভর করিয়া দেবতার চরণে কায়মনে প্রার্থনা করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

কলিকাতা আসিবার পর দেড়মাস গত হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। রাত্রি তখন এগারোটা-হতাশমনে বাড়ি ফিরিতেছিল, দেখিতে পাইল, পথের ধারে একটা ঘরের সম্মুখে একজন আপনার মনে কি বলিতেছে। চন্দ্রমুখীর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর যে পরিচিত! কোটি-কোটি লোকের মধ্যেও চন্দ্রমুখী সে স্বর বুঝিতে পারিত। স্থানটা একটু অন্ধকার, তাহাতে আবার লোকটা অত্যন্ত মাতাল হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। চন্দ্রমুখী নিকটে গিয়া হাত দিল-তুমি কে গা, এমন করে পড়ে আছ?

লোকটা সুর করিয়া বলিল,-শুন সই, মনের মানুষ কই; যদি পাই কানু হেন স্বামী-

চন্দ্রমুখীর আর সন্দেহ নাই, ডাকিল, দেবদাস?

দেবদাস সেইভাবে বলিল, উঁ।

এখানে পড়ে কেন, ঘরে যাবে?

না, বেশ আছি-

একটু মদ খাবে?

'খাব' বলিয়া সে একেবারে চন্দ্রমুখীর গলা জড়াইয়া ধরিল, কহিল-এমন বন্ধু কে বাবা তুমি?

চন্দ্রমুখীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন বহু পরিশ্রমে টলিয়া টলিয়া তাহার গলা ধরিয়া কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাঃ, এ যে খাসা জিনিস!

চন্দ্রমুখীর কান্নায় হাসি মিশিল; কহিল, হাঁ; বেশ জিনিস; এখন আপাতত আমার কাঁধে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে চল, একটা গাড়ি চাই ত!

তা চাই বৈ কি! পথে আসিতে আসিতে দেবদাস জড়িতকণ্ঠে কহিল, সুন্দরী, আমাকে তুমি চেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, চিনি।

দেবদাস গাহিয়া উঠিল,-অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি-তাহার পর গাড়িতে বসিয়া চন্দ্রমুখীর কাঁধে ভর দিয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, সুন্দরী! কুড়িয়ে ত আনলে, কিন্তু পকেটে যে কিছু নেই-

চন্দ্রমুখী নীরবে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একেবারে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল, ঘুমোও।

দেবদাস তেমনি জড়িতকণ্ঠে কহিল, কিছু মতলব আছে নাকি? এই যে বললাম পকেট খালি,-কিছু আশা নেই। বুঝলে রূপসী!

রূপসী তাহা বুঝিয়াছিল; কহিল, কাল দিয়ো।

দেবদাস বলিল, এতটা বিশ্বাস ত ভাল নয়-কি চাও খুলে বল দেখি?

চন্দ্রমুখী কহিল, কাল শুনো-বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দেবদাসের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়াছিল। ঘরে কেহ ছিল না।

চন্দ্রমুখী স্নান করিয়া নীচে রান্নার উদ্যোগে গিয়াছে। দেবদাস চাহিয়া দেখিল, এ ঘরে কখন সে আসে নাই, একটি জিনিসও চিনিতে পারিল না। তাহার গত রাত্রের কোন কথাই মনে পড়িল না; শুধু স্মরণ হইল কাহার একটা আন্তরিক সেবা। কে যেন বড় স্নেহ করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সময়ে চন্দ্রমুখী ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রের সাজসজ্জার সে অনেকখানি পরিবর্তন করিয়াছিল। গায়ে গহনাগুলি ছিল বটে, কিন্তু পরনে রঙ্গিন কাপড়, কপালে টিপ, মুখে পানের দাগ-এ-সকল ছিল না। নিতান্তই একখানি সাদাসিধা কাপড় পরিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেবদাস মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, কোথা থেকে কাল আমাকে ডাকাতি করে আনলে?

চন্দ্রমুখী বলিল, ডাকাতি করিনি-পথ থেকে শুধু কুড়িয়ে এনেছিলাম।

দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, তা যেন হল, কিন্তু তোমার আবার এ-সব কি! কবে এলে? গায়ে যে গয়না ধরে না-দিলে কে?

চন্দ্রমুখী দেবদাসের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আবার!

দেবদাস হাসিয়া কহিল, না না-তা নয়; একটা তামাশা করতেও কি দোষ? এলে কবে?

চন্দ্রমুখী বলিল, দেড়-মাস হল।

দেবদাস মনে মনে যেন কি হিসাব করিল। পরে কহিল, আমাদের বাড়ি যখন গিয়েছিলে, তার পরেই এসেচ?

চন্দ্রমুখী বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম-কি করে জানলে?

দেবদাস কহিল, তুমি যাবার পরেই আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। একজন দাসী-যে তোমাকে বৌঠাকরুনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছেই শুনতে পাই,-কাল অশথঝুরি গাঁ থেকে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল, সে ভারী সুন্দরী। আর কি বুঝতে বাকী থাকে! কিন্তু এত গয়না আবার গড়ালে কেন?

চন্দ্রমুখী বলিল, গড়াই নি, এ-সব গিল্টির গয়না, কলকাতায় এসে কিনেচি। তবুও দেখ দেখি, তোমার জন্য আমার কত বাজে খরচ করতে হল! অথচ কাল আমাকে তুমি চিনতেও পারলে না।

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; বলিল, একেবারে চিনতে পারিনি, কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিল, আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এত যত্ন কার?

আনন্দে চন্দ্রমুখীর কাঁদিতে সাধ হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেবদাস, আমাকে আর তত ঘৃণা কর না-না?

দেবদাস জবাব দিল, না। বরং ভালবাসি।

দুপুরবেলা স্নান করিবার সময় চন্দ্রমুখী দেখিল, দেবদাসের পেটে একখণ্ড ফ-ানেল বাঁধা আছে। ভয় পাইয়া বলিল, ও কি, ফ্লানেল বেঁধেছ কেন?

দেবদাস বলিল, পেটে একটু ব্যথা বোধ করি-তুমি অমন করচ কেন?

চন্দ্রমুখী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, সর্বনাশ করনি ত? লিভারে ব্যথা হয়নি ত?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, চন্দ্রমুখী, বোধ হয় তাই হয়েচে।

সেইদিন ডাক্তার আসিয়া বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়া গেলেন, ঔষধ দিলেন, এবং জানাইলেন যে যথেষ্ট সাবধানে না থাকিলে বিষম অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অর্থ উভয়েই বুঝিল। বাসায় সংবাদ দিয়া ধর্মদাসকে আনা হইল, চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনা হইল। দু'দিন অমনি গেল, কিন্তু তৃতীয় দিনে তাহার জ্বর দেখা দিল।

দেবদাস চন্দ্রমুখীকে ডাকিয়া কহিল, খুব সময়ে এসেছিলে, নাহলে হয়ত আর দেখতেই পেতে না।

চোখ মুছিয়া চন্দ্রমুখী প্রাণপণে সেবা করিতে বসিল। যুক্তকরে প্রার্থনা করিল, ভগবান, অসময়ে এতখানি কাজে লাগিব, এ আশা স্বপ্নেও করি নাই, কিন্তু দেবদাসকে ভাল করিয়া দাও।

প্রায় মাসাধিক কাল দেবদাস শয্যায় পড়িয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল, অসুখ তেমন গুরুতর হইতে পারিল না।

এই সময়ে একদিন দেবদাস কহিল, চন্দ্রমুখী, তোমার নামটা মস্ত বড়, সর্বদা ডাকতে অসুবিধা হয়,-একটু ছোট করে নিতে চাই।

চন্দ্রমুখী বলিল, বেশ ত।

দেবদাস কহিল, তবে আজ থেকে তোমাকে বৌ বলে ডাকব।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া উঠিল। কহিল, তা যেন ডাকলে কিন্তু একটা মানে থাকা ত চাই।

সব কথার কি মানে থাকে?

যদি সাধ হয়ে থাকে, তাই ডেকো, কিন্তু এ সাধ কেন তাও বলবে না?

না; কখনো কারণ জিজ্ঞাসা করতেও পাবে না।

চন্দ্রমুখী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তাই হবে।

দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে যে এত প্রাণপণে আমার সেবা করচ?

চন্দ্রমুখী লজ্জাবনত বধূ নহে, অ-বাক্পটু বালিকাও নহে; মুখপানে স্থির শান্ত দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহজড়িতকণ্ঠে কহিল, তুমি আমার সর্বস্ব-তা কি আজও বুঝতে পারনি!

দেবদাস দেয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল। সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তা পেরেচি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনে। পার্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে, কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনো এ-সব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছে করে দিইও নি। কিন্তু তুমি এমন কেন করলে? জোর করে আমাকে কেন বাঁধলে? বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, বৌ, তুমিও হয়ত পার্বতীর মতই কষ্ট পাবে।

চন্দ্রমুখী মুখে অঞ্চল দিয়া শয্যার একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমাদের দু'জনে কত অমিল, আবার কত মিল। একজন অভিমানী, উদ্ধত, আর একজন কত শান্ত, কত সংযত। সে কিছুই সইতে পারে না, আর তোমার কত সহ্য! তার কত যশ, কত সুনাম, আর তোমার কত কলঙ্ক! সবাই তাকে কত ভালবাসে, আর কেউ তোমাকে ভালবাসে না। তবে আমি ভালবাসি, বাসি বৈ কি! বলিয়া মোটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল, পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা তোমার কি বিচার করবেন জানিনে; কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনো তোমা হতে দূরে থাকতে পারব না।

চন্দ্রমুখে নীরবে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, ভগবান, কোনকালে, কোন জন্মে যদি এ পাপিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে যেন এই পুরস্কার দিয়ো।

মাস-দুই অতিবাহিত হইয়াছে। দেবদাস আরোগ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু শরীর সারে নাই। বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক। কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সঙ্গে শুধু ধর্মদাস যাইবে।

চন্দ্রমুখী ধরিয়া বসিয়াছিল, তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।

দেবদাস বলিল, ছিঃ, তা হয় না! আর যাই করি, এতবড় নির্লজ্জ হতে পারব না।

চন্দ্রমুখী একেবারে মৌন হইয়া গেল। সে অবুঝ নয়, তাই সহজেই বুঝিল। আর যাহাই হোক, এ জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না। চোখ মুছিয়া কহিল, আবার কবে দেখা পাব?

দেবদাস কহিল, বলতে পারিনে, তবে বেঁচে থাকতে তোমাকে কোনদিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৃষ্ণা আমার কখনো মিটবে না।

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী সরিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি বলিল, এই আমার যথেষ্ট। এর বেশী আশা করিনে।

যাবার সময় দেবদাস আরও দু'হাজার টাকা চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়া কহিল, রেখে দাও। মানুষের শরীরে ত বিশ্বাস নেই; শেষে তুমি কি অকূলে ভাসবে!

চন্দ্রমুখী ইহাও বুঝিল, তাই হাত পাতিয়া অর্থ গ্রহণ করিল। চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একটি কথা আমাকে বলে যাও-

দেবদাস মুখপানে চাহিয়া বলিল,কি?

চন্দ্রমুখী কহিল, বড়বৌঠাকরুন বলেছিলেন, তোমার শরীরে খারাপ রোগ জন্মেচে-এ কি সত্য?

প্রশ্ন শুনিয়া দেবদাস দুঃখিত হইল; কহিল, বড়বৌ সব পারেন; কিন্তু তাহলে তুমি জানতে না? আমার কোন্ কথা তোমার জানা নেই? এ বিষয়ে তুমি যে পার্বতীরও বেশী।

চন্দ্রমুখী আর একবার চোখ মুছিয়া কহিল, বাঁচলুম। কিন্তু তবুও খুব সাবধানে থেকো। তোমার শরীর একে মন্দ, তার ওপর দেখো, কোনদিন ভুল করে বসো না।

প্রত্যুত্তরে দেবদাস শুধু হাসিল, কথা কহিল না।

চন্দ্রমুখী কহিল, আর একটি ভিক্ষে-দেহ এতটুকু খারাপ হলেই আমাকে খবর দেবে বল?

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল-দেব বৈ কি বৌ!

আর একবার প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী কাঁদিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন যখন দেবদাস এলাহাবাদে বাস করিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন সে চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখিয়াছিল, বৌ, মনে করেছিলাম, আর কখনো ভালবাসব না। একে ত ভালবেসে শুধুহাতে ফিরে আসাটাই বড় যাতনা, তার পরে আবার নূতন করে ভালবাসতে যাওয়ার মত বিড়'না সংসারে আর নেই।

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রমুখী কি লিখিয়াছিল তাহাতে আবশ্যক নাই; কিন্তু এই সময়টায় দেবদাসের কেবলই মনে হইত, সে একবার এলে হয় না!

পরক্ষণে সভয়ে ভাবিত-না, না, কাজ নেই,-কোনদিন পার্বতী যদি জানতে পারে! এমনি করিয়া একবার পার্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয়রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দু'জনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিত-যেন উভয়ের কত ভাব!

মনের মাঝে দু'জনেই পাশাপাশি বিরাজ করিত। কোনদিন বা অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইত, তাহারা দু'জনেই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই সময়টায় মনটা তাহার এমনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িত যে, শুধু একটা নির্জীব অতৃপ্তিই তাহার মনের মধ্যে মিথ্যা প্রতিধ্বনির মত ঘুরিয়া বেড়াইত। তার পরে দেবদাস লাহোরে চলিয়া গেল। এখানে চুনিলাল কাজ করিতেছিল, সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিল। বহুদিন পরে দেবদাস সুরা স্পর্শ করিল। চন্দ্রমুখীকে মনে পড়ে, সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। মনে হয়, তার কত বুদ্ধি। সে কত শান্ত, ধীর; আর তার কত স্নেহ। পার্বতী এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল-শুধু নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত কখনো কখনো জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাহার সহিল না। মাঝে মাঝে অসুখ হয়, পেটের কাছে আবার যেন ব্যথা বোধ হয়। ধর্মদাস

একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, দেব্তা, তোমার শরীর আবার খারাপ হচ্চে-আর কোথাও চল।

দেবদাস অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, চল যাই।

দেবদাস প্রায় বাসাতে মদ খায় না। চুনিলাল আসিলে কোনদিন খায়, কোন দিন বাহির হইয়া চলিয়া যায়। রাত্রিশেষে বাটী ফিরিয়া আসে, কোন রাত্রি বা একেবারেই আসে না। আজ দুইদিন হইতে হঠাৎ তাহার দেখা নাই। কাঁদিয়া ধর্মদাস অন্নজল স্পর্শ করিল না। তৃতীয় দিনে দেবদাস জ্বর লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল; শয্যা লইল, আর উঠিতে পারিল না। তিন-চারিজন ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল।

ধর্মদাস কহিল, দেব্তা, কাশীতে মাকে খবর দিই-

দেবদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল, ছিঃ ছিঃ-মাকে কি এ মুখ দেখাতে পারি?

ধর্মদাস প্রতিবাদ করিল, রোগ-শোক সকলেরই আছে; কিন্তু তাই বলে কি এতবড় বিপদের দিনে মাকে লুকানো যায়? তোমার কোন লজ্জা নাই, দেব্তা, কাশীতে চল।

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া কহিল, না, ধর্মদাস, এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাল হই, তার পরে।

ধর্মদাস একবার মনে করিল, চন্দ্রমুখীর উল্লেখ করে; কিন্তু নিজে তাহাকে এত ঘৃণা করিত যে, তাহার মুখ মনে পড়িবামাত্রই চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাসের নিজেরও অনেকবার এ কথা মনে হইত; কিন্তু কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কেহই আসিল না। তার পর অনেক দিনে সে ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল। একদিন সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, চল ধর্মদাস, এইবার আর কোথাও যাই।

আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই ভাই, হয় বাড়ি চল, না হয় মায়ের কাছে চল।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া চুনিলালের নিকট বিদায় লইয়া, দেবদাস আবার এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল-শরীরটা অনেকটা ভাল। কিছুদিন থাকিবার পর একদিন দেবদাস কহিল, ধর্ম কোন নূতন জায়গায় গেলে হয় না? কখনো বো'ম্বাই দেখিনি , যাবে?

আগ্রহ দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্মদাস মত দিল। সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস; বো'ম্বাই শহর তেমন গরম নয়। এখানে আসিয়া দেবদাস অনেকটা সারিয়া উঠিল।

ধর্মদাস জিজ্ঞাসা করিল, এখন বাড়ি গেলে হয় না?

দেবদাস কহিল, না, বেশ আছি। আমি এখানেই আর কিছুদিন থাকব।

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাসের সকালবেলায়, একদিন দেবদাস ধর্মদাসের কাঁধে ভর দিয়া বো'ম্বাই হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে আসিয়া বসিল। ধর্মদাস কহিল, দেব্‌তা, আমি বলি, মায়ের কাছে যাওয়া ভাল।

দেবদাসের দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল-আজ কয়দিন হইতে মাকে তাহার কেবল মনে পড়িতেছিল। হাসপাতালে পড়িয়া যখন তখন এই কথাই ভাবিয়াছে,- এ সংসারে তাহার সবই আছে, অথচ কেহই নাই। তাহার মা আছেন, বড় ভাই আছেন, ভগিনীর অধিক পার্বতী আছে-চন্দ্রমুখীও আছে! তাহার সবাই আছে, কিন্তু সে আর কাহারও নাই। ধর্মদাসও কাঁদিতেছিল; কহিল, তাহলে দাদা, মায়ের কাছে যাওয়াই স্থির?

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিল; বলিল, না ধর্মদাস, মাকে এ মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না,-আমার এখনো বোধ করি সে সময় আসেনি।

বৃদ্ধ ধর্মদাস হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, দাদা, এখনো যে মা বেঁচে আছেন!

কথাটায় কতখানি যে প্রকাশ করিল, তাহা অন্তরে উভয়েই অনুভব করিল। দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্লীহা-লিভারে পরিপূর্ণ; তাহার উপর জ্বর, কাশি। রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অস্থিচর্মসার। চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করিতেছে। মাথায় চুল রুক্ষ ও ঋজু-চেষ্টা করিলে বোধ হয় গুণিতে পারা যায়। হাতের আঙ্গুলগুলার পানে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়-একে শীর্ণ, তাহাতে আবার কুৎসিত ব্যাধির দাগে দুষ্ট। স্টেশনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার টিকিট কিনব দেবদা?

দেবদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, চল বাড়ি যাই-তার পর সব হবে।

গাড়ির সময় হইলে তাহারা হুগলির টিকিট কিনিয়া চাপিয়া বসিল।

ধর্মদাস দেবদাসের নিকটেই রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে দেবদাসের চোখ জ্বালা করিয়া আবার জ্বর আসিল। ধর্মদাসকে ডাকিয়া কহিল,ধর্মদাস, আজ মনে হচ্চে, বাড়ি পৌঁছনও হয়ত কঠিন হবে।

ধর্মদাস সভয়ে কহিল, কেন দাদা?

দেবদাস হাসিবার চেষ্টা করিয়া শুধু বলিল, আবার যে জ্বর হল, ধর্মদাস।

কাশীর পথ যখন পার হইয়া গেল, দেবদাস তখন জ্বরে অচেতন। পাটনার কাছাকাছি তাহার হুঁশ হইল, কহিল, তাইত ধর্মদাস, মায়ের কাছে যাওয়া সত্যিই আর ঘটল না।

ধর্মদাস কহিল, চল দাদা, আমরা পাটনায় নেমে গিয়ে ডাক্তার দেখাই-

উত্তরে দেবদাস বলিল, না থাক, আমরা বাড়ি যাই চল।

গাড়ি যখন পাণ্ডুয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোর হইতেছে। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল, এখন থামিয়াছে। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। নীচে

ধর্মদাস নিদ্রিত। ধীরে ধীরে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিল, লজ্জায় তাহাকে জাগাইতে পারিল না। তার পর দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ি সুপ্ত ধর্মদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে দেবদাস স্টেশনের বাহিরে আসিল। একজন ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল, বাপু, হাতীপোতায় নিয়ে যেতে পারবে?

সে একবার মুখপানে চাহিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর কহিল, না বাবু, রাস্তা ভাল নয়-ঘোড়ার গাড়ি এ বর্ষায় ওখানে যেতে পারবে না।

দেবদাস উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, পালকি পাওয়া যায়?

গাড়োয়ান বলিল, না।

আশঙ্কায় দেবদাস বসিয়া পড়িল-তবে কি যাওয়া হবে না? তাহার মুখের উপরেই তাহার অন্তিম অবস্থা গাঢ় মুদ্রিত ছিল, অন্ধেও তাহা পড়িতে পারিত।

গাড়োয়ান আর্দ্র হইয়া কহিল, বাবু, একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে দেব?

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণে পৌঁছবে?

গাড়োয়ান বলিল, পথ ভাল নয় বাবু, বোধ হয় দিন-দুই লেগে যাবে।

দেবদাস মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, দু'দিন বাঁচব ত? কিন্তু পাবর্তীর কাছে যাইতেই হইবে। তাহার অনেক দিনের অনেক মিথ্যা কথা, অনেক মিথ্যা আচরণ স্মরণ হইল। কিন্তু শেষদিনের এ প্রতিশ্রুতি সত্য করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে! কিন্তু এ জীবনের মেয়াদ যে আর বেশী বাকী নাই! সেই যে বড় ভয়ের কথা!

দেবদাস গরুর গাড়িতে যখন উঠিয়া বসিল, তখন জননীর কথা মনে করিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। আর একখানি স্নেহকোমল মুখ আজ জীবনের শেষক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল-সে মুখ চন্দ্রমুখীর। যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছে, আজ তাহাকেই জননীর পাশে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া

পড়িতে লাগিল। এ জীবনে আর দেখা হইবে না, হয়ত বহুদিন পর্যন্ত সে খবরটাও পাইবে না। তবু পার্বতীর কাছে যাইতে হইবে। দেবদাস শপথ করিয়াছিল, আর একবার দেখা দিবেই। আজ এ প্রতিজ্ঞা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। পথ ভাল নয়। বর্ষার জল কোথাও পথের মাঝে জমিয়া আছে, কোথাও বা পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাদায় সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল। কোথাও নামিয়া চাকা ঠেলিতে হইল, কোথাও গরু-দুটোকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে হইল-যেমন করিয়াই হোক এ ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। হুহু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আজও তাহার সন্ধ্যার পর প্রবল জ্বর দেখা দিল। সে সভয়ে প্রশ্ন করিল, গাড়োয়ান, আর কত পথ?

গাড়োয়ান জবাব দিল, এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।

শিগগির নিয়ে চল্ বাপু, তোকে অনেক টাকা বকশিশ দেব। পকেটে একখানা এক শ’ টাকার নোট ছিল, তাই দেখাইয়া কহিল, এক শ’ টাকা দেব, নিয়ে চল্।

তাহার পর কেমন করিয়া কোথা দিয়া সমস্ত রাত্রি গেল, দেবদাস জানিতেও পারিল না। অসাড় অচেতন; সকালে সজ্ঞান হইয়া কহিল, ওরে, আর কত পথ? এ কি ফুরোবে না?

গাড়োয়ান কহিল, আরও ছয় কোশ।

দেবদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, একটু শিগগির চল্ বাপু, আর যে সময় নেই।

গাড়োয়ান বুঝিতে পারিল না, কিন্তু নূতন উৎসাহে গরু ঠেঙ্গাইয়া গালিগালাজ করিয়া চলিল। প্রাণপণে গাড়ি চলিতেছে, ভিতরে দেবদাস ছটফট করিতেছে। কেবল মনে হইতেছে, দেখা হবে ত? পৌঁছব ত? দুপুরবেলা গাড়ি থামাইয়া গাড়োয়ান গরুকে খাবার দিয়া, নিজে আহার করিয়া আবার উঠিয়া বসিল। কহিল, বাবু, তুমি খাবে না কিছু?

না বাপু, তবে বড় তেষ্টা পেয়েচে, একটু জল দিতে পার?

সে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার পর জ্বরের সঙ্গে দেবদাসের নাকের ভিতর হইতে সড়সড় করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে লাগিল। সে প্রাণপণে নাক চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বোধ হইল, দাঁতের পাশ দিয়াও রক্ত বাহির হইতেছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন টান ধরিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, আর কত?

গাড়োয়ান কহিল, কোশ-দুই; রাত্রি দশটা নাগাদ পৌঁছব।

দেবদাস বহুকষ্টে মুখ তুলিয়া পথের পানে চাহিয়া কহিল, ভগবান!

গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল, বাবু, অমন করচেন কেন?

দেবদাস এ কথার জবাব দিতেও পারিল না। গাড়ি চলিতে লাগিল, কিন্তু দশটার সময় না পৌঁছিয়া প্রায় বারোটায় গাড়ি হাতীপোতার জমিদারবাবুর বাটীর সম্মুখে বাঁধান অশ্বত্থতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়োয়ান ডাকিয়া কহিল, বাবু, নেমে এসো।

কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিল, তবু উত্তর নাই। তখন সে ভয় পাইয়া প্রদীপ মুখের কাছে আনিল, বাবু, ঘুমালে কি?

দেবদাস চাহিয়া আছে; ঠোঁট নাড়িয়া কি বলিল, কিন্তু শব্দ হইল না। গাড়োয়ান আবার ডাকিল, ও বাবু!

দেবদাস হাত তুলিতে চাহিল, কিন্তু হাত উঠিল না; শুধু তাহার চোখের কোণ বাহিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়োয়ান তখন বুদ্ধি খাটাইয়া অশ্বত্থতলার বাঁধানো বেদীটার উপর খড় পাতিয়া শয্যা রচনা করিল। তাহার পর বহুকষ্টে দেবদাসকে তুলিয়া আনিয়া তাহার উপর শয়ন করাইয়া দিল। বাহিরে আর কেহ নাই, জমিদারবাটী নিস্তব্ধ, নিদ্রিত। দেবদাস বহুকে-শে পকেট হইতে একশ' টাকার নোটটা বাহির করিয়া দিল। লণ্ঠনের আলোকে গাড়োয়ান দেখিল, বাবু তাহার পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। সে অবস্থাটা

অনুমান করিয়া নোট লইয়া চাদরে বাঁধিয়া রাখিল। শাল দিয়া দেবদাসের মুখ পর্যন্ত আবৃত; সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নূতন বন্ধু পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে।

ভোর হইল। সকালবেলা জমিদারবাটী হইতে লোক বাহির হইল,-এক আশ্চর্য দৃশ্য। গাছতলায় একজন লোক মরিতেছে। ভদ্রলোক। গায়ে শাল, পায়ে চকচকে জুতো, হাতে আংটি। একে একে অনেক লোক জমা হইল। ক্রমে ভুবনবাবুর কানে এ কথা গেল, তিনি ডাক্তার আনিতে বলিয়া নিজে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল-একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান যতদূর জানে বলিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। ডাক্তার আসিয়া কহিল, শ্বাস উঠেছে, এখনই মরবে।

সকলেই কহিল, আহা!

উপরে বসিয়া পার্বতী এ কাহিনী শুনিয়া বলিল, আহা!

কে একজন দয়া করিয়া মুখে একফোঁটা জল দিয়া গেল। দেবদাস তাহার পানে করুণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চক্ষু মুদিল। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া ছিল, তাহার পরে সব ফুরাইল। এখন কে দাহ করিবে, কে ছুঁইবে, কি জাত ইত্যাদি লইয়া তর্ক উঠিল। ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে সংবাদ দিলেন। ইন্সেপক্টর আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। প্লীহা-লিভারে মৃত্যু। নাকে মুখে রক্তের দাগ। পকেট হইতে দুইখানা পত্র বাহির হইল। একখানা তালসোনাপুরের দ্বিজদাস মুখুয্যে বো'ম্বায়ের দেবদাসকে লিখিতেছে।-টাকা পাঠান এখন সম্ভব নয়। আর একটা কাশীর হরিমতী দেবী উক্ত দেবদাস মুখুয্যেকে লিখিতেছে-কেমন আছ?

বাঁ হাতে উলকি দিয়া ইংরাজী অক্ষরে নামের আদ্যক্ষর লেখা আছে। ইন্সেপক্টরবাবু তদন্ত করিয়া কহিলেন, হাঁ, লোকটা দেবদাস বটে।

হাতে নীলপাথর দেওয়া আংটি-দাম আন্দাজ দেড়-শ’ গায়ে একজোড়া শাল-দাম আন্দাজ দুই শ’। জামাকাপড় ইত্যাদি সমস্তই লিখিয়া লইলেন। চৌধুরীমহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তালসোনাপুর নাম শুনিয়া মহেন্দ্র কহিল, ছোটমার বাপের বাড়ির লোক, তিনি দেখলে-

চৌধুরীমহাশয় তাড়া দিলেন, সে কি এখানে মড়া সনাক্ত করতে আসবে নাকি?

দারোগাবাবু সহাস্যে কহিলেন, পাগল আর কি!

ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না; কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল-কাক-শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুক্কুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যে শুনিল, সেই কহিল, আহা! দাসী চাকরও বলাবলি করিতে লাগিল, আহা ভদ্দরলোক, বড়লোক! দু শ’ টাকা দামের শাল, দেড় শ’ টাকা দামের আংটি! সে-সব এখন দারোগার জিম্মায় আছে; পত্র দু’খানাও তিনি রখিয়াছেন।

খবরটা সকালেই পার্বতীর কানে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আজকাল সে মনোনিবেশ করিতে পারিত না বলিয়া ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সকলের মুখেই যখন ঐ কথা, তখন পার্বতীও বিশেষ করিয়া শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বে একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল, কি হয়েচে লা? কে মরেচে?

দাসী কহিল, আহা, কেউ তা জানে না মা! পূর্বজন্মের মাটি কেনা ছিল, তাই মরতে এসেছিল। শীতে হিমে সেই রাত্রি থেকে পড়ে ছিল, আর বেলা ন’টার সময় মরেচে।

পার্বতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহা, কে তা কিছু জানা গেল না।

দাসী বলিল, মহেনবাবু সব জানেন, আমি অত জানিনে মা।

মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনা হইলে সে কহিল, তোমাদের দেশের দেবদাস মুখুয্যে।

পার্বতী মহেন্দ্রর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া, তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে, দেবদাদা? কেমন করে জানলে?

পকেটে দু'খানা চিঠি ছিল; একখানা দ্বিজদাস মুখুয্যে লিখচেন-

পার্বতী বাধা দিয়া কহিল, হাঁ, তার বড়দাদা।

আর একখানা কাশীর হরিমতী দেবী লিখেচেন-

হাঁ, তিনি মা।

হাতের উপর উলকি দিয়ে নাম লেখা ছিল-

পার্বতী কহিল, হাঁ, কলকাতায় প্রথম গিয়ে লিখিয়েছিলেন বটে-

একটা নীল রংয়ের আংটি-

পৈতার সময় জেঠামশাই দিয়েছিলেন। আমি যাই,-বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ও মা, কোথা যাও?

দেবদার কাছে।

সে ত আর নেই-ডোমে নিয়ে গেছে।

ওগো, মা গো। বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী ছুটিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হলে মা? কোথা যাবে?

পার্বতী মহেন্দ্রের পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, মহেন, আমাকে কি সত্যি পাগল পেলে? পথ ছাড়।

তাহার চক্ষের পানে চাহিয়া, মহেন্দ্র পথ ছাড়িয়া নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলিল। পার্বতী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখনও নায়েব গোমস্তা কাজ করিতেছিল, তাহারা চাহিয়া দেখিল। চৌধুরীমহাশয় চশমার উপর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, যায় কে?

মহেন্দ্র বলিল, ছোটমা।

সে কি? কোথায় যায়?

মহেন্দ্র বলিল, দেবদাসকে দেখতে।

ভুবন চৌধুরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি, ধর-ধর-ধরে আনো ওকে। পাগল হয়েচে! ও মহেন, ও কনেবৌ!

তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মূর্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতরে লইয়া গেল। পরদিন তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। একজন দাসীকে ডাকিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে এসেছিলেন, না? সমস্ত রাত্রি!

তাহার পর পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে-যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।

নববিধান

এক

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নীবিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধুমহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং রঙ বদলাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত, তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং ভূমিকায় সেই বিবরণটুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক,—বিলাতী ডিগ্রী আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস-পাঁচেক পূর্বে বছর-নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস। বাড়ির মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা-বাবুর্চি, সহিস-কোচম্যান প্রভৃতিতে প্রায় সাত-আটজন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা একরকম এইসব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিল না। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুজ্যের মেজমেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহলও সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশ্বরেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধুসমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল-পণ্ডিত ছিল। চা-রসের পিপাসাটা তাহার কোন বড় বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিল না। পাগলাটে গোছের বলিয়া প্রফেসাররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিত না, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিত না। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজী জানিত না, মেয়েমানুষে একজামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্বাঙ্গ

জ্বলিয়া যাইত। ভূপেনবাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে! সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়িতে আনুন—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ!

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁশ থাকিত না, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই? আমাকেও লোকে পাগল বলে—তাই বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িল না। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিতমুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত Unfortunate ব্যাপার। বিলাতে যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়িতে রাখতেও পারেন নি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিল, ওহে দিগ্‌গজ! বুদ্ধিমান! তা' না হলে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেন না? চায়ের মজলিসে গরহাজির ত কখনো দেখলুম না, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর করো না। গঙ্গাজল আর গোবর ছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখলুম।

দিগ্‌গজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না!

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেন না। ইহার পরে সাধারণ গোছের দুই-চারিটি কথাবার্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এমনি সময়েই প্রত্যহ সভা ভঙ্গ হয়, হইলও তাই। কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ ম্লান ছায়া সকলের মুখের ‘পরেই চাপিয়া রহিল—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিল না।

দুই

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না, অপরদিকে তেমনি লজ্জারও অবধি রহিল না। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠার বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী ঊষার বয়স তখন মাত্র এগার। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালীপদবাবু, অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে একপ্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেন না। ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন; অযাচিত, কোনমতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, বাড়ি গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর চারেক পরে যখন যথার্থই বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদলাইয়া গেছে। অতএব আর-একজন বিলাতফেরতের বিলাতি আদবকায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে, শৈলেশের পিতা কালীপদবাবু মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতকালের মধ্যে ও-বাড়ির কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপতপ, পূজা-অর্চনা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগলামিতে ভায়েরা পর্যন্ত

অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে; কেবল একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয় না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাসমাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল; ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। বিশেষতঃ সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপে বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ী শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিস্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এমনি করিয়া তাহার শোধ দিল।

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্বল-প্রকৃতির মানুষ। তাই সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে না। বন্ধুরাও মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে, ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে পাঠাইলে ত সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দু'দিনেই

আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু-পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসির বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল। এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। এই ত ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটি লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে ঊষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাত ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী অফিসে চাকরি করিত। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, ভূতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিকে আনতে হবে।

ভূতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিটা আবার কে?

তুই ত বরযাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্‌চায্যির বাড়ি?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আসবেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আসবে না বললেই ফিরে আসবি।

ভূতো আশ্চর্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু মারধোর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচপত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদে যাচ্ছি। সাত দিন পরে ফিরব। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভূতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হল কেন মেজদা? খাল খুঁড়ে কুমীর আনচ না ত?

শৈলেশ চিন্তিতমুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আসবে না নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পাঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

তিন

দিনকয়েক পরে একদিন দুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল এবং মিনিট-দুই পরেই একটি বাইশ-তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যালবাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সেই-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদাসিধা একখানা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই-একখানা গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক্ হইল।

প্রথমে ঊষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম করলে না বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। ঊষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরঝি, বসো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

ঊষা বলিল, সোমবারে এসেচি, আজ বুধবার—তাহলে তিন দিন হল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কেন ভাই, বসো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ি হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব ঊষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি করে থাকব ভাই? সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ

একজন কাছে না থাকলে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেচেন আমার ওখানে গিয়ে থাকতে। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই সোমেন—যাও ত শীগ্‌গির কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউ মার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সে যেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া ঊষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করচি নে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়িতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্য দিয়া আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে ঊষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায় না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস, আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

ঊষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত ঠিক করে উঠতে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ! ও বোঝেই বা কতটুকু! আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুললে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এসব আমি সামলাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা হলে চিঠি লিখে দেব।

ঊষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে, তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়। এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পারো না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বসলে না পর্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বসবে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার সময় নেই—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, বারান্দায় রেলিঙ ধরিয়া ঊষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চার

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ-দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখের নীচে বারান্দায় বসিয়া সোমেন কতকগুলো কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্র সংবর্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্টভাবে পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনও সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইল। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, ও-সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এককথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা, ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি করে জানব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ।

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপ কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলায় উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙ্গাতে হবে বাবা! মা বলেন, আমার ঠাকুরদ্দারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিল, আশীর্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার—যা পড় গে যা বলচি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা হইতে অত্যন্ত মিষ্টকণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্তমুখে তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্, কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল!

আবদুল আসিল না।

গিরিধারী? গিরিধারী!

গিরিধারীর পরিবর্তে বাঙ্গালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিল, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেচিস?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কৈ?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, সে বাড়ি গেছে।

ছুটি দিয়েচেন! বাড়ি গেছে! গিরিধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল, সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে।

শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিল, বাড়িতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে আর সবাই আছে।

তাই বা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশ্বর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল; আলনা হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার

লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেকটাই, কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখে টেবিলের উপর ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল—মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক—মাছ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দা সরানর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল, কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হউক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এত বেলায় আবার চা খাবে না কি? কিন্তু তাহলে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাব না!

না খাও, হাতমুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান করে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক করে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেছি। চল।

এখন থাক।

ওগো আমি ঊষা—বাঘ-ভাল্লুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবে না।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ-ভাল্লুক?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা, তোমাকে সে কখ্খনো লেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন?

কে বলেচে তাড়িয়েচি? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছিল; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েচ? তা হলে সে আর আসবে না। গিরিধারী গেল কেন?

ঊষা কহিল, এ ত তোমার ভারি অন্যায়! চাকর-বাকরদের মাইনে না দিয়ে আটকে রাখা কেন, তাদের কি বাড়ি-ঘর-দোর নেই নাকি? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ঠমুনির আশ্রম বানিয়ে তোলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই, চমকিয়া কহিল, এটা কি? চারশ' ছ' টাকা—

ঊষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েচি। এখনো বোধ করি শ'-দুই আন্দাজ বাকী রইল, বলেচি আসচে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক হইয়া বলিল, ছ-শ' টাকা মুদির দোকানে বাকী?

ঊষা হাসিয়া কহিল, হবে না? কখনো শোধ করবে না, কখনো হিসেব দেখতে চাইবে না—কাজেই দু'বছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দু'বছরের হিসেব দেখলে নাকি?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, এ কথা এই পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও ঊষার চিনিতে বাকী রহিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ বল ত?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাবচি টাকা যা ছিল, সব ত খরচ করে ফেললে, কিন্তু মাইনে পেতে পনর-ষোল দিন বাকী !

ঊষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলেমানুষ যে, সে হিসেব আমার নেই? পনর দিন কেন, একমাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না। কিন্তু কি কাণ্ড করে রেখেচ বল ত? গোয়ালা বলছিল, তার প্রায় দেড়শ' টাকা পাওনা। ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে, সে শুধু তারাই জানে। আমি হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বলবে—কিন্তু দেবে কোথা থেকে?

ঊষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একবারেই দিতে পারব তা ত বলিনি, আমি তিন-চার মাসে শোধ করব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি? আমাকে লুকিয়ো না।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা যেতে একজনের কাছে হ্যান্ডনোটে দু' হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্যন্ত দিতে পারিনি।

ঊষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখচি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না। কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেচি, এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারব না।

ঊষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে? কতদিন অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যেন দম আটকে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমকে তুমি ভুলিয়ো না। যথার্থ-ই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

ঊষার চোখের কোণ সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্ধঘণ্টা পূর্বেও চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহারই জন্য হৃদয়ের

সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েচে, শোধ দিতে হবে না? কিন্তু এই ক-টা টাকা দিয়ে ফেলতে আমার ক-দিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

ঊষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবে না কোথাও কোন পরিবর্তন হয়েচে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, অনেক দিনের মেঘলা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়ে যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

পাঁচ

খাম ও পোস্টকার্ডে বিস্তর চিঠিপত্র জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এমনি সব ছোটখাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাহার কর্মনিরত একাগ্র মুখের চেহারা বাহির হইতে পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে এই কর্তব্যনিষ্ঠ ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ী লোকের মনের মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে, সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হঠাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। যেন তাহার নষ্ট করিবার মুহূর্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম করিতে পূর্বে তাহাকে কোনদিন দেখা যাইত না।

এইরূপে যখন সে অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে পর্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েচে, আসুন।

শৈলেশ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ ত আমার খাবার সময় নয়! এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ কহিল, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেচে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিল, সমস্ত তোলাতুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাস বাটি প্রভৃতি মাজাধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই-সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাহাকে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিল, তোমাকে ত সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন? তাকেও খেতে নেই না কি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, আমি রোজ মার সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এত সব রাঁধলে কে? তুমি নাকি?

ঊষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিল, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকী ছিল না—তাকে কি তা হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদায় করলে?

ঊষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হলে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকী রাখলেই চলে না। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, থাক। তাকে দেখবার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন—হঠাৎ সেই দিনের কথা মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিল, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েছে। গোঁসাইরা মাংস খায় না, তারা কাঁঠালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁঠা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক

অতখানি উচ্চজাতীয় নয়। তাই কাঁঠাল বরঞ্চ আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁঠা সইবে না।

ঊষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিল না, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁঠা কি মা?

প্রত্যুত্তরে ঊষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, না, চারপেয়ে পাঁঠাই বটে, চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে?

ঊষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে? আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাইবাড়ি থেকে আসচি!

শৈলেশ কহিল, এই একবাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য! কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে?

ঊষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি?

শৈলেশ কহিল, আবদুলের শোক ত আমি আজই ভোলবার জো করেচি, দেনা—

ঊষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে, স্বামী-পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ করব? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আনতে পারবে না বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিল, তোমাকে বলে দিতে হবে না, দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

ঊষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয়নি।

কিসের জন্যে যে হল কিছুই ত জানিনে ঊষা—

ঊষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া করে এইটি শুধু ক'রো, পাগল বলে আবার যেন নির্বাসনে পাঠিয়ো না।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিল। সোমেন কহিল, খাবে চল মা। কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখচি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

ঊষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, এর কারণ কি জান?

ঊষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়িতে—

তা বটে, কিন্তু মা থাকতেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায়নি।

ঊষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আনতে বলে দি? আচ্ছা, না খাও—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠো না কিন্তু! সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ, এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া ঊষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এমনি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্যি দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের এক ছেলে—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিল না। ভাঙ্গিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কোন দিকের কোন হিসাবই আর আমি করব না ঊষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়াই সে গাত্রোত্থান করিল।

ছয়

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল, শৈলেশ ঠাহর পাইল না। সকালে উঠিয়াই ঊষা কহিল, তোমাকে রোজ বলচি কথা শুনচো না—আজ যাও ঠাকুরঝির ওখানে।সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে নাকি?

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, কলেজের যে-রকম কাজ পড়েচে—

ঊষা বলিল, তা আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠতে পারলে না!

কিন্তু কি রকম ক্লান্ত হয়ে ফিরতে হয়, সে ত জান না? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয় না।

ঊষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর মুখ দেখবে না। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ি তৈরি করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজার পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস। গাড়িতে আমার কাজ আছে।

যাবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোনদিনই উৎসাহ বোধ করিত না, বিশেষতঃ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিল না। ঊষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক, ও না হয় আরেকদিন যাবে।

শৈলেশ কহিল, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায় না, সে দেখচি তুমি টের পেয়েচ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ি ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাহার সতর-আঠার বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিল না। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। ঊষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লীগ্রামের কুশিক্ষিতা ভাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্যন্তই সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারংবার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে, তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবে না, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবে না, এমন কি বড়ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

অপরিচিত ঊষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই-একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ি ঢুকতে না

ঢুকতেই এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান বলে, গিরিধারীকে দূর করলেন ছোটজাত বলে। এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বৌকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না, তা যিনিই কেন না যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল, তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে, ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বৌদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা দেয় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি করে?

শৈলেশ নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল, অমনি একরকমে যাচ্ছে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আসবে না, আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ি ত একেবারে ভট্চায্যি-বাড়ি করে রাখলে চলবে না, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখেশুনে রাখো—মানুষে বলবে কি?

শৈলেশ কহিল, না চললে রাখতে হবে বৈ কি!

বিভা বলিল, কি করে যে চলচে সে তোমরাই জান, আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ি না গিয়েও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবে না।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাইবোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও তখন নাহয় বলো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেচি! এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না, তাহা উভয়ের কেহই জানিতেন না। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ, ব্যাপার কি তোমাদের?

চাকর-বাকর সমস্ত বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টম-বৈরাগী হয়ে থাকবে নাকি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিল, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গলচে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাঁধচে না এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, ঠিক তা আমিও জানি। এবং আমার যে সত্যি সত্যিই বাধে তাও নয়, কিন্তু মজা এমনি যে, সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার জো নেই। তুমি কি এমনই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ নাকি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, দেখ ক্ষেত্র, যথার্থ কথা বলতে কি, স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার 'পরে তিনি দেননি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেচি যে, তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি!

শৈলেশ কহিল, এদিকে যদি রক্ষা নাও থাকে অন্য দিকে একটু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবে না। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাবনা, মাসের পনর দিন পার হলেই মনে হয় বাকি পনরটা দিন পার হবে কি করে—সে পথে আর পা বাড়াচ্ছি নে।

আমি বেঁচে গেছি ভাই—টাকা ধার করতে আর যেতে হবে না। যে ক'টা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট, এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল নাকি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি, সে খবর ত রাখো না।

শৈলেশ বলিতে লাগিল, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই, একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোন কালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিল, তাদের মুসলমান এবং ছোটজাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি, যাবার সময়ে তারা এক বছরের বাকি মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুশি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চার-শ' টাকা দেওয়া হয়েচে, আরও ছোটখাটো কি কি সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় লেখা—ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো ঊষা, অর্ধেক মাস যে এখনো বাকি—চলবে কি করে? জবাবে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একতিল পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত। আমার দর্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যান্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক ভাই, নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাঁহার কানেই গেল না।

সাত

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ি আসিয়া শৈলেশ্বরের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে কয়লাভাঙ্গা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাঠে বসিয়া তাহার রেলগাড়ির চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা সাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম-সীতা পর্যন্ত সর্বপ্রকার দেবদেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েচে বাবা, বেঁচে থেকো!

শৈলেশের এই দুইজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল। স্বভাবতঃ সে মৃদুপ্রকৃতির লোক, যে-কোন কারণেই হউক, হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিত না, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোথা থেকে এই সমস্ত করে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্ গে, যা বলচি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর; মিনিটখানেক কেহই কোন কথা কহিল না, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, এতটা বাড়াবাড়ি সে

স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেললে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে! তোমাদের সঙ্গে ত চলাফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম! তুমি কি এটাকে ছেলেখেলা মনে করলে নাকি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্ছে না তা অস্বীকার করতে পারিনে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ। আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আছে, হয়ত কেউ দুটো-একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েচে। এতে খুনোখুনি কাণ্ড করবার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখহাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলেপুলে থাকলে তুমিও তা হলে এইরকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলেপুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা।

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হতে পারে, চন্দন ধুয়ে ফেললে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠতে পারে। ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজটা করতে হয়। আজকার কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় এ কথা আমি একশ'বার বলব, তা তোমরা যাই কেন না বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—একা আমি! শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে—আমি কিন্তু এ আশা করিনে যে, অধ্যাপক-বংশের মেয়ে একদিনেই মেমসাহেব হয়ে উঠবে। তা সে যাই হোক, তোমরা দু' ভাইবোন এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠলুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, উপরে। ঠাকরুনের সঙ্গে পরিচয়টা একেবারে সেরে আসি, কথা কন কি না একটু সাধ্যসাধনা করে দেখি গে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতে ডাক দিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটাদুই আলমারির কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ি জ্যাকেট কোট পেন্টুলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত

করা তাহার নির্ণয় নাই। ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্ছে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্য হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া বেরিয়েছে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া—চেয়ে দেখ মা!

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ কি অনাথ আশ্রমের ফর্দ তৈরি হচ্ছে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে? কি করচেন বলুন ত? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয়া হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইল না। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজকণ্ঠেই দিল; কহিল, এগুলো সব সারাতে পাঠাবো ভাবচি।

কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে, বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, এখন কেউ নেই, এই সময় চট করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তাঁর স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেন না। বাইরে থেকে আমার সাজসজ্জা আর আচার-ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেন না, আমি নিতান্তই বাঙ্গালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেছে শুনলে তাকে আমার মারতে ইচ্ছা করে না, এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যিসত্যিই নয়।

ঊষা এ কথারও কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট

হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজকর্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, এ-সব মেয়েদের কাজ, আপনার শিখে লাভ কি?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই কহিল, এসব ত গরীব-দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষায় ত কোন প্রয়োজনই হবে না।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাকবে না। ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিনকতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মীশ্রীর কতকটাও হয়ত সে তাহলে শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আসচেন দেখচি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও একরকম বলে স্থির করে নেবেন না।

ঊষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারব।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়! নিশ্চয় পারবেন, এও আমি নিশ্চয় জানি।

আট

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ উমা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিল, সকলের পিছনে ছিল উমা; সে চৌকাঠের এদিকে পা বাড়াইতেই, তাহার দাদা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, জুতোটা খুলে এস উমা।

বিভা ফিরিয়া চাহিয়া স্বামীকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, দোষ কি? পায়ে কাঁটাও ফুটবে না, হোঁচটও লাগবে না।

বিভা কহিল, সে আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলার দরকার হ'ল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুন হিঁদু মানুষ—তা ছাড়া গুরুজনের ঘরের মধ্যে ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্বে তাহা পালন করিয়াছেন দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল; কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ সে ভালই, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের এটা শোবার ঘর না হয়ে ঠাকুরঘর হলে আজ হয়ত তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ঢুকতে।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা বৌঠাকরুনের খাতিরেও মুখে তুলতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই রাখিনে, তখন অকারণে তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত

করতুম না। আচ্ছা বৌঠাকরুন, এ ঘরে ত আগেও বহুবার এসেচি, মনে হচ্চে যেন একটা ভাল কার্পেট পাতা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

ঊষা কহিল, ধোয়ামোছা যায় না, বড় নোংরা হয়। শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট পাতা থাকলে ঘর নোংরা হয়?

ঊষা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বৈ কি ভাই। চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নীচে তার ঢের ধুলোবালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্ ব্যস্, বৌঠাকরুন, নোংরা চাপা পড়লেই আমাদের কাজ চলে যায়—তার বেশি আর আমরা চাইনে। ও জিনিসটা চোখের আড়ালে থাকলেই আমরা খুশি হয়ে থাকি। কি বল শৈলেশ, ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিল না। বিভার ক্রোধের অবধি রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া সে তর্ক না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কোন অভাব ছিল না, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচরণে বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত। লোকের সম্মুখে বিভা তর্কে কিছুতেই হার মানিতে পারিত না, ইহা তাহার স্বভাব। সেই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বস্তুটা পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার সে ভাব নয়, ইহা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া বিভা আপনাকে সংবরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনের মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল না। পরের দোষ ধরিয়া কটুকথা বলা বিভার একপ্রকার স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা

ভিন্ন আর কোন ক্ষতিই হইত না; কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূটির বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনাদোষে অশেষ দুঃখভোগের পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি আর একজন স্বামীর চিত্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথচ ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই, এই সত্য চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের তিক্ত ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক্ষমা রহিল না। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাও এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেমনি সুকঠিন। বরঞ্চ যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার আবরণে বাহিরে ইহাকে গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এসে যদি রোজ দুপুরবেলা বসতে পার, যে-কোন সংসারেই পড় না কেন দিদি, দুঃখ পাবে না তা বলে রাখচি।

উমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। ঊষা মুখ না তুলিয়া বলিল, ত হলেই হয়েচে আর কি! আপনাদের সমাজে ওকে একঘ'রে করে দেবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা দিক বৌঠাকরুন। কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাকবে তা বাজি রেখে বলতে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখতে আর হবে না ভাই, এই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া কহিলেন, আর যাই হোক, আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে পারে ত নিরর্থক নিত্য নূতন মোজা কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পাবে।

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, আর পারিল না। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, ওর ভবিষ্যৎ

সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন নাও হতে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী পরতে চাইবে না। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যায় বৈ কি। চোখ-কান খোলা থাকলেই বলা যায়। যে সত্যিকারের জাহাজ চালায়, সে জলের চেহারা দেখলেই টের পায় তলা কত দূরে। বৌঠাকরুন, জাহাজে পা দিয়েই যে ধরে ফেলেছিলেন, একটু অসাবধানেই তলায় পাঁক গুলিয়ে উঠবে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর শৈলেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষকোটি ধন্যবাদেও পর্যাপ্ত হবার নয়।

ঊষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করার মধ্যে ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহনবাবু।

এ কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ নিজের স্ত্রীকে অপমান করার কাজটা হয়ত সিদ্ধ হয়। তা ছাড়া, কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলেই বোধ হয় আর কারুর ভক্তিশ্রদ্ধা উথলে উঠে।

ঊষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ঠাকুরঝি?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না, বলে না। পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে আনতেও পারে না। কিন্তু স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে নিরন্তর হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিন।

বিভার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। অভিভূতের মত একবার সে বক্তার মুখের দিকে, একবার শৈলেশের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এতগুলি লোকের সমক্ষে তাহার স্বামী যে যথার্থই তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারে প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার পরে শৈলেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে

আর ত তোমার বাড়িতে আসতে পারিনে দাদা! আমি তা হলে চিরকালের মতই চললুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঊষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলিনি ভাই!

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল, এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই করচি, তখন এ বাড়িতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

ঊষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ত কোনদিন মনেও ভাবিনি ঠাকুরঝি!

বিভা কানও দিল না। অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেলেন, কাল হয়ত দাদাও বলবেন তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া।

উমা, বাড়ি যাও ত এস। এই বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়িতে পা দিতে যাওয়া চাই আমাদের ভুল। এবার বাড়ির সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচল। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিল, নাহয়, আমার লাইব্রেরি ঘরে এসেই একটু বস্ না বিভা।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেও না দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়—দোহাই তোমার, তাকে নষ্ট হতে দিয়ো না। আজ তাকে যেভাবে চোখে দেখতে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চলতে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব না।

তাহার অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের ঘরে বসবি চল্ বোন, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কিনা জানি না, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বসতে চাইনে দাদা, কিন্তু সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, একেবারে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না দাদা। এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিল। উমা বরাবর নীরব হইয়াই ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিল না, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে নাহয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলেপুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ করে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবে না—তোমাকে পারতেও দেব না।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর করিল, আমি পারবই—এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

বিভা সন্দিগ্ধকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পার ভালই। তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চশিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্চি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে উমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঊষা নীচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইল

না, সাহসও ছিল না, সমস্ত কথাই যে ঊষা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিল না।

নয়

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঊষা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়াছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিল না। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিল, তাহার মুখ অতিশয় গম্ভীর। হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা ঊষার স্বভাব নয়, আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং যাহা জানে না, তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ঊষা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত সে খাইতে পারিল না। যেজন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে, অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু-চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড় করাইলে আর স্বাদ থাকে না, তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া ঊষা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিসটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই শুইতে আসিয়া শৈলেশ খামকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও ব্যবস্থাই চলবে না এও ত ভারি জুলুম!

এরূপ শক্ত কথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। ঊষা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে।

শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উল্টে দিয়ে যদি এ বাড়িকে তোমার বাপের বাড়ি বানিয়ে তুলতে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হতে থাকে। সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসির বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

ঊষা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বৈ কি।

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য যে এসব করিতেছে তাহার হেতুও মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই সকল দুর্বল-প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে, তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসঙ্গত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে বলেই সকলের বিশ্বাস।

যে-সব আচার-ব্যাবহার রীতিনীতি আমরা মানিনে, মানতে পারিনে, তাই নিয়ে অযথা ভাইবোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হতে হয়—এ আমার ভাল লাগে না।

ঊষা প্রতিবাদ করিল না, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা মাত্র করিল না, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। ঊষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে ঊষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলে না, ভুলাও যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর

একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে না—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলাফেরা করতে হবে, ছেলেবেলা থেকে তার সেই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটতে দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেই তার জবাব হয় না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে স্থির করেচি।

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায় আসিয়া পর্যন্ত ঊষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বাম হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, যাই কেননা স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কি কেউ কখনও ভাবতে পারে! বেশ ত, তাই তুমি করো।

ইলেকট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই সামান্য আলোকে শৈলেশ নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্তী শয্যায় শায়িত ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেচে। সে ত কম নয়!

ঊষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইত না। শান্তভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না, সে হতে পারবে না। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

ঊষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগো না, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্নকালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ি ফিরিয়া রান্নার একপ্রকার সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিতচিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে মুসলমান।

রাত্রে খাবার ঘরে আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না যে, ইহার জন্য অত্যন্ত সঙ্গোপনে মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিনার তখনও দুই-একটা ডিসের অধিক অগ্রসর হয় নাই, ঊষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

ঊষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয়। যে শাস্ত্রকে তুমি মান না, গণ না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজে না।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেব না, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম, তাই ত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটল! ঠিক না ঊষা? কিন্তু খরচপত্র কি তোমার খুব বেশি পড়বে?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হলে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়ে না। আসচে মাস থেকে আমি নিজেই এসব করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এইটি দেখ, জিনিসপত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়। আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেমনটি যেন হয়। হবে ত?

শৈলেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

ঊষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নিচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারারাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি তাকে অস্থির করবার জন্য আমাকে আদেশ করো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা ত আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করিনে ঊষা! আমি নিশ্চয় জানি, তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়চড় হয়ও না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্বল, কিন্তু তোমার মন তেমনি সবল, তেমনি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে ঊষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি অনেক ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয়ই বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা ত হল, এখন স্থির কি করেচ বল ত? আমি শপথ করে বলতে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করব না।

ঊষা মিনিটখানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে বলিল, দাদার সংসারে আমার চলে যাচ্ছিল—বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কাল আবার আমি তাঁদের কাছেই যাব।

তাঁদের কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

ঊষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ফিরতে আর আমি পারব না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি, এখানে আমার থাকা চলবে না। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল, যে লৌহকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

দশ

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল, সারারাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল ঊষা নিত্যনিয়মিত গৃহকর্মে ব্যাপৃতা,—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে। সিঁড়িতে নামিবার পথে দেখা হইতে ঊষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি করে ফেলেচে, মুখহাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল, বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবে না। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথরুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট আমি? দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকালবেলায় এই কথা মনে করিয়া সুদ্ধ তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মতভেদ বা দুটা কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামীগৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তাহা হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিত না। সোমেনের মা হইলেও বা দু-দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু ঊষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে গড়া স্ত্রী,—ধর্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল। এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে ঊষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজে আরও দুই-চারিজন

মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা-দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবনিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক লাগিল। এই সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিন কয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল; ঊষা গৃহে আসিয়া পর্যন্ত এই সকলের পরিবর্তে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি স্বহস্ত-রচিত খাদ্যদ্রব্য সকালের চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত থাকিত, কিন্তু আজ তাহার কোনটাই নাই দেখিয়া, তাহার আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হইতে নিজে ঢালিয়া লইয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বিদায় করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল।

এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ত যে একটু কড়া করিয়াই দিবে, এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল, তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; ফিরিয়া আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না, ঊষা ঘরে প্রবেশ করিল না।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল, স্নানাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইবে। খাবার সময় আজও ঊষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্তার মধ্যে কোন প্রভেদ বাড়ির কাহারও কাছে ধরা পড়িল না, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায়,

বিনা আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজ যাইবার পোশাক পরিতে এ ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি।হয়ত কাল হইতেই এমনি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই—না হইলে তাহারই জন্য ঊষা এইমাত্র রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই—অকস্মাৎ এখানে ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি গলায় টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত রহিল, কতক কৌতূহলে, কতক অন্যমনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উলটাইয়া একেবারে শেষ পাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা—সেই মাছ, শাক, আলু, পটল, চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে—কাল পর্যন্ত জমা বইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিল না, আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তেমনি হাত নাই। বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দু'দিনের ব্যাপার। আগেও ছিল না, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবে না,—দু'দিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনশ্চ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সবচেয়ে বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এ জগতে কোন কিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দেশ করা চলে না। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিল না, আবার একদিন সেই-সকলই না কতখানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল।

অবশেষে পোশাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ঊষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারংবার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল,

তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোনক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

এগার

কলেজের ছুটির পরে শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, অনুমান তাহার নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হন নাই, এবং ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার রফা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ করিল। কহিল, কই, সোমেনকে আনতে ত লোক পাঠালে না বিভা?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, হাতি যে কিনছিল সে নেই।

তার মানে?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি গল্প শোননি? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে রাজার হাতি কিনতে চেয়েছিল। পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ত চাওয়ায় সে হাত জোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ, হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিলেন, এবং পরে হাসি থামিলে বলিলেন, এই গল্পটা শুনিয়ে বউঠাকরুনকে রাগ করতে বারণ করো শৈলেশ, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসির কাছে এসে যদি ছেলে মানুষ হয়, তার চেয়ে না হয় ধার-ধোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব। এই বলিয়া তিনি বিভার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে হাসিতে শৈলেশ যোগ দিল না, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সংবরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ব্যাপার কি শৈলেশ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবে না, তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, অর্থাৎ ডাইনির হাতে ছেলে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না,—না?

শৈলেশ বলিল, এই কটূক্তির জবাব না দিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, ঊষা শীঘ্রই চলে যাচ্চেন।

চলে যাচ্চেন? কোথায়?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন—তাঁর দাদার বাড়িতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, আমি এই রকমই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, স্বামীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে বুঝিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিমিত্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্চো? তা যদি হয়, আমি নিষেধ করব না, কিন্তু একদিন তোমাদের দুজনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্চি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলিনি, কিন্তু যেতে বাধাও আমি দেব না। আত্মীয়-বন্ধুমহলে একটা আলোচনা উঠবে এবং তাতে যশ আমার বাড়বে না তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হয়ে গেল, তার জন্যে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ক্ষেত্রমোহনও বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন না। শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত

জানানো কর্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে সেই যে একবার একটা কথাবার্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁরা কেউ খবর-টবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার ইঙ্গিত এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সামলানো শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা করা যায় যে, কোথায় আঘাত করচ তুমি জানো না। এই বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়িয়া চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবিচলিতভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া কহিলেন, সে ঠিক। জায়গাটা যে তোমার কোথায় আমি ঠাওর করতে পারিনি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে,—তাতে আমি আর তোমার কাছে কি বেশি প্রত্যাশা করতে পারি! তোমার দম্ভে ঘা লাগবে বলেই কখনো কিছু বলিনি, কিন্তু বহুপূর্বেই বোধ করি বলা উচিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, তাই ত হে শৈলেশ, it reminds; স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠতে পারিনি, শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু তুমি যদি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারতে ভাই—আচ্ছা, তোমরা ভাইবোনে ততক্ষণ নিরিবিলি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম বলে। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখতে হয়ত দেরি হতেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে ভবানীপুরের উল্লেখ করে বিদ্রূপ করলে, তাঁরা কেউ আমার খবর নিন বা না নিন, আমাকে উদ্যোগী হয়ে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহির হইতে শুধু জবাব দিলেন, নিশ্চয় হবে। এমনিই ত অযথা বিলম্ব হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পটলডাঙ্গার বাড়িতে দেখা দিলেন। শৈলেশ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অসময়ে ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের পরে অযাচিত ও এত শীঘ্র ইঁহাকে সে আশা করে নাই। মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, আজ কি হাইকোর্ট বন্ধ নাকি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিলেন, প্রশ্ন বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিলে নাকি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য, আমার স্নানের সময় হয়েছে, তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবে না?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তুমি যেতে পারো।

বৌঠাকরুন, আসতে পারি?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিল না। শোবার ঘরের একধারে আসন পাতিয়া ঊষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল; কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ি যাবার খেয়াল হয়েচে নাকি? বাবা কি পীড়িত?

ঊষা কহিল, বাবা বেঁচে নেই।

ওঃ—তা হলে মা'র অসুখ নাকি?

ঊষা বলিল, তিনি বাবার পূর্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তা হলে যাচ্ছেন কোথায়? আছে কে? এমন জায়গায় ত কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না! শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমারাই ত রাজী হতে পারিনে।

ঊষা মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেন না?

না, কিছুতেই না।

কিন্তু এতকাল ত আমার সেই দাদার বাড়িতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু। অচল হয়ে ত ছিল না।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি করে বলে যান। না হলে কিছুতেই যেতে পাবেন না।

ঊষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কিন্তু সোমেন?

ঊষা কহিল, তার পিসি আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

ঊষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে?

ঊষা তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখভোগও আছে, এবং থাকবারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বলতে পারেন?

ঊষা কহিল, অর্থাৎ, একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন? হয় এইমাত্র জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানিনে ক্ষেত্রমোহনবাবু।

কবে যাবেন?

দাদা নিতে এলেই। কালও আসতে পারেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্চে, গোপন রাখলে আমার অপরাধ হবে।

আপনার আসবার পূর্বে, এ বাড়িতে আর-একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ঊষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তাহলে রাগ করে সেই ষড়যন্ত্রটাকেই কি অবশেষে জয়ী হতে দেবেন? এতেই কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। ঊষা শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, জয়ী হোক, পরাস্ত হোক ক্ষেত্রমোহনবাবু আমাকে আপনি ক্ষমা করুন—এই বলিয়া ঊষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

বার

স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ শৈলেশ বন্ধ করিল, কিন্তু ঊষা করিল না। তাহার আচরণে লেশমাত্র পরিবর্তন নাই—সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্ম ঠিক তেমনিই সে করিয়া যাইতেছে। মুখ ফুটিয়া শৈলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, অথচ, সবচেয়ে মুশকিল হইল তাহার এই কথা ভাবিয়া, এ গৃহ যে-লোক চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেই গৃহের প্রতি তাহার এতখানি মমতা-বোধ রহিল কি করিয়া? আজ সকালেই তাহার কানে গিয়াছে, দেয়ালের গায়ে হাত মুছিবার অপরাধে ঊষা নূতন ভৃত্যটাকে তিরস্কার করিতেছে। অভ্যাসমত কাজে ভুলভ্রান্তি তাহার নাই যদি-বা হয়, কিন্তু সর্বত্রই তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে এতটুকু শিথিলতাও যে শৈলেশের চোখে পড়ে না! ঊষাকে ভাল করিয়া জানিবার তাহার সময় হয় নাই, তাহাকে সে সামান্যই জানিয়াছে, কিন্তু সেইটুকু জানার মধ্যেই কিন্তু এটুকু জানা তাহার হইয়া গেছে যে, যাবার সঙ্কল্প তাহার বিচলিত হইবে না। অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ বয়সে তাহার সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগরদোলায় পাক খাওয়াইয়া মারিতেছে।

ক্ষেত্রমোহন আসিয়া একবারে সোজা রান্নাঘরের দরজায় দেখা দিলেন, কহিলেন, প্রসাদ পাবার আর বিলম্ব কত বৌঠাকরুন?

ঊষা মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি টানিয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, সে কথা আপনার বড় কুটুম্বটিকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, নইলে আমার সব হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ঠকবার পাত্রী আপনি নন, কিন্তু ঠকে গেলাম আমি নিজে। রান্নার বহর দেখে এই ভরা-পেটেও লোভ হয় বৌঠাকরুন, কিন্তু অসুখের ভয় করে। তবে, নেমন্তন্ন ক্যান্‌সেল করলে চলবে না, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনার ছেলেটি কই?

ঊষা কহিল, আজ কি যে তার মাথায় খেয়াল এল কিছুতেই ইস্কুলে যাবে না। কোনমতে দুটি খাইয়ে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনাকে সে বড্ড ভালবাসে! একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভাল কথা, আপনার সেই বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাবটা কি হল? বাস্তবিক বৌঠাকরুন, রাগের মাথায় আপনার মুখ দিয়েও যদি বেফাঁস কথা বার হয় ত ভরসা করবার সংসারে আর কিছু থাকে না।

ঊষা এ অভিযোগের উত্তর দিল না, নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ স্নানান্তে আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল, মুখ ফিরিয়া চাহিল।

ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজ আজ বন্ধ নাকি হে?

না। তবে প্রথম দু'ঘণ্টা ক্লাস নেই।

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা বেশ। কিন্তু বৌঠাকরুনের বাপের বাড়ি যাবার আয়োজন কিরূপ করলে?

শৈলেশ কহিল, আয়োজন যা করবার তিনি গেলে তবে করব। শুনচি কাল তাঁর দাদা এসে নিয়ে যাবেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি একটি ইডিয়ট। ও স্ত্রী নিয়ে তুমি পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে বরঞ্চ বদ্‌লাবদ্‌লি করে নাও, তুমিও সুখে থাকো, আমিও সুখে থাকি।

শৈলেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, বয়েস ত ঢের হল ক্ষেত্র, এইবার এই অভদ্র রসিকতাগুলো ত্যাগ কর না!

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ত্যাগ কি সাধে করতে পারিনে ভাই, তোমাদের ব্যবহারে পারিনে। তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে বললেন, বাপের বাড়ি চলে যাবো; তুমি অমনি জবাব দিলে, যাবে যাও,—আমার ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া হয়নি। এই সমস্ত কি ব্যবহার? ভাইবোন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। যাক, আমি সব ভেস্তে দিয়ে এসেচি, যাওয়া-টাওয়া তাঁর হবে না। তুমি কিন্তু আর খুঁচিয়ে ঘা করো না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, উঃ—ভারি বেলা হয়ে গেল, এখন চললুম, কাল সকালেই আসবো। ফিরিতে উদ্যত হইয়া সহসা গলা খাটো করিয়া কহিলেন, দিনকতক একটু বনিয়ে চল না শৈলেশ! অধ্যাপকের ঘরের মেয়ে, অনাচার সহ্য করতে পারেন না, খানাটানাগুলো দু'দিন না-ই খেলে! তাছাড়া এসব ভালও ত নয়,—খরচের দিকটাতেই চেয়ে দেখ না! আচ্ছা, চললুম ভাই, এই বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কখন আসিল, কি বলিয়া, কি করিয়া হঠাৎ সমস্ত ব্যাপার উল্টাইয়া দিয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে। উত্তরের ঢাকা বারান্দায় যথানিয়মে আসন পাতিয়া ঠাঁই করা। প্রতিদিনের মত বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া অদূরে ঊষা বসিয়া আছে, শৈলেশ ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে বসিয়া গেল। অনেকবার তাহার ইচ্ছা হইল, ক্ষেত্রর কথাটা মুখোমুখি যাচাই করিয়া লইয়া সময়োচিত মিষ্ট দুটো কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিতে পারিল না, কিছুতেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এমন কি সোমেনের ছুতা করিয়াও আলোচনা আরম্ভ করিতে পারিল না। অবশেষে খাওয়া সমাধা হইলে নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তের

পরদিন সকালে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেশ সেইমাত্র হাতমুখ ধুইয়া পড়িবার ঘরে চা খাইতে যাইতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? আগন্তুক ঊষার ছোট ভাই। সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, দাদা নিজে আসতে পারলেন না, দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ ত নিয়ে যান। এই বলিয়া শৈলেশ তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রাতরাশের সর্ববিধ সরঞ্জাম টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র একবাটি চা ঢালিয়া লইয়া সে নিজের আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশন করিল, অবশিষ্ট সমস্ত পড়িয়া রহিল, তাহার স্পর্শ করিবারও রুচি হইল না। ঊষার পিতৃগৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। এ দিক দিয়া অবিনাশকে দেখিয়া তাহার চমকাইবার কিছু ছিল না, এবং আসিয়াছে বলিয়াই যে অপরকে যাইতেই হইবে এমনও কিছু নয়;—হয়ত, শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হইবে না,—কিন্তু নিশ্চয় একটা কিছু এ বিষয়ে না জানা পর্যন্ত সমস্ত দেহমন তাহার কি রকম যে করিতে লাগিল তাহার উপমা নাই। আজ সকালবেলাতেই ক্ষেত্রমোহনের আসিবার কথা, কিন্তু সে ভুলিয়াই গেল, কিংবা কোন একটা কাজে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সহসা এই আশঙ্কাই যেন তাহার সকল আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিল। সে আসিয়া পড়িলে যা হোক একটা মীমাংসা হইয়া যায়। এইটাই তাহার একান্ত প্রয়োজন। অধৈর্যের উত্তেজনায় তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল, পাছে আপনাকে আর সে ধরিয়া না রাখিতে পারে, পাছে নিজেই ছুটিয়া গিয়া ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, কাল ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাহার কি কথা হইয়াছে। শৈলেশ নিজেকে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

এমনি করিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময় যখন আর কাটে না, এমনি সময়ে দ্বারের ভারী পর্দা সরাইয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিল সে একান্ত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রমোহন নয়—অবিনাশ। শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া একখানা বই টানিয়া লইল। তাহার সর্বদেহে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল।

অবিনাশ বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি চোখ পড়িতে ওধারের একখানা চেয়ার আরও খানিকটা দূরে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা করিবে এ ভরসা বোধ করি তাহার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢোকার একটা কারণ পর্যন্তও যখন সে জিজ্ঞাসাও করিল না, তখন অবিনাশ নিজেই কথা কহিল। বলিল, এই আড়াইটার গাড়িতেই ত দিদি যেতে চাচ্চেন।

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, চাচ্চেন? কেন, আমার পক্ষ থেকে কি তিনি বাধা পাবার আশঙ্কা করচেন?

অবিনাশ ছেলেমানুষ, সে হঠাৎ কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, আজ্ঞে না।

দরজার বাহিরে চুড়ির শব্দ পাইয়া শৈলেশের মন আরও বাঁকিয়া গেল। বলিল, না, আমার তরফ থেকে তাঁর যাবার কোন নিষেধ নেই।

অবিনাশ নীরব হইয়া রহিল। শৈলেশ প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার আসবার কথা শুনেছিলুম, তিনি এলেন না কেন?

অবিনাশ সঙ্কুচিতভাবে আস্তে আস্তে বলিল, তাঁর আমাকে পাঠাবারও তেমন ইচ্ছে ছিল না।

কেন?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ বলিল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সব কথা বলাও যায় না, বলে লাভও নেই। তবে, তোমার দাদা যদি কখনো জানতে চান ত বলো যে, এ

ব্যাপারে ঊষার দোষ নেই, দোষ কিংবা ভুল যদি কারও হয়ে থাকে ত সে আমার। তাঁকে আনতে পাঠানোই আমার উচিত হয়নি।

একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, মনে হত বাবা অন্যায় করে গেছেন। দীর্ঘকাল পরে অবস্থাবশে যখন সময় এল, ভাবলুম, এবার তার প্রতিকার হবে। তোমার দিদি এলেন বটে, কিন্তু এক দোষ শত দোষ হয়ে দেখা দিল।

ইহার আর উত্তর কি! অবিনাশ মৌন হইয়া রহিল, এমনি সময় সহসা অন্য দিকের দরজা ঠেলিয়া ঘরে ক্ষেত্রমোহন প্রবেশ করিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল, কিন্তু থামিতে পারিল না। কঠিন বাক্যের স্বভাবই এই যে, সে নিজের ভারেই নিজে কঠিনতর হইয়া উঠিতে থাকে। ঊষা অন্তরালে দাঁড়াইয়া; অভ্রান্ত লক্ষ্যে তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিবার নির্দয় উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈলেশ বলিতে লাগিল, তোমার ভগিনীকে একদিন বিবাহ করেছিলুম সত্য, কিন্তু সহধর্মিনী তাঁকে কোনমতেই বলা চলে না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ, ধর্ম কিছুই এক নয়—জোর করে তাঁকে গৃহে রাখতে নিজের বাড়িটাকে যদি স্মৃতিশাস্ত্রের টোল বানিয়েও তুলি, কিন্তু আমার একমাত্র ছোটবোন দুঃখে ক্ষোভে পর হয়ে যায়, একটিমাত্র ছেলে কুশিক্ষায় কু-দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ ত কোনক্রমেই আমি হতে দিতে পারিনে। তবে তাঁর কাছে আমি এই জন্যে কৃতজ্ঞ যে, মুখে ফুটে আমি যা বলতে পারছিলুম না, তিনি নিজে থেকে সেই দুরূহ কর্তব্যটাই আমার সম্পন্ন করে দিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

শৈলেশ লাজুক, দুর্বল স্বভাবের লোক, ভয়ঙ্কর কিছু উচ্চারণ করা তাহার একান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু উন্মাদের মত সে এ কি করিতেছে! ঊষার ছোটভাই লইতে আসিয়াছে এ সংবাদ তিনি ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলেন, অতএব অপরিচিত লোকটি যে সে-ই, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহারই সম্মুখে এসব কি?

ক্ষেত্রমোহন ব্যগ্র-অনুনয়ে হাত দুটি প্রায় জোড় করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দেখবেন, আপনার দিদিকে যেন এসব ঘুণাগ্রেও জানাবেন না।

অপরিচিত ছেলেটি দ্বারের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে কিছুই জানাতে হবে না, বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি নিজের কানেই সমস্ত শুনতে পাচ্চেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে? ওইখানে?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি জবাব দিবার পূর্বেই শৈলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিল, হাঁ, আমি জানি ক্ষেত্র, তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে।

উত্তর শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্তব্ধ বিবর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেইদিন ঘণ্টা দুই-তিন পরে ভগিনীকে লইয়া যখন অবিনাশ স্টেশন অভিমুখে রওনা হইল, তখন সোমেন তাহার পিসির বাড়িতে, তাহার পিতা কলেজগৃহে এবং ক্ষেত্রমোহন হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বিভা স্বামীকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কি করচেন দেখলে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, দেখলুম ত হাতে আছে একখানা বই, কিন্তু আসলে করচেন বোধ করি অনুশোচনা।

এ কাজটা তুমি কবে করবে?

কোন্‌টা? বই, না অনুশোচনা?

বিভা কহিল, বই তোমার হাতে আর মানাবে না, আমি শেষের কাজটাই বলচি।

ক্ষেত্রমোহন খোঁচা খাইয়া বলিলেন, ভাইকে ডেকে বাপের বাড়ি চলে গেলেই বোধ হয় করতে পারি।

বিভার মন আজ প্রসন্ন ছিল, সে রাগ করিল না। কহিল, ও কাজটা আমি বোধ হয় পেরে উঠব না। কারণ, হিঁদুয়ানির জপ-তপ এবং ছুঁই-ছুঁই করার বিদ্যেটা ছেলেবেলা থেকেই শিখে ওঠবার সুবিধে পাইনি।

স্ত্রীর কথায় ক্ষেত্রমোহন আজকাল প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, এখন কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন, তোমার অতি বড় দুর্ভাগ্য যে, ও সুযোগ তুমি পাওনি। পেলে হয়ত এতবড় বিড়ম্বনা তোমার দাদার অদৃষ্টে আজ ঘটত না। এই বলিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌদ্দ

ভবানীপুরের সেই সুশিক্ষিতা পাত্রীটিকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইল, শুধু বিভা এবার স্বামীর আন্তরিক বিরাগের ভয়ে তাহাতে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নানা প্রকারে দেখাইতে বিরত রহিল না। কন্যাপক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রমোহন একদিন সোজাসুজি প্রশ্ন করিল শৈলেশ অস্বীকার করিয়া সহজভাবেই কহিল, জীবনের অধিকাংশই ত গত হয়ে গেল ক্ষেত্র, বাকি কটা দিনের জন্যে আর নতুন ঝঞ্ঝাট মাথায় নিতে ভরসা হয় না। সোমেন আছে, বরঞ্চ আশীর্বাদ কর তোমরা, সে বেঁচে থাক—এ সবে আমার আর কাজ নেই।

মানুষের অকপট কথাটা বুঝা যায়, ক্ষেত্রমোহন মনে মনে আজ বেদনা বোধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আদালতের ফেরত প্রায়ই আসিতে লাগিলেন।

গৃহে গৃহিণী নাই, সন্তান নাই, গোটা তিনেক চাকরে মিলিয়া সংসার চালাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়িটা এমনি বিশৃঙ্খলা ছন্নছাড়া মূর্তি ধারণ করিল যে, ক্লেশ অনুভব না করিয়া পারা যায় না। প্রায় মাসাধিককাল পরে সে সেই কথারই পুনরুত্থাপন করিয়া কহিল, তুমি ত মনের ভাব আমার জান শৈলেশ, কিন্তু কেউ একজন বাড়িতে না থাকলে বাঁচা কঠিন। বিশেষ বুড়ো বয়সে—

উমা আজ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, বুড়ো বয়সের এখনো ঢের দেরি, এবং তার ঢের আগেই বৌদি এসে হাজির হবেন। রাগ করে মানুষে আর কতকাল বাপের বাড়ি থাকে? এই বলিয়া সে একবার দাদার মুখের প্রতি ও একবার শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু দুজনের কেহই জবাব দিল না। বিশেষতঃ শৈলেশের মুখ যেন সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু উমা চাহিয়াই

আছে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল। না, তিনি আর আসবেন না।

উমা অত্যন্ত অবিশ্বাসে জোর করিয়া বলিল, আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন। হয়ত এই মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন। হাঁ দাদা, পারেন না?

ফিরিয়া আসা যে কত কঠিন দাদা তাহা জানিতেন। যাইবার পূর্বে শৈলেশের মুখের প্রত্যেক কথাটি তাহার বুকে গাঁথা হইয়াছিল, ঊষা কোনদিন যে সে-সকল বিস্মৃত হইতে পারিবে, তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। বধূর প্রতি শৈলেশের পিতা অপরিসীম অবিচার করিয়াছে, ফিরিয়া আসার পরে বিভা ঈর্ষাবশে বহুবিধ অপমান করিয়াছে এবং তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে শৈলেশ নিজে তাহার যাবার দিনটিতে। তথাপি হিন্দু নারীর শিক্ষা ও সংস্কার, বিশেষ ঊষার মধুর চরিত্রের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়াটা ক্ষেত্রমোহন কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না।

এই কথা মনে করিয়া তাঁহার যখনই কষ্ট হইত, তখনই এই বলিয়া তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিতেন যে, ঊষা নিজের প্রতি অনাদর অবহেলা সহিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্মাচরণে ঘা দিল, সে আঘাত সে সহিল না। বোধ করি এইজন্যই বহুদিন পরে একদিন যখন তাহার স্বামীগৃহে ডাক পড়িল, তখন এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু অভিমান করে নাই, নিঃশব্দে এবং নির্বিচারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিন্দু রমণীর এই ধর্মাচরণ বস্তুটির সহিত সংস্কারমুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত ক্ষেত্রমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এখন নিজের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করিয়া আর-একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আপনাকে বঞ্চিত করিবার শক্তি দেখিয়া তাঁহার নিজেদের সমস্ত সমাজটাকেই যেন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হইত। তিনি মনে মনে বলিতেন, এতখানি সত্যিকার তেজ ত আমাদের কোন মেয়ের মধ্যেই নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইত, বুঝি এই সত্যকারের ধর্ম-বস্তুটাই তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া গেছে। যে বিশ্বাস আপনাকে পীড়িত করিতে পিছাইয়া

দাঁড়ায় না, শ্রদ্ধার গভীরতা যাহার দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়া আপনাকে যাচাই করিয়া লয়, এ বিশ্বাস কই বিভার? কই উমার? আরও সে ত অনেককেই জানে, কিন্তু কোথায় ইহার তুলনা? ইহারই অনুভূতি একদিকে সঙ্কোচ ও আর-একদিকে ভক্তিতে তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ করিয়া দিতে থাকিত। কারণ, এই কয়টা দিনের মধ্যেই স্বামীকে যে ঊষা কতখানি ভালবাসিয়াছিল এ কথা ত তাঁহার অবিদিত ছিল না। আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইত, সমস্ত ভাসিয়া গিয়া এত বড় কাণ্ড ঘটিল কিনা শুধু একজন মুসলমান ভৃত্য লইয়া—যে আচার সে পালন করে না, বাটীর মধ্যে তাহারই পুনঃ প্রচলন একেবারে তাহাকে বাড়ি ছাড়া করিয়া দিল। অপরে যাই কেন না করুক, কিন্তু বৌঠাকরুনকে স্মরণ করিয়া ইহারই সঙ্কীর্ণ তুচ্ছতায় এই লোকটি যেন একেবারে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উমা প্রশ্ন করিয়া মুখপানে চাহিয়াই ছিল, জবাব না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাঁ দাদা, বললে না?

কি রে?

উমা কহিল, বেশ! আমি বলছিলুম বৌদি হয়ত এই মাসেই ফিরে আসতে পারেন। তোমার মনে হয় না দাদা?

ভগিনীর প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যদি ধরাই যায় তিনি আসবেন না—বহুকাল তাঁর না এসেই কাটছিল, বাকীটাও না এসে কাটতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি অন্য উপায় নেই? আমি সেই কথাই বলচি।

উমা ঠিক বুঝিল না, সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

শৈলেশ তাহার বিস্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাঁর ফিরে আসা আমি সঙ্গত মনে করিনে উমা। তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সহধর্মিণী তাঁকে আমি বলতে পারিনে।

ঊষার বিরুদ্ধে এই অভদ্র ইঙ্গিতে ক্ষেত্রমোহন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, ধর্মই নেই আমাদের, তা আবার সহধর্মিণী! ওসব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় কাজ নেই ভাই, আমি সংসার চালাবার মত একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব করচি।

শৈলেশ গভীর বিস্ময়ে কহিল, ধর্ম নেই আমাদের?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, কোন্‌খানে আছে দেখাও? রোজগার করি, খাইদাই থাকি, ব্যস। আমাদের সহধর্মিণী না হলেও চলে। তখনকার লোকের ছিল শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম, ধর্ম নিয়েই তারা মেতে থাকত, তাদের ছিল সহধর্মিণীর প্রয়োজন। আমাদের অত বায়নাক্কা কিসের?

শৈলেশ মর্মাহত হইয়া কহিল, সহধর্মিণীর তাই? শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজো-পাঠ—

কথা তাহার শেষ হইল না, ক্ষেত্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাই ভাই তাই, তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। তুমিও হিঁদু, আমিও হিঁদু—without offence পুজোও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, কেষ্ট-বিষ্টুকে ধরে খোঁচাখুঁচি করার কু-অভ্যাসও আমাদের নেই—মেয়েরা ত আরও harmless, আমরা সহজ মানুষ—লোক ভাল। কি হবে ভাই আমাদের অত বড় পাঁচ-সাতটা অক্ষরের সহধর্মিণী নিয়ে, ছোট্ট একটু স্ত্রী হলেই আমাদের খাসা চলে যাবে। তুমি ভাই দয়া করে একটু রাজী হও—ভবানীপুরের ওঁরা ভারী ধরেচেন—তোমার বোনটিরও ভয়ানক ইচ্ছে, কথাটা রাখ শৈলেশ।

শৈলেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ কোরচ, ক্ষেত্র!

ব্যাপার দেখিয়া উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রমোহন ভীত হইয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, না ভাই শৈলেশ, না। যদি ও রকম কিছু করেও থাকি, তোমার চেয়ে আমাকেই আমি বেশি করেচি।

শৈলেশ প্রতিবাদ করিল না, কেবল, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পনর

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরা কোর্টে হঠাৎ একটা মোকদ্দমা পাওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্বে পাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেলেন যে, কেস যতটা হোপলেস মনে হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাঁহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উমার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম ঊষা-বৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, মাসখানেক আগে এ কথা আমি ভাবতেও পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মাসখানেক পূর্বে কি আমিই ভাবতে পারতুম? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। ঊষা-বৌঠাকরুনের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভকামনাই করব; কিন্তু যা হবার নয়, হয়ে লাভ নেই তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেই বা ফল কি!

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপা হাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমারা পুরুষমানুষ বলেই বোধ হয় বৌঠাকরুনটিকে বুঝতে এত দেরি হল, আমি কিন্তু দেখবামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। তাঁকে নিয়ে আমরা চলতে পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, সে ত চোখেই দেখতে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হল এবং তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল

তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হলে আজ জিনিসটা কি দাঁড়াত এখন সে আলোচনা বৃথা, তবে এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক, তা হলেই হল। জপ-তপ আর হিঁদুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান-খ্রিস্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে—এ দর্প কেন? শুধু ভট্‌চায্যিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার, এ ধারণা তাঁর বাপের বাড়িতে চলতে পারে, কিন্তু এখানে পারে না। আর পারে না বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হল না।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এমন করিয়া সত্য-মিথ্যায় জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, জবাব দিতে পারিলেন না।

এই সময় উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হল? ধর, তোমার নালিশটা যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেমনি অপমান কি তাঁর জন্যে তুমি আমাকে করনি? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব? এই কি তুমি বল?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, না, তা আমি বলিনে।

বিভা কহিল, বলতে পারো না আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নূতন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিঁদুয়ানির গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র, ঢের সত্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারী ইচ্ছে ছিল, বৌঠাকরুনের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখো। বসে শোনবার এখন সময় নেই

ভাই, কিন্তু কি কি তার কাছে শিখলে আর কি-ই বা বাকি রয়ে গেল, তোমার দাদাকে নাহয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাহাঁকে বেশি করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলেন না। হিঁদুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাহাঁরা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচারনিষ্ঠা, সাবেক দিনের জীবনযাত্রার ধারা কল্পনায় তাঁহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এইজন্যেই চোখের উপরে অকস্মাৎ ঊষাকে পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে শিক্ষা ও সংস্কারের কথা আত্মীয়-পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। নিজের জন্য ঊষা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছু স্পর্শ করে নাই—করিতেই পারে না। এই কথাটা তিনি জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাঁহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে তিনি উমার কাছে কতকটা জবাবদিহির মতই সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ এ আমি অস্বীকার করিনে উমা—হিঁদুয়ানীর ঐ গলদটাই ঘুচানো চাই—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদির বাদ-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে ছাপরা যাইবার পূর্বে ক্ষেত্রমোহন বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার ফিরতে বোধ করি চার-পাঁচদিন দেরি হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, বলো, শৈলেশকে সম্মত করাতে আমি পারব।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠাকরুন তাহলে আর ফিরবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, না। যতই ভাবছি, মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধই বেশি। তুমি ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এত বড় সঙ্কীর্ণ

এবং স্বার্থপর করে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক এখন আর নেই। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে তার আর পুনঃপ্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌঠাকরুনের আচার-বিচারের বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিল না। থাকলে গৃহাশ্রয় ত্যাগ করতেন না। আচ্ছা চললুম, এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

মফঃস্বলে মোকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিনদশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সে-ই খবর দিল যে, দিন-দুই পূর্বে মাস-ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশবাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সোমেনকেও স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে?

উমা কহিল, কি জানি! সোমেনকে নিতে এসেছিলেন, বললেন, শরীর ভাল নয়।

বিভার ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শরীর ভাল না থাকবারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থা ও নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

ষোল

আরও পাঁচটা জুনিয়র ব্যারিস্টারের যেভাবে দিন কাটে, ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেমনি কাটিতে লাগিল। হাতে টাকার টান পড়িলে হিঁদুয়ানির ও সাবেক চালচলনের অশেষ প্রশংসা করেন, আবার অর্থাগম হইলেই চুপ করিয়া যান—যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলে। শৈলেশের তিনি বাস্তবিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে চিনিতেন, তাহার মত দুর্বল প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া তিনি ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া করেন নাই। তাহাদের এই বলিয়া ভরসা দিতেন যে, পশ্চিম হইতে ঘুরিয়ে আসার যা বিলম্ব। বৌঠাকরুনকে তিনি এখনও প্রায় তেমনি স্নেহ করেন, তেমনি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনও তাঁহার প্রতি আছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নেই। যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, ধর্মজীবনের তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে ঊষা ভালবাসিতে পারে নাই, পারাও কখনও সম্ভব নয়। ছেলেবেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়ে ধাতটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশি আপনার। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাঁহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, ঊষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইত, সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভালবাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে তাহার কোথাও কোন টান লাগে নাই।

এমনিভাবেই যখন কলিকাতায় ইঁহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস-দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই

শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে, এবং নিজেও এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যেও পিতাপুত্রের বাদ যাইবার জো নাই এবং মাছ-মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটে না।

শুনিয়া উমা চুপিচুপি হাসিতে লাগিল। বিভা কহিল, তামাশাটি কে করলেন? যোগেশবাবু?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেচে সত্যি, কিন্তু তামাশা করবার মত ঘনিষ্ঠতা ত তাঁর সঙ্গে নেই।

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি? একটু থামিয়া বলিলেন, কেন জানো? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন এবং এত লোকের মাঝখানের তুমিই শুধু তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার ‘পরেই হয়েচে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস আরম্ভ করবার সময় মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মোকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয় না। উমা, আজ একটু চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নাও, সাতটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। তোমার দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেকলে যেন এখন থেকে কন্‌সাল্ট করেন। পয়সা যারা দেয় তারা খুশি হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা যে বৌদিদি ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরে, একখানা মস্ত চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। বয়স সত্তর-বাহাত্তর—চাক্ষুষ আলাপ নেই, চিঠিপত্রেই পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানিনে, তবে এটা ঠিক জানি যে, ঠাট্টার সুবাদ আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাঙ্গলায় লেখা। আদ্যোপান্ত বার-দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি? তোমাকে ত একবার যেতে হয়।

কিন্তু আমার ত এক মিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বললে হবে না। এ বিপদে আমরা না গেলে আর যাবে কে? এ চিঠির অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে ত আর একবিন্দু সন্দেহ নেই!

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যাই কি করে? এবং গেলেই যে বিপদ কাটবে তারই বা ঠিকানা কি!

দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব, মনের জোর বলে যে বস্তু, সে তার একেবারে নেই। মরুক গে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও সে বিগড়ে তুলচে। যেমন করে পারো এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই।

বিভা বিষণ্ন গম্ভীরমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কান্নাকাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে মনে মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু একটি জিনিস আমি নিশ্চয় ধরেচি বিভা, ঊষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসেনি এসব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল, কহিল, তাই, এমনি করে তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করচেন? দেখ দাদা আমার দুর্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর নন। কারও জন্যেই এই সঙ সাজার ফন্দি মাথায় আসবে না।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে! শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছেন, তিনিও ইহার বিশেষ কিছু জানেন না, তাই

স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অন্ধকারে তর্কযুদ্ধ চালাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন-দুয়ের মধ্যেই কাজকর্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনুপূর্বিক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরুভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনে বৃন্দাবন গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসঙ্গত আচার-বিচার। স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া যান। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দু'চোখ ছলছল করতে লাগলো। তার চেহারা দেখে মনে হল যেন খাবার কষ্টটাই বেশি হয়েছে।

এই ছেলেটির প্রতি বিভার এক প্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশি না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া সে সহিতে পারিল না। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলে না কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখলুম, তাতে শেষ পর্যন্ত সুফল ফলবে না। ধর্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের উপর ঢের বেশি বেঁকে যেত।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে জানলে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

সতর

চিঠি লেখালেখি একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয়-বন্ধু মহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্তিকথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই। হয়ত বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল। ভবানীপুরে এ সংবাদ যে গোপন ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিত না, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন, আমার সুমুখে কি করে এসব করেন আমি দেখবো।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন—বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু সমাজের সমবেত মর্যা ল প্রেশারের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। দুর্বলচিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশি দিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস-দুই বাকি। চাকরি ছাড়িতে সে পারিবে না তাহা নিশ্চয়। গঙ্গাস্নান ও ফোঁটাতিলক যতই কেন না সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরু ও গুরুভাইয়ের দল এ কুমতলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবে না। তার পরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু ঊষা বৌঠাকরুন এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ি পালাবার ফন্দি করতে হবে না। জপ-তপের মধ্যে দুজনের বনবে!

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি!

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়াগাঁয়ে শুনেচি নানারকমের তুকতাক আছে, আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, না। যদিও বা থাকে এ-সব করবেন না।

কেন করবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, বৌঠাকরুনের ওপর আমি খুশি নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেন না তা তোমাকে আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিল না। শুধু ধীরে ধীরে কহিল, যা ইচ্ছে হোক, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আনবই, তোমাকেও আমি প্রতিজ্ঞা করে বললুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, বন্ধু দুখানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য, বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেটে হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে?

সাহেবের সঙ্গে তিন-চারজন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দুজনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেইদিনটা কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নীচের লাইব্রেরি-

ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সেই ভারী পর্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই চোখে পড়িল।

একটা দিনেই বাড়ির চেহারা বদলাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারিগুলো আছে, কিন্তু আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফর্সা জাজিম পাতিয়া জন-দুই লোক নধর পরিপুষ্ট-দেহের সর্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ সাহেব-মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, উড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইনি আছেন।

গোঁসাইনিটা কে?

পাচক-ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায়?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলে ক্ষেত্রমোহন সেইখানেই দাঁড়াইয়া শৈলেশ, শৈলেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরনে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক, অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয়ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীভাগবৎ পড়ছেন।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

তিনি খবর পেয়েচেন, আসচেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে খড়ম পায়ে শৈলেশ নীচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা, মাথায় একটা সরুগোছের টিকি ছাড়া বাহিরের চেহারায় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকেই চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা—উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়াই আশীর্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিল না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়িতে একটু বসবার জায়গাও নেই নাকি হে?

শৈলেশ লজ্জিতভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোংরা হয়ে আছে—পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তাহলে এখনকার মত আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চললুম। আমাদের বোধ করি আর বড় একটা প্রয়োজন হবে না, তবু বলে যাই, বসবার জায়গা যদি কখনও একটা হয় ত খবর দিস্ বাবা! চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়িতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না, তাহার দু'চক্ষু বাহিয়া হু-হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন, ও-বাড়িতে তাঁহাদের আর স্থান নাই। দাদা যা-ই কেন না করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। স্নেহের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই বার বার মনে পড়িল, কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ইহার পর মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু-সমাজে এমন আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

মুখে মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিসটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে কোথাও যাওয়া-আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া

উঠিয়াছে, অথচ কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছে না। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, শুধু এই পরকালের লোভের ব্যবসাটাই একবার শুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহে না। অনিশ্চিতের পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয়া যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা ঊষা। বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্বনাশের বনিয়াদ গড়িয়া গেছে সে-ই। কোনমতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকি কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উমার, এমনকি ক্ষেত্রমোহনেরও আজকাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক তাহাকে না আনিলে ত এ বালাই কোনদিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

আজ রবিবারে সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিলেন। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু সে বাড়ির খবর পাইতে বাকি থাকিত না। গুরুভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্যন্ত মুখে আনেন না এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই-ঠাকুরানী উপরের ঘরে তেমন কায়েম হইয়াই বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নামকীর্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, এ-সকল সংবাদ বন্ধুজনের মুখে নিয়মিতভাবেই বিভার কানে পৌঁছে; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সঙ্কল্প করিয়াছে এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিনমুখে কহিল, যদি সত্যিই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল?

বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে।

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্যন্ত ত আর কখনও যাইনি, আজ চল না একবার যাই!

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইল না, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উমাকে আজ তাহারা সঙ্গে লইল না। এই মেয়েটির সম্মুখে লজ্জার মাত্রাটা আজ তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাড়ির সুমুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরুভাই-যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটলি কষিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ি আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিংবা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়িতে আছে?

তাঁহারা উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল, লাইব্রেরি-ঘরের দ্বারে সেই পুরানো ভারী পর্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে। একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল, পূর্বের আসবাবপত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দুটো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটায় শ্রী ফিরিয়েছেন। এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনও হবে আমার আশা ছিল

না। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি, আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরনে চমৎকার লালপেড়ে জরি বসানো ধুতি, মাথার চুল বাঙ্গালী ছেলেদের মত পরিপাটি করিয়া ছাঁটা, পায়ে বার্নিশ-করা পাম্পসু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেচেন পিসিমা, রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল। এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেছেন, না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুরবেলা এসেছেন। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখে আসিতেই ঊষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখলে বৌদি?

ঊষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিয়া কহিল, দেখলুম বৈ কি ভাই। ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচিনে। তাড়াতাড়ি মালা-ফালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নাপতে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই, নতুন কাপড় জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা আপনিই বা কি করছিলেন বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বলবার তাড়াহুড়ো নেই বৌঠাকরুন, ধীরে সুস্থে সমস্তই বলতে পারব, এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরুভাই দুটি ত দেখলুম, বাহিরে পুঁটলি কষছেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ-যুগলমূর্তির কি করলেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

ঊষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তাঁরা নবদ্বীপধামে গেছেন।

বলি, আবার ফিরে আসছেন না ত?

ঊষা তেমনই মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাকরুন, আপনার যে এরূপ সুবুদ্ধি হবে এ ত আমাদের স্বপ্নের অগোচর। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসীমালা ছিঁড়ে দিয়ে টিকি কেটে দিয়ে—এ সব কি বলুন ত?

ঊষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, বেশ ত, বলবার তাড়াহুড়ো কি জামাইবাবু! ধীরে সুস্থে সমস্তটাই বলতে পারব। এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিই।

নিষ্কৃতি

এক

ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ ও হরিশ এবং খুড়তুতো ছোট ভাই রমেশ। পূর্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী ও বিষয়-সম্পত্তি রূপনারায়ণ নদের তীরে হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয্যের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, হঠাৎ একসময়ে রূপনারায়ণ এমনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবানীর জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান গিলিতে শুরু করিলেন যে, বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশেষে, সাতপুরুষের বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে-সব অনেক দিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকীল হইয়াছেন, বিস্তর বিষয়-আশয় অর্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন-এক কথায়, যাহা গিয়াছিল তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন বড়ভাই গিরীশের বাৎসরিক আয় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা, হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই রমেশ। তবে একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বার দুই-তিন সে আইন ফেল করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রতি কি-একটা ব্যবসায়ে বড়দার হাজার তিন-চার লোকসান করিয়া এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবৌ ও ছোটবৌয়ে কিছুতেই আর বনিবনাও হয় না। হরিশ এতকাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে মফস্বলে থাকিয়া প্র্যাকটিস করিতেন। তখন মাঝে মাঝে দু-দশদিনের বাড়ি আসা-যাওয়ার অল্প সময়টুকু

এই দুটি নারীর বিশেষ সদ্ভাবে না কাটিলেও কলহ-বিবাদের এরূপ প্রচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাসখানেক হইল হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন এবং বাড়ি হইতে সুখশান্তিও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। তবে এবার আসিয়া পর্যন্ত দুই জায়ের মনকষাকষি ব্যাপার এখনও উঁচু পর্দায় উঠে নাই; তাহার কারণ ছোটবৌ এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের স্ত্রী শৈলজা তাহার একমাত্র পুত্র পটল ও সপত্নী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগর গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন পাঁচ ছয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়িতে শাশুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এইজন্যই বোধ করি পাড়ায় তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না, মাসখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ি আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনিই প্রাতঃস্নান চলিতে লাগিল এবং কিছুতেই কুইনিন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই-চারি দিন যায়-জ্বরে পড়েন, আবার উঠেন আবার পড়েন। ফলে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন- এমনি সময়ে শৈল বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি শুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না। আরও একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারী ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ এবং এমনি

কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার শুরু করিলে কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না-এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল।

শৈলর মাসীর বাড়ি পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর রান্নার কাজ নাই-তাই সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজছেলে হরিচরণের উপর মাকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-দুই হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভালো করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন এবং এই শয্যার উপরেই তিন চারিটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল-অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ওধারে শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাসের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল ইহারা সকলেই মেজকর্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা, না বড়মা?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডানদিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা?

কাল শুয়েছিলাম? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে বাঁদিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁদিক ঘেঁষিয়া পড়িয়াছিল।

বেদখল হইবার সম্ভাবনায় অমন হুড়োমুড়িতে পর্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে!

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, পটল! বড়ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করো না বলচি। মাকে বলে দেব।

পটল বেচারা অত্যন্ত বেগতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে!

কানাই ছোটভাইয়ের স্পর্ধায় চোখ পাকাইয়া 'পটল' বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এইসময়ে ঘরের বাহিরের বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল, ওরে বাপ রে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে!

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্তন! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্যপুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল-চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যা আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল-'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি-', আর সবচেয়ে আশ্চর্য ওই শিশুর দলটি! ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে একমুহূর্তে অন্তর্ধান হইয়া গেল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড়জার জন্য একবাটি গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকে হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতি চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ ইতিপূর্বে সে 'আনন্দমঠ' পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ জীবানন্দ ছোটখুড়ীমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে ওই 'বিস্তীর্ণ জলরাশি' এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত-কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া বলিল, আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক ডানদিকের মকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিল, কাউকে ত দেখচি নে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে?

এবারে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায় নি মা, সব ঐ নেপের মধ্যে ঢুকেচে।

তাহার কথা ও মুখচোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিল। দূর হইতে সে ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিল। এবার বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, খেয়ে ফেললে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা- বেরো-চল্ আমার সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, এখন মৃদুকণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকে বা খেয়ে ফেলবে কেন, আর তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মারধর কত্তে হবে না! যা, তুই এখান থেকে-লেপের ভেতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠচে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি কি শুধুই মারধর করি দিদি?

বড্ড করিস শৈল। ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালিবর্ণ হয়ে যায়-আচ্ছা যা না বাপু তুই সুমুখ থেকে-ওরা বেরুক।

আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবারাত্রি জ্বালাতন করলে তোমার অসুখ সারবে না। পটল সবচেয়ে শান্ত, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুতে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে, বলিয়া শৈলজা জজসাহেবের

মত রায় দিয়া বড়জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখন ওঠো-দুধ খাও-হাঁ রে হরি, সাড়ে-ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?

প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উদ্ধার করিতেছিল, তুচ্ছ ঔষধ-পথ্যের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ওষুধ-টুষুধ আর আমি খেতে পারব না শৈল।

তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর, বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, তোকে জিজ্ঞেস কচ্চি, ওষুধ দিয়েছিলি?

তিনি ঘরে ঢুকিবার পূর্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীতকণ্ঠে বলিল, মা খেতে চান না যে!

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিল, ফের কথা কাটে! তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল?

খুড়ীর কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন তুই এত রাত্তিরে হাঙ্গামা কত্তে এলি বল ত শৈল? ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে যা না শিগগির কি ওষুধ-টষুধ আমাকে দিবি!

হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শয্যার অপর প্রান্তে নামিয়া পড়িল এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছিপি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিল, গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হলো, না রে হরি? জল চাইনে, মুখে দেবার কিছু চাইনে, না? এ ব্যাগারঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বা'র কচ্চি।

ঔষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাৎ ভরসা হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার মত কাটিয়া গেল। কিন্তু এই 'মুখে দিবার কিছু'র

প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিরুপায়ের মত এদিকে ওদিকে চাহিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, কোথাও কিছু নেই যে খুড়ীমা!

না আনলে কোথাও কিছু কি উড়ে আসবে রে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, ও কোথায় কি পাবে যে দেবে? এসব কি পুরুষমানুষের কাজ? শৈলর যত শাসন এই ছেলেদের ওপরে। নীলিকে বলে যেতে পারিস নি? সে মুখপোড়া মেয়ে তুই আসা পর্যন্ত এ ঘর একবার মাড়ায় না-একবার চেয়ে দেখে না, মা মরচে কি বেঁচে আছে।

সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় গিয়েছিল যে।

কেন গেল? কোন্ হিসেবে তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি? দে, হরিচরণ, তুই ওষুধ ঢেলে দে-আমি অমনি খাব, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনুপস্থিত কন্যার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ঔষধের জন্য হাত বাড়াইলেন।

একটু থাম হরি, আমি আনচি, বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবিয়ানা শিখিয়াছিল। ছেলেদের সে বিলাতী পোশাক ছাড়া বাহির হইতে দিত না। আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিকে বসিয়াছিল, কন্যা নীলাম্বরী ঔষধের তোড়জোড় সুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, দরজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, জামার দাম কুড়ি টাকা?

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিল, এ আর বেশী কি দিদি? আমার অতুলের এক-একটি সুট তৈরি করতে ষাট-সত্তর টাকা লেগে গেছে।

'সুট' কথাটা সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিল, কোট, প্যান্ট, নেকটাই-এইসব আমরা সুট বলি।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষুব্ধভাবে মেয়েকে বলিলেন, নীলা, তোর খুড়ীমাকে ডেকে দে, টাকা বা'র করে দিয়ে যাক।

নয়নতারা বলিল, চাবিটা দাও না-আমিই বা'র করে নিচ্ছি-

নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল-সে-ই বলিল, মা কোথা পাবেন, লোয়ার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়ীমার কাছে থাকে, বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, ছোটবৌ এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিনকতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক করিতে শুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট-দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন অতুলের নূতন কোট লইয়া রীতিমত আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

অতুল কোটটা গায়ে দিয়া ইহার কাটছাট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মা ও হরিচরণ মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া ফ্যাশন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিতেছে।

অতুল বলিল, ছোটখুড়ীমা, তুমি দেখ ত কেমন তৈরি করেচে।

শৈল সংক্ষেপে বেশ বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া কুড়িটা টাকা গণিয়া তাহার হাতে দিল।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর তোরঙ্গভরা পোশাক, তবু তোর আর কিছুতেই হয় না।

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, কতবার বলব মা তোমাকে? আজকালকার ফ্যাশন এইরকম। কাটছাঁট অন্ততঃ একটাও এরকমের না থাকলে লোকে হাসবে যে! বলিয়া টাকা লইয়া বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া বলিল, আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে। এখানে ঝুলে আছে, ওখানে কুঁচকে আছে-ছি ছি, কি বিশ্রীই দেখায়! তারপর হাসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিল, ঠিক যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্চে!

ছেলের ভঙ্গী দেখিয়া নয়নতারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। নীলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

হরিচরণ করুণচক্ষে ছোটখুড়ীর মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথাটা হেঁট করিল।

সিদ্ধেশ্বরী নামেমাত্র আহ্নিক করিতেছিলেন, ছেলের মুখ দেখিয়া ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, সত্যিই ত! ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল? দে না, বাছাদের সব দুটো জামাটামা তৈরি করিয়ে।

অতুল মুরুব্বির মত হাত নাড়িয়া বলিল, আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তুরমতো তৈরি করিয়ে দেব-বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

নয়নতারা পুত্রের হুঁশিয়ারী সম্বন্ধে কি-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে। ওদের জামা তৈরি করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিল, দিদি, ছোটবোর কথা শুনলে? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল। সে দু পা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোটবোর কথা দিদি অনেক শুনেচে- তুমিই শোননি। অতুল ছোটভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিলখিল করে হাসলে-ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘরসুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, আজ আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোটবৌ যা মুখে এল তাই বলে তাকে গাল দিয়ে গেল!

সিদ্ধেশ্বরী দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, তুমি নিজে কিছু না করে দিলে আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু মিনিট-দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, সেই কথাই জানতে এসেছি। আমি কারুর খাইনে পরিনে দিদি যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে বলিলেন, ঝাঁটা মারবে কেন মেজবৌ, ওর ঐরকম কথা। তা ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু-

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল। আর আমি খিলখিল করে হাসি! শাগ দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি-আবার ঝ্যাঁটা লোকে কি করে মারে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন ওঠেনি?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া গেলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, ও কি কথা মেজবৌ? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?

মেজবৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছিল, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, সে তুমিই জানো। কেউ কারো মন জানতে যায় না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বলতে হয়। আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদ-বালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বললেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, তিনি বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবৌ অধিকতর কঠোরস্বরে কহিল, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলেই ত দেখতে শুনতে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই। উঃ-উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। যাকে তাকে বলে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুন মানুষ নয়-সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা!

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ আমার শত্তুরেও দিতে পারে না মেজবৌ! এ-সব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে

আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার কত আহ্‌-াদ-আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে-

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহ্নিক হয়েচে? একটু দুধ খাও দিদি।

সিদ্বেশ্বরী কান্না ভুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, বেরো আমার সুমুখ থেকে-দূর হয়ে যা।

হঠাৎ শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আসবে তাই লোককে বলবি কেন?

কাকে কি বলেচি?

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেমনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলে বলে তোর বুক বেড়ে গেছে-কে তোর কথার ধার ধারে লা? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস? দূর হ আমার সুমুখ থেকে।

শৈল সহজভাবে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। এ বাটিটায় আমার দরকার।

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন, খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই-দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এই সেদিন এসেচি দিদি এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাক গে-কাছেই গঙ্গা-অমনি বা'র করে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় ক'চ্চ বল ত? জ্বরে জ্বরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েছে, ওঁকে কেন বিঁধচ? আমি যদি দোষ করে থাকি, আমাকে বললেই ত হয়-কি হয়েচে বল?

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, আজ অতুলের জন্মদিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বললি?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঃ এই! কিছু ভয় করো না মেজদি-তোমার মত আমিও ত মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেমনি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি; আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্বাদ করছি-নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস।

আচ্ছা মানচি, বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, যদি অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ কর-আমি ঘাট মানচি।

নয়নতারা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোটজায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ পাগলীর কথায় কোনদিন রাগ করো না মেজবৌ? এই আমাকেই দেখ না-ওকে বকি-ঝকি কত গালমন্দ করি; কিন্তু একদণ্ড দেখতে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে-এত দুধ ত খেতে পারব না দিদি?

পারবে, খাও।

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্তটা খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্বাদ করিস শৈল।

এক্ষণি করচি, বলিয়া শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদরযত্নে লালিত পালিত; বাপ-মা কোনদিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এতবড় অপমান তাহার সর্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর। কারণ, তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে-তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা-তাহাকে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল।

কিন্তু অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ, অপমানটাই এ ক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাশন, অনেক কোট-প্যাণ্ট নেক্টাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোটখুড়ীমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া যায় দেখিয়া সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিদাকে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা! এ শর্মা অতুলচন্দর,-রোগ গেলে ও-সব ছোটখুড়ী-টুড়ী কাউকে কেয়ার করে না!

হরিচরণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল, আমিও করিনে-চুপ, কানাই আসছে। পাছে নির্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মোগল-বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা, মা ডাকচেন-শিগগির।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে? আমি কি করেচি? আমাকে কখ্খন নয়-যাও অতুল, ছোটখুড়ীমা ডাকচেন তোমাকে।

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, দু'জনকেই-দু'জনকেই-এক্ষুণি-অ্যাঁ, সেজদা, তোমার নতুন কোট মাটিতে ফেলে দিলে কে?

প্রত্যুত্তরে সেজদা শুধু মেজদার মুখের পানে চাহিল, এবং মেজদা সেজদার মুখের পানে চাহিল, কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি-তুমিই বলেচ ছোটখুড়ীমাকে কেয়ার কর না-

আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ, বলিয়া অতুল সগর্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ভাবটা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

হরিচরণের চেহারা আরও খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোটখুড়ীমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইল না। এদিকে হাজিরির সময় নিকটতর হইয়া আসিতেছে-কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোটখুড়ীমাকে বাড়িসুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সংবাদ লইয়া জানিল, ছোটখুড়ীমা নিরামিষ-রান্নাঘরে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ

বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত সে এই ছোটখুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধারণ দুর্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়তার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া তাহার মা, খুড়ী, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল, ইঁহাদিগের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে পারা চাই। তাহা হইলেই ইঁহারা সায় দেন, অন্যথা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে তাহাকে চিরকাল ঠকিয়া মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোটখুড়ীমার তাড়া খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা-কোনপ্রকার জবাবই মুখে যোগায় নাই-হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরে দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমন কি মুখ তুলিলেই তিনি অতুলকে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যাঠাইমার নয়-এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্যন্ত সাহস হইল না-কোনরকম সাড়া দিয়াও ছোটখুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজদার পায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল

ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল, জুতা পায় দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোটখুড়ীমার আনত-মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল, জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোটবোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত না এবং স্পর্ধাপূর্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত-বিবর্ণমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী দুর্যোধনের মত সূচ্যগ্র ভূমিও পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, অতুল এসেচিস? দাঁড়া বাবা-ও কি রে! জুতো পায়ে? নীচে যা-নীচে যা-

বাড়ির আর কোন ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে নেই অতুল, নীচে যাও।

অতুল শুষ্কমুখে ক্ষীণস্বরে কহিল, আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি-এখানে দোষ কি?

শৈলজা ধমকাইয়া উঠিল, দোষ আছে-যাও।

অতুল তথাপি নড়িল না; সে মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই

বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, আমরা চুঁচড়ার বড়িতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম-এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালে কিচ্ছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্ধা দেখিয়া শৈলজা দুঃসহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ঠিক এইসময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে বাইরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা?

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়াছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে-কিছুতে নাবছে না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, এই-নেবে আয়!

অতুল গোঁ-ভরে বলিল, এখানে দাঁড়াতে দোষ কি? ছোটখুড়ী আমাকে দেখতে পারে না বলে শুধু যা যা কচ্চে।

মণীন্দ্র তড়াক করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল, 'ছোটখুড়ী' নয়-'ছোটখুড়ীমা'; 'কচ্চে' নয়-'কচ্চেন'-বলতে হয়-ইতর কোথাকার!

একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক, চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটা ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতাবাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া, জ্যাঠতুত-খুড়তুত ভায়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মণি প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে

মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক-াসে পড়ে এবং বয়সে ছোট ভাইদের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড়ভাইয়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। এ বাড়িতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ যে এই-সমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না-অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া, লাথি মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জন ঘরে বসিয়া গোটা-দুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন-গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেলেন। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া, মড়াকান্না তুলিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। সমস্তটা মিলিয়া এমনি একটা গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্তারা কাজকর্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, মণি, তুই বাইরে যা। বলিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতা মেজবৌমার উন্মাদ ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারী ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন।

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটখুড়ীর প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল, ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে-ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিশ চিৎকার করিয়া বলিলেন, ছোটবৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোটখুড়ীর হইয়া জবাব দিল, সেজদা কথা শোনেন নি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিল, তবে আমিও বলি ছোটবৌ-তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেলছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে, নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়!

নয়ই ত। বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন-তোর ছোটখুড়ীমাকে জিজ্ঞাসা কর্ নীলা, উনি কে যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনেছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হল? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?

নীলা এই তিনটি প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না।

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত, এ সংসারে তিনি ছেলেপুলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না, কারণ তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট এবং ছোটবৌ করিয়াও রাশিপ্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবার্তা কহিতে, রোগে শোকে চারিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে, রাঁধিতে-বাড়িতে, সাজাইতে-গুছাইতে ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্তা কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে নিজে শাসন করছ কেন? মা বেঁচে, আমি বেঁচে-ঝি-বৌকে শাসন করতে হয় আমরা করব! তুমি পুরুষমানুষ, ভাশুর-ও কি কথা-বাইরে যাও। লোকে শুনলে বলবে কি!

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তুমি সবদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাবনা কি বৌঠাকরুন। তা হলে কি একজন আর একজনকে বাড়ির মধ্যে হত্যা করে ফেলতে পারে? বলিয়া বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি ঝি-বৌকে কেমন শাসন করেন।

হরিশ সে কথার আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজগিন্নীদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিট-খানেক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ এ-সব কি হচ্চে মেজবৌ।

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিল, দেখতেই ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে?

নয়নতারা তেমনিভাবে কহিল, যেখানে হোক।

তবু, কোথায় শুনি?

কি করে জানব দিদি, কোথায়? উনি বাসা ঠিক করতে বেরিয়েছেন, ফিরে না এলে ত বলতে পারিনে।

তোমার ভাশুর শুনেচেন?

তাঁকে শুনিয়ে কি হবে? যাঁর শোনা দরকার, সেই ছোটগিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকাল বেলাটায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না-সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দেখ মেজবৌ, এই ভাশুরের মান-মর্যাদা তোমরা বুঝলে না, কিন্তু বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, আমরা সে কথা কি জানিনে দিদি? দুজনে দিবারাত্রি বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা

মেলে। তোমার বাড়িতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরদের মত থাকতে পারি, কিন্তু এখানে আর একদণ্ড বাস করতে পারব না।

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বরে এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, এ আমার বাড়ি ত নয় মেজবৌ, বাড়ি তোমাদেরই। কোনমতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না।

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিল, যদি কখন ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তা হলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব; কিন্তু, এখানে একটি দিনও আর থাকতে বলো না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৌ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে কি সেই কথা মনে রাখতে আছে? অতুল আমাদের ছেলে-

কথাটা শেষ হওয়া পর্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য ধরিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল-কোন কথা মনে রাখতে পারিনে বলে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হলো, তখনই হাউমাউ করে কেঁদেকেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল-একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না। আমি ত সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম; কিন্তু রাগ করতে পাব না দিদি-তুমি যতই বল, আমাদের ছোটবৌ সহজ মেয়ে নয়! বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুন করে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেস করে শুনতে পেলুম। না দিদি, এখানে আমাদের থাকা চলবে না। এক বাড়িতে থেকে ছেলে আমার অমন মন গুমরে গুমরে বেড়ালে ব্যামোতে পড়বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়োয়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা

জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজবৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারিতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে! বাড়িতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, মেজবৌ?

নয়নতারা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, জিজ্ঞেস করেই দেখ না দিদি।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা? বড়দাকে যা মুখে আসে তাই বলে; ছোটখুড়ীমাকে গালাগালি দেয়!

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি হরি; যাও, ডেকে কথা কও গে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, ওর কথা বলবার ভাবনা নেই মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তোর মুখও ত নেহাত কম নয় হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস!

আচ্ছা, সেই ভাল! আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধেছেঁদে নিক্।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা ক'ব। তা নইলে ছোটখুড়ীমা-না, মা, সে আমরা কেউ পারব না। বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজবৌ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ছোটবৌ একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা হলে সমস্ত গোলই মিটে যায়!

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবৌ কহিল, তবেই দেখ দিদি। এইসব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে, না ভালবাসবে? বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা-নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্চে, কিন্তু আমার অতুল-টতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বললে, সাধ্যি কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে বেরিয়ে যায়! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন, তা বটে। এ বাড়ির মণি থেকে পটল পর্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বশে। সে যা বলবে যা করবে, তাই হবে-কেউ আমাকে মানেও না।

এটা কি ভাল?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্টা?-ওরে ও নীলা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে দে ত মা।

নীলা কি কাজে এইদিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিল না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, জিনিসপত্র বাঁধা হয়েছে-এরা তবে চলে যাক?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈকি-কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না- কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি? আর নিজের ছেলের দিবারাত্রি শুকনো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস করে? তুই এদের তা হলে এ বাড়িতে রাখতে চাসনে বল্?

নয়নতারা চিমটি কাটিয়া কহিল, তা হলে হয়ত সবদিকেই ছোটবৌর হয় ভাল।

শৈলজা এ কথা কানে তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই মিশতে দিতে পারিনে দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না।

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত মাথা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল-হতভাগী, মায়ের মুখের সামনে তুই অমন করে ছেলের নিন্দে করিস! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খসে যায়।

আমি ইচ্ছে করে কখন তোমার ঘর মাড়াই নে মেজদি। কিন্তু তুমি এমনি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ। বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুতেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ্চ; কিন্তু ছোটবৌর এতটুকু ইচ্ছে নয়- আমরা এ বাড়িতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ওরা যা বলচে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি মেজবৌ!

আমি কি বলচি-সে ভাল কাজ করেচে দিদি? জ্ঞানবুদ্ধি থাকলে কেউ কি বড়ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায় নাকখত দিচ্ছি, বলিয়া নয়নতারা মাটিতে সজোরে নাক ঘষিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাকে তোমরা মাপ করো দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে-বলিয়া

নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটিতে নাক ঘষিতে যাইতেছিল-সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল্ না শৈল, মেজবৌরা চলে যাক।

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহনি সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল; বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দিক। আমার সংসারে বনিয়ে না চলতে পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও- আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার নও। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি, তাহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতা-বেড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্তা আহারে বসিলে, সিদ্ধেশ্বরী পাখার বাতাস করিতে করিতে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন; কহিলেন, মেজবৌদের আর ত এ বাড়িতে থাকা পোষায় না দেখছি। আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্ছে।

গিরীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈ কি! এমনি ত ছোটবৌয়ের সঙ্গে এক তিলার্ধ বনে না, তার ওপর ছোটবৌ বাড়িতে সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে-কেউ অতুলের সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক’দিনে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেছে-

এইসময়ে শৈলজা দুধের বাটি-হাতে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়-চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটি রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এই যে ছোটবৌ-বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

ও-পক্ষের দোষ যতই হোক, অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন; বলিলেন, এই যে শৈল এখন থেকেই ভায়ে ভায়ে অসদ্ভাব করে দিচ্চে, বড় হলে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি করে বেড়াবে-এটা কি ভাল?

কর্তা ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া বলিলেন, বড় খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী কহিতে লাগিলেন, ওর জন্যেই ত মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙ্গালে। আচ্ছা সে-ও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েচে-চুকেবুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ করে দেওয়া? আজ তুমি মণি হরিকে ডেকে বলে দিয়ো-তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, নইলে ওরা চলে গেলে যে পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দেবে। সত্যিই ত আর ছোটবৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না!

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোটঠাকুরপো কি কোনদিন কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবে না? এমনি করেই কি চিরটা কাল কাটাবে?

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এইসকল প্রসঙ্গ সে কোনদিন শুনিত না এবং

শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অথচ সত্যকে সে আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক বলিতে বা শুনিতে কোনদিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে সে তাহার স্বভাবটিকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন।

পাঁচ

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধেরই উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে শুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল-কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল! স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া কর্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবং কহিলেন, আমি বেশ করে ধমকে দেব'খন। বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুতঃ গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত মকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি তত্ত্ব লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন এবং ভালোমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক একটা মতামত প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধমকে দেব'খন' বলিয়া কর্তা যখন কর্তার কর্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না; কাহাকে ধমকাইবেন- কেন ধমকাইবেন -জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অমন করে বসে কেন দিদি, বেলা হ'ল, যা হোক চাট্টি মুখে দেবে চল।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়-এই ত সবে এগারোটা।

এগারোটা কি সোজা বেলা দিদি? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া-দাওয়ার কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন, তা হোক, মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত শিগ্গির খাইনে-আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, এইজন্যেই ত পিত্তি পড়ে দেহের এই আকার! আমার হাতে হেঁসেল থাকলে আমি ন'টা পেরুতে দিই? তুমি না বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্বনাশ। নাও চল, যা হোক দুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা এক মাসের অধিককাল এখানে আসিয়াছে; এবং বড়জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দারুণ অস্থিরতা ভোগ করা সত্ত্বেও কেন যে এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতববাদের এমনি মহিমা, সমস্ত বুঝিয়াও, আর্দ্রচিত্তে কহিলেন, তুমি আপনার জন বলেই এ কথাটি আজ বললে, মেজবৌ; নইলে কে আর আমার আছে বল!

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকরুনের দ্বারা ভাত বাড়াইয়া আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত। মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া কহিল, তোর ছোটখুড়ীকে বল্ গে ও-হেঁসেলে কি আছে এনে দিতে।

মিনিট-খানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল-তিনি মেজজাকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কণ্ঠে চিঁচি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা এইসঙ্গে কেন বসলে না মেজবৌ।

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বসব। শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না তা বলে দিচ্চি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কত দূরে আছে দেখিয়া লইয়া কহিল, এরা দু'জনে যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মরব, আর কি কেউ তেমন করে কাঁদবে? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে, কিন্তু আমি করব ভেতর থেকে। তুমি এই যে বললে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকারের আপনার জন নেই-এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বরী বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন, এ কি ভোলবার কথা মেজবৌ? এতদিন যে তোমাকে চিনতে পারিনি তার শাস্তিই ত ভগবান আমাকে দিচ্চেন।

মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল, শাস্তি যা-কিছু ভগবান যেন আমাকেই দেন, দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল, আজ যদি বা জানতে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধূলোর যোগ্য নই, কিন্তু জানবো সে কথা কি করে দিদি? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করব, ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েচি যে ছোটবোর দু'চক্ষের বিষ!

সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সে যেন তার ছেলেপিলে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাতগুষ্টীকে দুধেভাতে খাওয়াব কি নিজের সর্বনাশ করবার জন্যে? খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদের ছেলেপুলে-এই সম্পর্ক। ঢের খাইয়েচি, ঢের পরিয়েচি-আর না দাসী-চাকরের মত মুখ বুজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক, না হয় চলে যাক।

অদূরে চৌকাঠ ধরিয়া শৈল দাঁড়াইয়া ছিল, সিদ্ধেশ্বরী তাহা স্বপেনও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই, তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ঠিক পাশের কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারের রুচি চলিয়া গেল; এবং এই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ যাত্রা রক্ষা পান-তাঁহার এমনি মনে হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু হাত নাড়চ-খাচ্চ না যে?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও দিদি, আর দুটি খাও-

তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন মিছে কতকগুলো বকচ মেজবৌ, আমি খাব না-যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাকলে, আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া যা পারিলেন নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া? এবং ইহার অনিবার্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস শুরু করিয়া দিবে ইহাতেও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়ীমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ-াদ কতটুকু হইল বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ম্লানমুখে বসিয়া ছিলেন-আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হোক, রমেশকে বকিতে হইবে-তাহ মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল- তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন নীলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না-না, বৌঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না-সে আর ছেলেমানুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না, রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল-দাদার আহ্বানে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেচিস কেন?

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেচি?

গিরীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আলবত করেচিস। বলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বড়গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে, তাই বলে তাকে গালমন্দ করেচিস। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বললে?

রমেশ অবাক হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গর্জিয়া উঠিলেন, তোমার কি ভীমরতি ধরেচে? কখন তোমাকে বললুম ছোটঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেছে?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না-না, সে ছোটবৌমা।

তখন গিরীশ বলিলেন, ছোটবৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, সেই বা কেন অতুলকে গালমন্দ করবে! সেও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলব আমি। তুমি ছোটঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্চ কেন?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি, আর দেখ গে যে বাগবাজারের খাঁ-দের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, খড়ের দালালি?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল-আমি জানিনে, তুই জানিস! খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় পাটই হ'লো। এই পাটের দালালি করে তুই কি দু'শ এক'শও করে আনতে পারিস নে? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে বসে খাওয়াতে পারব না! 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার গেছে-গেছেই। কুছ পরোয়া নেই-আর চার হাজার দাও। না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা বলে, আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে বসে খাবে?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, সব কাজ শিখতে হয়; নইলে, পাটের দালালি ত করলেই হয় না! বার বার এই টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের দালালি-টালালি বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা থাকবে। এটা নষ্ট হলে তবে ও-টাকায় হাত দেবে-তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না-যাও।

রমেশ নীরবে চলিয়া গেলে হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কি বল বৌঠান?

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম?

হরিশ বলিলেন, এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার আট হাজার সেই জলেই ফেলতে দেবেন, এ যেন আমি ভাবতেই পারিনে।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে তুমি কি রকম করতে বল?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা? আট হাজার দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আনতে পারবে না-আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি!

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক, ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা মানুষ?

হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে ২৫ টাকা মাস্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে।

কি বল বৌঠান?

কিন্তু বৌঠান জবাব দিবার পূর্বেই গিরীশ খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক, ঠিক কথা বলেচ হরিশ। কাঠবিড়াল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেচি কিনা ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারী প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখতে পারে এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

সিদ্ধেশরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না নাকি?

নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার নাকি আমি টাকা দিই তাকে?

তবে এমন কথা বলাই বা কেন?

হরিশ কহিলেন, বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নাই বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই! সংসারে টাকা নষ্ট হলে আমারও ত গায়ে লাগে!

সেইটেই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ছয়

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এমনি নিরেট, এমনি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার জো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল এ রহস্য জানিত শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত টলিয়া টলিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত-দুর্বলকণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজবৌ, সে না থাকলে আমাকে দেখচি বেঘোরে মরতে হয়। এমনি সেবাযত্ন আমার মায়ের পেটের বোন থাকলে করতে পারত না।

শৈল ঘরের ভিতরে রাঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় শুরু করিলেন, আর অপরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্মের ভোগ-ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজবৌ। মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকেও আমি পরের ভাঙ্চি শুনে পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে থাকিয়াও সে যখন এতবড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্য্যের সীমা রহিল না। তাঁর চিঁচিঁ কণ্ঠস্বর

একমুহূর্তেই প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল; মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেচে তা যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুনব, আমার সে জোটি পর্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ান-পরান আমার কিসের জন্যে?

নীলা ছোটখুড়ীর কাছে বসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল; সেইখান হইতে কহিল, সে চিঠি যে মেজখুড়ীমা তোমাকে দু-তিনবার পড়ে শোনালেন মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল?

তুই সব কথায় গিন্নীপনা করতে যাসনে নীলা, বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, চিঠি শুনলেই হ'লো। তার জবাব দিতে হবে না? কেন তোর ছোটখুড়ী কি মরেছে যে আমি ও-পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব?

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, চিঠি লেখবার কি আর কেউ নেই মা, যে আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়ীমাকে মরিয়ে দিচ্চ?

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর স্মরণ ছিল না। তিনি একমুহূর্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, তুই যে অবাক করলি নীলা? বালাই ষাট! মরবার কথা আমি তাকে আবার কখন বললুম লা? পেটের মেয়ে আমাকে মুখনাড়া দেয়! কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলেপিঠে মানুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না; এত যে রোগে ভুগচি, তবুও ত আমার মরণ হয় না! আজ থেকে আর যদি একফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতি বড়-

কান্নায় সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেবারে মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল; এখন ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্য আবার তার

খোশামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম।

সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না; পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে এখনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় বকাও মেজবৌ। বলচি, সে এখন থাক-সে তুমি পারবে না। তা না-

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দুটা-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খুড়ীমা ভাত খেয়েছে রে?

নীলা আশ্চর্য হইয়া বলিল, খাবেন না কেন? রোজ যেমন খান, তেমনিই ত খেয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরী হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী। সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া খোশামোদ করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ; সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গ নাতেও কেন যে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোনমতে একটা প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন-কিন্তু তাহার ধার দিয়াও শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত সে তাহার

নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ির কেহ কিছুই দেখিতে পায় না; শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্তচিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলর চারিপাশে একটা নির্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঝাপসা দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই?

মা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় শুনি?

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ীর সঙ্গে তোর এত কি লা যে একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস না? বসে থাক পোড়ারমুখী চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না। বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদু-পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহে অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুরঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভালো কথা শিখে নেবে; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে বসে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেক্ষণ জেগে আছেন।

নীলা মেজখুড়ীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, বাড়ির মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজখুড়ীমা? তুমি কি খুড়ীমার কথা বলচ?

তাহার রুষ্ট আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বলচি, তোমার রোগা মায়ের সেবাযত্ন করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবাযত্ন করবে! আমি ম'লেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোটবৌ ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস। না সে নিজে একবার আসবে, না মেয়েটাকে আসতে দেবে।

নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া চাপিয়া গিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বলচি মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা বলো না দিদি। হাজার হোক সে সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথাটা ত মনে রাখতে হবে। ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচ শ টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচরো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই নাও দিদি-বলিয়া নয়নতারা আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদাস-মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নীলা, যা তোর ছোটখুড়ীমাকে ডেকে আন, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা উপলক্ষ করিয়া সে কল্পনায় যে-সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়; এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে এই ছোটবৌকেই কিনা ডাক পড়িল-সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ, এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল চালিবার জন্যই

স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলো টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয়দিন পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে?

শৈলর মুখের মাত্র এই দুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কানের মধ্যে অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন, হাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈ কি! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, যা মা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও-বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন।

শৈল আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোনমতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বললেন, দিদি, 'জাঠতুত-খুড়তুত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না, পরব না ত আর যাব কোথায়? তবু, মাসে মাসে এমনি পাঁচশ-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার! কি বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গাম্ভীর্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন-তখন বলেন, বড়বোঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান না; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না? যার যেমন শক্তি, কাজ ক'রে

তাকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে বসে বসে শুধু গুষ্টিবর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো, আর ঘুমোবো, তা করলে কি চলে? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই! আমাদের জন্যে সর্বস্ব উড়িয়ে দিলে ত তোমার চলবে না। ঠিক কিনা, সত্যি বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বৈ কি!

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিং হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তীক্ষè-ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'লো ছোটবৌ?

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ক'দিন ধরেই ভেবে দেখেছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে-মতিভ্রম হতে কতক্ষণ, কি বল মেজদি?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও?

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুনতে পাই কি?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এমনি ত তোমাদের শুধু আমরা খাচ্চি, পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে, না পারি গতর দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, এত ভাল কবে থেকে হলি লা? এত ভালমন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায়?

শৈল অবিচলিত-স্বরে বলিল, কেন রাগ করে শরীর খারাপ করচ দিদি? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগচে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগচে না।

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে, সে কথা মানি, কিন্তু তোমার ভাল লাগচে না কেন ছোটবৌ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, বলে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই বিদায় হবি-আমি হরির নোট দেব! আমার সোনার সংসার ঝগড়া-বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি। মেজবৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাকলে মানুষের এত তেজ হয় না?কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস, তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকাণ্ডের মত মুহূর্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন-শাখার ন্যায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ; সে আমাকে এমনি করে অপমান করে গেল! কর্তারা বাড়ি আসুন, ওকে আমি উঠানের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয়।

সাত

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল-তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু, দিন-কয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে, এই টাকার মূল যে কোথায় তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামী-পুত্র লইয়া এই শহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোনমতেই থাকিতে সাহস করিবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কজকর্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পার? কেবল শুয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না আর দেরি নেই।

এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্ছি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বলচে! আমি বলচি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল সে খবর শুনেচ কি?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হুঁ, শুনেচি বৈ কি। ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল-মণিকে-মকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবে থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন-আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুলতে নেই? আমি কি বলচি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ? ছোটবৌরা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চে?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্ছে তার আমি কি জানি?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল! আমি নিতে যাব তাদের ঠিকানা লিখে! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে পড়ব কেন? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন? বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। কহিলেন, আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ি দাসীবৃত্তি করে খাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা বেশ জানি-আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার-, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরী মকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিলেন-হরে?

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল। শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই ঝগড়া করবি ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙ্গবো। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগড়া! মণি কৈ?

পিতার কাছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে, বটে? আমার সবদিকে চোখ আছে, তা জানিস? কে তোদের পড়ায়? ডাক্ তাকে?

হরি অব্যক্তকণ্ঠে কহিল, আমাদের থার্ডমাস্টার ধীরেনবাবু সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে? রাত্রে পড়ায় না কেন শুনি? আমি চাইনে এমন মাস্টার, কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা, মন দিয়ে পড় গে যা; হারামজাদা বজ্জাত!

হরি শুষ্ক ম্লানমুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরিশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ আজকালকার মাস্টারগুলোর স্বভাব? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে বলে দিয়ো, কালই যেন এই ধীরেনবাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাস্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধূলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে!

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষকষায়িত তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন এবং গিরীশ কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিসটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না, তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু

লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়ার পর শৈল এ বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়া ছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

সিদ্ধেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ওষুধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাই আমি ভাবছিলুম দিদি, লোক কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ায় যদুবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্ঠাকুরের অর্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারদের হাতেও দশ-বিশ হাজারের কম নেই।

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি করে জানলে মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সব এঁর বন্ধু কিনা। কাল গোপালবাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বললে, এ কি একটা কথা মেজবৌ, যে তোমার দিদির হাতে টাকা নেই? যেমন করে হোক-

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বাক্স-পেটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসারখরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি নুকোনো একটা পয়সা দেখতে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বলবার জো ছিল!

এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম মেজবৌ, যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না। তেমনি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্চে-কি করবে তার? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাকলে সে টাকা ঘরেই থাকত, না এমনি করে জলে যেত তা বলে দেখি মেজবৌ?

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে ত সত্যি কথা দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এতবড় সংসার তাঁর মাথায়, তাঁরই বা দোষ দিই কি করে বল দেখি?

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছি দিদি!

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাকসাইটে কেরানী। ছোটভাইকে মানুষ করতে, লেখাপড়া শেখাতে তার ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে নিজের হাতে আর কানাকড়িটি রাখলে না। বড়বৌ বলতে গেলে ধমকে জবাব দিত-

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি!

নয়নতারা কহিল, তা বৈ কি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধমকে বলত, তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকীল করে দিলুম বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখবে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এমনি কলিকাল দিদি, সে নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাকরিটি গেল, তখন নরেন উকীল-সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে পৈতৃক বাড়িটার অংশ পর্যন্ত নীলাম ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে করে খায়, আর কেঁদে বলে, স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত খুড়তুত-জাঠতুত নয়, মায়ের পেটের ভাই!

সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবৌ?

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্বে তাঁহার এক-একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে মনে ইহাও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু নন্দ মিত্তিরের দূরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর তাঁহার চেষ্টামাত্র রহিল না।

গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি-উঠি করিতেছিলেন; রমেশ আসিয়া কহিল, আমি দেশের বাড়িতে গিয়েই থাকব মনে করচি।

কেন?

রমেশ কহিল, কেউ বাস না করলে বাড়ি-ঘর-দোর ভেঙ্গেচুরে যায়, আর জমি-জায়গা পুকুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই। তাই বলচি।

বেশ কথা! বেশ কথা! বলিয়া গিরীশ খুশী হইয়া সম্মতি দিলেন।

ছোটভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহবিচ্ছেদ কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল সে-সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের চৌকাঠের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটি তোরঙ্গমাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিছানার ওপর কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং নয়নতারা নিজের দোতলার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

আট

গোটা-দুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ির কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত; কোনদিনই সুস্থ নিশ্চিত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না; অথচ শৈল কিংবা আর কেহ যে এইসকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এতবড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য এতটা স্থান চাই, ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েলক-থের ব্যবস্থা; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর-একপ্রকার বন্দোবস্ত; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধাবোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত; খেঁদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কিনা, এই সব দেখিতে দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

আজ শোবার সময় বিছানায় এতখানি জায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁশ ছিল না। নয়নতারা শতকোটি মাথার দিব্য দিবার পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা-সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে

বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে-বাকী বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূন্য খাঁখাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই দুটি নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া তখন অজস্র তপ্ত-অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া কম খায় এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কোনগতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাইলে তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া, নানারকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন-সে কিছুতেই তাহার ন্যায্য আহার করে নাই; এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিত; জবরদস্তি খাওয়ানোর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন-সে রোগা হইয়া যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অবধি ছিল না।

আজ বিছানায় শুইয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয়ত কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হয়ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয়ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিবে,-কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে দুঃখে বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া

ঘুম ভাঙ্গাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মানলুম যেন, পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়,-তার ওপর তার জোর কি?

গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিত হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হলে আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কিনা ঠিক বলো?

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশায় আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হ'লো; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, চাই কি ভেবে ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে, তাহলে হাকিম কি রায় দেবে না যে সে তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক? বেশ! অমনি তোমার নাক ডাকচে-আমার কথা বুঝি তবে শোননি! বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয়? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারানীর কিছু এমন হুকুম নেই। কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকীলের চিঠি দিই, কি হয় তা হলে?-বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন সকাল হইবে, কখন হরিশকে দিয়া উকীলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশকুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে না হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, উঠেচ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরি করলে চলবে না, এখ্খুনি ছোটঠাকুরপোদের নামে উকীলের চিঠি লিখে, দরোয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে।

হরিশকে এ বিষয় উত্তেজিত করা বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়বৌ? বসো, বসো- কি কি নিয়ে গেছে? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই। বুঝলে না?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া, দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বৌঠান? আমি বলি, বুঝি আর -কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে!

হরিশ কহিলেন, দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে তামাশা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, এতটা বয়স হ'লো তামাশা কাকে বলে বুঝিনে ঠাকুরপো? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে, ছেলে-দুটাকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো; আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এখন মিথ্যে দাবী-

দাওয়া করতে পারবো না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না! তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে। বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সরকার গণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু'টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা-তাঁহাকে নির্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্তীও যে চুরি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন, পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজলা টাকা গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচ হয়েচে বলে এই পঞ্চশ-পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে-আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা!

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়-

নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে আমার চেয়ে বেশী বুঝবে? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে সে হবে না বলচি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। পোড়ারমুখীকে দশ-বছরের মেয়ে বৌ করে আনলুম, বুকে করে মানুষ করে এত বড় করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ির দু-দুটো ছেলে নিয়ে পালিয়ে গেল। তা যাক। আমিও খবর রাখচি। কানাই-পটলের কোনদিন এতটুকু অসুখ শুনতে পেলে দেখব, কেমন করে সে ছেলে রাখে! তা এখন যাও-দুপুরবেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলে।-বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বলতে পারিনে, কিন্তু আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকাকড়ি হিসাবপত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্ঝাট তুমি সহ্য করবে, আর আমি বসে বসে দেখব, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেব গোল করবার জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে! শৈল ছিল-যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো-সমস্তই তার কাজ। এসব কি আর আমাকে দিয়ে হয়? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই করো মেজবৌ।-বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। সে শত্রুপক্ষকে যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্র পক্ষের উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়, সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে-মুহূর্তে ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

নয়

কোন একটা অভাব লইয়া-তা সে যতই গুরুতর হউক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতেই পারিতেন না, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যান-মনেও পড়ে না। কানাই-পটলের সংবাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এখন সে উৎকণ্ঠার অর্ধেক তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূপে সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেল যে, দেশের বিষয় লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট-দেবরের সহিত তাঁহাদের মামলা চলিতেছে। মকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানী ত চলিতেছেই, গোটা-দুই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত সংবাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোটঠাকুরপো করচে তোমার দাদার সঙ্গে মামলা?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহিলে, তাই ত হচ্চে বৌঠান।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমার যে বিশ্বাস হয় না, মেজঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-সূর্যি উঠচে।

নয়নতারা খাটের একধারে বসিয়া খেঁদিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, মৃদুস্বরে কহিল, সে ত উঠচেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব তখন যায়নি, যাচ্চে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মকদ্দমা কেন?

হরিশ বলিলেন, কেন! দেখলুম, মকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখলুম আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি-বিপিন-ক্ষুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না-দেশের বাড়িতে হয়ত ঢুকতে পর্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বৌ, দেশে যা-কিছু আছে, সে-ই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করচে, খাচ্চে দাচ্চে-একটা পয়সা পর্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেচেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না-এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ি থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তারাই বা ছেলেপিলে নিয়ে যাবে কোথায়?

হরিশ বলিলেন, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড়বৌ।

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দাদা কি বললেন?

হরিশ বলিলেন, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাবনা ছিল না বড়বৌ। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিসফিস করিয়া বলিল, আচ্ছা, ছোটঠাকুরপোই যেন দোষী, কিন্তু, আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবৌ কি করে এত মত দিলে, আমরা আর

সবাই দুষ্টু বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তার বঠ্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারিতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাঁহার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ কখন জ্বর এল?

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞাসা করলে।

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! জিজ্ঞেসা করিনি ত কি? পরশুও ত মণিকে ডেকে বললুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এমনি যে, বাপ-মাকে পর্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়োবয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর ব'লো না, পনর দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসির ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পরশু জিজ্ঞাসা করলে! কখনো যা করনি, তা কি আজ করবে? তা নয়, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি জানতে এসেচি, ব্যাপারটি কি? ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, সেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! বিষয়পত্র সব নষ্ট করে ফেললে। সেটাকে দূর করে না দিলে দেখচি আর ভদ্রস্থ নেই-সমস্ত ছারখার ধ্বংস করে দিলে।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তা যেন দিলে, কিন্তু মামলা-মকদ্দমা ত শুধু শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোটঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিলেন, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। তিনি জবাব দিলেন-

টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবৌ বলে দিলেন বড়বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই; তা ছাড়া, ছোটবৌমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল-বুঝেই দেখ না!

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে, কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ! সেটা একেবারে বেহেড লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে-বাড়ি-ঘরদোর মেরামত করতে হবে, পাঁচশ টাকা চাই।

হরিশ অবাক হইয়া গেলেন, বলেন কি? সাহস ত কম নয়!

গিরীশ কহিলেন, সাহস বলে সাহস! একেবারে লম্বা ফর্দ-এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথতে হবে; এটা না বদলালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। শুধু কি তাই! সংসারের অনটন-শীতের কাপড়-চোপড় কিনতে হবে-ধান কিনে, আলু কিনে রাখতে হবে,-এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার।

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিলেন, নির্লজ্জ! তারপরে?

গিরীশ বলিলেন, ঠিক তাই। হতভাগার একেবারে লজ্জাশরম নেই-এক্কেবারে নেই। এই আটশ'টাকা নিয়ে তবে ছাড়লে।

নিয়ে গেল? আপনি দিলেন?

গিরীশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে? নিয়ে তবে উঠল যে!

হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের মত হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হলে মামলা-মকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু না, কিছু না। নিজের সংসারটা যে চালিয়ে নেবে হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই-এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনি,

বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চলচে, আর খাচ্চেন-ব্যস্। মানুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই-বুঝলে না হরিশ! বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হোহো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা, আমি একাই দেখচি।

মাঘ মাসের বাইশে মকদ্দমার দিন ছিল। বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতিকন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার বড় সাধ। তোমাকে একটি দিনের জন্যেও অন্তত দেশে যেতে হবে।

'না' শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বৈ কি ভায়া, নিশ্চয় যাব।

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তাহা সবচেয়ে বেশী জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। সুতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন, স্ত্রী হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি! আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক-

না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকীল হয়ে পর্যন্ত ত মিছে কথা বলে আসচ-আজ একটা কথাও রাখো। পরকালের ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না?

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, পরকাল? তা বটে-কিন্তু-

না, কিছুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।

অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে দুটোকে-বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন!

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামী-স্ত্রীর কেহই বুঝিলেন না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও বাড়িতে কিছু খেতেটেতে বট্‌ঠাকুরকে মানা করে দিলে না কেন?

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি!

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মকদ্দমার তদবির করিতে দুই-একদিন পূর্বে যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। শৈল সেখানে ছিল না। সে ঠাকুরঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিল, ঠাকুর, আর ত কিছু নাই; এইবার যেমন করিয়া হোক আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কালসার হইতেছেন-

ওরে কেনো-ওরে পটলি-

শৈল চমকিয়া উঠিল,-এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি। চিরকালটি যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোন অঙ্গে এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল; পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

গিরীশ কহিলেন, এমন সময়, কোথায় যাওয়া হবে?

রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্টস্বরে বলিল, জেলায়-

গিরীশ চক্ষের পলকে বারুদের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন-হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, তুমি আমার খাবে-পরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা করবে? তোমাকে এক সিকি-পয়সার বিষয়-আশয় দেব না-দূর হও আমার বাড়ি থেকে; এখখুনি দূর হও-এক মিনিট দেরি নয়-এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও-

রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না; যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তিমান্য করিত, তেমনি চিনিত। এইসব তিরস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন শৈল আসিয়া দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

গিরীশ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস, এস, মা এস। সে স্বরে উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই-বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মুহূর্তকাল পূর্বে ওরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না; কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার গায়ে গয়না দেখচি নে কেন ছোটবৌমা?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক এক পর্দা চড়িতে লাগিল-ঐ হতভাগা শুয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার? আমার। ওকে আমি জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইশে মকদ্দমার দিন অপরাহ্ন বেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং ধড়াচূড়া না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল; খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মকদ্দমায় যে হার হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই,-দুই জায়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন-মকদ্দমায় হার-জিত আছেই-তা ছাড়া এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে-এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকীল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের হাত ধরিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোট কর। আমি আশীর্বাদ করচি তুমি জিতবেই।

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বৌঠান, সে হবার জো নেই-সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল-কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল। বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি-সর্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন। রেজিস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই।

দুই জায়ে মুখোমুখি হইয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকী রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন, যে এ-ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা নচ্ছার বোম্বেটে, ছোটবৌমার গয়নাগুলো

বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হলেই বাড়ির ইঁটকাট পর্যন্ত বেচিয়া খাইত-দেশের বাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভালমন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখদুটিতে জল তখনও টলটল করিতেছিল; দুই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এলো-বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।

গিরিশ মহা খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেখলে বড়বৌ, আমার সবদিকে নজর থাকে কিনা! রমেশ কালকের ছোঁড়া, সে আমার চোখে ধূলো দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে! এমনি কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধনের চালাকিটি চলবে না।-বলিয়া কি জানি নিজের কোন্ হাসির কথায় নিজেই হোহো শব্দে হাসিয়া ঘরদ্বার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পথের দাবী

এক

অপূর্বর সঙ্গে তাহার বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

বন্ধুরা কহিতেন, অপূ, তোমার দাদারা প্রায় কিছুই মানেন না, আর তুমি মানো না শোনো না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই।

অপূর্ব কহিত, আছে বৈ কি। এই যেমন দাদাদের দৃষ্টান্ত মানিনে এবং তোমাদের পরামর্শ শুনিনে।

বন্ধুরা পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে পড়িয়া এম. এস্সি. পাস করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ। তোমার টিকির মিডিয়ম দিয়া মগজে বিদ্যুৎ চলাচল হয় নাকি?

অপূর্ব জবাব দিত, এম. এস্সি.-র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিরুদ্ধে কোথাও কোন আন্দোলন নেই। সুতরাং টিকি রাখা অন্যায় এ ধারণা জন্মাতে পারেনি। আর বিদ্যুৎ চলাচলের সমস্ত ইতিহাসটা আজিও আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বাস না হয়, বিদ্যুৎ-বিদ্যা অধ্যাপকদের বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া কহিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

অপূর্ব হাসিয়া বলিত, তোমাদের এই কথাটি অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তবু ত তোমাদের চৈতন্য হয় না।

আসল কথা, অপূর্বর ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যে ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুরগি ও হোটেলের রুটি খাইতে লাগিল, এবং স্নানের পূর্বে গলার পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রি করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কিনা আলোচনা করিয়া হাসি-তামাশা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর

বেদনা ও নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না। একে ত বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত। তিনি শ্বশুরকুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া কহিতেন, ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত না হয়ে বাপের মতই হয়ে উঠে ত কি করা যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপি পরে বলেই যে মাথাটা কেটে নেওয়া উচিত আমার তা মনে হয় না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেদের সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল নিজের আচার-বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পরে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া তিনি গৃহে বাস করিয়াও একপ্রকার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। উপরের যে ঘরটায় তিনি থাকিতেন, তাহারই পার্শ্বের বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চলিত। বধূদের হাতেও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল।

এদিকে অপূর্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাসও করিত, ঘরে একাদশী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট-হকি খেলাতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বধূরা মাঝে মাঝে তামাশা করিয়া বলিত, ঠাকুরপো, পড়াশুনা ত সাঙ্গ হল, এবার ডোর-কোপ্নি নিয়ে একটা রীতিমত গোঁসাই-টোঁসাই হয়ে পড়। এযে দেখচি বামুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলে!

অপূর্ব সহাস্যে জবাব দিত, ছাড়িয়ে যেতে কি আর সাধে হয় বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়েও নেই, বয়স হয়েছে, হঠাৎ অসমর্থ হয়ে পড়লে একমুঠো হবিষ্যি রেঁধেও ত দিতে পারবো? আর ডোর-কোপ্নি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন একদিন তা সম্বল করতেই হবে।

বড়বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া কহিত, কি করবো ঠাকুরপো, সে আমাদের কপাল!

তা বটে! বলিয়া অপূর্ব চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত, মা, এ তোমার বড় অন্যায়। দাদারা যাই কেননা করুন, বৌদিরা কিছু আর মুরগিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি রেঁধেই খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না বাবা। আর নিতান্তই যখন অপারগ হব, ততদিনে তোর বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ব বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে আনিয়ে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখলে মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকবো।

মা মাতৃগর্বে দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও আনিস নে অপূ! তোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার? তুই ইচ্ছে করলে যে বাড়ির সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

তোমার যেমন কথা মা! তুমি মনে কর ভূ-ভারতে তোমার মত এমন ছেলে আর কারও নেই। এই বলিয়া সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ব যাহাই বলুক, তাই বলিয়া কন্যাভার-গ্রস্তের দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে-অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মাকে ধরিতেন, মা, কোথায় কোন্ নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড় ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি বা বাড়ির কর্তা।

ছেলের কঠিন বাক্যে করুণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিতেন, লোকে ত মিথ্যে ভাবে না বাবা, তাঁর অবর্তমানে তুমিই বাড়ির কর্তা, কিন্তু অপূর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়ো না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিনু, সে আমি আপনি দেখেশুনে তবে দেব।

বেশ ত মা, তাই দিয়ো। কিন্তু যা করবে দয়া করে একটু শীঘ্র করে কর। রাঙ্গা মাকালফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

করুণাময়ীর মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিল। স্নানের ঘাটে ভারী একটি সুলক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি মায়ের সহিত প্রায়ই গঙ্গাস্নানে আসিত। ইঁহারা যে তাঁহাদের স্ব-ঘর এ সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানান্তে মেয়েটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করুণাময়ী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আরও কিছু কিছু জানিবার ছিল, এবং সে-পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বাসনা ছিল সমস্ত তথ্য যদি অনুকূল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ দিবেন।

এমন সময় অপূর্ব আসিয়া অকস্মাৎ সংবাদ দিল, মা, আমি বেশ একটি চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে? এই ত সেদিন পাস করলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিলে কে?

অপূর্ব হাসিমুখে কহিল, যার গরজ! এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বোথা কোম্পানি বর্মার রেঙ্গুন শহরে একটা নূতন আফিস খুলিয়াছে, তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসাভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাতত চারি শত টাকা, এবং

চেষ্টা করিয়াও কোম্পানিকে যদি লালবাতি জ্বালাইতে না পারা যায় ত ছয় মাস পরে আরও দুই শত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, বর্মা-মুল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসুককণ্ঠে কহিলেন, তুই কি ক্ষেপেছিস অপূ, সে-দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছু নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার কাজ নেই।

জননীর বিরুদ্ধতায় অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে, তোমার হুকুমে আমি ভিখিরী হয়েও থাকিতে পারি, কিন্তু সারা জীবনে কি এমন সুযোগ আর জুটবে? তোমার ছেলের মত বিদ্যে-বুদ্ধি আজকাল শহরের ঘরে ঘরে আছে, অতএব, বোথা কোম্পানির আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ির সত্যকার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয় মা?

মা বলিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

অপূর্ব কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ম্লেচ্ছ দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোর বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ব কহিল, একেবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, দু-এক মাস পেছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই ফিরে এসে তোমার আজ্ঞা পালন করবো।

করুণাময়ী বাহিরের চক্ষে সেকেলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ো।

এই বর্মা-যাত্রা সম্পর্কে তাঁহার আর দু'টি সন্তানের উল্লেখ করিতে করুণাময়ীর অতীত ও বর্তমানের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন এককালে আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দুঃখ আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাঁহার পিতৃকুল গোকুল-দীঘির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং বংশপরম্পরায় তাঁহারা অতিশয় আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে যে সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুত্রদের হস্তে যতদূর আহত ও লাঞ্ছিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্বকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আজও গৃহে বাস করিতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাঁহার চোখের আড়ালে কোন্ অজানা দেশে চলিয়াছে। এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না, শুধু মুখে বলিলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি অপূ, তুই কিন্তু আর আমাকে দুঃখ দিসনে বাবা। এই বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চোখ-দু'টি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, সে প্রত্যুত্তরে কেবল কহিল, মা, আজ তুমি ইহলোকে আছো, কিন্তু, একদিন তোমার স্বর্গবাসের ডাক এসে পৌঁছবে, সেদিন তোমার অপূকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটা দিনের জন্যেও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আহ্নিক ও মালায় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভারে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোন মতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড় ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে একবার সান্ধ্য-পোশাকে ক্লাবের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া

একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুতঃ, এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বিনু।

কি মা?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্বে ভাল করিয়া মুছিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দ-মুখে কহিলেন, তাই ভাবছি বাবা, এই ক'টা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কি না, তখন বিনোদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুক্ষস্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্বর মত ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করে এ কথাটাও ত না মেনে পারিনে যে, প্রথমে চার শ এবং ছ মাসে ছ শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেছি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিনু, এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হল না, তখন শেষ দশায় আর ও-শিক্ষা দিয়ো না। অপূর্বর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠানো উচিত কি না।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়ের দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য একথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলত সে সত্যি, এবং টাকা জিনিসটা যে সংসারে দামী ও দরকারী এ তাঁর কাছেই শেখা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি

দেখাচ্চি নে। তোমার ম্লেচ্ছ বিনুর এই হ্যাট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় সাহেব হয়ে উঠেনি যে, ছোটভাইকে খেতে দেবার ভয়ে স্থান-অস্থানের বিচার করে না। কিন্তু তবুও বলি, ও যাক। দেশে আবহাওয়া যা বইতে শুরু করেছে মা, তাতে ও যদি দিন-কতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত ওর নিজেরও ভালো হবে, আমরাও সগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাবো! তুমি ত জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে ওর গলা টিপলে দুধ বেরোত, তবু তারই বিক্রমে বাবার চাকরি যাবার জো হয়েছিল।

করুণাময়ী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, না না, সে-সব অপূ আর করে না। সাত-আট বছর আগে তার কি বা বয়স ছিল, কেবল দলে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত, তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব এখন আর কিছু করে না, কিন্তু, সকল দেশেই জন-কতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো,— এর পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়!বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সম্পর্কে এদের কখনো বিশ্বাস করো না মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তর্জনীর প্রান্তভাগটুকু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই ম্লেচ্ছাচারী বিনুটিকে তোমার ওই টিকিধারী গীতা-পড়া এম. এস্সি. পাস করা অপূর্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে জেনো।

ছেলের কথাগুলো মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু এক সময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা

দিয়াছে এ সংবাদ তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্বর পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে যাইবার ত্বরা ছিল, কহিল বেশ ত মা, সে ত আর কালই যাচ্চে না, সবাই একসঙ্গে বসে যা হোক একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

দুই

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌঁছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানির জন-দুই দরোয়ান ও একজন মাদ্রাজী কর্মচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজারকে তাঁহারা সাদর সম্বর্ধনা করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাবপত্রে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ সংবাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্রপথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা ভোগের পর নিরালা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইতে পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সপ্রমাণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ির বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এই বিশ্বস্ত লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল-ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা, মায় আলু পটল পর্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে মুখের শুকনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে ফিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া গেল। গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোটঘাট জিনিসপত্র লইয়া আফিসের দরোয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল, এবং একটানা জলযাত্রা ছাড়িয়া শক্ত ডাঙার উপরে গাড়ির মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ব আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট-দশেকের মধ্যে গাড়ি যখন বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরোয়ানজী হাঁকডাকে প্রায় ডজন-খানেক কলিঙ্গ দেশীয়

কুলী জোগাড় করিয়া মোটঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটীর চেহারা দেখিয়া অপূর্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ির শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্দর নাই, প্রাঙ্গণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতলা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ।এই উঠা-নামার কার্যে দৈবাৎ পা ফসকাইলে প্রথমে পাথর-বাঁধানো রাজার রাজপথ, পরে তাঁহারই হাসপাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবাই ভাল। এই দুরারোহ দারুময় সোপানশ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব নূতন লোক, তাই সে প্রতি পদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরোয়ানের অনুবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরোয়ান কতকটা উঠিয়া ডান দিকে দোতলার একটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহারই মুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধদ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে ?

দরোয়ান কহিল, কোই এক চীনা-সাহেব রহেতেঁহে শুনা।

অপূর্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতলায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহেতেঁহে দেখা। কোই মান্দ্রাজ-বালে হোয়েঙ্গে জরুর!

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পার্শ্বে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আরও মন খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া-দেওয়া পাশাপাশি ছোট-বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই,—মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির।

আফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া আর একটায় যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গসুন্দর জতুগৃহ বোধ করি রাজা দুর্যোধনও তাঁর পাণ্ডবভায়াদের জন্য তৈরি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘরবাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্মরণ করিয়া মুহূর্তের দুর্বলতায় তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া লইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিস দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল যে কলে তখনও জল আছে, স্নান ও রান্না দুই-ই হইতে পারে। দরোয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ শহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্য এ বাড়িতে একটা করিয়া বড় রকমের জলের চৌবাচ্চা উপরে আছে, তাহা হইতে দিবারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ব পাচককে কহিল ঠাকুর, মা ত সমস্তই সঙ্গে দিয়েছেন, তুমি স্নান করে দুটি রাঁধবার উদ্যোগ কর, আমি ততক্ষণ দরোয়ানজীকে নিয়ে জিনিসপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।

রসুই ঘরে কয়লা মজুত ছিল, কিন্তু বাঁধানো চুল্লী। নিকানো মুছানো তেমন হয় নাই, পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু কালির দাগ প্রকাশ পাইল। কে জানে এখানে কে ছিল, সে কোন জাত, কি রাঁধিয়াছে মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল, ঠাকুরকে কহিল, এতে ত রাঁধা চল্বে না তেওয়ারী, অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। একটা তোলা-উনুন হলে বাইরের ঘরে বসে আজকের মতো দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এ পোড়া দেশে কি তা মিলবে?

দরোয়ান জানাইল কোন অভাব নাই, মূল্য পাইলে সে দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়া হাজির করিতে পারে। অতএব, সে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে তেওয়ারী রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং অপূর্ব নিজে যথাযোগ্য স্থান মনোনীত করিয়া তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি টানাটানি করিয়া ঘর সাজাইতে নিযুক্ত হইল। কাঠের আলনায় জামাকাপড় সুট প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিল, বিছানা খুলিয়া খাটের উপর তাহা পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া লইল, তোরঙ্গ হইতে একটা নূতন টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া টেবিলে পাতিয়া কিছু কিছু বই ও লিখিবার সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিল, এবং উত্তরে খোলা জানালার পাল্লা-দুটা আপ্রান্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দুই কোণে দুটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া শোবার ঘরটাকে অধিকতর আলোকিত এবং নয়নরঞ্জন জ্ঞান করিয়া সদ্যরচিত শয্যায় চিত হইয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ক্ষণেক পরেই দরোয়ান লোহার চুল্লী কিনিয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে আগুন দিয়া খিচুড়ি এবং যাহা-কিছু একটা ভাজাভুজি যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া অপূর্ব আর একদফা বিছানায় গড়াইয়া লইতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়িল মা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নামিয়াই একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে। অতএব, অবিলম্বে জামাটা গায়ে দিয়া প্রবাসের একমাত্র কর্ণধার দরোয়ানজীকে সঙ্গে করিয়া সে পোস্টআফিসের উদ্দেশে আর একবার বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহারই কথামত তেওয়ারী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়া গেল, ফিরিয়া আসিতে তাহার একঘণ্টার বেশি লাগিবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজ কি একটা খ্রীষ্টান পর্বোপলক্ষে ছুটি ছিল। অপূর্ব পথের দুইধারে চাহিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিল এই গলিটা দেশী ও বিদেশী মেমসাহেবদের পাড়া, এবং প্রত্যেক বাটীতেই বিলাতী উৎসবের কিছু কিছু চিহ্ন

দেখা দিয়াছে। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দরোয়ানজী, এখানে আমাদের বাঙালী লোকও ত অনেক আছে শুনেচি, তাঁরা সব কোন্ পাড়ায় থাকেন?

প্রত্যুত্তরে সে জানাইল যে এখানে পাড়া বলিয়া কিছু নাই, যে যেখানে খুশি থাকে। তবে 'অপসর লোগ্' এই গলিটাকেই বেশী পছন্দ করে। অপূর্ব নিজেও একজন 'অপসর লোগ্', কারণ, সেও বড় চাকরি করিতেই এ দেশে আসিয়াছে, এবং আপনি গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তথাপি, এইভাবে আপনাকে উপরে নীচে দক্ষিণে বামে বাসায় ও বাসার বাহিরে চারিদিকেই খ্রীষ্টান প্রতিবেশী পরিবৃত দেখিয়া তাহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় না দরোয়ান?

দরোয়ানজী এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নহে, সে চিন্তা করিয়া যাহা সঙ্গত বোধ করিল, তাহাই জবাব দিল, কহিল, খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু এ ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া কঠিন।

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারই নির্দেশমত অনেকখানি পথ হাঁটিয়া একটা ব্রাঞ্চ পোস্টআফিসে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন মাদ্রাজী তার-বাবু টিফিন করিতে গিয়াছেন, ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করিয়া যখন তাঁহার দেখা মিলিল, তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ ছুটির দিন, বেলা দুইটার পরে আফিস বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন দুটা বাজিয়া পনর মিনিট হইয়াছে।

অপূর্ব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, সে দোষ তোমার, আমার নয়। আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছি।

লোকটা অপূর্বর মুখের প্রতি চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিল, না, আমি মাত্র মিনিট-দশেক ছিলাম না।

অপূর্ব তাহার সহিত বিস্তর ঝগড়া করিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিল, রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। সে

নির্বিকারচিত্তে নিজের খাতাপত্র দুরস্ত করিতে লাগিল, জবাবও দিল না। আর সময় নষ্ট করা নিষ্ফল বুঝিয়া অপূর্ব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক বিলম্বে নিজের নির্বিঘ্ন পৌঁছান সংবাদ যখন মাকে পাঠাইতে পারিল, তখন বেলা আর বড় নাই।

দুঃখের সাথী দরোয়ানজী সবিনয়ে নিবেদন করিল, সাহেব, হাম্কো ভি বহুত দূর যানা হ্যায়।

অপূর্ব একান্ত পরিশ্রান্ত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল, ছুটি দিতে আপত্তি করিল না; তাহার ভরসা ছিল নম্বর-দেওয়া রাস্তাগুলা সোজা ও সমান্তরাল থাকায় গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। দরোয়ান অন্যত্র চলিয়া গেল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে এবং গলির হিসাব করিতে করিতে অবশেষে বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিল, দ্বিতলে তাহার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী ঠাকুর মস্ত একটা লাঠি ঠুকিতেছে এবং অনর্গল বকিতেছে, এবং প্রতিপক্ষ একব্যক্তি খালি-গায়ে পেন্টুলুন পরিয়া তেতালার কোঠায় নিজের খোলা দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া হিন্দী ও ইংরাজিতে ইহার জবাব দিতেছে, এবং একটা ঘোড়ার চাবুক লইয়া মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই শব্দ করিতেছে। তেওয়ারী তাহাকে নীচে ডাকিতেছে, সে তাহাকে উপরে আহ্বান করিতেছে,—এবং এই সৌজন্যের আদান-প্রদান যে ভাষায় চলিতেছে তাহা না বলাই ভাল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া অপূর্ব তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, কি উপায়ে তেওয়ারীজী এইটুকু অবসরেই প্রতিবেশী সাহেবের সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল সে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অকস্মাৎ বোধ হয় দুই পক্ষের দৃষ্টিই তাহার উপর নিপতিত হইল। তেওয়ারী মনিবকে দেখিয়া আর একবার সজোরে লাঠি ঠুকিয়া কি একটা মধুর সম্ভাষণ করিল, সাহেব তাহার জবাব দিয়া প্রচণ্ডশব্দে চাবুক

আস্ফালন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চ যুদ্ধঘোষণার পূর্বেই অপূর্ব দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া লাঠিসুদ্ধ তেওয়ারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুই কি ক্ষেপে গেছিস? এই বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়াই জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এই দেখুন হারামজাদা সাহেব কি কাণ্ড করেছে?

বাস্তবিক, কাণ্ড দেখিয়া অপূর্বর শ্রান্তি এবং ঘুম, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা একই কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুসিদ্ধ খেচরান্নের হাঁড়ি হইতে তখন পর্যন্ত উত্তাপ ও মসলার গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহার উপরে, নীচে, আশেপাশে চতুর্দিকে জল থৈথৈ করিতেছে। এ ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার সদ্যরচিত ধপধপে বিছানাটি ময়লা কালো জলে ভাসিতেছে। চেয়ারে জল, টেবিলে জল, বইগুলা জলে ভিজিয়াছে, বাক্স—তোরঙ্গের উপরে জল জমা হইয়া রহিয়াছে, এমন কি এককোণে-রাখা কাপড়ের আলনাটি অবধি বাদ যায় নাই। তাহার দামী নূতন সুটটির গায়ে পর্যন্ত ময়লা জলের দাগ লাগিয়াছে।

অপূর্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে হল?

তেওয়ারী আঙুল দিয়া উপরের ছাদ দেখাইয়া কহিল, ওই শালা সাহেবের কাজ। ঐ দেখুন—বস্তুতঃ, কাঠের ছাদের ফাঁক দিয়া তখন পর্যন্ত ময়লা জলের ফোঁটা স্থানে স্থানে চুয়াইয়া পড়িতেছিল। তেওয়ারী দুর্ঘটনা যাহা বিবৃত করিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

অপূর্ব যাইবার মিনিট-কয়েক পরেই সাহেব বাড়ি আসেন। আজ খ্রীষ্টানের পর্বদিন | এবং খুব সম্ভব উৎসব ঘোরালো করিবার উদ্দেশেই তিনি বাহিরে হইতেই একেবারে ঘোর হইয়া আসেন। প্রথমে গীত ও পরে নৃত্য শুরু হয়। এবং অচিরেই উভয় সংযোগে শাস্ত্রোক্ত ‘সংগীত’ এরূপ দুর্দাম হইয়া উঠে যে, তেওয়ারীর আশঙ্কা হয় কাঠের ছাদ হয়ত বা সাহেবের এত বড় আনন্দ বহন করিতে পারিবে না, সবসুদ্ধ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহাও সহিয়াছিল,

কিন্তু রান্নার অদূরেই যখন উপর হইতে জল পড়িতে লাগিল, তখন সমস্ত নষ্ট হইবার ভয়ে তেওয়ারী বাহির হইয়া প্রতিবাদ করে।

কিন্তু সাহেব, —তা কালাই হউন বা ধলাই হউন, —দেশী লোকের এই স্পর্ধা সহ্য করিতে পারেন না, উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং মুহূর্তকালেই এই উত্তেজনা এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয় যে, তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া বালতি বালতি জল ঢালিয়া দেন। ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য—অপূর্ব নিজেও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অপূর্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, সাহেবের ঘরে কি আর কেউ নেই?

তেওয়ারী কহিল, কি জানি, আছে হয়ত। কে একজন মাতাল ব্যাটার সঙ্গে ঝুটোপুটি লড়াই করছিল। এই বলিয়া সে খিচুড়ির হাঁড়িটার প্রতি করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল। অর্থাৎ কে একজন প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য একতিল কমাইতে পারে নাই।

অপূর্ব নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু নূতন উপদ্রব আর ছিল না। উৎসব-আনন্দ-বিহ্বল সাহেবের নব উদ্যমের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বোধ করি এখন তিনি জমি লইয়াছিলেন, – কেবল নিগার তেওয়ারীকে যে এখনও ক্ষমা করেন নাই, তাহারই অস্ফুট উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল।

অপূর্ব হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, তেওয়ারী, ভগবান না মাপালে এমনি মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়। আয়, আমরা মনে করি আজও জাহাজে আছি। চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশ এখনো ত কিছু আছে, – রাতটা চলে যাবে। কি বলিস?

তেওয়ারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, এবং ওই হাঁড়িটার প্রতি আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিঁড়া-মুড়কির উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিল। সৌভাগ্য এই যে, খাবারের বাক্সটা সেই যে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের কোণে রাখা হইয়াছিল আর

স্থানান্তরিত করা হয় নাই, – খ্রীষ্টানের জল অন্ততঃ এই বস্তুটার জাত মারিতে পারে নাই।

ফলারের যোগাড় করিতে করিতে তেওয়ারী রান্নাঘর হইতে কহিল, বাবু এখানে ত থাকা চলবে না!

অপূর্ব অন্যমনস্কভাবে বলিল, বোধ হয় না।

তেওয়ারী হালদার পরিবারের পুরাতন ভৃত্য, আসিবার কালে মা তাহার হাত ধরিয়া যে কথাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেই-সকল স্মরণ করিয়া সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, না বাবু, এ ঘরে আর একদিনও না। রাগের মাথায় ভাল কাজ করিনি, সাহেবকে আমি অনেক গাল দিয়েছি।

অপূর্ব কহিল, হাঁ, গাল না দিয়ে তোর মারা উচিত ছিল।

তেওয়ারীর মাথায় ক্রোধের পরিবর্তে সুবুদ্ধির উদয় হইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না বাবু, না। ওরা হাজার হোক সাহেব। আমরা বাঙালী।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারী সাহস পাইয়া প্রশ্ন করিল,আফিসের দরোয়ানজীকে বলে কাল সকালেই উঠে যাওয়া যায় না? আমার ত মনে হয় যাওয়াই ভাল।

অপূর্ব কহিল, বেশ ত, বলে দেখিস। সে মনে মনে বুঝিল সাহেবের প্রতি দেশী লোকের কর্তব্যবুদ্ধি ইতিমধ্যেই

তেওয়ারীর সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জনের প্রতি আর তাহার নালিশ নাই, বরঞ্চ, কালব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে স্থানত্যাগই অবশ্যকর্তব্য স্থির অবশ্যকর্তব্য স্থির করিয়াছে। কহিল, তাই হবে, তুই খাবার যোগাড় কর।

এই যে করি বাবু, বলিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্তচিত্তে স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু তাহারই কথার সূত্র ধরিয়া ওই ওপরওয়ালা ফিরিঙ্গিটার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর সমস্ত চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে

হইল, এ ত কেবল আমি এবং ওই মাতালটাই শুধু নয়। সবাই মিলিয়া লাঞ্ছনা এমন নিত্যনিয়ত সহিয়া যাই বলিয়াই ত ইহাদেরও স্পর্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত হইয়া আজ এমন অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের প্রতি অন্যায়ের ধিক্কার সে উচ্চ শিখরে আর পৌঁছিতে পর্যন্ত পারে না।

নিঃশব্দে ও নির্বিচারে সহ্য করাকেই কেবল নিজেদের কর্তব্য করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া অপরের আঘাত করিবার অধিকার এমন স্বতঃই সুদৃঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমার চাকরটা পর্যন্ত আমাকে অবিলম্বে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপদেশ দিতে পারিল, লজ্জা-শরমের প্রশ্ন পর্যন্ত তাহার মনে উদয় হইল না! কিন্তু সে বেচারা রান্নাঘরে বসিয়া চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার প্রভুর জন্য সযত্নে প্রস্তুত করিতে লাগিল, জানিতেই পারিল না তাহারই পরিত্যক্ত মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে করিয়া অপূর্ব নিঃশব্দ-পদে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলে সাহেবের দরজা বন্ধ ছিল, সেই রুদ্ধদ্বারে গিয়া সে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভীত নারীকণ্ঠের ইংরাজিতে সাড়া আসিল, কে?

অপূর্ব কহিল, আমি নীচে থাকি। সেই লোকটাকে একবার চাই।

কেন?

তাকে দেখাতে চাই সে আমার কত ক্ষতি করেচে। তার ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না।

তিনি শুয়েছেন।

অপূর্ব অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে কহিল, তুলে দিন, এ শোবার সময় নয়। রাত্রে শুলে আমি বিরক্ত করতে আসব না। কিন্তু, এখন তার মুখের জবাব না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এবং ইচ্ছা না করিলেও তাহার হাতের মোটা লাঠিটা কাঠের সিঁড়ির উপর ঠকাস করিয়া একটা মস্ত শব্দ করিয়া বসিল।

কিন্তু দ্বারও খুলিল না, কোন জবাবও আসিল না। মিনিট-দুই অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব পুনশ্চ চীৎকার করিল, আমি কিছুতেই যাব না,—বলুন তাকে বাইরে আসতে।

ভিতরে যে কথা কহিতেছিল এবার সে রুদ্ধদ্বারের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া নম্র ও অতিশয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি তাঁর মেয়ে। বাবার হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। তিনি যা কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেন নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার যত ক্ষতি হয়েছে কাল আমরা তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করব।

মেয়েটি কোমল স্বরে অপূর্ব নরম হইল, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। কহিল, তিনি বর্বরের মত আমার যথেষ্ট লোকসান এবং ততোধিক উৎপাত করেছেন। আমি বিদেশী লোক বটে, কিন্তু আশা করি কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি কহিল, আচ্ছা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মত আমরাও এখানে সম্পূর্ণ নূতন। মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে এসেছি।

অপূর্ব আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখিল তখন পর্যন্ত তেওয়ারী ভোজনের উদ্যোগেই ব্যাপৃত আছে, এত কাণ্ড সে টেরও পায় নাই।

দু'টি খাইয়া লইয়া অপূর্ব তাহার শোবার ঘরে আসিয়া ভিজা তোশক বালিশ প্রভৃতি নীচে ফেলিয়া দিয়া রাত্রিটার মত কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। প্রবাসের মাটিতে পা দিয়া পর্যন্ত তাহার ক্ষতি, বিরক্তি ও হয়রানির অবধি নাই; কি জানি এ যাত্রা তাহার কিভাবে কাটিবে, কোথায় গিয়া ইহার কে পরিণাম ঘটিবে,—এই স্বস্তি-শান্তিহীন উদ্বিগ্ন চিন্তার সহিত মিশিয়া আরও একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল ওই অপরিচিত খ্রীষ্টান মেয়েটিকে।

সে সম্মুখে বাহির হয় নাই,—কেমন দেখিতে, কত বয়স, কিরূপ স্বভাব কিছুই অনুমান করিতে পারে নাই—শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে তাহার ইংরাজি উচ্চারণ ইংরাজের মত নয়।

হয়ত, মাদ্রাজী হইবে, না হয়ত, গোয়ানিজ কিংবা আর কিছু হইবে,—কিন্তু আর যাহাই হউক, সে যে আপনাকে উদ্ধত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করিয়া তাহার পিতার মত অত্যন্ত দর্পিতা নয়, সে যে তাঁহার অত্যাচারের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছে,—তাহার সেই ভীত, বিনীত কণ্ঠের ক্ষমাভিক্ষা নিজের পরুষতীব্র অভিযোগের সহিত এখন যেন বেসুরা বাজিত লাগিল। স্বভাবতঃ, সে উগ্রপ্রকৃতির নহে, কাহাকেও কঠিন কথা বলিতে তাহার বাধে, বিশেষতঃ, তেওয়ারীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া যখন মনে হইল, হয়ত এই মেয়েটিই তাহার মাতাল ও দুর্বৃত্ত পিতাকে নিবারণ করিতে নীরবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহার অনুতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, আজিকার মত চুপ করিয়া গেলেই ভাল হইত। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াই ছিল, ক্রোধের উপর উপরে গিয়া কথাগুলি না বলিয়া আসিলেই চলিত।

ওঘরে তেওয়ারীর ঘষ-মাজার কর্কশ শব্দ অবিশ্রাম শুনা যাইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিল। এবং পরক্ষণেই তাহার গলা শোনা গেল, কে?

অপূর্ব চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জবাব শুনিতে পাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্তে তেওয়ারীর প্রবল কণ্ঠস্বরই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, না না, মেমসাহেব, ও-সব তুমি নিয়ে যাও। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে,—ও-সব আমরা ছুঁইনে।

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, কিন্তু কথা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইয়া দিল তেওয়ারী। কহিল, কে বললে আমাদের খাওয়া হয়নি? হয়ে গেছে। ও-সব তুমি নিয়ে যাও, বাবু শুনলে ভারী রাগ করবেন বলচি।

অপূর্ব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি হয়েছে তেওয়ারী ?

মেয়েটি চৌকাটের এদিকে ছিল, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। তখন সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হয় নাই, সিঁড়ির দিক হইতে একটা অন্ধকার ছায়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেল। তাহার রঙ ইংরাজের মত সাদা নয়, কিন্তু খুব ফরসা। বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা কিছু বেশিও হইতে পারে, এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত-দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানি বোধ করি ভালই। পায়ে চটি-জুতা, পরনে চমৎকার একখানি মাদ্রাজী শাড়ী,—সম্ভবতঃ, উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরনটা কতক বাঙালী, কতক পার্শীদের মত। একটি জাপানী সাজিতে করিয়া কয়েকটি আপেল, নাশপাতি, গুটি-দুই বেদানা এবং একগোছা আঙুর সুমুখে মেজের উপর রাখা রহিয়াছে।

অপূর্ব কহিল, এ-সব কেন ?

মেয়েটি বাহিরে হইতে ইংরাজিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ আমাদের পর্বদিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া আজ ত আপনাদের খাওয়াও হয়নি।

অপূর্ব কহিল, আপনার মাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের খাওয়া হয়নি তাঁকে কে বল্লে ?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে কহিল, ওই নিয়েই প্রথমে ঝগড়া হয়। তাছাড়া আমরা জানি।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যই আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, তা’ বটে, কিন্তু সে ভাল হয়নি। আর এ-সব ত বাজারের ফল,—এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব বুঝিল তাহাকে কোনমতে শান্ত করিবার জন্য অপরিচিত দুটি রমণীর উদ্বেগের অবধি নাই। অল্পক্ষণ পূর্বে সে লাঠি ও গলার শব্দে তাহার মেজাজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কাল সকালে যে কি হইবে এই ভাবিয়াই তাহাকে প্রসন্ন করিতে ইহারা এই ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তাই, সদয়কণ্ঠে কহিল, না, কোন দোষ নেই। তেওয়ারীকে কহিল, বাজারের ফল, এ নিতে আর দোষ কি ঠাকুর ?

তেওয়ারী ঠাকুর খুশী হইল না, কহিল, বাজারের ফল ত বাজার থেকে আনলেই চলবে। আজ রাত্রে আমাদের দরকারও নেই, আর মা আমাকে এ-সব করতে বার বার নিষেধ করেছেন। মেমসাহেব, এ-সব তুমি নিয়ে যাও,—আমাদের চাইনে।

মা যে নিষেধ করিয়াছেন বা করিতে পারেন, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই, এবং বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী তেওয়ারী ঠাকুরকে যে এ-সকল ব্যাপারে প্রবাসে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন তাহাও সম্ভব। এই সেদিন সে জননীর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, শুধু ত কেবল মাতৃ-আজ্ঞা নয়, আমি সত্য দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি ওই সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপরিচিত মেয়েটি—যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে ভয়ে ভয়ে তাহার দ্বারে আসিয়াছে—তাহার উপহারের সামান্য দ্রব্যগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমান করাকেও তাহার সত্য বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মৌন হইয়া রহিল, তেওয়ারী বলিল, ও-সব আমরা ছোঁব না মেমসাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও, আমি জায়গাটা ধুয়ে ফেলি।

মেয়েটি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ডালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অপূর্ব চাপা রুক্ষস্বরে কহিল, না হয় না-ই খেতিস, নিয়ে চুপি চুপি ফেলে দিতেও ত পারতিস!

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, নিয়ে ফেলে দেব ? মিছামিছি নষ্ট করে লাভ কি বাবু!

লাভ কি বাবু! মুখ্যু, গোঁয়ার কোথাকার! এই বলিয়া অপূর্ব শুইতে চলিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া প্রথমটা তাহার তেওয়ারীর প্রতি ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করতে লাগিল ততই মনে হইত লাগিল, এ আমি পারিতাম না, কিন্তু হয়ত এ ভালই হইয়াছে সে স্পষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার বড় মাতুলকে মনে পড়িল। সেই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের বাটীতে অন্নাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বীকার করিবার জো নাই করুণাময়ী তাহা জানিতেন, তথাপি স্বামীর সহিত ভ্রাতার মনোমালিন্য বাঁচাইতে কি একটা কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাতে মৃদু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, না দিদি, সে হতে পারে না। হালদার মহাশয় রাগী লোক, এ অপমান তিনি সইবেন না,—হয়ত বা তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে;—কিন্তু আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলতেন, মুরারি, সত্যপালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না। এই ভাল, যে আমি না খেয়েই চলে গেলাম বোন।

এই লইয়া করুণাময়ীর অনেকদিন অনেক দুঃখ গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন দাদাকে তিনি দোষ দেন নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব মনে মনে বার বার কহিতে লাগিল,—এ ভালই হয়েছে,—তেওয়ারী ঠিক কাজই করেছে।

তিন

অপূর্বর ইচ্ছা ছিল সকালে বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার ম্লেচ্ছাচারের দুর্নাম ত সমুদ্র পার হইয়া তাহার মায়ের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা চলে না,—মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু, হিন্দুত্বের ধ্বজা বহিয়া সে-ই ত প্রথম কালাপানি পার হইয়া আসে নাই!—সত্যকার হিন্দু আরও ত থাকিতে পারেন যাঁহারা চাকরির প্রয়োজন ও শাস্ত্রের অনুশাসন দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়া ধর্ম ও অর্থের বিরোধ ভঞ্জন করতঃ সুখে বসবাস করিতেছেন! সেই সুগম পথের সন্ধান লইতে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক, এবং, বিদেশে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার এত বড় সুযোগ বাজার ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ, নিজের কানে শুনিয়া ও চোখে দেখিয়া এই জিনিসটাই তাহার স্থির করা প্রয়োজন যে, জননীর বিরুদ্ধাচারী না হইয়া এ দেশে বাস্তবিক বাস করা চলে কি না। কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, কারণ, উপরের সাহেবটা যে কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একে ত, উৎপাত সে সজ্ঞানে করে নাই, এবং আজ যখন তাহার নেশা ছুটিবে, তখন স্ত্রী ও কন্যা তাহাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না, তাহাদের মুখের এই অনুচ্চারিত ইঙ্গিত সে গতকল্যই আদায় করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটিকে আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া পর্যন্ত অনেকবার মনে পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যেও যেন তাহার ভদ্রতা, তাহার সৌজন্য, তাহার বিনয়নম্র কণ্ঠস্বর কানে কানে একটা জানা সুরের রেশের মত আনাগোনা করিয়া গেছে। মাতাল পিতার দুরাচারে ওই মেয়েটিরও যেমন লজ্জার অবধি ছিল না, মূর্খ তেওয়ারীর রূঢ়তায় অপূর্ব নিজেও তেমনি লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই। পরের অপরাধে অপরাধী হইয়া এই দুটি অপরিচিত মনের

মাঝখানে বোধ করি এইখানেই একটি সমবেদনার সূক্ষ্ম সূত্র ছিল, যাহাকে না বলিয়া অস্বীকার করিতে অপূর্বর মন সরিতে ছিল না। হঠাৎ মাথার উপরে প্রতিবেশীদের জাগিয়া উঠার সাড়া নীচে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রত্যেক স-বুট পদক্ষেপেই সে আশা করিতে লাগিল, এইবার সাহেব তাহার দরজায় নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইবেন। ক্ষমা সে করিবে তাহা স্থির, কিন্তু, বিগত দিনের বীভৎসতা কি করিলে যে সহজ এবং সামান্য হইয়া বিবাদের দাগ মুছাইয়া দিবে ইহাই হইল তাহার চিন্তা। কিন্তু মার্জনা চাহিবার সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। উপরে ছোটখাটো পদক্ষেপের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবের জুতার শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার পায়ের বহর ও দেহের ভারের পরিচয় দিল, কিন্তু দীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। এইরূপে আশায় ও উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া ঘড়িতে যখন নয়টা বাজিল, এবং নিজের নূতন আফিসের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাহার আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন শোনা গেল সাহেব নীচে নামিতে শুরু করিয়াছেন। তাঁহার পিছনে আরও দুটি পায়ের শব্দ অপূর্ব কান পাতিয়া শুনিল। অনতিবিলম্বে তাহার কবাটের লোহার কড়ার ভীষণ ঝন্‌ঝনা উঠিল, এবং রান্নাঘর হইতে তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু, কালকের সাহেব ব্যাটা এসে কড়া নাড়চে। তাহার উত্তেজনা কণ্ঠস্বরে গোপন রহিল না।

অপূর্ব কহিল, দোর খুলে দিয়ে তাঁকে আসতে বল্।

তেওয়ারী দ্বার খুলিয়া দিতেই অপূর্ব অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—এই, তুম্‌হারা সাব্ কিধর্ ?

উত্তরে তেওয়ারী কি কহিল ভাল শুনা গেল না, খুব সম্ভব সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে সাহেবের আওয়াজ সিঁড়ির কাঠের ছাদে ধাক্কা খাইয়া যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বোলাও!

ঘরের মধ্যে অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। বাপ্ রে! একি অনুতাপের গলা! একবার মনে করিল সাহেব সকালেই মদ খাইয়াছে, অতএব, এ সময়ে যাওয়া উচিত কিনা ভাবিবার পূর্বেই পুনশ্চ হুকুম আসিল, বোলাও জল্দি।

অপূর্ব আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এক মুহূর্ত তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংরাজি জান ?

জানি।

আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কাল তুমি আমার উপরে গিয়েছিলে ?

হাঁ।

সাহেব কহিলেন, ঠিক। লাঠি ঠুকেছিল ? অনধিকার প্রবেশের জন্য দোর ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে?

অপূর্ব বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন, দৈবাৎ দোর খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে তুমি আমার স্ত্রীকে কিংবা মেয়েকে আক্রমণ করতে। তাই আমি জেগে থাকতে যাওনি ?

অপূর্ব ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ত ঘুমিয়েছিলে, এ-সব জানলে কি করে ?

সাহেব কহিলেন, সমস্ত আমার মেয়ের কাছে শুনেচি। তাকে তুমি গালিগালাজ করে এসেচ। এই বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্তিনী কন্যাকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল। এ সেই মেয়েটি কিন্তু কালও ইহাকে ভাল করিয়া অপূর্ব দেখিতে পায় নাই, আজও সাহেবের বিপুলায়তনের অন্তরালে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বুঝা গেল ইহারা সহজ মানুষ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উলটা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাহেব কহিলেন, আমি জেগে থাকলে তোমাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতাম, এবং একটা দাঁতও তোমার মুখে আস্ত রাখতাম না, কিন্তু সে সুযোগ যখন হারিয়েছি, তখন, পুলিশের হাতে যেটুকু বিচার পাওয়া যায় সেইটুকু নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে। আমরা যাচ্ছি তুমি এর জন্যে প্রস্তুত থাক গে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

সাহেব মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এস। এবং নামিতে নামিতে বলিলেন, কাওয়ার্ড! অরক্ষিত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যা তুমি জীবনে ভুলবে না।

তেওয়ারী পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, কি হবে ছোটবাবু?

অপূর্ব তাচ্ছিল্যভরে কহিল, হবে আবার কি!

কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যে অন্যকথা কহিল তেওয়ারী তাহা বুঝিল। কহিল, তখনি ত বলেছিলুম বাবু, যা হবার হয়ে গেছে আর ওদের ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। ওরা হ'ল সাহেব-মেম।

অপূর্ব কহিল, সাহেব-মেম তা কি?

তেওয়ারী কহিল, ওরা যে পুলিশে গেল!

অপূর্ব বলিল, গেল ত কি ?

তেওয়ারী ব্যাকুল হইয়া কহিল, বড়বাবুকে একটা তার করে দিই ছোটবাবু, তিনি না হয় এসে পড়ুন।

তুই ক্ষেপ্লি তেওয়ারী! যা দেখ্ গে, ওদিকে বুঝি সব পুড়ে-ঝুড়ে গেল। সাড়ে দশটায় আমাকে বেরোতে হবে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তেওয়ারীও রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল কিন্তু রাঁধা-বাড়ার কাজ হইতে বাবুর আফিসে যাওয়া পর্যন্ত যা কিছু সমস্তই তাহার কাছে একেবারে অর্থহীন হইয়া

গেল। এবং যতই সে মনে মনে আপনাকে সমস্ত আপদের হেতু বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, ততই তাহার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত এদেশের ম্লেচ্ছতার উপরে, গ্রহনক্ষত্রের মন্দ দৃষ্টির উপরে, পুরোহিতের গণনার ভ্রমের উপরে এবং সর্বোপরি করুণাময়ীর অর্থলিপ্সার উপরে দোষ চাপাইয়া কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমনিধারা মন লইয়াই তাহাকে রান্নার কাজ শেষ করিতে হইল। করুণাময়ীর হাতেগড়া মানুষ সে, অতএব মন তাহার যতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাক হাতের কাজে কোথাও ভুলচুক হইল না। যথাসময়ে আহারে বসিয়া অপূর্ব তাহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে রন্ধনের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করিল। একদফা অন্ন-ব্যঞ্জনের চেহারার যশঃকীর্তন করিল এবং দুই-এক গ্রাস মুখে পুরিয়াই কহিল, আজ রেঁধেছিস্ যেন অমৃত, তেওয়ারী। ক'দিন খাইনি, ভেবেছিলাম বুঝি বা সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলবি। যে ভীতু লোক তুই—আচ্ছা মানুষটিকে মা বেছে বেছে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

তেওয়ারী কহিল, হুঁ। অপূর্ব তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মুখখানা যে একেবারে তোলো হাঁড়ি করে রেখেছিস রে? এবং শুধু কেবল তেওয়ারীর নয়, নিজের মন হইতেও সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় কৌতুক করিয়া বলিল, হারামজাদা ফিরিঙ্গীর শাসানোর ঘটাটা একবার দেখলি ? পুলিশ যাচ্চেন!—আরে, যা না তাই! গিয়ে করবি কি শুনি ? তোর সাক্ষী আছে ?

তেওয়ারী শুধু কহিল, সাহেব-মেমদের কি সাক্ষী-সাবুদ লাগে বাবু, ওরা বললেই হয়।

অপূর্ব কহিল, হাঁ বললেই হয়! আইন-কানুন যেন নেই! তাছাড়া, ওরা আবার কিসের সাহেব-মেম? রঙটি ত একেবারে আমার বার্নিশ-করা জুতো! ব্যাটা কচি ছেলেকে যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে গেল! নচ্ছার, পাজী, হারামজাদা!

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আড়ালে গালি-গালাজ করিবার মত তেজও আর তাহার ছিল না।

অপূর্ব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহার করার পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, আর ঐ মেয়েটা কি বজ্জাত, তেওয়ারী! কাল এলো যেন ভিজে বেড়ালটি! আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে! চেনা ভার!

তেওয়ারী কহিল, খিস্টান যে!

তা বটে! অপূর্বর তৎক্ষণাৎ মনে হইল ইহাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানে না, সামাজিক ভাল-মন্দের কোন বোধ নাই,—কহিল, হতভাগা, নচ্ছার ব্যাটারা। জানিস তেওয়ারী, আসল সাহেবেরা এদের কি রকম ঘেন্না করে—এক টেবিলে বসে কখন খায় না পর্যন্ত—যতই হ্যাটকোট পরুন, আর যতই কেননা গীর্জেয় আনাগোনা করুন। যারা জাত দেয়, তারা কি কখখনো ভাল হতে পারে তুই মনে করিস ?

তেওয়ারী তাহা কোনো দিনই মনে করে না, কিন্তু নিজেদের এই আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরে কে ভাল আর কে মন্দ, এ আলোচনায় তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ছোটবাবুর আফিসে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে, তখন একাকী ঘরের মধ্যে যে কি করিয়া তাহার সময় কাটিবে সে জানে না। সাহেব থানায় খবর দিতে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত দোর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, হয়ত পুলিশের দল সঙ্গে করিয়া আনিবে,—হয়ত তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে,—কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না সমস্ত অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আসল ও নকল সাহেবের প্রভেদ কতখানি, একের টেবিলে অপরে খায় কি না, এবং না খাইলে অন্যপক্ষের লাঞ্ছনা ও মনস্তাপ কতদূর বৃদ্ধি পায় এ-সকল সংবাদের প্রতি সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করিল না। আহারাদি শেষ করিয়া অপূর্ব কাপড় পরিতেছিল, তেওয়ারী ঘরের পর্দাটা একটুখানি সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া কহিল, একটু দেখে গেলে হোতো না ?

কি দেখে গেলে ?

ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত—

অপূর্ব কহিল, তা কি হয়! আজ আমার চাকরির প্রথম দিন,—কি তারা ভাববে বল ত?

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিল, তুই দোর দিয়ে নির্ভয়ে বসে থাক না—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো,—দোর ত আর ভাঙ্তে পারবে না,—কি করবে সে ব্যাটা!

তেওয়ারী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল অপূর্ব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাহির হইবার সময়ে দ্বারে খিল দিবার পূর্বে তেওয়ারী গলাটা খাটো করিয়া বলিল, আজ আর হেঁটে যাবেন না ছোটবাবু, রাস্তায় একটা গাড়ি ডেকে নেবেন।

আচ্ছা সে দেখা যাবে, এই বলিয়া অপূর্ব সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার মনের মধ্যে নূতন চাকরির আনন্দ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে।

বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্ব অঞ্চলের ম্যানেজার রোজেন সাহেব সম্প্রতি বর্মায় ছিলেন, রেঙ্গুনের আফিস তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অপূর্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাহার চেহারা, কথাবার্তা ও ইউনিভারসিটির ডিগ্রী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সমস্ত কর্মচারীদের ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং যে মাস দুই-তিন কাল তিনি এখানে আছেন তাহার মধ্যে ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিখাইয়া দিবেন আশা দিলেন। কথায়-বার্তায়, আলাপে-পরিচয়ে ও নূতন উৎসাহে ভিতরের গ্লানিটা তাহার এক সময়ে কাটিয়া গেল। একটি লোক তাহাকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিল সে আফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট। মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস তলওয়ারকর। বয়স বোধ হয় তারই মত,—হয়ত বা কিছু বেশি। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ,—সুপুরুষ

বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না।পরনে পায়জামা ও লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা;—ইংরাজি কথাবার্তা চমৎকার শুদ্ধ, কিন্তু, অপূর্বর সহিত সে প্রথম হইতে হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু করিল। অপূর্ব ভাল হিন্দী জানিত না, কিন্তু যখন দেখিল, সে হিন্দী ছাড়া আর কিছুতেই জবাব দেয় না, তখন সেও হিন্দী বলিতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব কহিল, এ-ভাষা আমি ভাল জানিনে, অনেক ভুল হবে।

রামদাস কহিল, ভুল আমারও হয়, আমাদের কারও এটা মাতৃভাষা নয়।

অপূর্ব বলিল, যদি পরের ভাষাতেই বলতে হয় ত, ইংরিজি দোষ করলে কি?

রামদাস কহিল, ইংরিজি আমার আরও ঢের বেশী ভুল হয়। একটু হাসিয়া কহিল, আপনি না হয় ইংরাজিতেই বলবেন, কিন্তু আমি হিন্দীতে জবাব দিলে আমাকে মাপ করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, আমিও হিন্দী বলতেই চেষ্টা করব, কিন্তু ভুল হলে আমাকেও মাপ করতে হবে।

এই আলাপের মধ্যে রোজেন সাহেব নিজেই ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হল্যান্ডের লোক, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ, ইংরাজি উচ্চারণ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, পাকা ব্যবসায়ী—ইতিমধ্যেই বর্মার নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কাছে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাজকর্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাগজখানা অপূর্বর টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য একটা জানতে চাই। তলওয়ারকরকে কহিলেন, আপনার ঘরেও এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। না না, এখন থাক—আজ ম্যানেজারের সম্মানে দুটোর সময় আফিসের ছুটি। দেখুন, আমি ত শীঘ্রই চলো যাবো, তখন, আপনাদের দুজনের পরেই সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করবে। আমি ইংলিশম্যান নই,—যদিচ, এ রাজ্য একদিন

আমাদেরই হতে পারত,—তবুও তাদের মত আমরা ইণ্ডিয়ানদের ছোট মনে করিনে, নিজেদের সমকক্ষই ভাবি,—কেবল ফার্মের নয়, আপনাদের নিজেদের উন্নতিও আপনাদের নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানের উপরে—আচ্ছা, গুড ডে—আফিস দুটোর সময় বন্ধ হওয়া চাই—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি যেমন ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মোটরের শব্দ বাহিরের দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় উভয়ে একত্র পথে বাহির হইল। তলওয়ারকর শহরে থাকে না, প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইন্সিন্ নামক স্থানে তাহার বাসা। বাসায় তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে থেকে, সঙ্গে খানিকটা জমি আছে, সেখানে তরিতরকারি অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়, চমৎকার খোলা জায়গা, শহরের গণ্ডগোল নাই,—যথেষ্ট ট্রেন, যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না।—হালদার বাবুজী, কাল আফিসের পরে আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

অপূর্ব কহিল, আমি চা খাইনে বাবুজী!

খান না ? আমিও পূর্বে খেতাম না, আমার স্ত্রী এখনও রাগ করেন, — আচ্ছা, না হয় ফলমূল—শরবত— কিংবা—আমরা ত আপনার মতই ব্রাহ্মণ—

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ ত বটেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের হাতে খান তবেই আমি শুধু আপনার স্ত্রীর হাতে খেতে পারি।

রামদাস কহিল, আমি ত খেতে পারিই,কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা,—আচ্ছা,সে তাঁকে জিজ্ঞেসা করে বলব। আমাদের মেয়েরা বড়,—আচ্ছা, আপনার বাসা ত কাছেই, চলুন না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, আমার ট্রেন ত সেই পাঁচটায়।

অপূর্ব প্রমাদ গণিল। এতক্ষণ সে সমস্ত ভুলিয়াছিল, বাসার কথায় চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত হাঙ্গামা, সমস্ত কদর্যতা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া মুখের সরস শ্রী যেন মুছিয়া দিয়া গেল। এখানে পা দিয়াই সে এমন একটা কদর্য নোংরা

ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ কথা জানিতে দিতে তাহার মাথা কাটা গেল। এতক্ষণ সেখানে যে কি হইয়াছে সে কিছুই জানে না। হয়ত, কত কি হইয়াছে। একাকী তাহারই মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন একজন পরিচিত মানুষকে সঙ্গে পাইলে কত সুবিধা, কত সাহস। কিন্তু সদ্য পরিচয়ের এই আরম্ভকালেই সে যে হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, দেখুন, সমস্ত বিশৃঙ্খল—মুখের কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিয়া রামদাস সহাস্যে কহিল, এক রাত্রে শৃঙ্খলা আমি ত আশা করিনে বাবুজী। আমাকেও একদিন নূতন বাসা পাততে হয়েছিল, তবু ত আমার স্ত্রী ছিলেন, আপনার তাও সঙ্গে নেই। আপনি আজ লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে না নিয়ে এলে এক বচ্ছর পরেও এই লজ্জা আপনার ঘুচবে না তা বলে রাখচি। চলুন, দেখি কি করতে পারি,—বিশৃঙ্খলার মাঝখানেই ত বন্ধুর দরকার।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। সে স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় লোক, তাহার স্ত্রীর একান্ত অসদ্ভাবের কথাটা সে অন্য সময়ে কৌতুক করিয়া বলিতেও পারিত, কিন্তু এখন হাসি-তামাশার কথা তাহার মনেও আসিল না। এই নির্বান্ধব দেশে আজ তাহার বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, সদ্যপরিচিত এই বিদেশী বন্ধুটিকে সেই প্রয়োজনে আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।, তাহার কথায় সে যে ঠিক সায় দিল তাহা নহে, কিন্তু উভয়ে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তলওয়ারজীকে গৃহে আমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। উপরে উঠিতে গিয়া দেখিতে পাইল সেই ক্রীশ্চান মেয়েটিও ঠিক সেই সময়েই অবতরণ করিতেছে। বাপ তাহার সঙ্গে নাই, সে একা। দুজনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া কিছু দূরে রাস্তায় গিয়া যখন পড়িল, রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা তেতলায় থাকেন বুঝি ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ!

আপনাদেরই বাঙালী ?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, না দেশী ক্রীশ্চান। খুব সম্ভব, মাদ্রাজী, কিংবা গোয়ানিজ, কিংবা আর কিছু,—কিন্তু বাঙালী নয়।

রামদাস কহিল, কিন্তু কাপড় পরার ধরন ত ঠিক আপনাদের মত ?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের ধরন আপনি জানলেন কি করে ?

রামদাস বলিল, আমি ? বোম্বায়ে, পুণায়, সিমলায় অনেক বাঙালী মহিলাকে আমি দেখেচি, এমন সুন্দর কাপড়-পরা ভারতবর্ষের আর কোন জাতের নেই।

তা হবে—এই বলিয়া অন্যমনস্ক অপূর্ব তাহার বাসার রুদ্ধদ্বারে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। খানিক পরে ভিতর হইতে সতর্ক-কণ্ঠের সাড়া আসিল, কে?

আমি রে, আমি, দোর খোল্, তোর ভয় নেই, বলিয়া অপূর্ব হাসিল। কারণ, ইতিমধ্যে ভয়ানক কিছু ঘটে নাই, তেওয়ারী নিরাপদে ঘরের মধ্যেই আছে অনুভব করিয়া তাহার মস্ত যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামদাস এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া খুশী হইল, কহিল, আমি যা ভয় করেছিলাম তা নয়! আপনার চাকরটি ভাল, সমস্তই একপ্রকার গুছিয়ে ফেলেছে। আসবাবগুলি আমিই পছন্দ করে কিনেছিলাম। আপনার আরও কি-কি দরকার আমাকে জানালেই কিনে পাঠিয়ে দেব,—রোজেন সাহেবের হুকুম আছে।

তেওয়ারী মৃদুস্বরে কহিল, আর আসবাবে কাজ নেই বাবু, ভালয়-ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচি।

তাহার মন্তব্যে কেহ মনোযোগ করিল না, কিন্তু, অপূর্বর কানে গেল। সে একসময়ে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হয়েছিল রে?

না।

তবে যে ও—কথা বললি?

তেওয়ারী জবাব দিল, বললুম সাধে? সারা দুপুরবেলাটা সাহেব যা ঘোড়দৌড় করে বেড়িয়েচে তাতে মানুষ টিক্তে পারে?

অপূর্ব ভাবিল, ব্যাপারটা সত্যই হয়ত গুরুতর নয়, অন্ততঃ, একটা ইতরের ছোটখাটো সমস্ত তুচ্ছ উপদ্রবকেই বড় করিয়া তুলিয়া অনুক্ষণ তেওয়ারীর সহিত একযোগে অশান্তির জের টানিয়া চলাও অত্যন্ত দুঃখের, তাই সে কতকটা তাচ্ছিল্যভরে কহিল, তা সে কি চলবে না তুই বলতে চাস? কাঠের ছাদে একটু বেশী শব্দ হয়ই।

তেওয়ারী রাগ করিয়া কহিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা ঠোকা কি চলা?

অপূর্ব বলিল, তা হলে হয়ত আবার মদ খেয়েছিল—

তেওয়ারী উত্তর, দিল, তা হবে। মুখ শুঁকে তার দেখিনি। এই বলিয়া সে বিরক্তমুখে রান্নাঘরে চলিয়া গেল, এবং বলিতে বলিতে গেল, তা সে যাই হোক, এ ঘরে বাস করা আর পোষাবে না।

তেওয়ারীর অভিযোগ অন্যায়ও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়; দুর্জনের অসমাপ্ত অত্যাচার যে একটা দিনেই সমাপ্ত হইবে এ ভরসা সে করে নাই, তথাপি অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন তাহার অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। প্রবাসের প্রথম প্রভাতটা তাহার কুয়াশার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, মাঝে কেবল আফিসের সম্পর্কে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দিনান্তের কাছাকাছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার তাহার চোখে পড়িল।

ট্রেনের সময় হইতে রামদাস বিদায় গ্রহণ করিল। কি জানি তেওয়ারীর নালিশ ও তাহার মনিবের মুখের চেহারায় সে কিছু অনুমান করিয়াছিল কিনা, যাইবার সময় সহসা প্রশ্ন করিল, বাবুজী, এ বাসায় কি আপনার সুবিধা হচ্ছে না?

অপূর্ব ঈষৎ হাসিয়া কহিল, না। এবং রামদাস জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল, উপরে যাঁরা আছেন আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করচেন না!

রামদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, ওই মহিলাটি?

হাঁ, ওঁর বাপ ত বটেই। এই বলিয়া অপূর্ব কাল বিকালের ও আজ সকালের ঘটনা বিবৃত করিল। রামদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি হলে এর ইতিহাস আর এক রকম হতো। ক্ষমা প্রার্থনা না করে এই দরজা থেকে সে এক পা নীচে নামতে পারত না।

অপূর্ব কহিল। ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

রামদাস কহিল, এই যে বললুম—নামতে দিতাম না।

অপূর্ব কথাটা যে তাহার বিশ্বাস করিল তাহা নয়, তবুও সাহসের কথায় একটু সাহস পাইল। সহাস্যে কহিল, কিন্তু এখন আমরা ত নামি চলুন, আপনার গাড়ীর সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে বন্ধুর হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আসিবার সময় যেমন, যাইবার সময়েও ঠিক তেমনি সিঁড়ির মুখেই সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইল। হাতে তাহার ছোট একটি কাগজের মোড়ক, বোধ করি কিছু কিনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ দিবার জন্য অপূর্ব একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, রামদাস পথ না ছাড়িয়া একেবারে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি করিয়া কহিল, আমাকে এক মিনিট মাপ করতে হবে, আমি এই বাবুজীর বন্ধু। এঁদের প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য আপনাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

মেয়েটি চোখ তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, ইচ্ছা হয় এ-সব কথা আমার বাবাকে বলতে পারেন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন ?

না।

তাহলে অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন যে তাঁর উপদ্রবে ইনি থাকতে পারচেন না।

মেয়েটি তেমনি তিক্তকণ্ঠে কহিল, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিচ্চি যে ইচ্ছে করলে ইনি চলে যেতে পারেন।

রামদাস একটু হাসিল, কহিল, ভারতবর্ষীয় ক্রীশ্চান 'বুলি'দের আমি চিনি। এর চেয়ে বড় জবাব তাদের মুখে আমি আশা করিনি। কিন্তু তাতে তাঁর সুবিধে হবে না, কারণ, এঁর জায়গায় আমি আসবো। আমার নাম রামদাস তলওয়ারকর,—আমি মারাঠী ব্রাহ্মণ। তলওয়ার শব্দটার একটা অর্থ আছে, আপনার বাবাকে সেটা জেনে নিতে বলবেন। গুড্ ইভনিং। চলুন বাবুজী,—এই বলিয়া সে অপূর্বর হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

মেয়েটির মুখের চেহারা অপূর্ব কটাক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল, শেষ দিকটায় সে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহিতেই পারিল না, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, এটা কি হল তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর উত্তরে কহিল, এই হল যে আপনি উঠে গেলেই আমাকে আসতে হবে। শুধু খবরটা যেন পাই।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ, দুপুরবেলা আপনার স্ত্রী এখানে একাকী থাকবেন?

রামদাস কহিল, না, একাকী নয়, আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

অর্থাৎ, আপনি পরিহাস করচেন ?

না, আমি সত্যি বলচি। পরিহাস করতে আমি জানিই নে।

অপূর্ব তাহার সঙ্গীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, তাহলে এ বাসা আমার ছাড়া চলবে না। তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই রামদাস অকস্মাৎ তাহার দুই হাত নিজের বলিষ্ঠ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চাই বাবুজী, এই ত আমি চাই। অত্যাচারের্ ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েচি, কিন্তু,— ব্যস!

একটা হাত সে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু একটা হাত সে শেষ পর্যন্ত ধরিয়াই রহিল। কেবল ট্রেন ছাড়িলে সেই হাতে আর একবার মস্ত নাড়া দিয়া নিজের দুই হাত এক করিয়া নমস্কার করিল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ট্রেনেরও আর সময় ছিল না বলিয়া স্টেশনের এই দিকের প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় ছিল না। এইখানে অপূর্ব পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই একটা দিনের ব্যবধানে জীবনটা যেন কোথা দিয়া কেমন করিয়া একেবারে বহু বৎসর দীর্ঘ হইয়া গেছে।

খেলাধূলা ও এমনি সব তুচ্ছ কাজের মধ্যে সে কখন যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল, সেখানে সমস্ত দুনিয়ার কর্মস্রোত কেবলমাত্র কাজের বেগেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই, আনন্দ নাই, অবসর নাই,—মানুষে মানুষে সংঘর্ষের মধ্যাহ্ন সূর্য দুই হাতে কেবল মুঠা মুঠা করিয়া অহরহ আগুন ছড়াইয়া চলিয়াছে। এখানে মা নাই, দাদারা নাই, বৌদিদিরা নাই,—স্নেহচ্ছায়া কোথাও নাই,—কর্মশালার অসংখ্য চক্র দক্ষিণে, বামে, মাথার উপরে, পায়ের নীচে, সর্বত্র অন্ধবেগে ঘুরিয়া চলিয়াছে, এতটুকু অসতর্ক হইলে রক্ষা পাইবার কোথাও কোন পথ নাই,—সমস্ত একেবারে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ। চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া গেল,—অদূরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সে তাহারই উপরে বসিয়া পড়িয়া চোখ মুছিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রবল ধাক্কায় উপুড় হইয়া একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি

কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল জন পাঁচ-ছয় ফিরিঙ্গী ছোঁড়া,—কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে পাইপ,—দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সম্ভবতঃ, যে ধাক্কা মারিয়াছিল সে বেঞ্চের গায়ে একটা লেখা দেখাইয়া কহিল, শালা, ইহ্ সাহেব লোগ্‌কাবাস্তে তুম্‌হারা নেহি—

লজ্জায়, ক্রোধে ও অপমানে অপূর্ব্বর সজল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, সে প্রত্যুত্তরে কি যে বলিল, বুঝা গেল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গীর দল অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল, একজন কহিল, শালা দুধবালা, আঙ্খি গরম করতা—ফাটকমে জায়েগা ? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—একজন তাহার মুখের সামনে একটা অশ্লীল ভঙ্গী শিষ করিয়া দিল।

অপূর্ব্বর হিতাহিতজ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছিল, হয়ত মুহূর্ত্ত পরে সে ইহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী অনতিদূরে বসিয়া বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা মাঝখানে পড়িয়া তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্ম্মের বাহির করিয়া দিল, একটা ফিরিঙ্গী ছোঁড়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে পা গলাইয়া অপূর্ব্বর সাদা পিরাণের উপর বুটের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল। এই হিন্দুস্থানী দলের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে টানাটানি করিতেছিল, একজন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আরে বাঙালী বাবু, সাহেব লোককা বদন্ ছুয়েগা ত ইঁহা এক বরস্ জেল খাটেগা—যাও—ভাগো—একজন কহিল, আরে বাবু হ্যায়, —ধাক্কা মাৎ দেও—এই বলিয়া সে তারের গেটটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় জমিবার উপক্রম করিতেছিল, যাহারা দেখিতে পায় নাই তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, একজন হিন্দুস্থানী চানা-ভাজা বিক্রি করে, সে কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা শিখিয়াছিল, সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে, এদেশে চট্টগ্রামের অনেক লোক দুধের ব্যবসা করে, তাহারা পিরাণ গায়ে দেয়, জুতা পরে,— অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ

বাঙালীর পোশাকে স্টেশনে আসিয়াছিল, সুতরাং, সাহেবেরা সেই দুধবালা মনে করিয়া মারিয়াছে, কেরানীবাবু বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার কৈফিয়ত, সঙ্গ ও সহানুভূতির দায় এড়াইয়া অপূর্ব স্টেশনে খোঁজ করিয়া সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

তিনিও সাহেব,—কাজ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপূর্ব জুতার দাগ দেখাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বিরক্ত ও অবজ্ঞা ভরে মিনিট-খানেক শুনিয়া কহিলেন, ইউরোপীয়ানদের বেঞ্চে তুমি বসিতে গেলে কেন?

অপূর্ব উত্তেজনায় সহিত কহিল, আমি জানতাম না—

তোমার জানা উচিত ছিল।

কিন্তু তাই বলে খামকা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে?

সাহেব দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন—গো—গো—গো—চাপ্রাশি ইস্কো বহর্ কর্ দেও—বলিয়া কাজে মন দিলেন।

তাহার পরে অপূর্ব কি করিয়া যে বাসায় ফিরিয়া আসিল সে ঠিক জানে না! ঘণ্টা-দুই পূর্বে রামদাসের সহিত এই পথে একত্রে আসিবার কালে সবচেয়ে যে দুর্ভাবনা তাহার মনে বেশী বাজিতেছিল সে তাহার অকারণ মধ্যস্থতা। একে ত উৎপাত ও অশান্তির মাত্রা তাহাতে কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে, তা ছাড়া, সে ক্রীশ্চান মেয়েটির যত অপরাধই কেন না থাক কেবলমাত্র মেয়েমানুষ বলিয়াই ত পুরুষের মুখ হইতে ওরূপ কঠিন কথা বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই,—তাহাতে আবার সে তখন একাকী ছিল। তাহার শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ রামদাসের কথায় ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ফিরিবার পথে তাহার সে ক্ষোভ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহাকে মনে যখন হইল, তখন মেয়েমানুষ বলিয়া আর মনে হইল না, —মনে হইল ক্রীশ্চানের মেয়ে, সাহেবের মেয়ে বলিয়া,—যে ছোঁড়াগুলো তাহাকে এইমাত্র অকারণে অপমানের একশেষ করিয়াছে—যাহাদের কুশিক্ষা, ইতরতা ও বর্বরতার অবধি নাই—তাহাদেরই

ভগিনী বলিয়া,—যে সাহেবটা একান্ত অবিচারে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—মানুষের সামান্য অধিকারটুকুও দিল না—তাহারই পরম আত্মীয়া বলিয়া।

তেওয়ারী আসিয়া কহিল, ছোটবাবু আপনার খাবার তৈরি হয়েছে। অপূর্ব কহিল, যাই—

মিনিট দশ-পনেরো পরে সে পুনরায় আসিয়া জানাইল, খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল বাবু—

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, কেন বিরক্ত করিস তেওয়ারী, আমি খাব না, —আমার ক্ষিদে নেই।

চোখে তাহার ঘুম আসিল না। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, সমস্ত বিছানাটা যেন তাহার কাছে শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। একটা মর্মান্তিক কণ্টক-বেদনা তাহার সকল অঙ্গে ফুটিতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল স্টেশনের সেই হিন্দুস্থানী লোকগুলোকে, যাহারা সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনার কোন অংশ লয় নাই, বরঞ্চ, তাহার অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। দেশের লোকের বিরুদ্ধে দেশের শোকের এতবড় লজ্জা, এতবড় গ্লানি জগতের আর কোন্ দেশে আছে? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

চার

দুই-তিনদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, উপরতলা হইতে সাহেবের অত্যাচার আর যখন নব-নবরূপে প্রকাশিত হইল না, তখন অপূর্ব বুঝিল ক্রীশ্চান মেয়েটা সেদিনের কথা তাহার পিতাকে জানায় নাই। এবং তাহার সেই ফলমূল দিতে আসার ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া এই না-বলার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব নয়, সত্য বলিয়াই মনে হইল। অনেক প্রকার কালো ফরসা সাহেবের দল উপরে যায় আসে, মেয়েটির সহিতও বার-দুই সিঁড়ির পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, কিন্তু সেই দুঃশাসন গৃহকর্তার সহিত একদিনও মুখোমুখি ঘটে নাই। কেবল, সে যে ঘরে আছে সেটা বুঝা যায় তাহার ভারী বুটের শব্দে। সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব কহিল, না। যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না।

তেওয়ারী বলিল, আমাদেরও কিন্তু বেশী দিন এ বাসায় থাকা চলবে না। ব্যাটা মাতাল হলেই আবার কোন্ দিন ফ্যাসাদ বাধাবে।

অপূর্ব কহিল, নাঃ—সে ভয় বড় নেই।

তেওয়ারী কহিল, তা হোক, তবু মাথার ওপরে মেলেচ্ছ ক্রীশ্চান,—যা সব খায়-দায়, মনে হলেই—

আঃ তুই থাম্ তেওয়ারী। সে নিজে তখন খাইতেছিল, ক্রীশ্চানের খাদ্যদ্রব্যের ইঙ্গিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। কহিল, এ মাসটা গেলে উঠে ত যেতেই হবে। কিন্তু একটা ভাল বাসাও ত খুঁজে পাওয়া চাই!

এ সময়ে ও উল্লেখ ভাল হয় নাই, তেওয়ারী মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই দিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে যেন এই একটা বেলার মধ্যে শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেছে।

কি রে তেওয়ারী?

প্রত্যুত্তরে সে আলপিনে গাঁথা কয়েক খণ্ড ছাপানো হলদে রঙের কাগজ অপূর্বর হাতে দিল। ফৌজদারী আদালতের সমন, বাদী জে. ডি. জোসেফ, প্রতিবাদী তিন নম্বর ঘরের অপূর্ব বাঙালী ও তাহার চাকর। ধারা একটা নয়, গোটা-চারেক। দুপুরবেলা কোর্টের পিয়াদা জারি করিয়া গেছে, এবং কাল সকালে আর একটা জারি করিতে আসিবে। সঙ্গে সেই সাহেব ব্যাটা। হাজির হইবার দিন পরশু। অপূর্ব নিঃশব্দে কাগজগুলা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, তা আর হবে কি। কোর্টে হাজির হলেই হবে।

তেওয়ারী কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিল, কখনও যে কাঠগড়ায় উঠিনি বাবু।

অপূর্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি কি উঠেছি নাকি? সবতাতেই কাঁদবি ত বিদেশে আসতে গেলি কেন?

আমি যে কিছু জানিনে ছোটবাবু!

জানিস নে ত লাঠি নিয়ে বেরুতে গেলি কেন? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকলেই ত হতো! এই বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন তাহার নিজের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, এবং তাহার পরদিন তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইল। নালিশ মকদ্দমার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না; বিদেশ, কোন লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় নাই, কাহার সাহায্য লইতে হয়, কি করিয়া তদবির করিতে হয় কিছুই জানে না, তবুও কোন ভয়ই হইল না। হঠাৎ কি করিয়া যে তাহার মন এমন শক্ত হইয়া গেল সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না। এ বিষয়ে রামদাসকে কোন কথা বলিতে,

কোন সাহায্য চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। শুধু কাজের অজুহাতে সাহেবের কাছে সে একটা দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

যথাসময়ে ডাক পড়িল। ডেপুটী কমিশনর নিজের ফাইলেই মকদ্দমা রাখিয়াছিলেন। বাদী জোসেফ সাহেব সত্য-মিথ্যা যা খুশি এজাহার দিয়া গেল, প্রতিবাদীর উকিল ছিল না, অপূর্ব নিজের জবাবে একটি কথাও গোপন করিল না, একটা কথাও বাড়াইয়া বলিল না। বাদীর সাক্ষী তার মেয়ে, আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটির নাম এবং তাঁহার বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা, বাটী পূর্বে ছিল বরিশাল, এখন বাঙ্গালোর। নিজের নাম মেরি-ভারতী; ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন। তাঁহার স্বর্গীয় হওয়ার পরে মা কোন এক মিশনরি-দূহিতার দাসী হইয়া বাঙ্গালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈত্রিক ভট্টাচার্য নামটা কদর্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই অবধি সে মিস মেরি-ভারতী জোসেফ নামে পরিচিত। হাকিমের প্রশ্নে সে ফলমূল উপহার দিতে যাওয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর হইতে মুখের চেহারায় মিথ্যা বলার বিড়ম্বনা এমনি ফুটিয়া উঠিল যে, শুধু হাকিম নয়, তাঁহার পিয়াদাটার চক্ষুকে পর্যন্ত তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। কোন পক্ষেই উকিল ছিল না, সুতরাং জেরার প্যাঁচে প্যাঁচে পাক খাইয়া তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু সুবৃহৎ হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। বিচার একদিনেই শেষ হইল, তেওয়ারী রেহাই পাইল, কিন্তু বিচারক অপূর্বর কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। জীবনের এই প্রভাতকালে রাজদ্বারে বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। টাকা-কয়টি গণিয়া দিয়া সে বাহির হইতেছে, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামদাস। অপূর্বর মুখ দিয়া প্রথমেই কুড়ি টাকা ফাইন হল রামদাস, কি করা যাবে? আপিল??বাহির হইয়া গেল,

আবেগ ও উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল। রামদাস তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ কুড়ি টাকার বদলে দু হাজার টাকা আপনি লোকসান করতে চান?

তা হোক, কিন্তু এ যে ফাইন! শাস্তি! রাজদণ্ড!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিসের দণ্ড? যে মিথ্যে মামলা আনলে, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ালে, আর যে তাকে প্রশ্রয় দিলে তাদের দণ্ড ত? কিন্তু এর উপরেও একটা আদালত আছে, যার বিচারক ভুল করেন না, সেখানে আপনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন বলে দিচ্চি।

অপূর্ব বলিল কিন্তু লোকে ত বুঝবে না রামদাস। তাদের কাছে এ দুর্নাম যে আমার চিরকালের সঙ্গী হয়ে রইল।

রামদাস সস্নেহে তাহার হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল, চলুন, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি গে।

পথে চলিতে চলিতে কহিল, অপূর্ববাবু, আমি আফিসের কাজে আপনার ছোট হলেও বয়সে বড়।

যদি দুটো কথা বলি কিছু মনে করবেন না। অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। রামদাস বলিতে লাগিল, এ মকদ্দমার কথা আমি আগেই জানতাম, কি হবে তাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। লোকের কথা আপনি বলছিলেন, যে লোক, সে জানবে হালদারের সঙ্গে জোসেফের মামলা বাধলে ইংরাজের আদালতে কি হয়! আর কুড়ি টাকার জরিমানার দুর্নাম—

কিন্তু বিনা দোষে যে রামদাস?

রামদাস কহিল, হাঁ হাঁ, বিনা দোষেই বটে। এমনি বিনা দোষেই আমি দু বৎসর জেল খেটেচি।

জেল খেটেচ? দু’ বৎসর?

হাঁ, দু বৎসর, এবং, এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিয়া অপূর্বর হাতখানা তাহার পিঠের নীচে টানিয়া লইয়া কহিল, এই জামাটা যদি সরাতে পারতাম ত দেখতে পেতেন এখানে বেতের দাগে দাগে আর জায়গা নেই।

বেত খেয়েচ রামদাস?

রামদাস সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং এমনই বিনা দোষে। তবু এত নির্লজ্জ আমি যে আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্চি। আর আপনি কুড়ি টাকার আঘাত সইতে পারবেন না বাবুজী?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। যে ল্যাম্পপোস্ট আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আলো জ্বালিতে আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রামদাস চকিত হইয়া কহিল, আর না, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাই।

অপূর্ব আবেগের সহিত বলিল, এখনি চলে যাবেন? অনেক কথা যে আমার জানবার রইল বাবুজী?

রামদাস হাসিমুখে কহিল, সব আজই জেনে নেবেন? সে হবে না। হয়ত অনেক দিন ধরে আমাকে বলতে হবে। এই অনেকদিন কথাটার উপর সে এমনি কি একটা জোর দিল যে অপূর্ব সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু সেই সহাস্য প্রশান্ত মুখে কোন রহস্যই প্রকাশ পাইল না। রামদাস গলির ভিতরে আর প্রবেশ করিল না, বড় রাস্তা হইতেই বিদায় লইয়া সোজা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

অপূর্ব তাহার বাসার দরজায় আসিয়া রুদ্ধদ্বারে ঘা দিতেই তেওয়ারী প্রভুর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে পূর্বাহ্ণে আসিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছিল, মুখ তাহার যেমন গম্ভীর তেমনি বিষণ্ণ। কহিল, তখন তাড়াতাড়িতে দু'খানা নোট ফেলে গিয়েছিলেন।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ফেলে গিয়েছিলাম রে?

এই যে এখানে, বলিয়া সে পা দিয়া দ্বারের কাছে মেঝের উপর একটা জায়গা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। কহিল, আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি। পকেট থেকে বাইরে পড়ে যায়নি এই ভাগ্যি।

কি করিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিল এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

রাত্রে আহারাদির পরে তেওয়ারী করজোড়ে সাশ্রুনয়নে কহিল, আর না ছোটবাবু, এইবার বুড়োমানুষের কথাটা রাখুন। চলুন, কাল সকালেই আমরা যেখানে হোক চলে যাই।

অপূর্ব কহিল, কাল সকালেই, কোথায় শুনি? তুই কি ধর্মশালায় গিয়ে থাকতে বলিস নাকি?

তেওয়ারী বলিল, এর চেয়ে সেও ভাল। মকদ্দমা জিতেছে, এইবার কোন্ দিন ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনকে মেরে যাবে।

অপূর্ব আর সহিতে পারিল না, রাগ করিয়া কহিল, তোকে কি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই মা সঙ্গে দিয়েছিলেন? তোকে আর আমার দরকার নেই, কাল জাহাজ আছে তুই বাড়ি চলে যা, আমার কপালে যা আছে তা হবে।

তেওয়ারী আর তর্ক করিল না, আস্তে আস্তে শুইতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলা অপূর্বকে অপমানের একশেষ করিল বলিয়াই সে এরূপ কঠোর জবাব দিল, না হইলে সে যে বিশেষ অসঙ্গত কিছু কহে নাই অপূর্ব মনে মনে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। যাহা হউক, পরদিন সকাল হইতেই একটা নূতন বাসার খোঁজ চলিতে লাগিল, এবং শুধু তলওয়ারকর ছাড়া আফিসের প্রায় সকলকেই সে এই মর্মে অনুরোধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তেওয়ারীও অনুযোগ করিল না, অপূর্বও মনের কথা প্রকাশ করিল না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই একপ্রকার সশঙ্কিতভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। আফিস হইতে ফিরিবার পথে অপূর্ব প্রত্যহই ভয় করিত, আজ না জানি কি গিয়া শুনিতে হয়! কিন্তু কোনদিন কিছুই শুনিতে হইল না। মকদ্দমাবিজয়ী জোসেফ পরিবারের নানাবিধ ও বিচিত্র উপদ্রব নব নব রূপে নিত্য প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু উৎপাত ত

দূরের কথা, উপরে কেহ আছে কি না অনেক সময়ে তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকে কোন কথা কহিত না। নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতেছিল—এই ভাল। সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে তেওয়ারী প্রফুল্লমুখে মনের আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল, আর শুনেছেন ছোটবাবু?

অপূর্ব কহিল, কি?

সাহেব যে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে একবারে হাসপাতালে। বাঁচে কি না বাঁচে! আজ ছ'দিন হল—ঠিক তার পরের দিনই!

অপূর্ব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কি করে জানলি?

তেওয়ারী বলিল, বাড়িয়ালার সরকার আমাদের জেলার লোক কিনা, তার সঙ্গে আজ পরিচয় হল। ভাড়া আদায় করতে এসেছিল। কে বা ভাড়া দেবে,—মদ খেয়ে মারামারি করে জেটি থেকে নীচে পড়ে সাহেব ত হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

তা' হবে, বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করার পরে এই প্রথম তেওয়ারী মন সত্যকার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল এই লইয়া সে আজ বেশ একটুখানি আলোচনা করে, কিন্তু মনিব তাহাতে উৎসাহ দিলেন না। নাই দিন, তবুও সে বাহির হইতে নানা উপায়ে শুনাইয়া দিল যে এরূপ একদিন ঘটিবেই তাহা সে জানিত। তেওয়ারী সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু গায়ত্রীটা তাহার মুখস্থ হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী সে জরিমানার দিন হইতে সকাল-সন্ধ্যা একশত আট করিয়া দুইশত ষোল বার প্রত্যহ জপ করিয়াছে। সাহেবের পা-ভাঙ্গার যথাহেতু কি, ছেলেমানুষ মনিব তাহা অনুধাবন করিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তির প্রতি তেওয়ারীর বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। ম্লেচ্ছ

হইয়া ব্রাহ্মণের মাথার উপরে যে ঘোড়ার মত পা ঠুকিয়াছে, পা তাহার ভাঙ্গিবে না ত কি!

পরদিন সকালে তাহার আফিসের আরদালির কাছে খবর পাইয়া অপূর্ব তেওয়ারীকে ডাকিয়া কহিল, একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে তেওয়ারী, গিয়ে দেখে আয় দেখি পোষাবে কিনা।

তেওয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আর বোধ হয় দরকার হবে না বাবু, সে-সব আমি ঠিক করে নিয়েছি। আসছে পয়লা তারিখে যারা যাবার তারাই যাবে। বাসা বদলানো ত সোজা ঝঞ্ঝাট নয় ছোটবাবু!

ঝঞ্ঝাট যে সোজা নয় অপূর্ব নিজেও তাহা জানিত, কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে যে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যাগমনের পরেও যে তাহা বজায় থাকিবে এ ভরসা তাহার ছিল না। বাসা তাহাকে বদল করিতেই হইবে, কিন্তু আফিসে যাইবার পূর্বে তেওয়ারী যখন ছুটি চাহিয়া জানাইল যে আজ দুপুরবেলা সে বর্মাদের ফয়ার মন্দিরে তামাশা দেখিতে যাইবে, তখন অপূর্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, তোর যে আবার তামাশা দেখতে শখ হ'ল তেওয়ারী?

তেওয়ারী কহিল, বিদেশের যা-কিছু সব দেখা ভাল ছোটবাবু।

অপূর্ব বলিল, তা বটে। খোঁড়া সাহেব হাসপাতালে, এখন আর রাস্তায় বেরোতে ভয় নেই। তা যাস, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরে আসিস। কেউ সঙ্গে থাকবে ত?

তাহার স্বদেশবাসী যে লোকটির সহিত কাল তেওয়ারীর আলাপ হইয়াছে সেই আসিয়া আজ তাহাকে তামাশা দেখাইয়া আনিবে স্থির হইয়াছিল। সাহেবের দুর্ঘটনার সংবাদে এতই সে খুশী হইয়াছিল যে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নাই।

তাহাকে বাহিরে যাইবার হুকুম দিয়া অপূর্ব যথাসময়ে আফিসে চলিয়া গেল, এবং ইহার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তেওয়ারীর দেশের লোক আসিয়া তাহাকে বর্মা তামাশা দেখাইয়া আনিতে সঙ্গে লইয়া গেল। তালার একটা চাবি অপূর্বর নিজের কাছেই থাকিত, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব ঘটিলেও ছোটবাবুর যে বিশেষ অসুবিধা হইবে না তেওয়ারীর তাহা জানা ছিল। নিষ্কণ্টক হইয়া আজ আর তাহার স্ফূর্তির অবধি ছিল না।

অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া অপূর্ব দেখিল দরজায় তালা বন্ধ, তেওয়ারী তখন পর্যন্ত তামাশা দেখিয়া ফিরে নাই। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল চাবি লাগে না, এ কোন্ এক অপরিচিত তালা, এ ত তাহাদের নয়! তেওয়ারী এ কোথায় পাইল, কেনই বা সে তাহাদের পুরাতন ভালো তালার বদলে এই একটা নূতন তালা দিতে গেল, ইহার চাবিই বা কোথায়, কেমন করিয়াই বা সে ঘরে ঢুকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

বোধ হয় মিনিট-দুই সে এইভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ত্রিতলের দ্বার খুলিয়া সেই ক্রীশ্চান মেয়েটি মুখ বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্চি, এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অসঙ্কোচে অপূর্বর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ময়ে ও লজ্জায় যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তেওয়ারী নাই, কি তার হইল, এবং কি জন্য কেমন করিয়া ঘরের চাবি সাহেবের মেয়ের হাতে গিয়া পড়িল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। স্বল্প আলোকিত এই সংকীর্ণ সিঁড়িটায় দুজনের দাঁড়াইবার মত যথেষ্ট স্থান ছিল না, অপূর্ব এক ধাপ নীচে নামিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর সহিত নির্জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার অভ্যাসই ছিল না, তাই মেয়েটি যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা বলছিলেন চাবি বন্ধ করে আমি ভাল কাজ করিনি, হয়ত বিপদে পড়তেও পারি, তখন অপূর্বর মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তরই বাহির হইল না। ভারতী কবাট খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার মা ভয়ানক ভীতু মানুষ, তিনি

আমাকে তখন থেকে বকছেন যে আপনি বিশ্বাস না করলে আমাকেও চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে। আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।

অপূর্ব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

ভারতী কহিল, ঘরে গিয়ে দেখুন না কি হয়েছে। এই বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে দুই চক্ষু তাহার কপালে উঠিল। তোরঙ্গ-দুটার ডালা ভাঙ্গা, বই, কাগজ, বিছানা, বালিশ, কাপড়-চোপড় সমস্ত মেঝের উপর ছড়ানো, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, কি করে এমন হ'ল? কে করলে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, আর যেই করুক, কিন্তু আমি নয়, তা শত্রু হলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বলিয়া সে ঘটনাটা যাহা বিবৃত করিল তাহা এই—দুপুরবেলা তাহার সদ্য পরিচিত দেশওয়ালী বন্ধুর সহিত তেওয়ারী যখন তামাশা দেখিতে বাহির হইয়া যায়, ভারতীর মা বারান্দায় বসিয়া তাহাদের দেখিতে পান। অল্পক্ষণ পরেই নীচের ঘর হইতে একপ্রকার সন্দেহজনক শব্দ শুনিতে পাইয়া ভারতীকে দেখিতে বলেন। তাহাদের মেঝের একধারে একটা ফুটা আছে, চোখ পাতিয়া দেখিলে অপূর্বর ঘরের সমস্তই দেখা যায়। সেই ফুটা দিয়া দেখিয়াই সে চীৎকার করিতে থাকে। যাহারা বাক্স ভাঙ্গিতেছিল তাহারা সবেগে পলায়ন করে, তখন নীচে নামিয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে থাকে পুনরায় না তাহারা ফিরিয়া আসে। এখন অপূর্বকে দেখিতে পাইয়া সে ঘর খুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

বিবর্ণ, পাংশুমুখে অপূর্ব তাহার খাটের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ ঘরে আপনার কোন খাবার জিনিস আছে কি? আমি ঘরে এসে একবার দেখতে পারি?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, আসুন।

সে ঘরে আসিলে তাহার মুখপানে চাহিয়া অপূর্ব বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, এখন কি করা যায়?

ভারতী কহিল, করা ত অনেক কিছু যায়, কিন্তু সকলের আগে দেখতে হবে কি কি চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, বেশ ত, তাই দেখুন না কি-কি চুরি গেল।

ভারতী হাসিল, কহিল, আসবার সময় আপনার তোরঙ্গ গুছিয়েও আমি দিইনি, চুরিও করিনি, —সুতরাং, কি ছিল আর কি নেই আমি জানব কি করে?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা। তাহলে তেওয়ারী আসুক, সে হয়ত সমস্ত জানে। এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি করুণচক্ষে চাহিল।

তাহার নিরুপায়ের মত মুখের চেহারায় ভারতী আমোদ বোধ করিল। হাসিমুখে কহিল, সে জানতে পারে আর আপনি পারেন না? আচ্ছা, কি করে জানতে হয় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া সুমুখের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা হাতের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, জামা-কাপড়গুলো আগে সব গুছিয়ে তুলি। এ-সব নিয়ে যাবার বোধ হয় তারা সময় পায়নি। এই বলিয়া সে এলোমেলো ধুতি, চাদর, পিরান, কোট প্রভৃতি একটির পর একটি ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার শিক্ষিত হস্তের নিপুণতা কয়েক মুহূর্তেই অপূর্বর চোখে পড়িল। এটা কি? মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুট বুঝি? এরকম ক' জোড়া আছে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, দু'জোড়া।

ঠিক মিলেছে। এই এখানে আর এক জোড়া, এই বলিয়া সে সুট দু'টি সাজাইয়া বাক্সে তুলিল। ঢাকাই ধুতি—একটা, দুটো, তিনটে;—চাদর—এক, দুই, তিন,—ঠিক মিলেছে। বোধ হয় তিন-জোড়াই ছিল, না?

অপূর্ব কহিল, হাঁ, আমার মনে আছে, তিন জোড়াই বটে।

এটা কি, আলপাকার কোট? কৈ ওয়েস্ট কোট, প্যান্ট দেখছি না যে? ও—না, এ যে গলা বন্ধ দেখছি। এর সুট ছিল না, না?

অপূর্ব বলিল, না, ওটা আলাদাই বটে। ওর সুট ছিল না।

তাহাদের গুছাইয়া তুলিয়া ভারতী আর একটা হাতে তুলিয়া কহিল, এটা দেখছি ফ্লানেল সুট,—আপনি সেখানে টেনিস খেলতেন বুঝি? তা হলে একটা, দুটো, তিনটে, ওই আলনায় একটা, আপনার গায়ে একটা,—সুট তা হলে পাঁচ-জোড়া, না?

অপূর্ব খুশী হইয়া কহিল, ঠিক তাই। পাঁচ-জোড়াই বটে।

কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে উজ্জ্বল কি একটা পদার্থ চোখে পড়িতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এ যে সোনার চেন, ঘড়ি গেল কোথায়?

অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, যাক বাঁচা গেছে—চেনটা তারা দেখতে পায়নি। এটি আমার পিতৃদত্ত, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন—

কিন্তু ঘড়িটা?

এই যে, বলিয়া অপূর্ব তাহার কোটের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

ভারতী কহিল, চেন, ঘড়ি পাওয়া গেল, বলুন ত আংটি আপনার কটা? হাতে ত একটিও নেই দেখছি।

অপূর্ব বলিল, হাতেও নেই, বাক্সেও ছিল না। আংটিই আমার কখনো হয়নি।

তা ভাল। সোনার বোতাম? সে বোধ হয় আপনার গায়ে সার্টে লাগানো আছে?

অপূর্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, কৈ না। সে যে একটা গরদের পাঞ্জাবীর সঙ্গে তোরঙ্গের মধ্যে সুমুখেই ছিল।

ভারতী আলনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, যে-সকল বস্ত্র তখনও তোলা হয় নাই, একপাশে ছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিল, তার পরে একটু হাসিয়া কহিল, জামাসুদ্ধ এটা গেছে দেখছি। অন্য বোতাম ছিল না ত?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল না। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ট্রাঙ্কে টাকা ছিল ত? অপূর্ব 'ছিল' বলিয়া সায় দিলে ভারতী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, তা হলে তাও গেছে। কত ছিল জানেন না? তা আমি আগেই বুঝেচি। আপনার মনিব্যাগ আছে জানি। বার করে আমাকে দিন ত দেখি—

অপূর্ব পকেট হইতে তাহার ছোট চামড়ার থলেটি বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিতে সে মেঝের উপর ঢালিয়া ফেলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া বলিল, দু'শ পঞ্চাশ টাকা আট আনা। বাড়ি থেকে কত টাকা নিয়ে বার হয়েছিলেন মনে আছে?

অপূর্ব কহিল, আছে বৈ কি। ছ'শ টাকা।

ভারতী টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল, জাহাজ ভাড়া, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া, কুলি ভাড়া,—পৌঁছে বাড়িতে টেলিগ্রাম করেছিলেন ত? আচ্ছা, তারও এক টাকা, তারপরে এই দশ দিনের বাসাখরচ—

অপূর্ব বাধা দিয়া কহিল, সে ত তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা না করলে জানা যাবে না।

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা যাবে, দু'এক টাকার তফাত হতে পারে, বেশী হবে না। যে ফুটা দিয়া আজ সে চুরি করা দেখিয়াছিল, সেই ছিদ্রপথে চোখ পাতিয়া সে যে এই ঘরের যাবতীয় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিত, তেওয়ারীর বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না, এ কথা বলিল না, কাগজে ইচ্ছামত একটা অঙ্ক লিখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, এ ছাড়া আর বাজে খরচ নেই ত?

না।

ভারতী কাগজের উপর হিসাব করিয়া কহিল, তাহলে দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব চমকিয়া কহিল, এত টাকা? রোস রোস, আর কুড়ি টাকা বাদ দাও—জরিমানার টাকাটা ধরা হয়নি।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না সে ত অন্যায়, মিথ্যে জরিমানা—এ টাকা আমি বাদ দেব না।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কি বিপদ! জরিমানা করাটা মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু আমার টাকা দেওয়াটা ত মিথ্যে নয়?

ভারতী কহিল, দিলেন কেন? ও টাকা আমি বাদ দেব না। দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, না, দু'শ ষাট টাকা।

ভারতী বলিল, না, দু'শ আশি টাকা।

অপূর্ব আর তর্ক করিল না। এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধি ও সকল দিকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল; অথচ এই সোজা বিষয়টা না বুঝিবার দিকে তাহার জিদ দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বিচারের ন্যায়-অন্যায় যাহাই হউক, টাকা ব্যয় হইলে সে যে আর হাতে থাকে না এ কথা যে বুঝিতে চাহে না, তাহাকে সে আর কি বলিবে?

ভারতী অবশিষ্ট কাপড়গুলি গোছ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে খবর দেওয়া কি আপনি উচিত মনে করেন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা বটে। উচিত শুধু এই দিক থেকে হতে পারে যে তাতে আমার টানাটানির আর অন্ত থাকবে না। নইলে, তারা এসে আপনার টাকার কিনারা করে দিয়ে যাবে এ আশা বোধ হয় করেন না?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী বলিল, ক্ষতি যা হবার হয়েছে, এর পরে আবার তারা এলে অপমান শুরু হবে।

কিন্তু আইন আছে —

অপূর্বর কথা শেষ হইল না, ভারতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; বলিল, আইন থাকে থাক; এ আপনাকে আমি কিছুতে করতে দিতে পারবো না। আইন সেদিনও ছিল আপনি যেদিন জরিমানা দিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যেই বুঝি তা ভুলে গেছেন?

অপূর্ব কহিল, লোকে যদি মিথ্যে বলে, মিথ্যে মামলা সাজায়, সে কি আইনের দোষ?

ভারতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইল। বলিল, লোকে মিথ্যে বলবে না, মিথ্যে মামলা সাজাবে না, তবেই আইন নির্দোষ হয়ে উঠবে, এই আপনার মত নাকি? এ হলে ত ভালই হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না, এবং হবার বোধ করি বিস্তর বিলম্ব আছে। এই বলিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, তর্কে যোগ দিল না। সেই প্রথম দিনে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে, তাহার সুমিষ্ট সলজ্জ ব্যবহারে, বিশেষ করিয়া তাহার এই সকরুণ সহানুভূতিতে অপূর্বর মনের মধ্যে যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, তাহার পরবর্তী আচরণে সে ভাব আর তাহার ছিল না। ভারতীর এই চুরি গোপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার ভারী খারাপ লাগিল। এই-সকল অযাচিত সাহায্যকেও আর যেন সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি একপ্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া উঠিল। সেদিনের সেই সভয়ে, সঙ্কোচে, গোপনে ফলমূল দিতে আসা, পরক্ষণেই আবার ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিকৃত করিয়া মিথ্যা করিয়া বলা, তারপরে সেই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া,—নিমেষে সমস্ত ইতিহাস মনের মধ্যে তড়িৎরেখায় খেলিয়া গেল এবং মুখ তাহার গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

এ সমস্তই অভিনয়, সমস্তই ছলনা! তাহার মুখের এই আকস্মিক পরিবর্তন ভারতী লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, আমার কথার জবাব দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, এর আর জবাব কি? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না,—পুলিশে একটা খবর দিতেই হবে।

ভারতী ভয় পাইয়া কহিল, সে কি কথা! চোরও ধরা পড়বে না, টাকাও আদায় হবে না,—মাঝে থেকে আমাকে নিয়ে যে টানাটানি করবে। আমি দেখেচি, তালাবন্ধ করেচি, সমস্ত গুছিয়ে তুলে রেখেচি,—আমি যে বিপদে পড়ে যাবো।

অপূর্ব কহিল, যা ঘটেছে তাই বলবেন।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া জবাব দিল, বললে কি হবে! এই সেদিন আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখাদেখি নাই, কথাবার্তা বন্ধ, হঠাৎ আপনার জন্যে আমার এত মাথাব্যথা পুলিশে বিশ্বাস করবে কেন?

অপূর্বর মন সন্দেহে অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার আগাগোড়া মিছে কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলে আর সত্য কথা পারবে না? টাকা সামান্যই গেছে, কিন্তু চোরকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না!

তাহার মুখের পানে ভারতী হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল; কহিল, আপনি বলেন কি অপূর্ববাবু! বাবা ভাল লোক নন, তিনি অকারণে আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আমি যে সাহায্য করেছি তাও আমি জানি, কিন্তু তাই বলে, ঘর ভেঙ্গে বাক্‌স ভেঙ্গে আপনার টাকা চুরি করব আমি? এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন, কিন্তু আমি ত পারিনি! এ দুর্নাম রটলে আমি বাঁচব কি করে! বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিতে চাপিতে সে যেন ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব পুলিশ-থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যে কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ, চোর ধরা পড়িবে না,—এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ওই ক্রীশ্চান ম্লেচ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিংবা চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। জোসেফ সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ত্রুটি তাঁহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার শয়তানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাঁহার চাবুকের আস্ফালন দ্বিধাহীন, জড়িমাবর্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও কোন হেঁয়ালি নাই, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসঙ্কোচ, বক্তব্য সরল ও প্রাঞ্জল, তাঁহার মদমত্ত পদক্ষেপ অনুভব করিতে কান খাড়া করিয়া রাখিতে হয় না,— এক কথায়, তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু, এই মেয়েটির কথা ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ খুঁজিয়া মিলে না। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্যও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্বর বুদ্ধিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া সে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু ততদূর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক শুনিল, এ কি অপূর্ব নাকি | এখানে যে!

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ-কর্মচারী। অপূর্বর

পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরব্বি।নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশীযুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচিছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘরদোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হতে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করচে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবচি।

অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই,—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয়—এ কথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতবড় গবর্নমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও একসময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্চেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ-ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যাণ্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রুমিত্র সকলের মনেই তার স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্যন্ত এ জন্মে যে এর আর পরিবর্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এদেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এ-সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তা হলে এই বৃদ্ধবয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি ত মারা যাবেই, হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখনো শুনেছি মনে হচ্চে না?

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই–সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে, এখন চিনতে পারচো না। আর, কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজশত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় একদফা তিন মাস, এবং সিঙ্গাপুরে আর একদফা তিন বচ্ছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ–বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারীং পাস করেচে, বিলেতে আইন পাস করেচে, আমেরিকায় কি পাস করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এ–সব বোধ করি এর তাস–পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান,—কিন্তু, কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি–স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া–মায়া, না আছে ধর্ম–কর্ম, না আছে কোন ঘরদোর,—বাপ রে বাপ! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব কহিল, ধরুন পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষমুহূর্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তা হলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্মেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারী আশ্চর্য বাবা। এতবড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়— কিছুই বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটি আমাদের বৃথা।

অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু! নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের স্টিমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি

পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চি নে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

ইচ্ছে না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ–সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ–পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব! এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ–পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেন নি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও ত তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেছেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্তব্য!

কর্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল, এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টিমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ–সাতজন পুলিশ–কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্বে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল।

ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়,—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী–শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে–চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ

ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, —হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুকচক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা

করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটী নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানবো ত সে কি পালায়? প্রায় শ'-তিনেক যাত্রী, বিশ-পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ'দেড়েক হবে, বাকী বর্মা—সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজী—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই,—সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার

করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল–মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু!

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চল একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হলঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোট-ঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট-বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশী দিন নাই; ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে

ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ-সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলআনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,— এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি,— অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন, কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরনে বিলাতী মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞেসা না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কাল্চরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা ত খানাতল্লাশী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে, এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কল্কেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে, খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্‌র! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে | মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ্ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থরপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

সাত

আশ্চর্য এই যে, এত বড় সব্যসাচী ধরা পড়িল না, কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাক-পরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই, অথচ, চোখ-কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি ?

কৈ না।

বাড়ির খবর সব ভাল ত?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিল,যতদূর জানি সবাই ভালই ত আছেন।

রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোন আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজী হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই-সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত, কেবল উপরের সেই ক্রীশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি

ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহুত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশ-করা এ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর। বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর! তা ছাড়া এত বড় বন্ধু!

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারী ঘরে ছিল না, বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক, সাহায্য করেচে।

তার পর?

তার পর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাশা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হল না। এমন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বল-বীর্য, তাহার রামধনু রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নালঠোকা পাম্প শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনমতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মত নির্বোধ আহম্মক

হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাঙলা দেশের পুলিশ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। তা ছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়ত আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই। অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে ত তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মত তাড়া করে বেড়াচ্চেন তিনি ঢের বেশী আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজী, এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মত সাহস আমার নেই, আমি ভীরু,

কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গী ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশী লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মত দূর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর! এমন ত নিত্য-নিয়তই ঘটচে, —আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এই-সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কৈ এ ঘটনা ত আমাকে বলেন নি!

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু, আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশী হয়ে গেল। তোমাকে জানাবো কি—মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড়সাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর আফিসে কোন শৃঙ্খলাই হচ্চে না। ম্যান্ডালে, শোএবো, মিক্‌থিলা এবং এদিকে প্রোম সব-কটা আফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস।

আমার অবর্তমানে সমস্ত ভারই ত তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশী দেরি না কোরে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি। বস্তুতঃ, নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর একমুহূর্ত মন টিকিতে ছিল না। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্নবেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারী খবরদারির জন্য বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙ্গা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষতঃ, এই ম্লেচ্ছদেশের রেঙ্গুন শহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোন কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে!

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাততঃ ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দু'জন বন্ধু নোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি নুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবয়। লল্লাটের লেখা ত খণ্ডাবে না!

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোন ধার ধারিনে,— সেদিন কেবল তামাশা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজী, ম্যয় নে আপকো ত জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবু সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা যায়গায় ত ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যা সন্দেহ রাখবেন না বাবুমশায়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে— বাবুমশায় আপনারা—

অপূর্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে, তা হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবুসাহেব, রাম রাম— বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদ্গত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর! বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না।পরক্ষণে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব লক্ষ্য করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই

মুহূর্তকালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ্য লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব প্রথমশ্রেণীর যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে-সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালী পূর্বাহ্নেই রাখিয়া গিয়াছিলও, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, অতএব রাত্রির মত অপূর্ব ভোজনাদি শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত সুস্থচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড় ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি ত ইউরোপিয়ান নও!

অপূর্ব কহে, না। কিন্তু আমি ত ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে ত আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

ইহার পরে আর অপূর্ব প্রত্যুত্তর করে নাই। কিন্তু শেষের দিকে ঘণ্টা তিন-চারেক নিরুপদ্রবে কাটার পরে সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বিগত রাত্রির গ্লানির কথা আর তাহার মনে ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের অনতিদূর দিয়া গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, খুব সম্ভব এটা চড়াইয়ের পথ। এইখানে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ

হইয়া রহিল। চক্ষের পলকে বুঝিল,পৃথিবীর এতবড় সৌন্দর্যসম্পদ সে আর কখনও দেখে নাই। গিরিশ্রেণী অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও সুমুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিরাট দেহ ব্যাপিয়া কি গভীর বন, এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষরাজিই না তাহার সুবিস্তীর্ণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে! বোধ হয় সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে,বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা মাখাইয়া সেই তাঁহার আসার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। খাদের মধ্যে শির-নিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ার নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রুরেখার মতই সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া গেল। একি আশ্চর্য সুন্দর দেশ! এখানে যারা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বাসা বাঁধিতে পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? কিন্তু কেবলমাত্র সীমা নাই বলিয়া, শুধু একটা অনির্দিষ্ট আনন্দের আভাসমাত্র লইয়াই মানবের হৃদয় পূর্ণ-তৃপ্তি মানিতে চাহে না, তাই সে ইহাকে মূর্তি দিয়া, রূপ দিয়া মনে মনে সহস্রবিধ রসে ও রঙে পল্লবিত করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহার ভাবুক চিত্ত যখন অন্তরে-বাহিরে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন কঠিন ধাক্কায় চমকিয়া দেখিল তাহার কল্পনার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিতেছে। রামদাস তলওয়ারকরের কথাগুলা মনে পড়িল। আসিয়া পর্যন্ত এই ব্রহ্মদেশের অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত কাহিনী সে সংগ্রহ করিতেছিল।

সেই প্রসঙ্গে একদিন সে বলিয়াছিল, বাবুজী, শুধু কেবল শোভা-সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি-মাতার দেওয়া এতবড় সম্পদও কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখানির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বী মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশী দিনের কথা নয়, সংবাদ পাইয়া একদিন

ইংরাজ বণিকের লুব্ধদৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক-কামান আসিল, সৈন্যসামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রানীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর, দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন। তাই ত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাই ত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারংবার ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিল, তুমি ত সাহেব নও, যে তোমাকে অপমান করিতে আমার বাধিবে? অপূর্ব মনে মনে কহিল, বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে ? ইহার বড় আমিই বা কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী, করিব ?

অরণ্যশিরে প্রভাতসূর্যের কনক আভা তখনও রঙ হারায় নাই, কিন্তু তাহার চোখে অত্যন্ত ম্লান ও ক্লান্তিহীন ঠেকিল, সমুন্নত পর্বতমালা তাহার কাছে সামান্য এবং বৃক্ষশ্রেণীর যে বিপুলতা দেখিয়া সে ক্ষণেক পূর্বে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারাই তাহার দৃষ্টিতে সাধারণ ও নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত বলিয়া বোধ হইল। তাহার নদীমাতৃক, সমতল, শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিকে মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রবাসী পীড়িতচিত্ত তাহার বুকের মধ্যে আর্তনাদ করিয়া যেন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নরনারী! ওই অশেষ ঐশ্বর্যময়ী জন্মভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার, যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না তাহার প্রতি এই ব্যর্থ-লোভ তোদের কিসের জন্য? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার আছে কেবল মনুষ্যত্বের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকে না; এ কথা আজ কে অস্বীকার করিবে? ভগবানও যে ইহা হরণ করিতে পারেন

না! তোদের ওই-সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্গু হাত-পাগুলাকেই কি তোরা মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস? ভুল, ভুল; ইহার বড় আত্মঘাতী ভুল ত আর হইতেই পারে না! এমনি কত কি যে আপনাকে আপনি বলিতে বলিতে তাহার সময় কাটিতে লাগিল তাহার হিসাব ছিল না, অকস্মাৎ, ট্রেনের গতি মন্দীভূত হওয়ায় তাহার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল গাড়ি স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

আট

ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্বর শ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বৌদিদিরা ঠাট্টা-তামাশা করিলে সে মনে মনে রাগ করিত, ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিলে দূরে সরিয়া যাইত। মা ভিন্ন আর কাহারও সেবাযত্ন তাহার ভালই লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিন পাস করিয়াছে শুনিলে সে খুশী হইত না এবং সেদিন যখন বিলাতে ইহারা কোমড় বাঁধিয়া রাজনৈতিক অধিকারের জন্যে লড়াই করিতেছিল খবরের কাগজে সেই-সকল কাহিনী পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। তবে একটা জিনিস ছিল, তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র-হৃদয়। এইখানে সে নরনারী-নির্বিশেষে প্রাণিমাত্রকেই অত্যন্ত ভালবাসিত, কাহাকেও কোন কারণেই ব্যথা দিতে তাহার বাধিত। তাহার এই একটি দুর্বলতাই যে ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই এ সংবাদ তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু পুরুষের যৌবন-চিত্ততলে আরও যে অনেক প্রকারের দুর্বলতা একান্ত সংগোপনে বাস করে, সেই খবরটাই আজও তাহার কাছে পৌঁছে নাই। এই ক্রীশ্চান মেয়েটিকে কোনদিন কঠিন দণ্ড দেওয়া যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি তাহার বিমুখতা সত্য বলিয়াই যে মন তাহার ভারতীকেও অনায়াসে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহাও তেমনিই সত্য না হইতে পারে। অথচ, আজ যে সেই নিষ্ঠুর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না এ কথাও ত তাহার অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন।

দিন-পনর হইল সে ভামোয় আসিয়াছে। এখানকার কাজ তাহার একপ্রকার সমাধা হইয়াছে, কাল-পরশু তাহার মিক্থিলা রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যার পরে আজ অফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে মনে

মনে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন তাহার কোনকালেই সায় দিতে চাহিত না। ইহাতে মঙ্গল নাই, ইহা ভাল নয়—তাহার রুচি ও আজন্ম সংস্কার এ কথা অনুক্ষণ তাহার কানে কানে বলিত। অথচ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলার মধ্যেও যে ইহাদের প্রতি গভীর অবিচার নিহিত আছে এ সত্য তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতে সে দুঃখ পাইত কিন্তু পথ পাইত না। অকস্মাৎ, আজ এই দ্বিধা তাহার যে কারণে একেবারে কাটিয়া গেল তাহা এইরূপ—

যে দ্বিতল ঘরটিতে সে বাসা লইয়াছে তাহার নীচের তলায় একটি ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সকালে আফিসে যাইবার পূর্বে তাঁহার সংসারে এক বিষম অনর্থ ঘটে। তাঁহার চার কন্যা, সকলেই বিবাহিতা। কি একটা উৎসব উপলক্ষে জামাতারা সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের সময় সম্ভ্রম ও ইজ্জত লইয়া প্রথমে মেয়েদের মধ্যে, এবং অনতিকাল পরেই বাবাজীবনদের মধ্যে লাঠালাঠি রক্তারক্তি বাধিয়া যায়; অপূর্ব খবর লইতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া শুনিল যে ইঁহাদের একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙালী-পর্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব, এবং ছোট-জামাতাটি চীনা, কয়েক পুরুষ হইতে এই শহরেই বাস করিয়া চামড়ার কারবার করিতেছেন।

এইরূপ পৃথিবীসুদ্ধ জাতির শ্বশুর হইবার গৌরব অন্যত্র দুর্লভ হইলেও এখানে অতিশয় সুলভ। তত্রাচ, প্রতিবারেই নাকি ভদ্রলোক সভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা তাহাতে কান পর্যন্ত দেয় নাই। এক-একদিন এক-একটি কন্যাকে বাটীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, আবার এক-একদিন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে আসিল এই বিচিত্র জামাইয়ের দল। তাহাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, ধর্ম আলাদা, মেজাজ আলাদা,—শিক্ষা সংস্কার কাহারও সহিত কাহারও এক নয়,–এই যে দেশের মধ্যে

ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মত ধীরে ধীরে এক অতি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে ইহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া? ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে মনে মনে লাফাইতে লাগিল, এবং মেয়েদের এই সামাজিক স্বাধীনতাকেই একশ' বার করিয়া বলিতে লাগিল, এ হইতেই পারে না,—এমন কিছুতেই চলিবে না। বর্মা নষ্ট হইতেছে, ইয়োরোপ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে—সেই ধার-করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানি করিলে আমরা সমূলে মরিব। আমাদের সমাজ যাঁহারা গড়িয়াছিলেন নারীকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাই ত এই সতর্ক বিধি-নিষেধ। ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ দুর্দিনে যদি না তাঁহাদের অসংশয়ে ধরিয়া থাকিতে পারি ত, মৃত্যু হইতে কেহই আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। এমনি ধারা কত কি সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হায় রে! এই সোজা কথাটা তাহার একবারও উদয় হইল না যে, যে মুক্তিমন্ত্রকে সে এ জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই অসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে! মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট্ট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ? সে সমুদ্র। আছেই ত তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমির হাঙ্গর! তরী সেইখানেই ডোবে,—তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ, তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা। নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না।

বাবুজী, আপনার খাবার তৈরি।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, রামশরণ, একটা আলো নিয়ে আয়। কাল সকালের গাড়িতেই আমরা মিক্থিলা যাবো। ম্যানেজারকে একটা খবর পাঠিয়ে দে।

আরদালি কহিল, কিন্তু আপনার যে পরশু যাবার কথা ছিল?

না, আর পরশু নয়, কালই,—একটা আলো দিয়ে যা, এই বলিয়া অপূর্ব এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার একটা নূতন দিক দেখিয়া মন তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আরও যে দিক আছে, যাহার বর্ণ ও আলো সমস্ত গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, এ দৃশ্য আজ তাহার মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না।

পরদিন যথাসময়ে সে মিক্‌থিলার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন টিকিল না। দেশী ও বিলাতী পল্টনের ছাউনি আছে, বাঙালী অনেকগুলি সপরিবারে বাস করিতেছেন,—খাসা শহর, নূতন লোকের পক্ষে দেখিয়া বেড়াইবার অনেক বস্তু আছে, কিন্তু এ-সকল তাহার ভালই লাগিল না। মনটা রেঙ্গুনের জন্য কেবলই ছটফট করিতে লাগিল। ভামোয় থাকিতে রিডাইরেক্ট-করা মায়ের একখানা পত্র সে পাইয়াছিল, রামদাসেরও গোটা-দুই চিঠি তারপর আসিয়াছিল, কিন্তু সেও প্রায় দশ-বারোদিন পূর্বে।

রামদাস জানাইয়াছিল তাহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাসাবদল করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সে নিজে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে তেওয়ারীজী সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কেমন আছে, তাহার সুখ-শান্তি বজায় আছে, কিংবা দুই-ই অন্তর্হিত হইয়াছে কোন খবরই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব সমস্তই ঠিক আছে, ব্যাঘাত কিছুই হয় নাই কিন্তু তবু একদিন সে ভামোর মতই হঠাৎ জিনিসপত্র বাঁধিয়া স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে হুকুম করিয়া দিল। এই স্থানটাকে মনে রাখিবার মত কিছুই তাহার ঘটে নাই, যৎসামান্য কাজকর্মের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার মিনিট-পনর পূর্বে স্টেশনে আসিয়া এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা আপাততঃ সামান্য ও সাধারণ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বহুদিন তাহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। একজন মাতাল বাঙালীর ছেলেকে রেলের লোকে ট্রেন হইতে নামাইয়াছে। পরনে

তাহার মলিন ও ছিন্ন হ্যাট-কোট প্রভৃতি বিলাতি পোশাক। সঙ্গে কেবল একটা ভাঙ্গা বেহালার বাক্স, না আছে বিছানা, না আছে কিছু। টিকিটের পয়সায় সে মদ কিনিয়া খাইয়াছে এইমাত্র তাহার অপরাধ। বাঙালীর ছেলে, পুলিশে লইয়া যায়, – অপূর্ব তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল, আরও গোটা-পাঁচেক টাকা তাহার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ সে হাতজোড় করিয়া কহিল, মশাই, আমার এই বেহালাখানা আপনি নিয়ে যান। বিক্রি করে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে বাকী আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা সত্ত্বেও ইহা বুঝা গেল সে সজ্ঞানেই কথা কহিতেছে।

অপূর্ব কহিল, কোথায় ফিরিয়ে দেব?

সে কহিল, আপনার ঠিকানা বলে দিন, আপনাকে আমি চিঠি লিখে জানাব।

অপূর্ব কহিল, তোমার বেহালা তোমার থাক বাপু, ও আমি বিক্রি করতে পারব না। আমার নাম অপূর্ব হালদার, রেঙ্গুনের বোথা কোম্পানিতে চাকরি করি, যদি কখনো তোমার সুবিধে হয় টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা মশাই, নমস্কার,—আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। বার হবার পথ বুঝি ওই দিকে? বেশ বড় শহর, না? বোধ হয় সব জিনিসই পাওয়া যায়! বাস্তবিক মশায়, আপনার দয়া আমি কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আর একটা নমস্কার করিয়া বেহালার বাক্স বগলে চাপিয়া চলিয়া গেল। তাহার চেহারাটা এইবার অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বয়স বেশী নয় কিন্তু ঠিক কত বলা শক্ত। বোধ হয় সর্বপ্রকার নেশার মাহাত্ম্যে বছর-দশেকের ব্যবধান ঘুচিয়া গেছে। বর্ণ গৌর, কিন্তু রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে; মাথার রুক্ষ লম্বা চুল কপালের নীচে ঝুলিতেছে, চোখের দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, নাক খাঁড়ার মত সোজা এবং তীব্র। দেহ শীর্ণ, হাতের আঙুলগুলা দীর্ঘ এবং সরু—সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া উপবাস ও অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। সে চলিয়া গেলে অপূর্বর কেমন যেন একটা কষ্ট

হইতে লাগিল। তাহাকে আর অধিক টাকা দেওয়া বৃথা, এমন কি অন্যায়—এ কথা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু আর কোন-কিছু একটা উপকার করা যদি সম্ভব হইত! কিন্তু, এ লইয়া চিন্তা করিবার আর সময় ছিল না, তাহাকে টিকিট কিনিয়া গাড়ির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

পরদিন রেঙ্গুনে যখন সে পৌঁছিল তখন বেলা বারোটা। যেমন কড়া রৌদ্র, তেমনি গোমট গরম। তাহার উপর বিপদ এই হইয়াছিল যে তাড়াতাড়ি ও অসাবধানে তাহার খাবারের পাত্রটা মুসলমান কুলি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিল। স্নান নাই, আহার নাই,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তাহার দেহ যেন টলিতে লাগিল।

কোনমতে বাসায় পৌঁছিয়া স্নান করিয়া একবার শুইতে পাইলে যেন বাঁচে। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মিনিট-দশেক মাত্র লাগিল। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তেওয়ারীর কোন উৎকণ্ঠাই নাই, রাস্তার দিকে বারান্দার কবাটটা পর্যন্ত খোলে নাই, গাড়ির শব্দে একবার নামিয়াও আসিল না। দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া দ্বারের উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,— তেওয়ারী! ওরে ও তেওয়ারী! ক্ষণকাল পরে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে কবাট খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ অপূর্ব ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবে কি বিস্ময়ে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুমুখে দাঁড়াইয়া ভারতী। তাহার এ কি মূর্তি! পায়ে জুতা নাই, পরনে একখানি কালো রঙের শাড়ী, চুল শুকনো এলোমেলো, মুখের উপর শান্ত-গভীর বিষাদের ছায়া,—এ যেন কোন বহুদূরের তীর্থযাত্রী, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি-দিবা পথ চলিয়াছে—যে-কোন মুহূর্তেই পথের পরে পড়িয়া মরিতে পারে। ইহার প্রতি কেহ যে কোনদিন রাগ করিতে পারে অপূর্ব মনে করিতেই পারিল না। ভারতী মাথা নোয়াইয়া একটু নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি এসেছেন,—এবার তেওয়ারী বাঁচবে।

ভয়ে অপূর্বর স্বর জড়াইয়া গেল, কহিল, কি হয়েছে তার?

ভারতী তেমনিই মৃদুকণ্ঠে বলিল, এদিকে অনেকের বসন্ত হচ্চে, তারও হয়েচে। কিন্তু আপনি ত এখন এত পরিশ্রমের পরে এ ঘরে ঢুকতে পারেন না। উপরের ঘরে চলুন, ঐখানে বরঞ্চ স্নান করে একটু জিরিয়ে নীচে আসবেন। তা ছাড়া ও ঘুমোচ্চে, জাগলে আপনাকে খবর দেব।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, উপরের ঘরে?

ভারতী বলিল, হাঁ। ঘরটা এখনো আমাদেরই আছে, কিন্তু আমি চলে গেছি। বেশ পরিষ্কার করা আছে, কলে জল আছে, কেউ নেই, আপনার কষ্ট হবে না, চলুন। কিন্তু আপনার লোকজন কৈ? সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো তারা ওইখানেই নিয়ে আসুক।

কিন্তু তাদের ত আমি স্টেশন থেকেই ছেড়ে দিয়েচি। তারাও ত আমারি মত ক্লান্ত হয়েছিল।

ভারতী কহিল, তা বটে, কিন্তু এখন কি কুলী পাওয়া যাবে? আচ্ছা দেখি।

আপনাকে দেখতে হবে না, আমিই দেখচি। ওই ক'টা জিনিস আমি নিজেই আনতে পারবো, বলিয়া অপূর্ব নীচে যাইতেছিল, গাড়োয়ান মুখ বাড়াইয়া ভাড়া চাহিল। ভারতী তাহাকে ইশারায় উপরে ডাকিয়া কহিল, এখন ত লোক পাওয়া যাবে না, তুমি যদি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে যাও তোমাকে তার দাম দেব। তাহার স্নিগ্ধ কথায় খুশী হইয়া গাড়োয়ান জিনিস আনিতে গেল।

সমস্ত আসিয়া পড়িলে ভারতী পথের দিকের ঘরটায় মেঝের উপরে পরিপাটি করিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া দিয়া কহিল, এইবার স্নান করে আসুন।

অপূর্ব কহিল, সমস্ত ব্যাপারটা আগে আমাকে খুলে বলুন।

ভারতী কলের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আগে স্নান করে আপনার সন্ধ্যে-আহ্নিকগুলো সেরে আসুন।

অপূর্ব জিদ করিল না। খানিক পরে সে স্নান প্রভৃতি সারিয়া আসিলে ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, আপনার এই গেলাসটা নিন, জানালার উপরে কাগজে মোড়া ওই চিনি আছে, নিয়ে আমার সঙ্গে কলের কাছে আসুন, কি করে শরবত তৈরি করতে হয় আমি শিখিয়ে দিই। চলুন।

অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিতেছিল, সে নির্দেশমত শরবত তৈরি করিয়া পান করিল, এবং একটু নেবুর রস হইলে আরও ভাল হইত তাহা নিজেই কহিল।

ভারতী বলিল, আপনাকে যে আরও একটা দুঃখ আমাকে দিতে হবে, বলিয়া সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপূর্বর সেই চুরির দিনের কথাবার্তা, কাজকর্মের ধরন-ধারণ মনে পড়িয়া নিজেরও কথা কহা যেন সহজ হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দুঃখ?

ভারতী কহিল, নীচে থেকে আমি কয়লা এনে রেখেচি, টেলিগ্রাম পেয়ে সুমুখের বাড়ির উড়ে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার সেই লোহার উনুনটি মাজিয়ে ধুইয়ে নিয়েচি,—চাল আছে, ডাল আছে, আলু, পটল, ঘি, তেল, নুন সমস্ত মজুত আছে,—পেতলের হাঁড়িটি এনে দিচ্চি আপনি শুধু একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে চড়িয়ে দেবেন। এই বলিয়া সে অপূর্বের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব আন্দাজ করিয়া বলিল, সত্যি বলচি, কিচ্ছু শক্ত কাজ নয়। আমি সমস্ত দেখিয়ে দেব, আপনি শুধু চড়াবেন আর নামাবেন। আজকের মত এই কষ্টটি করুন, কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

তাহার কণ্ঠস্বরের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা অপূর্বকে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা মারিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা কি-রকম হয়? কখন বাসায় যান?

ভারতী কহিল, বাসায় নাই গেলাম, কিন্তু আমাদের খাবার ভাবনা আছে নাকি? এই বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অপূর্ব রাঁধিতে বসিলে সে ঘরের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, এখানে দাঁড়ালে দোষ হয় না তা জানেন ত ?

অপূর্ব কহিল, জানি, কারণ, হলে আপনি দাঁড়াতেন না। জীবনে সে এই প্রথম রাঁধিতে বসিয়াছে অপটু হস্তের সহস্র ক্রুটিতে মাঝে মাঝে ভারতীর ধৈর্যচ্যুতি হইতে লাগিল, কিন্তু রাঁধা ডাল বাটিতে ঢালিতে গিয়া যখন বাটি ছাড়া আর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল, তখন সে আর সহিতে পারিল না। রাগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, আপনাদের মত অকর্মা লোকগুলোকে কি ভগবান সৃষ্টি করেন শুধু আমাদের জব্দ করতে? খাবেন কি করে বলুন ত?

অপূর্ব নিজেই অপ্রতিভ হইয়াছিল, কহিল, এ যে হাঁড়ির ওদিক দিয়ে না পড়ে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়বে কি করে জানব বলুন? আচ্ছা, ওপর থেকে একটু তুলে নেব?

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নেবেন বৈ কি! নইলে আর বিচার থাকবে কি করে! নিন উঠুন, জল দিয়ে ও-সব ধুয়ে ফেলে দিয়ে এই আলু-পটলগুলো তেল আর জল দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলুন। গুঁড়ো মশলা ওই শিশিটাতে আছে, নুন দেবার সময়ে আমি না হয় দেখিয়ে দেব,—তরকারি বলে ওই দিয়ে আজ আপনাকে খেতে হবে। ভাতের ফ্যান ত সব ভাতের মধ্যেই আছে, নেহাত মন্দ হবে না। আঃ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার রান্না দেখার চেয়ে বরং নরকভোগ ভাল।

ইহার ঘণ্টা-দেড়েক পরে অপূর্বর আহার শেষ হইলে সে কৃতজ্ঞতার আবেগ দমন করিয়া শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি যে কি বলব ভেবে

পাইনে, কিন্তু এবার আপনি বাসায় যান। এখন থেকে আমিই দেখতে পারব, আর আপনাকে বোধ হয় এত দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। এদিকে আরও দশজনের বসন্ত হচ্চে, তেওয়ারীরও হয়েচে—এ পর্যন্ত খুব সোজা। কিন্তু এ বাসা থেকে আপনাদের সবাই চলে গেলে এই নির্বান্ধব দেশে এবং ততোধিক বন্ধুহীন পুরীতে আপনি কি করে যে তার প্রাণ দিতে রয়ে গেলেন, এইটেই আমি কোন মতে ভেবে পাইনে। জোসেফ সাহেবও কি আপত্তি করেন নি?

ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।

মারা গেছেন? অপূর্ব অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটলো হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন –

মা মারা গেছেন? অপূর্ব স্তব্ধ অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-একরকম করিতে লাগিল কখনো সে পূর্বে অনুভব করে নাই। ভারতী নিজেও জানালার বাহিরে মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু সংবরণ করিল। মুখ ঘুরাইতে গিয়া দেখিল অপূর্ব সজলচক্ষে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আবার তাহাকে জানালার বাহিরে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কাহারো কাছেই অশ্রুপাত করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিত। কিন্তু আপনাকে শান্ত করিয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইত না, মিনিট দুই-তিন পরে ধীরে ধীরে বলিল, তেওয়ারী বড় ভাল লোক। আমার মা অনেকদিন থেকেই শয্যাগত ছিলেন, যে-কোন সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে

পারে আমরা সবাই জানতুম। তেওয়ারী আমাদের অনেক করেছে। আমার চলে যাবার সময় সে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু এত ভাড়া আমি কোথা থেকে দেব?

অপূর্ব নীরবে শুনিতে লাগিল। ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনার সেই চুরি ধরা পড়েচে,—টাকা, বোতাম পুলিশে জমা আছে আপনি খবর পেয়েছেন?

কৈ না!

হাঁ, ধরা পড়েচে। ওকে যারা সেদিন তামাশা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দল। আরও কার কার চুরি করার পরে বোধ হয় ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনাও না হওয়াতেই একজন সমস্ত বলে দিয়েছে। এক চেঠির দোকানে যা-কিছু জমা রেখেছিল, পুলিশ সমস্ত উদ্ধার করেচে। আমি একজন সাক্ষী, এইখানে সন্ধান নিয়ে তারা একদিন আমার কাছে উপস্থিত,—সেই খবরটা দিতে এসেই ত দেখি এই ব্যাপার। কবে মকদ্দমা ঠিক জানিনে, কিন্তু সমস্ত ফিরে পাওয়া যাবে শুনেচি।

এই শেষ-কথাটা হয়ত সে না বলিলেই পারিত; কারণ লজ্জায় অপূর্বর মুখ শুধু আরক্তই হইল না, এই ব্যাপারে নিজের সেই-সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতগুলা মনে করিয়া তাহার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ভারতী এ-সব লক্ষ্যও করিল না, বলিতে লাগিল, ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিলে না। আমাদের উপরের ঘরের চাবিটা আমার কাছে ছিল, খুলে ভেতরে গেলাম। মেঝেতে আমার একটা প্রসিদ্ধ ফুটো আছে,—বলিয়া সে একটুখানি লজ্জার মৃদুহাসি গোপন করিয়া কহিল, তার মধ্যে দিয়ে আপনার ঘরের সমস্ত দেখা যায়, দেখি, সমস্ত জানালা বন্ধ, অন্ধকারে কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে,—তেওয়ারী বলেই বোধ হল। সেই ফুটো দিয়ে চেঁচিয়ে এক শ' বার বললাম, তেওয়ারী, আমি, আমি ভারতী, কি হয়েছে দোর খোল। নীচে এসে আবার তেমনি ডাকাডাকি করতে লাগলাম, মিনিট-কুড়ি পরে তেওয়ারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কোনমতে দোর খুলে দিলে। তার চেহারা দেখে আমার

বলবার কিছু আর রইল না। দিন-চারেক পূর্বে সুমুখের বাড়ির নীচের ঘর থেকে বসন্ত-রোগী জন-দুই তেলেগু কুলীকে পুলিশের লোকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কান্না আর অনুনয়-বিনয় তেওয়ারী নিজের চোখে দেখেছে,—আমার পা-দুটো সে দু হাতে চেপে ধরে একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজী, আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো না তাহলে আমি আর বাঁচব না।

কথাটা মিথ্যে নেহাত নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায় না । সেই ভয়ে সে দোর-জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে,—পাড়ার কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে আর রক্ষে নেই।

অপূর্ব অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, আর সেই থেকে আপনি একলা দিনরাত আছেন,—আমাকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? আমাদের আফিসের তলওয়ারকরবাবুকে ত জানেন, তাঁকে বলে পাঠালেন না কেন?

ভারতী কহিল, কে যাবে? লোক কৈ? ভেবেছিলাম, হয়ত খবর নিতে একদিন তিনি আসবেন, কিন্তু এলেন না। এ বিপদ যে ঘটেচে তিনিই-বা কি করে ভাববেন? তা ছাড়া জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

তা বটে। বলিয়া অপূর্ব একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, আপনার নিজের চেহারা কি হয়ে গেছে দেখেছেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ এর চেয়ে আগে ঢের ভাল ছিল?

অপূর্বর মুখে সহসা এ কথার উত্তর যোগাইল না, কিন্তু তাহার দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গঙ্গাজল দিয়া যেন এই তরুণীর সর্বাঙ্গের সকল গ্লানি, সকল ক্লান্তি ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, মানুষে যা করে না, তা আপনি করেছেন, কিন্তু এবার আপনার ছুটি। তেওয়ারী শুধু

আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়,—তার কোলে পিঠে চড়ে আমি বড় হয়েচি। এখন থেকে তার রোগে আমিই সেবা করব,—কিন্তু তার জন্যে আপনাকে আমি পীড়িত হতে দিতে পারব না। এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি, আপনি বাসায় যান। সে কি এখান থেকে বেশী দূরে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। বাসা আমার তেলের কারখানার পাশে, নদীর ধারে। আমি কাল আবার আসব। দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল, তালা খুলিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তেওয়ারীর সাড়া নাই, ঘুম ভাঙ্গিলেও সে অধিকাংশ সময় অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। অপূর্ব গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিল। এবং যে দুই-চারিটা অপরিষ্কার পাত্র তখনও মাজিয়া ধুইয়া রাখা হয় নাই, সেইগুলি হাতে লইয়া ভারতী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে রোগীর সম্বন্ধে গোটা-কয়েক প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া এই দুর্দান্ত ভয়ানক রোগের মধ্যে আপনাকে সাবধানে রাখিবার অত্যাবশ্যকতা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। হাতের কাজ শেষ করিয়া সে এই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব অচেতন তেওয়ারীর অতি-বিকৃত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছে, তাহার নিজের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। বসন্ত রোগ সে জীবনে দেখে নাই, ইহার ভীষণতা তাহার কল্পনার অগম্য। ভারতী কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, এবং সেই চক্ষে পলক না পড়িতেই ঠিক ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি পারব না।

নয়

ভারতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শুধু কহিল,পারবেন না? তাই ত!

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই কি জবাব? এই কি সে তাহার কাছে আশা করিয়াছিল? হঠাৎ যেন মার খাইয়া অপূর্বর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ভারতী কহিল, তাহলে একটা খবর দিয়ে ত ওকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়। তাহার কথার মধ্যে শ্লেষও ছিল না, ঝাঁজও ছিল না, কিন্তু লজ্জায় অপূর্বর মাথা হেঁট হইল। লজ্জা শুধু তাহার না-পারার জন্য নয়, যে পারে তাহাকেই পারিতে বলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্যে লুকাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন যে দাবী ছিল, ভারতীর শান্ত প্রত্যাখ্যানে সে যখন কঠিন তিরস্কারের আকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাজিল, তখন আনতমুখে বসিয়া অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত তাহাকে আর একবার মনে করিতে হইল, এই মেয়েটিকে সে যথার্থই চিনে নাই। দুঃখ দুশ্চিন্তা কোথাও কিছু ছিল না,—ছিল যেন কেবল কত দীপ, কত আলো জ্বালা;—হঠাৎ কে যেন সমস্ত এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিয়া অসমাপ্ত নাটকের মাঝখানে যবনিকা টানিয়া দিল। ভয়ানক অন্ধকারে রহিল শুধু সে আর তাহার অপরিত্যাজ্য মরণোন্মুখ অচেতন তেওয়ারী।

ভারতী বলিল, বেলা থাকতে থাকতেই কিছু করা চাই। বলেন ত আমি যাবার পথে হাসপাতালে একটা টেরিফোঁ করে দিয়ে যেতে পারি। তারা গাড়ি এনে তুলে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে বললেন সেখানে গেলে কেউ বাঁচে না?

ভারতী কহিল, কেউ বাঁচে না এ কথা ত বলিনি।

অপূর্ব অত্যন্ত মলিনমুখে বলিল, তাহলে বেশী লোকেই ত মরে যায়?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তা যায়। এই জন্যই জ্ঞান থাকতে কেউ সেখানে কিছুতে যেতে চায় না।

অপূর্ব চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তেওয়ারীর কি কিচ্ছু জ্ঞান নেই?

ভারতী কহিল, কিছু আছে বৈ কি। সব সময়ে না থাকলেও মাঝে মাঝে সমস্তই টের পায়।

এই সময়ে তেওয়ারী সহসা কি-একপ্রকার আর্তনাদ করিয়া উঠিতে অপূর্ব এমনি চমকিয়া উঠিল যে, ভারতী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়া রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই তেওয়ারী?

তেওয়ারী ঠোঁট নাড়িয়া যাহা বলিল, অপূর্ব তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু ভারতী সাবধানে তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া ঘটি হইতে একটুখানি জল তাহার মুখে দিয়া কানে কানে কহিল, তোমার বাবু এসেছেন যে!

প্রত্যুত্তরে তেওয়ারী অব্যক্ত ধ্বনি করিল, ডান হাতটা একবার তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাড়িতে পারিল না। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহার নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অপূর্বর নিজের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু থামাইতে পারিল না,—বারে বারেই সেই দুটি আর্দ্র চক্ষু প্লাবিত করিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানি দুঃখ ও শোকের ঘন-মেঘে যেন থমথম করিতে লাগিল। কথা কহিল প্রথমে ভারতী। সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কি আর করা যাবে, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দিন।

অপূর্ব চোখের উপর হইতে তখনও আবরণ সরাইতে পারিল না, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল না।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, সেই ভাল। আমি এখন তাহলে চললুম। যদি সময় পাই কাল একবার আসবো।

তখনও অপূর্ব চোখ খুলিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যাইবার পূর্বে ভারতী বলিল, সবই আছে, কেবল মোমবাতি ফুরিয়ে গেছে, আমি নীচে থেকে এক বাণ্ডিল কিনে দিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে বাতি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কতকটা পরিমাণে বোধ হয় আপনাকে অপূর্ব সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। চোখ মোছা শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভেজা পাতার নীচে সে-দুটি রাঙ্গা হইয়া আছে। ভারতী ঘরে ঢুকিতেই সে আর একদিকে মুখ ফিরাইল। হাতের মোড়কটি কাছে রাখিয়া দিয়া কি যেন সে একবার বলিতে চাহিল, কিন্তু আর একজন যখন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন সেও আর প্রশ্ন না করিয়া পলকমাত্র নিঃশব্দে থাকিয়া প্রস্থানের জন্য দ্বার খুলিতেই, অপূর্ব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তেওয়ারী যদি জল খেতে চায়?

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জল দেবেন।

অপূর্ব কহিল, আর যদি পাশ ফিরে শুতে চায়?

ভারতী বলিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবেন।

বলা ত সহজ। আমি শোব কোথায় শুনি? তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ চাপা রহিল না, কহিল, বিছানা ত রইল পড়ে ওপরের ঘরে!

ভারতী কি মনে করিল তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না। একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া তেমনি শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটা বিছানা ত আপনার খাটের উপরে আছে, তাতে ত অনায়াসে শুতে পারবেন।

অপূর্ব কহিল, আপনি ত বলবেনই ও-কথা। আর আমার খাবার বন্দোবস্ত কি-রকম হবে?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু এই অসঙ্গত ও অত্যন্ত খাপছাড়া প্রশ্নে গোপন হাসির আবেগে তাহার চোখের পাতা-দুটি যেন কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, আপনার শোওয়া এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার কি আমার উপরে আছে?

তাই কি আমি বলচি?

এইমাত্র ত বললেন। এবং ভাল করে নয়, রাগ করে।

অপূর্ব ইহার আর উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মলিন বিপন্ন-মুখের প্রতি চাহিয়া ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, আপনার বলা উচিত ছিল, দয়া করে আমার এই-সব বিলি-ব্যবস্থা আপনি করে দিন।

অপূর্ব কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তা বলা আর শক্ত কি?

ভারতী কহিল, বেশ ত, তাই বলুন না!

তাই ত বলচি, বলিয়া অপূর্ব মুখ ভারী করিয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো কি কারও রোগে সেবা করেন নি?

না।

আর কখনো বিদেশেও আসেন নি?

না। মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না।

তবে, এবারে যে বড় আপনাকে ছেড়ে দিলেন?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে তাহার বিদেশে আসায় মা সম্মত হইয়াছিলেন এ কথা সে পরের কাছে বলিতে চাহিল না। ভারতী কহিল, এতবড় চাকরি,—না ছেড়ে দিলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তিনি সঙ্গে এলেন না কেন?

তাহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমার মাকে আপনি দেখেন নি, নইলে এ কথা বলতে পারতেন না। অনেক দুঃখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিধবা মানুষ, এই ম্লেচ্ছদেশে তিনি নিজে আসবেন কেমন করে?

ভারতী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ম্লেচ্ছদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘৃণা। কিন্তু রোগ ত শুধু গরীবের জন্য সৃষ্টি হয়নি, আপনারও হতে পারতো। এখনো ত হতে পারে,—মা কি তাহলে আসেন না?

অপূর্বর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কহিল, এমন করে ভয় দেখালে আমি কি করে একলা থাকবো?

ভারতী কহিল, ভয় না দেখালেও আপনি একলা থাকতে পারবেন না। আপনি অত্যন্ত ভীতু মানুষ।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করি আমি। আমার হাতে জল খেয়ে তেওয়ারীর ত জাত গেছে, ভাল হয়ে সে কি করবে?

অপূর্ব ইহার শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিত না, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, সে ত আর সজ্ঞানে খায়নি, মরণাপন্ন ব্যারামে খেয়েচে, না খেলে হয়ত মরে যেত। এতে বোধ হয় জাত যায় না, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারে।

ভারতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ। তার খরচ বোধ হয় আপনাকেই দিতে হবে,—নইলে, আপনি বা তার হাতে খাবেন কি করে?

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিল, আমিই দেব বৈ কি, নিশ্চয় দেব। ভগবান করুন সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুক!

ভারতী বলিল, আর আমিই শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলি, না?

তাহার শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর অপূর্ব লক্ষ্যই করিল না, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উত্তর দিল, সে আপনার দয়া। তেওয়ারী বাঁচুক, কিন্তু আপনিই ত তার প্রাণ দিলেন।

ভারতী একটুখানি হাসিল। কহিল, ম্লেচ্ছতে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না? এই বলিয়া সে পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন আমি চললাম। কাল যদি সময় পাই ত একবার দেখে যাবো। এই কথা বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আর যদি আসতে না পারি ত তেওয়ারী ভাল হলে তাকে বলবেন, আপনি না এসে পড়লে আমি যেতাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছদেরও একটা সমাজ আছে, আপনার সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালে তারাও ভাল বলে না। কাল সকালে আপনার পিয়ন এলে তলওয়ারকরবাবুকে খবর দেবেন। তিনি পাকা লোক, সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

অপূর্ব কহিল, পাশ ফিরিয়ে দিলে ওর লাগবে না?

ভারতী বলিল, না।

রাত্রে যদি বিছানা বদলে দেবার দরকার হয়? কি করে দেব?

ভারতী কহিল, সাবধানে দেবেন। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি পেরে থাকি আপনি পারবেন না?

অপূর্ব শঙ্কিতমুখে স্থির হইয়া রহিল। ভারতী যাইবার জন্য দ্বার খুলিতেই অপূর্ব সভয়ে বলিয়া উঠিল, আর যদি হঠাৎ বসে? যদি কাঁদে?

ভারতী এ-সকল প্রশ্নের আর কোন জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মৃদু পদশব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে যতক্ষণ শুনা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত অপূর্ব কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল, কিন্তু শব্দ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার চোখের উপরে কোথা হইতে একটা কালো জাল নামিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ কি করিয়া

যে উঠিল সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার কবাট খুলিয়া ফেলিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল ভারতী দ্রুতপদে রাস্তায় চলিয়াছে। মিস্ জোসেফ নামটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, ভারতী!

ভারতী মাথা তুলিয়া চাহিতে অপূর্ব দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, একবার আসুন—মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না। ভারতী দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিল। মিনিট-দুই পরে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অপূর্ব নাই, তেওয়ারী একাকী পড়িয়া আছে।

আগাইয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল বারান্দায় সে নাই—কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্নানের ঘরের কবাট খোলা। কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন সে সন্দিগ্ধচিত্তে দরজার ভিতরে গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে ভয়ের আর সীমা রহিল না। অপূর্ব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইয়াছিল সমস্ত বমি করিয়াছে, তাহার চোখ মুদিত এবং সর্বাঙ্গ ঘামে ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ববাবু!

প্রথম ডাকেই অপূর্ব চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ বুজিয়া তেমনি স্থির হইয়া রহিল। ভারতী মুহূর্তকালমাত্র দ্বিধা করিল, তাহার পরেই সে অপূর্বর কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, উঠে বসতে হবে যে। মাথায় মুখে জল না দিলে ত শরীর শোধরাবে না অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিলে সে হাত ধরিয়া তাহাকে কলের কাছে আনিয়া জল খুলিয়া দিলে সে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া খাটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ভারতী গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়া তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিল এবং একটা হাতপাখা খুঁজিয়া

আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাবো না।

অপূর্ব লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনার যে এখনো খাওয়া হয়নি।

ভারতী বলিল, খেতে আর আপনি দিলেন কৈ? আপনি ঘুমোন।

ঘুমিয়ে পড়লে ত আপনি চলে যাবেন না?

না, আপনার ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস্ ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

নিশ্চয় করব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে করব না।

কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি,—আমার ঢের কাজ আছে।

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই, আপনি আটকাবেন কি করে?

অপূর্ব চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাদের ম্লেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় করে চলতে হয় না?

অপূর্বর বুদ্ধি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না, প্রত্যুত্তরে সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, আমার মা এখানে নেই, আমি রোগে পড়ে গেলে তখন আপনি কি করবেন? তখন ত আপনাকেই থাকতে হবে।

ভারতী কহিল, আমাকেই থাকতে হবে? আপনার বন্ধু তলওয়ারকরবাবুদের খবর দিলে হবে না?

অপূর্ব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তা কিছুতেই হবে না। হয় আমার মা, না হয় আপনি,— একজনকে দেখতে না পেলে আমি কখনো

বাঁচব না। কাল যদি আমার বসন্ত হয়, এ কথা যেন আপনি কিছুতেই ভুলে যাবেন না। তাহার অনুরোধের শেষ দিকটা কি যে একরকম শুনাইল, ভারতী হঠাৎ আপনাকে যেন বিস্মৃত হইয়া গেল। বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে অপূর্বর গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না না, ভুলব না, ভুলব না! এ কি কখনো আমি ভুলতে পারি? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু ভাল হয়েও ত বিপদ কম ঘটবে না অপূর্ববাবু! ঘটা করে আবার ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কিন্তু ভয় নেই, তার দরকার হবে না। আচ্ছা, চুপ করে একটু ঘুমোন; বাস্তবিক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

কি কাজ?

ভারতী কহিল, কি কাজ! খাওয়া ত দূরে থাক, সারাদিন স্নান পর্যন্ত করবার সময় পাইনি।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্নান করলে অসুখ করবে না?

ভারতী বলিল, করতেও পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নানের ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেছেন তা পরিষ্কার করার পরে না নেয়ে কি কারু উপায় আছে নাকি? তারপরে দুটো খেতেও হবে ত?

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু সে-সব আমি সাফ করে ফেলবো,—আপনি যাবেন না। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। ভারতী রাগ করিয়া কহিল, আর বাহাদুরির দরকার নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এত বড় ঠুনকো জিনিসটিকে যে মা কোন্ প্রাণে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আমি তাই শুধু ভাবি! সত্যি বলচি, উঠবেন না যেন। তিনি নেই,—কিন্তু এখানে আমার কথা না শুনলে ভারী অন্যায় হবে বলে দিচ্চি। এই বলিয়া

সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে শাসনের হুকুম জারি করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত ও একান্ত নির্জীবের ন্যায় অপূর্ব কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই, তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মুছিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। ভারতী পাশে দাঁড়াইয়া। অপূর্বর প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার চুলের আয়তন ও দীর্ঘতার প্রতি। সদ্য-স্নান-সিক্ত বিপুল কেশভার ভিজিয়া যেমন নিবিড় কালো হইয়াছে, তেমনি ঝুলিয়া প্রায় মাটিতে পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ সাবানের গন্ধে ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরনে একখানি কালপাড়ের সুতার শাড়ী, —গায়ে জামা না থাকায় বাহুর অনেকখানি দেখা যাইতেছে। ভারতীর এ যেন আর এক নূতন মূর্তি, অপূর্ব পূর্বে কখনো দেখে নাই। তাহার মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইল, এত ভিজে চুল শুকোবে কি করে?

ভারতী কহিল, শুকোবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবতে হবে না, আপনি আসুন দিকি আমার সঙ্গে।

তেওয়ারী কেমন আছে?

ভাল আছে। অন্তত, আজ রাত্রির মত আপনাকে ভাবতে হবে না। আসুন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে আসিয়া দেখিল ছোট একটি টুকরিতে কতকগুলি ফলমূল, একটা বঁটি, একটা থালা, একটা গেলাস— ভারতী দেখাইয়া কহিল, এর বেশী করা ত চলবে না। কলের জলে সমস্ত ধুয়ে ফেলুন,—বঁটি, থালা, গেলাস সব। গেলাসে করে জল নিন, নিয়ে ও-ঘরে আসুন, আমি আসন পেতে রেখেছি।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এ-সকল আপনি কখন আনলেন?

ভারতী বলিল, আপনি ঘুমোলে। কাছেই একটা ফলের দোকান আছে, দূরে যেতে হয়নি। আর টুকরিটা ত আপনাদেরই। এই বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল, শুধু সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, বঁটি ধুইতে গিয়া যেন হাত না কাটে।

খানিক পরে আসনে বসিয়া অপূর্ব ফল কাটিতেছিল, এবং ভারতী অদূরে বসিয়া হাসিতেছিল। অপূর্ব কহিল, আপনি হাসুন ক্ষতি নেই। পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে। কিন্তু আপনি আমার খাবার জন্যে যে যত্ন করেছেন সেজন্যে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। মা ছাড়া এমন আর কেউ করতেন না।

তাহার শেষ কথাটা ভারতী কানেই তুলিল না। আগের কথার উত্তরে কহিল, হাসি কি সাধে অপূর্ববাবু! পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে সত্যি, কিন্তু, তাই বলে এমনটি কি সবাই জানে? তেওয়ারী ভাল হয়ে গেলে মাকে আমি নিশ্চয় চিঠি লিখে দেব, হয় তিনি আসুন, না হয় ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ মানুষকে বাইরে ছেড়ে রাখা চলবে না।

অপূর্ব কহিল, মা তাঁর ছেলেকে ভাল করেই জানেন। কিন্তু, দেখুন, আমি না হয়ে আমার দাদাদের কেউ হলে আপনার এত কথা আজ চলত না। আপনাকে দিয়েই তাঁরা সব কাজ করিয়ে নিতেন।

ভারতী বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, দাদারা ছোঁন না, খান না এমন জিনিসই নেই। মুরগি এবং হোটেলের ডিনার না হলে ত তাঁদের খাওয়াই হয় না।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি?

অপূর্ব কহিল, ঠিক তাই। বাবা ত অর্ধেক ক্রীশ্চান ছিলেন বললেই হয়। মাকে কি এই নিয়ে কম দুঃখ পেতে হয়েছে!

ভারতী উৎসুক হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? কিন্তু মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু?

অপূর্ব বলিল, ভয়ানক আর কি, হিন্দুঘরের মেয়ের যথার্থ যা হওয়া উচিত, তাই। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর করুণ এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল,

বলিল, বাড়িতে দুটি বউ, তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। কিন্তু এমনি মা যে কখখনো কারু ওপর জোর করেন না, কখখনো কাউকে এর জন্যে অনুযোগ করেন না। বলেন, আমিও ত নিজের আচার-বিচার ত্যাগ করে আমার স্বামীর মতে মত দিতে পারিনি, এখন, ওরাও যদি আমার মতে সায় দিতে না পারে ত নালিশ করা উচিত নয়। আমার বুদ্ধি এবং আমার সংস্কার মেনেই যে বউব্যাটাদের চলতে হবে তার কি মানে আছে?

ভারতী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া কহিল, মা সেকেলে মানুষ, কিন্তু ধৈর্য ত খুব বেশি।

অপূর্ব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, ধৈর্য? মায়ের ধৈর্যের কি সীমা আছে নাকি? আপনি তাঁকে দেখেন নি, কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী প্রসন্ন মৌনমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অপূর্ব ফলের খোসা ছাড়ানো বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ধরলে, সমস্ত জীবনই মা আমার দুঃখ পেয়ে আসছেন, এবং সমস্ত জীবনই স্বামী-পুত্রদের ম্লেচ্ছাচার বাড়ির মধ্যে নিঃশব্দে সহ্য করে আসছেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। অসুখে-বিসুখে কেবল আমার হাতেই দুটো হবিষ্য সিদ্ধ তিনি মুখে দেন।

ভারতী কহিল, এখন ত তাঁর কষ্ট হতে পারে।

অপূর্ব বলিল, পারেই ত। হয়ত হচ্চেও। তাইত আমাকে তিনি প্রথমে ছেড়ে দিতে চাননি। কিন্তু, আমিও ত চিরকাল ঘরে বসে থাকতে পারিনে! কেবল তাঁর একটি আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাঁর সেই আশাটি কেন পূর্ণ করেই এলেন না? সেই ত উচিত ছিল!

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—ছিলই ত। মেয়ে নিজে পছন্দ করে মা যখন সমস্ত ঠিক করছিলেন তখনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে

হল, সময় হল না। কিন্তু বলে এলাম, মা, যখনি চিঠি লিখবে তখনি ফিরে এসে তোমার আদেশ পালন করব।

ভারতী বলিল, তাই ত উচিত।

অপূর্ব মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, উচিত নয়? বারব্রত করবে, বিচার-আচার জানবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে,—মাকে কখনো দুঃখ দেবে না,—সেই ত আমি চাই। কাজ কি আমার গান-বাজনা-জানা কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে?

ভারতী বলিল, দরকার কি!

অপূর্ব নিজেই যে একদিন ইহার বিরোধী ছিল এবং বৌদিদির স্বপক্ষে লড়াই করিয়া মাকে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর হইতে যা হউক একটা মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া দিতে, সে-কথা আজ সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্যন্ত নেওয়া যায় না, ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কাপড়খানি অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তফাত, তবু আপনি যা বোঝেন আমার দাদারা কিংবা বৌদিদিরা তা বুঝতে চান না।

যার যা ধর্ম তাই ত তার মেনে চলা চাই? একবাড়ি লোকের মধ্যে থেকেও যে মা আমার একলা, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর আছে? তাই ভগবানের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, আমার কোন আচরণে আমার মা যেন না কোনদিন ব্যথা পান। বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারী হইয়া অশ্রুভারে দুই চক্ষু টলটল করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘুমন্ত তেওয়ারী কি একটা শব্দ করিতে ভারতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় ফল বানাইতে প্রবৃত্ত হইল। মাকে সে অতিশয় ভালবাসিত, এবং বাড়িতে থাকিতে সেই মাকে খুশী রাখিতে সে মাথার টিকি হইতে একাদশীর দিনে ভাতের বদলে

লুচি খাওয়া অবধি সবই পালন করিয়া চলিত। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ সন্তানের আচারভ্রষ্টতাকে সে নিন্দাই করিত, কিন্তু প্রবাসে আসিয়া আচার-বিচারের প্রতি তাহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ বোধ হয় তাহার জননীও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই যে, আজ তাহার দেহমন ভয়ে ও ভাবনায় নিরতিশয় বিকল হইয়াছিল, মাকে কাছে পাইবার একটা অন্ধ আকুলতায় ভিতরে ভিতরে তাহার কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে সমস্ত ভাবই যে পরিমাণ হারাইয়া বিকৃত আতিশয্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল এ খবর অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না, কিন্তু ভারতীর বুকের মধ্যেটা অপমানের বেদনায় একেবারে টনটন করিতে লাগিল।

সে খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অপূর্ব কোনমতে ফল-কাটা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, বসে আছেন, খাননি?

অপূর্ব বলিল, না, আপনার জন্য বসে আছি।

কিসের জন্য?

আপনি খাবেন না?

না। দরকার হলে আমার আলাদা আছে।

অপূর্ব ফলের থালাটা হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বাঃ—তা কি কখন হয়? আপনি সারাদিন খাননি, আর—

তাহার কথাটা তখনও শেষ হয় নাই, একটা অত্যন্ত শুষ্ক চাপা কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, আঃ—আপনি ভারী জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন। এই বলিয়া সে মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ, মুহূর্তমাত্রই তাহার মুখের চেহারা অপূর্ব দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তকালই তাহার বুকে মরণকাল পর্যন্ত ছাপ মারিয়া দিল। এ মুখ সে আর ভুলিল না। সেই আসার দিন হইতে অনেকবার দেখা হইয়াছে; বিবাদে,

সৌহৃদ্যে, শত্রুতায়, বন্ধুত্বে, সম্পদে ও বিপদে কতবারই ত এই মেয়েটিকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু, সে-দেখার সহিত এ-দেখার সাদৃশ্য নাই। এ যেন আর কেহ।

ভারতী চলিয়া গেল, ফলের পাত্র তেমনি পড়িয়া রহিল এবং তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ কাঠের মত অপূর্ব বসিয়া রহিল। কিসে যে কি হইল সে যেন তাহার উপলব্ধির অতীত।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে এ ঘরে আসিয়া দেখিল তেওয়ারীর শিয়রের কাছে একটা মাদুর পাতিয়া ভারতী বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া তাহার খাটে শুইয়া পড়িল, এবং শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে মুদিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন ভোর হইয়াছে।

ভারতী কহিল, আমি চললুম।

অপূর্ব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া চেতনা হইবার পূর্বেই দেখিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

দশ

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লোকটি সঙ্গে ভামোয় গিয়াছিল সেই রাঁধিতেছে। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিসসুদ্ধ সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। শহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্মদেশটা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু সারিলেই সে বাড়ি চলিয়া যাইবে। আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তাহা অসম্ভব হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। ভারতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এত বড় একটা আশ্চর্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না; বরঞ্চ সে যেন ভয়ে ভয়েই থাকিত পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রুপক্ষীয়া, এখানে আসা অবধি তাহাদের অশেষ প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অপূর্বকে জেল খাটাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছে; মনিবের অবর্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সঙ্কোচ দুই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে না। জানিবার জন্য ছটফট করিত,—তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে; কখনো ভাবিত অপূর্ব আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দুয়ের যাহাই কেন না ঘটিয়া থাক, ভারতী আপনি

ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্ব নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশী করিত পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ঝগড়া-বিবাদের কথা চুলায় যাক, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বার্লি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ি চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া, কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজচলাগোছের শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দিলে যে কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ির চাকরি ত ঘুচিবেই, এমন কি তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্যন্ত গিয়া টান ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক ছাড়া তাহার অন্তরের আর একটা দিক ছিল তাহা যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্ব আফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলায় সে প্রত্যহ একখানি বেতের মোড়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিত। দুর্বল দেহটিকে দেয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোন দিন প্রয়োজন হইবে না, ওই মোড় অতিক্রম করিবার বেলা, অভ্যাসবশতঃও একবার এদিকে সে চাহিবে না এমন হইতেই পারে না।

অপূর্ব ভামোয় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া যায়, তখনও তেওয়ারীর খাওয়া হয় নাই, মেয়েটা কাঁদিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে। দিন-দুই পূর্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, তাহার সে ভয় ছিল না, আসিয়া কবাট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি কান্না! কে বলিবে সে ম্লেচ্ছ,

কে বলিবে সে ক্রীশ্চানের মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা-ভাত হাঁড়িতেই রহিল, সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল! পরদিন কফিন লইয়া যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। এই সময় হইতেই ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো বা দিদি বলিতে শুরু করিয়াছিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে সে চার-পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। তারপরে যেদিন ভারতী জিনিসপত্র লইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার যেন আর কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়াছিল তাহা সে ভাল জানিতও না, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাইবার কথা। কিন্তু, এই সঙ্গেই আর একটা কথা সে সর্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকালবেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা চুলের রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারীর তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও ঢুকিত না, কোন কিছু স্পর্শও করিত না, চৌকাটের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আজ কি-কি রাঁধলে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না। আবার ত কাচতে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনো ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বৈ কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি থাকার জন্যে সমস্ত বাড়িটাই ছোঁয়া গেছে। নিজের হলে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তেওয়ারী?

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি! তুমি নিজে দেখতে পারো না বলে সবাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবুকে যদি একবার ভাল করে জানতে ত তুমিও বলতে এমন মানুষ সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আটকালে, তাকেই গেলেন চোর বলে ধরিয়ে দিতে।

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া তেওয়ারী মর্মাহত হইয়া পড়িত। কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি । সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড করালে, দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হল না।

দিতে হল না কি রকম? স্বচক্ষে দেখলাম যে দু'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই দু'খানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে।

তেওয়ারীর হাতের খুন্তি হাতেই থাকিত—ওঃ! তাই বটে।

কিন্তু ভাজাটা যে পুড়ে উঠল তেওয়ারী, ও যে আর মুখে দেওয়া চলবে না।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া লইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু এ কথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্যে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

কিন্তু এতবড় আশ্চর্য কথাটা ছোটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্যবশতঃ সে বাসী হলুদ দিয়া তরকারি রাঁধিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রাঁধিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা যে খ্রীষ্টান

দিদি, তোমাদেরও এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা-ঠাকরুনকেও ছাড়িয়া গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপারে একা মা-ঠাকুরানী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেও সে সতর্ক না হইয়া পারে নাই। তখন এ-সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালও লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্মায় সে আর ফিরিবে না। যাইবার পূর্বে দেখা হইবার আর আশা নাই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে জানে বলিবার লোক নাই, দিনের পর দিন একই পথের প্রান্তে নিষ্ফল দৃষ্টি পাতিয়া একাকী চুপ করিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীর বাসাটা ঠিক কোন্ জায়গায় রে তেওয়ারী?

তেওয়ারী সংশয়তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেছি নাকি?

যাবার সময় তোকে বলেনি?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জন্যে!

অপূর্ব কহিল, আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক মনে নেই। কাল একবার খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা দুলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে, কিন্তু এ সাহস তাহার হইল না যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপূর্ব নিজেই ব্যক্ত করিয়া কহিল, সে চুরির জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীর একটা সই চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব বলিতে লাগিল, সেদিন এই কথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখলে ত তুই কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস তেওয়ারী, আমার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা হতো না।

তেওয়ারী হাঁ না কিছুই কহিল না, শেষ কথাটা শুনিবার জন্য নিঃশব্দে কাঠের মত বসিয়া রহিল। অপূর্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কি যে ঘটবে তার ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে গেছে,—কিন্তু কি শক্ত মেয়েমানুষ, তেওয়ারী, কিছুতে ভ্রূক্ষেপই নেই।

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি?

অপূর্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই 'চললুম' বলে যেন একেবারে উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি?

রাগ করে? অপূর্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হতেও পারে। তাঁকে বোঝাই ত যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কি না?

এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই হয়ত অসুখ-বিসুখ কিছু করেচে।

নিজের অসুখ-বিসুখ! অপূর্ব চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথাই মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনে আসে নাই। যাবার সময়ে সে হয়ত রাগ করিয়াই গিয়াছে, এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অসুখের কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সে রাত্রে হইয়াছিল সমস্ত একনিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ব বসন্ত ছাড়া

আর কিছু ভাবিতেই পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল।

একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েস্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ শুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ তাহার সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, মুখে তাহার শব্দ রহিল না, সেই চেয়ারে মাটির পুতুলের মত বসিয়া এই একপ্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ অবধি কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কাটিয়া গেলেও যখন অপূর্ব নড়িবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য নয় উদ্বিগ্ন হইল। আস্তে আস্তে কহিল, ছোটবাবু, বাড়িওয়ালার লোক এসেছিল; যদি তেতলার ঘরটাই নেওয়া হয় ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানো চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে!

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে!

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোস্টকার্ড পেয়েচি। দরোয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন।

কি লিখেছেন?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেছেন। দরোয়ানের ভাই ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্চে, তার হাতে বিশ্বেশ্বরের নামে পাঁচ টাকার পূজো পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব কহিল, ভালই ত। মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশী। আমি চলে যাবো, মার ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমরা দুজনেই যাই। চারিদিকে অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব বলিল, অসুখ-বিসুখ কোথায় নেই? কলকাতায় হয় না? তুই বুঝি ভয় দেখিয়ে নানা কথা লিখেছিলি?

আজ্ঞে না। তেওয়ারী ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে রাত্রে আহারাদির পরে ধীরে-সুস্থে পাড়িবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়াবান্দা হয়ে ধরেছেন। বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারে আচারপরায়ণতার খ্যাতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যাকে মাতাঠাকুরানী পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল। তেওয়ারীর কথাটা অপূর্বর ভাল লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সয়, তিনি ত আর কোথাও চেষ্টা করতে পারেন!

তেওয়ারী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি তাঁর কি মা'র, কি করে জানবো ছোটবাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্মা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগড়ে যায়।

অপূর্ব খামকা ভয়ানক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, দ্যাখ তেওয়ারী, তুই আমার ওপর অত পণ্ডিতি করিস নে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ রোজ অত চিঠি লিখিস কিসের? আমি ছেলেমানুষ নই।

এই অকারণ-ক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না, সেও রাগিয়া বলিল, আসবার সময়ে মাকে এ কথা বলে আসতে পারেন নি? তাহ'লে ত বেঁচে যেতাম, জাতজন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হতো না।

অপূর্ব চোখ রাঙ্গাইয়া চট করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গলায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তাহলে জলটল কিছু খাবেন না?

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আলনা হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে দুমদুম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবারে চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ি যাব বলে রাখলাম। অপূর্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস ত তোর দিব্যি রইল!—বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যে কিসের জন্য যে এমন একটা রাগারাগি হইয়া গেল, অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না যে, এমনি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চিরদিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এগার

অপূর্বর যাইবার জায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্যন্ত এমন ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসত পায় নাই। বাহির হইয়া আজও সে রেলওয়ে স্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবারে তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায় যাইবে যখন ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিঁধিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে যেন জবাবদিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে, তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে, এতবড় জীবন-মরণ সমস্যায় একটা খবর পর্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবাবদিহির বেশী আর অগ্রসর হইল না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথাও তাহার নূতন বাসা ইহা সে ভুলে নাই, ইহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন তাহার নাচিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে লোক আত্মগোপন করিয়া আছে, এতকাল পরে তাহার তত্ত্ব লইতে যাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহা চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশত-বার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার সই চাহে, অতএব কাজের জন্যই সে আসিয়াছে; সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ-সকল অকারণ কৌতূহল তাহার নাই। এতদিন পরে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্বমুখে প্রশস্ত রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া ডান দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে সাহেব-মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশেপাশের যে-সকল ছোট-বড় বাঙলো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজসজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে। সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাঙালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিগর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের মেয়েছেলেরা—

লোকটি কহিল, ঢের, ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার তাঁবেই ত পঞ্চাশ জন কারিগর—যা করব তাই! ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাঙালী ক্রীশ্চান কিংবা—

লোকটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলছেন বাঙালী,—আবার খ্রীষ্টান কিরকম? খ্রীষ্টান হলে আবার বাঙালী থাকে নাকি? খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টান। মোচলমান—মোচলমান! বস্, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব বলিল, আহা! বাঙলা দেশের লোক ত! বাংলা ভাষা বলে ত!

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বললেই হল? যে জাত দিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালী তার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোত্থেকে সব মেয়ে-মাস্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পড়ায়—বস্! তা বলে কেউ কি তাদের সঙ্গে খাচ্চে, না বসচে?

অপূর্ব কূল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানো?

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল-ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কিনা! মানুষ ত নয়,— দেব্‌তা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই

বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ি দেখিতে পাইল।

বাড়িটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপরে। তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এইখানেই ভারতী থাকে, এবং ওই জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট-পনেরো পরে জন দুই-তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া সহসা যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কাকে চান?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বৈ কি—আসুন।

অপূর্বর ঠিক যাইবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এমনিই বিশ্রী হইয়া উঠিবে যে সে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া একমুহূর্ত পরেই এই কাঠের বাড়ির নীচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা-কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন ইস্কুল-ঘর অপূর্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই

করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল, অপূর্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেননি যে বড়?

অপূর্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেননি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ি যেতে চাচ্চে, যাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেন না এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে শুনে নেবেন যেন ঠকায় না।

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব কহিল, মিছে না হোক, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী বলিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে ত আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতো।

অপূর্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখখনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই!

ভারতী বলিল, কৈ আর আছে? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখবেন সত্যি না মিছে!

অপূর্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাকরিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

অপূর্ব বলিল, এ যা চাকরি, এই ত শুকিয়ে মরা! তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকরি আছে, মাইনে একশ’ টাকা,—হয়ত দু-এক ঘণ্টার বেশী খাটতেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাকরি করতে বলেন?

অপূর্ব কহিল, দোষই বা কি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি করব না। আপনি ত তার কর্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

অপূর্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুঝিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথাপি তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল, সহসা তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপূর্ব ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ইস্কুল বসলো বোধ হয়—ছেলেরা সব পড়ায় মন দিয়েছে।

ভারতী গম্ভীরমুখে কহিল, তাহলে হাঁকাহাঁকিটা কিছু কম হতো। তাদের শিক্ষকেরা বোধ করি বিষয় নির্বাচনে মন দিয়েছেন।

আপনি যাবেন না?

যাওয়া ত উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্বর কান পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা ওখানে?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের-দাবী। তার মানে?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা! আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,— ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান স্পষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত-মাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ববাবু? সত্যিই কি মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না?

অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না! মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেই ত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্ম্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষে হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার! এই বলচি আপনাকে আমি, এর জন্যেই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখখনো ক্ষমা করবেন না।

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তুটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের, পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের মর্মান্তিক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব চমকিয়া

উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিট-খানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নীচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের-দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি?

সভাপতি? না, তিনি আমাদের মূল-শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্বর কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধ হয় সকলে ক্রীশ্চান?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পাচ্ছি যে?

ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব মুহূর্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁহার বোধ হয় জাতিভেদ,— অর্থাৎ কিনা, খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার বোধ করি করেন না?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি মেনে চলেন, তাঁর মুখেও আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে গুঁজে দিইনে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব বলিল, ভয় আবার কিসের? কিন্তু,—আচ্ছা, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলাও বোধ করি আপনাদের দলে আছেন?

আমার মত? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট যিনি, তাঁর নাম সুমিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধ হয় এ-দেশে কেউ নেই।

অপূর্ব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তার যাঁকে বলছেন, তিনি?

ডাক্তার? শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো

অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দেশের প্রতি ভালবাসার নেশা তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের-দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল।

এই সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও উদ্যম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্মজীবনের অপরিজ্ঞাত পদ্ধতি ওই যে অদ্ভুত নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু তবুও কেমন যেন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নীচে হইতে উঠিয়া তাহার মনটাকে ধীরে ধীরে গ্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই।

অপূর্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—

উভয়ে নীচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তাহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটা এমন সঙ্কীর্ণ যে এত লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলে না। এরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, কিন্তু এখানে এই-সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর নাই। সে আর একটা বস্তু লক্ষ্য

করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, যে বিতণ্ডা উদ্দাম বেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা পড়িল না। কেবল, একটিমাত্র লোক যে পিছন ফিরিয়া কোণের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিল সে লিখিতেই রহিল, তাহার আগমন বোধ হয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব গণিয়া দেখিল ছয়জন রমণী এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের সকলেই অচেনা, কেবল একটি ব্যক্তিকে অপূর্ব চক্ষের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্তিকেই সে কিছুকাল পূর্বে মিক্থিলা রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং টাকাটা যতশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় যাহার কাছে হাত পাতিয়া উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইঁহার জন্য নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে ব্যথাটা অতিশয় বাজিল যে এরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

সুমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট, সুমিত্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরানী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরনে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিকচিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই!—ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রু, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত

রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন, কেন যে তাঁহারা এত-কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ-বাইশ বছরের সাধারণ-গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এক তর্কের ঝড় উঠিয়াছে।

আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরনের কাটছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোশাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ; কি বলিতেছিলেন অপূর্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন্ পরম বিস্ময় ঝড়িয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল পূর্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে এইবার তিনি কথা কহিলেন।

এই ত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়্লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না, দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায় কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আছে ত? দেশের কাজ করব বললেই ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, এ কথা আপনারা সবাই জানেন। কর্তব্য ত কেবল একদিকে নয়!

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন,—এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলে না!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর করে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, এবং সবচেয়ে বড় যা, সেই ধর্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলছেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন।

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্মজ্ঞান ত! দেশের কাজে এই শিক্ষাই বোধ হয় উনি দেশের মেয়েদের দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ওঁর দায়িত্ববোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেন নি, আর একটা বড় কাজের জন্য যাঁকে ত্যাগ করে আসা উনি অন্যায় মনে করেন নি,সেই শিক্ষাই যদি দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি করব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এমনি শিক্ষা উনি গৃহস্থ মেয়েদের দেবেন?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন বুলি উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন, এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে এত ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি,—এবং আমি নিজেও যে দুর্বৃত্ত স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি তাকে পরিত্যাগ করে এসেছি, অতএব, আমার মত অবস্থায় তোমরাও তাই করো,—এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহরবাবু।

মনোহরের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তারপরে বলিয়া উঠিলেন, তাহলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, দোহাই আপনাদের, নিজেরা যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

সুমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল থেকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে ত এই। কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং, এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,—আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহরবাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপর্যাপ্ত নয়। নবতারা তাহলে যাবেন না?

নবতারা এতক্ষণ মুখ তুলিয়াও চাহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর সুমিত্রাকে প্রশ্ন করিলেন, এঁর দায়িত্ব তাহলে আপনারাই নিলেন?

নবতারাই ইহার জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সুমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, স্বামীগৃহে বিবাহিত-জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্তু নারীর আর কিছু আছে আপনি বলতে পারেন?

সুমিত্রা কহিলেন, অপরের যাই হোক, অন্ততঃ, নবতারার স্বামীগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারিনে।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বলতে পারবেন?

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত বড় কদর্য বিদ্রূপেও কাহারও মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শান্তস্বরে বলিলেন, মনোহরবাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মানতে পারি?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

মনোহরবাবু যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চললুম! গুডবাই! এই বলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে? মনেও করো না! আমি চাষা নই, আমি অ্যাডভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শিকল পরাতে হয় ভালরকম জানি! আচ্ছা,—এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উত্তেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কিন্তু সকলের মুখেই যেন কি-একপ্রকার ছায়া পড়িল। কেবল যে লোকটা

কোণে বসিয়া লিখিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্বর মনে হইল, হয় সে সম্পূর্ণ বধির, না হয়, একেবারে পাষাণের ন্যায় নিরাকুল, নির্বিকার। ভারতীর মুখের চেহারাটা সে দেখিতে চাহিল, কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। মনোহর ব্যক্তিটি যেই হোন, রাগের মাথায় এই সমিতির বিরুদ্ধে যে-সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অতিশয় সন্দেহজনক। এতগুলি আশ্চর্য নরনারী কোথা হইতে আসিয়াই বা এখানে সমিতি গঠন করিলেন, কি বা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য, হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল?

আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্তে একদিন অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছিল,—আর সকলের বড় এই নবতারা!—স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে,—সতীত্ব-রক্ষার কথা ভাবিবার এখন যাহার সময় নাই,—অথচ এই লোকগুলা এত বড় অন্যায়কে শুধু সমর্থন নয়, প্রাণপণে প্রশয় দিতেছে। এবং যিনি ইহাদের কর্ত্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের সমক্ষে সতীধর্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধটুকুও করিলেন না।

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত রাজপথ তেমনি জনহীন নীরব, কেমন যেন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্বর মনের ভিতরটা ভার হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সুমিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে আমরা সবাই আপনাকে চিনি। শুনলাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বর হতে চান। সত্য?

অপূর্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি এক মনে লিখিতেছিল, সুমিত্রা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ববাবুর নামটা লিখে নেবেন। অপূর্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই,—টাকাকড়ি দিতে হয় না এইটে আমাদের সমিতির বিশেষত্ব।

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা মোটা বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল এবং চুপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য, কি আমাকে করতে হবে কিছুই ত জানতে পারলাম না।!

ভারতী আপনাকে জানান নি?

অপূর্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়েছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অন্যায় মনে করেন না?

সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের সেবা করবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এঁদের কর্মক্ষেত্র ত এক নয়; আমরা পুরুষে বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়াই সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যতবড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবে না।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ববাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত

জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে ওঠে না। এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন সে যদি কখনো ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ববাবু, ওটা বাইরে আসার দোষ নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে অনুরাগের আকর্ষণ দিয়েছেন, তাঁর। অপূর্ববাবু, মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব খুশী হইতে পারিল না, বরঞ্চ, একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি নিজেদের কল্যাণ-চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না করে পারিনি যে, বিবাহিত-জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নাই, এমন কি নারীত্বের যা চরম উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পতিব্রতা-ধর্মকেও আপনারা অবহেলার চক্ষে দেখেন। এর থেকে আসবে দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ববাবু, আপনি একটু রাগ করে বলচেন, নইলে ঠিক ও-ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে আগাগোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেছেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি

শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু, এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, অপূর্ববাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌঁছান যায় না? আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? একি পুকুরের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

অপূর্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেও ত যাচ্ছে?

সুমিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্ছে। প্রাণাধিক স্বামী বলে পাঠ লিখতেও তার বাধে না, কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও হয়ত তার আটকায় না। বস্তুতঃ, ঘরকন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজন হয় না। আপনি ত গল্প পড়েছেন, কোন্ এক ঋষিপুত্রের দুধের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটতো। কিন্তু, আরাম যেমনই হোক, যা নয় তাকে তাই বলে গর্ব করা ত যায় না।

এই আলোচনা অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পারিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চান এর অধিক কারও ভাগ্যেই জোটে না?

সুমিত্রা কহিলেন, না, তা আমি বলিতেই পারিনে। কারণ, সংসারে দৈবাৎ বলেও একটা শব্দ আছে।

অপূর্ব কহিল, ওঃ—দৈবাৎ! কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয়, তবুও আমি বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, উত্তর-পুরুষের কল্যাণের জন্য আমাদের এই-ই ভাল।

সুমিত্রা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, না অপূর্ববাবু, সমাজ এবং আপনার উত্তর-পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হবে না। সমাজ ও বংশের নাম করে ব্যক্তিকে একদিন বলি দেওয়া হতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয়নি,—আজ তা অচল। ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর-পুরুষের জন্য না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তার মাঝখানে স্থান পেত না। এই ব্যর্থ বিবাহিত-জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে গৌরব নেই।

অপূর্ব ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষায় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন, হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সর্তকতায় আপনাকে আগলে রাখেত চায় কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে ত যাক না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে। দুদিন আগে-পাছের জন্য কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে?

এ কথার অপূর্ব আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, ঋষিপুত্রের উপমা দিয়ে হয়ত আপনাকে আমি ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যথা যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে?

তাঁহার শেষের কথাটা অপূর্ব বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়ে ক্রীশ্চান মিশনারিরা যাত্রীদের অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগ করে কেউ হাতওয়ালা খ্রীষ্টকেও ভজে না। ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য!

সুমিত্রা রাগ করিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে না অপূর্ববাবু। গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখে না এ তারা জানেও না। তবু যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য! সতীত্বের সত্যিকার মূল্য জানলে কি—

সুমিত্রা! যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অপূর্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র!

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথাগুলো তাহার চক্ষের নিমেষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব হাসিতে পারিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সব্যসাচী ত? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ববাবু, চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল নয়,—পাঠান ওয়ার্কমেন-গুলোর মদ খেলে আর যেন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

সুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইল না, ভারতীকে একটা কথা বলা হইল না,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বুকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা,—তাহার নাম যাহাতে লেখা রহিল।

বার

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই ত সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে,—আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যেতে পারা যায় অপূর্ববাবু? তখন সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল, এখন, এত রাত্রে জেরবাদীপাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন, আর দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বৈ কি! মদের খরচটা তারা পরের ঘাড়ে চাপাবার কাজে ও-অনুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠতে পারে না। এই যেমন সোনার ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান যাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার পরের ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই ত তারা বুঝতে চায় না! কিন্তু, আজ না বুঝলে চলবে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুরই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বরঞ্চ চলুন, কোন পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েদের মত স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক নেই, চলুন—এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়া অপূর্বর ডান হাতটি টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিতেই অপূর্বর অনেক দিনের অনেক জিম্নাস্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকিখেলা হাতের ভিতরের হাড়গুলা পর্যন্ত যেন মড়মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সেদিন আপনার কথাতেই রহস্য করে আমাকে বলেছিলেন, সাধে কি বাবাজী মহাপুরুষের সংবর্ধনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুহ্য কেতাবে লেখা আছে, কৃপা করলে তিনি পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাঙ্গ করে দিতে পারেন! কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্চে অত হাসা ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, কহিলেন, কাকাবাবুর ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমরা কে কে?

অপূর্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই দু’চার জন কর্মচারী।

ওঃ—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল; এবং কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সোজা পথটা আজ সোজাই ছিল, কারণ, যে জন্যই হউক, পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার আজ কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া

তাহারা বড় রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছিলে অপূর্ব সহসা বলিয়া উঠিল, এবার বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোনমতেই আর সংবরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়,—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশী থাকলেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু'দশ জনের বেশী কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব বলিল, দু'দশ জন! অর্থাৎ, দু'জন থাকলেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার পিস্তলের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেমনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ত? আমার সঙ্গে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য! অন্ধকার গভীর রাত্রি ঝাঁঝাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘপথের প্রতি চাহিয়া কহিল, পথে না আছে লোক, না আছে একটা পুলিশ; আলো ত না থাকার মধ্যেই—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশখানেক হবে, না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বৈ কি।

অপূর্ব কহিল, আচ্ছা, নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে চলিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এমন ত হতে পারে, সে ব্যাটারা আজ আর কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব কহিল, নয়ই ত! আছেই!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, যেখানে আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্যন্ত দেখবার জো নেই। এই হল তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান! আর এর জন্যই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি। সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটে আপনার সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব লজ্জায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। একমুহূর্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বড্ড ভীতু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর কেউ হলে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয়-নম্র নিরভিমান সত্য-কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্য নিজেও যেন লজ্জা পাইলেন। সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার জন্যেই আমি এসেচি অপূর্ববাবু, নইলে প্রেসিডেন্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিতেন না। এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, সুমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করতে পারেন?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, পারেন বৈ কি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অন্য লোকও সঙ্গে দিতে পারতেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দল বেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই সোজা হয়েছে অপূর্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলের কর্ত্রী, তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম লেগেই আছে সেখানে যাকে-তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না থাকলে আজ আপনাকে থাকতে হতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্বর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে!

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে।

অপূর্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জনশব্দ পাছে অবাঞ্ছিত কাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপথে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট-পনের এইভাবে চলিয়া শহরের প্রথম পুলিশ-স্টেশনটা ডানহাতে রাখিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশী দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাকলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় না অপূর্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোন কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন নেই বলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ। আমি তাহলে বিদায় হই অপূর্ববাবু?

অপূর্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া যাইতে কল্পনা করিয়া আর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীতু লোক, দলবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে,—আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারবো?

ডাক্তার চক্ষের নিমিষে তাহার দুই হাত সস্নেহে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন তবে আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হই গে। কিন্তু এ-সব হাঙ্গামা কি সহজে নিতে আছে ভাই !

কথাটা অপূর্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেমনতর একপ্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোধ করি লাগছে ডাক্তারবাবু, আপনি খোঁড়াচ্চেন!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু না। লোকালয়ে আমার পা-দুটো কেমন আপনিই খুঁড়িয়ে চলে। গিরীশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্যাদা?

অপূর্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্যাদা কি? পায়ের ধূলোর যোগ্যও ত নই। আপনি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এতবড় সাহস আছে!

এই ডাক্তার-ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না। থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায় এই পথটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলিশের লোকে যাহাকে

সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্বৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরোধ করিবে কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা, তার চেয়ে চলুন না কেন দুজনেই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আক্রমণ করতে সাহস করে আপনি কাছে থাকলে ত সে সম্ভাবনা থাকবে না!

অপূর্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাবো?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাকবে না।

থাকবো কোথায়?

আমার কাছে।

আফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইতেছিল, একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি,—আচ্ছা, তা না হয় আজ—

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা করে আজ দেখাই যাক। কিন্তু একটা কথা, তেওয়ারী বেচারা বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র প্রতিশোধের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুক গে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁধারের জনশূন্য-পথে উভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনেই হইল না। পুলিশ থানা পার হইয়া সহসা একসময়ে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি এ্যানার্কিস্ট?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাকাবাবু কি বলেন?

অপূর্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন ভয়ানক এ্যানার্কিস্ট।

আমি যে সব্যসাচী এ-সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?

না।

এ্যানার্কিস্ট বলতে আপনি কি বুঝেন?

অপূর্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ কিনা রাজদ্রোহী—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এদেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে অতিশয় ভদ্রলোক। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনো লেশমাত্র ক্ষতি করেন নি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আসবে আমার কোথা থেকে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরই বা কি করে আসে বলুন! তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি!

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তাই, আপনি যা বলছেন এদেশে তা নেই একেবারে মিছে কথা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না। অথচ, দেশে কিছু যে একটা আছেই, ছেলেবেলা তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত, ইহা সে বড়-বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল এ কথা ত মিথ্যা নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, কর্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায়, হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে জটিল এবং

মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মানুষে যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেইজন্যে তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা বলে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাকতেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁরা সব আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন?

তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব কহিল, হাসলেন যে?

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, আপনার সেই কাকাবাবুটি উপস্থিত থাকলে কিন্তু বুঝতেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানার্কিস্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ববাবু?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপূর্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই অনুচিত হতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। মেম্বরদের এটুকু জানবার অধিকার আছে, এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ ত ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে!

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন। এই সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি ঠিক ব্যঙ্গোক্তির মতই অপূর্বর কানে বাজিল। বিদ্রোহী দলের বাঁধানো খাতায় যাহার নাম লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশি জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই! মনে মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিয়া পরবর্তীকালে বহুবারই তাহাকে

দেখিতে হইয়াছে কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইঁহার মুখের হাসি উদ্বেগে এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে চাহিয়া নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না,—ওই ছোট্ট কথাটুকুর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা তীরের ফলাটুকুর মতই যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, দলের খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেননি?

অপূর্ব কহিল, কিছুই না। পথের-দাবী না পথের-দাবী! দাবীর বহর যে এত, তা কে জানতো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখবার পূর্বে আপনারও ত জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বর করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবিকই আমি এঁদের সভার বিশেষ কিছু জানিনে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার অত্যন্ত বিশ্রী লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সংবরণ করিতে পারিল না, জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ছলনা করচেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপনার এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবেন কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

তাহার কথা শুনিয়া এইবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানার্কিস্টের দল ত? আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন অপূর্ববাবু,

আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েছে। তাদের হল জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল?

অপূর্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, পথের-দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। আপনারা, অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা, তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। সুমিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই। আমি রাজী হয়েছি,—এ ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। হয়ত, কিছুদিন আছি, হয়ত, কালই চলে যেতে পারি; সারাজীবনে আর কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই, এটুকু খবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছবে না।

কথাগুলি শান্ত, ধীর,—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হউক, কিন্তু সব্যসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব কাকাবাবুর মুখে শুনিয়াছে, সেই-সব দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া তাহার বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিঁধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল, সে ত পাষাণ,—তাহার জন্য আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু, সুমিত্রা কে? আপনি তাঁকে জানলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্পকালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের আচরণের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সংবরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাবচেন বলুন ত?

অপূর্ব বলিল, ভাবচি ত অনেক-কিছু, কিন্তু সে যাক। আচ্ছা, আপনি বললেন মানুষের নির্বিঘ্নে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা নির্বিঘ্নে পথ চলচি,—এমনি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, এমনিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব কহিল, ওই যে মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করে পথের-দাবীর সভ্য হতে এসেছেন, ওটাও ঠিক বুঝলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেছি তা বলতে পারিনে। ও-সব ব্যাপার সুমিত্রাই বোঝেন ভাল।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধ হয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিলেন না। এবং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই আশ্চর্য মানুষটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক যেন সে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি—তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্যন্ত যাহা কিছু জানিয়াছে সে তাহার অতীত, যেন কোন্ বহুদূরাঞ্চলে তাঁহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথাও আর নাই। অনতিদূরবর্তী ল্যাম্পপোস্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক ইঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া যাইবার সময় অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই ভয়ঙ্কর-সতর্ক লোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপসা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্তের জন্য যেন তিনি সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

অপূর্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট-দু'য়ের বেশী হইবে না, অকস্মাৎ, অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন অপূর্ববাবু, আপনাকে আমি সত্যিই বলচি, মেয়েদের এই-সব প্রণয়ঘটিত মান-অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা করতে গেলেও নিরর্থক ভারী সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্বর প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারী মুশকিল, এঁদের বাদ দিয়ে কাজও চলে না, নিলেও গণ্ডগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসংবদ্ধ। অপূর্ব নিরুত্তরেই রহিল।

কি হল? কথা কন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, কি বলব বলুন!

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ববাবু, এই ভারতীটি বড় ভাল মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্মঠ এবং তেমনি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিল না যে, আপনি তাহাকে কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া জানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতার যদি এদিকে কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত ত অপূর্বর মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিমনা হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, অপূর্বকে তাহা আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইল না। বক্তা বোধ করি তাঁহার শেষ-কথারই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গেই কথা কইতে তিনি আপনার সম্বন্ধে বলছিলেন, আপনি নাকি ভয়ানক হিন্দু,—একেবারে গোঁড়া। ভারতী বলছিলেন, এতবড় ভয়ঙ্কর হিঁদু বামুনেরও তিনি জাত মেরে দিয়েছেন।

অপূর্ব বলিল, তা হবে। এই একান্ত অন্যমনস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সামনাসামনি আলো-দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট-দশেকের মধ্যেই

গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যাইবে, এমনি সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিলেন, কহিলেন, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্নতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এঁর পথের-দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল এই ক'টি মেয়েমানুষেই সার্থক করে তুলতে পারবে! আপনার একনিষ্ঠ সেবার একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপূর্ব তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়াকে তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্চেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই মঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকাতেই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনে ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না, অপূর্ববাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্বেই বলেচি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবনযাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি দিয়েই ঠেকিয়া রাখতে পারিনে। শুধু ত মনোহরের নয়, বহুলোকের নির্দিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নির্বিঘ্নে

হতো, এ আমি বুঝি, এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করবো কি দিয়ে বলুন ! সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না।

এ কথার ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ববাবু।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত—

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়?—বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবে না, অপূর্ববাবু, আমরা এসে পড়েচি। আর একদিন না হয় এ আলোচনার শেষ করা যাবে।

অপূর্ব সুমুখে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিদ্যালয়-গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী ।

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনাকে সে ডাকতে গিয়েছে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন হুকুমই এত রাত্রে ও-পথে কাউকে পাঠাতে পারবে না। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখেচ?

ভারতী ঠাওর করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও চিনিতে পারিল। কহিল, ভাল করেন নি।

আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরেচে,—বাঁচে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রাদিদি সেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেচে। মরে ত সে মরুক না। কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে নরহরি হলে আপনি এতক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় ঊর্ধ্বশ্বাসেই দৌড়চ্চি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্চি, বলিয়া ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাস্তবিক আর দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু, যান। কিন্তু খ্রীষ্টানের আতিথ্য কি উনি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি যাই কি করে ভারতী? হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি আর দেরি করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সামলাতে পারবো। আপনি দয়া করে একটু শীঘ্র যান।

অপূর্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু, তাহার জন্য একটা লোক মারা পড়িবে ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না। সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই ডাক্তার দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তের

নীচেকার ঘরের দরজা-জানালা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভাল দেখিয়া একটা আরামকেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট-কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তেপায়ার উপরে রাখিতেছে অপূর্ব তখন টের পাইল, কিন্তু সহসা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার ন্যায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর কোন সঙ্গত ছলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্বেও তাহারা একঘরে রাত্রিযাপন করিয়াছে, কিন্তু শরমের বাষ্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। সে তখন মরণাপন্ন, তাহার জ্ঞান ছিল না, সে যে না থাকার মধ্যেই, তথাপি সেই উপলক্ষ্যটুকুকেই হেতু নির্দেশ করিতে পাইয়া অপূর্ব স্বস্তিবোধ করিল। ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে-সকল হাতের কাজ তখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা-জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণ শব্দ-সাড়া উত্থিত হইতে লাগিল, তাহা সত্যকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আসতে হলো!

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানালা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন? সরকার-মশায়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতাম!

কথা শুনিয়া অপূর্বর ঘুম-ভাঙ্গা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম নাকি?

ভারতী লোহার ছিটকিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েছে। খাবার কথাটা তখনি তাঁকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হতো না। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন?

অপূর্ব কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পর্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস্, গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই সার হল । এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার বালাই এখনো আছে, না গেছে? থাকে ত কাপড় দিচ্চি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চলসুদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাবে। আজ ত দেখচি আফিস থেকে একবার বাসায় যাবারও সময় পাননি।

অপূর্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখতে পান যা আমি পাইনে তা স্বীকার করচি, কিন্তু কাপড় বার করবার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাই আমার যায়নি, এ জন্মে যাবেও তা মনে হয় না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তার সুবিধে হবে না। থাক, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব বলিল, আমি জানি তসর কিংবা গরদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি বার করবেন না।

সন্ধ্যা করবেন না?

না।

শোবেন কি পরে? আফিসের ওই কোট-পেন্টুলানসুদ্ধ নাকি?

হাঁ।

খাবেন না?

না।

সত্যি?

অপূর্বর কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ সুর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাশা করচেন নাকি?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাশা ত আপনিই করচেন। আপনার সাধ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্য হইতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ী বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নিভাঁজ পবিত্র। আমিও কোন দিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্চি, হাত-মুখ ধুয়ে ওইখানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও কথা বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব থতমত খাইয়া গেল। তাহার দপ করিয়া মনে পড়িল সেদিন ভোরবেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিন না কাপড়,—আমি নিজেই আলো নিয়ে নীচে যাচ্চি। আমি কিন্তু যার-তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা বলে দিচ্চি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকারমশায় যে ভাল বামুন। গরীব লোক, হোটেল করেছেন, কিন্তু অনাচারী নন। নিজে রাঁধেন, সবাই তাঁর হাতে খায়,—কেউ আপত্তি করে না—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূর্বর কুণ্ঠা ঘুচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা-তা খেতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।

ভারতী হাসিল, কহিল, যা-তা খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে সমস্ত গুছিয়ে আনবো,—তাহলে ত আর আপত্তি হবে না?—এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো এবং কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সে হোটেলের অন্ন আহার করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিঘ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব যখন গরদের শাড়ী পরিয়া নীচের একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আহ্নিকে নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকারমশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে না, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্তুতঃ ফিরিতে তাহার দেরি হইল না। সেই মাত্র অপূর্বর আহ্নিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকারমশায়, হাতে তাঁহার খাবারের থালা একটা বড় পিতলের গামলা দিয়া ঢাকা, তাঁহার পিছনে আর একজন লোক জলের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দেশমত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া ঠাঁই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্নপাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ ম্লেচ্ছের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তারবাবুর। আপনি অসঙ্কোচে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই তাহার রুচি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ ম্লেচ্ছ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না।

বড়ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধাচারিণী মাতাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, ভাল হউক মন্দ হউক সেই মায়ের আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ কথা ভারতী যে একেবারে জানে না তাহাও নয়, অথচ, যখন-তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আসিয়া বসিল, এবং আচ্ছাদন খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভারতী সাবধানে সর্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমিতলে বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ক্রীশ্চান বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের আহারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই যে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া সরকারমশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিল না, তথাপি আবরণ উন্মোচন করায় অন্ন-ব্যঞ্জনের যে মূর্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। অনেকদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ছিদ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লুকাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোটখাটো সামান্য ত্রুটিতে সেই খুঁতখুঁতে মানুষটির খাওয়া নষ্ট হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সে-ই যখন আজ নিঃশব্দ ম্লানমুখে এই কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, থাক থাক, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারব না? কেন?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিয়া তেমনি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারবো, এই বলিয়া সে ভাত ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অসুখ হলে এ বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তাহলে? আজ আবার তলওয়ারকর পর্যন্ত আফিসে আসেন নি,—যা পারি এই দুটি না হয় খেয়ে নি? কি বলেন? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকী রহিল না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিল; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি মরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ববাবু,—হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বরঞ্চ আর কোন ব্যবস্থা করচি।

অনুরোধ অথবা আদেশমত অপূর্ব শান্ত বালকের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকারমশায় এবং তাঁহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন। এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটি; আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব মনে মনে খুশী হইল। এইটুকু সময়ে এতখানি সুব্যবস্থা সে কল্পনাও করে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে অপূর্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল। দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন। কাঠের মেঝেতে দোষ ধরতে গেলে আর বর্মায় বাস করা চলে না।

ভারতী সেইখান হইতেই সহাস্যে কহিল, বলেন কি? আপনার মত যে একেবারে উদার হয়ে উঠল!

অপূর্ব কহিল, না, এতে সত্যই দোষ নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন, ফিরে যাই—আমিও ফিরে এলাম। এখানে যে মাতালের কাণ্ডে খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে কে জানতো?

জানলে কি করতেন?

জানলে? অর্থাৎ,—আমার জন্যে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জানলে আমি কখখনো ফিরে আসতে রাজী হতাম না।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন।

অপূর্বর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখখনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন!

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা-পড়ারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্বর গা জ্বলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস নয়,—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না করব কেন?

অপূর্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব । এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করচেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আপনাকে আমি বলছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েছে?

অপূর্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকেলবেলা সংবাদ নিতে আসা এবং দুপুররাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ই ত। তাইত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জানিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হতো না।সমস্তই ত ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব নীরবে খাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, ভারতী স্নিগ্ধ সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুন ত খাবার কত কষ্টই হল!

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝতে পারচি নে? বলিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা জ্বালাতন করিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, এমনি ধারা সব ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া এই খ্রীষ্টান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্বেষ নয়, কারণ, যে-কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বিদেশে তাহার অন্য কোথাও নাই,—এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় তাহার চিরদিনের জন্য একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়াছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঐ যাঃ—

আর জল নেই নাকি?

আছে বৈ কি! এই বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত নেশা করলে কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে? খাবার জলের ঘটিটা শিবু নীচের টুলটার

ওপর ভুলে রেখে এসেচে,—আমারও পোড়া কপাল চেয়ে দেখিনি। এখন আর ত উপায় নেই, একেবারে আঁচিয়ে উঠেই খাবেন, কি বলেন? কিন্তু রাগ করতে পাবেন না বলে রাখচি।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, এতে আর রাগ করবার কি আছে?

ভারতী আন্তরিক অনুতাপের সহিত বলিল, হয় বৈ কি। খাবার সময় তেষ্টার জল না পেলে ভারী একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চলবে না। আচ্ছা, যাবো, চট করে শিবুকে ডেকে আনবো?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্যে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আনতে? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার নিজেরই কেমন যেন ভারী লজ্জা করিতে লাগিল। কহিল, বাস্তবিক বলচি আপনাকে, আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো,—আপনি মিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো? কখখনো না। আমি জানি দুঃখ করবার আমার কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্চি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের ঘটিটা সুমুখেই আছে,—যেন ভুলে আসবেন না।

অপূর্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ-হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ভুক্তাবশেষ সরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে; দুই-একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সেগুলো যথাস্থানে আনা হইয়াছে, এবং যে ইজিচেয়ারটায় সে ইতিপূর্বে বসিয়াছিল তাহারই একপাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে

করিয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ-হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া সে আরামকেদারায় বসিয়া পড়িল, এবং হেলান দিয়া তৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল!

তাহার চোখের সুমুখ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সর্দি হয়েছে দেখছি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, কৈ, না।

না কেন! গলা ভারী, চোখ ফুলো-ফুলো, দিব্যি ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি! এই রাত্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল!

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জানতো বলুন, ডাক্তারবাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টানতে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন! ভুগতে হল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তা ত হলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টানতে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন?

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ভারতী তেমনি কাজ করিতে করিতেই বলিল, মানে কি ছাই আমিই জানি? কিন্তু দেখচি ত, বর্মায় আপনি পা দেওয়া পর্যন্ত বোঝা টেনে বেড়াচ্চি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তার সেবা করে মলুম আমি। ডেকে আনলেন ডাক্তারবাবু, হাঙ্গামা পোহাতে হচ্চে আমাকে। ভয় হয়, সারা জীবনটা না শেষে আমাকেই

আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয়। কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত?

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি?

ভারতী কহিল, হোটেলে ডাক্তারবাবুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেচি, ব্যবস্থা বোধ হয় হয়েছে।

কে নিয়ে যাবে? আমি ত চিনিনে।

আমিই নিয়ে যাচ্চি, চলুন, ডাকাডাকি করে তাদের তুলি গে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সঙ্কোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ, এ দুটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে যাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গম্ভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও ত পরের বিছানা অপূর্ববাবু, ঘৃণা বোধ না হওয়াই ত ভারী আশ্চর্য। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার হোটেলে শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল না যে, মাত্র ঘণ্টা-কয়েক পূর্বেই তাহার দেওয়া অশুচি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

অপূর্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন? আপনার ত কষ্ট হবে!

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যাহোক একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েছে সে ত আপনি দেখতে পাননি?

অপূর্ব একমাস পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখতে পেয়েছি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে? বেশ, তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখতে পাবেন।

অপূর্ব ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অসুখ,—কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে। কারণ পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার লেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বললে আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি খেতে পারিনে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ, এর জন্যে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোরবেলায় যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না।

ভারতী বলিল, আমার আর যাই কেন না ভুলুন, সে অপরাধ ভুলবেন না!

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল? ঘৃণা?

নিশ্চয়!

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক সূক্ষ্ম,—আছে কি নেই! কিন্তু, আর কাজ নেই আপনি শোন। আমার রাত-জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশী জেগে থাকলে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাকবে না।

এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ না দিয়া র‍্যাকের উপর হইতে গোটা-দুই কম্বল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলিয়া গেল, কিন্তু অপূর্বর নিমীলিত চোখের কোণে ঘুমের ছায়াপাতটুকুও হইল না। ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি স্তব্ধ হইয়া আছে,—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নেই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দুমাত্র অস্বস্তিও সে অনুভব করিল না। তাহার সকল দেহমন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল, এই ঘরে, এই শয্যায়, এই নীরব নিশীথে ঠিক এমন চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর বস্তু আর ত্রিভুবনে নাই। এমন একান্ত ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর কখনও পায় নাই,—তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

সকালবেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মেলিয়াই দেখিল সম্মুখে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পূবের জানালা দিয়া প্রভাত-সূর্যের রাঙ্গা আলো তাহার সদ্যোস্নাত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরনের সাদা গরদের রাঙ্গা পাড়টুকুর উপরে, তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্যাম রঙের উপরে পড়িয়া একেবারে যেন অপরূপ হইয়া অপূর্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত!

তা ত হবে, বলিয়া অপূর্ব শয্যাত্যাগ করিল। আপনার ত দেখচি স্নান পর্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কাল অতিথি-সৎকারে যথেষ্ট ত্রুটি হয়েছে, আজ আমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ, আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সে মেয়েটি বেঁচেছে?

তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—বাঁচবে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এমনি জ্ঞান হইল।

সে স্নান-আহ্নিক সারিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা প্রায় নয়টা। ইতিমধ্যে ঠাঁই করিয়া সরকারমশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ত দেখা হল না! তাঁর অতিথি-সৎকারের বুঝি এই রীতি?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বৈ কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব কহিল, আর ডাক্তারবাবু? যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন? এখনো বোধ হয় তিনি বিছানাতেই পড়ে? এই বলিয়া হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না-শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অসুখ করে না?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। সুখ অসুখ দুই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েছে। মানুষের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই স্মরণ হইল, মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁকে অতিশয় ভক্তি করেন?

ভক্তি করি? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে।

বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধূলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশ মেটে না অপূর্ববাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট করিয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল, সুমিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে মানুষ এতখানি উচ্চে সিংহাসন গড়িয়াছে, জানি না ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন!

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার একপ্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া শুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সরকার-মহাশয়ের জরাজীর্ণ হোটেল-বাড়ির একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশেপাশে নোংরা জল জমিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমনি একটা কদর্য বিশ্রী ঘরে ভারতী যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ব্ববাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিষ্কার করেছেন ডাক্তারবাবু!

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমরা দুঃখী লোকেরা সব কিরকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রাসাদ।

অপূর্ব কহিল, তা হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপ রে বাপ!

ডাক্তার বলিলেন, শুনলাম, কাল রাত্রে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে অপূর্ব্ববাবু, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা করব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব নজর করে নাই, হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাপ করবেন, আমি একেবারে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ব্ববাবু, অন্ধকারের।

অপূর্বর বিস্ময়ের সীমা রহিল না তাঁহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোশাক? কোথাও কি বার হচ্ছেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, পরনে ঢিলা পায়জামা, পায়ে রাওলপিণ্ডির নাগ্রা, একটা চামড়ার ব্যাগে কি-কতকগুলা বান্ডিল বাঁধা।

কহিলেন, আমি ত এখন চলতি অপূর্ব্ববাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এর বেশী বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ব অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ চলতি কি রকম? কোথায় চলতি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি 'হঠাৎ' শব্দ থাকে অপূর্ববাবু? চলতি সম্প্রতি ভামোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাঁচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রি হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভামোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর এখন কিরকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে কখখনো ভেবো না সকলের চোখেই তুমি ধূলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা যেন অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো, না গেলেই নয়।

সুমিত্রা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অপূর্ব ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন যদি তারা কেউ চিনতেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার কহিলেন, ধরে ফেললে বোধ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেনের আর ত সময় নেই অপূর্ববাবু, আমি চললাম। এই বলিয়া তিনি স্ট্র্যাপে-বাঁধা মস্ত বোঝাটা অবলীলাক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও কহিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। সুমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে—বোধ হয় মিনিটখানেক হইবে,—যখন সে নীরবে উঠিয়া

দাঁড়াইল, তখন স্বল্পালোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্বর হাতখানি গতরাত্রির মত মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, চললাম অপূর্ব্ববাবু,—আমি সব্যসাচী।

অপূর্ব্বর মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙ্গা ঘরের রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে কর্তব্যকঠিন, অশেষ বুদ্ধিশালিনী, পথের-দাবীর ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সভানেত্রী কি যে করিতে লাগিলেন, তাহার কিছুই জানা গেল না।

চোদ্দ

ভারতী ও অপূর্ব দু'জনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না।অপূর্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ববাবু, আমরা ঘরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, এ কথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আর ব্যস্ত হতে হতো না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু এটুকু ভুলে গিয়েছিলেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা হবে। কিন্তু, কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার কথাটা ভুলিনি।

অপূর্ব হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার জো নেই, তেওয়ারী-বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না। তার কারণ, আপনি জাগবার পূর্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোরবেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই সংবাদ শুনিয়া অপূর্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয় তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া

খাওয়া শোয়া সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল সকালে তেওয়ারী ব্যাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই বর্মাদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত বাড়িতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয় ত, ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে—পাকা কালির মত, কালি গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচখচ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে, তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই, অপূর্ব তাহা ভাল করিয়াই জানিত। পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনার সকল দিকে চোখ আছে। বাড়িতে বৌদিদিদেরও দেখেচি, অন্য-সব মেয়েদেরও দেখেচি, আমার মাকেও দেখেচি, কিন্তু এমন সর্বদিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখিনি। বাস্তবিক বলচি, আপনি যে বাড়ির গৃহিণী হবেন সে বাড়ির লোকেরা চোখ বুজে দিন কাটিয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছনে হইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হতো বলুন ত! সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামুনের ছেলেকে মেথর-মুদ্দাফরাসে টানা-হেঁচড়া করত।—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল, আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে যেতে হতো।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা কেমন করে বলবেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত, আর কোথাও কেউ থাকতে পারে যে

আপনার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ব নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল, সে ত বটেই।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ি যাবেন?

অপূর্ব অন্যমনস্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোনদিন জীবনে সুখ ভোগ করেন নি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আসতে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবার গেলে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। হঠাৎ ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখুন, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যতই সচ্ছল হোক ভিতরে কিন্তু বড় অনটন! শহরে অধিকাংশ গৃহস্থেরই এমনি দশা! বৌদিদিরা যে-কোন দিন আমাদের পৃথক করে দিতে পারেন। আমি ফিরে যদি না আসতে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাকবে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আসতেই হবে।

মায়ের কাছ থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাকবো?

তাঁকে রাজী করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, কখখনো না। মাকে আপনি জানেন না। আচ্ছা, ধরুন যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখবে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখবো।

আপনি? আপনি ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন।

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুকবো। দু'জনেই হাসিয়া উঠিল। ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি-ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে দিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো,

পৃথিবীর সমস্যা তাহলে খুব সোজা হয়ে উঠতো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা সত্যি। সে বেচারা হাঁড়ি ফেলবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার জলও পড়বে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে ক্রীশ্চান হতেও রাজী হয়ে পড়ে, বলা যায় না।

ভারতী কহিল, সংসারে কিছুই বলা যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মুখ নীচু করিল, তখন অপূর্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, সংসারে এটুকু-কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাকতে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া কহিল, আছেই ত। সেইজন্য তার রাজী হতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা-হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল । অপূর্ব পরিহাস বুঝিতে পারিয়া খুশি হইয়া কহিল, আচ্ছা তামাশা নয়, বাস্তবিক বলচি, আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যি পারেন?

সত্যিই পারি।

অপূর্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারিনে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাওয়া যে কি জিনিস সে ত আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে। কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে, আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী কাজ আমার এখনো বাকী। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন।

অপূর্ব বলিল, দিনের বেলায় আমি ঘুমুই নে। কিন্তু জরুরী কাজটা আবার আপনার কি?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরী কাজ নাকি? আমাকেও দুটি রেঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নীচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি, কেমন করে রাঁধি দেখবেন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে খাবো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে খাবার কথাই বলচি। এই বলিয়া সে হাসিমুখে নীচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তাহলে এখন বাসায় যাই,—তেওয়ারী-বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাচ্চে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। হয়ত সে শুনিতে পায় নাই, হয়ত শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই; কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা এই যে, তাহার অবিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরি করা সাজে না। অথচ, ভিতর হইতে যাওয়ার তাগিদ যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

পনর

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস! তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি কেন? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্যন্ত কখন দিয়ে দিয়েছেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙ্গে!

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙ্গবার হলে তখনি ভাঙ্গতো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হতো। যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন, সরকারমশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁর ঢের কাজ, একটু চটপট করে তাঁকে ছুটি দিন।

দ্বারের বাহিরে যে লোকটি দাঁড়াইয়া ছিল, মুখ বাড়াইয়া সে তাহার ত্বরা নিবেদন করিল।

নীচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব খাবার খাইয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হবে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েচি যে আফিসের ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন, এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থদেহে, বহাল তবিয়তে ঘর আগলাচ্চে,—কোন চিন্তা নাই।

কিন্তু কেন?

ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেচি, প'রে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে-সব নরককুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন?

ভারতী উওর দিল, নইলে, পথের-দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাতব্বর সভ্য, সরজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না, অপূর্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল? পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ওর পাস আছে?

না।

অপূর্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা দু'জনেরই হবে। ক'বছর দেয়?

দেবে না,—চলুন!

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্মা ও চীনাপল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া দু'জনে প্রায় মাইল-খানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বন্ধ-ফটকের কাটা-দরজার ফাঁক দিয়া গলির ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে

কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙ্গালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার-খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই দু-একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা' অনুভব করতে পারছি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পর্দা ঠেলিয়া পায়খানায় ঢুকিতেছিল, পর্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের-দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এ-সকল বালাই কেন?

কয়েকখানা ঘর পরে উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় পিতল ঢালাইয়ের কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মুখ খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতী ডাকিয়া কহিল, মানিক, কার ওপরে রাগ করচ? সুশীল কৈ? সে আজ দু'দিন পড়তে যায় না কেন?

মানিক কোনমতে হাতে-পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাহিয়া চিনিত পারিয়া বলিল, দিদিমণি! এস, বসো। সুশী কি করে তোমার ইস্কুলে যাবে বল?

রাঁধাবাড়া বাসনমাজা মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্চে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত থেকে খারিজ! বড়সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।

ভারতী সহাস্যে কহিল, তা দিয়ো। আর বল ত না হয়, সুমিত্রাদিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফয়ার মাঠে মিটিং, তা মনে আছে ত?

এমন সময় বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাবধানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকী রইল। দেখ বাবা, রাম আইয়া মাতাল হয়ে আমাকে কি বলছিল জানো?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদর্য ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, ও-সব জায়গায় তুমি আর যেয়ো না। তোমার মা কোথায় সুশীলা?

মা? মা ত পরশু রাত্তিরে যদুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘরভাড়া করেচে। মেয়েটা আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু বাপ গর্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্চি! এ বাবা বিয়ে-করা পরিবার, বেউশ্যে নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিতহস্তে স্ক্রুর অভাবে ভাঙ্গা খুন্তির ডগা দিয়া নূতন বোতলের ছিপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্বর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মানিক ছিপি বোতল ও খুন্তির বাঁট লইয়া বীরদর্পে গর্জাইতে লাগিল যে, খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে হয় সে ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল,—হারামজাদা, নচ্ছার, পাজী মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হল না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। তার কারণ এ নরককুণ্ড ত এরা বানায় নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করচে।

অপূর্ব কহিল, না এরা বানায় নি আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেছে! নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখ্খনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ম্লেচ্ছ ক্রীশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্যে কি সৎ-অসৎ বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাবদিহি করবো? কার মাথাব্যথা পড়েচে আমার জন্যে, আপনিই বলুন?

অপূর্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এ-সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে যান বললেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

তাহলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। এই মূর্তি ও কণ্ঠে অপূর্বর অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ নয়? কখখনো না! ডাক্তারবাবুকে না-জানা পর্যন্ত আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবে এসেচি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণশোধ না করে পরিত্রাণ পান! আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের পথের-দাবীর সবচেয়ে বড় সাধনা। চলুন।

অপূর্ব নিরীহ ও নিঃস্পৃহের ন্যায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছু দূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সামনে ক' ঘর বাঙালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?

ভারতী বলিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর ত কেউ সকলের ভাষা জানে না, তিনি সুস্থ থাকলে এ কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন?

জানেন।

আর ডাক্তারবাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা-কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা-কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্তে তাহা কুকুর-শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎবিধানে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন্ পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়াগোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলা প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত-আমাশায় বোধ হয় বাঁচবে না, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁশ জ্বর, এমন একটা পয়সা নেই যে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দি, কি এক বাটি সাগু-বার্লি রেঁধে খাওয়াই। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

অপূর্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পয়সা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পুলির শেকল পড়ে ডান হাতটাই জখম হয়ে গেছে, মাস-খানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবুমশায়?

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায়! হায়! দিনমজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই বলচে কাজ করতে না পার ত ঘর ছেরে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এসো,—কাজ দেবো। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায়? ছোটসাহেবের হাতে-পায়ে ধরে বড়জোর আর হপ্তাখানেক থাকতে পাবো। বিশ বচ্ছর কাজ করছি মশায়, এরা এমনি নেমকহারাম!

কথা শুনিয়া অপূর্ব রাগে জ্বলিতে লাগিল। তাহার এমনি ইচ্ছা করিতে লাগিল ম্যানেজার লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেখায়, সুদিনে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা-উপার্জন করিয়া দিয়াছে আজ দুর্দিনে তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে! অপূর্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ির আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রি করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করে না, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সেই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে, তখনই এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জন্য নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্বর নিষ্ঠুরতায় মানুষ আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে! সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, ঠিক কথাই ত! কে কোথায় করিতেছে আমি ত করি না, অথবা, এমনিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এতবড় ত্রুটির জবাবদিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উপলক্ষ্য। এই হাত-ভাঙ্গা পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাঁচাইতে পারে না তাহার হত্যায়, যে দুর্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সবলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিয়াছে, ইহার বাতি নিভিবে কবে? এই সর্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবে না!

ঘরের একধারে মলিন, শতচ্ছিন্ন শয্যায় ছেলেমেয়ে-দুটি মৃতকল্পের ন্যায় পড়িয়া ছিল, ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব ভয়ে সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু-দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত যাহা মৃত কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে!

চলুন।

অপূর্ব চমকিয়া দেখিল, ভারতী। পাঁচকড়ি নীরবে, ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার, এরা সেরে উঠবে। কাল সকালেই আমি ডাক্তার, ওষুধ-পথ্য সব পাঠিয়ে দেব—

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেছিল, সেই হাত ভারতী হাত বাড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল।

পাঁচকড়ির দৃষ্টি অন্যত্র ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্বও ইহার হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন নিজের জামার পকেট হইতে চার আনার পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, ছেলেদের চার পয়সার মিছরি, চার পয়সার সাগু, আর বাকী দু’ আনার চাল-ডাল এনে তুমি এ বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চললাম। এই বলিয়া অপূর্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি ভারী কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না নিজেও দিলেন না।

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই দুঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে যাহা উঠিত তাই দিত। কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা-পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপ রে! সর্বনাশ করেছিলেন আর কি। বাপ ত মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলেমেয়ে-দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো!

খেতো না! হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

অপূর্ব ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার সব কথায় তামাশা। রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ভারতী কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বলবেন,—মা মনসা, ওলা বিবি—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেব না, সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট!

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এদের মা নেই?

না।

কোথায় কোন আত্মীয়ও নেই বোধ করি?

ভারতী বলিল, থাকলেও কাজে লাগবে না। বছর দশ-বারো পূর্বে পাঁচকড়ি একবার দেশে যায়, কোন এক প্রতিবেশীর বিধবা মেয়েকে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। ছেলে-মেয়ে দুটি তারই; বছর-দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভবযন্ত্রণা এড়িয়েছে,—এই ত পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নরককুণ্ডই বটে!

ভারতী নিতান্ত সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাতে আর লেশমাত্র মতভেদ নেই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, এরা সব ভাই-বোন। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিলবে না অপূর্ববাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখচেন, তিনি কড়ায়-গণ্ডায় এর কৈফিয়ত নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষণকাল পূর্বে এই পাঁচকড়ির ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে-সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ তখন দায়িত্ব আছে বৈ কি।

ভারতী সায় দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখতে পেতাম না, রাগ করে ঝগড়া করতাম। এই-সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে অহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখতে পাই অপূর্ববাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রী থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাঁচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমস্বরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া উভয়কে বসিতে দিল। অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোক মিলিয়া মদ খাইতেছিল।

একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়াগোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,—তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ-ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ-রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধ হয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়েমানুষকে চোখের সুমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, এতবড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যেও ভারতীর মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নাই। এ-সব তাহার সহিয়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে গৃহস্বামীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুনা—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া খামকা একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া প্রাণপণে বেলো করিতে শুরু করিল, তখন এত ভার ভারতীর বোধ হয় সহিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রীমশাই, কাল আমাদের মিটিং—এর কথা বোধ হয় ভোলনি? যাওয়া কিন্তু চাই-ই।

চাই বৈ কি দিদিমণি! এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেলেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতি বাঁধা যায়! এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবে না। কেবল তোমাদের ভালর জন্যেই সুমিত্রাদিদি কি পরিশ্রম করছেন বল ত!

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এ ত সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার ।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন-তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করতে গিয়ে পাঁচকড়ি হাত ভেঙ্গেচে বলে আজ সে খেতে পায় না, তার ছেলেমেয়ে-দুটো ওষুধপথ্যির অভাবে মারা যাচ্চে। ঘর থেকে পর্যন্ত বড়সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়! এই যে ক্রোড় ক্রোড় টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু? এই যে সেদিন শ্যামললালকে ছোটসাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলতো, এ নির্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি! কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো,—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজন মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি বল্টু ঢিল করে রেখে দিতে পারি, যে—কড়্ কড়্ কড়াৎ! ব্যস্! অর্ধেক কারখানাই ফরসা!

ভারতী সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ও-সব কাজ কখখনো করো না! ওতে তোমাদেরই সর্বনাশ। হয়ত, লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এ-সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেয়ো না দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ানক পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের হাসি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তা কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বলচি আমরা পারিনে কি?

ভারতী বলিতে লাগিল, তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে। ওদের কাছে তোমাদের বহু বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।

মেয়ে-পুরুষে এই লইয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। ভারতী কহিল, সন্ধ্যা হয়, এখনো আর এক জায়গায় যেতে হবে। আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে-সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। বাহিরে আসিয়াই ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এ-সব কথা এদের বলতে গেলে কেন?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কি-সব কথা?

অপূর্ব বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল! দুলাল না কি নাম,—কি বললে শুনলে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন কি কাণ্ড করে বসবে, তখন, তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বলবে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে ত মিছে কথা!

অপূর্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা! আরে, ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারো জেল হয়নি নাকি? রাজত্বটাই ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে।

ভারতী বলিল, আমারও না হয় জেল হবে।

অপূর্ব কহিল, তুমি ত বলে ফেললে, না হয় জেল হবে! না না, এ-সব হবে না। এখানে আসা তোমার আর কখখনো—কখখনো চলবে না।

কিছুদূরে একজনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দ্বারে তাহার তালা দেওয়া দেখিয়া উভয়েই সেই পথেই ফিরিল। কালাচাঁদের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, সেই যমুনা প্রবাহিণীর গান তখন থামিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে মদ-মত্ত তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একজন স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া তাহার স্বামীর শোকে কান্না শুরু করিয়াছে, আর একজন তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে যে দেশের কথা বলিয়া আর লাভ নাই,—এইখানেই আবার তোর সব হবে, তুই বরঞ্চ মানত করিয়া পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা দে। অনেকে এই বলিয়া ঝগড়া করিতেছে যে, এই ক্রীশ্চান মেয়েগুলা কারখানায় ধর্মঘট বাধাইয়া দিতে চায়। তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকিবে না, উহাদের লাইনের ঘরে আর আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কালাচাঁদ মিস্ত্রী বুঝাইয়া বলিতেছে যে সে বোকা ছেলে নয়। ইহাদের দৌড়টাই কেবল সে দেখিতেছে। একজন অতিসাবধানী মেয়েমানুষ পরামর্শ দিল যে, খোকাসাহেবকে এই বেলা সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল।

সেখান হইতে ভারতীকে জোর করিয়া দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অপূর্ব তিক্তকণ্ঠে কহিল, আর করবে এদের ভাল? নেমকহারাম! হারামজাদা! পাজী! নচ্ছার! উঃ—পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না! নরক আর আছে কোথায়?

ভারতী মুখপানে চাহিয়া বলিল, হঠাৎ হ'ল কি আপনার?

অপূর্ব কহিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি জানতাম। কিন্তু তুমি শুনলে কি না, তাই বল!

ভারতী বলিল, নূতন কিছুই নয়, এ-রকম ত আমরা রোজ শুনি।

অপূর্ব গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, এমনি শয়তানি? এমনি কৃতঘ্নতা? এদের চাও তুমি দলে আনতে— দলবদ্ধ করতে? এদের চাও তুমি ভাল?

ভারতী কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ, সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, এরা কারা অপূর্ব্ববাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনি ভুলচেন, তখনি আপনার গোল বাধচে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কথা থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে ত এইখানে। ভাল ত ডাক্তারবাবুর করা যায় না অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব এ কথার কোন জবাব দিল না।

দুজনে নিঃশব্দে ফটক পার হইয়া আবার সেই বর্মাপাড়ার ভিতর দিয়া বাজারের পথ ঘুরিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৃহস্থের ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, পথের দুধারে ছোট ছোট রাত-দোকান বসিয়া বেচাকেনা আরম্ভ হইয়াছে,—ইহারই মধ্যে দিয়া ভারতী মাথার কাপড় কপালের নীচে পর্যন্ত টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে লোকালয় শেষ হইয়া যেখানে জলা ও মাঠ শুরু হইল, সেইখানে তেমাথায় আসিয়া সে পিছনে চাহিয়া কহিল, আপনি বাসায় যান ত শহরে যাবার এই ডান দিকের পথ।

অপূর্ব অন্যমনস্ক হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন?

ভারতী বলিল, এতক্ষণে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। যথাযোগ্য সম্বোধনের ভাষা মনে পড়েছে।

তার মানে?

তার মানে রাগের মাথায় এতক্ষণ আপনি-তুমির ভেদাভেদ ছিল না। এখন ফিরে এল।

অপূর্ব অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আপনি রাগ করেন নি?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একটু করলেই বা। চলুন।

আবার যাবো?

যাবেন না ত কি অন্ধকার পথে আমি একলা যাবো?

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি করিল না। আজ মনের মধ্যে তাহার অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাতালগুলার কথা সে কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এ-সব হল সুমিত্রার কাজ, আপনার ওখানে মোড়লি করতে যাবার দরকার কি? কে কোথায় কি করে বসবে, আর আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে।

ভারতী বলিল, পড়লই বা।

অপূর্ব বলিল, বা রে পড়লই বা! আসল কথা হচ্চে সর্দারি করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আরো ত ঢের জায়গা আছে।

একটা দেখিয়ে দিন না!

আমার বয়ে গেছে।

খানিকটা খুঁড়িয়া রাস্তার এই স্থানটা মেরামত হইতেছিল। যাইবার সময় দিনের বেলা কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুপাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ভাঙ্গা পথটা অন্ধকারে একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী হাত বাড়াইয়া অপূর্বর বাঁ হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, স্বভাব ত আমার যাবে না, অপূর্ববাবু, কিছু একটা করাই চাই। কিন্তু আপনার মত আনাড়ীর ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি।

আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। এই বলিয়া সে সাবধানে ঠাহর করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

ষোল

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সুমিত্রার নেতৃত্বে ফয়ার মাঠে যে সভা আহূত হইল তাহাতে লোকজন বেশী জমিল না, এবং বক্তৃতা দিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। নানা কারণে সভার কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল এবং আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। সুমিত্রার নিজের বক্তৃতা ভিন্ন বোধ করি এই সভায় উল্লেখযোগ্য কিছুই হইতে পাইল না, কিন্তু তাই বলিয়া পথের-দাবীর এই প্রথম উদ্যমটিকে ব্যর্থ বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। কারণ মুখে মুখে চারিদিকের মজুরদের মধ্যেও যেমন ব্যাপারটা প্রচারিত হইয়া পড়িতে বাকী রহিল না, তেমনি কারখানার কর্তৃপক্ষদের কানেও কথাটা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। যেমন করিয়া হউক, ইহাই সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমনি শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য! কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কানে ধরিয়া মজুরদের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইবেন, এবং তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, নিজের মুখেই সে-সকল কথা তিনি প্রকাশ্যে বিবৃত করিয়াছেন। যাহারা খবর না পাওয়ার জন্য সেদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতে সকল কথা শুনিতে পায় নাই তাহারা আগামী শনিবারে গিয়া যেন মাঠে উপস্থিত হয়।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যতগুলা কল-কারখানা ছিল, এই সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রাকে কয়টা লোকেই বা চোখে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রূপ ও শক্তির খ্যাতি অতিরঞ্জিত, এমন কি অমানুষিক হইয়াই যখন লোকের কানে গেল, তখন এই অশিক্ষিত মজুরদের মধ্যে সহসা যেন একটা

সাড়া পড়িয়া গেল। চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সব চেয়ে বেশী। সুমিত্রার সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাহাদের কাছে কিছুই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না,—এটা প্রায় একপ্রকার স্থির হইয়া গেল যে, একটা রোজ কামাই করিয়া শনিবার দিন ফয়ার মাঠে হাজির হইতেই হইবে। তাঁহার কথা ও উপদেশের মধ্যে এমন পরশ-পাথর যদি-বা কিছু থাকে যাহা দিয়া দিনমজুরদের দুঃখের কপাল রাতারাতি একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙ্গা হইয়া উঠিবে তা হইলে যেমন করিয়া হউক সে দুর্লভ বস্তু তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

সেদিন বৈকালের সভায় বক্তার অভাবে অপূর্বর মত আনাড়ীকেও সনির্বন্ধ উপরোধের তাড়নায় বাধ্য হইয়া দুই-চারিটা কথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে হইয়াছিল। বলার অভ্যাস তাহার কোনকালে ছিল না, বলিয়াও ছিল সে অতিশয় বিশ্রী এবং এজন্য মনে মনে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়াই ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যখন খবর পাইল তাহাদের সেদিনকার বক্তৃতা বৃথা ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ফল এতদূরে গড়াইয়াছে যে তাহাদের আগামী সভায় সমস্ত কল-কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া কারিকরের দল উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন শ্লাঘায় ও আত্মপ্রসাদের আনন্দে বুকের মধ্যেটা তাহার ফুলিয়া উঠিল। সেদিন নিজের বক্তব্যকে সে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভয় ভাঙ্গিয়াছিল।

বহুলোকের মাঝখানে উঠিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলার মধ্যে যে নেশা আছে, সেদিন সে তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, আজ আফিসে আসিয়াই সুমিত্রার চিঠির মধ্যে বহুবিধ প্রশংসার সঙ্গে আগামী সভার জন্যও পুনরায় বক্তার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আফিসের কাজে মন দিতে পারিল না, এবং কি করিয়া আরও বিশদ, আরও সতেজ ও আরও সুন্দর করিয়া বলা

যায় তখন হইতে মনে মনে তাহার ইহারই মহলা চলিতে লাগিল। দুপুরবেলা টিফিন খাইতে বসিয়া আজ সে হঠাৎ রামদাসের কাছে এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদিন তাহারই জন্য সে ভারতীকে অপমান করিয়াছিল, সেই অবধি তাহার লেশমাত্র সংস্রবের কথাও এই লোকটির কাছে বলিতে অপূর্বর অত্যন্ত লজ্জা করিত। আদালতে সেই জরিমানার দিন হইতে গণনার হিসাবে কত দিনই বা গত হইয়াছে! ইহার মধ্যে সেই দুর্দান্ত বর্বর সাহেবটা মরিয়াছে, তাহার বাঙালী স্ত্রী মরিয়াছে এবং তাহাদের সেই শয়তান ক্রীশ্চান মেয়েটাও ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে—এইটুকুই শুধু রামদাস জানিত। কিন্তু এই অবসরটুকুর মধ্যেই যে সেই ঘরছাড়া মেয়েটির সহিত নিঃশব্দ গোপনে তাহার বন্ধুর জীবনে কতবড় কাব্য ও কতবড় দুঃখের ইতিহাস দুঃসহ দ্রুতবেগে রচিত হইয়া উঠিতেছিল সে তাহার কোন খবরই পায় নাই। আজ পুলকের আতিশয্যে সকল কথাই যখন অপূর্ব ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিল, তখন রামদাস তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তারবাবু, নবতারা, এমন কি সেই মাতালটার পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের পথের-দাবীর কর্ম ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া সেদিনকার লাইনের ঘরে অভিযানের বিবরণ যখন একটি একটি করিয়া দিতে লাগিল তখন পর্যন্তও রামদাস একটা প্রশ্ন করিল না। একদিন দেশের জন্য এই লোকটি জেল খাটিয়াছে, বেত খাইয়াছে, হয়ত আরও কত-কি নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেবল একটি দিন ছাড়া যাহার কোন বিবরণ কোনদিন সে রামদাসের কাছে শুনিতে পাই নাই, তথাপি তাহাকেই কল্পনায় বাড়াইয়া লইয়া অপূর্ব আফিসের মধ্যে বড় হইয়াও আপনাকে সর্বদাই ছোট না ভাবিয়া পারিত না। ক্ষুদ্রতা তাহার ছিল না, রামদাস তাহার বন্ধু—বন্ধুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু বড় ও ছোটর ভাবটাও সে মন হইতে তাড়াইতে পারিত না। এমনি করিয়াই এই দুটি বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ সুমিত্রার পত্রখানি সে রামদাসের চোখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নিজেকে পথের-

দাবীর একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং দেশের কাজে নিয়োজিত-প্রাণ বলিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া একদণ্ডেই যেন সে বন্ধুর সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

চিঠিখানি ইংরাজিতে লিখা, তলওয়ারকর আদ্যোপান্ত বার-দুই তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুজী, এ-সকল কথা আমাকে আপনি একদিনও বলেন নি কেন?

অপূর্ব কহিল, বললেও কি এখন আর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন?

তলওয়ারকর বলিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাকে ত আপনি যোগ দিতে ডাকেন নি।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অভিমানের সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই অপূর্বর কানে বাজিল, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তার কারণ আছে রামদাসবাবু। আপনি ত জানেন, এ-সব কাজের কতবড় দায়িত্ব, কতবড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন, আপনি গৃহস্থ,—তাই আপনাকে এই ঝড়ের মধ্যে আর ডাকতে চাইনি।

তলওয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয়?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলওয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অন্যত্র আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এ বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলওয়ারকর কহিল, বোধ হয়! তা হতে পারে। কিন্তু বিজিত, পরাধীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ববাবু। তার যে আর কোন নাম নেই এ কথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম, মাতৃভূমির সেবা

তার চেয়ে বড় ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্মাচরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজী, আমি কখনো বিবাহ করতাম না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই যুক্তিকে সে মনে মনে সমর্থন করিল না। একদিন স্বদেশের কাজে এই লোকটি বহু দুঃখ পাইয়াছে, আজও তাহার অন্তরের তেজ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, সামান্য প্রসঙ্গেই সহসা তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু সে সত্য সত্যই প্রত্যাশা করিল না। আহ্বান করিলেই সে যে স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইয়া, তাহাদের প্রতিপালনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া পথের-দাবীর সভ্য হইতে ছুটিয়া যাইবে ইহা সে বিশ্বাসও করিল না, ইচ্ছাও করিল না। স্বদেশ সেবার অধিকারের স্পর্ধা এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উঁচু হইয়া গিয়াছিল। সহসা এ প্রসঙ্গ সে বন্ধ করিয়া আগামী সভার হেতু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধুর কাছে কিন্তু এখন সরলকণ্ঠেই ব্যক্ত করিল যে, সেই একটি দিন ভিন্ন জীবনে কখনো সে বক্তৃতা করে নাই; সুমিত্রার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একের কথা বহুজনকে শুনাইবার মত ভাষা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তাহার আয়ত্ত নয়।

তলওয়ারকর জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন তাহলে?

অপূর্ব বলিল, বক্তৃতা করার মত কেবল একটি দিনই জীবনে আমার কারখানা দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তাদের কুলী-মজুরেরা যে অধিকাংশই পশুর জীবন যাপন করে এ আমি অসংশয়ে অনুভব করে এসেছি, কিন্তু কেন, কিসের জন্য তার ত কিছুই জানিনে।

রামদাস হাসিয়া কহিল, তবুও আপনাকে বলতে হবে? নাই-ই বললেন।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এতবড় মর্যাদা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

রামদাস নিজেই তখন বলিল, আমি কিন্তু এদের কথা কিছু কিছু জানি।

কেমন করে জানলেন?

বহুদিন এদের মধ্যে ছিলাম অপূর্ববাবু। আমার চাকরির সার্টিফিকেটগুলো একবার চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন দেশে আমি কলকারখানা, কুলী-মজুর নিয়েই কাল কাটিয়েছি। যদি হুকুম করেন ত অনেক দুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাতে পারি। বাস্তবিক, এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায় বাবুজী।

অপূর্ব কহিল, সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই বলেন।

রামদাস কহিল, না বলে ত উপায় নেই। এবং জানেন বলেই ত পথের-দাবীর কর্ত্রী তিনি। বাবুজী, আত্মত্যাগের উৎসই ঐখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর পরে, ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উদ্যম, সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত দুদিনে শুকিয়ে উঠবে!

কথাগুলা অপূর্ব এই নূতন শুনিল না, কিন্তু রামদাসের বুকের মধ্যে হইতে যেন তাহারা সশব্দে উঠিয়া আজ তাহার বুকের উপর তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। রামদাস আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ পর্দা সরাইয়া সাহেব প্রবেশ করিতে দুজনেই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব অপূর্বকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি চললাম। তোমার টেবিলের উপরে একটা চিঠি রেখে এসেচি, কালই তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। উভয়েই ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল বেলা চারিটা বাজিয়া গেছে।

সতর

সাহেব চলিয়া গেলে আজ একটুখানি সকাল-সকাল আফিসের ছুটি দিয়া উভয়ে ফয়ার মাঠের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পাঁচটায় মিটিং শুরু হইবার কথা, তাহার আর বিলম্ব নাই। এই দিকটায় গাড়ি মিলে না, সুতরাং একটু দ্রুত না গেলে সময়ে পৌঁছানো যাইবে কিনা সন্দেহ। পথের মধ্যে অপূর্ব কথাবার্তা প্রায় কিছুই বলিল না। তাহার জীবনের আজ একটা বিশেষ দিন। আশঙ্কা ও আনন্দের উত্তেজনায় তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। কারিকর ও কুলী-মজুরদের সম্বন্ধে কতক একখানা পুস্তক হইতে, এবং কতক রামদাসের নিকট সে যোগাড় করিয়া লইয়াছিল, সেই-সমস্ত মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ব নিঃশব্দে মহলা দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ের কোন্খানে সর্বপ্রথমে তুলার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তারপরে সেইগুলা বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, তখন কুলী-মজুরদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, কিরূপ দিনরাত্রি মেহন্নত করিতে হইত, এবং এই লইয়া কবে বিলাতের তূলার কলের মালিকদের সহিত ভারতবর্ষীয় মালিকদের প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং কারখানা-আইন কোন্ সনের কোন্ তারিখে কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া পাস হইয়া এদেশে প্রথম প্রচলিত হয় এবং শর্ত তাহাতে কি ছিল, এবং এখনই বা সেই আইন পরিবর্তিত হইয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তখনকার ও এখনকার বিলাতের ও ভারতবর্ষের মজুরির হারে পার্থক্য কতখানি, ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কল্পনা কবে এবং কে উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, সে-দেশের ও এ-দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে সুনীতি ও দুর্নীতির তুলনামূলক আলোচনা করিলে কি দেখা যায় এবং সংসারে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে কোথায় নিদিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি সংগ্রহমালার কোথাও না খেই হারাইয়া

যায় এই ভয়ে সে আপনাকে আপনি বার বার সর্তক করিল। তাহার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ সে ভুলিয়া যাইবে না, অনেকগুলা একজামিন ভাল করিয়া পাস করার ফলে এ ভরসা তাহার ছিল। সুতরাং মুখ দিয়া তাহার এই-সকল নিরতিশয় সারগর্ভ বাক্যধারা কখনো বা উচ্চ-সপ্তকে, কখনো বা গম্ভীর খাদে, কখনো বা হুঙ্কার-শব্দে গর্জিয়া গর্জিয়া এক সময়ে যখন সমাপ্ত হইবে তখন বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি-ধ্বনি হয়ত বা সহজে থামিতেই চাহিবে না। সুমিত্রার প্রসন্ন দৃষ্টি সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আর ভারতী! এইটুকু সময়ে এতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে যে কি করিয়া আয়ত্ত করিল ইহারই আনন্দিত বিস্ময়ে মুখ তাহার সমুজ্জ্বল ও চোখের দৃষ্টি সজল হইয়া একমাত্র তাহারই মুখের পরে নিপতিত হইয়াছে, কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া অপূর্বর শিরার রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপের সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তলওয়ারকরের পক্ষে আজ যেন দুরূহ হইয়া পড়িল। তাহারা মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল তথায় তিল ধারণের স্থান নাই, লোক জমিয়াছে যে কত তাহার সংখ্যা হয় না। সেদিনকার বক্তা হিসাবে অপূর্বকে যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যাহারা চিনিত না তাহারাও দেখাদেখি সরিয়া দাঁড়াইল। বিপুল জনতার মাঝখানে মাচা বাঁধা। ডাক্তার আজিও ফিরেন নাই, তাই শুধু তিনি ছাড়া পথের-দাবীর সকল সভ্যই উপনীত। বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া অপূর্ব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাচার উপরে একখানা বেঞ্চ তখনও খালি ছিল, চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া সুমিত্রা সেইখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মাচার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিতেছিল, বোধ করি সে জবাব-পাওয়া মিস্ত্রী কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে, অপূর্বদের অভ্যাগমে ক্ষণকালমাত্র বাধা পাইয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ তেজে চীৎকার করিতে লাগিল। ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয়

না, শুধু মন্দ যে কত মন্দ অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রীর প্রচণ্ড বলার মধ্যে বোধ করি এই গুণটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় শ্রোতার দল যে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাইতেছিল। অকস্মাৎ কি যেন একটা ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিল। মাঠের কোন্ এক প্রান্ত হইতে অগণিত চাপাকণ্ঠে সত্রাস কলরব উঠিল, এবং পরক্ষণেই দেখা গেল বহু লোক ঠেলাঠেলি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং তাহাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পিষিয়া মাড়াইয়া প্রকাণ্ড বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশ জন গোরা পুলিশ কর্মচারী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের একহাতে লাগাম এবং অন্য হাতে চাবুক,—কোমরবন্ধে পিস্তল ঝুলিতেছে। তাহাদের কাঁধের লোহার জাল ঝকঝক করিতেছে, এবং রাঙ্গা মুখ ক্রোধে ও অস্তমান সূর্যকিরণে একেবারে সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিল তাহার বজ্রকণ্ঠ হঠাৎ কখন নীরব হইল, এবং মঞ্চ হইতে নীচের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে যে কি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না।

সর্দার গোরা মঞ্চের ধারে ঘেঁষিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, মিটিং বন্ধ করিতে হইবে।

সুমিত্রা এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উপবাসক্লিষ্ট মুখের পরে পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সে কহিল, হুকুম।

কার হুকুম?

গবর্নমেন্টের।

কিসের জন্য?

স্ট্রাইক করার জন্য মজুরদের ক্ষ্যাপাইয়া তোলা নিষেধ।

সুমিত্রা বলিল, বৃথা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখবার আমাদের সময় নেই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য।

সাহেব চমকিয়া কহিল, দলবদ্ধ করা? ফার্মের বিরুদ্ধে? সে ত এদেশে ভয়ানক বে-আইনি। তাতে নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হতে পারে।

সুমিত্রা কহিল, নিশ্চয়, পারে বৈ কি! যে দেশে গবর্নমেন্ট মানেই ইংরাজ ব্যবসায়ী, এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা—

বক্তব্য তাহার শেষ হইতে পাইল না, গোরার রক্তচক্ষু আগুন হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া বলিল, দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করলে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

সুমিত্রার আচরণে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না, শুধু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল। কহিল, সাহেব, আমি অসুস্থ এবং অতিশয় দুর্বল। না হলে শুধু দ্বিতীয়বার কেন, এ কথা একশ'বার চীৎকার করে এই লোকগুলিকে শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার শক্তি নেই। এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

এই পীড়িত রমণীর সহজ শান্ত হাসিটুকুর কাছে সাহেব মনে মনে বোধ হয় লজ্জা পাইল, অল্রাইট্! আপনাকে সাবধান করে দিলাম। ঘড়ি খুলিয়া কহিল, মিটিং বন্ধ করবার আমার হুকুম আছে, কিন্তু ভেঙ্গে দেবার নেই। দশ মিনিট সময় দিলাম, দু'চার কথায় এদের শান্তভাবে যেতে বলে দিন। আর কখনো যেন এরূপ না হয়।

কিছুদিন হইতে প্রায় উপবাসেই সুমিত্রার দিন কাটিতেছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ সামান্য একটু জ্বর লইয়াই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন শ্রান্তি ও অবসাদ তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। চৌকির পিঠে

মাথা হেলান দিয়া সে অস্ফুটে ডাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবু, দশ মিনিট মাত্র সময় আছে,—হয়ত তাও নেই। চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিন সঙ্ঘবদ্ধ না হলে এদের আর উপায় নেই। কারখানার মালিকেরা আজ আমাদের যে অপমান করলে মানুষ হলে এরা যেন তার শোধ নেয়। বলিতে বলিতে তাহার দুর্বল কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু সভানেত্রীর এই আদেশ শুনিয়া অপূর্বর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বিহ্বলনেত্রে সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া কহিল, উত্তেজিত করা কি বে-আইনী হবে না?

সুমিত্রা বিস্মিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, পিস্তলের জোরে সভা ভেঙ্গে দেওয়াই কি আইনসঙ্গত? বৃথা রক্তপাত আমি চাইনে, কিন্তু এই কথাটা সকল শক্তি দিয়ে আপনি শুনিয়ে দিন আজকের অপমান শ্রমিকেরা যেন কিছুতেই না ভোলে।

পথের-দাবীর অন্য চার-পাঁচজন পুরুষ সভ্য যাহারা মঞ্চের পরে আসীন ছিল, চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তাহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত, কারিগর কিংবা এমনি কিছু হইবে। অপূর্ব নূতন হইলেও সমিতির শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য। এত বড় জনতাকে সম্বোধন করিবার ভার তাই তাহার প্রতি পড়িয়াছে। অপূর্ব শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমি ত হিন্দি ভাল জানিনে।

সুমিত্রা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তথাপি কহিল, যা জানেন তাতেই দু'কথা বলে দিন অপূর্ববাবু, সময় নষ্ট করবেন না।

অপূর্ব সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভারতী মুখ ফিরাইয়া ছিল, তাহার অভিমত জানা গেল না, কিন্তু জানা গেল সর্দার-গোরার মনের ভাব। তাহার সহিত অত্যন্ত কাছে, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন চোখাচোখি হইল। বলিবার জন্য অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই দুটি কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে বাংলা ইংরাজি হিন্দি কোন ভাষাই ব্যক্ত হইল না। কেবল একান্ত পাণ্ডুর মুখের পরে ব্যক্ত যাহা হইল, তাহা আর যাহারই হউক পথের-দাবীর সভ্যদের জন্য নহে।

তলওয়ারকর উঠিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি বাবুজীর বন্ধু। আমি হিন্দি জানি। আদেশ পাই ত ওঁর বক্তব্য আমি চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়ে দিই। ভারতী মুখ ফিরাইয়া চাহিল, সুমিত্রা বিস্মিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল এবং এই দুটি নারীর উন্নদ্ধ চোখের সম্মুখে লজ্জিত, অভিভূত, বাক্যহীন অপূর্ব স্তব্ধ নতমুখে জড়বস্তুর মত বসিয়া পড়িল।

রামদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং, তাহার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে বিক্ষুব্ধ, ভীত, চঞ্চল জনসমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভাই সব! আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু এরা গায়ের জোরে আমাদের মুখ বন্ধ করেছে। এই বলিয়া সে আঙুল দিয়া সুমুখের পুলিশ সওয়ারগণকে দেখাইয়া বলিল, এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ, তোমরাও যে তাদেরি মত মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ, এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়।

শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! তোমাদের গায়ের জোরকে

তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়! অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশী তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোন দিন দেবে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন! আর সেই কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করার অপরাধেই কি আজ এই গোরাগুলোর কাছে আমার লাঞ্ছনাই সার হবে! দরিদ্রের এই বাঁচবার লড়াইয়ে তোমরা কি সকল শক্তি দিয়ে যোগ দিতে পারবে না?

সর্দার-গোরা এদেশে যেটুকু হিন্দি-ভাষা জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহাতে বক্তৃতার মর্ম প্রায় কিছুই বুঝিল না, কিন্তু সমবেত শ্রোতৃবর্গের মুখে-চোখে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নিজেও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার রিস্টওয়াচের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, আপনি শেষ করুন।

তলওয়ারকর কহিল, শুধু পাঁচ মিনিট! তার বেশী এক মুহূর্তও নয়! তবুও এই অমূল্য ক'টি মিনিট আমি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না। ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে আমার মিনতি—আমাদের তোমরা অবিশ্বাস করো না। শিক্ষিত বলে, ভদ্রবংশের বলে, কারখানায় দিনমজুরি করিনে বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি। আজ হয়ত না বুঝতেও পারো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এই পথের-দাবীর চেয়ে বড় বন্ধু এ-দেশে তোমাদের আর কেউ নেই। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও কঠিন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, আমি বহুদিন তোমাদের মধ্যে কাজ করে এসেছি, আমাদের তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। যাদের তোমরা মনিব বলে জানো, একদিন আমি তাদেরই একজন ছিলাম,।

তারা কিছুতেই তোমাদের মানুষ হ’তে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে রাখতে পারে, আর কোন মতেই না—এই কথাটা আজ তোমাদের না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত—তাদের মুখ থেকে এই-সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেছ। তাই, যখনই তোমরা তোমাদের দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকেই দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেছে,—কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেছে,—ভাল না হলে কারও উন্নতিই কোন দিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসঙ্কোচে এবং একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়; তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী।

তাদের অসত্যকে আজ তোমাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রবলকণ্ঠে তোমাদের ঘোষণা করতেই হবে কেবল টাকাই সবটুকু নয়। বলিতে বলিতে তাহার নীরস কণ্ঠ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই, শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক,—ঠিক তোমাদের মতই সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী। এমনি সময়ে কে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সর্দার-গোরার কানে কানে কি একটা কথা বলিতেই তাহার রক্তচক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উগ্র হইয়া উঠিল। সে গর্জন করিয়া বলিল, স্টপ্! এ চলবে না। এতে শান্তি ভঙ্গ হবে।

অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। রামদাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—থামো, রামদাস থামো। এই নিঃসহায় নির্বান্ধব বিদেশে যে তোমার স্ত্রী আছে,—তোমার ছোট্ট একফোঁটা মেয়ে আছে!

রামদাস কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—এরা অন্যায়কারী! এরা ভীরু! সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের শুনতে দিতে চায় না! কিন্তু এরা জানে না সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী! সে অমর! গোরা ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সহস্র লোকের সর্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া যেন তীক্ষ্ণ উত্তাপের ঝাঁজ তাহার মুখে লাগিল। সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এ চলবে না। এ রাজদ্রোহ!

চক্ষের পলকে পাঁচ-ছয়জন ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রামদাসের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া নীচে নামাইল। তাহার দীর্ঘদেহ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের মাঝখানে এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কিছুতেই চাপা পড়িল না, এই বিক্ষুব্ধ বিপুল জনতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ভাই সকল, কখনো হয়ত আর আমাকে দেখবে না, কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার মর্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকো ত এতবড় উৎপীড়ন, এতবড় অপমান তোমরা সহ্য করো না!

কিন্তু কথা তাহার শেষ না হইতেই যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।ঘোড়া ছুটিল, চাবুক চলিল, এবং অবমানিত অভিভূত উত্রস্ত শ্রমিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাহার ঘাড়ে পড়িল এবং কে যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

জন-কয়েক দলিত পিষ্ট আহত লোক ছাড়া সমস্ত মাঠ জনশূন্য হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাহারা তখনও চলিয়াছিল তাহাদেরই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সুমিত্রা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এবং তাহারই অনতিদূরে বসিয়া অপূর্ব ও আর একজন নির্বাক নতমুখে তেমনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

যে ব্যক্তি গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে গাড়ি লইয়া আসিলে সুমিত্রা নিঃশব্দে ভারতীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। নিজে হইতে কথা না কহিলে তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করিতে কেহ তাঁহাকে ব্যর্থ প্রশ্ন করিত না। বিশেষতঃ, আজ তিনি অসুস্থ, শ্রান্ত ও উৎপীড়িত। ভারতী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, চলুন।

অপূর্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমাকে যেতে বলেন?

ভারতী কহিল, আমার বাড়িতে।

অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। শেষে আস্তে আস্তে বলিল, আপনারা ত জানেন সমিতির আমি অযোগ্য।ওখানে আর ত আমার ঠাঁই হতে পারে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, তা হলে কোথায় এখন যাবেন? বাসায়?

বাসায়? একবার যেতে হবে,—এই বলিয়াই অপূর্বর চক্ষু সজল হইয়া আসিল; তাহা কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, কিন্তু এই বিদেশে আর একটা জায়গায় যে কি করে যাব আমি ভেবে পাইনে ভারতী!

সুমিত্রা গাড়ির মধ্যে হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এস।

ভারতী পুনশ্চ কহিল, চলুন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পথের-দাবীতে আর আমার স্থান নেই।

ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া একমুহূর্ত তাহার মুখের পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল, পথের-দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে, কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন ত কিছুই নেই, অপূর্ববাবু!

গাড়ি হইতে সুমিত্রা পুনশ্চ অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমাদের আসতে কি দেরি হবে ভারতী?

ভারতী হাত নাড়িয়া গাড়োয়ানকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিয়া কহিল, আপনি যান, এটুকু আমরা হেঁটেই যাবো।

পথে চলিতে চলিতে অপূর্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি আমার সঙ্গে চল ভারতী!

ভারতী কহিল, সঙ্গেই ত যাচ্ছি।

অপূর্ব বলিল, সে নয়। তলওয়ারকরের স্ত্রীর কাছে আমি কি করে যাবো, কি গিয়ে তাঁকে বলব, কি তাঁর উপায় করব আমি ত কোন মতেই ভেবে পাইনে। রামদাসকে এখানে সঙ্গে করে আনবার দুর্বুদ্ধি আমার কেন হল?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিতে লাগিল, এই বিদেশে হঠাৎ কি সর্বনাশই হয়ে গেল! আমি ত কূলকিনারা দেখতে পাইনে।

ভারতী কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পরে অপূর্ব উপায়হীন দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সহসা গর্জিয়া উঠিল, আমার দোষ কি? বারবার সাবধান করে দিলেও কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে তাকে বাঁচাবো আমি কি করে? আমি কি বলেছিলাম যা-তা বক্তৃতা দিতে! স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, ঘর-সংসার আছে এ হুঁশ যার নেই—সে মরবে না তো মরবে কে? খাটুক আবার দু'বছর জেল!

ভারতী বলিল, আপনি কি তাঁর স্ত্রীর কাছে এখন যাবেন না?

অপূর্ব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, যেতে হবে বৈ কি! কিন্তু, সাহেবকেই বা কাল কি জবাব দেব? তোমাকে কিন্তু বলে রাখছি ভারতী, সাহেব একটা কথা বললেই আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

দিয়ে কি করবেন?

বাড়ি চলে যাবো। এদেশে মানুষ থাকে?

ভারতী বলিল, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টাও করবেন না?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল না একজন ভাল ব্যারিস্টারের কাছে যাই ভারতী। আমার প্রায় এক হাজার টাকা আছে,—এতে হবে না? আমার ঘড়িটড়িগুলো বিক্রি করলে হয়ত, আরও পাঁচ-ছ'শ টাকা হবে। চল না যাই।

ভারতী বলিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে যাওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অপূর্ববাবু! আমার সঙ্গে আর যাবেন না, এইখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে যান। তাঁর কি চাই, কি অভাব, অন্ততঃ একটা খবর দেওয়াও যে বড় দরকার।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। ভারতী বলিল, এটুকু আমি একাই যেতে পারবো, আপনি ফিরুন।

জবাব দিতে বোধ হয় অপূর্বর বাধিতেছিল, কিন্তু ক্ষণেকমাত্র। তাহার পরেই কহিল, আমি একলা যেতে পারব না।

ভারতী বলিল, বাসা থেকে তেওয়ারীকে না হয় সঙ্গে নেবেন।

না, তুমি সঙ্গে চল।

আমার যে জরুরি কাজ আছে!

তা হোক, চল।

কিন্তু কেন আমাকে এত করে জড়াচ্চেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, কহিল, আচ্ছা, চলুন আমার সঙ্গে। নিজের কাজটুকু আগে সেরে নিই।

পথের মধ্যে ভারতী সহসা এক সময়ে কহিল, যে আপনাকে চাকরি করতে বিদেশে পাঠিয়েছে সে আপনাকে চেনে না। তিনি মা হলেও, না। তেওয়ারী দেশে যাচ্চে, আমি নিজে গিয়ে উদ্যোগ করে তার সঙ্গে আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল। ভারতী বলিল, কৈ, উত্তর দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, উত্তর দেবার কিছু ত নেই। মা বেঁচে না থাকলে আমি সন্ন্যাসী হতুম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, সন্ন্যাসী? কিন্তু মা ত বেঁচে আছেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। দেশের পল্লীগ্রামে আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে, মাকে আমি সেইখানে নিয়ে যাবো।

তারপরে?

আমার যে এক হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে একটা ছোট্ট মুদির দোকান খুলবো। আমাদের দুজনের চলে যাবে।

ভারতী কহিল, তা যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এর দরকার হ'ল কিসে?

অপূর্ব বলিল, আজ আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। শুধু মা ছাড়া সংসারে আমার দাম নেই। ভগবান করুন এর বেশী যেন না আমি কারো কাছে কিছু চাই।

ভারতী পলকমাত্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা আপনাকে বুঝি বড্ড ভালবাসেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। চিরকাল মা'র দুঃখে-দুঃখেই কাটলো, কেবল ভয় হয় তা আর যেন না বাড়ে। আমার সকল কাজেকর্মে আমার আধখানা যেন মা হয়ে আমার আর আধখানাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে। এ থেকে আমি একমুহূর্ত ছাড়া পাইনে, ভারতী, তাই আমি ভীতু, তাই আমি সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। এই বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

ইহার জবাব ভারতী দিল না, কেবল হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে অপূর্বর হাতের মধ্যে ধরা দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, অপূর্ব উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, রামদাসের পরিবারের কি উপায় করবে ভারতী? শুধু দাসী ছাড়া এদেশে

তাদের দেশের লোক বোধ করি কেউ নেই। থাকলেই বা কেউ কি তাদের ভার নেবে?

ভারতী নিজেও কিছু ভাবিয়া পায় নাই, শুধু সাহস দিবার জন্যই কহিল, চলুন ত গিয়ে দেখি। উপায় একটা হবেই।

অপূর্ব বুঝিল ইহা ফাঁকা কথা। তাহার মন কোন সান্ত্বনাই মানিল না । কহিল, তোমাকে হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি ত ক্রীশ্চান, তাঁদের কি কাজেই বা লাগবো?

তা বটে। কথাটা নূতন করিয়া অপূর্বর বিঁধিল।

উভয়ে বাসায় আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। এই রাত্রে কেমন করিয়া যে কি হইবে চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহাদের ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। নীচের ঘর খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ভারতী দেখিতে পাইল ওদিকের খোলা জানালার ধারে ইজিচেয়ারে কে একজন শুইয়া আছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই ভারতী চিনিতে পারিয়া উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, কখন এলেন আপনি? সুমিত্রাদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না।

অপূর্ব কহিল, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের একাউন্টেন্ট রামদাস তলওয়ারকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারতী বলিল, ইন্সিনে তাঁর বাসা। সেখানে স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, তাঁরা এখনো কিছুই জানেন না।

অপূর্ব বলিল, অত দূরে এই অন্ধকার রাতে—কি ভয়ানক বিপদই ঘটলো ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার হাই তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিলেন, ভারতীকে কহিলেন, আমি বড় শ্রান্ত, আমাকে একটু চা তৈরি করে খাওয়াতে পারো ভাই?

ভারতী বলিল, পারি, কিন্তু আমাদের যে এখুনি বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু।

কোথায়?

ইন্সিনে। তলওয়ারকরবাবুর বাসায়।

কোন প্রয়োজন নেই।

অপূর্ব সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, প্রয়োজন নেই কিরকম ডাক্তারবাবু? তাঁর বিপন্ন পরিবারের ব্যবস্থা করা, অন্ততঃ একটা খোঁজখবর নেওয়া ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভার আমার; আপনারা বড় জোর এই অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে ইন্সিনে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারবেন,—শেষ পর্যন্ত হয়ত বাড়িটাও চিনে বার করতে পারবেন না।

এই বলিয়া তিনি পুনরায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি বসুন, এবং ভারতী চা তৈরি করে আনুক। কিন্তু আপনার বুঝি চলে না? তা বেশ, হোটেলের বামুনঠাকুর পবিত্রভাবে কিছু খাবার তৈরি করে দিয়ে যাক, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন।

ভারতী নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লচিত্তে চা তৈরি করিতে উপরে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব কিছুই বিশ্বাস করিল না। ডাক্তারের সমস্ত কথাবার্তাই তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া অতিশয় খারাপ বোধ হইল। ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, এই রাত্রে কষ্ট করা থেকে তুমি হয়ত বেঁচে গেলে, কিন্তু আমার দায়িত্ব ঢের বেশী। যত রাত্রিই হক আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া ভারতী থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই ডাক্তারের চোখের দিকে চাহিয়া আবার স্বচ্ছন্দমনে কাজে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু একখণ্ড মোমবাতি জ্বালাইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া জবাব লিখিতে বসিলেন। মিনিট-দশেক নীরবে অপেক্ষা করিয়া

অপূর্ব বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিগুলো কি অত্যন্ত জরুরী?

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, হাঁ।

অপূর্ব বলিল, ওদিকের একটা ব্যবস্থা হওয়াও ত কম জরুরী নয়। আপনি কি তাঁর বাসায় কাউকে পাঠাবেন না?

ডাক্তার কহিলেন, এত রাত্রে? কাল সকালের পূর্বে বোধ হয় আর লোক পাওয়া যাবে না।

অপূর্ব বলিল, তাহলে তার জন্য আর আপনি চিন্তিত হবেন না, সকালে আমি নিজেই যেতে পারবো। ভারতীকে নিষেধ না করলে আমরা আজই যেতে পারতাম, এবং আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভাল হতো।

ডাক্তারের চিঠি লেখায় বাধা পড়িল না, কারণ তিনি মুখ তুলিবারও অবকাশ পাইলেন না, শুধু বলিলেন, আবশ্যক ছিল না।

অপূর্ব অন্তরের উষ্মা যথাসাধ্য চাপিয়া কহিল, আবশ্যকতার ধারণা এ ক্ষেত্রে আপনার এবং আমার এক নয়। আমার সে বন্ধু।

ভারতী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নীচে আসিল এবং পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া দিয়া কাছে বসিল। ডাক্তারের চিঠি লেখা এবং চা খাওয়া দুই কাজই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিবার পরে সহসা ভারতী অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, আপনি সদাই ব্যস্ত। দু'দণ্ড যে আপনার কাছে বসে কথা শুনবো সে সময়টুকুও আমরা পাইনে।

ডাক্তারের অন্যমনস্ক কানের মধ্যে গিয়া রমণীর এই অভিমানের সুর বাজিল, তিনি চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া হাসিমুখে কহিলেন, করি কি ভাই, এই দুটোর ট্রেনেই আবার রওনা হতে হবে।

সংবাদ শুনিয়া ভারতী চকিত হইল, এবং অপূর্ব্বর মনের সংশয় তাহার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, একটা রাতও কি আপনি বিশ্রামের অবকাশ পাবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, আমার শুধু একটি দিনের অবসর আছে ভাই ভারতী, সে কিন্তু আজও আসেনি।

ভারতী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে আসবে?

ডাক্তার ইহার উত্তর দিলেন না।

অপূর্ব্বর মনের মধ্যে কেবল একটা কথা তোলাপাড়া করিতেছিল, সে তাহারই সূত্র ধরিয়া বলিল, সমিতির সভ্য না হয়েও রামদাস যে শাস্তি ভোগ করতে যাচ্চে তা অসাধারণ।

ডাক্তার কহিলেন, শাস্তি নাও হতে পারে।

অপূর্ব কহিল, না হয় ত সে তার ভাগ্য। কিন্তু যদি হয় সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই তাকে এনেছিলাম।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিয়া চুপ করিলেন।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, দেশের জন্য যে ব্যক্তি দু'বছর জেল খেটেচে, অসংখ্য বেতের দাগ যার পিঠ থেকে আজও মোছেনি, এই বিদেশে স্ত্রী-পুত্র যার শুধু তারই মুখ চেয়ে আছে, তার এতবড় সাহস অসামান্য! এর আর তুলনা নেই।

তাহার বন্ধুর প্রতি উচ্ছ্বসিত এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্যের মধ্যেও একটা গোপন আঘাত ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ডাক্তার মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি অপূর্ব্ববাবু! পরাধীনতার আগুনে বুকের মধ্যে যার অহোরাত্র জ্বলে যাচ্চে এ ছাড়া তার ত উপায় নেই! সাহেবের দোকানের বড় চাকরি বা ইন্সিনের বাসায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই তাকে ঠেকাতে পারে না,— এই তার একটিমাত্র পথ।

দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে অপূর্বর বুদ্ধি ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না। ডাক্তারের উক্তিকে সে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল। কহিল, আপনি তাঁর মহত্ত্ব অনুভব না করতে পারেন, কিন্তু সাহেবের দোকানের চাকরি তলওয়ারকরের মত মানুষকে ছোট করে দিতে পারে না। আমাকে আপনি যত ইচ্ছে ব্যঙ্গ করুন, কিন্তু রামদাস কোন অংশেই আপনার ছোট নয়! এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, আমি নিশ্চিতই জানি। তাঁকে ত আমি ছোট বলিনি অপূর্ববাবু!

অপূর্ব কহিল, বলেছেন। তাঁকে এবং আমাকে আপনি পরিহাস করেছেন। কিন্তু আমি জানি জন্মভূমি তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সে নির্ভীক! সে বীর! আপনার মত সে লুকিয়ে বেড়ায় না। আপনার মত পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে না! আপনি ত ভীরু।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ভারতী অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর সে সহিতে পারিল না। দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনি কাকে কি বলচেন অপূর্ববাবু? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কি?

অপূর্ব কহিল, না পাগল হইনি। উনি যেই হোন, রামদাস তলওয়ারকরের পদধূলির যোগ্য নন, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। তার তেজ, তার বাগ্মিতা, তার নির্ভীকতাকে ইনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই তোমাকে যেতে দিলেন না, তাই আমাকে কৌশলে বাধা দিলেন।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনাকে অপরিসীম যত্নে সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি অপমান করতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে আপনি যান অপূর্ববাবু। আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে উন্মাদের এখানে ঠাঁই নেই। আপনার কথাই সত্য, পথের-

দাবীতে আপনার স্থান হবে না। এর পরে আর কোন ছলে, কোন দিন আমার বাসায় ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

অপূর্ব নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আর একটু বসুন অপূর্ববাবু, এই অন্ধকারে একলা যাবেন না। আমি স্টেশনে যাবার পথে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অপূর্বর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় অধোমুখে বসিয়া পড়িল।

ভুক্তাবশিষ্ট বিস্কুটগুলি ডাক্তার পকেটে পুরিতেছিলেন দেখিয়া ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ওকি হচ্চে আপনার?

রসদ সংগ্রহ করে রাখচি ভাই।

সত্য সত্যই আজ রাত্রে যাবেন নাকি?

নইলে কি মিথ্যামিথ্যিই অপূর্ববাবুকে ধরে রাখলাম? সবাই মিলে এমন অবিশ্বাস করলে আমি বাঁচি কি করে বল ত?

এই বলিয়া তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে ভারতী অভিমান করিয়া কহিল, না, আজ আপনার যাওয়া হবে না, আপনি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, আপনি কেবলি কোথায় চলে যাবেন,— একটা কথা শুনতে পাইনে, একটা উপদেশ নিতে পাইনে, পথের-দাবী একলা চালাই কি করে বলুন ত? আমিও তাহলে যেখানে খুশি চলে যাবো।

লেখা চিঠিগুলি ডাক্তার তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন, একখানি তোমার, একখানি সুমিত্রার, অন্যখানি তোমাদের পথের-দাবীর। আমার উপদেশ বল, আদেশ বল, সবই এর মধ্যে পাবে।

চিঠিগুলি মুঠার মধ্যে লইয়া ভারতী মুখ মলিন করিয়া বলিল, এবার কি আপনি বেশী দিনের জন্যে যাচ্চেন?

দেবা ন জানন্তি,—বলিয়া ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমাদের মুশকিল হয়েছে, না মুখ দেখে, না কথা শুনে আপনার মনের কথা জানবার জো আছে। ঠিক করে বলে যান কবে ফিরবেন?

ঐ যে বললাম, দেবা ন জানন্তি—

না তা হবে না, সত্যি করে বলুন কবে ফিরবেন?

এত তাগাদা কেন বল ত?

ভারতী কহিল, কি জানি এবার যেন ভয় করচে। মনে হচ্চে যেন সব ভেঙ্গেচুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, হবে না গো, হবে না,—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়াই হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে এমন মিছেমিছি ঝগড়া করলে কিন্তু সত্যিই কাঁদতে হবে তা' বলে রাখচি। অপূর্ববাবু রাগ করেন বটে কিন্তু ভাল যাকে বাসেন তাকে ভালবাসতেও জানেন। মানুষের মধ্যে যে হৃদয় বস্তুটি আছে সে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। ফুটন্ত পদ্মটির মত ঠিক তাজা আছে।

ভারতী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

এমনি সময়ে দ্বারের কাছে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি থামিল, এবং অনতিকাল মধ্যেই দুইজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজনের পরিধানে আগাগোড়া সাহেবি পোশাক, ডাক্তার ভিন্ন বোধ করি সকলেরই অপরিচিত; আর একজন রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্বর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব করিয়া সে বন্ধুকে সংবর্ধনা করিতে গেল না। রামদাস অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। অপূর্বর কাছে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের প্রতি সে শুধু নীরবে নেত্রপাত করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

ইংরাজি পোশাক-পরা লোকটি ইংরাজিতেই কথা কহিলেন, বলিলেন, জামিনের জন্যই এত বিলম্ব ঘটিল। কেস্‌ বোধ হয় গবর্নমেন্ট চালাবে না।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার মানে গবর্নমেন্টকে তুমি আজও চেনোনি কৃষ্ণ আইয়ার।

এই কথায় রামদাস সহাস্যে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঠ থেকে থানা পর্যন্ত আপনাকে সকল সময়েই সঙ্গে দেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কখন যে অন্তর্হিত হয়েছিলেন সেইটাই জানতে পারিনি!

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, অন্তর্ধানের গভীর কারণ ঘটেছিল রামদাসবাবু। এমন কি রাতারাতি এখান থেকেও অন্তর্হিত হ'তে হ'ল।

রামদাস কহিল, সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে এত রাত্রে এখানে কেন?

রামদাস কহিল, আপনাকে প্রণাম করতে। পুনার সেন্ট্রাল জেলে আমি যাবার পরেই আপনি চলে গেলেন। তখন সুযোগ পাইনি। নীলকান্ত যোশীর কি হ'ল জানেন? সে ত আপনার সঙ্গেই ছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। ব্যারাকের পাঁচিল টপকাতে পারলে না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হ'ল।

অপূর্বর কাছে এই সকল অচিন্তনীয়, অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, আপনারও কি তাহলে ফাঁসি হতো?

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া অপূর্বর মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

রামদাস উৎসুক হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, একবার এই সিঙ্গাপুরেই আমাকে বছর-তিনেক আটকে থাকতে হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা আমাকে চেনেন। তাই সোজা রাস্তাটা এড়িয়ে ব্যাঙ্ককের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেভয়ে এসে পৌঁছুলাম। জোর কপাল! হঠাৎ বনের মধ্যে একটা হাতির বাচ্চাও ভগবান পাইয়ে দিলেন। সেটা সঙ্গে থাকায় বরাবর ভারী সুবিধে হয়ে গেল। শেষে হাতির বাচ্চা বিক্রি করে দিশি জাহাজে নারকেল চালানের সঙ্গে নিজেকে চালান দিয়ে মাসতিনেকের মধ্যে একেবারে আরাকানে এসে পাড়ি জমালাম। খাসা থাকা গিয়েছিল রামদাসবাবু, হঠাৎ থানার মধ্যে আজ এক পরম বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ। ভি. এ. চেলিয়া তাঁর নাম, বড্ড স্নেহ করেন আমাকে। বহুদিনের অদর্শনে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সিঙ্গাপুর থেকে বর্মা মুলুকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভাবে বোধ হয় খোঁজ পেয়েছেন। তবে, ভিড়ের মধ্যে তেমন নজর দিতে পারেন নি, নইলে পৈতৃক গলাটার,—এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—ও কি অপূর্ববাবু? কি হল আপনার?

অপূর্ব দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আঠার

অপূর্বর এমন করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াটা সকলকেই বিস্মিত করিল। ঘরে আলো বেশী ছিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব ও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন অতিশয় বে-মানান দেখাইল। ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ডাক্তার? অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল! তাঁহার শেষ কথাটার উপরে স্পষ্ট একটা অভিযোগের খোঁচা ছিল। অর্থাৎ, এ-সকল লোক এখানে কেন?

ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন তলওয়ারকর। কহিলেন, ইনি মিস্টার হালদার—অপূর্ব হালদার। এক আফিসে আমরা কাজ করি, আমার সুপিরিয়র অফিসর। একটু থামিয়া সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমার একান্ত অন্তরঙ্গ,—আমার পরম বন্ধু। সেন্টিমেন্টাল? ই—য়েস্। ডাক্তারবাবু আপনি বোধ করি হালদারের রেঙ্গুনের প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প শোনেন নি? সে এক—

সহসা ভারতীর প্রতি চোখ পড়িতেই তিনি সলজ্জে থামিয়া গিয়া কহিলেন, সে যাই হোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই কিন্তু আমরা বন্ধু,—বাস্তবিক পরম বন্ধু।

তলওয়ারকরের ব্যগ্রতায় ও বিশেষ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু শব্দটার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে সেন্টিমেন্টালিস্মের প্রতি খোঁচা দিতে ব্যারিস্টার সাহেব আর সাহস করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারাটা যেন সন্দিগ্ধ এবং অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, সেন্টিমেন্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হলেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।

কৃষ্ণ আইয়ার খুশী হইলেন না, বলিলেন, তা আমি মনেও করিনে, কিন্তু এটুকু মনে করাও বোধ হয় দোষের নয় ডাক্তার, এই ঘরটা ছাড়াও তাঁদের চলে বেড়াবার যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা পৃথিবীতে খোলা আছে।

তলওয়ারকর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। যাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু বলিয়া বারংবার অভিহিত করিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহারই সম্মুখে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন, মিস্টার আইয়ার, অপূর্ববাবুকে আমি চিনি। আমাদের মন্ত্রে দীক্ষা তাঁর বেশী দিনের নয় সত্য, কিন্তু বন্ধুর অভাবিত মুক্তিতে সামান্য বিচলিত হওয়া আমাদের পক্ষেও মারাত্মক অপরাধ নয়। সংসারে চলে বেড়াবার স্থান অপূর্ববাবুর যথেষ্টই আছে, এবং আশা করি এ ঘরেও স্থান তাঁর কোনদিন সঙ্কীর্ণ হবে না।

কৃষ্ণ আইয়ার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ অপূর্বকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক শান্তির সহিত কহিলেন, নিশ্চয় হবে না তলওয়ারকর, নিশ্চয় হবে না। এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলের মুখের প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ভারতীকেই যেন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু এই বন্ধুত্ব জিনিসটা সংসারে কতই না ক্ষণভঙ্গুর ভারতী! একদিন যার সম্বন্ধে মনে করাও যায় না, আর একদিন কতটুকু ছোট্ট কারণেই না তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়! সেটাও দুনিয়ার অস্বাভাবিক নয় তলওয়ারকর, তার জন্যেও প্রস্তুত থাকা ভাল। মানুষ বড় দুর্বল কৃষ্ণ আইয়ার, বড় দুর্বল! তখন এই সেন্টিমেন্টের দরকার হয় তার ধাক্কা সামলাতে।

এই-সকল কথার উত্তর দিবারও কিছু নাই, প্রতিবাদ করাও চলে না; উভয়েই মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু ভারতীর মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। ডাক্তারের প্রতি তাহাদের অবিচলিত ও অসীম শ্রদ্ধা, অহেতুক একটি বাক্যও উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব নয়, এ সত্য ভারতী ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু কি এবং কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যে এ কথা তিনি কহিলেন, এবং ঠিক কি ইহার তাৎপর্য তাহা ধরিতে না পারিয়া মনের মধ্যেটা তাহার শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার ত ক্রমশঃ যাবার সময় হ’য়ে এল ভারতী, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি চললাম তলওয়ারকর।

কোথায় এবং কি জন্য, নিজে হইতে না বলিলে এরূপ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের বিধি ইহাদের নাই। একমুহূর্ত জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া থাকিয়া তলওয়ারকর প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আদেশই বটে! কিন্তু একটা কথা। বর্মায় স্থানাভাব যদি হয়ও, নিজের দেশে হবে না তা নিশ্চয়। শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

তলওয়ারকর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। আবার কবে দেখা হবে?

ডাক্তার কহিলেন, নীলকান্ত যোশীর শিষ্য তুমি, এ আবার কি প্রশ্ন তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, আর দেরি করো না যাও,— বাসায় পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। প্র্যাক্টিস তা’হলে এখানেই স্থির ক’রলে কৃষ্ণ আইয়ার?

কৃষ্ণ আইয়ার মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। ভাড়াটে গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল, দুজনে বাহির হইবার সময়ে তলওয়ারকর কেবল একবার কহিল, অন্ধকারে অপূর্ববাবু কোথায় চলে গেলেন একবার দেখা হ’ল না—

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি কেহ প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিছুক্ষণেই বাহিরে গাড়ির শব্দে বুঝা গেল তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমার কি মনে হয় অপূর্ব বাসায় চলে গেছে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, খুব সম্ভব আশেপাশে কোথাও আছেন, একটু খুঁজে দেখলেই পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা না ক'রে তিনি কখনো যাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই এ কাজটা তার সেরে নেওয়া আবশ্যক। তার বেশী ত আমি সময় দিতে পারবো না ভাই!

না, এর মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন, এই বলিয়া ভারতী শুধু যে কেবল উপস্থিত ডাক্তারের কথার একটা জবাব দিল তাই নয়, সে আপনাকে আপনি ভরসা দিল। একাকী এই অন্ধকারে অপূর্ব কিছুতেই যাইবে না, অতএব কোথাও নিকটেই আছে এ বিষয়ে সে যেমন নিশ্চিত ছিল, তাহাদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এই অতিমানবের বিদায়ের পূর্বক্ষণে আর একবার সর্বান্তঃকরণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সে তেমনি নিঃসংশয় ছিল। নানাদিক দিয়া নানাকারণে আজ অপূর্ব বহু অপরাধ জমা করিয়াছে, সময় থাকিতে তাহাকে দিয়াই সেগুলার ক্ষালন করিয়া না লইয়াই বা ভারতী বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু, সেই অমূল্য স্বল্পকালটুকু বৃথায় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল,—অপূর্বর দেখা নাই! আঁধার দ্বারপথে ভারতীর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল এবং উৎকর্ণ চিত্ত বাহিরে পরিচিত পদশব্দের প্রতীক্ষায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিল।

কোথাও সে হাতের কাছেই আছে, একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া সে একমুহুর্তে খুঁজিয়া আনে, কিন্তু এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে আজ তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। ডাক্তার তাঁহার স্ট্র্যাপ-বাঁধা বোঁচকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভারতী দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া

দেখিল আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের অধিক সময় নাই, কহিল, আপনি কি হেঁটেই যাবেন?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। দুটো কুড়ি মিনিটে সদর রাস্তার উপর দিয়ে খুব সম্ভব একটা ঘোড়ার গাড়ি ফিরে যাবে, চলতি গাড়ি—গণ্ডা-ছয়েক পয়সা ভাড়া দিলেই স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভারতী বলিল, পয়সা না দিলেও দেবে। কিন্তু যাবার পূর্বে সুমিত্রাদিদিকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন না? তিনি সত্যই পীড়িত।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত বলিনি তিনি অসুস্থ নন। কিন্তু ডাক্তার না দেখালেই বা সারবে কি করে?

ভারতী বলিল, কিন্তু তাই যদি হয় ত আপনার চেয়ে বড় ডাক্তারই বা পৃথিবীতে আছে কে?

ডাক্তার রহস্যভরে জবাব দিলেন, তাহলেই হয়েছে! দীর্ঘ অনভ্যাসে ও-বিদ্যে ত মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছেই, তা ছাড়া বসে বসে কারও চিকিৎসা করি সে সময়ই বা কৈ?

কথা তাঁহার শেষ না হইতেই ভারতী বলিয়া উঠিল, সময় কৈ! সময় কৈ! কেউ মরে গেলেও সময় হবে না— এমনিই দেশের কাজ? দেখুন ডাক্তারবাবু, বিদ্যে মুছে যাবার মন ও নয়; মুছে সত্যিই কিছু গিয়ে থাকে ত সে দয়া-মায়া!

ডাক্তারের হাসিমুখ কেবল মুহূর্তের তরে গম্ভীর হইয়াই পুনরায় পূর্বশ্রী ধারণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভারতী সেই একমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে সত্য, কিন্তু এদিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবার অধিকার আজও তাহার ছিল না। বস্তুতঃ, সুমিত্রা কে, ডাক্তারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এবং কবে কি করিয়া সে যে এই দলভুক্ত হইয়া পড়িল অদ্যাবধি ভারতী তাহার কিছুই জানিত না। তাহাদের সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সুতরাং, অনুমান ভিন্ন সঠিক কিছুই

জানিবার তাহার উপায় ছিল না। শুধু মেয়েমানুষ বলিয়াই সে সুমিত্রার মনোভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নিজের সেই অনুভূতিমাত্রটুকু ভিত্তি করিয়া অকস্মাৎ এতবড় ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া সে শুধু সঙ্কুচিত নয়, ভয়ও পাইল। ভয় ডাক্তারকে নয়,—সুমিত্রাকে। এ কথা কোন মতেই তাঁহার কানে উঠিলে চলিবে না! তাঁহার অন্য পরিচয় জানা না থাকলেও প্রথম হইতেই সেই নিস্তব্ধ তীক্ষ্ণ-বিদ্যা-বুদ্ধিশালিনী রমণীর দুর্ভেদ্য নিবিড়তার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার স্বল্পভাষণে, তাঁহার প্রখর সৌন্দর্যে প্রতি পদক্ষেপে, তাঁহার অবহিত বাক্যালাপে, তাঁহার অচঞ্চল আচরণের গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় এই দলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অপরিসীম দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই যেন সকলে অনুভব করিত। এমন কি তাঁহার অসুস্থতা লইয়াও গায়ে পড়িয়া আলোচনা করিতেও কাহারো সাহস হইত না। কিন্তু একদিন সেই দুর্লঙ্ঘ্য কঠোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গোপন দুর্বলতা যেদিন অপূর্ব ও ভারতীর সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যেদিন একজনের বিদায়ের ক্ষণে সুমিত্রা নিজেকে সংবরণ করিতে পারে নাই, সেদিন হইতেই সে যেন সকলের হইতে আরও বহু দূরে আপনাকে আপনি সরাইয়া লইয়া গেছে। সেই দীর্ঘায়ত ব্যবধান অপরের অযাচিত সহানুভূতির আকর্ষণে সঙ্কুচিত হইবার আভাসমাত্রেই যে তাহার সেই আত্মাশ্রয়ী অন্তর্গূঢ় বেদনা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া ভারতীর ক্ষুব্ধ চিত্ত শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত।

ডাক্তার আরামকেদারায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় সুমুখের টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সহসা মহা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—

ভারতী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, শুলেন যে বড়?

ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন, কেন, আমি কি ঘোড়া যে একটু শুলেই বেতো হয়ে যাবো? আমার ঘুম পাচ্চে,— তোমাদের মত আমি দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারিনে।

ভারতী বলিল, দাঁড়িয়ে ঘুমোতে আমরাও পারিনে। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে আপনি দৌড়তে দৌড়তে ঘুমোতে পারেন, আমি তাতেও আশ্চর্য হইনে। আপনার ওই দেহটা দিয়ে সংসারে কি যে না হ'তে পারে তা কেউ জানে না। কিন্তু সময় হল যে; এখনি না বেরুলে গাড়ি চলে যাবে যে!

যাক গে।

যাক গে কিরকম?

উঃ—ভয়ানক ঘুম পাচ্চে ভারতী, চোখ চাইতে পারচি নে। এই বলিয়া ডাক্তার দুই চক্ষু মুদিত করিলেন।

কথা শুনিয়া ভারতী পুলকিতচিত্তে অনুভব করিল, কেবল তাহারই অনুরোধে আজ তাঁহার যাওয়া স্থগিত রহিল। না হইলে শুধু ঘুম কেন বজ্রাঘাতের দোহাই দিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া যায় না। কহিল, আর ঘুমই যদি সত্যি পেয়ে থাকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না!

ডাক্তার চোখ মুদিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিজের উপায় হবে কি? অপূর্বর পথ চেয়ে সারারাত বসে কাটাবে?

ভারতী বলিল, আমার বয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরে বিছানা করে এখনি গিয়ে শুয়ে ঘুমবো।

ডাক্তার কহিলেন, রাগ করে শোওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাগ করে ঘুমোনো যায় না। বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে খুঁজে আনো গে,—আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে লজ্জা ধরা পড়িল না। কারণ, ডাক্তার চোখ বুজিয়াই ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত চোখের প্রতি চোখ রাখিয়া ভারতী

মুহূর্ত-কয়েক মৌন থাকিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই এ আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, লোকে বলে তাই শুনি।

নিজে থেকে কিছুই জানেন না?

ডাক্তার চোখ মেলিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমাদের মত দুর্ভাগাদের শুতে বিছানাই মেলে না, তায় আবার ছটফট করা! এতখানি বাবুয়ানার কি ফুরসত আছে? এই বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে বলে আপনার দেহের মধ্যে রাগ নেই, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন, সত্যি? কখনো না, কখনো না! লোকে মিথ্যে করে আমার বিরুদ্ধে গুজব রটায়,—তারা আমাকে দেখতে পারে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, কিংবা অত্যন্ত বেশী ভালবাসে বলেই হয়ত গুজ রটায়। তারা আরও বলে আপনার মান-অভিমান নেই, দয়া-মায়া নেই, বুকের ভেতরটা আগাগোড়া একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া।

ডাক্তার কহিলেন, এও অত্যন্ত ভালবাসার কথা। তারপর?

ভারতী কহিল, তারপর সেই পাষাণ-স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু,—জননী জন্মভূমি! তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই আপনার কাছে-কাছে থাকতে পারি, নইলে,—বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ একমুহূর্ত থামিয়া কহিল, কিরকম জানেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাদিদিকে নিয়ে আমি সেদিন বর্মা অয়েল কোম্পানির কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; সেদিন তাদের নতুন বয়লারের পরীক্ষা হচ্ছিল।

অনেক লোক ভিড় করে তামাশা দেখছিল। কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু, জড়পিণ্ডের বেশী সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা

দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে যেন নিমিষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল, আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাহিরে নেই। সুমিত্রাদিদির মুখ দিয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেসা করলাম, কি দিদি? সুমিত্রা বললেন, এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যিকার প্রতিমূর্তি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সবাই কি ভালই আমাকে বাসে! কিন্তু ঘুমে যে আর চোখ চাইতে পারিনে ভারতী, কিছু একটা কর! কিন্তু তার আগে সে লোকটা গেল কোথায় একবার খোঁজ করবে না?

আপনি কিন্তু কারও কাছে গল্প করতে পারবেন না।

না। কিন্তু আমাকে বুঝি লজ্জা করবার দরকারই নেই?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। মানুষের কাছেই শুধু মানুষের লজ্জা করে! এই বলিয়া সে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট দশ-পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অপূর্ববাবু চলে গেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে? একা?

তাই ত দেখছি।

আশ্চর্য।

ভারতী বলিল, আমার বিছানা করা আছে, শুতে চলুন।

তুমি?

আমি মেঝেতে একটা কম্বল-টম্বল কিছু পেতে নেব। চলুন।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই চল। লজ্জা-সঙ্কোচ মানুষে মানুষকেই করে,—আমি পাষাণ বৈ ত নয়।

উপরের ঘরে গিয়া ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিলে ভারতী মশারি ফেলিয়া দিয়া সযত্নে চারিদিক গুঁজিয়া দিল, এবং তাহারই অনতিদূরে নীচে মেঝের উপর আপনার বিছানা পাতিল। ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমরা সকলে মিলে আপনাকে মানুষের দল থেকে বার করে পাথরের দেবতা বানিয়ে রেখেচি।

তার মানে আমাকে ভয়ই নেই?

ভারতী অসঙ্কোচে জবাব দিল, একবিন্দু না। আপনার থেকে কারও লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে এ আমরা ভাবতেই পারিনে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার হাসিয়া শুধু বলিলেন, আচ্ছা, টের পাবে একদিন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কে আপনাকে সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এ ত আপনার আসল নাম নয়। ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল যাই হোক, নকল নামটি দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। তাঁর মস্ত উঁচু একটা আমগাছ ছিল, কেবল আমিই তার ঢিল মেরে আম পাড়তে পারতাম। একবার ছাত থেকে লাফাতে গিয়ে ডানহাতটা আমার মচকে গেল। ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। সবাই আহা আহা করতে লাগলো, শুধু পণ্ডিতমশাই খুশী হয়ে বললেন, যাক, আম ক'টা আমার ঢিলের ঘা থেকে বাঁচলো। পাকলে দুটো-একটা হয়ত মুখে দিতেও পারবো।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্টু ছিলেন ত!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাই হোক পরের দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতেনাতে একেবারে ধরে ফেললেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে।

ডানটা ভেঙ্গেছে, বাঁ-হাত চলছে, বাঁ-টা ভাঙ্গলে বোধ হয় পা-দুটো চলবে। থাক বাবা, আর কষ্ট করো না, যে ক'টা কাঁচা আম বাকী আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছি।

ভারতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিতমশায়ের অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।

ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, আমার অনেক দুঃখের নাম। কিন্তু সেই থেকে আমার আসল নামটা লোকে যেন ভুলেই গেল।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সকলে যে বলে দেশ আর আপনি, আপনি আর দেশ—এই দুই-ই আপনাতে একেবারে এক হয়ে গেছে,—এ কি করে হল?

ডাক্তার কহিলেন, সে-ও এক ছেলেবেলার ঘটনা ভারতী। এ জীবনে কত কি এলো, কত কি গেলো, কিন্তু সেদিনটা এ জীবনে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল, একদিন রাত্রে সেখানে ডাকাত পড়লো। চেঁচাচেঁচি কান্নাকাটিতে গ্রামের বহুলোক চারিদিকে জমা হল, কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে একটা গাদা বন্দুক ছিল, তারা তাই ছুঁড়তে লাগলো দেখে কোন লোক তাদের কাছে ঘেঁষতে পারলে না। আমার জাটতুতো একজন বড়ভাই ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং পরোপকারী, যাবার জন্যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু গেলে নিশ্চয় মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিলে। নিজেকে কোনমতে ছাড়াতে না পেরে তিনি সেইখান থেকে শুধু নিষ্ফল আস্ফালন, এবং ডাকাতদের গালাগালি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলই তাতে হল না, তারা ওই একটিমাত্র বন্দুকের জোরে দু'তিন শ লোকের সুমুখে মোহন্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে। ভারতী, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু আজও তার কাকুতি-মিনতি, আজও তার মরণ চীৎকার যেন মাঝে মাঝে কানে শুনতে পাই। উঃ—সে কি ভয়ানক বুক-ফাটা আর্তনাদ!

ভারতী নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পর?

ডাক্তার কহিলেন, তারপর বাবাজীর জীবন-ভিক্ষার শেষ অনুনয় সমস্ত গ্রামের সম্মুখে ধীরে ধীরে সাঙ্গ হল, তাদের লুটপাটের কাজও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পরিসমাপ্ত হল,—চলে যাবার সময় সর্দার বড়দাদার উদ্দেশে পিতৃ উচ্চারণ করে শপথ করে গেল যে আজ তারা শ্রান্ত, কিন্তু মাস-খানেক পরে ফিরে এসে এর শোধ দেবে। বড়দা জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়লেন একটা বন্দুক চাই। কিন্তু পুলিশ বললে, না। বছর-দুই পূর্বে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী পুলিশ সাব-ইন্সেপক্টরের কান মলে দেবার অপরাধে তাঁর দু'মাস জেল হয়েছিল। এবং এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কোন মতেই না। দাদা বললেন, সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো? সাহেব হেসে বললেন, এত যার ভয় সে যেন ঘর-বাড়ি বেচে আমার জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যায়।

ভারতী উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, দিলে না? এতবড় সর্বনাশ আসন্ন জেনেও দিলে না?

ডাক্তার কহিলেন, না। এবং কেবল তাই নয়, বড়দা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর-ধনুক ও বর্শা তৈরি করালেন, পুলিশের লোক খবর পেয়ে সেগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

কি হল তার পর?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যেই সর্দার তার প্রতিজ্ঞা পালন করলে। এবারে বোধ করি আরও একটা বেশী বন্দুক ছিল। বাড়ির আর সকলেই পালালেন, শুধু বড়দাকে কেউ নড়াতে পারলে না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

ভারতী রক্তহীন পাংশুমুখে বলিয়া উঠিল, প্রাণ দিলেন?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। ঘণ্টা-চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামসুদ্ধ জড় হয়ে হৈচৈ করতে লাগলো, কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গাল পাড়তে লাগলো, শুধু দাদাই কেবল চুপ করে রইলেন। পাড়াগাঁ, হাসপাতাল দশ-বার ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তাঁর হাতটা দাদা সরিয়ে দিয়ে কেবল বললেন, থাক, আমি বাঁচতে চাইনে। বলিতে বলিতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ! মেয়েদের মত এই-সব গরু ভেড়া ছাগলদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিস নে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিস নে। এই ক'টা কথা, এর বেশি আর একটা কথাও তিনি বলেন নি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্তবড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল।

ভারতী নীরবে স্থির হইয়া রহিল। কবে কোন্ পল্লী-অঞ্চলের এক দুর্ঘটনার কাহিনী। ডাকাতি উপলক্ষে গোটা-দুই অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এই ত! জগতের বড় বড় বিরোধের দুঃসহ দুঃখের পাশে ইহা কি-ই বা! অথচ এই পাষাণে কি গভীর ক্ষতই না করিয়াছে! তুলনা ও গণনার দিক দিয়া দুর্বলের দুঃখের ইতিহাসে এই হত্যার নিষ্ঠুরতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বাঙলা দেশেই ত নিত্য কত লোকে চোর-ডাকাতের হাতে মরিতেছে! কিন্তু একি শুধু তাই? ও পাথর কি এতটুকু আঘাতেই দীর্ণ হইয়াছে? ভারতী অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল। এবং বিদ্যুৎশিখা অকস্মাৎ অন্ধকার চিরিয়া যেমন করিয়া অদৃশ্য বস্তু টানিয়া বাহির করে, ঠিক তেমনি করিয়া ওই পাথরের মুখের পরেই সে যেন

সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য চক্ষের পলকে প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, এই বেদনার ইতিহাসে মৃত্যু কিছুই নয়,—মরণ উহাকে আঘাত করে নাই, কিন্তু মর্মভেদী আঘাত করিয়াছে ওই দুটো লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত পদানত সমস্ত ভারতীয়ের উপায়বিহীন অক্ষমতা! আপন ভাইয়ের আসন্ন হত্যা নিবারণ করিবার অধিকারটুকু হইতে সে বঞ্চিত—অধিকার আছে, শুধু চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবার। ভারতীর সহসা মনে হইল, সমস্ত জাতির এই সুদুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি ওই পাষাণের মুখের পরে যেন নিবিড় নিচ্ছিদ্র কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বেদনায় সমস্ত বুকের ভিতরটা ভারতীর আলোড়িত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা!

ডাক্তার সবিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, দাদা বলে কি তুমি আমাকে ডাকচো?

ভারতী বলিল, হাঁ, তোমাকে। আচ্ছা, ইংরাজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?

না। আমার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই।

ভারতী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, কারও শত্রুতা, কারও অকল্যাণ তুমি কামনা করতে পারো এ আমি ভাবতে পারিনে দাদা।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, এ কথা তোমার মুখেই সাজে এবং এর জন্যে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তিনি পুনরায় একটুখানি হাসিলেন। কিন্তু, এ কথা ভারতী জানিত যে এ হাসির মূল্য নাই, হয়ত ইহা আর-কিছু,—ইহার অর্থ নিরূপণ করিতে যাওয়া বৃথা। তাই সে মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, এই কথাটা আমার তুমি চিরদিন মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের

হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন। যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।

নীচের ঘড়িতে টং-টং করিয়া চারিটা বাজিল। সম্মুখের খোলা জানালার বাহিরে রাত্রিশেষের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, সেইদিকে নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া ভারতী স্তব্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু একটা সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

উনিশ

কাল সারারাত্রি ভারতী ঘুমাইতে পায় নাই। দিনের বেলায় তাহার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ ছিল, তাই ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবে। এইজন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সে রাঁধাবাড়ায় মন দিয়াছিল। এমন সময়ে দলের একজন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। সুমিত্রার লেখা, তিনি একটি ছত্রে শুধু এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে যেন এই পত্রবাহকের সঙ্গে চলিয়া আসে।

সুমিত্রার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জো নাই, কিন্তু ভারতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে? উত্তরে পত্রবাহক জানাইল, না। নীচে নামিয়া দেখিল দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি, কিন্তু গাড়োয়ান বদল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না গাড়ি চালানো ইহার পেশা। তা ছাড়া গাড়ি কেন? সুমিত্রার বাসায় যাইতে ত মিনিট-তিনেকের অধিক সময় লাগে না। অধিকতর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি হীরা সিং? সুমিত্রা কোথায়?

এই হীরা সিং লোকটি তাহাদের পথের-দাবীর সভ্য না হইলেও অতিশয় বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ, পূর্বে হংকঙে পুলিশে চাকরি করিত, এখন রেঙ্গুনে টেলিগ্রাফ আফিসে পিয়নের কাজ করে। সে চুপি চুপি কহিল যে, মাইল চার-পাঁচ দূরে অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরি সভা বসিয়াছে, তাঁহার না যাইলেই নয়। ভারতী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিল। এবং হীরা সিং সরকারী পিয়নের পোশাকে সরকারী দু–চাকার গাড়িতে অন্য পথে প্রস্থান করিল। পথে ভারতীর অনেকবার

মনে হইল সে গাড়ি ফিরাইয়া তাহার রিভলভার সঙ্গে লইয়া আসে, কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে আর ফিরিতে পারিল না, অস্ত্রহীন অরক্ষিতভাবেই তাহাকে অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল। গাড়ি যে অত্যন্ত ঘুর-পথে চলিয়াছে তাহা ভিতরে থাকিয়াও ভারতী বুঝিল, এবং কিছুক্ষণেই পথের অসমতলতা ও অসংস্কৃত দুরবস্থা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল তাহারা শহর ছাড়াইয়া গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা জানা কঠিন। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না কিন্তু অনুমান রাত্রি দশটার কাছাকাছি গাড়ি গিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিয়া থামিল। হীরা সিং পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, সে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। মাথার উপরে বড় বড় গাছ মিলিয়া অন্ধকার এমনি দুর্ভেদ্য করিয়াছে যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না, নীচে দীর্ঘ ও অত্যন্ত ঘন ঘাসের মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথের একটা চিহ্নমাত্র আছে, এই ভয়ানক পথে হীরা সিং তাহার দু-চাকার গাড়ির ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। পথে চলিতে ভারতীর সহস্রবার মনে হইতে লাগিল—সে ভাল করে নাই, ভাল করে নাই। এই ভীষণ স্থানে আসিয়া সে ভাল করে নাই। অনতিকাল পরে তাহারা একটা জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া পৌঁছিল, অন্ধকারে তাহার আভাসমাত্র দেখিয়াই ভারতী বুঝিল ইহা বহুদিন-পরিত্যক্ত একটা চাউঙ্। কোন্ সুদূর অতীতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণ এখানে বাস করিতেন সম্ভবতঃ, কোথাও একটা লোকালয় পর্যন্ত ইহার কাছাকাছি নাই।

এতবড় ভাঙ্গা বাড়ি, এতটুকু আলো নাই, মানুষ নাই, মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে,—সুমুখের ঘরে ঢুকিতেই বাদুড় ও চামচিকার ভয়ানক গন্ধে ভারতীর দম আটকাইয়া আসিল,—তাহারই মধ্যে দিয়া পথ, বোধ করি কত যে বিষধর সর্প তথায় আশ্রয় লইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মস্ত হল-ঘরের এককোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির মাঝে মাঝে কাঠ নাই, এই দিয়া ভারতী হীরার হাত ধরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া সুমুখের

বারান্দা পার হইয়া এতক্ষণে এত দুঃখের পরে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে চাটাই পাতা, একধারে গোটা-দুই মোমবাতি জ্বলিতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে সভানেত্রীর আসনে বসিয়া সুমিত্রা। অপর প্রান্তে ডাক্তার বসিয়া ছিলেন, তিনিই সস্নেহ-কণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, এস ভারতী, আমার কাছে এসে ব'স।

অজানা শঙ্কায় ভারতীর বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটুখানি যেন দ্রুতপদেই সে কাছে গিয়া ডাক্তারের বুক ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া যেন তিনি নিঃশব্দে তাহাকে ভরসা দিলেন। হীরা সিং ঘরে ঢুকিল না; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল, যাহারা বসিয়া আছে পাঁচ-ছয়জনকে সে একেবারেই চেনে না। পরিচিতের মধ্যে ডাক্তার ও সুমিত্রা ব্যতীত রামদাস তলওয়ারকর ও কৃষ্ণ আইয়ার। একজন ভীষণাকৃতি লোককে সর্বাগ্রেই চোখে পড়ে—পরনে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ি। মুখখানা বড় হাঁড়ির মত গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মত স্থূল, মাংসল ও কর্কশ। ভাঁটার মত চোখের উপর ভ্রূর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলার মত গোঁফের রোম বোধ করি দূর হইতে গণিয়া বলা যায়, রঙ তামার মত, লোকটা যে অনার্য মোঙ্গল-জাতীয় দৃষ্টিপাতমাত্র তাহাতে সংশয় থাকে না। এই বীভৎস ভয়ানক লোকটার প্রতি ভারতী চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারিল না। মিনিট-দুই সমস্ত ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তখন সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, ভারতী, তোমার মনের ভাব আমি জানি, তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ববাবু কি করেছেন জানো?

ভারতীর নিভৃত হৃদয়ে এমনিই কি যেন একটা তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শুধু সে নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিস্মিস্ করেছে। অপূর্বরও সেই দশা হতো শুধু পুলিশ কমিশনারের কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করেই তাঁর চাকরিটা বেঁচেছে। মাইনে ত কম নয়, বোধ হয় পাঁচ শ।

রামদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সুমিত্রা কহিলেন, শুধু এই নয়। পথের-দাবী যে বিদ্রোহীর দল, এবং আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলভার রাখি সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী?

সেই ভীষণাকৃতি লোকটা গর্জন করিয়া উঠিল, ডেথ্!

এতক্ষণে ভারতী নির্নিমেষ দুই চক্ষু তাহার মুখের প্রতি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রামদাস কহিল, সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবর তারা জানে। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তাঁকে ধরা যেতে পারে অপূর্ববাবু এ কথা জানাতেও ত্রুটি করেন নি। এমন কি, আমি ইতিপূর্বে যে পোলিটিক্যাল অপরাধে বছর-দুই জেল খেটেছি,—তাও।

সুমিত্রা কহিলেন, ভারতী, ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জানো? ফাঁসি। তা যদি না হয়, ট্রান্সপোর্টেশন্! জেন্টেলমেন্! এ অপরাধের কি শাস্তি আপনারা অনুমোদন করেন?

সকলে সমস্বরে কহিল, ডেথ্!

ভারতী তোমার কিছু বলবার আছে?

ভারতী কথা কহিতে পারিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার বলিবার কিছু নাই।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এবার বাংলায় কথা কহিল।

উচ্চারণ শুনিয়া বুঝা গেল সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ। বলিল, এক্সিকিউশনের ভার আমি নিলাম। আমি কিন্তু গুলিগোলা, ছুরি-ছোরা বুঝিনে। এই আমার গুলি এবং এই আমার গোলা! এই বলিয়া সে বাঘের মত দুই থাবা মুঠা করিয়া শূন্যে উত্থিত করিল।

কৃষ্ণ আইয়ার দ্বারের দিকে চাহিয়া হীরা সিংকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে—একটু বেশী মাটি চাপা দিয়ে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বার হয়।

হীরা সিং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।

তলওয়ারকর কহিল, বাবুজীকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সমবেত জুরির সাহায্যে অপূর্বর অপরাধের বিচার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল। বিচারকের রায় যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। না বুঝিবার মত জটিলতা কোথাও নাই। ভারতী সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার কান ও বুদ্ধির মাঝখানে কোথায় একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়া ছিল, বাহিরের বস্তু যেন কিছুতেই সেটা ভেদ করিয়া আর ভিতরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। তাই, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত যে-কেহ কথা কহিতেছিল তাহারই মুখের প্রতি ভারতী ব্যাকুল জিজ্ঞাসু চোখে নির্বোধের মত চাহিয়া দেখিতেছিল। এইটুকু মাত্র সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অপূর্ব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, এবং এই লোকগুলি তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এদেশে জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু এ সঙ্কট যে কিরূপ আসন্ন হইয়াছে, সে তাহার কিছুই বুঝে নাই। সুমিত্রার ইঙ্গিতে একজন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরে যে দৃশ্য ভারতীর চোখে পড়িল তাহা অতি-বড় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। সেই লোকটা অপূর্বকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই হাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা, এবং কোমর হইতে মস্ত ভারী একখণ্ড পাথর ঝুলিতেছে। মুহূর্তের জন্য চৈতন্য হারাইয়া ভারতী

ডাক্তারের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু সকলের দৃষ্টি তখন অপূর্বর প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই শুধু একজন ভিন্ন এ খবর আর কেহ জানিতে পারিল না।

ভারতী এখানে আসিবার পূর্বেই অপূর্বর এজাহার লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে অস্বীকার কিছুই করে নাই। আফিসের বড়সাহেব ও পুলিশের বড়সাহেব, এই দুই সাহেবে মিলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছে তাহা সে বলিয়াছে, কিন্তু কিসের জন্য যে দলের এবং দেশের এতবড় শত্রুতা সাধন করিল, তাহা সে এখনও জানে না।

আজ বেলা বারোটার মধ্যেই রামদাস এ সংবাদ সুমিত্রার কর্ণগোচর করে। দণ্ড স্থির হইয়া যায়, এবং যে উপায়ে অপূর্বকে হস্তগত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

আফিসের ছুটির পরে আজ অপূর্ব হাঁটিয়া বাসায় যাইতে সাহস করিবে না তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহাদের ভাড়াটে গাড়িখানা হীরার সাহায্যে আফিসের গেটের কাছে রাখা হয়। এই ফাঁদে অপূর্ব সহজেই পা দেয়। কিছুদূর আসিয়া গাড়োয়ান জানায় যে, মস্ত একটা রোলার ভাঙ্গিয়া গলির মোড় বন্ধ হইয়া আছে, ঘুরিয়া যাইতে হইবে। অপূর্ব স্বীকার করে। ইহার পরেই বোধ হয় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন হীরা সিং গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে অনায়াসে এখানে লইয়া আসে।

সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু, আমরা আপনাকে ডেথ্ সেন্টেন্স দিলাম। আর কিছু আপনার বলার আছে?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই বুঝে নাই।

ডাক্তার এতক্ষণ কোন কথায় প্রায় বলেন নাই, পিছনে চাহিয়া কহিলেন, হীরা, তোমার পিস্তলটা কৈ?

হীরা সিং ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে দেখাইয়া দিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, পিস্তলটা দেখি সুমিত্রা!

সুমিত্রা বেল্ট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কারও কাছে পিস্তল কিংবা রিভলভার আছে?

আর কাহারও কাছে ছিল না তাহা সকলেই জানাইল। তখন সুমিত্রার পিস্তল নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সুমিত্রা, তুমি বললে ডেথ্ সেন্টেন্স আমরা দিলাম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি!

সুমিত্রা একমুহূর্ত ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার বলিলেন, পারা উচিতও নয়। তাই না ভারতী?

ভারতী কথা কহিল না, এই কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারের ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ডাক্তার তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু যা করে ফেলেছেন সে আর ফিরবে না—তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু আমি বলি তাতে কাজ নেই—ভারতী এঁর ভার নিন। এই দুর্বল মানুষটিকে একটু মজবুত করে গড়ে তুলুন। কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা কহিলেন, না।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না।

সেই কুদর্শন লোকটাই সর্বাপেক্ষা অধিক আস্ফালন করিল। সে তাহার থাবা-যুগল শূন্যে তুলিয়া ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়াই কি একটা বলিয়া ফেলিল।

সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অন্যায় প্রশ্রয়ে আমাদের সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ-সাতজন গর্জিয়া উঠিল, উপায় কি? দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা কিছুই মানবো না। আপনার একার কথায় কিছুই হতে পারবে না।

গর্জন থামিলে ডাক্তার উত্তর দিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের শান্ত ও মৃদু শুনাইল। তাহাতে উৎসাহ বা উত্তেজনার বাষ্পও ছিল না, বলিলেন, সুমিত্রা, বিদ্রোহে প্রশ্রয় দিয়ো না। তোমরা ত জানো, আমার একার মত তোমাদের এক শ' জনের চেয়েও বেশী কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রজেন্দ্র তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য বাটাভিয়াতে একবার আমাকে তুমি শাস্তি দিতে বাধ্য করেছিলে। দ্বিতীয়বার বাধ্য করো না।

ভারতী মুখ তুলে নাই, তখনও তেমনি পড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিঠের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া তেমনি সহজ গলায় কহিলেন, ভয় নেই ভারতী, অপূর্বকে আমি অভয় দিলাম।

ভারতী মুখ তুলিল না, ভরসাও পাইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সুদীর্ঘ সরু সরু আঙুলগুলা নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, কিন্তু ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার কহিলেন, সহজে দেবেও না। কিন্তু এ কথা ওরা বোঝে যে, আমি যাকে অভয় দিলাম, তাকে স্পর্শ করা যায় না। একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই প্রায় দিন কাটে,—তবুও ওরা জানে এই ক'টা সরু আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের অতবড় বাঘের থাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র?

চট্টগ্রামী মগ মুখ কালো করিয়া নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব যেন না আর এখানে থাকে। ও দেশে যাক। অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, কিন্তু অধিকাংশ,—থাক, স্বজাতির নিন্দা আর করব না,—কিন্তু বড় দুর্বল। ওকে মজবুত করবার ভার তোমাকে

দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভরসা নেই ভারতী। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর আজকের কথা, তোমার কথা, কোনটা ভুলতেই বেশী সময় লাগবে না। যাক সে পরের কথা।

আপাততঃ, আমরা সভানেত্রীকে অনুরোধ করতে পারি আজকের মত সভা ভঙ্গ করা হোক। এই বলিয়া তিনি সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রা তাঁহাকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলিয়া সসম্মানে কথা কহিত, এখন সেইভাবেই কহিল, অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তিবিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, তাকে আর যাই বলুক সভা বলে না। কিন্তু এই নাটক অভিনয় করাবারই যদি আপনার সঙ্কল্প ছিল পূর্বাহ্ণে জানান নি কেন?

ডাক্তার কহিলেন, না হলেই ছিল ভাল, কিন্তু অবস্থাবিশেষে নাটক যদি হয়েও থাকে সুমিত্রা, অভিনয়টা যে ভাল হয়েছে তা তোমাদের স্বীকার করতে হবে।

রামদাস কহিল, এরকম যে হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, বন্ধুত্ব জিনিসটা যে এমনি ক্ষণভঙ্গুর সে ধারণাই কি তোমার ছিল তলওয়ারকর? অথচ, এমন সত্যও জগতে দুর্লভ।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, বর্মার এ্যাক্টিভিটি আমাদের উঠলো। এখন পালাতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন, হবে। কিন্তু সময়মত স্থান ত্যাগ করা এবং এ্যাক্টিভিটি ত্যাগ করা এক বস্তু নয় আইয়ার। দীর্ঘকাল কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে যদি না পাই, তার জন্যে নালিশ করা আমাদের সাজে না। এই বলিয়া তিনি ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, হীরা সিং, অপূর্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও, চল ভারতী, তোমাদের একটু নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হীরা সিং আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে আনন্দে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ

নতুন নয়। ছেলেবেলায় কোথায় একটা উপন্যাসে যেন পড়েছিলাম। কিন্তু একটুখানি যেন বাদ রইল। যুগল-মিলন আমাদের সম্মুখে হয়ে গেলে অভিনয়ে আর কোথাও খুঁত থাকতো না। কি বল ভারতী?

ভারতী লজ্জায় মরিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, লজ্জা পাবার এতে কিছুই নেই ভারতী। বরঞ্চ আমি কামনা করি অভিনয় সমাপ্ত করবার মালিক যিনি তিনি যেন একদিন কোথাও এর খুঁত না রাখেন। পকেট হইতে সুমিত্রার পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এদের পৌঁছে দিতে চললাম, কিন্তু ভয় নেই, আমার কাছে আর একটা গাদা পিস্তল রইল। ব্রজেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমরা ত সবাই তামাশা করে বলতে, অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মত দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না। এই বলিয়া তিনি একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া ভারতী ও অপূর্বকে লইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইলেন।

সুমিত্রা অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না ?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা?

কোন একটা কার্যের পূর্বে এই মানুষটিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইতে যাওয়া যে কত বড় বাহুল্য ব্যাপার তা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা নিজেই লজ্জিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সমস্ত ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু আবার কখন দেখা হবে ?

ডাক্তার বলিলেন, প্রয়োজন হলেই হবে।

সে প্রয়োজন কি হয়নি ?

হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি অপূর্ব-ভারতীকে সঙ্গে করিয়া সাবধানে নীচে নামিয়া গেলেন।

যে গাড়ি ভারতীকে আনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা করিতেছিল। সুনিদ্রা হইতে গাড়োয়ান প্রভুকে তুলিয়া ইহাতেই তিনজনে যাত্রা করিলেন। বহুক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এইবার ভারতী কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমরা কোথায় যাচ্চি?

অপূর্ববাবুর বাসায়,—এই বলিয়া ডাক্তার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। মাইল-দুই নিঃশব্দে চলার পরে গাড়ি থামাইয়া ডাক্তার নামিতে উদ্যত হইলে ভারতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কেন?

ডাক্তার বলিলেন, এইবার ফিরি। ওঁরা অপেক্ষা করে আছেন, একটা বোঝাপড়া হওয়া ত চাই!

বোঝাপড়া? ভারতী আকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি সঙ্গে চল। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া সে সুমিত্রার মতই অপ্রতিভ হইল। কারণ, ইঁহার বলা মানেই স্থির করিয়া বলা। এবং সংসারের কোন ভয়ই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তথাপি ভারতী হাত ছাড়িয়াও দিল না, ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু তোমাকে যে আমার বড় দরকার দাদা!

সে আমি জানি। অপূর্ববাবু, আপনি কি পরশুর জাহাজে বাড়ি যেতে পারবেন না?

অপূর্ব কহিল, পারবো।

ভারতী হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, এখনই আমাকে বাসায় যেতে হবে।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, না। তোমার কাগজপত্র, তোমার পথের-দাবীর খাতা, তোমার পিস্তল-টোটা সমস্তই এতক্ষণে নবতারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভোর নাগাদ খানাতল্লাশী হবে, -আর্টিস্ট স্বয়ং সশরীরে,—তার ধেনো-

মদের বোতল, আর তার সেই ভাঙ্গা বেহালাখানা—অপূর্ববাবু, আপনার সে বেহালাটার ওপর একটু দাবী আছে, না? এই বলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ ছাড়া ভয়ানক কিছু আর পুলিশ সাহেবের হাতে পড়বে না। কাল নটা-দশটা আন্দাজ বাসায় ফিরে রাঁধাবাড়া খাওয়া-দাওয়া সেরে বোধ করি একটুখানি ঘুম দেবারও সময় পাবে ভারতী। রাত্রি দুটো-তিনটে নাগাদ দেখা পাবে—কিছু খাবার-দাবার রেখো।

ভারতী অবাক হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এমন একান্ত সজাগ না হইলে কি এই মরণ-যজ্ঞে কেহ সঙ্গে আসিতে চাহিত? মুখে কহিল, তোমার চোখে কিছু এড়ায় না, তুমি সকলের ভাল-মন্দই চিন্তা কর। সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের-দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিও না দাদা।

অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ভগবানের কাজ থেকে বিদায় দেবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু এর ধারা তোমাকে বদলে নিতে হবে।

ভারতী কহিল, তুমিই বদলে দিয়ো।

ডাক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, সহসা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ভারতী, আর আমার সময় নেই, আমি চললাম। এই বলিয়া অন্ধকার পথে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কুড়ি

গাড়ি চলিবার উপক্রম করিতেই ভারতী অপূর্বর বাসার ঠিকানা বলিয়া দিতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, দেখো গাড়োয়ান, ত্রিশ নম্বর—

তাহার কথা শেষ না হইতেই গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, আই নো—আই নো।

গাড়ির পরিসর ছোট বলিয়া দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়াছিল, গাড়োয়ানের মুখের ইংরাজী কথায় অপূর্বর সমস্ত দেহ যে শিহরিয়া উঠিল ভারতী তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল। ইহার পরে প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া ঘড়র্-ঘড়র্ ছড়র্-ছড়র্ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি চলিতেই লাগিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন কথাই হইল না। অন্ধকার নিঃশব্দ নিশীথে গাড়ির চাকা ও পথের পাথরের সংঘর্ষে যে কঠোর শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে অপূর্বর সর্বাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়া কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতে আর বাকী থাকিবে না, এবং শহরের সমস্ত পুলিশ ছুটিয়া আসিল বলিয়া। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না, গাড়ি আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। ভারতী ভিতরে হইতে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া অপূর্বকে নামিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও তাহার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কত ভাড়া?

গাড়োয়ান একটুখানি হাসিয়া কহিল, নট্ এ পাইস। পরক্ষণেই বার-দুই মাথা নাড়িয়া বলিল, গুড নাইট্ টু ইউ! এই বলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তেওয়ারী আছে ত?

আছে।

উপরে উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর ঘুম ভাঙ্গাইল। কবাট খুলিয়া তেওয়ারী দীপালোকে প্রথমেই দেখিতে পাইল ভারতীকে। কাল অপূর্ব বাসায় ফিরিয়াছিল প্রায় ভোরবেলায়, আজ ফিরিয়াছে রাত্রি শেষ করিয়া। সঙ্গে আছে ভারতী। তাই বুঝিতে তেওয়ারীর বাকী কিছুই রহিল না; ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল এবং একটা কথাও না কহিয়া সে দ্রুতবেগে নিজের বিছানায় গিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এই মেয়েটিকে তেওয়ারী ভালবাসিত। একদিন তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু, কিছুদিন হইতে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে অপূর্বর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্ভব দুশ্চিন্তা তেওয়ারীর মনে উঠিতেছিল,—এমন কি জাতিনাশ পর্যন্তও। সেই সর্বনাশের প্রকট মূর্তি আজ যেন তেওয়ারীর মানসপটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহাকে এমন করিয়া শুইয়া পড়িতে দেখিয়া কেবল অভ্যাসবশতঃই অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, দোর দিলিনি তেওয়ারী?

তাহার মূর্ছাহত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত লক্ষ্য কিছুই করে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিল ভারতী। সে-ই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

অপূর্ব শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, খাটের উপর শয্যা তেমনি গুটানো রহিয়াছে, পাতা হয় নাই। বস্তুতঃ বারান্দায় বসিয়া পথ চাহিয়া থাকিতেই আজ তেওয়ারীর সমস্ত সন্ধ্যাটা গিয়াছে, বিছানা করার কথা মনেও পড়ে নাই। কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্বেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি আরামকেদারাটায় একটুখানি বসুন, আমি এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া অপূর্ব পুনশ্চ ডাকিল, এক গেলাস জল দে তো তেওয়ারী।

তাহার পাশের টুলের উপরেই খাবার জলের কুঁজা ও গেলাস ছিল, বিছানা পাতিতে পাতিতে তাহা দেখাইয়া দিয়া ভারতী বলিল, ঘুমন্ত মানুষকে আর কেন তুলবেন অপূর্ববাবু, আপনি নিজেই একটু ঢেলে নিন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা তুলিতে গিয়া তুলিতে পারিল না; তখন উঠিয়া আসিয়া কোন মতে জল গড়াইয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বসিতে যাইতেছিল, ভারতী মানা করিয়া কহিল, আর ওখানে না, একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

অপূর্ব শান্ত বালকের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভারতী মশারি ফেলিয়া ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতেছিল, অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় শোবে?

আমি? ভারতী কিছু আশ্চর্য হইল। কারণ, এরূপ ঘটনা নূতনও নয়, এবং এ ঘরের কোথায় কি আছে তাহাও তাহার অবিদিত নয়। এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু আরামচৌকিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সকাল হতে আর ঘণ্টা-দুই মাত্র দেরি আছে। ঘুমোন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না ওখানে নয়, তুমি আমার কাছে বস।

আপনার কাছে? বাস্তবিকই ভারতীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অপূর্ব আর যাহাই হউক, এ-সকল ব্যাপারে কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। এমন কতদিন কত উপলক্ষেই ত তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু মর্যাদাহানিকর একটা কথা একটা ইঙ্গিতও কোন দিন তাহার আচরণে প্রকাশ পায় নাই।

অপূর্ব কহিল, এই দেখ এরা আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েচে। কেন তুমি এদের মধ্যে আমাকে টেনে আনলে? তাহার কথার শেষ দিকটা অকস্মাৎ কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারতী মশারির একটা দিক তুলিয়া দিয়া তাহার কাছে বসিল,

পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বহুক্ষণ ধরিয়া শক্ত বাঁধনের ফলে হাতের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া ফুলিয়া আছে। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল, ভারতী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়া সাহস দিয়া বলিল, কিচ্ছু ভয় নেই, তোয়ালে ভিজিয়ে আমি ভাল করে জড়িয়ে দিচ্চি, দু-একদিনেই সমস্ত ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া স্নানের ঘর হইতে একটা গামছা ভিজাইয়া আনিল, এবং সমস্ত নীচের হাতটা বাঁধিয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অপূর্ব অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিল, কাল জাহাজ থাকলে আমি কালই চলে যেতুম।

ভারতী কহিল, বেশ ত, পরশুই যাবেন। একটা দিনের মধ্যে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিতে লাগিল, গুরুজনের কথা না শুনলেই এই-সব ঘটে। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

মা বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চাননি?

না, এক শ' বার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। তার ফল হল এই যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে পড়ে রইলুম। সে যা হবার হবে, দুর্গা দুর্গা বলে পরশু একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়। এই বলিয়া সে সহসা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ইহা অপেক্ষাও শতগুণ গভীর নিঃশ্বাস আর একজনের হৃদয়ের মূল পর্যন্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। আর একটা দিনও যেন না অপূর্বর বিলম্ব ঘটে, দুর্গা দুর্গা বলিয়া একবার সে জাহাজে উঠিতে পারিলে হয়! বর্মায় আসা তাহার সর্বাংশেই বিফল হইয়াছে, বাড়ি গিয়া এ দেশের জন-কয়েকের বিষদৃষ্টির কথাই শুধু তাহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে, কিন্তু সকল চক্ষুর

অন্তরালে একজনের কুণ্ঠিত দৃষ্টির প্রতিবিন্দু হইতেই যে নীরবে অমৃত ঝরিয়াছে, একটা দিনও হয়ত সে কথা তাহার মনে পড়িবে না।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, এ বাড়িতে পা দিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, কোর্টে জরিমানা পর্যন্ত হয়ে গেল যা জন্মে কখনো আমার হয়নি। এর থেকেই আমার চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না।

ভারতী চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। অপূর্ব নিজেও একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া তাহার দুরদৃষ্টের সুত্র ধরিয়া বলিল, তেওয়ারী আমাকে বার বার সাবধান করেছিল,—বাবু, ওরা এক জাত, আমরা এক জাত, এ-সব করবেন না।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বল? চাকরি সেই গেল,—পাঁচ শ’ টাকা মাইনে এ বয়সে কটা লোকে পায়? তাছাড়া এ হাত আমি লোকের সুমুখে বার করব কি করে?

ভারতী আস্তে আস্তে বলিল, ততদিনে হাতের দাগ ভাল হয়ে যাবে। ইহার বেশী কথা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল না। মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সে হাত আর চলিতে চাহিল না, এবং এই অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ লোকটাকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছে মনে করিয়া নিজের কাছেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এ কথা দলের অনেকেই জানিয়াছে আজ অপূর্বর প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের কাছে অপরাধী এবং সুমিত্রার চক্ষে সে ছোট হইয়া গেছে, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অসম্মান ও ক্ষুদ্রতা হইতে সে যে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া এখন তাহার গর্ব বোধ হইল।

অপূর্ব বলিল, দাগ সহজে যাবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে কি জবাব দেব জানিনে। কিন্তু শ্রোতার নিকট হইতে সায় না পাইয়া আপনিই কহিতে লাগিল, সকলে ভাববে কাজ চালাতে আমি পারলুম না। তাইত লোকে বলে, বাঙালীর ছেলেরা বি. এ. এম. এ পাশ করে বটে, কিন্তু বড় চাকরি পেলে রাখতে

পারে না। আমার কলেজের ছেলেরা আমাকে ছি ছি করতে থাকবে, আমি উত্তর দিতে পারব না।

যাহোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। আচ্ছা, আপনি ঘুমোন। এই বলিয়া ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ভারতী!

না, আমি বড় ক্লান্ত।

তবে থাক, থাক। রাতও আর নেই।

ভারতী পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল, আলোটা তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, এবং তেওয়ারী তেমনি চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অদূরে ভাঙাগোছের একখানা ডেকচেয়ার পড়িয়া ছিল, তাহাতেই আসিয়া সে উপবেশন করিল। অপূর্বর ঘরে ভাল আরামচৌকি ছিল কিন্তু ওই লোকটিকে সুমুখে রাখিয়া একই ঘরের মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ডেকচেয়ারটায় কোনমতে একটু হেলান দিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে যে তাহার কি করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। ইতিপূর্বে এই ঘরের মধ্যেই সে একাধিক বার কঠিন ধাক্কা-খাইয়াছে, কিন্তু আজিকার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। ভারতীর প্রথমেই মনে হইল, কি করিয়া এবং কাহার অপরিসীম করুণায় অপূর্ব সুনিশ্চিত ও প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে আজ রক্ষা পাইল, অথচ রাত্রিটাও প্রভাত হইল না, এতবড় কথাটা সে ভুলিয়াই গেল। তাহার পরম বন্ধু তলওয়ারকরের প্রতি, দলের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া ওই ডাক্তার লোকটির প্রতি যে কি অপরিসীম অপরাধ করিয়াছে সে কথাই তাহার মনে নাই। সেখানে বড় চাকরি ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। সেইখানে বসিয়া হঠাৎ ভারতীর চোখে পড়িল, সুমুখের খোলা জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সে মুহূর্তে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল, এবং কদর্য, অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত

স্থানে মাতালের নেশা কাটিয়া গেলে সে যেমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

একুশ

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সকল কথা, সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া ভারতী পরিশেষে কহিল, অপূর্ববাবু যে মস্ত লোক এ ভুল আমি একদিনও করিনি, কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ,— এ ধারণাও আমার ছিল না।

ভারতীর ঘরে খাটের উপর বসিয়া সব্যসাচী ডাক্তার একখানা বইয়ের পাতা উলটাইতেছিলেন, তাহার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, কিন্তু আমি জানতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হলে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায়? যাক, বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বৈ ত নয়!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র, বিশেষ করিয়া মেঝের উপর ছড়ানো পুস্তকের রাশি চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ ঘরে ইতিপূর্বে পুলিশ-তদন্ত হইয়া গেছে। সেইগুলা সব গুছাইতে গুছাইতে ভারতী কথা কহিতেছিল। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি তামাশা করচ দাদা?

না।

নিশ্চয়।

ডাক্তার কহিলেন, আমার মত ভয়ানক লোক, যে বোমা-পিস্তল কেবল মানুষ খুন করে বেড়ায়, তার মুখে তামাশা?

ভারতী কহিল, আমি ত বলিনে তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও! ও-কাজ তুমি পারোই না। কিন্তু তামাশা ছাড়া এ কি হতে পারে বলত? ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই যে সব ভুলে গিয়ে মনে রাখলে শুধু হাতের দাগ আর পাঁচ শ’ টাকার চাকরি, তার চেয়ে অধম, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর ত আমি দেখতে পাইনে। তুমি বলছিলে এ আমার মোহ। ভাল, তাই যদি হয়, তুমি আশীর্বাদ কর, এ মোহ আমার

চিরদিনের মত কেটে যাক, আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমার দেশের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, কহিলেন, তোমার মুখের ভাষাটা যে মোহ কাটার মতই তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তা সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্ববাবুই ঢের ভাল। দেনাপাওনার চুলচেরা বিচার করতে করতে বোঝাপড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ, তাই কর গে।

ভারতী কহিল, তার মানে দেশকে আমি ভালবাসতে পারব না?

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অনেক পরীক্ষা না দিলে কিন্তু ঠিক করে কিছুই বলা যায় না ভাই।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমাকে আজ বলে রাখলাম দাদা, সমস্ত পরীক্ষাতেই আমি উত্তীর্ণ হতে পারবো। তোমার কাজের মধ্যে এত স্বার্থ, এত সংশয়, এতবড় ক্ষুদ্রতার স্থান নেই।

তাহার উত্তেজনায় ডাক্তার হাসিলেন, পরে ক্রীড়াচ্ছলে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্তবড় মাটি, নদ-নদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও, আর সেখানে কেবল শত-সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই,

স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে।

দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার, ভারতী, এর বেশী দাবী করবার কিছু যদি থাকে, ত সে শুধু পরলোকে। এতবড় ভয়ানক পরীক্ষা তুমি কিসের জন্যে দিতে যাবে, বোন? বরঞ্চ, আশীর্বাদ করি অপূর্বকে নিয়ে তুমি সুখী হও,—আমি নিশ্চয় জানি, তার সকল দ্বিধা, সকল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে পড়বেই পড়বে।

ভারতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নতমুখে থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় তাহা নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই কোনমতে আমাকে বিদায় করে দিতে চাও দাদা?

তাহার এই একান্ত সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নের এমনি সোজা উত্তর বোধ হয় ডাক্তারের মুখে আসিল না, হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের মায়া কি সহজে কেউ কাটাতে পারে বোন? কিন্তু, কাল স্বচক্ষেই ত দেখতে পেলে এর মধ্যে কত লুকোচুরি, কত হিংসে, কত মর্মান্তিক ক্রোধ জরিয়ে রয়েছে। তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এ-সবের জন্যে তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ভাল কাজ হয়নি। শুধু তোমার কাছে কাজ আদায়ের আমার একটা দিন আছে, যেদিন ছুটি নেবার আমার তলব এসে পৌঁছবে।

ভারতী এবার আর তাহার চোখের জল বারণ করিতে পারিল না। কিন্তু তখনই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তুমিও আর এদের মধ্যে থেকো না দাদা।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এবার কিন্তু বড় বোকার মত কথা হয়ে গেল ভারতী।

ভারতী অপ্রতিভ হইল না, কহিল, তা জানি, কিন্তু এরা সবাই যে ভয়ঙ্কর নির্দয়।

আর আমি?

তুমিও ভারী নিষ্ঠুর।

সুমিত্রাকে কি রকম মনে হল ভারতী?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভারতীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। লজ্জায় উত্তর দিতে সে পারিল না, কিন্তু উত্তরের জন্য তাগিদও আসিল না। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু এইটুকু মাত্র মৌনতার অবকাশ-পথ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য মানুষটির ততোধিক আশ্চর্য হৃদয়ের রহস্যাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া ফেলিলেন। সহসা ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, অপূর্বকে তুমি অবিচার করেছ ভারতী। এতবড় মারাত্মক কাণ্ড এর ভেতরে আছে সে বেচারা বোধ করি কল্পনাও করেনি। বাস্তবিক বলচি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। চাকরি করতে বিদেশে এসেছে, বাড়িতে মা আছে, ভাই আছে, দেশে বন্ধু-বান্ধব আছে, সাংসারিক উন্নতির জন্য দশজনের একজন হবে এই তার আশা। লেখাপড়া শিখেচে, ভদ্রলোকের ছেলে পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। তাই তুমি বললে যখন পথের-দাবীর সভ্য হও, দেশের কাজ করো, সে বললে, বহুৎ আচ্ছা! তোমার কথা শুনলে যে তার কখনো মন্দ হবে না এইটুকুই কেবল সে নিঃসংশয়ে বোঝে। এই বিদেশে সকল আপদে-বিপদে তুমিই তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেই তুমিই যে হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেবে সে তার কি জানত, বল?

ভারতী অশ্রু গোপন করিতে মুখ নীচু করিয়া কহিল, কেন তুমি তাঁর জন্যে এত ওকালতি করচ দাদা, তিনি তার যোগ্য নন। যে-সব কথা তাঁর মুখ থেকে কাল শুনেচি, তারপরেও তাঁকে শ্রদ্ধা করা আর উচিত নয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, অনুচিত কাজই না হয় জীবনে একটা করলে। এই বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ত চোখে দেখনি, ভারতী, কিন্তু আমি দেখেচি। তারা যখন তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে অবাক হয়ে রইল।

তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এই সমস্ত বলেছ? সে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তারা বললে, এর শাস্তি—তোমাকে মরতে হবে। প্রত্যুত্তরে সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি ত জানি তার বিহ্বল দৃষ্টি তখন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই ত তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম বোন। এখন যাই কেননা তোমাকে সে বলে থাক, ভারতী, এ ধাক্কা বোধ হয় আজও অপূর্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতী আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আমাকে তুমি এই-সব শোনাচ্চ দাদা? তোমার চেয়ে কারও আশঙ্কা বেশী নয়, তাঁর আচরণে বেশী বিপদে তোমার চেয়ে কেউ পড়েনি। তবুও কেবল আমার মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ঘরে-বাইরে শত্রু তৈরি করলে!

ইস্! তাই বৈ কি!

তবে কিসের জন্যে তাঁকে বাঁচাতে গেলে বলত?

বাঁচাতে গেলাম অপূর্বকে? আরে ছিঃ! আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নর-নারীকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম নেই নাকি যে, ব্রজেন্দ্রের মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে?—শুধু এই ভারতী, শুধু এই! নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে? একটা কানাকড়িও না! এই বলিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হাসো দাদা, তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে তোমাকে আঁচল-চাপা দিয়ে কোন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিরকাল লুকিয়ে রেখে দি। যারা ধরে তোমাকে ফাঁসি দেবে তারাই কি তোমার দাম জানে? তারা কি টের পাবে জগতের কি সর্বনাশ তারা করলে? নিজের দেশের লোকই তোমাকে খুনে, ডাকাত, রক্তপিপাসু,—কত কথাই না বলে! কিন্তু আমি ভাবি, বুকের মধ্যে এত স্নেহ, এত করুণা নিয়ে তুমি কেমন করে এর মধ্যে আছ!

এইবার ডাক্তার আর একদিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তারপরে মুখ ফিরাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন সেই স্বচ্ছন্দ সুন্দর হাসিটি মুখে ফুটিল না। কথা কহিলেন, কিন্তু সেই সহজ কণ্ঠস্বরে কোথা হইতে একটা অপরিচিত ভার চাপিয়া আসিল, কহিলেন, নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি কখনো,—আচ্ছা থাক সে কথা। তোমাকে একটা গল্প বলি। নীলকান্ত যোশী বলে একটি মারহাট্টা ছেলেকে তুমি দেখোনি, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্যন্ত কেবলি আমার তাকেই মনে পড়ে। রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। একদিন রাত্রে কলম্বোর একটা পার্কের মধ্যে আমরা দুজনে বেড়া ডিঙিয়ে আশ্রয় নিই। গাছতলার একটা বেঞ্চের উপরে শুতে গিয়ে দেখি আর একজন শুয়ে আছে। মানুষের সাড়া পেয়ে সে জল জল করতে লাগলো, চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরিয়েছে,—দেশলাই জ্বেলে তার মুখের পানে তাকিয়েই বোঝা গেল, কলেরা। নীলকান্ত তার শুশ্রূষায় লেগে গেল। ফর্সা হয়ে আসে, বললাম, যোশী, লোকটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক পেয়াদাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাগানটায় রয়ে গেছে, কিন্তু সকালে তা হবে না। ওয়ারেন্টের আসামী আমরা,—এ ত মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে যেতে হবে। চল, সরি! নীলকান্ত কাঁদতে লাগলো, বললে, এ অবস্থায় একে কি করে ফেলে যাবো ভাই,—

তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যাও, আমি থাকি। অনেক বুঝালাম, কিন্তু যোশীকে নড়াতে পারলাম না।

ভারতী সভয়ে কহিল, কি হল তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, লোকটা বিবেচক ছিল, ভোর হবার পূর্বেই চোখ বুজলে। তাই সে-যাত্রায় নীলকান্তকে নড়াতে পারলাম।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সিঙ্গাপুরে যোশীর ফাঁসি হয়। পল্টনের সিপাইদের নাম বলে দিলে ফাঁসিটা তার মাপ হতো,—গবর্নমেন্ট থেকে অনেক প্রকার চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু যোশী সেই যে ঘাড় নেড়ে বললে আমি জানিনে, তার আর বদল হল না। অতএব, রাজার আইনে তার ফাঁসি হল। অথচ, যাদের জন্য সে প্রাণ দিলে, তাদের সে ভাল করে চিনতও না। এখনও এই-সব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী, তা নইলে বাকী জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতেই হয়ত রাজী হয়ে পড়তাম।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ডাক্তার কহিলেন, নরহত্যা আমার ব্রত নয়, ভাই, তোমাকে সত্যই বলচি, ও আমি চাইনে।

চাইতে না পারো, কিন্তু প্রয়োজন হলে?

প্রয়োজন হলে? কিন্তু, ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন এবং সব্যসাচীর প্রয়োজন ত এক নয় ভারতী।

ভারতী বলিল, সে আমি জানি। আমি তোমার প্রয়োজনের কথাই জিজ্ঞাসা করচি দাদা।

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন উওর দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাহার পরে কতকটা যেন অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বলিলেন, কে জানে কবে আমার সেই পরম প্রয়োজনের দিন আসবে। কিন্তু, থাক, ভারতী, এ তুমি জানতে চেয়ো না। তার চেহারা তুমি কল্পনাতেও সইতে পারবে না, বোন।

ভারতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, এ ছাড়া কি আর পথ নেই?

না।

তাঁহার মুখের এই সংশয়লেশহীন অকুণ্ঠিত উওর শুনিয়া ভারতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর 'না' সে সত্যই সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ছাড়া আর পথ নেই, এমন কিন্তু হতেই পারে না দাদা।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, না, পথ আছে বৈ কি! আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা খোলা আছে, ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌঁছাবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

ভারতী স্বীকার করিতে পারিল না। শান্ত, মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাদা, তুমি অশেষ জ্ঞানী। এই একটিমাত্র লক্ষ্য স্থির রেখে তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েচ, তোমার অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার মত এতবড় মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মনে হয়, কেবল তোমার সেবা করেই আমি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে তর্ক সাজে না, কিন্তু বল, আমার অপরাধ নেবে না?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কি বিপদ! অপরাধ নেব কিসের জন্যে?

ভারতী তেমনি স্নিগ্ধ সবিনয়ে কহিতে লাগিল, আমি ক্রীশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরাজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি, আজ তাদের প্রতি মন ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারী কষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ছাড়া এ কথা আমি কারও সুমুখে বলতে পারিনে। অথচ, তোমাদের মতই আমি ভারতবর্ষের,—বাঙলা দেশের মেয়ে। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য হইলেন।

সস্নেহে ডান হাতখানি তাহার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, এ আশঙ্কা কেন ভারতী? তুমি ত জানো তোমাকে আমি কত স্নেহ, কত বিশ্বাস করি।

ভারতী বলিল, জানি। আর তুমিও কি আমার ঠিক এই কথাই জান না দাদা? তোমার ভয় নেই, ভয় তোমাকে দেখানো যায় না, শুধু সেইজন্যেই কেবল তোমাকে বলতে পারিনি, এ বাড়িতে আর তুমি এসো না। কিন্তু এও জানি, আজকে রাত্রির পরে আর কখনো,—না না, তা নয়, হয়ত, অনেকদিন আর দেখা হবে না। সেদিন যখন তুমি সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করলে তখন প্রতিবাদ আমি করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর এই প্রার্থনাই করেচি, এতবড় বিদ্বেষ যেন না তোমার অন্তরের সমস্ত সত্য আচ্ছন্ন করে রাখে। দাদা, তবুও আমি তোমাদেরই।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, হাঁ আমি জানি, তুমি আমাদেরই।

তা হলে এ পথ তুমি ছাড়।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, কোন্ পথ?

বিপ্লবীদের এই নির্ম্মম পথ।

কেন ছাড়তে বল?

ভারতী কহিল, তোমাকে মরতে দিতে আমি পারব না। সুমিত্রা পারে, কিন্তু আমি পারিনে। ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এতবড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেছ, সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী শত-সহস্র লোকের পায়ে পায়ে এই পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্বমানবের একান্ত শুভবুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনিই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্তরেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোন দিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারে না। দাদা, মনুষ্যত্বের এতবড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া

আর কোথাও আমি দেখিনি,—নিষ্ঠুরতার এই বারংবার চলা-পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।

ডাক্তার ম্লানমুখে একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ভারতীর মাথার পরে হাত রাখিয়া বার-দুই ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই ভাই, আমি চললাম।

কোন উত্তর দিয়ে গেলে না, দাদা?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু কহিলেন, ভগবান যেন তোমার ভাল করেন।—এই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

বাইশ

জলপথে শত্রুপক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে, শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোটরকমের মাটির কেল্লা আছে, এখানে সিপাহি-সান্ত্রী অধিক থাকে না, শুধু ব্যাটারি চালনা করিবার জন্য কিছু গোরা-গোলন্দাজ ব্যারাকে বাস করে। ইংরেজের এই নির্বিঘ্ন শান্তির দিনে বিশেষ কড়াকড়ি এখানে ছিল না। নিষেধ আছে, অন্যমনস্ক পথিক কেহ তাহার সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাড়া করিয়াও আসে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইহারই একধারে গাছপালার মধ্যে পাথরে বাঁধানো একটা ঘাটের মত আছে, হয়ত কোন উচ্চ রাজকর্মচারীর আগমন উপলক্ষে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহার কাজও নাই, প্রয়োজনও নাই। ভারতী মাঝে মাঝে একাকী আসিয়া এখানে বসিত। কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের প্রতি ছিল তাহাদের কেহ যে দেখে নাই তাহা নহে, সম্ভবত স্ত্রীলোক বলিয়া, এবং ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহারা আপত্তি করিত না। বোধ করি এইমাত্র সূর্যাস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কতক অংশে, এবং পরপারবর্তী গাছপালার উপরে শেষ স্বর্ণাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দলে দলে পাখির সারি এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে,—কাকের কালো দেহে, বকের সাদা পালকে, ঘুঘুর বিচিত্র পাণ্ডুর সর্বাঙ্গে আকাশের রাঙ্গা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে কোন্ অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি অনুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য আকর্ষণ কাহারও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। এই কথা মনে করিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, দূর বৃক্ষশ্রেণীর সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপরে গাছপালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত

করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে হইতে অন্ধকার যেন সুদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সম্মুখের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।

সহসা নদীর ডানদিকের বাঁক হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাম্পান নৌকা সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় মাঝি ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সে চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্ষণকাল ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য মুসলমানী বাংলায় কহিল, আম্মা, ওপারে যাবে? একআনা পয়সা দিলেই পার করে দিই।

ভারতী হাত নাড়িয়া কহিল, না, ওপারে আমি যাবো না।

মাঝি বলিল, আচ্ছা দুটো পয়সা দাও, চল।

ভারতী কহিল, না বাপ্ তুমি যাও। বাড়ি আমার এপারে, ওপারে যাবার আমার দরকার নেই।

মাঝি গেল না, একটু হাসিয়া কহিল, পয়সা না হয় নাই দেবে, চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে ঘাটের একধারে নৌকা ভিড়াইতে উদ্যত হইল। ভারতী ভয় পাইল। গাছপালার মধ্যে স্থানটা অন্ধকার এবং নির্জন। দীর্ঘদিন এদেশে থাকার জন্য ইহাদের ভাষা বলিতে না পারিলেও ভারতী বুঝিত। এবং ইহাও জানিত, চট্টগ্রামের এই মুসলমান মাঝি-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্বৃত্ত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যাও বলচি এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবো।

তাহার উচ্চকণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বোধ হয় চট্টগ্রামী মুসলমান এবার ভয় পাইয়া থামিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কিন্তু শখ যায় নাই। পরনে লতাপাতা-ফুল-কাটা লুঙ্গি, কিন্তু তেলে ও ময়লায় অত্যন্ত মলিন। গায়ে মূল্যবান মিলিটারি ফ্রক-কোট, জরির পাড়, কিন্তু যেমন নোংরা তেমনি জীর্ণ। বোধ হয় কোন পুরাতন জামা-কাপড়ের দোকান হইতে কেনা। মাথায় বেলদার ন্যাকড়ার টুপি, কপাল পর্যন্ত টানা। এই মূর্তির

প্রতি রোষদৃপ্তচক্ষে চাহিয়া ভারতী কয়েক মুহূর্ত পরেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, চেহারা যাই হোক, কিন্তু গলার আওয়াজটাকে পর্যন্ত বদলে মুসলমান করে ফেলেচ!

মাঝি কহিল, যাবো, না পুলিশ ডাকবে?

ভারতী বলিল, পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়াই উচিত। অপূর্ববাবুর ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন!

মাঝি কহিল, তার কথাই বলচি! এসো। জোয়ার আর বেশী নেই, এখনো কোশ-দুই যেতে হবে।

ভারতী নৌকায় উঠিলে, ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার পাকা মাঝির মতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। যেন দুইহাতে দুখানা দাঁড় টানাই তাঁহার পেশা। কহিলেন, লামা জাহাজ চলে গেল দেখলে?

ভারতী কহিল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব এই দিকের ফার্স্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পেলে?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ডাক্তার কহিলেন, তার বাসায় কিংবা আফিসে আমার যাবার জো ছিল না, তাই জেটির একধারে শাম্পান বেঁধে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হাত তুলে সেলাম করতেই—

ভারতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কার জন্যে কিসের জন্যে এতবড় ভয়ানক কাজ তুমি করতে গেলে দাদা? প্রাণটা কি তোমার একেবারেই ছেলেখেলা?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, একেবারেই না। আর গেলাম কিসের জন্যে? ঠিক সেই জন্যেই, যে জন্যে তুমি চুপটি করে এখানে একলা বসে আছো, বোন।

ভারতী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিছুতেই চাপিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কখখনো না। এখানে আমি এমনি এসেছি—প্রায় আসি। কারও জন্যে আমি কখখনো আসিনি। তোমাকে চিনতে পারলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, না, একেবারেই না। এ বিদ্যে আমার খুব ভাল করেই শেখা,—এ দাড়ি-গোঁফ ধরা সহজ কর্ম নয়, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে ছিল অপূর্ববাবু যেন আমাকে চিনতে পারেন। কিন্তু এত ব্যস্ত যে তার সময় ছিল কৈ?

ভারতী নীরবে চাহিয়া ছিল, সেই অত্যন্ত উৎসুক মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য ডাক্তার নির্বাক হইয়া গেলেন।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল?

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কিছুই না।

ভারতী চেষ্টা করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বিশেষ কিছু যে হয়নি সে শুধু আমার ভাগ্য। চিনতে পারলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতেন, আর সে অপমান এড়াবার জন্যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো। চাকরি যাক, কিন্তু প্রাণটা বাঁচলো! এই বলিয়া সে দূর পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ডাক্তার নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া ভারতী সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবচ দাদা?

বল ত দেখি?

বলব? তুমি ভাবচো এই ভারতী মেয়েটা আমার চেয়ে ঢের বেশী মানুষ চিনতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে কোন শিক্ষিত লোকই যে এতবড় হীনতা স্বীকার করতে পারে,—লজ্জা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া-দয়া নেই,—খবর দিলে না, খবর নেবার এতটুকু চেষ্টা করলে না,—ভয়ের তাড়নায় একেবারে জন্তুর মত ছুটে পালিয়ে গেল, এ কথা আমি কল্পনা করতেও পারিনি, কিন্তু ভারতী একেবারে নিঃসংশয়ে জেনেছিল! ঠিক এই না? সত্যি বোলো?

ডাক্তার ঘাড় ফিরাইয়া নিরুত্তরে দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

আমার দিকে একবার চাও না, দাদা।

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ভারতীর দুই ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কহিল, মানুষ হয়ে মনুষ্য-জন্মের কোথাও কোন বালাই নেই এমন কি করে হয় দাদা? এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া তাহার ওষ্ঠাধরের কম্পন নিবারণ করিল, কিন্তু দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সায় দিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন না, সান্ত্বনার একটি বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল পলকের জন্য যেন মনে হইল তাঁহার সুর্মাটানা চোখের দীপ্তি ঈষৎ স্তিমিত হইয়া আসিল।

ইরাবতীর এই ক্ষুদ্র শাখানদী অগভীর ও অপ্রশস্ত বলিয়া স্টীমার বা বড় নৌকা সচরাচর চলিত না। জেলেদের মাছ ধরার পানসি কিনারায় বাঁধা মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু লোকজন কেহ ছিল না। মাথার উপরে তারা দেখা দিয়াছে, নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, নির্জন ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারের সতর্কচালিত দাঁড়ের সামান্য একটুখানি শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। উভয় তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন সম্মুখে এক হইয়া মিশিয়াছে। তাহারই ঘনবিন্যস্ত শাখা-পল্লবের অন্ধকার-অভ্যন্তরে সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতী নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। তাহাদের শাম্পান যে কোন্ ঠিকানায় চলিয়াছিল ভারতী জানিত না, জানিবার মত উৎসুক সচেতন মনের অবস্থাও তাহার ছিল না, কিন্তু সহসা প্রকাণ্ড একটা গাছের অন্তরালে গুল্ম-লতা-পাতা-সমাচ্ছন্ন অতি সঙ্কীর্ণ খাদের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র তরী প্রবেশ করিল দেখিয়া সে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চো?

ডাক্তার কহিলেন, আমার বাসায়।

সেখানে আর কে থাকে?

কেউ না।

কখন আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে?

পৌঁছে দেব? আজ রাত্রির মধ্যে যদি না দিতে পারি কাল সকালে যেয়ো।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না। তুমি আমাকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু আমার যে অনেক কথা আছে ভারতী !

ভারতী ইহার জবাব দিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল, না, তুমি আমাকে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু কিসের জন্য ভারতী? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

ভারতী অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, এমন কত রাত্রি ত তুমি একাকী অপূর্ব্বর সঙ্গে কাটিয়েছ, সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশী বিশ্বাসের পাত্র?

ভারতী তেমনি নির্বাক হইয়াই রহিল, হাঁ না কোন কথাই কহিল না। খালের এই স্থানটা যেমন অন্ধকার তেমনি অপ্রশস্ত। দু’ধারের গাছের ডাল মাঝে মাঝে তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। এদিকে নদীতে ভাটার উলটা টান শুরু হইয়া গেছে,—ডাক্তার খোলের মধ্যে হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া সম্মুখে রাখিলেন, এবং দাঁড় রাখিয়া দিয়া একটা সরু বাঁশ হাতে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, আজ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্চি ভারতী, দুনিয়ার কেউ নেই সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা বুঝতে বোধ হয় তোমার আর বাকী নেই? এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া যেন জোর করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাঁহার হাসির স্বরে কে যেন অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে তাহাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া নিঃশঙ্ককণ্ঠে কহিল, তোমার মনের কথা বুঝতে

পারি এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু, তোমার চরিত্রকে আমি চিনি। একলা থাকা আমার উচিত নয় বলেই ও-কথা বলেচি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ডাক্তার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতী, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বোন, আমার দিদি, আমার মা,—এ বিশ্বাস নিজের পরে না থাকলে এ পথে আমি আসতাম না। কিন্তু তোমার মূল্য দিতে পারে এ সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর শতাংশের এক অংশও অপূর্ব যদি কোনদিন বোঝে ত জীবনটা তার সার্থক হয়ে যাবে। দিদি, সংসারের মধ্যে তুমি ফিরে যাও,—আমাদের ভেতরে আর তুমি থেকো না। কেবল তোমার কথাটাই বলবার জন্যে আজ অপূর্বর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। আজ একটা কথাও না বলিয়া অপূর্ব চলিয়া গেছে। চাকরি করিতে বর্মায় আসিয়াছিল, মাঝে ক'টা দিনেরই বা পরিচয়!

সে ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম ও হিন্দু-আচারের প্রতি তাহার অগাধ নিষ্ঠা, তাহার দেশ আছে, সমাজ আছে, বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন কত কি! আর অস্পৃশ্য ক্রীশ্চানের মেয়ে ভারতী!

দেশ নাই, গৃহ নাই, মা-বাপ নাই, আপনার বলিতে কোথাও কেহ নাই। এ পরিচয় যদি সাঙ্গ হইয়াই থাকে ত অভিযোগের কি-ই বা আছে! ভারতী তেমনি নিঃশব্দেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল অন্ধকার দুই চক্ষু বাহিয়া তাহার অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

অনতিদূরে গাছপালার মধ্যে হইতে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। ডাক্তার দেখাইয়া কহিলেন, ওই আমার বাসা। এই বাঁকটা পেরোলেই তার দোরগোড়ায় গিয়ে উঠবো। খুব ফ্রি ছিলাম, কি-একরকম মায়ায় জড়িয়ে গেলাম, ভারতী, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। কোন একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ শুধু এইটুকুই যদি যাবার আগে দেখে যেতে পারতাম!

ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ত ভালই আছি, দাদা।

ডাক্তারের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এ বস্তুটা এতই অসাধারণ যে, ভারতীর কানে গিয়া তাহা বিঁধিল। কহিলেন, কোথায় ভাল আছ ভাই? আমার লোক এসে বললে তুমি ঘরে নেই।

ভাবলাম, জেটির উপরে কোথাও এক জায়গায় তোমাকে পাবো, পেলাম না বটে, কিন্তু তখনি নিশ্চয় মনে হল এই নদীর ধারে কোথাও-না-কোথাও দেখা তোমার মিলবেই। দুর্ভাগা তোমার আনন্দই শুধু চুরি করে পালায় নি, ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

এ কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে শুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মানুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আর সে সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ব নয়, তবু সে কাছেই ছিল বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হতো না। আশ্চর্য এই যে তোমার মত মেয়েরও নির্ভয় স্বাধীনতাকে তার মত একটা অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু উপায় কি দাদা?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উপায় হয়ত নেই। কিন্তু আমি ভাবচি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে, তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায় তুমি বাঁচবে কি করে? এমন করে ত কারও প্রাণ বাঁচে না ভারতী।

এমন করিয়া ভারতী আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। তাহার সময় ছিলই বা কৈ! তাহার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, আমি আর একটি মেয়েকে জানি, সে জাতে রুশ। কিন্তু তার কথা থাক। কবে তোমাদের আবার দেখা হবে আমি জানিনে, কিন্তু মনে হয় যেন একদিন হবে। বিধাতা করুন, হোক। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই, সেখান থেকে অপূর্বকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি-সতর্ক সাধনা শুরু হবে, তার প্রতিদিনের অসম্মানের গ্লানি মনুষ্যত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব করে দেবে ভারতী! হায় রে! এমন চির-শুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই, সেখানে এমনি করেই বোঝাতে হয়! পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি মানে না, দেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তার কাছে দাম আদায় হয়! হবেও হয়ত। কি জানি, কপালে বাঁচবার মিয়াদ ততদিন আমার আছে কি না, কিন্তু যদি থাকে দিদি, বোন বলে গর্ব করবার তখন আর সব্যসাচীর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তাহলে কি করতে বল? তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেছ সংসারের মধ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।

ভারতী বলিল, কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে না দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তবে যেয়ো না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা, যাওয়া আমার হবে না। সমস্ত পথ নিজের হাতে বন্ধ করে কেবল একটি পথ খুলে রেখেছিলাম, সেও আজ বন্ধ হয়ে গেছে এ ত তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেছ। এখন, যে পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই পথেই চলবো; কেবল এইটুকু মিনতি আমার রেখো, তোমাদের ভয়ঙ্কর পথে আমাকে তুমি ডেকো না।

ভগবানের মত দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাবারও এত রাস্তা বেরিয়েছে, শুধু তোমার লক্ষ্যে পৌঁছবারই রক্তপাত ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই? আমার একান্ত মনের বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, কোথাও-না-কোথাও অন্য পথ আছেই আছে! এখন থেকে তারই সন্ধানে আমি পথে বার হবো। ভয়ানক দুঃখ যে কি সে রাত্রে আমি টের পেয়েছি, যেদিন তোমরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, এই আমার বাসা। এই বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা জোর করিয়া ডাঙ্গায় ঠেলিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন, এবং লণ্ঠন হাতে তুলিয়া পথ দেখাইয়া কহিলেন, জুতো খুলে নেবে এসো। পায়ে একটু কাদা লাগবে।

ভারতী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। গোটা-চারেক মোটা মোটা সেগুন কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য তক্তা মারিয়া একটা কাঠের বাড়ি খাড়া করা হইয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া গিয়া সমস্ত তলাটা একহাঁটু পাঁক পড়িয়াছে, লতাপাতা, গাছপালা পচার দুর্গন্ধে বাতাস পর্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, সুমুখের হাত-দুই পরিসর পথটুকু ছাড়া চারিদিক কেয়া ও দেনো গাছের এমনি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরিয়া আছে, যে, শুধু সাপখোপ বাঘ-ভালুক নয়, একপাল হাতি লুকাইয়া থাকিলেও দেখিবার জো নাই। ইহার ভিতরে যে মানুষ বাস করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই লোকটির কাছে সকলই সম্ভব। ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি ও দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে একটি সাত-আট বছরের ছেলে আসিয়া যখন দ্বার খুলিয়া দিল, তখন ভারতী বিস্ময়ে বাক্যহীন হইয়া রহিল। ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল মেঝের উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া একজন অল্পবয়স্কা বর্মা স্ত্রীলোক, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে যে যেখানে পড়িয়া, ইহাদেরই একজন ঘরের মধ্যে বোধ হয় একটা অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছে,—খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই—একটা দুঃসহ দুর্গন্ধে গৃহের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঝের সর্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছে

কাঁটা এবং পিঁয়াজ-রসুনের খোলা, নিকটেই গোটা দুই-তিন কালি-মাখা ছোট-বড় মাটির হাঁড়ি, ছেলেগুলা হাত ডুবাইয়া খাবলাইয়া ভাত-তরকারি খাইয়াছে তাহা চাহিলেই বুঝা যায়; ইহারই পাশ দিয়া ভারতী ডাক্তারের পিছু পিছু আর একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও কোন আসবাবের বালাই নাই, মেঝের উপর চাটাই পাতা, একধারে একটা শতরঞ্চি গুটান ছিল, ডাক্তার স্বহস্তে ঝাড়িয়া তাহা পাতিয়া দিয়া ভারতীকে বসিতে দিলেন। ভারতী নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই পরিচিত প্রকাণ্ড বোঁচকাটি ডাক্তারের একপাশে রহিয়াছে। অর্থাৎ, সত্যসত্যই ইঁহার এই ঘরটিই বর্তমান বাসস্থান। ও-ঘর হইতে বর্মা স্ত্রীলোকটি কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বর্মা ভাষাতেই তাহার জবাব দিলেন। অনতিকাল পরেই সেই ছেলেটা সানকিতে করিয়া দু' চাঙড় ভাত, পেয়ালার ঝোল এবং পাতায় করিয়া সেই ছেলেটা খানিকটা মাছ-পোড়া আনিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া গেল। নৌকার লণ্ঠনটি ডাক্তারের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারই আলোকে এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিবামাত্রই ভারতীয় গা বমি-বমি করিয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু এ-সব—

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, না, কিছুতে না। সে ক্রীশ্চানের মেয়ে, জাতিভেদে মানে না, কিন্তু যেখান হইতে যেভাবে এই-সকল আনীত হইল তাহা ত সে আসিবার পথেই চোখে দেখিয়া আসিয়াছে!

ডাক্তার কহিলেন, আমার কিন্তু ভারী ক্ষিদে পেয়েছে ভাই, আগে পেটটা ভরিয়ে নিই। এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া স্মিতমুখে আহারে বসিয়া গেলেন। ভারতী চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, ঘৃণায় ও অপরিসীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। হায় রে দেশ! হায় রে মুক্তির পিপাসা! জগতে কিছুই ইহারা আর আপনার বলিয়া

অবশিষ্ট রাখে নাই? এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংস্রব, এমনি করিয়া এই বন্য-পশুর জীবনযাপন, ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুও ভারতীয় কাছে অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেই পারে, কিন্তু এই যে দেহ-মনের অবিশ্রাম নির্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা, স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও কি ইহার তুলনা আছে! অধীনতার বেদনা কি ইহাদের এ জীবনের আর সমস্ত বেদনাবোধেই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে! কিছুই কোথাও বাকী নাই! তাহার অপূর্বকে মনে পড়িল। তাহার চাকরির শোক, তাহার বন্ধুমহলে হাতের কালশিরার লজ্জা,—ইহারাই ত মাতার সহস্রকোটি সন্তান! ইহারাই ত দেশের মেরুমজ্জা, খাইয়া-পরিয়া পাস করিয়া চাকরিতে কৃতকার্য হইয়া যাহাদের একটানা জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরম নিরাপদে কাটিতেছে! আর ওই যে লোকটি একান্ত তৃপ্তিতে নির্বিকারচিত্তে বসিয়া ভাত গিলিতেছে,—ভারতীয় মুহূর্তের জন্য মনে হইল, হিমাচলের কাছে সহস্রখণ্ড উপলের তিলার্ধ বেশী তাহারা নয়! আর তাহাদের একজনকে ভালবাসিয়া, তাহারই ঘরের গৃহিণীপনার বঞ্চিত দুঃখে আজ সে বুক ফাটিয়া মরিতেছে। অকস্মাৎ ভারতী জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, তোমার নির্দিষ্ট ওই রক্তারক্তির পথ কিছুতেই ভাল নয়। অতীতের যত নজিরই তুমি দাও—যা অতীত, যা বিগত, সে-ই চিরদিন শুধু অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, মানব-জীবনে এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়! তোমার পথ নয়, কিন্তু তোমার এই সকল-বিসর্জন-দেওয়া দেশের সেবাই আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম। অপূর্ববাবু সুখে থাকুন, তাঁর জন্যে আর আমি শোক করিনে, আমার বাঁচবার মন্ত্র আজ আমি চোখে দেখতে পেয়েছি।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাতের ডেলার মধ্যে হইতে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল ভারতী?

তেইশ

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার উপরে চাপিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বর্মা সেলাই টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল, এবং কয়েক মুহূর্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধুম উদ্গিরণ করিয়া চুরুটটি ডাক্তারের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভারতীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন অনুভব করিয়া ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, অমনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসি নে ভারতী। অপূর্বর কাকাবাবু আমাকে যখন রেঙ্গুনের জেটিতে প্রথম গ্রেপ্তার করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কলকে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি, এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাও না তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়িটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বর্মি মেয়েটি, এবং শিশুগুলি?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না, ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমারি মত ফাঁসিকাঠের আসামী, কিন্তু সে অন্য বাবদে। সম্প্রতি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবে না।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্যে আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু সর্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গপুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবে না, সে তোমাকে আনবার পূর্বেই আমি জানতাম। কিন্তু, তোমাকে বলবার আমার যত

কথা ছিল, সে ত এই স্বর্গপুরী ছাড়া প্রকাশ করবারও আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটুখানি কষ্ট পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। উত্তর এবং পূর্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আসতে হবে। ফিরতে হয়ত বছর-দুই লাগবে। কিন্তু, আজ তুমি নানারকমে এত ব্যথা পেয়েছ বোন, যে সকল কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তাহলে কালই চলে যাচ্চো?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্তন নাই। তারপরে এই রাত্রিটুকু অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবে না!

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর ও-পথে কর্মসূত্রে যদি না অ্যামেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব।

তারপরে আগুন যতদিন না জ্বলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর ফিরতে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শান্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটা-পথে চীনদেশে যাওয়া যে কত ভয়ানক সে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসো না দাদা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, অতটুকু

তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও এইখানেই আবার কেন ফিরে আসতে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্যে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাবো না। মেয়েরা এ দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জ্বলছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী, এই কথাটা আমার তখন স্মরণ করো, এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেচে। কথাটা আমার মনে থাকবে ত?

এই ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক ত আমি নই!

ডাক্তার কহিলেন, তা আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেন না হোক, বড়ভাইয়ের কথাটা স্মরণ করতে ত দোষ নেই, তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে!

ভারতী কহিল, বড়ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মানুষকে তুমি টেনে আনো দাদা? আমাকে কিন্তু তা পারবে না। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল, এবং গুটানো শতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ব্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়া গেছে, এ জীবনে সেই আমার একটিমাত্র পথ। আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ এ আবার কি শুরু করে দিলে ভারতী? ঐ ছেঁড়া কম্বলটুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল। যার জন্যে যখনই বিছানা পাতি দাদা, তোমার এই ছেঁড়া কম্বলটুকু আর কখনো ভুলব না। মেয়েমানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বোন, তোমার কাছে আমি হার মানছি। কিন্তু তুমি ছাড়া নিজের পরাজয় আমাকে কোনদিন কোন মেয়েমানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি।

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদির কাছেও না?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোটবোনের অপরাধ মাপ করবে?

করব।

তবে বল সুমিত্রাদিদি তোমার কে? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও যে আমার কে এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, যেদিন ওকে চিনতাম না বললেও চলে, সেদিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতূহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদি মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে সুরভায়া রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনারিদের ইস্কুলে লেখাপড়া

শিখতো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ-ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে, মা, মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে, এবং জন-দুই মাদ্রাজী মুসলমানে মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিং গাঁজা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করেন, শুধু দেখতে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরভায়ার পথে রেলগাড়িতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্যন্তই। কিন্তু হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগ স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। বাঙ্গালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

ভারতী বলিল, সুন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুলতে পারলে না,—না দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে যাই হোক, একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু বছর-খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙ্কুলান শহরের জেটিতে দেখা-সাক্ষাৎ। এক তোরঙ্গ আফিং, চারিদিকে পুলিশ, আর তার মাঝে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তার জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চমকে গেল। সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটাও আমারই দেওয়া। নইলে, তার সাবেক নাম ছিল—রোজ দাউদ। তখন বেঙ্কুলানের মামলা-মকদ্দমা পাদাঙ শহরে হতো, আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন পল ক্রুগার, তাঁর বাড়িতে সুমিত্রাকে নিয়ে এলাম।

মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোনদিন পাবেও না দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁদের দলের লোক খবর পেয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো, বন্ধু ক্রুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্যে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, অতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি সুমিত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ অনেকটা অপূর্বর মত। আবার বছর-খানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার শহরে একটি ছোট্ট অখ্যাত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকে দেখি সুমিত্রা বসে। তার পরনে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ি, আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কাজে ভর্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। যে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কার একদিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু, তাঁকে তুমি কতখানি ভালবাসো? কিন্তু, লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ ওই আশ্চর্য

রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাঁহার নির্ম্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য—কিছুরই অর্থ বুঝিতে যেন আর তাহার বাকী রহিল না।

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্তকালের জন্য যেন তিনি লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, ওই মুহূর্তের জন্যই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রতিবিন্দুটির উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বৃথায় অর্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্তকণ্ঠ ও সহজ-হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে সুমিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যান্টনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে না-ই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল? আমরা ত কেউ দিইনি!

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিব্যি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম সে কথা আর কেউ জানবে না, কিন্তু, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্যন্ত না শুনলে আর কৌতূহল মেটে না। আবার না বললে এমন-সব কথা অনুমান করতে থাকবে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বলাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও ত তাই বলচি দাদা। ঐটুকু তুমি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে সুমিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম, কিন্তু, কিছুতেই শুনলে না। যখন বললাম, আমাকে তাহলে অন্যত্র যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদের দল দেখা দিলেন। জন-দশেক লোক, একজন অর্দ্ধেক

আরবি অর্ধেক নিগ্রো, ছোটখাটো একটা হাতীর মত, অনায়াসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে বসলো।

ভারতী কহিল, আবার তোমারই সাক্ষাতে! তোমাদের দুজনের বোধ করি খুব ঝগড়া বেধে গেল?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বারবার বলতে লাগলো সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিং বেচার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপগুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে,—এদের একটা প্রকাণ্ড দুর্বৃত্তের দল। এরা না পারে এমন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি, এবং তার চেয়েও বেশী বুঝলাম যে এ সমস্যার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিন্তু বিলম্ব সয় না, সদ্যসদ্যই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাত তারা মিথ্যে বলে যায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবধান হয়ে রইলাম। তারা যে সদলবলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে তা জানতাম।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, তখনি তোমরা পালিয়ে গেলে না কেন? পুলিশে খবর দিলে না কেন? ডচ্ গবর্নমেন্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাটলো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে যাবার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল জ্বর,—সে উঠতে পারলে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে

দেখলাম হোটেলওয়ালা কপাট খুলে দিয়েচে, এবং জন দশ-বারো লোক বাড়িতে ঢুকচে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সুমিত্রার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে? তোমরা পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কৈ? কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাবার সিঁড়িটা আটকে ফেললাম।

ভারতী পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘটলো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেরটা জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগলো ঠিক হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো, পাহারা এলো, গাড়ি এলো, ডুলি এলো, জন-ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেলওয়ালা এজাহার দিলে—ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হত বলা যায় না, কিন্তু সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোকগুলোর নিশানদিহি যখন হল না, তখন পুঁতেটুঁতে ফেললে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাক্রোধ হইয়া রহিল, পরে শুষ্ক বিবর্ণমুখে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, পুঁতেটুঁতে ফেললে কি? তোমার হাতে কি তবে এতগুলো মানুষ মারা গেল নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। নইলে নিজেদের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকোয়, কতক ঘোড়ার গাড়িতে, কতক স্টীমারে মিনাডো শহরে এসে পৌঁছলাম, এবং সেখান থাকে নামধাম ভাঁড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে

কোনমতে দুজনে ক্যান্টনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আর বোধ হয় তোমার শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক না ভারতী? কেবলি মনে হচ্ছে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অন্যমনস্ক ভারতী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে না দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদাপিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে, এবং সুমিত্রার উপদেশমত সে-ও ইতিপূর্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু, ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র, এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ডাক্তারের পকেটে রহিল, হয়ত, কত নরহত্যাই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেন না কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাবে না!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে বোন, তোমার কাছে ছুটি নিয়েই আমি যাবো।

চব্বিশ

নদীপথে সমস্তক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই। অধিকাংশই এলোমেলো,—শুধু যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সব চেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়া গেল সে সুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ কাহিনী। সুমিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব-বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্য হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ব করিয়া থাক, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিসীম ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাখা খড়্গের সম্মুখে যেমন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে,—তেমনি। অপূর্বকে ভারতী যে কত ভালবাসিত সুমিত্রার তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবিদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলার্ধ বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এমনি করিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া বুঝাইত যে কর্তব্যের প্রতি এতবড় নির্ম্মম নিষ্ঠা না থাকিলে পথের-দাবীর কর্ত্রী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাহারা নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহার আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি, তাহার কর্তব্যবোধ, তাহার পাষাণ-হৃদয় সকলের সঙ্গেই আজ ভারতী সঙ্গতি দেখিতে লাগিল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে যেন আপনা-আপনিই একেবারে

বাহুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে সে নিজের স্বজাতি বলিয়া ভাবিতেই পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, করুণার দিক দিয়া সুমিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া সিংজী, খবর সব ভালো?

হীরা সিং বলিল, সব্ আচ্ছা।

আমিও যেতে পারি নাকি?

হীরা কহিল, আপ্‌কো কঁহি যানা দুনিয়ামে কোই রোক সক্তা? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িল না, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবো না দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাকবার দরকার নেই ভারতী।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাকলেও আমি পালাতে পারব না। কিন্তু এর সঙ্গে যাবো না।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্বর বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি ত জানো ভারতী পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে—

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে—

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই থামিয়া গেল। কিন্তু, এতরাত্রে ও-পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশী কে জানিত? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক জায়গায়? আমাদের কবির ওখানে? সে নদীর ঠিক আর-পারেই থাকে। যাবে?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী, বেহালা-বাজিয়ে,—

ভারতী খুশী হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার কহিলেন, আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার গলা শুনলেই তার নেশা কেটে যায়। তা ছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকে দুটো খাইয়ে দিতেও পারব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষে কর দাদা, এই শেষ-রাত্তিরে আর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করো না,

কিন্তু তাই চল যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আসবো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া গেল। ভারতী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করেনি?

ডাক্তার কহিলেন, না। ও টেলিগ্রাফ আফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরী তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্রির কোন সময়ে কোনখানেই বেমানান দেখায় না।

সেইমাত্র জোয়ার শুরু হইয়াছে, খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্য কিনারা ঘেঁষিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাক গে, কাজ নেই দাদা আমাদের ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ চল, তোমার বাড়িতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘণ্টাও লাগবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সেজন্য নয়, ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা করাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এ ত আমার সহজে বিশ্বাস হয় না, দাদা।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেউ ওকে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙ্গা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায়নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ও ভারী পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। ওকে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তাহলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করো না কেন?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন-কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী। একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তাছাড়া, ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাঁধা আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারী দুঃখ পায়, তখন, আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্যেই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল। কিন্তু, তোমার গুণীকে তুমি বিশ্বাস কর কি করে? উনি মাতাল হয়ে ত সমস্তই বলে ফেলতে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, ওই জ্ঞানটুকুই ওর বাকী থাকে। আর একটা সুবিধা এই যে, ওর কথায় বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করে না।

ভারতী কহিল, ওঁর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, ধীরেন,—যখন যা মনে আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাধ্য।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পর-পারের জন্য নৌকার মুখ ফিরাইলেন। স্রোত ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরণী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানির বড় বড় কাঠের মাড় স্তূপাকার করা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্তী জাহাজের তীব্র আলোকে ঝিকঝিক করিতেছে, ইহারই একটা ফাঁকের মধ্যে ডিঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। পিচ্ছিল কাঠের উপর দিয়া সাবধানে পা টিপিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া গেল, আশে পাশে ছোট-বড় ডোবা, লতা-গুল্ম ও কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই একধার দিয়া এই পথ অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, ও-পারের এমনি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ-ভালুকের মত এ ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে জানো না? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

মন্তব্য শুনিয়া ভারতীর আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এমনি সহাস্য কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিরুদ্ধে কি অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাকত! হয়ত, বিদেশ থেকে শিকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্তশোষণের জন্য কামড়ে পড়ে থাকত না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটির এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুক্ষণ হইতে একটা অপূর্ব সুস্বর মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কানে লাগিতেছিল, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের জেগে আছেন এবং সজ্ঞানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থামিল। কোথায় কোন্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কান্নাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি-অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট-দুয়ের জন্য ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিল না। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি। কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু পাগলার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার দুর্দশার অবধি নেই। আমিই বোধহয় ওকে দশবার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনেচি অপূর্বর কাছে পাঁচ টাকায় বাঁধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওঁর নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছপালার আড়ালে একখানা দোতলা কাঠের বাড়ি। একতলাটা পাঁক, জোয়ারের জল এবং দেনো গাছে দখল করিয়াছে, সুমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তাহারই সর্বোচ্চ ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্তবড় একটা রঙ্গীন চীনালণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় বড় কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা,—শশিতারা লজ্।

ভারতী বলিল, বাড়ির নাম রাখা হয়েছে শশিতারা লজ্? লজ্ ত বুঝলাম, শশিতারাটা কি?

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, বোধ হয় শশিপদর শশী এবং নবতারার তারা এক করে শশিতারা লজ্ হয়েছে।

ভারতীর মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, এ ভারী অন্যায়। এ-সব তুমি প্রশ্রয় দাও কি করে?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্বশক্তিমান মনে কর? কে কার লজের নাম শশিতারা রাখবে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ-সব নোংরা কাণ্ড তুমি বারণ করে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুনচি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি করে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মরতে কতক্ষণ দিদি? শুনেচি ব্যাটা মরেচে দিন-পনর হল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তিসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া, এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থামতেই হবে, নইলে সে যে ভারী বিশ্রী দেখাবে!

তাহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখবো। তবে, থামলে বিশ্রী দেখাবে কি না-থামলে বিশ্রী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার চাপা-গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগলাটার জন্যেই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি বাসত! সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সংসারের ভাল-মন্দের ফরমাশ, বন্ধুগণের অভিরুচি,—এ-সব অতি তুচ্ছ কথা ভারতী! কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে সত্য যদি থাকে ত সেই সত্যই যেন ওকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। এবং তেমনি চাপাকণ্ঠে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তা কি হয় দাদা?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে নিঃশব্দপদে উঠিয়া গুণীর বন্ধ-দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেহালা থামিল। খানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আঁধারে ঠাহর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—অ্যাঁ আপনি? ভারতী? আসুন, আসুন, আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া

তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দদীপ্ত মুখের অকপট আবাহনে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দশ হাজার টাকার ড্রাফট্ আসছে,—নট্ এ পাই লেস্! বলতাম না? আমি জোচ্চোর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন হল ত? দশ হাজার! নট্ এ পাই লেস্।

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফ্ট সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত এমন কেহ ছিল না যে অচিরভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতেই শুনে নাই। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা-তামাশাই করিত, কিন্তু ইহার ছিল ওস্তাদজীর মূলধন।

ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসঙ্কোচে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর তাহার কত আশা-ভরসাই না জড়াইয়া ছিল! বছর পাঁচ-সাত পূর্বে তাহার বিত্তশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতুত ভায়েদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রি করিবার কথাবার্তা চলিতেছিল, মাসখানেক পূর্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটর্নির চিঠি ছিল, টাকাটা দুই-এক দিনেই পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ হাজার টাকার না কথা ছিল, শশি?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি? তাছাড়া নিজের মাসতুত ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল, ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাই ত মেজদা লিখে জানিয়েছেন। কিরকম

লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজদার চিঠির জন্য উঠিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, থাক থাক, মেজদার চিঠির জন্যে আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এইরকম একটা ক্ষ্যাপা মাসতুত ভাই আমাদের থাকলে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুশী হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রি না করিয়াই এতগুলা টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তাহার মেজদার মত আদর্শপুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজদাকে না দেখেই তাঁর দেবচরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশটা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ, কালকের দশ আর অপূর্ববাবুর দরুন সাড়ে আট টাকা,—পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরশু-তরশু দিয়ে দেব। নিতে হবে, না বলতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল, ড্রাফ্টটা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেণ্ডথ্রিফ্ট যা মুখে এসেছে লোকে বলেছে, কিন্তু এবার দেখাবো। আসলে হাত পড়বে না, কেবল সুদের টাকাতেই সংসার চালিয়ে দেবো, বরঞ্চ বাঁচবে দেখবেন, পোস্ট-অফিসেও একটা অ্যাকাউন্ট খুলেত হবে,—ঘরে কিছু রাখা চলবে না। চাই কি বছর-পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ি কিনতেও পারবো। আর কিনতেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়ল কিনা! সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে!

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠলেন, কিন্তু সে মুখ গম্ভীর করিয়া আর-একদিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েছি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

শশী কহিল, হাঁ একেবারে। নবতারা প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছেন।

এই লইয়া উভয়ের আলোচনা দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সকৌতুক প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর-দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, শশি, তুমি ত তাহলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়তে পারচ না।

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তাহলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনাদের সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখতে পারব না। লাইফ আমার রিস্ক করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক, চক্ষুলজ্জা আছে এ অপবাদ অতিবড় শত্রুতেও দেবে না। পারো যদি এই বিদ্যেটা ওর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশীর পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি পারিনে, কিন্তু অতুলবাবুর কাছে এ বিদ্যে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটি হয়ে যেতো দাদা।

তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারী হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিল না, করিলেও হয়ত তাৎপর্য বোধ করিত না, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ যাঁহার, বুঝিবার তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট-দুই সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথমে কথা কহিলেন ডাক্তার, বলিলেন, শশি, দিন-দুয়ের মধ্যে আমি যাচ্চি। হাঁটা-পথে চীনের মধ্যে দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যান্ডগুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে

অ্যামেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কি না তাই বা কে জানে,—কিন্তু, হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশি, তোমার বাড়িতে বোধ হয় আমার স্থান হবে না?

শশী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠশব্দ আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে। আমার বাড়িতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে কহিলেন, সেকি কথা শশি, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মানুষের আর আছে কি?

শশী মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা হোক গে। এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিয়ো শহরে বোমা ফেলার জন্যে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সাব্‌এডিটার। বাসার সুমুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বললেন, মরলে চলবে না শশি, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তারবাবু, উঃ—মনে আছে আপনার? এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু আ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সাঙ্গ হত ডাক্তারবাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হত না। উঃ—ঐ বেঁটে ব্যাটাদের মত বজ্জাত আর ভূ-ভারতে নেই। আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না—বাসায় থাকতাম, বেহালা শেখাতাম। কিন্তু সে কথা কি শুনতো? শয়তান ব্যাটাদের না আছে আইন, না আছে আদালত! ধরতে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়ত। আজ যে কথা কইচি, চলে

ফিরে বেড়াচ্চি সে কেবল ওঁরই কৃপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধুও দুনিয়ায় নেই ভারতী, এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাও না দাদা। ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন, শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝাবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলে ছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী। বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোনদিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি-বাঁধার ঘটনাও শশী ভুললে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা সাদা-চামড়াকে চিনেছিল। আড়াই শ বৎসর আগে যে জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র-সূর্য যতদিন বিদ্যমান থাকবে খ্রীষ্টান যেন না তাদের রাজ্যে ঢোকে, এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে জাত যাই কেন না করে থাক তারা আমার নমস্য!

বক্তার দুই চক্ষু একনিমেষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল। সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক! সে ঠিক!

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব অব্যক্ত আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে একমুহূর্তের জন্য এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বলছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস? ক্যান্টনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন্ আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠচে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে-সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধতে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইল না শশী। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবতারাদের একবার আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘুপদ। কিন্তু, সঙ্গে তাঁর 'দের'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেন্ট? সুমিত্রাদিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল।

ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাঁহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বৃথায় যাইবে না, প্রত্যাসন্ন বিক্ষেপের মুখে পথের-দাবীর শেষ মীমাংসা আজ অনিবার্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও শহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার

অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বাঁ হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শান্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য, কিন্তু ভারতীর মুখ অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

পঁচিশ

একে একে ঘরের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সকলেই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সেই মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ আজিকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সংবাদ তাঁহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গূঢ় পরামর্শ যে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগুন্তুকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হউক, ডাক্তারের আসার কথা তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে এ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত আজই ইহার একটা কঠিন বুঝাপড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি শুরু হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার গেরুয়া রঙের মস্ত পাগড়ি খুলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্রদৃষ্টি একবার ভারতীর ও একবার ডাক্তারের মুখের পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবতারা। কিছুর সঙ্গেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, আজ ভারতীকে

সে চিনিতেও পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্বনাশা ঝড়ের পূর্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে শুরু করেছে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা চোখের ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্রকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয় সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কর্কশ ভাঙ্গাগলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তার প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটাকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মুখ নীচু করিয়া রহিল, এবং অন্য কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ হয়ে গেছে, এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত ক্রোধের বশেই তোমাদের তা মনে ছিল না। আহমেদ দুরানী ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারি, অমন নির্ভীক, কর্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিল না। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার

মাস-খানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন্ একটা রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, দুরানীকে তুমি দেখেছিলে, না?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙ্গা-দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্যন্ত পেলাম না যে আমার একখানা হাত ভেঙ্গে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাশা যখন পুরোদমে চলছিল তখন রক্ষা করা তাকে একবিন্দু কঠিন ছিল না। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐখানেই বাস করছিল। তবুও, এত বড় দুর্ঘটনা কেন ঘটলো জানো? ফয়জাবাদের মথুরা দুবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিষ করে তুলেছিল। দুরানীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যান্টনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরানীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেছে। প্রতিকারের কিছুই আর ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে-রাত্রের গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার, তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল।

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত করছেন আমি ত বুঝতে পারচি নে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইন এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চলবে না,—

ব্রজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করিল, আলোচনাও চলবে না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন না, আড়ালে চলবে না। কিন্তু চলে তা জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যান্টনের সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, দুরানীর মৃত্যুতে তাঁরা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, সুতরাং এ বস্তু চলেও আসচে, আমিও অবহেলা করেই আসচি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেমনি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বলচি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। দুরানীর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়া দরকার অপরেরও ঠিক এমনি থাকতে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকেই চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিল না।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্বাক্ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড । ভেবেছিলাম যাবার পূর্বে আর কিছু করব না, কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর সইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয়?

ব্রজেন্দ্রর মুখ কালো হইয়া উঠল। মুহূর্তকাল সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি এনার্কিস্ট, আমি রেভোলিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—নিতেও পারি, দিতেও পারি।

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেল্ট থেকে ওটা টেনে বার করবার সময় হবে না ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল-সমেত বাঁ হাত তুলিয়া ধরিলেন; ভারতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা তাঁহার চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিলেন, ছি!

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিমিষে যেন একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ-সব কি বলুন ত?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার

সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু? অপূর্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুশীই হয়েছি, কিন্তু আপনার অন্যায় তাতে কম হয়নি, এ সত্য বলতে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্ধা ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই না হয় যাক। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়েড কম্রেডের রক্তেই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার!

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট-দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে-সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা? এই ট্রায়েড কম্রেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি। সে যাক্। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াৎ সেন্ একদিন বলেছিলেন, নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ রাস্তা থেকে ততখানি দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অন্যত্র যেতে হচ্চে, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভেঙ্গে গেলে ত আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড ল্যক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায় একবার এ্যাটেম্প্ট্ করেছ, পরশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পরে ইফ্ উই মিট—ইউ নো!

সুমিত্রা উদ্বেগে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব কথার মানে? এ্যাটেম্প্ট্ করার অর্থ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই অ্যাম সরি!

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া ছিল, ইঙ্গিতমাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু দ্বারের কাছে হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, গুড্ নাইট!

এই বিদায়-বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, অভিভূতের ন্যায় সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গেলে, ডাক্তার উপরের দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন, অকস্মাৎ কবাট খুলিয়া শশী মুখ বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল । রুদ্ধশ্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মধ্যেই নই ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখবো। এ আমি ভুলব না।

ডাক্তার সস্নেহে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে তোমাকে মানুষ নয়, শশি? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে ত না ভোলাই ভাল।

শশী বলিল, না, আমি ভুলব না। কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা-কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েছে, পাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ

আর মনে না থাকে। তাই ছুটে বলতে এসেছে, ওর যা-কিছু আছে সমস্তই আমার।

ভারতী বলিল, তাই নাকি শশিবাবু?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুকে স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাকবে হে শশি, থাকবে। এ বস্তু জগতে এত সুলভ নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন? তার আগে কি আর দেখা হবে না?

ডাক্তার বলিলেন, ধরে রাখো দেখা হবেই না। কিন্তু তুমি ত আমার বয়েসে ছোট, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্চি, তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সবিনয়ে কহিল, আসচে শনিবারটা পর্যন্তও কি থাকতে পারেন না?

ভারতী কহিল, শনিবার যে ওঁদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরণী শেষ-ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সযত্নে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আসতে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আসবে না শশি, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্চি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্যে এই প্রার্থনাই করব, বাকী দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগি দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠ্যালা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভাঁটার টানে ঢিমা পড়িয়া আসিয়াছে। সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীরভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া

তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জন্য পাড়ি দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কনুই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাকলে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উদ্যত, তাকেও তুমি মন খুলে আশীর্বাদ করে এলে,—শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকেই আশীর্বাদ করবার? তুমি গুরুজন হও আর যাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্বাদ করব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ছোটর আশীর্বাদ খাটে না। উল্টো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়। যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে সুমিত্রাদিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও।

সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বলবে সুমিত্রাকে ত তুমি ভালবাস না। নাই বাসলে। তোমাদের পুরুষমানুষের ভালবাসার কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই? অপূর্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেন নি, কিন্তু আমি ত পেরেছি। আমার পারাই যা-কিছু সব। বোলতার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নেই বলে ঝগড়া করতে যাবো কার সঙ্গে? কিন্তু আজ তোমাকে বলচি দাদা, এই বিশ্ব-বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন, নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধতে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ববাবুকে সঁপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাসচো?

কৈ, না!

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডাক্তার হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এইবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চলতে হতো, তোমার সুমিত্রাদিদির কি হতো জানো? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সঁপে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে,—আমি বলচি, এত বেশী ভালবাসেন?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মানুষের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, শরম নেই,সম্ভ্রম নেই,—হিতাহিতবোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবে না। ভারতী, তোমার দাদার এই হাত-দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাকতো, সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাকত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেন নি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার পরে সেই হাত-দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা, এত জেনেও তুমি এরই হাতে সুমিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্চো? এতবড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো, আমি ভাবতেই পারিনে।

ডাক্তার কহিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু সুমিত্রাই ত হতে দিলে না।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলে না কিরকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেন্দ্রকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে নাকি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যিই চেয়েছিলাম ! ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে জেলে পাঠায় ত ফিরে এসে আর একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিল, এই কথার পরে উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া পর-পারের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড়-দুটা হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার সুমিত্রা হতাম, এমনি করে কি আমাকেও ফেলে যেতে পারতে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু তুমি ত সুমিত্রা নও, তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবো না, কাজের জন্যে রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই-সব খুনোখুনি রক্তারক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত-সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

ডাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্চো?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এতবড় অন্যায় কথা তুমি আমাকে বলতে পারো দাদা? তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু, আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে গেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্যেও বাঁচতে পারি তুমি ভাবো? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, যতদিন না তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার

কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজেই আমি লেগে থাকবো, এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম।

ডাক্তার একমুহূর্তের জন্য দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের-দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিল না গুপ্ত-সমিতি হয়ে ওঠা! কারখানার মজুর-মিস্ত্রীদের অবস্থা ত আমি নিজের চোখেই দেখে এসেছি। তাদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একবিন্দু প্রতিকারও যদি সারাজীবন করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে? সত্যি বলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয়?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড়-দুটা জল হইতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভারতী, তোমার অন্য কর্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার,—তাই, তার 'পরেই আমি এ ভার ন্যস্ত করে রেখেচি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহানায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের স্ফীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেই স্তব্ধপ্রায় নদীবক্ষে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণী মন্থর মন্দগতিতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জন-কতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের-দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের মুখে হয়ত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি থেকো না বোন, সে তুমি পারবে না।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ-সব তুমি কি বোলচ দাদা? মানুষকে বলি দেবে কি!

ডাক্তার তেমনি শান্তস্বরে বলিলেন, মানুষ কোথায়? জানোয়ার বৈ ত নয়!

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মানুষের সম্বন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনো না বলচি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝতেও পারিনে, তা মানি; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে আমি ঢের বেশী বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবার চেষ্টা করচি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি-মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়।

হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন শহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিনমজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ওই-সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আনবে নাকি? যাদের একফোঁটা ভালো করবার জন্যে আমরা অহর্নিশি পরিশ্রম করচি, তাদেরি রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও নাকি?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই। মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু' ফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে আমি চিনি, দাদা। কিন্তু দেশের মধ্যে এই অশান্তি ঘটিয়ে তোলবার জন্যেই এতবড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ আর তোমার নেই?

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে,—ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাইত হয়েছে, তাইত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইঁট-পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভারতী বলিল, তাও যদি হয়, দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে । কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যে সেদিন কারখানার কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্মঘট করাবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি তবে তাদের মঙ্গলের জন্যে নয়? তুমি চলে গেলে পথের-দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী, ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না,—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই-সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তার পরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব-অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ? এই ত পরম লাভ ভারতী! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা জানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকা বোধ হয় আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে এসেছে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সেদিকেও চোখ আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে, তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায় দিতে চাও এতক্ষণে তা বুঝেচি। আমি ভারী দুর্বল। হয়ত, তাঁরি মতই দুর্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই সুমিত্রাদিদির ’পরেই।

কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই,—মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বললেও না।

সে আমি জানি বোন।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে? থাকবো কি নিয়ে? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জান তুমি সব। তবে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনে। তবু, তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেছে কিসে? আচ্ছা, যাবার সময় কি আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারো না দাদা?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষেপেচ ভারতী?

ক্ষেপেচি? তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু, আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগতে পারিনে? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরি করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা যে গম্ভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে

ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া—তাঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনো না।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ছাব্বিশ

আজ শনিবার, শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আজ তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া যান। পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো র্যাপারে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভারতী আরোহণ করিয়া বলিল, কত-কি যে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। জানি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবে না, তবু ত ভয় ঘোচে না। ক'দিনই বা, কিন্তু, মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ তোমাকে দেখতে পাইনি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনেদের দেশে চলে যাবো তা বলে রাখছি।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও বলে রাখচি তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুকু ত, বেশ যাওয়া যাবে, কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উলটো স্রোত ঠেলে পৌঁছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে।

ভারতী কহিল, হলই বা। এমনি কি শুভকর্মে যোগ দিতে চলেছ যে সময় বয়ে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না,—শুধু তুমি যাচ্চো বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোংরা কাণ্ড বলত!

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা-না-করার জন্য দায়ী যারা, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভালবাসতো ভারতী!

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশীবাবু না হয় আর কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু সে বাসবে কেন? ওঁর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসতে পারে এ ত আমি ভাবতেই পারিনে। আচ্ছা তুমিই বল, পারে দাদা?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বৈ কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্বাদ করব বলে। মনে হল, সত্যকার শুভকামনার যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসো, না দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধ হয় এমনিই।

ভারতী আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা দুজনে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুশী হয়ে তাদের আশীর্বাদ—না না, প্রণাম করে আসি গে।

ডাক্তারও হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে, তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাঁড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে বাঁধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হতো, দাদা, সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমারও তেমনি তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই তোমাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় তলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ, সমুদ্রের তল আছে, সুতরাং, উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধ হয় তোমাকে এক শ' বার বললাম যে, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, হৃদয় ত নেই। আমি ঠিক জানি একবার চোখের আড়াল হলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাকবে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকবো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী, ছেলেপুলে, বিষয়-আশয়, ঘরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকানোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি, ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, না, করনি বৈ কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাধা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এই-সব বলবে!

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা বলে, অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন সুমিত্রার কথায় বললে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায়

টেনে এনে ফেলবে, আর আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুঁজে এলো!

ভারতী চোখ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কখনো এ-সব কথা আমাকে বলতে পাবে না।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বলব না। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যদি ফিরে আসি বোন, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে স্বীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েছে,—নিশ্চয় তুমি হাত গুণতে জানো, নইলে সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কথা কহিলেন, এবার কোথা দিয়া যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরূপ সুর মিশিল, বলিলেন, সে-রাত্রে সুমিত্রার কথা যখন বলছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তবু তোমার মুখের সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো! দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিস পেয়েছি, পেলাম না শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি, অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদেরই অভিধানে লেখে না।

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। উদাস-নিস্পৃহ স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। সুমিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেচি, আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে পুনরায় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অপূর্ব্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর-সংসার না করতে পেলেই জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কিসের জন্যে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে অকপটে যথার্থই বলচি আমাকে তুমি

শান্তমনে আশীর্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও,—তোমার মত আমিও পরের কাজেই এ জন্মটা আমার সার্থক করে তুলব। নাও না দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট বোনটিকে সাথী করে!

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশান্বিতা হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সস্নেহ-অনুনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল, বলিল, নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে একফোঁটা আলোও আর কোথাও দেখতে পাইনে!

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার কথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে; তোমারই মত তার অমূল্য জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? এর জন্যে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না বোন, তোমার মধ্যে যে হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাবো না।

ভারতীর সর্বাঙ্গ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর গভীর অন্তরের একটা অপরূপ মূর্তি যে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও ত তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে! আর তাই যদি হলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছো? দেশে-বিদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করে বেড়ানো তোমার কিসের জন্যে? মানবের চরম কল্যাণ ত কোন দিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবে না।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চেষ্টাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার,—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাইনে, ভারতী।

ভারতী কহিল, সে ত সবাই চায়, দাদা, কিন্তু তার জন্যে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্যে বল ত? কি তার প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য!

তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তচিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের ওপরেই বলে ফেলেছি। আমাকে তুমি ফেলে চলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচি নে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে ‘স্বদেশী’ আন্দোলন ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন বাঁচাইয়া যে-সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এমনি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া ফিরিতেছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত দুনিয়াই ত তাদের নয়! সেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্যভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি মনে মনে

তুমি হাসচো। কিন্তু, তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যাঁরা দেশের কাজে,—তাঁরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা,—আচ্ছা দাদা, কালকের বাংলা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না, ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী, আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্যাদা করো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাঁদের বিদ্রূপ করচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটে না। তাঁদের আমি ভক্তি করি, এবং তাঁদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশী উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাসছিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ করব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহুজাতিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব-জন্মের আর নেই, সেই স্বাধীনতার দাবী করা, চেষ্টা করা ত ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরাজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ। আমি সেই অপরাধেই অপরাধী! চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই-সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোন দিন কোন-কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েচে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক। এই বলিয়া তিনি নিজের

রসিকতায় উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্যে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন।

হাসি থামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল, তাঁরাও যে দেশের নমস্য ন’ন এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বলচি নে, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁরা রাষ্ট্রনীতিবিদ—যথার্থই যাঁরা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের সকল শ্রমই ব্যর্থশ্রম, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। পিছন হইতে একটা স্টিম লঞ্চ যথেষ্ট শব্দ-সাড়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণীকে রীতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্যগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাজনীতিবিদ্যার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও আমার ভক্তি কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটিমাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গরুর একান্ত নাগালের বাইরে খাদ্যবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টার মধ্যে অবৈধতা কিছুমাত্র নেই, এমন কি অত্যন্ত আইনসঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাকলে দিতেও পারো, রাজার নিষেধ নেই, কিন্তু বৃষের এই আন্তরিক প্রবল উদ্যম বাইরে থেকে যারা দেখে, তাদের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারী দুষ্টু। বলিয়াই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ যার অহর্নিশি সরু সুতোয় ঝুলচে সে কি করে হাসি-তামাশা করে পরের কথা নিয়ে।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্যার মীমাংসা পূর্বেই হয়ে গেছে ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছি। আর আমার ভাববারও

নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি, আমাকে হাতে পেয়েও যে রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ নয় তার ফাঁসি দেবার দড়িটুকু পর্যন্ত নেই।

ভারতী বলিল, তাইত আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোনমতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চক্ষের পলকে ভারী হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকায় জোয়ার লেগেছে ভারতী, পৌঁছতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুক গে। কিছুই আমার ভাল লাগচে না। মিনিট-দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এতবড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্বেই ভেঙ্গে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিচ্চ,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্যে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠবে। সংসারে তোমার অন্য কাজ আছে বোন—কল্যাণকর, শান্তিময় পথ, যা তুমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি কর গে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপ্লব-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবে না। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন,

তার কাছে তোমার বিপ্লবী দল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে— কিন্তু এতবড় পাগলামি আমি ত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখতে পাইনে। তুমি বলবে, তবে কি দেশের উদ্ধার হবে না? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছে থেকে, তোমার চরিত্র হতে জননী জন্মভূমি যে কি সে আমি চিনেছি। তাঁর পদতলে সর্বস্ব দিতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ কথা যদি না আজও শিখতে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারী জন্মে কেউ জন্মায় নি। কিন্তু নিছক আত্মহত্যা করেই কোন্ দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে? কোন মতে তোমার ভারতী যে কেবল বেঁচে থাকতেই চায় এতবড় ভুল ধারণা করেও আমার সম্বন্ধে তুমি রেখো না দাদা।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাইত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুলই হয়েছে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ, এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিত্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায় রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে!

অন্ধকারেও ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে, যে ছেলেটি লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়াছে তাহাকে স্মরণ করিয়া এই নির্বিকার পরমসংযত মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বলছিলে ভারতী, গোষ্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ

করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো? শহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোন দিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুনলে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দগ্ধ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের কল্পনায় কি তোমার মনে করুণাও জাগে না?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বচ্ছন্দে কহিলেন, না। প্রায়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা? পূর্ব-পিতামহগণের যুগান্তসঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বলতে পারো? করুণার চেয়ে ন্যায়ধর্ম ঢের বড় বস্তু, ভারতী।

ভারতী ব্যথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরানো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগতেই পায় না। রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তা হলে তারও ত জবাব রক্তপাত? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আসচে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোন দিন দিতে পারবে না? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও যে বড় সেই মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানাহানি না করে কোনমতেই পাশাপাশি বাস করতে পারে না?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব কোনদিনই মিলতে মিশতে পারে না।

ভারতী রুষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুক গে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেসা করেচি, আজও জিজ্ঞেসা করচি, হোক তারা

পশ্চিমের, হোক তারা ইউরোপের মানুষ, কিন্তু তবু ত মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষে কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারে না? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্গুণ আমি নিজের চোখে দেখেচি,—তাদের এত মন্দ ভাবতে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝো না দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—তোমারই বোন। বাঙলার মাটি, বাঙলার মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে, তুমি শান্তমনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারা জীবন মুখ তুলে সোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভারে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান না। সে হাত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ-মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়া বার বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কথা কহিলেন।

স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নাই,—যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এমনি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয়-দিনের স্কুলের নিরীহ নির্বোধ মাস্টার মহাশয়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেমনি,—ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে। সেই নিরুৎসুক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে, ভারতী, তারা সাপ খেয়েই জীবনধারণ করে। দেখেচ?

ভারতী বলিল, না দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্বকে হুকুম করো, সে দেখিয়ে আনবে।

বার বার ঠাট্টা করো না দাদা, ভাল হবে না বলচি।

না, ভাল হবে না আমিও তাই বলচি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আর ও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়। বিশ্বাস না হয় জু'র অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেসা করে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমধর্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্গুণ চোখে দেখেচ,—দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এ দেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত-সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ-আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলা দেশের মেয়ে বলছিলে, না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জলবায়ু, বাঙলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয়, না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধজাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই ধীর সংযত কণ্ঠস্বর কোন্ একসময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বলিলেন, তুমি ক্রীশ্চান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলে? সেদিন ব্যথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূলমন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্মই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ-চরিত্র সে যথার্থই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা, যে-জন্যেই হোক, তোমার শান্ত-বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম প্রচার করতে যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে পারছ না। ইউরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করেনি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, চড়কের সময়ে পিঠ-ফোঁড়া, সন্ন্যাসীদের খাঁড়ার ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গির হাঙ্গামা, গোঁড় ও খাসিয়াদের আষাঢ়ের নরবলি,—আর যে মনে পড়ছে না ভারতী—

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েছে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ-ঝি ঘরে রাখা যেত না,—নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখত,—হায় রে হায়, এমনি করেই বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরি করে দেশের প্রতি দেশের লোকের চিত্ত বিমুখ করে দিয়েছে! মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম, বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রীর চোখের নিদ্রা এবং মুখের অন্ন বিস্বাদ হয়ে গেছে। এই সত্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয়, এবং উদরান্নের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়। সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্বকে দোষ দেওয়া বৃথা।

অপূর্বর লাঞ্ছনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, রুষ্ট হইল। কহিল, তুমি যা বলচ তা সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতিভক্ত রাজকর্মচারী এমনিই করেছে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারে না। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাকতে পারে না। তুমি বলবে কালের পরিমাণে এ ক'টা দিন? এমনি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্বেও ছিল, সে কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তোমার কথা যদি যথার্থ হয়, এও চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য,—যত নিন্দেই কর না কেন,—এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েছ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ত হয়নি। ক্রীশ্চান বলে আমাকে তুমি উলটো বুঝো না দাদা,

কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারব না। এত বিদ্বেষ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুমি ইংরাজের ক্ষতি হয়ত করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবে না এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণস্বর নিস্তব্ধ নদীবক্ষে আহত হইয়া সব্যসাচীর কানে পশিয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল। ভারতীর এই রূপ অপরিচিত, এ মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বয়স হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া সে এই যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হউক, সব্যসাচীর চক্ষে তাহাকে যেন নব-মর্যাদা দান করিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কৈ জবাব দিলে না দাদা? এতবড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে তুমি আর যাই কর দেশের ভালো করতে পারবে না।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেছি দেশের ভালো যাঁরা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ-আশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বেদান্ত-আশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য করছেন, মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু, দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিস দিয়ে। এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যেদিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি, সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবেছে।

ভারতী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই বিষকুম্ভের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম বেসাতি করতে এসেছিল, তখন চিনতে পেরেছিল কেবল জাপান। তাই আজ তার এত সৌভাগ্য, তাই আজ সে ইউরোপের সমকক্ষ সম্ভ্রান্ত মিতা। কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত,

চিনতে পারেনি চীন। তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে, অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল, হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্যে দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক-ফোঁটা জমি। তার পরে আনি মিশনারি, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার বেশী করে সেদেশের ধর্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু-একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান-বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্যসামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে প্রমাণিত করে দিই। শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তাহলে গা তুলুন, আপনাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে,—চন্দ্র-সূর্য যত দিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত ভারতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর, তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে, মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে ১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নিলে, তখন আমি সাংহাইয়ে। সে দিনের সে-সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োরোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না, বললে, অ্যাঙ্গো- জাপানী- সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ।

এবং সেই কথাই আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বললেন, প্রতিশ্রুতি তা কি! যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা

করতে পারে না তাদের রাজ্য যাবে না ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েছে! এখন আমরা যাবো তাদের উদ্ধার করতে? অসম্ভব! পাগলামি! এই বলিয়া সব্যসাচী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী,—অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগলামি। প্রবল দুর্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবে না, এ কথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিক-বুদ্ধি ভাবতেই পারে না।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকার্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাঞ্চুরাজ শিন্লুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু; দূতের বিনীত আবেদনে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা, ক্যানটন শহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্চি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্বাদ নিষ্ফল হলো না, ভালই হলো। পঞ্চাশ বছর পেরুল না, চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বসলো আফিং খেয়ে খেয়ে চোখ-কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে ও-জিনিসটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে?

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর-দুয়ের মধ্যে পুনশ্চ আফিং খেতে রাজী হয়ে আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি-পরোয়ানা দিয়ে এবং সর্বশেষে হংকং বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হল। ঠিকই হয়েছে। এত সস্তায় আফিং পেয়েও যে মূর্খ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক, গল্পটা শুনতে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বললে, আমার ত আফিং নেই, কিন্তু, খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি। হলো যুদ্ধ। ফরাসী চীন-সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, ট্রিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি—এ-সব তুচ্ছ কাহিনী থাক।

ভারতী কহিল, কিন্তু দাদা, তালি কি একহাতে বাজে? চীনের অন্যায় কি কিছু ছিল না?

ডাক্তার বলিলেন, থাকতে পারে। তবে তামাশা এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যায়বোধটা অপরের ঘর-চড়াও হয়েই হয়, তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্য ঘটতে দেখা যায় না।

তারপরে?

বলচি। জার্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এতো ভারী মজা! আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন। ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা, শান্তি এবং ন্যায়ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্মিক জন-দুই প্রচারকের মুণ্ডু ফেললে কেটে। অন্যায়! চীনেরই অন্যায়। অতএব, গেল শ্যান্টঙ প্রদেশ জার্মানির উদর-বিবরে।

তারপরে এল বক্সার-বিদ্রোহ। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার আর তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কতকালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যিশুখ্রিষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-সিংহ, জারের ভালুক, জাপানের সূর্যদেব,—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আসচে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই। সম্রাট শিন্লুঙের নির্বাণ লাভ হোক, তাঁর আশীর্বাদের বহর আছে!

ভারতী মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী!

কি দাদা?

চুপচাপ যে?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাবচি। আচ্ছা দাদা, এই জন্যেই কি চীনেদের দেশে তোমার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছ? যারা শত অত্যাচারে জর্জরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবেচ? এই-সব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষোর দুঃখ এমনিই ত যথেষ্ট, তার ওপরে আবার কাটাকাটি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাকবে না!

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ, বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, এ কথাটা ভুলো না। আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশী কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আমিও তাই চাই দাদা, আমাদের বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের-দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিঃশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসচে।

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিতে পারিল না, তেমনি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ঐ একটা আচ্ছার বেশী আর কি তোমার কিছুই বলবার নেই দাদা?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েছি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বসো দিদি, যেন আঘাত না লাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করার মত নির্বিঘ্ন স্বস্তি আর নেই।

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলত? এ কি বিয়েবাড়ি? না আছে আলো, না আছে চীৎকার, না শোনা যায় বেহালার সুর,—কোথাও গেল নাকি এরা?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখ পড়িল সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র-বিচিত্র কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে-আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁশিয়ারিটা শশী-তারার দেখবার বস্তু, দাদা। এই বলিয়া সে হাসিল।

দু’জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠতেই খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল,—শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশীবাবু, এই যে আমরা এসে পড়েছি,—খাবার বন্দোবস্ত করুন, নবতারা কৈ? নবতারা! নবতারা!

শশী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্মিতমুখে কহিলেন, গৃহিণীশূন্য গৃহ কিরকম কবি? ডাকো তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক, নইলে দাঁড়িয়ে থাকবো। হয়ত খাবোও না।

শশী বিষণ্ণমুখে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারায় ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো? আজকের দিনে? কি চমৎকার বিবেচনা!

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়,—সেই যে আহমেদ,—ফর্সা মতন,—চমৎকার দেখতে,—কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপার,—দেখেছেন না? আজ দুপুরবেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েছে। সমস্তই তাদের ঠিক ছিল—আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুইজনে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন,—বল কি শশী?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ন্যাকড়ার থলি আনিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েছি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েছি। বাকী আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম, কিন্তু—

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্চ?

শশী কহিল, হাঁ। আমার আর কি হবে? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাকে কবে টাকা দিলেন?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেছি।

নিলে?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ি কিনবে।

নিশ্চয়ই কিনবে! এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্যে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেন্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তিনি সুরাবায়ায় চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন?

শশী কহিল, বললেন ত শীঘ্রই। তাঁকে লোক এসেছে নিতে।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদি কি সত্যিই চলে যাবেন বলেছেন শশীবাবু?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি। তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পত্তি। সম্প্রতি মারা গেছেন,— ইনি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। তাঁর না গেলেই নয়।

ডাক্তার কহিলেন, না গেলেই যখন নয়, তখন যাবেন বৈ কি।

শশী ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, অনেক খাবার আছে, খাবেন কিছু? কিন্তু ভারতীর ইতস্ততঃ করিবার পূর্বেই ডাক্তার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,— চল, কি আছে দেখি গে। এই বলিয়া তিনি শশীর হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন। যাবার পথে শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ববাবু ফিরে এসেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশি, কে বললে তোমাকে?

শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা। তাঁর মা নাকি বড় পীড়িত।

সাতাশ

শশী অতিশয়োক্তি করে নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল খাদ্যবস্তুর অত্যন্ত বাহুল্যে ঘরের দক্ষিণ ধারটা একেবারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট-বড় ডেকচি, প্লেট, কাগজের ঠোঙা, মাটির বাসন পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ আহার্য-দ্রব্যসম্ভার দোকানদার ও হোটেলওয়ালার দল নিজেদের রুচি ও মর্জি মত ওপার হইতে এপারে অবিশ্রাম সরবরাহ করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে,— অভাব বা ত্রুটি কিছুরই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে কেবল সেগুলি উদরসাৎ করিবার লোকের। ডাক্তার ক্ষণকালমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোফা! তোফা! চমৎকার! শশী কি হিসেবী লোক দেখেচ ভারতী, কে কি খাবে না-খাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখেচে! বহুৎ আচ্ছা!

ভারতী অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, এবং শশী হাসিবার একটুখানি বিফল চেষ্টা করিল মাত্র। কোন দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়াও ডাক্তারের উল্লাস অকস্মাৎ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গৃহস্থের জয়জয়কার হোক,— শশি! কবি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী আর সহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া সজলচক্ষে রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মনের মধ্যে কি একটু দয়ামায়াও নেই দাদা? কি করচ বলত?

বাঃ! যাদের কল্যাণে আজ ভাল ভাল জিনিস পেট পুরে খাবো,— তাদের একটু আশীর্বাদ— বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী রাগ করিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। মিনিট দুই-তিন পরে শশী গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে সে প্লেটে করিয়া মাংস, পোলাও, ফলমূল, মিষ্টান্নাদি সযত্নে সাজাইয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কৃত্রিম কুপিতস্বরে

কহিল, নাও, এবার দশহাত বার করে রাক্ষসের মত খাও। হাসি বন্ধ হোক, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা! উপাদেয় খাদ্য! এর স্বাদ-গন্ধও ভুলে গেছি।

কথাটা ভারতীর বুকে গিয়া বিঁধিল। তাহার সে রাত্রের শুকনা ভাত ও পোড়া-মাছের কথা মনে পড়িল।

ডাক্তার আহারে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন, কবিকে দিলে না ভারতী?

এই যে দিচ্চি, এই বলিয়া সে প্লেট সাজাইয়া আনিয়া শশীর কাছে রাখিয়া দিয়া ডাক্তারের সম্মুখে বসিয়া বলিল, কিন্তু সমস্ত খেতে হবে দাদা, ফেলতে পারবে না।

নাঃ—কিন্তু, তুমি খাবে না?

আমি? কোন মেয়েমানুষ এ-সব খেতে পারে? তুমিই বল?

কিন্তু রেঁধেছে যেন অমৃত।

ভারতী কহিল, এর চেয়ে ভাল অমৃত রেঁধে আমি রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াতে পারি দাদা।

ডাক্তার বাঁ হাতটা নিজের কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, কি করবে দিদি, অদৃষ্ট! যাকে খাওয়াবার কথা, সে এ-সব খাবে না, যে খাবে তাকে একদিনের ওপর দু'দিন খাওয়াবার চেষ্টা করলেই সুখ্যাতিতে তোমার দেশ ভরে যাবে। ভগবানের এমনি উলটো বিচার! কি বল কবি, ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

এবার ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তোমার দুষ্টুমির জ্বালায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু এ তোমার ভারী অন্যায়। তার পর পেট পুরে খেয়ে-দেয়ে টাকার থলিটিও নিয়ে চলে যাবে নাকি?

ডাক্তার মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া কহিলেন, নিশ্‌চয় নিশ্চয়,—অর্ধেকটা ত গেছে নবতারার বাড়ি তৈরির খাতায়, বাকীটা কি রেখে যাবো আহমেদ-আবদুল্লা সাহেবের গাড়ি-জুড়ি কিনতে? তামাশা সর্বাঙ্গসুন্দর করতে নেহাত মন্দ পরামর্শ দাওনি ভারতী। কি বল শশী? হাঃ হাঃ হাঃ—

ভারতী বলিল, দাদা, তোমাকে হাসি-ঠাট্টা করতে আগেও দেখেছি বটে, কিন্তু, এমন ক্ষ্যাপার মত হাসতে আর কখনো দেখিনি।

ডাক্তার জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। ভারতী পুনশ্চ কহিল, নর-নারীর ভালবাসা কি তোমারই মত সকলের উপহাসের বস্তু যে, তাসের ছক্কা-পঞ্জা হারার মত এর হার-জিতে অট্টহাসি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই? স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যথা পাবার কি দুনিয়ায় কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না? দেখ ত একবার শশীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। একটা বেলার মধ্যে উনি কি হয়ে গেছেন! অপূর্ববাবু যখন চলে গেলেন, সেদিন আমাকে উপলক্ষ করেও হয়ত তুমি এমনি করেই হেসেছ।

না, না, সে হল—

ভারতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না বলছ কিসের জন্যে দাদা? শশীবাবু তোমার স্নেহের পাত্র, তুমি এই ভেবেই খুশী হয়ে উঠেছ যে, নির্বোধ তাঁকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে নবতারা অনেক দুঃখ দিত। ভবিষ্যতের সেই দুঃখের হাত থেকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎই কি মানুষের সব? আজকের এই একটিমাত্র দিন যে ব্যথার ভারে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডিঙিয়ে গেল এ তুমি কি করে জানবে বল? তুমি ত কখনো ভালোবাসো নি!

শশী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কোনমতে বলিতে চাহিল যে তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল, সাংসারিক সাধারণ বুদ্ধি না থাকার জন্যই—

ভারতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, লজ্জা কিসের শশীবাবু? এ ভুল কি সংসারে একা আপনিই করেছেন? আপনার শতগুণ ভুল আমি করিনি? তারও সহস্রগুণ বেশী ভুল করে যে দুর্ভাগিনী নিঃশব্দে এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, তাকে কি ডাক্তার চেনেন না? নবতারা ঠকিয়েছে? ঠকাক্ না। তবু ত আমাদেরই বঞ্চনার গান গেয়ে জগতের অর্ধেক কাব্য অমর হয়ে আছে।

ডাক্তার বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ভারতী গ্রাহ্য করিল না। বলিতে লাগিল, শশীবাবু, সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম? কিন্তু আমার ত কম ছিল না? সুমিত্রাদিদির বুদ্ধির তুলনাই হয় না। অথচ, কিছুই ত কারও কাজে লাগেনি। এ শুধু পরাভূত হল, দাদা, তোমার বুদ্ধির কাছে। যে চিরদিন অজেয়, পথ যার কখনো বাধা পায়নি, সেও তোমারই পাষাণ-দ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে খানখান হয়ে পড়ে গেল,—প্রবেশ করবার এতটুকু পথ পেলে না!

ডাক্তার এ অভিযোগের উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভারতী বলিল, শশীবাবু, আমি আপনার প্রতি মহা অপরাধ করেছি, আজ তার ক্ষমা চাই—

শশী বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ভারতী নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, একদিন দাদার কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়েমানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাসতে পারে না। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্চে অপূর্ববাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেছে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে একটুকরা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয় না, তাই সেদিন দুঃখ

করে আমার কাছে বলেছিলে, শশী যদি আর কাউকে ভালবাসত! কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতে না, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি করো না! পুরুষের দুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সুমুখে বসে,—আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই!

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব কি বললে শশী?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব, টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জানতে পারবে না। ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে। কিন্তু, কাকা পুলিশ কর্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে দাদা। তুমি-আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবো না। ক্ষুদ্র! লোভী! সঙ্কীর্ণচিত্ত ভীরু! ছি!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, যথার্থ ভাল না বাসলে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায় না। কবি, এবার তোমার পালা। বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্তন শুরু কর—আমার অবহিত হই!

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায়, ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখখনো আমাকে বকতে পাবে না। ভেবেছ, সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মানুষের! উচ্ছ্বসিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিস, কহিল, তিনি ফিরে এসেছেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়া নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্ দুর্ভাগার পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে বসে আছি! বলিতে বলিতেই মেঝের উপর মাথা রাখিয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাক্তার স্মিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, এই-সকল প্রণয়-উচ্ছ্বাস তাঁহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে ভারতী উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোখ-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেটে হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে, কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন-দুই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা ধোয়া তোয়ালে বাহির করিল, এবং রকমারি খাদ্যবস্তুর একটি পুঁটলি বাঁধিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের ছাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট্ট থলিটি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ওটি হল বামুনের ছেলের ভোজন-দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ-ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারী কাজগুলা সমস্তই নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

অকস্মাৎ, হাঃ হাঃ করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইলেন, গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হাসতে গেলেই মুখ দিয়ে আমার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায় না। অট্টকান্না কাঁদবার জন্যে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখানোই ভার হতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন করচ?

জ্বালাতন করচি? আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করচি।

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিল না।

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলতে পারি।

কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্তের জন্য চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশী, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগার অদৃষ্টে হবে? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি!

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন।

ডাক্তার কহিলেন, হায়! হায়! অনেকে না ভেবে যদি একটিমাত্র লোক একটি পলকের জন্যও ভাবতেন!

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগার ভাগ্য ত একটি পলকেই বদলাতে পারে দাদা। তুমি হুকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমার দিব্যি করে বলচি, বলব না যে আর একটা দিন সবুর কর।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব বেচারা যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে?

ভারতী বলিল, তাঁর কনে-বৌ দেশে মজুদ আছে, তাঁর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী!

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পড়ব তার আর ভয়টা কিসের?

ডাক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি! ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করি তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ভারতী বলিল, কাউকে সাক্ষী দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নাম নিয়ে এতবড় শপথ কখনো অস্বীকার করব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি-ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে, ত আমি নিশ্চয় বলচি দাদা, মুখে কালি মেখে তাঁদের ফিরে যেতে হতো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি লড়াই চলে! পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুই চক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি এমন করে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্যেও যাঁকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? ভাঁটার দেরি কত?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেরি আছে বোন। তাহার পরে ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য! এত দুর্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙলার খোয়া যায়নি। থাক না নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশী, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এখানে সহস্র সব্যসাচীর সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়! ভাল কথা শশী। মদের বোতল কৈ?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, বলিল, কিনিনি ডাক্তার। ও আমি আর খাবো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবতারা ওঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারই সায় দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর খাবো না। এ সত্য আমি ভাঙবো না, ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু বাঁচবে কি করে শশী? মদ গেল, নবতারা গেল, যথাসর্বস্ব-বিক্রি-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সইবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী ব্যথা পাইল, কহিল, তামাশা করা সহজ দাদা, কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই বলচি ভারতী। এই টাকাটার ওপরে যে শশীর কতখানি আশা-ভরসা ছিল তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি। তার পরে এলো নবতারা। ছ'-সাত মাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। আর মদ? সে ত শশীর সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা-কিছু আনন্দ, যা-কিছু সান্ত্বনা একদিনে একসঙ্গে চক্রান্ত করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু, কারও বিরুদ্ধে ওর বিদ্বেষ নেই, নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজলচক্ষে বলতে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি হও ত এর বিচার করো!

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কহিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে, বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বোধ করি কথার অভাবেই তিনজনেই নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি? তোমার বাকী রইল ত কেবল ওই বেহালাখানি। আগের মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে?

এবার শশী হাসিমুখেই বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভর্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভারতী হাসিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, না, কবি, ওতে তোমার আর ভর্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোনটির কাছে থেকো, তাতেই আমার ঢের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার,—হয়ত এখনও পারি।

ডাক্তার খুশি হইয়া কহিলেন, তাও ত বটে। আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ করব। চাষাভূষা কুলি-মজুরদের জন্যেই এবার শুধু লিখব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানে না কবি?

শশী কহিল, নাই জানলে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখবো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভাবিক জিনিষ টিকবে না। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ, তাদের ক্ষুধা-বোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না। তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য

তারাই করে নেবে,—নইলে, তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গলধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি করো না কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিল না, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি করব?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান করো। যেখানে জন্মেছ, যেখানে মানুষ হয়েছ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতের দিকে?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি, ভারতী, সেই জোর-করা জাতিভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি! সে বৈষম্য আমার নেই,—কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিতে জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে! এই ত সত্যকার জাতি,—এই ত ভগবানের হাতেগড়া সৃষ্টি। ক্রীশ্চান বলে কি তোমাকে ঠেলে রাখতে পেরেছি দিদি? তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত-চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজবে না দাদা! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার পরেই থাক বোন,—ও বোঝা বইবার মত জোর,—না না, সে থাক—সে শুধু আমার! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন! রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,— আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে

দাও,—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়! কে?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন—

ডাক্তার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসছেন।

আটাশ

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন-সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ডাক্তার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বসো। তুমি কি একলা এলে নাকি?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছ ভারতী?

এই মিনিট-খানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজিও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাহার কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অহেতুক কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভালো আছি দিদি। আপনি ভাল আছেন? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভারতীর সাহস হইল না। হাঁ,আছি,—বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথন বেশী করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজে হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুনলাম, তুমি প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যাচ্চ।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে।

কবে যাবে?

প্রথম স্টিমারেই—শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক, এবারে তাহলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে।

ডাক্তার বলিলেন, পাবে। এটর্নির পরামর্শ ছাড়া কাজ করো না। আর, একটু সাবধানে থেকো। যাঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, তাঁরা বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তাহলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল; বলিল, এ হল মন্দ নয় ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি নিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যেতে উদ্যত, শুধু ভারতী—

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করবেন তা একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিহাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্চে। তাহলেই দেখুন, আপনার পথের-দাবীর এ্যাক্টিভিটি বর্মায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল।

কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারের মুখের পরে ইহার লেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখেশুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের-দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।

কথাটা তামাশার মত শুনাইলেও যে তামাশা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জন্যে মদ ধরবার আবশ্যক নেই, কিন্তু তবু ত বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রাদিদি—যাঁকে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেন্টের আসন দিয়েছ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের-দাবীতে আঘাত লাগবে না? সত্যি কথা বলো দাদা, শুদ্ধমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জন্যেই রাগ করে যেন বলো না! এই বলিয়া সে চোখাচোখি হইবার নিঃসন্ধিগ্ধ ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু অন্যত্র অপসারিত করিল। চোখে চোখ মিলিল না, সুমিত্রা সেই যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি নির্বাক নতমুখে মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে এ-সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। তা ছাড়া প্রাণ যাদের এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বল ত? মানুষ ত যাবেই। যত বড়ই হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে এই শিক্ষাই ত আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা ভারতী!

ভারতী কহিল, কিন্তু এ ত আর সংসারে সত্যই ঘটে না! এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারে এ কথা ত আমি ভাবতেই পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র, ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আর আমি দলের মধ্যে টানতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, জগতে তোমার অন্য কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলই আমার মনে হয়েছে আমাকে অযোগ্য জ্ঞানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অন্য কাজ থাকে, আমি তারই জন্যে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হল না, দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বলছ পারে,—আমি বলচি, পারে না। আমি জানি, পারে না, আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্যে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু যা নয়, যা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না, উত্তরের জন্য ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এদেশে আর তোমার থাকা চলে না,—তুমিও যাবার জন্যে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতিমুহূর্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না! আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্চে দাদা, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সত্য বলেছ, মিথ্যা বলেছ, সত্যি-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জানতে দাওনি। তোমার পথের-দাবীর সেক্রেটারি আমি, তবু যে তোমার কাজের পদ্ধতিতে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না এ কথা তোমাকে ত আমি একটা দিনও লুকোই নি। তুমি রাগ করোনি, অবিশ্বাস করোনি,—হাসিমুখে শুধু বারবার সরিয়ে দিতে চেয়েছ। অপূর্ববাবুর জীবন-দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট্ট জীবনের

কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার পূর্বে আর নিজেকে গোপন করে যেয়ো না,—তোমার, আমার, সকলের যা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অনুনয়ের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, এবং তাহাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন সত্য, মিথ্যা, এবং সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হল কি? তা ছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত সে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি তোমার না-ই থাকে ডাক্তার, কিন্তু মেয়েরা সত্যি কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বলতেই পারে না।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের জন্য বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য, বোধ হয় তাহাই অপর সকলকে নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই-তিন এমনি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ভারতী, সুমিত্রা বললেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেমনি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের-দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি!

ভারতী অবাক হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্তি?

সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হাঁ, ঠিক এই! এই ওঁর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণমূর্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথাগুলা যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যেকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সব্যসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল, অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের-দাবীর নীতি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের-দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর! কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের-দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যে? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই!

উত্তেজনায় সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শঙ্কায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি!

আজ্ঞে।

শশীর কি ভক্তি দেখেছ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিল না। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেরি নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল। তোমার তারাবিহীন শশি-তারা লজে আর আসার সময় পাবো না।

শশী কহিল, কালই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবে?

শশী কহিল, আপনার আদেশমত ভারতীর কাছে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশী আমার আদেশ অমান্য করে না। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি? শশী-ভারতী লজ? বার-তিনেক ফসকাতে ত আমিই দেখলাম, এবারে হয়ত লাগতেও পারে। ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। সুমিত্রা হাসিমুখে মাথা নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার থলিটি কিন্তু সঙ্গে নিলাম। ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ি কিনবে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কি তোমার থামবে না?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার, আপনাকে আমি দিলাম। আমার দেশের বাড়ি-ঘর সর্বস্ব-বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই লাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশি, এখন আর দরকার নেই। তা ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া এই কথাটাই ফুটিয়া বাহির হইল, সবই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোঁবে?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া ডাকিলেন, কবি!

বলুন।

ব্রাহ্মণ-ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ করো না। কারণ, শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌঁছবে তখন দ্বিতীয়বার আর আমি ফুরসত

পাবো না। কিন্তু সেদিন আসবে। নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম, তুমি সুখী হবে। কিন্তু দুটি কাজ তুমি কখনো করো না। মদ খেয়ো না, আর রাজনীতিক বিপ্লবের মধ্যে যেয়ো না। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলো না।

শশী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তার মধ্যে থাকলে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড়?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বৈ কি! তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতা-সমস্যার মীমাংসা হবেই,—এর দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে।

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে বলিল, কবে গাঁথবেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে গেঁথে যে মূল্য ওঁর এখনি বাড়িয়ে দিলে, ভারতী সামলাবে কি করে?

শুনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি হবে শশি, তারই চারণ-কবি! পারবে না ভাই?

ভারতীর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শশী ভ্রাতৃ-সম্বোধনের মাধুর্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার, চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতে পারি। এমন কি—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাংলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা! শশি, পৃথিবীর প্রায় সকল

ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্রদলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময়ে ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এ দেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙলা দেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি করে ভালবাসবে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত করছ শশি, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিনকালেও বাঙলাদেশকে বাসেনি। তার তিলার্ধ থাকলেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই সাত কোটি ভাই-বোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা! মুসলমান বাদশার পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্যে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বর্গীরা দেশ লুট করতে আসত, বাঙালী লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক-কান কেটে দিয়ে যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্মের জন্যে গলা দিতো না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করবার মত তাদের কিচ্ছু ছিল না। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো,—তাদের ধর্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের

দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি,—তাদের যা-কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার সত্যকার দেশপ্রেম!

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম্ম তারা আপনারা মানতো না, যে দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিল না, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে! এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এ-সব আপনি কি বলচেন?

ভারতীর ক্ষোভের অবধি রহিল না, বলিল, দাদা, আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্ব্বপিতামহ। তাঁদের আর যা দোষ থাক, ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রবঞ্চনা ছিল,—এরকম অন্যায় কটূক্তি তুমি করো না।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ভারতীর প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সম্বন্ধেই কটূক্তি করা অন্যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করাও অন্যায়, এমন কি তিনি পূর্ব্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না, কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কৈ? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের-দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করছি নে, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি পুরাতনের শত্রু, কিন্তু কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন হয়েছে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা, এবং পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে? মানুষে তাহলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এতখানি ভারসহ বস্তু দুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয় না। শুধু একটা বিপদ হয়েচে এই যে, কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রাচীনতা নিরূপণ করা যায় না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে, দাদা, যা-কিছু পুরাতন, যা-কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্বিচারে নির্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ, নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন?

যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্মম-চিত্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেই ত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয়, ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশী পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো, ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয়

পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, দাদা, যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এত বড় পাপের পথই তোমার পথের-দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম-বিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই ত তোমাকে আমি টানতে চাইনি, ভারতী। তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন সুমিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চল গে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবে না শুধু পথের-দাবী,—পাবে না শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য জ্বলিয়াই যেন নিবিয়া গেল। কণ্ঠস্বর স্থির, গভীর। ভারতী ও সুমিত্রা উভয়েই বুঝিল, সব্যসাচীর এই শান্ত মুখশ্রী, এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ।

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেছি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোর যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মারবাড়ে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিল না—সে আজ কত শতাব্দের কথা,— তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড় হয়ে আছে! কিন্তু থাক এ-সব নিষ্ফল তর্ক, যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যাণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ধারা নয়। আজ তাহার সমস্ত মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের জোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র কোথায়?

সুমিত্রা উত্তর দিল না, নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আসবো?

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

ডাক্তার কি একটা পুনরায় বলিতে গেলেন, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া শুধু কহিলেন, আচ্ছা। ভারতীকে কহিলেন, আর দেরি করো না দিদি, এস। এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুমিত্রা তেমনি নতমুখে বসিয়া রহিল। ভারতী তাঁহাকে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

ঊনত্রিশ

স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ভারতী নৌকায় আসিয়া বসিল, এবং নদী-পথের সমস্তক্ষণ নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর হইবে; আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রালোকে পৃথিবীর অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল। হাত ধরিয়া ভারতীকে নামাইয়া দিয়া সব্যসাচী নিজে নামিবার উপক্রম করিতে ভারতী বাধা দিয়া কহিল, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না দাদা, আমি আপনিই যেতে পারবো।

একলাটি ভয় করবে না?

করবে। কিন্তু তা বলে তোমাকে আসতে হবে না।

সব্যসাচী কহিলেন, এইটুকু বৈ ত নয়, চল না তোমাকে খপ করে পৌঁছে দিয়ে আসি, বোন। এই বলিয়া তিনি নীচে সিঁড়ির উপরে পা বাড়াইতেই ভারতী হাতজোড় করিয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তুমি সঙ্গে গিয়ে ভয় আমার হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি বাসায় যাও।

বাস্তবিক, সঙ্গে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ডাক্তার আর জিদ করিলেন না, কিন্তু ভারতী চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই নদীকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শ্রান্তিতে মুদিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে,—যুগে যুগে কালে

কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তোলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ, ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয়; কোন উপায়, কোন অভিসন্ধিই হেয় নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ বিদ্যালয়,—ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় আবার পথের বাচবিচার কি? একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী! সেইদিন এ কথার তাৎপর্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার পরে কখন যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বারবার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতিমানুষ তুমি, তোমার পরে ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাকবে, কিন্তু, তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারবে না।

জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়েই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু, অন্যায়কে কখনও ন্যায়ের মূর্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ো না। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায় না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, দুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই

বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়া দুর্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্মকেই ধর্ম বলে সৃষ্টি কর, এ দুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবে না।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া নীচে আসিয়া কবাট খুলিতেই জন-কয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্লেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক সরকার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ববাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে এসেছিলেন?

ঠাকুরমহাশয় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দি গে?

ভারতীর মুখ পলকের জন্য শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে ত জানিনে দিদি। বোধ হয় তাঁর মায়ের অসুখের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চান।

ভারতী হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েছে তার আমি কি করব?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অপূর্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার যত্ন এবং সমাদরের ত্রুটি ছিল না, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মালমশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিতে হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তাপের সে হেতু বুঝিল না। কহিল, আমি ত সে-সব কিছু জানিনে দিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা

এসেছে, তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাও গে দেখা করবার এখন সময় হবে না।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকাল আসতে বলে দেব?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘণ্টা-খানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিদ্যালাভের ঐকান্তিক উদ্যমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে দু'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিদ্যালয়টা প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছে; সুমিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অন্যত্র গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লওয়া আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্মবঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এমনি করিয়া ঘণ্টা-দুই কাটিলে পড়ুয়ারা যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্বর চিন্তা।

তাহাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা যতই থাক, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে ঢের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পূর্বেকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অসুখ যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? মা তাহার, ভারতীর নয়। তাঁহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সম্বন্ধে

অপূর্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমলচিত্ত বাহিরে হইতে ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া যত ছটফটই করুক, রুগ্নের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে সাহস। এ ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করার মত সর্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত, সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্ব কতখানি ভালবাসে। মায়ের জন্য করিতে পারে না পৃথিবীতে এমন তাহার কিছু নাই। তাঁহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্বর কত, ইহাই কল্পনা করিয়া একদিকে যেমন তাহার করুণার উদয় হইল, অন্যদিকে এই অসহ্য ভীরুতার ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলিল, শুশ্রূষা করিতে পারে না বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই? এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এমনি করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার ধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অসুখের সম্বন্ধে অপূর্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারে যাহা তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, ইহার আভাস পর্যন্ত তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোটঘাট গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গতরাত্রের হাসি-তামাশাকে জগতে যে কোন মানুষই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অভাবনীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মূর্তিমান সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশিবাবু? শশী স্মিতমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে হুকুম করিয়া দিল, সমান সব কুছ্ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে জায়গা কোথায় শশিবাবু?

শশী কহিল, আচ্ছা বেশ, তাহলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও সুবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক শশীবাবু। হোটেলে ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাকবেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগবে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগবে না, ছ মাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন।

শশী খুশী না হইলেও এই ব্যবস্থায় রাজী হইল। সমস্ত জিনিসপত্র-সমেত দাদাঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিল না, পাছে শশী কিংবা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অভ্যাসমত পরদিন প্রত্যুষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দেহ-ধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচবিচার করিয়া চলিত, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি,

মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত, তাই বলিয়া পূর্বেকার দিনের অখাদ্য-বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া উঠে নাই। ছোঁয়াছোঁয়ির বিড়ম্বনা তাহার ছিল না, কিন্তু যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পরে হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁধিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বা কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়াভাব ঘটিলেই, কদাচিৎ কখনও ঠাকুর-মহাশয়ের হোটেল হইতে সাগু বার্লি বা রুটি আনাইয়া খাইত! বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না, তাই হোটেল হইতে রুটি ও কিছু তরকারি তৈরি করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর-মহাশয়কে খবর পাঠাইল। সোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় ঝি খাবারের থালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল দিদিমণি—

ভারতী তাহার নিজের থালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া ঝি দূর হইতে সেই পাত্রে রুটি ও তরকারি এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। ঝির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে ফিরে এসে শুনি তোমার অসুখ। একলা হাতে তখন থেকে ধড়ফড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা রুটি বেলে দেয়। আর দেরি করো না দিদি, বসো।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি যাও ঝি, আমি বসচি।

ঝি কহিল, যাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত ধোয়া মাজা,—যাহোক, ফিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কেঁদে ফেলে বললেন, ঝি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে, মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও যত কাঁদেন আমিও তত কাঁদি, দিদিমণি! আহা, কি কষ্ট! বিদেশ-বিভুঁই, কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সুমুদ্দুর পথ, টেলিগ্রাফ করলেই ত আর বউ-ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোষ কি ?

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাকুরমশাই ডেকে বললেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত। আমি আর না বলতে পারলুম না। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে ধর্মশালার ভিড়, জানালা-কবাট সব ভাঙ্গা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতান্তর! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাকতে হাঁকতে, মড়া উঠলো সেই দুটো-আড়াইটে রাতে। ফিরে আসতে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, লা ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধর্মশালায় নেমে একবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে এক দণ্ড কথা কবার জো নেই

দিদিমণি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আসবো তখন সন্ধ্যাবেলায়,—এই বলিয়া সে গল্প করার প্রলোভন সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রুটির থালা তেমনি পড়িয়া রহিল, প্রথমে দুই চক্ষু তাহার ঝাপসা হইয়া উঠিল, তাহার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্ব্বর মাকে সে দেখেও নাই, এবং স্বামী-পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন—এ ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের নিরালা ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবা রমণীর সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিয়াছে! সুখের মাঝে নয়, দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয়, যখন সে ছাড়া আর কেহ তাঁহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন—এ কথা জানিবার তাহার ভারী সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুর্দ্দিনের সেই অগ্নিপরীক্ষায় আপন-পর সমস্যার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে। ধর্ম্মমতভেদই এ জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল!

আর, অপূর্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশী জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীর্বাদই তাহাকে কবচের মত অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ-সকল তাহার আকাশকুসুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন-রচনা বৈ আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নির্দ্দেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত সে ছাড়া এ কথাই বা আর কে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশী, ঘরে-বাহিরে অপূর্ব আজ কিরূপ নিরুপায়, কতখানি সঙ্গিহীন!

এই প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্বর কর্ম নাই, হয়ত আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীরু লোভী নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজনমধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়া সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

উদ্যমের পটুতা, ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিথিশালার অসহ্য জনতা ও কোলাহল, এবং সর্ববিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্তগুলি কাটিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া চোখের জল তাহার যেন থামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই স্মরণ হইল, যেন সকল দুঃখের সূত্রপাত অপূর্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না হইলে, পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতেক দুঃখ সহিয়াছে তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্যপথ-ভ্রষ্ট করে নাই কেন? দুর্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বধর্মাচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা,—সমস্তই যাহার মায়ের মুখ চাহিয়া, সে কি সত্যই এমনি ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চনা, তাহার গঙ্গাস্নান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কার্য, সকল অনুষ্ঠান—হোক না ভ্রান্ত, হোক না মিথ্যা, তবু ত সে সকল বিদ্রূপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল! এ কি অপূর্বর অস্থিরচিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্মায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এতকাল এতখানি দুর্বলতা তাহার লুকানো ছিল কোন্খানে? সব্যসাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া কতদিন এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নয়, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার ভাবিয়াছে, এ সংসারে যাহা কিছু জানা যায় দাদা ত সমস্তই

জানেন, তবে এ সমস্যারও উচ্ছেদ তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সঙ্কোচ ও শরমেই সে অপূর্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্মদোষে যখন সবাই অপূর্বর প্রতি বিরূপ, তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই,—সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জন্য? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাঁহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্বর কিছুই ছিল না? সত্য সত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রেই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! সে দুর্দিনে সতর্ক করিবার মত পুঁজি কি কিছুই তাহার ছিল না? হৃদয় কি তাহার এমনি কাঙাল, এমনি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এমনি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘণ্টা-দুই সময় যখন কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, ঝি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলের জরুরী কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া যাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর মাঝখানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকেই জানিত, ঝিরও অবিদিত ছিল না। তবে, সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়া-স্পর্শ করিল না? স্ত্রীলোক হইয়া এতবড় সংবাদটা না জানা পর্যন্ত ক্ষান্তর মুখে অন্ন-জল রুচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা অছিলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে কহিল, কিছুই ত ছোঁওনি দেখচি।

ভারতী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না!

ঝি মাথা নাড়িয়া কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখবে চল, ভাতের থালা আমার যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে,—মুখ দিয়েছি কি না দিয়েছি।

ইহার অবাঞ্ছিত সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অবধি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দাও না ঝি।

যাবে বুঝি?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

ক্ষান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুরমশায়কে কি সাধ্যি-সাধনা! আমি শুনে বলি সে কি কথা! মানুষের আপদে-বিপদে করব না ত করব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল, যেমন ছিলুম, তেমনি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই-সমস্ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে যা করেছ তার তুলনা নেই। কিন্তু, আর দেরি কর না ঝি, গাড়ি একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলাবেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজকর্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

ঝি লোক মন্দ নয়। সে গাড়ি ডাকিতে গেল, এবং দুঃসময়ে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে, ঘরের কাজকর্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলো যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহার বাধা নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট-পনেরো পরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পান্থশালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। দ্বিতলের একখানা উত্তর ধারের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরোয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালী বাবু ভিতরেই আছেন; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিন দিনের বেশী থাকার রুল নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজর্ সাবের লুটীশ হইলে তাহার নোক্রিতে বহুত গুলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি-দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল, সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈথৈ করিতেছে, জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো, এবং তাহারই একধারে একখানা কম্বলের উপরে অপূর্ব উপুড় হইয়া পড়িয়া। নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া,—সে জাগিয়া আছে কিংবা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ, অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী ধীরে ধীরে ডাকিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সদ্যমাতৃ-বিয়োগের সীমাহীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু, আবেগের চাঞ্চল্য নাই,—শোকাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষপুটচ্ছায়াবাসী যে অপূর্বকে একদিন সে চিনিয়াছিল, এ সে মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিস্ময়ে এমনি অবাক হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ব নিজে। সে-ই কথা কহিল, বলিল, এখানে বসবার কিছু নেই, ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোরঙ্গটার উপরে বস।

ভারতী উত্তর দিল না, কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া নতনেত্রে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দুজনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, ভারতী, বস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বসলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে!

এখখুনি যাবে? একটুও বসতে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোরঙ্গটার উপরে বসিয়া একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জানতাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্চে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এ জন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন করে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাকবো কি করে? সঙ্গে গাড়ি আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব হয়ত শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাস পর্যন্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে কহিল, অশৌচের অনেক হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে সুবিধে হবে না। তাছাড়া এই শনিবারের স্টিমারেই আমি বাড়ি ফিরে যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সইতে পারবো না আমি, আর পারবে এই অতিথিশালার লোকে? চল।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বললেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে যেতে পারতাম, আমি আসতাম না, অপূর্ববাবু। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ঢেকে বলবার, লজ্জা করে বলবার আর আমার কিছুই নেই। মায়ের শেষ কাজ বাকী—শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ি

ফিরে যেতেই হবে এবং তার পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধা দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ কটা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি ত তোমারই দিব্যি করে বলচি, বাসায় ফিরে গিয়ে আজ আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ের শোক তাতে বাড়বে বৈ কমবে না, অপূর্ববাবু।

অপূর্ব অধোমুখে মিনিট-দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তাহলে ডাকো, জিনিসপত্রগুলো সব বেঁধে ফেলুক।

জিনিসপত্র সামান্যই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়িতে তুলিতে আধ-ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আসতে পারলেন না?

অপূর্ব কহিল, না, তাঁর ছুটি হলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েছ?

হাঁ, সে একরকম ছেড়েই দেওয়া।

মা'র কাজকর্ম চুকে গেলে কি এখন বাড়িতেই থাকবে?

অপূর্ব কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ও-বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

ত্রিশ

পরিত্যক্ত, পতনোন্মুখ, ঘন-বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণ মঠের মধ্যে একদিন অপূর্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কক্ষেই পথের-দাবী আহূত হইয়াছে। সেদিনের সেই অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুর্জয় ক্রোধ ও নির্ম্মম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়াছিল, আজ তাহার স্ফুলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু,—সুমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর ধরা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষতদেহে সে জেলের হাসপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকন্যা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাট্টি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। সুমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকর-বাবুর কি হবে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে, জেল খাটবে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাঁচতেও ত পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে?

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তাঁর বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত! ধরুন, যদি কেউ না আসেন? যদি কেউ না থাকে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিরুপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধনসম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের মাথা রাখবার ঠাঁই নেই,—বন্য পশুর মত আমরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখ মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু যাঁদের এ-সব আছে,—আমাদের এই দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারে না দাদা?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি? তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না! বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখে না। ইংরাজ যখন দম্ভভরে প্রচার করে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায় না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাত মিথ্যে বলে না! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে দু চোখের দৃষ্টি যাদের বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধেই বা হাহুতাশ করবার কি আছে ভারতী!

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবে না। আমি তাকে চিনি, লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী অস্ফুটে কহিল, উঃ!

কৃষ্ণ আইয়ার বাংলা বলিতে পারিত না, কিন্তু, মাঝে মাঝে বুঝিত; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস্, ট্রু!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, এই ত সত্য! এই ত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কান্না কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি ফাঁসি হয়েছে শোনো, জেনো,

বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েছে! দেবেই ত! কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে? তার আবার নালিশ কিসের বোন?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের লোকে এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে, কিন্তু যাকে এই ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে কিন্তু সহজে যোগাবে না। এই বলিয়া সহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে খ্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখ্রীষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েছে ভাবো?

সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা ত জানো বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটা পিঁপড়ে মারতেও পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেই ত আমি বার-দুই দেখেচি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এই ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী? ছি!

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইল না, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না দাদা, আজকে আমাকে তুমি কিছুতেই লজ্জা দিতে পারবে না। এ-সব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের বড় কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি?

ভারতী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্বরতার দিন থেকেই চলে আসচে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?

কে বলবে?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবের বুটের তলায় চিত হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে ঠিক বার হবে না,—হয়ত আটকাবে। বরঞ্চ ও ভার শশীকে দাও, তোমার খাতিরে ও পারবে। এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু যাঁদের পরে তোমার এত বিদ্বেষ, সেই ইংরেজ মিশনারীদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেচি তাঁরা সত্যই আনন্দলাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুশী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিদ্রূপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সেদিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আসবে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্ত শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতে ফিরে আসবেই আসবে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন্ যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত করচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম, অহিংসা এবং শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মত করে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও আমাদের ফুরোয় নি।

ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ নেই ভারতী। ওদের আবহাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই তোমার মনে হয় ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি শুধু মানুষ-মারা কল তৈরি করা? দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না,—অতএব আত্মরক্ষার ছলে এর নিত্য-নূতন সৃষ্টিরও আর

বিরাম নেই। কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য থাকে ত সে এই যে, অক্ষম ও দুর্বলের ন্যায্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়। কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ন্যায়ের গৌরব দিতে? একদিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্মরণ আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইউরোপিয়ান পাওয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে, কোথায় লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শার বীভৎসতার কাহিনী? সূর্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ এবং যত অন্যায়ই হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী,—সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই—যে পাপের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায়, যে-কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল নীতির বাধা, ধর্মের নিষেধ কি শুধু নির্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়?

ভারতী নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এই-সকল অভিযোগের প্রতিবাদের সে কি জানে? যে নির্মম, একান্ত দৃঢ়চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহমন অহর্নিশি শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মূক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষহীন নারী-হৃদয় অন্ধ করুণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই-সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, আজিও সে অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নীরবতার

মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাভায় ফিরে যাওয়াই স্থির?

হাঁ।

কবে?

বোধ হয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের-দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েকখানা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিং কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্বলিত মোমবাতিটা তুলিয়া ধরিল। সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম, ভাষা ইংরাজি, অর্থও স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব এবং ক্রুগার তার পাঠিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রুগার ওয়্যার করেছে ক্যানটন থেকে। সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব ভোররাত্রে পুলিশ ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্যসিংহ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে,—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে,—সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লবের জন্যে পুলিশ সমস্ত শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। মোট সুসংবাদটা এই!

খবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যন!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দু’ভাই যে রেজিমেন্ট ছেড়ে কবে, এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর ফুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে এ কাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ-না কিছুই বলিলেন না,—নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটাপথে বর্মা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার এ কথারও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখে শব্দ নাই, বাক্য নাই, মূর্তির মত সকলে নিঃশব্দে বসিয়া। সম্মুখে টেলিগ্রাফের সেই কাগজগুলা পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছিল, শশী আর একটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট-দশেক এইভাবে কাটিবার পরে, প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধুঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড!

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সে সিগারেটে পুনশ্চ একটা বড় টান দিয়া শুধু ধূম উদ্গীর্ণ করিল। শশী মদ খাইত, কিন্তু তামাকের ধূঁয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে খামকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আইয়ার কহিল, ওয়ার্স্ট লাক্। উই মস্ট স্টপ্!

শশী কহিল, আমি আগেই জানতাম। কিছুই হবে না, শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বললে? বুধবারে?

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী-জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেছি ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত কেউ থাকবে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই অভিমত ব্যক্ত করিল, করিল না শুধু ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাঁহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাকে না বলে কোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাঁহার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একত্রিশ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা-কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নকাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী সুমিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় লইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্যোগ শুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও জল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শশী হিন্দুহোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল জানাও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানালা-কবাট বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। সুমিত্রা আপাদমস্তক চাপা দিয়া আরামকেদারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, নীচে কম্বলের শয্যায় অপূর্ব, এবং তাহারই জলযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ভারতী ফল ছাড়াইতেছে। অনতিদূরে একধারে স্টোভের উপরে মুগের ডালের খিচুড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

অপূর্ব বলিয়াছিল সংসারে তাহার আর রুচি নাই, সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র শ্রেয়ঃ। শশী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারে নাই, সে যুক্তি-সহযোগে খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছিল যে, এরূপ অভিসন্ধি ভাল নহে, কারণ, সন্ন্যাসের মধ্যে আর মজা নাই; বরঞ্চ, বরিশাল কলেজে প্রফেসারির আবেদন যদি মঞ্জুর হয় ত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কথা কহিল না। ভারতী সমস্তই জানিত, তাই সে-ই ইহার জবাব দিয়া বলিল, জীবনে মজা করে বেড়ানো ছাড়া কি মানুষের

আর বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, শশীবাবু? পৃথিবীতে সকলের চোখের দৃষ্টিই এক নয়।

তাহার কথা বলার ধরনে শশী অপ্রতিভ হইল। ভারতী পুনশ্চ কহিল, ওঁর মনের অবস্থা এখন ভাল নয়, এ সময়ে ওঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা শুধু নিষ্ফল নয়, অবিহিত। তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের নিজেদের—

আমার মনে ছিল না ভারতী।

শশীর মনে না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে অপূর্বর আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা ভারতী ব্যতীত অপরে জানিত না। সাংসারিক হিসাবে তাহার ফল ও পরিণাম মাতৃবিয়োগের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। জননীর মৃত্যুসংবাদে অপূর্বর দাদা বিনোদবাবু দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু নহে। মা রাগ করিয়া, সম্ভবতঃ, অত্যন্ত অপমানিত হইয়াই অবশেষে গঙ্গাবিহীন, ম্লেচ্ছদেশ বর্মায় আপনাকে নির্বাসিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অপূর্ব দুঃখে, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যে দুইদিন কলিকাতায় ছিল, বাটীতে খায় নাই, শোয় নাই এবং ফিরিবার মুখে রীতিমত কলহ করিয়াই আসিয়াছিল। তথাপি, এতবড় ভয়ানক দুর্ঘটনায় সকলের কনিষ্ঠ হইয়া তাহার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসা ছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ না কেহ আসিবেই আসিবে। তেওয়ারী থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সে-ও নাই, ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে।

বাঙ্গালী পুরোহিত এখানেও আছে, আজই সকালে অপূর্ব ভারতীকে ডাকিয়া কহিয়াছিল, সে কলিকাতায় যাইবে না, যেমন করিয়া পারে মাতৃশ্রাদ্ধ এখানেই সম্পন্ন করিবে।

মাতার আকস্মিক আগমনের হেতু যে ছেলেদের প্রতি দুর্জয় মান-অভিমান,— এ খবর অপূর্ব জানিয়া আসিয়াছিল, শুধু, কতখানি যে ক্রীশ্চান-কন্যা

ভারতীর কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল ইহাই জানে নাই। সাঙ্ঘাতিক পীড়িতা অচৈতন্যপ্রায় জননীর বলিবার অবকাশ ঘটিল না, এবং বিনোদবাবু রাগ করিয়া বলিলেন না।

সহসা মুখের আবরণ সরাইয়া সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, কহিল, নীচেকার দরজা খুলে কে যেন ঢুকলো, ভারতী।

বাতাস ও বারিপাতের অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দের মাঝখানে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া কঠিন। শঙ্কায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল, ভারতী একমুহূর্ত কান খাড়া করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, কেউ নয়। অপূর্ববাবুর চাকরটা শুধু নীচে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দে আনন্দ-কলরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরে, এ যে দাদা! এক হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ ওয়েলকম্! হাতের ফল এবং বঁটি ফেলিয়া সিঁড়ির মুখে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এক ক্রোড় দশ ক্রোড় বিশ ক্রোড় হাজার হাজার ক্রোড় গুড্ ইভ্নিং দাদা, শীগ্গির এসো!

সব্যসাচী ঘরে ঢুকিয়া পিঠের প্রকাণ্ড বোঁচকা নামাইতে নামাইতে সহাস্যে কহিলেন, গুড্ ইভনিং!

গুড্ ইভ্নিং! গুড্ ইভ্নিং।

ভারতী তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, এই দেখ দাদা, তোমার জন্যে খিচুড়ি রাঁধচি। ওভারকোটটা আগে খোলো। ইঃ— জুতোটুতো সব ভিজে গেছে, দাঁড়াও আগে আমি খুলে দি। এই বলিয়া সে আগে কোট খুলিবে, না হেঁট হইয়া বুটের ফিতা খুলিবে ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আমি জুতো খুলে দি। আচ্ছা, এই বৃষ্টিতে একটা গাড়ি করে আসতে নেই! হাঁ দাদা, ও-বেলা কি খেয়েছিলে? পেট ভরেছিল? ভালো কথা! ঠাকুরমশায়ের হোটেলে আজ মাংস রান্না হয়েছে আমি খবর পেয়েছি, আনবো দাদা, ছুটে গিয়ে এক বাটি? খাবে? সত্যি বল!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, আরে, এ আমাকে আজ পাগল করে দেবে নাকি!

ভারতী জুতা খুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথায় তাঁহার হাত দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। ঠিক যেন নেয়ে উঠেচ এমনি ভিজে। এই বলিয়া সে আলনা হইতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে আনিতে গেল।

মিনিট-খানেকের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এমনি কাণ্ড করিল যে, শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনাকে যেন ভারতী দু'-দশ বচ্ছর পরে দেখতে পেয়েছেন।

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়েও বেশী। এই বলিয়া ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে টানিয়া লইয়া কহিলেন, ওর আদরের জ্বালায় আমার প্রাণটা গেল।

প্রাণ গেল? তবে, থাকো বসে। এই বলিয়া ভারতী কৃত্রিম অভিমান ভরে তাহার ফল ছাড়াইতে ফিরিয়া গিয়া বঁটি লইয়া বসিল।

তাহার বন্ধু, সখা, সহোদরের অধিক আত্মীয়—আজিকার এই দুর্যোগের মধ্যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত, অভাবিত আগমনে স্নেহে, শ্রদ্ধায়, গর্বে ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপচিয়া পড়িয়াছে,—আপনাকে সে সংবরণ করিবে কি দিয়া? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, নীরবে রহিল, কিন্তু ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই দুটি নর-নারীর মাঝখানে প্রবাহিত দেখিতে পাইল। মুহূর্তের জন্যও কখনো যে তথায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে, মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার ভারতীর কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীনার মত সব্যসাচীর আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ সুমিত্রা বুঝিল।

এতক্ষণ মানুষটিকে লইয়াই ভারতী ব্যস্ত ছিল, এখন বোঁচকাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই ঝড়জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেছ কেন বলত? কোথাও চলে যাচ্চো না ত? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবে না তা বলে রাখচি, দাদা।

ডাক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের চেহারায় নিজের মুখে আর হাসি আসিল না, তথাপি তামাশার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না ত কি রামদাসের মত ধরা পড়ব নাকি?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই।

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশীবাবু যে মতামত দিচ্চেন!

বাঃ জানিনে?

কিচ্ছু জানেন না।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, ঝগড়া করলে খিচুড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু, কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময়মত পৌঁছতে পারবেন না।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মায়ের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই করব ডাক্তার।

এখানে? হেতু?

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীও জবাব দিল না।

ডাক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটিয়াছে যাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তাহলে ফিরে যাবারই বা দরকার কি? চাকরিটা আপনার আছে না?

অপূর্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ব্ববাবু সন্ন্যাস নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাস? এ আবার কি কথা!

তাঁহার হাসিতে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার রুচি নেই, জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে, এ ছাড়া তার আর পথ কি আছে, ডাক্তার?

ডাক্তার কহিলেন, এ-সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকারচর্চা করতে আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন, ও জানে শোনে। ইস্কুলে ফেল হয়ে একবার ও বছর-খানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলাগিরি করেছিল।

শশী সংশোধন করিয়া বলিল, দেড় বছরের ওপর। প্রায় দু বছর।

সুমিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল।

অপূর্বর গাম্ভীর্য ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার। সেদিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসচি। যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিক্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা উপলব্ধি করিলেন, সস্নেহ-মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মানুষের এই দিকটা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয়নি অপূর্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জীবনই যাপন করা চলে, কিন্তু বৈরাগ্য-সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বেঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারে না। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মারা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্যে আপনি যেতে চান না কিছুই আমি জানিনে, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সমস্ত অনাগত কালের

তাই শুধু সত্য হল, আর অমৃত যদি কোথাও লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না?

অপূর্ব কহিতে গেল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্বর দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভারতীর দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার নাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়িটুকুই কি বামনের বিশ্বব্যাপী পদতলের ন্যায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার আর ঠাঁই রাখেনি? অপূর্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নেই।

অপূর্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ধর্মসাধনা বা আত্মার মুক্তির কামনায় আমি সংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি করি, পরার্থেই করব। আমাকে আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন, না করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্বকে আপনারা জানতেন, মায়ের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ব আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেন সত্য হয় অপূর্ব।

অপূর্ব গাঢ়কণ্ঠে বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন-দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ করব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিল, কলকাতায় আমার বাড়ি, শহরেই আমি মানুষ, কিন্তু শহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং

নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করব, এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্যে, নিজের জন্যে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী ম্লান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে, এ ত তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠলে ত কোন কিছুই হবে না।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও তো নেই দাদা!

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য করচ মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করি নে।

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানে নেই অপূর্ববাবু। এদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলে না?

বলুক। যা ভুল তা তেত্রিশ কোটী লোকে মিলে বললেও ভুল। বরঞ্চ এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙলা দেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে

ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্যে জানো? তোমাদের দু-দশ জনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশী, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে? নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, একপ্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা কর গে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়,—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়! সুদূর-ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পোঁছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে করো না দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু শহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার দু চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর-কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের-দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে, সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, ভদ্র-জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল, এ কি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যে নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেছি তোমাকে, 'পথের-দাবী' চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারেকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কর্তব্যটি যেন ভুলে যেয়ো না দিদি। এই

বলিয়া স্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দু-দিন দেরি হলে সইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে সইবে না।

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মারা যাবে না।

কিন্তু বিলম্ব কত?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো-কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিসের বল ত?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নেতে এলাম।

কথা যেমনই হউক, তাঁহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। বাহিরে ঝড়-জলের বিরাম নাই, ভারতী ক্ষণিকের জন্য জানালা খুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপ রে বাপ! পৃথিবী বোধ হয় ওলটপালট হয়ে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অন্য কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ওই ছোট্ট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন? এই বলিয়া সে হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তাহা লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহার্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেষণের অছিলায় তুমি বাকী থাকলে চলবে না। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসব।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বসব।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতে পারি, কিন্তু বুভুক্ষু অপূর্ববাবু না নজর দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ওঁকে বল।

অপূর্ব হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধাবে কে দাদা? ও আগুনে পাহাড়-পর্বত গুঁড়িয়ে দিলেও ত ভস্ম হয়ে যাবে। যে খাওয়া খেতে দেখেছি! এই বলিয়া ভারতী আর এক দিনের খাওয়া স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ব আরম্ভ হইল। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুখ্যাতিতে এবং লঘু হাস্য-পরিহাসে ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গেল। খাওয়া যখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে, সহসা রসভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ব। সে কহিল, দিন-দুই পূর্বে খবরের কাগজে একটা সুসংবাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার। যদি সত্য হয়, আপনার বিপ্লবের প্রয়াস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত গবর্নমেন্ট তাঁদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শশী চক্ষের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! ছল!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, ছলনা নাও ত হতে পারে শশিবাবু। যাঁরা নেতা যাঁরা এই অর্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাসতে পারবে না বলচি!—তাঁদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়!

শশী তেমনি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্পাবাজি!

অপূর্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মিথ্যে। ভগবান কি নেই নাকি? এবং পরক্ষণেই অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ-সব যদি সত্যই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়!

অপূর্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্তি ছেড়ে আবার শান্তমূর্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশী দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিংবা শান্তমূর্তি আমি আপনিই জানিনে, শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্তন হবার নয়। আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকী,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজি হয় না, এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে, মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য কর। ভারতী, আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্মবঞ্চনার

অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটিমাত্র পথ খোলা আছে,—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না, তথাপি, মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের পুনরুল্লেখে ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু আলোড়িত হইয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।কহিল, কিন্তু, একাকী কি করবে দাদা, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল?

ডাক্তার বলিলেন, যাবেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সইতে পারেন না বোন।

ভারতীর মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাতমুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাঁহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদর দরজায় সজাগ হইয়া ছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের ধারে কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ববাবুর চাকর আছে না? জেগে আছে? ওহে হনুমন্ত, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শয্যা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা? কে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিং। তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। বল কবি, কতকটা কাব্যের মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্যোগে তোমার একার কাব্যের জ্বালাতেই আমারা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্যে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাই হতো না।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন! এই বলিয়া ভারতী উঁকি মারিয়া দেখিল, অপূর্বর ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল সে সত্যই হীরা সিং। ক্ষণেক পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল, এবং হাতজোড় করিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিল। পরনে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উর্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী মুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি-গোঁফ বাহিয়া জল ঝরিতেছে,-বাঁ হাত দিয়া নিংড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হালকা করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহারই ফাঁক দিয়া অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ সরদারজী! কখন?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে যাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে সরদারজী? কি নাউ?

অথচ, সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে, কিন্তু বিনা-হুকুমে কথা ফুটিবে না। সুতরাং, উত্তরের পরিবর্তে তাহার ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুম্ফ ভেদ করিয়া গুটিকয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছু বাহির হইল না।তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত, ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই; দেশের কাজে সব্যসাচীকে সে সর্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়া কঠোর সৈনিকবৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া

গেল। ইঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অনিষ্ট কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত। সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হউক, দুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্লবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে, এবং যেখানে হউক, এবং যেমন করিয়া হউক ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সন্নিকটে একখানা চীনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যূষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। সেই সংবাদই হীরা সিং এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিঙ্গাপুরে। এবং, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ-বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, সুমিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে, এবং অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হউক, কিন্তু যে কারণে সুমিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে যাবার পূর্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোন মতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যতকিছু অস্ত্র তাহার তূণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ, জীবন-মরণ সমস্যায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিংহের শান্ত মৃদু দুটি শব্দ ‘নাউ’ এবং ‘রেড়ি’ তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক দিয়া আঘাত-প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীর মনে পড়িল তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্বোত্তম বন্ধু রেভারেণ্ড লরেন্স আহারের টেবিলে হৃদ্রোগে মারা গিয়াছিলেন। আজিও ঠিক তেমনি অকস্মাৎ হীরা সিং ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের ন্যায় একমুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্চে ডাক্তার।

কথাটা সাদা এবং নিতান্তই মোটা কথা। কিন্তু সকলের বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, সত্যি কথা। আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্ল্যাঙ্ক,—ফাঁকা, ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চলবো।

যথা?

যথা, মদ খাবো না, পলিটিক্সে মিশবো না, ভারতীর কাছে থাকবো এবং কবিতা লিখবো।

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখবে না কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখচি নে। আপনার সে কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং, এ উপদেশও কখনো ভুলবো না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান,অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, যাই হয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ-কথা নয় কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ শান্তচিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্মবলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

অপূর্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইঁহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শশীর শেষের দিকের মন্তব্য তাহার ভারী খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই-সকল অভিমতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন; কাব্যচর্চা ভালো, তাই করুন; কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এমনি তুচ্ছ, এতই অবহেলার বস্তু? এবং, এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে? এবং, করবেই বা কেন? আর পলিটিক্স! যথার্থ বলচি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্ন্যাসব্রত যদি আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হতো আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা, প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নয়। দেশের ও দশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো, কারও সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশী হয়েছে ডাক্তার? আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্বস্মৃতির আঘাতে তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শশী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। অপূর্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকেই, কিন্তু দণ্ডভোগ করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? কার এতখানি জ্ঞান? জাতি ও দেশ নির্বিশেষে কার এতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা? কার এত ব্যথা? অথচ, কিছুই কাজে এলো না। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়ই,—এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্টাই ধ্বংস হাবার উপক্রম হয়েছে। শুধু প্রাণটাই বাকী, সেও কোন দিন যায়!

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্যচক্ষে আর কিছু দেখতে পাও না কবি?

শশী বলিল, তাও পাই। তাইত আপনাকে দেখলেই মনে হয়, নিরুপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের-দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাকতো!

অপূর্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ! একই সঙ্গে একেবারে দুই উলটো কথা।

সুমিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এইজন্যই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরার সৃষ্টি করে। একটু থামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই

এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই, মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব-মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশী। অপূর্ববাবু, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু পারেন নি সুমিত্রা। ভারতী, জীবনযাত্রার মাঝখানে যদি এমনি আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদার এই কথাটি তখন যেন ভুলো না। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে, ভাটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টানলে আর ভোর-রাত্রে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে? এই ভীষণ ঝড়ের রাত্রে?

তাহার ব্যাকুল-কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পাংশুমুখে প্রশ্ন করিল, সত্যি সত্যিই কি তুমি সিঙ্গাপুরে নামবে নাকি? এ কাজ কখখনো করো না ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই—কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানেই আমাকে চেনে না সুমিত্রা?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই,—হয়ত-বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই; যে কথা বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল,—কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত আমার উপরে নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আমি সুরবায়ায় নিতে যেতে পারি কি না! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতায় ফিতা বাঁধিতেছিলেন, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বুঝিল, এ আলোচনা বৃথা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, ভারতী কহিল, আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চললে দাদা, অথচ, বার বার বলতে আমাকে,—আর

শুধু আমাকে কেন আমাদের মত বয়সের যেখানে যত মেয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার বড় লোভ, সকলকেই তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, সে কি এই?

ডাক্তার সায় দিয়া বলিলেন, সত্যই ভালবাসি, ভারতী। মেয়েদের পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হল না, কিন্তু পারো যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ো বোন।

ভারতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানাবো এই যে, আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।

ডাক্তার মুহূর্তকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, বেশ তাই বলো। বাঙলা দেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হব। এই বলিয়া তাঁহার সুবৃহৎ বোঁচকাটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। ভারতী শেষ-চেষ্টা করিয়া কহিল, দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায় বিদেশের আয়োজনে তার কি হয় দাদা? যারা অন্তরঙ্গ সুহৃৎ একে একে সবাই ছেড়ে গেল, এখন যে তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ,—একেবারে একা!

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু, একাই আরম্ভ করেছিলাম ভারতী! আর বিদেশ? কিন্তু, ভগবান এইটুকু দয়া করেছেন মানুষের মর্জিমত ছোট-বড় প্রাচীরের বেড়া তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারাকক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি জো রাখেন নি। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙ্গিয়ে গেছে। এখন একপ্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।

কিন্তু, এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উন্মাদ-মূর্তিই ধারণ করিয়াছিল, ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে,

ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়াছিল। এবং, ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া, আলো নিবাইয়া, সমস্ত ওলটপালট করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদারজী!

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস্ ডক্টর, রেডি।

সকলে চমকিত হইল। এই দুঃসহ বায়ু ও মুষলধার বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া কেহ যে এই সূচীভেদ্য আঁধারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল-নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে পারে এ কথা যেন সহসা কেহ ভাবিতেই পারিল না।

ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, তাহলে আসি এখন! এই বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম এ কথা চিরদিন মনে রাখবো, ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে অপূর্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না?

অপূর্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মনে? এ জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্যন্ত আমি—

দূরে আঁধারের মধ্যে হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিনতে পারো, অপূর্ববাবু! সেদিন সব্যসাচীর ঋণ—

কথার শেষটা আর শুনা গেল না, অস্ফুটধ্বনি বায়ুবেগে শূন্যে ভাসিয়া গেল। তাহার পরে ক্ষণকালের জন্য যেন কাহারও সংজ্ঞা রহিল না! অচেতন জড়মূর্তির ন্যায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকিয়া ভারতী অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিতেই সবাই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় নিষ্পলক

চক্ষু-দুটি অন্ধকারে একাগ্র করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল। সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ-শিখা শুধু পলকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্যোগে বাটীর বাহিরে আসিয়া ইঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিশের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ-প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছের বেড়া; এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ির নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

নিমিষ মাত্র। নিমিষমাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।

হঠাৎ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিয়া উঠিল, দুর্দিনের বন্ধু! নমস্কার সরদারজী।

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বও তাহার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহারই উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। তাহার মনের মধ্যে হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভারতী তেমনি পাষাণমূর্তির মতই অন্ধকারে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শশীর কথাও যেমন তাহার কানে গেল না, তেমনি জানিতেও পারিল না ঠিক তাহারই মত আর একজন নারীর দুই চক্ষু প্লাবিয়া তখন এমনি অশ্রুপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছিল।

পন্ডিতমশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কন্ঠীবদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কন্ঠীবদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রচনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় বলিতে পারিত না। এত কান্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বেমানান দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি

সোনা ও একশ’ ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে।

তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সেকথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হর পন্ডিতের পাঠশালে পড়িয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গীসাথী। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর- গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজি হ। ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে, এই কণ্ঠীবদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল; যাও, ও-সব আমার সুমুখে তুল না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী মরেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে, আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু’খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে।

তবুও এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কন্ঠীবদল তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহার মা, ও-কাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্পাত করিতেছে না, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। শুধু সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরানী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্সি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হাঁ, একটা গেরস্থ বটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথা ধরে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহলে দাদা বুঝি সারাদিনি এই কর্ম্মই করেছ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, কি করি বল বোন! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে?

কুসুম কহিল, তাহলে ও গাঁয়ে আর কোনদিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না! কেন?

পথে দেখা হলেই ত ধরে নিয়ে যাবে। তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু আমাদের তাহলে ত চলবে না দাদা!

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলিনি দাদা—সে কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোকসান হবে। তা নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশি মেশামিশি করে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি, কুসুম!

তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়! এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষী তাঁদের দয়া করেছেন, দু’ পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! বৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিল উঠিল, আবার সেইসব পুরোনো কথা! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ!

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ লোকে হিংসে করে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশ’ বার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস নে; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়! আজ আমি ম’লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীরমুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ি নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছে, সবাই খুশি হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বৈ কি!–বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠীবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা

চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,–এ সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি খাবে দাদা?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সংবরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, কুসুম!

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল–সাড়া দিল, কেন?

বলি রাত্তির হচ্ছে না? রাঁধবি কখন?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধবো না.

কেন? তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল আমি এক শ বার বকতে পারিনে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল, জ্বালাতন করিস নে কুসি! অমনধারা করলে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তা বলে দিচ্চি।

যাও—এক্ষুণি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ী-ডোমের মত অমন করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ারমুখী, তুই ছোটবোন হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে দিস?

কুসুম বলিল, দিই। বড় বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?

বোনের মূখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করলুম শুনি?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েচে। ঢের দোষ হয়েচে। আমি মানা করে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড়ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড়বোন যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা!

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিও না বলছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই?

কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে’। নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোর কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল, চাইনে আমি কারো কথা, এক শ’ বার না-না শুনতে আমি চাইনে! আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই—বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্দ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; বলিল, বসে বসে কোঁদল করবে, না যাবে এখান থেকে?

ছোটবোনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুমুখের বড়ভাইয়ের কর্তা সাজিবার শখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁচিঁ করিয়া বলিল, বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিটখানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশি রাত কর না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথলিয়া পড়িতেছিল; অথচ সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এইসব অনাসৃষ্ট কার্যে পুত্রকে প্রশয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—বেন্দা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই না।

মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলসকক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল; সে তখন

সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিত; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদের যে দোষ আছে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবনি কেন?

মা বলিলেন, সেসব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা বুঝেছিলেন— করে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকি; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পীড়াপীড়ি করো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই—কুসুমকে কোনমতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ—সে তাহার নিরীহ অসমর্থ ও অল্পবুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না। কিন্তু ঐ যে আবার কি-সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্যজীবনের বিস্তৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতুহলী হইয়া দেখিতে

আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ী-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল। ছি ছি, এ-সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে-সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট এ কথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম যাহা অনুমান করিল তাহা নহে, সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মল্লিকা ও যুঁই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্যপূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময় সদরে কয়েখানা গোযান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষনেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত

উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, যেই হ'ন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কৈ?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো!

কাল সে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগনে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ি। তিনি আসনে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়াদাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাশা করে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে, কুঞ্জদা বড়ভাই-এর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জ়ল পর্যন্ত খেতে বললেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সকলকে নেমতন্ন করে এল—তারা সবাই এলো বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা

গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বৌমা,কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যায়নি!

কুসুম ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তার পর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিনতে-টিনতে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

কুঞ্জদা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতরে একটা সতরঞ্চি পেতে দাও বাছা –ওরা বসুক |

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কান্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোটবোনকে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট

মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পয়সা নাই।

এখন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল! উনি কে যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে; জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে।

কুসুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন একা সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার

সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাহিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, হুঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি করে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাশা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশি বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কোথায়?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই

নাকি?

কিছু না; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে বল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুঞ্জদার তুমি বোন হও, তাই সে পালাতে পেরেচে; আর কিছু হলে বোধ করি, এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয়ত একদিন ভাঙ্গতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নাই। যাক, এ-সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও–রাঁধবার যোগাড় কর গে।

রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ-কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আমাকে তা সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়িঠাকরুনকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে-বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশি তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা-আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আগে সেই যোগাড়টা করে দাও গে, আমি চললুম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি করে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর একদিনের আশা দাও ত আজ না হয় শিগ্গির করে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য! একবার মনে হল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনি শাসন করে এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য বাঁধন কুসুম।

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, তাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে বাটী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রু-বধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল ; সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সস্নেহে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু বস।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনোদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল—যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্রহৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার এই একফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক-পা নড়তে পারিনে, তাই আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নিয়ে নামিয়েচে। তাকে শিগ্গির ঘরে আন বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই – দিন-কতক কাশী-বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা দু’গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেইদিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। অবশ্য খাঁটি কিনা, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিলটি নয়, একথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হাঁ রে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা ক'ন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই, —বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায়নি, তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়াসুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নি:শব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, শুনলুম, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার জো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে

ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না, —সারা সন্ধ্যেবেলাটা কেবল মনে হয়েছে, কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে মা?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুনতেও মন্দ না; তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে-কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিনক্ষণ দেখাই গে মা। তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা-পাওনার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চন্ডীমন্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ি হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে; বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নার গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন—এইসব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া

দেখিল, সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমারই কথা হচ্ছিল, এস বস। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়াই এ-রকমের সংবর্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল। তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন দারোগা!

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েচেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্বনাশ হত বল ত!

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হালকা করিতে চাহিল না; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিগ্ধসুরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি!

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তা হলে এটা তোমাদের নয় বল? বলিয়া মহা-আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বহস্তে পুত্রবধুর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নির্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পান্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে? কুঞ্জদা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই মহা আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা তাহার খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন কুসুম ম্লানমুখে বালাজোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে; তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘুরপ্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়,—মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এ-সব অসম্ভব কান্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন—এইসব।

কিন্তু কৈ, সে-রকম ত কিছুই হইল না? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এতবড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন তাঁহার সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল-মন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা যেমন আর সর্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনিই করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটিমাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন্ সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে।

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাল একটি দিনের মেলামেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ি ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের আগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালাজোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্মান্তিক হইযা বাজিবে এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের' কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুসি, আলো জ্বালাস নি রে?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে?

এই ত আসচি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনো প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেইসব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এতবড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূর গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চূপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন তিনি?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়িঠাকরুন কি এক-রকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশি হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন–ও কি রে?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ-কথা তিনি বললেন?

হাঁ, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি–এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম, তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারিদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাইবোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, আমি কারো কেনা দাসী নই— পারব না রাঁধতে— যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দুর হ, তখন আনি কি না দেখিস। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘন্টাখানেক কাঁদিয়া-কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে

দাঁড়াইয়া ‘কুঞ্জদা’ ‘কুঞ্জদা’ করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্তির মত একভাবে পলকবিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গোযান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র ‘চরণ’ পূর্বাহ্নেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস।

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার একমুহূর্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একে ত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছি বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই।

বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এতবড় অনধিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃহৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে

হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইহা উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তাহলে ছেড়ে দেব।

চরন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

চরণ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হল রে চরণ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক!

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন? তা ছাড়া, এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন?

কুসুম সে-কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েছে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি। বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশি হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাতে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটুজলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্যঃবিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপাহাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই; সহজভাবে কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

তারপরে?

খাবে।

তারপরে?

খেয়ে একটু ঘুমোবে।

তারপরে?

যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরি কর না, বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা হোক দুটো খাইয়ে দাও—আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন? গাড়ি ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

ঠিক সেইজন্যেই গাড়ি ফিরে যায়নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুসুমের হাসিমুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাহলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।

তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েচি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না।

যাক, যে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও আর দেরি করো না, ওকে খাইয়ে দাও গে। বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘন্টা-খানেক পরে পিতাপুত্রে গাড়ি চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল, তোর মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়া কহিল, হাঁ, আমার মা-ই ত হয়—হয় না?

বৃন্দাবন ও-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস তোর মার কাছে?

চরণ খুশি হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ির একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়ল থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন, বলিয়া সে মলিন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা-বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্মত্ত-আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি পণ্ডিতমশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?

ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিতমশাই।

তাঁর কাছে তুমি পড়?

আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ-সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিতমশাই নিজেই শ্লেট পেনসিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে-সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র

পাঠশালে ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্বাদ পর্যন্ত নাই। অথচ, এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেরই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ!আগাগোড়া কাজের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এ কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেননা, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর-একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার সমস্ত অক্ষরগুলা তাহার চোখের সুমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোনমতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে-সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল, দাদা শাশুড়ির পরামর্শে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘরজামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙ্গার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রি হইল না। অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয় কোথায় সরিয়া যায়–সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল

না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙ্গায় যাবে বুঝি?

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসো গে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল-কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্যন্ত নেই। ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কতদিক সামলাব বল্ ত?

দাদার কথার ভঙ্গীতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও-কি জানি কেন সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুক্ষস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে একবার আসতে পারলে না, শুনি?

কুসুমের উওরোওর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্তভাবে বলিল, তাঁর জ্বর হয়েছিল।

হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা জানিস? নেমকহারাম আর কাকে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেইদিন বেশি করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন শুনিতেই পাইল না, এইরকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কার হত? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বলেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয়?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচমচ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না? লজ্জা হয় না?

কেন, এখানে কি বাঘ-ভাল্লুক আছে যে তোকে খেয়ে ফেলবে? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর ঘরের কাজ করতেও পারবে। হুকুম দেবে ত মা? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি বলছিস বৃন্দাবন?

সত্যি বৈ কি মা! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান ; কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা!

আচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বলিল, সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাবতে সময় দেব না। যা হোক একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবিনে?

তার কারণ আছে মা! তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধাসাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস নি বৃন্দাবন?

তা জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেচে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্তত: করচ মা, তা দু'দিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নি:শব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমশায়, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই,

বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নীচে দস্তখত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্বে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে–দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। হয়ত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ-ভাল্লুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এমনি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জলমগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ

চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুঝিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না।

আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, কিন্তু অর্ন্তযামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ির শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কিভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত বাকি রাখে নাই! বারংবার প্রত্যাখান করিয়াছে, মাকেও অপমান

করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধে সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল; কেন, একি আমার নিজের হাতে-গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে-কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়িইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই!

হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—কি মা?

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশি ভালবাসিস বল্ ত চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হাঁ, দেবো।

তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?

হাঁ, দেবো।

কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, এক প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাশুড়ি। শুধু কৌতুহলবশে জামাতার কুটীরখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি না।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ি বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি?

কুঞ্জ খুশি হইয়া কহিল, হাঁ মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষনাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি বাবা, বলতে নেই! মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাশুড়ি বলিলেন, বেন্দা বোষ্টোমের ছেলে বুঝি? এককোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসিমুখ একমুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এ কি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাশুড়ির এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কানে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়িও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু-নিজের শাশুড়ির সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশি খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া সারাদিনটাই সেটা ঘনঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলকসেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আরশিটি পর্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্যপূজা সারিয়া রাঁধিতে বসিয়াছিল,তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাবে না যে।

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত!

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাশুড়ি কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!

কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে মা?

মা গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজি

হল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত। পাড়ার পাঁচজন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স, এমন কাঁচা-সোনার রঙ–লোকে বলে, মন না মতি, পা ফস্কাতে, মন টলতে কতক্ষণ বাছা?

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা! উঠে যাও।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ি উষ্ণ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা! এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চিৎকার ও চোখমুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ি মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ি যে বিবাদ-সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, তাঁহার বলার মর্মটা ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন একসময়ে গ্রহণেচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কাজ হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ি সেদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাট-মানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মান রক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্তদিন ভগিনীকে ভৎর্সনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ি কথা কহেন নাই এবং জামাইকে উপলক্ষ করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে, এখানে বোন আগলে বসে থাকলেই ত তার চলবে না!

কুসুমের দিক হইতে এ কথার জবাব ছিল না; তাই সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা এদিক ওদিক দু'দিক সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়,

এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না।

কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙ্গিয়াছে।

তথাপি এ-সব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও, বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না— একফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সে-ই মা মা করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে সে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা ত আসিলই না, দু'ছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদুকণ্ঠে বলিয়া বসিল, এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না!

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, যা ভেবেচি তাই। অমনি পেছু ডেকে বসলি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পালটা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু অতি কঠোর-স্বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আজ পর্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।

আমি মানুষ নই?

না। কুকুর-বেড়ালও নও-তারা তোমার চেয়ে ভাল-এমন নেমকহারাম নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘন্টা-খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

কুঞ্জের ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া কেঁউ করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকি আছে–উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া

ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাঁদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই ; জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম রুদ্ধস্বরে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল! কি হয়েছিল?

তাহার গম্ভীরস্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ, তামাশা করো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচি বলে কি এমনি করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এদিকে আসতে যেতে, এখন ভুলেও আর এ-পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন কহিল, ভুলতে পারিনি বলেই মাড়াই নে, পারলে হয়ত মাড়াতুম। যাক, কি কথা?

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বৃন্দাবন হাসিল। তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিইনি, ভালভাবেই জানতে চাচ্চি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, বেশ ত তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি–আমি চূল এলো করে, পথেঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ কথা কে রটিয়েছিল?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে?

তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে পেরেচি, আজ আর পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এখন পেরেছ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাড়িঁকুড়িঁ রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল।

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, যাক গে। আমি ত খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই যেতুম না।

আজ একাদশী বুঝি?

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ওসব আমি করিনে।

কর না?

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর রহিল।

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্যক্ত হইয়া কহিল, করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না, সেইজন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলচি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা করো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হল কেন?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত–তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না—তাঁর শাশুড়ির হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হতো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি না। তারপর বলিল, এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন একদন্ডও এখানে আর থাকতে চাইনে।

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই?

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নিচু করিল। এই সহজ সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু কোথায় থাকতে চাও তুমি?

কুসুম তেমনি নতমুখেই বলিল, কি করে জানব? তাঁরাই জানেন।

তাঁরা কে?–আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলেচি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানিনে, কিন্তু পারলে ভাল হত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাইনে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুশি তোমার।

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সে উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার

খুব মস্ত অপমান হতো না। যাক চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম।

আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্মতি হয়েছিল—মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে আমার মা, স্বামী, পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে—বাড়ির বৌ। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে, পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশি কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মালমসলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই বলবার নেই।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল—যাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিজ্ঞেস করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ কচ্চি—

বৃন্দাবন দুই-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। তাহার অর্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল, তা ছাড়া পরের চলাফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনেকদিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দাদার সেই একই ভাব—সর্বরকমেই প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া কিংবা পূর্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া দেয়, —এমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎ গুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সে-ই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্নবেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যেদিন তাহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই

অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিমাত্র চিন্তাকেই অনির্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত।

তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তার পরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামী-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ির সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্য সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল, যা হোক কিছু।

তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীদেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কার্য নিত্য করিতে পায়, এ সংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষদিনের কথা। যেদিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যিই যদি সে না আসে, তবে একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্বে ছিল, যাহা এ দুর্দিনে হয়ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে

হিঁদুর মেয়ে, অতএব যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোনমতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালোবাসিতে পারে না; তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাজে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার।

গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এইজন্য সদর দরজা খোলা ছিল; হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচমচ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুকলুষিত রাঙ্গা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সুমুখে আসিয়া কহিল, তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!

কুসুমের বক্ষঃস্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারিতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাল্গুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাজ্।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, বেশ! কখ্খন না, আমার বোনের মত দেখতে? দ্যুৎ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস?

ভূতো জবাব দিবার পূর্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সুমুখে আসিয়া বলিল, কি রে কুসি, বলেছিলুম না! বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফলল কিনা? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু কি-একরকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভেতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল; ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিস নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে

তাই করে কি না। কিন্তু তুইও ত শ্বশুরঘর করতে চাইলি নি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারুর কানে তুললি নে।

কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেকদিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হসনে বোন, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোনমতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বলচিস কি কুসুম?

না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা–তুই বলিস কি রে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম বালিশে মুখ লুকাইয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিও না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না–বিয়ে হচ্চে হোক।

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না।

না কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুই-ই সমান। তোমার পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাঙ্গামা করে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না–তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত তোকে চিরকাল। একবার 'না' বললে কার বাপের সাধ্যি 'হাঁ' বলায়। তুই কারো কথা শুনবি নে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুনতে হবে।

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথ্যা নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর করবি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি করে? এখন না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক, না করুক, তুই তবে এত কাঁদচিস্ কেন?

ইহার আর জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবলবেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলো স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। এজন্যই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্বত-প্রমাণ

অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল–উঃ, এইজন্যই আমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোন কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল–যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়া ছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চন্ডীমন্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পন্ডিতমশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন ছিল শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তিবশতঃই–ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতায়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘন্টা হইতে কমাইয়া পনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া, বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্বে একবার দেখতে এলাম–আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃদকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজী-শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। পনর-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম. এ. পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু মামার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-টই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও– এতে আমিও রাজি ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি–নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এতবড় জড় পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে এক চুলও

নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে–শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি–তা আমার পাঠশালা চলল না–ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম–না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে না–তোমাকে–তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়–কি জানো–

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা–তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই–জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসে দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো–ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকের সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাষাভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েচে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি–আমার পাঠশালায় জুটেচে; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে–তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে–যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশি বুঝি; তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পনর-আনা লোকই মনে করে, যাতে

ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা

ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্গবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে না।

এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না।এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমারা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোল-আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, যদি

তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না?

প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।

তা হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা–কিংবা আরও কিছু বেশি–সেটা বললে তুমি রাগ করবে?

ধৃষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভালো করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্মেকর্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি–বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙ্গে গেছে। শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেস কচ্চি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে, সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হল।

দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বলবে–পণ্ডিতমশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হল না ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন,

বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ–কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্বল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশি কথা কি কেশব?

বেশি কথাও আছে, বলচি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা!

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদচে–তার বাপ নাকি ভেদবমি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। পণ্ডিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না।

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ-সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়াছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টাখানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে, এসব

রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া নুন-জল খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকালবেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল তাহার অনশন ও অর্ধাশনক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় বোস ষষ্ঠীচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পণ্ডিতমশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য-পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্টাও বমি কচ্চে!

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুকফাটা কান্না, চিকিৎসকের

মর্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্য-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কিনা, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নির্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মরমর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীতশুষ্ক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশপাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়্‌লের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারটা পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধপথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়,

অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা! এবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।

বৃন্দাবন ছলছল চক্ষে বলিল, মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো।

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়িঠাকরুন এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই মাথায় থাক। কিন্তু, তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে যাব, মা? ধর যদি—মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, সে ত সুসময় বাবা। তখন জানব, আমার কাজ শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই

হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, তা হলে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারিনে। কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ দেখতে পাবে না মা।

তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতগুলি কাপড়চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকি আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেচেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল, তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাওনি?

বৃন্দাবন কহিল তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাবো বন্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন মানুষ হন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন।

আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হাঁ, বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুস্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু’পাতা ইংরিজি পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশবার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ ম’লে ও-সব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিস্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্তদিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া

দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট-বড় অনেকগুলি বস্ত্রখন্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর মায়ের কাছে যাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুতঃ এ-দিকের সূক্ষ্ম বাঁধাধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কিরকম একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখে সস্নেহের অনুযোগ ভিন্ন, কাহারও ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজল-চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য

আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে।

মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হল না। অত বড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ত উলটো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল। চরণ পূর্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামিচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কৈ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয় এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?

না।

কোথায় ছিলে?

মাসখানেক পূর্বে কুসুম দাদার শাশুড়ির সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যবারে কুসুম সর্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এতবড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেছি, বলি।

আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তাছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব–নাইতে যাবে না, মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আচ্ছা, বলচি তা হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে-কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়চে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীরস্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেরি করিস্ নে রে, আয় বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধমুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন কেন?

তা ত বলতে পারিনে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায় শুকনো দেখাচ্চে।

ভাবনা-চিন্তা। স্বামীর শীর্ণমুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুর্নবার জ্বলিয়া উঠিল। শেষ কথায় পুনর্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলআনাই সুখের! ভাবনা-

চিন্তা কি শুনি?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?

সে নামিয়া দ্বারের বাহিরে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু, আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও-সব আমি শুনতে চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, তবু সেই রাগের কথা! কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেছ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না!

কুসুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন ‘যাই’ বলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি সত্যিই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সেকথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত?

কিংবা সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিত নির্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এমনি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনাবাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ি কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, নলডাঙ্গায় ফিরিয়া যখন সে বাড়ি আসিতে চাইল, এবং তিনি সাপের মত গর্জন করিয়া বলিলেন, ক্ষ্যাপার মত কথা বলো না বাছা। আমাদের বড়লোকদের শত্রুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘরদোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজি হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারি চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখামাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশি হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া তা যাক বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-ঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবচি ঠাকুরঝি!

কুসুম চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোনপো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁয়ত্রিশ কি পঁয়ষট্টি, তাহা ধরিবার জো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসীমায়ের প্রতি তাহার ভক্তি ভালবাসা এতই বড় হইয়া উঠিল যে প্রত্যহ যখন তখন 'মাসীমা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন আর কিছু না বলিয়া, কোনমতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা গোবর্ধন দাদা, আগে কোনকালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল ত? বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।

গোবর্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যও তত বলিনে মা, কিন্তু আমার ননদ রয়েচে, পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোনপো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না বাড়ি ঢুকবে না? তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার বিবি, না কারুর সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে সে ভালবাসে নাই, এখন বাসিয়াছে। এবং এধরনের ভালবাসা ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্ধন দাদা, ভারী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আসতে পার ত এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি। বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েচে রে গোবর্ধন?

গোবর্ধন মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তোমার দিব্যি মাসী, আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভিতর—মাইরি বলচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্চি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহির দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিকতে দেবে না?

আগে কাপড় ছাড়, তারপর বলচি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দিয়া কহিল, অন্যায় আমি কোনমতেই সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক, আর আমার জন্যই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েছি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মতলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা নিয়ে কথা কয়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন?

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখচি হবে, কপালে সজোর আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ করো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও দোষ কম নয় ঠাকুরঝি!

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলার ঘটনা সব শুনেচ ত?

শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এ'স্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদুর পর না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ,

না তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েচে ত? তুমি বল, কোন্ সধবা কবে বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু আমি সিঁদুর-নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে শুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোননি, ঐ কথা নিয়ে কি কান্ড নন্দজ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল? একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্ত জানেন, তিনি বলেন নি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনেশুনেই এখানে এসেচ, তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেইজন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং, তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর আমার রাগ পর্যন্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে! আমার শাশুড়ির কথা, তোমাদের কথা, ওদের কথা, সমস্তই উঠে—তখন নন্দজ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়।

তারপরে ঠাকুরবাড়ির বড়-বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনি মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ-সকল কাজ হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দজ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে এ কাজ করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয় কণ্ঠীবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয়নি।

কুসুম আশঙ্কায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কিনা তাই। অপর কেউ হয়ত চক্ষুলজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওঁর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দিকে তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কণ্ঠীবদল দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশি কিছু নেই। আমার শাশুড়িঠাকরুন আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে-দুঃখে, লজ্জায়-অভিমানে তোমাকে নিয়ে এইখানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু হতে পায়নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান নি? আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাওনি, না কথা কওনি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি একটু বসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা প্রদীপ জ্বেলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যই কাজটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয়নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হলে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকখত দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম!

কুসুম পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিছু না। গেলে স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন, তুমি যাও; আমিও বলতুম, তুমি যাও—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর

হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বৈ কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন, বারজন করে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ো না ঠাকুরঝি।

বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি——কুসুম তাহার দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকরুনকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিকস্বরে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কুমতলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণে!

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিমটি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেইজন্যেই কালামুখীকে বলছিলুম, যা শ্বশুরঘর কর্ গে যা, থাকিস নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস লো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান করো না।

শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস্!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ী মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক, চেঁচামেচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দু:খ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো; তোমার দিব্যি করে বলছি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই।

মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস নে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্তব্যবিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তাঁরা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরচে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন দিদিঠাকরুন, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিনে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর-একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলার মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক, মাগী দোষেগুণে ভালমানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েচে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্তর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদবমি হয়েচে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেছিস রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিনে, আমি ঘরদোর, পুকুর, বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল–তবে সে আর নেই। মার গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন করে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আমার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাশুড়ি কিছুই জানিতেন না, চিৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হল রে!

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ! ছুঁসনি আমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে? আমি বলচি সে কক্ষনো ডুবে মরেনি!

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, একভাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখ-কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃতদেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজলচক্ষে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্বত ভুল! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যও ত সে যেতে পারে!

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না?

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল করে পৌছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল শ্বশুরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে,

জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোনদিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সেদিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহু পরিমাণে মারীভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড়-রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফার্মে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো!

কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার শাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ যেন মুখের উপর

সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙ্গাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ-বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসীমঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মিলন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্যে যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশুপক্ষী—যে-সমস্ত লইয়া ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনদিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্ভ্রান্ত

দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কতরকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিবে না। শেষ পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া

লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—যাইবার সময় কথাটি পর্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কিরকম হয়ে গেছে!

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েচে চরণের?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকচেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!

দাসী ধমক দিয়া উঠিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ খুশি হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকি আছে; সকালে বৃন্দাবন চন্ডীমন্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদবমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দাও, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা-দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু, সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধূলো দিন, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে!

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিনী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়!

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বৈ কি! মামা ভারী অন্যায় করেচে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু' ছত্তর ইংরিজি পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ! অতবড় পুকুরে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও! এত দর্প! অত অহঙ্কার! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মানচি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেব—দু'শ টাকা, পাঁচ শ টাকা—যা চান দেব ডাক্তারবাবু, চলুন—ওষুধ দিন।

পাঁচ শ টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হলে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে।

এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে ত হবার জো নেই! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে-পায়ে ধর গে—কি জান

বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ঔষধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়ে পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও দেরি করো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফলল কি না! নির্বংশ হলি কি না!

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, ছি ছি, এমন অধর্মের কাজ করো না। যা হবার হয়েচে—আহা শিশু নাবালক—বলে দাও গোপালকে, ওষুধ দিক।

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—তুই থাম মাগী! পুরুষমানুষের কথায় কথা কস নে।

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে—পায়ে ধরিতে লাগিল, না তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষালমহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে।

যখন ও আমার কথা মানলে না, তখনই জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী?

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, আর আমি! সেদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্রসূর্য উঠচে, এখনও জোয়ার-ভাঁটা খেলচে! বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাএ পুএশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়ইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিইয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ-বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই অধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্বিতণ্ডার শেষ-মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্তমুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে-পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতার চললুম।

যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে

যায় হে বৃন্দাবন! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, পিতাকে কাছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোনদিনই জিদ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত চিৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চিৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু, ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একাধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু।

পিতার এত বড় ধৈর্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুর-ঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়া ছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে, ভগবান, আমি সে নালিশ জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? পিতৃহৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কিজন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র একফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাহাকে একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু

মেঘ-মুক্ত নির্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে আড়ালে বসিয়া আছে!

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম।

তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার ষোল-আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হত। আজ সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা! যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর!

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব 'উঃ'–বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগদীদের দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাড়াঁইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি তার জবাব পেলাম—সংসারের এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহাশত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এর দামও আছে কেশব, এখন যেন টের পাচ্ছি, খুব বড়-রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিরুত্তর-মুখে চাহিয়া রহিল; বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখচি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্চে—চরণ বেঁচে থাকতে ত একটা দিনও এমন হয়নি!

কেশব অবনতমুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোটভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী কোথায় যাচ্ছিস রে?

বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পণ্ডিতমশাই।

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই একসঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ, বুক জুড়িয়ে গেল রে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বুঝি সত্যই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারী রাগ করবে।

ওঃ—তা বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আসছি যে! বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না! আজ যেমন দেখতে দিলে, এমনি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের মুখ দেখতে পাই। এমনি বুকে নেবার জন্যে

যেন চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জপ-তপের তেজে; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোচ্চোরকে—সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।

কেশব সেইসব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ জীবনে স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হল, তত বড় শিক্ষা, পুত্রশোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম,

আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস; এ পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে এমন কূপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুশি হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেস্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এই করো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ত আমার নেই মাস্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্বস্ব ত জলকষ্ট-মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙ্গানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টিভিক্ষার অভাব হবে না মাস্টারমশাই, এইতেই আমার বাকি দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন মুখ নিচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করবার আবশ্যকতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যেদিকেই চোখ পড়ছে, সেইদিকেই তার ছোট হাত-দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্চি। আমাকে

ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষমুখে মৌন রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকালে বিনা-আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালা নিয়ে সারাজীবন থাকবে?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই। টাকা রোজকার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় মানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়! উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে রে!

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী-হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্ম্মমভাবে ত্যাগ

করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁত্লে থেঁত্লে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে-কোনস্থানে নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যেদিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জমিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও কার্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েকবার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সেদিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ-কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাইরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার জো নেই, সে কথা বলে দিলে না কেন?

দাসী কহিল, বৌমা নিজেই সমস্ত জানেন।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক কত শীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো।

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্ত নারী কি কান্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ-কণ্ঠে বলিল, সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ; কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষ-বহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর-একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুব সম্ভব। আমি যাব।

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য ত পারিনে! তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে?

কুসুম অবিচলিত-স্বরে কহিল, আমিও খুব হাঁটতে পারি—হেঁটেই এসেছি। তা ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল। কুসুম বলিল, ভাবনা মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।

বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?

কুসুম শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, পারব।

তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর-একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।

পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যুষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানী। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকাগাড়ির ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মত একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা, হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ-সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয় কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, বাবা, চল না দেখবে।

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলাস জল আন ত খাই।

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকাগৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মত যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার-মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হু হু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্গাপূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজমেয়ের ওখানে

তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। অফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতে হইবে। কাল বড়সাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ অফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন হইবে, অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্ধেক কাপড়-চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশি অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, বাবা ওঠ, জল এনেছি।

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেছি ওঠ।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল, বলিলেন, সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশী এ সংসারে আর কেহ

অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক, আয়, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার এই মাটিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।

ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে!

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধবি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?

জানি মামা। আমি মামীমার কাছে সব শিখে নিয়েছি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি! মামীমা দেখিয়ে দেন,—আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই মুখ নীচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর নাকি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরন বলিলেন, বসো, আজ সকালে তোমার খুড়ীমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ত বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কি সে শুধু আমিই জানি যে!

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়ীমা শুনলে বড় কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি! কিন্তু বাবা, ভগবানও ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েচে, তা পড়ুক, সে জন্য দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখ না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মা বাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়।

কি করে একে প্রাণ ধরে যার-তার হাতে তুলে দিই বল ত? রাজার মুকুটে যে কোহিনুর জ্বলে, তেমনি কোহিনুর রাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কি রকম শেল বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হলো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।

গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো ত বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কি বলব বাবা, এ পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতই দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি ত দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত। একফোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপই কি কিছু কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই বা বলি কি করে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না?

শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিল না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্চ?

শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, কথাটা একটু মনে রেখো বাবা! ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি

হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল,—ছোট ছেলে এই শেখরনাথ।

তাঁহার প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারের এক বড়লোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোন একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিণীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা! মেয়ে ত দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, তার পরে আশীর্বাদ করার দিন ভাল করে দেখলেই হবে।

তথাপি গৃহিণী সম্মত হইলেন না, পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু শৌখিন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে, সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্নবেলায় সে সেই ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌ দেখতে যাবে, না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে! কৈ বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি, বৌ যাতে পছন্দ করে।

ললিতা হাসিল। বলিল, এখন ত আমার সময় নেই শেখরদা—আমি টাকা নিতে এসেচি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া

গণিয়া গণিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?

শেখর চুলের একপাশ বুরুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে, না হচ্ছে!

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি রকম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। শহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই।

এই মা'টি যে শেখরের কত বড় গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য,

রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে তাই ত বললুম।

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, কৈ বললি? রঙ কেমন, ফরসা? কার মত হবে? আমাদের ললিতার মত?

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, ললিতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা।

মুখচোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কর্তাকে বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেচে কেমন?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞাসা করিনি মা!

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিসনি কি রে! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেইটেই জেনে আসিসনি?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে তুই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখচি!

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া

দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সুমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিচ্ছু না মা।

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসীমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোর আমি ত মাসী হইনে ললিতে,মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন,কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেছিস?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেচে, রাঁধবে কখন?

মা বলিলেন, রাঁধবে কেন?

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তবে ওদের রাঁধবে মা? ওর মামাও ত সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধাবাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হলো। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে? আমাদের বামুনঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়বৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি?

ললিতা বলিল, টাকা নিচ্চি।

হুঁ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা।

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই ত চলে না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কি জন্য, এ-সব তর্কও কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাহার মৃদুকণ্ঠ শেখরের কানে গেল না—সে জবাব দিল না।

ললিতা তখন আরো একটু গলা চড়াইয়া বলিল, সবাই আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, এতক্ষণে বুঝি কানে গেল। আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।

শেখর বলিল, আমরা কারা?

আমি, আন্নাকালী, চারুবালা, তার মামা।

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছ'দিন হলো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি. এ. পড়বেন—বেশ লোক সে—

বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরন দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, চারু বললে যে।

চারু বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সী এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ গিরীনকে ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যেতেই ত বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে।

চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালমন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েচে।

ললিতা চমকিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কতবড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তেরো বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি-বমি কচ্চে—ভারী অসুখ কচ্চে, বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল,

মামীকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পাছে এই-সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্চে—সে নাই গেল চারুদি! আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারো খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজী বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে, ওঠ। বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামীকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল। কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ করেছিল।

গিরীন হাসিয়া বলিল, এখন ত অসুখ সেরেচে, চলুন কাল যেতে হবে।

না না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই তাহা নহে, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা করিতেছিল।

শেখরের বাটীর মত, এই বাটীতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও বাহির হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই তাহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু, আজ গিরীনের সুমুখে বসিয়া সমস্ত খেলার সময়টা কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিচয়েই গিরীন্দ্র তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছে। পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এতবড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে শেখরের ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং একেবারে কাজে লাগিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে এ ঘরের ছোটখাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাজাইয়া দেওয়া, দোয়াত-কলম ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ-সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না।

ছয়-সাত দিনের অবহেলায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা সময় পাইলেই কাছে কাছে থাকিত এবং সে নিজে কাহাকেও পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর মনে করিত না। আট বছর বয়সে মা-বাপ হারাইয়া মামার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোটবোনটির মত শেখরের আশেপাশে ঘুরিয়া তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী তাহা সবাই জানিত, শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিশুকাল হইতে শেখরের কাছে তাহাকে একইভাবে এত অপর্যাপ্ত আদর পাইতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কোন আদরই কাহারই চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বধূরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই, ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ দ্বারের বাহিরে জুতার মসমস শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এই যে! কাল তা হলে ফিরতে কত রাত হ'ল?

ললিতা জবাব দিল না।

শেখর একটা গদিআঁটা আরাম-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ফেরা হ'ল কখন? দুটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকছেন।

ভুবনেশ্বরী ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিলেন, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল, ডাকছিলে মা?

কৈ ডাকিনি ত, বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াই বলিলেন, মুখখানি এমন শুকনো কেন ললিতে? কিছু খাসনি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা, যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে, উপরে আসিয়া দেখিল, তখনো শেখর তেমনিভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোশাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই—দাঁড়াইয়া আছে।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা, আমার দেরি আছে, রেখে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, থাক দেরি, আমারো নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েছে। নীচে কাজ না থাকে ও-বাড়িতে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নয় ললিতে?

নয়ই ত! বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা দুম করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার এসো।

এক শ-বার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসিবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি, পান দিয়ে এলিনে রে!

আমার ক্ষীদে পেয়েচে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা বসিয়া পড়িল।

মা তাহার রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুই খেতে ব'স, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবুও শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই রাগে সে চার-পাঁচ দিন শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলা গিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিত। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দু'দিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তথাপি সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ পাড়ার একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার উপর ললিতার বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাইয়া সে যে-সমস্ত অপূর্ব এবং অসম্ভব আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই কেমন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সেই বুড়া ছেলেটি তাহার আজ সকালেই দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে আজ ললিতা কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে, সে টাকা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক-সেদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঝির সহিত বকাবকি করিয়া বিরক্ত-মুখে রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোরগোড়ায় লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্বে ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধুহাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সরিল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজদি, তোমার সেই ছেলে এসেচে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে শেখরদার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে আয়।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে তেমনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, এই নাও।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, শেখরদা কি বললে রে?

কিছু না। আমাকে বললে চাপকানের পকেট থেকে টাকা নিতে, আর নিয়ে এলুম।

আর কিছু বললে না?

না, আর কিচ্ছু না, বলিয়া আন্নাকালী ঘাড় নাড়িয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল।

ললিতা ভিক্ষুক বিদায় করিল; কিন্তু অন্যদিনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বাক্যচ্ছটা শুনিতে পারিল না—ভালই লাগিল না।

এ কয়দিন তাহাদের আড্ডা পূর্ণ তেজে চলিতেছিল। আজ দুপুরবেলা ললিতা গেল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিল। আজ সত্য সত্যই তাহার ভারী মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা কালীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, কালী, তুই পড়া বলে নিতে শেখরদার ঘরে আর যাসনে?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ যাই ত।

আমার কথা শেখরদা জিজ্ঞেস করে না?

না। হাঁ, হাঁ, পরশু করেছিল—তুমি দুপুরবেলা তাস খেল কিনা?

ললিতা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কি বললি?

কালী বলিল, তুমি দুপুরবেলা চারুদিদিদের বাড়ি তাস খেলতে যাও, তাই বললুম।

শেখরদা বললে, কে কে খেলে? আমি বললুম, তুমি আর সই-মা, চারুদিদি আর তার মামা। আচ্ছা, তুমি ভাল খেলো, না চারুদিদির মামা ভাল খেলে সেজদি? সই-মা বলে তুমি ভাল খেলো, না?

ললিতা সে কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই অত কথা বলতে গেলি কেন? সব কথায় তোর কথা কওয়া চাই, আর কোনদিন তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কালী অবাক হইয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের হেতু সে কিছুই বুঝিল না।

মনোরমার তাস খেলা দু'দিন বন্ধ হইয়াছে—ললিতা আসে না। তাহাকে দেখিয়া অবধি গিরীন্দ্র যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই মনোরমা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সন্দেহ আজ সুদৃঢ় হইল।

এই দুইদিন গিরীন কি একরকম উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইত না, যখন-তখন বাড়ির ভিতরে আসিয়া এঘর-ওঘর করিত, আজ দুপুরবেলা আসিয়া বলিল, দিদি, আজও খেলা হবে না?

মনোরমা বলিলেন, কি করে হবে গিরীন, লোক কৈ? না হয়, আয় আমরা তিনজনেই খেলি।

গিরীন নিরুৎসাহভাবে বলিল, তিনজনে কি খেলা হয় দিদি? ও-বাড়ির ললিতাকে একবার ডাকতে পাঠাও না।

সে আসবে না।

গিরীন বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন আসবে না, ওদের বাড়িতে মানা করে দিয়েচে বোধ হয়, না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, ওর মামা-মামী সে-রকম মানুষ নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীন হঠাৎ খুশি হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেই আসবেন—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে নিজের মনেই ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোরমা হাসিয়া ফেলিলেন,—আচ্ছা, তাই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ললিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাস পড়িয়া বসিলেন।

দু'দিন খেলা হয় নাই, আজ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমিয়া গেল। ললিতারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা কালী আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেজদি, শেখরদা ডাকচেন—জলদি!

ললিতার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি?

কি জানি, চলে এসেচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু-হাত দেখে যা।

ললিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রশ্ন করিল, শেখরদাদা আবার কে দিদি?

মনোরমা বলিলেন, ঐ যে সুমুখের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ও—ওই বাড়ি। নবীনবাবু ওঁদের আত্মীয় বুঝি?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন! ললিতাদের ঐ ভিটেটুকু পর্যন্ত বুড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন!

গিরীন আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুরুচরণবাবুর মেজমেয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন। এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবংঅবশেষে বাড়িটা নবীন রায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়ার আন্তরিক ইচ্ছা গুরুচরণবাবুর ভাঙ্গা বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐখানে ছোটো ছেলে

শেখরের জন্যে একটি বড় রকমের বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্লেশ বোধ হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুরুচরণবাবুর আরও ত মেয়ে আছে, তাদেরি বা বিয়ে কি করে দেবেন?

মনোরমা বলিলেন, নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা। ওর বাপ-মা নেই, সমস্ত ভার ঐ গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেচে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামী আমার কাছে কেঁদে ফেললে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই হাঁ গিরীন, মুঙ্গেরে তোদের কোননগুরুচরণবাবুর পেটে অন্ন-জল যায় না, বন্ধুবান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করে? অমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, বন্ধুবান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ডাক্তারি করিয়া অনেক টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তরই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা, তুই ধার দিবি?

ধার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয়, উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমনি কে কাকে টাকা দেয়?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙ্গালী ত? ওঁর একান্ত অভাব, আর আমার

বিস্তর রয়েচে,— তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজি হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত খরচ না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেক স্ত্রীলোকই প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশি হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম চারু, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিস নে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই বলো দিদি। পরশু রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়বার্তায় মনে হল—বেশ সরল লোক; তুমি কি বল?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই বড় সাদাসিধে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, অমন লোকটিকে হয়ত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তার সাক্ষী দেখলি নে গিরীন, শেখরবাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িসুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু, যত খোশামোদই করুক না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েচে, রেহাই পাবে, এ ভরসা কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে তো দিদি?

আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস, ভালই ত। বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরই বা এত চাড় কেন গিরীন?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখ-কষ্টে পরস্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্থান করিল। দ্বারের বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি যে?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যেরকম টাকা খরচ করে সে ত দু:খীর মত মোটেই নয় দিদি। সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চারুকে জিজ্ঞেস কর না, কিরকম খরচ করে; মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওর নিজের খরচই চলে না যে।

মনোরমা বিশ্বাস করিলেন না।

চারু বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেবেলা থেকে ওই শেখরদার আলমারি খুলে টাকা নিয়ে আসে—কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা আনে শেখরবাবু জানেন?

চারু মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আন্নাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে? সবই ত সই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা অমন চামার নয়—ওরা সব মায়ের ধাত পেয়েচে—তাই দয়াধর্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি নাকি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে, তাই ওকে মায়া-মমতাও সবাই করে। হাঁ চারু, তুই ত

যাওয়া-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে নাকি বিয়ে হবে? শুনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চারু বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ—যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারিদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অফিস হইতে ফিরিতেই তাঁহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়া বলিতেন, ললিতে, চা তৈরি হলো মা? কালী, যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইবার ডেকে আন। তারপর উভয়ে চা-খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকিত।

ললিতা কোন কোন দিন মামার আড়ালে বসিয়া চুপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তিতর্ক শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধেই হইত। সমাজের হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণের উৎপীড়িত অশান্ত হৃদয়ের সহিত গিরীনের কথাগুলা বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন। কার ইচ্ছে আর না করে নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি করে? সমাজ বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ গিরীন, এই আমাকে দিয়েই দ্যাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়েচে, দু'দিন পরে ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে

হবে—সমাজ তখন ত বলবেন না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও। কি বল হে?

গিরীন হয়ত চুপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙ্গায় আর গলা চেপে ধরে সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তারাই থাক, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সহসা চুপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিত নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীনবাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা, বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্বিরোধী দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এত ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু কেন?

কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়ে, কাল যদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তাহলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাৎ কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারাতুরা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে-কেহ কথা কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল

না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সন্ধ্যার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে গিরীন ললিতাকে ‘আপনি’ বলিয়া ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওকে আবার ‘আপনি’ কেন গিরীন, ‘তুমি’ বলে ডেকো। তখন হইতে সে ‘তুমি’ বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নিচু করিয়া ঘাড় নাড়িলে, গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার বারণ আছে। মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু শুনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ শনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটার সভা ভাঙ্গিতে অধিক বিলম্ব হইল।

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি-একরকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার দেহটা বোধ করি তেমন ভাল নাই?

গুরুচরণ হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, কেন? দেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, তাহলে অফিসে কি কিছু—

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল তাহা এই নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতেই পারেন নাই।

ললিতা পূর্বে একেবারেই চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল দু’-একটা কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ তোমার হয়ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা! হ্যাঁ মা, ঠিক ধরেচিস বটে, আজ আমার সত্যিই মন ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনেশুনে গোটা-কতক শক্ত কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিয়ে দিলেন। আর তাঁরই বা দোষ কি, ছ’মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কান্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলা পরের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিষণ্নভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মা’টি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোকে যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চায় না, ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটাকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতে হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন আজ তা হলে বলি।

গুরচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীনবাবুর খুব বেশী সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর, তাঁরও দরকার, না হয় এই ঋণটা শোধ করেই দিন না?

ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, তাই যখন আপনার সুবিধা হবে, ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলছিলাম যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নিচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজদি, জলদি— শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলেন। ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্নাকালী মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৈ, উঠলে না সেজদি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েচি যে!

তথাপি ললিতা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গুরুচরণ কালীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথায় একটা হাত দিয়া বলিলেন, তাহলে যা মা, দেরি করিস নে— তোর জন্যে বুঝি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু, যাইবার পূর্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-দশেক পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার ছুতা করিয়া আর একবার বাহিরের ঘরে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীন চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদিত চক্ষুর দুই পাশ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ যে আনন্দাশ্রু, ললিতা তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল না, যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার নিজের চোখ দুটিও অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল। কালী ছিল না, সে সকলের আগে গাড়িতে গিয়া বসিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া তাহার জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-দশ দিন ললিতাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে তাহা ভুলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কাঁদচ নাকি?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই কয়দিনের একান্ত অদর্শনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাই সে কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যিই কাঁদচ যে! হলো কি?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীন রায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গণিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, বলতে নিষেধ আছে।

টাকাটা ফেরত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিরূপ নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লেষ করিয়া বলিলেন, তা এখন নিষেধ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ, টাকাটা ফিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন!

গুরুচরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, সে কি কথা দাদা! আপনার টাকার ঋণটাই শোধ করেচি, কিন্তু আপনার দয়ার ঋণ ত শোধ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে গুড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে যদি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয় একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌঠানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়,—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচরণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বন্ধক রাখিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হাঁ দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিষেধ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু সংসারের অনেক জিনিসই দেখেচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসাদে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথায় আর জবাব না দিয়া নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরই ভুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশি নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন। যাই হোক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় শৌখিন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমরা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর মায়ের সঙ্গে যাইত, এবারেও যাইবে তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না!

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ, কি করে যাবে! মাঘ-ফাল্গুন মাসে ওর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।

শেখর নির্নিমেষ চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ির ভিতরে যাহা শুনিয়াছিল উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেচেন যত টাকা লাগে ভাল পাত্তর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়েদেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজদির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যাঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস-তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েচেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোনও ভয় নেই, সত্যি না শেখরদা?

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনিই চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না রে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শিগগির ডেকে দে, বল আমি ডাকচি, যা ছুটে যা।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন্ দ্রব্যে তাহার প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-রকম মুখের ভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। ললিতা আশ্চর্য

হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের গাড়িতেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্চি, এবার ফিরতে হয়ত দেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকাকড়ি ও-দেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিবার ললিতাও সঙ্গে যায়। গতবারে এই উপলক্ষে সে কি আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেখরদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবামাত্রই ললিতার তাহা মনে পড়ল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একবার কাশিয়া গলাটা পরিস্কার করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো।

অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। বেলা হলো, আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা খোলা তোরঙ্গের সমুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি স্নান কর গে, আমি গুছিয়ে দিচ্চি।

তাহলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কালীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র স্থির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহাও সত্য। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘন্টা-দুই পরে স্নানাহার শেষ করিয়া অফিসের পোশাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল।

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু, শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অফিসের পোশাক পরিতে পরিতে সহজভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে গুছিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাঙ্গা চোখের হেতু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না করা পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন অপরাহ্নে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়া ছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু'বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও তাহার মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজে এটা খায় না, অপরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে, ইত্যাদি বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের রূপ আর কোন্ কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনোমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু, গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিমে চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোনও কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েচে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ কি,—হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েচে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী! এমন মেয়ে বহু ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ! কথাটা উচ্চারণ করিতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল।

মকদ্দমায় সর্বস্ব হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আইসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই একঘন্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে ললিতা?

ললিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েচে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়া একটু হাসিল। ললিতার করস্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্চে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই দিতে এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটাসোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাপ দিয়ে এইটে তৈরি করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারী একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি ‘বাবু’ মানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরি করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরি করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রইল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিতে ভুলো না যেন।

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেষ চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না?

শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, সে-কথা নয়-ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিসপত্র গোছান হয়েচে কি না জানো?

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে বছর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন সে আমিই টের পাচ্চি ভাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুষ্কমুখে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে যাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে যেয়ো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যই উপায় হবে কি? আমার শখ ত আছে ষোল আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখচি, তোমার মামার মত হতে হবে—এক কাপড় এক চাদর সম্বল করে—যা হয় তাই হবে।

ললিতা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা শুনিয়াও শুনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথচি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কৈ, আমাকে বলিস নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তির ছাড়া আর এ-মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েচে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।

ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। যা, আমার বালিশের নীচে আছে, নিগে যা। হাঁ রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না পেলে হয়। আমি কতগুলো মেয়ে পার করলুম সেজদি। আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েচে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি—যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিণী, সমস্ত কাজকর্মই সে সুশৃঙ্খলায় করে। শেখরদাদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি একছড়া মালা চাইলেন। যাও না

সেজদি, শিগগির করে দিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকে বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আয়।

আচ্ছা যাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসচি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—মরবার ফুরসত নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একেবারে পাকা বুড়ি, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও শেখর টের পাইল না! তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী! পরক্ষণেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা!

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়।

এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে না, কক্ষনো না,—কক্ষনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—বিশেষ কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু শুনিবে কে? কোথাও সে থামিতে পারিল না, দৌড়িয়া আসিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গম্ভীরপ্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতেও পারিত না। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। অথচ, শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির ঝির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গা, ছোটবাবু এবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাচ্ছি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, কাছে এসো বলছি।

না ঐখান থেকে বল।

শেখর মনে মনে হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ করে ফেললে বল ত?

ললিতা রষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার!

শেখর মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি! তুমিই ত করে গেলে—

কিছু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েছি ললিতা। কাছে এসো, ফিরিয়ে দিচ্চি। তুমি অর্ধেকটা করে গেছ, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা দ্বারের অন্তরালে ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্যি বলছি তোমাকে, ও-রকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি ঐখান থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সম্মুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। এইবার তাহার চোখ জ্বালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এ-সব কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্মান্তিক উপহাস করা! সে যে কত তুচ্ছ, কত নীচে, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং নিরুপায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদর ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কাহারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন্দ্র সম্পূর্ণ পর হইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরদের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ।

ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, দু'দিন আগেই হউক, পাছেই হউক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে নবীন রায় কত টাকা আদায় করিবেন, সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন, তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বসিল! এই সব কথা ললিতা সুমুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি করেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিঁড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাঁদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ!

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়! কহিল, আমি অপমান করছি, না, তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কৈ অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমার বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, নীচে যাও।

যাচ্চি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল। একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া নত হইয়া তাহার অধরে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না ললিতা, আজ থেকে আপনিই বুঝতে পারবে।

ললিতার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবচি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেচি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা শুনলে দুঃখ করবেন—এ হবে না শে—

বাবা শুনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারিনে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনেক পরে একদিন গুরুচরণ ম্লানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চিৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন, না না না, এখানে নয়—ঐ চৌকির উপর ব'সো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চারেক পূর্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে, সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ত মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—ক্রোধে নবীন রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেবো, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হবো, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীই হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চিৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজের গলায় দড়ি না দিতে পেরে জাতের গলায় দড়ি টাঙ্গিয়ে দিয়েছ—আচ্ছা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বার করো না, এখন যাঁরা-সব মন্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেয়েদের হাড়ি-মুচির ঘরে দেও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মুঠার মধ্যে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাই নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করিয়া আপাতত জব্দ করিবার আর কোন ফন্দি খুঁজিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূর-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর, এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পরে তোমরাই ত তাঁকে একঘরে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিতেন, আমি ত ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই তাদের ভার নিতেন।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাকেই করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে গুরুচরণ এই-সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুঝি সত্যিই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই

হয়েচে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানুষ হচ্চে।

ভুবনেশ্বেরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্তা এক রকমের মানুষ, তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর একমিনিটও তাহার বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত, অপ্রসন্ন-মুখে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই!

ভুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগচে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা, এমন কি, মুখের আলাপ রাখাও যে কর্তার অভিপ্রেত নয়, তাহা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পরে বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলুম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেচি। সেই অবধি কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেললে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আচঁলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না—কার আর দোষ দিই বল!

যাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সঙ্গতিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না—মুখ নিচু করিয়া খাবারগুলা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে যাইবামাত্র সে একবার স্থির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন্দ্র এবং আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্বাপেক্ষা অধিক চেঁচাইতেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তক্তপোশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে বোধ করি আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোঝা গেল না।

তাঁহার মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজেই কথা পাড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পশ্চিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপিরিচিত যুবকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন, ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখাপড়া শেখা, অতি সৎ ছেলে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কাঁদ–কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ করো না।সব কথা শুনেচ ত?

শুনেচি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরেই ভিতরে গৃহিণীর কান্নার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কোঁচার খুঁট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে গিয়া দেখিল, অন্ধকার কবাটের আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কি যেন আশা করিয়া রহিল, তার পর পিছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কৈ, আমি ত চিঠি পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তা বৈ কি ললিতা। আমি কার ওপর হুকুম দেব?

আমার ওপর, আর কার ওপর দিতে পারো?

তোমার ওপরেই বা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি শুনবে কেন? শেখরের কন্ঠস্বর গম্ভীর, ইষৎ করুণ।

এবার ললিতা মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল যাও—এখন আমার তামাশা ভাল লাগছে না। পায়ে পড়ি, কি হবে বল? ভয়ে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

বেশ যা হোক। ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমার মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েচেন, সে-কথা তিনি শুনেচেন। তা ছাড়া, এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।

আন্নাকালী এইসময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকচেন।

ললিতা চেঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক, পিছনেই হোক, দিতেই তো হবে।

শেখর প্রশ্ন করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষে কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতক্ষণ শেখর সংযত হইয়া কথা কহিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রি করে ফেলেছেন যে!

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা করো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রি করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার বটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শেখর বিহ্বলের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার একফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপরে নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই কয়টা মাসের প্রবাস-বাসকালে সে নিজের কল্পনায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া শুধু কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই

তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতরে, বাপ-মা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপর কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বরাবর এই ধার বহিয়াই চলিয়াছিল তাই বিদেশে যাইবার পূর্বের রাত্রে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙ্গনটার মুখেই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্ম্মমত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া, শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া অহর্নিশি এই চিন্তাই করিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটাই তাহার পরিচিত ছিল,

আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এইদিকটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবনার ধারা একেবারে উলটা স্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহারাও অত টাকা দিতে শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শেখরের জননীরও মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সুতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাততঃ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্ত নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়। সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতর হইয়া উঠিবে, ললিতা যে এমন অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখেই উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না, কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে সমস্তটা ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের মোহ ছিল, এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন, তাহাই পান করার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না, এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে আর মুখে আনিবারও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, সে শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে না। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যই ত! সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—দোষ নাই বলিয়াই দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব সে কার কাছে কি দিবে?

পিতামাতার অমতে ললিতার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিরীনের সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবার পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন সে মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এই সব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সম্মুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নি:শ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?

পূর্বে সে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও-

বাড়ির কাহাকেও ছাদে দেখিতে পাইল না। শুধু একদিন আন্নাকালী কি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ ঐ একফোঁটা কালী পর্যন্ত জানিয়াছে।

আরও একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাটাকে দেখেচিস শেখর?

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কেন?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর-এক রকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েচে। এমনি গম্ভীর, কার সাধ্যি দেখে বলে চোদ্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায় বলিলেন, পরনের কাপড়খানি ময়লা, আঁচলের কাছে খানিকটা সেলাই-করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। কোনদিনই সে ওর মামার দেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিইনি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর-এক দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে খিদে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতেও পারে না,—সেও আমি—ঐ আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে

শুকিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে বোঝেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে মা বলেই ডাকে না, মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যেদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়াই কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন?

নেবে কেন? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমিই বা দিতে যাবো কোন মুখে? ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত-ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পীড়াপীড়িতেই সে জাত দিয়ে ফেলেছে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেছেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর ঢের বেশি আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলচি। শুনচি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত শুনি।

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে শুনলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য কান্নাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে স্বস্তি নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দু'খানা গাড়ির স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের স্থান হয় না। একখানা গাড়ি খুব একপাশে ঘেঁষিয়া না দাঁড়াইলে আর একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের অফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সুমুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর অফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না, সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা এবং গিরীন শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, সুমুখে চৌকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অস্ফুট-স্বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিতেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গিরীন পিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময়, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইশারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, শেখর সুমুখের চৌকিতে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমনি চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্যন্ত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না।

আজ সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে নির্ভয়ে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচুক—আর শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না! ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও-বাড়ির পরম বন্ধু, সকলের আশা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে, এমন বিপদের দিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা গদীআঁটা আরাম-চৌকির উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, যেন সম্পূর্ণ পর—একেবারে অপরিচিত! আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীনকে আড়ালে ডাকিয়া কত-না পরামর্শ! অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই থিয়েটার দেখিতে পর্যন্ত যাইতে দেয় নাই।

এখনও একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত সে তাহাদের গোপন সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই লজ্জায় ওরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথচ একটি কথাও কি সে এতদিনের মধ্যে কোন কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিত না?

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কৈ রে, এখনও হাতমুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে!

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেক রকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত দোষ কোনদিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নাই। বরঞ্চ, পাছে প্রকাশ পায়, সে কোনরূপ দাবি করিয়া বসে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথাপি, সর্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় তুলিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিংসায়, ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিতেছিল। বোধ করি, এমনি করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দগ্ধ হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল! কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কার্পেটের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরদা, আমরা দু'জনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেচি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক দোষ-অপরাধ তোমার পায়ে আমরা করেচি শেখরদা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুঝিল, ইহার একটি কথাও কালীর নিজের নহে, সে শেখানো কথা বলিতেছে মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় যাবে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেছেন, এ-দেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের ভিতর হইতে কয়েক জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইমা আমাদের কিনে দিয়েচেন।

ললিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু টাকাকড়ি ওতে আর নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজদি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এস ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরে পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে দিয়া আসিল।

পান হাতে লইয়া শেখর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

চললুম শেখরদা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। ললিতা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুরমুখে বিহ্বল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চিরদিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন, বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল; কারণ, সে চাহে না কোন কথা উঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্বশরীর ঝিমঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া গিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচরণের ভাঙ্গা দেহ মুঙ্গেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথার্থই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাহার যথাসাধ্য করিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সজল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায় এবং এই গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসুখে সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহার পর এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন।

ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড়বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন রায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্বেই হইয়া যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসর স্থগিত ছিল। কন্যাপক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিন বৎসরের অধিক হইল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি, ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপরে ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোনমতে একটা খবর পাওয়া যায়—কে কেমন আছে। অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথাপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চারুর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহারা গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। ক্ষণকালের জন্য তোরঙ্গ গুছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কহিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখর মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসচেন যে।

চল যাচ্চি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুকভাঙ্গা কান্নার রোল উঠিল। বিধবা-বেশধারিণী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। শুধু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকেও আর একবার অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না। তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কান্নাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুঙ্গেরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বহুদিন হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারাই ক্রয় করিলে ইহা একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখন তিনি এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এই-সব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজার, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলেন ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন ছুটি পাইল, তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন্দ্র উপর হইতে নামিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটীতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সুমুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অন্ধকার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশি কাতর হয়ে পড়েচেন?

হাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়েছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমনি মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাহাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ ত সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্ধাটা যেন সমস্ত আগুনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনেক পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলো তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কাজে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

সে যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া, না, এখন থাক, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সঙ্গতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাহার পত্নীর হাত এরূপ অলঙ্কারশূন্য হইবার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল, ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, একপাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেখর নিকটে আসিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত স্থির হইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কাকে? আমাকে?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্বাপেক্ষা দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতি-নমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা একপাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু, আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্যন্ত দু'জনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেচি। আমার শাশুড়িঠাকরুনের অভিপ্রায় আপনি শুনেচেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুঙ্গেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীনকে দেখিবামাত্রই শেখরের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলা তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিল না, অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু তাঁকে আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল, আমার বলবার আবশ্যক হলে বলতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল,—সেজদি—ললিতাদিদি বলছিলেন—শেখর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল, তাহার একবিন্দুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিব কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু, সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথাই শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য। গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজদিদি আমাকে বুঝিয়া বলেন, অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না যে, ইতিপূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। এ-কথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই বাষ্প অশ্রুধারায় চোখের কোণ বহিয়া গিরীনের সম্মুখেই ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিরীন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয় চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন?

গিরীনের মুখের উপরে প্রচ্ছন্ন বেদনার গাঢ় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া

আনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-শুনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজনের সম্বন্ধে ও-সব আলোচনা আমি করতে চাইনে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিরীনকে শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবারে সেই বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কতবড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরাহ্নবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝেয় বসিয়া ললিতার সাহায্যে নূতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল! আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি রে!

শেখর জবাব দিল না, চুপ করিয়া থাক দেওয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, ও কি হচ্ছে মা?

মা বলিলেন, নূতন কাপড় কাকে কি-রকম দিতে হবে, হিসেব করে দেখচি—বোধ করি, আরও কিছু কিনতে হবে, না, মা?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শেখর হাসি-মুখে কহিল, আর যদি বিয়ে না করি মা?

ভুবনেশ্বরী হাসিলেন। বলিলেন, তা তুমি পারো, তোমার গুণে ঘাট নেই।

শেখরও হাসিয়া বলিল, তাই বোধ করি হয়ে দাঁড়ায় মা।

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ও কি কথা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনিস নে।

শেখর বলিল, এতদিন মুখে ত আনিনি মা, কিন্তু আর না আনলে নয়—আর চুপ করে থাকলে মহাপাতক হবে মা।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন।

শেখর বলিল, তোমার এই ছেলেটির অনেক অপরাধই তুমি ক্ষমা করে এসেচ, এটাও ক্ষমা কর মা, আমি সত্যই এ বিয়ে করতে পারব না।

পুত্রের কথা ও মুখের ভাব দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সত্যই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা তুই এখান থেকে, আমাকে জ্বালাতন করিস নে শেখর—আমার অনেক কাজ।

শেখর আর একবার হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, না মা, সত্যিই বলচি তোমাকে, এ বিয়ে হতে পারবে না।

কেন, এ কি ছেলেখেলা?

ছেলেখেলা নয় বলেই ত বলচি মা।

ভুবনেশ্বরী এবার রীতিমত ভীত হইয়া সরোষে বলিলেন, কি হয়েচে আমাকে বুঝিয়ে বল শেখর। ও-সব গোলমেলে কথা আমার ভাল লাগে না।

শেখর মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো মা, আর একদিন বলবো।

আর একদিন বলবি! তিনি কাপড়ের গোছা একধারে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাইনে।

শেখর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী অধিকতর অস্থির হইয়া বলিলেন, ললিতাও আমার সঙ্গে কাশী যেতে চায়, দেখি তার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি।

এবার শেখর মুখ তুলিয়া হাসিল, তুমি নিয়ে যাবে, তার আবার বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করবে মা? তোমার হুকুমের বড় ওর আবার কি আছে!

>ছেলের হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু যেন আশান্বিতা হইলেন, ললিতার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, শুনলি মা ওর কথা! ও মনে করে, আমি ইচ্ছা করলেই যেন যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি! ওর মামীর মত নিতে হবে না?

ললিতা জবাব দিল না। শেখরের কথাবার্তার ধরনে সে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

শেখর বলিয়া ফেলিল, তাঁকে জানাতে চাও, জানাও গে, সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তুমি যা বলবে তাই হবে মা, এ আমিও মনে করি, যাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, সেও মনে করে, ও তোমার পুত্রবধূ। বলিয়া ফেলিয়াই শেখর ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জননীর সম্মুখে সন্তানের মুখে এ কি পরিহাস! একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললি? ও আমার কি?

শেখর মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, ঐ ত বললুম মা। আজ নয়, চার বৎসরের বেশি হ'লো, তুমি সত্যই ওর মা। আমি আর বলতে পারিনে মা, ওকে জিজ্ঞেস কর ও-ই বলবে,—বলিয়াই দেখিল ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ললিতাকে সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাকে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বুঝি গিরীনের কালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে?

ললিতা বলিল, হ্যাঁ মা, তাই। গিরীনবাবুর মত মানুষ সংসারে আর আছে কিনা জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতেই, তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু তিনি আছেন।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি মা! আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক, একটু বোস মা, আমি অবিনাশকে জানিয়ে আসি যে, বিয়ের কনে বদল হয়ে গেছে, বলিয়া হাসিয়া বড়ছেলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পল্লী-সমাজ

এক

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসি, রমা কই গা?

মাসি আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হ'লে রমা, কি করবে স্থির করলে?

জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা?

বেণী কহিল, তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন! রমেশ ত কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে;—যাবে না কি?

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে ত জানি দিদি। আর যেই হোক, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবি নে। তবে শুন্চি নাকি ছোঁড়া সমস্ত বাড়ি-বাড়ি নিজে গিয়ে ব'লবে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ'লে কি বলবে?

রমা সরোষে জবাব দিল, আমি কিছুই বলব না—বাইরের দারোয়ান তার উত্তর দেবে।

পূজানিরতা মাসির কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, দরোয়ান কেন?

আমি বলতে জানিনে? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যেবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে? আমি কিছুই ভুলি নি বেণীমাধব! তারিণী তার ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল।তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তাহ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝলে না বাবা বেণী! তা যখন হ্'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি-সব জপ-তপ, তুকতাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোটজাত হয়ে চায় কিনা যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত পেলে না। ছোটজাতের মুখে আগুন! বলিয়া মাসি যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ ছোটজাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসিকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসি তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেচে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসি ঠিক কথাই বলেচেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুকতাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।

মাসি কহিলেন, সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া দশ-বারো বছর ত দেশে আসেনি—এত দিন ছিল কোথায়?

কি করে জানব মাসি। ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুনচি এতদিন নাকি বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ

করে এসেচে, কেউ বলচে উকিল হয়ে এসেচে, কেউ বলচে সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, তখন দুচোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙ্গা ছিল।

বটে? তা হ'লে তাকে ত বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!

বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল।সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, পড়ে বৈ কি! সে ত আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। তা ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে দুজনেই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।

মাসি আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার ভালবাসার মুখে আগুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলব ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোটখুড়ীমার যে,—

কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসিকে বলিয়া উঠিল, সে-সব পুরনো কথার দরকার নেই মাসি।

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ-সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে এই ত স্থির হ'ল দিদি, নড়চড় হবে না ত?

রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস নে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ করে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আছে, তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, সেই চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই আমার সহায় থাকিস, আর আমি কোনও চিন্তা করি নে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচায্যি। আর তারিণী ঘোষাল নেই, দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে!

রমা কহিল, রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি বলে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।

বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উবু হইয়া বসিল। তারপর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিল, রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয় বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখে নি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়!

সে আমি বুঝি বড়দা।

তুই না বুঝিস কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কাল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল যাই, বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িল। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল—রাণী, কই রে?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীয় প্রতি চাহিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুক্ষ-মাথা, খালি-পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, এই যে বড়দা, এখানে? বেশ চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কৈ রাণী কোথায়? বলিয়াই কপাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পালাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! আরে ইস, কত বড় হয়েছিস রে? ভাল আছিস?

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, চিনতে পাচ্ছিস রে? আমি তোদের রমেশদা!

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন?

হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা? বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমার সেই কথাটা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই

আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।— তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল, আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়,আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারচি না।

মাসি আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ এই মাসিটিকে ইতিপূর্বেই দেখে নাই; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষে সেই যে মুখুয্যেবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসি বলিলেন, না হলে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে শরম হয় না তোমার?

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল।

রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বোকচ মাসি, তুমি নিজের কাজে যাও না—

মাসি মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, নে রমা, বকিস্ নে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোমাদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হ'ত। আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্মবাড়িতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে,—এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর বলে গেলেই ত পুরুষমানুষের মত কাজ হ'ত।

রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ-সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কপাটের শিকলটা ঝনঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসি রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-দরোয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে—একটু হুঁশ করে কাজ ক'রো বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকে আবদার করে বেড়াবে! তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনও পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলুম।

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ ক'রো রাণি! বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা

ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পালায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসির সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমার সাধ্যিই ছিল না অমন করে বলা! এ কি চাকর-দরোয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিনা, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বার হয়ে গেল। এই ত—ঠিক হ'ল!

মাসি ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, খুব ত হ'ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত! আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত হয়নি!

মাসির কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল, এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, তুমি যখন নিজে বলেচ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না—

মাসি এবং বেণী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসি রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কি বল্লি লা?

কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না? বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মাসি?

কি করে জানব বাছা! ও রাজরাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম! বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি মুখখানা কালিবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দুই

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জিত হইবার একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্ধমান রাজ-সরকারের চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই দুঃখে-কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য কথা শুনা গেল, তিনি নিজেই সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মোকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় গিয়া দিন-ছয়েক পূর্বে হঠাৎ যেদিন আদালতে ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মুলতুবি মোকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পরিয়া গেল। বড় তরফের কর্তা বেণী ঘোষাল

বুড়োর মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন কি করিয়া খুড়োর আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়ো-ভাইপোর মুখ দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্বে তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাড়ির ভিতরে দাস-দাসী এবং বাইরে মোকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষকার্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দু'টা দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজ-কর্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্যে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতিবৃদ্ধ পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিল। তাঁহার কাঁধে মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন্ ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ,

তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যেবংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরুবে। আসবাব সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটু থামিয়া বলিল, আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস,আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হুঁকাটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল।

ধর্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য থান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল—সেদিকেও জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছিমিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়ঘড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাগ্রে আসিয়াছিল। সুতরাং ধর্মদাস যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা রমেশ! বললে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললুম বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাঙ্গালী-বিদায়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটাও বলি একে! এতটা বয়েস হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধ্যিই বা কি! যাঁর কাজ তিনি উপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্পাল ছিলেন বৈ ত নয়!

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই বেশ বেশ কথাগুলি অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে বাড়ি—সে-সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে-কোন কাজ-কর্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে!

ধর্মদাস প্রাণপণ-বলে কাসি থামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিল—কেন, বাজে বকিস্ গোবিন্দ? খক্—খক্—খক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্লি, আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে? খক্—খক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিল। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি! খক্—খক্—খক্—

গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, এলুম?

এলিনে?

দূর মিথ্যাবাদী ।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা !

গোবিন্দ তাহার ভাঙ্গা ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তবে রে শালা!

ধর্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হই কিনা, তাই শালার আক্কেল দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই! বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দিকে যাহারা কাজ-কর্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাশা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া আসিল। ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত লোকের দৃষ্টির সুমুখে রমেশ লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান! এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে! বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক দিতে দিতে

সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রায় শ'-চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্মের বাড়িতে কত ঠেঙ্গাঠেঙ্গি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও থান ফাড়ব কি না?

ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিরদ কর্ম বলেচে কেন? শাস্তরে আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর—তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে রাঘব ভট্চায্যিতে হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরবভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী! ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ!

এখন পর্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র-বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে, এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড

করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, আরও দু শ' কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্ররাশির নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটীর ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কৈ গো, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক দু'টি কোমরে এক-একগাছি ঘুন্সি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনুদা, ব'সো। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়া চাহিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা—বলিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া বলিল, আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্চে? পথে আসতে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে ষোলখানা করে লুচি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদাকে বলছিলুম বাবাজী,—তোমাদের

পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত যাচ্ছে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েচে; কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্মদাসদা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই! নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি ক'রো না বাবা! বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক্‌, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবি-টাবি দিও না বাবা, কিছুতে দিও না—ঘি, ময়দা, তেল, নুন অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। ধর্মদাস যে তাহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ করিয়াছিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটা ছুটিয়া আসিয়া দীনুদার কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীনু একবার রমেশের প্রতি একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, সন্দেশ কোথায় পাব রে?

কেন, ঐ যে হচ্চে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আঁমরাও দাঁদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ ত, বেশ ত, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল—ও আচায্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল; বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল্ দেখি?

বেশ বাবা, বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ তোদের আবার পছন্দ! মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে—কি বল গোবিন্দভায়া, এখনও একটু রোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

তবে কৈ দাও দেখি একটা গোবিন্দভায়াকে, চেখে দেখুক কেমন কলকাতার কারিগর তোমরা! না, না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস ষষ্ঠীচরণ।

প্রভুর আদেশ মত ভিতর হইতে গোটা-তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্ধেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, কলকাতার কারিগর বটে! কি বল ধর্মদাসদা? বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ধর্মদাসদার তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার

অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই।

হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে! বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিদানাটা একটু পরখ করে দিন।

মিহিদানা? কই আনো দেখি বাপু?

মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল! দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, ওরে ও খেঁদি, ধর্‌ দিকি মা এই দুটো মিহিদানা।

আমি আর খেতে পারব না বাবা।

পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস্‌ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্‌, কাল সকালে খাস্‌, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েচে। মিষ্টি বুঝি দুরকম করলে বাবাজী!

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

অ্যাঁ ক্ষীরমোহন! কৈ সে ত বার করলে না বাপু?

বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, খেয়েছিলুম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়িতে। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু।

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, বল গে, আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দেখলে দীনুদা, ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসির বেশি দরদ। সেই জন্যই আমি বলি—

সে কি বলে তাহা না শুনিয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, আচায্যিমশাই কি করবেন? ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্ম্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল, কে, বড়গিন্নী?

রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট-বড় দুই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ করে ফেলেছেন।

বিস্ময়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন

জ্যাঠাইমা!

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না।

রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে এক সময় বড় ভালবাসিতেন। বধূ-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ি-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দু'টি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম গ্রন্থিবন্ধন হয়। তার পরে, গৃহবিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা, পৃথক হওয়া, কত রকমের ঝড়-ঝাপটা এই দুইটি সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোটবৌয়ের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহারই হাতে সাজানো এই-সমস্ত বহু পুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের

পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি, এই সদ্য-পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাইরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে পারিস্ রমেশ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্যন্ত করেন নাই। তার পর রমাদের বাড়িতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসির নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা, এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল যেখানে অভিমানের কোন মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েচি জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই ত আমাকে ডেকে আনিস নি রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন্ বলি। কাজ-কর্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বা'র হতে দেব না; যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্নি যেন। হাঁ রে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন ত বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে সস্নেহে অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোর করা চাই। যা একবার ভাল করে বল গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা যে, কোন লোকের হাতেপায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মীমানিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয় সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। তাঁদের কথা শুনিস্ নে। আয় আমার সঙ্গে, তোর বড়দার কাছে একবার যাবি চল।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসবো। বলিয়া

বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন; বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজী, বড়গিন্নী এসেছিলেন, না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কহিল, দেখলে ধর্মদাসদা, যা বলেচি তাই। বলি মতলবটা বুঝলে বাবাজী?

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীনু ভটচায তখনও যায় নাই। কারণ তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না। ছেলেমেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটা আশীর্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাত-পুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া! তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াছিল; নির্বোধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, বোঝো না সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এ-সব ব্যাপারের কি বোঝো যে মানে করতে এসেচ?

ধমক খাইয়া দীনুর নির্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, আরে এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোনখানে? শুনচ না, গিন্নীমা স্বয়ং এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্চায। যে জন্যে ছুটে এসেছিলে—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেও, আজ আর হবে না। এখন যাও আমাদের ঢের কাজ আছে।

দীনু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কন্ঠস্বরে থামিয়া গেল—আপনার হ'ল কি গাঙ্গুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামকা অপমান করচেন কেন?

গোবিন্দ ভর্ৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না সত্যি কথাটি বলেচি কি না? ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় ফিরি যে! দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্ধা? আচ্ছা—

ধর্মদাসদা কি দেখিল তা সেই জানে, কিন্তু রমেশ লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্যকথাই বলেচে। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড় ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিন্তু মনে ক'রো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুশিই হয়েচেন।

হঠাৎ দীনুর গম্ভীর শুষ্ক চোখ-দু'টা জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ্টপ্ করিয়া দু'ফোঁটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীনু তাহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু আমিই নই বাবা। এদিকে আমার মত দুঃখী-গরীব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে-কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে! আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে মা খেঁদি ওঠ, হরিধন চল্ বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব, আর কি বলব বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী হও।

রমেশ তাহার সঙ্গে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, ভট্চায্যিমশাই, এই দুটো-তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়িতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত ভাগ্য বলে মনে করব।

ভট্চায্যিমশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আমি বড় দুঃখী বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে যাই।

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙ্গুলীমশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই সে থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ যে আমার নিজের কাজ রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি; ধর্মদাসদা আর আমি দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি বাবা।

ধর্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিল, বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু রাগ করিল না। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কতবড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধে এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকাহাঁটিকাই সবচেয়ে বেশি। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেণীবাবু! নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনলে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা ত জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর্, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ্দ করে, তা ত কখন শুনিনি বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা হলে কথাটা ত বা'র করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিল, সবুর কর না বাবাজী! একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাত্তিরে তুমি কেন বাবা?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, আসবে বৈ কি বাবা, একশ' বার আসবে! এ ত তোমারই বাড়ি। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য! তাই ত আমরা বেণীবাবুকে বলতে এসেছি, বেণীবাবু, তারিণীদার সঙ্গে

মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু’ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদারমামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আছিস রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না বেণীবাবু, তুমি বড়ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া বড়গিন্নীঠাকরুন যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী চমকাইয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন!

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুশি হইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করা-কর্ম যা কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নীঠাকরুনের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে কেন? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়? বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, আচ্ছা—

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্দ করে ফেলা হোক না কেন? কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কথা কি না হালদারমামা? ধর্মদাসদা চুপ করে রইলে কেন? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীতকণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী গম্ভীর হইয়া কহিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্বেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখে-শুনে আসবেন।

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, দেখলে বেণীবাবু, কথার ভাবখানা!

বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রমেশ? কেন রে?

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটু দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্তিরে যে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলুম।

তবেই মুশকিলে ফেললি বাবা। এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যেমশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানিনে জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বললি রমেশ, এরাই তোর সবচেয়ে আপনার! তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে বাবা? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজ-কর্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা?

সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে-অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী-দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি, বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারও সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণশূদ্রই নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ-রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ। তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ-রকম হ'লে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ!

ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের একজন কর্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ! সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান্ কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া, আমি যখন সত্যি-মিথ্যে কারো দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায় ।

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, আমি তোর গুরুজন, মায়ের মত। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায়।

কি করবো জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো।

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, তা হলে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছলনামাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবি করিতেছিল, এখন দেখিল, এ দাবির অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর আপন সন্তানের দাবি জায়গা জুড়িয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল, কাল পর্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।

এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া

গেল। ঘণ্টাকয়েক মাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন। কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেছেন।

চার

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে–বাড়ির ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালার কপাটের একপাশে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমি গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?

গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুয্যেবাড়ির গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে দুজোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী বসিয়াছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন, যদি আমার নামটাই করলে ক্ষ্যান্তমাসি, তবে সত্যি কথা বলি বাছা! খাতিরে কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুদ্ধ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাশ্চিত্যও হয়েচে,

সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি! মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু–

ক্ষ্যান্তমাসি চীৎকার করিয়া উঠিল, ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ারঘরে বসে পান সাজচে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শলতেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি? বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙ্গে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না, বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে ঢুকতে যায়নি; দোরগোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বসলো, বলি তার বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না এতেই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষ্যান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল, এতেই হবে মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ্ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে বসবি চল্।

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে! এমন

সব খান্কী নটীর কাণ্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর চারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল— ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার আর যদু মুখুজ্যেমশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েচেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল্ সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না, বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে ঢুকতে যায়নি; দোরগোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বসলো, বলি তার বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না এতেই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষ্যান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল, এতেই হবে মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ্ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে বসবি চল্।

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে! এমন সব খান্কী নটীর কাণ্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর চারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল— ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার আর যদু মুখুজ্যেমশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েচেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল্ সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যাহারা যা খুশি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্চায কাঁদ কাঁদ হইয়া বার বার ক্ষ্যান্তমাসি ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙ্গুলী, একবার হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথা কহিতে পারিল না। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ!

অকস্মাৎ একমুহূর্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল-বাড়ির গিন্নীমা।

পল্লীগ্রামে শহরের কড়া পর্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ির বধূ বলিয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য চোখ-দুটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে দে রমেশ! আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল্ যে, আমি সবাইকে আদর

করে বাড়িতে ডেকে এনেচি, সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্মের বাড়িতে হাঁকাহাঁকি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কে আসিল, না আসিল তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনার অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুটে কহিল, বসে পড় না খুড়ো? ষোলখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয় বাবা!

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পঙক্তি-ভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খুদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্টাচার্য ছেলেদের লইয়া লুচি-মণ্ডার গুরুভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল; পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, খেঁদি, এ-সব কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস রে?

তাহাদের ছোট-বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিল, পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেপিলেরা আছে ত বাবা, এঁটো-কাঁটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দুখানা-চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক বাবা, কেন যে দেশসুদ্ধ লোক ওঁকে গিন্নীমা বলে ডাকে তা আজ বুঝলুম।

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্যন্ত আসিয়া—হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্চায্যিমশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত রেষারেষি কেন বলতে পারেন?

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হায় রে বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত পদে আছে। যে কাণ্ড এ কদিন ধরে খেঁদির মামার বাড়িতে দেখে এলুম! বিশ ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্ত চারটে দল। হরনাথ বিশ্বেস দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল বলে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে। সমস্ত গ্রামেই বাবা এই রকম—তা

ছাড়া মামলায় মামলায় একেবারে শতচ্ছিদ্র!—খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে মা।

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, এর কি কোন প্রতিকার নেই ভটচায্যিমশাই?

প্রতিকার আর কি করে হবে বাবা—এ যে ঘোর কলি! ভট্টাচার্য একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে একটা কথা বলতে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষে-সিক্ষে করতে অনেক জায়গাতেই ত যাই—অনেকে অনুগ্রহ করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলেছোকরাদের দয়াধর্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না। বলিয়া দীনু যেমন ভঙ্গি করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল।

দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্ত—তুমি যে অন্ধকারে অনেকদূর এগিয়ে এলে বাবাজী।

তা হোক ভটচায্যিমশাই, আপনি বলুন।

কি আর বলব বাবা, পাড়াগাঁ-মাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ক্ষ্যান্তিবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়ায়।

রমেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—এই আমার কথা তুমি দেখে নিও বাবা, ক্ষ্যান্তিবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার দু-দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি

সহজ কথা। কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে। আর সাহস থাকবে নাই বা কেন? মুড়ি বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারীর সীমা-পরিসীমা থাকবে না তা বলে দিচ্চি। অনাচার আর কোন্ ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—

রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, থাক্, বড়দার কথায় আর কাজ নেই—

দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, থাক্ বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন—

রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, ভট্চায্যিমশাই, আপনার বাড়ি কি আরো দূরে?

না বাবা, বেশি দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—

আসব বৈ কি, নিশ্চয় আসব। বলিয়া রমেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্ত তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন, বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও। বলিয়া দীনু ভট্চায অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্বচন করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাঁচ

এ পাড়ার একমাত্র মধু পালের মুদীর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ-বারদিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকি দশ টাকা লইয়া যায় নাই বলিয়া রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্যে অবাক হইয়া গেল। যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বহিয়া ঋণশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেমন করে চলবে বাবু? দু আনা, চার আনা, এক টাকা, পাঁচ-সিকে করে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকি পড়ে আছে। এই দিয়ে যাচ্ছি বলে দু'মাসেও আদায় হবার জো নেই। এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ে নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরে এলুম, তামাক খা' দিকি মধু, —বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সৈরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক-কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

ক্রুদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশায় একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই বলে খামকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে

হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল্‌! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলুম, হাটটা একেবারে ঘুরে যাই! মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—আমাকে স্বচ্ছন্দে বললে কি না, কিছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে! আরে আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস্‌ করে তুলে ফেলতেই দেখি না—অম্নি ফস্‌ করে হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তোর সেই আড়াইটা—আর আজকের একটা—এই সাড়ে-তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু সায় দিয়া কহিল, তাও কি হয়!

তবে তাই বল না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা-নাপতে বন্ধ করে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না?

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুটি কে মধু?

মধু সগর্বে কহিল, আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকী ছিল বলে নিজে বাড়ি বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশায় কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, আঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক বাবা। হাঁ, এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচে বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলুম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাঁড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকানসুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু দোকানি বাঁড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? হ’লে হবে কি—সেখানে কে থাকতে পারে বল্। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি!

মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরটা একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি!

বাঁড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি কি মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকব সেও ভাল, কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বললে বিশ্বাস করবি নে, সেখানে সুষনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, থোড়, মোচা পর্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি। দিবারাত্রি পেট ফুট্‌ফাট্ করে, বুক জ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে বসে জোটে একবেলা একসন্ধ্যা খাব, না জোটে, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ভিক্ষে করব, বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু মা-লক্ষ্মী মাথায় থাকুক—বিদেশে কেউ যেন না যায়।

তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছে তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতরে উড়খি ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্তে ঢালিয়া দিয়া বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দেখি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো!

আবার বিকেলবেলা? বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুন দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিলেন, তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস দেখি? বলিয়া

আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুন তুলিয়া ঠোঙ্গায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঐ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

চলুন, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া করুণকণ্ঠে কহিল, বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—হাঁ রে মধু, দুবেলা চোখাচোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা-বেটির মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে গেল—আর এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল! কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?

মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুট বলিতে গেল, অনেক দিনের—

হলেই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতিবিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসনগ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোটরকমের

ইস্কুল মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্নমেন্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে নাহয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনার পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোনমতে, ও গভর্নমেন্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কুলান হয়; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশি আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ-ছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্নমেন্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সব-ইনেস্পক্টারবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন—আমি মিথ্যে বলচি নে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

মাস্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু! বেণীবাবু এ কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনি কর্তা বুঝি?

মাস্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে; কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যেমহাশয়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেক দিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না?

মাস্টার কহিল, যতীন ত? পড়ে বৈ কি।

রমেশ বলিল, আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হেডমাস্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

ছয়

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিয়া রমার মাসিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে নাকি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসিটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা কাঠের নয় বলিয়াই হউক, কিংবা এ-কাল সে-কাল নয় বলিয়াই হউক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ, ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবে পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই! রমেশ শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বার বার মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিবে এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ও-বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে; কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিবার

আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাস্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল।

চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যে-বাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক্—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসি ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল ক্রমশঃ সংস্কার-অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না। কই, মাগুর প্রভৃতি যে-সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকারমশাই, লোক পাঠান নি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাচ্ছে?

আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেদের খোট্টা দারোয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্গির পাঠান।

গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না,—আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন, কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত!

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরনের। বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো সিঙি-মাগুর মাছ আচায্যিমশাই! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি করব বাবু? আমার রমেশবাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসত পেলেন না।

তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুলগাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন! কিন্তু ন্যায্য অংশ ছেড়ে দেবেনই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট-পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!

ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বলেন কি!

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, বলি ভাল, আচায্যিমশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি, আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েছেন!

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আর শরিকদের এত ভয় করলে কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়?

যদু মুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক, সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে নাকি সেদিন তামাশা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লো, একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে? বলিয়া গোপাল রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্বত্রই অবারিতদ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙ্গা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্যকর্মে উত্তেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তিরক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি—রোজ রোজ চালাকি নাকি! ভজুয়া!

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেউ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।

ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙ্গলাদেশের তেলে-জলে মানুষ; হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচিকে মোটে ভয় করে না। কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায় বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে

জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময় মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সকার-বকার চীৎকার করিয়া দুটা কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালিগালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটা হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক; ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও নাই, সঙ্কল্পও ছিল না। মুহূর্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ডহাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো যাস্নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ একদণ্ডও বাঁচব না।

রমেশ বিরক্ত হইয়া ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না বাবা। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না।

রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সাত

হাঁ রে যতীন, খেলা করছিস, ইস্কুলে যাবিনে?

আমাদের যে আজ কাল দু'দিন ছুটি দিদি!

মাসি শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, মুখপোড়া ইস্কুলের মাসের মধ্যে পনর দিন ছুটি! তুই তাই ওর পিছনে টাকা খরচ করিস্, আমি হ'লে আগুন ধরিয়ে দিতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ষোল আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসির অখ্যাতি প্রচার করিত তাহারা ভুল করিত। এমনি এক-আধটা সত্য কথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

রমা ছোটভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে! তারপর চুনকাম হবে—কত বই এসেচে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারি, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি?

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি রে!

হাঁ দিদি সত্যি। রমেশবাবু এসেচেন না—তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুমুখে মাসিকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া এই ছোটভাইটির মুখ হইতে সে রমেশের ইস্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘন্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া

যান, তাহাও শুনিল! হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন?

বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ—

কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস?

এইবার যতীন একটু মুশকিলে পরিল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোর্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার পর্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা—ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে স্বীকার করাও ত সহজ নহে! ছেলেরা মাস্টারদিগকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল।

তাই সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, আমরা ছোটবাবু বলি।কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি ছোটদা বলে ডাকতে পারিস নে?

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্চ দিদি?

তাই ত হয় রে—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল যে বন্ধ! এই দুটা দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে যে-সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া! সে আর একবার ছট্ফট্ করিয়া বলিল, এখন যাব দিদি?

এত বেলায় কোথায় যাবি রে? বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে যতীন? বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরে কি-রকম একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, ছোটদার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি করে তুমি জানলে?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে কিংবা গ্রামের আর কেহ কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্য এই অত্যল্পকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জিদ করিল না। কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, ছোটদা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না? বড়দা ত রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তথাপি হাসিয়া কহিল তুই তাকে ডেকে আনতে পারিস্ নে?

এখনই যাব দিদি? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়-ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। খবর্দার যতীন—কখ্খনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কখ্খনো না। বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃদস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন বালক হইলেও এবার বড় বিস্ময়ে দিদির মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত এমনধারা করিতে কখনও সে পূর্বে দেখে নাই, তা ছাড়া ছোটবাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্যপথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি বলি বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে! বলি একাদশী বলে কি এতটা বেলা পর্যন্ত মাথায় একটু তেল-জলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

রমা জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি যাও মাসি, আমি এখন যাচ্ছি।

যাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখ্গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসির অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা ঝুড়ির প্রায় এক ঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির

হইয়াছেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—কি মাছ পড়ল হে বেণী ! বলিয়া লাঠি হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিল।

তেমন আর কই পড়ল ! বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করচিস্ কেন রে? শীগ্গির করে দু ভাগ করে ফেল না।

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কি হচ্চে গো রমা? অনেকদিন আসতে পারিনি। বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই, বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী বাড়ি ঢুকিলেন।

আসুন, বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

এত ভিড় কিসের গো? বলিয়া গাঙ্গুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য হইয়া গেলেন—ব্যস! তাইত গা, মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখচি। বড় পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য-বিভাগের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সমাধা হইয়া গেল। বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে, একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুশমনের মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সবাই

তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া ‘মা-জী’ বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমন হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙ্গা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাঙ্গলা মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক সহসা উত্তর দিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, এই যাও মাৎ।

চাকরটা ভয়ে চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। আধ-মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই, তখন বেণী সাহস করিল। যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, বাবুজী, আপকো নেহি পুছা।

মাসি অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বলিলেন,কি রে বাপু মারবি নাকি?

ভজুয়া একমুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণে তাহার ভাঙ্গা গলার ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ি ভরিয়া উঠিল।খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু প্রায় লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মা-জী? তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল, রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্গে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহুৎ আচ্ছা মা-জী। বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া হিন্দি-বাঙ্গলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল এবং কহিল, মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন।

বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা, মা-জীকে জিজ্ঞেস করে আয় ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলিয়া দিলেন—আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবামাত্র বেণী মেয়েলি সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, এমনি করে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি, আমি আজ

থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মা-জীর মুখ হইতে কখনো ঝুটা বাত বাহির হইবে না—ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুদ্ধ এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আচঁলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আট

জ্যাঠাইমা!

কে, রমেশ? আয় বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসিকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাই সবদিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায় সে আড় হইয়া বসিয়াছিল, রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া ধীরে-সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয়ত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মিত-ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বালাই ষাট্! ওকি কথা বাপ। বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখ-দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না—বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিঁকতে পাচ্ছিনে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠচে।

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁকতে পারছিস নে কেন বল্ দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু সেই জন্যেই ত বলচি, তোর আর কোথাও গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?

রমেশ চুপ করিয়া রহিল, আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট-দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙ্গনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে—প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটো বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙ্গা তালের ডোঙ্গা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙ্গিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকা-কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব।

এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আট-দশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময় পথের ধারে সেকরাদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, একটা পয়সা কেউ তোরা দিসনে। দেখছিস নে, ওর নিজের গরজটাই বেশি। জুতো পায়ে মস্মসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলেও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস! তা ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইস্টিশান যাওয়া কি আটকে ছিল?

কে আর-একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুয্যেমশায় বলছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোশামোদ করে দুটো বাবু বাবু করতে পারলেই ব্যস।—তখন হইতে সারা সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, সে ভাঙ্গনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি তার কি হল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, দেবে না বলে কি হবে না রে? তোর দাদামশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েচিস—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজে দিতে পারিস।

রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিচ্ছু করতে নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভাল করলে গরজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ; ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল্ ত বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস্ রমেশ, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু থামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ

করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস নে বাবা, এরা তোর রাগ-অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ মা?—হ্যাঁ রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস নে?—না মা, সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জন মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা! রমেশদা—

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না জ্যাঠাইমা! সেদিন কোন গতিকে ওঁর মাসির হাতে প্রাণে বেঁচেছ; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, যাসনে রমেশ, কথা শুনে যা।

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা; যারা অহঙ্কারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি ব'লো না, বলিয়া তাহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসিকে শিখিয়ে দিই, না তার জন্য আমি দায়ী?

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, শিখিয়ে যে দাও না এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বৈ কি মা!

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী? কখ্খনো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে দোষ দিয়ে অপমান করে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে ত ভেতরের কথা জানতে পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েচি, তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস; সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ করে নিলে, তখন ও কারো কথায় কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই; সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল যদি না সেদিন গড়পুকুরের—

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আজ একটা কথা বলি মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে

ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলচি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ বাড়ি যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

নয়

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল—এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে পড়িল, দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! নগরের সজীব-চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই-সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র?

কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই-সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে। অথচ সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া শহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই।

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগার-বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেচে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশাই? গ্রামে কি আর লোক নেই?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু! কিন্তু কর্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না; তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোকে ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয় বাছা! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এখন মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছ! ঘরে ঘটিটা-বাটিটাও কি নেই বাপু?

কামিনীর মা জাতিতে সদ্গোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বেস না হয় বাপু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলেও কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি! চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছ মাস

ধরে আমার যথাসর্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েচি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে!

রমেশ এই ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয় মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাস কাল তাহার সর্বস্ব নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহারও কিছু নাই। সেজন্যে ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাকবে?

সরকার হাসিয়া কহিল, উপায় কি বাবু? অশাস্তর কাজ ত আর হতে পারে না। আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারিটি হালদারমশাই দিয়েচেন। কিন্তু যেমন করেই হোক ন'সিকের কমে ত হবে না! তাই, বাবু যদি—

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্চি। তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ-গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি?

সরকার কহিল, দু-তিন ঘর আছে, বেশি নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু, শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে দ্বারিক

চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু-ঘরই বছর-পাঁচেক আগে শেষ হয়ে গেল। গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুললেন।

তারপরে?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু-ঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা। অসময়ে বামুনের যা করলে এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা! মরি এখানে সেও ঢের ভালো কিন্তু এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

দশ

মাস-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধ-পুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে?

রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ কহিল, আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেননি।

এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। যেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

সঙ্গে চাকর আছে ত?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখাচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বোধ করি একটু ইতস্ততঃ

করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গেই আসুন; বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেননা, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল। একি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল; তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ বহুদিন-রুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোনমতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না।

আধঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল, রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে

পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তাই আজিকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে মাধুর্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিতান্ত সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এই জন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তাদের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজের কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে! আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না!

এই আহার্যের স্বল্পতার ত্রুটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়েও কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অর্ধনিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যাঁর বাড়ি তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি করে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিল, তিনি বলচেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ ত, তেমন সময় নাই এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর কই? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত!

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, যা জোটে তাই খাই। আমার খেতে বসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আলস্য।

কিন্তু পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু যাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানিনে রমা। কেননা, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েচেন।

রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয়নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও হয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না। মন্দিরের মধ্যে কি আছে না-আছে, তা না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে বসে গণ্ডুষ করাটাও কি ভুলে যাচ্ছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু এ কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশি কিনা, তাই জিজ্ঞেসা করচি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না। তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না। বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি মরবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশিদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হলেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও ত সে

কথা খাটে না! আপনাকে জোর করে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্ভতা; কিন্তু সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হবে, তখন আমার এই কথাটি স্মরণ করবেন।

প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—আমি তোমাকে স্মরণ করেই বলচি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্চে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয় পরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা বসে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশি দিন লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোনও উত্তর করিল না।

রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না, এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইরে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এগার

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্নবেলায় একটু ধরন করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি?

চাষীরা কহিল, এক শ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। এক শ' বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তর ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু-শ' টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন; বোধ করি

এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন্ বাঁধটা?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর ক'টা আছে বড়দা? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিন শ' টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব, তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব সে ত বুঝতে পারিনে!

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে ত আমি বুঝতে পারিনে!

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দরোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরাজুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু-শ' টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিল, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি?

যেন ভারি হাসির কথা! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরা উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল,—আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিল, বেশ, গিয়ে দেখ গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি ত ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বল খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল, তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল, না, অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা? তোমার অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্চি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিও না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, নাহয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই নাহয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি! চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে; কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে একথা বলতে পারেননি; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেধেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব, তাও এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা কর গে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন?

রমা কহিল, কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জলকাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস, রমা?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি।

দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব-দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙ্গা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা, তুমি একবার বল না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বলিল, সাবাস! হাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানী চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই, সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ্' করে বসে পড়ল, বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এতবড় লাঠিয়াল, একথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্রান, তিন বাপ-বেটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্ঝে দেখ্ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক' সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মারচে, ওদের মুণ্ড ক'টা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে—

তাহারা তিন বাপ-বেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখ্লি জানতি পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা, তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, নাহয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। এমন সুবিধে যে কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, দিদিঠাক্রান, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না? দিদিঠাক্রান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাক্রান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার

বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল; ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বার

ছেলেবেলায় একদিন রমেশ রমাকে ভালবাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষী ভালবাসা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যে কত গভীর সেদিন তারকেশ্বরে ইহা সে প্রথম অনুভব করিয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়াছিল যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সম্বন্ধ সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার দিন হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মহামরুর ন্যায় শূন্য ধূ-ধূ করিতেছিল। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা, এমন কি, চিন্তা-অধ্যয়ন পর্যন্ত এমন বিস্বাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করে নাই। তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ এবং সর্বব্যাপী অনাত্মীয়তায় প্রাণ যখন তাহার একমুহূর্ত আর গ্রামের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারি। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টারমহাশয়রা কোনমতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনিনি! তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এস, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি ক'রে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিঁদুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না; কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই

হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল।

ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দুপ্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রতিহাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচারফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা-দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমন কি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ-বিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি-সংস্থাপনে প্রযত্ন করাও পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখায়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য।

ইহাদের ভাল কোনদিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই।

নানা কারণে অনেকদিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যুষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালেই যে রে?

রমেশ কহিল, অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করচি।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, শুনেচি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আর পড়াতে যাস্নে কেন বল্ ত?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেচি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অভিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশি, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকার মঙ্গল হবে, আমি সেইখানেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েচে চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্, তা হলে

ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ দ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল বলে মানিনে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সাংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যেতে। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে! দেখতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেচে। তবু ত হিন্দুর হুঁশ হয় না!

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁশ হচ্ছে না রমেশ! যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে,

এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হলে হয়ত আমার হুঁশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে সে কথা মানি; কিন্তু তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওয়া-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

রমেশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা !

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা। কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে, অমুক গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও না হয় পণ্ডিতের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তারা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চলবে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সেজন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙ্গালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে।

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, তুই বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পিরপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত

পাপ-পুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ফলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস নে বাবা! যেজন্যে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না, সেই জাতের ছোট-বড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ, কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস, এদিক-ওদিক দুদিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না যদি যাচাই করতে চাস রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস—আপনি টের পাবি!

কলিকাতার অতি নিকটবর্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাসনে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল, দূরে সরে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী এই সুরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন, না রমেশ, সে কিছুতেই হতে পারবে না! যদি এসেচিস, যদি কাজ শুরু করেচিস, মাঝপথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়!

জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখতে পাসনে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর তর্ক করিল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল রমার ছোট ভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্তভাবে ডাকিতেছে, ছোড়দা।

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকচ যতীন?

আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি? তিনি কি কিছু বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়িতে এসেচি—বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনের মধ্যে যে-সকল সঙ্কল্প আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল—সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা দিন।

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙ্গে দিয়েছ রমা!

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারুর ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্যকথা বলব! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না একেবারে মরে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয়ত কোনদিনই একথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না, বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় কহিল,

আজ নাকি আর কোন-পক্ষেরই লেশমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জান?

রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, কিন্তু শুনে রাগ ক'রো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে ক'রো, এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র।

রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি; ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপর যেদিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার মনে পড়ে।

কথাগুলো জ্বলন্ত সীসার মত রমার দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল এবং একান্ত অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রমা রমেশের বিষাক্ত-মধুর কথাগুলো একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ কহিতে লাগিল, তুমি ভাবচ, তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, তখনো চুপ করে ছিলাম। কিন্তু সে চুপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হচ্চে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই! যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানিনে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তার পরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি, বাইরে এত গোলমাল কিসের?

বাবু—

গোপাল সরকারের ত্রস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

কেন?

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল; কোনমতে কহিল, পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর একমুহূর্ত থেক না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও; পুলিশ খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।

রমা নীলবর্ণ-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কোন ভয় নেই ত?

রমেশ কহিল, বলতে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল, ছি,—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগ্গির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাইবোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তের

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন খানাতল্লাশিতে রমেশের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই।

বেণী আসিয়া কহিল, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায়! সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে, আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দুকথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস বোন,—আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে।

রমা এমনি ম্লান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না, না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয় তাতেই বা কি! জমিদারি করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে ত সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চাল চালল না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোছলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারি থাকা না-থাকা সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখচি।

জমিদারির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন মতভেদ পর্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল, রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়!

বেণীর নিজেরও এ সম্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে জব্দ হলেই ও খুশি। দেখচ না এসে পর্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা রব উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আর আমরা দু-ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশি দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শুনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেছেন?

বেণী কহিল, ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কথাই উঠবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না।খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুনচি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ-ছটা গ্রামে স্কুল করবার, রাস্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্ছে। আজকাল

ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করচে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা-দুটো ইস্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি।

রমেশ প্রচার করে দিয়েচে, যেখানে নূতন স্কুল হবে, সেইখানেই ও দু-শ' করে টাকা দেবে। ওর দাদামশায়ের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানেরা ত ওকে একটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক ক'রে বসে আছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি এবার ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি করে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল করে দেখব! আরও একটা ফন্দি আছে, দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে! তার পর দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত, তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই তুমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা আমিও মনে করিনি।

রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হওয়ার বার্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা না থাকুক, কিন্তু জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু

বিস্ময়াপন্ন হইয়াই বেণী রান্নাঘরে যাইয়া মাসির সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?

বেণী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রমা কহিল, আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি-ছি করবে।

বেণী জবাব দিল, যে যেমন কাজ করবে সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?

রমা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, রমেশদা সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্বস্ব দিচ্চেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে।

বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল ত বোন?

রমা এই লোকটার সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল, গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই; তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে, কিন্তু ভগবান ত আছেন! নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিল, হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে! শীতলাঠাকুরের ঘরটা পড়ে যাচ্ছে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে, বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই।

শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে মোচলমানদের ইস্কুল করে দেওয়া। তা ছাড়া বামুনের ছেলে—সন্ধ্যে-আহ্নিক কিছু করে না। শুনি মোচলমানের হাতে জল পর্যন্ত খায়। দুপাতা ইংরাজী পড়ে আর কি তার জাতজন্ম আছে দিদি—কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে। সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।

রমা আর বাদানুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু রমেশের অনাচার এবং ঠাকুর-দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ যেন সে স্বস্তিবোধ করিল।

চৌদ্দ

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাঙ্গলার পল্লীজননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর মাসের পর মাস মানুষকে এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে; কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে এ-সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্‌যম ব্যয় করিতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কারণ,

তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল—এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল-নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনিই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু!

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভৈরব আচার্য ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল, বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল, দোরগোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছু যেন ঠাহর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি অল্পতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে স্মরণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতবড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই—ভৈরবের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে

পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগার-শ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুটা ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্যদিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে; অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই।

মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া এই মহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে! সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে, অথচ সমস্তই যে বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাজ তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই এবং এই অত্যাচারের যত বড় দুর্গতি ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের সকলেই চুপি চুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না, কারণ তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হোক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসঙ্কোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া পায়

এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়াও সত্যধর্মবিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছাচারে বাস করে।

আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথাগুলো বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন সেই যে তিনি মর্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদের জাতবিচারের ভাল-মন্দ ঝগড়াঝাঁটি; বাবা, শুধু আলো-জ্বেলে দে রে, শুধু আলো জ্বেলে দে! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি ফিরেই এসেছিস বাবা, তবে চলে আর যাসনে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস বলেই তোদের পল্লীজননীর এই দুর্দশা। সত্যই ত! সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না।

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, হায় রে, এই আমাদের গর্বের ধন—বাঙলার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী-সমাজ! একদিন হয়ত যখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুষ্টের শাসন করিয়া আশ্রিত নরনারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া চলিবারও ইহার শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ ইহা মৃত; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার-বিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া এমন দিনের পর দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বস্তু আর্তকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পথেই টানিয়া নামাইতেছে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল করে জেনে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন এবং যেমন করে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে আসবেন। এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।

চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাশা করিতেছে না তা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চেঁচাইয়া, আশীর্বাদ করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল বেণী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চিরশত্রুকে হাতে পাইবার জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা কাহারও কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্বল ভৈরবের পরিবর্তে ভগবান তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুষ্কৃতির গুরুভার তুলিয়া দিলেন যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তারপর মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনই উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপজোপ করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগামীকালই যে ভৈরবের মকদ্দমা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল রোশনচৌকির সানায়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া

রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না ।

শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কি না সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয়, তাহার স্মরণ হইল, এতবড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসে নাই! ব্যাপার কি? কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারের সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্যবাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া এঁটো কলাপাত লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রোশনচৌকি-ওয়ালারা আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাদ্যভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল উঠানে শতছিদ্রযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সম্বল পাঁচ-ছয়টা কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখুয্যে ও ঘোষালবাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জ্বালানো হইয়াছে। তাহারা অল্প-আলোক এবং অপর্যাপ্ত ধূম উদ্গিরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশি লোক আর ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাষার ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন এক মুহূর্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই

বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দদা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল, বাবা রমেশ!

ফিরিয়া দেখিল দীনু হন হন করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, চল বাবা, বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমাদের সকলকেরই ঘর করতে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাত দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাত-টাত তেমন ত কিছু মানতে চাও না—তাইতেই বুঝলে না বাবা—দুদিন পরে, ওর ছোটমেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, বুঝেচি।

রমেশের বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুশি হইয়া কহিলেন, বুঝবে বৈ কি বাবা, তোমরা ত আর অবুঝ নও। ও ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দিই কি করে—আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—

আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক কথা; বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোকে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর

বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহার সবচেয়ে বেশি বাজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সমাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে আহ্বান পর্যন্ত করে নাই, তাহার এই কাজটাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

হা ভগবান! সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

পনর

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিয়াছে অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিসমিস হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন একমুহূর্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরি দমন করিতে যে মিথ্যা ঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কল্যকার অপমানকেও বহু ঊর্ধ্বে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্মসংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি কোথাও যাচ্চেন?

আসচি, বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল । ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্যগৃহিণী সন্ধ্যাদীপ-হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চমূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সুমুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। যে কখনও আসে না, আজ কেন আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল, আচায্যিমশাই কৈ?

গৃহিণী অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বুঝা গেল তিনি ঘরে নাই । রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না । সন্ধ্যার

অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যাইতেছিল না । এমন সময়ে ভৈরবের বড়মেয়ে লক্ষ্মী ছেলেকোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না ।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, বাবা, কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না ।

কে রে? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতেও সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিল না।

রমেশ কঠোরস্বরে ডাকিল—নেমে আসুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল, কেন এমন কাজ করলেন?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, মেরে ফেলল রে লক্ষ্মী, বেণীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল ।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া কহিল, চুপ! বলুন, কেন এ কাজ করলেন?

ভৈরব উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাশা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোধান্ধ রমেশ সেদিকে লক্ষ্যই করিল না। শতচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে

লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ির লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিল, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বড়বাবু—বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না, চোখের নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল, পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, হয়েচে—এবার ছেড়ে দাও ।

রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কেন?

রমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই!

রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রতি তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটার এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙ্গুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করো।

ভৈরব দুই-হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়ভাবে বেণীর মুখপানে চাহিল। রমা তখনও যায় নাই। বেণীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিয়ে হৈ-চৈ করতে হবে?

বেণী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কি রমা!

ভৈরবের বড় মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা ফণিনীর মত একেবারে গর্জাইয়া উঠিল, তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

তাহার গর্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়—তা নাহয় নাই হইল; কিন্তু তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের ঝাঁজ আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে সে পরমুহূর্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাত লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা ক'রো না; কিন্তু আমি কারও হয়েই কোনও কথা বলিনি, ভালর জন্যেই বলেছিলাম।

লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ঝগড়ায় অপটু নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল, বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিত।

বেণী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, তুই থাম না লক্ষ্মী! কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী কহিল, কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি মারা যেতেন?

রমা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।

লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিল, ওঃ, তাইতেই বুঝি তুমি মরেচ রমাদিদি?

রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা? বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখিতে লাগিল।

বেণী ক্ষুব্ধভাবে বলিল, কি করে জানব বোন! লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

এই ঘটনার কার্য-কারণ যত বড় এবং যাই হোক, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সঙ্কুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটীর বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণে ক্ষণে যেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল। তাই তাহার গ্লানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির আনন্দ ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জন গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই !

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। আজ বৈকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্বে

করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোটবাবুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই একফোঁটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে । দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।

এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়া ছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই-সকল দুর্ভাগাদের মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই-একটা কাজ করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই-সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় এবং কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু বজ্জাতিবুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা

অধোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্য-চর্চার শখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার; অথচ নানা বয়সের বিধবায় প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই নৈতিক স্বাস্থ্যও অতিশয় দূষিত। সমাজ ইহাদিগের আছে—তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃস্ব যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পিরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে পঞ্চায়েত আহ্বান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ঝাপসা ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও যাই-যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল, কি চাও?

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?

রমেশ চমকিয়া উঠিল—এ কি রমা? এমন সময় যে!

যে হেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যেজন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্ছে।

তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি করে?

তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে, যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকার মশাইকে বলে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম দেখবো।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে? কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি?

রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ়কণ্ঠের এই অভাবনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কি ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেচ! সে-সব কাণ্ড এত পুরানো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজী হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না।

কতবড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্যগোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল, এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে দুদিন পরে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা স্মরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্ত থাকিতে পারিল না। কহিল, তার পরে?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে? না তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট ক'রো না; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে যেখানে যে-কোন অবস্থায় হোক রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটূক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজের গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই-হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নির্বন্ধতায় অখণ্ড স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল।

রমেশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ, আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনই বার হতে হবে।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, আজ কি কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না?

না। তোমার দাসী গেল কোথায়?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে? একজন দাসী পর্যন্ত সঙ্গে করে আনোনি!

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না!

তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পারত। রাত্রি কম হয়নি রাণী!

সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! রমা সহসা বলিতে গেল, দুর্নামের বাকী নেই রমেশদা, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল, তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা। অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পারব, বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ষোল

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত। এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভুষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজসরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখুয্যেবাড়ির মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অন্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ইস্! এত আহার্য-পেয় নষ্ট করে দিচ্চে দেশের ছোটলোকের দল? এত বড় স্পর্ধা! বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—বেটাদের শেখাবো¬—চাল কেটে তুলে দেবো—এমন করবো, তেমন করবো, ইত্যাদি। গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কোন্ শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে! হিন্দু-মুসলমান একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য! এদিকে অন্দরে মাসি ত একেবারে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপার। এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে

নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কণামাত্রও এখন পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। একি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না¬—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

রোগে রূপ নষ্ট করে —সে যাক্। কিন্তু সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই, সে জিদ নাই। ম্লান চোখ-দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চৌদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একটুখানি হাসিল। বোঁটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক কি নিরর্থক তাহাই বা কে জানে!

বেণী রাগিয়া কহিল, না না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্বনেশে কথা। একবার যখন জানব এর মূলে কে,—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল, তখন এই এমনি করে ছিঁড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিস নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্ সেই রমেশ নিজে যে জেলে ঘানি টানচে! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?

রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়-মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়

নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব কি করিয়া পূর্বাহ্ণেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেকপ্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়াছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে! তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা, একটা তৃণ পর্যন্ত ছিল না। সে আদালতে ও-কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না! কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাঢ় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেককেই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া এতবড় গুরুদণ্ডের কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দু শ’-এক শ’ জরিমানা হইবে ইহাই জানিত। বরঞ্চ বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা

মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।

ভালই ত। তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার ঋণ শোধ করিল এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিতে পারিল না তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য! তাহার সেই দুর্জয় অভিমান বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না। সে কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই, এ কৈফিয়ত তাহার অন্তর্যামী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই।

সত্য-গোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবারও জানিতে পারিত! রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মনে পড়ে ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জনা করিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য করিয়া কে কবে তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল। যে সমাজের ভয়ে সে এতবড় গর্হিত কর্ম

করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রূর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেণীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে এবং সেই বেণীই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক শৃঙ্খল সর্বাঙ্গে শতপাকে জড়াইয়া রাখাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিঁদুয়ানী! কিন্তু যে ভৈরব এত অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিল না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে একঘরে হইতে হইবে এবং বাড়িসুদ্ধ লোকের জাত যাইবে। এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বেণীর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী গরম হইয়া কহিল, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে!

সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ত আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেল; ইহারই সর্বস্ব যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখনই এই সনাতন দুবেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি কেন বল্ ত রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুকের পাটা! যা করবার সে ত আপনারা আমার করেচেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুনবাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি, বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুন, পিরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা ঐ মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে, বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন কহিতে লাগিল, ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যে বলচি নে বড়বাবু, একটু সামলে-সুমলে থাকবেন। রাত-বিরেতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে বলা যায় না ত!

বেণী কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না! তাহার মত ভীত লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহার্দ্র-করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব এত রাগ?

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথ্যে বলে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুন, তাই বটে! মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে। শুনি মসজিদে তাঁর নাম করে নাকি নেমাজপড়া পর্যন্ত হয়।

রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আর ক'টা দিন বা বাঁচব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এ কাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না! সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু, সে দিনকাল আর নেই! ছোটবাবু সব উল্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা হলে রাখবি নে বল্?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পিরপুরের নতুন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা ক'রে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দিদিঠাকরুন, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল, বিশেষ করে ছোঁড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়িতে। তারা ত চারিদিকে স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে, জমিদার ত ছোটবাবু। আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা, তারাও তাই।

বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন বলতে পারিস্?

সনাতন কহিল, রাগ ক'রো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকী নেই।

বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—তাহার বুকের ভিতর টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছিল।

গোবিন্দ কহিল, তা হলে জাফরের বাড়িতেই আড্ডা বল্‌? সেখানে তারা কি করে বলতে পারিস্‌?

সনাতন তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল, কি করে জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে মতলব ক'রো না ঠাকুর ! তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়া চক্মকি ঠুকে আগুন জ্বালতে যেও না ঠাকুর!

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল, ব্যাপার শুনলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না । হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ-সব কিছু হ'ত না। তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে ক্রোধে জ্বালায়

মুখখানা কি-একরকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না

দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা-দুই আলো এবং পাঁচ-ছয়জন লোক সঙ্গে করিয়া আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে প্রস্থান করিল।

সতর

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস মা রমা?

রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী তার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনমাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জুড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না কিসের অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরা অহর্নিশি পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। শুধু বিশ্বেশ্বরীর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না; তাই সে অত্যন্ত স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন রমার চোখ-দুটি গভীর কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহুদূরের কিছু-একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা?

কেন জ্যাঠাইমা?

আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েছে?

অসুখ করেচে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে ত এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে এ সময় মায়ের কাছে লুকোস নে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা?

জানালার বাইরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদুমন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথায় ঘা সারতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে, বলিয়া তিনি রমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি, কি আনন্দ বেশি পেয়েচি তা আমি বলতে পারিনে। কেননা, আমি জানি যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তা হলে সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়-বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে ত খামকা মেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক করে তবে তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের একঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে বলে গেছে এর পরেও বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটলোকদের এত সাহস ত কোনদিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলে?

বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে কি তুই নিজে জানিস নে মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন করে ভরে দিয়ে গেছে? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা! তাকে জোর করে নেবালেও সে আশেপাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুশি সেখানে থাক, বেণীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। কিন্তু বলা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, তাহা রমা টের পাইল। তাই তাঁহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন, রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পালকিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্যন্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি মা যে এক সন্তান বলে ধর্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি হয়, তবে রমেশদা কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন? আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, না মা, তা নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—, বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি জানিস মা, কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি ক'রে করে, তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারল না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটছে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বলতে এসেছিল, জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এদের ভাল করে, আমি যেখান থেকে চলে এসেছি সেইখানেই চলে যাই। তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না রমেশ, কাজ যদি শুরু করেছিস বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাস নে।

আমার কথা সে ত কখনও ঠেলতে পারে না; তাই যেদিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সেদিন মনে হ'ল ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু তার পরে বেণীকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদিন প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে-মন্দতে এক না

হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু সে ত আমার চোখে পড়ল না মা; আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন, না রমা, অনুতাপ আমি সেজন্য করিনে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিস নে মা, এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অধর্ম যত বড়ই হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড়-গলা করেই বলে যাচ্ছি।

রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ করতে হোক, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, করবে বৈ কি মা। নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি উলটে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতায় দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই বলচিস মা, কিন্তু তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেমনটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াত, ভৈরব তার সেই ডান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।

তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন, কিন্তু কে জানে! হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙ্গা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে, বলিয়া তিনি গভীর একটা নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানর শাস্তি কি?

বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার করেচে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা! বলিয়া তিনি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার একটিমাত্র আশ্বাসেই রমার রুদ্ধ অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু। তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা।

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। যে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একদিন তাঁর মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে যেন তাহার মুখোশ ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আর তাঁহার অগোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়া ছিল, বিশ্বেশ্বরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহার মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পিরপুরের জাফর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথামত সৎ আলোচনাই করত, বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল—আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিয়েছি। কারণ পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষা রাখত না।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেণী মিছে করে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চুম্বন করিলেন। বলিলেন, তার মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি, এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাইমা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ’য়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের চাষাভুষারা এবার ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেচে—তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা !

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটা জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটা দাবি তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েচি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল মা আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুল্লেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলেপুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি ক'রেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

আঠার

কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, বোধ করি উন্মত্ত বিকারেও ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে উভয়-বিদ্যালয়ের মাস্টার পণ্ডিত ও ছাত্রের দল, কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল, রমেশ ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু মুখুয্যের মেয়ে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত করে এমন শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছটা মাস আমি যে তূষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাস্টার পাড়ুইমহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। তাঁহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না।অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস নে ভাই, বাড়ি চল্। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল; রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিল। ঘা

শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। বেণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উলটাইয়া কহিল, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্মফল—আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু সে আর শুনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেণী যেজন্য এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা নিঃশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্‌মগত দোষ যে কিছুতেই মনে এক মুখে আর করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়, কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের দোষের মধ্যে সেদিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্বনাশ আমাদের করলি! জেল হয়েছে শুনলে যে মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জন করবেন! আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—যা করি, কিন্তু তবু ত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মার্লি, মাকে মার্লি! কিন্তু নির্দোষীর ভগবান আছেন। বলিয়া সে গাড়ির বাইরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, রমেশ, রমার সে উগ্রমূর্তি মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি?

পারলে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দর্প সহ্য হ'ল না রমেশ! আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!

এতক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না। কিন্ত ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসির মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তার অভ্যাস আছে ত। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি, বরঞ্চ তুমিই উলটে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমাকে দেখচ ত? এই ক্ষীণজীবী—বলিয়া বেণী একটু চিন্তা করিয়া লইয়া তুষ্টু কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষায় ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পর?

বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তার পরে কি আর মনে আছে ভাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে, কিছুই জানিনে। দশ দিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বজ্র-কঠিন মুঠায় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবারও কাহারও সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সংসারে

কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উবিয়া গেল। তাহার অবর্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা সামাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে; তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু এই কয়টা মাসের মধ্যেই এতবড় পরিবর্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহার অনুকূলতায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ সে যেমন দেখিতে পাইল এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয় রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্মাহত, সে কথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত সহানুভূতি লাভ করিয়া এবং বেণীকে সপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে যে-সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সঙ্কল্প করিয়া রমেশ কিছু দিনের জন্য, নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া দিয়া সর্বত্র ছোট-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্বপ্রযত্নে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তাহা রমার

প্রসঙ্গ। সে পীড়িত তাহা পথে শুনিয়াছিল; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই।

তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে তাহার সমস্ত দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পিরপুরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেণী বাহিরে যাই বলুক, সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না; উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক, আপাততঃ বে-দখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে জিদ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য হইয়া অস্বীকার করিতেই বেণী বহু প্রকারের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেয়াৎ করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন্ কম ছিল ভাই!

কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না—বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল; তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না! রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী কাজ হইতেছে জানিলে ধৈর্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্বেও জানিত, কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সমভিব্যাহারে যেদিন সে-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সজলকণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি যেন একটা তাহাতে ছিল, যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল বিশ্বেশ্বরী কাশী-বাস সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না; শুনিয়া সে চমকিয়া গেল।

কৈ সে ত কিছুই জানে না! নানা কাজে পাঁচ-ছদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু যেদিন হইয়াছিল সেদিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই! যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সেদিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন নটা-দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখুয্যেবাড়ি গেছেন।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময় যে?

এ দাসীটি বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তা ছাড়া, আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কিনা ।

যতীনের উপনয়ন?

রমেশ আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ এ কথা ত কেউ জানে না?

দাসী কহিল, তাঁরা কাউকে বলেন নি। বললেও ত কেউ গিয়ে খাবে না—রমাদিদিকে কর্তারা সব একঘরে করে রেখেছেন কিনা।

রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল, কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি সব বিশ্রী অখ্যাতি বেরিয়েচে কিনা—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু ক্রোধ কি জন্য এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদর্য ধারায় রমার অখ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ-সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।

উনিশ

সেইদিন অপরাহ্নে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু?

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম? আর হাকিম হুজুর যা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই ত হয়ে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। তখন ত মানব না বললে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দুজনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারব; কিন্তু আদালতে সেটি হবে না। ত ছাড়া গাঁটের কড়ি মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু। এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাহাঁটি করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা হুকুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী হয়ে আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।

একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর ভবিষ্যতেও সে কখনো এত বড় আশা মনে ঠাঁই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা

ইহারা পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু আজ যে ইহারা সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিও বেশি কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা, কিন্তু এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি না করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কূল-কিনারা রহিল না। বাহিরে বসন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেদিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত।

কিন্তু আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা, কোথাও সে একবিন্দু উত্তাপের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।—কে গা?

আমি রাধা, ছোটবাবু! রমাদিদি অতি অবিশ্যি করে একবার দেখা দিতে বলচেন।

রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছেন!

দাসী কহিল, একবার দয়া করে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি?

ঘরে শুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল ত আর সময় হয়ে উঠবে না; তাই এখন যদি একবার—

আচ্ছা চল যাই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই সে শুদ্ধমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিট্‌মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল; তাহারই মৃদু-আলোকে রমেশ অস্পষ্ট আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছু জানিতে পারিল না। এইমাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে রকম সঙ্কল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাক্বেন।

রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ, তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক, সে ধ'রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়াও ধীরে ধীরে কহিল, এখন আমি ভাল আছি।

তার পরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় শেলাঘাত করিল তা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌন-নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ

দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেচি, সে ত আমি জানি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই জানতাম, তুমি আসবে আর আমার এই শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।

অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টের পাইল এবং চক্ষের নিমেষে তাহার পূর্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মরে নাই, শুধু নির্জীব অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমার অনুরোধ ?

রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্চেন, সেটা আমার নিজের, অর্থাৎ আমার পোনর আনা, তোমাদের এক আনা; সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ পুনর্বার উষ্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার ভয় নেই আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে—আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখুয্যেদের দান গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্য নেবে না সে-ও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই জরিমানা বলে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমায় দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা কহিল, আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত করে মানুষ ক'রো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল! রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যতীনের দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে শেখালে হয় ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখ, এ-সকলের মধ্যে আর আমাকে টেন না। আমি অনেক দুঃখকষ্টের পর একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেছি; তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধাবিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্চে; আগে হলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না— এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্বাদ করে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন ঝগড়া ক'রো না।

রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে?

রমা কহিল, মানে যদি কখনও শুনতে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে ক'রো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সহ্য করে চ'লে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে; তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেচি—এটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না মনে করে দুঃখ ক'রো না রমেশদা। আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ যা কঠিন বলে মনে হ'চ্চে একদিন তাই

সোজা হয়ে যাবে, সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কাল আমি যাচ্চি।

কাল! রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানে যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি ত আর ফিরে আসবেন না শুনচি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্চি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা যাও। কিন্তু কেন বিদায় চাইচ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারার যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

রমার দুই চোখ বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পালকিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে

মুখ লইয়া অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা! তাতে কাজ নেই। তার পরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলেপুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ ক'রে যেতে চাইনে, শুধু এই

কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস সব মিথ্যে, যা জেনেচিস সব ভুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ অনুরোধ। এইজন্যই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেচে রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

গতরাত্রে রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা, তাই হবে। বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বামুনের মেয়ে

এক

ক

পাড়া-বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন! সঙ্গে দশ-বারো বৎসরের নাতিনীটি আগে আগে চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত পল্লীপথের এধারে বাঁধা একটি ছাগশিশু ওধারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি নাতিনীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওলো ছুড়ী, দড়িটা ডিঙুস্নি, ডিঙুলি? হারামজাদী, সগ্গপানে চেয়ে পথ হাঁটচ। চোখে দেখতে পাও না যে ছাগল বাঁধা রয়েচে!

নাতিনী কহিল, ছাগল ঘুমোচ্চে ঠাকুমা।

ঘুমোচ্চে! আর দোষ নেই? এই শনি-মঙ্গলবারে কিনা তুই দড়িটা স্বচ্ছন্দে ডিঙিয়ে গেলি?

তাকে কি হয় ঠাকুমা?

কি হয়? পোড়ারমুখী বামুনের ঘরের ন'-দশ বছরের বুড়োধাড়ী মেয়ে এটা শেখোনি যে, ছাগলদড়ি ডিঙোতে মাড়াতে নেই—কিছুতে নেই! আবার বলে কিনা, কি হয়! না বাপু, ব্যাটাবেটীদের ছাগল-পোষার জ্বালায় মানুষের পথেঘাটে চলা দায় হ'লো। অ্যাঁ! এই মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা যে দড়িটা ডিঙিয়ে ফেললে—কেন? কিসের জন্যে পথের ওপর ছাগল বাঁধা? বলি তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে নেই? তাদের কি একটা ভালোমন্দ হতে জানে না?

অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়িল বারো-তেরো বছরের একটি দুলেদের মেয়ের প্রতি। সে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহার ছাগশিশুটিকে সরাইবার জন্য আসিতেছিল। তখন অনুপস্থিতকে ছাড়িয়া তিনি উপস্থিতকে লইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে

কহিলেন, তুই কে লা? মরণ আর কি, একেবারে গা ঘেঁষে চলেছিস যে! চোখে-কানে দেখতে পাস্নে? বলি, মেয়েটার গায়ে তোর আঁচলটা ঠেকিয়ে দিলিনে ত?

দুলে মেয়েটি ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, না মাঠান, আমি ত হেথা দিয়ে যাচ্চি!

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, হেথা দিয়ে যাচ্চি! তোর হেথা দিয়ে যাবার দরকার কি লা? ছাগলটা বুঝি তোর? বলি কি জেতের মেয়ে তুই?

আমরা দুলে মাঠান।

দুলে! অ্যাঁ, এই অবেলায় মেয়েটাকে ছুঁয়ে দিয়ে তুই নাওয়ালি?

তাঁহার নাতিনী বলিয়া উঠিল, আমাকে ত ছোঁয়নি ঠাকুমা—

রাসমণি ধমক দিলেন, তুই থাম পোড়ারমুখী। আমি দেখলুম যেন দুলে-ছুড়ীর আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। যা—এই পড়ন্তবেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মর্ গে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি। না বাপু জাতজন্ম আর রইল না। ছোটলোকের বড় বাড়বাড়ন্ত হয়েচে, দেবতা-বামুন আর গেরাহ্যিই করে না! হারামজাদী দুলেপাড়া থেকে ছাগল বাঁধতে এসেচ বামুনপাড়ার মধ্যে?

দুলে মেয়েটির ভয় ও লজ্জার অবধি ছিল না। সে ছাগশিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, মাঠান আমি ছুঁইনি।

ছুঁস্নি যদি তবে এ-পাড়ায় এসেচিস কেন?

মেয়ে হাত তুলিয়া অদূরে কোন একটা অদৃশ্য গৃহ নির্দেশ করিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই তেনার ওই গইলের ধারে আমাদের থাকতে দিয়েচে। মাকে আর আমাকে দাদামশাই তেইড়ে দিয়েচে না!

যাহারাই হোক এবং যেজন্যই হোক, একজনের দুর্গতির ইতিহাসে রাসমণির ক্রুদ্ধ হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল এবং এর রুচিকর সংবাদ সবিস্তারে

আহরণ করিতে তিনি কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বটে? বলি, কবে তাড়িয়ে দিলে লো?

পরশু রাত্তিরে মাঠান।

ও তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি? তাই বল্। এককড়ে মরতে না মরতে বুড়ো তোদের বে'র করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আগুন! তা বাপু, দিলে বলেই কি তোরা বামুনপাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আস্পর্দা ত কম নয় লা! কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘরজামাই ঘরজামাইয়ের মত থাক্, তা না, শ্বশুরের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে ক্যাওরা এনে বসাবি।

এই বলিয়া রাসমণি হাঁক দিয়া ডাকিলেন, বলি সন্ধ্যা—ও সন্ধ্যা, ঘরে আছিস গা?

সামান্য একটুখানি পোড়ো জমির ওধারে রামতনু বাঁড়ুয্যের খিড়কি। তাঁহার ডাক শুনিয়া অদূরবর্তী খিড়কির দ্বার খুলিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের সুশ্রী মেয়ে মুখ বাহির করিয়া সাড়া দিল—কে ডাকে গা? ওমা, দিদিমা যে! কেন গা! বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া আসিল।

রাসমণি কহিলেন, তোর বাপের আক্কেলটা কি রকম শুনি বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাঁড়ুয্যে—একটা ডাকসাইটে কুলীন, তার ভিটেবাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগদী-দুলে! কি ঘেন্নার কথা মা!

এই বলিয়া গালে একবার হাত দিয়াই পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, তোর মাকে একবার ডাক। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে ত একটা জমিদার! একটা নামজাদা বড়লোক। সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে দিদিমা?

ডাক্ না একবার তোর মাকে। তাকে বলে যাচ্চি কি হয়েচে।

এই বলিয়া নাতিনীকে দেখাইয়া কহিলেন, এই যে মেয়েটা মঙ্গলবারের বারবেলায় ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, ওই যে দুলে ছুড়ী আঁচল ঘুরিয়ে বাছাকে ছুঁয়ে দিলে—

সন্ধ্যা দুলে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই ছুঁয়ে ফেলেচিস?

সে বেচারা তখনও ছাগশিশু বুকে করিয়া একধারে দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদ-কাঁদ গলায় অস্বীকার করিয়া বলিল, না দিদিঠান—রাসমণির নাতিনীটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, না সন্ধ্যাদিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ওই হোথা দিয়ে—

কিন্তু কথাটা তাহার পিতামহীর হুঙ্কারে ওই পর্যন্তই হইয়া রহিল।

ফের 'নেই' কচ্ছিস হারামজাদী? চল্, আগে বাড়ি চল্। ছুঁয়েচে কিনা সেখানে গিয়ে দেখাচ্চি।

সন্ধ্যা হাসিয়া কহিল, জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা?

তাহার হাসিতে রাসমণি জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, জোর করি, না করি, সে আমি বুঝব, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কিরকম? কোন্ ভদ্দরলোকটা ভিটেবাড়িতে ছোটজাত ঢোকায় শুনি? লোকে কথায় বলে, দুলে। সেই দুলে এনে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়েচে! বলি, ঘরজামাই ঘরজামাইয়ের মত থাকলেই ত ভাল হয়?

পিতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সেও কঠিন হইয়া জবাব দিল, বাবা ত আর পরের ভিটেয় ছোটজাত ঢোকাতে যাননি দিদিমা। ভাল বুঝেচেন নিজের জায়গায় আশ্রয় দিয়েচেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

আমার গায়ের জ্বালা কেন? কেন জ্বালা দেখবি তবে? যাব একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

তা বেশ ত, গিয়ে বল গে না। বাবা ত তাঁর জায়গায় দুলে বসান নি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন!

বটে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ওলো, সে আর কেউ নয়—গোলোক চাটুয্যে! তোর বাপ বুঝি এখনো তারে চেনেনি? আচ্ছা—

হাঙ্গামা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাসমণি অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকারে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, শোন্ জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্ধার কথাটা একবার শোন্। লেখাপড়া শেখাচ্চিস্ কিনা! বলে, বলিস তোর গোলোক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়! বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় হাড়ী-দুলে বসিয়েচি—কারো বাপ-ঠাকুদ্দার জায়গায় বসাই নি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পারে তা করুক। শোন্, তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্!

জগদ্ধাত্রী বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলেচিস এইসব কথা?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি তাহারই মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, বললি নে? এরা সবাই সাক্ষী নেই?

কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর অনির্বচনীয় কৌশলে উচ্চ সপ্তক হইতে একেবারে খাদের নিখাদে নামাইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, তাই বললুম, আহা, কে এমন করে পথের ওপর ছাগল বাঁধলে গা? তাই না শুনতে পেয়ে দুলি-ছুড়ীটা ছুটে এসে বাছার মুখের ওপর আঁচল ঘুরিয়ে মারলে! বলে ঠাকুরমশায়ের জায়গায় ছাগল বেঁধেচি, তুমি বলবার কে? তাই মা, তোমার মেয়েকে ডেকে শুধু এই কথাটি বলেচি, দিদি, এই যে অবেলায় মেয়েটার নাইতে হবে, বারবেলায় ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে ফেললে—তা তোমার বাবা যদি এদের দুলেপাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে ত দিদি, ছাগল-টাগলগুলো একটু দেখেশুনে বাঁধতে বলে দিস্—ছোটজেতের আচার-বিচারের জ্ঞানগম্যি ত

নেই—চাটুয্যেদাদা, বুড়োমানুষ, এই পথেই ত আসা-যাওয়া করে—মাড়ামাড়ি করে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা, এই। এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকী রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন্ গে! তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি! তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ী-দুলে প্রজা বসাব, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বল দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা?

জগদ্ধাত্রী অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, বলেছিস্ এইসব?

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাক-বিস্ময়ে রাসমণির মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া শুধু বলিল, না।

বলিস্ নি, তবে কি মাসী মিছে কথা কইচে?

বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্।

সন্ধ্যা মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, জানিনে মা, কার কথা মিছে। কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো-মাসীকেই যদি বেশী চিনে থাকো ত না হয় তাই।

এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্বেই খোলা দ্বার দিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। উভয়েই বিস্ফারিত-নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং অবসর বুঝিয়া দুলে-মেয়েটাও তাহার ছাগলছানা বুকে করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

রাসমণি বলিলেন, দেখলি ত জগো, তোর মেয়ের তেজ! শুনলি ত কথা! বলে, পাতানো মাসী! কুলীনের ঘরের মেয়ে, তাই। নইলে, বিয়ে হলে এ-বয়সে যে পাঁচ-ছ’ ছেলের মা হতে পারতো। পাতানো মাসী,—শুনলি ত!

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিলেন, এবং রাসমণি নিজেও একটু স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হাঁ জগো, শুনলুম নাকি অমর্ত চক্কোত্তির ছেলেটাকে তোরা আজও বাড়িতে ঢুকতে দিস্? বলি, কথাটা কি সত্যি?

জগদ্ধাত্রী মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

রাসমণি বলিতে লাগিলেন, আমি ত সেদিন পুলিনের মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করে ফেললুম। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ নয়। হরিহর বাঁড়ুয্যেমশায়ের নাতনী, রামতনু বাঁড়ুয্যের কন্যা! যারা শূদ্দূর বলে কায়েতের বাড়িতে পর্যন্ত পা ধোয় না! তারা দেবে ঐ মেলেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস কি?

এই হিতৈষিণীর দরদের কাছে লজ্জা পাইয়া জগদ্ধাত্রী শুধু একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ মাসী, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়ীমা বলতে অজ্ঞান, তাই, কালেভদ্রে যদি কখনো আসে ত মুখ ফুটে বলতে পারিনে, অরুণ, তুমি আর আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি প্রথমে অবাক্ হইলেন, পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, অমন মায়ার মুখে আগুন!

অকস্মাৎ সেই ক্রোধ অতি উচ্চ ধাপে চড়িয়া গেল এবং তাহারই সহিত কণ্ঠস্বরের সমতা রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা একটা জমিদার মানুষ,—তিনি নিজে স্বয়ং ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ, জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে বসো গে যাও। বিলেতে যেয়ো না। কিন্তু কথাটা কি ছোঁড়া শুনলে? অত বড় একটা মানী লোকের মান রাখলে? উলটে ছোঁড়া নাকি বিলেতে যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেতে গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলোক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁঠা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে, সমাজের মাথায় চড়ে, লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি

সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম। যে গোলোক চাটুয্যে—ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কিনা—

জগদ্ধাত্রী বিনীত-কণ্ঠে বলিতে গেলেন, কিন্তু অরুণ ত কখনো কারও নিন্দে করে না মাসী?

তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি? চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

না না, তিনি বলবেন কেন? তবে, লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

তোর এক কথা জগো। লোকের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই বা বিলেতে গিয়ে কোন্ দিগ্গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষার বিদ্যে! শুনে হেসে বাঁচিনে! চক্কোত্তিই হ, আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হালগরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙ্গল দিতে! মরণ আর কি!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্র সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে পাড়ার সমঝদার মধুমক্ষীর দল জুটিয়া যায়, এই ভয়ে জগদ্ধাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসী, একটু ভেতরে গিয়ে বসবে চল না?

না মা, বেলা গেল আর বসব না। মেয়েটাকেও ত আবার নাইয়ে-ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। দুলি ছুড়ীটা বুঝি পালিয়েচে?

হাঁ ঠাকুমা, তোমরা যখন কথা কচ্ছিলে। কিন্তু সে আমাকে ছোঁয়নি—

ফের 'নেই' কচ্চিস হারামজাদী। কিন্তু জগো, ব্যাগত্তা করি বাছা, পাড়ার ভেতর আর হাড়ী-দুলে ঢোকাস নি। জামাইকে বলিস্।

বলব বৈ কি মাসী, আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে ত আমাদের পুকুরঘাট সরবে, ওদের জল মাড়ামাড়ি করে আমাদেরই ত হাঁটতে হবে।

তবে, তাই বল্ না মা। তা হলে কি আর জাতজম্ম থাকবে? আমি ত সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়ে-ছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়! তাই ত চাটুয্যেদাদা সেদিন শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, রাসু, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্চে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।

জগদ্ধাত্রী ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কহিলেন, চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

বলবে না? সে হলো সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার। তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্। এই ত আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটা না জানি বল্? কারও বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামনি একটা অশাস্তর কাজ করেছে? এই যে মেয়েটা ছাগলদড়ি ডিঙোবা-মাত্তর শিউরে উঠে বললুম, ওলো ছুড়ী, করলি কি, আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা! কৈ কোন্ পণ্ডিত বলে যাক দিকি—না, এতে দোষ নেই! তা হবার জো নেই মা। তা হবার জো নেই। আমার বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষে পেয়েছিলুম। কিন্তু ডাক দিকি তোমার লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে কেমন বলতে পারে।

জগদ্ধাত্রী নিঃশব্দে ত্রুটি স্বীকার করিয়া কহিলেন, একটু বসলে হত না মাসী?

না মা, বেলা গেছে,—আর একদিন আসব। নে খেঁদী, বাড়ি চল্। এই বলিয়া নাতিনীকে অগ্রবর্তী করিয়া কয়েক পদ চলিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ জগো, অমন পাত্তরটি হাতছাড়া করলি কেন বল্ দেখি?

না হাতছাড়া ঠিক নয়, তবে কিনা ঘরবাড়ি কিছু নেই, বয়েস হয়েচে—তোমার জামায়ের যে মত হয় না বাছা।

রাসমণি বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, শোন কথা একবার! বলি, তার ঘর নেই, তোর ত আছে? তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা। এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতিস, সে কি অমন্দ হত বাছা? আর বয়েস? কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়েস কি আবার একটা বয়েস? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তুর। তার আবার বয়েসের খোঁজ কে করে জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়েসের দিকেও একবার তাকা দিকিনি! আরও গড়িমসি করবি ত বিয়ে দিবি কবে? শেষে কি তোর ছোটপিসীর মত চিরটাকাল থুবড়ো রাখবি?

জগদ্ধাত্রী সলজ্জভাবে কহিলেন, আমিও ত তাই বলি মাসী, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে দিবার ধৈর্যও রাসমণির রহিল না। জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘর-বাড়ি জমিদারি ছিল! হাসালি বাপু তোরা! তা ছাড়া ঐ অরুণদের বৈঠকে দিনরাত বসা-দাঁড়ানো গানবাজনা করা—শুনি হুঁকো পর্যন্ত নাকি চলে যাচ্চে—ও-কথা সে বলবে না ত কি চাটুয্যেদাদা বলবে? হদ্দ করলি জগো! কিন্তু তাও বলে দিচ্চি বাছা, ঘর-বর যখন মিলেচে, তখন, না না করে দেরি করে শেষকালে অতিলোভে তাঁতি নষ্ট করিস নে। তোর ছোটপিসী গোলাপী থুবড়ো হয়ে মলো, তোর বাপের বড়, মেজ—দুই পিসীর বিয়েই হলো না। আর তোমার কি সময়ে বিয়ে হত বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়ত? বেয়ান কাশীবাসিনী, কামড় কোমড় নেই, জামাই ইস্কুলে পড়চে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধাঁ করে তোদের দু'হাত এক করে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এলো। ভাঞ্চির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্যন্ত দিলে না। তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হতই কিনা তাই বা কে জানে! নে খেঁদি, চল্! জয়রাম মুখুয্যের নাতি—তার আবার ঘরবাড়ি, তার আবার বয়স, তার আবার

কালো□ধলো□কালে কালে কতই শুনব। নে, এগো বাছা, আর দেরি করিস নে। কাপড়-চোপড় কাচতে, সন্ধ্যা দিয়ে আহ্নিক-মালা সারতে আজ দেখচি এক পহর রাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাও বলি বাপু, খিস্টেন-ফিস্টেনকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়া, মেয়ের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে দেওয়া ভাল নয়। কথাটা ঢিঢি হয়ে গেলে মেয়ের পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা। নে না খেঁদি, চল্ না! পরের কথা পেলে তুই যে আর নড়তে চাসনে দেখি।

বকিতে বকিতে নাতিনীকে অগ্রবর্তী করিয়া রাসমণি প্রস্থান করিতেছিলেন, জগদ্ধাত্রী শঙ্কিত-বিরসমুখে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কহিলেন, ওমা খেঁদি, একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি নতুন মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটা কতক আর নাউয়ের একফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট্ করে এনে দিই—

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর দিকে যাইতেছিলেন, রাসমণি পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ও মা, বেগুন বুঝি এরি মধ্যে উঠলো? বলিয়াই কণ্ঠস্বর একমুহূর্তে খাটো করিয়া নাতিনীকে কহিলেন, ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে! ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে রইল, সঙ্গে সঙ্গে যা না! এবং পরক্ষণেই তাহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, ছুটে আসিস খেঁদি,—আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

খ

সম্মুখের একটা দাওয়ায় বসিয়া সন্ধ্যা নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণকাল কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকাল থেকে কি অত সেলাই হচ্চে সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে গেছে —নাওয়া-খাওয়া করবি নে? পরশু সবে পথ্যি করেছিস, আবার কিন্তু পিত্তি পড়ে অসুখ হবে তা বলে দিচ্চি।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সুতাটা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবা যে এখনো আসেন নি মা।

তা জানি। কেবল বিনিপয়সার চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানিনে। আর বেশ ত, আমি ত আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকারটা কি?

সন্ধ্যা নীরবে কাজ করিতে লাগিল, জবাব দিল না।

মা প্রশ্ন করিলেন, সেলাইটা কিসের হচ্ছে শুনি?

মেয়ে অনিচ্ছুক অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, এই দুটো বোতাম পরিয়ে দিচ্চি।

তা জানি মা, জানি। নইলে আমার কাপড়খানা সেরে রাখতে বসেচিস্ কি না তা জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু কি বাপ-সোহাগীই হয়েছিস সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারও নেই! কোথায় একটা বোতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোণে একটু খোঁচা লেগেছে, কোন্ পিরানটায় একটু দাগ ধরেছে, জুতোজোড়াটার কোথায় একরতি সেলাই কেটেছে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস, এ ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জবাব শুনিয়া মা খুশী হইলেন না, বলিলেন, পড়বে কি করে,—বিনিপয়সার ডাক্তারিতে সময় পেলে ত! বলি, দুলে মাগীরা গেলো?

যাবে বৈ কি মা।

কিন্তু সে কবে? ছোঁয়া-ন্যাপা করে জাতজন্ম ঘুচে গেলে, তারপরে? আবার যে বড়ো ছুঁচে সুতো পরাচ্চিস? উঠবি নে বুঝি?

তুমি যাও না মা, আমি এখুনি যাচ্ছি।

এই অসুখ শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দুজনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ক্রোধভরে একটা পিতলের কলসী তুলিয়া লইয়া খিড়কির পুকুরের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা আনত-মুখে মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, জননীর কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার সেলাই প্রায় শেষ হইয়াছিল, ছুঁচ-সুতা প্রভৃতি এখনকার মত একটা ছোট সাবানের বাক্সে গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার পিতার সোরগোলে চমকিয়া মুখ তুলিল। তিনি সদাই ব্যস্ত,—এইমাত্র বাড়ি ঢুকিয়াছেন, হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের ছোট বাক্স এবং বগলে চাপা কয়েকখানা ডাক্তারি বই। মেয়েকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে, ওঠ ত মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার,—কি যে করি কিছুই ভেবে পাইনে—এমনি মুশকিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইগুলা লইয়া একধারে রাখিয়া দিল। বারান্দায় ইতিপূর্বে যে মাদুরখানি পাতিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই উপর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, আজ কেন তোমার এত দেরি হলো বাবা?

দেরি! আমার কি নাবার-খাবার ফুরসত আছে তোরা ভাবিস? যে রোগীটির কাছে না যাব তারই রাগ, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতের একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন কেউ আর বাঁচবে না। ভয় যে নেহাত মিথ্যে তা যদিও বলতে পারিনে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ত একটাই—দুটো ত নয়! তাদের বলি—এই নন্দ মিত্তির লোকটা যা হোক একটু প্র্যাক্টিস ত করচে,—দু-একটা ওষুধও যে না জানে তা নয়,—কিন্তু তা হবে না। মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না। আর তাদের বা কি বলি! একটা বলি! একটা ওষুধের সিমটম যদি মুখস্থ করবে! আরে অত সহজ বিদ্যে নয়—অত সহজ নয়! তা হলে সবাই ডাক্তার হত। সবাই প্রিয় মুখুয্যে হত!

বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

ছাড়চি মা। এই আজই,—ধাঁ করে যে পল্সেটিলা দিয়ে ফেললি, প্র্যাক্টিস ত কচ্চিস, কিন্তু বল্ দেখি তার অ্যাকশন? দেখি, আমার মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারিস! সন্ধ্যে, ধর দিকি মা বইখানা, একবার পল্সেটিলাটা—

তোমার আবার বই কি হবে বাবা! আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে ওই ওষুধটাই তোমার কাছে পড়ে নেব। দেবে পড়িয়ে বাবা?

দেব বৈ কি মা, দেব বৈ কি। নক্সের সঙ্গে তফাতটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবার—

তোমার পায়ে ততক্ষণ তেলটুকু মাখিয়ে দিই না বাবা? বড্ড বেলা হয়ে গেছে—মা আবার রাগ করবেন। বলিয়া সে একবার উদ্বিগ্ননেত্রে দেখিয়া লইল তাহার জননী ঘাট হইতে ফিরিতেছেন কিনা। এবং আপত্তি করিবার পূর্বেই তেলের বাটি হইতে খানিকটা তেল লইয়া বাবার পায়ে মাখাইয়া দিল।

ইঃ—একটু সবুর করলি নে মা। একবার দেখে নিয়ে—

আজ কাকে কাকে দেখলে বাবা? আচ্ছা, পঞ্চা জেলের ঠাকুদ্দাদা—

সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস্ সন্ধ্যে। আর ঐ পরানে চাটুয্যে, ও হারামজাদার নামে আমি কেস করে তবে ছাড়ব। যে রুগীটি পাব, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙ্চি দিয়ে আসবে! একদিনের বেশী যে কেউ আমার ওষুধ খেতে চায় না সে কেন?— সে কেবল ওই নচ্ছার বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে! কি করেচে জানিস? পঞ্চার ঠাকুরদাকে যাই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেছি, অমনি ব্যাটা পিছনে পিছনে গিয়ে বলেচে কৈ দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তারপরে?

তাহার পিতা ততোধিক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ব্যাটা বজ্জাত ঢক্‌ঢক্ করে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেচে, ছাই ওষুধ! এই ত সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কৈ, আমার ওষুধ সে খাক ত দেখি! এই বলে না এক শিশি ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে এসেচে। তারা বলে ঠাকুর, তোমার ওষুধ সে একচুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পার ত তোমার ওষুধ আমরা খাব, নইলে না।

সন্ধ্যা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিল, সে ত তুমি খাওনি বাবা?

নাঃ—তা কি আর খাই! কিন্তু এতটা বেলা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালুম, একটা রুগী যোগাড় করতে পারলুম না। পরাণের নামে আমি নিশ্চয় কেস্ করব তোকে বললুম সন্ধ্যে।

ক্ষোভে অভিমানে সন্ধ্যার চোখে জল আসিতে চাহিল। এই পিতাটিকে সংসারে সর্বপ্রকার আঘাত, উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস-পরিহাস হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যেন অহরহ তাহার দশ হাত বাড়াইয়া আড়াল করিয়া রাখিত। সজলকণ্ঠে কহিল, কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াবে! এই বাড়িতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্যে এসে এসে ফিরে গেল।

কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। পল্লীর গরীব-দুঃখীরা ঔষধ চাহিতে আসে বটে, কিন্তু সে সন্ধ্যার কাছে, তাহার পিতার কাছে নয়। বাবার কাছেই সে ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা করিতে শিখিয়াছিল, এবং তাহার দেওয়া

ঔষধ প্রায় নিষ্ফলও হইত না।কিন্তু গুরুটিকে রোগীরা যমের মত ভয় করিত। তাই তাহারা সতর্ক হইয়া খোঁজখবর লইয়া এমন সময়েই বাড়িতে ঢুকিত, যেন হঠাৎ মুখুয্যেমশায়ের হাতের মধ্যে গিয়া না পড়িতে হয়। সন্ধ্যা ইহা জানিত, কিন্তু বাবার জন্য মিথ্যা বলিতে তাহার বাধিত না।

কিন্তু পিতা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ফিরে গেল? কে কে? কারা কারা?কতক্ষণ গেল? কোন্ পথে গেল? নামধাম জেনে নিয়েচিস ত!

সন্ধ্যা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, নামধামে আমাদের কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে অখন।

আঃ, তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু! নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি ত একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরিতে কঠিন দাঁড়াতে পারে—কিছুই বলা যায় না—এখন একটি ফোঁটায় যে সারিয়ে দিতুম।

সন্ধ্যা নীরবে তেল মাখাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, কখন আসবে বলে গেল?

বিকেলবেলায় হয়ত—

হয়ত! দেখ দিকি কিরকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর্, যদি কোন গতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্নের কাছে গিয়ে পড়ল না ত? পরাণে হারামজাদা ত ঐ খোঁজেই থাকে, সে ত এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারিনে আমি। বাড়িতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুড়কিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টা-খানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস নে? যা না বলে দেব, যেটি না দেখব—কে? কে? কে উঁকি মারছ হে? চলে এস না। আরে রামময় যে! খোঁড়াচ্চ কেন বল দিকি?

তাঁহার সাদর আহ্বান ও কলকণ্ঠে একজন চাষীগোছের মধ্যবয়সী লোক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত নিস্পৃহস্বরে কহিল, আজ্ঞে না, ও কিছু না—

কিছু না! বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্চ যে! আঃ—তেলমাখানোটা একটু রাখ্ না সন্ধ্যে! কিছু না? স্পষ্ট আর্নিকা কেস দেখতে পাচ্চি—না না, তামাশা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

পা দেখানোর প্রস্তাবে রামময় একটিবার করুণচক্ষে সন্ধ্যার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, এই পা-টা একটু মুচড়ে কাল পড়ে গিয়েছিলুম।

প্রিয়বাবু কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেখলি ত সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কিনা আর্নিকা! আমরা দেখলেই যে বুঝতে পারি! হুঁ পড়লে কি করে?

আজ্ঞে, ঐ যে বললুম পা মুচড়ে। দরজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

অন্যমনস্ক? অ্যাগ্নস্—এপিস্!—সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেচেন—হুঁ, অন্যমনস্ক হয়ে—তারপর?

যাই পা বাড়াব অমনি দুমড়ে পড়ে—

থামো, থামো। এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

আজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়েই পড়ে গেলুম বটে।

হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে এই ভোলে। এ্যাগ্নস্! এপিস্ হুঁ—তার পরে?

তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচি নে। বলিয়া লোকটা উৎসুক-চক্ষে একবার সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কহিল, বাবা, বেলা হয়ে যাচ্চে, একটু আর্নিকা—

আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে। কেসটা স্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্! রেমিডি সিলেক্ট করা ত ছেলেখেলা নয়। বদনাম হয়ে যাবে। হুঁ, তারপরে? বেদনাটা কি রকম বল দেখি রামময়?

আজ্ঞে বড্ড বেদনা ঠাকুরমশাই।

আহা তা নয়, তা নয়। কি রকমের বেদনা? ঘর্ষণবৎ, না মর্ষণবৎ, সূচীবিদ্ধবৎ, না বৃশ্চিক-দংশনবৎ। কনকন করচে, না ঝনঝন করচে?

আজ্ঞে হাঁ, ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই-রকম করচে।

তা হলে ঝনঝন করচে! ঠিক তাই! তারপরে?

তারপরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্চি—

থামো, থামো! কি বললে, মরে যাচ্চ?

রামময় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তা বৈ কি মুখুয্যেমশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারিনে—আর মরা নয় ত কি! তা ছাড়া ছোঁড়াগুলো যে বজ্জাত,—কথা শোনে না, বারণ মানে না,—ওই তক্তাখানা নিয়েই তাদের যত খেলা। আবার কোন্দিন হয়ত আঁধারে পড়ে মরব দেখতে পাচ্চি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারী বেলা হয়ে গেল!

বাবা, আর্নিকা দু' ফোঁটা—

প্রিয়বাবু মেয়ের প্রতি চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, না মা, না। এ আর্নিকা কেস নয়। বিপ্নে হলে তাই দিয়ে দিত বটে। চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশ শক্তি। দু'ঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, একোনাইট বাবা? ”

হাঁ মা, হাঁ। মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়! পড়ে মরব! সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউরেণ্টার! মহাত্মা হেরিং বলেচেন, রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। বিপ্নে হলে—হুঁ:—তবু, তবু হারামজাদারা চিকিৎসা করতে আসে! রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর

চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসব। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার করো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢকঢক করে হয়ত সবটা খেয়ে ফেলে আবার ক্যাস্টর অয়েল রেখে যাবে। উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠচে যে!

রামময়কে ঔষধ দিতে সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভয়ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ক্যাস্টর অয়েল অতখানি ত সব খেয়ে আসোনি বাবা?

নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কৈ রে?

তবে বুঝি তুমি—

না—না—না—দে না শিগগির গাড়ুটা! পোড়া বাড়িতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে! তবে থাকগে গাড়ু। বলিতে বলিতেই প্রিয়বাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় কহিল, দিদিঠাকরুন, ওষুধটা তা হলে—

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

এই যে তুমি বললে 'আর্নি' নাকি, তাই দু'ফোঁটা দিয়ে দাও দিদিঠাকরুন। মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা না হয়—

সন্ধ্যা অন্তরে ব্যথা পাইয়া কহিল, আমি কি বাবার চেয়ে বেশি বুঝি রামময়?

রামময় লজ্জিত হইয়া বলিল, না—তা না,—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড়ো জোর ওষুধ কিনা দিদিঠাকরুন,—আমি রোগা মানুষ—বরঞ্চ গিয়েই না হয় সাঁতেদের মেধোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দেব—কাল থেকে তার পেট নাবাচ্চে,—দাঠাকুরের ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমণি।

সন্ধ্যা বিষণ্ণমুখে কহিল, আচ্ছা, এসো এইদিকে।

এই বলিয়া সে রামময়কে সঙ্গে লইয়া বারান্দা দিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী ঠাকুরঘরের জন্য এক ঘড়া জল আনিতে পুকুরে গিয়াছিলেন, বাড়ি ঢুকিয়াই জলপূর্ণ কলসীটা দাওয়ার উপর ধপ্ করিয়া বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা ঘরের মধ্য হইতে সাড়া দিল, যাই মা।

মা কহিলেন, তোর বাবা এখনো ফেরেনি? ঠাকুরপূজো আজ তা হলে বন্ধ থাক?

মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাবা ত অনেকক্ষণ এসেচেন মা। তেল মেখে নাইতে গেছেন।

কৈ, পুকুরে ত দেখলুম না?

তিনি যে কোথায় ছুটিয়া গেলেন সন্ধ্যা তাহা জানিত। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ বোধ হয় তা হলে নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হলো, এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী কিছুমাত্র শান্ত হইলেন না, বরঞ্চ অধিকতর উত্তপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এঁকে নিয়ে আর ত পারিনে, সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্চায্যিমশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—ঠাকুরের মাথায় একটু জল পর্যন্ত পড়তে পেলে না—তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেছে জানিস? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুফ করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেচে।

সন্ধ্যা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, কে বললে মা?

কেন, বিরাটের নিজের বোনই বলে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাই-বোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়ত কথাটা সত্যি নয়।

মা রাগিয়া বলিলেন, কেন তুই সব কথা ঢাকতে যাস বল দিকি সন্ধ্যে? জ্বর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়েচে, ধন্বন্তরি বলে পায়ের ধূলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে, ন্যাজ চুলকে দিয়েচে—তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি! টাকা যাক, কিন্তু মনে হলো যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কলসীটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেচে সন্ধ্যে, আমি সংসার চালাই বা কি করে বল্ দিকি?

কত টাকা মা?

কত! দশ-বারো টাকার কম নয় বললুম। একমুঠো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

কথাটা তাঁহার সমাপ্ত হইতে পাইল না। প্রিয়বাবু আর্দ্রবস্ত্রে ব্যতিব্যস্তভাবে বাড়ি ঢুকিতে ঢুকিতে চেঁচাইয়া ডাকিলেন, সন্ধ্যে, গামছা—গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি—বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, একোনাইট ঘোচাচ্চি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে। কার জায়গায় তুমি হাড়ী-দুলে এনে বসাও? কার জমি তুমি 'গোচর' বলে দান করে এসো? চিরটা কাল তুমি হাড়মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে! আজ, হয় আমি চলে যাই, না হয়, তুমি আমার রাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা তীব্রকণ্ঠে কহিল, মা, দুপুরবেলা এ-সব তুমি কি শুরু করলে বল ত?

মা তেমনিভাবে জবাব দিলেন, এর আবার দুপুর-সকাল কি? কে ও? ঠাকুরপুজো সেরে উনুনের ছাইপাঁশ দুটো গিলে যেন বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না।

বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

হুঁ, বলিয়া প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বললুম তাদের জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট? তোরা বলিস কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর তাদেরই বা দোষ দেব কি ? ওষুধ খাবে ত পথ্যির যোগাড় নেই। নেট্রাম দু'শ শক্তি একটা ফোঁটা দিয়ে—

সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু টলটল করিতেছিল, সে অলক্ষ্যে আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এসব হাঙ্গামার মধ্যে যাও?

আমি ত বলি যাব না—কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ের কিছুটি হবার জো নেই, তাও ত দেখতে পাই। কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে না দিয়াই সন্ধ্যা চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, আর দেরি করো না বাবা, ঠাকুরপূজোটি সেরে ফেল। আমি আসচি।

এই বলিয়া সে তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং প্রিয়বাবুও মাথা মুছিতে মুছিতে বোধ করি বা ঠাকুরঘরের উদ্দেশেই প্রস্থান করিলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—ইঃ—আবার যে পেটটা কামড়াতে লাগলো! পরাণের নামে—ইঃ—

গ

যে গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের নামে বাঘে ও গরুতে একত্রে একঘাটে জলপান করে বলিয়া সেদিন রাসমণি বারংবার সন্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুকুল-চূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এইমাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা একটি করবী পুষ্প দেখিয়া মনে হয় অনতিবিলম্বেই তাঁহার সকালের আহ্নিক ও পূজা সারা হইয়াছে। বাহিরের লোকজন তখনও হাজির হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভৃত্য হুঁকায় নল করিয়া তামাক দিয়া গিয়াছিল, সুডৌল ভুঁড়িটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, অন্যমনস্ক-মুখে তাহাই পান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা নড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন, কে?

অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল, আমি। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড়? রাগ হলো নাকি?

গোলোক কহিলেন, রাগ? না, রাগ-অভিমান আর কার ওপর করব বল? সে তোমার দিদির সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, না, এখন আর কিছু খাব না। আজ গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবে—সেই সন্ধ্যার পরেই একবারে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেব। এমনি করে যে ক'টা দিন যায়। বলিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

যে মেয়েটি নেপথ্য হইতে কথা কহিতেছিল, সে দ্বারটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কিনা দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বিধবা। দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়সেও বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই।

পরিধানে মিহি সাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ-বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি ওই-সব ঠাট্টা করেন, লোকে কি মনে করে বলুন ত? তা ছাড়া আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না? বলিয়া পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া কহিল, যাঁকে সেবা করতে এলুম তিনি ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে শুনতে হবে না? আপনিই বলুন।

গোলোক তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে তো বটেই। আমার সংসার অচল বলে ত আর কুটুম্বের মেয়েকে ধরে রাখা যায় না। আর তাই যদি না হবে ঘরের লক্ষ্মীই বা এ-বয়সে ছেড়ে যাবে কেন? মধুসূদন! বেশ, তাই যাও একটা ভাল দিন দেখিয়ে। বোনের সেবা করতে এসেছিলে, সেবা দেখিয়ে গেলে বটে! গ্রামে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

জ্ঞানদা মৌন হইয়া রহিল। গোলোক কোঁচার খুঁট দিয়া চক্ষু মার্জনা করিয়া মিনিটখানেক নিঃশব্দে তামাক খাইয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, সতী-লক্ষ্মী তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন। সেজন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল। মেয়েরা সব বড় হয়েছে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুরঘর করচে, তাদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে।

জ্ঞানদা আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বালাই ষাট। আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন?

গোলোক মুখ তুলিয়া একটু ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিনা! মধুসূদন! তুমিই সত্য! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয়-কর্মও বিষের মত ঠেকচে। যে ক'টা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে। সেজন্যে চিন্তা নেই—একমুঠো একসন্ধ্যে জোটে ভালো, না জোটে ক্ষতি নেই—কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই□মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জ্ঞানদার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। গোলোকের স্ত্রী তাঁহার মামাত ভগিনী হইলেও সহোদরার ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। তাই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদাকে স্মরণ করিলে, সে না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে নাই। সেই দিদি আজ মাসাধিক কাল হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাবার সময় নাকি ইহারই হাতে তাঁহার বছরদশেকের ছেলেটিকে সঁপিয়া গিয়াছেন।

সে করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি ত চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশায়। লোকেই বা বলবে কি বলুন?

গোলোক দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া কহিলেন, লোকে বলবে তোমাকে? এই গাঁয়ে বাস করে? ইহার অধিক কথা আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না।

জ্ঞানদা নিজেও ইহা জানিত, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

গোলোক কহিতে লাগিলেন, আমার কথায় কথা কইলে তাকে আর কোথাও বাস করতে হবে—এ গাঁয়ে হবে না। সে বড় ভাবিনে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে। সে নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসত, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল; কৈ আমার হাতে দিলে না?

জ্ঞানদা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, সব ত বুঝি চাটুয্যেমশায়, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েচেন! আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই।

গোলোক তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, না গতি নেই! তুমিও যেমন! হাঁ, মুখুয্যে বেঁচে থাকত ত একটা কথা ছিল; কিন্তু তাকে ত চোখেও দেখনি। তের বছরে বিধবা হয়েচ—

জ্ঞানদা বলিল, হ'লাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলোক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে যাও আমাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আবার ছোটগিন্নী! বলেচি না আপনাকে, লোকে হাসি-তামাশা করে। কেন, নাম ধরে ডাকতে কি হয়?

গোলোক মুখখানা ঈষৎ প্রফুল্ল করিয়া বলিলেন, করলেই বা তামাশা ছোটগিন্নী? সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাশার!

জ্ঞানদা হঠাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধরে ডেকেছেন—তাই ডাকবেন।

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখখানা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে একটা উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া কতকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে দিবারাত্রি হু হু করে জ্বলে যাচ্চে—হায়রে! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাশা! তবে মাঝে মাঝে—তা যাক, নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব? বিষয় বিষ! সংসার বিষ! কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাব! মধুসূদন!

জ্ঞানদা ছলছল চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিল। গোলোক বলিতে লাগিলেন, আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি, কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয় এও জানি, আবার শোকে-তাপে অকালে-অসময়ে চুলগুলো পেকেচে তাও সত্যি, কিন্তু তবু ত পাকা চুল! এ নিয়ে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায়? তুমি বল না ছোটগিন্নী?

জ্ঞানদা শুষ্ক একটুখানি হাসিয়া কহিল, বেশ ত, করুন না একটি বিয়ে।

গোলোক কহিলেন, ক্ষ্যাপা না পাগল! আবার বিয়ে! লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছ—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে ভাসিয়ে যেতে পারবে না। যে

মরণকালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার—কে?

ভৃত্য মুখ বাড়াইয়া সংবাদ দিল, চোঙদারমশাই এসেচেন।

গোলোক মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, আঃ, আর পারিনে। কাজ, কাজ, বিষয়, বিষয়,—আমার যে এদিকে সব বিষ হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল গে।

ভৃত্য অন্তর্হিত হইল, জ্ঞানদাও ও-দিকে দরজার বাহিরে গিয়া চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি তা হলে সত্যিই কিছু খাবেন না?

গোলোক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না। প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্র-সূর্য আকাশে উঠচে, জোয়ার-ভাটা নদীতে খেলচে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা!

জ্ঞানদা কহিল, তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শিগগির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকব। এই বলিয়া সে অন্দরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিল।

সম্মুখের দ্বার দিয়া ভৃত্যের পশ্চাতে একজন ভদ্রব্যক্তি প্রবেশ করিলেন, গোলোক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এসো চোঙদার, বসো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পারো না? ভুলো, যা, শূদ্রের হুঁকোয় শিগগির জল করে তামাক নিয়ে আয়।

বিষ্ণু চোঙদার প্রণাম করিয়া গোলোকের পদধূলি লইয়া ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে কহিলেন, দম ফেলবার ফুরসত ছিল না বড়কর্তা, তা খবর! যাক, পাঁচ শ আর তিন শ—এই আট শ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দিবার গোপন কারবারে এই বিষ্ণু চোঙদার ছিল তাঁহার অংশীদার। তিন মাসের মধ্যে তিন হাজার পশু যোগান দিবার শর্তে লেখাপড়া হইয়াছিল। তাই খবরটা শুনিয়া গোলোক খুশী হইলেন না। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, মোটে আট শ। কনট্রাক্ট ত তিন হাজারের—এখনো ত ঢের বাকী হে! চোঙদার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্চে বড়কর্তা, সব চালান, সব চালান—এই আট শ যোগাড় করতেই যেন জিভ বেরিয়ে গেছে। তবু ত হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেচে, আট-দশ দিনেই আরও পাঁচ-সাত শ রেলে পাঠাচ্চে—কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় ত তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

গোলোক আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে ত এখন একরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকরুনের মৃত্যুর পর থেকে টাকাকড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে। কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে—তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না?

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাত-শোর কন্টাক্টো পেয়েচে—আরও বেশী পেতো, শুধু সাহস করলে না টাকার অভাবে।

গোলোক চোখের একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বড় নাকি?

চোঙদার বলিলেন, হুঁ, নইলে আমি ছেড়ে দিই!

গোলোক ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুর্গা দুর্গা, রাম রাম! সক্কালবেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই—তা হাজার দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয় না?

চোঙদার কহিলেন, বেশি! বেশি!

গোলোক বলিলেন, লড়াইটা বেশীদিন চললে ব্যাটা দেখচি লাল হয়ে যাবে। তাই ত হে!

চোঙদার কহিলেন, নিঃসন্দেহ। তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে জোটাতে পারলে হয়।

গোলোক কহিলেন, কনটাক্টো দেখিয়ে কর্জ করবে—শক্ত হবে কেন?

চোঙদার মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কিনা।

খবর শুনিয়া গোলোক উৎসুক হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, বলছিল নাকি? সুদ কি দিতে চায়?

চোঙদার কহিলেন, চার পয়সা ত বটেই। হয়ত—

এই 'হয়ত'—টাকে গোলোক শেষ করিতে দিলেন না। রাগ করিয়া বলিলেন, চার পয়সা! টাকায় টাকা মারবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ' আনা হয়ত, না হয় একবার দেখা করতে বলো।

চোঙদার কিছু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা আপনিই দেবেন নাকি সাহেবকে? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে—

মুহূর্তে গোলোক নিজেকে সাবধান করিয়া লইয়া একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার! বরঞ্চ, পারি ত নিষেধ করেই দেব। আর জানাজানির মধ্যে ত তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই-নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে, তাতে মহাজনের কি? এই বলিয়া তাহার মুখের প্রতি সম্মতির জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজেই বলিলেন, তা নয় চোঙদার, শুধু একটা কথার কথা বলচি যে, অত খোঁজ নিতে গেলে মহাজনের চলে না; কিন্তু আমাকে ত চিরকাল দেখে আসচ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতি স্থির রেখেচি

বলেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি। আজ মুখের একটা কথায় বামুনকে শূদ্দুর, শূদ্দুরকে বামুনের দলে তুলে দিতে পারি। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! সেবার সেই ভারী অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে সেটা কিছু বেশী কথা নয়, কিন্তু গোলোক চাটুয্যেকে ও-কথা যেন আর দ্বিতীয়বার না কানে শুনতে হয়। কেনারামের পুত্র হররাম চাটুয্যের পৌত্র□যাঁর একবিন্দু পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়ারহাটির রাজাকেও পালকি-বেহারা পাঠিয়ে দিতে হ'ত।

চোঙদার দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও-কথা কে আর অস্বীকার করবে বলুন—ও ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকে জানে।

গোলোক প্রত্যুত্তরে শুধু কেবল একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোঙদার প্রস্থানের উপক্রম করিতে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে, রেলের রসিদটা দেখিয়ে যেয়ো।

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

গোলোক কহিলেন, তা হলে আট শ আর পাঁচ শ হলো! বাকী রইল সতের শ—মাসতিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে?

চোঙদার বলিলেন, আজ্ঞে হয়ে যাবে বৈ কি।

গোলোক কহিলেন, তাই তোমাকে তখনই বলেছিলুম চোঙদার, একেবারে ওটা পুরোপুরি হাজার-পাঁচেকের কন্টাক্টোই করে ফেল। তখন সাহস করলে না—

চোঙদার কহিলেন, আজ্ঞে, অতগুলো ছাগল-ভেড়া যদি যোগাড় না হয়ে ওঠে—

গোলোক প্রতিবাদ করিলেন না, কহিলেন, তাই ভাল, তাই ভাল। ধর্মপথে একের জায়গায় আধ, আধের জায়গায় সিকি হয় সেও ঢের, কিন্তু অধর্মের পথে মোহরও কিছু নয়। বুঝলে না চোঙদার? মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোঙদার আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলে ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী চাটুয্যেমহাশয় দগ্ধ হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিতমুখে তামাক টানিতে লাগিলেন, বিষয়কর্ম বোধ করি বা বিষের মতই বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু এমনি সময়ে অন্দরের দিকের কবাটটা ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল, মাসীমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলোক চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল্ ত সদু?

দাসী কহিল, একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসীমা।

গোলোক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, তোর মাসীর জ্বালায় আর আমি পারিনে সদু। পর্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইল না! এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, সংসারে থেকে পরকালের দুটো কাজ করার কতই না বিঘ্ন! মধুসূদন! হরি!

ঘ

সন্ধ্যার শরীরটা কিছুদিন হইতে তেমন ভাল চলিতেছিল না। প্রায়ই জ্বর হইত, এবং পিতার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সে যেন ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই পথ করিতেছিল। মা বিপিন ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবেন বলিয়া প্রত্যহ ভয় দেখাইতেছিলেন, এবং এই লইয়া মাতায়-কন্যায় একটু না একটু কলহ প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতেছিল। আজ সায়াহ্নবেলায় সন্ধ্যা সম্মুখের বারান্দায় একটি খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মাতৃ-প্রদত্ত সাগুর বাটিটা চোখ বুজিয়া নিঃশেষ করিল এবং তাড়াতাড়ি একটি পান মুখে পুরিয়া দিয়া কোনমতে সেগুলার ঊর্ধ্বগতি নিবারণ করিল। এই খাদ্যবস্তুটার প্রতি তাহার অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু তথাপি না খাওয়া এবং কম খাওয়া লইয়া আর তাহার কথা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল না।

কোথাও না কোথাও হইতে মা যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। ইতিপূর্বে বোধ হয় সে একখানা বই পড়িতেছিল—তাহার খোলা পাতাটা উপুড় করিয়া তাহার কোলের উপর রাখা ছিল, সেইখানা পুনরায় হাতে তুলিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই শুনিতে পাইল প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক আসিল, খুড়ীমা, কৈ গো?

যে বাড়ি ঢুকিয়াছিল সে অরুণ। তাহার জামাকাপড় এবং পরিশ্রান্ত চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় সেই এইমাত্র অন্যত্র হইতে আসিতেছে।

মুহূর্তের জন্য সন্ধ্যার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর একটা রক্তিমাভা দেখা দিয়া গেল। সে চোখ তুলিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আসচ অরুণদা?

অরুণ কাছে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুক্নো দেখাচ্চে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা বলিল, ঐ-রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়; কিন্তু তোমার চেহারাটাও ত খুব তাজা দেখাচ্চে না।

অরুণ হাসিয়া কহিল, চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই-আচ্ছা প্যাটার্ন ফরমাস করেছিলে যা হোক, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, খুড়ীমা কৈ? কাকা বেরিয়েছেন বুঝি? গেল-শনিবারে কিছুতেই বাড়ি আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরি হয়ে গেল। কি বুনবে, পাখি-পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপফুলের—

সন্ধ্যা কহিল, সে ভাবনার ঢের সময় আছে; কিন্তু যা আনতে সাতদিন দেরি হলো, তা দিতে কি ঘণ্টা-খানেক সবুর সইত না, ইস্টিসান থেকে বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে কেন?

অরুণ সহাস্যে কহিল, নাওয়া-খাওয়া ত? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল ত?

তাহার 'সন্ধ্যা' কথাটার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় কটাক্ষ সন্ধ্যার কর্ণমূলে আঘাত করিয়া একটুখানি রাঙ্গা করিয়া দিল, কিন্তু যেন লক্ষ্যই করে নাই এমনিভাবে সে রাগ করিয়া কহিল, তারই বা আর বাকী কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরি করতে হবে না।

প্রত্যুত্তরে অরুণ পুনরায় হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি ক্রোধে সমস্ত মুখখানা কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পানটা আর চিবোস নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস হাসি-তামাশা কর্।

বলিয়াই কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত-মাত্র না করিয়া দ্রুতপদে ঘরে চলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অরুণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল নির্বাক হইয়া রহিল এবং সন্ধ্যা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিছুক্ষণের জন্য সায়াহ্নের আকাশতল হইতে সমস্ত আলো যেন একেবারে নিবিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে থাকিয়া মুখের পান ফেলিয়া দিয়া, সহসা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এ-বাড়িতে আর এস অরুণদা? আমাদের সর্বনাশ না করে কি তুমি ছাড়বে না?

প্রথমটা অরুণ একটা কথাও কহিতে পারিল না, তারপরে ধীরে ধীরে শুধু বলিল, মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য?

সন্ধ্যা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার জাত নেই, ধর্ম নেই, কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে!

আমার জাত নেই? ধর্ম নেই?

না নেই। তুমি বিলেত গেছ—তুমি ম্লেচ্ছ। সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই?

অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না, আমার মনে নেই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ!

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া কহিল, শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোনোনি—বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ কহিল, কিন্তু আমি মনে করেছিলাম—

কিন্তু কি মনে করিয়াছিল তাহা আর বলিতে পারিল না। নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া কহিল, আমি আর হয়ত এ-বাড়িতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা করো না সন্ধ্যা—আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা কহিল, তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে?

অরুণ কহিল, না, ঝগড়া আমি করব না। যে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই। এই বলিয়া অরুণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল,—সন্ধ্যা সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

মা সুমুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, যাক, আর বোধ হয় আসবে না?

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, না।

মা বলিলেন, খামকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল গে।

সন্ধ্যা মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়খানা পর্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে?

তাহার ম্লানমুখের অন্তরের ছবি জননীর চোখে পড়িল না, তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, হবে না?

খ্রিস্টেন মানুষ—বিধবা গিন্নী-বান্নী হলে যে নেয়ে ফেলতে হতো! সেদিন রাসু-মাসী—হাঁ, বড়াই করে বটে—কিন্তু বিচের-আচার শিখতে হয় ত ওর কাছে। দুলে-ছুড়ী ছুঁলে কি ছুঁলে না, তবু নাতনীটাকে অবেলায় ডুব দিইয়ে তবে দোরে তুললে।

সন্ধ্যা কহিল, বেশ ত মা যাচ্চি।

মা ঘাড় নাড়িয়া বামনাই আচার-বিচার সম্বন্ধে বোধ হয় আরও কিছু উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিছন হইতে ডাক শুনিলেন, জগো, ঘরে আছিস গা?

গোলোক চাটুয্যেমশায় একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; জগদ্ধাত্রী ফিরিয়া চাহিয়া সাড়া দিলেন, ও মা, চাটুয্যেমামা যে! কি ভাগ্যি!

কিন্তু সেদিনকার রাসু-মাসী ও কন্যার ঘটনাটা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোলোক মায়ের উত্তর না দিয়া

মেয়েকেই সম্ভাষণ করিলেন, সহাস্যে কহিলেন, বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস গো? যেন রোগা দেখাচ্ছে না?

সন্ধ্যা বলিল, না, ভালো আছি ঠাকুদ্দা।

জগদ্ধাত্রী শুষ্কমুখে একটু হাসি আনিয়া বলিলেন, হাঁ ভালই বটে! মাস ঘুরতে চলল মামা, রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। আজও ত সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলোক কহিলেন, তাই নাকি? তা হবে না কেন বাছা,—কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি! পাত্রস্থ্ করবি কবে? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী বয়সের কথাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি করব মামা, আমি একা মেয়েমানুষ আর কতদিকে সামলাবো! তোমার জামাই গেরাহ্যি করে না—ডাক্তারি নিয়েই উন্মত্ত,—আমার এমন ধিক্কার হয় মামা, যে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে কাশীতে পালিয়ে গিয়ে থাকি। তারপরে যার যা কপালে আছে হোক।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিল!

গোলোক কহিলেন, পাগলাটা এখন করচে কি?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শিকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দু'য়ের বার—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিলে! এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন।

গোলোক সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও ত বাপু, ধনুকভাঙ্গা পণ করে আছিস, স্বয়ং কার্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে দেব না। আমাদের ভারী কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়, না, হয়েচে বাছা? শুনিস নি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের কুল রক্ষা করতে হতো? মধুসূদন তুমিই সত্য!

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, কে তোমাকে বলেচে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেব না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ

কখনো শূদ্দুর বলে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্তিক। ছোট ঘরে যাব না এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেব।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, এই ত কথা! আচ্ছা, আমি দেখচি।

যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যা নতশিরে আরক্তমুখে দাঁড়াইয়াছিল। গোলোক তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে রহস্য করিয়া বলিলেন, কার্তিক যখন চাসনে জগো, তখন মেয়েকে না হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজরানীর মত। কি বলিস নাতনী—পছন্দ হবে?

অন্য সময়ে হইলে সন্ধ্যা পরিহাসে যোগ দিতে পারিত, কিন্তু অরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়া পর্যন্ত সে ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জায় জ্বলিয়া যাইতেছিল, মুখ তুলিয়া কঠিনভাবে জবাব দিল, পছন্দ কেন হবে না ঠাকুদ্দা? দড়ির খাটের চতুর্দোলায় চেপে আসবেন এই দিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকব তখন। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যে ভয়ানক রাগ করিয়া গেল তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্যর্থ পরিহাসের এই তীব্র লাঞ্ছনায় প্রথমটা গোলোক অবাক হইয়া গেলেন, পরে হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে ত নয়, যেন বিলিতি পল্টন! এ না হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাসুর মুখে শুনলাম নাকি, যা মুখে এসেচে তাই বলেচে! মা-বাপ পর্যন্ত রেয়াত করেনি।

গোড়ায় জগদ্ধাত্রীর ঠিক এই ভয়ই ছিল, কেবল মাঝখানে আশা করিয়াছিলেন পরিহাসের মধ্য দিয়া বুঝি এবারের মত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। হয়ত কাটিয়াই যাইত, শুধু মেয়েটাই আবার নিরর্থক খোঁচা মারিয়া বিবরের সর্পকে বাহিরে আনিয়া দিল। কন্যার প্রতি তাঁহার বিরক্তির অবধি রহিল না, কিন্তু প্রকাশ্যে সবিনয়ে কহিলেন, না মামা, সন্ধ্যা ত সে-সব কিছুই বলেনি। মাসী তিলকে তাল করেন, সে ত তুমি বেশ জানো!

গোলোক কহিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা!

গোলোক হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ত আরও ভাল। শাসন করতেও বুঝি পারলি নে?

এই হাসিটুকুতে জগদ্ধাত্রী মনে মনে একটু বল পাইয়া সক্রোধে কহিলেন, শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা, ওর কি দুর্গতিটাই আমি করি!

গোলোক স্নিগ্ধভাবে বলিলেন, থাক, দুর্গতি করে আর কাজ নেই—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস। কালটা বড় ভয়ানক কিনা! অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিলেন, অরুণ? নাঃ—

গোলোক বলিলেন, ভালই। ছোঁড়াটাকে দিসনে আসতে। অনেক রকম কানাকানি শুনতে পাই কিনা।

অরুণকে সন্ধ্যা ছেলেবেলা হইতে দাদা বলিয়া ডাকে। সে বিলাত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃর্দ্য ছিল, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ বংশের এতটাই নীচের ধাপের যে, এই স্নেহ কখনও কোন কারণেই যে আর কোন আকারে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতে পারে, এ সংশয় স্বপ্নেও মায়ের মনে ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে সন্ধ্যা আচরণে ও কথায়-বার্তায় মাঝে মাঝে এমনই একটা তীব্র জ্বালা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিত যে, তাঁহার মুদিত চক্ষেও তাহার আভাস পড়িত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিনিসটা এতখানিই অসম্ভব যে এ লইয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। এখন ইহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত অপরের মুখে শুনিয়া সহসা তিনি ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, শুনলে অনেক জিনিসই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথাব্যথা কেন?

গোলোক মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন, তা সত্যি বাছা। কিন্তু, সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়ার মুখও যে বন্ধ করা যায় না, জগো।

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে, এখনও মুছিবার অবকাশ হয় নাই—এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোলোক কহিলেন, মেয়ের জ্বর বললি নে জগো? সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে এল যে?

জগদ্ধাত্রী কেবলমাত্র জবাব দিলেন, কি জানি মামা! কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, এ তাঁহারই বিরুদ্ধে অরুণের অপমানের গূঢ় সুকঠোর প্রতিশোধ।

গোলোক কহিলেন, এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, দাঁড়ালেই বা কি করব বল? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলোক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, তা বুঝেছি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ-বাড়ির কর্তাটা কে? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, সবাই কর্তা।

গোলোক কহিলেন, তা হলে তাদের বলিস যে, পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগদী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

প্রত্যুত্তরে জগদ্ধাত্রী সক্রোধে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে, এদিকে আয়।

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে বোধ হয় মাথা মুছিতেছিল, একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিল, কেন মা?

মা বলিলেন, দুলে মাগীদের সরাবি, না, আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?

সন্ধ্যা কহিল, দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা ত শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে?

গোলোক ইহার জবাব দিলেন। কহিলেন, ক্ষতি করে বৈ কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্চে। ছিটকে ছিটকে পড়চে ত? বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিয়া কহিলেন, পড়বে বৈ কি মামা।

গোলোক কহিলেন, তবে তাই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু, জেনে ত আর পারা যায় না!

সন্ধ্যার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, তোমার কাঁচা বয়স নাতনী, তুমি না হয় রাত্তিরেও নাইতে পার, কিন্তু আমি ত পারিনে!

সন্ধ্যা অন্তরের দুর্দমনীয় ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, সে জানি ঠাকুদ্দা। কিন্তু বাবা যখন ওদের স্থান দিয়েছেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও ত তাঁর অপমান করতে পারিনে।

মেয়ের এই মান-অপমানের ধারণায় মায়ের মুখ দিয়া রাগে কথা বাহির হইল না। কিন্তু গোলোক বলিলেন, বেশ ত, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা? অরুণের বাড়ির পিছনে ত ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল্ না আশ্রয় দিতে। বাগদী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে তার আর জাত যাবে না। এই বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার রসিকতার রসগ্রহণ জগদ্ধাত্রী যত বেশিই না করুক, অরুণের কথায় পাছে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েটা ভয়ানক কঠোর কিছু বলিয়া বসে এই ভয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের তরলতা উছলিয়া উঠিল, কিন্তু কথাগুলা শুনাইল যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি শক্ত। কহিল, গেলেই বা কে তার জমাখরচ রাখচে বলুন? যে জাতই মানে না, তার আবার যাওয়া আর থাকা ।

গোলোক হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ তাঁহার কালো হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমার সঙ্গে এই সব তার বুঝি পরামর্শ চলে?

সন্ধ্যা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হায়, হায়, ঠাকুদ্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না—কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি! এই বলিয়া সে বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চক্ষের পলকে ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ধমক দিয়া উঠিলেন,—হতভাগী! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস! তাকে কে না জানে? সে কখনো এ-কথা বলেনি—আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

ঘরের মধ্যে হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না।

গোলোক কহিলেন, না জগো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব এমনিই বটে, তা বেশ, না হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম। কিন্তু, একটা কথা বলে যাই আজ, আর বিয়ে দিতে মেয়ের দেরি করিস নে। যেখানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দেয়, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দাও না মামা একটা দেখেশুনে। আর যে আমি ভাবতে পারিনে।

গোলোক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আচ্ছা, দেখি। কিন্তু কি জানিস মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবি নে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের স্বভাবের-ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দু'বেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস ত, তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, কোথায় পাব মামা এত সুবিধে? তবে ঘরজামাই—

গোলোক কথাটা শেষ করিতেও দিলেন না, বলিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস নে জগো, ঘরজামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস, গাঁজা গুলি আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবে। বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ না।

ইহার নিহিত ইঙ্গিত অনুভব করিয়া জগদ্ধাত্রী চোখের নিমেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, চিরকালটাই দেখচি মামা, চিরকালটাই জ্বলেপুড়ে মরচি।

গোলোক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, তবে তাই বল্। বিনা কাজকর্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না?

জগদ্ধাত্রী আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, বুঝি বৈ কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোনদিকে চেয়ে যে কূলকিনারা দেখতে পাইনে।

গোলোক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবেচিন্তে। কিন্তু আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

জগদ্ধাত্রী মিনতি করিয়া বলিলেন, মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসবে না?

গোলোক বলিলেন, না মা, সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আজ আর বিলম্ব করব না। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে আগাইয়া দিতে সদর দরজার বাহিরে পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

৬

সকালবেলায় প্রিয় মুখুয্যেমশায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্র্যাক্টিসে চলিতেছিলেন, বগলে চাপা একতাড়া হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে-বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে পিছনে এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী মিনতি করিয়া চলিয়াছিল, বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বড় বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি?

দুলে-বৌ বিস্মিত হইয়া বলিল, সক্কলের প্যাঁটাপেঁটি ত ফ্যান খায় বাবাঠাকুর?

প্রিয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ফের মিথ্যে কথা হারামজাদী! কারুর ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

দুলে-বৌ কহিল, ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয় তেমনি হাত নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না না, তোদের আর আমি রাখব না, তোরা আজই দূর হ! গোলোক চাটুয্যে বলে গেছে, বামুন-পাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েচিস। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

দুলে-বৌ শেষ মিনতি করিয়া কহিল, ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেব বাবাঠাকুর?

প্রিয় অসঙ্কোচে কহিলেন, হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকত খাওয়াতিস, দোষ ছিল না; কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা বুঝলি? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সল্ফর দেবার সময় বয়ে যায়। বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতবেগে

প্রস্থানের উদ্যম করিতেই দুলে-বৌ পিছন হইতে করুণস্বরে কহিল, বাবাঠাকুর, কাল চোপ্পর দিন-রাত মেয়েটার পেটে লক্ষ্মীর দানাটুকু যায়নি—

প্রিয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেন, কেন? পেট নাবাচ্চে? গা বমি-বমি করচে?

দুলে-বৌ মাথা নাড়িল।

তবে কি? পেট ফুলচে? ক্ষিদে নেই?

ক্ষিদে বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয় কহিলেন, ওঃ—তাই বল্। সেও যে একটা মস্ত রোগ—ন্যাট্রাম, আইয়োডম, আরও ঢের ওষুধ আছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন—দেখেশুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম। চল্ দেখি—

দুলে-বৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ওষুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয় ক্ষণকাল বিস্মিতের মত চাহিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, ওষুধ চাইনে চাল চাই! দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন!

দুলে-বৌ লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে প্রিয় ধমক দিয়া বলিলেন, খেতে পাসনি ত সন্ধ্যের কাছে গিয়ে বল্ গে না।

দুলে-বৌ শুধু নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রিয় কহিলেন, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস নে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্ গে, দিদিঠাকরুণ এলে বলিস আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট-আনি আছে দিতে। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপ্নের কাছে গিয়ে—কে হে ত্রৈলোক্য নাকি? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ির সব খবর ভাল ত?

দুলে-বৌ আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল, ত্রৈলোক্য ও ষষ্ঠীচরণ সম্মুখে আসিয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয় অস্ফুটে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, ভাল, ভাল। যে দিনকাল পড়েচে, আমার ত নাইবার খাবার সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দিকাশি, একটু অবহেলা করেচে কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ত্রৈলোক্য কহিল, আজ্ঞে, আপনারই কাছে।

প্রিয় উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন, আমার কাছে কেন?

ত্রৈলোক্য কহিল, লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ওই বৈকুণ্ঠের দরুন ছোট বাঁশঝাড়টা না দিলে ত আর কিছু হয় না।

প্রিয় রাগ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি দিতে যাব কেন? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?

বুড়ো ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার সে ঘাড় নোয়াইয়া আর একটা প্রণাম করিয়া বলিল, যদি অভয় দেন ত বলি জামাইবাবু, এ গাঁয়ে আপনি ছাড়া আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন ত, দশজনে চলে বাঁচবে, নইলে আমরা চাষী-মানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা?

প্রিয় একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকজনের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি?

ত্রৈলোক্য কহিল, মরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, হাত-পা ভেঙ্গে একেবারে মরে যাচ্ছে।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারী রাগ করবে!

ষষ্ঠীচরণ কহিল, আপনি দিলে মা-ঠাকরুন করবেন কি? তখন না হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয় চিন্তিত-মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, লোকজনের কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা নাও গে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল—রস্কে বাগদীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে! ব্রায়োনিয়ার অ্যাকশনটা—নড়লে-চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা চললুম—চললুম। বলিয়া প্রিয় দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বুড়া ষষ্ঠীচরণ একটু হাসিল, কিন্তু ত্রৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত সাদা। এই বলিয়া সে যেদিকে পাগলাঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিল।

ষষ্ঠীচরণ বলিল, হুকুম হয়ে গেল, আর দেরি নয় ত্রৈলোক্য, কাজটা শেষ করে ফেলতে পারলে হয়।

ত্রৈলোক্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই চল খুড়ো।

দুই

ক

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। অরুণ তাহার পড়িবার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া কড়িকাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ক্রোড়ের উপর বই খোলা, কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইত যে, এ কেবল সন্ধ্যার অজুহাতেই পড়া বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ আলো যখন যথেষ্ট ছিল, তখনও ঐ বই ওখানে অমনি করিয়াই পড়িয়া ছিল। বস্তুতঃ সেইদিন হইতে সে কাজেও যায় নাই, বাড়ির বাহির পর্যন্ত হয় নাই। এই কয়টা দিন তাহার কেবল একটা কথাই বার বার মনে পড়িয়াছে যে, একজনের কাছে সে একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া গেছে! ঘৃণা এবং অশুচিতা এতদূরে গিয়াছে যে, তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিলেও একজনের মুখের পান ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়!

সহসা তাহার চিন্তা বাধা পাইল। দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া সে চোখ নামাইয়া ঠাহর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ওখানে?

আমি সন্ধ্যা,—বলিয়া সাড়া দিয়া সন্ধ্যা দরজা খুলিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং একান্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি এখানে? এমন সময়ে যে? ঘরে এসে বসো।

সন্ধ্যা কহিল, আমার বসবার সময় নেই। আমি পুকুরে গা ধুতে এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমাদের একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

তা আমি জানতুম, বলিয়া সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাবার কাছে শুনলুম এ ক'দিন তুমি কাজে যাওনি, বাড়ি থেকে পর্যন্ত বেরোও নি—কেন শুনি?

আমার শরীর ভাল নেই।

সন্ধ্যা কহিল, না থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তা হলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যা নিজেও একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কারণ আমি জানি অরুণদা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়িতে নয়—এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাব কিনা, যেথায় বিনাদোষে মানুষে মানুষকে এত হীন, এত লাঞ্ছিত করে না—আমি সেই কথাই দিনরাত ভাবচি।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ কহিল, জন্মভূমিই ত আমাকে ত্যাগ করচে সন্ধ্যা। আজ তোমার কাছেও আমি এমন অশুচি হয়ে গেছি যে, তোমাকেও মুখের পান ফেলে দিতে হলো। এই ঘৃণা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা নিরুত্তরে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ কহিল, আচারের নাম নিয়ে এই চিরাগত সংস্কার তোমাদের মনটাকে হয়ত আর স্পর্শ পর্যন্ত করে না, কিন্তু যেখানে করে, সেখানে মানুষের হাত থেকে মানুষের এই লাঞ্ছনা মানুষকে যে বেদনায় কতদূর বিদ্ধ করতে পারে, এই কথাটা যে একদিন আমাকে এমন করে অনুভব করতে হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমি নিজেই টেনে আনোনি অরুণদা?

অরুণ কহিল, কি জানি। কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পার?

সন্ধ্যা বলিল, হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজী হওনি—আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জন দাও ত, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না।

অরুণ কহিল, কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না!

কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি?

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা! এ কথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

সন্ধ্যা বলিল, তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে দিলে না অরুণদা। আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে!

অরুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আর আমি?

সন্ধ্যা বলিল, তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা! কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই যেন মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল তাহার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত, ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল।

সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি যেখানেই যাও না অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করেনি।

অরুণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে-জন্যে এসেছিলে তা ত এখনো বলনি?

সন্ধ্যা প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পৃথিবীতে আশ্চর্যের আর অন্ত নেই। তারপরে কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া কহিল, অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই। এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেচেন। আমি দিয়েছি তাদের আশ্রয়।

কোথায়?

আমাদের পুরানো গোয়ালঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পাবে না।

অরুণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সন্ধ্যা বলিল, কেন কি? তারা যে দুলে! তারা আমাদের পুকুরঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান খাওয়ায়—গোলোকঠাকুর্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলেন—মা প্রতিজ্ঞা করেছেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করে তবে স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা—তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ কহিল, বেশ, কিন্তু কোথায় স্থান দেব?

সন্ধ্যা বলিল, তা আমি জানিনে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব?

অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার উড়ে মালীটা বাড়ি চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে? না হয় একটু-আধটু সারিয়ে দেব।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না, কেবল অধোমুখে মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

অরুণ কহিল, তা হলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালীটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

সন্ধ্যা ইহারও জবাব দিতে পারিল না। তেমনি নতনেত্রে থাকিয়া বোধ হয় আপনাকে সামলাইতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এখন আমার মুখেও পান নেই, গা ধুতেও এসেছিলাম। এই সময়ে তোমাকে একটু প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে যাই। এই বলিয়া সে গড় হইয়া নমস্কার করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অরুণ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিবার, বা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল না, কেবল সেইদিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

খ

বোধ করি দিন-দুই পরে হইবে, জগদ্ধাত্রী তাঁহার পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন, পথের মধ্যে রাসমণি দেখা দিলেন। তাঁহার সমস্ত চোখমুখ উত্তেজনা ও আগ্রহের আতিশয্যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে; কাছে আসিয়া অশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, জাগো, মা আমার, তোর ঐ পাগলি মেয়েটা কি শেষে এমন তপিস্যেই করেছিল। অ্যাঁ, এ যে স্বপনের অতীত!

জগদ্ধাত্রী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু এঁর মুখে কেবল মেয়েটার নাম শুনিয়াই মনে মনে ভয় পাইলেন। উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে মাসী? কি করেচে সন্ধ্যে?

রাসমণি বলিলেন, যা করেচে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে কবে করেচে শুনি? যা ভিজে কাপড়ে, ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। পঞ্চাননের আর বিশালাক্ষীর স্থানে পূজো পাঠিয়ে দি গে। কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টিকবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী আকুল হইয়া কহিলেন, কি হয়েছে মাসী? খুলে না বললে বুঝব কি করে?

রাসমণি একটু হাসিয়া বলিলেন, খুলে বলতে হবে? তবে বলি। তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি, নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে,—এখন যা□একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে বস গে।

কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাসমণি সদয়কণ্ঠে কহিলেন, তোর একার দোষ নেই জগো, শুনে আমিও অমনি করে চেয়েছিলুম, মনে হলো বুঝি-বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখচি।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, খুলে বল না মাসী কি হয়েচে? আমি যে আকাশপাতাল ভেবে মরে গেলুম।

রাসমণি তখন জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, কথা গোপন রাখিস মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস নে—ভাঙচি পড়ে যেতে পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জনপ্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই সঁপে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে। মনে ভাবলাম, আমারও ত বৈকুণ্ঠপুরী শূন্য খাঁখাঁ করচে—ছেলেটাও মানুষ হচ্ছে না—যাক্, এক কাজে দু'কাজ হবে। একটা ব্রাহ্মণের কুলরক্ষাও করা হবে, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাদেরও ত সবেমাত্র ওই মেয়েটি—

কিন্তু কথাটাকে তিনি রাজার ভাবী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া আর শেষ করিতে পারিলেন না। শুনিতে শুনিতে জগদ্ধাত্রী একেবারে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন।

রাসমণি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, কি হলো রে জগো?

জগদ্ধাত্রী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, নাঃ—মাসী, গোলোকমামা তোমাকে তামাশা করেচেন।

তামাশা কি লো? এতটা বয়স হলো তামাশা কাকে বলে জানিনে? তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাশা?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তামাশা বৈ কি মাসী? একি কখন হতে পারে?

রাসমণি একটু হাসিলেন, বলিলেন, তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বুঝি-বা স্বপনই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলাম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ কখনো দেখেচে না শুনেচে। আশীর্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাক, কিন্তু যা যা বলে দিলুম আজকেই কর গে বাছা। আর কথাটা না যেন পাঁচ-কান হয়। আগে ভালোয় ভালোয় আশীর্বাদটা হয়ে যাক।

জগদ্ধাত্রী বাক্শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাসমণি পুনশ্চ কহিলেন, এই সামনের অঘ্রানের পরেই নাকি এক বছর অকাল। আমার চাটুয্যেদাদার ইচ্ছেটা—, বলিয়া তিনি একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, আর হবে নাই বা কেন বল্? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে! দেখলে যে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলোক চাটুয্যে! বলিয়া সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপরে একটু আঙুলের চাপ দিয়া কহিলেন, যাও মা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ো না—আমিও যাই, বেলা হয়ে গেল—ও-বেলা আবার তখন আসব এখন, ঢের কথা আছে।

এই বলিয়া তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী অনেকটা যেন টলিতে টলিতে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরঘরের বারান্দার উপর জলপূর্ণ কলসীটাকে ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া সিক্তবস্ত্রে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

তাঁহার ওই একমাত্র সন্তান। তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যা রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর প্রতিমা, সেই প্রতিমার বিসর্জনের আহ্বান আসিল গোলোক চাটুয্যের নরককুণ্ডে! যে গোলোক কন্যার মাতামহের অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারই হাতে সমর্পণ করার চেয়ে যে তাহার মৃত্যু ভাল, এ তাঁহার বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া 'না' কথাটাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেও নাকি ব্রাহ্মণ কুলীনেরই মেয়ে□সমাজে এবং পরিবারে

ইহা যে কিছুই বিচিত্র নয়—ইহার চেয়েও বহুতর দুর্গতি নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাই নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরটা ধুধু করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও ইহাকে অসম্ভব বলিয়া নিবাইয়া ফেলিবার একবিন্দু জল কোনদিকে চাহিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। একাকী বসিয়া নিঃশব্দে কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, অচিরভবিষ্যতে হয়ত ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবে—হয়ত এই বীভৎস মানুষটার দুর্জয় বাসনাকে বাধা দিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না।

উহার সেদিনের সকৌতুক রহস্যালাপের কথাগুলাই তাঁহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই স্মরণ হইতে লাগিল—তাহার মধ্যে যে এতখানি গরল গোপন ছিল, তাহা কে সন্দেহ করিতে পারিত!

সদর দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক-পা করিয়া প্রবেশ করিল। পড়া বোধ হয় তখনও শেষ হয় নাই, কোনদিকে না চাহিয়াই ডাক দিল, মা, মা গো?

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া সাড়া দিলেন, কেন মা?

তাঁহার ভারী গলার আওয়াজে সন্ধ্যা চমকিয়া মুখ তুলিল, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা?

জগদ্ধাত্রী কন্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিছুই ত হয়নি মা।

সন্ধ্যা আরও নিকটে আসিয়া নিজের অঞ্চলে মায়ের অশ্রুজল সযত্নে মুছাইয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি আজ কিছু করেছেন মা?

জগদ্ধাত্রী শুধু বলিলেন, না।

মেয়ে তাহা বিশ্বাস করিল না। আস্তে আস্তে জননীর পাশে বসিয়া কহিল, সংসারে সব জিনিস মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই ত আমার বাবাকে পাগলা-ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তারা ভাবতে পারে তাদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে ত জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে!

এই জ্বালা যে কি এবং তাঁহার জন্যে কাহাকে যে কোথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, ইহা সে কোনদিন ভাবিয়া পাইত না, আজও পাইল না এবং এই তাহার নিরীহ নির্বিরোধী, পরদুঃখকাতর, অল্পবুদ্ধি পিতার দুঃখে তাহার চিত্ত স্নেহে ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া চোখ-দুটি ছলছল করিয়া আসিল; কহিল, আমার যদি সাধ্য থাকত মা, তা হলে বাবাকে নিয়ে আমি বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে এমন কোথাও চলে যেতাম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে আর জ্বালা সইতে হতো না।

জগদ্ধাত্রী তাঁহার কন্যার চিবুক হইতে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, বালাই! ষাট! কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালোবাসতিস সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা কহিল, তোমাকে কি ভালবাসি নে মা?

মা বলিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেচিস, কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবিনে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ-সব কি আমি টের পাইনে সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, তাই বৈ কি! বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি!

মা বলিলেন, নেই সে কথা সত্যি।

সন্ধ্যা রাগ করিয়া বলিল, যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি একদিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি ত আগের ঢের সেরে উঠেচি।

এই বলিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া কহিল, দুলে-বৌরা উঠে গেছে মা। বাঁচা গেছে।

কখন গেল?

কি জানি! বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

তাহার কৃত্রিম ঔদাসীন্য মাকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথায় উঠে গেল জানিস?

সন্ধ্যা তেমনি তাচ্ছিল্যভরে কহিল, অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তার উড়ে মালীর একটা ভাঙ্গা পোড়ো-ঘর ছিল না? তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালো? তুই বুঝি?

সন্ধ্যা মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া কোনমতে সোজা মিথ্যাটা বাঁচাইয়া বলিল, অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাব মা? আমি কাউকে কারো কাছে পাঠাই নি।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় বিশ্রী প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি উলটাইয়া দিয়া হাতের চিঠিটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয়নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী থেকে সত্যি সত্যিই আসবেন লিখেছেন। তিনি ত কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মার চিঠি? কবে আসবেন লিখেছেন?

তাঁহার কাশীবাসিনী সন্ন্যাসিনী শ্বশ্রূ কাশী ছাড়িয়া একটা দিনের জন্যও কোথাও যাইতে চাহিতেন না। এবার জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে অনেক করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহে তাঁহাকে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়, কন্যাদান

করিতে হইবে। শাশুড়ী দান করিতে কোনমতেই সম্মত হন নাই, কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জবাব দিয়াছেন।

সন্ধ্যা নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়া বলিল, তোমার চিঠির জবাব তুমিই পড় না মা। বলিয়া কাগজখানি মায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া হঠাৎ ব্যগ্র হইয়া কহিল, ও মা, তুমি যে এখন পর্যন্ত ভিজে কাপড়েই রয়েছ—যাই তোমার শুক্নো কাপড়খানা দৌড়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

জগদ্ধাত্রী চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, বৌ বলে এতকাল পরে কি সত্যিই দয়া হলো মা! বলিয়া তিনিও উঠিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার স্বামী অত্যন্ত সোরগোল করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দুটো দিন যাইনি, দুটো দিন দেখিনি অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ্ করেচে!

স্বামীর সহিত জগদ্ধাত্রীর বড় একটা কথা হইত না, কিন্তু তাঁহার এই অতি-ব্যস্ততা এবং বিশেষ করিয়া বেলা বারোটার পূর্বে আজ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন দেখিয়া তিনি মনে মনে কিছু বিস্মিত হইলেন। মুখ তুলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি হয়েচে?

প্রিয় কহিলেন, অরুণের। ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগনোস্ করব, কারুর বাবার সাধ্যি আছে কাটে? কৈ, বিপ্নে বলুক ত এর মানে কি!

অন্য সময়ে জগদ্ধাত্রী বোধ হয় আর দ্বিতীয় কথা কহিতেন না, কিন্তু অরুণের নাম শুনিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় কহিলেন, ঐ ত বললুম গো। বিপ্নেই বুঝবে না, তা তুমি! তবু ত সে যা হোক একটু প্র্যাক্টিস-ফ্র্যাক্টিস্ করে। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ি-ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রি হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েচে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম! যেদিকে যাব না, যেদিকে একদিন নজর রাখব না, অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমন করে আমার ত প্রাণ বাঁচে না বাপু! সন্ধ্যে, কোথা গেলি আবার?

ধাঁ করে মেটিরিয়া মেডিকাখানা নিয়ে আয় ত মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি।

যাই বাবা, বলিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া কহিলেন, পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় চমকিয়া উঠিলেন, তারপরে বলিলেন, আহা হাইপো—মানসিক ব্যাধি। আজকালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় হারাণ কুণ্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ওসব হতে আমি দেব না। একটি ফোঁটা দু'শ শক্তির—

সন্ধ্যা বিবর্ণ নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদ্ধাত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয় হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, উঁহু, তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া! পাগল নয়—তারে বলে ইন্স্যানিটি। তার আলাদা ওষুধ। বিপ্নে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া লইলেন এবং স্বামীর অনর্গল বক্তৃতা সহসা দৃঢ়কণ্ঠে থামাইয়া দিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই। অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্চে?

প্রিয় বলিলেন, চাইচে! একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে—

ফের আমি? অরুণ কবে যাবে?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, কবে? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুণ্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হারাণ কুণ্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে?

প্রিয় বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা ত কেবল ওই চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ কথা গ্রামের আর কেউ জানে?

প্রিয় বলিলেন, কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তোমার ভাগ্যের কথা জানবার আমার সাধ নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পার? বলবে, তোমার খুড়ীমা এখ্খুনি একবার অতি অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, এবং কথা কহিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরেই সে দৃঢ়স্বরে বলিল, কেন মা তাঁকে তুমি বার বার অপমান করতে চাও? তোমার কাছে তিনি কি এত অপরাধ করেচেন শুনি?

জগদ্ধাত্রী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা কহিল, না, তুমি কখ্খনো তাঁকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ?

সন্ধ্যা বলিল, ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ি বিক্রি করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে, এ তুমি বলতে যাবে? এ বাড়িতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি, ঐ পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব। বলিতে বলিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, জননীর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র করিল না।

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—কেবল প্রিয়বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা বইখানা দিয়ে যা না ছাই! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে ফেলি, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা পিতার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ঔষধ-নির্বাচনে মনোনিবেশ করিলেন।

জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি মেয়ের বিয়ে কি দেবে না ঠিক করেছ?

প্রিয় কাজ করিতে করিতে বলিলেন, দেব না? নিশ্চয়ই দেব।

কবে দেবে? শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে দেবে?

হুঁ।

জগদ্ধাত্রী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, রসিকপুরে যাও না একবার!

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, রসিকপুরে? কার কি হয়েচে? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি? কখন দিয়ে গেল?

জগদ্ধাত্রী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জয়রাম মুখুয্যের নাতির সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো না।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু যাই কখন? দেখলে ত, একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যেমশায়ের ওখান থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শ্যালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার, জ্ঞানদার অসুখ? কি হ'ল আবার তার?

প্রিয় বলিলেন, অম্বল! অম্বল! খাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা বমি-বমি—অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি ফোঁটাই—

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক করে মেয়েটার একটা উপায় কর।

গৃহিণীর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর বোধ করি প্রিয়বাবুকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। কহিলেন, কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারী বকাটে! কেবল নেশা-ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, করুক নেশা-ভাঙ, হোক গে বকাটে, তবু মেয়েটা দু'দিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে। তুমি কি? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন?

এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্রিয় অবাক হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বইখানি মুড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দু-দুটো সাঙ্ঘাতিক রোগী হাতে—এমনধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায়! বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বইটা বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

গ

স্নান, পূজাহ্নিক এবং যথাবিহিত সাত্ত্বিক জলযোগাদি সমাপনান্তর মূর্তিমান ব্রহ্মণ্যের ন্যায় গোলোক চাটুয্যেমহাশয় ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন, এবং বোধ হয় সোজা বাহিরেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের বারান্দাটা ঘুরিয়া ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ, এ-সব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালীর ছাই-পাঁশ খাটুনিগুলো কি না খাটলেই নয়? তাই আমি বলি! আচ্ছা, দেহ আগে, না কাজ আগে?

জ্ঞানদা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিল, কুটিতেই লাগিল। তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকার বিকট খটাখট শব্দও যেমন তাহার কানে যায় নাই, তাঁহার উৎকণ্ঠিত অনুযোগও তেমনি যেন তাহার কানে গেল না।

গোলোক একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি? আজ সকালে আছ কেমন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, হাতের বেগুনটার প্রতি চোখ রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালো।

গোলোক অতিশয় আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক ক্ষ্যাপা-পাগলা কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরি! কিন্তু যেমন বলে যাবে টাইম-মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্চি।

জ্ঞানদা এত কথার কোন জবাব দিল না, অধোমুখে কাজ করিতেই লাগিল।

গোলোক কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েচি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে—সকালে এসেছিল ত?

জ্ঞানদা তেমনি নতমুখেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, আসবে বৈ কি! আসবে বৈ কি! সে যে আমার ভারী অনুগত। কিন্তু ঝি বেটী গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে, তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক এ-সব পড়ে। যাও ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করগে—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! এই বলিয়া গোলোক পরের এবং নিজের লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কর্তব্যই আপাততঃ শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার খড়মের একটুখানি শব্দে চকিত হইয়া এতক্ষণে জ্ঞানদা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে সেদিনের সেই প্রসন্ন হাসিটুকু আজ নাই, আজ তাহা চিন্তা ও বিষাদের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ দুটি আরক্ত, পল্লবপ্রান্তে অশ্রুর আভাস যেন তখনও বিদ্যমান—সেই সজল দৃষ্টি গোলোকের মুখের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচ? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি বল?

গোলোক থতমত খাইয়া হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, আমি? সন্ধ্যাকে? নাঃ! কে বললে?

জ্ঞানদা কহিল, যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে? সামনের অঘ্রানে সমস্ত স্থির হয়ে গেছে? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা বল।

গোলোক অস্ফুট তর্জনে শাসাইয়া বলিলেন, রাসী-বামনী বলে গেছে? আচ্ছা দেখছি তাকে! আমি—

জ্ঞানদা বলিয়া উঠিল, কেন তবে তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই,—বলিতে বলিতেই তাহার বিকৃতকণ্ঠ বুক-ফাটা ক্রন্দনে একেবারে সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল।

গোলোক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, আহা হা! কর কি, কর কি! লোকজন শুনতে পাবে যে মিছে—মিছে—মিছে কথা গো! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না কখ্খনো ঠাট্টা নয়—কখ্খনো এ মিথ্যে নয়। এ সত্যি। এ সত্যি। তুমি সব পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

না না বলচি, এ ঠাট্টা—তামাশা—নাতনী সুবাদে—আহা হা! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে! বলিতে বলিতে গোলোক খটখট করিয়া শশব্যস্তে পলায়ন করিলেন।

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের মধ্যে অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন প্রাণপণে নিরোধ করিল।

বাটীর দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জানাইল, মাসীমা, ঝি সঙ্গে করে কানা দাদামশাই যে স্বয়ং এসে হাজির গো!

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা-মুখে চাহিল। তাহার অশ্রু-কলুষিত ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখে দাসী বিস্ময়ে লজ্জায় বলিল, তোমাদের সেই পুরোনো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার শ্বশুরমশাই এসেচেন মাসীমা। কি হয়েচে গা?

খবর শুনিয়া জ্ঞানদার মুখের উপর রক্তের লেশমাত্রও যেন আর রহিল না। মুখোমুখি মৃত্যুকে দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এমন পাণ্ডুর হইয়া যায় না।

দাসী ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েচে মাসীমা?

জ্ঞানদা ইহারও উত্তর দিল না, কেবল বিহ্বল শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দাসী পুনরায় বলিল, তোমার কি কোন অসুখ করেচে মাসীমা?

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। বাবা কতক্ষণ এসেচেন কালী?

ঝি বলিল, সে ত জানিনে মাসীমা। এইমাত্র দেখলুম তিনি উঠানে দাঁড়িয়ে বাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

জ্ঞানদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুর সঙ্গে?

ঝি বলিল, হাঁ। আমি বাইরে থেকে আসছিলুম, বাবু ডেকে বলে দিলেন, কালী, তোমার মাসীমাকে খবর দাও গে তাঁর শ্বশুরমশাই তাঁকে নিতে এসেছেন। ও মা, ঐ যে নিজেই আসচেন! বলিয়া ঝি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই লাঠির শব্দে বুঝা গেল এ লাঠি যাঁর তাঁকে চোখের চেয়ে লাঠির উপরে চলাচলের পথটা অধিক নির্ভর করিতে হয়।

পরক্ষণেই একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাহর করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, আমার মা কোথায় গো?

জ্ঞানদা উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ মানুষ চিনিতে না পারিলেও চেহারাটা দেখিতে পাইতেন। তিনি আশীর্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো-বুড়ীকে এমন করে ভুলে কি করে আছিস মা?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ো শাশুড়ী মরে, কেবল মুখে তাঁর—আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও। কেমন করে এতদিন ভুলে আছ বল ত?

জ্ঞানদা এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না। কেবল এক হাতে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অন্য হাতে বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারান্দায় আনিল, এবং স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, চাটুয্যেমশাইকে দু'খানা চিঠি দিলাম। কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম, তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই। কিন্তু মা ত আমার এই দুঃখীরই ঘরের লক্ষ্মী—

যে দাসী সঙ্গে আসিয়াছিল অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, হলেই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ি ফেলে রাখতে পারে, বৌদিদি? তা ছাড়া, যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল! আমি বলি—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, থাক সদু ওসব কথা। তোমার শাশুড়ীঠাকরুন, বৌমা, বড় পীড়িত। আজ দিন ভালো দেখেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন যে আমার বৌমাকে একবার—

সদু বলিল, বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ ক'দিন থেকে কেবল বলচেন—সদু, মা আমার, যা তুই একবার এঁকে নিয়ে। এনে একবার দেখা আমার মাকে। বলিতে বলিতে সদুর গলা করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, চাটুয্যেমশায় যে আমার চিঠি দুটো পাননি, তা ত আর আমরা জানিনে।

আমরা কত কথাই না তোলাপাড়া করছিলাম। বড় ভালো লোক—সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললেন, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে? পালকি বেহারা বলে দিলেন। তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বলতে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের সময় এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখ্খুনি নিয়ে যান, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।

জ্ঞানদা এতক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল—চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্খুনি পাঠাবেন? আজই?

সৌদামিনী খুশী হইয়া কহিল, হাঁ—বললেন বৈ কি। বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন যে, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ি ধরে অনায়াসে কাল সকাল

নাগাদ বাড়ি পৌঁছান যাবে। তা ছাড়া ঘরে মর-মর রোগী, কোথাও কি একটা দিনও দেরি করবার জো আছে বৌদিদি! আহা! বুড়ী যেন কেবল হা-পিত্যেস করে তোমার পথ চেয়ে আছে!

জ্ঞানদা কেবল যেন কলের পুতুলের মত তাহার পূর্ব-কথাটাই আবৃত্তি করিতে পারিল। কহিল, উনি বললেন পাঠাবেন? আজই?

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ মা, আজই বৈ কি! থাকবার ত জো নেই।

কিন্তু সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশও রহিল না। কহিল, শোন কথা একবার। শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেচেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? তা ছাড়া, আর থাকাই বা এখানে কিজন্যে? ভালো, তোমার ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না হয় পাঠাও না বৌদিদি?

কিন্তু পাঠাইতে হইল না। বোধ করি কাছেই কোথাও তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবটা তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, না মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, স্নানাহ্নিক সেরে আহারাদির পরে একটু বিশ্রাম করে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না হয় একটু কষ্টই হবে, তা বলে—সে কি কথা! শাশুড়ীঠাকরুনের অত বড় ব্যারাম, আমার যে সহস্র ঝঞ্ঝাট—এতটুকু ফুরসত নেই, নইলে যে নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম! চিঠি কি একটাও পেলাম! তা হলে আপনাকে নাকি আবার কষ্ট করে আসতে হয়? পিয়ন বেটারা সব হয়েচে—কালী কোথায় গেলি? ভুলোকে না হয় এইখানেই বল্ না এক কল্কে তামাক দিয়ে যেতে। নিন মুখুয্যেমশাই, আর দেরি নয়, উঠুন। জ্ঞানদা, একটুখানি চটপট নাও দিদি—ওদিকে আবার তিনটের গাড়ি ধরাই চাই। আঃ—চোঙদারটা আবার বাইরে বসে—গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যে মন হয়েচে মুখুয্যেমশাই,

কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই ভরসা! বলিতে বলিতে গোলোক চাটুয্যেমশাই যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে সমস্ত বাড়িটা খড়মের কঠোর শব্দে মুখরিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল সেইদিকে চাহিয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুলো আসিয়া কহিল, মাসীমা, খোকাবাবু নাইবার জন্যে কাঁদছে। নদীতে কি নিয়ে যাব?

জ্ঞানদা তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, ভৃত্যের আবেদন বোধ হয় তাহার কানেও গেল না।

বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, আমি তা হলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

সদু কহিল, আজ আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, এবেলা ভাত খাব না বলে দিয়ো।

জ্ঞানদা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা, আমি যাব না।

বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, যাবে না? কেন মা, আজ ত বেশ দিন!

সৌদামিনী ষষ্ঠীর ফলার ভুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, আমরা যে ভট্চায্যিমশায়কে দিয়ে দিন-ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ি থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা শুধু বলিল, না বাবা, আমি যেতে পারব না।

গোলোকের বছর-দশেকের ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়া বলিল, মাসীমা, তুমি বলে দাও না মাসীমা, আমি যাব, নদীতে নাইতে—হুঁ—যাবই কিন্তু—

জ্ঞানদা কাহাকেও কিছু কহিল না, কেবল সেই দুর্দান্ত ছেলেটাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হুহু রবে কাঁদিয়া উঠিল।

ঘ

তাহার পর জ্ঞানদা সেই যে ঘরে কবাট দিল আর খুলিল না। বৃদ্ধ অন্ধ শ্বশুর সমস্ত দুপুরবেলাটা বিমূঢ় বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সৌদামিনীও গেল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের হেতু সেও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সে মেয়েমানুষ—অমন করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাওয়া তাহার সাধ্য নয়। যাইবার পূর্বে জ্ঞানদার রুদ্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া যে গুটি-কয়েক কথা বলিয়া গেল তাহা সুন্দরও নয়, মধুরও নয়।কিন্তু কোন কথার কোন জবাবই জ্ঞানদা দিল না। এমন কি তাহার একবিন্দু কান্নার শব্দ পর্যন্ত সে বাহিরে আসিতে দিল না। ছেলেবেলা বিধবা হওয়ার দিন হইতে যে শাশুড়ী তাহাকে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, একটি দিনের জন্য কোন দুঃখ দেন নাই, আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়, কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার দুঃখের জীবন মুক্তি পাইতেছে না, অথচ, তাহার অশক্ত অন্ধ শ্বশুর রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিলেন—এ যে কি এবং কি করিয়া যে এই ব্যথা সে তাহার রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একাকী বহন করিতে লাগিল, সে কেবল জগদীশ্বরই দেখিলেন, বাহিরে তাহার আর কোন সাক্ষ্য রহিল না।

বৃদ্ধের যাইবার সময় গোলোক দেখা করিলেন, সবিনয়ে পাথেয় দিতে চাহিলেন, এবং জ্ঞানদার না যাওয়ার বিস্ময় ও বেদনা তাঁহার বুদ্ধিকেও যেন অতিক্রম করিয়া গেল।

গোলোক বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য বসিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলোক নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ঘাড়টা একটুখানি নড়িয়া বলিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম বাবাজী!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, শুনেই ত মুখে দুটি ভাত দিয়েই ছুটে আসচি চাটুয্যেমশাই!

গোলোক বলিলেন, তা ত আসচ হে—কিন্তু ঘটকালি ত করে বেড়াও, বলি দেশের খবর-টবর কিছু রাখো? হাঁ, ঘটক ছিলেন বটে তোমার পিতামহ রামতারণ শিরোমণি! সমাজটি ছিল নখ-দর্পণে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, আমার অপরাধ কি? এ-সব কি মেয়েমানুষের কাজ? কিন্তু, সে যাই হোক—জগো বামনীর মেয়েটার কি আস্পর্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাসুপিসীর কাছে শুনে পর্যন্ত আমরা যেন রাগে জ্বলে যাচ্চি।

গোলোক অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কি কি? ব্যাপারটা কি বল দেখি?

আপনি কি কিছু শোনেন নি?

না না, কিছু না। হয়েচে কি?

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, আপনারও গৃহশূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া করে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুড়ী নাকি তেজ করে সকলের সুমুখে বলেচে—কথাটা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে মশায়—বলেচে নাকি, ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পরিয়ে দেব! তাঁর মা-বাপও নাকি তাকে সায় দিয়েচে।

রাগে গোলোকের চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এক নিমিষে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, বলেচে নাকি? ছুড়ী আচ্ছা ফাজিল ত!

ক্রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কহিল, হোক ফাজিল, কিন্তু তাই বলে আপনাকে বলবে এই কথা! জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! আপনি বলেন কি?

গোলোক প্রশান্ত হাসিমুখে কহিলেন, ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই। আমার মর্যাদা সে জানবে কি—জানো তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয় গলাটা কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি তা হলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসুপিসীকে দিয়ে—

গোলোক কহিলেন, রাধামাধব! তুমিও ক্ষেপলে বাবাজী! যার অমন গৃহলক্ষ্মী যায়, সে নাকি আবার—বলিয়া অকস্মাৎ প্রবল নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তাঁহার ভক্তি-গদ্গদ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

গোলোক কয়েক মুহূর্ত পরে উদাসকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ছাইপাঁশ মনেও পড়ে না কিছু—লোকজনেরা ত দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন—আমাকে ত জানো, চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই গতি মুক্তি!

ঘটক মৃত্যুঞ্জয় পাইয়া বসিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে তাই যদি হয়,আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে। ব্রাহ্মণ গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হলো—কিন্তু যেমন লক্ষ্মী, তেমনি সুরূপা।

গোলোক বলিলেন, তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়! আমার ওসব সাজে, না ভাল লাগে? তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর-চোদ্দর হলো? বেশ একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই শুনেচি, না?

মৃত্যুঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, আজ্ঞা হাঁ, খুব খুব। তা ছাড়া যেমন শান্ত তেমনি সুন্দরী।

গোলোক মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঃ! আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার সুরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারিনে, শুনলে দুঃখই হয়। তেরো-চোদ্দ যখন বলচে তখন পনর-ষোল হবেই। ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়িয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

গোলোক কহিলেন, বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়সও ধর পঞ্চাশের কাছে ঘেঁষেই আসচে—কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয় পুনঃপুনঃ শির সঞ্চালন করিতে লাগিল। গোলোক পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝকমারি তা আমিই জানি। কে খেতে পাচ্চে না, কে পরতে পাচ্চে না, কার চিকিৎসা হচ্চে না—এ-সকল ত আছেই, তার ওপর এইসব জুলুম হলে ত আমি আর বাঁচিনে মৃত্যুঞ্জয়! প্রাণকৃষ্ণ গরীব—তা মেয়েটি বুঝি বেশ ডাগর হয়ে উঠেচে? তের-চোদ্দ নয়, পনর-ষোলর কম হবে না কিছুতেই—তা বলো না হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে—

মৃত্যুঞ্জয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, আজই—গিয়েই পাঠিয়ে দেব—বরঞ্চ, সঙ্গে করেই না হয় নিয়ে আসব।

গোলোক উদাসকণ্ঠে কহিলেন, এনো, কিন্তু বড় বিপদে ফেললে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি করে! মধুসূদন! ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন। যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বৈ ত না।

মৃত্যুঞ্জয় নীরব হইয়া রহিল।

গোলোকের হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, হাঁ দ্যাখো, তোমাকে যেজন্যে ডেকে পাঠিয়েচি, তাই এখনো বলা হয়নি। বলচি, মাসটা বড় টানাটানি চলচে, তোমার সুদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয় করুণসুরে বলিল, এ মাসটা যদি একটু দয়া করে—

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাইনে। কিন্তু বাবাজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল হইয়া কহিল, যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন।

গোলোক বলিলেন, সনাতন হিন্দুধর্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা করে চলা ত সোজা দায়িত্ব নয় মৃত্যুঞ্জয়! এ মহৎ ভার যার মাথার উপর, তার সকল দিকে চোখকান খুলে রাখতে হয়। শুনেছিলাম প্রিয় মুখুয্যের মায়ের সম্বন্ধে কি একটা নাকি গোল ছিল। এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ করে আনতে হবে। সে ছিলেন বটে তোমার পিতামহ শিরোমণি-মশায়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ—ভূপতি চাটুয্যের যে দশটি বছর হুঁকো-নাপ্তে বন্ধ করে দিয়েছিলাম—ভায়াকে শেষে বাপ বাপ করে ছন্নভন্ন হয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হলো, সে ত তোমার পিতামহের সাহায্যেই। কিন্তু তোমরা বাবা তাঁর কীর্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ-কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাহার পূর্বপুরুষের তুলনায় নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি দেখবেন, চাটুয্যেমশায়, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনব।

গোলোক উৎসাহ দিয়া বলিলেন, তা তুমি পারবে, পারবে। কত বড় বংশের ছেলে। কিন্তু দেখ বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ-কান করবার আবশ্যক নেই—কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপনে থাক; সমাজের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার প্রয়োজন। তা দ্যাখো, কেবল সুদ কেন, তোমার

আসল টাকাটাও আমি বিবেচনা করে দেখব। কষ্টে পড়েচ, এ কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে—আমরা আপনার চরণেই ত পড়ে আছি।আমি কালই এর সন্ধানে যাব—এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

গোলোক জিভ কাটিয়া কহিলেন, অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্তমাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটাণুকীটের ন্যায় পড়ে আছি। এই বলিয়া তিনি উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলোক সহসা কহিলেন, আর দ্যাখো, প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তিন প্রসিদ্ধ জয়রাম মুখোর দৌহিত্র শ্রীমান বীরচন্দ্র বন্দ্যোর সহিতই সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। আগামীকল্য বরপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিবেন, বাড়িতে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি বিবাহ, একটিমাত্র দিন আছে, তাহার পরে দীর্ঘদিনব্যাপী অকাল। এই সূত্রে বহু বৎসর পরে বহু সাধ্যসাধনায় শাশুড়ি কাশী হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন রচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহারই অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ি কালীতারা মালা জপ করিতেছিলেন। শীতের আভাস দিয়াছে, তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরিধানেও সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র; পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ের বুঝি আর দিন-দশেক বাকী রইল বৌমা?

জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, কোথায় দশ দিন মা? এই আজ নিয়ে ন'দিন। কাজটা হয়ে গেলে যেন বাঁচি। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হলে আর ভরসা হয় না।

শাশুড়ী একটু হাসিয়া কহিলেন, সব দেশেই এই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামেই নয়। কিন্তু এতে আশা-ভরসাই বা কি আছে বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে যখন জলে ফেলেই দিচ্চ?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, প্রিয়র কাছে সমস্তই শুনেচি। আজ সকালে স্নানের পথে অরুণকেও দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হলো না বৌমা?

জগদ্ধাত্রী বিশেষ খুশী হইলেন না, বলিলেন, কিন্তু কেবল পছন্দই ত সব নয় মা?

শাশুড়ী বলিলেন, নয় মানি। কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু করে যতটুকু পেলাম তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না?

চোখে তাঁহার বহুদিন পড়িয়াছে, কিন্তু স্বীকার করা যে একেবারে অসম্ভব। বরঞ্চ সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিলেন, কাজ-কর্মের বাড়ি, কেউ যদি এসে পড়ে ত শুনতে পাবে মা।

শাশুড়ী আর কিছুই বলিলেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী নিজের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা মা, তুমি কি করে এমন কথা বল?

তোমার এতবড় কুলের মর্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল ত? তা ছাড়া তার ত জাতও নেই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেচে, এ কথাটা কি তোমাকে তারা বলেছে?

জগদ্ধাত্রী মনে করিলেন, ইহার পরে আর কাহারও বলিবার কিছু থাকিতেই পারে না। কিন্তু শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বলেচে বৈ কি। কিন্তু তার কিছুই যায়নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচি নে। ছোটজাত বলে যে অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে

তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে, বৌমা, তাকে আর মানুষ মারতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী মনে মনে কুপিত হইয়া বলিলেন, অনাথা বলেই কি হাড়ি-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়িতে বাস করবে মা? এই কি শাস্তরে বলে?

শাশুড়ী বলিলেন, শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানিনে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা ত ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে, ত বুঝতে বৌমা, ছোটজাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতিনিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্চেন। এই যে কুলের মর্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন করে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা?

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, তা হলে কি মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

শাশুড়ী একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, পৃথিবী ত চলে না বৌমা,—চলে কেবল আমাদের মত অভিশপ্ত জাতের। আমি বিদেশে থাকি, অনেক বয়স হল, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম,—আমি জানি যাকে বংশের মর্যাদা বলে ভাবচো, যথার্থ সে কি! কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমার মনে রেখো মা, মিথ্যাকে মর্যাদা দিয়ে যত উঁচু করে রাখবে তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠচেও তাই।

জগদ্ধাত্রী কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মেয়েকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা খিড়কির বাগানে এতক্ষণ তাহার ফুলগাছে জল দিতেছিল, বাড়িতে প্রবেশ করিয়া হাতের ঘটিটা প্রাঙ্গণের চাতালের উপর রাখিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ের প্রতি চাহিয়া কহিল, ও-কি মা?

চন্দ্রপুলি বুঝি? বলিয়াই হঠাৎ পিতামহীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ঠাকুরমা, সক্কলের নাড়ু আছে, আমাদের নেই কেন?

কালীতারা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, তা ত আমি জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা কহিল, বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ কথা জিজ্ঞেসা করোনি!

কালীতারা বলিলেন, কি করে আর জিজ্ঞেস করব ভাই, জন্মে ত কোনদিন শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখিনি।

জগদ্ধাত্রী ইহা জানিতেন, তিনি লজ্জিত-মুখে নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবসুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? এক শ’? দু’শ’? তিন শ’? চার শ’?

ঠাকুরমা পুনরায় হাসিলেন—ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তারপরেও অনেক বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কত, সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না, তা আমি জানব কি করে?

সন্ধ্যা বলিল, আহা, তাঁর লেখা ত ছিল? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুরমা, তা হলে বাবাকে দিয়ে আমি খোঁজ করাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমার কত কাকা, কত জ্যাঠামশাই, কত ভাই-বোন সব আছেন, না ঠাকুরমা? আহা, তাঁদের যদি সব জানতে পারা যেত!

একটুখানি হাসিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুদ্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক’টাকা দিতে হতো? দর-দস্তুর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া বেধে যেতো,—না?

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জ্যাঠামি রেখে ঠাকুরের শেতলের জোগাড়টি সেরে ফেল্ দিকি সন্ধ্যে!

ঠাকুরমা নিজেও একটু হাসিয়া বলিলেন, সমস্তই ত জানো দিদি, কিন্তু তবু ত তোমাদের মোহ কাটে না!

এইসকল বিরুদ্ধ-আলোচনা জগদ্ধাত্রীর গোড়া হইতেই ভাল লাগিতেছিল না এবং মনে মনে তিনি বিরক্তও কম হইতেছিলেন না; শাশুড়ীর কথার উত্তরে বলিলেন, তখনকার দিনের কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ করে না, ওসব অত্যাচারও আর নেই। আর জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে কি বংশের সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা? আমি বেঁচে থাকতে ত সে হবে না।

গৃহস্বামিনী পুত্রবধূর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী নীরব রইলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ব্যথিত হইয়া উঠিল; সে পিতামহীর আর একটু কাছে গিয়া কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, কেন তাঁরা অমন অত্যাচার করতেন ঠাকুরমা? তাঁদের কি মায়াও হতো না?

ঠাকুরমা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া বলিলেন, মায়া কি করে হবে দিদি? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হয়তো কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারো প্রাণ কাঁদে? আর সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে? তোমার ওপরে যা হতে যাচ্চে সে কি কারও চেয়ে কম অত্যাচার দিদি?

জগদ্ধাত্রী হাতের কাজ রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কঠোরস্বরে মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুই ঠাকুরঘরে যাবি, না আমি কাজকর্ম ফেলে রেখে উঠে যাবো সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথাও কহিল না, উঠিবারও চেষ্টা করিল না।

ধীরে ধীরে পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, যে জিনিসটার এত সম্মান—এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভাল?

এবার শাশুড়ীও বধূর রুক্ষ-কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। নাতিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সে-ই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই না কি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হয়েছে,—বলিতে বলিতে তাঁহার গলা যেন ভিতরের অব্যক্ত যাতনায় বুজিয়া আসিল।

সন্ধ্যা তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, থাক গে ঠাকুরমা এ-সব কথা।

তিনি অন্য হাত দিয়া পৌত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে আপনি একমুহূর্তেই সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর সহজকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য-মর্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দিনও একদিন এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদের বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবদ্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তা হলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়—ছোটজাত বলে যে দুলে-মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, তাদেরও ছোটো বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হতো।

জগদ্ধাত্রী ক্রোধ এবং বিরক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সন্ধ্যা চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সত্যবাদিনী সন্ন্যাসিনী পিতামহী ভিতরের কি একটা অত্যন্ত লজ্জা ও ব্যথার ইতিহাস কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার বুক

ফাটিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সহিত ইহার কি যেন একটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সে সলজ্জে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি ঠাকুরমা, আমাদের মধ্যে খুব বেশি অনাচার প্রবেশ করেচে? যা নিয়ে আমরা এত গর্ব করি তার কি অনেকখানি ভুয়ো?

পিতামহী কহিলেন, এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিতেও যে তাঁর চোখে জল আসিয়া পড়িল তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও সন্ধ্যার অবিদিত রহিল না। তিনি হাত দিয়া চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আমি মাঝে মাঝে কি মনে করি জানিস সন্ধ্যা? মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে-গড়া গণ্ডি, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তঁর প্রকাশ্য মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্যে দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জনাই কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।

অতঃপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার নিশ্চয় মনে হইতে লাগিল, ইহার সহিত তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সত্যই কি একটা কদর্য সম্বন্ধ আছে এবং কিছু না বুঝিয়াও তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, যাও দিদি, ঠাকুরঘরের কাজটি সেরে ফেল গে, নইলে তোমার মা বড় রাগ করবেন।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, তিনি নিজেই করে নেবেন এখন। বলিয়াই সে তাঁহার একটা হাত ধরিয়া কহিল, চল না ঠাকুরমা আমার ঘরে গিয়ে একটু সেকালের গল্প করবে!

এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

৬

রাত্রি খুব বেশী হয় নাই, বোধ হয় একপ্রহর হইয়া থাকিবে, কিন্তু শীতের দিনের পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে অত্যন্ত গভীর মনে হইতেছিল। জ্ঞানদার শয়ন-কক্ষের এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘরের মেঝেয় বসিয়া জ্ঞানদা এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, কথা শোন্ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে—খেয়ে ফ্যাল্। আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি! পাপের ওপর এতবড় পাপ আমি কি করে করব? নরকেও যে আমার জায়গা হবে না!

রাসমণি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, আর এতবড় কুলে কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয় সয় তাই কর্ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এতবড় একটা দেশপুজ্যি লোকের মাথা হেঁট করে দিসনে।

জ্ঞানদা হাতজোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ও আমি কিছুতে খেতে পারব না, আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, তবে, তাই বল্ মরবার ভয়ে খাব না। মিছে ধর্ম ধর্ম করিস নে।

জ্ঞানদা কহিল, কিন্তু ও যে বিষ!

রাসমণি বলিলেন, বিষ তা তোর কি? তুই ত আর মরচিস নে। বলিয়াই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চক্ষের নিমিষে কোমল ও করুণ করিয়া কহিলেন, পাগলী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিস খেতে বলতে পারি বোন? এ কি

কখনো হয়? রাসী-বান্নীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি—কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেচে, সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক—কতক্ষণেরই বা মামলা! তারপরে যা ছিলি তাই হ—খা, দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থ-ধর্ম বার-ব্রত কর্—এ কথা কে-ই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে!

জ্ঞানদা অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে আনতে বলে দি' বোন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না, আমি ওসব কিছুতেই খাবো না—আমি কখ্খনো তা হলে আর বাঁচব না।

রাসমণি ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন, এ ত তোর ভারী ছিষ্টিছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্, যা এখান থেকে। পুরুষ মানুষ, একটা অ-কাজ না হয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমনি জিদ ধরলে ত চলে না। চাটুয্যেদাদা ত বলেচেন, বেশ, যা হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্চি, ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক। তারপরে ত তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা? টাকাটাও ত কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা কহিল, আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে কার কাছে গিয়ে এ মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি বলিলেন, এ তোমার জব্দ করার মতলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলেচে কাশী-বৃন্দাবন! এত লোকের স্থান হয়, আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, রাসুদিদি, আমি সব জানি। কাল ওঁর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও জানি। আজ, তাই আমাকে বিষ দিয়ে হোক, কাশীতে পাঠিয়ে হোক, বাড়ি থেকে দূর করা চাই। কিন্তু ভগবান! বলিতে বলিতে সে সহসা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাত জোড়

করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবান! তোমার পায়ে এত লোকের যখন স্থান হয়, তখন আমারও হবে।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করিনি, হয়ত কখনো করতেও হতো না—কিন্তু তুমি ত সব জানো? এর সমস্ত শাস্তির বোঝা কি কেবল নিরুপায় বলে আমার মাথাতেই তুলে দেবে?

ভগবানের নামে রাসমণির বোধ করি বিরক্তির অবধি রহিল না, তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, আ-মর্! শাপমন্যি দিস কেন? কচি খুকি! চোর মরে সাত বাড়ি জড়িয়ে,—এ হয়েচে তাই। তুমি আশকারা না দিলে পুরুষমানুষের দোষ কি! কৈ বলুক ত দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসী-বাম্নীকে—

ইহার আর উত্তর কি? জ্ঞানদা নীরবে অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলিলেন, বেশ ত জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে ত বিশ্বেস হয়? সেই না হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক হইয়া বলিল, তিনি দেবেন?

রাসমণি বলিলেন, হুঁ! দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েচে, এসে পড়ল বলে! তখন কিন্তু না বললে আর হবে না বলে দিচ্চি।

জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল। রাসমণি অধিকতর উৎসাহজনক আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অদূরে প্রাঙ্গণে জুতার শব্দ এবং প্রিয় মুখুয্যের গলা শোনা গেল— আঃ! এখানে একটা আলো দেয় না কেন? লোকজন সব গেল কোথায়?—বলিতে বলিতে খটখট করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বগলে চাপা ছোট-বড় চার-পাঁচখানা বই তক্তপোশের উপর এবং হাতের বাক্সটা নীচে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, আজ কেমন আছ জ্ঞানদা? উঁহুঁ, হুঁ,—ও চলবে না—ঠাণ্ডা পড়েচে, মাটিতে বসা চলবে না—রেমিডিটা একটু পালটে দিতে হলো

দেখচি! এ কে, মাসী যে! কতক্ষণ? ভালো ত সব? তোমার নাতনীটিকে কাল রাস্তায় দেখলাম—তেমন ভালো বলে ত মনে হলো না? ক্ষিদে কেমন? কাল নিয়ে গিয়ে তার জিভটা একবার দেখিয়ো দিকি। মরবার ফুরসত নেই, কোন্দিকে যে যাই! যেদিকে নজর না রাখব অমনি—কাল মেয়েটার বিয়ে—মাসী, কাল কিন্তু সকালবেলাতেই যাওয়া চাই। মেয়ের বিয়ে, কাল কিছু আর বা'র হতে পারব না,—কিন্তু রোগীগুলোর কি যে হবে তাই কেবলি ভাবচি। একটা আধটা ত নয়! এমনি হয়েচে যে প্রিয় মুখুয্যেকে ছেড়ে কেউ আর বিপ্নেকে ডাকতেই চায় না। তারই বা চলে কি করে? দুঃখও হয়, তবু যা হোক একটু শিখেচে ত! দাও হাতটা একবার দেখি। পঞ্চা গয়লার শুনলাম বুকে সর্দি বসে গেছে—খপ্ করে একবার দেখে আসতে হবে। দাও হাতটা একবার—

জ্ঞানদা হাত বাড়াইয়া দিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রাসমণি বলিলেন, ছুড়ীর ব্যারামটা কি ঠাওরালে বল দিকি জামাই?

প্রিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ডিজিস্—গরহজম, অজীর্ণ—অম্বল! অম্বল!

কিন্তু প্রশ্নকারিণীর মৃদু মৃদু শিরশ্চালনা দেখিয়া তাঁহার ডাক্তারি-বিদ্যা একেবারে নিবিবার উপক্রম করিল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্নে এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ দেখি, কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণির মুখে সত্য-মিথ্যা, উগ্র-কোমল, ভাল-মন্দ কিছুই বাধে না, ভূমিকা করিয়া কথা কহিবার প্রয়োজন তাঁহার দৈবাৎ ঘটে—কিন্তু তবুও তাঁহাকে আজ সাবধান হইতে হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, বিপিন ডাক্তারকেও ডাকা হয়নি, পরাণ চাটুয্যেও আসেনি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ কথা চাটুয্যেদাদা যে সক্কলের কাছে বলে বেড়ায়।

বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্নেকে যে আমি দশ বচ্ছর শেখাতে পারি। সেবার পল্সেটিলা দিয়ে—

মাসী বললে, তা ছাড়া ছুড়ী এমন কাণ্ড করে বসল বাবা যে, আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্যন্ত জো নেই।

প্রিয় উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসী, এ-সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু, তাও বলে যাচ্চি, দুটির বেশি তিনটি রেমিডি আমি দেব না। কেমন জ্ঞানদা, গা-বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে থামল কিনা? ঠিক বল?

জ্ঞানদার আনত-শির একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল। তাহার হইয়া রাসমণি বলিলেন, তোমাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিশ্বাস করে না বাবা, তোমার ওষুধ যেন ওর ধন্বন্তরি। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয় পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া-কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উলটো!

প্রিয় হাতটা তুলিয়া কহিলেন, উলটো নয় মাসী, উলটো নয়। বিপ্নে মিত্তিরের হাতে পড়লে তাই হয়ে দাঁড়াত বটে, কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে!

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি বাঁচাও ত ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্বনাশী যে এদিকে সর্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হলো বাবা।

কিন্তু এত বড় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও তাঁহার শেষ কথাটা যে বেশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল না, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া মাসী চক্ষের নিমিষে অনুভব করিলেন, এবং ইহাই যথেষ্ট পরিস্ফুট করিতে প্রিয়নাথকে তিনি ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকয়েক কথা বলিতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, বল কি মাসী? জ্ঞানদা—?

মাসী কহিলেন, কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নিচু হয়।

একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুড়ি কি ঢলাঢলিটা করলি বল্ দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার জ্ঞানদার মুখখানা তিনি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসী, এ-সব ওষুধ আমার কাছে নেই। বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা এবং বইগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসমণি আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, বল কি পিওনাথ, আর কি পাঁচ-কান করা যায়? হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর, শূদ্দুর, বামুনের মান-মর্যাদা কি তারে বলা যায়?

কিন্তু বলিবার পূর্বেই সহসা দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে গোলোক প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়র বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, বিষের ভয়ে ও যে আর কারও ওষুধ খেতে চায় না বাবা, নইলে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে, প্রিয়নাথ।

প্রিয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না, না, ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই। আমি রোগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, ব্যস্! বিপিন-টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ওসব জানি-টানিনে। বলিয়া আর একবার তিনি বইগুলা বগলে চাপিবার আয়োজন করিলেন।

গোলোক সেই হাতটা তাহার আর একবার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন, প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে তোমার আমি শ্বশুরই হই। রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না। দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়নাথ হাতটা পুনরায় ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, সম্পর্কে শ্বশুর হন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক ত আপনি! পরলোকে জবাব দেব কি!

গোলোক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত জাদুবলে এক নিমিষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রিয় শুধু আশ্চর্য নয়, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; বলিলেন, কি দরকার! বাঃ- বেশ ত! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলোক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস হারামজাদা নচ্ছার? কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে?

জ্ঞানদার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হলো না! বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ-সময়ে তাঁর সেবা করো গে। কিছুতে গেলিনে এইজন্যে? রাত-দুপুরে চিকিচ্ছে করাবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই ত, আমার নাম গোলোক চাটুয্যেই নয়।

জ্ঞানদার মাথায় কাপড় নাই—কখন পড়িয়া গেছে জানিতেই পারে নাই—মুখেও কথা নাই—কেবল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে যেন একেবারে পাথর হইয়া রহিল।

গোলোক রাসমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, রাসু, চোখে দেখলি ত এদের কাণ্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়িতে পাপ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হলো রে!

রাসমণি নিজেও এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, হলোই ত দাদা!

গোলোক কহিলেন, কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি কহিল, রইলুম বৈ কি। আমি বলি, রাত্রিতে ত একটু হাত আজাড় হলো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি, না বেশ দুটিতে বসে বসে হাসি-তামাশা, খোশগল্প হচ্ছে।

জ্ঞানদা ইহার কোন উত্তর দিল না, তেমনি প্রসারিত-চক্ষে পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিল।

প্রিয় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, গোলোক ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বইগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, বেরো ব্যাটা পাজী নচ্ছার আমার বাড়ি থেকে! কি বলব, তুই রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধ-মরা করে তোকে থানায় চালান দিতাম! বলিয়া পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন এবং যে চাকর-দাসীরা গোলযোগ শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদেরই মধ্য দিয়া তাঁহাকে বারংবার ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

প্রিয় বলিতে বলিতে গেলেন, বাঃ—বেশ মজা ত!

চাকর-দাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং রাসমণি নীরবে তাহাদেরই পিছনে পিছনে নিঃসাড়ায় সরিয়া পড়িলেন।

রহিল কেবল জ্ঞানদা—তেমনি নিশ্চল, তেমনি বাক্যহীন, তেমনি অচেতন মূর্তির মত বসিয়া।

চ

আজ সমস্ত দিন ধরিয়াই কাছে ও দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল। অঘ্রানের আজিকার দিনটি ছাড়া অনেকদিন পর্যন্ত বিবাহের দিন নাই; তাই বোধ হয় এই ছোট গ্রামখানির মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচটা বাড়িতে শুভ-বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে। আজ সন্ধ্যার বিবাহ।

নানা কারণে অরুণ এখনো পর্যন্ত বাসস্থান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পূর্বের মত আবার সে কাজকর্মও শুরু করিয়াছে। বাহির হইতে জীবনে তাহার কোন পরিবর্তনও দেখা যায় না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইতে পারিত যে, দেশের প্রতি মমতাবোধটা তাহার যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তাহারা যেন তেমনি দূরে সরিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে 'একঘরে', এতগুলা বিবাহবাটীর কোনটা হইতেই তাহার নিমন্ত্রণ ছিল না, সামাজিকতা রাখিতে তাহার কোথাও যাইবার নাই, আজ সকল বাটীর দরজাই তাহার কাছে রুদ্ধ।

সন্ধ্যার পর হইতে তাহার দোতলার পড়িবার ঘরটিতে সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শীতের হাওয়া বহিতেছে, কিন্তু তবুও ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হয় নাই—সব কয়টাই খোলা খাঁখাঁ করিতেছিল। নির্মেঘ নির্মল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারই একটুকরা পিছনের মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্মুখের খোলা বারান্দার অদূরে একটা ছোট নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল, সে তাহার প্রতি অর্ধ-জাগ্রত অর্ধ-নিদ্রাতুরের ন্যায় চাহিয়া কি যে

ভাবিতেছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। পাচক আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, ক্ষুধা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল, এবং দেওয়ালে একটা অন্ধকার স্থান হইতে ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া তাহার শোবার সময়টা নির্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আজ তাহার নড়িবার ইচ্ছাই হইল না, যেমন ছিল তেমনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার কানে সদর দরজায় করাঘাতের আওয়াজ এবং পরক্ষণে তাহা খোলার শব্দও শুনিতে পাইল। একবার ইচ্ছা করিল ডাকিয়া হেতু জিজ্ঞাসা করে, কারণ, পল্লীগ্রামে এত রাত্রে সহজে কেহ কাহারও বাটীতে যায় না, কিন্তু উদ্যমের অভাবে প্রশ্ন করা হইল না।

কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। মুহূর্ত-কয়েক পরেই দ্বারপ্রান্তে নূতন রেশমের শাড়ির প্রবল খসখস শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কে একজন ঝড়ের মত ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল।

অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জ্যোৎস্নার আলোকে ইহার পরিধানের রাঙ্গা চেলী চকচক করিতেছে। এ যে কে, তাহা চক্ষের নিমেষে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্তেই একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহারও সময় রহিল না। একটা ভয়ানক মর্মান্তিক চাপা কান্নায় অকস্মাৎ ঘরের বাতাস, ঘরের আঁধার, ঘরের ম্লান আলোক, ঘরের যাহা-কিছু সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে যেন চিরিয়া খানখান হইয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে থাকিয়া অরুণ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পরিধানের রাঙ্গা চেলীর সঙ্গে সর্বাঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নায় জ্বলিতে লাগিল, সুন্দর ললাটে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়া চন্দনের

পত্রলেখা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই ঈষৎ নিম্নে অশ্রুভরা আয়ত চোখ দুটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।নারীর এমন রূপ অরুণ আর কখনো দেখে নাই, সে যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা কহিল, অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেচি তোমাকে নিয়ে যেতে। আর আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

কোথায় যাব?

যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে চলে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল। কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছে সে বুঝিল। কিছু একটা কলহের পর বর-পক্ষীয়েরা জোর করিয়া পাত্র তুলিয়া লইয়া গেছে। হিন্দুসমাজে এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে, তাই সেই অপরের পরিত্যক্ত আসনে অকস্মাৎ তাহার ডাক পড়িয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, আজ সন্ধ্যার বিবাহ হওয়া চাই-ই।

কিন্তু নিজে আঘাত খাইলেও অরুণ প্রতিঘাত করিতে পারিল না, বরঞ্চ সস্নেহ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছিঃ—তোমার নিজে আসা উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমন ত প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ ত আসতে পারতেন?

বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েচেন! মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরাধরি করে তুলেচে। আমি সেইসময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এত বড় সর্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারও হয়েচে? আমরা বাঁচব কি করে?

তাহার শেষ কথাটায় অরুণ পুনরায় ঘা খাইল। কহিল, কিন্তু আমাকে দিয়ে ত তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারী ছোট বামুন! কিন্তু দেশে আরও অনেক কুলীন আছে—তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানেই গেছেন।

সন্ধ্যা কাঁদিয়া বলিল, না, না, না অরুণদা—বাবা কোথাও যাননি, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালোবাসো,—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

তাহার ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় অরুণ ক্লেশ বোধ করিল, হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে সন্ধ্যা বাধা দিয়া বলিল, না আমি উঠব না—যতক্ষণ পারি তোমার পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। কুলরক্ষা হবে না বলছিলে? কার কুল অরুণদা? আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে! তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না! উঃ! এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম!

অরুণ চমকাইয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল বুঝি বা সন্ধ্যা প্রকৃতিস্থা নয়। হয়ত এ-সমস্তই তাহার উষ্ণমস্তিষ্কের উদ্ভট বিকৃত কল্পনা। হয়ত বা এ-সকল কিছুই ঘটে নাই—সে পলাইয়া আসিয়াছে—বাড়িতে তাহাদের এতক্ষণ হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ি পাঠাইবার অভিপ্রায়ে সস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, চল সন্ধ্যা, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল, চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চল—নইলে কি জানি, তুমিও হয়ত—কি বলেছিলুম তোমাকে একদিন? ছোট বামুন, না? আজ বোধ হয় সেই পাপেই কেবল প্রমাণ হয়ে গেল আমি বামুনের মেয়ে নই। উঃ—আমরা বেঁচে থাকব কি করে অরুণদা?

তাহার মানসিক যাতনার পরিমাণ দেখিয়া অরুণের মন আবার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল হয়ত বা যথার্থই কি একটা ঘটিয়াছে—হয়ত বা সে সত্য ঘটনাই বিবৃত করিতেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কে এ কথা প্রমাণ করলে?

কে? গোলোক চাটুয্যে। হাঁ, সেই। কি আমাকে সে বলেছিল জানো? জানো না? আচ্ছা, থাক তবে সে কথা। মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো। একজন তাঁকে ডেকে বললে, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পার? একজন আমার মাকে দেখিয়ে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচ—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে এদের জাত মারচ? তারপরে, বাবাকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোন, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয়, সে হিরু নাপ্তের ছেলে।

অরুণ বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছ সন্ধ্যা?

কিন্তু সন্ধ্যা বোধ করি এ প্রশ্ন শুনিতেই পাইল না—নিজের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা ঠাকুরমার সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন সত্যি কিনা? বলুন ও কার ছেলে? মুকুন্দ মুখুয্যের, না হিরু নাপিতের? বলুন? অরুণদা, আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারলেন না। ওগো! এ সত্যি, এ সত্যি, এ ভয়ঙ্কর সত্যি! সত্যিই আমাদের তোমরা যা বলে জানতে তা আমি নই। তোমার সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে নয়!

অরুণের মনের মধ্যে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবকাশ রহিল না, শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে, সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপরে চোদ্দ-পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে—মুকুন্দ মুখুয্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দু'দিন বাস করে চলে যায়।—ওঃ—ভগবান!

অরুণ তেমনি নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, কি বলছিলাম অরুণদা? হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তারপর থেকে লোকটা প্রায়ই আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিত না। তারপরে একদিন যখন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন। উঃ—আমি মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম, বড় হতে দিতাম না।—কি বলছিলাম?

অরুণ অস্ফুট-স্বরে বলিল, লোকটা ধরা পড়ে গেল?

সন্ধ্যা বলিল, হাঁ হাঁ, তাই। ধরা পড়ে গেল। তখন সে কি কথা স্বীকার করলে জানো? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়োমানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর্, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ্, এখন থেকে যা-কিছু রোজকার করে আনবি তার অর্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ চমকিয়া বলিল, এ কাজ সে আরও করেছিল নাকি?

সন্ধ্যা কহিল, হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেত। সে আরও কি বলেছিল জানো? বলেছিল, এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, খুব সম্ভব সত্যি। নইলে ব্রাহ্মণ-কুলে গোলোকের মত কসাই বা জন্মায় কি করে? অথচ, এরাই সমস্ত হিন্দুসমাজের মাথায় বসে আছে।

তারপর ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে গিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি তিনি কোথাও মুখ দেখান না।

সন্ধ্যা পুনশ্চ কহিল, হিরু নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুরমশাই, পরকালে কি জবাব দেব? তার মনিব বলেছিলেন, সে পাপ আমার,—আমি তার জবাব দেব। হিরু জিজ্ঞেসা করেছিল, তাদের গতিই বা কি হবে ঠাকুর?

ঠাকুরমশাই হেসে বলেছিলেন, তারা আমার স্ত্রী, তোর নয়। তোর এত দরদ কিসের? যাদের চোখে দেখিনি, চোখে দেখব না, তাদের গতি কি হবে না হবে সে চিন্তা আমারই বা কি, তোরই বা কি! আমাদের চিন্তা টাকা রোজগার। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, কে বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে। কিন্তু তখন ত ভাবিনি তার মানে আজ এমন করে বুঝতে হবে! কিন্তু রাত যে বেশী হয়ে যাচ্ছে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চিরজীবনে ভুলব না। বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অরুণ অনিশ্চিত-কণ্ঠে সঙ্কোচের সহিত বলিল, কিন্তু এখন ত তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারিনে সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা চকিত হইয়া কহিল, কেন? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি বাঁচব কি করে?

এই আকুল প্রশ্নের জবাবটা অরুণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না; তারপরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবতে? এই বলিয়া সন্ধ্যা অবাক হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া বোধ করি বা অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তাহার মুখখানাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা ভাবো। একটু নয়, বোধ হয় ভাববার সময় আজীবন পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। যখন নিজের কাছে তোমাকে খুব ছোট করে

দেখতে আমার বাধেনি, তখন এই কথাই ভেবেচি। আজ আবার তোমাদের ভাববার সময় এলো! আচ্ছা, চললুম,—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া এতক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ভগবান! এই রাঙা চেলী, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন—এসব পরবার সময়ে এ কথা কে ভেবেছিল! বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া আসিল, সেই ভাঙ্গা গলায় বলিল, আমি বিদায় হলাম অরুণদা। বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে সন্ধ্যা অন্তর্হিত হইতেই হঠাৎ যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল—ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে চাকরটাকে বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! বলিতে বলিতে সে নিজেই ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

ছ

বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া প্রিয় মুখুয্যে কি কয়েকটা বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিলেন, বাবা—

কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে? সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চলে,—আর দেরী হবে না—

সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, আমি? কৈ না,—কিছুই ত নয় মা!

সেই বস্ত্রখণ্ডটা দেখাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

ধরা পড়িয়া প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কতকটা মিনতির সুরে কহিলেন, গোটা-কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম, আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয়, ছোটটা—ছিঁড়ে-খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা, যা হোক একটু প্র্যাক্টিস্ করতে ত হবে! তাই ভাবলাম—

মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া কি যে জানাইলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

তুমি কোথায় প্র্যাক্টিস্ করবে বাবা?

বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায় আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে? তা হলেই ত আমার বেশ চলে যাবে!

খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে ত তুমি কাউকে জানো না? পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা, আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে। আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত-দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, কিন্তু আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব!

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলি, সে কি কখনো হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা,—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাকো, সেও অনেক দুঃখ পেলে। আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে, তাদের ওষুধ দিয়ো। আর দ্যাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস। সে বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই। এই দেখ না আমার পরনের কাপড়-দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েচি। এই বলিয়া সে অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রিয় কোনদিনই বেশী প্রতিবাদ করিতে পারেন না, তিনি রাজী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, চল্, কিন্তু তোর মা যে বড় দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

কাল সর্বসমক্ষে, সমাজের ষোল আনার সম্মুখে পিতার উৎকট দুর্গতি সে চোখে দেখিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর নিজের বাড়ি বলিয়াই এতটা সম্ভব হইতে পারিয়াছে—এ অপমান সন্ধ্যার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহার কোন উল্লেখ করিল না, শুধু বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার ঔষধগুলি ও বইখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া কহিল, চল বাবা, আমরা এই বেলা বেরিয়ে পড়ি, নইলে বারোটার ট্রেন হয়ত ধরতে পারা যাবে না।

মায়ের রুদ্ধ-ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া সন্ধ্যা প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমরা চললুম। কেবল দু'খানি পরনের কাপড় ছাড়া আর তোমার আমি কিচ্ছু নিইনি। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম, তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হলো তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

ঘরের অভ্যন্তর তেমনি নিস্তব্ধ, দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রহিল, সন্ধ্যা পিতার পিছনে পিছনে বাটীর বাহির হইয়া আসিল। কে একজন অদূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে কাছে আসিতেই প্রিয় জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, কে অরুণ নাকি?

অরুণ কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আজ আপনি বারোটার গাড়িতে যাবেন শুনে দেখা করতে এলাম।

প্রিয় কহিলেন, হাঁ। আর এই দেখ না মুশকিল, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি!

অরুণ অবাক হইয়া কহিল, সন্ধ্যা, তুমিও যাবে?

সন্ধ্যা শুধু কেবল বলিল, হাঁ।

অরুণ একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেচি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি। কিন্তু আর ত আমাদের সময় নেই অরুণদা—পারো ত আমাদের ক্ষমা করো। এই বলিয়া সে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতেই সন্ধ্যা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, না অরুণদা, আমাদের সঙ্গে আসতে পাবে না, তুমি বাড়ি যাও।

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা, এই দুঃখের সময় তোমার মাকে ছেড়ে চললে?

সন্ধ্যা কহিল, কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ-মা দু'জনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, কিন্তু আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। তবু মায়ের বোধ হয় একটা উপায় আছে। কাল অনেকেই ত তামাশা দেখতে এসেছিলেন, কেউ কেউ বলছিলেন, কি নাকি একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। থাকে ভালই। তখন দেখবার লোকের তাঁর অভাব হবে না, কিন্তু আমি ছাড়া আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে। কিন্তু আর দাঁড়িয়ো না বাবা, চল।

এই বলিয়া তাহারা পুনশ্চ অগ্রসর হইয়া গেল। অরুণ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটুখানি পথ আসিয়া দেখিতে পাইল, জন-কয়েক লোক লুচি, মাছের তরকারি ও বিবিধ মিষ্টান্নের ভূয়সী প্রশংসায় সমস্ত রাস্তাটা মুখরিত করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরে চলিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ধরে না। জ্যোৎস্নার আলোকে পাছে ইহারা চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া পথের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা চলিয়া গেলে আবার পথ চলিতে লাগিল।

মোড় ফিরিয়াই ইহাদের ভুরিভোজনের হেতু বুঝা গেল। পার্শ্বের আমবাগানের ভিতর দিয়া গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের বাটী হইতে প্রচুর আলোক এবং প্রচুরতম কলরব আসিতেছে। লুচি আনো, তরকারি এইদিকে, দই কে দিচ্চে, মিষ্টি কই—প্রভৃতি বহুকণ্ঠনিঃসৃত শব্দে সমস্ত স্থানটা জমজম করিতেছে।

প্রিয় কহিলেন, গোলোক চাটুয্যেমশায়ের আজ বৌভাত কিনা! কাজেকর্মে চাটুয্যেমশাই খাওয়ায় ভাল। শুনলাম পাঁচখানা গ্রাম বলা হয়েছে—বামুন-শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা অবাক হইয়া কহিল, কার বৌভাত বাবা? গোলোক ঠাকুদ্দার?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে পরশু বিয়ে করলেন কিনা!

সন্ধ্যার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, হরিমতী? তার বৌভাত?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ হাঁ, হরিমতীই নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—কি রে?

কিছু না বাবা, চল আমরা এখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি যাই। এই বলিয়া সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া রেল-স্টেশনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পিতাকে লইয়া সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন গাড়ির প্রায় অর্ধঘণ্টা বিলম্ব আছে। পল্লীগ্রামের ছোট স্টেশন, বিশেষতঃ রাত্রি বলিয়া লোক কেহ ছিল না, শুধু প্ল্যাটফর্মের একধারে একটা করবীবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় কে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, সে ইহাদের দেখিবামাত্রই ব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

প্রিয় সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সন্ধ্যার তীক্ষ্ণচক্ষুকে সে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সন্ধ্যা মিনিট-খানেক নিঃশব্দে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, জ্ঞানদিদি, তুমি যে এখানে? একলা যে?

সন্ধ্যা ঠিক চিনিয়াছিল, জ্ঞানদা মুহূর্তে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে নিজের দুর্ভাগ্যেই অভিভূত ছিল, ইতিমধ্যে তাহারই পাশের বাড়িতে আর একজন হতভাগিনীর ভাগ্য যে কোন্ অতলে তলাইতেছিল তাহার কিছুই জানিত না, কিন্তু প্রিয় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা কহিল, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানোদিদি?

জ্ঞানদার রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, সে কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, গন্তব্যস্থান যে কোথায় তাহা সে জানে না।

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না। কিন্তু গাড়ির সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, টিকিট কিনিতে হইবে, তাই প্রিয় অনেক চেষ্টায় স্বর বাহির করিয়া কহিলেন, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানদা? তোমার কি টিকিট কেনা হয়েছে?

জ্ঞানদা তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তাহার পরে অশ্রুবিকৃত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

প্রিয় কহিলেন, বৃন্দাবনে।

সন্ধ্যাও কি সঙ্গে যাবে?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ।

জ্ঞানদা অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কতকগুলা টাকা প্রিয়র পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, টিকিটের দাম কত আমি জানিনে, কিন্তু এই পঞ্চাশটি টাকা আমার আছে—আমাকেও একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিন। কেবল এইটুকু আমাকে সঙ্গে নিন, তার বেশী আর আমি পৃথিবীতে কারও কিছু চাইব না।

প্রিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা, চল আমাদেরই সঙ্গে।

বিপ্রদাস

এক

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষাভুষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জনকয়েক নামকরা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দোমাতরম্ ধ্বনিসহযোগে গ্রাম পরিক্রমণপূর্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘর-কয়েক বাগদী ও দুলেদের বসতি। ভাগীরথীর একটি শাখা বহুকাল পূর্বে মজিয়া অর্ধবৃত্তাকারে ক্রোশেক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমিজমা তালুক-তেজারতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি ও সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন রক্তপতাকায় লিখিত নানাবিধ ‘বাণী’ ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ-গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্বেলিত কোলাহল যেন একমুহূর্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্তী নেতৃস্থানীয় জন দুই-তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহু লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই

তিনি থামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বিপ্রদাসবাবু!

কে বিপ্রদাস? গাঁয়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ।

নেতারা শহরের লোক, কাহাকেও বড়-একটা গ্রাহ্য করেন না; উপেক্ষাভরে কহিলেন, ওঃ এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ-চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘুরাইয়া সমস্বরে হাঁকিলেন, বল, 'ভারত মাতার জয়!' বল, 'কৃষাণ-মজুরের জয়।' বল, 'বন্দেমাতরম্!'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল এবং যে দুই-চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণকণ্ঠ বেশী ঊর্ধ্বে উঠিল না—বিপ্রদাসের বারান্দা ডিঙাইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কিনা বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য গ্রাম্য জমিদার তাকেই এত ভয়! ওরাই ত আমাদের পরম শত্রু,—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযান ত ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগ্মিতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাণিত শর তখনও তাঁহাদের তূণে সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিঘ্ন ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আস্তে বলিল, ওঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড়ভাই। অথচ এই ছেলেটিরই আগ্রহ, উদ্যম ও অর্থব্যয়ে আজিকার অনুষ্ঠান সফল হইতে পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সলজ্জ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

দুই

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোটভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, কালকের আয়োজনটা মন্দ হয়নি। অনেকটা চমক লাগবার মত। War cry-গুলোও বেশ বাছা বাছা, ঝাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিলেন, শোভাযাত্রাটা কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশে আমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল? ভয় পাব বলে?

দ্বিজদাস শান্তস্বরে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্যেই নয়। শোভাযাত্রা যে পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক, ভয় যাদের পাবার তারা ত পাবেই দাদা ।

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিলেন। সে একেবারে অবজ্ঞা ভরা। বলিলেন, তোমার দাদা ঠিক সে জাতের মানুষ নয়, এ খবর তোমার শোভাযাত্রীরা অনেকেই জানত। নইলে তাদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্যে আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে হত না। ঘরে বসেই শোনা যেত। তোমাদের রকমারি নিশান আর বড় বড় বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি, ঝকঝকে বাঁধান দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং ইহারই ইঙ্গিতে দ্বিজদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতির মানুষ, এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিত বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহা কঠিন। তথাপি মৃদুকণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশী যে হয় না এ কথা আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে

সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বটে?

দ্বিজদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল। ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা দরজার পর্দা টাঙিয়ে রাখিস কেন বল ত? ছোঁয়াছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো তার জো নেই। ঘর-সংসার বিলিতী ফ্যাশনে ভরে গেল।

দ্বিজদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দা টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের পরে বৈধব্যের কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোটছেলের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেধেছে? এমন ত কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়া ত উচিত নয় মা।

তুই স্মৃতিরত্নমশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি!

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্চি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা, তোমার কানে একবার যখন খবর পৌঁছেচে, তখন ও-দুটো দিনের একটা দিনও তুমি জলস্পর্শ করবে না তা জানি।

মা হাসিলেন,বলিলেন, মিথ্যা উপোস করে মরা কি কারও শখ রে? কিন্তু উপায় কি? এ করলে পুণ্যি নেই, না করলে অনন্ত নরক। হাঁ রে, বৌমা বলছিলেন, খবরের কাগজে লিখেছে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কলকাতায় নাকি চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা করচেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ বাড়িতে তিনি পায়ের ধূলো দিতে পারেন?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি! তোদের শুনতে কি ইচ্ছে যায় না? সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল—

বিপ্রদাস সহাস্যে বাধা দিয়া কহিল, সে ত এখনো তিন মাসও হয়নি মা!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস? কিন্তু তিন মাসই কি কম সময়? তা সে যাই হোক বাবা, এবার কিন্তু না বললে চলবে না। আমার দু মামীই চিঠি লিখেচেন। কৈলাসনাথ, মানস-সরোবর দর্শনে এবার আমি যাবই যাব।

বিপ্রদাস হাতজোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি করো না। তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে মামীদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারব না। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারানো আমার সইবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেই রে, কৈলাসের পথে মরণ হবে তেমন পুণ্যি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসব। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই ত আমার সঙ্গে যেতে পারবি নে বিপিন, তোর পরেই এত বড় সংসারের সব ভার, আর পিছনে যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক ত অনেকদিনই ছেড়েচে, শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যেরও নাকি বিচার করে না। এর ওপর কাল কি করেছে শুনেছিস?

বিপ্রদাস ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি আবার করলে? কৈ শুনিনি ত কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় শুনেছিস। তোর চক্ষুকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও-ছোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁটবে? ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচ বন্ধ করে দেব? ও পড়বে না?

মা বলিলেন, দরকার কি? আমার শ্বশুরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখাপড়ায় দেশের সর্বনাশ হল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি। আর তোর নিজের ছোটভাই যখন ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবি নে? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসিমুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম.এ. পাস করে বিলিতী শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল, কালকের সভা-সমিতির জন্যে তোমাদের এস্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্রশ্ন করিলেন, তা হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস কর ত টাকা পেলে কোথায়? রোজগার করচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দার বাহিরে টুংটাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ ত তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বল দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন, ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারি থেকে বছরে যে ছ' হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্চেন! একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াইমশাই নিজে যখন এলেন তখনি কর্তাকে আমি বলেছিলুম, রায়বাড়ির মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই

ত অনাথ রায় বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁটা আর যাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় বাঙালী-মেম বিবাহ করিয়াছিল, এ কথা মা আর ভুলিতে পারিলেন না।

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেছেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তার পরে এর বিহিত করব। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, কি রে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেছেন তখন থামানো যাবে বলে ভরসা হয় না।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি তো জানেন, ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কি না তাই বল।

আমার এখন মরবার ফুরসুত নেই। এই বলিয়া দ্বিজদাস অন্য প্রশ্নের পূর্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলে না।

এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা। তাঁহার জননীর মৃত্যুর বৎসর-কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়ামযীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে ইঁহার হাতেই সে মানুষ। ইনি যে জননী নহেন এ সংবাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত জানিতেও পারে নাই।

তিন

এ বাড়িতে দ্বিজদাস সবচেয়ে বেশী খাতির করিত বৌদিদিকে। তাহার সর্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে। সতী শুধু সম্পর্ক-হিসাবেই তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস-কয়েকের বড় ছিল। তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত। এই লইয়া ছেলেবেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালিশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না। শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সত্যি নাকি? কিন্তু এ ত তোমার বড় অন্যায় বৌমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা!

সতী বলিত, অন্যায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অনেক বড়? কত বড় মা?

আমি জন্মেছি বোশেখ মাসে, ও জন্মেচে ভাদ্র মাসে।

মা সহাস্যে কহিতেন, ভাদ্র মাসেই ত বটে মা, আমারই মনে ছিল না। এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে ওর কান মলে দেব।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শাশুড়ী সস্নেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কিনা তাই বোঝে না। ঠাকুরপো বললে ভারী খুশী হয়! মাঝে মাঝে ডেকো, কেমন মা?

সতী রাজী হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন যে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ির গৃহিণী। বিধবা হওয়ার পর হইতে শাশুড়ী ত থাকেন নিজের জপ-তপ এবং ধর্মকর্ম লইয়া, তথাপি

তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্তীকালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে প্রায় পনর- ষোল দিন অতীত হইয়াছে, সকালবেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুরপো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক বৌদি, আর খোশামোদের আবশ্যক নেই, আমি করব।

কি করবে শুনি?

তুমি যা হুকুম করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্যায়।

অন্যায়টা কিসের হল বলো ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাএ দাদার ঘরের সুমুখ দিয়ে এসেচি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা হচ্চিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেছেন কাজ আদায়ের জন্যে। কত বড় অন্যায় বল ত!

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্যায় ত নয় ঠাকুরপো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাএই জবাব আসবে, আমার মরবার ফুরসত নেই—কিন্তু বৌদিদি হুকুম করলে দ্বিজুর সাধ্য নেই যে না বলে।

দ্বিজদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েছে আমার মুশকিল, আর এইখানেই পেয়েচেন ওঁরা

জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাস-দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দু-তিন মাসের কমে হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি?

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি করো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেছ, তখন আপত্তি আর করব না, সঙ্গে যাব। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্যে বলিল, ওটা রাগের কথা ভাই। কিন্তু হুকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি। কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেচি জান? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময়ও হবে না, সুযোগও ঘটবে না। সুতরাং খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাব, কিন্তু এদের এস্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না। অন্ততঃ, আমি বেঁচে থাকতে ত নয়। সে ভার আমার রইল।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ছিল,পলকের জন্য তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কবে যাত্রা করবেন স্থির করেছেন? যবেই করুন, শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হল! অথচ মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত ম্লেচ্ছাচারীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি নন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস, না বৌদি?

সতী এ অনুযোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করব না বৌদি,—তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তই আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বলছিলেন, এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন কর গে মা, যাঁকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা গেল তাঁর সুমুখে ভায়ার তর্ক চলবে না। ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করবে, তুমি দেখে নিয়ো।

শুনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারব না জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা বলো বৌদি, যে, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্ধেক মালিক হয়েও যখন তুমি এদের এস্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েছি যে, তাঁর যাওয়ার বিঘ্ন হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো, যত লোকসানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেব।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চৌকি হইতে উঠিয়া বৌদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ফিরিয়া গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই ত সময় কাটল, এখন নিজের অনুরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের? ঐটি কিন্তু পারব না বৌদি!

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না বলে বসো।

বেশ ত, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন,—আপনার নয়, বাবার খুড়তুত ভাই,—তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে আমার ঢোকাই ঘটত না। মার মুখে এ কথা শুনেছ বোধ হয়?

বহু বার। এমন কি পড়পড়তা দিনে একবার করে হিসাব করে নিলে এই পনর-ষোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ-ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোম্বায়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলাত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে।

কোথায়? বোম্বাই থেকে?

হাঁ। সে লিখেচে, সে একলাই আসতে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

তাঁকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

দ্বিজদাস হঠাৎ রাজি হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল, আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সাত-আট বছরের বালিকা। তার পরে একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাস করে আই. এ. পড়তে শুরু করেছে,—সে ত কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারী ভালবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট করে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্যে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনোই বা সুযোগ হল কিসে? মা কি রাজি হয়েছেন?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটুখানি থামিয়া কহিল, মাকে বলেছি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজের তীর্থযাত্রা নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে, আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া নিজে যখন থাকবেন না তখন এই দু-তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাকতে পারবে।

দ্বিজদাস মনে মনে বুঝিল, শাশুড়ীর হুকুম না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাসী বোনটিকে একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু-সমাজও তাদের আপনার বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না। এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্চে।

এ অবস্থা অনেকেরই। দ্বিজু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনো না। মাকে ত জানই, হয়ত খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে, বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে গেলে তাঁকে আনার ব্যবস্থা করো—সব দিকেই ভাল হবে।

ইহা যে সুপরামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিষেধ করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার সঙ্কোচ এবং দুঃখই কি কম? কহিল, নিজের বোন বলে বলচি নে ঠাকুরপো, কিন্তু সেবার মাস-খানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেছি যে, রূপে-গুণে তেমন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা যদি তাকে দুটো দিনও কাছে কাছে দেখতে পান ত ম্লেচ্ছ

মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বৌদি। তিনি দেখতেই চাইবেন না। ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত চোখে পড়বে? চোখ বুজে ত মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না! সেও ত একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারে না। মাও না।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা! নামটা যে শুনেচি মনে হয় বৌদি।কোথায় যেন দেখেচি, আচ্ছা দাঁড়াও, খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঝি সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বৌমা, তুমি এখানে? তোমার কে এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়েই বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকারমশাই তাঁদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অভাবনীয়। অ্যাঁ—বলিস কি রে? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিছনে গেল দ্বিজদাস।

চার

নিখুঁত সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরনে যাহা ছিল তাহা নিছক মেমসাহেবের মত না হউক, বাঙালীর মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয় না। বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফরসা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ব করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা ত শাশুড়ীর চোখে পড়িবে,—চোখ বুজিয়া ত এটা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না, বস্তুতঃ, এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, সেজকাকা, মেয়ের বাড়িতে এতকাল পরে পায়ের ধুলো পড়ল?

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, সহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ রে বুড়ি, পড়ল! কবে, কোন্ কালে কাকাকে নেমন্তন্ন করে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করেছিলাম? কখনো বলেচিস আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে পায়ের ধুলো পড়ল? দ্বিজদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, উটি আমার দেওর—দ্বিজু।

দ্বিজদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? যাঁর জ্বালায় জমিদারি বুঝি যায়-যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে। বংশছাড়া, গোত্র-ছাড়া, ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলুম?

এই ত সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ও-সব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজদাস এতক্ষণ পর্যন্ত কি একপ্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভাল দেখায়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্বে কখনো সুযোগও ঘটে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই,—কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিল। তাহার অহেতুক ও অশোভন জড়তা একমুহূর্তে কাটিয়া গিয়া সে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুদ্ধি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে, স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ, সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতায় তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ঐ-সব মামুলী দাবী-দাওয়ার যুক্তির চেয়েও ঢের বড় কথা এই যে, পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন।

তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষে কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এতবড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এই বলিয়াই সে ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমারই চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করচি। তোমাদের জমিদারি অক্ষয় হয়ে থাক, তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ

কর, আজই উকিল ডেকে সমস্ত লেখাপড়া করে দিচ্ছি। ইনিই সাক্ষী থাকুন, দেখ আমি পারি কি না?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতী?

সতী বলিল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বললেই লেখাপড়া করে জমিদারির অংশ ছেড়ে দিতে চায়?

সতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

বন্দনা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সত্যিই পারি। ওতে আমার একতিল লোভ নেই। দেশের পনের-আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও-কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না, গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোস করে মরতে পারলে বরঞ্চ একদিন হয়ত স্বর্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ পথে কোন কালে সে আশা নেই।

বন্দনা নিষ্পলকচক্ষে চাহিয়া শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে আর কোন কথা কহিল না,—শুধু মুখ দিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। ঠাকুরপোর এ-ছাড়া যেন আর কথা নেই। বলে বলে এমনি মুখস্থ হয়ে গেছে। কহিল, পুরনো বক্তৃতা পরে দিও ঠাকুরপো, ঢের সময় পাবে। সেজকাকাবাবুর হয়ত এখনও হাতমুখ ধোয়াও সারা হয়নি। বন্দনা, চল্‌ ভাই, ওপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়বি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই-বাবাজীকে দেখচি নে ত?

সতী কহিল, তিনি সকালেই কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েচেন, ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, তোমার শাশুড়ীকে ত দেখতে পেলুম না? বাড়িতেই আছেন?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস মানস-সরোবরে তীর্থযাত্রা করবেন। সমস্ত সকালটা পূজো-আহ্নিক নিয়েই থাকেন। আর একটু বেলা হলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, তিনি খুব বেশী ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন, না?

সতী বলিল, হাঁ।

বিধবা হবার পরে শুনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না, সত্যি?

সত্যি বৈ কি। সব আমাকেই দেখতে শুনতে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সৎশাশুড়ী না মেজদি?

সতী হাসিয়া কহিল, চোখে ত দেখিনি বোন, লোকে হয়ত মিথ্যে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিথ্যেই বলে। কারণ, সৎশাশুড়ী মানে দাদার সৎমা ত? মিছে কথা। সৎমা বটে, দাদার নয়, আমার। সে যাক, স্নানাদি সেরে নিয়ে সে আলোচনা পরে হবে,—এখন ওপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখি গে—বৌদি, আর দেরি করো না, এঁদের নিয়ে এস। এই বলিয়া সে আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যাইতেছিল, এমনি সময় মাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

খুব সম্ভব দয়াময়ী খবর পাইয়া আহ্নিকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশী নয় বলিয়া তিনি বৈধব্যের পরেও সচরাচর অনাত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়াই কথা কহিতেন,

কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় কপালের উপর পর্যন্ত টানিয়া দেওয়া,—কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

আমার সেজকাকাবাবু, মা। আর এইটি আমার বোন বন্দনা। এই বলিয়া সতী কাছে আসিয়া হঠাৎ শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও নয়, কেহ করেও না। দয়াময়ী মনে মনে হয়তো একটু আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতে সস্নেহে সযত্নে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি চোখ পড়িতেই তাঁহার চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিদির দেখাদেখি সেও কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাইতেই এক-পা পিছাইয়া গিয়া শুধু অস্ফুটে বলিলেন, বেঁচে থাক।

কহিলেন, বেইমশাই, নমস্কার। ছেলেমেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধূলো পড়ল।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেন্ ঠাকরুন, কিন্তু না বলে কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জনা করবেন। এবারে যখন আসব যথাসময়ে একটা খবর দিয়েই আসব।

দয়াময়ী এ-সব কথার উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন, পূজো-আহ্নিক এখনো সারা হয়নি বেইমশাই, আবার দেখা হবে। বৌমা, এদের ওপরে নিয়ে যাও, খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। এই বলিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ, প্রচলিত সৌজন্যের বিশেষ কিছু যে ত্রুটি হইল তাহা নয়, কিন্তু ভিতরের দিক দিয়া সকলেরই মনে হইল জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি একখণ্ড কালো মেঘ নির্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভাসিয়া গেল।

পাঁচ

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পিতা ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একখানা জমকালোগোছের আরামকেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া দ্বিজদাস সেইগুলির তারিখ মিলাইয়া গুছাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। কন্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা দুটোর গাড়িতেই কলকাতা যাব স্থির করলাম। দিদির বাড়িতে দিন-কতক যদি তোমার থাকবার ইচ্ছে হয় ত ফেরবার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাব। কি বল?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেরি হবে বাবা?

পাঁচ-সাত দিন—দিন-আষ্টেক,—তার বেশী নয়।

কিন্তু তার পরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, তা বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছে থাক, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন?

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দ্বিজদাস কহিল, বৌদি রান্নাঘরে ঢুকেছেন, হয়ত দেরি হবে। হাতের বাণ্ডিলটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব?

খবরের কাগজ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না?

না। ও আমার ধৈর্য থাকে না। সন্ধ্যাবেলা বাবার মুখে গল্প শুনি তাতেই আমার ক্ষিধে মিটে।

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশী পড়েন।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অমন ভাবেন কেন? ভারী অন্যায়।

দ্বিজু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল, বন্দনা হাসিয়া কহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙ্গালে তার কিছুতেই আমার কৌতূহল নেই। আছে বাবার। ঐ দেখুন না, একেবারে খবরের তলায় তলিয়ে গেছেন,—বাহ্যজ্ঞান নেই।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের 'বাবা' কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলেন না, বলিলেন, একটু সবুর কর—বলচি—ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম।

মেয়ে মুচকিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারাদিন পড় বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই। দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে শুনেচি আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখি গে আপনার কত বই জমেছে।

চলুন।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতলায়। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো সন্ধান নিই এবং হুকুম মত কিনে এনে দিই।

কিন্তু পড়েন ত আপনি?

সে কিছুই নয়। পড়েন যাঁর লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য শক্তি এবং তেমনি অদ্ভুত মেধা তাঁর।

কে? দাদা!

হ্যাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপছোপ বিশেষ-কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এত বড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে। হয়ত নেই। আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখন দেখেন নি তাঁকে?

না। কিরকম দেখতে?

ঠিক আমার উলটো। যেমন দিন আর রাত। আমি কালো, তাঁর বর্ণ সোনার মত। গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত। লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করে না।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মেজদিও না?

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজদিও না।

ভয়ানক বদরাগী বুঝি?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিস্টোক্র্যাট বলে একটা কথা আছে, আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। বদরাগী কি না জিজ্ঞেসা করছিলেন? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশই হয় না।

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি? না?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এ কথার জবাব যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বলি, আর একদিন জবাব দেবার প্রয়োজনই হবে না। আজ থাক।

মস্ত লাইব্রেরি। যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোম্বাই শহরে এ বস্তুর অভাব নাই, সে

তুলনায় এ হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জন্য এত অধিক সঞ্চয় সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক এত বই দাদা পড়েন নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়েছেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন? দিন-রাত শুধু এই-ই করেন নাকি?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ আমি ত জানিনে। তা ছাড়া আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয়। তার কোথায় কি আছে এবং হচ্চে সমস্ত দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাকতেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে, আপনার মত আমার বিস্ময়ও কম নয়, তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু-একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসাবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব। আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয় না, ছাপার অক্ষর চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেন নি, আমার মুখে একতরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে।

কিন্তু আমার শুনতে খুব ভালই লাগচে।

কিন্তু কেবল ভাল-লাগাটাই ত সব নয়। পৃথিবীতে আমরাও অত্যন্ত সাধারণ আরও দশজন ত আছি। একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে, আমরা যাই কোথা? ভগবান মুখটা ত কেবল পরের স্তব গাইতেই দেননি?

বন্দনা সহাস্যে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোটভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান;—এই ত?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, চাই ত বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুনগুন করা চলে কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে-বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে, চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ বিদ্যেয় আজন্মসিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরম্ভ করুন।

দ্বিজু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিলি বসে দু-চারখানা বই দেখুন, আমি বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বন্দনা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ত আপনি! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েচি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি।

কিসের গল্প?

আপনার নিজের।

তা হলে একটু সবুর করুন, আমি এক্ষুনি নীচে গিয়ে ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজদিকে ত? তার দরকার নেই। তাঁর বলবার যা-কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো সত্যি কিনা এখন তাই শুনতে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না, সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো-আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শীঘ্রই বিলেতে যাচ্চেন?

বন্দনা বুঝিল, এই লোকটি নিজের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চায় না এবং জিদ করার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। ইস্কুলের বিদ্যেটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করতে বলেন। আপনিও কেন চলুন না?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? সেখানে ছেলে পড়িয়েও চলবে না, এবং এত ভার বৌদির ওপরেও চাপাতে পারব না। এ আশা বৃথা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি, আপনি যাবার জন্য প্রস্তুত হোন।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে-সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার ওপর আছি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যুক্তি যে কি এবং কোন্‌টা, সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে সম্পত্তি আপনি নিজে অর্জন করেন নি সে নিতে আপনি অনিচ্ছুক। এ কথা কি ঠিক নয়?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মানুষের ধর্মবুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনতে পাইনে?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কৌতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য যে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাকলেই সংসারের সব প্রয়োজন মেটে না—অভাব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আপনার কথা আমি এত বেশী শুনেচি যে, আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুকলেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হ’ল না, যেন কতবার দেখেচি এমনি সহজে চিনতে পারলুম। মেজদিকে এত কথা বলতে পেরেচেন, আর আমাকে পারেন না? আর কিছু না হোক, তাঁর মত আমিও ত একজন আত্মীয়।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্থা কন্যার সহিত নির্জনে এইভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, একঘণ্টারও উপর কাটিয়া গেছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে, এ বাটীতে তাহার জবাব যে কি, সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ি ফিরিয়াছেন, হয়ত মায়ের আহ্নিক সারা হইয়াছে,—হঠাৎ সমস্ত দেহ-মন তাহার ব্যাকুল হইয়া যেন একমুহূর্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেমনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কৈ, বললেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক ভাঙ্গিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বলব। বৌদিকেও আজও বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে,—

বলা যে উচিত নয় এ-সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিল না, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করারও তাহার শক্তি রহিল না।

হতবুদ্ধির মত মিনিট-খানেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্তুতঃ কিছুই দিয়ে যাননি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল, —ইস! মিছে কথা। এ হতেই পারে না।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল, —পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে একবার তাঁর বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরনের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, এ শুধু দাদাই জানেন। তিনি বলেন,—না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু রক্ষে। আমি ভেবেচি বুঝি তিনি সত্যিই উইল করে আপনাকে বঞ্চিত করে গেছেন।

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু মনে হয় দাদা করতে দেননি।

দাদা করতে দেননি। আশ্চর্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জানলে আর আশ্চর্য মনে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকরে আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল। দাদা বললেন, না। বাবা জিদ করতে লাগলেন, না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা-পিতামহকালের সম্পত্তি আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাব না। তবুও দাদা জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বললেন, তবুও তোমারি হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর দিয়ো, যদি তা না মনে করতে পার, তাকে দিয়ো না। এর পরেও বাবা দু-তিন বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে?

কেউ না। শুধু আমি জানি লুকিয়ে শুনেছিলাম বলে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, সত্যিই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ।

দ্বিজদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশদিন ত এখানে আছি, – বই পড়বার অনেক সময় পাব।

দ্বিজদাস চলিতে উদ্যত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাব।

দ্বিজদাস কহিল, বরঞ্চ আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখচি তাতে ঢের অসুবিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজী হন, আপনার পরামর্শই শুনি।

কিন্তু আমি ত তখন থাকব না। এই সোমবারে মাকে নিয়ে কৈলাস তীর্থে যাত্রা করব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কৈলাস? কৈলাসে যাবেন? শুনেচি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন?

ঠিক জানিনে, বোধ হয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষুণ্ণ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর এই জন্যেই বুঝি ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাকবার সুপরামর্শ দিচ্চেন?

দ্বিজদাস তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্যে পরামর্শ দিয়েছি। বৌদি এত কথা লিখেচেন, কেবল এই খবরটিই দেননি যে আমাদের এটা কতবড় গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এর আচার-বিচারের কঠোরতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না? আশ্চর্য! একটুখানি থামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাবার লোক এ বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা?

না।

মেজদি?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ বাড়িতে থাকা চলে না।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সত্যি বলচেন?

সত্যিই বলচি।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের সিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল,—ঠাকুরপো! বন্দনা! তোমরা দুটিতে করচ কি?

যাচ্চি বৌদি,—সাড়া দিয়া দ্বিজদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, বন্দনা পাংশুমুখে চাপাকণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

ছয়

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হৃষ্টচিত্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসিবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রূপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকৃতি অতিশয় সুশ্রী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফরসা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাঙালীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে এবং ইতিপূর্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল, বড়ভগিনীপতিকেও তাহাই করিত কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। ইঁহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিবার কথা তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। দিদির মর্যাদা রক্ষা করিয়া সে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, তুমি একলা খেতে বসেচ, আমাকে ডেকে পাঠাও নি কেন?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ির সময় হ'লো মা, কিন্তু তোমার ত তাড়াতাড়ি নেই। বলিলেন,—আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অনুমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেজদি এতগুলো দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন, বাবাকে এনামেল কিংবা চিনেমাটির বাসনে খেতে দিলেই ত হত?

সাহেবের চিবানো বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির মানুষ তিনি, কন্যার কথার তাৎপর্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—যেন দোষটা তাঁহার নিজেরই—তাইত, তাইত—এ আমি লক্ষ্য করিনি,—সতী কোথা গেলে—আমাকে ডিসে খেতে দিলেই হত—এঃ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এত বড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল। বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা ছলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া এ দুরভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক, এই ভাল-মানুষ বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ সৃষ্টি করার কদর্যতায় তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে, এ গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এখানে এনামেল বল, চিনেমাটিই বল কিছুই ঢোকবার জো নেই—শোনোনি?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেচি ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ বাড়িতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ বাড়িতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যত দামই হোক, তাঁর মর্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ,—তোমাদের আসার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়,—যাক না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মত

তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়িতে বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ো, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না। কি বল বন্দনা?

ইস, তাই বৈ কি! বাবার জন্যে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে রেখে দেব।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস, আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়েও বেশী ভালবাসে।

শুনিয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, সমস্ত অন্তর খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা ভারী সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাকুরি নিয়ে থাকি, সর্বদা বাড়ি আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত,—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল,—ও-সব কথা থাক না বাবা—

না না, আমার যে সমস্তই মনে আছে,—মিথ্যে ত নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেল—তার মা ত এই দেখে—

আঃ, বাবা, তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে,—তোমার কিচ্ছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন,—বাঃ মনে আছে বৈ কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কিরকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ি ফেল করবে। ক’টা বেজেচে জান?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস যে চমকে উঠতে হয়। এখনো ঢের দেরি—অনায়াসে গাড়ি ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ির এখনো ঢের দেরি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করুন, আমি নিজে স্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই বন্দনা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচ?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। না মেজদি?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক, কাকা শুনতে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন, এ অপরাধের মার্জনা বোধকরি তাঁর কাছেও নেই?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যিই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জনা চাইব কেন? সে বিচার আমি তাঁর পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। যদি থাক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব বল?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল; নীচে গাড়িবারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একখানা গাড়িতে চাপানো হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমনি সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিতা বিস্মিত হইলেন—এই রোদে স্টেশনে গিয়ে লাভ কি মা?

বন্দনা বলিল, শুধু স্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা! তুমি দিন-কতক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে খাব।

তুমি চলে যাচ্ছ তোমার মেজদি শুনেছেন?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে, আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন করে চলে গেলে সে ভারী কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের? আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেন নি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নির্বোধ নন, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়িতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন-কিছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জানতাম ও দিন-কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন গাড়িতে গিয়ে উঠেচে তখন আর নামবে না।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল তেতলার লাইব্রেরি-ঘরের খোলা-জানালার গরাদে ধরিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সাত

স্টেশনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব,—বোধ করি বা একঘণ্টারও বেশী লেট হইবে। পরিচিত স্টেশনমাস্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যান্ড কাল হইতে কাজ করিতেছিল, সে সঠিক সংবাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে, দেরি একঘণ্টাও হইতে পারে, দু-ঘণ্টাও হইতে পারে। বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চলবে না? আমার ত—

বন্দনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না। একবার বেরিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুনয়ের সুরে কহিল, কেন চলবে না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না খেয়ে এসেচ, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে পারব না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা। একবার জিদ ধরলে আর টলান যায় না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, আর অনুরোধ করিল না।

স্টেশনটি বড় না হইলেও একটি ছোটগোছের ওয়েটিং রুম ছিল। সেখানে গিয়া দেখা গেল, একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্বাহ্ণেই দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিস্টার কিংবা ডাক্তার কিংবা বিলাতী পাশকরা প্রফেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায়

আসিয়াছিলেন, সে একটা রহস্য। আরামকেদারার দুই হাতলে পদদ্বয় দীর্ঘপ্রসারিত করিয়া অর্ধসুপ্ত। আকস্মিক জনসমাগমে মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—ভদ্রতা-প্রকাশের উদ্যম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত মেমসাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া মনে হয়, এ-বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আরামচৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল এবং অত্যন্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, জামাইবাবু, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশী নাকি?

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হলে খুব বেশী হয়, না জানলে এ প্রশ্নের জবাব দিই কি করে?

বৃদ্ধ কহিলেন, এই ধর বন্দনা যা বললে?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক রেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাথায় যা বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি রেগে নেই,—একটুও রেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছ, এবং খুব বেশী রকমই রেগে আছ, নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। তা ছাড়া তোমার আপনিই মনে পড়ত যে, এইমাত্র আমরা এক গাড়িতেই এলাম, জাত গিয়ে থাকলে আগেই গেছে, বেঞ্চিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক ছল, কিন্তু সত্যি বলুন ত মুখুয্যেমশাই, আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ি করার জন্যে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার স্নান করতে হবে কিনা?

চল না, বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখবে?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোঁবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন? বলিতে বলিতেই তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শান্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে নয়, অথচ সত্যিও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। ক্ষোভ নানা কারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র এবং সে নিজেও যেন ইহাতে কতকটা জড়াইয়া গেছে। অথচ, বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্যপক্ষে, ধীরচিত্তে বুঝিবার মত মনোবৃত্তিও বন্দনায় একান্ত অভাব। সুতরাং চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না,—বিপ্রদাস একেবারেই নীরব হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই জমিদার বিপ্রদাসবাবু না?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গাঁয়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ি, বেঙ্গলে যখন আসাই হল তখন ওঁর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান। তাই আসা। আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল, লোকটি তাহারই সমবয়সী—এক-আধ বছরের এদিক-ওদিক হইতে পারে, তার বেশী নয়।

সাহেব কহিতে লাগিল, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি ভয়ানক,— অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশ্য দু-চারজন বামুন-পণ্ডিতে গোঁড়া হিঁদু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখচি নেহাত কথাটা মিথ্যে নয়।

অপরিচিতের এই অযাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এমনিই অন্যমনস্ক ছিল, যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেকচারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই রিয়েল সলিড্ শিক্ষা—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিদ ক'রে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না,—কুসংস্কার থেকে মন মুক্ত হতে চায় না। আমি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর সে দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুশী হইয়া কহিলেন, এ কথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্র্যাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর করে assert করা,—consequence তার যা-ই কেন না হোক। আমার টাকা থাকলে আপনার জমিদারির প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইয়োরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে, এ কথা তারা তখন নিজেরাই বুঝত।

বন্দনার বোধ করি ভারী খারাপ লাগিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, জামাইবাবু তাঁর প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন এ-খবর আপনাকে কে দিলে? আশা করি আপনার মামা-শ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি?

ও—উনি বুঝি আপনার ভগিনীপতি? Thanks. না, তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি এইরকম হত! আপনি বোধ করি বিলেত ঘুরে এসেছেন? যাননি? যান, যান।

Freedom, সাহস, শক্তি কাকে বলে, সে দেশের মেয়েরা সত্যি কি, একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমি next time যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করেচি।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্বেই স্টেশনের সেই রিলিভিং হ্যান্ডটি মুখ বাড়াইয়া জানাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ি দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। কোথাও তিল-ধারণের জায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফার্স্ট ক্লাস ও আর একখানি সেকেন্ড ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাস ভরতি করিয়া একদল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যাণ্ট কলিকাতায় কি একটা খেলার উপলক্ষে চলিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানাভাবে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপর্যাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলার চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর, ব্যবহারও তেমনি বেপরোয়া। গাড়ির দরজা আটকাইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—go —যাও—যাও!

স্টেশনমাস্টার আসিল, গার্ডসাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিলেন, উপায়?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন, আজ বাড়ি ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না ত কি? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি? কষ্ট হবে, তা হোক।

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়িতে চার-পাঁচজন আছে, আর চার-পাঁচজনের জায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাই ত জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে!

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঋজু হইয়া উঠিল, কহিল, সে ওদের শখ,—আমাদের অপরাধ নয়। উঠুন, আমি সঙ্গে যাব। এবং পরক্ষণেই গাড়ির হাতল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, right assert করবেন ত স্ত্রী নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমিদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলা এই লোকটির মুখের পানে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া ও-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

আট

গণ্ডগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্লাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং রুক্ষকণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, What's up? ভাবটা এই যে, সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোকগুলা খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়, তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কাল-সাহেব। সুতরাং ডিউটি যাই হউক, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাশা দেখিতেছিল, সেই মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যান্ডটিও দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিঙ্গীর দল জোর করে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, নামতে চায় না। আর এ-খবরটাও তাদের জানিয়ো যে গাড়ির গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people? তোমরা রেলওয়ে সারভ্যাণ্ট, রেলের পাশে যাচ্ছ—be careful!

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব তাহারা নামিয়া পাশের কামরায় গেল, কিন্তু ঠিক অহিংস মেজাজে গেল না। চাপাগলায় যাহা বলিয়া গেল তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটত না।

ও—নো। এ আমার ডিউটি।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবে না।

ব্যারিস্টার বলিলেন, সাহস করবে না। চাকরির ভয় আছে ত!

বন্দনা দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, সে হবে না। চাকরির ভয়টাই চরম guarantee নয়,—সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝতে এর চেয়ে বড় guarantee সংসারে নেই। কিন্তু আমি যে কিছু খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও ত আসিনি।

সে তোমার শখ। কিন্তু একটু পরেই আসবে হোটেলওয়ালা বড় স্টেশন, সেখানে ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেরই লাভ নেই,—আমি নেবে যাই। ব্যারিস্টারসাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখবেন। যদি আবশ্যক হয় ত—

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ি থামাবেন? সে আমিও পারব। এই বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ির চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা মাকে গিয়ে ব'লো যে, উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, আপনি ত একগুঁয়ে কম নয়!

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়িতে তুললেন, কিন্তু ওরা ত ছিল মাতাল, যদি নেবে না গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা হলে ওদের চাকরি যেত।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেত? দেহের অস্থিপঞ্জর। সেটা চাকরির চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অন্য মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী পাঞ্জাবের নবীন ব্যারিস্টার মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

বন্দনার পিতা এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা কানে যাইতেই সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, না না, তামাশার কথা নয়, এ ব্যাপার ট্রেনে প্রায়ই ঘটে, খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত জোর-জবরদস্তির আমার ইচ্ছেই ছিল না,—রাত্রের ট্রেনে গেলেই সব দিকে সুবিধে হ'ত।

বন্দনা কহিল, রাত্রের ট্রেনেও যদি মাতাল সাহেব থাকত বাবা?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে? তা হলে ত ভদ্রলোকদের যাতায়াতই বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখুয্যেমশাই, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে জেরা করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝেচি।

আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, ছেলেবেলা গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেছেন? সত্যি বলবেন।

না, সে সৌভাগ্য কখনো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror। শুনি, বাড়ির সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে। সত্যি?

কিন্তু শুনলে কার কাছে?

বন্দনা গলা খাট করিয়া বলিল, মেজদির কাছে।

কি বলেন তিনি?

বলেন, ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

কিরকম জল! মাতাল সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়,—তেমনি?

বন্দনা সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, অনেকটা ঐরকম।

বিপ্রদাস কহিল, ওটা দরকার। নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটে না এও জানবেন। মেজদি বরাবরই ভালমানুষ, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে হ'ত।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ ভয়ে বাড়িসুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্যি নয়। কারণ, একটা বেলার মধ্যেই নমুনা যা দেখিয়ে এসেচ তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ, মা সহজে ভুলতে পারবেন না।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেছেন জানেন? আমি প্রণাম করিতে গেলুম,—তিনি পেছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকুমাএই দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে এই নিয়ে রাগ করে না খেয়ে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মানুষের আত্মসম্ভ্রম বলে ত একটা জিনিস আছে।

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আত্মসম্ভ্রমের ধারণা পেলে কোথা থেকে? ইস্কুল-কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে ত? কিন্তু মা ত ইংরিজী জানেন না, বইও পড়েন নি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি শুধু নিজের ধারণা নিয়েই চলতে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ তোমার হয়েছে। বিদেশের বই থেকে যা শিখেচ তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েচ বলেই

এমনি করে চলে আসতে পারলে। নইলে পারতে না। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধত। আত্মমর্যাদা আর আত্মাভিমানের তফাত বুঝতে।

বন্দনা তফাত না বুঝুক, এটা বুঝিল যে তাহার আজিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তরে লাগিয়াছে। তাহার জন্য নয়, মায়ের অসম্মানের জন্য।

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ।

তেমনি ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার করে চলেন?

চলি।

প্রণাম করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান?

যাই। সময়-অসময়ের হিসেব আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধ করি এমনি অন্ধ বানিয়ে তুলেছেন?

সে তোমার দিদিকেই জিজ্ঞেসা করো। তবে, পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চলতে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ বাঘের ভয় না করে কারও চলবার জো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না, জো নেই। যেমন দিনের গাড়িতে বাঘের ভয় থাকলে মানুষকে রাত্রের গাড়িতে যেতে হয়। ওটা প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দিদি মেয়েমানুষ, সহজেই দুর্বল, তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটান যায়, কিন্তু দ্বিজুবাবুও ত শুনি পারিবারিক নিয়ম মেনে চলেন না, সে সম্বন্ধে বাঘমশায়ের অভিমতটা কি?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জন্যই বন্দনা করিয়াছিল এবং বিদ্ধ করিবে বলিয়াই সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল

না; তেমনই হাসিয়া বলিল, এ-সকল গূঢ় তথ্য অধিকারী ব্যতিরেকে প্রকাশ করা নিষেধ।

দ্বিজুবাবু নিজে জানতে পাবেন ত?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সময় হলেই পাবে। সে জানে রক্তমাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মুহূর্তকালের জন্য বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এড়াইল না।

পিতা ডাকিলেন, বুড়ি, আমাকে একটু জল দাও ত মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ দ্বিজদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল, মেজদির শাশুড়ীর জন্যে নয়, কিন্তু আমার না খেয়ে আসায় মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন ত আমিও দুঃখ পাব। আমি সেই কথাই এখন ভাবচি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হ'লো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনাবোধ করবেন সেটা হ'লো তুচ্ছ। তার মানে, মানুষে আসল জিনিসটি না জানলে কত উলটো চিন্তাই না করে!

বন্দনা কহিল, একে উল্টো চিন্তা বলচেন কেন? বরঞ্চ এই ত স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুণ্ণ মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায় না, তথাপি জানালার বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়ে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু-তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিপ্রদাস পকেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি-

সব লিখিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি কথা?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ শুধু ইস্কুল-কলেজের বই-পড়া ধারণা। কিন্তু আপনার মা ত ইস্কুল-কলেজে পড়েন নি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

বন্দনা কহিল, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে সরাতে পারচি নে। তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সকল কথার বড়?

বিপ্রদাস পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলুম তাঁর বাড়িতে অনাহূত অতিথি। এ ত আমার বই-পড়া বিদেশের শিক্ষা নয়? তবুও এ-সব কিছুই নয়,—শুধু বয়সে ছোট বলেই কি আমারই অপমানটা আপনারা অগ্রাহ্য করবেন?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিল না,—তেমনি নীরবে রহিল।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। আমার আচরণের জন্যে দিদি যেন না দুঃখ পান। একটু থামিয়া বলিল, আমার বাপ-মা বিলেত গিয়েছিলেন বলে মেমসাহেব ছাড়া তাঁকে আর কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না। শুনেচি, এই জন্যেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না। বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি ত তোমাকে অপমান করেন নি!

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেছেন।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না, অপমান তোমাকে মা করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝতে হবে।

বন্দনা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়াল মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম আমার এই লেখাপড়া-না-জানা মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ কত গভীর।

বন্দনা সহসা ফিরিয়া দেখিল, অপরিসীম মাতৃগর্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া জানালার বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— মা, এত বড় আত্মমর্যাদাবোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায়?

বন্দনা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি?

বিপ্রদাস কহিল, জান বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের দুটি ছেলেমেয়ে আছে—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তোদের তিনটিকে একসঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ বিদ্যে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অন্য কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আত্মসম্মানবোধই কাউকে একটা দিনের জন্যে জানতে দেয়নি, তিনি আমার জননী নন, বিমাতা। বুঝতে পার এর অর্থ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়াল, নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে কে

কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠল। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জবরদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্যাদা। সে এত উঁচু যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলে না। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর ত জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এদের দাসী, বলে অন্তঃপুরে শেকল-পরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে, কিন্তু বাড়ির দাসদাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না?

বন্দনা অভিভূত-চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিস্টারসাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাওড়া প্লাটফর্মে ইন্ করলে।

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নামতে আর যেন ভাল লাগচে না, মুখুয্যেমশাই। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মার কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা, আমি ভাল করিনি, আমাকে মার্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল, কিছু বলিল না।

স্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

রায়সাহেব বলিলেন, গ্র্যান্ড হোটেলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার করেও দিয়েছি—ঐখানেই উঠব।

এই লোকটির সুমুখে গ্র্যান্ড হোটেলের কথায় বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব গাড়ির অত্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বার বার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি. এন. লাইনে যাইতে হইবে,—অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ আর গত্যন্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায়সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমি—তুমিও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্র্যান্ড হোটেলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই। বৌবাজারে দ্বিজুর একটা বাড়ি আছে, প্রায়ই আসতে হয়, লোকজন সবই আছে—আচ্ছা, আজ সেইখানেই কেন সকলে চলুন না?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল—চলুন, সবাই সেইখানেই যাব। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সে-ই সাদরে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

নয়

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়িটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষমানুষের বাসাবাড়ি, হয়ত ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে থুথু, পানের পিচের দাগ, ভাঙ্গাচোরা আসবাবপত্র, ময়লা বিছানা, কড়ি-বরগায় ঝুল, মাকড়সার জাল—এমনি সব অগোছাল বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাত্রে সামান্য আলোকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য হইল। মস্ত বাড়ি, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, সমস্ত পরিষ্কার ঝকঝক করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা সঙ্কোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ির দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেছেন?

না, কাল শুতে দেরি হয়েছে, হয়ত উঠতেও দেরি হবে।

আমাদের সঙ্গে আর দুজন যাঁরা এসেচেন তাঁরা?

না, তাঁরাও ওঠেন নি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুচ্চেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গাস্নান, পূজো-আহ্নিক সেরে কাছারি-ঘরে গেছেন। খবর পাঠাব কি?

বন্দনা বলিল, না, তার দরকার নেই।

স্নানের ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার জো নেই, না?

দাসী কহিল, না।মা মাঝে মাঝে কালী-দর্শনের জন্যে কলকাতায় এলে এ-বাড়িতেই থাকেন কিনা, তাই ও-সব হবার জো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল-প্রতাপ মা। আচার-অনাচারের কঠিন শাসন। সে ফিরিয়া গিয়া কাপড় জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল,কহিল, এখানে দু-চারদিন যদি থাকতে হয়, তোমাকে কি বলে ডাকব? এখানে তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কোন দাসী নেই?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক কাজ।ওপরে আসবার সময় পায় না।যা দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেন, দিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি হবে।

তাহার বিনয়বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার বাড়ি অন্নদা? তোমার কে কে আছে?

অন্নদা বলিল, বাড়ি আমার এঁদের গ্রামেই—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে এঁরাই লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বৌ নিয়ে সে দেশেই থাকে। ভালই আছে দিদি।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে নিজে তুমি এখনো চাকরি কর কেন, বৌ-ব্যাটা নিয়ে বাড়িতে থাকলেই ত পার?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে ত হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলেদের মানুষ করার ভার নেব। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনে। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখাপড়া করে। আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়িতেই থাকে?

হাঁ, এই বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে,আমি বাইরেই আছি, ডাকলেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল ভিতরে নানাবিধ ব্যবস্থা। পাশাপাশি গোটা-তিনেক ঘর,স্পর্শদোষ বাঁচানোর যতপ্রকার ফন্দি-ফিকির মানুষের বুদ্ধিতে আসিতে পারে তাহার কোন ত্রুটি ঘটে নাই। বুঝিল এসব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে, পাথরের জলচৌকি, একদিকে গোটা-তিনেক প্রকাণ্ড তাঁবার হাঁড়া, বোধ হয় গঙ্গাজল রাখার জন্য,—নিত্য মাজাঘষায় ঝকঝক করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি অবহেলার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়িবার জো নাই। যেন এখানেই বাস করিয়া আছেন এমনি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার চেয়েও বড় কিছু-একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এ কথা বন্দনা চাহিবামাত্রই অনুভব করিল। এবং এই মা, এই স্ত্রীলোকটি যে এ-সংসারে সর্বসাধারণের কতখানি ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারীজাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লজ্জায় নিজে নারী হইয়া সে মর্মে মরিয়া গেছে—ইহা মিথ্যাও নয়,—কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আজ একাকী দাঁড়াইয়া সে-সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে দিদি, প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক, ওঁরা সব নীচে খাবার ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েছেন?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি খাবেন না?

অন্নদা সহাস্যে কহিল, খেলেও ত সেই দুপুরের পরে দিদি। আজ আবার তাও নেই। একাদশী, সন্ধ্যের পরে বোধ হয় কিছু ফলমূল খাবেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ গৃহে এই স্ত্রীলোকটি ঠিক দাসী জাতীয় নয়। কহিল, তিনি ত আর বামুনের ঘরের বিধবা নয়, একাদশীর উপোস করবেন কোন্ দুঃখে? কাল গাড়িতে একাদশী না হোক দশমীর উপবাস ত এমনিই হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক, উপোস ওঁর গায়ে লাগে না। মা বলেন, আর জন্মে তপস্যা করে বিপিন এ জন্মে উপোস-সিদ্ধির বর পেয়েছে। ওঁর খাওয়া দেখলে অবাক হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের অভ্যস্ত চা রুটি ডিম প্রভৃতি টেবিলে সুসজ্জিত, এবং পিতা ও সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ক্ষুধায় চঞ্চল। অধৈর্য তাহাদের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত, মুহূর্তে খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সাহেব অনুযোগের কণ্ঠে কহিলেন, ইঃ—এত দেরি মা, সকালবেলাটায় আর ত কোন কাজ হবে না দেখচি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল; বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মুখুয্যেমশাই, আপনি খাবেন না?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে। খাই শুধু ডাল-ভাত। তার সময় এ নয়—আমার জন্যে চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিল না, পিতা এবং অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করবেন না—আরম্ভ করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরি করে দিই। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পিতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেনি ত মা? সস্ত্রীক ব্যারিস্টারসাহেব কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বন্দনা চা তৈরি করিতে করিতে কহিল, না বাবা, অসুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করচে না।

তা হলে কাজ নেই। কাল বেশী রাত্রের খাওয়াটা বোধ করি তেমন হজম হয়নি। তা ছাড়া দিনের বেলা পিত্তি পড়ে গেল কিনা।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মুখুয্যেমশায়ের সঙ্গে বসে ডাল-ভাত খাব, এ-বাড়িতে সে হয়ত হজম করতে পারব।

কথাটায় আর কেহ তেমন খেয়াল করিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কাল ছায়া মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আজ একাদশী; ও-বেলায় দুটো ফলমূল ছাড়া আর ত কিছু খান না।

বন্দনা এইমাত্র এ কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, তথাপি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, শুধু ফলমূল? বেশ হালকা খাওয়া। সে-ই বোধ হয় খুব ভাল হবে। না, মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু কেহ যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে উপহাস করিতে পারে আজ এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনাও বোধ করি ইহা অনুভব করিল।

কাজকর্ম সারিয়া বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণবেলা। সস্ত্রীক ব্যারিস্টারসাহেব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পরিদর্শন করিয়া তখনও ফিরেন নাই। রাত্রের গাড়িতে তাঁহাদের যাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া যাত্রাটা আপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

রায়সাহেব কাপড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে অনুযোগের সুরে বলিল, দিদি, সারাদিন ত না খেয়ে কাটল,—আপনার ফলমূল সমস্ত আনিয়ে রেখেচি, একটু শিগগির করে মুখহাত ধুয়ে নিন, আমি ততক্ষণ সব তৈরি করে ফেলি। কি বলেন?

কিন্তু বড়বাবু,—মুখুয্যেমশাই? তিনি কৈ?

অন্নদা কহিল, তাঁর জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি; এ-সব তাঁর রোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কৈ তিনি?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বরে কালীদর্শন করতে। এখুনি আসবেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভাল, তিনি এলেই হবে। কিন্তু বাকী সকলে? তাঁদের কি ব্যবস্থা হলো? চল ত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ-বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা ত রান্নাঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে—খাবার সেখান থেকেই আসবে।

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল—সে কি কথা এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে?

বড়বাবু নিজেই হুকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায়? এই বাড়িতে? তোমাদের মা শুনলে বলবেন কি?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি শুনতে পাবেন না। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসনপত্র হোটেলওয়ালারাই নিয়ে আসবে, কোন অসুবিধে হবে না।

বন্দনা বলিল, হুকুম ত দিয়ে গেলেন, কিন্তু তামিল করলে কে? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার?

সে আর বেশী কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্চি।

চল।

মুখুয্যেদের একটা বড় রকমের তেজারতি কারবার কলিকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা-চারেক ঘর লইয়া অফিস; কেরানী, গোমস্তা, সরকার, পেয়াদা, ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন সেখানে কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকে সহজে চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, হোটেলে হুকুম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার যান তাদের বারণ করে দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত—

বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবে না। মুখুয্যেমশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন। আপনার ভয় নেই। যান, দেরি করবেন না। এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্যত হইল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয়। বিপ্রদাসের হুকুম অমান্য করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির সুনিশ্চিত, নিঃসংশয় শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয়। প্রায় তেমনি অসম্ভব। ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধার স্বরে কহিল, আজ্ঞে, যাই তা হলে—নিষেধ করে আসি? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা হোক, আপনি দেরি করবেন না। এই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল। খুশী হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক-ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া

কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাথায় ম্যানেজারবাবুকে বরখাস্ত করে আসেন নি ত মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস কহিল, মুখুয্যেমশাই যে এমন বদরাগী এ খবর তোমায় দিলে কে?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু অতিথিদের উপায় হবে কি? এঁদের সকলের যে রাত্রে ডিনার করা অভ্যেস—তার কি বল ত?

বন্দনা কহিল, যাঁর না হলে নয় তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেব।

তামাশা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভাল হল না।

ভাল হতো বুঝি ঐ-সব জিনিস এ-বাড়িতে বয়ে আনলে? মা শুনলে কি বলতেন বলুন ত?

বিপ্রদাস এ কথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জানতে পারতেন না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন। আমি চিঠি লিখে দিতুম।

কেন?

কেন? কখনো যা করেন নি, দুদিনের এই ক'টা বাইরের লোকের জন্যে কিসের জন্যে তা করতে যাবেন? কখখন না।

শুনিয়া বিপ্রদাস শুধু যে খুশী হইল তাই নয়, বিস্ময়াপন্ন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা। রাগ কি পড়বে না? তাহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু স্নেহের সুর লাগিল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন? কিন্তু শুনুন, আপনার খাবার ফলমূল সব আনানো আছে, ততক্ষণ সন্ধ্যে-আহ্নিক আপনি সেরে

নিন, আমি গিয়ে তৈরি করে দেব। কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাব না তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, এস,—বলিয়া বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে বন্দনা ফলমূল মিষ্টান্নের সাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদার হাতে আসন ও জলের গ্লাস। জল-হাতে সমস্তটা সে সযত্নে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন স্নান করলে নাকি?

আপনি খেতে বসুন, বলিয়া সে পাত্রটা নামাইয়া রাখিল।

দশ

বিপ্রদাস আসনে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার স্নান করে এলে নাকি? অসুখ করবে যে?

তা করুক। কিন্তু হাতে না-খাবার ছলছুতা আবিষ্কার করতে আপনাকে দেব না এই আমার পণ। স্পষ্ট করে বলতে হবে, তোমার ছোঁয়া খাব না, তুমি ম্লেচ্ছ-ঘরের মেয়ে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়নি যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না?

বন্দনা বলিল, পড়েচি, কিন্তু আপনি দুরাত্মাও নন, ভয়ানকও নন—আমাদেরই মত দোষে-গুণে জড়ান মানুষ। তা না হলে সত্যই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতুম না।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলেচি। আপনাদের পরিবারে ওটা চলে না। না দেশের বাড়িতে, না এখানে। কিসের তরে ও-কাজ করতে যাবেন?

কিন্তু জান ত, সবাই ওঁরা বিলেত-ফেরত—এমনি খাওয়াতেই ওঁরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস যাই হোক, তবুও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী-অতিথি ডিনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজির নেই। সুতরাং, এ অজুহাত অগ্রাহ্য। ওটা আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তবে কাজের কথাটা কি শুনি?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু বোধ হয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেন না। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে

কিছুতেই রাজী হতেন না। লোকে আপনাকে মিথ্যে অত ভয় করে। যাঁকে করা দরকার সে আপনি নয়, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ হাসিয়া বলিল, তুমি দুজনকেই চিনেছ। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিল এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে?

বন্দনা নাম করিল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েচি। সে এতবড় দুর্ঘটনা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না, চিরদিন অভিসম্পাত করে বলবেন, বন্দনার জন্যেই এমন হল। তাই কিছুতেই এ কাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আত্মীয়, কুটুম্বের মধ্যে সকলের বড়। এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরি না করে তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে কিনা এ কথা সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? বরঞ্চ জেনে এস গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া সে হাসিয়া খাবারের থালাটা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মুখ প্রথমে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না, এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি যেতে পারব না, আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু মুশকিল এই যে, নিজের বাড়িতে তোমাকে উপবাসী রাখতেও ত পারিনে, এই বলিয়া সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন?

বাড়ি ফিরে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, এই বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি সত্ত্বেও ইহা সত্য না পরিহাস বন্দনা নিশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া একটা হবেই, কিন্তু তোমার বোনের শাস্তি থেকে যে পরিত্রাণ পাব এটা তার চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস হল না? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন মুখুয্যেমশায়ের কথাটা বুঝবে, এই বলিয়া সে খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ডিনার বাতিল হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য রুচিকর আহার্যের আয়োজনে অবহেলা ছিল না। সুতরাং পরিতৃপ্তির দিক দিয়া কোথাও ত্রুটি ঘটিল না। কিন্তু সর্বকার্য সমাধা করার পরে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে বিপ্রদাসের আচরণ অপ্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অন্যায়ও নয়, এবং আপনার জন হইয়াও যেজন্য এতকাল ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিল না তাহাও এতদিনের প্রাচীন কাহিনী যে নূতন করিয়া আঘাত বোধ করা শুধু বাহুল্য নয় বিড়ম্বনা। প্রণাম করিতে গেলে বিপ্রদাসের মা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে বন্দনা না খাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিহীন নারীর উদ্ধত ধর্মবোধ তাহাকে আঘাত করে নাই তাহা নয়, তথাপি এই মূঢ়তাকেও একদিন বিস্মৃত হওয়া সহজ, কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার প্রতিবাদে কি করা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার হাতের ছোঁয়া ফলমূল-মিষ্টান্ন সে খাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়িয়া। পাছে বলরামপুরের কদর্য কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ যেন পাগলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে। কিন্তু এই অনাচার বিপ্রদাসের লাগিয়াছে, বাড়ি ফিরিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই কথাটা কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুমান করিয়া বন্দনার চোখে ঘুম রহিল না। অথচ, একথাও বহুবার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কিসের? তাহাদের চলার পথ ত এক নয়,—সংসারে উভয়ের জন্যই প্রশস্ত স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে। দৈবাৎ সংঘর্ষ যদি একদিন বাধিয়াই থাকে বাধিলই বা। এ প্রশ্নের মুখোমুখী হইবার ডাক এ-জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি শান্ত করিবার

অনেক চেষ্টাই করিল, কিন্তু তথাপি এই মানুষটির নিঃশব্দ অবজ্ঞা কোনমতে মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ বাধাগ্রস্ত নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রার অবসন্ন জড়িমা দুই চোখ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল কালো-আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বড় রাস্তায় ক্বচিৎ-কদাচিৎ গাড়ির শব্দ অস্ফুটে শোনা যায়, লোক-চলাচলের তখনও অনেক বিলম্ব, সমস্ত বাড়িটাই একান্ত নীরব; সহসা চোখে পড়িল দ্বিতলে মায়ের পূজার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই একটা সূক্ষ্ম রেখা রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সম্মুখের থামে আসিয়া পড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকরেরা হয়ত আলোটা নিবাইতে ভুলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস,—পূজায় বসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুঝিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিবে না, এই রাত্রে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবে না, কিন্তু আগ্রহ সংবরণ করিতে পারিল না।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, ছবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দ রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাতির আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ কিছুই নয়, হয়ত আর কোন সময়ে দেখিলে বন্দনার হাসিই পাইত, কিন্তু তন্দ্রাজড়িত চক্ষে এ মূর্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হুঁশ নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল তখন পূবের আকাশ ফরসা হইয়া গেছে, এবং ভৃত্যের দল ঘুম

ভাঙ্গিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভাল যে, ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই। আর সে অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্নদা ডাকিল, দিদি, বড্ড বেলা হয়ে গেল যে, উঠবেন না?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হইয়াছে, লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা বোধ হয় আজও অপেক্ষা করে আছেন? একটু সকালে আমাকে তুলে দিলে না কেন? স্নান করে তৈরি হয়ে নিতে ত এক ঘণ্টার আগে পেরে উঠব না অন্নদা।

তাহার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আজ আর ওঁরা সবুর করতে পারেন নি,—শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুশি স্নান করুন গে, কেউ পেছু ডাকবে না।

শুনিয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কহিল, তোমাদের অনেক জিনিসই পছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু এটা করি। সকলের দল বেঁধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেলবার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায় না দিদি?

বন্দনা কহিল, একদিনও না। অথচ ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসচি। আচ্ছা যাই, আর দেরি করব না।—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাছারি-ঘর হইতে কাজ সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার কহিল।

চা খাওয়া হলো?

হাঁ।

ওঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা থামাইয়া দিয়া কহিল, সেজন্যে ত অনুযোগ করিনি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাদুরি আছে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু দু বোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র-সূর্যির মত। শুনলাম নাকি শীঘ্রই যাচ্ছ বিলেতে শিক্ষাটা পাকা করে নিতে। যাও, ফিরে এসে একটা খবর দিয়ো, গিয়ে একবার মূর্তিটা দেখে আসব।

শুনিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিপ্রদাস কহিল, সে দেশে শুনেচি বেলা বারোটা পর্যন্ত লোককে ঘুমুতে হয়। কঠিন-সাধনা। তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধতে হবে না, এদেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইল।

বন্দনা এবারও হাসিল, কিন্তু তেমনিই চুপ করিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিতান্তই সাদাসিধে সাধারণ ভদ্র চেহারা। হাস্য-পরিহাসে স্নেহশীল, তাহাদেরই একজন। অথচ কাল রাত্রির নীরবতায়, নির্জন গৃহের মধ্যে স্তব্ধ-মৌন এই মূর্তিটিকে কি যে রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল, এই দিবালোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৌতুকের সীমা রহিল না।

মুখুয্যেমশাই, এঁরা কোথায়? কাউকে ত দেখচি নে?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই। অর্থাৎ শ্বশুর মশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিস্টারমশাই—তিনজনেই গেছেন হাওড়ায় রেলওয়ে স্টেশনে—গাড়ি রিজার্ভ করতে।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিস্টারমশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনো ত আট-দশ দিন বাকী আছে। তা ছাড়া আমাকে না বলে?

বিপ্রদাস কহিল, বলবার সময় পাননি, বোধ করি ফিরে এসেই বলবেন। সকালে বোম্বাইয়ের অফিস থেকে জরুরী তার এসেচে—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইল না যে না গেলেই নয়।

কিন্তু আমি? এত শিগগির আমি যেতে যাব কেন?

বিপ্রদাসও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই, যেতে যাবে কেন? আমিও ত ঠিক তাই বলি।

বন্দনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, বোনটিকে একটা তার করে দাও না,—দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে পড়ুন। তোমাদের মিলবেও ভাল, অতিথি-সৎকারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচব।

বন্দনা সভয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যেমশাই? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজী হবেন? আমাকে তিনি ত দেখতে পারেন না।

বিপ্রদাস কহিল, একবার চেষ্টা করেই দেখো না। বল ত তার করার একটা ফরম পাঠিয়ে দিই,—কি বল?

বন্দনা উৎসুক-চক্ষে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া বলিল, থাক গে মুখুয্যেমশাই, এ আমি পারব না।

তবে থাক।

আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

সেই ভাল, এই বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেল।

খাবার টেবিলের উপর পিতার টেলিগ্রামটা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সত্যই বোম্বাই অফিসের তার। অত্যন্ত জরুরী,—বিলম্ব করিবার জো নাই।

বন্দনা ঘরে গিয়া আরেকবার তোরঙ্গ গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফিরেন নাই, ঘণ্টা-কয়েক পরে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে দিদি, এই নিন।

আমার টেলিগ্রাম? সবিস্ময়ে হাতে লইয়া বন্দনা খুলিয়া দেখিল বলরামপুর হইতে মা তাহাকেই তার করিয়াছেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন পিতার

সহিত সে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যায়। বৌমা দ্বিজুকে লইয়া রাত্রের গাড়িতে যাত্রা করিতেছে।

এগার

রাত্রের গাড়িতে আসিতেছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিতেছে দ্বিজদাস। বন্দনার আনন্দ ধরে না। সেদিন দিদির শ্বশুরবাড়িতে নিজের আচরণের জন্য সে মনে মনে বড় লজ্জিত ছিল, অথচ প্রতিকারের উপায় পাইতেছিল না। আজ অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে পিতার সঙ্গে বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যাইতে হইত, অকস্মাৎ অভাবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল, অন্নদাকে পড়িয়া শুনাইল এবং উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার জন্য—এই ছোট্ট কাগজখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে। বিপ্রদাস বাড়িতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি বাহিরে গেছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে জানাইবার কিছুই নাই, তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপূত হয় না। আনন্দ-প্রকাশের সহজ রাস্তাটা যেন কখন বন্ধ হইয়া গেছে। বহুনিন্দিত জমিদার-জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার শুরু হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখনো তিনি যথেষ্টই দুর্বোধ্য, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতেছিল এই মানুষটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন একটা ব্যবধান তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে।

আশ্রিত পরিজন, দাসী-চাকর, কর্মচারিবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ—বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্তা, বড়বাবু দুর্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু

কাহারও আত্মীয় নয়। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানান যায়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু তাহারা ভাবিতে পারে না।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাসীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নির্বোধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকুই বাহির করিতে পারিল যে, সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও করে। এবং অপরকে প্রশ্ন করিলেও বোধ করি এই উত্তরই মিলিত। মুখুয্যেপরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেনের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছে। গাড়ির মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হাস্য-পরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল, কিন্তু আজ মনেই হয় না সেই মানুষটিই এ-বাড়ির বড়বাবু।

হঠাৎ নীচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে একজন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রায়সাহেব স্টেশন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ও তদীয় পত্নী দুইজনে দুই বগল ধরিয়া সাহেবকে গাড়ি হইতে নীচে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ের জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই-তিন ভিজা রুমাল জড়ানো। প্লাটফর্মে ভিড়ের হুড়ামুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাক্স ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল,—দরোয়ান ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে,—ডাক্তার আসিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল,—বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিকালে সতী আসিয়া পৌঁছিল, বন্দনা কলরবে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি

নয়, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী—দয়াময়ী। উচ্ছ্বসিত আনন্দকলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আড়ষ্টভাবে কোনমতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল; কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ ত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল,—ভাল আছি। মা, হঠাৎ, আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বল ত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে, তাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শান্তি পাই কৈ মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলেমেয়ে হোক, আমার মত তাদের মানুষ করে বড় করে তোল, তখন আপনিই বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্টি করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না দিয়া হেঁট হইয়া এবার তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অসুস্থ মা।

অসুস্থ? কি হয়েচে তাঁর?

পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেন না। এই বলিয়া সে দুর্ঘটনার হেতু বিবৃত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি ত? চল ত কোন্ ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসি গে, তারপরে অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রায়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইঁহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন।

দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বেইমশাই, পা ভাঙলো কি করে, কোথায় ঢুকেছিলেন?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রায়সাহেব নিরীহ মানুষ, প্রতিবাদের সুরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কোথাও ঢুকিবার জন্য নয়, স্টেশন প্লাটফর্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েচে, এখন থাকুন দিন-কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়েতে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আর একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিন-কতক সেবা করুক।

রায়সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং এই অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য বহু ধন্যবাদ দিলেন।

আবার দেখা হবে,—যাই এখন হাত-পা ধুই গে, এই বলিয়া বিদায় লইয়া দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছিল, দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাসুদেব। মেজদির ছেলেকে বন্দনা সেদিন দেখিতে পায় নাই। সে ছিল পাঠশালায় এবং তাহার ছুটির পূর্বেই বন্দনা বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পিতামহীকে ছাড়িয়া বাসু থাকে না, তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

কাকা পরিচয় করাইয়া দিলে বাসুদেব প্রণাম করিল। বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আট-নয় বছরের ছেলে কিন্তু জানে সব।

বন্দনা সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারলে না বাসু?

পেরেচি মাসীমা।

কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ’ বছরের ছেলে—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা?

তবু মনে আছে মাসীমা, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আমাদের বাড়ি থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে, আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না।

রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ির সবাই জানে। তা ছাড়া আপনি লুকোবার ত বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে?

দ্বিজদাস বলিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয়, আমার রাগ করাটা আপনি উচিত বিবেচনা করেন?

দ্বিজদাস কহিল, করি, যদিচ তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

আপনি আমার বাবার সঙ্গে বসে খেতে পারেন?

পারি। কিন্তু দাদা বারণ করলে পারিনে।

পারেন না? কিন্তু আপনাকে বারণ করার অধিকার দাদার আছে মনে করেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে তাঁর ব্যাপার, আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া আমি অনুচিত মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্তব্য বলে বোঝেন তা করার কি আপনার সাহস নেই?

দ্বিজদাস ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন এ ঠিক সাহস অ-সাহসের বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলেবেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনিনি, দণ্ডও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখন উপেক্ষা করে না।

উপেক্ষা করলে কি হয়?

কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেন যা দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে-সব করেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে নয়। তা হলে পারতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা ভেবেছিলুম তা আপনি নয়। এখন তাঁকে ভরসা দিতে পারব, তাঁদের ভয় নেই। আপনার স্বদেশ-সেবার অভিনয়ে মুখুয্যেবংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোনদিন লোকসান হবে না। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা কেন চাইব! আমি চাই তাঁদের ভয় ঘুচুক, তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই, তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অন্ততঃ দাদার সম্বন্ধে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটা সবটুকু বাড়ির সকলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েচেন, তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত!

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, কহিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবে না, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিনি-চারদিন একসঙ্গে আছেন, এখনও তাঁকে চিনতে পারেন নি?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখব আশা করে আছি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হলে প্রথম পাঠ নিন। ঐ জুতোজোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনাদের ওপরে ডাকচেন।

চলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেছেন কেন?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম, কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা; দ্বিতীয়, আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন, যেন না বলে বসবেন না।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা, তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মার সামনে আপনাকে মিস রায় বলা চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকব। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না, রাগ করব কেন? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজুবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখুয্যেমশাই বলা মানবে না। তাঁকে সবাই বলে বড়দাদাবাবু,—আপনাকেও ডাকতে হবে বড়দাদা বলে। এই হ'ল আপনার দ্বিতীয় পাঠ!

কেন?

দ্বিজদাস বলিল, তর্ক করলে শেখা যায় না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্থ হলে এর কারণ প্রকাশ করব,— কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য হবেন।

দ্বিজদাস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা বৌদিদি এঁরা বড় খুশী হবেন। এটা সত্যিই দরকার।

আচ্ছা, তাই হবে।

সিঁড়ির একধারে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল দ্বিজদাস ও বাসুদেব। তিনি তোরঙ্গ খুলিয়া কি একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাঁড়াইয়া অন্নদা বোধ করি গৃহস্থালীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সহজ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া হয়েচে মা?

হাঁ মা, হয়েছে।

তা হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা। এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামুনঠাকুর করচে জানিনে—আমিও আহ্নিকটা সেরে নিয়েই যাচ্ছি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না, বলিলেন, দ্বিজুর শরীরটা ভালো নেই, সকালেও ও কিছু খেয়ে আসেনি। ওর খাবারটা যেন একটু শিগগির হয় মা। এই বলিয়া তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করিলেন না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করল?

দ্বিজদাস কহিল, সামান্য একটু জ্বরের মত।

কি খাবেন এ বেলা?

দ্বিজদাস কহিল, সাগু বার্লি ছাড়া যা দেবেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, রান্নাঘরে যাব, শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবে না ত?

দ্বিজদাস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধ হয় আপনার দিয়েছেন। ওঁর কথা মা কখন ঠেলতে পারেন না।—ভারী ভালবাসেন। ম্লেচ্ছ অপবাদটা বোধ করি আপনার কাটল।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্যের কথা।

দ্বিজদাস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি করেছেন, অন্নদাদিদি কি কথা মাকে বলেছেন জানিনে কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি আপনার চেয়েও ঢের বেশী আমি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না, যান, খাবার ব্যবস্থা করুন গে। আবার দেখা হবে।

এই বলিয়া দুইজনেই মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বার

কৈলাস তীর্থযাত্রায় পথের দুর্গমতার বিবরণ শুনিয়া মামীরা পিছাইয়াছেন, দয়াময়ীর নিজেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার কলিকাতায় কাটিল পাঁচ-ছয়দিন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গাস্নান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আসিয়া ঠেকিয়াছে বন্দনার কাছে। সতী কিছুই করে না, সকল ব্যাপারে বোনকে দেয় আগাইয়া, নিজে বেড়ায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘুরিয়া। তবু কোথাও বাহির হইতে হইলে তাহাকে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আয় না ভাই আমাদের সঙ্গে। তুই সঙ্গে থাকলে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে হয় না।

বিপ্রদাসেরও আজ কাল করিয়া বাড়ি যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন, বিপিন চলিয়া গেলে তাঁহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া

আনিয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, বিপিন, তুই যাই বলিস, বাবা, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঝিল, এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, কি হয়েছে? আজ মস্ত একটা লালমুখো সার্জেন এসে আমাদের গাড়ি আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, ইংরিজিতে কি দু'কথা বুঝিয়ে বললে, সাহেব তক্ষনি গাড়ি ছেড়ে দিলে। নইলে কি হ'ত বল ত? হয়ত সহজে ছাড়ত না, নয়ত থানায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত—কি বিভ্রাটই ঘটত! তোর নতুন পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে তোমরা—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কথা বিপিনকে তাই বলছিলুম মা, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই আলাদা! তুমি সঙ্গে না থাকলে সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম! কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেমবেটির। চালাতে জানে না তবু চালাবে। জানে না—তবু বাহাদুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই ঐ রকম মা। মেমসাহেব নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন। বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, সেটা মেমসাহেবের দোষ, লেখাপড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। কাল দ্বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিকে দৃষ্টি আছে। কেবল লেখাপড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। আর তেমনি মিষ্টি কথা। ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি—সংসারের কিচ্ছুটি চেয়ে দেখতে হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, ম্লেচ্ছ বলে আর ঘেন্না কর না ত মা?

দয়াময়ী বলিলেন, তোর এক কথা! ম্লেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্যে,—ওর মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেমসাহেব বলে দুর্নাম রটালে। নইলে আমাদের মতই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে—তা পরলেই বা! বিদেশে অমন সবাই পরে। লোকজনের সামনে বার হয়—তাতেই বা দোষ কি? বোম্বায়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই—ছেলেবেলা থেকে যা শিখেচে তাই করে। আমার যেমন বৌমা তেমনি ও। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলচে—শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চলবে কেন মা? বন্দনা থাকতে আসেনি,—দুদিন পরে ওকে যেতে ত হবেই।

দয়াময়ী কহিলেন, যাবে সত্যি, কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায় না,—ইচ্ছে করে চিরকাল ধরে রেখে দিই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে ত আর সত্যিই হবার জো নেই মা—পরের মেয়েকে অত জড়িও না। দুদিনের জন্যে এসেছে সেই ভালো। এই বলিয়া সে কিছু অন্যমনস্কের মত বাহিরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপূত হইল না। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। বলরামপুরে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলা কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মত—হাসিয়া, গল্প করিয়া এবং চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের সঙ্গেই হাস্য-পরিহাসে এতটা হাল্কা হইতে দয়াময়ীকে ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই,— তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতিসিদ্ধ গাম্ভীর্যকে সেই স্রোতে মাঝে মাঝে যেন ভাসাইয়া দিতে চায়।

সতীর সঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয়, তাহার অর্থ শুধু শাশুড়ী-বধূই বুঝে, আরও একজন হয়ত কিছু-একটা অনুমান করে সে অন্নদা। সস্ত্রীক

পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ি গেছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী যাইবার সময়ে কৌতুক করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন যে, কর্মস্থলে ফিরিবার পূর্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায়সাহেবের পা ভাল হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছুদিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বায়ের পরিবর্তে বলরামপুরে গিয়া অন্ততঃ আরও একটা মাস দিদির কাছে অবস্থান করিবে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখুয্যেদের মামলা-মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মামলার তারিখ নিকটবর্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ি না গিয়া এই দিনটা পার কারিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস বিপিন?

বিপ্রদাস আদালতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিজুদের কি-একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হতে দেবে না, আর ওরা করবেই। লাঠালাঠি মাথা ফাটাফাটি হ'তই, শুনে ভয়ে মরি—

সে গেছে নাকি?

না। সেই কথাই ত তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনবে না, এমন কি ওর বৌদিদির কথা পর্যন্তও না, শেষে শুনতে হ'ল বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্যাদায় কোথায় যেন একটু ঘা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইয়াও মুখে শুধু বলিল, সত্যি নাকি?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাই ত হ'ল দেখলুম। কবে নাকি ওদের শর্ত হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল- চলনে এ বাড়ির নিয়ম লঙ্ঘন করবে না, আর তার বদলে অন্যজনকে তার অনুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে, দ্বিজুবাবু, শর্ত মনে আছে ত? আপনি কিছুতে আজ যেতে পাবেন না। দ্বিজু স্বীকার করে বললে, বেশ তাই হবে, যাব না। শুনে আমার ভাবনা ঘুচল বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্তা বেঁচে নেই, কি ভয়ে ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আগে তবু ওর ইস্কুল-কলেজ, পড়াশুনা, একজামিন-পাস করা ছিল, এখন সে বালাই ঘুচেছে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন্ ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি, শেষ পর্যন্ত এত বড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, না, মা সে ভয় ক'র না, দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখনো করবে না।

মা বলিলেন, ধর যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায়? সেই আশঙ্কা কি নেই?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে মানি, কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ সে কোনদিন করবে না। ধর যদি আমারি কখন জেল হয়,—হতেও ত পারে, তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

কথাটা দয়াময়ীকে শূল-বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এতবড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ, কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র

আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান-পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে সেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজুর জন্য তাঁহার উদ্বেগ আছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঢের বেশী ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্য। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। বিপ্রদাস কহিল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে!

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বালাই ষাট! ও-সব অলুক্ষণে কথা তুই বলিস নে বাবা। তার পরেই কহিলেন, জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন? এত সম্পত্তি রয়েচে কিসের জন্যে? তার আগে সর্বস্ব বেচে ফেলব, তবু এ ঘটতে দেব না, বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল, দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, দ্বিজুর যা হয় তা হোক গে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব বিপিন। এ সইতে আমি পারব না, তা জেনে রাখিস। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা, এ বেলা কি—, বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, ছেলেটাকে অনেকদিন বুকে করিনি তাই একটু সাধ হলে নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা দিও কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েচি, আমার পিসশাশুড়ী তখনও বেঁচে, বিপিনকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই

নাও তোমার বড়ছেলে বৌমা। কাজকর্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায়নি—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে, তার পরে হবে অন্য কাজ। তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন আমি পারি কিনা—কি জানি পেরেচি কিনা! এই বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভেতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল সোনা দিয়ে গড়া জ্যান্ত পুতুল, বড় বড় চোখ মেলে আশ্চর্য হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অনুষ্ঠান তখন অনেক বাকী, সবাই হৈচৈ করে উঠলো, আমি কিন্তু কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চিনিনে—যে দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আন ত ঝি আমার খোকার দুধের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি এক পা নড়ব না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বললে বেহায়া, কেউ বললে আরো কত কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্যই করলুম না। মনে মনে বললুম, বলুক গে ওরা। যে রত্ন কোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সেই ছেলেকে তুমি বল কিনা বুড়ো!

ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রুজলে ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখন ঘটে নাই। অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আপনার দুটি ছেলের কোন্‌টিকে বেশী ভালবাসেন সত্যি করে বলুন ত?

শুনিয়া দয়াময়ী হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বন্দনা বাহিরের লোক, সবেমাত্র পরিচয় হইয়াছে, ইহার সম্মুখে এই-সকল পূর্বকথার আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ-সব তত্ত্ব নেই; তার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারী অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক।

শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, কহিল, ইংরিজি পুঁথি আপনিও ত কম পড়েন নি মুখুয্যেমশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে?

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা,—বুঝিনে। এ-সব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিলে সে ত এখনও বললে না?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা, এ-বেলার রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। এই বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন তুই ত খুব ধার্মিক, জানিস ত বাবা, মাকে কখনও ঠকাতে নেই!

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা, অমন করে তুমি ভূমিকা ক’র না। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

দয়াময়ী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বললি কেন যে তোরও জেল হতে পারে?

কৈলাসে যাবার সঙ্কল্প এখনও ত্যাগ করিনি বটে, কিন্তু আর ত আমি এক পাও নড়তে পারব না বিপিন।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিও না। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত,— দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্যই কারও বংশে কলঙ্ক পড়ে না।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন—ওতে আমি ভুলব না বিপিন। এলোমেলো কথা বলার লোক তুই নয়—হয় কি করেচিস, নয় কি-একটা করার মতলবে আছিস। আমাকে সত্যি করে বল।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করেই বলচি আমি কিছুই করিনি। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কত রকমের মতলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দেশ দেওয়া চলে মা?

দয়াময়ী পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তাও না। নইলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মানুষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই শেষকালে এতবড় নেমকহারামি করবি বাবা? বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিপন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি বল? তুমি ত জান তোমার অমতে কখন একটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী কহিলেন, কর না সত্যি, কিন্তু কাল দ্বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচ কাজকর্ম সমস্ত বুঝে নিতে?

বড় হল, আমাকে সাহায্য করবে না?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাস নে বিপিন, তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হল ওর সাহায্য নেবার। কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, এ কথা বলিল না যে, তিনি নিজেই এইমাত্র দ্বিজদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বলিতেছিলেন। কিন্তু ইহারই আভাস পাওয়া গেল দয়াময়ীর পরবর্তী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্মের পরিবার, এখানে অনাচার সয় না। আমাদের বাড়ি নিয়মের কড়াকড়িতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি সতেরো বছর বয়সে,—সে তোর মত নিয়ে নয়,—আমাদের সাধ হয়েছিল বলে। কিন্তু দ্বিজু বলে, সে বিয়ে করবে না। ও এম. এ. পাস করেছে, ওর ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি হয়েছে, ওর ওপর কারও জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই, আমার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিতে সে যেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবে না?

প্রায়ই ত বলে। বলে, বিয়ে করবার লোক অনেক আছে, তারা করুক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস এখানে এসে পর্যন্ত আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াই,—খুব মনের সুখে আছি। কিন্তু সুখে আমি নেই। এর ওপর তুই দিলি আজ জেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিল না। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বৌদিদিকে হুকুম করতে বল না মা?

তার কথাও সে শুনবে না।

শুনবে মা, শুনবে। সময় হলেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ কর ত তার পাত্রীর সন্ধান করতে পারি।

বন্দনা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, অনুযোগের সুরে কহিল, কৈ এলেন না ত? আমি কতক্ষণ ধরে বসে আছি মা!

চল মা, যাচ্ছি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবুর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা? এখন সে বড় হয়েচে। মেয়েটি যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদেরই

স্ব-ঘর, বল ত গিয়ে দেখে আসি, কথাবার্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপছন্দ হবে না।

না না, সে এখন থাক,—বলিয়া দয়াময়ী পলকের জন্য একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সতীর ইচ্ছে, না—না বিপিন, বৌমাকে জিজ্ঞেসা না করে সে-সব কিছু করে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। সুন্দর শান্ত চোখে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাতে দোষ কি মা? এই ত কলকাতায়, চলুন না দিদিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসি গে।

শুনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে ইস্কুল-কলেজ থেকে পাস করান নি বটে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েছেন অনেক। একদিন তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেসা করেছিলুম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল, বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাও না মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে— তোমার বড়বৌ অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করবেন তিনি ছাড়াও সংসারে রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন। কিন্তু হাসি আসিল না, মুখে কথাও যোগাইল না,— বন্দনা পুনশ্চ অনুরোধ করিল, চলুন না মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসি গে? বেশী দূর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের পরে এখন সে লাবণ্য আর নাই, যেন ছায়ায় ঢাকা দিয়াছে। এইবার, এতক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, না মা, দূর বেশী নয় জানি, কিন্তু সে সময়ও আমার নেই। চল আমরা

যাই,—এ বেলায় কি রান্না হবে দেখি গে। এই বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

তের

সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বিপ্রদাস সেইমাত্র নিজের লাইব্রেরিঘরে আসিয়া বসিয়াছে; সকালের ডাকে যে-সকল দলিলপত্র বাড়ি হইতে আসিয়াছে সেগুলা দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন,—হাঁ রে বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস!

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিসের মা?

অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে আমরা যে দেখে এলুম।

মেয়েটি কি মন্দ?

দয়াময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, না মন্দ বলিনে,—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়ে না সে সত্যি,—কিন্তু তাই বলে আমার বৌমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বৌমার কথা যাক, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি সে দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে। আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হলো, কি যত্ন করেই না সে বৌমাদের খাওয়ালে—তার পরে কত বই, কত লেখাপড়ার কথাবার্তা বন্দনার সঙ্গে তার হলো, আর তুই বলিস আমরা আর কাকে দেখে এসেচি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে হয়ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা, লেখাপড়ায় বন্দনা ইস্কুল-কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পরীক্ষা পাস করেচে, আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোটছেলের তফাত।

শুনিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল,—চুপ কর বিপিন, চুপ কর। দ্বিজ ও-ঘরে আছে, শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ি ছেড়ে পালাবে। একটু থামিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্যু বলে কি এতই মুখ্যু যে কলেজের পাস করাকেই চতুর্বগ্য ভাববে? তা নয় রে, বরঞ্চ ছোট্ট ছোট্ট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েছে। গাড়িতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখাপড়ায়? আমার একটি বৌ যেমন হয়েছে আর একটি তেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিদ্যের গুমরে সে যে মনে মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে সে হবে না।

বিপ্রদাস বুঝিল জেরার জবাবটা মায়ের এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় করো না মা। বিদ্যে যাদের কম, গুমর হয় তাদেরই বেশি। ও বাপের কাছে যদি সত্যি সত্যিই কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নীচু হয়েই থাকবে তুমি দেখ।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এ কথা তোর সত্যি, কিন্তু আগে থেকে জানব কি করে বল? তা ছাড়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিদ্যের কমবেশি কেউ যাচাই করতে আসে না, কিন্তু বৌ দেখতে এসে সকলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিল না যে অমন বৌয়ের পাশে এই বৌ এনে দাঁড় করালে! এ আমার সইবে না বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা। সেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম, আমার মায়ের বোধ হয় অমত হবে না।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও-কথা না বললেই ভাল হত বিপিন। তা সে যাই হোক, বৌমার কি ইচ্ছে আগে শুনি, তার পরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিল না বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্যেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর-এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে, নিজের ইচ্ছাতেই দিয়েছিলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞেসা করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি যত মত-জানাজানির দরকার হল মা?

তর্কে হারিয়া হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েছি বাবা, আর কতকাল বাঁচব বল ত? কিন্তু চিরকাল যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে কি বিয়ে দিতে পারি? না না, দুদিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে। এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয় দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল,—প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহ্নিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন,—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি সুদর্শন যুবক বন্দনার সহিত মৃদুকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিখুঁত সাহেবি পোশাকের এই অপরিচিত লোকটির সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দয়াময়ী সলজ্জে পিছাইয়া যাইবার উপক্রমেই রায়সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাচ্চেন বেয়ান, ও যে আমাদের সুধীর। ওকে লজ্জা কিসের? ও ত বিপ্রদাস দ্বিজদাসের মতই আপনার ছেলে। আমার অসুখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে। সুধীর, ইনি বন্দনার দিদির শাশুড়ী—বিপ্রদাসের মা, এঁকে প্রণাম কর।

সুধীরের প্রণাম করার হয়ত অভ্যাস নাই, ও-পোশাকে করাও কঠিন, সে কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সন্তান-সম্বন্ধ যে কি সূত্রে হইল ইহাই বুঝাইবার জন্য রায়সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি একসঙ্গে

বিলেতে পড়েছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমরা পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলেতে অনেকগুলো পাস করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগে ভাল চাকরি পেয়েছে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্তি হবে, না হয় শুধু দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে। দ্যাখো সুধীর, তোমরা যদি এই আগস্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার আমিও না হয় মাস-তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি। কি বলিস রে বুড়ি, ভাল হয় না?

বন্দনা সেখান হইতেই আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবে না বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালই হয়।

রায়সাহেব উৎসাহ-ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে, তোদের বিয়ের পরেও মাস-খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোনরকম তাড়াহুড়ো করতে হবে না।

বুঝলে না সুধীর, সুবিধেটা?

ইহাতে সুধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দয়াময়ী এতক্ষণে বুঝিলেন এই ছেলেটি রায়সাহেবের ভাবী জামাতা। অতএব, তাঁহারও পুত্র-স্থানীয়। বুকের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিপ্রদাসের মা, বলরামপুরের বহুখ্যাত মুখুয্যে-পরিবারের কর্ত্রী, মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীর, তোমাদের বাড়ি কোথায় বাবা?

সুধীর কহিল, এখন বোম্বায়ে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু বর্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই।

কোন্ দুর্গাপুর সুধীর? বর্ধমান জেলার?

সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেচি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি সে দেশ ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি?

সুধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহের নাম কি ছিল হরিহর বসু?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়সাহেব পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি?

হাঁ, জানি। দুর্গাপুরে আমার মামার বাড়ি। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছি বলে ও-গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ি ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমার আহ্নিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না খেয়েও যেন তুমি চলে যেও না,—আমি এখনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলচি।

সুধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকি নেই,—বিপ্রদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দিয়েছে? আচ্ছা, তা হলে এখন আমি আসি, এই বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বন্দনার প্রতি একবারও চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

পরদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাসমত মায়ের পদধূলির জন্য আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছে।

এ কি মা, কোথাও যাবে নাকি?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না, তাই দত্তমশায়কে জিজ্ঞেসা করে জানলুম সাড়ে-নটার গাড়িতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছতে পারব। কিন্তু পরশু তোর মকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবি নে, দ্বিজুকে বলে দে, ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়ের দুই চোখ রাঙ্গা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি তাঁহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েচে মা?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্যে এসে আট-দশদিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্চে জানিনে, পাঁচ-ছটি গরুর প্রসব সময় হয়েচে দেখে এসেচি, তাদের কি হল খবর পাইনি; বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্চে—আর ত দেরি করা চলে না বিপিন।

এ-সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় সত্য, কিন্তু আসল কারণটা যে তিনি প্রকাশ করিলেন না বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজই না গেলে নয় মা?

না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিসনে। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফলমূল ও ছেলের দুধের ঘটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদাদিদি, ব্যাপার কি জান?

না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালেই মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলে-বৌয়ের গাড়িতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি ন'টার ট্রেনে বাড়ি যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না।

শুনিয়া বিপ্রদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্নদা না জানিতেও পারে, কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিস্ময় কি আছে? কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ-সকল

মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন্ গভীর দুঃখ তাঁহার এই বিপর্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল যাহা কাহারো কাছেই তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন, তখনও ট্রেনের অনেক সময় বাকী, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহে না, কোনমতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিসপত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ-হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দ্বিজু কৈ?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবে না মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেন, যেতে রাজী হল না বুঝি?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই কবে অবাধ্য হয়েছে বল ত?

তবে হল কি? গেল না কেন?

আমিই যেতে বলিনি মা, এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচ তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল,—তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘটল নিজের চোখে দেখব বলেই সঙ্গে যাচ্চি। অন্য কিছুই নয় মা।

আর কোন সময়ে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হয়ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে এইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে যাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে দ্রুতপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ি যাচ্চি বন্দনা!

বাড়ি? সেখানে কি হয়েচে মা?

না, হয়নি কিছু। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ-বারো দিন দেরি হয়ে গেল, আর বাড়ি ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলো না—তখনো তিনি ওঠেন নি—আমার ক্রুটি যেন বেহাই মার্জনা করেন। দ্বিজু রইল, অন্নদা রইল, তুমিও দেখো যেন তাঁর অযত্ন না হয়। এসো বৌমা, আর দেরি করো না, এই বলিয়া তিনি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল,—আমরা চললুম ভাই—আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়িতে তাহার শাশুড়ীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্বাক দাঁড়াইয়া,—যেন পাথরের মূর্তি, অকস্মাৎ এ কি হইল!

বাসু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্চি মাসীমা,—তখনই তাহার চৈতন্য হইল, তাহারও এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তাড়াতাড়ি বাসুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দয়াময়ী ও মেজদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অস্ফুটে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন, বুঝা গেল না। মোটর ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চল দিদি, আমরা ওপরে যাই।

তাহার স্নেহের কণ্ঠস্বরে বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহ্বলতা সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি রান্নাঘরের কাজগুলো সেরে নিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সেই দিকে চালিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু আজ তাহার উল্লেখ পর্যন্ত নয়, সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্যন্ত নয়।

ঘণ্টা-খানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানরা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছি ছি, কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন!

বন্দনা বলিল, বাবা, আমরা কবে বোম্বায়ে যাব?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলে না কেন?

মেয়ে বলিল, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাব বাবা, তুমি যে আজও ভাল হতে পারনি।

ভাল ত হয়েছি মা। বেহানকে কথা দেওয়া হয়েছে তুমি যাবে, না হয়, যাবার পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নাবিয়ে দিয়ে যাব। কি বল মা?

না বাবা, সে হবে না। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারব না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিতচিত্তে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর বুড়ি! দেখা হলে বেয়ান তোরে ঠাট্টা করে বলবে, বুড়ো বাপটাকে মেয়েটা চোখের আড়াল করতে পারে না। ছি—ছি—

তুমি খাও বাবা, আমি আসচি, এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

চোদ্দ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বন্দনা আসিয়া দ্বিজদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আসতে পারি দ্বিজবাবু? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পার।একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্য বার পার।

বন্দনা দরজার পাল্লা-দুটা শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘরের সবকয়টা আলো জ্বালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

দ্বিজদাস হাতের বইটা একপাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হুকুম?

কি পড়ছিলেন?

ভূতের গল্প।

অতিথি বড়, না, ভূতের গল্প বড়?

ভূতের গল্প বড়।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিল, সকল সময়েই তামাশা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে?

দ্বিজদাস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। এবং বাড়িওলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। ত্রুটি নিশ্চয় হত না, কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আত্মবিস্মৃত হয়ে কর্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেছে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেছে জানেন?

নিশ্চয় জানি।

নিশ্চয় জানেন, অথচ, প্রতিকারের কি কোন উপায় করেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

কেন?

সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ি চলে গেলেন কেন?

মেজদি গেলেন প্রবলপরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দোষ।

কিন্তু মা গেলেন কেন?

মা-ই জানেন।

আপনি জানেন না?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে, মিথ্যা বলা হবে। কারণ, বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেছেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেচি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেললে বন্দনা। এ কথা কি তোমার না শুনলেই চলে না?

না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

না-ই বা শুনলে?

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজবাবু, আমাদের শর্ত হয়েছিল, এ বাড়িতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমি লঙ্ঘন করিনি। বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল, আর

একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল,—বলুন না শিগগির চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজদাস বলিল, চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা-ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়ল যখন শূন্য তখন সমস্ত সংসারের উপর গেলেন চটে। চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, জানো নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার প্রতি ছিল তাঁর যত বড় বিতৃষ্ণা আর একদিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজকর্মে, দয়া-মায়ায় একা বৌদি ছাড়া মার কাছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে ম্লেচ্ছ বলে সাধ্য কার? তখনি মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এতবড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া দ্বিজদাস নিজের রসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাসি বন্দনার অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

দ্বিজদাস বলিল, হাসচ কি বন্দনা, আসলে সেই ত হয়েছে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ হবে কিসের জন্যে?

দ্বিজদাস বলিল, তবে অবধানপূর্বক শ্রবণ কর। দয়াময়ীর দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিসীম সন্দেহ ও ভয়। তাঁর ধারণা অপদার্থতায় পৃথিবীতে কনিষ্ঠের

সমকক্ষ নেই। কিন্তু মা ত! গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না,—অতএব মনে মনে পুত্রের সদ্গতির উপায় নির্ধারণ করলেন তোমার স্কন্ধে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার-মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হল বন্দনার স্কন্ধদেশে স্থান নাই, ছোট সে তরী—অর্থাৎ কিনা দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প, সকল স্বপ্নজাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্বাহ্নেই সমারূঢ়, তাঁকে নড়ায় সাধ্য কার! এই বলিয়া সে আর এক দফা উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এ-রকম বিকট হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েছেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোন্‌টা?

দ্বিজদাস স্মিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই যে অকস্মাৎ পদস্খলনে মা-জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্তিতে দর্শক হিসেবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেচি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবে না যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে, সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিজস্ব নয়, ওতে অপরেরও দাবী থাকতে পারে। কারণ, আমাকে না হোক দাদাকেও মা যদি তাঁর ষড়যন্ত্রের আভাস দিতেন, আর কিছু না ঘটুক, এ কর্মভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে পারা যেত। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম, তুমি অন্যের বাগ্‌দত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ,

অতএব এ ব্যবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়সাহেব তোমাদের ভালবাসা, বাগ্‌দান ও আশু বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনায় আমাদের দু ভায়ের দু জোড়া কানেই সুধাবর্ষণ করেছিলেন। না না, রাগ করো

না বন্দনা, সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, চিত্তের প্রফুল্লতায় সুসংবাদ আত্মীয়স্বজনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেন নি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্যেই কি মুখুয্যেমশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানিনে। কারণ, দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতাদেরও অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মতে মৈত্রেয়ী দেবী সর্বগুণান্বিতা কন্যা। বলরামপুরের ধনী ও মহামাননীয় মুখুয্যে-পরিবারের অযোগ্যা নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি?

দ্বিজদাস বলিল, এ বাড়িতে ও প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে-কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন, তাঁরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকব। এই এ গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্তন নেই।

তাহার বলার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন?

দ্বিজদাস ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা! দুষ্ট রাহু পূর্ণচন্দ্র ভক্ষণ করেছে, কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অভাগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উক্তিতে বন্দনা আর একবার হাসিয়া ফেলিল বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা ত পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোক-কাননটা রক্ষে পেয়েছিল! হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বৃথা। শ্রীরামচন্দ্রের বরাতের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

না যায়নি।

কি যায়নি?

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই। সংসারে কারও নেই, মায়েরও না, আপনার দাদারও না।

তাহার শান্ত-দৃঢ় কণ্ঠস্বরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুপ করে রইলেন যে? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি, আজ কি এই ছলনা করতে চান?

না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অনুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলার পরিচয়, তবু কি অর্থ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ?

দ্বিজদাস বলিল, বোধ হয় আর একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবচি, আমার সংশয় নিরসনের এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আসুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে, তাকে বোঝাবার আমার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। তাঁকে বোঝাবে কি করে?

বন্দনা বলিল, মা আপনি বুঝবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। আজ হঠাৎ যত চঞ্চল হয়েই চলে যান, যা জেনে গেছেন সে যে সত্যি নয় এ কথা মাকেই যদি না বোঝাতে পারি, আমি কিসের আশা করি বলুন

ত! আমার কোন ভাবনা নেই দ্বিজুবাবু, একদিন না একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাব। বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙ্গিয়া দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার দ্বিধা দ্বিজদাসের ঘুচিয়াও ঘুচিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্তনে তাহার সকল সংশয় মুছিল,—এ ত শুধুই পরিহাস নয়! বিস্ময় ও ব্যথায় আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচ যে?

প্রত্যুত্তরে বন্দনা কথা কহিল না, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোনও দোষ করেনি বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিল না, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্যে বলুন ত? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেচি?

দ্বিজদাস এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না, বুঝিল, প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্য এদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্যে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবধি থাকবে না। আমাকে তুমি কিভাবে বুঝেচ জানিনে, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবে না। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সইবে?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোলা থাকে দ্বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই তা বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমাকেও আপনি

কি বুঝেচেন জানিনে, কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ, এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার থাকেন।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ-সব ধারণা ত তোমাদের নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায় নি দ্বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছে থেকে, মুখুয্যেমশাইকে দেখে এ-সব আমার আপনিই মনে হয়েছে। এ বাড়িতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তার পরে মুখুয্যেমশাই, তার পরে দিদি, তার পরে আপনি, এখানে অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ বাড়িতে জায়গা যদি কখনো পাই এঁদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবে না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের যেমন ভাল লাগিল তেমনি মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমন করিয়া জানিয়া লওয়া অন্যায়,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই-সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন এ আমি জানি, তাই তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল তুমি হবে এ বাড়ির ছোটবৌ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পরকালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারবেন। তাঁর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর জো নেই, তাঁর মতে বাগ্‌দান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে যাকে সম্মতি দিয়েচো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে

ত্যাগ করতেও তুমি পার, কিন্তু সেই শূন্য-আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবে না।

শুনিয়া বেদনায় বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মা কি এই-সব বলে গেছেন দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, অন্ততঃ বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বৌদি বলছিলেন, মায়ের সবচেয়ে বেজেচে এই ব্যথাটা যে সুধীর আমাদের জাত নয়,— আসলে তোমরা জাত মানো না। এতবড় বিভেদ যে, কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবে না।

আপনিও কি এই কথাই বলেন?

আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়!

রায়সাহেবের আহারের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছিল, বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্বে কহিল, বাবার ছুটি শেষ হয়েচে, কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, এ-ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেও না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দেমাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পনর

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা করিয়াছে যে, নির্লজ্জ উপযাচিকার ন্যায় আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্মমর্যাদার জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ দ্বিজদাস পুরুষ হইয়াও যেমন রহস্যাবৃত ছিল তেমনি রহিল। তাহার মুখের ভাবে না ছিল অগ্রাহ্য, না ছিল উল্লাস, সে না দিল আশা, না দিল সান্ত্বনা, বরঞ্চ পরিহাসচ্ছলে এই কথাটাই বার বার করিয়া জানাইল যে সে তৃতীয় পক্ষ। তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ বাড়িতে অবান্তর বিষয়। শুধু কি এই! মার নাম করিয়া বলিল, বাগ্‌দান মানেই সম্প্রদান; বলিল, নিরপরাধ সুধীরের শূন্য আসনে গিয়া দয়াময়ীর ছেলে বসিবে না। কিন্তু অপমানের পাত্র ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দয়ার্দ্র-চিত্তে মাত্র এইটুকু কথা দিয়াছে যে বন্দনার এই বেহায়াপনার কাহিনী মায়ের কাছে সে উল্লেখ করিবে।

আবার এইখানেই কি শেষ! দ্বিজদাসের কথার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল, এই পরিবারের যেখানে যে-কেহ আছে, সকলের ছোট হইয়াই সে আসিতে চায়। আর সে ভাবিতে পারিল না, সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে—এত ছোট যে আত্মঘাতী হইলেও এ হীনতার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বাহিরে হইতে কে আসিয়া জানাইল রায়সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। উঠিয়া সে পিতার ঘরে গেল, সেখানে তাঁহাকে বারংবার জিদ করিয়া সম্মত করাইল, কালই তাঁহাদের বোম্বায়ে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাস ফিরিয়া আসিলে রাত্রের ট্রেনে তাঁহারা যাত্রা করিবেন। হঠাৎ এইভাবে চলিয়া

যাওয়াটা যে ভালো হইবে না ইহাতে সাহেবের সন্দেহ ছিল না,—ছুটিও ছিল, স্বচ্ছন্দে থাকাও চলিত, তথাপি কন্যার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজি হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তার পরে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিসপত্র সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল, ফোন করিয়া গাড়ি রিজার্ভ করিল এবং বোম্বায়ে তার করিয়া দিল। সন্ধ্যায় ট্রেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার বিলম্ব সহে না।

বেলা তখন ন'টা বাজিয়াছে, অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড?

বন্দনা ময়লা কাপড়গুলা ভাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল, কহিল, আজ আমরা যাবো।

সে তো আজ নয় দিদিমণি। যাবার কথা যে কাল।

না, আজই যাওয়া হবে। এই কথা বলিয়া সে কাজ করিতেই লাগিল, মুখ তুলিল না।

অন্নদা একমুহূর্তে মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন, আমি গুছিয়ে দিচ্চি। আপনার কষ্ট হচ্চে!

কষ্ট দেখবার দরকার নেই, নিজের কাজে যাও তুমি। এ বাড়ির সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগারাগির পালা চলিতেছে অন্নদা তাহা জানিত। হঠাৎ মা কাল বাড়ি চলিয়া গেলেন, আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত। কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমণি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, আমি ত তার কৈফিয়ত চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও। দ্বিজুবাবু তাঁর ঘরেই আছেন, তাঁকে বলো

গে। এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল। বন্দনা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশী আদরেই প্রতিপালিত। সহ্য করার শক্তিটা তাহার কম। কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও তাহার হয় নাই এবং হয়ত এতবড় কঠোর বাক্য সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই। তাই বলিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফরসা হয়েছে দেখে ভাবলুম আর শোবো না, শুইনিও, কিন্তু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো, কোথা দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুম না। মনিবের কথা বলচেন দিদিমণি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব নয়? বলুন ত, এ অপরাধ আর কখনও কি আমার হয়েছে? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই।

শেষের দিকে কথাগুলো বোধ হয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন মানে?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারী অসুখ গেছে। এখানে এসে পর্যন্তই ওর শরীর খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। কাল মা'দের নিয়ে বাড়ি যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, মা যেন না জানতে পারেন, কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অনুদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচি নে এমনি দুর্বল।

ওকে মানুষ করেছি, ওর সব কথা আমার সঙ্গে। ভয় পেয়ে বললুম, সে কি কথা? শরীর খারাপ ত লুকোচ্চো কেন? ওর স্বভাবই হলো হেসে উড়িয়ে দেওয়া, তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে, তুমি ওদের বিদেয় করো না দিদি, তার পরে আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। ভাবলুম, মার সঙ্গে ওর বনে না, কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না, এ বুঝি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না। বড়দাদাবাবু ওঁদের নিয়ে চলে গেলেন। তার পরে সমস্ত দিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলে না। দুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু,

কেমন আছ? বললে, ভাল আছি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হলো না। ডাক্তার আনাতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বললে, কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের উপর এ অভিমান ওর আর গেল না। সমস্ত দিন খেলে না, বিছানায় শুয়ে কাটালে, বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, দ্বিজু, শরীর যদি সত্যিই খারাপ নেই তবে সমস্ত দিন শুয়ে কাটাচ্ছোই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অনুদিদি, শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মত পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারত্রিক মঙ্গলের চেষ্টায় আছি। তোমার ভয় নেই। সব তাতেই ওর তামাশা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম কিন্তু ভয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে পড়তে শুরু করে দিলে।

অন্নদা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা, আমার দোরে ঘা পড়ল। কে রে? বাইরে থেকে জবাব এলো, অনুদিদি আমি। দোর খোলো। এত রাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, ব্যস্ত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজুর এ কি মূর্তি! চোখ কোটরে ঢুকেছে, গলা ভাঙ্গা, শরীর কাঁপচে,—কিন্তু তবু হাসি। বললে, দিদি, মানুষ করেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙ্গালুম। যদি চোখ বুজতেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বুজবো। এই বলিয়া অন্নদা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন থামিতে চাহে না এমনি ভিতরের অদম্য আবেগ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষণ লাগিল, তারপরে কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলুম, কিন্তু যেমন কাট বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হলো রাত বুঝি আর পোহাবে না, কখন নিশ্বাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারদের খবর দেওয়া হলো, তাঁরা সব এসে পড়লেন, ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ-সেঁক চলতে লাগলো—চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তাররা বললে আর ভয় নেই। কিন্তু কিভাবে যে রাতটা

কেটেছে দিদিমণি, ভাবলে মনে হয় বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেচি—ও-সব কিছুই হয়নি! এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি, আমাকে তুললে না কেন অন্নদা?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো, আর তোমাকে ব্যস্ত করলুম না দিদিমণি। নইলে দ্বিজু বলেছিল।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল, দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমোচ্চে। ডাক্তাররা বলে গেছেন, হয়ত সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙ্গবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

না। দত্তমশাই বললেন তার আবশ্যক নেই, তিনি আপনিই আসবেন।

ও-ঘরে লোক আছে ত?

হাঁ দিদিমণি, দু'জন বসে আছে।

ডাক্তার আবার কখন আসবেন?

সন্ধ্যার আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকুই সান্ত্বনা। এছাড়া তাহার কি-ই বা করিবার আছে!

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বেশি বলিল না।

তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি?

না, আমাদের ঘুম ভাঙ্গানো কেউ উচিত মনে করেনি।

কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি!

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল, তিনি ক্ষণেক পরে নিজেই বলিলেন, টিকিট কিনতে পাঠান হয়েছে, গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘটল।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো?

না, উপকার নয়, কিন্তু তবু—

না বাবা, এমনি করে কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে, আর তুমি মত বদলিয়ো না। এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া আসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, বন্দনার ঘরে ঢুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা-দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজুবাবু ভাল আছেন?

হাঁ দিদি, ভাল আছে, ঘুমুচ্চে।

বন্দনা কহিল, আমাদের যাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবে না, আর একজন যখন বাড়ি এসে পৌঁছবেন তখন আমরা অনেক দূর চলে গেছি।

অন্নদা সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় নটা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল, তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি। সকলের ভয় ঘোচে।

কিন্তু ভয় ত কিছু নেই অন্নদা!

অন্নদা বলিল, নেই সত্যি, কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়িতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দায়িত্ব নেই, সব তাঁর। যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিবেচনা, তেমনি সাহস, আর তেমনি গাম্ভীর্য! সকলের মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ায় বসে আছি।

সেই পুরাতন কথা, সে বিশেষণের ঘটা। মনিবের সম্বন্ধে এ যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অন্য সময় হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িত না, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই দ্বিজু! দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ।

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া কহিল কেন?

অন্নদা বলিল, তা বৈ কি দিদি। না আছে দায়িত্ববোধ, না আছে ঝঞ্ঝাট, না আছে গাম্ভীর্য। বৌদি বলেন, ও হচ্চে শরতের মেঘ, না আছে বিদ্যুৎ, না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক, হেসে খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরিগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই রাগ করেন না?

করেন না? খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কোথায়? কিছুদিনের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয় যে বৌদি কান্নাকাটি শুরু করে দেন, তখন সবাই মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিরদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে হবে, ছেলেপুলে হবে, তখন যে এ ব্যবস্থায় একেবারে দেউলে হতে হবে!

বন্দনা কহিল, এ কথা তোমরা ওঁকে বলো না কেন?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েছে, কিন্তু ও কান দেয় না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবে না, তখন সকলে মিলে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের ওপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন, আমরা খাবো আর দ্বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচ শ টাকা আয় ত আর কেউ

ঘুচোতে পারবে না, আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবো না।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন। অথচ যে সমাজে, যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ, সেখানে এ কথা কেহ বলে না, হয়ত ভাবিতেও পারে না। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কিনা তাই বা কে জানে।

কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্তী পরিবার, কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয় ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয়, দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্মে গত হইয়াছে, তাহার ছেলে এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই, তবু মায়া কাটাইয়া তাহার যাইবার জো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অনুবিদ্ধ এমন কতজনের পুরুষানুক্রমের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধ্য সন্তান দ্বিজদাসও কাল বলিয়াছিল, তাহার মা, দাদা, বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই সে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে, তবু আজই এ কথার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায়সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছ'টা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন, বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্যায় যতবড় হউক, অনিচ্ছা যত কঠিন হউক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ করিয়া যে ব্যবস্থা নিজে

ঘটাইয়াছে তাহার পরিবর্তন চলিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সর্বাগ্রে মনে হইল, ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক সুখের স্বপ্ন দিয়া এই ঘরখানি যে পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সোজা পথ ছাড়িয়া দ্বিজদাসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল। কিন্তু যে জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিজদাসকে দেখা গেল না।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দত্তমশাই, রায়সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দেবার জন্য অনেকগুলা টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিজদাসের খবরটা তাঁহাকে অতি শীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, দ্বিজুবাবুর তুমি দিদি—তাঁকে মানুষ করেছ,—এই আংটিটি তোমার বৌমাকে দিও অনুদিদি, যে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দত্তমশাই নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপরে চোখ তুলিল, কিন্তু আজ সেখানে আর একদিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ সংকেতে বিদায় দিতে দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিদ্রায় অচেতন।

ষোল

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি যে প্রচ্ছন্ন লাঞ্ছনা ও অব্যক্ত গঞ্জনা ছিল সতীকে তাহা গভীরভাবে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। দুপুরের ট্রেনে বিপ্রদাস কলিকাতায় ফিরিবে। এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখন করেন না,—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী নিষেধ করিয়া কহিলেন, না বৌমা, যেও না। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবো না, একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস তুই, কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ি চলে এলুম?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি-একটা গোলযোগ ঘটেছে এইটুকুই আন্দাজ করেচি।

মা কহিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষে করেছেন। কাল বেহাই-মশাই বোম্বায়ে চলে যাবেন, কথা ছিল তার পরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে ওর মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবে না, বাপের সঙ্গে সোজা বোম্বায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস। বৌমা, মনে দুঃখ করো না মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল যে ওকে ভালবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমাদেরই একজন। ওর চালচলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে-

সব ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মত, বাতাস লাগলে উড়ে যাবে—থাকবে না। হাজার হোক সতীর বোন ত বটে! কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়েতের ঘর থেকে, কে জানত বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপাতে গেছে!

বিপ্রদাস কহিল, ও—এই কথা! কিন্তু ওরা যে জাত মানে না এ খবর তুমি ত শুনেছিলে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম, কিন্তু চোখে দেখিনি, বোধ হয় মনে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা সত্যিই জানতুম না বাবা। বলিতে বলিতে ঘৃণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মরুক গে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়িতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কৈ জবাব দিলিনে যে বিপিন?

জবাব ত তুমি চাওনি মা! হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, হুকুমটা কি অন্যায় দিচ্ছি তোর মনে হয়?

হয় বৈ কি মা! বন্দনা অন্যায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না, তারা জাত মানে না, এ কথা জেনেই তাকে তুমি আসার আহ্বান করেছিলে, ভালোও বেসেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুখেই বলে কাজে করে না,—এইখানেই তোমার হয়েচে ভুল, আঘাতও পেয়েচো এই জন্যে।

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরই কি ঘেন্না হয় না বিপিন? তুই বলিস কি বল ত!

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাস সত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেচি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতিভেদ বিশ্বাসও করে না, গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলে না। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ করো না মা, তোমার দ্বিজুটি হলো এই জাতের।

শুনিয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুশী হইলেন তা নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ। কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিস নে, তবে তার ছোঁয়া কিছু খাসনে কেন? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই সে-ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি, খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক, আমিও বুঝতে পারিনি ভাবিস?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবে না ত মা হয়েছিলে কেন? কিন্তু আমি যে সত্যিই জাত মানি মা, আমি ত তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যেদিন মানবো না সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো, একটুও লুকোচুরি করবো না!

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিস নে বিপিনি, কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক, দেখিস যেন একথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারী লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কিনা জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

অমন অভিমানী মেয়ে এ জেনেও তোকে অত ভক্তি করতো? তার মানে?

ভক্তি করার কথা তোমরাই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তোমাদের সমস্ত ঢাকাঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পরে বলিলেন, তাই বুঝি সে অতো করে পীড়াপীড়ি করতো?

কিসের পীড়াপীড়ি মা?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাতে-ভাত হলেই চলে, কিন্তু সে তা কিছুতে দেবে না। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারি আনাবে, নিজে কুটে বেছে দেবে, বামুনপিসিকে দিয়ে দশখানা তরকারি জোর করে রাঁধিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যার দেওয়া চলে না তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন, খেয়েও কি বুঝতে পারিস নি বিপিন, অমন রান্না পিসি তার বাপের জন্মেও রাঁধতে জানে না?

বিপ্রদাস সহাস্যে উত্তর দিল, না মা, অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরা-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্নাঘরেও ছিটকে এসে পড়েছে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় একজনের ইচ্ছাকৃত এ খবর আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। ট্রেনের সময় হয়ে এলো, আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে, না প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সতীকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বৌমা?

ছেলেবেলায় সতী শাশুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলে না। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাক গে মা, এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শাশুড়ী খুশী হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাষ ছিল অন্য প্রকার, অথচ নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলে না। বলিলেন, বড়মানুষের মেয়ের অভিমান হলো বুঝি?

না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেচি তার পরে আর তাকে এখানে ডাকা চলে না।

কেন চলবে না বৌমা, একটা অন্যায় যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই?

নেই বলিনে, কিন্তু দরকার কি? আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েছে, কিন্তু কখনো আমরা রাজী হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে ঢুকতো বলে উনি রান্নাঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে?

বিপ্রদাস কহিল, সে নালিশ তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার সাক্ষী।

সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া গেল,শাশুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন আমিও তার সাক্ষী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নালিশ আর করে না। দেবদেবতাও কম পীড়ন করেন না, তবু পূজো বন্ধ করে না, বলে—দুঃখ দিয়েছেন তিনি ভালোর জন্যেই। শাশুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি করেনি মা, কম ভালোবাসে নি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে দিত কেবল ওঁর জন্যে? তা নয়, করত সে তোমাদের দু'জনের জন্যেই,—তোমাদের দু'জনকেই ভালোবেসে। তার পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের ভার—সকলকে খেতে দেবার কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারত না মা, ভাতে-ভাত সবাইকেই গিলতে হতো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেছে—সে আর ফিরবে না মা। এই বলিয়া সতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দারুণ বিস্ময়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সতীর স্বভাবে এরূপ উক্তি, এরূপ আচরণ এমনি সৃষ্টিছাড়া যে ভাবাই যায় না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মা?

দয়াময়ী কহিলেন, জানিনে ত বাবা।

কিসের জন্যে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুচলো?

দয়ামগ্নী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না, কি তাঁর সঙ্কল্প ছিল। শুধু বলিলেন, সে-সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আজ না।

মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

আমার আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকেও জিজ্ঞাসা করিস সে কি বলে। এই বলিয়া তিনিও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইল না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আর ছিল না।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ি খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা-কয়েক পূর্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটাও আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার ইচ্ছা রায়সাহেবের তেমন ছিল না, কেবল কন্যাই জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার পরে দাবী কিছুই নাই, থাকার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাত্র, তবু সে যে দেখা না করিয়া পীড়িত দ্বিজদাসকে অচেতন ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে,—মনে করিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো—নির্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া যেন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে ভাব তাহার মনের মধ্যেই রহিয়া গেল।

দিন-চারেক পরে বিপ্রদাস হাইকোর্ট হইতে ফিরিল প্রবল জ্বর লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া, হয়ত বা আর কিছু। চোখ রাঙ্গা, মাথায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, অন্নদা কাছে আসিলে বলিল, অনুদি, অসুখ ত কখন হয় না, বহুকাল জ্বরাসুর দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবার বুঝি বা সে সুদে-আসলে উসুল করে। মনে হচ্ছে কিছু ভোগাবে, সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল, কিন্তু নির্ভয়ের সুরে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা, তোমার পুণ্যের দেহ, এতে দৈত্য-দানার বিক্রম চলবে না। তুমি দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছিল্য করতে পারবো না।

তাই দাও দিদি, বলিয়া বিপ্রদাস শয্যা গ্রহণ করিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাসুদেবের অসুখের সংবাদে কাল দ্বিজদাস বাড়ি গেছে, দত্তমশাই শহরে নাই—মনিবের কাজে তিনিও ঢাকায়। একাকী কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আসিয়া বলিল, বিপিন, একটা কথা বলব ভাই, রাগ করবে না ত?

তোমার কথায় কখনো রাগ করেচি অনুদি?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্রাণ দিয়ে রোগের সেবা করতেই পারি, কিন্তু মুখ্যু মেয়েমানুষ জানিনে ত কিছু, বাড়িতেও খবর পাঠাতে পারচি নে, ছেলের অসুখ—ফেলে রেখে বৌ আসবে কি করে—কিন্তু বন্দনাদিদিকে একটা খবর দিলে হয় না?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি, যে, খবর পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তার নুন আনতেই এদিকের পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিল, বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। বন্দনাদিদি কলকাতায় আছে, এখানো তার বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

বন্দনা কলকতায় আছে?

হাঁ, তার মাসীর বাড়িতে বালিগঞ্জে। মেসো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তার, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেছেন। হঠাৎ হাওড়ার ইস্টিশানে দেখা, তাঁরাও নাবচেন গাড়ি থেকে, এঁরাও যাচ্চেন বোম্বায়ে। মাসী জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, দৈবাৎ যখন পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত

তিনি কিছুতে ছেড়ে দেবেন না। শুধু একদিন আটকে রেখে ওর বাপকে তারা যেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, মাসীটি কি চেনা?

হাঁ, আপনার বড়মাসী। দূরে দূরে থাকে। সর্বদা দেখাশুনো হয় না, সত্যি, কিন্তু আপন লোক বটে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে অনুদি?

কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুর খবর নিতে। দুপুরবেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতির জন্য কাঁথা সেলাই করচি, দেখি বাইরের উঠানে দু-গাড়ি লোক এসে উপস্থিত। মেয়ে-পুরুষে অনেকগুলি। কে এঁরা? উঁকি মেরে দেখি আমাদের বন্দনাদিদি। কিন্তু সাজসজ্জায় এমনি বদলেছে যে হঠাৎ চেনা যায় না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি, কোথায় বসাই,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিক পরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন, খবর দিলেন,—তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলুম অন্ততঃ মাসখানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। থিয়েটার, সিনেমা, চড়িভাতি, বাগান-বাড়ি—আমোদের শেষ নেই। নিত্য নতুন ঘটা।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অসুখের খবর তাকে দিয়েছিলে?

হাঁ, দিলুম বৈ কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—সেরে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অনুদি, আমিও সেরে যাবো। সে কটা দিন তুমি একলা পারবে না আমাকে দেখতে?

অন্নদা জোর করিয়া কহিল, পারবো বৈ কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয় একবার জানানো উচিত, নইলে বউ হয়ত দুঃখ করবে। হাজার হোক বোন ত?

ঠিকানা জানো?

আমাদের শোফার জানে। ওদের পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা দাও একটা খবর। কিন্তু অতো আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারে? মনে ত হয় না দিদি।

অন্নদা বলিল, মনে আমারও বড়ো হয় না ভাই। তার সাজগোজের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবুও একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসুক ক্লান্তকণ্ঠে শুধু বলিল, পাঠিও দিদি, তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

সতর

হঠাৎ বড়মাসীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল তখন বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য হইল না। তিনি মেয়ের বিবাহ-উপলক্ষে স্বামীর কর্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এতকাল সুদূর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সেদিকের, অথচ, যে সমাজের অন্তর্গত সে, তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায়, ইহার সহিত আজও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সহযোগে। কলিকাতায় সর্বদা আনাগোনা যাহাদের, তাহাদের মুখে মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে—অ্যানিটা চ্যাটার্জি এম.এ., বিনীতা ব্যানার্জি বি. এ., অনসূয়া, চিত্রলেখা, প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি বহু জমকালো নাম ও চমকানো কাহিনী—বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতটা যে যথার্থ ও কতটা যে বানানো দূরে হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন চিত্রটা ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ঘোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসীমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাঁহাদের জানাশুনা, বিশেষতঃ, প্রকৃতি এখনকার স্কুল-কলেজে

পড়িয়াই বি এ. পাস করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

আসিয়া পর্যন্ত এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয়দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধীর রহিল কলিকাতায়। আসন্ন-বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া সদলবলে বাড়ি ফিরিবার পথেই সে দ্বিজদাসের সংবাদ লইতে এ বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অন্নদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়িতে দলের লোকের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, শলা-পরামর্শের কামাই নাই, আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহাসমারোহে চলিয়াছে চা-খাওয়া। এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শোফার দরজা খুলিয়া দিতে যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাহার পোশাকের সামান্যতায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। মোটরের সঙ্গে মানুষটির সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরনে ছিল সাদা থান, তেমনি একটা সাদা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি, মাথার আঁচলটা কপালের অর্ধেকটা চাপা দিয়াছে—সে নিজেও যেন সলজ্জ সঙ্কোচে কিছু জড়সড়ো। ভৃত্য-বেহারাদের চাপকান-পাগড়ির সাজসজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন্ দেশের, তথাপি সম্মুখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনাদিদি বাড়ি আছেন?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ, আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্চেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না?

পারবো। কি বলতে হবে?

বলো গে বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি থেকে অন্নদা এসেছে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনও করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পর্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট—ও-বাড়ির দাসী মাত্র। অকারণে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, অনুদি, তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবেছিলুম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

না অনুদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবো না।

অন্নদা আপত্তি করিল না, শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচি বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ির আমি দাসী বৈ ত নয়।

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মুখুয্যেমশাই ত এসেছেন পাঁচ-ছ'দিন হোল কলকাতায়, নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না? তিনি ত জানেন আমি বোম্বায়ে যাইনি।

হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেছেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ। এতটুকু সময় ছিল না।

এ কথা শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অনুদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতা-রক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বলো গিয়ে আমার মাসীমার তাঁদের মতো ঐশ্বর্য নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ-বাড়িতে পা দিলে তাঁর জাত যেতো না। মর্যাদার লাঘব হতো না।

এ-সকল অনুযোগের উত্তর অন্নদার দিবার নয়। সে ও-বাটীতে যাইবার অনুরোধ করিতে গেল, কিন্তু শুনিবার ধৈর্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথার

মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অনুদি, সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরশু আমার বোনের বিয়ে।

পরশু?

হাঁ পরশু।

এ সময় অসুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখনি প্রশ্ন করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার হুকুমটা দিল কে? ছোটবাবু ত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি? কিন্তু তাঁকে বলো গিয়ে হুকুম চালিয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমি খাতকও নই, তাঁর জমিদারির আমলাও নই। আমাকে অনুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভাল

আছেন?

হ্যাঁ আছেন।

আর সকলে?

অন্নদা বলিল,খবর এসেছে ছেলের অসুখ।

কার অসুখ,—বাসুর? কি হয়েছে তার?

সে আমি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিতমুখে বলিল, ছেলের অসুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখুয্যেমশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো? মামলা-মকদ্দমা আর টাকাকড়ির টানটাই কি হলো তাঁর এত বেশি অনুদি? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিত।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয্যাগত। ছেলের অসুখে সেখানে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না, অথচ এখানে দত্তমশাই পর্যন্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়, একা আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কিছুই বুঝিনে, ভয় হয় অসুখটা পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল,—ডাক্তার এসেছেন? কি বলেন তিনি?

বললেন, ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন। অন্নদার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এ দুটো দিন যেমন করে হোক কাটাবো, কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না? আমাদের ওপর রাগ করেই থাকবে? তোমাদের কোথায় কি ঘটেছে আমার জানবার কথা নয়, জানিও নে, কিন্তু এ জানি আর যে-ই দোষ করে থাক বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভুল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চলো আমি যাচ্ছি।

এখুনি যাবে?

হ্যাঁ, এখুনি বৈ কি।

বাড়িতে বলে যাবে না? এঁরা ভাববেন যে।

বলতে গেলে দেরি হবে অনুদি, তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মাসীমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়িতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাসবাবুর অসুখ!

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে কিন্তু আলো জ্বালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বালিশগুলা জড়ো করিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অসুখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন, গুরুজনের পায়ের ধুলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুঁতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া যান!

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন,—সেবা করতে? অনুদি বলছিলো ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু একি ব্যাপার! ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে? কবরেজের বড়ি কৈ? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘেন্না করে, ছোঁয় না তাদের বলে। তাদের চেয়ে বড় ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, আছে। যাদের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য নাই, অকারণে নির্দোষীকে হুল ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে তারা। তাদের দলের মস্তবড় পাণ্ডা তুমি নিজে।

অকারণে কোন্ নির্দোষী ব্যক্তিটিকে হুল ফুটিয়েছি আপনি বলে দিন ত শুনি?

আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

আচ্ছা, সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন?

ভালো আছি, কিন্তু জ্বরটা রয়েছে। রাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

দরকার আমার নয়, অনুদিদির, সে-ই ভয় পেয়েচে। তার মুখে শুনলুম, পরশু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমাকে শোনাবো।

আজ পারেন না?

না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট-দুই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পরে কহিল, মুখুয্যেমশাই, অসুখ আপনার বেশি নয়, দু'দিনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভান করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকার? কিন্তু বোনের বিয়ের যে!

বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

সত্যি থাকবে না বিয়েতে?

না।

কিন্তু এরই জন্যে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল, যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, স্টেশন থেকে ফিরে এলুম, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই নয়। দূরে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনিনে, মুখে মুখে কত কথা শুনি, গল্প-উপন্যাসে কত কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে—মনে হয় বুঝি বা আমরা সমাজছাড়া এক-ঘরে। মাসীমা ডাকলেন, ভাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ যে সুযোগ মিললো, এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু সেই বিয়েটাই যে বাকী এখনো। দলের লোকদের চেনবার সুযোগ পেলে কৈ?

সুযোগ পুরো পাইনি সত্যি, কিন্তু যতটা পেয়েচি সে-ই আমার যথেষ্ট।

নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো বন্দনা? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি সেরে উঠুন তার পরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

চাকরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল, আর বসে নয়, এবার আপনাকে শুতে হবে। এই বলিয়া এলোমেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলা ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস শুইয়া পড়িলে পা হইতে বুক পর্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেরে উঠে নিজেকে শুদ্ধশুচি করে তুলতে না জানি কত গোবর-গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, এত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেবাযত্ন করতেও একটু জানো দেখচি।

জানি একটু? না মুখুয্যেমশাই, এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমাদের নিন্দেই যদি করেন সজ্ঞানে করতে হবে। এমনধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে আমি দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা কারা বন্দনা? কাদের সম্বন্ধে আরও খোঁজ-খবর নিতে হবে? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের?

কে বললে আমি পালিয়ে এলুম?

আমি বলচি।

জানলেন কি করে?

জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার চোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অসুখ আমি চাইনে, কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেছে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে কটা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তার পরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো—

মাসীর বাড়িতে আর ফিরবো না। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি, এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের জন্যেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, ওদের শুধু শাড়ী গাড়ি আর মিথ্যে ভালবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসৌরির হোটেল আমি জানিও নে, কিন্তু ওদের মুখে মুখে তার কি-যে নোংরা চাপা ইঙ্গিত,—শুনতে শুনতে ইচ্ছে হতো, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই ঘরের মধ্যে বসে মনে হচ্ছে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলোমেলো ধূলোবালির ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে আমার দিনরাত কেটেছে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি করে।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শান্তি, না আছে কোন ধর্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করে না, কেবলি করে তর্ক। একটু থামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়। কিন্তু আমি ত ও-সব পড়তে পারিনে, তাই অর্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অরুচি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদের ত ক্লান্তি নেই, তার বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবা কাছে থাকলে সুবিধে হত বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হতো না।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বাবার সে বাতিক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর তৃপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত? কি হবে জেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিনরাত ঘটচে!

এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা, তোমার মুখে নয়। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশী জানে মনে করেছেন? একটুও না। শূন্য কলসী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বার হয়। তাদের আর কিছু না জেনে থাকি এ খবরটা জেনে নিয়েচি মুখুয্যেমশাই।

কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

না চাইনে! জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠচে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে? পারে না। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে? মনে হয় কেউ নেই এমনি পরস্পরের বিদ্বেষ। তাদের অভাবটাই কি কম? বাইরের জাঁকজমকে বোঝাই যাবে না ভেতরটা ওদের এত ফোঁপরা। কিসের জন্যে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘূণে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, হয়েছে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত?

না, ঠকিয়ে নেয়নি, ধার নিয়েছে।

কত?

বেশি না চার-পাঁচ শ’।

তাদের নাম জানো ত?

জানতুম কিন্তু ভুলে গেছি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছি ছি, এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে। বলতে মুখে বাধে না, লজ্জার ছায়া এতটুকু চোখে পড়ে না, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব হয় মুখুয্যেমশায়?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিষিয়ে দিয়েছে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসীমার

দলটাই তোমাদের সমস্ত দল নয়। যারা বাইরে রয়ে গেল খুঁজলে হয়ত তাদেরও একদিন দেখা পাবে।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই। তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে পেলুম তারা সবাই শিক্ষিত, সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয়। গল্প-উপন্যাসের রঙ-করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূরে থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত। মনে গর্বের সীমা ছিল না, ভাবতুম আমাদের মেয়েদের পেছিয়ে পড়ার দুর্নাম এবার ঘুচলো। আমার সেই ভুল এবার ভেঙ্গেচে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, ভুল কিসের? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ ত মিথ্যে নয়।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিথ্যে হবে কেন, সত্যিই। তবু আমার সান্ত্বনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প,—এঁদেরই গড়ের মাঠের মনুমেন্টের ডগায় ঠেলে তুলে হট্টগোল বাধানো যেমন নিষ্ফল তেমনি হাস্যকর।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্চে তোমার আর এক ধরনের গোঁড়ামি। স্বধর্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা,—সাবধান।

বন্দনা এ কথায় কান দিল না, বলিতে লাগিল, এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েছে বাঙলার প্রকাণ্ড নারীসমাজ। এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধ করি দেখাও মেলে না, তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙালীর নিশ্বাসে মিশে। জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়,—বড়র দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে, তাঁর শাশুড়ীতে,—এবার কলকাতায় আসা আমার সার্থক হলো মুখুয্যেমশাই। আপনি হাসচেন যে?

ভাবছি, টাকার শোকটা মানুষকে কি রকম বক্তা করে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কিনা।

কোন্ টাকার শোক—সেই পাঁচশ’-র?

তাই ত মনে হচ্চে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, টাকার জন্যে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার মজুরী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না দেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে, বিপিনের খাবার সময় হলো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অনুদি যাচ্চি। কেমন, যাই মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও। কিন্তু সেবার ত্রুটি হলে মজুরী কাটা যাবে।

ত্রুটি হবে না মশাই, হবে না। বলিয়া সেও হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

আঠার

বন্দনা বলিল, খাবার হয়ে গেছে নিয়ে আসি?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্চে আমার জাত মারার। কিন্তু সন্ধ্যে-আহ্নিক এখনো করিনি, আগে তার উদ্যোগ করিয়ে দাও।

আমি নিজে করে দেবো মুখুয্যেমশাই?

নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে? কিন্তু মার পূজোর ঘরে যেতে পারবো না—গায়ে জোর নেই,—এই ঘরে করে দিতে হবে। আগে দেখবো কেমন আয়োজন করো, খুঁত ধরবার কিছু থাকে কিনা, তখন বুঝে দেখবো খাবার তুমি আনবে, না আমাদের বামুনঠাকুর আনবে।

শুনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল, আমি এই শর্তেই রাজী। কিন্তু একজামিনে পাস যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে ছলনায় ফেল করাতে পারবেন না। কথা দিন।

দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ?

তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটায় খোলা জানালা দিয়া পূবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জনা করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধুতি গামছা এবং হাত-মুখ ধোবার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার, নইলে দিতুম, কাল এ ত্রুটি হবে না। কিন্তু আধ-ঘণ্টা সময় দিলুম, এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা—ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসবো।

এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধ-ঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা আরামচৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

পাস না ফেল মুখুয্যেমশাই?

পাস ফার্স্ট ডিভিশনে। আমার মাকেও হার মানিয়েছ। কার সাধ্য বলে তোমাকে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেচ।

এবার তা হলে খাবার আনি?

আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসো গে, বলিয়া বিপ্রদাস কোশাকুশি প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উঁচুগোড়ালি জুতার খুট্ খুট্ শব্দ একসঙ্গে কানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনাদিদি, তোমার মাসীমা—

মাসী এবং আরও দুই-তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

মাসী বলিলেন, নীচে থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ, আমি ভাল আছি।

আগন্তুক মেয়েরা বন্দনাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুলে গরদের শাড়ী ভিজিয়াছে; এলো কালো চুলের রাশি পিঠের পরে ছড়ানো, দুই হাতে পূজোর জিনিসপত্র, তাহার এ মূর্তি তাহাদের শুধু অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত নয়, অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান, এগুলি রেখে আসি গে।

একটি মেয়ে বলিল, ছোঁয়া যাবে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সে সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাসের চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মাসী বলিলেন, আমাদের না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেজন্যে রাগ করিনে, কিন্তু আজ তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দুটি বলিল, আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমার যাওয়া হবে না।

সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ করবে জানো?

জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসী বিস্ময় ও ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু এই জন্যই তোমার বোম্বায়ে যাওয়া হল না,—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিস্টার ডাটা—ভারী রাগ করেছেন। আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেন নি।

বন্দনা তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু জবাব দিল মাসীকে, বলিল, আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু গেলে মুখুয্যেমশায়ের সেবার ত্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার এখানে কেউ নেই।

কিন্তু উনি ত ভাল হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত। এই বলিয়া মাসী বিপ্রদাসের দিকে চাহিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত, বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। বেশ আপনি বলচেন যেতে, আমি যাবো। কিন্তু রাত্রেই চলে আসবো, সেখানে থাকতে পারবো না। এ অনুমতি মাসীমাকে দিতে হবে।

একটা রাতও থাকতে পারবে না?

না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসী মনে মনে রাগ করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রদাস বলিল, দেখলে ত তোমার মাসীমা রাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হলো কেন?

বন্দনা বলিল, রাগ করে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালের বশেই যেতে চাইচি নে তা নয়। ওদের যা-কিছু সমস্তর উপরে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তাই ওখানে আর যেতে চাইনে মুখুয্যেমশাই।

এটা একটু বাড়াবাড়ি বন্দনা।

সত্যিই বাড়াবাড়ি কিনা বলা শক্ত। আমি সর্বদাই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি, অথচ, বেশ বুঝতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে সুখ, না থাকে স্বস্তি। একবার বোম্বায়ের একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবলি আমার সেই কথা মনে হতে থাকে,—তার কত কল কত চাকা আশেপাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড়-মুড় গুঁজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। ও-সব দেখতে যে ভাল লাগে না তা নয়, তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচি। কিন্তু আর দেরি করবো না, আপনার খাবার আনি গে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখ পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতোর দাগ; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হল না মুখুয্যেমশাই, একটু সবুর করতে হবে। চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি, এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখুয্যেমশাই, বলিয়া একটু চুপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায় নি।

আমার আপনিই মনে হচ্চে, আপনাকে সেবা করার এ-সব অপরিহার্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজসজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, চললুম বোনের বিয়ে দেখতে। মাসী ছাড়লেন না বলেই যেতে হচ্চে।

বিপ্রদাস কহিল, আশীর্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো। তখন ঐ মাসীকে পঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেও।

মাসীর ওপর রাগ নেই, কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো। ভয় নেই গাড়িভাড়া আমরাই দেবো, আপনার নিজের লাগবে না। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, ফিরতে আমার রাত হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অন্যথা হলে এসে রাগ করবো।

করবে বৈ কি! না করলেই সকলে আশ্চর্য হবে। ভাববে, শরীর ভালো নেই, বিয়েবাড়িতে খেয়ে বোধ হয় অসুখ করেছে।

বন্দনা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয়েছে আমার গুণ-ব্যাখ্যা করা; কিন্তু সে কথা যাক, আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে নীচে যাবেন না যেন। অনুদি এই ঘরেই সব এনে দেবে। তার আধ-ঘণ্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, এক ঘণ্টা পরে ঝড়ু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন?

হাঁ বুঝেছি।

তবে চললুম।

যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে বন্দনা, এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, যে পোশাকটা পরেছো এইটেই হ'লো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা কৃত্রিম।

সে কি কথা মুখুয্যেমশাই,—ওরা বলে মেয়েদের জুতো-পরা আপনি দেখতে পারেন না?

ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখুয্যেমশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিই ত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, যেতো না।

কথাটা বন্দনা বুঝিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার মনের কথা কেউ জানতে পারে না, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায়; কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে,—মুখুয্যেমশাই এ কি সত্যি?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদি সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছা না হয় থেকো না—চলে এসো।

চলেই আসবো মুখুয্যেমশাই, থাকতে সেখানে পারবো না। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বোনের বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো?

হাঁ হলো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

নিজের জিদই বজায় রইলো, মাসীর অনুরোধ রাখলে না? কত রাত্রে ফিরলে?

রাত্রি তখন তিনটে। মাসীর কথা রাখা চলল না। রাত্রেই ফিরতে হলো। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কিনা, তার পরেই সে বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু কাজ করে এসেচি অনেক।

এক বছরে যা করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে শেষ করে এলুম।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলো কি!

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি। আজ সকালে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম। হেমনলিনী রায়। ওর জিম্মাতেই সুধীরকে দিয়ে এলুম। আবার আমার সেই বোম্বায়ের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদের ওখানেও ভালবাসার টানা-পোড়েনে দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে! আবার ভাঙ্গেও তেমনি।

বিপ্রদাস তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হলো কি? সুধীরের সঙ্গে হঠাৎ শেষ করে আসার মানে?

বন্দনা কহিল, শেষ করার মানে শেষ করা। কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠাৎ বলেও কিছু নেই। ওদের তাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সুধীর আমাকে ডেকে বললে আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বললুম, কি অন্যায় হয়েছে সুধীর? সে বললে, কাউকে না বলে—অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ বাড়িতে চলে আসা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েছে। বিশেষতঃ, সেখানে বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন। বললুম, সেখানে অন্নদাদিদি আছে। সুধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম, ও বাড়িতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে। শুনে সেই হেম মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ে ও-রকম ডাকার রীতি আছে শুনেচি, তাতে দাসী-চাকরের অহঙ্কার বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না। তারা নিজেরাও বড় হয়ে ওঠে না।

সুধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না, রাত্রেই ফিরে যাবে; কিন্তু সে-বাড়িতে তোমার একলা থাকাটা আমরা কেউ পছন্দ করিনে। তোমার বাবা শুনলেই বা কি বলবেন? বললুম, বাবা কি বলবেন সে

ভাবনা তোমার নয়, আমার। কিন্তু আরও যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছ? হেম বললে, নিশ্চয়ই আছেন! সকলকে ছাড়া ত উনি নয়। এই মেয়েটার গায়েপড়া মন্তব্যর উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না, তাই সুধীরকে বললুম, তোমার এ কথার জবাবে আমিও বলতে পারতুম যে অনর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কলকাতায় থাকাটা আমিও পছন্দ করিনে, কিন্তু সে কথা আমি বলব না। তুমি যে নোংরা ইঙ্গিত করলে তা ইতর-সমাজেই চলে, কিন্তু তোমাদের বড়-দলেও সে যে সমান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি চললুম। সেই মেয়েটা বলে উঠল, যা অশোভন, যা অনুচিত তার আলোচনা ছোট-বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনার যত খুশি আলোচনা চালান আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। সুধীর হঠাৎ কেমন ধারা যেন হয়ে গেল,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল,—নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, তোমার মাসীমাকেও জানিয়ে যাবে না? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাতই হোক। সুধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারবে? বললুম, না। সে বললে, পরশু? বললুম, পরশুও না।

তার পরের দিন?

না, তার পরের দিনও নয়।

কবে তোমার সময় হবে?

সময় আমার হবে না।

কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে?

তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

সুধীর আমাকে যে চেনে না, তা নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলে না, সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাড়িতে এসে বসলুম।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা? একটুখানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদিকে জিজ্ঞেসা করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখুয্যেমশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিস কি কখনও এত অল্পেই শেষ হতে পারে? সুধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, ভেবে দেখেছি মুখুয্যেমশাই। এ আঘাত সামলাতে সুধীরের বেশী দিন লাগবে না, আমি জানি ঐ হেম মেয়েটি তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলুম। শুধু যে গাড়িতে বসেই ভেবেছি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি, কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

কষ্ট পাবে রাগ পড়ে গেলে। তখন এই সুধীরের জন্যেই আবার পথ চেয়ে থাকবে, এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল এই অনুতাপ হয় যে, চলে আসার সময়ে যদি কঠিন কথা আমার মুখ দিয়ে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তাঁর,—জানিয়ে এলুম যেন মর্মাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তা ত সত্যি নয়,—এই মিথ্যে আচরণের জন্যেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখুয্যেমশাই, আর কিছুর জন্যে নয়। তাহার কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিস্ময় বহুগুণে বাড়িয়া গেল, এ যে ছলনা নয় এতক্ষণে সে বুঝিল। বলিল, সুধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালবাসো না?

না।

একদিন ত বাসতে? এত সহজে এ ভালবাসা গেল কি করে?

এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হত। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোন দিন সুধীরকে ভালোবেসেছিলুম কি না! সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়্লো চোখে—সুধীর গেল মিলিয়ে। এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,—কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয়। হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে, আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিংবা, এমনিই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিংবা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিস নয় মুখুয্যেমশাই—ওটা মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনিই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে লাগিল, এই সুধীরের সঙ্গেই এক বছর পূর্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু তার মায়ের অসুখ বলেই হতে পারেনি। কাল ঘরে ফিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো, আজ কি মন আমার এমনি করেই তাকে ঠেলে ফেলে দিতো? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিয়ে? ধর্মবুদ্ধি দিয়ে? সংস্কার দিয়ে? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন? যাদের মধ্যে এই কটা দিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে টেনে লোক ভুলিয়ে

বেড়াতুম? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে ঝড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চুপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন।

কিন্তু শান্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় এ কথা তুমি বুঝতে পারবে কেন?

কেন পারবো না মুখুয্যেমশাই, বুদ্ধি ত আমার যায়নি।

যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে। এখন থাক। সন্ধ্যের পরে সমস্ত কাজকর্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

তবে সেই ভালো, এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ, তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলাও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর-বাকর, কত ছেলে এখানে থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পড়িল না সে সারারাত্রি ঘুমায় নাই, সে আজ ভারী ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পরে বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাঙ্গ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখুয্যেমশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন?

বিপ্রদাস বলিল, সচরাচর তাই ত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি?

বন্দনা বলিল, মেজদিদিকে আপনি কি সত্যিই ভালবাসেন? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েছে—সে কতদিনের কথা—কখনো কি এর অন্যথা ঘটেনি?

বিপ্রদাস অবাক হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারও মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, তোমার মেজদিদিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারে না। না বলতে চান বলবেন না, আমি এরকম করে বুঝে নেবো, কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয়?

হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারী একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা কি সত্যি নয়?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই?

দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখুয্যেমশাই। বলবো সে কথা?

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক, পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিংবা হয়তো আপনিই তখন বুঝবে, ঐ যারা তোমার মাসীর বাড়িতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেছে তারাই সব নয়। ধর্ম যাদের কাছে অত্যাজ্য তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না, আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল, এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্তু যাহাকে বাড়িসুদ্ধ সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, আবার চললুম মাসীমার বাড়িতে। এবার আর ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে নয়, এবার যতদিন না মাসী আমাকে বোম্বায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে ততদিন।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আরজেন্ট টেলিগ্রামে এসেছে বাবার হুকুম। কালই সকালবেলা মাসী গাড়ি পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসীর প্রতিশোধ নেবার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কৈ দেখি কাগজটা?

না, সে আপনাকে দেখাতে পারবো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে জড়ানো যায় না, কিন্তু দেখচি যায়। অন্ততঃ, তেমন লোকও আছে। তোমার মাসীর মাথায় এ ফন্দিও খেলেছে। দাও না পড়ে দেখি অভিযোগটা কতখানি গুরুতর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। রায়সাহেবের সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম,—সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসঙ্গ ত কিছুই লেখেন নি। নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিপদ আছে, অসুস্থ আত্মীয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসারে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি মাসীর বাড়িতেই ফিরে যেতে বলেন?

সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ি নয়—হুকুম দেওয়ার কর্তা এ ক্ষেত্রে তোমার মুখুয্যেমশাই নয়,—মাসী আবার আদেশটা দিয়েচেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মান্য করতেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলি বচন। বাবা জানেন না কিছুই, তবু সেই আদেশ, ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, শুনতে হবে? মাসীর বাড়িটি যে কি সে ত আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কহিল, জানিনে, কিন্তু তোমার মুখে শুনেচি সে ভালো জায়গা নয়। আমি সুস্থ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম, কিন্তু সে শক্তি নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে ফেলে চলে যাবো? যে মাসীকে চিনিনে তাঁর জিদটাই বড় হবে?

কিন্তু উপায় কি?

উপায় এই যে আমি যাবো না।

তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাও। কিন্তু মাসী নিতে এলে কি তাঁকে বলবে?

বন্দনা কহিল, যেতে পারবো না, শুধু এই কথাই বলবো। তার বেশি নয়।

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়িতে আমার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি ঠিকই বলছেন মুখুয্যেমশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে—খবর দিতে মাসীর বাকী নেই, কিন্তু কেন জানেন?

বিপ্রদাস কহিল, জানা ত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উদ্যম তাঁর নিঃস্বার্থ নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্যেও নয়; হয়ত কি একটা তাঁদের মনের মধ্যে আছে।

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি। ভাইপো এসেছেন ব্যারিস্টারি পাস করে,—মাসী দিয়েচেন আমাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর! কারণ বাবার আমি এক মেয়ে, যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন, তার আয়ে উপার্জন না করলেও ভাইপোর অনায়াসে চলে যাবে।

বিপ্রদাস বলিল, ভাইপোর কল্যাণ-চিন্তা করা পিসীর পক্ষ থেকে দোষের নয়। ছেলেটি দেখতে কেমন?

ভালো।

আমার মতো হবে?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা। মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই। কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারে সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখুয্যেমশাই। কেবল আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালই, খুঁতখুঁত করা অন্ততঃ আমার সাজে না!

তা হলে পছন্দ হয়েছে বলো?

যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দের কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো, আপনার বার্লি খাবার সময় হয়েছে—যাই আনি গে। ইতিমধ্যে অশোকের কথাটা আর একটু ভেবে রাখুন, বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে রূপার বাটিতে বার্লি—বরফের ভিতর রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কহিল, এর সবটুকু খেতে হবে, ফেলে রাখলে চলবে

না। সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ত চাইবে সে আমি হতে দেবো না।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিদ্যেটি ষোল আনায় শিক্ষে করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখছি।

বন্দনা বলিল, না। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবো, মুখুয্যেমশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি।

খাওয়া শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথার জবাব দেবেন মুখুয্যেমশাই?

কি কথা বন্দনা?

সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশী ভালোবাসে বলতে পারেন?

পারি।

বলুন ত কি নাম তার?

তার নাম বন্দনা দেবী।

শুনিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-পনেরো পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলো ত?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ কেমন সইতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই। মনে হল যেন আমার কি-একটা বিশ্রী চুরি আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারছো না?

তা কেন পারবো না, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু সলজ্জ শরমে সমস্ত মুখখানি তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পরে

আত্মসংবরণ করিতে করিতে বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে এটুকুও বুঝতে পারিনি? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে, আজ তোমার পানে চেয়ে আর ত আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচু করিল।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু তাই বলে ও চলবে না বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। চাও, মুখ তোলো, শোন আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব রাগ করেছেন, না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, কিছুমাত্র না। একি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেইদিনই এর প্রতিকার হবে।

কিন্তু ধরা যদি কখনো না পড়ে? একে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই?

পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি না বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসো নি। সুধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল—মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলানো। তার বেশি নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, সুধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখুয্যেমশাই, এ আমি সইতে পারিনে। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, আপনার এ কথা মানবো। মানবো

যে, এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলে স্বীকার করবো না। মিথ্যেই যদি হতো এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বিপ্রদাস কথাগুলি শুনিতেছিল, জিজ্ঞাসা শেষ করিয়া বন্দনা মুখ তুলিতেই সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, পেয়েচো বৈ কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েছ। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রিদিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃপ্তস্বরে কহিল, তাহলে আপনিও স্বীকার করুন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এই দম্ভটাকে। বলুন সত্য করে ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেছেন। নইলে কিসের গ্লানি মুখুয্যেমশাই,—কাকে মানতে যাবো আমরা অধর্ম বলে? মানুষের মনগড়া একটা ব্যবস্থা—মানুষেই যাকে বার বার মেনেছে, বার বার ভেঙ্গেছে—তাকেই? আপনি পারলেও আমি এ পারবো না।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি না পারলেও আমি পারবো, আর তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। ইংরেজি বই অনেক পড়েচো বন্দনা, মাসীর বাড়িতে আলোচনাও অনেক শুনেচো, সে-সব ভুলতে সময় লাগবে দেখচি।

বন্দনা কহিল, আপনি, আমাকে তামাশা করচেন, আমি কিন্তু একটুও তামাশা করিনি মুখুয্যেমশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্যি বলেচি।

তা বুঝেচি। কিন্তু এ পাগলামি মাথায় এনে দিলে কে?

আপনি।

বলো কি? এ অধর্ম-বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

হাঁ, আপনিই দিয়েচেন। হয়তো না জেনে কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

এইবার বিপ্রদাস নির্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, যাকে অধর্ম বলে নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,—আমি জানি, ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন যা একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার, তবু সে তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়তো এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,—সুদৃঢ় সংস্কার, কিন্তু মানুষের ধর্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধে না, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সেদিন এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম—এর আর পরিবর্তন নেই।

কোনদিনই কি এর পরিবর্তন নেই মুখুয্যেমশাই?

তাইত আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ-জীবনে এর পরিবর্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস সযত্নে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু পরিবর্তনেরই বা দরকার কিসের? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে,—এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা, নইলে পারবো না ত আসতে মুখুয্যেমশাই।

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস যেন চমকিয়া গেল, বলিল, বটেই ত! বটেই ত! আসার পথ থাকে যদি খোলা,—চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যেমশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে ত তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

হাঁ পেরেচি।

দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম। আপনাদের বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে। গাড়িতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা মনে পড়ে? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—তবু মনে হলো যাদের আমরা চারপাশে দেখি তাদের দলের আপনি নয়,—একাকী কোন ভার কাঁধে নিতেই আপনার বাধে না। এই কথাই বলেছিলেন সেদিন দ্বিজুবাবু,—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি আপনাকে মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না। শেষরাত্রে উঠে দেখি নীচে পূজোর ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেছেন ধ্যানে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো, পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায়, ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার

ঘরে। আপনার সে মূর্তি আর ভুলতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলে নাকি আমাকে পূজো করতে?

বন্দনা বলিল, পূজো করতে ত আপনার মাকেও দেখেচি, কিন্তু সে ও নয়। সে আলাদা। আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে জেনে তোমার কি হবে? তুমি ত তা করবে না!

না করবো না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হয় সকলের মধ্যে থেকেও আপনি আলাদা, আপনি একা। যেখানে উঠলে আপনার সঙ্গী হওয়া যায় সে উঁচুতে ওরা কেউ উঠতে পারে না। আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করবো মুখুয্যেমশাই? বলবেন?

কি কথা বন্দনা?

মেয়েদের ভালোবাসায় বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না?

এ প্রশ্নর মানে?

মানে জানিনে, এমনি জিজ্ঞেসা করচি। এ বোধ হয় আর আপনি কামনা করেন না,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে।—সত্যি কিনা বলুন।

বিপ্রদাস উত্তর দিল না, শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

নীচের প্রাঙ্গণে সহসা গাড়ির শব্দ শোনা গেল, আর পাওয়া গেল দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর। এবং, পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ডাকিয়া বলিল, দ্বিজু এলো বিপিন।

একলা নাকি? না, আর কেউ সঙ্গে এলো?

না, একাই ত দেখচি। আর কেউ নেই।

শুনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখুয্যেমশাই, দেখি গে তাঁর খাবার যোগাড় ঠিক আছে কিনা। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে দ্বিজু আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল তখন ঘরের একধারে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, দ্বিজদাস বলিল, এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর – প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা!

মায়ের কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে? বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

দ্বিজদাস কহিল, তা হয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো হওয়ার মানতপূজো—সেও একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ তৈরি হচ্ছে,—কুটুম্ব-সজ্জন অতিথি-অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলুম তাতে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকতে সতর্ক হোন।

বন্দনা মুখ তুলিল না, কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস বিষয়ী লোক, বিপ্রদাস কৃপণ, এ দুর্নাম একা মা ছাড়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়ে না। বিপ্রদাস নিজেও এ হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

আমার? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েচে,—তারা।

বিপ্রদাস তেমনই হাসিয়া কহিল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের? লোকের মুখে মুখে এদের শুধু নিন্দেই শুনলি, নিজে কখনও চোখে দেখলি নে। ওদের দলভুক্ত বলে হয়ত আমি পর্যন্ত তোর আমলে ভাত পাবো না।

দ্বিজদাস কাছে আসিয়া আর একবার পায়ের ধূলা লইল, কহিল, ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু দলেরই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও

আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জেনে রেখেচি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্রদাস কথাটাকে চাপা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার অসুখের কথা মা শোনেন নি ত?

না। সে বরঞ্চ ছিল ভালো, পুকুর-প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হতো।

আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েছে?

হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সকলকেই। সকন্যা অক্ষয়বাবুর আমন্ত্রণ-লিপি গেছে, মায়ের বিশ্বাস বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপর ভার পড়েছে তাঁদের নিয়ে যাবার।

মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেননি?

হাঁ, অনুদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও!

তোর বৌদিদির কোন ফরমাস নেই?

না।

নীচে আবার মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। হর্নের চেনা আওয়াজ কানে আসিতেই বন্দনা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মাসীমার গাড়ি। আমি দেখি গে মুখুয্যেমশাই। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নিন—দেরি হয়ে যাচ্চে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও যাই মুখ-হাত ধুইগে। ঘণ্টা-খানেক পরে আসবো, বলিয়া দ্বিজদাসও চলিয়া গেল। বিপ্রদাসের পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইল, আজ খাবার ফলমূল দিয়া গেল অন্নদা। মাসীর বাড়ি হইতে যে মেয়েটি নিতে আসিয়াছে বন্দনা ব্যস্ত আছে তাহাকে লইয়া। এ খবর সে-ই দিল।

দ্বিজদাস যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার বিরাট ফর্দ, কলিকাতার অর্ধেক জিনিস কিনিয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া চালান দিতে হইবে।

দুই ভাইয়ে এই লইয়া যখন ভয়ানক ব্যস্ত তখন দরজার বাহির হইতে প্রার্থনা আসিল, মুখুয্যেমশাই, আসতে পারি কি? পায়ে কিন্তু আমার জুতো রয়েছে।

জুতো? তা হোক, এসো।

বন্দনা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যে-বেশে বলরামপুরে তাহাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল এ সেই বেশ। বিপ্রদাস অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও যাচ্চো নাকি বন্দনা?

হাঁ, মাসীমার বাড়িতে।

কখন ফিরবে?

ফেরবার কথা ত জানিনে মুখুয্যেমশাই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না, শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল, তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুড়ি

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেছেন মাসীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ মাসী বেরুলো কোথা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তার পর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সেও মুখ ফিরিয়ে। আমার বিরুদ্ধে হলো কি তাঁর?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসীর ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসীর বাড়ি থেকেই অনুদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে পাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ত কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারী নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্বোধ নই। আমার কথা যাক। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিল, কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেছিস বল?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে শুধু আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র, আমি কুলাঙ্গার, তাঁর কাছে এই পরিচয়ই থাক। একে আর নড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভাল বলে ভাবতে পারেন, এ কি তুই সত্যিই চাসনে? এ অভিমানে লাভ কি'বল তো?

লাভ কি জানিনে, কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ, পেয়েছি বৌদিদির ভালবাসা, এই আমার সাত রাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবো না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই-সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ-সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্চে এই যে, আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

মানেটা বোধ হয় এই যে, তুই যখন এসে পড়েছিস তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা-শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করচেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এই-সব ইংরেজিনবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেন-না কখনও আসে, কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহহাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে

নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে,—সে মা। বোঝাপড়া তোদের একটা হওয়া দরকার—বুঝলি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা, বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝাপড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই হল উলটো। বাবা জন্ম দিলেন, কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ি সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদাদিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, এবং মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেন নি?

কে বললে তোকে?

এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষে করে এসেছেন এ তাঁর মুখেই শোনা।

তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেন নি। এমন ত হতে পারে, বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-

ই হবে সমান। যা হোক, এটা বোঝা গেল, বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।

আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু মা জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো, তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে, ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়কর্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশসেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথা ত তোকে কোনদিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক,—চিরদিন থাক—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ কথা মানবো না।

বিপ্রদাস একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায়

তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে ঢের সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু শুনিতে পাইল দাদার কথা—তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ শুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্মণ্য, উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ। কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত-প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে, তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ি বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ি পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয়-কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কারে শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা, আজ রাত্রির গাড়িতে আমি বাড়ি যাচ্চি, সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল-পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম।

অনুদিকে কি আপনিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন-চারের বেশী বিলম্ব করবেন না যেন।

আমাকে কি যেতেই হবে?

হাঁ। না যান ত একজোড়া খড়ম কিনে দিন, নিয়ে গিয়ে ভরতের মতো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েচিস তুই। কিন্তু আশ্চর্য করলি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি করে? তাঁর ত ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড়ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকাওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা,—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিস নে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল, তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার কথাটাও ঠিক মধুমাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নেই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহুলোকের অন্ন যা অনেক বড়লোকে পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে জন্তু করে তোলা ছাড়া বড়লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বৌদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর

সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন, কিন্তু মাসীর বাড়ির বদলে দিন-কতক আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাক গে এ-সব আলোচনা।

আপনি কবে বাড়ি যাচ্ছেন বলুন?

আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবি নে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয়, আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখ কি এখনো সারেনি দাদা?

না, সেরে গেছে।

তবু মায়ের কাজে বাড়ি যেতে পারলেন না এ কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস?

দ্বিজদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যেমশাই, বাড়ি যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

শুনলুম, কিন্তু ও জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ি যেতে চান না। আপনাকে বলতেই হবে।

আমি ক্লান্ত।

না।

না কেন? ক্লান্তিতে সকলেরই দাবী আছে, নেই কি শুধু আমার?

আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো, আপনার রোগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

মেজদি নিজে পারবেন না রোগ ধরতে, তুমি দেবে ধরে!—এ কথা শুনলে কিন্তু তিনি খুশী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুশী হবেন না সত্যি, কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হলেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙ্গতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার অভিযানে আজ পর্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েছো, তাদের বাইরে যে কেউ আছে এ তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এ ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যেমশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালবাসেন?

সে আজও বলি। কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো গে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হোলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেচে ভালবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার-আমারও,—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা!

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যেমশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালবাসতেন, দুঃখ আমার ছিল না; কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম, মেনে চলেন শুধু কর্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি, কাউকে ভালোবাসতে জানেন না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠল, আজ আমারও ভুল ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল, করলুম তোমাকে সেই আশীর্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করচেন মুখুয্যেমশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেশা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যিই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখানে

আপনাদের সংস্রবে এসে ভেবেছিলুম এই-সব আচার-বিচার বুঝি সত্যিই ভালো, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পূজোর সাজ-গোছ করা—আরও কত কি খুঁটিনাটি,—মনে করতুম এ-সব বুঝি সত্যিই মানুষকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়িতে গিয়ে এ মূঢ়তা ঘুচেছে। দিন-কয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখুয্যেমশাই, যেন সত্যিই এ-সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায় সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই। এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারী আঘাত করবে, কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার ছদ্মহাসিতে সে প্রসন্নহাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক করে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ-সব তোমার জন্যে নয়, এ-সব করতে তুমি যেয়ো না। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুশীই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো, কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করে ছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এ-সব কথাবার্তা এখন থাক। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিন স্থির হলো?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

সেদিন তোমার মাসীর ভাইপো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেছে। এ কয়দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে?

না।

তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্বাদ করবো, কিন্তু মাসীর তাড়ায় যেন কিছু করে বসো না। তাঁর তাগাদাকে একটু সামলে চলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কিন্তু মুখ নিচু করিয়া সামলাইয়া বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ি যাব। দু-তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলিকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল, মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মঞ্জুর হলো, এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন, কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্চে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হয়েছে মুখুয্যেমশাই? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা, আমার অসুখে তোমার সেবার উল্লেখ করে বলছিলুম, তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্ধেক তারা কেউ পারতো না। দ্বিজু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেচে, যদি সে সময় কখনো আসে, দাদার সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন শর্ত আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

জানি মুখুয্যেমশাই। ভালো করেই জানি, আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা, দ্বিজু আমার সাধু লোক।

আপনার চেয়েও নাকি?

হাঁ, আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

কথা কইবার দরকার হয়নি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্বদা বড় মোলায়েম হয় না, কিন্তু তার এই কর্কশ আবরণটা ঘুচিয়ে যদি কখনো তার দেখা পাও, দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস করো, এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মুখুয্যেমশাই, আমি যাই। যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়িতে একবার যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপরে বলিল, কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

আমি নিজেই করচি।

কিন্তু আপনি ত ও-বাড়িতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক আমার বাঁচবার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্যন্ত অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আচ্ছা, তাই যাবো, কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

একুশ

অনেকদিনের পরে বিপ্রদাস নীচের আফিসঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের পরে কাগজপত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকী। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু দ্বিজুর ভরসায় ফেলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সে পাতা উলটাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পূবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কটকি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্যক ভঙ্গিতে জড়ানো মোটা সাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দের হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, ইনিই মিস্টার চাউড্রি—বার-অ্যাট-ল। কিন্তু এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই শর্তে আলাপ করিতে দিতে রাজী হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে, কিন্তু তার আগে আপন কর্তব্যটা সেরে নিই—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধূলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে করে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমানভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসীর কাছে শেখা। তাঁর পরে আপনার প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কি না!

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসীমার কাছে এইভাবেই আমার গুণগান করো নাকি? নবাগত যুবকটির প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে।

দেখেই মনে হলো চেহারাটা পর্যন্ত চেনা, যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হলো অযথা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে করে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্দনা শাসনের ভঙ্গীতে তর্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যেমশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যার কোঠায় এলো, এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

ইহার অর্থ?

ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের অতি-সাধারণদের মত সত্যি-মিথ্যে যা খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নয়,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞেসা করো, তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য।

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহচর্মটি দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তখন আসল মূর্তিটি তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্বাদ করে বলবে তুমি রাজরানী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্বাদে আপত্তি নেই, এমন কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কুসংস্কার, বলো ও শুধু কথার কথা।

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা? কে বলেছে গুরুজনদের আশীর্বাদ আমরা চাইনে,—কে বলেচে, কুসংস্কার? এবার কিন্তু সত্যই রাগ হচ্চে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যই রাগ হচ্চে নাকি? তবে থাক এ-সব গোলমেলে কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ত নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ শুরু করেছেন?

করিনি, করবার সঙ্কল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস দূরে ঠেলিয়া দিল।

বন্দনা প্রসন্নমুখে কহিল, কৈফিয়ত satisfactory; অবাধ্যতা মার্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এঁর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্যের বিবরণ, প্রজা-শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশি। আমি ওপরে যাচ্ছি অনুদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেনে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো—ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। মিস্টার চাউড্রির ইচ্ছে সঙ্গে যান,—বড়ঘরের বড়রকমের যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপ দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘটা-পটা কখনো চোখে দেখেন নি,—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা কহিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি-বিগর্হিত। উনি দেখেন নি এই কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েছি সঙ্গে যাবার, তাতে এত খুশী হয়েচেন যে তার পরে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েচেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না, এ শুধু তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, লাগবার কথাই যে। জপ-তপও আছে, ষোল-আনা হিংসেও আছে। এই বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ যেন কথামালার সেই কুকুরের

ভূষি আগলানোর গল্প। খাবেও না, আর ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি করে বলো ত?

বন্দনা দ্বার-প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম রোষে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ, কিচ্ছু তফাত নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় করে মরে।

তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

তাই তো যাচ্চি এবং ভূষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুর্বুদ্ধিরও শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ-বৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিস্টার—

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল,—না না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি-জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাসবাবু। উনিও ভরসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, ভালোই হ'লো অশোকবাবু, সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, মনেও থাকে না, অভ্যাসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারবো। শুনলুম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়িতে যেতে চেয়েছেন, সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারের কর্ত্রী আমার মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনয়-বচনে অশোক পুলকিতচিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো—নিশ্চয় যাবো। কত দরিদ্র অনাথ আতুর আসবে নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে—আনন্দোৎসবে কত খাওয়া-দাওয়া, কত আসা-যাওয়া, কত বিচিত্র আয়োজন—

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সমস্ত বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু রহস্য করেছে।

রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাসবাবু?

একটা লাভ আমাদের অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদের পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিল না, কিন্তু আপনাদের কথা নিয়ে ওর মাসীর সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসী বললেন, বিপ্রদাসের মা সর্বসাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তাঁর প্রশংসা করি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ নেই,—ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন,—ওঁরা বড়লোক, বড়লোকের কাজেকর্মে ঘটা ত হয়েই থাকে মাসীমা। তাতে আশ্চর্যের কি আছে? আমার পিসীমা বললেন, বড়লোকের অপব্যয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই মানি, কিন্তু ও-ত কেবল ও-ই নয়, ও-টা কুসংস্কার। তোমার যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা বললেন, আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসীমা। বরঞ্চ, এই মনে করি যে, যা জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি, তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওঁর জবাব শুনে পিসীমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদির স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়? প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হলো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না, শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেসা করলেই যে আমাকে জবাব দিতে

হবে ছেলেবেলা থেকে এ শিক্ষা আমার হয়নি মাসীমা। পরশু সকালে মুখুয্যেমশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না।

পিসীমা রাগ করে উঠে গেলেন। আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারী ইচ্ছে করে ঐ-সব আচার-অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন, কিন্তু সে-সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমারও যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের একসঙ্গেই জাত যাক, আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুয্যেমশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন একদিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসবাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পূজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা সম্মতি দিয়েছেন?

না। কিন্তু অসম্মতিও জানান নি।

এটা আশার কথা অশোকবাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সকৃতজ্ঞ-চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, নাও হতে পারে। অন্ততঃ, নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুশকিল হয়েছে এই যে আমি গরীব, কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা

নয়, কিন্তু পিসীমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ কথা বোঝাবে কি করে যে, পিসীমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় এই ভাবটা একটু কমিল। সদয়কণ্ঠে কহিল, পিসীর ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে এ কথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের পরিমাণ নিয়েও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাসবাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাই ত মনে হয়।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশি প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতায়। সে যেদিন পাবো, আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ও স্বামী নির্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেছে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোকবাবু!

না পরিহাস নয়, এ সত্য।

কে বললে?

অশোক একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। বললুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে, সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই

জানাবেন,কিন্তু মাসীকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ-সব পূজো-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর-দেব্‌তা সত্যিই ত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বললেন, বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ-সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাব। মুখুয্যেমশায়ের অসুখে সেবা করেছিলুম, তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তার পরে শুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ কাউকে করে, কারো শুভ-কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পূজো-আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেকলো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয়, ওতে পূজোয় ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হয়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন করে করতে হলো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা, সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙ্গে ত অন্নদাদিদিকে দিও পূজার সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এমনি কতদিনের কত ছোটখাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেল, শেষে বললেন, মাসী তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন, আমি নিজেও একদিন দিয়েছি অশোকবাবু—কিন্তু আজ কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ বুঝতে আমার গোল বাধে। খাওয়ার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস এতে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনই মনে হয় এ-সব উনি ভালোবাসেন না, তখনি মন যেন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেছে? কিন্তু সেদিন যে এসে দম্ভ করে বলে গেল মাসীর বাড়িতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মুখুয্যেদের বাড়ির সহস্র প্রকারের কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে!

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে-ন'টার গাড়ি।

পূজো-টুজো, বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো কেউ আপনার ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম, আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তার পরে কাপড়-চোপড় পরাবো, তার পরে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কিনা—তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধূলো কিন্তু আর নেবো না মুখুয্যেমশাই, ওটা কুসংস্কার। ভদ্রসমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত-দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাইশ

পরদিন সকালেই সকলে বলরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। বাটীর কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয়-যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালাঘর—কতক তৈরি হইয়াছে—কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন,—এ কি দেহ হয়েছে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছিস।

বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না, তা যত কাজই তোর থাক। এখন থেকে নিজের চোখে চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা, এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভবপর নয়। বলিলেন, বাপ শেখায় নি এমন বিষয় নেই, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না,—তাই ও একাই

সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েছে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন, নইলে কি যে হোতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজকর্ম দেখে মনে হয় কর্তা যে বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তার আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে পারবেন, কোথাও ক্রুটি ঘটবে না। এ বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত মনে কৈলাস-দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা হয়ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয়ত এমনি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান-কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যাই হোক, উপলক্ষটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার সুপরিচিত মর্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতিকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভিড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল, খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেছিস দ্বিজু, সামলাবি কি করে?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় ত তবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্যে দিয়া মায়ের মনোভাবটা যেন কমিয়া গেল, স্মিতমুখে কৃত্রিম রুষ্টস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও কি ঠিক তোমার বোনের মতই হবে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হলে গায়ে লাগে না মা, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বলিলেন, রাগ ত ও করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা বলিল, তারও কারণ আছে মা। মুখুয্যেমশাই জানের পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বৈ কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যেমশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার জো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হত না তা বলিনে, কিন্তু তোমাকে ত বলেছি, বিপিন আমার পরম ধার্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয়, সে ও কিছুতে নিতে পারে না। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে, ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজাপীড়ন! প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে-কথা কি তোমার মনে নেই?

মা বললেন, মনে আছে বলেই ত বলছি। যে ন্যায্য দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সে-ই পারে বিপিন, অপরে পারে না। দয়া-মায়া ওর আছে,—একটু বেশী পরিমাণেই আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

না মা, পাবে না তুমি দেখো।

দয়াময়ী কহিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস বলে। নইলে এমন কেউ চাই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে, পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা ঠিক হল না মা। নিজে ডুববো সে হয়ত একদিন সত্যি হবে কিন্তু পরকে ডোবাবো না এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন, এর এটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাবনা ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় ত তুমি প্রায় করে এনেছো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যিই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস।

তর্ক-বিতর্কের মূল তাৎপর্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এত বড় যে কাণ্ড করে তুললি কারো কথা শুনলি নে, বললি দাদার হুকুম; কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বলতো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল, সেই তো শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল, কাজটা আগে হয়ে যাক মা, তার পরে যাকে খুশি সনন্দ দিও, আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখুনি তার তাড়াতাড়ি কি!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয় পক্ষ নয় ত?

দ্বিজদাস কহিল, না, তৃতীয় পক্ষর সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনি বিদ্যমান। বলিতে দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপ্রদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনাদিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা ত দেখতে পাচ্চিনে—হারালো না ত?

না, হারায় নি অনুদি, কলকাতার বাড়িতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

ভাবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন, আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন, একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলি দয়াময়ীর অত্যন্ত ভাল লাগিল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি মা। পাড়াগাঁ জায়গা, ডাক্তার-বদ্যি তেমন মেলে না, দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবে না মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনাদিদি ডাক্তার-বদ্যির চেয়েও বেশী জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, বন্দনা কহিল, অনুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যেমশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে যে কি সেবা মা, সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়িতে কেউ নেই, বাসুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেছে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়, বিপিনের হল জ্বর। প্রথম দুটো দিন কোনমতে কাটলো, কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার

ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলুম বন্দনার কাছে, ওঁর মাসীর বাড়িতে। কেঁদে বললুম, দিদি, রাগ করে থেকো না, এসো। তোমার মুখুয্যেমশাইয়ের বড় অসুখ। বন্দনাদিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়িতে উঠলেন, মাসীকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ি এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিনরাতে একটি ঘণ্টাও সে কটা দিন জিরোতে পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই ত নয়; সকালে পূজোর সাজ থেকে আরম্ভ করে রাত্তিরে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনাদিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই, ওতেই বিপিন সুস্থ হয়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিও না, ওর সুবুদ্ধি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়মনে আশীর্বাদ করবো, বন্দনা রাজরানী হোক।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বৌদিদি বলছেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিসপত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুলবেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ মেয়ে বলে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাবো না, কেবল চুপ করে বসে থাকবো? এমন কত জিনিস ত আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেব কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন

ভাঁড়ারের চাবি, যা বৌমা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়াছুঁয়ির নাগালের বাইরে, আছে সোনা-রূপো, টাকাকড়ি, চেলি-গরদের জোড়। যা অতি বড় ধার্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক-বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মানরক্ষা, আত্মীয়স্বজনগণের পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও ঠকিয়ে যে আমাকে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি ব'লো না মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে, মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল ত? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে, আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম; কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন

সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বলেই ত নিস্তার পাবে না!

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন ত মায়ের হুকুম?

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বৈ কি! কিন্তু দাদা দিয়েছেন আমার ওপর খরচ করার ভার, মা দিলেন তোমাকে খরচ না-করার ভার। সুতরাং, খণ্ডযুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবে না দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবে না। আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক-ফাইট শুরু করবার ছেলেমানুষি আমার গেছে। বাঙলা দেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন, এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবো না মা, তোমাকেই এ বইতে হবে। কিন্তু এখানে আর নয়, ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিই গে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ-বাড়িতে ঘণ্টা-কয়েক মাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পরে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ওদিকটায় আছে কাছারিবাড়ি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা; কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুরবাড়ি, রান্নাবাড়ি, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার উপর।

ও-ধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতকগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল, দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দিদির পায়ের ধূলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন, আমার এই ম্লেচ্ছ মেয়েটিও কোন একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েছি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ-মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়ামযী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন, ব্রাহ্মণ–পণ্ডিতদের মর্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙ্গাইয়া টাকাসিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলা স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসকল বস্তাবন্দী হইয়া এখনো পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ-সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারি সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা, ওর মধ্যেই রয়েচে আমার যথাসর্বস্ব, আর ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন-মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এতবড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার।—তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেছে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে, আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকে আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই, আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়িতে এসে এ কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

তাই ত মনে হচ্চে, বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

তেইশ

সংসারে বিপদ যে কোথায় থাকে এবং কোন্ পথে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা, উনি বলছেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ি চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই—স্টেশনে বসে থাকবেন সে-ও ভালো, তবু এ-বাড়িতে আর একদণ্ড না।

পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রীয় ক্রিয়া এইমাত্র চুকিয়াছে, এইমাত্র দয়াময়ী মণ্ডপ হইতে বাটীতে আসিয়া পা দিয়াছেন। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের কথাটা ভালো বুঝিতেই পারিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, কে বলচে তোমাকে যেতে—শশধর? কেন?

বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেছেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, এই বলিয়া কল্যাণী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও খাওয়ানোর আয়োজন, কোথাও গানের আসর, কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্র-বিচার—অগণিত মানুষের অপরিমেয় কোলাহল,—উহারই মাঝখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপার।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে চাবি দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মীয়-কুটুম্বিনীগণের অনেকেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শশধর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আমরা চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা এসেছিলুম কিন্তু থাকতে পারলুম না।

কেন বাবা?

বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

তার কারণ?

কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখ-কানে দেখতে শুনতে পান না। ভেবেচেন নিজের বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ; কিন্তু ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন, সে-ও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞেসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হলো না, ব্রাহ্মণ-ভোজন বাকী, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয়নি, তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে পুকুর এইমাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শাশুড়ীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্রসন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভদ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতর মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের সুমুখে হাতজোড় করে আমার ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এতবড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাতজোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত সকলেই নির্বাক। সহসা পাংশুমুখে একান্ত অনুনয়ের কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজকর্ম চুকুক, রাত্তিরে মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পারে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের কোণ-দুটা ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তকণ্ঠে কহিল, তিনি অন্যায় ত কখন করেন না মেজদি!

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, তুই থাম বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না, তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী যেন জ্বলিয়া গেল, তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলচেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেচি মুখুয্যেমশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিদ্রূপে কহিল, অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকেও অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা হলে শশধরবাবুর মত তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্ণতরস্বরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ত আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে, যিনি আহ্বান করে এনেছেন।

সতী সরোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা, তুই যা এখান থেকে, নিজের কাজে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, এসেছি জানতে আপনার ছেলে জোড়হাতে আমার ক্ষমা চাইবেন কি না? নইলে চললুম—এক মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, না-ও পারেন, কিন্তু তার পরে শ্বশুরবাড়ির নাম যেন না আর মুখে আনেন। এইখানে আজই তার শেষ হয় যেন!

এ কি সর্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—মেয়ে-জামাইকে বাড়ি আনিয়া এ কি ভয়ঙ্কর বিপদ! সুমুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী কাঁদিতেই লাগিল, পরামর্শ দিবার লোক নাই, ভাবিবার সময় নাই, ত্রাসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কর্তব্য-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থাম বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

আমি জানি কোথায় তোমার মস্ত ভুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর কহিল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেন নি।

মিথ্যে কথা সে বলে না শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাঁড়াইল। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ও আত্মসমাহিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদাস ক্লান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখন সত্যি হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বৈ কি মা!

ঘর থেকে সত্যি বার করে দিয়েছিস, আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়িতে?

হাঁ, সত্যিই বার করে দিয়েছি। বলেচি আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

শুনিয়া দয়াময়ী বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণে এই অভিভূত ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সে তোমার না শোনাই ভালো মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ শুনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে চাচ্চেন, এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারী,—ওঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে,—বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না সতী।

হয়, হয়, হঠাৎ একটা অন্যায় সকলেরই হয়। বল না ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্যায় আমার হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাঝে দয়াময়ী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, সহসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল, তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, ন্যায়-অন্যায়ের ঝগড়া থাক। মেয়ে-জামাই আমার চিরকালের মত পর হয়ে যাবে এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

সম্ভব-অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আর সম্ভব করা যাইবে না,—ক্রোধের সীমা রহিল না, বলিলেন, বাড়ি তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্তা তোমাকে দিয়ে যাননি, ওরা এ বাড়িতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা, আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর ফেরাতে পারবে না। কোন্‌টা চাও, বল?

জীবনে এমন ভয়ানক প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, এতবড় দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতেও কেহ বলে নাই।

একদিকে মেয়ে-জামাই, আর একদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের আশ্রয়—যে ছেলে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এ অমর্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর

তাঁর পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহার দৈবের মতই অমোঘ, নির্মম ও অনন্যগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাত্যায় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে জন্মের মত পর করে দেব এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে কর গে। শশধর, এস তোমরা আমার সঙ্গে—ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ি ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইঁহাদেরই সে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তায় বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিস্মিত হইল। তাহার চোখে জল নাই কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, বলিল, ঠাকুরমশাই কি করেচেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এতবড় কাণ্ড করোনি, তা নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোন দিন দেব।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে?

না, কাল যাবো।

আর আসবে না এ বাড়িতে?

মনে ত হয় না।

আমি? বাসু?

যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পার অন্য কোন দিন।

না, অন্য দিন নয়, আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করবি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমি ত ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না। কিন্তু যেখানে ওঁর জায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস।

বন্দনা বলিল, বিয়ে না হয়েও বুঝি মেজদি, স্বামীর জায়গা না হলে স্ত্রীরও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়,—না বুঝে তাকেই স্বীকার করা স্ত্রীর কর্তব্য, তোমার এ কথা আমি মানব না।

শাশুড়ীর প্রতি সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, স্বামী থাকলে মানতিস। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মুখুয্যেমশাই?

না করে উপায় ছিল না বন্দনা।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন এসে যখন পথ আগলায় তখন নতুন সমাধানের কথা ভাবতেই হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। তোমার মেজদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু তুমি? আরও দু-চার দিন কি থাকবে মনে করেছো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন আপনার যতই আসুক আমি কিন্তু সেই পুরনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরবো—যে পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল, যেদিন হঠাৎ এসে এ বাড়িতে দাঁড়িয়েছিলুম,—যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারা দিয়েছে চিরকালের মত বদলে।

বিপ্রদাস ইহার উত্তর দিল না, শুধু ওষ্ঠপ্রান্তে তাহার একটুখানি ম্লান হাসির আভাস দেখা দিল। সে হাসি যেমন বেদনার তেমনি নিরাশার। কহিল, আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

অশ্রুবাষ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে স্নেহ, না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, সুযোগ যদি না হয় এখুনি বলে রাখি মুখুয্যেমশাই, যাদের নিয়ে চলে আমাদের ঘরকন্না, হাসিকান্না, মান-অভিমান তাদের নিয়েই যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনার বলে এ জীবনে ভাবতে শিখি। আলেয়ার আলোর পিছনে আর যেন না পথ হারাই। একটু থামিয়া বলিল, দূরে থেকে যখনি আপনাকে মনে পড়বে তখনি একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নয়,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বলিয়া দু'চোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেদিন কাজকর্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ গৃহের সুশৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহির হইতে কেহ জানিতেও পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিই আজ চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্মক্লান্ত বৃহৎ ভবন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্থান পাইয়াছে নিদ্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দায়িত্ব সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়িল ওদিকের বারান্দার পাশে দ্বিজদাসের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বিধা জাগিল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কিনা, কাহারো চোখে পড়িলে সুবিচার সে করিবে না, নিন্দা হয়ত শতমুখে বিস্তারলাভ করিবে, কিন্তু থামিতে পারিল না, যে উদ্বেগ তাহাকে সারাদিন চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দ্বিজুবাবু এখনো জেগে আছেন?

ভিতরে হইতে সাড়া আসিল, আছি। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে?

আসতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

বন্দনা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া দ্বিজদাস বিছানায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল, আজকের হিসেব বুঝি! কিন্তু হিসেব ত পালাবে না দ্বিজুবাবু, এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাঁচতুম, এগুলো চোখে দেখতে হতো না।

খরচ অনেক হয়ে গেছে বুঝি? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ত দিতে হবে?

দ্বিজদাস কাগজগুলা একধারে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর এখন আমার নেই বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ত দেবো। এখন উলটে কৈফিয়ত চাইবো আমি। বলবো, লাও শিগগির হিসেব—জলদি লাও রূপেয়া—কোথায় কি করেছো বলো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, ব্যাপার কি?

দ্বিজদাস মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কহিল, ব্যাপার অতীব ভীষণ। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নীপতি শশধর আমার সহায় হোন—সাবধান বিপ্রদাস! তোমাকে এবার আমি ধনেপ্রাণে বধ করবো। আমাদের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিন্তা উদ্দাম হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সব তাতেই হাসি-তামাশা? আপনি কি একমুহূর্ত সিরিয়াস হতে জানেন না দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তারা থাক। দেখবে, হাসি-তামাশা পালাবে চক্ষের নিমিষে সাহারায়, গাম্ভীর্যে মুখমণ্ডল হয়ে উঠবে বুনো ওলের মতো ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, আপনি তা হলে শুনেছেন সব?

সব নয়, যৎকিঞ্চিৎ। সব জানেন দাদা, কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিথ্যে করে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজুবাবু? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছি।

দ্বিজদাস কহিল, ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সঙ্কল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালুম।

দীপালোকে দেখা গেল এইবার অশ্রুজলে দু'চক্ষু তাহার টলটল করিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার সে সোজা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাঢ়স্বরে কহিল, বিচ্ছেদ এত সহজেই আসবে দ্বিজুবাবু, সত্যিই ঠেকান যাবে না?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও-বস্তু যখন আসে তখন এমনি অবাধে, এমনি দ্রুতই আসে, বারণ কিছুতে মানে না। যার কাঁদবার সে কাঁদে, কিন্তু শেষ ঐখানে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইছিলেন হেতু। বিস্তারিত জানিনে, কিন্তু যতটুকু জানি সে শুধু আপনাকেই বলবো, আর সাহায্য যদি কখনো চাইতে হয়, যেখানেই থাকুন সে কেবল আপনার কাছেই চাইব।

কেবল আমার কাছেই কেন?

তার কারণ হাত যদি পাততেই হয় মহতের দ্বারে পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু মহৎ কি আর কেউ নেই?

হয়ত আছে, কিন্তু ঠিকানা জানিনে। দাদার কথা তুলবো না, কিন্তু চিরদিন হাত পাতার অভ্যাস ছিল বৌদিদির কাছে, কিন্তু সে পথ বন্ধ হলো। আপনি তাঁর বোন, আমার দাবী তার থেকে।

কিন্তু মা?

দ্বিজদাস বলিল, রথ যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সারথি, কিন্তু চাকা যখন কাদায় বসে মা তখন নিরুপায়। নেমে এসে ঠেলতে তিনি পারেন না। সে দুর্দিনে যাব আপনার কাছে। দেবেন না ভিক্ষে?

ভিক্ষের বিষয় না জেনে বলবো কি করে দ্বিজুবাবু?

সে নিজেও জানিনে বন্দনা, সহজে চাইতেও যাব না। যখন কোথাও মিলবে না, যাব শুধু তখনি।

বন্দনা বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, যা জানতে চেয়েছিলুম বললেন না?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিনে, যা জানি তাও হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে দাদা আজ সর্বস্বান্ত। সমস্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল — মুখুয্যেমশাই সর্বস্বান্ত? কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। সাহা-চৌধুরী কোম্পানি হঠাৎ যেদিন দেউলে হলো দাদারও সর্বস্ব ডুবল সেই গহ্বরে। অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রইলো অন্য ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুবাবু, শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্বস্ব যাওয়া সত্যি কিনা।

হ্যাঁ, সত্যি। ওখানে কোন ভুল নেই।

কিন্তু মেজদি? বাসু? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি?

না। রইলো শুধু বৌদির বাপের বাড়ির আয়। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

কিন্তু সে ত মুখুয্যেমশাই ছোঁবেন না দ্বিজুবাবু।

না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশী ভরসা। যে ক'টা দিন চলে।

উভয়েই নির্বাক হইয়া রহিল। মিনিট-কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি? আপনার নিজের কি হলো?

দ্বিজদাস বলিল, পরম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ডুবলেন কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জলকণাটি পর্যন্ত লাগতে দিলেন না গায়ে। বলবেন, এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে? হলো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের কল্যাণে। গল্পটা বলি শুনুন। এই শশধর ছিল দাদার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। দু'জনের ভালোবাসার অন্ত নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কল্যাণীর বিয়ে। এই ঘটকালিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্তি। শোনা গেল, শশধরের বাপের মস্ত জমিদারি, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর-চারেক হয়ে গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালো জমিদারি, ঐশ্বর্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিলম্ব নেই,—রক্ষা করতে হবে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত, কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক, তার টাকায় ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে, বছর ঘুরবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্বাদ করি তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি, কর্তার একান্ত নিষেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বললে, দাদা বিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে? মা পারেন, কিন্তু তুমি? যেখানে ওঁর ধর্ম, যেখানে ওঁর বিবেক ও বৈরাগ্য, যেখানে উনি আমাদের সকলের বড়, কল্যাণী সেইখানে দিলে আঘাত। দাদা অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাড়ি যা বোন, যা করতে পারি আমি করবো। সেই অভয়-মন্ত্র জপতে জপতে কল্যাণী বাড়ি ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন ভোর হয়েছে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ঐ কাগজগুলো আপনার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দলিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

ঠিক জানিনে দ্বিজুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা হবে। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙ্গা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

তুমি পারবে না কেন অনুদি, তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা এই জন্যে যে, এর আগে মরিনি কেন? শুধু দ্বিজুকেই ত মানুষ করিনি বন্দনাদিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে দিয়েছিল তার দু'মাসের ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়াময়ী? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে-জামাই? বলিতে বলিতে সে মুখে আঁচল চাপিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র সরিয়া গেল। মেঝেয় বসিয়া নিজের জানুর উপর দিদির পা-দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ করিয়া একফোঁটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, তুই কেন কাঁদচিস বল ত বন্দনা?

বন্দনা তেমনি নতমুখে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কাঁদচে ত সবাই মেজদি। আমিই ত একা নয়।

সবাই কাঁদছে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখাপড়া শিখে এই বুঝি তোর যুক্তি হলো?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মুহূর্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, যুক্তি দেখিয়ে কাঁদতে হবে নইলে মানুষে কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, তর্কবাগীশের সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই। তা বলিনি রে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেছে আমার সব বুঝি গেলো তাই ওদের কান্না, কিন্তু সত্যি ত তা নয়। আমার এক দিকে রয়েছেন স্বামী, অন্য দিকে ছেলে,—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি ভাই, আমার জন্যে তুই শোক করিস নে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার না-ই থাকে মেজদি। কিন্তু তোমার দুঃখটাই সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি গেলো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে কেঁদে যারা চোখ অন্ধ করলে তাদের লোকসান কে পুরোবে বলো ত?

একটু থামিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই পুরুষমানুষ, যা খুশি উনি বলুন, কিন্তু যাবার ক্ষণে আজ শুকনো চোখে যেন তুমি বিদায় নিও না দিদি। সে ওদের বড় বিঁধবে।

কাদের বিঁধবে রে বন্দনা?

কাদের? জানো না তুমি তাদের? তোমার ন'বছর বয়েসে এসেছিলে এই পরের বাড়িতে, সেই বাড়িকে বছরের পর বছর ধরে তোমায় আপনার করে দিলে যারা, আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি? তোমার শাশুড়ী, তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস-দাসী, আশ্রিত-পরিজন, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামী-পুত্র দিয়ে? আর কেউ নেই জীবনে—শুধু এই?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখের কথা জানো মেজদি, যে সমাজে আমরা মানুষ হয়েছি তাদের। তুমি ভেবেছো স্বামীভক্তির এই শেষ কথা? স্ত্রীর এর বড়ো ভাববার কিছু নেই? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাসীর বাড়িতে, দেখবে এ কথা সেখানে পুরনো হয়ে আছে,—এর বেশি তারা ভাবেও না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখিল দ্বিজদাস। কখন যে সে নিঃশব্দে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাইয়া বন্দনা কি যেন বলিতে গেল, দ্বিজদাস থামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকেও চিনিনে, তাঁর দলের কাউকেও জানিনে,—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্চে। পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ারের দল আছে, তাদের আচরণ ফরমূলায় বাঁধা যায়, কিন্তু মানুষের দল নেই। একজোটে এমন গড়পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলুম। মাসীর দল থেকে টেনে অনায়াসে আপনাকে দাদার দলে ভর্তি করা যায়, আবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে ঐ মৈত্রেয়ীকে আপনার মাসীর দলে চালান করা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও একতিল বিভ্রাট বাধবে না। বাঃ রে মানুষের মন! বাঃ রে তার প্রকৃতি!

সতী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথার মানে ঠাকুরপো?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মানে? দ্বিজুর কাজ, দ্বিজুর কথার মানেই যদি থাকবে বৌদি, এতকাল দয়ামযী-বিপ্রদাসের দরবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আরজি পেশ হতো কেন? মানে বোঝার গরজ তোমার নেই বলেই ত? আজ যাবার দিনেও সেইটুকু থাক বৌদি, ঠিক-বেঠিকের চুলচেরা বিচারে কাজ নেই। এই বলিয়া সুমুখে আসিয়া সে তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক। কথাটা কিছুই নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা দিতে। সময় হয়ে আসছে, দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাসুকে জামা-কাপড়

পরিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছি, মাঙ্গলিকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে, কিন্তু তাও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অনুদি হয়ত ডুবে মরেছেন, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে ওগুলো এলো কি করে? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাঁকে যাবে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মহল অর্গলবদ্ধ। সঙ্কট-উত্তরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন তাতে করবার কিছু নেই। তবে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে বলে যেতে পারো যথাসময়ে মা'র কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসবে চলো, বৌদি, তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে আমি নিস্তার পাই, একটু কাজে মন দিতে পারি।

সতী ম্লান হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারী তাড়া।

আমার কাজ পড়ে রয়েছে যে।

কি কাজ শুনি?

এর আগে কখনো ত শুনতে চাওনি বৌদি। যখন যা চেয়েছি জিজ্ঞাসা না করেই চিরকাল দিয়ে এসেছো। এ তোমার শোনার যোগ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কহিল, তুইও এখানে দেরি করিস নে বোন, — যত শীঘ্র পারিস বোম্বায়ে ফিরে যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কাকা সেখানে একলা রয়েছেন মনে রাখিস।

বন্দনা দ্বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল, না মেজদি, মাসীর বাড়িতে আর না। সেদিকের পাট উঠিয়ে দিয়েই বেরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আঁচলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, হয়ত কালই বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভরসা দিয়ে যাও মেজদি, আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে কি আশীর্বাদ করিল সে-ই জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিমুখে বলিল, সে ত তোর নিজের হাতে বন্দনা। কাকাকে বলিস বিয়ের নেমন্তন্নপত্র দিতে, যেখানে থাকি গিয়ে হাজির হবোই। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিল বলা উচিত কিনা, তার পরে বললি, ভারী সাধ ছিল এ-বাড়িতে তুই পড়বি। ঠাকুরপোর হাতে তোকে সঁপে দিয়ে, তোর হাতে সংসারের ভার বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাসদর্শনে যাবো, ফিরতে না পারি না-ই পারলুম,—কিন্তু, মানুষ ভাবে এক হয় আর। এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, এ বাড়িতে আমি যা পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা পায় না। আবার সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলুম আমার শাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশি। যাবার আগে প্রণাম করতে পেলুম না, দোর বন্ধ, চৌকাটের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, মা, এই কাঠের ওপরে তোমার পায়ের ধুলো লেগে আছে, এই আমার—কথা শেষ করিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া এইবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার দু'চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। মিনিট দুই-তিন গেল সামলাইতে, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আর পেলুম না খুঁজে আমার অনুদিকে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বলিস ত রে, আমি রাগ করে গেছি। আবার দু'চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, আবার আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। একটা বিড়াল পুষিয়াছিল, নাম নিমু। কাজকর্মের বাড়িতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে, এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মারলে দেখে যেতে পেলুম না। অনুদিকে বলিস ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল, তাহার এক দিকে রহিলেন স্বামী, অন্য দিকে সন্তান,—সংসারে কোন ক্ষতিই তাহার হয় নাই! কথাটা কত বড়ই না মিথ্যা!

বৌদি করচো কি? বাহির হইতে দ্বিজদাসের আর একদফা তাগাদা আসিল।

যাচ্চি ভাই, হয়েছে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

স্টেশন হইতে দ্বিজদাস যখন একাকী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমনি আলো জ্বলিয়াছে, তেমনিভাবেই লোকজন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারে কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেও না। বাহিরের মহলে উপরে বিপ্রদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—ও দিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জ্বলে না, বিপ্রদাস থাকেন কলিকাতায়, অভাবনীয় কিছুই নয়। সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরটায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পড়িল ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া বাতির আলোকে সে নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিংবা বায়ু-সেবনে বহির্গত হইয়াছেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই দ্বিজদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের লাইব্রেরিঘরটা। সন্ধ্যার পরে এ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিন্তু খোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুছিতে। লোকের সংস্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে এই নির্জনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রিটা কোনমতে কাটাইয়া সে কাল চলিয়া যাইবে সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে—যেখানে মানুষ হইয়া সে এত বড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাহার কত দিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখনো যে এ গ্রামে তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না। না আসুক কিন্তু এ বাড়ি সে সহজে ভুলিবে না। বিচিত্র এ দুনিয়া,—কত অদ্ভুত অভাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত সকল কথাই দ্বিজুর মনে পড়িল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনি হঠাৎ রাগ করিয়া যাওয়া। মধ্যে শুধু ঘণ্টা-খানেকের

আলাপ-আলোচনা। সেদিন বন্দনা সহাস্যে বলিয়াছিল, শুধু চোখের পরিচয়টাই নেই দ্বিজুবাবু, নইলে দেওরের গুণাগুণ লিখে পাঠাতে মেজদি কখনো আলস্য করেন নি। আমি সমস্ত জানি, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অজানা নেই। যতদিন যত জ্বালিয়েছেন বাড়িসুদ্ধ লোককে, তার সমস্ত খবর পৌঁচেছে আমার কাছে। দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কেউ কারুকে চিনিনে, তবু আপনার কাছে আমার দুর্নাম প্রচার করার সার্থকতা ছিল কি? বন্দনা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বোধ করি আসলে মেজদি আপনাকে দেখতে পারতেন না,—এ তারই প্রতিশোধ।

তার পরে দুজনেই হাসিয়া কথাটাকে পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন উভয়ের কেহই ভাবে নাই এ ছিল সতীর দ্বিজুর প্রতি বন্দনার চিত্ত আকর্ষণের কৌশল। যদি কখনো বোনটিকে কাছে আনা যায়, যদি কখনো তাহার হাতে দিয়া অশান্ত দেবরটিকে শাসন মানানো চলে। কিন্তু সে ঘটিল না, তাহার গোপন বাসনা গোপনেই রহিয়া গেল,—আজও দুজনের কেহই সে-সব চিঠির অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

দ্বিজদাস সোজা উপরে উঠিয়া গেল। পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার কোলের উপর বই খোলা, কিন্তু সে জানালার বাহিরে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। একটা ছত্রও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ, বুঝিয়াও শুধু কথা আরম্ভ করিবার জন্যই সে প্রশ্ন করিল, কি বই পড়ছিলেন?

বন্দনা বই মুড়িয়া টেবিলে রাখিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ফিরতে এত দেরি হলো যে? কলকাতার গাড়ি ত গেছে কোন্ কালে।

দ্বিজদাস বলিল, দেরি হোক তবু ত ফিরেচি। না ফিরলেও ত পারতুম।

বন্দনা বলিল, অনায়াসে।

দ্বিজদাস একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাই আমার প্রথমে মনে হয়েছিল। গাড়ি ছেড়ে দিলে, জানালায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসু হাত

নাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ তার ছোট্ট হাতখানি গেল বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে। প্রথমে মনে হলো গেলেই হতো ওদের সঙ্গে—

বন্দনা কহিল, আপনি বাসুকে ভারী ভালবাসেন, না?

দ্বিজদাস একটু ভাবিয়া বলিল, দেখুন জবাব দেবো কি, এ-সব জিনিসের আমি বোধ হয় স্বরূপই জানিনে। প্রকৃতিটা এত রুক্ষু, এমন নীরস যে, দু'দণ্ডেই সমস্ত উবে গিয়ে শুকনো বালি আবার তেমনি ধূধূ করে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে একবার জল এলো, কিন্তু তখনি আবার আপনিই শুকলো,—বাষ্পের চিহ্নও রইলো না।

বন্দনা কহিল, এ একপ্রকার ভগবানের আশীর্বাদ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে। অথচ, এই বাসুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন। নইলে দাদার জন্যেও না, বৌদিদির জন্যেও না। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেছেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্ধেক কাল কেটেছে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাকতো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেছে ষাট দিন? আমি। আজ যাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? আমি। ওর জামাকাপড় থাকে আমার আলমারিতে, ওর বই-শ্লেটের জায়গা হলো আমার টেবিল, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙ্গে ও পালিয়ে এসেছে আমার ঘরে।

বন্দনা নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, বলিল, তবু ত চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্তের বেশি লাগে না।

দ্বিজদাস কহিল, না। এই আমার স্বভাব। ওকে নিয়ে আমার ভাবনা শুধু এই যে, সে পড়বে গিয়ে তার বাপ-মায়ের হাতে। আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েছে এই যে, এত বড় উলটো কথাটা মানুষকে আমি বোঝাবো কি করে!

বন্দনা এ কথা বলিল না যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি! অন্যপক্ষে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ, বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই

রহিল।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস নিজেই কহিল, একটা সান্ত্বনা বৌদি রইলেন কাছে, নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলার্ধ শান্তি থাকতো না।

বন্দনা কহিল, আপনি ত নির্বিকার, বাসুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের? যা হয় তা হোক না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখে শুনেছিলাম। সে-ও কি ওই চোখের জলের মতো এক নিমিষে শুকিয়ে গেল? কিংবা যে লোক নিজের দোষে সর্বস্বান্ত হয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এই কি অবশেষে বলতে চান?

দ্বিজদাস বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে দুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, সে আমি বলিনি। আমি বলছিলুম তৃষ্ণার জলের জন্যে মানুষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন হাত না পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোকে তা বুঝবে না।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিজদাস একেবারে অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কালই বোম্বায়ে যাবেন?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

অশোকবাবুই নিয়ে যাবেন?

হাঁ, তিনিই।

দ্বিজদাস বলিল, বোম্বাই-মেল এখান থেকে বেশী রাতে যায়, কাল আপনাদের আমি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবো না, একটু কাজ আছে।

বাবাকে একটা তার করে দেবেন।

আচ্ছা।

মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিজদাস কহিল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করবো প্রায় ভাবি, কিন্তু নানা কারণে দিন বয়ে যায়, জিজ্ঞেসা করা আর হয় না। কাল চলে যাবেন, সময় আর পাবো না। যদি রাগ না করেন বলি।

বলুন।

দেরি হইতে লাগিল।

বন্দনা কহিল, রাগ করবো না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দ্বিজদাস বলিল, কলকাতার বাড়ি থেকে মা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে?

পড়ে।

কারণ না জেনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভাল লাগে। মনে পড়ে?

পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সঙ্গেই মনে পড়ে।

সে কথার মূল্য কিছু নেই?

না।

দ্বিজদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মূল্য কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলেছিলেন আপনার মাসির ইচ্ছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হয়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, এ আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলে না।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ কৌতূহল আপনার লজ্জাকর। শুনিয়া দ্বিজদাস সত্যই লজ্জা পাইল, তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েছে বন্দনা। স্বভাবতঃ আমি কৌতূহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হতো যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে বিপদে কাউকে ডাকা চলে না, আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথার মাঝখানেই বন্দনা হাসিয়া বলিল, কিন্তু এই যে বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি ত পর, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবু আপনিই বা কেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে অশ্রদ্ধার খোঁটা দিলেন? জানেন না কি হচ্চে আমার? দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণ-দু'টা অশ্রুবাষ্পে ছলছল করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজুবাবু, আপনি কখন বাড়ি এলেন আমরা ত কেউ জানতে পারিনি?

দ্বিজদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার খুব দরকার হয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মার ঘরে।

কিন্তু মার দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে দোর খুলিয়েছি, তাঁকে স্নান করিয়েছি, আহ্নিক করিয়েছি, জোর করে দুটো ফল মুখে গুঁজে দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন, দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম, সে হবে না মা, আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবো না। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার পথ চেয়ে আছি। চলুন, আপনার খাবার রেখে এসেছি মার ঘরে।

দ্বিজদাস অবাক হইয়া রহিল। ইহার এত কথা সে পূর্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

মৈত্রেয়ী বন্দনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনিও আসুন। মা আপনাকে ডাকছেন। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসকে একপ্রকার গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সকলের পিছনে গেল বন্দনা।

নিজের ঘরের মধ্যে দয়াময়ী ছিলেন বিছানায় শুইয়া। অনুজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিলে ক্লেশ বোধ হয়। পরিস্ফীত দুই চক্ষু আরক্ত, সদ্যস্নাত আর্দ্র কেশগুলি আলুথালু বিপর্যস্ত। শিয়রে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অন্য দিকে একটা চেয়ারে শশধর, দূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। দ্বিজদাস ঘরে ঢুকিতেই দয়াময়ী মুখ ফিরিয়া শুইলেন, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট ক্রন্দনের অবরুদ্ধ আক্ষেপে তাঁহার সর্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা নীরবে ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল, এতবড় ব্যথার দৃশ্য বোধ করি সে কখনো কল্পনা করিতেও পারিত না। বহুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই নির্বাক, এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা কহিল শশধর! বলিল, কাল থেকে শুনচি না খেয়েই আছো,—যা হোক দু'টো মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ।

মেঝের উপর ঠাঁই করিয়া মৈত্রেয়ী সযত্নে খাবার গুছাইয়া দিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া শশধর পুনশ্চ কহিল, তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে! তাঁরা গেলেন ত সেই আড়াইটার গাড়িতে?

হাঁ।

শশধর একটুখানি হাসির ভান করিয়া বলিল, অথচ, কলকাতার বাড়িটা ত শুনেচি তোমার।

দ্বিজদাস কহিল, আমার বাড়িতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল, তা বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ি ছেড়েও ত তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই ত পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল আপনি করে নিলেন না কেন?

আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কিরকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমাট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে দ্বিজদাস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধরবাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্বত, আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে ত যায়নি,—মাত্র শুরু হলো।

তার মানে?

মানে এই যে, আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই,—আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ভয়ানক গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুলে বল দিকি?

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার এ কথা মানি যে অর্থ আজ স্পষ্ট হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্যরক্ষার জন্যে সর্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্যে গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি এক অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই,— ওরা একধরনের পাগল,—তাই এই দুর্দশা। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশী প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতই আমার হিংসে আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো,—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু পক্ষই একদিন পথের ভিখিরি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞজনের মুখে শুনি এমনিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক।

শশধর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, মা, শুনচেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই,—মাতৃবাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুকে স্পর্ধার অভিনয় করে না এ কথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত। বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয়,—অতিশয় কঠোর সঙ্কল্প। উত্তর দিতে গিয়া আর তাহার কণ্ঠস্বরে পূর্বের প্রবলতা ছিল না, তথাপি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্যন্ত করবো না।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য শশধরবাবু।

কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, ছোড়দা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্বনাশ?

দ্বিজদাস বলিল, তুই ভাবিস চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিত? দাদা নেই বটে, তবুও খেতে যখন পাবিনে আসিস আমার কাছে, তখন তোর কান্না শুনবো,— এখন নয়।

দয়াময়ী নিঃশব্দে অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু, তুই যা এখান থেকে। এমনি করে গালিগালাজ করতে কি বিপিন তোরে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

কে শিখিয়ে দিয়ে গেল বলচো? বিপিন?

হাঁ, সে-ই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসের ওষ্ঠাধর মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্চি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট করো না। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, ঘণ্টা–দুই পরে মৈত্রেয়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন করে তৈরি করে নিয়ে এলুম, খেতে বসুন। এই ঘরেই ঠাঁই করে দিই।

এ আপনাকে কে বলে দিলে?

কেউ না। কাল থেকে আপনি খাননি সে কি আমি জানিনে?

এত লোকের মধ্যে আপনার জানার প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, ঐখানে রেখে যান। এখন ক্ষিদে নেই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেয়ী ঘরের একধারে আসন পাতিয়া, খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে খাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সামান্য কিছু খাইয়া শুয়ে পড়িবে এই মনে করিয়া হাতমুখ ধুইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দ্বারের বাহিরে কে-একজন বসিয়া আছে। বারান্দার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি মৈত্রেয়ী।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কহিল, এত রাতে আপনি এখানে কেন?

খেতে বসে যদি কিছু দরকার হয় তাই বসে আছি।

এ আপনার ভারী অন্যায়। একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদিই বা হয় বাড়িতে আর কি কেউ নেই?

মৈত্রেয়ী মৃদুকণ্ঠে বলিল, ক'দিনের নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেন নি, তবে ঘুমোলেন না কেন?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজদাসের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বর এবার অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল, এভাবে বসে থাকাটা বিশ্রী দেখতে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, যতক্ষণ খাই তদারক করুন। এই বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে জলের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতিপূর্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কহিয়াছে। প্রয়োজনও হয় নাই, ইচ্ছাও করে নাই। এখন আলাপটা কিভাবে চালাইবে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, না আছে খাবারের পাত্র, না আছে মৈত্রেয়ী নিজে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্বেই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঢাকা খুলে দেখি সমস্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে, তাই আবার আনতে গিয়েছিলুম। বসুন।

দ্বিজদাস কহিল, ধূঁয়া উঠছে দেখচি। এতরাত্রে ও-সব আবার পেলেন কোথায়?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক করে রেখে এসেছিলুম। যখনি বললেন খেতে দেরি হবে তখনি জানি এ-সব না রাখলে হয়ত খাওয়াই হবে না।

দ্বিজদাস ভোজনে বসিয়া প্রথমে রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার কতকগুলি মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরি। সেগুলি বারংবার অনুরোধ করিয়া সে দ্বিজদাসকে বেশি করিয়া খাওয়াইল। এ বিদ্যায় সে ব্যুৎপন্ন,—জানে কি করিয়া খাওয়াইতে হয়।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, বেশি খেলে অসুখ করবে যে।

না, করবে না। কাল থেকে উপোস করে আছেন, একে বেশি খাওয়া বলে না।

কিন্তু আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ বাড়িতে বোধ করি অনেকেই আছেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু মাকে যে কি করে দুটো খাওয়াতে পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দোর বন্ধ করে অনাহারে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অন্নদাদিদির খবর নিয়েছিলে?

মৈত্রেয়ী কহিল, তার আবার কি হলো? সেও কি না খেয়ে আছে নাকি?

এতক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেছিল, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার মনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই শেষ কথাটায় চিত্ত তাহার মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠিল, কহিল, অনুদির সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনেচো সে আমাদের

দাসী, কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মানুষ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়িতেই ত পুরনো দাস-দাসী ছেলেপুলে মানুষ করে। তাতে নতুন কি আছে? আচ্ছা, আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরুত্তরে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যিই ত, এমন কত পরিবারেই ঘটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানে না, তাহার কাছে শুধু বাহিরের ঘটনায় একান্ত বিস্ময়কর ইহাতে কি আছে! কঠোর বিচার হালকা হইয়া আসিল, কহিল, অনুদি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্যে আজকে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কার কাছে? তোমার মার কাছে কি?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাউকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, স্বামী কি পর? আমি পরকে যত্ন করার কথা জিজ্ঞেসা করেছিলুম।

ওঃ—পর? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, বলো তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হলো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন। চৌধুরীমশাই কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না, আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত!

দ্বিজদাস বলিল, পুরুষমানুষে তাই করে। ওরা অন্যায় মানে না।

আপনিও কি তাই করবেন নাকি?

আগে একটাই ত করি, তার পরে অন্যটার কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে?

দ্বিজদাস বলিল, কে দেখবে জানিনে মৈত্রেয়ী, হয়ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয়ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে,—সংসারে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক, তোমার নিজের কথা বলো।

কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

কিছুই নেই? একেবারে কিচ্ছু নেই?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল, তার পরে একটু হাসিয়া বলিল,—ও আমি বুঝেচি। আপনি চৌধুরীমশায়ের কথা কারো কাছে শুনেছেন বুঝি? ছি ছি, কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মরতে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

তার পরে?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরীমশায়ের অনেক টাকা, বাবা-মা দুজনেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও কথা তোমরা মুখে আনলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

কেন, এত আপত্তি তোমার কিসের?

আপত্তি হবে না? জগতে এতবড় অশান্তি আর কিছু আছে নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, এ কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল হলো কি? আজকের মত দুঃখের ব্যাপার এ বাড়িতে আর কখনো এসেছে কি?

দ্বিজদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্যও কিছুতে নয়। মিনিট দুই-তিন অভিভূতের মত বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবো না। এ পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি, তবু জানি, তোমার এ কথা সাধারণ মেয়েদের অতি তুচ্ছ সাংসারিক হিসেবের চেয়ে বড় নয়। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে বাড়ি ছিল না, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনার গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আসতে পারি?

কে, দ্বিজুবাবু? আসুন।

দ্বিজদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স গুছানো শেষ হইয়াছে, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তাহলে? একটা দিনও বেশি রাখা গেল না?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইল না বলে, তবু বলিতেই হইল,—যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে কি লাভ বলুন?

দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথা ত ভাবিনি, শুধু ভেবেচি সবাই গেল—এতবড় বাড়িতে বন্ধু কেউ আর রইলো না।

বন্দনা কহিল, পুরনো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে, এমনিই জগৎ দ্বিজুবাবু। সেই আশায় ধৈর্য ধরে থাকতে হয়,—চঞ্চল হলে চলে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশী নেই, কাজের কথা দুটো বলে নিই। শুনেছেন বোধ হয় শশধরবাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন?

না শুনিনি, কিন্তু অনুমান করেছিলুম।

যাবার পূর্বে একফোঁটা জল পর্যন্ত তাঁদের খাওয়াতে পারা গেল না। দু'জনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চললুম। মা বললেন, এসো। তার পরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বলিয়া বন্দনা নীরব হইল। যে কারণে তাহার যাওয়া, যে-সকল কথা মায়ের সম্মুখে দ্বিজু গত রাত্রে বলিয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারী ভেঙ্গে পড়েছেন। দেখলে মায়া হয়,—লজ্জায় কারো কাছে যেন মুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেয়ী ওঁর যে সেবা করছে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না। মা সুস্থ হয়ে যদি ওঠেন সে শুধু ওর যত্নে। মেয়েটি বেশ ভাল, কিছুদিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ।

তাই হবে।

দ্বিজুবাবু, যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো?

করুন।

আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কেন?

বন্দনা বলিল, এই বৃহৎ পরিবার নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের অনেক ক্ষতি হলো জানি কিন্তু যা রইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত সৎকাজ, কত আশ্রিত-পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা,—আর সে কি শুধু আজ? কত দীর্ঘকাল ধরে এই ধারা বয়ে চলেচে আপনাদের পরিবারে—কোনদিন বাধা পায়নি, সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো সে ছিল বাহুল্য, সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক সে। যা রেখে গেলেন শান্তমনে তাকেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অবশিষ্ট আপনার অক্ষয় অজস্র হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্বে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

দ্বিজদাসের চোখের জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অখণ্ড ভরসায় দাদার ওপর সর্বস্ব রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা রইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে রইলেন। কিন্তু সেই ত্রুটি যদি দৈন্য এনে তাঁদের পুণ্য কর্ম বাধাগ্রস্ত করে, কোনদিন মুখুয্যেমশাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। এই অশান্তি থেকে তাঁকে আপনার বাঁচতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন করে কেউ ভাবেনি বন্দনা, আমিও না। এ কি আশ্চর্য!

ভাগ্য ভালো যে, বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা দেখিতে পাইল না। বলিল, দাদার জন্যে সকল দুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাজের বোঝা বইবো কি করে—সাহস পাইনে যে! সেই-সব দেখতেই আজ বেরিয়েছিলুম। তাঁর ইস্কুল, পাঠশালা, টোল, মুসলমান ছেলেদের জন্যে মক্তব,—আর সেই কি দু-একটা? অনেকগুলো। প্রজাদের জল-নিকাশের একটা খাল কাটা হচ্চে, বহুদিন ধরে তার টাকা যোগাতে হবে। কাগজপত্রের সঙ্গে একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়েছি—শুধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলব, জানিনে।

বন্দনা কহিল, বলবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি, এতকাল তিনি কিছুই কি কাউকে জানান নি?

না।

এর কারণ?

দ্বিজদাস বলিল, সুকৃতি গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে? সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ত ছিল না। দুঃখ যখন এসেছে একাকী বহন করেছেন, আনন্দ যখন এসেছে তাকেও উপভোগ করেছেন একা। কিংবা, জানিয়ে থাকবেন হয়ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া

কহিল, কিন্তু সে খবর আত্মীয়—স্বজন জানবে কি করে? জানেন শুধু তিনি আর তাঁর ঐ অন্তর্যামী।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখুয্যেমশাই কাউকে কোনদিন ভালোবাসেন নি? কোন মানুষকেই না?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষের সংসারে এতবড় নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর নেই। তার পরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া একটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা হোক গে দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু আমি ত দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা?

একলা ত নয়, দু'জনে নেবেন। তাই ত বলেছি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে?

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলছেন দ্বিজুবাবু? এ কথা ত আমাদের সমাজে শুধু আমরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনাদের পরিবারে কে কবে ভালোবেসে বিয়ে করেছে যে আপনার না হলে নয়! এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ির নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চিরদিন মানতে হবে? তাতেই সুখী হবো এ বিশ্বাস আর নেই।

বন্দনা বলিল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, সুখের জামিন দিতেও পারবো না, কারণ সে ধন যাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে। অদ্ভুত তাঁর বিচারপদ্ধতি,—তত্ত্ব-অন্বেষণ বৃথা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্বরাগের

খেলা দেখলুম অনেক, আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন্ গহনে, সে প্রহসনও দেখতে পেলুম অনেক। আমি বলি ও-

ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সোনার মায়ামৃগ যে বনে চরে বেড়াচ্চে বেড়াক, এ বাড়িতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, তার মানে সুধীরবাবু দিয়েছে আপনার মন ভয়ানক বিগড়ে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যেটুকু বাকী ছিল বিগড়ে দিলেন আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক! এখন পোড়া অদৃষ্টে উনি টিকে থাকলে বাঁচি।

উনিটি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে শুরু করেছেন।

কেউ ভালবাসার ধার দিয়েও যাবে না এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প?

হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন মস্ত বিড়ম্বনায় না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েছি, আমাকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

শুনে তিনি কি বললেন?

বললেন না কিছুই, শুধু দু’চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হলো দ্বিজবাবু।

দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আজও আশা আছে। কিন্তু জানবেন এ-সব শুধু মাসীর বাড়ির ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব নয়, হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে এসেছিলুম কলকাতায়, নইলে কত জিনিস ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশী সময় আর নেই, এবার শেষ উপদেশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গীতে মাথাটা বারকয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই? সত্যিই চাই নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো। কিন্তু ভালোবাসা না পাই, বন্ধুত্ব না পেলে যত ভার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো কি করে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, এ কণ্ঠস্বর বন্দনাকে বিচলিত করিল, কহিল, ভয় নেই দ্বিজুবাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে মৈত্রেয়ীর সাড়া পাওয়া গেল,—দ্বিজুবাবু আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার ডাকচেন।

দ্বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বারোটায় গাড়ি, সাড়ে এগারোটায় বার হতে হবে। ঠিক সময়ে এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

পঁচিশ

বন্দনার নির্বিঘ্নে বোম্বাই পৌঁছান—সংবাদের উত্তরে দিনকয়েক পরে দ্বিজদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেমন দেখিয়া গেছে সমস্ত তেমনি চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গেছেন, কিন্তু সে নিজে এখনও এ বাড়িতেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নে তাহার ক্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহারি উপরে পড়িয়াছে, ভালোই চালাইতেছে। বাড়ির সকলেই তাহার প্রতি খুশী। দ্বিজদাসের নিজের পক্ষ হইতেও আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিশেষে, বন্দনা ও তাহার পিতার শুভকামনা করিয়া ও যথাবিধি নমস্কারাদি জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিন মাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই আর পত্রাদির আদান-প্রদান হয় নাই। বিপ্রদাসের, মেজদিদির, বাসুর সংবাদ জানিতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাঁহারা আজও খবর দেন নাই,—কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই সুপারিশ করিতে দ্বিজদাসকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অসাধ্য ঠেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্মৃতির তীক্ষ্নতা ও বেদনার তীব্রতা দুই-ই অনেক লঘু হইয়া গেছে, কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যথাতুর বিক্ষুব্ধ চিত্ততল ধীরে ধীরে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধ কোন সত্যকার সম্বন্ধ নহে।

একত্রবাসের সেই দুঃখে-সুখে ভরা অনির্বচনীয় দিনগুলি বিচিত্র ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে যতই কেননা নিবিড়তার মোহ সঞ্চার করিয়া থাক আয়ু তার ক্ষণস্থায়ী। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই যে, এই আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী মুখুয্যে-পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও নয়, আপনারও নয়। উভয় পক্ষের শিক্ষা, সংস্কার ও সামাজিক পরিবেষ্টনে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন সত্য, তেমনি কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্মস্থল পাঞ্জাব হইতে মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভালো নয়। পাঞ্জাবের চেয়ে বোম্বায়ের জল-বাতাস ভালো এ বুদ্ধি তাঁহাকে কোন্ ডাক্তার দিয়াছে সে তিনিই জানেন। কিন্তু আসিয়াছেন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। বোম্বাই আসিবার পূর্বে বন্দনা দেখা করিয়া আসে নাই, এ অভিযোগ তাঁহার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোনঝির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনীপতি রে-সাহেবের দরবারে প্রকাশ্য নালিশ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিস্টার রে, এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেচি বাপ-মায়ের এক ছেলে কিংবা এক মেয়ে এমনি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—

বন্দনা কহিল, তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালোবাসো না বাবা?

সাহেব সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এইমাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাসী পর্যন্ত না হাসিয়া পারিল না।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মা—ও কি আমাকে দেখতে পারতেন না?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েছে। ছেলেবেলায় তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙ্গেছিলে। তোমার মা রাগ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুকে তুলে নিলাম। সেদিন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালবাস না বাবা?

সাহেব মাসীকে আবেদন করিলেন,—শুনলেন মিসেস ঘোষাল, বুড়ীর কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে যখন-তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

শুনচেন মিসেস ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মাসী বললেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবে।

আমি বুঝতে চাইনে মাসীমা।

কিন্তু পিতার কর্তব্য রয়েছে যে মা। বাপ-মা ত চিরজীবী নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শান্তি পান না, সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা তারাই জানে। তোমার বোন প্রকৃতির যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেছি ততদিন খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি। কত রাত্রি যে জেগে কেটেছে সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন। তোমার মা বেঁচে থাকলে আজ তাঁরও আমার দশাই হতো।

রে-সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, খুব সত্যি মিসেস ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ওর মা বেঁচে থাকলে বন্দনার জন্যে আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজেই কি কম করেছি ওঁকে। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনিই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাই ত জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়েস বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার ত স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না কোন উপায় করে যেতে পারি হঠাৎ কিছু ঘটলে কি হবে। ভয়ে উনি ত একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও শুকাইয়া উঠিয়াছে, খাওয়া বন্‌ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি মেসোমশাইকে অকারণে নানা ভয় দেখিয়েচো মাসীমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্চো। কি এমন হয়েছে বলো ত? বাবা এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্যে যা ভালো, করে যাবার ঢের সময় পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দমিবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ রে-সাহেব তাঁহাকেই সমর্থন করিয়া বলিলেন, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেছেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশী বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়, সময় থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত? এই বলিয়া তিনি উভয়ের প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভকণ্ঠে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিস্টার রে। আপনার এক শ' বছর পরমায়ু হোক আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম—

সাহেব বাধা দিলেন,—না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায়।

বন্দনা গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসীমা।

মাসী বলিলেন, থাক এ—সব আলোচনা মিস্টার রে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারী কষ্ট পাবো।

সাহেবের আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া তিনি এক টুকরা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্‌টিস কিরকম হচ্চে মিসেস ঘোষাল?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেছেন। শুনতে পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাক্‌টিস যাই হোক মিস্টার রে, আমি এইটেই খুব বড় মনে করিনে। আমি বলি তার চেয়েও ঢের বড় মানুষের চরিত্র। সে নির্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন যথার্থ সুখী হতে পারে না।

তাতে আর সন্দেহ আছে কি!

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুশকিল হয়েছে আমার বাপের বাড়ির শিক্ষা-সংস্কার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে গাঁথা। তার থেকে একতিল কোথাও কম দেখলে আর সইতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যার মধ্যে আমি মানুষ। আমার বাবা, আমার দাদা — এই অশোকও হয়েছে ঠিক তাঁদের মতো। তেমনি সরল, তেমনি উদার, তেমনি চরিত্রবান।

রে-সাহেব সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি অতি সৎ। ছ-সাত দিন এখানে ছিল, তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস বুড়ী, অশোককে আমাদের কি ভালই লেগেছিল। যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র।

আমার ত কোন অনুরোধে কখনো না বলেন নি। আমাকে বোম্বায়ে তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হতো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেছো বন্দনা, ওর স্নবরি নেই। যেটি আজকালকার দিনের দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা সহাস্যে কহিল, তোমার বাড়িতে কোন স্নবের দেখা ত কোনদিন পাইনি মাসীমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছো বৈ কি মা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি করে?

শুনিয়া রে-সাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাঁহার ভারী ভালো লাগিল। বলিলেন, এত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে এ কথা গর্বের মতো শুনতে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসীমা, নইলে বাবাকে সামলানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখেছো, কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপেদের মতো দাম্ভিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ওঁর মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি, কহিলেন, আমি দাম্ভিক কিনা জানিনে, কিন্তু জানি কন্যা-রত্নে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কৈ আজ ত তুমি একটিও সন্দেশ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি?

সাহেব প্লেট হইতে আধখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ীর নিজের হাতের তৈরি। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পর্যন্ত ও সমস্ত খাওয়া বদলে দিয়েছে। ডালনা, সুক্ত, মাছের ঝোল, দই, সন্দেশ আরও কত কি। কার কাছে শুনে এসেছে জানিনে, কিন্তু বাড়িতে মাংস প্রায় আনতেই দেয় না। বলে বাবার ওতে অসুখ করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই-সব বাঙলা খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়েসে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিদে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসীমার অভ্যেস নেই, হয়ত কষ্ট হয়।

মাসী এই গূঢ় বিদ্রূপ লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, না না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভালোই লাগে। শুধু আবহাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

ভালো হয়েছে, না মাসীমা?

নিশ্চয় হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক।

কিন্তু বেশীদিন থাকবার যে জো নেই বন্দনা। অশোক লিখেচে এ মাসের শেষেই সে পাঞ্জাবে চেঞ্জের জন্যে আসবে। তার আগে আমার ত ফিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ব সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি-উঠি করিতেছিলেন,—মাসী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাব উত্থাপনের সপক্ষে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন, তাহা চক্ষুলজ্জায় ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরাইয়া আনা হয়ত দুরূহ হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিস্টার রে, একটা কথা ছিল, যদি সময় না—

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বৈ কি। বলুন কি কথা?

মাসী বলিলেন, আমি শুনেচি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্যি, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে একদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন ত—

সাহেব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি করে হতে পারে মিসেস ঘোষাল? অশোক আপনার ভাইপো, সম্পর্কে সেও ত বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিস্টার রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি একটা হিসাব করিলেন, তারপরে বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেছি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেছি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত ত জানা দরকার।

মাসী স্নেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লজ্জা করো না মা, বল তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জন দিয়েছি মাসীমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

সাহেব সভয়ে কহিলেন, এর মানে?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যেন আমি বাধা দিচ্চি। একটু থামিয়া কহিল, আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু, ভাগ্যে যাঁকে পেলেন সে স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন ভয় রাখবো না।

সাহেব বিস্ময়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তার মতামতের প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েছো, নিজের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের। এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা ত তোমার সাজে না বন্দনা।

সাজে কিনা জানিনে মাসীমা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।

কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনস্থির করবেন কি করে?

যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সম্বন্ধে, যেমন করে ওঁর সকল পূর্বপুরুষরাই দিয়েছিলেন তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ, আমার সম্বন্ধেও বাবা তেমনি করেই মনঃস্থির করুন।

তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না?

ভাবা-ভাবি, দেখা-দেখি অনেক দেখলুম মাসীমা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্বাদে আর সেই ভাগ্যের পরে যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায়নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মানি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখুয্যেদের এই ক'দিনের সংস্রব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের সেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর হয়ে গেছো।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমি পর হয়ে যাইনি। তাঁদের আপনার করতে আমার কাউকে পর করতে হবে না এ কথা নিশ্চয় জেনে এসেছি। আমাকে নিয়ে তোমরা কোন শঙ্কা করো না।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই?

দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিস্টার রে, আপনার নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মাসী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম আজ থাক মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন মিস্টার রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেল।

না না, আজ থাক, বলিয়া তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এবং ঐ অশ্রুজল মাসীকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিল। একজন প্রবীণ পদস্থ লোকের এইরূপ সেন্টিমেন্টালিটি তাঁহার অসহ্য। কিন্তু জিদ করিতেও সাহস করিলেন না। মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বলিলেন, ওর বাপের

ভাবনা আমি ভেবেচি, কিন্তু ওর মা নেই, তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মাসী মনে মনে বলিলেন, আর একটা স্টুপিড সেন্টিমেন্টালিটি। সাহেব অনুমান করিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল হয়েছে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাঙলা থেকে আসা পর্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে বটে, কিন্তু সে-ও, না ওর নতুন রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

নতুন রিলিজন? মানে?

মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙলা থেকে ও কি যেন একটা সঙ্গে করে এনেছে, সে রাত্রি-দিন থাকে ওকে ঘিরে। ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই। ভোরবেলায় স্নান করে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। বলি, বুড়ী, আগে ত তুই এ-সব করতিস নে?

তখন জানতুম না বাবা। এখন তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি, বেশ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষে করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ-সব নতুন ধাঁচা শিখে এসেছে ও মুখুয্যেদের বাড়িতে। জানেন ত তাঁরা কি রকম গোঁড়া। কিন্তু একে রিলিজন বলে না, বলে কুসংস্কার। ও পূজোটুজো করে নাকি?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কিনা। হয়ত করে না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েছে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর ত তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্বলতা। কিন্তু নিশ্চিত জানবেন একে রিলিজন বলে না, বলে শুধু সুপারস্টিশন। একে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়! অপরাধ!

সাহেব দ্বিধাভরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো নিজেও চর্চা করিনি, এর নেচার কি তা—ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষাদিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে ভিজে। কখনো ডেকে বলি, বুড়ী, আমাকে লুকোস নে মা, তোর ভেতরে ভেতরে কোন অসুখ করেনি ত? অমনি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অসুখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাঁজর ভেঙ্গে পড়তে চায় মিসেস ঘোসাল। ঐ একটি মেয়ে, মা নেই, নিজের হাতে মানুষ করে এতবড়টি করেছি,—সর্বস্ব দিয়েও যদি আমার সেই বন্দনাকে আবার তেমনি ফিরে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্চি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্মের ঝোঁক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসার। কেবল ওঁদের সংসর্গে আসার ক্ষণিক বিকার। বিবাহ দিন, সমস্ত দুদিনে সেরে যাবে। চিরদিনের শিক্ষাই মানুষের থাকে মিস্টার রে, দু দিনের বাতিক দু দিনেই ফুরোয়।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন, ও কোথায় কার কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু শুনেচি সে যদি আসে সত্যিকার মানুষ থেকে কিছুতে সে ঘোচে না। মানুষের চিরদিনের অভ্যাস দেয় একমুহূর্তে বদলে। নেশা গিয়ে মেশে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর ঘোর কাটে না। সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেছি মিস্টার রে—দুদিন পরে আর কিছুই থাকে না। আবার

যাকে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবে না,—আজই অশোককে একটা তার করে দিই—সে এসে পড়ুক।

আজই দেবেন?

হাঁ, আজই। এবং আপনার নামেই।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিত্রবান, সৎ—তা নইলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজী হতো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা, আজ হাজি-সাহেবের মেয়েরা আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। দুপুরবেলা যাবো,—বিকালে আফিসের ফেরত আমাকে বাড়ি নিয়ে এসো।

মাসী প্রশ্ন করিলেন, তাঁদের বাড়িতে তুমি ত কিছু খাবে না বন্দনা?

না মাসীমা।

কেন?

আমার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না ত?

না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

বেশ ত বাবা, দাও না।

মাসী বলিলেন, আমিই জোর করে তাকে আনচি। দেখো, এলে যেন না অসম্মান হয়।

তোমার ভয় নেই মাসীমা, আমরা কারো অসম্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া সাহেব প্রসন্নমুখে বলিলেন, আফিসের পথে আজই তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো বুড়ী। আজ শুক্রবার, সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদি না কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরোয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদপত্র নানা স্থানের। চিঠিপত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা করা বৃথা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দু-খানা। আপনারও একখানা রয়েছে মিসেস ঘোষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, একখানা ত দেখচি অশোকের হাতের লেখা। ওটা কার?

এই অকারণ প্রশ্নের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি-দুটা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখচি চিঠিপত্র চলে। তার করে দিই, সে আসুক। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনো চিঠি লিখত না।

প্রত্যুত্তরে মাসীও সগর্বে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

বিকালে আফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ি ঘুরিয়া রে-সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা সেখানে যায় নাই। মাসী সুমুখেই ছিলেন, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে আর বার হয়নি।

সাহেব উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিলেন, খায়নি?

না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছু না।

সাহেব দ্রুতপদে কন্যার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন,—বুড়ী!

বন্দনা কবাট খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—কি হয়েছে রে?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি বলরামপুরে যাবো।

বলরামপুরে? কেন?

দ্বিজদাসবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন,—পড়বে বাবা?

তুই পড় মা, আমি শুনি, বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। বন্দনা তাঁহাকে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এই—

সুচরিতাসু,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ি দাঁড়িয়ে, বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিতে। বললুম, কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠিপত্র লেখা সহজে আসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে যান।

শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপরে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন, দ্বিতীয় অনুরোধ করলেন না। হয়ত ভাবলেন অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভালো কথা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে!

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন কিছু লিখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। সে লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই?

দাদার ইষ্টদেবতা শুধু চোখ বুজেই থাকবেন, চেয়ে কখনো দেখবেন না? অঘটন যা ঘটল সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললো তাঁর ভক্ত। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা আজও তেমনি ঊর্ধ্বমুখে জ্বলচে, জ্যোতিঃর কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিন দিন হলো দাদা বাড়ি ফিরে এসেছেন। সকালে যখন গাড়ি থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামলো বাসু। খালি পা, গলায় উত্তরীয়। গাড়ি ফিরে চলে গেলো আর কেউ নামল না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার,—ঠিক অমাবস্যা রাত্রির মতো। বোধ করি মিনিট-দুই হবে, তার পরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন দ্বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে। মা কোথায়?

ঢাকায় । তাঁর মেয়ের বাড়িতে।

ঢাকায়? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, আসতে হয়ত পারবেন না, কিন্তু মাতৃদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বৈ কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকালো। তার পরে কেঁদে উঠলো। সে কান্নারও যেমন ভাষা নেই, চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশী হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝবার লোক পাবি, কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক, বাপ না থাক কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারবো না,

কিন্তু অস্বীকার করবো না কখনো। আজ সবচেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে এই রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি। ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, গোঁয়ার, মা বলতেন চুয়াড়, কতবার রাগ করেছেন দাদা,—অনাদরে অবহেলায় কতদিন এ বাড়ি হয়ে উঠেছে বিষ, তখন বৌদিদি এসেছেন কাছে, বলেছেন, ঠাকুরপো, কি চাই বলো ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েছি, কিছুই চাইনে বৌদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুধু হেসে বলেছেন, হুকুম নেই যাবার। যাও ত দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনিই গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্যেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে ঘটলো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হলো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সুবিধে কোথাও হলো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেখানেই মারা গেলেন। ব্যস্!

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হলো বলি, আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আর আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি দাদা?

বলিলেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা—দশেক পূর্ব পর্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেসা করলুম, সতী, মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্বাদ দিও। বলো সব রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘরে। ছবি তোলাতে তাঁর ভারী লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকনো তাঁর আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক তাঁর কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ, এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করিনি, ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো—আনা আনন্দই যদি ঘুচলো এক—আনার জন্যে আর টানাটানি করবো না। কিন্তু সে—ও আর হয় না,—বৌদিদির মৃত্যু এনে দিলে অলঙ্ঘ্য বাধা। বাধা কিসের? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হলো ভারী। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেছে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে বাসু উঠলো কেঁদে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়চেন। কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেছিস বল? তাঁর পানে চেয়ে যা

বলতে এসেছিলুম বলা হলো না। ভাবলুম ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেছে, তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্য কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাদ্ধের পরে আপনি কোথা থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে, যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবো না।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ সঙ্কল্প টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু অনুনয়-বিনয় কাঁদা-কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ? তারপর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়ল আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন, বন্ধুর যখন হবে সত্যিকার প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁছে দেবেন তাকে দোরগোড়ায়। বলেছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন সে আসবেই।

দ্বিজদাস

পড়া শেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া, বলিলেন, আজই যাও মা, আমি বাধা দেব না। দরোয়ান আর তোমার বুড়ো হিমুও সঙ্গে যাক।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, বলিল, যাবার উদ্যোগ করি গে বাবা, আমি উঠি।

ছাব্বিশ

ম্যানেজার বিরাজ দত্ত মোটর লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে সসম্মানে ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়িতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ি এসে পৌঁছন নি দত্তমশাই?

না দিদি।

মৈত্রেয়ী?

না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

বাসু ভাল আছে?

আছে।

মুখুয্যেমশাই? দ্বিজুবাবু?

বড়বাবু ভাল আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর-টর হয়নি ত?

দত্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম করেই ত বেড়াচ্চেন।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দত্তমশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ দুঃখের মধ্যে আর আসবেন না। কিন্তু দুঃখ যতই হোক, শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে হবে। কিছু হচ্চে কি?

হচ্চে বৈ কি দিদি। কর্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি ব্যবস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার মত বলচেন, মুখুয্যেমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মত? তেমনি বড় আয়োজন?

দত্ত বলিলেন, হাঁ, প্রায় তেমনিই। গেলেই দেখতে পাবেন। বড়বাবু ডেকে বললেন, দ্বিজু, পাগলামি করিস নে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু বললেন, মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রাবোধ ত সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের সকল মাত্রাই ডিঙিয়ে যাচ্ছিস দ্বিজু। ছোটবাবু বললেন, তাহলে আপনাদের কাছে মিনতি এই একটিবারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাত্রা লঙ্ঘন করতে পারবো, কিন্তু বৌদিদির মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।

এর পরে আর কেউ কথা কয়নি, এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ-পঁচিশ হাজারের কমে যাবে না।

খরচ কি সব ছোটবাবুর?

হাঁ, তাই ত।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশী মনে হয় দত্তমশাই?

বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশী না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেক দিদি। এখন সামলে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ?

আবার নতুন বিপদ কিসের?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেন নি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেধেছে? এ-সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল বলতে কেউ পারে না।

তবে নিষেধ করেন নি কেন?

নিষেধ? এ ত বড়বাবু নয় দিদি, যে নিষেধ মানবেন। এঁকে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। এই বলিয়া বিরাজ দত্ত নিশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল সুমুখের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে-সকল চালাঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষে সেদিন তৈরি হইয়াছিল, সেগুলা মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে, তথায় বহু লোক বহুবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যুক্তি করে নাই বন্দনা তাহা বুঝিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল দ্বিজদাসের ঘরে। একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়া ছিল, পর্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, বন্ধু আপনি এলো আমার ঘরের দোরগোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত। কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন?

দ্বিজদাস বলিল, চোখ বুজে তোমাকেই ধ্যান করছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম, বন্দনা, দুঃখের সীমা নেই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা, বোধ করি ঠেলতে আর পারব না, নৌকো মাঝখানেই ডুববে। ও-পারে পৌঁছনো আর ঘটবে না।

বন্দনা বলিল, ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকো বাইবার ভার নেবো আমি।

তাই নাও। রাগ করে আর চলে যেও না।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দুজনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুম না।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধ করি তার আসার পথটা এতকাল বন্ধ ছিল। প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে এ সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চলে গেলে। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, এতবড় আঘাত

যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবো না। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌদিদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে মা চলে গেলেন মেয়ের বাড়িতে, দাদা জানালেন সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্পে যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূলিসাৎ। এ-ও সয়েছিল, কিন্তু শুনলুম যখন বাড়ি ছেড়ে বাসু যাবে কোন্ একটা অজানা আশ্রমে, সে আর সইলো না। একবার ভাবলুম যা-কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর একদিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আসবে আমার দোরগোড়ায়। ভাবলুম, এই ত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর করে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বলি—আসবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হবে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদির শেষের আশীর্বাদ। যে বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে বোঝা বইবো আমি কোন্ জোরে! বলিতে বলিতে দু'ফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি বড় অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা কখনো শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়! কিন্তু কেন যে শুনিনি বৌদি বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, জবাব পেয়েছি তোমার, আর আমার শঙ্কা নেই। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কেবল তোমার চারপাশেই যে ভূমিকম্প হয়েছে তাই নয়, আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাৎ হবার তা ধূলোয় লুটিয়েছে, যা ভাঙবার নয়, টলবার নয়, সেই অটলকেই আজ ফিরে পেলুম। এবার যাই দাদার কাছে। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, বন্দনা, যে তোমার আপন,

আমার আশীর্বাদ যেন তাকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় জেনেছিলুম এ কথা তাঁর সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি, সে আশীর্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপনজনকে এনে দেবে। যাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি গে।

দ্বিজু, বন্দনা এসেচে না? এই বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এসেচি অনুদি, বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চাহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, তোমার ও-মূর্তি আমি ভাবতেও পারিনি অনুদি। তার পরেই হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেও না দিদি, দিন-কতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এমনিভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাসু কোথায় অনুদি?

চাকরেরা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

তাকে রেঁধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা ত শুধু বাসুর মরেনি, ওরও মরেছে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ির বৌ মরেছে, ছেলেমানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘটা কেন? ওরে সবাই করে মানা,— বাহুল্য দেখে তাদের গা যায় জ্বলে, ভাবে, এ যে বাড়াবাড়ি! জানে না ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্যাদায় ঘা লাগলে ও সইবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অনুদি, বন্দনা এসেছেন, এবার সমস্ত বোঝা ওঁর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পরের মেয়ে এত বোঝা বইবে কেন ভাই?

পরের মেয়েরাই ত বোঝা বয় অনুদি। ওঁকে ডেকে এনে বলেছি, এত দুঃখের ভার বইতে আমি পারবো না, এর ওপর বাসু যদি যায় ত, রইলো তোমাদের বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ি, রইলো তাদের সাতপুরুষের অভিমান, শশধরের ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। দাদাই শুধু পারে তাই নয়, দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝিনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত-দুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে? পারবে না বাসুকে বাড়িতে রাখতে?

পারবো অনুদি।

আর এই যে বাধলো সর্বনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে, পারবে না থামাতে?

হাঁ, এ-ও পারবো অনুদি। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না, এই শর্তেই এ বাড়ির ছোটবৌ হতে রাজী হয়েছি অনুদি।

কথাটা অন্নদা ভাল বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিল, যা গেছে সে ত গেছেই। এর উপর কি মাকেও হারাতে হবে? মকদ্দমা না থামালে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো আমি কি করে?

দ্বিজদাস বালিশের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবো না সেই শর্তই তোমার কাছে আজ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল।

এইবার অন্নদা ইহার তাৎপর্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া শুধু বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সম্বোধন বিপ্রদাসের কানে ঠেকিল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবার তার পাওয়া গিয়েছিল। পথে কষ্ট হয়নি ত?

না।

সঙ্গে কে এল?

আমাদের দরোয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

বাবা ভালো আছেন?

হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিজু কি পাগলামি করচে দেখলে?

বন্দনা কহিল, আপনি শ্রাদ্ধের কথা বলচেন ত? কিন্তু পাগলামি হবে কেন? আয়োজন এত বড়ই ত চাই। এ নইলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো যে!

কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা?

উনি না পারলেও আমি পারবো বড়দা।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, সে শক্তি তোমার আছে মানি, কিন্তু মেজাজ বিগড়োলেই মুশকিল। হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পরের মত, মাথায় কোন ভার ছিল না। কিন্তু আজ এসেছি এ বাড়ির ছোটবউ হয়ে। রাগিয়ে দিলে রাগ করতেও পারি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন করে? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে! এই বলিয়া সে

চাবির গোছা দেখাইয়া কহিল, এই দেখুন এ বাড়ির সব আলমারি-সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেচি।

আনন্দ ও বিস্ময়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা করে বলবার, গোপন করে বলবার কিছু নেই। ভগবানের কাছে যেমন মানুষের নেই লুকোবার ঠিক তেমনি। মনে পড়ে কি আপনার আশীর্বাদ? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথার্থ আপন তাকেই তুমি পাবে একদিন। সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শান্তমনে কেবল এই কথাই ভেবেচি, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি আজন্ম শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু, তাঁর আশীর্বাদে আর আমার ভয় নেই। যিনি আমার স্বামী তাঁকে আমি পাবোই। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, এবং আজ এই প্রথম দিন বন্দনা তাঁহার পায়ের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা পাতিয়া নমস্কার করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা, তার চেয়ে দুর্লভ ধন আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা কহিল, রাখবো বড়দা। একদিনও ভুলবো না।

একটু থামিয়া কহিল, একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলুম, আপনি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নিইনি,—মনে পড়ে সে কথা?

পড়ে।

আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলুম।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিলেন, নাও।

তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

তাই করো। ওর মা এবং বাপ দু'জনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুয্যেবাড়ির বৃহৎ মর্যাদাকে তোমার হাতে।

বন্দনা ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া এই ভার যেন নীরবে গ্রহণ করিল, তারপরে কহিল, আর একটি প্রার্থনা। নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙ্গেচে, আজ তার মার্জনা চাই।

মার্জনা অনেকদিন করেছি বন্দনা। আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্তমনে চেয়েছে একদিন তাকে তুমি চিনবেই। তাই, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আরও একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না আর? অভিমানে, সঙ্কোচে কোনদিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু সে বাধা ত ঘুচলো; আর ত আমার লজ্জা নেই—কিছুদিন থাকুন না আমার কাছে? দু'দিন পূজো করি। এই বলিয়া সে সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল,—তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, ওই হাসিমুখের মৌনতাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি বড়দা। কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। দেবেন না উত্তর?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি নির্মল। তাঁহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রথম দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শান্ত হবে বন্দনা, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি। কিন্তু তার আগে নয়।

কিন্তু এ বুঝবো আমি কেমন করে?

শুধু আমাকে বিশ্বাস করে। জানো ত দিদি, আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা, সত্যি কথাই বলে গেছেন, সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি। যেখানে আছে মানুষের চরম শ্রেয়ঃ, সেই তীর্থেই তিনি যাত্রা করেছেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, হাঁ। তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে, তাই হবে। এ জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই, তবু বলবো তিনি ভ্রান্ত নন, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি, একটা জরুরী কথা আছে,—একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজবাবু। বড়দা, আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতীসাধ্বীর জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখুয্যেবাড়ির কাজ এমনি করেই হয়, এর ছোটবড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল—তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানে না। মায়ের মূর্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বসিয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে—দুঃখশোকের এমন ব্যথার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সেদিনের সেই ঐশ্বর্যবতী সর্বময়-কর্ত্রী

বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধূলায়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন, আমার আসায় খবর কিসের জন্যে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চল না মায়ে-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ের যাত্রার বিঘ্ন ঘটবে না,—কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসছেন কাল, তোমার ছোটবৌয়ের হাতে সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন করে?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক বিপিন। সহ্য হবে না আমার, এমন মিথ্যে আর মুখে আনবো না। কিন্তু ক'টা দিন আর বাকী?

কেবল সাতটা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।

বন্দনা কহিল, মা, বাড়ির ভেতর আপনার ঘরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবো না মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাকবো, আবার যাবার দিন এলে এই বাইরের ঘর থেকেই দু'জনে বার হয়ে যাবো। ভেতরে যা-কিছু রইলো সে-সব তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া রে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাজিল না, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁক বাজিল চাপা সুরে,—বাসরগৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি ভাবচো বলতো?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা, ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

কেন?

নইলে পারতে না। সর্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না?

না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম। পেলুম বাসুকে, মাকে, বড়দাকে। আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগ্যের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।

হবে না, তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল, আজ তুমি ক্লান্ত, একটু ঘুমোও, তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট-দুই পরে বলিল, আমার মেজদির কথা মনে পড়ে। সেদিন বড়দার সঙ্গে তখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বললুম, তুমি ত ঝগড়া করোনি মেজদি,

তুমি কেন যাবে? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না, সেখানে স্ত্রীরও না। একটা দিনের জন্যেও না। তোর স্বামী থাকলে এ কথা বুঝতিস। সেদিন হয়ত ঠিক এ কথা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝচি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে পারিনে।

একটু থামিয়া বলিল, এই ত মাত্র ঘণ্টা-কয়েক আগে, পুরুতের সঙ্গে গোটা-কয়েক শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার দেহের প্রতি রক্তকণাটি পর্যন্ত বদলে গেছে।

দ্বিজদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিল না।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ। তীর্থভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে, সেদিন সংসারের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাঁহাকে টানিয়া আনিবে; কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না আর বিপ্রদাসের, আর ফিরাইয়া আনিবে না তাঁহাকে এ গৃহে। এ কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে, দূরে বাটীর সকলেই উপস্থিত। মেয়েরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজুকে দেখচি নে কেন?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ি নেই, কি-একটা কাজে বাইরে গেছেন। শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েছে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভীতুর অগ্রগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি আবার কবে আসবে বাবা? একটু শিগগির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

বন্দনা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট-বৌমা। আর রইলেন মন্দিরে তোমার শ্বশুরকুলের রাধাগোবিন্দজী। ফিরে কখনো এলে তোমার কাছ থেকে এঁদের নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তার পরে কাছে আসিয়া সজলচক্ষে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতায় পূজোর ঘরে যে-মূর্তি একদিন আপনার লুকিয়ে দেখেছিলুম, আজ আবার সেই মূর্তিই আমার চোখে পড়লো, বড়দা। আর আমার শোক নেই, ঠিকানা আপনার নাই বা পেলুম, জানি, মনের মধ্যে যেদিন ডাক দেবো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ কথা কোনমতেই মিথ্যে হবে না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন তেমনি করিয়া বন্দনারও।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বিরাজবৌ

এক

হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল। কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে খর্বকায় এবং কৃশ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেই তাহার সন্ধ্যার পর গা ছম্‌ছম্‌ করিত। দাদার মত অমন মূর্খও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলির আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিয়া সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা স্বহস্তে বন্ধ করিত এবং স্ত্রীকে দিয়া পুন:পুন: পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত।

আজ সকালে নীলাম্বর চন্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি নি:শব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া আন্দাজ করিয়া এক হাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, সস্নেহে কহিল, সকালবেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বৌদি গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং ‘কানী’ বলিয়া গাল দিয়াছে।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তোমাকে ‘কানী’ বলে? অমন দুটি চোক থাকতে যে কানী বলে, সে-ই কানী। কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিছিমিছি।

মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি, বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, বিরাজবৌ?

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সকলে বিরাজবৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ-কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সে গৃহিণী। বিরাজ আসামান্যা সুন্দরী। চার-পাঁচ বছর পূর্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, পোড়ামুখী আবার নালিশ করতে গিয়েছিলি?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাবে না? তুমি 'কানী' বলেচ, সেটা তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?

বিরাজ কহিল, অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।

নীলাম্বর বলিল, না। ঝিকে গয়লা-বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনে করেচি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।

আর কোন দিন মনে ক'রো! বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে, খাঁচার পাখি উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পড়ে; কিন্তু ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল না দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি, আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি।

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারাণ ঠাকুরদা বসে আছেন।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে বসে আছেন?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, যেতে বলে দে খুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকালবেলাতেই যদি ও-সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি-সব হচ্ছে আজকাল!

নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশেপাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশে বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে একখণ্ড কালো পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীরগাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এ বাড়ির বধূরা প্রতিসন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড়, দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, বট নদীর উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখি নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড় করিয়াছে, কত

ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া ভাইবোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টমঠাকুর বলে ডাকে?

নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম বলেই ডাকে।

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে! আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই বলেই করে।

হরিমতি মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হলে কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাম্বর বলিল, তোর দাদাই কি তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে।

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাঃ—

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মাবাপ-মরা এই ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়বৌব্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করে। সেইদিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত

গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্তন গাহিয়াছে। গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমনি করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বৌমা ডাকচেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি বলে দাও না, এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে, সে-ই বুঝবে না!

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্‌বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন আমি বসে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, ও খাবে না, সে খাবে না—শেষকালে কিনা মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত, এত তরকারি হয়েচে!

এত কত! ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাঁড়া-বড়ি-থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে পারে? এ শহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে; পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কিনা তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি,

কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবে না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে। দিন দিন তোমার খাওয়া কমে আসছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বেরোবার জো হচ্ছে, সেদিকে চেয়ে দেখ।

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধরে দিতে পারি, তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে শুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধম্মকম্ম করবার ঢের সময় আছে। আজ ও-বাড়ির পিসীমা এসেছিলেন, শুনে বললেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের জোর কমে যায়—না না, সে হবে না—শেষকালে কি হতে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হয়ে তুই বেশী করে খাস্, তা হলেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওরার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বলিল, মনে থাকে না রে। ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কান মলে দিয়েচি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই! ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েচ! কত শয়তান লোক তুমি!

নীলাম্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আজও সেই সব মনে আছে? কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, চুপ কর, পুঁটি আসচে।

হরিমতি দুধের বাটি পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেলগে যা।

পুঁটি চলিয়া গেলে বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, সত্যি বলচি—অত ছোটবেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন নয়? আমি ত বলি, মেয়েদের খুব ছোটবেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কথা আলাদা, কেননা, আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুষ্টু বজ্জাত জা-ননদ ছিল না—আমি দশ বছর বয়স থেকেই গিন্নী। কিন্তু, আর পাঁচজনের ঘরেও দেখচি ত, ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকাঝকা, মারধর শুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হয়েও সে দোষ ঘোচে না—বকাঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করিনে—নইলে, পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ি থেকে ঘটকী এসেছিল; সর্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না, আরও দু-বছর থাক।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচবি নাকি রে?

বিরাজ বলিল, কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাকলে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিন শ টাকা দিয়ে কিনে আননি? ঠাকুরপোর বিয়েতে পাঁচ শ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও-সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।

নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।

বিরাজ স্বামীর মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই ক'র—এখন খাও—ছুতো করে যেন উঠে যেও না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি বুঝি ছুতো করে উঠে যাই?

বিরাজ কহিল, না—একদিনও না। ও দোষটি তোমার শত্তুরেও দিতে পারবে না। এজন্য কতদিন যে আমাকে উপোস করে কাটাতে হয়েচে, সে ছোটবৌ জানে। ও কি! খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শিগগির যা—ছোটবোয়ের কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখ্খন পেট ভরেনি—মাইরি বলচি, আমি তা হলে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলো সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?

বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।

তবু খেতে হবে?

বিরাজ কহিল, হাঁ। হয়, মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয় এ-জিনিসটা একটু বেশী করে খেতেই হবে।

নীলাম্বর রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল, তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে বনে গিয়ে বসে থাকি।

পুঁটি বলিয়া উঠিল, আমাকেও দাদা—

বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল, চুপ কর পোড়ামুখী, খাবিনে ত বাঁচবি কি করে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

দুই

মাস দেড়েক পরে, পাঁচ দিন জ্বরভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাম্বরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসী কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া, মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাম্বর জানালার বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই স্নান করিয়া বিরাজ সিক্ত চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি?

বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পূজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, না জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কান্ড যে শুরু হয়েছে—আজ সকালে শুনলাম, আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্বাঙ্গে মার অনুগ্রহ হয়েচে—দেহে তিল রাখবার স্থান নেই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতির কোন্ ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েচে?

বড়ছেলের। মা শীতলা, গাঁ ঠান্ডা কর মা! আহা ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারের শেষ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্চে। ভয়ে বুকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলুম, তার পরে মানস করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই তো তোমার পূজো দিয়ে আবার খাব-দাব, না হলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল পড়িল।

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি উপোস করে আছ নাকি?

হরিমতি কহিল, হাঁ দাদা, কিছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যেবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারও কথা শোনে না।

নীলাম্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এইগুলো তোমার পাগলামি নয়?

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, পাগলামি নয়? আসল পাগলামি! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে, স্বামী কি বস্তু!—তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হলে, বুকের ভিতরে কি করতে থাকে! বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, পুঁটি, ঝি পূজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস ত যা, শিগগির করে নি গে।

পুঁটি আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যাব বৌদি!

তবে দেরি করিস নে, যা। ঠাকুরের কাছে তোর দাদার জন্যে বেশ করে বর চেয়ে নিস।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে ও পারবে। বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে।

বিরাজ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তা মনে ক'রো না। ভাই বল আর বাপ-মাই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্বস্ব যায়! এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা, দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে উপোস করে আছি কিন্তু কৈ, ডাক ত তোমার কোন বোনকে দেখি কেমন—

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আবার!

বিরাজ ববিল, তবে বল কেন? পাগলামি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি ত তাহলে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁথির এ সিঁদুর তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে চেঁচে ফেলতুম।

শুভযাত্রা করে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্মে লোক ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু-হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষমানুষে তখন মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতো, এখন বোঝে না।

নীলাম্বর কহিল, না, তুই বুঝিয়ে দি গে।

বিরাজ বলিল, তা পারি। আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে-কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক, কি সব বকে যাচ্ছি, বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, গায়ে কোথাও ব্যথা নেই ত?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

বিরাজ বলিল, তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই এইবার দুটো রাঁধবার যোগাড় করি গে—সত্যি বলচি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তাহলেও বোধ করি রাগ হয় না।

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, মা, কবিরাজমশাইকে এখন ডেকে আনতে হবে কি?

নীলাম্বর কহিল, না না, আর আবশ্যক নেই।

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, না? যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল করে দেখে যান।

দিন-তিনেক পরে আরোগ্যলাভ করিয়া নীলাম্বর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল, মতি মোড়ল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধূলো দাও দেব্‌তা, তাহলে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে— ।আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, গায়ে কি খুব বেশী বেরিয়েচে মতি?

মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুই ত জানি নে কি করতে হয়—একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল, কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাব।

তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ, সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাস-বাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাম্বর এ কথা নিজেও জানিত। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল তাহার পায়ের ধূলা, তাহার হাতের জলপড়াকে যে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুঝিত বলিয়াই কাহাকেও কোনদিন ফিরাইয়া দিতে পারিত না। মতি চাঁড়াল আর একবার কাঁদিয়া, আর একবার পায়ের ধূলার দাবী জানাইয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নীলাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্বল ছিল বটে কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল, বাড়ির বাহির হইবে কি করিয়া। সে বিরাজকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহার কাছে এ কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া?

ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল, দাদা, —বৌদি ঘরে এসে শুতে বলচে।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

মিনিট-খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, শুনতে পাওনি দাদা?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিমতি কহিল, সেই চারটি খেয়ে বসে আছ,—বৌদি বলচে, আর বসে থাকতে হবে না, একটু শোও গে।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি করচে রে পুঁটি?

হরিমতি কহিল, এইবার ভাত খেতে বসেচে।

নীলাম্বর আদর করিয়া বলিল, লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি?

পুঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, করব।

নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি!

চাদর আর ছাতি?

নীলাম্বর কহিল, হুঁ।

হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ করে খেতে বসেচে যে!

নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, পারবি নে আনতে?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই-তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদা, দেখে ফেলবে; তুমি শোবে চল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে শুধু-মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোটবোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণা উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল মসৃণ সিমেণ্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও

মামীকে চারপাতা-জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়িতে শুদ্ধমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে এ যাত্রা সিঁথার সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, একটি কথা রাখবে বিরাজ?

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি কথা?

যদি রাখ ত বলি।

বিরাজ কহিল, রাখবার মত হলেই রাখবো—কি কথা?

নীলাম্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, বলে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখতে পারবে না।

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না—ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বল, আমি কথা রাখব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে বলিল, দুপুরবেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের বিশ্বাস, আমার পায়ের ধূলো না পড়লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না—আমাকে একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে?

কি করব বিরাজ, কথা দিয়েচি—আমাকে একবার যেতেই হবে।

কথা দিলে কেন?

নীলাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, তুমি কি মনে কর, তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার?

নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ঠিক ত! তার কান্না দেখলে— কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি? বলিয়া চারপাতা-জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, উঃ! পুরুষমানুষেরা কি! চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চলল! ঘরে ঘরে জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রোগী ঘাঁটতে চলল—আচ্ছা যাও; আমার ভগবান আছেন। বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল, সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ যে, কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস!

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্বরে বলিল, না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরিনে, মড়া পোড়াই নে, তাই আমাদের নয়,—একলা তোমাদের।

নীলাম্বর তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভরসা করে থাকতে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়েমানুষের দেহে থাকে না— তাতে তোর দোষ কি?

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, না, দোষ কেন, ওটা মেয়েমানুষের গুণ। কিন্তু, গায়ের জোরেই যদি এত দরকার ত বাঘ-ভালুকের গায়েও ত আরও জোর

আছে। আর জোর থাক্ ভাল, না থাক্ ভাল, এই রোগী দেহ নিয়ে তোমাকে আমি আর বার হতে দেব না—তা তুমি যত তর্কই কর না কেন।

নীলাম্বর আর কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, বেলা গেল—যাই বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘন্টা-খানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল, স্বামী শয্যায় নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, পুঁটি, তোর দাদা কৈ রে? যা, বাইরে দেখে আয় ত!

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট-পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। তার পরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তিন

বছর-তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস-দুই পূর্বে হরিমতি শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে; ছোটোভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরের চন্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বিরাজ নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হঠাৎ বাইরে যে?

বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কি?

বিরাজ বলিল, কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, হয় বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্চ।

শুকিয়ে যাচ্ছি কে বললে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিল, তারপরে বলিল, হাঁ গা, কেউ বলে দেবে তবে আমি জানব, এ কি সত্যিই তোমার মনের কথা?

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না রে, তা নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয়—তাই জিজ্ঞেস কচ্চি; এ কি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস?

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, কত বললুম তোমাকে পুঁটির আমার অমন জায়গায় বিয়ে দিও না—কিছুতেই কথা

শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুন ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রি করলে, তার উপর এই দু সন অজন্মা। বল আমাকে, কি করে তুমি জামাইয়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোঁটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুনতে পারবে না—শেষে কি হতে কি হবে ভগবান জানেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে যে শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু-পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি করে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় করে গলায় কাপড় দিয়ে জামাইয়ের বাপকে বল গে, এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না। এতে ভালমন্দ পুঁটির অদৃষ্টে যা হয় তা হোক।

তথাপি নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পারবে না বলতে?

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রি বরে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি

বিরাজ বলিল, হবে আবার কি! বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভালো। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে তার জন্যে ভাবনা—আমরা দুটো প্রাণী—যেমন করে হোক চলে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টমঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দু'জনে বৃন্দাবন করে বেড়াব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুই কি করবি, মন্দিরা বাজাবি?

হুঁ বাজাব। নেহাত না পারি, তোমার ঝুলি বয়ে বেড়াতে পারব ত! তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে পশু-পক্ষী স্থির হয়ে দাড়াঁবে, আমাদের দুটো প্রাণীর খাওয়া চলবে না? চল, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে।

ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, না সাহস হয় না, এমন বোষ্টমটিকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না—তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না, বোষ্টমও থাকে।

বিরাজ বলিল, তা থাক। একজন দুজন কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ থাক,—বলিয়া প্রদীপটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা, শুনি সংসারে সতী অসতী দুই-ই আছে—অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখতে সাধ হয়, তারা কি রকম! ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম! তারা কি করে, কি ভাবে, কি খায়, কেমন করে শুয়ে ঘুমায়—এ-সব আমার দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তুমি দেখেচ?

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি।

দেখেচ? আচ্ছা, এই আমি যেমন করে বসে কথা কইচি তারা কি এমনি করে বসে যার-তার সঙ্গে কথা কয়?

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তা বলতে পারিনে—আমি ততটা দেখিনি।

বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া তাহার সর্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, ও কি রে?

বিরাজ বলিল, উঃ, কি—তারা! দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে করলে না?

নীলাম্বর বলিল, এই উঠি।

হাঁ যাও, হাত-পা ধুয়ে এস, আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই করে দিচ্চি।

দিন পাঁচ-ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া গুড়্গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া শুইবার পূর্বে মেঝেয় বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ বলিল, না, মিথ্যে বলচি নে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাম্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আমি পন্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, এ কি সত্যি হতে পারে?

নীলাম্বর বলিল, কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।

তা হলে আমিও ত পারি?

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা।

বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, হলেনই বা দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে-জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন আর যেই হ'ন।

নীলাম্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপর সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি এক রকমের আশ্চর্য দ্যুতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, তা হলে তুমিও পারবে বোধ হয়।

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এই আশীর্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি—তার পরে, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন এই সিঁদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হয়েচে রে বিরাজ, আজ?

বিরাজের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, তৎসত্ত্বেও তাহার ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু অতি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুই পায়ের ধূলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি।

সে আর বলিতে পারিল না। এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নীলাম্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কি হয়েচে রে আজ? কেউ কিছু বলেচে কি?

বিরাজ স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশদে কাঁদিতে লাগিল; জবাব দিল না।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, কোনদিন ত তুই এমন করিস নি বিরাজ—কি হয়েচে, বল্!

বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো।

নীলাম্বর আর পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্যুপরি দুই সন অজন্মা; গোলায় ধান নাই, পুকুরে জল নাই, মাছ নাই—কলাবাগান শুকাইয়া উঠিতেছে, লেবুবাগানের কাঁচা লেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উত্তমর্ণেরা আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছিল এবং পুঁটির শ্বশুরও ছেলের পড়ানোর খরচের জন্য মিঠেকড়া চিঠি পাঠাইতেছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অপ্রীতিকর সংবাদই নীলাম্বর প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে।

সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল; কহিল, একটি কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে?

নীলাম্বর মনে মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল, কি কথা?

বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্যের বড় সৌন্দর্য ছিল তার মুখের হাসি। সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কালো-কুচ্ছিত নই ত?

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

যদি কালো-কুচ্ছিত হতুম, তাহলে আমাকে কি ক'রে এত ভালবাসতে?

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তাহার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুশী হইয়া বলিল, ছেলেবেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি—কি করে বলব এখন, সে কালো-কুচ্ছিত হলে কি করতুম?

বিরাজ দুই বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, আমি বলব? তা হলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে।

তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তুমি ভাবচ, কি করে জানলুম?—না?

এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, ঠিক তাই ভাবচি—কি করে জানলে।

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না। তাই জানি, আমাকে তুমি এমনই ভালই বাসতে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখন করতে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কানা-খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদরই পেতুম।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া চোখের কোণে আঙুল দিয়া বলিল, জল কেন?

নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, জানলে কি করে?

বিরাজ বলিল, ভুলে যাও কেন যে, আমার ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। ভুলে যাও কেন যে তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েচি। নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?

নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, ভেব না, মা মরণকালে তোমার আমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পুঁটির ভাল হবে বলে যা ভাল বুঝেচ তাই করেচ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্বস্ব যায় তাও যাক।

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, তুই জানিস নে বিরাজ, আমি কি করেচি—আমি তোর—

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হতে দিতে যে পারব না সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার ওপর ভগবান আছেন, পায়ের নীচে আমি আছি।

নীলাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চার

আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। হরিমতির বিবাহের পূর্বেই ছোটভাই বিষয়সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল, নীলাম্বরের নিজের ভাগে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, পীতাম্বর এক কপর্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমিজমা যাহা ছিল তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাম্বর বিবাহের শর্ত পালন করিয়া ভগিনীপতির পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে সে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতাবশে কোনমতেই পৈতৃক সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকী সুদের জন্য কয়েকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাম্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্নাঘর হইতে নি:শব্দে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই নীলাম্বর মনে মনে প্রমাদ গণিল। ক্ষোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে ভাব সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, ঐখানে ব’স।

নীলাম্বর শয্যার উপর বসিতেই সে নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয়, আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করব।

নীলাম্বর বুঝিল, সে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, ছি বিরাজ, সামান্যতেই আত্মহারা হ’সনে।

বিরাজ মুখের উপর হইতে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, এতেও মানুষ আত্মহারা না হয়, কিসে হয় বল শুনি।

নীলাম্বর কি জবাব দিবে হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

নীলাম্বর মৃদুকণ্ঠে বলিল, জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুতে হবে না। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান করে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য করে থাকব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, একদিনেই কি উপায় করব বিরাজ?

বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, একটা অসম্ভব আশা করে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্বনাশ ক'রো না! যত দিন যাবে ততই বেশী জড়িয়ে পড়বে, দোহাই তোমার, আমি ভিক্ষে চাইচি—তোমার দুটি পায়ে ধরছি, এই বেলা যা হয় একটা পথ কর।—বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, অধীর হলে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব। কিন্তু বিক্রি করে ফেললে আর ত হবে না সেটা ভেবে দেখ!

বিরাজ আর্দ্রস্বরে বলিল, দেখচি; আসচে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব দুঃখ সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারিনে।

নীলাম্বর নিজে তাহা বেশ জানিত, তাই কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ পুনরায় কহিল, শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ? দিবারাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের সামনে শুকিয়ে উঠচ, এমন সোনার মূর্তি কালি হয়ে যাচ্চে। আচ্ছা, আমার গাঁ ছুয়ে তুমিই বল, এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?

আরও একটা বছর। তা হলেই সে ডাক্তার হতে পারবে।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, পুঁটিকে মানুষ করেচি—সে আমার রাজরাণী হ'ক, কিন্তু সে হতে আমার এত দুঃখ ঘটবে জানলে, ছোটবেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম। এমন করে নিজের মাথায় বাজ হানতুম না। হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার রক্ত শুষে নিতে তাদের এতটুকুও দয়া-মায়া হচ্চে না! —বলিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব-দুঃখীরা ত এরই মধ্যে কেউ উপোস, কেউ একবেলা খেতে শুরু করেচে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করব কেন? পুঁটির শ্বশুরের অভাব নেই, সে বড়লোক; সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে, আমরা পড়াব কেন? যা হয়েচে তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পাবে না।

নীলাম্বর অতিকষ্টে শুষ্কহাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে! তার কি হবে?

বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কিচ্ছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমারই অর্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাকব; তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি আর ঋণ ক'রো না।

নীলাম্বর কাতরদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিরুপায়ের মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ধর্মপ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিদারুণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থই স্বামী তাহার সর্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহর্নিশি চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক অবসন্ন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোনমতে সে কান্না চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের অসহ তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিলে সে তেমনই মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছেলেবেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে, কোনদিন তোমার মুখ শুক্‌নো দেখিনি, কোন দিন তোমার মুখ ভার করতে দেখিনি; এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে—তুমি নিজের পানে না চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ! সত্যই কি শেষকালে আমাকে পথের ভিখারিণী করবে? সে কি তুমিই সইতে পারবে?

নীলাম্বর তথাপি উত্তর দিতে পারিল না, অন্যমনস্কের মত তাহার চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে পুরানো ঝি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, বৌমা, উনুন জ্বেলে দেব কি?

বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী পুনরায় কহিল, উনুন জ্বেলে দেব?

বিরাজ অস্পষ্টস্বরে বলিল, দে, তোদের জন্যে রাঁধতে হবে, আমি আর কিছু খাব না।

ঝি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, তুমি কি মা, তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে? না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে!

বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উনুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ বলিল, সত্যি কথা মা, তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখন দেখিনি—এত রূপ রাজা-রাজড়ার ঘরেও নেই।

বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, তুই রাজারাজড়ার ঘরের খবর রাখিস?

সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময় খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

সে বলিত, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু সধবার সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, রাজারাজড়ার ঘরের খবর রাখি বৈ কি মা! না হলে সেদিন তাকে ঝাঁটাপেটা কত্তুম।

এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল, বলিল, তুই যখন তখন ঐ কথাই বলিস কেন সুন্দরী? তাদের যা খুশি বলেচে, তাতে তুই বা ঝাঁটাপেটা করবি কেন? আর আমাকেই বা নাহ'ক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, শুনলে কি বলবেন বল ত?

সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বাবু শুনবেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা!

কথার মত কথা নয়, সে কথা কি তুই আমাকে বুঝিয়ে বলবি? তা ছাড়া যা হয়ে বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কি?

সুন্দরী খপ করিয়া বলিল, কোথায় চুকেবুকে শেষ হয়েচে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—

বিরাজ রাগিয়া উঠিল। বলিল, তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করবি, আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না বললি সেদিন তাঁরা সব কলকাতায় চলে গেছেন?

সুন্দরী বলিল, সত্যি কথাই বলেছিলুম মা। মাস-দুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার দেখচি সব এসেচেন। আর যাবার কথা যদি বললে মা, পিয়াদা ডাকতে এলে, না বলি কি করে? তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার, আমরা দুঃখী প্রজা—হুকুম অমান্যি করি কি ভরসায়?

বিরাজ ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, হাঁ মা, এ মহালটা তাঁরাই কিনেচেন—বাবু তাঁবু খাটিয়ে আছেন—তা সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কিবা মুখ চোখের—

বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, থাম্ থাম্, চুপ কর্। ও-সব কথা তোকে জিজ্ঞেস করিনি—কি তোকে বললে, তাই বল।

সুন্দরী এবার মনে মনে বিরক্ত হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।

বিরাজ 'হেঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর-দুই পুর্বে এই মহালটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়; তাঁহার ছোটছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজকর্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে।

রীতিমত কাছারি-বাটী না থাকায়, সে সপ্তগ্রামের পরপারে গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি

একটি দিনের জন্যও সে কাজকর্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে না। পাখি শিকার করিতে ভালবাসিত, হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার-পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখি মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস-ছয়েক পূর্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্নাভামণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকের বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক হইতে দেখা যাইত না। বিরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ-কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখির সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরস্থিত সমাধিস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু, আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলকদৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্রবসনে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইলে। এই অরণ্যপরিবৃত, ভদ্রসমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল! এই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পরে আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়িতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, যা' ত সুন্দরী, ঘাটের ধারে কে একটা লোক পীরস্থানের ওপর দাঁড়িয়া আছে, মানা করে দি গে, যেন আর কোনদিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, বাবু আপনি!

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

সুন্দরী বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?

আমি কোথায় থাকি, জান?

সুন্দরী কহিল, জানি।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ একবার ওখানে আসতে পার?

সুন্দরী সলজ্জহাস্যে মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবু?

দরকার আছে, একবার যেও, বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর অনেকবার সুন্দরী গোপনে ও নিভৃতে ওপারের জমিদারী কাছারিতে গিয়াছে, অনেক কথা বিরাজের সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্বোধ ছিল না; সে বিরাজবৌকে চিনিত। বাহিরে হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক না কেন, ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের দেহে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস। তা সে মানুষ বলেই হোক, আর সাপখোপ, ভূতপ্রেতই হোক—ভয় কাহাকে বলে ইহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাষ্ঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আচ্ছা সুন্দরী, তুই ত অনেকবার সেখানে গিয়েছিস এসেছিস, অনেক কথাও কয়েচিস, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস নি?

সুন্দরী প্রথমটা কিছু হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, কে তোমাকে বললে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেচি?

বিরাজ বলিল, কেউ বলেনি, আমি নিজেই জানি। আমার কপালের পেছনে আরও দুটো চোখ-কান আছে। বলি, কাল ক’টাকা বকশিশ নিয়ে এলি? দশ টাকা?

সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না তাহাও বুঝিল।

ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সুন্দরী, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুলবি; কিন্তু, কেন মিছে আনাগোনা করে, টাকা খেয়ে শেষে বড়লোকের কোপে পড়বি? কাল থেকে এ বাড়িতে আর ঢুকিস নে। তোর হাতের জল পায়ে ঢালতেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুদিন আগে তাও শুনেচি। কিন্তু যা, আঁচলে যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দি গে, দিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখ-ধান্দা করে খে গে। নিজে বয়সকালে যা করেচিস, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্বনাশ করতে যাসনে।

সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

বিরাজ তাহাও দেখিল। দেখিয়া বলিল, মিথ্যে কথা বলে আর কি হবে? এ-সব কথা আমি কাউকে বলব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সে কথা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু, এখন সব বুঝতে পাচ্ছি। যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ি ঢুকিস নে।

এ কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতেও পারিল না। সে যে অনেক দিনের দাসী! সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সেও যে এ বাটীর একজন। আজ তাহাকেই বিরাজবৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ

করিল! ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—একমুহূর্তে বড় রকমের জবাবদিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্রে পর্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিত্তলের কলসীতে জল ছিল, ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া একমুহূর্ত স্থির হইয়া থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া দিয়া বলিল, না, তোর হাতের জল ছুঁলে ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ঐ হাত দিয়ে টাকা নিয়েচিস।

সুন্দরী এ তিরস্কারেও উত্তর দিতে পারিল না।

বিরাজ আর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া এই রাত্রে সূচীভেদ্য অন্ধকার আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল।

বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মন হইল সেও পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বনপথ, চারিদিকের প্রাচীর, সপ্তগ্রামের জানা-অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে ‘মা গো’ বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচ

দিন-দুই পরে নীলাম্বর বলিল, সুন্দরীকে দেখচি নে কেন বিরাজ?

বিরাজ বলিল, আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, বেশ করেচ। বল না কি হয়েচে তার?

বিরাজ বলিল, কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরনো লোক তা জান? কি করেছিল সে?

বিরাজ বলিল, ভাল বুঝেচি, তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর বিরক্ত হইল, বলিল, কিসে ভাল বুঝলে তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ভাল বুঝ, ফিরিয়ে আন গে। —বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বুঝিল বিরাজ রাগিয়াছে, আর কোন কথা কহিল না। সে ঘন্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে, কাজ করবে কে?

এবার বিরাজ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পরে বলিল, তুমি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তবে দাও এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।

বিরাজ হাতের খুন্তিটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, যাও তুমি এখান থেকে। একটা তামাশা করবার জো নেই—তা হলেই এমন কথা বলে বসবে যে, কানে শুনলে পাপ হয়।

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এও কানে শুনলে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝিনে বিরাজ?

বিরাজ বলিল, তুমি সব বোঝ। না বুঝলে এত কাজ থাকতে এঁটো বাসনের কথা তুলতে না—যাও, আর বেলা ক'রো না, স্নান করে এসো—আমার রান্না হয়ে গেছে।

নীলাম্বর চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, সত্যি কথা বিরাজ, সংসারের কাজকর্ম করবে কে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা নেই, আমিই ত কাজের অভাবে সারাদিন বসে কাটাই। বেশ ত, কাজ যখন আটকাবে তখন তোমাকে জানাব।

নীলাম্বর বলিল, না বিরাজ, সে হবে না, দাসী-চাকরের কাজ আমি তোমায় করতে দিতে পারব না। সুন্দরী কোন দোষ করেনি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্য তুমি তারে সরিয়েচ, বল সত্যি কিনা?

বিরাজ বলিল, না সত্যি নয়! সে যথার্থই দোষ করেচে।

কি দোষ?

তা আমি বলব না। যাও, আর বসে থেক না, স্নান করে এসো।—বলিয়া বিরাজও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কৈ গেলে না? এখনও বসে আছ যে?

নীলাম্বর মৃদুস্বরে বলিল, যাই—কিন্তু, বিরাজ, এ ত আমি সইতে পারব না, তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেব কি করে?

কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুশি হইল না। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি করবে শুনি?

সুন্দরীকে না চাও আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাকবে কি করে?

যেমন করেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাইনে।

নীলাম্বর বলিল, না, সে হবে না। যতক্ষণ সংসারে আছি ততদিন মান-অপমানও আছে; পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে?

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি করে থাকব, আমার দুঃখ-কষ্ট হবে, এ কেবল তোমার একটা ছল।

নীলাম্বর ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, ছল?

বিরাজ বলিল, হাঁ, ছল। আজকাল আমি সব দেখেচি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দু:খ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনতে, তা হলে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।

নীলাম্বর বলিল, তোমার একটা কথাও শুনিনি!

বিরাজ জোর দিয়া বলিল, না একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই কোন না কোন ছল করে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি, আমার কি হবে?

নীলাম্বর বলিল, আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না?

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, দেখ ও-সব ছেলেভুলানো কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাব না। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার করতে হ'ল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি করে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখতেও

হবে না, কানে শুনতেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জা ত হবে না, ভাবনা-চিন্তা করবারও দরকার নেই—এই না?

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ কক্ষণ তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট হয়েচে বলেই রাগ করে বলচ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ বলিল, তাই আগে জানতুম বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়া-দয়াও তেমনই, সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু, তোমার সঙ্গে এই দুপুরবেলায় আমি রাগারাগি করতে চাইনে—যা বলচি তাই কর, যাও নেয়ে এসো।

নীলাম্বর 'যাচ্চি' বলিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, আজ দু বছর হতে চলল; পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে। তার আগে থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা সেদিন আমি মনে মনে ভেবে দেখছিলুম—আমার একটি কথাও তুমি শোননি। যখন যা কিছু বলেচি, সমস্তই একটা একটা করে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে গেছ। লোকে বাড়ির দাসী-চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখনি।

নীলাম্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কত বড় ঘেন্নায় যে আমি ইষ্টিদেবতার নাম করে দিব্যি করেচি, তোমাকে আর একটি কথাও বলতে যাব না, সে কথা তুমিও শুনতে পেতে না, আজ যদি না কথায় কথা উঠে পড়ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়বে না, কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি; তোমাকে দোর খুলে দিতে দেরি হয়েছিল বলে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করনি। সেইদিন থেকে দিব্যি করেছিলুম, অসুখের কথা আর জানাব না—আজ পর্যন্ত সে দিব্যি ভাঙ্গিনি।

নীলাম্বর মুখ তুলিতেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে সহসা উঠিয়া আসিয়া বিরাজের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিল, সে হবে না বিরাজ, কক্ষণ তোমার দেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েচে বল—বলতেই হবে।

বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়্—লাগচে।

লাগুক—বল কি হয়েচে?

বিরাজ শুষ্কভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কৈ, কিছুই ত হয়নি, বেশ আছি।

নীলাম্বর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, না, কিছুতেই তুমি বেশ নেই। না হলে, কখন তুমি সেই কত বৎসরের পুরনো কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্যে কতদিন, কত মাপ চেয়েচি।

আচ্ছা, আর কোন দিন বলব না,—বলিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল।

নীলাম্বর তাহার কথার অর্থ বুঝিল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। তার পর মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতেছিল। নীলাম্বর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল এ জন্মে তোমার ত কোন দোষ-অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্বজন্মের পাপ ছিল, না হলে কিছুতেই এমন হ'ত না।

বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ত না?

নীলাম্বর কহিল, তোমার সমস্ত দেহ-মন ভগবান রাজরানীর উপযুক্ত করে গড়ে ছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ একমুহূর্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, এ খবর কখন তোমাকে ভগবান দিয়ে গেলেন?

নীলাম্বর কহিল, চোখ-কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন।

বিরাজ 'হুঁ' বলিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তখন বলছিলে, আমি কোন কথা তোমার শুনিনে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ?

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বেশ ত, আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও?

নীলাম্বর বলিল, তোমার দোষ দেখাতে পারব না; কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা বলব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা করেই দেখ। কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত ক'টা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মূর্খের হাতে পড়ে? এইটেই তোমার পূর্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।

বিরাজ নি:শব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল ইহার জবাব দিবে না; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুনে আমি খুশী হই?

কি সব কথা?

বিরাজ বলিল, এই যেমন রাজরানী হতে পারতুম—শুধু তোমার হাতে পড়েই এমন হয়েছি, এই সব; মনে কর, এ শুনলে আমার আহ্লাদ হয়, না যে বলে তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

নীলাম্বর দেখিল, বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, রূপ, রূপ, রূপ। শুনে শুনে কান আমার ভোঁতা হয়ে গেল। আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধরে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশী আমায় আর কিছু দেখ না? এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় বস্তু? তুমি কি বলে এ কথা মুখে আন? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাই?

নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল, না না—

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই, সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলে ভালবাসতে কিনা! মনে পড়ে?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ বলিল, হাঁ বলেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলেও ভালবাসতে, কেননা, আমাকে বিয়ে করেচ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ-সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না? এর পূর্বেও আমাকে তুমি এ কথা বলেচ।— বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমান চোখে জল আসিয়া পড়িল, এবং সে জল প্রদীপের আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তাহার রাগ থাকে না।

নীলাম্বর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়া ছিল। এক সময়ে নীলাম্বর সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ কেন অত রাগ, বিরাজ?

বিরাজ জবাব দিল, কেন তুমি ও-সব কথা বললে?

নীলাম্বর বলিল, আমি ত মন্দ কথা বলিনি!

বিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীরভাবে বলিল, তবু বলবে মন্দ কথা নয়? খুব মন্দ কথা। অত্যন্ত মন্‌দ কথা। ওই জন্যেই সুন্দরীকে—

সে আর বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, শুধু এই দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বিরাজ 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিল।

নীলাম্বর আর প্রশ্ন করিল না।

তখন বিরাজ নিজেই বলিল, দেখ, জেরা ক'রো না—আমি কচি খুকি নই—ভালমন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে বলেই তাড়িয়েচি। কেন, কি বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে!

না, আর অত শুনতে চাইনে, বলিয়া নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পৃথগন্ন হইবার দুই-চারি দিন পরেই ছোটভাই পীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আলাদা করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহারই সম্মুখে একটি ছোট বৈঠকখানা-ঘর করিয়া সে সর্বরকমে নিজের বাড়িটিকে বেশ মানানসই ঝরঝরে করিয়া লইয়া মহা আরামে জীবন-যাপন করিতেছিল। কোনদিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্তা বলিত না। এখন সমস্ত একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজকে প্রায় সমস্তদিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরী যাওয়ার পর হইতে

শুধু যে সমস্ত কাজকর্ম তাহাকেই করিতে হইত তাহা নহে; যে-সব কাজ পূর্বে দাসীতে করিত, সেইগুলো লোকলজ্জাবশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ও-বাড়ি হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি!

রাত অনেক হইয়াছিল। বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। তেমনই মৃদুস্বরে আবার কহিল, দিদি, আমি মোহিনী।

বিরাজ আশ্চর্য হইয়া বলিল, কে, ছোটবৌ! এত রাত্তিরে?

হাঁ দিদি, আমি। একবারটি কাছে এসো।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, দিদি, বঠ্ঠাকুর ঘুমিয়েচেন?

বিরাজ বলিল, হাঁ।

মোহিনী বলিল, দিদি, একটা কথা আছে কিন্তু বলতে পাচ্ছিনে,—বলিয়া চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল ছোটবৌ কাঁদিতেছে। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে ছোটবৌ?

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি, সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কি ছোটবৌ!

এবার সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিল, বঠ্ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে,—কাল সমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি?

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া বলিল, সমন বার হবে, তার আর ভয় কি ছোটবৌ?

ভয় নেই দিদি?

বিরাজ বলিল, ভয় আর কি! কিন্তু নালিশ করলে কে?

ছোটবৌ বলিল, ভুলু মুখুয্যে।

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, থাক আর বলতে হবে না—বুঝেচি। মুখুয্যেমশাই ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেচেন। কিন্তু তাতে ভয়ের কথা কিছু নেই ছোটবৌ। তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, দিদি, কোনদিন তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোটবোনের একটি কথা রাখবে দিদি?

তাহার কন্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, কেন রাখব না বোন?

তবে, একবারটি হাত পাত। বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছাড়া সোনার হার রাখিয়া দিল।

বিরাজ আশ্চর্য হইয়া বলিল,—কেন ছোটবৌ?

ছোটবৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, এইটে বিক্রি করে হোক, বাধাঁ দিয়ে হোক, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু ‘চললুম দিদি’, বলিয়া ছোটবৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, যেও না ছোটবৌ, শোন।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন দিদি?

বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, ছি, এ-সব করতে নেই।

ছোটবৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, কেন করতে নেই?

বিরাজ বলিল, ঠাকুরপো শুনলে কি বলবেন?

কিন্তু তিনি ত শুনতে পাবেন না।

আজ না হোক দু'দিন পরে জানতে পারবেন, তখন কি হবে?

ছোটবৌ বলিল, তিনি কোনদিন জানতে পারবেন না, দিদি। গত বছর মা মরবার সময় এটি নুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোনদিন পরিনি, কোনদিন বার করিনি—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি তুমি নাও!

তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর আচরণের সহিত সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তারপর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আজকের কথা মরণকাল পর্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন মেয়েমানুষের কোনও কাজই উচিত নয় ছোটবৌ! তাতে তোমার আমার দু'জনেরই পাপ।

ছোটবৌ বলিল, তুমি সব কথা জান না তাই বলচ—কিন্তু ধর্মাধর্ম আমারও ত আছে দিদি,—আমিই বা মরণকালে কি জবাব দেব?

বিরাজ আর একবার চোখ মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোটবৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিনতে পারিনি; কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েচেন। যাও, রাত হ'ল, শোও গে বোন।—বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সেও ঘরে ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ মকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সকরুণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বাহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সবচেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা না

করিলেও একটি দিনও তাহার হইয়া কখন ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো একমুহূর্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোটবৌ তেমনই করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে।

নীলাম্বর সংক্ষেপে বলিল, ঘরে চল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেচে।

বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

ছয়

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দুই আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলা হইতেই প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত, তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যেমশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর তাহা গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহাও জানাজানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে। পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোনদিকে চাহিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্বদেহটা যেরকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ির মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে, সংবাদ লইতে আসিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আলনা অগোছান, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন—সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে আর খুঁজিয়া পায় না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাম্বর ছোটবোন হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা পাঠায় নাই। দিন-পনর হইল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্যন্ত দেয় নাই। কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া

উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, মায়ের মত ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত সংস্রব পর্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোস্ট আপিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এ পূজাতেও বোধ করি বোনটিকে একবার দেখতে পেলেম না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একধার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, তার নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ—সে কি কোন দোষ করেছে?

বিরাজ অদূরেই বসিয়া ছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, জ্বলে উঠি কে বললে?

কে বলবে, আমি নিজেই টের পাই।

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখাপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পেলেই ভাল। বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, নীলাম্বর

ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আজকাল এমন হয়ে উঠচ কেন? এ যেন একেবারে বদলে গেছ।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, বদলালেই বদলাতে হয়, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার দুই-তিন দিন পরে অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর বাহিরের চন্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছিল, বিরাজ পিছনে আসিয়া কিছুক্ষন নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নীলাম্বর মুখ নীচু করিতেই বিরাজ রুক্ষস্বরে বলিল, আর একবার মুখ তোল দেখি।

নীলাম্বর মুখও তুলিল না, জবাবও দিল না; চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পূর্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, এই যে চোখ রাঙ্গা হয়েছে, আবার ঐগুলা খেতে শুরু করেচ?

নীলাম্বর কথা কহিল না, ভয়ে চোখ নীচু করিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। একে ত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছুদিন হইতেই বিরাজ এমনই একরাশি উত্তপ্ত বারুদের মত হইয়া আছে যে, কখন কিভাবে জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্যন্ত করিবার জো ছিল না।

বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সেই ভাল, গাঁজা-গুলি খেয়ে বোমভোলা হয়ে বসে থাকবার এই ত সময়, বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন গেল, পরদিন গেল, নীলাম্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকালবেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর ত একটা জবাব পর্যন্ত দিল না—তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্ না, যদি বোনটিকে দুটো দিনের তরেও আনতে পারিস!

পীতাম্বর দাদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকতে আমি আবার কি চেষ্টা করব?

নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু, যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল, তা হোক, যেমন আমার, তোরও ত সে তেমনই বোন। না হয় মনে কর্ না আমি মরে গেছি—এখন, তুই শুধু একলা আছিস।

পীতাম্বর কহিল, যা সত্যি নয় তা তোমার মত আমি মনে করতে পারিনে। আর তোমাকে চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন?

নীলাম্বর ছোটভাইয়ের এ কথাটাও সহ্য করিয়া বলিল, যা সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি! আচ্ছা, তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করিতে চাইনে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে ত তোকে ডাকিনি—যা বলচি, পারিস কি না, তাই বল্।

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

করলে কি হ'ত?

পীতাম্বর বলিল, ভাল পরামর্শই দিতুম।

নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, তা হলে পারবি নে?

পীতাম্বর বলিল, না। আর, পুঁটির শ্বশুরও যা, নিজের শ্বশুরও তাই—এঁরা গুরুজন।তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছা করেন না, তখন তার বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যা, বেরো—যা আমার সামনে থেকে।

পীতাম্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর করে তাড়াতে পার?

নীলাম্‌বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, বুড়া বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস, সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল, বাস্! একটি কথাও না—যাও।

গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলযোগ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ছি, সমস্ত জেনেশুনে কি ভাইয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে আছে?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, জানি বলে কি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভন্ডামি সহ্য হয় না।

বিরাজ বলিল, কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাম্বর বলিল, না। যিনি ভাববার তিনি ভাবেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।

বিরাজ জবাব দিল, তা ঠিক। যার কাজের মধ্যে খোল বাজানো আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা-চিন্তে মিছে।

কথাগুলি বিরাজ মধুর করিয়া বলে নাই, নীলাম্বরের কানেও তাহা মধুবর্ষন করিল না, তথাপি সে সহজভাবে বলিল, ওগুলো আমি সবচেয়ে বড় কাজ বলেই মনে করি। তা ছাড়া, ভাবতে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে? বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল, চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েচে—আমি ত অতি তুচ্ছ!

বিরাজ অন্তরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিল, ও-সব মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। তা ছাড়া, তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি ত পারিনে! মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে—আমাকে খোশামোদ করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে। ছোটভাইয়ের মন যুগিয়ে থাকতে না পার, অন্ততঃ হাতাহাতি করে সব দিক মাটি ক'র না।—বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর তাহা জানিত, কিন্তু আজ যাহা হইয়া গেল, তাহা কলহ নহে—এ মূর্তি তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, অমন হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েচে—যাও, স্নানক্রিয়া করে দুটো খাও—যে কটা দিন পাওয়া যায়, সেই কটা দিনই লাভ।—বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বুকে শূল বিঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘরে দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের পট ঝোলানো ছিল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ? সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পরিতে লাগিল। যাঁহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাঁহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানির সীমা ছিল না। সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিছামিছি এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ফিরিল, তার পর সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়াই একবারে ফুপাঁইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ি নির্জন, নিস্তব্ধ। নীলাম্বর বাড়ি নাই, তিনি দুপুরবেলা একটিবারমাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

বিরাজ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোন দিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, সেইখানে অন্ধকার উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কেবলই বলিতে লাগিল,—অন্তর্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সইতে পারব না।

রাত্রি তখন নটা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিল না, কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট-পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল—বিরাজের লুপ্ত অভিমান ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ করে শুনি?

ইহাতেও নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, বল না শুনি?

নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, শুনে কি হবে?

বিরাজ বলিল, তবু শুনিই না।

এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, তোর আমি গুরুজন বিরাজ, খেলার জিনিস নয়।

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত, এমন গম্ভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

সাত

মগ্‌রার গঞ্জে কয়েকটা পিতলের কবজার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ কর্মপটু, দু'দিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এগুলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা উপার্জন করিতেছিল, অথচ, স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল এবং ক্লান্তিবশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা মাখা, আশেপাশে তৈরী ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিনদিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ভূলুণ্ঠিত সুপ্ত মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ জাগিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া-চড়িয়া পা-দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাম্বর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্তী স্তিমিত দীপশিখাটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এতদিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের কোণে এমন কালি পড়িয়াছে! ভ্রুর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দুশ্চিন্তার এত সুস্পষ্ট রেখা

ফুটিয়াছে! একটা অবোধ্য, অব্যক্ত অপরিসীম বেদনায় তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল এবং অসাবধানে একফোঁটা বড় অশ্রু বিরাজের নিমীলিত চোখের পাতার উপর টপ করিয়া পড়িবামাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তার পর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাম্বর সেইভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল—কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশী বাকী নাই, পূর্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাম্বর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল আর হিমে থেকো না বিরাজ, ঘরে চল।

চল, বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল, এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালবেলা নীলাম্বর বলিল, যা তোর মামার বাড়ি থেকে দিন-কতক ঘুরে আয় বিরাজ, আমিও একবার কলকাতায় যাই।

কলকাতায় গিয়ে কি হবে?

নীলাম্বর কহিল, কত রকম উপার্জনের পথ সেখানে আছে, যা হোক একটা উপায় হবেই—কথা শোন্ বিরাজ, মাস-কয়েক সেখানে গিয়ে থাক্ গে!

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?

নীলাম্বর বলিল, ছ' মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

'আচ্ছা' বলিয়া বিরাজ সম্মত হইল।

দিন চার-পাঁচ পরে গরুর গাড়ি আসিল, মামার বাড়ি যাইতে আট-দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাগিদ দিতে লাগিল।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে বলিয়া বসিল, আজ ত আমি যাব না—আমার অসুখ কচ্চে।

নীলাম্বর অবাক হইয়া বলিল, অসুখ কচ্চে কি রে?

বিরাজ বলিল, হাঁ, অসুখ কচ্চে—বড্ড অসুখ কচ্চে, —বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতলের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। সেদিন গাড়ি ফিরিয়া গেল। রাত্রে অনেক সাধাসাধি, অনেক বোঝানোর পর সে দুদিন পরে যাইতে সম্মত হইল। দু'দিন পরে আবার গাড়ি আসিল।

নীলাম্‌বর সংবাদ দিবামাত্রই বিরাজ একেবারে বাঁকিয়া বসিল;—না, আমি কক্ষণ যাব না।

নীলাম্বর আরো আশ্চর্য হইয়া বলিল, যাবিনে, কেন?

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল—না, আমি যাব না। আমার গয়না কৈ, আমি দীন-দুঃখীর মত কিছুতেই যাব না।

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাসনি?

বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে-কষ্টে বুঝি তোর হুঁশ হয়েচে—তা দেখছি কিছুই হয়নি! ভাল, তুইও শুকিয়ে মর্, আমিও মরি।—বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ি ফিরাইয়া দিল।

দুপুরবেলা নীলাম্বর ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, দিদি, অপরাধ নিও না, তোমায় আমি আর বোঝাব কি, কিন্তু দু'দিন ঘুরে এলে না কেন?

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, ওঁকে বদ্ধ করে রেখো না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান দু’দিনে মুখ তুলে চাইবেন।

বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, আমি ত বুক বেঁধেই আছি, ছোটবৌ!

ছোটবৌ একটু জোর দিয়া বলিল, তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জন করতে দাও—আমি বলচি, তোমার প্রতি ভগবান দু’দিনে প্রসন্ন হবেন।

বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তার পর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, পারবে না যেতে?

এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব’লো না,—বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, যেও না দিদি, শোন, তোমাকে দিন-কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ও বুঝেছি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, এসেছিল।

তাই চলে যেতে বলচ?

তাই বলচি দিদি, তুমি যাও এখান থেকে।

বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল; তার পরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

ছোটবৌ বলিল, কুকুর পাগল হ’লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি! তা ছাড়া , তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ , এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে।

বিরাজ আবার চুপ করিয়া রহিল। তারপর উদ্ধতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, না কোনমতেই যাব না,—বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যুত্তরের অবসরমাত্র না দিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল। কিন্তু তাহার যেন ভয় করিতে লাগিল।

তাহাদের ঘাটের ঠিক পরপারে দু'দিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটা স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্ত্বেও মাছ ধরিবারও মঞ্চ প্রস্তুত হইতেছিল। বিরাজ মনে মনে বুঝিল, এ-সব কেন।

নীলাম্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওপারে ঘাট বাঁধলে কারা বিরাজ?

বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি জানি? —বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলাম্বর অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে বিরাজ যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে যাইত, এ ছাড়া সহস্র কাজ আটকাইলেও সে ও-মুখো হইত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না।

দিন-চারেক পরে নীলাম্বরই একদিন ঘাট হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল, নূতন জমিদারের সাজ-সরঞ্জাম দেখেচিস বিরাজ?

বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, দেখচি বৈ কি!

নীলাম্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, লোকটা পাগল নাকি, তাই আমি ভাবচি।

নদীতে দুটো পুঁটিমাছ থাকবার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হুইল-বাঁধা ছিপ ফেলে সারাদিন বসে আছে।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোনমতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সামনে সমস্ত দিন বসে থাকলে মেয়েছেলেরাই বা যায় কি করে? আচ্ছা, তোদের নিশ্চয়ই ত ভারী অসুবিধে হচ্ছে।

বিরাজ বলিল, হলেই বা কি করব?

নীলাম্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই? না না, কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে বলে আসব—শখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে বসে থাকুন গে; কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে ও-সব চলবে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, তোমাকে ও-সব বলতে যেতে হবে না; নদী আমাদের একলার নয় যে, তুমি বারণ করে আসবে।

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই বলিস কি বিরাজ! নাই হ'ল নদী আমার; কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে বলে আসব, না শোনে নিজেই ঐসব ঘাট-ফাট টান মেরে ভেঙ্গে ফেলব, তার পরে যা পারে সে করুক।

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করতে?

নীলাম্বর কহিল, কেন যাব না? বড়লোক বলে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে, তাই সয়ে থাকতে হবে?

অত্যাচার করচে তুমি প্রমাণ করতে পার?

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আমি এত তর্কের ধার ধারিনে; স্পষ্ট দেখচি অন্যায় করচে, আর তুই বলিস প্রমাণ করতে পার? পারি, না পারি সে আমি বুঝব।

বিরাজ একমুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে এ কথা শুনলে লোকে গায়ে থুথু দেবে। কিসে আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে!

কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, তুই আমাকে কি কুকুর-বেড়াল মনে করিস যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস! কোন্ দিন তোর দুবেলা ভাত জোটে না?

দুঃখে-কষ্টে বিরাজের আর পূর্বের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, মিছে চেঁচিও না। যা করে দু'বেলা ভাত জুটচে, সে তুমি জান না বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বলতে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মরব। বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল, নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধি দৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চন্ডীমন্ডপের একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচন্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অনুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোরে ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে! এবং কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সেদিনের সেই অন্ধকারে গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে ভূশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যই ত! দিন যে কি করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে তাহা ওই অসহায়া রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে কথা আর ত তাহার জানিতে বাকী নাই। অনতিপূর্বে

বিরাজের শক্ত কথা শক্ত তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছিল, কিন্তু যতই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষত, সেই ক্ষোভ শুধু যে মিলাইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ নয়, সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তের। তাহার বিচার ত শুধু দুটো দিনের ব্যবহারে, দুটো অসহিষ্ণু কথার উপরে করা চলে না! সে-হৃদয় যে কি দিয়া পরিপূর্ণ, সে কথা ত তার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না! এইবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্ধ্বমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবান, আমার যা আছে সব নাও, কিন্তু আমার একে নিও না। বলিতেই একটা প্রচন্ড ইচ্ছার বেগ সেই মূহূর্তেই তাহার প্রিয়তমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্যে তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিয়া বিরাজের রুদ্ধদ্বারের সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে ঘা দিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, বিরাজ!

বিরাজ মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বর বলিল, কি কচ্চিস বিরাজ, দোর খোল!

বিরাজ সভয়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলে দে না বিরাজ!

এবার বিরাজ কাঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মারবে না বল?

মারব!

কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃদপিন্ডে গিয়া প্রবেশ করিল; বেদনায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার কন্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাঠ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিল না; সে না

জানিয়া ছুরির উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া বলিল, আর আমি এমন কথা ক'ব না—বল, মারবে না?

নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে, কোনমতে একটা 'না' বলিতে পারিল মাত্র। সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গল মুক্ত করিবামাত্রেই নীলাম্বর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর এমন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই! সমস্তই বুঝিল। শিয়রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা নিজের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া আচঁল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আধাঁর ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই মুখ খুলিল না। তাহাদের কথা বোধ করি শুধু অন্তর্যামীই শুনিলেন।

আট

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল—এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া! সে তাহাকে মারধর করিতেও পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দু'দিন যায় না, বিবাদ বাধে, কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল—অথচ কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। নীলাম্বরের ভগবানের চরণে অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চন্ডীমণ্ডপের দেয়ালে টাঙ্গানো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান, যদি এত দুঃখেই ফেলবে মনে ছিল, তবে এতবড় নিরূপায় করে আমাকে গড়লে কেন? সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর কেহই জানে না। লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজকর্ম জানিত না, জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া! আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দু'চোখ যায় যাইবে; কিন্তু এই সাত-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায় ঘেরা বাড়ি, এই ঘরে-বাহিরে আজন্মপরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই

চন্ডীমন্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এইখানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘরবাড়ির মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোনটিকে সে কোথায় দিয়া আসিল তাহার একটা সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না; কতদিন হইয়া গেল, তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার-সুতীক্ষ্ণ কন্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার মায়ের পেটের বোন, হাতে কাঁখে করিয়া বড় করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সেজন্য কত কথা, কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুঁটিকে কাঁদাইয়া রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ-সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোটবোনটি জানে।

বিরাজ জানিয়াও জানে না। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। পুঁটির সম্বন্ধে সে যেন পাষাণমূর্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্বাক হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধা বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিঁধিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্যন্ত ছিল না।

কোন একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজ থামাইয়া দিয়া বলে, ও-সব কথা থাক—সে রাজরানী হোক, কিন্তু তার কথায় কাজ নেই। এই 'রাজরানী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাম্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকিত। পাছে তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত,

ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া ‘হরির লুঠ’ দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে ক’একটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল।

সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল। নীলাম্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন উত্তরীয়ের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, তুই ত তাকে মানুষ করেচিস সুন্দরী, যা একবার দেখে আয়। আর সে বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল।

সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, সে কেমন আছে বড়বাবু?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে।

সুন্দরীর বুদ্বি-বিবেচনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে জানাইতে নীলাম্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না; কহিল, না বড়বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হলে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ করেচি।

নীলাম্বরের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল। এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল যেন এই সব দুঃখ-কষ্টের কথা পুঁটি কোনমতে না জনিতে পারে।

নীলাম্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার একফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ন, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ খুড়ো বলিয়া বাড়ি ঢুকিল, কেহ নীলুদা বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাম্বর শুষ্কমুখে চন্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম-কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল, বিরাজ রান্নাঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করিতে এসেচে বিরাজ।

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, আমার জ্বর হয়েচে—উঠতে পারব না।

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকন্ঠে ডাক আসিল, দিদি, আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল।

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, সে হবে না দিদি, সারারাত এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেও থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্বাদ না নিয়ে যাব না।

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিদ্ধি-গোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, শুধু এই আশীর্বাদ কর দিদি, যেন তোমার মত হতে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্বাদ পেতে চাইনে।

বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোটবধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বলতে পারলুম না দিদি; তোমার দেহের বাতাসও যদি আমার দেহে লেগে থাকে, ত, সেই জোরে বলে যাচ্ছি, আসচে বছরে এমনই দিনে সে কথা বলব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেইসব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজিকার দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকালবেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল।

বিরাজ আশীর্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হয়ে গেল, তাই আজ সকালেই বলতে এলুম। কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জানলে আমি কিছুতেই যেতুম না।

বিরাজ বুঝিতে পারিল না—চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, বাড়িতে কেউ নেই—সবাই গেছে পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো পিসী, তার শক্ত শক্ত কথা কি বৌমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা। জামাইয়ের পর্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায়নি, শুধু একখানা সূতোর কাপড় নিয়ে পূজোর তত্ত্ব কত্তে এসেচে! তারপর ছোটলোক, চামার, চোখের চামড়া নেই—এ যে কত বললে, তা আর বলে কি হবে।

বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে কাকে বললে রে?

সুন্দরী বলিল, কেন, আমাদের বাবুকে।

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, আমাদের বাবুকে কে বললে তাই বল্।

এবার সুন্দরীও কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিল, তাই ত এতক্ষণ বলচি বৌমা! পুঁটির বুড়ো পিসশাউড়ির কি দপ্প, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলে না, ফিরিয়ে দিলে;—বলিয়া কাপড়খানি আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল।

এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার অন্তরে বাহিরে আগুন ধরিয়া গেল।

নীলাম্বর বাহিরে গিয়াছিল, কত বেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা নীলাম্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমন ভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিরাজ কহিল কেন তারা নিলে না, কেন গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলে, সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুনতে পাবে।

তথাপি নীলাম্বর মুখ তুলিল না, কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না।

বিরাজও চুপ করিল।

নীলাম্বরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনতমুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল,—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাম্বর কহিল, পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয় ভালই আছে, না সুন্দরী?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভাল আছে বৈ কি বাবু।

নীলাম্বরের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল, কহিল, কত বড়টি হয়েচে দেখলি?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, দেখা ত হয়নি বাবু!

নীলাম্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু দাসী-চাকরের কাছেও শুনলি ত?

না বাবু। তার পিসশাউড়ি মাগীর যে কথাবার্তা, যে হাত-পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস করব কি, পালাতেই পথ পাইনি।

নীলাম্বর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ক্ষুব্ধ-মুখে কহিল, আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হয়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হয়েছে—তোর কি মনে হয়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, মোটাসোটাই হয়ে থাকবে।

নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, শুনে এসেচিস বোধ করি, না?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবু, শুনে কিছুই আসিনি।

তবে জানলি কি করে?

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, জানলুম আর কোথায়? তুমি বললে আমার কি মনে হয়, তাই বললুম—হয়ত মোটাসোটা হয়েচে।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তা বটে। তারপর কয়েক মুহূর্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আসব।

সুন্দরী মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুত তাহার অপরাধ ছিল না। এক ত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা-দুই হইতে নিরন্তর এক কথা এক শ রকম করিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, হাঁ বাবু, রাত হ'ল, আজ এসো, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।

এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল এবং 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীর উৎকন্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলী প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইতে পায়ের ধূলা দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধূলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কন্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সুমুখে চাহিতেই দেখিল, নীলাম্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্তমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্তত করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট হইতে খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর কাছে বলতে ত লজ্জা নেই সুন্দরী, সবই জানিস—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে। বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বলিল, কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া-আসার খরচ পর্যন্ত দিতে পারিনি। আর সে বলিতে পারিল না, কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরী একমুহূর্তে কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বলা সাজে না। বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, তবে আর একবার ভিতরে এসো, বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল।

নীলাম্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া মিনিট-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে চেয়ে থাকলে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শূদ্দুর হলেও এ জোর শুধু আমারই আছে, বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ করব বলে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেতে হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।

নীলাম্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু এ কথা তিনি যেন কিছুতেই না জানতে পারেন।

নীলাম্বর কি একটা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হলেও শুনব না বাবু। আজ আমার মান না রাখলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময় 'কি হচ্ছে গো?' বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলী খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাম্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, ও ছোঁড়াটা নীলু না?

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, হাঁ, আমার মনিব।

শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?

কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।

ও—কাজ ছিল? বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাহার মত বয়সের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম নয়।

সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইয়ের বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বারো আনা পাকিয়াছে—তাহার গোঁফ-দাড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতাইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, অমন করে চেয়ে আছ যে?

দেখচি।

কি দেখচ?

দেখচি তোমরাও বামুন, আর যিনি চলে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু, কি আকাশপাতাল তফাত।

নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্ন করিল, তফাত কিসে?

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, বুড়ো মানুষ, আর হিমে থেকো না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বলচি গাঙ্গুলিমশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধূলো পেলে তোমাদের মত কতগুলি গাঙ্গুলী কত জন্ম উদ্ধার হতে পারে!

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, রাগ ক'রো না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ বলে নয়, বরাবরই দেখে আসচি ত আমার মনিবের পৈতেগাছটার দিকে চোখ পড়লে চোখ যেন ঠিকরে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তোমাদের দেখ—দেখলেই আমার হাসি পায়। বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষায় জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, অত দর্প করিস নে সুন্দরী—মুখ পচে যাবে।

সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, কিচ্ছু হবে না—নাও, তামাক খাও। বরং তোমার মুখই ম'লে পুড়বে না—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ব'স,ব'স, মাথা খাও—

ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও—নিপাত যাও—বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তার পর উঠিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বলচে!

নয়

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কানে উঠিতে বাকী থাকিল না। সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন ও বাড়ির পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, ওঁর একটা কান কেটে নেওয়া উচিত পিসীমা।

পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি?

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?

নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল, অনেকদিন আগে পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।

আর যেও না। তার স্বভাব-চরিত্র শুনতে পাই ভারী মন্দ হয়েচে; বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান, তাঁকে ধরিয়া রাখিবার জো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই-যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপর একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে-কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূলবিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর, শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া করিয়া, শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যেভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন চোরের মতন আসেন যান, সেদিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাঙ্গাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সেদিন দশহরা। অতি প্রত্যূষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

ও-পারে জমিদারের ঘাট তৈরি হওয়া পর্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জায়ে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনো সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দু'জনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয়ত সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে। মুহূর্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর ছোটজায়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দাঁড়াস নে ছোটবৌ, চলে আয়।

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর দৃঢ়পদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল।

বিরাজ বলিল, আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না। বিরাজ বলিতে লাগিল, আপনার জমিদারি যত বড়ই হোক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার।

হাত দিয়া ওপারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, আপনি যে কত বড় ইতর, তা সবাই জানে, আমিও জানি। বোধ করি, আপনার মা-বোন নেই। অনেকদিন

আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।

রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিনলে কখনই আসতেন না। তাই, আজ বলে দিচ্ছি, আর কখনও আসবার পূর্বে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করে দেখবেন, বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়িতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল, পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ও-ই জমিদারবাবু, না?

চক্ষের নিমেষে বিরাজের চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না! কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট-দশেক পরে ও-বাড়ি হইতে একটি মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্তকাল কান পাতিয়া শুনিল, এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ও-বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙ্গার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড়ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল।

নীলাম্বর ভূ-শায়িতা ছোটবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।

ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল, বৌমার সামনে আর তোর অপমান করব না, কিন্তু, এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়িতে আছি ততদিন এ-সব চলবে না। যে হাতটা তুই ওর গায়ে তুলবি, তোর সেই হাতটা ভেঙ্গে দিয়ে যাব।—বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ি চ'ড়ে মারতে এলে, কিন্তু কারণ জান?

নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়িইল, বলিল, না, জানতেও চাইনে।

পীতাম্বর বলিল, তা চাইবে কেন? আমাকে দেখচি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে।

নীলাম্বর তাহার মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ভিটে ছেড়ে কাকে পালাতে হবে, সে আমি জানি—তোকে মনে ক'রে দিতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাকতেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম। বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, তবে তোমাকে জানিয়ে দিই দাদা, পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, ও পারের ঘাটটা কার জান ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা ক'রে দিই। আজ রাত থাকতে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয়ত রোজই যান, কে জানে!

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া বলিল, এই দোষে গায়ে হাত তুললি?

পীতাম্বর বলিল, আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলে—কি জানি, রাজেনবাবু না কি নাম ওর—দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে বৌঠান তার সঙ্গে আধঘন্টা ধ'রে গল্প করছিলেন, কেন?

নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, কে কথা কইছিল রে? বিরাজবৌ?

হাঁ, তিনিই।

তুই চোখে দেখেছিস?

পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার না, জানি, —আমার সে বিচার সে নারায়ণ করবেন—কিন্তু—

নীলাম্বর ধমকাইয়া উঠিল, —আবার ঐ নাম মুখে আনে! কি বলবি বল।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ থামিয়া রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিল, চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। ঘর শাসন করতে না পার, পরকে তেড়ে মারতে এস না।

নীলাম্বরের মাথায় উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধঘন্টা ধরে গল্প করছিল, কে? বিরাজবৌ? তুই চোখে দেখেছিস? পীতাম্বর দু-এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, চোখেই দেখেচি। আধঘন্টার হয়ত বেশী হতেও পারে।

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জানলি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা জানি নে। তবে আমার মারধর করা উচিত হয়নি, কেননা ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয়নি।

মুহূর্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তৎপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই জানোয়ার, তাতে ছোটভাই। বড়ভাই হ'য়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে-কথা গুরুজনকে বললি, ভগবান হয়ত তোকে মাপ করবেন না—যা, —বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ-ধারে আসিয়া ভাঙ্গা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিল, একবার ভাবিল, সামনে গিয়া নিজের সব কথা বলে, কিন্তু, পা বাড়াইতে পারিল না। তাহার রূপের উপর পরপুরুষের লুব্ধদৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সুমুখে এ কথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে!

বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাত্রে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙিবার পূর্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দু'দিন কাটিয়া গেল, অথচ নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরনের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রী সম্বন্ধে এতবড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুইদিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে; এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিবেন। তাহা হইলেই সে আনুপূর্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নীচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু, কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্বাক হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না! অথচ যাহা এতদিন পর্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সেদিনটাও এমনই করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভয়ার্ত ভাবাতুর হৃদয় লইয়া সে কোনমতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ

আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্তের মত বাহির হইয়া আসিল, আর যদি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করেই থাকেন, তা হ'লে?

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সুমুখে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল, কেন, কি করেচি? কথা কও না যে বড়?

নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?

পালিয়ে বেড়াচ্চি! তুমি ডাকতে পারনি একবার?

নীলাম্বর বলিল, যে লোক পালিয়ে বেড়ায় তাকে ডাকলে পাপ হয়।

পাপ হয়? তাহলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?

সত্যি কথা বিশ্বাস করব না?

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, সত্যি নয়—ভয়ঙ্কর মিছে কথা। কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

তুমি নদীর ধারে কথা বলনি?

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, হাঁ বলেচি।

নীলাম্বর বলিল, আমি ঐটুকুই বিশ্বাস করেচি।

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যদি বিশ্বাসই করেচ, তবে ঐ ইতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, তবে কাছে আয়, ছেলেবেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

চক্ষের পলকে বিরাজ সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং পরক্ষণেই তাহার বুকের উপরে সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দু চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথার উপরে নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাম্বর সস্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, জানি; তাকে আসতে বারণ করে দিয়েচ।

কে তোমাকে বললে?

নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও-ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ!

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমিই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেকদিন পূর্বেই তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখতেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে করেই কোনদিন কিছু বলিনি।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাম্বর বলিল, আজ সারাদিন তাকে দেখবার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

বিরাজ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন? কেন?

দুটো কথা না বললে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাকতে হবে— তাই।

ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, সে হবে না, কিছুতেই হবে না; এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বলতে পাবে না।

তাহার মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্তব্য নেই?

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, স্বামীর অন্য কর্তব্য আগে কর, তারপরে এ কর্তব্য করতে যেও।

কি? বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, অবশেষে মৃদুস্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল।

বিরাজ তেমনইভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, —এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দ খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী-স্ত্রী নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, আমি যে কত অপদার্থ, বিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না।

বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্যপীড়িত দম্পতিটির সন্ধির সূত্রপাতেই আবার তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

দশ

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ বিরাজের পায়ের নীচে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুইদিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকু প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কাঁদিয়া বলিল, শাপ-সম্পাত দিও না দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে বাঁচব না।

বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর-মুখে বলিল, আমি অভিসম্পাত দেব না বোন, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মত সতীলক্ষ্মীর দেহে বিনাদোষে হাত তুললে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কি করব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন, তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এজন্য মানত করিনি, কিন্তু মহাপাপী আমি, আমার ডাকে কেউ কান দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি, —বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে ছোটবৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, তোর কপালে কি মারের দাগ নাকি রে?

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি দিয়ে মারলে?

স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না; নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ হলে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।

তা জানি, তবু কি দিয়ে মারলে?

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, পায়ে চটিজুতা ছিল—

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, জুতা দিয়ে মারলে! কি করে সহ্য করে রইলি ছোটবৌ?

ছোটবৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ সে কথা যেন কানে শুনিতে পাইল না, তেমনই বিকৃত গলায় বলিল, আবার তারই জন্যে তুই মাপ চাইতে এলি?

ছোটবৌ বড়জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, হাঁ দিদি। তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর অকল্যাণ হবে। আর, সহ্য করার কথা যদি বললে দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা—আমার যা কিছু সবই তোমার পায়ে—

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল, না ছোটবৌ, না, মিছে কথা বলিস নে—এ অপমান আমি সইতে পারিনে।

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া বলিল, নিজের অপমান সইতে পারাটাই খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেয়েমানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি যা সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতর সুখ নেই, তোমায় রাতদিন চোখে দেখতে হচ্চে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না দিদি।

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ খপ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, ওঁকে ক্ষমা করলে? তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমি কিছুতেই পা ছাড়ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পারবে না দিদি !

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোটবৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, মাপ করলুম।

ছোটবৌ আর একবার পা'র ধূলা মাথায় লইয়া আনন্দিতমুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানেই বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বারংবার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, এই দেখে শেখ বিরাজ!

সেই অবধি অনেকদিন পর্যন্ত ছোটবৌ এ বাড়িতে আসে নাই, কিন্তু একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এদিকে ওদিকে চাহিয়া এ বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, তেমনই করিয়া রহিল।

ছোটবৌ কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিদি কি পাগল হয়ে যাচ্চ?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, তুই হ'তিস নে?

ছোটবৌ বলিল, তোমার সঙ্গে তুলনা করে আমাকে অপরাধী ক'র না দিদি, এই দুটি পা'র ধূলোর যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন কচ্চ? কেন, বঠ্‌ঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?

আমি ত খেতে বারণ করিনি!

ছোটবৌ বলিল, বারণ করনি সে কথা ঠিক, কিন্তু, কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাকলেন। একটা সাড়া পর্যন্ত দিলে না। আচ্ছা তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একটিবার কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল, হাত-জোড়া ছিল ব'লে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁকে সুমুখে বসে খাইয়েচ— সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোনদিন ছিল না, আজ—

কথা শেষ না হইবার পূর্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, তবে দেখবি আয়। বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ চেয়ে দেখ্!

ছোটবৌ চাহিয়া দেখিল একটা কাল পাথরে অপরিষ্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি-শাকসিদ্ধ, আর কিছুই নাই।

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্‌ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোটবৌর দুচোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু, বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জায়ে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, তুইও ত মেয়েমানুষ, তোকেও রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্, পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখতে পারে? আগে বল্, ব'লে যা, তোর মুখে যা আসে তাই ব'লে আমাকে গাল দে, আমি কথা ক'ব না।

ছোটবৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোনদিন তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েছে, ত, সারাদিন বুকের ভিতর আমার কি ছুঁচ বিঁধেছে, সে আর কেউ না জানে ত তুই জানিস, ছোটবৌ, আজ তাঁর ক্ষিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়—তাও বুঝি আর জোটে না—

আর সে সহ্য করিতে পারিল না, ছোটজার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুই অভিন্ন নারীহৃদয় নিঃশব্দে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, না তোকে লুকাব না, কেননা, আমার দুঃখ বুঝতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি সরে না গেলে ওঁর কষ্ট যাবে না। কিন্তু, থেকে ত ও-মুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পারব না। আমি যাব, বল্ আমি গেলে ওঁকে দেখবি?

ছোটবৌ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপর বলিল, কি করে জানব বোন কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক এ জ্বালা এড়াব ত!

এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি, ও কথা মুখে এনো না দিদি! আত্মহত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কানে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হয়ে গেলে তুমি!

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, তা জানিনে। শুধু জানি, ওঁকে আর খেতে দিতে পারচি নে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই, যেমন ক'রে পারিস দুই ভায়ে মিল করে দিবি।

কথা দিলুম, বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

তবে এক মিনিট সবুর কর আমি আসছি, বলিয়া সে পা বাড়াতেই বিরাজ আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না যাসনে। আমি একটি তিল পর্যন্ত কারু কাছে নেব না।

কেন নেবে না?

বিরাজ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, সে কোনমতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পারব না।

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্যে স্থিরদৃষ্টিতে বড়জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল। তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তবে শোন দিদি। কেন জানিনে, আগে তুমি আমাকে ভালবাসতে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সেজন্য কত যে নুকিয়ে বসে কেঁদেচি, কত দেবদেবীকে ডেকেচি, তার সংখ্যাই নাই। আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিও ছোটবোন বলে ডেকেচি। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে এই অবস্থায় দেখে কিছু না করতে পেলে তুমি কিরকম ক'রে বেড়াতে?

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া রহিল।

ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্বপ্রকার আহার্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া একখানা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।

মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বঠ্ঠাকুর আমাকে বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন। বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

এগার

মগরার এতদিনের পিতলের কবজার কারখানা যেদিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাচ বিক্রির অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল, তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া গেল। হায় রে, অবোধ দুঃখীর মেয়ে, তুই কি করিয়া বুঝিবি সেইটুকু নিশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল! শান্ত নির্বাক ধরিত্রীর অন্তস্তলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল, সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্তনের দলে সে খোল বাজাইবে।

খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত পান্ডুর হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে! তবে, আহার জুটিবে! লজ্জায় ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—ভালই হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতিমুহূর্তে ক্ষয়চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল। অতি দ্রুত অতি সুস্পষ্টভাবে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেববাঞ্ছিত অতুল যৌবনশ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—যেন কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ

নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ; সেও মাসাধিক কাল ভাইয়ের অসুখে বাপের বাড়ি গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার, তাহার দুই চোখ প্রায়ই রাঙ্গা, নিশ্বাস উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোনো কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্তা কহিতেও এমনি ক্লান্তি বোধ হয়।

কয়েকদিন হইল, বিকাল হইতে তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা-দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ি থাকেন না বলিয়া, দিনের বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাতে ভাত রাঁধিত, কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত-পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর-দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে, ঠাকুর যে পথে যাচ্ছি, সে পথে যেন একটু শিগগির ক'রে যেতে পাই।

সেদিন শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘন-বৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। তিন দিন জ্বর-ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ি ছিল না। পরশু, স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরের এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল কোনোমতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেইদিনই সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে।

পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে, তাহার দেখা নাই। অনেকদিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন-তখন কাঁদিয়াছে। অনেকদিনের পর আজ সে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পায় মানত করিতে করিতে তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে। আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পারিয়া,

সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি জানি, তাঁহার কি ঘটিল! একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্বল, তাহাতে পথশ্রম—কোথায় অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্বনাশ ঘটিল—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে, কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ, বাড়িতে পীতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবধূকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এমন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোনোমতে হাতে পায়ে ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চন্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল। বিরাজ একবার কান পাতিয়া শুনিল, দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ‘যাই’ বলিয়া চোখের পলকে কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ, মুহূর্ত পূর্বে সে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল , সে ও-পাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, মাঠাকরুণ, দাঠাকুর একটা শুকনা কাপড় চাইলে—দাও।

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাঠে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কাপড় চাইলেন? কোথায় তিনি?

ছেলেটি জবাব দিল, গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি ক’রে এই সবাই ফিরে এলেন যে।

গতি ক'রে? বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্তী তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন-দুই পূর্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে জানাইল, দাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেউ নাড়ী ধরতে পানে না, তাই তিনিও সেইদিন হ'তে সঙ্গে ছিলেন।

বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাপড় দিয়া, শয্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে যাহার স্ত্রী একা, জ্বরে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত, সেই হতভাগিনীর বলিবার, কি কহিবার আর কি বাকী থাকে! আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল,—বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই; আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল নাই-নাই শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল।

ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই—সুখ নাই, শান্তি নাই। স্বাস্থ্য নাই—ও বাড়িতে ছোটবৌ নাই, সকলের সঙ্গে আর তার স্বামীও নাই। অথচ আশ্চর্য এই, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশ বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত; কিন্তু, আজ কি-একরকম স্তব্ধ অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল, ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাবনাই এলোমেলো। অথচ ইহারই মধ্যে অভ্যাসবশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!

আর শুইয়া থাকিতে পারিল না; ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে! কিন্তু কিছুই নাই—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া একমুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপরে হাতের প্রদীপ ফুঁ দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা, ঘন গুল্মকন্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছল পথ, কিছুই তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, তুলসী!

ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল—এই আঁধারে তুমি কেন মা?

বিরাজ কহিল, চাট্টি চাল দে!

চাল দেব? বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস নে তুলসী, একটু শিগগির ক'রে দে।

তুলসী আরও দু' একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু এ মোটা চালে কি কাজ হবে মা? এ তো তোমরা খেতে পারবে না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারব।

তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল। বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, কাজ নেই, তুই একা ফিরে আসতে পারবি নে। বলিয়া নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন করিয়া বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান, কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুনির্বার আকর্ষণ প্রচন্ড গতিতে ক্রমাগত ঐদিকে টানতে লাগিল, কিন্তু, এখন আর তাহাকে এক-পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ-সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমেষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবার-মাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল—সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল, তাঁহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়ে তাহারা যে এই তিন দিন অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে, সে কথা তাহার অগোচরে রহিল না। মিনিট পাঁচছয় এইভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া হয়নি?

নীলাম্বর বলিল, না।

বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল, শোন, এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পাড়িয়া একমুহুর্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—ঘাটে।

নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, না, ঘাটে তুমি যাও নি।

তবে যমের বাড়ি গিয়েছিলুম, বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘন্টা-খানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল, নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি-স্বরূপে কহিল, কোথা গিয়েছিলে?

বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্ত করিয়া শান্তভাবে বলিল, আজ খেয়ে শোও, সে কথা কাল শুনো।

নীলাম্‌বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজই শুনব। কোথায় ছিলে বল?

তাহার জিদের ভঙ্গী দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিল, বলিল, যদি না বলি?

বলতেই হবে, বল।

আমি তা কিছুতেই বলব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুনতে পাবে।

নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ভীষণকণ্ঠে বলিল, না কিছুতেই না; কোনমতেই না, না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাব না।

বিরাজ চমকাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি বললে? আমার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাবে না?

না, কোন মতেই না।

কেন?

নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, আবার জিজ্ঞেস কচ্চ কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, বুঝেচি! আর জিজ্ঞেস করব না।

আমিও কোন মতে বলব না, কেননা কাল যখন তোমার হুঁশ হবে তখন নিজেই বুঝবে—এখন তুমি তোমাতেই নেই।

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাঁজা খেয়েছি এই বলছিস ত? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েচি। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস তুই, তুই আর তোতে নেই।

বিরাজ তেমনি মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, কার চোখে ধূলো দিতে চাস বিরাজ? আমার? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন তুই বলতে পারিস নে কোথা ছিলি? কেন মিছে কথা বললি—তুই ঘাটে ছিলি?

বিরাজের দুই চোখ এখন পাগলের চক্ষুর মত ধকধক করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল, মিছে কথা বলছিলুম , এ কথা শুনলে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে, হয়তো তোমার খাওয়া হবে না তাই,—কিন্তু সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা-শরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু, তুমি মিছে কথা বলনি? একটা পশুরও এত বড় ছল করতে লজ্জা হ’ত, কিন্তু তোমার হ’ল না। সাধুপুরুষ! রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে কোন্ শিষ্যের বাড়িতে তিন দিন ধরে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে বল!

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। বলচি, বলিয়া হাতের কাছের শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বদ্ধ-ডিবা তার কপালে লাগিয়া ঝনঝন করিয়া খুলিয়া নীচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত বাহিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আমাকে মারলে!

নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না, মারিনি। কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস নে—অলক্ষ্মী , দূর হয়ে যা!

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাচ্চি। এক-পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিন্তু সহ্য হবে ত? কাল যখন মনে পড়বে, জ্বরের উপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি, তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা করে এনেচি—সইতে পারবে ত? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত?

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল, এই এক বছর যাই-যাই করচি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে—আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমার মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নীচে মরবার লোভ আমার সবচেয়ে বড় লোভ,—সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম, —বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন্ মায়ামন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদুপ্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। যে কালো পাথরখণ্ডটার উপর একদিন বসন্ত-প্রভাতে দুইটি ভাইবোনকে অসীম স্নেহসুখে এক হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কালো পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর-ভিত্তিতে ধাক্কা

খাইয়া আবর্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেইদিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশ, সুমুখে কালো জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ স্তব্ধ বনানী— আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কালো আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া নিজের হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।

বার

প্রত্যূষের আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপিটিপি জল পড়িতেছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্তকর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজবৌমা!

নীলাম্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া কাঁদিয়া ঘন্টা-খানেক পূর্বে শ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় বাবু?

নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাকছিলি?

তুলসী বলিল, বৌমাকেই ত ডাকচি বাবু! কাল এক প্রহর রেতে কোত্থাও কিছু নেই, এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ি মোটা চাল চেয়ে আনলে, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জানতে এলুম, সে চেলে কি কাজ হ'ল?

নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

তুলসী বলিল, এত ভোরে তবে খিড়কি খুললে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত, প্রতি বাঁক, প্রতি ঝোপ-ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিন অভুক্ত অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরেও সে কি কোথাও

কোন কারণে একমুহূর্ত থাকিতে পারে? তবে একি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি! এ-সব চোখের সামনে এমনই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায়-যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ি ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়া ভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরশোলা ইঁদুরে ছিটাছিটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে ভোরের আঁধারে ঠাহর করে নাই; এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল, ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটু কথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথা ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতর এত সত্বর এমন হাহাকার উঠিল। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সন্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ আমি সইতে পারব না বিরাজ, তুই আয়।

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়িতে কেহ দীপ জ্বালিল না; রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না। দুদিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না। বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদ্রিত চক্ষুর ভিতর

পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্যোগের বার্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল; তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোমটা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে কি-একটা আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে গিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুভারাক্রান্ত রক্তাক্ত চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখ-কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হলেন, তবুও আমরা পর হয়ে থাকব? তুমি থাকতে পার থাক গে, আমি আজ থেকে ও-বাড়ির সব কাজ করব।

পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিল—সে কি কথা!

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়। কহিল, তাঁর দেহ ভেসে উঠবে ত!

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, না উঠতেও পারে। স্রোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়েচেন। তা ছাড়া কে বা সন্ধান করচে , কে বা খুঁজে বেড়িয়েচে বল?

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল; বলিল, আচ্ছা, আমি খোঁজ করাচ্চি। একটু ভাবিয়া বলিল, বৌঠান মামার বাড়ি চলে যায়নি ত?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কখ্খনো না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যাননি, নদীতেই প্রাণ দিয়েচেন।

আচ্ছা, তাও দেখচি, বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ি পাঠাইয়া জীবনে আজ প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙ্গিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না, – বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চাঁর-পাঁচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছিল , ইনি যে মুখের পানে চাহিতে পারেন নাই, সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চন্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সুমুখের দেয়ালে টাঙ্গান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেলগাড়ি হয় নাই, তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল।

ঠাকুর-দেবতা জিনিসটা তাহার কাছে ঝাপসা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এঁরা যে সুমুখে আসেন, কথা ক'ন, এ-সমস্ত তাঁহার কাছে প্র্যতক্ষ সত্য ছিল। তাই ইতিপূর্বে গোপনে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার কত প্রয়াস সে যে করিয়াছে, তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে; এমন সংশয় কোনদিন মনে উঠে নাই, পট সত্যই কথা কহে কি না! লেখাপড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর বিরাজের কাছে রামায়ণ-মহাভারত

পড়িতে এবং এক-আধটু চিঠিপত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরনের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্কও সহিতে পারিত না। ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও-বা পীতাম্বরের সহিত কখনও-বা বিরাজের সহিত মারপিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে র্ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছি মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে দিতে নেই। বিরাজ কাদিঁতে কাদিঁতে বলিয়াছিল, ও আমাকে আগে মেরেছিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে—সেই অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সেদিন পর্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এইসব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড়বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল—অন্তর্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখতে পেয়েচ! সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না। তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।

বাবা!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সে সহজকণ্ঠে বলিল, আমি আপনার মেয়ে, বাবা, ভেতরে আসুন, স্নান করে আজ আপনাকে দুটি খেতে হবে।

প্রথমে নীলাম্বর নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই। ছোটবৌ পুনরায় বলিল, বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এইবার সে বুঝিল। একবার তাহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তার পর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল, বিরাজবৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে; বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপঝাড়, মৃতদেহ কোথাও-না-কোথাও আটকাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া, ধারে ধারে বেড়াইয়া, তটভূমের সমস্ত বন-জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারো কাছে বলিবার জো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা হলে ঠাকুর-দেবতাও মিছে, রাতও মিছে, দিনও মিছে। দেয়ালে টাঙানো অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, দিদি ওঁর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি জানি, বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে শুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সেই জানিল কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল, কি মর্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করিনি, তবে কি করে মায়া কাটিয়ে চলে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি যাবে বলিয়াই একদিন স্বামীর ভার তাহার উপর দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্‌বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?

মোহিনী জবাব দিল, বাবা বলি, তাই কথা কই।

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল, কিন্তু লোকে শুনলে নিন্দে করবে যে!

মোহিনী রুষ্টভাবে বলিল, লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব।—বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

তের

পনের মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাস জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পান্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।

শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, না বাবা, এখনও সময় আছে—আসতেও পারে। দুর্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামীপুত্র ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ি আসিতেছে এবং পূজার কয়দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোন সংবাদই জানে না। তাহার মাতৃসমা বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্বে সর্পাঘাতে ছোটদাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, একসঙ্গে এতগুলো সে কি সইতে পারবে মা!

প্রিয়তমা ছোটভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আমার কোন ওষুধপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচতেও চাইনে, বলিয়া সর্বপ্রকার ঝড়-ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিয়াছিল এবং বিষের যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

পা ছাড়ে নাই, সেইদিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সেজন্যেও তত দুঃখ করিনি মা; আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হ'ল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, তাই মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুনলে বল ত মা, তার বুকের ভিতর কি করতে থাকবে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতেও পারবে না!

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস-দুই পূর্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমিদার রাজেন্দ্রর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনোকষ্ট আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল।

সেই কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।

কি করে লুকাবে মা? যখন জিজ্ঞেস করবে, বৌদির কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেবে?

ছোটবৌ বলিল, যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েচেন—তাই।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা। শুনেচি, পাপ গোপন করলেই বাড়ে; আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভার আর বাড়িয়ে দেব না। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সেটুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোটবৌ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল, এ-সব কথা হয়ত সত্যি নয়, বাবা!

কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, সত্যি বৈ কি মা—সব সত্যি। জান ত মা, রেগে গেলে সে পাগ্‌লীর জ্ঞান থাকত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল তখনও তাই। তাতে যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য কর্‌তে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ। নীলাম্বর হাত দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া বলিল, মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিন দিন খায় নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—আর যেন বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল।

বহুক্ষণে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখমুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি ক'রে জানিনে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে উঠে, তারপরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী পাগলীকে আমার সেই রাতেই রাজেনবাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা-শরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কক্ষণ সত্যি নয় বাবা, কক্ষণ সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাঁকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্যন্ত দেখ্‌তেন না।

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, তাও শুনেচি। হয়ত, তোমার কথাই সত্যি মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জ্ঞানবুদ্ধি হ'বার পূর্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায়নি, আজও ত আমার কাছে আছে, —বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম স্থান পর্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত পাণ্ডুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, দিদি চিনেছিল, তাহাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ি আসিয়াছে এবং বড়মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশুপুত্র পাঁচ-ছয়জন দাসদাসী এবং অগণিত জিনিসপত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে শুরু করিয়াছিল। উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ি ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে নিজে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদিকে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষমানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না, সমস্ত আবদার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুরবাড়ি যাইবার পূর্বের দিনও সে বৌদির কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না।

তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরকুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদার সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দু'দিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তুমি এইসব লটবহর নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।

যতীন অনেক যুক্তি-তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। পুঁটি সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাইতে পারিব না এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি। আর কিছু বলিবার নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাতজোড় করিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝবে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করে থাক, সেই আমার সর্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ-প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল। কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাশুরকে খাওয়াইবার ভার পুঁটি লইয়াছিল। এ-কয়দিন সেখানেও বসিবার তাহার আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে না মা?

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিল, সে হয় না মা। তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে, আর থেকেই বা কি হবে মা? চল।

ছোটবৌ তেমনই হেঁটমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা। আমি কোথাও যেতে পারব না।

ছোটবৌর বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তারা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

ছোটবৌ চুপ করিয়া রহিল।

না বললে ত আমার যাওয়া হবে না মা!

ছোটবৌ মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনি যান, আমি থাকি।

কেন?

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা যেন প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখমুখ ধাঁধিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনিই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, ছি মা, তুমিও যদি এমন ক্ষ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হয়ে যাও, তাহলে আমার উপায় কি হবে? ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণেই সংশয়লেশহীন স্থির মৃদুস্বরে বলিল, অবুঝ হইনি বাবা। আপনাদের যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠতে দেখব, ততদিন কারো কোন কথা আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেমনই সুদৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হতে পারে না।

সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা।—বলিয়া এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না; যে কান্না তাহার গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নীচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—বৌদি! কখনো তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, বৌদি—আমাকে মাপ কর।

ছোটবৌ হেঁট হইয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

চোদ্দ

বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে, মরিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাহার বহুদিনব্যাপী দুঃখদৈন্যপীড়িত দুর্বল বিকৃত মস্তিষ্ক অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত-পা বাঁধিতেছিল তখন কোথায় বাজ পড়িল; সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে ও-পারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলা এতক্ষণ ঠিক যন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টির অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখাচোখি হইবামাত্রই ইশারা করিয়া ডাক দিল। বিরাজ সহসা ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল, ধর্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, একদৃষ্টে প্রাণপণে ও-পারে ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়কড় করিয়া অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে দেখিল। তাহার পর লঘুহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সরসর খসখস করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চানন ঠাকুরতলায় তাহার ঘর। পূজা দিতে গিয়া কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ

গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথঘাটই সে চিনিত, অল্পকালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা-দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পানসিখানি ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজুদেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, কে অমন ক'রে মারলে বৌমা?

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, আমার গায়ে হাত তুলতে পারে সে ছাড়া আর কে, সুন্দরী, যে বার বার জিজ্ঞেস কচ্চিস্? সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরো ঘণ্টা-দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজরা নোঙ্গর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবিনে?

না বৌমা, আমি এখানে না থাকলে লোকে সন্দেহ করবে। যাও মা, ভয় নেই, আবার দেখা হবে।

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পানসিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজরা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণী অভিমুখে যাত্রা করিল। দাঁড়ের শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল। দূরে একধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণ-মূর্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল। বজরা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল।

বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রের একি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূতপ্রেতের ভয় মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে, তাহারও সমস্ত বুক জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়াই রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহারনিদ্রা ভুলিয়া বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার কানে কানে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশ অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উভয় তীরের দুই প্রকান্ড বাঁশঝড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। বজরা এইখানে প্রবেশ করিবার পূর্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল, তুমি—আপনি—আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডালপালা লাগবে।

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখাচোখি হইল, পূর্বেও হইয়াছে—তখন দুর্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু, বিরাজ চাহিয়াই রহিল। তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথায় এতটুকু আঁচল পর্যন্তও নাই। এই সময়ে বজরা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাঁটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে সাবধন!—বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে—লাগবে,—ভিতরে আসুন—বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তখন অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ ও রক্তমাখা সিঁথার সিন্দুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতাল সে আগুনের সুমুখ হইতে আহত কুক্কুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে ক্লেদাক্ত শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যেভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল,—একবার জলের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে 'মা গো! এ কি কল্লুম মা!' বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ী-মাঝিরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজরা উলটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, —আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র একচুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজরা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্নমুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কি করা যাবে? পুলিশে খবর দিতে হবে ত? রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া

ভগ্নকণ্ঠে বলিল, কেন, জেলে যাবার জন্যে? গদাই, যেমন ক'রে পারিস পালা। গদাই-মাঝি পুরানো লোক, বাবুকে চিনিত, সবাই চিনে—তাই, ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল। এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপিচুপি আদেশ দিয়া বজরা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখমুখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূরে আসিয়াও তাহার গা ছমছম করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কান মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ও-কাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকানো থাকে কেহই জানে না। পাগলী যে কাল চোখ দিয়া পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং কোন কারণে কখনও যে সে ওমুখো হইতে পারিবে, সে ভরসা তাহার রহিল না। মূর্খ কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে। সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অতবড় জমিদারপুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।

পনর

সেদিন অপরাহ্নে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর, যখন হইতে তাহার হুঁশ হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জর, উপবাসে অবসন্ন, ভগ্নদেহ, বিমল মন, সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেকদিন হইতেই সে হয়ত পাগল হইয়া আসিতেছিল। সেদিন অভিমানে ঘৃণায় আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া, সমস্ত বাঁধন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তাহার পর জ্বর ও বিকারের ঝোঁকে বজরায় উঠিয়াছিল এবং অর্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায়, ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণু-পরমাণু অহর্নিশ

ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিমঝিম করিয়া মূর্ছার মত বোধ হইত। একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, এখন সে ভাল হইয়াছে। এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। বিরাজ 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া রইল। সে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এ পীড়িতার আত্মীয়-স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, রাগ করো না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা আর কোনদিন ত দেখতে এলেন না, তাঁরা কি তোমার আপনার লোক নয়?

বিরাজ বলিল, না, তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি। একদিন বর্ষার রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে জলে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি দয়া করে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

ওঃ, জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ি কোথা গা?

বিরাজ মামার বাড়ির নাম করিয়া বলিল, আমি সেখানেই যাব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।

স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটু মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র-কণ্ঠে বলিল, তাই যাও বাছা, একটু সাবধানে থেকো, দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর ভাল কি হবে মা? এ চোখও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কহিল, বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি নিজের মুখখানা একবার দেখব—একটা আরশি যদি—

আছে বৈ কি, এখনই এনে দিচ্ছি, বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আরশি খুলিয়া বসিল। প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কৈ? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল? ভগবান! এ কি গুরুদণ্ড করিয়াছ! যদি কখন দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে! যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহারও হয়ত অতি ক্ষীণ একটু আশা অন্তঃসলিলার মত নিভৃত অন্তস্তলে তখনও বহিতেছিল। দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল!

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখনও বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে, সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না? সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহার নাই? অন্তর্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকুও হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার এতদিনের স্বামী-সেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ গিয়া পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হলে? তাহা হইলে সম্ভবত কি যে করেন, কল্পনাটাকে সে যে কত

রঙে, কতভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখেমুখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা ভগবান! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে! সে তাহার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এ-মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি হল গা? কেন কাঁদচ?

সে বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বসিল এবং কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের এক প্রান্ত বাহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারাজীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, ভগবান! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত এই যাত্রারই উপযুক্ত। গ্রামের লোক জানিয়াছে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, যে মুখ তুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমন হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান! বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

ষোল

কতদিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্নদেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন। তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্তমান জীবনে, তাহার অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, জটবাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ,—তেমনই সব। অথচ এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স, এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান তাহাকে একবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু ভুলিতে পারে নাই দুটা কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু এটা জানে, তাহা বহুদূরে। সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রমেয়ই হউক, এ অবস্থা চোখে দেখিলে তাঁহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে, কিন্তু কোথায় তাহার অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জাহত তপ্ত মাথাটা পাতিয়া এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পাইবে? আজ দুদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগ ঘিরিয়াছে—কাশি, জ্বর, বুকে

ব্যথা। দুর্বল দেহে শক্ত অসুখে পড়িয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্ধাশন। তাহার বড় সবলদেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিঁকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্যস্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল, গাছের সর্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল , সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সম্মুখে অপরিচিত গৃহস্থবধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে,—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদ্বীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে তাঁহার আয়ু ঐশ্বর্য মাগিয়া লয় নাই। এ-সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আজ আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থবধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘরদোর, প্রতি প্রাঙ্গনপ্রান্তর, বাঁধান তুলসীবেদী, প্রতি দীপটি পর্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিল না, পীড়ার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর সমস্ত কাজকর্ম সমাধা

করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে এ কি অসহ সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে, এ কি মধুর নিশাযাপন! বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও ধূষর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালিপুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে। সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত একমুহূর্ত কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধদৃষ্টি সজোরে উদঘাটিত করিয়া সমস্ত হৃদয় আনন্দে মাধুর্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে।আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমিষের জন্যও স্বামী হইতে বিছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না! এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাবার পথ ছিল, অথচ, সে বৃথায় এতদিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থিরবিশ্বাস হইয়াছে তিনি ডাকিতেছেন।

বিরাজ দৃঢকণ্ঠে বলিল, ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার যে, তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! আমার বিচার করিবার অধিকার আমার নয়, তাঁর। যা করিবার তিনিই করিবেন, আমি সব-কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব। বিরাজ প্রত্যাবর্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাটির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি

করিতে লাগিল, এ কি বিষম ভুল! এ কি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই কুরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সুমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সতর

পুঁটি দাদাকে মুহূর্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগর, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। তার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভারাক্রান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন-জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণদেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায়—দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনি হয়। তেমনিই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণে উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে। আগে সে এমন করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত, আর দুদিন যাক। কিন্তু দুদিন করিয়া চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ি ছাড়িয়া আসিবার দিনে মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলো বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া সে হয়ত মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিদিকে একটুখানি মাধুর্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময় নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত সংসারের এমন কোনও দুঃখ,

কোন হেতু সে কল্পনা করিতেও পারে না যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, পুঁটি আর ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেন অন্ত রহিল না। সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিরা আসিয়া বলিল, দাদা, বাড়ি যাই চল। নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইয়া যাইবার কথা ছিল। পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, একটা দিনও আর থাকতে চাইনে, কালই যাব।

তাহার রুষ্টভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষন্নভাবে হাসিয়া বলিল, কেন রে পুঁটি?

পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কি হবে থেকে? তোমার ভাল লাগচে না, তুমি যাই যাই করে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠচ, না, আমি কিছুতেই একদিনও থাকব না।

নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যাব রে? এ দেহ সারবে বলে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—তাই চল বোন, যা হবার ঘরে গিয়েই হোক।

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুমি সদাসর্বদা তাকে এমন করে ভাববে? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্চ।

কে বললে আমি তাকে সর্বদা ভাবি?

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল, কে আবার বলবে, আমি নিজেই জানি।

তুই তাকে ভাবিস নে?

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, না, ভাবিনে। তাকে ভাবলে পাপ হয়।

নীলাম্বর চমকিত হইল—কি হয়?

পাপ হয়। তার নাম মুখে আনলে মুখ অশুচি হয়, মনে আনলে স্নান করতে হয়,—বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি একনিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পুঁটি!

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন, ছেলেবেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শুনে নাই। এখন বড়বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে, সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুরবেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্নে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরন। ছেলেবেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমলস্বরে বলিল, কি রে?

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর তাহার মাথায় উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার সুরে বলিল, আর বলব না দাদা!

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, আর ব'ল না।

পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখের ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়। পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কেন সে আমাদের এমন করে ফেলে রেখে গেল!

কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্বযামী তিনি জানেন। সে নিজেও জানত না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আত্মহত্যাই করত, এ কাজ করত না।

পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, কিন্তু—এখন, তবে কেন আসে না দাদা?

কেন আসে না? আসবার জো নেই বলেই আসে না দিদি, বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাকলে সে ফিরে আসত—একটা দিনও কোথাও থাকত না। এ কথা কি তুই নিজেই বুঝিস নে পুঁটি?

পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝি দাদা।

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, তাই বল্ বোন; সে আসতে চায়, পায় না। সে যে কি শাস্তি পুঁটি, তা তোরা দেখতে পাসনে বটে, কিন্তু চোখ বুঝলে আমি তা দেখি! সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় করে আনচে রে, আর কিছুই নয়।

পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন-তখন বলত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখতে পায়; আর সাধ, সীতা-সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেচে।

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, তোরা সবাই তার অপরাধ দিস্, বারণ করতে পারিনে বলে আমিও চুপ করে থাকি, কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কি করে বল্ দেখি? তিনি ত দেখচেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল্, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্বাদ না করে কি করে থাকি? না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান করুন, যেন পরজন্মেও তাকে পাই। সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল।

পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল,সহসা তাহার মনে হইল, দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু, আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও একলা ছেড়ে দেব না।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনুদ্দিষ্ট মৃত্যুশয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ! এখন সে বাড়ি যাইতেছে। তাহার দুর্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে ততই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন

কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাশি যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে, মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। এ কি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ-জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাতজোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হাটবার ছিল। প্রভাত হইতে সেই পথে গরুর গাড়ি চলিতে লাগিল। সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়ো মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া তাহাকে গাড়ি করিয়া তারকেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশেপাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌর কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

আঠার

কঠিন ব্যাধিপীড়িত কত নরনারী কত কামনায় এই দেবমন্দির ঘেরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেকদিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে তাই লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল। কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জয় শীতে ও অনাহারে ছয়দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর—সে তারই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অপরাহ্ন না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠায় মৃতকল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, বুঝি, আজই সব সাঙ্গ হইবে এবং তখন হইতেই মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্যদিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এতদিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানাইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এ জন্মের কোন দাবী রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায়, ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন এ জন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হইতে পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে। কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব অভিমানের সুর

অনির্বচনীয় মাধুর্যে বাজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই বলিতে লাগিল, কেন তবে তুমি বলেছিলে!

অজ্ঞাতসারে কখন তাহার পঙ্গু বাঁ হাতখানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, সে টের পায় নাই, সহসা তাহারই উপর একটা কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। যে ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আহা হা—কে গা, এমন করে পথের উপর শুয়ে আছ? বড় অন্যায় করেচি—বেশী লাগেনি ত?

চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর আর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাম্বর। সে একবার একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণে সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ছিল না, চক্রবালবিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, ওই রোগা মেয়েমানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েচি বোন, দেখ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস—বোধ করি ভিক্ষুক।

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা তোমার বাড়ি কোথায়?

সাতগাঁয়, বলিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিল।

বিরাজের সবচেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার জো ছিল না। ওগো এ যে বৌদি, বলিয়া সেই মুহূর্তেই পুঁটি সেই জীর্ণশীর্ণ দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল, এখানে কাঁদিসনে পুঁটি, ওঠ, বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণদেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

চিকিৎসার জন্য, উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই তাহাকে রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল, আর কটা দিন বোন? যেখানে যেমন করে ও থাকতে চায়, দে। আর ওকে তোরা পীড়াপীড়ি করিস নে।

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি ভীষণ তৃষ্ণা , তাহা যে-কেহ চোখে দেখে সে-ই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে , কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে।

নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না এবং প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, ভগবান, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে , তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।

গৃহত্যাগিনীর গৃহের উপর এই নিদারুণ আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কন্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের

কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, ছোটবৌ না?

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।

পুঁটি কোথায়?

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্চে।

উনি কৈ?

ও ঘরে আহ্নিক কচ্চেন।

তবে আমিও করি, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তারপর ছোটবৌয়ের মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি আজই চললুম বোন, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমনি কাছে পাই।

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল , ছোটবৌ , সুন্দরীকে একবার ডাকতে পারিস?

ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, আর তাকে কেন দিদি? সে আসবে না।

আসবে রে আসবে। একবার ডাকা—আমি তাকে মাপ করে আশীর্বাদ করে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোন ক্ষোভ নেই। ভগবান আমাকে যখন ক্ষমা করেচেন , আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা করে যেতে চাই।

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এ আর ক্ষমা কি দিদি? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—তিনি তোমাকেও নিতে বসেচেন।

একটা হাত নিলেন, চোখ নিলেন , তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—

বিরাজ হাসিয়া উঠিল। বলিল, কি করতিস আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নাম রটেচে—আমার বেঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন।

ছোটবৌ গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম—ওতে আমরা ভয় করিনে।

তোরা করিস নে, আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যতটুকুই হয়ে থাক ছোটবৌ, তার পরে আর হিঁদুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানের দয়া নেই বলচিস, কিন্তু—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার সুরে চেঁচাইয়া উঠিল, ওঃ ভারী দয়া ভগবানের!

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল, তাঁর এতটুকু দয়া নেই, এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী, তাদের কিছু হল না, আর আমাদের তিনি এমনই করে শাস্তি দিচ্চেন।

তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কি মধুর, কি বুকভাঙ্গা হাসি! তারপরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, চুপ কর্ পোড়ারমুখী, চেঁচাস্ নে।

পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তুমি ম'রো না বৌদি, আমরা কেউ সইতে পারব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, আর দুটো দিন বাঁচ।

তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর ত্রস্তপদে কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা মুখে আসিল, সে তাই বলিয়া ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল। এইবার বিরাজের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল।

ছোটবৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই, সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিরাজ অবনত ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাঁদিস নে পুঁটি, শোন্।

নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। বিরাজ বলিতে লাগিল, না বুঝে তাঁর দোষ দিস না পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার, তবু যে কত দয়া, সে কথা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা, সে কথা আমি গেলেই তোরা বুঝবি। আর বলচিস— একটা হাত আর একটা চোখ নিয়েচেন, সে ত দুদিন আগে পাছে যেতই। কিন্তু এইটুকু শাস্তি দিয়ে তিনি তোদের কোলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, সেটা কি করে ভুলবি পুঁটি?

ছাই ফিরিয়ে দিয়েচেন, বলিয়া পুঁটি কাঁদিতেই লাগিল।

ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্মবিচারের একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করিল না। বরং সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। খানিক পরে বিরাজ বলিল, পুঁটি, অনেকক্ষণ দেখিনি রে, তোর দাদাকে একবার ডাক্।

নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, আসিতেই ছোটবৌ বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া স্ত্রীর ডান হাতটা সাবধানে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। সত্যই বিরাজের আর কিছু ছিল না। সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে এবং ইহারই অবসানের সঙেগ খুব সম্ভব সমস্তই শেষ হইবে, তাহা সে পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল, এখন তাহাই বুঝিল।

বিরাজ বলিল, বেশ হাত দেখ, বলিয়াই হাসিল।

সহসা সে মর্মান্তিক পরিহাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই যে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা সকলেরই মনে পড়িয়া গেল। বেদনায় নীলাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিরাজও বোধ করি তাহা দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ

অনুতপ্ত হইয়া বলিল, না, না, তা বলিনি—সত্যিই বলচি, আর কত দেরি? বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিল, সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ?

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে 'করেচি' বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল।

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জ্ঞানে, অজ্ঞানে এতদিনের ঘরকন্নায় কতই না দোষ-ঘাট করেচি—ছোটবৌ, তুমিও শোন, পুঁটি তুইও শোন্ দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল—আর কিছু বাকী নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, এমনই করে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেও না, বলিয়া নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারোটার পর হইতে আবার সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা—কিন্তু, সব কথার মধ্যে অত্যুগ্র একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্তের ভ্রম কি করিয়া সে সতী-সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সেদিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া, ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তার পর, ভোরবেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আর সে চাহিল না, আর সে কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।

বৈকুণ্ঠের উইল

এক

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদীর দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ তাল সামলাইল তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্তি করিয়া দিল, তখনও পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলাসে উঠিতেই পারে নাই, তাই বলে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কৈ ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে।

বস্তুতঃ গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। ক্লাসে সে কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, গোকুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন কতশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য করে আবার চেষ্টা করে, সে-ই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসচে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়েক ছোট, তিন-চার ক্লাস নীচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া

ডবল প্রমোশন পাইয়াছে! পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আশীর্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরেসুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

দুই

আমার মা ভবানী কৈ গো? বলিয়া লাঠির গোটা-দুই ঠোকা দিয়া ইস্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারেব বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারি দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকী ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন; শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই শুরু করিয়া দিলেন, হাঁ রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্স্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন। ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেডমাস্টার মশাইয়ের পর্যন্ত তাক লেগে গেছে আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েচে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না! আমি এই বলে যাচ্ছি আজ ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই গোক্‌লো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এতবড় গাধার সদ্দার মা, এক্‌জামিনের দিন আমিও ত ছিলুম এদের পাহারায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে দিব্যি বই খুলে কাপি করে দিলে—ওরই ডাইনে-বাঁয়ে মল্লিকদের দুই ছেলে বই খুলে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখলুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইশারা পর্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, কোনদিকে চোখ পর্যন্ত ফেরালে না নইলে আশু মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হতে পারে না ! সত্যি কিনা, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ

দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাস্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অস্থি-মজ্জাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখেছিল, তুমি শুধু কোনদিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খুব মন দিয়ে পড়লে আসচে বছর ও-ও ফার্স্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়ুয্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোক্লোকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে জিহ্বার দ্বারা তালুতে একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোক্লো হবে ফার্স্ট। পূবের সূয্যি উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্স্ট হবে মা সে ঐ তোমার বাঁ-দিকে শুনচে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ একটুখানি কাষ্ঠহাসির রসান দিয়া

বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জাশরম আছে! উলটে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে ‘আমি পাশ হইনি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সক্কলের প্রথম হয়েচে! তোদের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্ ত রে!’ শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্স্ট হয়েছে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোটভাইটিকে যে কত ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এইসময়ে পাশের ঘরের এক ঝলক আলো মাতা-পুত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাঁহার মনে যেন একটু খটকা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্বোধ সপত্নীপুত্রকে বুকে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। সুতরাং এই তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখনও বেশি কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিনোদের জজিয়তি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখে

আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্‌লো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ করে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বাহ্লেই হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখাদেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্য সত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা! দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাকতে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়াতে দেব না। এমন রাগ ত দেখিনি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ করতে কখনও দেখেছ?

এ তবে তোমার কি-রকম কথা শুনি? ছেলেবেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করিনি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোটছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কিনা, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার

অবর্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি।

স্বামীর অবিদ্যমানতার কথায় ভবানীর চোখের কোণ একমুহূর্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচই বুঝতে পারবে? ওকে হয়ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠকিয়ে নেবে, সে কথা সত্যি। তা নিক, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা-লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠর নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক, কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেচে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচ চৌদ্দ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকী দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দু'চক্ষু বুজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিয়ে যাও। বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখচুম্বন

করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না; কিন্তু কোনদিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সহপাঠীদের বিদ্রূপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

তিন

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গঞ্জের ভিতর সে মুদীর দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোলদারি দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলো বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্বাঙ্গে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চললুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দু'টিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়ত বাঁচাতে পারব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজি হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনোদিন কোন দুঃখ পাইনি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া

উঠিল। ভবানী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোটবৌ, আমার অবর্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দু'দিনে নষ্ট করে ফেলবে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না—সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—আমার গোকুলকেও হয়ত ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না।

তোমার গায়ের রক্ত-জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাকব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবচি ছোটবৌ, আমি ভগবানকে পর্যন্ত মন দিয়ে ডাকতে পারচি নে! কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পারবে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশভাবে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পারব। তোমাকে ছুঁয়ে বলচি পারব। আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও। এ সময়ে তোমার মনে যেন কোন ক্ষোভ, কোন ক্লেশ না থাকতে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমিষমাত্র দেরি না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখচে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই হোক—গোকুল তাকে ফেলতে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখবেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যে কি শূলবিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্বনাশের পথ যখন নিজেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্নকালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দৃঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটী হইতে যে দুইজন কর্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে-বেটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে না গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আসত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ধিক্কারে বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস আমি আশীর্বাদ করে যাচ্চি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এভাবে চিরকাল কাটাতে পারবে না। দেখিস বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস নে। আর এই তোমার মা রইলেন— অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল!

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হতে দেখলে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজবে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া শুধু চুপি চুপি বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চললুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুমিত্র দু-ই তাঁর একটু বেশি পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়াইয়া গেল। আবার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহারা কৃপণ বলিয়া, চশমখোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারাও অস্বীকার করিল না যে, আর যাই হোক লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশী কাহাকেও কোনদিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল, আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস নে বাবা যে, ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই মরতে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে

কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্যাদাটুকু বজায় রাখিস বাবা!

চার

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম-ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাথায় একেবারে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসা করে এই সব রটাচ্চে।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই লাঠি ঠকঠক করিয়া আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে শুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায়নি শোয়নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল?

গোকুল তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধিনি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজকর্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন-তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট করবে, তখন যেন তারা কথা কয়। বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হয়ে গেল, তা আমরা কোন্ ছার! কি যে বাবার কানে কানে ফুস্ ফুস্ করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সবদিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত-পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়!

মেয়েমানুষের জাতটাই এম্‌নি! বলিয়া, তাঁহাকে ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। একে দোকানদার তাহাতে মূর্খ, গোকুলের কথাই এমনি সকলেই জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধা-বাঁধন থাকিত না। ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্নবেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল

তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া ম্লানমুখে, বিনীতভাবে বলিল, মাস্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচাটা দিতে এলুম।

থাক থাক, সেজন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কৈ আজও ত বিনোদ এলো না মাস্টারমশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই তীব্রভাবে সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না না, তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাস্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আসচে না। আমার মুখ থেকে না শুনলে সে আর কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্বনাশই করলে! বলিয়া গোকুল সহসা আর্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া এবং তাহার এ-অবস্থায় কোনমতেই সে স্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, বার বার প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

পাঁচ

জয়লাল মাস্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুষ দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেকেই তাহার নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছটফট করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রুক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমনধারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে-মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ি বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভাবে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কলকাতার গাড়ি নেই যে তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরো গে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানাপানি পায় নাই বলেই চলে আসতে হ'লো।

গোকুল একমিনিটেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হ্যায় কিনা, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানাপানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্তী বহুদিনের কর্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারবেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই? বাড়িতে

মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না করলে আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখত রে, আমাদের গাড়ি কিনা! ঘোড়া দুটোকে হয়রান করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বললুম, আর বেটারা কিনা সত্যি মনে করে গাড়ি নিয়ে ইস্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সৎমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্তি। কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হনহন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও, যাও, ওসব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়লি?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশকণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম করলে লোকে কি বলবে বল দেখি বাছা! যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসচে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েচে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা।

কে তাকে খবর দিল?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টারমশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েচে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হাহা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজকণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ-কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এ ক্ষেত্রে বড়বৌ বাহূল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্বে শ্বশুর বর্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সবল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দ্যাখো, যা বলবে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোনদিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাটতে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে শুতে বসতে—আমার চারটে পাশ-করা ভাই, আমার পাঁচটা পাশ-করা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-শরম থাকলে কি আর কথা বলবার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুমগুম পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার

বড়বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দায় একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখচি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হতে থাকলে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাকতে পারিনে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে, তত ঠকিয়েচে। ঠকাক, আমার কি? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বসবে। বলিয়া বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? কোন্ শালা বলে? এ-সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ করতে পারি তা জানিস? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুকলে দরোয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে।

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চিৎকার করিতে লাগিল! ভবানী সেই যে নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া একসময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

ছয়

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকি রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকি রহিয়াছে, সে কথা বাড়িসুদ্ধ সকলকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে-কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল, সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক, ষোল আনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ূয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃবৎসল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন আর মনে মনে

বলিয়াছেন, আরে, সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে-পুরাণে যা কস্মিনকালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে! সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন, একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই।

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কিনা!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও যখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল।অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কইতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা একসময়ে স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া এইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাবগতিক দেখচ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না। কি হয়েচে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। তোমার সঙ্গে কথা-টথা কইচেন ত?

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না।

মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নিচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা! যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু'হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাকলে ত আমাদেরই থাকত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেচেন। আমাদের তিনি সর্বনাশ করবেন—আর সে-কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্তা

বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত 'মা' 'মা' করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বৈ নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? না না, আমার সব কথা অমন করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে, অমন 'মা' 'মা' করে গলে গেলে সবদিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি! বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব শঙ্কায় গুরগুর করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণমুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ-একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনধারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চলবে না। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক একটু চাকরি-বাকরি করে মাকে নিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার যা হোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোক যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না।

বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বলতে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়। বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি-সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্যোপলক্ষে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজকর্মের বাড়িতে বসে থাকলে ত চলবে না মা!

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট করচে! বাবা তার বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি গোকুল, কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইনে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাকলে চলবে না। বিনোদকে ব’লো সে যেন চাকরি-বাকরি করে। আমার বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আর বেশী কথা কি! বলিয়া ভবানী মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাকরি-বাকরি করে যা ইচ্ছে করুক আমি কিছু জানিনে।

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন উনি?

গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল, বলবেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি! তাঁকে স্বীকার করতে হ'লো যে—না, বিনোদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ ষোল আনা রাগের কথা, তা বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দু'চক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝিনি? আমার কাছে কি চালাকি চলে? বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্কোত্তিমশাই? এতকাল এত করে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের বিষ। কথাবার্তা আর আমাদের সঙ্গে ক'ন না, সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, না না, বল কি বড়বাবু!

কি বলি? ওরে ও হাবুর মা, শোন শোন!

বাড়ির বুড়া ঝি কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে

দেখ।—কি বলিস হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখচিস? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সত্যি-মিথ্যে শুনলে ত? বলিয়া চক্রবর্তীর প্রতি একটা ইশারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে-কেহ দেখাশুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃপুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীনপো বৈ ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্ধমান থেকে ছোটপিসীমাদের আনতে যাব। এত গরজ নেই—আসতে হয় তিনি নিজে আসবেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালোমন্দ জানিনে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'র না, তা বলে দিচ্চি।

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বললেই ত আর আনতে পারিনে মা। ধারকর্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।

ভবানী অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে।

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি ম'লেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকাকড়ি বুঝেসুঝে খরচ করা দরকার। নিজের মা ত নেই। বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এতবড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বললে, গোকুল, তোর পিসীমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বলচ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এমনি করে জব্দ করা! লোকে বলবে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত একমুহূর্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা!

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনিনে মা, যে তুমি আমাকে এমনি করে বলচ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায়-ঘেন্নায় বাড়িছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব। থাকো তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাত

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেচে মা, কাকা এসেচে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়াছিল। সে ধড়ফড় করিয়া কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে?

মেয়ে কহিল, এখনও ওঠেন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বললে রে হিমু?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বকলে বুঝি রে?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, হুঁ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বললে—বল ত মা হিমু।

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানিনে ত বাবা!

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, এই যে বললি, জানিস। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না? আমি কাউকে বলব না রে, তুই বল না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল ত মা, কি কি কথা হ'ল? মা বুঝি বললে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, হুঁ বললে।

তার পর? তার পর?

হিমু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানিনে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস বৈ কি! তোর কাকা কি বললে?

কিচ্ছু বললে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বললে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

ফের জানিস নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে চড় কসাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ! সে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নানারকম করে নাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙ্গে যায়—এই ত? সে-সব কিছু আমার আর শুনতে বাকী নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে, তা বলে দিয়ে যাচ্চি। বলিয়াই তেমনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হাবুর মা, বলি, ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হলো? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি। যদু তার ব্যাগটা নিয়ে এলে আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুকলেন আর ত বার হননি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাকচিস ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'লো না বড়বাবু। আমি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাজকর্ম করে দিলুম। তিনি মাকে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ-মুখ বসে গিয়ে এক্কেবারে কালিবণ্ণ হয়ে গেছে।

গোকুলের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্যন্ত পেলে না—তার মনে মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। বাবাকে সে কি ভালই বাসত, তা তোরা সব জানিস? কি বলিস হাবুর মা? বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

হাবুর মা অনেকদিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বলতে বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল

যে! তবে কিনা বড় বড় লেখাপড়া করতে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে! অনার গ্রাজুয়েট্! বলি, এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে ক'টা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কৈ দেখিয়ে দে দেখি? লাটসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভদ্রলোককে বল্ গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিনতে পারলে? মুখখানি একবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি, না রে ?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিনতে পেরেচিস। আহা! চিরটা কাল তার হেসেখেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ-সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েচে, বল দেখি? আর উইল করে বিষয় দেব না বললেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে? ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন্ শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ করলে আমাকে যে বাবা বলে অর্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুলচিরে ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস!

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বৈ কি বাবু!

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল না! আর এই মা-টি! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'লো? ধর্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারী বিষয়—আজ বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ তার আটকাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয়? এ-সব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে না? এখন স-মানে না দিলে, তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!

হাবুর মা খুশী হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশায় ভাই তুই নে! তুমি দিলে ত আর কারুর না বলবার জো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খটকা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোনকে চিঠি লিখেচে, তা হলে জেল খাটতে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বৌ রাজী হয়, তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল হিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেচে রে?

হিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, হুঁ, উঠেই তার বসবার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজি ধরনে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখাসাক্ষাৎ

করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নীচে মেঝের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরন দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোট-ভাইয়ের মুখখানি দেখিবার আসায় মিনিট-পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্তী কহিল,বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়াও চক্কোত্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েছেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন। আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না, চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম খেকে উঠেন নি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রা আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে, বড়বাবু, ছোটবাবুর মুখের পানে চাইলে আর চোখের জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েছে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালিমাড়া হয়ে গেছে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটির উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই!

চক্রবর্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ লইয়া যাইতেছিল, গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিলো, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞাসা করি, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয়ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস তেমনি চলুক!

চক্রবর্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পারলে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ-সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বসলে? কে আছিস রে ওখানে—ভূতো? যা ত একবার চট করে আমাদের ভশ্চায্যিমশাইকে ডেকে আন। না হয় যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারব না। ওকে আমি আলোচালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ করতে পারব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বলবে—

আরে লোকে কি বলবে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেলব? তোমার এ-সব কি বুদ্ধি হ'লো, বল ত চক্কোত্তিমশাই? না না, ফর্দ-টর্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করার দরকার নেই। মুখে যা হোক একটু-কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক, বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্তদিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু কিছু কথাবার্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ঝঞ্ঝাটে হঠাং সেইদিকেই আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্ববেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বাসিয়া ছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, কলিকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাশা আর কি! বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্কহাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই; তা যাক, সে-সব হবে অখন—কাজটা চুকে যাক—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানোই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়ের রইল, এ একটা শুধু বুঝলে—না—তা যাক—সেজন্য কিছুই আটকাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার ত এমন

ফুরসত নেই যে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া অবধি এই কথাগুলোই সে মনে মনে মক্‌শ করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ-সব আমি ছোঁব না।

একমুহূর্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারা দিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্যে এসেচি—দু'দিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে। তা ছাড়া এ-সব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁকজমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ করেচে?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না বেশ আছি।

তবে, অমন করে শুলে যে?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'লো?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহন করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্ছে শুনেচ?

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরোও একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

মনোরমা বলিল, আমি? আমি ন্যাকা? এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও করিনে।

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কুলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুকজোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেকরকম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিছুতে কান দিও না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাজও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়িতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন?

আসবেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সামলাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুশী এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকানপত্র যা-কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বলবে, আমি জানিনে বাবা জানেন। ব্যস! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সে হাঁ-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্-মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল। সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কৈ না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মতলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেললুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্দুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ-সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ

করিলেন না এবং এই তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন কবিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসীমাদের যে আনতে গেল, কৈ তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বলতে পারিনে ত!

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা! এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ-মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছটফট করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ব-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রুক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজীতে আলাপ কচ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম হুজুর; ওঁদের কি বাংলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুনলেই বা তোমাকে বলবে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ-রকম করলে আমি ত একদণ্ডও টিকতে পারিনে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে! বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ-ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকের কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা

ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

নয়

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটীতে একমুহূর্তেই তিনি কর্মকর্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়ে-জামাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অমনি একটু টানিয়া দিয়া সৎ-শাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু স্নিগ্ধ-গম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে

লাগিলেন; কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধরতে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধরতে পারি, ধরবও, কিন্তু তোমাদের ত ছটফট করলে চলবে না বাবা। যেখানে বসতে বলব, যেখানে দাঁড়াতে বলব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই, তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে-সব এলোমেলো কথা যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছ, এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য করতে পারচ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্চেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেচি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করবো না, তুমি কি করচ না করচ।

পিতা খুশী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মামলা-মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস। শোননি মা, লোকে গাল দেয়, ‘তোর ঘরে মামলা ঢুকুক’। সেই মামলা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস করচি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক। একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমনধারাই করিলেন যে, ওয়াটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অতবড় গর্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অমনি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে-টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ’লো শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দ্দিষ্ট কর্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ-মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার

শ্বশুরের প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মামলা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্বনাশ হইল—প্রভৃতি ঈশারা-ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য গ্রহন করিতে না পারিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে বসো—দুটো কথাবার্তা হয়ে যাক।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা, এইবেলা। কিন্তু একটা সর্বনেশে মকদ্দমা যে বাধবে, সেও চোখের উপরই দেখতে পাচ্চি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুনলে বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার কৌঁসুলীর মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো একফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দু'পাতা ইংরিজী পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বলচেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখলে বাবা, যা বলেচি তাই। জিজ্ঞাসা করচেন কার মকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বলচি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্বস্ব নেবে সে কি বেশী কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বচ্ছরের মধ্যে দেখতে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাতকুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ-সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি

আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের মাসী কনের পিসী, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বলতে পারি। বলিয়াই নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি! আমি আর জানিনে বাবা, সব জানি। জেনেশুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুশি রাখো, যাকে খুশি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝলে না বাবাজী!

গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু তাঁহার কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তার কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায়মহাশয়ের উৎসাহের প্রাখর্যটা যেন ঢিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, আচ্ছা সে-সব পরামর্শ কাল-পরশু

একদিন ধীরে সুস্থে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী, হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই গোকুল হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায়মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না! টাকা ছাড়া কি মামলা-মকদ্দমা করা যায়? বিপক্ষের সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চলবে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁহার মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে? কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, এমন কি কুণ্ডুদের আড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাদপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

দশ

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারারাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষমূর্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃপুনঃ কহিতেছে; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উক্ত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয়-কুটুম্বেরা তখনও নাকি বাটীতে ছিল তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি? কি করতে পার তোমরা? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না তা বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ করবে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

গোকুল কহিল, সবাই বললে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে?

ভবানী বলিলেন, কৈ আমি ত জানিনে।

আচ্ছা, জানো কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি! বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারিনে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সন্মুখ হইতে ভয়ার্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে, তাই সেদিন সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরি তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্মকর্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল।

বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁহার ছেলেমেয়ে লইয়া বর্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়— ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্রকন্যা ছাড়া এ বাড়িতে আর যেন কোন মানুষ নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডুদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি

আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন অতিপ্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইহাদের বৈঠক বসিল; এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিকমত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তোমার কর্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যাঁ? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্কোত্তিমশাই, আরও যদি—

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী। চক্রবর্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি! আমি যা করব, তাই হবে। মাহিনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো।

চক্রবর্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্‌দার মাখাইয়া দিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সব্বাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় সুখে গর্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ-আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আসবার জো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে করচি মা, আমার নন্দলালকেই দেখিয়ে-শুনিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে যাব। আর যাই হোক, ও আমারই ত ছেলে!

তাই করে যাও বাবা। আমি সেইজন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথাই আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ-কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার-কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে? চক্রবর্তীমশাই অনেকদিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধকরি লোকে এত আশ্চর্য হইত না।

ভবানী একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেচেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন; দেখুন-শুনুন; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্তীমশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন, ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখলে বাবাজী।

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙ্গাত, বিদায় হও না! আবার ডেকে আনা হয়েচে? নেমকহারাম। জেলে দিলুম

না কিনা, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে; যা করেচে তা করেচে; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্তব্য ছিল আমার।

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হলে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া, হাসি চাপিয়া হেলিয়া-দুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা-প্রদর্শন, অনুনয়-বিনয় এবং পরিশেষে মর্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা

করচেন—আমার কি কোথাও থাকবার জো আছে। তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলেপিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবাব ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্চি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখনো বেঁকে বসেনি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা তোমরা দু'জনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে-তিনটের গাড়িতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জানো ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উলটে গেলেও হবার জো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার একঘন্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এগার

নিমাই যখন দেখিল তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুন ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাস্টারমশাই, মা যে তাকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার না তোমার মায়ের, গোকুল? তা ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে বাঁড়ুয্যেমশাই খুশি হইয়া বলিলেন, তবে পাগলামি করো না ভায়া; রায়মশাইকে বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তল্লাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাস্টারমশাই; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই ত

হ’লো না। নিষেধ শুনতে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ-সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবৎ নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলেন, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি আশীর্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথাসর্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, আপনার আশীর্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখতেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ-বাড়িতে একটি দিনও থাকতে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি বাঁড়ুয্যেমশাই। তা তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন, আর ভাই-ই হোন। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহন করব। কে আছিস রে ওখানে? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্‌ দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এ-সব চক্ষুলজ্জার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখতে পারব না—কোনমতেই না। তার বড় আস্পর্ধা। আমরা তাকে চাইনে তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করচেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি। বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই কহিলেন, তা হলে সে থাকবে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই ভয়ে বলিলেন, তা হলে রায়মশায়ের কি-রকম হবে?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশদিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেমনি প্রতি মুহূর্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবারও মনেও হইল না। কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার বাপ-ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্যে আর-একজনের সর্বনাশ করাটাই কি ভালো?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্বনাশ করেচি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা। বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পর আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আর কোন মতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য গোকুলকে

লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারিনে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাকব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তার পর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞেসা করেই বাসা করা হয়েচে নাকি?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম. এ. পড়া তা হলে ছাড়লে বল?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোটভাইয়ের এই এম. এ. পাশের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া

হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েটে'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মখমলের বাক্সসুদ্ধ জিনিসটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল সেকরা ডাকাইয়া এই দুর্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম. এ.-র মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কিভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ-হেন এম. এ. পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী; যে-সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখিনি মা। যেখানে খুশি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ-কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভেঙ্গাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুশি। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলেপিলেগুলো পটপট করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম দ্যাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

বার

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাবে, তারই সর্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধমক খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।

নিমাই আসিয়া কহিল, এটা ত ভাল কাজ হচ্ছে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল।

কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুন তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্ছেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুনলে আমার অখ্যাতি করবে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাইনে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন প্রয়োজন দেখিনে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্‌, সাফ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ি ফেরত দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না।

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পারবে। আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেননি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হ'ত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্চি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না। বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে তোমার মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ির চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহারে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু খানিক পরে সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে-মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নির্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেমনি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা-আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগ করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুশি হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ শখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবার তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে-সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে, রেঁধে খাওয়াবে কে? মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ-ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ-শাশুড়ি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙ্গা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল; এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্মে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাসকাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার বার্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তার পরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরি করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই; কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এইদিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি, হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি— সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেন নি বুঝি? যাই, কাজকর্ম করবার লোকজন গিয়ে

পাঠিয়ে দিই গে? যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে খবর দি গে হাবুর মা, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্র অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ‘শনিবারের রাত্রি’ করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে সমস্ত

অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'তো। আমার যে এতে অপমান হয়।

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'সো।

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া সেদিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুন সেদিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশী বাজিয়াছিল। সর্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চালটা টের পেয়েচ ত?

কথার ধরনে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদু-গম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখচি মকদ্দমা জিতেচ! বি. এ., এম. এ. পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'লো না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখমুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্খনো না মাস্টারমশাই, কখ্খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুকতে দিয়ো না ভায়া, সর্বনাশ করে তোমার ছাড়বে।

এ কথাটাও গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁড়ুয্যের কথাগুলো শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায়মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা, হিমুকে কাছে লইয়া, পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারাদিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত। অভিযোগের ধরনটায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

মনোরমা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোনদিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বলচি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশায় ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

তের

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেকদিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যেহেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোসে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক।

কিন্তু এতবড় বিষয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটু বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে কোনদিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভুতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাস্টারমশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া

তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকালবেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাশা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল; বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কৈ রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রবেশ করিল।

হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু এখনো শেষ হয়নি।

হয়নি? বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল।

বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠান্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। মা কৈ রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না।

বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত | কহিল, সব মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে

পারিনে? বাবার এই হ'লো আসল উইল—তা জানিস হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যাননি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায়নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেচে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি। তা হলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি দেখচি।

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাশা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকরি হচ্চে কেমন?

চক্রবর্তী আশ্চর্য হইয়া কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে নাকি?

বিনোদ বলিল, শুনতে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাকতে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্বস্বর মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্তী

সেদিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কিনা, লোকের প্যাঁচ-স্যাঁচ ধরতে পারে না।

কিন্তু তা হলে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সেই যে বললেন, মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি—না, কিছুতে না | আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্তা ছিলাম—তেমনি আছি ছোটবাবু।

বিনোদের দু'চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়। আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এমনি বোকাই ঠাউরেচে শালারা!

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোনার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচ শ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুনলেন না; বললেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম. এ. পাশ করে—যায় যাক আমার পাঁচ শ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেচি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েচে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁর দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে একভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকালবেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে একধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ, তাই এত লোক! যান আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আটকাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাওনি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, জুচ্চুরি করেছি? আমি জোচ্চোর? কোন্ শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই পুরানো দিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নি গে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নি গে যা—আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হবো।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা-হা, থাক না গোকুল। কর কি, কি-সব বলচ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের সন্মুখে ডান-পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি চিৎকারে কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল—তোর দাদা জোচ্চোর | সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা-হা, কর কি বাবাজী। করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ-সব দিব্যি-দিলেসা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক-পা নড়ব না। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুনচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কিনা গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা-কিছু পাওনা।

ওপর থেকে বাবা দেখচেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসবে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি—

আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বলছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বলচি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

বড়দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন–সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল ও সলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাঠি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে, –এই ক্ষুদ্র কাঠিটির তখন বড় প্রয়োজন–উসকাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে তৈল এবং সলিতা সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ যেমন সে উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকিটুকু সে তেমন নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন–সে উসকাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙলাদেশের সহিত তাঁহার বেশি কিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম.এ. পাশ করে; কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না। সুরেন্দ্র বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না, এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়। এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি

কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথু ফেলাটি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই

কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া সুরেন্দ্র নামে লেখাপড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোনো কর্মই যে তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময় এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাইশ ঘন্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব হইতেই তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাঁহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত । আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা একমুখে রায়গৃহিনীর সুখ্যাতি না করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না-তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছলছল করিত, রায়গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার শখ এবং বাবুয়ানা করিবার গুপ্ত ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনিভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল । এমনি সস্নেহ-সতর্কতার মাঝে তাহার কখনও কখনও মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে; কখনও বা সে মনে মনে ভাবিত, বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয় ।

কিন্তু এক-একদিন আশেপাশের লোকগুলো গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল । একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেন্দ্রের মন্দ লাগিল না। বনের পাখির চেয়ে পিঞ্জরের পাখিটাই বেশি ছটফট করে। সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা উন্মত্তের মত পিঞ্জরের চতুর্দিকে ঝটপট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে-সকল উন্নতির আশা ছিল–তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু গৃহিনীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অট্টহাসি হাসিলেন যে, দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল!

গৃহিণী কহিলেন, তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও–না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে? যে জানে না, কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ির ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি ঘুম পাইয়াছে – তোমার সুরো তাও পারে না। তারপর আবার হাসি।

হাস্যের আধিক্য-দর্শনে রায়মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না । বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া

খাওয়া শ্রেয়; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম.এ. পাশ করিতে পারে–উদরান্নের জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে–ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল । সবাই কিন্তু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে সে স্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়িতে বসিল এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ি পরিত্যাগ করিতেছে, অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না এবং সন্ধান পাইলেও যে সে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়মহাশয় গৃহিণীকে এ, পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, সুরো এখন মানুষ হইয়াছে–বিদ্যা শিখিয়াছে–পাখা বাহির হইয়াছে–এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে!

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন–কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল। এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না। মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারী হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না। এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয় । এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে–কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই; স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা, নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে–এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।

কতদিন হইল, সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে, বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই–সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। বাটীতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না–বড় লজ্জা করে এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটি যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?

লোকটা একটু বোকা ধরনের–না হইলে উপহাস করিত। সে বলিল, চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?

সুরেন্দ্র বলিল, আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?

সে কহিল, তূমি কি কাজ জান?

সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তুমি কি ভদ্রলোক? –সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

তবে লেখাপড়া শেখনি

কেন?

শিখেছি।

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, তবে ঐ বড়বাড়িতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে–একটা কিছু কাজ করিয়া দিবেই। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল–আবার ফিরিয়া গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান?

বাবুকে–

বাবু বাড়ি নেই।

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল–একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ি নাই। চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল–পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহে না। আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে–ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, বাবু বাড়ি আছেন, দেখা করবেন কি?

হাঁ।

তবে চলুন।

এটা আরও কঠিন!

জমিদারবাবুর প্রকান্ড বাড়ি। রীতিমত সাহেবী ধরনের সাজান আসবাবপত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়লণ্ঠন লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকান্ড মুকুর, কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ। এ-সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে। কারণ, তাহার পিতার বাটীও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র ভাবিতেছেল–সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,–তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে।

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই–কর্তা সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, কি প্রয়োজন?

আজ তিন দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল, বলিল, আমি–আমি–

ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ববঙ্গের জমিদার। মাথায় দুই-চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে–বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল। বড়লোক, অনেককে দেখিয়াছিলেন; তাই চট্ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?

কোন একটা–

কি একটা?

চাকরি–

ব্রজরাজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমি চাকরি দিতে পারি এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?

পথে একজনের সহিত দেখা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-ই আপনার কথা–

ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?

পশ্চিমে।

সেখানে কে আছে?–সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

তোমার পিতা কি করেন?

অবস্থাবৈগুণ্যে সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল–একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, সামান্য চাকরি করেন।

তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জন করিতে চাও?

হাঁ।

এখানে কোথায়

থাকো?

কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই–যেখানে সেখানে।

ব্রজবাবুর দয়া হইল । সুরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দু:খ

হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।

আচ্ছা, বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই?

না।

ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি,–কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না?

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, এখন কোথায় যাইবে?

কোন একটা দোকানে।

সেইখানেই আহার করিবে?

প্রতিদিন তাহাই করি।

তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ?

কিছু শিখিয়াছি।

আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে?

সুরেন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, পারিব।

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে তাহার মাথার ঠিক নাই, কেননা, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, যদি সে বলে, আমি বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে?

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, তা একরকম হইবে–

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বঙ্কু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।–পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব। তুমি

আমার বাড়িতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দ্যে এখানে থাকিতে পারিবে।

দ্বিপ্রহরের আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকিয়া কহিলেন, মা, একজন দু:খী লোককে বাড়িতে স্থান দিয়াছি।

কে, বাবা?

দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয় কিছু জানে, কেননা, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি.এ. ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অন্তত তোমার ছোট বোনটিকে সে নিশ্চয়ই পড়াইতে পারিবে। মনে, করিতেছি সে-ই প্রমীলার মাস্টার থাকুক।

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার বয়স সাত বৎসর। সে বোধোদয় পড়ে। বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্স্ট বুকের ভেকের গল্প পর্যন্ত পড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, লজেঞ্জেস প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।

Do not move.– সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল–Do not move–নড়িও না।

প্রমীলা পড়িতে লাগিল, Do not move–নড়িও না।

তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া শ্লেট টানিয়া লইল–পেন্সিল হাতে করিয়া আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রব্লেমের পর প্রব্লেম সল্ভ হইতে লাগিল–ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তারপর নয়টা বাজিতে লাগিল। প্রমীলা কখনও এ-

পাশ কখনও ও-পাশ ফিরিয়া, ছবির পাতা উল্টাইয়া, শুইয়া বসিয়া লজেঞ্জেস মুখে পুরিয়া নিরীহ ভেকের সর্বাঙ্গে মসীলিপ্ত করিতে করিতে পড়িতে লাগিল, Do not move–নড়িও না।

মাস্টারমশাই, বাড়ি যাই?

যাও।

সকালবেলাটা তাহার এইরূপেই কাটে। কিন্তু, দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে

উপায় হয়, এজন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া দু-একজন ভদ্রলোকের নামে খানকতক পত্র দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলি পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ি, কয়টা জানালা,

বাহিরে কতগুলি ঘর, দ্বিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্প-পোস্ট আছে কি না, তাহার পর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসে।

কলিকাতায় আসিয়াই সে কতগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ি হইতেও কতগুলি লইয়া আসিয়াছিল। এখন সেইগুলি সে গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, নাহয় বলে, ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইল ব্রজরাজবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে–বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাক–তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী যে এই তার ষোল বৎসর বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে–ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া ঘটা করিয়া তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের অনেক টাকা,–তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলেটির বিষয়-আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই, শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান, সৎ, সাধুচরিত্র লক্ষ্য করিয়া মাধবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এগার বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীব কাছে ছিল। যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা সবই সে পাইয়াছিল।

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সব সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া, তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময় মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, মাধবী, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাহিতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে আজীবন ক্লেশ পাইবে, এইটি আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না–

দরবিগলিত অশ্রুরাশি যোগেন্দ্রের শীর্ণবক্ষে ঝরিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিও –

যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন

দেখিবে তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও–আর কি বলিব, মাধবী–আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল–মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।

সৎপথে থাকিও–তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।

সেই অবধি মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ

প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত সবগুলি সে ইহজন্মের মত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে-সব যায় না,–মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য পরের হিংসা করিব! কাহার জন্য পরের চোখে জল বহাইব! আর এ সকল হীন প্রবৃত্তি তাহার কোন কালেই ছিল না, বড়লোকের মেয়ে–কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত ছিল না–হিংসা-দ্বেষ কোনদিন শিখেও নাই।

তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুলগাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনো তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভুমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই, এতটুকু মুখ ভারী করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিনী যেদিন পরলোকগমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত; কেহ কাহাকেও দেখিত না, কেহ কাহারও পানে চাহিত না। সকলেরই এক-একজন ভৃত্য মোতায়েন ছিল, তাহারা আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধনশালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাতপাড়িয়া বসিয়া খাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। সে দুঃখ কেহ চাহিয়াও দেখিত না।

কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, 'বড়দিদি', সবাই বলে মাধবী। বাড়ির পোষা কুকুরটা পর্যন্ত দিনান্তে একবার 'বড়দিদি'কে দেখিতে চাহে। এত লোকের মধ্যে সেও যেন একজনকে স্নেহময়ী সর্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির প্রভু হইতে সরকার,

গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে বড়দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হোক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবি আছে।

স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, দেখিব কি না তাহাও জানি না, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু, এই ব্রজবাবুর সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল। তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরনের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাইল। সকলে যখন একজনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু, অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, 'বড়দিদি' বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতায় রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের জন্য নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনে কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে।

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি–যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া

গিয়াছে। প্রথমে কৌতূহল হইত, সে জিজ্ঞাসা করিত, এ সব কোথা হইতে আসিল? উওর পাইত, বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জলখাবারের থালাটি পর্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে, ইহাতে বড়দিদির সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছে।

অঙ্ক কষিতে বসিয়া একদিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল; প্রমীলাকে কহিল, প্রমীলা! বড়দিদির কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে এস।

কম্পাস লইয়া বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল

না; কিন্তু বাজারে

তখনই সে লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার টেবিলের উপর প্রার্থিত বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। পরদিন সকালে প্রমীলা কহিল, মাস্টারমশাই, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সে এমন এক-আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত যে, মাধবী সেজন্য বিপদে পড়িয়া যাইত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখনও সে বলে নাই, দিতে পারিব না।

কিংবা কখনও সে হঠাৎ হয়ত প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদির নিকট হইতে পাঁচখানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস; ভিখারীদের দিতে হইবে। নূতন-পুরাতন বাছিবার অবসর মাধবীর সব সময় থাকিত না; সে আপনার পাঁচখানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ হইতে দেখিত–চারি-পাঁচজন দুঃখী লোক কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেহে–তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোটখাটো আবেদন-অত্যাচার নিত্যই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশ এ সকল এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে, মাধবীর আর মনে হইত না, একটা নূতন জীব তাহার সংসারে আসিয়া দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাঝখানটিতে নূতন রকমের ছোটখাটো উপদ্রব তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। এই নূতন জীবটির জন্য মাধবীকে আজকাল খুবই সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশি খোঁজ লইতে হয়। সে যদি সব জিনিস চাহিয়া

লইত, তাহা হইলেও মাধবীর অর্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত; সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না–এইটিই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে সে জানিতে পারে নাই যে, সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। প্রাতঃকালে চা ঠান্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত খায় না। জলখাবার হয়ত স্পর্শ করিতেও তাহার মনে থাকে না, হয়ত বা কুকুরের মুখে তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। খাইতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনের সে কোন সম্মানই রাখে না, পাশে ঠেলিয়া

নিচে ফেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া যায়; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরে না। ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, মাস্টারবাবু পাগলা, কিছু দেখে না, কিছু জানে না–বই নিয়েই বসে আছে।

ব্রজবাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কি না। সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সেসব শুনিতে পায়, সে-ই কেবল বুঝিতে পারে যে, চাকরির জন্য মাস্টারবাবুর একতিল উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই। যাহা আপাতত হইয়াছে, তাহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট। বেলা দশটা বাজিলেই বড়দিদির নিকট হইতে স্নানাহারের তাগিদ আসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্যন্ত বই লইয়া বসিয়া থাকিলে ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনে না-বড়দিদির হুকুম।

একদিন মাধবী পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাস্টারও ঠিক তেমনি।

কেন মা?

দু’জনেই ছেলেমানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না, তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়, কখন কি করা উচিত, তার মাস্টারও সেইরকম, নিজের কিছুই বোঝে না–অথচ, অসময়ে এমনি জিনিস চাহিয়া বসে যে, জ্ঞান হইলে তাহা আর কেহ চায় না।

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, তোমার মেয়েটি বোঝে কখন তার কি দরকার?

তা বোঝে না?

অথচ, অসময়ে উৎপাত করে ত?

তা করে।

মাষ্টারবাবু তাই করে–

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, ছেলেটি বোধহয় একটু পাগল।

পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া জানিলে?

মাধবী জানিত না, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে নিজের একটি কাজও নিজে করিতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না–এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকটে ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত–এটা তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস। বিশেষ এই নূতন ধরনের আহার-প্রণালীটা মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেনা, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্বক আহার করে না–কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা,–খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না–এ সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত। একটা অজ্ঞাত করুণাচক্ষুও সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাষ্টারবাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহে না, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই সে চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময়-অসময় থাকে না–একেবারে বড়দিদির নিকট আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয়, এ লোকটি নিতান্ত বালকের মত সরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোরমা মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, বড়দিদি ! মাধবী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

মাষ্টারমশায়ের চশমা কোথায় হারিয়ে গেছে–একটা চশমা দাও। মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

তোমার মাস্টারমশায়কে বল গে, আমি কি চশমার দোকান করি? প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল,

কোথায় যাচ্ছিস?

বলতে।

তার চেয়ে সরকারমশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রমীলা সরকারমশায়কে ডাকিয়া আনিলে, মাধবী বলিয়া দিল–মাষ্টারবাবু চশমা হারিয়েছেন, ভাল দেখে একটা কিনে দাও গে।

সরকার চলিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল–

প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন–তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্বে সে কখনও বাটীর বাহিরে হয় নাই–সংসারের কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার একদন্ডও চলে না। আমার অর্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে,–তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্মণ্য লোকটিকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চুপ করিয়া উপবাস করে।

হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাহার মনেও পড়ে না যে, তাহার আহার হইয়াছে কি না! একদিনের জন্যও সে আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে না। তাই ভাবি এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন? শুনিতে পাই, তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ। আমি ত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে

পারিতাম না!

মনোরমা তামাশা করিয়া উত্তর লিখিল–তোমার পত্রে অন্যান্য সংবাদের মধ্যে জানিতে পরিলাম যে, তূমি বাড়িতে একটি বাঁদর পুষিয়াছ, আর তুমি তার সীতাদেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি–মনোরমা।

পত্র পড়িয়া মাধবীর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল–তোমার পোড়া মুখ, তাই কাহাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জান না।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, প্রমীলা, তোমার মাস্টারমশায়ের চশমা কেমন হয়েছে?

প্রমীলা বলিল, বেশ।

কেমন করে জানলে?

মাস্টারমশায় সেই চশমা চোখে দিয়ে বেশ বই পড়েন–তাই জানলুম।

মাধবী কহিল, তিনি নিজে কিছু বলেন নি?

কিছু না।

একটি কথাও না? ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, কিছু না?

না কিছু না।

মাধবীর সদাপ্রফুল্ল মুখ যেন মুহূর্তের জন্য মলিন হইল; কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিল, তোমার মাস্টারকে বলে দিয়ো, তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।

আচ্ছা, বলে দেব।

দূর পাগ্‌লি, তা কি বলতে আছে! তিনি হয়ত কিছু মনে করবেন।

তবে কি বলব না?

না।

শিবচন্দ্র মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, দাদা, প্রমীলার মাস্টার রাতদিন কি পড়ে জান?

শিবচন্দ্র বি.এ. ক্লাসে পড়ে। ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষক-শ্রেণীর লোকগুলো তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া বলিল নাটক-নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে?

মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া বলিল, নাটক-নভেল বলে ত বোধ হয় না!

শিবচন্দ্র আগাগোড়া কিছু বুঝিল না, শুধু এইটুকু

বুঝিল যে, ইহার একবিন্দুও তাহার জানা নাই এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, এটা অঙ্কের বই, ইস্কুলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়। বিষণ্ণমুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, কোন পাশের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?

শুষ্ক হাসিয়া শিবচন্দ্র বলিল, না, কিছুই নয়।–কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কখনও সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে তাহাকে প্রাতঃকালটা প্রমীলার সহিত এক সঙ্গে এই মাস্টারটার নিকট খাতা–পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছুদিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, বাবা আমি দিনকতকের জন্য কাশী যাব।

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,–সে কি মা? তুমি কাশী গেলে এ সংসারে কি হইবে?

মাধবী হাসিয়া বলিল, আমি আবার তো আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত।

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরুপ কথা বলা অন্যায় হইতেছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।

তা যাও–কিন্তু মা, সংসার চলবে না।

আমি ছাড়া সংসার চলবে না?

চলবে না কেন মা, চলবে! হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন করে চলে–এও তেমনি চলবে।

কিন্তু, কাশী যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার বিধবা ননদিনী একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন,তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে।

কাশী যাইবার দিন সে প্রত্যেককে ডাকিয়া সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা ও প্রমীলাকে বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল; কিন্তু মাস্টারের কথা কাহাকেও কহিল না। ভুলিয়া যায় নাই–ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি

তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন কি সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে না থাকিলে ইহার কেমনভাবে দিন কাটে, দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্‌লেম সল্‌ভ করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, কাল রাত্রে দিদি কাশী গিয়াছেন।

কথাটা তাহার কানে গেল না। কিন্তু দিন দুই-তিন পরে যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না–কোনদিন বা একটা-দুইটা বাজিয়া যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখে বোধ হয় সেগুলি আর তেমনি পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সযত্ন-সজ্জিত নহে। রাত্রে গ্যাসের চাবি কেহ বন্ধ করিতে আসে না, পড়ার ঝোঁকে দুইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না। শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারে একটূ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে তবে লোকে পাখার সন্ধান করে। সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না?

সে বলিল, দিদি কাশী গিয়াছেন।

তাইত!

দিনদুই পরে হঠাৎ প্রমীলার পানে চাহিয়া সে কহিল, বড়দিদি কবে আসবেন ?

একমাস পরে!

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, প্রমীলা, একমাসের আর কত বাকি?

অনেক দিন।

পেন্সিল তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথ চশমা খুলিয়া কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল।

তাহার পর চক্ষে দিয়া পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কহিল, প্রমীলা, বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখ না?

লিখি বৈ কি!

তাড়াতাড়ি আসতে লেখনি?

না।

সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তাইত।

প্রমীলা বলিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না?

বেশ হয়।

আসতে লিখে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল হইয়া বলিল, দাও।

আপনার কথা লিখে দেব?

দাও।

'দাও' বলিতে তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেননা, জগতের কোন আদব-কায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে তাহার বড় ক্লেশ হয়, যাহার অবর্তমানে তাহার চলিতেছে না–তাহাকে আসিতে বলায় সে কিছুই অসঙ্গত মনে করিল না।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না। সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ খায় না। কৌতূহলী হওয়া সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে। যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে স্বেচ্ছাপূর্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না, সময়ও পাইত না। তাই বড়দিদির সম্বন্ধে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন এ সংসারে তাহার অতিবাহিত হইল, এই তিন মাস ধরিয়া সে বড়দিদির উপর ভর দিয়া পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন।

কত বড়, কত বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না, জানিবার বাসনা হয় নাই, একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ত লোকের সাধ হয়!

সবাই কহে, বড়দিদি, সেও কহে, বড়দিদি। সবাই তাহার নিকট

স্নেহ-যত্ন পায়, সেও পায়। বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে সে পায়–সুরেন্দ্রও লইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ–জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ–স্নেহ-যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে সে-ই জল পায়। বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট-পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন। মোটের উপর সে এমনি একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল । আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল–আজও তাহাই আছে। শুধু এই কাশীগমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু সে বেশি জানিয়াছে যে, বড়দিদি ভিন্ন তাহার একদণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়িতে ছিল, তখন তাহার পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারও সহিত পরিচিত হয় নাই–যখন পরিচয় হইয়াছে, তখন সে এমনিই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনে না, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চেনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্বস্ব।

লোক যেমন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে-কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে,চক্ষে জল আসে,মুছিয়া ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে–কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুইটি কথা অস্ফুট উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথও অস্ফুটে উচ্চারণ করিল,’বড়দিদি’!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, পূর্বদিক রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল–মাস্টারমশায়! সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল–কি প্রমীলা?

বড়দিদি এসেছেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল। প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, চল, দেখে আসি।

এই দেখিবার বাসনাটি তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন যে সে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমীলা ডাকিল, বড়দিদি।

বড়দিদি অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কাজ করিতেছিল, কহিল, কি দিদি!

মাস্টারমশাই—

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মাধবী শশব্যস্ত দাঁড়াইয়া উঠিল; মাথার উপর এক হাত কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, বড়দিদি, তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে—মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিষম লজ্জায় জিভ কাটিয়া মনে মনে বলিল, ছি-ছি!

তুমি চলে গেলে—

মাধবী মনে মনে বলিল, কি লজ্জা !

মাধবী মৃদুকণ্ঠে কহিল, প্রমীলা, মাস্টারমশায়কে বাহিরে যাইতে বল।

প্রমীলা ছোট হইলেও তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, চলুন মাস্টারমশাই—

অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চল। বেশি কথা সে কহিতে জানিত না, বেশি কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন মেঘের পর সূর্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সেদিকে চাহিতে চায়, ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্যের পানে চাহিতে নাই, কিংবা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি একমাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্যোদয়ের সহিত সুরেন্দ্রনাথ পরম আহ্লাদে চাহিয়া দেখিতে

গিয়েছিল, কিন্তু ফল যে এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না।

সেইদিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল। মাধবী যেন একটু লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল । আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদির অসীম ভান্ডার সসীম হইয়াছে। ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদি আমার উপর রাগ করেছেন, না?

প্রমীলা বলিল, হাঁ।

কেন রে?

আপনি অমন করে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন কেন?

যেতে নেই, না?

তা কি যেতে হয়? দিদি খুব রাগ করেছে।

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল, তাইত–

তারপর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া ঝড়-জল আসিল। ব্রজরাজবাবু আজ দুদিন হইল বাড়ি নাই; জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না, প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতেছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া কহিল, প্রমীলা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েছিস।

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, নিয়ে আয়।

বড়দিদি, রাত্তিরে আনব।

না, এখনি আন্। নিতান্ত দুঃখিত মনে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, মাস্টারমশাই কিছুই পড়ায়নি–খালি আপনি পড়ে। মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, সত্যই মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করিবার পর, এই তিন-চারিমাস ধরিয়া বেশ ধীরে ধীরে সবটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, বিন্দু, মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়ান নি?

বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাস্টার তখন প্রব্লেম

ভাবিতেছিল। বিন্দু কহিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি বলচেন যে,আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়ান নি কেন? মাস্টারমশায় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, মাস্টারমশায়?

কি?

বড়দিদি বলচেন–

কি বলচেন?

ছোটদিদিকে পড়ান নি কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল,–ভাল লাগে না।

বিন্দু ভাবিল, মন্দ নয়। একথা সে মাধবীকে জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, ছোটদিদিকে একেবারে পড়ান নি কেন? কথাটা বার দুই-তিন জিজ্ঞাসা করিবার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, আমি পারব না।

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল, তবে আপনি কি জন্য আছেন?

না থাকলে কোথা যাব?

তবে পড়ান না কেন?

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল! ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কি বলচ?

বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল, সে ত রোজ পড়ে!

পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?

না। আমার সময় হয় না।

তবে এ বাড়িতে কেন আছেন?–সুরেন্দ্র চুপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

আপনি আর পড়াতে পারবেন না?

না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।

মাধবী ভিতর হইতে কহিল, জিজ্ঞাসা কর্ বিন্দু, কেন এতদিন তবে মিছা কথা বলে আসছেন? বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রের প্রব্লেমের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, তাইত, বড় ভুল হয়েছে।

এই চার মাস ধরে ক্রমাগত ভুল?

হ্যাঁ, তাইত হয়েছে দেখছি–তা কথাটা আমার তত মনে ছিল না।

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না,

সুরেন্দ্রেরও তত মনে হইল না। তার পরদিনও আসিল না–সেদিনও অমনি গেল।

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে কহিল, প্রমীলাকে ডেকে আন।

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়বেন না।

কার কাছে তবে পড়বে?

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, অন্য মাস্টার আসবে।

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই-তিন খানা বই বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চশমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, মাস্টারবাবু, এ সময়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বড়দিদিকে বলে দিও, আমি যাচ্ছি।

আর আসবেন না?

সুরেন্দ্রনাথ একথা শুনিতে পাইল না। বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্র ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সংবাদ দিল যে, মাস্টারমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

কোথায় গেছেন?

তা জানি না। বেলা নটার সময় চলে যান। যাবার সময় আমায় বলে যান যে, বড়দিদিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি।

সে কিরে? না খেয়ে চলে গেলেন? মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তারপর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল–সব জিনিসপত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চশমাটি খাপেমোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল–সুরেন্দ্রনাথ আসিল না। পরদিন মাধবী দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিয়া দিল, তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, বড়দিদি, তিনি চলে

গেলেন কেন?

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, বাইরে যা, কাঁদিস নে।

দুইদিন, তিনদিন করিয়া যতদিন যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, বড়দিদি, তা এত খোঁজাখুঁজি কেন? কলকাতা শহরে আর কি মাস্টার পাওয়া যায় না?

মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুই দূর হ! একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস খোঁজাখুঁজি কেন?

তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি করে জানলে ?

তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি?

বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাতদিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্নজল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত, সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে। যে বাড়ির জিনিস চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে? তাহার দৃঢ় ধারণা সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোটছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয়ত বা কোন ফুটপাতে বসিয়া কাঁদিতেছে, না হয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজবাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনদিন অনাহারে কাটিল, কলের জলে পয়সা লাগে না, তাই ক্ষুধা পাইলে পেট ভরিয়া জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল, সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান কোনরূপে অশ্বের বেগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচন্ড আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া

গেল। পুলিশ আসিয়া গাড়ি করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। চার-পাঁচদিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, বড়দিদি!

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে-রাত্রে

ডিউটিতে ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, বড়দিদি এসেছেন?

কাল সকালে আসবেন।

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ জ্ঞান হইল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না, প্রবল জ্বরে সমস্তদিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি হাসপাতালে আছি?

হ্যাঁ।

কেন?

আপনি গাড়িচাপা পড়েছিলেন।

বাঁচার আশা আছে?

নিশ্চয়।

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন?

কেহ না।

তবে সে-রাত্রে বড়দিদি বলে ডাকছিলেন কাকে? তিনি কি এখানে আছেন?

আছেন, কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না। আমার পিতাকে সংবাদ দিতে পারেন?

পারি।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে

স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে আসতে পারেন, আমরা সে বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানতে পারলে তাঁকেও সংবাদ দিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ব্রজরাজবাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

আমার বাসা ব্রজরাজবাবুর বাড়ির নিকটেই, আজ তাঁকে আপনার অবস্থা জানাব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখতে আসতে পারেন।

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিল–বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্রজবাবুকে সংবাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন–বাঁচবে ত?

সম্পূর্ণ আশা আছে।

বাড়ির ভিতর গিয়া কন্যাকে কহিলেন, মাধবী, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে। সুরেন গাড়িচাপা পড়ে হাসপাতালে আছে।

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তোমার নাম করে নাকি বড়দিদি বলে ডাকছিল। তুমি দেখতে যাবে? এই সময় পার্শ্বের কক্ষে প্রমীলা ঝনঝন করিয়া কি-সব ফেলিয়া দিল। মাধবী সেইদিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি দেখে এসো, আমি যেতে পারব না।

ব্রজবাবু দুঃখিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে বনের পশু, তার উপরে কি রাগ করে?

মাধবী কথা কহিল না। তবে ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, কহিলেন, সুরেন, তোমার পিতামাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?

সংবাদ দিয়েছি।

কোন ভয় নেই, তাঁরা আসলেই একটা বন্দোবস্ত করে দেব।

ব্রজবাবু টাকাকড়ির জন্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, বরং আমাকে তাঁদের ঠিকানা বলে দাও, যাতে তাঁদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তা করে দেব।

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, বাবা আসবেন, অসুবিধা আর কি আছে?

ব্রজবাবু বাড়ি ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন।

সেই অবধি নিত্য তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়াছিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মাধবী, তুমি ঠিক বুঝেছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান লোক।

মাধবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জানলে?

তার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাত্রে তিনি এসেছেন।

মাধবী মৌন হইয়া রহিল। তাহার পিতা কহিলেন, সুরেন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।

কেন?

ব্রজরাজবাবু কহিলেন, তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল। তিনি সেকথা সমস্ত বলিলেন। এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম. এ.পাশ করিলে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া তাঁহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে তিনি বাটী লইয়া যাইবেন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া লইয়া মাধবী বলিল, তাই ভাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছয় মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটিবার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল , আর লেখে নাই ।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল, তোর বাঁদর দেখা।

মাধবী হাসিয়া কহিল , বাঁদর কোথায় পাব লো?

মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল–

আমি এলাম ছুটে দেখব বলে,

কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর–

তোমার ঐ রাঙ্গা চরণতলে।

সেই যে পুষেছিলি?

কবে?

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে নেই! যে তোকে বৈ আর জানত না?

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল; তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ও– তাঁর কথা? তিনি আপনি চলে গেছেন।

অমন রাঙ্গা পা-দুটি তার পছন্দ হল না?

মাধবী মুখ ফিরাইল–কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল–কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষে একরাশি জল আনিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া কহিল, একি মাধবী!

মাধবী আর সামলাইতে পারিল না–চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমা বিস্ময়ের সীমা নাই–একটা উপযুক্ত কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল। তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল, একটা সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন!

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যে বিধবা দিদি!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দুইজনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

মনোরমা কাঁদিতেছিল মাধবীর দুঃখে–সে বিধবা, তাই বলিয়া। কিন্তু মাধবীর অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, যে তোকে বৈ আর জানত না–মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। এ কথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত। অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি।

কোন্ কাজটা?

তা কি বলে দিতে হবে বোন?–আমি সব বুঝেছি।

এই ছয় মাস ধরিয়া যে কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলেমানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল, কিন্তু গেল কেন?

আমি যেতে বলেছিলাম।

বেশ করেছিলে–বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছিলে।

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বোঝে নাই–তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, কিন্তু তিনি যদি না বাঁচতেন, তাহলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম। মনোরমা মনে মনে কহিল, –এখনি বা তার কম কি?

সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই কাগজ-কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল–

তুমি ঠিক বলিতে–স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই। আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেননা, মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না; সমস্ত স্ত্রীজাতিকে দোষ দিই–বিধাতাকে দোষ দিই–তিনি কি জন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল? তাঁহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্মাণ করা হয়। আর তোমার চরণে প্রার্থনা, যেন ঐ পায়ে মাথা রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে পারি। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,–সে আমার আজন্মের ধারণা ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আমাকেও

বেশি বিশ্বাস করিও না–শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইও।

তাহার স্বামী উত্তর লিখিলেন–

যাহার রূপ আছে, সে দেখাইবেই। যাহার গুণ আছে, সে প্রকাশ করিবেই। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে,–সে ভালবাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি–তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি–সেজন্য চিন্তিত হইও না।

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লিখিল–মাধবী পোড়ামুখী–বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর-একজনকে ভালবাসিয়াছে!

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিলেন। তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন,–মাধবী পোড়ামুখী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা, বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা–বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও

না। এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ-ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুইজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে। কাজকর্মে তেমন বাঁধুনি নাই—একটু ঢিলা রকমের হইয়াছে। সকলকে যত্ন-আত্মীয়তা করিবার ইচ্ছা তেমনই আছে, বরং বাড়িয়াছে–কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না–মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে,

‘বড়দিদি’, এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাত পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু একথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এ-সকল কথার আলোচনা যত না হয়, ততই ভাল। হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা একথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পারে নাই–অন্তরে একটু ব্যথা আছে। রূপ-যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,–এসব সে জানিত না। পূর্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভরশূন্য। কিন্তু কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এইটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই

যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে, আজও পরের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁতখুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, সুরো আজকাল বদলে গেছে।

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল; চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন–তিনিও একটা নূতন জিনিস দেখিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, সুরো, কেন বাবা? সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তারপর একখানা পোস্টকার্ড চাহিয়া লইয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল–বড়দিদি, আমার জ্বর হইয়াছে, বড় কষ্ট হইতেছে।

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেঝের উপর পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল সে বেদানার খোসা, বিস্কুটের

টুকরা , আঙ্গুরের তুলা এবং সেই চিঠিখানি, সব একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল,–সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ধুলা মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া , শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া অবশেষে একটা বাবলা গাছের তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রথমে সে একখানি মূর্তিমতী উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর–কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল –পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায়মহাশয় ইহা বহূদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেন্দ্রের মাতামহ পাবনা জেলার একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামে জমিদারি; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক,খরচপত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি

একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহূ অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন । তাঁহার অবর্তমানে সমস্ত বৈভব একমাত্র দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, রায়মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন। তাহাই হইল। রায়মহাশয় সংবাদ পাইলেন, শ্বশুরমহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন । কিন্তু পৌঁছাইবার পূর্বেই শ্বশুরমহাশয় পরলোকগমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারিতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্ক-বুদ্ধি প্রাচীন উকীল রায়মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে,প্রজারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

এখন সুরেন্দ্রের বিবাহ হওয়া আবশ্যক। ঘটকের আনাগোনায় গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাড়িতে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাড়িতেই ঘটকের দল ঘন ঘন পদধূলি দিয়া পিতামাতাকে আপ্যায়িত ও আশান্বিত করিতে লাগিল– এমনভাবে দুই মাস, ছয় মাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন, তাঁহার সর্ম্পকের যে কেহ ছিল, সেও আসিল–বন্ধু-বান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশি বাজাইয়া ঢাকের প্রচন্ড শব্দ করিয়া, কাঁসির খন্‌খন্‌ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায়মহাশয়ও আর নাই, ব্রজরাজ লাহিড়ীও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামী-দত্ত সমস্ত সম্পত্তি টাকাকড়ি লইয়া পিতৃভবনে বাস করিতেছেন।

আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। একদল লোক কহে, এমন বন্ধুবৎসল, উদারচেতা, অমায়িক ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে, এমন উৎপীড়ক, অত্যাচারী জমিদার এ-তল্লাটে কখনও জন্মায় নাই।

আমরা জানি এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টা তাঁহার ম্যানেজার মথুরনাথবাবুর জন্য সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে। তাহারা পরম সুখে সংসারের সাধ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক মদ-মাংস–কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না–আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মথুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্তহস্ত। কিন্তু এজন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার জো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটাছাড়া করিতে, কাছারিঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, তুমি নিজে জমিদারি না দেখলে সব যে জ্বলে পুড়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গে–তাইত, তাইত, এসব কথা কি সত্য?

সত্য নয়? নিন্দায় যে দেশ ভরে গেল–তোমারই কানে কেবল এসব পৌঁছায় না। চব্বিশ ঘন্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাকলে কি এসব কেউ শুনতে পায়? কাজ নেই অমন ম্যানেজারে, দূর করে তাড়িয়ে দাও।

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া

কহে, তাইত, কাল থেকে আমি নিজে সব দেখব। তাহার পর কিছুদিন জমিদারি দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মথুরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীরভাবে তখন কহেন, সুরেনবাবু, এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহে, দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি মথুরবাবু?

তবে আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাই।

সুরেন্দ্রনাথ অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে-গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন-মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেইদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ তিনদিন হইল–শান্তির স্বামিদর্শন ঘটে নাই। চার দিনের দিন সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

বাগানবাড়িতে।

সেখানে কে আছে যে, তিনদিন ধরে পড়েছিলে?

তাইত–

সব কথায় তাইত! আমি সমস্ত শুনেছি–বলিতে বলিতে শান্তি কাঁদিয়া কহিল–আমি কি দোষ করেছি যে, আমাকে পায়ে ঠেলছ?

কৈ তা ত আমি–

আবার কি করে পায়ে ঠেলতে হয়? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে?

তাইত–তা ওরা সব–

শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরও কাঁদিয়া কহিল, তুমি স্বামী, আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনিনে! আমি ত জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বলব কি! পাছে তুমি

লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্লেশ হয়, তাই কোন কথা বলি না।

শান্তি, কেন কাঁদ?

কেন কাঁদি! অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না–তোমারও মনে ক্লেশ আছে–তুমি আর কি করবে? তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানতে পারি–

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছিয়া সস্নেহে কহিল, তা হলে কি কর, শান্তি?

এ কথার কি আর উত্তর আছে? শান্তি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে শান্তি কহিল, তোমার শরীরও আজকাল ভাল নেই।

আজ কেন, পাঁচ বছর থেকে নেই। যেদিন কলকাতায় গাড়িচাপা পড়েছিলাম, বুকেপিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়েছিলাম, সে অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হই, কেমন করে বেঁচে আছি।

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিল, চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় যাই, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে–

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল–তাই চল। সেখানে বড়দিদিও আছেন।

শান্তি বলিল, তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করে, তাঁকে আনবে ত?

আনব বৈ কি! তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, নিশ্চয় আসবেন, আমি মরে যাচ্ছি শুনলে–

শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল–তোমার পায়ে পড়ি, আর ওসব বলো না।

আহা, তিনি যদি আসেন ত আমার কোনো দুঃখই থাকে না।

অভিমানে শান্তির বুক পুড়িয়া গেল। এইমাত্র সে বলিয়াছিল, স্বামীর সে কেহ নহে। সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না। অত দেখিল না, যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়, কহিল, তুমি নিজে গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো, কেমন? শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তিনি এলে দেখতে পাবে,

আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, বাগানবাটীতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া না দিলে, তাহাকে আর ম্যানেজারের কাজ করিতে হইবে না। স্বামীকে শাসাইয়া বলিল, আর যাই হোক, তুমি বাড়ির বার হলে আমি মাথাখুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

তাইত, ওঁরা কিন্তু–

আমি ‘কিন্তু’র ব্যবস্থা করছি। বলিয়া শান্তি দাসীকে পুনর্বার ডাকিয়া হুকুম দিয়া দিল–দারোয়ানকে বলে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়িতে না ঢুকতে পায়!

আর সুবিধা নাই দেখিয়া মথুরবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইয়ারদলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি চুটাইয়া জমিদারি দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না, বুকের ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই। এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামীসেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বক্ষের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সঙ্গত নহে।

অবসর বুঝিয়া ম্যানেজারবাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বাটীতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্তা। মাধবীর পরিবর্তে নূতন বধূ এখন গৃহিণী। মাধবী এখনও এখানে আছে। তাই শিবচন্দ্র স্নেহ-যত্ন করে, কিন্তু মাধবীর এখানে থাকিতে মন নাই। বাড়ির দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা এখনো 'বড়দিদি' বলে, কিন্তু সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা করে তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে মাধবী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা এখন আর তাহার মানায় না।

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আবদার ছিল–এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল, এখন 'আত্মীয়-কুটুম্বের' দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিংবা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারি উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। মাধবীর যেন কপাল পুড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, একথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র নাহয় মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে কেন? মাধবী সব বুঝিতে পারে। বৌ যখন ছোট ছিল, তখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে

ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে

সকলের নীচে। কথা সহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা সহে না। যেখানে তার জোর নাই সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়। মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়, –শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আত্মীয়তার ধুয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে মনে ধিক্কার উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা তাহা শুধু সে-ই জানে।

একদিন শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, দাদা, আমি শ্বশুরবাড়ি যাব। শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল।—সে কি মাধবী, সেখানে ত কেউ নেই!

মাধবী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছোট ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে, তাকে’নিয়ে আমি গোলাগাঁয়ে বেশ থাকব।

পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে মাধবীর শ্বশুরবাড়ি। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে।

কেন কষ্ট হবে দাদা? বাড়িটা এখনো পড়ে যায়নি। দু’বিঘা দশ বিঘা জমি-জিরাতও আছে, একটি বিধবার কি তাতে চলে না?

চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে মাধবী!

কষ্ট কিছুই নয়।

শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল, কেন যাবি বোন? আমাকে সব খুলে বল দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।–ইতিপূর্বে শিবচন্দ্র বোধ হয় স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল। লজ্জায় মাধবীর সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বলিল, দাদা, তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া করে তোমার বাড়ি থেকে যাব?

শিবচন্দ্র বড় লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, না না, তা নয়। আমি ও-কথা বলিনে, কিন্তু এ বাড়ি চিরদিনই তোমার, আজ কেন তবে চলে যেতে চাও?

যুগপৎ দুই জনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুই জনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া মাধবী বলিল,

আবার আসব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই!

সে ত আট-দশ বছরের কথা।

যদি বেঁচে থাকি, তা হলে আসব।

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতনবৌকে সংসার বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, মাধবী, তোর দাদা কখনো ত তোকে কিছু বলেনি?

মাধবী হাসিল, বলিল–সে কি কথা দাদা?

তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোনদিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু–

না দাদা, সে সব কিছু নয়।

সত্যি কথা?

সত্যি!

তবে যা। তোর নিজের বাড়ি যেতে আর মানা করব না। যেখানে ভাল লাগে–। তবে সর্বদা সংবাদ দিতে ভুলিস নি।

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয়ে আসিয়া এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিল।

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় বিপদ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা উভয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। তাই মৃত্যুকালে যোগেন্দ্র যে কয় বিঘা জমি-জায়দাদ ছিল, তাঁহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তিনি যে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যোগেন্দ্র সে সকলের বিশেষ কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুরমহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বিষয়টুকু তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর চাটুয্যে মহাশয় ন্যায্য অধিকারে বিনা বাধায় সে-সকল ভোগদখল করিতেছিলেন। এখন বিধবা মাধবী এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ পাতা সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। সুতরাং, চাটুয্যে মহাশয়ের ইহা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল, এবং মাধবী যে হিংসা করিয়াই

এমনটি করিয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, তাইত বৌমা, তোমার দু’ বিঘা যে জমি আছে, তার দশ বৎসরের খাজনা মায় সুদসুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নিলাম হবার মত হয়েচে। মাধবী ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য এ টাকা চাটুয্যে মহাশয়ের অন্য কাজে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুই বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকি যেসব জমি-জায়গা আছে, তাহা কোথায় এবং কাহার নিকট আছে?

চাটুয্যে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্তে আছে। এই আট-দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব?

মাধবী কহিল, জমির কিছু কি উপস্বত্ব হইত না যে, এই কয়টা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই? আর যদি যথার্থই বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজপত্রই বা কোথায়? চাটুয্যে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব দিয়াছিলেন কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড়বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া একখানা থান কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া জমিদারবাবুর কাছারি লাল্‌তা-গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন। এই লালতা-গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটী, এবং ম্যানেজার

মথুরবাবুর কাছারি। ব্রাহ্মণ আট-দশ ক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন–দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে

পথে ভিক্ষে করে খেতে হয়।

এমন ত অনেকে আসে! মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হয়েছে কি?

বাবা, রক্ষে কর।

কি হয়েছে তোমার?

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি ধর্মাবতার, আপনি না রক্ষা করলে আমার সর্বস্ব যায়!

আচ্ছা, খুলে বল।

গোলাগাঁয়ের রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ কোথা থেকে এতদিন পরে ফিরে এসে, আমার সমস্ত দখল করতে চায়।

মথুরবাবু হাসিলেন–সে তোমার সমস্ত দখল করতে চায়, না, তুমি তার সর্বস্ব দখল করতে চাও–কোন্‌টা?

ব্রাহ্মন তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন–আমি যে এই দশ বছর থেকে সরকারের খাজনা যুগিয়ে আসচি?

জমি ভোগ করচ, খাজনা দেবে না?

দোহাই আপনার–

ভাবটা মথুরবাবু বেশ বুঝিলেন–বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত? ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

কয় বিঘা জমি?

পঁচিশ বিঘা।

মথুরবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, অন্ততঃ তিন হাজার টাকা। জমিদার কাছারিতে কি সেলামি দেবে?

যা হুকুম হবে তাই,–তিন শ’ টাকা।

তিন শ’ টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা নেবে? আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ব্রাহ্মণ শুষ্কচক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল, কত টাকা হুকুম হয়?

এক হাজার দিতে পারবে?

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দু’জনে পরামর্শ হইল, ফল এই দাঁড়াইল যে, যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনা বাবদ দশ বৎসরের সুদে-আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল। কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রি হইয়া গেল, এবং দেড়-মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে

বাকি খাজনার দায়ে জমিদার সরকার হইতে তাহার মায় বাটীসুদ্ধ নিলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, তোমাদের দেশ কি মগের মুল্লুক?

কেন বল দেখি?

তা নয় ত কি? একজন ঠকিয়ে আমার সর্বস্ব নিতে চায়, তোমরা দেখচ না?

সে বলিল, আমরা আর কি করব? জমিদার যদি নিলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করতে পারি?

তা যেন হল, কিন্তু আমার বাড়ি নিলাম হবে, আর আমাকে সংবাদ নেই? কেমন তোমাদের জমিদার?

সে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখনও পূর্বে দেখে নাই। সে আরও কত কি কহিল। এ যাবৎ যাহা কিছু লোকপরম্পরায় অবগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিলে, মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর সঙ্গে নিজে দেখা করলে হয় না? ভাগিনেয় সন্তোষকুমারের জন্য মাধবী তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল।

সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল যে, কাল তাহার বোনপোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোনপো দুই-তিনবার লাল্‌তা-গ্রামে গিয়াছিল, জমিদার সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সেদিন সে বাগানবাড়িতে এলোকেশীর সংবাদ পর্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসিমাতা যখন জমিদারবাবুর সহিত রামতনুবাবুর বিধবা পুত্রবধূর দেখা করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, এই বিধবা পুত্রবধূটির বয়স কত?

মাসিমাতা বলিল, কুড়ি-একুশ হবে।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, দেখতে কেমন?

মাসিমাতা কহিল, পরীর মত।

তখন সে মুখভঙ্গী-সহকারে কহিল, দেখা করলে কাজ হতে পারে; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাত্রেই নৌকা

ভাড়া করে বাপের বাড়ি প্রস্থান করুন।

কেন রে ?

এই যে বলচ– সে দেখতে পরীর মত।

কেন, তাতে কি?

তাতেই সব। দেখতে পরীর মত হলে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষে নেই।

মাসিমাতা গালে হাত দিলেন,–বলিস কি, এমন!

বোনপো মৃদু হাসিয়া কহিল, হাঁ, এমন। দেশসুদ্ধ লোক এ কথা জানে।

তবে ত দেখা করা উচিত নয়?

কিছুতেই নয়।

কিন্তু বিষয়-আশয় যে সব যাবে!

চাটুয্যে মহাশয় যখন এর ভিতর আছেন, তখন বিষয়ের আশা নেই। তার উপর গৃহস্থঘরের মেয়ে–ধর্মটাও কি যাবে?

পরদিন তিনি মাধবীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রায়ের কথা সে সমস্ত দিন চিন্তা করিল। মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত, কিন্তু লোকটির সহিত ত মিলিতেছে না। এ নাম সে কত দিন মনে মনে ভাবিয়াছে। সে আজ পাঁচ বৎসর হইল। ভুলিয়া ছিল–আবার বহুদিন পরে মনে পড়িল।

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি বড় দুঃখে কাটিল। অনেকবার পুরানো কথাগুলো মনে পড়িতেছিল, অনেকবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল । সন্তোষকুমার তাহার মুখপানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, মামীমা, আমি মা’র কাছে যাব।

মাধবী নিজেও কয়েকবার এ কথা ভাবিতেছিল, কেননা, এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখন কাশীবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। সন্তোষের জন্য সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিষেধ করিতেছে। তা ছাড়া এখন যেখানেই সে যাক, একটা নূতন

ভাবনা, একটা নূতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা! মাধবী মনে করিল, পোড়াকপাল! এ উৎপাতগুলা কি এখনও দেহটায় লাগিয়া আছে! আজ সাত বৎসর হইল, এগুলা তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করাইয়া দিতে

কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল,'বড়দিদি', সবাই ডাকিল 'মা'! এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছাই রূপ-যৌবন! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাইতে হইত, সেখানে কি এসব কথা মনে থাকে! মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে তাই ভাবনাও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই 'যৌবনে'র উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, এখানকার লোকগুলা কি অন্ধ, না পশু! কিন্তু মাধবী ভুল করিয়াছিল–সকলেরই মন তাহার মত একুশ-বাইশ বছরে বৃদ্ধ হইয়া যায় না।

ইহার তিনদিন বাদে যখন জমিদারের পিয়াদা তাহার দ্বারপথে আসন করিয়া বসিল এবং হাঁক-ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে লাগিল যে, সুরেন রায় আর একটা নূতন কীর্তি করিয়াছে, তখন মাধবী সন্তোষের হাত ধরিয়া দাসীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

বাটীর অদূরেই নদী; মাঝিকে কহিয়া দিল, সোমরাপুরে যাইতে হইবে। একবার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে।

গোলাগাঁ হইতে পনর ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ হইয়াছিল। আজি এক বৎসর হইতে সে শ্বশুরঘর করিতেছে। সে হয়ত আবার কলিকাতায় যাইবে, কিন্তু মাধবী তখন কোথায় থাকিবে? তাই একবার দেখা করা।

সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া চলিল; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীরমন্থর গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া,শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া,শরঝাড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না! সে ছইয়ের ভিতর হইতে

হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝিরা কহিল, বাতাস না থামিলে, কাল দুপুর পর্যন্ত নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।

আজ মাধবীর একাদশী, কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পানসি বাঁধিয়া,

পাক করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি কহিল, দিস্তেপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়।

দাসী কহিল, তাই কর বাপু, যেন দশটা-এগারটার মধ্যে ছেলেটা খেতে পায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্যালোক প্রবেশ করায় বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা-খাতা ও কাগজপত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন; আদায়-উসুল, বাকি-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মামলা-মকদ্দমার নথিপত্র সব একে একে উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন। এসব দেখাশুনা একরকম আবশ্যকও হইয়া পড়িয়াছিল এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এ জন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে সে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অক্ষরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিংবা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যকমত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পুরা অধিকার–তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নাই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার-বন্ধু মিলিয়া দিন-কতক শান্তিকে বড় দুঃখ দিতেছিল। স্ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রের বাহির-বাটীতে পর্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশ শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাঙ্গা ফিতা দিয়া কাগজের বান্ডিল বাঁধিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, শান্তি!

শান্তি কোথায় গিয়াছিল–কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকছিলে?

হাঁ, আমি একবার কাছারিঘরে যাব।

না। কি চাই বল, আমি আনিয়ে দিচ্চি।

কিছু চাই না, একবার মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাই, তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু, এমন সময় তাঁকে কেন?

বলে দেব যে অগ্রহায়ণ মাস থেকে তাঁকে আর কাজ করতে হবে না।

শান্তি বিস্মিত হইল; কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর অপরাধ?

অপরাধ যে কি, তা এখন ঠিক বলতে পার্‌চি না, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি কর্‌চেন। তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট ও কয়েকখানা কাগজপত্র দেখাইয়া কহিলেন, এই দেখ, গোলাগাঁয়ে একজন বিধবার ঘর-বাড়ি সমস্ত বেনামী নিলামে খরিদ করে নিয়েচে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, আহা বিধবা? তবে এ কাজটা ভাল হয়নি– কিন্তু বিক্রি হল কেন?

দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল; সুদে-আসলে দেড়-হাজার টাকার নালিশ হয়েছিল।

টাকার কথা শুনিয়া শান্তি মথুরনাথের প্রতি একটু নরম হইয়া পাড়িল। মৃদু হাসিয়া কহিল, তা ম্যানেজারবাবুর বা দোষ কি? অত টাকা কেমন করে ছেড়ে দেন?

সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল । শান্তি প্রশ্ন করিল, অত টাকা ছেড়ে দেবে?

দেব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ি-ছাড়া করব? তূমি কি পরামর্শ দাও?

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল, সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল, না, বাড়ি-ছাড়া করতে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন?

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, সে নয় শান্তি, আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাকব, তখন তুমি–

ও কি কথা–

তুমি–আমি যা ভালবাসি, তা করবে ত?

শান্তির চোখে জল আসিল, কেন না, স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, বলিল, ও কথা কেন বল?

বড় ভাল লাগে, তাই বলি। তুমি, আমার কথা, আমার সাধ ইচ্ছা জেনে রাখবে না শান্তি?

শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, আমার বড়দিদির

নাম।

শান্তি অঞ্চল সরাইয়া সুরেন্দ্রের মুখপানে চাহিল।

সুরেন্দ্র একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখ, আমার বড়দিদির নাম।

কোথায়?

এই দেখ, মাধবী দেবী যাঁর বাড়ি নিলাম হয়েছে।

একমুহূর্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল, তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইছ?

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাই হলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব–সমস্ত–সব!

মাধবীর কথায় শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িল; ভিতরে বোধ হয় একটু হিংসার ভাব ছিল। কহিল, তিনি হয় ত তোমার বড়দিদি নন। শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই!

বড়দিদির নামের একটু সম্মান করব না?

তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জানতে পারবেন না।

তা পারবেন না–কিন্তু আমি কি অসম্মান করতে পারি?

নাম ত এমন কত লোকের আছে।

আছে! তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার?

ছি! ও-কি কথা? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে–

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ করতে পার।

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, কি কাজ?

দেয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ছবিটি যদি–

কি?

চারিজন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার।

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদষ্ট রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে, শান্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে-চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল–তাহার পর করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শান্তিস্বস্ত্যয়নের

ব্যবস্থা করিয়া রাজার অর্ধেক রাজত্ব মানত করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এই বড়দিদি যিনিই হউন, ইহাঁর সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না । তাহার পরে ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিল। এ জীবনে এমন কটু কথা সে আর কখনও শোনে নাই!

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন,–কাছারিঘরে মথুরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাগাঁয়ে কার সম্পত্তি নিলাম হয়েছে?

মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর।

কেন?

দশ বছরের মাল-গুজারি বাকি ছিল।

কই খাতা দেখি?

মথুরানাথ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তাহার পর কহিল, খাতা-পত্র এখনও পাবনা থেকে আনা হয়নি।

আনতে লোক পাঠাও। বিধবার থাকবার স্থানটুকু পর্যন্ত রাখোনি?

বোধ হয় নেই।

তবে সে কোথায় থাকবে?

মথুরানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, এতদিন যেখানে ছিল, সেখানে থাকবে বোধ হয়।

এতদিন কোথায় ছিল?

কলিকাতায়। তাহার পিতার বাটীতে।

পিতার নাম কি জান?

জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ী।

বিধবার নাম?

মাধবী দেবী।

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ভাবগতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল?

সুরেন্দ্রনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কষিতে বল–আমি এখুনি গোলাগাঁয়ে যাব। এখান থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান?

প্রায় দশ ক্রোশ।

এখন ন'টা বেজেছে–একটার মধ্যে পৌঁছতে পারব।

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, কোন্ দিকে?

উত্তর দিকে, পরে পশ্চিমে

যেতে হবে।

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল,–ঠাকুর,এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব!

তাহার পর দুজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল–মা দুর্গা! জোড়া মোষ দেব–যা চাও, তাই দেব–তাঁকে ফিরিয়ে দাও–বুক চিরে রক্ত দেব–যত চাও–হে মা দুর্গা, যত চাও–যতক্ষণ না তোমার পিপাসা মিটে।

গোলাগাঁ পৌঁছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের ক্ষুর পর্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙ্গাইয়া,খানা টপকাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য।

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রের গা–বমি বমি করিয়া উঠিল; ভিতরের প্রত্যেক নাড়ী যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! তাহার পর টপ্ করিয়া ফোঁটা দুই-তিন রক্ত কষ বহিয়া ধূলিধূসরিত পিরানের উপর পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন । একটার পূর্বেই গোলগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। পথের ধারে দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন,এই গোলাগাঁ?

হ্যাঁ।

রামতনু সান্যালের বাটী?

ঐ দিকে।

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঞ্ছিত বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়াছিল; প্রভুকে দেখিয়া সে প্রণাম করিল।

বাটীতে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? কোথায় গেলেন?

ভোরেই নৌকা করে চলে গেছেন।

কোথায়–কোন্ পথে?

দক্ষিণ দিকে।

নদীর ধারে ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়তে পারবে?

বলতে পারি না। বোধ হয় নেই।

পুনর্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ-দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া চলে না। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তখন

সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন–জামার উপর অনেক ফোঁটা রক্ত ধূলায় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন, তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই–সর্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ! বুকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না– যেন এইবার শুইতে পারিলেই জন্মের মত ঘুমাইয়া পড়িবে–তাই যেন অন্তিম শয্যায় এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের

মত ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষশয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না!

নদীর বাঁকের পাশে–একখানা নৌকা না? কলমীশাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে! সুরেন্দ্র ডাকিল, ‘বড়দিদি ‘! শুষ্ককণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না–শুধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল।

‘বড়দিদি ‘– আবার দুই ফোঁটা রক্ত ।

কলমীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্রর কাছে আসিয়া পড়িল।

আবার ডাকিল, ‘বড়দিদি’।

সমস্ত দিনের উপবাস ও মনঃকষ্টে মাধবী নির্জীবের মত নিদ্রিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সহসা কানে শব্দ পোঁছিল : পুরাতন পরিচিত স্বরে–কে ডাকে না!

মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্বাঙ্গে ধূলা-কাদা-মাখা–মাষ্টারমহাশয় না?

ও নয়নতারার মা, মাঝিকে শীগগির নৌকা লাগাতে বল্।

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে কাদার উপর শুইয়া পড়িতেছিলেন।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল। মুখে-চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, লাল্তাগাঁয়ের জমিদার। মাধবী ইষ্ট-কবচসুদ্ধ স্বর্ণহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লাল্তাগাঁয়ে

এই রাত্রে পৌছঁতে পার? সবাইকে এক-একটা হার দেব।

সোনার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নামিয়া পড়িল।

মাঠাকরুন, চাঁদনি রাত; ভোর নাগাদ পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন! মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রর মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

তুমি বড়দিদি?

আমি মাধবী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আঃ–তাই!

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অধরের কোণে সরক্ত হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে– বড়দিদি, যে কষ্ট!

তর্‌তর্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙ্গা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিলেন, কোথায় যাচ্ছিলে?

মাধবী ভগ্নকণ্ঠে কহিল, প্রমীলার শ্বশুরবাড়ি।

ছিঃ–এমন করে কি কুটুমের বাড়ি যেতে আছে দিদি?

দশম পরিচ্ছেদ

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়নকক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছে। পা-দুটি শান্তি কোলে করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে। পাবনায় যতগুলি ডাক্তার-কবিরাজ সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমেও রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই আঘাতে এখন রক্ত বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ি হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর ফিরাইতে পারে নাই; পাঁচ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখের পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়–হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন, শোধ হল ত?

মুহূর্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত-মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল,– যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।

শুভদা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন-চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরানীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকরুনকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসীমা?

এই হারাণ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্যেদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল!

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরানী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা, মাসখানেক হল ছেলে মারা গেছে বটে! সেকথা নয় বিন্দু, সেকথা নয়; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতই বটে, কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিস নি মা?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস নি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আবার কিসের কথা?

আহা! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি করেই মারেন। কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্য ত কষ্ট হয় না, কষ্‌ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হলে। হতভাগী ড্যাক্‌রার হাতে পড়ে ত একদিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়াছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঠাকুরানীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই; সেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতে ছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুজ্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাইনে?

পি। কেন পাবে না মা? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে করে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। আহা, ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছিলেন !

বি। কিসের কষ্ট?

পি। কষ্ট কি এক রকমের? কত রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব?

বি। তবু শুনিই না পিসিমা?

পি। না এখন থাক। কিছুই চাপা থাকবে না, সকলেই শুনতে পাবে— পেয়েচেও। কিছু আগে আর কিছু পরে— তোরাও সবাই শুনতে পাবি।

বি। তুমিই বল না!

পি। না না, আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেচি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

পি। বিন্দু, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব?

বি। কিসের মিথ্যে কথা? মিথ্যা কথা কি তোমাকে বলতে বলেচি?

পি। তবে কেমন করে বলা হয়? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী চলিয়া গেলে সকলেই সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরানীকে এ পর্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল।

বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু, এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হলে কি হবে বল দেখি?

বি। কি আর হবে,—দু’দিন ভুগব।

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা, এর জন্যে আর ভাবনা কি!

বিন্দু বলিল, মা, হারাণ মুখুজ্যেদের আবার কি হয়েছে?

মা। কি আবার হবে?

বি। আজ ঘাটে কৃষ্ণপিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেচে। তুমি কিছু শোননি?

মা। কিছুই না। কি বললে?

বি। বললে যে হারাণ মুখুজ্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন, কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে, আর কিছু বললে না। বলে, পরের কথায় আর থাকব না।

মা। ঠাকরুনের এতদিনের পর ধর্মজ্ঞান জন্মেচে!

বি। মা, সত্যি তুমি কিছু জান না?

মা। কিছু না।

বি। তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

মা। কেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেচে জানবার জন্যে?

বি। হ্যাঁ—

মা। তুই কি পাগল হয়েছিস? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না, সেকথাটা তুই জিজ্ঞাসা করতে যাবি?

বি। উনি কে?

বিন্দুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকরুন।

বি। কৃষ্ণঠাকরুন কি আদর্শ, যে উনি যা না করবেন তা আর কাউকে করতে নেই?

মা। এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বৈ কি।

বি। তা হোক, আমি যাব।

মা। পরের কথায় না হয় নাই থাকলে?

বি।আচ্ছা, মা, একজন যদি ডুবতে থাকে, ‘পরের কথায় কাজ নেই’ বলে তাকে আর তুলতে নেই?

মা। তুই ত আর তুলতে যাচ্ছিসনে বিন্দু?

বি। কে ডুবচে জানলে যাব বৈ কি!

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে; তোমার কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায়?

বি। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি ত আর তার কাছে যাচ্চি নে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে; আমরা পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে যদি এসময় চোখ বুজে থাকি তা হলে শ্বশুরবাড়িতে আমার আর কেউ মুখ দেখবে না।

মা। অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হল না হল দেখে বেড়াতে বলেচে যে, তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আর তোর মুখ দেখবেন না? আর আমি তোর মা হয়ে বারণ কচ্চি সেটা কি শোনবার যোগ্য নয়?

বি। মা, আমাকে যেতেই হবে!

মা। গিয়ে কি শুনবে? হারাণ মুখুজ্যের কি হয়েচে তা বাড়ির কেউ জানে না।

বি। তুমি কি করে জানলে?

মা। তোমার বাপের কাছে শুনেছি।

বি। তবে কি হয়েছে বল।

মা। নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেচে বলে তারা হাজতে দিয়েছে।

বি। নন্দীরা কারা?

মা। বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারিতে হারাণ মুখুজ্যে চাকরি করত।

বি। কত টাকা চুরি করেছে?

মা। প্রায় দু শ’ টাকা।

বি। কেউ জামিন হয়নি?

মা। কে আর হবে বল? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং তিনিই কেবল জামিন হতে পারেন কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্‌সে শত্রু করে রেখেচে। এঁকে একবার জামিন হতে বলেছিল, কিন্তু স্বীকার হননি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুরবেলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্যন্ত বউকে একদিনও দেখিনি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা শুনেও যাবি?

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল, তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়েমহল পর্যন্ত না পৌঁছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন; যাইবার সময় বলিলেন, ইনি শুনলে বড় রাগ করবেন।

বি। যাতে না শুনতে পান এমনি করে যাব।

মা। নিশ্চয় শুনতে পাবেন।

বি। তুমি শোনালেই পাবেন।

মা। কিন্তু, শুনলে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্কভাবে কহিল, বাপ-মা সন্তানের উপর রাগ করেন, আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেব না মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায় পরিবার

এ স্থানটার নাম হলুদপুর। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কখনও যাইতে হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই, তবে যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতটা পারেন উপলব্ধি করিয়া লউন।

শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও, কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত, তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটা ঘাটবাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরুবাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামের চিরদিন যে এমনি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয়, কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাটী, আর পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষাভুষার কুটীর আর জঙ্গল আর জঙ্গল, এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন ইষ্টক-নির্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দিকে একরাশ বাঁশঝাড়, দুই-চারিটা কদলীবৃক্ষের ঝাড়, গোটা-দুই বেলগাছ, গোটা-দুই আমগাছ—একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদার-সরকারে মুখুজ্যে মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু

ইহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্বদা অনটন, সর্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটি মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁহার সংসারে আজকালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেহই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড়ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া যাইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না।

আজ চাউল নাই, আজ দাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ-নাই, ও-নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুজ্যে মহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না; ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন; খাতায় অনেক ভুল, অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করিয়াছ?

তাহা জানি না।

জানি না? খাতাপত্র দেখিয়া বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করিয়াছ—এত টাকা কি করিলে?

খরচ করিয়াছি।

খরচ ত করিয়াছ, কিন্তু চুরি করিলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না, কাজেই চুরি করিতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলিয়াছে, এখন না চলিবার কোন কারণ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না; যা হোক, তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে, তোমার কুড়ি টাকায় সংসার চলে না।

বলিলে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয়ত দিতাম, কিন্তু সেকথা যাউক; যা লইয়াছ তাহার অর্ধেক আমাকে ফিরাইয়া দিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

কেমন করিয়া দিব, আমার কিছুই নাই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করিয়া দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাহাই বিক্রয় করে লউন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকিবে কোথায়?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুজ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চক্ষু অত রাঙা কেন?

কেমন করিয়া জানিব?

তখন হারাণ মুখুজ্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের বাটীর সংবাদ লইতে পার?

কি সংবাদ লইব?

এইরকম যে ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন, কেমন সম্পত্তি আছে, কোনরূপ দেনাকর্জ আছে কি না—এই সব।

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল, আমি যতদূর জানি, মুখুজ্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নহে, সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ আছে কি না বলিতে পারি না।

ভাল করিয়া সংবাদ লইয়া আমাকে জানাইও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে, সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুজ্যেমশায়ের তাহা হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পূর্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল, সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখুজ্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি?

আজ্ঞা হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখিয়াছিলাম; আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি?

আমলা নতমুখে বলিল, শুনতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়া চুরির অপরাধে মুখুজ্যের নামে নালিশ করিয়া দিও—পুলিসকেও সংবাদ পাঠাইয়া দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে, মুখুজ্যে মহাশয়কে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরে একথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না ; তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলী একথা জানিলেন; বোধ হয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বর্ধিষ্ণু লোক, ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুজ্যেকে অনায়াসে হাজতমুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুজ্যে মহাশয় হাজতগৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এইসময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড়কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক, আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা; আর তাহার জননী—তিনিও এখন পর্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা, আজো বোধ হয় বাবা আসবেন না। মেঘ করে আসছে, যদি জল হয় তাহলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না; তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল, আরও একটু দেখি, তিনদিন আসেন নি—আজ যদি আসেন।

মা, বাবা এমনতর ত কখন করেন নি; তিনদিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন? কি করব বল, ভগবান আছেন!

একাদশীর দিন রাসমণি (হারাণবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্যন্ত খাসনি?

বৌ বিমর্ষভাবে কহিল, আরও একটু দেখচি।

আমার পিণ্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আসবে? দেখগে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিলে রাসমণির মেজাজটা একটু খিটখিটে রকমের হইয়া পড়িত; কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছুছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু ছোট ললনা যে একথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন।—তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়োমাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিনদিন বাড়ি আসেনি—বুকের ভিতর যে কি কচ্চে তা ইষ্টিদেবতাই

জানতে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়োমানুষ, যদি একটি কথা বলি তাহলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস।—কাজ নেই মা, আমি তোদের কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যায়, তাই দুকথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না।—পিসিমা আমার ঘাট হয়েচে, এমন কথা আমি আর বলব না। বাস্তবিক কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা, বড় হয়েছ, সব কথা বুঝে বলতে পার না?

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে; সেও সহাস্যে বলিল, তুমিই কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর জো আছে বোন, ছোটছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক-পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নেই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকি নেই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ওঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেচে।

এত বেলা হল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে, সে ত তিনদিন থেকে আর বাড়ি আসেনি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এই রকম করে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, সে আজ একবৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় পীড়িত, শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাঁচন ও কুইনাইনের উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চারদিন আমাকে দেখতে আসেন নি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েচেন মা?

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আনতে গেছেন।

বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি ওষুধ যেন আনেন, তেতো ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হয়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা, আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল—কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিংবা তাহার জননী কেহই এ পর্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করেন নাই, সহসা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা, খেয়েচিস ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা; বিন্দু তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড়মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা!

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন?

একবার নেমে আয় ত মা!

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোটভাইটির কাছে বসত মা, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল; তোর মার সঙ্গে ওঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌ, হারাণদাদা আজ ক'দিন বাড়ি আসেন নি?

তিন দিন।

কেন আসেন নি কিছু জানিস কি?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল, পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিন্দু বলিল, শুভদা, ইচ্ছে থাকলেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস ত?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, জানি—কেন?

হারাণদাদা আজ তিন-চারদিন বাড়ি আসেন নি;—মনে কর্ যদি তাঁর সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল;—তিনি বুঝি বেঁচে নেই?

ও কি, কাঁপচিস কেন? কে বললে তিনি বেঁচে নেই?

বেঁচে আছেন?

বালাই, বেঁচে কেন থাকবেন না? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন করে বলি?

শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েচে, বল।

চুরি করেছেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

হাজতে দিয়েচে? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—তবে কি হবে?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিকস্বরে বলিল, কি আর হবে? খালাস করে আনতে হবে।

তা কি হয়?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায়?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে, কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলী গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে?

আমাদের কেউ নেই; তিনি যদি দয়া করে কোন উপায় করে দেন।

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন; হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায়?

উপায় আমি করে দোব। নাহলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেছি? কিন্তু আমি যা বলব তা করতে পারবে?

পারব।

যতই শক্ত হোক?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দু শ না তিন শ টাকা চুরি করেচেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

দু শ-তিন শ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি একসঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা, বিন্দু, তিনি কখন চুরি করেন নি।

না করে থাকেন ভালই, কিন্তু সেকথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

সেকথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয়; তুমি আমার এই বালা দু' গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও; তার পর যা ভাল বোঝ করো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দু গাছা?

হাঁ, আমার বালা দু গাছা। এর দাম তিনশ চারশ টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্যিসাধনা করলে দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও, তারপর কিন্তু করো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

আজই যাব?

হাঁ—আজই।

কার সঙ্গে যাব?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি?

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল; কেননা পাঁচজনে শুনলে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই।

হাঁ—আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় পরে মুখ ঢেকে যেও। কাল এমনি সময় আর একবার আসব।

যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা নাহলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ, আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতত এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস।

নিচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা, বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবানবাবুর দয়া

তখন দ্বিপ্রহরের সময়, যেসব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহাসমারোহে বাজনা-বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপালদোষে আজ এই দুর্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দু' গাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া, একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্বে আর কখন বামুনপাড়ায় যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে, উত্তরমুখ ধরিয়া চলিলে আধক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছতে পারিলে জমিদারবাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকারাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া একফোঁটা দুইফোঁটা জল পড়িতে লাগিল; একফোঁটা দুইফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, চতুর্দিক হইতে বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই

বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া সভয়ে চিৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল, যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এইখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না, কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দু গাছির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা-ভরসা সমস্তই এই বালা দু গাছি।

সত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছপালার আঁচড়ে ও কণ্টকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্তের জন্য মেঘের শব্দের বিশ্রাম নাই, কোন্ মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহারও স্থিরতা নাই, তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুন উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকাপথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে, দেখা হইলেই কি কার্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক, এ দুর্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দিক-সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের বাটী; কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে ! শুভদার কান্না আসিল; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, নন্দীদের বাটির সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন একমুহূর্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনিই একমুহূর্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ

মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভ্রশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুছাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ ভৃত্য হস্তে প্রদীপ লইয়া জমিদারবাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া শুভদা প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্রঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না। কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে?

বাবুর কাছে।

কোন্ বাবুর কাছে?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিতকেশ সৌম্যমূর্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেঝের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো; সম্মুখে মসলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখ-কষ্টে পূর্বের সে জ্যোতি এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হইয়াছে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করিতে চাও।

বিনোদবাবু কে?

বিনোদবাবু ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহি না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকটই প্রয়োজন আছে?

হাঁ

ভগবান নন্দী আমারই নাম; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিয়াছি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শুভদা কথা কহিল না।

ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকটই থাকিতে পারে; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোনও উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে? আমার নিকট প্রয়োজন? তুমি কি হারাণের স্ত্রী?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দু গাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দু গাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হইলাম যে সে তোমাকে ইহাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নীচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা লইতে চাহি না। ছাড়িয়া দিতে হয় অমনিই দেব; বিশেষ সে আমার যাহা লইয়াছে তাহাতে এ অলঙ্কার লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও যা, না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিবেন ত?

ইচ্ছা ছিল না ! সে যেরকম দুশ্চরিত্র তাহাতে তাহার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছাড়িয়া দেব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফুটিয়া আশীর্বাদ করিতে সাহস করিল না; মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া

যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেহ লোক আছে?

কেহ না।

কেহ না? তবে এত রাত্রে একাকী যাইও না। একজন লোক লইয়া যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্বে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান করে এলে?

হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাদের মত ললনা ছলনা নাম দুটা অষ্টপ্রহর তাঁর কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিকসই; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম ! ছলনাকে না দেখিতে পারার কারণ অর্দ্ধেক তার ঐ নামটা। লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলেমেয়ের নাম রাখে ; কেননা, তাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয়, কিন্তু এ দুটো মেয়েকে ডাকলে যেন পাপের ভার একটু একটু করে বাড়ছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুরই দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট; একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, একজন একাদশবর্ষীয়া; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপ-গুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, ঠাকুর বিধবা করিবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন ! ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্কারা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে, তবে ভাবে বোধ হয় বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না, বেশি কথায় থাকিতও না—দুই-চারিটা কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত—উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত। কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী

ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারী করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন বলিয়া থালাসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত; এইরূপে দিনের মধ্যে শতসহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপপুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূদুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দুখানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত।

মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ, না জানি বয়সকালে কি হবে! সমস্ত অঙ্গে কত গহনা থাকিবে; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরও কত কি—উঃ, তখন কি হবে ! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না—ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত।

ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটছিস কেন?

দিদি আমার রঙটা কি আগেকার চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয় নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণতে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুণে বলে দেবে, বড় হলে আমার গয়না হবে কি না।

ললনার চক্ষে জল আসিত।—হবে দিদি হবে, তুই রাজরানী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইত। গহনা হইবে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল; রাজরানীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন?

ললনা বলিত, আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন করেছেন তাকে তেমনি করেই থাকতে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না, কেবল আমাদেরই এমন করলেন?

আমাদের পূর্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি একরকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম করেছি। বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিনি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি করেই তবে কি চিরকাল কাটবে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুর্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হাতে লইয়া বলিত, দেখিস দেখি—তোর কত সুখ হবে; কত ঐশ্বর্য, কত গহনা, কত দাসদাসী—তুই রাজরানী হবি।

ললনা একথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুমি?—

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাকব বোন—ঐ আমাকে মা ডাকছেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেচেন, ঐ ঘরে—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা!

রাসমণি মুখব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্বমত গম্ভীরমুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে, মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার শেষ নাই; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল হারাণ।

হারাণ গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ, নালিশ করেছিল; কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসচি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখবে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এজন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে

থাকি ত প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেচে, তার শোধ তুলবই তুলব!

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়বিস্মিত চক্ষে বীর ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, তাহলে কিন্তু খরচপত্রের—

সে ভাবনা ভেব না দিদি—বেটাছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণবাবুর কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, তাহা নহে, তথাপি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এসময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও তাহাই করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস— নাহলে, অসুখ-বিসুখ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বাচওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণবাবু নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা; তুমি এতদিন আসনি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেচ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেছি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈ কি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তবে দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয়, রাত্রে খেও।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিল, তাই খাব। তাহার পর কিছুক্ষণ পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও—দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দিবেন।

তাহার পর শুভদা আসিলে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা দুই পয়সা দিতে পারো?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিলেন বাক্সে আরো অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দু' আনা পয়সা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার স্বামীর অর্দ্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর পড়ে আছে।

তবে যাও—

তিনি চলিয়া যাইলে শুভদা বাক্স খুলিল। আর একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল। শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসলি, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণবাবুর দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা কাছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না, অবশেষে শ্রান্তমনে অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এসেচে?

শুভদা চক্ষের জল চাপিয়া বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নেই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ, হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক

সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেট,—সমস্ত পয়সা কোথায় পড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডাচারেক পয়সা ধার দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই।

হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাকবে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণবাবু আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা দিয়ে বিশ্বাস না হয়, আনা চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়।

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে ! হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুনপাড়ায় আসিলেন। তাহার পরে একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমাঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এককোণে বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা সাহ্লাদে মহাকলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতিসম্ভাষণ হইল; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহুমান্যে বহুসম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অনেক কথা চলিতে লাগিল। অনেক রাজা-উজিরের মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান, আর অপরপ্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানেও ভিক্ষুক মহারাজার সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি,মুক্তা, হীরক, কাঞ্চন, কত রাজ্য, কত রাজকন্যা ; টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একাধারে এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু অর্ধ আলোকে, অর্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে, সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস, অনেকগুলি দিল্লীর বাদশাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌল্লা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না,

কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনিও অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দিল।

দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, রাজকোষ প্রায় শূন্য। অতবড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুৎ আচ্ছা ! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত একটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা-সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন।সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেকদূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী !

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছ কি?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না।

এবার অতি ক্ষীণ রমণীকণ্ঠে জবাব আসিল, কে?

আমি—আমি

আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কালোকোলো মোটাসোটা সর্বাঙ্গে উল্কিপরা মাননসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা ! অত ষাঁড়-চেঁচাচ্চ কেন?

চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু, অত আমার সইবে না। আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন যে অমনি করে চেঁচাবে—তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা ! পেটে ব্যথা হয়েছে, তা ত আমি জানিনে।

তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায়নি। তা এত রাত্তিরে কেন?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি?

বলছি। তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও, আমাকে আর জ্বালাতন করো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, তোমাকে বলিনি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাকু সাজিয়া হুক্কা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিবার পর, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা-দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুনলে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, কিন্তু কথা কহিল না।

হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যানভ্যান করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈ কি! বড় দরকার; আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাকলে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে। টাকা অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্চে না, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে। কাতু, আজ আমাকে বাঁচাও—

থাকলে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল। বলিলেন, কেন থাকবে না? এত টাকা দিলাম, আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্তলোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোটলোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চিৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সেসব ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না, আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব?

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানে আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা। যাও, বাড়ি যাও—এত রাত্তিরে বিরক্ত করো না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেকদিন ফুরিয়েচে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি; তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এস না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোন্‌দিন আমার কি সর্বনাশ করে ফেলবে—তার চেয়ে আগেভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আসব না। তোমার জন্যে আমার সব হল; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোক—কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়িঘর, তারপর আমরা ; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর শখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি—এখানে আর এস না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান করো—এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে, তা জান?

কেন?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন করে জানলে?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বললে—ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়। তুমি এত কথা না বললেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেছি।

কেন?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনিই দেখতে ইচ্ছে হয়, তার পর সব দেখেশুনে আটঘাট না বেঁধে চললে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন, আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখেশুনে চললে কি আমাদের চলে? বুঝেচ?

কাত্যায়নীরও বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে সমস্ত ঢাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বললাম সব বুঝেচ? এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও দুদিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুনচ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

অনেক রাত্রি হল, আজ আর কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক ‘সদাদাদা’ বলিয়া ডাকিত, অর্ধেক লোক ‘সদাপাগলা’ বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজি শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দু-দশ বিঘা জমিন আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাতি দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত, জানে না; যাহা হউক এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে, তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ বাটী ও বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহার সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই। বাল্যকালে সদানন্দর পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে এক বৎসরের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল, সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হউক, আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হউক, সে আর বিবাহ করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাই কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারী মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রকৃতি এমনি ভাব ধরিয়া আছে যেন সে ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবলধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন-চারি ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললনা, ঘরে যে একফোঁটা খাবার জল নেই। চট করে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না, মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হনহন করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী; পথের ধারের আটচালাঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া সে গান থামাইয়া বলিল, ললনা, ভিজচ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে ; তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সেকথা যাক, মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, দাঁড়িও না, বাড়ি যাও।

সে কি?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশি জল আসিলে যাইবে কেমন করিয়া?

ললনা ভাবিল, সেকথাও বটে; দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরিলে কেন?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন মনে গান ধরিল—

কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।

কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জানবি পাষাণী মা!

আমার সোনার তরি ডুববে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল; মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, ওকি থামিলে যে?

আর গাইব না।

কেন?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন?

আমি অমন গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেচ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেচ?

হ্যাঁ দেখেচি। কবে দেখলে?

প্রায়ই দেখি।যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয়?

কেন হবে না? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নেই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেই জন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা শারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সদানন্দ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না?

না।

কেন?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল, কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি, যাও কোথা?

বাড়ি যাই।

এত বৃষ্টিতে যাইলে অসুখ করিবে যে।

কি করব!

ললনা চলিয়া গেলে সদানন্দ আবার গান ধরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরাপুরি দশটি টাকা গুণিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না,বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

সেও সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই।কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা, তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি বলা যায়? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত? চুরি করা ধন খাইবার পূর্বে সে অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখ-স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুজ্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করে, তুই সমস্তদিন কোথায় থাকিস রে?

হারাণ বলে, আমার কত কাজ, চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাহাই সম্ভব, কেন না আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা, চারি আনা, ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব, কেননা আমি তাহা জানি। সে সমস্তদিন অনাহারে অবিশ্রামে চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম

প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত; সেইজন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আইসে; শুভদা ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করে; বলে, আমার খাইবার অভাব কি? কে আমাকে না জানে?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে; আর দুই-একদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শুভদা তাহার স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা-দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্কবিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা হইল না। দুজনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়াছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় সে দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সহানুভূতি পাইয়া আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম করে, করিতে লাগিল। রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া

ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত-পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার, ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জননী সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

আর কি করব? সেকি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই।

কি নেই?

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেলে শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সে কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপরপানে হাত দেখাইয়া বলিত—তাঁর উপরে !

কপোলে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁতির মালায় তাহার হস্তপদহীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েচে, ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ হাতের পুতুল ও হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয়নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেন হয়নি? তুমি বুঝি বেলা পর্যন্ত শুয়েছিলে ! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি কেন?

এইবার সব হবে।

মা, তুমি অমন করে আছ কেন?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, ও মা!

শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি বস, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা, মা।

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্বরাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লানমুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না। গাঙ্গুলীবাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতেছিল না। কিন্তু শুধুহাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাটপানে চলিল।

নিকটে চক্রবর্তীদের বাটী। বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গোবৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল, পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই, আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল। বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি—ছি ছি !

একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল — তবু মুখ ফুটে না। যে কখনো এই অবস্থায় পড়িয়াছে, সে–ই জানে ইহা বলা কত কঠিন ! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত – প্রতিঘাত হইয়া যায়। বলিবার পূর্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা-আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়!

ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল, তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল; সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত না; অন্যে যাহাতে সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে সঙ্কোচ করিত না; অন্যকে যাহা মানাইত না, তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদাদাদাকে লজ্জা হইতেছে?

সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করিতে হয়? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, কথা বলিবে না?

সদানন্দের গলার স্বর, কথার ভাব—একরকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে ললনা? কিছু হইয়াছে কি?

ললনা মুখ নিচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্বের মত, বরং আরো একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না? কিন্তু টাকা কি হবে?

তখনও লজ্জা! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হলে তাহাকে লজ্জা করিতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হইবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে আসিয়া বলিও। কেমন বলিবে ত?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হইবে?

রাখিয়া দিলে পচিয়া যাইবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছি, ছেলেমানুষি করো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরাইয়া দিও। আর একথা কাহাকেও বলিও না; তবে নিতান্ত যদি বলিতে হয়, বলিও যে সদাপাগলা টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল, কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায়, একহাঁটু ধূলা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ, দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমনি কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল একরকমের নহে; তাহাতে সরু, মোটা, আতপ, সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা

বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তাহাদিগের জন্য এইগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না। ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দুদিন কেটে গেল, কই সেরে ত উঠলাম না।

এইবার সারবে।

আচ্ছা, যদি ভাল না হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছিঃ, দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাস লইয়া সমস্ত ঔষধটা নীচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখনও এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, ও কি মাধু!

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না, তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেচে ভাল হবে না?

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু, আমার কথা শুনবে না?

বালক-সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শোনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুনব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুনব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাকব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যাদুর অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল হল না। তার পর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসীমা কাঁদলেন, তুমি কাঁদলে—সবাই কাঁদলে — মা আজও কাঁদেন, কিন্তু সে আর এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্যসময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্বার কহিল, বল না বড়দিদি, মরে গেলে কি হবে?

ললনা মুখ আবৃত করিয়াই কহিল, কিছু না—শুধু আমরা কাঁদব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না; অনেকদিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্বার বলিল, দিদি, মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়?

ললনা উপর পানে চাহিয়া বলিল,—ঐখানে—আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে? বালক বড় বিস্মিত হইল—কিন্তু সেখানে কার কাছে থাকব?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। হাসিয়া বলিল, তবে ভাল। আচ্ছা, আমাদের সেখানে বাড়ি আছে?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দুজনে সেখানে বেশ থাকব, না?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়—না?

যায়।

অনেক ডালিম আছে?

আছে।

বালক একগাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, কবে যাওয়া হবে?

মাধু!

কি দিদি?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন করে যাবি?

কেন, মা – ও ত যাবে!

যদি না যায়?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায়?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না?

যাবে, কিন্তু অনেকদিন পরে।

তা হোক—আমরা আগে যাব; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

না। একথা মাকে বললে তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বলব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও। আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া, বাতাসা খাইয়া, জল খাইয়া, মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে, কত ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত ডালিম খাইবে, দুই–চারিটা জননীর নিকটে নীচে ফেলিয়া দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলো ছলনাদিদির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে—তবে দুটো–

একটা ফেলিয়া দিবে,—আরো কত কি শত–সহস্র কর্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা? সেও সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা, হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না।

বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত, তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না; এটা খাব না, ওটা দাও, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু, কিছু খাবি কি? সে বলে, দাও।

কি দেব?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। দুজনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলে চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা দুটো – একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি! যখন কোথা হইতে আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল

রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইব? যেমন করিয়াই হউক আর যাহা করিয়াই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি, তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না; সময় ভাল হইলে আবার সবই হইবে, এখন যেমন আছি তেমনিই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী করিয়া লইয়া আইস; কবে মরিব কিছুই জানা নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখিয়া লই।

সদানন্দ কোন কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা', ললনা' ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচার কাপড়ে করিয়া গোটা-পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাইব। কবে ফিরিব বলিতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ করিও।

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নহে! দেখিতে অনেকগুলি বটে, কিন্তু খরচের সময় খরচ করিতে অনেক নহে।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নীচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আজ আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, কবে আসবে?

তা কেমন করে বলব? তবে পিসিমার কাশী দেখা হলেই ফিরে আসব বোধ হয়। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই এস বাবা। আশীর্বাদ করি নিরাপদে থেক।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুণিতে লাগিলেন। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দ আর-জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়।

এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?

ললনা উত্তর দিল না।

ললনা, সদানন্দ কি পাগল?

কেন?

তবে এমন করে কেন?

দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?

তবে লোকে পাগল বলে কেন?

ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন বলে থাকে।

হারাণ মুখুজ্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়। খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে; কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী

হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায়-পরিবার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরানী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরানী পানের সহিত তামাকপত্র চর্বণ করিতে করিতে এবং পিক্ ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করতঃ বলিলেন, বৌ, হারাণ আজকাল করছে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছেন।

সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরানী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুজ্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে; সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি, সংসার এখন চলে কেমন করে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম করে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাতি, সে-ই ত দুর্ঘটনা ঘটালে। ইচ্ছে করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে?

হাঁ বোন, হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কি না, তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দু শ' এক শ' মাগীর হাতেই এনে দিতিস! তবু ত কিছু থাকত?

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে?

কি আর রাঁধব বোন? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করিনি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে? মিন্

সে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে–পায়ে ধরলে, তখন কিনা ঘর থেকে বের করে দিলে! কিন্তু ভগবান কি নেই? বামুনের যেমন সর্বনাশ করেছে, তোর মতন সতীলক্ষ্মীর যখন চোখের জল ফেলিয়েচে, তখন শাস্তি কি হবে না? তুই দেখিস, আমি বললাম—

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল কেন?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কিরকম বন্দোবস্ত করবি?

আমি আর কি করব? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। কিন্তু ভাবনার উপর ভাবনা হচ্চে এই তোর ছোট মেয়েটা। ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল — এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচকথা বলবে। তার কি কিছু উপায় হচ্চে?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, তখন ললনা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে, সুসময়ই হউক, আর অসময়ই হউক, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীতীরের অর্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছেন।

যুবকের নাম শারদাচরণ রায়। এই হলুদপুর গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম নিজেই নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হারাণ মুখুজ্যেদের বাটীর সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। রাসমণি ও শারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ শারদাচরণের পিতা হরমোহনবাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি; কেননা, তাহার সহিত এ আখ্যায়িকায় আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই শারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব, ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাটী ফিরিয়া আইসে। তখনও শারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। শারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার

দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া শারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি প্রকাশ করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল, কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল যে তাহার এসব আর ভাল লাগে না।

শারদাচরণও সে-দিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগিল কেন?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম, এখন বড় হইয়াছি।

বড় হইলে বুঝি আর ভাল লাগিতে নাই?

না।

কিন্তু বুঝিয়া দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝিয়া কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

শারদাচরণ চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই?

দাও না ত কি!

দিই?

দাও

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এজন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

ক'য়ো না।

তখন দুইজনে দুজনের গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা শারদাচরণ গর্জিতে গর্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে শারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্বের কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল; কিন্তু ললনাই পুনর্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে। তাই পূর্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে; কেহ বলে, বাল্যপ্রেম দৃঢ় হয় না; কেহ কহে, দৃঢ় হয়। যাহাই হউক এবিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে; কিন্তু যাহাই হউক, ইহার একটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

শারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! শারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এসময়ে এস্থানে আসিতে অনুরোধ করিল? আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে। একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেই পথে আসিতে লাগিল। শারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে, কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। শারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, বসো।

তখন বহুদিন পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর শারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমাকে এখানে ডাকাইয়া আনিলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলিতেছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে শারদাচরণ বলিল, কই বলিলে না?

বলিতেছি। পূর্বে তুমি আমাকে ভালবাসিতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে শারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনও ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করিবে?

শারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করিবে না?

তোমাকে বিবাহ করিলে জাতি যাইবে।

গেলেই বা।

খাইব কি?

খাইবার ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না।

কিন্তু পিতার মত হইবে না।

হইবে। তুমি তাঁহার ত একটিমাত্র সন্তান; ইচ্ছা করিলে মত করিয়া লইতে পারিবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ পিতার মত হইলেও, তোমাকে বিবাহ করিলেই জাতি যাইবে। জাতি খুইয়ে হলুদপুর তিষ্ঠান আমাদিগের সুখের হইবে না। আর আমার এমন অর্থও নাই যে, তোমাকে লইয়া বিদেশে গিয়া থাকিতে

পারি। দ্বিতীয়তঃ যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে তাহা ফুরাইয়াই যাউক, ইহা আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাহাই হউক। কিন্তু আমার একটি উপকার করিবে?

বল, সাধ্য থাকে ত করিব।

তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করিবে কিনা বলিতে পারি না।

বল; সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

শারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন, তাহার কি পাত্র জুটিতেছে না?

কৈ জুটিতেছে? আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের ঘরে কে সহজে বিবাহ করিবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর; তুমি বিবাহ করিলে সবদিকই রক্ষা হয়। বিবাহ করিবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না লইয়া কোন কথাই বলিতে পারিব না।

তবে মত লইয়া বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁহার মত হইবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হইবে না?

তবে তোমাকে বুঝাইয়া বলি। লুকাইয়া কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থপিপাসু; তাঁহার ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা অবশ্য কিছুই দিতে পারিবে না, তখন বিবাহও হইবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাইব? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? যথেষ্ট ত আছে।

শারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝিবেন না।

তুমি বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় বুঝিবেন।

আমি একবার মাত্র বলিব; বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করিয়া হইবে?

আমি কি করিব?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।

না।

ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাইবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্ম্মিষ্ঠা—অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হইবে, একজন ব্রাহ্মণের জাতি-কুল রক্ষা করা হইবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব। বল, এ বিবাহ তুমি করিবে?

পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এজন্মে আর কখন বলিবার অবসর পাইব না, তাহাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও করিব না। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া যাই—তোমাকে চিরদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বলিলাম। তুমি, আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখিলে না। যা হইবার হইল, আর এমন কখন হইবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করিও।

শারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এবিষয়ে অনুরোধ করিব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, করিও।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।

ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তাহা ত শুনিলাম।

যদি কিছু করিতে পারি তোমাকে জানাইব।

ভাল।

ললনা, আমাকে ক্ষমা করিও।

করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার নক্সা,—দাও বাবা চার আনা পয়সা। ‘গাড্ডিলে’র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুণিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা থাকে কপালে—ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতচ্ছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা! ‘গাড্ডিল’ হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা।

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকায় পয়সায় রীতিমত ভারী। সে রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ দোকান সে দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটিতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ; মুখ, নাক, কাপড়, চাদর, সর্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েচে।

কি করি বল, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনো কি খাওনি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওনি?

এইবার খাব।

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এসব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্ত দিন না আসি, তাহলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকালবেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাওনি? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দুদিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা আষ্টেক টাকা বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল; বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই। বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বইচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায়?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো, আমাদের টাকার জন্য ভাবতে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটায় টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ?

শুভদা কি বুঝিল, সে-ই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা, মা, আজ কি কিছু নেই?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ওকথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দুস আনা চার আনা বের করে দিয়েচিস; দ্যাখ মা, যদি কিছু থাকে, নাহলে আজ রাতে জলবিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদগদ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাসী করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে 'কিছু নাই' বলিয়াও ইহার পূর্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলে কি খাইবে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে, না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে, প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল, সে এখন নাই; সদানন্দ ছিল, সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই? আজ দুইদিন হইতে হারাণচন্দ্রের দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে, নাহয় জুয়ার আড্ডায়।

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গামময় ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানের শেষ বৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু জুয়ার মর্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়াখেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয়, অর্থাৎ দুই-চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই-চারি টাকা লাভ হয়—তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে

কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপদজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে-কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সে-ই কিছু-না-কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা, এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ করা আছে; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা, আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে একপার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না, কিন্তু পরের খেলায় বাজি মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না হারাণচন্দ্র সে-সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দু'বার দুর্গানাম জপ করিয়া জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া, মৌতাতের জোগাড়টা করিয়া লন। যে দিবস কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দু'হাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, নাহয় লাভের অংশ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

দুই-চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাহাকে পায় কে? গুলির দোকানে আসিয়া সাবেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন; অনেককে রাজা-উজির প্রভৃতি উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই। শুভদার জমিদারি কখন ফুরাইবে না; তাঁহার মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখনও রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারও

না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই। কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুশকিল হয়; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আইসে, যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আইসে, যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া থাকে, তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হউক আর রাত্রি তিনটাই হউক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পায় শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না কেন এত বেলা হইল; একবার জিজ্ঞাসা করে না এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; সে বুঝিতে পারে, সে স্বামী হইলেও এত শ্রদ্ধা এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তা এত যত্ন এত আদর সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাবভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয়, যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাহা হউক, এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অদ্য অনেকরাত্রে হারাণচন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাঁহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ

বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপটিপ করিতেছে, দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল; আজ দুইদিন তিনি বাটী আইসেন নাই, বুঝি-বা ইহার মধ্যে কিছু হইয়া গিয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কিসব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতচ্ছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়া ছিল। অত ভোরে সে কখন গাত্রোত্থান করে না, কিন্তু আজ কি জানি কেন উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়দিদি—কেউ একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি, আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে করে পালিয়ে যাচ্চ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারাণচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা-আপনি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরও চিৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন মিথ্যে কথা বলচি? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন করে জানবে বল? শুধু খেতে আসা বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, জুতা জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ছলনা আর একবার চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয় সে কখনও শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা, তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখনি? বাবাকে অমন করে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম, না আপনি পালিয়ে গেল!

ছিঃ! বাপকে কি ওকথা বলতে আছে?

কেন বলতে নেই? বাপের মত বাপ হলে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমনধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ অমন করে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ অমন করে গাঁজা-গুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বলব—আরো বলব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে একটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হল, আজ তিনি বোধ হয় আর আসবেন না। এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসিমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা !

কেন, তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পর সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ললনা, লুকিয়ে দুটো সজনে শাক ছিঁড়ে আন না মা!

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার মা?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল, বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নেই?

ভাত কেন থাকবে না?

তবে কেন?

গৃহস্থঘর; দুটো সিদ্ধ করে রাখতে দোষ কি?

ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েচে?

কি আর হবে?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না, মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, জননী তাহা ধরিয়া ফেলিল। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্নমুখে বলিল, একজনের বেশি ভাত নেই; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজনে পাতা চিবিয়ে থাকবে?

শুভদা পূর্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সজনে পাতা কি অখাদ্য?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায়?

তা হোক। তখন তুই ত বললি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই ! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখতে নেই। আবার যখন ভগবান মাপবেন, তখন আবার সব হবে। তখন—এবার শুভদার চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি সজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুনপাড়ার একটি ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই-এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এস্থানে আইসে না। কত লোক আসিতেছে; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার দাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে, তাহার পর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না; ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে.। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এইসময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে !

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও, এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্বস্থানে দাঁড়াইল। দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে?

চাল কিনবে?

কি চাল? কত করে?

মোটা চাল।

কৈ দেখি?

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে করা চাল। ক'টা পয়সা নিবি?

চাউল-বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দু' আনা?

ইস্—চারটে পয়সা দাম হয় না, আবার দু'আনা? আমি নিতে চাইনে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না। ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র !

হারাণচন্দ্র নিকটবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চর্বণ করিতে লাগিল। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায়? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা? আড্ডাধারীর কাছে নিয়ে যাই ত চারদিনের মৌতাত যোগায়, কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায়? ছিঃ—ব্যাটারা ভিক্ষে-করা চাল চিনে ফেলবে। তা হলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাড়ি নিয়ে যাব? কিন্তু এ ক'টি চাল কার মুখে দেব? কাজ নেই—

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিল, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিল। দোকানদারের নিকট চারিটি পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইল।—কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম তেমন ফল দিয়েছি। অর্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি ব্যাটা ধরতেও পারেনি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিল না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কাজ নাই; আমরা অন্যত্র যাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর ত পারি নে মা!

তিনদিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললনা সযত্নে মাতৃ–অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারিনে। আমি মা–গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন করে পারিস এদের দেখিস। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস—উঃ—মা হয়ে আর পারিনে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিল তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেকদিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়াছে, তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয়; যে বড় শান্ত, তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে; তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয়দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ

অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

কেন মা অমন কর? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দুজনেই কাঁদিয়া শেষ করিল।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরানী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে মুখুজ্যেবাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ!

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি? ব'স।

আর বসব না দিদি—বেলা হল। নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরানী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত।

শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসেনি?

ছ' দিন হল।

ছ' দিন আসেনি? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস নি কেন?

কাকে পাঠাব? কে যাবে?

তাও বটে, আমাকে বলিস নি কেন?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসীটি নামিয়া আসিতেছিল; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, হাতে কিছু টাকাকড়ি আছে কি?

কিছু না।

তবে সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিল, কেষ্টঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন?

তা জানিনে।

ললনা কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল, আর কিছু বললেন কি?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপট প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্তকরে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথাসময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

রাত্রে একটু আঁধার হইলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্ত দিনের পর হারাণচন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুণিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট-বাঁধা দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে যথামত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও এমন পাইনি।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেচে? ভাল আছে?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল?

তা জানিনে।

বৌ জিজ্ঞাসা করেনি?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলেনি?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না? কেন?

তা জানিনে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা-চাপা একটা পাথরের বাটি হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস।

শুভদা বাটিটি হাতে লইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, তা হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আদুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি?

কি?

এতদিন সে কোথায় ছিল?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাণচন্দ্র মলিনমুখে অধোবদন হইয়া বলিলেন, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্তার পর বলিলেন, বৌ, সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হাঁ।

কি বললে?

বললেন যে, গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নীচ হইতে দু'খানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম। হারাণকে পরতে দিস।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েচে, তা হলে আর কারো নাম করিস। আমার নাম করিস নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্টঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন–দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র এবার আসিয়া অবধি আর বাটীর বাহির হন না। শুভদার সে পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে; কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে? দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই। কে একদিন একটাকা দান করিল, কে আর–একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি একটা পরিবার প্রতিপালিত হয়? ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই? মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্ধেক রক্ত জল হইয়া যায়; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের বয়স হইয়াছে, এমন কি দুই–চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে–বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূলকিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তাহার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকেন, ললনা তাহা দেখিতে পাইত; তরকারি কুটিবার সময় আলু–পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত

আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি কাটা আজকাল সরু–মোটা হইয়া যায়,

ললনা তাহা বুঝিতে পারিত; আহার কমিয়া গিয়াছে, দুইবেলার পরিবর্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় একবার দাঁড়াইয়াছে; পীড়াপীড়ি করিলে বলে আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত; কখন কখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা? কি পোড়াচ্চ?

চারটি সরষের ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে বলেছিল; কিন্তু তেল ত নেই, তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই বুঝি ভাজা হয়েছে? এ ছাই হয়েছে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাইনে, তুমি বুঝি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত করে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমিই খেয়ো—এই রইল। ছলনা মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নীচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তা নিজের বিশ্বাসমত বলিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজগজ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হয়ে যাচ্চে; ওকে কিছু বল না কেন? আমার ত ওকে কোন কথা বলতে সাহস হয় না। একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে—কাজেই রাগ করে দুটো কথা বললে সয়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল?

ভাল নয় তা জানি। কিন্তু কি করব? আমার সময় ভাল হলে ছলনাও বলত না, আমাকেও শুনতে হত না।

ললনা বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

পরদিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্নমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি হল?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণপিসিমা বললেন, আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই। তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।

সকল কাজকর্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হল?

কার কি মাধু?

মাধু একটু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে বলব মাধু।

মাধব আগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি? কবে যাওয়া হবে?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে? আর আমি?

আমি আগে যাই, তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্ততাসহ বলিল, কেন একসঙ্গেই যাই চল না !

ললনা বলিল, না, তা হলে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক গে।

ছিঃ তা কি হয়? আমি যাই।

আবার কবে আসবে?

তুমি যেদিন যাবে, সেইদিন আর একবার আসব।

তার মধ্যে আর আসবে না?

না।

আমি কবে যাব?

আমি যেদিন নিতে আসব।

আসবে?

হাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে কাজ নেই।

কেন ভাই?

মা কাঁদবে মনে হলে আমার ওখানে যেতেই ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবিনে?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবি নে?

কবে আমাকে নিতে আসবে?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এসব কথা মাকে বলো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছুক্ষণ থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—

তা হলে?

তা হলে ব'লো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এইসময় শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হয়েচে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও—আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকালবেলায় সে যেসকল গৃহকর্ম করে তাহা এখন পর্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে

দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলিতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম নিজেই করিতে লাগিলেন; ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ীও আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পূর্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না—বাড়ি এসেচে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নেই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণবাবু ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই; তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথা, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারোটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন; রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনাও কাঁদিল, শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য উঠিল অস্ত গেল, কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচরকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চারি-পাঁচদিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ দেখিলে বোধ হয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবারও বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না, বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইত—মাধব বোধ হয় কিছু জানে; কিন্তু সাহস করিয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনী গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে আঘাটায় একটা চওড়া লালপেড়ে কাপড় অর্ধ জলে, অর্ধ স্থলে, বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেকদিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধ হয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া একথা রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন; শুভদা দেখিলেন, হারাণচন্দ্র দেখিলেন, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে! সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া, তাহার হাতের এককোণে লাল সূতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল মুখুজ্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে; বোধ হয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না; এই বয়সে অনেক শখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারিজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহারা অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এই জন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু-পরিবর্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু-পরিবর্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলিতে পার কোন্ স্থানের বায়ু সর্বাপেক্ষা উত্তম? তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করিলে হয় না?

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার কথা।

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিনমাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই করা হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু

নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ারবন্ধু, গায়ক বাদক অনেক চলিল, তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিয়া ‘বদর’ বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পালভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেকদিন কাটিয়া গেল; তাহার পর বজরা কলিকাতায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এইস্থানে যেন অধিকদিন থাকা হয়।

কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকিব না। বজরা উত্তরাভিমুখে চালাও। সুতরাং একদিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া বজরা উত্তরমুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে, অনেকদিন বজরায় বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণাসম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভবতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল; আর দুই-একদিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-একজন বলিয়াও ফেলিল, অনেকদিন দেশ ছাড়িয়া আসা হইয়াছে—আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে—এখন ফিরিলে হানি কি?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হানি কিছুই নাই, কিন্তু এখন ফিরিব না, তোমাদের যদি বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবুও আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিল; ভিতরে কিন্তু আর পূর্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্ণভাবে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌঁরুষের গর্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রী-পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। একদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। আর তিন-চারি দিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাইরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্তকী রহিল। বাবু তাহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিচরণ, মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়াছ?

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হইবে বলিয়া বোধ হয় কি?

বৈশেখ-জোষ্টি মাসে ঝড় হওয়া আশ্চর্য কি বাবু?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না; আঘাটায় লাগাব কি?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাকতে সে ভয় নেই বাবু। ঝড় আসবার আগেই লঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস করিয়া কাজ নাই—তুমি কাছি কর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কালো মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থটা একটা মনুষ্য-মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসিবে না; একটু গীতবাদ্য হউক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

সুরেন্দ্রবাবু আবার সেই পদার্থটা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়াতবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর

উঠিতেছিল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নীচে যাও—বাজনায় আর কাজ নেই; আজ শুধুই গান হউক।

ওস্তাদজী একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্বে যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী; বয়সে বোধ হয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে; বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশি কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালাপেড়ে শাটি ও দুই-একখানা গহনা পরিয়া শিষ্টশান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই?

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়েছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প আসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছা হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষু রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্চে—না?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দূরবীনটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নীচে থেকে আমার দূরবীনের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দূরবীন আসিলে বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দূরবীন বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

একজন মানুষ বলে বোধ হয়।

এতক্ষণ ধ'রে জলে কি কচ্চে?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন না।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরাসংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ওপারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি, স্ত্রীলোকটা উঠিল না বা উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধ হয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হতে এলে?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই?

না; অনেক দূর।

তবে এখানে কেন?

আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

কবে?

কাল রাত্রে।

তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বলিতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ কেন? নিকটবর্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন?

সে পুনর্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হইতে কতদূরে হইবে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ।

কোন্ দিকে?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐদিকেই যাইব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সহিত আইস; তোমাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাইবে?

যাইব।

তবে আইস।

পুনর্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভাসিয়া গিয়াছে।

এইবার সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সে কিজন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, বস্ত্র আসিলে আমার সহিত যাইবে ত?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, যাইবে।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন, আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে আপনার কামরায় সে রাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া, কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই, তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ি?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি—বিয়ে হয়নি?

হয়েছিল, কিন্তু সেসব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিতভাবে কহিল, কতদিন?

অনেক দিন। আমার সেসব কথা মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপিয়া দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধ হয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ কথারও আন্দোলন করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হল?

জানিনে।

এখন বাড়ি যাবে?

তাই ভাবচি।

জয়াবতী অল্প হাসিয়া, অল্প অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেছেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই! বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাকব তা ত জানিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়াছিল; উত্তর শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয়, তাই—

আরও দুই-চারিটা কথাবার্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেইজন্য অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাতমুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝিমাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জানতে পেরেছ?

সমস্ত।

বাড়ি কোথায়?

মহেশপুরে।

মহেশপুরে কোথায়?

তা জানিনে। এখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখচি! স্বামীর নাম কি?

স্বামী নেই।

শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বলেনি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি?

না।

নাম জান?

জানি; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাকতে ব'লো—আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এ সকল সে জানিত; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কৌচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ,—কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহার বোধ হইল, এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি?

সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বোধ হয় কেহই নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু আমরা সাগরে যাইতেছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হইয়াছে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে, কিন্তু আমি তাহাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবারমাত্র গিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেহ নাই, শ্বশুরবাড়িতেও কেহ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাইবে?

কলিকাতায়।

কলিকাতায়? সেখানে কে আছেন?

কেহ না।

কেহ না? তবে কোথায় থাকিবে?

কাহারও বাটী অনুসন্ধান করিয়া লইব।

তাহার পর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধিতে জান?

জানি।

কলিকাতায় কোথাও রাঁধিতে পাইলে থাকিবে?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পাইলে করিবে কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে কিছু বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলিকাতায় যাহা আশা কর, অন্যস্থানে তাহার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ পাইলেও করিবে না কি?

মালতী পূর্বের মত মাথা নাড়িল—কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাইব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই, সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যাহারা কলিকাতা চিনে না তাহাদের পক্ষে কলিকাতা অতি মন্দ স্থান; তোমার যাহা অভিলাষ করিও, কিন্তু খুব সাবধানে থাকিও। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী; নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সংবাদ দিও, কিংবা আমার বাটীতে যাইও। আপদবিপদে উপকার করিলেও করিতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা একসপ্তাহ পরে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিব। এখন এই বজরাতেই থাক; যখন কলিকাতায় পৌঁছিব তখন নামিয়া যাইও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতে সে বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু কাঁদিবার আরো শত-সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে কি রাঁধিতে মাত্র কলিকাতায় যাইতেছে? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার, সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে এবং

কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী; শরীরে তাহার রূপ ধরে না একথা সে টের পাইয়াছে; কলিকাতা বড় শহর। সেখানে এ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সে-ই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধাঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না। গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন? তাঁদের সময় হয়েছিল, তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েচেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড়; তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে; বিশেষ, মালতি কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথাবার্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাঁশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দের পিসিমাতা কাশী যাইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ, পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির-শিবলোকবাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে দুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণবাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে, কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত; রোগের সেবা করিতে করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সংবাদ অবগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাসকাল কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সেইসব কথা মনে করিতে লাগিল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্মফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল, মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না—সে কথা সঙ্গত কি না? আর একথা যে বলিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাহা হউক রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে, কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ফুল, বেলপাতা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল; খ্যাংরাটা নীচে ফেলিয়া দিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসিমা; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েচেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েচেন?

পিসিমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েচে।

শুভদা একথা জানিত না; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, বাবা, ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়াছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কোথায় আর যাইবে—বাছা সংসারের দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হয়েচে। পাঁচদিন হল গঙ্গার তীরে তার পরনের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু একফোঁটা কিংবা দুইফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইলেন ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায়নি?

কিছু না।

হারাণকাকা কোথায় আছেন?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলিতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করিতেছেন?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে?

পূর্ব্বের মত।

আর সকলে?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল। শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধবে কে?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না?

হবে না কেন? কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক, তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসিমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও বা, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে; সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া শারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল; চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, শারদা !

শারদা গৃহে ছিল, সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানালার নিকট আসিয়া বলিল, কে?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ?

হাঁ।

কবে এলে?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল, বৈঠকখানায় গিয়া বসি।

না, ওদিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

শারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

শারদাচরণ বিষণ্ণভাবে কহিল, জানি।

কেন মরিল কোন সংবাদ রাখ কি?

না তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হইয়াছে।

সদানন্দ তাঁহার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড। সাংসারিক দুঃখকষ্টে একজন মরিতে পারে, আর তুমি সম্মুখে থাকিয়া একটু সাহায্য করিতে পার না?

সদানন্দর ভাবভঙ্গি দেখিয়া শারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল; সে এবং সদানন্দ বাল্যসুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। শারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেইজন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে; কিন্তু শারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেইসব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে; তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ,

সে সকল কথায় এখন আর ফল কি? আরো মনে করে দেখ, আমার পিতা জীবিত রহিয়াছেন, তাঁর বর্তমানে ইচ্ছা হইলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করিতে পারি? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই? কিছুই বলিতে আসে নাই?

সম্প্রতি নহে; তবে অনেকদিন পূর্বে একবার আসিয়াছিল।

কি জন্য? কোথায়?

শারদাচরণ বলিল, বলিতেছি। বলিল, প্রায় মাসখানেক পূর্বে অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল; আমার যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও গিয়াছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাইবার ইচ্ছা ছিল না?

শারদা ম্লানমুখে বলিল, আর কেন ভাই!

সদানন্দ সেকথা শুনিল না, বলিল, তারপর?

তারপর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

কাহার সহিত?

তাহার নিজের সহিত।

নিজের? ললনার সহিত? তুমি কি বলিলে?

শারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল; কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি—তা কি করিব বল? বাবা এখনো বাঁচিয়া আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বাঁচিয়া কি লাভ?

এইবার শারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত না; বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এবিষয়ে বিচার

করিবার কোন অধিকার নেই—ভালও দেখায় না। যা হউক, আমি বলিলাম, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

সে চলিয়া গেল?

না, তখনও চলিয়া যায় নাই; ছলনাকে বিবাহ করিতে বলিল।

তুমি স্বীকার করিলে না?

শারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই; বলিয়াছিলাম পিতার মত হইলে করিতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হইল না?

না।

কেন?

বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলিতেছি শুন; বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তাহা দিতে পারিতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না; বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলিতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণিত হইলে আর কোন আপত্তি হইতে পারে কি?

সম্ভবতঃ নহে।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই?

কিছু না।

তবে দেখা যাউক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্বার বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

শারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও? একটু বসিবে না?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলিতে পারি না।

রাগ করিলে?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল; দূরে একখানা বজরা ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্যমনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাটের সর্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশপানে চাহিয়া গান ধরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেইদিন, রাত্রে জ্যোৎস্নাধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালনের মত ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, নীচে কামরার জানালা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুণিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুর আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গাতীরের অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধাঘাট চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্‌ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নরনারীর নিদ্রিত মুখ মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল তখন দু'বেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত; ঐ ঘাট হইতে পিত্তলকলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্‌ধন করা চলিত না। মালতী এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। শুভদাকেও ভুলিতে পারা যায় না, মাধবকেও ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুজ্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল; আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসীমা, গিরিজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্ধেক জড়াইয়া বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলার প্রফুল্ল সুর করুণ

হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত কে গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরও একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে।

লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসীমা আর হতভাগা হারাণ মুখুজ্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে মালতী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখছি জ্বর হয়েচে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি করে কি জানালায় মাথা দিয়া শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পূবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েচে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানালা বন্ধ করা হয়নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া

খাইতে দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। কামরার জানালা সার্সী সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল, প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কতদূরে?

এখনো প্রায় দু’দিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এ সময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তাহলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দোব।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসিতে এ-হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হলে ভাল হতো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই, বলিল, ছিঃ! ওকথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে ভাবিয়া দেখিতেছিল যে, জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই। তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি মরিতে পারিবে না; মরণে ভয় নাই, তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে, তাই বলে কি ভাবতে হয়? তাহার পর একটু থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে, কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার-বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পঁহুছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নোঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল; ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোলে, এত শব্দসাড়ার মধ্যে কে তাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত শহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে। যেজন্য এ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে, বজরা এস্থানে আরও তিন-চারিদিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে; বজরাও সেইসময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল; কেননা, যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্তব্য হউক না, আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজী করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্বেই সে এই মর্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া

সেটাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া চলনসই গোছ একরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ি, পান্‌সি ঠিক করিয়া ভৃত্য সংবাদ দিল; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না! মালতী যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পারে। তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্রবাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নামিয়া যাইবে?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মালতী সেইরূপভাবে বলিল, দেখিয়াছি।

কোথায় যাইবে?

তা ত জানি না।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তবে আর কি দেখিয়াছ? আজ নয়, কাল একবার কলিকাতার ভিতরটা দেখিয়া আসিও; তাহার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যাইও, আমি বারণ করিব না।

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভাবিয়াছ, আমি ততটা ভাবিয়া দেখিয়াছি। তুমি

ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি করিতে পারিবে না; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্রসংসারে প্রবেশ করিতে না পারিলে তুমি থাকিতে পারিবে না; এ অবস্থায় নিঃসহায় কেমন করিয়া যে এত বড় শহরে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবে, আমি বুঝিতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, ভাবিয়া দেখ, তোমার এ বয়সে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আপনাকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে কি? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু উপায় ছিল না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, মালতী কাঁদিতেছে, পূর্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল; বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করিলে?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না?

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাঁহার আর বাকি নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল, কারণ, এসব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ-দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া, অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদিতেছ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলিকাতায় যাইতেছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—কলিকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখিতে পাইবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপ কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বোধ হইল, যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নিবিক্ষিপ্ত, বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত, তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অস্থিময়। মূর্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না; চক্ষু চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলিয়া দিব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যেজন্য তুমি কলিকাতা যাইতে চাহিতেছ তাহা তুমি পারিবে না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্বে কখন কর নাই, এখনও পারিবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যাহা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দিব।

মালতীর রুদ্ধশ্বাসের সহিত চক্ষুজল বাহির হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সহিত চল। আমি খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র নহি—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিব; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলিয়া গেলে বাঁচিবে কি? না, আমিই শান্ত মনে বাটী ফিরিতে পারিব? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত?

মালতীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; সে আর সে নয়; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী, আজন্মের প্রণয়িনী; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী; সীতা-সাবিত্রীর নাম কেন; সে রাধা, চন্দ্রাবলী; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান-অপমান কি?

ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গারবিক্ষিপ্ত নহে; এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল, মধুময়! ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃতধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য অস্তগমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ন-সূর্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রের চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল; তিনি সহস্র আবেগে, সহস্র তৃষ্ণায় সে-মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন— তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি?

কে দিদি?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী! সে ত অনেকদিন মরিয়াছে।

জয়াবতী?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন; বললেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়— তাকে কখন বিবাহ করি নাই।

তবে কি?

কিছু নয়— কিছু নয়। তুমি আমার সব, সে কেহ নয়— তুমি সব— তুমি সমস্ত।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,— ছিঃ ছিঃ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

না, কখন না।

তবে আমাকে নিয়ে চল।

চল।

আজি।

এখনি।

এই সময়ে বাহিরে শত-সহস্র কণ্ঠ নানাকণ্ঠে নানারূপে চিৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর— সরে যাও— তফাৎ— তফাৎ— গেল গেল— ডুবল— হো হো— ঐ যা— সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এপারে ওপারে, চতুর্দিকে মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর

সমস্ত সমবেত হইয়া চিৎকার করিতেছে এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পান্‌সি স্টিমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে।

চক্ষুর নিমিষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে; চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছটফট করিয়া আবার চিৎকার করিলেন, ধরো না, ধরো না— আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড স্টিমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথও মাঝিমাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয়া! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু তাহা দেখিলেন না; একবারমাত্র চাহিয়া ছিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বাঁচিয়া নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হইয়াছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সংবাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন, বলিলেন, তোমরা সবাই যাও— সমস্ত শহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে।

ভৃত্য মনে মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম নয়! মুখে বলিল, যে আজ্ঞা... পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার

পরে বারোটা, তাহার পর একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা— তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল, আর চক্ষু মুছিতে লাগিল; তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে— চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়াশব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যা জাগিয়া কোন ফল নাই, তুমি শোও গে।

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, বসো, যেও না, তোমাকে কিছু বলিব।

মালতী দুইপদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেইখানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হইল?

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে তাহার মুখ বন্ধ হইল, কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে সব কথা পরে হইবে, এখন যাও।

মালতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি? না; বাকি রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেবদেবীর নাম করিল, অনেক কথা মনে করিল; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল

জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে। সর্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে, মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রাতঃসূর্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্তদিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না; কিছু পূর্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিনও তিনি আসিলেন না; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেদিনও এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া কি লিখিতেছিলেন, বোধ হয় কোথাও পত্র লিখিতে ছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে, মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা-আপনি শিহরিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে কি?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আমি আজি বজরা খুলিয়া দিব। পরপারে কলিকাতা— তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল, কোন কথা সে কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বের কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা লইয়া সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইও, তিনি তোমার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুও বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার নিকট টাকাকড়ি বোধহয় কিছুই নাই?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহা আমি জানিতাম। এই নাও, বলিয়া একটা মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাতে যাহা আছে, কোনরূপ উপায় না হইলেও এক বৎসর ইহা হইতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলিবে; তাহার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদে যাহা হয় করিও।

আর একফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার পাপে এমন ঘটিল? কিন্তু এখন জ্ঞান হইয়াছে, এখন দেখিতেছি আমারই পাপের এই ফল— তুমি নির্দোষ! আমার জয়াকে আমিই মারিয়া ফেলিয়াছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া হাত মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হইয়াছে— আর পাপ করিব না; কিছুদিন সৎপথে থাকিয়া দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল; সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, মুড়িয়া খামে পুরিয়া শিরোনামা দিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া

দিয়া বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করিয়া লইও, বোধ হয় ইহাতে উপকার হইবে।

কম্পিতহস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল; বলিলেন, ধর্মপথে থাকিও—

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল। এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল— মালতী, সেদিনকার কথা বিস্মৃত হইও—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্ধউন্মোচিত হইল, সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল— অসময়ে, কষ্টে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল; ডাকিলেন, মালতী !

মালতী সেইখানেই দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী!

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি লইয়া সংসারে থাকিব? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আর বাঁচিব না। এইবার নীচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাইব না।

তখন দুইজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন। মালতী পুনর্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল; সেইভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সেদিন তুমি কি বলিয়াছিলে মনে আছে?

কি?

চিরদাসী।

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ!

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে।

বজরা এখনি খুলিয়া দাও।

এখনি?

এখনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না?

আমি তাই মনে করছি; আমার কেউ নেই, দু'বেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসিমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমিজমা আছে, সেগুলা আমিই পাইয়াছি, দু-একদিনের মধ্যেই সেখানে যাইয়া আমাকে সব দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হইবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয়, না হলে কে আর দেখিবে?

তাই মনে করিতেছি যে, আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখিব, না হইলে চুরি যাইতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায়নি।

না যাউক, কিন্তু এখন ত যাইতে পারে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই-একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেলের ডাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুজ্যে-পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া-শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলিবে?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নহে। আমি এইখানে খাই, এইখানে থাকি, আমার জিনিসপত্রও এইখানে থাকিবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল; কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে জাদু করিয়াছে; কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে; কেহ বা এমন কথাও রটাইল যে, ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল; যে সম্মুখে একথা উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দুবিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পিসিমার শ্বশুরবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রাখিয়া যাইব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করিয়া চলিতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি নাই।

তবে এমন কথা বলিলে কেন?

সদানন্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎসন্ন যাইতেছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; আপনারা একটু চেষ্টা করিলে না যাইতেও পারিতাম।

তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

যে আজ্ঞা, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি, মুখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খুব খেয়েছি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া আর একবার হাসিয়া পূর্বত্যক্ত গানটার সুর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব সুখের শেষ সীমা, শুভদা তাহা তেমন উপভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্র দুবেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দুই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ পাইতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার পূর্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে; আর চাই কি? তবে যেটুকু বাকি আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একটু ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন।

গুলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন, আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব রীতিমত খর্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী!

আমাকে হেয় করিস? পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন্ ছার। আর ভগবান নন্দী তার বাটীর সম্মুখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গুনগুন্ স্বরে গলায় সুর লইয়া সমস্ত বামুনপাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শুভদা? তাহার কি এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামীসুখ সে একদিনের জন্যেও পায় নাই; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না— সে স্বামীর মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আইসে, কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল, বুঝিবার একজন ছিল, কিন্তু সে পূর্বেই গত হইয়াছে।শুধু ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শুভদা এই সুখেই সাংসারিক কাহিনী খতম করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শুভদা সে তত্ত্ব কিছুতেই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক সুযোগ হইয়াছে, যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে, কিন্তু ফল যে কিছু হইতেছে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শুভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া আকুলভাবে আপনা-আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে; আবার জল আনে, রন্ধন করে, সকলকে খাওয়ায় পরায়— এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া সদানন্দ শুভদার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, ছলনা বড় হয়েছে।

শুভদা মলিন মুখে বলিল, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শুভদা বলিল, মা দুর্গাই জানেন।

সদানন্দ একটু হাসিল; বলিল, মা দুর্গা ত আর বিবাহ দিয়া যাইবেন না?

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে শারদার সহিত বিবাহ দিলে হয় না।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, শারদার সঙ্গে?

হাঁ।

তা সম্ভব কি?

অসম্ভবই বা কিসে?

কি জানি! একথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল; তাহার পর বলিল, এ বিষয় শারদার নিকট একদিন বলিয়াছিলাম; তাহার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল; বলিল, কিন্তু তার পিতা? তাঁর কি মত হইবে?

না হইবে কেন?

কেন হইবে না, তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন যে বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিত না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করিতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না, শুধু মৌনমুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগলা সে মৌনভাষাও বুঝিল; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হইবে।

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হইবে কি?

নিশ্চয় হইবে।

কেমন করিয়া জানিলে?

পাগলা আবার একটু হাসিল; আমি তাহা জানি। আপনি ভাবিবেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করিতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত যে নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল। কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় একফোঁটা চোখের জল মিলাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, বসো, ওঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ওঘরে আসিয়া, দুগ্ধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপরে ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে; বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু; ললনার শোকের একফোঁটা জল; স্বামীর বেদনার একবিন্দু বারি।

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরুবাছুর চরিয়া বেড়ায়— সেখানে সদানন্দ আলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থমূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাকু পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ, সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে, অনেকদিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেকদিন কাশীতে ছিলাম।

তাহা শুনিয়াছিলাম। তোমার পিসিমাতার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছি। আসিলে কবে? বসো।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না; বসিয়াই বলিল, মহাশয়ের নিকট বিবাহের ঘটক হইয়া আসিয়াছি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কাহার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন। বিষয়ী লোক সাংসারিক কথাবার্তার সময় হাসিতামাশাগুলিকে অনেকদূরে বিদায় দিয়া আইসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার যুক্তিতর্কে রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালির কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপ গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাহার বিবাহ?

শারদার?

আজ্ঞা হাঁ।

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতরপানে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, ঐদিকে বোধ হয় শারদা আছে, যাও।

তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, শারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই আসিয়াছি।

বৃদ্ধ পূর্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট?

আজ্ঞা হাঁ।

কেন?

এই যে বলিলাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করিতে। শারদার কি বিবাহ দিবেন না?

দিব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকিলেই কি আসিয়াছি?

তোমার প্রয়োজন? আমার সহিত?

আজ্ঞা হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সেসব কথা হইতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে, জগতের এ শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্নমাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্তা চলিতে পারে না; মুখখানা তোলোহাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনাপাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, খুব হইতে পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হইয়াছে; সেই অবধি আমিই তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয় দেখিয়া আসিতেছি। সাংসারিক কথাবার্তা আমাদিগকেও কহিতে হয়; বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়া দেনাপাওনা মীমাংসা করিতে হয় তাহা অবগত আছি এবং আশা করি সে বিষয়ে আপনিও যতটা বুঝিবেন, আমিও প্রায় ততটাই বুঝিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে, ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনাপাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না; তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্বেই মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি যে, সে সব আমার সহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; তাহার কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কাহার কন্যা? কোথায়?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।

হারাণের?

আজ্ঞা হাঁ।

সে কি দিবে?

আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন ; তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে কেমন?

আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; যাহা হউক, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাহাকে দেখিয়াছে—বিবাহ করিতেও অনিচ্ছুক নহে।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হইলেই হইল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই; দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজকর্ম করিতে পারে, এই হইলেই হইল।

সদানন্দ বলিল, তা পারিবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারিবে? তার অবস্থা ত এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়। তাই বুঝে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই দিবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জানি বাপু, মেয়ের বিবাহের কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম শারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাহাই হইবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন। আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না, এ আপসোস তাঁহার হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিরাইতে পারা যায় না; যাহা হউক, মন্দের যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গহনা দিতেই হবে।

হবেই।

দান-সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করিয়া ফেলুন।

বৃদ্ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করিয়া চলিতে হইবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি?

সহাস্যে—নিয়ম এমন কিছুই নয়, তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাহাই হউক।

কিন্তু কাহার সহিত হইবে?

আমারই সহিত হউক।

কবে?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু?

এ দেনাপাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনিতে পায়।

কেন?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বৈষয়িক লোক; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করিতে চাও?

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সে নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেইসময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি রীতিমত বৈষয়িক লোক, এভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না। একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়েস হইয়াছে, এইজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হইলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যাহা হউক, তুমি যখন নিঃশব্দে দান করিতে পারিতেছ, তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে পারিব। সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না।

সদানন্দ প্রফুল্লমুখে নমস্কার করতঃ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুভদা শুনিলেন, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে, তাহার সহিত শারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সদানন্দ পূর্বজন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ পর্যন্ত পিসিমার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল; তখন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্য শ্রীমাণ সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসিমাতার সমস্ত জমিজমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল, তাহার পর একজন মুরুব্বি স্থির করিয়া এককথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্ধমাস-কালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখাপড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির করিল, তাহার পর সময় করিয়া শারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্যন্ত নিভৃতে তাহার সহিত দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেকদিনের পরে দুজনেই আপসে দুটো কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া শারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

স। কতক কতক মনে পড়ে বৈ কি।

শা। মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবিতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলিতাম, অভিমান হইলে কত কাঁদিতাম, আর তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে—নাহয় বিদ্রূপ করিতে, সেসব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ?

স। তা আর পড়ে না? সে ত সেদিনকার কথা; বোধ হয় সাত-আট বৎসরের অধিক হইবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

শা। আমার বোধ হইত যেন বিদ্রূপ করিতে। যা হোক, তাহার পর যেদিন সে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিল, অভিমানভরে দুজনেই কথা বন্ধ করিয়া চিরবিদায় লইলাম; সেদিন কত রাত্রি পর্যন্ত তোমার কাছে বসিয়া কাঁদিলাম, সেকথা তোমার মনে আছে ভাই?

স। আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। শারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরিয়াছে!

সদানন্দ সেকথা যেন শুনিতে পাইল না, আপনমনে গঙ্গায় একখানা নৌকা সাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। শারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবিয়া মরিয়াছে।

এবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোন্‌খানে?

শা। ঐখানে।

স। কেমন করে জানিলে?

শা। ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল তবে, কাপড়খানা একবার দেখিয়া আসি।

শারদা অল্প হাসিল; কাপড়খানা কি এখনো ঐখানে আছে?

স। চল তবে স্থানটা দেখিয়া আসি।

দুজনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখমুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

শা। সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

স। কেন?

শা। সময়ে সময়ে বোধ হয় আমিই তাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

স। কেন?

শা। জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হইয়াছিল কি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করিলে সে হয়ত এখনও বাঁচিয়া থাকিত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরিয়াছে সে নিশ্চয়ই মরিত! তুমি কি করিবে?

শা। তাহা জানি। তবুও যদি তাহার কথা রাখিতাম, যদি বিবাহ করিতাম!

সদানন্দ হাসিল; জাত যাইত যে।

শারদাচরণ তাহা ভাবিল; বলিল, তাহা যাইত।

তবে আর তুমি কি করিবে?

শারদার চোখে জল আসিল। আর কি করিব, কিন্তু এত অনুতাপ হইত না!

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে।

শা। আহা, যদি তাহার শেষ অনুরোধটাও রক্ষা করিতে পারিতাম!

স। কি অনুরোধ?

শা। বলিয়াছিল, একঘর দরিদ্রের জাতি বাঁচাও—ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করিবে না?

শা। করিব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হইল কি?

স। কেন হইল না?

শা। প্রকারান্তরে হইল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করিয়া সম্মত করিলে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বললাম, যে তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে।

শা। শুধু এই?

স। আবার কি?

শা। আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

শা। জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কত টাকা দিতে হইবে?

স। সেকথা শুনিয়া তোমার লাভ নাই।

শা। সদানন্দ, এ যে পাপের ধন!

স। আমি আশীর্বাদ করিব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

শা। সময় হইলে আমি ফিরাইয়া দিব।

স। দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যেস্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সেস্থানের মাটি তুলিতে লাগিল।

শারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করিতেছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, শারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না; তথাপি বলিল, পাগলামি করিতেছ তাহা ত বলি নাই।

স। তুমি বলিবে কেন, আমি বলিতেছি।

শা। না না, সত্য বল মাটি লইয়া কি করিবে?

স। আমি আজকাল শিবপূজা করি; বাটীতে গঙ্গামাটি নাই তাই লইয়া যাইতেছি।

শারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া শারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল শারদা বাড়ি যাই।

শা। তুমি ওসব কি করিলে?

স। তাহা ত চক্ষেই দেখিলে।

শা। কৈ, শিবপূজার মাটি লইলে না?

স। না। আর শিবপূজা করিব না।

শা। কেন?

স। আর একদিন বলিব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সেরাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসিমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল; কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই! ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজি সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুজ্যের চিৎকারের শেষ নাই, পিসিমাতার

চক্ষুজলের অর্গল নাই—বাটীতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইতেছে যে, এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত এ ব্যথা বুঝিতেছে; কেবল শুভদা আজি বড় শ্রান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাজনা-বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময়, কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়েছে; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হাঁ, মনটা দরজা বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি বৈ ছেলে নয়, তার ওখানে বিবাহ করিতে ইচ্ছা—আমি আর তাহাতে অমত কেন করিব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পালটি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখিতেও হয়!

শারদাচরণ একথা শুনিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে! এখন আরাম করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে সে আরামটা আর তেমন করিয়া উপভোগ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দু পয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে ধৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনের আনন্দে পাশবালিশ জড়াইয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারিদিন নির্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে, শয্যাটা একটু গরম, বালিশগুলো একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্তদিন ধরিয়া হইতেছিল, তাহা তখনও শেষ হয় নাই; কালো মেঘগুলা ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না—ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল; তাহার পর মাথায় ছাতা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এপথ ওপথ করিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, একপা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতরে আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধ হয় রন্ধনশালায় ছিলেন, সদানন্দ সেদিকে গেল না; পিসিমাতা সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে খোঁজ সে লইল না। পা ধুইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া যে ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদর্শী বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত

প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না; যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপনমনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক আর না আসুক, সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আমার কাছে আস না কেন?

স। আমার কত কাজ ছিল ভাই।

মা। সব হয়ে গেছে?

স। হাঁ।

মা। ছোটদিদি কবে ফিরে আসবে?

স। আর তিন – চারদিন পরে।

মা। দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না —

স। কেন?

মা। তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল; বলিল, একলা কেন মাধু?

মা। চুপিচুপি তোমাকে বলতে দিদি বলে গিয়েছিল।

স। কে, মাধু?

মা। দিদি; বড়দিদি যে রাত্তিরে চলে গেল—তুমি তখন এখানে ছিলে না কিনা তাই, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বলতে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু? কেউ গালাগালি দিয়েছিল?

মা। কেউ না।

স। তবে কেন গেল?

মা। আমিও যাব।

স। ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আমার আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দুজনে খুব সুখে থাকব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল; তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, কবে?

মা। যবে আমার সময় হবে।

স। মাধব, এসব কথা তোমাকে কে শেখালে?

মা। বড়দিদি।

স। সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?

মা। হাঁ—

স। আর যদি না নিয়ে যায়?

মা। কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে!

স। যদি না নিয়ে যায়, তাহলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, ভাবিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, কি জানি!

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

স। যায়। না হলে তোমার দিদি গেল কি করে?

মা। আমিও তবে যেতে পারব?

স। পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন করে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই। সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, আমি কিন্তু কেমন করে যাব? এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারিনে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দের চক্ষে জল আসিল; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না। সে সুখী ছিল, অসুখী হইয়াছে, বিবাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথমে মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না; যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই, সেকথা মনে পড়িল; মাধবচন্দ্র মরিতেছে, একথাও স্মরণ হইল; আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে, সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে—তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সেস্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে, তাহার দিদি কখন

মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয় আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্তমনে নিদ্রা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর–একবার নূতন করিয়া কন্যা –জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাশা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ব্যায়ানঠাকুরানীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছটফট করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসিমাতা, কৃষ্ণঠাকুরানী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া কতক রাঁধিতেছেন, কতক কাঁদিতেছেন, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে, আর হারাণচন্দ্র 'এই আসিতেছি' বলিয়া ঘণ্টাতিন হইল বাহির হইয়াছেন, এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন; কৃষ্ণঠাকুরানী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুনিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন; তিনি আজ ছয়–সাত দিবস হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু সদানন্দর পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকিবেন; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচিবে না।

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল; খাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধ হয় ভাল নয়।

ভাল নয়?—একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন; স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন; মনে মনে বোধ হয় স্থির করিয়া লইলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুখ হয়েচে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু মৌন হইয়া রহিলেন; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের মায়াদয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাকতে হয়!

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরানী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসিমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে, বড় গা বমিবমি করচে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসিমাতা দুগ্ধের পরিবর্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন; কৃষ্ণঠাকুরানী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নীচে শোওয়াইতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসিমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায় অচেতন দেহ নীচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসিমাতা পূর্ব্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল, তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা,—দিদি—এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজি সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই,—শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল; রাসমণির সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন? সময় হয়েচে—রাসমণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীপাতা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চিৎকার-শব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চিৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা— মাধু—

সেও বোধ হয় গোঁ-গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা-বা।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র হর্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্বসুন্দরী মালতী, কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সাইড বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত সুসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত; দেওয়াল নানাবিধ লতাপাতা ফুলেফলে বিচিত্র, তাহার উপর বহুবিধ তসবির, বহুমূল্য অয়েল পেন্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আশেপাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাঁচের ভিতর দিয়া লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্মরপ্রস্তরের মেজ এবং শ্বেতপ্রস্তরের ঝরনা, তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে; চতুর্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য প্রতিকৃতি, সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধনয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কিন্তু একবর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয়; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য

পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্রপরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া—বসিয়া রহিল। পুনর্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না।

কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না, কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী!

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দুটি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদিতেছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পাইলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল কিন্তু পাইল না, আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্বেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহাই হউক

আর কাঁদিবে না কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল, তেমনিই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করলে যে একজন সুখী হইতে পারে তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলিতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করিয়া সাজাইলাম, এ দেবীপ্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, কিন্তু সুখী হইতে পারিলাম কি? সুখের কথা ছাড়িয়া দিই— বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহাকে সুখী করিতে এত করিলাম তাহাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখিলাম না, তোমাকে পাইয়া অবধি ও অধরে একতিলের জন্যও হাসির রেখা দেখিলাম না,— বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীরভাবে সে অশ্রুমলিন মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, মালতী, কতদিন কাটিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হইবে না, কিছুতেই কি একবার হাসিয়া চাহিবে না?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনের সাধে সাজাইব বলিয়া কত অলঙ্কার আনিলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু একদণ্ডের তরেও তুমি পারিলে না। মালতী! তুমি কি আমাকে দেখিতে পার না?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখিতে পার না তাহা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ লইও না— আমার যাহা মনে হয়—আজ তাহা বলিয়া যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করিয়া

থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য ভিন্ন তাহাদের সুখ যে আর কিসে আছে তাহা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাহাদের মত বোধ হয় না, সেইজন্য বুঝিতেও পারি না কি করিলে তুমি সুখ পাইবে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তুমি এতদিনে সুখী হইতে—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, মালতী! তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল, তোমাকে বিবাহ করিলে কি সুখী হও? বল—বল, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল; হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষের জলে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে, তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ গত হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—ভগবান জানেন আমার কি হইয়াছে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হইয়াছি তা বলিতে পারি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নাই, ভালমন্দ বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্যন্তও বুঝি দিতে পারি।

ঈশ্বর জানেন, তোমার মন পাইবার জন্য মিথ্যা বলিতেছি না, সত্যই বলিতেছি; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি—যাহা হইবার হইবে—তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করিলেই যদি সুখী হও, তাহাই করিব। জাতি, কুল, মান, এতবড় বংশ, কিছুই মনে করিব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহার পর মালতী, আমাদিগের মত মনুষ্যের পরিষ্কার পথ

পড়িয়া আছে—যখন সহ্য করিতে পারিব না, তখন আত্মহত্যা করিয়া নরকের পানে সোজা চলিয়া যাইব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওকথা তুমি বলিও না। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছিলে, লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে—না হইলে এখনও বোধ হয় বাঁচিয়া থাকিতাম না; আমি নীচ, কুৎসিত; কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ, এ জীবনে কখন ভুলিব না—এ সকলের প্রতিশোধ কি আমি এইরূপে দিব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিশোধ হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, আমি জানি না। তোমাকে বলিব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করিয়া আসিতেছি। মনে দুঃখ করিও না, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে, এত অল্পদিনে স্ত্রীলোকের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ সম্মান লুপ্ত করিতেও সম্মত হইয়াছি।

মালতী সেইরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসীর যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য তুমি এতই সহিবে—তোমার কেশাগ্রও বিসর্জন দিবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন ইহাই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাইতেছ না।

মালতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

সু। কিন্তু আমি ত দরিদ্র নহি। আমার যাহা আছে, তোমারও ত তাহা আছে।

মা। আমি নিজের কথা বলিতেছি না।

সু। তবে কাহার কথা? তোমার ত কেহ নাই!

মা। ভগবান জানেন এখন আর কেহ আছে কিনা, কিন্তু যখন চলিয়া আসিয়াছিলাম তখন সব ছিল।

সু। সে কি? নৌকাডুবি হইয়া—

মা। সেসব মিছে কথা, নৌকাডুবি আদতে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এসকল ছলনা, না সত্য কথা? কিন্তু সে-মুখে ছলনা সম্ভবে না—সে-চক্ষু, সে-অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী।

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখপানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলিয়া বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া, কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি—কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইলাম—যাঁহার সহিত বিবাহ হইল তাঁহাকে বোধ হয় একবারের অধিক দেখিতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেইখানেই থাকিলাম। পিতা আমাদিগের গ্রাম হলুদপুর হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম করিতেন। সামান্যই বেতন পাইতেন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টে চলিয়া যাইত। এইসময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

মা। সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসিমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তাহার পর চুরির অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করিয়া কোনদিন আমাদের আহার হইত, কোনদিন হইত না। মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চাহিয়া চিন্তিয়া যাহা মিলিত তাহাতে অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকিতেন; এমন কি একসঙ্গে তিনদিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। গাঁজা-গুলি খাইতেন, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন—হয়ত বা চার-পাঁচদিন ধরিয়া বাড়িতেই আসিতেন না।

আমার ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হইতে পীড়ায় ভুগিতেছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারিতেছিল না, বোধ হয় এতদিনে সে আর বাঁচিয়াও নাই—

এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরানীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হইল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া কেহ বিবাহ করিতে চাহিল না। বিবাহ না হইলে ব্রাহ্মণের ঘরে জাতি যায়—আমাদেরও জাতি যায়-যায় হইল; মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ফিরিয়াও চাহিতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁহার পিসিমাতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার চাকুরি যাইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীতে আর কত সাহায্য করিবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ফুরাইয়া গেল—এ সময়ের কথা আর

বলিতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন; কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্যদিন বলিও।

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত, আমি ভাবিতাম কলিকাতায় গিয়া উপার্জন করিব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে আসিলাম, মনে করিলাম তীরে তীরে কলিকাতায় যাইব—তাহা হইলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না, কাহাকেও পথও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। ঘাটে আসিয়া দেখিলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাইতেছে, আমি সাঁতার জানিতাম, নৌকা দেখিয়া ভাবিলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া নৌকার হাল ধরিয়া থাকিব। শুনিয়াছিলাম আমাদের দেশ হইতে কলিকাতা অধিক দূর নহে—তবে ঠিক জানিতাম না যে কতদূর। ভাবিলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমিও তখন নামিয়া যাইব। জলে পড়িলাম, সাঁতার দিয়া কিছুদূর আসিলাম—এই সময়ে কাপড়খানা হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া গেল, আমিও প্রায় ডুবিবার মত হইলাম, কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু হাত হইতে সেটা পিছলাইয়া কোথায় সরিয়া গেল, এইসময় নৌকাখানাও কাছে আসিয়া পড়িল; আমার হাতপা-ও ধরিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না—তাই হালটা ধরিয়া ফেলিলাম।

নৌকা চলিতে লাগিল, আমিও সাহস করিয়া তাহা ছাড়িতে পারিলাম না, ভয় হইল, তাহা হইলেই ডুবিয়া যাইব। এইরূপ বহুদূর চলিয়া আসিলাম। তখন আর ফিরিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। অবশেষে স্থির করিলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে অনেক স্ত্রীলোকেই আসিয়া থাকে, তাহাদের নিকট বস্ত্রও থাকে—ভিক্ষা করিয়া একটা চাহিয়া লইব—বিবস্ত্রা দেখিলে স্ত্রীলোকের দয়া হইবেই—। তারপর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করিলে এতদিনে তাহার কোন উপায় করিয়াছ কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

সু। তাহা জানি। আর তাই ভাবিতেছি, যে মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারে না সে কোন্ সাহসে এতটা করিয়াছে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। মাসে মাসে কত টাকা হইলে তাঁহাদের চলে?

মা। কুড়ি টাকা।

সু। প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিও।

মা। তুমি দেবে?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন; বলিলেন, দোবো; আরো চাও আরো দোবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তাহার জন্ম সার্থক হইল।

সু। তার পরে একটা কাজ করিও—আমাকে বিবাহ করিও—কেননা নরাধম হইলেও—অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগিতে দিব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, না—

সু। কেন—না? তুমি ভাবিতেছ আমার জাতি যাইবে; কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যাহার টাকা আছে তাহার জাতি শীঘ্র যায় না।

মা। গোলমাল হইবে।

সু। হইবে। কিন্তু তাহাও অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

মা। বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

সু। মালতী! একদিনের জন্যও সেসকল ভুলতে দাও—জগতে আসিয়া অনেক দ্রব্য পাইয়াছি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হইতে দাও।—

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকিব।

সু। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। তুমি চিরদিন থাকিবে, কিন্তু আমি পারিব কি? তুমি সংসার দেখ নাই, কিন্তু আমি দেখিয়াছি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চিরজীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিবে, আমি হয়ত কোনদিন তাহা মাঝখানে ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যাইব। মালতী! সময় থাকিতে আমাকে বাঁধিয়া ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেক দিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, বাঁধিয়াছি, পার ইহাই ছিন্ন করিও। ইহার উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

সু। তোমার নাই কিন্তু আমার আছে।

মা। থাকুক, কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না।

সু। কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই?

মা। বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।—

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

মা। নয় কি? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি।

সু। ছি ছি!—ওকথা মুখে আনিও না—তোমাকে কত ভালবাসি।

মা। সেইজন্যই মুখে আনিলাম; না হইলে হয়ত বিবাহ করিতেও সম্মত হইতাম।

সু। মালতী!

মা। কি?

সু। সব কথা খুলিয়া বলিবে?

মা। বলিব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্বে কেহ স্পর্শও করে নাই, কিন্তু একজনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে অনেক সাধিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। জাতি যাইবার ভয়ে সে বিবাহ করিল না।

সু। সে মনপ্রাণ ফিরাইয়া লইলে কিরূপে?

মা। সে যেরূপে ফিরাইয়া দিল।

সু। পারিলে?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে।

সু। উঃ—সে কি সদানন্দ?

মা। না—আর একজন।

সু। তবে তুমি মানুষ চিনিতে পার নাই—তাহাকে বল নাই কেন? সে তোমাকে ভালবাসিত।

সহসা মালতীর সর্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল, সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থসাহায্য পাওয়া; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া; সেই কাশী যাইবার দিন; সেই বালিশের নীচে একরাশ টাকা দেওয়া;—সেই আরো কত কি! মনে পড়িল, দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বহিয়া পড়িবার পূর্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর?

মা। কলিকাতায় যাইতেছিলাম।

সু। তারপর?

মা। দয়া করিয়া পায়ে স্থান দিয়াছ।

পূর্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি রত্ন। রত্ন কুস্থানে পাইলেও গলায় পরিতে হয়।

মা। কে বলিল? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্যে হয়ত তাহা পায়ে রাখিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও,—আমি রত্ন, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করিব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবিতাম তুমি বোকা, কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন; অঘোরবাবুর? কিন্তু এ বাগানবাড়িতে কেন?

তিনি বলে পাঠিয়েছেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস। কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনিও।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কোথায় বিবাহ করিয়াছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কেন, পরিচয় আছে নাকি?

বোধ হয় কতক আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতে হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে, কিংবা মানুষে শখ করিয়া কাঁদে, কিংবা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটাফাটি কাণ্ডও বাঁধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শতহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়; এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে। যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিতমুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া হৃষ্টপুষ্টভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে, তাহাদের বুকখানা ফাটিয়া যাউক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু

যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু-বিসর্জন ভগবান-পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও হয়ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এইরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল তাহা বলিব না; বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসায় কত প্রভেদ! মালতী আপনা হারাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতাও মিশিয়াছে। ছাই নিজের সুখেচ্ছা! তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার একগাছি কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচকথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎসুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ, সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্ম্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর, তুমি জান, এ জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সেদিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি—কখন সেদিন হয়, যদি কখন স্বামিস্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সেরাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্তদিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী, কিছু শঙ্কিতা হইল। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রঞ্জিতমুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে, কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝিবে! আগে আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করিতে শেখ, তার পর বুঝিবে মকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সে কথা ভাবিয়াছিলে?

মা। কোন্ কথা?

সু। কোন্ কথা! কালিকার কথা আজই ভুলিয়া গেলে?

মা। ভুলি নাই, মনে আছে।

সু। তা ত থাকিবেই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

মা। দেখিয়াছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

সু। হয় না? সে আবার কি?

মা। সেকথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সু। বলিয়াছ আমার মাথা আর মুণ্ড। বিবাহ আমি করিবই।

মা। আমি হইতে দিব না। একমাসের উপর হইল এখানে আসিয়াছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্ব্বে করিলে না কেন? এখন সবাই জানিয়াছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন—বলিলেন, আমিও তা ভাবিতেছিলাম, হোক গে—আমি—

মা। তাহা হইলে আমি বিষ খাইব।

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সেকথা পরে বোঝা যাইবে। আপাততঃ এখন সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিব।

মা। তবে সাতদিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কোথায় যাইবে?

মা। যেখানে ইচ্ছা।

সু। মরিবে?

মা। মরিব না—কেন না মরিতে আমি পারিব না। তবে যেপথে ভাসিয়াছিলাম আবার সেই পথেই ভাসিয়া যাব।

সু। তবু বন্ধন পরিবে না?

মা। না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, মালতী মিথ্যা কহিতেছে না, একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিবে? ইহা তোমাদের স্বধর্ম! ভাল, তাই হউক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌনমুখে এ তিরস্কার সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠাইয়াছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল—মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

সু। কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

মা। না।

সু। কিছুই ছিল না?

মা। না।

সু। এতদিন আসিয়াছ, হাতে কিছুই হয় নাই?]

মালতী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করিয়া এমন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিলে আমি কি করিব বল? একখানা কাপড় পরিবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলিবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটিয়া বলিবে না—আমি আর কি করিব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রাখিয়া দাও। ইহা হইতে যাহা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও—বাকি যাহা রইল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়ো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়ো; অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাইতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। ভুলিয়ো না—আজ টাকা পাঠাইয়া দিও।

মা। কেমন করিয়া দিব?

সু। রেজেস্ট্রি করিয়া দিও।

মা। আমি পারিব না। তুমি আর কারো নাম করিয়া পাঠাইয়া দাও।

সু। কেন? ধরা পড়িবার ভয় হয়?

মা। হয়।

সু। তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলিয়া দিই। তিনি কলিকাতায় থাকেন, সেখান হইতেই পাঠাইয়া দেবেন।

মা। সেই ভাল! কিন্তু যদি কেহ তাঁহার নিকট সন্ধান লইতে আসে—তা হইলে?

সু। যেমন বুঝিবেন সেইরূপ উত্তর দিবেন।

মা। না। তাঁহাকে বারণ করিয়া দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ করেন।

সু। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়াবতী মরিয়াছে, কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেইখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভও নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাউক সে কথা। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানি না কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদারবাবুর নিজ ভবনের একাংশে স্থান পাইল। যখন সে পাইল তখন তাহার মাতাও আসিল; তখন দুইজনে ঘরকন্না পাতাইয়া দিল; কিন্তু জয়ার মার অদৃষ্ট ভাল ছিল না, তাই মাসপাঁচেক যাইতে না যাইতেই মাতা কন্যার কলহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এরূপ হইল যে, দু জনে দুসন্ধ্যা রীতিমত চিৎকার করতঃ উভয়ে উভয়ের মঙ্গল-কামনা এবং আশু সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবার বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এরূপেও দিন কাটিতে লাগিল, আরো ছয় মাস কাটিল। তাহার পর জয়ার মা প্রাসাদ-বাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহাকে সেখানে যাইতে নিতান্ত বাধ্য করা হইয়াছিল, কেননা যাইবার কালীন সে যেরূপ নির্ম্মমভাবে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং কন্যা ও তাহার—কল্যাণ-ভিক্ষা করিতে করিতে গিয়াছিল তাহা দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে, ইচ্ছাসুখে সে এ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই অবধি সুরেন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল যেন সে মাগী কিছুতেই আর এবাড়িতে না ঢুকিতে পায়। কিন্তু তাহা হইত না। সে মাগী আবার আসিত, আবার প্রবেশ করিত। কিন্তু ফল কিছুই হইত না। বহুবিধ গালিগালাজ, শাপশাপান্ত, অশ্রুপাত, বুকে দারুণ চপেটাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন এবং

পরিশেষে ভৃত্যহস্তের ‘অর্ধচন্দ্র’, এই লইয়া জয়ার মাকে বাসপুরে ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতি দুইমাস-একমাস ব্যবধানে ইহা নিশ্চয় ঘটিত। বোধ হয় ইহাতে তাহার ভিতরে ভিতরে কিছু লাভ ছিল, না হইলে শুধু এইগুলির জন্যই সে অত পরিশ্রম করিয়া এতদূরে আসিত না; সে যেরূপ চরিত্রের লোক ছিল তাহাতে এগুলি আর কোথায় অনেক কম ক্লেশে উপার্জন করিয়া লইতে পারিত। যাক একথা—এমনও হইতে পারে যে, সে কন্যারত্নকে অতিশয় স্নেহ করিত, এইজন্য বিপথগামিনী হইলেও মায়া কাটাইতে পারিত না—দেখিতে আসিত। এইরূপে চলিত। তাহার পর যখন সে শুনিল যে, জয়াবতী গঙ্গায় ডুবিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তখন চিৎকার শব্দে বাসপুরের অর্ধেক প্রতিবাসীকে আপনার বাটীর সম্মুখে একত্র করিয়া ফেলিল।

বাসপুরে অধিকাংশই ছোটলোকের বাস, সেজন্য অধিকাংশ চাষাভুষা লোকের বাটীস্থ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, আধবয়সী, যুবতী প্রভৃতি দর্শকবৃন্দে জয়ার মার দাওয়া দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, বাক্ শক্তিহীন হইয়া এ কাহিনী শুনিল যে, জয়াবতীর গ্রামজোড়া জাহাজখানা প্রায় পাঁচশত দাসদাসীর সহিত কলিকাতার অতল জলতলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

তখন জয়ার মা বলিল, যারা দেখেচে, তারা বলচে যে অত বড় জাহাজ কলকাতা শহরে নেই।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলিল, তা ত নেই-ই।

একজন আধবয়সী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কত দাম ছিল?

আর বাছা দামের কি আর নেখা-জোখা আছে?

সে চুপ করিল।

জয়ার মা কহিল, নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত দেখতে এসেছিল।

যুবতীরা কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত কেঁদে সারা—বাছাকে সবাই ভালবাসত কিনা!

এইখানে জয়ার মা চোখের কোণে অঞ্চলটা রগড়াইয়া লইল। আর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মনে মনে প্রার্থনা করিল যে, কি সুকৃতি-বলে পরজন্মে জয়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করা যায়।

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল? সাক্ষেৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা; কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোনখানে একতিল খুঁত ছিল কি?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন? যখন যা বলেচে তখনই তাই পেয়েচে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা!

একথা মনে মনে প্রায় সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হল?

তিনি ভাল আছেন; আলাদা জাহাজে ছিলেন কিনা তাই রক্ষা পেয়েচেন।

দুজনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল?

তা ছিল বৈ কি, না হলে কুলুবে কেন? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি!

তাদের কি হল?

আহা! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল। ‘সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ পড়ে আছে’ বলিয়া ‘কি আর কোরবে বল? তবে এখন আসি’, সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা-তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল

দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের অন্তঃকরণে সেই গ্রামজোড়া জাহাজ আর লাটসাহেবের কান্নার কথা জাগাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেইসব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে, এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখন হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল; সহস্রগুণ চিৎকারে তাহা শমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শতকর্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানালার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে! জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্বে সে ঢুকিতে পাইত না; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এখন সে যেরূপ ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে, দ্বারবানদিগের বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চিৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়া নিকটেই উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃপুনঃ শতসহস্র আবেদন, ভিক্ষা প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ, তলব ইত্যাদি—নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল;

তৎপশ্চাদ্বর্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্বশেষে জয়ায় মা এই বলিয়া শেষ করিল যে, তাহার আর একটি পয়সাও খাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, নাহয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হইবার হইয়াছে, এখন কি হইলে তোমার চলে?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলিবে—আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আর আমার লাগিবে?

সু। তবু কত টাকা চাও?

জ-মা। পনের টাকা মাসে পেলেই আমার চলে।

সু। তাই পাইবে। যতদিন বাঁচিবে, মাসে মাসে কাছারি হইতে ঐ টাকা লইয়া যাইয়ো।

তখন জয়ার মা অনেক আশীর্বাদ করিল, অনেক প্রীতিপ্রদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা একথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যেস্থানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে, তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিসিক্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং বাবু তাহাকে বহু সমাদরে বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন, তখন জয়ার মা অন্য আকৃতি

ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল; স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সেইখানেই বাগানবাটী-অধিকারিণীর উদ্দেশে বহুবিদ হীনবাক্য গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ, সেই বুক-চাপড়ানি। দাসদাসীরা ভীত হইল, শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল, শেষে বাবুর ভয় পর্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্বক সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গর্জাইতে গর্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধকষায়িত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনী কোথা?

সে বেচারী নূতন লোক, ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না। আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজসজ্জা! সে পূর্বে সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল, তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল

সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর কে জানে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না? এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল। ডাকিয়া কহিল, ওগো, তোদের গিন্নী কোথায়? অস্বাভাবিক কর্কশবচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গাত্রে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই—কিন্তু মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল; বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি। আপনি বসুন।

জয়ার মা। তুমি কতদিন আসিয়াছ?

স্ত্রীলোক। প্রায় একমাসের কিছু অধিক।

জয়ার মা। তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেচ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনী হারামজাদীর মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশসুদ্ধ লোক চেনে। হারামজাদী ডাইনী আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—খাব (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) খাব, তবে যাব, খাব—খাব—খাব—সব শেষ কোরে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে অলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদী তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত)—ওরে আবাগী—শতেক খোয়ারি—ছেনাল—ডাইনী (মস্তকের কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব—তোকে খাব—মা-কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমনি কোরে মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন)—ওরে আবাগী, এমনি কোরে—এমনি কোরে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)— কই, কোথা সে?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সুমুখে বসিয়াছিল; জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধহয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিল, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন—

আমি চুপ কোরব! তুই হতভাগী সেকথা বলবার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে, আর আমি চুপ কোরে থাকব? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই?

মা। না।

জয়ার মা। আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নোড়ব না—হারামজাদীকে দেখব, খাব—তবে যাব!

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। কিন্তু অনেক বেলা হল, খাওয়া-দাওয়া ত এখনও আপনার হয় নাই?

জয়ার মা। খাওয়া-দাওয়া? তা তখন একেবারেই কোরব।

মা। আহা, মেয়ের শোক! মার প্রাণ যে কি কোরচে তা আমিই জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ বাছা!

মা। তা কি আর বুঝিনে! কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়, পোড়া পেট ত আর মানে না।

জয়ার মা। তা সত্যি কথা।

মা। তাই বলচি, এখানেই দুটো জোগাড় করে দিই—

জয়ার মা। দিবি? তা দে বাছা।

মা। আহা! জয়াদিদি আপনার কথা কত বোলতেন।

জয়ার মা। বোলত? তা বলবে বৈ কি! তুই তাকে দেকেচিস!

মা। আহা—কতদিন একসঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখিনি?

জয়ার মা। তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি?

মা। হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়েছিলেন।কত কথা বোলতেন—তার মধ্যে আপনার কথাই বেশি হোত।

জয়ার মা। তা হবে বৈ কি! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না।

মা। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

জয়ার মা। আহা, অমন মেয়েও মরে! কিন্তু তোদের এ ডাইনী কোত্থেকে উঠল?

মা। কলকাতা থেকে।

জয়ার মা। মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ করেচে?

মা। শুনতে ত পাই।

জয়ার মা। কিন্তু আমি তার ওষুধ করা আজ ভেঙ্গে দেব।

মা। দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

জয়ার মা। তা যাব। মাগী মন্তর-তন্তর কিছু জানে?

মা। মন্তর-তন্তর? শুনতে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া কোরে রাখতে পারে। এই বাবুকে এমনি করেচে যে, ইনি উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্কমুখে বলিল, তা মন্তর-তন্তর আমিও জানি।

মা। জানবে না কেন? তা আজ দুপুরবেলা যখন আসবে তখন দেখিয়ে দেব।

জয়ার মা। বাণ মারতে জানে?

মা। জানে বৈ কি!

জয়ার মা। কখন আসবে?

মা। দুপুরবেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাত আছে—আজ তবে এখন যাই, কাল আসব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা। না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

জয়ার মা।বড় দেরি হবে যে।

মা। কিছুই দেরি হবে না!

জয়ার মা। তবে শীগ্গির শীগ্গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা?

মা। আমার নাম মালতী।

জয়ার মা। আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নীচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল। মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে, জয়ার মার আহারে তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

মা। একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি ত নেই, এখন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করেন।

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি?

মা। সেই দশ টাকা আপনি নিন।

জয়ার মা। আমাকে তুমি দেবে?

মা। হাঁ।

মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা, তুই নিশ্চয় ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক—তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হলে—এই দেখ্ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল, কিন্তু মা বলে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন করে হাতে তুলে দেয়নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

মা। আমরা দুঃখী লোক, কিন্তু ধর্ম ত আছেন।

জয়ার মা। আছেন; কিন্তু সবাই কি তা জানে?

মা। তা হোক—কাল তবে আসবে?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈ কি।

মা। আমাদের ঠাকরুনকে তোমার কথা আজ তবে বলে রাখব কি?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—না তা আর বলে কাজ নেই।

কামরূপ হইতে শিক্ষা করা ‘বাণমারা’ বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আসব এখন।

মা। এসো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল।

সু। তবে ভাব করে নিয়েচ?

মা। নিয়েচি।

সু। কিন্তু ওর নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

মা। তা শুনেচি।

সু। কি করে?

মা। নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে।

মনদুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

সু। প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয়নি। যে ডাইনীকে তুমি কলিকাতা থেকে এনেচ তাকেই দিয়েছিল।

সু। সে ডাইনী ত তুমিই।

মা। আমি কেন হব? আমি ত কলিকাতা থেকে আসিনি।

সু। তা হোক, তবু ত তুমিই সে।

মা। আমাকে সে চিনিতেও পারেনি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে করতে পারে?

মা। আমিও সেই জন্যে আজ বেঁচেচি—না হলে বোধহয় আমাকে আস্ত রাখত না।

সু। মেরে ফেলত?

মা। বোধ হয়।

সু। তার পর?

মা। আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বললে যে, সে এলেই তাকে খেয়ে ফেলবে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বললাম, বোধ হয় করেচে, না হলে বাবু উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন কেন?

সু। আমি বুঝি তাই করি?

মা। কর না কি?

সু। আচ্ছা তা দেখচি; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা করলে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কিনা, আমি বললাম, খুব জানে; কামরূপ থেকে শুনতে পাই শিখে এসেচে। বললে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েচে।জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বললাম, পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

মা। হাঁ।

সু। আর কখন এখানে আসবে না?

মা। আসবে বৈকি। কিন্তু তোমার সে ডাইনীর কাছে আসবে না—আসে ত আমার কাছে আসবে।

সু। যার কাছে ইচ্ছা আসুক, কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, মালতী, আর কতদিন এমন করে কাটাবে? এমনধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, গয়না পরিলে কি রূপ বাড়িবে?

সু। তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ান যায় না। কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ—

মা। গয়না পরিতে হবে?

সু। হাঁ।

মা। পরিতে পারি, কিন্তু আগে বল আমাকে গহনা পরাতে তোমার এত জেদ কেন?

সু। যদি বলি, তা হলে মনে দুঃখ পাবে না?

মা। কিছু না!

সু। তবে বলি শোন। তোমার এ নিরাভরণা মূর্তি বড় জ্যোতির্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া একটু ম্লান করিয়া লইব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল, প্রকাণ্ড দর্পণে তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থ-ই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত-স্মৃতি এখনও বুঝি সে-দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে,

সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল—সে দেখিল, সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্তি, আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্তি।

বিস্ময়ে, আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবরবেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে; জুঁই, বেলা, বকুল, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে, একহস্তে ফুলের তোড়া, অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স; পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে জরির জুতা, হেলিতে দুলিতে একেবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল, আজ আবার এ কি?

সু। কি বল দেখি?

মা। তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তুমি পূজা কর?

মা। করি।

সু। তবে তোমার বাড়িতে চন্দন আছে; চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ!

মা। কার সঙ্গে?

সু। আগে সাজাও, তার পরে শুনিও।

মালতী নীচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল!

সু। তা কি এখনো বুঝিতে পারনি!

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল-বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেইরূপ দেখেন নাই, বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,

তোমাকে বিবাহ করিলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হইলে; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরাইলাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলিতে পারিবে না।

উভয়ের চক্ষেই জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল—আপনার সংসার আপনি বুঝিয়া লও—আশীর্বাদ করি এ জীবনে চিরসুখী হও!

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবার চক্ষু তিতিয়া উঠিল—কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, মালতী, আজ পিতা-মাতার কথা মনে হইতেছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যাহা ইচ্ছা ছিল তাহাতে তুমি নিজেই বাদ সাধিলে। মনে করিয়াছিলাম, আর এমন করিয়া থাকিব না, তোমাকে যখন পাইয়াছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিব, আর একবার সংসারী হইব। তোমার পিতা-মাতাকে এখানে আনিব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন—আমি নিজে সুখী হইব। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা।

এখন বাড়ি যাইবে?

মালতী বলিল, কোথায়?

যে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাইবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভাবিয়াছিলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে, বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে-ঘাটে কাদা-পাঁক, পিছল ছিল—এখন তাহার পরিবর্তে শরৎকাল পড়িয়াছে। সে মেঘ নাই, সে কাদা-পাঁক, পিছল নাই—পথঘাট খটখট করিতেছে; কখন দুই-একখণ্ড শুভ্র মেঘ উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশ বহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লানমুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল—এখন সেসব আর নাই। কখন কখন সেমুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-একফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুঃখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত, গগনের কোন অনির্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড়গুড়' করিয়া কখনো কাঁদিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না, একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্তন ভিন্ন সংসার চলে না। একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্তা! জন্মিয়া অবধি আজ পর্যন্ত! শুভদা একথা মনে করিয়া দেখে—আর দেখে শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। পাড়ার পাঁচজন দেখে—শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলের কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর-গমনে চলিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী!

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ী আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা' 'আহা' সবাই বলে, কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'-টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে

না। আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই—প্রয়োগ করিবার অবকাশও আইসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাই কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য-কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্বশেষপ্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতীয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালক-বালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সেসব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজ সম্পূর্ণ নির্জন হইয়াছে; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্তদিন বাটী আসেন না। আর হারাণ মুখুজ্যে! তা সে আজকাল ভাল ছেলে হইয়াছে। নিত্য দুবেলা বাটী আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্বের মত কর্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরবেলাটা রান্নাঘরের মাটির মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথাল অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়, সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়—আবার রাত্রি আইসে।

নিত্য যেমন হয় শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকুরুন!

শুভদা শুনিতে পাইল কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল, বলি মাঠাকুরুন! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিয়ন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখিবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও—

অমনি পাবে না মাঠাকুরুন। এখানা রেজেস্ট্রি চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেস্ট্রি অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারই নাম শুভদা।

পিয়ন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল,—সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি-কলম দাও।

পিয়ন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, কালি-কলম আমি পাব কোথায়? আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি-কলম নেই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার পর উপর-নীচে সর্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্ধভগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায়?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল।

শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনিভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত দপ্তর ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল আইসে নাই, বহুকাল এদিকে চাহে নাই। এটা ললনার

ঘর; ললনা মরিয়া পর্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙ্গা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পঞ্জিকা হইতে কর্তিত গোটা-পাঁচেক ছবি—টপ্ করিয়া একটা মস্ত বড় ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নীচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; পিয়নকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু পিয়ন ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চিৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না—কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল, আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সেদিনও আসিল না। কিংবা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা এ কথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ গ্রামে আপনার নামে আর কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলিকাতায় কে আপনার আছে?

কলিকাতায় আমার কেহ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল—কলিকাতা হইতে এ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাহাকেও আমি চিনি না।

তবে?

শু। তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি করিব? টাকা যদি না লওয়া মত হয়, তাহা হইলে ফিরাইয়া দিন।

শু। বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খাইতে পাই নাই, তখনো বোধ হয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেব? এ আমার টাকা নয়, তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলিকাতায় গিয়া সন্ধান লইব। এ টাকা এখন আপনি রাখিয়া দিন—যদি ফিরাইয়া দিবার হয়, ফিরাইয়া দিব।

শু। তুমি টাকা সঙ্গে লইয়া যাও—মত-অমত নাই—একেবারে ফিরাইয়া দিও। সম্ভব, তিনি আর কাহারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

স। যা হয় সেখানে গিয়া স্থির করিব।

শু। তাই করিও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনার প্রশস্ত কাছারিঘরে উকিলবাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে; ব্যস্তভাবে দুইজনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধ হয় এ মকদ্দমা আমি জিতিতে পারিব না।

অ। এখনো কিছুই বলা যায় না।

সু। বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝিতেছি মকদ্দমা হারিতেই হইবে।

অ। কিন্তু হাইকোর্টের উপরও ত আছে?

সু। আছে, কিন্তু ততদূর যাইবার ইচ্ছা নাই।

অ। তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছাড়িয়া দিবেন?

সু। না দিয়া আর উপায় কি?

অ। বিস্তর আয় কমিয়া যাইবে।

সু। হাঁ, প্রায় অর্দ্ধেক কমিবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইসময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাহিরে একজন আপনার সহিত দেখা করিতে চান।

অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না—বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, এঘরেই ডাকিয়া পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা, কিন্তু কপালে ফোঁটাতিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্ধময়লা উত্তরীয় বসন, সাদা থান পরিধানে, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে। দুজনেই চাহিয়া দেখিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিলবাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

ব্রা। তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলিবার এইখানেই বলিব কি?

অ। স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠাইয়াছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিই পাঠাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুজ্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে?

অ। হাঁ, তাই বটে।

ব্রা। কেন?

অ। মনিবের হুকুম।

ব্রা। মনিব কে?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তাহা বলিতে নিষেধ আছে।

ব্রা। তবে এ টাকা ফিরাইয়া নিন। যাঁহাকে ইহা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করিবেন না, আপনাকে তিনি চিনেন না এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চিনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সংবাদ লইয়া নোটখানা ফিরাইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করিয়া একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

ব্রা। না হোক, কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

অ। তাহাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করিব না।

ব্রা। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ দিবেন, আমি অন্যদিন আসিয়া দিয়া যাব। তিনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই বলিলেন, মহাশয়ের নাম?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন?

স। কোথায় থাকিব এখনো স্থির করি নাই; বরাবর এখানেই চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরিয়া যাইব।

সুরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসিব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

স। বলুন।

সু। এখানে নহে। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানেই যাই—তথায় সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না; তখন দুইজনে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিলেন, ইহার পূর্বে আপনাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু—কিন্তু—আপনি আমাকে কখন দেখিয়াছিলেন কি?

সু। না, দেখি নাই। কিন্তু আপনাকে জানি।

স। কিরূপে?

সু। বাসায় চলুন—সেখানেই বলিব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হইয়াছে—আপনি এখানে আহার করিলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

স। দরিদ্র বটে; কিন্তু তাই বলিয়া—

সু। বুঝিয়াছি। তাই বলিয়া দান লইবেন কেন?

স। কতক তাই বটে; বিশেষ দাতার নাম না জানিতে পারিলে—

সু। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? যে দান করিয়াছে, সে-ই বলিতেছে, ভুল-প্রমাদ কিছুই ঘটে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে।

স। কে দান করিয়াছে?

সু। ধরুন, এখন অঘোরবাবুই—

স। অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করিতে সকলেরি অধিকার আছে।

স। থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

সু। করে না; কিন্তু যাহার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না লইলেও চলে।

সু। আজকাল বোধ হয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে চলিত কি?

স। সেকথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জানিলেন কিরূপে?

সু। আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী-পুত্র- পরিবার প্রতিপালন করে না, তাহার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

স। কিছু না।

সু। বুঝিয়াছি। আপনার সাহায্যে তবে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়?

স। ভগবান সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

সু। ছলনার বিবাহ হইয়াছে?

স। হইয়াছে।

সু। কোথায়? কাহার সহিত?

স। আমাদের গ্রামেই। শারদাচরণ রায়ের সহিত।

সু। মাধব কেমন আছে?

স। সে বাঁচিয়া নাই—অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে।

সু। আহা! তাঁর বড় মেয়েটি এখন কোথায়?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বাঁচিয়া নাই।

সু। বাঁচিয়া নাই? মরিল কিরূপে?

স। গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

সু। কেমন করিয়া জানিলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল কি?

স। মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে নাই; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতেই বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে। সু। সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ নাই?

স। কিছু না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, মনে করুন, যদি এ-টাকা সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

স। কে? ললনা?

সু। ললনা কে? তার নাম কি ললনা ছিল?

স। হাঁ।

সু। আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ললনাই বটে! ললনা, ছলনা দুই বোন,—না?

স। হাঁ।

সু। মনে করুন দেখি, যদি সে-ই এ টাকা পাঠাইয়া থাকে?

স। যে মরিয়াছে, সে?

সু। হাঁ, সে-ই। গঙ্গাতীরে তাহার বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে সে মরিয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল। কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া থাকিলে পত্র লিখিত।

সু। পত্র লিখিতে যদি তাহার লজ্জা বোধ হয়?

স। আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখনো সে করিবে না—জীবিত থাকিয়া কখনো আত্মগোপন করিবে না!

সু। সে মরে নাই—বাঁচিয়া আছে; সে-ই টাকা পাঠাইয়াছে এবং প্রতি মাসে পাঠাইবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, আপনার নাম?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস?

নারায়ণপুর।

স। আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করিয়া জানিলেন?

সু। ললনা বলিয়াছে।

স। ললনা বলে কেউ নাই—সে মরিয়াছে।

সু। মরে নাই—সে সুখে আছে।

স। সে স্বর্গে গিয়াছে—

সুরেন্দ্রবাবু চিৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখন দেখা হয় বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে—

তাঁর মাকে বলিবেন—

হাঁ—স্বর্গে গিয়াছে।

সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু দিবস পূর্বে হইলে বোধ হয় এখন হাসিতেন, কিন্তু আজ চক্ষুকোণে জল আসিয়া পড়িল। এইসময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু, গাড়ি সাজাবে?

হাঁ, সাজাও।—ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছা করিয়া খায়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া ‘সীতার বনবাস’ পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে। আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এইসময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের ‘সীতার বনবাস’ নীচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা!

তুমি?

হাঁ, আমি; কিন্তু তুমি ধরা পড়িয়াছ। নাম জাল করিয়াছিলে কেন?

কৈ?

আবার মিছে কথা? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া আসিলাম। ললনা ছিলে—মালতী হইয়া বসিয়াছ।

কোথায়?

কলিকাতায়।

কলিকাতায় আমাকে ত কেহ জানে না।

সু। সেখানে কেহ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হইতে আসিয়াছিল।

মা। কে?

সু। তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরাইয়া দিতে অঘোরবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন।

মা। নোট ফিরাইয়া দিতে?

সু। হাঁ—

মা। সদাদাদা?

সু। সে-ই।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে?

মা। সদাদাদা কেমন আছেন?

সু। ভাল আছেন। তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয়, তাই তোমার দান গ্রহণ করিবেন না। সদানন্দবাবু তাঁহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মা। আমার নাম ললনা—সে কথা কেমন করিয়া জানিলে?

সু। সদানন্দ বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

সু। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে তুমি বাঁচিয়া আছ এবং সুখে আছ।

মা। তা কেন বলিলে?

সু। তবে কি মিথ্যা বলিব? তুমি বাঁচিয়াও আছ, আর আমার বোধ হয় সুখেও আছ—

সুখে নাই কি?

মা। আছি—কিন্তু সেকথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

সু। নাঃ আমি আপনি বলিয়াছি এবং তোমার মাকেও একথা বলিতে বলিয়াছি।

মা। আমি টাকা পাঠাইয়াছিলাম—তাহাও বলিয়াছ কি?

সু। বলিয়াছি।

মা। তুমি আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলিয়া বেড়াইবে। যদি তাহাদিগের নিকট মরিয়াই ছিলাম, তবে কেন বাদ সাধিয়া আবার বাঁচাইলে?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন, যাহাকে তোমরা পাগল মনে করিতে, সে বাস্তবিক একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সেদিন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচিবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করিয়াছ, সে কখন তাহা প্রকাশ করিবে না।

মা। কেমন করিয়া জানিলে?

সু। জানিয়াছি! যখন, তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাইতে বলিলাম, সে বলিল—ললনা লজ্জার কাজ কখন করিবে না, আত্মগোপন কখন করিবে না—সে বাঁচিয়া নাই, মরিয়াছে। আমি বলিলাম, সে সুখে আছে। সে বলিল, সে স্বর্গে গিয়াছে। আমি বলিলাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। সে বলিল, আমি যাই—যদি কখন তার দেখা পান, বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম; যে বিষ আমি খাইয়াছি—সে বিষ সেও খাইয়াছে। আমার সুধা হইয়াছে—তাহার প্রাণহন্তারক হইয়াছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হইয়াছে? কোথায়, কার সহিত?

ঐ গ্রামেই। শারদাচরণ না কে—তাহারি সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ কারত সে-ই করিবে, তাহা কতক জানিতাম।

সু। কেমন করিয়া জানিলে? পূর্ব হইতে কি কথাবার্তা ছিল?

মা। না—কথাবার্তা কিছুই ছিল না—তবে আমি এক সময়ে ছলনাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরিয়াছি—এই ভাবিয়া দয়া করিয়া বোধ হয় বিবাহ করিয়াছেন।

সু। পিতার ভয় কেন?

মা। তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থলাভ করিবেন।

সু। তাহা বদলাইল কেন? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

মা। সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়াছ শারদাচরণের সেই ভালবাসায় শারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে, তাই বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল। ভাবিল, সদানন্দ আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে করিল—শারদাচরণ! পূর্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল, এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে

পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল, শারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে হৃদয় হইতে পূর্ণ বিলীন হইয়া যায় নাই। আজ আরো স্পষ্টীকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ; কিন্তু সে শারদা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে-কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর কোত্থেকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ'।—কোথায় গেছলে? সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্ছি। তাহার হালের গরু ততক্ষণ একজনের বেগুনক্ষেতে ঢুকিয়াছে, সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা-আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকানঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন, একপা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচদিন তোমাকে যে দেখিনি, ছিলে কোথা?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে!

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে?

হুঁ। সদানন্দ হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সেকথা শুনিল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হইল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পাইলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিলেন, তবে এ টাকা লইয়া কি করিব?

স। আপনার যাহা ইচ্ছা। টাকা আপনার ইচ্ছা হয় বিলাইয়া দিন, নাহয় রাখিয়া দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরাইয়া দিবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল, হারাণকাকা কোথায়?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুইয়া আছেন।

কোথাও যান নাই?

গিয়াছিলেন—এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইল। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না; আকাশে মেঘ কোরে আছে, রাত্রে যদি জল হয়?

হোলেই বা।

তা হ'লে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে। যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী; ঠাকুরঝির আবার অসুখ হয়েচে—অঘোরে পড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিল না। ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি-দেওয়া চটি-জুতা হাতে লইয়া, কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থই অনুমান করিয়াছিল; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত; কিন্তু একথা কাহাকেও বলা দূরে যাউক, সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত, শুধু তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল, হাতের নিকট যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রাবোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল, কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহার হস্তে বংশযষ্টি, সমস্ত বদন ও অঙ্গ মসীলিপ্ত, তাহার উপর শাদা-শাদা চুনের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো!

চুপ! সে বজ্রগম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার-দুই ঠকঠক করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সর চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারী। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝি বা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে, লাঠিটা আর একবার শানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে, না হলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিশের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সের ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে, তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চুনকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে মোটে হস্তনিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এসকল তাহার বিশেষ জানাশুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; মৃদু মৃদু কহিল, নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙ্গাইয়ো।

শেষ প্রশ্ন

এক

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ-বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ-বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্ব্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারত দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আ-ভাঙ্গা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে, ওপার হইতে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোকে কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়ঘর ছিল, কোন্ জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে,—সে কালির দাগ কত প্রাচীন,—কোন্ দস্যু কত হীরা-মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত,—কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, অ্যামেরিকান টুরিস্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরত বৈষ্ণবদের পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এমনি সময়ে একজন প্রৌঢ়বয়সী ভদ্র

বাঙালী সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা, সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে শহরের এক প্রান্তে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চি, দরোয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ি, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচয়ানে এতকালের এত বড় ফাঁকা বাড়ির সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র যেন যাদুবিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ির ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ি এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনে হৃদ্যতা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানেকের অধিক সময় লাগিল না। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। ইঁহারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্মসমাজমুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না। তবে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়া যতটা বুঝা যায় সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছিল যে ইঁহারা যে-

সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাচ-বিচার করিয়া চলেন না। বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হউন, বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল,—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর দুই পূর্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তা হইয়া বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহের তিনিই কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে,—বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ করো না,—কপাল! নইলে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে, সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিং, মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এইদিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোকসমাগম ঘটে। আজ কি-একটা পর্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন-দুই নীচে ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে

ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটামাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্নমেন্টের প্রতি রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারী মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল।

পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতে সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময়? এতবড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক ছোটখুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি। কিন্তু, এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাক্‌রুনের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজে রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে, যে পায়ের ধূলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হত অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ আর বসবার জো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি,—সপরিবারে যেতে হবে। তার পরে একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবে না।

আরও একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস, মেয়েদের জন্য না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্য দুরকম খাবার ব্যবস্থাই,—অর্থাৎ কিনা,—প্রেজুডিস যদি না থাকে ত—বুঝলেন না?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে তাঁহাদের প্রেজুডিস নাই।

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, না থাকবারই কথা! মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার শখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস, পিঁয়াজ-রসুন ও ত স্পর্শও করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারী অনিচ্ছে, সে হলো আবার সন্ন্যাসী-গোছের মানুষ—চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি-সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কন্যার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও দুই-চারি মিনিট যাহা ইঁহারা বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল। এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে সে আজও অনূঢ়া—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ, এই সন্ন্যাসী-গোছের বাবাজী যেই হউন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ, তাঁহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এতবড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস রসুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

এবং, লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল। এবং এই আগুন্তক পরিবারের সহিত মিলামিশার যে সবুজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

দুই

মনে হইয়াছিল আশুবাবু শহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর-মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন; বাড়ির মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্বেই আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলী! মোস্ট ওয়েলক্যম্!

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যেই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি, মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা নয়,—সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। এই বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহে এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে—যে কি বিস্ময়ের বস্তু তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতিনমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কৈ আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিলেন, পাননি বুঝি? আশ্চর্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন!

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হউক, ইঁহারা যে পূর্ব হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু, রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ প্রকৃতি অবিনাশ পর্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ির সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ-ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল,—বিশেষত্ব-বর্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্রপরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত, অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্বাঙ্গীণ তান-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমীর খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতেই গান-বাজনার চর্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টনটন করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইমপ্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচ্চা লোক বলিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি আছে। গানবাজনা ভাল লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে শহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইঁহাদেরও ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টিই লেগে থাক, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ, অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ থাকা-না থাকার সুনির্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও ছিল না। গুণমুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল, মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন, এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান-মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর-মহল। ক্রমশঃ, তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক আহারের রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুণ্ডলা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিনদিনের আলাপেই কি করিয়া সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর, সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক? বলিনি যে, মণি, এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক না অক্ষয়। থাক না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন, কহিলেন, না অবিনাশবাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা হা,—কর কি অক্ষয়! কর্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন আর একদিন। এই বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু

কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই নাকি? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ শহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ, কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, It is too much!

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, No it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা হা—করচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্যে।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন,—মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে কথাই ত কারণ, প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ, আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হতো। আর তাই ত হলো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্যে।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো-না-কখনো মাতাল হয়। যে হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিইনি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করবার জন্যে, আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হলে আশা করি আরও একটা সত্য এমনিই স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানিনে। তবে, এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল। কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কি না?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন,—আপনি কি-সব বলছেন অক্ষয়বাবু? একি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চললো,—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট! তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে করে দাঁত পড়ে চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হলো।

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—অ্যাঁ! শুধু এই জন্যে? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না, মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্মল সত্যবাদিতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ-লোকসান চুলোয় যাক, একবার মিথ্যে করেই বল যে, সে গভীর অপরাধ করেছিল, তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিল না; শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই ত জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথবাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হলো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধহয় বাপ-মা নেই।

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝি-র বিধবা মেয়ে।

বাড়ির ঝি-র মেয়ে? চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি-টাতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া রহিল। কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহই হলো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হলো শৈব মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ, ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশদিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু। নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁকি ছিল না, অথচ ফাঁক যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করবার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলেন না, সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে,—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক

এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক,—যাক এ সব কথা। শিবনাথ, তা হলে সেই পাথরের কারবারটা করচ? না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হল? তাদের মা আছেন, না? অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃদ!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে-সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক, শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলে না কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসরের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি-রকম শিবনাথবাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বৈ কি।

অক্ষয় বলিলেন, কখ্‌খনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেন্ট ছিল? শুনেছিলেন?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রি আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েচে। তা হলে শেষ পর্যন্ত বিধবাদের কিছুই দিতে হল না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপটা খাসা রেঁধেচ হে! আর দু-একটা আন ত?

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কৈ আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্ছেন?

মনোরমা এ কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; ঘৃণায় তাহার সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।

তিন

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহকাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় শুরু হইয়া যাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোশ গায়ে দিয়া আরামকেদারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাও নি, আজ যে আমাদের এতবারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—তা হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটুখানি ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিকপত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

আচ্ছা, চললাম। কিন্তু ফিরতে আমার দেরি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্ছি, এই বলিয়া সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ি ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হল? কি লিখেচে?

কিন্তু, কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগল?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা হলে আমি নিয়ে যাই, পড়ে এখ্‌খুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। এই বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড়-ছাড়া, হাত-মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন্ গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এইভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই; এই সময়ে চাকরটাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন গেল?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশী নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এ-সব আমি ভালবাসিনে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি-সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ কি আমি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্ছ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপাকার করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাববশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেইদিকে চক্ষু নির্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল।

শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলাম না, আশুবাবু। এখন তা হলে চললাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে যে?

শিবনাথ কহিল, তা হোক। ও বেশী নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্যে আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেন নি। অত নির্দয় আপনি কিছুতে নন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব নিয়ে এ-বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন

একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়,—এও আর একটা কথা। কিন্তু কথা যাই হোক, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশী দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধূলো দেবেন, আমি খুশীই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, চা, আমার জন্যে নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী মেয়েদের মত কাপড়-পরা,—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কি না? কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল, মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে ত?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি, কিন্তু, আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ-বাড়িতে সঙ্গে আনতে পারেননি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল, এ-বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দু'জনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাকচে, আমার নাম করো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি কাজটা হয়ত ঠিক হল না।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,—তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে, আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার যাঁরা সমশ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দোষ, কিন্তু এ হল—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল, এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্চে, শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল,—তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজেছেন ঢের বেশী। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইঁহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা-কাপড় ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত না-ই হউক, পতি-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দুটি নরনারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য এই, যেদেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যেদেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্তকালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিক্তবস্ত্র পরিবর্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ

ইহার যত বড়ই হউক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচজাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে এস বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ করিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিচ্চি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইঁহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফরসা ধোপার বাড়ির কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাখা-সাবান গায়ে মাখিনে, ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু, শুনচেন, দিদিমণির স্নানের ঘর! তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারী ঘেন্না করে। তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝকঝক করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাত মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুন, সাবান-টাবান মেখে আগে তৈরি হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্যদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত, সে এই অপরিচিত অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

চার

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়, তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু,—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচে দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বিধি বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে, কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিল না; স্ত্রী বিয়োগের পরে আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই, হয়ত, তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ, বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে-তিন মণ ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন, সে ত জানি, সে-ই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ কথা আমার সয় না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বার বছরের মেয়ে, জানিস ত সব। কার গলায় যে কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা

ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই এবং পত্নী-প্রেমের নির্দশনস্বরূপ গৃহের সর্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ, আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষ দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাস্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে ও বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে-তিন মণ, বাতে পঙ্গু, কখন চলতে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেছে অবিনাশ, মরেছে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি সার্সী পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না, মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকছে!

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দু'টোর জায়গায় দু'শোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন একটুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ি পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হউক, আশু বদ্যির নির্বন্ধাতিশয় তাহার এড়াইবার জো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ,—এ-সকল কি কিছুই নয়? তবে কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছিলেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূর করিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ত্রুটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোক এ কাজ পারলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত, ভিতরে কি একটা রহস্য আছে,—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দোষ এ কথা সে ত নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজে এ দুষ্কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য,—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিক্রি দিলে কি করে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারি নে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেন না।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশী। মুখে সে বিশেষ কিছু বলিত না, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ-বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পর্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজেও নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরামকেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা! এমন রূপ কখনো দেখিনি। মনে হল এদের দু'জনকে ভগবান যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি!

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা শুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকে না আশুবাবু।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ-ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেন না এঁর সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডানদিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্বের পরিহাসের ভঙ্গীও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তা হলে অকারণ দম্ভ করেনি বলুন? কিন্তু পরিচয় হল কি করে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে আনতে সাহস করেন নি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশী

হতে পারেনি। ওরই সমবয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে, শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ, সে যে আমাদের ভদ্রসমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নেই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে কাপড়ের পরিবর্তে একখানি ফরসা কাপড় চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কারও ব্যবহার করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গীর মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্যন্ত বুঝতে নাকি বাকি ছিল না যে, মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয়, এরও হয়েছে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা! কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি ভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, জায়গাটা ভাল লাগচে কিনা—প্রশ্ন করার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ, শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেন না?

না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বললাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়িতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু।কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেছেন। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ-পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে ত জানে সবই,—তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, কহিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অর্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন-একটা ব্যথার মত লেগেছে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির,—শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি, কথাও শুনিনি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিছু আশ্চর্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা শুনে মনে হল যে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম, এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে। কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেছে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সে সত্যই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন, মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু এঁদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য

আছে যে রহস্য গোপনে আছে, তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়? অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশবাবু লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে? তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁহার শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবে না?

না, মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবে না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব,—চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

পাঁচ

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা—বৈকালে নিশ্চয় আসবেন।—আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসী দ্বারের পর্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল নাকি—আসতে না আসতেই জরুরী তলব পাঠিয়েচে, যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই! তারা কি মুখুয্যে-মশাইকে গিলে খেতে চায় নাকি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নী, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নী, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বৈ কি?

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না,—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যে-মশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন,

আপনি অধার্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত,—ইতিমধ্যে অধীনের দশ-দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একবারে দশ-দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েচে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপরে এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন শুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পর্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েচেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্বিকার-চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করচেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশ্ব উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামতি-কার্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্তপ্রায়, এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়েও হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বলতে, অন্ততঃ, আপনাকে বলতে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন; আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হিন্দুমতেই হয়। যথাসময়ে, অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হতোও তাই, কিন্তু হল না। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে, সেও এক বিচিত্র ব্যাপার,—বিধিলিপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন; আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়েহলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়িতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনিই বাড়ির কর্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়ীমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারে না। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হলে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থূল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বুঝলাম এর আর নড়চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড়লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ী ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন; অজিত দুঃখে, অভিমানে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙ্গে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হলাম, হল না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে, বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এমনই কি বেশী সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করলে, একটা দিনের জন্যেও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার জো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত-চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার জো নেই। কিন্তু আমি আশীর্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। অজিত সর্বাগ্রেই খুড়োমহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর, উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেলে, বছর-দুই পর্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা নয়। কিন্তু মণি হঠাৎ জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা এ চেষ্টা তুমি করো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা। কিন্তু, মেয়ের দু’চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথাবার্তাই হয়, কিন্তু তার বেশী—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি

করো না। দু'জনের চোখ দিয়েই জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কিসের?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি, মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে মেমসাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বলুন ত?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া-না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে।—এই যে অজিত! মণি কৈ?

বছর-ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়ে-জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেচে, তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মণির আসতে মিনিট-পাঁচেকের বেশী লাগবে না। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ, তোমারই দেরি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকী।

ছেলেটি নিজের পোশাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালিসুদ্ধ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাদাসিধা পোশাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল, পিতৃস্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গেছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটরযানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলুব্ধ নারী ও রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্বত্রই তাহাদের সাজসজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয়

অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্বখ্যাত, অনন্ত সৌন্দর্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে যাইতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দলবল ইতিপূর্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সংবর্ধনা করিলেন। বাতব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতিগুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ কর গে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ বলিলেন, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে, এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হতো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; মনোরমা বলিল, সে হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে এর অর্ধেক সৌন্দর্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি যত খবরই দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশী জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধই করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, আশুবাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে!

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথবাবু? এদিকে আসুন!

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না, আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীরও পরিচিত। বসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বৈ কি। উনি আমার,—উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিন কয়েক হল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেন-না এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে এখনো দেখেনি, এইবার দেখবে। কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরি করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল দেরি ত শুধু তোমার জন্যেই বাবা। ওঠো।

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্যে যে আয়োজন করতে হয়।

তা হলে সেই আয়োজন কর বাবা!

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হল?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে বাবা, ওঠো এইবার।

উঠি মা। এই বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন একমুহূর্তেই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙ্গিল! বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস, ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্ধেক সৌন্দর্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই—সৌন্দর্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিও নে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজ-কণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশী হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে, এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ-করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য

হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে-শ্রদ্ধার আসন আর থাকবে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেচি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসীকন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি, মা!

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে। এই বলিয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসি গে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি। কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

ছয়

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া ঊর্ধ্বভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল-জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া, কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসত পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ,—ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনিই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে!

আশুবাবু শুধু বলিলেন, বসো। কিন্তু তাহার কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কি না, সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্বেলের মত সাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ

এবং সোজা,—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটিও ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু এ কথা উনি ভাবতেই পারলেন না তাঁর মৃত স্ত্রীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না,—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ি যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়িটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্তন হইল না,—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরি সহিতেছিল না, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে। তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করচি, তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েচি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেচি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারচি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, কহিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠাবোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেচ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এ-সব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এইজন্যেই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এইজন্যেই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধচে যে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, কিন্তু কি মানেন একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই

থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবা-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এদেশের বৈধব্য-জীবন কাটানোই বিধি, বলুন, একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে,—আমি অস্বীকার করব না।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্যের মধ্যে—না থাক, ব্রহ্মচর্যের কথা আর তুলব না,—কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবনযাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে, তার আর স্থান-কাল কারণ-অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়, এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয়, আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধকরি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু। অথচ, কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ-সব কদর্য ধারণা আমাদের ভদ্রসমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্রসমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল। পবিত্রতা-অপবিত্রতার জন্য বলচিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারিনে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েচি মানি, কিন্তু সে দিন ত বুড়ো ছিলাম না। কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারিনি।

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো-মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সেই বুড়োর শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত-যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো-মন খুশী হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই,—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনা, এ কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন, ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তবগানে সকলের

কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো-মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই সেই কি না।

কমল কহিল, মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে-মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন, জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই,—বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙ্গিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকী দিন-কটা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বৈ কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস্ কিসের জন্যে? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন আমাকে ডাকবার জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি, আপনি রাগ করেন নাকি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ রাগ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু ত কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায়, বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না, রাজারা তাঁদের নামের আগে-পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়? নইলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, যেমন ইনি। কখনও কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল, এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অগ্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েচেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করবার জন্যে যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বসিয়া বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিল, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞেসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু?

অবিনাশ কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট!

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে-সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাশার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু? আমি বলচি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়,—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, বিবাহ হল শৈব মতে। আমি বললাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈবমতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে!

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কিনা, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম কোনদিন?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদাস গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না নাকি?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবে না। আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গীতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনি। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য,কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারী হিম পড়বে, এখন না উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি।

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানী, আর দেরি করো না, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল যেন কেবল তর্ক করার জন্যেই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে, শিবানী, শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চে না ত।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য!

সাত

আশ্চর্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ, উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া—পর্দার ও-পিঠে না-জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল! সকলের মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এইজন্যেই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশ চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ-জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেতমর্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা।

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা-ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশী ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া ছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ; কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন সামান্য দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ত গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশবাবু!

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকেই ঠকানো! একেবারে monopoly-তে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্রঘরের culture সিকি-পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ-সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাশার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি! Absolute indifference নোটিশ করেন নি? এ কি কখনও ভদ্রকন্যার সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর form-টার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যা হোক কিছু একটা হলেই ওর হলো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হলো ফাঁকি। স্বামী বললেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈবমতে। কমল তাই শুনে খুশী হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈবমতে ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু!

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা—হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম? দেবে নাকি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া শুধু একটুখানি মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিল না, বলিল, আপনারা অবাক করলেন অবিনাশবাবু! তাঁদের যা-কিছু সমস্তই মিষ্টি-মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো?

হরেন্দ্র কহিল, শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ-সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি, আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকী পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িলেন। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য পরিহাস করিয়াছে, এবং শিবনাথের শৈবমতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে

আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ, শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারংবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে, গাড়ি আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেলে হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পৌঁছাইয়া দিতে গাড়ি চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ির মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, না, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্বের ধারণা কি আজ বদলায় নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন,—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনিমাত্রই হতো ত এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হত না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই

যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কেবল, এরই জন্যে আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল, —তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি,—কিন্তু সমস্ত ছলাকলা, সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—কি যে তোরা সব বলিস মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জানো বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি।

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ, পেলেই তার মিথ্যাচার হতো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে

ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে তোমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা,—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হল না। যাই হোক,—না, তার কাছে নেই।

তা হলে আত্মসংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন, সে শুধু নিষ্ফল আত্মপীড়ন। আর, তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকানো নয়, পৃথিবীকে ঠকানো। তার মুখ থেকে শুনে মনে হলো, কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনলে ভারী বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল,—বিস্ময় লাগে! সর্বশরীরে জ্বালা ধরে না? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? যে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বললে তার মোট কথাটা বোধ হয় এই যে, সুদীর্ঘ সংস্কারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে

দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুঁজে মাথা নাড়লেই হবে কেন, মণি?

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখাবার লোক ছিল না?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধ করি কিছুই বুঝতে পারচো না,—না?

অজিত ঘাড় নাড়িলে আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোমকুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন, লোকে চেয়ে দেখবে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ খুলতেই পারলে না। অথচ, মজা হল এই যে, আমাদের মামলা হলো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈবমতে,—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞাসা করা হলো, মেয়েটি কি ভদ্রঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ির দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হলো, মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্যে বিবাহ করেন নি, করেছেন রূপের জন্যে। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনে অজিত, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার পরেই সব চেয়ে বেশী। আর এই হলো সমাজের সুবিচার!

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজে অক্ষয়বাবুরাও ত আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধ হয়?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা?

অজিত বলিল, আশ্চর্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশী।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না। দেবতার দলই আসুক, আর দৈত্যদানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্ত,—শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুশী। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি করেছি, না করেছি, নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আনবে। তখন?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেতে গিয়েছিলেন নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা ব্যারিস্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি?

আশুবাবু তেমনিভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিত্ততলটা একেবারে ধুয়েমুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। ছাপছোপ কোথাও কিছু বাকী নেই। সে যাই হোক, দয়া করে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারী ভয়?

আশুবাবু তৎক্ষনাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে এক্কেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

বাবা বলিলেন, অন্যায় হোক মা, আত্মরক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল; মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু, মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে ত হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেছে, মীমাংসা আর হলো না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনো স্পষ্ট করে কিছু বল না। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট করে বলবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি,—সে তোর কপাল। এখন খামকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বলত?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে? এই অন্ধকারে?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই, একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়ো না!

না, গাড়িতেই যাবো।

গাড়ির ঢাকনাটা তুলে দিয়ো অজিত, যেন হিম লাগে না।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হলে অবিনাশবাবুকেও অমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু, ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখচি এখনো যায়নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

আট

দিন-পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা শহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ি থামাইয়া দেখিল, শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙ্গাচোরা পুরাতন কালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সুমুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান,—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিতে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন আপনি এমনি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলাম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে? বাপ্ রে বাপ্! যে জোরে যান,—দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করে না?

অজিত গাড়ি হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কৈ?

কমল বলিল, তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না, তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারিনে।

কমল কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনে বললেই ত হয় না,—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে করে? একটুখানি ঘুরে আসবো।

অজিত মুশকিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্বেই শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই?

কমল কহিল, শোন কথা! সঙ্গী-সাথী পাব কোথায়? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। শহরের বাইরে বললেই হয়,—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে,—আমার প্রতিবেশী ত শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে,—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা বাড়িতে যেতে দেবে কেন? তা হলে ত,—মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়,—তখন আপনাদের ওখানেও যেতে পারতাম। বলিতে বলিতে সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল; কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। আজ কিন্তু আমাকে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশী দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ি ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ,—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি করে? অতদূরে পিছনে বসে বুঝি মুখ বুজে যাওয়া যায়? আপনি উঠুন, আর দেরি করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জন, কদাচিৎ এক-আধজনের দেখা পাওয়া যায়,—এইমাত্র। গাড়ির দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল, কমল কহিল, আপনি জোরে গাড়ি চালাতেই ভালবাসেন, না?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগচে। বোধ হয় স্বভাব, না?

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও,—না?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু! দ্রুতবেগের ভারী একটা আনন্দ আছে। গাড়িরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি! কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষণেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই। এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকুই শুধু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেকদূরে এসে পড়েচি। ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হলই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিলম্ব হলে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা শহরে ত গাড়ির অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারবেন। চলুন, আরো একটু। এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোকবিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্বিগ্ন-চিত্তে গাড়ির গতিরোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরি চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম, মিথ্যের সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদই না মানুষে নষ্ট করে। আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম, এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে।

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে ঊর্ধ্বশ্বাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম। আজ আমার কি ভালই যে লেগেছে তা আর বলতে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই,—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিতেছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবুও প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না,—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা,—এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে তাহারা দেয় না, যেন সমস্তটাই তাহাদের কাছে একেবারে নিছক পরিহাস।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন, ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বৈ কি!

অজিত কহিল, তা হলে?

কমল বলিল, তা হলেও এ প্রমাণ হয় না, যে আনন্দ আজ পেলাম তা পাইনি!

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তার্কিক, তাই আমি?

অজিত কহিল, না, তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যকার আনন্দভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অল্পই হোক, পরিমাণ তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক, তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের

আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া। এই কি ঠিক নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায়।

কৈ জবাব দিলেন না?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না?

না।

একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলিল, তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ি আসিয়া সেই ভাঙ্গা ফুলবাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও এতটুকু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে? গাড়িতে একটা হাতলণ্ঠন আছে, সেটা জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো?

কমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিতবাবু। আসুন, আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়িটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিটমিট করিয়া একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। রাত অনেক হলো।

কমল জিদ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবচেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারী লজ্জার কথা। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশী এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম-কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা,—যেন, সাধারণতঃ তাহাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব। ঘর শূন্য,—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল, কিন্তু মনে মনে ভারী একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কৈ তিনি ত এখনো আসেন নি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে।

কি করে জানলেন?

কাল-পরশু দু'দিন যাননি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দু'দিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সম্ভবতঃ, আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেন নি। নইলে স্বেচ্ছায় গরহাজির হয়েছেন এ ত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে! বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে যদি কেউ ধরে রাখতো, থাকতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই।

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুশকিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানবার জো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পাননি। থাক থাক, সব কথার তর্ক করেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্চে, যাই, আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো? সে হবো না।

হবার দরকার কি। এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ করে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো,—কিন্তু সে ত আর আর-একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু,—তবুও আপনাকে বসতে ত দিলাম। অথচ, কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসতে দেননি কেন?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাদের নিজের হাতে কিন্তু কোথায় বসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশী চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা হলে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্যে।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল বলিল, হাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি? কিন্তু কৈ, আজকে রাঁধবার ত সময় পাননি?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন—তা হলে আপনি খাবেন কি? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাইনে। সমস্তদিনে কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র?

কমল কহিল, হাঁ। কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হলো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ি এসে খাবেন কি? তাঁর খাওয়া ত দেখেচি,—সে ত আর এক-আধবারের ব্যাপার নয়? তবে? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়িতেই খেয়ে আসেন,—তাঁর ভাবনা কি? আপনি বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাববো এ কথার জবাব পরকে দিয়ে আর লাভ কি? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে, অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।

অজিত সত্য সত্যই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে? আপনি কি রাগ করে বলছেন?

কমল কহিল, না, রাগ করে নয়। রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর নেই। আমি জানতাম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যাননি। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসি গে।

এ ঘরে আনিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশী একটা জিনিসও এখানে ছিল না,—আজও তাই আছে। কিন্তু সেদিন এদের

চেহারা দেখে থাকলে আজ আমাকে বলতেও হতো না যে আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু, আর ত দেরি করা চলে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তাহ'লে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আসবেন। এই বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'ল আসেন নি?

হল অনেকদিন। এই বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

নয়

অজিত যখন বাড়ি ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ,—কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয় ত দুইটা,—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত; শোওয়ার কথা দূরে থাক, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ, মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু, মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবিতে হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরোয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ি আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি কি একটা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্ষে হল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল ক'রো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দ্যাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু!—সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় শহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বললে অন্যায়। কিন্তু আমাদের যা হচ্ছিল তা আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে,—মণিই বা গেলো কোথায়? তাকেও ত তখন থেকে দেখচি নে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়াও হয়নি। বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে?

অজিত কহিল, কৈ না?

তবেই হয়েছে। এই বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়িটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েছে। দ্যাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে। আজ রাতটা তাহলে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়িটা আছে কি না। এই বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ি মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর-প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা হইতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল; সে

যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভয়ের কেহ জানিতেও পারিল না তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ি-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখিচি মেয়েটার খাওয়া হল না। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যান।

এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যদু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়িবারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ! কখন এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, দ্যাখো ত তোমার অন্যায়। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে সারা,—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই ত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই-সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেন নি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিই গে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্যন্ত।

তা হলে খেয়ে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না?

না। এই বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই,—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে,—বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই,—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না, এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্বাক নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল, জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল কি গেল এটুকু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ

করিল না। গভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিংবা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হল যে?

অজিত শুধু কহিল, এমনিই।

মনোরমা নিজে চা খায় না। সে পিতাকে চা তৈরি করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক, তবুও এ-বাড়িতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ কথা ত আমি বলিনি বাবা!

না না, বলনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুনলে?

আশুবাবু, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেন নি কিছুই, জানেন না কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ, এমন করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওঁর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হলে তাঁর কর্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থে যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই নয়, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্তব্য কে নির্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেসা করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ-দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু বসো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশী দূর গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ়, তেমনি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে ত বাবা?

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েছে আমি ত ভেবে পাইনে। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত করে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে বাবা?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব

স্পষ্ট। বোধ হয় সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা কর। এ-রকম অন্যায় ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনকে গায়ে পড়ে নিতে হবে বাবা?

পিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলাপাড়া করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে এবং এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকে তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়া সুশিক্ষিতই নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা চরিত্রের সত্যপরতা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর লইয়া জানিলেন গাড়ি আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হলো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত!

যদি হয়ও, তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, কৈ আমি ত জানিনে। তবে, আজও আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ি পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশী। ঘোড়ার গাড়িতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল, কাল সভাভঙ্গের পরে আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরেই মজলিস বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল, এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতায় কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই, এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ-সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞেসা করে দেখ না। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ করে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা, সে-সব আর একদিন হবে, এখন, যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে। কিন্তু বেশী দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুঁড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উচ্ছল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিত হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া করে বেড়াতে? ছিঃ!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা? না, একদম ভুলে বসে আছ?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমন্তন্ন? তোমার গানের পালা শেষ হলে তাঁদের যে আজ খাওয়াবে,—বলি, মনে আছে ত?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আছে বৈ কি! মোটর পাঠিয়ে দিয়েচি তাঁদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েছ আনতে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ কথা বলতে হতো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর ’পরে তুমি কেন রাগ করে আছ, এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার করে নিতেন,—কিন্তু তিনি ত নেই,—আমাকে কি তা বলা যায় না?

তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্তা হয়নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন হল? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হতো না, কিন্তু তিনি ঘুমোন নি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে?

তারপরে আর কোন কথা আপনাকে বলব না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল, সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট -কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, সে-ও তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেন না, সেইখানেই মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল,—সকলেরই বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল, বাড়ির একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

দশ

এদিকে অজিতের গাড়ি আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়িটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাব?

কেন, ভয় করবে নাকি? না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। আসুন। এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেচি। আপনি না এলে রাগ করে আমি সমস্ত মুচীদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়। কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশী সদ্গতি হতো।

এ কথার মানে? বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,—কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং, তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হলো সাধু লোকেদের ভাল-মন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্মবুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হোল ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি?

কমল কহিল, না নেই। কর্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হলে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেচি—আপনি এসে খাবেন বলে, এত বড় অকর্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্‌খানে? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উলটো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধ হয়, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক, আপনি খেতে বসুন। এই বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্চে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি? আমার দরকার? এই বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলা অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাত্রে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ-সুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু, আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খাননি, অথচ সেদিকে আমার হুঁশ নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়, তাই ত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ-সব মাছ-মাংসের কাণ্ড। আমি ত খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। এই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আর আলু সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল। কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বলতে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয়বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য থাকে না,—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই যেন আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি। ধৈর্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি করে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না। তিনিও এমনি ধীর, এমনি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল।এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবে না।আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক পা-ও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! এই বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-

সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়,সে জানে না। কিন্তু আজ এতপ্রকার পর্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায়, এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং, যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে করে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি করে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানিনে, কিন্তু এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রিশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এইরকম নানা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধনা আর কি, বরঞ্চ শরীর-মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতী।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বলতেন, তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতী নয়, বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যে-ই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা, আপসোস করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসেই জ্বরে মারা গেলেন। বছর-তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্তকাল পূর্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র! তার বেশী নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি, অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইল, এ হয়ত উপহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি উপহাস? কহিল, এ-সব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য হইয়াই জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলিনে অজিতবাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে, কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর আমার সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত, কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর ‘পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়িভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হলে কাল-পরশু চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। নেবেন?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্য তা নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নন।

না-ই হলাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়। আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না?

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেছি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়িভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্চে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হলে আসুন, নমস্কার। এই বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেইখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

এগার

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরে সার্সীগুলো সারাদিনই বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতায় পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি ত বাবা, তা হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা-দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোশ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই।এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে,—এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—

অর্থাৎ কাল তোমার চাকরি যাইবেই। কোন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবংবিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই ত বলি, একি যোদোর হাত! এমন করে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে হাত পুড়ে যাচ্চে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, তুমি আমার খুব কাছে এসে বসো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারী ইচ্ছে হল আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেছো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী-সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই,— নিতান্ত নিঃস্ব জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিও। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলা নীচে খসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে, যেটুকু বাকী আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া

তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে, তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো, আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর-সকলে রাগ করবেন যে!

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তাঁর স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মনোরমা, কিন্তু বাকী কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হতো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশী, যেন অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দু-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই।এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল,অর্থাৎ কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত! কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরের তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্য? আমি ত কারও বাড়িতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি।শহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারে না, মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে, তোমাকে খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলা

তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা।ইংরিজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম-ধাম নেই, কিন্তু এর আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে নাকি নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন হবে,—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান।এই বলিয়া তিনি সেগুলো দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়,মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই,—বিরোধ থাকতেই পারে না, কিন্তু, এ ত সে নয়।ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল, একে ত আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না,—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেচে ভরাডুবির মুষ্টিলাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটায় কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্বলতাটুকু তাঁরা ধরেছেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেন নি।

তুমিই কি পেরেচো মা?

বোধ হয় ওঁদের চেয়ে বেশী পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন,যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি—

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় আছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশু বদ্যির কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, না-ই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয় কমল, তাকে বিনয় করে বলো, এই আমার ঢের। বলো গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রুনিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই দু'জনের কোথাও মিল নাই; শুধু অনাত্মীয়-অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ! কোন সম্বন্ধই যেখানে নেই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না! না কেন?

কমল এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না, অন্য কথা পড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত বাড়িতেই আছে! পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসে না। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরোনো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করচে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরোনো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভালবেসেছে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু, সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেছে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তার পরে খাচ্ছিলো, আবার দেখচি পরশু থেকে বন্ধ

করেছে। যদু বলে, বাবু ঘণ্টাখানেক ধরে ঘরে বসে নাক টিপে নাকি যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? অজিতবাবু?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হল সর্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল। এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়াছে সে-ই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে দর্শন মিলিতে তাহা পারে তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাঁহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা

মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া অক্ষয় কাগজগুলো কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ওধারের সোফায় বসিয়া সেইদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে শুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়া পড়েচি আশুবাবু। ওর অধিকাংশই সত্য, এবং মূল্যবান।দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্তব্য। ইউরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে মানি, কিন্তু আমাদের সংসার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাঁদের ভ্রষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবু প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্মপ্রসাদের অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বার-কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে ত তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আসচেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করে না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার জো নেই এবং এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ-সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি

না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই?

অন্য সময়ে হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু, একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা, না ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা?

আশুবাবু বলিলেন, ধরো, যদি বলি দুটোই!

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে ফাঁক থাকে। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বৈ কি কমল, আছে। ও-রকম সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে,—কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর। আসল কথা, বর্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি না। এ ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশী নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশী নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কৈ? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়।

আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু!

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হলে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি!

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট্।

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখেচি। বিস্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, দ্যাখো কমল, অপরের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প, কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হলে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্যেই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তারা নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে, বহুদিন ধরে

কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার?

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয়বাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলো না কমল, বাইরের অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতে বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্যদের একটি শাখা ইয়োরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব-পিতামহদের জন্যে শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাও ত সত্য না হতে পারে | তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ

আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনো মরে না।

অক্ষয় হাতের কাগজ ফেলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল এবং মুহূর্তকালের জন্য কমলও নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ-উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে, এবং, এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুরু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই,—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশী করতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ বলে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ! এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহুযুগের ধন!

কমল বলিল, হোক বহুযুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি! আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরি করবার সময় নেই,—পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এইভাবে পুরুষের দল নিজেদের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ কাকাবাবু। আপনি ত এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আসব না কাকাবাবু। এই বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

বার

আগ্রার নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারী-কল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়ার নিষেধ ছিল না।বস্তুতঃ এ আয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল, লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শ-মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোটশালী নীলিমা ঘরে ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে শহরের সমস্ত বাঙালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কন্‌কনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য-বিষয় যেমন অরুচিকর তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারীজাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন | একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইঁহাদেরই ‘তথাকথিত’ শিক্ষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ব ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাহাই থাক, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই ‘তথাকথিত’ শব্দটায় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—

সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছে। শেষের দিকে সে গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই শহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে, যে ভদ্রসমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচবশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব – প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ-সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে, এবং এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং, রুচি ও নীতির সম্যক বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিস্টলি এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ – লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা-খুশি তাই বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিস্ট এবং ব্রুট বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এইপ্রকার বাক-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িল, এবং সেই উত্তেজনার মুখেই স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ-পাঠের গোড়া হইতেই সেই যে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন, সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিবেন না। আরও একটি মানুষ তর্কযুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভাল-মন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এ প্রকার আলোচনায় নর-নারী কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া আসিয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে বসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্যে আমি দুঃখিত আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বাড়িতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ ও অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদেরও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

রাজী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ্য করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁহাকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিল, বোম্বাইওয়ালার মত তাহার পোশাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে ইংরাজীতে অভিবাদন করিল।

কি?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের? কি লিখেচে কমল?

লিখেচেন, পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসু-মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কাহারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ, সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্যে!

গাড়ির উপর হইতে অক্ষয় কহিল, just like her!

কথাটা সকলেরই কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্যে জামিন হলে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছে, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনিনি।

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night, এস অজিত, আর দেরি করো না। এই বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়িবারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে গাড়ি পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার?

এ কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা ও চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্তকাল পূর্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শপন্থী অক্ষয় নারীত্বের আদর্শ – নির্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক, অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি, অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্বরতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাক, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন, তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল।

কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট

হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভদ্রসমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করায় অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল! দুর্দশাপন্ন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়টা টাকার ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যে সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেই সকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার-সাহেবের গৃহে তাহার জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অরুচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু, দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে, গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য। দৈবক্রমে তাহারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই শহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের ’পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত? আমি নিশ্চয় বলছি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হতে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে! কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে ত ঢের বেশী অন্যায়। স্বামীকে লুকোনো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত বা তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করিতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অন্যায় বল ত? এ কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চাননি, শুধু জামিন হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয় পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য? সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না না, কথাটা ঠিক ওভাবে বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটিকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারী একটা গ্লানি চলিতেছিল; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে ত নিয়ে গেলেই হত। খামকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠানোর কি আবশ্যকতা ছিল? আর যাই বল, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেহারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে, জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা—মনি-লেন্ডার কিনা। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্‌খানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, এই অক্ষয় লোকটা একেবারে নুইসেন্স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। যদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা,— আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসাটা চেনে—শিবনাথকে মাঝে মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাত্রে থাক, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝ না অজিত বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাত্রেই কখনো লোক পাঠাতো না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ি নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তাও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে পাবেন। তার পরে আর টাকা পাঠান উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার শুধু অনুমানমাত্র অজিত।

হাঁ, অনুমান বৈ আর কি।

কিন্তু, বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও ত শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

তের

নারী-কল্যাণ-সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখুয্যেমশাই, কমলকে আমি একবার দেখব। আমার ভারী ইচ্ছে করে তাকে নেমতন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমতন্ন করা!

কেন, সে বাঘ না ভালুক? তাকে এত ভয়টা কিসের?

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলে না, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেমতন্ন করে আসতে পারি, কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনিনে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ,— তাঁকে ত আমি নেমতন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে! কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয় করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাকো, শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে,—তোমার ভয়টা কিসের?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে,—কিন্তু করতে হবে কি?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি কি ওদের বাসা চেন? আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে নেমতন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা? সেজদা? ওঁর অভিপ্রায়টা কি? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই, কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওঁর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন, আমার কাজ নেই। আমি ওঁর শালী শালীর বোন নই যে পতি-পরম-গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছা খাওয়াব। ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ওঁর ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না | এবং, পাছে সেই লজ্জাকর টাকার কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায়, সেই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও দুটো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচবে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোঁটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারি তা হলে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই ঢের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে, কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ি করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে খাবার কথা তাঁকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, যাচ্চি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমত্যন্ন করেচেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার, যেতে হবে যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা। বললাম, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন এসে

আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব,—অবিনাশবাবুর বাসা আমি চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল। ভারী নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাক্সটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞাসা করিনি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রি কিংবা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ-সমিতিতে অক্ষয়ের প্রবন্ধ শুনেছেন ত? আমরা লোকটাকে ব্রুট্ বলি। কিন্তু, ও বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি বুদ্ধি থাকলে সমাজে অনায়াসেই সাধু-সজ্জন বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হে, নিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু! এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও।

চেষ্টা করব। কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে—সে কোনমতেই আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আসিলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামা-কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে তুমি বল। কাজটা ভাল হয়নি কিন্তু—ছোটগিন্নী, ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্যেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে? তা হলে অনর্থক দেরি করে লাভ হবে না,—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই ত!

এ-সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুটতে পারিনি বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া মুহূর্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ-সব আমি খাইনে।

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক হইল, কহিল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এ-সব খাইনে বলেই অভাবটাও আবার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু মনে না করিলে চলে না। নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা হবার তা হয়েছে,—সে আর ফিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যেও কি নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিমাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ইহার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রের কানে। শুধু সে-ই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁচে-পুঁছে খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁকে আর নয়। বরঞ্চ, যা খাবেন, তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি থাম। এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেলে দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যেই ত তোমার যত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জন কম কর না। এতদিনে বৌ এলে ত ছেলেপুলেয় ঘর ভরে যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্তিক,

দলটিও তৈরি হচ্চে তারই উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতেই খাওয়াব না—এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল বুঝিতে কিছুই পারিল না, আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটিকয়েক ছাত্র আছে আমার, তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুল কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ, এ ত এতদিন শুনিনি?

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ, গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশী হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি—যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে; তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশী হবেন।

অবিনাশ সেইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস হরেন!

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যেমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেন নি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চ?

নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ, যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা কহিল, আমি বলছিলাম রাগে। কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বলতে যান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইস্কুল-কলেজে পড়েন?

হরেন বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি-সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চা করা হয়, সেটাও অম্‌নি খুলে বল?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যেমশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ওঁর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হতো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাসটুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরি হইয়া গেছে। অতএব, এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন,—কমল তখন পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে,—সে কি?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধূলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব, আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিচ্চ এ কথা জানাতে দোষ কি? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলাম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচি নে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি, না জানলে ত বলা যায় না হরেনবাবু। কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরি করে তোলাটাই যে সত্যিকারের মানুষের ছাঁচে গড়ে তোলা এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শই যে চিরযুগের চরম আদর্শ,—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্বপিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্যকালের লক্ষ্য—এই তাদের একটিমাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমার কাছে এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশবাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী,—আজও মনে মনে হয়ত তাই আছেন,—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতেছিলেন, কিন্তু, কমল সেদিকে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেচি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? না-ই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিল, এ-সব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা ত জানিনে—তিনিও এ কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান। কথাগুলি মুখস্থ করেচ। আর জান না কার?

তাঁহার এই কদর্য দৃঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখুয্যেমশায়, মাস্টারিগিরি কাজে কড়া কথার ধমক দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করায় লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ি ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখুয্যেমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠচে—তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? না-ই বা গেলাম?

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই সাদাসিধে। গেরুয়াও পরিনে, জটা-বল্কলও ধারণ করিনে। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সেও ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের জোচ্চুরি। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরঞ্চ জটা-বল্কল-গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই—হটতেই হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি, আর না পারি, এর আদর্শ কত বড়!

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক-ধরনের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে,—না গেলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছুই করিনে। সহসা নীলিমাকে দেখাইয়া কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতই আমরা সহজের পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই,—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন!

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না; কিন্তু বলুন ত—নারীত্বের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহের উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ-বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে। অথচ, কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবারা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখে স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং নীলিমা আশ্চর্য দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই করে তুলুক, গৃহিণীপনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এ গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত ওঁর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতাম না। অথচ, এমনি করেই কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি, এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল—তাকে বাড়িতে এনে নিজের একপাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলে-মেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত হয়ে, এ বাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ—এই আমার আশীর্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেল, সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই। শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এতবড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তার পরে?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে, হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি, আগেই চলে আসতে হয়েছিল; কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার। এই বলিয়া সে একমুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

চোদ্দ

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে-ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা-খরচায় স্কুলে পড়াশুনা করিতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ, নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে। কিন্তু এ-সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইলও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেনের বিধবা মা। তিনিও পরলোক গমন করিলেন। ছেলের তখন লেখাপড়া সাঙ্গ হইল। অতএব, আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিল না যে তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিংবা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব, পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধুসঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্যদেবের দলে ভিড়িল, মুক্তি-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া-নুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল,—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভালো লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে

হাত না দিলে আর চলে না,—এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হউক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকী আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এ খবর সেইদিন সে প্রথম পাইল।অবিনাশদের কলেজে তখন মাস্টারি একটা খালি ছিল; চেষ্টা করিয়া সেই কর্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন শহরগুলার সাবেককালের অনেক বড় বড় বাড়ি এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল—তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই, ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা করো না। আমি বাড়ির গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পড়েছে আমার ওপর। তোমার দাদা বলছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীব মানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই। দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

হরেন কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমনি জড়সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিল না। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশী লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই,—এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই—তিনিও যে এ বাড়িতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজসজ্জায়, তাঁহার রহস্য-মধুর

আলাপ-আলোচনায় ধরিবার জো নেই, তেমনি এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়,—এমনি হালকা তাঁহার হাসি-খুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাচ্ছিল?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন ত যেতেই হত বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হত। কিন্তু দেশসেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন-কতক না হয় বৌদির হেপাজতেই থাকতে।

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি। এই ত মিনিট-দশেকের পথ—আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নমে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাসনে আর কোথাও, এইখানে থাক। কিন্তু সে কি হয়? ইজ্জত বড়—না দাদার কথা বড়! যাও, নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হল চড়কের সন্ন্যাসী—পিট ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর-বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্তশিষ্ট নিরীহ মাস্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে অনেক ঘর। গোটা-দুই ঘর ছাড়া বাকী সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাস-খানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না।অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতির সেক্রেটারি। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল।

হরেনের চিঠি এবং ট্রেনের মাশুল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি যদি তোমার একটা চাকরি-বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসঙ্কল্প মুলতবি রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং, একাকী আসিল না, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রবচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্মভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল। এবং ইতিপূর্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই, এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন

ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব-পিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্যরক্ত-সম্ভূত কোন্ পাষণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না, এবং পারিবার মত দুর্মতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু, ইহা তপস্যা এবং সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রের চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্তি হইল,—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোকে বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা-ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে, হরেন্দ্রর বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলেরা লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না,নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার জো নাই, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল,—অতএব এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না; ছেলেদের পড়াশুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাধা-নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরে কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর

কোথাও কোন মার্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা, পাছে কোথাও কোনও ছিদ্রপথে বিলাসিতা অনধিকার-প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি-সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ প্রহরা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবেই আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিল না। বাহিরে কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেকেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে, রাজেনের আচরণ পূর্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ, শরীর ভাল না থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কি তাহার নালিশ, কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ-সকল একান্তই আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার জো নাই—এ কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার ভার তাহারই উপরে। এই-সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন নিজেও যে না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস

তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই,—সকালে যখন সে বাড়ি ফিরিল তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতে ছিল। হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি রাজেন,কাল ছিলে কোথায়?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

গাছতলায়? গাছতলায় কেন?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গালাম না।

বেশ। অত রাত্রিই বা হল কেন?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে?

তাই ত হে, এতটা ত ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারী করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে বছর-দুই জেলে রেখেছিল?

হরেন বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর ত কোন সত্যিকার দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে রাজেন ভগবান পর্যন্ত বিশ্বাস করে না?

হরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, কৈ না!

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজকর্ম, বিধিনিষেধের প্রতিও তার তিলার্ধ শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরি-বাকরি করে দিন।

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয়, সতীশ, যে ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট, এবং আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি হয়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়াও আমি কর্তব্য মনে করি।

হরেন মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। এদিক দিয়ে অতিবড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে অস্বাভাবিক রকমের নির্মল, কিন্তু—

হরেন প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্‌বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি. এস্-সি. পড়ত। সবাই জানত ও-ই ফার্স্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি ডাক্তারি পড়ত নাকি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে থার্ড-ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাস্টাররাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসীমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর-দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসীমা তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ক্লাশে প্রত্যেক বিষয়েই ও ফার্স্ট হচ্ছিল, অথচ বছর-তিনেক পরে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে! ওই এক ছুতো—ভারী শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি. এস্-সি. পাস করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করে কাটাব। আমি বললাম, বেশ তাই কর। তার পরে দিন-পনর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই,—এমনি পড়াই পড়লে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সবাই বললে, এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন এ-সব কিছুই জানিত না,—রুদ্ধনিঃশ্বাসে কহিল, তার পরে?

সতীশ কহিল, তার পরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা-পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট্ বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিতে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্যন্ত ছিল না!

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়িময় যেন দক্ষযজ্ঞ শুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, ওটা খোলে, একে ধমকায়, তাকে

আটকায়,—সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করবার জো নেই। বাসার সবাই কেরানী, ভয়ে দুজনের সর্দিগর্মি হয়ে গেল,—সবাই ভাবলাম আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ আমাদের সবাইকে ধরে বোধ হয় ফাঁসি দেবে।

তার পরে?

তার পরে বিকেল-নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদায় হল। আমাকে দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান স্টেপ্ ! ওন্লি ওয়ান্ স্টেপ্ ! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ স্টেপ্। গো। গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু' মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। শুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাশিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞেসা করবেন না। সে আমার বন্ধু।

হরেন খুশী হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে, তারা আমাকে বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করেচে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

হরেন বলিল, বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে, তারা এ-ই বা পারবে না কেন? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারী অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে, পাছে, তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া

যায়। হরেন স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হউক, বা মিথ্যাই হউক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে, তখন কোথাও চাকরি করিয়া দিয়া হোক বা যে-কোন অজুহাতে হোক, তাহাকে অন্যতর সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্বোপলক্ষে দু'দিনের ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিল। আগ্রা আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিনকতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্চি। যাবার গাড়িভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই, হরেনদা, সে আমি জানি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়িতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন। এবং বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেনকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্ল মুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেনবাবু। কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্যে এ কদিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেচে।

হরেন কহিল, পরিশ্রম করলে ত সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেছে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজেদের আশ্রমটুকুর জন্যে করত!

হরেন আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বলচি, তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেছি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে আর চলবে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজে বাধা পাবে না?

হরেন বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বৌঠাকরুন। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই,—শুনলাম জয়পুরে গেছেন কার্যোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেছ—তিনিও আসবেন; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হয়ত আশুবাবুকেও

ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি যাঁদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্ব্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল এবং সেই বয়সের আর একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর-দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর-দম? ডাল কিংবা ঝোল, কিংবা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশী হবার নিয়ম নেই।

হরেন হাসিয়া কহিল, হবার জো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন কহিল, না। তাদের আনলে আলুর-দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে-দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এর সার্থকতা। তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আপনাকে সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এই-সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চার নাম কি মানুষ-গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন,—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না।

তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল। অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে কারও মধ্যে আমি নয় কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি,

ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বা'র হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ হাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেককালের কারুকার্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে সাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে, মাঝখানে তাঁহারই বাড়ির লতাপাতা-কাটা বারো ডালের শেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়ালগিরি এক কোণে জ্বলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্যে হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুশী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল!

হরেন মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুশকিলে ফেললি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েচেন, ওঁর সুমুখে কোন-কিছুকে ভালো বলতে সাহস হয় না—হয়ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে, এর ছাদের নকশা থেকে মেঝের গালচে পর্যন্ত সবই মন্দ।

এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেচি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা আজ বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে

অপ্রিয় বাক্য-মাত্রই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েছে, কেবল এইটি দেখচি সে শেখাতে বাকী রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ক্রুটি হয়েছে মুখুয্যেমশাই, তাঁকে জরিমানা করে আমরা তার শোধ দেব। কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি, তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয়বাক্য বার কর—আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল, তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি-একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়কুটা ধূলাবালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে-মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া-দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে, হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেন নি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকী নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজিপাটা সেই সেকেল সোজা ধরনের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না। কিন্তু ছোটগিন্নী হঠাৎ যে-রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্ধায় আরও কি-একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল।

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

নীলিমা বলিল, তা হলে আমার সম্বন্ধেও দয়া করে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যেমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারঘরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

হরেন্দ্র হাত জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকী রইল এখন থাক, বাড়ি ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না,তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুনিলাম কাল নাকি আপনি বাড়ি যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলাম, তিনিই বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ি চলে যাচ্ছেন!

অজিত কহিল, বোধ হয়। কিন্তু সে কাল নয়, পরশু। এবং বাড়ি কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত, বিকেল নাগাদ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ি পাবো তাতেই এ যাত্রা শুরু করে দেব।

হরেন সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দেশ নেই।

হরেন কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্পি বইবার লোকের দরকার হয় ত আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় ত আমিও একজনকে দিতে পারি, রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না; বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক না, কি বল?

হরেন সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? দুটো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেন না সেজদা?

অবিনাশ কহিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলাম শুধু ওঁদের সঙ্গী হিসেবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই,—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটা সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে, আজ এদের সেই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন।

হরেন কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত বক্তৃতা দিতে পারিনে, হরেনবাবু।

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ। দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন, আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না।

সতীশ মুশকিলে পড়িল। এ কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতাম, এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি, হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভাববন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ-সেবার আদর্শ?

হরেন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এ-সব নয়, এ-সব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল কহিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে জীর্ণবস্ত্র, মাথায় রুক্ষকেশ, একবেলা অর্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন-মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলচেন। তা যদি হয় সতীশবাবু, আমি নিজে ত ধর্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি। তবুও আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলাম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই চঞ্চল দৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায়

নিষ্পলকচক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, রং অতিশয় ফরসা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র—অন্ধকার গর্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জ্বলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরর সুকঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু,—শুধু বন্ধু নয়, ছোটভাইয়ের মত, রাজেন্দ্র। এতবড় কর্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এঁর গল্পই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য মানুষ! অজিতবাবু, একেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁ হে হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল,অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলেন। সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না! তাই আসা, তা বেশ।

এ-সকল কথার কেহ জবাব দিল না, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই, বিশ্বাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা ত চিনিনে—ভালই হল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, গোপন করবার আর কি আছে! পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রি-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া শেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন,-শিবনাথ ত দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েছেন, কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে,—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে কথা জানালেই হত।

তাহার বলার বর্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্মাহত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্যন্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ বাড়ি থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ব্রুট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না?

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছলছল করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ি সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না, আমি এখান থেকে যাচ্চি।

কোথায়, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পনর

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ছিল, গাড়ি থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয়?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়।

নয়? তা হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলবার অনুরোধ ত আমি করিনি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে। ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল করে থাকি কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার করব।

অজিত অস্ফুট-স্বরে বলিল, তা হলে বিচারই করুন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। এই বলিয়া সে গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু!

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়ে কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়িতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপস করব আমি কি করে? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক। কিন্তু, আমি আজ কি ভাবচি তুমি বুঝতে পার না?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন, আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্তকণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই অজিতবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু আপনি ত শুধু কেবল পুরুষমানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষমানুষ। এর পরে ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি করে? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেরে উঠবেন না।

অজিত গাঢ়কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন করচ কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্যে করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্যে। পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা। শুধু

একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল,—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল?

মুহূর্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্যে ফিরতে চাও কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ি চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিতকে ভাবিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই—তার ত দরকার।

কমল কহিল, গাড়িখানা বেচে ফেললেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ি বেচবো? কিন্তু এ ত আমার নয়,—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ির নাম কখনও মুখে আনবেন না। কোন চিন্তা নেই,—চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে উপহাস করচ?

না, সত্যিই বলচি।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ কাজ তুমি নিজে পার?

কমল বলিল, আমার পারা না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতাম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই এবং সেজন্যে লজ্জা বোধ করিনে। এই বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জাবোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস, সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশী নয়? শিক্ষিত ভদ্র-মন বলে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে, আজ নয়। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রূপ করে বলত যে, কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র-মনের সঙ্কোচ বাধেনি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ, কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্যেই শিবনাথের এতবড় নির্ম্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। এই বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ি। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমনভাবে গাড়িগুলা রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত, সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এত ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল?

না, তা হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত কেবল আপনাকে নিয়েই নয়,—তা হলে ত সব গোলই চুকে যেত। এখানে আরো দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই, শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা-প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয়? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আত্মানুশোচনা হয়নি কমল? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল?

কমল এ প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাই নি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্যে নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাওনি?

না।

তা হলে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পরে অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমনি ভুল যদি আবার কালও করে বসি তখনো কি তোমার দেখা পাব?

কিন্তু, যদির উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু! অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ মোহ আমার কাল পর্যন্ত টিকবে না এই তোমার বিশ্বাস?

অন্ততঃ অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই, কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশী করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে, আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম; এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও দুটো এক বস্তু নয়। আর মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চাননি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হতে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি। একি শুধুই উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল, একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না করে থাকো তবে এই কথাই বলব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে? কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়। সত্যও নয়। কোন্ আদিম কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত, ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়! ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতীফুলের আয়ু সূর্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য?

কথাগুলা যে অজিত বুঝিতে পারিল না, তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি

আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা পেয়েচি তার বেশী কেন পাইনি, এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনিই নির্বিকার করে তুলচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা? যাই হোক, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারব, অন্ততঃ, আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিন্ত হলেই কি খুশী হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ি থামান, আমি নেবে যাই!

গাড়ি থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেছেন।

ওঃ—রাজেন? এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন, তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রাত এখন কত?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ি চালাইয়া হরেন্দ্রের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সাদা কথায় জানাইয়া গেল—এ তাহার কর্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রের মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাস করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি নীরব হইয়া ছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পরে কোনকিছুতে মন দেবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসংবদ্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত-অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশী ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে শুধু অপমান করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কমলকে সে ঘৃণা করে এবং ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্মবিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ির শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হ্যাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্তনের কালটা এমনই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্যারাম হঠাৎ যা শুরু হয়েছে, লোকে মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরি হতে লাগল—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে? ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চারদিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্যন্ত ত নাওনি? ছি, এ কাজ ভাল হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ত ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল, এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ি নেই, তখনই বুঝেছি অজিত তোমাকে ছাড়েনি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে!

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপধপ করিতেছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু, কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতাল? তবেই ত তোমার রাগ এখনো পড়েনি।

রাগের জন্যে বলচি না আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে, এটা স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ-পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত, এ

ভালই হয়েছে যে খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁচেছে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল,—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষমাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে।আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যির ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহ পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে, রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সন্নদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। মুহূর্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ষোল

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়িতে আর ত আপনার এক মুহূর্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাব।

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ, এই চেয়ারটায় বসে বাকী রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল,— ইতিপূর্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না, আজ মনে হচ্ছে যেন,—আচ্ছা, বস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুড্‌বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্বান্তঃকরণে আমি আশীর্বাদ করেচি,—যেন, আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হতে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্বাক হইয়া গেল। নির্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখাচোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি, সে আমি কাকে জানাব?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন, শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম, এ তাঁর অত্যুক্তি, তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে,—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম, কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার একফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা তুমি উপায় করে দাও। আমার বাড়িতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল, অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন, বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না, কিন্তু তিনি পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়, তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন ত, চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশী পারিনে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্যে ভয় করো না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাকতে এতবড় অন্যায় অত্যাচার তোমার ওপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবচ কমল?

ভাবছিলাম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্যে খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেন নি, যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,— আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগই হয় বটে কমল; এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে যাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচি নে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না তখন আমার উপায় নেই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। এই বলিয়া সে যথার্থই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্যে যা করতে যাচ্চি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং

এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই আমি এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতাবশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়,—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।

তাহার বলার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত পরে কহিলেন, একি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যে-ই কেননা দিয়ে থাক, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙলাদেশেরই মেয়ে, এ পথ তোমার আমার নয়,—এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম আর এক দেশের অধর্ম। আর স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং, কথা শেষ করিয়া যেন

তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য,কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হত ! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত—উঃ— শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা ! এই বলিয়া তিনি স্বর্গগত মনীষিগণের উদ্দেশে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই,—এমনি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এইজন্যেই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এইজন্যেই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এইজন্যেই। বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলেছিলেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হয়, তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম, দেশের পুরাণ-ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ ত শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা যে ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বল ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এ-সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো কল্পনাও করিনি। আমার ভারী দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে, হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়িটা অমনি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়স নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি। এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায় না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি শিক্ষিত মনের পরিবর্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছাড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যেই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। সেই ব্রহ্মচর্য, সেই সংযম-সাধনা, সেই পুরানো রীতি-নীতির প্রবর্তন—এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়?

তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকী থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নতশিরে নিতে পারাই হল আমাদের চরম সার্থকতা; এই আমাদের কল্যাণের পথ, কমল, এ ছাড়া আর পথ নাই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা নাই,—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা! সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই,—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকাল পূর্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখান নি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে তার প্রমাণ কি আশুবাবু? কৈ, সে ত বলেন নি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেন নি। যা বলছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবকমাত্রেই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধারমাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তু ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্য কেউ শক্তি ক্ষয় করে না।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতনমাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে ক'রে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলাম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম-কর্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশী করা যায় না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি কি বল কমল? দেশের ধর্ম, দেশের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকী থাকবে কি? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না কমল!

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তে পদে পদে যে সত্য নিত্য-নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারাও যাবে না। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে! কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়,—এমনিভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল,—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন, চলুন না পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেন্দ্রের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সর্তে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য করে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন,—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্ধেক পথে রাজেন্দ্র বিদায় হইল, বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। সে নীচ-জাতীয়া দাসীটি

তাহার কাজ-কর্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদির দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুনবালি আসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখির বাসা তৈরির অতিরিক্ত মাল-মশলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার-টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজার পাপোশটায় কাদা জমাট বাঁধিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে; দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলামাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবেই বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই যেন সে কেমন করিয়া নাগাল পাইতেছিল না,—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এতটা খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এমনি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্যচক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই-ই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শুধু এমনি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উলটাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরে দীপের আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না।

অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েচি। তাকেই দেখতে যাচ্ছিলাম।

বেশ খবর। ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি শুরু হল। বস্তিগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে। মথুরা-বৃন্দাবনের মত শুরু হলে হয় পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শুনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এদিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেছেন—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটিও দেখলাম শুকনো-শুকনো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ-সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ-ছাড়া শিবনাথবাবু। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলেন না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে,—ঠিকেদারি করে। শুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেনবাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐদিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে, তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েচে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবে না,—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই এক শ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন ত কিছুই দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি?

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেন না কেন?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাকে, সেও সইবে, কিন্তু ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনাও করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি? অসুখ বাড়ল নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে,—আশ্রমের নিয়মে আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন—এই তাঁর পণ, এর আর নড়চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হল ভেতরে কি একটা গোলযোগ আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন,

সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিন-কতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখচি তল্পি বাঁধতে হল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আসচি। ভাবচি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বলব কি?

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিল না, তেমনিই নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলে না। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য নয়। কিন্তু শুনলেন কার কাছে? রাজেন্দ্র বললে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অনুমান। তাই ভাবচি, মিটমাট ত হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ত্রুটি হবে না।

কমল কহিল, সেই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জন্যেই ভাবনা, ভারী অল্পে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেন্দ্রকে পাঠাতে ভুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, এই বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নবেলায় রাজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা দেব। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খসল?

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না চাও ত বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারী করে তুলতে আমার লজ্জা করে। 'আপনি' বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোক বলে তুমি বিপ্লবপন্থী, তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে

দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো করো না।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্যে নয়—বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি।

কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী, ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা; তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচ?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ, কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ?

সত্যিই বলচি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে

তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল। ‘তুমি’ বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই, ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজিও নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নাই,—’তুমি’ বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জান?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ করে নানা কথা কইলে, বললে, এ বিবাহ পাকা হল না। আমার কিন্তু ভয় হল না; বললাম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক’ পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ, ভাবলাম এ ভালই হল যে স্বামী বলে যাকে নিলাম তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল। কিন্তু এ-সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না।

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে, তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল! জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতে পারতাম।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে?

কমল সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরে সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ চলুন। আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি গে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন্দ্র বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু, এখানে আমার থাকা চলবে না, শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেছে?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে—সেজন্যে নয়।

কমল হরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বলচেন? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যাঁরা এমন আতঙ্কিত, ঘটা করে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু, তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন্দ্র কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং। কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুলব না। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায় না। ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাকলে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেত।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্যে নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যারই হোক, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন?

যাব নিজেরই জন্যে। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেচে, থাক না সেখানে মতের অমিল, হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন; কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা? মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ, এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসলাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিচ্ছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে?

রাজেন্দ্র বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য এবং মহত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্তবড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ-মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্বনাশ করিনে,—বন্ধুর হলেও না—তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল?

রাজেন্দ্র কহিল, বলি। হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই। শিবানী—

কমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কৈ, দুজনের মনে মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের ঐক্যটাই রাজার শক্তি,হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—

এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।

গাড়োয়ান রোকো রোকো,— শিবানী, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়ে আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্প লোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সতের

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের একি চেহারা ! এখানে যে মানুষ বাস করিয়া আছে সহজে যেন প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো-আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথবাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত এরই ডিউটি।সূর্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমুতে শুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাত বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দুটা আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হ,—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবীবাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাড়ু কিছু আছে?

ফগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন্দ্র কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিট্‌বেন নাকি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাশার সময়? মায়া- মমতা কি তোমার শরীর কিছু নেই?

আগে ছিল। ফ্লাড্ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জন দিয়ে এসেচি।

ফগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন্দ্র বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

শহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে, হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন্দ্র কহিল, ইতিমধ্যে দেখচি, বিছানাটা পর্যন্ত বদলে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলেন কি করে? জানার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা-বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাই ত বলি ! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, খাবার কথা ত তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন?

রাজেন্দ্র বলিল, খেয়াল হঠাৎই হল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হল আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজাটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ির কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া একটুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে, আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এই-সব দামী, ভাল ভাল খাবারও খাইনে। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হলে আর রাত না করে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার ফিরে আসবে?

আসব।

কতক্ষণ থাকবে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না। একটু ক্লান্ত, তা হোক। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ি পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচীদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার! দু'ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে?

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ-লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নেই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্মে নিযুক্ত করে—কর্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন-কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জলবায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ, অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজেও ত ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-স্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবীশি করেছিলাম।

তা হলে ওদের দেখচে কে?

যম।

তবে তুমি কর কি?

আমি করি তাঁর তদবির। তাঁর গুণমুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া, তেমনি সুবিবেচনা।

বিশ্ব-ভুবনে সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখে গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে বলেন আমাকে সিনিক্, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অতএব, মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা—আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে মৃত্যুরাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গাল দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয়, তোমাকে সিনিক্ বলাটা কি দোষের?

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায়? গড়াগড়া পড়ে আছে,—আজকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে-কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হল। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই,—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায়? তখনি কূল দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই, ওরে ভয় নেই,— সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশী সৌভাগ্যবান্। কিন্তু কোথা থেকে কি-সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে?

তা হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা হলে তোমার পা-গাড়ি করে ঘুরে এসো গে,—আমি বসচি।

রাজেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা! আপনার যে দুদিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আসবার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুদ, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন-দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব, হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

তা জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাব।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা করো না। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেছেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ, তার জন্যে সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবে না। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতিদরিদ্রের যা আহার,—সেই একমুঠো ভাত-ডাল। কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি। কিন্তু দিন-দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না। তোমার স্নেহটুকু

আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন। তাই বলে রাগ করো না যেন।

না।

কি ভাবচ বল ত?

ভাবচি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হল না। আমি দেখচি, সহজে ভুলতে পারব না।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেবো কেন? এই বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি করো না, যাও। যত শীঘ্র পার ফিরে এস। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখব—দু'চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন?

রাজেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু, এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক, সে তামাশা করেছে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞেস করলেই খবর পাবে।

রাজেন্দ্র কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এই জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে?

শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার অধিক নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি

ঘটিয়াছে, কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানী? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেছেন?

হাঁ। আমাকেও এনেছেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন তিনি। নাম?

রাজেন্দ্র।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়িতে থাকো?

সেই চেষ্টাই ত করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেছ কেন? আমাকে দেখাতে?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি, তুমি ত করতে? চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয়, সে ত ভাল করেই জানতে? তবে, কেন করনি তা?

শিবনাথ কয়েকমুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে, ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক থাক, ও আমি জানতে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায়

নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যিই যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়িতে গেলে কিসের জন্যে? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের একশেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি, আমার সব সইল, কিন্তু তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না, তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ শিবানী।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটিই সবচেয়ে ভালবাসতে! এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনিই নির্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানী?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হলে তবে এ কথা মনে করে দিতে পারে।

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যেও আমি ধরে রাখতাম না।।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানী।

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে, স্টেশনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্যে আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্যে। কিন্তু আজ তোমার জন্যেও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু—

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, দ্যাখ, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমাকে মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করো, হয়ত সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, তুমি ভাল থাকো, এ আমি আজও সত্যি সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন্দ্র চাপা-গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি! রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াই নি।

রাজেন্দ্র অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সেটা ভাল না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরা করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মাদুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড়-দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা-আষ্টেক শুষচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কৈ?

ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটোছুটিতে ঘেমে গেছি, একটা পাখা-টাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সবদিকেই সুখবর। এই বলিয়া সে চোখ বুজিল।

আঠার

ইন্ ফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে শুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না; রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। শহর ও পল্লী সর্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না,—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোনদিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছপালা, বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন শহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছলছল করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যেই মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা

হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ায় লোক আর বেশী নাই। যত বা মরিয়াছে, তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলেবয়সে চা-বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলে না। মুচীদের সে কি অবস্থা ! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই, এবং আবর্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্বে কমল জানিত না। অথচ, এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোনকিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না।

নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল, ইহারও সীমা আছে। দিন-কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন ! কিন্তু আর আবশ্যক নেই,—আপনি দিন কতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ কয়দিন একেবারে বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতেই হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হইবে না মনে করিয়া একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। কমল রাজেন্দ্রর খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতে হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী-বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ' দিন রোজ আসচি, আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচীদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, যেখানে? সেখানে ত ভয়ানক লোক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে? যে-ই দিয়ে থাক কাজটা ভাল করেনি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ, আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিন কয়েকের জন্যে—নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না,—আচ্ছা রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি শহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে কোন সন্ধান পাবার জো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোকে যা বোঝে তা নেই। তবুও প্রয়োজনই বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি ত একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ি থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বেরিয়ে গিয়ে সে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ি নয়, আমাদের আশ্রম

সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তাঁকে ঢেকে যে রাখব হরেনবাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন?

হরেন নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেকে আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন? বলবেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহুপ্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোকে আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই ত আপনাদের মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারংবার জিজ্ঞেসা করি।

কোন উত্তর পান না?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি,—ভালো কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েছেন।

হরেন বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় সুমুখে এসে দাঁড়াল যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায় মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন করে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই যে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি? দু-কানকাটার গল্প শোনেন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেন নি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলাধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই; কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি করে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ, আমি জানি তা সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না,—জগতের কাছে তার প্রমাণ কৈ?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেচেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে-বিষয় আপনি নির্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা করেই ঘটে চলেছে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশী পাইনি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে, অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত-কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত ও আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ, আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলিনি হরেনবাবু! আমি বলেচি, এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত ও নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে

আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহু স্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক, অশ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু, আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াই নে এই সাহসটুকুই আমার আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ, ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে, এর জন্যেই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা ত বলিনি। আমি বলছিলাম, এ-বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময় হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলা যেন তাদেরও ডিঙ্গিয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতাম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলাম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে।

বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে, অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এই-সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ; এবং এইজন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন,—ভাল কথা, শুনেছেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা শর্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তিপত্র লেখাপড়া করে নয়, এমনিই।

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশী নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার ত আপীল-কোর্ট মেলে না।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালোবাসার অতিরিক্ত কোনও বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপার আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশী বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হলে পারতাম না। হলেও পারতাম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতাম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ দেহে সংলগ্ন হয়েই থাকত, এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্যন্ত উপড়ে

ফেলতে হত। তার ভয়ঙ্কর মূর্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না।

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুলচুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনিই অধিক, সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে, তাকে ভাল বলে মানি কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ-আলোচনায় সহজে যোগ দিত না এবং বিপক্ষ দল যখন নানাবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই। আপনারা নিতেও পারেন না, ফেলতেও চান না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা-চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-দুই-তিন ইংরাজি তর্জমার বই পড়লেই জানা যায়। বুলির জৌলস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত, ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য! এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশবাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল-নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনে হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতেও চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করেও বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্যে ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে। এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্মল চাপা-হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু, সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান।

ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না। এই বলিয়া সে অপর দু’জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এতবড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন ভারী একটা পরিহাসের ব্যাপার!

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত,কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজদা, নইলে হাসি-তামাশা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনায় লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাঁকে লোকচক্ষে ছোট করতে চাননি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তাঁর ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না।এই ত আপনাদের ঘৃণার মূলধন? একে ভাঙ্গিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলাম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে, কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে, যে শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায়,সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র,অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী-নির্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—এই জন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সর্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত।এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ-সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহারই মুখের

পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম, নীতি,আচার, ইহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ, সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতায় ইহার ব্যতিক্রমগুলাকেও সে অস্বীকার করিত না; কিন্তু এমন স্পর্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না। এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা,—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রের মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,কিন্তু যেজন্যে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল,যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাকলেই আমার যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে?

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধুকে শুধু জানলে হয় না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি।বহুদিনের বহু কাজে-কর্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক,আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্যদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলা যে শুধু তত্ত্ব হিসাবেই কমল বলে নাই, কি-একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেন্দ্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক, তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল,শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে তার মৃত-বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে,নিজের রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্বনাশ করেছে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানে না যে দুনিয়ার এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

প্রস্তাবটা হরেন্দ্রর কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল-মত নির্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও ত হতে পারে না? আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই?

কমল কহিল, তা হলে হবে কি এনে? আমাকে পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ,টাকা আমি নেবো না, দ্বিতীয়তঃ, সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না? আর কিছু না হোক বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পারব না। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরছিলাম যে, এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল? স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতাম? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পর্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দিত।

তার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলাম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান। লুকোচুরি,ছলনা,তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে।আর আমার নালিশ নেই,

আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল,সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয়,হরেনবাবু! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর না। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নির্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প একমুহূর্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছে খবর দিন!

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন!

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন?

হাঁ। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাট্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু-এক মাস দেরি হবে।

আর নীলিমা? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে? একলা ঐ খালি বাসায়?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্তুতঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল, এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল,

বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে ত জাট্‌তুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি,—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ,আমি তোমারই আত্মীয়,তাও অত্যন্ত দূরের,—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে,আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে চারিদিকে, দাদার বাড়ি থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ি ত আছে শুনেচি?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়িও আছে শুনেচি, কিন্তু সে-সকলের কোন উল্লেখই হল না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্‌ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু, পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপনার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎচরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দিনে ছেড়ে যেতে পারেন নি, এই থাকার জন্যই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই-সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসচেন, না?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে। ওঁরা দুজনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—একদিন যাবেন ওখানে?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন? চলুন। আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়িতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই,—এমনি। চলুন যাই।

উনিশ

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্নপ্রায়। শয্যার উপরে অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেইদিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিনকয়েক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্বলতা যায় নাই। ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতে আশুবাবু কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুশী হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আর আসিবে না। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস আমার কাছে এসে বস। এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই ত আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্বাদ। নইলে যে দুর্দিন পড়েচে তাতে কেউ যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি দিন-কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছ।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না,—এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন্দ্র ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তাহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ শুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু-তিনদিনের বেশী দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যেন এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরি। তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞাসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না।

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না, এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে তোমারই বা কি করে ছুটি হলো? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল!

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্যে নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন্দ্র।

এক-একজনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে, সে না হয় কখনো শেষ, না যায় কখনো বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হতো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি করে? ক'দিনই বা বাঁচবে? সেখান থেকে একলা যখন চলে এলাম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে যেন নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে

দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম—

আশুবাবু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যেই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে,—

কমল কহিল, লজ্জা সেজন্য নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলাম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভান, কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায়নি, আপনি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—তখন কি যে আমার হলো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ কথা জানাতে পারিনি,—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পথের মধ্যে বার বার করে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ার না আছে ধর্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্যি নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতিনমস্কার করিল, এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্বলতা কমল! এ জিনিস ত তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আমি বরাবর ভাবতাম, যা অন্যায়, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ কর না।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারনা বদলেছে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক, এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সেই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশী একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশী পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেন না। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন ত খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আনতে বলব?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙতে আমি দেবো না।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বৈ কি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনো আপনার অনেক—অনেক বাকী। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করি গে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল; কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে। এই বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গীটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটি-কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্যের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ কথা বলা চলে, কিন্তু সেই সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে, কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে যে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোনদিনের কোন প্রলোভনই তাহার গায়ে দাগ ফেলিতে পারে নাই। ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশী ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই;

কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উদ্যম-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙ্গিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ-সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী।

এ ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য ধর্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন যাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আসক্তির এই নবজাগ্রত চেতনায়, সে ধর্ম লেশমাত্রও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কি না।

চাকর চা, রুটি, ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই-সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোটোখাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে,—এমনি অনেক-কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু। এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, যে বৌদিদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কি না। এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত-কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এই কিনা।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে দু-একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলেন?

ভুলে গেলাম? তার মানে?

তার মানে এই যে, আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাইনে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার জো নেই,——এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ একগুঁয়েমির পরিবর্‌তন নেই। কিন্তু অত দর্প আমি করিনে, হরেনবাবু সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই, আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু যেখানে থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক-চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতিঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল, এবং এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই তাহারা বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়িতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি? আশ্রমে পাচক রাখবার ত ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু?

হাঁ। কিন্তু হাসচেন যে? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা জানি, এবং পরক্ষণে সত্যিই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই, সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারী ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যি মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ত্রুটি করিনি যে যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবো না তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেচি তাকেও প্রচুর বলা চলে না। সুতরাং, এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুশী হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অসচ্ছল নয়,—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক, প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধেও এমনি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভিতরের লোককে দিতে পারব। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশী চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন নি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়,—সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু, এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই। এবং বোধ করি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচি নে কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারিনে যে, আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ,—দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই। এই বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারী একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল, কিন্তু এটা ত মানেন যে, প্রাচুর্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল স্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল, এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ওদিকেও খানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ বস্তু দেখতে পাবেন,—দৃষ্টান্তের জন্যে ভারত পর্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুশকিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাশা বলেই ঠেকবে। দিন, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ধরুন, কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন ত অভিনয় বলে তাকে তামাশা করা চলবে না! তখন ত—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাশা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেনবাবু, কিছুকাল পূর্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেচি, উপবাসের নেশার মত আমাকেও তা

মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ,—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেছি মহামারীর মধ্যে,—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আরও একজন দেখেচেন, তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না, —আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাঁচখণ্ড গেরো দেওয়া,—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না? আশ্চর্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রর বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য ও শুচিতার আদর্শে ইঁহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে বিভেদ ইঁহাদের মধ্যে যত বেশীই থাক, সেবা ও মমতায় ইঁহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রর ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারী ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জব্দ করেচি, কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া বলিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদিদির খাওয়া হতো না,—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেন না।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক—এতেই লাভ বেশী। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস করে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথারও জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন, এ কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরানী হওয়াই যাকে সাজে, কাঙালপনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার উঠুন। ও ঘরে গিয়ে সারা রাত গল্প শুনবো, এ ঘরের কাজটা ততক্ষণে সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশদাদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকুই জানি। কেবল একটা কথা বোধ করি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি,—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে মোছেনি, মোছবার নয়,—জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষমহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে—তাঁর নিষ্ঠাও অনন্যসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন ত আর বাসায় যাওয়া চলে না,—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব। আর ত ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল।

কমল হাসিয়া বলিল,আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে নাকি?

হরেন্দ্র স্তব্ধ নির্নিমেষ-চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ কথা উচ্চারণ করিল কি করিয়া!

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকেও ধাক্কা দিল।সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল,আমারই ভুল হয়েচে হরেনবাবু,আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি,মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ,এর বেশী খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায় নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান, আর দেরি করবেন না, আশ্রমে যান। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

কুড়ি

প্রায় মাসাধিক-কাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্তিটা শান্ত হইয়াছে;স্থানে স্থানে দুই-একটা নূতন আক্রমণের কথা না শুনা যায় তাহা নয়,তবে,মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল,হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি,নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে-রকম খাটচেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞেসা করবে,হলো? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে, ঢের দেরি। জরুরী থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরী জিনিস যে একবার ব্যবহার করেচে, সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন না লালাদের বাড়ি থেকে আবার এক থান গরদ,আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বললাম ছ মাসের আগে হবে না,—তাতেই রাজী। বললে, ছ মাসের পরে ত হবে তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।।এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশী আসতে থাকলে দেখচি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী,—আমাকে দিয়ে এ রকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,আপনার চেয়ে বড় কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, শৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরি করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই,আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল,আমি হাত গুণতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য,অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলেও চলে,—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নির্বোধ নয়, হরেনবাবু। তাঁকে জানাবেন—তাঁর জামা তৈরি করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারী ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যে সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজী হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্যব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতের তৈরী জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষ্যে পর্বদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ জগতে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল,কিছুকাল পূর্বে ঠিক এর উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর, কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেচি। আমার নিজের

কথাটাই ধরুন না, আজ ত আর প্রমাণ দিতে হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টিপাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন্দ্র বুঝিল, এই-সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিসের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কিনা এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, নিয়েছি।আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তিবোধ করিল।জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ-সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে, আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুলচক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতূহলের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে! একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেন নি?

বসতে আপনি ত বলেন নি।

বেশ যা হোক। বলিনি বলে বসবেন না?

না। না বললে বসা উচিতও নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ত বলিনি—দাঁড়িয়ে বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন ত আমার না দাঁড়ানই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করচি।

শুনিয়া কমল হাসিল, বলিল, তা হলে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেনবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বলতে ভুলেচি, যে আদরটুকু অতিথিকে করা উচিত ছিল, করিনি,— হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না না, রাগ করেছেন বলিনি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ সংস্কার মানুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ, এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আমাকে বলচেন, না আপনাকে আপনি বলচেন? যদি আমার জন্যে হয়, ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অন্ততঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁশ করে চলা ভাল,— ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায়ই ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্মার্থ উপলব্ধি হ'ল না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগা। হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্চি খুলতে, তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূল-কিনারা পাচ্চিনে। এ-সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারবো। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিমুখে বলিল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দুজনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়চে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ,—এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না। আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠচেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আমার সইবে না। বরঞ্চ, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি,—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি আর যাই করি, আপনাকে ঠকাবো না, সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশিতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, না, তারা খাবে না, আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেছে, যেখানেই যাই সৎপথে আমাকে সে রাখবেই। বরঞ্চ, আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারেন না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি করে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও নয়। এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেছি। কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর করে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস ত অনুমানে ভর করে বিচার করা যায় না, হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজগুলা একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েছে হরেনবাবু, একটুখানি তৈরি করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন্দ্র কহিল, বসেই ত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাইনে। ওর জন্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যাননি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেছেন?

কমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, না। এ আমার মনেও হয়নি।

তা হলে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুশী হবেন। সেই অসুখের মধ্যে একবার গিয়েছিলেন; এখন ভাল হয়েছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তা হলে আজই চলুন না?

চলুন। কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে এক বাটি চা নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইয়া হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হতো।

কমল কহিল, হতো না। চেনা লোক, কেউ হয়ত দেখে ফেলতো।

দেখলেই বা। ও-সব আমি গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু ওই চেনা লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হতে আজকাল সঙ্কোচবোধ করেন, কি তারা ভাবে?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাবতে পারে? বলুন? এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, সমস্তই দুর্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে—এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া-আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। এ ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাইনি,—হয়ত বুঝতে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাটাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভাল আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হ্যাঁ, ভালই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন?

না, উপরে সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করচেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনেই একটু আশ্চর্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া চুরুট টানিতেছেন, এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহাওয়ার মতই কড়া ভাব—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাংলা বলায় রুচি নাই। হয়ত, অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেছেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয়ই উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসর অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকী পরিচয় যথাসময়ে হবে,—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসি। এইজন্যে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছটফট করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারী হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেচো ত?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না ত!

কমল চুপ করিয়া রহিল।

একুশ

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিললো তো? বুড়োবয়সে extravagance বলে উপহাস করা যে উচিত হয়নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার-কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়েটির বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলেও তেমনি অবাক হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্রও চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কি না তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাশা করে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ সংসারে অচল।

ইস, তাই বৈ কি! বলিয়াই আশুবাবু গভীর স্নেহের সুরে কহিলেন, এ বাড়িতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই, তাই।

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে?

তা হয়েছে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ্য-পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল, এবং সকলেই আশ্চর্য হইলেন। এ গৃহে অজিত একদিন

বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর সে আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের পরে ভারী একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, ব'সো অজিত। ভাল আছ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে, হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে? ভাল মনে হচ্ছে ত?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানে থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আসচেন?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েছে।

আমার সন্ধানে? প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম, কিন্তু রাজী হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটিকে দেখতে কেমন? বললেন না কেন সে এখানে নেই?

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছি।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু’-তিনবারের বেশী দেখিনি—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি।কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ, হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারী wild,—পুলিসে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না, —এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে, কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়, এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেনের কাছ থেকে শুনেচি। পরার্থে আপনাকে সত্যি করে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি, শুনতে শুনতে যেন তার ছবি দেখতে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন না তার কোন বিপদ ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলেই বোধ হয় এ প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলাম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন।শরীরটা বোধ হয় একটু বেশী রকমই খারাপ হয়েছে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ, আজ ভাবি সংসারে আপন-

পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন।দুনিয়ায় আপনার-পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায় তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিত রমণী বেলা ব্যতীত অপর সকলেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভালমন্দর বাদানুবাদ,—মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে।আনন্দ ত নয়, নিরান্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়,—যেন কুয়াশার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়িটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে!

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হলো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ির মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া। রাস্তায় মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এমনি অন্ধকার ছিল, মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজী হয়েছিলাম সে মনে আছে?

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে।

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলাম? কৈ না!

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল বলিল, তা হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আর তা করচি নে—চলুন না, আজই দুজনে চলে যাই?

দ্যুৎ! আপনি ভারী দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল, চল যাই,—তক্ষুনি রাজী হয়ে বললাম, চলুন।

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাস।

কমল বলিল, বেশ, না হয় পরিহাসই হলো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেছি বলুন ত? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেছেন আপনি বলতে। কত

দুঃখে-কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামা-কাপড় সেলাই করে কোন মতে হয়ত দুটি খেতে পাই, অথচ আপনার টাকার অবধি নেই,—একটা দিনও কি খবর নিয়েছেন? মনোরমা এ দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন? দিনরাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো,— এ যে পাগলা-গারদের সামনে এসে পড়েচি। গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে, হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার জো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমলও হাসিল, কহিল, তা বটে। কিন্তু বিচার জিনিসটাই ত সংসারে সব নয়; এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ি যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ-অঞ্চলে আমি গাড়ি পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

গাড়ি চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ, আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতাম না। আসুন।

বাসায় দাসী আলো জ্বালিয়া আজ অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, স্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাত বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই, মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারারাত খুঁজলেও পাবেন না। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন্ দিকে বলুন তো?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশী করে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেছে, শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলাম, যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়িতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট্ট উপলক্ষ,—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না। আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না,—এই বাড়িতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে 'আপনি' বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোন অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্যে। কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতাম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে ভালবাসি এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাইতে আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত যেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েচি বলে আপনারও জামা সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না!

না, দান আমি কারও নিইনে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, কমল, এ কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি তার কি জবাব দিতাম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো?

কথাটা ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল, বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও

এমন করে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশি নয়?

এই প্রশ্নের উত্তর আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই; এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশি করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক তোমার উপার্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই। অথচ, নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বহুবারই হয়েছে। আর, তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উঞ্ছবৃত্তি আর ক'রো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা কি বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনিনি সে কথা?

না।

তা হলে শোনবার মত করে বলেন নি। হয়ত, মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায়নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি?

তা হলে আমিও যদি বলি,—না।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত! তোমাকে একটা দিনও আমরা বুঝতে পারলাম না। যেদিন তাজের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজেই বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না।

কমল হাসিয়া কহিল, এমনি ধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি? বলুন ত যা খেয়েছেন আর কোনদিন খাবেন না,—কেমন আপনার কথা থাকে।

অজিত কহিল, থাকবে কি করে? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসেনি। যেদিন আসবে, সেদিন আমার মুখ দিয়ে 'না' বেরুবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কিনা বলে দিতে পার?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি। জবাব তোমার কাছে পাব, এই আশা করে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকব।

এই বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই। তুমি নিজেই ত জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার জো ছিল না।

জানি তা হলে?

হাঁ, জানো বৈ কি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি ত আর আসেন নি? সে যাক, কিন্তু হরেন্দ্রর আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই,—সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি করে?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আমার ও-কথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত, এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেচি—তিন-চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন। দেশের সর্বনাশ যারা চোখে দেখেচে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরেন্দ্র এ-সব দেখেছেন অস্বীকার করিনে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পাননি?

কিন্তু এ সবই ত সত্যি?

সত্যি নয় তা বলিনে, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বলতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা,—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি,—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্যব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের—জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন,—আর না।

তুমি খাবে না?

আমি কি দু'বেলা খাই যে আজ খাব? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

না হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্যে নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষে করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই,—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ ঘরে আনিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্তু দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্য মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা পাতিয়া রাখিয়া কহিল, আসচি। মিনিট-দশেকের বেশী দেরি হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।

তা হলে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে,—এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া, দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে,—নীচে সিঁড়ির কবাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এমনি সব ছোটখাটো কাজ তখনো বাকী, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্ন-রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির 'পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কৌতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত; কিন্তু হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্মোপলব্ধির একাগ্র সাধনা এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সূতা দিয়া তৈরি বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট্ট গুটি-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে সাদা রেশম দিয়া বোনা কোন একটি অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্পকর্ম,—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই ত আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়াচাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত!

কমল একটু আশ্চর্য হইল—কি বেশ? ঐ লতাটুকু?

হাঁ আর এই হলদে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেচ, না?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েছি? আপনার চাই ঐ-রকম?

না না না—আমার চাইনে। আমি কি করব?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েচে।

দ্যুৎ!

দ্যুৎ কেন? নিজের জন্য এ-সব জিনিস কেউ তৈরি করে না, করে আর-একজনের জন্য। কষ্ট করে ঐ ফুলগুলি যে সেলাই করেছিলাম সে কি আপনি শোবো বলে? একদিন একজন আসবেই,—শুধু তারই জন্যে এ-সব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা?

কেন?

তুমি আমাকেই মনে করে এ-সব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করব?

কেন করবেন না?

করব না সত্যি নয় বলে।

কিন্তু সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন বলুন?

নিশ্চয় করব। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি থাকে না। সে আলাদা। কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যেই মিথ্যে বলতে পারো না, এ আমি জানি।

তা হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন?

নিশ্চয় করব।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বলব। তখনো রাজেন আসেনি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইল না,—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্পকাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলাম আমি কোনদিন হয়ত জানতে পারতাম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না, ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েছে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারিনে।

কেন পারো না?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হলো, ঐগুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলাম, সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলাম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের 'পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমেষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপ করে কি ভাবচেন বলুন ত?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারছি নে।

তার কারণ?

কারণ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়,—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল, একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা

রাধাবল্লভজীউ পূজোর ঘরে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন,—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ির কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাশা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায় নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেমনি। এতদিন পৃথিবীর কত জায়গাতেই ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা, বাবার দেওয়া। এ ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েছে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ খবর কি ছাই আগে পেয়েছি? তা ছাড়া, ভাল-মন্দ বুঝে দেখবার সময় পেলাম কৈ? মনের মধ্যে শুধু একটা সন্দেহের মতই ছিল,—ঠিকানা পেতাম না,—কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচো মাত্র মিনিট-দশেক? কিন্তু সত্যি হলে এ ত পাগলামি।

কমল বলিল, পাগলামিই ত! তাই ত আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ করে ঘর-সংসার করুন, এ ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদবুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক। কিন্তু গাছের ফুল শুকোবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলাম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহারই কাছে পূর্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করে নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটা দিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথম দিনের জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কাছে আর আমি কিছুই গোপন করব না। এঁরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্যন্ত

জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু, তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও ডাকে সাড়া দিতে আমি পারবো না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালবাসে নি, তার আচরণ বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন আর সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাক। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অজিতবাবু, দু'পক্ষেরই সর্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন, দুনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই তা জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেছি বলে পুরুষের বিচারে এই হলো নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কি? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশী সম্মান মানুষে দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠানের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মসলা-পেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার, তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেন নি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখত লিখে যে বন্ধন নেবে না, তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে?ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্যকালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে রগড়ে মসলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে। ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রূপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষে বোঝে না হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য। অথচ এ কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি? তাই ত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ

করে তোলে। এই হলো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হলো সত্য?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারো না। এবং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হলো কমল, এ নিষ্ফল কলহ বন্ধ করো,—এ আদর্শ তোমার জন্যে নয়।

কোন্ আদর্শ? আপনার ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এ গূঢ়তত্ত্ব বিদেশীদের জন্যে নয়। এ তুমি বুঝবে না।

আপনার শাগরেদি করলেও পারবো না?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে-মানুষ আর নয়। কহিল,আচ্ছা বলুন ত, কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি ?বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেন্দ্রকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে,—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হলো না,—না?

কি আবার মনে হবে?

এ-সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করো না?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় করো না?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীদের ভয় কিসের?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার অনেক মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি,— এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিতে অবজ্ঞা করার সাহস যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মত শোনাচ্চে?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল,সত্যি বলো, আমার মতামতও কি অন্য সকলের মতো তোমার কাছে এমনি তুচ্ছ?

কিন্তু এ কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহঙ্কার করিনি। বাস্তবিক, ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছুই জোর করে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও আবার তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই ত। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি করে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না। সেদিন হারানোও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেচি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব করে কিসের?

কমল কহিল,অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তারপর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি। এই বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

বাইশ

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র,—এর বেশী দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত-ব্যাধিটাও তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই; সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন।একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য-দেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল, সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই।ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত যে, এমনি হয়। এমনি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এবং এমনি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই, ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকে নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ববিধ দুঃখই তাহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ-প্রসন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল

আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্যের অভাব বহুস্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁষিয়া আসে, মন্তব্য প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্নতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়,—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন ত সারিয়া আসিতেছে। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রাবাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তার পরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেলবেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, রায়বাহাদুর সদরআলা, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী—নানা কারণে স্থানত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা,—হরেন্দ্র,অজিত এবং বাঙালীপাড়ায় যাঁহারা আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ি গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজলিসী লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিসে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন,—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও

ত্রুটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা সভাশেষে পরিতৃপ্তচিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়!

সম্ভব কি করিয়া যে হয় এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাসও ছিল না, ভালও বাসিত না। কিন্তু, অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণ এই গৃহের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঋতুর প্রথমার্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতে টিপিটিপি বৃষ্টি নামিয়াছিল; বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের সার্সীগুলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে।আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি-একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়া-দেশের সবই উলটো। কিছুকাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলাম—জুন কিংবা জুলাই হয়ত হবে, এই জলের জন্যে যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে, না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে, তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এর কারণ কি সকলে টের পায়? পায় না।

বেলা সরল-চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন, এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে?

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয়, এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক, এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই, —অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি বা তেমনিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে।চোখের দৃষ্টি হাস্য-কৌতুকে চপল, চঞ্চল,—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে। সে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চা বলেই নয়, হাহাকার করে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক, সে আমি পারিনে এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মানবোধ বজায় থাক, তার বড় আমি কিছুই চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখনো পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভাল। এতদিন একসঙ্গে আছি, এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হাঁ-না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনিভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশঃ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মমত কি ছিল কেহ জানে না, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি শখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাস করিয়া আসিয়াছিলেন, দিনকতক দেখাশুনা ও মন-জানাজানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেস্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বায়ু-পরিবর্তন, এমনি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশে যেটুকু, তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যাপক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু

করিতে চাহিলেন। বন্ধু-মহলে আপসের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা-স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসৌরি, নইনি প্রভৃতি পবর্তাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর-সম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ-উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত পরের মতও আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ, অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অন্যরূপ। এ গৃহে কাহার স্থান যে কোথায়, এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও-কথা নীলিমা বলেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্যে বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করব না। নিজের মর্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি, আজও তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও আমি তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেকবুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটী।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলছিলেন যে, বিবেকবুদ্ধিটাই সংসারের মস্তবড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হ্যাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে-পিছনে দুদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

বেলা কহিল, এতবড় দুঃসাহসের কথাও ত কখনো শুনিনি!

আশুবাবু মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে। তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে পারিনি,—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি।

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই; কিন্তু তুচ্ছ দোষও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়, কিন্তু সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বৈ কি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই নীলিমা,, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত; বল ত সে নিজে এ ক্ষেত্রে কি করতো? কি জবাব দিত? তাইত সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত করে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেছি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয় নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন, তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না। চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যেই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভাল নয়।

নীলিমা এ কথা কানে তুলিল না, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থার কমল কি করত, তা সে-ই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ করতে হতো,—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না।

কমল আর যাই করুক, যে-স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইতো না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাশা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যেন তাহার কাজ; সে যে সহসা এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে, দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিসে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে-সকল প্রসঙ্গের অলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বলতাম না। কমল একটা দিনের জন্যেও

শিবনাথের নিন্দে করেনি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায় নি,—কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর তুল্য অধিকার—একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, মেয়েমানুষ হয়ে আমি মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে; আমি জানি এ সত্যি, কিন্তু এ কথাও জানি যে সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে, আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চা করবেন না।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্বেই সে সেলাইয়ের জিনিসপত্রগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্ধেক-অর্ধেক ভিজিয়াছে,—বৌদি কৈ?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না,— সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো অজিত, বসো হরেন্দ্র—

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস! দুজনেই যে ভারী ভিজে গেছো দেখচি—

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভিতরের দিকের পর্দা সরাইয়া নীলিমা আপনিই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

অজিত কহিল, একি? আপনি হাত গুনতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোণা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। একটি ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলেছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশসুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে? তাইতে দুজনকেই ভিজতে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী, অন্যায় করেন না, তাই চুলচিরে ছাতি ভাগ করে পথ হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। এই বলিয়া সে জামাকাপড় হরেন্দ্রের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং, দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক-বিষণ্ণমুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল; এবং নীলিমা জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হে হরেন, আর খুঁড়ো না। দেখচো না মেয়েদের কি-রকম ব্যথা লাগলো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্তন করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। এতএব চিরস্তূয়মান হিমাচলের ন্যায় ও দেহ অক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুতানাতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোশামোদ না করলে ইতর-জনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টিকথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে, আরম্ভ করব নাকি?

আচ্ছা এখন থাক। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড় গে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে? তার পরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখি গে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথলে যাবে। চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি গে, এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

তেইশ

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দুজনে সেই ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকার-তত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য, তার পরের ভাবনাটা নেই,—এখানে তা চুকিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং আর একবার ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না, না, থাক, তাতে আর কি হয়েছে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও! আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরিগীগিরিতে পেকে গেছেন,—এ দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্যে। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারছেন না, সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপই থাক, উনি ধরাই পড়ুন একদিন,—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা করে পূজো দেব।

তা হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারী বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারী রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েছে; এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ! ব্রহ্মচর্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনামাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুকবোধ করতেও অপারগ হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করছিলেন, আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষস্বর ইঁহাদের কানে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আমাদের কে, তবুও এতবড় অন্যায় সহ্য হলো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সে 'না'-র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর থেকে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল তার প্রতি নির্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়,—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নিচে গড়িয়ে বয়ে গেল।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক-অনুশাসন, সব কিছুকেই উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে, তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা, তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে, পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে থাকলে ন্যায়ের মর্যাদা থাকতো না। শুয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হতো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত, পুরুষদের

চেয়ে অনেকদিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এমনি সামান্য করে রাখে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্বজন্মে কোন রাজরানীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হতো।

হরেন্দ্র হাসিল, কহিল, কি করব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞেসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুণি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেনবাবু! আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, হবে একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন-ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হলে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই; অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ি রওনা করে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখচি তোমরা তা হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে ত মরল না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে!

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বলা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যিই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েন নি?

কৈ, মনে ত হয় না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ ত সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে। এই বলিয়া সে বইখানি পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত,—'একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম'।

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেছেন নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্তনের যে ছবি দিয়েছেন, তা স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক।

অজিত কহিল, থাক। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হলেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন,—বেশ ত অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়ো না শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে! গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অন্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা আছে, তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, এবং বড়ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে—সে বহুদিন পূর্বে।

সেদিন তাঁকে ভালবেসেছিল অনেকে; একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে, জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ও নি। তার পরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে,—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েচে, এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হলো, অভিযোগ-অনুযোগও

কম হলো না; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখে কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হতো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ-দ্বার ভেঙ্গে বাইরে আসতে চাইত, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, কিন্তু এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না, না, ইংরেজি নয় অজিত, ইংরেজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাংলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকীটুকু বলে যাও।

আমি পারব কেন?

পারবে, পারবে। যেমন করে বলে গেলে তেমনি করেই বল।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মত আমার ভাষার জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্তমনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন,—এই নিষ্ফল প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হ'লো না, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবে না, তাকেও দুঃখ দেবে না। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উলটো দিক থেকে। দুয়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত

করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে; আজ ঠিক সেইদিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শারীরধর্ম-বশে অবসিতপ্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ গতিরোধ করে থাকে, অভিযোগের কি আছে?

অথচ বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এ-সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী,—সেই কুৎসিতের জন্যেও যে নারীর অবিজ্ঞাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্ম্মম অপমানে আহত করতে পারে আজকের পূর্বে সে তার কি জানত?"

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তার পরে অজিত?

অজিত বলিতে লাগিল,—মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, কেবল ঐ মানুষটিই ত নয়, বহু লোকে বহুদিন ধরে তাকে ভালবেসেছে, প্রার্থনা করেছে,—সেদিন তার একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথার জন্যে তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটি ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিলতো না। তারাই আজ গেল কোথায়? কোথাও ত যায়নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে? তার হাসির রূপ বদলে? এই ত সেদিন—দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত, হয়ত শুধু গেছে তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক তাই। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জানলেন কি করে?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তার পরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের মস্ত বড় আরশির সুমুখে আলো জ্বেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোশাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন করে ধাক্কা না খেলে হয়তো এখনো চোখে পড়তো না যে, নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ,—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি,—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য যে এমন স্বল্পায়ু, এ বার্তা পৌঁছল তাঁর কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনিই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আরশির সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং আজ কি হতে বসেছে। কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না না, অজিতবাবু, ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়েস, তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলে না নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ও তো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে ত চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটি তিনি নিজে দিয়েছেন। বলেছেন—"আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা করে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্যের ভগ্নস্তূপ হয়ত আজও কোনো দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।"

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারী সুন্দর লাগলো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল; সেই মন্তব্যে খুশী হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছোয় না। রমণীর দেহ কি এমনিই তুচ্ছ জিনিস যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই?

নীলিমা কহিল, নেই এ কথা তো লেখিকা বলেন নি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটে না, এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া

কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্ দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন,—

কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেননা মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গেছে,—তাই ত সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এত দুরূহ। একে চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই ত তার মর্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে, গল্পের বাকীটা শুনি অজিত!

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ,—আপনার এই অনির্দিষ্ট ঢিলেঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সইবে না। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—রূপের বিচারে হারলে ত তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে আমি শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ, নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আমার বহুকাল পূর্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী,—আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়েসের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনেও উদয় হয়নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের সুকুমার শ্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী হতে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বৈ কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সমবয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-ঊনত্রিশের বেশী ছিল না।

তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন একনিমিষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধাসাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু পরিমাণও নড়ানো গেল না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলে না।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উলটো হলে বোধ করি অসম্ভব হতো না?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না? তেমন পুরুষ কি সেদেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি দুর্ভাগা বিশেষণটা বিশেষ করে সেই পুরুষদেরই স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি ত অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে না, এতবড় সত্য বস্তুটাও কোথা দিয়ে যে একনিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন,—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারে কবে ঘটে এর পূর্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শ্রান্তভাবে কহিল, আজ থাক। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্যদিন বলব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্তই থাক।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে,—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের এড়িয়ে চলতে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ, স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায়, টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছোয় নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যাঁরা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁদের পথের নির্দেশ কোন্ দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনিমাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশী শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। এ-সব আমিও জানি,

কিন্তু এর মাঝে নারীর অবিরুদ্ধ কল্যাণময় সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন, দিন দুই-তিন হ'লো মনোরমা চলে গেছেন, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ করে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর করে ডেকে কাছে বসালাম। আমার ব্যথার জায়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরনের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল, তখন আর তার হুঁশ রইলো না। তোমরা জানোই ত তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার 'পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার Passion।

মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও প্রবৃত্তি ত তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ওতো স্বভাব না—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কানাকড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার মর্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বললে, করতে দেখেচেন? একটা নাম করুন তো? সে এ-রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেন না কেন? মনে পড়েনি বুঝি?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না; কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,—তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যি তার মস্ত জবাব হতো, কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে-শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোল-আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ-বুলিই ত তারা সদর্পে আবৃত্তি করে ভাবে, এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা ত আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিত, দুপক্ষের দম্ভই ত সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য-জীবনের এতবড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বললে, উত্তর ত নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এই আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটু বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর

মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়,—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই, কিন্তু আর না, আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ কথা কি তিনি কখনো শেখান নি যে, নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা?

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন শৌখিন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা। তার বড় নয়!

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বললাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন? এবং জগতের যা-কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলচো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য কোন

স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে, এ চিত্তের অক্ষমতা, এবং অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থই সেদিন তুমি দেখতে পাওনি—

কমল বললে, আজও পাইনে আশুবাবু, সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও ত কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা,—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম,—শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর-এক ধরনের অসংযম, এ কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেন নি আশুবাবু?

ভেবে দেখিনি সত্যি। তাই, চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটাই খপ করে মনে পড়ল। বললাম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা ত মেটে না,—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেচেন,—ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশী জ্বলে উঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন? তার পরে?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ-রকম আছে নাকি? থাকবেই ত। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্মের সাধনায় ধর্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ

ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকী,— এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা আক্ষেপ করে যাননি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার স্পর্ধায় যেন হতবাক হয়ে গেলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হয় না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বললে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা-শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে,—আর না। এর আসল সত্তা ত বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললাম, তা হতে পারে, কিন্তু ও যে রিপু, ওকে ত মানুষের জয় করা চাই!

কমল বললে, কিন্তু, রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্তাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ, ঐ ধরনের যুক্তির জোরেই মানুষে অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়? শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হলো, ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,— কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই ত তার নেই,—

কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য হ'লো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না । শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু, দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি— আনন্দের সেই ছোট ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্তদাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলেনি, শুক্‌নো ঝরনার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরলো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তিই হলো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাবলেন এতবড় অপরাধ কমল মাপ করলে কি করে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হলো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু! বললাম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে—সেই ত সাতরাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত?

কমল চুপ করে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিত-কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই ত বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করেই কি সাঙ্গ করে দেবো?

বললাম, রাত্রি ত কেবল একটি মাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ করে সে ত আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আসুক না। তখনো ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করব।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম,—কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখলাম, না, তা নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র,—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখে পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তাই,—যা আজও এসে পৌঁছোয় নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকেও ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ কথাও ত মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না যে, এ ত কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেচে, একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচে। কতটুকুই বা বয়স, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক্ উপলব্ধি করে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। জীবনটা সত্যিই ত আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান ত সেজন্য আসেনি। আর-একজন কেউ আর-একজনের জীবনে বিফল হলো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলব কি করে?

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হলো, বৃষ্টিও কমেছে—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না, —উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোটখাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকী ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল,—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জন নিঃসঙ্গ গৃহের মধ্যে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপসা হইয়া গেল; অথচ পরমাশ্চর্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম।

চব্বিশ

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাঁধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এমনিই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুন্‌ডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে, অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে। অপরাহ্ণে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে-ও গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারোদিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নীলিমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে-ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠে না; খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙ্গাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হলো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তাকে নিজের কর্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না, ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হলো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে,—অথচ মেয়েদের কত কথাই ত ভাবতে হয়!

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই ত উচিত নীলিমা?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বেপরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে ত আমরাও পারি!

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে, আপনিও না। কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই এ কথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরি সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি,—কত যে জ্বলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে,—কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি।

মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা ত আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না,—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখলেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের

খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না,—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাত ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে দশ-বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইল না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হলো না যে, এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিত কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি করত?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রাঁধতো-বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ করতো; বস্তুতঃ একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজকর্ম করব না, শোক-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার ত কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ এই ধরনের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে ত জানে না, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার

মত সংসার তার ওপর দিয়ে বয়ে যেতো—ও টেরও পেতো না। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেচে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটা দিনও সে-সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারত না।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন,—তাই বটে, তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদেরই গাড়ি।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন-সংবাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল, এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছেন। কে জানতো আমাকে আপনারা এত ভালবাসেন,—তা হলে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতাম। এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেমনিই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েছে, আমি ঘাট মানচি। কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না, তখন সে সত্যই ভারী আশ্চর্য হইল এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতাম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারী হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী,—নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না,—তবে ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চারজনকে আহ্বান করেছেন। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধত। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতাম, না তুমি বলে ডাকতাম?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটা খটকা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক। সাত-আটদিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্যা করছিলাম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য তাহার মুখে নাই, তাই, অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্টি একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি ত সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্রসমাজের কেউ ত আমাকে চায় না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয়ত এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি করে চেয়ে থাকে ত এই নীলিমা। এতখানি ভালবাসা হয়ত তুমি কারও কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ ত, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই, আমিই ভার নিয়েছি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন? জ্ঞানতঃ, কোনদিন কোন অন্যায় করেন নি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেন

নি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল, আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে-মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন, এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন,—এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিলেন কেন? এর কোনটাই ত আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি ত তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙ্গালাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি দুটোই ত খুইয়েছি,—এর ওপর উপরি-লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবো না,—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই,—যে-কটা দিন

এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাইনে।

ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলব, না পাই মরব। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জনার মত আর ঘাটে ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ বলে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই ত আমার ভয়।

কমল কহিল, হলাম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমিই পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি করে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন আমি কি করতে পারি।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি করে? মেয়ে ত আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ, অস্বীকার করার জো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক খাইয়াছে। বলিলেন,

তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবদ্যির দুর্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে,—সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, সে পরিচয়টা কি সর্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি করে মানুষ করেছি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি, তাঁকে পর্যন্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি করে? কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয়, কমল, তার কর্তব্যও ত আছে? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেছি। তার সর্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো, এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশী দিন থাকবে না,—সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন, তা হলে?

তা হলে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যিই স্থির করেচেন?

হ্যাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব-প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না?

কৈ, প্রশ্ন ত কিছুই করেন নি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান, দুর্বলকে সে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার ত শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি! কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবু যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেছি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই ত? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারোনি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেছি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ করে তার দুঃখের বোঝা সহস্র-গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় করে বিসর্জন দেবেন,—ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না?

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁর মুখে আসিল না—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—ফেরবার পথ এখনি আছে

কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ করে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ, আমি কামনা করি, ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ হতে পেরেছে। ভুলকে ত ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকে পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকচে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারো না?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল। এবং, ইহা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধকণ্ঠ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে খাইয়ে-পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজে বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেন নি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি আজ দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাব কিসের জন্যে?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হলে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য নয়?

কমল কহিল, অন্ততঃ ভয় দেখিয়ে নয়—এইটুকুই বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় তোমার কল্যাণের পথ তিনি এদিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু, আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না,—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এই ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না। কিন্তু তখন তাকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষে করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন,এ-সব কথার মারপ্যাঁচ কমল, যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে,—ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করিনি আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই। মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি, ভুল ভেঙ্গে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না—এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু ত ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙ্গবেই, কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিয়ে? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'তো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের মস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে, নইলে, আমিই বা আজ বেঁচে থাকতাম কি করে?

বরঞ্চ, আপনি আশীর্বাদ করুন, ভুল যদি ভাঙ্গে তখন যেন সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত করে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশী বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্তব্য?

আমি মা হলে মেনেই নিতাম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতাম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতাম না। মনে মনে বলতাম, এ জীবনে যে রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলাম না কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ বাড়িতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ; এ মিথ্যে যেমন করে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারে সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা—অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির

করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই,—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন-জাতীয়।

ইহার ভাল-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্বিঘ্ন শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধচিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে; এমনি দুর্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ-বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার 'পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবে না,—হয়ত এ সবই সত্য, কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে-বস্তু বাকী থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড়, এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্বাপিত দীপ-শিখাকেও দীপ্তির পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে,—কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে; বেশ বুঝা গেল, এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে ত অপরের মন শান্তি মানে না। বস্তুতঃ, এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার, মুখে যাই কেন না বলুক, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা।

কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত; ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ, এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচে না।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো সে দেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেচি। অনেক ভালবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েচে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙ্গেচে তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙ্গার নজির সে দেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠচে, উঠবারই কথা,—এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না; বলিলেন, সে যাক, কিন্তু আমাদের এই দেশটার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি যে প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসচে

তার সৃষ্টিকর্তাদের দূরদর্শিতা! এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের পরে নেই, আছে বাপ-মা গুরুজনদের পরে। তাই বিচারবুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি ত মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি, আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তর্ক করে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্ত্যক্ত করছি; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান। কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই। এখন কহিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালাগুলোও খুলে দেওয়া চাই। এ ত চোখের দোষ নয়, দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাকলেও এ-ছাড়া কোন-কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি বসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই,—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থই বলচ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বলতে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশো বার বোঝাতে চাচ্চি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়, এ ভুল তার ভাঙ্গবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙ্গে তা নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙ্গে পড়ে। তাই, অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ ছিন্ন করার মামলা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বল, কমল, তাই বল। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেচি।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙ্গে না কমল?

কমল কহিল, ভাঙ্গবার কথাও নয় আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়,—চোখ চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারী মজবুত, সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?

কমল বলিল, যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিল না,

কিন্তু তার বেশী ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকুমাত্র দিয়েই বিদায় করেছে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করিতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে—বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়েও যা হাতে থাকে মাণিক্যের মত তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে,—বলে ঐ ত সর্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার হেতু আছে কমল। মণি-মাণিক্য সকলের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদমস্তক সোনা-রূপোর গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ একফোঁটা হীরে-মানিকের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক চাই, তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক জায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা বন্ধ থাক।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভবুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক, বেলার স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আমি জোর করে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই, স্বামীর

দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক করে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে-যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠত না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণ-ধী কমল একনিমিষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলোমেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা,—আরক্ত আভায় আকাশের যে-দিকটা আজ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব-পশ্চিম দিক্‌নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এভাবে অবজ্ঞা করো না। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে; মিথ্যে দিয়ে কখন এত লোককে ভোলানো যায় না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল, পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল, এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হলো না।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেন না। এই আমার শেষ অনুরোধ।কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বৈ কি কমল। কিন্তু সে ত মনিবের ফরমাস-মত কাটা-ছাঁটা মানান-করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্চি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজিতে emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি ত জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরি করেনি, করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আলগা করে যাঁরা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন,—তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যান্‌সিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিনে কেন, দেবার আসল মালিক যে আপনারা,—আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেনি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি, নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে ত সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

যে লোকটি তাহার পিতা, তাহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

পঁচিশ

শীতের সূর্য অস্ত গেল। সায়াহ্ন-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপসা হইয়াছে, একটা জরুরী সেলাইয়ের বাকীটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি-একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনিই একটা-কিছু যে শেষ পর্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পরে হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকুও নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব, অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল, আশ্চর্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই সাদাসিধে যে কোন সন্দেহই করনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে-না-পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারবেন না?

অজিত বলিল, হয়ত পারি,—কিন্তু তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা হলে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কিনা।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোমার কথাই সত্যি, তাকে অবিশ্বাস করনি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই!

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণে হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে জানো না?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা স্বভাব।

তা হলে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারে কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও-পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুকরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশী, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না, হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি করে সেইটে শুধু জানিনে। কিন্তু

একটু বসুন, আমি আলোটা জ্বেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং, তাদের হয়ে কৈফিয়ত দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না,—স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত করে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল, আমরা ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি দিন মাত্র দেখেচ, তবু আশা করি তাকে ভোলনি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা সাদা, আজ হয়েছে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণামাত্র, আর কিছু না। ও ৺কাশীধাম থেকে সদ্য-প্রত্যাগত,—ঘণ্টা-দুয়ের বেশী নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি আমি আসছি শুনে ও আবেগ সংবরণ

করতে পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্বাহ্ণেই সমুপস্থিত। যাক, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং, দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বসো; এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল, হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বসো হে সতীশ, জাত যাবে না। কাশী-ফেরত যত উঁচুতেই উঠে থাকো, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্যে নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না হরেনবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মহন্ত মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়েসেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাটো। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা, সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহান্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না-মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশী তত্ত্ব সঞ্চয় করে। ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না। এখন ভাবনা কেবল ঐ অর্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী-কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকে ও ফিরিয়ে এনেচে।

ইতিমধ্যে আচারনিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি; শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ি ভাড়াটা আমার আর লাগতো না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা! আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি-একটা নাম আছে—সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিক কালের আঁকা শুক্রাচার্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচ? দেখনি? তা হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবে না। দোতালায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ত হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙ্গে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কিনা সে তুমিই জানো; কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ, চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য-বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুলতেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করব না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার। তাতে কার কি ক্ষতি?

সতীশ বিনীতকণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না। কিন্তু তর্কের জন্যে নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটা কয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাশা করে বললেন আমি কাশী-ফেরত, যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই,—আশ্রম ভাঙ্গলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙ্গে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারত না। তার মত ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির মধ্যে দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এরই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠবাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া ত কখনো সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই ত নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি। কষ্ট ওখানে আছে,—থাকবেই ত। বহু শ্রম করে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই ত আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের ত কিছু নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না, কারণ, সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ ত অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, সংযম এ-সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম নয়; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ

ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদু-কণ্ঠ সতেজ ও উদ্দীপনায় কালো-মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেইদিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক, আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা, আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙ্গতে চাচ্চেন, কিন্তু ভাঙ্গাটাই কি বড়? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশী বড় নয়? আপনিই বলুন!

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমে শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্ষুব্ধ মুখের চেহারাটা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বললেই ত কৈফিয়ত হয় না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখান হয়। একে ত উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দায় নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্মে, কিন্তু তাকে ভাল হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্তব্য নির্দেশ করতে চায় তাকে ত ঠেকান যায় না সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে ত বর্বরের তুলনা হয় না হরেনদা!

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জান আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করাই যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেনদা। আপনি ত জানেন, আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে উপাদান যে সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম,—সেই আমাদের আপন জিনিস। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না-ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস, এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই-রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল; তাই নিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যে উপাদান হয়ে তারে নিশ্চিহ্ন করে সংসারে মুছে দিলে। এতটুকু দ্বিধা করলে না। সেই অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণে সত্য ছিল না?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা, এ-সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল; আর কিছু নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিক কালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্বাক স্তব্ধভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের ত জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হতো না যে ভাবের জন্যে, বিশেষত্বের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার সমাদর, মানুষের জন্যেই তার দাম? মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় ত হবে! তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন ত নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরে ছিল, ততদিনই তার হয়েচে বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে,—তার সমস্ত আবর্জনা ভেসে গেছে; আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তারও বিবর্তন

আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে—এও ত না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এও ত সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ ত ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল,—সে। এইখানেই ভারতের ভয়। এবং, সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হূন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী-ইংরেজ এসে পড়ল বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এমনি করে বলতে থাকলেই হবে সর্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙলায়—সে বেশীদিন নয়,বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে করে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট জন- কয়েক অসম্পূর্ণ

শিক্ষার বিজাতীয় স্পর্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপনা তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইল না। প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়ল। সেই বিষম দুর্দিনে মনস্বী যাঁরা স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁরা শুধু দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দু হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র-অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে খুব বেশী লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যেই সেটা হতে পারে নি। কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ, চুপ করিয়াই আছে। হয়ত, জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত,—কিন্তু হরেন্দ্রও যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িমা এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে, সে নীরবে থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক-ধরনের লোক আছে তারা ভূত মানে না, কিন্তু ভূতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি! এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারে না। এদেশে আশ্রমের জন্যে টাকার অভাব হবে না, ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না; অতএব, সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওঁকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি, সে খোঁজ তিনিও করেন নি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনে ছিল না । কামনা করি, ধর্মকে যেন আমরণ এমনি ভুলেই থাকতে পারি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন, এবং নমস্য বলে যাঁদের

নমস্কার করলেন, সর্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখনো শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হলে সেইটে আগে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে আমি ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানে হয় মানুষের ভুল। ওঁর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়ীতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এ কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দাম নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেচি। ও শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেচে। কিন্তু, দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘরছাড়া করে

এনেছে তাদের দিয়ে যে কি করব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও ত তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ অলৌকিক কিছু একটা করে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন করে তাদের বড় করে তোলে, তেমনি করেই এদের মানুষ করে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি কমল। মাস্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কিনা, সেই আমার ভয়।

কমল বলিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত করে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে, হয় ওরা দেবতা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত মনগড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত মলিন করে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েছে কি? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর,—সে আমায় সয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয়, তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনাদের নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞেসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল ত? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব সুখে আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে,—এমনি শাসন। নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার

জবাব খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা ত যুবক? এরাও ত সর্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই ত বেশী পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ-শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ করো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে ত বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এদেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহের রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে জেনেচ।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না । কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় করে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুটলো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে।পশ্চিম ত আর জগৎ-ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা করে কারও বাঁচবার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন,—কেমন! বলেছিলাম ত! দিন-কয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জানতাম। কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমলহাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেদিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নীচু করে পড়ে, তার ধূলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজের দুর্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিব-নিব হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা, চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেভায় তাকে বন্ধু বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার আর নেই, তবু বলতে পারি, যত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক, ভারতের কাজে সে-সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাসে প্রমোশন না-পাওয়া ছেলের এম.এ.পাস করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্যাদাবোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা বলেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু, এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং

কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি। বলিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীরমুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাঁহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনে এই কয়দিনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ, আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিল না,—ঘটিলও তাই।

ফটকের দরোয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি খানকয়েক চৌকি, সেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙান ছিল, আজ সেগুলা অন্তর্হিত। শুধু, ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখান লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জনা জমিয়াছে, সেগুলা পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশীমাত্রায় খুশী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—কমল যে! এসো মা, এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল, এ কি? আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন, বুড়ো? সে ত ভগবানের আশীর্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও ত ভাল দেখাচ্চে না!

না।

কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ কমল?

ভাল আছি। আমার ত কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ, তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না বলে ভগবান দু'হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ ত ডেপুটির আদালত নয় মা, যে, ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাই ত আজই সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেচে—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে,—ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোকে শুধু ভুল করেই ভাবে, মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দেশে শূন্যর দাম আছে। আমি ত দেখি কিচ্ছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটী হয়, শূন্যর সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই ত যাবার সময় হলো, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না, ভুলব না। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেকচে বলে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি সত্যিই পদার্থ,—মায়া নয়।

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটুখানি দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরনো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্মণ্য দেহটার দাম ত ভারী, এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবো না। কিন্তু কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন করেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এতবড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাদিদিকে দেখচি নে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন—কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোননি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে!

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যাবেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানি শেষ করে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ করে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম,—হয়ত এই আমার শেষ উইল,—এটর্নিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্যে এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল।

নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিল, ভাল-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল—চোখেমুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম,—চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বসলো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না! মনে হলো বুঝি

তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল,—আমার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই-তিন। এ অবস্থায় তারে কি যে বলব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, একবার চাইলেও না,—ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বললে সে একটা কথা, না বললাম আমি। তার পরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝতে পারেন নি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হতো এ শুধু ছলনা,—শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণদেহ, এই অক্ষম অবসন্নচিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়। এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে,শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকী দিন-কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা!

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। নিজের স্বামীকে এমনি করে সর্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ করে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা

কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না। ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই ত বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও ত কষ্টিপাথর, ওতে যাচাই করেই ভালবাসার মূল্য ধার্য হয়। আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়,—এ বাড়াবাড়ি।

কিন্তু আজ ভাবি, ভালবাসায় পারে না কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক। সেখানেই আসে আত্মমর্যাদা-বোধের টগ্-অফ্-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমিই ওর আদর্শ,—কিন্তু, চাঁদের আলো যেন সূর্যকিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধমাধুর্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দু'শো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালবাসার সে কবল একটিমাত্র দিক,—এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে-সকল দিক আঁধার করিয়া ছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙ্গাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের

বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে ত পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্বাদটুকু রেখে যাবো, দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালবাসা,—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেক পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু কখনো এ সংশয় আসেনি যে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্ম-বঞ্চনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষে এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে, সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকী দিনগুলোকে শূলের মত বিঁধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালবাসত! এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল-সংশোধনের দিন ত তার শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অন্ততঃ, অসম্ভব ত নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল কহিল, তা জানিনে। কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই স্মরণ করে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেন?

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না, কমল। আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলে না,—balance of yarning—তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল তাদের নিঃশেষে পান করে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত,—উপুড় হয়ে শুষে খাবার প্রয়োজনই হয় না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু, তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশকুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েছে। নীলিমাদিদির দেখা পাবো কিনা জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচ্ছো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে ত আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহে-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসি নে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা—এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই, তাই। চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারে না, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা-পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই চলে। নীলিমাদিদিকে সব মেয়েতে বুঝবে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায়, তারা ওকে বুঝবে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি করে বুঝেচি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জ্বালা নিবেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই ত তাজের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য,—নইলে, ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দুভাগ করে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা, তার পরে সেটা ফুরোয় বলেই সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি ত জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায় নি, মণি আপনি ভুলেছে। সূর্যাস্ত-বেলায় মেঘের

গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপনি বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না, মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাই ত ঘুরে ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্চে না। বরঞ্চ, যাবার সময় আপনার ওই আশীর্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা—তার বেশী নয়; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান, কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুনকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ি আনতে পাঠিয়েচি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি! কিন্তু বেলা ত নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট-পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়,—আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন। উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার

উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও। কিন্তু কাল বলো না যে আমাকে জানান নি কেন?—নীলিমা।”

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট-আত্মীয় বলে আমি দাবী করতে পারিনে, কিন্তু ওঁকে ত আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই ত থাকবেন?

হাঁ,—অন্ততঃ, এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ-বাড়িতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে, ও-বাড়িতেও দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বলিলেন না যে এতকাল এ সুযুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমসাহেবের জিনিসপত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ বাড়ি থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে,—বোধ হয় ওঁদের একটা reconciliation হলো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না; শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্মগরিমায় বাধলো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য হচ্চ কেন কমল? চরিত্র-দোষে যে স্বামী অপরাধী, তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির একই সুরে বাঁধা—এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমল তেমনি ভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্তা কিছুই হইল না। যাবার পূর্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়িতে পুরনো কেউ আর রইল না।

যদু?

হাঁ, আপনার পুরনো চাকর।

কিন্তু সে ত নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন-পাঁচেক হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে-সব ফেলে এয়োচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই,—এমনি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি দু’পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই, বসে বসে ভাবি।

ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজও সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, সহজে উপরে যাইবার জো নাই, রাশিকৃত বাক্স-তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল, পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে; উঁকি মারিয়া দেখিল, অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে স্টোভে জল চড়াইয়াছে, এবং চা-চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দিকে আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ না কি? জলটা ফুটে ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরি করে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি, এ-সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েচেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নীচেই পড়ে থাকবে? চুরি যাবে যে।

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—যায়নি ত? একটা চামড়ার বাক্সে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। এক জাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরে সাবালক হয় না। তাদের মাথার ওপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক, নীচে আসুন। ধরাধরি করে তোলবার চেষ্টা করা যাক।

সাতাশ

বাড়িয়ালা এইমাত্র পুরা মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা-ছাঁদা জিনিসগুলার ফর্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই,—যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশী নীরব।

সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রের নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়,—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা, কমল, নিশ্চয় এসো ভাই।—নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে নাকি?

যাবো বৈ কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে, কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনো চিঠির ’পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুকহাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিভাবে ও কোথায়, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিল না,—কমলকে

জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্যস্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখেদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙলো-বাড়ি তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়িটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাটীতেই দু'জনে কিছুকাল বাস করিবে। মালপত্র যাইবে লরিতে, এবং পরে শেষরাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি,—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রের ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি?

যাই না! আশ্রমের দোর ত তোমার খোলাই রইল, যবে খুশি দেখা করে যেতে পারবে। কিন্তু আমার ত সে আশা নেই,—শেষ দেখা দেখে আসি গে,—কি বল?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই দেখিতে পাইল, সেথায় নানা ছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ি কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রের বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলা, কোলাহলও কম হইতেছে না। মাঝখানে আশুবাবু, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জন-কয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন, এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন—তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী

মালিনী। কে-একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সংবর্ধনা করিল,—কমল যে? কখন এলে? অজিত কৈ?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল, যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন। কিন্তু দেশের ম্যালিরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিত না। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেন নি,—শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্মকে ত ফাঁকি দিলেন, কর্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না? এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্য-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে।পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই,—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বলিল,—কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রের কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল,—

এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হলো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন-শাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হলো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হলো। চিনতে তুমি পারচ ত অক্ষয়? কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে, এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই শহর থেকে, হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্চেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা-কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েছ বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র

আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে-ক’টি ছেলে বর্তমানে আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা-পথেই তাদের মানুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অনেকদিন অনেক কথাই বলেছ, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফলল বুঝি ওর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই ত। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। সকল ধর্মমতই ত মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা না-ই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ করেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার ত এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হলো না আশুবাবু, বরঞ্চ, হলো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন করে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না। কিন্তু তা ত নয়—আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা যেন হলো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল পরিহাস যে করে নাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশী নয়? সকল ধর্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্বকালে, সর্বদেশে ও-সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা।

মুঠোর মধ্যে ওকে ত পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে,—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া চলে। তাই ত জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ ত সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল। ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইল না।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারী অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাই ত তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে, আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি করে? মাঝখানে কুয়াশার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু ত পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতেই চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই ত। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে-শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারাজীবন মেনে মেনেই চলতাম—একটুও বিদ্রোহ করতাম না।

একটু থামিয়া কহিল, ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার-অনুষ্ঠানে। পুরনোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পূজো, ভেতরে গেল না শেকড়, শখের ফ্যাশন গেল দু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি করেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সায় পায় না, মনের মধ্যেটা রহিয়া রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুশকিল এই যে, তুমি ভগবান মানো না, মুক্তিতেও বিশ্বাস কর না। কিন্তু যারা তোমার ওই অজ্ঞেয় বস্তুর সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার-পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল আমি নিজের দুর্বলতাই অনুভব করেছি।

তা হলে ভাল করেন নি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট করে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠধারীর দল যে, বিগত দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙ্গার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি, কিন্তু ভাঙ্গা আশ্রমে বাকী রইলেন যাঁরা তাদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়,—ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল,—যত উজ্জ্বল হোক, তবু সে ছবি, তার বড় নয়। এমনি বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু, যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগকেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগকেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়াও যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখোমুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেচি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোশাক, মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বললেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বৈ কি হে! বল গে, রাতও ত হলো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুন আসা পর্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না। ওঁর ত কোথাও জায়গা ছিল না,—কিন্তু সতীশ রাগ করে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্তের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী,—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হলো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত-স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল,—হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকে সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পূজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট করে আত্মপূজোয় নেমে আসে। এ-ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ ত শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়,—এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখনি দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও ক্ষোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্যে দুশ্চিন্তা রাখবেন না, হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষ কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ়ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানো না, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে,তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত-যোজনায় সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই ত যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দু-

চিত্ত নির্বাতদীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে,কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল।সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন,কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু,সত্যি নয়। শুধু ত হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই ত কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়,মৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেচে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-চিন্তাই হয় ত এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়,হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

আটাশ

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক-আধবার গেছেন,শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে নয়,'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমানও করে না। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি ত কখনো যেতে বলেন নি।

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না?

কি করে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্চি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলালো কি করে? বরঞ্চ, আরও ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হতো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ বুঝলেন কিনা জানিনে—না বোঝাও আশ্চর্যি নয়—কিন্তু আমি

অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা ত সেই দেড়-হাজার বছরের পুরনো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান,—কিছুই ত ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় ত কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, ওঁদেরও ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন-একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না,আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেছেন, একবার তাঁকে দেখবেন না?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখাপড়া শেখবারও সময় পায়নি, দরকারও হয়নি। রাঁধাবাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছে; আমাকেই ইহকাল-পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না, বলে,স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে, বুঝবে স্ত্রীর আয়ু শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি ত ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে। এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানিনে। হয়ত, একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা।আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল,বলিল, একটা অনুরোধ করব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন,—এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাববো। আচ্ছা, চললাম,—নমস্কার! এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল। এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয়! এবং মানুষের জানার বাহিরে এইভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্ন শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে! একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা!

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। এ তাহার স্বভাব,—বিশেষ কেহ কিছু মনে করে না। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেকবুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখে না। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল, ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিল না যে, উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষবেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে

কহিলেন, কিছু মনে করো না মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রের সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন। কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা, বেশভূষায় আপ্-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওঁদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওঁদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ ত করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবে না তা জানি। রাগ আমাদেরি হলো না, শুধু হাসি পেলে। কিন্তু তুমি বাসায় যাবে কি করে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবো?

বাঃ, নইলে যাবো কি করে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু, আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে, তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হ্যালো! বেটার লেট দ্যান নেভার! একি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলা সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে ত আর দেখা হতো না। আমরা আজ ভোর-রাত্রেই দু’জনে চলে যাচ্ছি।

আজই? এই ভোরে?

হ্যাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁহার গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হতো আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেচি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্বসমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে ত আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কৈ সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান ত মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। ঐ একই কথা, মা। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশী।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্বাদ নিষ্ফলে যাবে না।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে ত আসোনি, নীচে চল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হলো—যা ও কখোনো করে না।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, এতদিন আসল জিনিসটা পেলে, কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি চুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না, তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবো, জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এইরূপে সে দেখা দেয়, তাকে আর কিছুতে চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অবিনাশবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হয়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়িতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে।তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষে করো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি যে, ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু, শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবো না। আমার ক্ষোভের নিঃশ্বাসে তোমাদের বিদায়-ক্ষণটিকে মলিন করে দেব না। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চারজনের জন্যই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবদের দিন পর্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম, কাকাবাবু।

ধর্ম? তোমারও ধর্ম?

কমল কহিল, হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই ত মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলচে? তেমনি করেই ছাই করে আনচে? এ নিভবে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, কমল, মনির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্বলতা,—কি জানি সে কি, কিন্তু এ-মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা, আসি। বাসদেও, চল।

টেলিগ্রাফ-পিওন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরী তার। হরেন্দ্র গাড়ির আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার একটি ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ,—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহমূর্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দোজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্তনাদি-সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-রাত্রি সকলের চক্ষেই একমুহূর্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু’দিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা ত যেতো না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্তহাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ,—এই ভারতবর্ষটা। তবু বলি, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত করো না। বাসদেও, চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশী বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার

আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন। এবং, সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়িতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চলো...

শেষের পরিচয়

এক

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু 'আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলাবেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ কিনা যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে ক্রিম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প, তেপায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী-সংবদ্ধ সোনার চৌকা রিস্ট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়ে বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুক গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধ-ঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকি। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়িআলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতলা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হউক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোশাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়ালের ঘড়িটাও নেহাত কম মূল্যের নয়—এমন আরও কত কি শৌখিন ছোটখাটো টুকিটাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজসরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম

করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকি সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে, সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্বে চাকরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্‌ভবপর তাহাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলে না। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাস করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত।

তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কন্টিনেনটাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোন্‌খানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা

করিল, এ-সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি, নিউটনের সহিত আইনস্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে না। যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার ভারী অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে,আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন না। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কিনা যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে রাজী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে

চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে।তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশীতে প্রলুব্ধ হয় না। এক ধরনের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো নাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো!

না, সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো। হয়তো আর কখনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেডমাস্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই ইস্কুল।

হাই ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোটখাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাশা করেচে। এ তো একশো টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না,—পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে কে লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—দ্যুৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। দ্যুৎ! চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি-মিছে যাই হোক, রাতের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল,—অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড়দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি —

কথাটা শেষ হইল না—এ কি তার বন্ধক নাকি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া

দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো,—এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পনর মিনিট হয়ে গেছে। এবার তোমার ছুটি। নাও, পোশাক-টোশাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোলগাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রংটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁষিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে-দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাস করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার,কিন্তু পাস করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে, হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপছোপ আছে, কিন্তু পড়াশুনা করিনি। তার সময় পেলাম কৈ? পড়া-মুখস্থর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে, কাটলো বছর দু'ত্তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে-পরতে পাচ্চি।

দ্যাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নার দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি-পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনতে পারিনি মা।

না পারবারই ত কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙ্গা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেডমাস্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম. এ. পাস করেছো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়!

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্চেন?

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎমা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আবার আসবো বাবা,—এখন

উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানাজানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিল না। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরোয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

দুই

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখবো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনি গে—কি বলো?

রাজী।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন; সবাই বললে, বাবুদের মেজমেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পুজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি পইঠের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাছছিলেন, সরকার বললে, মেজমা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়।

শুনে তাঁর চোখ ছলছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বললুম, মাসী আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হলো না, সরকারমশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা-দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পূজো দুই-ই শেষ হলো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামিগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু ত তিনি গৃহিণীই নন, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমিজমা চাষবাসও ছিল, দু-একখানি ছোটোখাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্ধেকটা কাটত তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বই-খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হলো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই-সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপঢিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উলটে-পালটে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে-চুরতে কোথাও কিছু আর বাকি রহিল না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলি নি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরোয়ান—আর নানা রকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্বণ উপলক্ষে উপহারের ত পরিমাণ থাকতো না। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উলটে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হলো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এইমাত্র ত ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে, কর্তার মতো সরলচিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসী রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপাগলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে ঘরের বাইরে এসে

দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্তার খুড়তুতো ছোটভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন, রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হল বাড়িতে এসে বসেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে, মনে হল চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলাম না,—কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা আর হল না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। এ কি সত্য সত্যই এ-বাড়ির নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হয়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেন নি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছ এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপূত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা আর চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসীমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল। ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার ’পরে পিসিমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বললেন, ওই ত তার রোগ ছিল পিসীমা। আপদ-বালাই ত আর একটি জুটোয় নি—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসীমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো—সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে নাকি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না পিসীমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসীমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী ত যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুন যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কৈ এমন মতি-বুদ্ধি ত নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হল না।

তার বেশি আর বলতে চাও না?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাবছি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াও নি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসীমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে

নড়াতে পারেনি, এঁর চোখের একটা ইশারার ধাক্কা সামলানো গেল না, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হল। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসত পেলে অবলা সবলা নির্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি—বকশিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেচি—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেন নি, কাজেই অল্পস্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে; এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ ত আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাঙ্চি দিতে এসেচো। তাতে কার্যসিদ্ধি ত হবেই না বরঞ্চ উলটো ফল দাঁড়াবে।

তাইতো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশি খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফরসা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি ত বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নার প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্পস্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই, দুটোই। শুধু তাৎপর্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও ত শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুশকিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা লেপেমুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যর প্রভেদ ঠাউরে পাইনে!

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিও নে, জানিও নে। মেয়েদের

সম্বন্ধে আমাদের এই ত জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা করো না তারক, আমি হদিশ বাত্‌লে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই শহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলামেশাটা একটু কম করো—যা হারিয়েছো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়তো কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বই। তাঁর মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না,

ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে, তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ করো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক। কিন্তু তোমার কাছে যে আজ পর্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওঁর নাগাল পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতো সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।

তিন

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখের লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হলো,—নইলে হতো না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা, কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো। তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক করো না। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা

প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল,এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইল না।

রাজু, আসতে পারি বাবা?

উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল,কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সবদিক দিয়েই যাত্রা হলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করো না?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু আর হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না?

রাখাল কহিল, তা হয়েছে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি ত শুধু বাহুল্য নয়, মা,—হলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রংটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল; দেওয়ালের ঘড়ির দিকে একমুহূর্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই-একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গলময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না; কিন্তু এই যে রাখাল বর্ণনা

করিল না, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয়, সুমুখের দাঁত-দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী-মাখনের সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব;কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরে না। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্যাদায় এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক ভাঙ্গিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই করেছেন।

কর্তা তবে কি করেন?

যা চিরদিন করতেন—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পান না। ঠাকুরঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয়-আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি রাজুবাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাকেই খুঁজচি। এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ-হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘরটি তো!

হঠাৎ শেল্‌ফের ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনস্টেবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠে না? হয়েচে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বসো, বসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখাপড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা শহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় ত সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে ত আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কিনা।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; লোভটা যে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন নি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কৈ না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হতো।

বজ্রবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো এ-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা অতিশয় ভারী করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ হয়—ওটা মিথ্যে নয়।সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে

ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

বলাই, কলাই খেয়ো না—

জানালা ভেঙ্গে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দিকি, ছেলেবেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামের আছে বৈ কি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশি হয়ে উঠবে—তা হলো উলটো।

নতুন-মা হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো।— রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে-জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি?

হয়তো বিগত-দিনের কি- একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না।নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল।অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠেকান যায় না, এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছিল্য, কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবু তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামিগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসের মুক্তস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা,অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বৈ কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবছেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন।

নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনির্মুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ! বলতে হবে, যা করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্মচারী—

ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—সেই—তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল তো নতুন—বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এবং হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি ত কখনো কিছু করো না,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্বাদ করো, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে

তৈরি করিয়ে এনেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে কারণেই হোক, সে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-আসলে সেটা হাজার-পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্‌নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক থাক, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ, নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলো না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড়ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না! এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিও! তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বৈ কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বে না।

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা শহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্নমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল, বলিল, এ হলো সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতো না—ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও-লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ি। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পায় না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শিগগির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শিগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে, রাগ করে বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু

বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্তা, দেখো তো তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বলো না। বলবে না বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবে না বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েচে—তাই এসেচি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আট দিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা, বৌটা হয়তো বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা-দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

চার

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তের বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাঁহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্য দিনে ত হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ, তাই বটে! কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে! তা ছাড়া, শুন্‌লে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না।

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো ত জীবনের স্ত্রী, কি সর্বনাশ —

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু! আমাদের রাখাল! বেশ, চিনতে পারবো না? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা! পুলিশে এবার বাড়িসুদ্ধ সবাইকে

হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নি কেন?

হাসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে ত জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই ত হবে না। একটা পরামর্শ করা ত দরকার? পুলিশের ব্যাপার কিনা।

নতুন-মা বলিলেন, তাহলে চলো; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাশা করলেই ত হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা, দেখি গে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসো গে সেজোবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা পারি করি গে, কেবল এইটি করো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র কেরানী, ভাড়ার

হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া আছেন।

শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নূতন, এ বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশি নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলেমেয়ের ভার ছিল তাহার ’পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সে-ই করিত। গৃহিণীদের ‘হাত-জোড়া’ থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের বৌকে—কারণ, সে ছিল ‘ঝাড়া-হাত-পা’র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুঁড়েমি ভাল নয়,—বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। সে যাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল শুধু আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে,—এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জলচৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তপোশের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাও নি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো তো মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশি ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানি খেয়েচে,—আর খেয়েচে বোধ হয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ী দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর, আত্মহত্যার মতো পাপ নেই তা কি কখনো শোনেন নি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে, তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্ধ-সচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখ পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক

দেখিয়াছে। নানা বয়েসের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খেংরা-কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বালা, চুল-ওঠা—পাস-করা, ফেল-করা—গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত।

আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পনা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এককোণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর একপ্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের ’পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ সুষমায়, না অন্তরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সঙ্কল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখসাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখের জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বার বার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মম্ভরিতায় তাহার উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য হারাইয়াছে, তথাপি যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে শক্তি আর নাই—সে শক্তি নিঃশেষিত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল, হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের 'পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ

অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ি চলুন।

মেয়েটি শান্ত কালো চোখদুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না। অথচ মুশকিল এই যে, কিছু-একটা বলে ডাকাও ত চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই ত। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না?

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ। তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেবতা। আমিও আপনাকে দেব্‌তা বলে ডাকবো।

ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানাকড়ির নেই সারদা!

নেই থাক। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল আনায় আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে, করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরনটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল।

সারদা পল্লীগ্রামের কোন্ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো। এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি-ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চার মাসের বাকী পড়ে আছে, আমরা তাও ত দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেন নি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ি, নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুশকিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, শ্বশুরবাড়িতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না,—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার ত ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে ত?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় ত কিছু বলিনি!

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই সংযম রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না।আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক

সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেব্‌তা।

না পারো দিও না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন,—অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবে না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়িতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছো?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কত?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ' টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলচি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখাপড়া জানো না?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশি হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে, বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপে যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই, এবার গাড়ি ডেকে আনি গে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ আনুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয়, এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে।

একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউ না। দরোয়ানজীকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু, তিনি ত রোজ আসেন না। এলেও রাত্রি নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ি-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই, তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল,—যে-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

আশ্চর্য!

না, আশ্চর্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল, নেই? কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকি নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয়ও নয়, অবাক হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হউক, তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল, এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই ত? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের লেখা? আনবো কালি-কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন দেব্‌তা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে; ইহারও উত্তরে বলিল, শহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে।

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হোল।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোনকিছু ভাবতে হয় না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো তো? ঘরে জিনিসপত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে ত রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেচে।

আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙ্গে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন—

কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরি করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণ করিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে।

তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙ্গা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেন—হয়তো ইহাই সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমনধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা, আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই শহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপনজন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশি নয়। ছেলে-টেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণলিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিনে না হউক, দু'দিন পরেও এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো

হয়তো চাকরির নিষ্ফল উমেদারির দিনগুলা মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই-সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, আলাপ-আলোচনা। পড়াশুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ!

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেব্‌তা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়তো সত্যই নাই! কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারী হাসি পাইল। নিজের মনেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পাঁচ

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাঁহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সেই যাই হউক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। ‘এখন স্থগিত’ থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল, দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের বহু স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে

ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতো না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো। আরও একটা কাজ হবে বাবা, আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল, ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ-সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ, যথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোশে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেব্‌তা, এতে কি আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশি হইয়া বার বার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখাপড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো, তুমিই কত লোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক

বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্চি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিচ্ছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেব্‌তা—সে-ই এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক, তা হোক—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা-গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁশিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবে না। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার একঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজি করানো কঠিন হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি লইয়া বর্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতেই পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকি, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে শৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্বে সে-সকল ঠিক করিয়া

ফেলা চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক ত নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেকদিনের শখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন না। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিবগৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোটখাটো ভুলচুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে—তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুশকিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন-দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক’টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার ত আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই ত নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি, ঐ নিরীহ শান্ত মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেচেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে ত এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে, মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন; কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল-প্রকৃতির উনি ত চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে

একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি, শুনেছো নতুন-বৌ।

হাঁ, শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হলো?

সে তো হবেই নতুন-বৌ।

তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই, কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বইতে হলো। সেদিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে, সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সবকিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙ্গিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাতদিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারী খাটতে হয়েচে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বৈ কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্তা! টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় ত যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বৌ, এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরবে হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন, কোন জবাবই দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু; নিজে করবে না?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশী নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞাসা করো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন; তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিলমোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন

ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ি হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কিনা—

তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা করো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ ত তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরোয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ-সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না, যা কপালে লেখা ছিল

ঘটেছে—গোবিন্দ মীমাংসাও তার একরকম করে দিয়েচেন,—আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস করো না নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলচি।

সবিতা তেমনিই আধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল, সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল, আর দেরি কতো? চলুন না ভারী বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদবালাই।

রাখাল হাতজোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়ে দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বার পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বরকর্তার কর্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিব-গৃহিণী তাহার কার্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ-যাবৎ লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর শখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয়। তার পর মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাস-করা আই-সি-এস-দের উল্লেখ সে ডাক-নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ডম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূরপ্রবাসের সামান্য চাকরিজীবী বাঙালীরা অবাক হইয়া যায়; কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে, এই কলিকাতা শহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাঙ্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে।

বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়—হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র,—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে-সমাজ ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে

এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হয়তো আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, বল দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের মুখে-শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই! এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,— অকূল সমুদ্র-মাঝে সে যেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও যেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক-কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে—রাত্তিরে আমাদের সক্কলের নেমন্তন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছে! নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চিৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীবাবু হাঁফ ছাঁড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছেন। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেই ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল; রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিতমুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি! পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেছে কলিকাতায়—বি.সি. ঘোষ নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটি টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব উকিল-এটর্নী মায় দু-তিনজন ব্যারিস্টার পর্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন্ এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল।

ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার-দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজী আছি, কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করো না রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না, যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না; বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হালকা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানালাগুলো সব বন্ধ—একটা নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রি করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতের নম্বরের বাড়ি।

সতের নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না!

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

ওষুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখ্‌চে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। কবে এখানে আসা হলো?

দাসী বলিল, চার দিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙ্গা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই দ্যাখো রাজু, ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে, না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পূজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। রেণু কৈ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,

কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দু'দিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বসো। মুখ-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া হয়েছে ত?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু— চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাচা-কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শিগগির উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল; ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ,—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধা-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা,

ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করে করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে ত?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললে? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ত আসেন নি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছামিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে ত?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিস্ পেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ কথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কূল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা

করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্মবুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার ’পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসায় তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে? সে জানে, যে-বাটিতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেমনি নিষ্ফল। অনেক ‘বড়লোক’ গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিয়াই স্তিমিত হইয়া আসিল—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে ত চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই—তাহাকে পাইতেই হবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল শৌখিন লোক, বেশভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না, যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খানকয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দীপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—

রাখালকে দেখিয়া একমুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা?

এ-কয়দিনে যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে, এ যেন সে নয়, অভিনব ও বহুমূল্য বেশভূষার পারিপাট্যে তাঁহার বয়সটাকে যেন দশ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, রাখাল কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাত্তির করে এলে রাজু?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল মা। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি ত কিছুই হয়নি।

না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল, তখন নিজেও জানতাম না নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলাম না।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট–পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিয়ে বসো গে।

রাখাল কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইতে পারে না, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়, শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধ হয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন, টাকা? টাকা ত নেই রাজু—যা ছিল ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে, ও-বেলাই ত শুনে গেলে?

কিছুই নেই মা?

না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর ত নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে, এনে দেবো?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে? আচ্ছা, দাও।

সারদা বলিল, মিনুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয়।

তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা?

কেন পারব না—তিনি ত বুড়োমানুষ। কিন্তু আমার তো জিনিস কিছু নেই—

তবু চলো না দেখি গে।

আসুন।

তাহাদের যাইবার সময় সবিতা বলিলেন, তা বলে না খেয়ে নীচে থেকেই যেন চলে যেও না রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় খাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নীচে নামিয়া গেল। সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেছে, সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকি কাজ সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাও ত মা, খাই।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্তিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল?

এত কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিঁধিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে ত নয়।

রাগ করে বৈ কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে আবার টাকা দিতে পারিনি—তুমি বুঝি দশ টাকা তারে দিলে?

না মা, আমার কাছে নিলেন না, মিনুর দিদিমার কাছ থেকে এক শ’ টাকা এনে দিলুম।

এমনি? শুধু-হাতে সে দিল যে বড়ো?

সারদা বলিল, না, এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা আমাকে খুলে দিয়ে বললেন, এর দাম তিন শ’ টাকা, তিনি যা দেন নিয়ে এসো। ওঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে, তাই বিক্রি করে এই মাসেই শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হলো কিসে?

সারদা কহিল, কে-একটি মেয়ে বড় পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্যে।

মেয়েটি কে যে তার জন্যে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয়?

সে ত জানিনে মা! কিন্তু, বোধ হয় তার খুব শক্ত অসুখই হয়েছে। টাকার অভাবে পাছে মারা যায়, এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিল বললে? এ ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ করেচে আমি জানি। তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয় না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে ত মনে হয় না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো— বললেন, এঁদেরও বিত্ত-বিভব অনেক ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্যে বাড়ি-ঘর পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হলো, অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত

মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—বুড়ো বাপ আপনি বসেছে রাঁধতে-কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেছে—রাখালবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজী হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল; জিজ্ঞাসা করলেন; রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই ত বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরনে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন, কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মুহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আর আপত্তিও করিল না,—নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। চোখ পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বান্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো ত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়তো নেবে না—তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহিরে হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়িল না, গৃহে

ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ি মা? এই বাড়িই বিক্রি হয়ে গেছে?

হাঁ।

এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই; এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয়—এ কথা না জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয় বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্যে কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের ‘পরে পড়িল; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা?

কেন মা?

বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের ‘পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বার-কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ি ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন নেয়ে এলে? মাথা ঘুরছিল বোধ করি?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা, সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে।

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

তাই এনো সারদা, আমি একটু শুই গে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেললে! বাড়িতে কোন একটা কাজ হলে তোমারও কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও, ছলা-কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো—বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনিই কিছু একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিল, ক্লান্তস্বরে বলিল, দেখা কিসের জন্যে?

কিসের জন্যে! কেন, তারা কি ভিখিরী যে খেতে পায় না? বাড়িতে নেমন্তন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে!

সবিতা কহিল, নেমন্তন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি? প্রথা নয় জানি—স্ত্রী হলে আলাপ-পরিচয় করতে কেউ চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল। সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায়, এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশি, তাই নম্রভাবেই কহিল, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না।

কিন্তু ফল হইল উলটা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠিলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটিপতি লোক তা জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো? আমি বলছি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিল, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইল, বলিল, আমার ফটো আপনি দেখেছেন নাকি?

দেখেচি বৈ কি! আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো। চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েক সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি আছে, তার উপর তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হলো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয় ত উদ্যোগ সআয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না, শুনি? লেখা-পড়া কাল-পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরোয়ান-চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিল, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিনা বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু, যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তাহা সত্য নয়।

সাত

সারদা বলিল, মা খাবেন না কিছু?

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো?

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্চে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোনরকমে মান-রক্ষেটা হলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহঙ্কার নেই, তোমার জন্যে ত ভারী ভাবনা, একশো-বার অনুরোধ করে গেলো, কাল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু—ওদের ত আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টারই বলো আর শেয়ারহোল্ডারই বলো, যা করে ঐ মিস্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক! কোটি টাকা! জারমানি, হল্যান্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চার বার এমন য়ুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ্ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই গেল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইল না,—বাধা পড়িল। সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে,—বাড়ি গেলে না?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আনন্দবর্ধন করিল না এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার 'মস্ত লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি? নাঃ—আজ আর যাবো না।

কেন?

নাঃ—আজ আর—

সবিতা একমুহূর্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে— তুমি মদ খেয়েচো?

মদ? আমি? (ইশারায়) মাত্র একটি ফোঁটা—বুঝলে না—

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম?

মদ আনতে কে বললে?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু-দশজন ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই—

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অবাক করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী জানতে বাকি নেই আমার। জানি সব।

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বৈ কি। আচ্ছা, যাও এখন। রাত হয়েছে, ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরনটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবুকে

বিঁধিতেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—আজ তোমার হয়েছে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারী গরম। এতটা ভাল নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনিই শুইয়া রহিল, একটা কথারও জবাব দিল না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নও—তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষমানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিল, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি। তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি তুমি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচেন মা আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিল না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিল, সত্যি কিনা তুমি নিজে জানো না? সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েছে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিল, শুধু আজই ত বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত রূঢ় এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না সারদা, আর আমি ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত।

সবিতা মৌন হইয়া রহিল।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরোয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই ত বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল ত?

না, তা বলেন নি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে ত?

করেছিলুম বৈ কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি ত মা?

না মা, কোন আপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সরিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশী ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর-সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

বেলা দশটা বাজে, সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—রাজু আসেনি সারদা?

না মা।

তুমি হয়ত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার ত হয়নি?

হওয়া ত উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাই নি। তখনি রাজী হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন? সকালেই ত আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাবু বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন, একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁশ হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সবুজ রঙের অনুজ্জ্বল আলোকে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিল, আমি ভাল আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না, নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকেও হয়ত যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছু করেন না?

সবিতা বলিল, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরেই চলে গেছেন!

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশী রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারী অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের 'পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন, বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনার চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নামাইয়া বলিল, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা ত শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্‌ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশি অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেন নি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিল, নিজের চোখকে অতো নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারী ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়,—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না,—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রইলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র তৃষ্ণার্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারই সম্মুখে মর্যাদাহানির অভিনয় করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জিত-রুচি অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়—উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হয়ত অপমানের পরিবর্তে

একটা কথাও বলিবে না, হয়ত শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমার?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগেরও উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশী খারাপ। হয়ত আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে কিন্তু একটা কথা আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে, এই দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্চে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পাবো না—মুখ বুজে চলে যাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিল না, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু।

তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাহার রোগশয্যায়। তাহার নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল—শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনুশোচনায়। কিছুতেই আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, কহিল, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দু’দিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দরোয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিকের মা বাহিরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

তুমি কে মা?

আমি ফটিকের মা। এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি?

না মা, এখনো আসেনি। শুনচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি?

তাঁকে চেনেন? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

কে দেখছে?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা?

আমি এঁদের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্চি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গে।

দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেব, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজী, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দার যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসত নাই, কহিলেন, তেল আনলে? জলটা ফুটে উঠেচে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ! কখন এলে? বসো। না না, মাটিতে না—মাটিতে না, বড় ধুলো। আমি আসন দিচ্চি, বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে?

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য নয়, অন্ততঃ সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি!

সবিতা কহিল, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি, তোমার জেরায় পাস করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি, একটায় তরিতরকারি অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরি ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া

পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুরঘরে যান, উদ্যোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকি রান্নাটুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

আর?

আর? আর ভাতটা হবে বৈ ত নয় রাজু।

এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু? জল কৈ, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুই ত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে, এত বেলা পর্যন্ত আপনারা করছিলেন কি? ফটিকের মা গেল কোথায়?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কিনা—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাসা করিল, এত ঘোল কিনলে কে?

ব্রজবাবু বলিলেন, ঘোল নয়, ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খায়নি। সংসারের ভার তাহার ‘পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি, পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজে রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল,

আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ত তাঁহার মুখে আসিল না; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুরঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরঘরের কোন কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই,—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন, সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ কিন্তু পূজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা, দেরি করলে চলবে না।

কেন?

কেনর উত্তর সবিতা দিল না; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেন নি!

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিল; ব্রজবাবু বলিলেন, এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ? আশ্চর্য!

সবিতা কহিল, আশ্চর্যই ত! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্চি। নইলে গোবিন্দর দোরগোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পূজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জ্বালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা?

না বাবু, কর্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

তা হলে উপায় কি হবে? রেণু খাবে কি?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বেহিসেবী নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ ত, বেশ ত, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিল, না। বাইরে বাইরের লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা, নতুন-বৌ?

সবিতা কহিল, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই, তুমি কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিল, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথামুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিল, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা, সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ! জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে ত আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিল, পারেই ত। তুমি কি করবে বলো না?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায়?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও—তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশী শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আমি কিছুতে যাবো না, মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল! পাগল!

পাগল কিসে? জোর করছি বলে? তোমার ওপর করবো না ত সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না?

কি করে পারবে? তোমার ত আর টাকাকড়ি নেই—গরীব হয়েছো—মামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ তিন দিন হইল সে সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ্য শূন্য-পথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছে, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পায় নাই। তাহার অসংহত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির 'পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যই ত ভাবনা নতুন-বৌ। আচ্ছা, দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। দু' চোখ জলে ভাসিতেছে, কহিল, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্যে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

আট

ঠাকুরঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাহার নিজের, সে না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্তব্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাহার নানা ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজকর্ম কি জানে না? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিত না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাহার মন- কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিত, গোবিন্দ, অযত্ন হচ্চে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙ্গা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জলরেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ

স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ওই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও সে ভুলে নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাহার নাই, দূরে, বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়িতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারী খুশী, বললেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়, কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সকলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু, চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা, আগেকার দিনে রাজা-রানীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বৌমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না মা, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলুম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক'দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না; কেবল ফটিকের মা নূতন লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে এ-বাটীর উপর হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়াশব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খনখন ঝনঝন আওয়াজ আসিতেছে, বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আজ বেলাবেলি মাজিয়া লইতেছে। সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল,—ওগো, জেগে আছ?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল, কৈ আমার জবাব দিলে না।

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবার সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য হচ্চো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সেদিনও ত রাখালের ঘরে অনেকদিনের মুলতুবি সমস্যার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেছো তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন, আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, দু-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থলিটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের 'পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো ত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুন-বৌ, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতে হয়তো বছরখানেক দেরি ঘটতো।

তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রি করে পাঁচ শ’ টাকা পেয়েচি, তাতেই চলচে।

কোন্ আংটিটা? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রি করেছো?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, যে দুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, যায় নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটলডাঙায় দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে,—কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্তা?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রকিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্যকর তাহার জোর করার দাবী, তাহার ভিত্তিহীন শূন্যগর্ভ আস্ফালন। আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়,

মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম, আছে নীতি, আছে সমাজ-বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান।

কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া? আর কথা কহিল না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্তা, আমি যাই এখন?

এসো।

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো?

আসবো বৈ কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তের বৎসর পূর্বেকার জীবন যা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্মগোপন করিয়াই তাহার এতকাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যায় নাই—কত পর্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ

সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙ্গিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকি থাকিবে না। তখন সেও হয়তো এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার ’পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকি কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

হিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকি দিন-কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুশকিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজী করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলে না, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি ত বুড়ো হয়েছি মা, ক’টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু তখন তোর কি হবে বল দিকি? ও বললে, বাবা, তুমি ত আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ-সম্পদ যার ভোজবাজীর মতো বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার

দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না।

বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানে ওর ভাগ্যে এ-সব ঘটবেই। ওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবেচিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাবি নতুন-বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে, রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল, মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছুই করতে পাবো না?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাঁহার কতদিকে কতভাবে তাঁহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে? পাংশু-মুখে চাহিয়া উত্তরের জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছো!

সবিতা মনে মনে বলিল, ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দর শেষের ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা-দিন ফুরিয়ে এলো, তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাঁহার সকালের কথাগুলা মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল, তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না যাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল, এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে, ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে—তাঁহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, রেণু জানে মা তাহার বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা তাহার যতবার মনে পড়িল, ততবারই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়,—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি তাহার মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও

রোগ-তপ্ত তাহার আপন মুখই যেন তাহার মানসপটে বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্তিই যে তাহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পাণ্ডুর, রুগ্ন মুখখানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না,—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পরে দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আসে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহার কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল, যখন গাড়ী আসিয়া তাহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করেছেন।

কখন এলেন তিনি?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিল, কহিল, তুমি নিজের কাজ করো গে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিল। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিল, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ?

সবিতা কহিল, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন? আগেই ত ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে?

সবিতা কহিল, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হলো না?

বিমলবাবু বলিলেন, না হলো না। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিল, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুম। শুনতে পেলে?

শুনিতে সকলে পাইলেন; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলাল্লাপনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লাপনা তুমি কাকে বল?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে।

কাজ থাকলেও যাবো না?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ, নেই।

তাই ত এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?

অবিশ্বাস তাহার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারে না? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইঁহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায়। সেই নতুন-বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ? তোমার? বলতে একটু লজ্জা হলো না?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথাই

বলেচো। না, এ-বাড়ি আমার নয়, তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙ্গিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

হাঁ, আমি কালই চলে যাবো!

চলে যাবো বললেই যেতে দেবো তোমাকে?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা করো না সেজবাবু, আমাদের সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁশ হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না?

সবিতা কহিল, রাগের জন্য নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠকেচো। দাঁড়িপাল্লায় একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার আমাদের অবকাশ হবে না—আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু আমারও নমস্কার নিন—চললুম।

নয়

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকি রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। শহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবে না, ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের ভাড়া বাকি পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলাবলি করচে মা?

কি কথা সারদা?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

সত্যি কথা! সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে।

আমিও ভাবতে পারিনে মা, বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে, সে আর সইছে না, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারে না!

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা? এ-বাড়ি আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার ত কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে ত তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নতমুখে কহিল, না মা, তিনি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা,—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা যাওয়া চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই—আমি আপনার সেই দাসী মা।

কি করে জানলে সারদা আমি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড়ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়; সে হলে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না সে শুধু এইজন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন ঘর থেকে আসো নি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামীগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামিগৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবনযাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হউক, সে আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্যহাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা

অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা?

সত্যি-সত্যিই আজ চলে যাবেন না ত?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক? লেখাপড়া হয়নি? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন, এখন রাগের উপর যদি তিনি অস্বীকার করেন?

সবিতা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতো না, কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেন না—এমনি কি করে সম্ভব হয় মা!

বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড় নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো কোন গোলযোগ ঘটবে না মা?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগে ঘটায় সাধ্য কার?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সংবরণ করিল, তখন কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এইসকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী!

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব?

দরোয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজুবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশী সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছে না।

কেন হচ্ছে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচি নে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি করে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জ্বেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার-যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দু'দিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা-ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া

তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা ভারী জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই ত? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়তো জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকমে ভেবে দেখেচি, কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক-জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ-জন্মের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেচে বলো ত? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব

দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা-দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের 'পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা–রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

দশ

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগরজল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারেন না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধ হয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেন নি?

না, তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কৈ, রাখালবাবুকে ত দেকচি নে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচি নে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনও বলেন নি?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্‌ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোয়ার জল এনেচি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের জায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোয়-জলে লুটোপটি করে একাকার হয়েছে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আমার এ রকম শক্ত হোলো কেন মা? ছেলেবেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হউক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না, খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্বল, এখনো যে পথ্যিই করোনি।

রেণু বলিল, মা, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোকে খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ কথার উত্তর আসিল না। সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে ত রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে একান্ত দুর্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পূজো-আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদাদিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন

উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাইতেন না; অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতো না, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেন নি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের উপর। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে ত মা? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজো না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়িতে না খেয়ে থাকি; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ

খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়ম-পালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকু বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্ত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনার বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্য? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে, সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার? অধর্মের মার যে এত নির্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর?

কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না?

মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন; সবিতা বলিল, কিন্তু আর বেলা করতে পাবে না। ঠাকুর-পূজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি!

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে ত মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তামাক সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিল, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি ত?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হলো নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবু মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম, আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন?

কি জানো—

সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে,—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায় নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে নাকি? দুঃসময় কার বেশি তোমার চেয়ে? কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দকও দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় দিয়ে, তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন—কর্মচারী,—স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিল।

বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাববে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ডি দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু, তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হলো—এইখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও! আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমোট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা-কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়ের দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেচি

মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই ত?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল!

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবে না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমার বাড়ি চলো।

এগার

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি ত যাবেন না—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলো দেন।

কেন রাজু?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজী হয়েছেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন, ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা, আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়িভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই

না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙ্গে সেদিন সকালেও সে জানিত না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল ত! আবার সহিল তাহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানে না। যতই ভাবিয়াছে, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনিই জগৎ—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাশ মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করে না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে, নিষেধ করামাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়তো, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া

সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙ্গিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর-প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্তের মিনতি, নাই উন্মাদ ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পুবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালই ত আছি।

কিন্তু ভালো ত দেখাচ্চে না? যেন শুক্‌নো-শুক্‌নো।

কৈ না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্চেন না। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন—দু'দিনেই ভেঙ্গে পড়বে যে।

না ভাঙ্গবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙ্গে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েছে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি ত কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন,তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেন নি ত?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোন বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তাঁর স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কৈ, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল, কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয় ত?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন ত?

এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিল না, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন?

জানি বৈ কি।

আর কি তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না।

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেস্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল, সোজা দানপত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

কিন্তু দানপত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিল, সে আমি জানি বিমলবাবু! আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ইতিপূর্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে খুশী হইল, কিন্তু, কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটি আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ার তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন?

হাঁ, ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকী রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে, কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই, শুধু আপনি আর

আমি।আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে ত লাভ নেই।

লাভ নেই তা-ও জানেন?

হ্যাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সংবরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেছে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশী নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হইল না, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম,—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ কথা কি আপনার মনে আসে না?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশী পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে?

সে ত একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানাশুনো আছে নাকি?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো—না নতুন-বৌ, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্মিক লোক আমি নয়।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই, সমস্ত কৌতূহলের মূল কারণ সে নিজে। থামিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, ওখানে মিল না থাক, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, অন্ততঃ দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেছেন?

শুনেছি বৈ কি।

সমস্তই?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি করে বলুন তো?

ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেন নি বলেই ত এ কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই— বাকী যেটুকু আছে তাও দু'দিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেন নি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বৈ কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো—তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই ত বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকি নেই বিমলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে

আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাক এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

তাও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয়, এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিল না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আপিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাই নি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ, ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল,—এ বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলুম ভালোই হলো যে গেলো, একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো; কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিল না, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে, বোধ করি নিজেও জানিল না। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারী অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না কখ্খনো না! দেরি হয়ে গেছে আপনার—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চললুম।’

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিল না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

বার

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল।দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়,তৃণ-শস্পে,গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে, গগনে-পবনে সর্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত-পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাসবোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীদিন থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুলচুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুলচুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা ত কিছুই এগোয় নি দেখচি।

না। সময় পাইনে যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার—তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারী অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেব্‌তা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন ত?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় ত কি! হলো জ্বর, তাও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না? তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিচ্ছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। একছত্রও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত আমার ধার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রান করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা-দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশী হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলা তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, উপার্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারী লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল, নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া

প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইনস্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি করে?

সারদা হাসিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেন নি কেন?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব?

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলে না আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে—তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারী খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না,—হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ জন্মের ত দোষ দেখিনে, একি গতজন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেব্‌তা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারী ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হলো কি বলো ত?

সত্যি আজ আমার ভারী রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি—আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ ছাড়া আরো একটা

কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাশা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো,—সে কত যে সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার 'পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও; উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেইখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন? সবই মিথ্যে?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল, এ উল্লেখ অনধিকার-চর্চা, এ তাহার আপন অপমান। একি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল!

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ, তিনি আমার মা-ই ত। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাও না, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকি, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে ত ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবে না—ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না—আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে?

হাঁ, হয়েছে; বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

পরে কেন? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে রসে, মাধুর্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে-বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তার পরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ! সেই দু'চোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবো না দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উলটাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেছি তত আপনার রেণুও না। তার পরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরোয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়ে না মা, ত্রিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্ তাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই ত বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তার পরে স্মিতহাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রীকে যে কি করে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন! এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়িঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু'বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু, দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরি হইয়াছে। রাখাল বুঝিল, এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি?

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়েক ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময় মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? কৈ আমি ত জানিনে!

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দুটো দিনের ছুটি কিনা!

রাখাল আর কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বলিয়াছে, ইদানীং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

তের

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা?

খাবো বৈ কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপিচুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনি।

সত্যি পারো না, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি

ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতে নাই। রাখাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এমনই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে। কত জিনিস হয়তো ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি।

সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেব্‌তা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হোতো না, হয়তো করতুমও—নষ্টও হোতো।

ভাল বুদ্ধি তোমার!

ভালোই ত! নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় ত কম নয়! দেনা শোধ করে না, আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবে না, ভাবতেও হবে না। কেবল খাতাটা দাও, আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তা হলে ছাড়-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেন না, আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারী দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেব্‌তা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে, কেউ চিনতেই পারে না।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যই আমাকে তিনি চিনতে পারেন নি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিল না।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা, আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

বললে ভার নিতে?

নিতুম বৈ কি। ভেবেচেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে, মেয়েরা পারে না! পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এইজন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুম না ত,—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? সত্যি বলুন না?

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে। সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিল না বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরীব বলে। জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিচ্ছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেব্‌তা। গরীব বলে কি মানুষের বিয়ে হবে না? তার সে অধিকার নেই? জগতে তারা এমনি আসবে আর যাবে, কোথাও বাসা বাঁধবে না? কিন্তু সে ত নয়, আসলে আপনি ভারী ভীতু লোক—কিচ্ছু সাহস নেই।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

কিন্তু ভাগ্য তো চিরকালই অনিশ্চিত দেব্‌তা, সে ছোটবড় বিচার করে না, আপন নিয়মে আপনি চলে যায়।

তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই। নিজেকে ত বদলাতে পারবো না সারদা।

না-ই বা পারলেন? যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে,—নইলে কিসের স্ত্রী, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে, নইলে কিছুতে আমি ছাড়বো না। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিল না বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরীবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়।

কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরীবের সৃষ্টি করেন নি, এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সে না পারে—শিখতে না যদি চায়, তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ কথা সে বুঝবে না, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারে না দেব্‌তা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিল না যে মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায় না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, কৈ কিছুই ত বললেন না দেব্‌তা।

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে? ভাবতে সময় লাগে যে!

সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি?

সে কথা আজই বলবো কি করে সারদা? যেদিন নিজে পাবো, উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে, আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না ত! একটু পরে বলিল, পরশু বোধ হয় আমরা হরিণপুরে যাচ্ছি দেব্‌তা।

পরশু? তারকের ওখানে?

হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়িতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যাওয়া স্থির হোলো কি করে?

কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

তারক এসেছিল কলকাতায়? কৈ, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি!

একদিন বৈ তো ছুটি নয়—দুপুরবেলায় এলেন, আবার সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর।বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারী বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেব্‌তা।

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেন নি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গার ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েচে সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই শহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন?

শুনে মা খুশিই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে?

সারদা বলিল, শক্ত নয় ত দেব্‌তা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলচি

মিনিট-কয়েক পরে হাতমুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

চলে গেছেন? কৈ না! কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছে থেকে জীবনবাবুও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙ্গে গড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি, সব শূন্য! নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া দেবার। জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেছে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে, বললেন, চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটিপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ-দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু বললেন, অনধিকার-প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেচি আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেব্‌তা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে

যেখানে যত ছিল নোংরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েচে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেব্‌তা?

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি! রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙ্গেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ জবাব রমণীবাবু আশা করেন নি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি-যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়!

সারদা বলিল, হয়তো তিনি আর পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হতো ঢের বেশী।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে—যাবো না?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার শর্তও ত ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না, সে শর্ত আর আমি মানবো না। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো ঘুচবে না,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি দেব্‌তা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেব্‌তা বলে ডাকি, দেব্‌তা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না? তার মানে?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবো না সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

চোদ্দ

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে-কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

ভাঙ্গবে না তারক, ভাঙ্গবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙ্গে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো, আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলাফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলার কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলা কাচাইয়া

রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটা-কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙ্গা পাত্রগুলা কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা ত কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মিলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিল, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয়,—না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিল।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবে না বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-

দিন পর্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, তোমার যৌবন গেছে, রূপ ত আর নেই! তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না,—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য মানুষ তুমি। এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য নয় নতুন-বৌ! এই ত সেদিন এমন করে ঠকলে, অতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি!

সবিতা কহিল, আঘাত পেয়েচি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়তো এমনিই চিরদিন বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙ্গেচুরে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের ’পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশী বাধবে নতুন-বৌ!

কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিল, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারী পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে ত বললে না?

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি, তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু, আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন-বৌ,—তুমি ঠিক কথাই বলেচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না, সইতে তাকে হবেই।

সবিতা কহিল, কেবল সইতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশি।

এ কথা কি তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময়?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ। তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে-সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয়, তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ,—এমন বিপরীত ঘটনা কি করে সত্যি হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিল, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উলটো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো,—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো ত?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে।

পথের সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানেই পেয়েছিলাম।

তার মানে?

মানে এই যে, যে কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিল, আমি যাই কেন না করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েচি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্বলতা-বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিল। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে সে ভাবিয়া পাইল না। দয়াময়ের কাছে নিচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কৈ?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

রাজু? কৈ সে?

এইত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা-গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণপুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও আপনাদের সে ঢের বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের 'পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু! আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে ছেলের শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা যে যেন আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আপনি অনেকের অনেক কিছুই করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেছি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায় নি সে?

কোনদিন না। সারদা বলে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমিই নিজেই ত এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে

শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধূলা লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগচে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নীচে নামিয়া গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেব্‌তা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন! আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

পনর

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে-দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে দেব্‌তা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকি বাড়িভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো, আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশি সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারী মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেব্‌তা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনোয়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপরে খেয়ে শুতে হবে?

হাঁ।

তারপরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা রাত ছটফট করতে হবে,—না দেব্‌তা?

এ তোমাকে কে বললে?

কে বললে জানেন? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই,—সে-ই।

রাখাল বলিল, তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্‌ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

সময় নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেব্‌তা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই ত সবচেয়ে বড় কারণ দেব্‌তা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো 'পরেই খাটাই নে।

রাগ করে বলছেন না ত?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,—কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেব্‌তা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেব্‌তা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের 'পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে?

হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না?

জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। হয়তো আমারও সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেব্‌তা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে, সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অল্পশিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেচেন বিমলবাবু—ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক, এসেচেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকি নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল ত?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না দেব্‌তা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়েমানুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিসপত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এত নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য! কিসের জন্য এই-সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে, অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহুপ্রকারে জানাইতে বাকি রাখে নাই। পায়ের ‘পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ত্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায় হয়তো, তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে, সে

আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো কাঙালবৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে, বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে; কিন্তু যে অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরিভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বল ত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘরবাড়ি নেই, বাপ-মা, আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যেন দিলে; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি বলো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্ত-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না,—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ,—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটে পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্য দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা-দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকি নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার? মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ, ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারে মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা! তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক-রকম রাঁধতে লেগেছে। কত কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেছে নতুন-বৌ।

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি ত কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারী পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা?

না মা, বলিনি।

কেন বলোনি? মনে ছিল না বুঝি?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু; কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলার কথা ওঁর মনেই এলো না। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায়-অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশি দাঁড়াইতেছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলেন তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক্। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না, সে হয় না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড়ঘরের বড়রকমের খাওয়ায় আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্যে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও, দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশি বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচারবুদ্ধির তুলনা নেই। আর্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নয়। দুঃখবোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন, তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয় এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে! তুমি ত নিষ্ঠুর নও—কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, আর কিছু বলিল না। চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা?

কি চাও তুমি?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়তো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

[অসমাপ্ত]

শ্রীকান্ত

প্রথম পর্ব

এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এম্‌নি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ্'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট্ শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া

গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিনকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি—ইতিপূর্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই।

তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এই কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুকনা পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে? কোথাকার গাধা রে! বেশ নেশা হবে—চিবো! চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্‌।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্‌রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্‌রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান! এক টানে সিগ্‌রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাস খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল।

মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে না কি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এম্‌নি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্‌নি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এম্‌নি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার শখও তাহার আদৌ ছিল না।

এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙ্গি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনর দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-

বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপু! গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাকে লক্ষ বার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি

মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাক ঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি।

যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে

আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সন্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা’র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সন্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা ‘হুম্’ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চিৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সন্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা’র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে ‘আঁ-আঁ’ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া

ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চিৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! —আরে, এ যে ভট্চায্যিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং ‘উহ বয়ঠা’ বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রানী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। ‘লাও’ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এম্‌নি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চিৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা

জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।

পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি সত্যিই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড় নিশীথে এই বাড়ির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধার-তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জল ধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেমে যা, সাবধানে নাবিস্, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্‌ব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে বুকের ভিতরটা এমনি ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই! বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোনখানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?

আমি বলিলাম, নাঃ—

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়।

কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙ্গাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এম্‌নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার ঝুপঝাপ্‌ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙ্গিসুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস?

পারি।

তবে টান্‌।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক’রে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই, তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম, কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর।

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত ক্রোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাক্‌লেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনর হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহনার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙ্গাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র

ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি? কি হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—ঐ দ্যাখ!

তাই ত বটে! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার

চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে ব’সে বুনো শুয়ার তাড়াচ্চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা

নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, করেত্‌—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মর্‌তে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের

মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ?

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে ব’সে বুনো শুয়ার তাড়াচ্চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ‘ছপাৎ’ করিয়া শব্দ হইতেছে।

একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, করেত্‌—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মর্‌তে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ?

সমস্ত বিপদের বার্তা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল—মর্‌তে একদিন ত হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে-কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সন্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই!

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে কথা কহিল। বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন? ঐখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে! আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নির্জীব মনটা তখন বোধ করি এম্‌নি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুবসাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া

দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দুচক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জন। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত; আমি এখ্খুনি ফিরে আসব—তোর কিছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এমনিই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধকরি, শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল।

বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাঁদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু

আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র, মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে! প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়ে যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস্‌নে যেন, ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু—বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অম্‌নি সেও যেন মাথা নিচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এইদিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ, এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, একথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি! যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া

ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-একপ্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

হাঁ, তা মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব-মুহূর্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এম্‌নি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল। এতক্ষণ এই মাছচুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা ছেলেবেলায় টাকাকড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি; আর সব—অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে সব ঠিক চুরি নয়—এম্‌নিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই ‘টুং’ শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত ঝড়িয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকাকড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ, ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্‌নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ ব'সে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালোবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আস্‌ব, তোকে শুধু ডেকে আন্‌ব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখর উপর সদ্য মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনো ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না ?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রাম নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চ'লে যাস্‌, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ'লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করছে—তারা সব অন্তর্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না' বলিবার পথ ত এক প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীর শুভাগমন না হইতে পারে; কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মট্‌কাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান এবং মাংসচর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্‌তর্‌ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি তাঁহার কাছে বোধ করি 'রামনামে'র জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতিবশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কিছু পচেছে, ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা| যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চ'লে যায়,—আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে! এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিন দিন আস্‌তে পারিনি!

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল্—কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেম্‌নি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়াচড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ—শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চিৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়নশব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক্, নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই।

ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি!

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের বেশি কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা! তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই

উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা— এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, ওই বয়েসে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি।

কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়। তোমরা যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্যবৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও না। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, কোন দিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়।

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই শহরেই রেলগাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই দুইরাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলাত-ফেরত' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল গতরাত্রি এগারোটা পর্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া

বেড়াইয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়! তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাঁহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছেন তাঁহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, 'ঘাট' মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমগ্ন বনঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে; তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট–দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস।

চার

পা আর চলে না—এম্‌নি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এম্‌নি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা প্রায় আমার সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্ত চিৎকার শব্দে—এসেচে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানার পাপোশের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত 'পাশের পড়া' পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এত বড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াইতে পারি না! অথচ কর্মকর্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার 'পাশের পড়া'!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। সেই, যাহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম, এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগম্ভীর 'আঁ-আঁ' রবে ও সেজ

উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই ‘দি রয়েল বেঙ্গল’কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পালাইতে হইয়াছিল—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমুতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙ্গা—ছল্‌ছল্ করছে, বলি জ্বরটর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে বেশ গা গরম হয়েচে। এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমার রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় ক’রে তবে আমার আর কাজ। চল্ ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া। বলিয়া তিনি বার্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীরকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চিৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, সতে! পিসিমা অত্যন্ত রাশভারী লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে

জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণেই, তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন-তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জান্‌তে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্চে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে। কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্যন্ত করতে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি দম লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কাহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, যতে এক ঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে আমরা আর কেয়ার কর্

ব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোটদাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়!

মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয়বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুর রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাস খেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এম্‌নি সমস্ত অত্যাচার! অথচ 'না' বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন,

কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও, একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙ্গে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর—সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়েছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডানদিকে বোস্। ভাল আছিস ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল! চক্ষের পলকে সর্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা নয়, বোধ করি বা অসাধ্য। কারণ বলিতে

গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই-সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল! আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সেই বা কি করিয়া তাহা জানিবে?

যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম। কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত! আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলুম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন নিয়ে ডাক্‌লে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এম্‌নি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না। বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয় তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস

নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কখ্‌খনো অসুখ করে না। কখনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্‌ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম করিস্‌—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর্‌, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। বঁড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর একদিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোন মতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিস্‌নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে, কিন্তু, তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি-একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক' টাকা?

ক' টাকা? এই—ধর্, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুশি হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি একরকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্ষের নিমেষে আমার সে রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে, এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়েদেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্, আমি নিয়ে যাব; আবার তখ্‌খুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না।

কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে

পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়! যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শরঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই! সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন-সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ-সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ

লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছু দূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলা চিৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা দুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চিৎকারে মুরগিগুলাকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম।

ইন্দ্র খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলাগোছের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হল্‌দে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা

চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহ্‌জী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহ্‌জী সেই কাসির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহ্‌জী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দুজনের মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহ্‌জী হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙ্গলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চিৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায়! তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায় শ্রীকান্ত?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান! ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি? ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখ্‌রো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখ্‌রো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায়? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে? আমি বলিলাম, তা হলে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে। ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে! বুনো সাপ ধরে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে

দিদি! এসো না, এসো না; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলো শুক্নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি করে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো-সাপ।

উনি ঘুমোচ্চেন বুঝি? ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্চে। চেঁচিয়ে মরে গেলেও উঠ্‌বে না। তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা এসো, আমি ধ'রে দিচ্চি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্‌খুনি ধ'রে দিচ্চি দ্যাখ। বলিয়া বাঁশের মাচা

হইতে একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে! তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখদুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রর দিদি হঠাৎ বার-দুই এম্‌নি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রর সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে

কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্‌খনো করো না। এ-সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা কর্‌তে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বলত?

আমি কি তেম্‌নি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্‌ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কি একটা শুক্‌না শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেচি কি না! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না

ছুব্‌লে ছেড়ে দিত? শাহ্‌জীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে? এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্‌জীকে টেনে তুলে তক্ষুনি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধঘণ্টা? একঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধরে চাইচি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা বল আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ

নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে বলে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আসিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্ রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্চে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেবো। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, শাহ্‌জীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জী গাঁজা-টাজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসীমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন!

সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে

তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েচ দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জী দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিটখানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগ্‌গির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাইত জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কাম্‌ড়ে ধ'রে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এ-সব জান ত? আর যদি নাই জান্‌বে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দিলে কি করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ-সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে আমার বুকখানা হাল্কা ক'রে ফেলি। বল্ তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপসা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণরেখা গাছের ঘনবিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি।

আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্জীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন আমি এই অত্যল্প কালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?

দিদি বলিলেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জোচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্ছি—চল্‌রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—

ওঃ—ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্জীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া? বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখ্তে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহ্জী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই যে সাধুভাষায় বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙ্গলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বলল?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহ্জীর চোখ দুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্ না। রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্জীর কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে; সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোন মতে শাহ্জীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরুশিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্জী লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহ্জীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেচে—এই দ্যাখ। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে—এই খবরদার! ঠিক অম্‌নি ব'সে থাকো। উঠ্‌লেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার কর্‌ব—হারামজাদা শুয়ার! নে, তুই টেনে বাঁধ—দেরি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্‌জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন কর্‌তে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বস্‌ল। শ্রীকান্ত নজর রাখ্‌, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের

ইহকাল-পরকাল মাটি কর্‌ব না’, সেই দিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়্‌ব—না হ’লে দিদিকে ও খুন ক’রে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এম্‌নি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই-সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না।

প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত

দিয়া শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্ নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্ নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন!—আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না তাহা পরে যত বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা-পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষরাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও

আর আমার সামনে আসিস্ নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথেঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত। ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিম্‌ন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে; কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান

দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্বপাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন-চারমাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। 'মেঘনাদবধ' হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন।

সুতরাং ভারী আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা ‘বেল’ হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ্‌সিন উঠিয়াছে। বোধকরি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এম্‌নি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চিৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট্ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু

তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপিচুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়। বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহ্‌জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বকশিস পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্‌জীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আয় দুজনে একসঙ্গেই যাই, বলে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দুজনেরই খেলা সাঙ্গ হল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা উপায় করে দিয়ে যাও। আঙ্গুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই! সকাল হলে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই

ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকি রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশেপাশে বনের পাখিরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষমুহূর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তার পরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে

ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটি দিয়া সিঁথির সিন্দূর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাঁহার স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি।

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি—সেই জন্যেই আমার যখন-তখন এই কথাই মনে হয়েচে,—আমাকে মাপ কোরো দিদি, তুমি কি ক'রে এর মধ্যে আছ,—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।

কেন পার না দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি! তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না, আজ তোমরা বাড়ি যাও—আমার অল্পস্বল্প যা কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই! তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চলে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর-একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার

সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম! অথচ কেন যে বলি নাই—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না।

অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইহাকে হত্যা

করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক্ বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা! তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সন্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে, খিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম, তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই— আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার

দিদি, যেখানেই থাকুক, ভালই থাকিবে; কেননা দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু, মাকড়ি-দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করিয়া শাহ্জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক-দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা-পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও

ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেম্‌নিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে?

কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এই-সব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া

জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল,—তে থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাস্‌তুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল. এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে

কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্‌চে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্চি নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা এ যে ভারি মুশকিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক। কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেত ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া, নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'রে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল্‌, যেমন ক'রে পারিস নিয়ে চল্‌। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বালিয়া গেল। ইঁহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও

মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত ব’সে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেলো, না খুলে—

হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি ক’রে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস্ কর।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম! পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর ক’রে টেনে নিয়ে চলুক

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই, সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা ব’লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজি হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকীসুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক্, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন; না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন, আর কোন কালে নয়। অথচ ঘণ্টাকয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না, তবে ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ

অতলস্পর্শী সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অল্পরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি-যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চিৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল।

এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপরে কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে

দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্তচীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয় মাত্র রহিল না যে নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব। আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হয়েচ ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখদুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা'হোক-একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নাই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চিৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই! সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চিৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা

আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ-সব কখনো চোখ্‌খে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই-সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতে ছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে—পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে

যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্রকবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্‌জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই-সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এ-সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না! ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ত আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয়ে যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি! সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে,

আমার ভাষাটা হয়ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপসা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁহার শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত।

তবে কিনা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইয়াই করে, না হইলে সত্য সত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতেও ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-বারো ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে! গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা

ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাসকামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া, তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহ্বল কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পর সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ঝাপ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কানা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ!

পিয়ারী মুখ নিচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য।

নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান দু-সপ্তাহ ধ'রে প্রত্যহ শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনর-ষোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চলে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল। সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা, তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্‌নো নদীর উভয় তীর! এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটা-কয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায় দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দু-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া

লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়া ছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমার সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সূরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম।। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্‌ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না; সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়! যাক্‌ আমি তাঁবুতে ফিরিলাম —কুমারসাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই,—বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর-এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি, বেয়ারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যেই হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?

রতন আসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল,—তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর। কিন্তু আমি জেনেশুনে আমার গুড়গুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে! আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—ওরে ও—

থাক থাক, চুরুটে কাজ নেই; আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো; ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ভাল লাগলো না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা করে কি আমোদ পায়, তা তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য সত্যই মৃদু ও আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা হ'লে যত্নটত্ন করবার আর কেউ নেই বল। পিসিমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা কর্‌চ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইচই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা, ভালবাসাটা কি কিছু নয়? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু, আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে ? তা ছাড়া আমি তোমাদের—ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল?

না, সে আমি বলব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন।

ছি-ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি ক'রে সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, না, তাতে দোষ নাই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাগ্যি সূয্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েচেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাকতো। বলি বিশ্বাস করতে পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাশা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য সত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গি, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস করতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এই চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চট্‌পট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম, চাকরি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বসে না থাকি বেগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে করে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর! এ কি একটা আপসোসের কথা?

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধু-মহলে, কুমারসাহেবের দরবারে প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয়ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত, আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসা-টাসা কিছু নাই?

আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটাও আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম আটটা ঘুঘুপাখি মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন-চারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি, প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল; সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোনদিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন,

প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক্ হইয় গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, নাহয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন? আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সেখি মৎ করো বাবু। বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত

করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের খল্ খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদ্ স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন একসময়ে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা?

যায়েগা বৈকি!

যায়েগা! আচ্ছা, আপ্‌কা খুশি। প্রাণ যানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমি ত শুধু হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না, তাহারা মুরগি খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে, এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে-সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের

আনন্দোদয় হয় এবং তাহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাঁহারাও দু'কথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না; এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে।

কারণ ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না। বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না?

একেবারে না।

কেন মান না?

মানি না, নেই ব'লে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ-সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাকতে ভূতই বল আর প্রেতই বল, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ-সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত মনে মনে রাম নাম কর! ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেই দিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছমছম যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে

একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না।

এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদিদির কালো কালো সেপাই-সান্ত্রীর ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ-সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারি দিনের উভয়পক্ষের ব্যবহারগুলা স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন।—কি সর্বনাশ! এই তাঁবুতে এতরাত্রে, এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বল গে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন এতটুকু কথার কখনো নড়চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারি জন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুট্টা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল, হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোন দিন শান্ত সুবোধ হবে না?

তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তা হ'লে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ চল! আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল, আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়িতে কি একেবারে আউট্ হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি। তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জান? তুমিই যে এত অধঃপথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশি হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবো দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললুম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্‌গতিতে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্চি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা পিছাইয়া গেলাম। কিছুক্‌ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মট্‌কেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়া পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মটকাবার জন্যেই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা। একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাই নি।মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয়ে কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায় কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায়

দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলা তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচকব্রাহ্মণ ভঙ্গকুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবাগোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্ন টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন।

কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল।আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এঁকে চিনিনে; বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশবার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভালো হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালোবেসেচে, ত মরেচে!

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, আমাকে বেঁধো! এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভালমন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা-কিছু হবে। হলে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা! দুর্গা! ছিঃ এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে নিজের হাতে নেড়েচেড়ে সেবা ক'রে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুলব!

তা হলে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠের দুর্গা! দুর্গা! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল! আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি— এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলেরোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

বিস্ময় সেজন্যও নয়। নভেল নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্!

চমকিয়া উঠিলাম। সন্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখিটা একবার 'বাপ্' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডাল পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের

ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই।

আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরী নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোন সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে ত

নয়। তবে কিনা, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদিবা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রি-জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এম্‌নি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলাগোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বস্তুত এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এই-সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু

সেটা যে কত বড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রামনামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়াখেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এম্‌নি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চিৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চিৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন! শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চিৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম।

খানিক পরেই টের পাইলাম, সে-ই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু-একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছটুলাল—সে তব্‌লা বাজায়; এবং আর একজন পিয়ারীর দরোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাইনে তোদের বকশিশ দিচ্ছি। আমি বললুম, ছটুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনিনে। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার ছ' টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি

ছেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল; কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন-মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মার কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ, ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে, সজলচক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই! সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! ছি ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক! তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম! বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোন মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম্। একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখলেই কি চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুল-ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মূল্য নাই? তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু একমুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটি বারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তব্ধ রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমানিকস্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ-সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত? তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত অন্নদাদিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশ লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে-সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কিনা, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না।

মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এম্‌নি অপরূপ আভা, চোখে এম্‌নি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এম্‌নি সতী, এম্‌নি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এম্‌নি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে,

এম্‌নি করিয়া সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ, এমনিই বটে! ছয়টা দিন আগে, আমার অন্তর্যামী আসিয়াও যদি এ কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমঝদার তাঁরা আমার আত্মকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ—এই ত? তা বেশ! এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদাদিদির নামটা আর তুলিয়ো না। কারণ তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানবচরিত্র বুঝি। জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিন্

কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। তর্ক আর নয়। আমি টের পাইয়াছি মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক। আমি ত নিজে জানি, আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ্' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ, হিপোক্রিট্ তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্ আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে!

লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

বাবুসাব! রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গতরাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বড় তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈহৈ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল।

দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতরে ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির ঢিপিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

ধু-ধু করছে বালির চর।

আর?

কসাড় ঝোপ, আর শিমুলগাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ-সব ত জানি হে! বলি, সে-সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুছ্ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না। উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্‌তা। আপ্ গয়া নহি। তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্যি বল।

সত্যিই বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখি বাপ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমুলগাছের উপর গোঁঙাইয়া-গোঁঙাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষার শীতল নিশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল।

আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু

আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী-কোটী প্রণাম—এ শুধু তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঝোঁকের মাথায় খপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্বলিত করিয়া, সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা-দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ চোখে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারা দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রুকলুষিত তদগত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই, অথচ

ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম! কেন তাহা জানি! যদিচ যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল; এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে।

কিন্তু অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র

লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটা যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্যের তির্যক্ রশ্মিচ্ছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই-সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই

ঘাটের উপরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না।

এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আর কত তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ো না, তোমাকে আর কখনো সে স্থানে যাইতে বলি না, কিন্তু যাহারা এ কাজ পারে তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না!

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল এখন এই কথাগুলাই এই নির্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজির বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা

নয়। কাল ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর শুরু করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না। এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্ ভুল করিয়া ত আর-একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয়ত? বাঁধই ত বটে! পা-দুটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান। আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদটা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বাহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই; এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘূণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায়; এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি কিছু ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু যাক গে!

বলিতেছিলাম যে সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছিঃ ছিঃ, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য! আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস্ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্। কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্‌নি একরকম করিয়া বজায় থাকে; একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে; এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম কিন্তু মনে হইল সব বৃথা।

এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন

করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে!

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিতচক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার;

সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো. গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ

মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এম্‌নি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁশ ছিল না। হুঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ জন-কয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই

অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর-কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চিৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখানি গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক-দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ি যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়িতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো বলচি!

না, তা পারব না, সময় নেই, ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে। পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাঢলি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন-হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম; পিয়ারী গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি-রকম? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু ওখানে আর একদণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে।

পিয়ারী কহিল, থাক পড়ে। তাদের ইচ্ছা হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে, নাহয় থাক গে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য; কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়!

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারা-জীবন শুধু জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?

না।

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশি হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দুটি চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলা চোখে পড়িবামাত্র একটি নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন?

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়াই শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বারবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল, যাহা আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপসা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচখচ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল; কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম সেটা 'বাড়' স্টেশন, এবং পাটনার আর দেরি নাই তখন হঠাৎ সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনো আছে। খুশি হইয়া দোকানের

সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সে জন্যে ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্ধমুদ্রিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয়

যাক গে পিয়ারী,—এই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়!

সাধুজী বললেন, কেঁও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বলিলেন, বাত তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা রামজীকা খুশি। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারি হইতেছিল সন্ধ্যার জন্যে। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায়

মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে! দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে; তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার!

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতেরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিন-মোড়া আরশি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরুমাহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-অধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে বহুত আচ্ছা বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি-কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন ঘন মুখবিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য উপকার, তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক

নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙ্গাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর এক বাড়ি এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ত তলব করিত না। ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না।

এম্‌নি দিন যায়। দিন-পনর ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্ মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর

বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিক ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ স্ট্রাইক্ দি টেণ্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়! সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কষিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরুমহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটা বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে-বোনা গুণচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার

পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগার বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁট-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সন্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক?

তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ি এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখ্‌ছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে

এদের শ্বশুরবাড়িটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত, খেত না, শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিনরাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধোর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না কারিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্‌বে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি—বলিতে আমি কোনোমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদীর দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারির নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, এবং সেও মারধোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তিনি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব, তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কি না; এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এম্‌নি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দুসমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দুজাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দুটো হতভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন এক বিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটির কান্না যে লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই, এ প্রশ্ন নিজের নিকটে হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতিরা মানুষ-সৃষ্টির শুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে, তাহাদেরও এমন

সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ূরোপের অনেক জাতির অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা দেয় না, এমনই এক-আধটা ক্বচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে-দুটির খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যাদুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে-সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড় রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়ে দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই, এই রকম একটা কথা; কিন্তু এই-সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—'হয় নাই', 'হইবে না', বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়; সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া এই-সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোন রকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না।

ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসে না। দেবমন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই-সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক, পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া।

আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি—গোপনে তিনি যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, এই ছোটা-বড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই-সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী' আপনারা ত আমাকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'

ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হু-হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড়ছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাস-খানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে-দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনর পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ্খনো বাঁচবে না। কৈ, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর

সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-লীলার অবসানে উত্তরাধিকার-সূত্রে টাট্টু এবং উট-দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে-দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তার পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন, শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম রাতজাগা

এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্নবেলায় বমি হইয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যসীদাদা? গাড়ি ত দুটোর বেশি পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেচে।

জ্বর? বলি কি গো? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে, বাড়ির ভিতরে ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই লইয়া স্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জনকয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না; কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র

জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনর টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে, কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রামের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁশ আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি ‘না না’ বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেউ নাই। তবে পাটনার পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ’য়ে পড়ে আছে, তা হ’লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্চি, চিঠি এবং টেলিগ্রাম দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্চি, বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে কে একজন লাল-চেক র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা!

ছেলেটি বলিল, দিচ্চি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়,—আর রাত জাগিস্ নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, পিয়ারী!

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌চ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ী যাব।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কয়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বার

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভালমন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু আর দেরি করিস নে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু চক্ষু জড়াইয়া ছিল; সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি খেপেছ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি! তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী! আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি। পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা ত বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী বলে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ, কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয় একরকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কটা দিন অপেক্ষা ক'রে বাড়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চার দিনে না হোক দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর-একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে একমাসের আগে তোমাকে

চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক্ গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় প'ড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে; সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দুগাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বলব বাবা! উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দুজনের চার-চক্ষুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয় নি—দেবে না! শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বার-তেরো দিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মারোয়াড়ী-পাড়ার মধ্যে এই-সকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত শৌখিন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিসপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরনের ঘরদ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়,

লণ্ঠন, ছবি, দেওয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশটুকুও বুঝি মিলিবে না। বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এম্‌নি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি-ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাতমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিসগুলার মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে! কিন্তু এ বাড়ির কোন ঘরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না; এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচিকে অতিক্রম করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গানবাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ!

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেজেটি সাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত সাদা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ঘরের একধারে একটা ছোট তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই। জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল—চৌকাঠের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্লান্তিবশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম। সুমুখের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ; তাহারই ভিতর দিয়া ঝিরঝির করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া

পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্কবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অ্যাঁ—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, বোস বোস,—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া লঘু পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম, বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিনমুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধ স্নাত প্রফুল্লহাসি মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা

সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধুলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা হ'লে ওটা দাবি করতে পারি বল?

তা পার। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাশা থাক—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় ক'রে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও আমি নড়ছি নে।

পিয়ারী বিরসমুখে বলিল, তা কি হয়! বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বঙ্কু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এন্ট্রান্স পাশ করেছি।

এখন তা হলে বাঁকিপুর কলেজে পড়চ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমরা ক'টি ভাই-বোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়িতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের দেশের বাড়িতে গেছেন?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলোই বা। আমাদের 'একঘরে' ক'রে রেখেচে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারি নে। আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বঙ্কু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গানবাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চা ত করেন না?

বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?

আমি বললাম, না; এ ত খুব ভাল কাজ।

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদের গাঁয়ের মত পাজী গাঁ কি কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়ি তৈরি হল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলাটাকেই একটু পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ ক'রে তাই ক'রে দিলেন, ঘাট বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল! বুঝলেন না?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না, কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু, পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই।

বঙ্কু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই! এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন? প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। হাঁ-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বঙ্কুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যিই ভালবাসে। অনুকূল

শ্রোতা পাইয়া শক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হুঁশ হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

কাল?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্চে?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলেটি চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম, যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে; এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্‌ করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলেটি খুব সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে

পারিলাম বলিয়া বোধ হইল; মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক্ দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃ পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারেনা—সে একজনের মা!

এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্ত-দিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, স্নেহ যতই মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা, যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে

পাই নাই—ছল করিয়া, একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধুনুচিতে ধূপধুনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা-গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না! রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিতে পারে না? এ বাড়ির চাকরগুলোর মত 'বাবু'-চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়িশুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধু যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল! দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, তখন

তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়িতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেছে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আট্‌টা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্‌। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্‌—এখানে হবে না! বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ি যাবে? আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাড়িতে যাবে?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে নাহয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দসাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে

কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক্, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল, পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি। তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর এক দণ্ডও বিশ্বাস নাই, সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে

পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে?

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়! যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পালকিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এম্‌নি গম্ভীর, এম্‌নি স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে

তখন কত বড় একটা আসন্ন-বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পালকি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য করিতে লেশমাত্র ইতস্তত: করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর-একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল,—কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমনি একপ্রকার অনির্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও

কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরুভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সে অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক সেকথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুকনা পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদিবা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনিভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা

নিজের চোখ-দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবত: এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদিবা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যত প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগা সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর

পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে-পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য একদিন রাত্রে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্মামুল্লুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙ্গালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী।

পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের

বর্মামুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে— আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, বিদ্যা-সাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও, সুদ্ধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার

বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌঁছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্তত: তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দিপরা দরোয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরোয়ানজীর

পরিবর্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরোয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু। ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাকরুন ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলার অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙ্গালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মসলিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। এক জোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবল্‌চি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম।

পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নিচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম।

বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে

কহিলাম, বাইজীবিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্মকর্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক; দেখিলাম, তিনি বাঙ্গলা বলিতে না পারলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেমনি হাসিমুখে বাঙ্গলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গানবাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুশি হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু!—পিয়ারীবিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক।

সন্ধ্যার পরে হবে—আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিনি-চারবার মুজ্‌রা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখনও কখনও দশ-বারো দিন পর্যন্ত থাকেন—মাস-তিনেক পূর্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন এসেচি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শান্ত স্বরে; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবল্‌চী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এতবড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান-অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কারণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায় পড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্বোধ নই যে, মনে করব তুমি ইচ্ছে করে আমাকে নীচে শুতে বলে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক্, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাও গে,

আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক্, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক বলে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন!

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারি ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না করে এ ঘরে করা হল কেন?

রতন আশ্চর্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল!

সে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরি হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এ-সব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সক্কলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারি আশ্চর্য যে মানুষের দুর্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে বস, এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব।

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো! তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে পড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হলে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাইত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে

রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্যে অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হতে পারে তা হলে? এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া কিসের জন্যে বর্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিও না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুশি হইল; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষে চিরকাল যা বলে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে করে সংসারী হও—সংসারধর্ম প্রতিপালন কর।

প্রশ্ন করলাম, সত্যি খুশি হবে তাতে?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুল দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ’ বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি?

বলিলাম, তা জানিনে, কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে বিয়ে না করে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হলে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা বলে দিচ্চি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হলে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতেও চাইনে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।

মার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিরকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি করে বলব! বিবেচনা করে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক, যথাসময়ে তাই নাহয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করে দিয়ো। শ’ পাঁচেক টাকা হ’লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ’তে দেব না; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে —

নইলে কি?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার করে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা করো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে নাহয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস! এ কি একটা শক্ত কথা বলে তুমি মনে কর?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই-সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-আশয় তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বঙ্কুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয়? এ-সব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানি রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আসব। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপটপ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়! একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরন, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও ঘড়ঘড় শব্দে অপরাহ্নবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাঁকি-কুর্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না-আসা পর্যন্ত আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াশা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোটঘাট লইয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যুষে সর্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া

হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগ্‌দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি।

জিনিসটা আরও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙ্গালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার

অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙ্গালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান-বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিত্তে সেই-সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীত অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না।

সে যাই হোক, পাশ করা যখন অবশ্য কর্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণক্রিয়া যে কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কলকারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, বাঙ্গালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী সুদ্ধমাত্র পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে

জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেন সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এককোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্স-পেঁটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া পা ফেলিতে পারি এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বকশিশ লইয়া প্রস্থান করিল।

এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নেই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই-

ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙ্গালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে এতগুলা সঙ্গীতবিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে না মুগ্ধ হয়, সে খুন করিতে পারে, না এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না জানি না; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড

চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখরাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরূ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি-

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাতবোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাতবোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর

কেউ হ’লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাতবোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা সুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশভাজা বিক্রি করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙ্গার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুসুরি-খেঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অত বড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি একহাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর

কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিসনে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবুলিকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারিনে। ওই দেখুন ভাঙ্গা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশি যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটি অমনি বেঁধে দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া, টগর চিৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি মিস্তিরী—ভাল হবে না, তা বলচি—

চিৎকার-শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সুর আরও এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা-ভোগ হবে? তোর কৈবত্তের মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপের পিণ্ডি দিস্।

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ণ মুখ্যব্যাদান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গালী নরনারীর দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরোয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাশা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন্ তো বহুত আচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ শর্তাদি নির্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, শর্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধগোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট-পনের পরেই দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেন্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে

আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক।

আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাহাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না—এ-সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া

গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকি ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব-কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই সাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেলে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে; পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি-একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত

করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষে হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়া ছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্ বজ্ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ-দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট।

কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ডগোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-সুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পেলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলা

বার-কতক ঝট্‌পট্‌ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর-একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক্‌, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি-না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রীমশায় সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে-যার কোটে ফিরে এসেচি।

আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না; কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে; বোধ করি একটা হ্যাঁমক পেয়েছিলেন, না?

হ্যাঁমক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরককুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকি রাত্রিটা ফার্স্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশি হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকি দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেকচেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নির্জীবের মত এই কেদারটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্যবস্তুর চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙ্গালী মেয়েলোক আপনাকে ডাক্‌তেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে! কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোনদিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাক্‌তেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষমানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙ্গালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দূর ডগ্‌ডগ্ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েচে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি নাহয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এঁর হয়েচে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এঁর স্বামী। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেচেন? বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্, বেশি দিন

টিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ-সব কি বলচেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আন্‌চে, না ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি করে এল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই! গতবারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবার' মিস্ত্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে —খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্তিরী মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধুলো দেবে? আরে, তুই ডাক্তার না বদ্যি যে, যেই একটু জল আনতে গেছি, অমনি ছুটে

দেখতে গেছিস? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্তিরী! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শিকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস, তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয় অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখতে হইবে, নাহয় যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজি আছেন।

এমনিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের

উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্বে বর্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজি করিয়া বর্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনমতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন? না, কিছু জানিনে।

তার পূর্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবত: হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেকে আছে, যাহারা সারাজীবন আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

খপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবচেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন, আমি ঘর করতে রাজি হ'লেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজি হবে কি না, এই ত?

বাস্তবিক, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় ত কি করবেন?

এইবার অভয়ার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড্ড সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকলে নিশ্চয় করব; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানায় গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের

সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে স্টিমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাক্তারবাবু?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজি—কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেন্ড অফিসার ৬-৭ জন খালাসীকে এলোপাতাড়ি লাথি মারিতেছে; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত—একদিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাটল্ সিধা হয়?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen; you ought to be proud of them!

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দুহাতের বুড়া আঙ্গুল-দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাসচিস যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ করে খায়ে হাসতেচি মোরা?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম, তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট স্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তারবাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ

পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শিগ্‌গির গুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বললাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও- জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনে। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন—আপনার হুকুম হয়েছে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না, না, তার দরকার নেই, আমি জানতাম। Good-bye, চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

পাঁচ

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমনকিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই। এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, একরাশ মোটঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দূরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচকা-বুঁচকিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে!

অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক স্কন্ধে ভর করিয়াছেন নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোটঘাটগুলা ত সব ফাউ। এই-সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া, পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে; হয়ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল, এতবড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না, তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথাও লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যাননি, তার নাম দান। এতবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিসপত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচকা-বুঁচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া

রহিল। অবশ্য সে-সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা ভাল ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো। না না, মাথা খান, উঠবেন না; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব যোগাড় করব কি ক'রে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকতক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পারিয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুখানি খাটিয়ার উপর দুজনের বিছানা পর্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। একাধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এবেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও বেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতার এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয় বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটো জিনিস শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দু'দিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না।

আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘন্টায় দুটা বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমারাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর-একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, শহরে মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

শহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্বদিন। আর পর্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব পোশাক-পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাইয়া সমস্ত পথটা মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রং অধিকাংশই খুব ফরসা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বুই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোঁপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল।

কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন— হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা, আর তিনজন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং বাহুবলং। পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড গাদি করিয়া বিক্রি করিতেছিল, অকস্মাৎ তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাশা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠিপেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে

লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং সুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙ্গালী বর্মা মুল্লুকে পদার্পণ করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরিতরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে

চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব’লে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব’লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—ওঃ—মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত দেখতে পাইনে! তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম! কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাত লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব’লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসচেন কোত্থেকে? বাঙ্গলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে! বরাতে করে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিস্তিরী। মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনার চাকরি ক’রে? তা সাহেবকে ব’লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক’রে,

কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারিতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কহিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্রলোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না!

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও-বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দের সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমুচ্চে। ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙ্গালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেলে রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিং রুমে জন-পনের লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজিতে দুটো কথা আছে instinct এবং prejudice; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়, কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁওয়া বস্তুটা যে instinct হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে

এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃঙ্খল —তাহা দুপায়ে পরিয়া ঝমঝম করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সেও একই কথা—না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্‌চায্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই-সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না।

অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্তমান রম্ভা পর্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই।

তবে আরাম এইটুকু যে, বর্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোটখাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্যন্তই থাক। হোটেলে যাহারা সারি সারি পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে-দশটায় ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোটজাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতেনাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

যাই হোক, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙ্গালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বহু লোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়া এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙ্গালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না, জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত আছে, সদ্‌গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্দুর-পারে এসে কি অত বাম্‌নাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্নান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চলতিমুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয় তাহাদের। আহারাদির পর কৈবর্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্মকারমশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে বলতেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এইজন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল? তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিনে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সবাই সমান; নবশাখই বলুন আর হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটচে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে; আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই না থাকলে এত দিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'ত যে!

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত চর লাগাইয়া তাহাদের আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং সুদ্ধ তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সেকথা উত্থাপন পর্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই

শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই।

যাক্। বহুদিন পর্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর–পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সৎসঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক। দেখিলাম বাঙ্গালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙ্গালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নই, বাঙ্গালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙ্গালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজি হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা

ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙ্গালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গাপূজা হইতে শুরু করিয়া ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা-বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্যন্ত যেন ভয়

করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগম্ভীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

যান ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হুঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন।

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার জো হয়েচি, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও একগ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্বাহ্ন হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরির যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পটপট শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে অর্ধেকটা এবং বাকীটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে

বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক্‌, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে!

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অর্ধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সারাদিন অফিসে খেটে খেটে ক্ষিদেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচিমোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসু-মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বৈ কি?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে!

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—এ কথা আমি বলেচি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্চি! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম—বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু দূর

বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না, তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বলতে চাইনে। বলিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দায় সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশেপাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা অফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটা যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারিতে লাগিয়া গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার 'পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণীবাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরিতরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামাকাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ-সীমায় পৌঁছিয়াছে—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই-সব কেনাকাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই-সকল লইয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছান একান্তই চাই, কেন যে এই-সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাঁহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া, শতচ্ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামাকাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে। আর

আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দুচক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম এবং নিজের মনেই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাঙ্গলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে এক লক্ষ আশীর্বাদ করিয়া হাড়-বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া

বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক, আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বরাবর বলচি রোহিণীদাদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্চে।

রোহিণীদার দুচক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এঁর অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না—আমার বিধাতাপুরুষেরও ছিল কিনা সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্মা রেল কোম্পানির অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানির চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে— তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কিনা, তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই

কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী ন’ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল-পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাইতেছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এতরকমের উল্টা-পাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশহাত না যাইতেই মনে পড়িল ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি ঢুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখে অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্বাক সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল।

আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা আসিয়া পর্যন্তই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না। তার পরে, লিখবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্রনারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সঙ্কটের কালে যে রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টাদিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ায় সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারেও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার

একজন বর্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেন্সিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ চুরির অভিযোগে সস্‌পেন্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচ পাতা-জোড়া কৈফিয়ত ছিল।

বর্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরনে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জিতরুচি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট- দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্ম্মদক্ষ লোকের বর্মা মুলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যে বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেবব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেছেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি ক'রে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই!

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লানমুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সূয্যিমামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমারও একটা জমিদার। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিকরে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সেই সবাই মরেহেজে গেল,—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘরবাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্ঠিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্ষতার ভান করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান নি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এই নিন কথা! জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপিচুপি সহ্য করতেই ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক পিটে প্রচার করতে পারিনে। থাকগে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তাহ'লে কেসটা ত আপনিই ডিস্‌পোজ করবেন? যাক, বাঁচা গেল, কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেবব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বললাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেচি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? নটার গাড়িতেই চ'লে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না; কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ খোশামোদ জিনিসটা এম্‌নি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উলটা কথাটা

মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্‌ করবার নোটিই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীকে মারবেন না বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলো পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরানী দরোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্মায় এসেচে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচপ্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্‌নি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবার দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্মা-মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশি হইব, কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃপুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনিই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল; পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশি কথা না কহিয়া শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন

সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি; এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য, এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)।

কিন্তু আজ রাত্রিই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে-বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-ছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে নাহয়

ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেছে। একবার ভেবে দেখুন দেখি ব্যাপারটা!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন গ্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল! তার পরে কতবার যে সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজপত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে-চারিটা বাজিয়া গেছে এবং কেরানীর দল দিনের কর্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

নয়

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ব্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে কি সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং তাহার একদিকে তাহার বর্ম্মী স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোনমতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্ম্মিণীর এই প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে এরূপ ঘটিত না—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত-সমেত তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আর্য-ললনা কৈ! সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়! যে আর্যনারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দু-মহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামীদেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী? কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ?

আর কি আমরা সে-সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা-জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতিদেবতাকে এই পর্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে তাই নয়, সে আজ পরম বন্ধু পোস্টমাস্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে-একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র

লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্যন্ত যে ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরলচিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ-বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সতীধর্মের একটা অপূর্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অন্নদাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অতবড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা

করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর-দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মাধর্ম, সমস্ত পাপপুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়টার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ-সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই-না তিরস্কার করিব, কতই-না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, সব ভাসিয়া গেল! এত বড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশি পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধুসঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল, সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর এই রাঁধাবাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হ'য়ে এসে ভারি বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু?

বলিব আর কি! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমানির্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না, কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোনভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে হতভাগ্যের গৃহের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল ভদ্দরলোক।

তাই আমার ঘরে!

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে

শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া ক’রে ধরে রাখত। কি জানি, সেকালে তারা কি করত; কিন্তু একালে বর্মামেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে একতিল কম নয়, সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট ভাইয়ের বর্মা-শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতঃভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া এবং সম্ভবত তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেমনি অলস; ঘরের কাজকর্ম হইতে শুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি-ছি করিয়া, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে ‘বাবুসাহেব’ দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু-তিনটা আঙটি, ঘড়ি-চেন—কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ সচ্ছল। তাঁহার বর্মা-গৃহিণী হাতের

কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এমনি কি-একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা নাহয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে।

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল, এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা ডাক দিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিসফিস মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী, এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম বলে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে। বেটির যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেঞ্চ লিভ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্মা-বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটোকাঁটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেপ্পী (এক প্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই নেপ্পী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা-বেটিদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে রাজার হালে খাওয়াচ্চে, পরাচ্চে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক করলেন মশাই! পুরুষবাচ্চা বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে বয়সের দোষে নাহয় একটা শখ ক'রেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জানতে বাকি নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ'য়েই পড়েচে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে! ভাল হ'য়ে সংসার-ধর্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে! কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না মিথ্যে বলচি!

বস্তুতই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি,—ব'লে যাওয়াই ভালো। এ বেটিরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাশরম, না আছে একটা ধর্মজ্ঞান! জানোয়ার বললেই ত চলে!

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যি ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে-ওদিকে চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙ্গা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত। তাঁহার দু'চাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ-বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়ঝাঁপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙ্গর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া, জায়গা

ঠিক করিয়া তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি। তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল!

লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহবা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্মা-ভাষায় এবং বাঙ্গলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙ্গলাটা কথঞ্চিৎ মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙ্গলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার

যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ' টাকা তামাক কিনতে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশেপাশে লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা।

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন করে হোক দুশ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে। কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এম্‌নি কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাশার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী, বাড়ি আমার আজ খালি হইয়া গেছে।

কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকব। একমাসের জন্য তামাক কিনিতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন

আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কত দূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি।

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু-একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে-কোন নর-

নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তাহাদের গ্রহণ নাহয় নাই করিল, কিন্তু আপামরসাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করা, নাহয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই-সকল কথা নাহয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব, কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু

লজ্জার যে মূর্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দু'রকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এ-সব অভ্যাস মত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ-সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।

দশ

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলাম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধকঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূরে এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ করেচি,—মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্ধা পুরুষমানুষ সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি

অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই, তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে—

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্চি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর-একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল!

আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছ—এ কথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ—এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন সুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু

একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু,—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একবারে মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?

এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদাদিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্য অমর হ'য়ে ছিল, সেইদিন তার প্রমাণ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল জানেন?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে যে, এই-সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে-আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েচে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি।

তার থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েচি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচিঁ। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার

নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েচেন, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম।

আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছুই নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্নিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে; যেন তার ভিতরে

প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন? ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্যি হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেচি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে। শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয়তো চোখে দেখে যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্মা দেশটাও একটা মুসলমান—প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার করে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারবো না।

অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি

চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

এগার

মনোহর চক্রবর্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দাঠাকুরের হোটেলে একটা হরি-সংকীর্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন। কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন জানিতাম না। এই মাত্র শুনিয়াছিলাম—তাঁর নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটিকয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁর কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়িঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনাপত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করচেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু আমার কথা মত, বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলচি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতরে ভিতরে

সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজমন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে রক্ত-উঠা কড়ি—আজকালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলেপুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,— যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না।

বেশি নয়, দু-চার দিন আসা-যাওয়া করেই নিজে হতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি ঝগড়াঝাঁটি,—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট্ করে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ ক'রে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বললেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া একপক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখ্‌খনি ব'লে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। নাহয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু-একটা—মা-শীতলা না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখ্‌খনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখ্‌খনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলামেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার

সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবনযাত্রার কার্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙ্গালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডি.-র লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলি মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজি হইতেন না।

আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে

জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর-একদিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে; এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলা দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই।

বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে-কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চালচলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে এসেছে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পঙ্গু ক'রে দেবার এত বড় ছায়াবাজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু, তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ

করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-একরকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, একথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত।

যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতে ছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, নাহয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই-সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত

প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে, —কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ওদিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেন্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন!

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কিনা চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে।

একটু আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ যাঁহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী

জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙ্গালী বামুনদের আজিও একাজে রাজি করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand-কে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যান্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেন্ট্রির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই আপনি কি সহজ লোক! শহরসুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবচেন! বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দ বচ্ছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা

লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে ‘দেও’ আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের ‘ছায়া’ রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর তা ‘ছায়া’র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল্ হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম।—চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পঁচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই;

এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খ্রিস্টান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্টশান্ত তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেচে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠান নি কেন, শীঘ্র পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দু'টাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে?

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি,—বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে?

বলিলাম, কেউ নয়। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্ দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভারী বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এইভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন শ গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের 'মেস'টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়াচড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতূহলবশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়।

সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙ্গিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল!

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, একথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি——আজও অপরাহ্ন। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্য সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলিব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধুলোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন

যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক। হয়ত তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, এখনও জ্ঞান আছে—এখন ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন করে ঘর-সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'ল।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

অফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না যাহা তোমার না জানিলেই নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিব্যি রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধ একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটি নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি সুদ্ধমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার

গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি, দিলে এ বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবো না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে! সে কথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর-একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়া উঠে, যে দুর্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত

বিধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম, তা কি সবল-দুর্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজই অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলেন, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ ক'রো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই-সব মতলব আঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর-একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেমে যান, আমি জিনিসপত্র নিয়ে পরে যাচ্চি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্বাদে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে পিছনে আসিস—দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্চে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছে আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না। সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্চে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্যটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে!

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখাদেখি ত সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্যামী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখখনো ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি

করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেমনি কি এখনো দেখতে আছি নাকি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচ।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসিমুখখানি আমার মুগ্ধদৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন করে হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙ্গালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এইপ্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কিভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে,

কত রঙে ভরিয়া যে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই

আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্চি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটিজুতাটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামচৌকি আমি সর্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহানার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ন-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে।

কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয়।আর বঙ্কু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস।

আমি আবার চোখ বুঁজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বঙ্কু? একবার এদিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু ব'স। কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে দরোয়ান সঙ্গে করে একবার বাজারে যা বাবা। কিচ্ছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা নাহয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বঙ্কুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণে কতই না প্রভেদ।

জিনিসপত্রর ফর্দ করিয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল।পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া

হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কিনা বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্য নয়। শখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি! তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্যাদা ও

অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদাসিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেননা আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ নির্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে নাকি? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়। নইলে ত সংসার চলতে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, কি বক্‌ছিলুম শুনবে? আজই ঘণ্টা-দুই পূর্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েচি। আগুনটা কি জান? সেদিন প্লেগ ব'লে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘরকন্নার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলচি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাতে ছিল না। কর্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় পিছুতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন ব'লে বকে মরছিলুম। আগুনের এক নাম সর্বভুক জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুই-ই টেনে নেয়—তার বাচবিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেছেন জানো? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়াই শুধু সংসারের অপরের জীবনের সার্থকতা পৌঁছাতে পারে। আর ব্যর্থ হলে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানা দিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না? বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তার পরে দুজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া রুক্ষ চুলগুলা নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা, না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হ্যাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েচেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।তখন অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলাজানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল-দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্মিক্ করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলেমেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেচি—একটি-দুটি নাতি-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। নাহয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যাণ্ডের কর্নেট এবং ব্যাগপাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের স্টেশনযাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তাহলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না; তাহলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এদেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্লাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র-নির্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থদের সম্বন্ধেই, তার কারণও তুমি জানো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে বলিল, তোমার ও মত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বঙ্কুর বাপ যখন তোমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে মাত্র বাহাত্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরানো হয়নি যে তোমার মনে নেই। তবে নাকি সে লোকটার নেহাত পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো—একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এইজন্য?—এই-সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, নাহয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেরানী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্যসামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরিতরকারি এবং ফলমূল। সাতদিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই

মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমনভাবে ইস্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্চেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্চেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ-সব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্চেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্তি—কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে— বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাইবোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ—বাঙ্গালী কেরানীজীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনাবোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এঁদের চোদ্দআনা লোকের কিচ্ছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না-না, শুনব না, শুনব না—আমি চাইনে শুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানিয়া,আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু দুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। দোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষা ক'রে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয়ত আবার আমাকে গালমন্দ করবে, কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-

মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই ক'রো— আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কিনা—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি ক'রো না— সে আমি জানি।

জানো? যাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা নাহয় মেনেই নাও!

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানাপুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটাভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয়ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক

তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্তি হবার মুলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাঁচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাঁচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন!

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত। বাঙ্গলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের

ভাল। তুমি ত পাষাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্লাদ করে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌঁছতে এঁদের আগ্রহটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমিও ত তাই বলচি! আজ বাবা আসচে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম? কখ্খনো নয়। অন্ততঃ—এক শ দেড় শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলচি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে দেড় শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপরিও কত পান!

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখচি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্চে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত-দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরিতরকারির পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়সুদ্ধ একটি মাটির পাখি লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কানা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েচে, আপনি শীঘ্র যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সেই আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙ্গা অংশগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবারে বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কিনা—দু আনা— তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়গোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার

হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘণ্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বঙ্কু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি চুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোঝবারও জো নেই।

চৌদ্দ

শ্রীমান বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন রেল কোম্পানিকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া?

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠায় বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বর্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকরবাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টিকটুতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য তাঁহাকে রাজি করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা-দুই স্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশপাশের গ্রামগুলার খবর পর্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁহাদের জন্য যে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্ধমানের কাছাকাছি আসিলে তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া

একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ি বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসি তাকে ভাল হ'য়ে পরতে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্বাদ করুন সে ভাল হ'য়ে উঠুক; কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখদুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নতুনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া!

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মরিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত

কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখদুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হ'লো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্য ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে।

কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না। এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যা শিখলে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি!

বলিলাম, হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে!

কেন, তারা তোমাদের করলে কি?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে—সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্য এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তাহা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয়ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্য কাঁদে তাদেরও হয়ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না!

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কৈ—তার ত কোন জবাব দাও না!

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া লইল এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও নাই; আমি যাহা-কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটি ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর তোদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেচে। কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার 'কিন্তু' গেয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন?

কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার অত বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে পরুক, যেমন করে হোক সুখে থাক্, আমরা আচার পালন করে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি! এই যে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই—যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা-কিছু শিক্ষা সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তাহলে গুরুর কাছে ঠিক উলটোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে একতিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ-দুটি সহসা ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এমনি করে ভাবতে পারতো, তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড় কে ছোট, এ সমস্যাই কখনো উঠত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ্যাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ। অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, ত বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমারই আজ সত্যি সত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাশা করেছিল। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপ্সা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে,

সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্চে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভালো ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাশা করচ, তা জানি। কিন্তু তামাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময় চাকরদের চেয়েও বেশি খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রানী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলচি।

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিচ্ছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্চে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক ছোট-বড় উঁচু-নিচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমার এই দশা। কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্‌খনো ছিল না। সেখানে কখ্‌খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু

করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকি জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিচ্ছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলচি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি!

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই?

আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধুলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কয়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়াটে—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়াপরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়; বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বৈ কি। এমনিধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্নবস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি!

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে

যাঁরা আমার সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেচি যাতে লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী!

মলে দেখো! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই।আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বঙ্কুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটল। ভাগ্যিস সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশুনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না!

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ-হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙ্গিয়ে যেও না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে! কিন্তু আমি হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সেজন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোটমানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাঁচতুম, গলায়

দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করচ!

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গম্ভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরচি,— বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছিঃ ছিঃ, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়োবয়সে এ-সব কি আমায় সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্মা যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেয়ো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ-সব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্য সত্যই কি-একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ি চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়িগাড়িই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না—তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্বাদ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না

ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি

পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

পনর

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা হলে কি করতে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই বিংশ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এত বড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্বশী তিলোত্তমার গর্ব খর্ব করুক—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ-সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম্। সে যাক আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙ্গালীর পরম তীর্থ চাকরিস্থান—অর্থাৎ বর্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্চো?

বলিলাম, পাপমুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধা যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে?

হাঁ।

আমাকে বিনা-অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা না হয় হ'লো, কিন্তু ফিরে বঙ্কুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসীবাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্চে না!

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের ওপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত

বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হ'য়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না!

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্মা যাবার পূর্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, একথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয়ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

বকশিশের লোভে গাড়ি প্রাণপণে ছুটিয়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম, আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকি দিন-কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্নবেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘরদুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা করে সংসারী হ শ্রীকান্ত! আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাহিরের ঘরেই নাহয় থাকব—ঘরে ঢুকিয়া দেখি এককোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত। এগুলো দেখেশুনে কোথাও এখন সরাতে হবে দেখচি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তাপোশ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত!

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত নাহয় তাই হোক।

বস্তুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্মায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা টিপটিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছুই না, ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন।

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এমনিভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বাকি কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক্, তুমি আমার পর নও, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, একথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, একথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম

না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যত্নের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি, কোচমানের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবিচলিত ধীর পদক্ষেপেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নাই। ও-বেলায় সাতটার গাড়িতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বলব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জ্বরটা বন্ধ হয়েচে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাহয় আজ থাক। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই; হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবে।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিনিতে পারবে না?

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক! এইখানেই মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে সেই ত চিনবে।

তবে?

কি করব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনও হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি নাহয় স্থির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুললে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখে দেখাবে কি করে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর-একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা কিছু এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি, শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা কহিলাম, বন্ধুর বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপরে—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজেস্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া সব একরকম ক'রে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি-দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে দেব ভেবেচি। আর কোম্পানির কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত একরকম ভাগ করে এসেচি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান ক'রে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অধৈর্য আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যকররঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্চে এঁকে কোথায় দেখেচি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

তৃতীয় পর্ব

এক

একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না। আমার সেই পল্লীগ্রামের যিনি ঠাকুরদাদা তিনি যখন আমার সেই নাটকীয় উক্তির প্রত্যুত্তরে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ প্রণামের প্রত্যুত্তরে শুধু যেভাবে শশব্যস্তে দুই পা হটিয়া গিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেশ বেশ—বেঁচেবর্তে থাকো! বলিয়া সকৌতুকে ডাক্তারটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন রাজলক্ষ্মীর মুখের যে ছবি দেখিয়াছিলাম সে ভুলিবার বস্তু নয়, ভুলিও নাই; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম সে আমারই একান্ত আমার—বহির্জগতে তাহার যেন কোন প্রকাশ কোনদিনই না থাকে—কিন্তু এখন ভাবিতেছি, এ ভালই হইল যে, সেই বহুদিবসের বন্ধ দুয়ার আবার আমাকে আসিয়াই খুলিতে হইল। যে অজানা রহস্যের উদ্দেশে বাহিরের ক্রুদ্ধ সংশয় অবিচারের রূপ ধরিয়া নিরন্তর ধাক্কা দিতেছে—এ ভালই হইল যে, সেই অবরুদ্ধ দ্বার নিজের হাতেই অর্গলমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলাম।

ঠাকুরদাদা চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া একটুখানি নিষ্ফল হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে আমি তাঁকে ছুঁয়ে ফেলতুম না; কিন্তু কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে? তার ত কোন দরকার ছিল না! এ শুধু—

বাস্তবিক এ শুধুই কেবল আপনাদের আপনি অপমান করিলাম। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাজারের বাইজী অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের পত্নী যে ইঁহাদের কাছে কত উচ্চ আসন পায় না—সুতরাং নীচেই নামিলাম, কাহাকেও

এতটুকু তুলিতে পারিলাম না, এই কথাটাই বলিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী আর শেষ করিতে পারিল না।

সমস্তই বুঝিলাম। আর এই অবমানিতার সম্মুখে বড় কথার আস্ফালন করিয়া কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না। যেমন নিঃশব্দে পড়িয়াছিলাম, তেমনি নীরবেই পড়িয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর একটা কথাও কহিল না, ঠিক যেন আপনার ভাবনার মধ্যে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল; তার পরে সহসা অত্যন্ত কাছে কোথাও ডাক শুনিয়া যেন চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনকে ডাকিয়া কহিল, গাড়িটা শীগ্‌গির ঠিক করতে বলে দে রতন, নইলে সেই রাত্রি এগারটার ট্রেনে আবার যেতে হবে। কিন্তু সে হলে কিছুতেই চলবে না—ভারি হিম লাগবে।

মিনিট-দশেকের মধ্যেই রতন আমার ব্যাগটা লইয়া গাড়ির মাথার তুলিয়া দিল এবং আমার শোবার বিছানাটা বাঁধিয়া লইবার ইঙ্গিত জানাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে আর আমি একটা কথাও কহি নাই, এখনও কোন প্রশ্ন করিলাম না। কোথা যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

দিনকয়েক পূর্বেই এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আজ আবার তেমনি এক সায়াহ্নবেলায় নীরবে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেদিনও কেহ আদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, আজিও কেহ সস্নেহে বিদায় দিতে অগ্রসর হইয়া আসিল না। সেদিনও এমনিই ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসুমল্লিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসরঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তথাপি সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমতা আমার কোনকালেই ছিল না, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়াকেও ইতিপূর্বে আমি ক্ষতিকর বলিয়া কোনদিনই বিবেচনা করি নাই; কিন্তু আজ যখন নিতান্ত অনাদরের মধ্য দিয়াই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কোনদিন কোন ছলে ইহাতে আবার কখনো প্রবেশ করিব তাহার কল্পনা পর্যন্ত যখন মনে স্থান দিতে পারিলাম না, তখনই এই অস্বাস্থ্যকর সামান্য গ্রামখানি একেবারে সকল দিক দিয়া আমার চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিল; এবং যে গৃহ হইতে এইমাত্র নির্বাসিত হইয়া আসিলাম, আমার সেই পিতৃ-পিতামহের জীর্ণ মলিন আবাসখানির প্রতি আজ যেন আর লোভের অবধি রহিল না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করিল এবং বোধ হয় কদাচিৎ কোন পরিচিত পথিকের অশোভন কৌতূহল হইতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতেই গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রেলস্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ি যখন অত্যন্ত সাবধানে অত্যন্ত মন্থর গমনে চলিতে লাগিল, আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা

আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায়, তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী তেমনি স্থির হইয়া আছে। আঁধার কোণের মধ্যে তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অনুভব করিলাম সে চোখ মুদিয়া যেন চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেছে। মনে মনে বলিলাম, তাই যাক। আজি হইতে নিজের চিন্তা-তরণীর হালখানা যখন তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন এই অজানা নদীর কোথায় ঘূর্ণী, কোথায় চড়া, সে-ই খুঁজিয়া বাহির করুক!

এ জীবনে নিজের মনটাকে আমি নানা দিকে নানা অবস্থায় যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ধাতটা আমি চিনি। অত্যন্ত কিছুই ইহার সহে না। অত্যন্ত সুখ,

অত্যন্ত স্বাস্থ্য, অত্যন্ত ভাল থাকা ইহাকে চিরদিন পীড়িত করে। কেহ অত্যন্ত ভালবাসিতেছে জানিবামাত্রই যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, সে মন যে আজ কত দুঃখে হাল ছাড়িয়াছে, তাহা এ মনের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে জানিবে!

বাহিরের কালো আকাশের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, ভিতরের অদৃশ্যপ্রায় নিশ্চল প্রতিমার দিকেও একবার চক্ষু ফিরাইলাম, তাহার পরে জোড়হাতে আবার যে কাহাকে নমস্কার করিলাম জানি না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, ইহার আকর্ষণের দুঃসহ বেগ আমার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে—বহুবার বহু পথে পলাইয়াছি, কিন্তু গোলকধাঁধার মত সকল পথই যখন বারংবার আমাকে ইহারই হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন আর আমি বিদ্রোহ করিব না—এইবার আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম। এতকাল জীবনটাকে নিজের হাতে রাখিয়াই বা কি পাইয়াছি? কতটুকু সার্থক করিয়াছি? তবে, আজ যদি সে এমন হাতেই পড়িয়া থাকে, যে নিজের জীবনটাকে এমন আকণ্ঠ-মগ্ন পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে কিছুতেই আর একটা জীবনকে তাহারই মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিবে না।

কিন্তু এ-সকল ত গেল আমার নিজের পক্ষ হইতে; কিন্তু অন্য পক্ষের আচরণ ঠিক আবার সেই পূর্ব্বেকার মত শুরু হইল। সমস্ত পথের মধ্যে একটাও কথা হইল না, এমন কি স্টেশনে পৌঁছিয়াও কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। অল্প সময়েই কলিকাতা যাইবার গাড়ির ঘণ্টা পড়িল, কিন্তু রতন টিকিট-কেনার কাজ ফেলিয়া যাত্রিশালার ক্ষুদ্র এককোণে আমার জন্য শয্যারচনায় প্রবৃত্ত হইল। অতএব বুঝা গেল এদিকে নয়, আমাদিগকে সেই ভোরের ট্রেনে পশ্চিমে রওনা হইতে হইবে। কিন্তু সেটা পাটনায় কিংবা কাশীতে কিংবা আর কোথাও, তাহা জানা না গেলেও এটা বেশ বুঝা গেল, এ-বিষয়ে আমার মতামত একবারেই অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী অন্যত্র চাহিয়া অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়া ছিল। রতন হাতের কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, মা, খবর পেলাম একটু এগিয়ে গেলে ভাল খাবার সব রকমই পাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কয়েকটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, বেশ ত, তাই যা না। কিন্তু দুধটা একটু দেখেশুনে নিস্, বাসী-টাসি আনিস নে যেন।

রতন কহিল, মা, তোমার নিজের জন্যে কিছু—

না, আমার জন্যে চাইনে।

এই 'না' যে কিরূপ তাহা আমরা সবাই জানি, এবং সকলের চেয়ে বেশি জানে বোধ হয় রতন নিজে। তবুও সে বার-দুই পা ঘষিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কাল থেকেই ত একরকম—

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল, তুই কি শুনতে পাস্‌নে রতন? কালা হয়েচিস্ ?

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রতন চলিয়া গেল। কারণ, ইহার পরেও তর্ক করিতে পারে এমন প্রবল পক্ষ ত আমি কাহাকেও দেখি না। আর প্রয়োজনই বা কি? রাজলক্ষ্মী মুখে স্বীকার না করিলেও আমি জানি রেলগাড়িতে বা রেলের সম্পর্কিত কাহারও হাতে কিছু খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। নিরর্থক কঠোর উপবাস করিতে ইহার জোড়া কোথাও দেখি নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কতদিন কত জিনিস ইহার বাটীতে আসিতে দেখিয়াছি, দাসী-চাকরে খাইয়াছে, দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে বিতরিত হইয়াছে, পচিয়া নষ্ট হইয়া ফেলা গিয়াছে; কিন্তু এ-সকল যাহার জন্য সে মুখেও দিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, তামাশা করিলে, হাসিয়া বলিত, হাঁ আমার আবার আচার! আমার আবার খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার! আমি ত সব খাই!

আচ্ছা, চোখের সামনে তার পরীক্ষা দাও?

পরীক্ষা? এখন? ওরে বাস রে! তা হলে আর বাঁচতে হবে! এই বলিয়া সে না-বাঁচিবার কোন কারণ না দেখাইয়াই অত্যন্ত জরুরি গৃহকর্মের অছিলায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সে মাছ-মাংস দুধ-ঘি খায় না আমি ক্রমশঃ জানিয়াছিলাম, কিন্তু এই না-খাওয়াটাই তাহার পক্ষে এত অশোভন এত লজ্জার যে, ইহার উল্লেখেই সে যে লজ্জায় কোথায় পলাইবে খুঁজিয়া পাইত না। তাই সহজে আর খাওয়া লইয়া অনুরোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। রতন ম্লানমুখে চলিয়া গেল, তখনও কথা কহিলাম না; খানিক পরে ঘটিতে গরম দুধ এবং ঠোঙ্গায় মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য দুধ ও কিছু খাবার রাখিয়া রতনের হাতেই যখন সমস্তটা তুলিয়া দিল, তখনও কিছু বলিলাম না, এবং রতনের করুণ চক্ষের নীরব মিনতিও স্পষ্ট বুঝিয়া তেমনই নির্বাক রহিলাম।

আজ কারণে-অকারণে কথায় কথায় তাহার না-খাওয়াটাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু একদিন ঠিক এরূপ ছিল না। তখন উপহাস পরিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কটাক্ষও কম করি নাই। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, ইহার আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছি। রতন চলিয়া গেলে আমার সেই কথাগুলাই আবার মনে পড়িতে লাগিল।

কবে, এবং কি ভাবিয়া যে সে এই কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি জানি না। তখনও আমি ইহার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ি নাই।

কিন্তু প্রথম যখন সে অপর্যাপ্ত আহার্য-বস্তুর মাঝখানে বসিয়া স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন গোপনে নিঃশব্দে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছিল, সে কত কঠিন! কিরূপ দুঃসাধ্য! কলুষ ও সর্ববিধ আবিলতার কেন্দ্র হইতে আপনাকে এই তপস্যার পথে অগ্রসর করিতে কতই না সে নীরবে সহিয়াছে! আজ এ বস্তু তাহার পক্ষে এমন সহজ এমন স্বাভাবিক যে, আমাদের চক্ষে পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব নাই, বিশেষত্ব নাই—ইহার মূল্য যে কি তাহাও ঠিক জানি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, তাহার এই কঠিন সাধনার সবটুকুই কি একেবারে বিফল,

একেবারে পণ্ডশ্রম হইয়া গেছে? আপনাকে বঞ্চিত করিবার এই যে শিক্ষা, এই যে অভ্যাস, এই যে পাইয়া ত্যাগ করিবার শক্তি, এ যদি না জীবনের মধ্যে তাহার অলক্ষ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিতে পাইত, আজ কি এমনি স্বচ্ছন্দে, এমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে সর্বপ্রকারে ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিত? কোথাও কি কোন বন্ধনেই টান ধরিত না? সে ভালবাসিয়াছে। এমন কত লোকেই ত ভালবাসে, কিন্তু সর্বত্যাগের দ্বারা তাহাকে এমন নিষ্পাপ, এমন একান্ত করিয়া লওয়া কি সংসারে এতই সুলভ?

যাত্রিশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, একটা মিটমিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল; কহিল, তুমি ঘুমোও নি?

না, কিন্তু এই ধুলোবালির উপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল। এই বলিয়া তাহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম; কিন্তু নিজের কাছে আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আস্তে আস্তে তাহার একটা হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রহিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলাম না।

আবার তেমনি নীরবে সময় কাটিতে লাগিল। সহসা একসময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয়নি লক্ষ্মী!

সে চুপিচুপি কহিল, কি কথা?

ইহাই বলিতে গিয়া সংস্কারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু থামিলাম না; কহিলাম, আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল-মন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই স্তিমিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না। আর—

বলিলাম, আরটা কি? পান-তামাক যোগান? না, সেটা কিছুতেই পেরে উঠব না।

কিন্তু আগের দুটো?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারতেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তার পরে নিঃশব্দ-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দ্যাখ, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হত; আবার ভাবতাম, যে মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্দুক নিয়ে কেবল জানোয়ার মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি ধার ধারে? এর ভেতরের এতবড় বেদনাকে অনুভব করাই কি তার সাধ্য! বরঞ্চ শিকার করার মত আঘাত দিতে পারাতেই যেন তার বড় আনন্দ। তোমার দেওয়া অনেক দুঃখই কেবল এই ভেবে আমি সইতে পেরেছি।

এবার চুপ করিয়া থাকার পালা আমার। তাহার অভিযোগের মূলে যুক্তি লইয়া বিচার চলিতেও পারিত, সাফাই দিবার নজিরেরও হয়ত অভাব হইত না, কিন্তু সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। তাহার সত্য-অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথাটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই, কিন্তু

সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, সেই করুণায় অভিনিষিক্ত সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দুটো কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল, এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের শুচিতা আবার একবার যেন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।

তথাপি একটা কথা তাহাকে বলিতেও পারিতাম। বলিতে পারিতাম, মানুষের একান্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলো যে কি করিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। না হইলে আমি স্বহস্তে জীবহত্যা করিতে পারি, এত বড় পরমাশ্চর্য নিজের কাছে আর আমার কি আছে? যে একটা পিপীলিকার মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা যূপকাষ্ঠের চেহারা যাহার আহার-নিদ্রা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়হীন কুকুর-বেড়ালের জন্য ছেলেবেলায় কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে—তাহার বনের পশু, গাছের পাখির প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া স্থির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। আর, এ কি শুধু কেবল আমিই এমনি? যে রাজলক্ষ্মীর অন্তর-বাহির আমার কাছে আজ আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে, সে কেমন করিয়া এতদিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পিয়ারীর জীবন যাপন করিতে পারিল!

এই কথাটাই মনে আনিয়াও মুখে আনিতে পারিলাম না। কেবল তাহাকে ব্যথা দিব না বলিয়াই নয়, ভাবিলাম কি হইবে বলিয়া? দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি? কি করিয়া যে ভোগী একদিনে ত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া যায়, নির্মম নিষ্ঠুর একমুহূর্তে করুণায় গলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এ রহস্যের কতটুকু সন্ধান পাই! কোন্ নিভৃত কন্দরে যে মানবাত্মার গোপন সাধনা অকস্মাৎ একদিন সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে তাহার কি সংবাদ রাখি? ক্ষীণ আলোকে রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে

উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলাম, এ যদি আমার ব্যথা দিবার শক্তিটাকেই কেবল দেখিতে পাইয়া থাকে এবং ব্যথা গ্রহণ করিবার অক্ষমতাকে স্নেহের প্রশ্রয়ে এতদিন ক্ষমা করিয়াই চলিয়া থাকে ত অভিমান করিবার আমার কি-ই বা আছে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

বলিলাম, তবু ত এ নিষ্ঠুরের জন্যই সর্বত্যাগ করলে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্বত্যাগ আর কই? নিজেকে ত তুমি নিঃস্বত্ব হয়েই আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে ত্যাগ করতে পারলাম না।

বলিলাম, হাঁ, নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ত তুমি আপনি দেখতে পাবে না—তাই, সে উল্লেখ আমি করবো না।

দুই

বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া আমাকে যে বেশ শক্ত করিয়াই ধরিয়াছিল তাহা পশ্চিমের শহরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বুঝা গেল। পাটনা স্টেশন হইতে রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে আমি অনেকটা অচেতন অবস্থাতেই নীত হইলাম। ইহার পরের মাসটা আমাকে জ্বর, ডাক্তার এবং রাজলক্ষ্মী প্রায় অনুক্ষণ ঘেরিয়া রহিল।

জ্বর যখন ছাড়িল, তখন ডাক্তারবাবু বেশ স্পষ্ট করিয়াই গৃহস্বামিনীকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও এই শহরটা পশ্চিমেরই অন্তর্গত এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়াও খ্যাতি আছে, তথাপি তাঁহার পরামর্শ এই যে, রোগীকে অচিরে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

আবার একবার বাঁধা-ছাঁদা শুরু হইয়া গেল, কিন্তু এবার কিছু ঘটা করিয়া। রতনকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার কোথায় যাওয়া হবে রতন?

দেখিলাম, এই নব-অভিযানের সে একেবারেই বিরুদ্ধে। সে খোলা দরজার প্রতি নজর রাখিয়া আভাসে ইঙ্গিতে এবং ফিসফিস করিয়া যাহা কহিল তাহাতে আমি যেন দমিয়া গেলাম। রতন কহিল, বীরভূম জেলার এই ছোট গ্রামখানির নাম গঙ্গামাটি। ইহার পত্তনি যখন কেনা হয় তখন সে একবার মাত্র মোক্তারজী কিষণলালের সহিত সেখানে গিয়াছিল। মা নিজে কখনও যান নাই—একবার গেলে পলাইয়া আসিতে পথ পাইবেন না। গ্রামে ভদ্রপরিবার নাই বললেই হয়,—কেবল ছোট জাতে ভরা,—তাদের না ছোঁয়া যায়, না আসে তারা কোন কাজে।

রাজলক্ষ্মী কেন যে এই-সব ছোটজাতির মধ্যে গিয়া বাস করিতে চাহিতেছে, তাহার হেতু যেন কতকটা বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গামাটি বীরভূমের কোথায়?

রতন জানাইল, সাঁইথিয়া না কি এমনি একটা ইস্টিসান হইতে প্রায় দশ-বারো ক্রোশ গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। পথ যেমন দুর্গম, তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে মাঠ আর মাঠ। তাতে না হয় ফসল, না আছে একফোঁটা জল। কাঁকুরে মাটি, কোথাও রাঙ্গা, আবার কোথাও যেন পুড়িয়া কালো হইয়া আছে। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আমাকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, বাবু, মানুষে যে সেখানে কি সুখে থাকে আমি ত ভেবে পাইনে। আর যারা এই-সব সোনার জায়গা ছেড়ে সে-দেশে যেতে চায় তাদের আর কি বলবো!

মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিলাম। এই-সকল সোনার স্থান ত্যাগ করিয়া কেন যে সেই মরুভূমির মধ্যে নির্বান্ধব ছোটলোকের দেশে রাজলক্ষ্মী আমাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহা ইহাকে বলাও যায় না, বুঝানও চলে না।

শেষে বলিলাম, বোধ হয় আমার অসুখের জন্যই যেতে হচ্ছে রতন। এখানে থাকলে ভাল হবার আশা কম, এ ভয় সব ডাক্তারেই দেখাচ্ছেন।

রতন বলিল, কিন্তু অসুখ কি কারও হয় না বাবু? সারাবার জন্যে কি তাদের সব ঐ গঙ্গামাটিতেই যেতে হয়?

মনে মনে বলিলাম, জানি না তাহাদের সব কোন্ মাটিতে যাইতে হয়। হয়ত তাহাদের পীড়া সোজা, হয়ত তাহাদের সাধারণ মাটির উপরেই সারে। কিন্তু আমাদের ব্যাধি সহজও নয়; সাধারণও নয়, ইহার জন্য হয়ত ওই গঙ্গামাটিরই একান্ত প্রয়োজন।

রতন কহিতে লাগিল, মায়ের খরচের হিসাবপত্রও আমরা কোনদিন ভেবে পেলাম না। সেখানে না আছে ঘরদোর, না আছে কিছু। একজন গোমস্তা আছে,

তার কাছে হাজার-দুই টাকা পাঠানো হয়েছে একটা মেটে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে। দেখুন দেখি বাবু, এ কি-সব অনাছিষ্টি কাণ্ডকারখানা! চাকর বলে যেন আর আমরা কেউ মানুষ নয়!

তাহার ক্ষোভ এবং বিরক্তি দেখিয়া বলিলাম, নাই গেলে রতন অমন জায়গায়! জোর করে ত তোমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে না!

আমার কথায় রতন কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না। কহিল, মা পারেন। কি জানি বাবু কি জাদুমন্ত্র জানেন, যদি বলেন, তোমাদের সব যমের বাড়ি যেতে হবে, এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের এমন সাহস কারও নেই যে বলে, না। বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

কথাটা রতন নিতান্তই রাগ করিয়া বলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন অকস্মাৎ একটা নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়া গেল। কেবল আমিই নয়, সকলেরই ঐ এক দশা! ওই জাদুমন্ত্রের কথাটাই ভাবিতে লাগলাম। মন্ত্রতন্ত্রে যে সত্যই বিশ্বাস করি তাহা নয়, কিন্তু এক-বাড়ি লোকের মধ্যে কাহারও যখন এতটুকু শক্তি নাই যে যমের বাড়ি যাইবার আদেশটাকে পর্যন্ত অবহেলা করে, তখন সে বস্তুটাই বা কি!

ইহার সমস্ত সংস্রব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমি কি না করিয়াছি! বিবাদ করিয়া বিদায় লইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া দেখিয়াছি, এমন কি দেশত্যাগ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেছি—জীবনে আর না দেখা হয়; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই একটা গোল বস্তুর উপর সরলরেখা টানিবার মত বারংবার কেবল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন রতন আসিয়া আজ আমাকে এই খবরটা দিয়া গেল—রাজলক্ষ্মী জাদুমন্ত্র জানে!

তাই বটে! অথচ, এই রতনকেই জেরা করিলে জানা যাইবে, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ দেখি মস্ত একটা পাথরের বাটিতে কি কতকগুলো লইয়া এই পথেই রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া নীচে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিলাম, শোন, সবাই বলে তুমি নাকি জাদুমন্ত্র জান?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি জানি?

বলিলাম, জাদুমন্ত্র!

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ জানি। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আমার গায়ের জামাটা ঠাওর করিয়া দেখিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওটা কালকের সেই বাসী জামাটা না?

নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, হাঁ সেইটাই বটে; কিন্তু থাক, বেশ ফর্সা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ফর্সার কথা নয়, পরিষ্কারের কথা বলছি। তার পরে একটুখানি হাসিয়া বলিল, বাহিরের ওই দেখান ফরসাটা নিয়েই চিরকাল গেলে। ওটা তাচ্ছিল্য করতেও আমি বলিনে, কিন্তু যে ভেতরটা ঘামে-ঘামে নোংরা হয়ে ওঠে সেটা দেখতে শিখবে কবে? বলিয়া সে রতনকে ডাক দিল। কেহই জবাব দিল না। কারণ কর্ত্রীর এইপ্রকার উচ্চ মধুর আহ্বানের সাড়া দেওয়া এ বাড়ির বিধি নয়; বরঞ্চ মিনিট পাঁচ-ছয় গা-ঢাকা দিয়া থাকাই নিয়ম।

রাজলক্ষ্মী তখন হাতের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘর হইতে একটা কাচা জামা আনিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার মন্ত্রী রতনকে বোলো, যতক্ষণ সে জাদুমন্ত্র না শিখচে ততক্ষণ যেন এই দরকারী কাজগুলো হাত দিয়েই করে। এই বলিয়া সে পাথরের বাটিটা তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

জামাটা বদলাইতে গিয়া দেখিলাম তাহার ভিতরটা যথার্থই মলিন হইয়া গেছে। হইবার কথা, এবং আমিও যে আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাও

নয়, কিন্তু আমার মনটা ছিল নাকি ভাবিবার দিকেই, তাই অতি তুচ্ছ খোলসটার অন্তর-বাহিরের বৈসাদৃশ্যই আমাকে আবার নূতন আঘাত দিল।

রাজলক্ষ্মীর শুচিবায়ুগ্রস্ততা অনেক সময়েই আমাদের কাছে নিরর্থক, পীড়াদায়ক, এমন কি অত্যাচার বলিয়াও ঠেকিয়াছে, এবং এখনই যে তাহার সমস্তটাই এক মুহূর্তে মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল, তাহাও সত্য নয়, কিন্তু এই শেষ শ্লেষটুকুর মধ্যে যে বস্তুটা আমি এতদিন মন দিয়া দেখি নাই তাহাই দেখিতে পাইলাম। যেখানে এই অদ্ভুত মানুষটির ব্যক্ত ও অব্যক্ত জীবনের ধারা দুটা একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানটাতেই আজ গিয়া আমার চক্ষু পড়িল। একদিন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই পিয়ারী তাহার উন্মত্ত যৌবনের কোন্ অতৃপ্ত লালসার পঙ্ক হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্রদল-বিকশিত পদ্মের মত চক্ষের নিমিষে বাহির করিয়া দিল? আজ মনে হইল সে ত পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে! রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দুটি নামের মধ্যে যে তাহার নারী-জীবনের কত বড় ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়াই মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি, একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই ত সে মানুষ!

পিয়ারীর সমগ্র ইতিহাস আমি জানিও না, জানিতেও ইচ্ছা করি না। রাজলক্ষ্মীরই যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি তাও নয়; শুধু এইটুকুই জানি, দু'জনের মর্মে ও কর্মে চিরদিন কোন মিল কোন সামঞ্জস্যই ছিল না, চিরদিনই উভয়ে পরস্পরের উলটা স্রোতে বহিয়া গেছে। তাই একের নিভৃত সরসীতে যখন শুদ্ধ সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর

দল মেলিয়াছে তখন অপরের দুর্দান্ত জীবনের ঘূর্ণিবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি, প্রবেশের পথই পায় নাই। তাই ত তাহার একটি পাপড়িও খসে নাই, এতটুকু ধূলাবালিও উড়িয়া গিয়া আজও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শীতের সন্ধ্যা অচিরে গাঢ় হইয়া আসিল, আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া ভাবিতেই লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়! পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি সে তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর রাজলক্ষ্মী যে তাহার সহস্র-কোটি দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া আজ তাহার অকলঙ্ক শুভ্রতায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব! মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুলভ্রান্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব; আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা, সকল অপমান নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সস্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না?

সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মন যেন আজ তাহার সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না, কখনই না, এ কখনই না! এমন যে হইতেই পারে না।

সে বেশিদিন নয়—নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন সেই পরাভূতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল। আমার মন যেন ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু আজ আমার সেই মন যেন সহসা সবলে এই কথাটাই বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ও দান দানই নয়, ও ফাঁকি। যে পিয়ারীকে তুমি জানিতে না, সে তোমার জানার বাহিরেই পড়িয়া থাক। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকে তুমি সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ কর,

এবং যাঁহার হাত দিয়া সংসারের সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে, ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

নূতন চাকরটা আলো আনিতেছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া অন্ধকারেই বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীর সকল ভাল-মন্দের সহিত আজ তাহাকে নিলাম। এইটুকুই আমি পারি, কেবল এইটুকুই আমার হাতে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত যাঁহার হাতে সেই অতিরিক্তের বোঝা তাঁহাকেই দিলাম। বলিয়া সেই অন্ধকারেই খাটের বাজুর উপর নীরবে মাথা রাখিলাম।

পূর্বের মত পরদিনও যথারীতি আয়োজন চলিল, এবং তাহার পরের দিনও সারাদিন-ব্যাপী উদ্যমের অবধি রহিল না। সেদিন দুপুরবেলায় প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকে থালা-ঘটি-বাটি, গাড়ু-গেলাস, বক্‌নো-পিলসুজ অপর্যাপ্ত ভরা হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়া ও-সমস্ত দেখিতেছিলাম। একসময়ে ইশারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব হচ্চে কি? তুমি কি আর ফিরে আসতে চাও না নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব শুনি?

আমার মনে পড়িল, এ-বাড়ি সে বঙ্কুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু ধর যদি সে-জায়গা তোমার বেশিদিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগলে চলে এসো, আমি তাতে বাধা দেব না।

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমি আঘাত পাইয়া চুপ করিলাম। এটা আমি বহুবার দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরনের কোন প্রশ্নই যেন সরলচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। আমিও যে তাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার সংস্রবে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চাহে না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস এক মুহূর্তেই

এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই রি-রি করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে এবং কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না। সেও ইহারই সন্ধানে অবিশ্রাম ঘুরিতেছে—এবং গঙ্গামাটি এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে কি না, সে তথ্য যাঁহার হাতে তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়াই আছেন।

সর্ববিধ আয়োজনে আরও দিন-চারেক কাটিল এবং আরও দিন-দুই গেল শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত গঙ্গামাটির উদ্দেশে আমরা সত্য সত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল কাটিল না—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারী করিয়া গাড়ির এককোণে চুপচাপ বসিয়া রহিল; স্টেশনের পর স্টেশন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি মন্দ, স্বাস্থ্যকর কি ম্যালেরিয়ায় ভরা, সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা আমার এতদিন নিরুপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুলচুক, অনেক দুঃখ-দৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে-সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবিলা ত বটেই, বরঞ্চ এক প্রকারের স্নেহই জন্মিয়া গেছে। তাহাদের জন্য আমিও কাহাকে দোষ দিই না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু এই যে কোথায় কি-একটা নূতনত্বের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে।

আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরি করিবার রাস্তা নাই। অথচ ইহার না জানি ভাল, না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল-মন্দ কোনটাই আজ আর কোনমতেই ভাল লাগে না। গাড়ি যতই দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোঝা আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কত

কি যে মনে হইতে লাগিল তাহার অবধি নাই। মনে হইল, অচির ভবিষ্যতে হয়ত আমাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না পারিব লইতে, না পারিব ফেলিতে। তখন কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না, ভাবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী জানালার বাহিরে দু'চক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকে আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে! অথচ একটা দিন পূর্বেও এই দ্বিধার যাঁতাকল হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, তোমার সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম লক্ষ্মী। অথচ আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত, এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তাই ভাবি, সংসারে করিব বলায় এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান!

তিন

সাঁইথিয়া স্টেশনে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীরাম স্বয়ং স্টেশনে আসিতে পারেন নাই—সেদিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন-দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার রোকায় অবগত হওয়া গেল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় 'অত্র' অর্থাৎ তিনি এবং তাঁহার গঙ্গামাটির সমস্ত কুশল। আদেশমত বাহিরে খানচারেক গো-যান অপেক্ষা করিতেছে—তাহার দুইখানি খোলা এবং দুইখানি ছই-দেওয়া। একখানিতে পুরু করিয়া খড়, আর খেজুরপাতার চাটাই বিছান—সেখানি স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানীর। অপরখানিতে সামান্য কিছু খড় আছে বটে, কিন্তু চাটাই নাই। সেখানে ভৃত্যাদি অনুচরগণের জন্য। খোলা দুইখানিতে মালপত্র বোঝাই হইবে। এবং যদ্যপি স্থানসঙ্কুলান না হয় ত পাইকদিগকে হুকুম করিলে বাজার হইতে আরও একটা যোগাড় করিয়া আনিবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আহারাদি সমাপনপূর্বক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রা করাই বিধেয়। কারণ অন্যথা কর্ত্রীঠাকুরানীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবং এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করাইতেছেন যে, পথে ভয়াদি কিছু নাই—স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন।

কর্ত্রীঠাকুরানী রোকা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, এবং যে ইহা দিল তাহাকে ভয়াদির কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বাবা, কাছাকাছি একটা পুকুর-টুকুর আছে দেখিয়ে দিতে পার, একটা ডুব দিয়ে আসি?

আছে বৈ কি মাঠান্। উই যে হোথাকে—

তা হলে চল ত বাবা দেখিয়ে দেবে; বলিয়া সে তাহাকে এবং রতনকে সঙ্গে লইয়া কোথাকার কোন্ অজানা পুকুরে স্নানাহ্নিক করিতে চলিয়া গেল। অসুখ প্রভৃতির ভয় দেখান নিরর্থক বলিয়া আমি প্রতিবাদও করিলাম না।

বিশেষতঃ ইহাতেই যদি বা সে কিছু খায়, বাধা দিলে সেটাও তাহার আজিকার মত বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সে মিনিট-দশেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই চলিতেছিল, সামান্য দুই-একটা বিছানা খুলিয়া গাড়িতে পাতা হইতেছে। আমাকে সে কহিল, তুমি কেন এইবেলা কিছু খেয়ে নাও না? সমস্তই ত আনা হয়েচে।

বলিলাম, দাও।

গাছতলায় আসন পাতিয়া একটা কলাপাতে সে সমস্ত গুছাইয়া দিতেছে, আমি নিস্পৃহচিত্তে কেবলমাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া আছি, এমন সময় এক মূর্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, নারায়ণ!

রাজলক্ষ্মী তাহার ঝুঁটি-করা ভিজে চুলের উপর বাঁ হাতের পিছন দিয়া আঁচলটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আসুন।

অকস্মাৎ এই নিঃসঙ্কোচ নিমন্ত্রণের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম এক সাধু দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তাহার বয়স বেশি নয়, বোধ হয় কুড়ি-একুশের মধ্যে, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমনি সুশ্রী। চেহারাটা কৃশতার দিকেই—হয়ত একটু দীর্ঘকায় বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু রঙ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। চোখ, মুখ, ভ্রূ ও কপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়। বাস্তবিক, পুরুষের এত রূপ আর আমি কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

তাহার পরিধানে গেরুয়া বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন—গ্রন্থিবাঁধা। গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবীরও যেমন জীর্ণ দশা, পায়ের পাঞ্জাবী জুতাজোড়াটিও প্রায় তদ্রূপ; হারাইলে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। রাজলক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসন পাতিয়া দিল। মুখ তুলিয়া কহিল, আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি, আপনাকে মুখ-হাত ধোবার জল দিক?

সাধু কহিলেন, তা দিক, কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আচ্ছা, আপনি খেতে বসুন, সে পরে হবে এখন। বাড়ি ফেরবার টিকিট চাই ত? সে আমি কিনে দেব। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

সাধুজী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, না, সে প্রয়োজন নেই। আমি খবর নিয়েচি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্চেন। আমার সঙ্গে একটা ভারী বাক্স আছে, সেটা যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়িতে তুলে নেন। আমিও ওই দিকেই যাচ্চি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আর বেশি কথা কি! কিন্তু আপনি নিজে?

আমি হেঁটেই যেতে পারব। বেশি দূর নয়, ক্রোশ ছয়-সাত হবে।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু না বলিয়া রতনকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল, এবং নিজে পরিপাটি করিয়া সাধুজীর খাবার সাজাইতে নিযুক্ত হইল। এই কাজটি রাজলক্ষ্মীর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাহার জোড়া পাওয়া ভার।

সাধু খাইতে বসিলেন, আমিও বসিলাম। রাজলক্ষ্মী খাবারের হাঁড়ি লইয়া পাশেই রহিল। মিনিট-দুই পরে রাজলক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুজী, আপনার নামটি?

সাধু খাইতে খাইতে কহিলেন, বজ্রানন্দ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাপ্ রে বাপ্! ডাকনামটি?

তাহার কথার ধরনে চাহিয়া দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি চাপা হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম। সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই—নিজেরও না, পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে! কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন কত দিন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়ারীর মুখখানি আমি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আবার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরানো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধু একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, ভালমানুষটির মত মাথা নাড়িয়া কহিল, তা সত্যি। তবে একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বল ত তোমার সেই উট আর টাট্টুঘোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়ে দাও ত—আহা হা! ষাট্ ষাট্! কে বুঝি বাড়িতে নাম করচে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম খাইলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কর্ত্রীঠাকুরানীর আড়ালে কতকটা অনুচরের মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলাইয়া যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি তা হলে একবার সন্ন্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশি কথার জো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটা আঙ্গুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—উহুঁ হুঁ—একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গাম্ভীর্য আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জন করিয়া উঠিল, বলিল, তাই বৈ কি! আচ্ছা, একবার নাহয় আমারি জন্যে—তাও ঠিক সত্যি নয়—আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই—কিন্তু আর তিনবার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না।আচ্ছা—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী জবাব দিল। কহিল, ওঁর নামে কি হবে? উনি বয়সে অনেক বড়, ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি বলে ডাকলে রাগ করব না। আর আমি কোন না বয়সে তোমার বছর-পাঁচেকের বড় হব!

সাধুজীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমিও এতটা প্রত্যাশা করি নাই। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—এ সেই পিয়ারী। সেই স্বচ্ছ, সহজ স্নেহাতুরা আনন্দময়ী ! সেই যে আমাকে কোনমতেই শ্মশানে যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিকিতে দিল না—এ সেই। এই যে ছেলেটি তাহার কোথাকার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে—সেখানকার সমস্ত অজানা বেদনা রাজলক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া টান ধরিয়াছে। কোনমতে ইহাকে সে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার তত আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের ও-সব বলে ডাকতে নেই।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না। কহিল, নেই কেন? দাদার বৌকে সন্ন্যাসীরা কিছু মাসি বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না—ও ছাড়া আমাকে তুমি আর কি বলে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরুপায় হইয়া শেষে সলজ্জ হাসিমুখে কহিল, আচ্ছা বেশ। ছ-সাত ঘণ্টা আরও আছি আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় ত তাই বলেই ডাকব। রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হলে ডাক না একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হলে ডাকব বলেচি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়।

রাজলক্ষ্মী তাহার পাতে আরও গোটা-চারেক সন্দেশ ও বরফি দিয়া কহিল, বেশ, তা হলেই আমার হবে। কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বলে তোমাকে ডাকবো ঠাউরে পাচ্চিনে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, ওঁকে ত ডাকতুম সন্ন্যাসীঠাকুর বলে। সে আর হয় না, ঘুলিয়ে যাবে। তোমাকে নাহয় ডাকবো সাধুঠাকুরপো বলে, কি বল?

সাধুজী আর তর্ক করিলেন না, অতিশয় গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, বেশ তাই ভাল।

তিনি এদিকে যাই হোন, দেখিলাম আহারাদির ব্যাপারে তাঁহার রসবোধ আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের তিনি কদর বুঝেন এবং কোনটির কিছুমাত্র অমর্যাদা করিলেন না। একজন সযত্নে পরম স্নেহে একটির পর একটি দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

মনে মনে বুঝিলাম সাধুজী পূর্বে যাহাই করুন, সম্প্রতি এরূপ উপাদেয় ভোজ্য এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রুটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে দর্শকের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা-কয়েক পেঁড়া এবং বরফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া একসঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নূতন কুটুম্ব দু'জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি রোগা মানুষ, তুমি উঠে হাত-মুখ ধোও গে না। আমাদের সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি?

সাধুজী একবার আমার প্রতি, একবার রাজলক্ষ্মীর প্রতি এবং তাহার পরে হাঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, দীর্ঘশ্বাস পড়বার কথাই বটে, কিছুই যে আর রইল না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ঠিক এমনি সময় রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা চিঁড়ে ত ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই তোমার জন্যে পাওয়া গেল না।

সাধু বেচারা অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো! মাইরি বলচি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেব।

সাধু ক্ষণকাল বিস্ময়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিলেন যে, এ কেমন স্ত্রীলোক যে একদণ্ডের পরিচয়েই এত বড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল! রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিস্ময়ের কথাই বটে। তার পরে তিনি একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু আপনারও ত কিছু খাওয়া চাই। আমার মাথা খেয়ে ত আর সত্যি সত্যি পেট ভরবে না।

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, ছি, ছি, অমন কথা মেয়েমানুষকে বলতে নেই ভাই, আমি এ-সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না। চাকরদের খাবার ঢের আছে। আজ রাতটা বৈ ত নয়, যা হোক একমুঠো চিঁড়ে-টিঁড়ে খেয়ে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে। কিন্তু ক্ষিদে থাকতে তুমি যদি

উঠে যাও, তা হলে তাও আমার খাওয়া হবে না ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞেস কর। বলিয়া সে আমাকে আপীল করিল।

কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম, এ যে সত্যি সে আমি হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছি সাধুজী। মিথ্যে তর্ক করে লাভ নেই ভায়া, পার হাঁড়িটা উপুড় না হওয়া পর্যন্ত সেবাটা যেমন চলচে চলুক, নইলে ও আর কোন কাজেই আসবে না। খাবারটা ট্রেনে এসেচে, সুতরাং অনাহারে মারা গেলেও ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ান যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিলেন, কিন্তু এ-সব খাবার ত গাড়িতে ছোঁয়া যায় না!

আমি বলিলাম, সে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ করে উঠতে পারলাম না ভায়া, আর তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পারবে? তার চেয়ে বরঞ্চ কাজ সেরে উঠে পড়, নইলে সূয্যি ডুব দিলে হয়ত চিঁড়ে-জলও গলা দিয়ে গলবার পথ পাবে না। বলি, ঘণ্টাকয়েক আরও ত তুমি সঙ্গে আছ, শাস্ত্রের বিচার পার ত পথে যেতে যেতেই বুঝিয়ো, তাতে কাজ না হোক অন্ততঃ অকাজ বাড়বে না। এখন যা হচ্ছে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে সমস্ত দিনই উনি কিছুই খাননি?

বলিলাম, না। তা ছাড়া কালও কি নাকি একটা ছিল, শুন্‌চি, দুটো ফলমূল ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া—বোধ হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাৎ থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এতে আপনার কষ্ট হয় না?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু হাসিল; কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোনটাতেই জানা যাবে না। তবে চোখে যা দেখেচি তাতে আরও দু-একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেচ চোখে? কখ্‌খনো না।

ইহার আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। বেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

রতন এবং সঙ্গের দু'জনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী নিজের ব্যবস্থা কি করিল সেই জানে।

আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু ছিল না। মালবোঝাই গাড়ি দুইটা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ি মাঝখানে ও আমার গাড়িটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া, হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ কর না?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পারলে না হয় উঠেই বসব—কিন্তু এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তা হলে আমার বডিগার্ড হয়ে চল ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে নিজের গাড়ির কাছে ডাকিয়া লইল।

সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ি, গরু ও গাড়োয়ানের সম্মিলিত উপদ্রবে তাঁহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই শুনিতে শুনিতে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই সে তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু আজ কোথায় চলেচ সত্যি বল ত ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু জবাব দিলেন, আপনার গঙ্গামাটিও জানিনে, আমার গোপালপুরও চিনিনে, তবে সম্ভবতঃ ও দুটো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম।

তা হলে এতরাত্রে গ্রামই বা কি করে ঠাওরাবে, যাঁর ওখানে যাচ্চ তাঁর বাড়িই বা কি করে খুঁজে পাবে?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরান শক্ত হবে না, কারণ পথের উপরেই নাকি একটা শুক্‌নো পুকুর আছে, তার দক্ষিণ দিকে ক্রোশখানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ি খোঁজবার দুঃখ পোহাতে হবে না, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া যাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতের রাত্রে গাছতলায়? ওই সামান্য কম্বলটা মাত্র অবলম্বন করে? সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না ঠাকুরপো।

তাহার উদ্বেগ আমাকে পর্যন্ত আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু আমাদের ত ঘরবাড়ি নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিদির চোখের সামনে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাই নে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিস গাড়ি হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসীঠাকুরের বাক্সটা আজ রাত্রির মত আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা হলে ঠাণ্ডায় আর কষ্ট নাই করলে ভায়া, এসো না আমার গাড়িতে।

সাধু একটু ভাবিয়া কহিলেন, থাক এখন। দিদির সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ভাবিলাম, তা বটে! নূতন সম্বন্ধটা অস্বীকারের দিকেই সাধুজীর মনে মনে লড়াই চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তবুও শেষরক্ষা হইল না। হঠাৎ একসময়ে যখন তিনি অঙ্গীকার করিয়াই লইলেন, তখন অনেকবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর পালালেই কিন্তু ভাল করতে—শেষে আমার দশা না হয়! অথচ চুপ করিয়া রহিলাম।

দু'জনের কথাবার্তা অবাধে চলিতে লাগিল। গরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে এবং তন্দ্রার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলাপের সূত্র হারাইতে থাকিলেও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া চলিতে চলিতে আমারও সময়টা মন্দ কাটিল না।

বোধ করি একটু তন্দ্রামগ্নই হইয়াছিলাম, সহসা শুনিলাম—প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার ঐ বাক্সটিতে কি আছে ভাই?

উত্তর আসিল, গোটা-কয়েক বই আর ওষুধপত্র আছে দিদি।

ওষুধ কেন? তুমি কি ডাক্তার?

আমি সন্ন্যাসী। আচ্ছা, আপনি কি শোনেন নি দিদি, আপনাদের ওদিকে কি রকম কলেরা হচ্ছে?

কৈ না! সে কথা ত আমাদের গোমস্তা আমাকে জানান নি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কলেরা সারাতে পার?

সাধুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক ত আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হুকুম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতেও ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যেই ত সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি কেবল এইজন্যই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই?

সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি। তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।

আমাদের? তবে বুঝি তোমাদের একটা দল আছে ঠাকুরপো?

সাধু জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজলক্ষ্মী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু সেবা করার জন্য ত সন্ন্যাসী হবার দরকার হয় না ভাই। তোমাকে এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে বল ত?

সাধু এ প্রশ্নেরও বোধ হয় উত্তর দিলেন না, কারণ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই কাহারও শুনিতে পাইলাম না। মিনিট-দশেক পরে কানে গেল সাধু কহিতেছেন, দিদি, আমি ছোট্ট সন্ন্যাসী, আমাকে ও-নাম না দিলেও চলে। কেবল নিজের কতকগুলো ভার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় অপরের বোঝা তুলে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল না। সাধু বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েচি, আপনি আমাকে ক্রমাগত ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করচেন। কেন জানিনে, বোধ হয় দিদি বলেই। কিন্তু যাদের ভার নিতে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েচি, এরা যে কত দুর্বল, কত রুগ্ন, কিরূপ নিরুপায় এবং সংখ্যায় কত, এ যদি একবার জানেন ত ও-কথা আর মনেও আনতে পারবেন না।

ইহারও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে প্রসঙ্গ উঠিল এইবার উভয়ের মন এবং মতের মিল হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধুজীও ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিলেন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ, ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানি না; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং ঢের বড় হৃদয় দিয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে চোখের ঘুম জলে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল এবং বুকের ভিতরটা ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে ব্যথায় যেন মথিত হইয়া যাইতে লাগিল। ও-গাড়ির অন্ধকার কোণে একাকী বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা প্রশ্নও করিল না, একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না। তাহার নীরবতায় সাধুজী কি ভাবিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই একান্ত স্তব্ধতার পরিপূর্ণ অর্থ আমার কাছে গোপন রহিল না।

দেশ বলিতে যেথায় দেশের চৌদ্দ-আনা নরনারী বাস করেন, সেই পল্লীগ্রামের কাহিনীই সাধু বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই—জঙ্গলের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম যেথায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প, জন্মভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না-থাকা যে কত বড় না-থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই দৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।

শুষ্ক শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। পথের ধূলা শিশিরে ভিজিয়া ভারী হইয়াছে; তাহারই উপর দিয়া গাড়ির চাকা এবং গরুর ক্ষুরের শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়, আকাশে জ্যোৎস্না পাণ্ডুর হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ভিতর দিয়া শীতের এই স্তব্ধ নিশীতে আমরা অজানার দিকে ধীর মন্থরগতিতে অবিশ্রাম চলিয়াছি।

অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া, আর কে নাই, জানা গেল না,—সবাই শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে এবং পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই-ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মনে হয় তোমাকে যেন আমি চিনতে পেরেচি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে একবার তোমাদেরই ভাইবোনদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না; তার পরে ভাঙ্গা গলায় কহিল, আমার কি সে সুযোগ হতে পারে আনন্দ! আমি যে মেয়েমানুষ, এ কথা কি করে ভুলব ভাই!

সাধু কহিলেন, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়েমানুষ, এই কথাটাই যদি ভোলো ত কষ্ট করে তোমাকে ও-সব দেখিয়ে আমার কি লাভ হবে?

চার

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারি দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখচ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়ে সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মস্ত জমিদারি কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি! তাঁহার কথায়, তাঁহার পার্থিব অবস্থা সম্বন্ধে আমার এক প্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরলভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ও-সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার শহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাব? কিন্তু আজ সে ত অনেক দূরের কথা ভাই!

সাধু কহিলেন, পার ত আর ফিরো না দিদি। এই-সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ-কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেচে। যখন কাছে ছিলে তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহরবাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে

পার দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ির জন্য মন তোমার কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিলেন, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল, কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিতোকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিলেন, কিন্তু বাড়ি ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েচি, তাই শুধু পেয়েচি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, উনি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েচেন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসি গে। আচ্ছা দিদি, কখনো দু-চারদিন যদি তোমাদের অতিথি হই, উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনিটি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ করব কি না জিজ্ঞেসা করলে না? আচ্ছা চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তারপর তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক পরে আমার গাড়িতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পার্শ্বে সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারীকে আর একটু জায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়াচড়া করিতে গেলে তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিংবা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে, এবং এই গভীর নিশীথে আর একদফা

দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা-প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ি কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ি আসিয়া থামিল আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা-চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ ছোটজাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ-ষাটটি নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া তামাশা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথাযোগ্যভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাহাই থাক, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুমভাঙ্গা মুখ এক নিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরুলের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল। কর্ত্রীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গি করিয়া তাহাদের তাড়া করিল যে, গাড়োয়ান দু'জন সুমুখে না থাকিলে সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিত। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত সব ছোটজেতের মরণ! দেখচেন বাবু, ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্ধা—যেন রথ-দোল দেখতে এসেচে! আমাদের মত সব ভদ্দরলোক কি এখানে থাকতে পারে বাবু! এখুনি সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে একাকার করে দেবে।

'ছোঁয়াছুঁয়ি' কথাটা সর্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজটা সমাধা করিয়া তিনি একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং কাছাকাছি যে

ছেলেটিকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা ত ভাই, এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—একঘটি জল নিয়ে আয়—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, একছটাক দুধ চেয়ে আনি।

গাঁয়ের টাট্‌কা খাঁটি জিনিস—চায়ের রঙটা যা দাঁড়াবে দিদি, বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দিদি কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অপ্রসন্নমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা ত বাবা, ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়িল, তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। একমুহূর্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার চেয়েও ছোট সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুঁলি কেন তুই? চল্‌ হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি। বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গীতেই ছেলেটাকে যেন গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সাধু হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই চা চাই!

সাধু বলিলেন, গৃহীদের রাত পোহায় নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়িটার মধ্যে ঢুকে দেখা যাক কাঠকুটো উনুন-টুনুন আছে কি না। ওহে কর্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু

আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই হাড়িঁটায় বরফি কিছু ছিল না? না, গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেষ করেচেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। পাড়ার যে দু-চারজন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময় গোমস্তা কাশীরাম কুশারীমহাশয় হন্তদন্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিন-চারজন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়িভরা শাকসবজি ও তরিতরকারি, কাহারো হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটা বৃহদায়তন রোহিত- মৎস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপর গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাড়িগোঁফ কামানো—রঙটি ফরসার দিকেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। কিন্তু সাধুজী এ-সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয়ে মত দিলেন, এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্বিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধুমহারাজের শুভাগমন-সম্বন্ধে গোমস্তা মহাশয় পূর্বাহ্ণে কোন সংবাদ পান নাই; তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর বার বার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেচে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজে হবে না দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ

আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কুশারীমহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং ভাঁড়ারঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘরখানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। একধারে একটি ছোট কূপ এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট-বড় তুলসীগাছের সারি এবং গোটা-চারেক যুঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সবসুদ্ধ জায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তিবোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল সন্ন্যাসীভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে মনে খুশিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্নাঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিল না। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারী করিয়াই একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেয়ালা-দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না, গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক। বাঁধটাও দূরে নয়, অমনি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারি পরিদর্শন করে আসবেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই—লজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, দেখে লোভ হচ্চে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা জানি। সন্ন্যাসীদের স্বভাবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, না মহারাজ, অমন টাট্কা মাছের মুড়ো তোমাকে দিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে রান্নাটা আমিই চড়িয়ে দেব। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত রতন কোন কথায় বা কাজে যোগদান করে নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্ভীরস্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর কি একটা পোড়াদেশের লোকে বলে, ওতে যেন আপনি নামবেন না। ভয়ানক জোঁক আছে, এক-একটা নাকি এক হাত করে।

মুহূর্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া গেল—বলিস কি রতন, এদিকে কি বড্ড জোঁক নাকি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাইত শুনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে হাঁ শুনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাপ্তে ভেবে ভেবে আচ্ছা ফন্দি বার করেচে! ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, আসুন। জোঁক আছে কি না, সে পরীক্ষা নাহয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাঁহার দিদি কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেন না, জোঁকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ নাহয় থাক আনন্দ। নতুন জায়গা, বেশ না জেনেশুনে অমন দুঃসাহস করা ভাল হবে না। রতন, তুই নাহয় ওঠ বাবা, এইখানেই দু ঘড়া জল কুয়ো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল—তুমি রোগামানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন জলে নেয়ে এস না। বাড়িতেই দু ঘটি জল মাথায় দিয়ে আজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি, যে আমাকেই কেবল সেই জোঁকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্চেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল। সে ক্ষণকাল নীরবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিষিক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে ভাই মানুষের হাতের বাইরে। যে বাপ-মায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা-অচেনা বোনেরই কথা রাখবে?

সাধু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা-অচেনা কথাটি বলবেন না দিদি। আপনাদের সবাইকে চিনব বলেই ত ঘর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত? এই বলিয়া তিনি একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও পিছুপিছু তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামখানিকে দেখিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট এবং আমরা যাহাদের ছোটজাত বলি তাহাদেরই। বস্তুত, ঘর-দুই বারুজীবী এবং এক ঘর কর্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরিদের বাস। বাউরিরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। গ্রামের উত্তর দিকে যে জল নিকাশের বড় নালা আছে, তাহারই ওপারে পোড়ামাটি। শোনা গেল, ও গ্রামখানা বড় এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুশারীমহাশয়ের বাটীও ওই পোড়ামাটিতেই। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আপাততঃ নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপসা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙ্গলাদেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। একছটাক জমিজায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপ্‌ড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সৎগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত

ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই এই অশুচি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয়ত এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই।

পথের কুক্কুর যেন জন্মিয়া গোটা-কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।

কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্চে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবছেন এ-সব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা মোটেই নয়।

আমি ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কিরকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তাহলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না, এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট-আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েচেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারি করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম জমিদারি এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্নের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাত্বিক, এবং অসাত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ এরূপ উদ্দাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমঝদার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আহার করিতে লাগিলেন। চর্বণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধচি নে ভাই?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি, ঠকবেন। তা সে যাই হোক, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে

পড়ল না যার জল ছোঁয়া যায়। এমন একটা ঘর দেখলাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে—যেন ঋষিদের আশ্রম।

আশ্রমের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুনলুম সত্যিই নাকি এ গাঁয়ে কেবল ছোটজাতের বাস,—একঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও কাছে নেই। বেশিদিন দেখচি থাকা চলবে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্য দিয়া এতবড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন এই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের কর্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অশুচি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবলমাত্র মানুষের দেহ বলিয়া কোনদিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গিয়াছে। অথচ, এ-সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও জো নাই—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেমনি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের সেই ভারী বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই, এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর-যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল, সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছ নাকি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরুলে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় খাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই!

আগে ত গিয়ে পৌঁছই দিদি!

কবে ফিরবে?

সে ত এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তার পরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন ফিরতেও পার? না, সে কিছুতেই হবে না।

কি হবে না তাহা বুঝা গেল,—তাই সাধু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলেচি দিদি।

বলেচ? আচ্ছা, তবে যাও। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত সাধুজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিতমুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি স্নেহের গভীরতা

কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়া মাপা যায় না; এবং এই বস্তুটা কাব্যের জন্য কবিরা কেবল শূন্য কল্পনাই করেন নাই—সংসারে ইহা যথার্থই ঘটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও যতখানি সত্য, অপরের আকুল কণ্ঠের একান্ত নিষেধটাও ঠিক ততখানি সত্য কি না, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে বিন্দু-পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম, এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজী কহিলেন, আমি চললাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয়ত আবার আসব, কিন্তু এখন এ কথা জানাবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য দেশ এই বাঙ্গলা দেশটা। এর পথেঘাটে মা-বোন, সাধ্য কি এঁদের এড়িয়ে যাই। এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মনে হইল, তাই বটে। দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটি মাত্র ভগিনীর স্নেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া?

পাঁচ

সাধুজী ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিরহব্যথাটা রতনের কিরূপ বাজিল অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সম্ভবতঃ মারাত্মক তেমন কিছু হইবে না; কিন্তু একজন ত দেখিলাম কাঁদিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি রহিলাম আমি। লোকটার সহিত পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাও ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই; তথাপি আমারও মনে হইতে লাগিল, আমাদের এই অনারব্ধ সংসারের মাঝখানে তিনি যেন মস্ত বড় একটা ছিদ্র করিয়া দিয়া গেলেন। এই অনিষ্টটি আপনা হইতেই সারিয়া উঠিবে কিংবা নিজেই তিনি আবার একদিন অকস্মাৎ তাঁহার প্রচন্ড ঔষধের বাক্সটা ঘাড়ে করিয়া ইহা মেরামত করিতে সশরীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিদায়কালে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অথচ আমার নিজের খুব যে বেশি উদ্বেগ ছিল তাও নয়। নানা কারণে এবং বিশেষ করিয়া কিছুকাল হইতে জ্বরে ভুগিয়া দেহ ও মনের এমনই একটা নিস্তেজ নিরালম্ব ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র রাজলক্ষ্মীর হাতেই সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দর দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছিলাম। সুতরাং কিছুর জন্যই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার আমার আবশ্যকও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তবুও মানুষের মনের চঞ্চলতার যেন বিরাম নাই। বাহিরের ঘরে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া একাকী বসিয়া আছি, কত কি যে এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই, সম্মুখের প্রাঙ্গণতলে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসন্ন রাত্রির ইঙ্গিতে অন্যমনস্ক মনটাকে মাঝে মাঝে এক-একটা চমক দিয়া যাইতেছে, মনে হইতেছে এ জীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে তাহাদের সহিত আজিকার এই অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত মূর্তি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব নারীর অবগুণ্ঠিতা মুখের মত রহস্যময়। অথচ, এই অপরিচিতার কেমন প্রকৃতি কেমন প্রথা কিছুই না

জানিয়া একেবারে ইহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতেই হইবে, মধ্যপথে আর ইহার কোন বিচারই চলিবে না। আবার পরক্ষণেই যেন অক্ষম চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলই এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এমনি যখন মনের অবস্থা, সেই সময় পাশের দ্বারটা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। তাহার চোখ-দুটো সামান্য একটু রাঙ্গা, একটু যেন ফুলা-ফুলা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কহিলাম, আশ্চর্য কি! যে ভার, যে শ্রান্তি তুমি বয়ে বেড়াচ্চ, আর কেউ হলে ত ভেঙ্গেই পড়ত, আর আমি হলে ত দিনরাতের মধ্যে চোখ খুলতেই পারতুম না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিতুম।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের ম্যালেরিয়া ছিল না। যাই হোক তুমি ত দিনের বেলায় ঘুমোও নি?

বলিলাম, না, কিন্তু এখন ঘুম পাচ্চে, হয়ত একটু ঘুমোব। কারণ, কুম্ভকর্ণের যে ম্যালেরিয়া ছিল না এমন কথাও বাল্মীকি মুনি কোথাও লিখে যাননি।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, ঘুমোবে এই অবেলায়! রক্ষে কর তুমি, জ্বর কি তা হলে আর কোথাও বাকি থাকবে? সে-সব হবে না,—আচ্ছা, যাবার সময় আনন্দ কি আর কিছু তোমাকে বলে গেল?

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম কথা তুমি আশা কর?

রাজলক্ষ্মী কহিল, এই যেমন কোথায় কোথায় যাবে; কিংবা—

এই কিংবাটাই আসল প্রশ্ন। কহিলাম, কোথায় কোথায় যাবেন তার একপ্রকার আভাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু এই কিংবাটার সম্বন্ধে কিছুই বলে যাননি। আমি ত তাঁর ফিরে আসার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখিনে।

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা এই লোকটিকে কি তুমি বাস্তবিক চিনেচ? আমাকে যেমন একদিন চিনতে পেরেছিলে?

সে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না।

কহিলাম, সত্যি বল, কখনো কোনদিন কি দেখনি?

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তোমার কাছে আমি সত্য করতে পারব না। অনেক সময় আমার বড় ভুল হয়। তখন অপরিচিত লোককেই মনে হয় কোথায় যেন তাকে দেখেচি, তার মুখ যেন আমার অত্যন্ত চেনা, কেবল কোথায় দেখেচি সেইটিই মনে করতে পারিনে। আনন্দকেও হয়ত কখনো দেখে থাকব।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আজ আনন্দ চলে গেল বটে, কিন্তু যদি সে কখনো ফিরে আসে ত তার বাপ-মায়ের কাছে আবার একদিন তাকে ফিরিয়ে দেব এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

আমি বলিলাম, তাতে তোমার গরজ কি?

সে কহিল, অমন ছেলে চিরদিন ভেসে বেড়াবে একথা ভাবলেও যেন আমার বুকে শূল বেঁধে। আচ্ছা, তুমি নিজেও ত সংসার ছেড়েছিলে—সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে কি সত্যিকার আনন্দ কিছু আছে?

কহিলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হইনি, তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটি তোমাকে দিতে পারব না। যদি কোনদিন সে ফিরে আসে এ সংবাদ তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বাড়িতে থেকে কি ধর্মলাভ হয় না? সংসার না ছাড়লে কি ভগবান পাওয়া যায় না?

প্রশ্ন শুনিয়া আমি করজোড়ে বলিলাম, এর কোনটার জন্যেই আমি ব্যাকুল নই লক্ষ্মী, এ-সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে তুমি কোরো না, আবার আমার জ্বর আসতে পারে।

রাজলক্ষ্মী হাসিল, তারপর করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু মনে হয় সংসারে আনন্দর ত সমস্তই আছে, তবু সে ধর্মের জন্য এই বয়সেই সব ছেড়ে দিয়ে এসেচে; কিন্তু তুমি ত তা পারনি?

বলিলাম, না, এবং ভবিষ্যতেও পারব মনে হয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন মনে হয় না?

কহিলাম, তার প্রধান কারণ যাকে ছাড়তে হবে সেই সংসারটা যে আমার কোথায় এবং কি প্রকার তা আমার জানা নেই, এবং যার জন্যে ছাড়তে হবে সেই পরমাত্মার প্রতিও আমার লেশমাত্র লোভ নেই। এতদিন তাঁর অভাবেই কেটে গেছে এবং বাকি ক'টা দিনও অচল হয়ে থাকবে না এই আমার ভরসা। অন্যপক্ষে তোমার ঐ আনন্দভায়াটিও গেরুয়া সত্ত্বেও যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেচেন আমার তা বিশ্বাস নয়। তার কারণ, আমিও বারকয়েক সাধু-সঙ্গ করেচি, তাঁদের কেউ আজও ওষুধের বাক্স ঘাড়ে করে বেড়ানকে ভগবৎলাভের উপায় নির্দেশ করে দেননি। তা ছাড়া তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও ত চোখে দেখলে!

রাজলক্ষ্মী মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তবে কি সে মিছামিছিই ঘরসংসার ছেড়ে এই কষ্ট করতে বার হয়েচে? সবাই কি তোমার মতই মনে কর?

বলিলাম, না, মস্ত প্রভেদ আছে। সে ভগবানের সন্ধানে বার না হলেও মনে হয়, যার জন্যে পথে বেরিয়েচে সে তারই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনার দেশ। তাই তার ঘরবাড়ি ছেড়ে আসাটা ঠিক সংসার ছেড়ে আসা নয়—সাধুজী কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি সংসার ছেড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেচেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিল না, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেল?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানি না। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটা তখন পর্যন্ত আমার কানে তেমনি বাজিতেছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিচিত্র দেশ এই বাঙ্গলা দেশটা! এর পথেঘাটে মা-বোন—সাধ্য কি তাদের ফাঁকি দিয়ে যাই!

ম্লানমুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে! তাই বটে! সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজেই এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না। জানি, অনেক দিনের অনেক ত্রুটি অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পঙ্ক লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সে-ই জানে ইহা কত বড় সত্য!

এইভাবে নীরবে মিনিট দশ-পনের কাটিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই উদ্দেশ্যেই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে দিচ্চি। এদেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার যে দুর্গতি হয়তো সে আজও জানে না। এর স্বাদ কতক আমি জানি। আমারই মত একদিন যখন সংশয়ে, বাধায়, কটু কথায় তার সমস্ত মন তিক্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সে পালিয়ে আসার পথ পাবে না।

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ-সব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে।

রাজলক্ষ্মী বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কখ্খনো না, কখ্খনো না। জানলে সে পথে কেউ যাবে না আমি বলচি।

এ কথার আর জবাব ছিল না। বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধুসঙ্কল্প, অনেক পুণ্যকর্ম তাহার শ্বশুরবাড়ির দেশে অত্যন্ত অপমানিত

হইয়াছিল। সেই নিষ্কাম পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়াছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের শুভচেষ্টা অপরে এমন সন্দেহের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষ সংসারের দুঃখের ভার লঘু করিতে দেয় না? মনে হইল, সাধুজী যদি থাকিতেন, কিংবা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জনকয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেছে,—এসো না হে, দিয়ে যাও না। বলিয়া সে একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্রারঙে ছোপান একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের মালা। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নূতন শালপাতায় একটি টাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতলের উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, মাঠাকরুন, আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পুলকিতচিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয়!

রতন কহিল, না মা, তা নয়, যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়, এরা ছোটজাত ডোম, এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই টাকাটা ডোমের শুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক থাক এ-ও দিতে হবে না—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে—

এই প্রত্যাখানে কন্যার পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিল; সে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজবরণের সম্মানটা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে ঐ সুপারিশুদ্ধ টাকাটা লইতে কিছুতেই চাহে না, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম এবং রতনই বা কি জন্য যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিদিত ছিল না। খুব সম্ভব দেয় টাকাটা আরও বেশি, এবং গোমস্তা কুশারীমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে; এবং রতন 'হুজুর' ইত্যাদি সম্ভাষণের পরিবর্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাহার এই সঙ্কট অবশেষে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ি গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করো গে।

রতনের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। খুশি হইয়া কহিল, এ ভালই হ'ল যে, যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ডোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, পহর রেতের মধ্যেই লগন, একবার যদি পায়ের ধুলো দেন! এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম, রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল, ওই বুঝি তোমার বাড়ি মধু? আচ্ছা, যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব। রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, বড় তোরঙ্গটা

খুলে দেখ ত রে, আমার নতুন শাড়িগুলো আনা হয়েচে কি না। যা মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আয়। মিষ্টি বুঝি এদেশে কিছু পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা, তাই বেশ। অমনি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস রতন। হাঁ মধু, তোমার মেয়ের বয়স কত? পাত্তরের বাড়ি কোথায়? লোক কতগুলি খাবে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছ?

জমিদারগৃহিণীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর-নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবাপুরুষ—ত্রিশ-চল্লিশের বেশি হইবে না—বাড়ি ক্রোশ-পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করে না—সকলেরই চাষবাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে, তবে ভয় শুধু এই রাত্রিটার জন্য। কারণ বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত কোনমতেই অনুমান করিবার জো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি; কি করিয়া যে মানমর্যাদা বজায় রাখিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই-সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিশেষে সকাতরে জানাইল যে, তাহার চিঁড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান-দুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সকৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবে না মধু, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্বিঘ্নে হবে, আমি আশীর্বাদ করচি। খাবার জিনিস এত জোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক-দুইটিকে লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আশীর্বচনের উপর বরাত দিয়া সে

বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না; আজ রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ জাগিয়া রহিল।

শুভকর্মে পায়ের ধূলা দিব বলিয়া মধুকে আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই যাইতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিল না। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল, আমি বিছানায় শুইয়া মুদ্রিতনেত্রে কতক বা শুনিতেছিলাম, কতক বা শুনিতেছিলাম না, কিন্তু অদূরে বিবাহ বাটীর কলরোল কিছুক্ষণ হইতে যেন কিঞ্চিৎ অসাধারণ রকমের প্রখর হইয়া কানে বাজিতেছিল। সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ির বিয়ে, মারামারি এর একটা অঙ্গ নয় ত?

বলিলাম, উঁচুজাতের নকল যদি করে থাকে ত বিচিত্র নয়। সে-সব কথা তোমার মনে আছে ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হুঁ। তারপর ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, এ পোড়া দেশে যা ক'রে আমরা মেয়েদের বিলিয়ে দিই, তাতে ইতর-ভদ্র সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ নিয়ে শুনলাম, ওই যে কাল সকালে ঐ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন্ অপরিচিত সংসারে টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আসতে পর্যন্ত দেবে না। এদের নিয়মই এই। বাপ ছ'গণ্ডা টাকায় মেয়েটাকে আজ বিক্রি করে দেবে। 'একবার পাঠিয়ে দাও' এ কথা মুখে আনবারও জো থাকবে না। আহা! মেয়েটা সেখানে কতই না কাঁদবে—বিয়ের সে কি জানে বল?

এ-সকল দুর্ঘটনা ত জন্মকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, একরকম সহিয়াও গিয়াছে, আর ক্ষোভ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে কেবল মৌন হইয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল, আমাদের দেশে ছোট-বড় সব জাতের মধ্যেই বিয়েটা কেবল বিয়েই নয়—এটা ধর্ম, তাই যা, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের? আর যে ধর্মকর্মে মন প্রসন্ন না হইয়া গ্লানির ভারে অন্তর কালো হইয়া উঠিতে থাকে তাহাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরূপে?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই পুনশ্চ কহিল, কিন্তু এ-সব বিধিব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি; শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়, আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

ব্যস! যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহুপূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। এ কথা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই নূতন শুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি এবং বরাবরই চুপ করিয়া গিয়াছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে উষ্ণ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলহে নিরতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে। ত্রিকালদর্শীদের আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের অতিশয় ভক্তি করি; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজী-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়ত সত্য সত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কেমন করিয়া পাইত জানি না, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট দীপালোকে আমার মুখের চেহারাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার নিভৃত চিন্তার ঠিক দ্বারপ্রান্তেই আঘাত করিল। কহিল, তুমি ভাবচ এটা নিতান্তই

বাড়াবাড়ি—ভবিষ্যতের বিধিব্যবস্থা কেউ পূর্বাহ্নেই নির্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বলচি, পারে। আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেচি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখতে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো, আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মানতে পার, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা নইলে আমাদের দেশের এই পুতুলখেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন হতে পারত না। এ-সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই ঋষিদের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার আর পাপ কোথায় নেই? সে সর্বত্রই আছে। কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পারো?

বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার যুক্তি নয়—বিশ্বাস।

ইতিহাসের প্রশ্ন হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম, এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যেথায় সতীত্বের আদর্শ আজও এমনিই উচ্চ। অভয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর-নারী উভয়কেই এক আদর্শে বাঁধিতে পারে না কেন? কিন্তু এ-সকলের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারাটা কিছুদিন হইতেই কোন্ দিক দিয়া বহিতেছে।

দুষ্কৃতির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কলুষিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ জীবনে লাভ করিবে তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। তাহার দুর্বশ হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্মবৃত্তি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন্ সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্যন্ত অপরের গোপন আক্ষেপ প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ

স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্মদ কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে। এই হিসাবের অঙ্কগুলায় কি আছে জানিনা, কিন্তু শূন্য ছাড়া যদি আর কিছুই আজ আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের এই শতচ্ছিন্ন জীবন-জালের গ্রন্থি বাঁধিতে বসিব, এ চিন্তা আমার মধ্যে বহুবার আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয় জানিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয় ত আবার সেই পথেই যাত্রা শুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়া কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া তুলিব না।

কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, যে মন্ত্রের সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে একমুহূর্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহার প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়িতেই যে তখন মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাৎ পাঁচ-সাতজন গোটা-দুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দিল, হুজুর! বাবুমশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, রাজলক্ষ্মীও সবিস্ময়ে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহারা সকলেই একসঙ্গে এবং সমস্বরে করিতে চায়। রতনের পুনঃ পুনঃ বকুনি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কেহই চুপ করিতে পারিল না। যাহা হউক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্প্রদান বন্ধ হইয়া আছে, কারণ মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ফুল-জল প্রভৃতি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার! পুরোহিতসম্প্রদায় অনেক কীর্তিই করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সমব্যবসায়ীর

ফুল-জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহার মুখ চাপিয়া স্বাধীন ও সজীব মন্ত্রোচ্চারণের বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মস্ত একটা ধমক দিয়া কহিল, তোদের আবার পুরুত কি রে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারিতে আসিয়া পর্যন্ত সে 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত! এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাক পেয়েচিস যে বিয়ে দিতে আসবে বামুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্বে চাহিতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জাতিতে নাপিত।

মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যাসম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুঝা গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল পণ্ডিত তাহাদের ব্রাহ্মণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈতা আছে এবং সে তাহাদের দশকর্ম্ম করায়। এমন কি, সে তাহাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খায় না। সুতরাং এত বড় সাত্ত্বিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অতঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সে যাহা হউক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও অদূরে বিবাহবাটীর প্রবল চিৎকারশব্দে আমাকে যাইতে হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, বাড়িতে একলা কি করবে!

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু শেষে কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। চল, বলিয়া আমার সঙ্গ লইল। আসিয়া দেখিলাম, মধুর সম্বন্ধী অত্যুক্তি করে নাই। বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বরপক্ষীয়

প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন এবং অন্যদিকে কন্যাপক্ষীয়ও প্রায় ততগুলি। মাঝখানে প্রবল ও স্থূলকায় শিবু পণ্ডিত দুর্বল ও ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আমরা সসম্মানে একটা মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু পণ্ডিতকে এই অতর্কিতে আক্রমণের হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, হুজুর, মন্তরের 'ম' জানে না এই ব্যাটা, আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত! বিবাহটাই আজ ভেস্তে দিত।

রাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, হাঁ দিত। পাঁচখানা গাঁয়ে ছাদ্দ, বিয়ে নিত্যি দিচ্ছি, আর আমি জানিনে মন্তর!

মনে ভাবিলাম, এখানেও সেই মন্ত্র! কিন্তু বাটীতে রাজলক্ষ্মীর কাছে না হয় মৌন থাকিয়াই তর্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থ-ই মধ্যস্থতা করিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে বহু বাদবিতণ্ডায় স্থির হইল যে, রাখালই মন্ত্র পাঠ করাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাখাল রাজি হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বর-কন্যার দুই হাত একত্র করিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিল তাহা আমার আজও মনে আছে। এগুলি সজীব কিনা জানি না, এবং মন্ত্র-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয়, বেদে ঠিক এই কথাগুলিই ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

রাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ত্রুটি হয় এইজন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু পণ্ডিত দু হাত তুলিয়া বজ্রগর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়। বিয়েই হ'ল না।

পিছনে একটা টান পাইয়া ফিরিয়া দেখি রাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

রাখাল পণ্ডিত লজ্জিতমুখে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা কেহ কানেই লইল না; সকলেই সমস্বরে শিবুকে অনুনয় করিতে লাগিল, পণ্ডিতমশাই, মন্তরটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি দক্ষিণে ওঁকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেবেন পণ্ডিতমশাই।

শিবু পণ্ডিত তখন ঔদার্য দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। বেশি দক্ষিণে আমি চাইনে; আমি এইখানে থেকেই মন্ত্রপাঠ করচি, রাখাল ওদের পড়াক। এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভালমানুষটির মত বর-কন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু, এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে পদার্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা।

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনিসহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জনরোল উঠিল—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে, হাঁ, একজন শাস্ত্রজানা লোক বটে! মন্তর পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

সমস্তক্ষণ আমি গম্ভীর হইয়াই ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এই অসীম গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়াই রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ওখানে কি করিয়া যে সে আপনাকে সংবরণ করিয়া বসিয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু ঘরে আসিয়া হাসির প্রবাহে তাহার যেন দম বন্ধ হইবার জো হইল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! রাখাল এতদিন এদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

প্রথমটা আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না; তাহার পরে কহিলাম, মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এমনি করেই ত এতকাল এদের মেয়ের মা এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিয়ে হয়েচে। রাখালের যাই হোক, শিবু পণ্ডিতের মন্ত্রগুলোও ঠিক ঋষিরুবাচ বলে মনে হল না, কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্ত্রই বিফল হয়নি। এদের বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেমনি দৃঢ় তেমনি অটুট আছে!

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

ছয়

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারীমহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাব বৈ কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু ধর্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে, রাজলক্ষ্মী তাহা জানে—এবং কত বড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারীমহাশয় সম্বন্ধে বেশি-কিছু জানি না, তবে বাহির হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া, কি করিয়া কি করিবে আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নটা বুঝিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুণ্ঠা আমাকেও নির্বাক্ করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবে না?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল। ঠাকুরানীর সাজসজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য হইয়াছিলাম; কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়িতে সে কোনকালেই বেশি গহনা পরে না, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল, কাল রাত্রি পর্যন্ত যে চুড়ি-কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরনের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, একে একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখচি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে, এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়তি ছিল সেইগুলো একে একে ঝরে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কি না; তার পরে গাড়োয়ানটাও না শুনিতে পায় এমনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত, সে আশীর্বাদই কর না তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে আনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া মোটা বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটিসুটি হইয়া আমার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল।

আমাদের গঙ্গামাটি হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খাদটার উপরে যে সঙ্কীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-দশেকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গরুর গাড়িতে

অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই বিলম্বে পৌঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

কুশারীমহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-যান থামিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অনতিবিলম্বেই বুঝা গেল, শহর হইতে দূরবর্তী এই-সকল সামান্য পল্লীঅঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই। কারণ আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়ো, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মীয় সম্বোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন।

রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিল না, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়াছিল। এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহুতের দল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে, আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার ব্রাহ্মণীও তেমনি, কেবল বাড়ির বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তালপাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর, আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কি না, জমিদারি নিজে না দেখিলে চুরি হয় কি না, ইহার নূতন কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কি না, ইত্যাদি অর্থ ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তরমালার ফাঁকে ফাঁকে কুশারীমহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বাটিতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলির মাটির; তথাপি মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা সচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা-দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা-দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লি নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিস্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ঠ গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী পরিবারের অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনটন নাই।

দক্ষিণের বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিড়ার উপর বসান আছে। হয়ত গুড় আছে, কি কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা- সমেত পাট এবং শনের গোছা বাঁধা রহিয়াছে; সুতরাং বাটিতে যে বিস্তর দড়িদড়ার আবশ্যক হয় তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না।

কুশারীগৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই অন্যত্র নিযুক্তা, কর্তাটিও একবারমাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির কৈফিয়ত আর একপ্রকারে দিয়া কহিলেন, মা, এইবার যাই, আহ্নিকটা সেরে এসে একেবারে বসি। বছর পনর-ষোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, কুশারীমহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ,

নারায়ণের অন্ন বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হল, একবার ভোগটি দিয়ে এসো গে বাবা। আহ্নিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরি হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাকে কষ্ট দিলাম—বড় দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরি না করিয়া চক্ষের পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পৌঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলার জন্যে নয়, এইবার আগন্তুকগনের প্রশ্নবাণে বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাঁহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারীমহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত-ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই; সুতরাং একাকী নির্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তি করিলাম না, আশ্চর্য হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যখন শুনিলাম, আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে—পরান্ন গ্রহণ করিবে না, তখনই আশ্চর্য হইলাম। এই ছলনায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাব না, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ আমি জানতাম না। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিল না, দিলেন কুশারীগৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েচি বাবা। মা যে এখানে খাবেন না তা জানতাম; তবু আমরা

যাঁদের দয়ায় দুটি অন্ন পাই, তাঁদের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কুশারীগৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই; কিন্তু এখনও যে এই পল্লী অঞ্চলেই আরও একটি ঢের বেশি আশ্চর্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকি ছিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারীগৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়, বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিংবা অসুন্দর মনেই হইল না। কেবল এইটুকুই মনে হইল, ইহা সাধারণ বাঙ্গালী মায়ের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। দ্বারের কাছে কর্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন; বাহির হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল এবং এই খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক মা, বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে সময় নষ্ট কোরো না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না আমি জানি।

কুশারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন; কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে, বাবুর খাওয়াটা হয়েই যাক না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ক্রুটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবে না। তুমি যাও—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ক্রুটি বাড়বে। আপনি যান কুশারীমশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধা হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিনী বলিলেন, নিরামিষ আলো চালের ভাত খান; জুরিয়ে গেলে আর খাওয়াই হয় না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যাঁরা অন্নদাতা তাঁদের পূর্বে নিজের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করাও কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম অন্নদাতা আমি নই; কিন্তু তাও যদি সত্যি হয়, সেটুকু এত কম যে, এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেতেন না।

কুশারীগৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি; কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়িতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে—কি হবে আমাদের গোলাভরা ধানে, কড়াভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ-সব ভোগ করবার যারা ছিল তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন

উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশ্বাস পিতামাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙ্গিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সংবরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে-বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আন, আমি তাঁদের কাছে কেঁদেকেটে দেখি যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বের মত এখনও দু'জনে মৌন হইয়া রহিলাম।

কুশারীগৃহিণী এইবার তাঁদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে, একথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরান্ন গ্রহণ করিবে না শুনিয়াও এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে শুরু করিয়া কর্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিত না। কিন্তু সে যাই হোক কুশারীগৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানি না এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারীগৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিষ হইয়া গিয়াছে তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট জা সুনন্দা; এবং যদিচ তাঁহার দেবর যদুনাথ ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শত্রুতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহী সুনন্দা ও তাঁহার স্বামী যখন সম্প্রতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হোক ইহাদের বশ করিতে হইবে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ি যখন স্বর্গগত হন তখন তিনি এ বাড়ির বধূ। যদু কেবল ছয়-সাত বছরের বালক। এ বালককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপরে পড়ে এবং সেদিন পর্যন্ত এ ভার তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর, বিঘা দুই-তিন ব্রহ্মোত্তর জমি এবং ঘরকয়েক যজমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার স্বামীকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রাচুর্য, এই যে সচ্ছলতা, এ-সকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জনের ফল।

ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করেন নাই, সাহায্য কখনও তাঁহার কাছে প্রার্থনাও করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অনেক দাবি করছেন?

কুশারীগৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবি কিসের বাবা, এ ত সমস্তই তার। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার এই ছেলেটি?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেন না, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বলচ?

ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়াই তিনি বিজয় সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি সে শুধু ভগবান জানেন

এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেচে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে-সব যাক বাবা, সে অনেক কথা। আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে কতদিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেচি, সেও আজ তার মনে পড়ে না। যাক—এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হল, কর্তা তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময়ে বলা নেই কহা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে নাই বলুক বাবা, অমন দাদার পর্যন্ত একটা মত নিলে না।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বৈ কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-ঘরও নয়, কুলে শীলে মানেও ঢের ছোট।কর্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইলেন না; কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার উপর যখন শুনতে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর

হাতে তাকে সঁপে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হ'ল তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল! এই বলিয়া তিনি হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বুঝিলাম, এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র, কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ

কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহাতে বুঝা গেল ইঁহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা কহিলেন না, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বস্তুটা এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এদিকে আমার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কান্নাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই।

সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমার থালার দিকে চাহিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদের ধৈর্য থাকবে না। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেচে, কেবল তারাই জানে, ছোটবৌ আমার কি সর্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডটাই তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

যে সম্পত্তিটার উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছরখানেক পূর্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়িতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে ব'লে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত তার সমস্তই মিথ্যে। ছোটবৌ স্নান করে যাচ্ছিল রান্নাঘরে সে যেন সেই- সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ঘুচতে চাইল না। আমি ডেকে বললাম,

সুনন্দা, দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্চে না? কিন্তু জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিকরে পড়চে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে—বিবর্ণ। তাঁতিবৌয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখ্খনি আমার জবাব দিলে না, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতিবৌকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবে না! তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিখারী করে রাখবে?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, শোন কথা একবার! কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে ইনি কিনে নিয়েচেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোটবৌ?

ছোটবৌ বললে, কিন্তু বট্‌ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞেস কর্ গে যা তোর বট্ ঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেচে। এই বলে আহ্নিক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নীলাম হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোটবৌ বলে কি করে?

কুশারীগৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা! কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রি হয়নি কিনা তাই। আমরা হলাম তাদের পুরুত-বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না, সেই সঙ্গে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোংরা জিনিস আমার মনের ভিতরটা একমুহূর্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারীগৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন

না। বলিলেন, জপ-আহ্নিক সমস্ত সেরে ঘণ্টা-দুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা সেইখানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে, কোথাও একটা পা পর্যন্ত বাড়ায় নি। কর্তা কাছারি সেরে এখুনি এসে পড়বেন; ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার দেখতে গেছে, তারও ফিরতে দেরি নেই। বিজয় নাইতে গেছে, এখুনি এসে ঠাকুরপুজোয় বসবে। রাগের পরিসীমা রইল না; বললাম, তুই কি রান্নাঘরে আজ ঢুকবি নে? ওই বজ্জাত তাঁতিবেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাকবি?

সুনন্দা মুখ তুলে বললে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা ফিরিয়ে না দাও ত আমি রান্নাঘরে ঢুকব না। ওই নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে পারব না, ঠাকুরের ভোগ রেঁধেও দিতে পারব না। এই বলে সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েচে, তাও জানতাম; কিন্তু সে যে মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতাম না। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম। পুরুষেরা সব বাড়ি ফিরে এলেন। কর্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত জোড় করে বললাম, সুনন্দা, একটু ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক। সে এটুকু অনুরোধও রাখলে না। গণ্ডূষ করে খেতে বসছিলেন, জিজ্ঞেস করলে, তাঁতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ ত আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেচি। তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনো কথা কয় না তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্তা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তার পর বললেন, এ-সব কথার মানে কি বৌমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতিবৌ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল। তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাহুল্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার তাকে যদি ফিরিয়ে

না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী-পুত্রকে খেতে দিতে পারব না।

আমার মনে হ'ল বাবা, হয় আমি স্বপ্ন দেখচি, নাহয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েছে। যে ভাশুরকে সে দেবতার বেশি ভক্তি করে তাঁকেই এই কথা! উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিষয় পাপের হোক, পুণ্যের হোক, সে আমার—তোমার স্বামী-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায় তোমরা আর কোথাও যেতে পার। কিন্তু বৌমা, তোমাকে আমি এতকাল সর্বগুণময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সেদিন সমস্তদিন আর কারও মুখে ভাত-জল গেল না। কেঁদে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম, বললাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি—তার এই প্রতিফল! ঠাকুরপোর চোখ-দুটো জলে ভরে গেল, বললে, বৌঠান, তুমি আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শ্বশুরমহাশয় সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখ্‌খনো ভুল করেনি।

হায়রে পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তায় চোখ খুলল। সেদিন ভাদ্রসংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে ঝরঝর করে জল পড়চে, কিন্তু হতভাগী একটা রাত্তিরের জন্যেও আমাদের মুখ রাখলে না, ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার শ্বশুরের কালের একঘর প্রজা মরেহেজে বছর-দুই হ'ল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙ্গা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল; শিয়াল-কুকুর-সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে সেই দুর্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠোনের জল-কাদা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম, সর্বনাশী, এই যদি তোর মনে

ছিল, এ সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি শ্বশুরকুলের নামটা পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেচিস? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বললাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেচেন, তার অর্ধেকটাও ত আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হ'ল। বললাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোরা নাহয় না খেয়ে মরতে পারিস, কিন্তু আমার বিনু? বললে, একবার কানাই বসাকের ছেলের কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের।

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জ্বলল না, হাঁড়ি চড়ল না। কর্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত বিনু আমার ঘুমোয় নি, হয়ত বাছা আমার ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করচে। ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গরু-বাছুর পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু রাক্ষুসী ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকবার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিশ্বাস পড়িল; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল, এবং আমার হাতের ডাল-ভাত শুকাইয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল।

কর্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা করি তাঁহার মৌনব্রত অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্ত্বিক আহারের আজ কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই, কিন্তু এদিকের ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেঙ্কারি বাবা—সে আর তোমাদের কি বলব! কর্তা বললেন,

দু’দিন যাক, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বললাম, তাকে চেনো না, সে ভাঙ্গবে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হ’ল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলে না। কর্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয় তিনি করবেন; কিন্তু সর্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরব। তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাব না। অর্থাৎ তার মানে, নিজেদের অবধারিত মৃত্যু।

আমি গেলাসের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারীগৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে ব’লো না বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় বুঝিবা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ-বাড়িতে মাছ আসে না, দুধ-ঘির কড়া চড়ে না। সমস্ত বাড়িটার ওপর কে যেন এক মর্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়িতে গিয়া বসিলাম, কুশারীগৃহিণী সজলকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার শ্বশুরের দরুন যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, মা, তোমার বাড়ি থেকেই চোখে পড়ে। নালার এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেমনি নাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

গাড়ি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যার লোভ নেই, যে চায় না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া অল্প একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তোমার কাছে আমার আর কিছুই না হোক এ শিক্ষা হয়েচে!

সাত

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারীমহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশ্চর্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও ঘটিত না। অধ্যাপক যদু তর্কালঙ্কারের ভাঙ্গাচোরা দু-তিনখানা ঘর আমাদের বাড়ির পশ্চিমে মাঠের এক প্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে—এখানে আসিয়া পর্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিণী যে ওইখানে তার স্বামী-পুত্র লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতাম না। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট-দশেকের পথ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেকদূর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত একপ্রকার অভূতপূর্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম; এবং যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়িটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে! কে অনুমান করিবে ওই কয়খানা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে; হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র-পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন। কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্গলাদেশের

এক তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে !

দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে, সুতরাং কণ্ঠস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল; কহিল, ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি? যাবেই ত। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়িসুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। অতএব সেও চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলাম না।

দেখিলাম একটা বড় চাঙ্গারিতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি এবং আর-একটা ছোট পাত্রে এতজ্জাতীয় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত হইয়াছে। মনে হইল, এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তিসামর্থ্য-প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা! এই ক'টা চাল-ডাল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্যাদাহানি হইবে। কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বললে না যে, ও-সব ছোট কাজ রতনবাবুর নয়। যা, কাউকে ডেকে আন্‌গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ-সব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালে পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠান হচ্চে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষ খাবে এবং যাচ্ছে বামুনবাড়িতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বলতে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস, তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবুমশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ—পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানি তেমনি মলিন, উপরন্তু দু-তিন স্থানে গ্রন্থি বাঁধা। পল্লীগ্রামের ভদ্রব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা বিস্ময়ের বস্তুও নয়। কেবলমাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলে না। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াটার উপরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা, ইতিপূর্বেই আমার আসা কর্তব্য ছিল, ভারি ক্রুটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ ইহারা যে-সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত এবং যে-সকল বদ্ধমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিল না। ইঁহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম না; কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ একেবারে না এলেও আমি ত্রুটি নিতাম না—ও-রকম আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আসব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

আমার বিরক্তিটা তিনি আনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মাঠাকরুন আমাকে স্মরণ করেচেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য, এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়। কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার লোক ছিল না, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুওরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রুক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইত না; কিন্তু ঐশ্বর্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে, সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত ঢের বেশি রূঢ় উত্তরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং রাজলক্ষ্মী তাঁহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেন না, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেকদিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, এতে প্রায় আমাদের পনর দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি অকাল চলচে, ব্রত-নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বারব্রতের দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেচেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার কালাকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এত বড় সিধেটা কি তা হলে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেন না, কিন্তু আমি এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণের অনুক্ত বাক্যের মর্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মী হয়ত একটা শক্ত কথা শুনিবে। লোকটির একদিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলেও আর একদিকের পরিচয় ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলাম; সুতরাং এমন ইচ্ছা হইল না যে, আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে, কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিত না। ঠিক তাহাই হইল। এই বিশ্রী প্রশ্নটাকেও সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কারমশাই, শুনেচি আপনার ব্রাহ্মণী ভারী রাগী মানুষ—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, নাহলে এ কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতক্ষণে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। অধ্যাপক মানুষ, প্রিয়তমার মেজাজের উল্লেখে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন; হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, না মা, রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারব না, তিনিই আসবেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কারমশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এদেশে বেশি ছাত্র ত পাবার জো নেই—অধ্যাপনা কেবল নামমাত্র।

সব ক'টিকেই খেতে-পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানে থাকে, একটির বাড়ি গ্রামের মধ্যেই, কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ ত সহজ নয় তর্কালঙ্কারমশাই!

ঠিক এই কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। অথচ এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-দিক দিয়াই গেল না! অতি সহজেই গৃহের দুঃখ-দৈন্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি। কিন্তু তবু ত ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকে না মা! তা ছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্যদেবের কাছে যা পেয়েচি, সে ত কেবল ন্যস্ত ধন—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা! একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন দিন কাল সমস্তই বদলে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও গেছে। প্রজার রক্তশোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাতে যেন আবার বাধা দেবেন না।

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন; কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যিই ত এ আপনাদেরই কর্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পুজো-আচ্চা করি, কিন্তু একটা মন্তরও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে—এও কিন্তু আপনার কর্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্চি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা! এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, যাইবার সময় আমিও কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুরবেলা একবার সুনন্দার বাড়িতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না, তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি একপাও নড়চি নে।

বলিলাম, আচ্ছা, তাই হবে।

আট

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করান শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অদ্ভুত; হয়ত, অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ-সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙ্গালী, বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থঘরে এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

তর্কালঙ্কারমশাই কোথায়? বিশ্রাম করচেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোনকালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব ভূতপূর্ব একটা ঢেঁকিশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়িটির মতই একেবারে আভরণবর্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারান্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল,—বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—আমাকে জীর্ণ একখানি

কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল, বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্বে উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারব না, পান আমাদের বাড়িতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরুপত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তাহলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে একমুহূর্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া, কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও- রবিবারে ছোট মোহন্তঠাকুরের আসবার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল—সে প্রায় দিন দশেকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরাল কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। অজয় মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা বেশ ত, হলই বা ফুরোলই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয়কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষমানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত! দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেম্‌নি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বৈ কি! না দিদি, আমার অজয়ই হল বাড়ির গিন্নী—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরি পর্যন্ত—এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

কেন পারব না! বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল! ও ত আমাদের—, বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল।

সুনন্দা কহিল, বামুন-পণ্ডিতের ঘরে হত্তুকীই যথেষ্ট, খুঁজলে এক-আধটা সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে—আচ্ছা, আমি দেখছি,—এই বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হত্তুকী আমার সইবে না ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে বোসো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর—একবার নূতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুতঃ এই দারিদ্র জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে। এই যে আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই—না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্নগৃহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব-অনটনের ছায়া—কিন্তু তবুও সে যে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকী থাকে না। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এতবড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাসকয়েক পূর্বেও ইহার সমস্তই ছিল—ঘরবাড়ি, লোকজন, আত্মীয়-বন্ধু—সচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মত—মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েচে। ও হরি! একেবারে ছেলেমানুষ।

অজয় বোধ হয় তাঁহার গুরুদেবের হুঁকাতেই তামাক সাজিয়া আনিতেছিল; সুনন্দা তাহাকে বলিল, ছেলেমানুষ কিরকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার, তার বয়স বুঝি কম! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার স্বচ্ছন্দ সরল হাসি। অজয় নিজেই উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জাতের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন ছুঁয়ে। আসল কথা, জ্বলন্ত অঙ্গার চুল্লী হইতে উঠানো শক্ত বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকাটার উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। সাধারণ পল্লীরমণী-সুলভ হাসি-তামাশা হইতে আরম্ভ করিয়া কথায়বার্তায় আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার জো নাই, অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য! এই অসাধারণতার হেতুটা পরক্ষণেই আমাদের দু'জনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অজয় আমার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, মা ওটা তাহলে তুলে রেখে দি'?

সুনন্দা ইঙ্গিতে সায় দেওয়ায় তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের পিঁড়ার উপর মস্ত মোটা একটা পুঁথি এলোমেলোভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখে নাই। অজয় তাহার পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, মা, 'উৎপত্তি-প্রকরণ'টা ত আজো শেষ হ'ল না, কবে আর হবে! ও আর হবেই না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পুঁথি অজয়?

যোগবাশিষ্ঠ।

তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি শোনাচ্ছিলে?

না, আমি মার কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত ওর মায়ের ছাই আছে! না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারে কাজ করি; উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাই নে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠ লইয়া প্রস্থান করিল। রাজলক্ষ্মী গম্ভীরমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্তকয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়িটা আমার কাছাকাছি হ'লে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহ্নিক—পুজোর কথাগুলোও যদি ঠিকমত বলতে পারতুম! মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি—ওটা আমার অভ্যাস ছিল; কিন্তু সুনন্দা এই প্রথমে শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য বুঝে না, প্রয়োগ জানে না, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় তার এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নূতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মুখে এম্‌নি সকরুণ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ-সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয়বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মত বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হাঁ করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। আর সে মন্ত্রতন্ত্রের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিছক ঘরকন্না ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া

দিল। তাহাদের মৃদুকণ্ঠের সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেল না, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ তর্কালঙ্কারের থেলো হুঁকায় অজয়-দত্ত শুষ্ক সুকঠোর তামাকু প্রাণপণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুস্বরে সংসারযাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু তাহাদেরই অদূরে হুঁকাহাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।

আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি এবং কোথায় উহার প্রতিকার, একথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমনি করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত।

দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্মামুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার জো কি! জন-তিনেক ব্রহ্মসুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা ষণ্ডামার্কা পুরুষকে আখপেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুগ্ধচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, ‘শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যদি এমনি—’। আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মারোয়াড়ী রমণীর নামে নালিশ করতে গিয়েছিলেন, তাহারা রেলগাড়িতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়ীমা আমায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয় ঘোরতর আপত্তি করিতেন, কিন্তু ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায় না। ইহাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্নগৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া

আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা ‘আসুন’ বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়, কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে জানাইয়াছিলে, এ বাড়িতে পান নাই; কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—এখানে উহা দুর্লভ বস্তু! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচলেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এক মুহূর্তেই জানা গেল এই ভাঙ্গা বাড়ি, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনটন—এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম ও বিদ্যাদান করিয়া শ্বশুরকুলে পাঠাইয়াছিলেন; তৎপরে সে জুতা-মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামী-পুত্র লইয়া ভাঙ্গা বাড়িতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কি না এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। অজয়ের ‘উৎপত্তি প্রকরণ’ উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখাপড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। তাহার মুড়িভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়া যোগবাশিষ্ঠের ঝাঁজ কোথাও উঁকি মারে নাই।

অথচ স্বামীর অবর্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে, শাসন ও সংশয়ের দড়িদড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোনদিন তাহার স্বামীর মনে

উঠে নাই। অথচ ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চললুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আসব।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আসব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী।

ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ির কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারীমহাশয়কে আজও ভাল চিনতে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি জা'ই বড় চমৎকার।

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই; কিন্তু তোমার ত মানুষ বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখ না চেষ্টা করে যদি এদের আবার মিল করে দিতে পার।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি তখন তর্ক করায় ফল হবে না।

রাজলক্ষ্মী তেমনি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখো না।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটেগোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ন-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙ্গিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙ্গুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে। কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়চে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়চে—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেচে। মনে হচ্চে এতদিন পরে একটি সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ধূলা-পা ধুইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি, বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ-পনর লোক বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চক্‌চক্‌ করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বার বার যা বলেচি ঠিক তাই হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্‌।

রতন কহিল, নব্‌নেকে পুলিশের লোক হাতকড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে এক্কেবারে খুন করে ফেলেচে।

বলিস কি রে! তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, মাঠাকরুন, এক্কেবারে খুন করেনি। খুব মেরেচে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙ্গাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। গেল কোথা? তোদের সুদ্ধ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস?

শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ওধারে দাঁড়া গে যা। যখন জিজ্ঞেস করব বলিস। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে সত্যি বল ত বিশ্বনাথ! লুকালে কিংবা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারীমহাশয়ের সন্ধানে কাছারি বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মারধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেম্‌নি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে এক শ’ বার বলেচি, ছোটলোকদের এসব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না।

যাও এখন সামলাও গে—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নব্‌নের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে।

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এম্‌নি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয়ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মতলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম, প্রেমলীলার যে অদৃশ্য চাপা-স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্বে

সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত দেখিতেছি, সমস্ত ডোমপাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিশেষ। কখন কোন্ পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুশ্রী তেমনি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরনে তার মিলের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি, তাহার মাথার ঘোমটা পথেঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়িতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াবে কি? এবং সেই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোন শহরে গিয়া পিয়াদাগিরি চাকরি করিয়া বছরখানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈঁচা, মিহি সুতার শাড়ি, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপজল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে এবং এইগুলির পরিবর্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা শুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি, ইহাদের বাক্ ও হাত-যুদ্ধ কোনদিন কামাই যায় না। মাথা ফাটাফাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন-দুই হইয়া গেছে—বোধ করি, এই জন্যও আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙ্গিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্তচিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে। কাল সকালে প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তীক্ষ্ণকণ্ঠ যখন গগন ভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া

কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ির পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না—নাহয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজী নয়। কাজকর্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট শুরু করবে। বলা বাহুল্য, এ-সকল সে শহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজকর্ম করবেই বা কখন? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালিগালাজ ও মারামারির মকদ্দমা আরও বার-দুই করিয়াছি—কোন ফল হয় নাই। আজ ভাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়ে-পুরুষে বাড়ি ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবুমশায়, ওকে আর আমি চাইনে—নষ্ট মেয়েমানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা-নোয়া খুলে দিক।

নবীন বলিল, তুই আমার রুপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে-দুইগাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পটপট করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত অবাক হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিকঠাক আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশ্বেশ্বরের বড়জামায়ের ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশুকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রুপোর চুড়ি এবং নাকে সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশুর কাছে জমা রাখিয়া পর্যন্ত দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছুদিন হইতে যে একটা কদর্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। শহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরি করব—তোর মত অমন দশগণ্ডা বিয়ে করব। রাঙামাটির হরি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্য সাধাসাধি করচে, তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস নে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গের চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। এই আস্ফালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহার শহরের চাকরি কিংবা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তাহার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বলচেন এ-সব নোংরা কাণ্ড বাড়ি থেকে বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশ্বেশ্বর মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধুলো লইতে আসে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক, যা হইল তা ভালই হইল। মন যখন ভাঙ্গিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গত কল্যকার নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্যবিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামীত্বের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে, কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—মেয়েটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পাড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ি চোখে পড়িল!

বলিলাম, এ মালতী!

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমায় ছুঁলি? ইস্! এ কি বল্ ত?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম, তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা-দুখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল; কহিল, মা, আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটুকণ্ঠে কহিল, কেন, তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বলচে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে—দিলেই পাঁচ বচ্ছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ'লই বা জেল, তাতে তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, ও-কথা তুমি ব'লো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে দিইনি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল; কহিল, মা, আমাদের তুমি এইবারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খাব। নইলে তোমারি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলোচুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, তুই চুপ কর্—আমি দেখচি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ'-দুই টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নবীন মোড়ল কিংবা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিত পাওয়া গেল না।

নয়

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল, যাক, বাঁচা গেল! রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিল না; সে উহাদের দুই-চারিদিনেই বিস্মৃত হইল; মনে পড়িলেও কি যে মনে করিত সেই জানে। তবে, পাড়া হইতে যে একটা পাপ বিদায় হইয়াছে তাহা অনেকেই ভাবিত। কেবল রতন খুশি হইল না। সে বুদ্ধিমান, সহজে মনের কথা ব্যক্ত করে না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল—এতসবড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আহত জ্ঞান করিল। তথাপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটীর যিনি কর্ত্রী, তাঁহার ত কোনদিকে খেয়ালমাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছ হইতে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণশুদ্ধির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। কোনদিন তথায় যাওয়ার তাহার বিরাম ছিল না। সেখানে সে কি পরিমাণে যে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল তাহা আমি জানিব কি করিয়া? আমি কেবল জানিতেছিলাম তাহার পরিবর্তন। তাহা যেমন দ্রুত, তেমনি অভাবিত। দিনের বেলায় আহারটা আমার চিরকাল একটু বেলাতেই সাঙ্গ হইত। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই—সে ঠিক; কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই। কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজলক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগামানুষ, তোমার এত দেরি করা কেন? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী-চাকরদের মুখের দিকে ত চাইতে হয়। তোমার কুঁড়েমিতে তারা যে মারা যায়। কথাগুলো ঠিক সেই

আগেকার তবুও ঠিক তা নয়। সেই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর যেন আর বাজে না—বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় রেশটুকু ধরা পড়ে না। তাই ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর-দাসী যাহারা, তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোনদিন রতন, কোনদিন বা দরোয়ান সঙ্গে যাইত, কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় পর্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই-চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল। কিন্তু ওই দুই-চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবে না। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্মকর্ম ও মন্ত্রতন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে নিমগ্ন থাকায় ক্রমশঃই উভয়ে যেন পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম, সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুরবেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এদিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিল না—সে আমি বুঝিতাম।

তবুও যতদূর পর্যন্ত তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়েহাঁটা আঁকাবাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত—অনেকদিন সেই সময়টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িত না; মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানি যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তার পরে বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তিবশতঃ হয়ত বা কোনদিন

ঘুমাইয়া পড়িতাম—নয়ত নিমীলিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি-বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশিদিন সহিতে পারিব না। রতন বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভান করিয়াছি; ভয় হইয়াছে, পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার ঘুণাগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরবেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটীতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্মার কথা মনে পড়িয়া বহুকালের পরে অভয়াকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে ফার্মে কাজ করিতাম, তাহার বড়সাহেবকেও একখানা পত্র লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, লইয়া কি হইবে, এত কথা তখনও ভাবি নাই। সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিতপদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখা গেল না। সেই মুহূর্তেই তাহার আঁচলের রাঙ্গা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোণটায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই একপ্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানি না কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ তখনও পর্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত, কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত, এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া

কিভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম, এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম। ছত্রকয়েক লেখার পরেই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা, গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল না। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামাণিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানে না!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জানলে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেচিস বল্। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাম্ভীর্যের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কিনা ছোটলোকের কথায় মজবেন না! তাদের চোখের জলে ভুলে দু'দু'শ টাকা জলে দেবেন না; বলুন, বলেছিলাম কি না! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা বরাবর জানি—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে, ইহার নিষ্ঠুর কদর্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে, নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে স্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে!

মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলোর যথার্থই এইভাবে সদ্গতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি নাকি? ছুঁড়িটা সেদিন আচ্ছা তামাশা করলে ত! টাকাগুলো গেল—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মারলে! —ও কি, তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি, তার চেয়ে খেতে না বসলেই ত হয়?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করি না—আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিল না, প্রায় কিছুই খাই নাই—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইহার লেশমাত্র কম-বেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা ও অভিযোগের অবধি থাকিত না—কিন্তু আজ যে কারণেই হোক একজনের সেই শ্যেনদৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে বলিয়াই যে অপরের গভীর বেদনাকেও হা-হুতাশের দ্বারা প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিব, সে-ও আমি নই। তাই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলা একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ কোন দুঃখ-কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমনি বাধাহীন উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ।

পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেইটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইল না—যথাসময়ের কিছু পূর্বেই সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেম্‌নিই

চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দুটা আজ শেষ করিয়া বেলা তিনটার পূর্বেই ডাকবাক্সে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দুখানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ত্রুটি, বার বার পড়িয়াও ধরিতে পারিলাম না। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়ার পত্রে রোহিণীদাদাকে নমস্কার জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি ঝুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিল না। তখন একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ-কথা বলি না; কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভয়ের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে। আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পা-

ও কখনো বাড়ায় নাই, তোমার এই কথাটাই আজ বারংবার মনে পড়িতেছে। হয়ত অত্যন্ত স্নেহ আমার সহে না বলিয়াই, হয়ত বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তোমাকে আর একবার মুখোমুখি না দেখা পর্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্যসত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেল না, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে, কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারীগৃহিণী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ি নেই, ফিরে আসতে বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সন্ধ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম, ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি অতিশয় দাম্ভিকা। কাহারও বাড়ি বড় একটা যান না। এ বাড়ির সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ; অন্ততঃ এতদিন ঘনিষ্ঠতা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্বে মাত্র বার-দুই আসিয়াছেন। মনিববাড়ি বলিয়া একবার নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

কেন যে আজ অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটীতে কেহ নাই জানিয়াও—আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

আসন গ্রহণ কহিয়া কহিলেন, আজকাল ছোটগিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন; তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারীগৃহিণী কহিলেন, প্রায়? রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোটগিন্নী কি কখনও আসে? একটি দিনও না! মানীর মান রাখবে সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই; সুতরাং তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও মনে হইল যে, মিথ্যাসঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অতএব এই অক্ষম ব্যক্তিটিকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানি না, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং কবে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহার সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার শ্বশুরকুলের বছর-দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজনামচার আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটাকয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়াদাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুণাবলী মনুষ্যজন্মে সম্ভবপর সমস্তগুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং অন্যদিকে যত কিছু ইহারই বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ,

মাস, প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধাম-সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না। প্রথমটা ছিলও না—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারীগৃহিণীর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েচে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তার পরে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকি রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচতেছিলেন।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইল না, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারীগৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল হাটে বেচতে—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বলচেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রি করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারীগৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবার আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই—আমি উঠলাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব-ঠাকরুনকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বলতেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ

মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্তা বলতেন, দু'মাস যাক, আপনিই ফিরে আসবে। তারপরে সাহস দিতেন, থাকো না আরও মাস-দুই চেপে, সব শুধরে যাবে—কিন্তু এমনি করে মিথ্যে আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে গেল। কিন্তু কাল যখন শুনলাম সে উঠানের দুটো বেগুন পর্যন্ত বেচতে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছারখার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়িতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়েমানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্তা ওকে কোনদিন চিনতে পারেন নি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিসপত্র পাঠাতাম; উনি বলতেন, সুনন্দা জেনেশুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবে না। আমিও ভাবতাম, হবেও বা! কিন্তু একদিন সব ভুল ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জানতে পারে, যতদিন যা-কিছু দিয়েচি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্তার তবুও চৈতন্য হ'ল না—হ'ল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয়কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোনপ্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারীগৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়াকপাল, তা হলে ত একটা উপায় হ'ত। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেচে যে, কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন, এমনি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দু'জনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাসত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাশুরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না। কিন্তু

এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেমন দয়ামায়াহীন—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারীগৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বলচি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়। কিন্তু শুনতে পাই আজকাল সে মার নাকি বড় বাধ্য—কোন একটা উপায় হয় না? আমি যে আর সইতে পারিনে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

দশ

মানুষের পরকালের চিন্তার মধ্যে নাকি পরের চিন্তার ঠাঁই নাই, না হইলে আমার খাওয়া-পরার চিন্তা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে পারে এত বড় বিস্ময় সংসারে আর কি আছে? এই গঙ্গামাটিতে আমরা কতদিনই বা আসিয়াছি, এই ক'টা দিনের মধ্যেই হঠাৎ সে কতদূরেই না সরিয়া গেল! আমার খাবার কথা জিজ্ঞেসা করিতে আসে এখন বামুনঠাকুর, আমাকে খাওয়াইতে বসে রতন। একপক্ষে বাঁচিয়াছি, সে দুর্লজ্ঘ্য পীড়াপীড়ি আর নাই। রোগা শরীরে এগারোটার মধ্যে না খাইলে এখন আর অসুখ করে না। এখন যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খাই। শুধু রতনের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় ও বামুনঠাকুরের সখেদ আত্মর্ভৎসনায় স্বল্পাহারের বড় সুযোগ পাই না—সে বেচারা ম্লানমুখে কেবলি মনে করিতে থাকে, তাহারই রান্নার দোষে আমার খাওয়া হইল না। কোনমতে ইহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বিছানায় গিয়া বসি। সম্মুখের সেই খোলা জানালা, আর সেই ঊষর প্রান্তরের তীব্র তপ্ত হাওয়া। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ দিনমান কেবলমাত্র এই ছায়াহীন শুষ্কতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কাটিতে চাহিত না, তখন একটা প্রশ্ন সবচেয়ে আমার বেশি মনে পড়িত—সে আমাদের সম্বন্ধের কথাটা। ভাল আমাকে সে আজও বাসে, ইহলোকে আমিই তার একান্ত আপনার, কিন্তু লোকান্তরে তার কাছে আমি তত বড়ই পর। তাহার ধর্মজীবনের আমি যে সঙ্গী নই, সেখানে আমাকে দাবি করিবার যে তাহার কোন দলিল নাই, হিন্দুঘরের মেয়ে হইয়া একথা সে ভুলে নাই। এই পৃথিবীটাই শুধু নয়, ইহারও অতীত যে স্থানটা আছে, পাথেয় তাহার শুধু আমাকে কেবল ভালবাসিয়াই অর্জন করা যাইবে না, এ-সংশয় বোধ করি খুব বড় করিয়াই তাহার মনে উঠিয়াছে।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলা কাটিতে লাগিল এম্‌নি করিয়া। কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারম্ভ হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন গ্লানিতে। নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। রতন আসিয়া মাঝে মাঝে তামাক দিয়া যায়, সময় হইলে চা আনিয়া দেয়—কিছু বলে না। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয়, সে পর্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাৎ আসিয়া বলে, বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিন, আগুনের ঝলক আসচে। আমি বলি, থাক। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁইয়া আসিল। হয়ত, সে আমারই মত তাহার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের শিশু সঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে। আর আমাদের উভয়ের সেই অন্নদাদিদি! ভাবিতাম, হয়ত এতদিনে তাঁহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। রোহিণীদা এখন কাজে গিয়াছেন, আর তাহাদের ছোট্ট বাসাবাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে।

দিনের বেলা আমারি মত সে ঘুমাইতে পারে না, এতদিনে—হয়ত, কোন ছোট্ট শিশুর কাঁথা, কিংবা ছোট বালিশের অড়, কিংবা এম্‌নি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিঁধে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে

প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায়ু হও বলিয়া আশীর্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরমে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়।

কর্মনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তাহারি পাশে নিষ্কলঙ্ক ঘুমন্ত বালক। যেন সদ্যফোটা পদ্মের মত শোভায় সম্পদে গন্ধে মধুতে টলটল করিতেছে। এতখানি অমৃত বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মানবসমাজে মানব-শিশুর মর্যাদা নাই, নিমন্ত্রণ নাই—স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে, তাহা আর কেহ না জানে আমি ত জানি। হৃদয়হীন-বর্বরতায় কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবার হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে!

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিমেষে শুকাইত। বর্মা হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকেও ঠাঁই দিত না। মৃত্যু-উৎসবের উদ্দণ্ড মৃত্যুলীলা শহরময় চলিয়াছে—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যুদূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন নূতন-পাতা ঘরকন্নার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্তও দ্বিধায় ফেলে নাই! সে কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইবে না, কিন্তু আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কাছে কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা—এই-সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

কাজের জন্য পুরানো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসা আছে আবেদন নামঞ্জুর হইবে না। সুতরাং আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে ভার সে জমা করিয়াছে আপনার অসামান্য সরলতায় ও স্বেচ্ছায়, আর আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ বলহীনতায় ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখোমুখি কেমনতর দেখিতে হইবে।

একাকী সমস্তদিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন বেলা পড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূলাময় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন কোন দিন অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম।

অন্যমনে আজও তেম্‌নি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে ধূলার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে-একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্তবাবু না? আমাকে চিনতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিন্ন ও মলিন সাহেবী পোশাক, মাথায় জরাজীর্ণ সোলার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ডক্লাস থেকে প্রোমোশন না পেয়ে সার্ভে-স্কুলে পড়তে যাই, মনে পড়ে না?

মনে পড়িল। খুশি হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ব্যাঙ। এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছ কোথায়?

ব্যাঙ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাধে সাজি ভাই, রেলওয়ে কনস্ট্রাক্‌শনে সাব-ওভারসিয়ারী চাকরি করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট-কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? এতদিন তারাই আমাকে তাড়াত। সোপলপুরে একটু বরাত সেরে ফিরচি—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, কোনদিন সুযোগ হয় আসব।

ব্যাঙ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে, ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত গোলমেলে। ছেলে-মেয়ে নাই, অতএব তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাঙ সাদাসিধাগোছের লোক। আমার উত্তরগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই হইবে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়; তবে লোকজন নাই, সঙ্গীসাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয় না, কারণ সন্ধ্যার পরে একটু নেশা-ভাঙ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হোক বাঙালীর চেয়ে ঢের ভাল—টেম্পোরারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা হইয়াছে—যত ইচ্ছা খাও, তার নিজের ত একরকম পয়সা লাগে না বলিলেই হয়—সবই ভাল—কনস্ট্রাক্‌শনে দু’পয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্যে বড়সাহেবকে ধরিয়া চাকরি একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে—এমনি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট-বড় কাহিনী। ব্যাঙ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেকদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে বকিতে চলিল; বার বার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধূলা দিতে পারি, এবং

ভরসা দিয়া জানাইল যে, পোড়ামাটিতে প্রায়ই তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত হইবে।

সেদিন বাড়িতে ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইল। পাচক আসিয়া জানাইল আহার প্রস্তুত। হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবে না বলে রাখচি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা না শুনেই?

কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় ব'লো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসিমুখ গম্ভীর হইল, কহিল, আচ্ছা—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল আমার থালার উপরে। কহিল, ভাত খাচ্চ যে বড়? তুমি জান রাত্রে তোমার ভাত সহ্য হয় না—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবে না ঠিক করেচ?

ভাত আমার ভালই সহ্য হইতেছিল, কিন্তু সেকথা বলিয়া লাভ নাই। রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ! পাচক দ্বারের কাছে আসিতেই তাহাকে থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ? তোমাকে বোধহয় এক হাজার বার বলেচি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাত্রে দেবে না—তোমাকে একমাসের মাইনে আমি জরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া জরিমানার কোন অর্থ নাই, তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরস্কারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বৈ কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, ঘি নেই, আমি কি করব?

নেই কেন তাই শুনি?

সে জবাব দিল, দু-তিনদিন জানিয়েচি আপনাকে ঘি ফুরিয়েচে, লোক পাঠান। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার খরচের সাধারণ ঘি এইখানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু আমার জন্য আসিত সাঁইথিয়ার নিকটবর্তী কি একটা গ্রাম হইতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে হইত।

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্যমনস্ক কর্ণরন্ধ্রে হয় প্রবেশ করে নাই, না হয় ত সে ভুলিয়াছে।জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা হবে পাঁচ-সাতদিন।

এই পাঁচ-সাতদিন তাঁকে ভাত খাওয়াচ্চ? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলেছিলাম, কিন্তু তুই কি আনিয়ে দিতে পারতিস নে বাবা! এম্‌নি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জব্দ করতে হয়!

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরানীর উপর খুশি ছিল না। দিবারাত্রি বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকায় এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ঔদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ হইয়া ছিল, কর্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাহ্যি করলে না দেখে ভাবলুম ভাল দামী ঘি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ-ছদিন ধরে রোগামানুষকে আমি ভাত খেতে দিই!

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিল না, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করিয়া বোধ করি সেইমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে?

বলিলাম, না,

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেচি, তার অর্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুম না।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক, ভালবাসাটাও ত একরকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয় না— গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই— এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য সেদিন তিক্ত বিষ হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিল না। জীবনের এতবড় সর্বব্যাপী প্রশ্নটাকেও সে যেন এক নিমিষে আপনা-আপনিই ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্ন ঠাকুর বলছিলেন একটা ব্রতের কথা,—কিন্তু একটু বলে সবাই নিতে পারে না, আর এত সুবিধাই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

অসমাপ্ত প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম; সে বলিতে লাগিল, তিনদিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি ইচ্ছে,—দু'জনের একসঙ্গেই তা হলে হয়ে যায়, কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল, তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে হবে না।

কহিলাম, তবে এ মতলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাশা করতে হবে না।

তামাশা নয়, সত্যি আমার মত নেই—আমি নিষেধ করচি

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেচি। জিনিসপত্র কিনতে লোক গেছে—কাল হবিষ্যি করে পরশু থেকে যে—বাঃ! এখন বারণ করলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—বাঃ! এ কেবল

তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবে না, তুমি বল তোমার মত আছে।

বলিলাম, আছে। কিন্তু তুমি কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা কর না লক্ষ্মী, আজই বা হঠাৎ কেন তামাশা করতে এলে? আমার আদেশ মানতে হবে এ দাবি আমি ত কখনো তোমার কাছে করিনি!

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনও হবে না, এইবারটি শুধু প্রসন্ন মনে আমাকে হুকুম দাও।

কহিলাম, আচ্ছা। কিন্তু ভোরেই তোমাকে হয়ত যেতে হবে, আর রাত ক'রো না শুতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেল না, আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে স্নেহস্পর্শ আর নাই। সেও ত বেশিদিনের কথা নয়, আরা রেলওয়ে স্টেশন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ি আনিয়াছিল, সেদিন এমনি করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাড়াইতে ভালবাসিত। ঠিক এমনিই নীরবে, কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া নারীহৃদয়ের যাহা-কিছু আছে, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা-দুটার উপরে উজাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই, এই লইয়াই যে কেমন করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত—আসার দিনেও আমার মত চাহে নাই, হয়ত যাবার দিনেও তেমনি মুখ চাহিবে না। চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙালবৃত্তি করিতেও আমি পারি না। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না প্রমত্ত আক্ষেপ—স্নেহের সুধা গরল হইয়া উঠার কত

না বিক্ষুব্ধ কাহিনী! এ-সকল মিথ্যা নয় জানি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে বৈরাগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া বলিতে লাগিল ছি ছি ছি!

বহুক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তখন জানিতেও পারিল না যে, নিদ্রাবিহীন নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। অশ্রু পড়িতেই লাগিল, কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত ধন একদিন আমারই ছিল বলিয়া ব্যর্থ হাহাকারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

এগার

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, অতি প্রত্যূষেই রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেছে, এবং তিনদিনের মধ্যে যে বাড়ি আসিতে পারিবে না, এ খবরও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট কাণ্ড কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যে গতিবিধি হইতেছে, কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে, তাহার আভাস জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ব্রত, কিরূপ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের পথ কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতাম না, জানার কৌতহূলও ছিল না। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও গেলেন না বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুস্কিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারে না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা। বলা যায় না ত!

না, বলা কিছুই যায় না। প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে ত ঠিক। তা ছাড়া তুমি ত জান রতন, এই-সব পূজা-অর্চনা, ধর্মকর্মের মাঝখানে আমি ভয়ানক বেমানান হয়ে পড়ি। যাগযজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক। কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক সে।

হঠাৎ মস্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীমহাশয় সস্ত্রীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস কি রতন, একেবারে সস্ত্রীক?

আজ্ঞে হাঁ। তাও আবার বিনা নেমন্তন্নে।

বুঝিলাম ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এইজন্যই সে নিজের বাটীতে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বিনুকে কোলে নিয়ে বড়গিন্নীর সে কি কান্না! ছোট-মাঠাকরুন স্বহস্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চাননি বলে আসন পেতে ঠাঁই করে ছোট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ব্যাপার দেখে বুড়ো কুশারীঠাকুরমশাই ত একেবারে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলেন— আমার ত বোধ হয় বাবু, কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে ছোট-মাঠাকরুন এবার ওই ভাঙ্গা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। তা যদি হয় ত গাঁ-সুদ্ধ সবাই খুশি হবে। আর এ কীর্তি যে আমার মায়ের, সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্চি বাবু।

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখানি আশান্বিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সুমুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দুটি ভাই ও জায়েদের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিড় না খাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভাঙ্গন ধরিয়াছে—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে। একান্তমনে আশীর্বাদ করিলাম, এই সদিচ্ছা যেন

তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন্ শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানি না, কিন্তু আজ তাহার তিনদিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এই কথাটা বহুদিন পরে আবার যেন নূতন করিয়া স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিল না, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই—দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বক্রেশ্বর বলিয়া তীর্থ আছে, সেখানে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন-স্নান করিলে শুধু কেবল সেই-ই নয়, তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের তিনকোটি জন্মের যে যেখানে আছে সবাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। সঙ্গী জুটিয়াছে, দ্বারে গরুর গাড়ি প্রস্তুত, যাত্রাক্ষণ প্রত্যাসন্নপ্রায়। দু-একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু দারোয়ানের হাত দিয়া রতন পাঠাইয়া দিল, সে বেচারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দিতে গেল। শুনিলাম ফিরিয়া আসিতে পাঁচ-সাতদিন বিলম্ব হইবে।

আরও পাঁচ-সাতদিন! বোধ করি অভ্যাসবশতঃই হইবে, আজ তাহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু রতনের মুখে অকস্মাৎ তাহার তীর্থযাত্রার সংবাদ পাইয়া অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়ারী সত্য সত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহমনে যে বেদনার আর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে অশ্রান্ত বিক্ষোভ, নিজের জীবন হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার এই যে দিগ্বিহীন ব্যাকুলতা, ইহার কি কোন শেষ নাই? খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত কি সে দিনরাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে? আর সেই পিঞ্জরের লৌহশলাকার মত আমিই কি চিরদিন তাহার মুক্তিপথের দ্বার

আগলাইয়া থাকিব? সংসারে যাহাকে কোনকিছু দিয়া কোনদিন বাঁধিতে পারিল না, সেই আমার ভাগ্যেই কি শেষে এত বড় দুর্ভোগ লিখিয়া দিয়াছেন? আমাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ইহারই পুরস্কার দিতে কি তাহার সকল ভবিষ্যৎ সুকৃতির গায়ে নিগড় হইয়া থাকিবে?

মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব—সেবারের মত নয়, এবার, একান্তচিত্তে, অন্তরের সমস্ত শুভাশীর্বাদ দিয়া চিরদিনের মত মুক্তি দিব, এবং যদি পারি, সে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি এ দেশ ছাড়িয়া যাইব। কোন প্রয়োজনে, কোন অজুহাতে, সম্পদ ও বিপদের কোন আবর্তনেই আর তাহার সম্মুখীন হইব না। একদিন নিজের অদৃষ্টই আমাকে এ সঙ্কল্প স্থির রাখিতে দেয় নাই, কিন্তু আর তাহার কাছে আমি কিছুতেই পরাভব মানিব না।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! একদিন পাটনা হইতে যখন বিদায় লইয়াছিলাম, পিয়ারী চুপ করিয়া তাহার দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তখন মুখে তাহার কথা ছিল না, কিন্তু সেই নিরুদ্ধ অন্তরের অশ্রুগাঢ় ফিরিবার ডাক কি সমস্ত পথটাই আমার কানে গিয়া পুনঃপুনঃ পৌঁছে নাই? কিন্তু ফিরি নাই। দেশ ছাড়িয়া সুদূর বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে রূপহীন, ভাষাহীন দুর্বার আকর্ষণ আমাকে অহর্নিশি টানিতে লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? আবার একদিন ফিরিয়া আসিলাম। বাহিরের লোকে আমার পরাজয়ের গ্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অম্লানকান্ত জয়মাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না।

এম্‌নিই হয়। আমি জানি, অচিরভবিষ্যতে আবার একদিন বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িবে । সেদিনও হয়ত সে এমনি নীরব হইয়াই রহিবে, কিন্তু আমার শেষ বিদায়ের যাত্রাপথ ব্যাপিয়া সেই অশ্রুতপূর্ব নিবিড় আহ্বান হয়ত আর কানে পশিবে না।

মনে মনে বলিলাম, থাকার নিমন্ত্রণ শেষ হইয়া যখন যাওয়াটাই কেবল বাকী থাকে, সে কি ব্যথার বস্তু! অথচ এ ব্যথার অংশী নাই, শুধু আমারই হৃদয়ে গহ্বর খনিয়া এই নিন্দিত বেদনাকে চিরদিন একাকী থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসিকান্না, মান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিবিড় মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে যেমন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ অন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেম্নি অর্থহীন। আজ এই কথাটাই আমার সবচেয়ে বেশি বাজিতে লাগিল, একের মর্মান্তিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি পৃথিবীতে আর আছে কি! অথচ, এম্নিই বটে। লোকের মধ্যেও বাস করিয়া যে লোক লোকাচার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নালিশ করিবে গিয়া কাহার কাছে? এ সমস্যা শাশ্বত ও পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্যন্ত এই প্রশ্নই বারংবার আবর্তিয়া চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অন্যায়, অবাঞ্ছিত। তথাপি, এত বড় সম্পদ, এত বড় ঐশ্বর্যই কি মানুষের আর আছে? অবাধ্য নরনারীর এই অবাঞ্ছিত হৃদয়াবেগের কত নিঃশব্দ বেদনার ইতিহাসকেই না মাঝখানে রাখিয়া যুগে যুগে কত পুরাণ, কত কাহিনী, কত কাব্যেরই না অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আজ ইহা যদি থামিয়া যায়? মনে মনে বলিলাম, থাক। রাজলক্ষ্মীর ধর্মে মতি হোক, তাহার বক্রেশ্বরের রাস্তা সুগম হোক, তাহার মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল হোক, আশীর্বাদ করি তাহার পুণ্যার্জনের পথ নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হইল, গঙ্গামাটির এই বাড়িঘর, পথঘাট, খোলা মাঠ, সকল বন্ধনই যেন আমার শিথিল হইয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী কবে ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু মন যেন আর একটা দণ্ডও এখানে থাকিতে চাহে না। স্নানের জন্য রতন তাগিদ শুরু করিয়াছে। কারণ, যাইবার

সময় রাজলক্ষ্মী শুধু কড়া হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, রতনকে তাহার পা ছুঁয়াইয়া দিব্য করাইয়া লইয়াছে যে, তাহার অবর্তমানে আমার এতটুকু অযত্ন বা অনিয়ম না হয়।

খাবার সময় সকালে এগারোটা ও রাত্রে আটটার মধ্যে ধার্য হইয়াছে, রতনকে প্রত্যহ ঘড়ি দেখিয়া সময় লিখিয়া রাখিতে হইবে। কথা আছে, ফিরিয়া আসিয়া সে প্রত্যেককে একমাসের করিয়া মাহিনা বকশিশ দিবে। রান্না শেষ করিয়া বামুনঠাকুর ঘর-বাহির করিতেছে, এবং চাকরের মাথায় তরিতরকারি, মাছ, দুধ প্রভৃতি লইয়া প্রভাত না হইতেই যে কুশারীমহাশয় স্বয়ং আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেছেন আমি তাহা বিছানায় শুইয়া টের পাইয়াছিলাম। ঔৎসুক্য কিছুতেই আর ছিল না—বেশ, এগারোটা এবং আটটাই সই। একমাসের উপরি মাহিনা হইতে আমার জন্য কেহ বঞ্চিত হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কাল রাত্রে অতিশয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, আজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া বিছানায় শুইতে না শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল চারিটার কাছাকাছি। কয়েকদিন হইতেই নিয়মিত বেড়াইতে বাহির হইতেছিলাম, আজিও হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বারের বাহিরে একজন লোক বসিয়াছিল, সে হাতে একখানা চিঠি দিল। সতীশ ভরদ্বাজের চিঠি, কে একজন অনেক কষ্টে এক ছত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে অত্যন্ত পীড়িত। আমি না গেলে সে মরিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে তাহার?

লোকটা বলিল, কলেরা।

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। খুশি তাহার কলেরার জন্য নয়। গৃহের সংস্রব হইতেই কিছুক্ষণের জন্যও যে দূরে যাইবার সুযোগ মিলিল ইহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

একবার ভাবিলাম রতনকে ডাকিয়া একটা খবর দিয়া যাই, কিন্তু সময়ের অভাবে ঘটিয়া উঠিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বাহির হইয়া গেলাম, এ বাড়ির কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটিয়া শেষবেলায় গিয়া সতীশের ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। ধারণা ছিল, রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের ইনচার্জ এস. সি. বর্‌দাজের অনেক কিছু ঐশ্বর্য দেখিতে পাইব, কিন্তু গিয়া দেখিলাম হিংসা করিবার মত কিছু নয়। ছোট একটা ছোলদারি তাঁবুতে সে থাকে, পাশেই তাহার লতাপাতা খড়কুটা দিয়া তৈরি কুটীরে রান্না হয়। একটি হৃষ্টপুষ্ট বাউরী মেয়ে আগুন জ্বালিয়া কি একটা সিদ্ধ করিতেছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। এ সতীশের প্রণয়িণী।

ইতিমধ্যে রামপুরহাট হইতে একজন ছোকরাগোছের পাঞ্জাবী ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সতীশের বাল্যবন্ধু জানিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। রোগীর সম্বন্ধে জানাইলেন যে কেস সিরিয়াস্ নয়, প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ট্রলি প্রস্তুত, এখন বাহির হইতে না পারিলে হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছাতে অতিশয় রাত্রি হইয়া যাইবে—ক্লেশের অবধি থাকিবে না। আমার কি হইবে সে তাঁহার ভাবিবার বস্তু নয়। কখন কি করিতে হইবে রীতিমত উপদেশ দিলেন, এবং ঠেলাগাড়িতে রওনা হইবার মুখে কি ভাবিয়া তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া গোটা দুই-তিন কৌটা ও শিশি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কলেরা কতকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ঐ ডোবার জলটা ব্যবহার করতে মানা করে দেবেন, এই বলিয়া তিনি মাটিতোলা খাদটা হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আর যদি খবর পান কুলিদের মধ্যে কারও হয়েচে—হতে পারে—এই ঔষধগুলো ব্যবহার করবেন।

এই বলিয়া তিনি রোগের কি অবস্থায় কোনটা দিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

মানুষটি মন্দ নয়, মায়াদয়া আছে। আমার বাল্যবন্ধু কেমন থাকেন কাল যেন তিনি খবর পান, এবং কুলিদের উপরও যেন দৃষ্টি রাখিতে ভুল না হয়, আমাকে বার বার সাবধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ হইল ভাল। রাজলক্ষ্মী গিয়াছে বক্রেশ্বর দেখিতে, আর রাগ করিয়া আমি বাহির হইয়াছি পথে। পথেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্যকালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই। তবে বছর-পনর খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই অকস্মাৎ এ কি ঘোরতর মাখামাখি! তাঁহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, শুশ্রূষার ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর! বাকি রহিল শুধু তাঁহার সোলার হ্যাট এবং টাট্টু ঘোড়াটি। আর বোধ হয় যেন ওই কুলি মেয়েটিও। তাহার মানভূমের অনির্বচনীয় বাউরী ভাষার অধিকাংশই ঠেকিতে লাগিল, কেবল এটুকু ঠেকিল না যে, মিনিট দশ-পনরর মধ্যেই সে আমাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছে। যাই, আর ত্রুটি রাখি কেন, ঘোড়াটিকে একবার দেখিয়া আসি গে।

ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে রাজলক্ষ্মীই বা আসিত কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোঝা বহাইত কেমন করিয়া? আর এই ব্যাঙ এবং তাহার কুলি গ্যাঙ! কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এ-সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে একমুহূর্তের অধিক সময় লাগিত না। আর আমিই বা সারাজীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?

তাঁবুটা রেল কোম্পানির। সতীশের নিজস্ব সম্পত্তির একটা তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কয়েকটা এনামেলের বাসন, একটা স্টোভ, একটা লোহার তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন তেলের বাক্স, এবং তাহার শয়ন করিবার ক্যাম্বিশের খাট, বহু-ব্যবহারে ডোঙার আকার ধারণ করিয়াছে। সতীশ চালাক লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়োজন হয় না, একখানা যা-তা হইলেই চলিয়া যায়, তাই ডোরাকাটা একখানা শতরঞ্চি ছাড়া আর কিছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে

কলেরা হওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাহার ছিল না। ক্যাম্বিশের খাটে শুশ্রূষা করার অত্যন্ত অসুবিধা এবং একমাত্র শতরঞ্চি অতিশয় নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। এতএব তাহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী; জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে পার?

কালী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, এখানে কি গরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচ্‌বেক!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনলে আর শঙ্করের মোহ-মুদ্গার-পাঠের আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া; কিছু একটা পাতা চাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরনের একখানা কাপড়চোপড়ও কি নেই?

কালী ঘাড় নাড়িল । তাহার মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। সে ‘বোধ হয়’ বলে না। কহিল, কাপড় নেই, পেন্টুলুন আছে।

পেন্টুলুন সাহেবী জিনিস, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহার দ্বারা শয্যারচনার কাজ চলে কি না ভাবিয়া পাইলাম না। সহসা মনে পড়িল, আসিবার সময় অদূরে একটা ছিন্ন জীর্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম; কহিলাম, চল না যাই, দু’জনে ধরাধরি করে সেটা নিয়ে আসি। পেন্টুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজী হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া তাহাতেই সতীশ ভরদ্বাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধারে কালী অত্যন্ত

সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেয়েদের নাক ডাকে না। কালী তাহাও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের হাতে-পায়ে ঘন ঘন খিল ধরিতেছে, সেকতাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জানাইল, কাঠকুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু আলোর মধ্যে সম্বল এই হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। তথাপি একবার তাহার রান্নাঘরে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই। এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নিসংযোগ করিতে পারি এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু সাহস হইল না, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই সতীশের সৎকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্প খাট এবং কেরোসিনের বাক্স বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুঁটুলির মত করিয়া কিছু কিছু সেঁক দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইল না।

রাত্রি দু'টাই হইবে কি তিনটাই হইবে, খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদবমি হইতেছে।

তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি-লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়িতে তাহারা থাকে। ছাদবিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটি কাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্যস্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রাকের উপরে উঠিলাম। একধারে একজন বুড়াগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছে। অন্যধারে জন পাঁচ-সাত লোক,

স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে, কেহ বা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কৈ?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আর-একখানা ট্রাক দেখাইয়া কহিল, উখানে।

পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক। বয়স পঁচিশ-ত্রিশের অধিক নয়, গুটি দুই ছেলেমেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামে চা-বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।

এ গাড়িতেও আরও জন পাঁচ-ছয় স্ত্রী-পুরুষ ছিল, তাহারা একবাক্যে উহার পাষণ্ড স্বামীর নিন্দা করা ছাড়া আমার বা রোগিণীর কোন সাহায্যই করিল না। পাঞ্জাবী ডাক্তারের শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশু-দুটাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদের ভার লইতে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

সকাল নাগাদ আর একটি ছেলের ভেদবমি শুরু হইল, ওদিকে সতীশ ভরদ্বাজের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বহু সাধ্যসাধনায় একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া স্টেশনে পাঞ্জাবী ডাক্তারকে খবর দিতে। সে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তিনি আর কোথায় গিয়াছেন রোগী দেখিতে।

আমার সবচেয়ে মুস্কিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না। নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আছি। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হইল, কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? সুমুখের খাদের জল ব্যবহার করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু কেহই কথা শুনিল না। মেয়েরা মৃদুহাস্যে জানাইল, এ ছাড়া

জল আর আছে কোথায় ডাক্তার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ করিতে রাজী নয়।

এম্‌নি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দুইদিন তিনরাত্রি বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব-কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দু'দিন আগে, কেহ দু'দিন পরে—এ আমি সহজে এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথাটা বুঝিবার জন্য এত শাস্ত্রালোচনা, এত বৈরাগ্যসাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য? সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।

পরদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হইল। লোকাভাবে দাহ করা গেল না, মা ধরিত্রী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকের কাজ মিটাইয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না, জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রখর সূর্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্যন্ত কেহ নাই। সরকারী কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে! গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনধারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া

আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই! শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি।

সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর কীর্তি তাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় নরনারী নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুরবেলায় রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হাঙ্গামাটাও এ বেলায় মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে। জমাদারের গাড়ি হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রাকেই কে-একটা মেয়ের বোধ হয় জন-দুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই। এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ-কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরের একটা গাড়ি হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার মা ঔষধ চাহিতে আসায় খবর পাইলাম কামিনীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। লজ্জা নাই, সরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। শুধু আমিই কেবল দল-ছাড়া। আসন্ন মৃত্যুলোকযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রাত্রে একাকী বসিয়া আছি।

ছেলেটা বলিল, জল—

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তারপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

তৃষ্ণার জল না থাক, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিই নয়, নিজের সুদুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম ঔদাসীন্য! এই ত পশু! এ ধৈর্যশক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু।

আমাদের ট্রাকের অন্য লোকগুলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কালি-পড়া হ্যারিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকেও আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, মা ও ছেলে উভয়েরই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে। কিন্তু কি-ই-বা আমার করিবার ছিল!

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমন্ডল জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর্। কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।

বার

সকালে খবর পৌঁছিল আর দুই জন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন!

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুই জন ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছিলেন; কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃদ্ধ, তিনি মুখটা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন, ঐ যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিস কিছু মেলে?

অন্যজন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলে না কি রকম! ভদ্রলোকের গ্রাম—চাল, ডাল, ঘি, তেল, তরিতরকারি যা খুশি আপনার। আসছেন কোথা থেকে? নিবাস? মশায়, আপনারা?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম করিতে উভয়ে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; বৃদ্ধ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর! ইনি কোন্-একটা হাইস্কুলের হেডমাস্টার।

তাঁহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে! কাঁচা পয়সাটা বেশ হাতে ছিল কিনা!

প্রত্যুত্তরে সতীশের টাটকা কবরের ঢিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ করিতে পারা যায় নাই, ঐখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি?

শুনিয়া উভয়েই ক্ষুব্ধ হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রাম, একটুখানি খবর পাইলে যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। এই বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিলাম। দুইদিন খাওয়া হয় নাই, অথচ, কুলিদের মধ্যে কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং, এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালি পেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশি বলিতে হইল না—বলার প্রয়োজনই ছিল না, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, শহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্সটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থিমজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায়, আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ!

ক্ষুধার্ত ও একান্ত ক্লান্ত দেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের

বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাতবার? কোন লোকে কি তা’ চায়? চায় না।

কিন্তু তবু চাই। দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়—কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মারা যেতেন? কখ্‌খনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা হর্‌-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই? ঠিক নয়?

আলোচনা করিবার মত গলায় জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্র এইজন্য তেত্রিশ কোটি নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার জো নাই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার এই চিন্তাতেই যেন বাক্যযোজনা করিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে মানুষ আমি, আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিসপত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেত, এখন থোড়, মোচা, উঠোনের দুই-আঁটি শাক পর্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে, থাক, সাড়ে-আটটার গাড়িতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দু’পয়সা

আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েচে অপব্যয়—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা-করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ।

এই-সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি। শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হতো না।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবন-ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া শৌখিন আবর্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা না জন্মিয়াই পারে না। বিশেষতঃ, দরিদ্র মানবের যে দুঃখ ও যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তিতর্ক দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না; তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না করে যদি বিক্রি হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হ্যাঁ নিতান্ত মন্দ, নিছক অকল্যাণ।

ইঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা ঢের বেশি প্রচণ্ড।

বলিলেন, এই অপচয়ের ধারণাটা আপনার বিলাতের আমদানি, ধর্ম্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয়নি, জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ? এই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি,

বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পর ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্বৃত্ত অন্নে অপরের চিরদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে থাকবে, এইটেই কি মঙ্গলের? তা ছাড়া, বাস্তবিক, বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায়?

ভদ্রলোক তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিনেই বটে। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ!

এই ব্যঙ্গোক্তির আর উত্তর দিলাম না। কারণ, একে ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিল না, অপিচ তাঁহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিল না।

কিন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ জ্ঞানে অত্যন্ত উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদ্দাম বণিকবুদ্ধির তত্ত্বকথাটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে শুধু ষোল আনার পরিবর্তে চৌষট্টি পয়সা গুনে নিতে—ওরা বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা, ওরা শিখেচে শুধু ভোগটাকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করতে। তাইত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েচে। মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা—এই ত হ'ল পবিত্র vested interest—এই গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলছিলেন একের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুটুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হ'ত, না হয় অভাবগ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেত। একেই অপচয় বলছিলেন, না?

কহিলাম, হাঁ, তার দিক দিয়ে অপচয় বৈ কি।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তরে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এসব বিলাতি বুলি অর্বাচীন অধার্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশি চিন্তা করতে শিখবেন, তখন আপনারই সন্দেহ হবে বাস্তবিক এইটেই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটাই বেশি অপচয়। দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জনকতক উদ্যমহীন, উপার্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা-পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড়লোকের আড্ডায় গান-বাজনা করে, বারোয়ারীতলায় মোড়লি ক'রে, আরও—এম্‌নি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্নসংস্থান থাকত তা নয়, তবুও অনেকের উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে-দুঃখে দিন চলে যেত। আপনাদের অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের পরেই ত? যাক, চিন্তার হেতু নেই, এই-সব অলস, অকেজো, পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে।

কারণ, উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অন্নাভাবে মরেচে, না হয় কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্যবৃত্তিতে ভর্তি হয়ে জীবন্মৃতভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহন্নতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আমার মত যাদের বেশি বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে। জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে।

এই শেষ কথাটায় চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাকে অল্পশিক্ষিত, সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক ব্যতীত কিছুই বেশি মনে হইল না—অথচ বাক্য যেন তাঁহার অকস্মাৎ আপনাকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

তাঁহার সকল কথাকেই যে অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিলাম তাহা নয়, কিন্তু অস্বীকার করিতেও বেদনা বোধ করিলাম। কেমন যেন সংশয় জন্মিল, এ-সকল বাক্য তাঁহার নিজের নয়, এ যেন অলক্ষিত আর কাহারও জবানি।

অতিশয় সঙ্কোচের সহিত প্রশ্ন করিলাম, কিছু যদি মনে না করেন—

না না, মনে করব কেন? বলুন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ-সকল কি আপনার নিজেরই অভিজ্ঞতা, নিজেরই চিন্তার ফল?

ভদ্রলোক রাগ করিলেন। বলিলেন, কেন, এসব মিথ্যে নাকি? একটি অক্ষরও মিথ্যে নয় জানবেন।

না না, মিথ্যে ত বলিনি, তবু—

তবু আবার কি? আমাদের স্বামীজী কখনো মিথ্যে উচ্চারণ করেন না। তাঁর মত জ্ঞানী কেউ আছে নাকি?

প্রশ্ন করিলাম, স্বামীজী কে?

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি ইহার উত্তর দিলেন। কহিলেন, স্বামী বজ্রানন্দ। বয়সে কম হলে কি হয়, অগাধ পণ্ডিত, অগাধ—

তাঁকে আপনারা চেনেন নাকি?

চিনিনে? বেশ! তিনি আমাদের আপনার লোক বললেই যে হয়! এঁর বাড়িতেই যে তাঁর প্রধান আড্ডা! এই বলিয়া তিনি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া কহিলেন, আড্ডা ব'লো না নরেন,—বল আশ্রম। মশাই, আমি গরীব, যা পারি তাঁর সেবা করি। কিন্তু এ যেন বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ ত নয়, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্প্রতি কতদিন আছেন আপনাদের গ্রামে?

নরেন কহিলেন, প্রায় মাস-দুই হবে। এ অঞ্চলে না আছে একটা ডাক্তার-বদ্যি, না আছে একটা ইস্কুল। এর জন্যেই তাঁর যত পরিশ্রম। আবার নিজেও একজন মস্ত ডাক্তার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইল। ইনিই সেই আনন্দ। সাঁইথিয়া স্টেশনে আহারাদি করাইয়া রাজলক্ষ্মী যাঁহাকে পরম সমাদরে গঙ্গামাটিতে আনিয়াছিল। সেই বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মীর সে কি কান্না! পরিচয় ত মাত্র দু'দিনের, কিন্তু কত বড় স্নেহের বস্তুকেই যেন চোখের আড়ালে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে এমনি তাহার ব্যথা। ফিরিয়া আসিবার সে কি ব্যাকুল অনুনয়! কিন্তু আনন্দ সন্ন্যাসী। তাহার মমতাও নাই, মোহ নাই। নারী হৃদয়ের বেদনার রহস্য তাহার কাছে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তাই এতদিন এত কাছে থাকিয়াও অপ্রয়োজনে দেখা দিবার প্রয়োজন সে পলকের জন্যও অনুভব করে নাই, এবং ভবিষ্যতে হয়ত কখনো এই প্রয়োজনের হেতু আসিবে না।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ কথা শুনিলে যে কত বড় আঘাত পাইবে, সে শুধু আমিই জানি।

নিজের কথা মনে পড়িল। আমারও বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন হইয়া আসিতেছে—যাইতেই হইবে তাহা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করিতেছি—আমার প্রয়োজন রাজলক্ষ্মীর সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে, কেবল ইহাই ভাবিয়া পাই না, সেদিনের দিনান্তটা রাজলক্ষ্মীর কোথা দিয়া কেমন করিয়া অবসান হইবে।

গ্রামে পৌঁছিলাম। নাম মামুদপুর। বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্তী তাহারই উল্লেখ করিয়া সগর্বে কহিলেন, নাম শুনে চমকাবেন না মশাই, আমাদের চতুঃসীমানার মধ্যে মুসলমানের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে হয় না। যেদিকে তাকান ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর সৎজাত। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্যন্ত নেই। কি বল নরেন, আছে?

নরেন সানন্দে সায় দিয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিল, একটিও না, একটিও না।তেমন গাঁয়ে আমরা বাস করিনে।

হইতে পারে সত্য, কিন্তু এত খুশি হইবারই বা কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

চক্রবর্তী-গৃহে বজ্রানন্দের সাক্ষাৎ মিলিল। হাঁ তিনিই বটে। আমাকে দেখিয়া তাঁর যেমন বিস্ময়, তেমনি আনন্দ।

দাদা যে! হঠাৎ এখানে? এই বলিয়া আনন্দ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। এই নরদেহধারী দেবতাকে সসম্মানে অভিবাদন করিতে দেখিয়া চক্রবর্তী বিগলিত হইয়া গেলেন। আশেপাশে আরও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেই হই, সামান্য ব্যক্তি যে নয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় রহিল না।

আনন্দ কহিলেন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে দাদা?

উত্তর দিলেন চক্রবর্তী। আমার যে দিন-দুই আহার-নিদ্রা ছিল না, এবং বহু পুণ্যফলেই শুধু বাঁচিয়া আসিয়াছি ইহাই ব্যক্ত করিয়া কুলিদের মধ্যে মড়কের বিবরণ এম্‌নি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন যে, আমার পর্যন্ত তাক লাগিয়া গেল।

আনন্দ বিশেষ কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া, অপরের কান বাঁচাইয়া কহিলেন, এতটা দু'দিনের উপবাসে হয় না দাদা, একটু দীর্ঘকালের দরকার। কি হয়েছিল? জ্বর?

বলিলাম, আশ্চর্য নয়। ম্যালেরিয়া ত আছেই।

চক্রবর্তী আতিথ্যের ত্রুটি করিলেন না, খাওয়াটা আজ ভালরকমই হইল।

আহারান্তে প্রস্থানের আয়োজন করিতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি হঠাৎ কুলিদের মধ্যে জুটেছিলেন কি করে?

বলিলাম, দৈবের চক্রান্তে।

আনন্দ সহাস্যে কহিলেন, চক্রান্তই বটে। রাগের মাথায় বাড়িতে বোধ হয় খবরও দেননি?

বলিলাম, না, কিন্তু সে রাগ করে নয়। দেওয়া বাহুল্য বলেই দিইনি। তা ছাড়া লোকই বা পেতাম কোথায়?

আনন্দ বলিলেন, সে একটা কথা। কিন্তু আপনার ভাল-মন্দ দিদির কাছে বাহুল্য হয়ে উঠলো কবে থেকে? তিনি হয়ত ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছেন।

কথা বাড়াইয়া লাভ নাই—এ প্রশ্নের আর জবাব দিলাম না। আনন্দ স্থির করিলেন জেরায় আমাকে একেবারে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। তাই স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যে ক্ষণকাল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কহিলেন, আপনার রথ প্রস্তুত, বোধ করি সন্ধ্যার পূর্বেই গিয়ে বাড়ি পৌঁছিতে পারবেন। আসুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।

বলিলাম, কিন্তু বাড়ি যাবার পূর্বে কুলিদের একটু খবর নিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তার মানে রাগ এখনো পড়েনি। কিন্তু আমি বলি, দৈবের ষড়যন্ত্রে দুর্ভোগ যা কপালে ছিল তা ফলেচে। আপনি ডাক্তারও নয়, সাধুবাবাও নয়, গৃহী লোক। এখন খবর নেবার যদি কিছু থাকে ত সে ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। কিন্তু গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর আনন্দ ভাল আছে।

দ্বারে গরুর গাড়ি তৈরি ছিল। গৃহস্বামী চক্রবর্তী আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, এদিকে আর যদি কখনো আসা হয় এ বাড়িতে যেন পদধূলি দিয়া যান। তাঁহার আন্তরিক আতিথ্যের জন্য সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু দুর্লভ পদধূলির আশা দিতে পারিলাম না। বাঙ্গলাদেশ আমাকে অচিরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কথা মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম, সুতরাং কোনদিন কোন কারণেই এ প্রদেশে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলে আনন্দ ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, দাদা, এদিকের জল বাতাস আপনার সইছে না। আমার হয়ে দিদিকে বলবেন, পশ্চিমমুলুকের মানুষ আপনি, আপনাকে যেন তিনি সে দেশেই নিয়ে যান।

বলিলাম, এ দেশে কি মানুষ বাঁচে না আনন্দ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন, না। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে দাদা, শুধু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধটা তাঁকে জানাবেন। বললেন, আনন্দ সন্ন্যাসীর চোখ নিয়ে না দেখলে এর সত্যতা বোঝা যাবে না।

মৌন হইয়া রহিলাম। কারণ রাজলক্ষ্মীকে এ অনুরোধ জানানো যে আমার পক্ষে কত কঠিন, আনন্দ তাহার কি জানে?

৭৪৬

গাড়ি ছাড়িলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কই, আমাকে ত একবারও যাবার নিমন্ত্রণ করলেন না দাদা?

মুখে বলিলাম, তোমার কত কাজ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা কি সোজা ভাই! কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা ছিল ইতিমধ্যে পাছে কোনদিন তিনি নিজেই গিয়া উপস্থিত হন। এই তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি হইতে তখন কিছুই আর আড়ালে রাখিবার জো থাকিবে না। একদিন তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, মনে মনে হাসিয়া বলিতাম, আনন্দ, এ জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব না, কিন্তু আমার লোকসানের সেই সহজ হিসাবটাই শুধু দেখিতে পাইলে; কিন্তু তোমার দেখার বাহিরে যে আমার সঞ্চয়ের অঙ্কটা একেবারে সংখ্যাতীত হইয়া রহিল! মৃত্যু-পারের সে পাথেয় যদি আমার জমা থাকে এদিকের কোন ক্ষতিকেই আমি গণনা করিব না। কিন্তু, আজ? বলিবার কথা কি ছিল? তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে মনে হইল ঐশ্বর্যের সেই অপরিমেয় গৌরব যদি সত্যি আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত এই গলগ্রহ

ভগ্নস্বাস্থ্য অবাঞ্ছিত গৃহস্বামীর ভাগ্যে অতিথি আহ্বান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেম্‌নি হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা, নূতন করে না-ই যেতে বললেন, আমার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঁজি আছে, আমি সেই দাবিতেই হাজির হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ হতে পারবে?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপনাদের রাগ পড়বার ভিতরে গিয়ে উত্যক্ত করব না—তার পরেই যাব।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে আসি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

পথ কম নহে, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি আর-একবার নমস্কার করিয়া মুখ সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যানবাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে পথ তৈরি করিয়াও কেহ রাখে নাই; গো-শকট মাঠ ভাঙ্গিয়া উঁচু নিচু খানাখন্দ অতিক্রম করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল। ভিতরে অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া আনন্দ সন্ন্যাসীর কথার সুরটাই আমার কানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি নাই, ও বস্তুটা লাভেরও নয়—লোভেরও নয়, কিন্তু কেবলি মনে হইতে লাগিল, এও যদি সত্য হইত। কিন্তু সত্য নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, রাগ করিব কাহার উপরে? কিসের জন্য? কি তাহার অপরাধ? ঝরনার জলধারার অধিকার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎসমুখে জলই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদের বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়িয়া মরিব কোন্ ছলনায়?

এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল হুঁশ করি নাই। হঠাৎ খালের মধ্যে গাড়ি গড়াইয়া পড়ায় ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চটের পর্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হয়-হয়। গাড়ির চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি

বছর পনরর বেশি হইবে না। বলিলাম, ওরে, এত জায়গা থাকতে খানায় নামলি কেন?

ছেলেটি তাহার রাঢ়দেশের ভাষায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নামবো কিসের তরে? বলদ আপনি নেমে গেল।

নেমে গেল কি রে? তুই কি গরু সামলাতে পারিস নে?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভাল। কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

তার কি জানি! গঙ্গামাটি কখনো আসচি নাকি?

বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞেস কর্ না রে, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে নাকি? নেই।

ছেলেটার আর যাই দোষ থাক, জবাবগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই গঙ্গামাটির পথ চিনিস ত?

তেমনি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে?

মামা বললে, বাবুকে নিয়ে যা। এই সোজা দক্ষিণে গিয়ে পুবে বাঁক ধরলেই গঙ্গামাটি। যাবি আর আসবি।

সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, আর বেশি বিলম্বও নাই। এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম, ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এই সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমে বাঁক ধরিস নি ত রে?

ছেলেটা কহিল, তার কি জানি!

বলিলাম, জানিস নে ত চল দু'জনে অন্ধকারে যমের বাড়ি যাই। হতভাগা, পথ চিনিস নে ত এলি কেন? তোর বাপ আছে?

না।

মা আছে?

না, মরে গেছে।

আপদ গেছে। চল্, তা হলে আজ রাত্রে তাদের কাছেই যাওয়া যাক! তোর মামার শুধু বুদ্ধি-বিবেচনা নয়, দয়ামায়া আছে।

আর খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল, জানাইল যে আর সে যাইতে পারিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকবি কোথায়?

সে জবাব দিল যে, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার উপায়?

পূর্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবাদী। কহিল, তুমি বাবু নেবে যাও। মামা বলে দেছে ভাড়া পাঁচ সিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

কহিলাম, আমার জন্যে তুমি মার খাবে সে কেমন কথা! একবার ভাবিলাম, এই গাড়িতেই যথাস্থানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় যে কোথায় এবং কতদূরে বুঝিবার জো নাই; কেবল সুমুখে একটা বড় আমকাঁঠালের বাগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় খুব বেশি দূরে হইবে না। আশ্রয় হয়ত একটা মিলিবে। আর যদি নাই-ই মিলে তাহাতেই-বা কি? নাহয়, এমনি করিয়াই এবার যাত্রা শুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম, ছেলেটির শুধু কথাই নয়, কাজের ধারাও চমৎকার স্পষ্ট। নিমেষে গাড়ির মুখ ফিরাইয়া লইল, বৃষযুগল গৃহ প্রত্যাগমনের ইঙ্গিতমাত্র চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তের

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হউক আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ কাজ আমার পক্ষে নূতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিন ভয় হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আমবাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলা পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্বিগ্ন লজ্জায় মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সম্বন্ধে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই! কিন্তু একথা স্মরণ হইল না যে, সে-সকল দেশের সম্বন্ধেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্বত্রই মুক্ত ছিল এবং আজ সঙ্কোচ ও দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধপ্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলাম না। সেদিনের সে-যাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সেদিনের নকল মাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাত্মীয়, তাদের পরে নিজের ভারার্পণ করিতে তখন বাধে নাই, কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একান্তভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারকেন্দ্রটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গেছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা-দুটো আমার প্রতিপদেই ভারি হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেই-সব সুখ-দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথাপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে

রাত্রযাপনের সাহসও নাই, শক্তিও গেছে—আজিকার মত কিছু একটা পাইতেই যে হইবে।

ভাগ্য ভাল, খুব বেশি দূর হাঁটিতে হইল না। পত্রঘন কি একটা গাছের ফাঁক দিয়া অট্টালিকার মত দেখা গেল। সেই পথটুকু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকাই বটে, কিন্তু মনে হইল জনহীন। সুমুখে লোহার গেট, কিন্তু ভাঙ্গা। শিকগুলার অধিকাংশই লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোলা বারান্দা, বড় বড় দুটো ঘর, একটা বন্ধ এবং যেটা খোলা তাহার দ্বারে আসিবামাত্র একজন কঙ্কালসার মানুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, ঘরের চার কোণে চারিটা লোহার খাট—একদিন গদি পাতা ছিল, কিন্তু কালক্রমে চটগুলা লুপ্ত হইয়াছে, আছে শুধু ছোবড়ার কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট, একটা তেপাই, গোটা-কয়েক টিন ও এনামেলের পাত্র, তাহাদের শ্রী ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনাতীত।অনুমান যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বটে। বাড়িটি হাসপাতাল। এই লোকটি বিদেশী, চাকরি করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়া দিনপনর হইল ইন্‌ডোর পেশেন্ট হইয়া আছে। লোকটির সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ ঘটিল—

বাবুমশায়, গোটা-চারেক পয়সা দেবেন?

কেন বল ত?

ক্ষিদেয় মরি বাবু, মুড়িটুড়ি দুটো কিনে খাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রোগী-মানুষ, যা তা খাওয়া তোমার বারণ নয়?

আজ্ঞে, না।

এখানে তোমাকে খেতে দেয় না?

লোকটি জানাইল যে, সকালে একবাটি সাগু দিয়াছিল তাহা সে কোন্ কালে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন হইতে সে গেটের কাছে বসিয়া থাকে, ভিক্ষা পায় ত আর একবেলা খাওয়া চলে, না হয় ত উপবাসে কাটে। ডাক্তার একজন

আছেন, বোধ হয় যৎসামান্য হাতখরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকালবেলায় একবার করিয়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউণ্ডারি হইতে শুরু করিয়া লণ্ঠনে তেল দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। পূর্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস-ছয়েক হইল মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া গেছে, এখনও নূতন কেহ ভর্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁটপাট কে দেয়?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিই দি। আমি চলে গেলে আবার যে নতুন রোগী আসবে সেই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কার জান?

লোকটি আমাকে ওদিকের বারান্দায় লইয়া গেল। কড়ি হইতে একটি টিনের লণ্ঠন ঝুলিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবু বেলাবেলি সেটি জ্বালিয়া দিয়া কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া গেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁটা মস্ত একটি মর্মর প্রস্তর-ফলক—সোনার জল দিয়া ইংরাজী অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন-তারিখ সংবলিত শিলালিপি। জেলার যে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট দয়া করিয়া ইহার উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম-ধাম সর্বাগ্রে, নীচে প্রশস্তি-পাঠ। কে একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নগর্ভা মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জননী-জন্মভূমিতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, ঊর্ধ্বতন তিন-চারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোটখাটো কুলকারিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকটি যে রাজসরকারে রায়বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট করার দিক দিয়া ত্রুটি ছিল না। ইট ও কাঠ এবং বিলাতের আমদানি লোহার কড়ি-বরগার বিল মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কিছু থাকিয়া থাকে সাহেব শিল্পীর হাতে বংশগৌরব লিখাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার ও রোগীর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার হয়ত টাকাও ছিল না, ফুরসতও ছিল না।

প্রশ্ন করিলাম, রায়বাহাদুরের বাড়ি কোথায়?

সে কহিল, বেশি দূরে নয়, কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্ঞে না, বাড়িতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব কলকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জান?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে কহিল যে, বছর-তিনেক পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন একথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছে। সর্বত্র একই দশা, অতএব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না।

৭৫০

এদিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল, সুতরাং রায়বাহাদুরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকি ছিল। লোকটিকে কিছু পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে, নিকটই একঘর চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের বাটী। তাঁহারা অতিশয় দয়ালু, এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেই রাজি হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কহিল, তাহাকে ত মুদির দোকানে যাইতেই হইবে, একটুখানি ঘুরপথ, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চলিতে চলিতে তাহার কথাবার্তায় বুঝিলাম, এই দয়ালু ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে সে পথ্যাপথ্য অনেক রাত্রিই গোপনে সংগ্রহ করিয়া খাইয়াছে।

মিনিট-দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্তীর বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই ঘরে আছেন?

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বাটীতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘরদ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ওদিকে সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায়ও অপরাজেয়।তাহা না হইলে এই গ্রাম ও হাসপাতালে বহুদিন পূর্বেই তাহার রুগ্ন-আত্মা স্বর্গীয় হইয়া তবে ছাড়িত। সে ডাকের উপর ডাক দিতেই লাগিল।

হঠাৎ জবাব আসিল, যা যা, আজ যা। যা বলচি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যুত্তরে কহিল, কে এসেচে বার হয়ে দেখুন না।

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যেন, চক্রবর্তীর পরমপূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূর্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল—কে রে ভীম? বলিতে বলিতে গৃহস্বামী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পরনের বস্ত্রখানি মলিন এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, অন্ধকারে তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশি বলিয়াও মনে হইল না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে ভীম?

বুঝিলাম, আমার সঙ্গীর নাম ভীম। ভীম বলিল, ভদ্দরলোক, বামুন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আমি বললাম, ভয় কি, চলুন না ঠাকুরমশায়ের বাড়িতে রেখে আসি, গুরু আদরে থাকবেন।

বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই, চক্রবর্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। স্বহস্তে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং তামাক ইচ্ছা করি কি না জানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকরগুলো সব জ্বরে পড়ে রয়েছে—করি কি!

শুনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এক চক্রবর্তীর গৃহ ছাড়িয়া আর এক চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে আতিথ্যটা এখানে কিরূপ দাঁড়াইবে। তথাপি হুঁকাটা হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, হ্যাঁ গা, কে মানুষটি এলো?

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীরই শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি, ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েচেন—শুধু রাত্রিটা—ভোর না হতেই আবার সক্কালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল-ডালের অভাব! চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করে দিচ্চি।

চক্রবর্তীগৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠোখানেক চাল, ছেলেমেয়ে-দুটোকে রাত্তিরের মত সেদ্ধ করে দেবো। বাছাদের উপুসী রেখে ওকে দেব গিলতে? মনেও ক’রো না।

মা ধরিত্রি, দ্বিধা হও! না না করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্রবর্তীর বিপুল ক্রোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি তুমি ছাড়িয়া তখন তুই ধরিলেন, এবং অতিথিসৎকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে আলাপ শুরু হইল, তাহার ভাষাও যেমন গভীরতাও তেম্‌নি। আমি টাকা লইয়া বাহির হই নাই, পকেটে সামান্য যাহা-কিছু ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোনার বোতাম ছিল, কিন্তু কেবা কাহার কথা শোনে! ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা হলে ত বাঁচি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল; হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্রবর্তীমশাই, সে নাহয় একদিন ভেবেচিন্তে ধীরে-সুস্থে করবেন—করাইভাল কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, নাহয় একগাছা দড়ি দিন, ঝুলে পড়ে আপনার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্রবর্তী অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, আক্কেল হ'ল? বলি শিখলি কিছু?

পাল্টা জবাব আসিল, হ্যাঁ। মুহূর্ত-কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, দুম করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তর দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে এসো গে। দেখো যেন মিন্‌সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্রবর্তী খুশী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে, না না, একি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট করিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার-কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আগুন নিবে গেছে। গিন্নী, দাও দিকি কলকেটা পালটে, একবার খেয়েই যাই। যাব আর আসব। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্দরের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

ব্যস, স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কর্তা প্রাণ ভরিয়া ধূমপান করলেন। প্রসন্নচিত্তে হুঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কারণ, আপত্তি করা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক হইল। এ জীবনে বহুবার বহুস্থানেই আমাকে অযাচিত আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সংবর্ধনাও কখনো ভাগ্যে জুটে নাই; কিন্তু শিক্ষার তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম, উনুন

জ্বলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্তে কলাপাতায় চাল ডাল আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্রবর্তী উৎসাহভরে কহিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চটপট হয়ে যাবে। খাঁড়ি-মুসুরের খিচুড়ি, আলুভাতে, তোফা লাগবে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—

চক্রবর্তীর রসনা সরস হইয়া উঠিল কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নির্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম, চক্রবর্তীগৃহিণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিল না, এবার তিনি আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কথা কহিলেন।

তাঁহার আর যা দোষই থাক, সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলা অভিধানে আছে, তাহাদের অতিবাহুল্য দোষ যে ইঁহার ছিল না একথা বোধ করি অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার না করিয়া পারিবে না। তিনি কহিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জান না।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, আজ্ঞে না।

তিনি বলিলেন, কর্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে বা জানবে, কে বা শুনবে। আমি বললাম, তা হতে পারে না। একটা রাত্তিরের জন্যে একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষের জাত মারতে পারব না। আমরা বাবা অগ্রদানী বামুন।

আমার যে আপত্তি নাই, এবং ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ ইতিপূর্বে করিয়াছি—একথা বলিতেও কিন্তু আমার সাহস হইল না পাছে স্বীকার করিলেও কোন বিভ্রাট ঘটে। মনের মধ্যে শুধু একটিমাত্র চিন্তা ছিল কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে এবং এই বাড়ির নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। সুতরাং, নির্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম। এ অসাধ্য যে কি করিয়া সম্পন্ন করিলাম আজও বিদিত নই,

কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল-ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক-কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাতমুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি আর ছিল না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল, কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গা দিন, মিনিট-পাঁচেক সামলে নিয়েই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যুত্তরে কি যে শুনিব জানি না, কিন্তু আশ্চর্য এই চক্রবর্তীগৃহিণীর ভয়ানক কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি অন্ধকার হইতে আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি কেন বাবা পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ করে ফেলচি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠতে পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শতচ্ছিন্ন শয্যায় আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না এম্‌নি জ্বর।

সহজে চোখ দিয়া আমার জল পড়ে না, কিন্তু এত বড় অপরাধের যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথা ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুবার বহু নিরুদ্দেশ-যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কিন্তু এতখানি বিড়ম্বনা জগদীশ্বর আর কখনও অদৃষ্টে লিখেন নাই। আর একবার প্রাণপণে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথা সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ চক্রবর্তীগৃহিণীর সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়াই নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই, তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এতবড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, ঘুম ভেঙ্গেচে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি—কিছু বেশি হইতেও পারে। রঙটি কালো, কিন্তু চোখমুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থঘরের মেয়েদের মতই। রুক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখতে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হ'ত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েচে।

আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারব—সে ত আর বেশি দূর নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি-একটা বলেচি বলেই বাবা, রাগ করে ওই যমপুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোকে হাসপাতালে গিয়ে থাকে সেখানে কাদের ছোঁওয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাগুবার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবে না?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার ইহাতে বাধা হয় না।

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধ হয় সর্বসমেত দিন-চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারিদিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকী দিন-কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেন না। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতিকে সহস্রগুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনাদোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন। চক্রবর্তীগৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেও এতটুকুও অবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন, ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেন না, এই ত্রুটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বে অবস্থা সচ্ছল ছিল, জমিজমাও মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহার নির্বোধ স্বামীকে লোকে প্রতারিত করিয়াই এই দুঃখে ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঋণ চাহিত, বলিত, দেশে বড়লোক ঢের আছে, কিন্তু এত বড় বুকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বুকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঋণ করিয়া ঋণ দিতেন। প্রথমে হ্যান্ডনোট কাটিয়া এবং পরে স্ত্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয় এখানেও তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য যে চক্রবর্তীর অসাধ্য নয় তাহা একটা রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। বুদ্ধির দোষে বিষয়-সম্পত্তি অনেকেরই যায় এবং তাহার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ যে সমাজের অনাবশ্যক, অন্ধ নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে পারে তাহা চক্রবর্তীগৃহিণীর প্রতি কথায় অস্থিমজ্জায় অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটিমাত্র শোবার ঘর। একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি।

ইহাতে আমার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর ছেড়েচে এবং আপনাদেরও ভারি কষ্ট হচ্ছে। যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারি তৃপ্তি পাই।

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত ও-ঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা মানুষ, এ ভরসা ত করতে পারিনে বাবা।

তাঁহাদের প্রাঙ্গণের একধারে কিছু খড় সঞ্চিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেরামত করে নেননি কেন? জলঝড়ের ত দিন এসে পড়চে।

ইহার প্রত্যুত্তরে জানিলাম যে, তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে, তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক, এ বৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা, আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত-আট বছরের মেয়েটা হঠাৎ কলেরায় মারা গেল; পুজোর সময় আমার ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেল না, ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা এঁকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সৎকার করা গেল? কাঠকুটো কেউ কেটে দিলে না, বাপ হয়ে গর্ত খুঁড়ে বাছাকে পুঁতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের কোন্ কালে কে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ত অপরাধ? অথচ, শ্রাদ্ধ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ-না-কেহ দান গ্রহণ না করিলে সে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তবে দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করান কিসের জন্য?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব-পিতামহগণের কোন্ দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা এতকাল পরে আবিষ্কার করাও তেম্‌নি দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের দান লওয়া ভাল কি মন্দ জানি না। মন্দ হইলেও এ-কথা সত্য যে, ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা করেন না, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার পথ বিনাদোষে মানুষে এতখানি দুর্গম ও দুঃখময় করিয়া দিতে পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় বর্বরতার উদাহরণ জগতে বোধ করি এক হিন্দু সমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশি নেই, জ্বর আর ওলাউঠায় অর্ধেক মরে গেছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর রাজপুত। আমাদের যে কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জাত যেতে পারে।

চক্রবর্তীগৃহিণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না, কহিলেন, আমার সম্পর্কে একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনি দুমকায় চাকরি করতে গিয়ে খ্রিস্টান হয়েচেন। তাঁর ত আর কোন কষ্টই নেই।

চুপ করিয়া রহিলাম। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মান্তর-গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশবোধ হয়, কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি বলিয়া? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য, নীচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহই বাদ যায় না। অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার। পরে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অন্যায়, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পন্থাই তাঁহারা নির্দেশ করিতে পারেন না। এই অন্যায়েরই মধ্য দিয়া তাঁহারা জন্ম হইতে মৃত্যু

পর্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন, কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাঁহাদের নাই। জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে, সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

দিন-তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা, আজ আমাকে বিদায় দিন।

চক্রবর্তীগৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল; বলিলেন, দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটুকথাও কম বলিনি।

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। না না, সে কিছুই না—আমি মহাসুখে ছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি মামুলি ভদ্রবাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। বজ্রানন্দের কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে! এই বাঙ্গলাদেশের গৃহে গৃহে মা-বোন, সাধ্য কি তাঁহাদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কতবড়ই না সত্য!

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্বোধ স্বামীর অবিবেচনার আতিশয্য এই গৃহস্থঘরের গৃহিণীকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরুপায়—আর তাঁহার ভাবিবার কিছু রহিল না। মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ ও পরগৃহবাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্রবর্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গৃহিণীর ভারি ইচ্ছা ছিল আমি স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কায় পীড়াপীড়ি করিলেন না। শুধু যাত্রাকালে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাবা, যদি কখনও এদিকে এস আর একবার দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনও হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম, রাজলক্ষ্মী কুশারীমহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের অনেকখানি ঋণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

চৌদ্দ

গঙ্গামাটির বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট বসান। উপরে আম্রপল্লবের মালা দোলানো। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গরুর গাড়ির শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর একজন যিনি অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি, তিনি স্বয়ং বজ্রানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদ্দাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল।স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও যেমন বিরাম নাই, বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাৎ কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত? গাড়োয়ান ছোঁড়াটা ত গিয়ে বললে আপনাকে গঙ্গামাটির পথে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কি শাস্তিই তুমি দিলে! বজ্রানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জানতে পেরেছিল যে আজ উনি আসবেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোরে কলাগাছ আর ঘটস্থাপনা দেখেই আমি বুঝেচি যে, আমার আসার খবরটি তুমি পেয়েচ।

কবাটের আড়ালে রতন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে সেজন্যে নয়। আজ বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজন হবে কিনা। বক্রেশ্বর দেখে এসে মা—

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল, তোকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না রতন, নিজের কাজে যা।

তাহার আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া বজ্রানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কি জানেন দাদা, কোন একটা কাজে লেগে না থাকলে মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সহ্য যায় না। ভোজের আয়োজনটা কেবল এইজন্যেই। না দিদি?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিল না, রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, ভয়ানক রোগা দেখাচ্চে দাদা, ইতিমধ্যে কাণ্ডটা কি ঘটেছিল বলুন ত? বাড়ি না ঢুকে হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন কেন?

গা-ঢাকা দিবার হেতু সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া আনন্দ কহিল, ভবিষ্যতে এরকম করে আর পালাবেন না। কিভাবে যে ওঁর দিনগুলো কেটেচে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তাহা জানিতাম। সুতরাং চোখে না দেখিয়াও আমি বিশ্বাস করিলাম। রতন চা ও তামাক দিয়া গেল। আনন্দ কহিল, আমিও বাইরে যাই দাদা। এখন আপনার কাছে বসে থাকলে আর একজন হয়ত ইহজন্মে আমার মুখ দেখবেন না। এই বলিয়া সে হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খানিক পরে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও ঘরে গরম জল গামছা কাপড় সমস্ত রেখে এলাম, শুধু গা-মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে ফেল গে। জ্বরের ওপর খবরদার যেন মাথায় জল ঢেলো না বলচি।

কহিলাম, কিন্তু স্বামীজী তোমাকে ভুল বলেছে, জ্বর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না-ই থাক, কিন্তু হতে কতক্ষণ?

কহিলাম, সে খবর তোমাকে সঠিক দিতে পারব না, কিন্তু গরমে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, স্নান করা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দরকার নাকি? তাহ'লে একা হয়ত পেরে উঠবে না, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,

কেন আড়ি ক'রে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে? এত অবেলায় নেয়ো না, লক্ষ্মীটি।

এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্যরসে এমনিই ভরিয়া দিতে পারিত যে, সে জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সঙ্কল্পই মাথা তুলিতে পারিত না। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, স্নান না করিলেও আমার চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায় না এমন ব্যাপারও বহুবার দেখিয়াছি। তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে খাবার আনিতে গেল।

বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণভোজনের পালাটা আগে শেষ হোক না!

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, রক্ষে কর তুমি, সে পালা শেষ হতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

গেলই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাই বটে। ব্রাহ্মণভোজন আমার মাথায় থাক, তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহার্য আনিতে প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল তাহা রোগীর পথ্য। কর্মবাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না; বুঝা গেল, আমার আসার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি আসা পর্যন্ত তাহার আচরণে, তাহার কথা কহার ধরনে এমনই কি একটা অনুভব করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নূতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেমন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল,

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতাম না। হয়ত এই কথাটাই প্রত্যুত্তরে বলিতাম যে, মানুষের অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া তাহার আগেকার দিনের সেই অভ্যস্ত জবরদস্তি ছিল না, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোর নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না, পড়ে শুধু মানুষের নিভৃত হৃদয়ের অপলক চোখ-দুটির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই?

অতিথি-সজ্জন বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন, বলিলাম, যাও।

আমার উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি হাতে লইয়া সে যখন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যমনে সেইদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম, এই কটা দিন পরে তেমনটি ত আর ফিরিয়া পাইলাম না। আনন্দ বলিয়াছিল, কাল হইতেই দিদির একপ্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল কত বেলায় যে তাঁহার উপবাস ভাঙ্গিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়।

চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি, ধর্মপিপাসু চিত্ত তাহার কোনদিন কোন কৃচ্ছ্রসাধনেই পরাঙ্মুখ নয়। এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার নিরন্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণমাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে সে এই অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিন্দিত জীবনের সঞ্চিত কালিমা যত বড়ই হোক আর তাহার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি? আমি যে তাহার পথের মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম সারিয়া নিঃশব্দপদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল, আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণভোজনের পালা ত সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ হয়েচে, এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আসচি পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই। এখনো জেগে আছ, ঘুমোও নি যে বড়?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাও নি কেন? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারির একটা ধার তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিল। বরাবরের অভ্যাসমত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আসতে? তোমার কত কাজ!

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধ্যি আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি, আমার আহ্বান সত্যই উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু আজ এই সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার সাধ্য আমার কৈ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবচি।

ভাবচো? কি ভাবচো? এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার উপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জানলে কি করে?

রাজলক্ষ্মী মাথা তুলিল না, আস্তে আস্তে বলিল, আমি রাগ করে গেলে তুমি জানতে পার না?

কহিলাম, বোধ হয় পারি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি বোধ হয় পার, কিন্তু আমি নিশ্চয় পারি, আর তোমার পারার চেয়েও ঢের বেশি পারি।

হাসিয়া কহিলাম, তাই হোক। এ নিয়ে বিবাদ করে জয়ী হতে আমি চাইনে লক্ষ্মী, নিজে হারার চেয়ে তুমি হেরে গেলেই আমার ঢের বেশি লোকসান।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যদি জান তবে বল কেন?

কহিলাম, বলিনে ত আর! কিন্তু বলা যে অনেকদিন বন্ধ করেচি সেই খবরটাই তুমি জান না।

রাজলক্ষ্মী নীরব হইয়া রহিল। পূর্বে হইলে সে আমাকে সহজে অব্যাহতি দিত না, লক্ষ কোটি প্রশ্ন করিয়া ইহার কৈফিয়ত আদায় করিয়া ছাড়িত, কিন্তু এখন সে মৌনমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাকি এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল? কোথায় ছিলে? বাড়িতে আমাকে খবর পাঠালে না কেন?

খবর না পাঠাইবার হেতু বলিলাম। একে ত খবর আনিবার লোক ছিল না, দ্বিতীয়তঃ যাঁহার কাছে খবর পাঠাইব, তিনি যে কোথায় জানিতাম না। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে ছিলাম তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। চক্রবর্তীগৃহিণীর নিকট আজই সকালে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সেই দীনহীন গৃহস্থ পরিবারে যেভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম এবং যেমন করিয়া অপরিসীম দৈন্যের মধ্যেও গৃহকর্ত্রী অজ্ঞাতকুলশীল রোগগ্রস্ত অতিথিকে পুত্রাধিক স্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া কৃতজ্ঞতা ও বেদনায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, যাতে তাঁরা ঋণমুক্ত হন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও না কেন?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই-সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্মান্তিক দুঃখিত হইত, আজও সে মনে মনে তেমনই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজোরে প্রতিপন্ন করিতে আগেকার দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইল না, চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিসটা তাহার নূতন দেখিলাম। আমার এই কথার উপরে ঠিক এম্‌নি শান্ত নিরুত্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিঁধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল, যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাষ্পাচ্ছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার মুখের চেহারা ভাল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যখন সে কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্মা থেকে তোমার চিঠির জবাব এসেচে। অফিসের বড় খাম, হয়ত জরুরী কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেচেন। জানিয়েচেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরি আবার ফিরে পাবে।

বটে!

হাঁ। আনবো চিঠিখানা?

না থাক। কাল সকালে দেখবো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভাঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাৎ একফোঁটা চোখের জল টপ্‌ করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েচে, এ ত খারাপ সংবাদ নয়। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরি নিয়ে আবার চলে যাবার চেষ্টা করচ, আমাকে এ কথা জানাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি বাধা দেব?

কহিলাম, না। বরঞ্চ জানালে তুমি উৎসাহই দিতে। কিন্তু সেজন্য নয়—বোধ হয় ভেবেছিলাম এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার শোনবার তোমার সময় হবে না।

রাজলক্ষ্মী নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টাও আমার কাছে গোপন রহিল না। কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণেক পরেই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ কথার জবাব দিয়ে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াব না। তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ করব না। এই বলিয়া সে পুনরায় মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, এখানে না এলে বোধ হয় আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না, তোমাকে কত বড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেচি।

এই গঙ্গামাটির অন্ধকূপে মেয়েমানুষের চলে, কিন্তু পুরুষের চলে না। এখানকার এই কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন ত তোমার আত্মহত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখেতে পেয়েচি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েচে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেচি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি। তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েচে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েচে, কিন্তু আর না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালার ভাবই ছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের অনির্বচনীয় করুণায় বিভোর হইয়া গেলাম। বলিলাম, তোমাকেই কি কম ছাড়তে হয়েচে লক্ষ্মী? গঙ্গামাটি ত তোমারও যোগ্য স্থান নয়; কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সঙ্কোচে মরিয়া গেলাম। কারণ, অনবধানতাবশতঃ যে গর্হিত বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এই রমণীর কাছে তাহা গোপন রহিল না। কিন্তু আমাকে আজ সে ক্ষমা করিল। বোধ হয়

কথার ভালমন্দ লইয়া মান-অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তাহার ছিল না। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গামাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবে না, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে সত্যিই আমাকে কিছু ছাড়তে হয়নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেচে। আর শুধু কি তাই! আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েচি, সে কি তুমিই জান না?

জবাব দিতে পারিলাম না। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মস্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছ। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই তারেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্যেই এ কথা কখনো তোমাকে জানাব না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলুম না। এই কষ্টটাই আমার সবচেয়ে বেশি লেগেচে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেচ যে পুণ্যের লোভে আমি এমনি উন্মাদ হয়ে গেছি যে, তোমাকেও অবহেলা করতে শুরু করেচি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে, ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লোভের বস্তু আর কি আছে! বলিতে বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িল না, শুধু মাথার উপর হইতে তাহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী বাঁ হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কিনা আমি দেখে আসি গে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয়ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। সেও আর ফিরিয়া আসিল না—আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, জোর

করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিল না, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন্ পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ওদিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল, কিংবা অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া গেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেটলি হইতে গরম চা পাত্রে ঢালিয়াছে এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা স্টোভে করিয়া সিঙ্গাড়া কিংবা কচুরি ভাজিয়া তুলিতেছে, এবং বজ্রানন্দ তাহার সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল এবং বজ্রানন্দ কলরব করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হ'ত।

আনন্দ কহিল, দিদি, সন্ন্যাসী ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ও-রকম কড়া কথা বলবেন না। আমাকে বলিল, কৈ, তেমন ভাল দেখাচ্ছে না ত ! হাতটা একবার দেখব নাকি?

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, রক্ষে কর আনন্দ, তোমার আর ডাক্তারিতে কাজ নেই, উনি বেশ আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় করবার জন্যে হাতটা একবার□

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, তোমাকে হাত দেখতে হবে না। এখ্‌খুনি হয়ত সাগুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলিলাম, সাগু আমি ঢের খেয়েচি, সুতরাং ও ব্যবস্থা করে দিলেও আর শুনব না।

শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্লেটে করিয়া খানকয়েক গরম কচুরি ও সিঙ্গাড়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রতনকে কহিল, তোর বাবুকে চা দে।

বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে হার মানিবার পাত্র নয়; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, এতটা দায়িত্ব আপনার□

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা! ওর দায়িত্ব আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে হয়েচে সে যদি শুনতে ত দিদির কাছে আর ডাক্তারি করতে যেতে না। এই বলিয়া সে বাকী সমস্ত খাবার একটা থালায় ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সহাস্যে কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বন্ধ হোক।

আনন্দ হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আরে এত খাওয়া যায়!

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ত সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলে কেন? আরও পাঁচজন ভদ্রলোকের মত গেরস্ত থাকলেই ত হ'ত!

আনন্দের দুই চক্ষু সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মত দিদির দল এই বাঙ্গলা মুলুকে আছে বলেই ত, নইলে দিব্যি ক'রে বলচি, আজই এই গেরুয়া-টেরুয়াগুলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে দিদি। পরশু থেকেই একরকম উপোস করে আছেন, আজ আহ্নিক-টাহ্নিকগুলো একটু সকাল সকাল সেরে নিন। এগুলোতে এখনও স্পর্শদোষ ঘটেনি, বলেন ত নাহয়□, এই বলিয়া সে সম্মুখের ভোজ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠতে পারেন নি!

আমি বলিলাম, আগে তাঁরা এসে উঠুন। তার পরে

আনন্দ কহিল, তাহলে আমাকেই উঠতে হ'ল। তাদের নাম ও ঠিকানা দিন, পাষণ্ডদের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়ব। এই বলিয়া সে উঠার পরিবর্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কিনা, দেবদ্বিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরূপে আমাদের সকালের চা-খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল তখন বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও গ্লানি ছিল না, হাসি-তামাশায় মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলার সহিত তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিল না। সে যে অভিমান ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ওরূপ কহিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রাত্রির স্তব্ধ আঁধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছি, আজ দিনের আলোকে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যকার মত আজ আর উৎসবের ঘটা ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে আহূত ও অনাহূতের ভোজনলীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজকর্ম কতকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বজ্রানন্দ কহিল, দিদি, স্বাগত !

রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ন্যাসীর বুঝি দেবসেবা শুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ?

আনন্দ কহিল, মিথ্যে বলেন নি দিদি। সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রে বলেচেন, ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথ্যে নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্মগ্রহণ করতে পারেন নি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মশগুল হয়ে আছি, আপনি তখন তিন দিন ধরে কেবল পরকে খাওয়াচ্ছেন, আর নিজে মরছেন উপবাস করে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরচি আর কৈ ভাই? দিনের পর দিন ত দেখচি এ দেহটার কেবল শ্রীবৃদ্ধি হয়ে চলচে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলাম, এবারেও এসে দেখচি। আপনার পানে চাইলে মনে হয় না যে পৃথিবীর জিনিস দেখচি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দর যুক্তির প্রণালীটা দেখলে?

শুনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ ত যুক্তি নয়, স্তুতি। দাদা, সে দৃষ্টি থাকলে কি আর বর্মায় যেতেন চাকরির দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন্ দুষ্টবুদ্ধি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অন্ধ মানুষটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে? তাঁর কি আর কাজ ছিল না?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতার দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ওঁর দোষ ত অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। এই বলিয়া সে আমাকে দেখাইয়া কহিল, পাঠশালে উনি ছিলেন সর্দার-প'ড়ো, যত না দিতেন পড়া ব'লে তার ঢের বেশি দিতেন বেত। তখন পড়ি ত সবে বোধোদয়, বইয়ের বোধ ত খুবই হ'ল, বোধ হ'ল আর

একরকমের। ছেলেমানুষ, ফুল পাব কোথায়, বনের বঁইচিফলের মালা গেঁথে ওঁকে করলাম বরণ। এখন ভাবি, তার সঙ্গে তার কাঁটাগুলোও যদি গেঁথে দিতাম! বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কণ্ঠস্বর চাপাহাসির আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃ□কি ভয়ানক রাগ !

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয়ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ত দি। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, পালাচ্ছেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই নাকি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কোঁদল করবার সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি, আমি আপনার অনুগত ভক্ত। কিন্তু এ অভিযোগে সায় দিতে আমারও লজ্জা করচে। উনি একটা কথাও কইলে নাহয় পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু একদম বোবা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি করে? করলেও ধর্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা। বেশ, ধর্মে যা সয়, তাই না হয় কর। চায়ের বাটিগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল□আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্মা যাবার সঙ্কল্প এখনও আছে নাকি? কিন্তু দিদি কখ্খনো সঙ্গে যাবেন না তা আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অন্যায়। অর্থোপার্জনের আবশ্যক আপনাদের নেই, তবে কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে?

বলিলাম, অন্ততঃ অভ্যেসটা বজায় রাখতে।

এটা রাগের কথা দাদা।

কিন্তু রাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই আনন্দ?

আনন্দ কহিল, থাকলেও অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্রয়োজন কি, কিন্তু বাদানুবাদে জিনিসটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেলাম।

এম্‌নি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া এবার ভালমানুষের মত আনন্দের পার্শ্বে গিয়া স্থির হইয়া বসিল। আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন, অন্ততঃ গোলামির অভ্যাস বহাল রাখবার জন্যেও ওঁর বিদেশ যাওয়া চাই। আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না, আমার কাজে যোগ দেবেন। বিদেশে না গিয়ে দেশের গোলামিতেই দুই ভাইয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ডাক্তারি জানেন না আনন্দ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ডাক্তারিই করি? ইস্কুল করি, পাঠশালা করি, তাদের দুর্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় তা অবিশ্রাম বোঝাবার চেষ্টা করি।

তারা বোঝে?

আনন্দ কহিল, সহজে বোঝে না। কিন্তু মানুষের শুভ-ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। বোধ হয় সে বিশ্বাস করিল না, বোধ হয় সে আমার জন্য মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে আমিও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও—

আনন্দ প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়লেন যে বড়?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে কহিল, দেশের দুর্দশা যে কত বড় তা আমিও জানি আনন্দ। কিন্তু তোমার

একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই? আমাকে দেখাইয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে? তবেই হয়েছে। তাহলে আমার মত ওঁর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবে না। এই বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ওঁকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল আপনার চোখের মণি হয়ে। কিন্তু একলা-দোকলার কথা এ নয়! একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এত বড় যে, তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামনদেবের পায়ের মত। বাইরে থেকে সে দেখতে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম, বামনদেবের উপমায় রাজলক্ষ্মীর চিত্ত কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই কহিল না।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারিনে। কিন্তু একটা কাজ করি। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখের অংশ আমি নিই দিদি।

রাজলক্ষ্মী অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, সে আমি জানি আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধ হয় একথায় কান দিল না, সে নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিল না। বাবার যা আছে, বিপুল সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশি। আমার কিন্তু তাতে প্রয়োজন নেই। এই দুখীর দেশে সুখভোগের লালসাটাও যদি এ জীবনে ঠেকিয়ে রাখতে পারি সেই আমার ঢের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠাঁই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কহিল, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু ক্লান্তির দোহাই দিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রঙ্গ-রহস্যে আজিকার প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ভারী একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, সায়াহ্নের সভাও জমিয়াছিল হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া। কিন্তু ভাঙ্গিল যেন নিরানন্দের মলিন অবসাদে। আহারের জন্য দুজনে যখন রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

পরদিন সকালে বজ্রানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কাহারও কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আপত্তি করে। দিনক্ষণের অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া অত্যন্ত বাধা দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। শুধু বিদায় লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আবার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি ঝাপসা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আসব বৈকি দিদি! যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীঘ্রই চলে যাব। যেখানে থাকব যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাব বৈ কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং রতন আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

পনর

সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের বাক্স ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন শুধু যে সে এ বাড়ির সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয়, আমার মনে হইল যেন সে সেই শূন্য স্থানটুকু ছিদ্রহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল-পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জনামুক্ত ছিল, সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইতে চলিল। তবুও ছয়-সাতদিন কাটিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী প্রায় সারাদিনই বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কি করে জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। দিনান্তে একবার যখন দেখা হয় তখন হয় সে অন্যমনস্ক, নাহয় বড় কুশারীঠাকুর সঙ্গে থাকেন, কাজের কথা চলে। একলা ঘরের মধ্যে, যে আনন্দ আমার কেহ নয়, তাকেই বার বার মনে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ যদি সে আবার আসিয়া পড়ে! শুধু কেবল আমিই খুশি হই তাই নয়, ওই যে রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কি একটা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি জানি, সেও তেমনি খুশি হইয়া উঠে। এমনিই বটে! একদিন যাহাদের উন্মুখ যুগ্মহৃদয় বাহিরের সর্ববিধ সংস্রব পরিহার করিয়া একান্ত সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ ভাঙ্গনের দিনে সেই বাহিরটাকেই আমাদের কত বড়ই না প্রয়োজন! মনে হয়, যে-কেহ হোক, একবার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচি।

এম্‌নি করিয়া দিন যখন আর কাটিতে চাহে না, তখন হঠাৎ একসময়ে রতন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের হাসি সে আর চাপিতে পারে না। রাজলক্ষ্মী গৃহে ছিল না, অতএব তাহার ভীত হইবারও আবশ্যক ছিল না, তথাপি সে সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, শোনেন নি বুঝি?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, মা দুর্গা করুন মায়ের এই মতিটি যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আমরা যে দু-চারদিনেই যাচ্চি।

কোথায় যাচ্চি?

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাইনি। হয় পাটনায়, নাহয় কাশীতে, নাহয়□কিন্তু এ ছাড়া মার বাড়ি ত আর কোথাও নেই!

চুপ করিয়া রহিলাম। আমার এতবড় ব্যাপারেও নিরুৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় সে ভাবিল আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলচি এ সত্যি। যাওয়া আমাদের হবেই। আঃ□বাঁচা যায় তাহলে, না?

বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চারদিন সবুর করুন, ব্যস্। বড়জোর হপ্তাখানেক, তার বেশি নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা মা কুশারীমশায়ের সঙ্গে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেঁধেছেঁদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। আমরা হলুম সব শহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে? এই বলিয়া সে খুশির আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অজানা কিছুই নাই। তাহাদেরই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয় এ কথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতেরই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা-না-লাগা কর্ত্রীর ইচ্ছা ও অভিরুচির 'পরেই নির্ভর করে।

যে আভাসটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মর্ম বুঝে না, কিন্তু তাহার বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তপটে সর্বদিক দিয়া

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। ভাবিতাম, আমার জন্য সে অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের কেন্দ্রটা এতকাল দেখি নাই বলিয়াই এরূপ ভাবিয়া আসিয়াছি। বিত্ত, অর্থ, ঐশ্বর্য□অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমারই জন্য? আবর্জনাস্তুপের মত সে-সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেরই পথ রোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে রাজলক্ষ্মীর কতবড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিত্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার করিও না কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম ধূর্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভ্রান্ত নহে। গঙ্গামাটি-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম। প্রভাতে নিয়মিত পূজা-আহ্নিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইল না। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশু এমনি সময়ে যদি খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আমরা বার হয়ে যেতে পারি ত সাঁইথিয়ায় পশ্চিমের গাড়ি অনায়াসে ধরতে পারব, কি বল?

বলিলাম, পারবে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এখানকার বিলি-ব্যবস্থা ত একরকম শেষ করে ফেললাম। কুশারীমশাই যেমন দেখছিলেন শুনছিলেন, তেমনই করবেন।

কহিলাম, ভালই হ’ল।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। বোধ হয় প্রশ্নটা ঠিকমত আরম্ভ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই শেষে কহিল, বঙ্কুকে চিঠি লিখে দিয়েচি, সে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করে স্টেশনেই উপস্থিত থাকবে। কিন্তু থাকে তবেই ত!

বলিলাম, নিশ্চয় থাকবে। সে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, সাধ্যমত করবে না। তবুও—আচ্ছা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না?

কোথায় যাইতে হইবে এ প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। মুখে বাধিল। কেবল বলিলাম, যদি যাবার প্রয়োজন মনে কর ত যেতে পারি।

ইহার প্রত্যুত্তরে রাজলক্ষ্মীও কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কৈ, তোমার চা এখনো ত আনলে না?

কহিলাম, না, বোধ হয় কাজে ব্যস্ত আছে।

বস্তুতঃ চা আনিবার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্বেকার দিনে ভৃত্যদের এতবড় অপরাধ সে কিছুতেই মার্জনা করিতে পারিত না, বকিয়া ঝকিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিত, কিন্তু এখন কি-একপ্রকারের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল এবং একটা কথাও না কহিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্বাহ্নে সকল প্রজারা আসিয়াই ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ডোমেদের মালতী মেয়েটিকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্যত্র গিয়া সংসার পাতিয়াছিল, দেখা হইল না। খবর পাইলাম, সেখানে স্বামী লইয়া সে সুখে আছে। কুশারী-সহোদরযুগল রাত্রি থাকিতেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁতিদের সম্পত্তি-ঘটিত

বিবাদের সুমীমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি করিল, সবিস্তারে জানিবার কৌতূহলও ছিল না, জানিও না। কেবল এইটুকু তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্বসঞ্চিত বিচ্ছেদের গ্লানি কোন পক্ষের মনেই আর বিদ্যমান নাই।

সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল; কহিল; আমাদের যে আপনি শীঘ্র ভুলে যাবেন না সে আমি জানি। এ বাহুল্য প্রার্থনা আপনার কাছে আমি করব না।

সহাস্যে কহিলাম, আমার কাছে আবার কি কাজের প্রার্থনা করবে দিদি?

আমার ছেলেকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাহুল্য প্রার্থনা, সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন্ আশীর্বাদ করা যায় সে ত আমিই জানিনে।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল, কথাটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্বাদ! তোমার ছেলেকে বুঝি লক্ষ্মী তামাশা করতে চায়, সুনন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি, তামাশা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত, আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বরই দেন। তার চেয়ে বড় ত আমি কিছুই জানিনে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি হইতে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্যন্ত পুনঃপুনঃ চোখ মুছিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলাম না আমি। আমিই কেবল নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম, এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সম্ভাবনা নাই। তাই যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বার বার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের এইমাত্র যবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধ ভিড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে।

কিন্তু জনতার মাঝখানে যে মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই মন যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্কু অবহেলা করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মালপত্র বোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। কিন্তু আমার সহিত সে বিশেষ কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, এখন তাহার দর বাড়িয়াছে ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বঙ্কু বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মানিয়া লইয়া চলিতে জানে। এ বিদ্যা যাহার অধিগত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না।

গাড়ি ছাড়িতে তখনও মিনিট-পাঁচেক বাকী ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেন আসিবে প্রায় শেষ রাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইশারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভিতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত

ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার দেখা দিয়ে যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যেতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপিচুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই, আসবে?

আসব।

কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে?

দেব।

বাহিরে গাড়ি ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং গার্ডসাহেব তাঁহার সবুজ আলো বার বার নাড়িয়া এই আদেশই কায়েম করিলেন। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি নামিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেই গাড়ি চলিতে শুরু করিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্টেশনপ্লাটফর্মের গোটাকতক কেরোসিনের আলো মন্থর-গতিশীল গাড়ির সেই খোলা জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তির উপরে বার-কয়েক আলোকপাত করিল।

কলিকাতায় আসিয়া চিঠি দিলাম এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন পনরর মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে প্রতিশ্রুতিমত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ-দুই এম্‌নিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল, এতদিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয়ত সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত অত দূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি তুলিয়া জিদ করিতে থাকিবে—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই-তিনখানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় কোথাও সে

ইঙ্গিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা! মনে মনে বলিলাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতাম না, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও।

অকস্মাৎ দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়াইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন ভুলিয়া ছিলাম, ভাবিয়া আশ্চর্য হইলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ি ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি চাহিয়া মনে হইল, থাক এ-সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশি করিয়া জানে তাহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোঝা বহিব না। রাত্রে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্দ্রার ঝোঁকে মুদিত দুই চক্ষুর পাতার উপরে কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি-অন্ত নাই। হয়ত, অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠানামা, হাঁকাহাঁকি, দৌড়ঝাঁপের অবধি রহিল না, খর রৌদ্রতাপে চতুষ্পার্শ্বের কোথাও কোন কুহেলিকার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেনের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃদ্ধগোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলাম না। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কাকে খুঁজছেন?

কাহাকে খুঁজিতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম, রতন আছে?

না, সে বাজারে গেছে।

ব্রাহ্মণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার ধূলিধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ হয় অনুমান করিলেন যে, আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আপনি বসুন, সে শীঘ্রই ফিরবে। আপনার কি তাকেই শুধু দরকার?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত?

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, বোধ হয় মুহূর্তকয়েকের বেশি নয়, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয়নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে শুধু থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। মাথার পরে ললাটের প্রান্ত পর্যন্ত আঁচলটানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা-চুলের দুই-চারিগোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের ‘পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল; এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় বাধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি। এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কু বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়িতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস্! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে বিস্মিত হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই সে হঠাৎ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার ত এখনও তিনদিন দেরি।

বলিলাম, হাঁ, আরও কাজ আছে।

পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয়, আমার শ্রান্তি বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখে আনিতে পারিল না। খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আমার গুরুদেব এসেচেন।

বুঝিলাম বাহিরে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল□তিনিই। ইঁহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাশীতেই টানিয়া আনিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ি ছাড়িবে বারটার পরে। এখনও ঢের সময়। মানুষটি সত্যই ভাল। স্বধর্মে অবিচলিত নিষ্ঠাও আছে উদারতারও অভাব নাই। আমাদের সকল কথাই জানেন, কারণ গুরুর কাছে রাজলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই। অনেক কথাই বলিলেন, গল্পচ্ছলে উপদেশও কম দিলেন না, কিন্তু তাহা উগ্রও নয়, আঘাতও করে না। সমস্ত কথা মনে নাই, হয়ত মন দিয়াও শুনি নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে যে, একদিন রাজলক্ষ্মীর যে এরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তিনি তাহা জানিতেন, তাই দীক্ষার সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত রীতি মানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যাহার পা পিছলাইয়াছে সদ্গুরুর প্রয়োজন তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহার বিরুদ্ধে আর বলিবার কি আছে? তিনি আর একদফা শিষ্যার ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মশীলতার অজস্র প্রশংসা করিলেন; কহিলেন, এমন আর দেখি নাই। বস্তুতঃ, ইহাও সত্য এবং তাহা কাহারও অপেক্ষা আমি নিজেও কম জানি না। কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

সময় হইয়া আসিল, ঘোড়ার গাড়ি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি গাড়িতে গিয়া বসিলাম। রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ির ভিতরে হাত বাড়াইয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় দিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সে শক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে, অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দেই সাঙ্গ হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সর্বান্তঃকরণে কহিলাম, তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য ধ্রুব হোক, তোমাকে হিংসা করি না, কিন্তু যে দুর্ভাগা সমস্ত বিসর্জন দিয়া একই সাথে একদিন তরণী ভাসাইয়াছিল এ জীবনে তাহার আর কূল মিলিবে না। ঘর্‌ঘর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের ক্ষণে যে-সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন-নাট্যের অত্যন্ত স্থূল এবং সাধু-উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অম্লান দীপ্তি কোনদিন নিবিবে না, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করিবার মত পাঠকেরও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবে না□কিন্তু আমার নিজের কথা কাহাকেও বলিবার নহে□আমি চলিলাম অন্যত্র,□আমারই মত যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ নাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে। মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্যজীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। স্নেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বর্মা হইতে আসিবার কালে ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত

ও বর্তমান ইতিহাস। চিত্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভয়তায় ও আত্মার স্বাধীনতায় সে যেন আমার সমস্ত দুঃখ একনিমেষে আবৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ি থামিতে চকিত হইয়া দেখিলাম স্টেশনে পৌঁছিয়াছি। নামিয়া দাঁড়াইতে আর এক ব্যক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে, রতন যে!

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় ত আমাকে একটু খবর দেবেন। যতদিন বাঁচব আপনার সেবার ত্রুটি হবে না।

গাড়ির লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কাঁদচিস্ কেন বল্ ত?

রতন জবাব দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আর একবার ঢিপ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য, এই সেই রতন!

চতুর্থ পর্ব

এক

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃপুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এম্‌নি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্‌ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণকণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ওদিকটা নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার জুড়িয়া

রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্মায় পৌঁছিব। কিন্তু এ যেন সর্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ির ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত—শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।

অ্যাঁ! একি শ্রীকান্ত যে! এ-যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ে মাথায় ও কাঁখে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, এই ত তিন-তিনটে মানুষ। তোমার গাড়িটি ত দিব্যি খালি,—উঠবো?

উঠুন, বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন। ঠাকুর্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশি ভাড়ার গাড়ি, আমার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে বলে দিয়ে আসচি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ি ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন, তোর এ কি ছিরি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যা হোক! সেই যে গেলি একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ-সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দা জানাইলেন, তিনি সস্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনি—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায়, তবু এত দিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'ল। পুঁটু, প্যাঁড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্নী, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে

আসা হয়নি ত? দাও, শালপাতায় করে গুছিয়ে দাও দিকি গোটা-দুই প্যাঁড়া, একথাবা দই! এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিব্যি করে বলতে পারি। না—না—না, ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেলো পুঁটু—যাকে তাকে ত নয়, —এ-সব মানুষকে কি করে দিতে-থুতে হয় শেখো!

পুঁটু যথা আদেশ সযত্নে কর্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাঁড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্য যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্মায় ভালো চাকরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মীয়জ্ঞানে পুঁটু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নাই!

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের, ফর্সা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও বাড়ির নন্দরানীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে, সাতদিনের দিন জামাই পনর দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহার মনেই নাই।

পরদিন দেশের স্টেশনে গাড়ি থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি। সময়ে স্নানাহার না করিলে পিত্ত পড়িবার আশঙ্কায় দু'জনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই পাঁচ-সাতদিনে এ-সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এমন কি পুঁটুরও না।

ঠাকুর্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিতচিত্তে কহিলেন, মজা দেখেচ, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচ, আগে থাকতে কারও বলবার জো নাই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপরে ভীত হইয়া উঠিলাম। সায় দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে, না বলিতে সাহস হয় না, পাছে বিশ্রী কিছু-একটা ঘটে। পুঁটুর মা এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহ্লাদ ঠাট্টা-তামাশাও চলে—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই, শুধু দিন-ক্ষণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জালে জড়াইতেছি—মনে শান্তিও পাই না—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও পারি না। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কোষ্ঠী আছে কি না। সেটা ত দরকার।

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেচেন?

ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা একবার!

কিন্তু আমি ত এখনো স্থির করিনি।

করোনি? তা হলে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি, আর যাই করি, আসলে ওর বয়েস হ'ল সতেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ে বিয়ে দেবো আমরা কেমন করে?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়!

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্নাকাটি, অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এত বড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর-এক কথা। সুতরাং ঠাকুর্দা চাপিয়া গেলেন। তারপরে শুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে! শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে, —ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়,—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ত হবে কার?

কলিকাতায় যাইবার পূর্বে ঠাকুর্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দা গদগদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুশি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দা আশীর্বাদ করিলেন,—কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

পাঁচ-ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট ! কিন্তু এ ভালোই হইল যে, একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

দুই

স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি। সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি,—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্তকয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্ আমাদের বাড়ি। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না,—চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না, সুতরাং আজ রাত্রের মত সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য, তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ্।

পরিত্রাণ নাই,—তর্ক করা বিফল।

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ি এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুঁড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আমবাগানে, ঝোপেঝাড়ে দু’জনে পাখি মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা

কতদিন তাহাদের বাড়িতে রাত কাটাইয়াছি,—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার ফলারের যোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল।

গাড়িতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি, শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন—বাড়িতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করোনি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস্ ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখি মারিনে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে?

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

গহরের আর-একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে, যে-কোন বিষয়ে অনেকটা পাঁচালীর ধরনে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্যশাস্ত্র-বিধি মানিয়া চলিত কিনা সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে

পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার শখ ছিল, সে সঙ্কল্প আছে, না গেছে?

গেছে! গহর মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে! ঐ নিয়েই ত বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকব। কত লিখেচি, চল্ না আজ তোকে সমস্ত রাত্রি শোনাব, তবু ফুরোবে না।

বল কি গহর!

নয়ত কি তোরে মিথ্যে বলচি?

প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভায় তাহার চোখমুখ ঝকঝক করিতে লাগিল। সন্দেহ করি নাই, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র, তথাপি, পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাকে ধরিয়া বসাইয়া সে সারারাত্রি ব্যাপিয়া কাব্যচর্চা করে, এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা বলিনি, তোমার অদ্ভুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে ছেলেবেলার কথা মনে আছে কিনা তাই শুধু বলছিলাম। তা বেশ বেশ—এ একটা বাঙ্গালাদেশের কীর্তি হয়ে থাকবে।

কীর্তি? নিজের মুখে কি আর বলব ভাই, আগে শোন, তারপরে হবে কথা।

কোনদিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেকচে যে মনে হচ্ছে ঘুমোতে পেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক-রথে সীতা যেখানে কাঁদতে কাঁদতে গয়না ফেলে দিচ্চেন, সে জায়গাটা যারা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারেনি, শ্রীকান্ত।

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম। বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্তীকে তোর মনে আছে ত, তার জ্বালায় আমি আর পারিনে। যখন-তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা একবার পড় দেখি, শুনি।

৭৭৯

বলে, বাবা তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্চি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচরাচর মেলে না, তাই মনে পড়িল। বাড়ি গহরদের গ্রামেই। জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কোত্তি বুড়ো ত? যার সঙ্গে তোমার বাবার লাঠালাঠি মালি-মোকদ্দমা চলছিল?

গহর বলিল, হাঁ কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুর, মায় বাস্তুসমেত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েচি। ভারী গরীব—দিনরাত চোখের জল ফেলত, সে কি আর ভাল শ্রীকান্ত!

ভাল ত নয়ই। চক্রবর্তীর কাব্য-প্রীতিতে এমনি কিছু-একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। দেনার জ্বালায় একসময়ে যা করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ির পাশেই বিঘে-দেড়েকের একটা আমবাগান আছে, তার প্রত্যেক গাছটাই চক্কোত্তির নিজের হাতে পোঁতা। নাতি-নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা ছাড়া আমার কেই-বা আছে, কেই-বা খাবে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাও গে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলেপুলেগুলোর নিঃশ্বাস পড়ে—আমার ভারি দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রি করিনে, বলি, চক্কোত্তিমশাই, তোমার নাতিরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারে, হানি কি? তাছাড়া গহর কবি। কবি-মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে?

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ির কপাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্ছিস শ্রীকান্ত?

পাচ্চি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেচেন, "আজ দখিন দুয়ার খোলা—"

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপটা মলয়ানিল রাস্তার শুকনো ধূলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ-দোর খোলা—সুতরাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল্। দুটো বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটেচে, আধক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জামগাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারিদিকেই ত আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেলে, কাল সকালে দেখিস মৌমাছির মেলা। কত

দোয়েল, কত বুলবুলি, আর কত কোকিলের গান। এখন জ্যোৎস্না রাত কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলদের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চিনে ভাই, তা আগে থেকেই বলে রাখচি। তা ছাড়া খাবার ভাবনাও নেই, চক্কোত্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা কিন্তু ঠিক সেদিনের সে গহর—এতটুকু বদলায় নাই—তেমনি ছেলেমানুষ—তেমনি বন্ধু-সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা শালিক পাখির অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুর্দার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জিত জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়িটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে-দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ

করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু ‘পথকর’ যোগাইতে হয়, কিন্তু সে-পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ-সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।

সেই পথের বহুকাল-সঞ্চিত স্তূপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ি আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না, আর না—থামো, থামো —একদম রোকো।

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন এ পাঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-ব্রেক চক্ষের নিমিষে কসিতে না পারিলে সর্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ি থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্চি, তুই নে বিছানাটা,—চল।

গাড়ি বুঝি আর যাবে না?

না। দেখচিস্ নে পথ নেই!

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পল্লীবীথিকা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। গাড়ি ঢোকার প্রশ্নেই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাত হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য। অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম, গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন,

খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান-আঙ্গিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টিমাত্রই ঝরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্তে গর্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্তপোশটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস কিরকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিনা-বায়ে রাজ্যের শুকনা লতাপাতা গবাক্ষপথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্তপোশ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত খুঁড়িয়া একরাশ মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্তটায় সাপ থাকতে পারে ত ?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিঞা ?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, ও আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাছুর চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙ্গালীও বটে, পৈতৃককালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাছুর চাষবাস হইতে বাড়িঘরদোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে দখিনা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার

লোভে সর্পযুগলের বহির্গমন আশ্চর্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল, আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের? তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিৎও নিস্তার পান না—আমরা ত তুচ্ছ | নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে। কিন্তু কি খাবি বল্ ত শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আখের গুড় আছে। আজকের মত যোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়িতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু যোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আস্তো দেখে একখানা ইট যোগাড় করে আনো। গর্তটা একটু মজবুত করে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঁজা ইট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর?

আমি? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন, তিনিই রান্না করেন। সে যাক, খাওয়া-দাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোরে পড়ে শোনাব।

সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই; কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি, কি বল? রাত্তিরে দু'জনে একসঙ্গেই থাকব, কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও গে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুনব।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিংবা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত? আমি পড়ে যাই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো, কি বলো? এই বেশ মতলব,—না?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের মর্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনব।

গহর ক্ষুব্ধমুখে বিদায় লইল। কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল! ইতিপূর্বে ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নূতন সাড়া পড়িবে। সে লেখাপড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য একটু বাঙ্গলা ও ইংরাজি শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই ! কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়াছে, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপরে জগতের বাকী সব-কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়িতে বসিয়া গুনগুন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্

দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ-বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এ-সব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যূষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল; তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে, কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনের বঙ্গের নিভৃত পল্লীর অপরূপ শোভাসৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মত, অনুরোধ এড়াইবার জো নাই, অতএব হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্ধেকটায় মাধবী ও অর্ধেকটায় মালতীলতা—কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নির্জীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাঠপিঁপড়া যে ছোঁবার জো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল যে, আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়া দিতে পারিবে।— আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্বাহের উদ্যোগপর্বে দম ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবলবেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনে-বাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্ছি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল—কেন রে?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুত্তিন শিয়াল ক্ষেপেচে—গরু-মনিষ্যি একসাই কামড়ে বেড়াচ্চে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম।— কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপেঝাড়ে। যান ত একটু চোখ রেখে চলবেন।

তাহলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ রে! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষেপেই, তা বলে লোকজন রাস্তায় চলবে না নাকি? বেশ ত!

এও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার। অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল, পথের দু'ধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চড়চড় পটপট শব্দে আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলো জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটুগাছের কুঞ্জ, মুকুলিত বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড়। মনে পড়িয়া গেল নবীনের সতর্কবাণী। গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী। সুতরাং ঘেঁটুফুলের শোভা সময়মত আর-একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে, আজ গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনের 'গরু-মনিষ্যি' একটু দ্রুতপদেই স্থানত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষার পরিস্ফীত জলধারা বসন্তসমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয় পানা ও শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুলগাছে অজস্র রাঙ্গা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। বলিল, চল্, ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এ-সব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এ-সব তুমি কবিতায় লিখো, পড়ে আমি খুশিই হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আর কানের রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত-বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি। এর জন্য তুমি দুঃখ করো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঠা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখে ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্তী যে তাহার সমুদয় হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল, সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়—তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ, শোনা গেল তাঁহার গৃহে গুটি-দুই নাতির 'মায়ের অনুগ্রহ' দেখা

গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাবিবি এখনো দেখা দেন নাই—পচা পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়িতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না, শ্রীকান্ত। সত্যি করে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য-আলোচনায় এ যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক কিন্তু নিবিড় সাহচর্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি বিস্ময়কর। ৭৮৫

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্মায় গিয়ে। আমাদের দু'জনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি ত তোমার মত কবি নই ভাই, গাছপালার ভাষাই বুঝিনে, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারিনে, পারব কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবো যে !

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ভাষা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস নে বিশ্বাস করতে?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও ত বোঝো!

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল; কহিল, হাঁ তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পরে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?

কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দার কথা, পুটুর কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল । পাঠান হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস, যদি কখনো সেদিন আসে, আমাকে জানাস শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরনটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাব। কিন্তু আশীর্বাদ ক'রো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আবার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্যি রইল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কুশল সংবাদ দেবে বলো?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কত দূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে ?

হ্যাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি—একখানা চিঠি আছে।

বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসত?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভুষো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্য। মার চিঠি একটা লোক না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পাঁচ শ' মাইল ছুটে হাতে করে না আনলে খোয়া যায়। জানেন ত সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ির ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়াইয়াছে। হাসিয়া কহিলাম, উপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিই গে।

রতন পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

তিন

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙ্গালী বামুনঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐসব মেড়ুয়া মহারাজগুলোকে ত জানোয়ার বললেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালমন্দ, অথবা পাচকের শিল্পনৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ির ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল, সে যাহা লিখিয়াছে তাহা ত জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি, মশারি খাটাবার হাঙ্গামা নেই,—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই—

কিন্তু খবর সব ভাল ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখায়। গুরুদেবের কৃপায় বাড়ির বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাসদাসী, বঙ্কুবাবু, নতুন বৌমা এসে ঘরদোর

আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ির গিন্নী—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপতে—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইস্টিশনে চোখের জল সামলাতে পারিনি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, বঙ্কুবাবুর বয়সও হ'ল, যা হোক একটু বিদ্যেসিদ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবচেন বোধ হয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেচেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু ?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেছেন মাসে অন্ততঃ দুবার করে আমার চাকরি যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাইনে কেন? পারিনে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েচে তাঁর একটা নিশ্বাসেই আশ্বিনের মেঘের মত সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ও তো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্বাদ।

এখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলিনে। ঘরে যা-কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বার হলাম, কিন্তু পূর্বজন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেল। সমস্ত

দুঃখই শুনলেন, কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিনকয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত ? যাবার দিনে হাতে একটা পুঁটুলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিস নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নি গে যা। খুলে দেখি পাঁচ শ' টাকা। প্রথমে নিজের চোখ-দুটোকেই বিশ্বাস হ'ল না, ভয় হল বুঝি-বা জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখচি। আমার সেই মাকেই বঙ্কুবাবু এখন ব্যাঁকাট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশি দিন নয়, মা লক্ষ্মী টললেন বলে।

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছুদিন হইতেই ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে। কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে ঢেলে দেন। বঙ্কুকেও দিয়েচেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো মৌচাকের আর দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্যু জানে না যে, আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রি করলে অমন পাঁচখানা বাড়ি তৈরি হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই নাকি ? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতন হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখিরী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বঙ্কু জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি করে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেচে, বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে ? গুরুঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায় ?

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেচেন, এ খবর ত তুমি জান রতন?

রতন জিভ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকর বাবু, এসব কথা আমাদের কানেও শুনতে নাই। ও মিথ্যে।

রতন আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্বে আর তার দেহটা ‘ধাতে’ আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে, বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ষোল-সতেরো। এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈশবের এই সকৃতজ্ঞ স্নেহ যদি আজ যৌবনের আত্মসম্মানবোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে, বিস্ময়ের কি আছে?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বঙ্কু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা-দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সযত্ন-অঙ্কিত শিলমোহরের গালার ছাপগুলো দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম।

তাহার হাতের লেখা বেশি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য না হইলেও ভাল নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয়, তাহার ভয়, বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রণয়-নিবেদন আতিশয্য ত দূরের কথা, ‘ভালবাসি’ এমন কথাও কখনো সুমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু কি-জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাঙ্গ হইয়াছিল

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদবিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্বদা প্রচলিত সামান্য গোটাকয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভকামনা করিয়া দু ছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গি যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপ দিয়াছে—

ঁকাশীধাম

প্রণামান্তে সেবিকার নিবেদন—

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে এক শ' বার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো, বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদায় দেবার কর্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙ্গামালার সে রাঙ্গা-রং তুমি চিনতে পারনি, বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায় তোমার বুকের 'পরে রক্তরেখায় যে লেখা এঁকে দিত সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তার পরে এলো দুর্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না ঢেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ জীবনে যথার্থই ও-সব ঘটেছিল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেচি, ভাবতে গিয়ে অনেক সময়ে ভয় হয়

বুঝি-বা আমি পাগল হয়ে যাব। তখন সমস্ত ভুলে যাঁকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতেও নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভয়।

হাঁ, বলছিলুম, তার পরে, এলো আমার দুর্দিনের রাত্রি, কলঙ্কে দিলে দু'চোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েচি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি করে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙ্গালী-ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবি আর করিনে। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই, ও-কথা যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে—তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইব কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুঁটু! আর আমি ফিরে আসব তোমার বাড়ির বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাব? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,—কিন্তু ঋণটা অস্বীকার ক'রো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছ শুধু ভার বোঝা। এমনিই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে ত ফিরে পেয়েছিলুম আমার তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায় ? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো ? স্বর্গের জন্যে নয়, সে আমি চাইনে। আমার কামনা, মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপতপ পূজা- অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ ক'রো। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে পারবো না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে-সূর্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায়ে বসে থাকার আমার

আর সময়ে হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল! সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম লিপি পাঠাইয়া একটা দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও ব্যাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী একেবারে নির্বাক। হয়ত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল

তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এদিকে ঠাকুর্দা মহাশয় সম্ভবতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন; ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ার বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু যাহা আসিয়া পৌঁছিল তাহা নির্বিঘ্ন অনুমতিই বটে! রতন নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই ঢের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুঁটুর আত্মীয়স্বজনও কেহ কেহ হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অন্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্তনে নিরাশায় ক্ষিপ্ত পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। পুঁটুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জনবিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়।

এ জীবনের গঙ্গা-যমুনাধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে এবং স্বল্পকাল পাশপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একত্রবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তব্ধ। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবঞ্চনার পরিবাদে কেহ কাহাকেও কলঙ্ক-লিপ্ত করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার শুরু হইবে আমোদ-আহ্লাদ, শুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীনদরিদ্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু সে

সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। ৭৯১

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধহাত-দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির আস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে-কোনদিন অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্তৃত্বই নাই, এতবড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই দিতে পারে না। সংসারের সবকিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব,- এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ এর কাছে, রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ ব্রত- উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ি করে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দা। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্ততায় ম্লান হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাঁদের এই

ঘরে এনে বসাও রতন, আমি মুখহাত ধুয়ে আসচি, এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দাই আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি,— এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায়?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দা কহিলেন, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম-পাঁচ শ’ টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেছে- ঘর-সংসার ফেলে পিসির বার হবার জো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম, বললুম, পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনি গে। ওর দিদিমা আশীর্বাদ করে বললে, পুঁটি এমনি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি নে ভায়া। হাকিমই হোন আর যেই হোন, আত্মীয় ত- দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে- তবে তাঁর ছুটি। জানোই তো দাদা, শুভকর্মে বহু বিঘ্ন—শাস্ত্রে কি যে বলে—শ্রেয়াংসি বহু

বিঘ্নানি,—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টুঁ-শব্দ করবার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের রাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবান্তর নয়—তাৎপর্য আছে।

নতুন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, ঠাকুর্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্চে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দেখেচেন বৈ কি। দেশের বাড়িতে বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাই ত বলি। চেনা মুখ।

আজ্ঞে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত লোক, বোধ হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্বাদের কাজটা অমনি সেরে রেখে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া যায়, চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো ?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারটা পর্যন্ত দিনটা ত বেশ ভালো। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পাঁজির দরকার নেই। বিবাহ আমি করতে পারব না।

ঠাকুর্দা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গালাটা বেশ শান্ত ও গম্ভীর করিয়া কহিলেন, উয্যুগ-আয়োজন একরকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার ত নয়—কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন ?

পুঁটু পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসিনি তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজী হতে পারি।

অনুমতি পাওনি ?

না।

ঠাকুর্দা একমুহূর্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে, সর্বরকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরাধরি করলে আর দু-এক শ' উঠতে পারে। কি বল হে ?

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি ?

দাও। তোমার নামটি কি বাপু ?

রতন।

রতন ? বেশ নামটি—থাক কোথায় ?

কাশীতে।

কাশী ? ঠাকুরুনটি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করচেন সেখানে ?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার?

ঠাকুর্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের ত কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে। হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে পড়্‌তেই বা হয়। তা ভাল আছে ত?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দা সবলে কয়েকটা টান দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—দাঁড়াও ত বাপু, পায়খানাটা একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা! বলিতে বলিতে তিনি রতনের আগেই ব্যস্ত-দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁটু মুখ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন? অমনি করে পরের গয়না চেয়ে দিদির বিয়ে,— এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্বে কহে নাই; কিছু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যিই কি হাজার টাকা দিতে পারেন না?

পুঁটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কখ্‌খনো না। বাবা রেলে চল্লিশ টাকা মোটে মাইনে পান, আমার ছোটভাইয়ের ইস্কুলের মাইনের জন্যে আর পড়াই হ'ল না। সে কত কাঁদে।বলিতে বলিতে তাহার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার কি শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁটু কহিল, হাঁ, তাই ত। আমাদের গাঁয়ের অমূল্যবাবুর সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বলেই ত সে বিয়ে বন্ধ হ'ল। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁটু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁটু সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও ত তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনের বছরের বড়?

পুঁটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সম্বন্ধ হয়নি?

পুঁটু মুখ তুলিয়া খুশি হইয়া বলিল, হয়েছিল ত। আপনাদের গ্রামের কালিদাসবাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি. এ. পাশ করেছে, বয়েসে আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁটু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁটু বলিল, তাই বৈ কি! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জন্যেই।

কিন্তু এ বিয়ে হ'ল না কেন?

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন্‌ না পাঁচ শ' টাকা খরচ হবে বলুন?

এ ত জমিদারদের ঘরের মেয়ের জন্যেই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ি গিয়ে কত হাতেপায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশি বড় নয়—তার বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটু ব্যগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগ্‌গির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে রাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেব।

এর বেশি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে কি-ই বা জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে তো?

হাঁ, নিশ্চয় করব।

তা হলে তোমার মাকে গিয়ে বলো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই-হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তাহলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হাঁ, তাও যাব!

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুর্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। রতন গেল কোথায়, আর এক কলকে তামাক দিক না।

চার

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎপরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্বাদ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি তিরস্কার করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরি করিয়া বহু দুঃখে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে, তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা গাড়িতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে! একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুর্দা। ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ি পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দিগর্মি হইয়া মারা যায়। কিন্তু আশা ভিত্তিহীন, নিশ্চয় জানি, লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া আনিবে। এক উপায়—যঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম, কিন্তু জাহাজে স্থানাভাব—সমস্ত টিকিট পূর্বাহ্নেই বিক্রি হইয়া গেছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর এক পন্থা—বাসা বদল করা। ঠাকুর্দা না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভাল জায়গা এত শীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভালমন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহম্—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানর দায়।

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশি মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচো রতন?

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম, আমার দু'-পাঁচদিন দেরি হবে। মরা সোসাইটি, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচি নে। আবার কবে কোন্ কালে আসা হবে তার তো কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি তো উদ্বিগ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে না। গাড়ির ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সেকথা লিখে দিয়েছি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা—

আজ্ঞে, দিন না। কালই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দেবোখন। সে বাড়িতে মার চিঠি যমে খুলতেও সাহস করবে না।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুর্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গেছেন। তাহা চিত্তের ঔদার্য অথবা সারল্যের প্রাচুর্য—এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। তিনি সাক্ষী রাখিয়া গেছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা তো নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ে বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামকা দান করবেন বললেন! তা ছাড়া, ঠাকুর্দাই হোক আর যাই হোক, বুড়োটা লোক ভাল নয়। ওকে বলাটা ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতেছিলাম।

তথাপি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভাল হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভাল হয়নি বাবু। টাকাটা তো কম নয়। তা ছাড়া, কিসের জন্য বলুন তো?

ঠিক ত! কহিলাম, তাহলে না দিলেই হবে। রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখাপড়া করে তো দিইনি। আর, তখন আমি এখানে থাকব কি বর্মায় চলে যাব, তাই বা কে জানে।

রতন একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিনতে পারেন নি বাবু, ওদের লজ্জা-শরম মান-অপমান নেই। কেঁদেকেটে ভিক্ষে করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক, টাকা ও নেবেই। আপনার দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মতলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দাকে যে চিনিতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন—কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। আশীর্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েচে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকাদেখা, আশীর্বাদ—বেলা তিনটের পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁটুর চিঠি—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কখনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক—চামার। চোখের চামড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে, গহনাপত্র নিজের সেকরা দিতে গড়িয়ে নেবে—ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্যন্ত না।

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য!

পুঁটু স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দু'পাতা নয়, চার-পাতাজোড়া ঠাস বুনানি। চার-পাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন। আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্বকালের নাটক-নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর স্বামী চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাতদিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাটা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে লইয়াছি এবং ভাঙচুর করিয়া প্রতারণা করিতেছি না—ঠাকুর্দা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণে। আমরা দেবতা নই তো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যই ত! রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গেছে। তাহার হাতে চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই বলিয়া। এ ত্রুটি যেন সে নিজগুণে ক্ষমা করে, এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়িসুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকাদেখা ও আশীর্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত পরিচয় হইল। লোকটা যেমন রুক্ষ মেজাজের, তেমনি দাম্ভিক। তাঁহার অনেক টাকা এই কথাটা সকলকে সর্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জিত। সদম্ভে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মানিনে, যা করব তা নিজের বাহুবলে। দেব-দেবতার অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে করিনে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশেরই বোধ করি তিনি মহাজন, এবং দুর্দান্ত মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলা স্বীকার করিয়া লইলেন।

তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং আশপাশ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানিনে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনিনে, কনেকেও না, অথচ টাকা যাচ্ছে আমার এবং সে ঢুকছে গিয়ে আপনার সিন্দুকে। একে বরাত বলে না ত বলে কাকে? এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আঙটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্যন্ত তৈরি হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয়ত-বা বৌভাতের খাওয়ানোটা পর্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্চেন তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্চেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্চি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাইনে। কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলে শুনেচে, আমি টাকা দিচ্চি, কেবল আপনিই শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়িসুদ্ধ সকলের হাতেপায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি এ পাশ-করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই—এটা ভেবে দেখেন নি আপনার ছেলে কেনবার অত টাকা হঠাৎ তারা পায়

কোথায়? যাই হোক, ছেলে-বেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়িতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েচেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হয় সবাই ভাবিলেন, এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠিপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেব না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়, আমি কথা দিয়েচি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখুয্যে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দা ব্যগ্রকণ্ঠে আমার পরিচয় দিলেন।

কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মামলা বাঁধে?

ঠাকুর্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—কিছুই আপনি বিস্মৃত হন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে এমনি বয়সই হ'ত। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সকৃতজ্ঞচক্ষে আমার প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি, অন্ততঃ বৌভাতের দিন এসে নববধূর হাতে অন্ন খেয়ে যাব। কিন্তু অনেক রূঢ় কথা বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূঢ় কথা যে বলেচ তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও করেচি। কিন্তু উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেচি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে, তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ অভ্যাগতগণের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর বিবাহটা তাহারই একটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটিমাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

পাঁচ

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয়নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? একপাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরোদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ডা-চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধম্মাধম্ম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাতজন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ-সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?

নবীন বলিল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়! বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্যপরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে? ৮০০

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ-কোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তরমুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলচে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত। খঞ্জুনি-কর্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীনও হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন কমলিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে অপরাহ্নবেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি-উত্তীর্ণ হইয়াছে, দূর হইতে কীর্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্রই পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুলবৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙ্গাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম, হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেদিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সঙ্কীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময়লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকদাস—আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চজাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘকায় বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথায় চুল চূড়ার মত করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই, চোখেমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুকরো মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাণ্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা।

বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তের নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্যের শেষ-দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট

ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ—চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ কালো অল্পপরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সেকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এসবই ভালো এবং যে দুটা লোক তদ্গতচিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই। নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টমী আছে, এবং সকলের সেরা বোষ্টমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙ্গিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত, না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদে শেষের ঐ সম্ভ্রমের 'দন্ত্য ন'টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ-দুটি যে রসের সমুদ্দুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে।

যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'ল তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখব বলেই ত এসেচি গোঁসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুশি হইলেন, কহিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেচে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ সমস্ত বলেচে। তারে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁসাই, ছ-সাতদিন আসনি কেন? সে বলল, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীঘ্রই আবার আসবে তাও বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক! ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভাল বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ অসাধু-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন, একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের,—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণব-রসচর্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহরগোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, কিংবা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গেছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখমুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরনটাও যেন পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পার?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচ বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো ?

বলিলাম, তা শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখন জন্মেও যাইনি!

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বৈ কি। অনেককালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাশা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়গোঁসাইজীকে ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে, আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে।বরঞ্চ কাল আবার আসব।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সেই।

কমলিলতার খবর বলেনি?

হাঁ, তাও বলেচে।

বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তাও দিয়েচে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁশিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করোনি।

কেন বলো ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্চ চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করবো?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেচি, ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশিদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি। কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!

গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

ছয়

যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোন কালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধুবর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি—ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না, সঙ্কল্প করিলাম। পুঁটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ সে-কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত-বিদলিত। মত্তহস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরি করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফলমূল বানাইতেছে—এ-সকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন নানা রঙের ছাপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে,

সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই। তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নামজপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই-একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে; কমললতা কহিল, চলো ঠাকুর, নমস্কার করে আসবে। কিন্তু আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকব বল ত ? নতুনগোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্যন্ত যখন গহরগোঁসাই হয়েচে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্চি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নিচু করিল। ঠাকুরঘরে কালোপাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জনপাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু সযত্ন পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কোচ হয় না, তথাপি কমললতা পূবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বসো, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে!

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বলিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কর্ত্রী নাকি?

কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট-বড় নেই। এক-একজনের এক-একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার দিয়েছেন। এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গোঁসাই, গহরগোঁসাই এঁদের দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে, নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে? আর ঐ নদীতে?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই-বা স্নান করালে না কেন?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাই নে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক— আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল এবং রাগ করিয়া কি-যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহরগোঁসাই যাই হোন কিন্তু তুমিও গরীব নয়। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য নয়।

বলিলাম, তাহলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে, আটকান যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায়?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবরই শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে, টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না, এ খবর পাইনি। কিন্তু হ'ল কি, বিয়ে ভেঙ্গে গেল?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙ্গেনি কিন্তু ভেঙ্গেছেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলেবেচা-পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটল!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বল ত? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গেছে।

বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল, যেন অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্বদিন,—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ার অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দু'দিন থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া, মালা গাঁথা, কাপড় রঙ-করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এ-সব ত কেবল ঘরগৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন কর কখন!

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধাবাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপান—একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ-দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরি কোন একটা বাড়ির ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই, গোঁসাই। এস ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি দেখিয়ে দিই!

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি পরে ঠাকুরঘরে এস। দেরি ক'রো না যেন! এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্তপোশে পাতা-বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুলফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় ধূপধুনা দিয়া গেছে, তাহার গন্ধ ও ধোঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভাল লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না,—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পরিলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিংবা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ-সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে

যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুনগোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকছেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা-সহযোগে কীর্তনগান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্টস্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল—অসম্ভব নয় এবং অন্ততঃ অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলেরই দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি—এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মন্থিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়।

গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই-সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকদাস মুদ্রিতনেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্বেই স্নিগ্ধহাস্যপরিহাস-চঞ্চল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্মে নিযুক্তা যে-সকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ কুরূপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধুনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্তকালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল,

অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি, প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পাড়িলাম না, সেইখানে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ বাড়ির সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গেছে—সেখানের পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনি অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল,—ওগো নতুনগোঁসাই।

জাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, কে?

আমি গো—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এত ঘুমোতেও পার!

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষ্ণবী। বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হ'ত কি? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হ'ল।

তা জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাব।

তবে ঘুমোচ্চ যে বড়?

জানি বিঘ্ন ঘটবে না, প্রসাদ পাবই। আমার সন্ধ্যেবেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে দাবী বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ। তুমি গহরকে পর্যন্ত গোঁসাই বানিয়েচ, আর আমিই কি এত অবহেলার? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজি।

কমললতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাশা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাইজীকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিংবা প্রসাদ নাহয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বল?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হ'ত না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহরগোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেচি। কমললতা, আমার তামাশাতে তুমি রাগ করলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাশা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আর জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথিসেবার ত্রুটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুনগোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি করেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কাঁসরঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্তনের পদ—কানু-গলে বনমালা বিরাজে, রাই-গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে মঞ্জরী-রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা, পাঠ, কীর্তন, নাওয়ানো-খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পরানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্টপ্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এতবড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা সাধন-ভজন কর কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভোজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধাবাড়া, ফুলতোলা, মালা-গাঁথা, দুধ জ্বাল দেওয়া, একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্তদিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলা তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই। দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম,

কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বল ত ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান! এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সেই যেন লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানিনে, তাই জিজ্ঞাসা করচি, তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মূর্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার জো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যর হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে, বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি-হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যিই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে

দু'দিনেই এলাইয়া পড়িত। কিন্তু সে ত হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনে পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভূয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকান?

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবচ?

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা, তোমার দেশ কোথায়?

কালকেই ত বলেছি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

তা হলে গাছতলায় আর পথে-পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে?

অনেকদিন পথে-পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা বিশ্বাস হয় না, কমললতা। যাকে ডাকবে সেই যে রাজি হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই—রাজি হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজি। নাবালক অবস্থায় যে লোক যাত্রার দলকে ভয় করেনি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টমীকে ভয় কি!

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তা হলে ত গান গাইতেও পারো।

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয়নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হ'ত বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এদেশে যেমন-তেমন করেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয় না। চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলেছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল; কহিলাম, পরিচয় তো এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাকে এতটা বিশ্বাস হ্'ল কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল একপক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দু'পক্ষেই। আমার বিশ্বাস, পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারী শুভদিন,—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভালো না লাগে ফিরে এসো, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েচে।

কমললতা বলিল, চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি গে।

আমার ঘর? তাই ভাল।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার এক মুহূর্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ। পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরি কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়া সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী দ্বারিকদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যবোধটা তেমন অটুট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দস্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্মকণ্টকাকীর্ণ তটভূমি এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল। অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথায় একটি লোক আড়ালে বসিয়া ছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষে থাকে! লোকটির বয়স হয়ত আমাদেরই মত—আবার বছর দশেকের বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। খর্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ-দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক

রকমের দীর্ঘে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোশাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই!

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

রাত্রিতে আখড়াতে ছিলেন বুঝি?

হাঁ, ছিলাম।

ওঃ!

মিনিটখানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়, ভদ্রলোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে?

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ! কমলিলতা থাকতে বললে বুঝি?

হাঁ।

ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি? ঊষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়েমানুষ! আমার বাড়িও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম, না। কিন্তু লোকটার ভাবগতিক দেখিয়া এবার সত্যি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠিবদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর কমললতারা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা ভ্রূ-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ি, ওদের জলে আমরা পা ধুইনে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছে হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাব মশাই, যাব, দারোগাকে দু পয়সা খাইয়ে রেখেচি, পেয়াদা সঙ্গে করে একবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনব। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'ল? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেত নাকি? ওঃ—ভদ্দরলোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং এই অতি দুর্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধ হয় এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজানো ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময়

কাটাইবার জন্য। ক্ষোভের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূ-ওয়ালা লোকটা! কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গহর কৈ? সেও ত আজ আমার খোঁজ লইল না। ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব,— পুঁটুর বিবাহের দিনটি পর্যন্ত—কিন্তু সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যেজন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা, আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল,—নতুনগোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল, আসিনি বলে মনে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছো—না গোঁসাই?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তার পরে বলিল, বনের মধ্যে ও লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হাঁ।

বলছিল সে তোমার স্বামী—অর্থাৎ তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি তার কণ্ঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছো?

না, করিনি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি?

করেছে।

আমার জাত?

হাঁ, তাও।

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুন্‌বে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা? তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালোলাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলো ত?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবচ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেব না।

তবে, কবে যেতে দেবে?

যেতে কোনদিনই দেব না। কিন্তু অনেক রাত হ'লো, ঘুমোও। মশারিটা ভালো করে গোঁজা আছে ত?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয়? বাঃ—বেশ ত! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা-টিপিয়া বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব-বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কি না।

বলিলাম, শুনতে আমি চাইনে, কিন্তু শুনলেও ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন? সে শুনলে মেয়েপুরুষে সবাই ত ঘৃণা করে!

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানিনে কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে জানি এবং তার কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে, কিন্তু অনেক সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেছি। কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না?

বোধ হয় আমার স্বভাব। কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে, তার দরকার নেই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া, কোথাকার কে—সে-সব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তার পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্বজন্ম পরজন্ম এ-সব বিশ্বাস করো?

না।

না কেন? একি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার জন্য অন্য জিনিস আছে, এ-সব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিনে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলবো, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে বলচি, তোমাকে মিথ্যে বলবো না।

হাসিয়া কহিলাম, কোরব গো কমললতা, কোরব। ঠাকুরের দিব্যি না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস কোরব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে; ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ-সাত দিন। আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না! তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললাম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই? নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই!

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞেস করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় টিপটিপ করতে লাগল। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখিনি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে, তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই নে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়বার্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথিসেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রুমোচনে ও মাধুর্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রহিল না। জানি না, কোন্ অশুভ লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম,

এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম।

এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙ্গাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি; কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচির হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না, এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম, কালই এস্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়েছি গোঁসাই।

বলো কি? পেলে কোথায়?

শহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও জিনিসটা যে আমি ভালবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং শহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকুই শুনিয়াছি তাহা ভাল নয়, তাহা নিন্দার্হ, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজি হই নাই। আমার

কৌতূহল নাই—কারণ প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটা বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত জন্মের স্বপ্নসাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত।

সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধদ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার ‘শ্রীকান্ত’ নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়!

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল; সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনারবেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই ত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয়নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে—এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনও দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধল। গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাকয়েক পরে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও দিব্যি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলেপুড়ে মরচি! কি দরকার বলো ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ অভিমান ধুয়েমুছে নির্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরুওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখোনি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তার পরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বলো।

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিগ্রহে জয়ী হইয়া একসময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের 'পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলচে। কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও ত বাড়াতে পারব না। আমার এ পথে আসাই যে তা হলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন। কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত, সব কথা খুলে বলতেও পারব না।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমললতা। তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহঙ্কার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দেশ করে দিয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এ-সব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কালকের পর আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি

সত্যিই বলতে চাও? না কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো। কিন্তু যথার্থই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জানতে ইচ্ছে করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়। কিন্তু কে ও?

কে ও! ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের উপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আমার সকল সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারী ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গোঁসাই, এ ত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভিতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দু'টি ছোটভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারী লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় বলে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ—মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পুজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাস খানেকের বেশি থাকতে পারতুম না। আমার ভালোও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তাঁর নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যেই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, তোমার ও নামটা মুখে আনতে পারিনে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়েস যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তান-সম্ভাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকত, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না।

তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মত আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবত আমাকে দেবতা, ডাকত আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ

হতেই চায় না। বললে, ঊষাদিদি, আত্মহত্যার মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড় অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির ক'রে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন কোরব।

তার জন্যেই আমার মরা হ'লো না।

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায়, দু-তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তার পরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হ'লো মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালাবদল করে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেছে, মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চললো, দীক্ষাই বলো আর ভেখই বলো, তাও আমাদের সাঙ্গ হ'লো, আমার নতুন নামকরণ হ'লো কমললতা। কিন্তু তখনো জানিনে যে, বাবা দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্মথকে বড় একটা দেখিনে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনিই ক'দিন যায়, তার পরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হ'লো। স্নান করে, শুচি হয়ে, শান্তমনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষণ্ণমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিলল, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটা যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে

আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসি, কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।

আমাদের কলকাতার পুরোনো দাসী কি-সব জিনিসপত্র নিয়ে এলো—সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বললে, মন্মথ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবি করে বসল। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্মথ কি টাকার বদলে রাজি হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা ত সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাত-কুল-মান সব যাবে।

মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া, পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিল, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হ'লো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বললে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জন করে উঠল—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম! যে লোক তোকে ভাতকাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্বনাশ! কি কালসাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম! ভেবেছিলাম বাপমা-মরা ছেলে মানুষ হবে। ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত

করতে লাগল, বললে একথা ঊষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস, না!

যতীন চমকে উঠে বললে, ঊষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখ্‌খনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে ত কিছুতেই বার হতে পারে না!

মন্মথ আর একবার গর্জন করে উঠল—ফের্‌! তবু অস্বীকার করবি পাজি হতভাগা শয়তান! জিজ্ঞেস কর্‌ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্‌!

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পরে আর প্রতিবাদ করলে না, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রে কেউ তার খোঁজ করলে না। সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙ্গা আস্তাবলের এককোণে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচ বিধি আছে কি না জানিনে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়—সে যাই হোক, শুভদিন দিনকয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তার পরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ-শুচি হয়ে মন্মথগোঁসাই মালাতিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্মথর অশৌচ গেল কিন্তু পাপিষ্ঠা ঊষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তার পরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কি না ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, দ্যাখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাসমত জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মত করে বুঝে রেখেচি গোঁসাই। স্পর্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছুই আমাদের হয়নি। হলে একে এত ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলো ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনিই হয়, এমনি কোরেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলব্ধি অর্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, এর পরে কি হ'লো?

শুনিয়া সহসা সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বল গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈষ্ণবী বলিল, আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিনচারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারিনে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েচে ঊষা?

বললুম, আমি মরব না বাবা, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মা, তাঁকে ব'লো ঊষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাবেন।

চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল, বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল—তারা যাচ্ছিল শ্রীবৃন্দাবনধামে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কতদিন কেটে গেল।

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শতসহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত তুমি বললে না কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইচি কমললতা।

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপাহাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাজী ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বল, গোঁসাইজী দ্বারিকা দাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

গুরুদেব! তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছ?

না, দীক্ষা নিইনি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলি বৈষ্ণবী—সেবাদাসী না কি যে বলে—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল, ওরা আমার মতই ওঁর শিষ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনা, না কি এমনি একটা সাধনপদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে ত দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টা-তামাশাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিদ্রূপ করতে পার। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস করলে অপরাধ হয় নতুনগোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গাম্ভীর্যে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিত মুখে বলিল, দু'দিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে? কেবল বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচি নে, আমাকে ত তুমি ভালোবাসো, আর কখনো যদি দেখা না-ও হয়, তবু ত দেখে যাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলিনি—দু'দিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে, তুমি যথার্থই খুশি হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, জাতবোষ্টমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। যতীনের প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসো নি?

তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মত। বাঁধন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভাল হ'ল না কমললতা, ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যি কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কাহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধুমাখানো ফাঁকিও সে সারাজীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যি হয়ে রইল।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্যি জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেছি ত। এমনি করে এ পথে কত লোকই এলো, এ পথ যাদের সত্যি নয়, জলের ধারাপথে শুকনো বালির মত সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা হয়ে রইল, কখনো জমাট বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দু'দিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি! এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এ-সব অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না। কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে, তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালোবাসার নামই হ'লো দুঃখ পাওয়া ?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন?

না বলেও যে থাকতে পারিনে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা; তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না!

কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না; ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, আমাদের সত্যিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর

ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে সেইদিনেই কেবল আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। ওগো নতুনগোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না, নিশ্চয় জানো?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করিনি কমললতা?

সে কহিল, জেনে করোনি, কিন্তু তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে না কি!

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পূজো আর রসের আরাধনার বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেছো এ কি সত্যি কমললতা?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপ-তপ, তোমার কীর্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা এ-সবের কি হবে বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চল না গোঁসাই, সব ফেলে দু’জনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই। কিন্তু সত্যি কি কাল যাবে?

হাঁ, সত্যিই কাল যাব।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

আট

এখানে আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয় এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন? ছ-সাতদিন থাকবে বলেই ত এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছু নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টা মতলব দেয়? কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনার? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এম্‌নি কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণেই সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এইসব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়,—শুধু, আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহাদের রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুশকিল, পুঁটুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগসমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক। হয় কলিকাতা,

নয় বর্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে, আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত কমললতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে কয়টা টাকা জামার পকেটে পড়িয়া আছে, কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সঙ্কল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই; আবার মনে হইল প্রত্যুষের মঙ্গল-আরতি বুঝি শুরু হইয়াছে, কিন্তু কাঁসরঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুকণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—'রাই জাগো, রাই জাগো, শূক-শারী বলে, কত নিদ্রা যাও লো কালো-মানিকের কোলে'। গোঁসাইজী! আর কত ঘুমোবে গো—ওঠ!

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পুবের জানালা খোলা—সম্মুখের আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে রাঙ্গার আভাস দিয়াছে,—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মত—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল; বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখির দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী,—কলিকাতা শহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেনদেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভিড় দেখিলে অবাক হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দিকের

বনজঙ্গলে ডালে ডালে তাহাদের অগুণতি আড্ডা! ঘুম-ভাঙ্গার সাড়াশব্দ কিছু কিছু পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখেমুখে জল দিয়া তৈরি হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিবসব্যাপী নাচগানের মোচ্ছব শুরু হইবে! সবাই এরা লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ,—ক্লান্তও হয় না, কসরত থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্তনের পালা যদিবা কদাচিৎ বন্ধ হয়, বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোটবড়, ভালোমন্দর বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না-থাক গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখির চড়াগলার পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন একটা ডাহুক নদীর কল্‌মীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিনকণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভাল যে এদেশে ময়ূর মিলে না, নহিলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও জো নাই—প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গানোর কি দরকার ছিল বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে কলকাতা যাবার কথা। মুখহাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে। কিন্তু স্নান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই!

স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত?

বৈষ্ণবী বলিল, হ্যাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো, টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তার পরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছ—একটুও বদলাতে পারনি।

কেন বল ত?

তুমি বল ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণে নিতে পারি বলে কি সত্যই মনে করো? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাব আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

নেই? তা হলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?

কিন্তু এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাব।

এই অন্ধকারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পুজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্বোপরি সবিনয় কর্মকুশলতার এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা-বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রমলক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নরনারী স্খলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশবোধ হইল। এই মঠে মাত্র দু'টি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম, লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রভ্রষ্ট উপগ্রহের মত সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোব না কমললতা, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারব ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই,—আচ্ছা চলো। আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনা পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই! বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে!

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারিঠাকুরের একটি গান আছে,—"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও"। গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না,—না?

বলিলাম, কি জানি আগে সকালবেলাটা ত কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।"

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানিনে।

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

“চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা, পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।”

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে! দু’জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারী ইচ্ছা করিতে লাগিল দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পাও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়া ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই, কিন্তু ফর্সাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতাঝরা ন্যাড়া চাঁপাগাছটায় ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপসা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায়

সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা।

করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপাডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—হঠাৎ তোমার হ'লো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েচি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদুগুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—"কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—"

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্যি শুনতে পাচ্চো কি? ফিরবে না?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, "ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—" আচ্ছা নতুনগোঁসাই,

জানো মেয়েদের মুখের গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারি খারাপ লাগে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

ওদিকে হয়ত আরতি শুরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন?

কেন তা তুমিই জানো। কিন্তু এ কথা তোমাকে বললে কে? আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি। আমাকে কেউ বলেনি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনস্কের মত ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না?

না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চল এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কেন বার বার এ কথা জানতে চাই,—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙ্গানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দু'জনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সেই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নিচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সস্নেহ কৌতুকে তর্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়িতে আমার যাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে, ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা-ধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানিনে এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দু'খানি কুঁচিয়ে দাও না গোঁসাই!

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানিনে গোঁসাই!

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি এ লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ

সময় তাঁহার নির্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইঁহার ধর্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখবোধ হয়। আপনি বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে, কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি, তবে একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহমূর্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয়, এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুইদিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম।

গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানিনে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা এঁর কানেও গেছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া কহিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই, আমি তাকে থামাব কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমার পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

দ্বারিকাদাস কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ ক'রো না গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিল। আর বোষ্টম-বৈরাগীদের আদর-যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখিরিদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেখানেই তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায়-গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্যাদা খর্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য হইয়া গেলাম,—সে কি নবীন, সে ত এখানেও আর আসে না!

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন্ বনেবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

তার সন্ধান করা ত দরকার নবীন?

দরকার ত জানি, কিন্তু খুঁজব কোথায়? বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারিনে বাবু, কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমলিলতা।

কিন্তু সে জানবে কি করে নবীন?

সে জানে না? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমললতা কিছুই জানে না নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন সে আখড়ার বাইরেও যাইনি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানে না? ও সব জানে। বোষ্টমী কি মন্তর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নব্‌নের পাল্লায়, ওর চোখমুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেলকিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টম মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে করে ঠাকুর-দেবতার

সেবা করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া বৈ ত নয়—ওকে টাকার কাঙ্গাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন!

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দরঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্যি চাই। নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানাঘুষোয় শুনচি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজব সত্যি নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও ত কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন। সেদিন খামকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুৎ রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা!

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কাল কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়! সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল-করা স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর।

এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন কৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।

নবীন চলিয়া গেছে, বকুলতলার সেই ভাঙ্গা বেদীটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি, আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বৌভাতে অন্নগ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহনের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি, পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌঁছতে তোমার রাত হবে নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আস্তে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলব না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে, বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না, সেও তোমাকে আমি বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল যাবো—কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা গেল না।

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কি রে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

নয়

আজ অবেলায় কলিকাতার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তার পরে এর চেয়েও দুঃখময় বর্মায় নির্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটিবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গণিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা। তথাপি মনের মধ্যে সন্দেহ নাই দশদিন পূর্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিয়াছি, তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে! অর্থাৎ অমুকের জীবনটা যেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের মত তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাব। গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কষার বাহিরে দুনিয়ার আর কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষেও তীক্ষ্ণতায় তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাদাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশন চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাবার মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পৌঁছিলে যখন হউক গাড়ি একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এপথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গেছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান। তাই ত বটে; এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে

গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরমস্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারি একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক-ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষ্ণবীর আউশফুলের গন্ধ! ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙ্গিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটে-ভরা বুড়ো মানুষের মত তাহার চেহারা—সেদিনের মত আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং ঊর্ধ্বে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে

তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি, আর্শি-চিরুনি, আলতা, তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশি প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ি বাড়ি বিক্রি করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জাম। বড় ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোরকাঁটা। এই কিনিতে যখন-তখন তাহাকে ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশগাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হয়ত খুব বেশিদিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই

হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙ্গা চালের নীচে দিয়া গুড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না, এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ-দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙ্গা পাড়ের সেলাইকরা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা-রানী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্তি নূতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির শখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায়

মুগ্ধ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দশায় পড়িয়া সেই রঙ-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বান্ডিল, দেখামাত্রই সেকথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃতশিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাঙ্গাচোরা জিনিস দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গেছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়ামোছা করিবার তাগিদ গেছে ফুরাইয়া—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থাকিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙ্গা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম, কেন এমন ‘হয়? আর কোন একটা দিনে এ-সব দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্রধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ি মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজলচক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটা দিন মানুষের জীবনের কতটুকু, অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তার পরে চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, দিন-দশেকের সাথী নতুনগোঁসাইকে ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে!

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া কোন-কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি এতটা কাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্বাহিত হয় না। দ্বিধায় দুর্বল সকল সঙ্কল্প সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—

মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে-পথে দু'জনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই, কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে নতুনগোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিঘ্ন ঘটিবে না। বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি! যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শ্মশানপথে তাহার সে কি ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশ্বাসে সে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেব নাকি? কই যাও ত দেখি। এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা, না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আরায় পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারে না— এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম— সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকরিতে? নূতন ত নয়—সেদিনই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই ত বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যেভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকি নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি,

বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

গাড়ি আসিয়া হাওড়া স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিসপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকী, সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকরি, রহিল আমার বর্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না।

হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম—রতন, কখন এলি রে?

এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে। খাওয়া হয়নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুস্কিলে ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুশি হইয়া কহিল, তবে ত ভালোই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপতে বিনয়ের অবতার! কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকানে খুঁজে দ্যাখ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস, কিন্তু শুভাগমন হ’লো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি?

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখালেখিতে অনেক ভজকটো। যা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে, না। মা নিজেই এসেচেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কিছু ত একটা করা চাই! জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে! না বাবু, আমরা চারদিন হ'লো এসেছি—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্চি। চলুন।

কোথায়? কতদূরে?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ি ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর একদফা জামা-কাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারে কোন্ একটা গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ি, সুমুখে প্রাচীরঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান। রাজলক্ষ্মীর বুড়া দরোয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজী?

বলিলাম, হাঁ তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিতে কুর্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙ্গলা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দ-সাড়ায় বোধ করি সেইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে বেচারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ বাড়িতে আপন মর্যাদা বহাল রাখে।

বলিল, এসে পর্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্যন্ত সেজে রাখতে পারনি? যাও জল্‌দি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুল-কাটা জাজিম ও গোটা-দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসচ্ছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ-ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নূতন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্বে এগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা!

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থদেহে ওঁকে যে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেচি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নূতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়জলে স্নান করিয়া যেন সে নবকলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়িটার বিলিব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই

ক'দিনেই ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটাকয়েক মাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অত দেখচ?

দেখছি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাই ত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত-দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচ না কি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেচে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানব কি করে?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বৈ কি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাব। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেব? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্চি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলার কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হ'লো?

বলিলাম, চোখে দেখিনি, কানে শুনেছি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক করলে! আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেব, কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বৈ কি! বোষ্টমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসত। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল—সেই বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে শুনেচি সব ভয়ঙ্কর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আরায় যে মূর্তি দেখেচি! মাথায় জট পাকানো, গা-ময় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে হাসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উলকিপরা অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো।

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছে, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেব। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বলিল, সে তোমার মত বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মত ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে ভীতু বলে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলত আমাকে অহঙ্কারী—দাম্ভিক।

কেন তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুনগোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার মত উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে?

বললে, এরকম উদাসীন, বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কি না আমি দুর্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল।পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসী-মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈষ্ণবীর প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি। কিন্তু তিনি তোমার নাম ত দিলেন নতুনগোঁসাই—তাঁর নামটি কি?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কমলিলতাও বলে। বলে, ও জাদু জানে। বলে, ওর কীর্তনগানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কত?

বোধ হয় তোমার মতই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা, উলকিপরা যাদের তুমি দেখেচ তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেছি। যে ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধ্যি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাব কোথাকার কে এক কমললতাকে? ছি! এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁশ হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্তবড় বীভৎস

জন্তুর মত কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ হয় এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এরকম কলকাতায় চলে এলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন মন কেমন করতে লাগল যে কিছুতেই টিকতে পারলুম না, ভয় হ'লো বুঝি হার্টফেল করবো—এ জন্মে আর চোখে দেখতে পাব না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জ্বালায় মুখ পর্যন্ত দেখতে পাইনে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেল, কিন্তু পরিবর্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশি কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলিনে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ কখনো তোমাকে দিয়েচি লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর

তোমার অসম্মান হতে দিলুম —তার শাস্তি এখন তাই দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলচে। দেখতে পাচ্চ ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাহলে মন্তর পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মত কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে জুটল ধর্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হ'লো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরল। খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ড নেই—গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে হু-হু করে, পুজোয় বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।

কে ধরলে?—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাটল। কোথা দিয়ে যে কাটল জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম। গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়।

আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় একমুহূর্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস করো?

এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না!

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রি করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালোবাসত, আমাকে বেটী বলে ডাকত। আশ্চর্য হয়ে বললে, বেটী, আপ ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাব, আমাকে একটি বাড়ি ঠিক করে দিতে পার?

সে বললে, পারি। বাঙ্গালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল, সস্তায় কিনেছিল; বললে, চাও ত বাড়িটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি।

সাউজী ধর্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজি হয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এ-সব জিনিসপত্র কিনা দিয়েচে। ছ-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এলুম, মনে মনে বললুম, মা অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেচো, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘটত না। দেখা তাঁর আমি পাবই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত চল না। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মান্দির আছে—এসব দেখতে পাব।

কহিলাম, কিন্তু সে যে বড় নোংরা দেশ লক্ষ্মী, শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপর অসাড়ের মত তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস আমার গলার উপরে, গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

দশ

ওগো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হ'লো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি-ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো। নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলচি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দোব।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা। সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্তচন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নূতন রাঙ্গা বারাণসী শাড়ি, পুবের জানালা দিয়া একটুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপাহাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূ-দুটির নীচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলমল করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অত দেখচো বলো ত?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অত দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু দেখতে ভালো কিনা, কমললতা দেখতে ভালো কিনা—না?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না সে এমনিই বলা যায়। অত করে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক গে। কিন্তু গুণে?

গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

হাঁ চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি করে?

বাঃ—তা আর বুঝিনে? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়ত। মনে নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামকা তোমায় ভীতু বলে অপবাদ দিয়েছি বৈ ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনীটা শোনেনি বুঝি?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে? সেই যে পাঠশালার ছুটি হলে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গোরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়ত—মানুষ ত কোন ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি মা, তৈরি হতে দেরি হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরি ক'রো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন খেপে যাবে! ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস রতন?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যই বড় ভালোবাসে।

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেব। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমন্তন্নপত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা ব'লো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবার সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁগো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত?

না।

না, বৈ কি। তোমরা সব পার।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দু'চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে না, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারব না—আমি নিজে নিয়ে যাব হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা?

রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েচে আমি জানিনে মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে—গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারব না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ো, সে বর্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি করো না যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানিনে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম জীবনের সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরব—তা ছাড়া কখনো পরব না।

তাই পরেছ আজ?

হ্যাঁ, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়ো গে!

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এখনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ত ছুটি পাব।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিল তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে শুরু হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখব, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই! খাই-দাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাট যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশা'দের যেমন কেনা-বাঁদী থাকত তার বেশি তোমার কাছে চাইব না।

এত বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সত্যি। আপনার ওজন বুঝে চলিনি, তোমাকে মানিনি তাই অপরাধের পরে অপরাধ করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেছো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়। কতদিন হ'লো ঠাকুর-দেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারিনি—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা ক'রো না—যাবার হুকুম দাও।

তবে চলো, দু'জনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে তাচ্ছিল্ল্য করবে না ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারব না, বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিয়ো।

কি বর চাইব বলো।

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সেকথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তুমি বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইব আয়ু, চাইব স্বাস্থ্য, আর চাইব আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পার, প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার সর্বনাশ করো। করতেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হ'লো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারব!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা বলে এও আমার সয় না। কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু একাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করত হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি? আরও খাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে?

ঠাওরাতে পারিনি, খুঁজে বেড়াচ্চি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয়?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখ্‌খনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত। কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ গোঁসাই। কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হ্যাঁগো করে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকব নতুনগোঁসাইজী বলে।

স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে—তাতেও স্বস্তি পাবে। বলো, ঠিক না?

হাসিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো মলেও যায় না। বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মত কথাই হচ্ছে বটে। এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিত।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্ট যে, কোন জল্লাদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে! দুধ কই? মাথা খাও, উঠে প'ড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ, আর সেই কমললতা !

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হ'ত, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসল না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়া এনে চুল কেটে গয়না খুলে একবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হ'লো বলে। এক আপদ তুমি—সে ত বিদায় হ'লো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামে না। ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুর-দেবতা করলে অন্তর্ধান, বুক উঠল শুকিয়ে, ভয় হ'লো এই যদি ধর্মের সাধনা তবে এ-সব হচ্চে কি ! শেষে পাগল হবো নাকি !

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান ! টিকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েচি।

কোথায় পেলে?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাব তোমার কাছে ! আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশ'বার ক্রীতদাসী-ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কত, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে—আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে, তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ

আর ফিরুতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক গে আমার ধর্মচর্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায়? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইল যে।

আর পারিনে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়েও থাকি সে অনেক দিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাব।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলব না। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙ্গে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! তারপর দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ি এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত-নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝরনার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বয়ে গেল। আনি গে দুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমায় খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ, আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দু'জনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি নয়টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সহজ-মানুষের মত কাছে আসিয়া বসিল।

বলিলাম, রাজপোশাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোশাকই বটে। কিন্তু রাজার দেওয়া যে! যখন মরব, ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে, এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যা হোক! তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখেচো খেতে?

দেখিনি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়। মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা ক'বো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাইনে, কিন্তু কি ক'রে খাব বলো ত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসত, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছুই নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি ?

তাই ত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোকদেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাব কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হ'লো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারে শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারনি।

হাতটা ধুয়ে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ববিধ কাজকর্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে? দোষ বৈ কি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিল সকলের আগে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই সকলের চোখে পড়ে গেল। এমনিই হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচল, কিন্তু ম’লো তার স্নেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে? বুঝেছে কমললতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই?

এই বৈ কি! আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনের সব কালি মুছে গেছে—আর কোন গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে?

মিছেই ত। কালি মুছবে ম’লে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েচি, কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্য!

তা জানি। কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এমনি নিরুদ্দেশ হবো, কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাইনি লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাওনি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করি যে।

না, তাকে আর ভয় ক'রো না, সে রাক্ষুসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবেই থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্মায় যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরি? কিন্তু আমরা ত দু'জন—কতটুকুতেই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই!

সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবে না, ও তোমার ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসব।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি ক'রে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পার।

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যি কষ্ট হবে। রাঁধাবাড়া, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকররা করবে কি?

কোথায় ঝি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক। কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পুজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসৎ।

তা হোক গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি।

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দু'দিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের? সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনব। রেখে আসতে হবে না ত! এই বলিয়া সে একমুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট্ট বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেব তাই খাবে, যা পরতে দেব তাই পরবে,—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইব না।

সহসা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া হাসিল, আমরা কবে যাব?

বলিলাম, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে চল যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্বে একবার দেখা দিয়ে আসব তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চল কালই দু'জনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমললতা, আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা। এ হয়েছে ভালো।

এ-সব কে তোমাকে বললে?

তুমিই বলেছ।

না, আমি বলিনি।

হাঁ, তুমিই বলেছ, শুধু জানো না কখন বলেছ।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয়?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কুপিত-কণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েছ তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসব।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চল যাই।

হাঁ চল, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব দু'জনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়!

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল।

এগার

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়িতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার স্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে না কি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু'একদিন থাকব না? দেশের বনজঙ্গল, নদীনালা, মাঠঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই? আমার দেখতে সাধ যায় না?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধুহাতে যেতে বলো? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে, বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে, কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে পারে না। যদিবা

এ-সব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহুল্যভার কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটাকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়েপাণ্ডার সযত্ন-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে, পরনে তেমনি নানা ফুলে-ফুলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ি, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের 'পরে স্নিগ্ধ-প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লম্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ-দুটা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্নাবসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল—বাড়িতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানি হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশি বাঁধাবাঁধি শুচিবায়ুগ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার 'পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছ? এভাবে বারে বারে কি আমাকে এত দেখ বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম বিধাতাকে ফরমাশ দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার? আমার পাঁচ-ছ’বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিল—মনে নেই বুঝি?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

চালান দেবার সময় কানে কানে তিনি বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হ’লো চা খাওয়া? দেরি করলে যে আজও যাওয়া হবে না।

নাই বা হ’লো।

কেন বলো ত?

সেখানে ভিড়ের মধ্যে হয়ত তোমাকে খুঁজে পাব না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমিই তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না, সে হবে না। লক্ষ্মীটি চল। শুনেচি নতুনগোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙ্গে রেখে দেব। ভয় নেই, খুঁজতে হবে না—দাসীকে এমনই পাবে।

তবে চলো।

আমরা মঠে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্নকালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুশি হইল বলিতে পারি না। বড়গোঁসাই আশ্রমে নাই, গুরুদেবকে দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন-দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমললতা, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল; কমললতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুনগোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা। বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন, কেবল আমার জন্যেই ঘটে

ওঠেনি। ওটা আমারই দোষে।

কমললতার মুখ ক্ষণকালের জন্যে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ

ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্তঘরের মেয়ে তাহা সবাই

বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে

নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায় না,

বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচো না?

কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বৃন্দাবনে দেখনি কখনো?

কমললতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এদেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের

ধারেও যাইনি,—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে

আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম—

দুটিতে যেন ভাইবোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মত

আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক এক রকম দেখতে। দু'জনেই লম্বা

ছিপছিপে—শুধু তুমি ফর্সা, আর নতুনগোঁসাই কালো, তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক একরকম না হয়ে কি

কোন উপায় আছে পদ্মা।

ও মা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোঁসাই বলেছে বুঝি?

বলেছে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম, বললুম, সেখানে একলা যাবে কেন,

আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে দেখলে কেউ কলঙ্কও

রটাবে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিষ লেগে থাকবে, উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মেয়েদের এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই

জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাশা কোরচ বলো ত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মত বলিল, সত্যি তামাশাটা কি তুমিই না হয় বলে দাও! যা

জানি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?

তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম,—সরল মনে বলচি! কমললতা,

এত বড় শয়তান ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি একটা মতলব আছে,

কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে কর গোঁসাই। তা হ'লে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার

মনেই কোন মতলব আছে?

আছেই ত।

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

হাঁ, যুধিষ্ঠির!

কমললতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গিতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল

না, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ সেদিনও আমি ত কোন রমণীর সম্বন্ধেই নিজের কোন

আভাস দিই নাই। আর দিবই বা কি করিয়া। দিবার সেদিন ছিলই বা কি!

কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি,

ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমক দিল—পোড়ারমুখীর ভারী বুদ্ধি! কি বুঝেচিস্ বল্ ত?

নিশ্চয় বুঝেচি। বলব?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু

কথায় কথায় বেলা বাড়ছে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসোনি

জানি—চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাব।

তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান।খাওয়া-

ছোঁওয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে, এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যর প্রশ্নই

অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত

প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে

সে কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি

শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল

পাওয়ার বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তাহার যতকিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল

না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অত কষ্ট করার! একালে অত বাছতে গেলে

মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানি না সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর

ভয়ঙ্কর একটা-কিছু না ঘটিলেই সে খুশি। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো বা

সে দুই কান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে,

আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হ'লে! তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল!

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জন মঠে যে-কয়টি প্রাণী শান্তিতে

বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্বাশ্রমের কথা

ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচে-শ্রদ্ধায়

বিতরণ করা এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই। কিন্তু

এই অপ্রীতিকর কার্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত

পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছুই

বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা শুদ্ধমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই

মাথা নিচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্বাক অভিযোগের জবাব যে কি, এইখানে

দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাতমুখ ধুয়েছো?

না।

তবে এস আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্চে।

প্রসাদটা কি হ'লো আজ?

আজ হ'লো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়ের সঙ্গে তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাব পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি নিজে।

সে খাবে না?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করলে না?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগল। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু'বোনে গিয়ে জন্মাব এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু'বোনে একপাতায় বসে খাব। তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান মলে দেবে।

শুনিয়া খুশি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও শুনে হাসতে লাগল, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড় বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আস্পর্ধা কিছুতেই সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দু'জনের ভারি একটি মিল হইয়া গেছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গোঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্বাঙ্গের ছাপছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়া বড়গোঁসাই খুশি হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ, শুনা গেল—ইহাদের একজন নামজাদা কীর্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে —গায়ের চামড়া বাঁচান দায়। আসন্ন সূর্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচুজাতীয় 'আঁধারমানিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে তিষ্ঠিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা ফুল এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্তন করিলাম, গিয়া দেখি, সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কীর্তন শুনতে তুমি ভালোবাস, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনো সারেনি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেচে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে স্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাব।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাব। আমাকে বলিল, তুমি কীর্তন শুনতে এত ভালোবাস, কই আমাকে ত সে কথা কখনো বলোনি?

উত্তর দিলাম, কেন বোলব তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুরবেলাটা কাটত শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে চাইত না—

রাজলক্ষ্মী চট করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমললতাদিদি, বলে এসো ত ভাই তোমার বড়গোঁসাইজীকে, আজ বাবাজীমশায়ের কীর্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাব।

কমললতা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুঁতে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুশি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও তত ভাবিনে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হ'লে কিন্তু বকশিশ পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সম্মুখে যেন বকশিশ দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশি হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, দূর হ পোড়ামুখী—চুপ কর। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলা। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণবসমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান হইতে কীর্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলা হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট

অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী মূর্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহর দাস ও তাঁহার মদৃঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলীকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে, কে একজন সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্তশালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাসদাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসম্ভার, আর আসিয়াছে কে এক নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।

মনোহর দাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি একসময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বসিল। হঠাৎ বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ি, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীল রঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়েপাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্টশান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল, সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়।

দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহর দাসও মনে মনে কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান শুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব-কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত! শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্বাসা—কাহাকে বেশি প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খলনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি একথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কি না।

সে গাহিতেছিল—

"একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জরজর ভেল,
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতঁহি গোবিন্দদাস।।"

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল; তিনি আবেশ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয়, ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইল, বকশিশের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল, জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে প'রে ফেললে আর খুলতে পারবে না এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ—কি দাতা! সে ত তোমারি থাকত গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী, তোমার কাছে সত্যই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যই আমি রাগ করব।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখব কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল। তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই।

না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে!

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে; কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যা হোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে রাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙ্গাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্তে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকেই সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারি তৃপ্তি লাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দু'জনে—তাহারা কতকালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গোঁসাই,

সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওর দু'টি কান ভাল করে মলে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা শর্ত করিয়ে নিয়েছি গোঁসাই। যদি মরি, ওঁকে বোষ্টমিগিরি ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ভুত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপব—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মত—কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ব।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশি দেরি ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেচি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে। রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা ব'লো না গোঁসাই, সে কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সেও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই চিনেছি, শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমি ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে; নবীন জানাইল সেদেশে কি এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে

পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্যু চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ঘরসংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে! চক্কোত্তিমশাইকে দিনরাত সাধচি, ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ' টাকা দেব, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটলে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াব, তারপর সেই আগুনে নিজে মরব আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখব না।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁখানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ একটেরে, ইস্টিশান থেকে অনেকদূর যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে-সকল হইতে কোন হদিস মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্বেও বিধবা মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ'দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো,—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে। একপয়সাও আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়। গেলাম দু'জনে চক্রবর্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী, পরদুঃখকাতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমনকি জেলার নাম পর্যন্ত না।

বহু চেষ্টায় একটা টাইম টেবল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমস্ত রেল-স্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু স্টেশনের আদ্যক্ষর পর্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত কি জিনিসপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারিনে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি মাথার ওপর ধর্ম আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।

চক্রবর্তী স্নেহার্দ্র-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস্ কেন দাদা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, পারলে কি আর এটুকু করিনে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানিনে, তোমাকে শেষবারের মত বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চল, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাব সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস!

অতএব, পুনরায় দু'জনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম চক্রবর্তী পোড়া কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুরঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে; বাবাজীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ সুপ্রচুর প্রসাদসেবার পরিশ্রমে নির্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর একদফা লড়িতে হইবে তাহার বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক; পাঁজি, পুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাঁহার কাছে। আমার প্রতি সর্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এয়েছে।

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহরগোঁসাই তোমাকে অমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক দিদি, ও আর জিজ্ঞাসা করো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধুলোবালি উঠেচে মাথায়—স্নানটান হয়েচে ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে, আমি রাজরানী হবো।

কি দিলে?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারে—বাঙ্গালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখিনি। দেখবেন, আমার হাতদেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুলফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুলফুলই সই! আমি এর থেকেই বলে দেব আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পার ঠাকুর?

পারি। খবর ভালো, দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া বলিল, দেখলে ত! আমি বলচি ইনি খুব ভালো গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়া—

ফাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্র। মরণ-বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার আর হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা, ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পার?

কেন পারব না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চল গোঁসাই তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখহাত ধোবার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া

কহিল, দ্যাখো, তোমাকে একশো বার বলেচি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি, কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরি করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল—'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমললতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, বনেজঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন গেল?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই।

আমি বলিলাম, ও দেখেনি, ওর অনুমান। গণকব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেল। শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি? সে যা দেখবে তাই ত বলবে? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কারও কখনো ঘটে না নাকি?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে, সেও চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করামাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসি গে?

বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ-দুটো অত রাঙ্গা দেখাচ্চে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসোনি ত?

না স্নান আজ করিনি।

কি খেলে সেখানে?

খাইনি কিছুই, ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখ ত এঁর গা-টা গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হ'লোই বা একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়োনি? এসেছ আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করব ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্তকণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে এখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাতে বার বার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হ'লে সহজে সারে না—ভারী ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণক্কার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেচে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয়নি, তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েচে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই?

নিকটে দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি-রকম কথা যে একজনের মনে রইল, আর একজনের রইল না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয়নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড় রে রাজু।

ইঃ ভারি বড়ো! মোটে পাঁচ-ছয় বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন’ বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হ’লে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষুনি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি করে?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচিফলের মালা। সে যাকে দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমললতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে শুরু হ'লো—আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কি-ই না ভাবে! তার পরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালাম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়াছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েচেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দু'জনকে দু'জনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ ক'রো না। আমার ছেলেবেলার সে রাঙ্গা মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁগো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙ্গুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, ব'সো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই গোঁসাই। অনেক উপদ্রব করেছি, যাবার আগেই তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা-ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারব না ভাই। কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো জ্বলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমললতা নাম দিয়েচে নতুনগোঁসাই, আর নাম দিলাম আজ আনন্দময়ী—

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই তোমাদের চোখে লাগল, কিন্তু কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্র কর্ণরন্ধ্রে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা ক'রো। আনন্দময়ীর সম্বন্ধে, অন্ততঃ রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিনরাত আমায় হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসব এই রোগা-পটকা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসব—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারব। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই, যেন আমি শীগ্‌গির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ী কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাব, তারা কানুসেবার কিবা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়! কিন্তু তুমি জানতে পেরেছ ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্বাদ ক'রো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসেখেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একগুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাব কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি, আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্বপ্রকার হাস্যপরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতেই ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেননা লোকের কাছে আমার

রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তিনসত্যি করো। বলো এ কথা কখনো মিথ্যে হবে না। বলিতে বলিতেই উদ্‌গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপচাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া রহিল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ পোড়ারমুখো গোণক্কারটা মিছিমিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটা-দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

স্টেশনে পৌঁছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ারমুখো গোণক্কার' লোকটাকে। প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু ত হবে না! আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না, ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না। ওকে যা দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহশান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

বার

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্মা-অফিসের একজন বড়দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়াছিলেন। নিজেই শর্ত করিয়াছিলেন, শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন, তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করব আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনর দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণপোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণপোষণের কথাই ভাবচি বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে-সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেব এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাব, না হয় উপোস করব।

তা হলে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচ সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ কর তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

বলিনি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এ-সব কথা আজ কেন বলচ লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে, কিন্তু এ যে আমার রাত্রিদিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্মপথের উপার্জন দিয়ে আমি ঠাকুর-দেবতার সেবা করি? সে অর্থের এককণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস কর কই?

বিশ্বাস করি ত!

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দু'দিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না কোন কথা, কখনো বললে না, লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বল। কেন জিজ্ঞাসা করনি? করনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর না আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচ। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলব না। কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও-কথায় আমি ভুলব না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুস্কিল! আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে । তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে, উচিত মনে হলে আমাকে দূর করে দিতে পার?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্থ কোরচ লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায়

দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়াব এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব, এ সকল ভয়াবহ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ কর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো, ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন?

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেককাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর ত শুনেছিলে?

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে মরে তবু যা হোক একটা সদ্‌গতি হ'লো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল,—যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহা'ও বলোনি আমি দিব্যি করে বলতে পারি । কই, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে করে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ

তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম, এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাব না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহারা মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মন নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মত সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমললতা। সংসারে একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারি একটি তৃপ্তি বোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রি করার—

এবার কার কাছে?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধুরত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে—কি হ'লো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা। কিন্তু তার পরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা তুমি বাড়ি যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েচি যে। বললুম, সে টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও,

দালালির টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ দেব। বললুম, আজ রাত্রির গাড়িতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেব আমি আপনাকে আপনি বিক্রি করে মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্ছি না। মা বিদেয় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—আহা! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হলে তোমার মুখের সেই 'আহা'টুকুই আমার ঢের। কিন্তু এবার যেদিন সত্যিসত্যিই মরব সেদিন কিন্তু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো।

ব'লো, পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালাবদল করেচে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাব।

একি, তুমি কাঁদচো যে!

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলেমানুষের ওপর তার আত্মীয়স্বজন যত অত্যাচার করেছে, অন্তর্যামী ভগবান কি তা দেখতে পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না, চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মত পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোনকালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা! কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্ম্মেকর্ম্মে তোমার-আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতই। একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজন বধ করে না, নির্ম্মম হয়ে বিদায় করে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্ম্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটচে।

তার পরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তার পরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। নাকখত দিয়ে বলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এ জীবনে এত ভুল আর করব না, রইল আমার জপতপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়। কিন্তু তোমার গল্পের কি হ'লো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলকচক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙ্গালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ! তাঁকে বলতুম আমি, দাদামশাই—আমাকে সত্যিই বড় ভালোবাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষে কর, এ-সব আর আমি পারব না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরলুম—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, মথুরা—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ি কিনে খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেচ।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হ'তো মিথ্যা বানানো একটা গল্প শুনচি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পার হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন! তোমার ভয়, মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

আমার মনের কথাই বা তুমি জানলে কি করে?

আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পারো কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববে না, এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরানো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হ'তে পারি। এমনই যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবচো? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখনি, কিংবা দেখেচো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পার? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাকখত দিয়েচি বলে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া করে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেচ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ, সেখানেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে দেখেচো রঙীন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশজোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বোলব আমার হাত-পা বাঁধা—নইলে এমন জব্দ করতাম যে জন্মে ভুলতে না। কিন্তু সে থাক গে, আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হ'য়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেব না।

বলিলাম, এই জন্যেই ত আমি যত শীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরিতে গিয়ে ভর্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে ত দিতে পারব না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠব না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান কর?

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত বাঘ-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্মা মানুষ আমাকে দিলেন, যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনার ত্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্ম্মঠ লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটেখাটো জোয়ান, যাকে কেউ

হারাতে কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হাঁ ছাড়া যে না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্বাকমুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ সর্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল।

বলিলাম, ও কি ও?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে ছবি তুমি আঁকলে তার অর্ধেক সত্যি হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মত এমন অকর্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করবো, আর চিরকাল জ্বলেপুড়ে মরবো। এ-জন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেব। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকব, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্ সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জ্বেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনোদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনোদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত যদি কেউ কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা-কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হ'লো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখিরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিয়ো মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কেই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে! আমি পারব, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি করে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। ঐ ত আমার পুজো, ঐ ত আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই, চায়ের জল তৈরি হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এত ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না?

তাতে টাকা ত আসবে না?

কি হবে টাকায়? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের মত করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুরঘর। এ জন্মে রইল আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না, কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি করে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলেচে খুব শীঘ্র, তারপরে সকলে মিলে যাব গঙ্গামাটিতে—থাকব সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সঙ সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েচে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে—দাগটুকু পর্যন্ত নেই । আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সে হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তারে দেব একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পাল্লায় পড়—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ আমার কেটেচে। বাপরে বাপ; এমনি ধর্মবুদ্ধি দিলে যে দিনেরাতে না পারি চোখের জল থামাতে, না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যা-ই হোক, অস্থির মনের লোক নয়। সে সত্যি ব'লে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিচ্ছু চাইনে। এ যদি না ভগবানের নির্দেশ হয় ত আর কি হবে বল ত? প্রতিদিন পূজা করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাই ত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাজে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করবো বলে।

বলিলাম, ক'রো।

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মত এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁজ যতদিন না মরবে ততদিন ও-বিদ্যে কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প ত নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মত নেই—আর সে-কথাও আমি বলিনি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্র-কথা, কত গল্প-উপাখ্যান জানে, ওর মুখে শুনে শুনেই ত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাই ত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই দ্যাখো ওর বিদ্যের মধ্যে কোথায় মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকেও সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয়; কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে

না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হ'ল সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হ'তো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্‌খনো না। সে করেছে ওর বড় জা কেঁদেকেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাশুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্রশিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে? হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয়, সত্যি করে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় এ-সব এলো কোথা থেকে। সে যাকগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারীগিন্নির সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্মা? আমার চাকরি?

আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেব না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বল না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর—খাঁটি বৈষ্ণবী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব!

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া! সে প্লেগের ভয়ও করেনি, সে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ হয়ত আমাকে তুমি পেতে না। আজ তাদের কি হ'লো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই, বর্মায় গিয়ে তাঁদের ধরে আনি গে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেচ তাদের নিতে। দেখো আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারব না; কিন্তু তার আগে চল না গিয়ে দিনকতক থাকি গে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েচেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রি করবে। ওটা ভাবচি কিনব। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরি করাব, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হ'তো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হ'তো না, কষ্ট হ'তো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশিদিন শহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি সরিয়া নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো, মনে শান্তি পাবে না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকো হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই, বিনাদোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবে না।

বলিলাম, শহরে আমি কোনকালেই থাকতে চাইনে। সেদিন গঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসিনি—এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছ লক্ষ্মী!

না গো না, ভুলিনি। সারাজীবনে ভুলব না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হ'তো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাব নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙ্গে গড়ে তুলব নতুন করে তোমাকে—আমার নতুনগোঁসাইজীকে! কমললতাদিদি আর যেন না দাবি করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এই-সব বুঝি ভেবে স্থির করেছো?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেব—তার ঋণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সে আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে

নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই; আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচো!

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানব না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমারও ছিল না, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমরা দু'বোনে মামার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোন। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি, কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতই

স্বভাব-কুলীন। বয়স ষাটের কাছে। আমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে এক'শ', মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্নত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু'-দুটো ভাগনীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁটলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্যু করে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া শুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশণ্ডিকে হোক, সে বললে, সে অত হাবা নয়, এসব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা-ঢাকা দিলে, বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়া কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হ'লো, সেখানে সে যায়নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বার করা হ'লো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এল বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পুরো হ'লো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বঁইচির মালা—তাও কিনতে হয়নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত আমার মত অমুল্য ধন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাই নে, সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের দু'বোনের মত শাস্তিভোগ এদেশে কত শত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে।

এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম একটা হ'লেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক, তাতেও আমার জবাব হ'তো; কিন্তু সে আমি বলবো না। আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই-সব বিধবাদের কাছে যাঁদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আত্মীয়স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হ'তো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাব।

আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাব আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্বকথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যে-দেশে মেয়ের বিয়ে না হলে ধর্‌ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয়ত মরত না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর,

তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচে হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িতে দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা!

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েছে মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এস্টিমেট করে দেবেন। বলিয়াই উর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এস্টিমেট কিসের?

বাড়িটা মেরামত করতে হবে না? তেতলার ঘরটা আধখানা করে তারা ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

তা হবে, কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না, যাই—তোমার খাবার তৈরির সময় হয়ে গেল. এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

তের

এক সকালে স্বামীজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্ণমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েচে। বলিহারি তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেছে ত!

রতন সর্বপ্রকার সাধুসজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্মিক ব্যাটারা জানে!

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ, বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেচে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হুঁ:—বড়লোকের ছেলে! টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ পথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কই?

বোধ হয় পুজোয় বসেচেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজে দিই গে। পুজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পূজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসি গে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অত দূরে যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচা মাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করিল

না, গম্ভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভালো হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটাকয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখহাত ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনচি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন?

সে কৈফিয়ত কি আমার দেবার, আনন্দ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়েনি। আবার গা-ঢাকা দেবার মতলব নেই ত? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, ওদিকে বাড়ির কর্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি—নতুন লোক—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উয্যুগ করলে—সে কি বিভ্রাট! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মত নিঃসঙ্গ, একাকী লোকেদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তা হলে ভোলোনি, মাঝে মাঝে মনে করতে?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, দিদিকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় ত মাত্র দু-তিনদিনের, কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসিনি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী-ধর্মের বিরুদ্ধ বলে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাত মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে শুরু করে। কত ঘরেই তো আশ্রয় নিই, কিন্তু ঠিক এমনটি আর দেখিনে। আপনিও ত শুনেচি অনেক ঘুরেছেন, কোথাও দেখেছেন এঁর মত আর একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল; আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির তাড়ায় খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উলটোটা চক্ষের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্বলেপুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়িতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত?

নমুনা সেই প্রথম দিনে সাঁইথিয়া স্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তারপরে আর একটিও কখনো চোখে পড়ল না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনরাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দু'জনের কত পরামর্শই যে হয় তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে, গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তর গরীব এবং ছোটজাতের লোকের বাস, উপলক্ষ বোধ করি তাহারাই; শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই-সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গেছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়ো না আনন্দ, তোমার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, এমন কথা আর কখনো মুখে আনব না।

তবে কি কোনদিন কিছুই করব না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আনন্দ কহিল, দিদি সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণক্কার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে, উনি বাড়ির বা'র হলে আমার বুক ঢিপঢিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারিনে।

এর মধ্যে আবার গোণক্কার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুণে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মত ভাগ্যবতী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তব্ধমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলি-ব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসি গে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্ছে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্চে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করিনে আনন্দ? ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দু'জনে বসে শোনো—সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

দিদির কি সে বিদ্যেও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি! তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা ‘ঠাকুরদের’ গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধচিত্তে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড় খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি!

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেখবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হ’লো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করব। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম। কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোটভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করব।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্যহীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর করে শেখাব।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মত ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোন কালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিন কয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল; রাজলক্ষ্মী জিনিসপত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল; বাড়ির ভার রহিল বুড়া তুলসীদাসের 'পরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চারপাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এল—পড়ে দেখ। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটিদুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার

দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়োগোঁসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণাশ্রিতা—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই! কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মী—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার—অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকলে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবারে আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন।

রাজলক্ষ্মী কুশারীগৃহিণীকে প্রণাম করিল; সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভালো দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পার এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দু'দিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা!

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল। পোড়ামাটি ক্রয় করার কথাবার্তা দামদস্তুর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়ত বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারিবিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে, তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করচেন ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বৈ কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাতে নাই, লড়াই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে

দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়িঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয় মানসম্ভ্রম এ-সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই, অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনতে পাই বৈষ্ণবী কমললতার সস্নেহ অনুরোধ—নতুনগোঁসাই এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েচে গো, তোমায় কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েচে গোঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙ্গে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গেছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানত বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চয্যি। আমি উত্তর দিতে পারি না। শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্মের মধ্যেও শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়ো ত, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? অত পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে।

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্ছেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হ'লো কি? না ঘুমোলেও ত তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না?

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম করতে পারিনে।

আপনারা দু'জনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরির কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদ্‌ঘর্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুরিয়া বহু

ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পৌঁছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন-ছয়েক পূর্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এ-দেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা।

চিঠি পাইয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত!

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়?

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলব?

না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনব না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাব, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজি হইতে হইল এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ

পাণ্ডুর হইয়া গেছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মত সাবধান করিয়া কহিল, শরীরের অবহেলা করবে না বলো।

না গো, না।

ফিরতে একটা দিনও বেশি দেরি করবে না বলো?

না, তাও করব না।

অবশেষে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্নবেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগিনী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গিহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জাহীন, ভূষণহীন কাঙালবেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দু'হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারল না।

চিকিৎসা হয়েছিল?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবু নিজেই সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়ার বড়গোঁসাইজী আসতেন?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসত না নবীন?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একটিবার উঠেন নি।

আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায়?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েচেন।

কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হ'ল না। বড়গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের একতাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচব না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম,

কমললতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যে ইচ্ছে হয় ক'রো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গেছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকিরবংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্তমনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙ্গা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জামগাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতীলতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষদান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পোঁছে দিয়ে আসি গে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোশের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া

গেছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা সহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটুলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বিষয়-সম্পত্তি যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো-ভাইবোনেরা, এবং তাহার পিতার নির্মিত একটি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং হাবভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণবসেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন একটা বিব্রত উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—পূর্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণবপরিচর্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা?

না, ডেকে দেব দিদিকে?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ-সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে বসবে চল।

আমার বিছানা প্রভৃতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া

সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা-খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না।

কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরি করে আনি গে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখহাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আবার মনে হইল ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার! তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ, মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যাঁরা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হাঁ তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ অসম্ভব!

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দু'জনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যেতে হবে তা ভাবিনি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড্ড কাঁদবে। যদি পার তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভাল সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবে না?

না, আমি ভিখিরি, টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলো ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগল? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছ কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেব—অপরের টাকা নিতে যাব কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না, গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেব না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুন গোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ-ঘরেই আনব দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এস। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না, পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ, তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, তাই হবে নতুনগোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখব।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস কর গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্চে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পার?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাচ্চি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখি চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত' তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্নবেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময় আর নাই—কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল—সে আসিবে না। শেষবিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্বাহ্নেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেছে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভালো লিখতে জানিনে, গোঁসাই।

তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেব।

দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

চৌদ্দ

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে স্টেশনে। লোকের ভিড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চললে?

এ-ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না কমললতা?

এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে?

যাব বৃন্দাবনে। কিন্তু অত দুরের টিকিট চাইনে—তুমি কাছাকাছি কোন-একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তার পরে শুধু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ হয়। এই ত?

ভিক্ষে কি এই প্রথম শুরু হবে গোঁসাই? আর কি কখনো করিনি?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চল একসঙ্গে যাই।

তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম, না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ি আসিলে দু'জনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচ গোঁসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

সত্যিই মনে রাখতে চাই কমললতা। তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই।

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ডবাসের কথা, কত তীর্থভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে, মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি; বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, বললেন, নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাব যদি তুমি যেতে বল। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাব?

এ প্রশ্নের সে উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোঝা? দেব দু-একটা বার করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরির গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখারিকেও খেতে হয়। পৌঁছতে আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্, রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব, থাক ও-সব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই; কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে ঊষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশি বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের 'পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া

আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

উপন্যাস সমগ্র সমাপ্ত